দীনেশচন্দ্র সেন ও মণিলাল বসু সংখ্যা

বৈশাখ ১৩৭৩

উত্তরশ্রী

CALCUTTA UNIVERSITY

সম্পাদিকা লীলা রায়

JAYASREE

Socio-Cultural Bengali Monthly
Founded in 1931

Advertisement Rate Schedule

Current from April, 1966

Ordinary

Re	100·00
Its	55·00
Its	30·00

For Special Position Contact *Advt. Manager* Jayasree.

Advertising Space 20·5Cm × 15·24Cm
(8" × 6")

জয়শ্রীর নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্য

জয়শ্রী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক সডাক ৯·৫০। বাণ্মাসিক ৪·৭৫। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে হয় না।

লেখকদের জন্য

শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ সর্বাগ্রে দেওয়া হয়।

লেখা পত্রিকার দফতরে ফুলস্ক্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। কারণ হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই।

কবিতা সম্বন্ধেও তাই নিয়ম।

উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়।

শক্তিশালী নূতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহযোগিতার জন্য আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কলকাতার সব স্টলে জয়শ্রী পাওয়া যায়।

প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী
৩১২, পামুলিবাগান
কলিকাতা-৪৭
ফোন ৪৬-৪১১৬

ইঞ্জিনিয়ারিং উৎকর্ষে

অনেক অনেক গ্রীষ্মের উপযোগী

ওরিয়েন্ট

সীলিং পাখা

দু' বছরের গ্যারান্টিযুক্ত

ওরিয়েন্ট জেনারেল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ, কলিকাতা-৫০

ASP/OGI-2/66

Tele : BEBELTI OR 23-1961-52-53

With Best Compliments from

THE BENGAL BELTING WORKS LTD.

MANUFACTURERS OF COTTON & HAIR BELTINGS,
PLY RUBBER TRAIN LIGHTING BELTINGS,
COTTON & RUBBER HOSES, CONVEYOR
BELTINGS & LISTINGS.

2, DALHOUSIE SQUARE EAST
CALCUTTA

সূচীপত্র

জয়শ্রী : বৈশাখ : ১৩৭৩

বিষয়		পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১৩৭৩		১	বঙ্গভারতীর ভক্তপূজারী (প্রবন্ধ)	জনার্দন চক্রবর্তী	
সম্পাদকীয়		৪	আচার্য নীলেশচন্দ্র ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ (আলোচনা)	ত্রিপুরাশঙ্কর সেন	
রবীন্দ্র চিত্রকলা (প্রবন্ধ)	নন্দলাল বসু	৯	নীলেশচন্দ্র, বঙ্গভারতী ও সাহিত্য (প্রবন্ধ)	অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	
আচার্য নন্দলাল (শ্রদ্ধাতর্পণ)	সুজিত কুমার মুখোপাধ্যায়		কণ্ঠ-ভরা বিষ (উপন্যাস)	বিভূতি মুখোপাধ্যায়	৫৯
৺ নন্দলাল বসু (স্মৃতিতর্পণ)	সুধাকান্ত রায় চৌধুরী		জল-মাটি-মন (উপন্যাস)	মহীতোষ বিশ্বাস	৬৩
সুভাষচন্দ্র (ধারাবাহিক রচনা)	পবিত্রকুমার ঘোষ		হেগেলীয় দর্শন (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	অনিল রায়	৬৯
সাতনম্বর বিশ্বকোষ লেন (স্মৃতিচারণ)	প্রেমেন্দ্র মিত্র	৩৭			

প্রচ্ছদচিত্র : কলাভবনের অধ্যক্ষ V. R. Chitre-এর সহযোগিতায় ও শ্রীসুজিত কুমার মুখোপাধ্যায়-এর সৌজন্যে শ্রীভবেশ সাহা কর্তৃক নির্মিত নন্দলাল বসুর মূর্তিটির ফটো আমরা পেয়েছি। এঁদের সবার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। জঃ সঃ

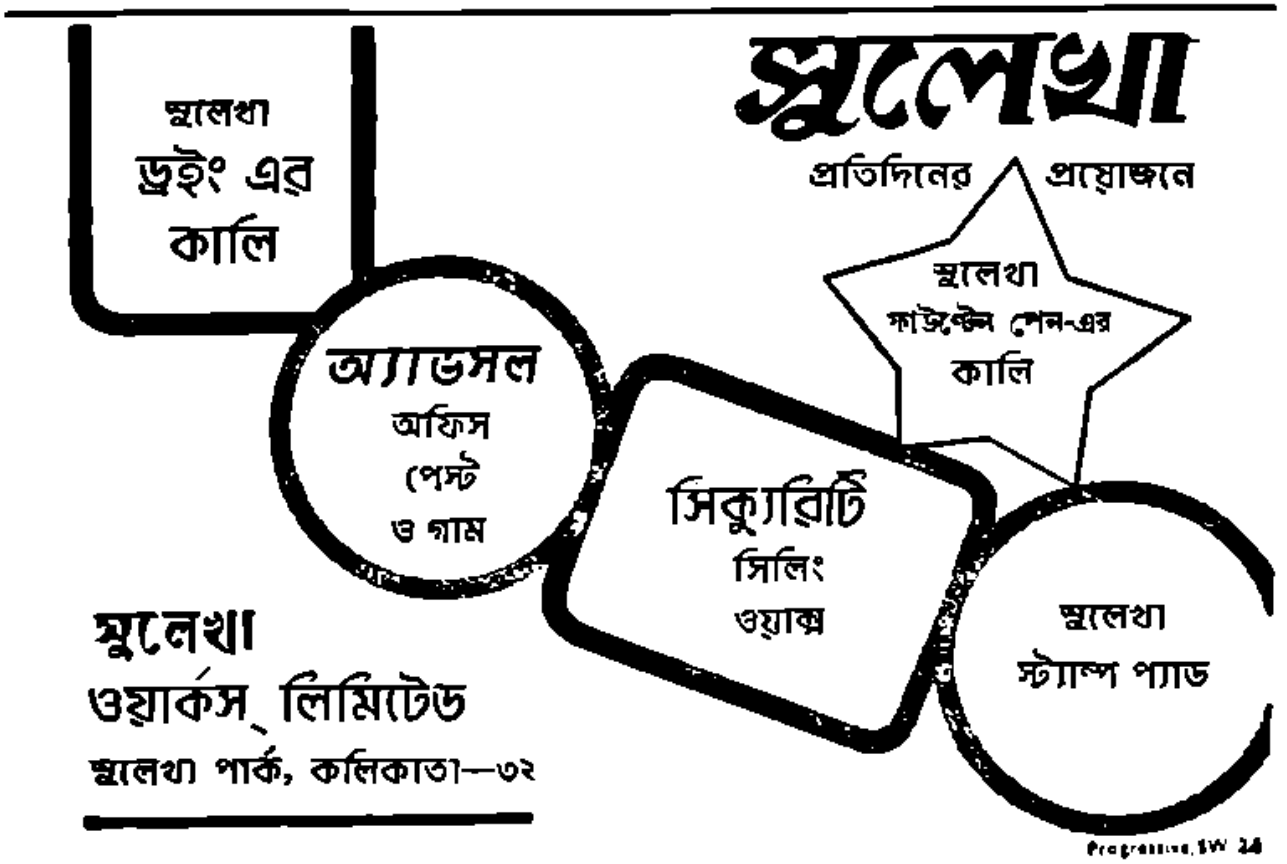

অতিথি-নিয়ন্ত্রণ বিধি

লঙ্ঘন করে

অতিথিদের আপ্যায়ন করলে

আপনার অহমিকা হয়তো তৃপ্ত হতে পারে

কিন্তু তার ফলে

হাজার হাজার লোক

দৈনন্দিন খাদ্যে বঞ্চিত হয়

অতএব

অতিথি-নিমন্ত্রণ বিধি মেনে চলুন

যাঁদের নিমন্ত্রণ না করলে নয়, শুধু তাঁদের
নিমন্ত্রণ করুন

আর যে-সব খাদ্য-পরিবেষণ আইন সম্মত
শুধু তাই খাওয়ান

—ডব্লিউ. বি. (আই অ্যান্ড পি. আর) এ. ডি. ডি ৮০৯৯/৬৬—
পলাশ : ২৬/৩/৬৬।

সূচীপত্র

জয়শ্রী : জ্যৈষ্ঠ : ১৩৭৩

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৭৭
সুভাষচন্দ্র (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	পবিত্র কুমার ঘোষ	৮৫
ভারত সেবক গোপালকৃষ্ণ গোখলে (শ্রদ্ধাঞ্জলি)	অনাথ বন্ধু দত্ত	৯১
হেগেলীয় দর্শন (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	অনিল রায়	৯৬
সাম্প্রতিক ভিত্যামূলেশন ও তাহার পরিণাম (আলোচনা)	ডঃ সুব্রতেশ ঘোষ	১০২
সুধার বিস্তার (কবিতা)	কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত	১০৫
বুকে নিয়ে সূর্যোদয় (কবিতা)	বাসুদেব দেব	১০৫
গ্রীষ্মকালীন বিকেলবেলা (কবিতা)	বাসুদেব দেব	১০৫
কণ্ঠ ভরা বিষ (ধারাবাহিক উপন্যাস)	দিদির মুখোপাধ্যায়	১০৯
রবিশংকরের মৃত্যু (গল্প)	শচীন্দ্রনাথ বসু	১১০
সামান্য শান্তি (কবিকা)	জ্যোতিরিন্দ্র মজুমদার	১২২
জল মাটি মন (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মহীতোষ বিশ্বাস	১২৪
পুস্তক পরিচয়		১৩৩
বিশ্বাবর্ত		১৩৯

জয়শ্রী

পরবর্তী কয়েকটি সংখ্যা প্রসঙ্গে

শ্রাবণ । ১৩৭৩

স্বাধীনতা সংখ্যা

[বিস্তারিত বিষয়সূচীর জন্য আষাঢ় সংখ্যা দেখুন]

ভাদ্র । ১৩৭৩

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় শতবর্ষ সংখ্যা

আশ্বিন । ১৩৭৩

শারদীয়া সংখ্যা

পৌষ । ১৩৭৩

নেতাজী সংখ্যা

প্রচার সম্পাদক । জয়শ্রী

৩১২, গাঙুলিবাগান, কলিকাতা ৪৭

৪৮-৪১১৬

PPS-KB-5/64

সবার সেরা
তামাকে গড়া
না খুব মিঠে
না খুব কড়া

লেক্স

খেয়ে
সুখ...

১৫ পয়সায়
১০টি

LC-25A BEN

জয়শ্রী

স্বা ধী ন তা সং খ্যা

শ্রাবণ : ১৩৭৩

বিষয় সূচী

১. জাতীয় আন্দোলনের প্রাথমিক ভিত্তি

২. স্বাধীনতা সংগ্রামে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা ও বিপ্লবী দল

৩. কংগ্রেস : দল ও নেতৃত্ব

৪. সুভাষচন্দ্র : স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায়

৫. আদর্শবাদের দ্বন্দ্ব : দল ও নেতা

৬. দেশ বিভাগ : নেতাদের ভূমিকা

৭. বিভিন্ন রাজনৈতিক দল : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

৮. সুভাষচন্দ্র : আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি
বর্তমান ভারত ও ভবিষ্যত

লিখবেন : প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ সুবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল দাস, সমর গুহ, পবিত্রকুমার ঘোষ, রমেন্দ্রনারায়ণ সরকার।

এছাড়া একগুচ্ছ দেশাত্মবোধক কবিতাও থাকবে।

দাম : একটাকা

প্রচার সম্পাদক, জয়শ্রী

৩১২, পাতুলিবাগান, কলিকাতা-৩৭

কৃষিক্ষেত্রে বা
বাড়ীর আশেপাশে

অপনার প্রয়োজনীয় শাকসব্জি উৎপাদন করে নিন

শাকসব্জিতে যথেষ্ট খনিজ পদার্থ, ছানা জাতীয় উপাদান, খাদ্যপ্রাণ, শ্বেতসার, শর্করা ইত্যাদি আছে। সুষম খাদ্যের জন্য আমাদের ২৮০ গ্রাম শাকসব্জি প্রয়োজন। ভারতের জনসাধারণ মোটামুটি মাত্র ৭০ গ্রাম শাকসব্জি খান।

বেশী শাকসব্জি খান

- ভালো স্বাস্থ্যের জন্য
- ধানশস্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য
- বাড়ীতেই যদি বেশী শাকসব্জি উৎপাদন করা যায় তাহলে বাজারে সেই পরিমাণ চাহিদা কমে
- এমন কি ছাদে পাত্র বসিয়ে তার ওপর শাকসব্জি উৎপাদন করা যায়।
- এগুলি উৎপাদন করতে যেমন আনন্দ, খেতেও তেমনি সুখ

অধিক শাকসব্জি উৎপন্ন করুণ—খাদ্যে আত্মনির্ভরশীল হউন

DA 64/207 Bengali

সূচীপত্র

জয়শ্রী : শ্রাবণ : ১৩৭৩

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		২০৯
নিক্ষেপিত প্রতিমা (কবিতা)	বিমলশঙ্কর সেনগুপ্ত	২১৬
স্বদেশী অনুভবে (কবিতা)	বিজয়কুমার দত্ত	২১৬
জাতীয় আন্দোলনের প্রাথমিক ভিত্তি	রমেন্দ্রনারায়ণ সরকার	২১৭
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা	প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	২২৫
দেশ বিভাগ : নেতাদের ভূমিকা	ডঃ অশোককুমার মজুমদার	২৩৪
হেগেলীয় দর্শন (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	অনিল রায়	২৪৩
কণ্ঠভরা বিষ (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মিহির মুখোপাধ্যায়	২৪৭
জল-মাটি-মন (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মহীতোষ বিশ্বাস	২৬১
মুক্তাঘচন্দ্র : আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, বর্তমান ভারত ও ভবিষ্যৎ	পবিত্রকুমার ঘোষ	২৬৫
রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র		২৭৬
আদর্শবাদের দ্বন্দ্ব : দল ও নেতা	সুনীল দাস	২৭৭
আত্মীয়তার সঙ্কট	সমর গুহ	২৮৫

জয়শ্রী

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় শতবর্ষ সংখ্যা

ভাদ্র : ১৩৭৩

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ রায়

২. মনস্বী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাংলার জন্মসাধনা

ত্রিপুরাশঙ্কর সেন

৩. বিচিত্র মননে ও ভাবুকতায় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

দেবদাস জোয়ারদার

৪. ঘাস্তে [গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা]

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

দাম ঃ ০·৭৫

আশ্বিন সংখ্যা শারদীয়া সংখ্যা। ঐ সংখ্যায় বিস্তৃত সূচী ভাদ্রের জয়শ্রীতে থাকবে।

প্রচার সম্পাদক, জয়শ্রী

৩১২, সাধুনিবাগান, কলিকাতা-৪৭

1,25,000 CARS ON THE ROAD TODAY

HM
HINDUSTAN MOTORS

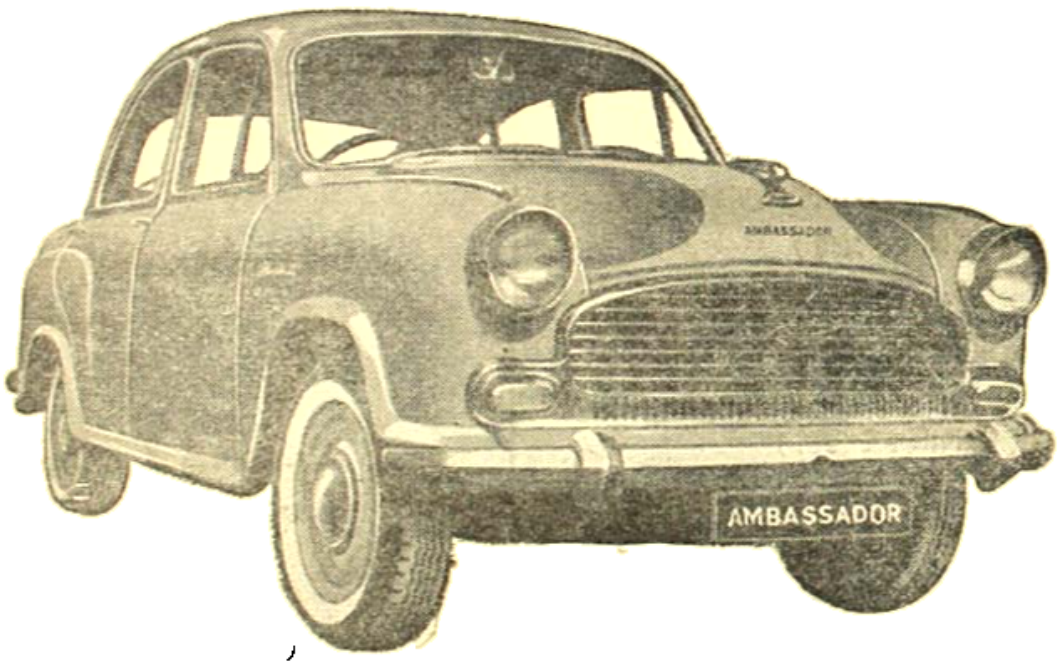

THREE CARS OUT OF EVERY FIVE PRODUCED IN INDIA DURING THE LAST FIVE YEARS WERE BY

HINDUSTAN MOTORS LIMITED

ASP/HM-7/66

Sales & Service throughout the Country.

সূচীপত্র

জয়শ্রী : ভাদ্র : ১৩৭৩

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		২১৩
আগস্টের স্বপ্নগুলি (কবিতা)	বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২১৭
আমার দেশ (কবিতা)	শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়	২১৭
বৃদ্ধ জেলের স্মৃতিচারণ (অনুবাদ-কবিতা)	নচিকেতা ভরদ্বাজ	২১৮
সুভাষচন্দ্র (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	পবিত্রকুমার ঘোষ	২১৯
পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ রায়	৩০৭
মনস্বী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাংলার তান্ত্রিক সাধনা	ত্রিপুরাশঙ্কর সেন	৩১৮
বিচিত্র মননে ও ভাবুকতায় পাঁচকড়ি	দেবদাস জোয়ারদার	৩২৩
ছায়ে	পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৩৪
বৈপ্লবীয় দর্শন (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	অনিল রায়	৩৪৫
জল-মাটি-মন (উপন্যাস)	মহীতোষ বিশ্বাস	৩৪৭
কণ্ঠ-ভরা বিষ (উপন্যাস)	বিভূতি মুখোপাধ্যায়	৩৫১
পূর্বগগনে এ কিসের ইঙ্গিত ? (প্রবন্ধ)	রাজর্ষি	৩৫৯
পুস্তক পরিচয়		৩৬২
বিশ্বাবর্ত		৩৬৫

জয়শ্রী

শারদীয়া সংখ্যা

আশ্বিন : ১৩৭৩

সুভাষ প্রসঙ্গ

'নেতাজীর ভাগবত'

১৯২৮ সাল। কে জানতো তরুণ 'গড়' পাশী দিনে জনগণের একমাত্র অধিনায়ক সামরিক পোষাকে নেতাজীরূপে রূপান্তরিত হবেন!

শংকরীপ্রসাদ বসু

তারই একটি চমৎকার চিত্র এই নিবন্ধে দেখেন।

'সুভাষচন্দ্র'

জয়শ্রীর পাতায় এই লেখাটি ইতিমধ্যেই পাঠক মহলে চাঞ্চল্য এনেছে। কিন্তু কোনও নাটক নয়, অভিনয় নয়, সুভাষচন্দ্রের জীবনের নূতন স্তরটিকে বুঝবার ও জানবার একটি সার্থক প্রয়াস।

লেখক : পবিত্রকুমার ঘোষ

•

এছাড়া

মূল জাপানী ভাষা থেকে অনূদিত জেনারেল কাওয়াবের রচিত 'সুভাষচন্দ্রে'র একটি নতুন অধ্যায়।

•

দাম : ২·০০

বিশদ বিবরণ পর পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রবন্ধ

জিন্না ও গান্ধী

ভারত বিভাগের অন্তরালে এই দুই নেতার ভূমিকার এমন বিশদ কাহিনী ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নি।

•

আগামী নির্বাচন

কংগ্রেস-বাংলা কংগ্রেস-চৌদ্দ দল —প্রভৃতির ইস্তাহার—বিবৃতিতে চতুর্দিক মুখরিত, নির্বাচক মণ্ডলী বিমোহিত। এই প্রবন্ধ নির্বাচক মণ্ডলীকে ভাববার ও আগামী নির্বাচনে পথ বেছে নিতে সহায়তা করবে।

•

শিক্ষা সংকট

অভিভাবকদের এটি দৈনন্দিনের চিন্তার বিষয়। দীর্ঘদিন শিক্ষা জগতে আছেন এমন একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী নিজের অভিজ্ঞতা থেকে লিখবেন।

•

যাঁরা লিখবেন

সরোজেন্দ্রনাথ রায়
সত্যেন্দ্রনাথ সেন
সুষমা সেনগুপ্ত
সুধাকান্ত রায় চৌধুরী
বিমলেন্দু মিত্র
দেবদাস জোয়ারদার
সুরজিৎ দাশগুপ্ত
সুনীল দাশ
অশ্রুকুমার সিকদার ও
আরো অনেকে

শুদ্ধ | শুভ্র | শ্রী

শারদীয়া • ১৩৭৩

শচীন্দ্রনাথ বসু
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
আশাপূর্ণা দেবী
নীলিমা দাশগুপ্ত
প্রবোধবন্ধু অধিকারী
মিহির মুখোপাধ্যায়
মহীতোষ বিশ্বাস
বিজনকুমার ঘোষ ও
আরো অনেকে

ভ্রমণ কাহিনী

সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

•

প্রচ্ছদ

খালেদ চৌধুরী

কবিতা

প্রেমেন্দ্র মিত্র
বিষ্ণু দে
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
অরুণকুমার সরকার
অশোক বিজয় রাহা
কৃষ্ণধর
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
আলোক সরকার
গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়
শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়
দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
নচিকেতা ভরদ্বাজ
মানস রায় চৌধুরী
শান্তি লাহিড়ী
প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত
স্বদেশরঞ্জন দত্ত
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
দুর্গাদাস সরকার
শান্তশীল দাশ
শিবদাস চক্রবর্তী
হরেন্দ্র সিংহ
বাসুদেব সেন
মণিভূষণ ভট্টাচার্য
বিজয়কুমার দত্ত ও
আরো অনেকে

দাম দুই টাকা

প্রাপ্তিস্থান। প্রচার সম্পাদক। জয়শ্রী। ৩১২ গাঙ্গুলিবাগান, কলিকাতা-৪৭

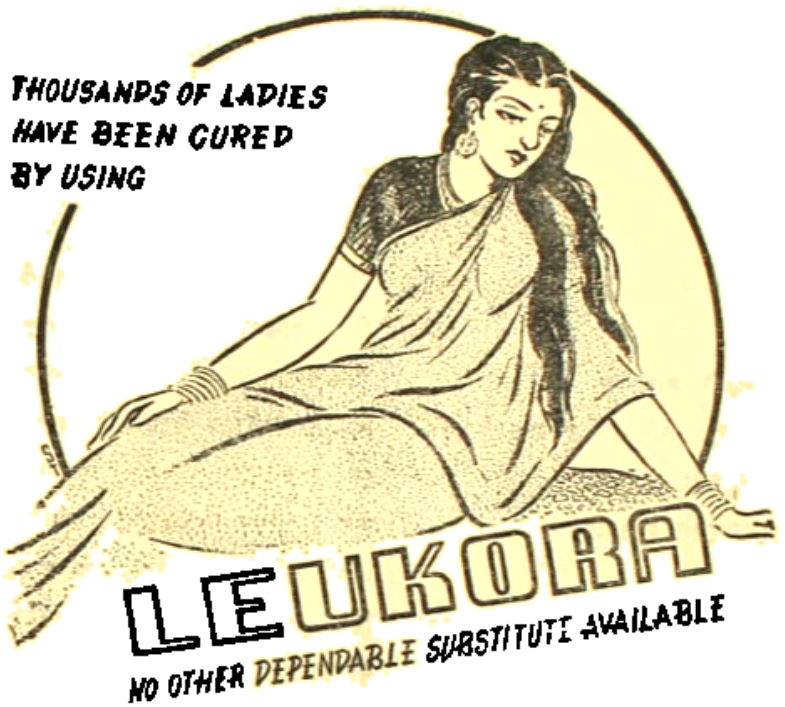

ADCCO LTD.
P O. ADCCONAGAR
Dt Hooghly, W. B.

ফোন
২২-৬৭৬৬

সারা ভারতবর্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ ও
সর্বজন প্রিয় "সিলেক্টা ব্রাণ্ড"
বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা

শরৎ সরদার এণ্ড সন্স

৬, রবীন্দ্র সরণী - কলিকাতা - ১

কারখানা: ১৮৬ ৯. গোপাললাল ঠাকুর রোড - কলিকাতা-৩৫

সূচীপত্র

জয়শ্রী : শারদীয়া সংখ্যা : ১৩৭৩

বিষয়		পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৩৬৭
নেতাজীর আগমন	পদ্মশ্রী : সাধু বসু	৩৭১
নেতাজীর আগমনের পূর্বে ঃ পূঃ এশিয়ায় ইণ্ডিয়ান ইণ্ডি-		
পেণ্ডেনস্ লীগের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা		
	জেমারেল কাওয়াবে	
ভিন্না ও গান্ধী (আলোচনা)		
	ইতিহাসবিদ	
সুভাষচন্দ্র (ধারাবাহিক রচনা)		
	পবিত্রকুমার ঘোষ	
কবিতা		
মূল্যবান বোধগুলো সব	কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত	৪০৭
হত্যা যাদের উৎসব	বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৪০৫

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কিছুই বুঝিনা	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	৪০৬
পায়রা	অরুণকুমার সরকার	৪০৬
শিউলি গাছটাকে নিয়ে	অরুণ ভট্টাচার্য	৪০৭
সেই দরদালানে	দুর্গাদাস সরকার	৪০৭
ফল ও আগুন	কৃষ্ণ ধর	৪০৭
একটি প্রতিদিনের	আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত	৪০৮
দিন যায়	অরবিন্দ গুহ	৪০৮
দ্বীপান্তর	নচিকেতা ভরদ্বাজ	৪০৯
সিঁড়ি নেই গোলঘরে	বাসুদেব দেব	৪০৯
আকোটা ভাত	ক্ষিতীশ দেব সিকদার	৪১০
কাব্যাত্মা দেবেন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)		
	সরোজেন্দ্রনাথ রায়	৫১১

আধুনিক ছিমছাম গড়ন

আজীবন ব্যবহারের উপযোগী

ক্যালকাটা ফ্যান

সীলিং • এয়ার সার্কুলেটর • এক্সহষ্ট

পাশ্চাশিল্পের কলাকুশলতায় দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ

ক্যালকাটা ফ্যান ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা-১৬

বিষয়	লেখক	
ডিস্ট্যাবুলেশন ও মূল্যবৃদ্ধি (প্রবন্ধ)		
	সত্যেন্দ্রনাথ সেন	৪১৯
দ্বিতীয়পৃষ্ঠা (প্রবন্ধ)	অন্নদাশঙ্কর রায়	৪২৪
শিক্ষা সংস্কারের গোড়ার কথা (প্রবন্ধ)		
	সুধাংশু সেনগুপ্ত	৪২৭
কবিতা		
কোর	প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত	৪৩২
টিকিট	শান্তি লাহিড়ী	৪৩২
কাল সারারাত	শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়	৪৩২
শব্দগুলি	সুনীল বসু	৪৩৩
অবসাদ	আলোক সরকার	৪৩৩
হে স্বদেশ, বহুরূপা !	সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত	৪৩৩
আরেক প্রস্থের মতো	দময়ন্তী সেনগুপ্ত	৪৩৪
ঢেউ	সুনন্দা দাশগুপ্ত	৪৩৫
বোধ	বিজয়কুমার দত্ত	৪৩৫
এমন নিরুপদ্রবে	দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৩৬
রাজহাঁস	মণিভূষণ ভট্টাচার্য	৪৩৬
এবারও সে এসেছিলো	সৌরাঙ্গ ভৌমিক	৪৩৭
যুগ-যন্ত্রণা	শান্তশীল দাশ	৪৩৭
নীল ভালোবাসা	শক্তি চট্টোপাধ্যায়	৪৩৮
কে কাকে	শিবদাস চক্রবর্তী	৪৩৯

With Best Compliments from :

KOTHARI HOSIERY FACTORY

H. O. 113, Monohardas Katra, Cal-7

Factory

24, Chaulpatty Road, Beleghata, Cal-10

Phone : 333312 (H. O)

355367 (Factory)

"KUMAR"

Sluice Valves, Large Diameter Pipes and Specials, Reflux Valves, Air Valves. Pressure Relief Valves are in service throughout India.

Kumar Engineering Works Private Ltd.

P-52, Banaras Road, Howrah.

Phone : 66-2515

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
চিন্তাধারা	হরেন্দ্রনাথ সিংহ	৪৩৯
লাল পাশবালিশ বুকে ঝিঁঝিপোকাদের	সুনীল বসু	
তোমার চতুর্দিকে	মোহিত চট্টোপাধ্যায়	
কে আছ সংসারে স্থায়ী সুখ নিয়ে	স্বদেশরঞ্জন দত্ত	
সম্পর্ক	আনন্দ রায়চৌধুরী	
নারী বন্দনা	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	
রবীন্দ্রনাথের ঠাঁই-বদল (স্মৃতিচারণ)		
রক্ত পথে-পথি (গল্প)	আশাপূর্ণা দেবী	
জানকীর জন্মস্থানে (ভ্রমণ কাহিনী)	সুস্মিতকুমার মুখোপাধ্যায়	৪৫৩
মধু ও মদিরা (গল্প)	শচীন্দ্রনাথ বসু	৫৬৭
শরৎচন্দ্র স্বয়ং (আলোচনা)	সত্যব্রত বসু	৫৭৮
নীলপাড়া নির্জন (বড় গল্প)	প্রবোধবন্ধু অধিকারী	৪৮৩
এমন হয় (গল্প)	নীলিমা দাশগুপ্ত	৪৯৯
ফুলমতির খোনুচে (গল্প)	মহীতোষ বিশ্বাস	৫০৬
একটি মক ও কয়েকটি ভূত (গল্প)	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০৯
ভারতের পরমাণু অস্ত্র (প্রবন্ধ)	বিমলকুমার মিত্র	৫২৩
গভীর নিশীথে (কবিতা)	অপরাজিতা গোস্বামী	৫২৮
বর্ষার প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে (প্রবন্ধ)	সুরজিত দাশগুপ্ত	
লেখা পড়া (প্রবন্ধ	দেবদাস আচারিয়ার	
আত্মহত্যা (গল্প)	বিজন ঘোষ	
চেষ্ট অফ ড্রয়ার্স (কাটাকী)	জ্যোতিরিন্দ্র নাথ মজুমদার	৫৫৩
বন্দরে (বড় গল্প)	শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৫৫
মঁসিও কলি (অনুবাদ-গল্প)	সুবীর গুপ্ত	
প্রচ্ছদ : খালেদ চৌধুরী		

For Steel Castings
& Engineering Jobs

CONSULT :

METALLOID INDUSTRIES

8 OLD POST OFFICE STREET
CALCUTTA-1

সূচীপত্র

জয়শ্রী : কার্তিক : ১৩৭৩

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৫৮৫
সুভাষচন্দ্র (ধারাবাহিক রচনা)	পবিত্র কুমার ঘোষ	৫৯৩
ঘনিষ্ঠ আঁধারে (কবিতা)	গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়	৫৯৮
অন্তরা পথে (কবিতা)	মধুছন্দা গুপ্ত	৫৯৮
খুকি (কবিতা)	বিনোদ বেরা	৫৯৯
সময়ের উজ্জ্বল উৎসব (কবিতা)	চিত্রভানু	৫৯৯
মিশ্র ও গান্ধী	ইতিহাসনিষ্ঠ	৬০১
হেগেলীয় দর্শন (প্রবন্ধ)	অনিল রায়	৬০৯
এখন খেয়েছে ঝড় (কবিতা)	প্রভাকর মাঝি	৬১৪
পাখী, দিস তারে (কবিতা)	মনিদীপা বিশ্বাস	৬১৫
আশরুম (কবিতা)	হেনা হালদার	৬১৪
কণ্ঠহারা দিন (উপন্যাস)	নিহির মুখোপাধ্যায়	৬১৭
বাস্তব অবাস্তব (গল্প)	বিহারী লাল বসুমা	৬২৩
জল মাটি মন (উপন্যাস)	মহীতোষ বিশ্বাস	৬২৭
স্বপ্নলোকের চাবি (গল্প)	নিহির মুখোপাধ্যায়	৬৩৩
পুস্তক পরিচয়		৬৪১
বিশ্বাবর্ত		৬৪২

অগ্রগামী সংস্কৃতি পরিষদ-এর উদ্যোগে

নেতাজী বক্তৃতামালা

সুভাষচন্দ্র ও ভারতীয় চিন্তাধারা
নেহেরু, গান্ধী ও সুভাষচন্দ্র
সুভাষচন্দ্র ও ভারতের নেতৃত্ব
সুভাষচন্দ্র : দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ভারতের ভূমিকা
সুভাষবাদ : মতবাদের দ্বন্দ্ব
সুভাষচন্দ্র ও ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব

প্রথম বিষয়টির বক্তা পবিত্রকুমার ঘোষ।

অন্যান্য বক্তৃতের জন্য নিম্ন লিখিত
ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

অগ্রগামী সংস্কৃতি পরিষদ
৩১২ শামুলিয়াপান কলিকাতা-৪৭

দীপ্তি

আপনার নিত্য প্রয়োজনে

দীপ্তি লণ্ঠন—এর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন, এর অসাধারণ জনপ্রিয়তার পেছনে আছে মজবুতী গঠন, সুন্দর আলো আর কম কেরোসিন খরচ।

খাস জনতা কেরোসিন স্টোভ—নিত্য প্রয়োজনের একটি আবশ্যকীয় জিনিষ। এই কেরোসিন স্টোভ ব্যবহারে কোন ঝামেলা নেই। গঠনে মজবুত, দেখতে সুন্দর, খরচে সামান্য। অল্প সময়ে যে কোন রান্না করা যায়।

'দীপ্তি' মার্কা এনামেলের বাসন—অল্প দিনের মধ্যে তার বৈশিষ্ট্য আর গুণের দ্বারা সমাদৃত হচ্ছে।

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিমিটেড

৬১ ও ৭৭ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

দীপ্তি লণ্ঠন

খাস জনতা

এনামেলের বাসন

Kalpana on

সূচী পত্র

অগ্রহায়ণ ১৩৭৩

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৬৪৭
বিধ্বস্ত (কবিতা)	বিকাশ দাস	৬৫৩
সূর্যের কোঠায়	দুর্গাদাস সরকার	৬৫৩
সুভাষচন্দ্র (ধারাবাহিক রচনা)	পবিত্রকুমার ঘোষ	৬৫৫
ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব (প্রবন্ধ)	সুরজিৎ দাশগুপ্ত	৬৬৩
শিক্ষার মাধ্যম (আলোচনা)	রাজর্ষি	৬৭৭
কর্কট রোগ (গবেষণামূলক প্রবন্ধ)	ডাঃ শৈলেশ রায়	৬৮২
জল মাটি বন (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মহীতোষ বিশ্বাস	৬৮৭
কণ্ঠ ভরা বিষ (ধারাবাহিক উপন্যাস)	বিভূতি মুখোপাধ্যায়	৬৯৫
হেগেলীয় দর্শন (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	অনিল রায়	৭০৩
পুস্তক পরিচয়		৭০৯

আপনাদের
অনাবৃষ্টি ক্লিষ্ট
দেশবাসীকে
সাহায্য করুন

—নগদ টাকা বা অন্যান্য জিনিষের সাহায্য
নিম্ন ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

প্রধান মন্ত্রীর অনাবৃষ্টি সাহায্য তহবিল
ক্যাবিনেট সেক্রেটারীয়েট রাষ্ট্রপতি ভবন
নূতন দিল্লী—৪

Gram : DEVICE

29-2161/2

Please Contact

MECHANICAL ENGINEERING CO

PRIVATE LTD

5, MISSION ROW
CALCUTTA-1

FOR ALL TYPES OF TRAILE RS,
TROLLEYS AND WHEEL BARROWS.

সূচী পত্র

পৌষ ১৩৭৩

বিষয়		পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৭১০	তোমাকে সংবর্ধনা করি	শঙ্করীপ্রসাদ বসু	৭২৯
ভারতের প্রয়োজন			আলাদ হিন্দ ফৌজ ও		
নেতাজীর নেতৃত্ব	ডাঃ রাধাবিনোদ পাল		নেতাজী	কেদারেশ কাওরাবে	
কবিতা :			রবীন্দ্রনাথের চক্ষে		
তেইশে জানুয়ারী	মানস রায় চৌধুরী		বিপ্লবী তরুণ	শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়	
মহানায়ক	বিজয়কুমার দত্ত		নেতাজী ও হি লাবের		
সবি ছিল	স্বদেশ রঞ্জন		সাক্ষাৎকার	ডাঃ অশোককুমার মজুমদার	৭৬৬
মৃত্যুঞ্জয় হে মহাপ্রাণ	শান্তশীল দাশ		কণ্ঠ তবা বিষ		
সুভাষচন্দ্র	চিত্রভানু		(ধারাবাহিক উপন্যাস)	মিহির মুখোপাধ্যায়	
রাজা	শান্তি লাহিড়ী		জল মাটি মন		
তেইশে জানুয়ারী			(ধারাবাহিক উপন্যাস)	মহীতোষ বিশ্বাস	
স্মরণে	শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়	৭২৫	পুস্তক পরিচয়		
সুভাষচন্দ্র	পবিত্রকুমার ঘোষ	৭২৬			

দুটি বা তিনটি সন্তানই যথেষ্ট

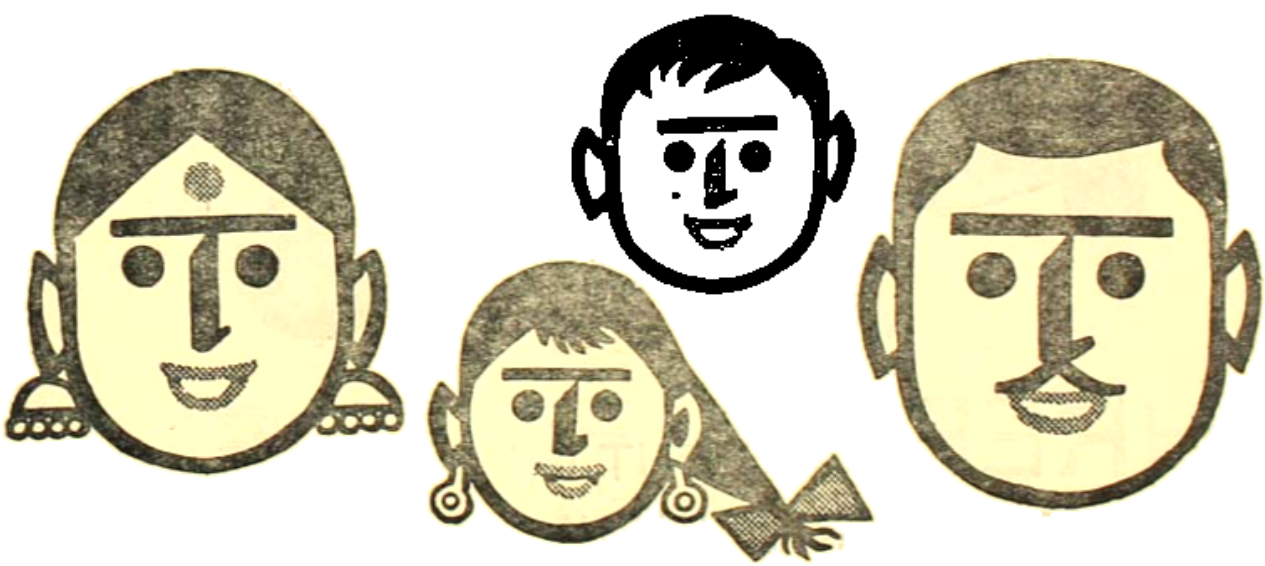

চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চলুন

OA 66/30

1,25,000 CARS ON THE ROAD TODAY

HM
HINDUSTAN MOTORS

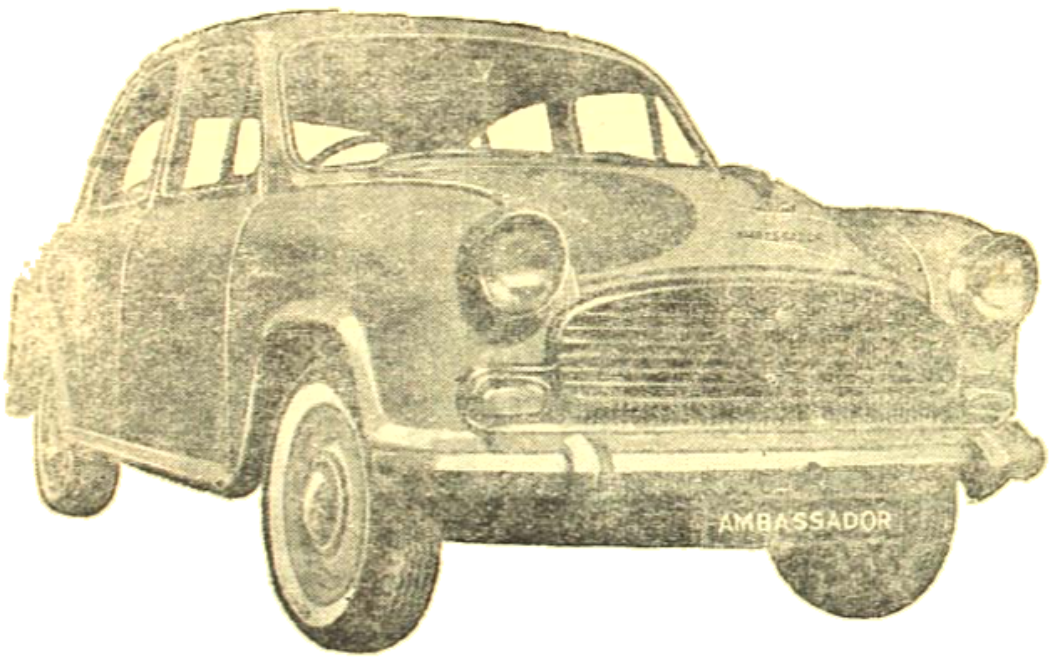

THREE CARS OUT OF EVERY FIVE PRODUCED IN INDIA DURING THE LAST FIVE YEARS WERE BY

HINDUSTAN MOTORS LIMITED

ASP/HM-7/64

Sales & Sevice throughout the Country.

সূচীপত্র

মাঘ ১৩৭৩

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়			৭৮৯
সুভাষচন্দ্র	(ধারাবাহিক রচনা)	পবিত্রকুমার ঘোষ	৭৯৭
কয়েকটি কিশোরের স্মৃতি	(কবিতা)	কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত	৮০৫
চোখ বুজলে	(কবিতা)	বাসুদেব সেন	৮০৫
অদৃশ্য সানাই	(কবিতা)	শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়	৮০৬
তুমি কি	(কবিতা)	,,	৮০৬
সংগঠন	(কবিতা)	আনন্দ চৌধুরী	৮০৭
প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য	(কবিতা)	সন্তোষ চক্রবর্তী	৮০৭
হেগেলীয় দর্শন	(ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	অনিল রায়	৮০৯
রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কয়েকটি স্মৃতিকথা	(স্মৃতি চারণ)	সুধাকান্ত রায় চৌধুরী	৮১৯
জল মাটি মন	(ধারাবাহিক উপন্যাস)	মহীতোষ বিশ্বাস	৮২৯
কণ্ঠ ভরা বিষ	(ধারাবাহিক উপন্যাস)	বিভূতি মুখোপাধ্যায়	৮৩৭
একটি অবিস্মরণীয় আত্মত্যাগ			৮৪৮

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·৩০
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	১·২৫
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.

বিদ্যাসাগর	২·২৫
মানুষের মত মানুষ	·৭৫
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা—১২

২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটবিশ্বকোষ প্রেস হইতে শ্রীবিশ্বপতি মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মাড়ী সুস্থ ও সবল রাখতে
এবং মুখের গন্ধ দূর করতে

নিম অদ্বিতীয়

নিমের উপকারিতা হাজার হাজার বছরের পরীক্ষিত সত্য

ভারতীয়দের সুদৃঢ় ও ঝকঝকে দাঁত বিদেশীদের বিস্ময় ও প্রশংসার বিষয়। এই প্রশংসনীয় দাঁতের মূলে ছিল নিমের দাঁতনের নিয়মিত ব্যবহার। অবশ্য নিম দাঁতনের স্থান এখন বহুলাংশে গ্রহণ করেছে নিম টুথ পেস্ট। কারণ, নিম টুথ পেস্টে নিমের সক্রিয় উপাদান ছাড়াও আছে ফ্লুরাইড এবং দাঁতের পক্ষে উপকারী অধুনা-আবিষ্কৃত অন্যান্য উপকরণাদি যা দাঁত ও মাড়ী সুদৃঢ় করে, পাইওরিয়া ও দন্তক্ষয় নিবারণে সাহায্য করে, মুখের দুর্গন্ধ দূর ক'রে শ্বাসপ্রশ্বাস সুরভিত এবং দাঁত ঝকঝকে করে তোলে।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল

সূচীপত্র

ফাল্গুন—১৩৭৩

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৮৬১
নির্বাচনোত্তর চতুর্থ লোকসভা	সমর গুহ	৮৬৫
ভিয়েৎনাম (প্রবন্ধ)	ডঃ অশোক মজুমদার	৮৩৭
অন্ধকার অনুভবে (কবিতা)	বিজয়কুমার দত্ত	৮৭১
কয়ালী ঘুটীর অবকাশে (কবিতা)	অমিতাভ দাশগুপ্ত	৮৭৮
আমি বারে বারে (কবিতা)	মহিষরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	৮৭৯
অসংবৃত (কবিতা)	হেনা হালদার	৮৮০
হেমেন্দ্রীর দর্শন (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	অনিল রায়	৮৮১
জল, মাটি, মন (উপন্যাস)	মহীতোষ বিশ্বাস	৮৯৩
কণ্ঠ ভরা বিষ (উপন্যাস)	নিহির মুখোপাধ্যায়	৯০২
বর্তমান যুগের রুচিসংকট (আলোচনা)	মীরা বালসুব্রহ্মনিয়ন	৯১৫
বিশ্ববৃত্ত		৯১৭

জয়শ্রীর নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্য

জয়শ্রী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক সডাক ৯'৫০। ষাণ্মাসিক ৫'৭৫। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে হয় না।

লেখকদের জন্য

শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ সর্বাগ্রে দেওয়া হয়।

লেখা পরিষ্কার হরফে ফুলস্ক্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। কারণ, হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই। কবিতা সম্বন্ধেও তাই নিয়ম।

উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়।

শক্তিশালী নূতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহযোগিতার জন্য আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কলকাতার সব স্টলে জয়শ্রী পাওয়া যায়

প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী
৩১২, পাতুলিবাগান
কলিকাতা-৪৭

মাড়ী সুস্থ ও সবল রাখতে
এবং মুখের গন্ধ দূর করতে

নিম অদ্বিতীয়

নিমের উপকারিতা হাজার হাজার বছরের পরীক্ষিত সত্য

ভারতীয়দের সুন্দর ও ঝকঝকে দাঁত বিদেশীদের বিস্ময় ও প্রশংসার বিষয়। এই প্রশংসনীয় দাঁতের মূলে ছিল নিমের দাঁতনের নিয়মিত ব্যবহার। অবশ্য নিম দাঁতনের স্থান এখন বহুলাংশে গ্রহণ করেছে নিম টুথ পেস্ট। কারণ, নিম টুথ পেস্টে নিমের সক্রিয় উপাদান ছাড়াও আছে ফ্লুরাইড এবং দাঁতের পক্ষে উপকারী অধুনা-আবিষ্কৃত অন্যান্য উপকরণাদি যা দাঁত ও মাড়ী সুস্থ করে, পাইওরিয়া ও দন্তক্ষয় নিবারণে সাহায্য করে, মুখের দুর্গন্ধ দূর ক'রে শ্বাসপ্রশ্বাস সুরভিত এবং দাঁত ঝকঝকে করে তোলে।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল

২৭৫৭৭

জয়ন্তী

ধীরেশচন্দ্র সেন শতবার্ষিকী ও মঙ্গলাল বন্ধু স্মৃতি সংখ্যা

৩১ বর্ষ ০ প্রথম সংখ্যা ০ বৈশাখ ১৩৭৩

১৩৭৩

১৩৭২ এর মৃত্যু হোলো। সে সঙ্গে নিয়ে এলো ভারতের দ্বিতীয় প্রধান মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু, গত ২৬শে পৌষ—১১ই জানুয়ারী, অতি আকস্মিকতায়—নাটকীয়। সে-ই মৃত্যু ঘটাল ভারতের প্রথম আণবিক কমিশনের সভাপতি ভাবের গত ৬ই মাঘ—১৯শে জানুয়ারি—দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়তার অন্তরালে। ১৩৭২, ঝরলো শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে ভারতের তৃতীয় প্রধান মন্ত্রী, এবার আর সর্ববাদীসম্মতির ভেত্তি নয়, দেশাইর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার অন্তে। সারা ভারতের বুভুক্ষা আছড়ে পড়লো পশ্চিম বাঙ্গলার তটে দুর্বার গণবিক্ষোভে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিশোরেরা বসিরহাটে শোনালো ইতিহাসের পদধ্বনি গত ৪ঠা ফাল্গুন—১৬ই ফেব্রুয়ারি। সে পদক্ষেপের সঙ্গে পা মেলালো সারা পশ্চিমবাঙ্গলা। গত ২৫শে ফাল্গুন—১০ই মার্চ সারা বাঙ্গলার বুক জুড়ে দেখাগেল তার রুদ্র প্রকাশ। সে রূপ দেখেও দেখেনি আমাদের চোখকান-বোজা শাসকেরা। ক্ষুধার জ্বালা রুখ্‌তে তার নিয়ে এলো বন্দুক, বেয়নেট, লাঠি, টিয়ার গ্যাস। ৫৬টী তরুণ তাজা প্রাণকে তারা দিল নিবিয়ে! কিন্তু নেবাতে পারলো কি তাদের জীবনাহুতির দীপ্ত দাহন? তীক্ষ্ণ মৌন-ঘৃণায় তার উত্তর দিল পশ্চিম বাঙ্গালার বঞ্চিত মানুষের মিছিল ১২শে ফাল্গুন—১৩ই মার্চ। আর গত ২৩শে চৈত্র—৬ই এপ্রিল পশ্চিম বাঙ্গলার হাজার মার-খাওয়া মানুষ ১৩৭২ এর শেষ স্বাক্ষর রাখলো। প্রমাণ হোলো শীর্ণকঙ্কালেরা বাঁচবার দুর্বার আদিম প্রেরণায় আজো রাজপথে বের হয়। অনাদি কাল থেকে মানুষ যেভাবে প্রমাণ দিয়েছে নিজের অস্তিত্বের—প্রমাণ দিয়েছে আদিঅন্তহীন বঞ্চনার মধ্যেও, —আজো তারা বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে। সে আশায়ই লক্ষ লক্ষ বছরের তিল তিল প্রয়াসে মানুষ গড়ে তুল্ল রাষ্ট্র, সমাজ, সভ্যতা। বনের মানুষ হোলো গৃহবাসী, পত্তন করলো পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র। এ সবই যদি রাজনীতির খেলা হয়, প্রাক্‌নির্বাচনী প্রচার কৌশলের

মহড়া, তবে তাকে রুখবে কি ভাবে? কালের ঘড়ির কাঁটাকে কি উল্টো ঘুরিয়ে স্তব্ধ করবে এই চলাকে। লোকসভায় বিতর্কের ঝড়েই কি প্রমাণ করা হবে এদেশের মানুষ মরে নির্ভেজাল অনাহারে, না দীর্ঘদিনের অপুষ্টি, কুপথ্যাহার জনিত হাজার রকম রোগে! প্রমাণ খুঁজুক তবে কলকাতা ও ভারতের বড় সহরের বস্তি, ফুটপাথ, নিম্ন বিত্তদের ঘরে ঘরে, বড় হাসপাতালগুলিতে, বিশেষ ভাবে তাদের বহির্বিভাগগুলিতে, খোঁজ করুক কোন্ ব্যাধিতে এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ নিত্য আক্রান্ত হয়, খোঁজ করুক ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রামে, কৃষকের কুটিরগুলিতে? উদয়াস্ত রৌদ্রে জলে, খরায় বর্ষণে যারা আমাদের ক্ষুধার অন্ন জোগাতে জীবনপাত করে তবু কেন তাদের ক্ষুধা মেটেনা, এ ক্ষুধা মেটাবার দায়িত্ব কাদের? প্রমাণ হয়ে যাক, কে বেশী শক্তিধর মুখোমুখি দাঁড়াক বাঁচবার দাবী আর স্বার্থপর ক্লীবত্ব ও দম্ভ। ১৩৭২ অতিক্রান্ত হোলো এবং ১৩৭৩ এলো এই মুখোমুখি সংগ্রামের শপথ নিয়ে। যারা কেবল নিজেকেই বাঁচাতে চায় তারা নয়, কারণ তারা নিজেরাও বাঁচবেনা আর বাঁচাবেওনা কাউকে। কিন্তু যারা বাঁচাতে চায় সমাজ সভ্যতাকে এবং সে প্রয়াসের মধ্যেই বাঁচতে চায় নিজেরা, তাদেরই ৩৬ বৎসর পূর্বে জয়শ্রী আহ্বান করেছিল এই বাঁচবার বাঁচাবার সংগ্রামের সক্রিক হবার জন্য। কোনো হঠাৎ চালাকি দ্বারা নয়, তিল তিল ত্যাগ, নিরলস সজাগ দৃষ্টি, একনিষ্ঠ সাধনার মধ্য দিয়ে, আর সর্বোপরি ভারতের ভবিষ্যতের উপর অটুট বিশ্বাস নিয়ে যারা নূতন রাজপথ তৈরী করতে চায় তাদের জয়শ্রী আহ্বান জানিয়ে চলেছে সংগ্রামের, ত্যাগের, সাধনার পথে। ৩৬ বৎসর ধরে এ চলার পথে কত সঙ্গী, কত সাথী পা মিলিয়েছে, কেউ দুদিনের জন্য, কেউ আমৃত্যু, কেউ আজো চলেছে সুদৃঢ় সঙ্কল্প এবং 'সংগ্রামের পথেই সমস্যার উত্তরণ' এই বিশ্বাস নিয়ে, কত আশা, বিশ্বাস, ত্যাগ; পথান্বেষণের কত সাধনা ছড়িয়ে রয়েছে এর চলার পথে পথে, বিগত বছরগুলির পাতায় পাতায়, আজ সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করি সেই সব লোকান্তরিত সাথীদের। তাদের সঙ্গ, শ্রম, সাধনাকে, সেই তিল তিল আত্মদান ও একনিষ্ঠ সাধনা যেন নিরর্থক না হয়ে যায় আমাদের দুর্বলতা ও ক্লান্তিতে; এ যেন আমরা নিরন্তর স্মরণে রাখি। এ কাজে যাঁরা বিশ্বাসী তাদের সহায়তা কামনা করে আর একটি বৎসরান্তে তাঁদের শুভেচ্ছা ও প্রীতি জানাচ্ছি।

জয়শ্রীর বার্ষিক বৈশাখ সংখ্যা কবিগুরুর স্মারক সাহিত্য-সংখ্যারূপে সাধারণত প্রকাশিত হয়ে থাকে। এবার এই সংখ্যা প্রকাশিত হোলো প্রধানতঃ দুইটী বিশিষ্ট জীবনের সাধনা ও সিদ্ধির স্মারক ও পরিচায়ক হিসাবে। এ কাজে যাঁরা জয়শ্রীকে সাহায্য করেছেন তাঁদের জন্য রয়েছে আমাদের সানন্দ

কৃতজ্ঞতা। তাঁদের মূল্যবান আলোচনা দ্বারা তাঁরা বাংলার এবং বাংলা-ভাষাভাষী এক শিক্ষিত মনোযোগী পাঠকগোষ্ঠিকে তাঁদের চিন্তার অংশীদার করতে পারবেন এ আশ্বাস তাঁদের দেয়া যায়। শিল্পী নন্দলাল বাংলা—তথা ভারতের গৌরব সে পরিচয় অনেকেই হয়তো অল্পবিস্তর জানেন, কিন্তু মানুষ নন্দলালের এমন মাধুর্যময় অন্তর-পরিচয় পাবার অনেকেরই সুযোগ হোত না যদি শিল্পী নন্দলালের কাছে-থেকে-দেখা এমন দরদী জীবনালেখ্য আমরা উপহার না পেতাম। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁদের বলতে চাই তাঁরা একটী জাতীয় কর্তব্য পালন করেছেন। অনুসরণীয়দের দেশের সামনে যথাযথ ভাবে তুলে ধরবার দায়িত্ব স্বীকার ও পালন করাও দেশসেবা।

১৩৭৩-এর পৌষে পড়েছে। দীনেশচন্দ্র সেনের জন্মশতবার্ষিকী। পৌষে নেতাজী-বিশেষ-সংখ্যা প্রকাশিত করে থাকে জয়শ্রী। কাজেই ১৩৭৩ বৈশাখের সাহিত্যসংখ্যায় সে অলঙ্ঘনীয় কর্তব্য পালন করতে চেষ্টা করেছি আমরা, বিশেষতঃ কবিগুরুর জন্ম-স্মরণী-সংখ্যায় এ মহৎ কর্তব্য পালনের একটী বিশেষ উপযোগিতা রয়েছে বলে আমরা মনে করি। যে বিশিষ্ট লেখকেরা জয়শ্রীর তরফে এ কর্তব্য পালনে সহায়তা করেছেন তাঁদের আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বাংলার সাহিত্য ও ঐতিহ্যের প্রতি যে তীব্র আকর্ষণ ও গভীর শ্রদ্ধা লেখকদের লেখায় ফুটে উঠেছে আজকের শ্রদ্ধা ও প্রত্যয়হীন দিনে তার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে বিশ্বাস করি। বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির আত্মভূমিকে আবিষ্কার করে যাঁরা আমাদের জন্য অমূল্য রত্নরাজি উপহার এনেছেন তাঁদের নিকট আমরা ঋণী হয়ে রইলাম। অতীতের প্রতি বিচারহীন ভাবালু আনুগত্য যেমন ক্ষতিকর হতে পারে তেমনি আধুনিকতার ছাপাঙ্কিত হবার আগ্রহে অগ্রজদের ঋণকে অস্বীকার ও উপেক্ষা করা সচেতন ব্যক্তি মাত্রের পক্ষেই গর্হিত ও সর্বথা পরিত্যাজ্য। এই কর্তব্যের গুরুভার বহন করেছেন দীনেশচন্দ্র 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস চাই' এই সোচ্চার দাবী তুলে। আমরা আশা করবো সে ইতিহাসের শূন্যস্থানগুলো পূর্ণকরবার দায়িত্ব তুলে নেবেন একালের সাহিত্যিকেরা—বিশেষ ভাবে বাঙ্গালী সাহিত্যিকেরা দীনেশচন্দ্র সেনের এই জন্মশতবার্ষিকী বছরে।

৩০শে বৈশাখ ১৩৭৩

সম্পাদকীয়

গোখ্‌লে জন্মশতবার্ষিকী

গত ৯ই মে মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। যে যুগে গোখ্‌লে ভারতীয় রাজনীতির কর্ণধারদের শীর্ষে নিশ্চিত আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তারপর ষাট বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও ১৯০৫ সালের সমীপবর্তী জাতীয় সঙ্কটের দিনে জাতীয় নেতৃত্বের প্রথম সারির সর্বাগ্রগণ্য আসনটিতে গোখ্‌লের স্থান ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে চিরকালের জন্য চিহ্নিত হয়ে থাকবে। বিপ্লব চেতনার দিক থেকে যেমন, সাংবিধানিক সংগ্রাম-চেতনার দিক থেকেও তেমনি বাংলার ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্য ছিল গোখ্‌লের সেই অবিস্মরণীয় উক্তিতে—"বাংলা আজ যা ভাবে, কাল সমগ্র ভারত তাই ভাববে"—তারই স্বাক্ষর রয়ে গেছে। ১৯০৫-এর অব্যবহিত পরেই সুরাত কংগ্রেসে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের সংঘাতে গোখ্‌লে নরমপন্থীদের সহযাত্রী হন এবং অতঃপর ইংলণ্ডে লিবারেল দলের গভর্নমেণ্ট লর্ড মর্লিকে ভারত-সচিব নিযুক্ত করে ভারতীয় শাসন সংস্কারের উদ্যোগ করলে ইংলণ্ডে লর্ড মর্লির সঙ্গে গোখ্‌লের ভারত শাসন সংস্কার সম্পর্কিত আলোচনা নিয়ে নানা সংশয় সৃষ্টি হলেও জনসেবায় ও রাজনীতিতে গোখ্‌লে ত্যাগের আদর্শ বীয় জীবনে রূপায়িত করে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যের অনন্ত সম্ভাবনা বর্জন করে তীক্ষ্ণধী ও মেধাসম্পন্ন গোখ্‌লে সামান্য মাত্র বেতনে একদল দেশপ্রেমিক যুবকদের দ্বারা পরিচালিত, যারা নিজেদের মূলত মিশনারি বলে অভিহিত করতেন, পুণায় নিউ ইংলিশ স্কুলে যোগদান করে তার সকল শুভার্থী ও পরিবারবর্গকে বিস্ময় বিমূঢ় করে দেন। তারপর তিনি ডেকান এডুকেশন সোসাইটিতে যোগ দিয়ে অল্প বেতনে দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেন। ২০ বৎসর এই ভাবে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যের জীবন যাপন করার পর গোখ্‌লে ১৯০৫-এ National Missionaries' গড়বার জন্য সার্ভেণ্টস অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি গঠন করেন। রাজনীতিকে আত্মিক পর্যায়ে উন্নীত করার মহান উদ্দেশ্য নিয়েই এই সংস্থার কাজ সুরু হয় এবং এই সংস্থার প্রারম্ভিক উদ্দেশ্য বর্ণনায় গোখ্‌লে লিখে গেছেন: "Politics must be Spiritualised."

ত্যাগের আদর্শকে জাতীয় জীবনের নিয়ামকরূপে প্রতিষ্ঠায় গোখ্‌লে সত্যই মহাত্মা গান্ধীর গুরু ছিলেন। ত্যাগ ও সেবার আদর্শ প্রতিষ্ঠায় নেতাজীও ছিলেন অনন্যপুরুষ। মহামতি গোখ্‌লের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের মধ্যে দিয়ে জাতীয় জীবনে ত্যাগের আদর্শের প্রতিশ্রুতি সঞ্চারিত হলেই এই মহান দেশপ্রেমিকের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সার্থক। অন্যথায় এই উদ্‌যাপনের সার্থকতা একটি আনুষ্ঠানিক আড়ম্বরের মধ্যেই সীমিত থাকবে।

উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ

উড়িষ্যার মন্ত্রীসভা অনাবৃষ্টির ফলে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি সম্পর্কে উপযুক্ত সময়ে বিপদের আসন্ন সঙ্কেত অগ্রাহ্য করে যে শোচনীয় অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দিয়েছেন, উড়িষ্যার কালাহান্ডি, বোলাঙ্গীর, সম্বলপুর, সুন্দরগড়, ঢেনকানল প্রভৃতি কয়েকটি জেলার প্রায় ষাট লক্ষ মানুষের জীবন তার ফলে অনাহার ও অর্ধাহারের মুখোমুখী হয়েছে।

অনাহারে মৃত্যুও ঘটেছে, যদিও সরকারী স্তরে তা স্বীকৃতি পায় নাই। গত ১৩ই মে থেকে দুই দিন প্রধান মন্ত্রী শ্রী ইন্দিরা গান্ধী সরেজমিনে কয়েকটি দুর্গত অঞ্চল সফর করে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে সমগ্রভাবে পরিস্থিতি বিচার করে স্বীকার করতেই হয় যে উড়িষ্যার এই দুর্গত অঞ্চল গুলিতে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নেমে এসেছে। অথচ, উড়িষ্যার মন্ত্রী সভা এই সহজ সত্যটিকে স্বীকার করা তো দূরের কথা, নানা পত্র-পত্রিকায় এবং বিরোধীদের সমালোচনার পর আর্ত ত্রাণের ব্যবস্থা সম্পর্কে এপ্রিল মাসের আগে তাদের চৈতন্যোদয়ই হয় নাই। অথচ এই কয়মাস এই অঞ্চলগুলি থেকে দলে দলে নরনারী দূর-দূরান্তে অন্নসংস্থানের জন্য ঘর ছাড়তে সুরু করেছে, ঘটিবাটি-গরু বিক্রি করছে। এমন কি সন্তানদেরও পরিত্যাগ করে চলে গেছে। এমনও অভিযোগ শোনা গেছে যে গ্রামবাসীরা শেষরক্ষার চেষ্টায় সাতটাকা তোলা করে লোনাদানাও বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে।

দিল্লী থেকে প্রেরিত একটি সরকারী পর্যবেক্ষক দল উড়িষ্যার অনাবৃষ্টি পীড়িত অঞ্চল ঘুরে যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাদের বক্তব্য চল্লিশ লক্ষেরও বেশী লোক দুর্ভিক্ষ কবলিত এবং কথিত জমির শতকরা ৫৬ ভাগ খরায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; এদের ক্রয়-ক্ষমতা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়েছে। খাদ্যবিতরণ কেন্দ্র গুলিতে পুষ্টিহীন বালক-বালিকাদেরই সংখ্যাধিক্য এবং খাদ্যের পরিমাণও যৎকিঞ্চিৎ; এই খাদ্যও মাত্র একবেলা দেওয়া হচ্ছে। তাই কমিটি বলছেন 'it is necessary to make some provision to enable these really destitute people to get another meal.' কমিটি বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণের কেন্দ্র আরও ব্যাপকভাবে খুলবার সুপারিশ করেছেন।

শ্রীমতী গান্ধী এই সমস্যাকে জাতীয় সমস্যার মর্যাদা দিলেও, মাত্র নয়কোটি টাকার কেন্দ্রীয় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি সমস্যার ব্যাপকতা ও গভীরতার তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। শ্রীমতী গান্ধী যথার্থই বলেছেন যে শিশুদের জন্য বিশেষ নজর দিতে হবে; "They do need extra help" তারাই জাতির ভবিষ্যত। কিন্তু উড়িষ্যার এই অসহায় মৃত্যুপথযাত্রী নরনারীশিশুদের বাঁচাতে হলে যে উদারমনস্কতা নিয়ে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ত্রাণকার্যে এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন, উড়িষ্যার মন্ত্রীসভা এই ব্যাপকাঠিতে দুরন্ত অযোগ্যতা, অপদার্থতা ও হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়েছে। এই মন্ত্রীসভার বিতাড়ন উড়িষ্যার দুর্গত ত্রাণকার্যের জন্য অপরিহার্য পূর্বসর্ত। যারা এই তথাবহ অবস্থা সৃষ্টির সহায়ক নিজেদের অকর্মণ্যতার দ্বারা, তাদের হাতে সেবা ও আর্তত্রাণের দায়িত্ব সাজিত হতে বাধ্য।

পশ্চিম বাংলায় দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি

পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে নিদারুণ অভাবের সংবাদ আসছে। ফলে দার্জিলিং জেলা ছাড়া অন্যান্য জেলাতে সাহায্য ও ত্রাণের কাজ শুরু হয়েছে। সাধারণতঃ জুন মাস থেকে ত্রাণ কার্য শুরু হলেও এবার এপ্রিল থেকেই এ কাজ আরম্ভ করতে হয়েছে। গত বছরও এপ্রিল থেকে খয়রাতী সাহায্য দেওয়া হলেও, এ বিষয়ের খরার প্রকোপে তুলনামূলকভাবে ইতিমধ্যেই অনেক বেশী অর্থ এ-বাবদ ব্যয় হয়ে গেছে। হিসাবে জানা যায় অনাবৃষ্টির দরুণ গত বছর এপ্রিল মাসে মোট তের লক্ষ টাকার খয়রাতি সাহায্য ও চার লক্ষ টাকার টেষ্ট রিলিফ বিতরণ করা হলেও এ-বছর এ মাসে পঁচিশ লক্ষ টাকার খয়রাতি সাহায্য ও সতের লক্ষ টাকার টেষ্ট রিলিফ বিলি করা হয়েছে।

কিন্তু এবার সাহায্য ও ত্রাণের দায়িত্বটা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের হাত থেকে জেলা পরিষদের হাতে দেওয়া হয়েছে এবং এ-বাবদ প্রতিটি জেলা পরিষদের হাতে প্রাথমিক ব্যয় রূপে এক লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। প্রাক্-নির্বাচনী বছরে এই ব্যবস্থাতর স্বভাবতই সন্দেহের উদ্রেক করবে, কারণ জেলা

পরিষদগুলির কংগ্রেসী-চরিত্র এই সংস্থাগুলির কর্মকুশলতা ও দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে ত্রাণের প্রয়োগ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মন প্রতিকূল। তাছাড়া জনসাধারণের সহযোগিতা ব্যতীত আপামী দালগুলির ত্রাণ-সমস্যা আয়ত্তাধীনে রাখা আদৌ সম্ভব হবে না। উড়িষ্যার পরিস্থিতিই তার সাক্ষ্য বহন করছে।

সঙ্কটের গুরুত্ব আরও বোঝা যাবে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মডিফায়েড রেশনিং অঞ্চলে রেশনের পরিমাণ কমিয়ে দেবার কিম্বা রেশন বন্ধ করে দেবার মধ্যে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় বর্ধমান, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া বীরভূম, বাঁকুড়া ও পশ্চিম দিনাজপুরের 'খ' শ্রেণীর রেশন কার্ডধারীদের চাল দেওয়া বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত ১৫ই মার্চ থেকে সপ্তাহে মাথাপিছু এদের ১৩০০ গ্রাম গম ও ৫০০ গ্রাম চাউল দিতে সরকার প্রতিশ্রুত ছিল। অতঃপর এদের চাউল-বর্জিত রেশনেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। অন্যান্য এলাকায়, যেমন উত্তর বঙ্গে, মডিফায়েড রেশনে চালের পরিমাণ ৭৫০ গ্রাম থেকে ৫০০ গ্রামে নামিয়ে আনা হয়েছে এবং সেভি আধারের পরিমাণ লক্ষ্যের এতো নীচে যে আশঙ্কা আছে মডিফায়েড রেশনিং-এর চালের পরিমাণ আরও নিম্নগামী হবে। সুতরাং গ্রামাঞ্চলে অবস্থা কি ভয়াবহ হবে, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

সব চাইতে বিপদ হল এই যে আউশ ধানের ওপর যেটুকু নির্ভরতা ছিল, অনাবৃষ্টিতে তাও প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। শুধু তাই নয় পাটও শুকিয়ে গেলো। পাটের উৎপাদন ১৯৬৫-৬৬ সালে ৮০ লক্ষ গাঁট প্রয়োজনের তুলনায় মোট ৬০ লক্ষ গাঁট হয়েছিল। কিন্তু এবার খরার ফলে পাটের উৎপাদন বিঘ্নিত, বাজারে কবে পাট উঠবে নিশ্চয়তা নেই। ফলে ২৮শে মে থেকে চটশিল্পের এক সপ্তাহের জন্য বন্ধ থাকবে যার পরিণতিতে আড়াই লক্ষ চটকল শ্রমিকের সাময়িক বাধ্যতামূলক কর্মবিরতির জন্য তাদের বেতনের এবং মহার্ঘ-ভাতার শতকরা ৫০ ভাগ মাত্র পাওনা হবে। শুধু পাটই বা কেন শাক-শব্জি সবই রোদে পুড়ে ছাই হয়ে গেলো।

অথচ, সরকারী অদূরদর্শিতা, অকর্মণ্যতা ও বুরোক্রাটিক মনোভাব এই সঙ্কটের জন্য বহুলাংশে দায়ী। কারণ ১৪০০ মেগা ওয়াটের নলকূপ সেচের জন্য বসানো সত্ত্বেও বিদ্যুৎ শক্তির অভাবে এই নলকূপগুলি এবার খরার দিনে কাজে এলোনা। অথচ, বিদ্যুতের অভাব নেই, কিন্তু বিদ্যুৎ সঞ্চালনের ব্যবস্থার অভাবেই নাকি নলকূপগুলি অকেজো হয়ে রয়েছে। সেচের জন্য নলকূপ খনন করে যারা বিদ্যুৎ সঞ্চালনের ব্যবস্থা রেখে লগ্নীকৃত মূলধনের ফলপ্রসূ হবার এবং খাদ্যোৎপাদনের পথে অন্তরায় হয় তাদের কঠিন বসিয়ে উপযুক্ত শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা উচিত। এই ধরণের অব্যবস্থার জন্য যারা দায়ী তারা জাতির শত্রু। এরাই দুর্ভিক্ষের অগ্রদূত।

অদ্ভুত অপচেষ্টা

আকাশবাণীর উপদেষ্টা পরিষদের একটি সুপারিশে ভারত সরকার নেতাজীর জন্মবার্ষিকী পাঁচবছরে একবার আকাশবাণী থেকে প্রচারের যে স্পষ্টিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, এবং তথ্য ও বেতার দপ্তরের নবীনা উপমন্ত্রী সেই সিদ্ধান্ত হঠকারিতার সঙ্গে লোকসভায় সমর্থন করে যে অসংলগ্ন আচরণের পরিচয় দিয়েছিলেন তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ সমগ্র দেশে ধ্বনিত হয়েছে। গান্ধীজী, শ্রীনেহেরু ও শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী—তিনজন নেতার জন্মবার্ষিকী প্রতি বৎসর পালনের সিদ্ধান্তের পাশাপাশি নেতাজীর জন্মবার্ষিকী পাঁচ বছর অন্তর পালনের সিদ্ধান্তের মধ্যে যে রাজনৈতিক হীনতা নিহিত ছিল, ভারত সরকার সে সম্পর্কে অজ্ঞতার ভাণ করলেও, দেশবাসীর চিত্তে নেতাজীর স্থান অনন্য, এবং ইতিহাসের বিকৃতির অপচেষ্টা সত্ত্বেও নেতাজীর গৌরবদীপ্ত

আসনকে হীনতার কালিমায় অবলুপ্ত করা যাবে না। যতই সময় উত্তীর্ণ হবে, ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ এই সত্য ততই ভাস্বর হয়ে উঠবে যে ইংরেজ বিতাড়নের শেষ পর্যায়ে নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিমূল টলিয়ে দিয়েছিলো যার ফলে ইংরেজের অপসারণ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। এই বৈপ্লবিক ঐতিহ্যকে ম্লানিমায় আচ্ছন্ন করবার মনোভাবই নেতাজীকে দ্বিতীয় সারির নেতারূপে চিহ্নিত করবার ধৃষ্টতাকে প্রশ্রয় দিয়েছিলো। অবশ্য পরবর্তীকালে তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রীরাজবাহাদুর এই হীন মূল্যায়নের জন্য ক্ষোভপ্রকাশ করে অন্যান্য আটজন নেতার সঙ্গে প্রতিবছর জন্মবার্ষিকী পালনের তালিকায় নেতাজীর নামও সংযোজিত করে অপরাধ খালনের চেষ্টা করেছেন। নেতাজী গান্ধিজীকে 'জাতির জনক' নামে ভূষিত করেছিলেন; ভারতবাসীর চোখে নেতাজী 'ভারতীয় বিপ্লবের জনক'। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের মূল্যায়নে যদি কোনো দুই নেতার নাম একই পংক্তিতে স্থাপনের প্রশ্ন আসে সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র এই দুইজনের নামই পাশাপাশি বসতে পারে।

এই সহজ সত্যটিকে নানাভাবে আচ্ছন্ন করবার অপচেষ্টা চোখে পড়ে। সম্প্রতি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে কটকে নেতাজীর পৈতৃক বাড়ীটি সংস্কারের অভাবে জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, অথচ সরকারের সেদিকে চৈতন্য নেই। আমরা শুনেছি সিঙ্গাপুরে যে বাড়ীটি নেতাজীর হেড কোয়ার্টার ছিল, সেটি সংরক্ষণের জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল, সিঙ্গাপুরস্থিত নেতাজী অনুগামীদের পক্ষ থেকে। ভারত সরকার তা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। সিঙ্গাপুরে আই, এন, এ-র যে স্মারক স্তম্ভটি মাউন্টব্যাটেন ভেঙে ফেলেছিল সেটি পুনর্নির্মাণের জন্য শ্রীজহরলাল নেহেরুর কাছে অনুরোধ এসেছিল, তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্বের আমলে। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের এই অনুজ্জ্বল অধ্যায়টির ঐতিহ্যমণ্ডিত স্মারকটির পুনরুজ্জীবনে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কোনো নিবিড় প্রচেষ্টা হয়েছিল বলে শোনা যায় নাই।

সম্প্রতি একটি সিনেমা ফিল্ম প্রদর্শনের অনুমতি দিয়ে ভারত সরকারের সেন্সর বোর্ড নেতাজীর অনন্যসাধারণ বন্ধু চরিত্রের উপর চপলতা ও লঘুচিত্ততার কালিমা লেপন করে, তাঁর দেবপ্রতিম পিতার চরিত্রের উপর কাপুরুষতার ছোপ লাগিয়ে, তাঁর ঐতিহাসিক সামরিক কুশলতার হাস্যকর রূপায়নে এবং ঐতিহাসিক তথ্যকে বিকৃত করে নেতাজী-চরিত্রের অমর্যাদাকর পরিবেশনে সহায়তা করে ইতিহাস-বিকৃতির আর একটি অপচেষ্টার নিদর্শন রেখেছেন।

নেতাজী চরিত্রের যারা অপলাপ ঘটাতে চায়, যারা জাতির মানসে তাঁর প্রদীপ্ত শিখাকে নির্বাপিত করতে চায়, তারা হয় বাতুল না হয় শয়তান। এই দুই শ্রেণীর মানুষকেই তাদের কুকর্মের জন্য ইতিহাসের দরবারে কৈফিয়ত দিতে হবে।

গতায়ু তাসখন্দ—চীনাদের সমর প্রস্তুতি

তাসখন্দ চুক্তির মৃতদেহের ওপর দিয়ে পাকিস্তানী সমরায়োজন যে কতদূর অগ্রসর হয়েছে, বিভিন্ন সরকারী বিবৃতিতে অতঃপর তা স্বীকৃতি পেয়েছে। পাকিস্তান কেবল জম্মু-কাশ্মীরের সীমান্ত বরাবরই যে সমরায়োজনে ব্যাপৃত তা নয়, পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত বরাবরও এই আয়োজন সমান উদ্যমে চলেছে। এই অঞ্চলে সিভোদের শিক্ষা দিবার জন্য তিনটি শিবির স্থাপিত হয়েছে হাজীপীর-পুঞ্চ এলাকায় রাস্তাঘাট নির্মাণ, সিয়ালকোটে ইছোগিলের মত প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে খাল নির্মাণ, সৈন্য শিবির তৈরীর সংবাদ, সরকার স্বীকার করেছেন। চীনারা পাকিস্তানী সেনাবাহিনী, আনসার, মুজাহিদদের গেরিলা যুদ্ধে ট্রেনিং দিচ্ছে, এবং পাকিস্তানিদের সমরাস্ত্র ক্রয়ের জন্য অর্থের যোগান দিয়েছে, অস্ত্রশস্ত্রও পাকিস্তানে আমদানী করেছে। সৌদী আরব, তুর্কি, পর্তুগালও পাকিস্তানী অস্ত্র আমদানীর উৎস। এদিকে

ভারতের উত্তর সীমান্ত বরাবর চীন সেন্য-সমাবেশ করেছে। সিকিমেও চীনাফৌজ প্রবেশের সংবাদ পাওয়া গেছে।

চীন ও পাকিস্তানের যুক্ত আক্রমণও যেমন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী অসম্ভব মনে করেন না, পৃথক পৃথক ভাবে পাকিস্তান ও চীনের দিক থেকে বিপদের সম্ভাবনাকেও তিনি অস্বীকার করেন নাই। বর্ষার আগেই আক্রমণ হতে পারে এরকম একটি সম্ভাবনার প্রচারে ত্রাস সৃষ্টি উচিত নয়,—এই মন্তব্য করেও এই সম্ভাবনাকে প্রবলভাবে প্রতিরক্ষামন্ত্রী অস্বীকারও করতে পারেন নাই। তাসখন্দ চুক্তির সুযোগে ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক দখল করা জমি পুনরুদ্ধার করে পাকিস্তান চীনের সহযোগে আবার রণসাজ শুরু করেছে।

এ সম্বন্ধে রুশ-মার্কিন নীরবতা তাৎপর্যময়। তাসখন্দ দলিলের অপব্যবহার নীরব সাক্ষীরূপে এই দুই শক্তি অলক্ষ্যে পাকিস্তানী সহায়করের ভূমিকা গ্রহণ করছে কিনা স্বার্থহীন-ভাবে তা প্রচারিত হবার সময় এসেছে।

চীনপন্থী পলিট ব্যুরো

চীনপন্থী কম্যুনিষ্ট পার্টির পলিট ব্যুরোর সদস্যরা গত ৭ই মে থেকে তিনদিন কলকাতায় মিলিত হয়েছিলেন। পৃথক কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠন করার পর এই প্রথম পলিট ব্যুরোর সভা বসে। এর অন্তর্বর্তী সময়ে সদস্যরা সকলেই আটক ছিলেন।

পলিট ব্যুরোতে রুশ-চীন দ্বন্দ্বের ওরুপত আলোচনা হলেও, কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এ-বিষয়ে গৃহীত হয় নাই। শোনা যায় পলিট ব্যুরোর পক্ষ থেকে চীনের সি-শাও-চির নিকট পত্র দিয়ে এই দ্বন্দ্বের কয়েকটি দিক সম্পর্কে মত জানতে চাওয়া হয়েছে। প্রধানতঃ, পিকিং-এর মস্কো সম্পর্কে দুটি অভিযোগ নিয়েই নাকি এই পত্রালাপের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে: (১) সোভিয়েত রুশ পুঁজিবাদের দিকে ঝুঁকে মার্কস্-লেনিন তত্ত্ব পরিত্যাগ করেছে (২) সোভিয়েত রুশ আমেরিকার সঙ্গে একযোগে বিভিন্ন দেশের মুক্তি সংগ্রামের বিরোধিতা করে সাম্রাজ্যবাদের সহচরের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সোভিয়েত রুশ সম্পর্কে চীনের এই মূল্যায়ন সম্পর্কে নাকি পলিট ব্যুরোতে মতভেদ আছে।

নির্বাচনী কৌশল সম্পর্কেও পলিট ব্যুরো একমত হতে পারে নি, আগামী জুনে কার্য নির্বাহক সমিতির বৈঠকে এই দুইটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। পলিট ব্যুরোর সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পার্টির কেন্দ্রীয় দপ্তরকে কলকাতায় স্থানান্তর এবং সাধারণ সম্পাদক শ্রী সুন্দরায়ার স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস। এই সিদ্ধান্তে এ-কথাই স্পষ্ট হয়েছে যে রাজনৈতিক শক্তি সমাবেশের দিক থেকে, কৌশলের দিক থেকে এবং উপযুক্ত মানসিক পরিবেশ রচনার দিক থেকে চীনপন্থী কম্যুনিষ্ট পার্টি ক্ষমতা দখলের জন্য এই সীমান্ত রাজ্যকে বেছে নিয়েছে। এদের রাজনৈতিক প্রচারের পূর্বাভাস পাওয়া গেছে শ্রীসুন্দরায়ার ও শ্রীরামমূর্তির বক্তৃতায়। এঁরা বলেছেন চীনের সঙ্গে ভারতেরই সীমাংসার জন্য অগ্রণী হতে হবে কলম্বো প্রস্তাব চীন স্বীকার না করা সত্ত্বেও এবং চীনের আক্রমণাত্মক সামরিক প্রস্তুতি সত্ত্বেও। তাছাড়া কাশ্মীর, মিজো এবং নাগাদের আভ্যন্তরীণ স্বতন্ত্রতার দাবীও মেনে নেবার স্বপক্ষে সুন্দরায়া বলেছেন। 'আভ-ন্তরীণ স্বতন্ত্রতা'র তাৎপর্যটি অবশ্যি তিনি অস্পষ্টই রেখেছেন। তিনি আবদুল্লার মুক্তির সুপারিশ করতেও ভোলেন নাই। অর্থাৎ, যে সকল শক্তি ভারতের সার্বভৌমত্ব এবং নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে তাদের সকলের সঙ্গেই সুন্দরায়া মিতালীর সুপরামর্শ দিয়ে কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। চীনের তৃতীয় আনবিক (?) বোমার তাত্ত্বিক করে রামমূর্তি বলেছেন যে আণবিক অস্ত্রসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে চীন সঙ্গতভাবেই এই প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং ভারতবর্ষও নিরাপত্তার খাতিরে

(শেষাংশ ৭৫ পৃষ্ঠায়)

রবীন্দ্র চিত্রকলা

নন্দলাল বসু

সাহিত্যে তখন তাঁর জগৎজোড়া সুনাম, ধর্ম-রাজনীতি-সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে মৌলিক চিন্তাশীল বলে তিনি পরিগণিত, শিক্ষাবিস্তারে তাঁর দুঃসাহসিক নিরীক্ষা দেশ বিদেশে সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, এবং গানে-গানে তিনি জয় করেছেন জনগণের হৃদয়। ঠিক এই সময়ে গুরুদেব শুরু করলেন ছবি আঁকতে। তাঁর চিত্রকলার অন্তর মহলে যাঁরা প্রবেশ করতে চান, তাদের একথাটি মনে রাখা দরকার।

বয়স সত্তরের সীমা ছুঁয়েছে গুরুদেব হাতে তুলে নিলেন চিত্রকরের তুলি। সাহিত্যসংগীতের সিদ্ধ-শিল্পী তিনি, জেনেছেন সামঞ্জস্য ও নির্বাচনের আন্তরতথ্য এবং গতি ও যতির সার্থক মূল্য। শিল্পের পক্ষে এই গুণগুলি অপরিহার্য, যা (জনৈক ইংরেজ সমালোচকের ভাষায়) প্রত্যক্ষ ও অবিচ্ছিন্ন দৃষ্টির পরিপোষক। যার সাহায্যে স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। নট ও নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের এই সাধারণী-কৃতির ক্ষমতা প্রচুর ছিল। সুতরাং তুলি হাতে নেবার আগেই শিল্পীর তিনটি অপরিহার্য গুণ আয়ত্ত করেছিলেন—ছন্দের চেতনা, সামঞ্জস্যের চেতনা, আত্মনীনতার চেতনা।

স্রষ্টার মনের আকাশে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত চিন্তার দল ভেসে আসে, একটি সুবিহিত ভাবনায় গাঁথা পড়ে তারা আকার নেয়, সুন্দর হয়। মানস বক্তব্য যখন রূপসী হতে চায়, তখন এই প্রস্তুতির 'ভেতর দিয়েই তাকে আসতে হয়; এর অভাবে ছন্দিত চরণ পরিণত হয় অর্থহীন সমস্ত বাক্যে। আবার, শিল্প কর্মমাত্রেই নিরুদ্দেশ। তাকে প্রাণদান করে শিল্পীর প্রতিভা। গুরুদেবের চিত্রকলার রূপায়ণের পশ্চাতে সদাসক্রিয় ছিল শিল্পজগতের ঐ মালা গাঁথা এবং প্রতিভার এই দীপ্ত স্বাক্ষর।

গুরুদেব প্রথম যৌবনে ছবি আঁকার চেষ্টা একবার করেছিলেন। সে সব ছবি, আমার মনে হয়, খুঁজলে এখনও পাওয়া যেতে পারে। তবে পাকাপাকি ভাবে ছবির হাতে ধরা দিলেন একেবারে সত্তরের সীমানায় এসে। সকলেই জানেন, কোনোরকম অপরিচ্ছন্নতাই তিনি পছন্দ করতেন না, রচনার কোনও অংশ কাটতে হলে পরিচ্ছন্ন ভাবে তার ওপর ঘন কালি লেপে দিতেন। ক্রমশ দেখলেন ঐ অবগুণ্ঠিত কাটাকুটিগুলির মধ্যে ছন্দের বেশ একটা আদল ফুটে উঠেছে এবং ওদের এখানে-ওখানে একটু-আধটু কলমের আঁচড় দিলেই সেগুলি আকার নিচ্ছে, ফুল পাখি কিংবা জন্তুর রূপ ধরেছে। এই ভাবে ছবি আঁকার তাগিদ এল মনের মধ্যে এবং ধীরে ধীরে তা রূপ নিল রীতিমতো চিত্র শিল্পায়নে।

ছন্দ কবিতার সম্পদ, কিন্তু কেবলমাত্র কবিতারই সম্পত্তি নয়। সব শিল্পেরই একটি করে নিজস্ব ছন্দ আছে, যা না থাকলে তারা সার্থক হতে পারত না। ছবির যে সৌন্দর্য তাও বিভিন্ন ছন্দের সমীকরণের ফল। প্রয়োজন অনুযায়ী ছন্দের আদল বদল হয়, শিল্পী নতুন নতুন পন্থায় সমন্বয়ের পথ খুঁজে ফেরেন। আত্মপ্রকাশের জন্যে ছন্দের একটি স্বগত শক্তি থাকা দরকার, তা তার প্রাণ শক্তি। গুরুদেবের ছবিগুলিতে ছন্দের এই প্রাণ শক্তি দুর্মর বলিষ্ঠতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। এগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য ক্রমবর্ধমান জীবনের ঘনিষ্ঠ সহচারিতা, যে জীবন ক্লান্তিতে শীর্ণ নয় সংগ্রামশক্তিতে উজ্জীবিত। তাঁর রেখা ও রঙের বিন্যাসে অবসাদ তাই অনুপস্থিত। এক আশ্চর্য সজীব প্রাণময়তা ছবি গুলির সহজাত গুণ। ভারতীয় শিল্পে এটি তাঁর বিশিষ্ট অবদান।

রবীন্দ্রনাথ আজীবন প্রকৃতিকে ভালোবেসেছেন, তাকে দেখেছেন নানারূপে, জেনেছেন নানা রসে। আকারের অন্তরে যে গোপন বিদ্রোহী সত্তা, তাকে তিনি সহজেই ছুঁতে পারতেন। যখনই ছবি আঁকতে বসতেন, অবিচ্ছিন্ন ভাবনা স্বতই জন্ম নিত তাঁর মনে, সঙ্গে সঙ্গে 'কলম' চলত সেই অরূপ ভাবকে রেখা-রঙের রূপে অনুবাদ করতে (এখানে 'কলম' শব্দটি সচেতন ভাবেই প্রয়োগ করেছি; কারণ গুরুদেব তুলি ব্যবহারই করতেন না, ছবিতে রঙ লাগাতেন প্রায়ই ছোকার হাতের কোশ দিয়ে)। এইভাবে সিদ্ধ শিল্পির প্রতিভার রূপ আর অরূপ অভেদে মিলে গিয়ে সমন্বয়ের সৃষ্টি করেছে।

অনুপাতের প্রয়োগেও তাঁর ছবির কোটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট, যার ফলে সংস্থাপনা ত্রুটিহীন হয়ে উঠেছে। শিল্পগত সামঞ্জস্যের এই আনুপাতিক বিন্যাস কখনও লৌকিক পদ্ধতি অবলম্বন করে, কখনও বা বলা যায় সমৃদ্ধ আলংকারিক রীতিকে আশ্রয় করে। চিত্রকর যখন হাতি আর ছাগলকে পাশাপাশি এঁকে তাদের আনুপাতিক আয়তন বোঝাতে চান, তখন তিনি সাধারণ পদ্ধতিরই অনুসরণ করেন। আলংকারিক রীতিতে অনুপাত যথাযথ থাকে না: কারণ তাকে একটি নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে বিভিন্ন মাত্রার আকারকে রূপ দিতে হয় এবং শিল্পের প্রয়োগগত ঐতিহ্যকে মেনে চলতে হয়। আর চিত্রকর যখন 'এটেন্‌স্‌ক্‌' বা অদ্ভুতের রাজ্যে প্রবেশ করেন, তখন তাঁকে এক বিশেষ ধরণের রীতি গ্রহণ করতে হয় এবং আয়তনের অনুপাতকে ইচ্ছে করেই বিস্রস্ত করে দিতে হয়। কারণ তাঁর লক্ষ্য অদ্ভুত রসসৃষ্টি। গুরুদেবের অনেক ছবি এই এটেন্‌স্‌ক্‌-এর বর্ণাঢ্য দৃষ্টান্ত। রঙে-রেখায় এগুলি যেমন অদ্ভুত রসের ব্যঞ্জনা, তেমনি শিল্প সুন্দর সৃষ্টি। বলা বাহুল্য, এখানেও তাঁর শিল্পী মানসের বলিষ্ঠতা জীবন-নিষ্ঠা এবং অনুপাত-সামঞ্জস্যের সর্বাঙ্গীণ চেতনা বিদ্যমান।

গুরুদেবের চিত্রকলা, তাঁর রীতি সবই তাঁর নিজস্ব, তবু তা ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুগত। আমাদের ধ্রুপদি সাহিত্যে ধ্বনিব্যঞ্জনাই মুখ্য, শব্দ ও অর্থের স্থান গৌণ: আমাদের ধ্রুপদি শিল্পেও রেখা ও রঙের স্থান দ্বিতীয়, ছন্দ সুষমার রসের ব্যঞ্জনা আনাই তার মৌল লক্ষ্য। পাশ্চাত্য দেশে আর্টের সৃষ্টি হয় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে। এবং অনুপাতের সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা হয় গাণিতিক নির্ভুলতায়। পাশ্চাত্যের চিত্রে আলোছায়ার ধারায় তিন মাত্রার। ভারতীয় কলার রাজ্যে দু'মাত্রার ছবিই বেশি। গুরুদেবের অঙ্কন পদ্ধতি এই দ্বিমাত্রিক ধারার।

অন্যত্র আমি বলেছিলাম-গুরুদেবের ছবি বস্তুর অনুকৃতি না হয়েও বাস্তব। কথাটা বোধ হয় একটু পরিষ্কার করা দরকার। পাশ্চাত্যের চিত্রকর আঁকার বিষয়টিকে নিখুঁত ভাবে রূপ দন। কিন্তু তথ্যের মূলে যে সত্য আছে, তাকে ধরিয়ে না দিলে তো শিল্প হয় না। ত্রুটিহীন কৌশলে, নির্ভুল হিসেবে এবং শরীরের সংস্থানের যথাযথ অনুপাত বজায় রেখে একটি সিংহের ছবি আঁকা হল, কিন্তু শরীরের জন্য সিংহ তো সিংহ নয়। তার 'সিংহত্ব' রাজসিকতা-শক্তি-নির্ভয়তার সমাহারে। এগুলিই যদি প্রকাশ না করা গেল, তবে ছবিটি সিংহের বিশ্বস্ত প্রতিকৃতি হয়েও শিল্প হল না। প্রাচ্য শিল্পী ঐ সিংহত্বের ভাবটিকেই রূপ দিতে চান, তার অবয়ব-সংস্থানকে নয়। তাঁর আঁকা সিংহ বাস্তবের অনুসৃতি না হতে পারে, তবু তা সিংহেরই ছবি বলে মনে হবে। গুরুদেবের ছবিও এই জাতের দেহের প্রতিকৃতি মাত্র নয়। অমূর্তভাবের দ্যোতক। অনেক শ্রম এবং অনুশীলন করে তবেই শিল্পী দেহের অন্তরালে এই বৈদেহীভাবকে অনুভব ও প্রকাশ করতে পারেন। আগেই বলেছি, প্রাক্-চিত্রকলাপটে রবীন্দ্রনাথ ছন্দ ও বিমূর্তভাবকে স্বগত করেছিলেন, সেই অধিকারনামা তাঁর ছবিতেও। এই দিক থেকেই তাঁর চিত্রকলাকে আমি বলেছিলাম বস্তুর অনুকৃতি না হয়েও একান্ত বাস্তব।

চিত্রশিল্পের পাঁচটি অঙ্গ, সব মিলে অখণ্ড-রূপ-ভাব-কারুশৈলী-হৃদয়সম্মত-প্রয়োগপদ্ধতি-জীবনধর্মতা বিচারের প্রয়োজনে এদের বিশ্লিষ্ট করে নিতে হবে ; ছবিতে এরা এমনভাবে পরস্পর মিলে মিশে থাকে, এদের কার যে কোথায় শুরু আর কার যে কোথায় শেষ তা ধরা বা বলা যায় না। শিল্পীর মনে প্রথমে একটি ভাব জাগে, তারপর তিনি তাকে রূপ দিতে বসেন। সব দেশেই শিল্পাঙ্কনের রীতি এই। কিন্তু গুরুদেব প্রথমেই আরম্ভ করতেন রূপ নিয়ে, তাঁর কল্পনালোকে ভাব তখনও অনাগত ; দেখলে মনে হত, তিনি বোধহয় স্থাপত্যের কোনো আঙ্গিক নিয়ে খেলা করছেন। কিংবা রঙ মেলাবার পরীক্ষায় মেতেছেন ; কিন্তু যখন শেষ করলেন, দেখা গেল—সমস্ত রচনাটি একটি সুস্পষ্ট আকার নিয়েছে, প্রাণ পেয়েছে, এক আশ্চর্য শিল্প হয়ে উঠেছে। অনুশীলন তিনি কোনো দিন করেন নি। প্রয়োজনীয় রীতি কৌশলের ধার দিয়েও যান নি ; অথচ যা সৃষ্টি করেছেন, তা কোনোমতেই অবাস্তব খেয়ালখুশি হয় নি। একমাত্র তাঁর পক্ষেই এমনটি সম্ভব ছিল। বিষয়কে তিনি অবহেলা করেন নি। তাকে অতি প্রাধান্যও দেন নি। আবার ছবি আঁকতে আঁকতে শিল্পির চিত্তে যে ভাবরসের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়, তাও তিনি সমভাবে আস্বাদন করেছেন।

গুরুদেব একবার আমাকে বলেছিলেন —সত্যের অন্তরে এমন একটি আকর্ষণী শক্তি আছে, যা অমোঘ চিরস্থায়ী। অপ্রাকৃত তার অভিনবত্বের জন্যে আমাদের মনকে টানে বটে, কিন্তু তার মধ্যে সত্য যদি না থাকে, তবে সেই মোহ স্বল্পায়ু হয়। গুরুদেবের অদ্ভুত রসাত্মক ছবিগুলি যে আমাদের মনোহরণ করে এবং কালপ্রবাহেও যে তাদের আকর্ষণ শক্তি কমে না গিয়ে বেড়েই চলেছে, এ-দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে—ওগুলির মধ্যে সত্য আছে। সে সত্য বস্তুর অনুকৃতি বা বৈজ্ঞানিক পরিমিতিবোধের নয়, সজীবতার ও রসতায়, যা প্রাচ্য শিল্পির স্বধর্ম।

আমাদের প্রাচীন চিত্রলিপির বর্ণোজ্জ্বলতা আজও অম্লান, পশ্চিমের চিত্রলেখার মতো ধূসর নয়। গুরুদেবও তরল উজ্জ্বল জারমান রঙ পছন্দ করতেন। ইউরোপের চোখ তাঁর ছবির এই উজ্জ্বল পাচতায় মুগ্ধ হয়েছিল। পরিচ্ছন্ন রুচিবোধ ও সমৃদ্ধ বর্ণজ্ঞান তাঁকে দিয়েছিল সুসম বর্ণবিন্যাসের শিল্প চেতনা। রঙ মেলানোর ক্ষেত্রে কখনও কখনও তিনি দুঃসাহসেরও পরিচয় দিয়েছেন। বিভিন্ন বোধের দুটি গাঢ় রঙকে (গাঢ় নীল ও গাঢ়তর কালো) পাশাপাশি এনেছেন। এবং সেখানেও প্রয়োগ এতো নিখুঁত হয়েছে যে, দুয়ে মিলে এক অপরূপ সমন্বয়ের সৃষ্টি করেছে।

অপ্রপাদন এবং প্রকাশের বলিষ্ঠতার জন্যে গুরুদেবের ছবিকে আদিমশিল্পের স্বজাতি বলে মনে হতে পারে। কিন্তু শ্রেণির দিক থেকে এগুলি আধুনিক ও বুদ্ধিজীবিত। তাঁর শিল্প সৃষ্টির মূলে যে জীবনায়ন সক্রিয় ছিল, তা একালীন সংস্কৃতি, রুচি ও মননে সঞ্জীবিত। আদিমতার স্পর্শ বা আভাস তাকে দিয়েছে বলিষ্ঠ শক্তিমত্তা।

গুরুদেবের স্বরচিত ভাষ্য তাঁর চিত্রগুলি অনুধাবনের সবচেয়ে বড়ো সহায়ক। চিত্রলিপির ভূমিকায় তিনি বলেছেন—'লোকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করে, আমার ছবির অর্থ কি। আমার ছবিরা যদি এর উত্তর না দিয়ে থাকে, তবে আমিও নিরুত্তর। তাদের সার্থকতা প্রকাশে, অর্থবহনে নয়, তাদের পেছনে কোনো চিন্তনীয় বক্তব্যও লুকিয়ে নেই, ওদের যেটুকু দেখা যাচ্ছে সেটুকুর কোনো মূল্য যদি থেকে থাকে, তবেই ওরা টিঁকবে ; নইলে, ভেতরে যতোই নীতিবাণীশ বা বৈজ্ঞানিক সত্য থাক না কেন, ওরা সহজেই বাতিল হয়ে যাবে বিস্মৃতির অগম পারে'।*

* সুরুলী'র রবীন্দ্র পরিষদপুস্তি স্মারক সংকলন হইতে সংকলিত

আচার্য নন্দলাল

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবির শেষ রশ্মি অস্তাচলে মিলিয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ পার্শ্বচর নন্দলালের তিরোধান হলো।

আড়াই হাজার বছর পূর্বের একটি স্মরণীয় ঘটনা মানসচক্ষে দেখছি—ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর তাঁর অন্তরঙ্গ পার্শ্বচর আনন্দের তিরোভাব।

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের পর নন্দলালের তিরোধান তেমনি এক ঐতিহাসিক স্মরণীয় ঘটনা।

ভারতবর্ষের একটা দিক অন্ধকার করে, এক দিকপাল অস্ত গেলেন। এক গৌরবোজ্জ্বল শতাব্দীর অবসান হলো।

রূপরসগন্ধস্পর্শে ভরা পরমসুন্দর এই বিশ্বকে সর্ব-ইন্দ্রিয় দিয়ে পান করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের সেই অপূর্ব উপলব্ধিকে পেয়েছিলেন আচার্য নন্দলাল। রবীন্দ্রনাথের পর এই বিচিত্র জগতের অপরূপ রূপকে সর্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে গভীর ভাবে গ্রহণ করেছিলেন যিনি, সেই তাঁর তিরোধান হলো। এখন এই সৌন্দর্যকে দেখবে কে—দেখাবে কে?

আমরা রঙ-কানা। চোখ থেকেও আমরা অন্ধ। শত সূর্যোদয়, শত সূর্যাস্ত তার বিচিত্র রঙের লহরী তুলে মিলিয়ে যাচ্ছে আমরা তা দেখেও দেখতে পাই না।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর কল্পনা করেছিলেন। বিশ্বের সকল বিদ্যার কেন্দ্র হবে তাঁর শান্তিনিকেতন। প্রাচী ও প্রতীচীর—বিদ্যার দুই ধারার—মহামিলন তীর্থ হবে তাঁর আশ্রম। তাঁর কাছে সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠবিদ্যা ছিল সঙ্গীত ও কলা। তিনি নিজে ছিলেন কবি ও শিল্পী। তাই শিল্পী নন্দলাল ছিলেন তাঁর সব্যসাচী,—তাঁর অন্তরেরঅন্তরঙ্গ।

বিশ্বভারতীর রূপায়ণে নন্দলালের দানের তুলনা নাই। প্রাচীন ভারতের ঋতু-উৎসব পুনরুজ্জীবিত করেন রবীন্দ্রনাথ। বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব, বসন্তোৎসব, যাঁরা রূপায়িত করতেন তাঁদের অগ্রণী ছিলেন নন্দলাল।

অপূর্ব আলিম্পনা,—মনোহর বর্ণবিন্যাস, বিচিত্র রঙ্গালয়ের পরিকল্পনা, রঙ-বেরঙের সাজসজ্জা—উৎসবের বহিরঙ্গের সর্ব-প্রকার রূপায়ণই হতো নন্দলালের হাতে।

প্রাচীনকালে, এই ধরণীতে, মহামৈত্রীর ধর্ম প্রচার করেছিলেন ভগবান তথাগত। তাঁর সেই ধর্ম প্রচারে আত্মদান করেছিলেন—শারীপুত্র, মহামৌদ্গল্যায়ন, আনন্দ, অনিরুদ্ধ, মহাকাশ্যপ প্রভৃতি অন্তেবাসিগণ।

এ যুগে বিশ্বমৈত্রীর স্বপ্ন দেখেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সেই স্বপ্ন সার্থক করতে এগিয়ে এসেছিলেন—আচার্য বিধুশেখর, আচার্য ক্ষিতিমোহন, আচার্য নন্দলাল, অসিতকুমার, মহামতি এণ্ড্রুজ, মহাপ্রাণ পিয়ার্সন, এলমহার্স্ট, রাখালদাস, প্রশান্তচন্দ্র, সুনীতি কুমার, কালিদাস, রথীন্দ্রনাথ।

ঋগ্বেদের ঋষির, উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞের এক অপূর্ব সূক্ত রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধি'লোচের হলো :—

"যেনতৎ পঞ্চভিহিতং তন্তা সহ যত্র বিশ্বং
ভবত্যেকনীড়ম্।"

সে-যুগের ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির সেই দর্শন রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তে আর এক বিচিত্ররূপে প্রতিফলিত হলো। বিশ্ব যেখানে

"একটি নীড় বেঁধেছে"– এমন এক আশ্রয় কি এ জগতে সৃষ্টি করা যায় না?

কবি সংকল্প করলেন –বিশ্বের সেই নীড় বাঁধতে হবে— এই শান্তিনিকেতনে। সেই নীড়ে—একাধারে বিশ্ব এবং বিশ্বনীড়ের বিরাজ করবেন।

বিশ্বের সেই নীড় গড়ে উঠলো শান্তিনিকেতনে। বিশ্বভারতীর সে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। বিশ্ববিদ্যার প্রাণ বিশ্বনীড়কে আদর্শ করেছিলেন –রবীন্দ্রনাথ। সেই মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ছুটে এলেন—পৃথিবীর নানা প্রান্ত হতে উদারচরিত মনীষিগণ।

ইউরোপ থেকে এলেন সিলভাঁ লেভি, (Sylvain Levi), উইন্টারনিজ (M. Winternitz) বেনোয়া (M. Benoit ক্রামরিশ (Stella Kramrisch), কারপেলে (A. Karpeles) স্টানলি জোন্স (G. S. Jones), প্যাট্রিক গেডেস্ (Patrick Geddes), লেসনি (V. S. Leaney), কলিন্স (M. Collins), কজিন্স (James Cousins), স্টেন্ কোনো (Sten Konow), ফরমিকি (Carlo Formichi), টুচ্চি (G. Tucci), বাকে (M. A. Bake), গেরমানুস (J. Germanus), আমেরিকা হতে এলেন প্র্যাট্ (J. B. Pratt), রাশিয়া থেকে রোগ্‌ডানব্ (L. Rogdanov), পারস্য থেকে পাউরি, (Pouri Daud), চীন থেকে এলেন লিন্ ও চিয়াং (Lin Wo-Chiang), তান য়ুন শান (Tan Yun-Shan), তিব্বত থেকে—সো-নম-ডো-ডুব্ (So-num-no-dudb), সিংহল থেকে এলেন রাহুল ধর্মাধার মহাস্থবির।

দেশ বিদেশের এমনই আরও কত মহাপ্রাণ বিশ্বভারতীতে আশ্রয় নিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিল আলো আপন হিয়ার পরশ দিয়ে ; এই জীবনের সকল দাবা কালো যাদের আলোক-ছায়ার লীলা ; মনের মানুষ বাইরে বেড়ায় যারা তাদের প্রাণের বরণ-স্রোতে আমার পরাণ হয়ে হারা যায় যারা চলছে ঘেরে চতুর্দিকে।"

এই সব "মনের মানুষ"– যাদের ছাড়া রবীন্দ্রনাথের আদর্শের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হতো না –সেই আচার্য বিধুশেখর, আচার্য ক্ষিতিমোহন, নন্দলাল, অজিতকুমার, দিনেন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ এণ্ড্রুজ, পিয়ার্সন, এলমহার্স্ট, মরিস্, হরিচরণ, কৃপালনি, কালীমোহন, সন্তোষচন্দ্র, গৌরগোপাল, চারুচন্দ্র, দেবেন্দ্রমোহন, অমিয়কুমার প্রভৃতি মনীষিগণ রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে এক নূতন সৌরজগৎ সৃষ্টি করলেন।

বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্ন ছিল। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীতে অতোধিক রত্ন ছিল। সে-সব রত্ন সাতসমুদ্রের সেরা রত্ন। নন্দলাল ছিলেন তাঁদের মধ্যে এক উজ্জ্বলতম রত্ন।

আজ আমরা তাঁকে হারালাম।

বিশ্বের এই "নীড়" সৃষ্টিতে মুখ্য অংশ নিয়েছিলেন নন্দলাল। বিশ্বভারতীকে যদি প্রাসাদের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহলে সেই প্রাসাদের উজ্জ্বলতম প্রকোষ্ঠ, নন্দলালের কলাভবন।

"বিশ্বের নীড়" বিশ্বভারতীর মধ্যে সবচেয়ে স্নেহময় আশ্রয় ছিল নন্দলালের "নন্দন"। সেখানে তাঁর অন্তরের স্নেহ অঝোর ধারে বর্ষিত হতো শিল্প প্রতিভূদের উপর। এ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। স্নেহ সেখানেই নিঃশেষ হয় নি। আমরা বহু বিদ্যার্থীরা তাঁর সেই স্নেহনির্ঝরে অবগাহন করেছি।

অতবড় মানুষ—কিন্তু কত সহজেই তিনি সকলকে গ্রহণ করতে পারতেন। কত সহজেই সকলে তাঁর কোলে স্থান পেতো।

সে কী স্নেহ! কোন্ পিতার, কোন্ মাতার স্নেহ, সে-স্নেহকে অতিক্রম করতে পারে? আমাদের সকলের

কাছে তিনি ছিলেন একাধারে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু, বয়স্য।

স্নেহময় নন্দলাল! কত নিঃস্ব, দরিদ্র বালক, তাঁর স্নেহলাভ করে ধন্য হয়ে গেছে। রামকিঙ্কর আজ ভারত বিখ্যাত। কিন্তু নন্দলালের স্নেহলাভ না করলে বিশ্বভারতীতে তাঁর শিক্ষালাভই সম্ভব হতো না! এরূপ কত উদাহরণ দেব! সব আমরা জানি ও না।

গোপনে, সবার আলোচরে, তাঁর দান অকৃপণধারে বর্ষিত হতো। নিজেকে আড়াল করে রাখাই ছিল তাঁর স্বভাব। এ বিষয়ে তিনি ছিলেন বিধাতার সমধর্মী।

রূপরসগন্ধস্পর্শেতরা এই সৃষ্টিকে আমাদের দান করেছেন যিনি—তাঁকে আমরা দেখতে পাই না। তিনি নিজেকে এমনই আড়ালে রেখেছেন যে তিনি আছেন কিনা—তাতেও আমাদের সন্দেহ।

এই বিধাতারই মত নন্দলাল সর্বত্র নিজেকে আড়ালে রাখতে চাইতেন। নিজেকে সবার চক্ষের সমুখে ধরতে তিনি স্বভাবতই সঙ্কোচ বোধ করতেন। "সবা নীচে সবার পিছে"—থাকতে চাইতেন নন্দলাল।

নন্দলালের কলাভবনের সৌরভ, ভারত এবং ভারতের বাইরেও প্রসারিত হয়েছিল। কলাভবনে স্থান পাবার জন্য এবং কলাভবনের স্নাতককে গ্রহণ করবার জন্য, ভারতে, সিংহলে এবং এসিয়ার অন্যত্রও প্রতিযোগিতা চলতো।

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি—"

কুসুমের চেয়ে কোমল—আবার বজ্রের চেয়ে কঠোর ছিলেন—নন্দলাল।

চোখের সামনে একদিনের এক অত্যাশ্চর্য সোমহর্ষক ঘটনা দেখতে পাচ্ছি। মানসপটে তা অঙ্কিত হয়ে আছে।

সে এক ভয়ঙ্কর রণক্ষেত্র! সেখানে বিরাম শরের অবিরাম বর্ষণ চলেছে। প্রতিরোধকূপে বিষপূর্ণ সূচী বিদ্ধ হচ্ছে। তার মধ্যে অচল, অটল নন্দলাল।

প্রভাতে মন্দিরে উপাসনা চলেছিল। কোনো এক চপল বালক নিকটবর্তী ভাঁশ মৌমাছির এক বিরাট চাকে ঢিল মেরে পালিয়ে যায়।

মৌমাছির দল এক নিরীহ শিশুকে ঘন অন্ধকারের মত ঢেকে ফেলে। চতুর্দিকে মৃত্যুর পাশপাশ। শিশুটির বুঝি আর রক্ষা নাই।

বিশ্বভারতীতে সাহসী যুবকের অভাব ছিল না। অসম সাহসে অনেকেই অগ্রসর হয়েছিলেন—শিশুটিকে উদ্ধার করতে। তাঁদের মধ্যে ব্যায়ামবিদ, দৃঢ়দেহ, দৃঢ়চিত্তের অধিকারী অনেকেই ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলকেই পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে হলো।

দূর থেকে এ দৃশ্য দেখলেন—প্রৌঢ় নন্দলাল। আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ওকে উদ্ধার করতে না পারলে মৃত্যু ওর অবশ্যম্ভাবী।

চকিতে তাঁর ছোট অঙ্গবাসখানি তিনি তাঁর মাথায় ও মুখে জড়িয়ে নিলেন। তারপর সেই ভয়ঙ্কর শরবর্ষণের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

তিনি ফিরে এলেন। কিন্তু একা নয়—বালকটিকে কোলে নিয়ে ফিরে এলেন। নিকটবর্তী অতিথিশালার (বর্তমান—দর্শনভবনের), এক অর্গলবদ্ধ প্রকোষ্ঠের অর্গল সবলশক্তিতে চূর্ণ করে, ঢুকে পড়লেন। তারপর পলকের মধ্যে নিজ পৃষ্ঠ দিয়ে কপাট বন্ধ করে শিশুটিকে কোলে নিয়ে বসে' পড়লেন।

ইতিমধ্যে শত শত মৌমাছির নিদারুণ দংশন তাঁর প্রতিরোধকূপে বিষের জ্বালা জ্বালিয়ে দিয়েছে। শিশুটি তো অচেতন। তিন দিন তাঁরা উভয়েই জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। মুঠো মুঠো হল তোলা হয়েছিল—তাঁদের দর্বাঙ্গ হতে।

জীবনমরণের সন্ধিস্থল হতে উদ্ধার করা হলো শিশুটিকে। এবং তা সম্ভব হলো ঐ শিল্পী নন্দলালের দ্বারাই। একথা

আজ প্রায় অবিশ্বাস্য। প্রত্যক্ষদর্শীদের বেশি কেউ আজ আর এখানে নাই।

এই নন্দলাল। কুসুমের চেয়েও কোমল অথচ বজ্রের চেয়েও কঠিন। এই ভারতীয় পুরুষের আদর্শ। সেই আদর্শ পুরুষ আজ চলে' গেলেন। ভারতবর্ষ হতে একজন সত্যিকারের পুরুষের তিরোধান হলো।

রত্নগর্ভা ভারতবর্ষ। হয়তো শতাব্দীর মধ্যেই নন্দলালের মত শিল্পী আবার জন্মগ্রহণ করবেন। কিন্তু একাধারে এমন পুরুষ ও এমন স্নেহশীল গুরু, এমন সর্বজনপ্রিয় মানুষ সহজে জন্মাবে কি?

সমস্ত বিশ্বভারতী আজ অন্ধকার। 'নন্দন' আজ নিরানন্দ!

কিন্তু মৃত্যুর এক অপূর্ব রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করলাম।

মৃত্যুর যে কেমন মহান্—তা আজ ব্রাহ্মমুহূর্তে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। চার পাঁচ বছরের শিশু থেকে, কিশোর কিশোরী, তরুণ তরুণী, অশীতিপর বৃদ্ধ পর্যন্ত সে-মহান মৃত্যুর শোভাযাত্রায় অংশ নিয়ে নিজেকে ধন্য পবিত্র মনে করেছে।

মৃত্যুর শোভাযাত্রা। মৃত্যুর শোভা! হাঁ মৃত্যুর শোভাই প্রত্যক্ষ করলাম।

চন্দনচর্চিত শায়িতদেহ পুষ্পমাল্যবিভূষিত। বনমালাধারী শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মহা-নিদ্রায় অভিভূত নন্দলাল। সেই নন্দলালকে ধীরে ধীরে আশ্রম প্রদক্ষিণ করাচ্ছেন আশ্রমিকগণ।

"কর তাঁর নাম গান"—এই মহাসঙ্গীত গুরুগম্ভীর সহস্রকণ্ঠে গীত হচ্ছে। সহস্র হৃদয়ের স্নেহ অশ্রুরূপে বর্ষিত হচ্ছে।

চলেছেন নন্দলাল। শ্রীপল্লী হতে সঙ্গীতভবনে, সঙ্গীত-ভবন হতে "নন্দনে"। নন্দন হতে শ্রীসদনে। সেখান থেকে ধনিকে—বেণুকুঞ্জের দিনেন্দ্র চা-চক্রে। সেখান থেকে বিদ্যাভবনে, বিদ্যাভবন থেকে আম্রকুঞ্জে—আম্রকুঞ্জ হতে ছাতিম-তলায়—সেখান থেকে উত্তরায়ণে, তাঁর গুরুদেব, তাঁর প্রিয়তমের উদ্যমে, শান্তীর সম্মুখে শেষ বিদায় নিয়ে, শান্তিনিকেতনের উপাসনা-মন্দির প্রদক্ষিণ করে, রতনপল্লীর পথ বেয়ে চলেছেন নন্দলাল সেই পবিত্র শ্মশানভূমিতে, যা কবি দ্বিজেন্দ্রনাথের, আচার্য-ক্ষিতিমোহন, আচার্য-প্রবোধচন্দ্র, মহীয়সী দেবী ইন্দিরার চিতাভস্মে তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

সেই মহাতীর্থের তীর্থরেণুতে নন্দলালের অমর আত্মার মরদেহের অণু, পরমাণু মিলিত হলো।

ওঁ বায়ুরনিলম্ অমৃতম্ অথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।

প্রাণবায়ু অনন্ত বায়ুমণ্ডলে মিলিয়ে গেল। খণ্ড অখণ্ডে, সীমা অসীমে, মৃত্যু অমৃতে প্রবেশ করলো। আত্মার পরিত্যক্ত আধার, দেহ ভস্মীভূত হলো।

ওঁ প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্বেভির্যত্র নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেয়ুঃ।

সংগচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সংযমেন ইষ্টাপূর্তেন পরমে ব্যোমন্।

হিত্বায়াবদ্যং পুনরস্তম্ এহি সংগচ্ছস্ব তন্বা সুবর্চাঃ।

হে যাত্রী। যাত্রা করো। যাত্রা করো। অনন্তকাল ধরে, তোমার এই মহাযাত্রা চলেছে। কবে—কত কোটী কল্প পূর্বে তার আরম্ভ, তা কেউ জানে না। জন্ম জন্মান্তর ধরে তুমি চলেছ। ভুবনে ভুবনে, লোকে লোকে। গড়েছ সামাজিক আশ্রয়। স্নেহ, প্রীতি, মায়ামমতায় সে-আশ্রয় ভরে উঠেছে। নির্মম তুমি আবার সেই মায়া কাটিয়ে, তোমার ক্ষণিক ক্ষণিত যাত্রা শুরু করেছ।

তোমার সংসার, প্রিয়তমার প্রেম, সন্তানের স্নেহ, প্রিয়জনের প্রীতি, কিছুই তোমায় বেঁধে রাখতে পারে নি।

"মৃত্যোঃ পদ্বীয়ম্ অবমুঞ্চমানঃ"—মৃত্যুর বন্ধন ছিন্ন করে' বীর তুমি এগিয়ে চলেছ।

"মহাপ্রস্থানে পিছনে তাকাতে নাই"—মহাভারতের এই শিক্ষা। পিছনের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে চলেছ তুমি সেই চিরন্তন পথে, যে-পথে তোমার পূর্ব পিতামহগণ প্রয়াণ

করেছেন, সেই পিতৃগণ তোমার জন্য প্রতীক্ষা করছেন—তুমি তাঁদের সঙ্গে মিলিত হও।

তোমার সুকৃত, তোমার ধর্মকে পাথেয় করে তুমি ধর্মরাজের সঙ্গে মিলিত হও। সেই "অনীকে" তুমি অবগাহন করো। ঐ পবিত্র অবগাহনে তোমার যা কিছু কলুষ তা ধৌত হবে। শোভন দীপ্ত তনু নিয়ে তুমি আর এক লোকে আশ্রয় নেবে।

পুনরেহি পুনরেহি দিব্যেন বর্চসা সহ।

আমাদের আকুল প্রার্থনা—আবার এসো তোমার জ্যোতির্ময় বল নিয়ে—আবার তুমি আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হও।

ওঁ বসু বাতা ঋতাবরী যজ্ঞং ধত্তং সরস্বতি বিদ্বঃ। *

---

* ১৭ই এপ্রিল সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতন-মন্দিরে আচার্যের ভাষণ।

৺নন্দলাল বসু

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

বলতে গেলে ১৯২১ সাল থেকে শান্তিনিকেতনেই নন্দলাল বাবুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয়ের সূত্রপাত। তখন থেকেই ক্রমে ক্রমে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্বন্ধ সুরু হয়েছিল। সেই বন্ধুত্ব শেষ পর্যন্ত গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সম্বন্ধে গভীরভাবে জড়িত ছিলেন আরো দু জন। তাঁরা হলেন ভেঙ্কেশচন্দ্র সেন ও অক্ষয়কুমার রায়—এই দুজনকে নিয়ে আমাদের একটি ছোট্ট অন্তরঙ্গ বন্ধুগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরও ছিলেন এই দলের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আমরা চারজন যেমন আসি, ভেঙ্কেশ বাবু, অক্ষয় বাবু এবং নন্দলাল বাবু প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো এক সময়, কখনো এক ঘণ্টা কখনো বা দুঘণ্টা কোনো কোনো দিন বা পিকনিক উপলক্ষে সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটা পাঁচটা পর্যন্ত একত্রে দিন কাটাতাম। এই রকমভাবে মেলামেশার প্রায় দৈনিক নিয়মের বন্ধনে দীনু বাবু (দীনেন্দ্রনাথ) ধরা পড়েন নি—ধরা না পড়লেও প্রায়ই আমরা তাঁর সঙ্গ, পেতাম। দীনু বাবু ছিলেন আমাদের এই বন্ধু গোষ্ঠীর সর্দার, তিনি ছিলেন মজলিসী, শান্তিনিকেতনের স্বনাম ধন্য সঙ্গীতাচার্য্য এবং সুরসিক।

আমাদের এই বন্ধু গোষ্ঠীর মেলামেশার ধরণধারণ কী রকমের ছিল সে প্রসঙ্গে পরে আসব। তার আগে, অতি সংক্ষেপে নন্দলাল বাবুর পরিচয় দেওয়া কর্তব্য মনে করি—কেননা শিক্ষিত জনসাধারণ প্রায় সকলেরই তাঁর বিস্তারিত পরিচয় জানা আছে। কারণ তিনি বঙ্গদেশের তথা ভারতের একজন স্বনামধন্য শিল্পী,—শুধু শিল্পী কেন একজন মনীষীও বটে। তবু এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়টুকু এইজন্যই দেওয়া কর্তব্য মনে করছি যে এ ব্যতীত আমার এই স্মৃতিকথায় বা এই রচনায় ত্রুটি থেকে যাবে এই আমার ধারণা। তাই সংক্ষেপে তাঁর পরিচয় বলি :

পরিচয়

১৮৮০ সালে বিহারের খড়গপুরে ৩রা ডিসেম্বর তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন সরকারী কর্মচারী। তিনি ছিলেন স্বপতি শিল্পের অনুরাগী আর তাঁর মাতা ছিলেন ঘরোয়া শিল্পী অর্থাৎ পুরান ছেঁড়া কাপড়ের নানা রঙের পাড়ের সুতো দিয়ে নানা ডিজাইনের বা নক্সার কাঁথা সেলাই করতেন। সেই সেলাই নক্সা ছিল শিল্পময়। আজকালকার মধ্যবিত্ত ঘরের গৃহিণীরা অবসর সময়ে এই কাঁথা শিল্প রচনার ট্রাডিশন্ সেকালের মতন আর রাখতে পারছেন না। আমার বাল্যকালে যখন গ্রাম-জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলাম তখন দেখেছি অনেক ঘরেই মধ্যবয়স্কা এবং বৃদ্ধারা নানা ডিজাইনের কাঁথার শিল্প রচনা করতেন, শুধু কাঁথার শিল্প রচনাই নয় নানা রকম পূজাপার্বণ উপলক্ষে পিঠুলী দিয়ে বিচিত্র রকমের আল্পনা তৈরী, ঝুনো নারকল দিয়ে নানা রকম ফুলের পাঁপড়ী তৈরী এবং সন্দেশাদি মিষ্টির নানা ডিজাইনের ছাঁচ তৈরী করাও ছিল তাঁদের সেরস্থানীয় অঙ্গ স্বরূপ। কাজেই একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে

সেকালের পল্লী বাংলার গৃহে গৃহে এই রকম শিল্প চর্চার আবহাওয়া সজীব ছিল। কিন্তু এই শ্রেণীর শিল্পচর্চার ধারা স্বাভাবিক ভাবেই মেয়েরাই বজায় রেখেছিলেন, এদিকে পুরুষদের তেমন কোন আগ্রহ ছিল না বললেই হয়। এ বিষয় কিন্তু নন্দলালের আকর্ষণ ছিল একটা ব্যতিক্রম। নন্দলালের কাছেই শুনেছি বাল্যকাল হতেই তাঁর এই সব শিল্পের প্রতি একটা সহজ আকর্ষণ ছিল। শুধু এই সব শিল্পের প্রতি নয় কুমোরদের (কুম্ভকারদের) দ্বারা নানা রকমের যে সব মাটির নিত্য ব্যবহার্য জিনিস তৈরী হতো—যেমন নানা ছাঁদের প্রদীপ, শিলসুড়ি, হাঁড়ি, কলসি, কড়াই, ঘট, গামলা, গেলাস, খুরি এইসব জিনিসের প্রতিও তাঁর নজর ছিল অর্থাৎ এগুলি কেমন করে তৈরী হয় তা দেখে তাঁর আনন্দ হতো। কাদা-মাটি দিয়ে তৈরী এই সব শিল্প সৌন্দর্যই যে তাঁকে মুগ্ধ করতো তা নয় মৃৎশিল্পীরা যে সব দেবদেবীর মূর্তি তৈরী করতো, নানারকম খেলনা পুতুল তৈরী করতো সেদিকেও তাঁর বেশ আকর্ষণ ছিল। তাঁর কাছেই শুনেছি যে তিনি এইসব শিল্প চর্চার দিকে আত্মনিয়োগ করবেন এইরকম একটা ইচ্ছে তাঁর মনে মাঝে মাঝে প্রবল হয়ে ওঠতো। কিন্তু শুধু নানা অনিবার্য কারণে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের অন্য দশজন ছেলেকে যেমন করে প্রচলিত নিয়মে স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া করতে হয় তাঁকেও তেমনিভাবেই স্কুলে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া করবার জন্য প্রস্তুত হতে হলো। প্রস্তুত হলে হবে কি তাঁর মনটা যে ঘুরপাক খেত শিল্পরাজ্যের চারিদিকে। তাই কোনরকমে স্কুলের পরীক্ষা পাশ করে কলেজে ভর্তি হলেন,—ভর্তি হলে হবে কি বহু চেষ্টা করেও এফ, এ ক্লাশের সীমানা পেরিয়ে বি. এ, ক্লাশে ভর্তি হওয়া তাঁর ভাগ্যে সম্ভব হয়নি। অভিভাবক-বর্গ দুশ্চিন্তায় পড়লেন এই ছেলেকে নিয়ে কি করা যায়! টাকা পয়সা রোজগার করার মত বিদ্যে অর্জন না করলে, কেবল কাদামাটি ঘেটে আর ছবি এঁকে কি হবে! এ সব করলে তো আর ভবিষ্যত আয়ের পথ প্রশস্ত হবে না। নন্দলালের কাছেই শুনেছি তাঁর এই শিল্পানুরাগের প্রতি আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের তেমন সহানুভূতি না থাকায় তাঁকে মানসিক কষ্টও বেশ কিছুটা ভোগ করতে হয়েছিল। এই কষ্ট সহ্য করেও তাঁর মন ক্রমাগত এগিয়ে চলল তাঁর কল্পনার শিল্পরাজ্যে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন মনে করি যে সব রকম ছবির প্রতি তার আকর্ষণ থাকলেও সেই সময়কার ভারতের স্বনামধন্য চিত্রশিল্পী রবি বর্মার অঙ্কিত হিন্দুদের দেবদেবীর পাশ্চাত্য ঢাইলে আঁকা নানা রঙের রকমারী ছবি তাঁর মনে আকর্ষণীয় কোন রেখাপাত করতে পারেনি যদিও তখন বহু সাধারণ অসাধারণ লোকের কাছে রবি বর্মার অঙ্কিত ছবিগুলি সমাদৃত ছিল। নন্দলাল ঐ সব ছবির প্রতি আকৃষ্ট না হলেও ঐ ছবিগুলি দেখে অনেক সময় ভাবতেন ছবিগুলি অন্যদের এত ভাল লাগে অথচ তাঁর ভাল লাগে না এর কারণ কি? এর কারণ খুঁজে বের করবার প্রচেষ্টা ছিল তাঁর শিল্পসাধনার একটা দিক।

নন্দলালের চিত্র শিল্প প্রতিভার দ্বার হঠাৎ খুলে গেল তাঁরই এক আত্মীয়ের সহায়তায়। এই আত্মীয়টি ছিলেন কলকাতা আর্ট স্কুলের ছাত্র। এর কাছেই নন্দলাল পেলেন নিজের পথ-চলার সম্বল, অর্থ সম্বল নয় পেলেন সহানুভূতি আর ভালবাসার সম্বল। এঁর কাছেই নন্দলাল কিছুদিন বাড়ীতেই চিত্রাঙ্কন বিদ্যা শেখবার সুযোগ পেলেন। তারপর একদিন একজনের সহায়তায় তিনি উপস্থিত হলেন কলকাতা আর্ট স্কুলে—প্রথমেই উপস্থিত হলেন আর্ট স্কুলের উপাধ্যক্ষ শ্রী অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুরের কাছে। মনে মনে ইচ্ছা কোন রকমে ঐ স্কুলে ছাত্র হিসাবে ভর্তি হওয়ার। তখন আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ বা প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন হ্যাভেল্ সাহেব। নন্দলালের ঐ স্কুলে ভর্তি হবার যোগ্যতা আছে কি না তা পরখ করবার জন্য নন্দলালের আঁকা কিছু ছবি এবং নকশা অবনীন্দ্র নাথ এবং হ্যাভেল্ সাহেব দেখলেন, দেখে খুশী হলেন। তাঁরা খুশী হলেও স্কুলে ভর্তি হবার বাঁধাধরা বিধান বা

নিয়মানুযায়ী চিত্রাঙ্কনের কিছু বিষয়ে নন্দলালকে পরীক্ষা করা হলো। সাফল্যের সঙ্গে সে পরীক্ষায় নন্দলাল পাশ করলেন। তার পরেই নিয়মিত ছাত্রহিসাবে সেই স্কুলে পাঁচ বৎসর কাটিয়ে দিলেন। সেখানে প্রথম কিছু দিন তাঁকে নক্সা তৈরী করার ক্লাশে শিক্ষা নিতে হয়েছিল। এই নক্সা আঁকার প্রাত্যহিক রুটিন বাঁধিক কাজ যাকে মাঝে মাঝে তাঁর এক ঘেয়ে মনে হতো। শুধু এই এক ঘেয়েমির কষ্টকে তিনি সাধনার অঙ্গরূপে স্বীকার করে নিয়ে মন দিয়েই নক্সা আঁকার কাজ করতেন।

আর্ট স্কুলে নক্সা আঁকার পর্ব শেষ করে যখন তিনি ছবি আঁকার ক্লাশে ঢুকলেন তখন তাঁর শিল্পী জীবনের আর একটা নতুন দরজা খুলে গেল। এই ছবি আঁকার ক্লাশের গুরু ছিলেন অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর। রঙে, রেখায় তুলিকায় মনের মতন ছবি ফুটিয়ে তোলবার আনন্দময় সাধনা তাঁর সুরু হলো। এই ক্লাশে তিনি ছবি আঁকতেন ঠিক যাকে বলে রুটিন মতো তা নয়, ক্লাশের বাঁধাধরা সময় সীমার মধ্যে থেকেও কিছুটা স্বাধীনভাবে ছবি আঁকবার সুযোগ পেলেন। এই স্বাধীন ভাবে ছবি আঁকবার সুযোগ সুবিধার উৎসাহ দাতা ছিলেন অবনীন্দ্র নাথ। নন্দলাল আর্ট স্কুলেও ছবি আঁকতেন আবার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুরের ঘরে বসেও ছবি আঁকতেন। আর্ট স্কুলে যে পাঁচ বৎসর তিনি শিল্প শিক্ষা করেছিলেন সেই সময়েই অবনীন্দ্র নাথের বাড়ীতে থেকে তিনি অবনীন্দ্র নাথের কাছে ছবি আঁকার তালিম নিতেন। এই ঠাকুর বাড়ীতে শিল্প সাধনার একটা আনন্দময় আবহাওয়া ছিল, দেশ বিদেশের চিত্র শিল্পের অনুরাগীরা এবং কয়েক জন চিত্র শিল্পীও অবনীন্দ্র নাথের বাড়ীতে যাওয়া আসা করতেন। এই সব শিল্পীদের মধ্যে দেশী বিদেশী শিল্পীরাও ছিলেন। কাজেই একদিকে আর্ট স্কুলে ছবি আঁকার সাধনা আর একদিকে অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুরের বাড়ীতে বিচিত্র আর্টিষ্টদের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য হয়েছিল নন্দলালের। নন্দলালের আর্ট চর্চার কিংবা ভারতীয় চিত্র শিল্পের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ ঘটেছিল আনুমানিক ১৯১০ কিংবা ১৯১১ সালে। তখন বিলেত থেকে ভারতে এসেছিলেন একজন বিশিষ্ট মহিলা অজন্তা গুহার দেওয়ালের ছবি নকল করার উদ্দেশ্যে। এই মহিলা অজন্তায় গিয়ে সেই বিশিষ্ট বিলাতী মহিলাকে অজন্তার ছবি নকল করার কাজে সুযোচিত ভাবে সাহায্যে করবার জন্য সহকারী চিত্র শিল্পীর প্রয়োজন হলো। এই প্রয়োজনে আত্ম-নিয়োগ করবার জন্য, সিষ্টার নিবেদিতার অনুরোধে অবনীন্দ্র নাথ অজন্তায় পাঠালেন নন্দলাল ও অসিত কুমার হালদারকে। সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে নন্দলালের পরিচিত হবার সুযোগ ঘটেছিল একদিন আর্ট স্কুলেই। সিষ্টার নিবেদিতা গিয়েছিলেন আর্ট স্কুলে কি একটা কাজে অবনীন্দ্র নাথ আর হ্যাভেল সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে—দেখা করতে গিয়ে যখন ঘুরে ফিরে ছাত্রদের ছবি আর ছবি আঁকা দেখছিলেন তখন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষিত হলো নন্দলালের কয়েকটি ছবির দিকেও, ছবিগুলি দেখে তিনি খুশী হলেন। এরপর থেকেই নন্দলালের ছবির প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ সুরু হলো। নন্দলাল সিষ্টার নিবেদিতার স্নেহের পাত্র হয়ে ওঠলেন। এই স্নেহ সম্বন্ধকে কেন্দ্র করেই সিষ্টার নিবেদিতার বইয়ের কয়েকটি ছবি নন্দলাল এঁকে দিয়েছিলেন।

ক্রমে ক্রমে নন্দলালের চিত্র শিল্প প্রতিভার যশ বাংলা দেশের সীমানা অতিক্রম করে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ও ছড়িয়ে পড়ল। বাংলা দেশের বাইরে ব্যারাণার কীর্তি মন্দিরে তাঁর আঁকা ছবির প্রশংসা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল তারপরে নানাদিক দিয়ে নানা সূত্রে তাঁর চিত্রাঙ্কন প্রতিভার ফুল নানা ভাবে পাপড়ি মেলে মেলেবিকশিত হয়ে উঠতে লাগল। এই প্রতিভা বিকাশের নানা উপলক্ষ্য। এই সব উপলক্ষ্যের ইতিহাস, বিশ্লেষণ করে করে দেখাবার প্রচেষ্টা আমি করব না—তিন কারণে করব না,—প্রথমত আমি চিত্র শিল্পী নই এবং চিত্র শিল্পের সমস্যার বলতে বা বোঝার আমি তাও

নই। দ্বিতীয়ত নন্দলাল বাবুর শিল্প কীর্তির ফর্দ তৈরী করতে হলে নানা দিক দিয়ে অনুসন্ধানের যে সময় প্রয়োজন সে সময় এবং সুযোগ আমার নাই। তৃতীয়ত যদি বা সময় সুযোগ পাওয়াও যেত তাহলেও একাজ আমার পক্ষে এখন অসাধ্য, কেননা আমার বয়স ৭২, দীর্ঘদিন নার্ভাস-রোগে ভুগে জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। কাজেই নন্দলাল সম্বন্ধে অর্থাৎ তাঁর শিল্প প্রতিভার সম্যক আলোচনা করা আমার সাধ্যাতীত।

একজন শ্রেষ্ঠ চিত্র শিল্পী হিসাবে নন্দলালের বৈশিষ্ট্য কি, তাঁর চিত্রাঙ্কনের স্বতন্ত্র ধারাই বা কি এ সম্বন্ধে আলোচনা করার কোন যোগ্যতাই আমার নাই। কাজেই এদিক দিয়ে তাঁর সম্বন্ধে কোন আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই নয়, তবু সংকোচের সঙ্গেই সরল ভাবে স্বীকার করছি যে শান্তিনিকেতনে ১৯০৮ সাল থেকে আজ পর্যন্ত এক টানা থাকার জন্য এখানে বহু শিল্পীর শিল্প রচনা দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে। অনেক চিত্র শিল্পীদের সঙ্গে চিত্র শিল্পের বিষয় আলাপ আলোচনা করেছি। শান্তিনিকেতনে এই দীর্ঘ দিন থাকার জন্য অনেক সংগীত শিল্পীদের এবং নৃত্য শিল্পীদের সঙ্গেও পরিচয় ঘটেছে। অনেক রকম গানও শুনেছি, অনেক ভঙ্গীর নাচও দেখেছি, অনেক দারু শিল্পকারকের দারু শিল্প রচনাও দেখেছি, ভাস্কর্য শিল্পীর শিল্প রচনাও দেখেছি, শান্তিনিকেতনে থাকার জন্যই বহু প্রখ্যাত দেশী বিদেশী কবি এবং সাহিত্যিকদেরও দেখেছি। নানা উপলক্ষ্যে বিচিত্র সাহিত্যানুষ্ঠানে সাহিত্যিকদের মধ্যে পরস্পরের সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনাও শুনেছি। শান্তিনিকেতনেই অনেক দার্শনিক খ্যাতনামা ব্যক্তিদের দেখেছি। দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের আলোচনাও এখানে শুনেছি। এই সব দেখা শোনা, আলাপ আলোচনা যে সবসময় আগ্রহ সহকারে দেখেছি বা শুনেছি একথা যদি বলি তাহলে মিথ্যে বলা হবে। তবু বলি এই সব দেখেছি, শুনেছি বাধ্য হয়ে এখানকার আবহাওয়ার এবং পরিবেশের মধ্যে থাকার জন্য। কাজেই বাধ্য হয়ে দেখার ভিতর দিয়ে শোনার ভিতর দিয়ে কিছু ভাল মন্দ জ্ঞান আমার অজ্ঞাতসারেই অর্জন করেছি। এই অর্জিত জ্ঞান মনের পাকস্থলীতে নিয়ে ঠিক হজম করতে পেরেছি এ কথা যদি বলি তাহলে সেটা হবে ধৃষ্টতা—কেন না যদি বা কিছু কিছু হজম হয়েও থাকে তা বুঝিয়ে বলবার মতন যুক্তি তর্কময় ভাষাও আমি আয়ত্ত করিনি; আয়ত্ত করতে না পারলেও এই সব বিষয়ের ভালমন্দ বিচারের একটা নিজস্ব চিন্তাধারা আমার মধ্যে কিছুটা পাকাপাকি রকমের হয়ে গেছে। এই পাকাপাকি চিন্তাধারার মধ্যে এসব বিষয় পাকা সমঝদারেরা এবং পাকা সমালোচকেরা অনেক গলদ পাবেন, যেমন অনেক মজবুত পাকা ইটেও অনেক গলদ থাকে। গলদ থাকলেও সেই পাকা ইটের দ্বারা ভাল পাকা ইটের মত কাজ না হলেও সেই ইটটা পাকাই থাকে। আমার জ্ঞান সম্বন্ধে এই সব কথা বাহ্যতঃ অবান্তর মনে হলেও নন্দলাল প্রসঙ্গে এবং তাঁর চিত্র শিল্প প্রসঙ্গে আমার ধারণা বলতে আমি বাধ্য। আমার ধারণার সঙ্গে নন্দলাল ভক্তদের অনেকের হয়তো মিল খাবেনা তবু আমার ধারণা আমারই ধারণা।

এইবার আমার দেখা নন্দলাল প্রসঙ্গ সুরু করি—

শান্তিনিকেতনের কলাভবনের যখন ভ্রূণ অবস্থা সেটা বোধ হয় ১৯১০ সাল। ১৯১০ সালেই শান্তিনিকেতনের তৎকালীন বিদ্যালয়ের প্রথম চিত্রাঙ্কনের শিক্ষকরূপে আসেন শ্রীযুক্ত সন্তোষ মিত্র। তিনি তখন যুবক। এখানে শান্তিনিকেতনে চিত্রবিদ্যা শেখাবার জন্যে তাঁকে পাঠিয়েছিলেন অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর। এখানে একজন চিত্রশিল্পী প্রয়োজন সুতরাং একজন চিত্রশিল্পীকে পাঠাবার জন্য রবীন্দ্র নাথ অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুরের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। সন্তোষ বাবুকে এখানে পাঠাবার আগে অবনীন্দ্র নাথের মনে একটা এই আশংকা ছিল যে এই রকম একজন ছেলে মানুষ

শিক্ষককে শিক্ষার্থীরা যথোচিত ভাবে মান্য করবে কি না। রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথকে অভয় দিয়ে জানিয়েছিলেন ছাত্রদের তরফ থেকে সন্তোষ বাবুকে শিক্ষক হিসাবে হেয় করতে কোনই বাধা হবে না যদি শিক্ষক নিজের গুরুত্ব নিজে রক্ষা করে চলেন।

সন্তোষ বিদায় এলেন তাঁর কাল সুরু হলো। তখনকার পরিবেশ এবং আয়োজনের মধ্যে যতটুকু সম্ভব। সন্তোষ বাবুর কাছেও নন্দলালের ছবির প্রশংসা এবং নন্দলালের প্রতি অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুরের স্নেহের কথা বহুবার বহুরকমে শুনলাম। তারপর চিত্রশিল্পী হিসাবে এলেন অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুরের আর একজন শিষ্য, সম্বন্ধে রবীন্দ্র নাথের সম্পর্কীয় নাতি অসিত কুমার হালদার। তাঁর কাছেও শুনতে লাগলাম নন্দলালের কথা। এঁদের কাছে নন্দলালের কথা শোনার আগেও রবীন্দ্র নাথের কাছে এবং আরো কয়েকজনের কাছে নন্দলালের বিষয় নানা রকম ভাল ভাল কথা শুনেছিলাম। এই সব শোনা কথার মাধ্যমে আমাদের কয়েক জনের মনের মধ্যে নন্দলালকে স্বচক্ষে দেখবার জন্য একটা আগ্রহ সচেতন হয়ে উঠল। কল্পনায় একটা অসাধারণ নন্দলাল থেকে থেকে ঝিলিক দিতে লাগল। এর দুই এক বছর পরেই বোধ হয় হঠাৎ অসিত দার কাছে কিংবা হয়তো অন্য কারো কাছেও শুনতে পেলাম নন্দলাল শান্তিনিকেতন আসছেন। এই খবরটা শুধু আমার কাছে নয় আরো অনেকের কাছে একটা মহা আনন্দের খবর হলো। সকলেই দিন গুনতে লাগলাম কবে নন্দলাল আসবেন কবে তাঁকে আমরা দেখতে পাব। অবশেষে একদিন সত্যই নন্দলাল এসে উপস্থিত। তাঁকে দেখে চেহারার, বেশভূষার নিতান্তই একটি সাধারণ ঘরোয়া মানুষকেই দেখলাম। এই অতি সাধারণ মানুষের মধ্যে যে একটি অনন্য সাধারণ শিল্পী এবং অসাধারণ মানুষ রয়েছে একথা বাইরে থেকে কে বুঝবে!. এই অসাধারণ মানুষটিকে সেদিন সম্বর্ধনা জানিয়ে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতা পাঠ করেছিলেন সে কবিতা বহু কাগজেই ছাপা হয়ে গেছে, বহু লোকই সে কবিতা পড়েছেন। তবু সেই কবিতার নকল এই প্রবন্ধে পাঠকবর্গকে উপহার দিচ্ছি। কবিতাটি এই—

ঐ

শ্রীমান নন্দলাল বসু

পরম কল্যাণীয়েষু

তোমার তুলিকা রঞ্জিত করে,
ভারত-ভারতী-চিত্ত।
বঙ্গলক্ষ্মী ভাণ্ডারে সে যে
যোগায় নূতন বিত্ত।
ভাগ্যবিধাতা আশিষ মন্ত্র
দিয়েছে তোমার কর্ণে
বিশ্বের পটে স্বদেশের নাম
লেখ অক্ষয় বর্ণে।
তোমার তুলিকা কবির হৃদয়
নন্দিত করে, নন্দ।
তাইত কবির লেখনী তোমার
পরায় আপন ছন্দ।
চির সুন্দরে কর গো তোমার,
রেখা বন্ধনে বন্দী।
শিব জটাসম হোক তব তুলি,
চির রস-নিস্যন্দী।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন
১২ই বৈশাখ
১৩২১

প্রথম যাত্রায় এসে নন্দলাল শান্তিনিকেতনে বেশি দিন থাকেন নি, কলকাতায় ফিরে চলে গিয়েছিলেন। তারপর

২৭৪০৭৭

পাকাপাকি রকমেই শান্তিনিকেতনে এসে শান্তিনিকেতনে চিত্রাচার্য হয়ে বসবাস সুরু করলেন এবং শান্তিনিকেতনেই তাঁর নিজ বাসভবনে বিগত ২রা বৈশাখ (১৩৭৩) শনিবার অপরাহ্ণ পাঁচটা বত্রিশ মিনিটে দেহত্যাগ করেন। এই দীর্ঘ দিন তিনি শান্তিনিকেতনে বাস করে শুধু ইটের তৈরী বাড়ী বলাভবন নয় শান্তিনিকেতন আশ্রমে তিনি নিজেকেই একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করলেন। রবীন্দ্র নাথের একটি গানে আছে "আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে"। শান্তিনিকেতনে আমরা যে সবাই রাজা হয়েছিলাম বা হয়ে আছি একথা অতি বড় কাল্পনিকও বিশ্বাস করবে না। কিন্তু এই শান্তিনিকেতনের সাম্রাজ্যে সম্রাট রবীন্দ্রনাথের এলাকায় চারটি বড় অঞ্চল ছিল. সেই চার রাজ্যের এক রাজ্যের অধিপতি ছিলেন দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর। দ্বিতীয় রাজ্যের অধিপতি ছিলেন মহামহোপাধ্যায় বিধু শেখর শাস্ত্রী। তৃতীয় রাজ্যের অধিপতি ছিলেন নন্দলাল বসু। আর চতুর্থ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন ক্ষিতীমোহন সেনশাস্ত্রী। এই চার রাজার রাজ্য ছিল চার রকমের। দ্বিজেন্দ্র নাথের রাজ্যে অগাধ দর্শন শাস্ত্রের বাতি। বড় বড় দর্শন শাস্ত্রের পণ্ডিতেরা, মনীষীরা দ্বিজেন্দ্র নাথের কাছে শ্রদ্ধাভরে অবনত হয়ে দাঁড়াতেন। দ্বিজেন্দ্র নাথের কাছে বড় বড় মনীষীদেরই যে যাওয়া আসা ঘটতো তা নয়। তাঁর দ্বার ছিল অবারিত সকলের জন্য। তিনি ছিলেন একাধারে গভীর তত্ত্বজ্ঞানী আর সাধাসিধে সরল শিশুর মতন। আশ্রমে ছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথের বড়দা। তারপর হলেন গান্ধীজীর বড়দা। তারপর দেশী বিদেশী অনেকেই তাঁকে বড়দা বলে শ্রদ্ধাভরে সম্বোধন করতেন। শাস্ত্রী (বিধু শেখর শাস্ত্রী) মশায়ের রাজ্যে আনাগোনা ছিল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের আর দেশী বিদেশী মনীষীদেরও। এই শাস্ত্রী মশায়ের কাছে হিন্দু আর্য শাস্ত্র বিষয় আলাপ আলোচনা করবার জন্য যেন থেকে থেকে দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর যাওয়া আসা করতেন, তেমনি আবার দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধেও আলোচনা করবার জন্য দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুরের কাছে শাস্ত্রী মশায় যেতেন। নন্দলালের রাজ্যের পরিধি কেবল চিত্র শিল্পী এবং চিত্র-শিল্পী-রসিকদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। তাঁর কাছে আশ্রমের ছোট বড় সকলেরই যাবার সরলা ছিল খোলা। তিনি একাধারে যেমন অসাধারণ মানুষ ছিলেন তেমনি ছিলেন সাধারণ ছোট বড় সব মানুষের প্রিয়পাত্র। কারো কারো কাছে তিনি ছিলেন 'নন্দদা', কারো কারো কাছে 'নন্দ বাবু' আর সকল ছাত্র ছাত্রীর কাছে ছিলেন 'মাষ্টার মশায়'। ক্ষিতি মোহন বাবুর (ক্ষিতি মোহন সেন শাস্ত্রী পরে কিছুদিন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন) রাজ্যে যাতায়াত ছিল বেশি তাঁদেরই যারা ছিলেন ভারতের বহুমুখীন সংস্কৃত সাহিত্যের অনুরাগী, বাংলা দেশের বাউল সংগীত সাহিত্যের অনুরাগী এবং সংস্কৃত সাহিত্যের অনুরাগী। এইটিই ছিল তাঁর প্রধান দিক। এই দিকটা তাঁর প্রধান দিক হলেও অন্য দিকেও তাঁর অসাধারণত্ব কম ছিল না। তিনি ছিলেন সুরসিক, পরিহাস রসিক, সুশিক্ষক। তিনি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র নাথের দুই একটি নাটকেও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। একটি নাটকে ঠাকুর্দার পাঠ অভিনয় করার পর থেকেই তাঁকে অনেকেই 'ঠাকুর্দা' বলতে সুরু করলেন। ক্রমশঃ তাঁর সহধর্মিনীকে আমরা সকলে 'ঠানদি' বলতে সুরু করলাম। এই প্রসঙ্গে আর একটি রাজার কথা মনে পড়ে গেল, তিনিও ছিলেন শান্তিনিকেতনের একজন অসাধারণ রাজা—শান্তিনিকেতনের সংগীত রাজ্যের একমাত্র সম্রাট তাঁকে বললে অত্যুক্তি হয় না,—তিনি ছিলেন দিনেন্দ্র নাথ ঠাকুর। এঁকেও অনেকে দিনু বাবু বলে সম্বোধন করতেন গোড়ায়, তারপর ধীরে ধীরে হয়ে গেলেন অনেকের দিনুদা আর ছাত্রছাত্রী প্রায় সকলেরই 'দিনুদা'।

এই পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের আলো গোটা শান্তিনিকেতনকে সমুজ্জ্বল করে রেখেছিল। এঁরা সকলেই

ছিলেন বিশ্বভারতীর পরম বন্ধু। দিনুবাবু তো ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র। কাজেই তাঁর সঙ্গে দ্বিজেন্দ্র নাথের স্বাভাবিক মধুর সম্বন্ধ ছিল এক্থা বলাই বাহুল্য। নন্দলাল বাবু, শাস্ত্রী মশায়, এবং ক্ষিতি মোহন বাবু এঁরা তিন জনেই ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথের স্নেহ এবং শ্রদ্ধার পাত্র। আর দ্বিজেন্দ্রনাথ, শাস্ত্রী মশায়, ক্ষিতি মোহন সেন এবং নন্দলালের মধ্যে সম্বন্ধ ছিল বন্ধুতার এবং পরস্পরের গুণের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধার।

নন্দলাল শান্তিনিকেতনে ১৯১৪ সালে প্রথম এলেও তখন থেকেই শান্তিনিকেতনে নিয়মিত পদ গ্রহণ করেন নি। ১৯১৫ সালে চিত্রশিল্পী হিসাবে শান্তিনিকেতনে এলেও বেশিদিন থাকেননি, কয়েক মাস পরেই অবনীন্দ্র নাথের অনুরোধে কলকাতায় ফিরে গিয়ে 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্টের' চিত্রাঙ্কন শিক্ষণ শাখার ভার গ্রহণ করেছিলেন। ১৯২০ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে বাস করবার জন্য এলেন এবং পরে ১৯২২ সালে চিত্রাঙ্কনের গুরুপদে বৃত হলেন। ১৯১৪ সাল থেকে ১৯২০ সাল এই সময়ের মধ্যে তিনি শান্তিনিকেতনে কয়েকবারই আসা যাওয়া করেছিলেন।

শান্তিনিকেতনে বসবাস করবার জন্য এসেই তিনি তাঁর নিজস্ব বাড়ী তৈরী করেন নি। দীর্ঘ কয়েক বৎসর সপরিবারেই ছিলেন শান্তিনিকেতনের গুরুপল্লীতে খড়ে-ছাওয়া একটি দোতলা মাটির বাড়ীতে। সেই বাড়ীর পাশেই একটি একতলা খড়ে-ছাওয়া মাটির বাড়ীতে আমিও নিজের ছোট সংসার পাতিয়ে বাস করেছিলাম দীর্ঘদিন। গুরুপল্লীতে তখন ঐ অঞ্চলে পূর্ব পশ্চিম লম্বালম্বি সারি সারি পাশাপাশি আরও অনেকগুলি খড়ে-ছাওয়া মাটির বাড়ী ছিল। এই সব বাড়ীর কোনটিতে থাকতেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (রবীন্দ্র জীবনীকার) কোনটিতে থাকতেন গোসাইজী (নিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামী) কোনটিতে থাকতেন প্রমথ রঞ্জন ঘোষ (ইনিও ছাত্র ছাত্রীদের অনেকের কাছে মাষ্টার মশায় বলে পরিচিত)। কিছুদিন জগদানন্দ রায় মশায় ঐ পাড়াতেই ছিলেন যে বাড়ীতে নন্দলাল বাবু পরে ছিলেন।

এই পাড়াতে একসঙ্গে বাস করবার সময় হতেই নন্দ বাবুর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ধীরে ধীরে গড়ে উঠল। বন্ধুত্বের সম্বন্ধ পাকা হবার সঙ্গে সঙ্গে নন্দলাল বাবু হয়ে ওঠলেন আমার 'নন্দদা'। তিনি আমার চেয়ে বয়সে বছর দশেক বড় হলেও সম্বন্ধটা দাঁড়াল যেন সমবয়সী বন্ধু। তাঁর সঙ্গে সকালে বিকালে গল্প গুজব করা, এক সঙ্গে আশ্রমের এদিকে ওদিকে বেড়াতে যাওয়া, পিকনিক করতে যাওয়া ইত্যাদি ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলা মেশায় নন্দদার সহজ সরল ভিতরকার অসাধারণ মানুষটির নিত্য নব নব রূপ দেখতে পাগলাম। ভুলেই গেলাম যে তিনি একজন অসাধারণ ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে এক পংক্তির বন্ধুর মতন মেলামেশার সুযোগটা আমার মতন লোকের পক্ষে একটা পরম সৌভাগ্য। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশলেও আমার স্মৃতিতে একথা মনেই পড়ে না যে কোনদিন তাঁর সঙ্গে চিত্র-কলা সম্বন্ধে সিরিয়াসলি কোন আলোচনা করেছি একটানা কিংবা তিনি আমাদের (আমার, তেজেশ বাবুর কিংবা অক্ষয় বাবু এই তিন জন বন্ধুর সঙ্গে) সঙ্গে ছবির বিষয়, ছবি সম্বন্ধে তাঁর সাধনার বিষয় সিরিয়াসলি বসে কোন আলোচনা করেছেন। সিরিয়াসলি কোন আলোচনা না করলেও মাঝে মাঝে গল্প গুজবের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর ছবি আঁকার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে টুকেটাকা দু একটা কথা বলতেন। এই দু একটা কথাও ছবি সম্বন্ধে কিছু বুঝিয়ে বলবার যে চেষ্টা করতেন তাও নয়, হঠাৎ হঠাৎ এক একটা প্রসঙ্গে এক একটা কথা বলতেন। এই সব তাঁর কথাগুলো যে কত দামী ছিল সেটা আমাদের বুঝতে যথেষ্ট সময় লেগে-ছিল—সময় এই জন্যেই লেগেছিল কারণ তাঁর দৈনন্দিন সহজ জীবন যাত্রা, তাঁর ছবির রাজ্যের পশু, পক্ষী, লতাপাতা গাছ পালা, নরনারী বিচিত্র বৃত্তের সঙ্গে তাঁর শিল্পী জীবনের

প্রকাশ কত একার ছিল সেটা তো চট্ করে বোঝা যায় না; চট্ করে বোঝা না গেলেও তাঁর সঙ্গে দিনের পর দিন মেলা-মেশার মাধ্যমে আমাদের অজ্ঞাতসারে শিল্পী নন্দলালের বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর বিচিত্র ছবির সৌন্দর্যময় বস্তুগত দিকটা আমাদের মনে চিত্রশিল্পের প্রতি এবং চিত্র শিল্পীর প্রতি একটা এপ্রিসিয়েশনের (appreciation) ভাব জাগিয়ে তুলেছিল চিত্র শিল্প সম্বন্ধে একটা শ্রদ্ধাময় আগ্রহ নন্দলালের সংস্পর্শে আসার পূর্বে ছিল না এটা নিশ্চয়ই সত্য কিন্তু এটাও নিশ্চয়ই সত্য যে চিত্র শিল্পের তত্ত্ব সে কিছু আমি বুঝে থাকি তা নন্দলালেরই কৃপায়। কেন নন্দলাল কৃপায় বলছি তার কারণ এই—

রোজ রোজ তাঁর সঙ্গে মিশে, যেখানে সেখানে এক একটা বিষয়ের স্কেচ করছেন দেখে, তাঁর ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা আঁকা নানা রকম ছবি দেখে এবং তারা কখনো কলাভবনের ঘরে ছবি আঁকছে এবং বাইরে বসেও জীব জন্তু, গাছ পালা, লতা, পাতা, ফুলের স্কেচ করছে দেখে আমারও মনে মনে একটা চাপা ইচ্ছে হতে লাগল। এই ইচ্ছের বশবর্তী হয়ে ভেবে-ছিলাম নন্দলালের কাছে ছবি আঁকা বিষয়ে শিখব, কিন্তু সে ইচ্ছে প্রবল না হওয়ায় আর নন্দলালের কাছে সে বিষয় কোন প্রস্তাবই করলাম না। তার অনেকদিন পরে হঠাৎ একদিন দেখা গেল আমার কপালে, গালে বসন্তোৎসব সুরু হয়েছে অর্থাৎ জল বসন্ত হয়েছে। তখনকার দিনের শান্তিনিকেতনের বিধান অনুযায়ী আমাকে একঘরে হয়ে থাকতে হলো ডাক্তার বাবুর আদেশে হাসপাতাল কম্পাউণ্ডের একটি ছোট খড়ো ঘরে। সেই ঘরটিই ছিল তখনকার কালে সেগ্রিগেশন ওয়ার্ড। আমি আচ্ছাবাজ মানুষ, চঞ্চল প্রকৃতি, একঘরে নির্জনতার মধ্যে বাস করা আমার পক্ষে দুঃসহ বোধ হচ্ছিল। দুঃসহ বোধ হলেও যখন বুঝতে পারলাম যে দশ বারো দিনের জন্যে ঐ নির্জন ঘর থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় নাই তখনি মনে একটা সুযোগের কল্পনা এল,—ভাবলাম এই ফাঁকে কয়েকটা সাদা কার্ড, দু একটা পেন্সিল আর একটা রবার (ইরেজার) যোগাড় করে ছবি আঁকব। রবার, পেন্সিল ও কার্ড যোগাড় করলাম—যোগাড় করে ছবি আঁকতে গিয়ে যে অবস্থাটা আমার ঘটল সেটা একটা দুর্যোগ হয়ে দাঁড়াল। একটা শাল গাছের পাতা সামনে ছিল সেইটিকে খাটের উপর তুলে নিয়ে একটি কার্ডে তারই স্কেচ করতে সুরু করলাম পেন্সিল দিয়ে। স্কেচ করা কিছুতেই হল না, কার্ডের পর কার্ড এই রকম করে চার পাঁচ খানা কার্ড নষ্ট হয়ে গেল। নষ্ট হয়ে গেল এমন যে পাতা দেখে সেইটিকে কাগজে আঁকতে গিয়ে কিছুতেই আর তার সমগ্র অবয়ব কে কাগজের চৌহদ্দির মধ্যে বাঁধতে পারছি না, পাতার কিছু অংশ আঁকতে গিয়েই কাগজের সমস্ত অংশটাই ফুরিয়ে যাচ্ছে, কিছুতেই পাতাটা সেই কার্ডে ফুলোচ্ছে না, কেমন করে ফুলোন যায় প্রাণপণে তারই চেষ্টা করতে লাগলাম। একটার পর একটা কার্ড নষ্ট করেও সে চেষ্টা আর সফল হল না। মহাক্যাসাদে পড়লাম—ভাবলাম বড় ছবিতে তো সামান্য একটা কাগজের গায় একটা পাতা কেন, দুচারটে গাছ, ঝোঁপঝাড়, ছোট ছোট দু একটে কুঁড়ে ঘর, দু একটা গরু ছাগল, এমন কি তাহাদের মধ্যে একটা নদীও বয়ে চলেছে আর সেই নদীতে ছোট বড় নৌকোও ভাসছে কিন্তু আমার একি দশা হলো আমি একটা বড় কার্ডে একটি মাত্র মাঝারি সাইজের শালপাতাকে ঢোকাতে পারছি না। ছবি আঁকা ব্যাপারের একটা গোলক ধাঁধায় পড়ে গেলাম। কাগজ, পেন্সিল, রবার খাটের পাশে টেবিলে তুলে রেখে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। এই সব ব্যাপারের মাঝখানে কখন যে কে আমার দুপুরের খাবার একটা টিফিন ক্যারিয়ারে করে আমার ঘরে রেখে গেছে সেদিকে আমার খেয়াল ছিল না। খাবার সময় কখন যে পার হয়ে গেছে তাও টের পাইনি। তখন প্রায় বেলা দুটো পিপাসার্ত হয়ে সামনের কুজো থেকে একগ্লাস জল খেয়ে নিলাম। ভাত টাত খাবার মোটেই ইচ্ছে হল না, খেলাম না। ঘরের দরজা

বন্ধ করে দিয়ে জানালার একটা পাটি খুলে রেখে আবার বিছানায় শুয়ে পড়ে ছবি আঁকা বিলাতের কথাই মনের মধ্যে দুশ্চিন্তার মত ভর করে বসল।

অবশেষে ঠিক করলাম পাতা সামনে রেখে দেখে দেখে ছবি আঁকার দরকার নাই, কিছু না দেখেই মন থেকেই কার্ডে একটা পাতা আঁকবার চেষ্টা করা যাক। এই চেষ্টা করতেই সেদিন হঠাৎ এক বিস্ময়ের মধ্যে পড়ে গেলাম,—সত্যই আমার কাছে সেই সময়টা অপূর্ব একটা বিস্ময়ের মত মনে হয়েছিল। বিস্ময়ের ব্যাপারটা অন্যের কাছে যদিও হাস্যকর মনে হবে তবু আমার কাছে আজো সেই বিস্ময়ের স্মৃতি অম্লান হয়ে রয়েছে। বিস্ময়ের কারণ এই যে যখন মন থেকে কার্ডে পাতার ছবি আঁকলাম, কার্ডে অতি সামান্য একটা ভাঁজের সেই পাতাটা কুলিয়ে গেল। ড্রইং এর বিচারের দিক দিয়ে সেই পাতার ছবি নিশ্চয়ই ত্রুটিতে ভরা ছিল তবু জিনিসটা দেখতে হয়েছিল পাতার মতনই। এই বিস্ময়ের দ্বারা চালিত হয়ে পরম উৎসাহে দুঃসাহসীর মতন, সেই কার্ডেই যেমন মনে এল তেমন ভাবেই দু একটা গাছের, দু একটা ঝোপঝাপ এমন কি দুটো লম্বা লম্বা তালগাছও তাতে এঁকে ফেললাম। এই সব ছবিগুলি ড্রইং এর দিক দিয়ে নিশ্চয়ই দুশ্রী হয়নি সেটা আমি ভাল করেই জানতাম কেননা আমি কোনদিন ড্রইং করা শিখিনি। কাজেই যে ছবিগুলো ঐ কার্ডে এঁকেছিলাম সেগুলো সবই 'মতন মার্কা', কোনটাই বিষয় বস্তুর অনুরূপ নয়। তবু আমার বিস্ময়ের প্রধান কারণ এইটেই ছিল যে, যে আমি ঘণ্টা দুই তিন আগে বহু চেষ্টা করেও একটা গাছের সামান্য পাতাকে কার্ডের বুকে ঠাঁই দিতে পারিনি কার্ডে স্বাভাবের জন্য, সেই কার্ডেই কেমন করে এতগুলো জিনিসকে ঠাঁই দিয়েও কার্ডে আরো জায়গা ছিল। এই বিস্ময়টাই আমার কাছে একটা গভীর রহস্য হয়ে প্রায় দুদিন পর্যন্ত ছিল। দুদিন পরে যখন নন্দদা আমাকে দেখতে এলেন আমি তাঁকে আমার সেই দুর্যোগ, বিস্ময় আর রহস্যের কথা বলে তাঁকে ছবিগুলো দেখালাম।

আমার সেই ছবিগুলো দেখে নন্দদা তাঁর স্বভাব সুলভ মৃদু হাসি হেসে সানন্দে আমার দিকে তাকিয়ে যা বললেন তার মর্মার্থ হচ্ছে এই—ঐ সেন্সিটিভেশন স্কুলে একাকী নির্জনতায় থাকার ফলে একটা বিষয়কে একাগ্র চিত্তে জানবার এবং বোঝবার যে সুযোগ পেয়েছিলাম এবং তার ফলে যে বিস্ময়ের রাজ্যে উপস্থিত হয়েছিলাম তার রহস্য ঠিক জানতে গেলে যে সাধনা এবং সহিষ্ণুতা প্রয়োজন সেই সাধনা এবং সহিষ্ণুতা কিছুদিন চর্চা করলে সেই রহস্য যে কী তা বুঝতে পারা যায়। নন্দদা বেশি কথা বলবার লোক নন তাই অতি সংক্ষেপে বললেন—"এই ঘরে এসে তোমার সত্যকার উপকার হয়েছে। ছবি আঁকার তত্ত্ব এখনো বোঝনি এটা ঠিক কিন্তু সেই তত্ত্ব বোঝবার যে ছবিসটি পেয়েছ সেটা কম নয় এখন ভাল করে যেখানে যত রকম ছবি নজরে পড়ে ভাল করে দেখো। ভাল করে দেখতে দেখতেই তোমার মনের থেকে এই রহস্য-প্রশ্নের যে জবাব তুমি পাবে সেই জবাবই তোমার রহস্যের বিষয়টা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবে। তোমাকে একটা কথা ইঙ্গিত স্বরূপ বলে রাখি দেখেছ তো একটা ছোট ফ্রেমে বাঁধা আয়নার—আয়নার সামনে কত রকমের বস্তু প্রতিফলিত হয় যে বস্তুগুলি আয়নার বাইরে অনেকটা জায়গা জুড়ে বসে থাকে। মানুষের মনের আয়নাতেও এই রকম অনেক কিছু প্রতিফলিত হয়।"

এরপর থেকেই আমার প্রতি নন্দদার স্নেহ ভালবাসা বেড়ে গিয়েছিল সেটা বেশ বুঝতে পেরেছিলাম। তাঁর সঙ্গে মেলামেশার, কথাবার্তা বলার, পিকনিক করতে যাবার সময় রাস্তার দুই ধারে পশুপাখি, গাছপালা যা কিছু দেখতাম সেই বিষয় তাঁর টুকিটাকি মন্তব্যের মাধ্যমে। বেশ মনে পড়ে একদিন বিশ্বভারতীর বিনয় ভবনের মাঠ দিয়ে (তখন

'বিনয় ভবন' হয়নি) স্কুলে (এখন যাকে শ্রীনিকেতন বলা হয়) পিকনিক করতে যাবার পথে একটা বড় তালগাছ দেখে তাঁকে বলেছিলাম—'দেখুন নন্দদা কি প্রকাণ্ড তালগাছ এর মাথায় ওঠে লোকে কচি তাল পাড়ে তালশাঁস খাবার জন্যে।' উত্তরে নন্দদা বললেন দুটি কথা—'এই তাল শাঁসের জন্যে কচি তাল পাড়া আমার কিন্তু ভাই ভাল লাগে না। দেখেছি কত গরীব সাঁওতাল একটা পাকা তালের রস পেট ভরে খেয়ে তৃপ্ত হয়, কেউ কেউ মুড়ি দিয়েও পেট ভরে খায়, গরীবের এই সব খাদ্যকে ক্ষণিক তৃপ্তির জন্যে তাল-শাঁস হিসাবে খাওয়াটা আমার কিন্তু সত্যই ভাল লাগে না। এইজন্যে আশ্রমে কেউ কচি তাল পাড়ছে দেখলে আমি বাধা দিই।' তাঁর কথা শুনে আমি বললাম—'তাহলে কি আপনি কোনদিন তাল শাঁস খান নি?' তিনি বললেন—"খাবনা কেন খেয়েছি তাল শাঁস খেতে তো খারাপ নয় কিন্তু শুধু গরীবদের ওটা একটা খিদের খাদ্য জানি বলে তালশাঁস খাওয়াটা খুব রেলিশ করি না।" তারপরেই যেতে যেতে কিছুক্ষণ পরে বললেন—'এই যে বললে প্রকাণ্ড তালগাছ, প্রকাণ্ডের কি কোন বিশ্লেষণ করা সীমা আছে? ছোট আর বড় এই দুটোই তুলনামূলক। একটা আর একটার চেয়ে যদি বড় দেখায় তাহলে সেই বড়টা ধরা পড়ছে তার পাশের ছোট গাছের তুলনায়, আর সেই ছোট গাছও বড় তারপাশে আর একটি ছোট গাছের তুলনায়। তুমি তো আজকাল ছবির কথা মাঝে মাঝে বল। যারা ছবি আঁকে তারা তাদের ছবিতে ছোট বড় এই ব্যাপারকে নানা রকম-ভাবে আঁকে। নন্দদার সেদিনকার এই দুটি কথা আজো ভুলিনি। প্রথম কথায় প্রকাশ পেল তাঁর দরিদ্রনারায়ণ মনের পরিচয়। আর দ্বিতীয় কথায় আভাসে ইংগিতে ছবির রাজ্যে প্রবেশ করবার একটা পথেরও ইংগিত দিলেন। এই রকম করে কতবার কত উপলক্ষ্যে ছবি ও তার সম্বন্ধে কথাচ্ছলে কতই শিক্ষণীয় কথা বলেছেন। একবার তাঁকে কথায় কথায় প্রশ্ন করেছিলাম—'নন্দদা আপনি তো দেব দেবীর অনেক ছবি এঁকেছেন, কেষ্ট ঠাকুরের গায়ের রং প্রায় সব আর্টিস্টই নীল রং দেয় কেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন- 'দেখো নীল রংটা হচ্ছে ভারতীয় সংস্কার মতে অনন্তের, গভীরের আর সুদূরের প্রতীক। নিচের থেকে সুদূর আকাশ নীল দেখায়, সমুদ্রের কূলে যাও দেখবে দিগন্ত ব্যাপী সমুদ্র নীল। খুব দূরের থেকে পাহাড়ের বৃক্ষ দেখবে প্রায় নীলাভ। কেউ কেউ বলেন ভারতীয় সংস্কার মতে নীল রংটা হচ্ছে ইটার্নিটির প্রতীক রহস্যের প্রতীক।' তাঁর কথা শুনে শুধু নীল রং কেন ছবিতে নানারকম রংয়ের যে লীলা খেলা দেখতে পাই তার সম্বন্ধেও আমার একটা নিজস্ব ধারণা হয়ে গেছে। এই ধারণা নন্দদা আমার মনে দিয়ে দেননি। তাঁর কাছে বর্ণ বৈচিত্র্যের, ছবিতে সৌন্দর্য সম্বন্ধে যা কিছু শুনেছি সে সবগুলো ঠিক বুঝতে পেরেছি এ কথা যদি বলি তা হলে নন্দদার প্রতি অবিচার করা হবে। কারণ তিনি বর্ণ বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করেছেন তার পেছনে রয়েছে অনেক সাধনা, অনেক অভিজ্ঞতা। সেই সব অভিজ্ঞতার কণা মাত্র আমার নাই—আর নাই সে সাধনার ছিটে ফোঁটাও। কাজেই তাঁর সব কথার সঠিক মর্ম আমি যে বুঝতে পেরেছি একথা বললে আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হবে। কারণ তিনি এসব কথা আমাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে তেমন করে বলেননি যেমন করে একজন গুরু শিষ্যকে শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষা দেন। যা কিছু বলেছেন গল্পচ্ছলে কথার ফাঁকে ফাঁকে।

নন্দদার শিল্প প্রতিভার খ্যাতি বিশ্বজোড়া। জীবদ্দশায় ভারতে তিনি সরকারী বেসরকারী সংস্থার তরফ থেকে যে শ্রেষ্ঠ সম্মান পেয়েছেন সে রকম অন্য কোন শিল্পী আজ পর্যন্ত পেয়েছেন বলে আমি জানি না। তিনি শুধু শিল্পী ছিলেন না, তিনি ছিলেন মানবিক ধর্মে ধর্মী। তাঁর উদার হৃদয়ে সকলের জন্যই ঠাঁই ছিল, ধনী নির্ধনী নির্বিচারে।

শুধু মানুষের জন্যই তাঁর দরদ ছিল তা নয়, সবুজ গাছপালা সহজে তিনি কাটতে দিতে চাইতেন না নিতান্ত অনিবার্য কারণ না ঘটলে। আর তাঁর চিত্র রাজ্যে চোখ বুলোলেই দেখতে পাওয়া যায় সেখানে যেমন সাধারণ মানুষের, দেব দেবীর সমাবেশ তেমনি দেখতে পাওয়া যায় প্রাকৃতিক দৃশ্যের খুঁটিনাটি কত লীলা খেলা কত রকম জীবজন্তু হাবভাব-বৈশিষ্ট্য। একাধারে অসাধারণ শিল্পী আর মানবিকতার যুগ্ম সম্মিলন সত্যই দুর্লভ। তিনি যেমন ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভক্ত তেমনি ছিলেন গান্ধীরও। শুধু রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীরই যে ভক্ত ছিলেন তা নয়, যাঁরা দেশের দশের শ্রদ্ধাভাজন ভক্তি ভাজন তাঁদের তিনি শ্রদ্ধার চোখেই দেখতেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের, সারদা মায়ের, সিষ্টার নিবেদিতার এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিও তার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। এই সব কারণেই অনেকের ধারণা মহাত্মাজী (গান্ধীজী) নন্দলালের প্রতি শুধু যে স্নেহাসক্ত ছিলেন তা নয়—শিল্পী নন্দলালের, সহৃদয় নন্দলালের, আড়ম্বরহীন নন্দলালের ভক্তও ছিলেন তিনি। এই জন্যেই বোধ হয় স্বনামধন্য সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অন্নদাশংকর রায় একটি ছড়ায় লিখেছিলেন—

"শিল্পী নন্দলাল বোস
গান্ধীকে করেছেন তোষ,
একথা বলা বড় শক্ত
দুজনে কে কার ভক্ত।"

শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের প্রতি নন্দদার শ্রদ্ধা ও ভক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি কারো অন্ধ ভক্ত ছিলেন না। তাঁর ভালো-মন্দ বিচারের মনোভাব ছিল তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব—সেই নিজস্ব-ভাবের শক্তিতেই তিনি ছিলেন শক্তিশালী। বহু দেশী-বিদেশী স্বনামধন্য চিত্র শিল্পীদের শিল্প-সৌন্দর্যের প্রভাব তাঁর শিল্পী মনে গভীর রেখাপাত করলেও তাঁর শিল্পী জীবনের, শিল্প প্রতিভার বৈশিষ্ট্যকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি—পক্ষান্তরে শিল্পী নন্দলাল তাঁদের কাছে গ্রহণ যোগ্য যা কিছু পেয়েছিলেন সে সব কিছুকেই নিজের বিশিষ্টতায় আত্মসাৎ করেছিলেন। এই জন্যই সামগ্রিক ভাবে তাঁর চিত্র-কলার রূপ যখন আমার চোখ দিয়ে বিচার করি তখন দেখতে পাই, দেশী-বিদেশী সব রকম ছবির সব কেমের টেকনিক তাঁর ছবিতে এক এক রকমে না ঢাকা দিয়ে আছে, অর্থাৎ নানা দিক হতে নানা শিল্পীর শিল্প-কলার যে যে দিক তাঁকে মুগ্ধ করেছে তিনি সে সব নিজের শিল্পকলায় মিশিয়ে যে শিল্প সৌন্দর্যের সৃষ্টি করলেন সেটা তাঁর শিল্পকলায় তিলোত্তমা।

একটা ঘটনার উল্লেখ করে এই স্মৃতি চারণ রচনা শেষ করি। ঘটনাটি এই—

তাঁর কলাভবনের একটি ছাত্রীর আচরণে, তখনকার শান্তিনিকেতনের মেয়েদের হোস্টেলের সুপারইনটেনডেনট, ক্ষুব্ধ হয়ে যে শাস্তির ব্যবস্থা করেছিলেন—সে শাস্তি দুই কারণে নন্দদাকে পীড়া দিল। প্রথমত নন্দদাকে না জিজ্ঞাসা করেই, ছাত্রীটির অপরাধের বিষয় নন্দদাকে কিছু না বলেই ঐ শাস্তি-দানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, দ্বিতীয়ত ঐ শাস্তির ব্যবস্থা নন্দদার বিচারে ছিল লঘু দোষের জন্য গুরুদণ্ড। নন্দদা ঐ শাস্তি যাতে ছাত্রীটিকে না দেওয়া হয় সেই পথে অগ্রসর হলেন এবং এও দাবী করলেন যে নন্দদার কাছে ঐ সুপার-ইনটেনডেনট মহিলাকে (মহিলাটি ছিলেন বিদেশিনী) বিনাশর্তে ঐ শাস্তি ব্যবস্থার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে হবে। ব্যাপারটার মামলা স্থানীয় সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের কাছে মীমাংসার জন্য উঠল। রবীন্দ্রনাথ চাইলেন নন্দদা এবং ঐ সুপারইনটেনডেনটের মধ্যে একটা আপোষ রফা হোক। উভয় পক্ষই নিজের নিজের মতের কিছুটা ত্যাগ করুন এই ছিল রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছে। নন্দলাল রবীন্দ্রনাথের ভক্ত হয়েও, তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের মতের প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারলেন না,—খুব নম্র ভাবেই বল্লেন 'আপনি আমার পিতার মতন, আপনার আদেশ অমান্য

করা আমার পক্ষে বড়ই কষ্ট কর. তবু এক্ষেত্রে আমার মত আমি পরিবর্তন করতে পারছি না,—আমাকে এখান থেকে ফিরতি দিন।"

নন্দলার এই উক্তি শুনে রবীন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ হতবাক্ হয়ে চুপ করে থাকার পর স্নেহময় স্বরে বল্লেন—"তুমি চলে যাওয়ার মানে আমাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া। নন্দলাল, তুমি চলে গেলে আমার এই বিশ্বভারতী-কে দেখতে আসবে।' এর পর উভয়েই চুপ করে বসে রইলেন। তখন আসন্ন সন্ধ্যা। "উত্তরায়নে"র "উদয়ন" বাড়ীর পূর্ব দিকের চাতালে একটা ছোট আরাম চেয়ারে বসে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ আর তাঁর পাশেই একটা মোড়ায় বসে ছিলেন নন্দলা, আর আমি ছিলাম ঐ দুজনের পেছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে। শুনছিলাম দুজনের গম্ভীর প্রকৃতির উদ্বেলময় কথা বার্তা। রবীন্দ্রনাথের শেষ কথায় নন্দলা বেশি আর কিছু না বলে মাত্র বল্লেন "আমাকে আজ ভাবতে দিন।" এই বলে' রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করে নন্দলা চলে গেলেন।

পরের দিন সুপ্রভাত হ'ল। ব্যাপারটার মীমাংসা হয়ে গেল। নন্দলার চেহারায় প্রফুল্লতা ফিরে এল। শুনলাম শাস্তির প্রস্তাবিত ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং সেই ছাত্রটি তার উগ্র আচরণের জন্য অনুতপ্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথ এবং নন্দলার কাছে ক্ষমা চেয়ে এবং সেই মেমসাহেবের কাছেও দুঃখ প্রকাশ করেছে।

—নন্দলা চলে গেছেন পৃথিবী ছেড়ে অন্য অজানা লোকে। রেখে গেছেন পেছনে বিশ্বভারতীর তথা ভারতের ইতিহাসে এক অমর শিল্পীর অক্ষয় পরিচয়।

ধারাবাহিক রচনা

সুভাষচন্দ্র

পবিত্রকুমার ঘোষ

প্রেসিডেন্সি কলেজ

কলেজ প্রাঙ্গণের বাহিরে

প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র থাকাকালে সুভাষচন্দ্র একবার সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করেন। এই ঘটনাটিকে পরবর্তী জীবনেও তিনি কখনো ভুলতে পারেন নি। তাঁর জীবন সম্পর্কে যাঁরাই আলোচনা করেছেন সকলেই এই ঘটনাটির ওপর অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। বস্তুতঃ তাঁর চরিত্র ব্যাখ্যায় এই সন্ন্যাসী হবার সঙ্কল্পে গৃহত্যাগের বিষয়টি আলোচনা না করে পারা যায় না।

বর্তমান সময়ে অবশ্য সুভাষচন্দ্রের চরিত্র অনুধাবনের পক্ষে বহুল বিঘ্ন সৃষ্টি করা হচ্ছে। স্বয়ং আমাদের জাতীয় সরকার সেই বিঘ্ন সৃষ্টিতে পরম উৎসাহী। সরকারী প্রচারজীবী একটি বিশাল শ্রেণী এই দুষ্কর্মে লিপ্ত। মিথ্যা ও বিকৃত তথ্যের অপপ্রয়োগে সুভাষচন্দ্রের এমন সব জীবন-কাহিনী পরিবেশনের আয়োজন হয়েছে চতুর্দিকে যে তার ফলে প্রকৃত ঘটনাগুলি এবং তাঁর চরিত্রের সম্যক পরিচয় হয়তো কালে লুপ্ত হয়ে যাবে। একথা নিতান্ত কিশোর বয়সে এক ধনীর পরিবারের সুখলালিত জীবনযাত্রা ও কলেজ ও অন্য সর্বত্র সম্মান ও সম্বর্ধনার মধ্যে বাস করেও সুভাষ গৃহত্যাগী হয়েছিলেন;—দৈহিক ও মানসিক কোন অভাববোধের বেদনা হতে নয়, কারও প্রতি অভিমানবশতও নয়; সত্যের অনুসন্ধানই ছিল তাঁর জীবনে বরাবর। সুখসম্পদের সমাসীন, একান্ত ভোগকাতর, স্বার্থপরে উল্লসিত একদল মানুষ আজ সুভাষচন্দ্রের চরিত্রের এই বিশেষ প্রবণতাটির প্রতি কটাক্ষ করে তাঁকে অর্বাচীন, বিকৃতমস্তিষ্ক, পাগলা বলে থাকেন—এবং মোটামুটিভাবে সুভাষচন্দ্রের সমস্ত জীবনটাকেই এই আলোকে আজ উপস্থাপিত করা হচ্ছে আমাদের সামনে। প্রকৃতপক্ষে একজন clown-এর বেশি মর্যাদা কি তাঁকে আজ দেওয়া হয়?

জওহরলাল নেহরু বলতেন সুভাষ মৃদু—। এই কারণে আমরা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হতাম। কিন্তু জওহরলালের পদাধিকারিগণ সুভাষ মৃদু একথা তো বলেছেনই, উপরন্তু সম্ভাব্য সর্বপ্রকার উপায়ে সুভাষের একটি বিকৃত পরিচয় দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছেন। শাস্ত্রীজী যখন প্রধানমন্ত্রী তখনই ভারতসরকারের পক্ষ হতে গভীর বিবেচনার পর তথ্য ও বেতার মন্ত্রীর (যাঁর ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন শ্রীমতী ইন্দিরা) ঘোষণা করেন যে সুভাষচন্দ্র একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর নেতা। সম্প্রতি সেই ঘোষণাকেই বলবৎ করে এই সিদ্ধান্তও প্রকাশ করা হয়েছে যে আমাদের জাতীয় জীবনে পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীজীর যে অবদান ও ভূমিকা সুভাষচন্দ্রের অবদান ও ভূমিকার গুরুত্ব তদপেক্ষাও কম! এই সিদ্ধান্তটি আমাদের লোকসভায় সাড়ম্বরে প্রকাশ করার সময় একথাও বলা হয়েছে যে দেশের অসংখ্য নেতাদের মধ্যে

সুভাষচন্দ্রকে বিশেষভাবে মনে রাখা সম্ভব নয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যখন দেখি যে কলকাতার প্রকাশ্য ময়দানে বহু অর্থ ব্যয়ে সরকার সুভাষচন্দ্রের একটি ভাঁড় সদৃশ মূর্তি স্থাপন করেন, সরকারী অর্থ ও পৃষ্ঠপোষকতায় সুভাষচন্দ্রের এমন কতগুলি জীবনীচিত্র নির্মিত ও প্রচারিত হয় যেগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য মিথ্যা ও বিকৃত তথ্যের সাহায্যে সুভাষচন্দ্রকে ভাঁড় বেশে উপস্থাপিত করা,—তখন সরকারের মূল অভীষ্ট কী তা যেন প্রাঞ্জল হয়ে আসে। আমাদের সরকারী ব্যবস্থায় বিদেশস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূতাবাসগুলি হতে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে ভ্রান্ত ও কুৎসিত ধারণা পড়ে ওঠার সাহায্য করা হয়। বিশেষত য়ুরোপে ও আমেরিকায় আমাদের রাষ্ট্রদূতাবাসগুলির আচরণ এবিষয়ে এমনকি নিন্দারও অতীত পর্যায়ে পৌঁচেছে।

হিন্দী ভাষার মাধ্যমে সারা ভারতে ও ভারতের বাইরে বিশাল জনসাধারণের সামনে সুভাষচন্দ্রের একখানি জীবনী-চিত্র সম্প্রতি প্রদর্শিত হচ্ছে। আমাদের লেখার সময় পর্যন্ত চিত্রখানি একটি মানহানি মামলার দায়ে আদালতে বিচারকার্য-ভুক্ত হয়ে আছে; সুতরাং এবিষয়ে আমাদের মন্তব্য করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই চিত্রখানি সম্পর্কে অপর একটি মামলার রায়দান প্রসঙ্গে অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী এ. এন. ব্যানার্জী বলেছেন: চিত্রখানির নির্মাতাগণ এমন সব দৃশ্যের অবতারণা করেছেন যেগুলি প্রকৃত ঘটনার বিপরীত। এই দৃশ্যগুলি সুভাষচন্দ্রের মর্যাদা ও জনচিত্তে তাঁর সম্মানের সঙ্গে অসঙ্গত। এমনকি তাঁর জীবন ও চরিত্রের পক্ষে অবমাননাকর দৃশ্যাবলীও এই চিত্রে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। (the producers had resorted to certain scenes which were contrary to facts. ....such scenes were not in consonance with the dignity and the status of the great leader and his father. They might even constitute a defamatory depiction of their life and character.—The Statesman, 6 May, 1966) শ্রী ব্যানার্জী তাঁর রায়ে আরও বলেছেন যে ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার উভয়েই এই চিত্রখানির প্রচারে সমর্থন ও উৎসাহ দিয়েছেন—তাঁরা চিত্রখানির প্রচারে বিশেষ সাহায্যও করেছেন। (the film concerned had been passed by the Board of Censors for exhibition to the public all over India. It was also not in dispute that the Government of West Bengal had exempted the film from the payment of amusement tax. It was, therefore, apparent, the Magistrate observed, that the producers and distributors of the film had got the legal right to exhibit it in different cinema houses all over the State of West Bengal and that also without payment of amusement tax'—পূর্বোক্ত পত্রিকা)। শুধু আলোচ্য চিত্রখানি ছাড়াও, বাংলা ও হিন্দী ভাষার মাধ্যমে সুভাষচন্দ্রের আরও একখানি নতুন জীবনীচিত্র কলকাতায় নির্মিত হচ্ছে। সে চিত্রখানিও অবিলম্বে সারা ভারতে প্রদর্শিত হবে। আমাদের লেখা পর্যন্ত চিত্রখানির প্রদর্শন সুরু না হওয়ায় মন্তব্য আমরা করতে পারিনা—কিন্তু উক্ত চিত্রের নির্মাতাদের পক্ষ হতে যেসকল প্রচারপত্র ইতিমধ্যেই প্রচারিত হয়েছে তাহতে আমরা জেনেছি যে উক্ত চিত্রের নির্মাণেও আমাদের সরকার সবিশেষ সাহায্য করছেন—এবং মহরত অনুষ্ঠানে মন্ত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন। বলা হচ্ছে যে দশ বছর ধরে ক্রমান্বয়ে গবেষণা করে, সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত বহু ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করে এই চিত্রের চিত্রনাট্য প্রস্তুত হয়েছে। উপরন্তু এই চিত্রের প্রযোজক নিজে ব্যক্তিগতভাবে একজন নেতাজী-অনুরাগী ও অনুসারী। তদুপরি এই চিত্রের কাহিনী রচনা করেছেন বিখ্যাত লেখক শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। এসবিধ সাড়ম্বর ঘোষণার দ্বারা যে ধূম্রজাল সৃষ্টি

হয়েছে তার ভিতর হতে চিত্রখানির আসল রূপ যতটুকু বেরিয়ে এসেছে তাতে আমাদের মনে হয় এ চিত্রখানির উদ্দেশ্যও সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে জনমনে ভ্রান্ত ও কুৎসিত ধারণা সৃষ্টি করা। মিথ্যা ও বিকৃত তথ্য এই চিত্রেরও উপজীব্য।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের সময় হতে ইংরেজ সরকার ও গান্ধীজী এক যৌথ চক্রান্তে অঙ্গীকারবদ্ধ হন যে সুভাষকে এ দেশের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ হতে সরিয়ে দিতে হবে। এই চক্রান্তের কথা ঐতিহাসিক অশোক মজুমদার বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থে। কংগ্রেস হতে সুভাষচন্দ্রকে বিতাড়নের ঘটনাটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়—অতি সুপরিকল্পিত সেই ঘটনা। যুদ্ধের সময় সুভাষ ভারতবর্ষ হতে অন্তর্ধান করলে আমাদের গান্ধীপন্থী নেতৃবৃন্দ প্রথম রটনা করেন যে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সুভাষ হিটলার ও তাঁর দলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। আজাদ হিন্দের সমস্ত সংবাদই তাঁরা জনসাধারণ হতে গোপন করে রেখেছিলেন। পরে ১৯৪৫ সালে যখন প্রকৃত সত্য প্রকাশিত হল তখন সুভাষচন্দ্রের জনপ্রিয়তাকে আসন্ন নির্বাচন-যুদ্ধে কাজে লাগানোই হয় কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের একমাত্র লক্ষ্য। নির্বাচনী সাফল্যের পর ক্ষমতায় এসে কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ এই তিনটি কাজ ইংরেজের সঙ্গে যৌথ চক্রান্তে মিলিত হয়ে সম্পন্ন করেন—(১) নেতাজী মৃত বলে ঘোষণা ও প্রচার (২) দেশবিভাগ (৩) নেতাজীর চরিত্রকে পুনঃপুনঃ কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা। তদানীন্তন কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের বর্তমান উত্তরাধিকারীগণও সমোৎসাহে এই তিনটি পবিত্র কর্তব্য আজও পালন করে চলেছেন। দেশবিভাগের ব্যাপারেও যেমন তাঁদের নীতির রদবদল নেই, তেমনি সুভাষচন্দ্রের জীবন ও কার্যাবলীকে বিকৃত ও উপহাসিত করার বেলায়ও তাঁদের আগ্রহ কমেনি। শুধু সরকার একা এ কার্যে লিপ্ত নন। সরকারী কলাভাতার পুষ্ট সংবাদপত্র ও বুদ্ধিজীবীগণ এবং বিদেশীর স্বার্থে পরিচালিত কোনো কোনো রাজনৈতিক দলও পরম অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা সহকারে সুভাষের চরিত্র হনন চেষ্টায় কালাতিপাত করছেন। এই সম্পূর্ণ বিকৃত পরিবেশের মধ্যে বসে সুভাষের চরিত্র ধ্যান করা আজ প্রায় অসম্ভব বলে মনে হয়। তাঁর জীবন সম্পর্কে সম্যক আলোচনা করতে আজ প্রতি পদে বাধা: আমাদের স্বদেশীয়গণই সে বাধার মূল কারণ। স্কুলের বালকেরাও আজ অবলীলাক্রমে এই মত ঘোষণা করে যে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে অধিক আলোচনা অপ্রয়োজনীয়; কোনো বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদক আমাকে জানিয়েছেন যে রোমান্টিক গ্ল্যামারটুকু বাদ দিলে সুভাষ-চরিত্রের আর উল্লেখযোগ্য অবশিষ্ট কিছু থাকে না। সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে আলোচনায় আমার উৎসাহ নির্বাপিত করার উদ্দেশ্যে র‍্যাডিকাল হিউম্যানিস্ট গোষ্ঠীর কোনো কর্মী আমাকে বলেছেন যে স্বাধীন ভারতে একজন এম. এল. এ. হওয়া ভিন্ন আর কিছু করার ক্ষমতা সুভাষ বসুর ছিল কি? এইসব উড়ো কথার উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে সরকারী নীতি বা দুর্নীতি যে কতখানি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে এবং সমাজের সর্বস্তরে সুভাষবিরোধী অপপ্রচার কতখানি প্রসার লাভ করেছে এগুলি তার দৃষ্টান্ত।

এই অতিশয় বিকৃত পরিবেশে সুভাষচন্দ্রের জীবন ও চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করতে বসেও আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে প্রশান্ত, গভীর ও স্বচ্ছ। সত্যের প্রতি আনুগত্যই আজ বিষয়ে সবচেয়ে প্রধান প্রয়োজনীয় সম্পদ।

২

ছাত্র থাকাকালে সুভাষচন্দ্রের বহিরঙ্গ জীবনের সবচেয়ে প্রধান ঘটনা অধ্যাপক ওটেনের সঙ্গে সংঘর্ষ। এই ঘটনার মধ্য দিয়েই তিনি প্রথম দেশবাসীর নিকট পরিচিত হন, তাঁর নেতৃত্ব-প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব ও আদর্শের জন্য আত্মত্যাগ বহুলের

প্রথম স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ মেলে এবং সম্ভবতঃ তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যও ধরা পড়ে। তাঁর অন্তর্জীবনের দিকে তাকালে তেমনি আবার তাঁর ছাত্রকালের সর্বপ্রথম ঘটনা বলে তাঁর সন্ন্যাসগ্রহণকেই চিহ্নিত করতে হয়। বস্তুতঃ তাঁর সমগ্র জীবনের মূল সুরটি এই একটি ঘটনায় ধরা পড়েছে। এই প্রসঙ্গটি বাদ দিয়ে তাঁর জীবন আলোচনা সম্ভব নয়।

সন্ন্যাসের প্রতি তাঁর আকর্ষণ জন্মে কটকে স্কুলে পাঠরত অবস্থায়, এমনকি বিবেকানন্দের ভক্ত হয়ে উঠবারও আগে তাঁর ধ্যানের অভ্যাস গড়ে ওঠে। আত্মচরিতে তিনি লিখেছেন: "নদীর ধারে কিংবা পাহাড়ের গায়ে অথবা অস্তগামী সূর্যের ছটায় রঙিন নির্জন কোনো মাঠে ভালো একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসে ধ্যান করতাম।" (ভারত-পথিক, পৃঃ ৪০) এর পর এল বিবেকানন্দ ও তাঁর গুরু রামকৃষ্ণের আদর্শের সঙ্গে পরিচয়ের পালা—এবং তখন সেই আদর্শকে কেন্দ্র করে স্বভাবের চারপাশে একটা জগৎ গড়ে উঠেছিল। তাঁর সাক্ষ্য এই: "অল্পদিনের মধ্যেই আমি রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের একদল ভক্ত জুটিয়ে ফেললাম।

স্কুলে বা স্কুলের বাইরে, যেখানেই হোক সুযোগ পেলেই আমরা এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু করে দিতাম। অনেক সময়ে দল বেঁধে ঘুরে বেড়াতে চলে যেতাম, এতে বেশ খানিকক্ষণ আলোচনা করবার সুযোগ পাওয়া যেত। ক্রমে আমাদের দল বেশ ভারি হয়ে উঠল।" (উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪৫) ক্রমে এই আদর্শ নিয়ে আলোচনাদি আর যথেষ্ট মনে হল না, জীবনে আদর্শ প্রয়োগের আকাঙ্ক্ষাও দেখা দিল। পারিবারিক বৃত্তের ভিতর এই নিয়ে অল্প অল্প সংঘাতও দেখা দিল। তাঁর নিজের কথায়: "বাবা মা যতোই আমাকে বাধা দিতে চেয়েছেন আমিও ততই বিদ্রোহী হয়ে উঠেছি। যখন অন্য কোনোভাবে আমাকে বাগে আনতে পারলেন না, তখন কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন। কিন্তু চোখের জলেও আমার মন ভিজল না। বরং বিরক্ত হয়ে আমি আরো বেশি অবাধ্য এবং স্বাধীনচেতা হয়ে উঠলাম, কোনোরকম শাসনই আমার উপরে খাটল না। অবশ্য এজন্য মনে মনে আমি অত্যন্ত অশান্তি ভোগ করেছি। বাপমায়ের অবাধ্য হওয়া যে আমার পক্ষে কতখানি পীড়াদায়ক ছিল তা বলে বোঝানো যায় না, কারণ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আমার স্বভাববিরুদ্ধ। কিন্তু আমার কাছে সবার উপরে তখন আদর্শ—সেই আদর্শের কাছে আর সবই তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল।" (উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৫৭) এই আদর্শ সাধনার একটা দিকে যেমন ছিল জনসেবা ইত্যাদি, আর একটা দিকে ছিল যোগ অভ্যাস। তিনি লিখেছেন: "লেখাপড়া ছেড়ে এখন আমার একমাত্র কাজ হল যোগ অভ্যাস করা। যোগ শেখাতে পারে এরকম গুরু তখনো আমার জোটেনি, কাজেই বই পড়ে যতটুকু শেখা যায় তাই দিয়েই কাজ চালাতাম। এইভাবে কিছুদিন যোগ অভ্যাস করবার পর আমরা পরস্পরের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে দেখতে লাগলাম।...মাসের পর মাস যোগ করবার পরও আমার মধ্যে কোনো অলৌকিক শক্তি অনুভব করিনি, তবে আগের চাইতে আমার আত্মবিশ্বাস ও আত্মসংযম অনেক বেড়ে গিয়েছিল, মানসিক শান্তিও অনেকটা ফিরে পেয়েছিলাম।" (পৃঃ ৪৮-৪৯) এক প্রশ্ন দেখা দিল যে শুধু বইয়ের সাহায্যে যোগাভ্যাস করা যায় কি না, জীবন্ত গুরুর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য দরকার কি না। অতএব সুরু হল গুরুর সন্ধান। তাঁর কথায়: "ভাবলাম হয়তো একজন গুরুর অভাবেই সাধনা আর এগোচ্ছেনা—অনেককেই বলতে শুনতাম কিনা গুরু বিনা যোগসাধনা কখনো সফল হয় না। অগত্যা গুরুর সন্ধানে মন দিলাম। আমাদের দেশে সংসার-ত্যাগী যোগীরা অনেকেই পরিব্রাজকের জীবনযাপন করেন কিংবা তীর্থস্থানগুলিতে ঘুরে বেড়ান। কাজেই হরিদ্বার, বারাণসী, পুরী কিংবা রামেশ্বরম - যে কোনো তীর্থে এদের দেখা মেলে। পুরীর কাছাকাছি বলে কটকেও এই ধরণের সাধুসন্ন্যাসীর ভিড় লেগেই থাকত। এই সাধুসন্ন্যাসীদের

মধ্যে আবার দুটো শ্রেণীবিভাগ আছে—একদল হল আশ্রম বা মঠবাসী, আর এক দল তারা কোনো দল বা সম্প্রদায়ভুক্ত নয়, সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত প্রকৃতির। আমাদের কাছে অবশ্য কোনো বাছবিচার ছিল না। শহরে কোনো সাধুসন্ন্যাসী এসেছে একবার খোঁজ পেলেই হল, সবাই ছুটতাম তার দর্শন নিতে। এইভাবে কত বিচিত্র ধরণের লোকের যে দেখা পেয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। এদের মধ্যে আমার সবচেয়ে ভালো লাগত সত্যিকার সংসারবিমুখ নির্লিপ্তপ্রকৃতির সাধুদের।" (উক্তগ্রন্থ, পৃঃ ৫০-৫১) এই সঙ্গে কটকে আগত একজন বৃদ্ধ সাধুর কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। এই সাধুর প্রতি শ্রদ্ধাসক্ত হয়ে তাঁর উপদেশাবলী প্রাণপণে কিছুদিন মেনে চলেছিলেন সুভাষ—পরে অবশ্য তাঁর কথায় আর আস্থা রাখতে পারেননি। তাঁর কথায়: "অগত্যা এসব ছেড়েছুড়ে দিয়ে আবার রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে নিয়ে পড়লাম। মনকে বোঝালাম—সংসার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হতে না পারলে মুক্তি অসম্ভব।" (পৃঃ ৫৮) এবং "মনে পড়ে বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি ভিক্ষুক, ফকির, সাধুসন্ন্যাসী—সবদেরই সঙ্গে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ হতে চেষ্টা করতাম। বাড়িতে এরা কেউ এলে তাদের যথাসাধ্য দান করে মনে মনে অদ্ভুত আনন্দ পেতাম।" (পৃঃ ৫২)

সুভাষচন্দ্রের বালকজীবনের মনোভাবের এই বিশেষ দিকটির পরিচয় আছে তাঁর সেসময়ে লেখা চিঠিগুলিতে। এগুলি তাঁর মাকেই লেখা, একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "ভগবানের শ্রীচরণে জীবন সমর্পণ করিয়া যিনি আপনার জীবনতরী ভাসাইতে পারেন, তিনিই ধন্য, তাঁহার জীবন সার্থক, তাহার মানব জন্ম সফল। কিন্তু হায়! আমরা এ মহাসত্য বুঝিয়াও বুঝি না। আমরা এরূপ অন্ধ, এরূপ অবিশ্বাসী ও এরূপ মূর্খ যে কিছুতেই আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় না। আমরা মানুষ নহি কলিযুগের রাক্ষস। (পত্রাবলী, পৃঃ ৯) আর একটি পত্রে মাকে তিনি জানিয়েছিলেন: যদি মানুষজন্ম লাভ করিয়া মানুষজীবনের উদ্দেশ্য না সফল করিতে পারিলাম—যদি গন্তব্যস্থানে পহুঁছিতে না পারিলাম তবে আর কি রহিল? যেমন সকল নদীর গন্তব্যস্থান সমুদ্র সেইরূপ সমস্ত জীবনের গন্তব্যস্থান ঈশ্বর। যদি মানুষ ঈশ্বর লাভ করিতে না পারে তবে মানুষজন্ম বৃথা—আর পূজা, জপ, ধ্যান সবই বৃথা—সব কেবল ভণ্ডামী। এখন আর বাজে কথায় পর্যন্ত সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা হয় না—ইচ্ছা হয় কেবল একটা ঘরে বন্ধ থাকি আর সমস্ত দিন সমস্ত রাত ধ্যান-চিন্তা এবং পাঠে অতিবাহিত করি।" (পত্রাবলী, পৃঃ ২৬)

হেমন্তকুমার সরকার লিখেছেন যে বেণীমাধব দাসের পত্র নিয়ে কটকে তিনি যেবার প্রথম সুভাষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তখন তাঁরা দুজনেই ছিলেন স্কুলের ছাত্র এবং সেসময়ই আজীবন ব্রহ্মচর্যের সঙ্কল্প সুভাষ গ্রহণ করেন।

কটক থেকে কলকাতায় যখন সুভাষ পড়তে এলেন তখনো তাঁর মনোভাবের কোনো পরিবর্তন হয়নি। কলকাতায় এসে ব্রহ্মচর্যের সঙ্কল্প আবার দৃঢ়ভাবে তিনি নেন। "দলের সকলেই আমরা ব্রহ্মচর্যের ব্রত নিয়েছিলাম।" (ভারত-পথিক, পৃঃ ৭৪) সন্ন্যাসী হবার স্পৃহা তাঁর হৃদয়ে ক্রমে বলবতী হয়ে ওঠে। তিনি লিখেছেন: "১৯১৩ সালে শীতের সময়ে আমরা কলকাতা থেকে ৫০ মাইল দূরে হুগলি নদীর ধারে অবস্থিত শান্তিপুর নামে একটি জায়গায় গিয়ে কিছুদিন গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী হয়ে বাস করেছিলাম।" (উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৭৫) এই শান্তিপুরে সন্ন্যাসজীবন যাপনের ঘটনাটি একটি বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন: "পশ্চিমের ভ্রমণ শেষ করিয়া কলিকাতায় আসার পর হইতেই আমাদের ভিতরে সন্ন্যাসভাব প্রবল হইয়া ওঠে। ঠিক হয়, কলেজের পড়া শেষ হওয়ার সাথে সাথেই আমরা সকলে গেরুয়া পরিয়া পাকা সন্ন্যাসী বনিয়া কাজে লাগিয়া যাইব। তখন হইতে

সন্ন্যাসীর চিহ্ন স্বরূপ অনেকে কাপড়ের নীচে গেরুয়া নেংটিও পরিতে আরম্ভ করে। পরবর্তী বড়দিনের ছুটিতে সন্ন্যাসী জীবন যাপন করার উদ্দেশ্যে শান্তিপুরে একটি বাড়িও ঠিক করা হয়। সকলের কাপড়ে গেরুয়া রং দেওয়া হইলো—আমারও। আঠারো উনিশ জন যাইবে ঠিক হইলো। রওনা হওয়ার আগের দিন নবীন মুখুজ্যের কঠিন অসুখের সংবাদ পাওয়ায় আমার আর যাওয়া হইলো না। এ-ক-জন গিয়াছিলো বলিয়া মনে পড়ে—(১) গুরুদাস (২) যুগল (৩) প্রফুল্ল (৪) যোগেন দাহা (৫) বিধু রায় (৬) শশাঙ্ক মুখার্জি (৭) প্রমথ সরকার (৮) সুভাষ বসু (৯) হেমন্ত সরকার (১০) অরবিন্দ মুখার্জি। এরা শান্তিপুরে সন্ন্যাসী জীবনের সমস্ত রকম কৃচ্ছতাই অভ্যাস করে। শেষরাতে উঠিয়া গঙ্গার ঠাণ্ডা জলে আকণ্ঠ গা ডুবাইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটায় ও। .....চাঁদপুর থেকে কলিকাতা আসিয়া দেখি শান্তিপুরের দল ফিরিয়াছে। দেখিয়া মনে হইলো প্রত্যেকে যেন এক একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—সন্ন্যাসী হওয়ার জলন্ত প্রতিজ্ঞা সকলের চোখে মুখে। সন্ন্যাস সম্বন্ধে নিত্য নূতন উপদেশ দিয়া আমিও তাদের সে-আগুনে ইন্ধন যোগাইলাম।" (জীবনপ্রবাহ, পৃঃ ১৯৩-৪) হেমন্তকুমার এ বিষয়ে আরও বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর মতে প্রমথ সরকার এই সন্ন্যাস দলে ছিলেন না—যদিও তাঁর যাবার কথা ছিল।

এরই কিছুদিন পর কৃষ্ণনগরে ইন্দ্রদাস বাবাজী নামে উদাসী শিখ সম্প্রদায়ের এক তরুণ সন্ন্যাসী আসেন। এই সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে সুভাষ এসেছিলেন। বন্ধু হেমন্ত কুমারের সঙ্গে সুভাষ প্রায়ই সন্ন্যাসীর কাছে যেতেন এবং তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে ওঠেন। আত্মচরিতে তিনি লিখেছেন: "তিনি যদি আর একটু মননশীল হতেন তবে সাধুজীবনের জন্যই হয়তো আমি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতাম। এই তরুণ তপস্বীর সংস্পর্শে আসবার পর থেকে আমার মনে কোনো গুরুর কাছে দীক্ষা নেবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠল।" (ভারতপথিক, পৃঃ ৮৫) হেমন্তকুমার লিখেছেন যে তিনি ও সুভাষ উভয়েই এই সাধুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন কিন্তু কয়েকদিন পর সাধু বলেন যে তাঁদের ওপর তাঁর এমন মায়া বসে গেছে যে সন্ন্যাসীর পক্ষে তা বিপজ্জনক। এই বলে সাধু কৃষ্ণনগর থেকে উধাও হয়ে যান।

একজন উপযুক্ত গুরুলাভের আশায় ও পূর্ণ সন্ন্যাসজীবন যাপনের উদ্দেশ্যে ১৯১৬ সালে কলেজের গ্রীষ্মের ছুটির সময় বন্ধু হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেন। বাড়িতে কাউকে কিছু না বলেই তাঁরা বেরিয়েছিলেন। সঙ্কল্প কোলা, হৃষীকেশ, হরিদ্বার, মথুরা, বৃন্দাবন, বারাণসী, গয়া প্রভৃতি উত্তর ভারতের বিভিন্ন তীর্থে তাঁরা পরিভ্রমণ করেন। হরিদ্বারে হেমন্তকুমার তাঁদের সঙ্গে মিলিত হন। তীর্থ দর্শনের অবকাশে দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি ঐতিহাসিক স্থানগুলিও তাঁরা দর্শন করেন। এই ভ্রমণের কথা সুভাষ তাঁর আত্মচরিতে ও হেমন্তকুমার তাঁর গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত গুরুলাভ ঘটেনি। রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে সুভাষের দেখা হয়। তিনি তাঁকে বলেন যে তাঁর জীবন নিয়ন্ত্রিত হবে দেশের সেবায়, প্রচলিত সন্ন্যাসী জীবন যাপনে নয়। গৃহে ফেরার পরামর্শ তিনিই তাঁকে দেন।

এই যাত্রায় অভীষ্ট ফললাভ সুভাষের হল না, কিন্তু ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে অভিজ্ঞতার বহর এই ভ্রমণের ফলে সুভাষের অনেকখানি বাড়ে। সাধুসন্ন্যাসীদের সম্পর্কে কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতাও তাঁর লাভ হয়েছিল। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিন্দুমাত্র বীতরাগ বা অশ্রদ্ধা মনে জন্মায়নি। কলকাতার গৃহে ফিরে আসার অব্যবহিত পরেই এক পত্রে এ বিষয়ে তিনি লিখেছিলেন: "হুগলীতে ফের বাবার সঙ্গে অনেক কথা হয়। নানা মত লইয়া—সন্ন্যাসী দর্শন সম্বন্ধে এবং ভ্রমণের সম্বন্ধে। বলিলাম কাহাকেও পছন্দ হইল না। তার সঙ্গে সঙ্গে আমার ideal-টা বলিলাম। সমস্ত

discussion-এ what he wanted to drive at was—(১) সংসারে থেকে ধর্ম হয় কি না (২) ত্যাগের জন্য preparation দরকার (৩) কর্তব্য ত্যাগটা কি ঠিক। আমি বলিলাম—(১) সকলের পক্ষে এক ঔষধ নয় কারণ সকলের এক রোগ, এক সামর্থ্য নয় (২) সংস্কারের উপর ত্যাগটা নির্ভর করে—সকলের জন্য বেশী ঘসা মাজা প্রয়োজন না হইতে পারে (৩) কর্তব্যটা relative higher call এলে lower calls ভেসে যায়—জ্ঞান এলে কর্মনাশ হয়।" (পত্রাবলী, পৃঃ ৭৪)

শুধু সেদিন নয়—এই আদর্শ চিরকালই তাঁর মনে উজ্জ্বল রূপে বর্তমান ছিল। পরবর্তী জীবনে রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যেও, কৈশোরে এই তাঁর হিমালয়ের আহ্বানে যাত্রার কথা। স্মৃতিকথার মতো তিনি লালন করেছিলেন এবং তাঁর স্বভাবধর্ম যে রাজনীতি নয় বরং পরম সত্যের অনুসন্ধানে সর্বত্যাগী হয়ে বেরিয়ে পড়া—এ কথাও বারবার স্মরণ করেছেন। সর্বত্যাগের মন্ত্রই ছিল তাঁর চরিত্রের মূল সুর। তাঁর সমকালীন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিগণ তাঁর সম্পর্কে বিচারের সময় এই কথাটাই বুঝতে চাননি—নতুবা ভারতীয় রাজনীতির অনেক জটিল ও আশান্তিময় অংশ হয়তো শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা হতে পারত। বস্তুতঃ সুভাষের প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব ও অন্য সকল গুণাবলীকে ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর বিশাল ত্যাগ। কোনো রাজনৈতিক নেতার পক্ষেই এটা অপ্রত্যাশিত এবং সেকারণেই সুভাষ-চরিত্র আজও দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যময়।

(ক্রমশঃ)

অখিল ভারতের

সময়োপযোগী দুইটি বই

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ : ৩'৫০ টাকা

"...সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থ-নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রাহ্য। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাদ্য।"
(ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনবাদ

নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের সম্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।

পাওয়া যাবে :

জয়শ্রী—৩১২, মাসুলী বাগান, কলিঃ-৪৭ (ডাকে)

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী,

২০৯বি বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

বরণীয় গ্রন্থসম্ভার

। জীবনী ও জীবন-প্রসঙ্গ ।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় শেলী ২·৫০। যতীন্দ্রমোহন দাস মানবেন্দ্রনাথ ১৫·০০। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলার বিপ্লববাদ ৫·০০। শ্রীরামকৃষ্ণ ও অপর কয়েক জন মহাপুরুষ প্রসঙ্গে ৫·০০। দিলীপ মুখোপাধ্যায় সঙ্গীতসাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু ৬·০০। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী ৪·০০। সীতা দেবী পুণ্যস্মৃতি ১০·০০। মণি বাগচী রামমোহন ৮·০০ বঙ্কিমচন্দ্র ৬·০০, মাইকেল ৫·০০, দেবেন্দ্রনাথ ৪·৫০, কেশবচন্দ্র ৪·৫০, প্রফুল্লচন্দ্র ৪·৫০, রমেশচন্দ্র ৫·০০, বিবেকানন্দ ৫·০০, আশুতোষ ৪·০০ সুরেন্দ্রনাথ ৬·০০, শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার ১০·০০। অবন্তী দেবী ভক্তকবি মধুসূদন রাও ও উৎকলে নবযুগ ৬·০০। সুধা সেন মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর ৮·০০। সুধীর রায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১০·০০। বলাই দেববর্মা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ৫·০০।

। সাহিত্য বিষয়ক ।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বপ্নপ্রয়াণ ৬·০০। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবন্ধ সংগ্রহ ৭·৫০। প্রবোধচন্দ্র সেন ছন্দ পরিক্রমা ৪·০০। বিমলবিহারী ভট্টাচার্য বাগর্থ ৪·০০। রবীন্দ্রনাথ রায় সাহিত্য বিচিত্রা ৮·০০। বিমান বিহারী মজুমদার ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য ৫·০০, পঁচিশত বৎসরের পদাবলী ৭·৫০। বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য কালীদাস ও রবীন্দ্রনাথ ৬·০০। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় মেঘদূত ৫·০০। ভবতোষ দত্ত চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র ৬·০০। অরুণ মুখোপাধ্যায় উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকবিতা ৮·০০। নারায়ণ চৌধুরী আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়ন ৩·৫০। অরুণ ভট্টাচার্য কবিতার ধর্ম ও বাংলা কবিতার ঋতুবদল ৫·০০। আজাহার উদ্দিন খান বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল ৫·০০। বিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ রবীন্দ্র সুভাষিত ১২·০০। Prabasjiban Choudhury Tagore on Literature and Aesthetics 8·50। সাধনকুমার ভট্টাচার্য রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা ৬·০০। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কাব্য পরিমিতি ৩·০০।

। বিবিধ বিষয়ক ।

প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া ৬·০০। জ্ঞানদেব জ্ঞানেশ্বরী (গীতা) ২০·০০। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য চরিতামৃত ১০·০০। রাধাকৃষ্ণণ হিন্দুসাধনা ৩·০০। কাকা সাহেব কালেলকার জীবনলীলা ১০·০০। দীনেশচন্দ্র সেন রামায়ণী কথা ৬·০০, পৌরাণিকী ৬·০০। প্রবোধচন্দ্র সেন রামায়ণ ও ভারতসংস্কৃতি ৩·০০। শিশির নিয়োগী সহজ কৃত্তিবাসী রামায়ণ ৩·৫০। ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী রামায়ণের কথা ১·২৫, ভারত জিজ্ঞাসা ৩·০০, মনোবিদ্যা ও দৈনন্দিন জীবন ২·৫০। প্রফুল্লকুমার দাস রবীন্দ্র সঙ্গীতপ্রসঙ্গ ১ম ৩·৫০, ২য় ৫·০০। সুনীলচন্দ্র সরকার রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ও সাধনা ৬·০০। শশাঙ্কমোহন চৌধুরী কালপরিক্রমা ৬·০০। সুভূতিরঞ্জন বড়ুয়া বুদ্ধপথ ৬·০০। অমূল্যচরণ সেন অশোক চরিত ২·৫০।

। উপন্যাস ।

হরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় নৌকাডুবির পরে ৪·০০। সুবোধ বসু পদ্মধ্বনি ৫·০০, রাজধানী ২·৫০, বুদ্ধদেব বসু চারমূর্তি ২·৫০ আমার বন্ধু ২·৫০। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় হাসি ২·০০, লক্ষ্মী ২·০০।

জিজ্ঞাসা ১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনু। কলিকাতা ২৯
১ ও ৩৩ কলেজ রো। কলিকাতা ৯

সাতনম্বর বিশ্বকোষ লেন

: দুর্গাদাস

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সাত নম্বর বিশ্বকোষ লেন।

স্মরণ-শক্তি নিয়ে আমার গর্ব করবার কিছু নেই। সত্যিই অত্যন্ত ভুলো মন আমার। নাম ঠিকানা তারিখ বেশীর ভাগই আমার ঠিক মত মনে থাকে না। তার জন্য এক এক সময় বেশ অসুবিধেতে পড়তে হয়।

কিন্তু ওই ঠিকানাটা একেবারে নির্ভুল ভাবে মনে আছে কি করে।

তাও ইদানীং জানা কোন ঠিকানা নয়। পঁয়ত্রিশ বছরেরও আগেকার কথা। বাগবাজারের একটা আঁকাবাঁকা সঙ্কীর্ণ গলি। বছর খানেকের বেশী সেখানে যাতায়াত করি নি। তবু ঠিকানাটা যেন মনের মধ্যে একেবারে খোদাই করা আছে।

থাকবার কারণ এই যে ওই ঠিকানায় আমি প্রথম দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়কে দেখি। ওই খানেই তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়।

ওইটুকু পড়ে কেউ যদি ভাবেন দেখা হওয়াটা একটা সমারোহ গোছের ব্যাপার তাহলে তিনি নিতান্ত ভ্রান্ত।

সে দেখার মধ্যে বিস্ময়মুগ্ধতা ছিল নিশ্চয়ই কিন্তু তা সম্পূর্ণ অন্য জাতের। সে মুগ্ধ বিস্ময় দীনেশচন্দ্রের অপ্রত্যাশিত সহজ স্বাভাবিকতায় যার মধ্যে কোন অনাড়ম্বরের সন্ধও ছিল না।

অসাধারণ মানুষও সচরাচর দু জাতের হন। তাঁদের কারুর কারুর ব্যক্তিত্ব বেষ্টন করে মহিমার একটা ছটা গোছের থাকে। সসম্ভ্রমে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের আশায় যেতে হয়, দেখতে হয় বেশ একটু দূরত্বের ব্যবধান মেনে নিয়েই।

আর এক ধরণের অসাধারণ মানুষ এমন যে তাঁদের সাধারণ থেকে আলাদা করে চেনাই যায় না ওপর থেকে দেখে।

দীনেশচন্দ্র এই দ্বিতীয় দলের অসাধারণদের একজন।

সত্যি কথা বলতে গেলে প্রথমটা মনে মনে খুশি একটু হতাশই হয়েছিলাম।

দীনেশ চন্দ্র সেন সম্বন্ধে মনের ভেতর একটা ছবি তখন আবছা ভাবে আঁকা হয়ে আছে। তাঁর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস পড়েছি। প্রথম পথিকৃৎ হিসাবে তিনি সন্ধান ও গবেষণার যে সব নতুন ক্ষেত্র উন্মুক্ত করেছেন তার খবর আমাদের কানেও পৌঁছেছে। শুধু পণ্ডিত গবেষক তিনি নন। তাঁর কলমেও যে মধু ঝরে তাঁর বেহুলা মুলরা ইত্যাদি নানা সর্বজন প্রিয় রচনায় তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে।

সেই মানুষকে একটা পায়জামা কতুয়া গায়ে প্রায় আধ খালি ঘরে প্রশস্ত একটি সিমেন্ট বাঁধানো বারান্দার মেঝেতে এক রাশ একালের সেকালের হাতের লেখা ও ছাপানো বই পত্রের মধ্যে একটু যেন দিশাহারা অবস্থায় দেখব ভাবতে পারি নি।

খানিকক্ষণ তাঁর কাছে বসে আলাপ করতে করতেই তাঁর

ব্যক্তিত্বের বহুর বৈশিষ্ট্যটুকু কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম : আমি যখন তাঁকে প্রথম দেখি তখন তাঁর পাংলা চোগাটে চেহারা। বলিষ্ঠ দৃঢ়তার বদলে মুখে চোখে একটু কৌতুক-স্নিগ্ধ প্রসন্নতা। ধরণ-ধারণ কথাবার্তা কোন কিছুতেই জোরালো আত্মপ্রকাশের ভঙ্গী নেই। নিজেকে জাহির না করে নেপথ্যে থাকাই তাঁর ধর্ম। কিন্তু জোর দিয়ে না বললেও কথা না বলেন তা মনের ওপর সুস্পষ্ট দাগ রেখে যায়।

তখন আমরা সাহিত্যের জগতে নবাগত। 'কল্লোলের' দল হিসাবে প্রবীণ নবীনদের নিন্দা প্রশংসা সমর্থন ও বিরোধীতা সব কিছুরই স্বাদ পেয়েছি। প্রবীণরা লেখা না পড়েই আমাদের প্রতি বিমুখ এমন একটা ধারণা আমাদের মনে বদ্ধ মূল হবার কারণও ঘটেছে।

সেই সময়ে দীনেশচন্দ্রের সঙ্গে সামান্য কিছুক্ষণ আলাপের মধ্যে তিনি আমাদের লেখা সত্যিই মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন জেনে যেমন বিস্মিত তেমনি অভিভূত হয়েছি কৃতজ্ঞতায়।

দীনেশচন্দ্র প্রশংসা নিন্দা কিছুই অবশ্য করেন নি। শুধু তাঁর কথায় এইটুকু বুঝেছি যে বাইরের শোর গোল শুনেই বিনা বিচারে তিনি আমাদের বাতিল করে দেন নি। নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়েই আমাদের যথার্থ মূল্য নির্ণয় করবার পরিশ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁর সে নিজস্ব বিচারে একেবারে যে ফেল পড়িনি তাঁর উৎস কৌতুক মেশানো অস্পষ্ট দু একটি মন্তব্য থেকেই তা বুঝেছি।

তখনকার নবীন সাহিত্য জীবনে এই পরোক্ষ সমর্থনটুকুর দাম অশেষ। খ্যাতির চূড়ায় যাঁরা আসীন আমাদের নবত্ব সেদিনের প্রবীণদের মধ্যে কয়েকজনের কাছে যত সে উৎসাহটুকু পেয়েছিলাম।

দীনেশচন্দ্রের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে কাছাকাছি আসবার সৌভাগ্য তারপর হয়েছে। দিনের পর দিন পাশে থেকে তাঁর কাজের ধারা দেখবার ও তাঁকে গভীর ভাবে চেনবার সুযোগ পেয়েছি।

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন

জন্মশতবার্ষিকী

'জিজ্ঞাসা'র শ্রদ্ধার্ঘ

অমূল্য গ্রন্থাবলীর পুনর্মুদ্রণ

"সংস্কৃত পুরাণের ভাণ্ডার এবং বাংলা সাহিত্যের সম্পদ গাথা-কাব্য ও মঙ্গল-কাব্যগুলি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তিনি সরল সুললিত গদ্যে···সর্বসাধারণের রসপিপাসা ও গল্পপিপাসা সার্থক ভাবে মিটাইয়াছেন। তাঁহার কাছে এই ঋণ আমাদের অপরিশোধ্য।" সাহিত্যসাধক চরিতমালা

॥ প্রকাশিত ॥

রামায়ণী কথা ৪·০০ পৌরাণিকী ৬·০০

বেহুলা ১·৬০ জড় ভরত ১·৫০

ফুল্লরা ১·৪০ সতী ১·৩০

ধরাক্রোণ ও কুশঙ্কুর ১·২০

॥ অচিরে প্রকাশিতব্য ॥

বাংলার পুরনারী

ঘরের কথা ও যুগ-সাহিত্য

রাগরঙ্গ ॥ কানু পরিবাদ

মুক্তাচুরি ॥ শ্যামলী খোঁজা

সুবল সখার কাণ্ড

জি জ্ঞা সা

১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনু কলিকাতা-২৯

১ কলেজ রো, ৩৩ কলেজ রো কলিকাতা-৯

বিশ্বকোষ লেন থেকে তখন তিনি তাঁর বেহালার বাড়িতে উঠেছেন। সেখানে 'বৃহৎ বঙ্গ' রচনার নেশায় নয় উপস্থায় তন্ময় হতে দেখেছি, দেখেছি তাঁর সেই পুরোনো ার গাড়িটি নিয়ে দূর দূরান্তরের গ্রামে বিস্মৃত আহেলিত া ভিটের ও মন্দিরে বাংলার পোড়ামাটির শিল্প ভাস্করের ন অক্লান্ত ভাবে দিনের পর দিন ঘুরে বেড়াতে, যে ঘাটের পটুয়াদের কাজ আজ হঠাৎ ফানুসের খাতিরে ার সমাদর পেতে সুরু করেছে তারই বিলুপ্ত উৎস সন্ধানে তখনকার দূর শহরতলীর দরিদ্র বস্তিতে তাঁর ব্যাকুল অভিযানের সঙ্গীও হয়েছি কখনো কখনো।

দীনেশচন্দ্রের সে বিস্ময়কর পরিচয় পাবার আগেই সেই প্রথম সাক্ষাতের দিনই অতি সাধারণের ছদ্মবেশে তাঁর অসাধারণত্বের এমন কিছু আভাস নিশ্চয়ই পেয়েছিলাম যাতে অভিভূত ভাবে সেখান থেকে ফেরবার পর আজ এতকাল বাদেও অন্ত বহু স্বাপদ স্মৃতি ভেদ করে সাত নম্বর বিশ্বকোষ লেনের ঠিকানাটা উজ্জ্বল হয়ে আছে।

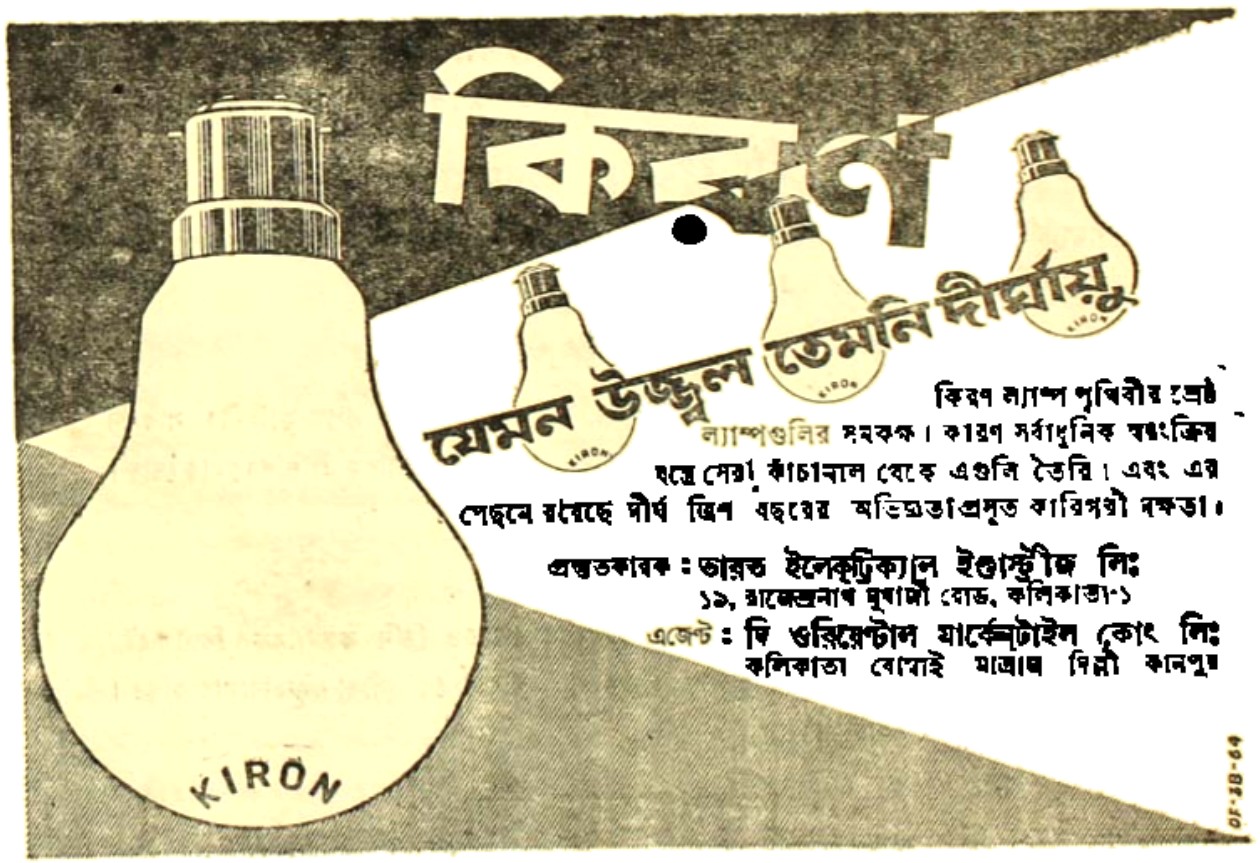

প্র কা শি ত হ ল

রবীন্দ্র-রচনাবলী

প্রথম ছত্র ও শিরোনাম্-সূচী

রবীন্দ্র-রচনাবলীর ২৭টি খণ্ডে ও অচলিত সংগ্রহ ২ খণ্ডে স কলিত যাবতীয় রচনার সূচী এই প্রথম প্রকাশিত হল। রবীন্দ্র রচনাবলীর অন্তর্গত যে কোনো রচনার সূত্রসন্ধানের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। মূল্য কাগজের বলাট ৪·০০, রেক্সিনে বাঁধাই ৬·০০ টাকা।

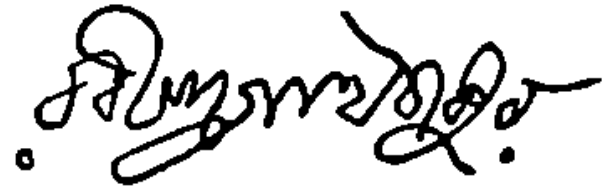

সংগীত-চিন্তা

সংগীত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় রচনা এবং সংগীত সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য এই গ্রন্থে স কলিত হল। এর অনেকগুলি রচনাই ইতিপূর্বে গ্রন্থভুক্ত হয়নি। মূল্য ৭·০০ টাকা।

চিঠিপত্র। প্রথম খণ্ড

সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী। গ্রন্থশেষে মৃণালিনী-প্রসঙ্গ সংযোজিত নূতন পরিবর্ধিত সংস্করণ। চিত্র-সম্বলিত। মূল্য ৩·০০ টাকা।

Tagore for You

ইংরেজিতে অনূদিত রবীন্দ্রনাথের রচনা, অভিভাষণ, পত্রাবলী, কবিতা ও রূপক-কাহিনীর সংকলন গ্রন্থ। রবীন্দ্র-জীবন ও প্রতিভা সম্বন্ধে তথ্যমূলক ভূমিকা সম্বলিত। সম্পাদক শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ। মূল্য ৪·০০ টাকা।

অবনীন্দ্রনাথ ॥ শ্রীলীলা মজুমদার

চিত্রশিল্পীরূপেই অবনীন্দ্রনাথ কীর্তিত। সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রেও তিনি কতটা সফল শিল্পী এই গ্রন্থে তা বিশেষভাবে আলোচিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীনা-বক্তৃতামালায় কথিত। সচিত্র। মূল্য ২·০০ টাকা।

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

বঙ্গভারতীর ভক্ত পূজারী

শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী

দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথার' ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্রকে ভক্ত পূজারী, আর তাঁর সাহিত্যকর্মকে দেবতার আরতি বলেছেন। কবির এই রহস্যগভীর উক্তিকে অতিক্রম করার সাধ্য আমাদের নেই। সত্যই এ যেন মন্দিরে দীপাবর্তন, অরিষা দেববিগ্রহের সমগ্র সৌন্দর্য যাতে প্রোদ্ভাসিত এবং নয়নাভিরাম হয়ে ওঠে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ মন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়ে ঘণ্টাবাদনের তৃপ্তি অনুভব করেছিলেন!

"সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।
.. বন্দে মাতরম্।"

এ-মন্ত্র সত্যদ্রষ্টা কবি বঙ্কিমের। মন্ত্র পূর্ণসত্যের বাণী-সংকেত। মন্ত্র সজীব হয়, অনুভবে আচরণে—জীবনসাধনায়। বাংলার তথা আসমুদ্র-হিমাচল ভারতের এই জাগরণ-মন্ত্রও সজীব হয়ে উঠেছিল দীনেশচন্দ্রের সারস্বত সাধনায়, সাহিত্য-কর্মে। বঙ্কিমের 'সুমধুর-ভাষিণী' জননীর বাণী-মাধুর্য আস্বাদন করে আত্মহারা হয়েছিলেন বঙ্গভারতীর এই সুসন্তান। তাঁর আস্বাদনের আনন্দ যেন আত্মহারা হয়ে পরিবেশন করে দিয়েছেন তিনি স্বজাতিকে। বিত্ত, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি-কামনা দীনেশচন্দ্রের সাধনকে স্পর্শ করেনি।

বাঙালীর ইতিহাস চাই—এই তাগিদ সৃষ্টি করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে। সাড়া দিয়েছিলেন মনীষী বঙ্কিম-পরিকরবৃন্দ। অক্ষয়কুমার সরকার, রামগতি ন্যায়রত্ন, ব্রজেশচন্দ্র দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সাহিত্য ইতিহাসের পথে তিমিরাভিসার করেছিলেন। দীনেশচন্দ্র তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দীনতার সঙ্গে পূর্বসূরীদের অনুগামী হয়ে এক্ষেত্রে অনুপম সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে তাঁর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রকাশিত হয় (১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে)। দীনেশচন্দ্রের অন্য-শতবার্ষিকী অনাড়ম্বর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা বুকে নিয়ে যাঁরা পালন করবেন তাঁদের প্রয়াসের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করি "চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করে!

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনার একটি ইতিহাস আছে। সেটি স্মরণ করলে দীনেশচন্দ্রের সাধনার গুরুত্ব আমাদের আংশিক উপলব্ধির বিষয় হতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক গুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এক হিসাবে তাঁর সংবাদ-প্রভাকর-পত্রিকায় এই কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁর অব্যবহিত পূর্ববর্তী যুগের কবিওয়ালাদের রচনা ও পরিচয়, সেই সঙ্গে রামপ্রসাদ-ভারতচন্দ্রের পরিচয় তিনি সাধ্যমত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তারও আগে, বৈষ্ণব পদাবলী রচনার অবসান-পর্বে শ্রবণ কীর্তনের মাধ্যমে রাগানুগা-ভক্তিসাধনার উপায় হিসাবে মহাজন পদাবলী সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছিল। এই সংকলনের প্রেরণা অবশ্য ততখানি সাহিত্যিক বা ঐতিহাসিক নয়, যতখানি আধ্যাত্মিক ও সাধনিক।

সপ্তদশ-শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বৈষ্ণবাচার্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'কৃষ্ণভাবনামৃত-চিন্তামণি' সংকলিত হয়। হরিবল্লভ বা বল্লভ দাস

ভণিতায় এঁর নিজেরও রচনা এতে ছিল, সব নিয়ে ৩১৫টি পদ এই সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। এর পরেই নরহরি চক্রবর্তীর গীতচন্দ্রোদয়। এই সংগ্রহকার 'ভক্তিরত্নাকর' প্রণেতা ঘনশ্যাম নরহরি। তারপর রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃত-সমুদ্র' ৩৫৫টি পদের সংগ্রহ, স্ব-রচিত 'মহাভাবানুসারিণী' নামক সংস্কৃত টীকা এর সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু বৃহত্তম পদসংগ্রহ গোকুলানন্দ সেন ওরফে পদকর্তা বৈষ্ণবদাসের সঙ্কলিত পদকল্পতরু বা গীতকল্পতরু ও তার চারিটি শাখা ও বিভিন্ন পল্লবে পদসংখ্যা তিন হাজারের কিছু বেশী, ৩০৯১ টি। এ-ছাড়া গৌরসুন্দর দাসের কীর্তনানন্দ, দীনবন্ধু দাসের সংকীর্তনামৃত, প্রভৃতি পদাবলী-সংগ্রহ রচিত হয়েছিল। এ কালেও উৎকৃষ্ট পদাবলী সংকলনের কাজ অব্যাহত ছিল, যাতে এক সময় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও হাত দিয়েছিলেন। আমাদের মতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যের সংকলন। প্রথমতঃনামা ভারতীয় ভাষাবেত্তা স্যর জর্জ গ্রীয়ার্সনের বিদ্যাপতির খাঁটি মৈথিল পদসংগ্রহ এই পর্যায়ে পড়ে। বঙ্কিমযুগের অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'প্রাচীনকাব্য সংগ্রহ' এবং এই জাতীয় আরও কিছু কিছু কাজ সাহিত্যের ইতিহাস রচনার পথ সুগম করেছিল।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রণালীবদ্ধ ইতিহাস বলা যায় পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থকে (১৮৭১ খৃঃ)। মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত ইংরেজিতে তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত-মূলক গ্রন্থ প্রকাশ করেন ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে। এঁরা পথিকৃৎ। রমেশচন্দ্র নানা গুরুত্বপূর্ণ সারস্বত কর্ম ও রাজকর্মে ব্যাপৃত থাকায় মুদ্রিত সাহিত্যের বাইরে যে বিরাট পুঁথি-সাহিত্য দেশময় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল তার সদ্ব্যবহার করে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সংকলন করে যেতে পারেননি। পণ্ডিত ন্যায়রত্ন প্রাচীনপন্থী ইতিবৃত্তকার। তাঁর ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক এই সুমহান অধ্যবসায়ের উপযোগী ছিল না। এই সময়ে পূর্ববঙ্গের জীবনসংগ্রাম-জর্জর শিক্ষক দীনেশচন্দ্র তাঁর স্বপ্ন ও সাধনা নিয়ে এই ক্ষেত্রে এগিয়ে এলেন। ভুবিদ্যা ভিক্টোরিয়া স্কুলের দরিদ্র শিক্ষক ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস পড়তে গিয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। কীটদষ্ট, অশ্রু-চন্দনে চর্চিত ও মুগাক্ষর রাশি রাশি পুঁথি তিনি পুঁথির খাটিয়ালদের আনুকূল্যে সংগ্রহ করেন। দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম এবং বিনিদ্র রজনী যাপন করে এই সব গ্রন্থের পাঠোদ্ধার করে রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে যুগবিভাগ এবং কালক্রমনির্ধারণ করে তিনি বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন সে-কালের প্রধান ভারতী প্রভৃতি পত্রিকায়। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি 'বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ দেশে-বিদেশে প্রতিপন্ন করল, ইংরেজ আমলের এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার আওতায় বাংলা সাহিত্যের নবজীবন সঞ্চারের পূর্বেও বাঙালীর প্রায় হাজার বছরের পুরানো একটি বিরাট সাহিত্য ছিল, যা নিয়ে বাঙালী পৃথিবীর যে-কোনও সুসভ্য ও স্বাধীন জাতির সঙ্গে সমকক্ষতা করতে পারে। এই বার্তা শিক্ষিত বাঙালী ও পাশ্চাত্য সভ্যতর সমাজে প্রথম ঘোষিত হল দীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর অনন্য অতুলনীয় সৃষ্টিসম্ভারের সাহায্যে। দীনেশচন্দ্র বাঙালী জাতির অতীত যুগের বিস্মৃত প্রায় সাহিত্যের গৌরবময় বার্তাটি প্রকাশ করলেন বাংলায় ভারতে ও বিশ্বে। দীনেশচন্দ্রের এই সারস্বত কর্মের গুরুত্ব শতবর্ষব্যবধানে আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষক ও ইতিহাস-কর্মী মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কলিকাতা রিভিউ পত্রিকায় ইংরেজিতে এই গ্রন্থের যে আলোচনা প্রকাশ করেন তাতে আছে,

"বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস আখ্যা পাওয়ার যোগ্য গ্রন্থ এই খানিই প্রথম। শিক্ষিত সমাজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কয়েক শত বাংলা পুঁথি শুধু লোকলোচনের গোচর করা হয়নি, সেগুলি সাজিয়ে শ্রেণীবিভাগ ও সমালোচনা করে সুবিন্যস্তভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। কাব্যকবিতার নানা ধারা নানা ঐতিহাসিক প্রভাবে যুগে যুগে উদ্ভূত হয়ে বয়ে চলেছে, তার বিবরণ এতে দেওয়া হয়েছে। শতাধিক কবির পরিচয় বিস্মৃতি ও বিলুপ্তি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। পূর্ববঙ্গের কবিদের রচিত সাহিত্য সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। কেউ ভাবেনি, ঢাকার ত্রিপুরায় চট্টগ্রামে এমন সব কবিরা ছিলেন যাঁরা সমগ্র রামায়ণ মহাভারত ও হিন্দুর ধর্ম ও ঐতিহ্য সংশ্লিষ্ট বহুগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ রচনা করেছিলেন। এই বিশাল সাহিত্য শিক্ষিত সমাজের গোচর করার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব দীনেশচন্দ্র সেনের, অপর কারো নয়।" আমরা ১৯৩১ সালের 'Calcutta Review পত্রিকায় 'Discovery of our Literary Heritage' প্রবন্ধে এ নিয়ে আলোচনা করিয়াছিলাম।

দীনেশচন্দ্রের 'সতী', 'বেহুলা', 'জড়ভরত' 'ধরাস্রোত', 'কুশধ্বজ, ফুল্লরা—যা পরবর্তী 'পৌরাণিকী' গ্রন্থে একত্র সমাবেশিত হয়েছিল—এক অননুকরণীয় বিশিষ্ট ভঙ্গিতে এ-দেশের সভ্যতা সংস্কৃতির আভ্যন্তর রূপটি তুলে ধরেছিল। তাঁর 'রামায়ণী কথা'র অভিনব মাধুর্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেছিলেন। ভরত ভ্রাতৃভক্তির প্রণাম, লক্ষ্মণ প্রতিদিনকার অন্নব্যঞ্জন—সৌভ্রাত্রের এই তাৎপর্য বিশ্লেষণ রামায়ণ পাঠককে মুগ্ধ করেছিল। শ্রীচৈতন্যের কথা বলতে গিয়ে দীনেশচন্দ্র এক জায়গায় বলেছেন "প্রেম পৃথিবীতে একবার মাত্র রূপগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গদেশে," কুলীনগ্রামবাসী শ্রীকৃষ্ণবিজয়-প্রণেতা মালাধর বসুর পৌত্রের প্রথম পরিচয় পেয়ে শ্রীচৈতন্য বলেছিলেন "এক বাক্যে বিকাইনু তার বংশের হাতে।" বাক্যটি "বসুদেব-সুত কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ" —মথুরাভবনের সঙ্কেতবাহী একটি মাত্র বাক্য। দীনেশচন্দ্রের শ্রীচৈতন্য-সম্পর্কিত এই বাক্যটিও আমাদের কাছে তেমন মনে হয়েছে।

আচার্য দীনেশচন্দ্রের মুখেই শুনেছি, বহুবেতনভোগী দরিদ্র শিক্ষক কিঞ্চিৎ অর্থাগমের আশায় কোলকাতায় এসে শিক্ষিত বাঙালীর কল্পতরু আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করেন। প্রার্থনার বিষয় ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও পরীক্ষায় বাংলার পরীক্ষক পদলাভ। তখন কোন পরীক্ষাতেই বাংলা অবশ্য পঠনীয় বিষয় ছিল না, তাই পরীক্ষক সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়। ব্যবহারাজীব আশুতোষ নাকি নাম শুনেই প্রদীপ, ভারতী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর নানা লেখার উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু কোনও প্রতিশ্রুতি দীনেশচন্দ্র সেদিন পাননি আশুতোষের কাছ থেকে। তিনি ভেবেছিলেন, সব বড়লোকের মতো আশুতোষও অপরিত প্রার্থীর অসংখ্য প্রার্থনা বিস্মৃতির রাজ্যে নির্বাসন দেন। কিন্তু কিছুদিন পরে, আহ্বান এল, ১৫০৲ টাকা বেতনে রামতনু লাহিড়ী গবেষকের পদ গ্রহণ করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতায় কাজ করবার এবং বক্তৃতা দেবার। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগ সেদিন ছিল না। কিন্তু আমাদের মনে হয়, বাংলার শ্রেষ্ঠ বিদ্যানিকেতনে সর্বোচ্চ পরীক্ষায় বাংলার পঠন-পাঠনার সেইদিনই সূত্রপাত হয়েছিল। সানন্দে কৃতজ্ঞচিত্তে সে পদ গ্রহণ করেন দীনেশচন্দ্র। সেই সূত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতামালা অল্পস্ত ইংরেজি ও বাংলা গ্রন্থরূপে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। তাঁর ইংরেজিভাষায় লিখিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, বঙ্গ সাহিত্য-পরিচয় (প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সংকলন) দুই খণ্ড, বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাস, শ্রীচৈতন্য ও চৈতন্য-পরিকর সম্পর্কিত দুইখানি গ্রন্থ, বাংলা রামায়ণ, বাংলার উপকথা, বাংলা গদ্যরীতি, পূর্ববঙ্গ-গীতিকা দুইখণ্ড, এবং আরও বহু গ্রন্থ এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

পূর্ববঙ্গ গীতিকার মাধ্যমে দীনেশচন্দ্র পূর্ববঙ্গের প্রত্যন্তসীমার গ্রামীণ জীবনের এক নূতন আধ্যাত্মলোকের সন্ধান দিয়েছিলেন। এই গীতিসমূহের আবিষ্কর্তা চন্দ্রকুমার দে, কিন্তু ব্যাখ্যাতা দীনেশচন্দ্র। বৃহৎ বঙ্গ, দুইখণ্ড, দীনেশচন্দ্রের সর্বশেষ ইতিহাসমূলক সাহিত্যকর্ম। দীনেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক জনোচিত অধ্যবসায় ও তথ্যানুসন্ধিৎসার অভাব ছিল না। গুরুগৃহে বাস করে খুব কাছে থেকে তাঁর অতন্দ্র সারস্বত নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু কবি-জনোচিত সৃষ্টিশীল কল্পনাশক্তি তাঁকে এই কাজে বেশি সহায়তা করেছিল।

ধীরে ধীরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাবিভাগ গড়ে উঠেছে, সর্বোচ্চ পরীক্ষার পাঠ্য বিষয় হিসাবে বাংলা স্থান লাভ করেছে। বাংলাভাষা ও সাহিত্য নিয়ে গবেষণায় ব এগিয়ে চলেছে। দীনেশচন্দ্রের পরে বহু অধ্যাপক ও গবে দীনেশচন্দ্রের সাধনপীঠে আসন গ্রহণ করেছেন। ভবিষ্যৎ পতাকা যাঁদের হাতে তাঁদের একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বাং দেশের নানা নবসৃষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবিভাগে বিদ্যাদুশী করছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দীনেশচন্দ্রের কীর্তিকথা অ কোথাও অনুচ্চ কণ্ঠেও ঘোষিত হয় না। কৃতং জানাতি, কৃত কথাটির ব্যুৎপত্তি হল, যিনি সবার জন্যে ভালবেসে ক করেন তাঁর কাজকে জানা ও মা না। এর উল্টো কথা হ কৃতঘ্ন, কৃতং ঘ্নতি। জাতীয় পিতৃপুরুষের স্মৃতিতর্প পবিত্র মুহূর্তে আমরা আত্মসমীক্ষা করি, আমরা কৃতঘ্ন, কৃতঘ্ন!

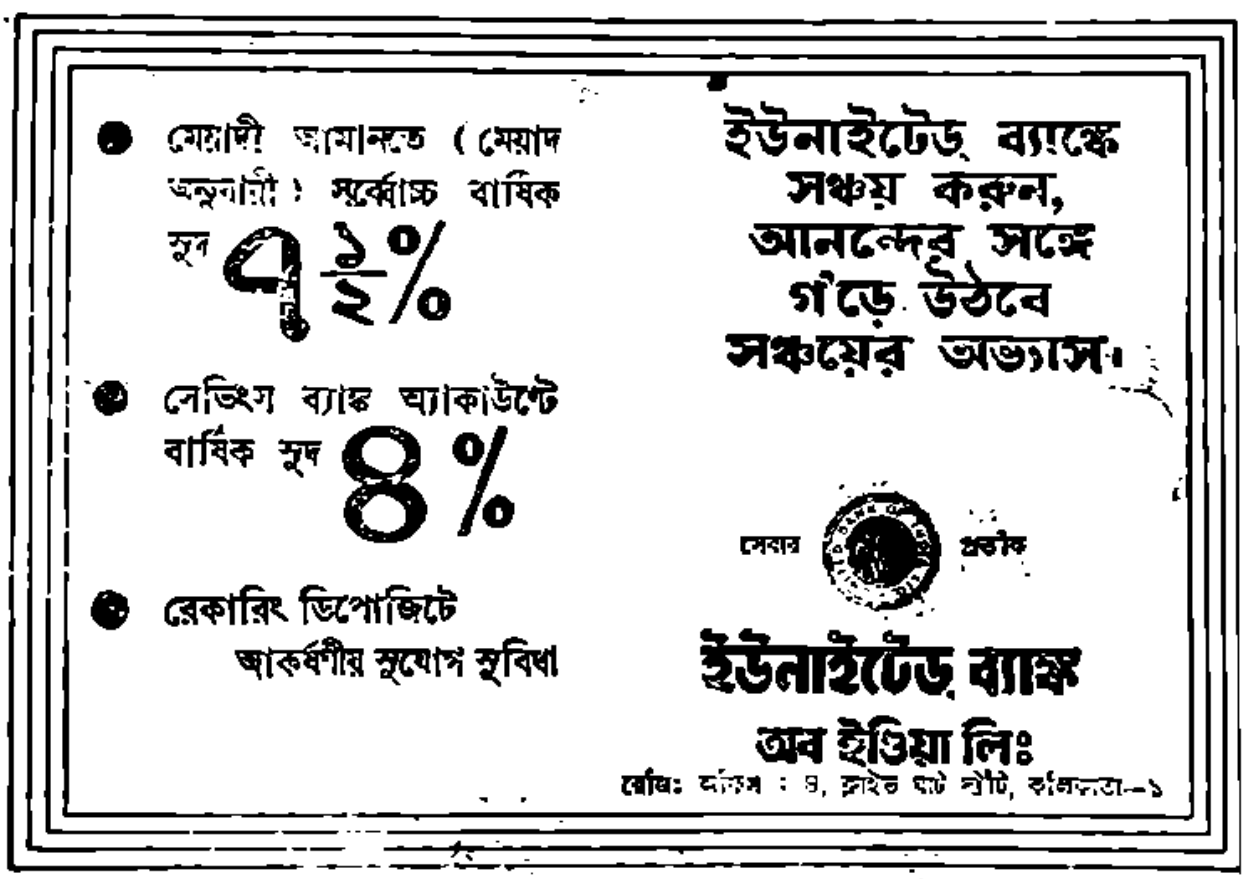

আচার্য্য দীনেশচন্দ্র
ও
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

আমাদের শাস্ত্রকর্ত্তারা নির্দ্দেশ দিয়েছেন, গৃহস্থকে প্রতিদিন পাপ-ক্ষালনের জন্যে পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে হবে। এই পঞ্চ যজ্ঞ হচ্ছে ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ ভূতযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ। অধ্যয়ন বা শাস্ত্রপাঠ হচ্ছে ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণ হচ্ছে পিতৃযজ্ঞ, হোম হচ্ছে দেবযজ্ঞ, বলি অর্থাৎ ইতর প্রাণীকে আহার প্রদান হচ্ছে ভূতযজ্ঞ আর অতিথি সেবা হচ্ছে নৃযজ্ঞ। এই পাঁচটি যজ্ঞের দ্বারা আমরা যথাক্রমে ঋষিঋণ, পিতৃ ঋণ, দেব-ঋণ, এবং সর্ব্ব জীব ও সর্ব্ব মানবের প্রতি ঋণ পরিশোধ করি।

'পিতৃ-যজ্ঞ' কথাটিকে যদি আমরা ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করি, তা হলে বলতে হয়, আমাদের পূর্ব্বগামী পুরুষদের ভেতর যাঁরা আমাদের স্মরণীয় ও বরণীয়, তাঁদের চরিত-কথা স্মরণ করা ও তাঁদের গুণাবলীর অনুধ্যান করা পিতৃ যজ্ঞেরই অন্তর্গত। মহাকবি কালিদাস বলেছেন—পূজনীয় ব্যক্তির পূজার ব্যতিক্রম ঘটলে আমাদেরই কল্যাণ ব্যাহত হয়।

উনিশ শতকের শেষার্দ্ধে বাংলা দেশে যে সকল স্মরণীয় ও বরণীয় পুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের ভেতর দীনেশ চন্দ্রের স্থানটি স্বতন্ত্র। বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনায় তিনি শুধু পথিকৃৎ নন, ভক্তের ভক্তিমিশ্রিত হৃদয়াবেগ নিয়েই তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তের উপকরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। দীনেশচন্দ্রকে খাঁটি বাঙালী বলে চিহ্নিত করলেও তাঁর প্রতিভার সম্যক পরিচয় দেওয়া হয় না। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার সম্পর্কে মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র একদিন বলেছিলেন—এই কবিতাগুলি যাহার প্রলাপ। দীনেশচন্দ্রের রচনাবলীকেও যাহার প্রলাপের সঙ্গে তুলনা করা চলে। তাই যাঁরা ভক্তিহীন, বাঙালী জাতি ও বাঙালী সংস্কৃতির প্রতি যাঁদের মমত্ব বোধ নেই, দীনেশচন্দ্রের সাহিত্যসাধনার উপযুক্ত মর্য্যাদা দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। দীনেশচন্দ্র যেখানে ঐতিহাসিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, সেখানেও তিনি প্রধানতঃ কবি, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' থেকে আরম্ভ করে 'বৃহৎ বঙ্গ' পর্য্যন্ত সকল গ্রন্থেই আমরা কবি ও ভক্ত দীনেশচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাই। দীনেশচন্দ্রের 'পৌরাণিকী' (কয়েকখানা ক্ষুদ্র পুস্তকের সমষ্টি যথা—'সতী', 'বেহুলা', 'ফুল্লরা', 'জড়ভরত', প্রভৃতি) পাঠ করলে দেখা যায়, তাঁর ভেতর কথাসাহিত্যিকের প্রতিভা ছিল। তাঁর গল্প বলার ভঙ্গি ছিল অপূর্ব্ব, ছায়াচরণের সৃষ্টিতেও তাঁর দক্ষতা ছিল, সর্ব্বোপরি, ভারতীয় ঐতিহ্য ও বাংলার সংস্কৃতির প্রতি তাঁর চিত্তে ছিল সহজ শ্রদ্ধাবোধ। স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্পর্কে লিখেছেন—

'সংস্কৃত পুরাণের ভাণ্ডার এবং বাংলা সাহিত্যের সম্পদ মঙ্গলকাব্য ও গাথা-কাব্যগুলি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তিনি সরল সুললিত গদ্যে সর্ব্বসাধারণের উপভোগের জন্য সেগুলি সযত্নে পরিবেশন করিয়া তাহাদের সাহিত্য রসপিপাসা ও গল্প পিপাসা সার্থকভাবে মিটাইয়া দিয়াছেন। পয়ার, ত্রিপদী ও ছাড়া ছন্দের আবরণ ভেদ না করিয়াও, সংস্কৃত ভাষায় অজ্ঞ হইয়াও তাহারা রামায়ণী কথা শুনিবার অধিকার

লাভ করিয়াছে। এমন ধর্ম ও নিষ্ঠার সঙ্গে এই কাজ তাঁহার পূর্বে কেহ করেন নাই। তাঁহারই উৎসাহে ও চেষ্টায় পূর্ব-বঙ্গের গাথা-কাব্যগুলি মুদ্রিত হইয়া বাংলা সাহিত্যের পরম সম্পদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার কাছে এই ঋণ আমাদের অপরিশোধ্য'। বাস্তবিক, উত্তর বঙ্গে সংগৃহীত গোপীচন্দ্রের গান ও পূর্ব বঙ্গে সংগৃহীত পূর্ববঙ্গগীতিকা (১ম-৫ম খণ্ড, ১ম খণ্ড ময়মনসিংহ গীতিকা) সম্পাদন করে দীনেশচন্দ্র শিক্ষিত বাঙালীর কাছে বাংলার সংস্কৃতির অনাবিষ্কৃত দিক উদ্‌ঘাটন করেছেন ও সেই সঙ্গে আমাদের রস-পিপাসাও চরিতার্থ করেছেন।

তিনি অতি সহজ ভাষায় ও সরল ভঙ্গীতে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক আখ্যান পরিবেশন করেছেন। তাঁর 'মুক্তা-চুরি', 'রাখালের রাজদি,' 'রাগরঙ্গ,' 'হুকুল সখার কাণ্ড' এবং 'কানু পরিবাদ ও শ্যামলী ধেনু' সরস রচনা ভঙ্গী ও আন্তরিকতার গুণে একদিকে বাঙালী পাঠক সমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল।

ইংরেজি ভাষায়, 'History of Bengali Language and Literature,' The Vaisnava Literature of Mediaeval Bengal', 'Chaitanya and his Companions,' 'The Folk-Literature of Bengal,' 'Chaitanya and His Age,' 'Eastern Bengal Ballads' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করে তিনি পাশ্চাত্য দেশে বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে গৌরবান্বিত করেন ও বহু প্রতীচ্য মনীষীর অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন।

সকলেই জানেন দীনেশচন্দ্রের এই অক্লান্ত সাহিত্য সাধনা ও ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। বিশ্বের বরেণ্য কবি দীনেশ-চন্দ্রের গুণমুগ্ধ ছিলেন, দীনেশচন্দ্রও কবিগুরুকে অন্তরের শ্রদ্ধা অর্পণ করেছিলেন। 'রামায়ণী কথা' (১৯০৪) নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে দীনেশচন্দ্র আর্য রামায়ণের প্রধান প্রধান চরিত্র গুলির ওপর নতুন আলোকপাত করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থখানির যে ভূমিকা লিখেছিলেন, তাতে তিনি রামায়ণকে উপলক্ষ্য করে ভারতের সাধনা ও সংকল্পকে আবিষ্কার করেছিলেন রামায়ণী কথার ভূমিকা ('প্রাচীন সাহিত্যে' পুনর্মুদ্রিত) সকলেই পাঠ করেছেন কিন্তু অনেকেই জানেন না যে পরবর্তী কালে কৃষ্ণকমল গোস্বামীর রচনাকে উপলক্ষ্য করে দীনেশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে গুরুতর মত বিরোধ ঘটেছিল। অবশ্য এই মত বিরোধ সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে প্রীতির বন্ধন ছিন্ন হয়নি। দীনেশচন্দ্রের সম্পাদিত কৃষ্ণকমল গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছিল ইংরেজি ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কিন্তু তাঁদের মতানৈক্যের সূত্রপাত ঘটেছিল 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রকাশের পর থেকেই।

'রামায়ণী কথার' ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, যথার্থ সমালোচক হবার অধিকার সকলের নেই। যথার্থ সমালোচনা হচ্ছে পূজা আর ভক্তি যাঁর সহজাত নয়, তিনি কখনো পূজারী হতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ বলেন—

'কবিকথাকে ভক্তের ভাষায় আবৃত্তি করিয়া তিনি আপন ভক্তির চরিতার্থতা সাধন করিয়াছেন; এইরূপ পূজার আবেগমিশ্রিত ব্যাখ্যাই আমার মতে প্রকৃত সমালোচনা—এই উপায়েই এক হৃদয়ের ভক্তি আর এক হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। অথবা যেখানে পাঠকের হৃদয়েও ভক্তি আছে, সেখানে পূজাকারকের ভক্তির হিল্লোল তরঙ্গ জাগাইয়া তোলে।• যথার্থ সমালোচনা পূজা—সমালোচক পূজারী-পুরোহিত—তিনি নিজের অথবা সর্ব সাধারণের ভক্তিবিগলিত বিস্ময়কে ব্যক্ত করেন মাত্র।

'ভক্ত দীনেশচন্দ্র সেই পূজা মন্দিরের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আরতি আরম্ভ করিয়াছেন। আমাকে হঠাৎ তিনি ঘণ্টা নাড়িবার ভার দিলেন। এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমি সেই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি কেবল এই কথাটুকু মাত্র জানাইতে চাহি যে, বাল্মীকির রামচরিত-কথাকে পাঠকগণ

কেবলমাত্র কবির কাব্য বলিয়া দেখিবেন না, তাহাকে ভারতবর্ষের রামায়ণ বলিয়া জানিবেন। তাহা হইলে রামায়ণের দ্বারা ভারতবর্ষকে ও ভারতবর্ষের দ্বারা রামায়ণকে যথার্থ ভাবে বুঝিতে পারিবেন'।

ভারতীয় আলঙ্কারিকদের মতে রামায়ণ ও মহাভারত হচ্ছে নিছক মহাকাব্য. এই শ্রেণীর মহাকাব্যের সমালোচকদের শুধু বিশ্লেষণী বুদ্ধি থাকলেই চলে না, এঁদের শ্রদ্ধাবান হতে হবে। দীনেশচন্দ্রের মধ্যে এই শ্রদ্ধাবোধের অভাব ছিল না, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ঋষি-কবির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্বতন্ত্র। এই জন্যে তিনি শ্রীরামচন্দ্রের বালিবধ প্রভৃতি কার্য সমর্থন করতে পারেন নি কিন্তু ভরতের চরিত্র তাঁর দৃষ্টিতে নিষ্কলঙ্ক। কিন্তু তিনি হয় তো একথা বিস্মৃত হয়েছেন যে মহর্ষি ভরতের সমগ্র চরিত-কথা কীর্তন করেন নি, রামচন্দ্রের সমগ্র জীবন-কথা আলোচনা করাই হচ্ছে তাঁর উদ্দেশ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে, চতুর্দশ বৎসর রাজত্ব-কালে ভরত কি ভাবে দুর্ব্যবহার দমন করতেন, তা আমরা জানি না। শ্রীরামচন্দ্র নরচন্দ্রমা বলেই তাঁর পক্ষে কলঙ্ক শোভা পায়।

এবার দীনেশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মত-বিরোধের ইতিহাস বিবৃত করি।

'কবি-সংগীতে' অনুপ্রাস-প্রয়োগের বাহুল্য দর্শন করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

'সঙ্গীত যখন বর্ব্বর অবস্থায় থাকে, তখন তাহাতে রাগরাগিণীর যতই অভাব থাক, তাল প্রয়োগের ঘচমচ কোলাহল যথেষ্ট থাকে। সুরের অপেক্ষা সেই ঘন ঘন সশব্দ আঘাতে অশিক্ষিত চিত্ত সহজে মাতিয়া ওঠে। এক শ্রেণীর কবিতার অনুপ্রাস সেইরূপ ক্ষণিক ত্বরিত সহজ উত্তেজনার ফল। সাধারণ লোকের কর্ণ অতি শীঘ্র আকর্ষণ করিবার এমন সুলভ উপায় আর নাই'।

আচার্য দীনেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করেছিলেন। দীনেশ বাবু লিখেছেন—বাংলা দেশের কবিওয়ালা ও যাত্রাওয়ালারা, এমন কি, পাঁচালীকার ও তরজাকবিরা কবিত ভাষারূপ অস্ত্রের সাহায্যেই জনসাধারণের হৃদয় জয় করেছেন। তাই বাংলা ভাষার যে একটা নিজস্ব শক্তি আছে এবং বিভিন্ন অর্থে একই শব্দের প্রয়োগের ভেতরেও যে একটা বাক্-চাতুর্যের পরিচয় আছে, তা তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন। অনুপ্রাস প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রয়োগেও তাঁরা শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। এই সম্প্রদায়ের লেখকদের মধ্যে কৃষ্ণকমল ছিলেন সংস্কৃত শাস্ত্রে ও সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী এবং স্বাভাবিক প্রতিভার অধিকারী, তাই তাঁর রচিত পালাগান শ্রোতৃবৃন্দকে প্রবল ভাবে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করেছে। তিনি এই শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে অনন্য দুর্লভ সিদ্ধি লাভ করেছেন। কৃষ্ণকমলের রচনায় অনুপ্রাসের যে প্রাচুর্য্য আছে, তা অধিকাংশ স্থলেই কর্ণকে পীড়া দেয় না। দীনেশ বাবু তাঁর এই বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করার জন্যে কৃষ্ণকমলের রচনা থেকে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আহরণ করেছেন।

'বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যে' ও আরও নানা প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র কৃষ্ণকমলের কবিত্ব-শক্তি ও শব্দ চয়ন-নৈপুণ্যের প্রশংসা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে দীনেশ বাবুর সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। তিনি লিখেছেন—

"আমাদের বন্ধু দীনেশ বাবু কর্ত্তৃক পরম প্রশংসিত কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহাশয়ের গানের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রকারের অবর্জ্জনা স্তূপ স্তূপ চাপিয়া আছে। তাহা কাহাকেও বাধা দেয় না।

'পুনঃ যদি কোন ক্ষণে দেখা দেয় কমলেক্ষণে
যতনে ধরে রক্ষণে জানাবি তৎক্ষণে'।

এখানে কমলেক্ষণ এবং রক্ষণ শব্দটাতে একার যোগ করা একবারেই নিরর্থক; কিন্তু অনুপ্রাসের বন্যার মুখে অমন কত একার ঊকার স্থানে অস্থানে ভাসিয়া বেড়ায়, তাহাতে কাহারো কিছু আসে যায় না।

আমাদের যাত্রার ও পাঁচালীর গানে ঘন ঘন অনুপ্রাস

ব্যবহারের প্রথা আছে। সে অনুপ্রাস অনেক সময় অর্থহীন এবং ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ"। (মুকুল পত্র, ১ম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ৮৯-৯০ পৃষ্ঠা।)

রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনার উত্তরে দীনেশচন্দ্র লিখেছেন—

"প্রথম ছত্রের 'ক্ষণের' পরিবর্ত্তে 'ক্ষণ' থাকিলে অর্থবোধ হইত না, ব্যাকরণানুসারেও তাহা সিদ্ধ হইত না, সাদৃশ্য রাখিবার জন্য পরবর্ত্তী 'ঈক্ষণ' ও 'রক্ষণ' এখানে যুক্ত হইয়াছে। পদ্যে এই রকম ব্যবহার চলিতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্র বাবুর মতে 'কমলেক্ষণ এবং রক্ষণ শব্দটাতে,' কথাটার মধ্যে শব্দ দুইটির স্থলে 'শব্দটা' লেখা যে ব্যাকরণ মতে একটু বেহিসাবী হইয়াছে,—তিনি অবশ্য স্বীকার করিবেন। এই সকল অনুপ্রাস মাঝে মাঝে চেষ্টা করিয়া তৈরী করিতে যাইয়া কবি তাঁহার লেখাটা কিছু শ্রুতিকটু করিয়াছেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু চারিটি 'ক্ষণ' শব্দের যে অন্ততঃ তিনটির পৃথক্ অর্থ আছে, তাহা দেখাইবার একটা বাহাদুরী আছে"।

দীনেশচন্দ্র বলেছেন, কৃষ্ণকমলের গান একদিন সহস্র সহস্র শ্রোতার প্রাণে অপূর্ব্ব সাড়া জাগিয়েছে ভক্তিভাবে বিগলিত হয়ে তাঁরা কেঁদে আকুল হয়েছেন। দিব্যোন্মাদ বা ভ্রান্তি উন্মাদিনী পাগলা বিরহিনী রাধার যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তার প্রতি দীনেশচন্দ্র বাল্যকাল থেকেই একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করেছেন, মহাভাবময়ী রাধার মুখে যখন তিনি শুনেছেন—'আমায় যেতে যে হবে সো, তাই বলে বাজিলে বাঁশী—বঁধুর লাগি পিছল পথে' ইত্যাদি, তখন অগণিত শ্রোতার সঙ্গে তাঁর মনও দিব্যধামে আরোহণ করেছে। হয়তো সেই শ্রোতাদের সঙ্গে তিনিও কিছুটা পরিমাণে কৃষ্ণকমলের পক্ষপাতী হয়ে পড়েছিলেন, এ কথা তিনি স্বয়ং স্বীকার করেছেন। তারপর তিনি দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রমাণ করতে চেষ্টা পেয়েছেন যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও কোনো একজন কবি সম্পর্কে এরূপ পক্ষপাত প্রদর্শন করেছেন। হয় তো এটা যুক্তি নয়, ব্যক্তিগত আক্রমণ, তার্কিকের ভাষায় এই হেত্বাভাসের নাম Argumentum ad hominem; দীনেশচন্দ্র লিখেছেন—

"শৈশব-সংস্কারের জন্য শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্র বাবু কোন কোন কবির কবিতার প্রতি অসামান্য অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা স্থিরভাবে আলোচনা করিয়া কতজন পাঠক সায় দিবেন জানিনা। তাঁহার প্রিয় এই কবিতাটি তিনি তাঁহার এক প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছেন—

'সর্ব্বদাই হুহু করে মন
বিশ্ব যেন মরুর মতন
চারিদিকে বালা বালা
উঃ কি জ্বলন্ত জ্বালা,
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ পতন'।

এই কয়েক ছত্র সম্বন্ধে তিনি (রবীন্দ্রনাথ) লিখিয়াছেন, 'আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম বোধ হয় কবির নিজের কথা', এই মন্তব্যের আলোচনা অনাবশ্যক। রবীন্দ্র বাবুর মতে এই লেখার পূর্ব্বে কোন আধুনিক বঙ্গীয় কবি আর নিজের মনের কথা বলেন নাই। আমরা সেই কবির প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন নহি। কিন্তু তিনি যে কয়েকটি ছত্র ধরিয়া তাঁহাকে এই অপূর্ব্ব প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, কবি-সম্রাটের স্বেচ্ছাচার কি তাহাতে দৃষ্ট হয় না? আমার কৃষ্ণকমল-ভক্তি কি এতটা উর্দ্ধে উঠিয়াছে"?

দীনেশচন্দ্রের এই উক্তি অপ্রাসঙ্গিক হলেও বিহারীলালের প্রতি পক্ষপাতবশত রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর সম্পর্কে অতিশয়োক্তি করেছেন, তাতে সন্দেহ নেই। বিহারীলাল এক হিসাবে আধুনিক গীতি কবিতার প্রবর্ত্তক হলেও তাঁর রচনায় যে সব দোষ-ত্রুটী রয়েছে, তাকে কোনোক্রমেই উপেক্ষা করা যায় না। অবশ্য দীনেশ বাবুর ব্যঙ্গোক্তি একটু বেশী তীব্র হয়েছে, যেমন 'অপূর্ব্ব প্রশংসাপত্র', 'কবি সম্রাটের স্বেচ্ছাচার' প্রভৃতি।

বাংলার কবিগানের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করেছেন, তাও কিছুটা একদেশদর্শী, সন্দেহ নেই। দীনেশ বাবু এই মন্তব্যকে 'পীড়াদায়ক' বলেছেন। কোন কোন কবিওয়ালা যে যথার্থ শক্তির অধিকারী ছিলেন, এটাই হচ্ছে দীনেশচন্দ্রের প্রতিপাদ্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি রাম বসুর কথা উল্লেখ করে পরিশেষে বলেছেন,—এই বিষয়ে কবিসম্রাটের মন্তব্য শিরোধার্য্য নয়। 'এই অপরাধে যে দণ্ডের ব্যবস্থা হয়— তাহা তিনি করিবেন।'

কৃষ্ণকমলের রচনার অনুপ্রাস ও যমক-সৃষ্টির যে প্রয়াস দেখা যায়, তার জন্য সে-কালের রুচি অনেকখানি দায়ী। তবু, এ কথা অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করতে হবে যে, কৃষ্ণকমল উনবিংশ শতাব্দীর বৈষ্ণব ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক, তাঁর গানগুলি তাঁর ভক্তি বিলসিত হৃদয় থেকেই স্বত উৎসারিত। কোনো কোনো স্থলে শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের প্রয়োগে তিনি অপূর্ব্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন, যেমন একটি প্রসিদ্ধ বাৎসল্য রসের গানে—

'শোন ব্রজরাজ, স্বপনেতে আজ
দেখা দিয়ে গোপাল কোথা লুকালে,
যেন, সে, চকল চাঁদে অকল ছুরে কাঁদে
জননি, সে নবী সে নবী বলে।
নীল কলেবর, ধূলায় ধূসর,
বিধুমুখে যেন কতই মধুর স্বর
সকাতরে ডাকে 'মা' বলে।
যত কাঁদে বাছা বলি সর সর,
আমি অভাগিনী বলি সর সর,
বলেম নাহি অবসর, কেবা দিবে সর,
অমনি সর সর বলি ফেলিলেম ঠেলে।
ধূলা ঝেড়ে কোলে তুলে নিলেম চাঁদ,
অকলে মুছালেম চাঁদের বদন-চাঁদ
পুনঃ চাঁদ কাঁদে চাঁদ বলে।
যে চাঁদ নিছনি কোটি কোটি চাঁদ,
সে কেন কাঁদিবে বলি 'চাঁদ' 'চাঁদ'
বলেম, চাঁদের মাঝে দুই অকলঙ্ক চাঁদ,
ঐ ভাখ, চাঁদ আছে তোর চরণতলে।'

বাস্তবিক, কৃষ্ণকমলের ভাষায় স্থানে স্থানে ত্রুটিযুক্ততা থাকলেও তিনি যে ভক্ত ও সাধক ছিলেন, সে কথা ভুললে চলবে না। তাঁর কবিশক্তি সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র বলেছেন—

'তাঁহার কবিত্বশক্তি সাধনার ফল, উহা গন্ধহীন ফুলের ন্যায় শুধু বর্ণের ঐশ্বর্য্য দিয়া চোখ ধাঁধিয়া দেয় না। দেবনির্ম্মাল্যের মত তাহা মাথায় রাখিবার বস্তু, তাহা গঙ্গাধারার ন্যায় পূত,—তাহা শুধু ছবি দেখাইবার যন্ত্র নহে, তাহা প্রাণ দেয়, প্রেরণা দেয়,—ভক্তি ও প্রেমের অমৃত দান বিলাইয়া দেয়।'

আমরা পূর্ব্বেই বলেছি, দীনেশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের এই মতানৈক্য তাঁদের অন্তরঙ্গ ভক্তি ও প্রীতির বন্ধনকে ছিন্ন করতে পারেনি। আমরা এই মত-বিরোধের ইতিহাস একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করলাম, কারণ, এই বিরোধের মূলে রয়েছে কাব্যের আদর্শ সম্পর্কে আচার্য্য দীনেশচন্দ্র ও বিশ্বের বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি-প্রবৃত্তির পার্থক্য এবং তাঁদের কবি মানসের স্বাতন্ত্র্যও * এই মতানৈক্যের জন্যে অনেকখানি দায়ী।

বাংলার কবিসঙ্গীত ও কৃষ্ণকমলের কাব্য সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র যে আলোচনা করেছেন, তা থেকে বোঝা যায়, বাংলার নিজস্ব সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ কত গভীর ছিল।

---

* আমাদের দেশের প্রাচীন পণ্ডিতেরা গদ্যকাব্যের উল্লেখ করেছেন। দীনেশচন্দ্রের গদ্যরচনাও কাব্যধর্মী, ভক্তি ও ভাবাবেগ তাঁর গদ্যরচনাকে এক বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

UPPER GANGES SUGAR MILLS Ltd.
THE OUDH SUGAR MILLS Ltd.
NEW INDIA SUGAR MILLS Ltd.
THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS Ltd.
BHARAT SUGAR MILLS Ltd.
GOBIND SUGAR MILLS Ltd.

Manufacturers of :

PURE CRYSTAL CANE SUGAR

Managing Agents :

BIRLA BOMBAY PRIVATE LTD.

(FORMERLY THE COTTON AGENT PRIVATE LTD.)
INDUSTRY HOUSE,
159, Churchgate Reclamation,
BOMBAY—1

দীনেশচন্দ্র, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালার দাঁড়িয়ে কাঁচের আলমারির মধ্যে স্তরে স্তরে সাজানো খেরোবোড়া পুঁথি গুলো দেখলেই আমার দীনেশচন্দ্রের কথা মনে পড়ে। কত পরিশ্রম ও প্রয়াস, কত আবেগ ও কল্পনা, কত অশ্রু ও হাসি দিয়ে পুঁথিগুলি সংগৃহীত হয়েছিল। তুলোট কাগজের গলিত পত্রে ধূপাস্তূপের পাশে একটা গোটা জাতি ও ঐতিহ্যের প্রাণীর বাণী আত্মপ্রকাশের জন্য আকুলিবিকুলি করছে, দেহাই কালির ভ্রমরকৃষ্ণ পংক্তিগুলি আধুনিক পাঠকের দরবারে, ছাপার স্তূপীকৃত সমারোহের পাশে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে আছে। সত্তর বছর আগে কুমিল্লা স্কুলের এক প্রধান শিক্ষক সেই পুঁথির কান্না শুনেছিলেন, তুলোটকাগজের খরখর ধ্বনির মধ্যে তিনি পুরানো দিনের পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন পাষাণী অহল্যা মানবীরূপ ফিরে পেয়েছিলেন রামচন্দ্রের পুণ্যস্পর্শে। মূক পুঁথি মুখর হয়েছিল দীনেশচন্দ্রের ছোঁয়া পেয়ে।

আজ বাংলা সাহিত্যের কত সমারোহ ; তার নানা গল্প-কথা, ইতিবৃত্ত, পুঁথির বিরাট বিবরণী কলকাতার নাগরিক সমাজে সুপরিচিত হয়েছে ; গত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যেই বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যের কত বিচিত্র ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। বাঙালীর যথার্থ পরিচয় এই সাহিত্যের ইতিহাসে যে ভাবে প্রকাশ পেয়েছে, অন্য কোন ব্যাপারেই ঠিক সেরকম পরিচয় ধরা পড়েনি। স্থাবর কীর্তির মধ্যে পূর্বভারতের প্রাচীন কোন গৌরব-চিহ্ন বেঁচে নেই। আর্দ্রভূমির দেশ, ধান বর্ষণের দেশ, পলিমাটির দেশ এই রাঢ়-সুহ্ম-বঙ্গ-বাঙ্গাল হরিকেল। পাহাড় এখান থেকে পলাতক। পাথর দিয়ে মঠমন্দিরবিহার এখানে কদাচিৎ তৈরি হয়েছে। তাই ইটকাঠের স্থাপত্য এবং ও ধরণের শিল্পকলা অচিরেই লোপ পেয়েছে, অথবা এখনও ভগ্নবিক্ষত শ্রীহীন কঙ্কালমূর্তি নিয়ে কোন রকমে বেঁচে আছে। কিন্তু পুঁথিপত্রের মধ্যে বাংলার যে বিপুল পরিচয় নিহিত আছে, সে কথা দীনেশচন্দ্রের পূর্বে বাঙালী সাহিত্যিক সমালোচকেরা বিশেষ অনুধাবন করেছিলেন বলে মনে হয় না। দীনেশচন্দ্রের সবচেয়ে বড় গৌরব, পুঁথির মধ্যে বাঙালী জীবনের যে মূর্তি ফুটে উঠেছে, তিনি তাকে উদ্ধার করেছেন, ইংরাজ-বর্জিত গৌড়ভূমির এক আশ্চর্য পরিচয় তিনি পুঁথি-সাহিত্যের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন। দীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ সেই প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য বলিয়া এতবড়ো একটা ব্যাপার যে আছে তাহা আমরা জানিতাম না।" প্রাচীন বঙ্গদেশ বলে যে একটা বড়ো দেশ আছে, তাও আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের আগেই কি জানতাম? সাহেবরা মুষ্টি ভিক্ষার দাপে বাংলার ইতিহাস লিখেছিলেন। তাতে সত্য এবং মিথ্যা, কৃপা ও হস্ত ঘৃণা ও অনুকম্পা মিশে গিয়েছিল। বাম হাতের দাক্ষিণ্যের দানকেই আমরা সত্যকারের বাংলার ইতিহাস বলতাম, বাংলার মলিন শ্রীহীন পরাভূত দীন মূর্তিকেই নিজেদের কুল পরিচয় বলে মাথা হেঁট করে থাকতাম। বঙ্কিমচন্দ্র সেই হেঁট মাথা সগর্বে তুলে ধরে বললেন "বাঙালীর ইতিহাস চাই।" আর তার কিছু পরে ভবিষ্যতের

কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হল—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস চাই। দীনেশচন্দ্র হলেন সেই কণ্ঠস্বর।

শতবর্ষ আগে তাঁর জন্ম হয়েছিল। মাত্র তিরিশ বৎসর বয়সেই তিনি 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, (১৮৯৬) রচনা করে অল্প সময়ের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার রূপে সাহিত্য সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন। কিন্তু এর পূর্বের ইতিহাসও কম বিচিত্র নয়। সারস্বত আবহাওয়ার দীনেশচন্দ্রের বাল্য-কৈশোর অতিবাহিত হয়েছিল। পিতা ছিলেন ঘোর ব্রাহ্ম—ব্রাহ্মধর্ম প্রতিপাদক দু'একখানি গ্রন্থও লিখেছিলেন। আর মা ছিলেন ঘোর হিন্দু—সুতরাং বাল্যবয়স থেকে দীনেশচন্দ্র বৈপরীত্যের দ্বন্দ্ব দিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর বিধবা ভগিনী বিশ্বমনী দেবীর কাছে পদাবলী কীর্তন শুনে অতি অল্পবয়সেই পদাবলী সাহিত্যের মাধুর্যের প্রতি তাঁর চিত্ত আকৃষ্ট হয়। বাল্যকালে এবং উত্তর জীবনে কাব্য-গল্প-উপন্যাস লিখে সরস্বতীর খাসদরবারে আসন করে নিলেও দীনেশচন্দ্র আসলে স্মরণীয় হয়েছেন মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের উদ্ধারকর্তা ও পরিপোষ্টা রূপে। কৈশোরজীবনের স্বপ্নিল মুহূর্তে তিনি চেয়েছিলেন, "আমি কবি বা গ্রন্থকার হইব, কুঁড়ে ঘরেও যদি থাকি, তবে সেই কুঁড়ে ঘরের নিকট যাবতীয় জ্ঞানী ব্যক্তি মাথা নোয়াইবেন।" প্রথম যৌবন থেকেই নানা পত্রপত্রিকায় কবিতা ও প্রবন্ধ লিখে তিনি 'কবি বা গ্রন্থকার হইব' বাসনা চরিতার্থ করতে প্রস্তুত হলেন, চব্বিশ বৎসর বয়সে ১৮৯০ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ কুমার 'ভূপেন্দ্র সিংহ' প্রকাশিত হল। কিন্তু তখনও তিনি অনুমান করতে পারেন নি যে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার বৃহত্তর কর্ম সম্পাদনের জন্য তিনি বিধাতার দ্বারা চিহ্নিত হয়েছেন। বরং ইংরাজী সাহিত্য ও তার ইতিহাস রচনার জন্য তিনি কলেজ জীবনে একবার বিশেষ ব্যগ্র হয়েছিলেন। স্কুলকলেজের ধরা-বাঁধা পথে তাঁর যাত্রা বিঘ্নমুক্তিতে পূর্ণ হয় নি। নিতান্ত সাধারণভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পাঠ্য-কেতাবের চেয়ে 'অপাঠ্য কেতাবের প্রতি অধিকতর আকর্ষণ বোধ করেছেন। কলকাতার কোন এক প্রতিষ্ঠান শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লেখককে রৌপ্যপদক দানের কথা ঘোষণা করলে দীনেশচন্দ্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে একটি ক্ষুদ্রায়তন প্রবন্ধ লেখেন, এবং পুরস্কারের যোগ্য বিবেচিত হন। ইতিপূর্বে তিনি ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রস্তাব পরিত্যাগ করলেও সেই উদ্দেশ্যে করাসী, জার্মান ও রুশ সাহিত্য সম্পর্কে প্রচুর পড়া-শুনো করে প্রধান ইয়োরোপীয় সাহিত্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস লেখা তাঁর হয়নি, কিন্তু সেই উদ্দেশ্যে তাঁর পাশ্চাত্য সাহিত্য অধ্যয়ন বাংলা সাহিত্যের কপালগুণে কাজে লেগে গেল—আমাদের পরম সৌভাগ্য। মাইকেল মধুসূদন খ্রীস্টান হয়েছিলেন, বিশপ্‌স্ কলেজে পড়েছিলেন—বাংলা সাহিত্যের তাতে সুবৃহৎ কল্যাণ লাভ হয়েছিল। বিশপ্‌স্ কলেজে অবস্থান ও অধ্যয়ন তাঁর দৃষ্টিকে য়ুরোপীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি প্রসারিত করতে সাহায্য করেছিল। দীনেশচন্দ্রও য়ুরোপীয় সাহিত্য ও ইতিহাস পাঠ থেকেই বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত রচনার প্রেরণা ও পদ্ধতি লাভ করেছিলেন। অবশ্য প্রথম যৌবনে তিনি রঙিন স্বপ্ন দেখেছিলেন, "বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হইব, যদি না পারি তবে ঐতিহাসিক হইব" ('ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য')। কবিতা তিনি প্রচুর লিখেছেন, প্রকাশিতও হয়েছে কিছু কিছু। কিন্তু তাঁর দিগন্তপ্রসারী কবি প্রতিভার যা মূল বনিয়াদ, তা তাঁর সাহিত্যের ইতিহাসে ফুটে উঠেছে। সাহিত্যরস ও ইতিহাস-রস এক সঙ্গে মিশে গেছে বলেই তাঁর 'বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য' একখানি অনবদ্য গ্রন্থ হয়েছে। শুধু নীরস পুঁথির তালিকা ও বিবৃতিমাত্র হয় নি।

অবশ্য দীনেশচন্দ্রের পূর্বেই বাংলা সাহিত্য বিশেষতঃ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে বিচ্ছিন্ন ভাবে আলোচনা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাসকার হলেন কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত। 'সংবাদ প্রভাকরে' তিনি ধারাবাহিক ভাবে

ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ এবং কবিওয়ালা-পাঁচালীকারদের জীবনী আলোচনা করেছেন, নানাস্থান থেকে তাঁদের রচনা সংগ্রহ করেছেন। তাঁর সমসাময়িক ও শিক্ষাদীক্ষার রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা কবিতা বিষয়ে দীর্ঘ অথচ তীক্ষ্ণ প্রবন্ধে পাশ্চাত্ত্য কবিতার তুলনায় আমাদের মধ্যযুগের কাব্য কবিতা যে নিকৃষ্ট নয় তা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বৈদ্য বংশের সন্তান ছিলেন। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকায় তিনি কয়েকজন বৈষ্ণব পদাবলীকারের পরিচয় দিয়ে বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। আরও কেউ, উনিশ শতকের মাঝামাঝি, পুরান বাংলা সাহিত্যের দুচার জন কবি সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য সরবরাহ করেছিলেন। রাজনারায়ণ বসু ও গঙ্গাচরণ সরকার (অক্ষয়চন্দ্র সরকারের পিতা) বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে ধারাবাহিক ভাবে কিছু কিছু আলোচনা করেছিলেন-তার মূল্য নিতান্তই "এ্যামে-চিওরিশ"। তবে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজীতে যে দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন সর্ব প্রথম তাতে ধারাবাহিকতার রূপটি কথঞ্চিৎ ফুটেছে। প্রথম প্রবন্ধটি "A Popular Literature for Bengal" নামে ১৮৭০ সালে Bengal Social Science Association এর পত্রিকায় এবং Bengali Literature প্রবন্ধটী ১৮৭১ সালের *The Calcutta Review* পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। রমেশচন্দ্র দত্তের 'The Literature of Bengal' প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ সালে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশ চন্দ্রের গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পুরোপুরি ঐতিহাসিক ধারা অনুসরণ না করলেও ইতিহাসের উপাদান হিসেবে এর মূল্য অনস্বীকার্য। কিন্তু রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' (১ম খণ্ড, প্রাচীন যুগ, ১৮৭২) প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের যথার্থ ঐতিহাসিক আলোচনা বিদ্যাসাগরের 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'-এর আদর্শ অবলম্বনে বিদ্যাসাগরের ভক্তশিষ্য ন্যায়রত্নমশাই এই প্রস্তাব রচনা করেন। বঙ্কিম চন্দ্রের উপন্যাসের ভাষা ও বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ন্যায়রত্ন কিছু প্রখর আলোচনা করেছিলেন (বঙ্কিমচন্দ্র বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের প্রতিকূল ছিলেন বলেই কি?) তাই বঙ্কিমচন্দ্র ন্যায়রত্নের এই প্রস্তাব সম্বন্ধে কিছু বিরূপ মন্তব্য করেছেন। অবশ্য তা হলেও এই প্রস্তাব পুরানো ধরণের এবং অসম্পূর্ণ হলেও বহুদিন ধরে সাহিত্যের ইতিহাস বলে খুব প্রচার লাভ করেছিল। অবশ্য ন্যায়রত্ন প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে 'নয় নয়' করে দেখেছেন এবং বহু স্থলে পুঁথি সাহিত্যের বিশেষ কোন সাহায্য নেননি বটতলা থেকে ছাপা ভুলত্রুটিপূর্ণ বৈষ্ণব পদাবলী প্রভৃতি এবং মঙ্গল কাব্য (সংখ্যায় খুবই অল্প। সংক্রান্ত দু একখানা বই ছিল তাঁর প্রধান আলোচ্য। এরপর মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। সরকারী ভাবে তিনি অনেক পুথিও সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের প্রকৃত ইতিহাস রচনার জন্য দীনেশচন্দ্র যেন বিধাতার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়েছিলেন। কুমিল্লার থাকার সময় তিনি বহু পুঁথি সংগ্রহ করেন। এশিয়াটিক সোসাইটিও হরপ্রসাদ পুঁথি সংগ্রহে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। পূর্বসূরীদের সংগৃহীত যৎকিঞ্চিৎ উপাদান এবং নিজের সংগৃহীত অসংখ্য পুঁথির সাহায্যে তিনি 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (প্রথম ভাগ) রচনা করলেন, ১৮৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ত্রিপুরাধিপতির আনুকূল্যে এ গ্রন্থ প্রকাশিত হলে বাংলার পাঠকসমাজ সর্ব প্রথম বাংলার মধ্যযুগীয় সাহিত্যের বিপুল পরিচয় লাভ করল। ১৯০১ সালে এর দ্বিতীয় সংস্করণ বর্ধিতাকারে প্রকাশিত হলে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় (রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদ, বৈষ্ণব পদাবলী, চৈতন্যজীবনী ও মঙ্গলকাব্য) বিশাল কলেবর এবং গুণগত উৎকর্ষ দেখে সাহিত্যানুরাগীরা যুগপৎ পুলকিত ও বিস্মিত হলেন। পুরাতন বাংলাদেশের এ কোন্

বিস্তৃত বিচিত্র মূর্তি সাহিত্যের সারস্বতে ফুটে উঠল? দীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য' বঙ্গদেশের প্রথম সামগ্রিক ইতিবৃত্ত – যা প্রধানতঃ সাহিত্য-আশ্রয়ী। দ্বিতীয় সংস্করণ পড়ে মুগ্ধ চিত্তে রবীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্রের এই গ্রন্থের মূল কথা অপূর্ব রসগ্রাহী আলোচনা করে লেখককে অভিনন্দিত করলেন।

দীনেশচন্দ্র শুধু বিবর্ণ পুঁথির তালিকা নির্মাণ করে, আর উদ্ধৃতি তুলে ইতিহাস রচনার কর্তব্য শেষ করেন নি। প্রাচীন ও মধ্যযুগ—প্রায় আট শ বছরের বাংলা সাহিত্যকে তিনি শ্রেণী ভাগ করে সাজালেন, যুগবিভাগ করলেন, পুঁথি পত্রাদি সন তারিখের ব্যুহসজ্জা করলেন। কিন্তু সকলের চেয়ে বড় কথা—তথ্য ও তত্ত্বকে রসে পরিণত করলেন। পাঠক তাঁর গ্রন্থ থেকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের যে জীবন্ত পরিচয় পাবে তাতে কারুর সঙ্গে তিনি কান্তিও সংযোজিত করেছেন, স্নেহের সঙ্গে সাবধান। বৈষ্ণব সাহিত্য বিভাগে তাঁর পদচারণা বিস্ময়কর। বৈষ্ণব সাহিত্যের সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালীর যথার্থ পরিচয় তাঁর গ্রন্থের সারস্বতেই হয়েছে। বাঙালীর মন, প্রাণ ও সমাজজীবনের কথা তাঁর মঙ্গলকাব্য ও অনুবাদ সাহিত্য—প্রসঙ্গ থেকে বিকাশ লাভ করেছে। ইদানীং অনেকেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছেন এখন তো তিনি কিছুই পাবেন না তিনি একখানা সাহিত্যের ইতিহাস অতি অবহেলা-ভরে লিখে ফেলছেন। কিন্তু পথের জনতার আজ স্মরণ রাখা উচিত সেই রাজপথ নির্মাণের প্রধান গৌরব কুমিল্লার স্কুলে এক প্রধান শিক্ষকের প্রাপ্য।

এর পরের কাহিনী অনেকের জানা আছে। কি ভাবে তিনি বাংলা সাহিত্যের সুধী সমাজে শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হলেন, ঠাকুরবাড়ী, ভগিনী নিবেদিতা, স্যার আশুতোষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সাগ্রহ চেষ্টা ও স্যার আশুতোষের আনুকূল্যে দীনা বঙ্গভারতীর আসন তৈরী হল—এ সব কথা এই পত্রিকায় আলোচিত হয়েছে। এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন কিন্তু বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আলোচনায় তাঁর আরও কয়েকটি মৌলিক দানের কথা না বললে এ প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে।

দীনেশচন্দ্র পল্লী থেকে বহু পুঁথি সংগ্রহ করে পুরাতন বাংলা সাহিত্যের পরিচয় উদ্ধার করেছেন, এবং সে যুগের সাহিত্যের ইতিহাসের আলোচনায় পুঁথি আশ্রয়ী কাব্যের বিশ্লেষণ যে অপরিহার্য তা তিনিই সর্বপ্রথম দেখিয়ে দেন। তাঁর সম্পাদনায় অনেকগুলি পুঁথি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। কিন্তু চন্দ্রকুমার দে-র সহায়তায় ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা নোয়াখালি থেকে তিনি যে পল্লী গীতিকা সংগ্রহ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ময়মনসিংহ গীতিকা · পূর্ববঙ্গ গীতিকা নামে প্রকাশ করেন তার একটা বিশিষ্ট মর্যাদা স্বীকার করতে হবে। এতদিন তিনি তুলোট কাগজের পুঁথি থেকে পুরাতন দিনের বাংলা সাহিত্যকে উদ্ধার করছিলেন, এবার মানুষের মুখের গান হল তাঁর প্রধান উপাদান। ময়মনসিংহের অধিবাসী অতি সামান্য অবস্থার ব্যক্তি চন্দ্রকুমার দে-র পুরাতন সাহিত্য, বিশেষতঃ কৃষক সমাজে-প্রচলিত গাথা ও গীতিকার দিকে ঝোঁক ছিল। ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত 'সৌরভ' পত্রে চন্দ্রকুমারের কয়েকটি আলোচনা পড়ে পূর্ববঙ্গের মৌখিক গাথাগীতিকা (ব্যালাড) সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। তাঁর আগ্রহে এবং স্যার আশুতোষের আনুকূল্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। দীনেশচন্দ্র পূর্ববঙ্গ থেকে মৌখিক পালাগান সংগ্রহ করবার জন্য চন্দ্রকুমার দে, কবি কলিমুদ্দিন, আশুতোষ চৌধুরী প্রভৃতি সংগ্রাহকদের নিয়োগ করলেন—ফলে বিরাট পালা গানের সম্পদ আমাদের হাতে ধরা দিল। ঐ পালাগানগুলিকে সুসজ্জিত ও সুসম্পাদিত করে দীনেশচন্দ্র প্রকাশ করলেন এবং বিদেশীদের কাছে গ্রহণীয় হবে মনে করে গুলিকে চারখণ্ডে ইংরাজী গদ্যে অনুবাদ করে প্রকাশ করলেন। নাম দিলেন *Eastern Bengal Ballads*। এই অনুবাদ গ্রন্থ বিদেশে

আশাতীত আগ্রহে গৃহীত হল। ভারতবর্ষের পূর্বে শ্রীহট্ট বাংলা দেশ, তারও উত্তর-পূর্বে মদনমী, খাল-বিল, ঝিল-হাওড়ের দেশ ময়মনসিংহ। সেখানে দরিদ্র হিন্দু-মুসলমান কৃষাণের হৃদয়ে একী অপূর্ব ধানবরসের বাণী, তাদের কণ্ঠে এ কী বেদনা মাধুরী দুলে উঠল। বিশ্বের সাহিত্যসভায় দীনেশচন্দ্র দ্বিতীয় বার অভিনন্দিত হলেন। এর পূর্বে ইংরেজীতে রচিত *History of Bengali Language and Literature*, *Medieval Vaishnav Literature*, *Chaitanya and His Age*, *Bengali Ramayanas* প্রভৃতি তাঁকে উচ্চ খ্যাতির শিখরে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। 'টাইম্‌স লিটারেরি সাপ্লিমেণ্ট'র খুঁতধরা সমালোচকও কলকণ্ঠে তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলেন। বিদেশের অনেকেই রবীন্দ্রনাথের অনূদিত গ্রন্থ ও দীনেশচন্দ্রের ইংরাজী গ্রন্থগুলির বাতায়ন থেকেই ভারতবর্ষকে চিনে ছিলেন। কিন্তু *Eastern Bengal Ballads* সারা য়ুরোপ-আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ল, বাংলার বাণী বিশ্ববাণী হয়ে দেখা দিল। রোমাঁ-রোলাঁ ইংরাজী জানতেন না, তাঁর ভগিনীকৃত এর ফরাসী অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ হলেন। আমাদের নিবেদিতাও স্নেহভাজন দীনেশচন্দ্রকে বললেন, "বড় বড় লম্বা লম্বা লাগাইয়া যাহারা মহাকবির নাম কিনিয়াছেন, পল্লীগাথার অনাবিল ভাষার মধ্যে অনেক সময় তাঁহাদের অপেক্ষা ঢের গভীর ও প্রকৃত কবিত্ব আছে··· তাদের মেঠো সুরে রাগিণী না থাকিলেও প্রাণ আছে, আর তাদের কুঁড়ে ঘরে সোনারূপার থাম না থাকিলেও আঙিনায় শিউলি ও মল্লিকাফুলের গাছ আছে।' ('ঘরেরকথা ও যুগসাহিত্য', পৃ. ৩১০) বস্তুতঃ বাংলা দেশ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বাইরের জগতে তুলে ধরতে দুজন সাহায্য করেছেন, রবীন্দ্রনাথ ও দীনেশচন্দ্র। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর রবীন্দ্রনাথের নাম ও সাহিত্য দাবানলের মতো য়ুরোপ-আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। ঠিক সেই মাহেন্দ্রক্ষণে দীনেশচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, চৈতন্যদেব ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা দ ক্রান্ত ইংরাজীগ্রন্থগুলি প্রকাশ করলেন। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আধুনিক ভারতবর্ষকে পেলেন তাঁরাই আবার দীনেশচন্দ্রের ইংরাজী গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রাচীন ভারতবর্ষের আর একটি শাখা বাংলা সাহিত্যের পুরাতন যুগের বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেলেন। অবশ্য গোলাপে কাঁটা থাকে, অনবদ্য পূর্ববঙ্গ গীতিকারও কয়েকটী সমালোচক আছেন। এদেশের কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, পূর্ববঙ্গ গীতিকার সবটাই বিশুদ্ধ গ্রাম্য সাহিত্য নয়, ওর মধ্যে অনেক ভেজাল ঢুকেছে। এ সব প্রশ্ন আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয় বলে ও বিষয়ে আলোচনায় বিরত হওয়া গেল। তবে উক্ত *Eastern Bengal Ballads*-এর দ্বারা প্রতীচ্য জগতে বাংলার যে সুনাম বেড়েছে, এবং তার সমস্ত গৌরব দীনেশচন্দ্রের প্রাপ্য তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আশুতোষ ছিলেন দুর্লভ শক্তিধর জহুরী। একদা দীনেশচন্দ্র তাঁর কাছে গিয়েছিলেন বি. এ. বাংলা পরীক্ষার পরীক্ষক হবার আবেদন নিয়ে। তাঁকে দেখে, তাঁর সব পরিচয় পেয়ে গুণগ্রাহী স্যার আশুতোষ তাঁকে দুবার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রীডার নিযুক্ত করেন—১৯০৯ এবং ১৯১৩ সালে। ১৯০৯ সালে দীনেশচন্দ্র রীডার পদের বক্তৃতা হিসেবে *History of Bengali Language and Literature*—গ্রন্থের যে ভাষণ দেন তাই ১৯১১ সালে এগ্রাকারে প্রকাশিত হল। রমেশচন্দ্র দত্তকে বাদ দিলে ইতিপূর্বে আর কেউ ইংরাজীতে বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস লেখেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন বটে, কিন্তু তা ছোট প্রবন্ধ মাত্র। হাজার পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই মহাগ্রন্থ দীনেশচন্দ্রের বিপুল পরিশ্রম ও বিস্ময়কর মনীষার সাক্ষ্য রূপে অচিরে য়ুরোপ এবং আমেরিকায় স্বীকৃতি লাভ করল। বহু পণ্ডিত তাঁকে উচ্ছ্বসিত ভাষায় অভিনন্দিত করলেন। বৃদ্ধ ওল্‌ডেনবার্গ *Frank-furter Zeitung* পত্রে বললেন, "It is an important supplementation of the history of modern Sanskrit Literature.'

এই কারণে ভারততত্ত্ববিৎ মনে করতেন, উত্তরাপথের (পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চল তার অন্তর্ভুক্ত) প্রাদেশিক ভাষাসমূহ সংস্কৃতেরই আধুনিক রূপ। তাই বাংলা ভাষাকেও তিনি 'Modern Sanskrit Literature' বলেছেন। সিলভাঁ লেভি মুগ্ধ ভক্তের মতোই এই গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্বন্ধে বললেন, "No book about India would I compare with yours ...Never did I find such a realistic sense of literature....Pundit and Peasant, Yogi and Raja, mix together in a Shakespearian way on the stage you have built up." দীনেশচন্দ্র নিশ্চয়ই এই সমস্ত অভিনন্দনে প্রীতি লাভ করেছিলেন। কিন্তু যেদিন অতি কৃপণস্বভাব *Times Literary Supplement*-এর সমালোচকও মুক্ত কণ্ঠে তাঁর বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে প্রশংসাবাণী মুদ্রিত করলেন, সেদিন দীনেশচন্দ্র মনে মনে গৌরব বোধ করেছিলেন এবং সে গৌরবের আবহাও অল্পভাষী। এখানে তাই সেই দীর্ঘ সমালোচনার কয়েক-পংক্তি তুলে দিলাম :

"In his narration, as becomes one who is the soul of scholarly candour, he tells those, who can read him with sympathy and imagination more about the Hindu mind and its attitude towards life than we can gather from 50 volumes of impressions of travel by Europeans. Loti's picturesque account of the rites practised in Travancore temples, and even M. Chevrillon's synthesis of much browsing in Hindu Scriptures, seem faint records by the side of this unassuming tale of Hindu literature—Mr. Sen may well be proud of the lasting movement he has erected to the literature of his native Bengal." (*Times Lit. Supple.* 20th June, 1912) এর পর বিদেশীরা প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী হলেন, অনেক বাঙালী পাঠক ও সাহিত্যের ইতিহাসে আলোচিত কবিদের রচনার সঙ্গে পরিচিত হতে চাইলেন। তখন কিন্তু বিরাট পুঁথি-সাহিত্যের অতি অল্পই ছাপা হয়েছে। তাই অনেকেই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের মূল রচনার সঙ্গে পরিচয় করতে পারেন নি। দীনেশচন্দ্র বিপুল পরিশ্রম করে বিরাট ভূমিকা সহ *Typical Selections from the Bengali Literature from the earliest times to the Middle of the Nineteenth century* নামক সুবৃহৎ সংকলনগ্রন্থ প্রকাশ করলেন। ১৯১৪ সালে এই সংকলন প্রায় দু'হাজার পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হল। দীনেশচন্দ্রের স্বাস্থ্য কোন কালেই বিশেষ ভাল ছিল না। কিন্তু ক্ষীণস্বাস্থ্য ব্যক্তিটির মধ্যে এতটা কর্মক্ষমতা কি করে সঞ্চিত হয়েছিল জানি না। এই সঙ্কলনটি প্রকাশিত হবার পর প্রাচীন বাংলার প্রধান অপ্রধান সমস্ত কবিরই রচনার নমুনা পাওয়া গেল। এখনও পর্যন্ত এ গ্রন্থ ছাড়া প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় স্থাপনের সহজতর পন্থা নেই। ইংরাজীতে লেখা সুবৃহৎ ভূমিকায় দীনেশচন্দ্রের পাণ্ডিত্য বিদেশীদের প্রশংসাবিস্ফারিত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। দীনেশচন্দ্র ইংরাজীতে বাংলাভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে যে গ্রন্থগুলি লিখেছিলেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও সমালোচকের দল তার মধ্য থেকেই প্রাচীন বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিচয় খুঁজে পেয়েছেন। সেজন্য এই গ্রন্থগুলির বিশেষ মূল্য অবশ্য স্বীকার্য।

পরিশেষে তাঁর দু'খণ্ডে সম্পূর্ণ 'বৃহৎ বঙ্গ' ১৯৩৫ সালে তাঁর প্রায় সত্তর বৎসর বয়সের সময় প্রকাশিত হল। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা দু'হাজার। সারা জীবন ধরে তিনি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙালীর সাহিত্য, জীবন ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন, কিন্তু শুধু সাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনা ছাড়া

সংস্কৃতির অন্য বিভাগে হস্তক্ষেপ করবার অবকাশ পাননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' পদ থেকে অবসর নিয়ে (১৯২০ সালে বাংলায় এম. এ. খোলা হয়, ১৯৩২ সাল পর্যন্ত তিনি 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' পদে অধিষ্ঠিত) রোগজীর্ণ শরীরে এই বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। আদি যুগ থেকে পলাশী যুদ্ধ পর্যন্ত বাঙালী জাতির রাষ্ট্র, সমাজ, সাহিত্য, ধর্ম, ব্যবসাবাণিজ্য, কলাশিল্প, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি সংস্কৃতির বাহ্য ও আন্তর প্রকাশ সম্বন্ধে তিনি অতি বৃদ্ধ বয়সেও যে বয়সের মানসিক সামর্থ্য দেখিয়েছেন, তাতে যুবক গবেষকও লজ্জা বোধ করবেন। অবশ্য এই মহাগ্রন্থের কতটুকু প্রামাণিক, কতটুকু নয়, তার আলোচনার স্থান এটা নয়। কিন্তু এত বড় দু খানা গ্রন্থ রচনা করতে যে কতখানি মানসিক 'ধৈর্য' প্রয়োজন তা আজকালকার চটিচটি রম্য-রচনার গৌধীন লেখকেরা কল্পনাও করতে পারবেন না।

প্রতিভার সীমা ও সংযম সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাই তিনি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে বিরাট বিরাট গ্রন্থ লিখলেও ইংরেজ অধিকারের পরবর্তী বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে (একখানি ছাড়া—*Bengali Prose Style*, ১৯২১ সালে প্রকাশিত) তিনি অতিশয় মিতবাক্। এ বিষয়ে আমরা অন্তর থেকে তাঁকে ভক্তি নিবেদন করি। তাঁর মন ও মেজাজ যে আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারত না, তা তাঁর চেয়ে বেশী কে জানত? পুরাতন বাংলার কাহিনী, কাব্য ও জীবন তাঁর চোখে যে রঙ্গীন পরিবেশ দিয়েছিল তার দ্বারা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যথার্থ স্বরূপ অনুধাবন করা যাবে না—নিশ্চয় তা তিনি জানতেন। তা নইলে প্রচুর শক্তি সত্ত্বেও তাঁর আলোচনা পলাশীর প্রাঙ্গণে এসে থেমে গেল কেন? পূর্ববঙ্গ গীতিকার তুলনায় আধুনিক সাহিত্য যে তাঁর কাছে কিছু অপকৃষ্ট মনে হত, সে কথা তিনি কখনও গোপন করেন নি। 'পূর্ববঙ্গ গীতিকার' ভূমিকায় তিনি স্বীকার করেছেন, "প্রথম যেদিন বঙ্কিম বাবুর বিষবৃক্ষ রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি ও শরৎচন্দ্রের রামের সুমতি পড়িয়াছিলাম, তাহারও পূর্বে যেদিন মধুসূদনের মেঘনাদের ভয়ঙ্কর ধ্বনি কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিল সেই সকল দিনের কথা আমার মনে আছে, তাহা কখনই ভুলিব না। এই পালা গানের শ্রেষ্ঠ গানগুলি পাঠকালে আমার মনের ওপর তদ্রোপ বিস্ময় ও আনন্দের প্রবাহ চলিয়া গিয়াছিল।" অনেক সময় আবেগের বশে তিনি বলে ফেলেছেন, "এগুলি (অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ গীতিকার স্ত্রী চরিত্র) জানিতাম না বলিয়া আমরা এতকাল শুধু সীতাসাবিত্রীকে লইয়া গৌরব করিয়াছি—এখন আমরা মহুয়া, মলিনা ও কমলকে লইয়া তদপেক্ষা বেশী গৌরব করিতে পারি—যেহেতু তাহারা খাসরা পরা বিদেশিনী নহে, শাড়ী পরা আমাদেরই ঘরের মেয়ে" (ময়মনসিংহ গীতিকা)। এ সব মন্তব্য বিচারের নিকষপাথরে যাই মনে হোক না কেন, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আলোচনা থেকে তিনি ইচ্ছে করেই দূরে ছিলেন, এর দ্বারা তাঁর অসাধারণ সংযম এবং পরিমিতি বোধ প্রমাণিত হয়েছে।

ইদানীং বাংলা সাহিত্যের নানা বিভাগে গবেষণা চলেছে, বহু তরুণ গবেষক কীটের ভোজ্য পুঁথিগুলি নিয়ে কত আলোচনা করছেন, সাগর পারের বিদেশী পণ্ডিত এসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচীন পুঁথির কত আলোকচিত্র তুলে নিয়ে যাচ্ছেন, বিদেশ থেকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতের সম্পাদনায় বাংলা পুঁথি প্রকাশিত হচ্ছে (যথা-এডোয়ার্ড ডিমক ও প্রফুল্লচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ')। বিদেশীরাও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (সোভিয়েট এ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের উদ্যোগে ভারত তত্ত্ববিৎ ইনেসা টলস্টিখ—*Inessa Tolstykh* ইংরেজীতে বাংলা সাহিত্যের একখানি চমৎকার ইতিহাস লিখেছেন) প্রণয়নে উৎসাহিত হয়েছেন। এর যাবতীয় গৌরব কার প্রাপ্য তা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। অবশ্য হয়তো কেউ কেউ বলবেন, দীনেশচন্দ্রের আলোচনার ভক্তের পুষ্পাঞ্জলি বড়

বেশী, সনতারিখেরও তিনি বড় একটা ধার ধারতেন না। এ মন্তব্য প্রতিবাদযোগ্য মনে হতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্রের 'রাধারাণী কথা'র ভূমিকায় যা বলেছিলেন, দীনেশচন্দ্রের প্রতিভা ও মানসিক প্রবণতার তাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পরিচয়—"যথার্থ সমালোচনা পূজা, সমালোচক পূজারী পুরোহিত মাত্র, তিনি নিজের অথবা সর্বসাধারণের ভক্তি-বিগলিত বিস্ময়কে ব্যক্ত করেন মাত্র। ভক্ত দীনেশচন্দ্র সেই পূজামন্দিরের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আরতি আরম্ভ করিয়াছেন।" পূজারতিই দীনেশচন্দ্রের সাহিত্যের ইতিহাস রচনার মূল আদর্শ। সে আদর্শে তিনি আজীবন একনিষ্ঠ হয়ে ছিলেন, তাই তুচ্ছ সনতারিখের বাদানুবাদ ছেড়ে দিলে আমরা তাঁর আলোচনার মধ্যে বহু পুঁথির জীবন্ত ভাষ্য পাব। আজকালকার সাবধানী গবেষক ও ইতিহাসকার পুঁথির কাগজ, কালি, পুষ্পিকা, সনতারিখ নিয়ে উদ্দাম আলোচনা করুন, অসংখ্য পুঁথির বহু বড় তালিকা তৈরি করে সাধারণ পাঠকের ভীতির কারণ হয়ে উঠুন—কিছুই আপত্তি করব না। কিন্তু আমরা, যারা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে কিঞ্চিৎ চর্চা করে থাকি, তারা যে দীনেশচন্দ্রের কাছে কত দিক থেকে ঋণী তা বোঝাতে পারব না। কৈশোরজীবনে একদা টানি সাইজের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' কিভাবে আমার হাতে এসে পড়েছিল। অনেকগুলি রঙিন পুরাতন পট ও ছবি ছিল সেই সংস্করণটির লোভনীয় আকর্ষণ। হায়, আজকালকার ছাপা সংস্করণ থেকে সেগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে। তার জন্যে একদিন ভুরু দিয়েছিলাম। সেই নাথ সাহিত্য, গোরক্ষনাথের অপূর্ব যাতিধর্ম, রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ চৈতন্য জীবনী, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি-রামপ্রসাদের আলোচনা সর্বশেষে পূর্ববঙ্গ গীতিকার সেই চমৎকার ছবির মতো পরিচয় কোন দিনই ভুলতে পারব না। পরবর্তী যুগে এম. এ. পড়তে এসে তাঁকে খুঁজেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের আনাচেকানাচে। তার পাঁচবছর আগেই তিনি লোকান্তরিত হয়েছেন। তারপর উত্তরজীবনে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রতি যে আকৃষ্ট হয়েছি, তার মূল কারণ—কৈশোর কালে পড়া সেই 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।' আজ তাঁকে গুরু বলে প্রণাম করি।

কণ্ঠ-তরী বিম্ব

মিহির মুখোপাধ্যায়

প্রসঙ্গ পরিচয়

[সময় আঠারো শতকের প্রথমার্ধ। বাংলা দেশের নাটমঞ্চে তখন অনেক চরিত্রের ভীড়। অনেক গোপন রহস্য, অনেক চক্রান্ত, অন্যায় লোভ আর হিংসের অন্ধকার।

সুবে বাংলার মসনদে একের পর এক এসেছেন নবাব মুর্শিদ-কুলি, সুজাউদ্দৌলা, সরফরাজ এবং মুহম্মদ আলিবর্দী খাঁন। দেওয়ান রাজবল্লভের পরামর্শে বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচাঁদ দশ হাজার সৈন্য পাঠিয়ে হুগলীর রাজ্য দখল করে নিলেন।

হত সর্বস্ব হলেন রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ, রাণী ভবানী দেবী। চার ছেলে তাঁদের—চতুর্ভুজ, অর্জুন, রঘুরাম এবং কনিষ্ঠ ভারতচন্দ্র। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের শেষ মহাকবি।

বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা থেকে চৌথ আদায় করার জন্য নাগপুরের রঘুজী ভোঁসলা পাঠালেন তাঁর রণনিপুণ ব্রাহ্মণ সেনাপতি ভাস্কররাম কোলহট্‌করকে। লোকের মুখে মুখে প্রচারিত যার নাম ভাস্কর পণ্ডিত। শুরু হল ইতিহাস-বিখ্যাত বর্গীর হাঙ্গামা।

ইতিহাসের চিরন্তন পথে মহাকালেশ্বরের রথ চলেছে নির্দিষ্ট নিয়মে।

॥ এক ॥

কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার নেমেছে কানা নদীর জলে। ভাগীরথীর এই উপশাখার নাম কানা দামোদর। দুই তীরের জঙ্গলে জোনাকী জ্বলছে, ঝিঁঝি ডাকছে আর কখনো অনেক দূর থেকে হাওয়ার টানে ভেসে আসছে কাদের কোলাহল, আচমকা বন্দুকের শব্দ, বনের আকাশে আগুনের আভা।

কানা নদীর অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে একখানা নৌকো চলেছে। কোন আলো নেই।

সেই রথের রশিতে হাত রেখেছে ছোট বড়, ভাল-মন্দ, ধনী-নির্ধন নানা মানুষ।

মহামানবের এই বিচিত্র বিপুল শোভাযাত্রায় যেমন আছেন, মহামান পেশবা বালাজীরাও, তেমনি আছেন দারদাশ্রামের সামান্য গৃহস্থ নরোত্তম আচার্য। যেমন আছেন কটকের মারাঠা শাসক শিবভট্ট, তেমনি আছেন দেবানন্দপুরের সম্মানিত মানুষ রামচন্দ্র দত্ত মুনসী। পাশাপাশি রয়েছে বিশ্বস্ত ভৃত্য রঘুনাথ, বহুবংশল বিদ্যাধর, বর্ধমানের কারাধ্যক্ষ দেবীসিঙ্, বৃন্দেলা, খানাকুলের বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য, রাজসভার গায়িকা রূপমঞ্জরী, প্রোষিতভর্তৃকা বালিকা বধূ রাধা এবং জগন্নাথদেবের মন্দিরের নৃত্যগীত নিপুণা দেবদাসী বিশাখা।

সমাজ ও জীবনের এই বিমুক্ত জটিল পরিবেশে ধীরে ধীরে উন্মেষ ঘটেছে এক মহৎ কবি-চেতনার। শৈশব থেকে মধ্যযৌবন। দেশকালের আবর্ত মন্থন করে যে বিষামৃত উঠেছে, অন্ধকার মধ্যযুগের সেই শেষ মহাকবি তার বিষভাগ আপন কণ্ঠে ধারণ করে, অমৃত অংশ পরিবেশন করে গেছেন সন্তায় দেশবাসীর জন্য।]

দাঁড়ি-মাঝিরাও চুপচাপ। এক খণ্ড অন্ধকার যেন জলের বুকে ভেসে ভেসে দূরের কোলাহল আর আগুনের দাহ থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। খুব চুপিচুপি চোরের মত পালাতে হবে। রাতের আকাশ লক্ষ তারার চোখ মেলে দেখছে। জোনাকিরা হাজার দীপ জেলে নদীর দুধারে ভীড় করে আছে। অশুভ ঝিঁঝিঁর শব্দে যেন শত্রুর সঙ্কেত আর আচমকা অলক্ষুণে পেঁচার ডাকে যেন জলের অন্ধকার শিউরে উঠ্‌ছে।

নৌকোর যাত্রীরা তাই ভয়ে ভয়ে চলেছে। দাঁড় টানার ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ। মাল্লারা নিঃশব্দে এক যেয়ে ছন্দে দাঁড় টেনে যাচ্ছে। নৌকোর ছই-এর নিচের অন্ধকার কোন থেকে কে যেন চাপা গলায় ডাকল,—বিশু, বিশু, বিশ্বনাথ। মেয়েলি গলার ডাক।

—যাই মাঠান—ছইএর উপর যে বলিষ্ঠ পুরুষটি চাল-সড়কি পাশে নিয়ে পাথরের মূর্তির মত বসেছিল, হামাগুড়ি দিয়ে সে নেমে এল।

ছই-এর খোলামুখের কাছে উবু হয়ে বসল—"ডাক্‌তিছ ক্যানো মাঠান?"

—"কতদূর এলম, বাবা!"

বিশুলেঠেল একবার এদিক ওদিক তাকাল, বোধহয় আন্দাজটার হদিশ নিল।

সামনে-পেছনে অকূল অন্ধকার, নদীর স্রোতধারা, ঢেউয়ের শব্দ।

তারপর মুখ নামিয়ে, চাপাস্বরে জবাব দিল—"না, মাঠান ভুরশো ছাড়াতি পারি নি।"

অন্ধকারের মধ্যে মেয়েলি গলার কান্নার সুরে আবার কথা ফুটল—"হরি হে, দীনবন্ধু, বিপদভঞ্জন মধুসূদন তুমিই জানো" —তারপর বিশুকে লক্ষ্য করে—"ওদের কি হবে বাবা, বড়ছেলে তো বাপের সঙ্গে রইল, আমি এই তিনটে নাবালক নিয়ে জলে ভেসেছি, আর কখনো দেখা হবে কিনা মধুসূদনই জানেন।

একটু নড়েচড়ে বসে বিশু অভয় দিল—"কোন ডর নেই মাঠান তোমার বিশুর হাতে লাঠি থাকৃতি, তোমাগো গায় কেউ এট্টা আঁচড়ও দিতি পারবে না, তয় এট্টা কথা রাখ্‌বা, আমি মরলি পর আমার এই ছাওয়ালডারে তুমি দেখবা"—তারপর নিজের ছেলেকে ডাকল—"ওরে রঘু, রঘু, ঘুমুলি নাকি?

নৌকোর আর এক কোন থেকে কমবয়সী ঘুম-ভাঙ্গি গলার জবাব এলো—"না বাবা।"

—মাঠানের ধারে গিয়া বয়, তোরও মা, আমারও মা, তোর ভয়ডা কিসি আজলেও মা'ঠানের কাছে থাকৃবি।

ভবানী দেবীও ডাক দিলেন—আয়রে রঘু আমার কাছে সরে আয়।

নিজের তিন ছেলের পাশে বিশু লেঠেলের মা-মরা ছেলে রঘুনাথকেও ডেকে নিলেন।

বিশু এবার ছই-এর মুখ থেকে সরে এল। দুহাতে ভর দিয়ে ছই-এর উপর উঠল। মচ্‌মচ্‌ করে হামাগুড়ি দিয়ে পেছনে হালের কাছে গিয়ে ডাকল—"ও দুখি, নওয়াপাড়া যাত্তি আর কতটা সময় লাগবে?

হালের কাছে শেষ নৌকোর মাঝি দুখিরাম। নিচু গলায় জবাব দিল—"এ আত্তির খান কাট্‌বো। সন্ধার, তামুক খাব।" বিশু ঘাড় নাড়ল—"উহু, সামনের বাঁকটা ছাড়ালি পর। এখন খাইস্‌ নে।"

অন্ধকারে তামাক ধরাবার আগুন দেখলে কেউ যদি টের পেয়ে যায়। এখনো অনেকটা পথ। নৌকো যাবে সেই নওয়াপাড়া দয়াময়ীর বাপের বাড়ি। নদীনালার পথ গেছে ঘুরে ঘুরে। ভাগীরথীর নানা শাখা।

যমুনা, সরস্বতী, চুর্ণী, কুন্তি, অজয়, জলাঙ্গী, শিবানদী, দামোদর, বাঁকা দামোদর আর এই কানা নদী। ওদিকে সরস্বতী তখন মজে এসেছে। সপ্তগ্রামের আর আগের জৌলুষ নেই। হুগলী ফেঁপে উঠেছে। ধনে-জনে-গৌরবে। ভাগীরথীর নূতন নাম-ডাক হুগলী নদী। আবার হুগলীকেও

ছাড়িয়ে যাচ্ছে কোম্পানীর শহর ক'লকাতা। সুতানটি, গোবিন্দ পুর, কলকাতা—অখ্যাত তিনটি গাঁ এমিশে এক নতুন বাণিজ্য-নগরীর পত্তন হয়েছে।

নৌকো যাবে সরস্বতীর পথে মণ্ডলঘাট পরগণার দিকে। ঘুষিরাম সাবধানে হাল ধরে আছে। মাথার উপর অসংখ্য তারার আকাশ। কালপুরুষ তাকিয়ে আছে অতন্দ্র প্রহরীর মত। কিন্তু লেঠেলের চোখেও ঘুম নেই।

পাকা বাঁশের লাঠি হাতে, পাশে রয়েছে চাল-সড়কি। পথে জল-ডাকাতের ভয়, পেছনে শত্রু।

তাও আবার যেমন-তেমন শত্রু নয়। স্বয়ং বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচাঁদ। এ বিপদে একমাত্র লাঠিই ভরসা। বাংলাদেশের মানুষ তখন লাঠির বশ। শুধু বাংলাদেশ কেন, তামাম হিন্দুস্থান জুড়ে লাঠির রাজত্ব।

ষড়যন্ত্র, গুপ্তহত্যা আর লুটপাটের মহোৎসব চলেছে দেশ জুড়ে। মাত্র তের বছর আগে মুঘল সম্রাট আলমগীর দূর দাক্ষিণাত্যের বাতাসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

সেই থেকেই মারামারি কাটাকাটির মহোৎসব শুরু হয়েছে। বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের তখন শেষ পর্ব।

এক একটা সুবার শাসন কর্তারা এক একজন স্বাধীন নবাব হয়ে বসেছেন। এদের একজন মুর্শিদকুলি খাঁ।

সম্রাট আলমগীরের আমলের দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ এখন বাদশা ফারুখ্‌শিয়ারের ফর্মানের জোরে সুবে বাংলার নবাব হয়ে বসেছেন। সবরকমের বিলাস-ব্যসনে উদাসীন ফকির গোছের মানুষ মুর্শিদকুলি। কিন্তু টাকা পয়সার ব্যাপারে দারুণ হুশিয়ার। লাঠির জোরে বাংলাদেশের জমিদারদের ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করছেন। যাদের ভাগ্যাভাল তারা টাকা দিয়ে রেহাই পাচ্ছে, আর যারা দিতে পারছে না তাদের ভাগ্যে বৈকুণ্ঠ দর্শন। ময়লাভরা নোংরা নরককুণ্ড। টাকা দিতে না পারলে তার মধ্যে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে আটকে রাখা হয়। মুর্শিদকুলি নিষ্ঠুর পরিহাস-রসিক।

সেই নোংরা কুণ্ডের নাম রেখেছেন বৈকুণ্ঠ। এই বৈকুণ্ঠ দর্শনের পাণ্ডা হচ্ছেন মুর্শিদকুলির এক নাত-জামাই। তিনিই এই মহৎ অনুষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক।

এই তখন দেশের শাসন। যার লাঠি, তার মাটি।

কানা নদীর কূলে পাণ্ডুয়া গড়ের রাজা নরেন্দ্র নারায়ণ রায়। ভুরশুট রাজ্যের দু'আনা অংশের মালিক। বর্ধমানের রাজার সঙ্গে জমির সীমানা নিয়ে একটা গোলমাল চলছিল। উত্তেজনার মাথায় হঠাৎ গাল দিয়ে বসলেন বর্ধমানের রাজমাতাকে। নরেন্দ্র রায়ের খুড়ো রাজবল্লভ ছিলেন বর্ধমান-রাজের দেওয়ান। তিনিই কথাটা রঙ-চড়িয়ে মহারাণীর কানে তুললেন।

কি, এত বড় স্পর্ধা একটা ক্ষুদে জমিদারের! চাল নেই, তলোয়ার নেই, এক কড়ার মুরোদ নেই আর গাল দিয়ে বসল কিনা স্বয়ং বর্ধমানের রাজমাতাকে!

মহারাণী ক্ষেপে গেলেন।

—"এই কে আছো, হয় আমার এই নাবালক ছেলে কীর্তিচাঁদকে মেরে ফেল, না হয় আজ রাতের মধ্যে ভুরশুট দখল করে নাও, পাণ্ডুয়ার গড় ধুলোয় মিশিয়ে দাও, আমি অন্ন জল ত্যাগ করে বসে রইলাম অনশনে প্রাণ দেব।"

দুই দুর্ধর্ষ সেনাপতি আলমচাঁদ ক্ষেমচাঁদ লাফিয়ে উঠল। মার মার করে দশহাজার সৈন্য নিয়ে ছুটল ভুরশুটের পথে। কোথা দিয়ে কোন্ পথে যেতে হবে, নরেন রায়ের অন্ন বল কেমন, লোক বল কত—সব খুলুক-সন্ধান বাতলে দিলেন দেওয়ান রাজবল্লভ।

আকস্মিক আক্রমণে নরেন রায় হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। পরিবার পরিজন যে যেদিকে পারলো পালিয়ে প্রাণ বাঁচালো। বড় ছেলে চতুর্ভুজ রায়কে সঙ্গে নিয়ে সংখ্যায় সামান্য, কিন্তু সাহসী কিছু অনুচরের ভরসায় নরেন রায় এগিয়ে গেলেন বাধা দিতে। যাবার আগে

স্ত্রী ভবানী দেবীকে ডেকে বললেন—"পালাও, তিন ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে যাও নওয়াপাড়া। চতুর্ভুজকে নিয়ে আমি এখানে রইলাম। তোমাদের সঙ্গে যাবে বিশ্বনাথ। পাল্কিতে যেওনা, ধরা পড়তে পারো, ঘুষিরামের নৌকায় যাও। সে সব ব্যবস্থা বিশুই করে দেবে, ঘুষিরাম বিশ্বাসী লোক। আর সময় নেই, আমি চল্লাম। যদি বেঁচে থাকি খবর পাঠাব।" চোখের জলের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ হল। বড় ছেলে বন্দুক হাতে ছুটে বেরিয়ে গেল, নরেন রায়ও ছুটলেন। সত্যবতী সব কাপ্‌ড়া দেখছেন। না, কাঁদবেন না তিনি, কাঁদলে চলবে না তাঁর। ছোট ছোট তিন ছেলের দায়িত্ব। স্বামী তাঁকে সহধর্মিণীর দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। ছেলেরা মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

তাঁকে মায়ের কর্তব্য পালন করতে হবে। সঙ্গে বিশ্বনাথ রয়েছে, তাঁর ভয়টা কি?

স্বয়ং যমরাজা এলেও বিশু লেঠেল প্রাণ থাকতে পথ ছেড়ে দেবে না।

বিশ্বনাথ জাতে নাপিত। কিন্তু ক্ষুর ছেড়ে সড়কি হাতে নিয়েছে, জাত-ব্যবসা ছেড়ে লাঠি-বাজিতে হাত পাকিয়েছে। দেশ ছিল পূব-বাংলায় এখন বয়স হয়েছে পঞ্চাশের ওপর। নরেন রায়ের বাপ সদাশিব রায়ের আমলের লাঠিয়াল। বড় বিশ্বাসী আর সাবধানী মানুষ। বুড়ো বয়সের ছেলে রঘুনাথ ছাড়া সংসারে আর কেউ নেই। ছেলের ভার ভবানীর হাতে দিয়ে বিশু এবার শক্ত হয়ে দাঁড়াল।

শত্রুকে সে পরোয়া করে না, মৃত্যুতে তার ভয় নেই। এদের নিরাপদে পৌঁছে দিতে পারলেই তার দায়িত্ব শেষ। তারপর লড়াই করে মরা হ'লেও পরম শান্তি।

ঘুষিরামের নৌকো এবার কানা নদীর বাঁক ঘুরে সরস্বতীর জলে দক্ষিণমুখী হল। সময়টা হেমন্তের শেষ। উত্তর থেকে হাওয়া দিচ্ছে, নদীতে ভাটার টান।

বিশ্বনাথ ডাক দিল—ওরে ঘুষি, পাল তুইলে দে, আর ভয় নাই, এহোনে তামুক খাতি পারস্।

আকাশে কালপুরুষ দিক বদল করেছে। রাত দুপুর গড়িয়ে গেল। উত্তুরে হাওয়ায় পাল তুলে ঘুষিরামের কোষ নৌকো চলেছে কওল ঘাট পরগণার পথে।

(ক্রমশঃ)

মহীতোষ বিশ্বাস

১

সারা কাঠুখালির বিলটা যেন উছলে উঠেছে।

চিত্রার পাশ ঘেঁষে আসতে আসতে ভৈরব নদ বাঁক নিয়েছে। আধখানা চাঁদের মতন। নামেই ভৈরব নদ। এখনিতে ছোটোখাটো। ভালোমানুষ বর্ষাকালে খামিকটে ফুলে-ফেঁপে ওঠে। জটা ছড়ায়। তারপরে আবার শান্ত। আপন মনে ব'য়ে চলে। ভৈরবের বাঁক ছাড়িয়ে যাইল চার পাঁচ পথ। পথ মানে মেঠো পথ। সোজা ভিতর দিকে। আর তার পরেই শুরু হ'ল কাঠুখালির বিল।

তখনো-পুব-আকাশের ঘোর ভাঙেনি। পাখ্-পাখালি ডাকেনি। তার আগেই সব বেরিয়ে পড়েছে। জোয়ান, বুড়ো, বাচ্চা। যা করবার, এখনই করে নিতে হবে। এর পর আর সময় পাওয়া যাবে না। এ-পাওনা, হকের পাওনা। কিন্তু সে পাওনা তো ফাঁকি দিয়ে পাওয়া যায় না। খাটতে হবে। গায়ের রক্ত জল ক'রতে হবে। সে জল ঘাম হবে পাড়িয়ে পড়বে মাটিতে। নরম-নরম সোঁদা গন্ধ ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে। আর তাতেই তো মাটির বুক ফুটবে। মুখ ফুটবে। কাঠুখালির বিলের মানুষকে আঁজলা ভ'রে সোনা ঢেলে দেবে।

খাটতে ওরা জানে। জান দিয়ে, প্রাণ দিয়ে। খাটতে ওরা কসুর করে না। ওদের রোদে-পোড়া কালটে শরীরে তখন যেন দৈত্যের মতন শক্তি আসে। দড়ি পাকানো শরীরগুলো টান হয়ে ওঠে। ওরা খাটে। ওদের বাপ-ঠাকুরদারা খেটে এসেছে। মাটি—পুত্তুর-ও খাটবে। খাটতে ওরা পেছ-পাও নয়। তবে হ্যা, ভগবান বিমুখ হলে ওরা কি করতে পারে। সেখানে তো ওদের হাত নেই। কোনোবার বা বান এলো। মাঠ-ভরা ফল-ফলান্তি ধান। দেখতে দেখতে সব সাফ। কুটো গাছাও রইল না। ওরা তার কি করতে পারে। কোনোবার এলো অজন্মা। পোড়া আকাশটা একটু রা কাড়লো না। বোশেখের বাতাসে আগুন ধরলো। গাঁও-গেরাম খাট খাট পুড়ে উঠতে লাগল। কোনো ক্ষেতে বা বীজই গেলনা। কোনো ক্ষেতে বা দু' এক গাছা কচি-কাঁচা কেবল মুখ বের করেছিল। দুদিনেই সব ঝোঁয়া। আগুন-জলা ক্ষেত গুলো হা হয়ে তাকিয়ে থাকে। ভেতে-ওঠা আকাশের দিকে মুখ তুলে ছাতিফাটা টিটু পাখী গলা ফাটায়—'হট্টি টিটু জল খাও—হট্টি টিটু জল খাও—।'

তবে সববারেই যে কপালে এমন ধারা বরবাদ লেখা থাকে—তা নয়। ভগবান সদয় থাকলে, আসমান-বান প্রসন্ন থাকলে ওরাও পায়। দু'হাত ভরেই পায়। ঠিকমতন জল-বাতাসে মাটি রসুমতী হয়। ওরা তখন শরীরের ঘাম ঝরায়। লাঙল দেয়। বীজ ছড়ায়। মেয়েমানুষের মতন মাটি। বীজগুলোকে বুকে তুলে নেয়। বুকের গভীরে লালন করে। আর কাঠুখালির চাষী মানুষগুলো অধীর হ'য়ে অপেক্ষা করে। দিনক্ষণের হিসেব গোনে। কান পেতে থাকে। তারপর একদিন সারা বিশ্ব জুড়ে ওরা যেন কচি শিশুর কান্না শোনে।

ওদের সারা শৌরুষ জুড়ে পুলক শিউরে ওঠে। বাদামীরঙের বীজধানের খোলস ছেড়ে বাইরে উঁকি মারে হাজার হাজার কচিমুখের হাসি। দেখতে দেখতে বর্ষার জলে নেয়ে উঠে হিস্ হিস্ করে বেড়ে ওঠে চারাগুলো। আস্তে আস্তে ডাগর-ডোগর, ডব্‌কা হয়ে ওঠে। জলে-হাওয়ায় বুক চিতিয়ে নাচে। তারপর একদিন যেন সরম আসে। একটু খানি কোল নুইয়ে দাঁড়ায়। এবার ফলন দিতে হবে। আশ্বিন মাসের শেষ রাতকে বলে 'খাসী'র রাত। 'খাসী' হ'ল ধানকে সাধ খাওয়ানো। কাঠুখালির ঘরে ঘরে ঐ রাতটার ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা রাত জাগে। ভোর রাতে কুলো বাজিয়ে গান ধরে—

'আশ্বিন যায় কার্তি আসে,
সেইদিনে ধান গর্ভে বসে,
ধানরে-তুই সাধ খা।
বুড়ি গালো মোড়োয়ে,
ধান পড়িছে নোড়োয়ে,
ধানের মাথায় নাদ্যা শিস্,
সোণায় পালায় ভ'রে দিস্,
ধান-রে—তুই সাধ খা—
ধান-রে - তুই সাধ খা।'

সকাল হ'লে দেখা যায়, ধানগাছ গুলোর বুক জুড়ে গুঁড়ো গুঁড়ো সাদা ফেনা। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে লম্বা লম্বা শিস্। দু'পাশ দিয়ে নীলচে খোসার বক্‌বকানি। আস্তে আস্তে খোসাগুলো পুষ্ট হয়। ভিতরে দানা বাঁধে। রং ফেরে। কাঁচা সোনার রং। হেমন্তে পাক ধরে। কাঠুখালির মানুষগুলো তখন আসে। ছেলেবুড়ো ছোটোবড়ো—সকলে। মাটিকে পুজো দেয়। ধানও ধানে। ধান তো নয়, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। বরণ-কুলো সাজিয়ে মাথায় করে লক্ষ্মীকে ঘরে তুলে নেয়। মাটির গর্ভে জন্মে চারাগাছ। তার গর্ভে জন্মে ধান। সোনার বরণ ধান। ঘর-দেওয়ালী, জন-মনিষ্যির ভরসা। তবে তার জন্য খাটতে হয়। বুক দিয়ে, প্রাণ দিয়ে। কাঠুখালির মানুষ গুলো খাটে। বুক প্রাণ দিয়েই খাটে। তবে ঐ যে এক কথা। ভগবানের মার। ভগবান বিমুখ হলে ওদের আর কিছু করবার নেই। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া।

এই বেমন এবার হয়েছিল।

গোটা চত্তির-বোশেখটা কেটে গেল। জ্যৈষ্ঠের ও আধাআধি হয়ে এলো। তবু একফোঁটা জলের দেখা নেই। আকাশটা যেন এবার দু'বাসা মুনি। সব দিশে পুড়িয়ে ভস্ম ক'রে তবে ছাড়ান্ দেবে। ফাল্-খাওয়া ক্ষেতের মধ্য দিয়ে লোকগুলো ভূতের মতন ঘোরে। আর আসমানকে শাপমন্যি দেয়। অবশেষে ভগবানের যেন কৃপা হ'ল। জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি চল্ নামল। আসমান্-জমিন্ কাঁপিয়ে, দিগ্-দিগন্তর জুড়ে। এতোদিনে যেন ধড়ে পরাণ এলো। মানুষগুলো হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ভগবান দিয়েছে। এবার ওদের পালা। যা করবার, এবার ওদের করতে হবে। আলসেমি করলে চলবে না। ঢিলেমি করলে চলবে না। বীজ না থাকে, ধার নাও। হাতে টাকা থাকে, কিনে নাও। লাঙল-বলদ নেই —একজনের সঙ্গে ভাগে চাষ করো। আর দশ ভাবে চেষ্টা করো। শুধু বসে থেকো না। বর্ষা পড়েছে। ক্ষেতে 'জো' এসেছে। মাটি—ঋতুমতী মাটি তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। তুমি ব'সে থেকো না। ও-মাটি তোমার মায়ের জাত। তোমার ঘরের মেয়ে-মানুষের জাত। ওকে তুমি হেলাছেদ্দা করোনা। ও দেবে। তোমার ঘর ভরে দেবে। ও এবার দিতে এসেছে।

পুব-আকাশের ঘোর ভাঙবার আগে, পাখ্-পাখালির সাড়া দেবার আগে, গোটা কাঠুখালির খিলটা তাই যেন উছলে উঠেছে। কন্ধাপুর, বেনাখালি, বাকুলী, হাতিনাড়া, খালিচক গুণোখালি, দোহাটি—সব গাঁয়ের মানুষগুলো ভেঙে পড়েছে। গরুবাছুর, জন-মনিষ্যির হাকে ডাকে সারা বিলটা জেগে উঠেছে। সময় বেশী হাতে নেই। যে যত তাড়াতাড়ি এখন

বীজ ছড়াতে পারবে, জমির ফসল সেই পাবে তত বেশী। এখন আশপাশে তাকাবার সময় নেই। শক্ত হাতে লাঙলের মুঠো ধরে থাকতে হবে। জলকাদা ঠেলে, জোয়াল-কাঁধে-বলদ দুটোকে তাড়িয়ে নিতে হবে। সূর্যদেব মাথার পরে উঠেছে। উঠুক। রোদের তাতে গা বেয়ে ঘাম ঝরবে। ঘামে-জলে মিশ্ খাবে। তবেই তো ফসল ফলবে। বেশী শ্রম হয়, মাঝে-মাঝে হাত বদলে নাও। একটুখানি জিরিয়ে নাও। তামুক খাও। আবার উঠে কাজে লাগো। ব'সে থেকো না। খিদে? হ্যাঁ, খিদে পাবে বইকি। খাটলে খিদে লাগে। দুপুর বেলায় বাড়ী থেকে খাবার আসবে। আসবে ছোটো ছেলেরা।—যারা এখনো পাকাপোক্ত হয়নি। লাঙল ধরতে পারেনি। কোনো বাড়ীর মেয়েমানুষ হয়ত নিজেই আসবে। খাটুয়ে পুরুষের জন্য ভাত আর জল নিয়ে। হাতের কাদা কোনো মতে ছাড়িয়ে নিয়ে আলের পরে ব'সে কাঠখানির চাষী মানুষগুলো নাকে মুখে দুটো গুঁজবে। কেউবা বাড়ীতে গিয়ে খেয়ে আসবে। তারপর আবার কাজ। কাজে লাগবে সবাই।

বাঁ-হাতে লাঙলের মুঠোটাকে শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে পাশের ক্ষেতের দিকে তাকায় বুড়ো সুখলাল। পাশের ক্ষেতে বলরাম। মাথাভর্তি ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। কাদামাটিতে এক-শেষ হয়েছে। শরীর খানা ওর দেখবার মতন। ইয়া ডাগুড়াই জোয়ান। তাউলে-বাঁশের কোড়ার মতন লক্-লক্ করছে। বাঘের থাবার মতন হাত দু'খানা। মেলা-পার্বণে লাঠি খেলে। চড়ক পুজোয় কসরৎ দেখায়। পুজো-আচ্চায় একটু আধটু নেশা-ভাঙও যে না করে তা নয়। তা হোক। কাজের ছেলে বলরাম। কাজে ওর খাটুতি নেই। এর মধ্যেই অনেক খানি কাজ শেষ করে নিয়ে এসেছে।

সুখলাল গলা চড়িয়ে হাঁক দেয়—"ও বলরাম, তামুক খাবা নাকি? এদিদি আসো। এটু জিরেন্ নাও।"

ঘানহাতি বলদটার লেজে মোচড় দিতে দিতে জবাব দেয় বলরাম—"আর এটু সুখানি সুখলাল-কাকা। এই মোড়টা ফিরেই আস্তিচি।"

জোয়াল থেকে গরু দুটোকে একটু খানি আ দিয়ে একটু পরেই আলে বলরাম।

লম্বা একটা সুখটান দিয়ে সুখলাল হুঁকোটা বলরামের হাতে এগিয়ে দেয়। বলরাম আয়েস ক'রে হুঁকোটা টানতে থাকে। এ-নিয়ে ওদের কোনো সঙ্কোচ নেই। হাড়ভাঙা খাটুনীর পর কড়া তামাকে সুখটান না দিলে ওদের চলে না। সেখানে ছোটোবড়ো লঘু-গুরুর ভেদ নেই। বাপকাকার হাতে যেমন নাবালকেরা কাজ শেখে, তেমনি এই হুঁকো খাওয়ার হাতে খড়িটাও শুরু হয় বাপ-কাকার হাতেই। কাজের সময় বড়োদের তামাক সেজে দেবার ভার থাকে ছোটোদের উপর। কাজে ব্যস্ত মানুষ গুলোর হাতে হুঁকো তুলে দেবার আগে কয়েকটা টান দিয়ে ভালো ক'রে হুঁকোটাকে ওদেরই জাগিয়ে দিতে হয়। আর এই হাতে-খড়ি থেকেই একাজেও তারা পোক্ত হয়ে ওঠে একদিন।

একটা আস্ত ঘাস শোড়া-শুদ্ধ উপড়ে নিয়ে তার পাতাগুলো ছিঁড়তে ছিঁড়তে সুখলাল বলে—"তোমাদের বাড়ীর খবর কি বলরাম? বাপের সাথে বনিবনা হয়ে চল্‌তিচে তো আজ কাল?"

হুঁকো টানতে টানতে জবাব দেয় বলরাম—"চল্‌তিচে একর'ম্।" সুখলালের গলাটা যেমন যেন উদাস শোনায়। আস্তে আস্তে বলে—

"তোমার বাবার মতিগতি কিন্তুক আগে এমন ধারা ছেলোনা। এই শাদ্দের-বিয়েডা করার পরেতেই মানুষটা ম্যানো ক্যামোন হয়ে গ্যালো।"

বলরাম একথা না মেনে পারে না। যথার্থ বলেছে সুখলালকাকা। প্রতিবেশী সুখলাল। সব খবর জানে বইকি! বাবা তার সত্যিই এ-রকম ছিল না। এতোটুকুখানি রেখে মা যখন মারা গেল, তখন কে দেখার ছিল বলরামের।

বাবাই তো কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে। কাজকাম শিখিয়ে দড় করে তুলেছে। তারপর বাপের মাথায় যে কি বুদ্ধি ঢুকল কে জানে। বয়স তিন চার আগে আবার বিয়ে করল। আর তারপর থেকেই বাপের মতিগতি গেল বদ্‌লে। বলরাম হ'ল বাপের দু' চোখের বিষ দিন-রাত্তিরের শত্তুর। বলরাম বাপকে মান্য করেই চলে। তবে বলরাম ও তো মানুষ। তারও তো মন-মেজাজ বলে একটা কথা আছে। মেজাজ যখন ভালো থাকে, বাপের গালাগালি গুম্ মেরে শোনে। মেজাজ না থাকলে সেও শুনিয়ে দেয় দু'কথা গরম গরম।

কাজের সময়। বেশীক্ষণ বসে থাকা যায় না। উঠতে উঠতে সুখলাল বলে—"কি আর করবা বাপু। কপালের ফ্যার। তাহো, যে কয়ডা দিন পারো মিলেমিশে থাকতি।"

দিন কয়েকের মধ্যেই মাঠের কাজ শেষ হ'ল।

বিষ্টি একটু পরে এলে কি হবে। এবার বাও-বাতাস ভালো। জল ভালো। ফসল এবার ভালোই হবে।

এর মধ্যেই ধান বেশ উঁচু হয়ে উঠেছে। একপাল ভর্‌কা ছুঁড়ির মতন বাতাসে হিল্‌হিল্ করছে। ভিতরে গেলে গায়ে জল লাগে। কাপড় ভেজে। ধানের পাতায় হাত কাটে। গা কাটে। তবু ভালো লাগে। এই ভালো লাগাই জীবন। এই ভালো লাগাই বেঁচে থাকা। ধানের মধ্যে বিলি কেটে কেটে ঘুরে বেড়ায় বলরাম। ধান দেখে বুক জুড়োয় ধান গাছের কচি কচি পাতাগুলো সোহাগের আলতো ছোঁয়ায়। মুঠো মুঠো ক'রে পাতাগুলো জড়িয়ে ধরে বলরাম। কি যেন একটা আবেগে বুজে আসতে চায় ওর দু'চোখের পাতাগুলো। তবু পরাণটার মধ্যে কেমন যেন উঁথালি-পাথালি করে। বাউরা বাতাসে বুকের মধ্যে গুমরে গুমরে ওঠে। গুন্ গুন্ করে গান গায়—

'মনের মানুষ বিনেরে মোর
পরাণ কাঁইন্দে ঘরে
উথাল-পাথাল বুকের মাঝে
মন মানেনা ঘরে।'

মনের মানুষ! তা বলরামের মনের মানুষ তো একরকম ঠিক হয়েই আছে। পদ্ম—পদ্মকলি। বড়ো ভালো মেয়ে। অনেক দিনের জানাশোনা। অনেক দিনের ভাব। বলরামের মা তখন বেঁচে। পদ্মকলির মার সঙ্গে বলরামের মা সই পাতিয়েছিল। বড় হলে বলরামের সঙ্গে পদ্মকলির বিয়ে দেবে ঠিক করেছিল। সেই থেকে বলরাম আর পদ্মর ভাব। দুজনে খেলা করে। গল্প করে। লজ্জাও করে দু'জনের। বর বউ ব'লে সবাই ঠাট্টা করে। রাগ হ'লে আবার দু'জনে মারামারি করে। পদ্মকলির চুলের মুঠো ধরে টান দেয় বলরাম—"জানিস্, তুই আমার বউ হবি!"

এক ঝটকায় চুল ছাড়িয়ে নিয়ে পদ্ম বলরামের গায়ে থুক্ করে খানিকটে থুথু ছিটিয়ে দিয়ে বলে—"ইস্, বয়ে গেছে তোর বউ হ'তি।"

বলরাম ধরতে যেত পদ্মকে। পদ্মকলি ছুটে পালাত। খানিকটে দূরে সরে গিয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসত। ভেংচি কাটত।

কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে বলরামের রক্তের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠত। অবাক দু'চোখের বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকত আধ-ফোটা কিশোরী পদ্মকলির দিকে। মনে ভাবত—পদ্ম কবে বড়ো হবে।—পদ্মকলি পদ্মফুলম হয়ে উঠবে।

এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন বলরামের মা মারা গেল। সন্ধ্যেবেলায় ঘাটে জল আনতে গিয়েছিল। সেখান থেকে সাপে কামড়ায়। সাউডগার মতন মেয়েমানুষটা দেখতে দেখতে নীল হয়ে গেল।

বলরামের মা মারা যাবার পর অনেকদিন কেটে গেল। আস্তে আস্তে ওদের বিয়ের কথাটাও একরকম চাপা পড়ে গেল। তারপর বলরামের বাবা আবার বিয়ে করল। নতুন

ঘরে পুরুষ মানুষের মন টেকেনা। নতুন বউ ঘরে নিয়ে এলো বলরামের বাবা। সংসারের আয়-বরকতও বাড়ল। কিন্তু বলরামের সঙ্গে ওর বাপের বনিবনাটা যেন কেমন কম হয়ে গেল। বলরামের বাপেরও এখন নতুন ঘর। নতুন সংসার। এ-পক্ষের এক ছেলে হয়েছে। বলরামের পরে বাপের টানটাও তাই যেন একটু কম হয়ে এসেছে।

পদ্ম-ও আর সে পদ্ম নেই। পদ্মকলি এখন পদ্মকুসুম হয়েছে। সারা দেহখানায় যেন জোয়ারের সাড়া জেগেছে। যৌবনের যাদু লেগেছে দুই চোখে। পথে ঘাটে এখন আর বড় একটা একা-দোকা বেরোয় না। বলরামের দামাল মনটা ছোঁৎ ছোঁৎ করে বেড়ায়। কখন একটু দেখা হয়। মাঝে মধ্যে ঘাটের পথে দেখা হয়ে যায়। সঙ্গে লোকজন থাকলে পদ্মকলি পাশ কাটিয়ে যায়। কথা কয়না। একা থাকলে পদ্মই আগে ফিক্ করে হেসে ওঠে। মুখখানা ঘাড়া করে একটা-আধটা কথা বয়। এদিক-ওদিক তাকায় কাউকে দেখতে পেলেই আবার পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

ধানের মধ্যে দিয়ে বিলি কেটে কেটে এগোয় বলরাম। মনে মনে ভাবে—না, আর দেরী নয়। পদ্মর বাপের কাছে কথাটা এবার পাড়তে হবে। আশ্বিনেরমধ্যেই পদ্মকে ঘরে আনতে হবে। আমন ধান ওঠার আগেই।

সঙ্গে সঙ্গে একটা রঙীন ভাবনা গুন্ গুন্ করে ওঠে বলরামের মনে।

—তার নিজের হাতে গড়া ছোটো একখানা ঘর। আর সেই ঘরে পদ্ম আসবে তার নতুন বউ হয়ে। সারাদিন সে ক্ষেত খামারে কাজ করবে। মনটা পড়ে থাকবে বাড়ীতে। পদ্ম-ও ঘরে বসে সমস্ত গুনবে। সন্ধ্যেবেলায় বলরাম খেটে খুটে বাড়ী আসবে। বাড়ির বারান্দার এক পাশে বসে হাতমুখ ধোবে। নিকানো বারান্দায় পদ্ম ওর জন্যে গরম ভাতের থালা নিয়ে এসে বসবে। পাশে বসে খাওয়াবে।

ভাবতে ভাবতে কেমন যেন আনমনা হয়ে যায় বলরাম।

অবশেষ কথাটা একদিন পাড়লো বলরাম পদ্মর বাবার কাছে।

শুনে খানিকক্ষণ গুম্ মেরে ব'সে রইল পদ্মর বাবা ভজহরি। পাড়া-পড়শি মানুষ। বলরামদের সংসারের হাল-চাল যে অজানা তা তো নয়। একটা কানাকড়িও যে বাপের হাত দিয়ে বলরামের কপালে ছুঁবে—তা তো মনে হয় না।

খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বলে ভজহরি—

"কথা তোমার মেন্দা বটে বলরাম। কিন্তুক পদ্মরে নিয়ে খাওয়াবা কি তা ভাবিছ? বাপের বত নেছো?

বলরাম বলে—"না।"

ভজহরি খুক্ করে একটু হাসে। বলে—"ভয় ভাই ডাও আগে। আমি তো আর অরাজী নই। কিন্তুক, আর এট্টা কথা। কাল নীলমণি মোড়ল আইলো। পদ্মরে চায়। পাঁচ বিঘে জমি পদ্মর নামে নেইহে দেবে কইছে। তাই ভাবতিছি—"

বলরামের চোখ দুটো দপ্ করে জ্বলে উঠল। নীলমণি মোড়লকে সে ভালো করেই চেনে। পাশের বেনাখালি গাঁয়ে বাড়ী। অনেক জমির মালিক। লাভিদার মানুষ। হাড়ে হাড়ে বজ্জাত। আর পয়লা নম্বরের বামলাবাজ। লোককে ঠকাতে ওর জুড়ি নেই। জমিজিরেত নিয়ে অনেকদিন থেকেই নীলমণির সঙ্গে ওদের শত্রুতা। তাই—নীলমণির নাম শুনতেই কেমন যেন ক্ষেপে গেল বলরাম—

"নীলে মোড়ল? সেই বেজব'রে ঘাটের মড়াডার সাথে তুমি পদ্মর বিয়ে দেবা?"

দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলে ভজহরি—

"ঘাটের মড়া তুমি কারে কও বলরাম! মোটে তো তিনকুড়ি বোছোর বয়েস। সেই সেবার বড়ো আকাল হলো—সেই বোছোরই তো আমি হইলাম। নীলমণি মোড়ল বড় জোর তার বোছোর তিনচার আগে হইলো। এইতো?

তা পুরুষ মানুষির বয়েসের কি আর অভো বাচ্-বিচের চলে? তাছাড়া পাঁচ বিঘে জমি—সোজা কথাটা তো নয়রে বাপু!—"

পাঁচ বিঘে জমি!—এবার সত্যিই বলরামের বুকখানা চুপ্‌সে গেল। ভজহরির লোভের কথাটা বুঝতে পারল। পাঁচ বিঘে জমির লোভে ঐ দুধের মেয়েটাকে তিনকুড়ি বছরের বুড়োর হাতে গছিয়ে দিতে চায়। বলরামের নিজের বলতে এতোটুকু মাথা গোঁজার ঠিকানা নেই। কোথায় পাবে সে পাঁচ বিঘে জমি।

লাজলজ্জা ফেলে কথাটা একদিন বলেই ফেলো বলরাম বাপের কাছে। সনাতন মুখ গোঁজ করল শুনে। উত্তর দিল না। সৎ-মা পাশেই ছিল। কোলের ছেলেটার পিট চাপড়াতে চাপড়াতে ফোঁস করে বলল—"পাঁচ বিঘে ক্যানো, —ভিটে মাটি সুদ্ধ নেইহে দাও না!"

আর চুপচাপ থাকা যায় না। সনাতনই এবার জবাব দেয়—"নবাবের ব্যাটা নবাব আইছেন। পাঁচ বিঘে জমি দিয়ে বিয়ে! অমন বিয়ের মুখি ঝাঁটা মারি। জমি বানারে দেহিছিস্ হারামজাদা? বিয়ের সব হইছে জমি নেইহে দিয়ে। কি আমার হড়িসরে—"

মুখ বুজে সরে যায় বলরাম। উপায়ই বা কি।

তবে পদ্ম সত্যিই কি পরের ঘরে যাবে নাকি। পাঁচ বিঘে জমির জোরে তার পদ্ম—তার পদ্মফুলমকে আজ অন্যে নিয়ে যাবে। না, তা হবে না। ঠ্যাকাতে হবে। ঠ্যাকাতে হবে যেমন করে হোক।

অগত্যা বলরাম সালিশী ডাকে। ওদের বাকসী গাঁয়ের সব প্রধান ব্যক্তিরা আসে। বলরাম নালিশ জানায়। ভজহরির বিরুদ্ধে। নীলমণি ঘোড়লের বিরুদ্ধে। তার বাপের বিরুদ্ধে। কিন্তু হলে হবে কি। সালিশের মাতব্বরেরা সব নীলমণি-ঘোড়লের ধাই-খাতিরের মানুষ। কথাবার্তা যা হবার আগেই হয়ে ছিল। তবু সালিশের সভায় লোক দেখানো সলা-পরামর্শ হ'ল। চোখ টেপাটিপি হ'ল। শেষ-মেশ মাতব্বরেরা বলরামকে বললো—

"এ তোমার অনেষ্য নালিশ বলরাম। তুমি যানে জমি দিতি পারতিছো না, স্থানে আর কথা চলে না। নীলমণি ঘোড়ল জমি দেছে। সোতোরাং পদ্মর হক দাবীদার নীলমণি। পদ্মর বাবার ইচ্ছেডাও তো তাই। সব কথা পষ্টাপষ্টি কওয়াই ভালো।

ভজহরি এবার এগিয়ে আসে। হাত জোড় করে বলে—"হয় কত্তারা—হয়। আমার ইচ্ছেডাও তাই।"

বলরামের নালিশ নিবেদনে কাজ হলো না। পদ্ম আর নীলমণি ঘোড়লের বিয়ে একরকম ঠিক হয়েই গেল।

বলরামের দামাল বুকটার জ্বালা ধরে।

তার পদ্ম এবার পরের বউ হয়ে যাবে। কোনো অধিকার থাকবে না আর তার উপরে। ঘাট থেকে ফেরার পথে পদ্ম আর কোনোদিনই তার দিকে তাকাবে না। ফিক্ করে হেসে দুটো কথা বলবে না।

মনটা পুড়ে যায় বলরামের।

(ক্রমশঃ)

হেগেলীয় দর্শন

অনিল রায়

তারপরে হেগেলের দৃষ্টান্তগুলিও এখানে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক ; কারণ স্ববিরোধী-নীতির ঘুণাও কোথাও নেই এদের ত্রিসীমানার মধ্যে।

(১) **আবহ-ক্রিয়া** (Meteorological action) এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক ঘটনার (Process) ডায়ালেকটিক বা স্ববিরোধ প্রত্যক্ষ দেখা যায় ব'লে হেগেল বলেছেন (p. 150, Logic)। কিন্তু এর কোনো দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় নি। তবু আমরা যদি ধরে নিই যে "শান্ত আবহাওয়া" প্রকৃতিতে যখন দেখি, তখন বুঝতে হবে যে এরই মধ্যে রয়েছে "ঝড়ের" বীজ লুকিয়ে। অতএব, হেগেলীয় নীতি বলবে যে, এই "শান্ত আবহাওয়া" পদার্থটি স্ববিরোধী (self-contradictory)। কারণ একই "শান্ত আবহাওয়া" ও "ঝড়" একত্র বিদ্যমান থাকার দুটো বিরুদ্ধ স্বভাব পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে।

এখানে জবাব এই যে শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে ভবিষ্যৎ ঝড়ের সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে একথা সত্যি। কিন্তু সে ঝড় হচ্ছে ভবিষ্যৎ ঝড়, যার আবির্ভাব হবে শান্ত আবহাওয়ার জীবনকাল সাঙ্গ হয়ে গেলে। একটি অবস্থা শেষ হয়ে গেলে তবে অপর অবস্থার উদ্ভব হবে। কাজেই ভিন্ন কালে ও ভিন্ন অবস্থায় পর পর দুটো বিরুদ্ধ অবস্থা প্রকৃতিতে দেখা দিচ্ছে। এখানে একই স্থানে ও কালে যদি ঝড় ও শান্ত আবহাওয়া এই দুটো বিপরীত বিদ্যমান থাকা সম্ভব হ'ত তবে হেগেলীয় নীতি খাটত। কাজেই শান্ত আবহাওয়া স্ব-বিরোধের (self-contradictoriness) দৃষ্টান্ত হতেই পারে না। এই সত্য সকল রকমের প্রাকৃতিক অবস্থার বেলায়ই খাটবে এবং হেগেলীয় দৃষ্টান্ত হেত্বাভাসদুষ্ট (fallacious)।

(২) **অরাজকতা ও স্বেচ্ছাচার :** হেগেল বলেন, এক অবস্থা চরমে উঠে হঠাৎ করে বিপরীত-অবস্থায় পর্যবসিত হয়।*

এমন ঘটতে সর্বদাই দেখতে পাওয়া যায়। অরাজকতা অত্যধিক হয়ে দাঁড়ালে তার প্রতিক্রিয়া হয়ে দেখা দেয় 'স্বেচ্ছাচার', আবার স্বেচ্ছাচার থেকে অরাজকতার উদ্ভব হতে পারে।

এখানেও সেই চিরন্তন হেগেলীয় ভুলের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। যা ভিন্ন ভিন্ন কালে সত্য তাকে একই কালে সত্য ধরে নিয়ে স্ব-বিরোধের দৃষ্টান্ত' হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে। 'অরাজকতা' এবং স্বেচ্ছাচারতন্ত্র (Anarchy and Despotism) একই বস্তু নয় এবং যাকে অরাজকতা বলছি তাকেই স্বেচ্ছাচারতন্ত্র বলা যেতে পারে না। 'অরাজকতা'

---

* The extreme of one state or action suddenly shifting into its opposite (p. 130 Logic)

যখন চরমে উঠেছে তখনই তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে অরাজকতাকে অবসান করে আবির্ভাব হতে পারে 'স্বেচ্ছাচার-তন্ত্র'। এখানেও একই অর্থে ও একই কালে দুই বিপরীত অবস্থা ঘটছে না। পর পর ক্রমিক অর্থে একের অবসানে অপরের অভ্যুদয় ঘটছে।

(৩) আনন্দ ও বেদনা: হেগেল বলেছেন, আত্যন্তিক আনন্দ ও দুঃখ একই বস্তু।* আমরা আনন্দে অশ্রুবিসর্জন করি এবং অতি দুঃখেও হেসে ফেলি। হৃদয়বৃত্তির জগতের এই ব্যাপারও হেগেলের মতে পরস্পর-বিরোধের দৃষ্টান্ত।

এখানেও উইলিয়ম জেম্‌স্-এর ভাষায় আমারা বলব: "why not take heed to the meaning of what is said?" এখানে অর্থের গণ্ডগোলে পা দিয়ে তার আড়ালে আশ্রয় নেওয়া হয়েছে এবং অর্থের সন্ধান করলেই সেই একই গলদ বেরিয়ে পড়বে। এখানে অশ্রুকে দুঃখের চিহ্ন বলে ধরে নেওয়া হয়েছে এবং আনন্দের সঙ্গে 'অশ্রু' থাকলেই মানে করা হচ্ছে আনন্দের সঙ্গে দুঃখ রয়েছে। কিন্তু সবাই জানে যে, অশ্রু একটা শারীরিক ব্যাপার ও দুঃখ হচ্ছে হৃদয়ানুভূতির রাজ্যের ব্যাপার। চোখের গ্রন্থি কোনো রকমে প্রভাবিত হলেই চোখে জল আসবে। চোখে কুটো পড়লেও জল আসে। নাকে নস্য দিলেও জল আসে, আবার কাল খেলেও জল আসে। দুঃখেও যেমন, আনন্দেও তেমনি চোখের গ্রন্থি ক্রিয়াশীল হয়ে চোখে জল আসতে পারে। কাজেই অশ্রুকে একমাত্র দুঃখেরই নিদর্শন বলে ধরে নিয়ে দুঃখ ও অশ্রুকে সমার্থক মনে করে নিলে দুঃখের ও অশ্রুর দুই-এরই ভুল মানে করা হয়। আনন্দের সঙ্গে অশ্রু থাকলে অমনি তাকে আনন্দ ও দুঃখের সমবায় বললে ভুল করা হবে। 'আনন্দ' ও 'অশ্রু' বিপরীত ও পরস্পরবিরোধী সংজ্ঞা মোটেই নয়, কাজেই এক্ষেত্রে পরস্পর-বিরোধের একত্র সংস্থান ঘটেনি; অতএব হেগেলীয় নীতির দৃষ্টান্তও একে বলা চলে না। তারপর দুঃখ ও আনন্দ নিতান্তই অনুভূতির ব্যাপার: যে সময়ে হৃদয় আনন্দ উচ্ছল হয়ে উঠছে তখনই সেই একই অর্থে একই কারণে, একই ব্যাপারে দুঃখে হৃদয় বিকল হয়ে পড়েছে কিনা সেইটেই আসল কথা। একই সঙ্গে হৃদয় কূল ছাপিয়ে উপ্‌চে পড়ছে এবং শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে, এমন দৃষ্টান্ত সংসারে আছে বলে কেউ বলতে পারেন না। একই সঙ্গে উচ্ছল ও বিকল, একই কালে প্রাচুর্যে মুখর ও শূন্যতায় মূক হয়ে হৃদয় বোটানায় দোদুল্যমান হচ্ছে এমন অনুভূতি প্রাকৃত মানুষের জীবনে আছে একথা মনস্তত্ত্ব বলে না। দুঃখে মুখ হাস্যোজ্জ্বল হয়ে ওঠে এমন আমাদের জানা নেই। হাসি জিনিষটা নিতান্তই বাহিরের ব্যাপার, একেও আনন্দের অব্যর্থ নিদর্শন বলে ধরলে ভুল করা হবে। মরা মানুষের মুখও অনেক সময়েই স্মিত-হাস্যে প্রসন্ন দেখায়। তার মানে এমন নয় যে মৃত্যুর অন্তর সুখানুভূতিতে প্রসন্ন হয়ে উঠেছে। অবশ্য কৃত্রিম হাসি ও কাষ্ঠ হাসি ইত্যাদি অনেক পর্যায়ের হাসিও আছে যাকে সত্যিকার হাসি বলা চলে না। তেমন হাসিকে আত্মগোপনের উপায় হিসাবে দুঃখের আবরণ রূপে কেউ কেউ ব্যবহার করে থাকে। তাকে হেগেলীয় বিরুদ্ধতা-সমন্বয় বলা চলে না।

(৪) দেনা-পাওনা: এখানেও হেগেলের মতে 'অস্তি' ও 'নাস্তি' একই সঙ্গে একই কালে একত্র রয়েছে।†

দেনাদারের কাছে যা দেনা তাই পাওনাদারের কাছে পাওনা। একই বস্তু আসলে একজনের কাছে দেনা বা ঋণাত্মক (negative) এবং অপরের কাছে পাওনা বা ধনাত্মক (positive)। অতএব, এখানেও হেগেলের দাবী এই

* The extremes of pain and pleasure pass into each other (p. 151, Logic)

† What is negative to the debtor, is positive to the creditor (p. 222)

যে, স্ববিরোধ (self-contradiction) যেন-পাওনাতেও অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়ে রয়েছে। এখানেও হেগেলের যুক্তির বিরুদ্ধে আমাদের একই আপত্তি, যেমন আপত্তি ছিল আগেকার দৃষ্টান্তগুলিতে। এখানেও স্পষ্ট প্রতীত হচ্ছে যে দুটো বিপরীত সত্তা একই অর্থে ও একই দিক্‌ভূমি থেকে একত্র হয় নি এখানে। একই ব্যাপারকে দুটো বিভিন্ন দিক্‌ভূমি থেকে দেখলেও দুটো বিপরীত দিক থেকে নজর করলে দুজনে দুরকম দেখবে। এখানে অভেদ-নীতির (Law of Identity) বিরোধী এমন কোনো অভিনব অবস্থা ঘটেনি যাতে করে হেগেলের বিরোধ-নীতি (Contradiction) বহাল থাকতে পারে। এই অর্থে, একই দেশে ও কালে একই বস্তু সম্বন্ধে বিপরীত উক্তি করা চলবে না এই হচ্ছে অভেদ-নীতির (Law of Identity) দাবী। এখানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে বিপরীত প্রতিভাত হচ্ছে—একই কালে ও অর্থে নয়।

(৫) পূবের পথ ও পশ্চিমের পথ : পূবের পথ সর্বদাই পশ্চিমের পথ।* চুম্বকের উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু একে অন্যকে ছেড়ে থাকতে পারেনা।†

এসব ক্ষেত্রেও একই দোষে দুষ্ট হয়েছে হেগেলের যুক্তি ও দৃষ্টান্ত। এখানেও একই বস্তুকে দুই বিভিন্ন অর্থে বিরুদ্ধ বলা হয়েছে এবং এদের বেলায় হেগেলের বিরুদ্ধ-সমন্বয় নীতি চলছে না। এখানেও উইলিয়ম জেম্‌সের ভাষায় শুধু এইটুকু উল্লেখ করলেই চলবে যে এরা পরস্পরের বিরুদ্ধতা করছেনা।‡

(৬) জীবন ও মৃত্যু : হেগেলের মতে 'জীবনও একটি স্ববিরোধের দৃষ্টান্ত। কারণ জীবনেরই মধ্যে রয়েছে মৃত্যু বা জীবনের বিরুদ্ধভাব (anti-thesis)। মৃত্যু একটা আলাদা জিনিষ কিছু নয়: মৃত্যু হচ্ছে জীবনেরই অন্তর্গত একটা বিরোধী সত্তা। "জীবনে মৃত্যুর বীজ নিহিত; স-সীম বস্তু মাত্রই মূলত স্ব-বিরোধী অতএব আত্মবিলয় তার অন্তর্ভূত।[1] সকল সত্তারই ভিতর রয়েছে পরিবর্তনের বীজ এবং এই পরিবর্তনের বীজই জীবনের মধ্যে রয়েছে মৃত্যুর বীজ রূপে।" অস্তিত্বের ধারণার মধ্যেই পরিবর্তনশীলতা রয়েছে; আর পরিবর্তন হল যা অন্তর্দৃষ্ট তারই বহিঃপ্রকাশ।[2]

এখানেও হেগেল অর্থবিভ্রাট ঘটিয়েছেন এবং বিভিন্নার্থক দুটো ধারণাকে (concept) একসঙ্গে মিলিয়ে ফেলে গোলমাল করেছেন। জীবনের মধ্যে মৃত্যুর অস্তিত্ব নেই। কারণ, জীবন ও মৃত্যু দুটো একেবারে বিরুদ্ধ (opposite) বস্তু; এদের মধ্যে একটির অস্তিত্ব মানেই অপরের অনস্তিত্ব। যা "জীবিত" তা একই কালে "মৃত" হতে পারে না, তেমনি যা 'মৃত' তাও একই সঙ্গে 'জীবিত' হতে পারে না। জীবনের মধ্যে যে লুকিয়ে আছে, সে 'মৃত্যু' নয়; মৃত্যুর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা (future possibility)। একদিন 'মৃত্যুর' আবির্ভাব ঘটবে একথা ঠিক। কিন্তু যখন—ঠিক যে মুহূর্তে সত্যি সত্যি দেখা যাবে সেই মুহূর্ত থেকেই জীবন বিদায় নিয়েছে,

---

* 'The way to the East is always a way to the West.' (p. 222, Logic).

† The North Pole of the magnet cannot be without the South Pole and vice versa (p. 222, Logic).

‡ 'Do not contradict each other, for they obtain in different respects.'

1 "……—Life, as life, involves the germ of death and that the finite being radically self-contradictory, involves its own self-suppression. (p. 148, Hegel, Logic).

2 "……Mutability lies in the notion of existence and change is only the manifestation of what it implicitly is. 'The living die, simply because as living they bear in themselves the germ of death." (Logic of Hegel, 174)

একথা বলতে হবে। পরস্পর একই সঙ্গে নীড় বেঁধে জীবন ও মৃত্যু বসবাস করতে পারবে না। যখন জীবন আছে তখন ঠিক মৃত্যু নেই; আর যখন মৃত্যু এসেছে, তখন জীবন নেই। হেগেলের নিজের কথায়ও এই কথা অগোচরে স্বীকৃত হয়েছে, যখন বলা হয়েছে 'germ of death' বা মৃত্যুর বীজ। মৃত্যুর বীজ মানে 'মৃত্যুর সম্ভাবনা'। এবং 'মৃত্যুর সম্ভাবনা' ও 'মৃত্যু' এক বা সমার্থক নয়, হতে পারে না। এই ক্ষেত্রেও জীবন ও মৃত্যু ভিন্ন ভিন্ন কালে ও স্থানে পর পর আসতে বা থাকতে পারে, কিন্তু একই অর্থে একত্র থাকতে পারে না। এরা একই কালে বিপরীত শ্রেণীর (opposite category) পদার্থ বটে, সেই জন্য একে অন্যকে খণ্ডন বা negate করে। এরা যদি ভিন্ন শ্রেণীর (distinct category) হতো, তবে অবশ্য একের সঙ্গে অপরের একত্র থাকার বাধা ছিল না। এখানেও দেখাতে পাচ্ছি সেই একই ত্রুটি যাকে কোচে বলেছেন ভিন্নতার অভাব ('lack of distinction') এবং তজ্জনিত গোলযোগ (confusion)।

উপরোক্ত সকল দৃষ্টান্তেই হেগেলের একই ত্রুটি ও অসঙ্গতি ঘুরে-ফিরে প্রকাশিত হচ্ছে। একটা metaphor-এর মোহ তাকে আবিষ্ট করেছে; তার ফলে যা ভিন্ন কালে ও ভিন্ন অর্থে সম্ভব হয় তাকে তিনি একই কালে একই অর্থে একত্র সম্ভব বলে মনে করেছেন এবং মনের এই বিমূঢ় অবস্থায় কল্পনা করেছেন যে জগতের সব কিছুই পরস্পর-বিরোধী দু'টো সংজ্ঞাধর্ম্ম অনুপ্রবিষ্ট হয়ে রয়েছে। যা বিভিন্ন কালে ও অর্থে সম্ভব হতে পারে তা যে একই কালে ও অর্থে সম্ভব হতে পারে না—একথা তাঁর প্রখর বুদ্ধির কাছেও ধরা পড়ে নি। "কাল্পু" নামক তত্ত্বকে তিনি বরাবরই বিস্মৃত হয়েছেন এবং এই বিস্মরণের ফলেই তাঁর দার্শনিকের যত অসঙ্গতি জন্ম নিয়েছে।

(৭) আর একটি যুক্তি অভেদ-নীতির (Law of Identity) বিরুদ্ধে দেওয়া হয়ে থাকে এবং এই যুক্তি নেওয়া হয়েছে গতিতত্ত্ব থেকে। জগতের সব বস্তুই চলিষ্ণু এবং বিশ্ব-সংসারের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু প্রতি মুহূর্তে বদলে নতুনতর পরিণতির পথে চলেছে। এমন করে রূপ বদলাচ্ছে যারা, তারা ঠিক সেই একই বস্তু কী করে থাকবে? প্রতি পলকে সবাই নূতন জন্ম নিচ্ছে, ফলে তাদাত্ম্য বা অভেদ (identity) বলে কোন জিনিসই সংসারে থাকছে না। যদি সকল বস্তুই স্থাণুর মতন অক্ষয় ও অনড় হয়ে যুগে থাকতো, তবে প্রত্যেকেই সেই সেই বস্তুই থাকতো বটে। কিন্তু বাস্তব জগতের অভ্রান্ত গতির মধ্যে কারুরই একই কায়গায় ও একই অবস্থায় অচল হয়ে থাকবার জো নেই।

হেগেল বলেন পরিবর্ত্তনের জগতে অভেদ-নীতি (Law of Identity) খাটতে পারে না, কারুরই তাদাত্ম্য (Identity) বজায় থাকছে না। অতএব এখানে যে তত্ত্ব গোড়ায় রয়েছে সে হচ্ছে বিরোধতত্ত্ব (contradiction)। প্রত্যেকটি পরিবর্ত্তনশীল বস্তু নিজেকে নিজেই অনবরত খণ্ডন করছে এবং এই কারণেই প্রত্যেকটি বস্তুই স্ব-বিরোধের (Self-contradiction) মূর্ত্তিমান বিগ্রহ (Logic, p. 148, Note 1)। মানুষ, জীব, জন্তু, গাছ-পালা, গ্রহ, উপগ্রহ এরা সকলেই গতিমান, মানে, এরা পরিবর্ত্তিত হচ্ছে। এরা সকলেই স্ববিরোধের (Self-contradiction) দ্বারা জর্জ্জরিত। যেখানে গতি, সেখানেই স্ববিরোধ, সেখানেই ডায়ালেকটিক। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নেওয়া যেতে পারে চলমান কোনো একটি বস্তু, যেমন গ্রহ। গ্রহ সম্বন্ধে হেগেলীয় নীতি বলছে: যে গ্রহটি কোন একটি বিশেষ স্থান-বিন্দুতে (point of space) আছে কি নেই, এই প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে বলতে হবে, "গ্রহটি সেই স্থান-বিন্দুতে আছে এবং নেই, এই দুই-ই ঠিক।" "আছে-ও এবং নেই-ও"—একই সঙ্গে ও একই কালে এই দুটো পরস্পর-বিরুদ্ধ যুক্তিই যেক্ষেত্রে সত্য গ্রহটি সম্বন্ধে। "আছে" কারণ ঐ স্থানটি গ্রহের পথে পড়েছে বলে গ্রহকে

ঐ বিন্দু অতিক্রম করে যেতেই হচ্ছে, এবং এই মুহূর্তে গ্রহ ওখানে আছে। কিন্তু "আছে" একথাতেও পুরো সত্যটি প্রকাশ পেল না। কারণ, গ্রহটি গতিমান এবং পরমুহূর্তেই গ্রহটি ঐ স্থানকে ছাড়িয়ে পরের স্থান-বিন্দুতে উত্তীর্ণ হয়েছে। 'আছে' বলতে গিয়েই দেখতে পাচ্ছি গ্রহটি ঐ স্থানে আর নেই। কাজেই হেগেলীয় নীতিতে ঐ গ্রহ ওখানে 'আছে' এবং 'নেই' এই দুই-ই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে চলমান বস্তুগুলি স্ববিরোধের একেবারে জলন্ত মূর্তি এবং একই সঙ্গে 'হাঁ' ও 'না' এই দুই বিরোধী অভেদনীতি (contradictory) উক্তির আশ্রয়। এখানে অভেদনীতি (Law of Identity) দ্বারা এই তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব ; একে বুঝতে হলে contradiction-এর logic-এর সাহায্যে বুঝতে হবে। এই তো গেল হেগেলীয় তরঙ্গের কথা।

(ক্রমশঃ)

॥ গান্ধী স্মারক নিধির বই ॥

বাহির হইল

সর্বোদয়ের পথ

বর্তমান ভারতের নানাবিধ সমস্যার উপরে আচার্য বিনোবা ভাবে, শ্রীআর. আর. দিবাকর, ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, জয়প্রকাশ নারায়ণ, ইউ. এন. ধেবর, প্রমুখ বিশিষ্ট গান্ধীবাদী নেতৃবর্গের ভাষণের সংকলন

মূল্য ৩·০০

•

মহাত্মা গান্ধী বিরচিত

মোহনমালা

দিনে একটি করিয়া সারা বৎসরের ব্যবহারযোগ্য গান্ধীবচনের জপমালা

মূল্য ৩·৫০

•

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

গান্ধীজীর অর্থনৈতিক দর্শন

মূল্য ৫·৫০

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

মহাত্মা গান্ধী

লেখকের ব্যক্তিগত স্মৃতিবিজড়িত অনবদ্য জীবনী

মূল্য : ৬·৫০ (কাপড়ে বাঁধাই) ও ৫·৫০

•

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রণীত

মহাত্মাজীর গঠনকর্ম-পদ্ধতি

গান্ধীজীর ১৮-দফা রচনাত্মক কার্যসূচীর দার্শনিক বিশ্লেষণ

মূল্য ৩·০০

•

প্রস্তুতির পথে

গান্ধী-রচনা-সংকলন

•

অন্যান্য বইয়ের তালিকার জন্য লিখুন

প্রকাশন বিভাগ,
গান্ধী স্মারক নিধি (বাংলা)
১২ডি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

Quality enamel products

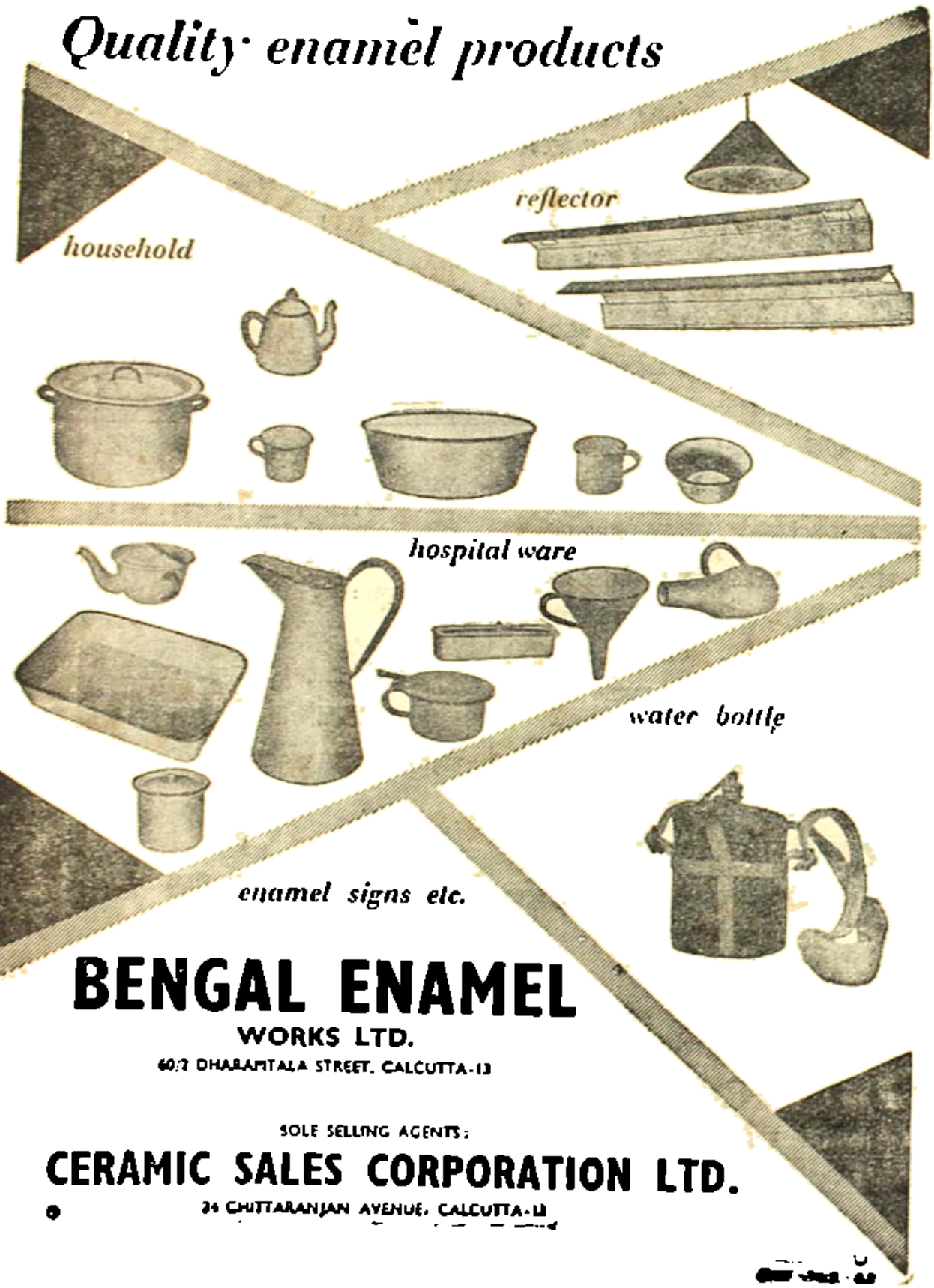

BENGAL ENAMEL
WORKS LTD.

60/2 DHARAMTALA STREET. CALCUTTA-13

SOLE SELLING AGENTS:

CERAMIC SALES CORPORATION LTD.

24 CHITTARANJAN AVENUE. CALCUTTA-13

সম্পাদকীয়

(৮ম পৃষ্ঠার পর)

প্রয়োজন বোধ করলে আণবিক বোমা প্রস্তুত করতে পারে। অর্থাৎ পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের চাইতে পারমাণবিক বিস্তারের দিকেই প্রীরামমূর্তির ঝোঁক, তার ফলে বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা গাঢ়তর হলেও।

পলিট ব্যুরোর সদস্যদের চীনা আনুগত্য ও ভারতীয় নিরাপত্তা বিপ্লবকারীদের সম্পর্কে মৈত্রীসুলভ মনোভাবের তাদের পুরাতন মানসিকতার সুরই ধ্বনিত হয়েছে। সুতরাং ভারতীয় রাজনীতিতে এবং জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে তাদের স্থান সম্পর্কে কোনো ভুল ধারণার অবকাশ নাই। কলকাতায় কেন্দ্রীয় দপ্তর স্থানান্তরের তাৎপর্য তাই খুবই স্পষ্ট।

রবীন্দ্র স্মরণীর উদ্বোধনে লাঠিচার্জ

জাতীয় নাট্যশালা রচনা করে কবিগুরুর স্মৃতিরক্ষার যে পরিকল্পনা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলকাতায় রবীন্দ্র স্মরণী নির্মাণের কাজ ১৯৬১ সালে আরম্ভ করেছিলেন ১৯৬৬ সালের ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র স্মরণীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য সমাগত হাজার হাজার মানুষকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শুধু সেই অনুষ্ঠানে প্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিতই করেন নাই, নৃশংস লাঠি চার্জ করে তাদের স্বাগত জানিয়েছেন। যে মহাকবি সাধারণের সবতলে এসে জীবনের জয়গান গেয়ে গেছেন, সকল স্তরের মানুষই যাঁর সৃষ্টির মধ্যে আপন অন্তরের অনুভূতির অকৃত্রিম প্রতিফলনে কবিকে আপনজন বলে জেনেছেন, তাঁরই স্মারক ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানটিকে বুরোক্র্যাসীর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখার ফলে স্বভাবতই সাধারণ মানুষের বেদনাহত মন এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া, বহু সংস্কৃতিবান নাগরিক ও প্রখ্যাত নানা শিল্পীদেরও প্রবেশাধিকারের আমন্ত্রণ জানাবার শালীনতাবোধটুকু পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের সরকারী আমলারা হারিয়ে ফেলেছিলেন। যে সরকারের লাঠি এবং বন্দুকই একমাত্র সহায় হয়ে উঠেছে, রবীন্দ্র স্মৃতি অনুষ্ঠানটিকে সাধারণ মানুষের ছোঁয়াচ থেকে বাঁচিয়ে তারা কুক্ষিগত রাখবার জন্য পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করবে তাতে আর বিচিত্র কি! রবীন্দ্রনাথের নাম নিয়ে এ ধরণের বাড়াবাড়ি ক্ষমার অযোগ্য।

পরীক্ষা ভণ্ডুল

প্রশ্নপত্র কঠিন হবার অজুহাতে এবার মে মাসের গোড়ায় বি, এ; বি, এস, সি পার্ট ওয়ান পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী ভবন, আশুতোষ হল ও ছাত্রভাঙ্গা হলে দশদিনের মধ্যে তিনবার কিছু সংখ্যক পরীক্ষার্থীর উচ্ছৃঙ্খলতায় বাতিল হয়ে যায়। ১০ই মে শেষবারের মত পরীক্ষা ভণ্ডুল হবার পর এই তিনটি কেন্দ্রে পার্ট ওয়ানের অবশিষ্ট পরীক্ষাগুলিও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাতিল করে দিয়েছেন। কিছু সংখ্যক ছাত্রের এই উচ্ছৃঙ্খল আচরণে বহু পরিশ্রমী ও জীবন সংগ্রামে নিয়োজিত পাঠের সুযোগে বঞ্চিত দরিদ্র পরীক্ষার্থীর অমূল্য সুযোগও হয় তো নষ্ট হয়ে গেলো। এই দুষ্কর্মের জন্য উচ্ছৃঙ্খল ছাত্ররা অবশ্যই দায়ী কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বও কিছু কম নয়। ভুল প্রশ্নপত্র, ভুল নির্দেশ কিম্বা দ্ব্যর্থবোধক নির্দেশ দানে পরীক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করে কিম্বা পাঠ্য বহির্ভূত প্রশ্নপত্র রচনা করে যে বিভীষিকার পরিবেশ তারা রচনা করেন, প্রতিবছর তার মানসিক প্রতিক্রিয়ার ফলে অমনোযোগী ও অপড়ুয়া পরীক্ষার্থীরা প্রাথমিক গোলমালের সূচনা করে একদল পরীক্ষার্থীর মানসিক বিপর্যয়ের কারণ হয়। এইভাবে গোলমাল উচ্ছৃঙ্খলতার রূপ নিয়ে পরীক্ষা ভণ্ডুলে পরিণতি পায়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এতোদিনে পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে তদন্তের জন্য কমিশন বসাবার কথা ভাবছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সামগ্রিক পাকিলতি ছাত্রসমাজের ও

শিক্ষাব্যবস্থার অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করেছে। অবিলম্বে পরীক্ষা নেওয়া বন্ধ করে উচ্ছৃঙ্খল পরীক্ষার্থীদের হাত থেকেও যেমন সাধারণ পরীক্ষার্থীদের রক্ষা করতে হবে, তেমনি প্রশ্নকর্তাদের খামখেয়ালী থেকেও তাদের বাঁচাতে হবে।

স্কট বিতাড়ন

নাগা শান্তি মিশনের অন্যতম সদস্য রেভারেণ্ড মাইকেল স্কটকে অবশেষে ভারত সরকার বহিষ্কার করেছেন। গত ৩রা মে এই বহিষ্কারের নোটিশ সিলং-এ জারী হয়। মাইকেল স্কট ১৯৬৪ সালের জানুয়ারীতে ওখাতে নাগা ব্যাপটিষ্ট চার্চের সম্মেলনে নাগা শান্তি মিশনের সদস্য নির্বাচিত হবার পর থেকে ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী নাগাদের প্ররোচিত করে এসেছেন এবং স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম বিদ্রোহী নাগাদেশের পক্ষে বিভিন্ন রাষ্ট্রের, রাষ্ট্রসঙ্ঘের এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার নিকট গোপনে সুপারিশ করে এসেছেন। বিদ্রোহী নাগাদের একটি ভারত-বিরোধী পত্রও তিনি বিদেশী বিভিন্ন সংস্থার নিকট প্রচার করেছেন। সম্প্রতি বিদ্রোহী নাগাদের কর আদায়ের সমর্থনেও তিনি প্রচারপত্র বিলি করেছেন। স্কটের ভারতবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বহুপূর্বেই জনমত বিক্ষিপ্ত হয়েছিল; অথচ, শান্তির মরীচিকায় অন্ধ হয়ে ভারত সরকার ভারতের নিরাপত্তাবিরোধী চক্রান্তকারী এই ইংরেজ ধর্মযাজকটিকে বরদাস্ত করে বিদ্রোহী নাগাদের সম্পর্কে বাস্তব মনোভাব গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন।

মাইকেল স্কটের কালো ছায়া তথাকথিত শান্তিমিশনের অপর সদস্য আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহাকে কতটা বিভ্রান্ত ও কর্তব্যভ্রষ্ট করেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় গত এপ্রিলে জোড়হাটের নিকট বিদ্রোহী নাগাদের দুই জন মন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করার পর শ্রীচালিহার নির্দেশে তাদের মুক্তিদানে। যদিও গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী কারকাটিং-এ ট্রেণের উপর যে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল সে-সম্পর্কে দলিল এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধীর নামও এই তথাকথিত মন্ত্রীদের নিকট পাওয়া গিয়েছিল। স্কটের প্রভাবে শান্তির মোহান্ধ শ্রীচালিহা শুধু যে এদের মুক্তি দিলেন তা নয়, এদের কাছে যে দলিল ছিল, ফটোষ্টাট কপি রেখে সেটিও ফেরৎ দিলেন। এই কারকাটিং বোমা বিস্ফোরণের পর লামডিং ও ডিমাপুরে বোমা বিস্ফোরণ হয়ে গেল। শ্রীচালিহার পরাজিতের মনোভাব, শান্তির বিভ্রান্তি ও প্রশাসনিক অকর্মণ্যতাও বিদ্রোহী নাগাদের এবং স্কটকে স্পর্ধা যুগিয়েছে। তাই স্কট বহিষ্কারের সঙ্গে চালিহার পদত্যাগও অপরিহার্য হয়ে উঠেছে এবং পরিশেষে বিদ্রোহীদের সঙ্গে মন্ত্র মধুর আলোচনারও অবসান চাই যদি না ইতিমধ্যে তারা ভারতীয় সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে নেয়। ১৪.৫.৬৬

২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভায়ন্ত্রী

৩১ বর্ষ ০ দ্বিতীয় সংখ্যা ০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩

সম্পাদকীয়

ডিভ্যালুয়েশন

মাত্র কিছুদিন পূর্বে লোক সভার ভেতরে এবং বাইরে অর্থ-মন্ত্রী এবং পরিকল্পনা মন্ত্রী টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাসের সম্ভাবনাকে জোরের সঙ্গে অস্বীকার করা সত্ত্বেও গত ৫ই জুন মধ্যরাত্রে ডিভ্যালুয়েশন সম্পর্কে ভারত সরকারের আকস্মিক সিদ্ধান্ত অর্থমন্ত্রী বেতারে ঘোষণা করেন। তৃতীয় পরিকল্পনার মূল্যায়নের জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক কর্তৃক নিয়োজিত বেল মিশনের রিপোর্টের পরই টাকার ডিভ্যালুয়েশনের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাসের সঙ্গে ভারতীয় আর্থিক নীতির অন্যান্য দিকে পরিবর্তন সাপেক্ষে ভবিষ্যতের বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর করবে। বেল মিশনের রিপোর্টে সে সম্পর্কে অনুচ্চারিত ইশারা ছিল। এই রিপোর্টের পরই লালবাহাদুর শাস্ত্রীর প্রধান মন্ত্রীত্বের আমলেই চতুর্থ পরিকল্পনার আয়তন নিয়ে কিছুদিন বিতর্ক চলেছিল। সেদিন বিতর্কের বিষয় ছিল, ১৯৬৬ সালে চতুর্থ পরিকল্পনা শুরু করা হবে না, চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম বছর প্রথম তিনটি পরিকল্পনার উন্নয়নের সংহতি সাধনে ব্যয়িত হবে। সেদিন থেকে ভারতীয় আর্থিক পরিস্থিতির উপর বিশ্বব্যাঙ্কের মধ্য দিয়ে যে মার্কিনী চাপ শুরু হয়েছিল, ধীরে ধীরে তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইতিমধ্যে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার তহবিলও শোচনীয় ভাবে হ্রাস পায় এবং ব্যালেন্স অফ পেমেন্টের ঘাটতিও সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে পৌঁছায়। এই সঙ্কট মোচনের জন্য ইন্টার ন্যাশন্যাল মনিটারী ফাণ্ডের স্বল্পকালীন তহবিল থেকে ঋণের (stand by credit) সুযোগও ভারতের পক্ষে দুরূহ করে তুলে এই পথেও ভারতের উপর চাপ দেওয়া হয়। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর এই আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থাগুলির পক্ষে ভারতের উপর চাপ দেবার আরও সুযোগ উপস্থিত হয় এবং সেই অবসরে আমদানীর পথে অন্তরায়গুলি দূর করার জন্য, ভারতে শিল্প বিস্তারের পথে রুকটোল, শিল্পসম্পর্কিত লাইসেন্স ইত্যাদি বিধি-নিষেধ গুলি অপসারণের এবং সর্বোপরি টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাসের চাপ দুর্বার হয়ে ওঠে। শ্রীকৃষ্ণমাচারীর অর্থমন্ত্রীত্বের আমলেই এই চাপ প্রবল হয়ে উঠলেও, ভারত সরকার সেই চাপের সামনে পুরোপুরি নতি স্বীকার করে নাই। এই চাপেরই উত্তরে শ্রীকৃষ্ণমাচারী ১০৭ কোটি টাকার সাপলিমেন্টারী বাজেট এনেছিলেন। এই মার্কিনী চাপের ফলেই ভারতের শিল্পনীতির ধীর-পরিবর্তন দেখা গেলো, সার উৎপাদনের ক্ষেত্রে বেসরকারী মার্কিনী

পুঁজির পাবলিক সেক্টারে অনুপ্রবেশ এবং দীর্ঘ বছরের জন্য বন্টন ব্যবস্থা ও মূল্যস্তর নির্ধারণে অবাধ সুযোগ। এই নীতিরও পরিবর্তন হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ বেসরকারী মার্কিনী পুঁজির সঙ্গে সংখ্যালঘিষ্ঠ ভারতীয় বেসরকারী পুঁজির সমবায়ে সার কারখানা স্থাপনে ভারত সরকারের স্বীকৃতিতে। ভারত সরকারের নীতি নির্ধারকেরা ভেবেছিলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মার্কিন সফরের পর মার্কিনী আর্থিক সাহায্য পুনরায় প্রসারিত হবার পথে যেটুকু অন্তরায় ছিল সার শিল্পের উৎপাদনে মার্কিনী পুঁজি ঢোকণের পর তা দূর হয়ে যেতো। অন্তত ভারত সরকারের মুখপাত্রেরা এই ধারণা সৃষ্টিতে খুবই সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু শ্রীঅশোক মেহতার মার্কিন সফরের পর সন্দেহ রইলোনা আমদানীর পথ সুগমের, শিল্পায়নের ক্ষেত্রে নানা বিধি-নিষেধ অপসারণের, প্রতিরক্ষা ব্যয় হ্রাস ও তার সীমা নির্ধারণে এবং সর্বোপরি টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাসের সর্তসাপেক্ষে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাবে। অন্যথা নয়। শ্রীঅশোক মেহতার "মনের মিলনের" বুদবুদ চৌচির করে গত ২৭ শে মে তারিখে ইন্টারন্যাশনাল মনিটরী ফাণ্ড থেকে শেষ বারের মত নির্দেশ এলো অবিলম্বে ডিভ্যালুয়েশনে স্বীকৃত না হলে, চতুর্থ প্ল্যানের জন্য কোনো সাহায্যই বরাদ্দ করা সম্ভব হবে না। ভারত সরকার সেই আদেশ শিরোধার্য করে নিয়ে ভারতের আর্থিক সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিল।

সুতরাং ডিভ্যালুয়েশন একদিকে যেমন গভীর আর্থিক সঙ্কটের স্মারক আর একদিকে তেমনি বৈদেশিক আর্থিক সংস্থা তথা মার্কিনী নির্দেশের নিকট নতি স্বীকার করে একটি গুরুতর রাজনৈতিক সঙ্কটের অস্তিত্বও ঘোষণা করেছে। ভারতের আর্থিক ব্যবস্থার ওপর মার্কিনী হস্তক্ষেপের সীমানা অতঃপর অনায়াসে ক্রমবিস্তৃত হবে এবং একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে সে-পথে রাজনৈতিক সঙ্কটও ঘনিয়ে আসবে।

বালান্স অফ ট্রেড অর্থাৎ রপ্তানীর ওপর আমদানীর আধিক্যের ফলে বৈদেশিক মুদ্রার ক্রমবর্ধমান ঘাটতি মেটাবার তাগিদেই টাকার বিনিময়মূল্য হ্রাসের অযৌক্তিক প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল, অর্থমন্ত্রীর এই যুক্তির অন্তঃসারশূন্যতা সহজেই সপ্রমাণ করা যায়। ১৯৪৯ সালের কথাই ধরা যাক। সে-বছর আর-একবার টাকার বিনিময়ে মূল্য হ্রাস করা হয়েছিল। সে-সময় ডলারের মূল্য ছিল ৩·৩০ টাকা এবং বিনিময় মূল্য হ্রাসের পর দাঁড়ায় ৪·৭৬ টাকা। ১৯৪৮-৪৯ সালে বালান্স অব ট্রেডের ঘাটতি ছিল ১৮৫ কোটি টাকা। ডিভ্যালুয়েশনের পর ১৯৪৯-৫০-এ এই ঘাটতি কমে ১৪১ কোটি টাকায় এবং ১৯৫০-৫১তে ৪৯ কোটিতে দাঁড়ায় কিন্তু ১৯৫১-৫২ সালে এটা বৃদ্ধি পেয়ে ২৩৭ কোটিতে পৌঁছায়। তারপর থেকে বৃদ্ধির দিকে এবং বর্তমানে এর পরিমাণ প্রায় ৫০০ কোটি টাকা।

টাকার বিনিময় হার ডলার প্রতি ৪·৭৬ টাকা থেকে ৭·৫ টাকায় এবং ষ্টার্লিং প্রতি ১৩·৩৩ টাকা থেকে ২১ টাকায় বৃদ্ধি হয়েছে। অর্থাৎ শতকরা বিনিময় মূল্য হ্রাসের ৫৭·৫ টাকা, যদিও টাকাপ্রতি সোনার পরিমাণ বিচারে এই হারের পরিমাণ শতকরা ৩৬·৪। ডিভ্যালুয়েশনের ফলে রপ্তানীর মূল্য কমে রপ্তানি বৃদ্ধি করবে এবং আমদানীর মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে আমদানী কমাবে, অর্থনীতির এই সূত্র অনুযায়ী আন্তর্জাতিক বানিজ্যিক ঘাটতি হ্রাসে সহায়তা করে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রাসঙ্কট দূর হবে, ডিভ্যালুয়েশন ভারতীয় অর্থনীতিকে এই পরিণতিতে পৌঁছে দেবে কিনা সে-সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ রয়েছে। ডিভ্যালুয়েশনের ফলে রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে এবং আমদানী কমবে ভারতবর্ষের আমদানী-রপ্তানীর প্রকৃতি বিচারে দেখা যাবে তা বোলআনা সম্ভব নয়। কারণ, রপ্তানি-যোগ্য পণ্যের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগই দ্রব্যাদিগত পণ্য যাকে বলা হয়

traditional exports যেমন পাট, চা, কফি, তামাক তৈলবীজ, চামড়া, কাপাস শিল্পজাত দ্রব্য প্রভৃতি। রপ্তানি-যোগ্য উদ্বৃত্ত পণ্য থাকলেই রপ্তানির সুযোগ বৃদ্ধির সদ্ব্যবহার হতে পারে। সম্প্রতি চটকলগুলি কাঁচা পাটের অভাবে সাত দিন বন্ধ ছিল আবার হয়তো বন্ধ থাকতে পারে। পাটের বাণিজ্যে পাকিস্তান ভারতের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। ডিভ্যালুয়েশনের ফলে ভারতীয় রপ্তানীর মূল্য হ্রাস পেয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে পাকিস্তানের চাইতে ভারতীয় পাটজাত পণ্য বেশী সুবিধা পাবার সম্ভাবনা। সেই অতিরিক্ত সুবিধা বন্ধ করার সকল রকম সম্ভাব্য পথ পাকিস্তান গ্রহণ করবে। প্রয়োজন হলে তাদের টাকার বিনিময় মূল্যও হ্রাস করবে। চা এর ক্ষেত্রেও সেই একই কথা খাটে। সিংহল ভারতীয় চা-শিল্পের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। তাছাড়া, যদি আন্তর্জাতিক বাজারে অধিক পণ্য বিক্রয়ের সুযোগও উপস্থিত হয়, অধিক পণ্য যোগান দেবার জন্য অধিক উৎপাদন প্রয়োজন হবে। রাতারাতি তা সম্ভব হবে না। এবং বাণিজ্যিক ফসলপণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে দেশের অভ্যন্তরে খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জমিতে টান পড়বে। তৈলবীজের রপ্তানি ভারত সরকার ইতিপূর্বেই বন্ধ করে দিয়েছে, কারণ দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারে চাহিদা মেটাবার মত যোগানই যেখানে নাই, সেখানে রপ্তানি বৃদ্ধির প্রশ্ন অবান্তর। তাই সামুদ্রী রপ্তানী পণ্যের ক্ষেত্রে ডিভ্যালুয়েশন সত্ত্বেও রপ্তানি বৃদ্ধির সুযোগ খুবই সীমিত। উপরন্তু টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাসের ফলে ডিভ্যালুয়েশনের পূর্বেকার রপ্তানী-সীমার বৈদেশিক মুদ্রার আয় বজায় রাখতেই অধিকতর পণ্য রপ্তানী করতে হবে। অন্তত শতকরা ৫১·৫ ভাগ রপ্তানি বৃদ্ধি না হলে পূর্বেকার রপ্তানীসীমার আয়ও বজায় রাখা যাবে না সে-কথাও স্মরণ রাখতে হবে। রপ্তানীর অবশিষ্ট ক্ষেত্রে, (Non-traditional items) যা মোট রপ্তানি বাণিজ্যের শতকরা ২০ ভাগমাত্র যথা ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের রপ্তানি সাময়িকভাবে কিছু বৃদ্ধি পেলেও, শেষ পর্যন্ত এই পণ্যগুলির ডিভ্যালুয়েশন-জাত মূল্য হ্রাসের সুযোগ অন্তর্হিত হয়ে এই পণ্য দ্রব্য গুলির মূল্যবৃদ্ধি ঘটাবে এবং সেই কারণে এই পণ্য গুলির রপ্তানি হ্রাস পাবে। ১৯৬৫-৬৬ সালের বাণিজ্য বছরালেখের রিপোর্টেও বলা হয়েছে ডিভ্যালুয়েশন রপ্তানী বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে না।

এই পণ্য গুলির মূল্যবৃদ্ধি ঘটার কারণ এই পণ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় আমদানীকৃত যন্ত্রপাতি, কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি, যা ডিভ্যালুয়েশনের ফলে অবশ্যম্ভাবী হবে। যেহেতু, ডিভ্যালুয়েশনের ফলে টাকার পরিমাণে আমদানী পণ্যের মূল্য শতকরা ৫১·৫ ভাগ বৃদ্ধি পাবে কারণ টাকার বিনিময় মূল্য এই হারেই হ্রাস করা হয়েছে। সুতরাং যে পণ্য উৎপাদনে আমদানীকৃত যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল প্রয়োজন সেই সকল পণ্যেরই নিহিত আমদানীকৃত অংশের অনুপাতে মূল্য বৃদ্ধি অনিবার্য। কিন্তু ডিভ্যালুয়েশনের ফলে আমদানী পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি যেহু আমদানি হ্রাসের যুক্তিও অসার। ভারতবর্ষ বছরে প্রায় ১৪০০ কোটি টাকার পণ্য আমদানী করে। ডিভ্যালুয়েশনের ফলে এর মূল্য শতকরা ৫১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২২০০ কোটি টাকায় দাঁড়াবে। আমদানী যে হ্রাস পাবেনা তার কারণ এই ১৪০০ কোটি টাকার আমদানীর মধ্যে খাদ্য আমদানী একটি বৃহৎ অংশ দখল করে আছে, প্রায় ৫০১·৩ কোটি টাকা (১৯৬৪-৬৫) তাছাড়া অত্যাবশ্যক কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের জন্য যন্ত্রাংশ ও অতিরিক্ত যন্ত্রের জন্যও ৬৮০ কোটি ব্যয় হবে এই ১৪০০ কোটির মধ্যে। এই আমদানীপণ্যগুলি রপ্তানীমুখীন বলেই এদের ছাঁটা যাবে না। সুতরাং আমদানী হ্রাসের সম্ভাবনাও কম। অথচ আমদানীকৃত পণ্যের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি, অন্তত শতকরা ৩৬·৫ ভাগ সকল আমদানী দ্রব্যেরই

মূল্যবৃদ্ধি করে সাধারণ মূল্যবৃদ্ধিতে ঘুরত ইন্ধন যোগাবে। রপ্তানী পণ্যও তা থেকে রেহাই পাবেনা। আমদানী নীতির (নমনীয়তা) liberalisation দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়তা করে মূল্যবৃদ্ধি রোধে সক্ষম হবে, সরকারী স্তরে এই আশা ভাবের ঘরে চুরি মাত্র। কারণ শিল্পে উৎপাদন ক্ষমতার স্বল্পতা আজও উন্নয়নের পথে অন্তরায় হয়ে রয়েছে।

ডিভ্যালুয়েশনের এই সর্বনাশা পরিণতির আভাস ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তরিতরকারীর বাজার থেকে সুরু করে সর্বত্রই একটানা মূল্যবৃদ্ধির নূতন ঝোঁক দেখা দিয়েছে। অর্থমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেছেন, গত ১০ বছরে শতকরা ৮০ ভাগ মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে এবং পাঁচ বছর পূর্বেও যে মূল্যস্তর ছিল সেখানে আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। ১৯৬৫ সালের মে'র মাঝামাঝি থেকে ১৯৬৬-র মে'র মাঝামাঝি মূল্য সূচক ১৪৫'৬ থেকে ১৮১'৭-এ এসেছে, অর্থাৎ এক বছরে শতকরা ১৬'৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর ৬৬র এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে এ-বছরের মে'র মাঝামাঝি ১৭৬'২ থেকে ১৮১'৭-এ মূল্য সূচক বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ এক মাসে শতকরা ৩'১ ভাগ! মূল্যবৃদ্ধির এই মারাত্মক প্রবণতার মুখে ডিভ্যালুয়েশন আরও কয়েক মাত্রা মূল্যবৃদ্ধির ঝোঁক যোগ করে দিয়ে গেলো, যার পরিণতিতে টাকার আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক মূল্য আরও দ্রুত ক্ষয়িষ্ণু হয়ে আর একটি ডিভ্যালুয়েশনের মুখে অনতিকালের মধ্যে পৌঁছে যেবে কিনা সেই আতঙ্ক এখন থেকেই উঁকি দিচ্ছে। মূল্যনিয়ন্ত্রণের কোনো বলিষ্ঠ কাঠামো রচনা না করে মার্কিনী চাপে টাকার বিনিময় হার হ্রাস করে এক যোগে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের চূড়ান্ত পটভূমি প্রস্তুত করতে কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যোগী হয়েছে। মূল্যবৃদ্ধিরোধের জন্য বক্তাপচা অকেজো আইনকানুনের রোমন্থন করে বহুতথায়, মুনাফাখোরদের নিকট আত্মসমর্পণের ভূমিকাই ভারত সরকার তৈরী করছেন।

ডিভ্যালুয়েশনের এক ধাক্কায় ভারতের বৈদেশিক ঋণ ২৬৩০ কোটি টাকা থেকে ৪১০০ কোটিতে বৃদ্ধি পেয়ে গেছে। চতুর্থ পরিকল্পনার আমলে এই ঋণের সুদ মেটাতেই ১৪০০ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য মার্কিনী সূত্রে ৪০০০ কোটি টাকা এবং সোভিয়েত সূত্রে যে ৫০০ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে, তার শতকরা ৪০ ভাগই পুরাতন ঋণ পরিশোধের জন্য। সুতরাং, চতুর্থ পরিকল্পনার আর্থিক বরাদ্দের পর বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ আরও অনেক বৃদ্ধি পাবে।

অতএব এ আশঙ্কা অনিবার্য যে ডিভ্যালুয়েশন বহুমুখী আর্থিক সঙ্কট বহন করে আনবে এবং ভারতীয় অর্থনীতিতে মার্কিনী হস্তক্ষেপের রাজপথ অধারিত করে রাজনৈতিক সঙ্কটের সম্ভাবনাকেও প্রশস্ততর করে তুলেছে।

বোম্বাইয়ে এ, আই, সি, সি

মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বোম্বাই-এ এ, আই, সি, সির অধিবেশনে কৃষি সংক্রান্ত একটি সদিচ্ছামূলক প্রস্তাব গ্রহণ করেই কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ তাদের সরকারী দায়িত্ব সমাধা করেছেন। অবশিষ্ট প্রস্তাবগুলি বেসরকারী পর্যায়ের ছিল। সরকারী প্রস্তাবটির মুখ্য বক্তব্য কৃষকের সেচ ও ঋণের ব্যবস্থা। শস্যবীমার ব্যবস্থা এবং কনসিউমারস্ কো-অপারেটিভের সম্প্রসারণ। সেচ, কৃষি ঋণ প্রভৃতি কৃষির উপাদানগুলি বহু বিতর্কিত, বহু আলোচিত মামুলী বক্তব্য। ভারতবর্ষে ৫৮ কোটি ৪০ লক্ষ একর কর্ষিত জমির মধ্যে ৩২ কোটি একর জমিতে সেচ ব্যবস্থা যে প্রসারিত হয় নাই, এ, আই, সি, সির মঞ্চে দাঁড়িয়ে সরকারী দলের পক্ষ থেকে ঘোষণা করার মধ্যে নাটকীয় বাহাদুরী ছাড়া আর কোনো তাৎপর্যই জনসাধারণের কাছে নাই। শস্যবীমার প্রস্তাব উত্থাপন

করে কৃষকের জীবনে একটি অত্যাবশ্যকীয় প্রসঙ্গের অবতারণা করা হলেও, অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় প্রসঙ্গের মতই শস্তবীমার কথাও অচিরেই চাপা পড়ে যাবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে নাগপুর কংগ্রেসে গৃহীত কো-অপারেটিভ ফার্মিং-এর প্রয়োগেই তা সপ্রমাণ হবে।

স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আইন, ইন্দো-মার্কিন কাউন্সেসন, সার প্রভৃতি বেসরকারী আলোচনার মধ্য দিয়ে সরকারী মনের কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। যেমন স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আইন প্রত্যাহারের বিষয় সরকারী বিবেচনাধীন, ইন্দো-আমেরিকান কাউন্সেসন গঠিত হবেই, তবে পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে। কাউন্সেসনের গঠন সম্পর্কে কোনো সরকারী প্রতিশ্রুতি পাওয়া না গেলেও নীতি নির্ধারণে এবং রূপায়নে ভারতীয়দের অগ্রাধিকারের দাবী স্মরণ রাখবার আশ্বাস পাওয়া গেছে।

আমেরিকার পল আমদানীর বাবদ টাকার পরিশোধ হয়ে যে তহবিল জমেছে পি এল ৪৮০ নামে পরিচিত ঐ তহবিলের ৩০ কোটি টাকা দিয়ে ইন্দো-আমেরিকান কাউন্সেসন গঠন করা হবে। ১৯৫৬ সালের অগষ্টে পি, এল ৪৮০ শুরু হবার পর থেকে এ-যাবৎ এই তহবিলে ১৮০০ কোটি টাকা মজুদ হয়েছে। এই তহবিলের শতকরা ৮০ ভাগই ঋণ অথবা দান হিসাবে ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের খাতে লগ্নী করা হয়েছে। এই তহবিলের শতকরা ৭ ভাগ দিয়ে কুলি ঋণ, (cooley loans) যার উদ্দেশ্য ইন্দো-আমেরিকার যৌথ উদ্যোগে বিনিয়োগের জন্য সংস্থান রাখা। এই তহবিল ১৯৬৮এ ৩১শে মার্চ পর্যন্ত সঞ্চিত ৪৪ কোটি টাকার মধ্যে ১৭ কোটি টাকা ইতিপূর্বেই ব্যয়িত হয়েছে। অবশিষ্ট শতকরা ১৩ ভাগ দিয়ে ভারতে প্রয়োজনীয় মার্কিনী ব্যয় মেটানো হয়। গত মার্চ পর্যন্ত এই তহবিলের মজুদ ২৫০ কোটি টাকার মধ্যে ৯৩ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণাচারী বোম্বাই এ, আই, সি, সিতে অভিযোগ করে বলেন এর মধ্যে ৪৭ কোটি টাকার লোন ভারত সরকারকে দেওয়া হয় নাই মার্কিনী সূত্রে এই অভিযোগের প্রতিবাদ জানানো হলেও ভারত সরকারের অর্থদপ্তরের এ-বিষয়ে নীরবতা তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতে মার্কিনী গোয়েন্দাগিরির ব্যয়ও এই তহবিল থেকেই হয়ে থাকবে।

এ, আই, সি, সির অধিবেশনের প্রকৃত কর্মসূচী ছিল কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটিতে পাঁচজন প্রতিনিধি নির্বাচন। এই নির্বাচনে সঞ্জীব রেড্ডি, ডি, পি, মিশ্র, সি, বি, গুপ্ত, জি, এম, সাদিক ও ঃঃ রাম সুভাগ সিং নির্বাচিত হয়েছেন। উল্লেখযোগ্য পরাজয় কে, ডি, মালব্যের। এই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও শ্রীকামরাজের মধ্যে শুরুতর মতভেদ আত্মপ্রকাশ করেছে। কামরাজ চেয়েছিলেন উত্তর প্রদেশ থেকে সি, বি, গুপ্তের পালটা প্রতিনিধিরূপে কে ডি, মালব্যর নির্বাচন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে শ্রীকামরাজের অগোচরে এবং শ্রীমতী গান্ধীর সমর্থনে সাদিকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এ-বিষয়ে বাদ সাধলো। সি, বি, গুপ্তের জয় মোরারজীরই জয়। মাত্র কয়েক দিন পূর্বে কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নির্বাচনে মোরারজীর পক্ষভুক্তদের সাফল্যের পর কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিটির সদস্যরূপে সি, বি, গুপ্তের জয় সংগঠনে মোরারজীর শক্তিবৃদ্ধির পরিচায়ক। ঃঃ রাম সুভাগ সিং-এর নির্বাচনে পাতিলের হাত রয়েছে। সুতরাং কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ডে—কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিটিতে নির্বাচিতরাও যার সদস্য হবেন—পাতিল গোষ্ঠির শক্তিও নিতান্ত কম নয়। কংগ্রেসের গোষ্ঠিশক্তির ভারসাম্য পরিবর্তনের ফলে গোষ্ঠিসংঘাত অনিবার্য ভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং হয়তো প্রধানমন্ত্রী কামরাজের দূরবর্তী হয়ে পাতিলগোষ্ঠির সমীপবর্তী হবেন। সে-অবস্থায় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে মার্কিণপন্থীদের প্রভাব বৃদ্ধি পাবে।

বোম্বাই-এ ট্রেন দুর্ঘটনা

গত ১৩ই জুন সকাল ৭ টায় উত্তর বোম্বাই-এর মাতুঙ্গা

ষ্টেশনে বিপরীতগামী দুইটি ট্রেণের মুখোমুখী সাংঘাতিক সংঘর্ষের ফলে ৬৭ জন নিহত ও ১৩৫ জন আহত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে কয়েকটি দুর্ঘটনার মধ্যে যাদুমার দুর্ঘটনা দিনের বেলায় সংঘটিত হয়ে ভয়াবহতার রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার দায়িত্ব স্বীকার করে রেলমন্ত্রী পদত্যাগ করেন নাই এবং ইলেকট্রিকাল সিগনালিং মেণ্টেনার ও কেবিন এ্যাসিটাণ্টকে সাময়িকভাবে সাসপেণ্ড করা হয়েছে। রেলওয়ে মন্ত্রী এবং সেণ্ট্রাল রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার উভয়েই বলেছেন হয় যান্ত্রিক ত্রুটি না হয় মানুষের ভুল এই উভয় কারণেই দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। তবে শেষ পর্যন্ত মানুষের ভুলই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী হয়। ভুল যে স্তরেই হোক না কেন প্রশাসনিক দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত রেলমন্ত্রীর, যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে ভারপ্রাপ্ত সমর নায়কের। সুতরাং, এত গুলি যাত্রীর মৃত্যুর জন্য যে নৈতিক ও মানবিক দায়িত্বের অপহ্নব ঘটলো আতীয় মানসিকতার ক্ষেত্রে সে বেদনা মূর্ত হয়ে উঠতো ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর পদত্যাগে, যা একদা লালবাহাদুর শাস্ত্রীর পদত্যাগে সম্ভব হয়েছিল। শ্রীপাতিল সে-মূল্য না দিয়ে জাতীয়-চেতনার এই ধরণের দুর্ঘটনার যে প্রতিক্রিয়া সকল স্তরের কর্মচারীদের অনুশোচনায় ভারাক্রান্ত করে কর্তব্য সম্পাদনে অধিকতর উদ্যোগী করে তুলতো, তা সঞ্চারিত হলো না।

রেলওয়ে যে সাংঘাতিক মৃত্যুর ফাঁদ তৈরী করে রেখে আছে, তার কিছু ইশারা পাওয়া যায় বোম্বাইতে শ্রীপাতিলের ১৪ই জুনের সাংবাদিক বৈঠকে। পাতিল বলছেন প্রতিদিন ৬৯০টি লোকাল ট্রেন দহ বছরে ২১০ কোটি যাত্রী নিয়ে ১০,৬৯০টি ট্রেন চলাচল করে এবং ভারতীয় রেলপথগুলিতে প্রতি বছর ২৯০০ দুর্ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ দৈনিক গড়ে ৯০টি। অবশ্য, শ্রীপাতিল এই বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন যে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে রেল দুর্ঘটনার হার অপেক্ষাকৃত কম। দৈনিক ৯০টি ট্রেন দুর্ঘটনা যে মন্ত্রীর আত্মপ্রসাদে কাটল ধরাতে পারেনা, যাদুমার দুর্ঘটনা যদি তাকে পদত্যাগের জন্য বিচলিত না করে থাকে, তবে অবাক হবার কি আছে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও ভারত সরকার

"ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে মহানায়ক সুভাষচন্দ্রের চিরজয়ী অবদান এবং বৈপ্লবিক ঐতিহ্যকে অবহেলা ও উপেক্ষার চক্রান্তে অস্বীকার করে ভারতের জাতীয় জীবন থেকে নেতাজীর মহান ভূমিকাকে বিস্মৃতির অন্তরালে বিলীন করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে যে মনোবৃত্তি কংগ্রেসী নেতৃত্ব গত আঠারো বছরে প্রকাশ করেছেন ভারতের জাতীয় ইতিহাসে তা এক অমার্জনীয় অপরাধরূপে কলঙ্কিত হয়ে থাকবে। এ কথা আজ অনস্বীকার্য ঐতিহাসিক সত্য যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বৈপ্লবিক আদর্শবাদ ও কার্যক্রমের সর্বোত্তম নেতৃত্বে নেতাজীর স্থান অনন্য ও সাগ্রহে বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর অন্তিম আঘাতের ফলেই বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদের বুনিয়াদ চূড়ান্তভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে এবং এই উপ-মহাদেশ ও সমগ্র এশিয়ার বুক থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ চিরতরে অপসারিত হয়েছে এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নায়ক এবং অখণ্ড ভারতীয় স্বাধীনতার সর্বপ্রথম রাষ্ট্র-প্রধান। ভারতের জাতীয় ইতিহাসে নেতাজীর বৈপ্লবিক অবদান অদ্বিতীয় ঐতিহ্যরূপে স্বীকৃত হলেও ভারতের স্বাধীনতা-উত্তর কংগ্রেসী নেতৃত্ব মহানায়ক সুভাষচন্দ্রের প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের জাতীয় কর্তব্য পালনে কিঞ্চিৎ আগ্রহও প্রকাশ করেনি। ভারতীয় জনতা স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে এবং পরম শ্রদ্ধায় সুভাষচন্দ্রকে জাতীয় নায়কত্বের মহত্তম আসনে অধিষ্ঠিত করে নেতাজীরূপে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছে, কিন্তু এই জাতীয় অনুভূতিকে কোনভাবেই স্বীকৃতি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কংগ্রেস সরকার বোধ করে নি।

"তাই হোক্ বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর জীবনাবসানের

ঘটনা ভারতীয় জাতি যথার্থ বলে গ্রহণ করেনি এবং গান্ধীজীও এই সংবাদের সত্যতা স্বীকার করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় মহল থেকে তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনার প্রচারিত সংবাদ বহুভাবে চ্যালেঞ্জ হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেস সরকার ভারতের এই অগ্নিহোত্রী নায়ক সম্বন্ধে যথাযথভাবে অনুসন্ধানের কোন চেষ্টা করেনি। কথিত বিমান দুর্ঘটনার এক বছরের মধ্যে কংগ্রেসী নেতৃত্ব দিল্লীর সরকারী আসনে অধিষ্ঠিত হ'ন কিন্তু একদিনও অপেক্ষা না করেও এই নেতৃত্বের পক্ষে নেতাজী সম্বন্ধে যে জাতীয় কর্তব্য পালনে উদ্যোগী হওয়া অপরিহার্য ছিল তাহা না করে শেষ পর্যন্ত জনমতের চাপে বাধ্য হয়ে দশ বছর পরে যখন আন্তর্জাতীয় তথ্যসংগ্রহের সুযোগ কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে সেই সময় ১৯৫৬ সালে শাহনওয়াজ খানের তত্ত্বাবধানে একটি নিম্নমানের কমিশন গঠন করে অত্যন্ত গায়সারা ভাবে বিমান দুর্ঘটনা সম্বন্ধে একটি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়। এই কমিশন নেহেরুর নির্দেশে ফরমোজার কথিত ঘটনাস্থলে যায়নি। এবং আন্তর্জাতীয় ক্ষেত্রে যেখানে যেখানে নেতাজী সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের অবকাশ রয়েছে সেখানেও অনুসন্ধান করা হয় নি। এমন কি এই কমিশন জাপানে পর্যন্ত যথাযথ ভাবে তদন্ত করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি। এই কমিশনের রিপোর্ট এরূপ অসম্পূর্ণ, ভাসা ভাসা এবং পরস্পর-বিরোধী যে এই কমিশনের সিদ্ধান্তকে ভারতবর্ষের জনসাধারণ উদ্দেশ্যমূলক বলে গণ্য ক'রে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রত্যাখ্যান করে দেয়। কমিশনের অন্যতম সদস্য নেতাজীর অগ্রজ শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু, বাধ্য হয়ে কমিশনের সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করে যে ভিন্ন রিপোর্ট প্রকাশ করেন তাতে তিনি সুস্পষ্টভাবে জানান যে বিমান দুর্ঘটনার সংবাদকে যথার্থ বলে গ্রহণ করা যায় না।

সম্প্রতি ভারত সরকারের এক প্রাক্তন কূটনৈতিক অফিসার ও লোকসভার সদস্য ডাঃ সত্যনারায়ণ সিংহ কথিত বিমান দুর্ঘটনা সম্বন্ধে যে বিস্ময়কর তথ্য প্রকাশ করেছেন যার ফলে ফরমোজা সরকার নেতাজী রহস্য উদ্‌ঘাটনে যে ভাবে অগ্রণী হয়েছেন এবং নেতাজী সম্বন্ধে যে সমস্ত সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে সেই ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র ভারতবর্ষ চঞ্চল হয়ে উঠেছে এবং নেতাজী সম্বন্ধে নতুন করে অনুসন্ধানের জন্য জনমন ব্যাকুলভাবে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এরূপ সত্ত্বেও কংগ্রেস সরকার নেতাজী রহস্য উদ্ধারে এক অভাবনীয় নিষ্ক্রিয়তার মৌন হয়ে রয়েছে।

শুধু নেতাজীর সন্ধানেই কংগ্রেস সরকার নিষ্ক্রিয় নন,—আজকের ভারতীয় জীবনে যেখানে জাতীয় সুরক্ষার সংকল্পকে ইস্পাতের মত সুদৃঢ় করার জন্য নেতাজীর অগ্নি-বাণী ও সামরিক ঐতিহ্যকে সর্বভাবে ভারতীয় জনতা ও জোয়ানদের সামনে তুলে ধরা এবং নেতাজীর সামরিক নেতৃত্বের অমর আবেদনে ভারতীয় সুরক্ষার মনস্তত্ত্বকে ছুঁইয়ার প্রেরণায় উদ্দীপ্ত করা প্রয়োজন সেখানে কংগ্রেস সরকারের সামান্য উদ্যমও দেখা যায় না। এমনকি ভারতের পার্লামেন্ট ভবনটি বহু নেতার চিত্রে শোভিত হওয়া সত্ত্বেও নেতাজীর একটি প্রতিকৃতি পর্যন্ত সেখানে আজও স্থান পায়নি। আজও ভারতের জাতীয় বাহিনীর সামনে স্বাধীনতাযুদ্ধের ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান সামরিক অধিনায়কের ঐতিহ্য তুলে ধরা হয়নি। নেতাজী ও আজাদ হিন্দের বৈপ্লবিক ইতিহাসের বহু সম্পদ এশিয়া ও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু সেগুলি সংগ্রহের কোন চেষ্টা পর্যন্ত কংগ্রেস সরকার করেনি। কংগ্রেস সরকারের হীন ও দলগত স্বার্থবুদ্ধি ও কুটিল সংকীর্ণতা এবং ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গৌরবময় অধ্যায়কে অস্বীকার করার প্রয়াস ভাবীকালের জাতীয় ইতিহাসে তিরস্কৃত ও ধিক্কৃত হয়ে থাকবে।

প: বঙ্গ প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির এই সম্মেলন নেতাজীর রহস্য উদ্‌ঘাটনে অবিলম্বে দেশবাসীর আশাভাজন একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিশন গঠন এবং ফরমোজা, জাপান ও অন্যান্য আন্তর্জাতীয় সরকারের সর্বযোগিতায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র

বিষয় সম্বন্ধে সামগ্রিক, নিরপেক্ষ ও প্রামাণ্য অনুসন্ধানের দাবী জানাচ্ছে। এই সম্মেলন সিঙ্গাপুরের নেতাজীভবন এবং আজাদ হিন্দ সরকারের হেড কোয়ার্টার ভবন দুইটি ক্রয় করার, নেতাজী সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য, দলিল ও স্মারকিক সংগ্রহের, ভারতের জাতীয় জীবনে সর্বস্তরে নেতাজীর সমর ঐতিহ্যকে মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি দানের এবং বিশেষভাবে ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে নেতাজীর বীর্যবত্তর প্রতিচ্ছবিকে সামরিক প্রেরণার উৎসরূপে প্রতিষ্ঠিত করার আহ্বান জানাচ্ছে। কংগ্রেস সরকারের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত অনেক উপেক্ষা, অনেক অপরাধ, অনেক অপচেষ্টা সত্ত্বেও এই সম্মেলন আবার কংগ্রেস সরকারকে এই বলে সতর্ক করে দিচ্ছে যে যুগোত্তম মহানায়ক নেতাজীর প্রতি জাতীয় কর্তব্যপালনে কংগ্রেস সরকার যদি এখনও সংকীর্ণ ও দলগত স্বার্থবুদ্ধির কুটিলতার পশ্চাদপর থাকে তা হলে ইতিহাসের দুর্বৈধ প্রতিক্রিয়ায় এই কংগ্রেসী নেতৃত্বকে একদিন এক চরমতম জাতীয় প্রতিশোধের সম্মুখীন হতে হবে।"*

* এই প্রস্তাবটি পশ্চিমবঙ্গ প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির সাম্প্রতিক রাজ্য সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সম্মেলনে উপস্থিত সমস্ত প্রতিনিধি প্রস্তাবনত চিত্তে দাঁড়িয়ে সমস্বরে, এই প্রস্তাবটির প্রতি সমর্থন জানিয়ে 'নেতাজী জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে সম্মেলন গৃহ মুখরিত করে তোলে। সম্মেলনের মঞ্চে সামনেই ছিল নেতাজীর একটি প্রতিকৃতি। আন্তরিক আনুগত্যে মাথা অবনত করে প্রতিনিধিবৃন্দ অভিবাদন জানায় ভারতের মহত্তম বিপ্লবী নায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতি।

কলকাতার জল

কলকাতার জল সঙ্কট এবার ভয়াবহরূপে আত্মপ্রকাশ করলেও গত কয়েক বছরের ক্ষমাহীন অবিমৃষ্টকারিতা, অকর্মণ্যতা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতা বর্তমানের শোচনীয় পরিণতি ডেকে এনেছে। এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী পশ্চিম বঙ্গ সরকার এবং বিরোধীদের সমেত সমগ্রভাবে কলকাতা কর্পোরেশন। পলতা থেকে জল সরবরাহের জন্য পুরাতন ৬০ ইঞ্চি মেইন পাইপের অস্তিত্ব দশ বছর পূর্বেই ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও নূতন ৭২ ইঞ্চি মেইন পাইপ বসাতে গড়িমসিতে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত কেটে যায় কিন্তু ৭২ ইঞ্চি মেইন পাইপের পুরো কার্যকারিতার জন্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা আজও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। কারণ পলতায় ৭২ ইঞ্চি পাইপের জন্য শোধনাগার ও ফিল্টার বেড তৈরী হলেও নদী থেকে উপযুক্ত পরিমাণ জল সংগ্রহের জেটি-ই তৈরী হয় নাই।

পলতায় নদীর জল ধরবার যে চারটি ট্যাঙ্ক আছে, সেগুলি পলি মাটিতে ভর্তি হয়ে গেছে। তার পরিমাণ তিন কোটি বর্গ ফুট। প্রতি বছরে এই ট্যাঙ্কগুলিতে পলি পড়ে ৫০ লক্ষ বর্গ ফুট। আর কর্পোরেশন কাটাচ্ছেন ৪০ লক্ষ বর্গ ফুট অর্থাৎ প্রতি বছরে ১০ লক্ষ বর্গ ফুট পলিমাটি জমছে। সুতরাং বহু বছর ধরে এই পলিমাটি জমে আসছে। দৈনিক এক হাজার লরি দিয়ে মাটি সরালেও এক বছরে দুই কোটি বর্গ ফুটের বেশী মাটি সরানো যাবেনা। কর্পোরেশন এই ভয়াবহ অবস্থার জন্য রাজ্য সরকারকে দোষ দিয়েই খালাস। কারণ রাজ্য সরকারের ব্রিক এণ্ড টাইল বোর্ড মাটি কাটার চুক্তি রাখে নাই। ট্যাঙ্কগুলি মাটিতে ভর্তি হয়ে থাকার ফলে জলের কাদা-মাটি থিতোবার অবসর পায় না এবং কাদা-মাটি সমেত জল ফাইনাল সেটলিং ট্যাঙ্কে ও ফিল্টার বেডে গিয়ে ফিলটারের কাজে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। তাই কলকাতার জলের পাইপ দিয়ে মাঝে মাঝে কাদাগোলা জল বার হতে দেখা যায়। এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র পন্থা "ক্ল্যারিফ্লকুলেটর" বসিয়ে দৈনিক ৯ কোটি গ্যালন জল সরবরাহ নিশ্চিত করবার কথা হয়েছে। কিন্তু এ কাজে যে ৬০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হবে,

(শেষাংশ ১০৬ পৃঃ)

ধারাবাহিক রচনা

সুভাষচন্দ্র

পবিত্রকুমার ঘোষ

প্রেসিডেন্সি কলেজ

প্রেসিডেন্সি কলেজে শতবার্ষিকী গ্রন্থে অধ্যাপক সুশোভন সরকার সুভাষচন্দ্রের লেখাপড়ার ধারা সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেছেন। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে সুভাষ দর্শনে অনার্স নিয়ে পড়াশোনা করছিলেন। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে ছাত্রবয়সে সুভাষের জীবনে সবচেয়ে প্রধান জিজ্ঞাসাই ছিল দার্শনিক জিজ্ঞাসা। সত্য কী? পরম সত্যই বা কী? এবং জীবনের উদ্দেশ্যই বা কী? এই প্রশ্নের মীমাংসাই সুভাষের অন্তরের প্রধান ও প্রধান তাগিদ ছিল। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন যে এমনকি দেশের সমস্যাও সুভাষকে তত বিচলিত করেনি যতটা তাঁকে বিচলিত করেছিল জীবনের মৌল সমস্যাগুলি—তাঁর দেশহিতব্রতী রাজনৈতিক নেতা হবার স্বপ্ন ছিল না, ছিল জীবনের পূর্ণ ও সামগ্রিক সত্যের অনুসন্ধানের স্বপ্ন। এই স্বপ্নটুকু সম্বল করেই কলেজে দ্বিতীয় বর্ষে পাঠকালে সুভাষ সুহৃদ্যাস করে বেরিয়ে গিয়েছিলেন অজানার পথে—উদ্দেশ্য, সত্যকে জানতে হবে। গৃহে ফিরে এসেছিলেন তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দের নির্দেশে এবং এবারও উপলব্ধি করে যে সত্য বনে বা হিমালয় পাহাড়েই নেই, আছে তা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনেরও মধ্যে। তপস্যা ও যোগসাধনার যে আকাঙ্ক্ষা তাঁর হৃদয়ে বরাবরই দেখা দিত তারই সঙ্গে-সঙ্গে এ চিন্তাও তিনি করেছিলেন যে জগতের মনীষীগণ জীবনজিজ্ঞাসার যে মীমাংসা রেখে গেছেন তাঁদের রচনাবলীতে,—তাও জানা দরকার। তাই গৃহে ফিরে এসে দর্শন পড়ার প্রবল ইচ্ছা জেগেছিল তাঁর মনে। আই. এ. পরীক্ষার পর ছুটির অবকাশে বন্ধু হেমন্ত কুমার সরকারকে লেখা একখানি পত্রে তাঁর এই ইচ্ছা প্রকাশিত হতে দেখি। ২৭।৩।১৫ তারিখে লিখিত সেই পত্রখানি এই: "বাবার সঙ্গে এপ্রিলের শেষে যাব। বর্দ্ধমান মহারাজার বাটী ঠিক হয়েছে। বিলাসিতার মধ্যে এবং বাড়ীর বন্ধনের ভিতরে থাকিতে খুব কষ্ট বোধ হইলেও থাকিব। সেখানে খুব extensive study করিব। আমার study চার ভাগে বিভক্ত করিব—

(১) Study of man and man's history.

(২) General study of the Sciences, first Principles.

(৩) The Problem of truth—the God of human progress অর্থাৎ Philosophy.

(৪) The Greatness of the world.

এ ছাড়া মনে করিতেছি—কলেজের বইগুলি সব একবার শেষ করিব। এখন পড়াতে খুব উৎসাহ। আমি দেখছি এখন সব উল্টা—পরীক্ষা শেষ হইল অমনি পড়ায় খুব চাড় হইল। ইচ্ছা হচ্ছে সব বইগুলি গ্রাস করে ফেলি।

B. A তে Philosophy Honours লইব এবং

first হইব, এই রকম ইচ্ছা। তারপর সংস্কৃত লইব কি Economics লইব এখন ঠিক করিতে পারিতেছি না—Economics এর একটা জ্ঞান না থাকিলে modern world এ live করা যায় না। সংস্কৃত নিজে নিজে পড়া যায়। এখন কথা হচ্ছে economics college-এ যাহা পড়া হয় তাহা প্রকৃতপক্ষে কতটুকু কাজ দেয়? যাক শীঘ্র এ বিষয়ে ঠিক করে ফেলিব। তুমি সুস্থ থাকিলে জর্মানী যাইব। ভবিষ্যতের কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করিবার জন্য এবং step by step কি রকমভাবে Proceed করিব—তাহা স্থির করিবার জন্য একবার আমাদের দেখা হওয়া দরকার। (পত্রাবলী, পৃঃ ৪৯-৫০)

আই. এ. পরীক্ষার পর ছুটির অবকাশে লেখাপড়ার যে পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন তার সঙ্গে পরীক্ষা বা বাস্তব প্রয়োজনের কোনো যোগ নেই। এ তাঁর নিজের আনন্দের জন্য বা নিজের আন্তরিক জিজ্ঞাসার উত্তর পাবার জন্য পড়াশোনার ব্যবস্থা। যে চার পক্ষার তাঁর পাঠক্রম বিভক্ত হয়েছে, লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে আসলে একই প্রশ্নকে চারদিক হতে মীমাংসা করার তা চেষ্টা মাত্র। মানবজাতির ইতিহাস এবং বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলি অধ্যয়ন না করলে Problem of truth-এর মীমাংসার কোনো ভিত্তিই পাওয়া যায় না। কিন্তু আসলে এই সত্যকে জেনেই বা কী হবে? জগতের ক্ষেত্রে সেই সত্যের জ্ঞান যদি প্রযুক্ত হয়, যদি সত্যবোধের ভিত্তিতে মানবসমাজ গড়ে ওঠে তবেই সত্যকে জানার সার্থকতা। জগৎ ও জীবনের মহিমা সম্পর্কেও সুভাষ তাই এত শ্রদ্ধাবান। অধ্যাপক সরকার লিখেছেন যে প্রেসিডেন্সি কলেজের দর্শন সেমিনারে যে আটেণ্ডান্স বুক আছে তার পৃষ্ঠায় সুভাষচন্দ্র বসু নিজের হাতে লিখেছেন যে সেমিনার হতে কী কী বই কবে কবে তিনি নিয়েছেন। ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মার্টিনোর বই তিনি পড়েছেন, ২৫শে নভেম্বর নিয়েছেন কেয়ার্ডের লেখা ধর্মের দর্শন গ্রন্থ; ১৯১৬ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী মাসে শ্লেগেলের দর্শনের ইতিহাস তিনি নিয়েছিলেন। ঐ তারিখেই উক্ত খাতায় তিনি একথাও লিখেছিলেন যে Transition from Locke and Kant —এই বিষয়ে তিনি একটি দার্শনিক প্রবন্ধ নিজেই লিখছেন।১১

অধ্যাপক সরকার যে মার্টিনোর কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর নাম জেমস মার্টিনো। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী, যা সুভাষচন্দ্র পড়েছিলেন, তা হচ্ছে: Essays, philosophical and theological; The Rationale of Religious Enquiry; The Seat of Authority in Religion; A Study of Religion, its sources and contents; A study of Spinoza; Types of Ethical Theory; Essays, reviews and addresses—ইত্যাদি। সুভাষচন্দ্র যে সময় দর্শন সেমিনারের একজন উৎসাহী পাঠক সদস্য ছিলেন সেসময় ঐ সেমিনারের পরিচালনার ভার ছিল শ্রীদেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী ও সুশীল চন্দ্র মিত্রের ওপর। এঁদের সঙ্গে সুভাষের তৎকালীন সম্পর্ক হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল বলেই মনে হয়।

প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র সুভাষচন্দ্রের কার্যধারার কয়েকটি দিক সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। অন্যান্য দিকগুলি সম্পর্কেও কলেজের ম্যাগাজিনে অনেক

১১ Thus we find Subhaschandra Basu recording his study of Martineau in September, 1915; of Cairds' philosophy of religion on November 25, 1915; of Schlegels History of Philosophy on February 16, 1916. On the last-mentioned date he has noted that he was writing a paper on the "Transition from Locke and Kant," (Presidency College Centenary Volume, p 167)

তথ্য পাওয়া যায়। ১৯১৪ সনের আগষ্ট সংখ্যার উক্ত ম্যাগাজিনে (২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা) দেখতে পাই দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে একটি সভার কথা। কিজিম্ব থিয়েটারে এই সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সভার সভাপতিত্ব করেছিলেন অধ্যক্ষ জেমস সাহেব। পূর্ববঙ্গে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের ফলে এই সময় বহু সংখ্যক নরনারী দুর্দশাগ্রস্ত হয়, তাদের সেবার জন্য একটি বন্যা ও দুর্ভিক্ষ ত্রাণ কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন অধ্যক্ষ এইচ. আর. জেমস এবং যুগ্ম-সম্পাদকদের মধ্যে একজন ছিলেন সুভাষচন্দ্র—তিনি তখন তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন কমিটির কোষাধ্যক্ষ। এই কমিটি কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের উদ্দেশ্যে একটি আবেদন প্রচার করেছিল। আবেদনটি এই :

সকলেই জ্ঞাত আছেন যে পূর্ববঙ্গের এক ব্যাপক অংশে, বিশেষত নোয়াখালি, কুমিল্লা, এবং পার্বত্য ত্রিপুরা জেলার ও সিলেট ও কাছাড়ে দুর্দশা দেখা দিয়েছে। আমাদের বিশ্বাস এই মুহূর্তেই সাহায্য দেওয়া একান্ত দরকার। ঐ দুর্দশার প্রতিকার কল্পে কিছু করার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজে একটি তহবিল খোলা হয়েছে। কলেজের অধ্যাপকগণ এবং প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের নিয়ে গঠিত একটি কমিটি ঐ তহবিলের তদারকি করবে। আমরা আশা করি যে প্রেসিডেন্সি কলেজের বহু প্রাক্তন ছাত্র এই কলেজ তহবিলটিতে দান করতে চাইবেন, তাই তাঁদের উদ্দেশ্যে এই আবেদন আমরা প্রচার করছি। তহবিলের কোষাধ্যক্ষ ডাঃ পি. সি. রায় : কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি, প্রেসিডেন্সি কলেজ —এই ঠিকানায় চাঁদা পাঠানো যেতে পারে।

এইচ. আর. জেমস—সভাপতি।
ডি. এন. মল্লিক—সহ-সভাপতি।
পি. সি. রায়——কোষাধ্যক্ষ।
হরিশচন্দ্র সিংহ, সুভাষচন্দ্র বসু } সম্পাদক।

ডি. এন. মল্লিক এবং হরিশচন্দ্র সিংহ ছিলেন প্রাক্তন ছাত্রদের প্রতিনিধি।

ম্যাগাজিনের পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হয় সেপ্টেম্বর মাসে। উক্ত সংখ্যার সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গে আলোচনাক্রমে জানানো হচ্ছে যে পূর্বোক্ত প্রেসিডেন্সি কলেজ রিলিফ ফণ্ডে সে পর্যন্ত মোট ১৫০০ টাকা উঠেছে। চাঁদা দাতাদের নাম এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। তার আশুতোষ মুখার্জি—১০৲ ; শ্রীনির্মলচন্দ্র চন্দ্র—১০৲ ; বেচনাথ সাহা—১৲ ; সুনীতি চট্টোপাধ্যায়—১৲ ; যদুনাথ সরকার—১৫৲ ;—ইত্যাদি নাম এই তালিকায় আছে। কমিটির রিপোর্টও এই সঙ্গে মুদ্রিত হয়েছে। সেই রিপোর্টে বলা হচ্ছে যে, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, কুমিল্লা ও টাকার অবস্থা খুবই খারাপ। কমিটির তরফ হতে প্রাক্তন ছাত্র হরিশচন্দ্র বসু ও যোগেন্দ্রকুমার চৌধুরীকে উপদ্রুত অঞ্চলগুলিতে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ সংগ্রহ করতে পাঠানো হয়েছিল। তাঁরা অনশনের দুর্দশার প্রকৃত চিত্র নিয়ে এসেছেন এবং ব্রাহ্মণবেড়িয়া মহকুমার শশিদলে তাঁরা একটি ত্রাণকেন্দ্র খুলেও এসেছেন। বর্তমানে কলকাতার "মালিং ব্রাদারহুড" প্রতিষ্ঠানটির সহযোগে উক্ত কেন্দ্রে সেবাকার্য চালানো হচ্ছে। ভিন্ন কোন স্থানে দ্বিতীয় একটি সেবাকেন্দ্র খোলার ইচ্ছা আছে। এখন পর্যন্ত মোট চাঁদা উঠেছে ১৫০০ টাকা, শীঘ্রই চাঁদার পরিমাণ দুই হাজার টাকায় দাঁড়াবে আশা করা যায় —কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজন আরো অনেক বেশী চাঁদার। আরও চাঁদা পেলেই অন্তত: তিন চার মাস পর্যন্ত সেবা চালিয়ে যাওয়া যাবে।

এই রিপোর্টে আরও দেখি যে কমিটিতে অধ্যাপক এস, পি, দাস ও জনাব হিদায়ৎ হোসেনকে অতিরিক্ত সদস্য করে নেওয়া হয়েছে এবং কলেজের প্রত্যেক ক্লাশ হতেই প্রতিনিধি নেওয়া হয়েছে।

ম্যাগাজিনের পরবর্তী সংখ্যার (২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা—

অক্টোবর, ১৯১৫) সম্পাদকীয় স্তম্ভে বলা হয়েছে যে দুর্ভিক্ষের এলাকা আরও বিস্তৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতও অন্ধকারাচ্ছন্ন। কেন না পূর্ববঙ্গে হয়েছে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ও বন্যা এবং পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে অনাবৃষ্টি। ফলে শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, কুমিল্লা, নোয়াখালির সঙ্গে সঙ্গে বাঁকুড়া জেলায়ও দুর্ভিক্ষ হয়েছে। অনশনে মৃত্যু ঘটছে।

১৯১৫ সনের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত সংখ্যায় (২য় খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা) সম্পাদকীয় স্তম্ভে বলা হচ্ছে যে বাঁকুড়ার অবস্থা খুবই খারাপ ও আরও কয়েক মাস সেখানে ত্রাণকার্য চালাতে হবে। ফলে টাকা চাই এবং সেই কারণে প্রাক্তন ছাত্রদের উদ্দেশ্যে চাঁদা দানের জন্য পুনরায় আবেদন প্রচার করা হয়েছে।

কলেজের বন্যা ও দুর্ভিক্ষ ত্রাণ কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে যে দুর্গপথ নিবারণে সরকার প্রত্যক্ষভাবে এগিয়ে আসায় কাজের অনেকটা সুবিধা হয়েছে এবং কমলপুরে কমিটি যে দ্বিতীয় সেবাকেন্দ্র খুলেছিল, অনাবশ্যক বিধায় সেটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ব্রাহ্মণবেড়িয়ার শশিদলের কেন্দ্রটি আছে ও ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত সেখানে কাজ চলবে। বাঁকুড়ার অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হয়ে চলছে। বাঁকুড়ার ওয়েসলিয়ান কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ মিচেলের নিকট হতে কমিটি যে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পেয়েছে তাতে অবস্থার গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করা গেছে। মিঃ মিচেলের একটি সেবা প্রতিষ্ঠান সেখানে আছে—প্রেসিডেন্সি কলেজ ত্রাণ কমিটি সেই প্রতিষ্ঠানকে ২০০ শত টাকা পাঠিয়েছে এবং অধ্যক্ষ জেমস ব্যক্তিগত ভাবে তৎসঙ্গে ৩০ টাকা পাঠিয়েছেন। বাঁকুড়ায় দীর্ঘকাল সেবাকার্য চালাতে হবে—এজন্য চাঁদা দানের আবেদন করা হল। এইবার চাঁদা দাতাদের নামের তালিকায় নিম্নলিখিত নামগুলিও রয়েছে :

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়—৫০৲
আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু—৫০৲
হরেশচন্দ্র বসু—৫৲
রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—৩৲
অধ্যক্ষ জেমস—৩০৲

এইসব রিপোর্টগুলির নিচে প্রতিবারই স্বাক্ষর থাকত দুজনের—হরিশচন্দ্র সিংহ ও সুভাষচন্দ্র বসুর।

এই কমিটির আয় ব্যয়ের একটি হিসাবও এই সঙ্গে দেওয়া হয়েছে। তাতে দেখছি প্রেসিডেন্সি কলেজের সবগুলি ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চাঁদা উঠেছে তৃতীয় বর্ষ কলাশ্রেণী হতে—যে শ্রেণীর একজন ছাত্র ছিলেন সুভাষ নিজে। কোন ক্লাস হতে কত চাঁদা উঠেছে তার হিসাব নিম্নোক্ত রূপ :

৩য় বর্ষ বিজ্ঞান—৪১৲
" কলা— ৯৲
৪র্থ বর্ষ বিজ্ঞান—৩৫।/
কলা— ১৩৲
৪র্থ বর্ষ বিজ্ঞান ২০৸
কলা— ৪৪।০
৩য় বর্ষ বিজ্ঞান ৫৭।/
" কলা— ১১৮৵/
২য় বর্ষ বিজ্ঞান ৫৭।৶
" কলা— ৫৫৸
১ম বর্ষ বিজ্ঞান—৪২৸
" বর্ষ কলা— ৯০৸

এই প্রসঙ্গে দুটি তথ্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ, কলেজের সমস্ত ছাত্রদের মধ্যে সুভাষচন্দ্রই বন্যা ও দুর্ভিক্ষ ত্রাণ কমিটির একমাত্র ছাত্র সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি উক্ত কমিটির শুধু অন্যতম সেক্রেটারিই নয়, সবচেয়ে উৎসাহী ও সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তার অন্যতম প্রমাণ, তাঁর নিজের ক্লাস হইতেই তাঁর চাঁদা সংগ্রহের পরিমাণ।

। দুই ।

প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠকালে সুভাষের চরিত্রের কাঠামো অনেকখানি সুগঠিত ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সজ্ঞেরো থেকে উনিশ—কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে এই তিনটি বছর তাঁর কেটেছিল প্রেসিডেন্সি কলেজে। ছাত্রদের মধ্যে এই কলেজটি সম্পর্কে একটি মোহ আজও আছে—তখন হয়তো আরও বেশিই ছিল। কেননা সেসময় এই কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে দিকপাল মনীষীবৃন্দ ছিলেন—আচার্য জগদীশচন্দ্র ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নাম দৃষ্টান্ত-স্বরূপ করা যেতে পারে। তাছাড়া এই কলেজে পড়তে আসত সমাজের প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তি ও অভিজাত শ্রেণীর ছেলেরা। আর আসত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী উজ্জ্বল ছাত্রের দল। সুভাষ নিজে ছিলেন এই উভয় দলের মধ্যমণি—আভিজাত্য ও মেধা, দুই পরিচয়েই তিনি ছিলেন উদ্ভাসিত। এই কলেজে তাঁর সুনাম ও সম্মান দুইই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবু এই কলেজ সম্পর্কে তাঁর মোহ ছিল না, এমনকি এই কলেজ ত্যাগ করে যাবার কথাও তিনি চিন্তা করেছিলেন। যে পত্রখানি ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করেছি সেই পত্রেই তিনি আই. এ, পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হবার পর তৃতীয় বর্ষে আর প্রেসিডেন্সি কলেজে না পড়ে কটকে বা হাজারিবাগ কলেজে যোগদানের ইচ্ছার কথা বলেছিলেন। কলকাতায় লেখাপড়ার সুবিধা ও কটকে কাজ করার সুবিধা—দুই দিকের কথা তুলনামূলকভাবে বিচার করে কটকেই পড়ার সঙ্কল্প তিনি করেছিলেন। পূর্বোক্ত ২৭।৩।১৫ তারিখের পত্রে তিনি লিখেছিলেন: "কলিকাতায় পড়িবার একটা সুবিধা এই যে, ভাল professor আছে। কটকে পড়িবার সুবিধা এই যে climate ভাল—কাজ করিবার সুবিধা কারণ বেশ influence—public এর মধ্যে। অন্ততঃ যতদিন বাবা বেঁচে আছেন। দরকার হইলে কটকে বা হাজারিবাগে পড়িতে পারি। হাজারিবাগে prospectus এর জন্য লিখেছি. Kurseong থেকে ফিরে এসে যদি দরকার মনে করি তাহা হইলে কলিকাতায় পড়া বন্ধ করিতে পারি।"

এই চিঠিখানি লেখা হয়েছিল প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর পাঠকালের দুটি বৎসর অতিক্রম হয়ে যাবার পর। কলেজ সম্পর্কে তিনি বিরূপ মন বা কোনো বিশেষ অভিযোগও তাঁর নেই—কিন্তু কোনো মোহও নেই। দ্বিতীয়ত এই চিঠি লেখা হয়েছিল তাঁর সন্ন্যাসী হবার ইচ্ছায় গৃহত্যাগ ও তারপর গৃহে ফিরে আসারও বেশ কিছুদিন পর। চিঠির এই অংশ হতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তিনি কাজ করতে চাইছেন, কাজের মধ্য দিয়ে সংগঠনও গড়তে চাইছেন মনে হয়;—সে কাজ ও সে সংগঠনের উদ্দেশ্য জনসেবা। কোনো রাজনৈতিক কর্মপন্থার আশ্রয় তিনি তখনও নেননি। এই জনসেবার উদ্দেশ্যে তাঁর কিছু কার্যক্রমের কথা তিনি আত্মচরিতেও লিখেছেন। তাঁর কথায়: "জনসেবার ব্যাপারেও আমার বেশ বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সে সময় দক্ষিণ কলিকাতায় অনাথ ভাণ্ডার নামে একটি দরিদ্র সেবা প্রতিষ্ঠান ছিল। জনসেবার উৎসাহে আমি এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলাম। আমাদের কাজ ছিল প্রতি রবিবার বাড়ি বাড়ি ঘুরে অর্থ এবং চাল ডাল সংগ্রহ করে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা। এই কাজটা সাধারণত ছাত্র-কর্মীদের উপর দেওয়া হত। আমি এদের দলে ভিড়ে ভিক্ষা করে বেড়াতে লাগলাম। সাধারণত চালটাই পাওয়া যেত। নিয়ম ছিল দিনের শেষে প্রত্যেককে অন্তত একমণ থেকে দু মণ পর্যন্ত চাল এনে দিতে হবে। প্রথম যেদিন ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে পথে বেরোলাম, এ ধরণের কাজে অনভ্যস্ততার দরুণ লজ্জায় আমার প্রায় মাথা কাটা যাবার উপক্রম হয়েছিল। আমার এই ভিক্ষা করে বেড়ানোর কথা আজও বোধ হয় বাড়ির কেউ জানে না। বহুদিন পর্যন্ত এই লজ্জা আমি কাটিয়ে উঠতে পারিনি—যখনই চেনা কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে

যাবার ভয় থাকতো ভিক্ষার ঝুলিটা কাঁধে ফেলে ডাইনে বাঁয়ে না তাকিয়ে সটান এগিয়ে যেতাম ! "(ভারত-পথিক, পৃঃ ৮০-৮১) জনসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করে অভিজাত-কুলতিলক সুভাষ, নিজের ছাত্রজীবনের সমস্ত কৃতিত্ব, লোকপরিচিতি ও সম্মান উপেক্ষা করে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে বেরিয়েছিলেন কলকাতার পথে। গৃহে গৃহে চাল ভিক্ষা করে ফিরতেন তিনি—একদিন, দুদিন নয়, মাসের পর মাস। দুটি বৃহৎ আহ্বান কৈশোরেই তাঁর শুভ্র অন্তরের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছিল—এক আহ্বান অজানাকে জানার, সত্যকে উপলব্ধি করার ; আর এক আহ্বান আর্ত মানুষের সেবার জন্য আত্মদানের। এই দুই আহ্বানই তাঁকে সেই বয়সেই ঘরছাড়া করেছিল। সন্ন্যাসীর উত্তরীয় নিয়ে তিনি হিমালয়ের দিকে ছুটে গিয়েছিলেন এক আহ্বানে সাড়া দিয়ে। আর এক আহ্বানে সাড়া দিতে ফিরে বিলাসনগরী কলকাতার পথে পথে ভিক্ষুক বেশে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। এ তাঁর শখের কাজ নয়—কেননা পরিচিত জনের দৃষ্টি গোচর হবার সম্ভাবনায় তাঁর স্বাভাবিক লজ্জানুভব তাঁকে অনেকখানি দমিয়ে দিত, এমন কি প্রথম প্রথম লজ্জা সংবরণ করতে খুব কষ্টও করতে হয়েছে তাঁকে। এই ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণের ব্যাপারটা না ছিল আত্মীয়স্বজনের প্রশংসার বিষয়, না ছিল এতে তাঁদের অনুমোদন। এমন কি তাঁদের চোখকে ফাঁকি দিয়েই সুভাষকে এ কাজ করতে হয়েছে।

ভারতীয় চিত্তে শিবের যে রূপ-কল্পনা ভাস্বর হয়ে আছে, কিশোর সুভাষের মধ্যে যেন পাই তারই প্রতিবিম্বন। আসলে বৈরাগ্যে তাঁর হৃদয় ছিল ভরপুর। নিজের কৃতিত্ব বা প্রাপ্তির দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল না। নিজের ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের কোনো বোধ ছিল তাঁর মধ্যে অনুপস্থিত। ভবিষ্যৎ চিন্তাও তাঁকে ভোলা দেয়নি। আত্মভোলা, স্বার্থ-বিহীন সেই মানুষ,—স্বচ্ছ, স্পষ্টগতি দৃষ্টি তাঁর ; কামনার আবিল ও বক্রকুটিল নয় তাঁর মুখাবয়ব ; সরল, উন্নত, ঋজু, আদর্শবাদী তাঁর চরিত্র।

জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে ভারতীয় রাজনীতির বিশাল প্রেক্ষাপটে এক সমুন্নত, উদার, বনস্পতিতুল্য পুরুষরূপে সুভাষ যখন ফুটে উঠলেন—তখন তাঁর সমকালীন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিগণ এবং সহকর্মীরাও তাঁকে বুঝতে ভুল করেছিলেন। তাঁর আপোষহীন সংগ্রামের সঙ্কল্প দেখে স্বয়ং গান্ধীজীই সন্দেহ করেছিলেন যে বৃটিশবিরোধী কোনো পররাষ্ট্রের চর কিনা তিনি গুপ্তচর - ইংরেজ গান্ধীজীকে এই কথা বুঝিয়েছিল ও গান্ধীজী কংগ্রেস হতে সুভাষকে বিতাড়নের জন্য ইংরেজের সঙ্গে সম্মিলিত ভাবে ষড়যন্ত্র করেছিলেন।* অন্যান্য অনেকের ধারণা হয়েছিল যে সুভাষ বুঝি ক্ষণতান্ত্রিক ও ক্ষমতালোভী। তাদের কারও হয়তো জানা ছিল না যে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে আর এমন কোনো দ্বিতীয় নেতার আবির্ভাব ঘটেনি যার সারা জীবনের স্বপ্ন ও সাধনাই ছিল (১) পরম সত্যের সন্ধানে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হবার (২) দীন দরিদ্র জন-সাধারণের সেবায় নিজেকে উজাড় ও নিঃসম্বল করে আত্মদানের। এই পরিচয়ই সুভাষের সত্য ও শ্রেষ্ঠ পরিচয়। তাঁর বীরত্ব ও ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা ও কীর্তি নয়, তাঁর সুবিশাল ত্যাগ ও নিঃস্বত্ব আত্মদানই তাঁর চরিত্র সম্পর্কে শেষ কথা। এই দিক হতে বাল্যের সুভাষ, কৈশোরকালের সুভাষ এবং পরিণত জীবনের সুভাষে কোনো তফাৎ নেই। তাই ভারতের সাধারণ মানুষ তাঁকে সহজেই চিনেছিল—তাদের চিত্তে সুভাষের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ সহজ, স্বাভাবিক ও গভীর। তাদের সংস্কারগত প্রত্যয় এই যে পৌরাণিক আখ্যানের ভিতর হতে বর্তমান কালের ইতিহাসের পৃষ্ঠাপটে শিবের চরিত্রই যেন সুভাষ রূপে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল !

(ক্রমশঃ)

---

* ডাঃ অশোক মজুমদারের গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

গোপাল কৃষ্ণ গোখ্‌লে

অনাথবন্ধু দত্ত

১৮৬৬ সনের ৯ই মে মহারাষ্ট্র দেশের রত্নগিরি জিলার চিপোর কুটলুপ নামে এক ক্ষুদ্র গ্রামে বিখ্যাত চিৎপাবন ব্রাহ্মণ বংশে গোপাল কৃষ্ণ গোখ্‌লে জন্ম গ্রহণ করেন। মাত্র তের বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। দুঃখ ও দারিদ্রের মধ্যে তাঁহার বাল্য জীবন কাটে এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সাহায্য না পাইলে তাঁহার লেখাপড়া বন্ধ হইয়া যাইত। পাঠ্যাবস্থায় তাঁহাকে রান্না করিয়া খাইতে হইয়াছে এবং অনেক সময় কেরোসিন তেলের খরচ বাঁচাইবার জন্য রাস্তার আলোতে পড়িতে হইয়াছে।

১৮৮১ সনে তিনি কোহলাপুর হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন এবং পরে বোম্বাই-এলফিন্‌ষ্টোন কলেজ হইতে গণিত ঐচ্ছিক বিষয় রূপে গ্রহণ করিয়া বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিদ্যালয়ে তিনি খুব প্রতিভার পরিচয় না দিলেও খুবই পরিশ্রমী ছিলেন। এই সময় তাঁহার মন স্থির ছিল না। তাঁহার ভ্রাতা তাঁহার শিক্ষার জন্য কণ্ঠাগত হইয়া পড়িয়াছিলেন—কিরূপে এই ঋণ শোধ করা যায় ইহাই তাঁহার বিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল। আই-সি এস পরীক্ষা দিবেন ভাবিতে ছিলেন। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হইয়া কয়েক সপ্তাহ পরে উহা ত্যাগ করিলেন। প্রায় বছর খানেক বোম্বে আইন কলেজে পড়িয়াছিলেন—তাহাও ছাড়িলেন। এই সময় ১৮৮৫ সালে জানুয়ারী মাসে তিনি পাগলের মত এক কাজ করিয়া বসিলেন, পুনা সহরের নিউ ইংলিশ স্কুলে মাসিক ৩৫৲ বেতনে সহকারী শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিলেন। এই স্কুলটী স্থাপন করিয়াছিলেন বাল গঙ্গাধর তিলক এবং গোপাল গণেশ আগরকার ১৮৮৪ সনে। ইঁহাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া গোখ্‌লে শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই মাষ্টারির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি Public Service Certificate এর জন্য ছাত্র দিগকে প্রাইভেট পড়াইয়া কিছু আয় করিতেন এবং এইরূপে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কিছু অর্থ সাহায্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

১৮৮৬ সনের শেষের দিকে লোকমান্য তিলক এবং আগরকার ডেকান এডুকেশান সোসাইটি স্থাপন করিলে গোখ্‌লে উহার আজীবন সভ্য হন। স্কুল মাষ্টাররূপে এবং পরবর্ত্তী সময়ে ফার্গুসন কলেজের অধ্যাপক হিসাবে গোখ্‌লে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার সরল জীবনের আদর্শে ছাত্রগণ অনুপ্রাণিত হইত। যদিও তাঁহার শিক্ষার বিষয় ছিল অঙ্কশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র বা ধনবিজ্ঞানের প্রতিই ছিল তাঁহার বেশী টান বা আগ্রহ।

১৮৮৭ সনে তাঁহার জীবনে এক মহাপরিবর্ত্তনের সুযোগ উপস্থিত হয়—তিনি বিচারপতি মহাদেব গোবিন্দ রানাডের সহিত পরিচিত হন এবং তাঁহার সান্নিধ্যলাভ করেন। হাইকোর্টের বিচারপতি রাণাডে সমকালীন বোম্বাই প্রদেশের সকল প্রকার সমাজ সেবার উৎস এবং চিন্তানায়ক ছিলেন। তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া গোখ্‌লের গুণবত্তা আরও বিকশিত

হইতে থাকে। রাণাডে গোখলেকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল গোখলের উপর। রাণাডের পাদপ্রান্তে গোখলে যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন পরবর্তীকালে সমস্ত জীবন তাহা খুব কাজে লাগিয়াছিল। সেকালের রাজনীতি ছিল সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদন। গোখলে এই সকলের নিষ্ফলতা দেখিয়া গুরু রাণাডের নিকট হতাশা প্রকাশ করিলে প্রবীণ রাণাডে বলিয়াছিলেন যে এই সকল আবেদন সরকারের নিকট হইলেও পরোক্ষে ইহা দেশবাসীর উদ্দেশ্যে। দেশবাসী এই সকল হইতে জানিতেছে কিভাবে চিন্তা করা উচিত, ন্যায় কোনটা, দেশের দরকার কি। গভর্নমেণ্ট গ্রাহ্য করুন বা করুন বেশী কিছু আসে যায় না। যদি কিছু চাহে হয় তবেই লাভ। দেশের বর্তমান সম্বন্ধে ইহাই আমাদের ঐতিহাসিক কর্তব্য। গোখলে ছিলেন দেশবাসীর জন্য ন্যায্য অধিকারের দাবীদার। ইংরেজ রাজের নিকট হইতে ভারতের অধিকার আদায় করাই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত।

রাণাডের নিকট গোখলের মাত্র তের বৎসর শিক্ষানবিশীতে কাটিয়াছিল। ১৮৯৭ সনের প্রথম দিকে রাণাডে গোখলেকে লণ্ডনে ওয়েস্‌বি কমিশনের নিকট সাক্ষী দিতে পাঠান। সঙ্গে ছিলেন দিনশা ইদুলজী ওয়াচা। উভয়েই ছিলেন ডেকান সভার প্রতিনিধি। কমিশনের তদন্তের বিষয় ছিল ভারতের সামরিক এবং অ-সামরিক ব্যয় সম্পর্কীয় তদন্ত—এই ব্যয়ের কতটা ইংলণ্ড এবং কতটা ভারত সরকার বহন করিবে তাহা নির্ধারণ। কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় তিনি খুবই যোগ্যতা প্রদর্শন করেন।

ইংলণ্ডে থাকাকালে তিনি পুনার কয়েকজন বন্ধুর চিঠির ভিত্তিতে ইংরেজ সৈন্যের বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগ প্রকাশ করেন। কিন্তু এতৎ সম্পর্কে কোন প্রমাণ দিতে অসমর্থ হইয়া এই ভুল সংবাদ প্রকাশের জন্য কাগজে সর্তহীন ত্রুটী স্বীকার করিয়া দুঃখপ্রকাশ করেন। এই ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া ইংরেজ সমালোচকেরা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলেন আর এদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী লোকেরা বলিলেন 'কাপুরুষ'। ইহাতে গোখলের রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা এক সংকটময় অবস্থায় পৌঁছিল। দেশে ফিরিয়া সাময়িকভাবে তিনি কংগ্রেস মহলে পেছনের আসনে স্থান লইলেন।

লোকমান্য তিলক প্রতিষ্ঠিত (৩১া জানুয়ারী ১৮৮১) সাপ্তাহিক 'কেশরী' এবং গোপাল গনেশ আগরকার প্রতিষ্ঠিত (২৭ জানুয়ারী ১৮৮১) সাপ্তাহিক "মারহাট্টা" (ইংরেজী) —এই উভয় পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন গোখলে। কাগজখানির সত্বাধিকারী ছিলেন তিলক, আগরকার এবং ডেকান এডুকেশন সোসাইটী। সামাজিক এবং রাজনৈতিক মতের দ্বন্দ্ব তিলক ও আগরকারের মধ্যে দেখা দিল। এক-দলে রহিলেন তিলক এবং বামনরাও আপ্তে অন্য দলে আগরকার এবং গোখলে। ১৮৮৮ সনে আগরকার 'সুদ্রক' (Sudhrak) নামক একখানি ইঙ্গ-মারাঠী সাপ্তাহিক কাগজ বাহির করেন কেবল নিজ মতামত প্রচার করিবার জন্য। ইহার ইংরেজী অংশে গোখলে লিখিতেন। কিছুদিন পরে তিলক ডেকান এডুকেশন সোসাইটী ছাড়িয়া দিলেন এবং দুইখানি সাপ্তাহিকের (কেশরী ও মারহাট্টা) সম্পাদক হইলেন। গোখলে সোসাইটীর সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিলেন। রাণাডের নির্দেশে গোখলে সার্বজনিক সভার (পরে ইহা ডেকান সভা নামে পরিচিত হয়) সম্পাদকের পদও গ্রহণ করিলেন।

১৮৯৯ সনে গোখলে বোম্বাই কাউন্সিলে এবং ১৯০২ সনে ইম্পীরিয়াল কাউন্সিলে প্রবেশ করেন। বোম্বে কাউন্সিলে তিনি বিরোধীদলের নেতা নামে পরিচিত হন এবং তাঁহার যোগ্যতায় দেশবাসী সন্তুষ্ট হয়। যাহারা তাঁহাকে এককালে 'মিথ্যাবাদী' 'কাপুরুষ' বলিয়াছিল তাহারাও মত পরিবর্তন করিতে বাধ্য হন।

তখনকার ইম্পীরিয়াল কাউন্সিলে ইংরেজ কর্মচারীর এবং

মনোনীত সদস্যের সংখ্যাধিক্য ছিল এবং বড়লাট ছিলেন ইহার সভাপতি। যে অষ্টজন ভারতীয় সদস্য ছিল তাঁহারা সকলেই উচ্চ উপাধিধারী ও সরকারের অনুগৃহীত। তাত্রিফ করিতে হইবে যে এ হেন লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে গোখ্‌লে ভারতীয় সদস্যগণের সমর্থন লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। লার্ড কার্জনের নীতির কঠোর সমালোচনা করা সত্ত্বেও, গোখ্‌লের মৃত্যুর পরে ১৯১৫ সনের ৩রা মার্চ্চ লর্ড সভায় তিনি বলিয়াছিলেন "আমি গোখ্‌লের মত স্বদেশভক্ত ভারতীয় পার্লেমেন্টারিয়ান আর দেখি নাই। পৃথিবীর যে কোন জাতীয় মহাসভায় গোখ্‌লে যোগ্যতার সহিত আসন গ্রহণ করিবার মত উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন।"

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের গোড়াপত্তন হইতেই (১৮৮৫) গোখলে ইহার প্রতি আকৃষ্ট হন। কংগ্রেসের দ্বিতীয় বোম্বাই অধিবেশনে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা যাহাতে ইংলণ্ড ও ভারতে উভয় স্থানে প্রবর্ত্তন হয় এই প্রস্তাবটি তিনি সমর্থন করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কলিকাতার অধিবেশনে কংগ্রেসে তিনি লবণ-কর হ্রাস করিবার প্রস্তাব সমর্থন করেন। ১৮৯০ সনে লাহোরে দাদাভাই নৌরোজীর সভাপতিত্বে কংগ্রেস অধিবেশনে ইংলণ্ডের হাউস অব কমন্‌সভায় তিনি 'হোম চার্জেস' হ্রাস করিতে দাবী জানান কারণ মাত্র সামরিক হোম চার্জেই বার্ষিক ২০ লক্ষ পাউণ্ড হইতে ৫০ লক্ষ পাউণ্ডে বাড়িয়া গিয়াছিল। যে ইংরেজ সৈন্য সংগ্রহ করিতে ১৯ পাউণ্ড খরচ পড়িত উহার জন্য ভারত সরকারকে দিতে হইত ১০৫ পাউণ্ড। ইংলণ্ডের কাজে ভারতীয় সৈন্য নিযুক্ত হইলে খরচ দেওয়া হইত না অথচ ইংলণ্ড হইতে সৈন্য আসিলে কড়াগণ্ডায় খরচ আদায় করা হইত, গোখ্‌লে ইহারও প্রতিবাদ জানান।

১৮৯৩ সনে তিনি বোম্বাই প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের সম্পাদক এবং ১৮৯৫ সনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের যুগ্ম সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত নিজের এবং ডেকান এডুকেশনে সোসাইটীর কাজ থাকায় তাঁহার বিশ্রাম ছিল না।

১৯০১, ১৬ই জানুয়ারী জাষ্টিস রাণাডের মৃত্যু হয় এবং ইহার পরেই তাঁহার জীবনের গতির দ্রুত পরিবর্ত্তন হয়। এখন তিনি স্বাধীনভাবে কাজ করিবার সুযোগ পাইলেন। তাঁহার গুরুর নিকট যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন তাহা কার্য্যকরী করিবার সময় আসিল। ঐ বৎসরই তিনি ফার্গুসন কলেজ হইতে সতর বৎসর কার্য্যান্তে অবসর লইলেন। ১৯০২ সনে তিনি ইম্পীরিয়াল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার বাগ্মীতা, তথ্যজ্ঞান, ভারতের স্বাস্থ্য অধিকারের দাবীতে ইংরেজ সরকারের বিরোধীতা তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিল। লর্ড কার্জ্জনের গভর্ণমেণ্টের তিনি ছিলেন তীব্র সমালোচক। মুদ্রানীতি, উচ্চ করনীতি, ইংরেজ সৈন্য রাখার ব্যয়, আবগারি কর, কৃষি সাহায্য, লবণ কর প্রত্যাহার ও অন্যান্য কোন কিছুই তাহার আলোচনা বা সমালোচনা হইতে বাদ পড়িত না। সকলেই তাঁহার বক্তৃতা মনোযোগের সহিত শুনিত। তিনি ভারতীয় দ্বারা সমস্ত উচ্চ পদগুলি পূরণ; অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাপ্রবর্ত্তন, স্বানীয় স্বায়ত্ব শাসন, পুলিস সংস্কার এবং শাসন সংস্কারের সমর্থণে বহু মূল্যবান কথা বলিয়া গিয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকগণের হইয়া তিনি লড়িয়াছেন। ১৯১২ সালে তিনি গান্ধিজীর অনুরোধে দক্ষিণ আফ্রিকায় যান ও তাঁহার এবং গান্ধিজীর চেষ্টায় জেনারেল স্মাটস্ ভারতীয়ের উপর তিন পাউণ্ড ব্যক্তিগত কর বাতিল করিবার প্রতিশ্রুতি দেন এবং পরে ঐ কর তুলিয়া দেওয়া হয়।

১৯০৫ সনের ডিসেম্বর মাসে তিনি বারাণসীধামে ২১শতম কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ৩৯ বৎসর—এত কম বয়সে আর কেহ কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন নাই। কংগ্রেস তখন দুই দলে বিভক্ত হইতেছিল

-গরম এবং নরম দল। একদল বৃটিশ সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতাকামী আর একদল বৃটিশ ঔপনিবেশিক স্বাধীনতায় সন্তুষ্ট। প্রথম দলের নেতা লোকমান্য তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল এবং লালা লাজপৎ রায় প্রভৃতি। নরম দলে তখন কংগ্রেসের পুরাতন ধুরন্ধরেরা এবং গোখ্‌লে নিজেও। যাহা হউক বারানসীতে কংগ্রেসের দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছায় নাই যদিও ১৯০৭ সনে সুরাটে পরস্পরের কলহে কংগ্রেস অধিবেশন ভাঙ্গিয়া যায় এবং মডারেট বা নরমপন্থীরা ইহার পর কয়েক বৎসর ইহা অধিকার করিয়া থাকে। লোকমান্য তিলক যাহাতে কংগ্রেসে ভাঙ্গন না ধরে তজ্জন্য খুবই চেষ্টা করিতে ছিলেন, কিন্তু এক ঐতিহাসিক রাজদ্রোহের মামলায় জন্য তাঁহার ছয় বৎসরের জন্য কারাদণ্ড হয় এবং ভাঙ্গন অনিবার্য হইয়া পড়ে। অবশ্য গোখ্‌লের মৃত্যুর প্রায় দুই মাস পরে লখ্‌নৌ কংগ্রেসে ১৯১৬ সনে উভয় দল আবার মিলিত হইয়াছিল। এই কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন কলিকাতার গণনেতা শ্রীঅম্বিকাচরণ মজুমদার। ইহাতে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্ব্বাচন অনুমোদিত হয় যাহার অন্যতম ফলস্বরূপ ভারত ১৯৪৭ সনে বিভক্ত হইয়া ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম হয়।

রাষ্ট্রনীতিতে গোখ্‌লে ছিলেন দাদাভাই নৌরোজী, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ফীরুশা ওয়াচা, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবন কী হিউম এবং ওয়েডারবার্ণ যাহাদিগকে বলা হয় কংগ্রেসের আদি এবং প্রতিষ্ঠাতা (Founding Fathers) তাঁহাদের মতাবলম্বী। নরমপন্থী বলিয়াই ইহাদের ছোট করিলে অন্যায় হইবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে যখন আমলাতন্ত্রের প্রভাব অপ্রতিহত, কংগ্রেসে কর্মীর সংখ্যা মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের মধ্যে নিবদ্ধ নেতাদের পক্ষে আবেদন নিবেদনের পথে আন্দোলন পরিচালন ছিল স্বাভাবিক। ইহাকেই তাঁহারা কার্য্যকরী পন্থা ভাবিয়াছিলেন। গোখ্‌লে পুরাতন পথ ছাড়িয়া নূতন পথে যোগদান করেন নাই এবং পুরাতন দলের ছিলেন যোগ্যতম নেতা এবং প্রতিনিধি। আজ পুরাতন দ্বন্দ্ব থামিয়া গিয়াছে। গোখ্‌লের মত অকৃত্রিম স্বদেশ সেবক এবং নেতার জীবন ইতিহাসের নতুন আলোকে যাচাই করিবার এবং শ্রদ্ধানিবেদন করিবার সময় আসিয়াছে। দেশবাসী এবং দেশনেতারা ইহা বুঝিয়াছেন এজন্যে ৯ই মে ১৯৬৬ তারিখে তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যে ভারতবাসী বিপুল আয়োজন করিয়াছিল। গোখ্‌লে চাহিয়াছিলেন স্বদেশের বাধাহীন স্বাধীনতা। অন্যান্য স্বাধীন দেশের লোকেরা যেমন আছে তাঁহার স্বদেশের লোকেরাও তেমনই থাকুক। তিনি চাহিয়াছিলেন দেশে শিল্প বাড়ুক, প্রতিভা বিকশিত হউক, সুখ এবং সম্পদ বৃদ্ধি পাইয়া সকলের আনন্দ বৃদ্ধি করুক।

গোখ্‌লে স্বদেশ সেবার জন্য নিজে দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং ১৯০৫ সনে তাঁহার এই সেবাব্রতের ২০ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল, ডেকান এডুকেশন সোসাইটীর আজীবন সভ্য হিসাবে। ১৯০৫ সনে ভারতের সেবক রূপে (as servant of India) তিনি নূতন ব্রত গ্রহণ করিলেন এবং স্বদেশের জন্য সেবা বা সেবাব্রতী প্রস্তুত করিবার জন্য সারভেন্ট অব ইণ্ডিয়া সোসাইটী প্রতিষ্ঠা করিলেন। মহাত্মা গান্ধী স্বদেশসেবায় সম্পূর্ণ আত্মদান করিবার জন্য নিজের সংসার ও সম্পত্তি ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারও পূর্ব্বে গোখ্‌লে এরূপ করিয়াছিলেন। একটী ছোট ঘরে বসিয়া গোখ্‌লে সার্ভেন্ট অব ইণ্ডিয়া সোসাইটীর কাজে নিযুক্ত থাকিতেন, আর সেই বাড়ীর আর একখানি কুটীরে গোখ্‌লের বিধবা ভগ্নী ভ্রাতার দুইটী মাতৃহীনা কন্যার তত্ত্বাবধান করিতেন। এই সরল অনাড়ম্বর এবং আত্মভোলা স্বদেশ এবং মানব সেবীর জীবন যে কোন জাতির পক্ষে গৌরবের, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই ভারত সেবক সমাজ বহু কর্মীকে আকর্ষণ করিয়া দেশের এবং মানবতার সেবায় নিয়োজিত করিয়াছে। পরবর্ত্তীকালে লালা লাজপৎ রায়

ার্দেশে সার্ভেন্ট অব পিপ্‌ল্ সোসাইটী লাহোরে করিয়াছিলেন, যাহার অন্যতম যোগ্য সদস্য ছিলেন পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী।

তাঁর জনক মহাত্মা গান্ধী ছিলেন গোখ্‌লের নিতান্ত ভক্ত। মহাত্মাগান্ধী গোখ্‌লে সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন ছিলেন স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, মেষের মত নীরিহ, মত সাহসী এবং সৎকার্যের জন্য সংগ্রামে সদাপ্রস্তুত। নিকট তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষ. ও ছিলেন ভবিষ্যতেও থাকিবেন।

খ্‌লে বাঙ্গালীকে ভালবাসিতেন এবং বাঙ্গালীর নেতা শ্রদ্ধা করিতেন। একদিন তিনি বলিয়াছিলেন "বাঙ্গালী আজ যাহা ভাবে, ভারতবাসী তাহা পরদিন ভাবে (Wh Bengal thinks, today India thinks to-morro ভাগ্রত স্বাধীন ভারতে বিভক্ত বঙ্গদেশে বাঙ্গালী আর বাঙ্গালী না থাকিলেও, বিংশ শতাব্দীর মহাপুরুষকে মহাপুরুষকে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধায় নত হইতেছে। কলিকাতায় গোখ্‌লে রোড এবং মি পি, কে, রায় প্রতিষ্ঠিত, মেয়েদের শিক্ষায়তন গোখ মেমোরিয়াল স্কুল এবং কলেজ এই মহাপুরুষের স্মৃতি ব করিতেছে।

১৯১৫ সনের ১৯শে ফেব্রুয়ারী মাত্র ৪৯ বৎসর ব এই মহাপুরুষ নশ্বর ধাম ত্যাগ করেন।

স্বাস্থ্য ও শক্তির উৎস...

এমন সময় আসে যখন আপনার দৈনন্দিন খাদ্যে দেহের সব প্রয়োজন পূরণ হয় না। তখন আপনাকে পুষ্টিকর টনিকের উপর নির্ভর করতে হয়। রোগাস্থিক দুর্বলতা, অতিরিক্ত পরিশ্রম, বা অন্য যে কোন কারণেই আপনি অবসন্ন বোধ করেন না কেন ভাইনো-মল্ট আপনার স্বাভাবিক শক্তি ফিরিয়ে আনতে সহায়ক হবে। সুনির্বাচিত উপাদানে সমৃদ্ধ ভাইনো-মল্ট ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, পরিপাক ক্রিয়ায় সাহায্য করে এবং দ্রুত স্বাস্থ্যের উন্নতি ও শক্তিবৃদ্ধি করে।

প্রাণোচ্ছল টনিক

ভাইনো মল্ট

বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী

হেগেলীয় দর্শন

অনিল রায়

এখন এর জবাব হচ্ছে এই যে এখানেও হেগেলীয় যুক্তি ও দৃষ্টান্তের পিছনে লুকিয়ে আছে সেই একই গোলযোগ (confusion) বা বিভিন্নতার অভাব (lack of distinction) (Croce)। অভেদ-নীতি (Law of Identity) বলছে যে একই কালে, একই স্থানে ও একই অর্থে কোনো বস্তু পরস্পর-বিরোধী সংজ্ঞার বিষয় হতে পারে না। এইটি যদি কোন এক বিশেষ মুহূর্তে কোন এক বিশেষ স্থান-বিন্দুতে আছে, একথা সত্য হয়, তবে সেই মুহূর্তেও সেই স্থানেই এইটি নেই, একথা সত্য হতে পারে না। এইটি হয় সেখানে থাকবে, নয় থাকবে না। একই সঙ্গে একই মুহূর্তে "আছে ও নেই" দুই-ই সত্য হতে পারে না। এইটি গতিশীল একথা ঠিক। কিন্তু গতি হচ্ছে একটা process এবং যে কোন process সংঘটিত হতে কিছুটা সময় নেবেই, যতো সূক্ষ্ম ও ছোট-সময়ই হোক না কেন। কালকে (Time) বাদ দিয়ে কোনো procse ঘটতে পারে না।*

সরোকিন-এর বিশ্লেষণ অনুসারে প্রত্যেক process-এর চারটে অঙ্গ (factor) থাকতেই হবে। এরা সকল process এর অপরিবর্জনীয় অঙ্গ। সেই চারটে হচ্ছে—(১) উদ্দেশ্য বা Logic, অর্থাৎ যে পরিবর্তিত হচ্ছে (২) দেশ-সম্বন্ধ বা place relationship' (৩) দিক্‌সম্বন্ধ বা direction (৪) কাল-সম্বন্ধ বা 'time relationship'।

হেগেলীয় যুক্তিতে এবং গতিশীল গ্রহের দৃষ্টান্তে ১, ২, ও ৩নং অঙ্গকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে কিন্তু চতুর্থ অঙ্গ বা Time category কে একেবারে বাদ দেওয়া হয়েছে। এইটির কঙ্কালকে যদি অপরিমিত সূক্ষ্মতম বিভাগ করা যায়, তবে কঙ্কালটা দাঁড়াবে কতকগুলো সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র points of space-এর ক্রমান্বিত রেখা। এইটিকে এই পথে চলতে গিয়ে প্রত্যেকটি point of space-এর উপর দিয়েই যেতে হবে। এই প্রত্যেকটি স্থান-বিন্দুকে ছাড়াতে তার কিছুটা সময় যাচ্ছেই। যে কাল-বিন্দুতে (point of time) এইটি যে স্থান-বিন্দুতে আছে, ঠিক সেই কাল-বিন্দুতে সে এইটি সেই স্থান-বিন্দুতেই ছিল। তার পরের কালবিন্দুতে (point of time) এইটি পরের স্থানবিন্দুতে সরে গেছে। ঐ পরের স্থানবিন্দুতে যেতে একটু—যত সামান্য বা ক্ষুদ্রতমই হোক—কাল লেগেছেই। কাজেই একই কাল-বিন্দুতে (point of time) এইটি ওখানে আছে এবং নেই, একথা ঠিক নয়। কোনো একস্থানে যে মুহূর্তে আছে, তার ঠিক পরের মুহূর্তেই হয়তো এইটি পরের স্থান-বিন্দুতে সরে গেছে।

---

* "Any process implies time and duration, is inseparable from and unthinkable without the time category." (Sorokin : Social & Cultural Dynamics p 153)

কিন্তু সে পরমুহূর্তে। কাজেই হেগেলীয় যুক্তি যখন বলছে যে একই মুহূর্তে গ্রহটি সেখানে আছে এবং নেই, তখন কাল-অঙ্গকে (time factor) বর্জন করে একটা অসম্ভব ও অর্থহীন বৃথাভাষণের অবতারণা করা হয়েছে। গ্রহটি আসলে সেই মুহূর্তে সেই স্থানে 'আছে' এবং তার পর মুহূর্তে সেই স্থানে 'নেই'। যে ব্যাপারটা আগের ও পরের কালে পরপর (successively) ঘটছে, সেই ব্যাপারকে একই কালে ঘটছে বলে অবলম্বিত বিরুদ্ধতা (contradictoriness) দেখানো হয়েছে। যা এককালে 'আছে', তা অন্যকালে 'নেই'। কাজেই এতে আসলে বিরুদ্ধতা নেই; যাকে কল্পনা করা হয়েছে সে একেবারে মনগড়া। গ্রহের নিজের সঙ্গে নিজের কোনো অযৌক্তিক বিরোধই নেই। কাজেই এখানেও হেগেলের অবিরোধ-নীতি স্থান-কাল-বহির্ভূত এবং অবান্তর। হেগেলের নিজের কথারও এর সমর্থন আছে; অবশ্য প্রকারান্তরে, কারণ প্রকাশ্যে হেগেল সর্বত্র অবিরোধকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছেন।*

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে হেগেলীয় উক্তিতে গ্রহটি যখন কোন একটি স্থান-বিন্দুতে আছে, তখনই সে সত্যি সত্যি সেখানে নেই বা অন্য কোনো স্থান-বিন্দুতে চলে গেছে, একথা বলা হয় নি। এখানে বলা হচ্ছে, যখন ওখানে গ্রহ আছে, তখন সত্যি সত্যি সশরীরে ও বাস্তবভাবে সেখানে 'নেই ও' একথা ঠিক নয়। 'আছে' যখন, তখনই 'নেই' একথা কেবল' ইঙ্গিতে (implicitly) থাকে; অর্থাৎ না থাকার সম্ভাবনা ("possibility") রয়েছে কারণ পরের মুহূর্তেই সে ওখানে থাকবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত পরের মুহূর্তটি আসেনি এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ স্থানত্যাগ না করেছে গ্রহটি, ততক্ষণ পর্যন্ত "আছে" শুধু এই কথাই সত্য। না-থাকার সম্ভাবনা এবং সত্যিকার না-থাকা, এক জিনিষ নয়। সম্ভাবনা (possibility) ও প্রকৃত অস্তিত্বে (actuality) অনেক ব্যবধান। যা ছিলো সম্ভাবনা (possibility) তা-ই পরের কালে হয়ে দাঁড়াবে বাস্তব (actuality)। সরে গিয়ে—"by moving"। কাজেই হেগেলের ভাষায়ই আমাদের মতের সমর্থন প্রচ্ছন্ন রয়েছে। একই সময়ে "আছে এবং নেই" ("is here and is not here")। একথা জগতের কোনো গতিশীল বস্তুর ব্যবহারেই প্রমাণ হবে না। 'আছে' এবং 'নেই' একসঙ্গে, হাঁ এবং না একই সময়ে ও স্থানে দেখতে হলে যে বস্তুটির দরকার হয় তার নাম ইন্দ্রজাল (magic), যুক্তি (logic) নয়। এবং এ ম্যাজিক হচ্ছে কথার যাদু। এ যাদুতে চিঁড়ে ভিজে না কারণ বাস্তব জগতে মিছে কথার যোগফল শূন্য (zero) বৈ আর কিছু নয়। 'আছে' এবং 'নেই'-এর মধ্যে, 'হাঁ' এবং 'না'র মধ্যে যে দুর্লঙ্ঘ্য বিরোধ রয়েছে তাকে কথার যাদুতে সত্যি সত্যি উড়িয়ে দেওয়া চলে না। এ দুস্তর বিরোধ হচ্ছে সেই ধরনের বিরোধ যাতে হেগেলের বিশ হাজা যুক্তি পাশাপাশি যুতে দিলেও আমাদের সেই বিরোধ উত্তীর্ণ করতে পারে না।†

(৮) গতিতত্ত্ব থেকে আর একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে এবং দেওয়া হয়েও থাকে। যে কোন রকম পরিবর্তনকে 'গতি' বলা হয়ে থাকে। 'গতি' মানেই 'পরিবর্তন'। এই গতি দুরকমের হতে পারে (১) কোন বস্তুর (thing) বাহিরের গতি (External motion)। এখানে একটি

* "Take as an illustration the motion of the heavenly bodies. At this moment the planet stands in this spot, but implicitly it is the possibility of being in another spot; and that possibility of being otherwise the planet brings into existence by moving." (Logic of Hegel p 110, Notes)

† "That twenty logics of Hegel harnessed abreast cannot drive us smoothly over." (28 p, W. James, ibid)

বস্তু অন্যান্য বস্তুর সম্বন্ধে আপেক্ষিক স্থান পরিবর্তন করে থাকে। অন্য বস্তু থেকে দূরত্ব বা নিকটত্ব দ্বারা এই পরিবর্তন অনুভূত ও পরিমিত হয়। যেমন একটি গ্রহের গতি, মানে অন্যান্য গ্রহ, তারা ইত্যাদির তুলনায় (in relation to) গ্রহের স্থান পরিবর্তন। এই ধরণের পরিবর্তনের প্রকৃতি সম্বন্ধে আগেকার গ্রহের দৃষ্টান্ত সম্পর্কেই আলোচনা করেছি। (২) আর এক ধরণের গতি আছে যাকে বলা যায় স্বগত পরিবর্তন (Inherent change)। কোন একটি বস্তুর (Thing) দেহের ভিতরেই অবিশ্রান্ত পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে, প্রত্যেকটি বস্তু কতকগুলি অণু-পরমাণুর সমষ্টি এবং এই অণু-পরমাণুগুলিতে প্রতি মুহূর্তেই নানা ধরণের পরিবর্তন চলেছে। বস্তুর অন্তর্ঘটিত বা অন্তর্নিহিত এই পরিবর্তনে বস্তুটীর স্বরূপেও পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। এই পরিবর্তনও একটা process এবং সেই কারণে এখানেও পূর্বোক্ত সেই চারটে অঙ্গ থাকবেই, যথা (১) unit বা উদ্দেশ্য (২) Space relationship বা স্থান-সংযোগ (৩) দিক (Direction), কাল সংযোগ (Time)। পরিবর্তনের দিক (direction) সম্বন্ধে কিন নানা রকম করে ব্যাখ্যা করেছেন। সাধারণভাবে এখানে বলতে পারি, পরিবর্তন দুই দিকেই হতে পারে, বৃদ্ধিও হতে পারে, ক্ষয়ও হতে পারে; সঞ্চয় ও অপচয় দুই-ই ঘটতে পারে কোনো বস্তুর দেহে ও স্বরূপে। বস্তুর অন্তর্গত পরিবর্তন নানারূপ গ্রহণ করতে পারে—সংহতি ও খণ্ডীভবন (Integration ও disintegration), বৃদ্ধি ও অবক্ষয় (growth ও degeneration), সংকোচন ও প্রসারণ (Contraction ও Expansion)।

হেগেলীয় মতে সকল বস্তুরই এই রকমের স্বগত পরিবর্তন হচ্ছে এবং এই পরিবর্তনেও বস্তু নিজেকে নিজে বিরোধিতা (contradict) করছে। স্বগত পরিবর্তনশীল বস্তুগুলিও সবাই স্ববিরোধ-এর (Self contradiction) দৃষ্টান্ত এবং এ অর্থেও অভেদ-নীতি (Law of Identity) ভুল প্রমাণ হয়। প্রাণি-বিজ্ঞানের জগৎ থেকে একটা দৃষ্টান্ত নেয়া যাক। ধরা যাক একজন মানুষ "রাম"। প্রত্যেক মানুষ কতকগুলি জীবকোষের সমষ্টি, এই কোষগুলি পুষ্টিলাভ করে অনবরত সংখ্যায় বাড়ছে এবং শৈশব থেকে মানুষের দেহ বৃদ্ধি পেয়ে পেয়ে পুষ্টতর হচ্ছে। আবার বয়সের মত দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি অহরহ কাজ করছে বলে কোষগুলির ক্ষয়ও হচ্ছে। এই ক্ষয় ও বৃদ্ধির পথেই দেহ পরিণতির দিকে এগুচ্ছে সারাজীবন। 'রাম'-ও তেমনি কতকগুলি কোষের সমষ্টি এবং রামের দেহও কোষগুলির ক্ষয়-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে প্রত্যেক মুহূর্তে। লক্ষ্য করলেই প্রতীতি হবে যে একবছর আগে যে রাম ছিল, একবছর পরে অবিকল সেই রামই আর নেই, কারণ রামের অনেক পরিবর্তন, ভিতরে ও বাইরে ঘটে গেছে। এই জন্য রামকে ঠিক আগেকার রাম বলা চলে না এবং এ কথাও বলা চলে যে রাম আগেকার রাম নয়। আবার অন্যদিকে রাম সেই রামই আছে একথাও ঠিক। রাম যতই পরিবর্তিত হোক না কেন তবুও তাকে আমরা "রামই" বলি, অন্য লোক বলে মনে করি না। তার মানে এই যে, পরিবর্তন সত্ত্বেও রামের একটা অভেদ (identity) বজায় রয়েছে; অন্য ভাষায় বলতে গেলে, রামের "রামত্ব" ঠিকই আছে, কোন হানি হয় নাই। রামের স্বরূপটি অব্যাহতই রয়েছে। কাজেই এ অর্থে যেমন রাম আগেকার রাম নয় একথা ঠিক; তেমনি অন্য অর্থে রাম সেই আগেকার রামই আছে, একথাও সমান সত্য। এখানেই হেগেল বলছেন যে "রাম" স্ব-বিরোধ বা self-contradiction-এর জাজ্বল্যমান প্রমাণ, কারণ "রাম রামও বটে" এবং "রাম রাম নয়ও" বটে এই দুটোই এক সঙ্গে সত্যি। কাজেই এখানে অভেদ-নীতি Law of Identity) মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে এবং স্ববিরোধই এখানে মূলতত্ত্ব।

এই হেগেলীয় দাবী সম্বন্ধেও সেই আগেকার আপত্তিই

ঘটেছে এবং সেই একই হেগেলীয় স্কুলের দ্বারা এই প্রাণি-বিজ্ঞানের দৃষ্টান্তও খণ্ডিত হচ্ছে। "পরিবর্তন-তত্ত্ব" অতি জটিল তত্ত্ব, এ নিয়ে বহু দার্শনিক বিচার ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। কেউ বলছেন পরিবর্তন বা গতিই বিশ্বের মূল সত্তা, এতদ্ব্যতীত অন্য কোন অস্তিত্বই নেই। কেউ বা বলছেন পরিবর্তনের পেছনে রয়েছে অপরিবর্তনীয় নিত্য সত্তা। নিত্য ও অনিত্য, নশ্বর ও অবিনশ্বর, স্থিতি ও গতি, অচল ও চঞ্চল—এই দুমুখো সমস্যা নিয়েই প্রাচীন কাল থেকে মানবমন বারম্বার প্রশ্নার্ত হয়ে, বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। সেই আর্তি ও বিক্ষোভ থেকে জন্ম নিয়েছে নানা দর্শন ও মতবাদ। আমরা তত্ত্ববিদ্যার (metaphysics) রাজ্যে ঢুকবো না, কারণ আমরা লজিকের নীতিগুলিকে নিয়ে আলোচনা করছি। লজিকের দিক থেকে হেগেল পরিবর্তন-তত্ত্বে অভেদ-নীতির (Law of Identity) নিরসন দেখতে পেয়েছেন। আমরা সেই দিক থেকেই পরিবর্তন তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করব এবং তাতে দেখা যাবে যে পরিবর্তন-তত্ত্ব দ্বারা অভেদ-নীতি বাধিত হয় না, সমর্থিত ও ও প্রমাণিত হয়।

যে কোন বস্তু যখন পরিবর্তিত হতে থাকে, তখন সব পরিবর্তনের তলে তলে একটা সূক্ষ্ম, অপরিবর্তনীয় ভিত্তি সকল পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও বেঁচে থাকছে। সেই শক্ত ভিত্তিটিকে সেই বস্তুর স্বরূপ বলা হয়। যতক্ষণ সেই স্থিতিশীল, শক্ত ভিত্তিটি বজায় থাকে, ততক্ষণ হাজার পরিবর্তন সত্ত্বেও আমরা বলে থাকি যে সেই বস্তুটি পূর্বেকার বস্তুই আছে। প্রত্যেক বস্তু বা মানুষের স্বরূপ বলতে আমরা বুঝি কতকগুলি elements বা ধর্ম। এই ধর্মগুলি অবিকৃত রয়েছে। যখন কতকগুলি ধর্ম বদলে গেছে অথচ অন্য কতকগুলি আবার বদলে যায়নি, তখন আমরা বলি যে বস্তুটি পরিবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ কতকগুলি দিকে (aspect) বস্তুটির বদল হয়েছে। কিন্তু সেই পরিবর্তন এতখানি গভীর ও ব্যাপক হয় নি যাতে করে ওই বস্তুটিকে চিনতে অসুবিধা হতে পারে কিংবা ওই বস্তুর স্বরূপ সম্পূর্ণ বদলে গেছে বলা যেতে পারে। যখন সব দিকেই (aspect) কোনো বস্তু বদলে যায়, তখন ওই বস্তু আর পূর্বেকার বস্তু থাকে না, সম্পূর্ণ অন্য বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যতক্ষণ এমন কতকগুলি দিকে বা ধর্মে element) পরিবর্তন ঘটে যাদের পরিবর্তনে বস্তুটির সত্যিকার স্বরূপে কোনো হানি হয় না, ততক্ষণ বলা হয়ে থাকে যে সেই বস্তুটি পরিবর্তিত হয়েছে ; অর্থাৎ অবিকল আগেকার বস্তুটি আর নেই ; কতকগুলি ব্যাপারে পরিবর্তন হয়েছে এবং কতকগুলি ব্যাপারে বস্তুটি পরিবর্তিত হয় নাই। অন্য ভাষায় বলা যেতে পারে যে বস্তুটি কোনো কোনো দিকে পূর্বেকার বস্তুই আছে এবং কোনো কোনো অংশে পূর্বেকার বস্তুটি নেই।

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে হেগেলীয় স্ববিরোধ (self-contradiction) এখানে ত্রিসীমানার মধ্যে কোথাও নেই। পরিবর্তনের ফলে কোন বস্তুকে "সেই বস্তু এবং সেই বস্তু নয়" (It self & not itself) এই দুরকমই বলা যেতে পারে। হেগেলের একথা হেত্বাভাস-দুষ্ট (fallacious)। পরিবর্তিত বস্তুটিকে যখন বলি "সেই বস্তুই আছে", তখন আমরা কতকগুলি ধর্ম বা দিক থেকে একথা বলি। যে ধর্মগুলির পরিবর্তন হয় নি, সেগুলির ওপর চোখ রেখে বলা চলে যে বস্তুটি সেই আগেকার বস্তুই আছে। কিন্তু যখন বলি "বস্তুটি সেই বস্তুটি আর নেই," তখন আমরা অন্য কতকগুলি দিক থেকে একথা বলে থাকি। যে ধর্মগুলি পরিবর্তিত হয়েছে, সেই বিশেষ ধর্ম বা গুণগুলির উপর দৃষ্টি রেখে একথা বলা চলে যে বস্তুটি আর আগেকার বস্তুটি নেই। কাজেই পরিবর্তনের ফলে, কতকগুলি দিক থেকে বস্তুটি আগেকার বস্তুটিই আছে, এবং অপর দিকগুলির সম্পর্কে সেই বস্তুটি আগেকার বস্তুটি নেই। কাজেই বস্তুটি "সেই বস্তুও বটে এবং সেই বস্তুটি নয়ও বটে" এই দুমুখো কথাটি একই

অংশে, একই অর্থে ও একই দিক সম্বন্ধে খাটেনা। বিভিন্ন অর্থে ও বিভিন্ন গুণ বা ধর্ম সম্বন্ধে এরা প্রযোজ্য। যদি একই অর্থে, একই দিকে এবং একই গুণ সম্বন্ধে ঐ বিরুদ্ধার্থক আখ্যান সম্ভব হ'ত তবেই হেগেলীয় বিরুদ্ধতার (contradiction) দৃষ্টান্ত হিসেবে একে নেওয়া চলতো।

পরিবর্তনকে যদি নাম দিই 'Becoming', এর স্থায়িত্বকে যদি বলি 'Being', তবে একথা বলা চলে যে সকল পরিবর্তন বা গতির পেছনে রয়েছে স্থিতি বা Being. Being কে ছাড়া Becoming অবাস্তব ও শূন্যগর্ভ হয়ে দাঁড়ায়। যখন Being বা স্থায়িত্ব নেই, তখন তাকে পরিবর্তন (change) বলা চলে না; তখন সেখানে দুটো সম্পূর্ণ আলাদা বস্তু স্বতন্ত্র হয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। পরিবর্তন বলতেই বুঝতে হবে, যে বস্তু পরিবর্তিত হচ্ছে সে স্বরূপে ও স্বকীয়তায় নিজের সত্তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। যে পরিবর্তিত হচ্ছে তার তদ্‌ভাব বা স্বত্ব (identity) বজায় থাকবে। সোরোকিন (Sorokin) বলছেন:

যখন মিঃ স্মিথ পরিবর্তিত হচ্ছেন তখন কতকগুলি দিকে (aspect) তাঁর বদল হয়েছে এবং কতকগুলিতে বদল হয়নি। কতকগুলি ব্যাপারে তিনি আগেকার স্মিথই আছেন এবং কতকগুলিতে অবশ্য বদলে গেছেন। কাজেই "আছেন" এবং "নেই" এই দুটো বিরুদ্ধ আখ্যা একই গুণ ও দিক সম্পর্কে বলা চলে না। ভিন্ন ভিন্ন দিকে (aspect), এই দু'টো বিরুদ্ধ আখ্যা খাটে।* কাজেই এখানে কোনো

*"That which changes preserves its identity (its Being) that it remains the 'same' throught the process it goes through: that in brief, it remains unchanged to the extent of preserving its identity. When we say, 'Mr J. B. Smith has changed during the last 15 years"... we assert that these subjects have been changed but at the same time we believe that inspite of change, we are still dealing with Mr J. B. Smith & not with Mr A B. Jhonson Inspite of change these units preserved their identity, remained in the domain of Being. Otherwise, we cannot contend that there was any change in these units, because if these were not the same subject in each case then there would have been no change but just two or more subjects quite different from the very begining" (Social & Cultural Dynamics: Sorokin, Pp 154-55)

অবিরোধ নেই এবং তাদাত্ম্য বা অভেদ-নীতি (Law of Identity) এখানে খাটছে, হেগেলীয় নীতি নয়। সোরোকিন (Sorokin) স্পষ্ট করে বুঝিয়েছেন:

"This reconciliation of permanent sameness with change is not the illogical matter that it seems. It is based on the fact that if the unit of change A consist of elements a, b, c together with other elements which are not essential—now m now n, now f now l or some combination of these, A, as an integration of the elements a, b, c can remain constant and at the same time be in a process of change with reference to m, n, f, k, l, or their combination; and thus A may change without losing it identity". (p 154-55 Sorokin: Social & Cultural Dynamics)

রাম পনের বছর আগে যে রাম ছিল আজ আর অবিকল ঠিক সেই রামটি নেই। রামের দেহ, আকৃতি, প্রকৃতি সবই অনেকাংশে বদলে গেছে। কিন্তু যখন বলছি, পনের বছর আগেকার রাম এবং পনের বছর পরের রাম, তখনি

প্রকারান্তরে বলছি যে পনের বছরের পরিবর্তন সত্ত্বেও রাম রামই আছে, অর্থাৎ রামের রামত্ব নষ্ট হয়নি। তার মানে এখন কতকগুলি গুণ বা ধর্ম আছে যা আগের রামেও ছিল এবং অন্তকার রামেও বর্তমান আছে। সেই গুণগুলির দিক থেকে দেখলে রাম সেই রামই আছে। কিন্তু অপর কতকগুলি গুণের বা ধর্মের দিক থেকে দেখলে দেখা যায় যে রামের পরিবর্তন হয়েছে, অর্থাৎ রাম ঠিক তেমনটি নেই। সেই রাম আর নেই। এখানে রাম কতকগুলি বিশেষ গুণে সেই প্রাচীন রামই আছে এবং অন্য কতকগুলি বিশেষ গুণে সেই প্রাচীন রাম নেই। কাজেই এখানে হেগেলীয় স্ববিরোধ মোটেই নেই, কারণ বিরোধ বা contradiction এখানে বিভিন্ন দিক থেকে বর্তাচ্ছে ("obtains in different respects"(W. James) একই গুণ সম্বন্ধে যদি 'হাঁ' ও 'না, দুই-ই বলা চলতো তবেই বিরোধ (contradiction) আছে বলা যেত। যখন স্বরূপে ও সকলগুলি ধর্মেই রাম বদলে গেছে, তখন রাম আর নেই, রামের পরিবর্তে ভিন্ন ব্যক্তির উদ্ভব হয়েছে। রাম নেই, আছে একেবারে আলাদা অন্য একজন লোক। তখন পরিবর্তনের কোনো মানে হয় না।

প্রাণীতত্ত্বের দৃষ্টি দিয়ে দেখে বলা হয়েছে যে রামের দেহের কোষগুলি অবিরত বদলে যাচ্ছে। ফলে রাম আর রাম থাকছে না। অথচ আবার রাম থাকবেও, কারণ আমরা নূতন কোষপুঞ্জ ব্যক্তিকে "রামই" বলে থাকি। অতএব contradiction রয়েছে। এখানেও সেই একই জবাব দেওয়া যায়। রামের সবগুলি কোষ বদলে নিয়ে নূতন কোষের সমষ্টি হয়ে রাম যদি দেখা দিয়ে থাকে, তবে তাকে "রাম" বলব কেন? যদি রাম নামেই তাকে আখ্যাত করতে হয়, তবে কোষগুলির আমূল বদল সত্ত্বেও অন্য কোনও দিকে রামের প্রাচীন সত্তার অবশেষ নিশ্চয় রয়ে গেছে যাতে করে একে "রাম" বলা চলে। তা হলেই দেখা যাচ্ছে যে, যে অংশে (কোষগুলিতে কিংবা অন্য বিষয়ে) রাম বদলেছে সেই অংশে রাম—রাম নয়। কিন্তু অন্য যে অংশে রাম বদলায়নি সেই সেই অংশে রাম—রামই আছে। এখানে একই অংশে রাম "রাম আছে ও রাম নেই" তা নয়। ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে (aspect) "রাম" এবং "রাম নয়" দুটো আখ্যা বলা হচ্ছে। একই দিক থেকে নয়।

কাজেই প্রত্যেকটি মানুষ বা প্রাণী এক একটি স্ববিরোধের (self-contradiction) মূর্তি, একথা নিতান্ত মিথ্যা। আপাতদৃষ্টিতে মনে এ ধাঁধা লাগতেও পারে যে রাম একই সঙ্গে 'রাম' ও 'না-রাম' কিন্তু সামান্য বিশ্লেষণ করলেই এ ধোঁকা ধরা পড়ে যায় এবং হেগেলীয়দের দাবীর চাতুরী যে কেবল কথার মারপ্যাঁচ এ তত্ত্বও চোখে পড়ে।

(ক্রমশঃ)

সাম্প্রতিক ডিভ্যালুয়েশন ও তার পরিণাম

ডঃ সুব্রতেশ ঘোষ

বেশ কিছু দিন ধরেই বাইরের নানা মহল থেকে ভারতীয় মুদ্রার ডিভ্যালুয়েশন ঘটাবার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছিল। সরকারী মহল বহু দিন পর্য্যন্ত এমন ভাব দেখাচ্ছিলেন যে, তাঁরা এ জাতীয় প্রস্তাবে সম্মত হবেন না। পার্লামেন্ট কিছুদিন আগেও এ হেন মনোভাব সৃষ্টিতেই প্রয়াস দিচ্ছিলেন। অবশেষে গত ৫ই জুন রাত্রে দেশবাসী অনেকটা চকিত ভাবেই শুনতে পেলেন। স্বর্ণভিত্তিতে পাউণ্ড ও ডলারের ভিত্তিতে ৪৭.৫ ভাগ) ডিভ্যালুয়েশনের ঘোষণা বেতার যোগে

ডিভ্যালুয়েশনের পক্ষে সেই থেকে সর্ব্বোচ্চ পর্য্যায়ে সরকারী মহল এর অবশ্য প্রয়োজনীয়তা প্রচারে পঞ্চমুখ হয়েছেন। বলা হচ্ছে যে, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে ক্রমাগত ঘাটতির ফলে ডিভ্যালুয়েশন না করে গত্যন্তর ছিল না। অর্থমন্ত্রীর ভাষায়, বৈদেশিক বিনিময় হার-ও প্রকৃত পক্ষে এক জাতীয় মূল্য (Price), এবং ভারতীয় মুদ্রার ঘাটতি-চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এই বৈদেশিক বিনিময় নামিয়ে আনা ছাড়া আর কোন উপায় থাকতে পারে না। এই সঙ্গে ডিভ্যালুয়েশন সমর্থক সরকারী মহল আরও বলেছেন যে এই ব্যবস্থার ফলে বিদেশে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানী বাড়বে এবং আমদানী পণ্যের দাম ভারতীয় মুদ্রার ভিত্তিতে বেড়ে যাওয়ায় বিকল্প পণ্যের ব্যবহার বাড়বে ও মোট আমদানী কমবে। এ সবের ফল স্বরূপ ভারতের Balance of Payments এর উন্নতি ঘটবে এবং বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি দূর হবে। ডিভ্যালুয়েশনের বিরুদ্ধে সমালোচনার কথা স্মরণ রেখে মন্ত্রী পর্য্যায়ে আরও বলা হয়েছে যে এর ফলে আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং এই ব্যবস্থায় মূল্যস্ফীতির (inflation) চাপ বাড়বে না।

এখন দেখা যাক, ডিভ্যালুয়েশনের সমর্থনে প্রদত্ত এই যুক্তিগুলি কতদূর টেঁকসই। প্রথমতঃ বৈদেশিকমুদ্রা ঘাটতির সমস্যা সমাধানে ডিভ্যালুয়েশনের ভূমিকা আমদানী ও রপ্তানীর মূল্যগত স্থিতিস্থাপকতার (price elasticity) ওপর খুব বেশী পরিমাণে নির্ভর করে ভারতের প্রধান প্রধান আমদানী-গুলি সবই অস্থিতিস্থাপক, incessatic দীর্ঘদিন ধরেই সরকার বৈদেশিক আমদানীর পরিমাণ ন্যূনতম স্তরে নিয়ে আসবার চেষ্টা করছেন। আমদানী নিয়ন্ত্রণ বিধি ও বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কড়াকড়ির ফলে অবশ্য প্রয়োজনীয় ছাড়া অন্য প্রায় সব রকম আমদানী এখন বন্ধ। ফলে, দেশীয় মুদ্রার ভিত্তিতে আমদানীর জন্য যত বেশী মূল্যই আমাদের দিতে হোক না কেন, আমদানীর পরিমাণ তাতে কমবার সম্ভাবনা কম। বরং আমদানী পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য আমাদের মোট বৈদেশিক মুদ্রার খরচ আগের থেকে বেড়ে যাবে।

সরকারী মহল, ডিভ্যালুয়েশনের ফলে, আমদানী করা হয় এমন পণ্যের দেশজ বিকল্পের (import substitutes) ব্যবহার বাড়বে বলে আশা করে। বাস্তবে এ আশা আকাশ কুসুম বলে প্রমাণিত হবে। আগেই বলা হয়েছে যে, আমদানী নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট

চেষ্টা হয়েছে এবং বর্তমানে যা আমাদের না হলেই চলে না ও যে সব পণ্যের দেশজ সরবরাহ প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল, প্রধানতঃ সে সব পণ্যই আমদানী করা হয়। এই সব আমদানীর বিকল্প সরবরাহ যদি প্রয়োজন মত বৃদ্ধি করা যেত তবে দীর্ঘদিন ধরে বৈদেশিক মুদ্রার এই ঘাটতি থাকতো না। উদাহরণ স্বরূপ আমদানী-কৃত যন্ত্রপাতির কথা বলা যায়। অবশ্য প্রয়োজনীয় এ সব যন্ত্রপাতির আমদানী কমিয়ে আনতে হলে এদের দেশজ উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বাড়াতে হবে। কিন্তু এ সব যন্ত্রের কিছু ভারতবর্ষে বর্তমানে একেবারেই উৎপাদন সম্ভব নয়। যেগুলির উৎপাদন সম্ভব তাদের সরবরাহ বাড়বার পথে মূলধনী যন্ত্রপাতির অভাব, দক্ষ শ্রমিকের অভাব, উপযুক্ত কাঁচামালের ঘাটতি, প্রভৃতি অনেক সমস্যা দেখা দেবে। অতএব, বিকল্প যারফৎ আমদানী হ্রাসের ওপর বেশী ভরসা করা চলে না।

এবার দেখা যাক রপ্তানীর দিক। ভারতের যেগুলি বনেদী রপ্তানী (যেমন চা, পাট কাঁচা চামড়া, কাজুবাদাম ইত্যাদি) তাদের বেশীর ভাগ পণ্যেরই বৈদেশিক চাহিদা অ-স্থিতিস্থাপক। ডিভ্যালুয়েশনের ফলে এ সব পণ্যের রপ্তানীজাত আয় বাড়াবার সম্ভাবনা কম। অন্যদিকে, কতগুলি অপেক্ষাকৃত নতুন রপ্তানী পণ্য আছে (যেমন, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পজাত পণ্য, বস্ত্রাদি প্রভৃতি), যেগুলির চাহিদা অপেক্ষাকৃত বেশী স্থিতিস্থাপক, কিন্তু ডিভ্যালুয়েশনের ফলে এদের বৈদেশিক চাহিদা বাড়লেও সে চাহিদা মেটাবার মত বাড়তি যোগানের সামর্থ্য আমাদের আছে কি? ইতিমধ্যেই ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে কাঁচা মালের অভাব ও বৈদেশিক মুদ্রা ঘাটতির জন্য দেশবের আমদানী সম্ভব না হওয়ায় বিনিয়োজিত উৎপাদন ক্ষমতার (installed capacity) প্রায় ৫০% শতাংশে অব্যবহৃত পড়ে রয়েছে। অথচ বাড়তি চাহিদা অনুযায়ী স্বল্প সময়ের মধ্যে পণ্য রপ্তানী সম্ভব না হলে, প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক বাজারে বিদেশীরা আমাদের রপ্তানী বৃদ্ধির ভরসায় দীর্ঘদিন অপেক্ষা করবে না। সেজন্য বনেদী বা নতুন, কোন রকম রপ্তানী থেকেই আমাদের বৈদেশিক আয় বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নেই।

ওপরে দেখা গেল যে রপ্তানীজাত আয় বেশী বাড়বে না, অথচ আমদানী জনিত ব্যয় কমার সম্ভবনা কম। ফলে, Balance of Payments এর উন্নতি তথা বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল ডিভ্যালুয়েশনের ফলে বাড়বে এমন আশা করা চলে না। অন্য পক্ষে ডিভ্যালুয়েশনের ফলে আভ্যন্তরীণ মূল্য স্ফীতির (inflation) চাপ সুনিশ্চিত ভাবে বেড়ে যাবে। ভারতের শিল্পায়নে বর্তমান পর্যায়ে প্রধানমান বহু গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় শিল্পই প্রচুর পরিমাণে অত্যাবশ্যক কাঁচামাল ও কারখানাজাত উপাদানের (finished imports) আমদানীর ওপর নির্ভরশীল। ডিভ্যালুয়েশন এই সব শিল্পের উৎপাদন ব্যয় বাড়াবে। এর ফলে বহু গুরুত্বপূর্ণ শিল্পজাত পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি আভ্যন্তরীণ মূল্যস্ফীতির চাপ দুর্বিসহ করে তুলবে। এ ছাড়া আমাদের জাতীয় অর্থনীতির গঠনগত অনমনীয়তার (rigidity) জন্য যে কোন গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে মূল্যবৃদ্ধি ক্রমাগত মূল্য স্ফীতির চাপ বৃদ্ধিতে সহায়ক। সর্বোপরি আমাদের শাসন যন্ত্রে দক্ষতা ও শক্ততার অভাব এবং কাটকাবাজী ও কালবাজারীর প্রভাবে কৃত্রিম ঘাটতি যারফৎ পণ্য মূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কথাও ভুললে চলবে না। ডিভ্যালুয়েশন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই বাজারের কতকগুলি বিশেষ পণ্যের দাম বেশ বেড়ে গেছে, যদিও এ সব পণ্য উৎপাদন বা আমদানী ডিভ্যালুয়েশনের বহু পূর্বেই ঘটেছিল। সরকার এ জাতীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সমর্থ হবেন, এমন আশা পরম আশাবাদীও করবেন না।

পরিশেষে সরকারী বহলে বৈদেশিক উদাহরণের যুক্তিটিও তলিয়ে দেখা যাক। ফ্রান্স ও যুগোস্লাভিয়ার ডিভ্যালুয়েশনের

কথা এ ক্ষেত্রে তারস্বরে প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে ফ্রান্স উন্নততর অর্থনৈতিক কাঠামোর অধিকারী। রপ্তানী চাহিদাবৃদ্ধির সুযোগ গ্রহণে তার অসুবিধা ঘটে নি, কিন্তু ওপরে আমরা দেখেছি যে ভারতে তা ঘটবে। অন্যদিকে যুগোস্লাভিয়ার অর্থনীতি অনেক বেশী পরিমানে কেন্দ্রীয় প্রভাবাধীন হওয়ায় আমদানী নিয়ন্ত্রণ বা আভ্যন্তরীন মূল্যনীতি রোধে তার ক্ষমতা ভারতের থেকে বেশী। তাছাড়া বৈদেশিক উদাহরণ ডিভ্যালুয়েশনের বিপক্ষেও গ্রহণ করা যায়। ১৯৪৯ সালে ব্রিটিশ ডিভ্যালুয়েশন যে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে নি সে কথা ভারত সরকার বোধ হয় না ভুললেই ভাল করতেন।

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.

বিদ্যাসাগর	২·২৫
মানুষের মত মানুষ	·৭৫
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·৩০
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	১·২৫
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা—১২

ক্ষুধার বিস্তার — বিরূপাক্ষ সেনগুপ্ত

চলে যাব ভেবে আমি স্থির হয়ে কিছুক্ষণ
বিচ্ছিন্ন বৃত্তের কাছে
আবার দাঁড়াই। কিছুক্ষণ আগে
প্রশ্নপত্র ছিন্নভিন্ন, ধূলি ঘর থেকে
অন্তর্হিত রুগ্ন ছাত্রদল। দেয়ালের কাঁচ
শতভগ্ন ; টেবিল চেয়ার ইত্যাদিও
বিক্ষিপ্ত অদূরে। চতুর্দিকে
রক্তচক্ষু বিক্ষোভের শান্তিত শরীর
পরীক্ষার ঘরে।

মনে হবে পিপাসার জলের সন্ধানে
সমস্ত সংসার
পলিত পিচের পথে সমস্ত অকেজো কলগুলি
প্রাণান্ত শক্তিতে নেড়েচেড়ে
হুমড়ি খেয়ে পড়ে।
পথের-বাঁধানো সড়কের
যুবকেরা একটু বাদেই
কফি হাউসের ভিড়ে লক্ষ্যভিৎ রায়ের ছবির
বিষয়ে প্রমত্ত হবে ; পর মুহূর্তেই
বাসেভেজা শরীরের তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায়
লোকা ঘরে বসে।

পাঁচটা বাজলে কের বিকেলে বাবারা,
মিছিল দিলবে ফের চতুর্দিক থেকে
বসুমেন্ট ময়দানে। সব বৃত্তে নির্বিকার
ক্রমবর্ধমান তীব্র ক্ষুধার বিস্তার॥

বুকে নিয়ে সূর্যোদয় — বাসুদেব দেব

ছেলেটাকে দেখি সারাদিন, ভালুক নাচায়।
রঙ্ ওঠা টিনটা বসে এক হাতে লোফালুফি করে।
গাছের ছায়ায় তার এনামেল মগে টুং টাং
কখনো বা পয়সা পড়ে। শীতের রাস্তিরে
তাকেই যখন দেখি রাজ্যের কাগজ, পাতায়
আগুন জ্বালিয়ে তাতে হাত সেঁকতে ভারী হাসি পায়
কেননা, উলঙ্গিতে তার বুকে আঁকা আছে সূর্যোদয়।

জামা খুলতে ভয় লাগে, তাকাই না বুকের কপাটে.
ডাক নাম ধরে যেন কে ডাকছে ভিতর বাগানে॥

গ্রীষ্মকালীন বিকেলবেলা — বাসুদেব দেব

বুকের কাছে লেপটে থাকে বাবার রঙ ঝরা পাতা
এলো হাওয়ায়। ধুলোর ঘতোন ঘুর্ণি নাচে হা হা হা হা—
বুকের ভিতর অস্তকালীন সূর্য নিয়ে নদী নিথর,
গ্রীষ্মকালীন বিকেলবেলা 'কুলপী বাদাই···ই' ফেরিওয়ালা
ডাকলে বুঝি ভালো ছিল, রাখলে হাতে সোঁদের বাদা।
গ্রীষ্মকালীন বিকেলবেলা এ সুস্থতার পরিত্রাতা
কোথায় আছে, বেতার যন্ত্র খুলে দিলে ঘোষক বলে :
'ঝড় হবে ঝড় সহ অন্ত রাতে'। কোথায় ঝড়
বৃষ্টি শুধু, মাটির গন্ধ, ঝরা বকুল কুড়োলো কে ?
মধ্যরাতে চিলে কোঠায় উঠে কে আসে কাঁদতে একা ?

সম্পাদকীয়—(৮৪ পাতার পর)

তার সংস্থান নেই। রাজ্য সরকার মাত্র ১৫ লক্ষ টাকা দিতে রাজী। ডিভ্যালুয়েশনের পর এই অঙ্ক নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে।

পলতার জলের সঙ্গে বড় টিউবওয়েলের জল মিশিয়ে জলের পরিমাণ বৃদ্ধির চেষ্টার পথেও অন্তরায়গুলি দূর করার দিকে করপোরেশন অথেই মনোযোগী নয়। বড় টিউবওয়েলগুলির কয়েকটি খারাপ হয়ে আছে, এদের পাইপগুলিও নাকি অনেক ক্ষেত্রে বুজে আসছে। সুতরাং, এই সূত্রেও আশানুরূপ জল পাওয়া যায় না। এ-ছাড়া ছোট টিউবওয়েলগুলি রয়েছে। ছোট টিউবওয়েলের প্রসঙ্গ উত্থাপন না করাই ভাল। ৮০০০ ছোট টিউবওয়েলের মধ্যে ৪০০০ই বিকল। যেগুলিও বা চালু থাকে, সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও সাময়িক মেরামতে পুরো গাফিলতি রয়েছে। তাছাড়া ট্যাঙ পাইপ থেকে দৈনিক ২০ লক্ষ গ্যালন জল অপচয় হচ্ছে, সি, এম্. পি, ও র মতে। ৬ হাজারের মধ্যে শতকরা ৭৭ ভাগেরই নাকি এই অবস্থা!

কলকাতার জল ক্রমশই অধিকতর নোনতা হয়ে উঠছে, গ্রীষ্মের সময়! ফারাক্কা বাঁধ তৈরী হয়ে ভাগীরথীর জলের ধারা না বাড়ালে জলের নোনতা ভাব কমবে না বটে। তা সত্ত্বেও বিকল্প ব্যবস্থার দিকে এতোদিনে করপোরেশনের নজর দেবার অনিবার্য দায়িত্ব ছিল। ১৯৬৮-৬৯ সালে দশ লক্ষ গ্যালন জলে লবণের পরিমাণ ছিল ২৮০০ ভাগ এবার ৭ই জুন এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৩৬৮০ ভাগে। অথচ বিশেষজ্ঞদের মতে ১৪০০ ভাগের বেশী থাকা উচিত নয়। জলসঙ্কট মোচনের দায়িত্ব সর্বাগ্রগণ্য। যে ভাবেই হোক অবিলম্বে এ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে হবে।

পাকিস্তানে ঝড়ের সঙ্কেত

গত ৭ই জুন সমগ্র পূর্ববঙ্গে আমরা ঔপনিবেশের যাঁতে যে আগুন জ্বলে উঠেছে আয়ুব সরকারের চরম অত্যাচারও সে দুর্বার গণঅভিযান দমনে যে সক্ষম হয় নাই তা সুপ্রমাণ হয়েছে গত ১৭ই জুন পূর্ববঙ্গে 'কালো দিবস'-পালনের মধ্যে দিয়ে। ৭ই জুনের রক্ত সেদিন ঢিলির বারুদায় গুলি চলেছে। হুগোহর ও ঢাকায় কাল ব্যাজ পরিহিত শোভাযাত্রীরা পুলিশের গুলিতে নিহত ও আহত হয়েছে। ৭ই জুনে অনুষ্ঠিত পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে পূর্ববঙ্গের বহু জেলার বাড়ীতে বাড়ীতে কালো পতাকা উড়েছে। পূর্ববাংলার এই সংগ্রামকে ভাষা দিয়ে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান তাঁর "আমাদের বাঁচার দাবী" শীর্ষক পুস্তিকায় বলেছেন: "অতীতে পূর্ব পাকিস্তান-বাসীর নিতান্ত সহজ ও ন্যায্য দাবী যখনই উঠেছে তখনই শোষকের দল ও তাঁদের দালালরা ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন।"

পূর্ববাংলার এই নবজাগৃতি যে সময় পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলেছে, ঠিক সেই সময়ে আয়ুব সরকারের ঘরে ভাঙন ধরেছে। চীন অনুগত ভুট্টো পদত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। কট্টর ভারত বিদ্বেষী পররাষ্ট্র সচিব এবং পাকিস্তানে পর্দার আড়ালের আসল নায়ক আজিজ আহমেদ ওকালত গ্রহণে বাধ্য হয়েছেন এবং পাকিস্তানী অর্থমন্ত্রী লোদাইবও বিদায় নিয়েছেন। এই পরিবর্তনের মুখে,—ভারতের ক্ষেত্রে ডিভ্যালুয়েশনের পর—মার্কিনী অবরুদ্ধ সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি ঘোষিত হয়েছে এবং নূতন সাহায্যের আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানী সামরিক কাঠামোতেও নানা রদবদল হয়েছে।

এই পরিবর্তনের কারণ কি তা সহজে বোঝা যাবেনা। একদিকে যেমন মার্কিনীদের লগুড়ির জন্য এই পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা যেতে পারে, অপরদিকে পূর্ববাংলার চীনাদের প্রভাব বৃদ্ধি করে এই অঞ্চলে মার্কিণ মুখীনতা খর্ব করা হচ্ছে। কারণ পূর্ববাংলার চীনাদের সাহায্যে নারায়ণগঞ্জ

ও চাটগাঁয় দুটি সামরিক অস্ত্রের কারখানার কাজ সুরু হয়ে গেছে, চাটগাঁ বন্দরে বহু চীনা টাঙ্ক বানানো হয়েছে এবং ঢাকায় চীনাবিমান আমদানী করা হয়েছে। পাকিস্তান পশ্চিমাঞ্চলে তার বিরুদ্ধ মনোভাব দ্রুত সংস্কারের কাজে অগ্রসর হলেও পূর্ব বাংলার জনগণ চীনাদের চাপের নিকট নতি স্বীকার করে তাদের হাতেই পূর্বাঞ্চল পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার ভার তুলে দিতে উদ্যোগী হয়েছে। সুতরাং মার্কিণ মুখীনতা ও চীনমুখীনতা —আমুব ও দুটো বার প্রতীক—দুটোগোটির বিদায়সত্ত্বেও অব্যাহতই থাকবে এবং পূর্ববাংলার মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে ইসলামাবাদ নির্মম মনোভাব গ্রহণ করবে। ভারতের পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তায় পূর্ববঙ্গের মুক্তির স্থান কোথায় তা সহজেই অনুমেয়।

প্রতিরক্ষা বাজেট হ্রাসের পাকিস্তানী প্রস্তাবেও এই দুরভিসন্ধি বজায় রয়েছে। ১৯৬৮-৬৯র পাকিস্তানী বাজেটে ২২৫ কোটি টাকা প্রতিরক্ষা ব্যয়ের জন্য ধার্য করা হয়েছে অর্থাৎ বাজেটের প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ। ভারত বরাদ্দ করেছে ৭৯৭ কোটি টাকা অর্থাৎ বাজেটের শতকরা ৩৫ ভাগ। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যয় হ্রাসের প্রস্তাবের চতুরতা এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। ডিভ্যালুয়েশনের ফলে বৈদেশিক বাজারে অস্ত্রক্রয়ের ক্ষমতা ভারতের তুলনায় শতকরা ৬০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং, পাকিস্তানের পক্ষে ব্যয় হ্রাসের বদান্যতার প্রস্তাবে কোনো ক্ষতিরই সম্ভাবনা নেই।

ধান লুট

মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার বিভিন্ন অঞ্চলে সম্প্রতি ধান-চাল লুটের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। এই দুই উদ্বৃত্ত জেলাতে ধান-চাল লুটের সংবাদ গ্রামীন জীবনে খাদ্যসঙ্কটের শোচনীয় পরিস্থিতির ইসারা বহন করে এনেছে। ক্যানিং অঞ্চলে চালের দাম মণ ৮০ টাকায় বৃদ্ধির সংবাদ পাওয়া গেছে, অন্যান্য ঘাটতি অঞ্চলে মজিকায়েড রেশনিং-এর বিপর্যয়ের সংবাদও সুবিদিত। অথচ, সরকার বলছেন চিন্তার কারণ নেই। রেশনিং-এর দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হবে। সরকারী আশ্বাসে পশ্চিমবাংলার জনসাধারণের কোনো আস্থাই নেই। আসন্ন সঙ্কটের মোকাবিলা করার জন্য কঠোর প্রস্তুতিই তাদের কাছে একমাত্র পথ।

মহীশূর বনাম মহারাষ্ট্র

মহীশূরের মারাঠিভাষী অঞ্চলগুলির মহারাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্তির দাবীতে মে'র তৃতীয় সপ্তাহে বোম্বাই এ, আই, সি, সি অধিবেশন চলাকালীন সমগ্র মহারাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রবল আন্দোলনের মুখে প্রধানমন্ত্রী এক লম্বা চিঠিই একটি কমিশনের হাতে সমস্যাটির মীমাংসা ছেড়ে দিতে সম্মত হয়ে একবছরের মধ্যে এবিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির প্রতিশ্রুতি দেন। তারপরই মহীশূরের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত রদের জন্য প্রবল আন্দোলন শুরু হয়েছে। মহীশূরের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্থানীয় কংগ্রেস। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্বিন্যাসের নীতি স্বীকৃত হবার পর কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ এবং ভারত সরকারকে এই অনিশ্চিত অবস্থা অবসানের জন্য অগ্রসর হতে হবে। কংগ্রেসের অব্যবস্থিত চিত্ততা জাতীয় সংহতি গঠন তো দূরের কথা, এই সংহতি বিনাশে সহায়ক হয়েছে। হরিয়ানা-পাঞ্জাবী সুবার প্রশ্নেও তারই পুনরাবৃত্তি দেখা গেছে। এই দুই নূতন রাজ্যের রাজধানীরূপে চণ্ডীগড়ের সামরিক অবস্থানও—প্রধান মন্ত্রীর ভাষায়—এই টানা-পোড়েনের জটিলতা বৃদ্ধি করবে। ভাষাগত ও অন্যান্য সঙ্কীর্ণ অর্থ নৈতিক স্বার্থের ফল জাতীয় সংহতির উপর ক্রমশ যে প্রচণ্ড আঘাত অনিবার্য করে তুলছে, তার ফলে ভারতের ফেডারেল কাঠামোর নূতন মূল্যায়নের প্রশ্ন দেখা দিয়ে

ইউনিটারী কাঠামোর দিকে যদি প্রবলভাবে জনতাকে উদ্বোধিত করে তবে অবাক হবার কিছু নাই। স্বাতন্ত্র্যের চাইতে সংহতির স্থান অনেক উঁচুতে। সুতরাং সংহতির নিরিখই অন্তিম নিয়ামক হবে।

জেনারেল চৌধুরীর অবসর গ্রহণ

গৌরবদীপ্ত সামরিক প্রতিভার অক্ষয় পদচিহ্ন রেখে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরী গত ৮ই জুন তাঁর ৩৮ বছরের সাফল্যমণ্ডিত সামরিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক চরম বিপর্যয়ের মুহূর্তে ১৯৬২ সালের নভেম্বরে জেনারেল চৌধুরী সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করে বর্তমানের কুশলী ও আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন সেনাবাহিনী গঠন করে গত পাক-ভারত যুদ্ধে উচ্ছ্বানের পাকিস্তানী সমরাস্ত্রের আঘাত দ্বিগুণ বেগে ফিরিয়ে দেবার পর সারা পৃথিবীতে যেখন ভারতীয় সেনা-বাহিনীর অপূর্ব রণকৌশলের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল, তেমনি তার শীর্ষ নেতৃত্বের অধিকারী জেনারেল জে, এন, চৌধুরীর। জেনারেল চৌধুরীর স্থলবর্তী জেনারেল কুমারমঙ্গলম তাই তাঁর প্রাক্তন অধিকারকের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বলেছেন: "It is a very difficult thing for a leader to take over the army with a shattered morale. General Chaudhuri is among the few, who has done it and done it well." জেনারেল কুমারমঙ্গলম সম্পর্কে মন্তব্য করে জেনারেল চৌধুরীর বলেছেন "আমার স্থলবর্তীও একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি"। জেনারেল কুমারমঙ্গলম নানা খ্যাতির সিঁড়ি বেয়ে সর্বোচ্চপদে উঠেছেন। জেনারেল চৌধুরীকে আমাদের বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে আশা করছি জেনারেল কুমার-মঙ্গলমের নেতৃত্বেও ভারতের সীমান্ত ও সার্বভৌমত্ব অটুট থাকবে।

১৮. ৬. ৬৬

ভুল স্বীকার

গত বৈশাখ সংখ্যার কভারে আচার্য নন্দলালের মূর্তির যে ছবিটী ছাপা হয়েছে সে মূর্তির শিল্পী শ্রীবিপুলকান্তি সাহা, কলাভবনের ২য় বার্ষিক ছাত্র। মূর্তিটি ১৯৬৫ সালে নির্মিত। আচার্য নন্দলাল মূর্তিটি দেখে খুসী হয়েছিলেন। ভুলক্রমে বৈশাখের জয়শ্রীতে শিল্পীর নাম শ্রীভবেশ সাহা মুদ্রিত হয়। এজন্য আমরা দুঃখিত। জঃ সঃ

: উপন্যাস :

কষ্টি ভরা বিষ

মিহির মুখোপাধ্যায়

দুই

তারানাথ কাব্যতীর্থ নওয়াপাড়ার সম্পন্ন গৃহস্থ। কৌশিক উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়। শাণ্ডিল্য গোত্রের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। কাব্য-ব্যাকরণ-অলঙ্কার শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যলাভ করেছেন। নবদ্বীপের টোল থেকে উপাধি পেয়েছেন। হেমন্তের ভোর। এক একদিন বেশ কুয়াশা নামে। শেষ রাত্রি থেকেই বেশ শীত শীত লাগে। ধান কাটা হয়ে গেছে। গেরস্থ-বাড়ির উঠোনে ধানের মরাই। শিশির, ভেজা ঘাসের উপর শেষ হেমন্তের শেফালি ঝরে আছে। তারানাথ ফুল তুলেছেন। প্রতিদিন নিজের হাতে ফুল তুলে গৃহদেবতার পুজো করেন। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণুমূর্তি। যদিও নবদ্বীপের ছাত্র ছিলেন তারানাথ, কিন্তু তাঁর উপাস্য দেবতা রাধিকারমণ, গোপীকুলবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ নন। তাঁর ইষ্টদেবতা সেই বিষ্ণু, যিনি বলেছেন :—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

কবি জয়দেব যাঁর স্তব করে বলেছেন, "দিনমণি-মণ্ডল-মণ্ডন, ভবখণ্ডন, মুনিজন-মানস-হংস, কালীয়-বিষধর-গঞ্জন, মধুমুর-নরক বিনাশন।" সেই কংসারি কৃষ্ণের উপাসক তিনি।

সূর্য উঠেছে। সরযূতী নদীর ওপারে বনের চূড়োয় পূব-আকাশের রঙ শেফালীবৃন্তের মত ঘনীভূত-রক্তিম হয়ে উঠল। আটচালা কাছারী ঘরের চালে কয়েকটা কাক ডাকছে। বিষ্ণু মন্দিরের রোয়াকে দাঁড়িয়ে বসুদেবের বাবাজী মুঠো মুঠো ধান ছড়িয়ে দিল। এক ঝাঁক পায়রা আর কয়েকটা চড়ুই ওকে ঘিরে পাখার ঝাপটায় খুশির হাওয়া ছড়াল। বড় সুন্দর সকাল। তারানাথ বেশ খুশি মনে ফুলের ডালা ভর্তি করে মন্দিরের দিকে চললেন। গুন গুন করে গানের সুরে স্তব করছেন—

প্রলয়োপয়োধিজলে ধৃত বানসি বেদম
বিহিত-বহিত্র-চরিত্র খেদম্
কেশব ধৃত মীন শরীর
জয় জগদীশ হরে।

মন্দিরের রোয়াকে উঠে ডাকলেন—"বাসু, চন্দন ঘষে দাও তো বাবা!"

—"এই যে দিচ্ছি বাবা!"—প্রতিদিনের নিয়মমতো বাবাজী স্নান সেরে এসে পাখির খাবার দেওয়া শেষ করল। এবার একপিট ভেজা ভেজা কালো কোঁকড়া চুল এলিয়ে চন্দন ঘষতে বসবে। কিন্তু কাছারী ঘরের উঠোনের দিকে নজর পড়তেই চেঁচিয়ে উঠল—"ও বাবা দাখো এসে, পিসীমা এসেছেন, বড় পিসীমা, ওমা! পিসীমা তোমার কি হয়েছে গো!"

—বলতে বলতে বাবাজী মন্দিরের রোয়াক ছেড়ে নেমে গেল। তারানাথের আর পুজোর আসনে বসা হল না। মন্দিরের দরজার কাছে দাঁড়িয়েই দেখতে পেলেন কাছারী ঘরের উঠোন পেরিয়ে সদর অন্দরের মাঝামাঝি মন্দিরের সামনের ঘাস জমিটুকুর ওপর এসে ভবানী দেবী দাঁড়িয়েছেন। মুখের চেহারা ভাল নয়। যেন সারারাত ঘুম হয়নি। দুই চোখে

কেমন একটা ভয়ের সৃষ্টি। পাশে পাশে বেজভাই কালিনাথ আসছিল। বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছিল। কারণ উত্তেজিত হলেই কালিনাথের নাকের ডগা ফুলে ফুলে ওঠে আর ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে। পেছনে ছোট ছোট তিন ভাগনে! দশ এগারো থেকে চৌদ্দ পনের বছরের। সবচেয়ে ছোটটিকে এর আগে একবার মাত্র দেখেছিলেন উপনয়নের সময়। বেশ ফুটফুটে চেহারা। ওদের সঙ্গে সঙ্গে আসছে, ওদের বাড়ির সেই সেটেলমেন্টের সর্দার। ব্যাটার চেহারা ঠিক মহিষাসুরের মতো, কি যেন নামটা বিশ্বম্ভর না বিশ্বেশ্বর! এখন মনে আসছে না। কিন্তু এতসব দেখার আগে প্রথমেই তাকালেন বোনের কপালের দিকে, না সিঁথির সিঁদুর ঠিক আছে। বেশভূষা একটু লক্ষ্মীছাড়া গোছের হলেও বৈধব্যের বেশ নয়। বীর স্থির মানুষ ভারানাথ, কোন কিছুতে সহসা বিচলিত হন না। মন্দিরের রোয়াক থেকে নেমে সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে বললেন—"কি হয়েছে ভব এমন ভাবে হঠাৎ এলি কেন?"

বাসন্তী তৎক্ষণে ছুটে গিয়ে শিলীমাকে জড়িয়ে ধরেছে। কালিনাথ তাড়াতাড়ি দুপা এগিয়ে এসে উত্তেজিত ভাবে বললো—"সর্বনাশ হয়ে গেছে, বর্ধমানের নৃসিংহরাজা রাজারাতি ভূতুরুড়ি ধরপাক্ড় করেছে।" উত্তেজনা এলেই কালিনাথের কথা একটু আটকে যায়। বড় ভাইয়ের সঙ্গে কোন মিল নেই। একেবারে অন্য ধরণের মানুষ। লেখা-পড়ায় বিশেষ যার যারে না। যাহ যারে, পাশা খেলে, লাঠি-খেলে, মড়া পোড়ায়। একটু সোজা বুদ্ধি, গায়েও বেশ জোর। নাকের ডাগা ফুলিয়ে বললো—আ-আমি ব্-যাচ্ছিলুম, গাজীপুরের হাটে মধুর জেলের কাছ থেকে জ্-আল কিনতে. পথে দেখি ও-ওরা আ-আসছে, কি ব্যা-ব্যাপার, না ব্ বর্ধমানের রাজার স-সঙ্গে জমি নিয়ে আ-আমাদের রায়মশাই কি গ্-গোলমাল ব্-বাঁধিয়েছেন, রাত্তির বেলা স্-মহারাজের স্-লোকজন এসে পেড়োর গড় দ-খলপ করে নিয়েছে।"

ভাইয়ের কথা শুনে তারানাথ উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞেস করলেন—"কেন এমন হল ভব, মহেশের খবর কি, সে ভাল আছে তো।"

ভবানী দেবী এতক্ষণ তেমনভাবে কাঁদেননি, এই দীর্ঘপথ বেশ শক্ত মনেই পার হয়ে এসেছেন। আপনজনের কাছে এসে আবার কান্নায় ভেঙে পড়লেন—"কেমন করে জানব দাদা, আমাদের যে সব গেল, বাড়িঘর কিছুই রইল না, একেবারে পথের ভিখিরি হয়ে"—নিচু হয়ে দাদার পায়ের ধুলো নিতে গিয়ে মন্দিরের সিঁড়িতে মাথা ঠেকিয়ে কোঁপাতে লাগলেন।

—আরে ওঠ্ ওঠ্ কাঁদিস্ নি, আ-আমরা তো রয়েছি, তুই তো আর জ-জলে পড়িসনি, আ-আমরা বেঁচে থাকতে—কালিনাথ বোনকে ওঠাবার চেষ্টা করল। বাসন্তী তাকে কোনরকমে ধরে নিয়ে মন্দিরের রোয়াকে বসিয়ে দিল। ভাজ করা হাটুর উপর কপাল রেখে এলোচুল ছড়িয়ে কেমন আলুথালুভাবে ভবানী দেবী বসে আছেন।

তারানাথ বিব্রত হয়ে উঠলেন। এখন কি করা উচিত। বোনের স্বভাব তিনি জানেন। স্বামীর শুভসংবাদ না আসা পর্যন্ত একফোঁটা জলও মুখে দেওয়াতে পারবেন কি না কে জানে।

তারানাথ মুখ ফিরিয়ে ডাক দিলেন—ওহে, তোমার নাম যেন কি, বিশ্বম্ভর না—

"—আইজ্ঞে বিশ্বনাথ, মাঠান বলে বিশু, রায় রাজা ডাকে, বিশু সর্দার, পাইকরা বলে, সর্দার, আপনি বিশু বলেই ডাইকো।—বিশু-সেটেলের বিনীতভাবে হাত জোড় করে কথা বলার ধরণ দেখে তারানাথ একটু হাসলেন—তা তোমাদের রায় রাজা এলেন না কেন, তিনি কেমন আছেন, তার খবর জানো কিছু?—আইজ্ঞে জানতি পারার উপায় ছেলো না, অবোস্থাখান বোঝেন এক রাত্তিরির মদ্দি আলায়, কোথায় ছুরশো আর কোথায় নওগাপড়া, দুখিরামের বস্তি

দিতি হয়, ওগো যে আনতি পারিছি, একমাত্তর ওই ওনার কিরপা।"—বিষ্ণুমন্দিরের দিকে মুখ করে জোড় হাত কপালে ঠেকালে বিশ্বনাথ।

ভবানী দেবীর দুই ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল বিস্তর পাশে। ফুটফুটে ছোট ছেলেটি গুটিগুটি মন্দিরের রোয়াকে উঠে মায়ের পাশে বসল। ওর বিস্ময় ভরা বড় বড় চোখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। ওই বুঝি বড়মামা, ওই মেজমামা আর এ হল বড়মামার মেয়ে বাসন্তীদি। বছর দুই আগে পৈতে হবার সময় মামাবাড়ির মানুষরা জুরতট দিয়েছিল। তখনকার দেখা। সকলের সব কথা ভাল করে মনেও নেই।

বাসন্তীদি পাশে বসে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললো—কিরে ভারত, আমাকে চিনতে পারলি।

ছেলেটি মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিল।

—কে আমি বলতো?

এবার ফিক করে একটু লজ্জার হাসি হেসে বললো—"দিদি।"

তারানাথ এবার অন্য প্রসঙ্গ পেয়ে একটু যেন হাঁফ ছাড়লেন—এইটি বুঝি ছোট ছেলে ভারতচন্দ্র, বঃ বেশ্ দেখতে হয়েছে তো আর এই বুঝি মেজ আর সেজ, তোর বড়ছেলে চতুর্ভুজ আসেনি?"

ভবানীদেবী একটু যেন ধাতস্থ হয়েছেন, কাপড় চোপড় সামলে বসে ছেলেদের ডেকে বললেন—"হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন, মামাদের পায়ের ধুলো নে—তারপর দাদার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন—"বড় ছেলে তো বাপের সঙ্গে রইল, কি যে আছে কপালে কে জানে।"

ছেলেরা এগিয়ে এসে টিপটিপ করে প্রণাম করল। তারানাথ বললেন—"থাক্ থাক্ বাবা হয়েছে, বেঁচে থাকো সুখে থাকো, বিদ্বান বুদ্ধিমান হও, এইটি বুঝি মেজছেলে অর্জুন আর সেজটির মুখখানি দেখছি একেবারে তোর মতই হয়েছে।"

ভবানীদেবী চোখের জল মুছে বললেন—"ওদের বাপ-পণ্ডিত গোবর্ধন ভট্টাচার্য বললেন, মাতৃমুখী ছেলে খুব সুখী হয় তা কপালে সুখ যে কত আছে এখুনি বুঝতে পারছি।"

বড়মামা এবার ভারতের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—"তোর ছোট ছেলেটি কিন্তু চমৎকার হয়েছে, আহা! মুখখানি একেবারে শুকিয়ে গেছে, তুই যদি অস্থির হয়ে পড়িস, তবে, এরা তবে কার মুখের দিকে তাকাবে—তারপর মেয়েকে বললেন—"যাও যাওতো মা, তোমার ভাইদের নিয়ে মুখ হাত ধুইয়ে দুধ খেতে দাও।"

কালিনাথের হাঁকডাক শুনে বাড়ির ভেতর থেকে বউএরা, ছেলেমেয়েরা এসে ওদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে। মস্তবড় সংসারে নানা আত্মীয় স্বজন, আশ্রিত বান্ধব। বড়বৌদি কাত্যায়নী এসে ভবানীদেবীর হাত ধরে বললেন—"চলো ভাই ঠাকুরঝি, ভেতরে গিয়ে বসবে চলো।"

ভবানীদেবী আবার ছেলেদের বললেন—"মামীদের পায়ের ধুলো নাও, বারবার বলতে হবে কেন?"

বড়মামীকে ভারত এই প্রথম দেখলো, এক গা গয়না, নাকে নাকফুল, গায়ের রঙ মায়ের মত অত ধপধপে নয় একটু ময়লা বটে, কিন্তু মুখখানি বেশ শান্তশিষ্ট, কপালে মস্ত সিঁদুরের টিপ্।

বাসন্তীদি হাত ধরে টানাটানি করছিল—"আয় রে বাড়ির ভেতরে চল, দেখবি, আমাদের বাড়িতে কাকাতুয়া আছে, টিয়াপাখি আছে, রাঙি গাই-এর লাল টুকটুকে বাছুর হয়েছে, গলায় আবার ঘুঙুর বেঁধে দিয়েছি, কত পায়রা আছে, পায়রা পুষবি তুই, সব দেখাবো তোকে চল্ ভেতরে চল।"

মামা বাড়িতে এই প্রথম আসা। অচেনা মানুষ সব, অজানা ঘরদোর। কেমন যেন লজ্জা লাগছিল।

মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু কিন্তু কিন্তু করল। মেজমা সেজমাও জড়ভরতের মত দাঁড়িয়ে আছে। নানাজনে চারপাশে দাঁড়িয়ে হা-হুতাশ করছে, যাকে তাকেই জিজ্ঞেস করছে।

বাসন্তীদি একরকম টেনেই বাড়ির ভেতর নিয়ে চললো। মেজদা সেজদাকেও আদর করে ডেকে নিল, ওরাও একপা' দুপা করে পেছন পেছন এলো'। বাসন্তী যেতে যেতে একটু পেছন ফিরে বললো—"এ ছেলেটি কেরে ?"

খালি গা, কালোমত গোলগাল ছেলেটি, পরনে ময়লা কাপড়, মাথায় একটা পুটুলি নিয়ে পেছন পেছন আসছিল। বাসন্তীর মুখের দিকে বোকার মতো তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ভারত জবাব দিল—"ও হচ্ছে রঘু, আমাদের বিশুদাদার ছেলে।"

বাসন্তী একটু ভুরু কুঁচকে বললো—"ও তাই নাকি।"

তার মুখের চেহারা দেখে ভারত তাড়াতাড়ি আবার বললো—"ও আমাদের ভাই হয়, মা বলে দিয়েছে।"

কথা শুনে বাসন্তী হেসে ফেললো—"আচ্ছা, তুমিও এসো।"

অন্দরের দরজার কাছে আসতেই দেখা গেল ভেতর থেকে একটি ছেলে আসছে ! ভারতের চেয়ে কিছু বড়, গ্রামগ্রামের সমবয়সী হবে। পাততাড়ি বগলে, হাতে মাটির দোয়াত, খাগের কলম।

—"হনুমান ! এত বেলায় তুই পাঠশালায় যাচ্ছিস্, ছিদি কোথায়, বাবার কাছে বলে মজা টের পাওয়াব, হা করে দেখছিস্ কি, এরা সব বড় পিসিমার ছেলে"—তারপর এদের দিকে মুখ করে বললো—"এটি আমার ছোটভাই বিষ্টুপদ।"

অর্জুন একটু ভারিক্কীচালে বললো—"আমি একে চিনি, খুব ছোট দেখেছি।"

বাসন্তী মুখ টিপে হাসল—"হ্যাঁ, তুমি এখন খুব বড় হয়ে গেছ।"

—"বড়ই তো আমার বয়স চোদ্দ বছর।"

—"তা'হলে তুমি আমাকে দিদি বলে ডাকবে।"—বাসন্তী গম্ভীর হবার ভান করল, কালো চোখে কৌতুকের হাসি।

—"কেন, তোমার বয়স কত ?"—অর্জুন তর্ক করার ভঙ্গিতে তাকাল।

বাসন্তী এদিক-ওদিক তাকিয়ে জবাব দিল—"কাউকে ব'লো না, আমার এই পনেরো চলছে, মা কম করে বলে, ছেরো, ছি-ছি মায়ের কি বুদ্ধি !"

সকলেই হিহি করে হাসল। কেন হাসল, কেউ জানে না। ভারতও জানে না। বড়মামীর বুদ্ধির জন্য, না দিদির কথা বলার ভঙ্গি দেখে, কিম্বা মেজদা বয়সে ছোট হয়ে গেল, এই জন্য। কেন, কি জন্য কেউ জানে না। শুধু সবাই হাসল। রঘুটাও বোকার মত দাঁত বার করে হাসছিল। বাসন্তী তাড়া দিল—"এই সব, চুপ, কেউ হাসবি না, মা আসছে।" ভারত পেছনে তাকিয়ে দেখল মায়ের হাত ধরে বড়মামী আসছেন। পেছনে বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা। সবারই মুখ থমথমে। এখন আর হাসা চলবে না, হাসা উচিত নয়।

বড় দুঃখের সময় চলছে। বড়দা কোথায় রইলেন, বাবা কেমন আছেন, কে জানে।

বাসন্তী বললো—"এই বিষ্টু, তোর আর পাঠশালায় যেতে হবে না, এদের সঙ্গে খেলা করবি আয়।"

—কি মজা, আজ আর পড়তে যাব না, তুই বাবাকে বলিস্ না, দিদি—বিষ্টুপদ তিন লাফে ঘরে ঢুকে পাততাড়ি দোয়াত কলম সব রেখে বাড়া হাত-পা হয়ে বাইরে এল।

তিন

—"তোর এ ছেলের হ'ল মেষ লগ্ন, কর্কট রাশি, চতুর্থে বৃহস্পতি তুঙ্গি, চন্দ্রের সঙ্গে রয়েছেন, পরাশর বলেছেন, কিং কুর্বন্তি গ্রহা সর্বে যস্য কেন্দ্রী বৃহস্পতি, বুঝলি ভব, সমস্ত গ্রহ বিরুদ্ধাচারণ করেও কিছু করতে পারে না, যদি বৃহস্পতি

কেন্দ্রী হয়।"—তারানাথ কাব্যতীর্থ ছোট ভাগ্নের ভাগ্যবিচার করছেন। ফলিত জ্যোতিষও কিছু কিছু জানা আছে তাঁর। একখণ্ড কালো পাথরের ওপর খড়ি দিয়ে রাশিচক্র এঁকেছেন। তন্ময়ময় জেনে নিয়ে লগ্ন নির্ণয় করেছেন। তারপর ভাগ্নেকে সামনে বসিয়ে তার ডানহাতের রেখার সঙ্গে রাশিচক্র মিলিয়ে দেখছেন। কিছু দূরে ভবানীদেবী বেশ আগ্রহের সঙ্গে শুনছেন।

কিছুক্ষণ দেখে তারানাথ আবার বললেন—"তোর ছেলে, কিছুক্ষণ দেখে তারানাথ আবার বললেন "তোর ছেলে রাজ-সম্মান পাবে, বিদ্বান আর শিল্পী হবে. শিল্পী কাকে বলে জানিস্ তো, গায়ক, চিত্রকর, কবি এরা সব হলেন শিল্পী। মহর্ষি ঐতরেয় বলেছেন, শিল্পীরা তাদের সৃষ্টি দ্বারাই দেবতার স্তব করেন. শিল্প সাধনার দ্বারা শিল্পী নিজের আত্মাকে শুদ্ধ সংস্কৃত করে তোলেন।" একটু থেমে রাশিচক্র দেখে নিয়ে আবার বললেন—দশমভবান নাথ কেন্দ্রে কোণে হুনবা, এই বচন অনুসারে দশমস্থানের অধিপতি যদি কেন্দ্র, কোণে অর্থাৎ পঞ্চমে কিম্বা নবমস্থানে অর্থাৎ ত্রিকোণে থাকে তবে রাজসম্মান প্রাপ্তি হয়! তোর ছেলের দশমপতি শনি সপ্তমস্থান তুলায় তুঙ্গি হয়েছেন তবে ছেলের স্বভাবটি হবে মেষের মতো, মেষের স্বভাব জানিস্ তো, এমনিতে বেশ ঠাণ্ডা, কিন্তু ক্ষেপে গেলে সাংঘাতিক, বড় একগুঁয়ে, এ ছেলের স্বভাব হবে তেমনি খুব ঠাণ্ডা বটে, কিন্তু ঝোঁক চাপলে মেষের মতো চুঁ মেরে বেরিয়ে যাবে কিছুতেই আটকে রাখতে পারবি না।"

ভবানীদেবী একটু হেসে বললেন—"সে তো এখন থেকেই দেখতে পাচ্ছি, সেদিন যে সোঁ ধরলো পরুর দুধ বাছুরকে না দিয়ে খাবে না, তা খেলোই না, কেউ খাওয়াতে পারল না, উল্টে আমাদের বোঝাচ্ছে, পরুর দুধ তো বাছুরেই খাবে আমরা বাছুরের খাবার কেড়ে খাব কেন, তাতে আমাদের পাপ হয়, কেমন কথা শিখেছে শোন।"

তারানাথ একটু স্নেহের হাসি হেসে বললেন—'কিন্তু বিদ্বান হবে, আমাদের শাস্ত্রে চৌষট্টি কলার উল্লেখ আছে, এই চৌষট্টি কলায় পারঙ্গম হলে সর্ববিদ্যাবিশারদ হয়। আরেকটু দেখি বাবা তোমার হাতখানা।"

ভাগ্নের ভাল লাগছিল না। মুখভার করে হাত বাড়িয়ে বসে আছে। কতক্ষণ আর এভাবে বসে থাকা যায়। চণ্ডীমণ্ডপের সামনে এতক্ষণে হয় তো কুমীর কুমীর খেলা শুরু হয়েছে। চণ্ডীমণ্ডপের রোয়াক, কাছারী ঘরের সিঁড়ি আর উঠোনের পাশে তমাল গাছের বাঁধানো গুড়িটা হয়েছে ডাঙ্গা, আর সব জল। জলের মধ্যে বিষ্টু কুমীর হয়েছে। বাসন্তীদি, মেজদা, সেজদা পলায় দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে উঠোনে নেমে চেঁচাচ্ছে

"এপারে কুমীর নাই
কাপুর ঝুপুর নেবে যাই।"

বিষ্টু ধরতে এলেই ছুটে গিয়ে সব ডাঙ্গায় উঠ্‌ছে। এই সময় এমনভাবে বড়মামার সামনে বসে থাকতে ভালো লাগে কারো! মামাবাড়ী আসা হয়েছে প্রায় একমাস হয়ে গেল। এর মধ্যে বিতদাদা একবার ভুরশুট গিয়েছিল, বাবা দাদার খবর এনেছে। তারা একরকম আছে। কয়েকদিন আগে বিতদাদা আবার গেছে। এবার নাকি ফিরে এলে তাদের সবাইকে নিয়ে যাবে।

কিন্তু মামাবাড়িটি মোটামুটি মন্দ লাগছে না। যদিও ভুরশুটের মত ঘোলান-দুর্গ নেই, নাট-মন্দির-চণ্ডীমণ্ডপ নেই, ভোগখানা, নহবৎখানা, মহাকেলখানা কিম্বা সিংহ-দরজা নেই। কিন্তু মামাবাড়িটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কেমন ছিমছাম শান্তশিষ্ট। এখানকার বিষ্ণুমন্দিরটা শুধু ইটের গাঁথুনি আর সব বাড়ির মেয়াল ছনের ছাউনি। বড় বড় ঘর। এমনকি এখানের চণ্ডীমণ্ডপটাও ওই রকম। বড় বড় কাঠের খুঁটি। চারদিক খোলা। খোতালা সমান উঁচু ছনের ঘর। ঝকঝকে তকতকে উঠোন।

বার-বাড়ির উঠোনে তালের শান্ত ছায়া। খিড়কির পুকুর

পাড়ে আর আধরুল সজনে গাছের ছায়া। টলটলে কাকচক্ষু জলে শাদা-কালো পাতিহাঁস কটা সারাদিন ভেসে ভেসে বেড়ায়। কখনো জলের কিনারায় একপায়ে খাড়া হয়ে মাথা ঘুরিয়ে পিঠের মধ্যে ঠোঁট গুঁজে ঘুমায়।

মেজমামা যেখানে বসে মাছ ধরেন, সেই বাঁশের মাচাটার ওপর মাঝে মাঝে একটা সবুজ রঙের মাছরাঙা বসে জলের আয়নায় নিজের লাল ঠোঁটের ছায়া দেখে। এক একদিন দুপুর বেলায় সজনে গাছের ডালে বসে ঘুঘু ডাকে। অদ্ভুত শোনায়। এখানকার গাছের ছায়া, জলের রঙ, মাটির উঠোনে নিশ্চিন্ত মুক্তির আনন্দ। এখানে কখনো এদিক-ওদিক গেলে কেউ কিছু বলে না।

কিন্তু ভুরশুটের বাড়িতে একপা এধার ওধার হলে পাঁচটা কি-চাকর ভিনটে পাইক-বরকন্দাজ হাহা করে ছুটে আসত। অন্তরমহলের কদমদাসী থেকে সিংহ-দরজার দারোয়ান মুকুন্দ সিং পর্য্যন্ত—সকলেই যেন সাবধানে সবসময় আগলে রাখতে চাইত। এরা সব রাজার ছেলে। কখন কোথায় গিয়ে কোন বিপদে পড়বে কিম্বা জলে ভিজে রোদে পুড়ে হয়তো অসুখ বাধাবে। তাই সব সময় আদর-যত্ন, আরাম-আয়োজনের মধ্যে রাখো। আর এখানে। বিষ্ণুর সঙ্গে সারাদিন খেলা করো কিম্বা মেজমামার সঙ্গে মাছধরা দেখতে যাও, বিকেল বেলা আখড়ায় গিয়ে লাঠি খেলা দেখো, মেজদা-সেজদা সেখানে লাঠিখেলা শেখে, সন্ধেবেলা বিষ্ণুমন্দিরে আরতির সঙ্গে কাঁসর-ঘণ্টা বাজাও—কেউ কিছু বলবে না।

ভুরশুট রাজবাড়ির নানা আদর-কায়দা আর বাঁধাধরা নিয়মের জগত থেকে এখানে এসে ভারত যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। বড়মামা মাঝে মাঝে পড়াশোনা করতে বলেন, বিষ্ণুপদর সঙ্গে পাঠশালায় যেতে বলেন—ওই যা এক মুস্কিল। এখন সামনে বসিয়ে তার হাতের রেখা দেখছেন, পাথরের ওপর খড়ি দিয়ে আঁক কষছেন আর মাঝে মাঝে কি সব বলছেন। খানিকবাদে হাত ছেড়ে দিয়ে বললেন—"আচ্ছা তুমি এবার যাও খেলা করগে।"

বাব্বা! বাঁচা গেছে। ভারত একপা-দুপা করে দরজার বাইরে এসেই একছুট। বড়মামা তখনো কি সব বলছেন। সে বড় হয়ে কি হবে না হবে এই সব, বলুন সে। সে বড় হলে কি হবে তাতো মনে মনে ঠিক করেই ফেলেছে। মেজদার মতো লাঠিখেলা শিখবে, বড়দার মতো বন্দুক ছুড়বে আর মেজমামার মতো মাছ ধরবে। বড় বড় রুই কাতলা ধরে আনবে।

বার-বাড়িতে এসে দেখল কেউ কোথাও নেই। কুমীর-কুমীর খেলা হচ্ছে না, শুধু বিষ্ণুপদ তমাল গাছের গুড়িতে ঠেস দিয়ে বসে আছে।

—"কিরে বিষ্টুদা, খেলা হচ্ছে না, মেজদা সেজদা কোথায়, রঘু কোথায়, বাসুদিদি আসেনি?"

বিষ্ণুপদ কোন জবাব না দিয়ে ছলছল চোখে একবার তাকাল।

এবার একটু ভয় পেলো ভারত—'কিরে কি হয়েছে?"

—"মা বকেছে"—বিষ্ণুর জবাব শুনে ভয়ে ভয়ে একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে নিল বড়মামীমা কাছাকাছি কোথাও আছেন কি না, তারপর গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করল —"কেন বকলো কি জন্য?"

বিষ্ণু গম্ভীর হয়ে জবাব দিল—"দিদি আমাদের সঙ্গে খেলছিল সেই জন্য, দিদি এখন বড় হয়েছে কিনা আর আমাদের সঙ্গে খেলবে না।"

এ আবার কি রকম কথা! দিদি বড় হয়েছে বলে খেলতে পারবে না, মেজদা'-সেজদা' তো পারবে।

একটু ভেবে আবার জিজ্ঞেস করলো ভারত—"কেন, বড় হলে বুঝি খেলতে নেই?"

—"না বড় হলে আর খেলতে পারে না, চাদ্দিকে দিদির এখন বিয়ের খোঁজ হচ্ছে কিনা, এখন বার-বাড়ির উঠোনে ছুটো-

ছুটি করে খেল্‌লে নাকি নিন্দে হবে।"—বিকুপদ আরো গম্ভীর হয়েছে এবং কথাগুলো আরো ঘোরালো হচ্ছে। নিন্দে হবে মানেটা কি? ভারত ভেবে পেল না। নিন্দে কখনো হয় নাকি, নিন্দে করে। কেউ কোন খারাপ কাজ করলে সবাই মিলে তার নিন্দে করে। কিন্তু কুমীর-কুমীর খেলাটা তো খারাপ নয়। এতদিন খেলা হ'ল কেউ নিন্দে করল না, আর আজকেই নিন্দে করার লোক জুটে গেল। কই, কাছাকাছি নিন্দে করার মত কাউকে তো দেখা যাচ্ছে না।

বাপ্‌জী বুড়ো উঠোন কাঁট দিচ্ছে আর বাজাজী গণেশ দত্ত মশাই কাছারী ঘরের মধ্যে বসে হিসেব লিখ্‌ছেন। বিকুকে এসব কথা বেশী জিজ্ঞেস করলে হয়তো আবার চটে যাবে, তার চেয়ে—"মেজদা, সেজদা গেল কোথা রে, রঘু কোথায়?" বিকু জবাব দিল—"অর্জুনদা'তো সেই কোন্ সকালে উঠে মেজকাকার সঙ্গে গেছে লাঠির বাঁশ কাটতে, রামুদাদা যাকে দেখেই কোথায় যেন পালিয়েছে আর রঘুটা—এই বলে বিকু একটু পর একটু হাস্‌ল। ভারত আশ্বস্ত হয়ে আবার জিজ্ঞেস করলো—"রঘু পালালো কোথায়?"

—"এই যে আমি এহেনে"—ডুমুরগাছের ডাল ধরে নাম্‌তে নাম্‌তে রঘু বল্‌লো—"মাষীমাকে আস্‌তি দেখেই একলাফে গাছে উঠেছি।"

বিকু আবার বল্‌লো—"মা কি বলে গেল জানিস্, আমাকে নাকি ভাজপুরে ভীমপণ্ডিতের টোলে পাঠিয়ে দেবে, বাবা নাকি অনেক আগেই পাঠাতে চেয়েছিল, মা রাজী হয়নি, এবার ঠিক রাজী হয়ে যাবে, বাবা আরো বলেছে তোকেও নাকি আমার সঙ্গে পাঠাবে সেই টোলে পড়তে।

—কেন আমাকে কেন, আমি তোদের সঙ্গে ছিলাম না—ভারত রীতিমতো অবাক হ'ল।

—না থাকলে হবে কি—বিকুর মুখে দুষ্টুমির হাসি—মা বলেছে আমরা দু'জনে একসঙ্গে পড়তে যাব, বড় পিসীমাও মত দিয়েছেন, কি বলা হবে বল্ দিকি।

এর মধ্যে আবার মজা কোথায়, ভারত এবার ভয় পেলো। কোথায় ভাজপুর, অচেনা অজানা জায়গা। মাকে ছেড়ে, মেজদা সেজদা'কে ছেড়ে, সেই সংস্কৃত টোল যার গুরুমশাইর নাম ভীমপণ্ডিত, নাম শুন্‌লেই হাত-পা হিম হয়ে আসে, সেখানে গিয়ে থাকতে হবে, বিষ্টু, এসব কি ভয়ানক কথা বলছে।

—তোর ভয় করছে বুঝি, খুব বোকা, ভয়টা কিসের—বিকু অভয় দেবার চেষ্টা করল—ভাজপুরে ছোট কাকা আছে, ঐ টোলেই পড়ছে, আমি আগে দু'বার গেছি সেখানে, মেজকাকার সঙ্গে গেছি, ভীমপণ্ডিত শুনেছি বদরাগী, গায়ে খুব জোর, কিন্তু আমাকে কিছু বলেনি সঙ্গে মেজকাকা ছিল কিনা, তাঁর গায়ে কিরকম জোর জানিস্ তো, হুঁ হুঁ তাঁর সঙ্গে ঠাট্টা নয়, আর সেখানে ছোটকাকাও আছে, ও তুই তো আবার ছোটকাকাকে দেখিস্‌নি, আচ্ছা ছোটকাকীকে দেখেছিস্ তো ওই যে সুন্দর মতো কাকিমা, ঘোমটা দিয়ে থাকে, দিদির একটু বড় হবে, সুন্দর আলপনা দেয়, বিকেল বেলা কি রকম সুন্দর করে দিদির চুল বেঁধে দেয়, আমাদের মুড়ি খেতে দেয়, সেই ছোটকাকিমা হ'ল ছোটকাকার বউ, ছোটকাকা এখন বেশি আসে না, পড়া শেষ হলে চলে আসবে, সেই বোশেখ মাসে এসে বিয়ে করে গেছে আর একবার এসেছিল পুজোর সময়"—বিকুপদ বুদ্ধিমানের মত হাত নেড়ে নেড়ে বল্‌ছিল, রঘু আর ভারত চোখ বড় বড় করে একমনে শুন্‌ছিল।

বিকুপদ বলে যাচ্ছে—"ছোটকাকা এমন মজার গল্প বলে না, এক পণ্ডিতের লেখা একখানা বই এর গল্প, বইখানার নাম যেন কি ভয়, পণ্ডিতের নামটা হ'ল আমার মত, বিকুশর্মা, আমার নাম বিকুপদ আর তার নাম বিকুশর্মা"—হিহি করে বিকু খানিকটা হাসল। রঘুও একটু হাসল। ভারত কিন্তু হাস্‌তে পারল না। ভীমপণ্ডিতের ভয়টা কাটেনি।

বিকু বল্‌ছে—"ছোটকাকা একদিন একটা সিংহের গল্প

বলেছিল, সিংহটার নাম ছিল শিরলক"—সিংহের গল্পটা আর শোনা হল না। পাল্কী বেয়ারার হুম্‌হুম্ হাঁক শুনে তিনজনেই ওআল-ওলার ছায়া থেকে উঠোনের রৌদ্রে এসে দাঁড়াল। সামনের রাস্তাটা গোবিন্দহালদারের পোড়া ভিটের পাশ দিয়ে বেঁকে গেছে। তারপরেই বাঁশবন। বাঁশবনের আড়াল থেকে একখানা পাল্কী বেরিয়ে এল। পাল্কীর আগে আগে লাল পাগড়ীমাথায় লাঠি হাতে একজন পাইক।

রমু হঠাৎ হাততালি দিয়ে উঠ্‌ল—"বাবা, বাবা আস্‌ছিস্নে!" দেখ্‌তে দেখ্‌তে পাল্কী কাছারী ঘরের সামনে এসে থাম্‌ল। খাজাঞ্চী দত্তমশাই ব্যস্তভাবে বেরিয়ে এলেন। আরো দু' চারজন কি চাকর, পাড়া প্রতিবেশী, বাড়ির ছোট ছেলে মেয়েরা বার বাড়ির উঠোনে ভীড় করে দাঁড়াল। পাল্কীর ভেতর থেকে নামল চতুর্ভুজ রায়। ভারত যেন একটা আশ্রয় পেল।

—বাবা এসেছে, বড়দা,—বলতে বলতে একছুটে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরল।

চতুর্ভুজ একটু স্নেহের হাসি হেসে বললো—"কিরে রঙ্গ ময়লা হয়েছে কেন, খুব বুঝি রোদ্দুরে ঘুরিস্?"

বড়দা বয়সে অনেক বড়, গম্ভীর গোছের মানুষ। তার কাছে কিছু লুকুনো যায় না।

ভারত প্রথমেই সমূহ বিপদের কথা বললো—"জানো বড়দা, আমাকে নাকি ভীম পণ্ডিতের টোলে পাঠিয়ে দেবে।" ভেতর বাড়ি থেকে তারানাথ খড়ম খট্‌খট্ করে কাছে এসে দাড়িয়েছেন, হেসে বললেন—"এরই মধ্যে নালিশ করা হয়ে গেল"—তারপর চতুর্ভুজ প্রণাম করতেই বললেন—"থাক থাক হয়েছে বাবা, সুখী হও, দীর্ঘায়ু হও, কেমন আছে তোমরা বলোত দেখি, ওদিকের খবর সব ভালতো?"

বড়দাদার পায়ের ধুলো নিয়ে মাথা তুলে দাড়াতে দাড়াতে জবাব দিল চতুর্ভুজ—"প্রাণে কেউ মরিনি, গোবর্ধন ভট্টাজ আমাদের বাঁচিয়েছেন, নদীর ওপারে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম, বসতবাড়ি, বাগান, পুকুর কেরত পেয়েছি কিন্তু সমস্ত ভূসম্পত্তি এখনো মহারাণীর দখলে, ভবানীপুরের গড় পেঁড়োর গড় সব লাটপাট হয়ে গেছে।"

দুজনে কথা বলতে বলতে কাছারী ঘরের ভেতরে গেল।

তারানাথ বললেন—"বাবা প্রাণে বেঁচেছ এই ভগবানের দয়া, কিন্তু এ রকম জুলুম করার কারণ কি, এর কি কোন প্রতিকার হবে না?"

চতুর্ভুজ ম্লানভাবে বললো—"কি করব বলুন, সবই অদৃষ্ট, ঘরের শত্রু এই সর্বনাশ করেছে, আপনি রাজবল্লভ রায় মহাশয়কে তো জানেন, বাবার কাকা, আমাদের ঠাকুর্দা সম্পর্কে, তিনিই এই ব্যাপারের মূলে, বর্ধমান রাজসরকারের দেওয়ান তিনি।"

—"খুব চিনি তাকে, দারুণ ধূর্ত লোক, তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া ইষ্ট চিন্তা কখনো করেন না।"—জবাব দিলেন তারানাথ।

চতুর্ভুজ বললো—"আমরা বাধা দিলাম প্রাণপণ, কিন্তু ওদের সঙ্গে লোক ছিল হাজার হাজার, অস্ত্রশস্ত্র আমাদের চেয়ে অন্ততঃ দশগুণ বেশি, তবু যতক্ষণ পারলাম ঠেকিয়ে রাখলাম, গোবর্ধন ভট্টাজের বাড়ি পালিয়ে গেলাম, চতুর্ভুজ আরো অনেক কথা বললো, বললো গোবর্ধন ভট্টাজের সাহসের কথা।

পরের দিন ভোরে মহারাণী এসে পেঁড়োর গড়ে ঢুকলেন। দু'চারজন কি-চাকর ছাড়া আর কেউ ছিল না সেখানে। ভট্‌চাজ মশাই গিয়ে মহারাণীর সঙ্গে দেখা করলেন।

মহারাণী তাদের অভয় দিয়ে বললেন—"তোমাদের কোন ভয় নেই, আগের দিন আমার একাদশীর উপোস গেছে, তোমরা আমাকে শালগ্রামের চরণামৃত এনে দাও, আমি তাই খাব।" গোবর্ধন ভট্‌চাজ তাঁর সামনে নয়ন রায়ের গৃহদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ এনে স্নান করালেন। মহারাণী সেই জল খেয়ে তৃপ্ত হয়ে বিগ্রহ পূজোর জন্য কিছু জমি দান করলেন

আর ভবানীপুরের কালীমন্দিরের পূজোর জন্য রোজ একটাকা করে দেবার ব্যবস্থা করে গেলেন।

শেষে চতুর্ভুজ বললো—"আমরা বসতবাটি ফিরে পেয়েছি বটে, কিন্তু দেবোত্তর জমিটুকু ছাড়া আর এককোঁটা জমিতেও কোন অধিকার নেই, বাবামশাইর মন খুব ভেঙে গেছে।"

ভারত এতক্ষণ চুপচাপ এদের কথা শুনছিল, এবার বললো—"দাদা, মায়ের কাছে যাবে না।"

—"ওই যাখো। কথায় কথায় খেয়াল নেই, চলো চলো বাড়ির ভেতরে চলো"—তারানাথ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তোমাদের খবর পাবার জন্য বাড়ির মেয়েরা খুব অস্থির, বুঝতেই পারছো। তব দিনরাত ছটফট করে, মায়ের প্রাণ তো—

দাদার হাত ধরে যেতে যেতে বললো ভারত—"দাদা এবার তুমি আমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে তো"—

চতুর্ভুজ জবাব দিল—"কেন মামার বাড়ি খারাপ কি, আমারই তো খেকে যেতে ইচ্ছে করছে, বাড়ি গিয়ে থাকবি কোথায়, ওখানে যত্নআত্তির ভাল ব্যবস্থা নেই, খাবার বন্দোবস্ত নেই, এখন কিছুদিন এখানে থাকতে হবে, ও তোকে বুঝি টোলে পড়তে পাঠাবে সেই ভয়ে আমার সঙ্গে চলে যেতে চাইছিস্।"

চতুর্ভুজ একটু হাসল। তারানাথও হেসে বললেন—"হ্যাঁ, আমি ভাবছিলাম বিষ্ণুকে আর ওকে ভাজপুরের টোলে পড়তে পাঠাব ওখানে ভীমদাস আচর্য আছেন, ভাল পড়ান, তোমাদের ছোটমামা ওখানেই আছে আজ তিনবছর।—তারপর একটু থেমে, পাশাপাশি যেতে যেতে আবার বললেন—তোমার এই ভাইটির লেখাপড়া হবে, অর্জুন আর দয়ারাম অন্যখাতের, ওদের খুব চেষ্টা করলে সামান্য কিছু হবে হয়তো কিন্তু ভারতের মত হবে না, ওর কোষ্ঠি খুব ভাল, তোমার মাকেও এই কিছুক্ষণ আগে সেই কথা বলছিলাম, তোমার কি মত বাবা।"

—"তা আপনি যা ভাল বুঝবেন, তাই করবেন, বাবামশায়ও সেই রকম বলে দিয়েছেন, আমি এবার আসছি কিছু সোনার গয়না আর রূপোর বাসনপত্র এখানে রেখে যাবার জন্য, গাড়ী জিনিস বলতে এখন এই সামান্যই সম্বল, মেজমামা, অর্জুন, রামু এদের দেখছি না যে—চতুর্ভুজ একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে বললো। তারপর বিষ্ণুমন্দির প্রণাম করে অন্দরের দিকে যেতে যেতে বললো—'তা'হলে ভারত, বড়মামা যা বললেন, তাই হবে, তোমাকে ভাজপুরের টোলে গিয়ে পড়তে হবে, বিষ্ণু যখন সঙ্গে যাচ্ছে, তখন আর ভাবনা কি, তাছাড়া সেখানে ছোটমামাও আছেন'—তারপর তারানাথকে লক্ষ্য করে বললো—"তবে একটা কথা কি জানেন বড়মামা, আজকাল আরবী-ফারসী না শিখলে নবাব সরকারে চাকরি পাওয়া মুস্কিল, দিনকালের যা অবস্থা হয়েছে—

—"দূর দূর, ও ম্লেচ্ছভাষা শিখে কি হবে—তারানাথ কাব্যতীর্থ আরবী-ফারসীকে উড়িয়ে দিলেন—তোমরা ব্রাহ্মণবংশের ছেলে তোমাদের চাকরি করার দরকার কি, আজ হোক কাল হোক জমিদারী তোমরা ফেরত পাবেই, ভারতচন্দ্রকে আমি কাব্য-সাহিত্যঅলঙ্কার-ব্যাকরণ শাস্ত্র পুরাণ সব শেখাব, ও শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হবে, ওর চতুর্থে তুমি বৃহস্পতি।"

বড়মা-বড়মামার কথা শুনে আশাভরসা যেটুকু ছিল, তাও গেল। ভারত এবার হাল ছেড়ে দিল।

বড়মামা তাকে পণ্ডিত না করে ছাড়বেন না। ছোটমামাও সেখানে আছেন। তিনি নাকি মজার মজার সব গল্প বলেন, বিষ্ণু যখন বলেছে, ভালমানুষ সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই পণ্ডিতমশাই, যার নাম ভীমপণ্ডিত, তিনি যে কিরকম লোক এবং কি বলবেন—সেটাই ভাবনার বিষয়।

(ক্রমশঃ)

রবিশংকরের মৃত্যু

শচীন্দ্রনাথ বসু

রবিশংকর বোষ মারা যাচ্ছেন। এই বৃহৎ পরিবার বর্গ, যারা এতকাল তাঁর আশ্রয়ে নিশ্চিন্তে বাস করেছে, আজ আট দশ দিন হল সব আশা ছেড়ে দিয়েছে। শহরের বিভিন্ন পল্লী থেকে আত্মীয় জন ও বন্ধু বান্ধব আসছে, কেউ গাড়ি করে, কেউ পায়ে হেটে, বাড়ির লোক নিঃশব্দে চোখ মুছতে মুছতে এদের নিয়ে যাচ্ছে দোতালার কোণের ঘরটিতে যেখানে রুগীর ক্ষীণ দেহ দক্ষিণের জানালার কাছে শায়িত। তাঁর চোখ প্রায় সর্বদাই বন্ধ, ঘরে ওষুধ ও ফুলের মিশ্র গন্ধ; শোকগম্ভীর আগন্তুকরা কিছু ক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে পা টিপে টিপে বেরিয়ে আসছে।

আটষট্টি বছর পরে যে জীবন শেষ হতে চলেছে তার ইতিহাস সংক্ষেপে বলা চলে, যদিও রবিশংকর ঠিক আর দশ জনের দলে পড়েন না। বাংলার এক ছোট শহরে জন্ম, বাবা ছিলেন উকিল। সংসার সচ্ছল ছিল না, আর দুই ভাই বোনের সঙ্গে সেখানেই বাল্য কাটল। তার পর প্রথানত পড়াশুনার সুবিধার জন্য সবাই চলে এল কলকাতায়। ক্রমে বি এ পাশ করে রবিশংকর চাকরিতে ঢুকলেন বিদেশী সওদাগরী আপিসে। কলেজ জীবনেই স্বদেশী আন্দোলনের দিকে ঝুঁকেছিলেন, এ বার কাজের ক্ষেত্রে ইংরেজের সম্পর্কে এসে স্বাধীন উপার্জনের দিকে রোখ চাপল। টুকটাক করে অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ আরম্ভ করলেন, ক্রমে ক্ষেত্র প্রসারিত হল, দিলেন চাকরি ছেড়ে।

ইতিমধ্যে বাবা রিটায়ার করেছেন, রবিশংকরের বিয়ে দিয়ে তার অল্প পরেই তিনি মারা গেলেন। স্ত্রীর পরেই বোধ হয়, রবিশংকরের উপর লক্ষ্মীর বরদৃষ্টি পড়ল; অক্লান্ত পরিশ্রমে একের পর এক উদ্যোগ দাঁড় করালেন, আজ তিনি অন্তত পনেরটা ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট. নিজের কারখানায় পাঁচ রকম জিনিস তৈরি হয়। অবশ্য তিনি দেশের পণ্যমান্য শিল্পপতিদের অন্যতম মোটেই নন, রাস্তার লোকে সকলে রবি ঘোষকে চিনবে না।

দশ বছর হল শহরের দক্ষিণে এই তিনতলা বাড়ি তিনি করেছেন। এখানে তাঁর নিজের পরিবার ছাড়াও থাকে বিধবা বোন ও তাঁর দুই ছেলে মেয়ে। তা ছাড়া, এক তলায় এক অংশে আছে ছোট ভাই শিবশংকর ও তার পরিবার। সে বেচারা কোনও দিনই বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি, চির জীবন কেরানীগিরি করে এখন রিটায়ার করেছে।

রবিশংকরের কর্মক্লান্ত জীবনে তা বলে আধ্যাত্মিকতা বাদ পড়ে নি। সেখানেও শ্বশুর বাড়ির প্রভাব দেখা যায়। সেই সূত্রের গুরুদেব তাঁকে মন্ত্র দেন, তখন থেকে রবিশংকর নিয়মিত তাঁর ধর্মকৃত্য সম্পন্ন করেছেন, প্রতি রাত্রে তাঁর ঠাকুর ঘরটিতে বসে ভুলে গিয়েছেন সারা দিনের ব্যস্ততা, ঘুরে ফেলেছেন ক্লেদ।

এই জীবনের এমন আকস্মিক অসহায় অবসান কেউ কল্পনাও করেনি। অনেক দিন থেকেই তিনি পেটের গোলমালে ভুগছিলেন, ডাক্তাররা প্রথমে আলসার সন্দেহ করেছিল, পরে প্রকাশ পেল কর্কট রোগ। তত দিনে তা তালপালা ছড়িয়ে বিরাট আকৃতি ধারণ করেছে, অস্ত্রোপচার

বরে কোনও লাভ নেই। সে আজ মাস তিনেক মাত্র, তখন থেকে রবিশংকর এই শয্যা গ্রহণ করেছেন।

নিদ্রাও নয় জাগরণও নয়, নানা রকম স্নায়বিক গুলুচের ফলে এক রকম ঘোরের মধ্যে রবিশংকরের সারা দিন রাত কাটে, পুরোপুরি সংবিৎ ফিরে আসে কদাচিৎ। সেই আবিলতার স্বপ্ন বা স্পষ্ট চিন্তন কোনওটাই ঠিক ধানা বাঁধে না। বাইরের বাস্তবতা উৎকণ্ঠা তাঁর আত্মনিমগ্ন অন্তর্লোকে স্পর্শও করে না।

তখন গভীর রাত। অল্প একটুখানি চোখ খুলে রবিশংকর টের পেলেন ঘরের কোণে মৃদু বাতি জ্বলছে, চেয়ারে ছায়ার মত এক মূর্তি বসে আছে মাথা নিচু করে। চোখ বন্ধ করে ফেললেন···এই রকম মুহূর্তে গত ক' দিন তিনি কয়েক বার টের পেয়েছেন যে মারা যাচ্ছেন। তা হলে সময় আসছে শেষ বোঝাপড়ার··চেতনা ধরা হল স্মৃতির মন্থনে, কবে কি পাপ করেছেন তার খোঁজে, জীবনে যা যা বার বার খচখচ করেছে মনে।

সবচেয়ে আগে মনে পড়ে বাল্য জীবনে বাবার এক অভিশাপ। ঘটনার শুরু এক তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে। নিজের একখানা গল্পের বইয়ের বদলে স্কুলের এক বন্ধুর থেকে একটি ফাউনটেন পেন যোগাড় করেছিলাম। দু দিন পরেই হঠাৎ তা হারিয়ে গেল। প্রথম থেকেই শিবুর খুব লোভ ছিল ওটার উপর, ওকে জিজ্ঞাসা 'করতে' ও উলটো আমাকে বকাবকি শুরু করলে। শেষে জোর করে ওর জিনিস পত্র খুঁজে বার হল কলম। ছুটে গিয়ে বাবাকে নালিশ করলুম। তিনি শুনে খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন, একটু পরে বললেন, "আমার ছেলে শুধু চোর নয়, মিথ্যাবাদী। সে ওর কান মলে।"

শিবুর দিকে তাকিয়ে দেখি ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গিয়েছে, নিঃশব্দে চোখের জল ঝরছে, তা দেখে আমার বড় রাগ কোথায় মিলিয়ে গেল। বাবা ধমকে বললেন, 'বলছি ওর কান মলে দে।'

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে, পালাতে পারলে বাঁচি। শিবুকে কি কখনও মারি নি? কত ঝগড়া কত হাতাহাতি হয়েছে, কিন্তু তখন কিছুতে হাত সরল না। ভয়ে ভয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে দেখি তাঁর রাগটা তখন আমার উপর পড়েছে, চোখ আরও লাল করে বললেন, "তুই পিতৃ আজ্ঞা অমান্য করলি আজ—এ কথা কোনও দিন ভুলতে পারবি না।"

আমাদের চোখে বাবা ছিলেন দেবতার মত, সত্যিই তা ভুলতে পারি নি, যেমন পারি নি আরও কয়েকটি পাপের স্মৃতি।···

বোধ হয় সবচেয়ে বেশী লজ্জা যে ঘটনার সঙ্গে জড়িত তা ঘটেছিল কলেজ জীবনে। সহপাঠী রণেন ছিল যাকে বলে বকাটে ছেলে, নানা রকম গল্প বলত সে, সম্ভবত তার অধিকাংশই মিথ্যা। তবু তার পাল্লায় পড়ে এক বার একটা মেয়ের ঘরে গিয়েছিলাম—খারাপ মেয়ে। ভয় আনন্দ বিতৃষ্ণা মিলিয়ে সে এক আশ্চর্য মারক অভিজ্ঞতা—এত উত্তেজক যে আর কখনও যেতে সাহস হয় নি।···

তার পর বাবার মৃত্যুর পর গয়াতে পিণ্ড দিতে দু বছর দেরি হয়ে গিয়েছিল—পুত্রের কর্তব্য যথাকালে করতে পারি নি।....

বন্ধুদের সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষত কর্ম জীবনে, আমাদের পাপগুলিও বোধ হয় বেশী ভারী হয়ে পড়ে। সবচেয়ে গভীর দাগ কেটে আছে মনে পঁচিশ বছর আগের এক সন্ধ্যার স্মৃতি। সে দিন গুরুদেব আসবেন বাড়িতে, ছটার মধ্যে ফিরতে হবে। বরাবরের রীতি অনুসারে তিনি বাড়িতে ঢোকা মাত্র আমি নিজ হাতে তাঁর পা ধুইয়ে দিয়েছি, তার পর তিনি বিশ্রাম করে পূজায় বসেছেন। সে দিন কি যে হল, দুটি মাড়োয়ারী আপিসে এসেছিল কাজের কথা বলতে, সেই কথা আর শেষ হয় না। তার পর রাস্তারও সে দিন গাড়ি ঘোড়ার

অসম্ভব ভীড়। বাড়ি পৌঁছাতে পৌনে সাতটা। সে দিন কীর্তন হওয়ার কথা ছিল, অনেক লোক এসে জড়ো হয়েছে, দেখি তাদের মধ্যে গুরু রেগে লাল হয়ে বসে আছেন। আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে বললেন, "আজ টাকার লোভ তোমাকে এমন পেয়ে বসেছে যে ধর্মের কথা ভুলতে বসেছ। কি পাপ করেছ তা নরকে গিয়ে বুঝবে।" পুজো না করেই তিনি চলে গেলেন, আর আসেন নি। যেশে গুরুর অভাব নেই, আমার ধর্ম চর্চায় বাধা পড়েনি—কিন্তু ঐ ঘটনা তো ভুলতে পারি নি।...

খোলা বইয়ের পাতা যেমন বাতাসে উলটে যায় তেমনি কয়েক মুহূর্তে ফুরিয়ে গেল এমনি সব পুরনো স্মৃতির পুনরাবৃত্তি। মনটা অস্থির হয়ে উঠছে, দেহের ব্যথাও ক্রমেই বেশী খোঁচা দিচ্ছে। রবিশংকর আবার একটু ফাঁক করলেন চোখ, দেখলেন ছায়ামূর্তি নড়াচড়া করছে, তার পর ওষুধের গ্লাস সামনে এনে মুখে ঢেলে দিচ্ছে। রবিশংকরের ঘোলাটে চেতনায় অস্পষ্ট কৃতজ্ঞতার প্রলেপ পড়ল—এ বার একটু শান্তি অন্তত কিছু ক্ষণের জন্য। কোথায় যেন ঘড়ির ঘণ্টা বাজল দু বার।

...এ কি, এ কোথায় এলাম নিজের ঘর নিজের বিছানা ছেড়ে? চার দিকে ভাসা ভাসা দেখ, বৃদ্ধ বিস্মরিত আলোয় সব কিছুই অস্পষ্ট। ও বুঝেছি, যে সুতোটা দিনে দিনে ক্ষীণ হচ্ছিল তা শেষ পর্যন্ত ছিঁড়ে গিয়েছে, ভবের খেলা সাঙ্গ হয়েছে। এই তা হলে মৃত্যু!

ঐখানে কে যেন বসে আছে না, সামনে এক মোটা খাতা নিয়ে ইশারায় ডাকছে যেন আমাকে।

"আপনি কি চিত্রগুপ্ত?"

"আমার পরিচয়ে দরকার নেই, তুমি রবিশংকর ঘোষ?"

রবিশংকরের বুকটা দুরদুর করে উঠল। এসেছে সেই চরম মুহূর্ত, যখন আর ঢাকাঢুকি কিছু চলবে না, সব হিসাব মিলিয়ে দিতে হবে। কিন্তু জীবনে, বিশেষত পরিণত বয়সে যে কথা ভেবে তিনি সাহস সঞ্চয় করেছেন তাই তিনি বললেন নিজেকে, পাপের তুলনায় পুণ্যের ভাগ তাঁর অনেক বেশী, কিছু কাল নরক বাস করতে হলেও পরে চির স্বর্গ সুনিশ্চিত।

লোকটি তত ক্ষণে পাতা খুলেছে এক জায়গায়। স্বীকারোক্তির সময় এসেছে বিবেচনা করে রবিশংকর একে একে বর্ণনা করলেন তাঁর পাপ, যেমন একটু আগে বলিছেন নিজের মনে। কিন্তু সেই ব্যক্তি খাতার পাতার দিকে চেয়ে বললে, "কই, এ সব তো কিছু দেখছি না।"

সে কি! রবিশংকর বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন—হঠাৎ মনে হল তা হলে · তা হলে কি তিনি নিষ্পাপ? কিন্তু পাতাটা তো খালি নয়, বরং যতটা আশঙ্কা করেছিলেন তার চেয়ে একটু বেশীই যেন ভরা।

"এ সব এ সব লেখা নেই? আপনার ভুল হয় নি তো?"

রবিশংকর মনে মনে ভাবলেন নিশ্চয় হিসাব রাখতে ভুল করেছে—এখানেও সেই পৃথিবীর আপিশের মত গাফিলতি!

সামনের লোকটি বললে, "আমার ভুল হয় নি!"

"এগুলি কি পাপ নয়?"

"হয়তো নয়, হয়তো অনুতাপে ধুয়ে গিয়েছে। প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার কাজ নয়। আমি বিচারকও নই। আমার এখানে যা লেখা আছে তাই আমি জানি। যেমন তোমার যখন বয়স নয়, এক ছুটির দিনে সময় কাটাবার জন্য তুমি ও তোমার বন্ধুরা একটা কাক ধরে তার পায়ে সুতো বেঁধে টানাটানি করেছিলে এক ঘণ্টা ধরে।"

"আমার তো একেবারেই মনে পড়ছে না। যদিও করেও থাকি, সামান্য একটা পাখিকে নিয়ে খেলা—তার বেশী তো কিছু নয়।"

"তার পর যখন চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজের ব্যবসা শুরু করেছ তখন এক দিন পুরনো আপিসের বড় বন্ধু সতীশের সঙ্গে তুমি দুর্ব্যবহার করেছিলে—"

"সে কি, এমন অপবাদ আমাকে শত্রুতেও দিতে পারবে না।"

"সতীশ যখন তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসে তখন হাতে তোমার বিশেষ কিছু কাজ ছিল না, শুধু তুমি তাকে এক ঘণ্টা বসিয়ে রেখেছিলে শুধু নিজের পায়া ভারী করতে; তার পরে কথায় ও ব্যবহারে তুমি তোমার ক্ষমতা ও কৃতিত্বই জাহির করেছিলে। সে আর তোমার কাছে আসে নি।"

"ও রকম অভিজ্ঞতা বড়লোকদের কাছে আমারও অনেক হয়েছে।"

"এবং আগে তুমি তার নিন্দাই করেছ—বোধ হয় সতীশের উপর তারই শোধ তুললে। যাক, আরও বছর দশেক পরের কথা। এক দিন তোমার দোতলার ঘরের জানালা দিয়ে দেখলে পাশের মাঠে তোমার ছেলে অজিত আর একটি ছেলের সঙ্গে বল খেলছে; হঠাৎ কি কথা কাটাকাটির পর অজিত তার সঙ্গীকে দুই চড় বসিয়ে দিল। সে ছুটে গিয়ে ডেকে আনল তার বাবাকে, তিনি অজিতকে বকাবকি করছেন দেখে তুমি দৌড়ে নিচে নেমে গিয়ে প্রতিবাদ জানালে, বললে তুমি স্বচক্ষে দেখেছ অজিতই আগে মার খেয়েছে, তোমার ছেলে অসভ্য নয়, ইত্যাদি।"

"বাড়িতে এসে ওকে আমি বকেছিলাম, কিন্তু বাইরে নিজের ছেলেকে বাঁচানো কর্তব্য মনে করেছি।"

"যারা দোষ করে তারা সবাই কারও ছেলে, ভাই বা অন্য কিছু। সবাই যে যার নিজের লোককে যদি বাঁচায় তা হলে তো দোষ নিরূপণই সম্ভব হয় না···যাক, তর্ক করা আমার কাজ নয়, তার সময়ও নেই।"

খোলা পাতার দিকে তাকিয়ে খাতার মালিক আবার বললে, "তালিকার শেষের দিকটাই বেশী ভারী; সব পৃথক ভাবে বলবার দরকার নেই, অধিকাংশই তোমার ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপার। স্বাধীন উপার্জন য ন শুরু করলে তখন তার মধ্যে অসাধুতা ছিল না, ক্রমে যারা রাতারাতি বড়লোক হচ্ছে তাদের দেখে শুনে তুমি নিজেকে ভাবলে বোকা, সেরি করলে না সেই পথ ধরতে। যেখানে যেটার অভাব সেটা মজুদ করে পরে চড়া দামে বেচা, এটা সেটা মিশিয়ে জিনিসের ওজন বাড়ানো, লোককে ঠকিয়ে বা ভুলিয়ে পয়সা করা···"

"লোকে পয়সা করতেই ব্যবসায় নামে, লাভের ইচ্ছায় যে লজ্জার কিছু নেই তা আজ পৃথিবীর সর্বত্র স্বীকৃত। কর্ম ক্ষেত্র আর ধর্ম ক্ষেত্র আলাদা, ধর্ম আমি কিছু কম করি নি; দান ধ্যান পুজো অর্চা করেছি, মন্দির ও আশ্রম গড়েছি—আজ বহু লোক আমার কাছে কৃতজ্ঞ, তারা অনেকে আমাকে চোখেও দেখে নি···"

সেই দিন ভোর পাঁচটায় রবিশংকর দোষ স্বীকার করেন।

সামান্য শান্তি

জ্যোতিরিন্দ্র মজুমদার

বারবছর ধরে পড়িয়াহাট অঞ্চলে আছি। আমার কেনা-কাটা বাজার হাট সবই পড়িয়াহাটায়। দোকানদার, গ্রামের তরকারীওয়ালা, গ্রাম থেকে ডিম-নিয়ে আসা মেয়েদের চলা-ফেরা কথাবার্তা, তাদের ধরন মন ভরে আছে। কারো মুখের আদলে, হাসির আওয়াজে; কথার সুরে পূর্ব-বাংলার গ্রামীন জীবনযাত্রার ছোঁয়া ও ছোঁয়াচ। ওদের মধ্যে খুঁজে বেড়াই শান্তিপিসি, কালোদি, রাঙাবাসী, বাসাদীর জুরদশাঙ্গী, সেঁকেরহাটের সৈরাণী, আশীকাটির ভুবনচুলি, ধলিশাচুলির কাপুব্যাপারী, নিলদিয়ার চন্দ্রাবাণী, বাসাদীর কৈলাশদণ্ডরী অন্তনতি মুখ বকুলগন্ধে স্মৃতির বান ডেকে আনে।

বাজার আমি বড়-একটা করি না। স্ত্রীই রোজ সন্ধ্যায় বাজার করেন। মাঝে মাঝে বাড়ী ফেরার পথে বাজারে যাই। শুধু দোকানীদের সঙ্গে আলাপের আছিলায়। সেই ফুলে যাওয়া ঘুপের আন্তরিক ধরন আবার যেন ফিরে পাই। আত্মীয়তার নতুন সুর যেন নতুন করে গানা বাঁধছে। যেন নিজের গ্রামের বাজার বাবুরঘাটের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে খুঁজছি। ফিরে পেতে চাই সেই শিশুকালের গ্রামের বাজার, অবাক-করা মন কেমন করা ভাব। ট্রাম নেই, মোটর নেই, নেই রিক্সা, কিন্তু সেখানে যা ছিল তা আজ কোথাও পাইনে। ধরন, অনাবিল আনন্দ, স্নিগ্ধ সবুজ নিদর্শ যা মনকে মেলে দেয় তারার হাটে। মনের গভীরে সোনার জাল সৃষ্টি করে। বাজারের লোকগুলোও যেন আমার মধ্যে কি খুঁজে পেল। সবাই ডেকে বলে—বাবু এটা নিন ওটা নিন। নিইও এমনি করেই কেটেছে দশবছর।

গেল বছরে শীতে ঘুরতে ঘুরতে রাত্রে একদিন বাজারে গেছি। কিছু তরকারী কিনে মোড় ঘুরতেই এক দোকানী ডাকলো—কি বাবু ফুলকপি নেবেন না? মুখ তুলে হেসে বললাম—না আগেই নিয়েছি। দোকানী বলে উঠলো সে হবে না বাবু, আমি একজোড়া কপি আপনার জন্যেই আলাদা করে রেখেছি। বলেই আমাকে, কপি দুটো তুলে দেখালো। কপি দুটো দেখে লোভ হলো। ভাবলাম আগেই দুটো কিনেছি আবার পয়সা খরচ। ইতস্তত করতে দেখে দোকানী বললো বাবু নিয়ে যান মোটে দশ আনা। খুব ভাল কপি। কপি দুটো ভাল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ঠিক এমন সময়ে দেখি এক ভদ্রমহিলা কপি দুটোর দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন।

আগে কখনও তাঁকে আমি বাজার করতে দেখিনি। দেখে একটু আশ্চর্য হলাম। ভদ্রমহিলার চালে চলনে কিছু আলগা শ্রী ও শালীনতা ছিল, যা আকর্ষণ করেই, আমি একটু ভেবে তাঁকে বললাম, কপি দুটো আপনিই নিন। ভদ্র-মহিলা আপত্তি করে বললেন, না না সে কি হয় আপনি পরম্পরা করছিলেন। আমি বাধা দিয়ে বললাম আমি আগেই দুটো কপি নিয়েছি, শুধু এতক্ষণ লোভের সঙ্গে যুঝছিলাম। তিনি আন্তরিক ভাবে আবার বললেন, না আপনিই নিন।

আমি কি ভেবে প্রস্তাব করলুম বেশতো দুজনে একটা একটা করে নি। তিনি হাসিমুখেই রাজি হলেন। আরো খুশি হলেন নতুনত্বের কিঞ্চিৎ আস্বাদ পেয়ে। তিনিই আগে একটা কপি নিয়ে আমাকে কুশল জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তিনি বেরুতেই দোকানী আমাকে বললো—বাবু আমরা মহাজন রক্ষা করে চলি। আমি অবাক হয়ে তাকাতেই সে কুমিল্লার টান তুলে বললো—'বাবু ভাইনেরে ছোটটা দিয়াদিছি-আপনার জন্য বড়টাই রইলো। আমি শুনে বিস্মিত ও দুঃখিত হলুম। মনটা যেন একটু ছোট হয়ে গেল। কেমন অনুশোচনা হল। দোকানীকে আর কিছু বললুম না। শুধু ভদ্রমহিলাকে এদিক ওদিক খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু তিনিত আগেই বের হয়ে গেছেন। মনটা খারাপ হয়ে গেল। শুধু তাঁর নিস্পাপ মুখ আমার মনের আয়নায় ভেসে উঠতে লাগলো। আর মনে মনে আমি কুণ্ঠিত বোধ করতে লাগলুম। কেমন যেন একটা আনন্দ ও গভীর স্নেহের রেশ খুঁজে পেলাম। মনে করলুম বড় অন্যায় হয়ে গেল। ভদ্রমহিলা আমার অজান্তে আমার কাছেই ঠকে গেলেন। বাড়ী ফিরে স্ত্রীকেও কিছু বলতে ভালো লাগলো না। রাত্রে ঘুব ভাঙতেই দেখি তীব্র অনুশোচনায় আমার সমগ্র চেতনা ভারাক্রান্ত। মাথা ভার ভার বোধ করছিলাম এবং সমস্ত দেহে একটা জ্বালা বোধ করছি। স্ত্রীকে ডেকে ঘুম ভাঙিয়ে ব্যাপারটা খুলে বলতে মন কিছুটা শান্ত হলো।

পরদিন ভোরে উঠেই বললাম বড় কপিটা শ্বশুরমহাশয়কে পাঠিয়ে দিও এ কপি আমার খেতে ইচ্ছা করছে না। গিন্নি কিছু হতভম্ব হয়ে বললো হাঁ, আমি শুধু কপি পাঠাতে পারবো না। আমাকে কপি বিদায় করবার জন্য বাজারে গিয়ে আবার বই মাছ কিনে আনতে হলো। সাময়িক একটা রেহাই পাওয়া গেল ভাব এল বটে কিন্তু বেশীক্ষণ তা টিকলো না।

দু'একদিন সন্ধ্যায় বাজারে গেলুম শুধু ভদ্রমহিলার সন্ধে যদি দেখা হয়। দিন পাঁচেক পর হঠাৎ ভদ্রমহিলাকে বাজারে দেখেই বলে ফেললুম যে বড্ড ভাল হল আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে। এ ভাবে কথা বলতে দেখে তিনি শুধু বিস্মিত নন, বোধহয় একটু বিরক্তও হলেন। আমার মনের অবস্থা তখন অঙ্কের বিরক্তি-অনুরক্তির বাইরে। আমি পরিষ্কার করে তাঁকে সব বললুম এবং কিছুতেই যে শান্তি পাচ্ছি না তাও তাঁকে বললুম। শেষে বললুম, আজ দুটো কপি কেনা থাক—আপনি বড়টি নেবেন আর আমার ছোটটি। তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে যেন কি দেখতে পেলেন! হাসিমুখে রাজী হয়ে গেলেন এবং নিজেই যেচে আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে দোকানের দিকে এগিয়ে গেলেন। আমরা দুজনে দুজনকে যেন আত্মীয় বলে জেনে নিলুম এবং আমরা যেন বহুদিনের পরিচিত তা ভাবতেও আমাদের দেরী হলো না। তিনিই কপির দরদস্তুর করলেন এবং ছোটটি আমার হাতে দিয়ে আমাকে বিদেয় করে দিলেন। কপিনিয়ে বেরিয়ে আসতে শুনলাম তিনি দোকানীকে আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করছেন। দোকানী তেমন কিছুই বলতে পারছে না। শুধু বলছে—ঘোষ বাবু, তাঁর স্ত্রী প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাজারে আসেন।

ভদ্রমহিলা দুদিন সন্ধ্যায় বাজারে আমার স্ত্রীকে ধরবার চেষ্টা করে তৃতীয় দিনে দেখি আমার স্ত্রীর সঙ্গে বাজার থেকে আমার বাড়ীতে এসে উপস্থিত। তাঁর চলাফেরায় কোন জড়তা নেই—ব্যবহারে কোন কৃত্রিমতা নেই। বাড়ীতে এসে আমার ছেলে মেয়েদের দেখে তিনি খুব খুশী। তিনি যেন ভেবেই এসেছিলেন আমার ছেলে মেয়েদের দেখে তাঁর খুব ভাল লাগবে। বিশেষ করে দেখলাম তিনি আমার বড় মেয়েকে বার বার নিবিষ্টভাবে দেখছেন। কি যেন তিনি ওর মুখে চোখে দেখেছেন। একবার দেখছেন একবার চোখ নামাচ্ছেন, তৃপ্তি যেন আর হচ্ছে না। নিজের প্লেট থেকে একটা মিষ্টি আমার মেয়ের হাতে তুলে দিতে গিয়ে

যেন তিনি অনেকটা শান্ত হলেন। অনেকক্ষণ আমার বাড়ীতে কাটিয়ে বেরুবার সময় দরজার কাছে এসে আমার স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে আত্মীয়তার সুরে বললেন—একটা কথা বলবো কিছু মনে করবেন না তো? আপনার বড় মেয়েটিকে আমার বড় ভাল লেগেছে, ইচ্ছে করে ছেলের বৌ করে নি। তিনি বলতে লাগলেন তাঁর একমাত্র ছেলে, বি, এস, সিতে ভাল রেজাল্ট করে একটা বিলেতী কার্মে চাকুরী করছে। আসছে জুলাইএ দুবছরের জন্য বিলেত যাবে। যাবার আগে ছেলেটির বিয়ে দিতে চান। ভগবানই যেন যোগাযোগ করে দিয়েছেন আমার মেয়েটিকে তাঁর চাই-ই। যাবার আগে আমার মেয়েটিকে ডেকে মাথার উপরে হাত রেখে আদর করলেন। আমি প্রসন্ন মনে সব দেখে গেলুম। দুঃখ দুর্দশার মধ্যে এই সামান্য শান্তি রীতিমতো লুব্ধ ও উপভোগ্য।

একদিন ভদ্রমহিলার অনুরোধে তাঁদের বাড়ীতে যেতে হলো। বোম্বাই থেকে বদলী হয়ে নতুন কলকাতায় এসেছেন। ছেলেটি কলকাতায় কাজ করছে। দেখে বড্ড ভাল লাগলো। তিনি বিয়ের কথা আবার তুললেন। আমি কোন সঠিক জবাব দিতে পারলুম না। আমার স্ত্রী, কমবয়সে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার বিপক্ষে। সোনালীর বয়েস সবে পনর, ইলেভেন ক্লাসে পড়ছে। হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে কলেজে ঢুকে বি, এ পড়বে, মেয়ের মা ঘরে এসব ভাবছেন। মেয়ে বড় হবে, বুদ্ধি বিবেচনা হবে, রূপে লাবণ্যে পরিচ্ছন্ন সৌরভের শুভ্রতায় মায়ের চারপাশে ঝলমল করে ঘুরবে—সে আশাতেই দুঃখ কষ্ট হাসি মুখে মেনে নিতে পারছেন। সব দেখে শুনে তবেই তাঁর বিয়ে দেবেন। কিছুই ঠিক করে বলতে পারলুমনা। ছেলের মা বিদায় নিতে উঠে আমাকে হাত জোড় করে গভীর আবেগে বললেন সোনালীকে তাঁর নাকি বড্ড ভাল লেগেছে।

ছেলের মা সব ভেবেই আমাকে বললেন যে ছেলে দুবছর পরে ঘুরে আসুক—মেয়েতো আপনাদের কাছে থেকেই পাশ করে কলেজে পড়তে পারবে, কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। শুধু একটু সম্মতি পাবার জন্য তিনি অনেক কথা বলতে লাগলেন। আমি বুঝলুম যে আমার মেয়ের এ সৌভাগ্য হবার কথা নয়। চোখে মুখে সূর্য্যালোকের মতো শান্তি রশ্মি যেন আমাকে ডেকে বললো, মনের মধ্যে কে যেন বলে গেল ভগবানের পাদক্ষেপ। অনাবিল শান্তি।

বিয়ে দিতে পারিনি। স্ত্রী রাজী নন। স্ত্রীর সেই কথা যেন বড় হোক, ভগবানের ইচ্ছা হলে ছেলে বিলেত থেকে ফিরে এলেই হবে। বিদায় দিতে ছেলেটিকে আমরা সবাই হাওড়া স্টেশনে গেলাম। ভদ্রমহিলার অনুরোধে সোনালীকেও সঙ্গে নিয়ে গেলাম। গাড়ী ছাড়বার আগে সোনালী ও অশোকের চোখে জল দেখে কেমন খটকা লাগল। আমার স্ত্রী সারা পথ কোন কথা বললেন না। সোনালী গাড়ীতে উচ্চ আবেগে ভদ্রমহিলার গা ঘেঁসে নিশ্চুপ বসে রইলো।

জল মাটি মন

ম হী তো ষ বি শ্বা স

[২]

ধানগাছগুলো এ-কদিনে আরো বড়ো হয়েছে। আরো ডাটো হয়েছে। জলে-হাওয়ায় দোল খায়। তবে কেমন যেন সরস সরস ভাব।—বুকের মধ্যে কিসের শিরশিরানি শোনে। দোল খেতে গিয়ে থমকে যায়।

বলরাম হন্তে হয়ে ঘোরে। জলকাদা ভেঙে—আলের উপর দিয়ে। ধান বড়ো হয়ে উঠেছে। গায়ে-গায়ে ঘন হয়ে উঠেছে। শ্যামল রঙের অরণ্যে হারিয়ে গেছে সারা বিল। পাগলের মতন ঘুরে বেড়ায় বলরাম। ঘুরতে ঘুরতে জলকাদার মধ্যে আলের 'পরে বসে পড়ে। কেমন যেন ঝাপ হয়। মুঠো মুঠো ক'রে দু'তিনগাছা ধানের চারা উপড়ে ফেলে। ছুঁড়ে দেয় ঘুরের দিকে। শিকড়ের খানিকটা কাদা ছিটকে এসে পড়ে বলরামের মুখে। একখানা কচি হাতের নরম ছোঁয়া যেন ছড়িয়ে পড়ে ওর সারা দেহে। মমতায় ভরে ওঠে মনটা। প্রতিটি ধানগাছের গোড়ায় জমেছে ওর রক্তজলকরা ঘাম। ওর শ্রম। ভাবতে রাগটা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। উপড়ানো গাছ কয়টাকে তুলে আনে। ঘর করে আবার পুতে দেয় মাটিতে।

নীলমণি মোড়লের কথা মনে পড়তেই রাগটা আবার চড়াৎ ক'রে মাথায় উঠে যায়।

হাতের তেল-চুচকুচে বাঁশের বড়ো লাঠিটা বাগিয়ে ধরে। দেবে নাকি একদিন এক ঘা বসিয়ে নীলমণির মাথায়। তারপর যা হয় হবে।

নীলমণির সঙ্গে বলরামের শত্রুতা আজকের নয়। তবে নীলমণির বাবা আর বলরামের ঠাকুরদার মধ্যে ছিল বড়ো ভাব। ডাকসাইটে লেঠেল ছিল দুজনে। ওদের দুজনকে একসঙ্গে লাঠি হাতে নামতে দেখলে এ-তল্লাটে এমন লেঠেল ছিল না যে যার বুকের রক্ত হিম হয়ে না আসত। যেমন ছিল ওদের লাঠির জোর, তেমনি ছিল ওদের বন্ধুত্বের বাঁধন। কিন্তু সেই বন্ধুত্বে কাটল ধরল নীলমণি আর বলরামের বাবা সনাতনের সময়ে। সনাতনেরও বাপের মতন দশাসই চেহারা হয়েছিল। অল্প বয়েসেই লাঠি ধরতে বাপের মতনই পোক্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ওর বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল একটু কম। ঘোর প্যাঁচ কিছু বুঝত না। সরল সাদাসিধে কাঠখোট্টা মানুষ ছিল বলরামের বাবা সনাতন। কিন্তু নীলমণি মোড়ল তার ঠিক উল্টো। দড়িপাকানো লম্বা চিমসে চেহারা। চ্যাপ্‌টা মুখখানার মাঝখানে কুতকুতে দুটি ছোটো চোখ। রাজ্যের সব শয়তানি যেন সেখানে এসে বাসা বেঁধেছে। এ-অঞ্চলে লেখাপড়ার চল নেই। লেখাপড়ার কোনো দরকারও হয় না। দৈবাৎ যদি একটু আধটু লেখাপড়ার কাজের দরকার হয়-ও, তবে তার জন্য ভাবনা নেই। বিল থেকে কুড়ি দুই বড়ো আকারের তাজা কইমাছ নিয়ে শহরে গেলে নায়েবমশাই নিজেই সব করে দেন। শুধু টাটকা মাছে হয়ত হয় না। নায়েব মশায়ের নানা ফাই-ফরমাশে পুরো একটা দিন বেগারও দিয়ে আসতে হয়। তবু তাতে কাঠখোট্টা মানুষগুলো কোনোদিন ওজর আপত্তি তোলে না।

গায়ে খাটার সব কাজ তারা করতে রাজী আছে। কিন্তু লেখাপড়া? সে ওদের দ্বারা হবে না। এ-অঞ্চলে তাই কোনোদিনই লেখাপড়ার চল নেই। তবে এ-তল্লাটের মধ্যে যদি কেউ একটু লেখাপড়া জানে সে হল ঐ নীলমণি। নীলমণির বাবার বাড়ী ছিল বাসুদেবের হাটের ওদিকে। ওদিকে বেশ লেখাপড়ার চল আছে। নীলমণির ছেলে-বেলাটা কেটেছিল ওখানেই। বাবাতো ভাইদের দেখাদেখি সেও পড়াশুনো করতে শুরু করেছিল। কিন্তু বেশীদূর এগোয়নি। কিছুদিন বাদেই তার বাবা তাকে নিয়ে এসেছিল কাটুখালিতে। কিন্তু লেখাপড়া না এগোলে কি হবে, তাতে নীলমণির বুদ্ধির ধারটা কিছু কমেনি। শহর থেকে নায়েব মশায় মাঝে মধ্যে পেয়াদা সঙ্গে নিয়ে গ্রামে আসেন। কখনো বা বাকী খাজনা আদায়ের জন্য। কখনো বা জমির তাগপত্তর নিয়ে প্রজাদের মধ্যেকার গোলমাল মিটোতে। নায়েব মশাই এদিকের যে গ্রামেই আসুন, ডেকে পাঠান নীলমণিকে। নীলমণির পরামর্শ না নিয়ে নায়েবমশাই কোনো কাজ করেন না এ-অঞ্চলে। নীলমণিও এ-সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ছাড়েনি। লোককে ফাঁকি দিয়ে লোকের চোখে ধুলো দিয়ে অনেকের অনেক জমিই নিয়ে এসেছে নিজের ভাগে। কাটুখালির অনেকেরই রাগ আছে তাই নীলমণির পরে। ছোটবেলার বন্ধু সনাতনের সরলতার সুযোগ নিতেও ছাড়েনি নীলমণি। পাকেচক্রে সনাতনের অনেক জমিই সে নিয়ে এসেছে নিজের নামে। কিন্তু প্রকাশ্যে শত্রুতাটা কোনোদিনই করতে পারেনি। কারণ সনাতনের বুদ্ধিকে ভয় না করলে কি হবে, তার লাঠিকে নীলমণি বেশ সমীহ করেই চলে।

সেই নীলমণি। এতোদিন বলরামের বাপের সঙ্গে শত্রুতা করে এসেছে, এবার শুরু হল বলরামের সঙ্গে। আর এ-শত্রুতা জমিজমা বিষয়-আশয় নিয়ে নয়। এ-শত্রুতা তার ভালবাসার পদ্মকলিকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। বলরামের উদ্যত রাগটা ফুঁসে উঠতে চাইল আহত কালকেউটের মতন। ওর উদ্ধাম চাষী-প্রাণের সরল রক্তে যেন আগুন জ্বলতে লাগল দাউ দাউ করে। এ-রক্ত ভালবাসে মাঠের আঁজলা ভরা পাকাসোনা ধানকে। দুই চোখ মেলে মুগ্ধ হয়ে মাথায় তুলে নেয় মূর্তিমতী লক্ষ্মীকে। এই রক্তই আবার ভালবাসে তার ঘরের মেয়েমানুষকে। তার মনের মানুষকে। বন্য সরলতা নিয়ে আবেগে ভালবাসায় তাকে এক করে ফেলতে চায় নিজের দেহের সঙ্গে। এ-রক্ত সরল, পবিত্র। সব অশান্তি থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজের নিভৃত বাসনার জন্য একটা নিরিবিলি নীড় রচনা করতে চায়। নিজের মনের সব প্রশান্তি ছড়িয়ে দিতে চায় উঠোনের ধানের পালায়। গোলা-ঘরে কিন্তু সেই প্রশান্ত রক্তে যখন কেউ আগুন জ্বালে—তখন তা জ্বলতে থাকে দাবাগ্নির মতন। এ-রক্ত সব হারাতে রাজী আছে। কিন্তু কাঁচাসোনার ক্ষেত আর মনের মানুষের কখনো কিছুতেই ছাড়বে না। বিপক্ষের পাকা লাঠির শক্ত ঘায়ে এ রক্ত পথের ধুলো রাঙা করে দেবে। কিন্তু পথ ছাড়বে না। আজ বলরামের সেই দাবাগ্নি রক্ত পাক দিয়ে উঠেছে। বাঘের মতন শক্ত থাবায় চিতিয়ে ওঠে পাকা বাঁশের লাঠি। নীলমণি মোড়লের ভ্যাবড়া মাথায় চাঁদির জন্য লোলুপ হয়ে ওঠে।

আস্তে আস্তে আবার রাগটা ঠাণ্ডা হয়ে আসে বলরামের। লাঠিটা সরিয়ে রাখে একপাশে। কিছুক্ষণ আগে বেলাটা ডুবে গেছে। আষাঢ়ের আলো। যাই যাই করেও এখানে ওখানে লুকিয়ে আছে একটু-আধটু। আনমনে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে বলরাম। আকাশটা কি বড়ো! তার কি শান্ত। জলভরা কালো মেঘগুলো এখানে ওখানে দলা পাকিয়ে গাদাগাদি হ'য়ে পড়ে আছে। ঐ মেঘের দিকে তাকে সে চোখ জুড়োয়। মনের জ্বালা জুড়োয়। মা বসু-মতীর-ও অঙ্গে যতো জ্বালা। রোদের তাপে, মানুষের পাপে—আগুনে আগুনে জ্বলে মা-বসুমতী। সেই মা-বসুমতীকেও

ওরা শীতল করে। তার বুকে চমা সব পাপ-তাপ সন্ত্রাস-আবর্জনা ধুয়ে মুছে সাফ করে। বলরামের মনের অলুনীটাও যেন একটু শীতল হ'ল। ভাববার চেষ্টা করে সব জিনিষগুলো। কিন্তু মাথাটার মধ্যে কেমন যেন ঝিম্ ধ'রে আসতে চায়। ভাবনাগুলো তালগোল পাকিয়ে যায়। সব ঝাঁকা ফাঁকা লাগে। জগতে সকলেই তার শত্রুর। একা সে বহুজনের সঙ্গে লড়বে। গাঁয়ের মোড়লরা, তার বাপ, নীলমণি—সকলে তার শত্রুর আজ। তার মুখের দিকে তাকাবার কেউ নেই। আর পদ্ম। সেও হয়তো শেষ পর্যন্ত বেঁকে দাঁড়াবে। নিঃসম্বল বলরামকে ভালবেসে বিয়ে করে কি সুখই বা সে পাবে জীবনে। বুড়ো বয়সের বউ চলে কি হবে, নীলমণি বউকে সুখেই রাখবে। আর পদ্মই যদি মন ভাঙিয়ে চলে গেল তবে রইল কি আর বলরামের।

অনেকক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলরাম হঠাৎ মতি ঠিক করে ফেলল। শহরে চলে যাবে বলরাম। একা মানুষের পেট। নিশ্চয়ই একভাবে চলে যাবে। শহরে নাকি বড়ো বড়ো কলকারখানা আছে। সেখানে অনেক লোকে কাজ করে। ওর মামার গাঁয়ের একটা লোক অনেকদিন আগে শহরে চলে গেছে। সেও কারখানায় কাজ করে। নগদ নগদ কাঁচা পয়সা। এ সবই অবশ্য শোনা কথা বলরামের। শহরে সে কোনোদিনই যায়নি। এমন কি যে রেলগাড়ীতে চ'ড়ে শহরে যেতে হয়, সে রেলগাড়ীরও মুখ দেখেনি কোনোদিন। তবু এই মুহূর্তে বলরাম যেন বড়ো নিশ্চিন্ত হ'ল। থাক সব পড়ে! কারো জন্যেই বলরাম আর কোনো মমতা করবে না। গাঁয়ের সকলে তার শত্রুর। পদ্মও আর তাকে চায় না। চাইবে না। নিজের ভালবাসাকে বুকে চেপে বলরাম একা একাই চলে যাবে শহরে।

সেদিন দুপুরবেলায় পুকুরঘাটে হঠাৎ পদ্মর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বলরামের।

বলরামের সঙ্গে পদ্মর পীরিতের কথাটুকু জানে পদ্মর বাবা। এতোদিন কিছু করেনি। এবার মেয়েকে মানা দিয়েছে—

"খবরদার পদ্ম—বলরামের সাথে কথা ক'বি না।"

পদ্ম বলে—"ক্যানো?"

পদ্মর বাবা ভজহরি গর্জন করে—"ক্যানো? ক্যানো দিয়ে তোর কাজডা কি? তালগাছের মাথানু স্থানা যাইয়ে—রাতদিন ভাং ভাং করে না ব্যাড়াদি বুঝি প্যাটের ভাত সিদ্ধে হয় না?"

পদ্ম কথা কয় না। চুপ করে থাকে।

বলরাম আর পদ্মর দেখাসাক্ষাৎ তাই এখন বড় আর একটা হয় না। একাদোকা পদ্মর এখন কোথাও যাওয়া মানা।

তবু সেদিন দেখা হ'ল।

দুপুরবেলা। বাবা বাড়ী ছিল না। মা ঘরের কাজে ব্যস্ত। এদিক ওদিক তাকিয়ে কলসীটা কাঁখে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে পদ্ম। ফাঁকা ঘাট এখন। বলরামের সঙ্গে যদি একটুখানি দেখা হয়।

বলরাম কাছে-পিঠেই ছিল। পদ্মকে ঘাটে আসতে দেখে এগিয়ে আসে। পুকুরের কোণে কোপটার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় দু'জনে। ধারে কাছে কেউ নেই। একেবারেই নিরালা।

কলসীটা কপাশে নামিয়ে রাখে পদ্ম। নখ খুঁটতে খুঁটতে আস্তে আস্তে বলে—"শুনিছো সব।"

বলরাম বলে—"শুনিছি।"

"শুনিছো? তা এর পিতিকার কিছু করবা না?"—

পদ্মর গলাটা এবার কেঁপে উঠল।

অনেকক্ষণ বলরাম কোনো জবাব দিতে পারে না। অসহায়ের মতন তাকিয়ে থাকে। তারপর ধরাগলায় বলে—"পিতিকারের আর আছে কি কও? তোমার বাবারে কলাম।

সালিশী ডাকলাম। সংসারে তো সেই একই কথা কয়। আর আমারে কি করতি কও?"

পদ্মর চোখে জল দেখা দেয়। বলে—"তালি তুমি আমারে ছাড়ে থাকতি পারবা? কও?"

উত্তর দিতে গিয়ে বলরামের গলাটাও কাঁপতে থাকে—

"কি আর করবো কও? ভাব্‌তিচি শহরে চলে যাবো। কারখানায় ভর্তি হবো।"

পদ্ম ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে—"তুমি তো শহরে চলে যাবা! আমারে তুমি কি করিয়ে যাচ্ছো? বাবা আমারে কু-পরামর্শ দেয়। নীলে মোড়লের সাথে বিয়ার কথা কয়। সেই যদি ছাড়েই যাবা, আর ঐ বুড়োর সাথেই বিয়ে হবে—তা'লি এ্যাতো পীরিতির কথা ক্যানো ক'লে এ্যাদ্দিন ধরে?"

বলরাম কপালে হাত দিয়ে বলে—"কপাল!"

চাপা প্রতিবাদে ফুঁকরে ওঠে পদ্ম—"কপাল! কপাল আমি মানিনে। তুমি যেখানে যাবা—আমারে নিয়ে যাবা। আমারে ফ্যালে তুমি যাতি পারবা না কলাম।"

বলরাম হা করে তাকিয়ে থাকে। পদ্ম জল নিয়ে ঘরে ফেরে।

(৩)

বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেল। বলরামের মনে শান্তি নেই। বুকখানা যেন কাঁটা ছাগলের মতন আছড়া-পিছড়ি করে। পদ্মর কথা ভেবে ভেবে কোনো কিনারা পাচ্ছে না। তবে পদ্মকে যা ভেবেছিল বলরাম, তা সে নয়। পদ্মর টান আছে বলরামের পরে। একটু একলা হলেই সেদিনের দুপুরের কথাটা মনে পড়ে। পদ্মর সেই টলটলে জলভরা চোখদুটো ওর সারা মনটাকে হুতাশে ভরে দেয়। কিন্তু কি-ই বা করতে পারে বলরাম।—সমাজ-সংসারের বিধান অবহেলা করে কোথায়ই বা গিয়ে দাঁড়াবে? অসহায় ভাবনায় তাই বলরাম নিজের মনের মধ্যে একা একা জ'লে পুড়ে মরে। খুব বেশী মন খারাপ লাগলে চলে যায় ক্ষেতের দিকে। ওটা ওর মন খারাপের ওষুধ। ক্ষেতে গেলে মনটা যেন খানিক শীতল হয়।

ক্ষেতে এখন কাজও বেড়েছে খুব।

সারা কাঠুখালির বিল জুড়ে রাশি রাশি ধানগাছ আরো বেড়ে উঠেছে। কিন্তু শুধু তো ধানগাছ নয়, ওদের সঙ্গে জলে হাওয়ায় গা মিলিয়ে বেড়ে উঠেছে আরো অনেকে। শ্যামাঘাস, শরাল, কলমী, আরালী, ভাসা, হিলঞ্চ—এমনি আরো নামনা আগাছা! ধানচারাগুলোর মতনই শ্যামল কচি রং নিয়ে বেড়ে ওঠে ওরাও। অনেক বেশী বাড়ন্ত ওরা। কয়েকদিনের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে সারা মাঠ জুড়ে। ধান-গাছগুলোর সাথে পাল্লা দিয়ে। গায়ের জোরে ওরা অনেক বেশী আলো জুড়ে নিতে চায়। কিন্তু কাঠুখালির চাষী মানুষগুলোকে অতো সহজে ফাঁকি দিতে পারে না। নিপুণ চোখ মেলে বেছে বেছে সমূলে ওরা তুলে ফেলে আগাছা-গুলোকে ধানগাছের মধ্য থেকে। কিন্তু কাজটা অতো সোজা নয়। একটু অমনোযোগী হলেই চোখ এড়িয়ে বেড়িয়ে যাবে আগাছা আর ঘাসগুলো। তাই সাবধানে কাজ করতে হয়।

কোনোদিন বা আকাশ ছাপিয়ে ঢল নামে। বিষ্টির বড়ো বড়ো ফোঁটাগুলো তীরের ফলার মতন এসে বিঁধতে থাকে চোখে মুখে। সারা দেহে। এখানে ওখানে গলা মিলিয়ে ব্যাঙের ডাক শুরু হয়। বর্ষার খলবলে জল পেয়ে কিলবিল্ করে ওঠে পানিজোক আর জল-টোড়া। এ-ধানের পাতা থেকে ও ধানের পাতায় লাফিয়ে পড়ে লম্বাটে ঘোড়া-ফড়িংগুলো। আর বিষ্টির সেই একঘেয়ে অবিশ্রান্ত ধারা-পাতের মধ্যে আবছা হয়ে আসে দূরের কালো কালো গ্রাম-গুলো। এরই মাঝখানে ক্ষেতের মধ্যে এক হাঁটু কাদার মধ্যে বসে কাজ করে যায় মানুষগুলো। ঘাস বাছতে বাছতে ধানের মধ্যে মিলি দিয়ে দিয়ে এগোয়। পরণে থাকে ছোটো একখানা গামছা আটোসাটো করে পরা। মাথায় থাকে তালপাতার টোকা। হাতে কাস্তে। ধান নিড়ানোর

সময় ওরা 'গাতা' বেঁধে কাজ করে। 'গাতা' হল দল। এক-পাড়ার বেশ কয়েক জনে মিলে 'গাতা' বাঁধে। গাতা ছোটোও হয়, বড়োও হয়। গাতার সকলে মিলে পর পর এক এক জনের ক্ষেতে কাজ করে। গাতার সুবিধে অনেক। এতে কাজও যেমন এগোয় তাড়াতাড়ি, কাজের মধ্যে তেমনি আনন্দও পাওয়া যায়। বিটির অবিরাম রমঝম শব্দ আর ব্যাঙের ডাকের সঙ্গে ওরাও গলা মিলিয়ে গান ধরে। সেই অখণ্ড ঐক্যতানে ডুবে যেতে চায় সারা কাঠুখালির আকাশ বাতাস জল মাটি আর মানুষগুলো।

বলরাম গাতায় ঢুকেছে। বাপ সনাতন বুড়ো মানুষ। তার পক্ষে এখন আর গাতার কাজ করা কুলোয় না। তাছাড়া জোয়ান ছেলে থাকতে বুড়ো মানুষ কেনই বা যাবে গাতার খাটতে। সেটা ভালো-ও দেখায় না। সনাতন তাই মাঝে মধ্যে ক্ষেতে আসে। আর বলরামের যেদিন গাতার পালা থাকে, সেদিন সাথে-সঙ্গে থেকে ওদের কাজে উৎসাহ দেবার চেষ্টা করে।

বলরামদের গাতায় সুখলালও আছে। বয়স হয়েছে সুখলালের। গাতায় খাটবার সামর্থ কমে এসেছে। কিন্তু তবু ওকে গাতায় খাটতে হয়। খাটতে হয়—কারণ না খেটে উপায় নেই। সুখলালের ছেলে নেই। দুটো মাত্র মেয়ে। ছেলে যে ছিলনা তা নয়। সুখলালেরও ছেলে ছিল। দুই দুটো জোয়ান ছেলে। ওরা বেঁচে থাকলে সুখলালের আজ আর ভাবনা কি! ওদের হাতে জমি-জিরেতের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত সুখে থাকতে পারত। কিন্তু তাই-ই যদি হবে, তাহলে অদৃষ্টের ভোগান্তি পোয়াবে কে! জন্মে ছয়দিনের দিন হল ষষ্ঠী। সেদিন ধাতৃত্ব ঘরে আসেন বিধাতাপুরুষ। সকলের কপালে তার সারা জীবনের সুখ-দুঃখের হিসেব লিখে যেন। সে হিসেব-নিকেশের হাত থেকে রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র হীন-মহৎ কেউই রেহাই পায়না। সেই নির্মম বিধাতাপুরুষ সুখলালের ছেলে দুটির আদু-ঘাদে খানিকটে পরিহাসের কালি দিয়ে লেপটে দিয়েছিলেন। আঠারো আর একুশ বছরের দুই দুটো বাঘের মতন ছেলে কাটা পাঁঠার মতন ছটফট করে এলিয়ে পড়েছিল। পাশাপাশি বিছানায়—মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে প্রাণকে প্রাণ দেবার উজাড় হয়ে গিয়েছিল ওসাবিবির খাসখেয়ালীতে। ছেলে দুটিকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে ডুকরে কেঁদেছিল সুখলাল। কিন্তু তাতে মরা ছেলে ফিরে আসেনি। প্রায় চার পাঁচ বছর হয়ে গেল। আজো ছেলে দুটোর কথা মনে পড়লে সুখলালের চোখ জলে ভরে আসে। সেই মুহূর্তটায় বড়ো অসহায় মনে হয় ওকে। কেমন যেন ধন্দা হয়। পাড়ার লোকেরা তাই যতদূর সম্ভব সাহায্য করে সুখলালকে। আপদে বিপদে ঠেকা-বাধায় পাশে এসে দাঁড়ায়। সুখলালকে নিয়ে গাতা বেঁধে পোষায় না। বুড়ো মানুষ। জোয়ান জোয়ান কিষাণদের সাথে জলে কাদায় তালতালে খাটতে পারে না। হাঁফিয়ে ওঠে। তবু গাতা বাঁধবার সময় ওকে কেউ বাদ দেয় না। ডেকে দলে নেয়। মানুষ কাজ একটু কমই করবে! সবলে বাদ দিলে অসহায় বুড়ো মানুষটার কি গতি হবে!

ওর নিজের পালার দিনটার জন্য হা করে থাকে সুখলাল। ঐদিনটায় যতদূর সম্ভব নিজের ক্ষেতের কাজ এগিয়ে রাখবার চেষ্টা করে। এর পর পালার দিন আসতে তো আবার বেশ কয়েকদিন কেটে যাবে। সকলের সঙ্গে আগ্রাণ খেটে চলে সুখলাল। কিন্তু তবুও ওর নিজের ক্ষেতে যেদিন কাজ থাকে, সেদিন কেমন যেন একটা ঢিলেমি দেখা দেয় ওর কাজে। ঘন ঘন তামাক খেতে ওঠে। আস্তে আস্তে কাজ করে। ফলে পংক্তি থেকে প্রায়ই পিছিয়ে পড়ে। অন্যের ক্ষেতে গিয়ে সুখলাল অবশ্য ফাঁকি দেবার চেষ্টা করে না। সুখলাল জানে—ওকে দলে নিয়ে গাতার সকলের কাজে পোষায় না। এ-সংকোচটুকু সবসময়েই সুখলালের মনে লেগে থাকে। তাই কেউ যাতে ওর কাজে খুঁত ধরতে

না পারে সেদিকে সজাগ থাকে। বড়ো কষ্ট হয়। মাঝে মাঝে পংক্তি থেকে পিছিয়ে পড়ে। আবার তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে ধানের মধ্যে ঝিলি দিয়ে।

আজ গাইবার পালা ছিল সুখলালের। ঘুঘুদের খুব খানিকটে বিষ্টি হয়ে গেছে। বেলা এ ন গড়িয়ে পড়েছে। বিষ্টি থেমে গেছে। কিন্তু আকাশের গুমোর কাটেনি। বিষ্টিতে ভিজে সন্ধসেরই যেমন যেন কাঁপুনি ধরে গেছে। আর কিছুক্ষণ বাদেই আজকের মতন কাজ শেষ হবে।

সুখলাল উঠে গিয়ে আলের উপর বসল। বাঁশের ডিবে থেকে তামাক বের ক'রে তরিবৎ করে কল্কেটা সাজাল। মাদ্‌লায় রয়েছে আগুন। বিষ্টিতে যাতে আগুন না নেভে সেজন্য তালপাতার পোড়া দিয়ে সাবধানে মাদলটা ঢাকা রয়েছে। পোড়াটা সরিয়ে কল্কের আগুন দিল সুখলাল। একটু তামাক খেয়ে না নিলে আর পারছে না। বড়ো কাঁপাচ্ছে।

সুখলাল বসে বসে হুঁকো টানে। পংক্তির এপাশে বসেছে ফটিক। সুখলালের চেয়ে বছর বছরের ছোটো। সুখলালকে হুঁকো টানতে দেখে গলা চড়িয়ে বলে ফটিক —"ও সুকনাদা, হুঁকো কি তুমিই একাই খাবা নাকি? আমাদের এট্টু দেবার থাও।"

লজ্জা পায় সুখলাল। হুঁকো হাতে উঠে দাঁড়ায়। বলে—"না, না, একা খাবো ক্যানো? তোমাদেও দিচ্ছি। তোমাদের জন্যিই তো সাজলাম।"

সুখলাল এগিয়ে গিয়ে হুকোটা ফটিকের হাতে দেয়। অবেলা হয়ে এসেছে। বেশীক্ষণ আর কাজ চলবে না। সারা পংক্তিটাই এখন আগুপিছু হয়ে পড়ছে। ফটিকদের কাছ থেকে খানিকটে দূরে কাজ করছে হারাধন, কেষ্ট, অনন্ত আর বংশী। সব কটারই উঠতি বয়েস। কাজ করছে আর কি যেন বলাবলি করছে। মাঝে মাঝে হাসতে হাসতে কারার উপরে গড়িয়ে পড়ে আর কি।

ওদের দিকে তাকিয়ে সুখলালও হাসে একটুখানি। ওদের ওই হাসি বড়ো ভালো লাগে সুখলালের। হাসিরই তো বয়েস ওদের। ওরা হাসুক। কোনো দুঃখ যেন ওদের না ছুঁতে পারে। অবশ্য ওদের হাসবার কারণটাও বুঝতে পারে সুখলাল। হয়তো কোনো জোয়ানো আদিরসের আলোচনা চলছে! আর ঐ আলোচনায় স্ত্রীলিঙ্গ-পুংলিঙ্গের সীমারেখাটা বড়ো শিথিল। কোনো কথার কোনো ঢাকা-ঢাপা নেই। রসরসের জোগান দিতে গিয়ে কোন্ কথাটা ভদ্র আর কোন্ কথাটা অভদ্র—সে বোধাবোধ আর থাকে না। অন্যান্য আর পাঁচটা কথার মতন চরমতম অশ্লীল শব্দগুলোও অবলীলায় বের হয়ে আসে। মনেই হয় না যে কোনো খারাপ কথা বলছি। উর্বরা প্রকৃতির কোলে বসে মাটি জল মেখে ভিজে মাটি আর জলের মতন নিজেদের মনটাও এলিয়ে যায়। ছড়িয়ে যায় পরস্পরের মধ্যে। নিজের ঐ বয়েসটার কথা মনে পড়ে সুখলালের। একটু একা একা বসে ভাবলে মনে হয়, সে দিনগুলো যেন এখনো শেষ হয়নি। চোখ বুজে একটুখানি হাত বাড়িয়ে দিলেই যেন সেই দিন-গুলোকে ছুঁয়ে আনতে পারবে। এমনি সজীব, এমনি জীবন্ত।

বুকের গহীন থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে সুখলালের।

আচমকা ওদের হাসির শব্দে চমক ভাঙে সুখলালের। কাজে মন দেবার চেষ্টা করে। হঠাৎ মনে পড়ে বলরামের কথা। তাইতো। বলরামকে তো দেখা যাচ্ছে না। উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকে ঠাহর করে দেখতে লাগল সুখলাল। একটু নজর করতেই দেখতে পেল—ক্ষেতের একপাশে বলরাম একা একা কাজ করছে! ধান এখন অনেক বড়ো হয়ে উঠেছে। উবু হয়ে ব'সলে দূর থেকে খুঁজে পাওয়া ভার। কিন্তু হলো কি ছেলেটার! অমন টগবগে ছেলেটা দিনকে দিন কেমন যেন চিমসে মেরে যাচ্ছে। মুখে মনে কোনো

ফুর্তির কথা নেই। মুখখানা গোঁজ করে একা একা কাজ ক'রে যায়। অথচ কিছুদিন আগেও ছেলেটা কেমন ভড়ভড়ে ছিল। কাজ ক'রতে ক'রতে বিষ্টির মধ্যে সকলে যখন বাত-বেলে গান ধরত, তখন বলরামের গলা উঠত সকলের গলা ছাপিয়ে। ওর মোটা ভরাট গলার সাড়া বিলটা যেন ঝম্‌ঝম্ করে উঠত। কাজেও ওর সাথে পারা দিয়ে পেরে উঠত না কেউ। পংক্তির সকলকে ছাড়িয়ে সকলের আগে আগে চলত ওর ধারালো কাস্তেখানা। সেই বলরামই আজকাল কেমন যেন মুষড়ে গেছে। পদ্মর ব্যাপারটা জানে সুখলাল। বলরামের মনের গোপন ক্ষতটা যে কোন্‌খানে তা সে আন্দাজ করতে পারে। ওর জন্য মনটায় বড় মায়া হয় সুখলালের।

উঠে দাঁড়ালো সুখলাল। কাস্তেখানা থেকে হাতের পোছা দিয়ে কাদা ছাড়াতে ছাড়াতে খপ্ খপ্ করে এগিয়ে চলল বলরামের দিকে। উবু হয়ে বসল গিয়ে বলরামের পাশে। ঘাসের গোড়ায় কাস্তে চালাতে চালাতে বলে "কি হ'লো বলরাম! এ্যাদ্দা এ্যাদ্দা কাজ করতিছো যে—"

অন্যমনস্ক বলরাম কেমন যেন থতমত খেয়ে যায়। তাড়া-তাড়ি বলে—"না না! এ্যাদ্দা এ্যাদ্দা আর ক'নে! তা ওদিগির কাজ আর কদ্দুর! সামনের দিন তোমার হালোটের ক্যাতে যাওয়া যাবে তো!"

সুখলাল বলে—"ওদিগি আর বেশী নেই। সবটুকু না হলিও অল্প আর বাকী থাকবেনে।"

এমনিধারা নানা কথাবার্তা চলে খানিকক্ষণ ধরে।

তারপর একসময় সুখলাল বলে—"এট্টা কথা কবো বলরাম?"

বলরাম মুখ তুলে তাকায়—"কি কথা?"

সুখলাল বলে—"সব কথাই তো এট্টু-আধটু কানে আসে।

সালিশীর ব্যাপারেরা তো নীলমণির বলে গেছে। আর পাঁচ বিঘে জমির নাম শুনে ভগহরির তো নোলা দিয়ে জল পড়্‌তিচে। তো তুমি কি করবা ঠিক ক'রলে?"

বলরাম কিছুক্ষণ উত্তর দিতে দোনোমোনো করে।

তারপর বলে—"কি আর করব কও সুখলালকাকা! সগোলরেই তো কলাম। লাভ তো কিছু হলো না! ক'নে পাব আমি পাঁচ বিঘে জমি? আর বাবারে তো তুমি চেনই।

তা ভাবতিচি—পদ্মরে যদি না পাই তো শহরে চলে যাবো।" শহরে যাবার নাম শুনে অবাক হয় সুখলাল। বলে—

"সে কি? তুমি শহরে যাবা? শহরে যাইয়ে কি করবা শুনি?"

বলরাম বলে—"ক্যানো,—কারখানায় খাটবো! আমার জন্যি কেউ ভাবে না। আমিও কারো জন্যি ভাববো না। আমার আছে কেডা?"

সুখলাল আস্তে আস্তে বলে "তোমার দুক্কুডা বুঝি বলরাম! কিন্তুক তাই বুলে এই গাঁও-গেরাম, ক্ষ্যাত-খামার তুমি ক্যালাতে যাবা? পারবা তুমি এসব ছাড়ে থাকতি? মনডা তোমার কান্দবে না?

বলরাম এ-কথার জবাব দিতে পারে না। মাথা নীচু করে কাজ করে যায়।

ওদের কথাবার্তা আর এগোয় না। বেলা পড়ে এসেছে। আজকের মতন এখানেই কাজ শেষ। ও-পাশ থেকে সকলেই উঠে পড়েছে। সকলেরই এখন ঘরে ফেরার তাগাদা। জল কাদামাখা ভূতের মতন মানুষগুলো কাঠুখালির বিলের এখান ওখান থেকে বেরিয়ে আসে। যে যার গাঁয়ে ঘরে ফেরার জন্য ব্যস্ত এখন। (ক্রমশঃ)

UPPER GANGES SUGAR MILLS Ltd.
THE OUDH SUGAR MILLS Ltd.
NEW INDIA SUGAR MILLS Ltd.
THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS Ltd.
BHARAT SUGAR MILLS Ltd.
GOBIND SUGAR MILLS Ltd.

Manufacturers of :

PURE CRYSTAL CANE SUGAR

Managing Agents :

BIRLA BOMBAY PRIVATE LTD
(FORMERLY THE COTTON AGENT PRIVATE LTD.)
INDUSTRY HOUSE,
159, Churchgate Reclamation,
BOMBAY—1

পুস্তক পরিচয়

নেতাজি সঙ্গ ও প্রসঙ্গ : ১ম খণ্ড। নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী। গ্রন্থপ্রকাশ। দাম বারো টাকা।

উদ্যত খড়্গ : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। আনন্দধারা প্রকাশন। ৮ ভাষাচরণ দে ষ্ট্রীট। দাম ৬·৫০।

দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র : মণি বাগচি। শিক্ষাভারতী। ৯/৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট। কলকাতা-৯। দাম-চার টাকা।

মানবেন্দ্রনাথ : জীবন ও দর্শন। যতেশ রঞ্জন দাস। লেখক কর্তৃক প্রকাশিত। ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট। দাম-পনেরো টাকা।

সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে আলোচনার অভাব এত বেশি যে তাঁর সম্পর্কে কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হলে বিশেষ আনন্দিত হই। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে আমাদের দেশের সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস ইত্যাদি সম্পর্কে বিদেশীয় পণ্ডিতদের গবেষণাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন—পশ্চিমী মনীষীবৃন্দই আমাদের দেশের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করাবার দায়িত্ব আজও পালন করছেন। সুভাষচন্দ্র সম্পর্কেও আজ প্রধানত আমাদের জানতে হচ্ছে বিদেশীয় গবেষকদের গ্রন্থ হতে, এবং ভবিষ্যতে তাঁর জীবন ও আদর্শ বিষয়ে বিদেশীয় লেখকদের প্রামাণ্য গ্রন্থাবলীই আমাদের একমাত্র সহায় হয়ে উঠবে। সুভাষ যখন এদেশে ছিলেন তাঁর সহকর্মীর অভাব তখন ছিল না, এবং বাল্যবয়স হইতেই দলপতি হয়ে বিচরণ করার ফলে তাঁর জীবনের অধিকাংশ ভাগের সাক্ষীর অভাব নেই। কিন্তু এই সাক্ষীর দল, কী এক অজ্ঞাত কারণে, তাঁদের মূল্যবান সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা থেকে বিরত রয়েছেন। ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত দু একটি বই বা রচনা চোখে পড়ে যাতে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কিছু কিছু কথা পাই,—কিন্তু এরকম রচনার সংখ্যা অতি কম এবং লেখাও অনুন্নত। সুভাষচন্দ্রের সংস্পর্শে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা অনেকেই কৃতী ও স্বনামধন্য ব্যক্তি, তাঁদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হবার বিশেষ দরকার ছিল ; বর্তমানকালে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে যে নিঃশব্দতার চক্রান্ত সরকার, সংবাদপত্র ও বিশিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলি একযোগে করে চলেছে এবং তার পাশাপাশি তাঁর চরিত্র-হননের যে বিরাট প্রচেষ্টা চলেছে অকাতর অর্থব্যয়ে, তখন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আলোচনার আসরে নামা প্রয়োজন ছিল ; এবং তার চেয়েও বড় কথা, ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকদের জন্যও সুভাষ সম্পর্কিত সকল তথ্য লিপিবদ্ধ করে যাওয়া সুভাষের সমকালীন ব্যক্তিদের বিশেষ কর্তব্য ছিল। এ দায় পালনে পরাঙ্মুখতা সুভাষচন্দ্রের আদর্শে বিশ্বাসী ও তাঁর অনুসারীরাও কী করে দেখাচ্ছেন, বোঝা যায় না। সুভাষচন্দ্র এদেশ হতে অন্তর্ধান করলে তাঁর আদর্শ অনুসরণের দায় পালনে তাঁর সহকর্মীরা যে অপারগতা দেখিয়েছিলেন হয়তো তারই ফলে আমরা খণ্ডিত ও বিকৃত স্বাধীনতা পেয়েছি, দেশ বিভাগ হয়েছে, যুদ্ধোত্তর কালে ভারতীয় বিপ্লবের সকল সম্ভাবনা চূর্ণীকৃত হয়েছে এবং আপসকামী, বৃটিশের অনুচর, পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রতিভূ রাজনৈতিক গোষ্ঠীই ভারতের শাসন ক্ষমতা দখল করে দেশের

জনসাধারণকে শোষণ এবং ইঙ্গ-মার্কিন প্রভুদের চরণতলে দেশকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করার সুযোগ পেয়েছে। যাঁরা একদিন আপসকামী এবং দালালি উভয়প্রকার রাজনীতির বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক সংগ্রামের পথ বেছে নিয়ে সুভাষচন্দ্রের পতাকা-তলে সমবেত হয়েছিলেন, নেতার অবর্তমানে তাঁরা নিজেদের আদর্শ ও ব্রতের প্রতি অনুগত থাকার বদলে নিজেদের ভিতর আত্মকলহ অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে ভারতবর্ষে দক্ষিণ ও বাম, কালো ও লাল—উভয় মহলের সুবিধাবাদী রাজনৈতিক চক্রান্তকেই স্বর্ণ-সিংহাসন দান করেছেন। ইতিহাস হয়তো একদিন সুভাষপন্থীদের দায়িত্ব পালনে এই অনীহাকে তাঁদের অক্ষমতা না বলে আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলেই রায় দেবে।

সুভাষপন্থীদের এই ব্যর্থতা কিয়দংশে শোধিত হত যদি তাঁরা দেশের জনচিত্তে অন্তত: সুভাষচন্দ্রের জীবন ও আদর্শকে প্রোজ্জ্বল করে রাখার চেষ্টাও করতেন। যে দায় তাঁরা নিজেরা পালন করতে পারেননি, সে দায় তাঁদের পরবর্তী বংশধরগণ, যুবকগণ হয়তো মাথায় তুলে নিত যদি আজ ত্যাগের সামনে সুভাষচন্দ্রের শুধু বীরত্বগাথা নয়, আদর্শ ও সেই আদর্শের মূর্ত রূপ তাঁর যে সমগ্র জীবন—তারই আলোচনা যথাযথভাবে উপস্থিত করা হত। সেদিকেও সুভাষপ্রেমিকরা বিশেষ কিছু করেননি। এমন কি ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকদের জন্যও মূল্যবান তথ্য ও দলিলগুলি তাঁরা রেখে গেলেন না। আজ সর্বতোভাবে সুভাষ ও তাঁর আদর্শের একটা বিকৃত রূপ দেশবাসীর নিকট প্রচারের ব্যাপক ষড়যন্ত্রের মাঝে বসে আমাদের দুঃখ, অভিমান ও ক্ষোভ হয় এই কথা ভেবে যে সুভাষচন্দ্রের সহকর্মীগণই মৌনসম্মতির দ্বারা এই আসুরিক ষড়যন্ত্রেরও দায়ভাগী হলেন। ভবিষ্যতের ইতিহাস এবিষয়ে কী রায় দেবে?

এই পরিস্থিতিতে নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর এগ্রন্থখানি আমাদের বিশেষ মনোযোগের দাবী রাখে। কেননা লেখক সুভাষচন্দ্রের একজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন এবং তিনি প্রত্যক্ষভাবে সুভাষচন্দ্রকে যতটুকু দেখেছেন ও জেনেছেন এই গ্রন্থে ও তার পরবর্তী খণ্ডে সেকথা সুন্দরভাবে বিবৃত করেছেন। সেদিনের জাতীয় সংগ্রামে লেখক অংশ নিয়েছিলেন—তার শাস্তি ও সম্মান দুইই তিনি ভোগ করেছিলেন। ইংরেজের পুলিশের লাঠি লেখকের মাথা ফাটিয়েছে এবং কারাবরণেও তিনি ইতস্তত: করেননি। জেলে ও জেলের বাইরে উভয়ত্রই তিনি সুভাষচন্দ্রের সান্নিধ্য পেয়েছেন, সুভাষচন্দ্রের আদর্শ ও কর্মপন্থাকে স্বীকার করে নিয়েছেন, ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীপন্থার সঙ্গে সুভাষপন্থার বিরোধ কোথায় ও তার উৎসই বা কী, জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র এই দুই নেতার ব্যক্তিত্বের গঠনেই দুস্তর ব্যবধান কেন ইত্যাদি আরও বহু জটিল প্রশ্নের মুখোমুখি লেখক হতে পেরেছিলেন। তদুপরি লেখকের আছে স্বচ্ছ ইতিহাসবোধ, একটা সামগ্রিক দৃষ্টির মাঝে খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলিকে বিধৃত করার রহস্য তাঁর আয়ত্তে এবং সেই কারণেই হয়তো তাঁর দৃষ্টিতে নিরাসক্তিও এসেছে, যা এই গ্রন্থের সবচেয়ে মূল্যবান দিক বলে আমার মনে হয়। গান্ধীজী ও জওহরলালের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বিরোধের কথা বলতে যেয়ে তিনি পূর্বোক্ত নেতৃত্বদ্বয়কে বিন্দুমাত্র অসম্মান করেননি, বিকৃত করেননি—তাঁদের মহত্ত্ব ও প্রতিভার দিকটি নিপুণ তুলিতে এঁকেছেন। সুভাষচন্দ্রকেও তিনি অতিরঞ্জিত আকারে দেখাননি।

এই গ্রন্থে সুভাষের এমন কতগুলি আলেখ্য আছে যা অন্যত্র আমরা পাইনি—এবং এককথায় সেগুলি অপূর্ব। যেমন গান্ধীগোষ্ঠীর বিরোধিতা সত্ত্বেও কংগ্রেস-সভাপতি পদে সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার বৃত হবার সংবাদ বেরোবার পর তিনি বাসগৃহে গিয়েছিলেন। সেই সময়কার এই বর্ণনাটি :

"স্নানের ঘর থেকে বেরিয়েই দেখি নেতা চেয়ে আছেন একদৃষ্টে বাইরের দিকে। গোধূলির আলো তখনও মিলে

যায়নি ; দিগন্তে তখনও রয়েছে রংএর ঝলকানি—সেইদিকে। হাতে সংবাদপত্র। বিস্ময়তায় দুটি চক্ষু ভরে উঠেছে। সামনে এসে দাঁড়ালাম। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—"পড়ো।"

কাগজখানা হাতে তুলে দিলেন। কাগজ মেলে ধরতেই চোখে পড়ল বড় বড় হরফের কয়েকটা লাইন। গান্ধীজির বিবৃতি : "ডাঃ পট্টভির পরাজয় আমারই পরাজয়।...তবুও বলব যে, সুভাষ দেশের শত্রু নয়।" ...ফিরে তাকালাম নেতার দিকে। ঠোঁট দুখানা ঈষৎ বিকসিত হল মাত্র। কথা ফুটল বেশ খানিকটা পরে। বললেন,—"এত অল্পে ওঁর মত মানুষের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে, এটা ভাবিনি।"...আবার বললেন,—"মহাত্মাজিকে আমি সমালোচনা করি ঘতটা, শ্রদ্ধা করি তার চেয়ে অনেক বেশি। উনি এতটা নামলেন কেমন করে ?" (পৃঃ ২৬৫-৬)

কিংবা যতীন দাসের মৃত্যু-সংবাদ পাবার পর একটি দৃশ্য :

"সেদিনের কথা ভোলবার নয়। জামিনে নেতা বাইরে এসেছেন। যতীনের মৃত্যু সংবাদ পাবার সঙ্গে সঙ্গে গোটা মানুষটার রূপ আমূল পাল্টে গেল। পাংশু মুখ, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, আর তার কোণে টলমল করছে অশ্রুর ফোঁটা। একটা অসহ্য বেদনায় ঠোঁট দুখানা বেঁকে গেল।...শিশুর মতো ফুলে ফুলে সে কী কান্না।"

(পৃঃ ৮-৯)

এরকম অন্তরঙ্গ চিত্র ছাড়াও এই গ্রন্থে আছে সেদিনের স্বাধীনতা-আন্দোলনের বিচার ও বিশ্লেষণ, বহু তথ্য ও গান্ধীজী, নেহরু, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতির ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা। এ সকল দিক হতেই বইখানি মূল্যবান। তবে লেখক এ বইকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে উপন্যাস-রচনার স্টাইল গ্রহণ করতে চেয়েছেন, তাতে বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য কোথাও কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়েছে মনে হয়। ইতিহাসকে কাব্য বা নাটকের ভাষায় ও ভঙ্গীতে পরিবেশন করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। প্রবীণ লেখকের এই সচেতনতার অভাব মনকে পীড়া দেয়।

অচিন্ত্যকুমারের গ্রন্থখানি চিত্রনাট্যের আকারে লিখিত। তাঁর গ্রন্থরচনার সময় তিনি নিজেই কী চান তা ভেবেছেন কি না জানি না ; কিন্তু এ বইখানিকে জীবনী, ইতিহাস, উপন্যাস—কিছুই বলা যায় না। এই গ্রন্থে তথ্যের ভুল ও বিকৃতি পদে পদে, পাতায় পর পাতা স্খলিত নাটকীয় সংলাপ লেখকের মনোকল্পিত,—এমনকি গ্রন্থের প্রধান চরিত্র যে ব্যক্তি সেই সুভাষচন্দ্রের চরিত্রও লেখকের রচনাগুণে একটা কল্পিত রূপ লাভ করেছে। বাংলা জীবনীসাহিত্যে অচিন্ত্যকুমার এ পর্যন্ত বহু গ্রন্থের সম্ভার নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, কিন্তু তাঁর কোনো গ্রন্থেই সততা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্বটুকুও তিনি পালন করেন নি, এটা বিস্ময়ের বিষয়। আলোচ্য গ্রন্থের যে কোনো পৃষ্ঠা হতেই লেখকের এই অসততার দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। একটি উদাহরণ দিচ্ছি :

"সরাসরি ভবানীপুরের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হল সুভাষ। ঘরে ঢুকে আশুতোষকে প্রণাম করে দাঁড়াল। বললে, 'আমি আপনার কাছে এলাম।' আশুতোষ চমকে তাকালেন আগন্তুকের দিকে। 'আমার কাছে ? 'হ্যাঁ, আমি ইউনিভার্সিটির কাছে আসিনি, হাইকোর্টের কাছেও আসিনি, আমি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে এসেছি।'.....

'হ্যাঁ, প্রায় দু বছর তো পিছিয়ে পড়লে। বলছিলাম আরো আগে আসনি কেন ?' সুভাষ আরো একটু এগিয়ে এল, বললে, 'বলবার তো আমি শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলারকে দেখেছিলাম, তার ভেতরের আশুতোষকে চিনতেই দেরি হয়ে গেল।'...

(পৃঃ ১৯০-৯১)

এই নাটকীয় দৃশ্য ও সংলাপ অচিন্ত্যকুমারের নিজস্ব

কল্পনাজাত। একজন তথ্যনিষ্ঠ জীবনীগ্রন্থলেখকের পক্ষে এরূপ পারিপার্শ্বহীন কল্পনার আশ্রয় নেওয়া অসঙ্গত। বইটির ছাপা ও বাঁধাই ভালো।

যদি বাগচি মহাশয়ের গ্রন্থখানি কোনো বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে না। তাঁর ভাষা সরল ও স্বচ্ছ, মোট ১৬৬ পৃষ্ঠার পরিসরে সুভাষচন্দ্রের সমগ্র জীবনের ঘটনাবলী তিনি সাধ্যমত ভঙ্গীতে বর্ণনা করেছেন। এই নাতিবৃহৎ গ্রন্থখানি সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে জানার পক্ষে সহায়ক হবে। এখনকার দিনে ছাত্র ও যুবকদের পক্ষে এরূপ গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন আছে—সেদিক হতে লেখক একটি গুরু দায়িত্বই পালন করেছেন বলা যায়। মুদ্রণ প্রশংসনীয়।

স্বদেশরঞ্জন দাসের গ্রন্থখানি আকারে বৃহৎ। মানবেন্দ্র নাথ রায়ের আদর্শে বিশ্বাসী এই লেখক সুদীর্ঘকালের চিন্তা ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে গ্রন্থখানি রচনা করেন। তাঁর ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী প্রাঞ্জল। কিন্তু ভূমিকায় লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন: "যে নিরপেক্ষতা থাকলে জীবনী লেখা সম্ভব হয় সে নিরপেক্ষতা, সে সমদৃষ্টি লেখকের নেই। কারণ লেখাটির মধ্যে বহু স্থানেই উচ্ছ্বাস আছে। এ সম্বন্ধে লেখকের নিবেদন হল, যে উচ্ছ্বাসের কথা বলা হয়েছে তা লেখকেরই নয়ন নয়। গ্রন্থের মুখবন্ধে অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায় লেখকের এই উচ্ছ্বাসের অংশের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখেছেন: "বর্তমান গ্রন্থে লেখক রবীন্দ্র এবং বিবেকানন্দের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের যে দার্শনিক আত্মীয়তা নির্ণয় করেছেন তা হয়ত অনেকের কাছে গ্রাহ্য না হতে পারে।"

মানবেন্দ্রনাথ রায় স্কুলের ছাত্র থাকাকালে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হন এবং যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রথম মহাযুদ্ধকালে তারা ভারতবর্ষে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। এই উদ্দেশ্যেই তাঁকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য ভারতের বাইরে পাঠানো হয়। তিনি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়, চীন, জাপান ও আমেরিকা যান। যুক্তরাষ্ট্রে তাঁকে হাজতবাস করতে হয়েছিল—সেখান থেকে পালিয়ে তিনি মেক্সিকো যান। মেক্সিকোয় কমিউনিষ্ট পার্টির তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। সেখানে রুশবিপ্লবের অন্যতম নেতা বোরোদিনের সংস্পর্শে আসায় তিনি মস্কোয় যাবার নিমন্ত্রণ পান এবং মস্কোয় লেনিন, স্টালিন ও ট্রটস্কির সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি মধ্য এশিয়ায় রাশিয়ার বিপ্লব প্রসারে বিশেষ সহায়তা করেন, ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হন এবং চীনের কমিউনিস্ট আন্দোলন পরিচালনার জন্য সেখানে যান। যাও সে তুঙ, পরবর্তীকালে মানবেন্দ্র নাথকে মূর্খ বলে অভিহিত করেছেন, স্টালিন রাশিয়া হতে তাঁকে বিতাড়িত করেছেন, ভারতের কমিউনিস্টরা তাঁকে সুবিধাবাদী আখ্যা দিয়েছেন, আমাদের স্বদেশ ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনাস্থা ও অবিশ্বাস উত্তরোত্তর প্রকাশ করায় এদেশের লোক তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছে এবং দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধকালে ইংরেজের সহযোগী হয়ে আগষ্ট আন্দোলন ও আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করায় দেশবাসী তাঁকে বৃটিশের চর আখ্যা দিয়েছিল।

যুদ্ধের শেষে মানবেন্দ্রনাথ কমিউনিজমের আদর্শ পরিপূর্ণ-ভাবে ত্যাগ করে নয়া মানবতাবাদ নামে এক আদর্শ প্রচার করেন। মার্ক্সবাদের যে সমালোচনা তিনি করেছেন তাতে মনে হয় মার্ক্সবাদ সম্পর্কে তাঁর অধ্যয়ন ও চিন্তা গভীর ছিল না; নয়া মানবতাবাদের সপক্ষে যে দর্শন, ইতিহাসের ব্যাখ্যা ও ভাবী সমাজগঠনের সূত্রাবলী তিনি উপস্থাপিত করেছেন - সে সবও খুব গভীর চিন্তার দ্যোতক নয়। তবে তিনি বহু দেশ দেখেছেন, গ্রন্থাদি পড়েছেন এবং নিজের বক্তব্য প্রকাশের সাংবাদিক সুলভ একটা স্বচ্ছন্দতাও তাঁর করায়ত্ত ছিল। এই কারণে একটা নতুন মতবাদ প্রচারে

অবতীর্ণ হয়ে তিনি প্রাথমিক সাফল্য অর্জন করতে পেরেছিলেন, যদিও সেই আদর্শের স্থায়ী মূল্য কিছু আছে বলে মনে হয় না।

বর্তমান গ্রন্থের লেখক যদি একটি প্রশ্নে মুখোমুখি হতে চেষ্টা করতেন তাহলে মানবেন্দ্রনাথের চরিত্রের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকের কিছুটা উদ্ঘাটন হত মনে হয়। মানবেন্দ্রনাথ তাঁর ইংরেজী স্মৃতিকথায় স্পষ্টভাবেই লিখেছেন যে তিনি টাকার মানুষ, বিপ্লবী হয়েও সব সময় তাঁর বাগে টাকা রাশি রাশি থাকত। এ দেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের আশায় বিদেশে যাবার সময় তাঁর সঙ্গে বিপ্লবীদের সংগৃহীত টাকা ছিল; মানবেন্দ্রনাথ (নরেন ভট্টাচার্য) নিজেই স্বদেশী ডাকাতির সাহায্যে সেকালে অর্থাদি সংগ্রহ করেছিলেন। চীনে জার্মাণ রাষ্ট্র-প্রতিনিধির নিকট হতেও তিনি টাকা পান, মেক্সিকোয় যাবার পর তাঁর হাতে রাশি রাশি টাকা এসেছিল, মেক্সিকো সরকারের সঙ্গে তাঁর মধুর সম্পর্ক থাকায় তাঁকে আর্থিক বিষয় আর চিন্তা করতে হয়নি। বোরোদিনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের পর রাশিয়ার টাকা ও সোনার সংস্পর্শ তিনি লাভ করেন, অতঃপর রাশিয়ায় তিনি একজন সরকারী তদারকের লোক হয়ে দীর্ঘকাল বাস করেন। মধ্য এশিয়ায় ও চীনে কমিউনিজম প্রসারের কাজ যখন তিনি করছিলেন তখন প্রকৃতপক্ষে অগাধ টাকার মালিক হয়ে উঠেছিলেন তিনি। এদেশে ফিরে আসার পর তাঁর জেল হয়। জেলে বসে তাঁর প্রেমিকা ও ভাবী পত্নী শ্রীমতী এলেনকে এক পত্রে তিনি লিখেছিলেন যে দারিদ্র্য তিনি সহ্য করতে পারেন না।

এই দারিদ্র্য সহ্য করতেও তাঁকে হয়নি, কেননা জেল হতে বেরিয়ে আসার কয়েকটি বছর পরই ইংরেজের সঙ্গে তাঁর চুক্তি হয় এবং ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনে যোগদান করে ভারতের তরুণরা যখন বৃটিশের অত্যাচারের যূপকাষ্ঠে আত্মাহুতি দিচ্ছিল এবং ব্রহ্মদেশে আজাদ হিন্দ বাহিনীর অভিযান আসন্ন হয়ে উঠেছিল, সেই সময় ইংরেজ সরকারের টাকা মানবেন্দ্রনাথের সহায়তায় এসেছিল। এই কুখ্যাত যোগাযোগের ফলে অবশ্য ভারতবর্ষের রাজনীতিতে মানবেন্দ্রনাথ ও তাঁর দল কোণঠাসা হয়ে পড়েন ও যুদ্ধোত্তর-কালের নির্বাচনে সম্পূর্ণ পরাস্ত হন। অতঃপর তিনি দল ভেঙে দেন ও দেরাদুনে আর নির্বাসিত জীবন কাটান। এই সময়ই তিনি নয়া মানবতাবাদ নামে একটি মতাদর্শ প্রচার করতে সুরু করেন যার ফলে তিনি কমিউনিস্ট বিদ্বেষী মহলের বিশেষত আমেরিকার নিকট সুপরিচিত ও প্রিয় হয়ে উঠেছেন। অকস্মাৎ দুর্ঘটনা ও মৃত্যু না হলে তিনি আমেরিকা ভ্রমণে যেতেন, আমেরিকার কয়েকটি প্রতিষ্ঠান তাঁকে বিশেষ সমাদরের সঙ্গে গ্রহণের জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। এদেশে বর্তমানে যাঁরা আমেরিকাপন্থী বলে পরিচিত মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁদের বহু পূর্বেই আমেরিকাপন্থী হয়েছিলেন। গ্রন্থের ভূমিকায় শিবনারায়ণ রায় মানবেন্দ্রনাথকে ভারতীয় রেনেসাঁসের আদিপুরুষ রামমোহন রায়ের শ্রেষ্ঠ উত্তরসাধক বলে যে দাবী করেছেন তাতে ভারতীয় রেনেসাঁস সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের অগভীরতাই প্রকট।

স্বদেশরঞ্জন দাস অতিশয় নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রন্থখানি রচনা করেছেন—লেখক হিসাবে তিনি সার্থক ও প্রশংসার্হ। তবে এ গ্রন্থে মানবেন্দ্রনাথের জীবন ও আদর্শের মূল্যায়ন নেই। শুধু তথ্যের জন্য বইখানি বাঙালী পাঠক পড়তে পারেন। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ রুচিপূর্ণ।

পবিত্রকুমার ঘোষ

নির্জন প্রহর : শ্রীপরমানন্দ সরস্বতী। শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ সাধন আশ্রম নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগণা। দাম তিন টাকা।

'নির্জন প্রহর' কাব্যগ্রন্থের কবি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করবার বহু আগে থেকেই শ্রীমৃণালকান্তি নামে আধুনিক বাংলা কবিতার পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

'কবিতা' 'দেশ' 'আনন্দবাজার' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর যেসব কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল তার অনেকগুলো 'নির্জন প্রহর'-এ সংকলিত। আশ্রমবাসী হবার দীর্ঘকাল পরেও কবি হিসেবে মৃণালকান্তি আশ্চর্য সক্রিয়তার পরিচয় দিয়েছেন।

বস্তুত, 'নির্জন প্রহর' একজন সুদক্ষ শিল্পীর বিশ্বাসী উচ্চারণ। সচ্ছন্দে তার আবেদন বিবেকী পাঠকের চিত্তকে স্পর্শ করে। কবিতাগুলোর স্নিগ্ধতা এবং গভীরতায় পাঠক আপ্লুত হয়। ছবির পর ছবি, সব মিলিয়ে একটি সজীব সমগ্রতা।

সে কি জানে, হৃদয়ের শতধূপ ঘরে
এতো রাত্রি, যার তরে এতো কান্না ঝরে?
এ-ঘরে ও-ঘরে মনে শূন্য ছায়া ঘুরে,
গোধূলির শেষগান বিষাদের সুরে।

নিঃসঙ্গ পাথরে ঢাকা রাতের বহলে,
বিস্মৃতির যুঁতি পড়ে গলে গলে।
সে কি জানে প্রতীক্ষার নিঃসঙ্গ প্রহরে,
একা একা প্রদীপের আলোয় কে পোড়ে?

এবং পড়তে গিয়ে কোথাও মনে হবে না যে কবিতা ভিন্ন অন্য কিছু পড়ছি। পরমানন্দর কাছে সম্ভবত প্রতিটি কবিতাই অর্জিত বিশ্বাসে নির্ভরশীল মন্ত্রোচ্চারণের মতো, কিন্তু কবিতাকে অনুভব করবার ক্ষেত্রে এই মনোভাব কোথাও পাঠকের কাব্যরসাস্বাদনের পক্ষে অন্তরায় হয়নি।

রাত্রি আসে, অন্ধকারে দীপশিখা জ্বলে
এক আলোর বন্দিনী পড়ে, সে থাকে আড়ালে।
তার স্মৃতি সম্মোহিত করে শুধু আমার চেতনা।
(অব্যক্ত)

এবং অন্যত্র অনুরূপ অনুভূতিময়

সেও কি পড়েছে বাঁধা হৃদয়ের অসংখ্য বন্ধনে।
সেও পোড়ে, যে আমারে অহর্নিশি পোড়ায় আগুনে?

পাঠককে এমন একটি স্নিগ্ধ কবিমানসের পরিচয় দিয়ে থাকে যার সঙ্গে সংযোগে তৃপ্তি। মাঝে মাঝে বিভিন্ন কবিতায় এখানে-সেখানে এমন সব পংক্তি বিন্যাস যা আধুনিক মনন ও মেজাজের সমীপবর্তী:

সংশয়ের গাঢ় অন্ধকারে
ঈশ্বরের অবাধ রাজত্ব চলে হৃদয়ের গোপন ভাঁড়ারে'

অথবা

সন্ধ্যাকাশে মেঘে মেঘে রঙের আঁচড়ে ফোটে কথাকলি,

ফলত, নির্জন প্রহর বিশ্বাসী ভক্তের নিবিষ্টচিত্ত উচ্চারণ হলেও কবিতাগুলো কবিতা হিসেবেই সার্থক এবং সে-কারণেই আধুনিক কাব্যপাঠকের ভালো লাগবে।

বিলুপ্ত হৃদয়: আজহার উদ্দীন খান। ডি, এম, লাইব্রেরী। তিন টাকা।

বিলুপ্ত হৃদয় নামটি সুন্দর। কয়েকজন বিস্মৃতপ্রায় সাহিত্যসেবীর নতুন ক'রে কিছু পরিচয় পাওয়া গেল এই বইটিতে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এককভাবে এঁরা যে খুব বিশিষ্ট ছিলেন তা নয়। কিন্তু সাহিত্যজাগরণের স্রোতে এককালে সমবেতভাবে ঢেউয়ের দোলানি এনেছিলেন। বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত হয়েছেন: মীর মশারফ হোসেন, কায়কোবাদ, মোজাম্মেল হক, আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ, এস্‌ওয়াজেদ আলী, শাহাদৎ হোসেন, গোলাম মোস্তাফা, জসীমউদ্দীন। মুসলিম লেখক সমাজে এঁদের প্রায় সকলেই সাহিত্য-চিন্তায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের সঞ্চার করেছিলেন। সমগ্রভাবে বাংলা সাহিত্যকে জানতে যে-পাঠক উৎসাহী 'বিলুপ্ত হৃদয়' পাঠে কিছু কিছু নতুন বিষয় তিনি জানতে পারবেন। আজহার উদ্দীনের গদ্য প্রাঞ্জল ও সাবলীল; খুব সাধারণ পাঠকের উপযোগী করে তিনি তাঁর বক্তব্যকে উপস্থিত করেছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক বইটি পড়তে আগ্রহী হবেন আশা করা যায়।

বিশ্বাবর্ত

ইন্দোনেশিয়ার নীতি পরিবর্তন

ইন্দোনেশিয়ায় দ্রুত পরিবর্তন হয়ে চলেছে। জেনারেল সুহার্তোর ক্ষমতা দখলের পরও ইন্দোনেশিয়ার আর্থিক পরিস্থিতি উন্নতির উদ্দেশ্যে এবং পিপলস কংগ্রেস আহ্বানের জন্য ছাত্র সংগঠনগুলির আন্দোলনের মুখে সুহার্তোকে নতি স্বীকার করে আগামী এই জুলাইয়ের মধ্যে কংগ্রেস আহ্বানের কাজ সম্পন্ন করতে সম্মত হতে হয়েছে। 'কামি' ও 'কাপী' ছাত্র সংগঠনগুলির বৈপ্লবিক প্রভাব ইন্দোনেশিয় সামরিক বাহিনীর উপর কিভাবে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে, জেনারেল সুহার্তোর এই স্বীকৃতি তারই পরিমাপক। অথচ কংগ্রেস আহ্বানের আয়োজন এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। কায়েম খসড়া নির্বাচনী বিলটি এখনও চূড়ান্তরূপ নেয় নাই এবং নূতন কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রকৃতি এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে নূতন সরকারের কাঠামো এখনও অস্পষ্ট রয়ে গেছে। ইন্দোনেশিয়াতে ১৯৫৫ সালের পর আর কখনও নির্বাচন হয় নাই। এই নির্বাচনের সম্ভাবনা বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে নূতন প্রাণের জোয়ার সঞ্চারিত করেছে। অবশ্য নাহদাতুল উলামা পার্টিই সব চাইতে উল্লসিত তাদের শক্তিবৃদ্ধির সম্ভাবনায়। কম্যুনিষ্ট পার্টির পুনরুজ্জীবনের কোনো আশাই নেই। জেনারেল সুহার্তোর ভাষায় ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টি মৃত। 'P. K. I is only an idea'.

ভারতবর্ষের সঙ্গে অবস্থার উন্নতি কামনা করেছেন নূতন পররাষ্ট্রসচিব ডঃ আলম মালিক। ডঃ মালিক সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে কাশ্মীরে গণভোটের দাবী প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ সুব্রন্দিওর আমলের নীতি। ইন্দোনেশিয়া প্রকৃত নন-এলাইণ্ডের ভূমিকায় ফিরে যেতে চায় এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘেও তার নির্দিষ্ট আসন ফিরে পেতে চায়। ইন্দোনেশিয়ার হাউস অফ রিপ্রেসেন্টেটিভস-এর রাষ্ট্রসংঘে পুনঃ প্রবেশ সম্পর্কিত প্রস্তাবের ভিত্তিতে ডঃ মালিক এ-বিষয়ে অগ্রসর হতে চান। ভারতবর্ষের সঙ্গে অবস্থার উন্নতির সূচকরূপে ইন্দোনেশিয়াকে ভারত দশকোটি টাকার বৈদেশিক ঋণের কথা উল্লেখ করে ডঃ মালিক সম্প্রতি আকার্তায় বলেছেন: "It will be better if you give more. We must restore trade ties which have been halted in the last two years."

কিন্তু সব চাইতে বড় পরিবর্তন হয়েছে ইন্দোনেশিয়ার মালয়েশীয় নীতি সম্পর্কে। গত ২০ মে তারিখেও প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ তার সবের 'Confrontation' নীতির পুনরুক্তি করে বলেছেন: "Confrontation (with Malaysia) must continue." অর্থাৎ মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ার সামরিক সংগ্রাম এবং 'Crush Malaysia' অভিযান অব্যাহত থাকবে। গত তিনবছর যাবৎ এই অভিযানের পরিণতিতে ইন্দোনেশিয়ার আর্থিক পরিস্থিতি দেউলিয়ার পর্যায়ে পৌঁচেছে। এই কারণে নূতন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সহজভাবেই বলেছেন "Crush Malaysia' অভিযান বন্ধ না হলে ইন্দোনেশিয়ার আর্থিক উন্নতি সম্ভব হবে না।

মালয়েশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির পথে সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটির অবস্থান অন্যতম প্রতিবন্ধকরূপে চিহ্নিত। বস্তুতপক্ষে সারওয়াক, সাবা, সিঙ্গাপুর ও মালয়ের সমবায়ে মালয়েশিয়ার গঠন সেদিন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার

নিদর্শনরূপেই ইন্দোনেশিয়ার কাছে উপস্থাপিত হয়েছিল। সিঙ্গাপুর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পর মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিকতার ঘাঁটির অপবাদ স্বভাবতই ম্লান হয়ে গেছে। তাছাড়া, সিঙ্গাপুরে ঘাঁটি রাখতে ব্রিটিশদের ব্যগ্রতারও ভাঁটা পড়েছে। কারণ, এই ঘাঁটি রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় যেমন একদিকে বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি ক্ষেপণাস্ত্রের যুগে এই ঘাঁটির সামরিক উপযোগিতাও হ্রাস পেয়েছে। সুতরাং, সিঙ্গাপুরের ব্রিটিশ ঘাঁটির অপসারণের সমস্যাটিও আর পূর্বেকার মত গুরুত্বপূর্ণ নয়। ডঃ মালিক অনেকটা সহানুভূতির সুর নিয়ে বলেছেন: "After all they (Malaysia and Singapore) want security. We can guarantee that."

তিন বছর আগে ম্যানিলাতে মালয়, ফিলিপাইন, ও ইন্দোনেশিয়ার সমবায়ে 'ম্যাফিলিণ্ডো' অঞ্চল গ্রহণের যে প্রস্তাব গত ৩০শে জুন থেকে তিনদিনব্যাপী ইন্দোনেশীয়-মালয়েশীয় বৈঠকের কয়েকদিন পূর্বে গত ২৭শে মে তারিখে ইন্দোনেশীয় কনফ্রন্টেশনের পর তিনবছরের মধ্যে এই প্রথম একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সামরিক মিশন পাঠিয়ে মালয়েশিয়ার প্রতি সংশয়াতীত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে। তাছাড়া এই অগ্রবর্তী সামরিক মিশন ব্যাঙ্কক বৈঠকের সাফল্যের প্রতি ইন্দোনেশিয়ার নূতন সামরিক কর্তাদের প্রবল আনুকূল্য প্রকাশ করে প্রেসিডেন্ট সুকর্ণর বিরোধিতাকেও স্তব্ধ করে দিলো। ব্যাঙ্কক বৈঠকে ইন্দোনেশিয়ার দুষ্করকা করে সুকর্ণর মুখবন্ধ করার দিকে স্বভাবতই ইন্দোনেশিয় মিশনের ঝোঁক থাকবে। তাদের কাছে মালয়েশিয়ার অন্তর্ভুক্ত দুইটি বোর্নিও রাজ্যের মালয়েশিয়ার সঙ্গে স্থায়ীভাবে সংযুক্তির প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসাই সব চাইতে বড় সমস্যা। এক-রাষ্ট্র কিম্বা দুই রাষ্ট্র বিশিষ্ট একটি কমিশন দ্বারা বোর্নিওর রাজ্যগুলির মনোভাব নির্ধারণের অথবা সারওয়াক ও সাবার নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এই সমস্যার সমাধানের প্রস্তাব ব্যাঙ্কক সম্মেলনের আলোচ্য ছিল। বোর্নিওর সমস্যা সম্পর্কে দুই রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা একটি সমত সিদ্ধান্তে পৌঁছালেও কোনো বিবৃতিতে সে-বিষয় তাদের পক্ষে ব্যক্ত করা সম্ভব হয় নাই। কারণ এই প্রস্তাব দুই রাষ্ট্রের গভর্নমেন্টের অনুমোদন-সাপেক্ষ। বোর্নিও এলাকায় নির্বাচনের মধ্য দিয়েই এই সমস্যার মীমাংসা করতে দু'পক্ষই রাজী হয়েছেন।

ব্যাঙ্ককের বৈঠক তাই কোনো চোখ-ঝলসানো সাফল্যমণ্ডিত না হলেও তিন বছরের সংঘাতের পর ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া সম্পর্কের সহজীকরণে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ব্যাঙ্ককে বোর্নিও সীমান্ত থেকে সৈন্য অপসারণ কিম্বা যুদ্ধবিরতি ঘোষিত না হলেও, প্রথম দিনের বৈঠকের পরই একজন থাই অফিসারকে বলতে শোনা গেছে কনফ্রন্টেশন শেষ হয়ে গেছে। বস্তুতপক্ষে ব্যাঙ্কক বৈঠক চলাকালীন আকার্তা থেকে ঘোষিত একটি সংবাদে জানা যায় বোর্নিও সীমান্তে যুদ্ধরত একটি ইন্দোনেশীয় সামরিক বাহিনী ভেঙে ফেলা হয়। ইন্দোনেশীয় কনফ্রন্টেশনের পরিসমাপ্তির ঘোষণা পরোক্ষে সুনিশ্চিতভাবে স্বীকৃত হয়েছে ব্যাঙ্কক অধিবেশনের সময় বক্তৃতাদানে বিরত থাকতে সুকর্ণর প্রতিশ্রুতিতে। সুকর্ণর মালয়েশীয় নীতির পরাজয়ে এই প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

ব্যাঙ্কক সম্মেলনের আলোচনা থেকে মনে হয় 'ম্যাফিলিণ্ডো'র পুনরুজ্জীবন বোধহয় আর সম্ভব নয়। 'ম্যাফিলিণ্ডো'র স্থলবর্তীরূপে চারটি দেশের অর্থনৈতিক সংহতির প্রস্তাব ইন্দোনেশীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ মালিক দিয়েছেন। ব্যাঙ্কক সম্মেলনের অব্যবহিত পরেই ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যাণ্ড ও ফিলিপাইনের মধ্যে আর্থিক, কারিগরী এবং সাংস্কৃতিক সংহতির সিদ্ধান্ত ডঃ মালিক ঘোষণা করেন। এই সংহতির সঙ্গে সিঙ্গাপুরও অতঃপর যুক্ত হবে। গত ৪ঠা জুন ইন্দোনেশিয়া সিঙ্গাপুরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ক'রে এই সম্ভাবনা আর এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে। এই সংহতির

কোনো সামরিক প্রবণতা থাকবে কি না তা এখনই সুস্পষ্ট-রূপে বলা সম্ভব নয়। কারণ চীনকে রুখবার জন্য ভারত, জাপান ও ইন্দোনেশিয়ার একটি আঞ্চলিক জোট সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উত্তরে জেনারেল সুহার্তো সম্প্রতি তার বিরোধিতা করেছেন। জেনারেল সুহার্তো বলেছেন "We oppose military pacts and also we donot agree with any alliance which is against a particular country."

স্বাধীন গায়না

গত ২৬শে মে পূর্ববর্তী ব্রিটিশ গায়না স্বাধীন হয়ে গায়না (Guyana) নাম ধারণ করেছে। গায়নার জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক ভারতীয় এবং নিগ্রোদের সংখ্যা শতকরা ত্রিশ ভাগ হলেও, প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে নিগ্রোদের সংখ্যাধিক্য গায়নাতে বর্ণবৈষম্যের সৃষ্টি করে রেখেছে। ইংরেজের ঔপনিবেশিক মন এই বর্ণবৈষম্যে ইন্ধন যুগিয়ে এসেছে। এই কারণেই ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত ডঃ ছেদি জগনের পিপল্‌স্ প্রোগ্রেসিভ পার্টির ক্ষমতা খর্ব করে ফক্সবেন বার্নাম-এর হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়। ইংরেজ উপনিবেশিকদের চক্রান্তে ১৯৬৩ সালের সংবিধানও আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গৃহীত হয় যার ফলে নূতন সংবিধানের পক্ষাতে শতকরা মাত্র ৪০ ভাগ ভোটারের সমর্থন প্রসারিত হয়েছিল। গায়না স্বাধীন হলেও ঔপনিবেশিক প্রভাব তার আর্থিক পরিস্থিতিতে বহুদূর বিস্তৃত। কারণ, এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের রপ্তানি বাণিজ্য এবং বৈদেশিক লক্ষ্য ব্রিটেন, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের মুঠোর মধ্যে। সুতরাং গায়নার রাজনৈতিক জীবনে নূতন অধ্যায়ের শুরু হলেও অতঃপর অর্থনৈতিক সংগ্রামের ছুরত টানা পোড়েন চলবে।

ভিয়েৎনাম

ভিয়েৎনামে কাই সরকারের বিরুদ্ধে বৌদ্ধদের প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। থানাং ও হুয়েতে সরকার-বিরোধী সেনাবাহিনীদের হটিয়ে দেবার জন্য সরকারপক্ষীয় সেনা-বাহিনী তৎপর হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভিয়েৎনাম সঙ্কটের এই নূতন পর্যায় শুরু হয়। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে নির্বাচনের আশ্বাস দিয়ে মাত্র কিছুদিন পূর্বে প্রধানমন্ত্রী মার্শাল কাই বৌদ্ধদের সঙ্গে যে আপোষ রফা করেছিলেন তা বানচাল হয়ে গেলো। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের কয়েকজন ইতিমধ্যে কাই সরকারের পশ্চাতে মার্কিনী সমর্থনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য আগুনে আত্মোৎসর্গ করেছেন এবং কাই সরকারের প্রতি মার্কিনী সমর্থন প্রত্যাহৃত না হওয়া পর্যন্ত বৌদ্ধরা ভিয়েৎনামে জনসন নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে থাকবেন। সেপ্টেম্বরের নির্বাচন বয়কটের সিদ্ধান্তও বৌদ্ধরা গ্রহণ করেছেন। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বৌদ্ধ কাই-অন্তর্দ্বন্দ্বের এই পর্যায়ে মার্কিনীরাও জড়িয়ে গেছে, কাই সরকারের প্রতি অটুট সমর্থনের মধ্য দিয়ে। তারই প্রকাশ দেখা গেছে হুয়েতে বৌদ্ধদের মার্কিন বিরোধী বিক্ষোভে। ইতিমধ্যে গত ১২ জুন দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বিশ লক্ষ ক্যাথলিকদের পক্ষ থেকে আধা সামরিক কায়দায় প্রায় ১০ হাজার ক্যাথলিক সাইগনে প্যারেড করে কম্যুনিষ্ট বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। বৌদ্ধ বিক্ষোভকারীদের কাই সরকার বিরোধী বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে ভিয়েৎকংদের প্রতি যে প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি অভিব্যক্ত হয়েছে ক্যাথলিকদের এই প্যারেড তারই পাল্টা জবাব এবং প্রকৃতপক্ষে কাই সরকারের প্রতি সমর্থনসূচকও বটে। বৌদ্ধ-ক্যাথলিকদের এই টানাপোড়েনে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে সংহত রাষ্ট্রশক্তির ক্রমবর্ধমান অবক্ষয়ী বিনাশের মধ্য দিয়ে তার আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক দায়িত্বেও আমেরিকা অনিবার্যভাবে জড়িয়ে পড়ছে। ফলে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ভিয়েৎকংদের বিরুদ্ধে সাহায্যকারীর ভূমিকা থেকে নায়কের ভূমিকায় নিঃশব্দে জনসন সরকার উপনীত হয়েছে।

কাম্বোডিয়াতে ছয় ডিভিসন উত্তর ভিয়েৎনামী

সেনাবাহিনীর সমাবেশের সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। কাম্বোডিয়ার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে অনুপ্রবেশকারী-দের চলাচল পুরাতন ঘটনা। আগামী বর্ষায় ভিয়েৎকং-এর শক্তিবৃদ্ধির সম্ভাব্য আয়োজনের পাশাপাশি মার্কিনী আয়োজনও বিপুলাকার গ্রহণ করেছে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে ইতিমধ্যেই ২৬০,০০০ মার্কিনী সৈন্য সমাবেশ করা হয়েছে, বছরের শেষে এই সংখ্যা দাঁড়াবে ৪০০,০০০ এ। এদিকে ইতিমধ্যে সে মাসে মূল চীনা ভূখণ্ডের ওপর মার্কিনী বিমান-বহর একটি বিশ বিমানকে খারেল করে চীনাদের প্ররোচিত করতে সচেষ্ট হলেও, চীনারা প্রত্যুত্তরে নীরবই রয়ে গেছে।

চীনে ক্ষমতার লড়াই

চীনের এই নীরবতার সঙ্গে তার আভ্যন্তরীণ জীবনে সাম্প্রতিক ক্ষমতাদ্বন্দ্বের কোনো সম্পর্ক আছে কি না নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। চীনে একটি প্রতি-বিপ্লবের গুরুতর সম্ভাবনা সম্পর্কে কিছুদিন যাবৎই সরকারী স্তরে জনসাধারণকে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে। এমন কি চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির তাত্ত্বিক পাক্ষিক পত্রিকা 'রেড ফ্ল্যাগ'-এ এ কথা বলেও সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে ১৯৪৬ সালে হাঙ্গেরীতে সংঘটিত বিদ্রোহের ন্যায় চীনেও একটি 'প্রতি-বিপ্লবী' বিদ্রোহের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে। 'রেড ফ্ল্যাগ' বলেছে যে চীনের বুর্জোয়ারা, বুদ্ধিজীবীরা সেখানকার কম্যুনিষ্ট ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে উঠতে পারে নাই এবং যে কোনো মুহূর্তে বুর্জোয়া শক্তির রুদ্র প্রকাশ দেখা দিতে পারে।

চীনের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের উৎস ছিল পিকিং মিউনিসিপ্যালিটির ও পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্টি কেন্দ্রগুলি। এই দুটি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কিছুকাল পিপল্‌স্ ডেইলীতে তীব্র সমালোচনার পর পিকিং মিউনিসিপ্যাল পার্টির প্রথম সম্পাদকের পদ থেকে পিকিং-এর মেয়র পেং চেনকে গত ওরা জুন অপসারিত করা হয়েছে। পেং চেন চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির পলিট ব্যুরোর নেতৃস্থানীয় সদস্যরূপে এই কমিটির নবম স্থানের অধিকারী ছিলেন। এ-ছাড়া পিকিং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পার্টি কমিটির সম্পাদক লু পি এবং ডেপুটি সম্পাদক পেন পি ইউন ও অপসারিত হয়েছেন। পিকিং-এর তিনটি দৈনিকের সম্পাদকমণ্ডলীরও পরিবর্তন হয়েছে, 'পার্টি বিরোধী' কার্যকলাপের দায়ে। পিপল্‌স্ ডেইলি বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিকে পার্টি বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল ও সংশোধন-বাদীদের একটি দুর্গ বলে আখ্যাত করেছে।

এই ক্ষমতাদ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লিন পিয়াও মাও-সে-তুঙ-এর উত্তরাধিকারীরূপে সুনিশ্চিতভাবে চিহ্নিত হয়েছেন এবং এই দ্বন্দ্বে লিউ-সাও-চির পরাজয়ও সুস্পষ্টরূপে ঘোষিত হয়েছে। কারণ, পেং চেন, লিউ-সাও-চির বলবদ্বরূপে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টিতে সুপরিচিত ছিলেন। লিন্ পিয়াওর ক্ষমতাবৃদ্ধির পরিমাপ পাওয়া যাবে রেড ফ্ল্যাগে মাও-সে-তুঙের পাশাপাশি তার নামোচ্চারণে। রেড ফ্ল্যাগের-প্রবন্ধে বলা হয়েছে' Comrade Lin Pao tells people to read Chairman Mao Tse-Tung's words, follow his teachings, act in accordance with his instructions and be a good soldier of Chairman Mao Tse-Tung. He has initiated a movement in the Peoples Liberation Army for the creative study and application of chairman Mao's work. This is a great new development.' রাষ্ট্রপতি লিউ-সাও চির বিরুদ্ধে লিন্ পিয়াও-এর সহযোগীরূপে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই এবং পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল তেন-হাসিয়া পিং। লিউ সাউ-চির সহিত ক্ষমতাদ্বন্দ্বে চূড়ান্ত বোঝাপড়ার সম্ভাবনায় লিন পিয়াও পিকিং ও তিনৎসিন এলাকার উহান্‌ ও কোয়াইচাউ প্রদেশ থেকে অনুগত দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছেন। লিন পিয়াও এর জয় মাওর শক্ত কামরারই (hard line) জয়। ১৪।৬।৬৬

২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

জয়শ্রী

৩১ বর্ষ ০ তৃতীয় সং

সম্পাদকীয়

আসন্ন খাদ্য সঙ্কট

আগামী বাদশুলিতে খাদ্য পরিস্থিতি সঙ্কটের সীমানা অতিক্রম করে দুর্যোগ ডেকে আনবে কিনা, সমগ্র পশ্চিম বঙ্গের দানদিকতা সেই আশঙ্কায় আলোড়িত হচ্ছে। পশ্চিম বঙ্গের খাদ্যের ঘাটতি, কেন্দ্রীয় গম ও চাউলের সাহায্য সমেত এমন নয় যে রাতো দুর্যোগ নেমে আসতে পারে। অথচ পরিস্থিতি এই ধরণের সঙ্কটেরই সম্মুখীন হয়ে আছে। তার কারণ যদিও পাঁচ লক্ষ টন আউস ধান সমেত এবারকার উৎপাদিত চাউলের পরিমাণ উনপঞ্চাশ লক্ষ টনের সহিত কেন্দ্রীয় চাউল ও গম সরবরাহ পনের লক্ষ টন যোগ দিলে রাজ্যের এবছরের সর্বমোট চাহিদা বাষট্টি লক্ষ টনের যোগানের পক্ষে যথেষ্ট, তবুও পশ্চিম বঙ্গ সরকারের খাদ্যনীতি, প্রশাসনিক নীতি এবং এবছর নতুন ফসল উঠবার সঙ্গে সঙ্গে লাঠি, গুলি ও টিয়ার গ্যাসের পুলিশী তাণ্ডবে সর্বস্তরের মানুষের মনে সরকারের বণ্টন ব্যবস্থায় রেশনে খাদ্য সরবরাহে যোগ্যতা, মূল্যস্তর রোধে দৃঢ়তা, ও সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে খোলাবাজারের চাউল যোগানের ব্যবস্থা এবং সর্বোপোরি মজুতদার-জোতদার-কালোটাকার চক্রকে প্রতিহত করবার ইচ্ছা বা ক্ষমতা সম্পর্কে গভীর সংশয়ই বর্তমান সঙ্কটের মূলে সক্রিয় হয়ে রয়েছে।

ভারতবর্ষের সাতটি রাজ্য খরা-ঘাটতি আক্রান্ত বলে ঘোষিত হয়েছে। পশ্চিম বঙ্গের সঙ্কট সত্ত্বেও এই সাতটি রাজ্যের মধ্যে এই রাজ্যটি অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার কারণও পশ্চিম বঙ্গের উৎপাদন ও কেন্দ্রীয় সরবরাহ সমেত চৌষট্টি লক্ষ টনের নিশ্চিত সরবরাহ। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের বণ্টন কিম্বা সরবরাহ ব্যবস্থা এমন, যে ঘাটতি ফসলের বছর তো দূরের কথা উদ্বৃত্ত ফসলের বছরও ঘাটতি এলাকার খাদ্য না পৌঁছবার দরুণ কিম্বা ফসলের যোগান সত্ত্বেও ক্রয়ক্ষমতার ক্রমাগত অভাবের দরুণ, প্রায় কোনো কোনো অঞ্চল স্থায়ী দুর্ভিক্ষ অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। খরা-ঘাটতির দিনে তো কথাই নাই। এবছর রাজ্যের ষোলটি জেলার মধ্যে ছয়টি জেলা খরা-আক্রান্ত এবং মোট সত্তর লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষ কবলিত। ২৪-পরগণা, নদীয়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বেশী। অবশিষ্ট দশটি জেলায়ও কম-বেশী দুর্ভিক্ষের আকর রয়ে গেছে। অথচ রিলিফের সরকারী ব্যবস্থায় এবার দুর্গতদের

মাত্র শতকরা সাড়ে সাতের ভাগের প্রতি সাহায্য প্রসারিত হয়েছে। তার ফলে যদিও গত বছর উদ্বৃত্ত ফসলের দিনেও যেখানে রিলিফে ৩'৭ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, এবার এবাবৎ এই খাতে ব্যয় ৩'৩ কোটি টাকা ধার্য হয়েছে। দুর্গতদের জন্য আরও অবারিত সাহায্যের ব্যবস্থা হলে, যে আতঙ্ক গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে আর্থিক ভারসাম্য বিপর্যস্ত করতে উদ্যত হয়েছে, তা বহুলাংশে প্রশমিত হয়ে মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনতে পারতো। এ-বিষয়ে সরকারী ব্যর্থতার ভয়ঙ্কর পরিণতির সম্ভাবনা উদ্বেগের কারণ হয়ে আছে।

মূল্য সম্পর্কেও সেই একই কথা। উদ্বৃত্ত অঞ্চলে চালের কালোবাজারী দর দেড় টাকা কিলোর কম নয় এবং ঘাটতি অঞ্চলে এই মূল্যস্তরের নিম্নতম পরিমাণ আড়াই টাকা কিলো। আর নিয়ন্ত্রিত মূল্যস্তরের গড় পরিমাণ হচ্ছে ছিয়ানব্বই পয়সা কিলোপ্রতি চাউল। কালোবাজারী মূল্যস্তরের আঘাত আগামী দিনগুলিতে আরও বৃদ্ধি পাবে অন্ততঃ নভেম্বরে নূতন ফসল না ওঠা পর্যন্ত। যাদের ক্রয়ক্ষমতা নিঃশেষিত হয়েছে, বর্ধিত মূল্যস্তর তাদের গভীরতর দুর্ভিক্ষের মধ্যে টেনে এনে অনাহার অনিবার্য করে তুলবে। সরকারী ভরসাস্থল আগস্টের শেষে আউস ফসলের বাজারে সরবরাহ। এই আউস ফসলও আবার নির্ভর করছে বৃষ্টির ওপর। জুন মাস পর্যন্ত যে খরা উদ্যত ফসলগুলিকে পুড়ে ছাই করে দিয়েছে, তার মধ্যে আউসের ভাগ কতটা সে হিসাব সরকারী আওতার বাইরে। সুতরাং এবার পাঁচ লক্ষ টন আউসের আবদানী হবে কিনা সে-সম্বন্ধে সন্দেহ রয়ে গেছে। এদিকে আবার এই আউসের বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত কতটা বাজারে আসবে, তার ওপর নির্ভর করবে চাউলের মূল্য হ্রাস পাবে কিনা এবং একথা নিশ্চিত চাউলের মূল্য সে সময় হ্রাস না পেলে মজুতদারেরা তাদের মজুত ছাড়বে না, যদি না অবশ্য জনসাধারণের আন্দোলনের চাপ মজুত ছাড়তে ইতিমধ্যে তাদের বাধ্য না করে। মজুতদলের জন্য সরকারী উদ্যোগ যে আদৌ কার্যকর হবে না, সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। কারণ, মজুতদারেরা গ্রামাঞ্চলে সরকারী দলের অন্তরঙ্গদের অন্যতম এবং নির্বাচনের বছরে তাদের ওপর সরকারী আইন ও শাসনের হস্তক্ষেপ প্রসারিত হবার আশা করা বাতুলতা মাত্র।

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের সাম্প্রতিক মজুত দখল অভিযানে শোনা যায় মাত্র ৮০০ কুইন্টাল চাউল উদ্ধার হয়েছে। সম্প্রতি জনৈক খানেক মজুত উদ্ধার দশ খান দশেক লরি নিয়ে সুন্দরবন তোলপাড় করে অখণ্ডিত প্রসব করেছে। সরকারী তৎপরতার নমুনা এ থেকেই বোঝা গেছে।

সুতরাং, রেশন-ব্যবস্থার প্রশাসনিক কাঠামো আরও সংহত, আরও তৎপর, আরও দুর্নীতিমুক্ত না করলে, চাউলে -গমে অঙ্কের হিসাবে চৌষট্টি লক্ষ টনের সরবরাহ পশ্চিম বাংলায় নিশ্চিত হলেও, একদিকে যেমন রেশনিং ব্যবস্থা কায়েম রাখা অসম্ভব হয়ে উঠবে অপর পক্ষে খোলাবাজারে চাউলের সরবরাহ এবং ক্রয়ক্ষমতার উপযুক্ত মূল্যস্তর বজায় রাখতে সরকারী অক্ষমতা পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। সরকার এবাবৎ ষ্ট্যাটুটারী ও মডিফায়েড রেশনিং বিলিয়ে দেড় কোটি লোকের দায়িত্ব নিয়েছেন। মডিফায়েড রেশনিং এলাকায় চাউলের পরিমাণ নেবে সরকারী প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করে সপ্তাহে মাথাপিছু পাঁচশ গ্রামে এসে দাঁড়িয়েছে। তাও 'এ' ও 'বি' শ্রেণীর মডিফায়েড রেশনিং-এর বরাদ্দের ক্ষেত্রেই এই অবস্থা। এখনও সরকারী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী 'সি', 'ডি'-'ই' শ্রেণীর মডিফায়েড রেশনের আওতায় আনা হয় নি। এদের কাগজে-কলমে মডিফায়েড রেশনিং-এর আওতায় আনা হলেও কার্যত 'এ' ও 'বি' শ্রেণীর মত এদের চাউলের বরাদ্দ কতটা হবে সে বিষয়ে গভীর সংশয় রয়ে গেছে। এই সংশয়ের মূল কারণ সরকারী লেভি নীতির চূড়ান্ত ব্যর্থতা। সরকারী ঘোষণায় ১৫ লক্ষ টন চাউল সংগ্রহ গোড়ায় লেভির লক্ষ্য ছিল। তা নামিয়ে সাড়ে এগার লক্ষ টন করেও এপ্রিল মাসের মধ্যে লেভির সূত্রে মাত্র পাঁচ লক্ষ টনের

বেশী চাউল সংগ্রহে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার কারণ মিল-মালিকদের সঙ্গে সরকারের জোট। এদের হিসাবের খাতায় যে পরিমাণ চাউল উৎপাদন দেখানো হয়ে থাকে, কার্যত তার চাইতে বেশী চাউল উৎপাদন করে হিসাবের অঙ্কের চাইতে উদ্বৃত্ত চাউল চোরাবাজারে চালান দিয়ে সরকারী লেভি প্রথাকে মিলমালিকরা বানচাল করে দিয়েছে। এদের সঙ্গে জোতদার-মজুতদারদের যোগ সাজস রয়েছে। পশ্চিম বঙ্গে ধানভানার ব্যবস্থার মধ্যে ১৯৬১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী ২০০০ টেঁকি —পাঁচলক্ষ লক্ষর হাজার কৃষি পরিবারের মধ্যে—১২,০০০ হাজার হাস্কিং মেশিন ও ৭৪৯টি চাউল কল রয়েছে। হাস্কিং মেশিনগুলি বছরে একশ দিন চালু থেকে ১২ লক্ষ টন চাউল উৎপাদন করে। চাউল কলগুলির বক্তব্য তারা আট লক্ষ টন চাউলের বেশী বছরে উৎপাদন করতে পারে না। সুতরাং, হাস্কিং মেশিনের বারলক্ষ টন ও চাউল কলের আট লক্ষ টন, মোট কুড়ি লক্ষ টন চাউল উৎপাদন হলে এ-বছরের ৪৯ লক্ষ টন চাউলের অবশিষ্ট ২৯ লক্ষ টন কে উৎপাদন করে, এই প্রশ্ন থেকে যায়। এই খানেই বর্তমান সঙ্কটের উৎস নিহিত রয়েছে।

সুতরাং একদিকে মজুত দখলের ও অপরদিকে চাউল কল ও হাস্কিং মেশিনের কালোবাজারী বন্ধ করবার জন্য অবিলম্বে আন্দোলন সুরু হওয়া প্রয়োজন। চাউল কল-হাস্কিং মেশিন সহ সমগ্র বন্টন ব্যবস্থার রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ব্যতীত এই সঙ্কটের সমাধান নাই। কিন্তু এই আন্দোলনকে অন্তর্ঘাতমূলক খাতে প্রবাহিত করবার দেশদ্রোহমূলক উদ্যোগ থেকে রক্ষার দায়িত্ব পশ্চিম বঙ্গের জনসাধারণকে গ্রহণ করতে হবে। যুবক-কিশোরদের প্রাণের বিনিময়ে খাদ্য আন্দোলন অতীতে কম্যুনিষ্টদের বন্দীমুক্তি আন্দোলনের খাতে প্রবাহিত হয়ে সাধারণ মানুষের মনকে ব্যর্থতার গ্লানিতে আচ্ছন্ন করেছে। আগামী আন্দোলনও তাই জাতীয় নিরাপত্তার বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক আন্দোলনে পরিণত করে ভারতের ওপর বিশেষ করে পূর্বাঞ্চল ভারতের ওপর চীন-পাকিস্তানের উদ্যত বৈদেশিক আক্রমণে চীনা ও পাকিস্তানী আনুগত্যসম্পন্ন শক্তিগুলি ইন্ধন যোগাবার সুযোগ না পায়, সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রেখে জাতীয় আনুগত্য, গণতন্ত্র ও সমাজবাদে বিশ্বাসী শক্তিগুলিকে কংগ্রেসের খাজনীতি পরাস্ত করবার জন্য অগ্রসর হতে হবে।

ত্রিশঙ্কু অবস্থায় প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা

ডিভ্যালুয়েশনের আবর্তে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা আজ শুধু হাবুডুবুই খাচ্ছেন না,—তাঁর 'দৈত্যিক' রাজপাটটিও আজ টলায়মান হয়ে উঠেছে। ভারতের জনজীবনে ডিভ্যালুয়েশন এরই মধ্যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ঝোঁক সুরু করে দিয়েছে। স্থির-আয়ের পরিবারবর্গে আজ ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে। নির্বাচনের সাত মাস আগে ভারতের চারদিকে দ্রব্যমূল্য যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে তার ফলে কংগ্রেস নেতারা শুধু যে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন তাই নয়—কংগ্রেসের সিণ্ডিকেট নেতৃত্ব এবং সংসদীয় দলেও গুরুতর বাক-বিতণ্ডা এবং মতান্তর সুরু হয়ে গেছে। কংগ্রেসের পার্লামেন্টারী দল প্রায় একবাক্যে এই রায় দিয়ে দিয়েছে যে ডিভ্যালুয়েশনের ন্যায় এতবড় গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণের আগে সংসদীয় দলকে পরামর্শ করার প্রয়োজনবোধ না করেই যে অন্যায় করা হয়েছে তাই নয়,—এই ডিভ্যালুয়েশনের সিদ্ধান্তও অনভিপ্রেত, অযৌক্তিক ও অবাস্তব হয়েছে,—যার ফলে জনতার দুঃখ দুর্দশা বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু রপ্তানী বাণিজ্যের সাহায্যে বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ে বিশেষ কোন লাভ হবে না। সমস্যাটি কংগ্রেস নেতৃত্বের একেবারে গোড়ায় গিয়ে আঘাত করেছে। মুদ্রা মূল্য হ্রাসের নীতি নিয়ে কামরাজ-ইন্দিরার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে, এবং মন্ত্রী সভার চৌধুরী-ফকৌ-ব্রহ্মানন্দ ছাড়া আর কেউ সমর্থন করেছেন বলে জানা যায়নি। ডিভ্যালুয়েশনের বিড়ম্বনায়

একদিকে জন বিক্ষোভের রক্ত চক্ষু এবং অন্যদিকে দলের মধ্যে নেতৃত্ব-সংকট,—জাতীয় জীবনে আজ এই দ্বিমুখী অস্ত্রের সম্মুখীন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

আন্তর্জাতীয় ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থা আরও শোচনীয়। শুধু অকংগ্রেসী মহলই নয়, কংগ্রেসী মহলও আজ এই সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠছে যে, বিশ্বব্যাংক ও আমেরিকার চাপেই ভারত সরকার ডিভ্যালুয়েশন করতে বাধ্য হয়েছেন। এভাবে ডিভ্যালুয়েশনের সঙ্গে, শুধু ভারতেই নয়, রাশিয়ারও এই তীব্র অভিমত ব্যক্ত হয়েছে ভারত সরকার রাজনীতির ক্ষেত্রে আমেরিকার প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। এই অভিযোগ খণ্ডনের জন্য, পূর্বে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেও হঠাৎ বিশ্ব যুদ্ধোন্মাদিনী ভ্রমণ করে মস্কো গিয়ে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী একথা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে ভারত আন্তর্জাতীয় নিরপেক্ষতার নীতি পরিত্যাগ করেনি এবং এই নীতিকে বাস্তবতার গুরুত্ব আরোপ করার জন্য ভিয়েতনাম শান্তির স্বপক্ষে একটি প্রস্তাব এই দেশ তিনটির সমর্থনের জন্য তিনি বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধীর প্রস্তাবে এই তিনটি দেশের মধ্যে একটি দেশেরও সমর্থন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। ভারতীয় রেডিয়োর প্রচার ছাড়া বাস্তবত এই তিনটি দেশেই ইন্দিরা গান্ধীর সফর ব্যর্থ হয়েছে। আন্তর্জাতীয় ক্ষেত্রে সব কূলই তিনি হারাতে বসেছেন।

ডিভ্যালুয়েশনের ফলে কংগ্রেস অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্মুখীন ভারতীয় আর্থিক জীবন চরম সংকটে বিপর্যস্ত এবং পররাষ্ট্র ক্ষেত্রেও ভারত সবকয়টি রাষ্ট্রই আস্থা হারাতে বসেছে। পরনির্ভর ভারত সরকারের অবস্থা আজ যেমন শোচনীয়' ইন্দিরা-নেতৃত্বও তেমনি বিপন্ন। আগামী কয়েক মাসে পাক-চীন আঁতাত ভারতের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে চরম সংকট সৃষ্টি করতে পারে। নেহেরু-কন্যা পিতার ভাগ্য ভারতকে যে কোন দুর্ভাগ্যের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে সেই দুশ্চিন্তা কালো মেঘের মত ভারতের ভাগ্যাকাশ ছেয়ে ফেলেছে।

পূর্ববাংলার সঙ্কট

সেপ্টেম্বর যুদ্ধের চেয়েও এক ভয়াবহ সংকটের কেন্দ্রস্থানে পরিণত হচ্ছে আজকের পূর্ব বাংলা। পাক-ভারত যুদ্ধের পরে দ্রুত গতিতে এক আন্তর্জাতিক চক্রান্তের প্রস্তুতি সুরু হয়েছে পূর্ব বাংলায়। রাষ্ট্রপুঞ্জের সহায়তায় অথবা একক সামরিক প্রচেষ্টায় যে কাশ্মীর দখল করা আর সম্ভব নয়, রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিষদে সতের বছরের পাক-প্রচেষ্টায় এবং গত সেপ্টেম্বর যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় সুস্পষ্টভাবে সেকথা উপলব্ধি করেছে পাক-প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান। কাশ্মীর দখল করা সম্ভব না হলে পিণ্ডি-নায়ককে পাক-ভারত মৈত্রী ও সমঝোতার পথ অনুসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না, কিন্তু এই পথে গেলে একই সঙ্গে প্রেসিডেন্ট আয়ুবখানের পতন এবং পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব বাংলার ভাবী বিচ্ছেদ অনিবার্য করার পক্ষে যে রাজনৈতিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে সে সম্বন্ধে আইয়ুবশাহী অত্যন্ত সতর্কভাবে সচেতন। তাই বিকল্প পথ অনুসরণ করার অপরিহার্যতার দিকে অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে অগ্রসর হয়ে পাক-চীন আঁতাতকে সুদৃঢ় করার সংকল্প গ্রহণ করেছেন পিণ্ডি-প্রেসিডেন্ট। কাশ্মীর দখলের চরম ও চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রচেষ্টায়, প্রয়োজন হলে, পূর্ব বাংলার বিনিময়ে কাশ্মীর অধিকারের কার্যক্রম গ্রহণ করতেও দ্বিধাগ্রস্ত নন এই কৌশলী নায়ক। তাই সুচতুরভাবে পশ্চিম পাকিস্তানে চীনা কম্যুনিজমের অনুপ্রবেশের পথ রুদ্ধ করে পূর্ববাংলায় রাজনৈতিক, আর্থিক ও সামরিক ক্ষেত্রে এই পিকিংপন্থী প্রভাব বিস্তারের প্রায় অবারিত সুযোগ করে দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট আয়ুব। চীনা কম্যুনিজমের এরূপ প্রভাব বিস্তারের ফলে পূর্ব বাংলায় যে চীনা প্রভাব বিস্তারের

সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে, তার গতিপ্রবাহ পিণ্ডি বেতারের জ্ঞাতসারেই ব্যাপকতা লাভ করছে। কাশ্মীর প্রশ্নের কার্যক্রমে প্রয়োজন হলে পূর্ববাংলায় ভিয়েৎনামের ন্যায় সঙ্কট সৃষ্টিতেও আয়ুবশাহী পশ্চাদপদ নয়। পাক-চীন আঁতাতের সামরিক গতি প্রকৃতির তাৎপর্যে যথার্থই পূর্ববাংলায় এমন এক গুরুতর সংকট ঘনিয়ে আনছে যার আবর্তে পূর্ব বাংলা ও পূর্বাঞ্চল ভারত সমভাবে চরম বিপদের সম্মুখীন হবে।

পাক-চীন আঁতাতের পশ্চাতে আইয়ুবশাহীর সর্বনাশা চক্রান্তের সংকেত লক্ষ্য করে পূর্ববাংলার জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। আওয়ামী লীগের মুখপত্রে চীনা রাজনীতির বিশ্লেষণ করে তাই বলা হয়েছে যে "চীন বোধগম্য কারণে তাসখন্দ চুক্তি সমর্থন করিতে পারে নাই। সাম্প্রতিক পাক-ভারত যুদ্ধকালে চীনের হুমকির ফলেই পূর্ব পাকিস্তান আক্রান্ত হয় নাই বলিয়া যারা মনে করেন আমরা তাঁহাদের সঙ্গে একমত নই। পূর্ব পাকিস্তান কোন শক্তিব্লকের নজরে পড়ুক, পূর্ব-পাকিস্তান ভিয়েৎনামের মত বৃহত্তর শক্তিদ্বন্দ্বের সংঘর্ষের ক্ষেত্রে পরিণত হউক, তাহা কখনো আমরা কামনা করি না।"

পূর্ব বাংলাকে ভিয়েৎনামের ন্যায় আরেকটি রণক্ষেত্রে পরিণত করার যে কারসাজী সুরু হয়েছে তার লক্ষণ দেখে এবং পাক-ভারত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব বাংলায় আজ এক নতুন পর্যায়ের গণ-আন্দোলন সুরু হয়েছে। পূর্ব বাংলায় গণ-আন্দোলন হয়েছে অনেক,—১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৬২, ১৯৬৩, ও ১৯৬৮ সালে স্বায়ত্বশাসনের দাবীতে পূর্ব বাংলায় ব্যাপক ও বৃহদায়তন গণ-আন্দোলন হয়েছে। এরূপ আন্দোলনে রক্ত, মৃত্যু ও অগণিত কারাবাসের গৌরবময় ঐতিহ্যও সৃষ্টি হয়েছে। এবারেও গত জুনের ঘটনার আগে ও পরে পূর্ব বাংলায় ব্যাপক নির্যাতন ও গ্রেপ্তার সুরু হয়েছে। এরই মধ্যে প্রায় ৩০০০ কর্মী ও নেতা গ্রেপ্তার হয়েছে এবং পূর্ব বাংলার সর্বত্র চলছে সন্ত্রাসবাদের রাজত্ব। কিন্তু এবার সংগ্রাম অন্যান্য সংগ্রামের চেয়ে গুণগতভাবে কোয়ালিটেটিভলি ভিন্ন।

পাক-ভারত যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় পূর্ব বাংলার গণ-মানসিকতায় এবং রাজনৈতিক লক্ষ্যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। পাক-ভারত যুদ্ধের সময়ে পূর্ব বাংলায় এক ডিভিশন পাঞ্জাবী সৈন্যের অস্তিত্ব এবং ঢাকা-পিণ্ডির মধ্যে অবাধ বেতার বার্তার ক্ষীণ বিনিময় সূত্রটি ছাড়া দেড় হাজার মাইল স্থলপথ ও তিন হাজার মাইল জলপথের ব্যবধানে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে কোনরূপ যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল না। সংকট কালে যে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব বাংলাকে কোন সাহায্য দিতে পারে না সেই বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব-বাংলার রাজনৈতিক দাবী এক বৈপ্লবিক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। আওয়ামী লীগের ছয়দফা দাবী তারই সুস্পষ্ট লক্ষণ। ছয়দফা দাবীর ভূমিকায় আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান লিখেছেন: "ভারতের সাথে বিগত সতর দিনের যুদ্ধের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ রেখে জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো সম্পর্কে আজ নতুনভাবে চিন্তা করে দেখা আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে।" এই প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের সম্পাদক জনাব তাজউদ্দীন আহমদও লিখেছেন: "সাম্প্রতিক পাকভারত যুদ্ধের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের নাজুক অবস্থা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়াছে এবং দেশের সংহতি, নিরাপত্তা ও পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে সকল কেন্দ্রীয় শক্তির কার্যকারিতার শ্লোগানগুলির অসারতাও প্রমাণিত হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের অধিকার-বঞ্চিত অসহায় জনসাধারণকে আর সস্তা বুলিতে ধোকা দেওয়া চলিবে না।"

স্বায়ত্বশাসনের দাবীকে পশ্চাতে ফেলে পাক-ভারত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব বাংলায় এখন মুসলীম লীগের ১৯৪০

লাহোর প্রস্তাব রূপায়নের দাবী তোলা হয়েছে। লাহোর প্রস্তাবে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল যে ভারত বিখণ্ডনের পরে পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চল মুসলীম সংখ্যাগরিষ্ঠ—অঞ্চল দুটিতে দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র-গঠন করতে হবে। এই প্রস্তাবের নির্দেশ ছিল: "That geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted with such territorial re-adjustments as may be necessary that the areas in which the muslims are numerically in a majority as in the North Western and Eastern Zones of India should be grouped to constitute "Independent states" in which the constituent units shall be autonomous and sovereign" দুরফা দাবীতে এই লাহোর প্রস্তাব রূপায়নের দাবী স্পষ্ট। প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীন পূর্ববাংলা গঠনের দাবী বে-আইনী,—তাই, অপ্রত্যক্ষত যে স্বাধীনতার দাবী তুলে পূর্ব বাংলার আজ আওয়াজ উঠেছে, "আমরা লাহোর প্রস্তাবের রূপায়ন চাই!"

মৌলানা ভাসানীর ন্যাশন্যাল আওয়ামি-পার্টি, ন্যাশন্যাল ডিমোক্রাটিক ফ্রন্ট, কাউন্সিলার মুসলীম লীগ, আমাতে ইসলাম বা নিজামে ইসলাম এই লাহোর প্রস্তাবের দাবী তুলতে, রাজনৈতিক কারণে আগ্রহী নয়, অথবা সাহস পায়নি। লাহোর প্রস্তাব রূপায়নের দাবী জনমতের বিপুল সমর্থন লাভ করেছে বলে ৭ই জুনের ঐতিহাসিক ধর্মঘটের আহ্বান একা আওয়ামী লীগই দিতে সক্ষম হয়েছে। এর আগে সমস্ত ধর্মঘট বা হরতালের আহ্বান উল্লিখিত দলগুলি সংযুক্ত ভাবে দিয়েছে। এই দলগুলি আজ পূর্ববাংলার পশ্চাতে পড়ে গেছে এবং আওয়ামী লীগ একক পূর্ব বাংলার জাতীয় দল ও জাতীয় নেতৃত্বে গুরুত্ব অর্জনে সক্ষম হয়েছে, এবং সেজন্য পূর্ব বাংলার সমস্ত জুলুম ও নির্যাতনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে আওয়ামী লীগ।

লাহোর প্রস্তাব রূপায়নের দাবীর বৈপ্লবিক তাৎপর্যের জন্যই অন্যান্য দলগুলি আওয়ামী লীগের দুরফা দাবীর পশ্চাতে এসে সক্রিয় ভাবে দাঁড়াতে সাহস পাচ্ছে না কিন্তু মৌলানা ভাসানীর ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টি, আওয়ামী লীগের দুরফা দাবীকে সমর্থন করছে না অন্য কারণে। এই দলটি আইয়ুবের চীনা আঁতাতের নীতির ঘোর সমর্থক। এই দলটিও তাই পূর্ববাংলায় লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে গণ-আন্দোলনের গুরুত্ব সৃষ্টি করার পরিবর্তে ভিয়েৎনামে চীনা নীতির সমর্থনে তীব্র আন্দোলন সুরু করেছে। তাই পূর্ব বাংলায় পিকিংপন্থী এবং জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে সংঘর্ষও সুরু হয়েছে। পশ্চিম বা লায় পিকিংপন্থীদের মত পূর্ববাংলার পিকিংপন্থীরাও একইভাবে এবং একই রকম তীব্রতায় ভিয়েৎনাম আন্দোলন সুরু করেছে।

ভিয়েৎনামের ন্যায় চীনা করায়ত্তের চক্রান্ত রোধ করার জন্য পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদীরা লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে অটোনমীর আন্দোলন সুরু করেছে। কিন্তু আইয়ুবশাহীর চক্রান্ত, না স্বাধীন পূর্ব বাংলা গঠনকামী গণ আন্দোলন,—কোনটি পূর্ববাংলার চূড়ান্ত রূপ নেবে, তারই উপর নির্ভর করছে পূর্ব বাংলার উপরে কম্যুনিষ্ট চীনের এ্যাণ্ড-ট্রাটেজীর কার্যকারিতা।

কে-সরকারী তদন্ত কমিশন

পশ্চিম বঙ্গে অনুষ্ঠিত গত ফেব্রুয়ারী-মার্চের ঘটনা সম্পর্কে আসামের অবসর প্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি শ্রীনরসুপ্রসাদের নেতৃত্বে যে তদন্ত কমিশন গঠিত হয়েছিল, তাদের রায় প্রকাশিত হয়েছে। কমিশনের মতে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী থেকে ৩১ই মার্চের ঘটনার মূল কারণ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্যনীতি এবং মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রীসভার তাঁর অনুগামীদের ঔদ্ধত্য—

"overbearing attitude of the Chief Minister and his followers in the Ministry." কমিশন আরও বলেছেন যে, সেদিনকার অভ্যুত্থান কোনো রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে সুরু হয় নাই, বরং সেই উত্তাল তরঙ্গের শীর্ষে রাজনৈতিক দলগুলিকে স্থাপন করে সেদিনকার অভ্যুত্থান প্রবল বেগে বয়ে চলেছে।

পুলিশী অত্যাচার সম্পর্কেও কমিশনের বক্তব্য সুস্পষ্ট। অনেক ক্ষেত্রেই কমিশনের মনে পুলিশী গুলির কোনো সঙ্গত কারণ ছিল না, বহুক্ষেত্রে নির্বিচারেগুলি চালনার উদ্দেশ্য ছিল শুধু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার নামে, গুলি করে নির্বিচার হত্যা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট কিম্বা সিনিয়র বিচার-বিভাগীয় অফিসারের হুকুম ছাড়াই গুলি চালানো হয়েছে। রাজ্যের বাহির থেকে পুলিশ আমদানী সম্পর্কে কঠোর বক্তব্য প্রকাশ করে কমিশন বলেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বেশ বুঝতে পেরেছিল এমন অবস্থার উদ্ভব হতে পারে যে-সময় বাংলার অধিবাসীদের বাঙালী পুলিশ দিয়ে শায়েস্তা করা যাবে না।

কমিশনের তীব্র ধিক্কার পশ্চিম বঙ্গের পুলিশী শাসকদের কাছে না পৌঁছলেও জনতার দরবারে তা অমূল্য হয়ে রইলো। অত্যাচারীর হিংস্র আক্রমণ থেকে ন্যায়বিচারের সুযোগ একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই, কমিশনের রায় তারই সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি।

মাইনরিটি কমিশনের রিপোর্ট

সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীকীর্তিলাল কাপুরের সভাপতিত্বে যে মাইনরিটি কমিশন গঠিত হয়েছিল পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগের কারণ নির্ণয়ের জন্য সেই কমিশন ২০০০ পৃষ্ঠার একটি রিপোর্ট ওরা জুলাই ভারত সরকারের কাছে পেশ করেছেন। এই কমিশনের পূর্ণ রিপোর্ট আমাদের হাতে আসেনি, সরকারও এখনও তা প্রকাশ করেন নি। দেশভাগের চুক্তিতে পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘুদের জীবন-সম্পত্তি ও মান-মর্য্যাদা রক্ষার যে প্রতিশ্রুতি ছিল এবং ১৫ই আগষ্ট সমগ্র ভারতের পক্ষ হয়ে স্বর্গত প্রীমেহেরু ও সর্দার প্যাটেল যে ঘোষণা করেছিলেন তা পালনে ভারত সরকার শুধু ব্যর্থ হয়েছেন বলা চলে না,—সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য যথাসময়ে যথাযথ চেষ্টাও করা হয় নি। মাইনরিটি কমিশন বলেছেন যে ১৯৫৮ সাল পর্য্যন্ত পূর্ববঙ্গ থেকে ৪২ লক্ষ হিন্দু চলে এসেছে এবং তারা দেশ ত্যাগ করে এসেছে স্বেচ্ছায় নয়,—বর্বাস্তিক ভাবে বাধ্য হয়ে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে পরে পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘুদের সুপরিকল্পিত ভাবে বিতাড়ন করা হয়েছে। কিভাবে বিতাড়ন করা হয়েছে, কিভাবে সংখ্যালঘুদের পূর্ব বা না থেকে উৎখাত করা হয়েছে অগ্রন্থির পৃষ্ঠায় গত আঠার বছরে তার বহু তথ্য আমরা তুলে ধরেছি। একটি দেশের মানুষ, যারা তাদের নেতাদের বিশ্বাস করেছিল, ভারতবর্ষকে ভাল বেসেছিল, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য অকাতরে দুঃখ ও লাঞ্ছনা বরণ করেছিল, সেই দেশের মানুষ তাদের সংগ্রাম, বিশ্বাস ও জননী জন্মভূমির প্রতি আনুগত্যের যে পুরস্কার লাভ করেছে তার নির্মমতার কোন বর্ণনা দেওয়া যায় না। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন দেশের আতীয় নেতৃত্বের এরূপ বিশ্বাসঘাতকতার আর দ্বিতীয় নজীর আছে বলে আমাদের জানা নেই। এক দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার অভিশাপে কুরুক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছিল,—দেশ ভাগের ফলে লক্ষ লক্ষ দ্রৌপদীর অশ্রুজল অসহায় আর্তনাদে বারে বারে শুকিয়ে শুকিয়ে বাষ্প হয়ে উড়ে গেছে। আজ ইতিহাসের কাছে এমনি একটি সংখ্যালঘু কমিশনের রিপোর্ট আমাদের প্রত্যাশা নয়, প্রত্যাশা একটি প্রলয় ঝঞ্ঝার, জননীর অশ্রুজল থেকে যে বাষ্প সৃষ্টি হয়েছে সেই বাষ্পের আবর্তে সৃষ্ট এক প্রচণ্ড বজ্রধ্বনি। ইতিহাস কি সেই প্রত্যাশা পূরণ করবে?

কমিশন বলেছেন যে যদি পূর্ব বাংলার সীমান্ত জোর করে

বন্ধ করে দেওয়া না হতো তা' হলে পূর্ব বাংলা থেকে সমস্ত সংখ্যালঘু ভারতে চলে আসতো, দেশভাগের পরে পূর্ববাংলার সংখ্যালঘুরা কোন্ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে তার গুরুত্ব, নির্মমতা ও অসহনীয় অবস্থা সম্বন্ধে এর চেয়ে তির্যক মন্তব্য আর সম্ভব নয়। কিন্তু পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘুদের রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে কমিশন কি পথ অবলম্বনের জন্য তাঁদের সরকারের কাছে সুপারিশ করেছেন যে সম্বন্ধে কমিশনের বিজ্ঞাপিত সংক্ষিপ্ত সমাচারে কোন উল্লেখ নেই।

প্রশংসনীয় প্রতিশ্রুতি পূরণ

চল্লিশ দশকে পশ্চিম বাংলার ব্যাঙ্কিং বিপর্যয়ে ছোট-বড় বহু আমানতকারীর জীবনের সঞ্চয় অকস্মাৎ শূন্যে মিলিয়ে যায়। আইনের বলে তার কিয়দংশ উদ্ধারের চেষ্টাও বহুলাংশে ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের ব্যাঙ্কিং ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমের সংবাদ সম্প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। মহীন্দ্র ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড (অধুনা মহীন্দ্র ব্যাঙ্ক এণ্ড বিল্ডিং কর্পোরেশন লিঃ নামে পরিচিত) ব্যাঙ্কের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ আমানতকারীদের পাওনা মিটিয়ে দিয়ে সম্প্রতি তাদের গচ্ছিত সমস্ত অর্থই পরিশোধ করে দিয়েছে।

ব্যাঙ্কের পরিচালকবৃন্দ আমানতকারীদের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য অভিনন্দনযোগ্য। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী বি. এন. রায় এই সাফল্যের জন্য বিশেষভাবে প্রশংসার্হ। সংবাদে প্রকাশ আমানতকারীদের অর্থ সম্পূর্ণভাবে মিটিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত শ্রী রায় তাঁর গচ্ছিত অর্থের কোনো অংশই তুলে না নিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। এঁদের দৃষ্টান্ত বাঙালী জাতির পক্ষে গৌরবের।

১৬. ৭. ৬৬

জয়শ্রী

পরবর্তী কয়েকটি সংখ্যা প্রসঙ্গে

শ্রাবণ। ১৩৭৩

স্বাধীনতা সংখ্যা

ভাদ্র। ১৩৭৩

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় শতবর্ষ সংখ্যা

আশ্বিন। ১৩৭৩

শারদীয়া সংখ্যা

পৌষ। ১৩৭৩

নেতাজী সংখ্যা

প্রচার সম্পাদক। অহশ্রী
৩১২, গাঙ্গুলিবাগান, কলিকাতা ৪৭
৪৬-৪১১৬

ধারাবাহিক রচনা

সুভাষচন্দ্র

পবিত্রকুমার ঘোষ

প্রেসিডেন্সি কলেজ

১৯১৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে বাংলা দেশে একটা ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। সে সময়কার পত্র-পত্রিকা হতে সেই দুর্ভিক্ষের কারণ, প্রসার ও গুরুত্বের কথা অনুধাবন করা যায়। কুমিল্লার চাঁদপুর শহরের নেতা হরদয়াল নাগ (পরবর্তী কালে ইনি একজন সুভাষ-সমর্থক রাজনৈতিক নেতা হয়েছিলেন) Amrita Bazar Patrika-য় (৫ই জুলাই, ১৯১৬) প্রকাশিত একখানি পত্রে লিখেছিলেন যে এক চাঁদপুর মহকুমাতেই ২০,০০০ লোক দুর্ভিক্ষপীড়িত হয়েছে, তন্মধ্যে ১০,০০০ লোক মোটামুটি সাহায্য পেয়েছে, ৪০০০ লোক অনিয়মিত সাহায্য পেয়েছে, ৬০০০ লোক কিছুই পায়নি। বহু লোক মারা গেছে, আত্মহত্যাও করেছে অনেকে, কিন্তু সরকার তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থই হয়েছেন। উক্ত পত্রিকার ৭ই জুলাই সংখ্যায় নোয়াখালি হতে নিজস্ব প্রতিনিধি জানাচ্ছেন যে, নোয়াখালিতেও দুর্ভিক্ষ বিস্তৃত হয়ে পড়েছে, বিশেষত বেগমগঞ্জ, সেনবাগ, রামগঞ্জ এবং লক্ষ্মীপুর থানা এলাকার লোকেরা দলে দলে অনশন করছে। মৃত্যু ও আত্মহত্যার ঘটনাও বিরল নয়। ১৫ই জুলাই তারিখে প্রকাশিত নোয়াখালি সেন্ট্রাল রিলিফ কমিটির সেক্রেটারী এক পত্রে দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়ে লিখেছেন: The calamity is widespread and the suffering of the people is very great. Unless the generous public came forward with their contributoin it is hardly possible for the committee to meet the demands of the occasion. ১৯শে জুলাই তারিখে অমৃত বাজার পত্রিকার প্রধান সম্পাদকীয় স্তম্ভে Famine in East Bengal: Duties of the Goverment and the Public এই শিরোনামায় এই মত প্রকাশ করেন যে, ১৮৭৭-৭৮ সালে প্রবর্তিত দুর্ভিক্ষ বীমা তহবিলের জন্য ভারত-বাসীকে নিয়মিত কর দিতে হয় এবং দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে সরকার দুর্ভিক্ষ হতে দেশবাসীকে রক্ষার সকল দায়িত্ব নিজে নিয়েছেন,—কিন্তু মহাযুদ্ধের ব্যয়ভার ভারত সরকারকেও বহন করতে হয় বলে সরকারের হাতে টাকা নেই, অতএব ব্যক্তিগত দানই এখন দুর্ভিক্ষ-প্রতিরোধের একমাত্র উপায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ঐ তারিখে প্রকাশিত একটি সংবাদে জানা যায় যে কলকাতার হরিশপার্কে পূর্বদিন অনুষ্ঠিত এক জনসভায় দুর্ভিক্ষের কারণ বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে যে তিনবৎসর ধরে পূর্ববঙ্গে পাট চাষ হতে সোনা আর নেই, তারপর আউষ ধান নষ্ট হয়ে গেছে, এবং তদুপরি ঘটে গেছে ভীষণ বন্যা,

চাষী, মধ্যবিত্ত ও দিনমজুর- এই তিন শ্রেণীই ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পূর্ববঙ্গের এই বিপদে সমস্ত বাংলা দেশকেই সাহায্যের হাত নিয়ে এগিয়ে আসা উচিত—বিশেষত যুদ্ধের কারণে সরকার যেখানে বেশি সাহায্যদানে অসমর্থ। এই সভায় শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আসতে পারেননি—কিন্তু ৩০০৲ সাহায্য তহবিলে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ২৪শে জুলাই অমৃত বাজার পত্রিকার প্রধান সম্পাদকীয় স্তম্ভে শিলচর ও শ্রীহট্টের ব্যাপক বন্যা সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখা হয় যে ত্রিপুরা, নোয়াখালি, কুমিল্লাই নয়—বাংলা ও আসামের বহু জেলা দুর্গতদের হয়ে পড়েছে—জনসাধারণের স্বেচ্ছাদত্ত চাঁদায় সে দুর্গতা মোচন হওয়া অসম্ভব, সরকার তাঁর কর্তব্য পালন করুন: People are houseless, foodless and moneyless. They have been reduced to utmost destitution Relief is therefore, most urgently needed in these flooded areas. The measures that have been adopted are quite inadequate. We do not know what further grants have been made by the Government. There is no doubt, however, that unless the authorities fully realise the gravity of the situation and come to the help of the famine-stricken it will be impossible for them to tide over the difficulty উক্ত সংবাদপত্রের ২৮শে জুলাই সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হচ্ছে যে আসামে ও পূর্ববঙ্গে যেমন বন্যা হয়েছে, তেমনি পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, নাগপুর প্রভৃতি স্থানে অনাবৃষ্টির দরুণ সব ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যুক্ত প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজপুতনা ও পাঞ্জাবে ভীষণ খরা চলছে। অতএব সারা ভারতেই দুর্ভিক্ষ দেখা দেবার সম্ভাবনা ঘনায়মান। ২৮শে জুলাই তারিখের পত্রিকায় এই মর্মে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় যে রাজা পিয়ারি মোহন মুখার্জির সভাপতিত্বে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে অনুষ্ঠিত কলকাতার বিভিন্ন সমিতিদের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনে একটি দুর্ভিক্ষ ত্রাণ তহবিল গঠিত হয়েছে। ঐ তহবিলে চাঁদাদানে সকলকে আহ্বান জানানো হয়েছে। ২৬শে জুলাই তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত Bengal Legislative Council এর সভায় সরকারী তরফ হতে দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে মিঃ বীটসন বেল একটি দীর্ঘ বিবৃতি দেন —অমৃত বাজার পত্রিকা বিবৃতিটি প্রকাশ করে সম্পাদকীয় মন্তব্য করেন যে সরকারের দায়িত্ব এড়াবার একটা ধূর্ত প্রয়াসই উক্ত বিবৃতিতে লক্ষ্য করা গেছে, ২রা আগষ্ট তারিখে উক্ত সংবাদ পত্রে সম্পাদকীয় মন্তব্যে লেখা হয়েছে: We are threatened with a still more serious calamity. It is something like an all-India famine. People have yet to realise its gravity. Rain is badly wanted in all parts of this continent.

২৫শে আগষ্ট তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকার বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগের সেক্রেটারির একটি বিবৃতি সহ পূর্ববঙ্গের দুর্গতদের সাহায্যকল্পে চাঁদা দাতাদের নামের একটি তালিকা প্রকাশিত হয়। ঐ তালিকায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নামও আছে: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮০৲, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০০৲, অধ্যাপক কালিদাস নাগ ৩০৲, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ২৫৲, অতুলপ্রসাদ সেন ২৫৲, W. W. Pearson ১০৲, সি. এফ. এণ্ড্রুজ ১০৲, সি. সি. বিশ্বাস ৫৲, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ২৲, ইত্যাদি।

২৫শে আগষ্ট তারিখে East Bengal Famine Relief Fund-এর পক্ষ থেকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরও কয়েকজনের একটি আবেদন প্রকাশিত হয়—জনসাধারণকে মুক্ত হস্তে চাঁদা দিতে অনুরোধ করে। এই সমিতিটি

রাজা সিয়ারীমোহনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পূর্বোল্লিখিত সম্মেলনে গঠিত হয়েছিল।

এই দুর্ভিক্ষের সময় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সেবাকার্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বারা। তাঁদের উদ্যোগে গঠিত তহবিলে চাঁদাদাতাদের নাম প্রায়ই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হত। ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে রামকৃষ্ণ মিশনের তদানীন্তন সেক্রেটারি স্বামী সারদানন্দ জানাচ্ছেন যে উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলায়ও জনসাধারণের ভয়ানক দুর্দশা দেখা দিয়েছে এবং বাঁকুড়ার অবস্থাও ক্রমশই মন্দের দিকে। মিশনের কর্মীরা উক্ত স্থানগুলিতেও সেবা কেন্দ্র খুলবেন।

উক্ত তারিখে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দুর্ভিক্ষ তহবিলে চাঁদা দাতাদের নামের তালিকাও প্রকাশিত হয়। ঐ তালিকায় এই নামগুলিও আছে, যথা:—বালবী মেরী (দেশবন্ধুর সহধর্মিণী) ৫০০৲, অতুল প্রসাদ সেন ১০০৲, ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ৩৫৲ ইত্যাদি।

বাঁকুড়ার অবস্থা ক্রমশঃ অবনতির দিকে যায়। বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানগুলি বাঁকুড়ার বিষয়ে বিবৃতি দিতে থাকেন, কিন্তু সরকার বাঁকুড়ার বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব ছিল (the authorities are maintaining a discreet silence A. B. Patrika 13th Sept 1915)

২

এই পটভূমিতেই প্রেসিডেন্সি কলেজে একটি বন্যা ও দুর্ভিক্ষ ত্রাণ কমিটি গঠিত হয়েছিল ১৯১৫ সালের জুলাই-আগস্ট মাসের কোন সময়ে। ২য় বর্ষ প্রথম সংখ্যা (August, 1915) কলেজ ম্যাগাজিনে এই কমিটি সম্পর্কে এই বিবরণটুকু প্রকাশিত হয়েছিল:

Famine Meeting

At a meeting held at the Physics Theatre of the College and presided over by the Principal it was resolved to raise funds for alleviating the distress caused by the floods and famine in E. Bengal. The following appeal has been issued to old students of the College.

An appeal to old Students

It is known that distress prevails over an extensive part of Eastern Bengal, specially in Noakhali, Comilla and Hill Tipperah districts and also, in parts of Sylhet and Cachar. We believe the need for help to be immediate and acute. A fund has been started at the Presidency College with a view for doing something towards alleviating this distress. This fund will be managed by a College Committee consisting of members of the staff and past and present students. It is hoped that many old Presidency College men may be willing to support this college fund, and we venture to issue an appeal to them. Subscription may be sent to Dr. P. C. Ray, Treasurer, Chemical Laboratory, Presidency College.

H. R. James	President
D. N. Mallik	Vice-President
P. C. Ray	Treasurer
Harish Ch. Sinha Subhas Ch. Basu	Secretaries.

কমিটির দুজন সেক্রেটারির মধ্যে একজনের সুভাষচন্দ্র

বসুই ছিলেন কলেজের ছাত্র। বস্তুতঃ এই কমিটিতে তিনি ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের সকল ছাত্রদের একমাত্র প্রতিনিধি। অবশ্যযোগ্য এই যে, তিনি তখন তৃতীয় বর্ষের ছাত্র।

কলেজ ম্যাগাজিনের পরবর্তী সংখ্যায় (সেপ্টেম্বর, ১৯১৪) সম্পাদকীয় স্তম্ভে পূর্ববঙ্গের দুর্ভিক্ষ ও কলেজের দুর্ভিক্ষ কমিটি সম্পর্কে পুনরায় লেখা হয়। ঐ সংখ্যায় (১৪২-১৪৫ পৃঃ) The Presidency College Flood and Famine Relief Committee-র তরফ থেকে হরিশচন্দ্র সিংহ ও সুভাষচন্দ্র বসুর স্বাক্ষরিত একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। ঐ বিবৃতির সঙ্গে একটি পুরো list of subscriptions ছিল।

কলেজ ম্যাগাজিনের পরবর্তী সংখ্যায়ও (অক্টোবর, ১৯১৪) ভারতের ও বিশেষত বাংলার দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে লেখা হয়েছিল: India is having her share of misery, and if she has escaped some of the evil effects of war (তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলেছে), at least an equally dreaded calamity and one peculiar to herself, viz famine, has befallen her..... Nothing can be more pitiable than death from starvation. No effort, no sacrifice can be too great that is devoted to the prevention of this useless loss of human life. (পৃঃ ১১৫) লক্ষ্য করার বিষয় এই যে যেখানে বাংলা দেশের প্রধান সংবাদপত্রগুলিতে ও বহু জনসভায় দাবী করা হচ্ছিল যে দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে সরকার তাঁর কর্তব্য পালন করুন, বিশেষত যখন দুর্ভিক্ষ কর দেশবাসীর কাছ হতে নিয়মিত আদায় করা হয়ে থাকে তখন দুর্ভিক্ষ নিবারণের দায়িত্ব প্রধানত তাঁর। সরকারের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল এই যে সরকার কর্তব্য পালন করা দূরে থাকুক, দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে সংবাদ ও তথ্য চেপে যাবারই ব্যবস্থার চেষ্টা করছেন। সেক্ষেত্রে অধ্যাপক জেমস সাহেব তাঁর সম্পাদকীয় মন্তব্যের মারফৎ পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিতে থাকেন যে দুর্ভিক্ষ ত্রাণ করা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়, দেশবাসীর যুক্তহস্তে দানই দুর্ভিক্ষত্রাণের একমাত্র উপায়। সেপ্টেম্বর সংখ্যাতেই তিনি লিখেছিলেন: Gratuitous relief by the State on any large scale is likely to be abused and moreover it cannot be relied upon to reach those purdanshin women who are the worst sufferers. Thus everything points to this being an eminently suitable field for the exercise of well thought out charity. We are glad to note that a number of organizations are already at work. (পৃঃ ৮৮) পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে অধ্যাপক জেমস জনসাধারণের ত্যাগস্বীকার ও চাঁদা দানকেই দুর্ভিক্ষ ত্রাণের একমাত্র উপায় রূপে প্রচার করেছেন, সরকারের যে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র দায়িত্ব আছে বা সে দায়িত্ব পালনে সরকার গাফিলতি দেখিয়েছেন—সে সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ নীরব। প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাস-লেখকরা এই জেমস সাহেবকে খুবই মহৎ ব্যক্তি রূপে চিত্রিত করেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন ভারতে বৃটিশ রাজের একজন গোঁড়া সমর্থক ও সাধক।

প্রেসিডেন্সি কলেজ বন্যা ও দুর্ভিক্ষ ত্রাণ কমিটির পক্ষ হতে কমিটির তহবিলে চাঁদা দানের জন্য দ্বিতীয় একটি আবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন দুজন,—সুভাষচন্দ্র বসু ও হরিশচন্দ্র সিংহ। প্রশ্ন হতে পারে যে সুভাষচন্দ্র অধ্যাপক জেমসের সভাপতিত্বে পরিচালিত কমিটির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করলেন কেন, এবং তিনিই বা পুনঃপুনঃ চাঁদা দানের আবেদন প্রচারে উৎসাহিত হলেন কেন? তার

কারণ পরাপরি রাজনীতির আসরে তিনি তখন নামেননি, এবং রাজনীতির চেয়ে জনসেবার প্রতিই তাঁর তখনও আকর্ষণ বেশি। সরকারকে তাঁর যথাবিহিত কর্তব্য পালনে বাধ্য করার জন্য যে গণ-আন্দোলন প্রয়োজন সে আন্দোলন ১৯১৪ সালে গড়ে ওঠে নি,— সুভাষও তেমন কোনো আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। বরং কলেজের দুর্ভিক্ষ-ত্রাণ কমিটির মারফৎ দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবায় আত্মনিয়োগের যে অবকাশ স্বাভাবিকভাবেই মেলা সম্ভব, সুভাষচন্দ্র তা অবহেলাবশতঃ হারাতে রাজি হননি। বস্তুতঃ কলেজের এই দুর্ভিক্ষ ত্রাণ কমিটিটির তিনিই ছিলেন অন্তরালে অবস্থিত প্রকৃত সংগঠক। সেই সময়ে তাঁর এক বন্ধুকে লেখা একখানি পত্রে তিনি লিখেছিলেন: "College Famine Fund-এর Secretary করেছে। তার জন্য একটু খাটিতে হইবে। উপস্থিত আর কেহ নাই।" (পত্রাবলী.) বস্তুতঃ এমন কাজে খাটবার লোক কমই পাওয়া যায়, উদ্যোগী হয়ে দায়িত্ব বহনের লোক পাওয়া যায় আরও কম। প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসলেখকগণ সে-সময়কার যে ছাত্রদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন এই দুর্ভিক্ষ-ত্রাণ কমিটির কাজে তাঁদের কাউকেই পাওয়া যায়নি। তাঁরা তখন নিজেদের ভবিষ্যৎ চিন্তায় ব্যস্ত ছিলেন।

যে দ্বিতীয় আবেদন পত্রটির কথা পূর্বেই বলেছি সেটি এই: Distress continues to prevail in East Bengal... Meanwhile acute distress owing to famine resulting from drought has taken place in the District of Bankura. We have received first-hand reports of the magnitude and acuteness of the distress prevailing there from Mr. Mitchell, Principal, Wesleyan College, Bankura....To help us to continue relief operations at Bankura, which as up-to-date reports distinctly show, is still suffering and will continue to suffer greatly for some time, we are issuing a fresh appeal to our fellow-students, ex-students and well-wishers for more contributions. As times are going hard greater sacrifice than hitherto borne is required of us.

(P. C. Magazine, vol II, No 4 p 271)

এই সূত্রে দুর্ভিক্ষ ত্রাণ কমিটির আয়-ব্যয়ের একটি হিসাবও প্রকাশিত হয়েছিল। হিসাবটি এই:

প্রাপ্তি	টাকা আনা	ব্যয়	টাকা আনা পাই
হিন্দু স্কুল	১০৭—০	স্টেশনারি	১— ৫—৬
হেয়ার স্কুল	১০৭—০	ট্রাম-ভাড়া	১— ৩—০
প্রেসিডেন্সি		ছাপা খরচ	১০ — ৪ — ০
কলেজ স্টাফ	৩৮৯— ০	ডাক খরচ	৬—১১—০
প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ	৭০৭—১	শরিষল ত্রাণ কেন্দ্র (বাঙ্গণবেড়িয়া)	১৪৫০— ০—০
বর্তমান ছাত্রবৃন্দ	৫৮৯—৭	বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ ত্রাণ ফণ্ডে	২০০— ০
ওয়ার্ড ২ ই, হিন্দু হোস্টেল	১৮— ০		
৩ ,,	২৩— ০		
৪ ,, ,,	৫০— ০		
	১,৯৪৬ - ৮		১, ৯১৯—৭ - ৬

মোট আয়—১৯৪৬—৮—০

" ব্যয়—১৯১৯—৭—৬

মোট উদ্বৃত্ত ২৬৭—০—৬

পূর্বেই উল্লেখ করেছি এই বিবৃতি ও হিসাবের তালিকার শেষে নাম স্বাক্ষর করেছেন সুভাষচন্দ্র ও হরিপদ চক্রবর্তী। লক্ষণীয় বিষয় এই যে কলেজের প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ ছাড়াও

ছুটি স্কুল থেকেও চাঁদা পাওয়া গিয়েছিল। সংগঠকের কৃতিত্বেরই সেটা পরিচায়ক।

সেদিনের সেই দুর্ভিক্ষ ত্রাণ কমিটির সম্পাদক ও প্রধান সংগঠক সুভাষচন্দ্র দুর্গতপীড়িত মানুষের প্রত্যক্ষ সেবার জন্য দুর্ভিক্ষগ্রস্ত অঞ্চলগুলিতেও যেতে চেয়েছিলেন। শুধু চাঁদা তুলে পাঠানোতেই তাঁর মন তৃপ্তি পায়নি। পূর্বোদ্ধৃত পত্রে তিনি লিখেছিলেন: "ইচ্ছা আমি relief-এ যাই—তাহাতে practical experience হইবে। আর famine-এর experience সব সময় হয় না। emotionsএর দিক দিয়ে দেখিলে আমার যাবার ইচ্ছা—বেশ ইচ্ছা আছে।" (পত্রাবলী,।) কিন্তু নিজের ভবিষ্যতের আশঙ্কাকে এবার বাধ্য হয়েই তাঁকে সংযত করতে হয়েছিল—পূর্ববঙ্গ বা বাঁকুড়ার সে যাত্রায় তাঁর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। তার কারণ অনুমান করা দুঃসাধ্য নয় নানা রকম কাজে জড়াতে গেয়ে তাঁর কলেজের পাঠবিষয়ের লেখাপড়া খুবই খারাপ চলছিল ফলে আই. এ, পরীক্ষায় তাঁর ফল আশাতীত ভাবে মন্দ হয়েছিল। আই, এ, পরীক্ষার আগেই তিনি সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন এবং বাড়ি ফিরে এসে হন টাইফয়েড। এ ছাড়াও বহুতর কাজ ও অ্যাডভেঞ্চার তাঁর ছিল, যে কারণে পাঠবিষয়ে মনোযোগ দেবার সময় তাঁর ছিলনা। ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগেও এই দশা ই ঘটেছিল তাঁর, কিন্তু শুধু পূর্ব হতে ধারাবাহিক পড়াশোনা ভালো থাকায় পরীক্ষার ফল খারাপ হয়নি। ১৯১৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৯৩৭৭ জন, তার মধ্যে পাশ করেছিল ৬০৯৭ জন বা শতকরা ৬১·৫ জন। সুভাষ তন্মধ্যে দ্বিতীয় হন। ১৯১৫ সালে সুভাষ আই, এ, পরীক্ষা দেন। সে বছর আই. এ পরীক্ষায় প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের ফলাফল ঐ কলেজেরই পূর্ব পূর্ব বৎসরের ফলাফলের চেয়ে ভালো হয়। ১৯১৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের আই, এ ছাত্রদের পাশের হার ছিল শতকরা ৬৩·৬৩ জন, কিন্তু ১৯১৫ সালে পাশের হার হয় ৭৩·৩৩ জন। কলেজের অধ্যক্ষ তাই লিখেছিলেন: It is thus seen that in the I. A. results there has been substantial improvement (P. C. Mag, vol, II No I. p. I)। শুধু তাই নয়। প্রেসিডেন্সি কলেজেরই একজন ছাত্র, সুভাষচন্দ্রের সতীর্থ, শ্রীশচীশ চন্দ্র সেন আই, এ, পরীক্ষায় সেবার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হন। আই. এ পরীক্ষোত্তীর্ণ প্রথম দশ জনের মধ্যে ছজন হন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে, প্রথম পঞ্চাশজনের মধ্যে সাতজন এবং প্রথম ১০০ জনের মধ্যে ১৫ জনও ছিলেন ঐ কলেজের ছাত্র। সুভাষের নাম এঁদের মধ্যে ছিল না। তিনি শুধু প্রথম বিভাগে পাশ করেছিলেন মাত্র। হয়তো তাই তাঁর ভবের কিছুটা বিবেকের দংশন ছিল, এবং আই. এ, পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা বি, এ, পরীক্ষায় সাফল্যের দ্বারা ঢেকে দেবেন এ বাসনাও হয়তো তাঁর ছিল। বি, এ, ক্লাশে ভর্তি হবার আগেই জনৈক বন্ধুকে লেখা একখানি পত্রে তিনি লিখেছিলেন: "B. A. তে Philosophy Honours লইব এবং first হইব। এই রকম ইচ্ছা।" (পত্রাবলী. পৃ ৫০) কিন্তু একথাও সত্য যে কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ার সময় পরীক্ষার চিন্তা তাঁর মনে না আসারই কথা, কেননা পরীক্ষা তখনো বহু দূরে। তৃতীয় বর্ষের ক্লাশ তখন সবে শুরু হয়েছে, পূজার ছুটিও আসেনি। কিন্তু আই, এ, পরীক্ষার শোচনীয় ফল তার কিছুদিন মাত্র আগেই প্রকাশিত হয়েছে (জুন মাসে)—তাই সে বিষয়টি তখনো যদি তাঁর মনে দোলা দিতে থাকে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

তবে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত অঞ্চলগুলিতে নিজের যাবার ইচ্ছাকে তিনি যে কেন দমন করতে বাধ্য হয়েছিলেন তার আসল কারণ জানতে পারা যায় তাঁর পূর্বোদ্ধৃত পত্রখানিতেই। পত্রে তিনি লিখছেন: "যাবার ইচ্ছা—বেশ ইচ্ছা আছে—তবে reasoning এর দিক দিয়া ইচ্ছা নাই—(১) শরীর খারাপ

হইতে পারে, কারণ না খাটিয়া থাকিতে পারিব না। (২) College-এর Relief Committeeর কাজ বাদ পড়ে যায়। (৩) সেলে আমার বোধ হয় College Organisation থেকে যাওয়া ভাল—কারণ তাহাতে লিপ্ত হয়েছি।

ভাবিয়া উত্তর দিব বলেছি। খুব সম্ভব না-ই করিব। তোমার মত জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

তবে জগৎটাকে আসলভাবে দেখিবার খুব ইচ্ছা। ইচ্ছাটিকেও কিন্তু দমন করিতে হইবে।" (পত্রাবলী, পৃঃ ৪০)

এই পত্রে নিজের স্বভাব সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় আছে,—কার্যক্ষেত্রে গেলে, নীরব দর্শকরূপে সকল আপদ-বিপদ হতে আত্মরক্ষা করে বাবু সেজে যে তিনি বিরাজ করতে পারবেন না, তার এই স্বীকারোক্তি সত্যই বটে। শরীরের আশঙ্কা আছে, কেননা পূর্ববঙ্গে বন্যা ও দুর্ভিক্ষ যুগপৎ চলছিল—আর এরই আগের বৎসর টাইফয়েড রোগে তিনি ভুগেছিলেন, কিন্তু এসবের চেয়েও বড় কথা এই, কলেজ যে রিলিফ কমিটির তিনিই প্রধান সংগঠক, তার দায়িত্বও প্রধানত তাঁকেই বহন করতে হচ্ছে—সেই দায়িত্ব পরিহার করে আবেগের বশবর্তী হয়ে চলে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তদুপরি যে সংগঠনের তিনি নেতা, সেই সংগঠনের মর্যাদা রক্ষা বিষয়েও তিনি সচেতন। একটা সংগঠনের সেক্রেটারি থাকাকালে সেই সংগঠনের বদলে আর এক সংগঠনের যারফৎ যাওয়াকে তিনি নিজের সংগঠনের মর্যাদা হানিকর বলেই হয়তো ভেবেছিলেন।

স্বভাব-চরিত্রের অন্যান্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। কিন্তু সংগঠন বিষয়ে তাঁর দায়িত্ববোধ ও মর্যাদাবোধের এই যে পরিচয় আমরা পেলাম, তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মাবলীর প্রসঙ্গে এই বিষয়টি বিশেষ-ভাবে স্মরণীয়। স্বামী বিবেকানন্দ একবার দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন যে এদেশের স্বভাবে সংগঠন-চেতনা নেই, দেশকে Organisation কী করে পড়তে হয় তা নতুন করে শেখাতে হবে। তাঁর রামকৃষ্ণ মিশনরূপী সৌধমূর্ত সংগঠনটি সৃষ্টির মূলে সেও একটা কারণ। স্বামিজীর এই শিক্ষাটি সুভাষ অতি অল্প বয়সেই আয়ত্ত করেছিলেন। আমরা এতদূর পর্যন্ত আলোচনায় সুভাষ-চরিত্রের যে পরিচয় এখন করছি তা তাঁর ভাবসত্তার দিক, কিন্তু সংগঠক রূপেও তাঁর চরিত্রবৈশিষ্ট্য আমাদের জানা দরকার। ভাবকে রূপ দিতেই যেন তাঁর আগমন—অন্তত সে-ই তাঁর জীবনের সঙ্কল্প বলে মনে হয়। ভারতবর্ষকে ও জগৎকে নতুন ভাব দিয়েছিলেন বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে তাই ছিল তাঁর কাজ। কেননা রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, নরেন লোকশিক্ষা দেবে জগৎকে নতুন ভাব ও আদর্শদেবে কিন্তু সেই ভাব ও আদর্শকে যদি জগতের বুকে স্থূল অবয়ব দান করতে হয়, রূপায়িত করতে হয়—তবে চাই আরেক জন দ্বিতীয় পুরুষ, যিনি অন্তরে ভাবকে ধারণ করবেন বটে, কিন্তু বাইরে কঠিন কর্ম ও সংগ্রামের ভিতর দিয়ে সেই ভাব ও আদর্শকে বাস্তবায়িত করাই হবে যাঁর মুখ্য কাজ। সুভাষ সেই দ্বিতীয়।—বিবেকানন্দেরই যেন দ্বিতীয় বা পরিপূরক সত্তা তিনি। তাঁর সেই কারণেই বিবেকানন্দ নিজের সম্পর্কে যেমন বলেছিলেন যে তিনি এক অশরীরী বাণী,—সুভাষচন্দ্রকেও আমরা বলতে পারি যে তিনি সেই বাণীর প্রয়োগবিৎ। বিবেকানন্দ যদি মন্ত্রদ্রষ্টা, তবে সুভাষ স্থূল বাস্তবজগতের পটভূমিতে সেই মন্ত্রের রূপদাতা সংগঠক। তাঁর এই সংগঠনী প্রতিভা ও প্রেরণার কথা তাঁর চরিত্র-বিশ্লেষণ কালে মনে রাখতেই হবে।

(ক্রমশঃ)

স্মৃতির খেলা — গৌরাঙ্গ ভৌমিক

দূরের স্মৃতিকে নিয়ে ছায়া ছায়া খেলা
তাই নিয়ে কাটে সারা বেলা।

নক্ষত্রের মসিন নিঃশ্বাস
প্রাণপণে খুঁজে ফেরে পুরণো আকাশ,
বুঁইয়ের সকাল থেকে আহরিত রোদ্দুরের ঘ্রাণ –
স্মৃতিদের বুড়ি-ছোঁয়া প্রাণের আজান।
ঘরের সঙ্কীর্ণ ব্রত, সমুদ্রের বিশাল জানায়ে
প্রসারিত, দূরান্তের হাওয়া ছুঁয়ে যায়।

কেবল একটি মুখ, অপহৃতা পূর্বাহ্নের ঘরে।
একটি নারীর ছবি সিঁড়ির আঁধারে
কখন মিলিয়ে গেলো। আজ তাও আরশি
অসম্মত ফিরে দিতে পুরাতন তার স্মিত হাসি।
ভাঙা ছবি, ভাঙা মুখ, স্পষ্ট ব্যর্থতা
তাই নিয়ে জেগে নম্র ব্যাকুলতা।

অন্তরা এমন দিনে, ক্ষুব্ধ দূরে সমুদ্রের হাওয়া
কোনোদিন করে নাই এতো আসা-যাওয়া।

স্মৃতির শোভা যাত্রা — বিজয় কুমার দত্ত

মধ্য রাতে ঘুম ভাঙে, সুপ্তিলীন অন্ধকার ঘরে
জানলার বাইরে স্থির চিহ্নিত সংসার
সহসা ছবির মত জেগে ওঠে দু'চোখে আমার :
পঞ্চাশপঞ্চাশের কুহকিনী বহুময় ঘরে
কে যেন অদৃশ্য হাত রেখে নিয়ে যেতে চায়
স্মরণের যাদুঘরে, পাথরের সমারোহে নানামূর্তি মণির সজ্জায়
কিংবা আরো আগেকার ঘটনা সংঘাতে—
মনে হয় ভালভঙ্গ সময়ের দ্রুত পদপাতে
এই সব ঘর বাড়ী, শহর মানুষ জন ঘন লোকালয়
মুহূর্তের পরিণতি। শুধু তার অনিবার্য ক্ষয়
হিসেবী চোখের সামনে জাগেনা তেমন,
রোজ রাত্রে ঘুম ভেঙে মনে পড়ে, কতটুকু ছোট এ জীবন।

সমস্ত চিন্তার পারে — চিরভানু

সমস্ত চিন্তার পারে তোমার চিন্তার অবসর ?
সে তো সহজ নয়। সব চিন্তা ঘোরে পরিধিতে
ছোট বড় নানা বৃত্ত র'চে, প্রাণের সহন কেন্দ্রে
তোমার চিন্তার স্বর্গলোক। শান্তিভরা সে-নিভৃতে
সর্ব্বচিন্ত ফিরে ফিরে আসে বারংবার আনন্দের
আবাহন গেতে—গানের ঘুমার মতো সেখানেই
প্রাণের আশ্রয়। তানের বিস্তার শেষে সমের
আশ্লেষে সুর আপনারে ফিরে পায় গভীর আশ্বাসে
যে-আগ্রহে, সেই মতো গাঢ় গূঢ় ধ্রুব সুনিবিড়
অভিষর্ষ তোমার চিন্তার কেন্দ্রনীড়ে। আর সব
চিন্তাজাল উত্তাপে প্রদাহে ভরা তৃষ্ণা বৈশাখের ;
মুক্তি তার আনন্দবর্ষণে আষাঢ়ের অভিষেকে,
তোমার চিন্তার ধারাজলে। তখন এ-আকাশের
চোখের পল্লব মুদে আসে সুখে, দৃষ্টি মুছে যায়।

আমদানী — দুর্গাদাস সরকার

যেহেতু এমন শব্দ কোনোদিন শোনেনি কৃষাণী:
এ গাঁয়ে নোতুন আমদানী
জীপগাড়ি—আবাদের নামে সব চাষীর দুয়ারে।
পেট্রলের গন্ধ শুঁকে ধনে পাতা কাঁদে।

যেহেতু এমন ঘ্রাণ কোনোদিন পায়নি কৃষাণী:
হাওয়ায় নোতুন হাতছানি
মাঠের তামাকে নয়, হাভানার চুরুটের আগে।
কে এসে দাঁড়ালো আজ নিজের সম্মানে !
যেহেতু এমন দৃশ্য কোনোদিন দেখেনি কৃষাণী:
প্যাকেটের শুঁড়ো ধাড়, শাদা প্যান্টে নোতুন দোকানী।
হাঁটু উঁচু জুতো আর কাদার সতর্কে, দেখে, হাঁটা
কৃষাণী নিজের কাছে ঘোরালো ঘাবাটা।

জন্ম দিনের নিমন্ত্রণ — শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আজকে আমার জন্মদিনের নিমন্ত্রণে
নেবে তোমার আসতে হবেই অনায়াসে।
বলতে হবে শুধাব যদি স্বজন-লোকে
কেন আমার দুঃখে-শোকে
তোমার সমান কষ্ট ঢাকা রয় গোপনে ?

তুমি তো নও চাঁদের কাছে অল্প দামি
তবু তোমায় চাইবো আমি
হয়তো রবে
আয়োজনের দেশে—আমার অনুভবে
একান্ত বাসনার মতন দিবসযামী
তবু তোমায় চাইবো আমি
আজকে আমার জন্মদিনের নিমন্ত্রণে
নেবে তোমার আসতে হবেই অনায়াসে।
বলতে হবে শুধাব যদি স্বজন-লোকে
কেন আমার দুঃখে-শোকে
তোমার সমান কষ্ট ঢাকা রয় গোপনে ?

কূল ছেড়ে আমি অকূলে — শক্তি চট্টোপাধ্যায়

কূল ছেড়ে আমি অকূলে গিয়েছি ভেসে
তুমি সাথে আছো তাই এ-নির্বাসনে
স্মরণ আমার ভালো লাগে, লাগে ভালো
চোখোচোখি কনফরাসের আলো।

কূলে বহুকাল ছিলাম নিভৃত ঘরে
তাই কি আমার অকূলকে মনে পড়ে
ভেলা ভাসিয়েই মনে হলো শুধু কূল
ভালোবাসি, তাই বারবারই করি ভুল।

নদী ফিরেই যাও — শক্তি চট্টোপাধ্যায়

একেক দিন আমি খেলার ছলে গিয়ে বলেছি, তুমি নদী
ফিরেই যাও যদি
যেয়ো না ভালোবাসা, ফেরো না গান
ফিরেই যাও তুমি সড়ক-সাঁকো ধরে বর্ধমান।

একেক দিন আমি পাহাড়ে পথ করে গিয়েছি এঁকেবেঁকে
ধুলোর ঝড় থেকে দুহাতে মুখ ঢেকে
মনপ্রাণ
রেখেছি কতো কাঁচা আমার শুধু বাঁচা, বাঁচানো ভাণ
একেক দিন ভুলে পাহাড়-নদী তাকে করেছি দান।

কোথাও নক্ষত্র নেই — হেনা হালদার

কোথাও নক্ষত্র নেই। সুসজ্জিত উষ্ণ বসবাস :
রঙীন পোস্টার লগ্ন নরনারী চুম্বনে নিবিড়,
লোপ্রাণোর বেজে ওঠা বৈদেশিক সোনাটার বীজ
অসতর্কে ঢোকা প্রায় নিষিদ্ধ কক্ষের বন্ধদ্বারে।
রক্তের লোহাতে ঝড় : দিকচিহ্নহীন অন্ধকারে
ডুবে গিয়ে ধ্রুব তারা খুঁজে খুঁজে হারাই ঠিকানা।

কোথাও নক্ষত্র নেই। নিঝুমের সুপ্তিত নিশীথে :
পথচারী পথিকের লোলুপ দৃষ্টির বেয়নেটে
টপলেস নায়িকারা বিদ্ধ হয়ে হাসে অকপটে
টুইস্টের ঘূর্ণাবর্তে। নক্ষত্রের আকাশ চুম্বিনী
আলোর অরণ্য কই ? বেথলেম—অযোধ্যা-সুষিনী
সমস্ত কুয়াশাচ্ছন্ন। তারাহীন কী গ্রীষ্মে, কী শীতে।

হেগেলীয় দর্শন

অনিল রায়

প্রত্যেকটি বস্তুই জগতে স্ববিরোধের (self-contradiction) দ্বারা বিধৃত. একথা কোন রকমেই ধোপে টেকে না। হেগেল কেবল এসম্বন্ধে প্রচুর ভাবণই করেছেন কিন্তু একে প্রমাণ করেন নি। একটা লুপ্তোপমার (metaphor) মোহ তাঁকে পেয়ে বসেছিলো। তারই ফলে যা' কল্পনা-জগতে চলতেও বা পারে, তাকে লজিক ও বাস্তবের জগতে জোর করে টেনে এনেছেন সর্বত্র। একটা কাল্পনিক লুপ্তোপমা দিয়ে কখনো কোনো বিষয় বোঝাবার সাহায্য হতে পারে। কিন্তু তাই বলে লুপ্তোপমা (metaphor) চুল-চেরা যুক্তির বাজারে সচল থাকবে, একথা হেগেল তাঁর মানসিক আতিশয্যের (mental excess) ফলেই ভাবতে পেরেছিলেন।

ক্রোচেও একথা বলে আমাদের সাবধান করেছেন যে, লুপ্তোপমা যেন আমাদের বিপথে চালিত না করে।*

সকল বস্তুরই অন্তরে বিরোধী শক্তি (contradiction) বাসা বেঁধে রয়েছে, একথা ঠিক নয়। বীজ থেকে যখন চারা গাছ বেরিয়ে আসে, তখন বীজের অথবা বীজের প্রতিষ্ঠিতি বা বিরুদ্ধ শক্তি (antithesis) হিসেবে চারাগাছ ছিল একথা নিতান্ত অসত্য ও অর্থহীন। শিল্প থেকে মানব-মন দর্শনে উত্তীর্ণ হয় হেগেলের মতে। কিন্তু তাই বলে শিল্পের বুকের ভিতরে শিল্পের বিরোধী শক্তি (contradiction) রয়েছে, একথা কে স্বীকার করবে! ক্রোচে তাই বলেছেন : যে ভিত্তী অতিক্রম করা গেল, তার অন্তরে তারই বিরোধী শক্তির (antithesis) উদ্ভব হয় না। দর্শন যেমন দর্শন হিসেবে স্ব-বিরোধী হয় না, তেমনি শিল্প ও শিল্পরূপে নিজের বিরোধিতা করে না।*

এপর্যন্ত যে আলোচনা হয়েছে তাতে দেখা গেল, হেগেল যে অর্থে বিপরীতের পরস্পর অনুস্যূতির (Interpenetration of opposites) কল্পনা করেছেন সে অর্থে জগতের বস্তুগুলো স্ববিরোধী নয়। হেগেল আকারিক যুক্তিবিদ্যার (Formal Logic) মূলনীতিগুলোর উপর আক্রমণ করে তাঁর এই বিরোধ-নীতিকে (contradiction) প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি অভেদকে (Identity) বলতে চেয়েছেন বিরুদ্ধতা (contradiction) এবং বিরুদ্ধতাকে (contradiction) দেখাতে চেয়েছেন অভেদ

* "... Only we must not allow ourselves to be misled by a metaphor." (Ch IV)

* "...the antithesis does not arise in the bosom of the degree that has been surpassed. As philosophy does not contradict itself as philosophy, so art does not contradict itself as art." (Ch. IV)

(Identity) হিসেবে। তাঁর দর্শনের মূল ভিত্তিই হল এই তত্ত্ব ৫৫

অভেদ-নীতি (Law of Identity) ও বিরোধ-নীতির (Law of Contradiction) প্রতি হেগেল তীব্র বিদ্রূপ ও আক্রমণ করেছেন সর্বত্র। অথচ কোথাও এমন যুক্তি বা দৃষ্টান্ত দেননি যাতে করে অভেদ-নীতি (Law of Identity) খণ্ডিত হতে পারে। তাঁর সকল যুক্তি ও দৃষ্টান্ত তাঁর সুযোপমা (metaphor) প্রীতির ফলে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সে সবগুলোই তাঁর এই সোপমোপের সৃষ্টি। লজিকের এই নীতিগুলো না স্বীকার করলে কোন চিন্তা বা মনন সম্ভব হয় না। হেগেলের বাগ্‌বিস্তার যে নিরর্থক ও নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র একথা হেগেল-ভক্ত Mc Taggart-ও বুঝতে পেরে হেগেলকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, হেগেল প্রকৃতপক্ষে লজিকের নীতিগুলোকে অস্বীকার করেননি। কারণ, ঐ নীতিগুলোকে উড়িয়ে দিলে মানুষের সকল মনন ও চিন্তাজগতের সকল প্রচেষ্টাকেই উড়িয়ে দিতে হবে। ওগুলো হচ্ছে চিন্তা ও মননের মৌলিক সূত্র। বিরোধ (contradition) সম্বন্ধে Mc Taggart বলতে চান যে হেগেল বিরোধ-নীতিকে (Law of Contradiction) লঙ্ঘন এবং অস্বীকার করেননি। হেগেল বরং বিরোধকে (Contradiction) বর্জন করতেই উপদেশ দিয়েছেন, কারণ যেখানে পরস্পর বিরোধ (contradiction) অতিক্রান্ত হয়ে বৃহত্তর সত্যে (synthesis) না উত্তীর্ণ হয়, সেখানে ভ্রমের (Error) সূচনা অবশ্যই হয়ে থাকে। হেগেলের আপত্তি বরাবরই অমীমাংসিত বিরোধের (unresolved contradiction) বিরুদ্ধে। পরস্পরবিরোধী দুটো উক্তি মিথ্যা বলেই হেগেল বৃহত্তর সমন্বয় বা সংশ্লিষ্টির (Synthesis) ওপরে এত জোর দিয়েছেন। সংশ্লিষ্টিকে (Synthesis) ওদের বিরোধ ছাড়া হয় বলেই স্থিতি (Thesis) ও প্রতিস্থিতির (antithesis) বিরোধ তেমন মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে না। সংশ্লিষ্টিই (Synthesis) সত্য ; প্রতিস্থিতি (anti-thesis) ও স্থিতির (thesis) বিরোধ সত্য নয় বরং অসত্য, যদি এদেরকে আলাদা করে দেখা যায়।

৫৫ "The principle of the contradictorinees of identity & the identity of contradiction is the essence of the Hegelian system." (James, Pp. 277)

। "It is sometimes supposed that the Hegelian logic rests on a defiance of the law of contradiction. That law says that whatever is A can never at the same time be Not-A but the Dialectic asserts that, when A is any category, except the Absolute Idea, whatever is A may and indeed must be, Not-A also.

Now if the law of contradiction is rejected, argument becomes impossible,... But if we are to regard the simultaneous assertion of two contradictories, not as a mask of error, but as an indication of truth, we shall find it impossible to disprove any proposition at all. Nothing however can ever claim to be considered as true, which could never be refuted, even if it were false.

And indeed it is impossible, so Hegel himself has pointed out to us, even to assert anything without involving the law of contradiction for every positive assertion has meaning only in so far as it is defined & therefore negative. If the statement "all men are mortal" for example, did not exclude the statement "some men are immortal," it would be meaningless. And it only excludes it by virtue of the law of contradiction. *If then the dialectic rejected the law of contradic-*

ম্যাক টাগার্ট (Mc. Taggart) এই রকমের ব্যাখ্যা করে হেগেল যে আকারিক ন্যায়ের (Formal logic) নীতিগুলোকে কখনো অস্বীকার করেননি তা দেখাতে চেয়েছেন। হেগেলের উক্তি : বিরোধ কোনো বিষয় বা বস্তুর শেষ কথা নয়, সে নিজেকে নিজেই খণ্ডন করে।*

তাঁর মতে হেগেল যেহেতু বিরোধকে (contradiction) অতিক্রম করে সংশ্লিষ্টিতে (synthesis) যেতে বলেছেন সর্বদাই, সেই হেতু বিরোধকে (contradiction) প্রকারান্তরে হেগেল মিথ্যাই বলেছেন, এমন কি ম্যাক টাগার্ট-এর মতে : ডায়লেকটিক বিরোধকে অস্বীকার না করে তাকেই ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে।**

কাজেই আকারিক ন্যায়ের (Formal Logic) মৌলিক নীতিকে অস্বীকার করা তো দূরের কথা, হেগেল তাদের ওপরেই নির্ভর গড়েছেন। কারণ, তা না হ'লে হেগেল অসীমাংসিত বিরোধকে (unreconciled contradiction) ছাড়িয়ে যেতে বলছেন কেন?‡

এমনি করে ম্যাকটাগার্ট হেগেলকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এ চেষ্টা নিতান্ত নিরর্থক ও হাস্যকর। কারণ হেগেলের বিরোধ (contradiction) সম্বন্ধে মতামত ও উক্তি অতি স্পষ্ট এবং সেখানে সন্দেহের অবকাশ কোথাও নেই। অভেদ-নীতির (Law of Identity) ওপর হেগেলের আক্রমণ অবিসম্বাদিত এবং একই কালে সকল বস্তুই স্ব-বিরোধী (self-contradictory) একথা নিঃসংশয় ভাষায় তিনি সগৌরবে প্রকাশ করেছেন। তাঁর ডায়ালেকটিক লজিকের মূলই ধ্বসে যায়, যদি তাকে আকারিক যুক্তিবিদ্যার (Formal Logic) মৌলিক নীতির সমর্থক করে দাঁড় করানো হয়। "Everything is opposite" (Logic, P.223), সকল সত্তাই "a concrete unity of opposed Determinations" (P 100, Logic) ইত্যাদি কথার মানে অতি নিশ্চিত। তাছাড়া হেগেলের অভেদ নীতি (Law of Identity) সম্বন্ধে তীব্র আলোচনা ম্যাক টাগার্ট-এর ব্যাখ্যাকে মিথ্যা প্রমাণ করছে। আরো কথা আছে। বিরোধকে (contradiction) ছাড়িয়ে যেতে বলেছেন হেগেল। এ থেকে প্রমাণ হয় না যে হেগেল বিরোধকে মিথ্যা মনে করেন। হেগেল স্বীকার করেছেন যে মানুষের মধ্যে রয়েছে উচ্চতর এষণা ("loftier Craving) (Logic, Hegel, p 18—Art II) যা তাকে স্ব-বিরোধিতায় (self-contradiction) তৃপ্ত হতে দিচ্ছে না। যেখানে আত্ম-বিরোধ (self-inconsistency or self-contradiction) রয়েছে সেখানে সত্যের অধিবাস থাকতে পারে না; সেখানে অসত্যের রাজত্ব। চিন্তা বা মননই মানুষের বিশেষত্ব। সত্যকে পাবার প্রধান সহায় হচ্ছে

---

tion it would reduce itself to an absurdity, by rendering all argument and even all assertion, meaningless." (McTaggart, Art 8)

* Contradicton is not the end of the matter but cancels itself (Hegel : Logic : Sec 119) এই উক্তিতে উদ্ধৃত করে এর জোরে ম্যাক টাগার্ট বলেছেন :

"The Dialectic however does not reject that law. An unresolved cantradiction is, for Hegel, as for everyone else, sign of error." (Art 8, Mc Taggart)

** "In fact, so far is the Dialectic from denying the law of contradiction, that it is especially based on it." (Art. 8, Mc Taggart)

‡ "But why should we not find an unreconciled contradiction & acquiesce in it without going further, except for the law that two cotradictory propositions about the same subject are a sign of error?" (Mc Taggart, Art. 8)

মানুষের মনন-শক্তি। মানুষের মননশক্তি কখনো আত্ম-বিরোধকে (self-inconsistency) সহ্য করতে পারে না। কারণ, বিরোধ বা অসঙ্গতি (Inconsistency) মানুষের চিন্তাকে বিকল করে, ব্যর্থ করে। তাতে মননক্রিয়া অসম্ভব হয়, তাই মানুষ অসঙ্গতিকে (Inconsistency) মিথ্যা বা Error বলে চিরকাল বর্জন করে এসেছে। হেগেলও এই তত্ত্বকে স্বীকার করেন এবং একেই উচ্চতর এষণা ("loftier Craving)" বলে সম্মানিত করেছেন। এ তত্ত্বকে আমরাও স্বীকার করে থাকি। এবং আকারিক যুক্তিবিদ্যাও (Formal Logic) এই তত্ত্বকেই সূত্রাকারে বিধিবদ্ধ করেছে।

কিন্তু অসঙ্গতি বা বিরোধ (Inconsistency) মিথ্যা এবং তাকে বর্জন করাই-সত্যানুসন্ধিৎসার পথ। একথা এক বস্তু, আর অসঙ্গতিই জগতের সকল বস্তুর গোড়ার কথা এবং সকল বস্তু বা সত্তাই হলো অসঙ্গতিময় (Inconsistent) এ বস্তু হলো একেবারে আলাদা ও বিপরীত কথা। পূর্বোক্তার কথাটি সর্ববীকার্য। কিন্তু আগেকার তত্ত্ব থেকে পরের তত্ত্বটিতে উত্তীর্ণ হওয়া একেবারে অযৌক্তিক। হেগেল তাই করেছেন। হেগেলের মতে জগতের সকল বস্তুই স্ব-বিরোধী (self-contradictory) একথা প্রমাণিত হয় নি। ম্যাক টাগার্ট দেখাতে চেয়েছেন, যেহেতু হেগেল অসঙ্গতিকে (Inconsistency) বর্জন করতে বলেছেন সেই হেতু তিনি অভেদ-নীতিকেও (Law of Identity) মানেন। কিন্তু হেগেল যে বিরোধকে (Inconsistency) idolise করে জগতের সকল তত্ত্ব ও বস্তুর মৌলিক ভিত্তি বলে নির্ধারণ করেছেন, সে কথাটি ম্যাক টাগার্ট বাদ দিয়ে ও এড়িয়ে গেছেন। আমাদের মতে হেগেল অভেদ-নীতি (Law of Identity) মানেন নি বলেই বিরোধের (contradiction) এত প্রাবল্য ও প্রাকর্ষ্য দেখিয়েছেন ছত্রে ছত্রে এবং ম্যাক টাগার্ট-এর শত চেষ্টা সত্ত্বেও হেগেলীয় ডায়ালেকটিক নীতির বাঁচবার পথ নেই।

ক্রোচেও যেন এই ব্যাপারে হেগেলকে বাঁচাবার একটু ক্ষীণ চেষ্টা করেছেন। ক্রোচের মতে কোন দার্শনিক অভেদ-নীতিকে (Law of Identity) অস্বীকার করতে পারেন, এ একেবারে অসম্ভব। কারণ তাহলে তো চিন্তা করাই চলবে না। কোনরকম মনন ক্রিয়া করতে হলেই তো অভেদ-নীতিকে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে হবে। তাই ক্রোচে বলেছেন : যদি সব বস্তু একই সঙ্গে পরস্পর বিরুদ্ধ আখ্যায় আখ্যাত হতে পারে ; যদি প্রত্যেক বস্তু একই কালে তৎ-স্বরূপ ও অতৎ-স্বরূপ (itself ও not-itself) হতে পারে, তবে হেগেলীয় তত্ত্বও তো একই সঙ্গে "সত্য" ও "অসত্য" দুই হতে পারে :* কিন্তু এতে তো হেগেলীয় লজিকই অসত্য হয়ে দাঁড়ায় এবং এতে কোনো তথ্যই নির্ধারিত হতে পারে না। কাজেই ক্রোচের মতে হেগেল এমন অসম্ভব ভুল করতে পারেন না। অথচ ক্রোচে এর আগে নিজেই হেগেলের এর চেয়েও আরো গর্হিত ও আরো অসম্ভব ভুল আড়াল দিয়ে ঢেকিয়ে দিয়েছেন। হেগেলের স্বতঃ ('Dis inct') ও বিপরীত (opposite) নিয়ে গণ্ডগোল করার কথা ক্রোচে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন এবং তার প্রতিবাদ করেছেন।

যাহোক, আমরা হেগেলের কথায় ও আলোচনায় সর্বত্রই দেখতে পাচ্ছি যে, হেগেল অভেদ-নীতিকে (Law of Identity) বরাবর অস্বীকার ও আক্রমণ করে চলেছেন। অবশ্য যদি হেগেল সত্যি সত্যি অভেদ-নীতিকে অস্বীকার না করে থাকেন তবে আমরা সুখীই হব। কিন্তু তা হলে হেগেলীয় বিরোধ-তত্ত্বের (contradiction) ব্যাখ্যা কী রকম হবে? তা হলে হেগেলীয় ডায়লেকটিকের বিশেষত্ব কিছু অবশিষ্ট

* Hegel does not deny the principle of identity, for other-wise he would have been obliged to admit that his logical theory was at once true & not true……"

থাকবে কি ? আমাদের মতে, থাকবে না। তা'হলে হেগেলীয় ডায়লেকটিক হ'য়ে দাঁড়াবে সাধারণ আপেক্ষিকতা (Relativity) মাত্র এবং হেগেল যে Negation-কেন্দ্রিক বিশেষ ধরণের আপেক্ষিকতা (Relativity) জগতে প্রচার করেছেন, তার ভিত্তি ধ্বংস হয়ে যাবে।

সকল সম্বন্ধই অসৎ ("All determination is negation") একথার মানে কি ? অথচ, হেগেল একেই তাঁর লজিকের মূল সূত্র বলেছেন। এই সূত্রকে গ্রহণ করা মানেই অভেদ-নীতিকে (Law of Identity) অস্বীকার করা। উইলিয়ম জেমস্ হেগেলীয় অভেদ-নীতিকে (contradiction) এই ভাবেই বুঝেছেন। খণ্ডন (negation) মানে হেগেলের মতে আত্ম-খণ্ডন (self-negation or self-contradiction) এবং এই মানে ধরলে তবেই হেগেলীয় ডায়লেকটিকের অর্থসঙ্গতি পাওয়া যায়। ধরা যাক এক গ্লাস দুধ সামনে রয়েছে। এর সঠিক বর্ণনা করতে হলে আমরা বলব,—"এ হচ্ছে এই গ্লাস দুধ। এটা অস্তিমূলক বা affirmative রূপে প্রকাশ করলাম। এই একই অর্থের বক্তব্য অন্যভাবে অর্থাৎ নাস্তিমূলক বা negative ভঙ্গীতেও বলা চলে : যেমন, "এ অন্যান্য গ্লাস দুধ নয়।" দুটী উক্তিই একটি বিশেষ গ্লাস সম্বন্ধে বলা হয়েছে। কাজেই দুটী উক্তিরই subject বা "উদ্দেশ্য" একই। কেবল predicate বা "বিধেয়" দুটো বাক্যে আলাদা আলাদা। এখানে বাস্তবিক কোন contradiction বা বিরোধ নেই। কিন্তু হেগেল অভেদনীতি (Law of Identity) মানেন না। তিনি বলবেন : "এটি এই গ্লাস বটেও এবং বটেও না।" (It is this glass and not this glass at the same time)। যে কোন উক্তি বা বাচন (Determination) যদি একই কালে বিরুদ্ধ বাচনও (negation) হতে পারে, তবে অভেদ-নীতির (Law of Identity) অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হয়ে যায়. একথা কে অস্বীকার করবে ! কাজেই সকল সম্বন্ধ অসৎও বটে "all determination is negation" এই নীতিকে বরণ করলে অভেদ-নীতিকে (Law of Identity) স্বীকার করা চলে না।

উইলিয়ম জেমস্ বলছেন* : সকল সম্বন্ধ অসৎও বটে,

---

* "The use of the maxim 'All determination is negation' is the fullest and most full-blown application of the method of refusing to distinguish....

The word 'negation' taken simpliciter, is treated as if it covered an indefinite number of secundums, culminating in the very popular one of self-negation, whence finally the conclusion is drawn that assertions are universally self-contradictory.....

When I measure out a pint, say of milk, and so determine it, what do I do ? I virtually make two assertions regarding it, (i) 'it' 'is' this pint ; (ii) it is not those other gallons. One of these is an affirmation, the other a negation. Both have a common subject, but the predicates being mutually exclusive, the two assertions lie beside each other in endless peace.

I may with propriety be said to make assertions more remote still,—assertions of which those other gallons are the subject. As it is not they, so are they not the pint which it is. The determination 'this is the pint' carries with it the negation—"those are not the pints". Here we have the same predicate but the subjects are exclusive of each other, so there is again endless peace.

In both these couples of propositions, negation and affirmation are secundum aliud : "this is a", "this is not not-a."

এই নীতি, প্রভেদ অস্বীকার করবার পদ্ধতির পূর্ণতম প্রয়োগ।

উল্লিখিত দৃষ্টিতে বিরোধ (Contradiction) আছে—কিন্তু সে বিরোধিতা অবিরোধ নয়। সে বিরোধিতা ভিন্ন ভিন্ন স্থিতিভূমি থেকে, ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে দেখলে বিরোধ (contradiction) বলে প্রতিভাত হবে। একই অর্থে ও দৃষ্টিতে বিরোধ নেই এখানে। উইলিয়ম জেম্‌স্‌ও আমাদের মতকেই সমর্থন করবেন এ-সম্বন্ধে। হেগেলের ডায়লেকটিক লজিকের অভেদ-নীতিকে (Identity) অস্বীকার করছে এবং অভেদ-নীতি-সম্ভূত যে বিরোধ সে বিরোধ হেগেলের অবিরোধ নয়।

তারপর পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বিরোধ (Contradiction বা negation) অব্যাহত রয়েছে, একথা হেগেলীয় লজিকের চরম কথা। সকল বাচনই বিরোধাত্মক ('All determination is negation') একথা লজিক স্বীকার করবেনা কখনো, কারণ এ নীতি অভেদ-নীতির (Identity) বাধক। কোন কোন বাচন (determination) জগতে নাস্তিমূলক, একথা স্বীকার্য্য। কিন্তু জগতের সকল বাচন (determination) সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র নাস্তিসূচক, একথা অযৌক্তিক ও অবাস্তব দুই-ই। আগেও আমরা দেখিয়েছি যে জগতে দু' রকমের পদার্থ (category) আছে; একটি বিরোধ বা খণ্ডন (negation) এবং দ্বিতীয়টি প্রভেদ (Distinction) এবং এদের দুইয়ের মধ্যে হেগেল আগাগোড়াই গণ্ডগোল করেছেন। সকল বাচনই বিরোধাত্মক ("All determination is negation"—এখানেও সেই একই অর্থবিভ্রাট ঘটেছে হেগেলের দিক থেকে। যখন বলছি 'This pint of milk.'' তখন হেগেল এখানে বিষম বিরোধ দেখবেন। তাঁর মতে এই বিশেষ পাঁইট (pint) জগতের অন্যসকল পাঁইটকে (pint) বিরোধিতা (negate) করছে। কিন্তু আমরা বলব এখানে negation বা হেগেলীয় বিরুদ্ধতা নেই। এখানে পৃথকত্ব বা distinctness আছে, কারণ এই বিশেষ পাঁইট (pint) জগতের সব পাঁইট থেকে distinct বা পৃথক বা other কিন্তু হেগেল বলবেন, এই পাঁইট (pint) অন্যান্য পাঁইট (pint)কে বিরোধিতা তথা খণ্ডন (contradict, তথা, negate) করছে। এই বিরোধ (Negation) বাস্তব জগতে সত্যি সত্যি কোথাও নেই। জেম্‌স্‌ বলেছেন, কাল্পনিক জগতের সঙ্গে বিরোধ ঘটতে পারে, কিন্তু বাস্তব জগতে যে সব বস্তু পাশাপাশি রয়েছে, তারা যে সবাই সবাইকে বিরোধিতা (negate) করছে, একথা একেবারে আজগুবি মিথ্যা। উপরোক্ত পাঁইট (pint) সম্বন্ধে জেম্‌স্‌ বলছেন :

'Assuredly if you had been hearing of a land flowing with milk and honey, and had gone there with unlimited expectations of the rivers the milk would fill; and if you found there was but this single pint in the whole country, —the determination of the pint would exclude another determination which your mind had previously made of the milk. There would be a real conflict in the victory of one side. The rivers would be negated by the single pint being affirmed; and as rivers and pint are affirmed of the same milk (first as supposed

---

This kind of negation involved in determination cannot possibly be what Hegel wants for his purposes. The table is not the chair, the fireplace is not the cup-board—these are literal expressions of the law of identity & contradiction, those principles of the abstracting & separating understanding for which Hegel has so sovereign a contempt, and which his logic is meant to supersede." (Ibid, W. James.)

and then as found) the contradiction would be complete.

But it is a contradiction that can never, by any chance, occur in real nature or being. It can only occur between a false representation of a being and the true idea of the being when actually cognised. The first got into a place where it had no rights, and had to be ousted. But in rerum naturalibus do not get into one another's logical places." (Pp. 287-8)

একগ্লাস জল অন্য এক গ্লাস জলকে খণ্ডন (negate) করছেনা। তারা পৃথক সত্তায় সত্তাবান হয়ে আছে। তারা পরস্পর থেকে পৃথক (distinct বা other) কিন্তু বিপরীত (opposite) নয়। বাস্তবে যেখানে এক গ্লাস জল আছে তাকে যদি আমি অন্য এক গ্লাস বলে কল্পনা করে নিই, তবে বিরোধ ঘটবে। আসলে বিভিন্ন সত্তার ভিতরে বিরোধ নেই। জেন্স্ ঠাট্টা করে বলছেন :

"Do the horse-cars jingling outside negate me writing in this room ? Do I, reader, negate you ? Of course, if I say, "Reader, we are two therefore I am two," I, negate you, for, I am actually thrusting a part into the seat of the whole. The orthodox logic expresses, the fallacy by saying the "we" is taken by me distributively instead of collectively, but so long as I donot make this blunder and am content with my part, we all are safe."

(p 287-89)

দেখা যাচ্ছে Mc Taggart এর চেষ্টা সত্ত্বেও হেগেলের দ্বন্দ্বিকের বিরোধ তত্ত্বকে (Contradiction) বাঁচানো অসম্ভব। কারণ আগাগোড়া হেগেল অভেদ-নীতিকে (Identity) অস্বীকার করেই তাঁর দার্শনিক দ্বন্দ্বিক গড়ে তুলেছেন। স্ববিরোধই (self-contradiction) তাঁর দ্বন্দ্বিকের প্রাণ এবং এর মাধ্যমেই তিনি সর্বত্র সর্বকালে দেখতে পেয়েছেন। এই বিরোধই (contradiction) তাঁর মতে খণ্ডনও (negation) বটে। যেখানে বিকাশ, যেখানে বিবর্তন, সেখানেই খণ্ডন (negation), সেখানেই নাস্তিত্ব। খণ্ডন (Negation) শব্দটা নিয়েও হেগেলীয়গণ চমৎকার ভেল্কী খেলেছেন। এর্‌মে আশ্চর্য প্রভাব ও অসম্ভব অর্থ-বৈচিত্র্য তাঁরা কল্পনা করেছেন, তাতে খণ্ডন (negation) হয়ে দাঁড়িয়েছে এক রহস্যলোকের আলেয়া। কারণ একে সঠিকভাবে ধরা ছোঁয়াও যেমন দুরূহ, তেমনি এর স্থান, কাল ও অর্থ পরিবর্তন চলেছে মুহূর্মুহু অতি বিচিত্র ঢঙে। এই দুর্বোধ্য খণ্ডন (negation) বস্তুটি কি তা একটু তলিয়ে বোঝার চেষ্টা করা যাক্।

(ক্রমশঃ)

সর্ব্বভারতীয় শিক্ষা কমিশন ১৯৬৪-৬৬

অধ্যাপক শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী

ষোল লাখ টাকা খরচ করে ২১ মাস পরিশ্রমের পর সর্ব্বভারতীয় শিক্ষা কমিশন তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেছেন। কমিশনে ছিলেন ৪ জন বিদেশী শিক্ষাবিৎ। মোট ৩০০০ পৃষ্ঠায় রিপোর্ট। সাধারণো প্রকাশ পেয়েছে মাত্র ১৮০ পৃষ্ঠায় কমিশনের সুপারিশগুলি। শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলা বলেছেন, এ রিপোর্ট 'অদ্ভূতপূর্ব্ব'। কারণ এমন সামগ্রিক ভাবে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজী শিক্ষার তত্ত্ব একসঙ্গে ইতিপূর্ব্বে হয়নি। চড়া-নিনাদের অন্ত নেই। ইতিপূর্ব্বেও বহুবারে স্যাডলার কমিশন (১৯১৭), রাধাকৃষ্ণন্ কমিশন (১৯৪৮), মুদালিয়র কমিশন (১৯৫২) ও দে কমিশন (১৯৫৪) বসেছিল। ফল তেমন কিছু হয়নি, যা যা হয়েছে একটা জগাখিচুড়ী বিশেষ। এবারের কমিশনের ফল যদি ভাল হয়, নিতান্ত সুখের কারণ হবে। কারণ কমিশন কতগুলি বিষয়ে অনেক ভাল কথা শিক্ষা সম্বন্ধে বলেছেন। এ যাবৎ পরিপূর্ণ রিপোর্ট আমরা পাইনি। খবরের কাগজে প্রকাশিত সারাংশের ওপর নির্ভর করেই এ প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে। সুতরাং যদি কমিশনের কোন সুপারিশ ঠিক মতো না বুঝতে পেরে থাকি ত্রুটী মার্জনীয়। কমিশনের অনেক ভাল কথার মধ্যে দেখতে পাই ১) ২০ বছরের মধ্যে সর্ব্বস্তরে নিরক্ষরতা দূর করতে হবে; ২) ক্রমশঃ সর্ব্বস্তরে অবৈতনিক শিক্ষার চেষ্টা করতে হবে; ৩) সর্ব্বস্তরের শিক্ষকদের একটা ন্যূনতম মাহিনার হার এবং প্রতি ৫ বছর অন্তর তার সংশোধন; ৪) সরকারী ও বে-সরকারী স্কুলের শিক্ষকদের চাকুরীর একই রকম সর্ত্ত বা ঐ দু' রকম স্কুলের মধ্যে পার্থক্যের অবসান; ৫) সরকারী কর্মচারীদের ন্যায় শিক্ষকদেরও মাগ্‌গী ভাতা সংশোধন; ৬) ইংরেজী, স্কুল ও কলেজে, অবশ্য পঠিতব্য হবে। আর হিন্দী শিক্ষা হবে ঐচ্ছিক—কিন্তু যথাকালে হিন্দী হবে সমস্ত দেশের যোগসূত্র (link language); ৭) মাতৃভাষা হবে সর্ব্বস্তরে শিক্ষার বাহন; ৮) হিন্দী ও অপর কোন দেশীয় বা বিদেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা; ৯) ছাত্রদের জন্য কোনরূপ বাধ্যতা-মূলক সমাজ শিক্ষা (social service)—ইত্যাদি। অবশ্যই সুভাষ তবুও। কিন্তু এর কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে উপসংহারে কিছু মন্তব্য করব।

প্রাথমিক শিক্ষা

কমিশন বলেছেন আগামী ৫ বছরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক করতে হবে। মাতৃভাষা হবে শিক্ষার বাহন। ইংরেজী ভাষা এ স্তর থেকে পড়াতে আরম্ভ করতে হবে। এ স্তরে কোন সরকারী পরীক্ষা হবে না; তবে কয়টী স্কুল মিলে একটী পরীক্ষার বন্দোবস্ত করতে পারে। প্রত্যেক প্রাথমিক শিক্ষক ২ বছরের ট্রেনিং নিবেন। যে স্কুলে ২০০ এর বেশী ছাত্র, সেখানে প্রধান শিক্ষক ট্রেনিংপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েট শিক্ষক থাকবেন। আগামী ২০।৩০ বছরে

সরকারের শিক্ষা খাতের মোট ব্যয়ের ½ অংশ যাবে স্কুলগুলির জন্য এবং ½ অংশ যাবে উচ্চতর শিক্ষার জন্য। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হবে তিন বছরের। ছয় বছর বয়সে ছাত্র আসবে প্রাথমিক শ্রেণীতে। তারপর আট শ্রেণী পর্যন্ত সে পড়বে। এর মধ্যে প্রদেশ ভেদে তিন চার বছর হবে নিম্নতর প্রাথমিক শিক্ষা এবং পরবর্তী ২।৩ বছর উচ্চতর প্রাথমিক শিক্ষা হবে। মোটামুটিভাবে একজন প্রাথমিক শিক্ষকের (মাট্রিক, ট্রেন্ড্) মাহিয়ানা হবে ১৮০-২০০৲ টাকা। প্রাথমিক শিক্ষকদের এ ন্যূনতম মাহিনার স্বীকৃতি, পর্য্যাপ্ত না হলেও, আধুনিক যুগে ইহা উল্লেখযোগ্য। এঁদের কতকটা মর্য্যাদা দেওয়া হল, এটাই সুখের বিষয়। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষকদের ট্রেনিং এর বন্দোবস্ত তাঁদের সংখ্যার তুলনায় নিতান্ত নগণ্য। ইচ্ছা থাকলেও তাঁরা শিক্ষণ-শিক্ষা পান না। সুতরাং উপরোক্ত মাহিনার হার সহসা কার্য্যকরী হওয়ার আশা দুরাশা মাত্র।

মাধ্যমিক শিক্ষা

মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনার জন্য একটা "সর্ব্ব ভারতীয় স্কুল বোর্ড" গঠনের সুপারিশ কমিশন করেছেন। ইহা মাধ্যমিক শিক্ষক সংস্থার অনেক কালের দাবী। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য এক সর্ব্ব ভারতীয় "বিশ্ববিদ্যালয় গ্রান্টস্ কমিশন" আছেন। আশা করা যায়, এ স্কুল বোর্ড গঠনের ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রতি কর্তৃপক্ষের অধিকতর দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। কমিশন সরকারী ও বে-সরকারী স্কুলের শিক্ষকদের চাকুরীর সর্ত্তাবলীর একীকরণ প্রস্তাব করেছেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ১৯ বছর যাচ্ছে, এখনও শিক্ষাক্ষেত্রে এ অস্পৃশ্যতা গেলনা, দুঃখের বিষয়। আবার কতকগুলি স্কুল মোটা মাহিনা নিয়ে 'বড়' লোকদের ছেলেদের পড়িয়ে থাকেন। তাতে যে একটা নতুন জাতিভেদের সৃষ্টি হচ্ছে, তার প্রতিও কমিশন কটাক্ষ করেছেন।

সমগ্র ভারতে দশ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষার পর একটিমাত্র সরকারী পরীক্ষা (public examination) হবে, ইহাই কমিশনের সুপারিশ। তারপর দু' বছর ছাত্রদের শিক্ষা হবে স্কুলে বা কলেজে। এ ভাবে বার বছর পড়ার পর ছাত্রেরা ডিগ্রিক্লাসে ভর্ত্তি হবে। কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্ব্বাচন করে ভাল ছেলেদের মাত্র ভর্ত্তি করা হবে। এ নির্ব্বাচন পদ্ধতির (selective) ওপর কমিশন জোর দিয়েছেন। যারা কলেজে যাবেনা বা যেতে পারবে না, দশম শ্রেণীর পর তারা কোন বৃত্তিমূলক (technical) স্কুলে গিয়ে তিন বছর পড়বে। রিপোর্টের সারাংশ পড়ে যতটা বুঝা গেল, মনে হয় একাদশ শ্রেণীর পর কোন সরকারী পরীক্ষা হবে না। দেখা যায়, পরোক্ষে পূর্ব্বেকার ইণ্টারমিডিয়েট্ পদ্ধতির পুনঃ প্রবর্ত্তন হবে—বার বছরের স্কুলে বা বর্ত্তমান কলেজগুলিতে। অর্থাৎ বর্ত্তমান প্রাক্-স্নাতক কোর্সের এক বছর স্কুলে দু'বছর, কোর্স হবে। এটা ভালই হবে। কারণ প্রি-ইউনিভার্সিটির এক বছরের মধ্যে ৪।৫ মাস পড়ে ছাত্ররা বিশেষ কোন লাভবান হয় না। কিন্তু একাদশ শ্রেণীর উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলে যদি দ্বাদশ শ্রেণীর প্রবর্ত্তন করা হয়, তা হলে আর একটা গুরুতর ভুল হবে। নীতির দিক দিয়ে এ ব্যবস্থা সমর্থনযোগ্য হলেও, বাস্তবক্ষেত্রে বর্ত্তমান অবস্থায় স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীতে ইংরাজী, পদার্থবিদ্যা বা রসায়ণ বিদ্যা বা অন্য কোন বিষয়ে পড়াবার উপযুক্ত শিক্ষক বিশেষ নেই। ঐরূপ শিক্ষক পাওয়া যায় না। এ জন্য আমাদের বর্ত্তমান একাদশ শ্রেণীর উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা পদ্ধতি অধিকাংশ স্কুলে নিষ্ফল হয়েছে। তাদের অবস্থা—দোয়াত আছে, কালি নাই অর্থাৎ শিক্ষকের অভাব। তারপর একাদশ শ্রেণীর স্কুলগুলিকে দ্বাদশ শ্রেণীতে উন্নীত করবার সঙ্গতি সরকারের বর্ত্তমানে নেই। শুধু স্কুলে দালান কোঠা করলেই শিক্ষা হয় না; চাই, উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ অর্থাৎ উপযুক্ত শিক্ষক, লাইব্রেরী, লেবরেটরী ইত্যাদি। ইদানীং কর্তৃপক্ষ জুনিয়র হাইস্কুলগুলিকে বা

দশম শ্রেণীর স্কুলকে একাদশ শ্রেণীতে উন্নীত করতে দিচ্ছেন না। সুতরাং বার বছরের উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলের কথা বর্তমানে কল্পনামাত্র। কমিশন আর এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত করেছেন, যথা প্রতি স্কুলের সঙ্গে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে ('to vocationalise secondary education') আরও, যারা কোন কলকারখানায় কাজ করে তাদের জন্যও শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদের "work experience" বা কাজের অভিজ্ঞতা বা পরিমাণ অনুসারে তাদের শিক্ষার মূল্যায়ন করতে হবে। পাশ্চাত্যের প্রতিটি শিল্পান্বিত দেশে এরূপ ব্যবস্থা আছে। তাতে ছেলেরা সকলে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয় না, যেটা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এক মহা সমস্যা হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে কমিশনের বিস্তারিত সুপারিশের জন্য আশার সহিত আমরা অপেক্ষা করব। বৃত্তিমূলক মাধ্যমিক শিক্ষাই আজ ভারতের শিক্ষা সমস্যার গোড়ার কথা। কমিশন যদি এ বিষয়ে যথোপযুক্ত আলোকপাত করে থাকেন, তবে তাঁরা ধন্যবার্হ। কারণ ভাল বা মন্দ সব ছাত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় ধর্না দিবে এবং একটা ডিগ্রি পেলেই মোক্ষলাভ করবে, এ ধারণার অবসান হওয়া দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ও সকলকে ভর্তি করে নিতে পারে না বা ডিগ্রি পেলেও চাকুরী হয়না, এই আজ সকলের তিক্ত অভিজ্ঞতা।

বর্তমানে বাংলাদেশে হাইস্কুলের ৯ম শ্রেণী হতেই ছাত্রদের কলা বা বিজ্ঞান শিক্ষার পাঠ্যক্রম নির্বাচন (specialisation) করে নিতে হয়। ফলে অপরিণত বয়সের ছাত্রদের এ নির্বাচন অনেক সময় ঠিক হয় না। এ ভাবে অনেক অযোগ্য ছাত্র বিজ্ঞান পাঠ্য বিষয় নির্বাচন করে ও আবার বিজ্ঞানের উপযুক্ত ছাত্র কলাপাঠ্য নিয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে। কমিশন সুপারিশ করেছেন যে দশম শ্রেণীর পরেই এ রকম নির্বাচন (specialisation) হওয়া উচিত। কমিশনকে ধন্যবাদ - এতে অনেক ছাত্রছাত্রী বেঁচে যাবে। আর একটা সুপারিশ বিতর্কমূলক হলেও প্রণিধানযোগ্য। দশম শ্রেণীর (অর্থাৎ বর্তমান স্কুল ফাইন্যাল) পরীক্ষায় কোন ছাত্রকে ফেল বা পাশ বলে সার্টিফিকেটে লেখা হবে না। শুধু বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্রের নম্বরগুলি মাত্র থাকবে। উদ্দেশ্য—যে ছাত্র যে দিকে যাবে, সেখানের কর্তৃপক্ষ তাঁদের আবশ্যকমত সে বিষয়ের নম্বরগুলি দেখে ছাত্রদের মূল্যায়ন করবেন। যে ছাত্র ভবিষ্যতে কৃষি-বিদ্যা পড়বে, কর্তৃপক্ষ দেখবেন শুধু উদ্ভিদবিদ্যা বা রসায়নে তার পরিদর্শিতা কেমন? তার ক্ষেত্রে অঙ্কের নম্বরের ওপর বিশেষ জোর হয়ত দেওয়া হবে না। এ প্রথা প্রবর্তিত হলে ছেলেদের যে কোন প্রকারে পরীক্ষায় পাশ করার হুজুগটা কমে যাবে। পাশ্চাত্যে G. C. E. পরীক্ষার নিয়ম আছে। তাতে ছাত্ররা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে পারে। তার ফলে ঐ ঐ বিষয়ের জন্য মাত্র ছাত্রেরা সার্টিফিকেট পায়। ফলে একদেশের মত এক বিষয়ে ফেল করলে পরীক্ষায় সামগ্রিকভাবে ফেল দেখানো হয় না। যে ছাত্রের যে দিকে যোগ্যতা আছে, সে সে দিকে জীবিকা বা বৃত্তির জন্য চলে যায়। আমাদের দেশেও তা হওয়া বাঞ্ছনীয়। সর্বশেষে' প্রতি মাধ্যমিক স্কুলেও কমিশন শিক্ষকের নিম্নতম মাহিয়ানার হার সুপারিশ করেছেন। বলেছেন—কোন শিক্ষণ-শিক্ষা প্রাপ্ত গ্রাজুয়েট শিক্ষক মাসিক ২২০৲ টাকার কম বেতন পাবেন না! ক্রমশ সর্বশেষে ৪০০৲ পাবেন। যে সব শিক্ষক এম. এ বা এম্ এস্ সি পাশ ও ট্রেনড্, তাদের বেতনের হার হবে ৩০০৲-৬০০৲ টাকা। প্রধান শিক্ষকেরা আরও বেশী পাবেন। স্কুল ও কলেজের সমান যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকদের বেতনের হার প্রায় সমান হবে। এ ব্যাপারেও মাধ্যমিক শিক্ষকদের মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে বি. টি. বা শিক্ষণ-শিক্ষার সুযোগ সুবিধা এত কম যে অনেক শিক্ষক আগ্রহ সত্ত্বেও বি. টি. ক্লাসে ভর্তি হতে পারেন

না। সে হিসেবে এ সুপারিশ অদূর ভবিষ্যতে কার্যকরী হবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা

এ বিষয়ে কমিশন বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাণ্টস কমিশনের অনুমোদন ভিন্ন কোথাও কোন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবে না। কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই সহরে আরও একটি করে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচন করে ছাত্র ভর্তি করা হবে। প্রতি রাজ্যে একটি করে কৃষি বিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলেছেন; কিন্তু কোন কৃষি কলেজ না করে কৃষি শিক্ষার জন্য কতকগুলি পলিটেকনিক (polytechnic) শিক্ষায়তন স্থাপন করে কৃষি শিক্ষার প্রচারের জন্য সুপারিশ করেছেন। এ সিদ্ধান্ত ভারতের বর্তমান অবস্থায় নিতান্ত উপযোগী মনে করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাণ্টস কমিশনের সহযোগিতায় আঞ্চলিক ভাষায় নানারূপ বিজ্ঞানের ও টেকনিক্যাল পুস্তকের প্রকাশের জন্য সরকারকে কমিশন অনুরোধ করেছেন। উদ্দেশ্য, কালক্রমে উচ্চশিক্ষায়ও আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষার বাহন হবে। কলেজ শিক্ষকদের ন্যূনতম মাহিয়ানা হবে ৩০০৲-৬০০৲ টাকা, এবং বিশেষ শ্রেণীর জন্য ৪০০৲-৮০০৲। এ কথা পূর্বেই শিক্ষামন্ত্রী লোকসভায় ঘোষণা করেছেন।

ভাষা-শিক্ষা

এ বিষয়ে কমিশন কিছুটা পোঁজামিল দিয়েছেন। শিক্ষার মাধ্যম হবে, মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা সর্বস্তরে, একথা নির্ভীকভাবে বলেছেন। কিন্তু ইংরাজী ভাষা অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যোগাযোগের ভাষা, বিশেষতঃ জ্ঞানের আদান-প্রদানে (intellectual link) বহাল রাখবার জন্য সুপারিশ করেছেন। যথাকালে (in due course) হিন্দী সে যোগাযোগের সূত্র হবে, একথাও বলেছেন। ইংরেজী ভাষা স্কুল ও কলেজে এক অবশ্য পাঠ্য বিষয় থাকবে। এর ফলে সরকারের পূর্ব সিদ্ধান্তের সঙ্গে কিছু অসঙ্গতি থাকছে। পূর্ব সিদ্ধান্ত ছিল প্রত্যেক ছাত্রকে তিনটি ভাষা পড়তে হবে। (১) মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা; (২) রাষ্ট্রভাষা বা সহযোগী রাষ্ট্রভাষা (Associate official language); (৩) আধুনিক ভারতীয় ভাষা বা ইউরোপের কোন ভাষা (যা ছাত্রের শিক্ষার বাহন নয়)। দেখা যাচ্ছে, হিন্দি, রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষিত হলেও, তার শিক্ষা বাধ্যতামূলক নয়। অ-হিন্দী-ভাষীদের ওপর হিন্দী জোর করে চাপান উচিত নয়, সে কথাও কমিশন বলেছেন। এ সুপারিশ মতে কোন বাঙালী ছাত্র যদি স্কুলে (১) মাতৃভাষা (২) ইংরাজী ভাষা ও (৩) সংস্কৃত ভাষা নেয়, তার কোন বাধা হবেনা। তা হলে, তার ক্ষেত্রে হিন্দীর স্থান কোথায়?

উপসংহার

এতক্ষণ আমরা সংবাদপত্রে প্রকাশিত কমিশনের বিশেষ বিশেষ সুপারিশ গুলি আলোচনা করলাম। মনে রাখতে হবে —এগুলি সুপারিশ মাত্র। সরকার ঐসব বা এর কতগুলি গ্রহণ করতে পারেন বা নাও পারেন (পূর্বকার কমিশন ও কমিটি গুলির সুপারিশ আজ সরকারের দপ্তর খানায় শোভাবৃদ্ধি করছে মাত্র। এমন কি, রাধাকৃষ্ণন্ কমিশনের সুপারিশও কার্যকরী করা হয়নি। আগামী অক্টোবরে দ্বারভাঙ্গায় শিক্ষামন্ত্রীদের বৈঠক হবে। তাতে কমিশন বিষয়ে সরকারী সিদ্ধান্ত হবে। অতএব যে কয়টি ভাল সুপারিশও এতে প্রকাশ পেয়েছে, তা নিয়ে এখনি উল্লসিত হওয়ার কারণ নেই। কমিশন বলেছেন, তাঁদের সুপারিশ কার্যকরী করতে হলে অনেক টাকা দরকার হবে। যথা, ১৯৫০-৫১ সনে ভারত সরকারের শিক্ষাব্যয় হয়েছিল ১১৪ কোটী টাকা; ১৯৬৫-৬৬ সনে তা হচ্ছে ৬০০ কোটী টাকা এবং ১৯৮৫-৮৬ সনে (অর্থাৎ বিশ বছরে) হবে ৪০০০ কোটী টাকা। যেখানে

পিছু ব্যয় হত ১২৲ টাকা ১৯৪০ সনে, বিশ বছর পরে সে ছাত্রের খরচ হবে মাথা পিছু ৫৩৲। শিক্ষকদের মাহিনার ন্যূনতম হারই বলুন, বা মাধ্যমিক শিক্ষার বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থাই বলুন, বা শিক্ষকদের শিক্ষন-শিক্ষার বন্দোবস্তের কথাই বলুন, প্রত্যেক কাজে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হবে। কমিশন বলেছেন ১৯৬৬-৬৭ সনে এ সুপারিশ কার্যকরী করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এবং পাঁচ বছরের মধ্যে সুপারিশগুলি বাস্তবে রূপায়িত করা দরকার একথাও বলেছেন। প্রতিবছর মোট ব্যয়ের দশ শতাংশ বাড়াতে হবে।

কমিশন অনেকগুলি ভাল কথা বলেছেন। সরকারকে তাঁদের সদিচ্ছার জন্য আমাদের ধন্যবাদ: কিন্তু তাঁরা সরকার তা অংশতঃও গ্রহণ করতে পারবেন কি? শেষ পর্যন্ত বাংলা প্রবাদটি—মন্ত্র মণ তেলও পুড়বে না রাধাও নাচবেন না—সত্য না হলেই হয়। শিক্ষামন্ত্রী চাগলা সাহেব বলেছেন—এ সুপারিশ কার্যকরী না করা গেলে এটা বাদির ওপর লেখার সামিলই হবে। তিনি কি তবে সেই আশঙ্কাই করছেন?

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.

বিদ্যাসাগর	২·২৫
মানুষের মত মানুষ	·৭৫
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·৩০
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	১·২৫
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা—১২

রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কারসমিতি

[বিশ্বভারতীর ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা]

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

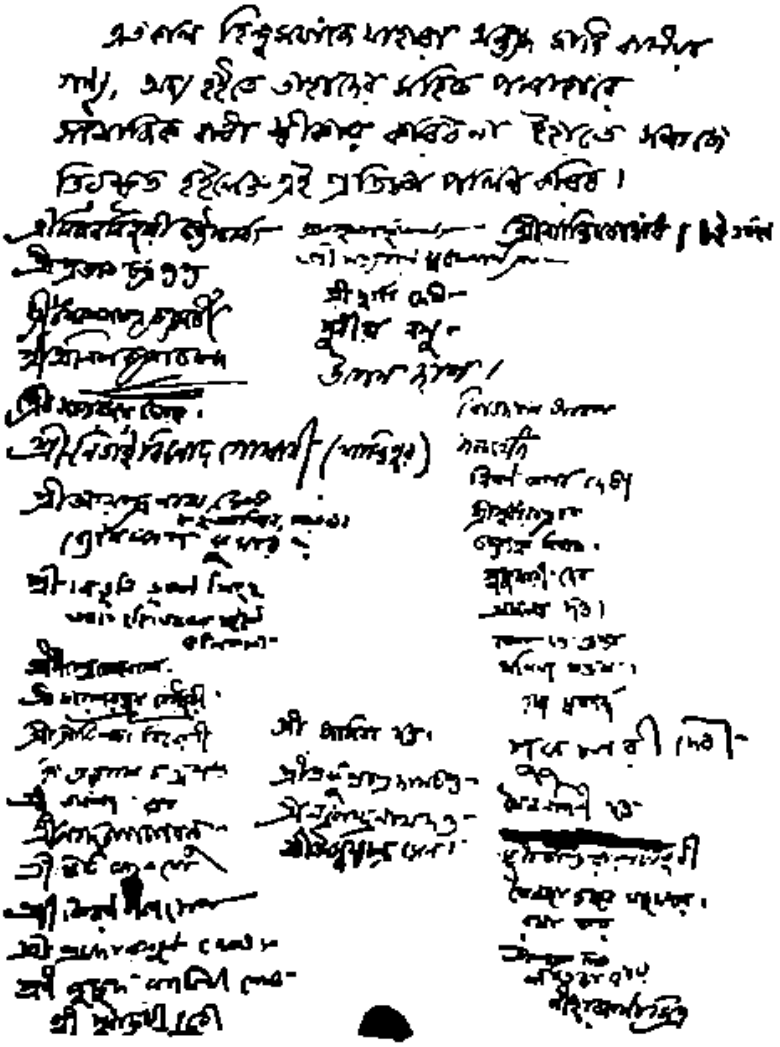

১৯২৬ সালে শান্তিনিকেতনে কয়েকটি তরুণ ছাত্র একটি সমিতি গঠন করেন। তার নাম দেন তাঁরা "সংস্কার সমিতি।"[১] সমস্ত (কু-) সংস্কার ত্যাগ করবেন এই ছিল তাঁদের প্রতিজ্ঞা।

"সংস্কারসমিতির" পাণ্ডাদের অনেকেই রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ-পরিবারের সন্তান। ব্রাহ্মণেতর জাতির হস্তে অন্নগ্রহণ তাঁদের বংশে কেউ কখনো করেন নি। নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ তো সে বংশে কল্পনারও অতীত ছিল। এমনি গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পরিবারের সন্তানেরাও সর্বজাতির হস্তে অন্নগ্রহণ, নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ ইত্যাদি বহু ধর্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ আচারে প্রবৃত্ত হলেন।

তাঁদের "সংস্কারসমিতি" কেবল হিন্দু নয়, হিন্দু মুসলমান, খ্রীস্টান, যে-কোনো সম্প্রদায়ের জন্য উন্মুক্ত হলো।

"সংস্কারসমিতির" উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করে' তাঁরা সর্বসম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের আহ্বান জানালেন। তাঁদের সেই আহ্বান-বাণীর কিয়দংশ বহুচেষ্টায় উদ্ধার করা গেছে। এখানে তা দেওয়া হলো :—

১ সকল প্রকার সংস্কারগ্রস্থে সংস্কার করবার জন্য যে-সমিতি— তাই "সংস্কারসমিতি"।

"সর্বপ্রকার অকল্যাণকর সংস্কার ছিন্ন করিয়া এবং সর্বশাস্ত্র অগ্রাহ্য করিয়া, এই শ্রেয়সী "সংস্কারসমিতি" যুক্তির উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। নিজযুক্তির বিরোধী হইলে এই "সংস্কার সমিতি" সকলের—এমন কি পরব্রহ্মের অনুশাসনও (অর্থাৎ বেদ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র) অগ্রাহ্য করে।

"হিন্দু, খ্রীস্টান, বৌদ্ধ ও ইসলামধর্মী সকলকেই এই "সংস্কারসমিতি" আহ্বান করিতেছে। ইহাতে সকলের অধিকার আছে।

"সংস্কারের দ্বারা আবিল বুদ্ধি মলিন দর্পণের ন্যায়। সেই বুদ্ধিকে বিমল করিলে তাহাতে আলোক প্রকাশিত হয়।"[২]

স্থির হলো—সমিতির আজীবন সভ্য (Life member)-দের একটা কঠিন সংস্কার ত্যাগ করতে হবে। অর্থাৎ হিন্দুকে "গোমাংস" এবং মুসলমানকে "শূকরমাংস" ভক্ষণ করতে হবে।

খ্রীস্টানকে কোন্ মাংস ভক্ষণ করানো হবে—সে-সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন হলো। সমিতির প্রধান যাঁরা, তাঁদের মধ্যে একজন বল্লেন—"খ্রীস্টানকে বাদুড়ের মাংস খেতে দেওয়া হোক।" আর একজন বল্লেন—"নাঃ। কাঠবেড়ালীর মাংস।" অন্য আর একজন বল্লেন—"ইঁদুরের মাংস।"

সৌভাগ্যের বিষয়, সে সময় কোনো খ্রীস্টান ছাত্র সভ্যপদপ্রার্থী ছিলেন না। তাই খ্রীস্টান সম্বন্ধে নিষিদ্ধ মাংসের ব্যবস্থা, তখনকার মত স্থগিত রইলো।

সংস্কারসমিতিতে একটিমাত্র মুসলমান ছাত্র সভ্যপদপ্রার্থী। সে কিন্তু নিরামিষাশী—মাদ্রাজী মুসলমান। কর্তারা ব্যবস্থা দিলেন—"আপাতত যে-কোনো মাংস একদিনের জন্য ভক্ষণ করলেই তাঁকে 'সভ্য' করা যাবে। তাঁকে আমরা 'সভ্য' করলাম—কিন্তু তাঁর নামে (খোসাগরণী) মাত্র আমাদের খাতাতে রইলো। তিনি আমাদের ছেড়ে গেলেন।

হিন্দুসভ্যই বেশি। তাঁদের জন্য গোমাংসের ব্যবস্থা দেওয়া হলো। ছুটির দিনে বাজারে গোমাংস ক্রয় করতে এক সভ্যকে পাঠানো হলো। তিনি পূর্বেই বহু সংস্কার পরিত্যাগ করেছিলেন। বাদুড়, ইঁদুর, কাঠবিড়াল, ব্যাঙ, অনেক কিছুই তিনি উদরস্থ করেন। কেবল গোমাংস না পাওয়ায়, তা ভক্ষণ করতে পারেন নি।

তিনি এবং আমি দুজনে মাংস কেনবার ভার নিয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় বোলপুর বাজারে 'গোমাংস' পাওয়া গেল না।

এখন কি করা যায়? ঠিক করলাম—খাসির মাংস বড় বড় টুকরায় কাটিয়ে 'গোমাংস' বলে চালাব।

সৌভাগ্যবশত, আমাদের মধ্যে কেউ গোমাংস চিনতেন না। সুতরাং সেই বড় বড় মাংস খণ্ডগুলিতে হলুদ মাখিয়ে আমরা তা 'বাদুড়ের মাংস' বলে প্রচার করলাম।

এতেই অনেকে কেটে পড়লেন। এই 'কেটে পড়া' দলে অনেক উৎসাহী কর্মী এবং বক্তা ছিলেন। তাঁরা 'সংস্কার-সমিতির' আদর্শ প্রচারে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিতেন। তাঁদের হাতে একেবারে না হারাই—তারই জন্যে, আমরা তিন প্রকার সভ্য নির্বাচনের প্রস্তাব গ্রহণ করলাম।

সভ্যদের শ্রেণী তিনটির সংজ্ঞা যাতে সাধারণের বোধগম্য হয়—তার জন্য আমরা অত্যন্ত সরল ও চলতি বাংলা-শব্দ ব্যবহার করি। আজ একথা স্বীকার করতে বাধা নাই, সেই সংজ্ঞাগুলি নিতান্ত হাস্যকর হয়েছিল।[৩] যাহোক সেগুলি এখানে লিপিবদ্ধ হলো:—

২ এই "আহ্বান-বাণী" সংস্কৃত, বাংলা, ইত্যাদি একাধিক ভাষায় প্রচারিত হয়।

৩ আমরা এখন বৃদ্ধ এবং প্রবীণ। কিন্তু একদিন আমরা বালক এবং তরুণ ছিলাম। বৃদ্ধ ও প্রবীণ পাঠকগণ, তাঁদের বাল্যকালের কথা স্মরণ করে, বাগ্বিলাসের এই চাপল্য আশা করি স্নেহপূর্ণ মার্জনার চক্ষে দেখবেন।

১। মহাচূড়ন্ত[৪] (আজীবন সভ্য—বা Life member)

২। চূড়ন্ত (সাধারণ সভ্য—বা Ordinary member)

৩। উড়ন্ত (অস্থায়ী সভ্য বা Associate member)

যাঁরা চূড়ান্তভাবে সংস্কারসমিতিতে যোগ দিতে পারেন নি—তাঁরাই 'উড়ন্ত সভ্য' অর্থাৎ কি না, মন যাঁদের 'উড়ু' 'উড়ু' করছে।

'উড়ন্ত' শব্দের সঙ্গে মিল রেখে কেউ কেউ চতুর্থ শ্রেণীর আর এক প্রকার 'সভ্য' করার প্রস্তাব আনলেন—তাঁরা তাদের নাম দিতে চাইলেন—'পুড়ন্ত'। আমরা অধিকাংশ সভ্য ওটা বাতিল করে দিলাম। অবশ্য বাতিল করার আগে, ঐ নামের অর্থ ব্যাখ্যার সুযোগ তাঁদের দিলাম।

তাঁরা বল্লেন "'পুড়ন্ত' অর্থাৎ যাঁরা পুড়ছেন। নিজেরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে যাঁরা অনুতাপানলে দগ্ধ হচ্ছেন। এর পরই তাঁরা সংস্কার ত্যাগ করে সংস্কারসমিতিতে যোগ দিবেন।"

আমরা বল্লাম—"কে কে পুড়ছেন, তা যাঁরা পুড়ছেন, তাঁরাই জানেন। আমাদের জানবার কথা নয়। কেন না, আমরা এখনও অন্তর্যামী হতে পারি নাই। অনুতাপানলে দগ্ধ হওয়াটা ভিতরের ব্যাপার। এরপর যখন তাঁরা সংস্কার ত্যাগ করবেন, তখন তো 'সভ্য' হবার জন্য আমাদের কাছেই আসবেন। সেই সময় ঐ তিন শ্রেণীর যে-কোন একশ্রেণীতে তাঁদের ভর্তি করা যাবে।"

"পুড়ন্ত" সভ্য আমাদের সমিতির অন্তর্ভুক্ত না হলেও আমাদের আলোচনার বহির্ভূত ছিলেন না। আমরা প্রায়ই কারো কারো সম্বন্ধে ঐ সংজ্ঞা প্রয়োগ করতাম।

এদিকে কিন্তু হলস্থূল ব্যাপার। শান্তিনিকেতনেও যে-এরূপ ব্যাপার ঘটতে পারে, তা আমাদের ধারণা ছিল না। সমিতির সভ্যগণ "গোমাংসে" ভক্ষণ করেছেন—এ সংবাদ আগুনের মত সর্বত্র প্রবলবেগে প্রসারিত হলো এক বৃহৎ এবং প্রবল গোষ্ঠি. সমিতির সভ্যদের উপর নিদারুণ ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁদের ধারণা—এইরূপ কালাপাহাড়দের মহর্ষি-প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে স্থান দেওয়া যায় না। সুতরাং অবিলম্বে তাদের বিতাড়িত করতে হবে।

এই বিরুদ্ধ দলের একজন, পূজনীয় শাস্ত্রীমহাশয়েরও শরণাপন্ন হলেন। ঐ ব্যক্তি এককালে "সংস্কারসমিতির" একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। গোমাংস দেখে "কেটে" পড়েন।

হিন্দুসন্তানের—বিশেষত, বাংলার প্রসিদ্ধ আচারনিষ্ঠ সর্বজন-শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণ-পরিবারের এক সন্তানের "গোমাংস ভক্ষণ" শাস্ত্রীমহাশয়ের কাছে অতি ভয়ংকর অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য হলো। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রিয় শিষ্য হস্টেলের (Hostel Superintendent) গোস্বামীকে৫

---

৪ "সংস্কারসমিতিতে" সে-সময়, মাত্র পাঁচজন মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে "মহাচূড়ন্ত" সম্মানের পদ লাভ করেছিলেন। তাঁদের প্রায় সবাই আজ দেশ-বিখ্যাত। এখানে তাঁদের নাম দেওয়া গেল।

(১) শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (দেশকর্মী, কবি, সাহিত্যিক, ও শিল্পী)

(২) শ্রীনিশিকান্ত রায়চৌধুরী (এখন স্বনামধন্য সাধক, শিল্পী এবং কবি—শ্রীনিশিকান্ত)

(৩) শ্রীরামকিংকর বেইজ (স্বনামধন্য শিল্পী—"রামকিংকর")

(৪) শ্রীপুলিনবিহারী সেন (রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, গ্রন্থন-বিভাগ, বিশ্বভারতী)

(৫) শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় (বর্তমান লেখক)

৫ আচার্য পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, তদানীন্তন অধ্যক্ষ, বিদ্যাভবন (Post-graduate Research Dept.)।
পণ্ডিত নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী (বিদ্যাভবনের প্রবীণ গবেষক)।

ডেকে পাঠালেন। গোস্বামী আদ্যোপান্ত নিদারুণ বর্ষণ শুরু হলো। তীক্ষ্ণ, কঠোর, কটু, তিক্ত, বাক্যধারার অবিশ্রাম নিরবচ্ছিন্ন বর্ষণ! মিনিট পনেরো গোস্বামী মুখ খুলবার অবসরই পেলেন না।

অবশেষে শাস্ত্রীমহাশয় যখন পরিশ্রান্ত হয়ে নিবৃত্ত হলেন, তখন গোস্বামী বল্লেন—"জগদানন্দ বাবু[১] জানিয়েছেন—বোলপুরে "গোমাংস" পাওয়াই যায় না। সুতরাং কেউই "গোমাংস ভক্ষণ" করেন নি। ছাগমাংসকেই তাঁরা গোমাংস বলে' প্রচার করেছেন।

শাস্ত্রীমহাশয় তাতেও বিশেষ শান্ত হলেন না। তিনি উত্তেজিতকণ্ঠে বলে চল্লেন—"হিন্দুর ছেলে অন্য মাংসই বা "গোমাংস" বলে, খায় কেমন করে? সংস্কৃতজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, ব্রাহ্মণ বিদ্যার্থী এবং প্রাতঃস্মরণীয় কবিবর মুখুজ্যেমহাশয়ের বংশধর—এরা এমন কাজ করলো কেমন করে? এইরূপ অনাচারে সমস্ত তীর্থস্থানগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। এই পবিত্র আশ্রমটিও নষ্ট হতে চলেছে। আমি এখনই গুরুদেবের কাছে যাচ্ছি।"

গোস্বামী সবিনয়ে জানালেন—"গুরুদেবের কাছে গিয়ে কিছু লাভ হবে বলে' মনে হচ্ছে না। কেননা, এইরূপ নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ ব্যাপারকে গুরুদেব তেমন গুরুত্ব দেবেন না।"

শাস্ত্রীমহাশয়কেও সেকথা স্বীকার করতে হলো। অতঃপর তিনি কি করবেন—কিছুই ঠিক করতে পারলেন না।

ইতিমধ্যে একজন উৎসাহী আদর্শবাদী শিক্ষক তাঁর বন্ধু এক অতি পুরাতন শিক্ষকের গৃহে উত্তেজিত হয়ে প্রবেশ করলেন। গৃহস্বামী তখন সপরিবারে চায়ের টেবিলে। উত্তেজিত আগন্তুক ঝড়ের বেগে বলে চল্লেন—"আপনারা এখানে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে চা খাচ্ছেন—এদিকে যে আশ্রমের কয়েকটি ছাত্র "বিফ (beef)" খেয়েছে—তার খবর রাখেন?"

বাড়ীর গৃহিণী শুনলেন—"বিষ খেয়েছে!" তিনি অধিকতর উত্তেজিত হয়ে বল্লেন—"বিষ খেয়েছে তো আপনি এখানে কিজন্যে এসেছেন? যান যান। দেখুন গিয়ে, তাদের হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে কিনা—এবং চিকিৎসা হচ্ছে কিনা!"

আগন্তুক বল্লেন—"আরে না না। বিষ নয়—বি—ফ (beef)।"

ভদ্রমহিলা বল্লেন—"বাঁচা গেল! যা ভয় পেয়েছিলাম। তাই বলুন বিষ নয় 'বিফ'।"

গৃহস্বামী ব্রাহ্ম।[৮] "বিফ" খাওয়ার কথায় তাঁর মনে বিন্দুমাত্র উত্তেজনা এলো না। তিনি হেসে বল্লেন—"আরে "বিফ" খেয়েছে তো কি হয়েছে?"

আদর্শবাদী আগন্তুক নিতান্ত নিরাশ হয়ে ফিরে গেলেন।

প্রবল বিরোধীদলের প্রচণ্ড উত্তেজনা নিতান্তই নিষ্ফল হলো। "সংস্কারসমিতির মহাচূড়ান্তগণের" কোনো ক্ষতিই তাঁরা করতে পারলেন না। সমিতির সভ্যগণ অধিকতর উৎসাহে তাঁদের সংস্কার তাঁদের কাজ করে চল্লেন।

অতঃপর স্থির হলো—স্মৃতিশাস্ত্র-বিরুদ্ধ দুটি 'গর্হিত' কাজ তাঁরা একসঙ্গে করবেন। কাজ দুটি হলো—চণ্ডালের অন্নগ্রহণ এবং গ্রাম্যশূকরের মাংস ভক্ষণ।

স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত "চণ্ডালকে" খুঁজে পাওয়া গেল না। হাতের কাছে পাওয়া গেল—তাঁদের চিরপরিচিত রসিক সেবককে। তাকেই তখনকার মত চণ্ডালের পদগৌরব দিয়ে অনুরোধ করা হলো—তার সহধর্মিণীর রান্না করা শূকর মাংস

১ শ্রীজগদানন্দ রায়—"গ্রহনক্ষত্র" প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচয়িতা—ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রবীণ অধ্যাপক, Bolpur Union Board এর Chairman.

৮ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (অধ্যাপক ও ভবানীভবন গ্রন্থাগারিক—অধুনা বনবাসগত)।

যেন সমিতির সভ্যগণকে সেরখানেক দেওয়া হয়। মাংসের দাম এবং তেল, ঘি, মসলার খরচ তাঁরা দেবেন।

রসিক বুদ্ধিমান। অত্যন্ত ভদ্র ও নম্র। সংস্কার-সমিতির আদর্শের কথা সে তার নিজের মত করে' এক প্রকার বুঝেছিল। তাই এই পবিত্র সাধন-কার্যে পয়সা নিতে তার ঘোর আপত্তি।

সমিতির সভ্যরাও নাছোড়বান্দা। অবশেষে রসিক যা যুক্তি দিল, তাতে দাম দেওয়া, বা খরচ দেওয়ার কথা আর তোলাই গেল না।

রসিক বল্লো—শূকর তার নিজের ঘরের। জীবনে কোনোদিন সে শূকর কেনে নি। তার ঠাকুর দাদার বাবা যা কিনে রেখে গেছলো—তাতেই তারা তিন পুরুষ বিনি পয়সায় মাংস খেয়ে আসছে।

আর, মাংসে তেল, ঘি বা মসলা, তারা কোনো কালেই দেয় না। এক মুন দেয়। তা, তার আর কি বা দাম!

রসিক নেথর বা তার পরিবারের রান্না সেই বরাহমাংস ছজন মহাচুড়ন্ত এবং জনা ছই চূড়ন্ত[৯] সভ্য মিলে শ্রদ্ধাস্পদ "তালধ্বজ"[১০] মহাশয়ের নিবাসে নিঃশেষ করলেন।

সেদিন তো বিনি পয়সার ভোজ হলো—পরদিন ভোজ ঘুরে থাক, ভোজনেরি প্রয়োজন হলো না।

শূকর মাংস যে এতদূর গুরুপাক—তা চূড়ন্ত, মহাচূড়ন্ত কোনো সভ্যেরি জানা ছিল না। ইতিহাসে তাঁরা পড়ে ছিলেন বটে, বৃদ্ধবয়সে শূকর মাংস ভক্ষণ করে, বুদ্ধদেব মারাত্মক অসুখে পড়েন।

যৌবনেই সুস্থ, সবল সভ্যদের যা অবস্থা হলো, তাতে বৃদ্ধবয়সে কী হতে পারে—কল্পনা করতে অসুবিধা হলো না।

সৌভাগ্যের বিষয়, প্রৌঢ় তালধ্বজ মহাশয়কে মাত্র একটুকরো মাংস "চাখতে" দেওয়া হয়েছিল—তাতেই তাঁর একদিনের রান্নার পরিশ্রম এবং খরচ বেঁচে যায়।

এইভাবে একটার পর একটা সংস্কারে আঘাত দিতে দিতে, সংস্কারসমিতির সভ্যগণ স্বচ্ছন্দে অগ্রসর হন। বিরুদ্ধ দলের বাধাদানকে তাঁরা আর তোয়াক্কা করেন না।

সংস্কারসমিতির সর্বশ্রেণীর সভ্যই প্রবল উৎসাহে নবাগত বিদ্বান ও বিদ্যার্থীদের মধ্যে তাঁদের আদর্শ প্রচার করে চলেছেন। তরুণদের অনেকেই এখন সংস্কারসমিতির আদর্শে অনুপ্রাণিত—প্রবল বিরোধীপক্ষ ক্রমশ তাঁদের সমর্থক হারাচ্ছেন—এবং সেজন্য তথাকথিত আদর্শবাদী বিদ্যার্থী ও কর্মিগণ ক্ষুব্ধ ও নিষ্ঠুর হয়ে পড়ছেন।

এমন সময় এলো ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস।

সারা ভারতব্যাপী প্রবল উত্তেজনা—মহাত্মা গান্ধী অনশন আরম্ভ করেছেন।

আশ্রমবাসিগণ দুঃখে, উদ্বেগে, মুহ্যমান। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বড়ই বিচলিত হয়ে পড়েছেন; আশ্রমের দীর্ঘ আশ্রম-জীবনে তাঁকে এরূপ বিচলিত হতে কখনো দেখিনি। আশ্রমের পুরাণো কর্মীদের এবং বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের তিনি বার বার ডেকে পাঠাচ্ছেন; আমাদের কী কর্তব্য সেবিষয়ে

---

৯ এই চূড়ান্ত সভ্যদ্বয়ের একজন হচ্ছেন—শ্রীক্ষেত্রমোহন সেন (বর্তমানে প্রখ্যাত সাংবাদিক)। প্রধানত এঁরই পরিকল্পনায় এবং এঁরই উদ্যোগে সেবারের সেই "সংস্কারমেধ-যজ্ঞ" সম্পন্ন হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় (প্রায়-) শূকর মাংস হিন্দুর পক্ষে "গোমাংস" পর্যায়ের না হওয়ায়, নিতান্ত আগ্রহ থাকলেও সংস্কার-সমিতির কর্তৃপক্ষগণ এঁকে "মহাচূড়ন্ত" উপাধি দিতে পারেন নি।

১০ শান্তিনিকেতন উপাসনা মন্দিরের পাশে, একটি দীর্ঘ তালবৃক্ষকে কেন্দ্র করে এক বিচিত্র গৃহ আছে—যার দেওয়াল মাটির এবং চাল খড়ের। রবীন্দ্রনাথ ঐ গৃহের নাম দেন "তালধ্বজ"। এখানে গৃহস্বামী অধ্যাপক ভেজেশচন্দ্র সেনকে "তালধ্বজ" বলা হয়েছে। ঐ গৃহে তিনি একাকী বাস করতেন এবং নিজ আহার্য নিজেই প্রস্তুত করতেন।

আলোচনা করছেন। পুণা থেকে ওয়ার্ধাতে, সংবাদের আদান প্রদান চলেছে।

শান্তিনিকেতনস্থ বিদ্যালয়ে অস্পৃশ্যতার অস্তিত্ব ছিল না। সর্বজাতি, সর্ববর্ণাবলম্বী একত্রে একস্থানেই তখন আহার করতেন।

তথাপি সমস্ত দেশের সঙ্গে সুর মিলিয়ে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য আমাদেরও কিছু করা প্রয়োজন—একথা সকলেই অন্তরে অনুভব করছিলেন।

বিশ্বভারতীর প্রবীণ অধ্যাপকগণ বলেন—"আশপাশের গ্রামবাসীদের আমন্ত্রণ করা হোক। সমবেত গ্রামবাসীদের সেই সভায় আমরা সামাজিকভাবে হরিজনদের জলগ্রহণ করবো।"

কর্মীগণ সকলেই এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন। গুরুদেবও এতে সম্মতি দিলেন।

৫ই আশ্বিন, ২১শে সেপ্টেম্বর, মহাত্মার প্রায়োপবেশনের দ্বিতীয় দিন অপরাহ্ণে গ্রামবাসীদের আহ্বান করা হলো। গুরুদেব তাঁদের উদ্দেশে সেদিন যা বলেছিলেন, দেবী বাগীশ্বরীর কণ্ঠের ন্যায় তাঁর সেই বাণীর কণ্ঠ হতেও এখন অশ্রুত নির্ঝর দুর্লভ ছিল না। সেদিন সে বাণী যে শুনেছে, সেই তার সমস্ত সংস্কার বিসর্জন দিয়ে, হাঁড়ি, ডোম, মুচি, মেথরের হাতে জল গ্রহণ করেছে। আচারনিষ্ঠ বিধবাগণ পর্যন্ত, সেদিন চোখের জলের সঙ্গে তাঁদের আজন্ম সংস্কার বিসর্জন দিয়েছিলেন। গুরুদেবের সেই অভিভাষণের কিছু পূর্বে কেউ যা কল্পনাও করেন নি, তাই ঘটতে দেখেছিলাম।

৬ঠা আশ্বিন, ২০শে সেপ্টেম্বর, শান্তিনিকেতনের প্রবীণ অধ্যাপকগণ যখন ঐরূপ সামাজিকভাবে হরিজন-হস্তে জল-গ্রহণের প্রস্তাব করেন, তখন বিশ্বভারতীর প্রগতিপন্থী তরুণ ছাত্রছাত্রীগণ সে-প্রস্তাবে তেমন খুশি হন নাই। তাঁরা তার চেয়ে ঢের বেশি কিছু করতে ইচ্ছুক। সুতরাং ঐ প্রস্তাব শোনামাত্র, তাঁরা বর্তমান লেখককে তাঁদের মুখপাত্র করে গুরুদেবের কাছে পাঠালেন।

গুরুদেবকে বললাম—"ছাত্রছাত্রীগণ কেবলমাত্র 'জলচলে' সন্তুষ্ট নন।" [১১]

তিনি তখন আমাদের কী ইচ্ছা—তা জানতে চাইলেন। বললাম—"সাধারণ পাকশালায়—যেখানে পাচক ব্রাহ্মণগণ পাক করেন, সেখানে আগামী কাল রাত্রে মেথরেরা পাক করবে। তাদের সেই পাক করা অন্ন, তারাই পরিবেশন করবে এবং সমস্ত আশ্রমবাসী তা গ্রহণ করবে।"

গুরুদেব প্রফুল্লচিত্তে সম্মতি দিলেন।

৫ই আশ্বিন, ২১শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণে, যেদিন বিশ্ব-ভারতীর সিংহসদনে হরিজনহস্তে জল গ্রহণ করা হয়, সেই দিনই রাত্রে, পাকশালায় মেথরের হাতে অন্নগ্রহণ করা হলো। শান্তিনিকেতনেও এ খুব সহজে হয় নাই। যাঁরা সর্ব-জাতির অন্নগ্রহণে অভ্যস্ত তাঁরাও মেথরের অন্নগ্রহণে রীতিমত সঙ্কোচ বোধ করেছিলেন।

যাইহোক, সেদিন রাত্রে বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীগণ এবং কর্মিগণী, সপরিবারে ঐ সর্বজনীন ভোজে যোগ দিলেন। মেথরগণ তাঁদের স্বহস্তে পক্ক অন্ন (খিচুড়ি) সকলকে পরিবেশন করলো।

কিন্তু পরদিন এক নতুন বিপদ উপস্থিত হলো। পাকশালায় দাসদাসীরা কাজ করবে না। ব্রাহ্মণ পাচকগণ কাজে যোগ দিল—কিন্তু হরিজন বি-চাকরের দল এলো না।

---

১১ কেবলমাত্র "জলচলে" সন্তুষ্ট না হলেও, যাতে ঐ "জলচল" পাকশালাভুক্ত হয়, তার জন্য সংস্কার-সমিতির সভ্যগণ জনে জনে আচারনিষ্ঠ ব্যক্তিদের—বিশেষত বিধবাদের নিকট গিয়ে, করজোড়ে আবেদন করতে থাকেন। গুরুজনদের চরণ ধরে' অনুনয় করেন। সন্তানস্থানীয়দের—এই করুণ আবেদন ও অনুনয় বিনয়, তাঁদের হৃদয় স্পর্শ করে।

নিকটবর্তী ভুবনডাঙা গ্রামে তাদের বাস। সেখানে গিয়ে আমরা বহু সাধ্যসাধনা করলাম। কিন্তু তারা অটল। মেথরেরা যে-বাসন ছুঁয়েছে—সে বাসন কেবল সেদিন নয়, কোনদিনই তারা (হাড়ি, ডোম, বাউরি, মুচিরা) মাজবে না। শুধু তাই নয়, ঐ পাকশালাতেই তারা আর ঢুকবে না।

কর্তৃপক্ষগণ মুষড়ে পড়লেন। কিন্তু তরুণদের নেতারা বিন্দুমাত্র ভয় পেলো না। তারা বল্লে—"আমরাই বাসন মাজব। শুধু একদিন নয়—দিনের পর দিন।"

তাদের সেই অটল প্রতিজ্ঞায় সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এক আশ্চর্য অনুপ্রেরণা দেখা দিল।

হাসিমুখে দিনের পর দিন তারা ঐ বিরাট পাকশালায়, বৃহদাকার, হাঁড়ি, ডেকচি, কড়াই প্রভৃতি হুবেলা মেজে যেতে লাগলো।

কিন্তু বেশিদিন তা করতে হলো না। কি-চাকরেরা অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেল। ঐ পাকশালা তাদের জীবিকার উৎস। সমস্ত পরিবার পোষণ হয় ওখানকার অন্নে। কদিন তারা তা থেকে নিজেদের বঞ্চিত করবে। তাছাড়া, তাদের আশঙ্কা হলো—অন্য জায়গা থেকে লোক আসবে।

একে একে, সকলেই এসে তাদের কাজে যোগ দিল।

৭ই আশ্বিন, ২৩শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণে, গুরুদেব বিশ্ব-ভারতীর কর্মীদের এবং বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের উত্তরায়ণের "উত্তরনে" আহ্বান করেন। গ্রামে গ্রামে, অস্পৃশ্যতাবর্জন ও হরিজন উন্নয়নের জন্য—আমরা কী করতে পারি—এই ছিল সেদিনের আলোচ্য বিষয়।

বহু আলাপ আলোচনার পর স্থির হলো—একটি সমিতি গঠন করা হোক—যার সভ্যেরা গ্রামে গ্রামে কি ভাবে ঐ কাজ করা যায়—তার পদ্ধতি নির্ণয় করবেন। এবং নির্ণীত পদ্ধতি অনুযায়ী কর্ম পরিচালনা করবেন। ঐ সভাতেই সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হলেন—প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায়। সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হলেন —বিদ্যাভবনের গবেষক ছাত্র শ্রীঅমিতকুমার মুখোপাধ্যায় (বর্তমান লেখক)।

সমিতির নামে কি হবে—তাই নিয়ে বহুক্ষণ বাদ প্রতিবাদ চলতে লাগলো, অবশেষে তরুণদের নায়ক বল্লেন—"সংস্কার সমিতি" নামে আমাদের একটি সমিতি—পূর্ব হতেই ঐ ধরণের কাজ করে আসছে—ঐ নাম যদি আপনারা গ্রহণ করেন, তা হলে আমরা ঐ সমিতি উঠিয়ে দিয়ে—এতে কাজ করি।"

সভায় বজ্রপাত হলেও সভ্যগণ হয়তো ততটা চমকে উঠতেন না। আমাদের এই আচম্বিত প্রস্তাবে সেই সভায় উপস্থিত অনেকেরই মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল—গুরুদেবের ভাষাতেই তার বর্ণনা দিই :

"মধুচক্রে লোষ্টপাতে বিক্ষিপ্ত চকিত
পতঙ্গের মতো—সবে বিস্ময়বিকল,
কেহ বা হাসিল কেহ করিল ধিক্কার
লজ্জাহীন "পাণ্ডবের" হেরি অহংকার।"

প্রবল বিরোধীদলের প্রচণ্ড আপত্তি সত্ত্বেও গুরুদেব প্রগতিপন্থী তরুণদের প্রস্তাবই গ্রহণ করলেন। ১৯৩২ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর "সংস্কারসমিতি" পুনর্জন্ম লাভ করলো। তরুণদের আগ্রহে গুরুদেব এই "সংস্কারসমিতির" পৃষ্ঠপোষক (patron) হলেন।

মহাত্মাজীর উপবাসের কিছুদিন পূর্ব হতে শান্তিনিকেতনে "কালের যাত্রা" নামক—রবীন্দ্রনাথের রচিত একটি নাটকের মহড়া চলছিল। নাটকটির বিষয় বস্তু হচ্ছে—

জগন্নাথের রথযাত্রা। রথ টানা হচ্ছে—কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় রথ চলছে না। ব্রাহ্মণেরা প্রাণপণে টানছেন। ক্ষত্রিয় বীরেরা [illegible] দিয়েছেন। বৈশ্য বণিকগণ তাঁদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছেন—তথাপি রথ অচল।

অবশেষে যখন সমাজের সর্বনিম্নস্তরের অবজ্ঞাত

নিশীড়িতের দল এসে রথের রশি ধরলো—তখন রথ চললো।[১২]

১২ "কালের যাত্রা" নাটকে "কবির" ভূমিকা স্বয়ং কবিই গ্রহণ করেছিলেন। কয়েকদিন মহড়া চলার পর খেয়ালী কবি হঠাৎ আমাকে "কবি"র পাঠ করতে বলেন। আমি হতভম্ব। জনতার মধ্যে এক সাধারণ পাঠমাত্র আমাকে দেওয়া হয়েছিল। সেই আমাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের পাঠ দিতে চাচ্ছেন—এও কি সম্ভব?

আমি প্রবল আপত্তি জানালাম। রবীন্দ্রনাথ সহসা অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বল্লেন:

"তোর ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ শুদ্রের (পতিতদের) উপর পড়ুক।"

এর পর আর কথা বলা গেল না।

লাইব্রেরীর বারান্দায় "কালের যাত্রা" উপর্যুপরি দুদিন (৩০শে সেপ্টেম্বর ও ১লা অক্টোবর) অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ সমস্তক্ষণ "ধ্বজের" এক পাশে বসে' অভিনয় দেখেছিলেন।

মনে আছে দ্বিতীয় দিন ক্ষণেকের জন্য পাঠ ভুলে গেছলাম। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া, হয় তো আর বিশেষ কারো তা লক্ষ্যগোচর হয় নি।

"কালের যাত্রা"র সমস্ত অভিনয়, ষোলোর উপর ভালই হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ খুশি হয়েছিলেন। নাটকটির "দর্শনী" লব্ধ অর্থ (১১০৲) সংস্কারসমিতির তহবিলে যায়।

এখানে উল্লেখযোগ্য—৪ঠা আশ্বিন ২০শে সেপ্টেম্বর এবং ৫ই আশ্বিন (২১শে সেপ্টেম্বর) রবীন্দ্রনাথ যে-ভাষণ দেন সেই বাংলা ভাষণ দুটি, প্রবন্ধটির ইংরেজি অনুবাদ, অনশন উপলক্ষ্যে মহাত্মাজীর সঙ্গে "তারের" আদান-প্রদান, Message on Mahatmaji's birth day প্রভৃতি প্রবন্ধ—*Mahatmaji and the Depressed Humanity* এই নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের সব সংস্কারসমিতিকে দেওয়া হয় (Proceeds from the sale of this book will go to the SAMSKARA-SAMITI, VISVA-BHARATI, for helping in its work of removing untouchability.)

মহাত্মাজীর উপবাসের সময়—তরুণ অধ্যাপকদের কেউ কেউ মন্তব্য করেন—"এই সময় নাটক অভিনয় করা বা তার রিহার্সেল দেওয়া—কি ঠিক হচ্ছে?"

৮ই আশ্বিন, ২৩শে সেপ্টেম্বর, দুপুর বেলা, মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্যে পাকশালার দিকে রওনা হয়েছি—এমন সময় —রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে জরুরী আহ্বান এলো।

উত্তরায়ণে প্রবেশ করে দেখি—রবীন্দ্রনাথের বাসগৃহ—"কোনার্কের" বাইরের বারান্দায় তাঁর টেবিলের উপর একখানি সাদা তুলট কাগজে, বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে:

"এতকাল হিন্দুসমাজে যাহারা অন্ত্যজ জাতি বলিয়া গণ্য, অদ্য হইতে তাহাদের সহিত পানাহারে সামাজিক বাধা মানিব না। ইহাতে সমাজে তিরস্কৃত হইলেও এই প্রতিজ্ঞা পালন করিব।"

গভীর মনোযোগের সহিত লেখাটি পড়ছি—এমন সময় রবীন্দ্রনাথ বেরিয়ে এলেন। তাঁর তখনকার সেই মূর্তি কোনদিন ভুলবো না।

পূর্বেই বলেছি, মহাত্মার উপবাসের সময় তিনি বড়ই বিচলিত হয়ে পড়েন। কিন্তু সেদিন যা দেখলাম—তা সারা-জীবনে আর কখনো দেখিনি।

তাঁর সুদীর্ঘ মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ। চক্ষু ভ্রূকুটি-পূর্ণ। শরীর কম্পমান। সেই "ভীষণ মধুর" অপরূপ রূপের দিকে

বজ্রমুষ্টির ভার চেয়ে আছি—সহসা বজ্রনির্ঘোষের ভায় তাঁর কণ্ঠ ধ্বনিত হলো :—

"মহাত্মাজীর উপবাসে, আমি অভিনয় করছি, তাঁর জন্য আমাকে স্পর্শ করেনি—করেছে তোমাদের কলেজের ঐ তরুণ অধ্যাপকদের।

"এ নাটকটা কী—তারা কি তা বোঝে না!

"এই নাটকের রিহার্সেলে যারা জোর দেখে—রঙনমুটীরে সন্ধেবেলায় তাদের প্রতিদিনের "ব্রিজ খেলা" কি বন্ধ হয়েছে?"

অপরাধীর ভায়, ভয়ে, উদ্বেগে, কম্পিত জদয়ে আমি দাঁড়িয়ে আছি। তিনি সেই লিখিত ভুলট কাগজটি আমার হাতে দিয়ে বল্লেন,

যাও। নিয়ে যাও।[১৩] তোমাদের ঐ অধ্যাপকদের কাছে। এই "প্রতিজ্ঞাপত্রে" সই করার সাহস তাঁদের আছে কি?"

"অত্যন্ত ভীত স্বরে প্রশ্ন করলাম: "আমি সই করবো।"

তিনি বল্লেন—"তোকে[১৩] করতে হবে না। তোর উপর আমার সে বিশ্বাস আছে।

যাদের কথা বলছি—তাদের সই নিয়ে আয়।"

হায় ভগবান। সেকালের প্রাচীন, সরল, অকপট মানুষ। মনে তাঁর এ সন্দেহ কখনো জাগেনি যে—এখানে আমরা গুরুজন বদনে, অকম্পিত হস্তে, বহু প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করি—অথচ জীবনে তা পালন করি না।

সেদিন অপরাহ্নেই রবীন্দ্রনাথ পুণা রওনা হলেন। আমি সেই প্রতিজ্ঞা পত্রে সই সংগ্রহের জন্য, ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

দিনেন্দ্রনাথ (ঠাকুর)-ই তখন আমাদের "কালের যাত্রার" রিহার্সেল চালাচ্ছিলেন। পরদিন অপরাহ্নে রিহার্সেলের সময়, সভয় শুনে তিনি বল্লেন—"দেখ বাপু, পুণা থেকে ফিরে এলে—তুমি যেন আবার ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রটি ওঁকে ফিরিয়ে দিতে যেও না।"

তাঁরই পরামর্শে ওই বহুজনের সইকরা প্রতিজ্ঞা পত্রটি আমি আর রবীন্দ্রনাথকে দিই নাই। তিনিও আর সেটার খোঁজ করেন নি।

(৩)

সংস্কারসমিতির সম্পাদকের নেতৃত্বে ছাত্রছাত্রীগণ দলে দলে গ্রামে গ্রামে অস্পৃশ্যতা বর্জন ও হরিজন উন্নয়নের কার্যে আত্মনিয়োগ করলো।

বিদ্যালয়ের ছুটির পর, বিকেলে তারা খেলাধূলা ছেড়ে, অতি উৎসাহের সঙ্গে এ কাজ করে যেতো। তখন তাদের মধ্যে এক অপূর্ব উন্মাদনা এসেছিল।

শুধু শান্তিনিকেতনে কেন, গান্ধীজির জীবন রক্ষার জন্য সারা ভারতবর্ষে তখন অস্পৃশ্যতা-বর্জনের কাজ প্রবলভাবে চলেছিল। এই সুযোগে, আর্যসমাজ, পুনরুদ্যমে প্রদেশে প্রদেশে, নতুন নতুন কর্মীকে এই অস্পৃশ্যতাবর্জন কার্যে নিযুক্ত করতে লাগলেন।

বাংলাদেশেও যাতে এই কাজ অধিকতর ব্যাপকভাবে হয়, তার জন্য আর্যসমাজ বিশ্বভারতীর নিকট কর্মী চেয়ে পাঠান। রবীন্দ্রনাথ আমাকেই ঐ কাজে যোগ দিতে বলেন।

তখন প্রায় পনেরো বছর আমি শান্তিনিকেতনে অধ্যয়ন করছি। নিম্নপ্রাথ হতে বিশ্বভারতীর শিক্ষাভবনে, শিক্ষাভবন হতে বিদ্যাভবনে আমার শিক্ষা চলেছে। আমি যে আবার কখনো শান্তিনিকেতন ছেড়ে বাইরে যাবো—তা

---

১৩ যাকে সাধারণ "তুই" বলে সম্বোধন করতেন—তাকেই ক্রুদ্ধ অবস্থায় "তুমি" সম্বোধন করেছেন। ক্রোধ শান্ত হওয়ায়; পুনরায় স্বাভাবিক সম্বোধনে আত্মস্থ করেছেন।

কল্পনা করি নি। বিশেষত আমার প্রিয় গবেষণা কাজ একেবারে ছেড়ে দিয়ে, সমাজসেবায় সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করবো—একথা যেন স্বীকার করে নিতে পারছিলাম না।

আমার দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তকে গভীরভাবে নাড়া দিয়ে গুরুদেব বলে উঠলেন :

"দু-একটা লুপ্ত-গ্রন্থ উদ্ধার করে' সংসারে কার কতটুকু উপকার হবে। তার চেয়ে দুর্ভাগাদের সেবা কর—জীবন তোর সার্থক হয়ে যাবে।"

গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সংস্কারসমিতির সম্পাদক শান্তিনিকেতনের বাইরে বৃহত্তর জীবনের উদ্দেশে পাড়ি দিলেন।

প্রাক্তন সম্পাদকের স্থান-ত্যাগে শ্রদ্ধাস্পদ কালীমোহন ঘোষ মহাশয়কে সম্পাদক এবং শ্রীসুধীরচন্দ্র কর মহাশয়কে সহ-সম্পাদক নির্বাচন করা হয়। বিশ্বভারতীর সুপ্রসিদ্ধ কর্মী কালীমোহন বাবু এবং অভয়আশ্রমের সুশিক্ষিত কর্মী সুধীর বাবুর পরিচালনায় সংস্কারসমিতি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক এবং সুশৃঙ্খলরূপে কাজ চালিয়ে যায়।

এই সংস্কারসমিতি পরে শ্রীনিকেতনে পল্লীসংগঠন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত এবং শান্তিনিকেতনে (১৯৩৩-৩৪ সালে) "সংস্কার ভবনে" রূপান্তরিত হয়।

সত্যের খাতিরে স্বীকার করতে হয়, প্রাক্তন ও নতুন, ঐ সংস্কারসমিতির চেয়ে "সংস্কার-ভবন" অধিকতর সংগঠন-মূলক কাজ করে।

শান্তিনিকেতনে দরিদ্র ও দুস্থ (বিশেষত অনুন্নত হরিজন) ছাত্রদের শিক্ষার সুযোগ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। আহার্য, বাসস্থান ও বেতন বাবদ সেকালে স্কুলের ছাত্রেরও মাসিক ব্যয় ছিল পঁচিশ টাকা। কোনো দরিদ্র ছাত্রের পক্ষে শিক্ষার জন্য এত অর্থব্যয় সম্ভব ছিল না।

দুঃস্থ হরিজনদের জন্য "সংস্কার-ভবনে" মাত্র ছয় টাকায় আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়েছিল। বাড়ী হতে চাল আনতে পারলে নগদ টাকা অতি সামান্যই প্রয়োজন হতো।

এই ব্যবস্থা মূলত হরিজনদের জন্য হলেও অন্যদেরও ঐ আহার্য গ্রহণে কোনো বাধা ছিল না।

"সংস্কার-ভবনের" প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম পরিচালক—শ্রীসুধীরচন্দ্র কর। তিনি ঐ ভবনের উন্নয়নকল্পে নানারূপে অর্থোপার্জনের চেষ্টা করতেন। বোলপুর বাজার হতে তরী-তরকারী প্রভৃতি ক্রয় করে এনে শান্তিনিকেতনে সামান্য লাভে তা বিক্রয় করে, তিনি মাসে যা উপার্জন করতেন—তা দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় ব্যয় করতেন।

সুধীর বাবুর পরে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক শ্রীজগদ্বন্ধু ঘোষ (অধুনা লাভপুর বহুমুখী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক) ঐ সংস্কার-ভবনের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। তাঁর সময়েও ঐ সংস্কার-ভবন অতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। নানা কারণে তখন আহার্যের ব্যয় মাসিক আট টাকা নির্ধারিত হয়। ব্যয় বৃদ্ধি হলেও আহার্যও কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্টতর হয়েছিল।

১৯৩৭ সালে (জুলাই মাসে) আমি যখন রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে নবনির্মিত চীনভবনে গবেষক অধ্যাপক রূপে যোগদান করি, তখন আমি কয়েক মাস সংস্কার-ভবন ও সাধারণ পাকশালা, উভয় স্থান হতে আহার্য গ্রহণ করতাম। খাদ্যমূল্যের দিক হতে, উভয় স্থানের খাদ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখি নাই। অবশ্য সাধারণ পাকশালার খাদ্যে, তেল, ঘি ও মসলার পরিমাণ অধিকতর এবং রান্নাও উৎকৃষ্টতর ছিল।

তবে মনে রাখতে হবে—আহার্যের মূল্যও দ্বিগুণ ছিল।

দুঃখের বিষয় "সংস্কার-ভবন" দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। নানা কারণে তার অস্তিত্ব লুপ্ত হয়েছে। জীর্ণ প্রাচীন গৃহটি (যা "সংস্কার-ভবনে" পরিণত হয়েছিল) ভেঙে পড়াই বোধহয় "সংস্কার-ভবনের" অস্তিত্ব লোপের অন্যতম কারণ।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনো এক সময়ে "সংস্কার-ভবন" (প্রাক্তন "বাগানবাড়ী") ভেঙে পড়ে।

"সংস্কার ভবন"[১৪] লুপ্ত হওয়ায় শান্তিনিকেতনে দুঃস্থ হরিজন বালকদের শিক্ষার সুযোগও প্রায় লুপ্ত হয়েছে।

কিন্তু বিশ্বভারতীর অন্তর—শ্রীনিকেতনে তাদের শিক্ষার সুযোগ ও ব্যবস্থা অধিকতর বর্ধিত হয়েছে এবং দিন দিন তা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। "শিক্ষাদানে" বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষা এবং শিল্পসদনে বৃত্তিকরী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বহু দুঃস্থ হরিজন সন্তান নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। গ্রামে, গ্রামেও তাঁদের উন্নয়ন কার্যে শ্রীনিকেতনের গ্রাম-কর্মীগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। হরিজনদের গ্রাম্য পরিবেশ এবং জীবনযাত্রা ক্রমশ অধিকতর উন্নত হচ্ছে।

শান্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতনের আজকের এই পরিবেশ অতিক্রম করে দৃষ্টি আমার ছুটে চলেছে—সুদূর অতীতের সেই দিনে—যেদিন উদার-হৃদয় রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়ে, তাঁরই অনুপ্রেরণায়, কয়েকটি তরুণ কিশোর খেলাচ্ছলে এই আশ্রমের ধূলিতে একটি বীজ বপন করেছিল। সেই বীজ আজ মহীরুহে পরিণত হয়ে, সকলকে শীতল ছায়া এবং সুমিষ্ট ফল প্রদান করছে।

সেদিনের সেই কিশোরেরা, আজ কেউ প্রৌঢ়, কেউ বৃদ্ধ, কেউ বা মৃত, কেউ বা মুমূর্ষু। আজকের এই মহীরুহের ছায়ায় বসে, যখন এ যুগের সর্বজাতির সর্বধর্মের ছেলে-মেয়েরা, সর্বজনীন বনভোজন করছে—তখন কি তারা কল্পনা করতে পারে, একদিন এখানের এই মাটীতে এক বৃহৎ ব্রাহ্মণ-পংক্তিতে ব্রাহ্মণ শিশুগণ আহারে বসতো, তাঁদের প্রথমে পরিবেশন করে' তবে ব্রাহ্মণ পাচকগণ, ব্রাহ্মণেতর জাতির পংক্তিতে অন্ন বিতরণ করতো।

উদার-চরিত রবীন্দ্রনাথ, বিভিন্ন মতবাদী, সকল সম্প্রদায়ের বিদ্বান ও বিদ্যার্থীকে তাঁর আশ্রমে আশ্রয় দিয়েছেন। কারো মত পরিবর্তনের জন্য, বলপ্রয়োগ দূরে থাক—কঠোর বাক্য পর্যন্ত প্রয়োগ করেন নি।

কিন্তু তাঁর অনিন্দ্য সাহচর্য, তাঁর আচরণ, তাঁর শিক্ষা, তাঁর সাহিত্য, সঙ্গীত, নাট্যাভিনয় কিশোর প্রাণে যে-মহান আদর্শের উন্মেষনা এনেছিল—তাতেই "অচলায়তনের" ভিত্তি ভেঙে পড়ে।

---

১৪ "সংস্কারসমিতি" ও "সংস্কার-ভবন" এই প্রতিষ্ঠান দুটিকে অনেকেই গুলিয়ে ফেলেছেন। "সংস্কার-ভবনের" প্রতিষ্ঠাতা শ্রীসুধীর চন্দ্র কর মহাশয়কে অনেকে "সংস্কারসমিতির" প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "রবীন্দ্রজীবনী"তেও (তৃতীয় খণ্ড, ৩৩৭ পৃষ্ঠা) এইরূপ গোলযোগ দেখা যায়।

প্রথম পর্যায়ের "সংস্কার-সমিতি" গঠিত হয় ১৯২৬ সালে। সেই সমিতির আদি সভ্যগণের কেউ-ই নিজেকে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা বলে, প্রচার করতে চান নি। এবং আজও চান না।

দ্বিতীয় পর্যায়ের "সংস্কারসমিতি" (যার মধ্যে প্রাক্তন "সংস্কারসমিতি," প্রাক্তন সভ্যগণের, সকলের সমবেত ইচ্ছায়—অন্তর্ভুক্ত হয়) উত্তরায়ণের "উদয়ন" গৃহে, ১৯৩২ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

সমিতিটি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে, নির্দেশে এবং তাঁরই পৌরহিত্যে সমস্ত আশ্রমবাসীগণের প্রতিনিধি-মণ্ডলীর সমক্ষে গঠিত হয়। সুতরাং তাঁকেই সংস্কার-সমিতির প্রতিষ্ঠাতা বলা উচিত।

"রবীন্দ্রজীবনীতে" রবীন্দ্রজীবনের এই স্মরণীয় ঘটনাটির উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

জল মাটি মন

ম হী তো ষ বি শ্বা স

[৪]

শাওনমাসের মাঝামাঝি মাঠের নিড়ান-বাছাইয়ের কাজ সব শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তাই বলে যে ফুরসৎ জুটেছে তা নয়। আরো অনেক কাজ আছে। কাঠুখালির বিলে ধান হয় দু'রকমের, আউশ আর আমন। আউশ হ'ল আশু ধান। এর ফলন হয় তাড়াতাড়ি। রাঙা'ল, মানিকমুড়ি, বোয়ালে কা'লেবরই, বউপাগলা—এমনি আরো নানান নাম আউশ ধানের। আমনের ফলন হয় দেরীতে। দিঘে, মাহুরাঙা, কালাবদই, ভোজনকলা, মালভোগ—এগুলো হ'ল আমন ধানের নাম। আউশ আর আমন দু'রকমের ধানই একই সময়ে বোনে কাঠুখালির মানুষেরা। নিড়ান বাছাইয়ের কাজও চলে একই সঙ্গে। আমন ধান কাটবার সময় অগ্রহায়ণ আর পৌষ। মাঝখানে কেটে যায় আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন আর কার্তিক মাস। ভাদ্র আশ্বিন মাসে যখন কাঠুখালির বিলটা অথৈ জলে ডুবে ডুবে যায়, সব গাঁয়ের বাড়ীগুলো দ্বীপের মতন বানের জলে ভাসতে থাকে, তখন সেই জলের সাথে তাল রেখে রেখে বেড়ে চলে আমন ধানের গাছগুলো। যত জল হবে, আমন ধানের গাছগুলোও ততই বেড়ে চলবে। আমন ধানকে তাই বলে 'বড়ান' ধান।

কিন্তু আউশ ধানের রীতি প্রকৃতি আলাদা। অল্পবয়েসী মেয়ের মা হওয়ার মতন আউশ ধান বড়ো তাড়াতাড়ি ফলন দেয়। বোশেখ নাগাদ বীজ ছড়াতে পারলে শ্রাবণ ভাদ্রে আউশ ধান ঘরে তোলা যায়। বেশী জল হাওয়া সইতে পারেনা আউশ ধান। অল্প জলে অল্প হাওয়ায় এরা দিব্যি ক্ষেত আলো করে ধরে। শ্রাবণ ভাদ্রের বড়ো কাজ হ'লো আউশ ধান ঘরে তোলা। গোটা বর্ষাকালটার খরচ চলে আউশ ধানে।

আরো কাজ আছে। পাট কাটার কাজ, ধানের বীজ ছড়াবার সময়েই পাটের বীজও ছড়াতে হয়। ধান হ'ল লক্ষ্মী। তার ঠাঁই সকলের আগে। কিন্তু পুটও ফেলনা নয়। নগদ দুটো কাঁচা পয়সা হাতে আনতে পাটের আর জুড়ি নেই। তাই কাঠুখালির মানুষেরা ধানের সাথে সাথে পাটেরও চাষ করে। আউষ ধান কাটার সময়ে পাট কাটতে হয়। আঁটি, বাঁধা বাঁধা পাট গাছগুলোকে জলের নীচে ডুবিয়ে রাখতে হয়। কিছুদিন বাদে গাছগুলো পচে' ওঠে। তখন সেই পচা গাছগুলোকে জল থেকে তুলে পাটের আঁশগুলোকে আলাদা করে ছেঁচে বেছে তুলতে হয়। জলে ধুতে হয়, তারপর রোদে শুকিয়ে 'গাইট' বাঁধতে হয়। পাটে কাঁচা পয়সা পাওয়া যায়। কিন্তু সে পয়সা ঘরে আনতে হাঙ্গামা-হুজ্জতও কম করতে হয় না।

কাঠুখালির বিলে এখন আউশ ধান আর পাট কাটার ধুমধাম। চলবে বেশ কিছুদিন ধরে। আকাশটাকে এ-সময় বোঝা ভার। মেঘ হল তো একেবারে কমুরম্ বিষ্টি। আর আর মেঘ না থাকলো তো কাঠ-কাটা ঠা ঠা রোদ্দুর। আর তেমনি গরম। লোকে বলে ভাদ্দুরে গরম।

বদরামদের আউশ আর পাটের ফসল এবার ভালোই।

ঘরে ঢুকতে হিমসিম খেয়ে যেতে হচ্ছে। এখন আর গতোর ঝুলোয় না। তাড়াতাড়ি কাজ করা দরকার। প্রায়ই তাই নগদ মজুরী দিয়ে কিষাণ কিনতে হয়। বলরাম-ও দশহাতে খাটছে। কিষাণ কিনে খাটাচ্ছে। বড় খাটুনী পড়েছে।

রাত্রে বলরাম বাইরের ঘরে শোয়। ঘরের পাশে গোয়াল। গোয়াল ভরা গরু। রাত্রে উঠে মাঝেমধ্যে গোরু গুলোকে খেতে দিতে হয়। বর্ষাকালে ডাঁশ আর মশার বড়ো উপদ্রব বাড়ে। সাঁজাল দিয়ে ওদের তাড়াতে হয়। আধ-ভিজে পচা খড় গাদা দিয়ে সাঁজাল সাজাতে হয়। সাঁজালে আগুন দিলে ভিজে খড় জ্বলে উঠতে পারে না। খালি ধোঁয়া হয়। চোখ জ্বালা করে। সেই ভ্যাপ্‌সা ধোঁয়ায় মশাগুলো বড়ো জব্দ থাকে। বর্ষাকালে সব গোয়ালেই সাঁজাল দেওয়া নিয়ম। বাড়ীর এসব কাজকর্মও দেখাশুনো করতে হয় বলরামকে। বাপ বুড়ো মানুষ। এসব কাজকর্ম এখন আর তেমন দেখাশুনো করতে পারে না। কোলের ছেলে আর সংসার সামলে সংসার পক্ষেও এদিকে আর নজর দেওয়া হ'য়ে ওঠে না। সংসারে আছে আর এক বুড়ি। বলরামের কেমন যারা পিসী হয়। বিধবা হবার পর শ্বশুর বাড়ী থেকে চলে এসেছে। এখানে ওখানে ছিল কিছুদিন। নিজের ভাই আছে,সেখানেও ছিল অনেকদিন। কিন্তু মুখের দোষে শেষ পর্যন্ত কোন জায়গাতেই টিকতে পারেনি। ঠেলা-গুঁতো খেয়ে বলরামদের বাড়ী এসে উঠেছে। এখানেই থাকে এখন। তবে মুখের দোষ যাবে কোথায়? এখানেও এক একদিন বেধে যায় বলরামের সংসার সঙ্গে। বাড়ীতে সেদিন কাক-চিল বসতে পারে না। তবে বুড়ীর একটা গুণ আছে, বেশ খাটতে পারে। আর সেই গুণেই এ-বাড়ীর ভাতটা এখনো ওঠেনি বুড়ীর। বাড়ীর এইসব কাজকর্মের বেশীর ভাগই করতে হয় বুড়ীকে। কিন্তু বুড়ী বড়ো ঘুম-কাতুরে। তাছাড়া রাতে উঠে গরুর দেখা-শোনা করা সম্ভব-ও নয় বুড়োমানুষের পক্ষে। বলরামকে তাই বাধ্য হয়ে এদিকেও নজর রাখতে হয়। রাত্রে বলরাম সেজন্য গোয়ালের পাশে বাইরের ঘরটাতেই শোয়।

সেদিন যেন বলরামের ঘুম আসছিল না। চারদিকটা কেমন নিঝুম। থমথমে। ঝিঁ ঝিঁ গুলো শুধু বিশ্রী আওয়াজ তুলে একটানা ডেকে চলেছে। ভীষণ গুমোট পড়েছে। গরমে গা-টা যেন গুলিয়ে উঠতে চায়। ঘরের পিছন দিকটা আর ডান পাশটায় শুধু ছাঁচা বাঁশের বেড়া। আর সব দিক খোলা। কিন্তু হলে হবে কি! এক ফোঁটা হাওয়া নেই। আকাশটা থমথম করছে, জল নামতে পারে, বলরামের ঘুম আসছিল না, গরমে আশপাশ করছিল। পহর খানেক রাতের সময় একবার উঠল। কুপিটা জ্বালাল। গোয়ালঘরে ঘুরে ঘুরে গরু গুলোকে খড় দিল। তারপর সাঁজালটা উস্‌কে দিয়ে ঘরে এলো। পায়ের আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে পাঁকুই-এর পোকাগুলো বড়ো কিলবিল করছে। পাঁক খেঁটে খেঁটে ঘা হয়। তাই এর নাম হল পাঁকুই। বর্ষাকালে এর হাত থেকে ওদের কারোরই রেহাই নেই। সারাটা সময়ই তো জলের মধ্যে কাজ, জলে পচে' আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে সাদা ঘা-গুলো ঘিক্ ঘিক্ করতে থাকে। পোকার কামড়ে শরীরে জ্বালা ধ'রে যায়।

বলরাম পায়ের আঙুলের ফাঁকগুলোতে খানিকটে চুঁতে ভিজিয়ে ঘসে' দিল, যন্ত্রণার ছিড়বিড়ানি যেন এবার একটু কমল। পাঁকুই-এর পোকা চুঁতের বড়ো জব্দ থাকে।

ফুঁ দিয়ে কুপিটা নিভিয়ে বলরাম আবার শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম যেন আজ আর কিছুতেই আসবে না। নানান এলোমেলো ভাবনা মাথার মধ্যে জট পাকাচ্ছে। পদ্মর সঙ্গে আর দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। কথাবার্তাও হয়নি। বড়ো কাজের চাপ পড়েছে আজ কদিন। সারাটা সময় কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে হয়। কাজের কথা ছাড়া অন্যকিছু ভাববার সময় হয় না। কিন্তু এই নিশুতি রাতে অনর্গলিছি

সব যখন ঘুমে নিস্তব্ধ হয়ে যায়, তখন বলরামের চোখে ঘুম আসে না। সব ভাবনা এসে মাথায় চাপে। শুয়ে শুয়ে পদ্মর কথা ভাবে। কি যে হয় জানে না বলরাম। কিন্তু বুকখানার মধ্যে কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। শরীর মন অবশ হয়ে আসতে চায়। নিথর রাতের অন্ধকার যেন ওকে হাতছানি দিয়ে ইশারা জানায়। ঐ রাতের অন্ধকারে কি যে মায়া আছে কে জানে! কিন্তু বলরাম ঐ মায়াবী অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে আর সামাল দিয়ে রাখতে পারে না। ঘর ছেড়ে যেখানে হোক বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়।

অনেকক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করল বলরাম। তারপর কখন যে একটু ঘুম এসেছিল খেয়াল নেই।

ঘুমটা ভেঙে গেল হঠাৎই। একটা ভারী কি যেন চেপে রয়েছে ওর দেহের উপর। হাত বাড়াতেই অনুভব করল নরম একটা উষ্ণ পুষ্ট শরীর। ফুলে ফুলে কাঁদছে। নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। চীৎকার করে উঠতে গিয়েও পারল না বলরাম। চকিতে কি যেন একটা সন্দেহ হল। তাড়াতাড়ি উঠে বসল। ফিস্‌ফিস করে বলে উঠল—"কেডা? পদ্ম নাকি?"

অন্ধকারের মধ্যে সেই উষ্ণ শরীরটাও এবার উঠে বসল। জবাব দিল—"হয়, আমি পদ্ম, আলাম তোমার কাছে।"

তখনো যেন ঘোর কাটেনি বলরামের। তেমনি ফিস্ ফিস্ করে কাঁপা গলায় বল্ল—"এতো রাত্তিরি আলে কি ভাবে? কেউ ট্যার পায়নি?"

পদ্ম কথা কয় না। চুপ করে থাকে।

বলরামের গলাটা এবার একটু রুক্ষ শোনায়—"কি, কথা কচ্ছো না যে?"

পদ্ম এবার কথা কয়। বলে—"না, কেউ ট্যার পায়নি। বাবা বাড়ী নেই। মা বারান্দায় শুয়ে আছে। আমি শুইলাম ভাইডারে নিয়ে ঘরে। কিন্তুক জানো, আমার মোটে ঘোম আসে না। তোমার জন্যি মনটা বড় কান্দে। থাকতি আর পারলাম না। তাই চলে আ'লাম।"

বলরাম গুম্ হয়ে বসে থাকে। কোনো জবাব দেয় না। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার চারদিকে। ভাবতে থাকে বলরাম। নিশি-রাতের ঐ ঘরছাড়ানো মায়ার ডাক তাহলে একা তাকেই পাগল করেনি। ও ডাকে পাগল হয়েছে পদ্মও। ঘর ছেড়েছে। ঘর ছেড়ে চলে এসেছে ওর কাছে। এক ঘর থেকে আর এক ঘরে।

বলরামকে চুপ করে থাকতে দেখে পদ্ম এগিয়ে এসে বলরামের গা ঘেঁষে বসে। এই অন্ধকার রাত্রি যেন ওকে বেহারা, বেলাজ করে তুলেছে। বলরামের হাত দুটি টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে বুকের উপর। অভিমানী গলায় বলে—"আমি আ'লাম বুলে তোমার রাগ হলো নাকি?"

কি উত্তর দেবে বলরাম এ-কথার! যে পদ্মর কথা ভেবে ভেবে রক্তে ওর ভাঙ্গনের বান আসে, যে পদ্মর মুখখানা মনে করে ঘুমোতে গিয়েও ওর চোখে ঘুম আসে না—সেই পদ্ম এসেছে ওর ঘরে। ও আসাতে বলরামের রাগ হয়েছে কি না জানতে চাইছে। এ-কথার কি জবাব দেবে বলরাম!

বলরাম কোনো জবাব দিলো না। দুই হাতের শক্ত বাঁধনে শুধু পদ্মকে টেনে নিলো বুকের মধ্যে। বাতাসের সোনার পাকাধানের সোহাগ মাখা পদ্ম এলিয়ে দিল নিজেকে বলরামের দীঘল বুকে। দুটি দেহের মধ্যে আর কোনো ভেদ রইল না। মিশে মিশে যেন একাকার হয়ে যেতে চাইল। শুধু দুজনের দুটি দ্রুত উষ্ণ নিঃশ্বাসের শব্দ গহীন রাতের অন্ধকার সাগরের তল ছেপে চলল। অনেকক্ষণ ধরে।

তারপর একসময় ফিস্‌ফিস্ করে বলে উঠল পদ্ম—"কি করবা কিছু ঠিক কত্তি পারলে?"

আবার সেই ভাবনার কথা! যে ভাবনার কোনো কিনারা করতে পারেনি এখনো বলরাম। উদাস গলায় জবাব

দেয়—"না পদ্ম, কিছু ঠিক করতি পারিনি। কি যে করা যায় বুঝে উঠতি পারতিচি না।

একটুক্ষণ চুপ করে থাকে পদ্ম। তারপর বলে—"সেই যে কইছিলে শহরে যাবা—আমারে নেবা?"

বলরামের গলাটা যেন উৎসাহে জ্বলে ওঠে—"তুমি যাবা? তুমি যাবা পদ্ম আমার সাথে? পলায়ে যাতি পারবা আমার সাথে শহরে? ভয় পাবা না তো?"

পদ্মর মুখখানা হাসিতে ভরে ওঠে। দু'হাতে বলরামের গলা জড়িয়ে ধরে মুখের কাছে মুখ এনে বলে—

"তোমার সাথে যাবো, তার আবার ভয় কিসির? তুমি যে আমার সাহস গো!"

নিবিড় ভালবাসায় বলরাম পদ্মর মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দেয়। পদ্ম বলে—"জানো, আজকাল নীলে মোড়ল পেরায়ই আসে। বাবার সাথে কিসব ফুসুর ফুসুর করে। কাল যার কাছে শোনলাম—ছেয়াবন মাসের আটাশে নাকি বিয়ের দিন আছে। বাবা আমারে ঐদিন নীলে মোড়লের সাথে বিয়ে দেয়া ঠিক করতিচে। বাবা আজ পাকা কথা কতি গেছে নীলে মোড়লের বাড়ী। তাই আর থাকতি পারলাম না। চলে আলাম। তা আমারে তুমি কি এইভাবেই ভাসায়ে দেবা?"

বলরামের গলাটা ভারী হয়ে আসে. পদ্মর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে—"ছিঃ, ওকথা কইয়ে না। আমারে তুমি ভুল বুঝোনা পদ্ম। আর যানে কোনো পথ নেই, জানে পলায়েই যাবো আমরা শহরে। শুনিচি শহরে খাটতি পারলি পয়সার অভাব নেই। দিন আমাগের ভালোই চলে যাবে।"

পরম নির্ভরতার সঙ্গে পদ্ম জড়িয়ে ধরে থাকে বলরামকে। তার ভালবাসার পুরুষ এবার তাকে সব ভয়ের হাত থেকে রক্ষা ক'রবে। তাকে নিয়ে ঘর বাঁধবে। এর চেয়ে আর বেশী কিছু চায়না পদ্ম।

আবেশে ওর চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসে।

বলরাম বলে—"তালি কও, কবে তুমি আমার সাথে যাতি পারবা?"

আহ্লাদে বুজে আসা গলায় বলে পদ্ম—"তা কি আমি কবো? সে ভাবনা তো তোমার। তুমি যা কবা, তাই হবে।" বলরাম ভাবে। মনে মনে দিনক্ষণের হিসেব করে। তারপর বলে—

"আটাশে তোমার বিয়ের দিন। তালি ঐ সাতাশ তারিখই ঠিক থাকল। সন্ধ্যে ঘোর হ'লি পুকুরপাড়ে বড়ো তালগাছটার তলায় আসে দাঁড়াইও। আমি থাকবো ঐ খানে। পারবা তো আসতি?"

বলরামের বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে পদ্মর মাথা নাড়ে। হ্যা, তাই হবে।

পদ্ম এবার আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। গায়ের বেসামাল কাপড় ঠিক করে পরে। তারপর বলে—"তালি এবার আমি যাই। আর বেশী দেরী হলি মা জানতি পারবেনে।"

বলরামও উঠে দাঁড়ায়। বলে—"চলো, তোমারে এটু আগোয়ে দি।"

দু জনে ঘর ছেড়ে উঠোনে নেমে আসে। সাবধানী চোখ মেলে এদিক ওদিক তাকায়। কেউ কোথাও দেখেছে কি না দেখে। তারপর পা টিপে টিপে এগোয়। এক সময়ে পদ্মদের বাড়ীর কাছাকাছি এসে যায়।

আস্তে আস্তে পদ্ম অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। একা একা দাঁড়িয়ে রইল বলরাম। রাত আর বেশী নেই। এ-বাড়ী ও-বাড়ী থেকে চেঁকির পাড়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। মেয়েরা ভোর রাতে উঠে ধান ভানছে। খানিকটে ভিজে ভিজে ঠাণ্ডা বাতাস এসে লাগল বলরামের গায়ে। মাথায়। আকাশের দিকে তাকাল বলরাম। পুব-আকাশের পোহাতী-তারাটা কেমন যেন জল জল ক'রে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

[৫]

মাঝখানের তিনটে দিন যেন বিকারের রোগীর মতন কাটল বলরামের। কাজকাম করেছে। খেয়েছে। ঘুমিয়েছে। কিন্তু কোনো কিছুতেই যেন মন নেই। সব কেমন ভাসা ভাসা। অবস্থা! মনের মধ্যে চমকে চমকে উঠেছে। এখনই যেন কি ভুল হয়ে যেতে পারে। আর একটু ভুল হলেই সব গোলমাল হয়ে যাবে। বলরাম তাই প্রাণপণে কি যেন মনে ক'রে রাখবার চেষ্টা করে। বুকের মধ্যে সবসময়েই কিসের একটা ধুক্‌পুকানি।

অবশেষে এসে গেল সাতাশ তারিখের দিন। দিনটা শেষও হয়ে গেল।

সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে সারা কাঠুখালির ঘাট-মাঠ ক্ষেত-প্রান্তর ঘর-দোরের উপর কে যেন একটা পাতলা কালো চাদর বিছিয়ে দিল। ক্ষেতের কাজে গিয়েছিল বলরাম। বিকেল না গড়াতেই বাড়ী ফিরে এসেছে। বাড়ীর সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে। এ-ঘর থেকে ও-ঘরে গেছে। এই ঘর, এই বাড়ী—জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে বলরাম এদের দেখে আসছে। এর সব জিনিষগুলোর যেন একটা মন আছে। এরা মানুষের মতন কথা বলতে পারে না। কিন্তু এদের স্পর্শ কর, এদের গায়ে গা ছুঁইয়ে দাঁড়াও! দেখবে, তোমার মনের সঙ্গে ওদের মনের সব চেনাজানার ভাল-বাসাটাকে ছড়িয়ে দেবে। বড়ো মমতা হবে তখন। বলরামের মনের মধ্যে সেই মমতার ব্যথাটাই যেন টনটনিয়ে উঠল। কিন্তু সে সামান্য সময়ের জন্য। ওর রক্তের মধ্যে জাগছে নিশি-রাতের মায়ার ডাক। সে ডাক ওকে ঘর ছাড়া করবে।

সব জায়গা ঘুরে ঘুরে গোয়াল-ঘরে গেল বলরাম। সাঁজালের ধোঁয়াটে আলোয় গোয়ালের ভিতরটা ছায়া ছায়া দেখাচ্ছে। গাইটা শুয়ে আছে এ-পাশে। শুয়ে শুয়ে বাছুরটার পিঠ চাটছে। পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল বলরাম ও পাশটায়। এক ধারে বাঁধা রয়েছে রাঙা দামড়াটা। আর এক ধারে ধলা দামড়াটা। বলরাম বলদ দু'টোর মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালো আস্তে আস্তে ওদের পিঠের উপর হাত রাখল। হাত রাখতেই ওদের পিঠের টান্‌ টান্‌ মসৃণ চামড়ার উপর একটা মৃদু কাঁপুনি খেলা করে গেল। অন্ধকারের মধ্যেও বলরাম বুঝতে পারল বলদ দু'টো ওর মুখের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে। ওরা কি কিছু বলতে চায় বলরামকে? তরল অন্ধকারের মতন ওদের ঐ চোখ দু'টোতে কি কোনো ভাষা আছে? বুঝতে পারে না বলরাম—কি বলতে চায় ঐ অবোলা প্রাণী দুটো। অনেক দিনের অনেক সুখদুঃখের সাথী ওরা। চোত-বোশেখের আগুনঝরা রোদ্দুরে খটখটে মাঠে লাঙল দিতে দিতে যখন তেষ্টায় টাকরা শুকিয়ে উঠেছে, রৌদ্দুরের হলকায় কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠছে। তখন ঐ দুটি ভাষাহীন অবোলা প্রাণীই বলরামের সাথে সাথে কাজ ক'রে চলেছে। ওর শ্রম, ঘাম সমানি ভাগে ভাগ করে নিয়েছে ওরাও। বলরামের সব দুঃখ সুখ আনন্দ অনুভূতি যেন ওরা জানতে পারে। আজও কি ওরা জানতে পেরেছে বলরামের মনের কথা? বলরামের ফাঁকি কি ধরা পড়ে গেছে ওদের কাছে? বলরাম ওদের ছেড়ে যাচ্ছে, ওদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে—এ-অযুক্ত দুঃখ কি সত্যিই ফুটে উঠেছে ওদের দু'চোখের বোবা ভাষায়?

তাড়াতাড়ি ওদের পিঠের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিল বলরাম। ওর দু'চোখের মধ্যে কির কির করে উঠল একটা অসহ্য যন্ত্রণা। একছুটে গোয়াল ঘরের ভিতর থেকে একেবারে বাইরে এসে দাঁড়াল।

আর দেরী নয়। এবার বেরোতে হবে। এতোক্ষণে পদ্ম হয়ত এসে গেছে। পুকুর পাড়ে তালগাছটার নীচে অন্ধকারে একা একা দাঁড়িয়ে আছে। পদ্মর কথা মনে হতেই বলরামের মনটা চাঙা হয়ে উঠল। পদ্ম কুসুমের সেই সুডৌল বুকের নরম ছোঁয়াটুকু যেন সারা অঙ্গ দিয়ে অনুভব করল। সেদিনের ঐ রাত্রিটা যেন ওর রক্তে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে

গেছে। নিভছে না। কিছুতেই নিভছে না। দুঃখের আগুনের মতন ধিকি ধিকি ক'রে জ্বলছে। জ্বলছেই। একটু নাড়া পেলেই দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠছে। বড়ো জ্বালা তার বুকে। পুড়িয়ে পুড়িয়ে মারছে বলরামকে।

বলরাম ঘরে গেল। ছোটো একটা পোঁটলা বের করে আনল। পোঁটলাতে কয়েকটা টুকিটাকি জিনিষ। কাপড়, গামছা। আর কয়েকটা নগদ টাকা। অতিকষ্টে জমানো বলরামের সামান্য সম্বল। বিদেশ বিভুঁই। টাকা তো লাগবেই। তাছাড়া পদ্ম থাকবে সঙ্গে। কাজ-কাম করে দুইবে তার তো ঠিক নেই। দুটো মানুষের পেট।—চালাতে তো হবে।

শেষ বারের মতন বলরাম বাড়ীটার দিকে আর একবার চোখ বুলোল। আকাশে ছোট্ট একফালি চাঁদ উঠেছে। একটা মেটে মেটে আলোয় সব জিনিষগুলো ঢেকে গেছে। বলরাম আর পিছন ফিরে তাকালো না। হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে চলল।

রাস্তায় খোক্ খোক্ কাদা জমেছে। পথটা সংক্ষেপ করবার জন্য বলরাম আর সোজা রাস্তায় গেলনা। বাঁ পাশের পাটের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে সোজা উঠল গিয়ে পুকুর পাড়ে। বর্ষার জল খেয়ে খেয়ে পুকুরটা সেই ফুলিয়ে ওরে আছে। একেবারে কানায় কানায় ভর্তি। পুকুরের চার পাড় জুড়ে খেজুর গাছ। অল্প অল্প বাতাসে খেজুর গাছের পাতার লম্বা ডালগুলো দুলছে। শির শির ক'রে শব্দ উঠছে। আধো অন্ধকারে জোনাকী গুলো এ-ঝোপ থেকে ও-ঝোপে উড়ে বেড়াচ্ছে। মিটি মিটি আলো জ্বেলে কি যেন খুঁজছে। বলরাম এগিয়ে চলল। পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে বড়ো তালগাছটার তলায় এসে দাঁড়ালো। ভালো ক'রে দেখল। না, পদ্ম এখনো আসেনি। এখনো হয়ত সুযোগ পায়নি। সুযোগ না পেলে বাড়ী থেকে বের হবে কি করে। আসুক যখন হোক।

তালগাছের গোড়াটায় বসল বলরাম গুটিসুটি মেরে। এ-জায়গাটা তার বড়ো ভালো লাগে। কতোদিন চোত-বোশেখের দাবিদাটা রোদে ক্ষেতে লাঙল দিয়ে এসে এই থানটায় বসেছে। জিরিয়েছে। বড়ো শীতল ছায়া এই তালগাছটার!

তালগাছটার মাথায় কি অন্ধকার! কিছুই দেখা যায় না। বলরাম মনে মনে ভাবল,—অন্ধকারটা যেন ওর ভবিষ্যতের মতনই। কিছুই আঁচ করা যায় না। বলরাম সেই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। একটু বাদেই ঘাড়টা টন্‌টন্ করে উঠল। নিজেকে ওর ভীষণ ক্লান্ত বলে মনে হল। বুকের মধ্যে যেন হাঁক ধরে গেছে। বলরাম মাথাটা নামাল।

পদ্ম এখনো আসছে না। কেন আসছে না কে জানে। মনের মধ্যে বড়ো অশান্তি লাগছে বলরামের। কেমন যেন একটা ভয় ভয় বোধ হচ্ছে। পদ্ম এসে পড়লে অবশ্য এ-সব আর থাকবে না। সব ভয়-ভূত দূর হয়ে গিয়ে রক্ত ওর উজিয়ে উঠবে। সেদিন রাতে পদ্ম ওর বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে বলেছিল "তুমি যে আমার সাহস গো!"—কথাটা বড়ো ভালো লেগেছিল বলরামের। কিন্তু বলরামই তো শুধু পদ্মর সাহস নয়। পদ্মও যে বলরামের সাহস। পদ্মর একটি ডাকে বলরাম আজ সব ভুলেছে। সমাজ-সংসার সকলকে ডিঙিয়ে পদ্মকে নিয়ে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখছে। কাউকে পরোয়া করে না বলরাম। নিজের পথ সে নিজেই ক'রে নেবে। একটি ঘর আর পদ্ম!—তার মনের মানুষ। আর কিছুই চায় না সে।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল বলরাম। বসে থাকতে আর ভালো লাগছে না। তালগাছটার গোড়ায় যেন বড়ো বেশী অন্ধকার। উঠে গিয়ে একেবারে পুকুরের কোণে গিয়ে দাঁড়াল। তালগাছের গোড়ায় লক্ষ্য রাখল। পদ্ম আবার কখন এসে হাজির হয়।

পুকুরের এ-পাশে আগাছা জঙ্গল কম। শুধু একটা বাবলাগাছের চারা ছোটো ছোটো হাতপা মেলে দাঁড়িয়ে

আছে। পুকুরের পাড়টা বেশ খানিকটে উঁচু। গাছের নীচে দিয়েই ধানক্ষেত। বলরামের নজর এতোক্ষণ এদিকে পড়েনি। হঠাৎ এদিকে ঘুরে দাঁড়াতেই সমস্ত দৃশ্যটা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। পশ্চিম আকাশের সেই চাঁদের কালিটা এখনো ডোবেনি। নতুন শান্ দেওয়া একখানা ঝক্‌ঝকে কাস্তের মতন আকাশের গায়ে ঝুলে আছে। আর তার মেটে মেটে আলো ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত কাঠুখালির বিলের উপর।

অবাক চোখ মেলে সেদিকে তাকালো বলরাম। একটা অদ্ভুত দোলায় ওর মনটা যেন দোল দিয়ে উঠল। কিছুই ভালো ক'রে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু সমস্ত কাঠুখালির বিলটা একাকার হয়ে গিয়ে ওর চোখের সামনে যেন এই মুহূর্তে জীবন্ত হয়ে উঠল। ভালবাসে বলরাম কাঠুখালির বিলকে। এখানেই তার সুখ। এখানেই সে তার সব দুঃখ-ভোলার সান্ত্বনা পায়। বারোমাসে বারোটি রূপ ধরে কাঠুখালির বিল। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্তের মধুর খেলা বসে এখানে। সে রূপের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলরাম হেসেছে, খেলেছে। কখনো বা চোখের জলে ভেসেছে। এমনি করে এক কুড়ি পাঁচটি বছর পার করে এসেছে। কিন্তু কাঠুখালির বিলের এমন রূপ তো সে কোনোদিন দেখেনি। এ কোন্ মোহিনী তার সামনে দাঁড়িয়ে চাঁদের আবছা আলোর সঙ্গে গা মিলিয়ে সবুজ শাড়ী প'রে কারা যেন শুয়ে আছে সারা কাঠুখালির বিল জুড়ে। ওদের গায়ের কোমল মধুর গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। ডাকছে বলরামকে। ওদের দু'চোখের করুণ হাতছানি দিয়ে ওরা যেন জড়িয়ে ধরতে চাইছে বলরামকে ওদের বুকের মাঝখানে।

পাড় হারিয়ে ফেলল বলরাম, কোন্ যাদু যেন মন্ত্র দিয়ে ওর মনটাকে অবশ ক'রে দিয়েছে। আস্তে আস্তে বলরাম পুকুর পাড় থেকে নেমে এলো। জলকাদা ভেঙে এগিয়ে চলল ধানক্ষেতের ভিতরে। তারপর একসময় পুকুর পাড়টা আবছা হয়ে এলো। বলরাম এগিয়ে চলল, কোথায় চলেছে জানেনা। মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়ায়, কোমর সমান আমন ধান। হাল্‌কা বাতাসের দোলায় পাতায় পাতায় ঘসা লাগছে। শির্‌শির্ ক'রে শব্দ উঠছে, বলরামের মনে হলো, ধারা যেন ফিস্ ফিস করে ওর কানে কানে কথা বলছে। ওর চার পাশে যেন সবুজ চাঁচর দুলিয়ে হাজার হাজার কিশোরীরা খেলা ক'রে বেড়াচ্ছে। বলরামকেও ওদের খেলায় যোগ দিতে বলছে। চিনতে পারল বলরাম ওদের। বৈশাখের কচি-মেয়ে আজ শ্রাবণশেষে কিশোরী হয়েছে। দু'মাস যেতে না যেতেই আবার রূপ পাল্টাবে। যুবতী হয়ে কখন দেবে। এরা যে বলরামের কতোদিনের চেনা। ওরা যে ওর কত আপন!

সম্মোহিত বলরাম দাঁড়িয়ে রইল। কিশোরী ধানচারা গুলি পাড়াগেঁয়ে পল্লবালি মেয়ের মতন বলরামকে ঘিরে নাচতে লাগল ঘুরে ঘুরে। হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে।

হঠাৎ মাথার উপর দিয়ে একটা প্যাঁচা ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। সেই কর্কশ শব্দ কানে যেতেই চমক ভাঙল বলরামের। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল পদ্মর কথা। পদ্ম নিশ্চয়ই এতক্ষণে এসে গেছে। একা একা দাঁড়িয়ে থেকে হয়ত ভাবনায় পড়েছে।

বলরাম তাড়াতাড়ি ফিরবার জন্য পা বাড়াল। কিন্তু পা বাড়াতে গিয়েও যেন পারল না বলরাম। সে দিন পদ্ম এসে ছিল ওর ঘরে। অন্ধকারের নিশির ডাক পাগল করে দিয়ে গেছে ওর এক কুড়ি পাঁচ বছরের ধামাল যৌবনকে। কিন্তু সে-রাতের ডাকের চেয়েও আজকের এ-রাতের ডাকে যেন অনেক বেশী মায়া। অনেক বেশী মমতা। সে-রাত বলরামকে ঘর থেকে বাইরে এনেছে। পথে টেনে নিয়ে এসেছে। অজানা অচেনার উদ্দেশ্যে তাকে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু আজকের এ-রাত বলরামকে ফিরিয়ে দিতে চাইছে চেনা ঘরের বাঙ্গায়। এ-ডাকে বড়ো সোহাগ! বড়ো

নিবিড় এই ডাক! এই জল-হাওয়া, ক্ষেত-প্রান্তর, গ্রাম-গাঁও এরই মাঝখানে মানুষ হয়েছে বলরামের বাবা। তার ঠাকুরদা, পুরুষের পর পুরুষ এই ডাকের মায়ার ঘর বেঁধেছে। সুখে দুঃখে মানব জনম ভোর করেছে। কেউ কোনদিন বাঁধন ছিঁড়ে বাইরে যায়নি। যেতে সাহস করেনি, ঘরের মেয়েমানুষ আর উদোম ক্ষেতের সোধাগী ধান—দুটোকেই ওরা সমান মমতায় বুকে তুলে নেয়। এটাকে বাদ দিয়ে আর একটাকে নিয়ে জীবন ওদের চলে না।

বলরামের মনের মধ্যেও যে সেই মায়ালু রক্তের ছোঁয়া রয়েছে। একদিকে তার ভালবাসার পদ্মকুসুম, আর অন্যদিকে তার বাপ-ঠাকুরদার সাত পুরুষের মমতা-জড়ানো এই গ্রাম-গাঁও, ক্ষেত-খামার! কাকে ছেড়ে আজ কাকে নেবে বলরাম! সোহাগের মেয়েমানুষের টানটাই বড়ো হয়ে উঠেছিল বলরামের কাছে। পদ্মকে নিয়ে তাই গ্রাম ছাড়তে চেয়েছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে বলরাম বুঝতে পারল, পদ্মকুসুমের চেয়েও অনেক বেশী টান তার এই কাঠুখালির ক্ষেত-খামার আর জল হাওয়ার দিকে। এক পদ্মকে নিয়ে সে শহরে চলে যাচ্ছে, কিন্তু এই কাঠুখালির দিগন্ত জোড়া বিল জুড়ে যে হাজার হাজার পদ্মকলি তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। এদের সে কার কাছে রেখে যাবে। পদ্মকুসুম তার ঘামাল বুকের অথৈ রক্তে আগুন জ্বালায়। কিন্তু কাঠুখালির এই শ্যামলকচি পদ্মকলিরা যে তার সারা অঙ্গ জুড়ে ঘুম-পাড়ানি গান গায়। তার সারা বুক ভরে শান্তির পরশ বুলিয়ে দেয়। কোথায় যাবে এদের ছেড়ে বলরাম। পদ্মকে হয়তো একদিন ভুলে যেতে পারবে। কিন্তু এদের কেমন ক'রে ভুলবে বলরাম। এরা যে ওর রক্তের সঙ্গে এক হয়ে গেছে।

বলরাম ফিরবার জন্য পা বাড়াল, জলকাদা ভেঙে এগিয়ে চলল। মন ওর ঠিক হয়ে গেছে। হোক পদ্মর বিয়ে নীলমণি মোড়লের সঙ্গে! কি আর করা যাবে। অদৃষ্টের লিখন বলেই মেনে নেবে বলরাম। কিন্তু পদ্মর জন্য কাঠুখালিকে সে ছেড়ে যেতে পারবে না। না, কিছুতেই না!

ফিরে এলো বলরাম পুকুর পাড়ের কাছাকাছি। কাস্তের মতন চাঁদখানা আকাশের কোনে হারিয়ে গেছে। এখন আরো বেশী অন্ধকার ঘনা বেঁধেছে পুকুর পাড়ের ঝোপ-ঝাড়গুলোর মধ্যে। ক্ষেতের ভিতর থেকে বলরাম উঠে এলো পুকুর পাড়ে। আর পুকুর পাড়ে উঠেই লক্ষ্য করল তাল গাছের নীচে থেকে একটা কালো মূর্তি আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে তার দিকে। চুপিসাড়ে, বুঝতে পারল বলরাম—পদ্ম আসছে। ভয় মানেনি, ভয় মানেনি। ভালবাসার পুরুষের একটি ইশারায় সব কিছুকে জয় করে ফেলেছে। মা-বাপ ভাই-বোনের সব মমতার বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে তার কাছে ধরা দিতে আসছে। জীবন মরণ, মান-ইজ্জত সব কিছু তার হাতে সঁপে দিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্নে অজানার নৌকায় পা বাড়িয়েছে।

এতোক্ষণে যা হয়নি বলরামের, এবার যেন তাই হল। ভীষণ ভয় পেয়ে গেল বলরাম, পুকুরের পাড় থেকে ক্ষেতের মধ্যে নেমে পড়ল তাড়াতাড়ি। হন্ হন্ ক'রে পা চালিয়ে দিল একেবারে উল্টো মুখে। একবারও থামল না। পিছন ফিরে তাকাল না।

আর ওদিকে এগিয়ে আসতে আসতে থমকে দাঁড়াল পদ্মর ছায়ামূর্তিটা। বলরামের গমন পথের দিকে তাকিয়ে শুধু অস্ফুটে একবার চীৎকার করে উঠল। কিন্তু কাঠুখালির বিলভরা হাজার হাজার কিশোরীর সতিনী, কৌতুকের কিস্-কিসানিতে পদ্মর সে বুকভাঙা, ক্ষীণ আর্তনাদ কোথায় মিলিয়ে গেল, কেউ শুনতেও পেলো না।

ক্রমশঃ

: উপন্যাস :

কষ্টি ভরা বিষ

মিহির মুখোপাধ্যায়

চার

তালপুর সংস্কৃত টোলের পণ্ডিত ভীমদাস আচার্য। আট দশটি ছাত্র তার ওখানে থেকে পড়াশোনা করে, আরো আট দশটি রোজ সকালে এসে সারাদিন পাঠচর্চার পর বিকেলে যে যার ঘরে ফিরে যায়। এই টোলের প্রতিষ্ঠাতা পিতামহ শ্রীধর আচার্য। তালপুরের কিছুদূরে সারদাগ্রাম তার পৈতৃক ভিটে। শ্রীধর আচার্যরা ছিলেন সাত ভাই। তাদের পুত্র-পৌত্ররা ছড়িয়ে আছে ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, সারদাগ্রাম, গাজিপুর আরো নানা জায়গায়। ভীমদাস সকলের খোঁজ রাখেন না, রাখা সম্ভব নয়। তবে জ্ঞাতিভাইদের কারো কারো সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা আছে। যেমন সারদাগ্রামের নরোত্তম আচার্য। তিনি শুধু জ্ঞাতি ভাই নন, গুরুভাইও বটে। একগুরুর শিষ্যশিষ্য তাঁরা।

পণ্ডিত হিসেবে ভীমদাসের খ্যাতি আছে। অবশ্য সে যুগে পাণ্ডিত্যের খ্যাতি পাওয়া সহজ ব্যাপার ছিল না। নবদ্বীপ কিম্বা ভট্টপল্লির পণ্ডিত সমাজের স্বীকৃতি পাওয়া যেমন তেমন লোকের পক্ষে সম্ভব হত না। ভীমদাস অতটা খ্যাতিমান না হলেও, মওলঘাট পরগণার সংস্কৃত শিক্ষক সমাজে তাঁর অধ্যাপনার সুনাম ছিল।

আচার্যের আশ্রমটি চমৎকার। আশ্রমে ঢোকার মুখেই যমজ বোনের মত পাশাপাশি দুটি বকুল গাছ। ডানদিকে লম্বা ঘরটায় ছাত্ররা থাকে। মাটির ভিত, মাটির দেয়াল, বাঁশের খুটি, খড়ের ছাউনি। সামনেই টোল ঘর' একই রকম চেহারা, তবে মাটির দেয়াল নেই, উঁচু মাটির ভিত, বাঁশের খুটির উপর খড়ের ছাউনি, চারধার খোলামেলা। তারপর দুখানি ঘরের অন্দরে থাকেন আচার্যের দুই স্ত্রী।

একজন বন্ধ্যা, চিররুগ্না, স্বাভাবিক কারণেই খিটখিটে। আর একজন ম্লান হাসিমুখে সংসারের সব কাজ করেন। রুগ্না সপত্নীর পরিচর্যা করেন, টোলের ছাত্রদের রান্নার আয়োজনে সাহায্য করেন, স্বামীর সুখ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখেন। এমনিতে ভাল মানুষ, কিন্তু কোন কারণে ক্ষেপে গেলে চেঁচিয়ে চুল ছিঁড়ে কেঁদেকেটে হাট বাঁধাবেন। তাঁর একমাত্র মেয়ে বিয়ের পর নবদ্বীপে শ্বশুর ঘরে চলে গেছে। এছাড়া একটা চালার নীচে রান্নার উনুন জ্বলে, গোয়ালে তিনটে গরু, দুটো বাছুর, গোটা দুয়েক, বেড়াল। পেছনের পুকুরে মাছ বেশী নেই বটে, তবে জলটা বেশ ভাল।

কিন্তু আচার্যের সাংসারিক সুখ-শান্তি তাঁর দুই স্ত্রী এমন পরিপাটি ভাবে ভাগ করে নিয়েছেন যে, তাঁর নিজের জন্য আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

আচার্য তাই আপন মনে পুঁথি-পত্তর নিয়ে থাকেন। মাটির দোয়াত খাগের কলম নিয়ে একটার পর একটা দুষ্প্রাপ্য পুঁথি নকল করেন, শামুকের ঝিনুক থেকে ঘন ঘন নস্যি টানেন, সামান্য কারণে কঠোর শাস্তি দেন আবার সামান্য অসুখে প্রাণ দিয়ে সেবা করেন।

সারাদিন ছাত্রদের শব্দরূপ মুখস্ত করান, টিকা ভাষ্য বোঝান, বকাবকি করেন, পুঁথি-পত্তর ঘেটে ঘেটে

অলঙ্কারের সূত্র সন্ধান করেন, উপমা-উৎপ্রেক্ষা-রূপকের রহস্য খোঁজেন।

তারপর যখন দিনের আলো ফুরিয়ে যায়, ছাত্ররা ছুটি নিয়ে ঘরে ফেরে, পুঁথির অক্ষর আপসা মনে হয়, আচার্য তখন আপন মনে বকুল তলায় পায়চারী করেন, কখনো টোল ঘরের বাঁশের খুটিতে ঠেস দিয়ে নিঃসঙ্গ বসে থাকেন, আজও বসেছিলেন। ঘুরে ঘুরে দু'একটি গৃহস্থ বাড়ির তুলসীতলায় সন্ধ্যা-দীপ জ্বলে উঠল। আরো ঘুরে বিস্তৃত মাঠের শেষে শালবনের মাথার পশ্চিম আকাশটা কিছুক্ষণ লাল হয়ে রইল। খণ্ড খণ্ড মেঘের তুলিতে নানা রঙের ছবি আঁকল, তারপর সন্ধ্যার রঙ মেখে ধূসর বিবর্ণ হ'ল। ভীমদাস সোজা হয়ে বসলেন, লক্ষ্য করলেন, মাঠের পাশের রাস্তা দিয়ে কারা যেন আসছে। শালবন অনেক পেছনে ফেলে এগিয়ে আসছে, আরো কাছে এলো, আশ্রমের পাশ দিয়ে চলে না গিয়ে সোজাসুজি বকুলতলার দিকে এল। এবার এগিয়ে দেখতে হয়। অসময়ে অতিথি এল নাকি, হতে পারে। অতিথি তো অসময়েই আসে, তিথি মেনে অবশ্য না বলেইতো অতিথি।

তবে অতিথি সৎকারের আন্তরিকতা আজকাল কমে যাচ্ছে। আগের দিন আর নেই। হিন্দু রাজা-মহারাজাদের দান-ধ্যান আর মোগল-পাঠান আমীর-ওমরাহদের দরবার মজলিশে উদার আপ্যায়নের দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। পশ্চিম থেকে নতুন হাওয়া বইছে। ডাচ-ইংরেজ-ফরাসীরা আমদানী করছে নতুন রুচি, নতুন দৃষ্টি। ফিরিঙ্গি বণিকদের কাছ থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য শেখার জন্য দেশ, গাঁয়ের মানুষ যাচ্ছে নগর বন্দরের দিকে। সেখানে নানা পণ্যের সম্ভার, কাঁচা টাকার লেন-দেন, ব্যবসার প্যাঁচ-পয়জার, হুঁসিয়ার বণিক-বুদ্ধির খেলা। সেখানে লাভ-লোকসানের হিসেব-কষা মন অতিথিকে অন্তরের অন্তরে আনার ঔদার্য হারিয়েছে, নতুন শিষ্টাচারের পর্দা ঝাড়ানো ভদ্রতার চমকার ওপারে তাকে দাঁড় করিয়ে রাখে। দেশকাল সমাজ বদলে যাচ্ছে। ভাবতে ভাবতে কয়েকপা এগিয়ে গেলেন পণ্ডিত মশাই। তাজপুর সংস্কৃত টোলের পণ্ডিত ভীমদাস আচার্য।

"প্রণাম পণ্ডিত মশাই।"—সবচেয়ে সামনের লোকটি মাথা নীচু করে জোড়হাত কপালে ঠেকাল। এ যে, নওয়াপাড়ার কালিনাথ বাড়ুয্যে।"

—"আরে এস এস কালিনাথ, এই ভর-সন্ধেবেলা হঠাৎ কি মনে করে?"

—"এলুম পণ্ডিত মশাই আপনার কাছে ছাত্র নিয়ে, একটি আমার ভাইপো আরেকটি ভাগ্নে।"—কালিনাথের পেছনে আরো দুটি ছোট ছেলে। আর একজন বলিষ্ঠ গড়নের মানুষ, বোধহয় পাইক, হাতে বাঁশের লাঠি, পোটলা-পুটলি। ছাত্রের কথা শুনে আচার্য যেন একটু গম্ভীর হলেন। ভালভাবে না জেনে শুনে তিনি নতুন ছাত্র স্বীকার করেন না। ছেলে দুটি এগিয়ে এসে পায়ের ধুলো নিল।

—"ভাইপো বলছ, তারানাথের ছেলে বুঝি, আর ভাগ্নেটি কে?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ দাদার ছেলে এটি, ওর ওপর এক বোন আছে, আর এটি আমার বোনের ছেলে, যে বোনকে ভুবনডাঙা বিয়ে দিয়েছিলাম, আপনি তো জানেন সবই।"

—"ও, নরেন রায়ের ছেলে, সদাশিব রায়ের নাতি, ওদের কি একটা সোনাদাস হয়েছে শুনলাম, বর্ধমানের মহারাণী নাকি"—

সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে ভীমদাস পণ্ডিতের লম্বা-চওড়া চেহারাটার দিকে ভাগ্নেচন্দ্র ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে ছিল, বিকুপদও একেবারে চুপচাপ। ভীমদাসের গলায় মোটা পৈতের গোছা, মাথায় কদম ছাঁট চুল, মোটা টিকি, মোটা ধুতি, পায়ে খড়ম।

ছাত্রদের ঘর থেকে দু'তিনটি ছাত্র বেরিয়ে এসেছে। তাদের মধ্য থেকে একটি কর্সামত ছেলে এগিয়ে এসে কালিনাথকে প্রণাম করে বলল।—"কেমন আছ দেজদা,

শুনলাম দিদি নাকি এসেছে, আমি এদিকে যেতে পারছি না।"

—"এই যে সৌরী, আছি একরকম আমরা, বিষ্ণুকে আর ভবানীর ছোট ছেলে ভারতকে নিয়ে এলাম, টোলে দিয়ে যাব ভেবেছি, এখন যদি পণ্ডিত মশাই অনুগ্রহ করে রাখেন।

—"এই নাকি দিদির ছোটছেলে, ওকে তো মুখে ভাতের সময় দেখেছি এতটুকু।"—ছেলেটি এগিয়ে এসে ভারতকে কোলে টেনে নিল। এই নিশ্চয় ছোটমামা সৌরীনাথ, কৌতূহলের চোখে তাকাল ভারত।

বিষ্ণুপদও একটা চেনামুখ দেখে ভরসা পেল, এতক্ষণ ছোটকাকাকেই আশা করছিল সে।

আচার্য বললেন—"সৌরী, এদের থাকার জন্য পুবদিকের ঘরটা পরিষ্কার করে দাও, আর বাড়ির ভেতর খবর দাও।" তারপর ভারতের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—"এর মাথায় এতবড় লম্বা চুল কেন, আমার এখানে চুলের বাহার চলবে না, ওসব রাজবাড়ির কায়দা কানুন"—

কালিনাথ তাড়াতাড়ি জবাব দিল—"না, না, পণ্ডিতমশাই, চুল রাখবে না মাথা কামিয়ে ফেলবে।" ভারতের ইচ্ছে হ'ল এখান থেকে একছুটে পালিয়ে যায়। তার এমন সুন্দর চুল ছেঁটে দেয়া হবে! মা কত যত্ন করে আঁচড়ে দিত, কেমন কালো-কোঁকড়া চুল।

পরদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে ভারতচন্দ্র আর বিষ্ণুপদ শুরু প্রণাম করল। আচার্যের দুটি শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। সূর্যোদয়ের কিছু পরে কালিনাথ আর বিশু লেঠেল বিদায় নিল।

যাবার আগে বিশ্বনাথ ভারতকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললো—"যাই দাদাভাই, যদি যদি দেখতি আসব, ভাল করি লেখাপড়াডা শিখি ফ্যালো।"

বিশুদাদার ময়লা গায়ে তামাকের গন্ধ, তবু অদ্ভুত ভালো লাগল।

বকুলতলায় দাঁড়িয়ে রইল দু'জনে, ভারতের বয়স দশ, বিষ্ণুর বারো। ওরা চলে যাচ্ছে, মেজমামা আর বিশুদাদা, মাঠের পাশ দিয়ে শালবনের দিকে। বিষ্ণু ফোঁপাতে লাগল, ভারতের চোখদুটো জ্বালা করে উঠল। দাঁতে ঠোঁট কামড়ে শুকনো চোখে তাকিয়ে রইল।

পাঠচর্চা শুরু হ'ল। ভীমদাস আচার্যকে যতটা ভয়ের চোখে দেখেছিল ভারত, যতটা খারাপ ভেবেছিল, মানুষ অতটা খারাপ নন। স্নেহ পেল ভরপুর, হাতের কাছে দোয়াত-কলম বা পান ছুড়ে ছুড়ে মারেন, কিন্তু রাগ বেশিক্ষণ থাকে না।

আচার্য কিন্তু অবাক হয়ে গেলেন ছেলেটির স্মৃতিশক্তি দেখে।

—"একদিন আর রাতের মধ্যে ধাতুরূপ সব হয়ে গেল!" ভীমদাস একটু বিস্মিত চোখে তাকালেন।

—"আজ্ঞে, হ্যাঁ"—ভারত বিনীত ভাবে সায় দিল।

—"কি করে হ'ল!"

—"আজ্ঞে, পরস্মৈপদী আর আত্মনেপদীর মূল সূত্র শিখে ফেললাম, দু-ধাতু আর সেব-ধাতু মুখস্থ করেছি আর বাকি গুলো সব এক একবার পড়তেই মোটামুটি হয়ে গেল।"

ভীমদাস আচার্য কিছুক্ষণ ভারতের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—"পড়ো বাবা, ভাল করে পড়ো, পড়ার শেষ নেই, জানার শেষ নেই, যত পড়বে তত জানবে আর যত জানবে, ততই জানার আগ্রহ বাড়বে, জ্ঞান সমুদ্র অসীম, সংস্কৃত ভাষা আর সাহিত্যের ভাণ্ডার অফুরন্ত।"

পড়ার শেষ নেই, জানার শেষ নেই। ভারতকে এই পড়ার নেশায়, জানার নেশায় পেয়ে বসেছে। জ্ঞানভাণ্ডারের নানা প্রকোষ্ঠ। বেদ-উপনিষদ, পুরাণ-দর্শন, ব্যাকরণ, অভিধান, সাহিত্য-নাটক, অলঙ্কার, সঙ্গীতশাস্ত্র। সেদিন আচার্য বড় সুন্দর কথা বললেন, ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণের কথা—এগিয়ে

চলাই জীবন, জ্ঞানের পথে, অমৃতের পথে এগিয়ে চল। দেবরাজ ইন্দ্র পথভ্রান্ত রাজকুমার রোহিতকে উপদেশ দিয়ে বলছেন যে বসে থাকে, তার ভাগ্যও বসে থাকে, যে উঠে দাঁড়ায়, তার ভাগ্যও উঠে দাঁড়ায়, যে শুয়ে থাকে তার ভাগ্যও শুয়ে থাকে আর যে এগিয়ে চলে তার ভাগ্যও এগিয়ে চলে, অতএব চরৈবেতি. চরৈবেতি—এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো। কি সুন্দর কথা, কোন ব্রাহ্মণঋষিকুমারের কথা নয় এক ইতরার পুত্র এই কথা বলেছেন —

চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদুমুদুম্বরম্
সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যোন তন্দ্রয়তে চরণ।
চরৈবেতি চরৈবেতি।

চলাই হ'ল অমৃতপ্রাপ্তি, সূর্যের আলোকসম্পদ সৃষ্টির আদি থেকে চলতে শুরু করেছে, একদিনের জন্যও ঘুমিয়ে পড়েনি। অতএব এগিয়ে চলো এগিয়ে চলো।

ভারতের মন যেন এই চলার মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে। জীবনের জটিল পথ চলেছে নানাদেশ ঘুরে ঘুরে, নানা জনের মন ছুঁয়ে ছুঁয়ে কোন অমৃত লোকের দিকে। জানা অজানার আলো-আঁধারের মধ্য দিয়ে জ্ঞানের পথ পৌঁছেছে চূড়ান্ত সিদ্ধিলাভের কোন রহস্যঘন ভুবনে। সেখানে কি কেউ পৌঁছুতে পারে? সমস্ত জীবন দিয়েও তো জানার শেষ হয় না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতকে জানার পরেও অজানা থাকে ইন্দ্রিয়াতীত সৌন্দর্য লোকে উত্তীর্ণ হবার পথ।

পাঁচ

চার বছর কেটে গেল। চারিটি শীত, চারিটি বসন্ত। দশবছরের ভারতচন্দ্র এখন চোদ্দ বছরের কিশোর। মাথায় কিছু লম্বা হয়েছে, টোলের কঠিন জীবন গায়ের রং একটু ময়লা করে দিয়েছে। একটু শীর্ণ শরীর, দৃঢ়, লঘু, মুখের সেই কচি কোমল ভাব নেই, পরিবর্তে দৃঢ়তার ছাপ। দিনরাত পড়াশোনা করে, পুঁথি নকল করে। হাতের অক্ষর মুক্তোর মত। আচার্য মশাই মোটা মোটা পুঁথি এনে নকল করে দিতে বলেন। ভারতের ক্লান্তি নেই, দুইচোখে জিজ্ঞাসার দৃষ্টি নিয়ে বসে আছে। পুঁথি নকল করার সঙ্গে সঙ্গে পড়ার কাজও চলে।

ভীমদাস আচার্য আরো কাজের বোঝা চাপিয়ে দেন। সবসময় খুঁত্‌খুঁত্‌ করেন—"হচ্ছে না, ভালো হচ্ছে না, আরো পড়ো, আরো জানতে হবে, আরো শিখতে হবে।"

আরো পড়তে হবে, আরো জানতে হবে। পড়ার শেষ নেই, জানার শেষ নেই। আচার্যকে খুশি করার জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করে ভারত। বিষ্ণুপদ বিরক্ত হয়—"কি যে দিনরাত পুঁথি মুখে দিয়ে বসে থাকিস্! বুড়োর তিনকাল গিয়ে এককাল ঠেকেছে, খেয়ে বসে কাজ নেই, বত্তরাজ্যের পুঁথি এনে তোকে দিয়ে নকল করায়, ছোট কাকাকেও বলিহারি, এখন নবদ্বীপ থেকে সব পুঁথি পাঠাচ্ছে, এসব নকল করে তোর কি লাভ হবে?"

নকল করে কি হবে ভারত জানে না। ছোটকাকা গৌরীনাথ এখানকার পড়া শেষ করে নবদ্বীপ চলে গেছে। সেখান থেকে ভাল ভাল পুঁথি সংগ্রহ করে পাঠায়। ভীমদাস আচার্য সেগুলি নকল করে রেখে পুঁথি ফেরত পাঠিয়ে দেন। কতগুলি পুঁথি গৌরীনাথ নিজেই নকল করে পাঠিয়ে দেয় টোলের জন্য। আচার্য সেগুলি আবার ভারতকে দিয়ে নকল করিয়ে রাখেন। এই ভাবেই গুরুশিষ্যক্রমে পুঁথির প্রচার হয়েছে, সংগ্রহের কাজ চলেছে। কাশী-কাঞ্চী-কোশল-মিথিলা-গৌড়-নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজ পরস্পরের কাছাকাছি এসেছেন। বিষ্ণুপদ নাছোড়বান্দা। তাকে ঠেলেঠুলে বাইরে নিয়ে আসে। দু'জনে বিচিত্ররূপ পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। এর মধ্যে দু'একবার মাসীবাড়ি গেছে, বাসন্তীদির বিয়ে হয়ে গেছে। স্বামী বর্ধমানের রাজসরকারে চাকরি করেন। মেজদা-সেজদাকে নিয়ে মা ভুরশুটের বাড়িতে ফিরে গেছেন। বিশুদাদা মাঝে মাঝে এসে খোঁজখবর নিয়ে যায়। তার বয়স

আরও বেড়েছে, মাথার চুলে পাক ধরেছে, আগের মত স্বাস্থ্য আর নেই। কোন কোনবার সঙ্গে রঘুও এসে দেখা করে গেছে। কিন্তু কেমন যেন ছাড়া-ছাড়া হয়ে গেছে ভারত। প্রথম প্রথম বাড়ীর জন্য মন কেমন করত। মা বাবা, বড়দা-সেজদা সেজদা—নানাভাবে নানা জনের কথা মনে পড়ত। ঘুরঘুটের বাড়িতে রাত্রির প্রহরে প্রহরে পাহারা বদলের সময় দূর থেকে ভেসে আসত ঘণ্টার শব্দ। দেউড়িতে দাঁড়িয়ে ঘণ্টা পেটাত মুকুন্দ সিং, রামসিং কিম্বা লছমন পাঁড়ে।

ভোর হতে না হতেই ঝি-চাকরের মহলে কাজের সাড়া পড়ে যেত। কলমদাসী আসত ছেলেদের হাত মুখ ধোয়াতে। সারক্ষণ কলকল করে কথা বলত। রোজ খিটিমিটি লাগত সেজদার সঙ্গে। সেজদা যখন ওকে আচড়ে-কামড়ে চুল টেনে অস্থির করে তুলতো সে আর সেজদা তখন দুধের বাটি উল্টে দিয়ে হাত-পা ছুড়ে চেঁচাত। কেন যে এমন করত, তারা কেউই ভালভাবে জানত না। শুধু কলমদাসীকে ক্ষেপাতে হবে, জব্দ করতে হবে। এই আনন্দেই তারা উদ্দাম হয়ে উঠত, সেজদার সঙ্গে যোগ দিত।

আজ মনে হলে হাসি পায়। মনে হয় যেন, অন্যজন্মের অন্য এক জীবনের কথা। এই চারবছর আচার্যের টোলে থেকে পুরনো পৃথিবীর স্মৃতিটুকু যেন ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে। যে মাকে ছেড়ে এক মুহূর্তও কাটতো না, সেই সিঁথিতে সিঁদুর টানা মায়ের মুখের ছবিও অস্পষ্ট মনে হয়।

হাতের কলম রেখে বাইরের দিকে চোখ মেলল ভারত। পুব আকাশ কর্সা হয়ে এল। বকুল গাছের ঘন পাতার আড়াল থেকে একটা কাক ডাকছে। কখন রাত কেটে গেল টের পায়নি। সারারাত বসে পুঁথি নকল করেছে। জলচৌকির মত একটা কাঠের জেকের ওপর মাটির দোয়াত, খাগের কলম আর পুঁথি-পত্তর। মাসখানেক আগে ছোট-মামা নিজে এসে একখানা পুঁথি দিয়ে গেছেন। কলপুরাণের বাংলা অনুবাদ। পুঁথিখানার নাম কালীখণ্ড। সেখানা নকল করছে ভারত। গঙ্গার সহস্র নামের উল্লেখ আছে পুঁথির মধ্যে। খাঁটি অক্ষর 'অ' থেকে 'ক্ষ' পর্যন্ত। নাম লিখতে লিখতে কখন ভোর হয়ে গেছে আর কেন যেন মায়ের কথা মনে পড়ল।

শেষ রাতে অল্প বৃষ্টি হয়েছিল। ঠাণ্ডা হাওয়ায় ভেজা মাটির গন্ধ। ওপাশে বিষ্টুটা কেমন আধেয়লা কাঁথা জড়িয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। নিভু নিভু প্রদীপটা ফুঁদিয়ে নিভিয়ে দিল ভারত। সারারাতে অনেকবার তেল দিতে হয়েছে। এই জন্যই বিদ্যাধর রাগ করে। টোলের ভাঁড়ার ঘরের ওপারক করে বিদ্যাধর। তেল পুড়িয়ে সারারাত জেগে অত পড়াশোনা কেন, বাপু। পড়াশোনার পাট বেলাবেলি চুকিয়ে নাও। সন্ধ্যার পর একটু সময় নাম-কীর্তন শোন, গল্পগুজব করো। কোথাও যাত্রাগান হলে সারারাত বসে শুনতে পারো, না হয় নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়। রাত্রির বেলা আবার পড়াশোনা কিসের। বিদ্যাধরের সোজা কথা। কাপড়ের খুঁটটা গায়ে জড়িয়ে বাইরে এল ভারত। আকাশে তখনো দু'একটা তারা। খণ্ড খণ্ড মেঘ ভেসে যাচ্ছে। বকুলতলা পেরিয়ে মাঠের দিকে খানিকটা হেঁটে গেল। তারপর পুব আকাশ সামনে রেখে আবার আশ্রমের দিকে ফিরে চলল। পূর্ব দিগন্ত যেন মায়ের সিঁথির মত লাল হয়ে উঠল। বাণভট্টের বর্ণনা মনে পড়ছে। সূর্যরশ্মি যেন সম্মার্জনী শলাকার মত আকাশ প্রাঙ্গণ থেকে তারাফুলগুলিকে মুছে দিচ্ছে।

বকুলতলার কাছাকাছি এসে একটু অবাক হ'ল ভারত। একটি মেয়ে ফুল কুড়োচ্ছে। বছর ন'দশ বয়স হবে। পরণে ময়ূরকণ্ঠি রঙের শাড়ি, আঁচলটা কোমরে জড়ান। কালো কোঁকড়া এলো চুল পিঠের ওপর, আর মুখের দু'পাশে ছড়িয়ে রয়েছে। বকুলতলাটা ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে। কিন্তু এত ভোরে এই মেয়েটি এলো কোথা থেকে। আশ্রমেতো কোন মেয়ে নেই। কাছাকাছি সেবক-বাড়ির মেয়েরাও কেউ এত ভোরে এদিকে আসেনা। আশ্রমের পেছনের

পুকুর থেকে অনেক বাড়ির বৌ-ঝিরা জল নিয়ে যায় অবশ্য। মেয়েটি বোধহয় পায়ের শব্দ শুনেই মুখ তুলে দাঁড়াল। বকুল-ফুলের মত স্নিগ্ধ চোখে কিছু সঙ্কোচ আর কৌতূহল। এই শান্ত ভোরের প্রথম আলোর সঙ্গে মেয়েটির মুখের যেন মিল রয়েছে।

হাওয়ায় বকুল ফুলের গন্ধ, ভেজা মাটির গন্ধ আর টোল ঘর থেকে ছেলেদের প্রার্থনার স্বর,—তমসো মা জ্যোতির্গময়। ভারত কয়েক পলক মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল।

ততক্ষণে মেয়েটির সঙ্কোচের ভাবটা যেন কেটে গেছে। ফুলের ডালা হাতে নিয়ে চলে যাবার মুখে মুখ ফেরাবার সময় জিজ্ঞেস করল ভারত—"কাদের মেয়ে তুমি?"

—সারদাপীঠের আচার্যিদের।

—এখানে কোথায় এসেছো?

—জ্যাঠামশায়ের বাড়ি।

তোমার জ্যাঠামশায়ের নাম কি?—ভারতের প্রশ্ন শুনে মুখটিপে হাসল মেয়েটি। মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে একটু দ্রুত ভঙ্গিতে কথা বলে—চেনো না তাকে, এই টোলের গুরুমশাই, আমার ছোট ভাইয়ের হাতে খড়ি হবে, জ্যাঠামশাই হাতে খড়ি দেবেন, কাল সন্ধেবেলা আমি বাবার সঙ্গে ছোট ভাইকে নিয়ে এসেছি।

ভারতের খেয়াল হ'ল। কাল একবার শুনেছিল বটে, আচার্যদেবের জ্ঞাতিভাই এসেছেন। কয়েকদিন হয়তো থাকবেন এখানে। বিদ্যাধর তাই গল্‌গল্‌ করছিল। ভাঁড়ারে চাল-ডাল বেশি নেই।

আজকাল শিষ্যবাড়ি থেকে চাল-কলার সিধে আর আগের মত আসে না। আশ্রমের ছাত্র-সংখ্যাও কমে আসছে। দেশের লোক সব ব্রেজ্ঞ হয়ে যাচ্ছে। মক্তব-মাদ্রাসায় গিয়ে আরবী-ফারসী শিখছে। এসময় যখন-তখন অতিথি এলে একটু টানাটানিতে পড়তে হয় বৈকি। সব ব্যক্তি পোষাতে হয় এই বিদ্যাধর শর্মাকেই। অনেকদিন ভেবেছে, অনেকের কাছে বলেওছে, এবার টোল ছেড়ে দেবে। কিন্তু এই সাত-আট বছরে কেমন মায়া পড়ে গেছে, আর উপাধিটাও পাওয়া গেল না। কিন্তু উপাধি মিলবে কি করে, বিভক্তি-বহুবচনের ব্যূহ ভেদ করে এগোনোই যে মুস্কিল, অনুস্বার-বিসর্গগুলো যেন চাল-অলোয়ার উঁচিয়ে থাকে। পড়াশোনার চেয়ে বৈষয়িক ব্যাপারেই বিদ্যাধরের বুদ্ধিটা খোলে ভাল। আশ্রমের ঘরদোর সারানো, গরুবাছুর দেখাশোনা, ভাঁড়ারের হিসেব রাখা, আচার্যের ফুফাতো জমি থেকে আদায়-উশুল করা—এসব কাজে বিদ্যাধর বেশ পটু। সেজন্য আচার্যদেবের ছোট গিন্নী তাকে স্নেহ করেন। আচার্যদেব নিজেও তাকে পড়াশোনার কথা বেশি জিজ্ঞেস করে বিব্রত করেন না। কাল সন্ধেবেলা বিদ্যাধর গল্‌গল্‌ করছিল নতুন অতিথির উৎপাতের জন্য। ভারত তেমন কান দেয়নি তার কথায়। কাশীখণ্ডের কাশীবাসের মাহাত্ম্য বর্ণনা তার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

এখন হেসে বললো—"ও তুমি আচার্যদেবের ভাইঝি, নাম কি তোমার?"

সুন্দর চোখ দুটি বড়বড় করে জবাব দিল মেয়েটি—'আমার ডাকনাম রাধা, ভাল নাম সরস্বতী, আমার দুই দিদির নাম গঙ্গা আর যমুনা, আমার ছোট ভায়ের নাম বিন্দু ভাল নাম বিশ্বনাথ।"

—বাঃ সুন্দর নাম তোমাদের, গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী, তোমার দিদিরা কেউ আসেনি।

—"না বড়দি'র বিয়ে হয়ে শ্বশুর বাড়ি চলে গেছে, মেজ'দি মায়ের কাছে রয়েছে, তোমার সঙ্গে আমি আর বকবক্ করতে পারিনা বাপু, অনেক কাজ আছে আমার"—মাথা দুলিয়ে দ্রুত কথা বলার ভঙ্গি দেখে ভারত হেসে ফেলল, রাধাও একটু হেসে চলে গেল।

টোল ঘরের মধ্যে বসে ছাত্রদের প্রার্থনার স্বর শুনতে শুনতে ভীষদাস আচার্য দেখলেন, দূরে বকুলতলায় দাঁড়িয়ে

নরোত্তমের মেয়েটি কোকড়া চুল দুলিয়ে হেসে হেসে কি যেন কথা বলছে ভারতের সঙ্গে, তারপর দু'জনেই হেসে দু'দিকে চলে গেল। ভারত গেল নিজের ঘরের দিকে আর নরোত্তমের মেয়েটি এদিকে এসে টোল ঘরের বারান্দা দিয়ে চলে গেল অন্দরের দিকে। ওদের দু'জনকে পাশাপাশি দেখে ভীমদাসের মনে পড়ল, নরোত্তম বলেছিল, টোলের ছাত্রদের মধ্য থেকে তার মেয়ের জন্য একটি পাত্র দেখে দিতে। ভারতের সঙ্গে হলে কেমন হয়। তাদের পালটি ঘর। ভারত ভাল বংশের ছেলে। যদিও অবস্থা পড়ে গেছে, তাহলেও লেখাপড়ায় ভাল আর রূপের দিক থেকেও—দুটিতে মানাবে ভাল। ভোরের প্রথম আলোয় ওদের দুটিকে পাশাপাশি দেখে কেন যেন মনে হ'ল ভীমদাসের, না, ওদের মানাবে ভাল, ওরা সুখী হবে। নিজের জীবনের একটা দিক অপূর্ণ রয়ে গেছে, ওদের মধ্যে, ওদের জীবনে সে দিকটা পূর্ণ হবে, সফল হবে। তাকেই উদ্যোগী হয়ে একাজটা করতে হবে আজই কথাটা তুলতে হবে নরোত্তমের কাছে। একটা নতুন কিছু করার আগ্রহে প্রবীণ আচার্যের প্রৌঢ় মনটা যেন অদ্ভুত আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল।

নরোত্তম আচার্য কিন্তু প্রস্তাব শুনে প্রথমটা খুব উৎসাহ দেখালেন না। মাথা চুলকে আমতা আমতা করে বললেন—"তুমি তো বলছো দাদা, ছেলেটিও সব দিক থেকে ভালই বলতে হবে, কিন্তু ওর বাপ কি রাজী হবে, শুনেছি নরেন রায় নাকি ধার্মিক মানুষ, বর্ধমানের মহারাণীকে কি বলেছিল জানোত, আমার মত গরীব ব্রাহ্মণের মেয়ে নিতে কি তিনি রাজী হবেন!"

ভীমদাস কোন কথা না বলে তাকিয়ে ছিলেন, তার মুখ-চোখের চেহারা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছিল। একটু থেমে আবার বললেন নরোত্তম—"কিছু মনে করোনা দাদা, আরো কথা আছে, আমরা হলাম কষ্ট শ্রোত্রীয়, ওরা কুলিয়ার মুখুটি, ভরদ্বাজ গোত্র, উঁচু বংশতো বটে, কতটাকা পণ চেয়ে বসবে, কে জানে, আরো জমিদারী না থাকলেও রাজবংশের ছেলেতো ঠিকই।

—"আরে রেখে দাও তুমি"—ভীমদাস আচার্য চোখের পলকে বদরাগী ভীমপণ্ডিত হয়ে গম্‌গম্‌ করে উঠলেন,—"আমার কিন্তু আমার ভাই-ঝিকে বিয়ে করতে পণ চাইবে, ব্রহ্মশাপ লাগবে না, আর ভারত আমার খুব অনুগত ছাত্র, তবে হ্যাঁ জেদি ছেলে, লেখাপড়ার ব্যাপারে জেদ আছে, যা ধরবে তা শেষ করে ছাড়বে, ওর মামাতভাই বিষ্ণুপদর সঙ্গে রেষারেষি করে রাত জেগে পড়ে, বিষ্ণাধরকে ক্ষেপাবার জন্য সারারাত প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে, বিষ্ণাধর এসে আমার কাছে নালিশ করে, আমি কিছু বলি না। বড় ভাল ছেলে ভারত, সদ্‌বংশের ছেলে, রাজবংশোচিত শিষ্টাচার, নম্রতা, ওদের জন্মগত গুণ, কারো শিখিয়ে দিতে হয় না, তুমি আর আপত্তি করো না নরোত্তম, দিয়ে দাও, আমি বলছি, ওরা সুখী হবে, আমার মন বলছে, তোমার মেয়ের কল্যাণ হবে, আজ ভোর-বেলা দুটিকে বকুলতলায় দেখলাম যেন উমা মহেশ্বর।"

তবুও কিন্তু কিন্তু করে বললেন নরোত্তম—"আমি ভাবছি ওর বাবার কথা, তার মতামত"—ভীমদাস বললেন—সে জন্য ভেবো না ওর অভিভাবক হচ্ছে ওর মামারা, নওয়াপাড়ার তারানাথকে জানতো, অতি সজ্জন, উদারচরিত্র, দেনাপাওনা নিয়ে খিটিমিটি করার মানুষ নয় সে, ওর ছোট মামা গৌরীনাথ এই টোলের ছাত্র ছিল, তাকেতো এখানেই দেখেছ তুমি, তাকে খবর দিয়ে আনাচ্ছি আমি, সে এখন নওয়াপাড়াতেই আছে, মাসখানেক আগে নবদ্বীপ থেকে ফিরেছে, ভারতের মেজমামা কালিনাথও ভাল মানুষ, একটু খামখেয়ালী বটে, তবে আমাকে খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, আমার কথা ওরা ফেলতে পারবে না, তাই ভাবছি বিয়েটা এখন হয়ে যাক, ওর বাপকে খবর দেব বিয়ের পরে, আর মেয়েকেতো এখন তুমি শ্বশুরবাড়ি পাঠাচ্ছ না, বড় হোক, ঘরের কাজকর্ম শিখুক, ভারতও নিজের পায়ে দাঁড়াক, তারপর পাঠাবে, এখন

শুধু বিয়েটা হয়ে যাবে, তোমার কোন ভাবনা নেই নরোত্তম, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।"

ছয়

ভারত ভেবে কূল পায়না, ছোটমামা হঠাৎ এলো কেন আর এসেই বা এমন অদ্ভুত কথা বলছে কেন। তাকে নাকি বিয়ে করতে হবে, কি আশ্চর্য কথা! ছোটমামার কি মাথা খারাপ হল।—"না মামা, সে হয় না, বাবা জানল না, মা জানল না, দাদারা কেউ বলল না, আমি এভাবে বিয়ে করব না।"

—"দূর বোকা, তাতে কি হয়েছে, তুই কুলীনের ছেলে হয়ে বিয়ে করতে ভয় পাস্, আর আচার্যদেব নিজে যখন বলছেন, তার কথা কি অমান্য করা ঠিক হবে, ব্রাহ্মণের কন্যাদায়।"

অবাক হল ভারত - পণ্ডিতমশাই বলেছেন।

—হ্যাঁ, ওর ভাইঝিকে তুই নাকি দেখেছিস্, মেয়েটি দেখতে বেশ ভাল, বড়দির অমত হবে না, এ আমি হলফ্ করে বলতে পারি।"

—"পণ্ডিত মশাইর ভাইঝি, সারদা পীরের নরোত্তম আচার্যের মেয়ে।"—ভারত একটু চুপ করে রইল।

সেদিনের ভোরবেলার দেখা, একমাথা কোকড়া চুল, মসৃণকান্তি শাড়ির আঁচল কোমরে জড়ান, সেই ফুটফুটে মেয়েটির চোখ বড় বড় করে এক নিশ্বাসে কথা বলার ভঙ্গী মনে পড়ায় একটু হাসল।

—"এই যে চাঁদ বদন, মুখে হাসি ফুটেছে।"—ছোট মামা জোরে জোরে পিঠ চাপড়ে দিলেন—"কুলীনের ছেলে তুই, চোখ বুজে পটাপট বিয়ে করে ফেলবি, অত ভয়টা কিসের।"

ছোটমামা কেমন ফাজলামি করে, ছিছি। ভারত লজ্জায় হাসি মুখে বললো—"ছিঃ ছোট মামা, তুমি না আমার মামা হও, তোমার মুখে এসব কথা কি শোভা পায়!"

গৌরীনাথ হোহো করে হেসে উঠল—"তুই দেখি একেবারে ভট্টপল্লীর ভট্টাচার্যদের মত কথা বলছিস্, নঃ ব্যাকরণ পড়ে পড়ে তোর রস-কষ একেবারে শুকিয়ে যাচ্ছে, তোকে এবার নবদ্বীপ নিয়ে গিয়ে কিছুদিন রসশাস্ত্র পড়াতে হবে। আগে বিয়েটা হয়ে যাক্, তারপরে তুই আর অমত করিস্ না।"

ভারত তবুও মাথা নাড়ল—"সে কেমন করে হবে মামা, মেজদা-সেজদার বিয়ে হল না, তাদের আগে আমার বিয়ে করাটা কি ঠিক হবে!"

—"আরে রখে দে, কুলীনের ছেলেরা কেউ ওসব কথা ভাবে নাকি, যার যখন জুটে যায়, সে তখুনি বিয়ে করে ফেলে, মেয়েদেরও সেই রকম, এই যে নরোত্তম ঠাকুরের মেজমেয়ের বিয়ের কথাবার্তা চলছে, যদি পারে দুই মেয়েকেই একসঙ্গে বিয়ে দেবে আর না হয় মেজমেয়ের বিয়ে দু'দিন পরে হবে; আগে ছোট মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে।"

—কিন্তু মা, বাবাকে একটা খবর—

ভারতের কথা শেষ না হতেই চলে যেতে যেতে জবাব দিল গৌরীনাথ—"তোকে কিছু ভাবতে হবে না, দূরভাষে আমরা খবর পাঠাচ্ছি।"

ছোট মামার কথা-বার্তাই ওই রকম। সবসময় হাসিঠাট্টা আর মজার মজার কথা বলে লোক হাসানো। নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজের মধ্যে থেকেও লোকটার কথা-বার্তা, চলা-ফেরায় কোনরকম গম্ভীর গম্ভীরভাব চিহ্ন নেই। মোটা মোটা দুরূহ তত্ত্ব ও তত্ত্বের পুঁথি পড়ছে, নকল করছে, টীকা-ভাষ্য নিয়ে তুমুল তর্ক করছে—সবই যেন হেসে-খেলে। যা হয় হবে, অত ভাবনা কিসের।

এরকম লোকের কথায় ভরসা করে আর যাই করা যাক, বিয়ে করা যায় না।

ভারত মনে মনে খুব স্বস্তি পেল না। তবু যা হোক

পণ্ডিত মশাই রয়েছেন, মেজমামা এসেছেন, বড়মামা অসুস্থতার অজুহাতে এলেন না। সত্যিমিথ্যে ভগবান জানেন। কিন্তু দুরন্তও থেকেতো কেউ এসে পৌছল না এখনো। বিয়ের সভায় বসেও ভারত উসখুস করছিল। বিষ্ণুপদ পাশে চাপা স্বরে ধমক দিল—"এই এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিস কেন, ভাল করে মন্ত্র পড়।" নরোত্তম আচার্য কন্যা সম্প্রদান করলেন। সামনে হুতাশন জ্বলছে। পাশে লাল চেলী পড়ে জড়সড় হয়ে বসে আছে যে মেয়েটি, তাকে যেন কেমন অচেনা মনে হচ্ছে। অচেনা আর অসহায়। ঘোমটায় মুখ ঢাকা। শুভদৃষ্টির সময় একপলক তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। সেই চকল দৃষ্টি নয়, কেমন শান্ত, ভীতুভীতু। ভারতের পরণে লাল চেলী, গলায় বেলফুলের মালা, কপালে চন্দন টিপ্। সমবেত সকলে মুগ্ধ হয়ে গেছে। রাধার বর যেন সাক্ষাৎ শিব কিম্বা কিশোর কন্দর্প। কি চমৎকার মানিয়েছে।

শ্বশুর-বাড়ির নতুন মানুষদের খুব খারাপ লাগেনি। শ্বশুর মশাইকে মনে হ'ল সাধাসিধে ভাল মানুষ। কেমন আলুথালু ভাব। সকলের কাছে হাতজোড় করে অকারণে ক্ষমা চেয়ে বেড়াচ্ছেন। বড়দের কাছেতো বটেই, এমনকি বিষ্ণুপদকেও একবার বলে গেলেন—তোমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো বাবা।" তারপর ভারতের গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন—"খুব কষ্ট হল বাবা, খুব কষ্ট হ'ল।"

মানুষটার এমন অস্থির ভাব দেখে বিষ্ণুপদ একটু মুখ টিপে হাসল্। ভারত কিন্তু হাসতে পারল না, শুধু বলল্যে—"দুরন্তও থেকে কেউ আসেনি, সেখানে খবর পাঠানো হয়েছিল তো?"—আচ্ছা দেখছি আমি, তুমি কিছু ভেবো না—নরোত্তম আচার্য কালিনাথের কাছে গিয়ে কিস্‌ফিস্ করে কি বললেন, ভীমদাস আচার্যের সঙ্গেও একটু বললেন, তারপর ব্যস্তভাবে অন্যদিকে চলে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আর এদিকে এলেন না।

একটু বাদে ছোটমামা একজনকে হাত ধরে নিয়ে এল।

—এই যে ভারত আলাপ করিয়ে দিই, ইনি হলেন তোর ভায়রাভাই' ঠাকুর মশাইর বড় মেয়ে গঙ্গার বর, নাম বাণীকণ্ঠ। থানাঝুল কেষ্টনগরের নাম শুনেছিস্ তো, সেই থানাঝুলে এদের বাড়ি। বছর বুড়ি-বাইশ বছর হবে, সুন্দর নাম, বাণীকণ্ঠ। হেসে হেসে বলল—"আমাদের বাড়ি তোমাকে নিয়ে যাব, যাবেতো ভাই, আমরা গরীব মানুষ, তোমরা হলে রাজার ছেলে।"

ভারত কোন জবাব দিল না, বিনীতভাবে হাসল।

তারপর রাধার দিকে ফিরে বলল: বাণীকণ্ঠ—"কি খবর ছোট শিন্নী, নতুন মানুষ পেয়ে আমাদের ভুলে গেলে নাকি। চোখ তুলে তাকাও, মুখখানি দেখি একবার, আরে বাপস্ একেবারে কলাবৌ দেখছি যে।" অবগুণ্ঠনের ঘোমটা খসে খসে যাচ্ছিল, আরো ভাল করে টেনে দিয়ে মুখখানি আরো নামিয়ে ফেলল রাধা। হোহো করে হেসে উঠল বাণীকণ্ঠ। গৌরীনাথ মুখ ঘুরিয়ে হাসি চোপে চলে গেল। মানুষটা ভালো বটে।

বাসর ঘরে বড় দু'বোনের সঙ্গে আলাপ হল—গঙ্গা আর যমুনা। যমুনার বাদি বিয়ে হ'ল আজ। পরপর দু'দিনের গোধূলি লগ্নে দুই মেয়ের বিয়ে দিতে নরোত্তম আচার্য হিমসিম খেয়ে গেছেন। খুব ধুমধাম না হলেও, আত্মীয় স্বজনের ভীড় মন্দ হয়নি। সারদাগ্রামের কেশরকুনি আচার্যকের মধ্যে নরোত্তম আচার্য মোটামুটি স্বচ্ছল গৃহস্থ। চুন-বালি খসা পুরনো একতলা দালান। এছাড়া অন্য গৃহস্থ বাড়ির মতই খানকয়েক ঘর, মাটির দেয়াল, ছনের ছাউনি। পরিষ্কার উঠোনের একপাশে সাম্বিয়ানা খাটিয়ে বিয়ের আসর বসেছে। আর একপাশে লাউয়ের মাঁচা, একটা টগর ফুলের গাছ, ভারত কেমন ফাঁকা চোখে তাকিয়ে রয়েছে, আর যে যা বলছে যেন যন্ত্রের মত করে যাচ্ছে। বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হ'ল। তারপর পুরনো দালানের এক ঘরে বাসর বসল।

খাট-পালঙ্ক নেই। মাটিতে ফরাস পেতে শুভ্র জাজিমের ওপর বিছানা। ফুলের পাপড়ি, ফুলের মালার ছড়াছড়ি। ঘরের কোণে কয়েকটা প্রদীপ জ্বলছে, অগুরু, চন্দনের গন্ধ আর ধূপের ধোঁয়ায় ঘরের বাতাস কেমন ভারী হয়ে উঠেছে।

গঙ্গা এসে সামনে দাঁড়িয়ে হেসে হেসে বললো—"আমি হচ্ছি রাধার বড়বোন, সম্পর্কে তোমার গুরুজন হই।"

ভারত বিনীতভাবে তার পায়ের ধুলো নিতে গেল।

—"থাক থাক, অত ভক্তি সহ্য হবে না"—গঙ্গা তার হাত দুটি চেপে ধরল—বেশি বেশি ঠাট্টা ইয়ার্কি না দিলেই খুশি থাকব।

ঠিক যেন বাসন্তীদি, কথা বলার ধরনটা সেই রকম। ভারত কিছুক্ষণ অভিভূত হয়ে রইল।

—"হা করে চেয়ে দেখছো কি, এবার ওঠো রাধাকে অরুন্ধতী দেখাবে, জানোত বিয়ের রাত্তিরে বর কনেকে অরুন্ধতী দেখায়।"

—"জানব কি করে"—ভারতের মুখে চট করে একটা চটুল জবাব এল—"আগের অভিজ্ঞতা তো কিছু নেই, আপনার না হয় সব জানা হয়ে গেছে, আমার তো এই প্রথম।"

গঙ্গার মুখ একটু লাল হয়ে উঠল, কিন্তু জবাব দিল সহজ ভাবেই—"ও বাবা, কথা ফুটেছে দেখছি, প্রথমের পর দ্বিতীয়েও লোভ আছে নাকি?"

ভারত একটু হেসে বললো, নেহাৎ গুরুজন বলে পরিচয় দিলেন, না হলে একথা জবাব দিতাম।"

গঙ্গার মুখে আর কথা নেই, পেছন থেকে কে যেন বললো—"শুনলিতো দিদি, যেরকম গোবেচারী খোকা ভেবেছিলি, তা নয়, ইঁচড়ে পেকেছে।"

কাছাকাছি অন্য মেয়েরা হেসে উঠল। ভারত মুখ ফিরিয়ে ঠিক দেখতে পেল না। যমুনা চট করে দরজার আড়ালে সরে গেল। বাসর ঘরে সব মেয়ে, কোন পুরুষ নেই। আত্মীয় প্রতিবেশী বউএরা মেয়েরা, সবাই অসংকোচে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, হাসি ঠাট্টার কথা বলছে। বাসর ঘরে বরের সামনে কোন লজ্জা সংকোচের বালাই নেই। আর তাছাড়া বরতো ছেলে মানুষ, চোদ্দ পনের বছর বয়স হবে, অপরূপ চেহারা।

ছেলেমানুষ আর সুন্দর বর-কনে দেখে সকলেই খুশি।

গঙ্গা বর-কনের হাত ধরে ঘরের বাইরে রোয়াকের পাশে নিয়ে গেল।

ভারতকে লক্ষ্য করে বললো—"কইগো ভাই বর, অরুন্ধতী দেখাও, এই রাধা মুখ তুলে তাখ।" উঠোনের ওদিকে দূর একটা লম্বা গাছের মাথার উপর অন্ধকার আকাশের পটে সপ্তর্ষি জ্বলছে। পরিষ্কার উজ্জ্বল সাতটী তারা, এক দুর্জ্ঞেয় প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ। সাত ঋষির নামে সাতটি তারা। অনন্তকাল ধরে উজ্জ্বল হয়ে আছে। বশিষ্ঠ নক্ষত্রের পাশে অনুজ্জ্বল অরুন্ধতী যেন ভীরু চোখ মেলে দেখছে লক্ষ যোজন দূরের এই নতুন দম্পতিকে।

গঙ্গা জিজ্ঞেস করল—"কই দেখতে পেলে?"

ভারত হাত তুলে জবাব দিল—"হ্যাঁ ওই যে, ওই তো অরুন্ধতী স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।"

গঙ্গা এবার ছোটবোনকে বললো—"এই রাধি, ভাল করে মুখ তুলে তাখ, দেখতে পেলি, এঃ একেবারে লজ্জাবতী লতা, হ্যা, এইবার বল। অরুন্ধতী যেমন বশিষ্ঠ মুনির পাশে রয়েছে, আমি যেন জন্ম জন্ম তোমার পাশে থাকতে পারি।"

সোজাসুজি সহজভাষায় এমন মধুর মন্ত্র শুনে ভারত যেন বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল। বাসন্তীদির মুখে ভাইফোঁটার মন্ত্র শুনেছে, সেও এমনি সহজ সুন্দর। বাংলাদেশের মেয়েদের ব্রত-পার্বণ কিম্বা স্ত্রী-আচারের মন্ত্র কেমন সহজেই মনকে ছুঁয়ে যায়। গঙ্গার ইঙ্গিত-মত যমুনার হাত থেকে

মোটা একছড়া বকুলফুলের মালা নিয়ে তার গলায় পরিয়ে দিল রাধা, তারপর হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিল।

এতফুল থাকতে বকুলফুল কেন, ভারতের ঠোঁটের কোণে একফোঁটা স্মৃতির হাসি। সেই প্রথমদিনের দেখা উষালগ্নে আশ্রমের বকুলতলা। বয়ঃকনিষ্ঠ রক্তের শাড়িপরা মেয়েটি বকুল ফুল কুড়োচ্ছিল। জীবনে এক একটা মধুর মুহূর্ত আসে, যখন বাতাস মধুময় হয়, আকাশ মধুময় হয়, চন্দ্র-সূর্য গ্রহ তারা থেকে পৃথিবীর প্রতিটি ধূলিকণা পর্যন্ত মধুময় মনে হয়। ভারত ভেবে দেখেছে, এক একটা আনন্দ লগ্নেই ঠিক বাবের কথা মনে পড়ে যায় আর মনটা খারাপ হয়ে যায়।

বাসরঘর খালি হয়ে গেছে। মেয়েরা কিছুক্ষণ আড়ালে উঁকিঝুঁকি মেরে চলে গেছে।

প্রহরের পর প্রহর ঘনিয়ে আসে। রাত গভীর থেকে গভীরতর হয়। এমন মধুর রাত্রির সংবাদ বাবের কাছে পৌঁছুলনা। কতকাল দেখা হয় না বাবের সঙ্গে। ভারত আপনমনে ভাবছিল। জীবনের অনেকগুলি পাতা যেন খুব তাড়াতাড়ি উল্টে গেছে সে। এই চোদ্দ-পনের বছরের জীবনে অনেক দেখেছে, অনেক শুনেছে, অনেক কিছু জানা হয়ে গেছে। দেহের বয়স বেশি না হলেও, মনের বয়স অনেক খানি বেড়ে গেছে। আজ এই ফুলের গন্ধভরা, স্নিগ্ধ প্রদীপ জ্বলা আধো অন্ধকার ঘরে রূপ-রসময় একটা নতুন জীবনের দুয়ারে দাঁড়িয়ে বাবের কথাই বারবার মনে পড়ছে। এবার সে ফিরে যাবে, ভুরশুটের বাড়িতে, যেখানে মা আছেন, বাবা আছেন, দাদারা রয়েছেন। ভাবতে ভাবতে কখন চোখের কোণে জল জমে এসেছিল টের পায়নি। খেয়াল হল রাধার কথা শুনে, একটু যেন লজ্জার সুরে জিজ্ঞেস করল সে—"ওকি তুমি কাঁদছ?"

—কই না তো—ভারত চমকে চোখ মুছল।

—বাড়ির কথা ভেবে দুঃখ হচ্ছে—রাধা একটু কাছে সরে এল—"ভয়কি, তুমি আমাদের বাড়িতে থাকবে।" ভারত অল্প হেসে দু'আঙুলে ওর চিবুক ধরে জবাব দিল—"না খুকি আমি বাড়ি যাব, তোমাকেও নিয়ে যাব।" যাঃ আমাকে খুকি বললে কেন?—রাধা তার হাতখানি সরিয়ে দিল—আমি এখন তোমার সঙ্গে যাব না, বাবা বলেছে আমি আর একটু বড় হয়ে যাব, এখন শুধুই, বড্ডো ঘুম পেয়েছে।—ভারতের কোলের কাছে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে নিঃসংকোচে চোখ বুজল রাধা।

(ক্রমশঃ)

পুস্তক পরিচয়

সম্পাদকের বৈঠকে। সাগরময় ঘোষ। আনন্দ পাবলিশার্স। ছয় টাকা। ২য় সংস্করণ।

বাঙলা সাংবাদিকতার ইতিহাসে শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষ একটি সুপরিচিত নাম। বিগত তেইশ বছর ধরে বাঙলা দেশের জনপ্রিয় সাহিত্য-সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকার সম্পাদনা কর্মের সঙ্গে তিনি যুক্ত। এই সম্পাদনাকর্মের সূত্রে বিভিন্ন সমসাময়িক সাহিত্যব্রতী, এবং তাঁদের সঙ্গে কথোপকথন সূত্রে তাঁর নিজের বিচিত্রজীবনের অভিজ্ঞতা এবং পূর্বসূরী নানা সাহিত্য-সাধকের বিচিত্র জীবন বৃত্তান্ত বাঙলাদেশের একটি চলচ্চিত্র-পত্রিকায় যখন প্রথম প্রকাশিত হতে থাকে তখন থেকেই এই রচনাগুলি সাহিত্যের নেপথ্যভূমির একটি কৌতূহলজনক স্মৃতিরঙ্গ হিসেবে ব্যাপক জনবল্লভতা অর্জন করে। 'সম্পাদকের বৈঠকে' সেই কথোপকথনলব্ধ স্মৃতিচারিকারই গ্রন্থবদ্ধ প্রকাশ। কবিকে জীবনচরিতে পাওয়া যায় কিনা এ সম্পর্কে বিতর্ক থাকলেও লেখকদের ব্যক্তিজীবন এবং তাঁদের সাহিত্যকর্মের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে পাঠকদের কৌতূহল যে অত্যন্ত উৎকর্ণ তা এই গ্রন্থটির অল্প সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের মধ্য দিয়েই বুঝতে পারা যায়। সাগরময় ঘোষ নিঃসন্দেহে, তথাকথিত অর্থে সাহিত্যিক নন। এবং সে দাবীকে তিনি বারবার অস্বীকারও করেছেন। কিন্তু সাহিত্যের অবধারকতার ক্ষেত্রে তাঁর যে একটি তীক্ষ্ণ এবং গ্রহিষ্ণু মন রয়েছে সেই মনের দর্পণে বিভিন্ন সাহিত্যব্রতীর নানা প্রসঙ্গের যে প্রতিচ্ছায়াপাত ঘটেছে সেই প্রসঙ্গগুলির সুত্রধার হিসেবে তাঁর রসসন্ধানী কৌতুকপরায়ণ এবং বিশ্লেষণী সাহিত্যবিবেক বারবার অত্যন্ত জাগ্রত মনস্কতার পরিচয় দিয়েছে। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার জলধর সেন, 'প্রবাসী'র রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি মানুষগুলি এতদিন আমাদের কাছে যে ভাবে চেনা ছিলেন, সাগরময় বাবুকে ধন্যবাদ তিনি তাঁদের আর এক লঘু, করুণ এবং আদর্শনিষ্ঠ পরিচয়টিকে আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত করেছেন। শিল্পীর প্রকাশের নেপথ্যালোকে আর একটি যে গোপন, করুণ, নিভৃত এবং রক্তক্ষরী পরিচ্ছেদ প্রচ্ছন্ন থাকে 'পথের পাঁচালী'র বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অনুনা বিস্মৃতপ্রায় জলধর গুপ্তের প্রসঙ্গসূত্রে শ্রীযুক্ত ঘোষ তার একটি আশ্চর্য আলেখ্য আমাদের উপহার দিয়েছেন। সাগরময়বাবু শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন আবাসিক, প্রখ্যাত কবি নিশিকান্তের (রায়চৌধুরী) অন্তরঙ্গ সতীর্থ, তাঁর স্মৃতিরঙ্গে নিশিকান্ত, তাঁর অগ্রজ রবীন্দ্রনাথের সবিশেষ প্রীতিভাজন সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, পুরানো দিনের শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্রনাথের 'সকল গানের ভাণ্ডারী' দিনেন্দ্র-ঠাকুরের একটি ভিন্নতর পরিচয় নিরবনৈপুণ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'চরিত্রহীন' শরৎচন্দ্র এবং 'চাঁদমুখ' শরৎচন্দ্র এই দুই সমনামা কিন্তু ভিন্নতর সাহিত্যব্রতীর কৌতুককর গ্রন্থ, কবি গিরিজা বসুকে 'শানপদ্ম'-প্রদান উপলক্ষ্যে শরৎচন্দ্র এবং বিশ্বপতি চৌধুরীর যোগাযোগে একটি করুণ সুন্দর কৌতুককর প্রসঙ্গের অবতারণা ইত্যাদি নানা 'অধুনা পুরাতন প্রসঙ্গের' গ্রন্থনাসূত্রে একটি সুন্দর বাচনভঙ্গির পরিচয় এখানে ফুটে

উঠেছে। অধুনালীবিত সাহিত্যিকদের মধ্যে বনফুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ প্রভৃতির সাহিত্যিক সত্তার নানা কৌতুককর কিম্বা কৌতূহলজনক প্রসঙ্গ কখনো কখনো শারদীয়া পত্রিকার প্রকাশনাসূত্রে কখনো বা ভিন্নতর কোনও উপলক্ষ্যে অত্যন্ত পরিমার্জিত ভঙ্গির সহায়তায় সাগরময় আমাদের উপহার দিয়েছেন। এখন প্রায় আমরা ভুলেই গেছি, কিন্তু এক সময় অগ্রগতি নামক যে একটি সুরুচি শোভন পত্রিকা প্রকাশিত হ'তো তার দুই কবি দিনেশ দাস এবং হীরালাল দাশগুপ্তের একটি মধুমধুর ছবি সাগরময় বাবু আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। দু'একটা ছোট তথ্যের ক্ষেত্রে মনে হয় সাগরময়বাবুর স্মৃতি কিছু প্রতারণা করে থাকবে। যেমন দীনেশচন্দ্র-বঙ্কিমচন্দ্র-প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্রের পাণ্ডিত্য এবং তাঁর প্রকাশের বাসনা-প্রসঙ্গে 'শীলারের এশিয়াইকিডিয়ন' উল্লেখ করেছেন, কিন্তু যতদূর জানি শীলারের এ নামে কোনও রচনা নেই, এটি 'শেলীর' একটি প্রসিদ্ধ কবিতা। জগদীশ গুপ্ত প্রসঙ্গে তাঁর রচনার মনে হয় যে 'প্রবাসী' এবং 'ভারতবর্ষই' জগদীশ গুপ্তের খ্যাতির প্রধান সোপান, কিন্তু পুরনো 'কল্লোল' এবং 'কালিকলম' পত্রিকার ফাইল দেখে মনে হয়েছে এই দুটি পত্রিকাই তাঁর পরিচিতিকে অনেকখানি ব্যাপকতা দান করেছিল। সমালোচক রচনার-মূল্যাবধারণ করতে গিয়ে কখনো কখনো অরসিক ছিদ্রান্বেষীর ভূমিকায় নিজেকে দাঁড় করায় তাই হয়তো এসব কথার অবতারণা, কিন্তু সব কিছু বাদ দিয়ে বলা যায়, 'কল্লোল যুগের' পর এরকম স্বাদু স্মৃতিচিত্রণ আমাদের হাতে আসেনি, সাগরময়বাবুকে পেশাদার সাহিত্যিক হ'তে হবেনা তিনি আমাদের এরকম আরও স্মৃতিচিত্রণ উপহার দিন, তাঁর বৈঠকের সাহিত্যব্রতীদের উদ্দেশ্যেও আমাদের এই নিবেদন রইলো।

শ্রীঅমল সরকার

লিখিত লীলিমায় অলঙ্কৃত। অরবিন্দ গুহ।
প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড। দাম তিন টাকা।

যে কবি শুধু সে-ই কবিতা লেখে। আর কেউ না, আর সবাই কবি-কবি। বস্তুতঃ কবি হিসেবে একবার যাঁকে চেনা যায়, তিনি যা লেখেন, সেগুলিই কবিতা পদবাচ্য। কবিতা পড়ে সব সময় চেনা যায় না, কোন কবিতাটা ভালো বা মন্দ, আমি অনেক সময়েই বুঝতে পারি না, তা ছাড়া এক সময় খারাপ লেখেছিল এমন অনেক কবিতা পরে উজ্জ্বল হয়ে এসেছে, অর্থাৎ সেই কবিতাটির জন্য আমি পাঠক হিসেবে যোগ্য হয়ে উঠেছি, আবার, ঠিক একই রকম ভাবে, এক কালের প্রচণ্ড ভাবে উত্তেজিত করানো কবিতা ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে, আর ভালো লাগেনি, আমি পাঠক হিসেবে সেই কবিতাকে বর্জন করার যোগ্য হয়ে উঠেছি। সুতরাং কবিতা পড়ে তৎক্ষণাৎ চেনা যায় না। কিন্তু কবিতা পড়েই তৎক্ষণাৎ একথা বোঝা যায় যে এর লেখক সত্যিকারের একজন কবি বা সৌখিন পলাতক। যদি কবি হিসেবে একবার চেনা যায়, তবে তাঁর যে-কোনো রচনাই কবিতা – এমন কি তাঁর ফেলে দেওয়া টুকরো লাইন পর্যন্ত।

অরবিন্দ গুহ যে একজন বড় কবি এ কথা আমরা চিনে গেছি অনেক আগে। এখন তাঁর প্রতিটি রচনাই আমাদের মনে হয়, একটি অবিচ্ছিন্ন দীর্ঘ রচনার অংশ। অর্থাৎ সারা জীবন ধরে তিনি একটি কবিতা লিখে চলেছেন, এবং আজীবন লিখবেন—সেই একটি মাত্র লেখাই, আমরা সেটা পড়তে পাচ্ছি ভিন্ন ভিন্ন ইনস্টলমেন্টে। তাঁর কবিতায় যে-সব গাছ বা ফুল, 'অমর্ত্য অন্ধকার' 'নদীর মৃত্যু', মেয়েরা বা নারী—এরা সবাই শুধু অরবিন্দ গুহর নিজস্ব জাদুপুরীর অন্তর্গত, ওরা আর কোথাও নেই, আর কারুর হাতে ধরা দেবে না, বাংলা কবিতায় আর কোথাও দেখা যাবে না। কথাটাকে আরও একটু স্পষ্ট করতে গেলে এই ভাবে বলা যায়, অসীম রাত্রিমুখের শেষে চেনা বাড়ির উঠোনে যে লাল শাড়ি পরা

বিশেষ মেয়েটির দেখা অরবিন্দ গুহ পেলেন, যাকে নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছেন, সেই বিশেষ মেয়েটিকে আর কোনো কবি চোখে দেখেনি বা লুকিয়ে দেখলেও, সেই মেয়েটিকে নিয়েও আর কেউ কবিতা লেখেন নি (বা সাহস পান নি)—ঠিক সেই রকমই, অরবিন্দ গুহ যখন একটি বকুল গাছ নিয়ে লেখেন, তখন সেটা আর বকুল বৃক্ষ সমাজের যে-কোনো একটি গাছ থাকে না, সেটা হয়ে যায় অরবিন্দ গুহের অধিকারভুক্ত একটি নির্দিষ্ট গাছ, বাংলা সাহিত্যে সে অরবিন্দ গুহের নামে চিহ্নিত হয়ে গেল। অরবিন্দ গুহের বাগানে দাঁড়িয়ে থেকে সেই বকুল বৃক্ষ চিরকাল বাংলা কবিতায় সুগন্ধ বাতাস ছড়াবে।

অথচ অরবিন্দ বলছেন, আমার বাগান নেই। 'কীপার' কবিতায় তিনি দুঃখ করে বলছেন, আমার বাগান নেই। কিন্তু আমি তোমাকে আনন কিছু ফুল দিতে চাই। তা বলে কি দোকানির কাছে ফুল কিনতে যাবো? না, যাবো না। মনে মনে বলি, আনো, আগে আনো বাগানের দিন, বীজ, ফুল ফোটাও গাছে। তা ছাড়া কি অন্য ফুল আমি নিতে পারি, দিতে পারি? না, পারি না। আগে চাই বাগান——কিন্তু লাইনগুলি ভেবে গদ্যের মতো লেখা উচিত হয়নি। এগুলো মুখের কথার মতো শুনতে লাগলেও, যেন মনে হয়, কবির স্বগতোক্তি, কিন্তু পুরোপুরি ছন্দমিল সমেত চমৎকার পর্বভাগ করে লেখা। কবিতাটির চেহারা আসলে নিম্নলিখিত মতো, 'আনো' কথাটিকে শুধু রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ অনুযায়ী শেষে 'ও' কার যোগ করে পড়তে হবে।

> আমার বাগান নেই। কিন্তু আমি তোমাকে আনন
> কিছু ফুল দিতে চাই। তা বলে কি দোকানীর কাছে
> ফুল কিনতে যাব? না, যাব না। মনে মনে বলি,
> আনো, আগে আনো বাগানের দিন, বীজ, ফুল
> ফোটাও গাছে। ইত্যাদি।

এই রকম ছন্দের ব্যালিক তাঁর সমস্ত লেখায়। যেন হাসি ঠাট্টা ইয়ার্কির মধ্যে মুক্তোর মতো এক একটা কবুতরকে——

মিল এসে যাচ্ছে' কথা বলার মতো ভঙ্গি লাইনগুলির—অথচ প্রতিটি লাইন নিটোল, গভীর সকারী। আমরা ভেবেছিলাম, কবিতাকে সব সময় ছন্দ-মিল পরিয়ে রাখলে বড় বেশী কবিতা-কবিতা মনে হয়, কিছুটা সেকেলে, স্বামীর সামনেও ঘোমটা দেওয়া বউয়ের মতো,—আমরা ভেবেছিলাম কবিতার শরীর থেকে ঐ সব গয়নাগাটি খুলে ফেলে (কখনো কখনো উন্মুক্ত হয়েছি) তাকে সহজ সাধারণ, আটপৌরে, প্রতিদিনের ব্যবহার ও মুখের ভাষার সমপর্যায়ে আনতে হবে, যাতে কবিতা হতে পারে সত্যিকারের জীবনসঙ্গিনী। কিন্তু অরবিন্দ আমাদের সকলকে চমকে দিয়ে এক অদ্ভুত সমন্বয় করে চলেছেন, তিনি ছন্দমিল ছাড়েন নি, অথচ আপাতোড়া মুখের ভাষাতেই লেখা তাঁর কবিতা। এই কৃতিত্ব তাঁকে সাফল্যের চূড়ায় শুধু না, সমসাময়িক কবিদের মধ্যে শীর্ষস্থানে নিয়ে গেছে।

এই রকম কৃতিত্বের কয়েকটি উদাহরণ:

> একটি তৃষ্ণা লুপ্ত হল, কিন্তু অন্য অনন্ত তৃষ্ণা যে রক্তে
> লক্ষ হাহাকারে বাজে।……আমার সমস্ত দিন
> সানন্দ, সুন্দর, অবারিত, উদয়াস্ত সুগন্ধে প্রণীত।
>
> (একজন মানুষের দিনরাত্রি)

> তুমি চলে যেও না কিন্নরী
> থাকো নিশ্বাসের নিরালোকে।
> আগে কবিতাটি সাঙ্গ করি।
> থাকো উপেক্ষার তীক্ষ্ণ শোকে।
>
> (কবিতা)

শরীর আমার শুনে গেল হাওয়ার পরিহাসের ভাষা; এই তো তোমার ইচ্ছাপূরণ, এই তো তোমার নির্বাসন। জলের টানে ভাসে আমার অন্ধ করুণ ভালোবাসা, এবং ভালোবাসার টানে নদী এখন ঘরছাড়া।

(আবহসঙ্গীত)

কোনো দিকে নেই ডানার চিহ্ন,
সব চরিত্র ছিন্নভিন্ন,
যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর মতো রিক্ত, রুক্ষ।
ভিতরে-বাহিরে রুঢ়, ক্ষমাহীন, দারুণ শীত তো
মুছে দিতে চায় আমার করুণ এ-অস্তিত্ব।

আমার জন্ম)

উদ্ধৃতিত অংশগুলি শুধুমাত্র ছন্দের সার্থকতার জন্যই উদ্ধৃত হয়নি। শব্দ নির্বাচন এবং লাইন সাজাবার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায়, মানুষটি বড় দুঃখী এবং সেই মানুষটিই একই সঙ্গে আবার সুন্দরের খোঁজপাঠক ও শান্তি অভিলাষী। দুঃখের কথা কোথায় অ্যাবস্ট্রেক্ট ভাবে বলা নয়, এ দুঃখে চোখে রুমাল আসে না—হাহাকার, নির্মমতা, রুঢ়, ক্ষমাহীন এই সব শব্দের উচ্চারণ সত্ত্বেও বোঝা যায়, এই কবির মুখে সব সময় একটি অমলিন হাসি লেগে আছে। অরবিন্দ গুহ বাংলা কবিতায় শুধু কিছু নারী বা বৃক্ষ বা নদীই উপহার দেননি, সেই সঙ্গে হাস্যোজ্জ্বল বিষাদ—এও তাঁর একান্তই নিজস্ব এবং তুলনাবিহীন পরিবেশন। এই কাব্যগ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে একটি অমূল্য স্মৃতিচিহ্ন।

অবশ্য বাংলা সমালোচনার নিয়ম এই, শেষের দিকে কিছু নিন্দে করতে হয়। কিন্তু আমার মুস্কিল এই, যে-কবিতা আমার ভালো লাগে, যা, পূর্বেই যা বলেছি—যে কবিকে আমি চিনতে পারি—তাঁর রচনায় আর কোনো খুঁত থাকে না আমার চোখে, প্রতিটি লাইনই সার্থক মনে হয়। তবু, নিয়ম রক্ষার জন্য বলতে গেলে বলা যায়, তাঁর কবিতায় পানকচুরেশানের ব্যবহার বড় বেশী। অত বেশী কমা বা দাঁড়ি ব্যবহার না করলেও চলে, কবিতার চেহারা থেকে প্রবহমানতা কিছুটা নষ্ট হয়। লাইনের মাঝখানেও দাঁড়ির ব্যবহার আর একটু কম হলে ভালো হতো। 'আবহসঙ্গীত' কবিতায় 'কয়লের ফলের মতো আলো আমার মর্মমূলে,'—এই লাইনটিতে 'আলো' কথাটা কিছুটা বিভ্রান্তিকর, ঐ ক্রিয়া পদটি ভবিষ্যৎ কাল না সাধারণ বর্তমান বোঝা যায় না, কিন্তু এসব ত্রুটি দেখাবার চেষ্টা আমার সাধ্যাতীত। আমি বরং একটি দাবি জানাই। একটি না দুটি। অরবিন্দবাবু, আপনি অনেকদিন কবিতা লেখেন নি, ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে ওসব গবেষণা-টবেষণা ফেলে আরও কিছু কবিতা লিখুন। এবং, আপনার কবিতা পড়লে মনে হয়, আপনি জীবনের অনেক কথা গোপন করে যান। অত গোপন করবেন না, কবিতায় সম্পূর্ণ হয়ে প্রকাশিত হোন।

সুশীল গঙ্গোপাধ্যায়

বিশ্ববার্ত

ভিয়েৎনাম যুদ্ধের আর এক ধাপ

হ্যানয় ও হাইফং-এর নিকটবর্তী পেট্রোল ডিপোগুলিতে বোমাবর্ষণের জল্পনা-কল্পনা অবসান করে গত ২৯শে জুন প্রেসিডেন্ট জনসনের ব্যক্তিগত নির্দেশে মার্কিনী বোমারুরা এই এলাকার পেট্রোল ডিপোগুলির ওপর বোমাবর্ষণ করে ভিয়েৎনাম যুদ্ধের আর এক ধাপ এগিয়ে গেছে। এই বোমা বর্ষণের মাত্র কয়েকদিন পূর্বে গত ২৬শে জুলাই অস্থায়ী মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিব জর্জ বল ওয়াশিংটনে বলেন যে ঐ অঞ্চলগুলির ওপর বোমা বর্ষণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। সেই সময় জর্জ বল একথাও বলেন যে ক্যানেডির সূত্রে হ্যানয়ের সঙ্গে সাম্প্রতিক আলোচনায় বোঝা গেছে যে উত্তর ভিয়েৎনাম এখনও যুদ্ধ বিরতির জন্য আলোচনা বৈঠকে যোগ দিতে সম্মত নয়। হ্যানয়ের পক্ষ থেকে উত্তর ভিয়েৎনামের জলাধারের বাঁধের ওপর বোমা বর্ষণ করে তাদের সেচ-ব্যবস্থার বিপর্যয় ঘটিয়ে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলিকে প্লাবিত করার অভিযোগ অস্বীকার করে জর্জ বল বলেন যে হয়তো বা কোনো বোমা আকস্মিক ছিটকে কোনো বাঁধের ওপর পড়ে থাকবে।

হ্যানয় ও হাইফং-এর সন্নিকটবর্তী এলাকা গুলিতে বোমা বর্ষণে উত্তর ভিয়েৎনামের তৈল সম্পদ ধ্বংস করে উত্তর ভিয়েৎনাম থেকে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে অনুপ্রবেশকারীদের গতি স্তিমিত করাই মার্কিনী উদ্দেশ্য বলে ঘোষিত হয়েছে। হাইফং বন্দরে উত্তর ভিয়েৎনামের আমদানীকৃত তৈলের শতকরা ৯৫ ভাগ পৌঁছায় এবং হ্যানয়-হাইফং এলাকায় তৈল গুদামে সমগ্র দেশের শতকরা ৬০ ভাগ তৈল সংরক্ষিত হয়। এই তৈল গুদামগুলি বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দেবার পূর্বেই মার্কিনী বোমা এদের ধ্বংস করতে উদ্যোগী হয়েছে। মার্কিনীদের বক্তব্য এই যে এ বছরের প্রথম পাঁচ মাসে উত্তর থেকে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের দিকে ট্রাক চলাচল দ্বিগুণ হয়েছে এবং অনুপ্রবেশের হার শতকরা একশ কুড়ি ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

উত্তর ভিয়েৎনামের উপর সামরিক চাপ বৃদ্ধি করে আলোচনা বৈঠকে সম্মত করাবার মার্কিনী কৌশল এবারও ব্যর্থ হয়েছে। হ্যানয়-হাইফং-এ বোমাবর্ষণের জবাবে উত্তর ভিয়েৎনাম ঘোষণা করেছে: We fight on। উত্তর ভিয়েৎনামের পত্রিকা 'নাহন ধান' বলছে:

Once again we tell the aggressors straight in their face "Never will you be able to attain that goal of youre even if you have enough strength to conduct the war for many more decades. The Vietnamese people have fought, are fighting and will determinedly fight till final victory."

উত্তর ভিয়েৎনামে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে সকল অধিবাসীদের যুদ্ধে ডাক পড়েছে। এদের দক্ষিণ ভিয়েৎনামে অনুপ্রবেশের জন্য তৈরী করা হবে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে প্রায় ৬০ ব্যাটেলিয়ান উত্তর ভিয়েৎনামী সৈনী ইতিমধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। লাওসের পথে এদের এবং ভিয়েৎকংদের রসদ সরবরাহের ক্ষীণ সূত্রটি হ্যানয়-হাইফং-এ বোমা বর্ষণের পর আরও ক্ষীণতর হয়ে যাবে। এদিকে মার্কিনীরা ইতিমধ্যে ২১০,০০০ সৈন্য দক্ষিণ-ভিয়েৎনামে হাজির করেছে। এই বছরের শেষে আরও একলক্ষ সৈন্য সেখানে পৌঁছাবে।

খাস আমেরিকায় জনসনের ভিয়েৎনাম নীতির বিরোধিতা

আরও সরব হয়ে উঠেছে এবং হ্যানয়-হাইফং-এ বোমা বর্ষণের পর এই বিরোধের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তা সত্ত্বেও জনসন অবশ্য। যে মুখে জনসন উত্তর ভিয়েৎনামীদের শান্তি বৈঠকে যোগদানের আহ্বান জানালেন, সেই মুখেই জনসন ১লা জুলাই আইওয়া তে বলেছেন :

The Communists expect us to lose heart, they intend to wear us down. They believe political disagreements in Washington and confusion and doubt in the U. S. A will hand them victory in South Vietnam—and then in Asia. They are wrong.

এই বোমাবর্ষণের পর হ্যানয় থেকে লোকাপসারণে বিপদের গুরুত্ব আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চীন ও রুশ উভয় দেশই মার্কিণ বর্বরতার তীব্র নিন্দা করে উত্তর ভিয়েৎনামের প্রতি এই মার্কিনী চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে উত্তর ভিয়েৎনামকে সর্বতোমুখী সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রসারিত করেছে। চীনা সরকার তো আমেরিকাকে 'boundaries of war', অর্থাৎ যুদ্ধের সীমানা সম্প্রসারণ অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। কয়েকমাস পূর্বে মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিব ডীন রাস্কও ভিয়েৎনাম যুদ্ধের সীমানা সম্পর্কে উল্লেখ করে দ্বিধাহীন ভাবে বলেছিলেন কোরিয়া যুদ্ধের মত এই যুদ্ধে কোনো নির্দিষ্ট এলাকা নেই : "The idea of sanctuary is dead". পূর্ব ইউরোপের ওয়ারশ চুক্তির সহিত সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলিও ভিয়েৎনাম যুদ্ধে চীনের ন্যায় উত্তর ভিয়েৎনামের আমন্ত্রণ সাপেক্ষে স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণের প্রস্তাব গ্রহণ করলেও হো চি মিন সরকারের সঙ্গে উত্তর ভিয়েৎনামের সাহায্যের জন্য বৈদেশিক স্বেচ্ছাসেবকদের উপস্থিতি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

হ্যানয়-হাইফং-এ বোমাবর্ষণে ইংরেজ সরকার ক্ষুব্ধ হলেও ভিয়েৎনামে মার্কিণ নীতির প্রতি তার অকুণ্ঠ সমর্থন রয়েছে। সম্প্রতি ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই বোমা বর্ষণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম থেকে সকল প্রকার বহিরাগত সমরায়োজন অপসারণ করে ১৯৫৪ সালের জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী আলোচনা বৈঠকের আবেদন জানিয়েছিলেন। মার্কিনী-আনুকূল্যের অভিযোগ উত্থাপন করে এই প্রস্তাব চীন প্রত্যাখ্যান করেছে। ভারত যদিও সোভিয়েৎ রুশ জেনেভা সম্মেলনের সহ-সভাপতি (co-chairman) হয়েও এই প্রস্তাব সম্পর্কে কোনো উচ্চবাচ্য করতে পারে নাই। ফ্রান্সের প্রতিক্রিয়াই এ-বিষয়ে রুশ অভিব্যক্তির নিয়ামক।

হ্যানয়-হাইফং-এ বোমাবর্ষণে উত্তর ভিয়েৎনামের জীবনেও মার্কিনীরা সুপরিকল্পিত উপায়ে ত্রাস ডেকে নিয়ে এসেছে। কিন্তু বার বার আলোচনা বৈঠকের সকল রকম প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে চীন ও উত্তর ভিয়েৎনাম এই পরিস্থিতি সৃষ্টির সহায়তা করেছে। মার্কিনীরা ভিয়েৎনাম যুদ্ধের সামরিক মীমাংসার দিকে ঝুঁকে যেন ভিয়েৎনাম যুদ্ধকে বৃহত্তর যুদ্ধে পরিণত করবার দায়িত্ব নিয়েছে, আলোচনার প্রস্তাব পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যান করে চীন-উত্তর ভিয়েৎনাম জোটও, ভিয়েৎনাম যুদ্ধকে সামরিক মীমাংসার দিকে ঠেলে দিয়ে সেই বিপজ্জনক পথেই এই যুদ্ধকে পরিণতি লাভে অগ্রসর হচ্ছে। সোভিয়েৎ রুশের দায়িত্ব শুধু মার্কিনী বোমাবর্ষণের নিন্দায় সীমিত থাকলেই চলবে না, জেনেভার চুক্তি অনুযায়ী বৈঠকের পরিবেশ সৃষ্টির এবং যারাই সেই পথে প্রতিবন্ধক হবে তাদের নিন্দার—সে মার্কিনীরাই হোক কিম্বা চীনারাই হোক। অন্যথায় ভিয়েৎনাম যুদ্ধকে বৃহৎ যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেবার দায়িত্ব শুধুমাত্র জনসনের উপরই বর্তাবে না, রুশ-চীনকেও সেই দায়িত্ব থেকে ইতিহাস রেহাই দেবে না। মার্কিনী বর্বরতার নিন্দার নেতিবাচক ভূমিকা থেকে আলোচনা বৈঠকে পৌঁছাবার বাস্তব ভিত্তিভূমি রচনার পরিচিত দায়িত্ব গ্রহণ না করলে বিস্তৃত যুদ্ধে ভিয়েৎনাম-সংঘর্ষ অনিবার্য ভাবেই পরিণতি পাবে।

সোভিয়েট-ফ্রান্স মিতালী

ভিয়েৎনাম সঙ্কটের সমাধানকল্পে ১৯৪৬ সালের জেনেভা বৈঠক আহ্বানে ব্রিটেন ও আমেরিকার সঙ্গে ফ্রান্স যে একমত নয় গত ৮ই জুলাই ফরাসী প্রধান মন্ত্রী পম্পিদু লণ্ডনে সে কথা প্রকাশ করেছেন। ঐ দিন সবে মাত্র সোভিয়েট রুশ সফর করে ফিরে আসবার পর ফরাসী প্রধানমন্ত্রীর এই মত খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। অথচ পম্পিদু একটি সাংবাদিক বৈঠকে এ-কথা স্বীকার করেছেন সাত বছর ফরাসী ইন্দোচীন যুদ্ধের পর ১৯৫৪ সালের জেনেভা বৈঠকে তার যে মীমাংসা হয়েছিল, সেই ভিত্তিতেই ভিয়েৎনাম সঙ্কটের মীমাংসা করতে হবে। কিন্তু তার সময় এখনও আসে নাই। রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতি এখনও জেনেভা বৈঠক আহ্বানের অনুকূল নয় বলে পম্পিদু মনে করেন :

"We donot believe that the present political and military atmosphere makes recalling the Geneva Conference useful at the present time."

ন্যাটোর সংহত কমাণ্ড থেকে ফরাসী সৈন্য সরিয়ে নেবার সিদ্ধান্তের পর পশ্চিমী গোষ্ঠির সঙ্গে সিমিত-বন্ধন মন নিয়ে ফ্রান্সের সোভিয়েত সফর খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ফ্রান্সের এই সফরকে সোভিয়েট নেতারা কি গুরুত্ব দিয়েছে, তা বোঝা যায় সোভিয়েটের মহাকাশ ঘাঁটি বৈকোনুর থেকে কসমস-১২২ উপগ্রহ উৎক্ষেপণ প্রত্যক্ষ করতে ফ্রান্সকে সুযোগ দেওয়া থেকে। এ-পর্যন্ত অন্য কোনো রাষ্ট্রের নেতাকেই এই মহাকাশ ঘাঁটি দেখবার বা উপগ্রহ উৎক্ষেপণ প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ দেওয়া হয় নাই।

ইউরোপ থেকে মার্কিনী নেতৃত্বের নির্বাসনের জন্য ফ্রান্স বদ্ধপরিকর। ন্যাটোর সংহত সামরিক সংস্থা থেকে বিচ্যুত হবার মধ্য দিয়ে ফ্রান্সের সেই পদক্ষেপই প্রকাশিত হয়েছে।

সুকর্ণের বিপর্যয়

গত ৫ই জুলাই জাকার্তায় সিপলস্ কনসালটেটিভ কংগ্রেসের বৈঠকে সুকর্ণের আজীবন রাষ্ট্রপতিত্ব কেড়ে নিয়ে মাত্র দুই বছরের জন্য তাকে ঐ পদে আসীন করা হয়। শুধু তাই নয় কংগ্রেসের এই বৈঠকে আরও সুদূর প্রসারী কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণে সুকর্ণ অনুসৃত মূলনীতিগুলির আমূল পরিবর্তন সাধনের মধ্য দিয়ে ইন্দোনেশিয়ারও নবায়ন হয়ে যায়।

কংগ্রেসের এই বৈঠকে সুকর্ণর রাষ্ট্রপতির যুগল নামা জারী নিষিদ্ধ হয়েছে এবং সুকর্ণ। রাজনৈতিক চিন্তাধারার পুনর্বিচারের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হয়েছে।

সুকর্ণ-আমলের জাকার্তা-পিকিং অক্ষ বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর, লাল চীন ইন্দোনেশিয়া মৈত্রীর অবসান হয়ে গেল।

মালয়েশিয়ার সহিত তিন বছরের অঘোষিত যুদ্ধ অবিলম্বে বন্ধ করা হবে।

অতঃপর ইন্দোনেশিয়া থেকে কম্যুনিজম, মার্কসিজম ও লেনিনিজম নির্বাসিত হল।

অনিবার্য অর্থনৈতিক সংস্কার সাধনের জন্যও কংগ্রেস নির্দেশ দিয়েছে।

এখানেই সুকর্ণ-অধ্যায়ের শেষ নয়। জাকার্তার পথে ছাত্রদের সঙ্গে সেনাবাহিনী ও পুলিশ মিলিত হয়েছে, গত ৯ই জুলাই থেকে। ইতিপূর্বে সুকর্ণর বিরুদ্ধে বিক্ষোভে খোলাখুলি সেনাবাহিনী কিংবা পুলিশ যোগ দেয় নাই। সুকর্ণর কাছে এদের দাবী অক্টোবরের ব্যর্থ বিপ্লবের কৈফিয়ৎ, জেনারেল সুহার্তোকে নূতন মন্ত্রীসভা গঠনের ক্ষমতাদান, কম্যুনিজম-এর নির্বাসন ও ইন্দোনেশিয়ার প্রায়াকলে বিদেশীদের ব্যবসার অধিকার বিলোপ। এই ব্যবসায়ীরা সকলেই চীনা।

সুতরাং রাষ্ট্রপতির মর্যাদা নিয়ে দু' বছরও সুকর্ণ টিঁকে থাকবে কিনা অতঃপর ইন্দোনেশিয়ার রাজনীতিতে সে-প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

১২. ৭. ৬৬

২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

জয়শ্রী

৩১ বর্ষ ০ চতুর্থ সংখ্যা ০ শ্রাবণ ১৩৭৩

বিংশতম স্বাধীনতা দিবসের সঙ্কল্প

অনেকের মুখে শুনছি এবারকার মত আনন্দ, উৎসাহহীন স্বাধীনতা অনুষ্ঠান নাকি এই উনিশ বছরের মধ্যে আর দেখা যায়নি। কারো কি অন্যরূপ প্রত্যাশা ছিল? সরকারি স্তরে আড়ম্বর আয়োজন করে উৎসবমুখর স্বাধীনতা দিবসের প্রদর্শনীকরা যায় হয়তো কিন্তু জনতার রিক্ত জীবনের হাহাকারকে ধামা-চাপা দেয়া যায় না। অবলুপ্ত করা যায় না সর্বোচ্চ স্তরে যথেচ্ছার, স্বার্থপরতা, দুর্নীতির সহস্র প্রমাণ, রাষ্ট্রের লক্ষ্য সম্বন্ধে পরস্পর-বিরোধী নীতি, অস্পষ্টতা, পরমুখাপেক্ষিকতা যা দেশ ও জাতিকে নিয়ে যাচ্ছে এক অতলস্পর্শী গহ্বরের ধারে। কোনো ইন্দ্রজালের প্রভাবে হঠাৎ সেখান থেকে তার প্রত্যাবর্তন ঘটবে আমরা তা মনে করি না।

এক ক্রুর দ্বিমুখী অভিযান চলেছে ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিরুদ্ধে। দীর্ঘ ১৯ বছর ধরে একদলীয় শাসন ও শোষণ ক্ষমতাসীন দলকে করেছে নিঃশঙ্ক, নির্লজ্জ ও বেপরোয়া, বারবার তাদের যথার্থ চেহারা অনাবৃত হয়েছে জনতার জীবনের সর্বাঙ্গীণ চিত্রে, লোকসভার সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে বিরোধী দলগুলি তাদের কর্তব্য পালন করে চলেছে, কিন্তু একদলীয় ভোটাধিক্যের বিচারে তাদের অনাস্থা প্রস্তাবগুলি একের পর এক বাতিল হয়ে চলেছে। কিন্তু তাতে দেশ ও বিদেশকেও কি ধোকা দেয়া যাচ্ছে "সব ঠিক হ্যায়?" তা সম্ভব নয়, সেকথা ক্ষমতাসীন দলও জানে। তাই মুখে অহিংসার উপদেশ যত সোচ্চার হচ্ছে সরকারি হিংস্রতার আবরণ ততই খুলে পড়ছে। জনতার মুখোমুখি দাঁড়াবার নৈতিক সাহস নেই শাসকগোষ্ঠীর। তারা আত্মরক্ষা করছে ক্রমবর্দ্ধমান লাঠি, কাঁদুনে গ্যাস, বেয়নেটের আড়ালে। জনতাও মরিয়া হয়ে উঠেছে, ভয় ভাঙ্গছে তাদের, প্রতিদিনের তিলে তিলে মৃত্যু থেকে, একদিনের বেহিসেবী আত্মদানে চরম প্রতিবাদের শোণিত স্বাক্ষর

রাখছে তারা বারবার, ভারতের দিকে দিকে। তাদের নিকট অহিংসার বাণী প্রচার করার মধ্যে না আছে মনুষ্যত্ব, না সার্থকতা, এমনকি নূতনত্বও নয়।

ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৭ ভারতের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের তারিখ স্থির হয়েছে। গণতান্ত্রিক দেশ মাত্রেই সাধারণ নির্বাচন একটী গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা। নির্বাচক মণ্ডলীর সমর্থন লাভের আশায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সাধারণ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হবে এটা প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক। এদেশেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ক্ষমতাসীন ও বিরোধীদলগুলি উভয়েই সেই প্রস্তুতিপর্ব শুরু করেছে বেশ কিছুদিন হোলো। ক্ষমতাসীন দলের চিরাচরিত দাবী তারা দেশকে গণতন্ত্র, জাতীয় সংহতি ও অর্থ-নৈতিক উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নতির নিরিখ যদি হয় দেশজুড়ে বুভুক্ষিতের মিছিল ও মৃত্যুপণ-প্রতিরোধ, ক্রমবর্দ্ধমান ছাঁটাই ও বেকারি, সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা অনুযায়ী এদেশের গ্রামাঞ্চলের এক তৃতীয়াংশ পরিবারের দৈনিক আয় দুই টাকা বা তারও কম এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে জীবনধারণের প্রাথমিক প্রয়োজন সমূহের যথেচ্ছ ঊর্দ্ধগতি, মুদ্রামূল্যহ্রাসের ফলশ্রুতি হিসাবে রপ্তানী বৃদ্ধির পরিবর্তে উৎপাদনে ঘাটতি এমন কি ভারতের বুনিয়াদি রপ্তানী পণ্য পাট ও চা শিল্পে পর্যন্ত বিপর্যয়ের কালোছায়া। আরো উদাহরণ বৃদ্ধি নিষ্প্রয়োজন—তবু কি স্বীকার করতে হবে যে অর্থনৈতিক উন্নতির পথে ভারতবর্ষ এই ১৯ বছরে দৃঢ়পদক্ষেপ করেছে? আর সমাজতান্ত্রিক আদর্শের অনুসরণ সম্পর্কে মূল্যায়ন করবার কোনো প্রয়োজন আছে বলেও মনে হয় না—বৈদেশিকঋণ-বিশেষভাবে মার্কিনী ঋণ লাভ করবার সর্ত হিসাবে দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব একের পর এক বিসর্জিত হচ্ছে এবং পাব্‌লিক সেক্টার সঙ্কুচিত ও প্রাইভেট সেক্টার ক্রমশঃ বিস্তৃততর হয়েই চলেছে। এই অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের উভয় সীমান্তেই শুধু গুরুতর আক্রমণাত্মক পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে তাই নয়, ভারতের অভ্যন্তরে জাতীয় প্রতিরোধকে দুর্বল ও বিভ্রান্ত করবার জন্য, জাতীয় সংহতি ও প্রস্তুতি ব্যর্থ করবার চেষ্টা চলে আসছে ক্রমাগত। আশঙ্কার কথা সে বিষয়ে ভারতের জনসাধারণ যথেষ্ট পরিমাণে সজাগ নয়। এই অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক। জীবন-যাপনের প্রতিটি স্তরে এত ব্যর্থতা ও হতাশা যে তা থেকে যে কোনো উপায়ে মুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষা প্রথমিক সর্ত হিসাবে দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক নয় এবং এই জন্যই প্রতিটী সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে বিরোধী দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হবার তাগিদ অনুভব করে থাকে ক্ষমতাসীন দলকে ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত করবার আশায়। যেহেতু তারা এককভাবে শাসক দলকে ক্ষমতা থেকে অপসারিত করবার শক্তি রাখে না। এই নির্বিচার ঢালাও ঐক্যবদ্ধ হবার তাগিদের মধ্যে রয়েছে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। বিশেষ ভাবে কম্যুনিষ্ট দল এই 'ইউনাইটেড ফ্রন্ট' গঠনে অত্যুৎসাহী। বিশ্বের সর্বত্র দেখা গেছে এই

ইউনাইটেড্ ফ্রন্ট গঠনের ফলে কম্যুনিষ্ট ব্যতীত অন্যান্য দলগুলি নিজেদের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্ন মত ও পথকে পরিত্যাগ করে কমিউনিষ্ট দলের অনুসারি হয়ে পড়ে এবং তার নেতৃত্বে নিজেদের স্বকীয় লক্ষ্যকে বিসর্জন দিয়ে পরোক্ষে কেবলমাত্র কমিউনিষ্ট দলকেই পুষ্ট করে। আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের স্বার্থে জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দেবার প্রলোভন কম নয় কারণ কমিউনিষ্ট দলগুলি কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলি থেকে নানাভাবে অর্থ, রসদ ও অন্যান্য সাহায্য পেয়ে থাকে। জাতীয় বিরোধী দলগুলি এই সাহায্য-পুষ্ট শক্তি দেখে তাদের অনুসারী হবার জন্য প্রস্তুত হয় এবং অন্তিমে নিজেদেরও জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে আত্মহত্যা করে। এর দ্বারা আর যারই লাভ হউক না কেন—ভারতের জাতীয় স্বার্থ নিঃসন্দেহ বিসর্জিত হয়। নির্বাচনের মাধ্যমে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে দলীয় ও ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষার তাগিদে জাতীয় স্বার্থ ও মর্যাদাকে বিনা দ্বিধায় বিসর্জন দিতে এরা ইতস্ততঃ করে না। অথচ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংকট ও সংঘর্ষকে দেখেও শিক্ষা লাভ করেনি ভারতবর্ষ, করতে প্রস্তুত নয়। ভারতবর্ষের সমীপবর্তী প্রতিবেশী দেশগুলিতে পুরোনো ও নতুন সাম্রাজ্যবাদের যে সংঘাত চলেছে, যার ফলশ্রুতি ভিয়েটনাম, ইন্দোনেশীয়া প্রভৃতি ভারতবর্ষে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে, আশ্চর্য্যের বিষয় গত ১৯ বছরে একদিকে কংগ্রেস অন্যদিকে কম্যুনিষ্ট দলের আচরণ, ও কার্যকলাপ দেখেও বিরোধীদলগুলি সে শিক্ষাগ্রহণ করতে রাজী নয়। দেখেশুনে এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য ভাবে করতে হয় যে, দেশ ও জাতি অপেক্ষা বড় ব্যক্তিগত ও দলীয় মর্যাদা ও ক্ষমতালাভ। কমিউনিষ্ট দলের —দক্ষিণ বা বাম সে যে কোনো মার্কারই হোক না কেন বক্তব্য ঘুরে ফিরে সেই একই—রুশ অথবা চীনের জনসাধারণ কত অগ্রসর, কত সুখী, কত শক্তিশালী, এবং ভারতবর্ষের কর্তব্য তাদের নিকট হ'তে শিক্ষালাভ করে তাদের অনুকরণ ও অনুসরণ করা। সেই সঙ্গে অতি সূক্ষ্মভাবে নিরবধি দেশের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা ও হীনমন্যতা প্রচার করা, এই অতি-পরিচিত্ত কৌশল চলেছে আবহকাল। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন দলের লক্ষ্যহীনতা, দুর্নীতি ও ক্ষমতাগর্বী হৃদয়হীনতার ফলে দেশের জনসাধারণের ক্রমবর্দ্ধমান দুঃসহ জীবন যা কমিউনিষ্ট দলের প্রচার ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে অনুকূল ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে ভারত-প্রেমিক (অবশ্যই প্রতিক্রিয়াশীল) অ-কংগ্রেসী ও অ-কমিউনিষ্ট দলের চলার পথ নিঃসন্দেহ কঠিন এবং বিকৃত ব্যাখ্যার শিকার হওয়াও সহজ ও স্বাভাবিক। কিন্তু যদি দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে বিপন্মুক্ত রাখতে হয় তবে গভীর প্রত্যয়, সাহস ও বিশ্বাস নিয়ে ক্ষমতা ও পদের লোভ পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র দেশের স্বার্থ ও জাতির ভবিষ্যৎকে লক্ষ্য রেখে অগ্রসর হতে হবে। এ ব্যতীত অন্য সহজ সুখ পথ আমাদের জানা নেই। এই পথেরই সন্ধান দেবার চেষ্টা হয়েছে বর্তমান সংখ্যায়।

বর্তমান স্বাধীনতা সংখ্যার পরিকল্পনা করা হয়েছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আদিপর্ব থেকে সুরু করে দেশবিভাগের আপোষবাণী পথে সেই সংগ্রামের ধারাকে বিপথগামী করবার প্রচেষ্টার পরিচয় দান। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের হাজার সমস্যার সংক্ষেপ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দ্বারা অহিংসা ও ভুয়া শান্তির পথে দেশকে পরিচালিত করার খেসারত লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষকে বলি দিয়ে লক্ষাধিক নারীর সম্মান ও মর্যাদাকে ধূলায় লুটিয়ে এবং এককোটীর বেশী মানুষকে তাদের স্বদেশ ও স্বভূমি থেকে উৎখাত করে তা সপ্রমাণ করা। এত মূল্য দিয়ে লাভ হয়েছে—অন্ত সহস্র সমস্যা বাদ দিয়ে—অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরমুখাপেক্ষী পরনির্ভর এক দুর্বল ভারতবর্ষ। আর পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অবাস্তব নীতি অনুসরণের ফলে সারা বিশ্বে কূটনৈতিক পরাজয় এবং পাক-চীনের দিক থেকে সদা আক্রমণ আশঙ্কা। অথচ এ সম্পর্কে কোনো বাস্তব বলিষ্ঠ নীতি নেই। একদিকে জাতিকে সতর্ক করা হচ্ছে সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে তৈরী থাকার জন্য, সঙ্গে সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসা সম্বন্ধে সোচ্চার ঘোষণা চলছে। এদেশের শাসকরা কি বোঝেন না যে মানুষ কলের পুতুল নয় পরস্পর-বিরোধী মনোভাব ও পরিবেশকে একই সঙ্গে জাগিয়ে রাখার পরামর্শ দেয়া যেমন অবাস্তব তেমনি বিপজ্জনক। ফলে জনসাধারণ কোনো সুনির্দিষ্ট নির্দেশ পায় না, কোন মনোভাব ও প্রস্তুতি তারপক্ষে বাস্তবানুগ ও উচিত। সর্বক্ষেত্রে এই অবাস্তবতা ও নীতির অপরিচ্ছন্নতা বহুলাংশে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এই সংখ্যার লেখাগুলিতে। বিশেষতঃ ডাঃ অশোক মজুমদার লিখিত "দেশবিভাগে ও নেতাদের ভূমিকা" এই প্রবন্ধে। কংগ্রেসের নেতারা স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায়ে কিভাবে ধাপেধাপে অবাস্তব নীতি, পথ ও মতকে অনুসরণ করে, এদেশের কোটী কোটী মানুষকে—যারা সেই নেতাদের উপর পূর্ণ আস্থা ও নির্ভরশীল হয়েছিল—সর্বনাশের পথে নিয়ে গিয়েছিলেন—যে ভুলের অভিশাপ তাদের জীবনকে করেছে ব্যর্থ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাহীন তার বাস্তবানুগ তথ্যবহুল বিশ্লেষণ। দেশবিভাগের জন্য কেবলমাত্র মুসলীম লীগ ও জিন্নাকে দায়ী করলে যে যথার্থ সত্যে পৌঁছান যাবে না, মহাত্মাগান্ধী, নেহেরু, প্যাটেল প্রভৃতি নেতৃবৃন্দও যে তার জন্য সমান দায়ী এই তথ্য উদ্ঘাটিত হবে। প্রতিটী ভারতবাসীর এই অধ্যায়কে তথ্য-নির্ভর হয়ে জানতে, বুঝতে বিশ্লেষণ করে সত্যে পৌঁছাতে হবে তা না হলে বর্তমান ভারতের বৃহত্তম ট্র্যাজেডী—যা পরবর্তী বহুতর ট্রাজেডীর জন্মদাতা তা অনাবিষ্কৃতই থেকে যাবে। ফলে ভুল প্রেমিস থেকে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে জাতির ভবিষ্যৎ চলার পথও বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠবে। দেশবিভাগের পশ্চাৎপট বোঝবার জন্য আমাদের পাঠক পাঠিকাদের কার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়ের সম্প্রতিক প্রকাশিত শ্রী এস, কে মজুমদার লিখিত

চমৎকার বিশ্লেষণাত্মক মূল্যায়ন "Jinnah and Gandhi" পুস্তকটী পড়তে অনুরোধ করি। সম্ভবতঃ এই বইতে দেশবিভাগে বিভিন্ন নেতাদের ভূমিকা সম্পর্কে বহু অজ্ঞাত তথ্য তাঁরা জানতে পারবেন এবং এই অধ্যায়ের যথার্থ মূল্যায়ণ দ্বারা এই প্রচণ্ড ঐতিহাসিক ঘটনাকে নানাদিক দিয়ে বিচার করে বড় বড় কথার আড়ালে নেতাদের অনুসৃত সর্বনাশাত্মক নীতি, তাদের অদূরদর্শিতা এবং ব্যক্তি চরিত্রের নানা অসম্পূর্ণতা, ক্ষমতালাভের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা কি ভাবে এই অবিশ্বাস্য ঘটনাকে সংঘটিত করে দুদেশের কোটী কোটী সাধারণ মানুষের জীবনে চরম দুর্দশা ডেকে এনেছে তা বুঝতে পারবেন এবং তা জেনে ও বুঝে বর্তমাণ কংগ্রেস নেতৃত্বের—যে নেতৃত্ব ১৯১৯ থেকে মুখে ও কাজে মহাত্মাগান্ধির মতামত নীতি ও কৌশল দ্বারা পরিচালিত হয়েছে কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব মুহূর্তে যাঁর নেতৃত্ব তাঁদের আর প্রয়োজনবোধ হয়নি শুধু তাই নয়, চরম পর্যায়ে যারা সে নেতৃত্বকে অসুবিধাজনক জ্ঞানে বর্জণ করেছে, যে মহাত্মা গান্ধী ব্যক্তিগত অহিংসার নীতি পরীক্ষা নিরীক্ষার পথে এই সুবৃহৎ দেশের কোটী কোটী জনসমষ্টির পরিপূর্ণ আস্থা ও আনুগত্য লাভের ফলে তাদের এমন একটা প্রান্তীয় সীমায় এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন যেখান থেকে শেষ মুহূর্তে তাদের প্রত্যাবর্তন আর সম্ভব ছিল না—তা জানতে ও বুঝতে পারবে। অপরদিকে দেখে মহাত্মাগান্ধির মত ও পথের একমাত্র প্রতিরোধী শক্তি, যিনি পরিপূর্ণ আত্মাবলুপ্তি, দেশ ও জাতির স্বার্থে যে কোনো ত্যাগ ও দুঃখবরণের সঙ্কল্প, যে কোনো দুর্গম পথকে একাকী অনুসরণ করবার মত দুঃসাহসিক ব্যক্তিত্ব ও প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয় নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন অজানার পথে, একমাত্র লক্ষ্য ছিল স্বদেশের স্বাধীনতা লাভ এবং সে লক্ষ্য সামনে রেখে ভারতের প্রয়োজনে মিত্র খুঁজেছেন ভারতের শত্রুর যারা শত্রু তাদের সঙ্গে স্বাভাবিক মৈত্রী-স্বার্থের নৈকট্য অনুভব করে। তাঁর বিরুদ্ধ-পক্ষীয়েরা সে সময় তাঁকে ক্ষমতা-লোভী, ফ্যাসিস্ট, জাপানীদের তাঁবেদার ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যায়িত করতে দ্বিধা করেনি। কংগ্রেসের কিছু অতি-প্রগতিশীল নেতা ও পরাধীন ভারতের প্রধানতম শত্রু সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তির সহিত স্বদেশের বিরুদ্ধে গাঁটছড়া বাঁধতে যাদের প্রগতিবাদী বিবেক বিন্দুমাত্র ইতঃস্তত করেনি সেই কম্যুনিষ্ট দল সেদিন ভারতের জনসাধারণের নিকট তাঁকে হেয় ও বিকৃত করতে কোনো চেষ্টারই ত্রুটি রাখেনি। অন্যসব নেতাদের আপেক্ষা ভিন্নতর ধাতু, প্রকৃতি, দৃষ্টিভঙ্গী ও নীতিদ্বারা গঠিত এই একটিমাত্র ব্যক্তির দৃষ্টিতে সেই দুর্যোগ পূর্ণ দিনগুলির বহুপূর্বেই ধরা পড়েছিল জাতির সামনে সম্ভাব্য বিপদ। ১৯৩৮ এর ফেব্রুয়ারিতে হরিপুরা কংগ্রেসে তাই বিশ্ব ইতিহাসের নিখুঁত ব্যাখ্যা করে সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন সুভাষচন্দ্র "an internal partition is necessary in order to neutralise the transference of power"

সেদিনকার অতি-প্রবীণ, অতি-বিজ্ঞ, আন্তর্জাতিকেরা এই সব উক্তিকে শিশুসুলভ জ্ঞানে অবজ্ঞায় তুচ্ছ ও উপহাস-যোগ্য মনে করেছিলেন এ অনুমান করা কঠিন নয়। কিন্তু গান্ধীযুগের এই একটিমাত্র ননকনফরমিষ্ট নেতা যিনি নিজের বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে গ্রাহ্যমাত্র না করে তাঁর জীবনের আশৈশব মিশনে—বিবসভায় ভারতকে তার যোগ্য মর্যাদায় স্থাপিত করবার ব্রতে—অবিচল ছিলেন। অন্যান্য নেতাদের ছিল আরো বহুতর লক্ষ্য, নীতি ও কৌশল।

উনিশ বছর ধরে দেশ কি প্রচুর প্রমাণ পায়নি কোন বিশ্লেষণ, কোন্ নীতি, কোন কৌশল নির্ভুল প্রমাণ হয়েছে? যে নেতারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ও নির্বাধায় তাঁদের নীতি, মত ও পথের অনুসরণ করেছেন এই দীর্ঘদিন তার ফলশ্রুতি—দেশ-বিভাগ, তার পরিণতি বর্তমান ভারত। আজকে নিঃসন্দেহ প্রয়োজন অন্য পথ ও অন্যনীতির অনুসরণ—যার লক্ষ্য হবে স্বনির্ভর, স্বয়ংসম্পূর্ণ শক্তিশালী ভারতবর্ষ, অন্যের স্বার্থ অথবা ভীতি প্রদর্শনে যে লক্ষ্যত্যাগ করবে না। কোনো দেশই স্ব স্বার্থকে পরিত্যাগ করে ভালমানুষী করে না, করবে না, কিন্তু ভারতবর্ষ কখনো ইংলণ্ড, কখনো রুশ কখনো যুক্তরাষ্ট্রকে পরম মিত্র জ্ঞানে শিশুসুলভ কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে যায়। চীন-ভারত যুদ্ধে যারা অস্ত্র সাহায্য করেছে তারা নিজের স্বার্থেই করেছে ভারতের নয়, বড় জোর ভারতের ও তাদের স্বার্থ তখন মিলে গিয়েছিল। এতে কোনো সুউচ্চ নীতি অথবা ভালমানুষির স্থান নেই। কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে সিকিউরিটি কাউন্সিলে এতদিন রুশ ভারতকে সমর্থণ করেছে এর দ্বারা ভারতের প্রতি তার পক্ষপাতিত্বের প্রমাণ দেখে যাঁরা উল্লসিত হয়েছেন তাঁদের তাসখন্দের গোলকধাঁধার লাভ লোকসান বিচার করে দেখতে বলি। পাকিস্তানের প্রতি চীন ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়ের মৈত্রীপ্রীতির বাস্তব কূটনীতি, এবং কমিউনিষ্ট চীনের ধর্মভিত্তিক একতন্ত্রী রাষ্ট্র পাকিস্তানের সহিত সম-স্বার্থের বন্ধনের গ্রন্থি উন্মোচন করতে বলি। যাঁরা শান্তি ও অহিংসার নামে নিউক্লিয়র অস্ত্র তৈরী থেকে ভারতকে বিরত রাখতে চান অথচ বিশ্বের দুই প্রধান আণবিক শক্তির নিকট নিরন্তর আকুল আবেদন করে চলেছেন, তাদের ছত্রচ্ছায়ার আশ্রয় নিতে বিবেক, মর্যাদা অথবা অহিংসা নীতিতে যাদের বাঁধে না, নিকৃষ্টতর ও অপ্রতুল অস্ত্রে সজ্জিত করে এদেশের জওয়ানদের শ্রেষ্ঠতর অস্ত্রশস্ত্রের শিকার হয়ে প্রাণ দিতে যাদের নৈতিকতায় বিন্দুমাত্র আটকায় না, তাদের স্বার্থপর দুর্বলতার মুখোস ও নীতিহীন দৃষ্টিভঙ্গীকে নিন্দা করবার মত ভাষা পাওয়া যায় না। আমরা আহ্বান করবো ভারতের তরুণ ও যুবক শ্রেণীকে বর্তমান ক্ষমতালোভী, স্বার্থপর নেতৃত্বকে অপসারিত করে স্বশক্তি, মর্যাদা ও ঐতিহ্যে ভারতবর্ষকে প্রতিষ্ঠিত করতে, আর এই পথে নেতাজীর ব্যক্তিগত নেতৃত্ব লাভ যতদিন না ঘটছে

—কারণ আমরা প্রত্যাশা রাখি সে নেতৃত্ব লাভের দুর্লভ ভাগ্য ভারতের হবে—ততদিন তাঁর জীবন, বাণী ও কর্মকে অনুধাবন ও অনুসরণ করে ভারতে সুভাষ-যুগকে আনয়ন করতে। ভারতের প্রয়োজন—লেনিন বা মাও সে তুং নয়—এসব নেতাদের নিকট থেকে ভারতের শিখ্‌বার যা রয়েছে তা শিখ্‌তে ভারত কোনোদিন বিধাগ্রস্থ নয়—কিন্তু সে অনুসরণ করবে এ যুগের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীকে, যাঁর প্রভাব ও পথ থেকে দেশকে দূরে রাখবার জন্য বর্তমান ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দের চেষ্টার অন্তনেই ; আর যাঁর নামোচ্চারণ করতেও সদা-বিরত থাকে ভারতের একমাত্র "জনদরদী" কমিউনিষ্ট দল। এই উভয়ের উদ্দেশ্যমূলক প্রচার ও কূট-কৌশল থেকে দূরে থাকতে বলবো দেশের জনসাধারণকে। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পূর্বাহ্নে বিংশতম স্বাধীনতা দিবসের সঙ্কল্প হিসাবে দেশকে আমরা আহ্বান করছি সুভাষচন্দ্রের পথে, সুভাষ-যুগের সূচনা করতে, কেবলমাত্র ভারতবর্ষে নয় সমস্ত বিশ্বকে বিশেষতঃ এশিয়া ও আফ্রিকার সদ্য ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ মুক্ত জনতার সাম্‌নে আমরা রাখ্‌ছি এই নতুন জাতীয়তাবাদ, নতুন আন্তর্জাতিকতা—যার উৎস জাতীয়তায়। যে জাতীয়তা পূর্ণ সার্বভৌমিকতা, স্ব স্ব ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক প্রয়োজনানুসারি যুগযুগবাহী বিশিষ্ট ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, যার আন্তর্জাতিকার ভিত্তি পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সমমর্যাদায় আদান প্রদান, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও খবরদারি বা ভূয়া আন্তর্জাতিকতার আড়ালে স্থূল-মাষ্টার সুলভ মুরুব্বিয়ানা নয়। সারা বিশ্বের উপর 'আমেরিকান সেঞ্চুরি' অথবা রুশ-চীনের পক্ষচ্ছায়া বিস্তারের পরিবেশ রচনা নয়। স্ব স্ব প্রয়োজন, প্রতিভা, ঐতিহ্য, বিচার ও রুচি অনুযায়ী বিচিত্র, বিভিন্ন পথে সভ্যতার প্রগতি ও ক্রমবিকাশে আমরা বিশ্বাসী। ভারতবর্ষকে সেই মহান প্রয়াসের পূর্ণ সরিক ও অংশীদার করতে আমরা প্রয়াসী ও দৃঢ় প্রত্যয়ী। আমাদের নীতি—আমরা নির্ভেজাল ভারত-পন্থী।

১৮।৮।৬৬

নিক্ষেপিত প্রতিমা : কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

অতিক্রান্ত উনিশ বছর।
উনিশ বছরে অবিকল
কতো না নির্মল শোভা
হ'তে পারে সমস্ত শরীরে।
যদি বৃক্ষ হ'তো তবে বিশাল শরীরে
এতো দিনে বনস্পতি-শোভা ;
যদি নদী হ'তো তবে সমুদ্র সঙ্গমে
এতো দিনে সার্থকতা তার।
যদি প্রেম হ'তো তবে উত্তরপুরীর
এতো দিনে সুস্থ অধিকার।
যদি পাঠ হ'তো তবে উজ্জীবন মন্ত্রে চতুর্দিকে
লাঙলের সুতীক্ষ্ণ ফলায়
ফসলের সোনালী বিস্তার।

উনিশ বছরে পৌঁছে গিয়ে
সমস্ত অন্বেষণ
জলে-যাওয়া চৈত্রের আকাশ ;
শরীরে শরীরে চতুর্দিকে
হাড়গুলো গণনীয়, মুনাফা হাতায়
বছর বছর ধরে বর্বরের লোভ।
প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার
একে একে খসে পড়ে জলে নিক্ষেপিত
প্রতিমার মৃত্তির মতোন,
থাক চাতুর্যের অন্তরালে।

চতুর্দিকে কোলাহলে সংসার এখন
ফিরে পেতে চায় তার বহু-প্রতিশ্রুত
সমস্ত মৌলিক অধিকার।

স্বদেশী অনুভবে — বিজয়কুমার দত্ত

সারা দেশময়, মরুভূমি বালিয়াড়ি
ফসল ফলানো স্বপ্ন ছিল কি বুকে ?
কোটি মানুষের ছায়া হাঁটে সারি সারি—
নীল মৃত্যুর আভাস লেগেছে মুখে।

তোতাপাখী রোজ ভোরবেলা গায় গান—
ইথার নদীর ঢেউ বেয়ে কাণে বাজে,
কেন যে বুকের ভিতরে দারুণ জ্বলে ওঠে অপমান
প্রতিবাদী এক ছিন্নোরণের সাজে।

অফিস কাছারী, ট্রামে বাসে সিনেমায়
স্কুল কলেজের চৌহদ্দীর মাঝে—
আগুন জ্বালানো কত স্বর শোনা যায় !
রক্তের সাথে সে সব কি লেখা আছে ?

উনিশ বছর দুঃস্বপ্নের মতো
ভয়াবহ দিন রাত্রির খতিয়ান
এখনো হয়নি। নিঃশ্বাস জুড়ে ব'য়ে যায় অবিরত
লবণ ছোঁয়ানো কালো বারুদের ঘ্রাণ।

শরীরে এখন আগুন জ্বলছে, আকাশ হয়েছে লাল,
ওই আগুনেই সূর্য উঠবে কাল।

জাতীয় আন্দোলনের প্রাথমিক ভিত্তি

রমেন্দ্রনারায়ণ সরকার

এক

'জনশক্তির ভ্যামপায়ার পক্ষী'

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এবং তারও বেশ কিছু আগে রচিত 'বর্তমান ভারত' রচনায় স্বামী বিবেকানন্দ ঘোষণা করেছেন জনশক্তির অপরাজেয় মহিমার কথা। প্রজাশক্তির ভিত্তিভূমিতে রাজন্যবর্গের রাজপাট এবং নেতৃবৃন্দের গৌরব-অট্টালিকা প্রতিষ্ঠিত। এই 'শক্ত্যাধার প্রজাপুঞ্জ' যখনই শাসকগণ কর্তৃক শোষিত ও নির্যাতিত হতে আরম্ভ করে তখনই সেই শাসকের ধ্বংসের সূচনা হয়।

ইংরেজ তথা বৃটিশ বণিকের মানদণ্ড যেদিন রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হল সেদিন কোম্পানির কুতর্কী পুরুষ ক্লাইভের স্বপ্ন কত সুদূরপ্রসারী ছিল, তা আজ ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের বিষয়। কিন্তু বৃটিশরাজ সেদিনই ভারতবর্ষে তার মৃত্যুশয্যা রচনা করলো যেদিন থেকে তার স্বার্থপরতা এবং ক্ষমতাগর্ব ভারতবাসীর সামান্যতম স্বচ্ছন্দতাকে পদদলিত করতে শুরু করলো। স্বামীবিবেকানন্দ ছিলেন সত্যদ্রষ্টা ঋষি। তাঁর এই ঘোষণা আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

"এক্ষণে বৈশ্যকুল আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছে; অতএব প্রজার সহায়তা অনাবশ্যক জ্ঞানে আপনাদিগকে প্রজাপুঞ্জ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে; এই স্থানে এ শক্তিরও মৃত্যুবীজ উপ্ত হইতেছে।"

পলাশীর যুদ্ধের পর ১৮৫৮ খৃঃ পর্যন্ত একশ বছর ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারত শাসন করে। একটি বণিক প্রতিষ্ঠান বা বৈশ্য সংঘ একশ বছর অবধি ভারতের রাজপাট অধিকার করেছিল। এই দীর্ঘ একশ বছরের মধ্যে এই বৈশ্যকুলের অর্থনৈতিক শোষণ এবং রাজনৈতিক অবিচার যে কত সুদূরপ্রসারী ও নিষ্ঠুর, তা সে যুগের নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক মাত্রেরই দৃষ্টি এড়ায়নি।

ইংরেজ শাসন ও শিক্ষার আগে সারা ভারতে যেমন এক জাতীয়তা বা নেশন বোধ জাগেনি, তেমনি এর আগে কোনো বহিরাগত শাসনযন্ত্রের শোষণ ও অত্যাচার এত গণস্পর্শী হয়নি। ইংরেজী শিক্ষা বাইরের জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং আধুনিক জগতের বিভিন্ন কর্মধারার সঙ্গে পরিচিত হতে আমাদের সহায়তা করেছে। এ হল বৃটিশ শাসনযুগের সর্বাধিক ইতিবাচক (positive) ফলশ্রুতি। কিন্তু নেতিবাচক (negative) দিকেও বৃটিশ শাসন আমাদের কম কল্যাণ করেনি। তার অর্থনৈতিক শোষণ এবং রাজনৈতিক ব্যভিচার সমস্ত ভারতীয়ের মনে একটা সাধারণ আত্মবোধ এবং তজ্জাত ঐক্যবোধ সৃষ্টি করেছে।

এ বিষয়ে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের অভিমত উল্লেখযোগ্য:

"মধ্যযুগের তুর্কী মুঘলদের শাসন ও শোষণ হইতে য়ুরোপীয়দের নীতির প্রভেদ একটি আয়গায়। তুর্কী মুঘলরা পরদেশ জয় করিতে আসে—এবং ভারত জয়ও করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা এ-দেশকে মাতৃভূমিরূপেই বরণ করিয়া লয়। এ-দেশের অধিবাসীর সহিত রক্তের সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া পড়ায় এই দেশ হয় তাহাদের বাসভূমি—ইহার সুখ-দুঃখ—ইহার ভালোমন্দ সমস্তের সঙ্গে তাহারা জড়াইয়া পড়ে।

মুঘল-পাঠান বাদশাহ, উজীর, সওদাগরের সন্তানরা এদেশেই শিক্ষিত হইত; এদেশের আহার-পানীয় দ্বারা রাজকুল পরিতৃপ্ত হইতেন; তাহাদের বিলাসব্যাসনের জন্য অপব্যয়ের প্রত্যেকটি কপর্দক দেশের লোকের কাছেই ফিরিয়া যাইত; ভারতকে কোনো 'হোমচার্জ' বহন করিতে হইত না। ঠিক বিপরীতটি ঘটে য়ুরোপীয়দের বেলায়। তাহারা এ দেশকে তাহাদের চাষের ক্ষেত্রতুল্য করিয়া রাখে—বৎসর বৎসর শস্য কাটিয়া গৃহে লইয়া যাওয়াই ছিল জমির সহিত তাহাদের সম্বন্ধ। ...ভারত হইতে ধনরত্ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শোষণ ও লুণ্ঠন ছিল এই শ্বেতাঙ্গ শাসকদের বৈশিষ্ট্য..... বৃটিশ যুগে সমগ্র ভারতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া ইংরেজ ভারতীয়দের সকল প্রকারের সম্পদ সুনিপুণভাবে শোষণ করে। জলজন্তুর ভ্যাম্পায়ার পক্ষী যেমন তাহার দীর্ঘপক্ষ দ্বারা ক্লান্ত পথিকের দেহ ব্যজন করে ও পরে চঞ্চুসংযোগে তাহার সমস্ত রুধির শুষিয়া পান করে—সেই পদ্ধতি ছিল বৃটিশের।" [১]

এই সর্বব্যাপী শোষণ ও লুণ্ঠনের কিছুটা পরিচয় সে যুগের ভারতীয় অর্থনীতির ক্রমাবনতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে পাওয়া যায়। এই সর্বগ্রাসী লোভ ও অমানবিকতার পটভূমিতেই ভারতে জাতীয়তার উদ্ভব ঘটেছে এবং ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের বীজ উপ্ত হয়েছে বৃটিশের এই রক্ত শোষণের প্রতিক্রিয়া থেকে। প্রজাকুলকে অবজ্ঞা এবং অত্যাচার করার যে পরিণাম যুগে যুগে নানাদেশের স্বৈরাচারী শাসকেরা লাভ করেছে, অপ্রতিরোধ্য বৃটিশ শাসকগণকেও সেই পরিণাম বহন করে শেষ পর্যন্ত ভারত থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, সারা বিশ্বে আজ বৃটিশ শক্তির প্রভাব ক্রমশঃ স্তিমিত হতে চলেছে। এজন্যেই আমরা বলছিলাম, বৃটিশ-রাজের স্বৈরাচার নেতিবাচক পন্থায় উপৌদিক থেকে আমাদের কল্যাণ করেছে। একটি বেদনাহত জাতির বিমুক্ত আত্মার জাগরণ ঘটিয়েছে।

দুই

'জনগণে যারা জোঁকসম শোষে তারে মহাজন কয়'

বৃটিশ জাতি মহান। শিক্ষায় সভ্যতায় তার উন্নতির গর্ব আকাশস্পর্শী। সে মহাজন। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে এই মহাজন-বৃত্তি সম্পূর্ণ রূঢ় অর্থে প্রযোজ্য। আমরা মহাজন বলতে এ যুগের শাইলকদের বুঝিয়ে থাকি। এবার এই মহাজন-পন্থার কিঞ্চিৎ কিরিস্তি রচনা করা প্রয়োজন।

পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী একশ বছরের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, এই সময়সীমার মধ্যে বৃটেনে অভূতপূর্ব আর্থিক উন্নতি ঘটেছে। ১৭৬০থেকে ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিজ্ঞান এবং কারিগরী শিল্পে যুগান্তর এল। এর ফলে ইংলণ্ডে অভাবিতপূর্ব শিল্পযুগের পত্তন হল। এই সহসা অভ্যুদয়ের পেছনে ভারত লুণ্ঠনের পটভূমিকা বিদ্যমান। ভারতীয় রাজন্যবর্গের স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার বিরাট অংশ ওদেশে চলে গেল। আর এদেশের মূলধন ও লুণ্ঠন-সঞ্চিত কাঁচামালে বিলেতের শিল্প-বাণিজ্য ফেঁপে উঠলো। তারপর অতি সুকৌশলে বিদেশী শিল্পজাত পণ্যজাত পণ্য-সম্ভার ভারতীয় বাজার ছেয়ে ফেললো আর এদেশের কুটির শিল্পের হল অকাল অপমৃত্যু। 'ভারত ছিল শিল্পজাত দ্রব্যাদির রপ্তানীকার, এখন সে হইল বিদেশী মালের আমদানীকার।'[২]

যারা ছিল শিল্পজীবী, কর্মহীন হয়ে পড়ে তারা হল কৃষিজীবী কৃষিযোগ্য ভূমির উপর অত্যধিক চাপ পড়লো। কিন্তু কৃষিপদ্ধতি রইলো সেই যাদ্ধাতার আমলের। ফলে শিল্প ও

১. ভারতের দ্বাধীনতা আন্দোলন...প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫—৬।

২। ভারত স্বাধীনতা আন্দোলন—প্রভাতকুমার ; পৃঃ ৫৫

কৃষি উভয় ক্ষেত্রেই ভারতবাসী একরকম দুর্দশার সম্মুখীন হলো। কিন্তু বিদেশী বণিকরাজের ঐশ্বর্যভাণ্ডার পূরণে উৎসাহের কোন কমতি পড়লো না।

১৭৬৫ সালে কোম্পানি মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে। তারপর লুণ্ঠন এবং শোষণের অর্থ দিয়ে রাজকোষ এবং কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ভাণ্ডার বিরামহীন ধারায় পূর্ণ হতে থাকে। একটু পরিসংখ্যান দিলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে :

"১৭৭৩ সালে পার্লামেন্টে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিবরণীতে দেখা যায় যে, দেওয়ানির প্রথম ছয় বছরে রাজস্ব আদায় হয়েছে ১,৩০,৬৬,৭৬১ পাউণ্ড। তা ছাড়া কর্মচারীরা লুণ্ঠন ও উৎকোচের দ্বারা কল্পনাতীত সম্পদ সংগ্রহ করে। আড়াই লক্ষ পাউণ্ড নিয়ে ক্লাইভ ঘরে ফেরেন; তা ছাড়া তাঁর জমিদারির বাৎসরিক আয় ছিল সাড়ে তিন হাজার পাউণ্ড। ইংরেজের লোভ ও লুণ্ঠনে বাঙালীর কী দুর্দশা হয়েছিল তা বর্ণনা করা যায় না। ১৭৬৩ সালে নবাবী আমলে খাজনা ছিল ৮,১৭,০০০ পাউণ্ড; ১৭৯০ সালে কর্ণওয়ালিসের কায়েমি বন্দোবস্তে খাজনা হল ৩৪ ০০,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ চার গুণের বেশি।"৩

রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধির উপর নির্ধারিত নয়। এই অমানুষিক নির্যাতনের ফলস্বরূপ বাংলা এবং ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ১৭৭০ থেকে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় দশটি লোকক্ষয়কারী দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এক ১৭৭০ এর মন্বন্তরেই এক কোটির মত লোক মারা যায়। এই মন্বন্তরের চিত্র বঙ্কিম চন্দ্রের আনন্দমঠের সূচনাতে নিপুণভাবে অঙ্কিত আছে। ১৭৭০; ১৭৭৪; ১৮০৩; ১৮৩৭; ১৮৬১; ১৮৭৪; ১৮৭৬; ১৯০৩ সালে দুর্ভিক্ষ হয়।[৪] এছাড়া ১৯৪৩ সালের কুখ্যাত পঞ্চাশের মন্বন্তরের করাল মূর্তি আমাদের কৈশোরকালেই প্রত্যক্ষ করেছি।

বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমাদের দেশাত্মবোধ জাগার দিন থেকে এই সত্যে স্মরণ করা কর্তব্য যে, দুর্ভিক্ষের ধ্বনিও বেশ স্পষ্ট। এর ফলেও সারা ভারতে একাত্মবোধ জাগে।"৫

বস্তুতঃ বৃটিশ বণিককুলের অমানবিক অর্থনীতি এবং রাজনীতিকদের অমানুষিক পক্ষপাতই এইসব মন্বন্তরের প্রত্যক্ষ কারণ।

তিন

'পীড়িত মানব পারেনাক আর, সহেনা এ অপমান'

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত সিপাহী বিদ্রোহের তাৎপর্য সম্বন্ধে নানামুনির নানা মত। কিন্তু বৃটিশ বণিক-রাজের নিষ্পেষণ ও শোষণের বিরুদ্ধে ভারতীয় মানুষের মনে সিপাহী বিদ্রোহের আগে থেকেই অসন্তোষ এবং ক্রোধ ধূমায়িত হচ্ছিল। ভারতের নানা জায়গায় এই অসন্তোষের বিভিন্ন প্রকাশও ঘটেছিল।৬

বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে প্রথম প্রত্যাঘাত হানেন বাংলার শেষ শক্তিশালী নবাব মীর কাসিম। অবশ্য, ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর বক্সার যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে পাটনায় অবস্থিত ভারতীয় সৈন্যরা বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহে এমনকি য়ুরোপীয়রাও যোগ দিয়েছিল। তাদের বেতন বৃদ্ধির দাবি ছিল। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঙালী পল্টনের

৩। বাঙালী : প্রবোধচন্দ্র ঘোষ : পৃঃ ৪০

১। বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি : যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় : প্রথম সং; পৃঃ ২৪।

৫। ঐ, পৃঃ ২৫।

৬। History of the Freedom Movement in India ; Dr. R. C. Majumdar ; volm, III ch. iv, v, vi.

১৫শ শাখা বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহের নেতা রঘুনাথ সিং, উমরাওগীর এবং ইউসুফ খানকে কাশীর সোনার উল্লিয়ে দেওয়া হয়। ১৭৬২ খ্রীঃ থেকে ১৭৭৪ খ্রীঃ পর্যন্ত চলে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের নেতারা ছিলেন হিন্দু সন্ন্যাসী এবং মুসলমান ফকির। কিন্তু 'They gained momentum from the support they received from the starving peasantry, dispossessed zamindars and the disbanded soldiers'৭ মারাঠারা, হায়দার আলি ও টিপু সুলতান, বেনারসের চিত সিং এর সঙ্গে বৃটিশ শক্তির দীর্ঘকাল সংগ্রাম করতে হয়। অযোধ্যার ওয়াজির আলি, মহীশূরের ধুনদিয়া ওয়াগের নামও এপ্রসঙ্গে স্মরণীয়। মুসলমানদের পরিচালিত ওয়াহাবি আন্দোলন সাম্প্রদায়িক চরিত্রের হলেও বৃটিশ শক্তিকে বিতাড়নের সংকল্প থেকে জাত। বাংলাদেশে ভিতু মীর গ্রামাঞ্চলে (১৮৩১-৩২) বেশ কিছুকাল বৃটিশ শক্তির শিরঃপীড়ার কারণ হন। এ ছাড়া আদিবাসীরাও অনেক জায়গায় বিচ্ছিন্ন ভাবে সংগ্রাম করে।৮ ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের এই আগষ্ট মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসী হয়। ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে নন্দকুমার যে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছিলেন, তাঁর শাসনতান্ত্রিক বিচার হল ফরিয়াদীকে গদিতে ঝুলিয়ে। পরবর্তীকালে বৃটিশ শাসনযন্ত্রের কাছে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ এবং জনগণের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন যে পদদলিত হবে তার প্রথম স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করছে নন্দকুমারের বলি।

অবশ্য উপরে আলোচিত বিদ্রোহ এবং আন্দোলন গুলির সবগুলিই যে জনমানসের দুঃখ অপনোদন এবং বন্ধন মুক্তির প্রয়াস তা বলা যায় না। ভারতের সামন্তরাজা, নবাব এবং তাঁদের অনুগামীরা বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত হয়েছিলেন নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, এই সমস্ত সংগ্রামের মধ্যে পরবর্তীকালের বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষতঃ ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে নীলবিদ্রোহ বাংলা দেশের গ্রামে যে রূপ নেয়, তা সম্পূর্ণভাবে গ্রাম্য লোকদের নেতৃত্বে পরিচালিত। দীনবন্ধুর নীলদর্পণে (১৮৬০) নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের মর্মন্তুদ চিত্র অঙ্কিত আছে। নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদ দ্বারা বৃটিশ কর্তাদের কাছেও পৌঁছে। নীলবিদ্রোহ বাংলার স্থানিক বিদ্রোহ হলেও জনসহযোগিতা এবং অশিক্ষিত মানুষের সংগঠন শক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে স্মরণযোগ্য। আর এই বিদ্রোহের ফলেই পরবর্তীকালে নীলকরদের অত্যাচার অনেকাংশে লাঘব হয়। কাজে কাজেই সাফল্যের দিক থেকেও নীলবিদ্রোহ জনশক্তিরই অপরাজেয় আকাঙ্ক্ষার কথা ঘোষণা করছে।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের নেতাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। একদল মনে করেন, সামন্ত নরপতি এবং অভিজাতদের প্রতিভূরা স্ব-স্বার্থে এই বিদ্রোহ পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহ শুরু হয়ে যাবার পর সারা ভারতে ব্যাপক আকারে দেখা দিল। এই ব্যাপকতার কারণ হিসেবে সিপাহীদের তীব্র অসন্তোষকেই চিহ্নিত করা যায়। দেশী সিপাহী এবং গোরা সৈন্যদের মধ্যে বেতন এবং ব্যবহারের তারতম্য এই অসন্তোষকে তীব্রতর করে তোলে। এই তীব্র বিক্ষোভের পরিব্যাপ্ত প্রকাশকে তাই আর অভিজাতলক্ষণযুক্ত বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। ফলতঃ সিপাহী বিদ্রোহ এর আগে বর্ণিত বিভিন্ন বিদ্রোহ এবং পুঞ্জিত অসন্তোষেরই পরিণাম। নানা সাহেব, তাঁতিয়া তোপে প্রমুখ নেতৃবৃন্দ

৭। ঐঃ পৃঃ ১২৯.

৮। The Roll of Honour : Kali Charan Ghosh : ch I.

এই অধ্যায়ে লেখক সিপাহী বিদ্রোহের আগের এবং পরের অন্যান্য বিদ্রোহের তথ্য উপস্থাপন করেছেন।

প্রাথমিক দিকে এই অসন্তোষেরই সুযোগ গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। বিদ্রোহ নিষ্ঠুরভাবে দমিত হলেও সিপাহী বিদ্রোহ বৃটিশের বিরুদ্ধে প্রথম ব্যাপক প্রত্যাঘাত। এর জাতীয় (national) বৈশিষ্ট্যকে এদিক থেকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

চার

'মনের শিকল ছিঁড়েছি, পড়েছে হাতের শিকলে টান'

সিপাহী বিদ্রোহের ব্যাপকতার ভিত্তিতে খাস ইংলণ্ডের শাসককুল ভীতিগ্রস্ত হ'ল। একটি বণিক প্রতিষ্ঠানের ওপর ভারত শাসনের দায়িত্ব ন্যস্ত রাখা আর তাদের যুক্তিযুক্ত মনে হলোনা। এবার বৃটিশ পার্লামেন্ট নিজেই ভারতের শাসন-কর্তৃত্ব গ্রহণ করলো। প্রকারান্তরে বৃটিশ পার্লামেন্ট কোম্পানির কাছ থেকে ভারতকে কিনে নিল এবং হস্তান্তরের জন্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে কোম্পানির কর্তাদের মোটা টাকা ভারতের ধন ভাণ্ডার থেকেই দেওয়া হল।৯ এ যাবৎ প্রতি বিশ বছর বাদে কোম্পানিকে পার্লামেন্টের কাছে সনদ নিতে হত। নতুন সনদ নেবার আগে কোম্পানিকে ভারতের অবস্থাদি সম্পর্কে পার্লামেন্টের কাছে জবাবদিহি করতে হত। এবার থেকে ভারতের জন্য জবাব দিহি করার আর কিছু থাকলোনা। এবার গোটা ইংরেজ জাতির খাস তালুকে পরিণত হল আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর এলাহাবাদের দরবারে লর্ড ক্যানিং ভাইসরয় হিসেবে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র পাঠ করলেন। ঘোষণায় বড় বড় কথা অনেক ছিল। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলকে সমানভাবে দেখা, ভারতীয়দের উচ্চ রাজকার্য প্রাপ্তি প্রভৃতি রং মাখানো প্রতিশ্রুতির ফানুস ওড়ানো হল। কিন্তু 'অল্পকাল পরেই দেখা গেল স্বাধীনতার এই কবচ বৃটিশ কূটনীতির একটি চালবাজি মাত্র।"১০

কিন্তু এদিকে ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকেই ভারতীয় জীবনে নব দিগন্তের সূচনা হয়েছে। বিশেষতঃ বাংলাদেশে এক অভাবিতপূর্ব জাগরণের ঢেউ উঠেছে। এই জাগরণকে বৃহত্তর অর্থে অনেক সময়ই ভারতীয় রেনেসাঁস আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা এবং বাংলা গদ্যের নতুন যাত্রারম্ভ; ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায়ের কলকাতা আগমন; ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় ভাষায় প্রথম পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। পাদ্রীদের বিপক্ষে ধর্ম সম্পর্কে রামমোহন রায়ের যুক্তিযুদ্ধ এই সময় থেকেই শুরু হয়। হিন্দুকলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণ যুবকদের কিছু অংশের মধ্যে প্রথম দিকে একটু উচ্ছৃঙ্খলা দেখা গেলেও একটি উন্নেষ-যোগ্য তরুণ দল ডিরোজিওর ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলা দেশে মানস-মুক্তির অগ্রদূতের ভূমিকা গ্রহণ করলেন। এই মানস-অভ্যুদয় সামগ্রিক ভাবে ভারতীয় নবযুগপত্তনে অনেকখানি সহায়তা করেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রামমোহনের কার্যধারা এবং চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে প্রথম জাগরণের সাড়া। রামমোহনকে অনেকে আধুনিক ভারতের জনক আখ্যা দিয়ে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর স্বাধীনচিন্তা, ধর্মসম্পর্কে সংস্কারমুক্ত মন, দেশবাসীর অধিকার প্রতিষ্ঠার বিরামহীন সংগ্রাম, তাঁর আন্তর্জাতিকতা বোধ এবং স্বাধীনতা প্রিয়তা সব মিলে তাঁকে আধুনিক ভারতের প্রথম জাগ্রত মানুষের পাদপীঠে স্থাপন করেছে। তিনি আধুনিক ভারতের 'প্রথম রাষ্ট্রচিন্তাবীর'। রামমোহনের অখণ্ড ভারতবোধ, সংবাদ পত্রের স্বাধীনতারক্ষার

৯. আমাদের ১৯শ শতাব্দীর আন্দোলন : প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, ৪র্থ সং পৃঃ ৩২।

১০. ঐ: পৃঃ ৩৪।

অন্তে সংগ্রাম প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।"[১১]

এই শতকের ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্মের যে সর্বাঙ্গীন মুক্তি প্রয়াস তারও মূলে রামমোহনের প্রেরণা। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতাদের মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাস, কালীশংকর সুকুল, কৃষ্ণকুমার মিত্র, হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় প্রমুখের প্রগতিশীল কার্যধারা খুবই উল্লেখযোগ্য। এঁরা নারীর রাষ্ট্রিক অধিকার, শ্রমিক আন্দোলন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে প্রগতিশীলতার পরিচয় দেন। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় আসামের চা-বাগানের কুলিদের ওপর অমানুষিক নির্যাতনের কাহিনী সংগ্রহ করেন এবং সঞ্জীবনী পত্রিকা প্রভৃতির মাধ্যমে এক বিরাট আন্দোলনের সূচনা করেন। দুঃখের বিষয়, তৎকালীন কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে কুলিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কোন গঠনমূলক প্রস্তাব রচনার যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘকাল সময় লাগে। 'দশ বৎসর পূর্বে যে আন্দোলন গ্রহণ করাইতে দ্বারকানাথ (গঙ্গোপাধ্যায়) প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহার যৌক্তিকতা স্বীকার করিতে কংগ্রেসের দশটি বৎসর লাগিল।'[১২] বর্তমান শাসনক্ষমতা-সম্পন্ন দলের দীর্ঘসূত্রতার জন্য এই দলের সূচনা পর্বেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

একালে সংবাদপত্র সমূহের মধ্যে হিন্দু পেট্রিয়ট, তত্ত্বকৌমুদী, সঞ্জীবনী, সোমপ্রকাশ প্রভৃতি ভারতবাসীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় অনেকখানি কাজ করেছে। সাংবাদিক হরিশ মুখোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

এই শতকের সাহিত্য দেশপ্রেম ও জাতীয়তার উদ্বোধনে বিরাট অবদান রেখেগেছে।[১৩] বঙ্কিম, হেম, নবীন, রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল, কান্তকবি রজনীকান্ত, গোবিন্দচন্দ্র রায় প্রমুখের উপন্যাস-কবিতা,-গান,-প্রবন্ধ দেশপ্রেম ও জাতীয়তার জয়যাত্রাকে ত্বরান্বিত করে। হিন্দুমেলা (১৮৬৭), ইণ্ডিয়ান লীগ (১৮৭৫), ভারত সভা (১৮৭৬), ন্যাশনাল কনফারেন্স (১৮৮৩), কংগ্রেস (১৮৮৫) প্রভৃতি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতীয়তার চেতনা ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকে। সুরেন্দ্রনাথের কর্মচ্যুতি এবং সারা ভারত ব্যাপী তাঁর আন্দোলন এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ঋষি রাজনারায়ণের দেশপ্রেম এবং কর্মনিষ্ঠা এ যুগে বিপুল প্রেরণা দান করে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার শিকাগোতে স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্ববিজয় ভারতকে আত্মশক্তিতে আস্থাবান করে। সর্বোপরি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের (১৯০৫) মধ্য দিয়ে বাংলার প্রচণ্ড বিক্ষোভ এবং বিপ্লব শেষ পর্যন্ত বিদেশী রাষ্ট্রশক্তিকে উচ্ছেদের সংকল্পে রূপ নেয়। অপমানিত দেশবাসীর সংহত চেতনাকে অস্ত্র করে বৃটিশের বঙ্গভঙ্গ দেশবাসীকে স্বৈরাচারী শাসকের অস্তিত্বের অনুপযোগিতা সম্বন্ধে সচেতন করে এবং একটি প্রাদেশিক আন্দোলন সারা ভারতে সাড়া জাগায়।[১৪] এই আন্দোলনের চরমপন্থীরা বাংলার যে সশস্ত্র বিপ্লব প্রয়াসের বিরামহীন সংগ্রাম করেন পরবর্তীকালে তার সংহত রূপ দেখি নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে লাল-বাল-পাল পন্থীদের (তিলক-লাজপতরায়-বিপিন পাল) রাস্তা গান্ধীপন্থীদের রাস্তার চাইতে প্রবল এবং অধিকতর কার্যকর হয়েছে কি না, তা তাত্ত্বিকদের বিচার্য। কিন্তু নামী-অনামী বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের দুর্জয় শক্তি জাতীর জীবনে যে নবপ্রেরণার সঞ্চার

১১। ভারত মুক্তির ইতিহাসের ধারা : প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

১২। ঐ, পৃঃ ৭৭।

১৩। স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য : যোগেশচন্দ্র বাগল

১৪। History of the Freedom Movement in India : by Dr. R. C. Majumder Vol II

করেছিল, তা অনস্বীকার্য। কবির এই ঘোষণা পরবর্তীকালে অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে :

"এসেছে সে একদিন,
লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে, না রাখে কাহারো ঋণ,
জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।"

ভারত স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু দ্বিখণ্ডিত ভারত। আর অন্যদিকে স্বার্থপরদের লোভ এবং ক্ষমতাবানদের নির্মমতা স্বাধীনতার পরেও আকাশচুম্বী। স্বাধীনতার দিগন্তে তাই আজও কুজ্ঝটিকার মায়া-মরীচিকা। এমন মুহূর্তে বারবার মনে পড়ে "যাহারা ঘরে বাহিরে লাঞ্ছিত হইয়াও সেই লাঞ্ছনাকেই তাহাদের সান্ত্বনার বস্তু করিয়া তুলিয়াছিল, যাহাদের লাঞ্ছনাকে দেশবাসী উৎসাহিত করিয়া, সম্মান করিয়া সহ্য করিবার মত গৌরবের সামগ্রী করিয়া তুলে নাই, যাহাদের অনুপশ্চাতে cheering crowd জয়ধ্বনি করে নাই—.. বুদ্ধিমান অভিজ্ঞদের কথায়, যাহারা কেবল ভুলই করিয়াছে, —সেই ভ্রান্ত-পথের যাত্রী এমন অদ্ভুত মানুষগুলির কথা"।১৫

১৫। বাংলার বিপ্লববাদ : নলিনী কিশোর গুহ : ভূমিকা।

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.

বিদ্যাসাগর	২·২৫
মানুষের মত মানুষ	·৭৫
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·৩০
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	১·২৫
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা—১২

Gram : DEVICE

23-2161/2

Please Contact

MECHANICAL ENGINEERING CO

PRIVATE LTD

5, MISSION ROW
CALCUTTA-1

FOR ALL TYPES OF TRAILERS,
TROLLEYS AND WHEEL-BARROWS.

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা

প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

এদেশ যখন মুসলমান পাঠান ও মোগলদের অধীন হয়, তখন তাঁহারা এদেশেরই স্থায়ী বাসিন্দা রূপে রাজত্ব করিতেন বলিয়া দেশবাসীর মনে পরাধীনতার গ্লানি তেমন প্রকট হয় নাই; কিন্তু ইংরেজগণ বিদেশ হইতে শাসন কার্য পরিচালনা করিতেন এবং সেই জন্য পরকীয়তার গ্লানি জনসাধারণের মধ্যে মাঝে মাঝেই বিদ্রোহাত্মক রূপে প্রকাশ পাইয়া সেই গ্লানি মুক্তির প্রচেষ্টা দেখা দিতে আরম্ভ করে। বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রভৃতি উহারই আত্মপ্রকাশ; কিন্তু এই সমস্ত বিদ্রোহের অন্তরালে কোনও বিশিষ্ট রাজনৈতিক চিন্তাধারা অথবা বিপ্লবাত্মক মনোভাব না থাকায় এবং দেশের চিন্তাশীল মানুষ মুসলমান রাজত্বের অবক্ষয়ের যুগে এদেশের মৎসন্যায় ও চুরি ডাকাতির প্রাবল্যে জনসাধারণ অতিষ্ঠ হইয়া ইংরেজ শাসনকে বিধাতার দান হিসাবে গ্রহণ করাতে এগুলি বিফল হইয়া যায়, এমন কি ইহাদের মধ্যে ব্যাপকতম বিদ্রোহ সিপাহী বিদ্রোহকেও প্রকৃতপক্ষে গণবিদ্রোহ বলা যায় না। এই বিদ্রোহ ঘটাইয়াছিলেন অনেকটা যাহা হইতে বঞ্চিত উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তি, যদিও তাঁহাদের মধ্যে কৈজাবাদের মৌলবী, তাঁতিয়া টোপী প্রভৃতির কিছু রাষ্ট্রিক জ্ঞান ছিল তথাপি তাহা সন্ধ্য-ঘুগীর পরিচালনা কৌশল, যাহা তৎকালের পাশ্চাত্য উন্নততর রাষ্ট্রীয় চিন্তার তুলনায় হীন ছিল এবং ভবিষ্যতে স্বাধীনতা পাইতে হইলে রাষ্ট্র ব্যবস্থার রূপ কি হইবে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণার অভাব ও সেই ব্যবস্থা সম্পর্কে নেতাদের মধ্যে মতভেদ এই বিদ্রোহকেও বিফলতায় পর্যবসিত করে। একদল, পুরাতন মোগল সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্নে যেমন বিভোর ছিলেন, অপর দল, মহারাষ্ট্র রাজত্ব স্থাপন করিয়া হিন্দু রাজত্বের পুনঃস্থাপনের স্বপ্ন দেখিতেন—অথচ ভারত বোধের একান্তই অভাব ছিল।

অবশ্য শিক্ষিত সমাজে যে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা একেবারেই ছিল না তাহা নহে। এদেশে আধুনিক রাষ্ট্র-চিন্তাধারার প্রবর্তক রাজা রামমোহন এসম্পর্কে দেশবাসীকে যে পন্থা অবলম্বন শ্রেষ্ঠতম পন্থা বলিয়া নির্দেশ করেন, তাহাই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধ হইতে ১৮৭০ পর্যন্ত শ্রেয়তম পথ হিসাবে গৃহীত হয়। তিনিই সর্বপ্রথম হইতে তাঁহার রাজনৈতিক শিষ্যদের ধীরতা অবলম্বন করিয়া অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক চিন্তাকে ও রাজনৈতিক কার্য্যাবলীকে সংযত রাখিতে উপদেশ দিয়া যে পত্র লেখেন তাহাতে দেশবাসী চিন্তাশীল ব্যক্তি যে পথের সন্ধান লাভ করেন তাহাই ওই সময় পর্য্যন্ত অনুসৃত হয়। রামমোহন এইপত্রে লেখেন যে "পরাধীনতার কুফল ও বিদেশের মুখাপেক্ষিতার গ্লানি চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব করেন, কেননা উহাই স্বাভাবিক, কিন্তু যখন আমাদের দেশের শিক্ষা-দীক্ষার স্বল্পতা এবং তন্মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানে পাশ্চাত্য দেশের শ্রেষ্ঠতার বিষয় চিন্তা জাগে এবং রাষ্ট্রতত্ত্বে বৃটেনের জনসাধারণের জ্ঞানের পরিমাণের তুলনায় আমাদের জ্ঞানের স্বল্পতার বিষয় স্মরণ করা যায়, তখন রাষ্ট্রিক ব্যাপারে সংযম ও অবস্থানুযায়ী ধীরতা অবলম্বনই

উচিত মনে হয়। সেজন্য অবস্থার পরিবর্তন দ্রুত পথে সাধনের পরিবর্তে ক্রমিক পরিবর্তন প্রার্থনাই শ্রেয় বোধ হয়। বর্তমান অবস্থায় বৃটিশ শাসন বর্তমান রাখিয়া ক্রমিক স্বায়ত্ত শাসনাধিকার অর্জন প্রচেষ্টাই আমাদের কাম্য থাকা অধিক বাঞ্ছনীয়।"

রামমোহন রায়ের নির্দেশেই আমাদের রাষ্ট্রচিন্তাকে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ অবধি প্রভাবিত করে। তবে এই ধারা হইতে আরও বিপ্লবাত্মক ধারার প্রথম প্রকাশ দেখা যায় ঊনবিংশ শতকের ষষ্ঠ দশকে। এই সময়ে নীলকরদের অত্যাচারে জর্জরিত নীলচাষীগণ জেলায় জেলায় সংঘবদ্ধ হইয়া যে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তুলে তাহার স্থায়িত্ব উপলব্ধি করিয়া তথাকথিত বুর্জোয়া শ্রেণীর লোকেরাও এই আন্দোলনের সহায়ক হইয়া উঠাতে ইহাই সর্বপ্রথম সার্থক জনআন্দোলনে রূপায়িত হইয়া দেশ হইতে নীলকর অত্যাচার চিরকালের জন্য বন্ধ করিয়া দেয়। সেজন্য জাতীয় রাষ্ট্র-চেতনার এই আন্দোলন জনশক্তির পরিচিতিতে দেশবাসীর প্রত্যয় সঞ্চারে এক নূতন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত হইয়া আছে। এই আন্দোলন খুব ব্যাপক আকারে জেলায় জেলায় আত্মপ্রকাশ করিলেও এক জেলার আন্দোলনের সহিত অন্য জেলার যোগ ছিল না। সর্বত্রই উহা স্থানিক আন্দোলনের রূপ নেয়, নিখিল বঙ্গ ঐক্য আন্দোলন রূপে জমিয়া উঠে নাই। তথাপি এই আন্দোলনে স্থানীয় জননেতা যশোহরের দিগম্বর বিশ্বাস ও তদীয় ভ্রাতা বিষ্ণুচরণ, উত্তর বঙ্গের রফিক মণ্ডল, পাবনার মহেশ বিশ্বাসের অতুলনীয় নেতৃত্ব এবং বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর মধ্যে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, মনোমোহন ঘোষ, শিশির কুমার ঘোষের নীলচাষীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা এক সর্বাত্মক প্রতিরোধ আন্দোলনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে। বিচ্ছিন্ন স্থানিক আন্দোলন হইতেই জনমনে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের শক্তির বিষয় উপলব্ধি জন্মে। সেই সময়েই ক্যালকাটা রিভিয়ু পত্রে লেখা হয় যে "A sudden and remarkable change has come over rural population of Bengal. All at once they have asserted their independence."

জনশক্তির এই পরিচয় লাভের পর দেশস্থ রাষ্ট্রগত শক্তিকে জাগাইয়া তুলিবার রাষ্ট্রিক প্রয়াসের অভাবে বিপ্লব ঘটাইবার সুবর্ণ সুযোগ এদেশ হারায়।

তাহার পর অবশ্য ঘটনাপরম্পরা উহার অনুকূল হওয়াতে এদেশের ভাবুক মনে স্বাধীনতা অর্জন স্পৃহা মুর্ত্তির হইতে থাকে। রাজনারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্র হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠা করিয়া জাতির মনে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারণের প্রয়াস ইহারই কার্যকরি প্রকাশ। এই মেলার দ্বিতীয়বারের কার্যবিবরণীতে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে "আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্ম-কর্মের জন্য নহে, কেবল আমোদ-প্রমোদের জন্য নহে, ইহা কেবল স্বদেশের জন্য, ইহা ভারত-ভূমির জন্য। অতএব যাহাতে আত্মনির্ভরতা ভারতে স্থাপিত হয়—ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহাই এই মেলার উদ্দেশ্য।"

মেলার প্রভাবে দেশময় স্বাদেশিকতার বন্যা বহিয়া যায় ও পরবশতার বিরুদ্ধে রব উঠিতে আরম্ভ হয়। কবি গোবিন্দচন্দ্র রায় গাহিলেন "কতকাল পরে বল ভারতরে দুঃখ সাগর সাঁতারি পার হবেরে।" মনমোহন বসু গাইলেন "দিনের দিন সবে দীন ভারত হয়ে পরাধীন।" এই আন্দোলন আরও ব্যাপকতা লাভের পক্ষে কয়েকটি ঘটনা খুবই সহায়ক হয়। আফগান যুদ্ধ, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ প্রচেষ্টা ও ভারতব্যাপী দুর্ভিক্ষ, পরাধীনতার গ্লানিকে লোকমানসে স্পষ্টতর করিয়া তুলে। ঠিক এই সময়ে ফরাসী বিপ্লবের "সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা"র সমর্থক দর্শনের তরঙ্গ ভারতের চিত্ততটে আঘাত হানে।

কিন্তু তাহা প্রধানতঃ ভাবুকতার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল; উহাকে রূপ দিবার কোনও সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রথমে দেখা

দেয় নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "জীবন স্মৃতিতে" তাহার বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"য়ুরোপীয় সমাজের সেই হোলি খেলার মাতামাতির সুর আমাদের এই অতি শিষ্ট সমাজে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ আমাদের ঘুম ভাঙাইয়া চঞ্চল করিয়া তুলিয়া দিল। হৃদয় যেখানে আচারে চাপা পড়িয়া পূর্ণ বিকাশের অবকাশ পায় না, সেখানে স্বাধীন ও সজীব হৃদয়ের অবাধ লীলার দীপক রাগিণীতে আমাদের চমক লাগিয়াছিল।" সেই সময়েই গুপ্তসমিতির প্রতিষ্ঠার যে উদ্যোগ আছে তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া 'সঞ্জীবনী সভা' নামে এক গুপ্ত সমিতি কলিকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে রাজনারায়ণ বসুর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা বিপ্লবী ও গুপ্তসমিতি স্থাপনের ভাবুকতার দিকেই বেশী আকৃষ্ট ছিল, ইহার কোনও কার্যক্রম ছিল না। এই সভাসম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে "কলিকাতার এক পোড়োবাড়ীতে সেই সভা বসিত। সেই সভার সকল অনুষ্ঠান রহস্যাবৃত ছিল। ● ● ● ● এই সভার প্রধান কাজ উত্তেজনার আগুন পোহানো। বীরত্ব জিনিষটা কোথাও বা অসুবিধাকর হইতেও পারে, কিন্তু ওটার প্রতি মানুষের একটা গভীর শ্রদ্ধা আছে। ● ● ● ● রাজ্যের মধ্যে এই বীরধর্ম্মের পথ রাখা চাই, নহিলে মানব ধর্ম্মে পীড়া দেওয়া হয়। তাহার অভাবে কেবলই গুপ্ত উত্তেজনা অন্তঃসীলা বহিতে থাকে।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন স্মৃতিতে এই সভার বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে "সভার নিয়মাবলী অনেকই ছিল, তাহার মধ্যে প্রধান ছিল মন্ত্রগুপ্তি অর্থাৎ সভায় যাহা কিছু কথিত হইবে, যাহা কৃত হইবে এবং যাহা শ্রুত হইবে, তাহা অ-সভ্যদিগের নিকট প্রকাশ করিবার অধিকার কাহারও ছিল না।" সভাকক্ষের টেবিলে দুইটি খড়ার মাথা রাখা হইত এবং তাহার দুইটি চক্ষু কোটরে দুইটি মোমবাতি বসানো থাকিত। "খড়ার মাথা মৃত ভারতের সাংকেতিক চিহ্ন। বাতি দুইটি জ্বালাইবার অর্থ, মৃত ভারতে প্রাণ সঞ্চার করিতে হইবে ও তাহার জ্ঞান চক্ষু ফুটাইয়া তুলিতে হইবে।" জ্যোতিবাবুর উদ্ভাবিত এক গুপ্তভাষায় সভার কার্য্যবিবরণী লেখা হইত। ইহার অব্যবহিত পরে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরী মোহন দাস, তারাকিশোর চৌধুরী, কালীশঙ্কর সুকুল, কবি আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি যুবক দল "অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা" গ্রহণ করেন। রক্তরক্তে একটি কাগজে প্রতিজ্ঞা লিখিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা কালে এই গৃহীত ব্রত আজীবন পালনে স্বীকার করা হইত। প্রতিজ্ঞাপত্রের মুখ্য বিষয় ছিল "বাহুবল শাসনই আমরা একমাত্র বিধাতৃ নির্দ্দিষ্ট শাসন প্রণালী বলিয়া স্বীকার করি। তবে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের মুখ চাহিয়া আমরা বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের আইনকানুন মানিয়া চলিব। কিন্তু দুঃখ দারিদ্র্য, দুর্দ্দশার দ্বারা নিপীড়িত হইলেও কখনও এই গভর্ণমেণ্টের দাসত্ব স্বীকার করিব না।" স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে রামমোহন রায়ের পথই ইঁহারা স্বীকার করিয়া বলিতেছেন যে বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যতের মঙ্গলের মুখ চাহিয়া তাঁহারা বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের নিয়মকানুন মানিয়া চলিবেন, কিন্তু সেই ভাবধারা হইতে এক ধাপ অগ্রসর হইয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছেন যে দুঃখ দুর্দ্দশায় নিপীড়িত হইলেও গভর্ণমেণ্টের দাসত্ব স্বীকার করিবেন না কেন না যে রাষ্ট্র বলপূর্বক ভারতবাসীর স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে সেই রাষ্ট্রের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিয়া তাহাকে শক্তিশালী করা পাপ, এই বোধ তাহাদের মধ্যে জাগ্রত থাকাতেই এই প্রতিজ্ঞা।

অন্য প্রতিজ্ঞার মধ্যে একটি প্রতিজ্ঞা ছিল "অস্ত্রারোহণ, বন্দুক ছোঁড়া প্রভৃতি নিজে অভ্যাস করিব ও অপরকে অভ্যাস করিতে প্রণোদিত করিব।" এই প্রতিজ্ঞার অর্থ যে ঘটনাচক্রে যুদ্ধ দেশের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়া দেশে স্বাধীনতার সংগ্রাম আরম্ভ হইবার অবস্থা দেখা দেয় তাহার উপযুক্ত

শিক্ষার প্রস্তুতির জন্যই উহা প্রয়োজন বোধ হয়। আর একটি অতি উল্লেখযোগ্য প্রতিজ্ঞা ছিল যে তাঁহারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন করিবেন না বা প্রাপ্ত সম্পত্তিও রক্ষা করিবেন না। ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন অথবা রক্ষণ সাম্য ও মৈত্রীর পরিপন্থী বোধ হইতেই এই প্রতিজ্ঞা। কম্যুনিষ্টবাদের বহু পূর্ব্বে এই প্রতিজ্ঞা তাহা স্মরণ করিলে বিস্ময় লাগে। এ সম্পর্কে স্মরণীয় এই যে শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরীমোহন দাস প্রমুখ অনেকেই ব্যক্তিগত কোনও সম্পত্তি অর্জন করেন নাই, যাহা কিছু রোজগার করিয়াছেন তাহাতে মণ্ডলীর সকলের অধিকার তাঁহারা মানিতেন ও সাংসারিক জীবনে উদ্বৃত্তরূপে কোনও সঞ্চয় তাঁহারা কখনও করেন নাই। ১৮১৪ সালে অ্যাবিসেনিয়ার আন্দারার রণাঙ্গনে কৃষ্ণকায় আবিসিনীয়দের নিকট শ্বেতকায় ইতালীয়দের পরাজয়ে শ্বেত জাতির শ্রেষ্ঠত্বের বৃথা গৌরবের সমাধি রচিত হয়। এবং প্রয়োজন হইলে শস্ত্রবলে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভবপর বলিয়া একদল ভাবুকের মনে প্রতীতি জন্মে। দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথ প্রকাশ্যে প্রচার আরম্ভ করিলেন যে তিনি ইতালীর স্বাধীনতা অর্জনের নেতা গ্যারিবল্ডি ও ম্যাটসিনির মন্ত্রশিষ্য এবং তাঁহারই একান্ত বাসনায় যোগেন্দ্রমোহন বিদ্যাভূষণ গ্যারিবল্ডির জীবন-চরিত বাঙ্গলায় রচনা করেন ও প্রকাশ সভায় পেরিলাযুদ্ধে লিপ্ত হইতে দেশবাসীকে আহ্বান করিতে থাকেন। তাহার পর বুয়ার যুদ্ধে ক্ষুদ্র বুয়ার জাতি ইংরেজ সরকারের যে হাল করেন তাহাতে দেশবাসীর প্রত্যয় জন্মে যে ইংরেজগণ অপরাজেয় নহেন, তাঁহাদের পরাজিত করা সম্ভব। এই সমস্ত ঘটনা দেশময় স্বাধীনতাকামী সংস্থার উদ্ভব এবং রাজনৈতিক কারণেই তাহা গোপনীয়ভাবে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তায় গুপ্তসমিতি চতুর্দ্দিকে গজাইয়া উঠিতে থাকে।

অবশ্য বাংলাদেশে এই আবহাওয়া সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বেই মহারাষ্ট্র অঞ্চলে মুক্তিলাভ প্রচেষ্টা বিদ্রোহের আকারে প্রকাশ পাইতে করে, দেশপ্রেমী মহারাষ্ট্রবীরযুবক বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কের বিদ্রোহের মধ্য দিয়া। ইংরেজগণ ফাড়কের প্রচেষ্টাকে লঘু করিয়া দেখাইবার জন্য উহাকে নিছক লুণ্ঠন-মূলক প্রচেষ্টা আখ্যা দিয়া থাকেন বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টা। প্রায় দুই বৎসর ব্যাপী প্রচেষ্টার পর ফাড়কে ইংরেজ সরকারের বন্দী হইয়া এডেনে নির্ব্বাসিত হন এবং নির্ব্বাসন ক্লেশ সহ্য করিতে না পারায় জন্য মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রকৃত পক্ষে ফাড়কেই ভারতের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহীদ। বীরের মৃত্যু কখনই বৃথা যায় না। ফাড়কের চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও তিনি যে দীপ জ্বালাইয়া ছিলেন তাহার আগুন ছড়াইয়া পড়িতে ইহার অনতিপরে পুনার চাপেকার সংঘ, সাতারকার ভ্রাতৃদ্বয় প্রতিষ্ঠিত অভিনব ভারত সমিতি, বিদেশে শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মার প্রয়াস প্রভৃতির উদ্ভব সম্ভব করে।

১৮৯৭ সালের ২২শে জুন পুনা সহরে প্লেগ রোগকে কেন্দ্র করিয়া ইংরেজগণ যে অন্যায় অত্যাচার আরম্ভ করেন তাহার প্রতিবাদে দামোদর চাপেকার ও তাঁহার ভ্রাতা বালকৃষ্ণ প্লেগ কমিশনার র‍্যাণ্ডকে তাঁহার প্রবর্ত্তিত কতকগুলি প্লেগ নিবারণের বিধান অকারণে প্রপীড়নের যন্ত্র হইয়া উঠায় সেরূপ অত্যাচার ভবিষ্যতে অন্য কোন সরকারী কর্ম্মচারী করিতে সাহস না পায় তাহার জন্য প্রকাশ্য দিবালোকে মিষ্টার র‍্যাণ্ড ও তাহার সহযাত্রী লেফ্‌টেনাণ্ট আয়ার্ষ্টকে হত্যা করে। র‍্যাণ্ডহত্যার দায়ে চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের ফাঁসী ও পুনার বিখ্যাত ধনী নাটু-কে বোম্বাই-এর ১৮২৭ সালের ১৫নং রেগুলেশনে বিনা বিচারে বন্দী করা হয়। চাপেকারগণ যে একক ছিলেন না, তাঁহাদের যে একটি বিপ্লবী সংঘ বর্ত্তমান ছিল তাহা প্রকাশ পায় চাপেকারদিগের সন্ধান সরকারকে দেওয়ার অপরাধে অপরাধীকে হত্যা করিয়া ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে চাপেকার সংঘের চারিজন সদস্য ধৃত হইয়া ফাঁসীমঞ্চে জীবনাহুতি প্রদানে।

চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত অরবিন্দ, বারীন্দ্র ও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংযোগ সাধিত হয় এবং বাঙ্গলাদেশে অনুরূপ গুপ্ত সমিতি স্থাপনের জন্য তাঁহাদের প্রচেষ্টা বিংশ শতকের গোড়াতেই আরম্ভ হয়। বারীন্দ্রনাথ ভ্রান্তিবশতঃ লিখিয়াছেন যে বাঙ্গলার গুপ্ত সমিতি চাপেকার সংঘের অনুসরণেই ঘটে। যদিও বারীন্দ্র ও যতীন্দ্রনাথ সেই সংঘের অনুসরণে এদেশে বিপ্লবী সংস্থা স্থাপনের জন্য আগমন করেন, কিন্তু তাহার পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালীরা নিজেদের মনের প্রেরণাতেই গুপ্ত সমিতি স্থাপন আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন এবং বারীন্দ্র ও যতীন্দ্র আসিয়াই পরিচয় লাভ করেন যে ক্ষেত্র প্রস্তুত আছে। এদেশে আসিয়াই তাঁহারা দেখিতে পান যে এদেশে অনুশীলন সমিতি, আত্মোন্নতি সমিতি প্রভৃতি অনেকগুলি বিপ্লবী সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছে। বিংশ শতকের প্রারম্ভে এদেশে জাপানী চিত্রকর, চিত্র সমালোচক ও দেশপ্রেমিক ওকাকুরা ভারত ভ্রমণে আসিয়া জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর সাংস্কৃতিক পরিবেশের সন্নিধ্যে আসেন। তিনি ভারতের পরাধীনতা মোচনে বুদ্ধিজীবিগণের নিষ্চেষ্টতার তীব্র সমালোচনা করিলে ঠাকুর বাড়ীর সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যোগদানকারিদের মধ্যে ব্যারিষ্টার প্রথম নাথ মিত্রের মনে প্রবল ধাক্কা লাগে।

তাহার ফলে প্রথম নাথের প্রচেষ্টায় ১৯০২ খৃষ্টাব্দে অনুশীলন সমিতির জন্ম হয়। এই সমিতির পত্তন ঠাকুর বাড়ীতেই হয় এবং উহার সভাপতি প্রথম নাথ, সহ সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাস ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন। অনুশীলন-সমিতির কার্য্য প্রথমতঃ উত্তর কলিকাতাতেই নিবদ্ধ ছিল। উহা প্রথমতঃ সার্কুলার রোডে একটি বাড়ীতে আরম্ভ হয় এবং তাহার অল্প পরেই বেহুয়ার সন্নিকটে কর্ণোওয়ালিশ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হয়। কলিকাতার নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলে বৈকালে ইহাদের বহু একটি আখড়ার আসর চলিত এবং এইখানেই তরুণ রংরুটদের বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া হইত। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন হইতে সমিতির নাম অনুশীলন সমিতি রাখার প্রস্তাব করেন ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। ইনি সুকবি ছিলেন এবং নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ওরফে মানবেন্দ্র রায় হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। সেই সময়ে বাঙ্গলার তরুণদের মনে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে স্বাধীনতার আকাঙ্খা জাগিতে ছিল তাহার সাক্ষ্য পুলিনবিহারী দাস প্রমুখ বহু ব্যক্তিই দিয়াছেন। আমারও মনে হয় যে যুগান্তর যুগ প্রভৃতির ফলে ও প্রতাপাদিত্য উৎসবাদিকে কেন্দ্র করিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য আকাঙ্খা জাগিয়া ছিল তাহার সাক্ষ্য আমিও দিতে পারি। কাজেকাজেই চাপেকার সংঘের প্রভাবেই এদেশে গুপ্ত সমিতি ও বিপ্লব প্রচেষ্টার আরম্ভ নহে, বাঙ্গলার ঘটনা প্রবাহে উহার সৃষ্টি স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবেই হইয়াছিল এবং ক্ষেত্র যে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিল তাহার প্রমাণ বারীন্দ্রদের আগমনের পরই অনুশীলন সমিতির অভূতপূর্ব্বব্যাপ্তি। এই সমিতির শাখা পটলডাঙ্গা, বহুবাজার, আহিরিটোলা, বাগবাজার প্রভৃতি সকল স্থানেই বেশ জাঁকাইয়া উঠে। পূর্ব্ব হইতে মানসিক প্রস্তুতি না থাকিলে উহা কি সম্ভব হইত? যাদুগোপাল মুখার্জ্জি জানাইয়াছেন যে তাঁহার ছাত্রাবস্থাতেই তাঁহার মনে বিপ্লবের বীজ রোপণ করিয়াছিলেন ডাফ স্কুলের শিক্ষক প্যারীমোহন দাস এবং সেজন্য বিংশ শতকের প্রারম্ভে তিনি অনুশীলন সমিতির সন্ধান পাইবামাত্র তাহাতে যোগদান করেন। এরূপভাবে অনেক সাক্ষ্যলাভ সম্ভব যে বাঙ্গলার বিপ্লববাদ অন্যপ্রদেশ নিরপেক্ষভাবে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। যদিও অনুশীলন সমিতির উদ্ভবের সমসময়েই বহুবাজার, মনজা প্রভৃতি অঞ্চলে গুপ্ত-উদ্দেশ্যেই আত্মোন্নতি সমিতির সৃষ্টি হইয়াছিল তথাপি অনুশীলন সমিতির সহিত প্রথম হইতে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা বর্ত্তমান ছিল এবং বস্তুতঃ অনুশীলন সমিতি বিপ্লবীগণের সংস্থাছিল বলিলেও অত্যুক্ত হয় না। এই সমিতির বারীন্দ্রনাথ ঘোষ, দেবব্রত বসু, অবিনাশ চন্দ্র

ভট্টাচার্য্য, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কতিপয় তরুণ অনুভব করিলেন যে গুপ্তভাবে বিপ্লববাদ প্রচার চলিতে থাকিলে তাহা ব্যাপকতা লাভ করিয়া তাহার সার্থকতার পথে যাত্রার বহু বৎসর লাগিবে। উহাকে ব্যাপকভাবে গড়িয়া তুলিতে গেলে প্রকাশ্যে পত্রিকা, পুস্তিকা প্রভৃতি মারফৎ সাহসের সহিত সকল বিপদ, সরকারি শাসন প্রভৃতি অগ্রাহ্য করিয়া ওই মন্ত্র প্রচার ও উহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া প্রচার প্রয়োজন। এই জন্য তাঁহারা "যুগান্তর" পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন ও "মুক্তি কোন পথে", "বর্ত্তমান রণনীতি" প্রভৃতি পুস্তিকা ও "Now or Never" নামক প্রচার পত্রাদি প্রচার আরম্ভ করেন। অনুশীলন সমিতির নেতাগণ এই প্রকাশ্য আন্দোলন গুপ্ত সমিতির পক্ষে ক্ষতিকর বিবেচনা করাতে উভয় দলের বিরোধ আরম্ভ হয় ও পৃথক যুগান্তর দলের সৃষ্টি হয়। উভয় দলের মতের মধ্যে আংশিক সত্য ছিল। প্রকাশ্য প্রচারে সরকার পক্ষ সচকিত হইয়া যে গুপ্ত অনুসন্ধান আরম্ভ করেন তাহার ফলেই মাণিকতলার বোমার আস্তানার সন্ধান ও বহু বিপ্লবীর সন্ধান পুলিস পায় যেমন সত্য, তেমনই যুগান্তরের প্রকাশ্য প্রচারের ফলে বাঙ্গলার তরুণের মনে উহার সন্ধানের প্রবৃত্তি জাগে ও যুগান্তর দলের বহু নায়কের গ্রেপ্তারের পরও ওই দলের বিস্তৃতি সম্ভব হয়। যাঁহারা ধরা পড়েন নাই তাঁহারা সক্রিয় হইয়া উঠিয়া বিপ্লবকে জয়ান্বিত করিবার ব্যবস্থাদি করেন। এই প্রকাশ্য প্রচারের ফলেই পরবর্ত্তি কালের প্রসিদ্ধ বিপ্লবী অতুলকৃষ্ণ ঘোষের মনে যে দলের সন্ধান লাভের আগ্রহ জন্মে তাহা অতুলকৃষ্ণ নিজেই স্বীকার পাইয়াছেন। তিনি দলে যোগ দিয়া বিপ্লবী নায়ক যতীন্দ্রনাথের নির্দ্দেশে অনুশীলন দলের কর্ম্মিকর্ম্মী তরুণদের যুগান্তর দলভুক্ত করেন। ইঁহাদের মধ্যে যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, হরিকুমার চক্রবর্ত্তি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইহারা সকলেই যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পরবর্ত্তিকালে যে সমস্ত বৈপ্লবিক কার্য্যে রত হন তাহাতে যুগান্তর দলের প্রকাশ্য প্রচারে যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা অধিক সুফলই প্রদান করে। অনুশীলন সমিতির ঢাকার শাখাও গুপ্ত আন্দোলন পরিহার করিয়া প্রকাশ্যে কুচ কাওয়াজ প্রভৃতি আরম্ভ করাতে পুলিন দাস ও ভূপেশ নাগ অন্তরীণ হন ও পরবর্ত্তীকালে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার উদ্ভব হয় বটে, কিন্তু মাখনলাল সেনের পরিচালনায় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সোনারং জাতীয় বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া এক শক্তিশালী গুপ্ত চক্র গড়িয়া উঠে। এই সমিতিতে প্রতুল গাঙ্গুলী, ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তি, শশাঙ্ক হাজরা নরেন সেন, মহেশ আচার্য্য, আশুতোষ দাসগুপ্ত, বিনোদ দাসগুপ্ত, যোগেন চক্রবর্ত্তি প্রমুখ বহু কর্ম্মী যোগদান করেন এবং সারা বাঙ্গলায় কর্ম্ম প্রসারিত করিয়া বহু চমকপ্রদ কার্য্যের অনুষ্ঠানে সক্ষম হন। ১৯০৯-১০ সালে মাদারী পুরের পূর্ণ দাসের নেতৃত্বে একটি বিপ্লবী দল গড়িয়া উঠে।

মাণিকতলার বাগানে বোমা আবিষ্কারের পর যে সমস্ত বিপ্লবী পুলিসের নজরে না পড়াতে বাহিরে রহিলেন তাহারা প্রথমে ছত্রছাড়া হইয়া পড়িলেও বিপ্লবী দল যে নিঃশেষ হইয়া যায় নাই, তাহাদের অস্তিত্ব যে আছে, তাহা জানাইবার জন্য প্রতাপচন্দ্র সেন, নাটোরের সতীশ সরকার, টাঙ্গাইলের প্রিয়নাথ সেনগুপ্ত ও খুলনার কিরণকুমার মুখোপাধ্যায় কলিকাতায় একত্রিত হইয়া "যুগান্তর" পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট নিখিলেশের ন্যায় মৌলিকের নির্দ্দেশ অনুসারে গোপনে "যুগান্তর" পত্রিকা প্রকাশ করিতে থাকেন ও ময়মনসিং-সুহৃদ-সমিতির যে আস্তানা কলিকাতায় আশুতোষ সেন সেনে যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর বাড়ীতে ছিল, সেখানে ফ্রান্স প্রত্যাগত চন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে গোপনে আগ্নেয় বিদ্যা বোমা প্রস্তুত প্রণালী শিখিয়া লয় এবং তাহারা বোমা বানাইয়া কলিকাতার আশেপাশে চলন্ত ট্রেনে ইউরোপীয় যাত্রীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষে ও পুলিশ থানা ও

কাঁড়ি প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া বোমা ছুঁড়িতে থাকে। কলিকাতার খিদিরপুরেও বিপ্লবী একটি আস্তানা ছিল। সেখানকার বিমলদেবের পরিচালনায় লাডলি মোহন মিত্র, যতীন্দ্রমোহন মিত্র প্রভৃতি স্বতন্ত্রভাবে গোপনে "যুগান্তর" পত্রিকা প্রকাশ করিতে থাকেন। এই সময়ে যে সমস্ত দল স্বতন্ত্র নিরপেক্ষ হইয়া সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল তাহার মধ্যে অনেকগুলির নাম চাউড়াডাকাতি মামলায় ধৃত ললিত চক্রবর্তি রাজসাক্ষী—হইয়া ফাঁস করিয়া দেয়। এই দলগুলি যথাক্রমে শিবপুর দল, বুড়ি দল, খিদিরপুর দল, চাঙ্গারিপোতার দল, মজিলপুর দল, হলুদবাড়ি দল, কৃষ্ণনগর দল, নাটোর দল, বাউগাছা দল, যুগান্তর দল, ছাত্র ভাণ্ডার দল, শ্রমজীবি সমবায় দল ও রাজসাহী দল। ইহাভিন্ন অন্য দলও ছিল যেমন যতীন্দ্ররায়ের বক্তৃতার দল, পূর্ব্ববঙ্গের সাধনা সমিতির দল, সুহৃদ্ সমিতির দল বরিশালের প্রজ্ঞানন্দের দল প্রভৃতি। ললিত চক্রবর্তীর স্বীকৃতিকে কেন্দ্র করিয়া সরকার পক্ষ হইতে হাওড়া কনস্পিরেসি নামক মামলার উদ্ভব হয় ও ললিতের কথায় বহুলোক তাহাতে গ্রেপ্তার হয়। তবে আসামী পক্ষের জেরার ফলে বহুদিন মামলা চলার পর মামলা ফাঁসিয়া যায়। এই মামলার প্রধান আসামী ছিলেন পরবর্তি কালের বিখ্যাত বিপ্লবী নায়ক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

এই সম্পর্কে ইহা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে বিপ্লবী দলের রংরুট সংগ্রহে তরুণদের মধ্যে কর্ম্মঠসমাজ-সেবী দেখিলেই তাহাদের সংগ্রহ করার যে প্রবৃত্তি অর্দ্ধোদয় যোগের সময়ে দেখাদেয় তাহার ফলে ও পরে অন্যত্রও এই উপায়ে যে সমস্ত কর্ম্মী সংগ্রহ করা হয় তাহাতে যেমন অনেক ত্যাগী ও মহাবীর কর্ম্মী সংগৃহীত হয়, তেমনই সংগৃহীত কর্ম্মীদের মনোবলও দৃঢ়তার পরিচয় না লইয়া কেবল মাত্র সেবাপরায়ণতা দেখিয়া কর্ম্মী সংগ্রহে কিছু কুফলও দেখা দেয়। ইহাদের মধ্যে দুর্ব্বলচিত্তগণ ধরাপড়িয়া রাজসাক্ষী হইতে থাকে যেমন বিখ্যাত ডাকাতির আসামী পাঁচুগোপাল চক্রবর্তী, নেতড়াডাকাতির আসামী ললিতচন্দ্র চক্রবর্তী, ঢাকার কতিপয় ডাকাতি সূত্রে ধৃত রজনী দাস ও গিরিন্দ্র দাস প্রভৃতি। এই লোক সংগ্রহে কিছুবেশী উৎসাহ বিপ্লবের পক্ষে অনেক ক্ষতির কারণ হইয়াছিল।

এই সময়ে বিপ্লবীগণ রিভলবারের সহায়তায় প্রতি পক্ষীয়দের হত্যাকরা, বোমা ব্যবহার হইতে কার্যকর তাহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করে পরস্পর আন্তরোষ বিশ্বাস, শামসুল হক, শ্রীশচক্রবর্তী, হরিপদ দেব, সুরেশ মুখার্জি, বসন্ত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিকে হত্যার সাফল্যে। তখন হইতে বোমার বদলে নিজের প্রাণ বিপন্ন করিয়া এরূপ পদ্ধতিতে সন্ত্রাস সৃষ্টির পথ বিপ্লবীগণ গ্রহণ করে। কিন্তু অসুবিধা দেখাদেয় রিভলবার সংগ্রহে চন্দননগর হইতে এবং কলিকাতার জাহাজী নাবিকদের নিকট হইতে যে অল্প সংখ্যক রিভলবার সংগৃহীত হইত তাহা যথেষ্ট নহে বলিয়া কলিকাতার আত্মোন্নতি সমিতির মতলবে বিপ্লবীগণ তাঁহাদের সদস্য কলিকাতার বন্দুক বিক্রেতা হজ্জাকোম্পানীর জাহাজী মাল খালাসকারি কর্ম্মী শ্রীশ মিত্রের দ্বারা এক অসম সাহসিক কাজ করিয়া এক চালান বাক্স ভর্ত্তি নূতন চালানী মসার পিস্তল হজ্জাকোম্পানীর গুদামজাত না করিয়া অপহরণ করে, ফলে শ্রীশকে দেরার হইয়া আত্মগোপন করিতে হয়। তাহার পর হইতে শ্রীশের কোন খোঁজ কেহ পায় নাই। এই অভাবনীয় সম্পদ নিজেরা রাখিতে সাহসী না হওয়াতে তাঁহারা উহা বিপ্লবী নরেন্দ্র ভট্টাচার্যের (পরে মানবেন্দ্রনাথ রায় নামে প্রসিদ্ধ) হস্তে সমর্পণ করে। নরেন্দ্র উহা অতুল কৃষ্ণের হেফাজতে দিলে অতুল তাহার বেশীর ভাগ নিজ দলের প্রয়োজনে রাখিয়া বিপ্লবী দলের সর্ব্ববাদী সম্মত নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নির্দ্দেশে বাঙ্গলায় ও বাঙ্গলার বাহিরে বিপ্লবীদের মধ্যে বিতরণ করে। এই সময়ে

অর্থসংগ্রহের চাহিদায় পুনরায় ডাকাতিকরার নির্দেশ যতীন্দ্রনাথ দিলে মানবেন্দ্র ও অতুলকৃষ্ণ মোটর যোগে কয়েকটি অসমসাহসিক ডাকাতি করিয়া বেশ কিছু অর্থ সংগ্রহ করে। এ প্রসঙ্গে যতীন্দ্রনাথের অধীনে সকল বিপ্লবী দলের একযোগে কাজের কাহিনী খুবই উল্লেখযোগ্য। অশ্বিনীচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর চেষ্টায় যুগান্তর দলের নেতৃত্ব যতীন্দ্রনাথের উপর অর্পিত হওয়ার পর ১৯১৪ সালে দামোদর বন্যাত্রাণ উপলক্ষে সমাগত বিপ্লবী দলের মধ্যে আলাপ আলোচনার ফলে অনুশীলন সমিতির তৎকালীন নেতা যাদবলাল সেন, প্রবর্তক সমবায়ের অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির চেষ্টায় বাঙ্গলার ও বাঙ্গলার বাহিরে রাসবিহারী বসু ও শচীন সান্যালের নেতৃত্বে যে দল গড়িয়া উঠে তাহাদের সকলের সম্মতিক্রমে যতীন্দ্র নাথের নেতৃত্বে সকল দল একযোগে কাজ করিতে সম্মত হয়। এই সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠে এবং তাহাতে জার্ম্মান সহযোগিতায় ভারতের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় বিদ্রোহ সফল করিবার এক পরিকল্পনা যতীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন। তিনি মনবেন্দ্র নাথকে জাভার জার্ম্মান কনসালের সহিত যোগ স্থাপনের জন্য ও তাঁহার সহিত সংযোগ রক্ষার ভার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের উপর অর্পিত করেন এবং দিঘাপুরে সৈন্যদলের মধ্যে বিপ্লবমন্ত্র প্রচারের জন্য ভূপতি মজুমদার ও পূর্ব্বপ্রান্তে অবনী মুখার্জ্জীকে প্রেরণ করেন। এই সব প্রস্তুতি যখন চলিতেছে তখন সুরেশ মুখার্জ্জীর হত্যাকাণ্ডের পর যতীন্দ্রনাথ সুরেশ চন্দ্রের হত্যকারি চিত্ত প্রিয় রায় ও তাহার সহকারিদের আর কলিকাতায় থাকা বিপজ্জনক বিধায় বাঙ্গলার বাহিরে গোপন আস্তানায় রাখিবার জন্য তাঁহাদের বালুরঘাটে প্রেরণ করেন। এখানে কিছুদিন গোপন থাকার পর তাঁহাদের কাছিপোতার আশ্রয়স্থলের খবর পুলিশে পাওয়াতে ডেপুটি কমিশনার টেগার্টের অধীনে একদল সশস্ত্র বাহিনীর সহিত বুড়িবালাম নদীর তীরে ইঁহাদের সহিত সরাসরি সংঘর্ষ বাধে। ইহাই বাঙ্গলায় প্রথম গেরিলা যুদ্ধ। এই যুদ্ধে যতীন্দ্রনাথ, চিত্ত প্রিয় প্রভৃতি বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া মৃত্যু বরণ করে।

জার্ম্মানীর সাহায্যে যে আগ্নেয়াস্ত্র আনিবার কথা ছিল তাহা গ্রহণের জন্য সুন্দরবনে হরিকুমার চক্রবর্ত্তি, যতীন্দ্র ঘোষাল, সতীশ চক্রবর্ত্তি প্রভৃতি সুন্দরবনে গমন করেন কিন্তু "স্যাভরিক" অস্ত্র আনিতে পারে নাই এবং ইতিমধ্যে ভারতীয় বিপ্লবীগণ চেকোশ্লোভাকিয়ার বিপ্লবীদের সহিত যে সংযোগ স্থাপন করিয়াছিল তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ইংরাজ ও মার্কিনদের নিকট এই সমস্ত ব্যবস্থার কথা ফাঁস করিয়া দেওয়ার ফলে এই ব্যবস্থা পণ্ড হইয়া যায়। যাদুগোপাল মুখার্জী, অরবিন্দনাথ চ্যাটার্জি, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, সতীশ চক্রবর্ত্তী আত্মগোপন করিতে বাধ্য হন। ১৯১৫ সালে ভারত রক্ষা আইন চালু হয় এবং বহু সন্দেহ ভাজন বিপ্লবীকে এই আইনের বলে বিনা বিচারে আটক করা হয়। ফলে কিছুদিনের জন্য বিপ্লবী আয়োজন স্তিমিত হয়। এ সময়ের কয়েক বৎসর পর গান্ধিজী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের সুযোগে বাহিরে গান্ধীপন্থী অহিংস পন্থা গ্রহণ করিয়া ভিতরে গোপনে বিপ্লব আয়োজনে লিপ্ত থাকিবার আশায় অনেক বিপ্লবী অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন; তবে কতক প্রখ্যাত বিপ্লবী সত্যসত্যই বিপ্লবপন্থার বিফলতা দর্শনে মনেপ্রাণে অহিংস আন্দোলনকে প্রকৃষ্টতর পন্থারূপে গ্রহণ করেন। বিপ্লবীদের মধ্যে আবার কেহ কেহ সন্ন্যাসী হইয়া যোগকার্য্যে আত্মনিয়োগের জন্য ভোলানন্দ গিরির আশ্রমে বা রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করেন। ঐ দুই আশ্রমের প্রায় সকল প্রধানই এখন প্রাক্তন বিপ্লবী। অবশ্য বিপ্লবী দলের মধ্যে কয়েকজন একনিষ্ঠকর্ম্মী বাহিরে অহিংসকর্ম্মী ভিতরে বিপ্লব কর্ম্মে লিপ্ত থাকা আত্মঅবমাননাকর বোধে নিষ্ক্রিয় হইয়া যান। ইহার পর বিপ্লব মন্ত্রের সাধকশ্রেষ্ঠ চাকায় হেমচন্দ্র ঘোষের

বেঙ্গল ভলান্টিয়ার, অনিল রায়ের নেতৃত্বে শ্রীসংঘ, মাষ্টার দার নেতৃত্বে বিপ্লবী দল এবং কলিকাতায় ও পূর্ববঙ্গে বিভিন্ন নেতৃত্বে অত্যন্ত প্রতাপশালী বিপ্লবী দল গড়িয়া তুলেন। বিপ্লব আন্দোলনে এই সমস্ত দলের একটি বিশিষ্ট অবদান আছে। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার দলের বাদল ও দিনেশ কলিকাতার রাইটার্স বিল্ডিংএ দুঃসাহসিকতার পরিচয় প্রদান করেন, মেদিনীপুরের পর পর উপর্যুপরি ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যাকরিয়া সন্ত্রাস সৃষ্টির এক রেকর্ড সৃষ্টি করেন, চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বিপ্লবীরা সশস্ত্র বাহিনীর সহিত যে সশস্ত্র সংগ্রামে ঘটে। প্রত্যেকটি দলই বাঙ্গালী জাতিকে আরও বেশী অভয় মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া এদেশে এমন আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়-যাহার সামগ্রিক ফলে এদেশ ত্যাগ করিয়া ইংরেজদের চলিয়া যাইবার পথে খুবই সহায়ক হয় এবং দেশ স্বাধীন হয়। আমাদের দেশ হইতে ইংরেজের স্বেচ্ছায় অপসারণ ও ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাহারো একক কৃতিত্ব নাই। গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রের অবদান সর্ব দিক হইলেও গ্রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সকল রাজনৈতিক কর্ম্মী ও দলের কিছু না কিছু অবদান আছে। ইহাতে আবেদন নিবেদনের পথ, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পথ, অহিংস অসহযোগের পথ ও রক্তাক্ত সংগ্রাম প্রচেষ্টার পথ প্রভৃতি সকল পথেরই অবদান আছে। ভারতের মুক্তি সংগ্রামে এই সমস্ত বিভিন্ন ধারার অবদানের মূল্যায়ন করা অত্যন্ত কঠিন এবং আমার মনে হয় এখনও দেশে সেরূপ নিরাসক্ত মনের সৃষ্টি হয় নাই যাহার দ্বারা অপক্ষপাত মূল্যায়ন সম্ভব। আমি নিজে বিপ্লবী ছিলাম ও পরে গান্ধিজীর পন্থা আরও কার্য্যকর বিশ্বাসে গ্রহণ করি, কাজে কাজেই এই সব ভাবধারার প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া মূল্যায়নের অধিকারি আমি নহি, সেরূপ তাহা হইতে বিরত হইলাম।

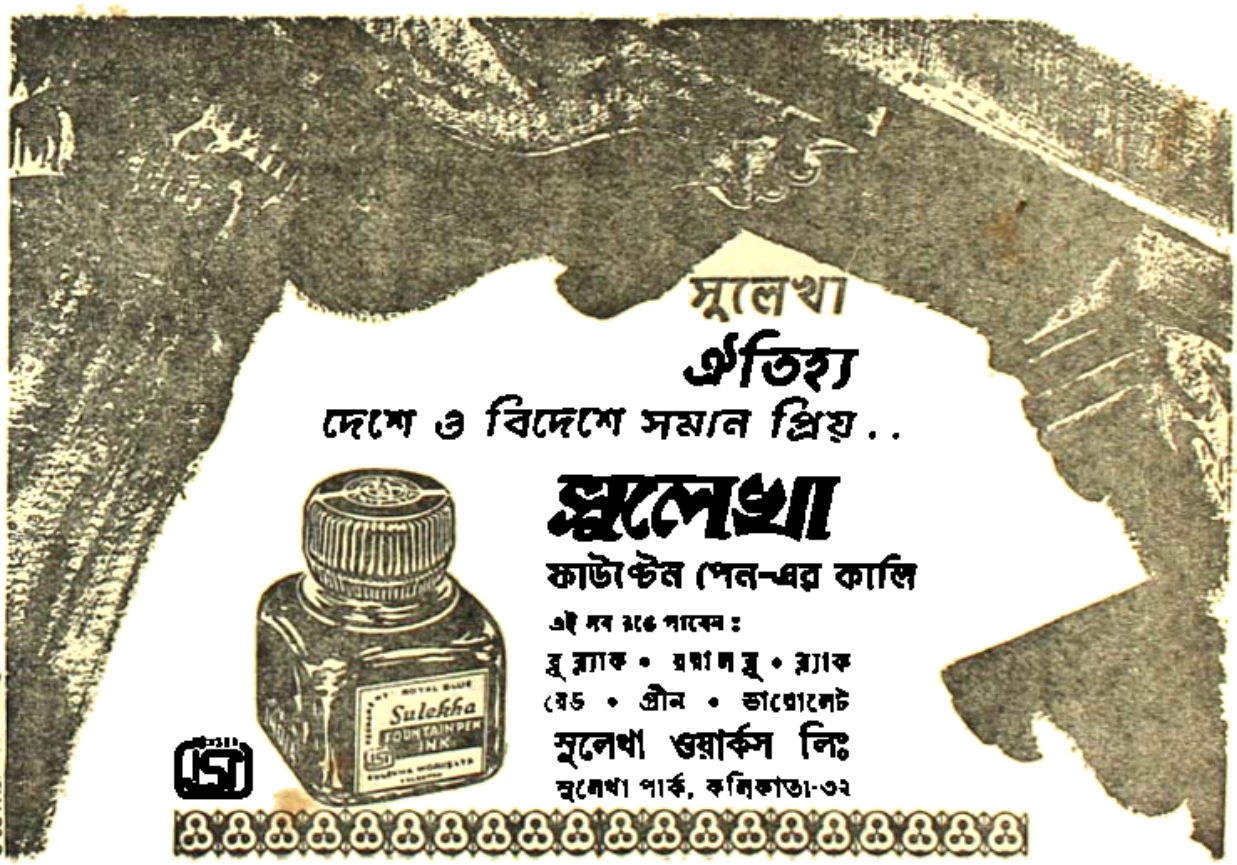

দেশ বিভাগঃ নেতাদের ভূমিকা

ডাঃ অশোককুমার মজুমদার

১

দেশবিভাগে নেতাদের ভূমিকা তথা দায়িত্বের সম্বন্ধে কিছু লিখিবার প্রথমেই বলা আবশ্যক যে ইতিহাসে যাহা ঘটে তাহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব কখনই নেতাদের উপর ন্যস্ত করা যায় না। বর্তমান প্রবন্ধ এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার স্থান নহে, সংক্ষেপে বলিতে গেলে, গীতার কথায় বলিতে হয়ঃ

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্
বিবিধাশ্চ পৃথক্‌চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্।

অর্থাৎ প্রত্যেকটি কার্যের পাঁচটি হেতু আছে। প্রথম, অধিষ্ঠান অর্থাৎ objective condition, দ্বিতীয়, কর্তা অথবা প্রেরক, করণ অর্থাৎ কার্য্য করিবার উপায়গুলি বা যাহাদ্বারা কার্য সংঘটিত হইয়া থাকে, বিবিধ চেষ্টা, নানাবিধ রাজনৈতিক আন্দোলন, এবং পঞ্চম দৈব, যাহাকে বর্তমানে statisticiansরাও random factor বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন।

বর্তমান প্রবন্ধে কেবল ভারতবিভাগে নেতাদের কতটা দায়িত্ব ছিল তাহাই আলোচিত হইবে। তবে বোধহয় এ কথা মনে করা সঙ্গত হইবে না যে নেতারা অন্যরকম ব্যবহার করিলেই দেশ ভাগ হইত না। ইহার উত্তরে সংক্ষেপে ইহাই বলা যায় যে যাহারা অন্যরূপ ব্যবহারের অনুমোদন করিতেন, তাহাদের নেতা হইবার কোনো সম্ভাবনাই বোধহয় ছিল না। যেমন কংগ্রেসের দিক হইতে দেশ ভাগের প্রধান দায়িত্ব গান্ধিজীর; আমরা তাঁহাকে যতই আলোচনা করিনা কেন, এক সময়ে দেশ তাঁহাকেই নেতৃত্বে বরণ করিয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে বিপ্লবী নেতাদের ভূমিকাও আলোচনা করা প্রয়োজন, যদিও মুখ্যতঃ দেশবিভাগের কোনো দায়িত্ব তাঁহাদের অর্পণ করা যায় না। কিন্তু বাঙ্গলাদেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহাদের অধিপত্যও অনস্বীকার্য্য।

বিপ্লবী নেতারা কোনোদিন মুসলমানদের দলভুক্ত করিবার চেষ্টা করেন নাই। ইহার অবশ্যই কারণ ছিল। ৺ প্রফুলচন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি (বোধহয় তাঁহার আত্মজীবনীতেও লিখিয়াছেন) যে তাঁহারা যখন বিপ্লবী দলে যোগ দেন তখন প্রায়ই মুসলমান গুণ্ডাদের সহিত মারপিট করিতে হইত। দ্বিতীয়তঃ তাঁহাদের সমশ্রেণীর মুসলমান তখন একেবারেই ছিল না। সুতরাং দলে নিবার প্রশ্নই ছিল না। ইহা সত্য হইলেও পুলিন বাবু যে ভাবে নবীন বিপ্লবীদের দীক্ষা দিতেন তাহাতে কোনো মুসলমানের পক্ষে বিপ্লবী দলে যোগদান করা সম্ভব ছিল না। হয়ত পুলিন বাবুর ঐরকম উদ্দেশ্যও ছিল না। পরে যখন ঐ প্রথার পরিবর্তন হয়, তখন উপর্যুপরি দাঙ্গায় হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হইয়া গিয়াছে, এবং নেতারা তখন মুসলমানদের দলে গ্রহণ করিবেন না, এই নীতি মানিয়া লইয়াছেন।

এই নীতির যে ব্যতিক্রম বাঙ্গলাদেশের বাহিরে দেখা যায়: যেমন কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসফাক উল্লা। শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইহাকে অতি উচ্চশ্রেণীর বিপ্লবী বলিয়া মনে করেন। এই সঙ্গে যোগেন গুবেষণা সিরিজ নাম উল্লেখ করা যাইত, কিন্তু তাহা

করিতেছিলেন। কারণ ওবেদুল্লার বৈপ্লবিক প্রেরণার উৎস সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি দেওবন্দের প্রধান আচার্য্য শেখ-উল-হিন্দের নির্দেশে কাজ করিতেন দেওবন্দের মৌলবীদেরও বিপ্লবের প্রেরণা ছিল, কিন্তু তাহা ইসলামের রাজনীতি ও ধর্মনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। বাঙলা দেশের বিপ্লবী নেতারা ইঁহাদের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। কারণ বোধ হয় বিপ্লব আন্দোলনের প্রথম যুগে যেমন হিন্দু আচার অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁহাদের আকর্ষণ দেখা যায়, পরবর্তী যুগে তাহারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে সমস্ত ধর্মের গোঁড়ামি হইতে তাঁহারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখিতে চেষ্টা করেন। এই অবস্থায় দেওবন্দের মৌলানাদের যে তাঁহারা বিশেষ সুনজরে দেখিতেন না তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ফলে এই মৌলানারা গান্ধিজীর সঙ্গে মিলিত হন, এবং খিলাফৎ আন্দোলন করেন। খিলাফৎ আন্দোলনের ফল দেশের পক্ষে মঙ্গলদায়ক হয় নাই। সুতরাং বিপ্লবী নেতারা দেওবন্দের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা না করিয়া যে ভুল করিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না।

অপরপক্ষে গান্ধিজীর নেতৃত্বে কতকগুলি ত্রুটি ছিল, বিপ্লবী নেতারা যাহা হইতে মুক্ত ছিলেন। প্রথমেই বলা যায় গান্ধিজীর অহিংসনীতি। মুসলমান নেতাগণ খিলাফৎ আন্দোলনে এই নীতি মানিয়া নিলেও, বস্তুতঃ মুসলমানেরা কোনো দিনই অহিংস নীতিতে বিশ্বাস করেন নাই। তাঁহারা নেতাজীর সশস্ত্র আক্রমণের যাহাতা বুঝিয়াছিলেন, এবং নির্বিচারে তাঁহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং দেওবন্দের মৌলানাগণ গান্ধিজীর পরিবর্তে বিপ্লবী নেতাদের সহিত মিলিত হইলে যে ফল অন্যরূপ হইত না, তাহা নিঃসন্দিগ্ধ রূপে বলা যায় না।

২

ভারতবিভাগের জন্য দায়ী প্রধানত গান্ধিজী এবং জিন্না। গান্ধিজী যদিও ঠিক দেশবিভাগের পূর্বে তাঁহার প্রবল আপত্তি ঘোষণা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কার্য্যাবলী আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে তাঁহার দায়িত্ব সর্বাধিক। অবশ্য সর্দার প্যাটেল, নেহেরু ইত্যাদিরও দায়িত্ব কম নহে। যাহা হউক বাঙলাদেশের পাঠকগণ কংগ্রেসের নেতাদের জীবনী অবগত আছেন, কিন্তু জিন্নার সম্বন্ধে হয়ত সেরকম বিশেষ কিছু জানেন না, সুতরাং জিন্নার সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

জিন্না করাচিতে এক দরিদ্র কচ্ছি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু এখন গুজরাতি বলিতেন ও গুজরাতিদের সহিত এমনভাবে মিশিয়াছিলেন, যে সকলেই তাঁহাকে গুজরাতি মনে করিত, এবং এখনও করে।

গান্ধিজী যে পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন, তাহার আভিজাত্য ও ধনগৌরব না থাকিলেও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। গুজরাত ইংরাজদের অধিকারে আসিবার পর হইতেই, শক্তিশালী নাগর ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বিশেষভাবে সরকারী অনুগ্রহ লাভ করে, এবং স্বল্পকালের মধ্যেই সৌরাষ্ট্রের সমস্ত দেশীয় রাজ্যগুলির শাসন ক্ষমতা করায়ত্ত করে। একবার একটি নাগর ব্রাহ্মণ একটি রাজ্যে দেওয়ান হইতে পারিলেই, সে সমস্ত কর্মচারীদের অপসারিত করিয়া নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের চাকরিতে নিযুক্ত করিত। কিছুদিন পরে পাটিদার সম্প্রদায় যাহাদের প্যাটেল বলা হয়—এই বিষয়ে অবহিত হয়, এবং চক্রান্ত করিয়া তাহারাও নাগরদের সরাইয়া কোন রাজ্যে নিজেদের ক্ষমতা বিস্তার করে। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়াও গান্ধি পরিবার ভিন্ন অন্য কোনো বণিক জাতীয় পরিবার বা ব্যক্তি দেশীয় রাজ্যে প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন তাহা জানিতে পারি নাই। গান্ধীজীর পিতামহ পোরবন্দরের মত বড় রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন; তাঁহার পিতা অপেক্ষাকৃত ছোট রাজ্যের দেওয়ান হইলেও, মনে রাখিতে হইবে যে সেকালে বানিয়ার পক্ষে দেওয়ান হওয়াটাই যথেষ্ট গৌরবের বিষয় ছিল। গান্ধীজির পিতামহ ও পিতার নিশ্চয়ই নানা রকম

সংগুণ ছিল, কিন্তু কেবলমাত্র নির্বল ও উদার চরিত্র এবং সততার অবলম্বনে কাঠিয়াওয়াড়ী রাজ্যে কেহ দেওয়ানি করিতে পারিত না, এবং তাঁহারাও করিয়াছিলেন এইরূপ মনে করিবার কোনো হেতু নাই। যাহা হউক, গান্ধিজী তাঁহার বিরাট আত্মপ্রত্যয়, কূট রাজনৈতিক বুদ্ধি ও নিজের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার কৌশল হয়ত উত্তরাধিকারী হিসাবে পাইয়া ছিলেন।

জিন্না এইসকল সুযোগ হইতে বঞ্চিত ছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কূটরাজনীতিতে, গান্ধিজীকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

অন্য একদিকে দুইজনেই সমান ছিলেন। নৈতিক চরিত্রের যে দুইটি দিককে আমরা সর্বাপেক্ষা মর্যাদা দিয়া থাকি, অর্থাৎ কামিনী কাঞ্চনে নিরাসক্তি, সেদিক দিয়া জিন্না কোনো অংশে গান্ধিজীর অপেক্ষা ছোট ছিলেননা। একমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুশ্চরিত্র হইয়া যাওয়ায় জিন্না তাহাকে কোনোদিন বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেন নাই। তাঁহার সংক্ষিপ্ত দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া পড়ে, তাহা সত্ত্বেও তাঁহাকে কেহই দোষী মনে করেনা। যাহা হউক; জিন্নার চরিত্রে কোনোরূপ কলঙ্ক প্রদান করিতে কাহাকেও শুনি নাই।

অর্থের দিক হইতে তিনি গান্ধিজীর মত দারিদ্র্য বরণ করেন নাই সত্য, কিন্তু অন্যায় ভাবে অর্থ উপার্জন কোনদিনও করেন নাই। এই বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া অবান্তর হইবে না।

জিন্না লোকমান্য তিলকের মামলা পরিচালন কালে উপযুক্ত কি গ্রহণ করিয়া ছিলেন। এই ব্যবহারের সমালোচনা করাতে জিন্নার বন্ধু শ্রীকানুগা মারকাদাস আমাকে নিম্নলিখিত ঘটনাটি বলেন। ১৯০১ এর আন্দোলনের সময় কয়েকটি রাজবন্দীর আপিলের জন্য কানুগা জিন্নাকে অনুরোধ করেন। জিন্না সানন্দে রাজী হইয়া বলেন, যে তাঁহাকে পারিশ্রমিক দিতে হইবে। ইহাতে কানুগি আপত্তি করিলে জিন্না বলেন যে তিনি তিলকের নিকট হইতেও পারিশ্রমিক লইয়াছিলেন কারণ পরিশ্রমিক না লইয়া আদালতে পক্ষ সমর্থন করিলে পক্ষপাতিত্ব (partiamship) দোষ হয়, এবং কোনো আইনজীবির পক্ষেই তাহা করা উচিত নহে। কানুগিকে জিন্না বিশেষ স্নেহ করিতেন সুতরাং শেষ আবেদন হিসাবে কানুগি জানাইলেন যে এই বিচারের ব্যয়ের মোটা অংশ তাঁহাকেই বহন করিতে হইবে; (জিন্নার কি তখন দৈনিক একহাজার); জিন্না হাসিয়া উত্তর দিলেন আমি আনন্দের সহিত তোমার টাকা গ্রহণ করিব। তিনি টাকা লইয়াই মামলা চালাইলেন।

অপরপক্ষে হরসিংভাই দিভেটিয়া (পরে বম্বে হাইকোর্টের জজ ও সোরাষ্ট্রের চিফ জাষ্টিস, নাইট খেতাবধারী) ১৯২০-২১ এই সময়ে জিন্নাকে একটি ব্রিফ দেন। তখন জিন্নার কি ছিল দৈনিক পঁচিশ গিনি। জিন্না কিছু কি বাড়াইয়া দিতে অনুরোধ করায়, হরসিংভাই কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন যে প্রায় তিনমাস দিল্লীতে এসেম্বলীর কাজে ব্যস্ত থাকায় অস্বাভাবিক খরচ হইয়াছে, পরন্তু ব্রিফ খেলিয়া মাত্র পনর টাকা ব্যতীত কিছুই রোজগার করিতে পারেন নাই। হরসিংভাই বলিলেন যে মক্কেলকে না জিজ্ঞাসা করিয়া টাকা বাড়াইতে পারেন না, তবে ত্রিশ গিনি দিলে কেমন হয়। জিন্না ইহাতে খুব খুশী হইয়াছিলেন।

হরসিংভাই বলেন যে সে সময়ে অন্যান্য যে সকল ব্যারিষ্টার এসেম্বলীর সদস্য ছিলেন। তাঁহারা সম্পূর্ণ সেসন দিল্লীতে থাকিতেন না। যাহাতে তাঁহাদের অর্থোপার্জন কম না হয়, তৎপ্রতি তাঁহারা বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। জিন্না সেরকম ছিলেন না, যাহা কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিতেন, তাহা একাগ্র হইয়া করিতেন, ফলে যত টাকা তাঁহার রোজগার করা উচিত ছিল, তাহা তিনি করিতে পারেন নাই।

এসেম্বলীর সদস্য থাকা কালীন এক সময়ে, জিন্না কোনো একটি দেশীয় শিল্পকে protection দিবার জন্য একটি

উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা দেন। ভারতীয় কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান এটর্নীর দ্বারা তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিল, এবং জিন্না তাহাদের দাবী ন্যায্য মনে করিয়াই বক্তৃতা দিয়াছিলেন। যাহা হউক বম্বেতে ফিরিয়া আসিবার পর ঐ এটর্নী একদিন তাঁহাকে একটি ব্রিফ পাঠায় জিন্নার উপযুক্ত ফি অপেক্ষা কয়েকগুণ বেশী ফি ঐ ব্রিফে লেখা ছিল। ফির অঙ্কের দিকে তাকাইয়া ঘৃণাভরে ব্রিফ ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া তিনি বলিয়া ছিলেন : "জিন্নাকে ঘুস দিতে আসিয়াছ।" ঘটনাস্থলে তাঁহার তৎকালীন বিশেষ স্নেহাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত কানাহাইয়ালাল মাণিকলাল মুনসি উপস্থিত ছিলেন।

জিন্নার আর এক বিশেষত্ব ছিল তাঁহার কঠোর আত্মমর্যাদা জ্ঞান। জিন্না একদিন তৎকালীন এড্‌ভোকেট জেনারেল Strangman এর সহিত consultation করিবার সময় Strangman তাঁহাকে কিছুটা অভদ্র ভাবে কথা বলেন এই ঘটনার পর Strangman প্রায় দশ বারো বৎসর বম্বে ছিলেন, কিন্তু জিন্না আর তাঁহার সহিত কথা বলেন নাই ; একই মামলায় ব্রিফ গ্রহণ করিলেও, এটর্নীর সহিত কথা থাকিত যে পরামর্শ (consultation) আলাদা হইবে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ বৃদ্ধবয়সে তাঁহার এই আত্মমর্যাদা জ্ঞান ঔদ্ধত্যে পরিণত হয়, এবং কর্তব্যজ্ঞানের পরিণতি হয় একান্ত অসহিষ্ণুতায়। তাঁহার শেষ জীবনের ঘটনা আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে জিন্না অত্যন্ত ক্ষমতাপ্রিয় ছিলেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পরেই তিনি এমন ভাবে শাসন ধারার পরিবর্তন করেন, যাহাতে যে কোনো ভাইসরয় অপেক্ষা অধিক স্বৈরাচারী ক্ষমতা তাঁহার হস্তগত হয়। ইহার ফলেই অদ্যাবধি পাকিস্তানে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইল না, এবং জিন্নার অনুকরণ করিয়া পাকিস্তানী নেতারা অদ্যাবধি হিন্দু বিদ্বেষের বিষ ছড়াইয়া নিজেদের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিতেছেন।

দুর্ভাগ্যের বিষয় গান্ধিজী বর্তমানে কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতায় ক্ষমতা লাভ করা যাইবে না, ইহা জিন্না বুঝিয়া ছিলেন। কারণ গান্ধিজী নিতান্ত অহিংস প্রকৃতি মহাত্মা হইলেও, তাঁহার বিরোধীদের কংগ্রেস হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন : যেমন, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি বিপ্লবীদের, বিঠলভাই প্যাটেল, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, আনে, মুঞ্জে, প্রভৃতি বিখ্যাত নেতাদের আর কংগ্রেসে স্থান হয় নাই। বিদেশে মৃত্যুকালে বিঠলভাই সমস্ত সম্পত্তি উইল করিয়া নেতাজীকে দিয়া গেলেন। যে ইংরেজের আদালতকে গান্ধিজী ও ঘৃণা করিতেন, সেই আদালতের সাহায্য লইয়া সর্দার প্যাটেল নেতাজীকে বিঠলভাইর সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিলেন। গান্ধিজীর সম্পূর্ণ সহমত না থাকিলে, সর্দার এ কাজে কিছুতেই অগ্রসর হইতেন না। ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর গান্ধিজী জোর করিয়া নেতাজীকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হয় যে সন্তাষ প্রতিদ্বন্দ্বীদের সম্পর্কে গান্ধিজী কত অনমনীয় ছিলেন। অবশ্য বলা যাইতে পারে যে বিশ্বের সমস্ত রাজনৈতিক নেতার চরিত্রেই এই অনমনীয়তা বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট।

জিন্নার সহিত গান্ধিজী এবং কংগ্রেসের নেতারা কি করিয়াছিলেন, তাহা পরে বলিতেছি। ক্ষমতা লাভের আশায় হিন্দু মুসলমানের মিলন ঘটাইতে ব্যর্থ হইয়া জিন্না দেশত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে বাস করিতে লাগিলেন। পরে লিয়াকৎ আলীর আহ্বানে দেশে ফেরেন, কিন্তু মুসলিম লীগের যতটা ক্ষমতা পাওয়া উচিত ছিল, তাহা পাইল না। রাজনীতি ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ বা জিন্না কংগ্রেস বা গান্ধিজীর তুল্য স্থান পাইলেন না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর, কংগ্রেস মন্ত্রীসভা ত্যাগ করিলে, ভাইসরয় লিনলিথগো যখন জিন্নাকে ক্ষমতা লাভের রাস্তা দেখাইয়া দিলেন, তখন জিন্নার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইল। ১৬ই আগষ্টে Direct Action Day'র ফলে সহস্র সহস্র হিন্দু নরনারী, শিশু, বৃদ্ধ হতাহত হইল, সহস্র সহস্র হিন্দু নারী ধর্ষিতা হইল কিন্তু জিন্নার ক্ষমতালোলুপ অন্তঃকরণ হইতে তখন সকল

সুকুমার বৃত্তি নির্মূলে উচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে। ইহার পর বিহারে দাঙ্গায় মুসলমানদের বিশেষ ক্ষতি ও সর্বনাশ হইল, জিন্না একটি ইস্তেহার জারি করিয়াই কর্তব্য শেষ করিলেন। তাঁহার মত বুদ্ধিমান লোক খুব ভাল করিয়াই জানিতেন, যে কংগ্রেস যতই অহিংস নীতি প্রচার করুকনা কেন, হিন্দুরা কখনই এক তরফা মার খাইবে না, প্রতিশোধ নিবেই। বাস্তবিক তাঁহাতে মনে হইয়াছিল প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল: দাঙ্গা করিতে করিতে সমস্ত দেশের শাসনযন্ত্র এমন ভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িবে যে তখন কংগ্রেসের নেতারা পাকিস্তান সমর্থন করিতে বাধ্য হইবে। কার্যতঃ তাহাই হইল। লক্ষ লক্ষ নরনারীর রক্তরঞ্জিত সিংহাসন জিন্না এক বৎসর ভোগ করিয়া ছিলেন। যে সংখ্যালঘু মুসলমানদের জন্য জিন্না চিৎকার করিতেন তাহারা এখনও ভারতবর্ষে আছে, বর্তমান পাকিস্তানে অর্থাৎ মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গে ও পশ্চিম পাঞ্জাবে মুসলমানদের কোনই ভয়ের হেতু ছিল না, কিন্তু কেবল ক্ষমতার লোভে জিন্না সমস্ত দেশের এবং বলিতে গেলে মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থে জলাঞ্জলি দিলেন।

এইখানেই গান্ধিজীর সহিত জিন্নার পার্থক্য। গান্ধিজীও ক্ষমতা আয়ত্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু এরকম নৃশংস ভাবে নয়। বৃদ্ধ বয়সে পর্যুদস্ত হিন্দুদের সাহস দিতে নোয়াখালিতে গিয়া দাঁড়াইলেন, পরে মুসলমানদের ডাকে বিহারে গেলেন। মানব জীবনের কতগুলি মূল্যবোধ গান্ধিজী কখনও ভোলেন নাই, সেই জন্যই তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ মানবের অন্যতম বলা হয়।

জিন্না ক্রমে ক্রমে সমস্ত আদর্শকে বিসর্জন দিয়াছিলেন, এই জন্য রাজনৈতিক হিসাবে তাঁহাকে যতই গৌরব দান করা যাক না কেন, মানুষ হিসাবে তাঁহাকে উচ্চস্তরের বলা যায় না। এ বিষয়ে নেতাজীপ্রমুখ আর যাহাদের গান্ধিজী কংগ্রেস হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদের ব্যবহারের সহিত জিন্নার ব্যবহার তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল লিখিয়াছেন: "An age appears in history through its prominent individuals, and derives its apparent character from the character of these men. As the qualities required for achieving prominence change, so the prominent men change."[১]

রাসেলের এই উক্তিটি যথার্থ বলিয়াই মনে হয়।

কংগ্রেসের গোড়াপত্তন হইতেই সার সৈয়দ আহ্‌মদ মুসলমানদের সাবধান করিয়াদিলেন যে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইলে তাহারা চিরকালের জন্য সংখ্যালঘু হইয়া যাইবে। ইহাতে মর্মাহত হইয়া তরুণ লালা লাজপৎ রায়, সৈয়দ আহ্‌মদকে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া খোলা চিঠি লেখেন। পূর্বে সার সৈয়দের মনোভাব সম্পূর্ণ অন্যরকম ছিল, এবং লাজপৎ রায় তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন, আজ তাঁহার কেন এই পরিবর্তন ইহাই ছিল লাজপৎ রায়ের জিজ্ঞাস্য। সার সৈয়দ কোনো উত্তর দেন নাই।

সার সৈয়দের বিরোধিতা সত্ত্বেও কিছু মুসলমান কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সকলের মনোভাব অসাম্প্রদায়িক বলা যায় না। বিখ্যাত কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট বদরুদ্দিন তায়েবজি এক চিঠিতে সার সৈয়দকে লেখেন:

"... It is in our power by firm and resolute action to divert the course the Congress shall take and my strong conviction is that the Mussalmans can by united action confine the Congress to such topics as they may deem desirable or safe for discussion....my

১। Bertrand Russel: *Power, a new social analysis*, p. 42.

policy, would be to act from *within* rather than from *without* ....[২] (February 18, 1888).

মুসলমানদের এই মনোভাব কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশনে প্রকটরূপে দেখা দিল। তাঁহারা দাবী করিলেন যে আইন সভায় হিন্দু এবং মুসলমানদের সদস্য সমান হইতে হইবে; একজন মুসলমান দাবী করিলেন যে মুসলমান সদস্যের সংখ্যা হিন্দু সদস্যর তিনগুণ হওয়া আবশ্যক। অনেক তর্কের পর স্থির হইল যে সকল ধর্ম সম্প্রদায় উপযুক্ত সংখ্যায় নির্বাচিত হইবে।

এই ভাবে বিবাদ নিষ্পত্তি হইলেও, কংগ্রেস কোনোদিনও মুসলমানদের আকর্ষণ করিতে পারে নাই। ইংরাজ সরকার তাহার প্রবল অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ক্রমে কংগ্রেসের রাজনীতির ধারা বদলাইল, সুরাটে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের বিবাদে কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত হইল (১৯০৭), ১৯০৬ সালে মুসলীম লীগ প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৯১০ সালে লীগের প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নবীবুল্লা দেশে ভেদ সৃষ্টি করার জন্য ইংরাজ কর্মচারিদের অভিযুক্ত করেন। ফলে ১৯১১ সালে, এলাহাবাদে হিন্দু মুসলমান Unity Conference অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৎসর ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়। পরবর্তী লীগ অধিবেশনে, প্রেসিডেন্ট সলিমুল্লা হিন্দুদের সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে তৎপর হইবার জন্য মুসলমানদের অনুরোধ করেন।

এইভাবে এক শ্রেণীর মুসলমানদের দিক হইতেও হিন্দুদের সহিত মিলিত হইয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য একটা প্রেরণা আসে এবং উল্লেখযোগ্য যে ইহা স্বল্পকাল স্থায়ী হয় নাই।

কিছুকাল পরে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল (১৯১৪) এবং শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ত কংগ্রেসে যোগদান করিলেন। ঐ বৎসর কংগ্রেস ইংলণ্ডে একটি প্রতিনিধি দল পাঠান, তাহার সভ্য ছিলেন ভূপেন্দ্র নাথ বসু, জিন্না, সমর্থ, লাজপৎ রায় ও অ্যানি বেসান্ত। প্রতিনিধি দল ইংলণ্ডে বিশেষ কিছু করিতে পারে নাই, কিন্তু একত্র কাজ করার ফলে জিন্না অ্যানি বেসান্তের আন্তরিকতা স্বীকার করেন।

দুঃখের বিষয় বর্তমানে অ্যানি বেসান্ত থিয়োসফিষ্ট নেতা হিসাবেই বিশেষ পরিচিত। তিনি যে তৎকালীন পাশ্চাত্য জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের অন্যতম বলিয়া পরিচিতা ছিলেন তাহা অনেকেই ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা শক্তি ছিল অসাধারণ। তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু বার্নার্ডশ তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, বেসান্ত ইংলণ্ডের এবং বোধহয় ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বক্তা।

ইংলণ্ডের রাজনীতির সহিত অ্যানি বেসান্তের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে যতদিন হিন্দু মুসলমান, ও নরমপন্থী চরমপন্থীর বিরোধ থাকিবে ততদিন কংগ্রেসের দাবী ইংরেজ রাজনৈতিকেরা গ্রহণ করিবেন না। ফলে মিসেস বেসান্ত প্রথমেই মিলনের চেষ্টা করেন এবং জিন্নার সহায়তায় লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে নরমপন্থী চরমপন্থী এবং হিন্দু মুসলমানের ঐক্য স্থাপিত হয়। অবশ্য মিসেস বেসান্ত এবং জিন্না ভিন্ন অন্যান্য নেতারাও ইহাতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে মতিলাল নেহেরুর নাম উল্লেখযোগ্য। তিলকও হিন্দু মুসলমানের ঐক্য হওয়াতে আনন্দিত হন। গান্ধিজী এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু কোনো অংশ গ্রহণ করেন নাই।

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে হিন্দু মুসলমানের মিলনের যে চুক্তি হইয়াছিল তাহা আলোচনা করিয়া লাভ নাই। মুসলমানরা তাঁহাদের বৈশিষ্ট বজায় রাখিয়া হিন্দুদের সহিত সম্মিলিত ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিতে রাজি

২। *Source material for a History of the Freedom Movement in India, collected from Bombay Government Records*, Volume II, p. 73.

হইলেন, এবং হিন্দু নেতারা তাহাই মানিয়া লইলেন। এই চুক্তির অনেক ত্রুটি ছিল, কিন্তু ইহার পূর্বে বা পরে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ ইহা অপেক্ষা অধিকতর ঘনিষ্ঠ ভাবে নিজেদের কর্মপন্থা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে নাই বস্তুতঃ ১৯১২ হইতে বিলাফৎ পর্যন্ত সালটিকে হিন্দু মুসলমানের মিলনের যুগ বলা যাইতে পারে।

৪

খিলাফৎ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ আলোচনা করিতে হইলে একটু অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ইতিহাসের অবতারণা করিতে হয়।

দিল্লীর শাহ্ ওয়ালীউল্লাকে (১৭০৩-১৭৬২) ভারতীয় ইসলামের মধ্যযুগের ও আধুনিক যুগের অন্তর্বর্তী সেতু বলা হইয়াছে। তাঁহার পিতা আবদুর রহমান ছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বে রচিত প্রসিদ্ধ ফতোয়ান-ই আলমগিরির অন্যতম রচয়িতা। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যখন ক্রমে মুঘল-সাম্রাজ্য শিখ, মারাঠা ও জাঠেদের আক্রমণে ধ্বংস পাইতে বসিল, তখন ওয়ালীউল্লা ভারতে মুসলিম শক্তির পুনরভ্যুদয়ের জন্য প্রথম নাজিবউদ্দৌলা প্রভৃতিকে জিহাদের জন্য আহ্বান করেন; নিজাম, নাজিবউদ্দৌলা প্রভৃতি যখন মারাঠাদের দমন করিতে অসমর্থ হইলেন, তখন ওয়ালীউল্লা আহ্‌মদ শা আবদালিকে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আহ্বান করেন, কিন্তু এই আক্রমণের ফলে মুসলমানদের যেন কোনো ক্ষতি না হয়, সে বিষয়ে আবদালিকে বিশেষ সতর্ক করিয়া দেন। আবদালি যে ওয়ালীউল্লার নিমন্ত্রণ পাইয়াই ভারত আক্রমণ করেন, তাহা সত্য না হইলেও, ওয়ালীউল্লার সহানুভূতি যে আবদালিকে উৎসাহিত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

যথাক্রমে ওয়ালীউল্লা কুরান ফার্সিতে ও তাঁহার পুত্র শাহ্ রফিউদ্দিন কুরাণ উর্দুতে তর্জমা করেন। রামমোহন বেদান্ত সূত্র ইত্যাদি বাঙ্গলায় তর্জমা করিয়া হিন্দুদের যে উপকার করেন, ইহারা পিতাপুত্রে মুসলমানদেরও সেই উপকার করিয়া ছিলেন। ১৮০৩ সালে, দিল্লির পরাজয়ের পর, ইংরাজ দিল্লি অধিকার করিলে ওয়ালীউল্লার অপর পুত্র শাহ্ আবদুল আজিজ তাঁহার প্রখ্যাত ফতোয়া জারি করিয়া ঘোষণা করেন যে ভারতবর্ষকে আর দার-উল-ইসলাম বলা চলেনা। আবদুল আজিজ কেবল ফতোয়া দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু সক্রিয় ভাবে ইংরাজের বিরোধিতা করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বার্দ্ধক্যের জন্য অপারগ হন। সুতরাং তিনি তাঁহার মন্ত্রশিষ্য সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীকে ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য আমির আলি খাঁর নিকট পাঠাইয়া দেন। এই সৈয়দ আহমদই পরে ওয়াহাবী আন্দোলন আরম্ভ করেন।

ওয়াহাবী আন্দোলনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম রাজশক্তির পুনরভ্যুদয়। সুতরাং ওয়াহাবীরা হিন্দুদের সাহায্য লাভের বিশেষ কোনো চেষ্টা করে নাই। ১৮৩১ সালে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী বালাকোট যুদ্ধক্ষেত্রে হত হন এবং ক্রমে ক্রমে ওয়াহাবী আন্দোলনের শক্তি হ্রাস পায়। কিন্তু মনে হয় যে সিপাহি বিদ্রোহে তাহাদের প্রেরণা বিশেষ কার্যকারী হয়। সিপাহী বিদ্রোহের মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন 'আলিম'[৩] দিল্লীর আলিমগণই ইংরাজ বিতাড়নের ফতোয়া জারি করেন। ইহাদের মধ্যে শাহ্ আবদুল আজিজের দৌহিত্র 'আল্লামাহ্ ফজ্‌ল-ই-হক্ খয়রাবাদী (মৃ ১৮৬১ খ্রীঃ) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বস্তুতঃ সিপাহি বিদ্রোহের সহিত যে সকল আলিম সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদেরই চেষ্টায় উত্তর প্রদেশের সাহারণপুর জেলায় দিল্লী হইতে ৭০ মাইল দূরে দেওবন্দ শহরে ১৮৬৭ সালে দার-উল-উলুম (বিদ্যালয়[৪]) প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩। 'আলিম' শব্দের অর্থ 'পণ্ডিত', বহুবচনে 'উলেমা'।

৪। 'ইল্‌ম্' শব্দের অর্থ 'বিদ্যা', বহুবচনে 'উলুম'; 'দার'

বিদ্রোহে পরাজিত হওয়ায় এই প্রতিষ্ঠানটির আরম্ভ, সুতরাং প্রথম হইতেই যে ইহা অত্যন্ত ইংরেজ বিরোধী ছিল তাহা সহজ বোধ্য।

স্যার উল-উলুমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা মুহম্মদ কাসিম নানবতবী সিপাই বিদ্রোহে শামলীর যুদ্ধে লড়াই করিয়াছিলেন। অস্ত্রের সাহায্যে ইংরাজ বিতাড়নে অসমর্থ হইয়া তিনি শাস্ত্রের সাহায্য লইলেও, উদ্দেশ্যের পরিবর্তন হইল না।

এই সময়েই স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের ইংরাজদের সহিত মিলিত করিবার জন্য সচেষ্ট হন এবং এই উদ্দেশ্যে ১৮৭৫ সালে আলিগড়ে একটী স্কুল স্থাপনা করেন। তিনবৎসর পরে এই স্কুল কলেজে, এবং ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

প্রথম হইতেই দেওবন্দ ও আলিগড়ের মধ্যে আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থায় বিরোধিতা দেখা দেয়। যে সময়ে স্যার সৈয়দ মুসলমানদের কংগ্রেসের বিরোধিতা করিতে বলিতেছিলেন, সেই সময়ে দার-উল-উলুমের প্রধানাচার্য্য বিখ্যাত শেখ-উল-হিন্দ্ মৌলানা মাহ্‌মুদ হসন* দেওবন্দী মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদান করিতে বলেন। ১৯০৭ সালে উত্তর প্রদেশে দেবনাগরী লিপিতে হিন্দি ভাষাকে সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করার ফলে আলিগড়ে ছাত্র সমাজে ভীষণ চাঞ্চল্য দেখা দেয়, এবং সেই সুযোগে শেখ-উল-হিন্দ্, দেওবন্দ ও আলিগড়ের সম্পর্ক কিছুটা ঘনিষ্ঠতাপূর্ণ করেন। অপরপক্ষে তিনি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও মৌলনা মহম্মদ আলির সহিত বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত করেন, এবং তাঁহার জীবনীলেখকের মতে হিন্দু সশস্ত্র বিদ্রোহীদের সহিতও সম্পর্ক স্থাপন করেন।

প্রথম হইতেই দেওবন্দ ও আলিগড়ের আর এক বিষয়ে মতানৈক্য দেখা যায়: দেওবন্দের কর্তৃপক্ষ তুরস্কের খলিফাকে মুসলিম জগতের অধিপতি বলিয়া জানিতেন, কিন্তু স্যার সৈয়দ এই মতের তীব্র প্রতিবাদ করেন। বস্তুতঃ ভারতীয় মুসলমানের পক্ষে তুরস্কের খলিফাকে মানিয়া নিবার মূলে কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি বা শাস্ত্রীয় বিধি নাই। এক সময়ে মারাঠা শক্তির নিকটে পরাজিত হইয়া শাহ ওয়ালী উল্লা আবদালিকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, এখন ইংরাজ বিতাড়নে ব্যর্থকাম হইয়াই হয়ত তাঁহারা মুসলমান জগতে একমাত্র শক্তি তুরস্কের সহিত নিজেদের একাত্মতা বোধ করিয়া কিছুটা শান্তি পাইয়া থাকিবেন। তাঁহাদের আস্ফালনে তুরস্ক ভারত আক্রমণ করিবে, এই রকম আশাও ছিল, তুরস্ক ভিন্ন অন্য কোন প্রথম শ্রেণীর মুসলিম শক্তি সেই সময়ে ছিল না।[৬]

শব্দের অর্থ 'আলয়' সুতরাং বাঙ্গলায় দার-উল-উলুমকে 'বিদ্যালয়' বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দার-উল-উলুমের অর্থ অতি ব্যাপক, এবং ইহাকে বিশ্ববিদ্যালয় বা মহাবিহার বলাই সঙ্গত। প্রায় প্রথম হইতেই দার-উল-উলুম বিদেশী মুসলমান জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ও বিদেশী ছাত্ররা এখানে পড়িতে আসে। ইহা গৌরবের বিষয়। দ্বিতীয়তঃ দার-উল-উলুম, ফরিঙ্গি মহল প্রভৃতি সুপরিচিত প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ইসলামের শাস্ত্রচর্চার প্রাচীন ধারা এখনও অব্যাহত আছে; হিন্দুরা এইরূপ প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে পারেন নাই, ফলে হিন্দু শাস্ত্র এখন বিদেশী পণ্ডিতদের মতানুসারেই হইয়া থাকে, এবং হিন্দুশাস্ত্রের অতি কদর্য্য ব্যাখ্যা হইলেও তাহার প্রতিবাদ হয় না।

৫। মাহ্‌মুদ হসন শেখ-উল-হিন্দ নামেই পরিচিত। মধ্যযুগে সুফী আচার্যদের 'শেখ' বলা হইত। মাহ্‌মুদ হসনকে প্রায় সেই অর্থেই, শেখ-উল-হিন্দ, অর্থাৎ হিন্দুস্থানের আচার্য বলা হয়।
মধ্যযুগে খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে তুরস্ক ভীষণ ভাবে লড়াই করিয়াছে; ১৬শ শতাব্দীতে যখন পর্তুগীজগণ ভারতে

সেখ-উল-হিন্দ্ সেই আশায় ১৯১৬ সালে তুরস্কে যান। সেখান হইতে তিনি তাঁহার শিষ্য ওবেদুল্লা সিন্ধিকে যে চিঠি লিখিতেন, তাহাই রাওলাট রিপোর্টে 'সিল্ক লেটার কন্‌স্‌পিরেসি' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তুরস্ক-নেতারা সেখ-উল-হিন্দকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলে তিনি ভারতের অভিমুখে যাত্রা করেন, কিন্তু মধ্যপথে মক্কায় তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী আরবগণ তাঁহাকে বন্দী করিয়া ইংরাজের হস্তে সমর্পণ করে, এবং তাঁহাকে মাল্টায় অন্তরীণ করা হয়।

সেখ-উল-হিন্দের ন্যায় বিদ্রোহী বীর নেতা কেবল মুসলমানদের মধ্যে নহে, হিন্দুদের মধ্যেও বিরল। কিন্তু তাঁহার ভাবধারায় কোনো নূতনত্ব ছিল না। বস্তুতঃ আওরঙ্গজেবের পারিষদ শাহ্ ওয়ালীউল্লা ও সেখ-উল-হিন্দের উদ্দেশ্যে মাত্রাগত পার্থক্য থাকিলেও মূলতঃ কোনো পার্থক্য ছিল বলিয়া মনে হয় না। উভয়েই চাহিয়া ছিলেন মুসলমান সমাজের পুনঃ প্রতিষ্ঠা; এই সমাজে মুসলমানদের কি স্থান দেওয়া যাইতে পারে, সে বিষয়ে শাহ্ ওয়ালীউল্লা ও আওরঙ্গজেবের মনোভাবে বিশেষ পার্থক্য থাকা সম্ভব নহে। সেখ-উল-হিন্দ হয়ত তাহাদের সহিত একমত ছিলেন না, কিন্তু দেশ স্বাধীন হইলে হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্য কোন্ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহা তিনি কখনও স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। তবে এ কথা নিঃসন্দেহ, যে ধর্ম নিরপেক্ষ সেকুলার রাষ্ট্রের কল্পনা তাঁহার সাধ্যাতীত ছিল। ভারতবর্ষে দার-উল-ইসলাম (ইসলামের নিকেতন) পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতেই দেওবন্দের দার-উল-উলুমের জন্ম—তাহার প্রধান আচার্য্য সেখ-উল-হিন্দ কখনও এই আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, এরূপ মনে করিবার সঙ্গত কারণ দেখিনা।

দার-উল-উলুমের কর্তৃপক্ষ সার সৈয়দ কর্তৃক প্রবর্তিত ইংরাজি শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। বিশেষতঃ আলিগড় কলেজের ধর্মশিক্ষা বিভাগ দেওবন্দের একজন মৌলানার দ্বারা পরিচালিত হইত। পরে শিবলি নুমানি আলিগড়ে আরবি ও পার্শীর অধ্যাপক হইয়া আসেন, এবং তাঁহার সহিত দার-উল-উলুমের মতের বিশেষ পার্থক্য ছিল না। সার সৈয়দের ইংরাজ প্রীতিই দার-উল-উলুমের সহিত মনোমালিন্যের কারণ। ইংরাজের অধিকৃত ভারতবর্ষকে দার-উল-উলুম অর্থাৎ শত্রুর অধিকৃত দেশ[1] বলিয়া মনে করিতেন ও তুরস্কের খলিফাকে মুসলিম জগতের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিতেন। গ্রীক-তুরস্ক যুদ্ধে (১৮৮১) যখন সার সৈয়দ ইংরাজের পক্ষে ও তুরস্কের বিরুদ্ধে লিখিতে আরম্ভ করেন তখন ভারতের শিক্ষিত মুসলমান সমাজে দুইটি ভাগ দেখা যায়, এক দল দার-উল-উলুমের পক্ষে অন্য দল সার সৈয়দের পক্ষে।

সার সৈয়দের মৃত্যুর (১৮৯৮) পর আলিগড় কলেজের মত ধীরে পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ করে; প্রথমতঃ শিবলি নুমানি ছাত্রদের মনে আলোড়ন জাগাইয়া দেন। তিনি রাজনীতিতে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে এবং কংগ্রেসের পক্ষে ছিলেন; দ্বিতীয়তঃ ইংরাজ শিক্ষকদের ব্যবহারে কলেজের ছাত্ররা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয় এবং একবার (১৯০৭) ধর্মঘট করে ইতিমধ্যে যতগুলি ইংরাজ-বিরোধী পত্রিকা প্রকাশিত

উপনিবেশ স্থাপন করিতে চেষ্টা করে, তখন তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য তুরস্ক তাহার এক নৌ-বাহিনী গুজরাতের সুলতানের সাহায্যার্থে পাঠায়। কিন্তু তাহারা পর্তুগীজদের কাছে পরাজিত হয়। বহু পার্শী ইতিহাসে এই যুদ্ধের কথা উল্লিখিত আছে, সুতরাং এই সকল ঘটনা মুসলমান পণ্ডিতদের ভাল ভাবেই জানা থাকিবার সম্ভাবনা।

১। এই অর্থে 'দার-উল-হরব' পদটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু দার-উল-হরবের প্রকৃত অর্থ "যে দেশে বর্তমানে যুদ্ধ না হইলেও, ভবিষ্যতে যুদ্ধ করিয়া দার-উল-ইসলামে পরিণত করিতে হইবে।"

হয়, তন্মধ্যে মৌলানা হসরৎ মোহানীর আলিগড় হইতে প্রকাশিত পত্রিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯১১ সনে মৌলানা মহম্মদ আলী কলিকাতা হইতে 'কমরেড' নামক ইংরাজি পত্রিকা ও পরবৎসর 'হমদরদ' নামে উর্দু পত্রিকা প্রকাশ করেন। ঐ বৎসর আবুল কালাম আজাদ, 'আল হিলাল' নামে উর্দু পত্রিকা প্রকাশ করিয়া উর্দু সংবাদপত্রের ইতিহাসে যুগান্তর আনয়ন করেন।

১৯১১ সালে ডঃ মোখতার আহম্মদ আনসারী (১৮৮০-১৯৩৬) তুরস্ক-ইটালি যুদ্ধে, তুরস্ককে সাহায্য করিবার জন্য একটি চিকিৎসা মিশন লইয়া তুরস্কে যান। এই মিশনে আনসারী ব্যতীত মাত্র পাঁচ ছয় জন লোক ছিলেন, তাঁহারা সকলেই আলিগড় কলেজের কিম্বা স্কুলের ছাত্র, তন্মধ্যে চৌধুরী খালিক উজ্জ-জমান ও সোয়াইব কুরেশী পরে সুপরিচিত হন। এই মিশনের ফল যতই অকিঞ্চিৎকর হউক না কেন, এখন হইতে আলিগড়ে ইংরাজের বিরোধী ও তুরস্কের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব বাড়িতে লাগিল। এবং প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে শিক্ষিত মুসলমান সমাজ একযোগে খিলাফৎ দাবী করেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে আরব দেশের মক্কা মদিনা প্রভৃতি তীর্থস্থান,[৮] তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধিকৃত ছিল। যুদ্ধের সময় স্বাধীনতার প্রলোভন দেখাইয়া ইংরাজেরা সহজেই অত্যাচারিত আরবদের তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাইতে সমর্থ হয়, এবং যুদ্ধান্তে, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আরব দেশকে তুরস্কের কবল হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীন সত্তা প্রদান করেন। ইহাতে ইংরাজেরা কোনো অন্যায় করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু ভারতীয় মুসলমানেরা ইহাতে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন এবং মক্কা মদিনা তুরস্ককে ফেরৎ দিতে হইবে এই মর্মে আন্দোলন করিতে আরম্ভ করেন।

মুসলমান নেতাদের আহ্বানে গান্ধিজী খিলাফতে যোগদান করেন, এবং অতি উৎসাহের সহিত উহার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। পরে কংগ্রেসও খিলাফৎ আন্দোলনে যোগ দেয়, কিন্তু মুসলিম লীগ খিলাফৎ আন্দোলনে যোগ দেয় নাই। কিন্তু গান্ধিজীকে খিলাফতে যোগদান করিতে বিশেষ ভাবে নিষেধ করিয়াছিলেন; তিনি বলিয়াছিলেন যে মুসলমানেরা স্বভাবতই ধর্মোন্মাদ; একবার তাহাদের ধর্মের নামে আন্দোলন করিতে শিখাইলে আর তাহাদের বাগ মানান যাইবে না। গান্ধিজী এই সদুপদেশ তো মানিলেনই না বরঞ্চ লিয়ার উপর বিরক্ত হইয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসদ্ব্যবহার করিলেন।

১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল জালিওয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর সিপাহ বেশান্ত তাঁহার জনপ্রিয়তা হারান ও ১১ মে তারিখে হোমরুল লীগের প্রেসিডেন্ট পদ ত্যাগ করেন। পরবর্তী ২৮শে এপ্রিল ১৯২০ জিন্নার একান্ত চেষ্টায় গান্ধিজী হোমরুল লীগের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হ'ন। ঐ বৎসর ৪ঠা-৯ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে, গান্ধিজী খিলাফৎ ও অসহযোগ প্রস্তাব দুইটি পাশ করাইয়া লন। কলিকাতা হইতে বম্বে ফিরিয়াই গান্ধিজী হোমরুল লীগ ধ্বংস করিতে তৎপর হইয়া উঠিলেন। তিনি প্রস্তাব করিলেন যে হোমরুল লীগের নাম বদলাইয়া স্বরাজ সভা রাখা হউক এবং এর আদর্শ পথও শাসনের পরিবর্তে পূর্ণ স্বাধীনতা করা হউক। এই প্রস্তাব দুইটি পাশ করাইতে

৮। ভারতীয় মুসলমানদের দাবী ছিল যে জজিরৎ-উল-আরব তুরস্ককে ফেরৎ দিতে হইবে। জাজিরৎ-অল-আরব বলিতে মেসোপটেমিয়া, আরব, সিরিয়া, এবং প্যালেস্টাইন বুঝায়। ভারতীয় মুসলমানরাও এই এলাকাই তুরস্ককে দিতে হইবে এই দাবী করেন, কিন্তু সাধারণতঃ বলিতেন যে তাহাদের দাবী অগ্রাহ্য হইলে মক্কা মদিনা অপবিত্র হইয়া যাইবে। মক্কা মদিনা তুরস্কের হাত হইতে হজরৎ মহম্মদের বংশীয় লোকদের হাতে গেলে কি ভাবে অপবিত্র হইবে, তাহা কেহ জিজ্ঞাসাও করে নাই, এবং মুসলমানরাও বলেন নাই।

হইলে দুই-তৃতীয়াংশ সভ্যের অনুমোদন পাওয়া আবশ্যক ছিল ; গান্ধিজীর প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পাইলেও দুই-তৃতীয়াংশ পাইল না। তখন গান্ধিজী প্রেসিডেন্টের বিশেষ ক্ষমতা বলে ঐ প্রস্তাব দুইটি পাশ হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ফলে জিন্না, জয়াকর, মুন্সি প্রভৃতি প্রায় কুড়ি জন সদস্য সভা পরিত্যাগ করেন। গান্ধিজীর বিপক্ষ দল বলেন যে জিন্না খিলাফৎ আন্দোলনের বিরোধিতা করায়, তাহার সমস্ত ক্ষমতা চূর্ণ করার জন্যই গান্ধিজী এই কর্ম করেন। এই অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন বলা যায় না।

১৯২০ ডিসেম্বর নাগপুর কংগ্রেসে পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য, জিন্না ও খাপার্দে অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতে উঠিলে চিৎকার করিয়া তাহাদের বক্তৃতা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, ফলে জিন্না কংগ্রেস ত্যাগ করেন এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ হইয়া পড়েন। মুসলিম লীগের সহিত তাঁহার সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়। কিন্তু এই সময়ে মুসলিম লীগও তেমন শক্তিশালী ছিল না।

জেল হইতে মুক্তি পাইয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস স্বরাজ্য পার্টি আরম্ভ করিবার পূর্বে বম্বে আসেন (জানুয়ারী, ১৯২৩)। ভূতপূর্ব হোম রুল লীগের সদস্যদের স্বরাজ্য পার্টিতে যোগদান করানোই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। দেশবন্ধু, জিন্না, জয়াকর, রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, সত্যমূর্তি, ও মুনজীর সহিত আলোচনা করেন। জিন্না প্রথমে দেশবন্ধুর সহিত যোগদান করিয়া কাজ করিতে রাজি হন, কিন্তু পরে যখন শুনিলেন যে দেশবন্ধুর নূতন পার্টির সহিত গান্ধিজীর সংস্রব থাকিবার সম্ভাবনা আছে, তখন তিনি জানাইলেন যে গান্ধিজীর সহিত কোনো সম্পর্ক রাখা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। এই সর্তে দেশবন্ধু রাজি না হওয়াতে, আলোচনা বিফল হয়।

এই সময়ে দেশবন্ধু হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্য, বাঙালী মুসলমানদের সহিত একটি চুক্তি করেন (১৫ই ডিসেম্বর, ১৯২৩)। লক্ষ্ণৌর চুক্তিতে মুসলমানেরা যে সুবিধা পাইয়াছিল, ইহাতে তাহা অপেক্ষাও তাহারা অধিক সুবিধা পায়, বিশেষতঃ একটি মানিয়া নেওয়া হয় যে, যে পর্যন্ত বাঙ্গলাদেশে মুসলমানেরা সরকারি চাকুরির শতকরা ৫৫টি পদ না পাইবেন, ততদিন পর্যন্ত নূতন নিয়োগের সময় হিন্দুদের মাত্র শতকরা কুড়িটি পদ দিয়া অবশিষ্ট পদ সর্বনিম্ন গুণ বিশিষ্ট মুসলমান দ্বারা পূরণ করাইতে হইবে। কিন্তু এই চুক্তির বিরুদ্ধে ভীষণ আন্দোলন হওয়ায় অবশেষে ইহা কার্যকরী হইতে পারে নাই। কিন্তু দেশবন্ধুর এই নিষ্ফল বদান্যতার ফল ভাল হয় নাই। দেশবন্ধুর স্বীকৃত সর্তগুলিকে মুসলমানেরা তাহাদের ন্যায্য দাবী মনে করিয়া, অতঃপর হিন্দুদের প্রতি অধিকতর বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া ওঠে। বাঙ্গলাদেশে যে আর হিন্দুমুসলমানের মিলন সম্ভব হয় নাই, তাহার অন্যতম কারণ এই ব্যর্থ বেঙ্গল প্যাক্ট। বোধহয় বেঙ্গল প্যাক্টের উপর ভিত্তি করিয়াই মুসলমানেরা তাহাদের দাবী বাড়াইতে লাগিলেন, কারণ দেখা যায় যে তাহাদের অন্যান্য দাবীর ফলে এই সময়কার সমস্ত আপোষের চেষ্টা ব্যর্থ হয়, এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট বাতিল হইয়া যায়।৯

গান্ধিজী যদি খিলাফতের মোহে আকৃষ্ট না হইয়া লক্ষ্ণৌ প্যাক্টের ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্য সংগঠিত করিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে বোধহয় হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক এত তিক্ত হইয়া দাঁড়াইত না। কামাল আতাতুর্ক খলিফাকে তুরস্ক হইতে বিতাড়িত করিতেই খিলাফৎ আন্দোলন শেষ হইল, এবং মুসলমানগণ গান্ধিজীর নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন ; মহম্মদ আলীও গান্ধিজীকে কুৎসিৎ ভাষায় গালি দিতে আরম্ভ করিলেন : গান্ধিজীর অপরাধ তিনি হিন্দু।

৯। ১৯০২ এবং ১৯০৩ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কৃষক শ্রেণীর স্বার্থের আনুকূল্যে সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথা রদ করিয়া অসাম্প্রদায়িক যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে প্রস্তাব পাস করেন। নানা কারণে কোনো ফল হয় নাই।

রহিয়া গেলেন ডাঃ আনসারী, আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি মুষ্টিমেয় নেতা ও একদল মৌলভী। ইহাদের মধ্যে আলিগড় গ্রুপ একেবারে ছিল না বলিলেই চলে।

এই সময়ে (মে ২২, ১৯২৫) জিন্না অন্যতরের নিকট এক নূতন পার্টি গঠনের প্রস্তাব করেন। জিন্না বলেন যে নিখিল ভারতীয় ঐক্য বর্তমানে অসম্ভব; সুতরাং বম্বেকে কেন্দ্র করিয়া একটী পার্টি গঠন করা যাউক; এই পার্টির উদ্দেশ্যের সহিত স্বরাজ্য পার্টি বা কংগ্রেসের একমাত্র পার্থক্য ছিল যে জিন্নার প্রস্তাবিত পার্টি জাতীয় স্বার্থের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া সরকারের সহিত সহযোগিতা অথবা অসহযোগিতা মূলক নীতি অবলম্বন করিতে পারিত। কিন্তু নানা কারণে জিন্নার প্রস্তাব কার্যকরী হয় নাই। অন্যতর বলেন যে স্বরাজ্য পার্টির সদস্যগণের বিরোধিতায় এই প্রস্তাব কার্যকরী হয় নাই। এই প্রস্তাব কার্যকরী হইলে ভবিষ্যৎ ইতিহাসের গতি কি হইত কে বলিতে পারে?

ইহার পর সাইমন কমিশন আসিল. গান্ধিজী সমগ্র আইন আন্দোলন আরম্ভ করিলেন, রাউণ্ড টেবিল বৈঠক হইয়া গেল, এবং র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা ঘোষণা করিলেন। গান্ধিজী উপবাস করিয়া হ'রজনদের সহিত একটা আপোষ মীমাংসা করিলেও, উক্ত বাটোয়ারাতে মুসলমানদের যে সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল তাহার সম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না। অবশেষে ১৭ই নভেম্বর ১৯৩৩ গান্ধিজী কারাগার হইতে মুক্তি পাইলেন। অতঃপর তিনি হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার দিবার জন্য সফর আরম্ভ করেন।

এই সময়ে, জহরলাল, সর্দার প্যাটেল, মৌলানা আজাদ রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ প্রথম শ্রেণীর নেতারা জেলে ছিলেন। অন্য কয়েকজন নেতা জেল হইতে খালাস পাইয়া, পুনরায় স্বরাজ্য পার্টি গঠন করিয়া আইন সভায় প্রবেশের কথা চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন। ইহাদের মধ্যে ডাঃ আনসারি, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, ভুলাভাই দেশাই, কানাহাইয়ালাল মুনসি, রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার ও সত্যমূর্তির নাম উল্লেখযোগ্য। কংগ্রেসের সম্মুখে স্থাপন করিবার মত কোনো কর্মপন্থা সৃষ্টি করিতে অক্ষম হইয়া গান্ধিজীও আইনসভায় প্রবেশের প্রস্তাবে সম্মত হ'ন। জানুয়ারী মাসেই কথাবার্তা শুরু হয়, ৩০ এপ্রিল, ১৯৩৪ রাঁচিতে মিটিং করিয়া পুনরায় স্বরাজ্য পার্টি গঠন করা হয়। পরে ইহার নাম বদলাইয়া কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টি রাখা হয়।

কংগ্রেস পুনরায় আইন সভায় যোগদান করিতে পারে, এই সংবাদ বোধ হয় জিন্না শুনিতে পান। যাহা হউক শ্রীমতি ১৯৩৪ জানুয়ারী মাসের কোনো এক সময় তিনি সরোজিনী নাইডু, ভুলাভাই দেশাই, নরিম্যান, মেহতা, গান্ধিজীর ভাগিনেয় মথুরা দাস ত্রিকম দাস, এবং মুনসীকে আহ্বান করেন। জিন্না তাহাদের বলেন যে "তোমরা সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা মানিয়া লও, তারপর সকলে মিলিত হইয়া White Paper এর বিরুদ্ধে প্রচার করিতে থাকি" এই দল দুইবার মাত্র জিন্নার সহিত মিলিত হন, দ্বিতীয় মিটিং-এ মুনসি ও মথুরা দাস জিন্নাকে বলেন যে তাঁহারা সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। ভুলাভাই এ মিটিং-এ ছিলেন না, পরে তাহাকে জানান হইলে তিনি মুনসি ও মথুরাদাসের মতের সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। এই ভাবে এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে মুনসি গান্ধীজীকে লিখিয়া জানান।[১০]

কিন্তু রাঁচির মিটিংএ গান্ধিজী সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারাকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। আনসারি, আসফ আলী প্রভৃতি মুসলমান সভ্যগণ তাঁহাকে পরিষ্কার বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারাকে সর্বতোভাবে

১০। গান্ধিজীকে লিখিত শ্রীযুক্ত মুনসির ২৭।১।৩৪ তারিখের অপ্রকাশিত চিঠি। মূল চিঠি গুজরাতি ভাষায় লেখা।

অগ্রাহ্য করিলে কংগ্রেসের পক্ষে একটি মুসলমানও নির্ব্বাচনে জিতিতেপারিবে না। ইহারই ফলে গান্ধিজী সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা সম্বন্ধে "না গ্রহণ না বর্জন" এই অদ্ভুত নীতির আধারে প্রশ্নটা এড়াইয়া যাইতে চেষ্টা করিলেন। ফল হইল যে কংগ্রেস প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা মানিয়া লইল, কিন্তু সরলভাবে মানিয়া নিলে মুসলমানগণের নিকট হইতে যে শ্রদ্ধা অর্জন করিতে পারিত, তাহা হইতে বঞ্চিত হইল। হিন্দুদেরও ক্ষোভের কারণ দূর করিতে পারিল না।

ইহার পর ১৯৩৭ সালে নূতন আইন অনুসারে প্রাদেশিক সভার নির্বাচন হইল। সমগ্র ভারতে মোট ৪৮৫ আসন মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল; ইহার মধ্যে কংগ্রেস ৫৮টি আসনে প্রতিযোগিতা করে, ও ২৬ আসনে জয়লাভ করে। মুসলিম লীগ সর্বত্র ১০৮ আসনে জয়লাভ করে।

প্রথমে কংগ্রেস মন্ত্রীসভায় যোগদান করিতে সম্মত হয় নাই। ইহার বিষময় ফল বাঙ্গালাদেশকে ভোগ করিতে হইয়াছে। বাঙ্গলার আইন সভার মোট আসনের সংখ্যা ছিল ২১০; নির্ব্বাচিত সদস্যগণ নিম্নলিখিত ভাবে পার্টিতে বিভক্ত ছিলেন: কংগ্রেস ৬০; স্বতন্ত্র মুসলমান ৩১ মুসলিম লীগ ৪০; কৃষক প্রজা পার্টি ৩৫; ইংরাজ ২৫; সতন্ত্র তপশীলী হিন্দু ২৩; স্বতন্ত্র বর্ণ হিন্দু ১৪; সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সদস্য ১২।

এই অবস্থায় কংগ্রেস কৃষক-প্রজা-পার্টির সহযোগিতায় অচ্ছন্দে মন্ত্রীসভা গঠন করিতে পারিতেন। কৃষক-প্রজা-পার্টির নেতা ফজলুল হক, বাংলার কংগ্রেস নেতা শরৎ চন্দ্র বসুকে অনুরোধও করিলেন; শরৎ বসুরও মত ছিল; কিন্তু মৌলানা আজাদ কিছুতেই রাজি হইলেন না। আজাদ তখন কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ডের সভাপতি, এবং বাঙ্গলা দেশের নির্ব্বাচনের ভার তাঁহার উপরেই ন্যস্ত ছিল। তাঁহার নির্দেশের ফলে ফজলুল হক, মুসলিম লীগের সহিত মিলিত হইয়া মন্ত্রী সভা গঠন করিলেন, এবং বাঙ্গলা দেশ মুসলিম লীগের হাতে চলিয়া গেল।

অন্যান্য প্রদেশেও আজাদ কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠনের যে নীতি অবলম্বন করিলেন, তাহাতে তাঁহারা খুব সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই। ইহার মধ্যে উত্তর প্রদেশ এবং বম্বের মন্ত্রীসভা গঠন বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

উত্তর প্রদেশে মুসলমানগণ সংখ্যালঘু হইলেও তাহাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার হার অত্যন্ত বেশী থাকায় চিরকালই তাহারা এই প্রদেশের রাজনীতিতে সংখ্যার অনুপাতে অনেক অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করিয়াছে। ইহার উপর দেওবন্দের দার-উল-উলুম, লক্ষ্ণৌ এর দরস-ই-নিজামিয়া[১১] (ফরিঙ্গি মহল) ও আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়, মুসলমানদের এই তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উত্তর প্রদেশে অবস্থিত হওয়ায়, উত্তর প্রদেশের মুসলমানগণ সমগ্রভারতের মুসলমানদের চিন্তাধারাকে বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত করেন। খিলাফৎ আন্দোলনেও উত্তর প্রদেশের মুসলমানগণ বিশেষভাবে অগ্রণী হইয়া আসেন, ও কংগ্রেসের অনেক নেতাদের সহিত ব্যক্তিগতভাবে সুপরিচিত হ'ন।

উত্তর প্রদেশের মুসলমানদের ৬৬ আসনের মধ্যে কংগ্রেস ১টী ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করেন ও ৯টী ক্ষেত্রেই পরাজিত হন। পরে রফি-উদ্দিন-কিদোয়াই এক উপনির্বাচনে জেতেন, তাহার কারণ মুসলিম লীগ তাঁহার বিরুদ্ধে প্রার্থী দাঁড় করায় নাই। মুসলিম লীগ মাত্র ২৭টী আসনে জয়লাভ করেন।

১১। দরস্-ই নিজামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মুল্লা নিজামুদ্দিনকে (মৃ ১৭৪৮ খৃঃ) সম্রাট আওরঙ্গজেব ফরিঙ্গীমহল নামে বাসভবনটি উপহার দেন। তাহা হইতে এই প্রতিষ্ঠানটি ফরিঙ্গি মহল নামে পরিচিত হয়। দার-উল-উলুমের শিক্ষা পদ্ধতি দরস্-ই-নিজামিয়ার অনুকরণে প্রস্তুত হয়।

জিন্না ও মুসলিম লীগ আশা করিয়াছিলেন যে তাঁহারা কংগ্রেসের সহিত একমত হইলে, পরে একত্র মন্ত্রীসভা গঠন করিতে সক্ষম হইবেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারের অনুরূপ ইস্তাহার গ্রহণ করেন; ফলে উত্তর প্রদেশের ধনী তালুকদারদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে গিয়াই উত্তর প্রদেশে মুসলিম লীগ যথাযোগ্য সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই।

মন্ত্রীসভা গঠনের সময় আলিগে উত্তরপ্রদেশ মুসলিম লীগের নেতা চৌধুরী খালিক-উজ্জ-জমান কংগ্রেসের সঙ্গে এক রকম রাজি হইয়া ছয়জনের মন্ত্রীসভায় দুইটি মন্ত্রী লীগের নির্বাচিত সদস্য হইবে এই দাবি করিলেন। কংগ্রেস কতগুলি পাল্টাদাবী করিল। আলোচনা অনেকদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়।

এই আলোচনার ইতিহাস অতি জটিল, সুতরাং বর্তমান প্রবন্ধে তাহার আলোচনা সম্ভব নহে। মৌলানা আজাদ তাঁহার গ্রন্থে এই আলোচনা ব্যর্থ করিবার জন্য জহরলালকে সম্পূর্ণ দায়ী করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে জহরলাল একটি চিঠিতে খালিক-উজ্জ জমানকে জানান যে মন্ত্রীসভায় মুসলিম লীগ হইতে একজনের বেশী মন্ত্রী লওয়া হইবে না। মৌলানার গ্রন্থে বহু ভুল আছে, ইহা তাহার অন্যতম বলিয়া মনে হয়। খালিক-উজ্জ-জমান তাঁহার গ্রন্থে সমস্ত দোষ মৌলানার উপর ন্যস্ত করিয়াছেন,[১২] এবং পণ্ডিতজীর বহুচিঠি প্রকাশিত করিলেও, মৌলানা-উল্লিখিত পণ্ডিতজীর উক্ত চিঠি প্রকাশিত করেন নাই। কারণ পণ্ডিতজী ঐ প্রকার চিঠি লেখেন নাই। মৌলানা দাবী করেন যে আইন সভায় মুসলিম লীগ পার্টি তাহার সত্তা বিসর্জন দিয়া কংগ্রেসের সহিত মিলিত হউক। খালিক উজ্জ-জমান ইহাতে রাজি হন নাই। ইহাই আপোষ না হইবার প্রধান কারণ, অবশ্য অন্য কারণও ছিল।

এই বিষয়ে পণ্ডিত নেহেরুর সহিত দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ প্রবন্ধলেখকের একবার হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন যে মৌলানার উক্তি অতিশয় অতিরঞ্জিত এবং উত্তর প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠনের দায়িত্ব ছিল চারিজনের: তাঁহার, মৌলানার, গোবিন্দবল্লভ পন্থের এবং পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডনের।

এই সময়ে মৌলানা আজাদের পরামর্শে উত্তরপ্রদেশের আলিগণ মুসলিম লীগ ত্যাগ করিয়া কংগ্রেসে যোগদান করেন। হয়ত আজাদ আশা করিয়াছিলেন যে মুসলিম লীগের একেবারে উচ্ছেদ সাধন করিয়া তিনিই ভারতীয় মুসলমানদের একচ্ছত্র নেতা হইবেন।

বম্বেতে মন্ত্রীসভা গঠনের ধারা কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকারের হইয়াছিল। এখানে কংগ্রেস একটিও মুসলমান সভ্য নির্বাচিত করাইতে পারে নাই। মন্ত্রীসভা গঠনের অনেক আগেই সকলে জানিত যে বম্বে মন্ত্রী সভা গঠনে মুনসি এবং খেরের বিশেষ হাত থাকিবে। একদিন হাইকোর্টে জিন্না মুনসিকে বলেন "মুনসি, ইলেকশনত জেতা গেল, এইবার ক্যাবিনেট ঠিক করা যাক।" মুনসি এই প্রস্তাব গান্ধিজীকে জানান, এবং তৎসহ ইহাও লেখেন যে জিন্নার প্রস্তাব গ্রহণ করিলে মহা অনর্থ হইবে। ইহার পর জিন্না আর নিজে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন নাই, তাঁহার পরিবর্তে সার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর সর্দার প্যাটেল এবং আজাদের সহিত মুসলিম লীগের পক্ষ হইয়া আলোচনা করেন। এখানেও মুসলিম লীগ দুইটি মন্ত্রীত্ব চায়, কিন্তু আজাদ এবং সর্দার একটির বেশী দিতে রাজি না হওয়ায় আলোচনা ব্যর্থ হয়।[১৩]

১২। A. K. Azad. *India Wins Freedom*, pp. 160-61। Choudhrey Khaliquzzaman, *Pathway to Pakistan*, pp. 160-66.

১৩। এই ঘটনা শ্রীযুক্ত মুনসি আমাকে যে রকম বলিয়াছেন তাহাই লিখিলাম। শ্রীযুক্ত কানজি দ্বারকাদাস

ইহার পর জিন্না আর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কংগ্রেস নেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। এখন হইতে তাঁহার প্রচ্ছন্ন অভিমান উগ্র সাম্প্রদায়িকতার রূপ ধারণ করে। তাঁহার বিশ্বাস হয় যে কংগ্রেস যে কোন উপায়ে লীগকে ধ্বংস করিতে উদ্যত, সুতরাং তিনি তাঁহার অতীত সংস্কার মুছিয়া ফেলিয়া কংগ্রেস তথা হিন্দুদের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করেন, এবং অল্পকালের মধ্যেই আশাতিরিক্ত সাফল্য লাভ করেন। এই সাফল্য লাভের জন্য তিনি সত্যাসত্য ও হিতাহিত জ্ঞান পরিত্যাগ করেন, এবং বিনা দ্বিধায় পিরপুর রিপোর্টের ন্যায় মিথ্যা রিপোর্টের ভিত্তিতে কংগ্রেসকে মুসলমান উৎপীড়ক বলিয়া অভিযুক্ত করেন।

ইহার পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। কংগ্রেস মন্ত্রীসভা ত্যাগ করিবার পরেই ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো গান্ধিজী, রাজেন্দ্র প্রসাদ ও জিন্নাকে একটি সম্মিলিত বৈঠকে আহ্বান করেন (১৭ই নভেম্বর, ১৯৩৯) এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভা গঠনের পূর্বে সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর আবশ্যকতার কথা বলেন। যদি লীগ এবং কংগ্রেস নিজেদের বিরোধ মীমাংসা করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের মনোনীত প্রার্থীদের লইয়া ভাইসরয়ের Executive Council গঠনের প্রস্তাবও লিনলিথগো করেন কিন্তু গান্ধিজী ও রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন যে ইংলণ্ড তাহার যুদ্ধের উদ্দেশ্য—অর্থাৎ যুদ্ধের পর ভারতকে স্বাধীনতা দিবে—খুলিয়া না বলিলে তাঁহারা ভাইসরয়ের কাউন্সিল পুনর্গঠনের আলোচনায় যোগদান করিতে অসমর্থ। পরদিন ভাইসরয় তাঁহার প্রস্তাব লিখিয়া গান্ধিজীর নিকট পাঠান, এবং তাঁহারই পরামর্শানুসারে জিন্না গান্ধিজী ও রাজেন্দ্রপ্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। গান্ধিজী জিন্নাকে বলিলেন যে ইংলণ্ড যুদ্ধের উদ্দেশ্য পরিষ্কার করিয়া না বলিলে তিনি কোনো আলোচনা করিতে পারেন না। ফলে জিন্না চলিয়া আসেন।

এই সমস্তকার ঘটনা পর্যালোচনা করিলে মনে হয় যে এইবার গান্ধিজী অবিভক্ত ভারত অক্ষুণ্ণ রাখিবার শেষ সুযোগ হারাইলেন। তবে তাঁহার পক্ষ হইতে স্বীকার করিতে হয় যে জিন্নার সহিত মীমাংসা করিতে হইলে ভাইসরয়ের Executive Council এ কংগ্রেসের যোগদান করিতে হইত। সেই-সময়ে কংগ্রেসের পক্ষে তাহা করা যাইত কিনা, এবং করা উচিত ছিল কিনা তাহা বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করা সম্ভব নহে। কিন্তু এ কথা বলা যাইতে পারে, যে কংগ্রেস সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিহীন, ইহাই প্রমাণ করিতে ব্যস্ত ছিল, সাম্প্রদায়িকতা দমন করিবার ক্ষমতা ছিল না।' সে

লিখিয়াছেন যে মন্ত্রীসভা গঠনের পূর্বে বম্বের প্রধান মন্ত্রী বালাসাহেব খের জিন্নার নিকট যাইয়া জিন্নাকে দুটি মুসলিম লীগ মন্ত্রী মনোনীত করিতে বলেন এবং জিন্না রাজী হন, পরে সর্দার প্যাটেলের বিরোধিতায় ইহা সম্ভব হয় নাই। (Kanji Dwarkadas, *India's Fight for Freedom* p. 466. মুনসি বলেন যে কানজির বর্ণনা সম্পূর্ণ ভুল। এই সময় তিনি এবং খের একযোগে মন্ত্রীসভা গঠন করিতেছিলেন, তাঁহাকে না জানাইয়া খের কোন কাজই করিতেন না। দ্বিতীয়তঃ পুণায় তাঁহার বাড়ীতেই সর্দার প্যাটেল ও মৌলানা আজাদ সার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীরের সহিত বার্তালাপ করেন। নানা কারণে কানজীর কথা সত্য বলিয়া মনে হয় না। খের প্রভৃতি সকলেই সর্দার প্যাটেলকে অত্যন্ত ভয় করিতেন, এবং তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়াই জিন্নাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। এখানে একটা কথা বলা উচিত মনে করি। মুনসি ও খেরের রাজনৈতিক হাতেখড়ি জিন্নার নিকট। কানজি লিখিয়াছেন যে এক সময়ে বম্বে শহরে দুইটি রাজনৈতিক আড্ডা ছিল, একটি তিলকের সর্দার গৃহে, অপরটি জিন্নার চেম্বারে। একথা মুনসিও স্বীকার করেন। কংগ্রেসের মন্ত্রীসভা গঠনের ফলে জিন্নার প্রতিপত্তি নষ্ট হইয়া যায়।

চেষ্টাও করে নাই। মুসলিম লীগের প্রতিপত্তি নষ্ট করিবার একটি উপায় ছিল, পাঞ্জাবে ইউনিয়নিষ্ট দলের নেতা সার সিকন্দর হায়াত খানের সহিত মৈত্রী স্থাপনা করা: তাহাতেও কংগ্রেস বরাবর ঔদাসীন্য দেখাইয়া আসিয়াছে। কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক আদর্শ ছিল মহৎ, কিন্তু তাহা কার্যকরী করিবার জন্য যে দূরদর্শিতা ও তৎপরতার প্রয়োজন তাহার অভাব ছিল বলিয়াই মনে হয়। এই সময়ে কংগ্রেসে কত মুসলমান সভ্য ছিল তাহা জানা যায় না, তবে ১৫ মে, ১৯৪১ তারিখে মুনশিকে লিখিত মহাদেব দেশাইর পত্র হইতে জানা যায় যে সেই সময়ে কংগ্রেসে তিন লক্ষ সদস্যের মধ্যে দেড় লক্ষ মুসলমান[১৪] ছিল, অর্থাৎ শতকরা ৫, অথচ ভারতবর্ষে তখন হিন্দুর তুলনায় মুসলমানের সংখ্যা ছিল প্রায় শতকরা ৩০। সুতরাং মহাদেব দেশাইর প্রদত্ত সংখ্যা সত্য মানিয়া নিলে বোঝা যায় যে কংগ্রেসে যত মুসলমান সভ্য হওয়া উচিত ছিল, তাহার এক ষষ্ঠাংশ মাত্রযোগদান করিয়াছিল। এই অবস্থাতেও কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ নির্বিকার রহিয়াছেন, জিন্না, সিকন্দর বা ইংরাজ সকলের প্রতিই সমান ঔদাসীন্য ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করিয়াছেন, বোধ হয় তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে "ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম" মহামন্ত্র জপ করিলেই হিন্দু-মুসলমান এক হইয়া যাইবে।

৪

১৯৪০ মার্চ মাসের শেষে (২২-২৪) মুসলিম লীগ লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কংগ্রেসের নেতাগণ অবশ্যই এই প্রস্তাবের নিন্দা করেন, কিন্তু তখন তাঁহারা স্বাধীনতা লাভের উপায় চিন্তা করিতেছিলেন, দেশভাগের কথা চিন্তা করিবার বিশেষ অবকাশ ছিল না। যাহা হউক, ১৯৪২ মার্চ মাসে সার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ মিটমাট করিতে দিল্লি আসিলেন। তিনি ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া গেলে পর ওয়ার্কিং কমিটি প্রস্তাব পাস করিল (২ এপ্রিল ১৯৪২) তাহাতে প্রায় পাকিস্তান মানিয়া লওয়া হইল। ইহা ভিন্ন তখন হয়ত গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু রাজগোপালাচারী ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি প্রথমে মাদ্রাজ আইনসভার সদস্যদের দ্বারা পুনরায় মন্ত্রীসভা গঠন এবং মুসলীম লীগের দেশ বিভাগের প্রস্তাব পূর্ণভাবে সমর্থন করিয়া এক প্রস্তাব পাস করেন, এবং পরে এ. আই. সি. সির ২৯ শে এপ্রিল হইতে ২রা মের (১৯৪২) অধিবেশনে ঐ প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। বিপুল ভোটাধিক্যে রাজাজীর প্রস্তাব নামঞ্জুর হয়।

অবশেষে পাকিস্তানও হইলই, সুতরাং রাজাজী ঐ প্রস্তাব আনয়ন করিয়া দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, এ কথা অনেকে বলিয়া থাকেন। কিন্তু অধিক আগ্রহ দেখাইতে গিয়া রাজাজী অত্যন্ত ভুল করিয়াছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটির ২রা এপ্রিলের প্রস্তাব অনুযায়ী জিন্নার সহিত দেনা-পাওনার ভিত্তিতে কথা বলা যাইত, কিন্তু রাজাজীর প্রস্তাবে জিন্নার সমস্ত দাবী মানিয়া লইতে হইত; তাহার পরিবর্তে জিন্নার কিছু দিবার দায় ছিল না। দ্বিতীয়তঃ এ. আই. সি. সির অধিবেশনে পাকিস্তান সমর্থন করান যাইবে না, ইহা সহজেই বোঝা উচিত ছিল, এবং রাজাজী কাহারও সহিত পরামর্শ না করিয়াই প্রস্তাব পেশ করেন। ফলে এই প্রস্তাবও গৃহীত হইলই না, উপরন্তু জগৎ নারায়ণ লাল কর্তৃক আনীত পাল্টা প্রস্তাব পাস হইয়া গেল। পরে যখন গান্ধিজী জেল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া জিন্নার সহিত মীমাংসার চেষ্টা করেন, তখন জিন্না বারংবার জগৎ নারায়ণের প্রস্তাবের কথা তুলিয়া গান্ধিজীকে বিব্রত করেন। জিন্না কি প্রকৃতির লোক ও কি রকম বুদ্ধিমান সে সম্বন্ধে রাজাজীর কোন ধারণা ছিল বলিয়া মনে হয় না। জিন্না পাকিস্তান

১৪। মহাদেব দেশাই এ. আই. সি. সি. হইতে অনুসন্ধান করিয়া মুনশিকে পত্র লেখেন।

প্রস্তাবে মুসলমানদের স্বায়ত্তশাসন দাবী করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন এলাকায় তাহারা সংখ্যাগুরু তাহা কোনোদিনও পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই। ১৯৪২ সালে রাজাজীর প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া মন্ত্রীসভায় যোগ দিলে জিন্না সমগ্র পাঞ্জাব, বাঙলা ও আসাম পাকিস্তানে লইতেনই, তদুপরি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংযোগকারী একটি রাস্তা আদায় করিতে ছাড়িতেন না, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

১৯৪২-এর আন্দোলনে কংগ্রেসের নেতারা জেলে গেলেন। ইহার কিছুদিন পরে হিন্দু মহাসভা ইঙ্গ-ভারতীয় সম্মানজনক আপোষমীমাংসার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন; কমিটির সভাপতি ছিলেন ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। মুনসি এই সময়ে কংগ্রেস পরিত্যাগ করিয়া পাকিস্তানের বিরুদ্ধে "অখণ্ড হিন্দুস্তান" দল গঠনের চেষ্টা করিতেছিলেন। মুনসির সহিত এই সময়ে হিন্দু মহাসভার ঘনিষ্ঠ যোগ হয়, এবং তিনি বলেন যে শ্যামাপ্রসাদ জিন্নার সহিত নিষ্পত্তির সূত্র খুঁজিতে ছিলেন। বোধহয় এই সময়েই শ্যামাপ্রসাদ মুনসিকে জিন্নার দাবী জ্ঞাপক সর্তগুলি দেন[১৫]। অতঃপর শ্যামাপ্রসাদ অ-কংগ্রেসী নেতাদের এক বৈঠক আহ্বান করেন, তাহাতে সাভারকরের মতানুযায়ী এক প্রস্তাবে স্থির হয় যে জিন্নার সহিত আপোষের আলোচনা করা উচিত নহে।

জেলে থাকাকালীন গান্ধিজী যখন ২১ দিন অনশন ব্রত পালন করেন (ফেব্রুয়ারী ৭, ১৯৪৩ হইতে) তখন তাঁহার সহিত রাজাজী দেখা করিতে যান, ও জিন্নার সহিত মিলনের ভিত্তি হিসাবে কয়েকটি প্রস্তাব গান্ধিজীর নিকট উপস্থিত করেন, এবং পরে গান্ধিজী অনুরোধ করিলে লিখিয়া দেন। পরে রাজাজী নিজেই ঐ প্রস্তাবের ভিত্তিতে জিন্নার সহিত কথা বলিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু জিন্না ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। গান্ধিজী জেল হইতে বাহির হইয়া আবার ঐ প্রস্তাবের ভিত্তিতে জিন্নার সহিত ১৮ দিন আলোচনা ও পত্র ব্যবহার করেন (৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪) ফল কিছুই হয় নাই।

ইহার পর কেন্দ্রীয় আইন সভায় কংগ্রেস পার্টির নেতা ভুলাভাই দেশাই মুসলিম লীগ পার্টির উপনেতা লিয়াকৎ আলীর সহিত আপোষের চেষ্টা করেন। কিন্তু জিন্না ও লিয়াকৎ আলীর ধল কূটনৈতিক ব্যবহারের জন্য এ প্রচেষ্টা বিফল হয়। বস্তুতঃ জিন্না এখন বেশ বুঝিয়াছিলেন যে কংগ্রেসের সহিত রাজনৈতিক যুদ্ধে তাঁহার কূটনীতি জয়লাভ করিয়াছে, এখন কংগ্রেস তথা হিন্দুদের যথা সম্ভব ধর্ষণ করিয়া প্রাপ্য আদায় করিয়া লইতে হইবে, তাহাদের সহিত বন্ধুত্বের কোনো প্রয়োজন নাই।

এই মনোভাব লইয়া পাকিস্তানের জন্ম এবং ইহাই তাহার জীবনীশক্তি।

অবশ্য ক্যাবিনেট মিশন আসিতে জিন্না প্রথমে ১৬ই মে তারিখের প্ল্যান অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারে ও কনষ্টিটুয়েন্ট এসেম্বলিতে যোগদান করিতে রাজি হন, কিন্তু পরে জহরলালের একটি বক্তৃতার পরে সম্মতি প্রত্যাহার করেন ও এর পর প্রথমে কলিকাতায় পরে নোয়াখালিতে দাঙ্গা লাগে। জহরলালকে এই বক্তৃতার জন্য অনেকেই নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার উত্তরে অনেক কিছুই বলা যায়। যাহাহউক এই সকল দাঙ্গার পর দেশ-বিভাগ ছাড়া আর উপায় ছিলনা,

১৫। হিন্দুমহাসভার তৎকালীন সেক্রেটারী মহেশ্বর দয়াল পরে দাবী করেন যে জিন্না স্বয়ং এই সর্তগুলি প্রস্তুত করেন। Indian *Annual Register*, Vol II, pp. 60-1. মহেশ্বর দয়াল আরও বলেন এই যে সর্তগুলিই রাজাজি পরে গান্ধিজীকে দেখান, ও আরও পরে ইহারই ভিত্তিতে গান্ধিজী জিন্নার সহিত আলোচনা করেন। কিছুদিন পূর্বে রাজাজী মুনসীকে একপত্রে জানাইয়াছেন যে মহেশ্বর দয়ালের এই দাবী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

সুতরাং নেতাগণ তাপাল পদ্ধতি মেননের [১৬] প্ল্যান অনুযায়ী ভারত বিভাগ করিতে রাজি হইলেন। গান্ধিজী প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলেন, পরে তিনিও রাজি হইলেন।

১৯৪৬-৪৭ সালে দেশ বিভাগের বিবরণ অনেক গ্রন্থেই পাওয়া যায়, সুতরাং সে বিষয়ে সবিস্তারে লিখিবার কোন প্রয়োজন নাই। তবে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও মেনন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

মেনন চিরজীবন ইংরাজ সরকারের চাকরি করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে নেতা বলা যায় না। কিন্তু যে প্ল্যান অনুযায়ী ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়, তাহা সম্পূর্ণ মেননের সৃষ্টি। তাঁহার প্ল্যান অনুসারেই ভারতবর্ষ,—অর্থাৎ কংগ্রেসের নেতারা—কমনওয়েলথে থাকিতে রাজি হন। মেনন বলিতেন যে ইহার বিশেষ ফল হইয়াছিল। ভারত কমনওয়েলথে থাকিবে, ইহা জানিয়া ইংরাজ সরকারের সুর বদলাইয়া গেল এবং এযাবৎ মুসলিম লীগ যে সুবিধা পাইতেছিল তাহা বন্ধ হইয়া, সে সকল সুবিধা কংগ্রেস পাইতে লাগিল।

মেননের মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে তাঁহার সহিত অন্তরঙ্গ ভাবে মিশিবার সুযোগ হইয়াছিল। কয়েক বৎসর যাবৎ হাপানিতে ভুগিয়া তখন তাঁহাকে দেখিলে জীবন্ত কঙ্কাল মনে হইত। সমস্তদিন একটা ইজিচেয়ারে বসিয়া হাপাইতেন, রাত্রেও ওষুধ খাইয়া দু'এক ঘণ্টার বেশী ঘুমাইতে পারিতেন না। অথচ এই অবস্থায় আমার সহিত তিন সপ্তাহ কাল প্রত্যহ দুইতিন ঘণ্টা ব্যাপী নানা ঘটনার আলোচনা করিয়াছেন। কথা তিনিই বেশী বলিতেন, কারণ আমিত কেবল প্রশ্ন করিতাম। তাঁহার বী ও স্মরণশক্তি দেখিয়া বারবার মনে হইয়াছে, যে এই ব্যক্তির যখন কর্মশক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল, তখন ইনি না জানি কি অদ্ভুতকর্মা ছিলেন, আর ইংরাজ কি রকম লোক বাছিতে পারিত।

মেননের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ ঘটে নাই, অথচ তিনি কেরানীগিরিতে ঢুকিয়া ক্রমে প্রমোশন পাইয়া ভাইসরয়ের Reforms' Secretary হইয়াছিলেন; এইরকম অশিক্ষিত লোক এই পদে কিরূপে নিযুক্ত হইলেন তাহা কোনোদিনই বুঝিতে পারি নাই। ভাবিতাম নিশ্চয়ই ইংরাজদের খোসামোদ করিয়া ঐ পদ পাইয়া থাকিবেন। কিন্তু পরে পরিচিত হইয়া দেখিলাম অন্তত: আমার পরিচিত কোনো রাজনীতির অধ্যাপক নাই যিনি মেননের ধারে কাছে আসিতে পারেন।

রাজনীতি সম্বন্ধে তিনি যেরূপ গভীর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে সমভাবে সেরূপ সম্ভব হয় নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাঁহার যেরূপ প্রবেশাধিকার দেখিয়াছি, তাহাবোধহয় কংগ্রেসের কোনো নেতার ছিল না।

১৯৪৭ সালের ২২শে অক্টোবর পাকিস্তানী হানাদারেরা কাশ্মীর আক্রমণের দুইদিন পর মহারাজা ভারতসরকারের নিকট সাহায্যের জন্য ব্যাকুল হইয়া আবেদন করেন, লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারত সরকারকে বাধা দিয়া বলিলেন যে হঠাৎ কোনো কাজ করা উচিত নয়, পরিস্থিতি বিশেষ ভাবে জানা প্রয়োজন। সুতরাং মেননকে কাশ্মীরের অবস্থা দেখিতে ২৪শে অক্টোবর পাঠান হইল। এখানে বলা আবশ্যক যে মাউন্ট-ব্যাটেন মেননকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন। পরদিন মেনন ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন যে ভারতের তরফ হইতে সৈন্য পাঠাইয়া এই আক্রমণ বন্ধ করা উচিত। তখন মাউন্টব্যাটেন প্রশ্ন তুলিলেন যে মহারাজা ভারতবর্ষের সহিত যোগদান করেন নাই সুতরাং ভারত তাঁহাকে কি ভাবে সাহায্য করিতে পারে। মেনন তৎক্ষণাৎ এরোপ্লেনে আম্বু গিয়া দলিলে মহারাজের সহি লইয়া ফিরিয়া আসিলেন, তাহার পর ভারতীয় সৈন্য কাশ্মীরে যাইয়া পাকিস্তানিদের দূর করিয়া দেয়।

আমি একদিন মেননকে বলিয়াছিলাম যে আপনি যদি সে সময়ে ঐ সমস্ত না করিতেন, তবে পাকিস্থান হয়ত কাশ্মীর

১৬। ইনি ভি. পি. মেনন নামেই সুপরিচিত।

নিত. কিন্তু আমরা এত বিপদের হাত হইতেও বাঁচিয়া যাইতাম। কথাটা আমি পরিহাস করিয়াই বলিয়াছিলাম, কিন্তু মেনন একটু গম্ভীর হইয়াছে বলিলেন : "আমি যখন শ্রীনগর পৌঁছিলাম, তখন বারবার এই কথাটা মনে হইতে লাগিল যে বারবার মুসলমানেরা উত্তর পশ্চিম হইতেই ভারত আক্রমণ করিয়াছে। আজ আমরা স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গেই যদি পাকিস্তান কাশ্মীর জয় করে, তবে অতঃপর যে তাহারা পাঞ্জাব জয় করিবেনা তাহা কে বলিতে পারে। দিল্লী ফিরিবার সময় এরোড্রোমে একটি ভদ্র মহিলা তাঁহার দুইটি কন্যাকে লইয়া আসিয়া আমাকে কাতর অনুরোধ জানান যেন আমি তাঁহার কন্যা দুটিকে দিল্লী লইয়া যাই, পাঠানেরা আসিলে তাঁহার অদৃষ্টে যা আছে তাহা হউক, কিন্তু মেয়ে দুইটি যেন রক্ষা পায়। দিল্লী ফিরিবার সময় এই কথা মনে হইতে লাগিল যে সুলতান মাহমুদের সময় হইতে যতবার দেশে মুসলমান আক্রমণ হইয়াছে তত বারই'ত হিন্দু মেয়েদের এই অবস্থা হইয়াছে। আমি স্থির করিলাম যে, যে প্রকারেই হউক কাশ্মীরে পাকিস্তানকে বাধা দিতেই হইবে।"

মেননকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে কাশ্মীর সমস্যা ইউ, এন ওতে গেল কেন। মেনন বলিয়াছিলেন যে ইহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী ছিলেন পণ্ডিত নেহেরু। ইউ. এন, ওতে বিষয়টি পাঠাইবার প্রায় পূর্বমুহূর্তে শেষ চেষ্টা করিবার জন্য মেনন ও সার গিরিজাশঙ্কর বাজপায়ী (Secretary-General External Affairs Ministry) একত্র হইয়া পণ্ডিতজীর সঙ্গে দেখা করিয়া তাহাদের আপত্তি জানান, ও নানা যুক্তি তর্কদ্বারা পণ্ডিতজীকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে ইউ, এন, ওতে গেলে মহা অনর্থের সম্ভাবনা। পণ্ডিতজী কিছুতেই তাহাদের কথা শুনিলেন না, অবশেষে গিরিজা শঙ্কর কাঁদিয়া ফেলিয়া ছিলেন (burst into tears)। কিন্তু পণ্ডিতজীর মত বদলাইল না।

মেনন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করেন নাই। কিন্তু স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি যে উচ্চ রাজকর্মচারীর পদ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা তিনি দেশের সেবাধিকার পাওয়া বলিয়াই গণ্য করিতেন। স্বাধীন ভারত সরকারের নিকট হইতে তিনি কোনো প্রকার সম্মান পান নাই, তাঁহার দেশবাসীগণ কোনোদিনই তাঁহাকে বিশেষ চিনিত না, এখন প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছে। কিন্তু স্বাধীনতা ও দেশবিভাগের সন্ধিক্ষণে যদি মেনন Reforms Secretary না থাকিতেন, তাহা হইলে আমাদের অবস্থা কি হইত তাহা বলা কঠিন। অকৃতজ্ঞতার দায় হইতে মুক্ত হইবার জন্য মেননের স্মৃতিকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করা দেশবাসীর কর্তব্য।

হেগেলীয় দর্শন

অনিল রায়

(৯) বিনশন বা বিলুপ্তি (Negation)

আমরা বিরোধ (contradiction) সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে যে সব কথা বলেছি সে সব কথাই বিনশন (negation) সম্বন্ধে খাটবে। যে সব ত্রুটি বিরোধ-তত্ত্বে রয়েছে, বিনশন (negation) বস্তুটিও সেই সব ত্রুটি দ্বারা দুষ্ট। এর কারণ হোলো এই যে হেগেলীয় বিরোধ-তত্ত্ব ও বিনশন-তত্ত্ব একই বস্তু। পৃথিবীর সকল বস্তু বা ঘটনা অন্য বস্তুকে ও ঘটনাকে বিরুদ্ধতা করছে যেমন, তেমনি বিনাশও (negate) করছে। একটি ঘটনা (phenomenon) ক্রমিক রূপান্তর প্রাপ্ত হচ্ছে, বদলে যাচ্ছে বা বিকশিত হচ্ছে। এখানে পরের অবস্থা বা রূপকে বাধিত করছে, বিরোধিতা করছে এবং বিনাশ (negate) করছে। পূর্বেকার অবস্থাকে হনন না করলে তার স্থলে পরের অবস্থার আবির্ভাব ঘটতে পারছে না। যেমন বীজ, চারা এবং গাছ। বীজ অবস্থাকে বিনাশ করে তবে চারাগাছের আবির্ভাব। তেমনি চারাগাছকে বিনাশ করে তবে গাছের উদ্ভব। এখানে বীজকে চারা বিনাশ (negate) করছে এবং চারাকে গাছ বিনাশ (negate) করছে। বীজের পূর্বাপর সকল অবস্থার ও সকল পরিণতির মূলে আছে বিনশন (negation)। এই রকম সকল পরিবর্তনে বিনশনই (negation) প্রকট হচ্ছে ও সকল ঘটনা ও বিবর্তনের কল বিনশন এবং ডায়লেকটিকের মূল প্রেরণাকেই আনছে বিনশন (negation)। হেগেলের মতে; ডায়লেকটিকের ক্রিয়াকারিত্ব থেকেই বিনশনের উদ্ভব।*

এখন জিজ্ঞাস্য হচ্ছে এই যে, বীজের পরিণতি হচ্ছে যেখানে চারাগাছে, সেখানে পরিণতিকে বিনশন বলবো কেন? যেখানে বৃদ্ধি, যেখানে পূর্ণতাপ্রাপ্তি, সেখানে বিনশন (negation) শব্দের তাৎপর্য কি? আমাদের এই বিশেষ ধরণের পরিবর্তনকে বর্ণনা করতে হলে বলতে হবে পূর্ণতাপ্রাপ্তি ('completion'), বিনশন (negation) নয়। বীজকে ধ্বংস করে, লুপ্ত করে, তবে চারাগাছ এলো, একথা ঠিক নয়। বীজ ধ্বংস হয়ে গেলে, তার ঐকান্তিক অনস্তিত্ব হয়। সেই শূন্যতা থেকে গাছের নতুন উদ্ভব অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। বীজের বিনশন মানে, বীজের 'মহত্তী বিনষ্টিঃ; তার নিঃশেষে বিলুপ্তি। কিন্তু বীজের পরিপূর্ণ বিলুপ্তি তো ঘটেনি। এখানে বীজের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব বিকশিত মহিমায় বেঁচে রয়েছে চারাগাছে। তেমনি চারাগাছ (plant)

* "...The result that ensues from its (dialectic's) action is presented as a negation." (Logic, p 147, Art 81)

আত্মবিনষ্টির দ্বারা গাছেতে (tree) পরিণত হয় নাই। চারাগাছের পরিপূর্ণ সত্তা পূর্ণতর রূপ ধারণ করেছে বড় গাছে। বীজ পরিণত হয়েছে চারাগাছে, চারাগাছ পরিণত হয়েছে বৃক্ষে। এখানে যা ঘটছে সে হচ্ছে বিকাশ, বিবৃদ্ধি ও পূর্ণতর রূপায়ন; (culmination বা completion) কিন্তু বিনশন (negation) নয়।

অবশ্য হেগেলীয়রা বলবেন যে বীজের আকার (form) বদলেছে, অর্থাৎ চারাগাছে বীজের আকৃতিটি নেই, কাজেই বীজের বীজ-আকৃতির (form) বিনাশ বা ধ্বংস হয়েছে, একথা ঠিক। এর জবাবে বলবো যে এ-যুক্তি ভ্রমাত্মক (fallacious)। কারণ, আকৃতির (form) পরিবর্তন বা ধ্বংসে সমগ্র বস্তুটির ধ্বংস হয় না। 'বীজ' বস্তুটির অনেকগুলি গুণ (characteristics) আছে; তার মধ্যে মাত্র একটি হলো আকৃতি (form)। কেবলমাত্র যদি আকৃতি নামক গুণটির বিনষ্টি ঘটে, তাতে কেবল একটিমাত্র গুণের বিলুপ্তি ঘটলো। এর থেকে একথা বলা অযৌক্তিক যে সমগ্র বস্তুটি স্বরূপতঃ ও সর্বতঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে বা বিনষ্ট (negated) হয়েছে। বালক-রাম যুবক-রামে পরিণত হয়েছে। রামের 'বালক-আকৃতি' ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে তার স্থানে 'যুবক-আকৃতি' স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। কিন্তু মাত্র "আকৃতির" বিলুপ্তি ঘটার ফলে রামের সর্বাঙ্গীন বিলুপ্তি ঘটে গেছে, একথা বলা চলে না। রামের আকৃতি (form) আর নেই, সেই থেকে রাম বিনষ্ট হয়েছে, বা রাম স্বয়ং বিনষ্ট (negated) হয়েছে, এ-সিদ্ধান্ত করা উন্মত্ততা বই আর কিছু নয়। তেমনি বীজ বিলুপ্ত (negated) হয়েছে একথা অসত্য, কারণ বিলুপ্তি (negation) আদৌ হয় নাই।

তারপরে আরো কথা আছে। একটা বস্তু যখন পরিণতির দিকে এগোতে থাকে, তখন অকস্মাৎ তা লাফিয়ে পরিবর্তিত হয় না। পরিণতি ব্যাপারটি খুব ক্রমায়িত রূপান্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। খুব সূক্ষ্ম ও ক্রমিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটি বস্তুর নবরূপে রূপান্তর ঘটে। বীজ একদিনেই চারায় পরিণত হয় না। বীজের মধ্যে সূক্ষ্মতম পরিবর্তন সুরু হয়ে ক্রমশঃ গভীরতর ও ব্যাপকতর পরিবর্তনে রূপান্তরিত হয়। তার ফলে নবরূপের উদ্গম চোখে পড়ে একদিন এবং পরে পরে একফালে চারাগাছ হয়ে দেখা দেয়। চারাগাছ হচ্ছে আগেকার অগণিত সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য পরিবর্তনের ফল। যে দীর্ঘ সময় ধরে বীজে পরিবর্তন চলেছে, ঐ সময়ের প্রত্যেকটি মুহূর্ত এই পরিবর্তনে সাহায্য করেছে; প্রত্যেকটি মুহূর্তের ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম দানেরই সমষ্টিগত রূপ হ'লো চারাগাছ।

এখন হেগেল বলছেন, বীজ নিঃশেষে বিলুপ্ত (negated) হয়ে তবে চারাগাছ আবির্ভূত হ'লো। চারাগাছ হ'ল নূতন আবির্ভাব ও নূতন বস্তু। এখানে গুণগত পরিবর্তন ঘটে গিয়ে সম্পূর্ণ নূতন একটি সত্তার জন্ম হয়েছে। এখানে পূর্ণ বিলুপ্তি (complete negation) ঘটে গেছে, আগেকার দীর্ঘকালের গুণগত পরিবর্তনের ফলে।

এতে প্রশ্ন আসে এই যে, একটানা নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তন নদীর স্রোতের মতো মুহূর্তে মুহূর্তে বয়ে চলেছে; এর মাঝে কোন্ জায়গায় সীমারেখা টেনে বলবো যে এখানে পূর্বতন বস্তুটি সমূলে বদলে গিয়ে বিলুপ্ত (negated) হয়ে গেলো এবং নবতর একটি রূপে আবির্ভূত হ'লো? প্রত্যেকটি মুহূর্তে যে ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটছে, বীজের অন্তরে, তাতেও তো বীজটির স্বরূপে পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। কারণ কোন একটি সমবেত সংঘাতের কোনো একটি অংশে পরিবর্তন ঘটলে, সেই সংঘাতের সকল অংশেই সেই পরিবর্তনের ঢেউ লাগে এবং ফলে সংঘাতটি সমষ্টিগত সত্তাতেও খানিকটা পরিবর্তনকে স্বীকার করে নেয়। কাজেই কোনো একটি মুহূর্তের পরিবর্তনের ফলে বস্তুটিতে যে পরিবর্তন ঘটলো, তাতে কি বলতে পারা যায় না যে যে বস্তুটি বিলুপ্ত বা বিনষ্ট (negated) হয়েছে? যদি বলা হয় যে এ হলো আংশিক

পরিবর্তন ; এতে সমগ্র বস্তুটির সর্বাঙ্গীন রূপান্তর বা বিনশন (negation) ঘটে নাই, তবে মুস্কিল এই দাঁড়ায় যে কখন কতটুকু পরিবর্তন ঘটলে বলা যাবে বস্তুটির বিলুপ্তি বা বিনশন (negation হয়ে গেলো ? বিশেষ কোনো একটি কাল-বিন্দুতে point of time) এলেই বা বস্তুটির সর্বাঙ্গীন বা মৌলিক পরিবর্তন (বা পুরোপুরি negation) হয়ে গেছে, একথা বলবো কেন ? বীজের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে পলে পলেই তো পরিবর্তন হচ্ছে। কেবল যখন চারাগাছের অবস্থায় উপনীত হবে, তখনই বলবো বীজ বিলুপ্ত (negated) হয়ে গেছে কিন্তু এর আগে যেন কোনো অবস্থাতেই বলবো না, এ কোন যুক্তিতে ও কোন কারণে ? যদি আংশিক ও পুরোপুরি পরিবর্তন বলে এদের পার্থক্য নির্দেশ করা হয়, তবে চারাগাছে বীজের পুরোপুরি পরিবর্তন হয়েছে বলবার কোনো কারণ আছে কি ? "পুরোপুরি" বলবো কেন ? বস্তুর স্বরূপে কোন্ ধরণের পরিবর্তন ঘটলে বলবো যে পুরো পরিবর্তন ঘটে গেছে ? কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন ঘটলে তার স্বরূপে মৌলিক বিপ্লব হয়ে গেল, এ কথা বলবো ? যদি জবাব দেওয়া হয়, "বহিরাকৃতি"র (external form) পরিবর্তনেই বস্তুর স্বরূপে বিপ্লব ঘটে যায়, তবে নিতান্ত যে আকারকে (formকে) কেন প্রাধান্য দেওয়া হবে ; অন্যান্য গুণে পরিবর্তন ঘটলে তাতেই বা গুরুত্ব আরোপ করা হবে না কেন ? আকার (Form) বদলালেই বলবো পুরো পরিবর্তন (complete change) অর্থাৎ বিলুপ্তি বা বিনশন (negation) হয়েছে, আর অন্য কোন রকম বদল ঘটলে বলবো বিনশন বা বিলুপ্তি হয় নি, এর কোন যৌক্তিক ভিত্তি নেই। বস্তুর পরিবর্তন ঘটছে নিরন্তর একটানা অবিচ্ছিন্ন ধারায় ; প্রত্যেকটি মুহূর্তের পরিবর্তনটি পরের ও আগের মুহূর্তের পরিবর্তনের মধ্যে নিশ্চিহ্নরূপে অন্তর্প্রবিষ্ট হয়ে আছে। কোথাও কোন স্থানে বা কালে সীমারেখা টেনে বলবো যে এখানে বস্তুটি বিনষ্ট বা বিলুপ্ত হয়েছে, আগে হয় নি, একথা নিছক মনগড়া তথ্য বই আর কিছু নয়। ফুল থেকে ফলে পরিণমন একটা দীর্ঘায়িত, সূক্ষ্ম ও অবিচ্ছিন্ন পরিবর্তনের একটানা ধারা। এই সূক্ষ্ম বিবর্তন-ক্রিয়ার নিরবচ্ছিন্ন ধারার প্রত্যেকটি স্থান-বিন্দুতেই (point of time) মূল বস্তুটি (অর্থাৎ ফুলের) কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে এবং অতএব, পূর্ব মুহূর্তের বস্তুটি থেকে এই মুহূর্তের বস্তুটি বিভিন্ন বলতেই হবে। যদি বলি, প্রত্যেকটি মুহূর্তেই বস্তুটি পূর্ব মুহূর্তের বস্তুটি থেকে বিভিন্ন এবং পূর্ব বস্তুটিকে বিনাশ করেই তবে পর মুহূর্তের বস্তুটির আবির্ভাব হ'তে পেরেছে, তবে একটা বস্তুর পরিবর্তনের ইতিহাসের প্রত্যেক মুহূর্তেই সে নিজেকে বিলুপ্ত বা বিনষ্ট (negate) করেছে। এ অর্থে কেবল বিশেষভাবে 'ফলে' এসেই 'ফুল' বিলুপ্ত (negated) হয়ে গেলো এ-কথার কোনো মানে থাকে না। দ্বিতীয়তঃ, এই অর্থ ধরলে "বিভিন্নতা"কেই বিনষ্টি বা বিলুপ্তি (negation) বলতে হয়। যদি বিনষ্টি বা বিলুপ্তি (negation) বলতে কেবলমাত্র বিভিন্নতা বা পরিবর্তনই (difference বা distinctness) বুঝতে হয়, তবে হেগেল এই 'negation' শব্দটিকে অপব্যবহার করেছেন বলতেই হবে।

পৃথিবীর সর্বত্র সকল রকম বিঘটনে ও বিবর্তনেই হেগেল বিলুপ্তি বা বিনশনের (negation) রাজত্ব ঘোষণা করেছেন। এতে negation-এর অর্থ নিয়েই ভয়ানক গোল পাকিয়ে ওঠে। হেগেলের এটা খেয়াল হয় নি। কিন্তু ম্যাক্ টাগার্ট-এর এটা খেয়াল হয়েছে। কাজেই তিনি এই 'negation'-এর একটা সঙ্গতিপূর্ণ ও যৌক্তিক ব্যাখ্যা বার করতে চেষ্টা করেছেন যাতে হেগেলের ডায়লেকটিক ও বিনশন-তত্ত্বকে (negation) বাঁচানো যেতে পারে। ম্যাক্ টাগার্ট এই হেগেলীয় বিনশন বা বিলুপ্তির (negation) মানে করেছেন পরিণতি (completion), বা বিকাশ। বিনষ্টি বা বিলুপ্তি

(negated) হওয়া আসলে হচ্ছে বিবর্দ্ধিত হওয়া ও পরিপূর্ণ হওয়া।••

বিবর্তনের মুখে আমরা যে ব্যাপারটি ঘটে, সে হচ্ছে বিকাশ, 'বিনাশ নয়।' সে হচ্ছে পূর্ণতাপ্রাপ্তি (completion), বিনষ্টি (negation) নয়। তবে হেগেল পূর্ণতাপ্রাপ্তি (completion) না বলে বিনষ্টি (negation) বললেন কেন? এ-সমস্যার সমাধান মার্ক্স টাগার্টের মতে এই যে বিনশন (negation) কথাটি বারবার ব্যবহার করা হয়ে থাকলেও, হেগেলীয় তত্ত্বে এর স্থান অতি নগণ্য ও তুচ্ছ। বিনশন-এর একটা স্থান আছে বটে; তবে সে স্থান এতো অপাংক্তেয় ও নিম্নতর যে তাকে ধর্ত্তব্যের মধ্যে না আনলেও চলে। তাঁর মতে: এই ধারায় বিনশনের স্থান গৌণ।•

সত্যিকারের ঘটনা যা ঘটেছে সে হচ্ছে পূর্ণতাপ্রাপ্তি (completion)। ফুলকে বিনাশ বা বিলোপ (negate) করে ফলের আবির্ভাব ঘটেছে; কারণ, ফুলকে অস্বীকার (deny) না করলে, ফল আসতে পারে না। কিন্তু এখানে মার্ক্স টাগার্ট বলছেন:

"But this is not done, as has occasionally been suggested, to an inherent tendency in all finite categories to affirm their own negation as such. It is due to their inherent tendency to affirm their own complement."

(Ibid—Art 9)

•• "The really fundamental aspect of the dialectic is not the tendency of the finite category to negate itself, but to complete itself." (Studies in the Hegelian Dialectic; Art 9)

• "The place of negation in that process is only secondary"

(ক্রমশঃ)

অনিল ব্লাক্সের

সময়োপযোগী দুইটি বই

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ: ৩·৫০ টাকা

"...সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থ-নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রাহ্য। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাদ্য।" ... (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনবাদ: ১·২৫

"...নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের সম্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া 'নাস্ত পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।

পাওয়া যাবে:

জয়শ্রী—৩১২, পাঞ্জুলী বাগান, কলিঃ-৪৭ (ডাকে)

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী,

২০৯বি বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

: উপন্যাস :

কষ্টি ভরা বিশ্ব

মিহির মুখোপাধ্যায়

। সাত ।

তুরন্তটের বাড়ীতে ভবানীদেবীর দুশ্চিন্তার শেষ নেই। ছোট ছেলেকে দেখেন না আজ প্রায় চারবছর। মাঝে মাঝে খবর পান। ছেলে নাকি সন্ন্যাসীর মত হয়ে গেছে। কেমন যেন উদাসীন। দিনরাত পড়াশোনা নিয়ে থাকে, বাড়ী ফেরার খুব একটা ইচ্ছে নেই। শেষের খবরটা শুনে ভবানীদেবী হতবাক। ভারত নাকি বিয়ে করেছে, সারদা-গ্রামের কেশরকুনি আচার্যদের দশ বছরের একটি মেয়েকে।

নরেন্দ্র রায় খবরটা শুনে গুম হয়ে রইলেন। তারপর স্ত্রীকে ডেকে বললেন—শুনেছো তোমার ছেলের কীর্তি, তালপুরের টোলে লেখাপড়া শিখে দিগ্‌গজ হয়েছেন, বাপ-মাকে একটা খবর পর্যন্ত না দিয়ে বিয়ে করে বসলেন, এখন যদি বাড়িতে ঢুকতে না দিই, ওর কোন্ বাবা ওকে ঠাঁই দেবে, শুনি, এসব হচ্ছে আমার গুণধর শ্যালকদের কারসাজি, তোমার দাদা হয়তো এসবের মধ্যে ছিলেন না, তিনি ধর্মভীরু ভালমানুষ, কিন্তু তোমার মেজদা ওই কালীনাথ একটি বদমাস, নেশাখোরদের যা হয় আর কি, কুলীনের ছেলে বিয়ে দিয়ে কিছু টাকাকড়ি পেয়েছে, সেই টাকায় ইয়ার-বন্ধুদের নেশাভাঙ করেছে, ওসব ফন্দি কি আর আমি বুঝি না, বিষয়-সম্পত্তি পেছে বলে, গরীব হয়ে পড়েছি বলে কি সামান্য বুদ্ধিও গেছে, ওই যে কথায় বলেনা—কাল পড়েছে বর্ষাকাল, হরিণে চাটে বাঘের গাল—এক নিশ্বাসে অনেক কথা বলে উত্তেজনায় হাঁপাতে থাকেন নরেন্দ্র রায়। একটু জল নিয়ে আবার বলেন—সব ব্যাটা যেন সাপের পাঁচ পা দেখেছে, যারা আগে মুখ তুলে কথা বলতে সাহস পেত না, তারাই এখন মাথে পা দিয়ে চলতে চায়।

নরেন রায়ের মনে হয় কেউ যেন আর মানতে চায় না। সংসারের অন্য সকলেতো বটেই, এমন কি নিজের স্ত্রী আর ছেলেরাও যেন তাচ্ছিল্য করে, অবজ্ঞার চোখে দেখে। তাই যেন নিজের সম্মান, নিজের অধিকার রক্ষার জন্যই কারণে-অকারণে ঘপ্ করে জ্বলে ওঠেন তিনি।

ভবানীদেবী সেজন্য ওরে ভয়ে থাকেন। নানা ভাবনা চিন্তায় মানুষটার মাথার ঠিক নেই। কোন সময় কি করে বসবেন কে জানে। কিছু সময় ভেবে ধীরে ধীরে বললেন তিনি—"তা, তুমি একবার খোঁজ নিয়ে দ্যাখোনা, খবরটা সত্যি না মিথ্যে, ওরকম উড়ো খবর কত আসে, কাউকে পাঠাও না, বিশু গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসুক, ভারতকে সঙ্গে করে নিয়ে আসুক, তার ওখানে থেকে কি হবে, লেখাপড়া যা শিখেছে ওই ঢের, এখন এখানে এসে থাকুক, আমাদের কপালে যা জুটবে তাই খাব, গরীব বাপ-মায়ের কাছে কি আর ছেলে থাকে না।"

শেষ পর্যন্ত বিশ্বনাথকে পাঠানো হয়েছিল। সেই বিশু আজ ফিরে আসবে ভারতকে নিয়ে। ওকি সত্যই বিয়ে করেছে, যদি বউ নিয়ে আসে। যাহোক হোক, ছেলের বউ, ছোট ছেলের বউ, ফেলেতো দিতে পারবেন না, ভবানীদেবীর মন আশা-আশঙ্কায় আকুল। নরেনরায় তাঁর কথা শুনে জলে

উঠেছিলেন,—"হ্যাঁ, জবার বরণ-ডালা সাজিয়ে বসে থাক, ছেলের বউ ঘরে তুলবে, উপযুক্ত ছেলে তোমার, বউ নিয়ে ঘরে ফিরছে ছিঃ ছিঃ তোমার লজ্জাও হয় না!"

ভবানীদেবী যেন নিভে গেলেন, আর একটি কথাও বলতে পারলেন না। মনের অস্থিরতা চাপা দেবার জন্য লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরে গিয়ে বসে রইলেন। বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে দু'চোখ জলে ভরে এল। আজুনের মত বলেছিলেন, কতক্ষণ খেয়াল নেই। হঠাৎ যেন চমকে উঠলেন অর্জুনের ডাক শুনে—মা ভারত এসেছে।

—কই কোথায়?—তাড়াতাড়ি উঠে এলেন।

—বাইরের ঘরে বাবার সঙ্গে কথা বলছে।

—আর কেউ আসেনি?—তাঁর বুকের ভেতর কেমন করছিল। বউ যদি এনে থাকে, অন্ততঃ শাঁখে ফুঁ দিতে হবে, উলু দিতে হবে, বাজি—বাজনা নাইবা হোল, এইটুকু না করে পারবেন না তিনি, তাতে যে যা খুশি বলুক। দু'চোখে উৎকণ্ঠা নিয়ে ছেলেছেলের দিকে তাকালেন।

অর্জুন অসংকোচে ঘাড় নাড়ল—"না, আর কাউকে দেখলাম না, বিভুদা এসেছে ওর জিনিষপত্তর নিয়ে"—তা'হলে বিয়ে করেনি। ভবানীদেবীর বুকটা হালকা হবার কথা। কিন্তু কেন যেন খুব খুশি হতে পারলেন না। যেন একটা আশাভঙ্গের অস্বস্তি নিয়ে সদর দরজার দিকে চললেন।

সদর আর অন্দরের মাঝামাঝি নরেন রায়ের খাস-কামরা। মাঝারি গোছের ঘর। এককালে দামী আসবাবে সাজানো ছিল। এখন সাধারণ তক্তাপোষের ওপর ফরাস-তাকিয়া। দক্ষিণে মানুষ-প্রমাণ বড় বড় তিনটে জানালা। পেছনের দিকে অন্দরে যাবার দরজা, সামনে সদরের টানা-বারান্দা। সবকিছুই কেমন শ্রীহীন, বিবর্ণ।

পেছনের দরজার কাছে পেতলানো কপাটের পাশে দাঁড়ালেন ভবানী দেবী। ভেতরে নরেন রায়ের গম্ভীর গলা—তোমার বিয়েতে কে কে উপস্থিত ছিলেন?

ভারত মিনমিন করে কি জবাব দিল, তিনি ঠিক শুনতে পেলেন না।

"ও তোমাদের সেই পণ্ডিত মশাইর ভাইপি, কি রকম ভাই?"—নরেন রায় ফরসি টানার ফাঁকে ফাঁকে থেমে থেমে ছেড়ে ছেড়ে কথা বলছেন—"ও, সারদাগ্রামের কেশবকুনি আচার্যদের মেয়ে, ওরা তো কট্ট শ্রোত্রীয়।" একটু চুপচাপ। তারপর আবার হুঁ, বুঝেছি, তোমার মেজমামাই এ বিয়ের পাওা, আমি আগেই বুঝতে পেরেছি, তারপর লেখাপড়া কি রকম শিখলে?

ভারতের নীচু গলার জবাবটা ঠিক কানে এল না। নরেন রায়ের উঁচু গলার মন্তব্য শুনতে পেলেন—কি আশ্চর্য, এই চার বছর শুধু সংস্কৃত শিখেছ, আরবী-ফরসী কিছু জানো না, চাকরি জুটবে কি করে, এখন তো আর বাপের জমিদারী নেই যে বসে বসে খাবে, তার ওপর আবার বিয়ে করেছ, যাও নিজের কপাল নিয়ে নিজে ভাসবে।

সদর দরজা দিয়ে কে যেন ধড়ম খট্ খট্ করে ঢুকল। বরছেলে চতুর্ভুজের গলা শুনতে পেলেন ভবানী দেবী।

—আমি তখুনি বড়মামাকে বলেছিলাম, আজকাল আরবী ফারসী না শিখলে কোন সুবিধে হবে না। শুধু সংস্কৃত শিখে কোন লাভ নেই।

আর থাকতে পারলেন না ভবানী দেবী। দরজা একটু ফাঁক করে দেখলেন, ঘরে অন্য কেউ নেই। তাকিয়া ঠেস দিয়ে নরেন রায় বসে গড়গড়া টানছেন। দামী তামাকের সুগন্ধ। ফরাসের একপাশে চতুর্ভুজ এসে বসল। দরজার কাছে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে ভারত। এই চারবছরে খানিকটা লম্বা হয়েছে। একটু রোগা, গায়ের রঙ একটু ময়লা। মাথায় ছোট ছোট চুল। সেই ঘাড় পর্যন্ত লুটিয়ে পড়া কোঁকড়া চুলের বাহার নেই। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বনাথ, তার পেছনে ধরারাম আর অর্জুন উঁকিঝুঁকি

দিচ্ছে। বাপের মেজাজ দেখে ঘরের ভেতরে ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না।

ভবানী দেবী কপালের ওপর ঘোমটা টেনে ভেতরে এলেন, বেশ শান্তস্বরেই বললেন—

'ছেলেটা দুপোপায়ে দাঁড়িয়ে আছে, ওকে একবার বলতেও বলোনি, শুধু গালমন্দ করছ, কেন তোমরা এই চারবছরে একবার খোঁজ নিলে না কেন, নিজেদের কাছে না এনে তালপুরে ফেলে রাখলে কেন?

তারপর ভাসুরের হাত ধরে বললেন—আয় বাবা, আমার সঙ্গে ভেতরে যাবি, চল্।

ভারত নীচু হয়ে পায়ের ধুলো নিল। দীর্ঘ চার বছর পরে মায়ের এতো কাছে দাঁড়িয়ে কেমন নির্বাক হয়ে গেল। কোন কথা বলতে পারছে না। আনন্দের লগ্নে কিম্বা দুঃখের প্রহরে সবসময় যার কথা মনে পড়ছে, সেই মা। কিন্তু মায়ের মুখের দিকে তাকাতে পারছে না ভারত। তাকালেই হয়তো চোখ ফেটে জল আসবে। কথা বলতে পারছে না, বললেই হয়তো কান্নায় ভেঙে পড়বে। মাথা নীচু করেই মায়ের সঙ্গে অন্দরের দিকে পা বাড়াল সে।

নরেন রায় চোখ পাকিয়ে স্ত্রীর দিকে একবার তাকালেন। হয় তো কিছু বলতেন, কিন্তু কি ভেবে চুপ করে গেলেন। চোখে মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটিয়ে গড়গড়া টানতে লাগলেন।

অন্দরের ভেতরে এসে মুখ তুলে চারধারে তাকাল ভারত।

বাড়ির চেহারা কেমন বদলে গেছে। আগের লোকজন, ঝি-চাকর, পাইক-বরকন্দাজ অনেকেই চলে গেছে। আগের মত জাকজমক নেই। বাড়িটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা।

রান্নাঘরের রোয়াকে বসে কে যেন কুটনো কুটছিল। তাড়াতাড়ি উঠে এল। কেমন চেনা-চেনা মনে হলেও, নামটা ঠিক মনে আসছে না।

মা বললেন—কি রে চিনতে পারলি?

ময়লা কাপড় পরা যুবোগত মেয়ে মানুষটি একগাল হেসে বললো—আমায় চিনতে পারবে না দাদাভাই, কত বড় হয়েগেছো। এবার চিনতে পারল ভারত। কদমদাসী। কিন্তু একি চেহারা হয়েছে কদমদাসীর। কেমন রোগা হয়ে গেছে, মাথার চুলে পাক ধরেছে। বাড়ির আরো সবাই এসে ঘিরে দাঁড়াল। ঝি, চাকর, আশ্রিত আত্মীয় বান্ধব। কিন্তু অনেক চেনা মুখই যেন নাই। নিরামিষ রান্নাঘরে ছিল, ব্রজদিদি, পুরোনাম ব্রজবালা। মায়ের চুলবাঁধা আর জামাকাপড় রিপু করার কাজ করত কুসুমদিদি। বাবা মশাইর পেয়ারের চাকর ছিল বৈকুণ্ঠদা। সদরঅন্দরে তার অবাধ গতি। লক্ষ্মীনারায়ণের ভোগ রাঁধত কুন্তিপিসি। অন্দরের দিকটা মেয়েদের মহল। ঝি, রাধুনি—সব মেয়ে। পুরুষ চাকর-দারোয়ানেরা এদিকটায় বেশি আসত না। শুধু ওই বৈকুণ্ঠ আর কুন্তিপিসির ছেলে রমাকান্ত। কোথায় গেল সব। হুঁকো-বরদার বনমালী, পাল্কি-বেয়ারাদের সর্দার গঙ্গাধর, ঘোড়ার সহিস আবদুল সেখ, দেউড়ীর দারোয়ান মুকুন্দ সিং, লছমন পাঁড়ে—সকলের কথাই আবছা মনে পড়ে। আবার অনেকের চেহারাটাও স্পষ্ট মনে আসছে না। তারপর বড়কাকা মেজকাকার ছেলে মেয়েরাই বা কোথায়?

ভারত একবার জিজ্ঞেস করেছিল—মা কমলা, মহামায়া ননীগোপাল ওদের কাউকে দেখছিনা যে—ভবানীদেবী বিষণ্ণ হয়ে জবাব দিয়েছিলেন—ওরা সব অন্য জায়গায় থাকে।

—কেন অন্য জায়গায় কেন?

—এক জায়গায় থাকতে অসুবিধে হয়, বিষয়-সম্পত্তি তেমন কিছু নেই আগের মতন অবস্থা কি আর আছে বাবা, যে সবাইকে নিয়ে এক জায়গায় থাকবো—একটু যেন কঠিন মুখেই বললেন—তোমার বাবাতো ভাবনা-চিন্তায় অস্থির, তোমরা ভাইয়েরা যদি একটু পেছনে না দাঁড়াও, উনি তো

জয়শ্রীর নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্য

জয়শ্রী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক সডাক ১৫০। ষাণ্মাসিক ৪'৭৫। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে হয় না।

লেখকদের জন্য

শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ সর্বাগ্রে দেওয়া হয়।

লেখা পরিষ্কার হস্তাক্ষরে ফুলস্ক্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। কারণ হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই।

কবিতা সম্বন্ধেও ওই নিয়ম।

৪. উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়।

শক্তিশালী নূতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহযোগিতার জন্য আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কলকাতার সব স্টলে জয়শ্রী পাওয়া যায়।

প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী
৩১২, গাঙ্গুলিবাগান
কলিকাতা-৪৭
ফোন ৪৪-৪১১৬

উপন্যাস

জল মাটি মন

ম হী তো ষ বি শ্বা স

[৬]

জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে। এ-তিনের উপর কারো হাত নেই। এদের খণ্ডানোর সাধ্য নেই কারো। কঠুখালির মানুষগুলো তা মানে। তাই কোনো মানুষ জন্মালে ওরা আনন্দ করে। শাঁখ বাজায়। কিন্তু সৃষ্টি-রহস্যের কিনারা খুঁজবার জন্য ওদের কোনো মাথাব্যথা নেই। ভাবনের দান ব'লে নতুন মানুষকে ওরা আদর ক'রে বুকে তুলে নেয়। মৃত্যুতেও তাই। সব মায়ার বাঁধন কেটে দিয়ে কেউ যখন চ'লে যায়, তখন ওরা বুক চাপ্‌ড়ে কাঁদে। হা-হুতাশে চোখের জলে ভাসে। কিন্তু তার জন্য দায়ী করে না কাউকে। ভগবান দেয়। ভগবানই আবার নিয়ে নেয়। কাকে দায়ী ক'রবে ওরা তার জন্যে। আর বিয়ে? সেখানে-ও তাই। যতোক্ষণ না বিয়ের ফুল ফুটবে, ততোক্ষণ তুমি যতোই চেষ্টা-চরিত্তির করো, ছুটোছুটি করো—কিছুতেই কিছু হবে না। আর যেই বিয়ের ফুল ফুটল, অমনিই দেখা গেল একজনের সঙ্গে আর একজনের জোড় বেঁধে গেল। যোগাযুঁজি, ছোটাছুটি কোনো কিছুরই দরকার হ'ল না। ওদেরই বিয়ের চেষ্টায় হয়ত একদময় পাড়া মাতিয়ে তোলা হয়েছিল। কিন্তু ফুল না ফুটলে তো আর বিয়ে হবে না। ঐ যে বলে—'যার হাঁড়িতে যার চাল বাঁধা, তা ঠ্যাকাবে কার বাবা!' ভগবান তোমার কপালে যার হাঁড়ির ভাত লিখে দিয়েছে, তা তোমাকে খেতেই হবে। এইটাই নিয়ম। ভগবানের বিধান।

কিন্তু পদ্ম ভগবানের এ-বিধানকে মানেনি। ওর মন মানতে চায়নি। তাই ভগবানের বিধানকে উল্টে দিয়ে পীরিতের মানুষকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু কাঠুখালির ভাগ্যবিধাতা বুড়ো ভগবান পদ্মর এই দুঃসাহস দেখে আড়ালে ব'সে মুখ টুকে হেসেছিল একটুখানি।

ভোর রাতে ঠাণ্ডা হাওয়ায় একটুখানি ঘুম এসেছিল পদ্মর। সারারাত দুচোখের পাতা এক করতে পারেনি। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে কেটে গেছে সমস্তটা। সমস্ত গায়ে যন্ত্রণা। শুয়ে শুয়ে ছটফট করেছে। আর বিছানার এ-পাশ ও-পাশ করেছে। সারারাত মা পাশে ব'সে হাওয়া দিয়েছে। মাথায় হাত বুলিয়েছে। ভোর রাতে কখন একটুখানি ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ ঘুমটা চম্‌কে গেল পদ্মর। মার গলা শুনতে পেলো।

"পদ্ম—ও পদ্ম! এবার ওঠ দি'নি। বেলা যে উঠে গ্যালো।"

পদ্ম মার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে আবার পাশ ফিরে শুলো। চোখ বুজলো। কিন্তু ঘুম আর এলো না। গত রাতের ঘটনাগুলো একটু একটু করে মনে পড়তে লাগল। কাল সন্ধ্যেবেলা নীলমণি ঘোড়লের বাড়ী থেকে লোক এসেছিল। বিয়ের বাবস্থাপত্র পাকা করতে অনেক কথাবার্তা হয়েছিল পদ্মর বাবার সঙ্গে। অনেক রাত পর্যন্ত ছিল ওরা। খাওয়া-দাওয়া করেছিল। মাকে রান্নাবান্নার কাজে সাহায্য

করতে হয়েছিল পদ্মর। বড়োলোক হবু কুটুম-বাড়ীর লোকের যাতে কোনো অযত্ন না হয়, সেদিকে যথাসাধ্য নজর রেখেছিল পদ্মর বাবা। কিন্তু যত্নের মধ্যে উৎখুশ করেছিল পদ্মর মন। মার কাজে সাহায্য করতে গিয়ে প্রতি ব্যাপারে ভুল হচ্ছিল। কোনো একটা ছুতো করে বাইরে যাবার ফাঁক-ফিকির খুঁজছিল। মা রান্নার ফাঁকে ফাঁকে বারবার পদ্মর মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। মা তো অমনভাবে কোনদিন তাকায় না! লজ্জা পেয়েছিল পদ্ম। ছোট একখানা পিঁড়ি টেনে নিয়ে কুলিটাকে আড়াল দিয়ে বসেছিল গিয়ে ওপাশটায়, মার মুখের দিকে তাকিয়েছিল, আগুনের আঁচে মার মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছিল। অনেকক্ষণ পদ্ম তাকিয়েছিল মার মুখের দিকে। আস্তে আস্তে বড় করুণ হয়ে উঠেছিল পদ্মর মনটা। মাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে! কি করে থাকবে পদ্ম মাকে ছেড়ে? এতোখানি বড়ো হয়েছে, এখনো রাত্রে মার কোলে গুটিসুটি হয়ে না শুলে ঘুম আসেনা। দস্যি মেয়ে বলে মার কাছে কতো বকুনি খায়, পরমুহূর্তেই সব ভুলে যায়। ছুটে এসে মার গলা জড়িয়ে ধরে। সেই মাকে ছেড়ে পদ্ম আজ কেমন করে চলে যাবে? পদ্মর অজান্তেই কখন ওর চোখ দুটো ছাপিয়ে জল নেমে এসেছিল। কোঁটার কোঁটায় গড়িয়ে পড়েছিল নীচে। মার রান্না শেষ হয়ে গিয়েছিল। কড়াইটাকে উনুন থেকে নামাতে গিয়ে হঠাৎ চোখ পড়েছিল পদ্মর মুখের দিকে। পদ্মর চোখে জল! ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল মার মনটা। আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে পদ্মর মাথায় হাত রেখে বলেছিল—

"কাঁদিস্‌নে মা—কাঁদিস্‌নে। কাঁদে আর কি করবি ক'।"

আকুল কান্নায় ভেঙে পড়েছিল পদ্ম। দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল মাকে। আর বোধহয় সে সামলে ঘরে থাকতে পারবে না। ওর ওর করে কাঁপছিল ওর সারা বুকখানার মধ্যে। লুকোনো কথাগুলো যেন ঠেলে ঠেলে বের হয়ে আসতে চাইছিল। বলেই ফেলবে সে মাকে সব কথা।

কিন্তু তারু আগেই আবার কথা বলেছিল পদ্মর মা। পদ্মর মার চোখ দুটোও ভিজে উঠেছিল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলেছিল—"কি আর করবি কস্‌! অদেষ্টের লেখন যুগে মানে নে। কপালে যদি তোর সুখ হয়, তো এতেই হবে। বুড়ো বর বুলে অছেদ্দা করিস নে।"

পদ্ম ততোক্ষণে সামলে নিয়েছিল। কেন যে সে কাঁদছে, তা বুঝতে পারেনি মা। কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখ দুটো মুছে ফেলেছিল পদ্ম। না, মাকেও সে জানাবে না কোনো কথা। মাকে জানালেই সব কথা বাবার কানে উঠবে।

পদ্মকে চোখের জল মুছতে দেখে মার মনও একটু স্থির হল। বাসন-কোসনগুলো ধুতে ধুতে বলেছিল—"তুই যা মা। মাধাই এ্যা'লা এ্যা'লা শুয়ে আছে। ওর ধারে যাইয়ে তুই এডুখানি শুয়ে থাক। এনাগের খাওয়া হয়ে গেলিই তোরে ডাক দেবা নি।"

আর কোনো কথা না বলে উঠে গিয়েছিল পদ্ম। পিছনের বারান্দা দিয়ে ঘুরে ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল। মাটিতে খড়ের বিছানো। অন্ধকারে ছোটো ভাই মাধাই শুয়ে আছে। পদ্ম আস্তে আস্তে ওর পাশে গিয়ে বসল। হাত বুলিয়ে গায়ের ধুলোগুলো উড়িয়ে দিল। বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। আর দেরী করল না পদ্ম। বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। অন্ধকারের মধ্যে চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই চলে এসেছিল পুকুর পাড়ে। একেবারে তালগাছটার গোড়ায়।

খবরটা ছড়িয়ে পড়েছিল একটুক্ষণের মধ্যেই। লোকজনকে খাইয়ে দিয়ে পদ্মর মা ঘরে এসেছিল পদ্মকে ডাকতে। এসে দেখে পদ্ম ঘরে নেই। প্রথমে কিছু বুঝতে পারেনি। ভেবেছিল, বাইরে কোথাও আছে। তাই বাইরে এসে পদ্মর নাম ধরে কয়েকবার ডেকেছিল। কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। তাড়াতাড়ি ঘরে এসেছিল পদ্মর

মা। বারান্দার এককোণে পদ্মর বাবা ভজহরি দুই কুটুম্বদের সাথে কথাবার্তা বলছিল। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে পদ্মর মা ডাকল ভজহরিকে—

"একবার শোনো দেহি ঘরে।"

বিরক্ত গলায় জবাব দেয় ভজহরি—"তোমার আবার হলো কি? ডাহো কানো আবার?"

গলাটা নীচু করে বলে পদ্মর মা—"পদ্মরে দেহি না যে! গেল ক'নে?"

—"যাবে আবার কনে? গাছো ঘরে টরে আছে কোনো আপায়।"

—হুঁকো টানতে টানতে বলেছিল ভজহরি।

পদ্মর মা জবাব দেয়—"আখলাম তো সব আপায়। কেনো আপায় পাচ্ছিনা যে।"

এর পরেই খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে ঘর-বারান্দায়। তারপর আনাচে-কানাচে। সর্বত্র। খুঁজতে খুঁজতে সকলে চলে এসেছিল পুকুরপাড়ে। চিন্তায় সকলেরই মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। হারিকেনের আলো ফেলে কোপঝাড় তন্নতন্ন করে দেখেছিল। হঠাৎ চোখে পড়েছিল কুটুম্ববাড়ীর একটা লোকের। একটু এগিয়ে যেতেই দেখতে পেলো, তালগাছের গোড়ায় সাদা মতন কি যেন একটা দাঁড়িয়ে। লোকটা উঁচু গলায় ডাক দিয়েছিল ভজহরিকে—

"ও বোড়শ কাকা, এদিগি আসো দেহি সগোলে আলো নিয়ে। মনে কয় ঐ তালগাছের গোড়ায়—"

কথা শুনে ছুটে এসেছিল সকলে। হারিকেন উঁচু করে দেখেছিল। হ্যাঁ, পদ্মই বটে! গড়িয়ে পড়তে পড়তে যেন কোনোমতে তালগাছের গোড়াটাকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ দুটো বোজা। মুখখানা শুকনো ধান পাতার মতন সাদা, ফ্যাকাশে। পদ্মর অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল সকলে। ধরাধরি করে নিয়ে এসেছিল বাড়ীতে। চোখেমুখে জল ছিটিয়ে দিয়েছিল। সেই রাতেই ওঝা এলো। জল পড়িয়ে খাইয়ে দেওয়া হল পদ্মকে। সুতো পাঁকে তাগা বেঁধে দেওয়া হল হাতে। নিশ্চয়ই কোনো অপদেবতার নজর পড়েছে পদ্মর উপরে। মন্ত্র পড়ে ওঝা ঘর বন্ধ দিল। বাড়ী বন্ধ দিল। পদ্মকে নজরে রাখতে বলে গেল সকলকে।

শুয়ে শুয়ে পদ্ম ভাবছিল গতরাতের কথাগুলো। ঠিক যে ভাবছিল, তা নয়। ভাবতে পারছিল না। মাথার মধ্যে সবকিছু যেন কেমন এলোমেলো হয়ে গেছে। ভাববার মতন ক্ষমতা তার আর নেই। ভালো করে কিছুই মনে করতে পারছে না। শুধু গতরাতের আবছা ঘটনাগুলো মনের মধ্যে খাপছাড়া ভাবে ভেসে উঠছে। হঠাৎ বাধা পড়ল। বাইরে দুটো তিনটে শাঁখ বেজে উঠল। কারা যেন উলু দিল। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকল পদ্মর মা। পদ্মকে আস্তে একটা ঠেলা দিয়ে বলল—"ওমা পদ্ম! ওঠ এবার! বারোয়ে গাধ, সগোলে আইছে। দই-মঙ্গলের কাজডা তাড়াতাড়ি সারে ফ্যাল্ মা!"

পদ্মর মার কথা শেষ হতে না হতেই ঘরের মধ্যে হুড়মুড় ক'রে ঢুকে পড়ল একদল মেয়ে। নানান বয়সের। ঘিরে বসল সকলে পদ্মকে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই পদ্মর মনে পড়ে গেল, আজ তার বিয়ে। না, বলরাম নয়,- নীলমণি মোড়লের সঙ্গেই তার বিয়ে হচ্ছে। কঠিন হয়ে উঠল পদ্মর মনটা। ঘেন্নায় যেন বমি ঠেলে আসতে চাইল। সে ঘেন্না নীলমণি না বলরামের উপর বুঝতে পারল না পদ্ম! সমস্ত পুরুষ-জাতটার পরেই যেন তার ঘেন্না ধরে গেছে।

একটিও কথা বললনা পদ্ম কারো সঙ্গে। স্তব্ধ অভিভূত হয়ে বসে রইল শুধু। গোধূলি-লগ্নে বিয়ে। সারাদিন উপোষ ক'রে থাকতে হবে। ঘরিঘরলের সময়েই সারাদিনের মতন যাহোক কিছু মুখে দিয়ে নিতে হবে। কিন্তু পদ্ম একটি গ্রাস খাবারও মুখে তুলল না। যেমন বসেছিল—তেমনই—বসে রইল।

অবশেষে সকলে হাল ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। পদ্ম গিয়ে শুয়ে পড়ল ঘরের মধ্যে। আস্তে আস্তে বেলা বাড়ল. বাইরে উঠোনে যোগাড় যন্ত্র চলছে। রাত্রে বর আসবে। বরযাত্রী তাদের আদর অপ্যায়নের আয়োজন চলছে। হঠাৎ মাধাইয়ের দিকে নজর পড়তেই ওকে ডাক দিল পদ্ম। মাধাই কাছে এসে দিদির পা ঘেষে দাঁড়াল। পদ্ম চুপিচুপি ওকে বলল – "এট্টা কাজ কর্‌বি রে মাধাই ?"

মাধাই সে কথার জবাব দিল না। দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—"তোর কি হইচেরে দিদি ?"

সস্নেহে পদ্ম ধমক দেয় মাধাইকে—"আমার আবার কি হতি দেখলি তুই। কিছুই তো হইনি আমার! তা তোরে যা কলাম, তা পারবি কিনা ক'।

মাধাই একটু নড়ে চ'ড়ে দাঁড়ায়। বলে—"ক' না তোর কি কাজ।"

"কারো কইয়ে দিবি না তো ?"—পদ্ম জিজ্ঞাসা করে মাধাইকে।

মাধাই ঘাড় নাড়ে। কাউকে বলবে না সে।

পদ্ম মাধাইয়ের মুখের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলে—"এট্‌খানি সেইহে আয়তো - বলরামদা বাড়ী আছে নাকি। কেউ কিছু জানতি চা'লি আমার কথা কিন্তুক কারো কোসনে যানো আবার !"

মাধাই বেরিয়ে গেল। কখন আসে, কখন আসে ক'রে পদ্ম তাকিয়ে থাকল পথের দিকে। খানিক বাদে ফিরে এলো মাধাই। না, বলরাকে পায়নি। বাড়ী নেই বলরাম। কোথায় গেছে বলতে পারেনা বাড়ীর কেউ।

একটা পাথুরে মূর্তির মতন পদ্ম স্তব্ধ অনড় হয়ে বসে রইল বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে।

(ক্রমশঃ)

JAYASREE

Socio-Cultural Bengali Monthly
Founded in 1931

Advertisement Rate Schedule
Current from April, 1968

Ordinary

Full Page :	Rs	100·00
Half Page :	Rs	55·00
Quarter Page :	Rs	30·00

Cover Page

Second Cover :	Rs	175·00
Third Cover :	Rs	200·00
Fourth Cover :	Rs	350·00

For Special Position contact *Advt. Manager* Jayasree.

Advertising Space 20·5Cm × 15·24Cm
(8" × 6")

Contact
Manager, Jayasree
312, Ganguli Bagan,
Calcutta—47
Phone : 46-1116

সুভাষচন্দ্র : আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, বর্তমান ভারত ও ভবিষ্যৎ

পবিত্রকুমার ঘোষ

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণের সময় সুভাষচন্দ্র একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ অবলম্বন করতেন,—তাঁর সমসাময়িক বহু ব্যক্তি বা দল এজন্য তাঁর প্রতি বিরূপ ছিল। এই দৃষ্টিকোণটি ছিল তাঁর নিজস্ব এবং তিনি কখনোই এটি বিসর্জন দেননি। ১৯২৮ সালে, মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে, আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ আলোচনার এই বিশেষ ভঙ্গীটি তিনি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেছেন দেখতে পাই——সম্ভবত তারও বহু পূর্ব হতেই এবিষয়ে তিনি মনস্থির করে ফেলেছিলেন। ১৯২৮ সালের ৩রা মে পুনায় অনুষ্ঠিত মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেছিলেন: "বর্তমান সময়ে আমার দেশবাসীদের বিশেষত আমার তরুণ বন্ধুদের একাধিক দিক হতে আন্তর্জাতিকতাবাদের উপর যে আক্রমণ চালানো হচ্ছে সে বিষয়ে আমি সতর্ক করে দেওয়া আবশ্যক মনে করি। সাংস্কৃতিক আন্তর্জাতিকতাবাদের দৃষ্টিকোণ হতে জাতীয়তাবাদকে সঙ্কীর্ণ, স্বার্থপর ও জঙ্গী বলে অভিযুক্ত করা হয়ে থাকে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকতা প্রসারের পক্ষে বাধাজনক বলেও একে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই অভিযোগের উত্তরে আমি বলব ভারতের জাতীয়তাবাদ সঙ্কীর্ণ নয়, স্বার্থপরও নয়, জঙ্গীও নয়।..... জাতীয়তাবাদের ওপর আর একটি আক্রমণ করা হচ্ছে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী বা আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের দৃষ্টিকোণ হতে। এই আক্রমণটি শুধু ভ্রান্তি-প্রসূতই নয়, নিজেদের অজ্ঞাতেই এই পক্ষাবলম্বীরা আমাদের বিদেশী শাসকদের সহায়তা করছেন।" "(Selected speeches of Subhas Chandra Bose, Publications Division, Govt of India, pp.32-33)

সুভাষচন্দ্রের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণের নিজস্ব দৃষ্টিকোণটিকে যারা বরদাস্ত করতে পারেনি তারা উপরোক্ত দুই শ্রেণীভুক্ত লোক। ভারতীয় রাজনীতিতে এরা সাধারণতঃ নেহেরুপন্থী উদারতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট বলে পরিচিত। উভয় পক্ষই জাতীয়তাবাদে প্রত্যয়হীন,—জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তারা অংশ নেয় শুধু নিজ নিজ প্রভাব বিস্তারের আশায়, উদারতান্ত্রিকদের আসল সম্পর্ক আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্রবাদের সঙ্গে এবং কমিউনিষ্টদের পরিচালন-কেন্দ্র কখনো রাশিয়া কখনো বা চীন।

সুভাষচন্দ্র এই দুই পক্ষ বা ধারা হতে আপন স্বাতন্ত্র্য স্থাপন করেছেন। স্পষ্টতই তিনি জাতীয়তাবাদী। ১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জেনেভা হতে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন: "আগের চেয়েও দৃঢ় ভাবে আমি বলতে চাই যে বিদেশের সকল সাম্প্রতিক আন্দোলনগুলিকে—আমাদের যেমন অধ্যয়ন করা একান্ত কর্তব্য, তেমনি ভারতবর্ষে আমাদের দরকার আমাদের প্রগতির রূপরেখা ভারতের অতীত ইতিহাস, এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের

প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নির্ধারণ করা। শত শত শতাব্দী ব্যাপী ভারতবর্ষ যে ভৌগোলিক ও মননের ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে তার ফলে আমরা অপরাপর দেশ ও জাতি সম্পর্কে একটি নরনী কিন্তু বিচারশীল মনোভাব অবলম্বন করতে সক্ষম হব।" (The Indian Struggle, Asia Publishing House p. 350) ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, বর্তমান ও ভবিষ্যতে সুভাষচন্দ্রের ছিল অবিচল আস্থা ;— কোনো আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী, শ্রেণী, দল বা রাষ্ট্রের দৃষ্টিকোণ হতে ভারতের নীতি ও ভূমিকা নির্ধারণের প্রয়াসকে তিনি কঠোর ভাষায় নিন্দাই করেছেন।

সুভাষচন্দ্র কি তবে সেই জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা যে জাতীয়তাবাদ ভারতবর্ষকে বিশ্বের লীলাক্ষেত্র ভূমি হতে আড়াল করে রাখতে চায়, কিংবা তিনি কি বিশ্বে ভারতের ভূমিকাকে অস্বীকার করতে চান? এরকম অনুমানের পক্ষে যে কোনো যুক্তি নেই তা হয়তো তাঁর পূর্বোদ্ধৃত বিবৃতি হতেই বোঝা যাবে। বিশ্বের কোনো আন্দোলন বা মতবাদকেই তিনি অবহেলাযোগ্য মনে করেননি এবং সকল দেশ বা জাতির প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব রক্ষা করাই আমাদের পক্ষে বিশেষ বলে তিনি মনে করেছেন। কিন্তু সমগ্র মানবজাতির জন্য ভারতবর্ষকে যে বিশেষ দায়িত্ব বহন করতে হবে এ চিন্তাও তাঁর ভাবাদর্শের মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে ছিল। বিশ্ববাসীর জন্য ভারতবর্ষের সেই দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে হরিপুরা কংগ্রেসে প্রদত্ত তাঁর সভাপতির ভাষণ তিনি এইভাবে সমাপ্ত করেছিলেন : We are, therefore, fighting not for the case of India alone but of humanity as well, India freed means humanity saved. Vande Mataram ! (Selected speeches of S. C. Bose, p. 94) সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে আপসহীন সংগ্রামের মন্ত্রে তিনি আমাদের দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন সে শুধু ভারতের বুকের উপর দস্যুর মতো চেপে-বসা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম নয়, জগতের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান ছিল। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল শুধু এই যে ভারতবর্ষ যদি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল হতে বেরিয়ে আসতে পারে তাহলে গোটা পৃথিবীতেই বৃটিশ সাম্রাজ্য চুরমার হয়ে যাবে—এবং সেক্ষেত্রে কোনো দেশের সাম্রাজ্যবাদই আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে এশিয়া ও আফ্রিকার তাঁর এই ভবিষ্যৎ দৃষ্টির সার্থকতাই প্রমাণিত হয়েছে। ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে হবে ভারতবর্ষের স্বার্থে তো বটেই, উপরন্তু বিশ্বের সকল পরাধীন জাতিরও স্বার্থে—সমকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র আমাদের এই ভূমিকাটির কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সমকালীন রাজনীতির গণ্ডীর বাইরে, বিশ্বসংস্কৃতির ক্ষেত্রে, মানব ইতিহাসের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের আর কী কোনো শাশ্বত ভূমিকা নেই? সেই ইতিহাসের উষালগ্ন হতে ভারতবর্ষ আত্মস্বাতন্ত্র্যকে যেমন বজায় রেখেছে, তেমন বিশ্বের দরবারে তার নিজের অবস্থানকে উপস্থিত করতেও কার্পণ্য করেনি। সুভাষচন্দ্রের প্রজ্ঞায় কি সে বিষয়ে দ্বিধা ছিল? ভারতপথের সেই তীর্থযাত্রীর পক্ষে তা কি সম্ভব? আজ পর্যন্ত কোন ভারততত্ত্ববিদই তো বিশ্বে ভারতের চিরন্তন ভূমিকাকে অস্বীকারও করেননি, লঘু করেও দেখেননি। আর সুভাষচন্দ্র, যিনি একান্তভাবে একজন দেশপ্রেমিকই নন ; ভারতবর্ষকে যিনি দেখেছেন বিদেশীর দৃষ্টিতে নয়, হ্যারো, ইটনের শিক্ষায় দীক্ষা লাভ করে নয়, রাজনীতির চকল আবর্তে পড়ে ভারতভ্রমণের কৃত্রিম অভিজ্ঞতা হতেও নয় ;—ভারতবর্ষকে তিনি অনুভব করেছেন আপন রক্তে ও স্নায়ুতে, মজ্জিকে ও মজ্জায় - আশৈশব হৃদয়ের নিবিড় ভালবাসায় ভারতবর্ষকে তিনি আপন করে নিয়েছেন গভীরতম অনুভবের মধ্যে—সেই সুভাষচন্দ্রের পক্ষে ভারতের মহিমা এবং ভারতবর্ষের সাধনা সম্পর্কে অন্ধ ও অজ্ঞ থাকা সম্ভব ছিল না ; অকুণ্ঠ প্রত্যয়ে ভারতবর্ষের শাশ্বত বিশ্ব-

ভূমিকার কথা দেশবাসীকে তিনি বলতে সুরু করেছিলেন তাঁর যৌবন কাল হতেই। সুভাষচন্দ্রের কর্মধারার এই দিকটি সম্পর্কে আজও আমরা যথেষ্ট সচেতন নই, সংশয় ও প্রশ্ন যদি কিছু দেখা দিয়ে থাকে তবে তা সেজন্যই।

দুই

১৯২৯ সালের ১৯শে অক্টোবর লাহোরে অনুষ্ঠিত পাঞ্জাব ছাত্র সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন: "আমি একথা নিশ্চিত ভাবে বলতে চাই যে ভারতের একটি বাণী আছে এবং সহস্র সহস্র শতাব্দী ধরে সে বেঁচে আছে জগৎকে সেই বাণী দান করার জন্য। বিশ্বের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন অবদান রাখার মতো সম্পদ ভারতের আছে।" (The Mission of Life, p. 161)

সুভাষচন্দ্র তাঁর এই বক্তব্যকে আরও পরিস্ফুট করেছিলেন উপরোক্ত বক্তৃতার মাসাধিককাল পরে ২৯শে নভেম্বরে অনুষ্ঠিত যুক্তপ্রদেশের যুব সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ দানের সময়। সেই ভাষণে তিনি বলেছিলেন: ভারতবর্ষ যেন ক্ষুদ্রাকৃতি একটি জগত এবং জগতের প্রায় সকল সমস্যাই এই দেশে দেখা যাবে। অতএব ভারতবর্ষে কোনো সমস্যার সমাধান হলে সারা জগতের পক্ষেই সেই সমস্যাটির সমাধান হয়েছে বলতে পারা যাবে। যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষ অবর্ণনীয় কষ্ট ও দুঃখভোগ এবং অসংখ্য সংগ্রাম ও সঙ্ঘর্ষের ভিতর দিয়ে পার হয়ে এসেছে এবং আজও সে জীবন্ত ও জাগ্রত হয়ে বেঁচে আছে। তার কারণ শুধু এই যে ভারতের একটি বিশেষ সাধনা আছে, আছে তার জীবনের নিজস্ব একটি লক্ষ্য—যা তাকে পূর্ণ করতে হবে। আজ তাকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে, কেননা বৃহত্তর বিশ্বকে সেই একমাত্র রক্ষা করতে পারে। তাকে স্বাধীন হতেই হবে, কেননা তার এই স্বাধীনতা জগতের পক্ষে একান্ত আবশ্যক;—কারণ আমাদের মাতৃভূমি এই ভারতবর্ষকে বিশ্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট অবদান রাখতে হবে। সেই তার ভবিতব্য। সমস্ত জগৎ অধীর উৎকণ্ঠায় আজ অপেক্ষমান ভারতের সেই অবদান প্রত্যক্ষ করার আশায়; সেই অবদান না পাওয়া পর্যন্ত জগৎ নিজেকে বঞ্চিতই বোধ করবে।" (The Mission of Life, p 236)

সুভাষচন্দ্রের নিজের জীবনের mission সম্পর্কে একটা দৃঢ় প্রতীতি কিশোর বয়সেই গড়ে উঠেছিল। তাঁর সমস্ত জীবনের যে একটি বিশেষ তাৎপর্য ও লক্ষ্য আছে এবং শত বাধা, বিপদ সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে পরিণামে সেই লক্ষ্যই যে জয়ী হবে এ বিষয়ে তাঁর মনে কোনো সংশয় ছিল না। ১৯৪২ সালের ৪ই ডিসেম্বর বার্লিনে বসে আর্যান সরকারকে তিনি একটি চিঠি লিখেছিলেন জার্মানী হতে দক্ষিণ-এশিয়ায় তাঁকে যাবার বন্দোবস্ত করে দেবার অনুরোধ জানিয়ে। এই যাত্রার পথ যে ছিল ঘোরতর বিপদসঙ্কুল এবং জীবনহানির সম্ভাবনা ছিল প্রভূত পরিমাণে তা আর্যান সরকারও জানত, তিনিও জানতেন। জার্মান সরকার তাই তাঁকে এই যাত্রা হতে বিরত হবার অনুরোধ জানিয়েছিল। সেই প্রসঙ্গেই এই পত্রখানি। এই পত্রের দুটি মাত্র বিশেষ বাক্যের প্রতি আমি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তাঁর একটি উক্তি এইরূপ 'I remain an optimist and I have an intuitive feeling that a way will be found to make the journey possible." এবং পত্রের শেষ অনুচ্ছেদে তিনি লিখেছিলেন: "That risk I shall gladly and voluntarily take. At the same time, I believe in my destiny and I therefore believe that this endeavour will succeed" (The Indian Struggle, p. 462) সুভাষ-চরিত্রের এই গভীরতর দিকটির কথা আমরা অনেক সময় ভুলে যাই; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর

কর্মপন্থার উৎস ছিল তাঁর সেই আর্ষ উপলব্ধি ও দৃষ্টি, যার বলে জড়ের আবরণের অন্তরালে নিহিত সত্য প্রত্যক্ষীভূত হয়। সুভাষচন্দ্র যে ভারতবর্ষের সেবায় আত্মদান করেছিলেন সেই ভারতবর্ষের সম্পর্কেও তাঁর সত্য দৃষ্টি ছিল অবাধ ও গভীর। ভারতের যে mission বা সাধনা বা লক্ষ্য বা জগতের ক্ষেত্রে ভারতের যে বিশিষ্ট অবদান সম্পর্কে তিনি বলেছেন, কারও কারও মনে হতে পারে যে সে যৌবনের উচ্ছ্বাস বা ভাবালুতামাত্র কিংবা তা একটা কথার কথা,—রাজনৈতিক নেতার পক্ষে স্বাভাবিক বাগবিলাসিতা মাত্র। সুভাষচন্দ্রের যেসকল বক্তৃতা, রচনা, উক্তি ও কার্যাবলীর সন্ধান আমরা পাই তার কোথাও বাগবিলাসিতার পরিচয় নেই,—তাঁর কোনো প্রকাশ উক্তি বা বিবৃতিতে উচ্ছ্বাস বা ভাবালুতারও স্পর্শ পাওয়া যায় না। এবং যে বিষয় সম্পর্কে তাঁর প্রত্যয় গভীর নয়, সে বিষয়ে প্রচার করার কোনো দৃষ্টান্তই তিনি রাখেননি; বস্তুতঃ কথার ফেনিল বুদ্বুদ সৃষ্টি রাজনৈতিক নেতার সাময়িক প্রয়োজন সিদ্ধির সহায়ক হতে পারে বটে—কিন্তু সুভাষ-চরিত্রের পক্ষে এ জিনিষটি অস্বাভাবিক ও অবাঞ্ছনীয়। সুভাষচন্দ্র তাঁর জীবনের সর্ববিধ ভোগাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কঠোর দুঃখবরণের পথে প্রথম যৌবনারম্ভেই যে নেমে এলেন—তার কারণ তাঁর নিজ আদর্শে বিশ্বাস ও নিষ্ঠা ছিল অটল। সেদিন যে আদর্শ ছিল ভারতবর্ষের পরাধীনতার বন্ধন মুক্তি;—কিন্তু কেন? তার কারণ ভারতবর্ষের যুগযুগব্যাপী সাধনা, যে আদর্শের জন্য ভারতবর্ষ বেঁচে আছে সেই আদর্শ, এবং মানবজাতির সমৃদ্ধি ও প্রগতির পক্ষে সেই আদর্শের একান্ত আবশ্যকতা—এ সব বিষয়েই সুভাষচন্দ্রের প্রত্যয় ও আস্থা ছিল স্থির, অকম্পিত। তাই ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সের সুভাষের মুখে যে কথাগুলি সেদিন ধ্বনিত হয়েছিল, যার সামান্য দু'একটি অংশ পূর্বে উদ্ধৃত করেছি,—সে কথাগুলিকে সামান্য অর্থে নিতে পারিনা আমরা, সে কথাগুলির তাৎপর্য আজও হৃদয়ের মাঝে অনুভব করতে হয়। যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, ভবিষ্যতে যে রূপ তিনি কল্পনা করেছিলেন—কিংবা যৌক্তিকসম্ভব নিষ্কণ্টকিকা যুক্তি দ্বারা যে অনিবার্য কিন্তু আপাতত লৌকিক দৃষ্টির অন্তরালবর্তী ভবিষ্যতের পাঠোদ্ধার তিনি করেছিলেন,—এবং সেই স্বপ্ন, কল্পনা বা নিখনেত্রের দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত ভবিষ্যতের সত্যরূপের বেদীতলে যে নিঃসর্ত আত্মদান ছিল তাঁর জীবনের সারাৎসার,—উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলিতে তারই কথঞ্চিত আভাস আমরা পেয়েছি। কালের নিকষে যাচাই হয়ে ঐ কথাগুলি সেদিনের চেয়ে আজ আরও গভীর তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে গেছে;—কর্মবীর নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মূর্তির ভিতর হতে যে মহাধ্যানী সুভাষের রূপ দেশবাসীর প্রত্যয়ের দ্বারে উন্মোচিত হচ্ছে,—সেই তাঁর সত্যতর রূপের পরিচয়ের আলোয় ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর যৌবনের উক্তিগুলিও গভীরতর দীপ্তিতে আজ দ্যুতিমান। ভারতবর্ষের mission ও মানব-সভ্যতার ক্ষেত্রে তার স্থান সম্পর্কে তাঁর উক্তিগুলিকে আজ আর কোনোক্রমেই লঘু করে দেখা সম্ভব নয় তাই, বরং নতুন করে সেগুলি সম্পর্কে অবহিত ও অভিনিবিষ্ট হতে হবে আমাদের।

তিন

ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ যত গৌরবোজ্জ্বল বলেই সুভাষচন্দ্রের বিশ্বাস থাকুক না কেন, সমকালীন পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম বাতীত বর্তমানে আর কোনো উপায় তিনি দেখতে পাননি। ভারতবর্ষকে স্বাধীন হতেই হবে, তার সাধনাকে সফল করার জন্যই স্বাধীনতা তার প্রয়োজন। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার পথে ইংরেজ অনড় বাধার মতো বসে আছে;—সেই ইংরেজের সঙ্গে স্বাধীনতার প্রশ্নে কোনো আপস চলতে পারে না। ১৯৪৫ সালের

৪ঠা এপ্রিল আই. এন. এর একটি ঘোষণাপত্রে ইংরেজ সম্পর্কে তাঁর শেষ নির্দেশ প্রচারিত হয়েছিল এই মর্মে: "ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি শুধু ভারতেরই দুশমন নয়, এশিয়ারও দুশমন। একমাত্র ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদকে খতম করতে পারলেই এ যুদ্ধ শেষ হবে এবং পৃথিবীতে শান্তি আসবে।" (বাংলাকেতন—টিই টঈ রচিত 'স্প্রিং-ফিং টাইগার' গ্রন্থের সুভাষ মুখোপাধ্যায় কৃত বঙ্গানুবাদ, পৃঃ ২৭৮)। ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ এশিয়ার চরম শত্রু এবং তাকে আঘাতের পর আঘাত দিয়ে চূর্ণ করতে পারলেই ঘটবে এশিয়ার মুক্তি এই সিদ্ধান্তে তিনি ১৯৪৪ সালে আসেননি, তার বহু পূর্বেই এ বিষয়ে তিনি মত স্থির করে ফেলেছিলেন। ১৯৪২ সালের ৪ই ডিসেম্বর জার্মাণ সরকারের নিকট লিখিত এক পত্রে তিনি লিখেছিলেন: ভারতবর্ষ হচ্ছে তেমন একটি স্থান, যেখানে দাঁড়িয়ে সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে এবং পরোক্ষভাবে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদকেও আঘাত করা যায়।" (The Indian Struggle p. 462) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে জগদ্বাসী সচেতন হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালে ও তারপর। তৎপূর্বে আমেরিকানরাও পৃথিবীর ওপর আধিপত্য বিস্তারের স্বপ্ন ঘোরালোভাবে দেখেনি। কিন্তু ইংলণ্ড একটি পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী দেশ, এবং ভারতবর্ষকে শাসন ও শোষণ করতে সে এতদূর অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে সাম্রাজ্যবাদীর দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন অপর কোনো দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই ভারতবর্ষকে দেখা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সুভাষ তাই বহু পূর্ব হতে গান্ধীপন্থী ও অন্যান্য আপসপন্থীদের আপস প্রয়াস যে সফল হতে পারে না এবং সফল হলে তা যে ভারতের সর্বনাশসাধনের ভিতর দিয়েই হবে এ বিষয়ে সতর্ক করে আসছিলেন। ১৯৩৩ সালের ১০ই জুন লণ্ডনে অনুষ্ঠিত ভারতীয় রাজনৈতিক সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন: ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে এমন কোনো সমস্যার্থের বন্ধন নেই যাতে উভয় দেশের ভিতর আপস সম্ভব ও কাম্য হতে পারে।" (Indian Struggle, p. 365) কেন ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের কোনো সমঝোতা হতে পারে না তার কারণস্বরূপ নয়টি সুস্পষ্ট ও বাস্তব হেতুর উল্লেখ তিনি সে সময়েই করেছিলেন। আমাদের মনে রাখতে হবে যে এর পূর্বে ১৯২৮ সালেই কলকাতার কংগ্রেসে বৃটিশ ডোমিনিয়নের অন্তর্ভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রের পরিবর্তে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে ভারতের অভ্যুত্থানের প্রস্তাব তিনি উপস্থাপিত করেছিলেন। সেই প্রস্তাবেই অখণ্ড স্বাধীনতা ও আপসহীন সংগ্রামের সিদ্ধান্ত তিনি চূড়ান্ত আকারে দেশবাসীকে জানিয়েছিলেন;—তাঁর একত্রিশ বৎসর বয়সের সেই সিদ্ধান্তে তিনি আজীবন দৃঢ়ই ছিলেন। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী আনীত ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস প্রস্তাবের সংশোধন করে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করে তিনি বলেছিলেন: "আমার সংশোধনী প্রস্তাব যদি গৃহীত হয় তবে তার ফলাফল স্বীকার করে নিতে এবং সমস্ত দায়িত্ব বহন করতে আজ আমি প্রস্তুত।..... আমরা আন্তরিক ভাবে অনুভব করি আজ সেই সময় উপস্থিত হয়েছে যখন ভারতকে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করতে হবে যে সে কী চায়,—ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস নয়, স্বাধীনতা।.....আমরা অনুভব করি এবং আমাদের বক্তব্য এই যে এক দিনের জন্যও স্বাধীনতার পতাকাকে অবনমিত করতে আমরা প্রস্তুত নই। এই সভার ভোটে আমরা হারি বা জয়লাভ করি তাতে আমাদের কিছু এসে যাবেনা। এখানকার ভোটের ফলাফলের প্রতি তরুণ সম্প্রদায় ভ্রূক্ষেপ করবে না, কেননা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার দায়িত্ব তারা মাথায় তুলে নিয়েছে।—দেশের তরুণ মানসে এক নতুন চেতনার আবির্ভাব ঘটেছে। অন্যের মতো পরিচালিত হতে তারা প্রস্তুত নয়। তারা উপলব্ধি করেছে এই কথা যে তারাই

ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী, ভারতকে স্বাধীন তাদেরই করতে হবে এবং এই নতুন চেতনা নিয়ে তারা সম্মুখের কঠোর কর্তব্য উদ্‌যাপনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করছে।" (selected speeches of S. C. Bose, pp, 61—14) এই বক্তব্যের কোথা অস্পষ্টতা কিছু নেই ; লক্ষ্য ও লক্ষ্যসাধনের উপায়—উভয় বিষয়েই সুভাষচন্দ্রের স্বচ্ছ দৃষ্টির পরিচয় এই ভাষণে মিলবে। আরও আশ্চর্য হতে হয় এই দেখে যে এই বক্তৃতায়ই য়ুরোপের বুকে দ্বিতীয় মহাসমরের অনিবার্য আগমন এবং সেই যুদ্ধের সুযোগে ইংরেজকে চূড়ান্ত আঘাত হেনে তার অনিচ্ছুক হাত হতে ভারতের পূর্ণ ও অখণ্ড স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবার আহ্বান দেশবাসীকে তিনি জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন : "সমস্ত ঘটনাই এই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে যুদ্ধ বাধবেই। বহু কারণেই একথা আমি বলছি। প্রথমত, যে সব হেতুর দরুণ যুদ্ধ বাধে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সেই হেতুগুলি আজ বর্তমান। ভার্সাই চুক্তির দ্বারা যে মীমাংসা এসেছিল তাতে সকল দেশের জাতীয় আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয়নি। ইটালি, বলকান, রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারী প্রভৃতি দেশের জনগণ এতে সুখী হয়নি। তাছাড়া এশিয়ায় প্রশ্নও রয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে ধনতান্ত্রিক দেশগুলি একজোট হয়েছে। অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতাও চলছে। এই সব ঘটনা যুদ্ধের দিকে জগৎকে নিয়ে যায়। আমি আপনাদের বলছি অস্ত্রসজ্জা বন্ধের কথা একটা বিরাট প্রহসন মাত্র। আসল সত্য এই যে স্বাধীন দেশগুলি আর একটি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ভারতবর্ষকে যদি সচেতন ও সতর্ক থাকতে হয় তবে আমাদের একটি নতুন মানসিকতা সৃষ্টি করতে হবে,—সেই মানসিকতা যা চায় শুধু পূর্ণ স্বাধীনতা। তা করা সম্ভব একমাত্র আদর্শকে পরিষ্কার ও স্বার্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে।" (উক্ত বক্তৃতা, উক্ত গ্রন্থ)। আর একটি মুহূর্তও আমাদের নষ্ট করা চলবেনা—একথাও তিনি সেসময় বলেছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কোন আদর্শ তিনি অনুসরণ করবেন—একত্রিশ বছর বয়সের কোনো যুবকের মুখে সেকথা শুনতে পাওয়া হয়তো অস্বাভাবিক মনে হয়, কিন্তু সুভাষের কথা যে এ বিষয়ে কতখানি তাঁর সত্যদৃষ্টির পরিচায়ক ছিল তা কালের কষ্টিপাথরে এতদিনে যাচাই হয়ে গেছে।

সুভাষ তাঁর এই স্বচ্ছ ও গভীর দৃষ্টি নিয়ে ভারত সম্পর্কে ইংরেজের নীতি ও ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকা সম্পর্কে পরিণত বয়সে যখন বিশ্লেষণ করেছিলেন তখন তাঁর মনে এবিষয়ে আর বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতের মধ্যে কোনো সমঝোতা, কোন আপস, কোনো শান্তিপূর্ণ মীমাংসাই হতে পারে না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলতে হবে—দেশবাসীর কাছে এই ছিল তাঁর বক্তব্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পরাধীন ভারতের সংগ্রাম-কৌশল কী হবে সে বিষয়ে তিনি ১৯২৮ সালেই চিন্তা করেছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন সত্যই এল তখন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের উপযুক্ত কর্মপন্থা উদ্ভাবনে তাঁর মন দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি। দেশ হতে অন্তর্ধানের পর ১৯৪২ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি আজাদ হিন্দ রেডিও মারফৎ দেশবাসীর উদ্দেশে প্রচারিত বেতার ভাষণে অবিচল প্রত্যয়ে তিনি ঘোষণা করেছিলেন : "আধুনিক ইতিহাসে স্বাধীনতার মূর্ত ও ক্রূরতম শত্রু এবং প্রগতির পথে দুস্তরতম বাধা হচ্ছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ মানবজাতির এক অতি বৃহৎ অংশকে দাসত্বের নিগড়ে বেঁধে রেখেছে এবং একমাত্র ভারতবর্ষেই মানবজাতির এক পঞ্চমাংশের ওপর নিষ্ঠুরতম দমন ও অত্যাচার চালাচ্ছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ হয়তো অন্যান্য জাতির সাময়িক শত্রু হতে পারে, কিন্তু ভারতের সে চিরন্তন শত্রু। এই দুইয়ের মধ্যে শান্তি ও সমঝোতা কিছুতেই হতে পারে না। এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের যারা শত্রু তারাই ভারতের স্বাভাবিক বন্ধু—যেমন বৃটিশ সাম্রাজ্য-

যাদের মিত্রেরা আজ আমাদের স্বাভাবিক শত্রু।" (Indian Struggle, p. 441) এই কথাটি আজ হয়তো আরও বেশি স্মরণযোগ্য। ভারতবর্ষের স্বার্থের দিক হতে বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিচার করতে বসলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে লঘু করে দেখা যায় না। কেননা ভারতের আজকের সমস্যাগুলি সমস্তই প্রায় বৃটিশের সৃষ্টি এবং এই সমস্যাগুলি জীইয়ে রাখতেই ইংলণ্ড কৃতসঙ্কল্প। ভারত-বিভাগ, কাশ্মীর সমস্যা, পাকিস্তান ও ভারতের ভিতরকার শঙ্কিতা, নাগাসমস্যা, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেও পাঞ্জাবে বীভৎসতম সাম্প্রদায়িকতা দাঙ্গা এবং তার ফলে ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রকেই উদ্বাস্তু সমস্যার ভারে জর্জরিত করে তোলা, কমনওয়েলথের নাম করে ভারত ও পাকিস্তানকে বাস্তবে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস সম্পন্ন দুটি দেশ করে রাখার অপপ্রয়াস, ভারতের স্টার্লিং ব্যালান্স অপহরণ করে বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্কটের মধ্যে ভারতকে ঠেলে দেওয়া, ভারতের সামরিক বাহিনীকে কার্যত দুর্বল ও অকেজো করে রাখা, অন্যান্য বাণিজ্যিক শর্তের সুযোগে ভারতের অর্থনীতিতে বৃটিশ পুঁজিবাদের অটল প্রতিষ্ঠা বাড়ানো,—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বৃটিশের এই সকল কর্মপন্থার কথা কারও অজানা নয়। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধে ইংলণ্ডের ভূমিকা দেখে সমস্ত ভারতে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জেগেছিল। ইংলণ্ডের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ মীমাংসা ও আপস করার ফল ভারতবর্ষের পক্ষে কী দাঁড়িয়েছে তা শুধু ভারত বিভাগ দিয়েই বিচার করলে চলবেনা।—উত্তর-স্বাধীনতা যুগের ভারত ও পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত শোষণমূলক জনবিরোধী রাষ্ট্রব্যবস্থা দিয়েও বিচার করতে হবে। কেননা এই উভয় দেশই মূলত কেবলমাত্র বৃটিশের দেওয়া বুরোক্রেসীই নয়, রাষ্ট্রব্যবস্থাকেও অক্ষুণ্ণ রেখেছে। ভারত, চীন ও পাকিস্তান আজ পরস্পর বিবদমান ;—চীনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য বন্ধ, পাকিস্তানের সঙ্গেও ভারতের সম্পর্ক ছিন্ন,—অথচ ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারত পাকিস্তানের বাণিজ্য শুধু অটুটই নয়, ক্রমবর্ধমান। ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই কমনওয়েলথভুক্ত দেশ, কিন্তু তাদের ভিতর শত্রুতা শুধু বেড়েই চলেছে, অথচ কমনওয়েলথ সম্পর্কের দোহাই দিয়ে ইংলণ্ড উভয় দেশের অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতিতে নিজের অনুপ্রবেশের বন্দোবস্ত পাকা করে নিয়েছে। ইংলণ্ডের কূটকৌশল এত নিপুণ যে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষকে বাহ্য পরিচয়ে সে স্বাধীনতা দিয়ে চলে গেছে বটে, কিন্তু ভারত ও পাকিস্তানের নীতি নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি রেখে দিয়েছে নিজের হাতে। সুভাষচন্দ্র তাই তাঁর পূর্বোদ্ধৃত বক্তৃতায় দেশবাসীকে এ বিষয়েও সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে ভারতে এমন সব লোক আছে যারা মুখে চীন, রাশিয়া বা অন্যান্য দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব বাড়াবার পরামর্শ দেয় ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে তারা বৃটিশ স্বার্থের অনুকূলেই কাজ করে। কে না জানে যে এমন কি ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনও সুদীর্ঘকাল ধরে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা।

চার

কেউ কেউ বলতে পারেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ভারতবর্ষে ইংরেজের প্রভাব অনেক পরিমাণে দূর হয়ে সেখানে এসেছে আমেরিকান প্রভাব, এবং অধুনা আমেরিকার কর্তৃত্বই এদেশে ক্রমবর্ধমান। ঠিক এই রকমটাই যে ঘটবে—বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে সুভাষচন্দ্র সেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসে আমেরিকা-বাসীদের উদ্দেশে প্রদত্ত তাঁর শেষ ভাষণে তিনি বলেছিলেন : 'the post-war plans of the Anglo-Americans are most dangerous...The Anglo-American powers want not only to disarm their enemies altogether, but they want also to provide for

an international force, really to strike at any time, for preserving the status quo. In such a new order, where do the 389 millions of Indian people stand? For them, the order will mean not only the perpetuation of political enslavement, and economic exploitation, but it will also mean more power in the hands of India's enemy for continuing and even tightening the political and economic slavery of India. (Amar Lahiri : Said Subhas Bose, p. 11) উদ্ধৃত অংশটি আমি বঙ্গানুবাদের বদলে সুভাষচন্দ্রের মূল কথাতেই উল্লেখ করলাম। অনুবাদে ভুল বা বিকৃতি ঘটতে পারে; কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর সুদূরদৃষ্টি কতখানি সত্য প্রমাণিত হয়েছে, পাঠকের বিচারের জন্য তাঁর নিজস্ব ভাষা তাই অবিকৃতভাবে উদ্ধৃত করেছি। ঐ বক্তৃতায় তিনি আরও বলেছিলেন যে, আমেরিকার ব্যাতিমান, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বলতে সুরু করেছেন যে বর্তমান শতাব্দীটি "আমেরিকান শতাব্দী" বলে ইতিহাসে অভিহিত হবে। "তাঁরা দাবী করেন যে আগামী কয়েক দশক ধরে জগতে কর্তৃত্ব করবে আমেরিকা। If this theory of the "American Century" correctly represents the view of the political, economic and military brains-trust of the United States today—then the reaction of the outside world to it can better be imagined then described. It is hardly necessary to say that the outside world can have no interest in the "American Century". India certainly will not welcome American hegemony in the world which will buttress British domination over India—even if the British hand over part of the spoils in India to America, in order to repay in part what she has been borrowing from America in the course of this war." (উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১২) শুধু ভারতবর্ষ নয়, দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ায় যুদ্ধোত্তর কালের ইঙ্গ-মার্কিন চক্রের নীতি কী হবে সুভাষচন্দ্র সে সম্পর্কেও ঐ বক্তৃতায় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এবং তাঁর প্রত্যেকটি কথাই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। আরও একটা দিকে লক্ষ্য রাখলে সুভাষচন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণীর গভীরতর দিকটি আমরা বুঝতে পারি। যুদ্ধোত্তর-কালে আমেরিকার পক্ষভুক্ত বহু দেশ রয়েছে:—পশ্চিম জার্মানী, ইটালি, জাপান ইত্যাদি। কিন্তু একমাত্র ইংলণ্ডই সারাবিশ্বে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বস্ততম সহচর; রক্ষণশীল বা লেবার পার্টি ইংলণ্ডের সরকার যে-ই পরিচালনা করুক না কেন, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সহায়ক রূপে ইংলণ্ডকে প্রতিষ্ঠিত করতে দুই দলই সমান উৎসাহী। আসলে ইংলণ্ড আমেরিকা এই উভয় দেশই সম্মিলিতভাবে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ গড়ে তুলেছে,—এই দুটি দেশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের বন্ধনে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ইংলণ্ডের East of Suez নীতিতে আমেরিকার উৎসাহ কম নয়: এবং ভিয়েৎনাম যুদ্ধে আমেরিকার কার্যক্রমের প্রতি সমর্থন জানাতে ইংলণ্ডের রাষপন্থী উইলসন সরকার কোনদিন পিছপা হয়নি।

পাঁচ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের আরও কয়েকটি পরিবর্তন সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে যুদ্ধান্তে এশিয়া ও আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদ প্রচণ্ড মার খাবে; বহু দেশের স্বাধীনতা আসবে, ভারতেরও আসবে। ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিতভক্ত করার যে চক্রান্ত বৃটিশ করেছে সেবিষয়েও তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন। যুদ্ধের পর ইংলণ্ডকে একটি তৃতীয় শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হবে এবং ইউরোপে তার বিশেষ কোনো প্রতিপত্তি থাকবে না এবিষয়েও তিনি সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করেছিলেন। (Great Britain will remain as the third class power in

Europe, with no influence on the continent"—Memorandum to German Govt, 9th April, 1941—Indian Struggle p. 425)।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে আর একটি নতুন সম্ভাবনার বিষয়ে তাঁর লেখা বা বক্তৃতায় কোনো ইঙ্গিত পাইনি। সে হল (১) চীনের কমিউনিস্ট বিপ্লব (২) পূর্ব য়ুরোপে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলির প্রতিষ্ঠা (৩) রাশিয়া ও চীন—বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন এই দুই ভিন্ন কেন্দ্র হতে পরিচালনার জন্য কমিউনিজমের ভিতর অন্তর্দ্বন্দ্ব। যুদ্ধের শেষ দিকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে দাঁড়িয়ে সুভাষচন্দ্র দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেছিলেন যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধবে এবং সে যুদ্ধ হবে কমিউনিজম ও পুঁজিবাদের সঙ্গে ;—প্রধানতঃ রাশিয়া ও ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে। কিন্তু সে যুদ্ধ যে দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়ার ভিয়েৎনামের মতো দেশকে কেন্দ্র করে চীন বনাম আমেরিকার যুদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে পারে—১৯৪৪ সালেও একথা বোঝার উপায় ছিল না। তদুপরি চীন যে ভারতবর্ষে আক্রমণ করবে, এবং ভারতেরই এক অংশ নিয়ে তৈরী পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের সঙ্গে মিতালিবদ্ধ হয়ে চীন ভারতবর্ষকে বাতিব্যস্ত করে তুলবে, ১৯৪৪ সালে একথাও বোঝা সম্ভব ছিল না। এই ঘটনাগুলি নতুন ঘটেছে বলে এমন সব সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে সুভাষচন্দ্রের পূর্বের রচনা বা ভাষণগুলিতে যে সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিত নেই। মনে রাখতে হবে চীনের জাতীয়তাবাদ এবং সম্ভবত মাও সে তুঙের নেতৃত্বে পরিচালিত চীনের বৈপ্লবিক আন্দোলনকে তিনি সমর্থন করতেন এবং চীনের এক সঙ্কটকালে তিনিই প্রথমত উদ্যোগী হয়ে ডাঃ কোটনীসের নেতৃত্বে একটি মেডিক্যাল মিশন চীনে পাঠিয়েছিলেন। যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের সকল রচনা ও ভাষণ হতে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে তিনি কমিউনিস্ট বা মার্ক্সবাদী না হলেও এবং মার্ক্সবাদের আদর্শ হতে ভিন্নতর এক সমন্বয়বাদী আদর্শে বিশ্বাসী হলেও, রাশিয়া ও চীনের কমিউনিস্ট বিপ্লবের প্রতি ছিলেন সহানুভূতিশীল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির জাতীয়তাবিরোধী আচরণ ও নীতি তাঁকে গভীরভাবে ক্ষুব্ধ করলেও কোনো কমিউনিস্ট রাষ্ট্র যে ভারতের শত্রু হয়ে দাঁড়াতে পারে ও বাহির হতে ভারতকে আক্রমণ করতে পারে এরকম সম্ভাবনা তাঁরা মনে কখনো দেখা দেয়নি।

আজকের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকার পাশাপাশি চীন, রাশিয়া ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের তরফ হতে আগত বিপদ সম্পর্কেও আমাদের সমান সচেতন থাকতে হবে। এই প্রবন্ধের সুরুতেই বলেছি যে সুভাষচন্দ্র জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিকোণ হতে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতেন এবং জাতীয়তাবাদের প্রতি দুপক্ষ হতে যে আক্রমণ আসে সেবিষয়েও আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন। সেই দুই পক্ষ হল—আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্রবাদ এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিজম। ধনতন্ত্রবাদ যে কীভাবে সাম্রাজ্যবাদের রূপ নেয় আমাদের মতো একদা ঔপনিবেশিক দেশগুলির অভিজ্ঞতা সেবিষয়ে যথেষ্ট। কিন্তু কমিউনিজম যে কীভাবে নতুন সাম্রাজ্যবাদের রূপ নেয়, ভারতবর্ষকে তা আজ নতুন করে অবহিত হতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে পূর্ব য়ুরোপের দেশগুলি কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যবাদের কবলে পড়ে আর তাদের হৃত স্বাধীনতা ফিরে পায়নি ; এশিয়ায় তিব্বতের ভাগ্যও ঘটেছে একই রকম। কমিউনিস্ট লাল সৈন্যবাহিনী আজ ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে পতাকা বহন করে নিয়ে যেতে উদ্যত সে পতাকা নবীন সাম্রাজ্যবাদের লাল পতাকা ;—বিপ্লব এবং প্রগতির কথাটা সেখানে নেহাৎই রণকৌশলের অঙ্গমাত্র।

ভারত ও দক্ষিণ এশিয়ার সমস্ত দেশগুলির পক্ষে কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যবাদ আরও বিপজ্জনক এই কারণে যে এই সব দেশগুলিতে বহু বছরের চেষ্টায় গড়ে উঠেছে ঐ সাম্রাজ্যবাদীকে আহ্বান করে আনার মতো সুগঠিত কমিউনিস্ট দল, যারা বামপন্থী ও প্রগতিশীল বলেই জনসাধারণের নিকট পরিচিত। সুতরাং কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যবাদের প্রসারিত সীমা যেমন ভারতবর্ষের উত্তর সীমা-রেখার ভিতর ঢুকে পড়েছে, তেমনি ভারতবর্ষের অভ্যন্তরেও —পূর্বে, দক্ষিণে, উত্তরে—সে তার বিষাক্ত থাবা গড়ে তুলেছে। সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে স্বপ্ন দেখতেন তা কমিউনিস্ট কবলিত ভারতবর্ষে কোনোদিন রূপ পাওয়া সম্ভব নয়,—বস্তুতঃ ভারতের আত্মাকে ধ্বংস করা ছাড়া কমিউনিজমের আর কোনো ব্রত নেই। এবং এই মহতী বিনষ্টির ব্রত উদযাপনে শুধু চীন একাই উৎসাহী নয়, রাশিয়াও সমান উদ্যোগী। চীন ও রাশিয়ার ভিতর অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকতে পারে, তাদের জাতীয় ও রাষ্ট্রস্বার্থের ক্ষেত্রে বিরোধ থাকতে পারে,—কিন্তু এশিয়ার আত্মাকে ধ্বংস করার অভিযানে চীন ও রাশিয়া উভয়েই একমত ও পরস্পরের সঙ্গী; ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী এক এবং ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট শাসন প্রবর্তনের ব্যাপারে উভয় দেশই সমান আগ্রহী, ও উৎসাহদাতা। কাজেই ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ এশিয়ার ব্যাপারে রাশিয়া ও চীনকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে দেখলে ভুল হবে;—এই দুটি দেশ ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের মতো জগতের বুকে এক নতুন কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যবাদের ধারক ও বাহক। এদের মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব তেমন স্বার্থগত অন্তর্দ্বন্দ্ব ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যেও আছে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের War Studies-এর অধ্যাপক মাইকেল হাওয়ার্ড মার্কিণ চাপে বৃটিশ স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার অভিযোগ করে লিখেছেন: "The extent to which the economic vulnerability of a Labour administration makes it particularly sensitive to the pressures of Washington—the deployment and structure of British forces will be devised to fit into the needs of a system whose centre of gravity and ultimate control lies in the United States." এবং আরও ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করেছেন: "Is it really sound policy for this country to plunge repeatedly into debt in order to please the Americans by remaining a world power?" (Arms and Man, Encounter, June, 1966, pp. 6-7) ইংলণ্ডের বুদ্ধিজীবী শ্রেণী আমেরিকার সঙ্গে ইংলণ্ডের স্বার্থ-সংঘাত সম্পর্কে যে অতিশয় সচেতন, এ তারই প্রমাণ। কিন্তু তাতে ইংলণ্ড ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী আঁতাত কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি। চীন ও রাশিয়ার বেলায়ও তা হবে না।

এই কমিউনিস্ট সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রস্তুতি ভারতের ক্ষেত্রে কোন ধারায় চলছে সম্প্রতি তার একটি ইঙ্গিত পাওয়া গেছে ভারত সরকারের গোপন একটি পুলিশ রিপোর্টে। সেই রিপোর্ট থেকে নিয়ে দেওয়া উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি একটী সাপ্তাহিক পত্রিকা থেকে। তাতে আছে "The latest police note on the subject, I understand, refers to a big conspiracy being hatched in the Eastern part of the sub-continent. The mastermind behind the conspiracy, it is stated, are using the genuine grievances of the people in four areas —Bhutan, Sikkim, East Pakistan and West Bengal—to stir widespread disturbances, since the grevaances are genuine many honest people are being drawn into the movements that are developing on local issues. Little do they know of the sinister intent of these movements. But

at a favourable moment all these movements will be synchronised and then—then of course the external enemies will step in from behind the scene and take over.'' (Now, 5th August 1966)

সুতরাং সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসরণে বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতের প্রেক্ষাপটে ভারতবর্ষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয়ের কথা বিচার করে এই সিদ্ধান্তে আমরা আসতে পারি যে ভারতবর্ষের যে জীবনব্রত বা মিশন বা আদর্শ তা মানবজাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের জন্যই নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন, কিন্তু সেজন্য ভারতবর্ষকে স্বাধীন, শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করে গঠন করা আগে দরকার। বর্তমান ভারতসরকার এ তিনটি কর্তব্যেই বিফল হয়েছেন। আজকের ভারতবর্ষ দরিদ্র, দুর্বল এবং খণ্ডিত, ফলে ইঙ্গ-মার্কিন ও কমিউনিস্ট রুশ-চীন—এই উভয় পক্ষীয় সাম্রাজ্যবাদের শিকারে পরিণত। এই অবস্থায় আমাদের সেই বলিষ্ঠ ও উন্নত জাতীয়তাবাদকেই অবলম্বন করতে হবে সুভাষচন্দ্র ছিলেন যার প্রবক্তা ও সাধক। এ বিষয়ে কোনো দ্বিধা, সংশয় বা আপসকামী মনোভাবের পরিচয় দিলে তা হবে ভারতবর্ষ তথা মানবসভ্যতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সমতুল্য।

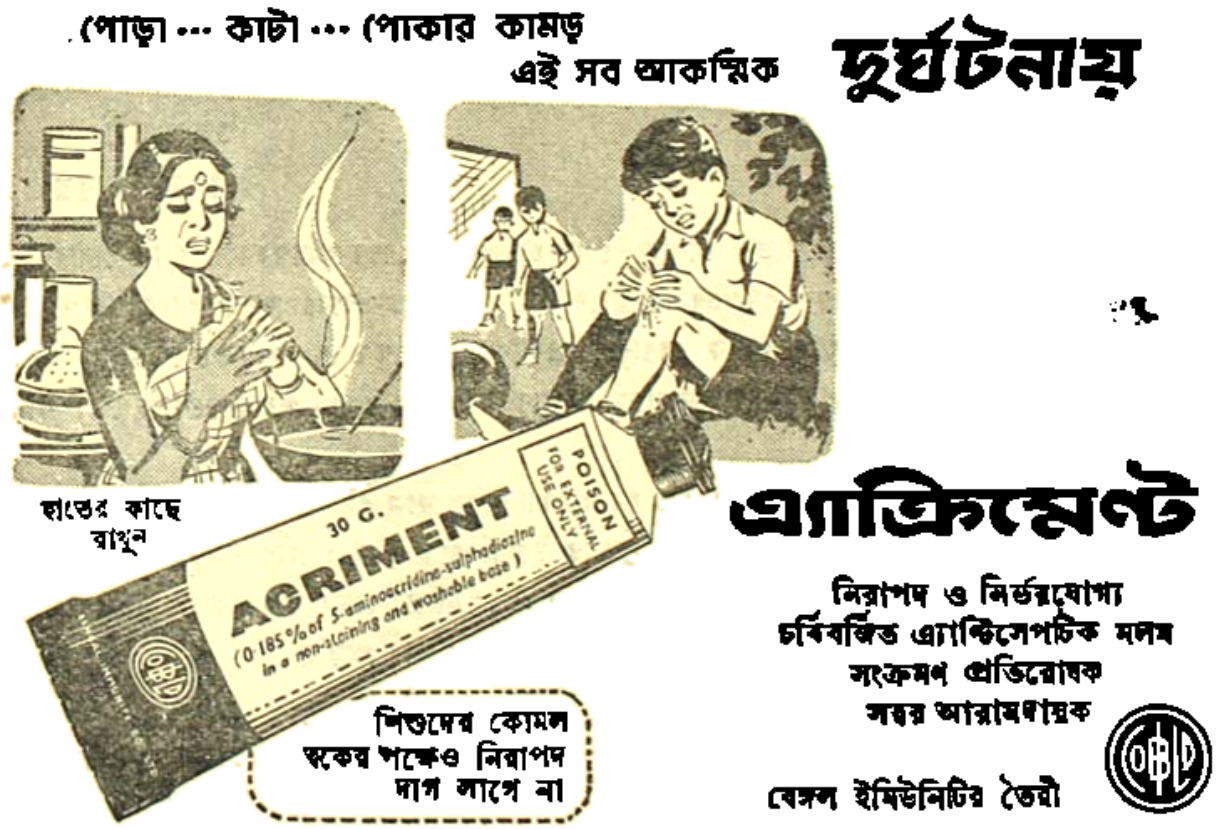

রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র

ও

"UTTARAYAN"
Santineketan, Bengal

কল্যাণীয়েষু ৮।১১।৩৬

সুজিত, বর্তমান অবস্থায় তোর এখানে আশা সম্ভব হবে না সেকথা স্বীকার করি। কিন্তু যে মুহূর্তে সম্ভব হবে তখনি আসা চাই। কারণ বুঝিয়ে বলি।—শাস্ত্রচর্চ্চার চেয়ে সমাজসেবা বড়ো কাজ। আমাদের এখানে সে কাজের পত্তন আছে—ভালো রকমেরই আছে। কালীমোহন এই কাজের ভার প্রাপ্ত। তাঁর বয়স হোলো ৫৫। তিনি বলছিলেন তাঁর সহকারিতায় উপযুক্ত লোকের দরকার; কারণ তাঁর অবর্ত্তমানে এত বড় কাজ কাঁধে নিতে পারে এমন বলিষ্ঠ কাঁধ এবং করুণাপ্রবণ হৃদয় পাওয়া যাচ্ছে না, পাওয়া দুরূহ হবে। এই ভার তোকেই নিতে হয়। অনেক চিন্তা, চেষ্টা ও ত্যাগের উপর এই বৃহৎ অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত – হঠাৎ এটাকে নষ্ট হতে দিতে পারব না। পল্লীসেবায় যাঁরা তোকে নিযুক্ত করেছেন তাঁদের বুঝিয়ে দিতে পারবি কাজটা একই, কেবল স্থানটা স্বতন্ত্র। এখানকার কাজ বহু বিচিত্র, দূরব্যাপী এবং এর আয়োজনও বিপুল, এখানকার দায়িত্ব নেবার জন্যে তুই যদি প্রস্তুত হতে পারিস তা হ'লে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে পরকালের কথা ভাববার অবকাশ পাব। *

শুভানুধ্যায়ী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[* যখন "চীনভবন" প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলেছে—সেই চীনভবনে গবেষক-অধ্যাপকরূপে যোগ দেবার জন্য শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়কে, তদানীন্তন কর্মসচিব শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিশ্বভারতীর অন্যতম আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন পত্র দেন। সেই পত্রের কথা – সুজিতবাবুকে লেখা—রবীন্দ্রনাথের (২০শে ভাদ্র, ১৩৪৩—সেপ্টেম্বর ১৯৩৬খ্রী:) পত্রে এইরূপ উল্লেখ আছে : "এখানকার কাজে তোমাকে আহ্বান করে পত্র লেখা হয়েছে—পেয়েছ বোধ করি। বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

এর উত্তরে সুজিতবাবু লেখেন—"শাস্ত্রচর্চার চেয়ে সমাজ সেবা বড়ো কাজ এই বলে আপনি আমাকে সমাজ-সেবার কাজে (১৯৩২ খ্রী:) পাঠিয়ে দেন,—("যে একটা লুপ্তগ্রন্থ উদ্ধার করে সংসারে কার কতটুকু উপকার হবে। তার চেয়ে দুর্ভাগাদের সেবা কর—জীবন তোর সার্থক হয়ে যাবে।" "রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কার সমিতি" দ্রষ্টব্য—অগ্রহায়ণ, আষাঢ় সংখ্যা ১৩৭০) এখন কেন শাস্ত্রচর্চার কাজেই ডাকছেন—এতে আমি ধাঁধায় পড়েছি।"

এরপর রবীন্দ্রনাথ ঐ পত্র লেখেন।

সুজিতবাবু শ্রীনিকেতনের কাজে যোগ না দিয়ে—চীনভবনের কাজেই যোগ দিয়েছিলেন এবং এখন পর্যন্ত সেখানকার কাজেই নিযুক্ত আছেন।]

আদর্শবাদের দ্বন্দ্ব ও দল ও নেতা

[স্বাধীনতা-পূর্ব যুগ]

সুনীল দাস

ফরাসী-বিপ্লবের রূপকার কার্লাইলের একটি বহু প্রচলিত উক্তি আছে: 'Revolution devours its own children.' অর্থাৎ বিপ্লব তার সন্ততিদের বিলোপ সাধন করে। পৃথিবীতে যে কয়টি মহৎ-বিপ্লব কিম্বা বৃহৎ-বিপ্লব ঘটেছে, তাদের সকলের ক্ষেত্রেই এই মূল্যায়ন বাস্তবানুগ। ফরাসী-বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার উদাত্ত আলোড়নের মধ্য থেকেই সমাজে ও রাষ্ট্রে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য উৎসারিত হয়ে সমাজে অন্যায়, অবিচার ও নিপীড়ন আহ্বান করে এনেছিল, যার ফলে দাহিত সাম্য ও মৈত্রীর পুনরুদ্ধারের জন্য নির্বাধ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে শৃঙ্খলিত করার বাধী দুর্বার হয়ে উঠে সমাজ-জীবনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অনিবার্য করে তুলেছিল। রুশ-বিপ্লব এই দুর্বার বাধীরই পরিণত ফলশ্রুতি। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মেরু থেকে সাম্যের মেরুতে প্রত্যাবর্তন, সামাজিক ন্যায় বিচারের আদর্শের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি-স্বার্থের পরাজয় ঘটানো, ব্যষ্টির পশ্চাদপসরণে সমষ্টি সেই শূন্য স্থান পূর্ণ করলো। কিন্তু অনতিকালেই ব্যষ্টি ও সমষ্টির স্বার্থ সমন্বয়ের ব্যর্থতার পরিণতিতে সমষ্টির কারাগারে ব্যষ্টিই যে শুধু বন্দী হলো তা নয়, ব্যষ্টির অস্তিত্বরক্ষার আয়োজনও সম্পূর্ণ হোলো। রুশ-বিপ্লবের সাম্যের আদর্শের প্রয়োগ যে দিন থেকে স্বাধীনতার প্রাণদণ্ড ঘোষণা করলো, সেদিন থেকেই এই বিপ্লব আদর্শভ্রষ্ট। সেই অবধি স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার করে সাম্য ও স্বাধীনতার সমন্বয়ের নিরন্তর প্রচেষ্টা চলছে পৃথিবীতে, যে কোনো তার স্বাক্ষরও পাওয়া গেছে। সাম্য ও স্বাধীনতার বৈপরীত্য নেই, সোভিয়েত সমাজেও এই আলোড়ন অন্তঃসলিলা হয়ে বয়ে চলেছে। সাম্য ব্যতিরেকে স্বাধীনতা যেমন অচল, স্বাধীনতা বর্জিত সাম্যও তেমনি অবাস্তব, সে-সাম্য ব্যষ্টির পীড়ন যন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। রুশ-বিপ্লবের এই আদর্শচ্যুতির ফলেই সাম্য ও স্বাধীনতার সমন্বয়ের আদর্শ নিয়ে পৃথিবীতে আগামী বিপ্লবের প্রয়াস চলেছে।

বিপ্লবের বৃহত্তর ক্ষেত্রে আদর্শবাদের দ্বন্দ্ব, তার রূপান্তর ঘটিয়েছে। অন্যকালে ভাষায় কার্লাইল সে-কথাই বলতে চেয়েছেন। বিপ্লবের আদর্শের ক্ষেত্রে যে কথা সত্য, বিভিন্ন দেশের দলের আদর্শের ক্ষেত্রে এবং দলের নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও সেই রূপান্তর বার বার ঘটেছে এবং এই রূপান্তরের পথে আদর্শবাদের দ্বন্দ্ব আত্মপ্রকাশ করেছে; আদর্শের রূপান্তর নেতৃত্বের পরিবর্তন এনেছে। ভারতবর্ষেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। দল ও আদর্শ পরস্পর অন্তরঙ্গ সহচর। আদর্শ ছাড়া দল হয় না; হয়তো কোনো ব্যক্তিকেন্দ্রিক দল গড়ে উঠতে পারে কিছু সময়ের জন্য। কিন্তু তার অকালমৃত্যু নিশ্চিত। তেমনি নিরালম্ব আদর্শ অনতিকালেই শূন্যে মিলিয়ে যাবে। দল, সঙ্ঘ কিম্বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান আদর্শের অবলম্বন। দলগঠনে পরিচ্ছন্ন আদর্শ চাই। 'মানুষকে প্রেরণা দেয় আদর্শ, দুঃখ ও বিপদকে তুচ্ছ করবার শক্তি দেয় আদর্শ। আদর্শই মানুষকে ধরে রাখে, সেখানে

অস্পষ্টতা থাকলে দলে ভাঙন ধরতে বিলম্ব হয় না। আদর্শের ক্ষেত্রে জোড়াতালি চলেনা।

দল ও আদর্শ হলেই চলবে না, দুষ্ট নেতৃত্বও চাই। দল যেমন সাধারণের চালক, দলের পরিচালনা করবেন নেতা। দলের যিনি প্রমুখ যিনি বেশী সচেতন, দৃপ্ত প্রত্যয়ের দৃঢ়তায় যিনি দলের মনে আত্মবিশ্বাস স্থাপন করতে পারবেন এবং যিনি সময়োপযোগী কর্মপদ্ধতি উপস্থাপিত করে জনসাধারণকে এমনভাবে আকর্ষণ করতে পারবেন, দলীয় আদর্শ পূরণের জন্য, তিনিই নেতৃত্বের অধিকারী। এজন্য ত্যাগ চাই, নিভীকতা চাই, চাই বাস্তববুদ্ধি এবং শুধু ভাববার শক্তি নয়, গঠন প্রতিভার। আদর্শবিহীন দল যেমন হয় না, নেতা ব্যতীতও তেমনি দল হয় না।'

নেতার ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন আছে। "নেতার সঙ্গে দলের সম্পর্কটি অতি বিচিত্র ও জটিল।···কেউ বলেন নেতা দলের যন্ত্র মাত্র। তার স্বাধীন কার্যক্ষমতা নেই। কেউ বলেন, নেতাই সর্বেসর্বা দলের অপর সভ্যেরা কেবল আজ্ঞাবাহক। কিন্তু এই উভয়তের কোনটাই সত্য নয়। নেতা হলেন দলেরই প্রতিনিধি।···কোন কোন মানুষ সমাজকে আঘাত করে ভূমিকম্প সৃষ্টি করেন। রাসেল বলেছেন যে বিসমার্ক না জন্মালে য়ুরোপের ইতিহাস অন্যরূপ ধারণ করতো। তেমনি লেনিন না থাকলে রুশ দেশের ভাগ্য অন্যরূপ হোতো। প্রথম বিপ্লবের পর দেশে ফিরে এসে লেনিন তাঁর এই এপ্রিলের বিখ্যাত প্রবন্ধে (Thesis of April 5) রুশ-বিপ্লবকে নবরূপ দিয়েছিলেন। এতে তাকে সমস্ত বলশেভিকদলের বিরুদ্ধে যেতে হয়েছিল। এইপ্রসঙ্গে ট্রটস্কি লিখছেন : "The role of personality arises before us here on a truly gigantic scale" ঐতিহাসিক ঘটনা বিবর্তনে নেতার ব্যক্তিত্ব যে কি তা লেনিনের ইতিহাস থেকেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। ঘটনা স্রোতের ওপরে নেতার ব্যক্তিত্ব প্রবলভাবে হস্তক্ষেপ করে ইতিহাসের পরিণতিকে রূপ দেয়। কেরাসী-বিপ্লবেও মিরাবো ডানটন, ম্যারাট, রোবসপিয়ারদের নেতৃত্বের প্রভাবে বিপ্লব রূপ থেকে রূপান্তরে পরিণত হয়েছে।"[১]

আদর্শবাদ, দল ও নেতৃত্বের ভূমিকা ভারতীয় রাজনীতিতে মোটামুটিভাবে রূপ গ্রহণ করে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের পত্তনের পর। রাজা রামমোহন রায় জাতীয় জীবনে যে বহুমুখী নবজাগরণের প্রবল প্রবাহ সৃষ্টি করেছিলেন তার গতিবেগ উনবিংশতি শতাব্দীর সীমানা অতিক্রম করে বিংশ-শতাব্দীকেও সর্বতোভাবে সিক্ত করেছে। বাংলার সেই নবজাগরণের প্রাণস্পন্দন রাজনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ধর্মকে গভীরভাবে আলোড়িত করে জাতীয় জীবনে আত্মপ্রত্যয় ও স্বধর্মের যে দৃঢ়তা এবং স্বকীয়তা দান করেছিল তার দৃপ্ত আলোকে উদ্ভাসিত জাতীয় চৈতন্য, স্বাধীনতার সংগ্রামে নূতন পর্যায় সংযোজিত করে।

১৮৫৭ সালের প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ ব্যর্থ হওয়ার পর, গোটা দেশে বেশ কিছুদিন ত্রাসের রাজত্ব চলে এবং ইংরেজ সমগ্র জাতিকে নিরস্ত্র করে ফেলে। এই ঘটনার প্রায় ত্রিশ বছর পর আবেদন-নিবেদনের নীতি নিয়ে কংগ্রেস এলো। যারা কংগ্রেসের তখনকার নেতা কোনো নূতন বিপ্লব সংঘটনের উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের নেতৃত্ব নয়, নিয়মতান্ত্রিক পথে আন্দোলনেই তাদের নেতৃত্ব নিঃশেষিত হয়েছিল।

হোম রুল ও স্বাধীনতা—এই আদর্শবাদের দ্বন্দ্ব কংগ্রেসে কেন্দ্রীভূত হোলো। এরাই 'মডারেট' বা নরমপন্থী এবং 'একষ্ট্রিমিষ্ট' বা চরমপন্থী নামে জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছেন। গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, ফিরোজ শা মেহতা, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি আবেদন-নিবেদনের আদর্শে বিশ্বাসী। অপর প্রান্তে বাল গঙ্গাধর তিলক,

---

১। দল ও নেতা : অমিল রায়, ভারতী, পৌষ, ১৩৭৭

লালা লাজপত রায়, বিপিন চন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ চরমপন্থীদের নেতা। এই দুই নেতৃত্বের সংঘাতে কংগ্রেসের ঐক্য বিধাবিভক্ত হবে কিনা, সে-সংশয়ও দেখা দিয়েছিল। কংগ্রেসের কার্যক্রমে বিলাতীদ্রব্য বর্জন গ্রহণের দাবী এলো চরমপন্থী পক্ষ থেকে, এ-ছাড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থেকে স্বায়ত্ত-শাসনের নরমপন্থী আবেদনেই তাদের লক্ষ্য সীমিত রাখতে চরমপন্থীরা সম্মত নয়। তাদের লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা। ফলে, চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের আদর্শগত দ্বন্দ্ব ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে সংঘর্ষে পরিণত হয়। সুরাটে নরমপন্থীদের জয়, অতঃপর চরমপন্থাকে কিছুদিনের জন্য কংগ্রেসের বাইরে ঠেলে দিল।

কিন্তু ইতিমধ্যেই চরমপন্থী আদর্শ বিপ্লববাদের পথে বহুদূর প্রসারিত হয়েছে। ইংরেজ যতদিন কেবলমাত্র ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত ছিল, কিম্বা প্রশাসনিক কর্মে লিপ্ত ছিল, দেশের মানুষের মনে তার কোনো মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নাই কিন্তু ইংরেজ শাসন যেদিন থেকে এ-দেশের মানুষের দৈনন্দিন জীবনে হস্তক্ষেপ করতে সুরু করলো, এদেশের স্বাধীন শাসনের ভিতগুলিকে উৎপাটনের কাজে লেগে গেল, তাদের ধর্মে, সংস্কৃতিতে, শিক্ষার আমূল পরিবর্তনে উদ্যোগী হোলো, সেদিন থেকেই ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ভূমিকা রচিত হয়েছিল। ১৮৫৭ সালে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম তারই পরিণত ফল।

কিন্তু তার বহুপূর্বে রামমোহনের অনুপ্রেরণায় মনের বন্ধনমুক্তির কুলছাপানো আন্দোলন তোলপাড় করে তুলেছে। তাঁর বেদান্তে প্রত্যাবর্তন, দেশপ্রেম প্রচার, হিন্দু-মুসলীম প্রীতি এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার কল্যাণকর দিকগুলি গ্রহণে নির্দ্বিধা, তাঁকে জাতীয়তার নব-ভগীরথরূপে চিহ্নিত করে। ১৮৫৭-এর পূর্বোক্ত বিপ্লবের পরও এই নবজাগরণের পল্লবিত বেগবান ধারাপ্রবাহ জাতীয় মানসে যে শক্তি সঞ্চার করে, তারই ফলে ভারতীয় রাজনীতিতে চরমপন্থীদের এক বিপ্লবীদের অভ্যুদয় সম্ভব করে তুলেছিল। বিপ্লব-মানসের এই আবির্ভাবের উৎসমুখে, "অন্তত বাংলার স্বামী বিবেকানন্দই বর্তমান জাতীয় আন্দোলনের আত্মিক জনক।"[২] বাংলায় তথা ভারতবর্ষে নবজাগরণের আদর্শবাদের এই শক্তিশালী প্রাণপ্রবাহের ভিত্তিভূমিতে বিপ্লব-মানসের স্ফুরণ, একদিকে যেমন বৈপ্লবিক সংগ্রাম বাংলায় দীর্ঘকাল অব্যাহত রেখেছিল, তেমনি পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনীতির অনুকরণে কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতির সমসাময়িক নিষ্ক্রিয়তান্ত্রিক কার্যক্রম পরম্পরার মতই সেদিন দৃঢ়মূল হতে পারে নাই। এই কারণেই রাজনীতির পৃষ্ঠপটে ১৯০৭-এর সুরাট সংঘাতের পর নরমপন্থীরা জয়ী হলেও ১৯১৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসের পরই তাদের কংগ্রেস থেকে বিদায় নিয়ে সর্বভারতীয় লিবারেল ফেডারেশন গঠন করতে হোলো। ভারতীয় রাজনীতিতে অতঃপর ব্রিটিশ পার্লামেন্টারী রীতি পরম্পরা সংস্করণ হয়ে রইলো। ১৯১৮ সালের বহুপূর্বেই ১৮৯৩ সালে মহারাষ্ট্রের 'ইন্দুপ্রকাশ' নামক পত্রিকায় "New lamps for old" শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধে ফরাসী-বিপ্লবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে অরবিন্দ বলেন: ফরাসী জাতি যেমন সশস্ত্র বিপ্লবে অগ্নি ও রক্তস্নানে পবিত্র হয়ে ('purification by blood and fire') মাত্র পাঁচ বছরে তের শতাব্দীর অত্যাচার মুছে ফেলেছিল ('blotted out in five terrible years the accumulated oppression of thirteen centuries') ভারতবর্ষকে সে-পথ গ্রহণ করতে হবে।

গত শতাব্দীর শেষ দশক থেকেই ভারতবর্ষে বিপ্লব-চেতনার উন্মেষ; মহারাষ্ট্র থেকে বাঙলায় সেই চেতনা সঞ্চারিত হয়। ১৯০৫-এর বঙ্গ-বিচ্ছেদ এই চেতনায় ইন্ধন

২। "So far at least as Bengal is concerned, Swami Vivekananda may be regarded as the spiritual father of the modern nationalist movement" (Indian Struggle: Subhash Ch Bose: pp 35)

যোগায় এবং ১৯৪৭-এর দেশ-বিভাগে বাংলাদেশের বৈপ্লবিক চেতনা সম্পূর্ণরূপে তিমিত হওয়ার পূর্বে নেতাজীর আজাদ হিন্দ আন্দোলনে ভারতীয় রাজনীতিতে বিপ্লব-প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সার্থকতায় পরিণতি পায়। বাংলা ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে বৈপ্লবিক আদর্শবাদ নির্বাসিত হবার পরও দীর্ঘকাল বাংলাদেশে এই আদর্শবাদের সফরন বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সর্বতোমুখী প্রবল গতিবেগের জন্যই সম্ভব হয়েছিল, যা অন্যান্য প্রদেশে সেই পরিমাণে মূর্ত হয়ে ওঠেনি। নির্বিশেষ ধ্বংস ও নির্বিবাদ হত্যার সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে চিহ্নিত করে বৈপ্লবিক আদর্শবাদকে খর্ব করে দেখানো যেমন একদিকে ইংরেজ শাসকদের প্রয়োজন ছিল, তেমনি যারা নিয়মতান্ত্রিক কিম্বা অহিংস পন্থায় সার্বভৌমত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন তাদের পক্ষেও প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই আদর্শবাদের মূলে স্বাধীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠারও সীমাবদ্ধ আবেগের রূপায়ন কিম্বা বিপ্লব-সাধনার পথে বর্তমান ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে অন্যায় অবিচারের শোষণ-ও শাসন যে সক্রিয় ছিল, ভারতীয় রাজনীতিতে আদর্শ-বাদের দ্বন্দ্ব সেই সত্যকে গোপন রাখতে দেয় নাই।

১৯২০ সালে কংগ্রেসের রূপান্তর হল। গণচেতনার আদর্শবাদ, নিয়মতান্ত্রিকতার ফলবর্তী হয়ে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে গণ-সংগ্রামের ভূমিকা রচনা করলো। মহাত্মা গান্ধী এই নূতন আদর্শবাদের পুরোধা। কংগ্রেসের এই রূপান্তরে অরবিন্দ-তিলকের চরমপন্থা নিঃসন্দেহে পথ কেটে দিয়ে গেলেও এঁদের বৈপ্লবিক আদর্শবাদের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর অহিংসার আদর্শবাদের দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্য জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে দুইটি পৃথক ও সুনির্দিষ্ট ধারার স্বাক্ষর রেখে গেছে। ১৮৯৩ সালেই অরবিন্দ "ইন্দুপ্রকাশে" লেখেন: "The congress in Bengal is dying of consumption……" এবং কংগ্রেসের গণসংযোগে তিলকের অবদান সম্পর্কে লেখেন: "…Tilak used methods which Indianised the movement and brought into it the masses……To bring in the mass of the people… is an indispensable condition for a great and powerful political awakening in India."

সুতরাং গান্ধীজীর অহিংস নীতির আবির্ভাবের বহুপূর্বেই কংগ্রেসের গণসংযোগ চরমপন্থীদের উদ্যোগে শুরু হয়েছিল। কিন্তু অরবিন্দের রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ, বিপিন পালের চরমপন্থী রাজনীতি ত্যাগ, ১৯২০-তে তিলকের লোকান্তর এবং সর্বোপরি যুদ্ধকালীন সশস্ত্র সংগ্রামের উদ্যোগের ব্যর্থতা জাতীয় আন্দোলনে গান্ধীযুগের অভ্যুত্থানের অনুকূল পরিবেশ তৈরী করে রেখেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও গান্ধীবাদের রাজনৈতিক আদর্শ কখনও ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছে দেবেনা, সেই সীমিত লক্ষ্য এই আদর্শের মধ্যেই নিহিত ছিল। কারণ রাজনীতিক্ষেত্রে এই আদর্শের চরম প্রয়োগ সত্যাগ্রহে, যে-সত্যাগ্রহে আপোষ নিহিত রয়েছে—'compromise is inherent in satyagraha'। এ-ছাড়া গান্ধীর আদর্শের যে দ্বৈত-ভূমিকা গান্ধীজীর জীবনে রূপায়িত হয়েছে, সেখানেও ভারতবর্ষের স্বাধীনতার চাইতে শান্তি ও অহিংসার বিশ্বাদর্শের স্থান অনেক উচ্চে নির্দিষ্ট। তাই এই বিশ্বাদর্শের সার্থকতার পথে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার লক্ষ্য বর্জনীয় হলেও গান্ধীবাদের আন্তরিক স্বীকৃতি রয়েছে এই বর্জনে। ভারতীয় সংগ্রামে গান্ধীজীর ব্যর্থতার কারণ

৩। "While it is a fact that they do occasionally resort to terrorism their ultimate object is not terrorism but revolution and the purpose of the revolution is to instal a National government." (Indian Struggle: Subhas. Ch. Bose. pp 416)

৪। "By Revolution we mean that the present order of things, which is based on manifest injustice, must change" Bhagat Singh.

নির্দ্বিধায় বহুপূর্বেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর এই দ্বৈত-ভূমিকার বৈপরীত্যকে দায়ী করেছিলেন। তাঁর এই দ্বৈত-ব্যক্তিত্ব একাধারে তাঁকে, চার্চিলের মতে, ইংরেজদের অনমনীয় শত্রু করে রেখেছিল, অপর পক্ষে, এলেন উইলকিনসনের মতে, ইংরেজদের সর্বোত্তম প্রহরীরূপে দেখা গিয়েছে।৫ গান্ধী-নেতৃত্বে রাজনৈতিক সংগ্রামে অভূতপূর্ব গণজাগরণ সত্ত্বেও সমাজ-পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরস্পর-বিরোধী শক্তির মৈত্রী-বন্ধনের প্রচেষ্টায় সমাজ-বিপ্লব অবরুদ্ধ হোলো এবং সেই সঙ্গে জাতীয় সংগ্রামের পরিণতিতে দেশ-বিভাগ অনিবার্য করে তুললো। "গান্ধী নেতৃত্বে কংগ্রেসের প্রকৃত বৈপ্লবিক সংগঠনে রূপান্তর ঘটেনি এবং গান্ধীবাদের বিভ্রান্তি দেশবিভাগ নিশ্চিত করে তুলেছিল।"৬

কংগ্রেসের রাজনৈতিক মঞ্চে গান্ধীজীর আবির্ভাবের পর থেকেই ধীরে ধীরে এই সংগঠনটিকে তার আদর্শবাদের প্রয়োগ ক্ষেত্রে পরিণত করতে গান্ধীজীর স্থির ও ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, এ পথে প্রধান অন্তরায় ছিলেন। ১৯২৫-এ দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ এলো কংগ্রেস করায়ত্তের। কংগ্রেসের মধ্যে জহরলাল নেহেরু ও সুভাষচন্দ্র বসুর যৌথ উদ্যোগে ১৯২৮ সাল থেকে বামপন্থী বিরোধী শক্তি গড়ে উঠেছিল। ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হবার পর গান্ধী-নেতৃত্বের প্রতি চিরকালের মত জহরলালের বিরোধিতার অবসান হয়ে গেল। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে সমাজবাদী আদর্শের প্রচারকরূপে চিহ্নিত হলেও গান্ধী-নেতৃত্বের বাইরে জহরলালের কোনো স্বকীয়তা ছিল না। দেশবিভাগের প্রশ্নে গান্ধী ও নেহেরুর আপাত-বিরোধ সত্ত্বেও, দেশ-বিভাগ গান্ধী-নেতৃত্বেরই স্বাভাবিক পরিণতি এবং সেই কারণে দেশবিভাগের অন্যতম উদ্যোক্তারূপে জাতীয় আদর্শের প্রতি নীতি-হীনতায় তাঁর ভূমিকা চিহ্নিত হয়ে থাকবে। জহরলাল সম্পর্কে ইংরেজ লেখক মাইকেল এডওয়ার্ড ঠিকই বলেছেন : মুখে বিপ্লবী কাজে ব্রিটিশ শ্রমিকদলের বুর্জোয়া নেতাদেরই মত (though revolutionary in speech, he was no more revolutionary in fact than the British Labour party)। গান্ধীজী সম্বন্ধেও এডওয়ার্ডের "The Last Years of British India" পুস্তকে 'হিংসার হ্রাসকারক'রূপে ('reducer of violence') পুনঃ পুনঃ যে মূল্যায়নের উল্লেখ করা হয়েছে, তারও যাথার্থতা আছে।

বামপন্থী নেতৃত্বের অন্যতম সহযোগী সুভাষচন্দ্র কিন্তু গান্ধীবাদ ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিকল্প আদর্শ ও নেতৃত্ব গড়ে তুলে জাতীয় সংগ্রামের ক্ষেত্রে শক্তিবাদের অপরাজেয় ভূমিকা রচনা করেন। সুভাষ-নেতৃত্বের এই অনন্যতার উল্লেখ করে মাইকেল এডওয়ার্ড বলেছেন "একজন মাত্র ব্যক্তিত্ব, ভিন্ন ও সংহিস পন্থা গ্রহণ করেছিলেন, এবং এক দিক থেকে ভারতবর্ষ অন্য কোনো ব্যক্তির চাইতে তাঁর কাছে বহুলাংশে ঋণী"।৭ গান্ধীবাদের মূল উৎস যেমন ঊনবিংশ শতাব্দীর

৫। 'The Mahatma has failed because he had to play a dual role in one person—the role of the leader of an enslaved people and that of a world-teacher, who has a new doctrine to preach. It is this duality which has made him at once the irreconcilable foe of the English-man according to Mr Winston Churchill, and the best policeman of the Englishman according to Miss Ellen Wilkinson" (Indian Struggle: Subhas Chandra Bose. pp 429)

৬। "...Congress never became a truly revolutionary movement. Gandhiji remained---inhibiting its actions, dividing its purpose, confusing the genuine revolutionaries and ultimately ensuring the partition of India." The Last years of British India, Michael Ewards. p 44)

৭। "Only one outstanding personality (took a different and violent path, and in a sense, India owes

নবজাগরণের পূর্বভূমিতেই নিহিত ছিল, নেহেরুর যেমন ছিল পাশ্চাত্য ভূমিতে, তেমনি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মধ্যে সেই নবজাগরণের পরিপূর্ণ মুক্তরূপ অভিব্যক্ত হয়েছিল। রামমোহন-বিবেকানন্দ-নেতাজী,— উনবিংশতি শতাব্দীর নবজাগরণের এই অব্যাহত ধারার পরম্পরার উপান্তে দাঁড়িয়ে নেতাজী তাই নূতন সমন্বয়ের আদর্শ নিয়ে জাতীয় সংগ্রামকে যেমন ঊর্ধ্বমুখ করেছিলেন তেমনি জীবন-বোধের পরিপূর্ণতা দিয়ে জাতীয়মানসে নূতন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন। নেতাজীর জীবনবাদ বা পরবর্তীকাল সুভাষবাদ নামে পরিচিত—জাতীয়জীবনে তাই মহত্তম সমন্বয়ভূমি।৮ ১৯৪৪ সালে নেতাজী চৌকিও বক্তৃতায় বলেন'……কোন মতবাদ মানবপ্রগতির চূড়ান্ত স্তর, একথা বলাই মূর্খতা হবে। কর্মনি-শাস্ত্রের ছাত্ররা স্বীকার করবেন যে মানবপ্রগতি কখনো থেমে যেতে পারে না বরং অতীতের জাগতিক অভিজ্ঞতা থেকেই আমাদের একটা মতবাদ সৃষ্টি করতে হবে। এই কারণে ভারতে আমরা এই প্রতিদ্বন্দ্বী মতবাদগুলোর একটা সমন্বয় গড়ে তুলবো এবং দুইয়েরই ভাল দিকগুলোকে নেবো।"

"নেতাজীর জীবনবাদ" নামক পুস্তকে অনিল রায় সংক্ষেপে কয়েকটি কথায় নেতাজীর আদর্শ রেখাঙ্কন করেছেন: "সুভাষচন্দ্রের সাম্যবাদ হলো ভারতবর্ষীয় ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নবসমাজতন্ত্রবাদ। একদিকে গান্ধীবাদের আতিশয্য অন্যদিকে মার্ক্সবাদের আতিশয্য। এই দুই মতবাদের বাইরে তিনি তৃতীয় মতবাদ সমাজতন্ত্রের পরিকল্পনা করেছেন। কিন্তু এই সমাজতন্ত্র ভারতবর্ষের আদর্শের মধ্যেই রয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মূল তত্ত্বের উপরেই এই সমাজতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করা হবে।"৯

নেতাজীর এই আদর্শবোধই পাকিস্তান প্রস্তাবের বহুপূর্বে ধর্মের ভিত্তিতে দেশবিভাগের সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত সম্পর্কে অবহিত রেখেছিল। তাই ১৯৩৮-এ হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণেই এ-সম্পর্কে জাতিকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে "An internal partition is necessary in order to neutralise the transference of power." এবং রাশিয়ার দৃষ্টান্ত দিয়ে এক রাষ্ট্রের আদর্শের দাবীর অনিবার্যতা বুঝিয়েছিলেন।১০

রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র গঠন ও মার্ক্সবাদের প্রসার ভারতীয় চিন্তায় প্রবল আলোড়ন তুলে জাতীয় সংগ্রামে আদর্শবাদের দ্বন্দ্বে নূতন এক অধ্যায় রচনা করে। আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের প্রসারিত বাহু ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টিরূপে এদেশের রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করে। ভারতের মাটিতে এই দলের উদ্ভব হলেও বৈদেশিক শক্তির আনুচর্যের ফলে এরা জাতীয় জীবনে প্রক্ষিপ্ত। এই প্রক্ষিপ্ত ভূমিকার জন্য গ্রহণ করে কম্যুনিষ্ট পার্টি জাতীয় আদর্শ ও জাতীয় সংগ্রামের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ভারতীয় রাজনীতিতে স্থান করে নিয়েছে। কম্যুনিষ্ট পার্টির ভূমিকা বৈদেশিক আনুগত্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আদর্শের ও প্রয়োগের দিক থেকে কম্যুনিজমের অ-ভারতীয়ত্ব এদেশে এই আদর্শের ব্যাপক প্রভাব বিস্তারের পক্ষে প্রবল অন্তরায়। ভারতীয় সমাজে সাম্য ও ন্যায়বিচার-বোধের পূর্ণ স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিজম বা মার্ক্সবাদী আদর্শ এদেশে বিলুপ্ত হবে। কিন্তু কম্যুনিষ্ট দলের বাইরেও মার্ক্সবাদী দল গঠিত

more to him than to any other man. "(The Last Years of British India : Michael Edwards, pp 45)

৮। ".....Samyavda an Indian word, which means literally the 'doctrine of synthesis or equality.' It will be India's task to work out this synthesis." (Indian Struggle : Subhas. Ch. Bose, p 431)

৯। নেতাজীর জীবনবাদ: অনিল রায়: পৃ: ৪০।

১০। "There is absolutely no reason why India which has much more homogenity than Soviet Union, should not be united as one nation." (Tokyo speech)

হয়েছে স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে। কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টিই তাদের অন্যতম। গান্ধীবাদী নেতৃত্বে ও মার্ক্সবাদী আদর্শের টানাপোড়েনে এদের নানা রূপান্তর ঘটেছে। আদর্শগতভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে মার্ক্সবাদে প্রত্যয় নিয়ে এক অংশ কম্যুনিজমের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং অপরাংশে গান্ধীবাদের অনুবর্তী হয়।

১৯২০ থেকে বন্দীশালায় অবরুদ্ধ বাংলার বিপ্লবীদের মধ্যে বিপ্লবের আদর্শ ও মূল্যায়ন নিয়ে গভীর সংশয় দেখা দেবার ফলে যখন নির্বিচারে মার্ক্সীয় বস্তুবাদী দর্শন অঙ্গীকারে বিপ্লবীদের মধ্যে প্রবল উন্মুখতা দেখা দিয়েছিল, সে-সময় বন্দীশালায় সমাজ-বিপ্লবের পর্যায়গুলি গভীর মনন ও বিশ্লেষণের মুখে সমাজ বিজ্ঞানের আধুনিকতম সূত্রগুলি আলোচনা করে বাংলার বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের পুরোধারূপে বাংলাদেশে যাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাঁদের অন্যতম অনিল রায়, মার্ক্সীয় ভাবধারার ভ্রান্তি সম্পর্কে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে সতীর্থদের অবহিত করেন। তাঁর প্রতিপাদ্য ছিল সোস্যালিজম একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পৃথক আদর্শবাদ। অনিল রায় তাঁর "সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ"-এর ভূমিকায় বলছেন, "সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক মতবাদ এবং সর্বতোভাবে। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাদ্য। ইতিহাসের বহুবাদী ব্যাখ্যাই (pluralistic Interpretation) বিজ্ঞান-সম্মত এবং সবগুলি একবাদী বা monistic ব্যাখ্যাই একদেশদর্শী। মার্ক্সবাদী ব্যাখ্যা একবাদী। কেবল ভৌতিক বা আর্থিক ব্যাখ্যা (Materialist বা Economic Interpretation) নয়, যাহার নাম ইতিহাসে চিৎ-ভৌতিক (Psycho-material Interpretation) ব্যাখ্যা তাহাই বৈজ্ঞানিক গবেষণার সহিত সঙ্গতি রাখিতে পারে। কেবল ভৌতিক জগতের শক্তিই নয়, চিৎলোকের বা মনোজগতের শক্তিগুলিও সমাজ ও বিবর্তনে প্রভাবশীল। সমাজবিকাশের মূলে কেবল একপেশে নিয়ন্ত্রণবাদ (one-sided determinism) যারা কল্পনা করেন তারা একদেশদর্শী। এই দৃষ্টিতে Economic determinism, genetic determinism তথা ভৌগলিক, যৌন, সামাজিক, বংশতাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণবাদ প্রভৃতি সবই ভ্রান্ত। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে Functional correlation, বা Interaction, ক্রিয়াত্মক সহসম্পর্ক ও পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদই সমাজ-ব্যাখ্যার বৈজ্ঞানিক নীতি। মার্ক্সবাদ আধিক নিয়ন্ত্রণবাদী, হওয়ায় যান্ত্রিকতাবাদী বা mechanist ব্যাখ্যায় অধোগত হইয়া পড়িয়াছে। বহুবাদী ব্যাখ্যার সহিত এইখানে মার্ক্সবাদের মতবিরোধ।" মার্ক্সীয় আদর্শবাদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী আদর্শবাদের দ্বন্দ্বে সেদিন অনিল রায় যে রাজনৈতিক চিন্তাধারার গোড়াপত্তন করেছিলেন বিপ্লবীদের মধ্যে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব নির্বিচার মার্ক্সবাদ গ্রহণে তাদের নিবৃত্ত করে মার্ক্সীয় ভাবধারার বিকল্প সমন্বয়বাদী সমাজ-প্রত্যয়ের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে। সেদিনকার বহু মার্ক্সবাদী বর্তমানে মার্ক্সবাদের জড়বাদী জীবন দর্শন ও নিয়ন্ত্রণবাদ বর্জন করে সমন্বয়বাদী সমাজদর্শনে প্রত্যাবর্তন করেছেন। এই সমন্বয়বাদী চিন্তাধারা ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সঙ্গে পারম্পর্যসূত্রে আবদ্ধ এবং এই চিন্তাধারাই নেতাজীর জীবনদর্শনে পরিপূর্ণতা লাভ করে 'সুভাষবাদ'-এ রূপায়িত হয়। "ফরওয়ার্ড ব্লক"-এর মধ্য দিয়ে এই প্রচেষ্টা আংশিকভাবে সফল হয়েছিল।

সাম্প্রদায়িক দলগুলিও উল্লেখ্য। ১৯০৬-এ মুসলীম লীগের জন্ম থেকে সুরু করে দেশবিভাগ পর্যন্ত লীগ রাজনীতির জাতীয়তা-বিরোধী ভূমিকা অব্যাহত রয়েছে। ১৯১৬-র লক্ষ্ণৌ চুক্তি এবং ১৯২৩-এ বাংলার হিন্দু-মুসলীম সমস্যা সমাধানে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রয়াস দুইটি ব্যতিক্রম মাত্র। ১৮৮৮ সালেই স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের পৃথক জাতীয় সত্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করে দিয়ে বলেছিলেন : ভারতবর্ষ

দুই জাতির দেশ।১১ সেদিন থেকেই ইংরেজের বিভেদনীতি ভারতীয় জাতীয়তার আদর্শের বিরুদ্ধে মুসলীম পৃথকত্ব বা অস্তিত্বে পৃথক মুসলীম জাতীয়তার পরিণতি পেয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুসলীম পুনর্জাগরণের (revival) মধ্যে নিহিত ধর্মীয় গোঁড়ামি ভারতবর্ষে মুসলীম লীগের রাজনীতিকে আচ্ছন্ন করে দ্বিজাতিতত্ত্বের জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু এই পুনর্জাগরণের মধ্যে বিপ্লবাত্মক ও প্রগতিমূলক যে দিকটি নিহিত ছিল, ভারতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ যদি মুসলীম পুনর্জাগরণের দ্বৈত-রূপের এই অংশটির সুযোগে সহায়তা করে ধর্মীয় ভিত্তি-ব্যতিরেকে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলীম সম্পর্কের সমন্বয় সাধন করতে পারতেন, সেক্ষেত্রে দেশবিভাগের বিষময় পরিণতি এড়িয়ে যাওয়া যেত। এদিকে জিন্নার নেতৃত্ব হয়তো অবরুদ্ধ হোতো।

মুসলীম সাম্প্রদায়িকতার প্রতিক্রিয়ারূপে হিন্দু মহাসভার গোড়াপত্তন হয়েছিল। হিন্দু মহাসভার রাজনীতি মুসলীম সাম্প্রদায়িকতার হ্রাস-বৃদ্ধির পাশাপাশি হ্রাস পেয়েছে কিম্বা বর্ধিত হয়েছে। ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শবাদের সংঘাত যে স্তরে ছিল, বর্তমানে তার পরিবর্তন হয়েছে। দেশবিভাগের ফলে জাতীয়তাবাদের আদর্শ সাহিত, গান্ধীবাদ পর্যুদস্ত এবং বিধ্বস্ত; সাম্প্রদায়িকতাবাদ দ্বিধিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক কম্যুনিজম-এর পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষেও মার্ক্সবাদের গতি রুদ্ধ হয়েছে। সমাজ-বিপ্লবের লক্ষ্যপথে সমাজবাদী আদর্শের বিস্তৃতি ঘটলেও, তার রূপান্তরও লক্ষ্যণীয়। মার্ক্সবাদের নিগড় থেকে এই আদর্শ মুক্ত হয়ে স্বকীয়তার মর্যাদা পেয়েছে, যদিও মার্ক্সীয় সমাজ-বাদী আদর্শ তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে পাশাপাশি চলেছে।

আদর্শবাদের সংঘাতের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ সমন্বয়ের পথ খুঁজে নেবে; যে সমন্বয় নেতাজীর জীবনদর্শনের ভিত্তিমূলে রয়েছে। 'দৈহিকের সহিত আত্মিকের, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির, আধিকের সহিত মানবিক মূল্যের, প্রাচ্যের ও ভারতীয়ত্বের সহিত পাশ্চাত্য সংস্কৃতির, একটা সুষমাময় সামঞ্জস্য নেতাজী স্থাপনের পক্ষপাতী।' নেতাজী ভারতীয় ঐতিহ্যের পটভূমিকায় সমাজতন্ত্রের যে পরিকল্পনা করেছেন, ভারতীয় রাজনীতিতে আদর্শবাদের ভবিষ্যৎ সেদিকে প্রসারিত রয়েছে। আদর্শবাদ, দল ও নেতার পারস্পর্য যেদিন এই পটভূমিকায় বিধৃত হবে সেদিনই সমাজবিপ্লব সার্থকতায় পৌঁছাবে।

১১। "India is a country inhabited by two different nations... It is necessary that one of them should conquer the other and thrust it down."

(Divide and Quit : Penderel Moon : p 11)

জাতীয়তার সঙ্কট

সমর গুহ

শতাব্দীর সংগ্রাম ও সাধনা সত্ত্বেও আজকের ভারতীয় জাতি আদর্শ ও উদ্দেশ্যহীন একটি পঙ্গুত্বের প্রতিমূর্তিতে পরিণত হলো কেন, বিপ্লবের প্লাবন পৃথিবীর সব দেশকেই বিপ্লবোত্তর যুগে এমন প্রবল বেগে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, যে সেরূপ প্রগতি স্বাভাবিক সময়ে সম্ভব হয় না। স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষ তড়িৎ গতিতে এগিয়ে যাবে,—এটাই ছিল ইতিহাসের প্রত্যাশা। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের ১৯ বছরেই ভারতীয় জাতি এমন জীর্ণ, অথর্ব এবং গতিহীন হয়ে গেল কেন? পরিকল্পনার পরিসংখ্যানে সরকারি স্তরে জাতীয় প্রগতির মূল্যায়ণের চেষ্টা হলেও একথা আজ অস্বীকার করার কোন অবকাশই নেই যে জাতীয় মানসিকতার এবং জাতির জীবনে এরূপ গতির যথার্থ কোন প্রতিফলন নেই। আজকের ভারতবর্ষের বস্তুর রূপায়নে সবচেয়ে অভাব ঘটেছে একটি প্রবল ও আদর্শবাদী জাতীয় মনের। জাতীয় মনকে সম্পূর্ণভাবে খর্ব ও আচ্ছন্ন করে ভারতীয় সমাজ জীবনের প্রতিস্তরে আজ আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিমন তীব্র হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে! এই প্রবল ব্যক্তিমনের কাছে আদর্শবাদী জাতীয় মন আজ নিষ্ক্রিয় ও শক্তিহীন। আজকের ভারতবর্ষের এটাই হলো সবচেয়ে মারাত্মক বিচ্যুতি।

শতাব্দীর জাতীয় সংগ্রামের ত্যাগ ও সংকল্পের প্রভূত সম্পদ সত্ত্বেও কেন স্বাধীন ভারতে তীক্ষ্ণ ও তীব্র প্রেরণার শক্তিধর জাতীয় মন সক্রিয় হয়ে উঠলো না তার প্রধান কারণ নিহিত রয়েছে নেহেরুবাদের মধ্যে। গান্ধীবাদ ও মার্ক্সবাদের সৃজনধর্মী দিক্ নয়—এই দুইটি মতবাদের এক বিকৃত সংকরূপে জন্ম লাভ করেছে নেহেরুবাদ। গান্ধীদর্শনের আপোষবাদ এবং মার্ক্সিজমের ভ্রান্ত আন্তর্জাতীয়তাবাদ,—এই দুইটি ঐতিহ্যের প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে নেহেরুবাদের দৃষ্টিভঙ্গী। বস্তুতঃ নেহেরুবাদ কোন সুস্পষ্ট আইডোলজী নয়। নেহেরুবাদের কোন সুস্পষ্ট রাজনৈতিক, আর্থিক বা সামাজিক মৌল ভিত্তি নেই, নেহেরুবাদ নিছক একটি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীমাত্র। গান্ধীবাদের মধ্যে যে অহিংস-দর্শনের দুঃসাহসী প্রয়োগবাদের আবেদন আছে অথবা মার্ক্সবাদে বিপ্লবের যে অপরিহার্য আহ্বান রয়েছে,—নেহেরুবাদে তা' নেই। নেহেরুবাদের রাজনৈতিক আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠেছে এই দুই মতবাদের মৌল আদর্শ থেকে নয় তাদের প্রয়োগকৌশল থেকে নেহেরুবাদের জন্মই ভারতে এক প্রবল জাতীয় বিপ্লব প্রত্যাসন্ন হয়েও শেষ পর্যায়ে আপোষবাদের সুবিধাবাদী পন্থায় বিপথগামী হয়েছে। এই নেহেরুবাদের প্রভাবেই স্বাধীন ভারতে একটি প্রবল অন্তর্মুখী জাতীয় মন গড়ে ওঠার পরিবর্তে আন্তর্জাতীয়তার নামে একটি বহির্মুখীন 'এক্সটোভার্সিন' গড়ে উঠেছে এবং নেহেরুবাদই শান্তিবাদের নামে আপোষপন্থার মনস্তত্ত্বে ভারতীয় জাতীয় মনকে শক্তিহীন করে বিপথগামী করেছে। নেহেরুবাদের জন্যই স্বাধীন ভারতবর্ষে একটি শক্তিবাদী জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠতে পারেনি।

ভারতীয় পুনর্জাগরণের ইতিহাসে জাতীয়তাবাদের নব্য দৃষ্টি ভঙ্গী গড়ে উঠেছে, রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, তিলক ও অরবিন্দের চিন্তাধারার অবদানে। বিশ্বের অন্যান্য দেশে উনবিংশ ও বিংশশতাব্দীতে জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছে রাষ্ট্র ও রাজনীতিকে কেন্দ্র করে। কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পুনর্জাগরণের পশ্চাতে পরাধীনতার রাজনীতি প্রাথমিক উৎস হিসাবে কাজ করলেও এই জাতীয়তাবাদের মৌল আবেদন সৃষ্টি হয়েছে ভারতীয় সভ্যতা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির আবেদনে, অনেকে পুনর্জাগরণের দৃষ্টিভঙ্গীকে 'হিন্দু রিভাইভালিজম্' বলে বিকৃত ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এই উদ্গাতারা কখনো হিন্দুধর্ম ও অনুষ্ঠান পদ্ধতির উপরে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ গড়ে তুলতে চান নি। তাঁরা নবভারতের জাতীয়তা বাদ গড়ে তুলতে চেয়েছেন ভারতীয়বাদের উপরে। ভারতবর্ষই বিশ্বের মধ্যে একটি মাত্র দেশ যে দেশে বিভিন্ন ধর্মের সার্বজনীন মৌল আবেদন ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে একটি সমন্বয়ী জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠেছে এবং একটি বিশ্বজনীন প্রমূল্য ধারা রচিত হয়েছে। ভারতীয় ইতিহাসের এই বিশ্বজনীন অবদানের জন্যই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পুনর্জাগরণের উদ্গাতারা সমস্বরে একথা বলেছেন যে ভারতবর্ষের একটি 'বিশ্বজনীন মিশন' আছে এবং সেজন্যই ভারতবর্ষের পুনর্জাগরণ ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বিশ্বের প্রয়োজনেই অপরিহার্য। মার্ক্সবাদের বিশ্ববিপ্লবের অপরিহার্যতার বিশ্বাস যেমন মার্ক্সবাদীদের প্রবলভাবে আন্তর্জাতীয় বিপ্লববাদের পথে প্রবুদ্ধ করেছে, ঠিক তেমনি এই "ভারতীয় মিশনে" বিশ্বাস ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভাগভিত্তিক আধ্যাত্মিক মূল্যের আবেদন সৃষ্টি করেছে। এজন্যই ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের চরিত্র ও মূল্যবোধ পৃথিবীর অন্যদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অপেক্ষা ভিন্নতর প্রকৃতি নিয়ে গড়ে উঠেছিল এবং এজন্যই ভারতের উচ্চশ্রেণির জাতীয় নেতাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যে একটি রাজনৈতিক সন্ন্যাসবাদের আবেদন বা মিশনারী মনোভাবও প্রবল হয়ে উঠেছিল।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রয়োগিক পদ্ধতিতে একটি নতুন ক্ষাত্রধর্মী বা শক্তিবাদী মানসিকতা গড়ে উঠেছিল জাতীয় পুনর্জাগরণের প্রাথমিক যুগে। ভারতীয় ইতিহাসের পুনর্জাগরণের নেতৃত্ব একথা লক্ষ্য করেছিলেন যে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের শান্তি ও অহিংসাবাদী ঐতিহ্যের আতিশয্যে ভারতের জাতীয় জীবনে এমন একটি দৈব ও সংস্কার-নির্ভর অপৌরুষবাদের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল যে তার ফলে ভারতবর্ষ আত্মরক্ষার প্রতিরোধ-শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে এবং প্রধানত সেজন্যই একহাজার বৎসর ভারতের পক্ষে বহিরাক্রমণ রোধ করা বা বহিশত্রুকে উৎখাত করার মত প্রবল সংকল্প বা আগ্রহ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। শান্তি ধর্মের নামে ভারতীয় মনস্তত্ত্বের এই আত্মদমপর্ধর্মী অপঘাত থেকে নবজাগ্রত ভারতকে মুক্তি দিয়ে ভারতের জাতীয় জীবনে একটি পৌরুষধর্মী ঐতিহ্য রচনার উদ্দেশ্যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রাথমিক অগ্রদূতেরা ভারতে একটি ক্ষাত্রধর্মী শক্তিবাদের ঐতিহ্য রচনাকে ভারতীয় পুনর্জাগরণের অবিচ্ছেদ্য প্রয়োজন রূপে বিবেচনা করেছেন। নবজাগ্রত ভারতীয় জাতীয়তা-বাদের ক্ষাত্রধর্মী শক্তিবাদের আবেদনেই বাংলা ও মহারাষ্ট্রে বিপ্লববাদ জন্মলাভ করেছিল এবং গান্ধীযুগের প্রারম্ভ পর্যন্ত নিঃসন্দেহে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান ধারারূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল ভারতীয় বিপ্লববাদ।

ভারতের জাতীয়তাবাদ এই ক্ষাত্রধর্মী শক্তিবাদী ঐতিহ্য ও আবেদন থেকে বিচ্যুত হয় গান্ধী দর্শনের অহিংসা ও শান্তিবাদের অবদানে। গান্ধী নেতৃত্বের আইন-অমান্যের অস্ত্র একটি নিরস্ত্র দেশের পক্ষে ছিল একটি অভূতপূর্ব সংগ্রামী হাতিয়ার। কিন্তু আইন অমান্যের সংগ্রামী নীতির সঙ্গে

অহিংসাবাদকে যুক্ত করে গান্ধিবাদী সত্যাগ্রহবাদ অনুসরণের ফলে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামকে এই অহিংসাবাদী সত্যাগ্রহের দর্শন দ্বারা পরিচালনা করার প্রচেষ্টায় ভারতীয় জনমন আবার ক্ষাত্রধর্মী শক্তিবাদের ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় এবং এই গান্ধীবাদী অহিংসাবাদের কঠিন থেকেই জন্মলাভ করে শান্তিবাদী পদ্ধতির নামে রাজনৈতিক আপোষবাদ।

নেহেরুবাদ গান্ধীবাদের অহিংসা দর্শনকে গ্রহণ করেনি কিন্তু সত্যাগ্রহের শান্তিবাদী আচরণ পদ্ধতি তথা রাজনৈতিক আপোষবাদকে গ্রহণ করেছিল। এই আপোষবাদের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেহেরুবাদ, প্রবলভাবে আমদানী করেছে মার্ক্সবাদ এবং মার্ক্সবাদী আন্তর্জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী। বস্তুত, এদেশে কম্যুনিজমের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি যদি কেউ রচনা করে থাকেন তা' হলে তিনি হলেন নেহেরু। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীদর্শনের শান্তিধর্মী আপোষবাদ এবং আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রয়োগ করে নেহেরুবাদ ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে শুধু স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত করেনি—এই মতবাদই একদিকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে মার্ক্সীয় আন্তর্জাতীয়তাবাদের আবেদনে বিভ্রান্ত করেছে এবং অন্যদিকে আপোষবাদী পন্থার অনুসরণে বিপ্লববাদকে প্রতিরুদ্ধ করেছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের মানসিকতা এবং পদ্ধতির সঙ্গে একদিকে এই অহিংসা দর্শন ও রাজনৈতিক আপোষবাদ এবং অন্যদিকে মার্ক্সবাদী আন্তর্জাতীয়তাবাদ যে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বিপ্লবের লক্ষ্য ও পরিণতিকেই ব্যর্থ করে দেবে তাই নয়—ভারতের মূল জাতীয়তাবাদকেই বিচ্যুত করে দেবে,—এ আশঙ্কা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন গান্ধীবাদ ও নেহেরুবাদ-বিরোধী সুভাষচন্দ্র। সুভাষচন্দ্র চেয়েছেন ক্ষাত্রধর্মী শক্তিবাদ তথা বিপ্লববাদী মানসিকতায় ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে প্রবুদ্ধ করতে। গভীরভাবে আন্তর্জাতিক দৃষ্টি-সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা গড়ে তুলতে তিনি আগ্রহী ছিলেন। মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমকে প্রত্যাখ্যান করে ভারতে গড়ে তুলতে চেয়েছেন 'ভারতীয় সমাজবাদ' নেহেরু ও সুভাষ দু'জনেই আন্তর্জাতীক দৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের আন্তর্জাতীয়তার মধ্যে এক মৌলিক পার্থক্য ছিল। নেহেরু আন্তর্জাতীয় রাজনীতি ও মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা ভারতীয় রাজনীতি ও জাতীয়তাবাদকে বিচার করেছেন, পক্ষান্তরে সুভাষ ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা আন্তর্জাতীয় রাজনীতি ও ঘটনাবলীর পর্যালোচনা করেছেন। নেহেরুর এরূপ আন্তর্জাতীয় রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে ভারতে কম্যুনিজমের নামে জাতীয়তাবাদ-বিরোধী আন্তর্জাতীয়তাবাদ প্রসার লাভ করেছে এবং এই মার্ক্সবাদী আন্তর্জাতীয়বাদ প্রতিপর্য্যায়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিরোধীতা করার যুক্তি ও দর্শনে আদর্শ নৈতিক ভিত্তি খুঁজে পেয়েছে। এমন কি নেহেরু নিজেও এরূপ আন্তর্জাতীয়তাবাদের বন্দী হয়েছিলেন বলেই জনযুদ্ধবাদী কম্যুনিষ্টদের ছায় ফ্যাসীবাদ-বিরোধী চিন্তাধারার প্রভাবে আগষ্ট বিপ্লবের যৌক্তিকতার বিরোধীতা করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা পরিচালিত সুভাষচন্দ্রের পক্ষে ভারতীয় স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টায় কম্যুনিষ্ট ফ্যাসিষ্ট বা ইম্পিরিয়েলিষ্ট,—কোন রাষ্ট্রের সাহায্য নিতেই তাঁর পক্ষে নৈতিক বা আদর্শগত দ্বন্দ্ব ঘটেনি। কারণ, নিজের জাতীয় উদ্দেশ্যের সততা সম্বন্ধে তিনি যেমন ছিলেন নিঃসংশয় তেমনি ভারতের কল্যাণেই ছিল তাঁর সকল প্রয়াসের একমাত্র লক্ষ্য; নেহেরুর বিচার ধারায় এই মূল কথাটি ধরা পড়েনি যে কম্যুনিজম, সোস্যালিজম, ফ্যাসিজম, ডিমোক্র্যাসী ইত্যাদি প্রতিটি বিজ্ঞাপিত ও সমাজোচ্চারিত আদর্শের পশ্চাতে যে মূল দৃষ্টিভঙ্গীটি যুগপৎ বা

যুদ্ধোত্তর যুগে কার্যকরী হয়েছে এবং হচ্ছে তা একমাত্র বিভিন্ন রাষ্ট্রের জাতীয় কল্যাণবোধ। যে কম্যুনিজমের তাত্ত্বিক আহ্বান আন্তর্জাতীয়তাবাদে সেই কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির বর্তমান পারস্পরিক সম্পর্ক কোন সুপার-কম্যুনিষ্ট-আন্তর্জাতীয় রাষ্ট্রের অস্তিত্বে বিলীন হয়নি-বরং এই সম্পর্ক তীব্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থবোধের মাধ্যমে দিয়ে। রুশ-চীন দ্বন্দ্ব, আলবেনিয়া-যুগোস্লাভিয়ার সংঘাত, বুলগেরিয়া-রুমানিয়া-রাশিয়ার সম্বন্ধ, পূর্ব জার্মানী পোল্যাণ্ডের বিতর্ক ইত্যাদি ঘটনাগুলি তার সুস্পষ্ট নিদর্শন। কিন্তু নেহেরু স্বাধীনতাত্তোর ভারতের পররাষ্ট্রনীতি ভারতীয় কল্যাণের দৃষ্টিতে পরিচালনা করেননি, করেছেন আন্তর্জাতীয় শান্তি, সহ-অবস্থান সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা ইত্যাদি আন্তর্জাতীয় প্রোপাগণ্ডার দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা। অপর পক্ষে সুভাষচন্দ্র বিশ্ব-রাজনীতির ঘটনাবলী ভারতের কল্যাণে ব্যবহার করেছেন কিন্তু নেহেরু বিশ্ব রাজনীতির আবর্তে ভারতীয় কল্যাণ-বোধকে ভাসিয়ে দিয়ে ভারতের জাতীয় মনকে সংহত করার পরিবর্তে লক্ষ্যহীন ও বিক্ষিপ্ত করেছেন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রয়াস চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করেছে ১৯৪২ এর ৮ই আগষ্ট থেকে ১৯৪৭ এর ১৫ই আগষ্টের রক্তাক্ষরিত পাঁচ বছরের চরম পর্বে। এই ঐতিহাসিক অধ্যায়েই ঘটেছে আগষ্ট বিপ্লব, নেতাজীর আজাদ হিন্দ অভিযান, নৌ-বিদ্রোহ ও যুদ্ধোত্তর বিপ্লব সম্ভাবনার ঘটনাবলী, লাল কেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারকালীন প্রবল ও ব্যাপক গণ-বিক্ষোভ, প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা, বৃটিশ সরকারের সঙ্গে ক্ষমতা হস্তান্তরের বার্তালাপ এবং দেশভাগের চরম বিপর্যয়ের পথে ভারতবর্ষের খণ্ডিত স্বাধীনতার জন্ম। স্বাধীনতার ইতিহাসের এই অন্তিম পর্বে গান্ধীবাদের প্রভাব নৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল,—এই পর্বে কংগ্রেসী নীতি পরিচালিত হয়েছে প্রধানতঃ নেহেরুবাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা। এই যুগসন্ধিক্ষণে নেহেরুবাদ আপোষপন্থী রাজনীতির কার্যক্রমে ভারতীয় বিপ্লবের স্বপ্ন ও সাধনাকে ব্যর্থ করে দিয়ে ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি,—যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনতা প্রধানতঃ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করেছে তারই পক্ষপুটচ্ছায়ে নেহেরুবাদ সৃষ্টি করেছে কমনওয়েলথ রাষ্ট্রপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম ভারতীয় রাষ্ট্র। নেহেরুবাদেরই দান এই পঙ্গু, অথর্ব ও আত্মবিশ্বাসহীন ভারতীয় রাষ্ট্র।

বিশাল ভূগোল, সুপ্রাচীন ইতিহাস ও বিপুল জনসংখ্যার সম্পদে বিশ্বরাজনীতিতে স্বাধীন ভারতের অন্যতম প্রধান ভূমিকা যে এক স্বতঃসিদ্ধ পরিণতি এবং এই অনিবার্যতাকে কার্যকরী করার যথার্থ ভিত্তি রচনা করার একটি আত্মপ্রত্যয়ী জাতীয় মন সৃষ্টি করা এবং দ্রুত শক্তি সঞ্চয়ের পথে জাতীয় সংকল্প গড়ে তোলা যে একান্ত প্রয়োজন ছিল সেই মৌলিক কর্তব্যবোধ নেহেরুর মনকে প্রভাবিত করেনি। শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের তত্ত্বপ্রচার করে তিনি বিশ্বরাজনীতিতে অন্যতম প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতে গিয়ে আন্তর্জাতীয় রাজ-নীতির আবর্তে এমনভাবে ডুবে গিয়েছিলেন এবং বিশ্বের রাজনৈতিক সমস্যাবলীর সঙ্গে এমনভাবে ভারতবর্ষকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন যে তার সঙ্গে ভারতের জাতীয় মন রাষ্ট্রীয় কল্যাণের সংকল্প সংহত হওয়ার পরিবর্তে আন্তর্জাতীয়তা বাদের আগ্রহে ও আবর্তে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। শান্তি-পূর্ণ সহ-অবস্থানের আন্তর্জাতীয় রাজনৈতিক দর্শনে নিজেকে বাধ্য করে ফেলেছিলেন বলেই কাশ্মীরকে বিভক্ত রেখেই তিনি আক্রমণকারি পাকিস্তানের সঙ্গে আপোষ করেছিলেন, বহু যুগের বাকার রাষ্ট্র তিব্বতকে তিনি শুধু চীনের গ্রাসেই তুলে দেননি তিব্বত দখলকারী সাম্রাজ্যবাদী চীনের সঙ্গে পঞ্চশীলের মিতালী পর্যন্ত করেছিলেন এবং চৌদ্দ বছর পর্যন্ত ভারতের পর্তুগীজ উপনিবেশগুলির উপরে হস্তক্ষেপ করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কম্যুনিজমের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতির জন্যই

দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ায় ভারতীয় প্রভাব বিস্তারের ঐতিহাসিক ক্ষেত্র থাকা সত্ত্বেও তিনি সেই সম্ভাবনার সুযোগ গ্রহণ করেন নি। ভারত-সিংহল দ্বন্দ্বও নেহেরুবাদের দুর্বলতারই পরিণতি। ভারত তাদের সঙ্গে এই উপ-মহাদেশের জীবনে যে চরম দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়েছে তাকে অবসান করার পূর্ণ সুযোগ এসেছিল ১৯৪৮ সালে পাক হানাদারদের কাশ্মীর আক্রমণ উপলক্ষে এবং ১৯৫০ সালের পূর্ব-বাংলার সংখ্যালঘু নিধনের ঘটনায়। তখন সিয়াটো-সেন্টোর বা পাক-চীন জোটের বিশ্বরাজনীতির জটিলতা ছিল না। কিন্তু নেহেরুবাদের শান্তিপূর্ণ-সহ-অবস্থান তথা আপোষপন্থী রাজনীতির জন্যই তা সম্ভব হয়নি। ভারতের আভ্যন্তরীণ জীবনেও জাতীয়-অসংহতি, পরিকল্পনার ব্যর্থতা, রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও প্রয়াসের অসংগতি, গণতান্ত্রিক মূল্যের প্রতি জনতার অবিশ্বাস সামাজিক ও শাসনতান্ত্রিক দুর্নীতি এবং জাতীয় মনের পরিবর্তে ব্যক্তিবাদী মনের ব্যাপক প্রাধান্য,—এই সমস্ত জাতীয় বিচ্যুতির মূল কারণও নিহিত রয়েছে নেহেরুবাদের দুর্বলতার মধ্যে। নেহেরুবাদ ভারতের জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় জীবনে অজস্র সমস্যার সৃষ্টি করেছে কিন্তু কোন সমস্যারই সমাধান করতে পারে নি। নেহেরুবাদের চরম ব্যর্থতার চরম আঘাত ১৯৬২ সালের চীনা আক্রমণ এবং 'ভাই ভাই' 'ভাই নেহেরুর' জীবনাবসানেরও পরোক্ষ কারণ হয়ে নেহেরুবাদের শোচনীয় ব্যর্থতাকে স্বাক্ষরিত করে রেখেছে।

নেহেরুর দেহাবসানের পরেও নেহেরুবাদের প্রভাব থেকে ভারত মুক্তি লাভ করেনি। নেহেরুবাদের ফলে আজ তিন দশান্তে ভারতের জাতীয় সার্বভৌমিকতা বিপন্ন।

আন্তর্জাতীয়তাবাদী নেহেরুবাদের জন্যই যে আন্তর্জাতীয় ক্ষেত্রে ভারত আজ একটি মেরুদণ্ডহীন জীর্ণ দীন ও কৃপা-ভিক্ষু পঙ্গু ও দীন রাষ্ট্রের প্রতিচ্ছবিতে পরিণত হয়েছে সেই নির্মম সত্যকে এখনো নেহেরু—উত্তর ভারতের রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব স্বীকার করতে সক্ষম হয়নি। নেহেরুবাদের প্রভাবের ফলেই ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত সংঘাতের সুযোগে ভারত-ভাগের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের নিষ্ঠীকতার পথ গ্রহণ না করে শাস্ত্রী-নেতৃত্ব তাসখন্দ চুক্তির আপোষবাদী পন্থায় আত্ম সমর্পণ করেছে। নেহেরু কন্যাও নেহেরুবাদের প্রতি বারবার আনুগত্য জানাবার সময়ে উনিশ বছরের ঐতিহাসের শিক্ষাকে এখনও অগ্রাহ্য করেই চলেছেন।

আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ভারত আজ এক চরম সংকটের সম্মুখীন। এই সংকট ভারতের জাতীয়তাবাদের সংকট এবং এই সংকট সৃষ্টি হয়েছে নেহেরুবাদের রাজনৈতিক দর্শনে। ভারতবর্ষ আজ চরম বিপর্যয়ের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। কেবলমাত্র ভারতের সার্বভৌমিকতা, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং জাতীয় সংহতিই আজ বিপন্ন নয়,—ভারতের সমগ্র জাতীয় সত্তাই আজ বিপন্ন। ভারতবর্ষকে বাঁচতে হলে আজ সেই আদর্শ ও ঐতিহ্যকে প্রবলভাবে গ্রহণ করতে হবে যাকে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের সংকীর্ণতা এতদিন অস্বীকার করে এসেছে। এই আদর্শ ও ঐতিহ্যের অগ্নিহোত্রী প্রতিমূর্তি হলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতিই ভারতের প্রাণ এবং সমস্ত ভারতীয় নীতির প্রধান ভিত্তি ও লক্ষ্য হলো ভারতবর্ষ,—নেতাজীর এই মৌল দৃষ্টিভঙ্গীর আহ্বানে আজ ভারতে এক তীব্র, তীক্ষ্ণ ও প্রবল জাতীয়তাবাদী আদর্শ গড়ে তুলতে হবে। শান্তি ও অহিংসার নামে আপোষপন্থী মনস্তত্ত্ব নয়—এক প্রবল শক্তিধর্মী ক্ষাত্রবাদে উদ্বুদ্ধ করতে হবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে। ভারতীয় গণতন্ত্র, ভারতীয় সমাজতন্ত্র, ভারতীয় অর্থনীতি, ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতি, এক কথায় ভারতের সমগ্র রাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য হবে ভারতের জাতীয় মন ও জাতীয় গর্ববোধকে শক্তিবাদী মনস্তত্ত্বে বীর্যবান করে তোলা; বিশ্বরাজনীতিতে বিক্ষিপ্ত ভারতীয় মনকে গুটিয়ে এনে ভারতকেন্দ্রিক করে তুলতে হবে। ভারতকে সংকল্প নিতে হবে যে, যে বিশ্ব

যে ভারতের প্রত্যক্ষ স্বার্থ বা কল্যাণ নেই—সেই যে ভারত মাথাগলাতে যাবে না। বিক্ষিপ্ত ভারতকে ভারতের প্রাণ কেন্দ্রে সংহত করে নতুন করে গড়ে ; হবে এক শক্তিশালী জাতীয় ভারতবর্ষ। বিশ্বের প্রধান রাষ্ট্রই চায় না যে ভারতবর্ষ একটি শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্ররূপে গড়ে উঠুক। ভারতের জাতীয় শক্তি সংহত ও সমৃদ্ধ হলে ভারতের ইতিহাস ও ভূগোলই ভারতবর্ষকে বিশ্বের অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রে পরিণত করবে। বর্তমান সংকট থেকে বাঁচবার জন্য প্রয়োজন আজ এক প্রবল শক্তিবাদী জাতীয়তাবাদী ভারতবর্ষ।

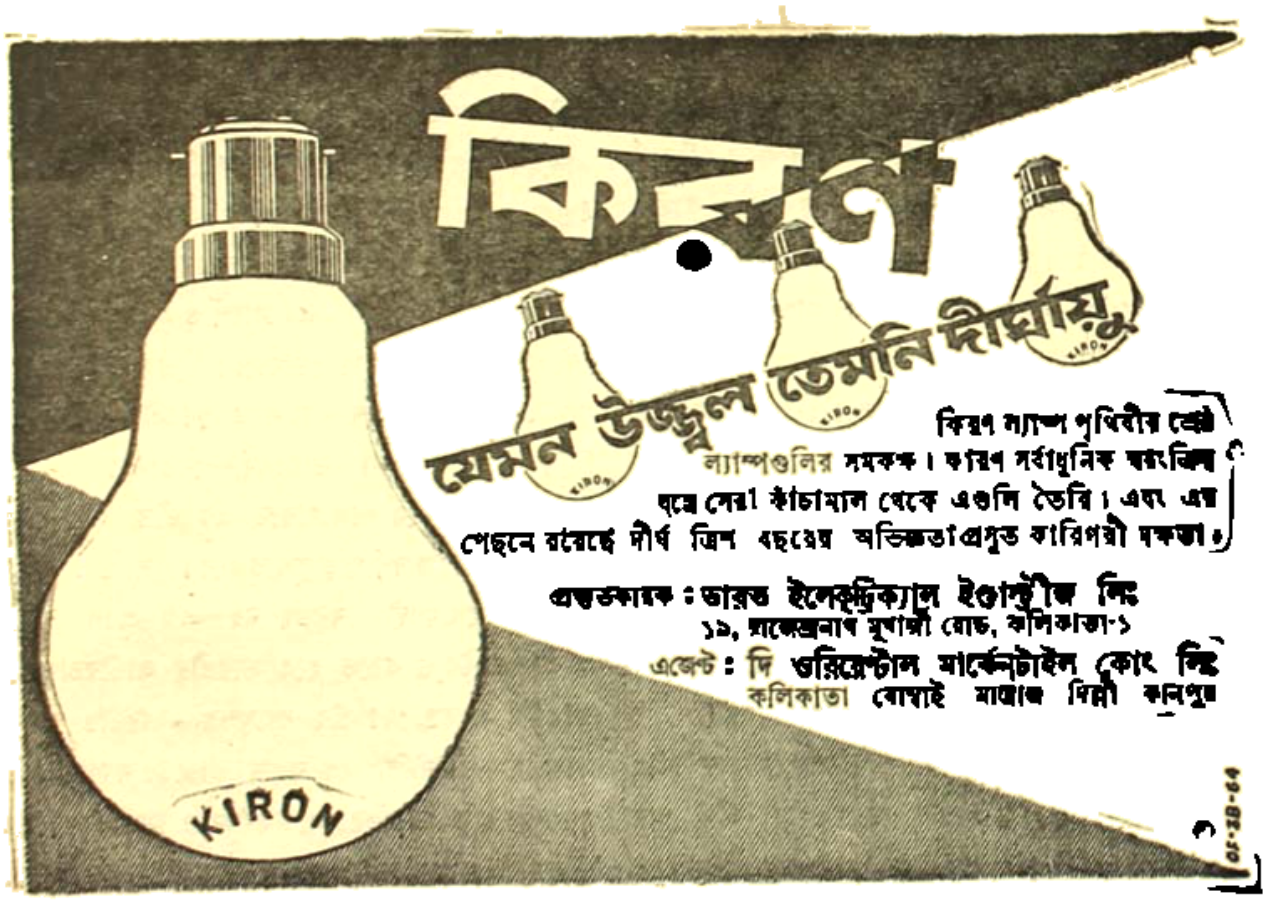

২০৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জয়ন্তী

৩১ বর্ষ ০ পঞ্চম সংখ্যা ০ ভাদ্র ১৩৭৩

সম্পাদকীয়

কংগ্রেসে অন্তর্দ্বন্দ্ব

নির্বাচন এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব নানা স্তরে প্রবলভাবে প্রকট হয়ে পড়েছে। ডিভাদুয়ে-সম্পর্কে কেন্দ্র করে কামরাজ ও ইন্দিরা গান্ধীর প্রবল বিরোধ আত্মপ্রকাশ করে। সোমার বিরোধ, মহারাষ্ট্র-মহীশূরের সীমানা বিরোধ সম্পর্কে প্রবল আন্দোলন এবং এই দুই রাজ্যের কংগ্রেসী বিরোধ, যুক্তপ্রদেশের চিরন্তন বিরোধ, পশ্চিম বাংলার বিরোধের ফলে অজয় মুখার্জির নূতন দল গঠন, উড়িষ্যার মহতাবের ক গ্রেস ত্যাগ এবং এই বছরের আরও ছোট বড় নানা বিরোধকে ছাপিয়ে সম্প্রতি মহারাষ্ট্র বন্ধ্ দমনে ব্যর্থতার জন্য মহারাষ্ট্রের কয়েকজন মন্ত্রী ও বৃহত্তর বোম্বাই থেকে নির্বাচিত কংগ্রেসী এম্ এল্ এদের একযোগে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য পদত্যাগ এবং উড়িষ্যারও অন্যান্য মন্ত্রীদের একযোগে মুখ্যমন্ত্রীর আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে পদত্যাগ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ গুরুতর ঘটনা। মহারাষ্ট্রের পদত্যাগের পশ্চাতে কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে পাতিল-চ্যবনের বিরোধ কাজ করেছে, তেমনি উড়িষ্যার পদত্যাগের পশ্চাতে বিজু পট্টনায়ক ও সদাশিব ত্রিপাঠীর বিরোধ সক্রিয় ছিল। পাতিল ও চ্যবন দুজনেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের শীর্ষস্থানে পৌঁছাবার আশায় রয়েছেন এবং মহারাষ্ট্রের রাজনীতির ওপর ভর করেই এই বাসনা পূর্ণ করতে হবে। তাই মহারাষ্ট্রের রাজনীতির ওপর স্বপরিবারীর অভিযানে চ্যবন-সমর্থক মুখ্যমন্ত্রী নায়েকের বিরুদ্ধে পাতিল-সমর্থক মন্ত্রীদের ও বৃহত্তর বোম্বাই-এর প্রতিনিধিদের এই অভিযান। উড়িষ্যারও বিজু পট্টনায়কের পুনরাগমনের জন্য এই সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছিল। কামরাজের নেতৃত্ব কিছু সময়ের জন্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়ে উড়িষ্যার সঙ্কটের সংযোগে বিজু পট্টনায়ক কামরাজের ওপরও চাপসৃষ্টি করতে পশ্চাৎপদ হন নাই। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের গতিবেগ কংগ্রেসকে ক্রমশ ভাঙনের দিকে অনিবার্যভাবে ঠেলে দিয়ে বর্তমান কংগ্রেসের আদর্শবিহীনতা সপ্রমাণ করবে।

পশ্চিম বঙ্গে বিক্ষোভ

পশ্চিম বঙ্গে বিক্ষোভ উত্তাল হয়ে উঠেছে। সর্বস্তরের শিক্ষক, অশিক্ষক স্কুল-কর্মচারী, বর্ণশিল্পী, সিনেমা কর্মচারী লরীওয়ালা, ছাত্র এবং সর্বোপরি গত ১০ই সেপ্টেম্বর পশ্চিম বঙ্গ সরকারের কর্মচারীদের একযোগে ছুটির মধ্য দিয়ে গণ-বিক্ষোভ এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। মূল্যবৃদ্ধি ও খাদ্যসঙ্কট শিক্ষক-কর্মচারীদের বিক্ষোভের মূল কারণ এবং সমাজের ও রাষ্ট্রে ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয়ে যারাত্মক

অধিরতা দেখা দিয়েছে। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি সর্বভারতীয় সমস্যা হলেও পাঞ্জাবে শ্রীধরদাসীর সর্তকতা নিযুক্ত হয়ে যে তৎপরতার সঙ্গে বহুত উদ্ধার করে মূল্যহ্রাসের উদ্যোগ করেছেন, পশ্চিম বঙ্গে বহু পূর্বেই তা করা যেতো। খাদ্যসঙ্কটও সরকারের সৃষ্টি। এই দুই সমস্যার তীব্রতা বৃদ্ধি না পেলে বহু বিক্ষোভ অবান্তর হয়ে পড়তো। সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে তিন বছরের মধ্যেও সাক্ষাতের অবসর পান নাই মুখ্যমন্ত্রী। শিয়রে যখন শমন তখন তার অবসর মিললো। কর্মচারীদের সঙ্গে এ-রকম দুর্ব্যবহার না করে গোড়াতেই যদি মুখ্যমন্ত্রী সহানুভূতির সঙ্গে তাদের দাবী নিয়ে আলোচনায় সম্মত হতেন সরকারী কর্মচারীদের মনোভাব এই পর্যায়ে এসে পৌঁছাতো না। এই পরিস্থিতির জন্য বর্তমান কংগ্রেসী শাসন সর্বতোভাবে দায়ী।

পশ্চিম বঙ্গ একটি সীমান্ত রাজ্য। এই রাজ্যের সীমান্তে চীনা ও পাকিস্তান সামরিক উদ্যোগ তৎপর এবং ভেতরে এদের চরেরাও সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। পশ্চিম বঙ্গের কংগ্রেসী শাসন ব্যাপক বিক্ষোভের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে সেই সুযোগ এনে দিয়েছে। কংগ্রেসী শাসন অপসারণের মধ্য দিয়েই সর্বাত্মক বিক্ষোভ প্রশমিত হতে পারে। অন্যথা নয়, এবং এই বিক্ষোভ শান্ত না হলে, দেশের অভ্যন্তরে প্রতিরক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী হবে না। সে ক্ষেত্রে চীনা ও পাকিস্তানী আক্রমণের এবং রাজ্যের অভ্যন্তরে তাদের চরদের পরোক্ষভাবে প্ররোচনা দিয়ে বর্তমান কংগ্রেসী সরকার দেশদ্রোহীদের পর্যায়ভুক্ত হবে।

স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আইন বাতিল নয়, সংশোধন

স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধিত হয়ে ১৪ ক্যারেটের বেশী বিশুদ্ধতার স্বর্ণালঙ্কার তৈরীর উপর সমস্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে। গত ২রা সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী এই মর্মে ঘোষণা করেছেন। সেই সঙ্গে সোনার বাট, পিণ্ড পাত, রড প্রভৃতি রাখা নিষিদ্ধ হবে। ইতিপূর্বে যারা ঐ রকম সোনার অধিকারী বলে ঘোষণা করেছেন, ব্যবসায়ীদের কাছে ঐ সোনা বিক্রির কিম্বা অলঙ্কারে পরিণত করার নির্দেশ তাদের দেওয়া হবে। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে বেশী সোনার গহনা যাদের কাছে থাকবে তাদের তা জানাতে হবে। সোনা চোরাই চালান বন্ধের জন্যই নাকি এই ব্যবস্থা। স্বর্ণ শোধনাগারগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে।

১৪ ক্যারেটের অধিক গহনা তৈরীর সোনা কোথা থেকে আসবে, সে সম্বন্ধে সরকারী ঘোষণা অস্পষ্ট। কেবলমাত্র সোনার বাট ইত্যাদির মালিকরা যদি সেই সোনা ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে তবে কিছু সময়ের জন্য তাদের সোনার অভাব হবে না। তা না হলে সরকারের উপর সোনার জন্য নির্ভর করতে হবে। সেখানে অনিশ্চিতি রয়েছে।

সোনার চোরাই চালান বন্ধের জন্য নিয়ন্ত্রণের তোড়জোড় অথচ নিয়ন্ত্রণ আইন পরীক্ষা করবার জন্য যে ঘরোয়া কমিটি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিব এল, পি, সিংহের সভাপতিত্বে গঠিত হয়েছিল, তাদের মতে চোরাই চালানের পরিমাণ বেশ ভালই, তাই যদি হয় নিয়ন্ত্রণের আটঘাট মূল্যহীন এবং সেক্ষেত্রে সোনার যোগানের ব্যবস্থা না রেখে ২২ ক্যারেট গহনা তৈরীর অধিকার পেয়ে স্বর্ণ শিল্পীদের খুব সুরাহা হবে না।

আবদুল্লার মুক্তির দাবীতে জয়প্রকাশ

সম্প্রতি অন্তরীণাবদ্ধ শেখ আবদুল্লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জয়প্রকাশ নারায়ণ তাঁর মুক্তির জন্য জোর প্রচার সুরু করেছেন। জয়প্রকাশের মতে আবদুল্লা কাশ্মীরের অবিসংবাদী নেতা এবং কাশ্মীরের নেতৃত্ব তাঁর হাতে তুলে দিলেই কাশ্মীর সমস্যার মীমাংসা হয়ে যাবে। জয়প্রকাশ আরও একটি যুক্তি দেখিয়েছেন আবদুল্লার স্বপক্ষে। জেদ্দায় মুসলিম রাষ্ট্রগুলির এক সম্মেলনে আবদুল্লা নাকি বলেছিলেন কাশ্মীরের উপর পাকিস্তানের কোনো দাবী

থাকতে পারে না। সুতরাং আবদুল্লার ভারতীয় আনুগত্য নিঃসন্দেহ।

যারা ভারতের প্রতি শত্রুর আচরণ করে, জয়প্রকাশের তাদেরই আপনজন করে নেবার প্রবণতা দেখা গেছে। আমুর খাঁ, বৈরী নাগা এদের ক্ষেত্রে জয়প্রকাশের এই মনোভাব অতীতে কাজ করেছে। এবার আবদুল্লার প্রতি তাঁর সহানুভূতির উদ্রেক হয়েছে। এই সহানুভূতির রাজনীতি থেকে জয়প্রকাশ কবে উদ্ধার পাবেন এবং দেশও মুক্তি পাবে তাই প্রধান সমস্যা।

ধানের দাম বাড়লো

গরীব চাষীদের প্রায় দুই লক্ষ টন, অন্যান্য চাষীদের প্রায় চার লক্ষ টন চাল কম দামে সংগ্রহ করে মোতায়েন-মজুতদারদের কাছ থেকে ধান সংগ্রহের জন্য মণ প্রতি অতিরিক্ত একটাকা বেশী দাম ও দুই টাকা বোনাস দেবার ঢালাও হুকুম পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেপ্টেম্বরে জারী করেছেন। এই বর্ধিত মণ প্রতি তিন টাকা দাম আগামী ২১শে অক্টোবর পর্যন্ত চালু থাকবে। উৎপাদকদের মজুত থেকে কালো-বাজারে প্রচুর পরিমাণে চাল পাচার বন্ধ করবার জন্যই নাকি এই ব্যবস্থা। কংগ্রেস সরকারের উপযুক্তই বটে। গরীব চাষীদের মেরে মজুতদার তোষণের এর চাইতে আর কি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে! বরং হওয়া উচিত ছিল ধান ওঠার সময় থেকে বৈশাখ পর্যন্ত বর্ধিত দামে ধান ক্রয় করে, তারপর দাম কমিয়ে মজুতদারদের গোড়াতেই ধান বিক্রিতে বাধ্য করা। নির্বাচনে যারা প্রধান সহায়ক, নির্বাচনের বছরে সেই মজুতদার-কালোবাজারীদের এই পুরস্কার না দিয়ে কংগ্রেসী কর্তারা অনন্যোপায়।

চীনে লাল প্রহরী

সম্প্রতি চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে কট্টর মাও পন্থীরা চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টিকে কবলিত করেছে। ১৯৬৫র আগষ্টে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণ বৈঠক ১৯৬২র আগষ্টের পর এই আর একবার বসে। এই বৈঠকের পরই পার্টি থেকে নরম পন্থীদের বিতাড়ন ও কট্টর মাও পন্থীদের ক্ষমতায় আরোহণ সুরু হয় এবং অনতিকালেই প্রতিরক্ষামন্ত্রী লিন পিয়াও মাও সে তুং-এর উত্তরাধিকারীর আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কমিটির বিবৃতিতে কম্যুনিষ্ট সেনাবাহিনীকে কম্যুনিষ্ট সংগঠনের মডেলরূপে জনসমক্ষে দাঁড় করিয়ে পার্টির সঙ্গে সামরিক বাহিনীর নৈকট্যের এবং সামরিক বাহিনীকে পার্টির প্রতিচ্ছবির স্বীকৃতি দিয়ে পার্টি-সামরিক বাহিনীর একান্ত সংহতি ঘোষণা করা হয় এবং লিন পিয়াও মাও সে তুং-এর চিন্তাধারার সঙ্গে সামরিক বাহিনীর ঘনিষ্ট পরিচয়ের আহ্বান জানিয়ে সমগ্র জাতি এবং পার্টিকে উদ্দীপিত করেন। উত্তর ভিয়েৎনামের ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিকের বিংশতিতম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে ১৯৬৫র ২রা সেপ্টেম্বর পিকিং-এ প্রকাশিত লিন পিয়াওর প্রবন্ধে নরমপন্থীদের বিরুদ্ধে কট্টর মাওপন্থীদের অভিযানের যে আভাস পাওয়া যায় তারপর থেকেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে ব্যাপক কম্যুনিষ্টদের বহিষ্কার সুরু হয়ে যায়। পিকিং-এর মেয়র পেন চেন, প্রচার সচিব লু তিং ই, সমরবিদ্যালয়ক লো জুই চিং একে একে এরা সকলেই বহিষ্কৃত হন। লিউ সাও চির মর্যাদা দ্বিতীয় থেকে অষ্টম স্থানে নেমে এসেছে এবং সাম্প্রতিক প্রচারে মনে হয় তার বহিষ্কারও আসন্ন। চৌ-এন-লাই পার্টির ভাইস-চেয়ারম্যানের পদ হারিয়েছেন।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে ব্যাপক ছাটাই-এর মধ্য থেকে যুবক মাওপন্থীরা রেড গার্ড-গঠন করে নানা অত্যাচারে শুধু নরমপন্থীদের নয়, বৈদেশিক দূতাবাসের অধিকারীদের, বহু প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিপীড়িত করেছে। বহুবছর চীনে বাস করার পর গত ২১শে আগষ্ট ৮ জন বৃদ্ধা সন্ন্যাসীনিকে এই রেডগার্ডের দল অসম্মান ও অত্যাচার করে পিকিং ছাড়তে বাধ্য করে, সোভিয়েট দূতাবাসের সম্মুখে দিন দিন তাণ্ডব করে দূতাবাসের কর্মচারীদের

জীবন দুঃসহ করে তোলে এবং রাস্তা-ঘাটে সর্বত্র ত্রাসের রাজত্ব বইয়ে দেয়। এমন কি লাল-ঝাণ্ডা-সেনের মূর্তি পর্যন্ত এদের অপমানের হাত থেকে রেহাই পায় নাই।

চীনের আভ্যন্তরীণ জীবনে বহিষ্কার, 'রেডগার্ড' নামক স্বাধিনায়কহীন যুবপ্রতিষ্ঠানের সাহায্যে অত্যাচার ও অপমান এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে কট্টর মাও পন্থীর বিরোধীদের উচ্ছেদের পশ্চাতে চীনে আভ্যন্তরীণ সঙ্কটই বোঝায়। এই সঙ্কটের উত্তরণ চীনে মাও পন্থীর শক্তিবৃদ্ধি করবে, সামরিক বাহিনীর ওপর দলের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করবে এবং অনিবার্যভাবে চীনকে যুদ্ধের কিনারায় ঠেলে নিয়ে যাবে। চীনের সাম্প্রতিক ঘটনা এই ইঙ্গিত বহন করছে। চীনা কম্যুনিষ্ট দলের তাত্ত্বিক পত্রিকা রেড ফ্ল্যাগ বলছে: "If they are not struck down, they will, like Kruschev rise up to usurp the leadership of our party and state whenever they see the chance, and make our whole country change colour."

এই সাংস্কৃতিক বিপ্লব কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার হাতাহাতির পর্যায়েও গিয়ে পৌঁছেছিল। লাল রঙ বিপ্লবের প্রতীক, সুতরাং যেখানে গতির ইশারা সেখানেই লাল রঙের ব্যবহারে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে হবে। তাই এই রেড-গার্ড বাহিনী তরুণ মাও পন্থীরা রাস্তার লাল আলোগুলিকে যানবহনের গতিরোধের চিহ্নরূপে ব্যবহারের পরিবর্তে অগ্রগতির চিহ্নরূপে ব্যবহারের জন্য অবতারণা করে। কিন্তু ফল হল বিপরীত। শেষ পর্যন্ত লাল আলো 'stop' এবং সবুজ আলো 'go' ইশারার বাহকই হয়ে রয়েছে। রেড গার্ডদের বাড়াবাড়িতে শেষ পর্যন্ত পার্টিরও টনক নড়ে এবং পিকিং থেকে তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়। মফস্বলে কোথাও কোথাও রেড গার্ডদের স্থলে রেড গার্ড বিরোধীদের সংঘর্ষও হয়ে গেছে।

রেড গার্ড চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টিতে মাও-বিরোধীদের বহিষ্কারনীতির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এই বহিষ্কার নীতি 'শক্ত লাইনে'র প্রয়োগের প্রস্তুতি, যে শক্ত লাইনের পরিণতি যুদ্ধে। চীনে এই বহিষ্কার নীতির প্রয়োগে শোধনবাদের কথাও উঠেছে। চীনে শোধনবাদ সোভিয়েট রুশের নীতিরই নামান্তর। তাই রেড ফ্ল্যাগ পত্রিকায় ক্রুশ্চেভের নাম উল্লেখ করে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টিতে মাও বিরোধীদেরই সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। 'শক্ত লাইনে'র প্রতিষ্ঠা, সেনাবাহিনীর ওপর পার্টির আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং সর্বোপরি চীনা পার্টির শক্তি-বিন্যাসে মাও সেতুং-এর উত্তরাধিকারীরূপে লিন পিয়াও-এর অসপত্ন প্রতিষ্ঠা যুদ্ধ প্রস্তুতিরই দ্যোতক। লাল প্রহরী তারই একটি সঙ্কেত মাত্র।

ভারতের ঋণের দ্রুত বৃদ্ধি

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ১৯৬৫-৬৬ সালের বার্ষিক রিপোর্টে জানা যায় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে ভারত সরকারের ঋণের পরিমাণ কি রকম হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫১ সালের মার্চ মাসের শেষে এই ঋণের পরিমাণ ছিল ২,৮৯৫ কোটি টাকা এবং ১৯৬৬র মার্চের শেষে পরিমাণ দাঁড়ায় ১১,৩৮৩ কোটি টাকায়। ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসের শেষে ভারত সরকারের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল ২,৬২৯ কোটি টাকা। বর্তমান আর্থিক বছরে ভারত সরকারের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৩২৯০ কোটি টাকায় এবং মোট ঋণের পরিমাণ ১২,৩৯৬ কোটি টাকার পৌঁছাবে বলে হিসাব করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্য সরকারগুলির ঋণও চৌগুণে বেড়ে গেছে। ১৯৫২ সালের মার্চের শেষে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্যসরকারগুলির ঋণের পরিমাণ ছিল ২৭৯ কোটি টাকা, ১৯৬৬ মার্চের শেষে তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪০৯১ কোটি টাকা।

দুর্বহ ঋণের বোঝা কেন্দ্রীয় সরকারের শোচনীয় আর্থিক পরিস্থিতির স্মারক। ডিভ্যালুয়েশনের পর বৈদেশিক ঋণ শতকরা ৫৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১১.৯.৬৬

আগষ্ট-এর স্বপ্নগুলি : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এখন রাত গভীর হলে তারা
নতজানু, জীবন ভিক্ষা করে।

তাদের হলুদ চোখে দারুণ ভয়
নাচতে থাকে, বুকের মধ্যে নিষ্ঠুরতা
হাততালি দেয়।

তারা প্রলাপ বকে, বাতাস চায়॥
[১৭ই জুলাই, ১৯৬৬]

আমার দেশ শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

তোমাকে দেখিনি আদি ঠিক যেন চিনিনা তোমাকে
তুমি আমার স্বদেশ
তোমাকে নিয়েও কোন কবিতা লিখিনি কোনদিন···
ঘরের স্ত্রী কবে কার কবিতার মুখর নায়িকা
যেমন জীবিকা নিত্য ঘৃণা করি, ঘৃণা
সর্বদাই মনে হয় আর পারছি না
যদিও পাঁকের 'পরে জীবন পদ্মের মত ফোটে
যদিও পদ্মের গন্ধ পরিজন আত্মীয় আমার
থাকে কাছাকাছি ঠিক কেননা জীবিকা আছে পাশে
যার কথা কখনো ভাবি না

তেমনি অপোচর এক নির্ঝর সন্ধ্যার
মাঝে মাঝে স্মৃতিচারণায় নিসর্গ, কৈশোর
যৌবনের বয়ঃপ্রাপ্ত আবিষ্ট প্রথম দিনগুলি
দেশের মেয়ের কোন বিশেষ ভঙ্গি ও ভালবাসা
মনে পড়ে কখনো কখনো....
কের মাঝে মাঝে আদি ক্রোধের বিস্ফারে
বন্ধু কেউ দূরদেশে আলোর মহিমা খুঁজে পায়
অন্যান্য অনেক দেশ উর্ধ্বগামী ফুল দেশাচারে
কখনো কখনো কাঁদি হতোদ্যম ভীষণ নির্বেদে···
মুহূর্তেই সব দূরে গেল
কাল রবে সিঁড়ির ওপাশ থেকে
বাইরের বারান্দায় দরোজায় টোকা মেরে বসে গেছে কেউ
সকালে দুপুরে সান্ধ্য অন্ধকারে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে
ছাদের ওপরে শব্দে হেঁটে হেঁটে, ডাকবাক্সের ভিতরে
পাড়ার বকাটে মাইক্রোফোনের চিৎকারে কেউ
বলে গেছে খুব হেসে হেসে
'তোমার ঘরের বউ ঘরে নেই আর
তোমার জীবিকা নেই আর
এমন কি কবিতালেখার খাতা কলমও নেইকো
যা খুশি বলার শক্তি নেইক' তোমার
আদি নেই, অন্ত নেই, মাটি নেই তোমার চারদিকে
মুখবন্ধ আছ তুমি ভীষণ বিদেশে'
তখন, তখনই আমি খুব জোরে কাঁদি—
বুঝি, কে ছিল আমার
কে আমার হতে পারে শুধু চিরদিন।

বৃদ্ধ জেলের স্মৃতি চারণ

অনুবাদ : নচিকেতা ভরদ্বাজ

যদিও পায়ের কাছে নাচছ, তোমরা ওহুদেরা, ক্রীড়াপর শিশুর মতন,
যদিচ কিকৃমিক্ করছ, এবং তাকিয়ে থাকছ, বর্ষরিত ফলতানে
ভেঙে পড়ছ আবেগে এখনো ;
আজকের চেয়ে ঢের উজ্জ্বল সেই সব আষাঢ়ে শ্রাবণে
উজ্জীবিত ওহুদেরা ছিল আরো নন্দিত চারণ,
কিশোর ছিলাম যবে—চিড় খায়নি হৃদয়ে তখনো।

আগের মতন আর জোয়ারের ভরা জলে ইলিশ পড়ে না :
হায়রে, সে-সব শঙ্খের শুভ্র ঝুড়ি ভরা মাছ নিয়ে গাড়ীর চাকায়
রমনার বাজারে সব পৌঁছে দিয়ে—কত বেচাকেনা,
কিশোর ছিলাম যবে – একটিও চিড় খায়নি হৃদয়ের গায়।

আর তোমরা সরবিনী কন্যারা, তোমরা রূপবতী নও তাদের মতন
বৈঠার জলের শব্দ শুনে যারা ঘাটে এসে জমা হত—
দর্পিত দ্রুত ব্যস্ত পায়
সন্ধ্যার ধূসরে যারা জালের চারদিকে আসত—বালুকা বেলায়,
কিশোর ছিলাম যবে – চিড় খায়নি হৃদয়ে তখন।

W. B. Yeats : The meditation of The old fisherman.

ধারাবাহিক রচনা

সুভাষচন্দ্র

পবিত্রকুমার ঘোষ

প্রেসিডেন্সি কলেজ

১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে The Amrita Bazar Patrika পত্রের সংস্করণে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয় :

An Unfortunate Incident the Presidency College

A very regrettable incident occurred in the Presidency College on Tuesday (yesterday) afternoon at 3 p. m. Prof Oaten was severely assaulted by a number of students. We have been able to gather the following facts in this connection.

It seems that after the dismissal of their class the First Year Chemistry students were passing along the corridor by the only path which the students could avail of and in which Prof Oaten was lecturing. Mr. Oaten felt annoyed, came out of his room and is said to have caught hold of one of the students by the neck, and called him a rascal. He then took him to the office room, and fined him Re. 1.

The student in question who is said to be barely 16, thereupon lodged a complaint before the Principal and awaited decision. The Principal, however, instead of taking immediate action postponed the matter till 3 p. m. Meanwhile, the news spread all over the College and the students in general felt aggrieved specially as Mr. Oaten had behaved himself similarly on two former occasions.

Now sometime after the above incident, when Mr. Oaten was coming downstairs and passing through a number of students who had collected in the corridor in front of the common room, he received a blow from behind, and as he turned to see his assailant another student who was standing close by sprang upon him and threw him on the ground. Thereupon several other students fell upon the helpless professor and committed a savage assault upon him.

After the incident, the Principal made an inquiry into the matter but the culprits, so far remain yet undetected.

পরদিন, বৃহস্পতিবার, ১৭ই ফেব্রুয়ারী The Statesman পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নিম্নলিখিত সংবাদটি :

The Presidency College Incident

Enquiries are now being made into the brutal assault upon Professor Oaten at the

Presidency College on Tuesday afternoon. The actual facts of the case appear to be as follows: —Just before one o'clock Professor Oaten had occasion to fine a student one rupee for creating a disturbance in the corridor outside his class-room. At half-past one, the student complained to Professor James, Principal of the College, that Professor Oaten had caught him forcibly by the neck and called him a rascal before some forty of his fellow-students. The Principal arranged to hold an enquiry into the case in Professor Oaten's presence at three o'clock, but just before the hour the Professor was attacked from behind by a number of students while he was fixing a notice. He was thrown to the ground and kicked about the head and body. He was unable to give the names of his assailants.

দুটি পত্রিকার সংবাদ-পরিবেশনের তারতম্যটুকু লক্ষ্য না করে পারা যায় না। স্টেটসম্যান ঘটনার দুই দিন পর, বিশেষ অনুসন্ধানাদির শেষে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তাতে ছাত্রদের দোষী ও পাপী সাব্যস্ত করার চেষ্টা আছে। অধ্যাপক ওটেন প্রথম বর্ষের ছাত্রটিকে 'র‍্যাস্কেল' বলেছিলেন —এটা স্টেটসম্যানের মতে, ছাত্রটির অভিযোগ মাত্র; এবং ওটেন নোটিশ লাগাবার সময় পিছন থেকে আঘাত হানার কাহিনীটিও মিথ্যা। কিন্তু এটাই ছিল সম্ভবতঃ ঘটনাটি সম্পর্কে সরকারী ভাষ্য। পরদিন শুক্রবার ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত The Bengalee সংবাদপত্রে এই ভাষ্যকেই বিশদতর ভাবে প্রকাশ করা হয়েছিল:

Assault on Prof Oaten
Professor's confidence in Students

The following is the full report which has been received by Government of the facts as to the assault committed upon Professor Oaten of the Presidency College on Tuesday on 15th instant. Shortly before 1 p. m. when Mr. Oaten was still lecturing to the 5th year class students in the History Seminar on the 1st floor of the College, he was disturbed by a number of students passing along the veranda outside the room talking loudly. There being a strict rule of the college, to which the attention of the students had been frequently called quite recently, that there is to be no talking in the corridor or passages, he went out of his room and remonstrated with these students and told them that they must not talk. He then turned back towards his lecture room, and he was just re-entering it when one of the students called out loudly some remark, which Mr. Oaten did not catch, to one of his companions. He turned back at once and went up to the student who had spoken and took him quietly by the arm and led him to the Steward's room, which was close by, and had his name recorded for a fine of Re 1. Mr. Oaten considered it necessary to put his hand on the student to pick him out from the crowd of other students around him, but the youth did not resist and he employed no force in leading him to the Steward's Room. Mr. Oaten states that he did not call the boy a "rascal," as alleged by him. Mr. Oaten then returned to his lecture room and reported the matter to the Principal in writing. He continued his work and shortly afterwards received a note from Mr. James saying that the boy who had been fined had complained to him and that he wished Mr. Oaten

to meet the boy in the Principal's Room at 3 o'clock.

Just before 3 o'clock Mr. Oaten left his room and went down the main staircase to the ground floor in order to affix a notice concerning some athletic sports on the Notice Board near the foot of the stairs. There were no students on the stairs as he went down, but he noticed a group of youths, whom he believes to have been students of the College, standing at the bottom of the staircase. He states that he did not recognise any of them and does not think that the group contained any students belonging to his own classes. He believes from what happened immediately afterwards that these students had been waiting for him. On reaching the bottom of the staircase he passed through the group and had taken only a few steps from the foot of the stairs when he was attacked from the behind and knocked down on to his hands and knees. He was then struck and kicked by some 15 assailants while he was prevented by blow and pressure from regaining his feet. He was kicked about the head and all over the body. Then the assault suddenly stopped, his assailants ran away, and he found that Mr. Gilchrist, a fellow Professor, was standing by his side. He believes that the whole assault must have occupied 40 seconds.

Mr. Oaten states that the story which has been published in the press alleging constant friction between him and his classes, culminating in a general appeal by the students to Mr. James against him on Monday last, the 14th instant, is entirely untrue, and this is corroborated by Mr. James the Principal. Mr. Oaten states that he is on cordial terms with all the students of his history classes, which are composed of 3rd and 4th year students for the B. A. and 5th and 6th year students for the M. A. and he is confident that none of these students took part in the assault.

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বেঙ্গলী' সংবাদপত্রে এই যে সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল, এ একটি সরকারী বিবৃতি। কেননা ঐ একই বিবৃতি ঐ একই তারিখে অন্যান্য সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে ঘটনাটি ঘটে যাবার কয়েকদিনের মধ্যেও সুরেন্দ্রনাথের পত্রিকায় এ সম্পর্কে কোন সংবাদই প্রকাশিত হয়নি; সরকারী তাল্পের বাইরে নিজেদের পক্ষ হতে সত্য যাচাইয়ের কোনো প্রয়োজনও পত্রিকাটি মনে করেনি।

অমৃত বাজার পত্রিকা ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সরকারী বিবৃতিটি প্রকাশ করে, কিন্তু সেই সঙ্গে সম্পাদকীয় স্তম্ভে একটি মন্তব্যও মুদ্রিত করে। মন্তব্যটি এই :

Elsewhere is published a Government communique relating to the deplorable incident that happened in the Presidency College on Tuesday, the 15th instant. Necessarily it contains the version of Professor Oaten, for it is not possible for the Government to secure the version of the other side. We were assured by our informants that Mr. Oaten caught the young boy by the neck and used an abusive epithet towards him, but when he contradicts it we should accept his denial unless it is contradicted by the other side.

১৯শে ফেব্রুয়ারি শনিবার অমৃত বাজার পত্রিকা পুনরায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখেন : The Government

communique on the recent regrettable incident in the Presidency College has been followed by a notice suspending the College in all its departments, theoretical and practical, until further orders. The notice was issued by Principal James yesterday (Friday) in accordance with orders from the Bengal Government. The classes were held as usual up to 1 p.m A meeting of the students condemning the assault on Mr. Oaten was held from 1 to 2. Since 2 p. m. the College was finally closed against the entry of all students.

বাংলা গভর্ণমেণ্টের আদেশটি ঐ তারিখের স্টেটসম্যানে ও বেঙ্গলীতে প্রকাশিত হয়েছিল। 'বেঙ্গলী' ঐদিন সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই মন্তব্যও করেছিল: We very deeply regret the incident in the Presidency College which has formed the subject of an official communique. We do not desire in the smallest degree to aggravate, by any remarks of our own, the situation already sufficiently delicate and difficult. It is a great pity that matters should have been permitted to drift to this unhappy end. We can not help thinking that a little more of the spirit of conciliation and little more tact would have averted a state of things which all must deplore. 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য ও সংবাদ পরিবেশনের ধরণ দেখে মনে হয় যে পত্রিকাটি দুই কূল বজায় রাখতে চাইছে এবং তাই নিজস্ব কোনো বক্তব্যের পক্ষপাতী নয়।

প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের দ্বারা অধ্যাপক ওটেনের লাঞ্ছনার ঘটনাটি সেদিন কতখানি গুরুত্ব নিয়ে দেশের সামনে দেখা দিয়েছিল তা উদ্ধৃত সংবাদ ও সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলি হতেই বোঝা যাবে। সরকারও ঘটনাটির উপর অসাধারণ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাই এ বিষয়ে অনতিবিলম্বে একটি সরকারী বিবৃতি প্রচার করা হয়েছিল এবং তৎসঙ্গে সমস্ত ঘটনাটি সম্পর্কে অনুসন্ধান ও প্রতিকারকল্পে একটি কমিটিও সরকার গঠন করেছিলেন। ২০শে ফেব্রুয়ারি তারিখে 'বেঙ্গলী' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় মহামুক্তের সংবাদের সমান গুরুত্ব দিয়ে সরকারী কমিটি গঠনের সংবাদ পরিবেশন করেন। সংবাদটি ছিল এই:

Presidency College
Question of Discipline
A Committee Appointed
Sir Asutosh to Preside.

The Government has decided to appoint a Committee of five with Hon'ble Sir Asutosh Mukherjee as President to consider the question of the strike of students which took place in January and the recent assault on Professor Oaten. The Committee will commence its sittings at once and will make its recommendation to the Government in due course.

The following gentlemen have been asked by the Government to serve under the committee—The Hon'ble Mr. W. W. Hornell, Director of Public Instruction; Mr. H. R. James, Principal of Presidency College; the Rev. Mr. J. Mitchell, Principal of the Wesleyan College, Bankura, Mr. Heramba Chandra Moitra, Principal of the City College.

এই কমিটি গঠনের সংবাদটি অন্যান্য পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছিল। ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকা হতে জানা যায় যে তার আশুতোষ মুখার্জির সভাপতিত্বে গঠিত কমিটির সদস্য সংখ্যা ছিল মোট ছয় জন। পূর্বে যাঁদের নামোল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা ছাড়াও ছিলেন Mr. B. B. Steele I. C. S. এবং তিনিই ছিলেন কমিটির সেক্রেটারি।

॥ দুই ॥

২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৬, রবিবার, 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা তার প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধে—এবং 'স্টেটসম্যানের' মান অনুসারে খুবই দীর্ঘ প্রবন্ধ—প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ওটেন সাহেবের প্রহারকে কেন্দ্র করে লিখল। এই প্রবন্ধটি আজ পড়ে মজা লাগে, কিন্তু সেই সঙ্গে গুরুতর কয়েকটি কথাও মনে আসে। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কোনো কোনো অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সাহেবের সঙ্গে সংঘর্ষ ইতিপূর্বে বেধেছিল ট্রামে বা বাসে; কারও নজর তাতে আকৃষ্ট হয়নি। কিন্তু এই প্রথম তিনি হলেন সংবাদপত্রের সংবাদের নায়ক, এবং প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রগুলির সম্পাদকীয় মন্তব্যের বিষয়। 'স্টেটসম্যান' সম্পাদকদের পক্ষে সেদিন অনুমান করা সম্ভব হয়নি যে, যে কিশোর ছাত্র-নেতার তীব্রতম সমালোচনায় তাঁরা মুখর হচ্ছেন উত্তরকালে তিনিই হয়ে দাঁড়াবেন তাঁদের দুর্ভাবনার প্রধান কারণ; কিন্তু সুভাষচন্দ্র হয়তো সেদিনই বুঝেছিলেন যে ইংরেজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে আসা ব্যাপারটা কী, তার পরিণামই বা কী এবং স্বার্থে ঘা পড়লে ইংরেজমাত্রেই কতখানি কুটিল, হিংস্র ও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করতে পারে। ওটেন সাহেবের ঘটনাটির মাধ্যমে বাংলা দেশে বাসরত ইংরেজরা সুভাষচন্দ্রকে চিনেছিল; সুভাষচন্দ্রও চিনেছিলেন ইংরেজকে; এবং দেশবাসীর বিস্মিত দৃষ্টির সামনে সেই প্রথম এসে দাঁড়াল এক নতুন মানুষ—যে মানুষ জাতির অন্তরাকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে দাঁড়াতে পারে মুহূর্তে।

'স্টেটসম্যান' তার আলোচ্য সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখেছিল: "এই আক্রমণটি ছিল কাপুরুষোচিত। মিঃ ওটেনের মুখোমুখি মোকাবিলা করার বদলে তাঁকে পিছন থেকে এমনভাবে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয় যাতে তিনি হাত পা ছড়ে পড়ে যান। তিনি মাটিতে পড়ে গেলে ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁকে লাথি মারতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না আরেক জন অধ্যাপক এসে পড়েন—তখন তারা পালিয়ে যায় ধরা পড়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য। মিঃ ওটেন এই যুবকদের উত্তেজিত হতে প্ররোচিত করেছিলেন সে কথাটা এখানে অবান্তর। যদি তিনি কোন ছাত্রকে 'রাস্কেল' বলেও থাকেন এবং কড়া হাতে কারও কান চেপে ধরেও থাকেন তবে ছাত্রদের পক্ষে তার প্রতিকারের পথ ছিল কলেজের অধ্যক্ষের নিকট দরবার করা। বাস্তব অথবা কল্পিত কোনো অন্যায়ের কারণে ছাত্ররা নিজেরাই প্রতিবিধান করতে উদ্যত হবে এ কথা আলোচনাই করা যায় না এবং এদেশ ভিন্ন আর কোথাও এ নিয়ে আলোচনা হতও না। সুতরাং যদি দোষীদের খুঁজে বের করা যায় তবে তাদের কঠোরতম শাস্তি দান করতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য। যে সব উচ্ছৃঙ্খল যুবকরা মনে করে যে তাদের সম্মানার্হ ব্যক্তিদের অসম্মান করা যায়, কলেজ হতে তাদের বিতাড়ন বা দুই এক বৎসরের জন্য বহিষ্কার করা ভিন্ন উপায় নেই। যদি এই দুষ্ট যুবকদের পিতামাতারা জানতে পারেন যে তাঁদের কর্তব্য কী এবং ঐ যুবকদের প্রতি কর্তৃপক্ষ কত রূঢ় ব্যবহার করবেন, তাহলে বিদ্রোহিরা সম্ভবত (এখানে rebel শব্দটির ব্যবহার মনে রাখার মতো—লেখক) শান্ত ও সুস্থ মনে তাদের স্বাভাবিক কাজকর্মে ফিরে আসবে।.....কতিপয় স্কুলের বালকের অস্ত্র ব্যবহারকে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ব্যাপার (affair of the state) করে তোলা বুদ্ধির পরিচয় হবে কি না সেবিষয়ে সংশয় আছে।...কিন্তু বাংলা দেশে স্কুলের ছাত্রদেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকার অংশীদার রূপে দেখতে হবে।...তারা তাদের নিজেদের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে চায় এবং তাদের অধ্যাপকদেরও শায়েস্তা করতে চায়। সরকার এ বিষয়ে যে কমিটি নিয়োগ করেছেন তা দেখে মনে হতে পারে যে এতে ঐ উচ্ছৃঙ্খল তরুণদেরই জয় হয়েছে এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের মর্যাদা আহত হয়েছে।...কিন্তু ঐ চপলমতি শাসনের অযোগ্য তরুণদের নত করার উপায় খুঁজে বের করতেই হবে।" 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা এই সঙ্গে

এমন একটি মন্তব্য যোগ করেন যা আজ পড়লে হাসি পায়। ভবিষ্যদ্বাণীর সুরে সম্পাদক বলেন: This want of self-control among youths, this morbid sensitiveness, this overweening idea of their own importance, are poor qualities with which to enter into the struggle of life.' সুভাষ কিন্তু তাঁর চরিত্রের এইসব poor qualities নিয়েই তেমন ভয়াল ও বিশাল জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন যা 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার সম্পাদকের পক্ষে কল্পনাতীত। বিজ্ঞপ্রবরদের ভবিষ্যদ্বাণী কখনো কখনো তাহলে ব্যর্থ হয়? 'স্টেটসম্যানের' আরেকটি মন্তব্য কিন্তু অতিশয় সত্য ও সার্থক বলে প্রমাণিত হয়েছে। ইতিপূর্বের ও সমকালীন বাঙালী নেতাদের তুলনায় এই নতুন বাঙালীরা যে চরিত্রবৈশিষ্ট্যে অনেকখানি তফাৎ হয়ে গিয়েছে এই আবিষ্কারটুকু পরবর্তী কালে সত্যই প্রমাণিত হয়েছে।

কলকাতায় প্রকাশিত ও বৃটিশ স্বার্থে পরিচালিত আরেকখানি ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্র The Englishman ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখ হতে নিয়মিতভাবে অধ্যাপক ওটেন সাহেবের প্রহার সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশন করেছিল। নির্জলা মিথ্যাও সেই সংবাদে পরিবেশিত হত। ২৯শে ফেব্রুয়ারি, সোমবার, দুই কলমের চেয়েও বেশি দীর্ঘ এক প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এই পত্রিকাটিতে। স্টেটসম্যানের চেয়েও কঠোরতর ভাষায় প্রেসিডেন্সি কলেজের সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের শাস্তি দাবী করে ঐ প্রবন্ধে লেখা হয়: "It were better to close the Presidency College and every other college than to allow them to remain open under these conditions.---Every one of the students concerned deserves—as a few have already received—instant expulsion, and the assault being of a criminal nature, their punishment ought not to stop there." সমস্ত ঘটনাটি যে ইংরেজ সমাজের ওপর একটা প্রচণ্ড আঘাত রূপে এসেছিল এবং অধ্যাপক ওটেনের ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, ইংরেজের ভবিষ্যৎ স্বার্থই বিপন্ন হয়ে পড়েছে বলে ইংরেজরা সেদিন মনে করেছিল তার প্রমাণ রয়েছে গভর্নমেন্ট এবং ইংরেজ সংবাদ-পত্রগুলি ঘটনাটির প্রতি এতখানি গুরুত্ব আরোপ করার মধ্যে; এবং The Englishman কাগজও কথাটি খোলাখুলি বলেছিল। সম্পাদক সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের শাস্তিদানের দাবী জানিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে লিখেছিলেন: "The question cannot be allowed to rest even with the punishment of the students concerned in this outrage. This is part of a much larger question which concerns the Government of Bengal."

এই ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখেই The Englishman একটি সংবাদ প্রকাশ করে যা হতে সুভাষচন্দ্রের বিতাড়নের কথা জানা যায়। অবশ্য সংবাদে তাঁর নাম প্রকাশ করা হয়নি। সংবাদটি এই: Two Students Expelled, Another Punished.

The Governing Body of the Presidency College has held an investigation into the assault on Professor Oaten and has, we understand, expelled two students in connection with the assault and punished a third who was concerned in the recent strike. The report of the committee of the Governing Body will, in all probability, be signed to-day and forwarded to Government.

The action taken by the Governing Body is quite independent of the other committee appointed by Government which will enquire into the general discipline of the college. The committee cannot commence its investigation

until the Rev. Mr. Mitchell, of Bankura arrives.

২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' দ্বিতীয় সম্পাদকীয় স্তম্ভে 'স্টেটসম্যান' ও 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার পূর্বোল্লিখিত সম্পাদকীয় মতামতের সমালোচনা করেন। 'ইংলিশম্যানের' মতামত সম্পর্কে 'অমৃতবাজার' লেখেন: 'It shows deep-rooted prejudices against Bengali students; its tone is very violent; it does not take into consideration the fact that if students are to blame, so are their teachers and professors; it exaggerates the real situation and tries to rouse the bad blood of the authorities; and lastly it suggests.....the expulsion, nay, even the criminal prosecution of the students...The article is to be specially condemned as it may have a mischievous effect on at least some members of the Government committee already appointed to enquire into the general condition of discipline in the Presidency College. The "Englishman" takes exception to the constitution of the committee evidently because there are two Bengalee gentlemen on it, though one of them is Sir Asutosh Mukherjee and the other Principal Herambra Chandra Moitra. Here we must say that it would have been a better arrangement if Principal James who is personally concerned in the matter, had not been appointed a member but cited as a witness. By the way the "Statesman" had an also equally objectionable article in its Sunday issue. But we need take no notice of it as the relation between that paper and Mr. James as well as another Professor of the Presidency College is very generally known."

অমৃতবাজার পত্রিকার এই প্রতিবাদ-বাণী ছাড়াও আরও লক্ষ্যণীয় এই যে, ঐ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ইংরেজের স্কুল-কলেজে ছাত্রগণ কিরূপ দুর্বৃত্ত হয় এবং তারা অধ্যাপকদের কিভাবে প্রহার করে তথ্য ও দৃষ্টান্ত সহকারে সে আলোচনাও করা হয়েছিল। সে তুলনায় ভারতীয় ছাত্রদের ব্যবহার যে অতিশয় ভদ্র তাও প্রমাণ করার চেষ্টা সম্পাদক করেছিলেন। এইভাবে অধ্যাপক ওটেনের সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের সংঘর্ষ জাতীয় জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় দাঁড়িয়ে গেল। গবর্ণমেন্ট, ইংরেজ সমাজ, আংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় ও বৃটিশ সংবাদপত্রসমূহই প্রধানত সেজন্য দায়ী। গবর্ণমেন্ট এই ঘটনার ওপর রাষ্ট্রীয় গুরুত্ব আরোপ করে বসল, বৃটিশ সংবাদপত্রগুলি বৃটিশ সমাজ ও স্বার্থের প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসাবে ঘটনাটিকে গ্রহণ করল এবং ছাত্রদের বিদ্রোহী বলে গণ্য করল। বাঙালী সম্পাদিত ও প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলিতে তীব্র প্রতিবাদ করা হল এবং এদেশের ছাত্র ও জন সাধারণের প্রতি ইংরেজের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও অশালীন ব্যবহারের জন্যই যে এ ধরণের বিক্ষোভ ঘটে তাই হল তাদের প্রতিপাদ্য। গবর্ণমেন্ট বিষয়টি বিবেচনার জন্য একটি সরকারী কমিশন বসানোর অনুমানসে ছাত্রদের বক্তব্য ও ব্যবহার আরও আলোচনা হলেন এবং বাংলা দেশের নেতৃবৃন্দ ও মন্ত্রীবর্গও নীরব রইলেন না। রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো ব্যক্তিও এবিষয়ে প্রকাশ্য আলোচনায় যোগ দিলেন ও তাঁরা ছাত্রদের পক্ষই সমর্থন করলেন। সেকথায় আমরা পরে আসছি।

এই ঘটনার একমাস আগে, জানুয়ারি মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজে একটি ছাত্র ধর্মঘট হয়েছিল—সেও সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে। সমস্ত সংবাদপত্রে সেবিষয়েও সংবাদ ও আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সেও ঘটেছিল অধ্যাপক ওটেনের

জয়শ্রীর নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্য

জয়শ্রী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক সডাক ১৫০। ষাণ্মাসিক ৮৭৫। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে হয় না।

লেখকদের জন্য

শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ সর্বাগ্রে দেওয়া হয়।

লেখা পরিষ্কার হরফে মূলস্ক্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। কারণ, হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই।

কবিতা সম্বন্ধেও তাই নিয়ম।

উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়।

শক্তিশালী নূতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহযোগিতার জন্য আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কলকাতার সব স্টলে জয়শ্রী পাওয়া যায়

প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী
৩১২, গাঙ্গুলিবাগান
কলিকাতা-৬৭
ফোন ৪৬-৪১১৬

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

রথীন্দ্রনাথ রায়

সাংবাদিকতা ও সাহিত্যচর্চার মধ্যে কতকগুলি মূলগত বিরোধ আছে। সাময়িক পত্রের টীকা-টিপ্পনী, সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রভৃতি যতই জোরালো হোক না কেন, তার অধিকাংশের মূল্য তাৎক্ষণিক, অপর পক্ষে উচ্চতর সাহিত্যের আবেদন চিরন্তন। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক সাময়িকপত্রেরই বিশেষ মতবাদ বা উদ্দেশ্য থাকে। সেখানে সাংবাদিকদের নিজস্ব মত প্রকাশের (যদি কিছু থাকে) অবকাশ নেই। অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাঁদের সংবাদপত্রের উদ্দেশ্যকেই সিদ্ধ করতে হয়। তৃতীয়ত, অনেক প্রতিভাবান সাহিত্যিককেও সংবাদপত্রের অফুরন্ত চাহিদা মেটাতে গিয়ে ফরমায়েশী লেখা লিখতে হয়। ফরমায়েশী লেখায় থাকে দ্রুত লিখনজনিত অনবধানতা। চিন্তাশীলতা ও যত্নের অভাবে রচনার মধ্যেও দেখা দেয় শৈথিল্য। অবশ্য সাময়িক পত্র পরিচালনা ও সম্পাদনাই যাঁদের আসল লক্ষ্য, তাঁদের পক্ষে এ নীতি প্রযোজ্য নয়। কিন্তু যাঁদের সাময়িকপত্রসেবা পেশা, অথচ উচ্চতর সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনেক কিছু দেবার থাকে, তাঁদেরই সত্যিকারের সংকট।

এই দুই শ্রেণীর সাময়িকপত্রসেবীর প্রথম শ্রেণীতে পড়েন সাপ্তাহিকসম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (১৮৭০-১৯২১), দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়েন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৬-১৯২৩। সুরেশচন্দ্র সে যুগে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর বাঙ্গ বিদ্রূপপূর্ণ টীকা-টিপ্পনী ও অন্যান্য সমালোচনাগুলি সে যুগে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সুরেশচন্দ্র ছিলেন সাহিত্যপ্রাণ ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক; তিনি লেখককে অনুপ্রাণিত করেছেন, তৈরি করেছেন নতুন লেখক। কিন্তু তাঁর মৌলিক রচনার সংখ্যা বেশি নয়। তাঁর পুস্তকাকারে প্রকাশিত অধিকাংশ রচনাই সংকলন, সম্পাদনা ও অনুবাদ। পাঁচকড়ির কথা আলাদা। তিনি ছিলেন জাত-সাহিত্যিক, সাময়িক পত্রের সম্পাদনা ছিল তাঁর পেশা। ফলে সাংবাদিক সত্তার যন্ত্রে তাঁর সাহিত্যিক সত্তা নানাভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। এইখানেই সাহিত্যিক পাঁচকড়ির জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।

১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দের ২০এ ডিসেম্বর (৬ পৌষ, ১২৭৩) ভাগলপুরে পাঁচকড়ির জন্ম হয়। তাঁর পিতা বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় কাজ করতেন ভাগলপুর কালেক্টারী অফিসে। পাঁচকড়ির ছাত্রজীবন কেটেছে বিহারে। তাই অল্প বয়সেই হিন্দীভাষায় তাঁর অধিকার জন্মেছিল। পাটনা কলেজ থেকে তিনি সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে বি এ পাশ করেন (১৮৮৭)। পাশ করার পরে অল্পদিন তিনি ভাগলপুরে শিক্ষকতাও করেছিলেন।

বি-এ পাশ করার পর থেকেই পাঁচকড়ি নিয়মিত লিখতে শুরু করেন। এই সময় তিনি বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সম্পাদিত 'ধর্মপ্রচারক' পত্রের তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। 'আর্যধর্ম প্রচারিণী সভা' ও 'সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা'-র জন্ম পাঁচকড়ির প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের উৎসাহে আনুকূল্যে পাঁচকড়ি বাংলা লেখায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন - এ কথা পাঁচকড়িও স্বীকার করেছেন।[১] তা ছাড়া পণ্ডিত-প্রবর শশধর তর্কচূড়ামণির সঙ্গেও

১। অন্নপূর্ণা, আষাঢ় ১৩২০

একদা তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। পাঁচকড়ি লিখেছেন: বি. এ. পাশ করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলাম; পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের হিন্দুধর্ম প্রচার কার্যে লেখক ও বক্তারূপে সহায়তা করিতাম।...১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত আমি কলিকাতায় আসিতাম যাইতাম, সাহিত্য চর্চা করিতাম, মাসিক ও সাপ্তাহিকে লিখিতাম, তখন আমাদের একটা বড় দল ছিল, সে দলের আনুকূল্য লাভ করিবার জন্য অনেকে আমার আনুগত্য করিতে বাধ্য হইতেন।[২]

পাঁচকড়ি বহু সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকাই পাঁচকড়িকে সংবাদপত্র জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার শ্রেষ্ঠ লেখক ও পৃষ্ঠপোষক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহায়তায় তিনি উক্ত পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে প্রবেশ করেছিলেন। ইন্দ্রনাথের মতো 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুও পাঁচকড়ির লিপিকৌশলকে প্রশংসা করতেন। 'বঙ্গবাসী' কার্যালয় থেকে প্রকাশিত দৈনিক ইংরেজি সংবাদ-পত্র 'টেলিগ্রাফ'-এর সম্পাদনাভার পাঁচকড়ির উপরেই অর্পিত হয়েছিল। বছর তিনেক পর তিনি 'বঙ্গবাসীর' প্রধান সম্পাদক পদে উন্নীত হন (১৮৯৫)। এইজন্য যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ও ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর তাঁর কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। যোগেন্দ্রচন্দ্র সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন:

> আপনার 'বঙ্গবাসী'র সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া আমি বাঙ্গালা লিখিতে শিখিয়াছি, আপনার 'বঙ্গবাসীর' সম্পাদক পদে উন্নীত হইয়া আমি বাঙ্গালীর সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত হইয়াছি। এখন ভাগ্যবশে আমি স্বতন্ত্র; কিন্তু 'বঙ্গবাসী'র ভাব ও ভাষা চিরদিনই আমার হইয়া থাকিবে।[৩]

ইন্দ্রনাথকে পাঁচকড়ি তাঁর সাহিত্যজীবনের গুরু হিসাবে স্বীকার করেছেন। একাধিক প্রবন্ধে তিনি এই ঋণ স্বীকার করেছেন:

> তিনি আমার খাঁটি গুরুমহাশয় ছিলেন, হাতে ধরিয়া লিখিতে শিখাইয়াছিলেন, কত ভঙ্গী করিয়া পড়িতে, বুঝিতে ও বুঝাইতে শিখাইয়াছিলেন। আমার লেখায় ও বলায় যদি কিছু মাধুরী থাকে তবে সে তাঁহার; আর বাকী উদ্ভটতা, উৎকটতা—সে সব আমার। এখনও তাঁহারই কথা বেচিয়া খাইতেছি, এবং তাঁহারই সিদ্ধান্ত সকল ব্যাখ্যা করিয়া সমাজে স্থান পাইয়া আছি।[৪]

ইন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে পাঁচকড়ি যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন তাও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।[৫]

প্রায় পাঁচবছর কাজ করার পর পাঁচকড়ি 'বঙ্গবাসী' ছেড়ে 'সাপ্তাহিক বসুমতী'তে যোগ দেন (১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৯)। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে তৎকালে 'বঙ্গবাসী' ছিল কংগ্রেস বিরোধী এবং 'বসুমতী' ছিল কংগ্রেস সমর্থক। কিন্তু দুবছর পরে মতবিরোধের জন্য 'বসুমতী' ছেড়ে তিনি প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রতিষ্ঠিত 'রঙ্গালয়' পত্রে যোগ দেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'দৈনিক সন্ধ্যাতে'ও তিনি নিয়মিত লিখতেন। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি হন দৈনিক 'হিতবাদী'র সম্পাদক। তাঁর সম্পাদনায় কিছুকালের জন্য 'বাঙ্গালী' ও হিন্দী দৈনিক 'ভারত মিত্র' পরিচালিত হয়েছিল। শতীশচন্দ্র মিত্র প্রবর্তিত সচিত্র 'প্রবাহিণী' সাপ্তাহিক পত্রিকার (প্রথম প্রকাশ—৩ মাঘ, ১৩২০) সম্পাদনাভারও তিনি কিছুকালের জন্য গ্রহণ করেছিলেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির অকাল মৃত্যুর পর তিনি 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন। একমাত্র 'নায়ক' ছাড়া অন্য

২। মাসনী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০।
৩। 'ছন-দহরী, উৎসর্গ পত্র।
৪। প্রবাহিণী, ২০ বৈশাখ ১৩২২।
৫। ৺ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; সাহিত্য, বৈশাখ ১৩১৮

কোনো পত্রের সঙ্গে পাঁচকড়ি দীর্ঘকাল যুক্ত থাকতে পারেন নি। জীবনের শেষ দিকে তিনি সরকারী প্রচার-বিভাগের বঙ্গানুবাদক নিযুক্ত হন (১ অক্টোবর, ১৯১৮)।

মাত্র সাতান্ন বছর বয়সে পাঁচকড়ির মৃত্যু হয় (১৫ই নভেম্বর, ১৯২৩)[৬]

২

পাঁচকড়ির আসল কৃতিত্ব প্রবন্ধরচনায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় পাঁচকড়ির সাহিত্যকৃতিত্বের মূলধারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত একাকারে গ্রথিত হয়নি। তাঁর প্রবন্ধগুলি সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠার মধ্যেই আত্মগোপন করেছিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের সুযোগ্য সম্পাদনায় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী দুখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে (প্রথম খণ্ড: ফাল্গুন, ১৩৪৭, দ্বিতীয় খণ্ড: আষাঢ় ১৩৪৮)। কিন্তু এখনো বহুরচনা উদ্ধার করা হয়নি। জীবিতকালে তাঁর মৌলিক রচনার মধ্যে মাত্র তিন চারখানি উপন্যাস ও কথাচিত্র প্রকাশিত হয়েছিল।

সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় পাঁচকড়ির অজস্র গদ্যরচনা যেমন বিপুলায়তন, তেমনি তার বিষয়বৈচিত্র্যও কম নয়। তাঁর প্রবন্ধাবলীকে মোটামুটি চারটি ভাগ করা যায়: (ক) সমাজ (খ) ধর্ম-দর্শন (গ) সাহিত্য (ঘ) রসরচনা ও বিবিধ। উনবিংশ শতাব্দীর অন্যান্য চিন্তানায়কের মতো পাঁচকড়ির রচনাতেও জাতীয়তাবোধ, দেশীয় ধর্ম-সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালী ও আদর্শ হিন্দু। তাই বাঙালীর সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম-দর্শন প্রভৃতি তাঁর রচনায় একটি প্রধান স্থান অধিকার করেছে।

'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় (ভাদ্র-চৈত্র ১৩২১) মৃত্যুর কিছুকাল আগে পাঁচকড়ি যে বাঙালীর ইতিহাস রচনার সূচনা করেছিলেন তা যেমন তথ্যনিষ্ঠ তেমনি আবেগদীপ্ত। আত্মবিস্মৃত জাতিকে শুনিয়েছেন জাতীয় মর্মব্যথার কাহিনী শুনিয়েছেন অতীত দিনের গৌরবগাথা। এই প্রবন্ধমালার প্রথমটিতে (বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা) লেখক নানাদিক থেকে বাঙালীর বিশিষ্টতা প্রতিপাদন করেছেন। বাংলার উপাসক সম্প্রদায়, বাংলাভাষার ক্রমপ্রসার, বাঙালীর স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্র, বাঙালীর কুলপরিচয় প্রভৃতির উপর তিনি বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন। বাঙালীর 'দেহতত্ত্ব' পূজাকে বলেছেন 'নরদেবতাপূজার বেদী।'— তাই বাঙালীর দেবতা দ্বিভুজ মুরলীধর, চিদ্‌ঘন শ্যামসুন্দর, সচ্চিদানন্দ মূর্তি। তাই বাঙালীর দেবী দ্বিভুজ মুরলীধারিণী, একাম্র-কাননবিহারিণী, উমাসুন্দরী, চিন্ময়ী, চিদ্‌ঘনশ্যামা রূপিণী।" বাঙালী সাধক আত্মস্থ দেবতাকে বর্জন করে বাইরের দেবতাকে অর্চনা করেননি—এই তত্ত্বের উপরেই বিন্যস্ত বাঙালীর উপাসনা পদ্ধতি।

পাঁচকড়ি তাঁর এই প্রবন্ধমালায় বাঙালীর জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। নবদ্বীপের নব্য ন্যায়, জীমূতবাহনের দায়ভাগ, স্মার্ত রঘুনন্দনের সমন্বয় প্রচেষ্টা, চৈতন্যদেব প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ও ব্রহ্মানন্দ গিরি প্রবর্তিত 'বাশিষ্ঠ পদ্ধতি,' দেবীবরের 'মেলবন্ধন,' বাংলা ভাষা ও শিল্প প্রভৃতি নানাদিক থেকে লেখক বাঙালী জাতির বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করেছেন 'বাঙ্গালীর জাতি-পরিচয়' প্রবন্ধে লেখক সিদ্ধান্ত করেছেন যে, "বাঙালী এখনও দশ আনা বৌদ্ধ রহিয়াছে।" দেবীবরের 'মেলবন্ধন', 'মেলমালা' প্রভৃতি কুলজী গ্রন্থ থেকে প্রচুর উদাহরণ নিয়ে লেখক বাঙালীর জাতিতত্ত্ব সম্পর্কে অনেক গভীর রহস্য স্বচ্ছন্দভাবে বলেছেন। এর আগে 'বিজয়া' নামে একটি মাসিক পত্রে তিনি বাংলার সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে

৬। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী সম্পর্কিত তথ্যাবলী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা'র ৮২ সংখ্যক গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

আলোচনা করেছিলেন। 'বাঙ্গালার উপাসক সম্প্রদায়' প্রবন্ধে লেখক গৌরাণিক সমুদ্রমন্থনের যে সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করেছেন, তা উল্লেখযোগ্য। এই সুচিন্তিত প্রবন্ধের মধ্যে 'নরপূজা বা আত্মপূজা' অধ্যায়টিতে লেখকের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আছে। 'বাঙ্গালীর সমাজ-বিন্যাস' প্রবন্ধে বাঙালীর লুপ্তপ্রায় সমাজজীবনের ইতিহাসের বিচিত্র উপকরণ তিনি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে আলোচনার চেষ্টা করেছেন।

বাঙালীর সামাজিক উৎসব, পাল-পার্বণ সম্পর্কেও পাঁচকড়ি বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এই প্রবন্ধগুলিও তাঁর সামাজিক প্রবন্ধেরই অন্তর্গত। 'শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব' (নারায়ণ, কার্তিক ১৩২২), বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব (সাহিত্য, আশ্বিন ১৩১৮), 'শারদীয়া পূজা' (সাহিত্য, কার্তিক ১৩২০)—এই তিনটি প্রবন্ধে লেখক দুর্গাপূজার তাত্ত্বিক ও সামাজিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। প্রবন্ধগুলিতে তন্ত্র, ধর্ম, দর্শন, সমাজ, সংস্কৃতি সম্পর্কে মূলকথাগুলিকে লেখক তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্বচ্ছন্দচারী ও সরস ভঙ্গির সাহায্যে বর্ণনা করেছেন। দুর্গাপ্রতিমা প্রসঙ্গে তিনি যা বলেছেন, তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

> এক সিংহবাহিনী মূর্তিরই যে কত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা বলা যায় না। ঐ সিংহবাহিনী প্রতিমার ভিতরে সহস্র বৎসরের বাঙালি জাতির ইতিহাস লুকান আছে। সিংহবাহিনী মূর্তি চতুর্ভুজা, অষ্টভুজা, দশভুজা ও অষ্টাদশভুজা হয়। বাঙালি দশভুজা পর্যন্ত উঠিয়াছে, এখনও অষ্টাদশভুজা প্রতিমা গড়িয়া পূজা করে নাই। পূর্বে সিংবাহিনী, মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তিতে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ কিছুই থাকিত না।...সে সিংহবাহিনীর সিংহ আর একরকম ছিল, এখনকার African lion এর নকল ছিল না।

এই জাতীয় প্রবন্ধের মধ্যে 'আমাইষষ্ঠী' (প্রবাহিণী, ২য় জ্যৈষ্ঠ ১৩২১) প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। পারিবারিক সম্পর্ক রক্ষা ও কল্যাণকামনার জন্য কতকগুলি উৎসব করা হয়, জামাইষষ্ঠী তার মধ্যে অন্যতম। জামাইষষ্ঠীর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে তিনি প্রবন্ধের শেষে আচারভ্রষ্টতার জন্য বেদনাপ্রকাশ করেছেন, "আমাদের শাস্ত্র মধুময় ভাব দিয়া জীবনযাত্রাকে মধুময় করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শাস্ত্রের সে মাধুরী বর্জন করিয়াছ, জীবনটাও তাই কঠোর হইয়াছে, সদা হাহাকারে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে; তোমরা কিছুতেই সুখী ও তুষ্ট হইতে পারিতেছ না।"[১]

৩

পাঁচকড়ির ধর্ম-দর্শন সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তন্ত্র সম্পর্কিত মূল্যবান রচনাবলী। তন্ত্রপ্রসঙ্গ তাঁর অনেকগুলি প্রবন্ধেই আছে। এক "প্রবাহিণী" তে (১৩২২) তিনি তন্ত্র সম্পর্কে অনেকগুলি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। পাঁচকড়ি দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির দিকে আমাদের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন। ইউরোপীয় সভ্যতার মোহে দেশে যে আচার ভ্রষ্টতার সৃষ্টি হয়েছিল পাঁচকড়ি তার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছিলেন। এইদিক থেকে তিনি বঙ্কিমানুবর্তী লেখক সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধি। তিনি বলেছেন :

> দেশ পূজ্য ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রেরণায়, বঙ্কিমের লেখনী পরিচালনায়, ইন্দ্রনাথের স্নেহ বিস্তারে, অক্ষয়চন্দ্রের সন্দর্ভে অনেকের দৃষ্টি এইদিকে নিপতিত হইয়াছিল বটে; পরন্তু তাঁহারা সাধারণ ইংরেজীনবীস দল হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাহাদিগের কেহ বা নব্য হিন্দু বলিয়া ঠাট্টা করিত, কেহ বা সেঁড়ো বলিয়া গালি দিত, কেহ বা আর্যামি বলিয়া বিদ্রূপ করিত। স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে এ ভাবটা অনেক কমিয়াছে— নাই বলিলেও চলে।[২]

১। বাঙ্গালার তন্ত্র; প্রবাহিণী, ২য় বৈশাখ ১৩২২।

পাঁচকড়ির মতে বাঙালী অর্ধেক বৈষ্ণব, অর্ধেক তান্ত্রিক, শুধু তাই নয় 'তন্ত্রধর্মই বাঙ্গালার আদিমধর্ম।' প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের "মডার্ণ বুদ্ধিজম্" নামক গ্রন্থের মতকে অনুসরণ করে তিনি বলেছেন যে বৈষ্ণব ধর্মও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে এক প্রকার আপোষ। বৌদ্ধ, তান্ত্রিক ও বর্ণাশ্রমাচারী হিন্দু—এই তিন ধারাই বাংলাদেশে প্রবাহিত হয়েছে। তন্ত্রসাধনার বৈশিষ্ট্য, বর্ণবিচারহীনতা, শৈববিবাহ পদ্ধতি ও 'বাশিষ্ঠ সমন্বয়' তন্ত্রের অধিকারীভেদ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি প্রথম প্রবন্ধটিতে (বাঙ্গালার তন্ত্র) আলোচনা করেছেন।

'কাম ও মদন' (প্রবাহিণী, ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩২২) পাঁচকড়ির অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে মূলত তন্ত্রের দিক থেকেই তিনি কাম ও মদন তন্ত্রের মূল অর্থ ও তাৎপর্য নির্ণয় করেছেন। 'তন্ত্রের মূর্তিপূজা' প্রবন্ধে (প্রবাহিণী, ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩২২) প্রবন্ধে লেখক দুটি সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন। প্রথমত, দেবতার শরীর বীজমন্ত্র থেকেই উৎপত্তি হয়ে থাকে—মন্ত্র জপ করতে করতেই হৃদয়ের মধ্যে মূর্তির উদ্ভব হয়। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি ভক্তিমার্গের। উপাসনায় তৃষ্ণা মেটানোর জন্য যে পূজাপদ্ধতির নির্দেশ আছে, তাতে দেবতার রূপ পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট থাকে—ছবি, ধাতু, পাষাণ, মাটি যে কোনো জিনিসে এই মূর্তি তৈরি হতে পারে। 'তন্ত্রের ঐতিহাসিক মূল্য' প্রবন্ধে (প্রবাহিণী, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২) লেখক তন্ত্রের সঙ্গে দেশের প্রাচীন ইতিহাসের সম্পর্ক কি, তা আলোচনা করে দেখিয়েছেন। লেখক বলেছেন: "এই তন্ত্রসাগর মন্থন করিতে পারিলে বাঙ্গালার বহু লুপ্ত রত্নের উদ্ধার হইতে পারে, বাঙ্গালা ইতিহাসের বহু তমসাবৃত কোটরে আলোক-রেখা ফুটিয়া উঠিতে পারে।" লেখক তাঁর এই প্রবন্ধে তার কিছু কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন।

'তন্ত্রের দেহতত্ত্ব' (প্রবাহিণী, ৬ আষাঢ় ১৩২২) ও 'তন্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্ব' (প্রবাহিণী, ২০ আষাঢ় ১৩২২)—প্রবন্ধ দুটি প্রধানত তন্ত্রের তত্ত্ববিষয়ক। দ্বিতীয় প্রবন্ধটির শেষ দিকে জগন্নাথ মন্দিরের বহুকাল মূর্তিগুলির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে:

> বিশ্বসৃষ্টি ও দেহসৃষ্টির সমরসতা এই শ্রীমন্দিরেই পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। অশ্লীল ছবির মধ্যে পুরুষমাত্রেই কামমানী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, নারী মাত্রেই দেবদাসী অথবা ভিক্ষুণী। মন্দিরটা আগাগোড়া বৌদ্ধ কামমানীদের principle বা মতানুসারে নির্মিত। দেহীয় ভাস্কর্য পদ্ধতির উপর সৃষ্টিতত্ত্বের অর্থবাদ পাষাণের লেখায় ফুটান আছে। জগন্নাথের শ্রীমন্দিরে আমাদের জাতির একটা যুগের ধর্মমতের ইতিহাস ও রীতি পদ্ধতি লুকান আছে। যেদিন ঐ মন্দিরের অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হইবে, সেইদিন জাতির ইতিহাসকথা জানিতে পারিব।

'পঞ্চ 'ম' কার' প্রবন্ধে প্রবাহিণী, ২৭ আষাঢ় ১৩২২ লেখক তন্ত্রোক্ত পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন। তুচ্ছ তত্ত্বও তাঁর রচনা কৌশলে সাহিত্য গুণসমন্বিত হয়ে উঠেছে। 'শিব ও শক্তি' প্রবন্ধে (প্রবাহিণী, ১১ শ্রাবণ ১৩২২) তন্ত্রসাধনার গোড়ার কথাকেই তিনি সংক্ষেপে ও সহজভাবে বলেছেন। তন্ত্রসম্পর্কিত এই আলোচনা গুলির মধ্যে পাঁচকড়ির পাণ্ডিত্য ও মননশীলতা একটি বিশিষ্ট পর্যায়ে পৌঁছেছে। তন্ত্র সম্পর্কিত সংস্কৃত গ্রন্থাবলী ছাড়াও বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, সহজিয়া প্রভৃতি সাধনার বিচিত্র কথা তিনি শুনিয়েছেন। তা ছাড়া হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর, প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু, বিচারপতি উডরফ প্রমুখের সিদ্ধান্তগুলিও তিনি আলোচনা ও পুনর্বিচার করেছেন।

সামাজিক ও ধার্মনিক প্রবন্ধের তুলনায় পাঁচকড়ির সাহিত্য সম্পর্কিত প্রবন্ধের সংখ্যা অনেক কম। তবে এ বিষয়ে যে ক'টি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ লিখেছেন, তাতে তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। 'বঙ্কিমচন্দ্রের জয়ী' প্রবন্ধটি (নারায়ণ, বৈশাখ ১৩২২) এই জাতীয় প্রবন্ধের মধ্যে সবচেয়ে

সুলিখিত। লেখকের মতে "এই তিনখানি উপন্যাসে, বাঙালী প্রকৃতির আধারে বঙ্কিমচন্দ্র সমষ্টি, ব্যষ্টি এবং সমন্বয়ের অনুশীলন পদ্ধতি পরিস্ফুট করিয়াছেন।" বলাবাহুল্য পাঁচকড়ি বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ীকে একটি বিশেষ তত্ত্বের তিনটি স্তর বিশ্লেষেই দেখেছেন, উপন্যাস হিসাবে দেখেন নি। তাঁর নিজের তত্ত্বদৃষ্টি ও ধারণাকে যে বঙ্কিমের উপর প্রয়োগ করেছেন, এ বিষয় কোনো সন্দেহ নেই। হয়তো 'সাধের বৌ' ও 'ধর্মিরাম' বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শেই তিনি ঔপন্যাস রচনার প্রেরণা পেয়ে থাকবেন। 'নবীনচন্দ্র ও জাতীয় অভ্যুত্থান' (সাহিত্য, মাঘ ১৩১৪) প্রবন্ধে ইসলাম ধর্মের সংঘর্ষে ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সংঘর্ষে আমাদের জাতীয় অভ্যুত্থানের পরিচয় দিয়েছেন। এই পটভূমিকায় তিনি নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ীর বিচার করেছেন। '৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়' (সাহিত্য, বৈশাখ ১৩১৮), '৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়' (সাহিত্য, আষাঢ় ১৩২০) ও '৺চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়' (সাহিত্য, ফাল্গুন ১৩২৯) তিনটি প্রবন্ধ খ্যাতনামা তিনজন সাহিত্য-রথীর মৃত্যুর পরে লেখা। তিনটি প্রবন্ধে লেখক তাঁদের সাহিত্যকৃতির কোনো বিবৃত আলোচনা করেন নি। জীবনীর কয়টি সূত্র ও সাহিত্যকৃতিত্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন মাত্র।

'জীবনচরিতের মূলসূত্র' প্রবন্ধটি (সাহিত্য, বৈশাখ ১৩১৯) সীড্‌নি লী-র 'Principles of Biography' প্রবন্ধ অবলম্বন করে লেখা। এখানে পাঁচকড়ি কোনো মৌলিক সিদ্ধান্ত না করলেও জীবনচরিতের কতকগুলি সমস্যা ও সূত্র তুলে ধরেছেন। এইভাবে তিনি বাঙালী পাঠকের সঙ্গে পাশ্চাত্য সমালোচকের মতামতগুলির পরিচয় করিয়েছেন। 'দুইটি গান' (সাহিত্য, পৌষ ১৩১৯) রচনাটিতে বিশ্লেষণ ও আস্বাদনের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। কমলাকান্তের দপ্তরের 'একটি গীত'-এ' এস, এস, বঁধু এস আধ আঁচরে বস' গানটির সঙ্গে শ্রীশ্রীপদকল্পতরু গ্রন্থের গোবিন্দ দাস রচিত 'আইস আইস বঁধু' পদটির তুলনা মূলক আলোচনা করেছেন। সমালোচক শুধু বিশ্লেষণ করেননি; তিনি তাঁর রসিক হৃদয়ের দ্বারা অনুভব করেছেন। 'বঙ্গের ভাস্কর্য' প্রবন্ধে (সাহিত্য, কার্তিক ১৩১৯) লেখকের প্রত্নতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসার সঙ্গে রসগ্রাহী চিত্তের শিল্প-সমালোচন সমন্বিত হয়েছে। মূলত রাজশাহীর বারেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতির একটি সাধারণ পরিচয় থাকলেও এই প্রবন্ধে বাঙালীর শিল্প-মনীষার গৌরবান্বিত ইতিহাস আছে। বিস্ময় বিমুগ্ধ লেখক বলেছেন: "বহুদিন পরে, প্রায় সহস্র বৎসর পরে আবার দেখিলাম, নয়নসফল হইল, বাঙ্গালার অতীত কীর্তির চিতাচুল্লী হইতে সমাহৃত অর্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড পরিদর্শনের ন্যায়, আবার দেখিলাম।"—পাঁচকড়ি এখানে অতীতগৌরবমুগ্ধ চারণ কবি!

৪

পাঁচকড়ি প্রবন্ধকার হিসাবে প্রধানত খ্যাতিলাভ করলেও তিনি তিনখানি উপন্যাস ও একটি গল্পগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর প্রবন্ধ ও উপন্যাসের মধ্যে একটি সংযোগ সূত্র আছে। সমাজ ধর্মসাধনা, দর্শন ও প্রাচ্য ভাবাদর্শ সম্পর্কে তাঁর ধারণাগুলিকেই উপন্যাস ও গল্পের আকারে প্রকাশ করেছেন। উপন্যাস আকারে প্রকাশিত হলেও আসলে যে সেগুলি প্রবন্ধকার পাঁচকড়িরই রচনা এ কথা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূর্ণবৃত্ত ঘটনার অভাব, তেমন কেন্দ্র সংহতিও নেই। বিচ্ছিন্ন ঘটনার টুকরো জোড়া লাগেনি। বড় জোর এদের কথাচিত্র বলা যায়, উপন্যাস বলা কোনো মতেই সম্ভব নয়। অনেক সময় ঘটনাপ্রবাহ বন্ধ করে লেখক হিন্দুধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তৃতার অবতারণা করেছেন। আর অনেক ক্ষেত্রে কাহিনী সম্ভাব্য বাস্তবতার সীমা অতিক্রম করে লেখকের কতকগুলি পূর্ব-নির্দিষ্ট ধারণার কঙ্কপথ পরিক্রমা করেছে। প্রবন্ধে যে মত মননশীলতায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে, কথাসাহিত্যের আধারে

তাই নিতান্ত অসংগত হয়েছে। পাঁচকড়ির গল্প—উপন্যাসকে তাঁর প্রবন্ধাবলীরই গল্পভাষ্য বললে ভুল হবে না।

"উষা" (১৯০১) পাঁচকড়ির প্রথম উপন্যাস। একে বলা হয়েছে 'গৃহচিত্র'। বঙ্গদর্শন, জন্মভূমি, বসুমতী প্রভৃতি পত্রে উপন্যাসখানি বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছিল। তৎকালে পরিবারিক উপন্যাস হিসাবে গ্রন্থখানি খ্যাতিলাভ করেছিল। পরবর্তী গ্রন্থ "রূপ-লহরী" বা 'রূপের কথা' (১৯০২) সাতটি ছোট গল্পের সমষ্টি। প্রথম গল্প 'কালিন্দী' আত্মকাহিনীর আকারে লিখিত। গল্পের শেষে লেখক "কলির কলুষনাশী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" সম্পর্কে এক বক্তৃতা দিয়ে অস্পষ্ট গল্পাভাসটুকুও নষ্ট করেছেন। দ্বিতীয় গল্প 'মনোরমা'য় এক বিধবার পদস্খলনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। গল্পটিতে গল্পরস আছে, অথবা নীতি প্রচারের দ্বারা বিকৃতিত করা হয়নি। তৃতীয় গল্প 'ভূলকুমারী'তে রূপসী ভূলকুমারীর 'মেয়াটোপ-ঢাকা' এক ঘেঁয়ে জীবনের আকস্মিক পরিবর্তন যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছিল, যে সন্দেহ সংশয় তাঁর জীবনে দুর্বানলের সৃষ্টি করেছিল, তা আত্মকাহিনীর মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে। চতুর্থ গল্প 'অনুপমা'-র একটি আখ্যানি আছে। রূপসী ও সুশিক্ষিতা অনুপমা বিবাহের আগে শীতেশচন্দ্রের প্রেমে পড়েছিল। বিবাহিতা অনুপমা এই ঘটনাটি তার স্বামী শরৎ চন্দ্রকে একখানা চিঠিতে লিখে জানায়। বিভ্রান্ত শরৎচন্দ্র বন্ধু প্রিয়নাথের কৌশলে শেষ পর্যন্ত তার স্ত্রীকে ফিরে পেয়েছে এক মিলনের মাধুর্যে গল্পটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে। লেখক আর একটু বিশ্লেষণ করলে গল্পটি একটি ভালো মনস্তাত্ত্বিক গল্প হতে পারত।

পঞ্চম গল্প 'দোপাটি' একটু নতুন রসের। বাদলদহের জেলেডাঙার কান্তিচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী সুরূপার নিস্তরঙ্গ জীবন স্রোতে ঝেরের মেয়ে দোপাটির আকস্মিক আবির্ভাবে যে আবর্তের সৃষ্টি হয়েছিল, তারই বিষামৃতময় কাহিনী এখানে বর্ণিত হয়েছে। দোপাটির রূপোন্মত্ত কান্তিচন্দ্র সা-সাহেবের রূপায় শেষ পর্যন্ত সুস্থ ও আয়ত্ত হয়েছিল। দোপাটি চরিত্রের কিঞ্চিৎ ছায়া তাঁর পরবর্তী দুটি উপন্যাসের (সাধের বৌ, দরিয়া) চরিত্রের উপর পড়েছে। গল্পটির পটভূমিকায় গৌড়ের ভয়াময় প্রদেশ ও মুসলমান কুঠির সা-সাহেবের ব্যক্তিত্ব রহস্যঘনের সৃষ্টি করেছে। ষষ্ঠ গল্প 'মালতী'-কে ছোট গল্প না বলে বিবৃতিধর্মী টৈল্ বলাই সংগত। উচ্চশিক্ষিত দরিদ্রের সন্তান রসময় সূর্যগ্রহণের দিনে আহিরীটোলার ঘাটে বেহাগসুরে প্রতিপালিতা মালতীকে দেখে মুগ্ধ হয়। কিন্তু বৈষয়িক বুদ্ধিসম্পন্না মালতীর পালিকা মাতা শঙ্করী অর্থের লোভে শেষ পর্যন্ত ধনীর দুলাল মেঘনাদের বাগান বাড়িতে সুকৌশলে মালতীকে পাঠিয়ে দিল। এর পরের কাহিনী সমস্তটাই কাহিনী নয়, অলৌকিক ও রোমাঞ্চকর ঘটনার পূর্ণ। অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন সন্ন্যাসীর আকস্মিক আবির্ভাব, সকলের কালীঘাটে গমন, উন্মাদ মেঘনাদের বিচিত্র আচরণ শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাসীর সঙ্গে মোহমুক্ত রসময়ের বৃন্দাবন যাত্রা - প্রভৃতি ঘটনার মধ্যে কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। বলাবাহুল্য সন্ন্যাসীর মুখ দিয়ে লেখক তাঁর প্রিয় মতবাদকে প্রচার করেছেন। আলোচ্য সংকলন খানিতে এই গল্পই সবচেয়ে দুর্বল। সর্বশেষ গল্প 'হাবী' আলোচ্য সংকলনের শ্রেষ্ঠ গল্প। এই বাহুল্যবর্জিত গল্প সংক্ষিপ্ত কাহিনীতে যথার্থ ছোট গল্পের আস্বাদন পাওয়া যায়। হাবী চরিত্রের উপর রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর চরিত্রের প্রভাব থাকাও বিচিত্র নয়।

৫

'বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী' (নারায়ণ, বৈশাখ ১৩২২) নামে পাঁচকড়ি একদা একটি সুচিন্তিত সমালোচনা লিখেছিলেন। পাঁচকড়ি নিজেও একটি ত্রয়ী পরিকল্পনা করেছিলেন। 'সাধের বৌ' (১৯১৯), 'দরিয়া (১৯২০) এই দুটি উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার পর তৃতীয়খানি 'নন্দ' আর প্রকাশিত হয় নি। 'উষা' ও 'রূপ-লহরী'-তে যার আভাস মাত্র দেখা যায়,' 'সাধের

বৌ' ও 'দারিয়া' উপন্যাসে তার পূর্ণ পরিণতি ঘটেছে। তবে তাঁর এই দুখানি গ্রন্থ যে উপন্যাস নয়, এ সম্পর্কে লেখক নিজেই সচেতন ছিলেন :

> সাধের বৌ ও তৎসংক্রান্ত আর দুইখানি বই নভেল নহে, উপন্যাস নহে, ইহা একটি অলৌকিক অর্থবাদের অনুরূপ। গল্পের ছলে গোটা কয়েক সিদ্ধান্তের কথা, কর্মপদ্ধতির কথা আমি বাঙ্গালী পাঠকবর্গকে শুনাইয়া রাখিলাম। যে সকল তত্ত্বের ব্যাখ্যা হিসাবে প্রকাশ করিলে হয়ত অনেকে পাঠ করিতেন না, তাঁহারা কৃপা করিয়া পড়িতেন তাঁহাদের পক্ষে সে পাঠ শ্রমসাধ্য হইত, আমি তাহাই রকম করিয়া উপন্যাসক ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিলে।[৮]

চারখণ্ডে বিভক্ত এই উপন্যাসটির প্রথম খণ্ডটির মধ্যেই একমাত্র সামাজিক জীবনের বাস্তব পরিবেশের পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তী তিনটি খণ্ডের মধ্যে নানা অলৌকিক কাহিনী ও অবাস্তব রহস্য সন্নিবেশিত হয়েছে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সুকুমার বন্ধু বান্ধবের অনুরোধে যেদিন বাড়িতে পার্টির ব্যবস্থা করল, সেইদিনই স্থানীয় বিজয়ের উপর সংসারের ভার দিয়ে সে বিলাত যাত্রার সিদ্ধান্ত করেছে। দ্বিতীয় খণ্ডে ভীষণ ঝড়ে সুকুমার জাহাজ থেকে দূরে গিয়ের বালুকারাশির উপর ছিটকে পড়া ও এক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বিশরীর ঘরবেশের দ্বারা প্রাণ রক্ষা, বিশরীর বালিকার সেবালাভ, কায়রোর হোটেলে একজন বাঙালী ডাক্তারের সাক্ষাৎ ঘটেছে। অন্যদিকে কাশী ও কলকাতা নিয়ে সুকুমারী-নন্দ-বিজয় ও সাধের বৌয়ের জীবনবৃত্তের মধ্যেও নতুন সুর সংযোজিত হয়েছে। এখানেও অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন রামানন্দ স্বামী বিজয়ের পরিবারের গতিশক্তি নিয়ন্ত্রিত করেছে। তৃতীয় খণ্ডে সুকুমার রুশ রূপসী আইরোজনের মোহপাশে আবদ্ধ হয়ে লেক্টপিটার্সবার্গ ও মস্কোযাত্রা করেছে। ঘটনাচক্রে এখানে সে নিহিলিষ্টদের চক্রে জড়িয়ে পড়েছিল। সর্বত্রগামী কিন্তু বিশরীর ঘরবেশের অলৌকিক শক্তি প্রভাবে সেবারেও সে রক্ষা পেয়েছে। এদিকে রামানন্দ স্বামীর কৃপায় বিজয় কাশীতেই একটি বড় চাকরি নিয়ে এসেছে। অঘোরী বাবা নামে এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর সঙ্গে এই খণ্ডেই পরিচয় হয়। কলকাতা থেকে কাশীযাত্রার পথে অঘোরী বাবা ও সুকুমারীকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। চতুর্থখণ্ডে সুকুমার, বালিকা দরিয়ার সঙ্গে সুকুমারী বিজয়, হাপ্‌সী প্রভৃতির মিলন হল। কোনো লৌকিক পদ্ধতিতে এ মিলন ঘটে নি। এ মিলনও সেই বিশরীর ঘরবেশেরই অলৌকিক শক্তির বলেই ঘটেছে। পাগ্‌লাবাবা, স্বামীজী ও অঘোরী বাবাও শেষ পর্যন্ত এক সঙ্গে মিলেছেন। সুকুমারী সুকুমার বৈষ্ণব মতে সাধনা শুরু করেছে, বিজয় ও হাপ্‌সী শুরু করেছে তান্ত্রিক মতে।

'সাধের বৌ' উপন্যাস হিসাবে অত্যন্ত দুর্বল। শেষের দিকে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন চিত্রসমষ্টি বলে মনে হবে। কার্যকারণ সুশৃঙ্খলিত বাস্তবজীবন চিত্রণ এখানে অনুপস্থিত। বহির্ঘটনার প্রাবল্য ও নীতিউপদেশ প্রচারের বক্তৃতা-সর্বস্ব ভঙ্গি উপন্যাসে বেমানান হয়েছে। "মাটি নিবি গো" (দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ) ও "খাওয়া নিবি গো" (তৃতীয় খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ) স্বয়ং সম্পূর্ণ রচনা হিসাবে লেখকের কৃতিত্বের পরিচয় দেয়, কিন্তু উপন্যাসের অংশ হিসাবে এই দুটি অংশ প্রক্ষিপ্ত—বাদ দিলেই ভালো হত। লেখক এই উপন্যাসের মুখবন্ধে ভাগলপুর জেলা স্কুলের শিক্ষক পার্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের যে সূত্রটি দিয়েছেন, তা কৌতূহলোদ্দীপক :

> আমি পার্বতীবাবুর কুটিরে প্রায়ই যাইতাম, এবং তাঁহারই বাগানে প্রথমে বহু সিদ্ধ সাধক সন্ন্যাসীর সহিত পরিচিত হই। ইঁহারই বাগানে কাশীর নেহ প্রদেশের ব্রাহ্মণ কণ্ডী কেশবদের নিকট প্রথমে সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের গঠন, বাঁধন ও শক্তি পরিচালন পদ্ধতির ইতিহাস

৮। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা 'সাধের বৌ'।

শুনিয়াছিলাম। তাহারপর যৌবনে ও প্রৌঢ়ত্বের প্রথমে বড় বড় কেন্দ্রী সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাদের কর্মের পরিচয় পাইয়াছি। এই গ্রন্থের একটি সন্ন্যাসী চিত্রও কাল্পনিক নহে। এমনকি তাঁহাদের নামটি পর্যন্ত লুকাই নাই।.....'সাহেব বৌ'—এর মত আরও দুইখানি এই আকারের উপন্যাস না লিখিলে সকল ঠিক করিয়া দেওয়া হইবে না, এই সকল সঙ্কল্প মনে আছে।

বলাবাহুল্য লেখকের এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলি উপন্যাসিক রীতির সঙ্গে সমন্বিত হয় নি। কিন্তু প্রবন্ধের ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতাগুলিই সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে উঠেছে।

'ধরিত্রী' (১৯২০) 'সাহেব বৌ' উপন্যাসেরই পরিশিষ্ট। 'ধরিত্রী'-র মধ্যেও তত্ত্ববিন্যাস করার চেষ্টা আছে—সে তন্ত্র পরকীয়া তন্ত্র। সেই সাধনার কয়েকটি ক্রম তিনি এই উপন্যাসে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। লেখক নিজেই বলেছেন :

> "ধরিত্রী"র পরকীয়া-তত্ত্ব একটু ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছি। পরকীয়া বলিলে এখন অনেকে যাহা বুঝেন উহা তাহা নয়; উহা পরস্ত্রী-গমনের নামান্তর নহে। যাহা পরের ভাব তাহাকে আমার ভাবের সহিত মিলাইয়া পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিতে পারিলে, তবে পরকে আপন-জন করিতে পারা যায়, তবে বিচিত্র বিশ্ব সৃষ্টিকে আমার বলিয়া এক করা চলে।...'ধরিত্রী'র একটি ক্রম আমি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এ সাধনার অনেকগুলি ক্রম আমি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এ সাধনার অনেকগুলি ভগবান রামকৃষ্ণদেব তাঁহার জীবনে ফুটাইয়া দিয়া গিয়াছেন। আধুনিক বাঙালী তাহা দেখিয়া ঠিকমত বুঝিতে পারে নাই। ৺কেশবচন্দ্র "নববিধান" ধর্মের প্রবর্তন করিয়া গোড়ার প্রথম স্তরটা বাঙালীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে। সে স্তরটাকে রোচক ও অর্থবাদের "মোড়ক" করিয়া "ধরিত্রী" পুস্তকে আমি খোলসা করিবার চেষ্টা করিয়াছি।[১]

'ধরিত্রী' উপন্যাসটি তিনটি অংশে বিভক্ত। সাহেব বৌ বা সুকুমারী চরিত্র এখানে থাকলেও ধরিত্রীই কেন্দ্রীয় চরিত্র। প্রথম অংশে ধরিত্রীর অপ্রতিরোধনীয় ভাবপ্রবেগ ও সুকুমারের রূপোল্লাস বর্ণিত হয়েছে। ধরিত্রী শেষ পর্যন্ত তার দুর্বার ভাবাবেগ সংবৃত করতে না পেরে নিষ্ক্রান্ত হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে ইছামতী তীরে স্বরূপদাস বাবাজীর আখড়ার বিচিত্র পটভূমি বর্ণিত হয়েছে। এইখানে ধরিত্রী শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত স্বরূপদাসের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। স্বরূপদাসের মধ্য দিয়ে সহজ মতের নিষ্ক্রিয়াশী রূপটিকে দেখানো হয়েছে। পরবর্তী অংশে বিচিত্র শ্রেণীর সাধু সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের নানাপ্রভাব কাহিনীর গতিপথকে নানা রূপান্তরের দিকে নিয়ে গিয়েছে। বিজয়া ও ধরিত্রীর শেষ বিবাহ ও ধরিত্রীর সন্তান লাভ ও ধরিত্রীর মৃত্যুতে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে। সুকুমার, সুকুমারী, বিজয়, হাপদী, ধরিত্রী—এই পাঁচজন নরনারীর জীবনের গতি সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অভিপ্রায় অনুযায়ী বিচিত্র ভঙ্গিতে আবর্তিত হয়েছে। এই দুটি উপন্যাসের কাহিনীজাল রাশিয়া থেকে সুদূর নেপাল রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত। ফলে অনেক সময় স্থানের ঐক্য (unity of place) রীতিমত ভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। তত্ত্বের গুরুভারে উপন্যাসের শিল্পরূপ ব্যাহত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসত্রয়ীতে তত্ত্ব আছে, কিন্তু তার আধার উপন্যাসই। বিশেষতঃ, 'সীতারাম' উপন্যাসে তত্ত্বনিরপেক্ষ শিল্পরূপ বঙ্কিমের বিশিষ্ট শক্তির পরিচয় দেয়। পাঁচকড়ির শেষ দু'খানি উপন্যাসে তত্ত্বই মুখ্য, কাহিনী বা চরিত্র গৌণ। চরিত্রগুলির অন্তর্জীবন নেই বাইরের আকস্মিক ধাক্কায় তাদের পরিবর্তন ঘটে। তাঁর উপন্যাসে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার প্রধান

১। গোড়ার কথা, 'ধরিত্রী' পৃ ৵৶।

দুজন লেখক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর উপন্যাসের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 'ঘাটি নিবি গো' 'ঘাটতা নিবি গো'— জাতীয় অংশ কমলকান্তের দপ্তরের কোনো কোনো দপ্তরকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তুচ্ছ বিষয়কে নিয়ে বিচিত্র প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে তিনি গভীরতায় অবতরণ করেছেন।

৬

পাঁচকড়ির সাংবাদিক জীবনের ত্রুটি প্রসঙ্গে মন্মথনাথ ঘোষ তাঁর একটি প্রবন্ধে যা মন্তব্য করেছেন, তা প্রণিধান যোগ্য :

> পাঁচকড়ির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ আনা হয়, তাঁহার মতিস্থৈর্য ছিল না। বাস্তবিক আজ তিনি কোনও রাজনৈতিক বিষয়ে এক প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন, কল্য পুনরায় তাহার বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন, কল্য পুনরায় তাহার বিপরীত মত প্রকাশ করিতেছেন। অবশ্য সকলেরই ভ্রান্তি ঘটিতে পারে এবং মত পরিবর্তন করা কোন লোকের পক্ষে আশ্চর্য নহে। কিন্তু পাঁচকড়ি প্রকাশ্যেই স্বীকার করিতেন যে, তিনি পেটের দায়ে কোনও বিশেষ নীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ...বাস্তবিকই তিনি স্বাধীনভাবে কিছুই লিখিতে পারেন নাই, সেইজন্য তিনি কিরূপ রাজনীতিক ছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না।...আমরা আশ্চর্য হইতাম সাহিত্যিকরূপে তাঁহার অপূর্ব ক্ষমতা দেখিয়া, 'বাঙ্গালীতে এক প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া এক মতের সমর্থন করিয়াছেন—সেইদিনই 'নায়কে' অপর এক প্রকার যুক্তি প্রদর্শিত করিয়া অপূর্ব নিপুণতার সহিত পূর্ব মতের খণ্ডন করিয়াছেন।[১০]

পাঁচকড়ির সাংবাদিক জীবনের এই অসংগতি তাঁর সাহিত্যিক জীবনকেও প্রভাবিত করেছিল। এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা মনে করেও সাহিত্য সাধক পাঁচকড়ির প্রতিভা অস্বীকার করা যায় না। তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট গদ্যশিল্পী। তাঁর গদ্য স্বচ্ছন্দ গতি ও অব্যর্থ-লক্ষ্য। বহু দুরূহ বিষয় নিয়ে তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন, কিন্তু লিপিনৈপুণ্যে ও সরসতায় তাহা সাহিত্য হয়ে উঠেছে। তাঁর তন্ত্র সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। সংস্কৃত সাহিত্যের কৃতিছাত্র পাঁচকড়ি তৎসম শব্দপ্রধান সমাসবদ্ধ বাক্‌বিন্যাসের দ্বারা যে ভাষার ভাস্কর্য ও কারুকার্য প্রকাশ করেছেন, তার ঐশ্বর্য ও আলঙ্কারিক রীতি অসাধারণ। এখন ভাষার রাজকীয় ঐশ্বর্য ও আভিজাত্য—

> গতপনা যামিনীর চন্দ্রিকারীতি যেমন নিরাবিল, অপসারিত বিস্মৃতিকুজ্ঝটিকার আত্মসুস্থতির দ্যুতিও তেমনি নিরাবিল। নিশাবসান হয় নাই বটে, পরন্তু মুদিতার হ্লাদিনী লোহিতাভা চক্রবালকে রক্তিমরঞ্জিত করিয়াছে; এক নিষ্ঠার শুকতারা সান্ধতকের ন্যায় আকাশের নীল বক্ষে ধপ্‌ধপ্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। ঐ শুন, আশা-পিক্ পঞ্চমতানে জাগরণের গান ধরিয়াছে।[১১]

এ ভাষা চিত্রধর্মী ও ভাস্কর্যসুঠাম। কিন্তু পাঁচকড়ির এমন ভাষাও আছে যেখানে সংগীতের উৎসব চলেছে। হৃদয়াবেগের দুর্বার প্রবাহে ভাষা পেয়েছে স্বচ্ছন্দগতি। যেমন—

> একবার তাকাও—মালঞ্চ-বেষ্টনী-পরিবৃত বাঙ্গালীর নিজ নিকেতনের প্রতি একবার সস্নেহে তাকাও,—জাতির অতীত ইতিহাসের মূলুকে স্বদেহের—স্বীয় সমাজ-শরীরের প্রতিবিম্ব দেখিয়া অধঃপতনের গভীরতা একবার বুঝিয়া লও। তাহা হইলে আবার যেমন ছিলে তেমনই হইবে, হারানিধি ফিরিয়া পাইবে, তোমাদের ভাষা জন্মভূমি তোমাদেরই হইবে।[১২]

১০। আবশী ও সর্বমঙ্গলা, পৌষ ১৩৫০।

১১। যমের অরুচি।

১২। বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা (বঙ্গবাণী, ভাদ্র ১৩২০)।

'মাটি নিবি গো' (সাধের বৌ দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ), 'ঘ্যাঙড়া নিবি গো' (সাধের বৌ : তৃতীয় খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ), 'চুড়ি নিবি গো' (সাহিত্য বৈশাখ ১৩২০)। এই জাতীয় রচনাগুলিতে একটি নতুন আস্বাদন লাভ করা যায়। একটি তুচ্ছ বিষয়কে ঘিরে নানা প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে লেখক ভাব গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করেছেন। এই জাতীয় রচনাগুলি কথাসাহিত্যের গল্পরসের কোনো কোনো রচনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 'মাটি নিবি গো' পাঁচকড়ির অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। যেমন গীতধর্মী, তেমনি ভাব-গভীর। কোনো কোনো রচনায় শ্লেষোক্তি ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্য রচনার মধ্যে নতুন আস্বাদন সঞ্চার করেছে। ভাষার সচলতা ও নমনীয়তা বিচিত্র শ্রেণীর শব্দকে একটি বৃন্দধারায় অভিযুক্ত করেছে। বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের একটি উদাহরণ দেওয়া যাক :

"ঐখানে দাঁড়ায়ে থাক,
রাইয়ের কুঞ্জে আর এস না।"

ইহাই আমাদের মন-কো-অপারেশনের মূলমন্ত্র। যিনি বৃন্দাদূতীর এই স্পর্ধার উক্তির মর্ম চিরদিন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, তিনিই আমাদের বিবৃত মন-কো-অপারেশনের ভাব ও ভঙ্গি বুঝিতে পারিয়াছেন।[১৩]

বাংলার সমাজ ধর্ম, দর্শনের ব্যাখ্যাতা, দেশ ও জাতির কল্যাণকামী বাংলাসাহিত্যের সুদক্ষ গল্পশিল্পী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী বাংলা সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ।

১৩। মন-কো-অপারেশন, বান্ধব, ৮ বৈশাখ ১৩১৮।

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.

বিদ্যাসাগর	২·২৫
মানুষের মত মানুষ	·৭৫
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·৩০
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	১·২৫
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা—১২

মনস্বী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাংলার তান্ত্রিক সাধনা

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার অন্যতম স্মরণীয় ও বরণীয় পুরুষ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী, অথচ তাঁর জীবন ছিল ভাগ্য-বিড়ম্বিত। শ্রীভগবানের অনুগ্রহ ও নিগ্রহ উভয়ই তাঁকে মাথা পেতে বহন করতে হয়েছিল। তিনি শৈশব কাল থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের স্নেহলাভে ধন্য হয়েছিলেন, বাল্যকালেই রঙ্গলালের সম্মুখে "পদ্মিনী উপাখ্যানের" অংশবিশেষ আবৃত্তি করে কবির আশীর্ব্বাদ লাভ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও রঙ্গলালের সঙ্গে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু আত্মীয়তা ছিল। আবার তিনি বাল্যকালেই হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি বরেণ্য পুরুষদের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। পরবর্ত্তী কালে তিনি নাথুরোশী কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলেঙ, ডাক্তার ভাণ্ডারকর, মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে প্রভৃতি মনস্বী পুরুষদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনজন প্রখ্যাতনামা বাঙালী তাঁর রচনা ও চিন্তাধারায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল,—পরিব্রাজক ও অসাধারণ বাগ্মী শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (কৃষ্ণানন্দ স্বামী), ধর্মপ্রবক্তা পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ও হাস্যরসিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এঁদের ভেতর ইন্দ্রনাথ ছিলেন পাঁচকড়ির সাহিত্যগুরু। তাই বলছিলাম, পাঁচকড়ি ছিলেন দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী, কেননা, সে যুগের বহু প্রতিভাশালী ও মহনীয় পুরুষের সান্নিধ্য তিনি লাভ করেছিলেন। আবার এ কথাও সত্য যে পাঁচকড়ির জীবন ছিল ভাগ্য বিড়ম্বিত, কেননা, তাঁর ভেতর যতখানি সম্ভাবনা ছিল, ততখানি সার্থকতা তিনি লাভ করতে পারেন নি। তিনি সাংবাদিক হিসাবেই বাংলা দেশে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি বহু পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন, যথা কংগ্রেস-বিরোধী বঙ্গবাসী (বঙ্গবাসী 'কংগ্রেসকে' বলতো 'কদরয়স'), কংগ্রেস সমর্থক বসুমতী, হিতবাদী, সাপ্তাহিক প্রবাহিনী, দৈনিক নায়ক প্রভৃতি আমরা দেখেছি, সম্পাদক রূপে পাঁচকড়িকে জনসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্যে স্থূল রসিকতারও আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে।* এদিক ভাবে তাঁর সময় ও শক্তির যথেষ্ট অপচয় ঘটেছে। উপন্যাস-রচনাও হয়তো তাঁর পক্ষে ছিল পরধর্ম। তা ছাড়া, তাঁকে স্বল্পাবসর জীবনে অনেক প্রবন্ধ অত্যন্ত দ্রুত লিখতে হয়েছে। তাঁকে 'দশোদরস্যার্থে' মাঝে মাঝে মহৎ পাতকের অনুষ্ঠান করতে হয়েছে।

পাঁচকড়ির মধ্যে মানসশীলতা, পাণ্ডিত্য ও ভাব প্রবণতার এক অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালী এবং বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধাবোধ। এই শ্রদ্ধাবুদ্ধি দেখেছি মনস্বী বিপিনচন্দ্র পাল

---

* 'বঙ্গবাসীকে' ব্যঙ্গ করে গোবিন্দ দাস লিখেছিলেন—

কি বল হে ব্যঙ্গভারী, এ কি রঙ্গরস ?
তুমি তো বোঝনা অজ্ঞ,
এ মহা জাতীয় যজ্ঞ,
ধমনী-চুয়ানো নাহি চেন সোমরস।

কবিতার শেষ কয় পংক্তি—

'যারা খায় জুতা লাথি,
জানে সেই মৃত জাতি,
তাদেরি বিজয়-গানে কাঁপে দিক্ দশ'।

ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মধ্যে কিন্তু তাঁরা দু'জনেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের প্রেম-সাধনার দিকেই বেশী আকৃষ্ট হয়েছিলেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাঙালী সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের ওপর আলোক-সম্পাত করেছেন, যথা বাঙালীর সমাজ-ব্যবস্থা, বাংলার উপাসক সম্প্রদায়, তান্ত্রিক বামাচারপূজা, তন্ত্রে মূর্তিপূজা, তন্ত্রের ঐতিহাসিক যুগ, তন্ত্রের দেহতত্ত্ব, তন্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্ব, তন্ত্রের পঞ্চমকার ইত্যাদি। বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য বিষয়: পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাংলার তান্ত্রিক সাধনা।

উনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষিত বহু বাঙালীর মনে তান্ত্রিক সাধনার প্রতি একটা বিরূপতা ছিল। অবশ্য রাজা রামমোহন 'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের' আদর্শ পেয়েছিলেন মহানির্বাণ-তন্ত্রে, ব্রাহ্ম সমাজে ব্রহ্মোপাসনার জন্যে 'মহানির্বাণ তন্ত্রের' পঞ্চ শ্লোক গৃহীত হয়েছিল, রামমোহন তাঁর দার্শনিক নিবন্ধে তন্ত্র থেকে বহু বচন উদ্ধৃত করেছিলেন এবং স্বয়ং তান্ত্রিকী দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ভূদেব বাবুও শ্রদ্ধার সঙ্গে তন্ত্র সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। কিন্তু তন্ত্র বলতেই এককালে শিক্ষিত বাঙালীর মনে জাগতো ষট্‌কর্ম্মের কথা, শ্মশান, নরকপাল, শব সাধনা প্রভৃতির কথা। তন্ত্রের লক্ষ্য যে দুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান, তান্ত্রিক সাধককে যে দিব্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েই এই জ্ঞান লাভ করতে হয়, সে তত্ত্বসম্পর্কে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বহু বাঙালী অজ্ঞ ছিলেন। অবশ্য, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি শক্তি সাধক গণের দৃঢ় ভাবাসক্তি শিক্ষিত বাঙালীদের মুগ্ধ করেছে কিন্তু তান্ত্রিক সাধক রূপেই তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠেছে ঘোনো পাশবিক বা অঘোর পন্থীর ভয়াবহ মূর্তি।

অন্যে পরে কা কথা। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র, যিনি বাঙালীকে বহু তান্ত্রিক ধর্ম্মে দীক্ষা দিয়েছেন, যিনি ধ্যানভূমিতে মৃন্ময়ী শৈশবজননীর মধ্যে চিন্ময়ীকে প্রত্যক্ষ করেছেন, তিনিও তন্ত্রের প্রতি সুবিচার করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র যখন রামচন্দ্র এই ছদ্মনামে অধ্যক্ষ হেষ্টির সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তখন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন হেষ্টির পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে তন্ত্রশাস্ত্রকে আক্রমণ করেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, বঙ্কিমচন্দ্র তদুত্তরে এই মন্তব্য করেন যে, যথার্থ হিন্দুধর্ম্ম ও তান্ত্রিক ধর্ম্ম আলো ও অন্ধকারের ন্যায় পরস্পরবিরোধী। বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য শুনুন—

'I can assure Dr Banerjea that he cannot be more emphatic in the condemnation of Tantrikism than I am, and that I have in no respect departed from the view I put forth and illustrated in Kapalkundala in regard to the morality of that form of Hinduism. True Hinduism and Tantrikism are as much opposed to each other as light and darkness and I say with as much sincerity as he does, that let it never be assumed that Tantrikism is the general religion of the Hindus; no one, I believe, has thought of making such an assumption.

Let Tantrikism perish—but let it not perish unstudied. The study of the darkest errors of humanity yields lesson as that of truth itself. And what is history, if it is not the history of human errors?'

সাহিত্যসাধক ও তন্ত্রাচার্য্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব এবং পরম-শ্রদ্ধেয় অনারেব্‌ল্ জাষ্টিস স্যার জন উড্রফই বিপুল তান্ত্রিক সাহিত্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 'তন্ত্রতত্ত্বের' প্রথম ভাগে শিবচন্দ্র বলেছেন—

'ইহা (তন্ত্রশাস্ত্র) ভ্রমপ্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-বিজড়িত সীমাবদ্ধ মানববুদ্ধিসিদ্ধ শাস্ত্র নহে, ভ্রম যাঁহার নিকটে ভ্রান্ত,

প্রমাদ যাঁহার নিকট প্রণত, বিপ্রলিপ্সা যাঁহার নিকট স্বতঃ-প্রত্যাহৃত, সেই সর্ব্বাস্তর্যামী ভগবান ভূতভাবন ইহার প্রকাশক, সর্ব্বান্তর্যামিনী ভগবতী জগদ্ধাত্রী ইহার শ্রোত্রী, পরে ব্রহ্মাদি দেববৃন্দ হইতে নারদাদি ঋষি-বৃন্দ এবং তাঁহাদের নিকট হইতেই বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র গৌতম প্রভৃতি গুরু-পরম্পরা এ তন্ত্র অধিগত হইয়া এ বিশ্বরাজ্য-রাজসভার সভাসদ'।

আর্থার উডরফ বিদ্যার্ণব-প্রমুখ ক্রিয়াকুশল তান্ত্রিক পণ্ডিতের নিকটে তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করে তন্ত্রের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি শুধু একজন শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ ছিলেন না, ভারতীয় দর্শনে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত, অধিকন্তু তিনি ছিলেন ক্রিয়াযোগী। তন্ত্রসম্পর্কে যাঁর কৌতূহলী, উডরফ রচিত Sakti and Sakta গ্রন্থখানি তাঁদের অবশ্য পঠনীয়।

যে কোন সাধন-প্রণালীর ন্যায় তান্ত্রিক সাধনার লক্ষ্যও দিব্যজীবন-লাভ। তান্ত্রিক সাধনায় জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলেরই অধিকার আছে। তবে সাধকের অধিকার ভেদ তান্ত্রিক সাধনায়ও স্বীকৃত। তাই তন্ত্রে তামসিক প্রকৃতির লোকের জন্যে পশ্বাচার, রাজস প্রকৃতির লোকের জন্যে বীরাচার ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকের জন্য দিব্যভাবে সাধনা ও মানসপূজার ব্যবস্থা আছে।

তান্ত্রিক সাধনার চরম লক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ, ব্রহ্মের সঙ্গে ঐক্যানুভূতি দীক্ষা। বীজমন্ত্র জপ, মন্ত্রযোগে উপাসনা প্রভৃতি সাধককে এই লক্ষ্যেই পৌঁছে দেয়। তন্ত্র বলেন, 'দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ', 'নিজে দেবতা হয়ে দেবতার আরাধনা কর্ত্তব্য'। ভূতশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, প্রাণায়াম প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সাধক ইষ্ট দেবীর সঙ্গে নিজের ঐক্য অনুভব করেন।

বিশ্বসার তন্ত্রে বলা হয়েছে,—মানুষ জন্মের মতো জন্ম নেই। দেবগণ ও পিতৃগণও এই মানবজন্ম বাঞ্ছা করেন। সকল দেহের মধ্যে নরদেহই দুর্লভ, এই জন্যেই বলা হয়েছে নরজন্ম সুদুর্লভ।

'মনুষ্যজন্মদুর্লভং জন্ম কুত্রাপি নৈব বিদ্যতে।
দেবতাঃ পিতরঃ সর্ব্বে বাঞ্ছন্তি জন্ম মানুষং।
দুর্লভো মানুষো দেহঃ সর্ব্বদেহেষু সর্ব্বদা।
তস্মাচ্চ মানুষং জন্ম এতদ্বক্ত্রং সুদুর্লভং'।

রুদ্রযামল তন্ত্রেও উক্ত হয়েছে, মনুষ্যজন্ম ভিন্ন অন্য কোন জন্মে তত্ত্বজ্ঞান-লাভের অধিকার হয় না। তাই তান্ত্রিক সাধক সাধনার মধ্য দিয়ে তাঁর জৈব প্রবৃত্তিকে ঊর্দ্ধমুখী করেন। এ কালের অনেক মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিত মনে করেন, তান্ত্রিক সাধকের 'কুণ্ডলিনী জাগরণ' হচ্ছে মূলতঃ জৈবী প্রবৃত্তিরই ঊর্দ্ধমুখীকরণ (sublimation of the libido) তান্ত্রিক পণ্ডিতগণ বলেন, প্রকৃত তন্ত্র কখনো বেদবিরোধী নয়, 'তন্ত্রং বৈ বেদসম্মতম্'। আর কলিকালে আগমোক্ত বিধানেই উপাসনা কর্ত্তব্য।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালীর কাছে তন্ত্রের মহিমাপ্রচারকে আপন কর্ত্তব্য বলে মনে করেছেন। তাই তিনি প্রাঞ্জল অথচ আবেগপূর্ণ ভাষায় তন্ত্রসম্পর্কে বহু নিবন্ধ রচনা করেছেন। সেই সকল নিবন্ধের সাহিত্যিক মূল্যও বড় অল্প নয়।

'শিব ও শক্তি' প্রবন্ধে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন —

'পুরাতন তন্ত্র শ্রুতি-উক্তির পদে পদে সমর্থন এবং সম্প্রসারণ করিয়াছেন, কোথাকেই শ্রুতির বিরোধী নহে। বেদ হইতে তন্ত্রের বিশিষ্টতা এই যে, তন্ত্র সর্ব্ব বর্ণের ও সর্ব্ব জাতির সেব্য। তন্ত্র পৃথিবীর সকল প্রকারের মানব জাতিকে নিজের গণ্ডীর মধ্যে গ্রহণ করিতে পারেন। দ্বিতীয় বিশিষ্টতা উদার মন্ত্রত্রাণ—'মননাৎ ত্রায়তে যস্মাৎ তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ'—এ মন্ত্রে সকল জাতিরই সমান দাবী আছে, অধিকারিভেদে মন্ত্রভেদ ঘটে মাত্র'।

আবার 'মানস পূজা' প্রবন্ধে তিনি শিক্ষিত বাঙালীর উদ্দেশে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছেন —

'আনন্দ পূজক হইলেও বাহ্যপূজা বজায় রাখিতে হয়; কারণ, তাহা না করিলে সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে। সমাজ ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তবে সাধক যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে। যতদিন সমাজে থাকিবে ততদিন সমাজধর্ম্ম মানিয়া তাহাকে চলিতেই হইবে'।

গীতায়ও বলা হয়েছে—'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্'। এই প্রসঙ্গে মহানির্ব্বাণতন্ত্রের একটি বচন আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র বলেছেন, কলিকালে শুধু দুটি আশ্রম, গার্হস্থ্য আর সন্ন্যাস, তবে সন্ন্যাস-গ্রহণের অধিকার সকলের নেই।

'মাতরং পিতরং বৃদ্ধং ভার্য্যাঞ্চৈব পতিব্রতাম্।
শিশুঞ্চ তনয়ং হিত্বা নাবধূতাশ্রমং ব্রজেৎ'।

বৃদ্ধ মাতাপিতা, পতিব্রতা ভার্য্যা ও শিশু পুত্রকে ত্যাগ করে অবধূতাশ্রম গ্রহণ করবে না।

'বাঙ্গালার তন্ত্র' প্রবন্ধে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

'তান্ত্রিক ধর্ম্মই বাঙ্গালার ধর্ম্ম, তন্ত্র সাহিত্যই বাংলার মূল সাহিত্য।.....বাঙ্গালার বাঙ্গালী চিরকালই নামে হিন্দু, কিন্তু কর্ম্মে অর্দ্ধেক বৌদ্ধ, অর্দ্ধেক তান্ত্রিক'।

তান্ত্রিক ধর্ম্মই যে বাংলার ধর্ম্ম, সে কথা ব্যাপক অর্থে সত্য। যেমন শাক্ত তন্ত্র, শৈব তন্ত্র, বৌদ্ধ তন্ত্র আছে তেমনই বৈষ্ণবীয় তন্ত্রও আছে। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম-সম্পর্কে তাঁর একটি উক্তি নিয়ে বর্তমানে বিতর্কের অবকাশ আছে। উক্তিটি এই—

'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত কতদূর সাদৃশ্য তাহা অভিজ্ঞমাত্রেই জানেন'।

'কাম ও মদন' প্রবন্ধে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তান্ত্রিক সাধনার গূঢ় রহস্য ব্যক্ত করেছেন। প্রবন্ধটি প্রতীচ্য শিক্ষায় শিক্ষিত পণ্ডিতগণের বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানে যাঁরা ফ্রয়েডের অনুবর্ত্তী, তাঁরাও এই প্রবন্ধ থেকে অনেক নতুন আলোক প্রাপ্ত হবেন।' এই প্রসঙ্গে তন্ত্রশাস্ত্রের একটি অদ্ভুত শ্লোক আমরা স্মরণ করি।

'যত্রাস্তি ভোগো ন চ তত্র মোক্ষঃ
যত্রাস্তি মোক্ষো ন চ তত্র ভোগঃ।
দেবী পদাম্ভোজ যুগাশ্রিতানাম্
ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব।

যেখানে ভোগ, সেখানে মোক্ষ নাই, আর যেখানে মোক্ষ, সেখানে ভোগ নাই, কিন্তু যাঁরা দেবীর পাদপদ্ম আশ্রয় করেন, ভোগ ও মোক্ষ দুটোই তাঁদের করতলগত হয়।

তুলসীদাসও বলেছেন—যাঁহা রাম তাঁহা কাম নেহি, যাঁহা কাম তাঁহা নেহি রাম'। কিন্তু তন্ত্রের সিদ্ধান্ত অন্যরূপ। তন্ত্র কামনার উচ্ছেদ করতে বলে না। মানুষ প্রবৃত্তিমার্গ আশ্রয় করেও কি ভাবে ধীরে ধীরে নিবৃত্তির দিকে অগ্রসর হতে পারে, সে কৌশল তন্ত্রই আমাদিগকে শিক্ষা দিয়েছে।

তন্ত্রের ঐতিহাসিক মূল্য যে উপেক্ষণীয় নয়, তন্ত্রে যে বাংলার দু' হাজার বছরের ইতিহাস লুকানো আছে, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সে কথাও প্রতিপন্ন করেছেন। বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে যাঁরা কৌতূহলী, তাঁদের নিকট 'তন্ত্রের ঐতিহাসিক মূল্য' ও 'তন্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্ব' প্রবন্ধ দুটি মূল্যবান।

তন্ত্রে দেহতত্ত্ব সম্পর্কে পাঁচকড়ি যা বলেছেন, তা তান্ত্রিক সাধনার একেবারে গোড়ার কথা। কথাটা হচ্ছে, যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তাই আছে দেহভাণ্ডে'। (What is in the macrocosm is also in the microcosm) পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

'মনুষ্যদেহভাণ্ড যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সংক্ষিপ্তসার, ইহাই তন্ত্র বলিতে চাহেন। ...এই দেহেতেই কৈলাস, এই দেহেতেই হিমালয়,—এই দেহেতেই শ্রীবৃন্দাবন, এই দেহেতেই গোবর্দ্ধন;—এই দেহাভ্যন্তরেই হরগৌরী বা রাধাকৃষ্ণ নানা লীলানাট্য প্রকাশ করিতেছেন।

…মার্কণ্ডেয় চণ্ডী আগাগোড়া দেহতত্ত্বের ব্যাখ্যামাত্র; এই দেহের মধ্যেই দেবাসুরের সংগ্রাম; মহিষাসুর, ধূম্রলোচন, শুম্ভ নিশুম্ভ দেহেই আছে. এই দেহের মধ্যেই চিন্ময়ী আদ্যাশক্তি নানা রূপ ধরিয়া অসুর নাশ করিয়া থাকেন'।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন, তন্ত্র আমাদিগকে ভাবের ঘরে চুরি করতে নিষেধ করেছেন, কপটতাকে নিন্দা করেছেন। তন্ত্রের মতে ইন্দ্রিয়নিগ্রহের পথ কল্যাণের পথ নয়। পাঁচকড়ি বাবু বলেছেন—

'তন্ত্রমতে নারীই আদ্যাশক্তিস্বরূপিণী—জগন্ময়ী—জগজ্জননী; সুতরাং নারী পূজনীয়া, অর্চ্চনীয়া, সাদরে রক্ষণীয়া।*……যে ধর্ম বা যে সাধন পদ্ধতিতে নারীর অত্যন্ত নিন্দা আছে, সেই ধর্মের যাহিকগণ পরে লাম্পট্যদোষে দুষ্ট হইয়া অধঃপাতে গিয়াছে।

আমরা পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর প্রতি আমাদের অন্তরের প্রণতি জানাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ তাঁর জীবনী (সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ৮২) ও দু' খণ্ডে তাঁর রচনাবলী প্রকাশ করে আমাদের ধন্যবাদ-ভাজন হয়েছেন। আমরা যদি তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে বাংলা ও বাঙালীকে চিনতে চেষ্টা করি এবং বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান হই, তা হলে আমাদের যথার্থ কল্যাণ হবে এবং আমরাও সেই দিব্যধামবাসী পুরুষের আশীর্বাদ লাভ করে ধন্য হবো।

* এই প্রসঙ্গে লেকির History of European Morals দ্রষ্টব্য।

বিচিত্র মননে ও ভাবুকতায়
পাঁচকড়ি

দেবদাস জোয়ারদার

উনিশ শতকের নব জাগরণের দুটি উজ্জ্বল দিক। একটি ভারতোপলব্ধি অর্থাৎ সর্বভারতীয়ত্ববোধের ভিত্তি সন্ধান। অন্যটি বঙ্গোপলব্ধি অর্থাৎ বাঙালীর বৈশিষ্ট্য সন্ধানের চেষ্টা। এই বঙ্গোপলব্ধির সূত্রপাত গত শতকের শেষ পাদে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায়। বঙ্কিম সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' নামের মধ্যেই বঙ্গোপলব্ধির ইঙ্গিত নিহিত ছিল। বঙ্কিমের ভাষায়ই প্রথম শোনা যাক।

"বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে, যে বাঙ্গালী, তাহাকেই লিখিতে হইবে। যা যদি মরিয়া যান, তবে মার পল্প করিতে কত আনন্দ। আর এই আমাদিগের সর্ব্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশ, ইহার পল্প করিতে কি আমাদিগের আনন্দ নাই?" [১]

বঙ্কিমই বাঙ্গালার ইতিহাসচর্চা প্রথম আরম্ভ করেছিলেন। এই ইতিহাস রচনার পথকে যাঁরা দিনের পর দিন প্রশস্ততর করেছেন তাঁদেরই অন্যতম পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। এই দিক থেকেই আমরা পাঁচকড়িকে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবশিষ্য মনে করি। বঙ্গোপলব্ধির প্রেরণায় একটি লেখকগোষ্ঠী বাঙালীর বৈশিষ্ট্য সন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা একথাও স্বীকার করেছিলেন, "বাঙ্গালায় ভারতবর্ষের common factor কি আছে ও কেমনভাবে আছে তাহাও বুঝিতে হইবে"। [২] পাঁচকড়ি শুধু বাঙালীই বিশিষ্টতা লাভ করেছে এমন সঙ্কীর্ণতার পরিপোষক ছিলেন না। তিনি জানতেন ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রদেশ ও জাতি যুগ যুগান্তরের সাধনায় বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন পাঁচকড়ির সাহিত্য গুরু। ইন্দ্রনাথ একবার তাঁকে লিখেছিলেন, "হিন্দুত্ব এক, কিন্তু দেশভেদে হিন্দুর আচারধর্ম স্বতন্ত্র রকমের। এই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারিলে ভারতীয় হিন্দুত্বের পুষ্টি হইবেই।" [৩] এই স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে ঐক্যের চিন্তা রবীন্দ্র চিন্তারও মূল কথা। তবে ইন্দ্রনাথ বা পাঁচকড়ির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথের সর্বভারতীয়ত্ব বোধ হিন্দুত্বের গণ্ডী ছাড়িয়ে গেছে। সেখানে স্থান পেয়েছে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকল মানুষ। রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তিকে আমরা এ বিষয়ে শিরোধার্য করে নিতে পারি। "বিকাশের অর্থ ই ঐক্যের মধ্যে পার্থক্যের বিকাশ। বীজের মধ্যে বৈচিত্র্য নাই। কুঁড়ির মধ্যে সমস্ত পাপড়ি ঘনিষ্ঠভাবে মিলিয়া এক হইয়া থাকে। যখন তাহাদের ভেদ ঘটে তখনই ফুল বিকসিত হইয়া উঠে। প্রত্যেক পাপড়ি ভিন্ন ভিন্ন মুখে আপন পথে আপনাকে যখন পূর্ণ করিয়া

১। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বিবিধ প্রবন্ধ।

২। হিন্দুমণ্ডল বা গৌরমণ্ডল—পাঁচকড়ি রচনাবলী ১ম খণ্ড; ৯১ পৃষ্ঠা।
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তোলে, তখনই মূল সার্থক হয়।" [৪] এই পূর্ণ বিকশিত ফুলটি ভারতবর্ষ, আর এই ফুলের এক একটি পাঁপড়ি ভারতবর্ষের এক একটি অঞ্চল বা বিচিত্র ধর্ম বিশ্বাসে উজ্জ্বল এক একটি সম্প্রদায়। পাঁচকড়ির দৃষ্টিতেও হিন্দুচেতনার উর্ধ্বে ভারতচেতনা বা বঙ্গচেতনা যে কখনও স্থান পায়নি তা নয়। কেননা এই বক্তব্যও তো পাঁচকড়িরই "হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ আমি যাহা কিছু হইনা কেন, আমি বাঙ্গালার জল, বাঙ্গালী যখন, তখন আমার সব।" [৫]

বঙ্কিম প্রবর্তিত বঙ্গোপলব্ধি বঙ্কিমের পরবর্তীকালে কার্জনের বঙ্গ বিভাগের তীব্র আঘাতে বাংলার জাতীয় জীবনে ও সাহিত্যে শতধারায় উৎসারিত হয়ে উঠেছিল। অক্ষয় কুমার মৈত্রের প্রতিষ্ঠিত রাজসাহী অনুসন্ধান সমিতি, অক্ষয় কুমারের বাংলার ইতিহাসচর্চা, রমাপ্রসাদ চন্দের গৌড়রাজমালা, পাঁচকড়ির বাংলার বৈশিষ্ট্য নির্দেশক অজস্র রচনা বঙ্গবিভাগেরই পরোক্ষ ফল। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় বঙ্গোপলব্ধির কাব্যরূপ দেখতে পাই।[৬] এই ধারার আরো পরবর্তীকালের অসাধারণ শক্তিমান্ লেখক মোহিতলাল মজুমদার। মোহিতলাল পাঁচকড়ি ব্যাখ্যাত বাঙালী জীবনের তান্ত্রিক ভিত্তিটি অজস্র রচনায় জীবনব্যাপী সাধনায় সুস্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছেন।

একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন। ১৯০৫ এর বঙ্গবিভাগকে ঘিরে সেদিনকার বাঙালীচেতনায় বাঙালী মুসলমানরা যে কোন কারণেই হোক্ অংশীদার হতে পারেন নি। আসল কথা, উত্তর ভারতের হিন্দু ধর্ম বা ইসলাম ধর্ম কোনটিই বাংলা দেশের জলবায়ুতে অপরিবর্তিত ভাবে স্থানান্তরিত হয় নি। বাংলাদেশের জল মাটির গুণে সেখানকার হিন্দু বা ইসলাম ধর্ম বাংলাদেশে একটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করেছে। এই চিন্তার ঐতিহাসিক স্বীকৃতি আছে পাঁচকড়ির রচনায়—"বাঙ্গালার হিন্দুও পাতি, মুসলমানও পাতি।" [৭] বাঙালীচেতনার উজ্জ্বল বাংলাদেশের বিশিষ্ট হিন্দু ধর্মের আলোচনা পাঁচকড়ির রচনায় স্থান পেয়েছে। বঙ্গ বিভাগোত্তর যুগে বাঙালী চেতনার উজ্জ্বল বাংলা দেশের ইসলাম ধর্মের আলোচনা যদি আমরা পেতাম তাহলে বাঙালী, হিন্দু মুসলমানের মিলনের পথ অনেক প্রশস্ততর হোতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তা হয় নি। আমার কথা স্বাধীনতা পরবর্তী কালে পূর্ববাংলার মুসলমান জীবন এবারে এই বাঙালী চেতনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

পাঁচকড়ি বাংলাদেশের যে ইতিহাসের কথা ভেবেছিলেন সে ইতিহাস রাষ্ট্রীয় উত্থান-পতনের বা যুদ্ধের ফলাফলের তারিখ কণ্টকিত ইতিহাস নয়। সে ইতিহাস বাংলাদেশের সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক ইতিহাস। বাঙালীর সমাজবিন্যাস, বৃত্তিভেদ, কৌলীন্যপ্রথা, মূর্তিপূজা, লৌকিক আচার-আচরণ, বিবাহপদ্ধতি এই সব কিছু তাঁর পরিকল্পিত ইতিহাসের মূল্যবান আলোচ্য বিষয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পরাগল খাঁ ও ছুটি খাঁর স্মরণীয় নাম, পূর্ববাংলার জনাব আলি খানের রচিত শ্যামাসঙ্গীত, দরাব গাজীর রচিত গঙ্গাস্তোত্র এগুলি তিনি হিন্দু-মুসলমান সমন্বয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরেছেন। বৌদ্ধধর্ম, সহজিয়া চিন্তা, অউল-বাউলদের চিন্তা, সুফী সাধনা, উত্তর ভারতের আচারনিষ্ঠ হিন্দুধর্ম, এসব বিচিত্র ধর্মীয় চিন্তার মধ্য দিয়ে বাঙালী কিভাবে বিশিষ্ট জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে এ সম্পর্কে পাঁচকড়ি ঐতিহাসিক ও ভাষুকের দৃষ্টিতে আলোচনা করেছেন। ইংরেজ আমলে সমাজের উচ্চ নিম্ন স্তরের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান দেখা দিয়েছে, এমন ব্যবধান তাঁর মতে সত্যযুগে

৪। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়—পরিচয়।
৫। সাহিত্য সম্মিলন—রচনাবলী ২য় খণ্ড।
৬। স্মরণীয়—তাঁর বিখ্যাত 'আমরা' কবিতা বা "পদ্মার প্রতি"।
৭। বাঙ্গালার হৃদয়—রচনাবলী ২য় খণ্ড, ২২০ পৃষ্ঠা।

ছিলনা। এই ব্যবধান ইংরেজী শিক্ষার অভিঘাতে মত্ত বাবু সম্প্রদায়ের নিজেদের গড়া বস্তু।

বাঙালীর বৈশিষ্ট্যসন্ধানের প্রেরণায় পাঁচকড়ির দৃষ্টি বিশেষভাবে বাংলাদেশের তন্ত্রসাধনা ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের উপর পড়েছে। তিনি আবার শ্যাম ও শ্যামার সমন্বয় সম্পর্কে বিশেষভাবে সজাগ। প্রথমদিকে দশ মহাবিদ্যার রূপ প্রকট করে পূজার রীতি বাংলা দেশে প্রচলিত ছিল না, প্রচলিত ছিল মন্ত্রোপাসনা। এবিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত— "বরেন্দ্রীর জনসংঘাত রাঢ় বোধ হয় সর্ব্বাগ্রে ও সর্বপ্রথমে মাটির নির্ম্মিত সিংহবাহিনীর পূজা আরম্ভ করেন।[৮] পাঁচকড়ির ভাবুক মনের আলোকে দেহাত্মবোধ ও দেশাত্মবোধে একাকার হয়ে গেছে। তন্ত্রের দৃষ্টিতে "প্রত্যেক ভারতবাসীর দেহ সংক্ষেপে ভারতবর্ষ" তাঁর ব্যাখ্যাত এসব তত্ত্ব মনে রাখলে বঙ্কিম সাহিত্যের দেশাত্মবোধ যে য়ুরোপীয় patriotism এর আদর্শে কল্পিত সম্পূর্ণ নূতন কিছুনয় এই বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি। উত্তর ভারত থেকে বারবার বাংলা দেশে ব্রাহ্মণের চাষ করতে হয়েছে। তবু বাঙালীর বিদ্রোহী চেতনা স্থানীয় দ্রাবিড় মোঙ্গল ভাবকে আত্মসাৎ করে আর্যের আস্ফালনকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। এসব ঐতিহাসিক তথ্য বারবার পাঁচকড়ির রচনায় ঘুরে ফিরে এসেছে। তিনি যে সব অভ্রান্ত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, এগুলির মধ্যে শুধু একটি মজার তথ্য উল্লেখ করে তাঁর বাংলার ইতিহাস চিন্তা প্রসঙ্গে এখানেই ছেদ টানছি। এখন কলকাতার বড়বাজারে যে সব মাড়োয়ারী বা ভাটিয়া বণিক আছেন, ওঁদের পূর্বপুরুষও বাংলাদেশের মানুষ ছিলেন। এই দলকে বলা হোতো গৌড়ীশ্রেষ্ঠী। এঁরা তমলুক (প্রাচীন তাম্রলিপ্ত) বন্দরে বাণিজ্য করতেন। তাঁরা ছিলেন জৈন ধর্মাবলম্বী। তাঁরা বৌদ্ধ উপদ্রবের যুগে বাংলাদেশ ত্যাগ করে রাজপুতানা ও গুর্জ্জর দেশে চলে যান।

৮ উপাসনা ও সাধনা রচনাবলী ১ম খণ্ড।

প্রচলিত অর্থে পাঁচকড়ি ভাষাতাত্ত্বিক বা শব্দতাত্ত্বিক ছিলেন না। আসলে শব্দের আলোচনা একটি বিদ্যার বিষয় হতে পারে না। সামাজিক ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গেই অনেক শব্দের বা প্রবাদ প্রবচনের উৎপত্তির প্রতি তিনি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পাঁচকড়ি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। সংস্কৃতে তিনি সসম্মানে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। শব্দতত্ত্বের প্রতি তাঁর আগ্রহের পরিচয় পাই, রামেন্দ্রসুন্দর সম্পর্কিত আলোচনায়। তিনি সেখানে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন 'শব্দকথার' মত বই বাংলা সাহিত্যে নেই। ব্যাকরণ শাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত রামেন্দ্রসুন্দর অতি সোজা কথায় লিখেছেন।'

বাংলার সামাজিক ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি 'ধর্মঘট' শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। আজকের ধর্মঘটপ্রিয় দেশবাসীর কাছে এই আলোচনা বেশ হৃদয়গ্রাহী ঠেকবে। এই কাজটির মধ্যে লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধ ধর্মের স্মৃতি লুকিয়ে আছে। কোন একজনকে সমাজে একঘরে করতে হলে সেই বৌদ্ধ যুগে বিশেষ ব্যবস্থা করা হোতো। গ্রামের একটি প্রকাশ্য জায়গায় একটি ধর্মের ঘট স্থাপন করা হোতো। আর সেখানে বসতো একটি বিচার সভা। সেখানে আলোচনা হোতো জাতিগত বা ব্যক্তিগত অভিযোগের কথা। তারপর সেখানে চলত ধোঁট।· পাচকড়ি বলেছেন যে এই ধোঁট শব্দের অর্থ debate, discussion। বিষয়টাকে খুঁটে তার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করার থেকে বাংলা শব্দ হচ্ছে ধোঁট। এই ধোঁট শেষ হলে পুরোহিত ডেকে ধর্মরাজ অর্থাৎ বুদ্ধদেবের ঘট স্থাপন করা হোতো। এই ঘট স্থাপনের কাজ 'পণ্ডিত' 'উপাধিধারী ব্রাহ্মণেরাই করতেন। তারপর সেই ঘটে জল ঢেলে আমের পল্লব দাগিয়ে ঘটের গায়ে সিঁদুর তেল দিয়ে একটা চক্র আঁকা হোতো। আর তার নীচে যে জাতি বা গৃহস্থের বিরুদ্ধে ধর্মঘট বসানো হয়েছে তার

নাম লেখা হোত। এধরণের আরো কিছু অনুষ্ঠানের শেষে ঐ ঘট মাথায় করে অভিযোক্তার ঘর, দুয়ারে দুয়ারে গ্রাম-গুলিতে বেড়াতেন। এভাবে ঐ বিশেষ লোক বা জাতিকে একঘরে করা হয়েছে একথা চাকে কাঠি মেরে মেরে প্রচার করা হোতো। আর এ থেকেই বাংলায় প্রবাদে দাঁড়িয়েছে, "আর কি রক্ষে আছে, চাকে কাঠি পড়েছে।" এমন আর একটি ঘটনার উল্লেখ তিনি করেছেন। রামপুর হাটের কাছে ভদ্রপুরের মহারাজ নন্দকুমার একবার তাঁর বাড়ীর দুর্গাপূজার জন্যে বারুচরের চেলী কিনে এনেছিলেন। তাতে তাঁর গ্রামের তাঁতীরা খুব চটে যান। যাতে নন্দকুমারের কাছে পশ্চিমবাংলার কোন তাঁতী কাপড় না বেচে এজন্যে তারা ধর্মঘট নিয়ে উত্তর এবং দক্ষিণ রাঢ়ের সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়ে ছিলেন। অবশেষে মহারাজ নন্দকুমারকে একটি প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। আর সেই প্রায়শ্চিত্ত খুব হাঁকের ব্যাপার হয়েছিল। এই উপলক্ষে অনেক ধরণের ছড়া পাঁচালী লেখা হয়েছিল। এমন একটি ছড়ার উল্লেখও তিনি করেছেন—

"ভাদুরের নন্দকুমার,
লক্ষ বামুন করলে তুমার।
কেউ পেলে মাছের মুড়ো,
কেউ খেলে বন্দুকের গুড়ো॥"

বাংলার কুলজী সাহিত্য অনুসারে পাঁচকড়ি বলেছেন 'জাতি' শব্দের অর্থই বৃত্তি। আর 'জাতঃপাৎ' শব্দের অর্থ বৃত্তিচ্যুত হওয়া। অর্থাৎ যার যা জীবিকা তার সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করা। সমাজের দৃষ্টিতে যা কিছু অপরাধের তার জন্যে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। মহারাজ নন্দকুমারের এই ঘটনাটি আমরা উল্লেখ করেছি এজন্যেই যাতে সে যুগের সামাজিক সংগঠন ও প্রতিরোধ শক্তি আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। একটি বিশেষ অঞ্চলের শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে যে সমাজতান্ত্রিক চেতনা সে যুগে ফুটে উঠত তা এ যুগেও বিস্ময়কর।

'হাটে হাঁড়ি ভাঙার ইতিহাস' পাঁচকড়ি সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। দুই পাল একজন বিখ্যাত সহজিয়া সিদ্ধাচার্য ছিলেন। তাঁর নামে একটা হাঁড়িতে সিঁদুর মাখিয়ে দুইয়ের হাঁড়ি বলে স্থাপন করা হোতো। এই হাঁড়িতে একটি খাসি কেটে নাড়িভুঁড়ি ভরা হোতো। এই পদ্ধতিটি কুম্ভকার সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। অভিযোক্তা তার অভিযোগ বর্ণনা করার পর ঘোট বলত। সেখানে প্রায়ই লাম্পট্যের অভিযোগই করা হোতো। আর সেই লাম্পট্যের সঙ্গে জড়িত নারী ও পুরুষ দুইয়ের বিরুদ্ধেই হাঁড়ি বসানো হোতো। সেই নাড়িভুঁড়ি ভরা হাঁড়ি হাটের দিনে মাথায় করে একটা বড় হাটে আনা হোতো। হাট জমার পর হাটের মাঝখানে ঐ নারী ও পুরুষের নামে কুৎসা কীর্তন করে হাঁড়িটি আছাড় মেরে ভাঙা হোতো। এই হচ্ছে 'হাটে হাঁড়ি ভাঙা।' কারো নামে হাটে হাঁড়ি ভাঙালে তাকে তখন এক ঘরে, করা হোতো। সে তখন 'ঠেকো' হয়ে যেতো। এই উপলক্ষে একটা মজার প্রবচন তখনকার যুগে প্রচলিত ছিল। প্রবচনটি এই—

"কাটল হাটে হাঁড়ি,
ছড়াল কুচ্ছার ভুঁড়ি ও নাড়ী
ঘুর ঘুর ছোঁড়া ও ছুঁড়ী।"

পাঁচকড়ির ভাষাতাত্ত্বিক কৌতূহল বাংলা ভাষার প্রাচীন-তম রচনা চর্যাপদকে ঘিরেও প্রকাশিত হয়েছে। এই গান-গুলির আবিষ্কর্তা হরপ্রসাদশাস্ত্রী এদের ভাষার নাম দিয়েছিলেন সন্ধ্যাভাষা। আলো-আঁধারীর রহস্যময় অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে বলে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অনুমান করেছিলেন এ ভাষার নাম সন্ধ্যাভাষা। কিন্তু পাঁচকড়ি এ সম্পর্কে তাঁর নিজের একটি মত দিয়েছেন। ভাগলপুর জেলার দক্ষিণ পূর্বাংশ, সাঁওতালপরগণা এবং বীরভূমের পশ্চিমাংশ এই অঞ্চলকে সন্ধ্যাদেশ বলা হয়। আর্যাবর্ত এবং বাংলাদেশের সন্ধিস্থলে অবস্থিত বলে সন্ধ্যাদেশ নামটি হয়েছে। এই সন্ধ্যা

দশ থেকে এ অঞ্চলের ভাষাকে বলা হয় সন্ধ্যা ভাষা। আর এই ভাষার উপর ভিত্তি করেই চর্যাপদের সন্ধ্যা ভাষা গড়ে উঠেছিল। পাঁচকড়ি বলেছেন, হরপ্রসাদের সংগৃহীত দোহার ভাষা এখনও হারিয়ে যায়নি। আর এই সন্ধ্যাভাষার বাংলাদেশের আলোক পেয়ে চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পদাবলীর এই ভাষাই পরে খাঁটি বাংলার রূপ নিয়েছে। চর্যাপদ ও চণ্ডীদাসের বিশেষতঃ যে চণ্ডীদাসকে অনেকে সহজিয়া সাধনার সঙ্গে যুক্ত করে থাকেন ভাষার মধ্যে পাঁচকড়ি প্রদর্শিত এই যোগসূত্রটি সম্পর্কে ভাষা-তাত্ত্বিকেরা কি বলেন, একথা আমাদের জানা নেই। তবে বিষয়টি স্বভাবতঃই কৌতূহল জাগায়।

নাড় বা নাঢ় নামে একজন বিখ্যাত সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। রাঢ়পণ্ডিতের স্ত্রীকে বলা হোতো নাঢ়ী। তাঁদের সম্প্রদায়-ভুক্ত নরনারীদের প্রাচীন বাংলায় নাঢ়া ও নাঢ়ী বলা হোতো। এখন এই নাঢ়া ও নাঢ়ী বাংলা ভাষায় নেড়া নেড়ীর দলে পরিণত হয়েছে। আর এই বৌদ্ধরাই বৈষ্ণব হয়েছিলেন। তাদেই বৈষ্ণবদেরও এখন নেড়া নেড়ী বলা হয়। এই হচ্ছে পাঁচকড়ির মতে, নেড়া নেড়ী শব্দের উৎপত্তির ইতিহাস। সহজ তে তিনটি পন্থা আছে—অবধূতী, চণ্ডালী, ডোম্বী বা বাঙ্গালী বা বঙ্গালী। যাঁরা ডোম্বী বা বঙ্গালী পন্থা অবলম্বন করে সাধনা করতেন তাঁদের বাঙালী বলা হোতো। এ সঙ্গে পাঁচকড়ি ভুসুকের একটি গান উল্লেখ করেছেন—

আজি ভুসু বাঙ্গালী ভইলী
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী ॥*

'দেশবাসী' অর্থে বাঙালী শব্দটির ব্যবহার নিতান্ত অর্বাচীন। পাঁচকড়ি বলেছেন, বর্তমান অর্থে শব্দটির ব্যবহার মোগল পাঠানের যুদ্ধের পূর্বে পাওয়া যায় না। বাংলাদেশ বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। বাঙালীত্ববোধও যখনও এমন সুস্পষ্ট ছিল না। সিদ্ধাচার্যদের প্রভাবে ক্রমে ক্রমে বাঙালী একটা জাতিবিশেষ হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছিল। 'বর্তমান' নামটির মধ্যে কোন ধর্মের প্রভাব আছে একথা পাঁচকড়ির রচনা পড়ার আগে আমাদের জানা ছিল না। বসুকাণের (একজন বিখ্যাত গায়ক) 'কাণ' শব্দটি তিনি কিন্নর শব্দের অপভ্রংশ বলেছেন। বাংলা ভাষায় যে স্বাভাবিকভাবেই অনেক নেপালী, ভুটানী, বা তিব্বতী শব্দ একটু রূপান্তরিত হয়ে স্থান পেয়ে থাকতে পারে এই সম্পর্কে তিনি 'বাঙালীর জাতি পরিচয়' প্রবন্ধে ইঙ্গিত দিয়েছেন। পাঁচকড়ির মতে, 'কানু ছাড়া গীত নাই' এই প্রবচনের মূলে কৃষ্ণের কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে সিদ্ধাচার্য কানের কথা। কেননা এই কানুই প্রথম বাংলাদেশে কীর্তনের প্রবর্তন করেন। বাংলার সহজিয়া ও তান্ত্রিক প্রধানগণের মধ্যে যাঁরা ধর্মপ্রচারক ও ব্যাখ্যাতা থাকতেন, তাঁদেরই বলা হোতো সিদ্ধাচার্য। এই সিদ্ধাচার্যগণের দলবলকে আত্মসাৎ করেই শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠা। এই হচ্ছে পাঁচকড়ির মত। 'কালাপাহাড়ের কাট' ও 'বিরূপাক্ষের কাট' এই দুটী প্রবচনের মূলে লুক্কায়িত ইতিহাসের উপর তিনি আলোকপাত করেছেন। কালাপাহাড় বরেন্দ্রের ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইসলামধর্ম গ্রহণ করে তিনি হিন্দুর দেব মন্দির ও প্রতিমা চূর্ণ বিচূর্ণ করার মন দেন। এ ইতিহাস শুধু আমাদের কিছুটা জানা। কিন্তু বিরূপাক্ষ সম্পর্কে কিছুই জানা ছিল না। তিনি ছিলেন একজন সিদ্ধ তান্ত্রিক পুরুষ প্রবাদ আছে, যে বিগ্রহে দেবভাব না থাকত, বিরূপাক্ষ প্রণাম করলেই সেগুলি ফেটে যেত। কালাপাহাড় ও বিরূপাক্ষের নামের সঙ্গে জড়িয়ে এই দুটী প্রবচন লোকমুখে জন্ম নিয়েছিল।

---

* এই দুটি চরণের আধুনিক বাংলার এই রূপ দাঁড়ায়,
'রে ভুসুক আজি তুই হইলি বাঙালী।'
নিজ গৃহিণীকে করি লয়েছ চণ্ডালী।
—মনীন্দ্রমোহন বসুর ভাবানুবাদ, তাঁর সম্পাদিত 'চর্যাপদের' ৪৯ সংখ্যক পদ।

এসব গুরু গম্ভীর বিষয় আলোচনার ক্ষেত্রেই শুধু যে শব্দতাত্ত্বিক কৌতূহলের পরিচয় তিনি দিয়েছেন তাই নয়। বেশ রসালো ভাষায় সম্পর্কেও পাঁচকড়ির এ জাতীয় পরিচয় পাওয়া যায়। 'বহুরূপে সম্মুখে' এই উপদেশ পালন করে পাঁচকড়ির শব্দচিন্তার প্রসঙ্গটি শেষ করছি। আমাদের দেশে প্রচলিত আমগুলির নাম নিয়ে তিনি বেশ রসালো আলোচনা করেছেন। ফজলী নামে এক মুসলমান মহিলা গৌড়ের জঙ্গলের পাশে বাস করত। তার বাড়ীর উঠোনে একটি আমগাছ ছিল। এক ফকির সেখানে মাঝে মাঝে আসতো এবং তাকে এই মহিলা আম খেতে দিতো। র‍্যাভেন্‌শা নামে এক সাহেব এই ফজলীর বাড়ীতে অতিথি হন এবং তাকেও সে মহিলা ঐ গাছের একটি আম খেতে দেয়। তিনিই পরে ঐ আমের নাম রাখেন ফজলী। ল্যাংড়ার আদিস্থান হাজিপুরে। এক ল্যাংড়া ফকির ঐ আমগাছের তলায় বাস করত। সেই থেকেই এই আমের নাম হয়েছে ল্যাংড়া। কিষণ ভোগ আমের আগে নাম ছিল ছয়হঙ্গীয়া অর্থাৎ ছাপড়াঙ্গা জেলার আম। মিথিলার একজন ব্রাহ্মণ জমিদার কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুরের বাগানের আম প্রথম বাইরে রপ্তানী হওয়ায় ভাগলপুরেই এই আমের নাম হয় কিষণ ভোগ। কৃষ্ণপ্রসাদের কৃষ্ণ থেকে কিষণ ভোগ আমের কিষণ দাঁড়িয়েছে। এভাবে পাঁচকড়ি আমাদের সুপরিচিত আমের নামগুলির ইতিহাস আলোচনাকেও নগণ্য বিষয় বলে ভাবেন নি।

পাঁচকড়ি মূলতঃ ছিলেন সাংবাদিক। সাংবাদিকতা সূত্রে তিনি কয়েকটি সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এই কটি প্রবন্ধের উপর ভিত্তি করে আমরা তাঁর সাহিত্যাদর্শের পরিচয় সন্ধান করতে পারি। 'বঙ্কিম-চন্দ্রের নায়ী' নামক প্রবন্ধটি প্রথমেই মনে পড়ে। আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম এই তিনটি উপন্যাসের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এই প্রবন্ধে তিনি করেছেন। তা সত্ত্বেও পাঁচকড়ির নিজস্ব বুদ্ধি অতন্দ্র ছিল। গুরু ব্যাখ্যার আড়ালে তাঁর শিল্পবোধ হারিয়ে যায়নি। তিনি স্পষ্ট বলেছেন, আর্টের বিচারে এই তিনটি উপন্যাসের ত্রুটি আছে যদিও উপদেশের দিক থেকে এগুলি পূর্ণাঙ্গ এবং নির্দোষ। 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায়' প্রবন্ধটি বোধ হয় এ জাতীয় প্রবন্ধের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। জীবন চরিতের আলোকে সাহিত্য বিচারের যে নূতন রীতি বঙ্কিম তাঁর ঈশ্বর গুপ্ত ও দীনবন্ধু মিত্র বিষয়ক দুটি বিখ্যাত আলোচনার মধ্যে প্রবর্তন করেছিলেন, সেই রীতি অসাধারণ সাফল্যের সঙ্গে পাঁচকড়ি এই প্রবন্ধে অনুসরণ করেছেন। শিল্পবোধে উজ্জ্বল পাঁচকড়ির একটি মন্তব্যের দিকে চোখ ফেরানো যাক্, "সাহেবের মতন তিনি (অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রলাল) তাঁহার ব্যক্তিত্বকে কবিত্বের প্লাবনে ডুবাইতে পারেন নাই। তাঁহার বিশিষ্টতা সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট; তাঁহার কাব্যনাটকের দোষগুণ তাঁহার ব্যক্তিত্বের দোষগুণ হইতে বিস্তৃত।" 'পৌরাণিকী কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা জানতে পারি পাঁচকড়ি সাহেবের উপর একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। সেই প্রবন্ধ পড়ার সুযোগ আমাদের হয়নি। যাকে পাঁচকড়ি কবিত্বের প্লাবনে ব্যক্তিত্বকে ডোবানোর কথা বলেছেন, এ জিনিষেরই অন্য নাম সাহিত্যে শিল্পীর আত্মগোপন। আর এই আত্মগোপনের কথাই negative capability নাম দিয়ে কীটস্ বলেছিলেন। কীটস্ থেকে আরম্ভ করে টী. এস্. এলিয়ট পর্যন্ত অনেক সাহিত্যিকই এ জাতীয় কথা বলেছেন। তাঁর ভাষা ও রচনা রীতি সম্পর্কে পাঁচকড়ির আলোচনাও হৃদয় গ্রাহী। দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় climax ও antithesis এবং উৎপ্রেক্ষা ও মালোপমার সম্মিলনে তাঁর মতে এক অপূর্ব রস সঞ্চারিত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় আলঙ্কারিকরা যাকে পরুষভাব বলেছেন সেইভাব পাঁচকড়ি লক্ষ্য করেছেন। ভাষার পৌরুষ দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা দেহে সঞ্চারিত হয়েছিল। পাঁচকড়ির সাহিত্যালোচনায় একটি মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য পাই। হিন্দী কবি সুরদাস, শ্যামদাস, তুলসীদাস প্রভৃতির হিন্দী

দাবলী গীত ও মহাকাব্যগুলির প্রভাবে চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, কুন্দরামের কাব্য রচিত হয়েছিল।[১]

পাঁচকড়ির নিজের রচনারীতির আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে তাঁর সাহিত্য গুরু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণীয় তাঁর আলোচনাটি। ইন্দ্রনাথ বলতেন, ভাষার tone ও instinct অর্থাৎ ধাতু ও প্রকৃতি ঠিক বজায় না রাখলে কোন ভাষা টিকে থাকতে পারে না। আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলব, পাঁচকড়ি বাংলা ভাষার ধাতু ও প্রকৃতির সন্ধান পেয়েছিলেন। পাঁচকড়ির যুগে 'সবুজ পত্র' সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী চলতি বাংলার ধারাটি প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। এই ধারাটি বাংলা ভাষার নূতন নয়। আলালী ও হুতোমী ভাষায় এই চলতিরূপের প্রথম বিকাশ হয়েছিল। পরে রবীন্দ্রনাথের ঘরোয়া রচনা গুলিতে এবং তার চেয়েও বলিষ্ঠতর ভাবে বিবেকানন্দের গদ্য রচনায় এই চলতি বাংলা প্রথম শিল্পশ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। প্রমথ চৌধুরী প্রায় হারিয়ে যাওয়া এই ধারাটিতেই বান ডেকে নিয়ে এলেন। পাঁচকড়ি সবুজ পত্রবিরোধী 'নারায়ণ' পত্রিকার মাঝখাতে লেখক। এই চলতি বাংলার আন্দোলন সম্পর্কে তিনি কি ভেবেছিলেন তা আমাদের জানা নেই। সর্বনাম ও ক্রিয়া পদের চলতি রূপই যদি চলতি বাংলার একমাত্র লক্ষণ হয়, তাহলে বলা বাহুল্য পাঁচকড়ি এই রীতির লেখক নন। মুখের ভাষার সঙ্গে মুখের ভাষার পার্থক্য ঘুচিয়ে দেওয়াই যদি এই রীতির মূলকথা হয় তাহলে পাঁচকড়ি নিঃসন্দেহে এই নূতন রীতির লেখক। পাঁচকড়ি নব্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। তাছাড়া তাঁর ছিল বাংলা দেশের মাটির সঙ্গে যোগ। মানুষের মুখের ভাষা তিনি বই পড়ে শেখেন নি, কান পেতে শিখেছেন। তাই তাঁর রচনায় বাক্‌ প্রবচনের এমন ছড়াছড়ি। 'ভগবান রামকৃষ্ণ' সম্পর্কে তাঁর আলোচনায় তিনি বলছেন, রামকৃষ্ণ মাতৃভাবের পরিবাটি ভাঙিয়েছিলেন, তাতে মানবত্বার বীজ না দিলে ফসল ভাল হবে কেন! এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজের মন্তব্যটি কত সহজ ও সরল তাই লক্ষ্য করা যাক, তাই বিবেকানন্দের উপর "এই রোয়া বোঝার ভার পড়িয়াছিল।" তাঁর অনন্ত ভাষারীতির আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। লেখক আলোচনা করছেন, জার্মাণ জাতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে হেরে গিয়ে নীৎশের শক্তিবাদের ঘোর যদি কাটিয়ে উঠে তাহলে আস্তিকতার ভাব ফুটে উঠতে পারে। তারপর তিনি লিখছেন "কথায় আছে শিখেছ কোথায়? না ঠেকেছি—ঠকেছি যথায়! না ঠেকিলে, না ঠকিলে আস্তিক্য শিক্ষা যজ্ঞাগত হয় না পড়া পাখীর বোল ও শিক্ষা নহে।" গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যদের দার্শনিক চিন্তা পাঁচকড়ি অবলীলাক্রমে সাধারণ পাঠকের কাছে স্পষ্ট করে তুলেছেন। জীব ও ব্রহ্ম নিত্য পৃথক। এঁদের আর এক করার প্রয়োজন নেই। বৈষ্ণব দর্শনের এই মূল চিন্তা নিতান্ত সহজ সরল ভাষায় পাঁচকড়ি ব্যাখ্যা করেন। ব্রহ্ম ও জীব দুই বলেই জীবের পক্ষ থেকে ভক্তির কথা উঠছে। এক হয়ে গেলে ভক্তির কথা উঠে না। পাঁচকড়ি এ প্রসঙ্গে বলছেন, "চিনি হইব না, চাটিয়া চাটিয়া ভারাইয়া চিনি খাইব, আর আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিব।" এ প্রসঙ্গে আমাদের প্রথমেই মনে পড়ে সাধক কবি রামপ্রসাদের গানের সেই বিখ্যাত উক্তি,

নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল।
ওরে, চিনি হওয়া ভাল নয় (মন) চিনি খেতে ভালবাসি।

এমন সহজ ভাষায় গূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ লোকশিক্ষক রামকৃষ্ণই একমাত্র তাঁর কথামৃতে ব্যাখ্যা করতে পেরেছেন। এই ছিল এক যুগের প্রকাশভঙ্গী ও ভাষারীতি। আর এ রীতির মূল কথা রূপকের সাহায্যে সত্য প্রকাশ। আমরা রবীন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন' কবিতার প্রেমিকের মতোই 'সে ভাষা ভুলিয়া গেছি'। তাই সে ভাষা আজ আমাদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়। আর পাঁচকড়িকেও

১) দ্রষ্টব্য—নবীনচন্দ্র ও আঠীয় অনুধ্যান—১ম খণ্ড

মন্তব্য করতে হয়, 'বলিব কি লজ্জার কথা, পূর্বেকার ছাড়ী ভেদে যাহা বুঝিত, যে রসের রসিক ছিল, এখনকার রাষ্ট্রচাণী প্রেমচাঁদীরা তাহা বুঝে না, তেমন রসিক নহে।'[১০]

আমরা স্বীকার করি, পাঁচকড়ির রচনায় সাংবাদিক সুলভ ব্যস্ততা আছে, দর্শকাধারণকে বুঝানোর মত আশু প্রয়োজনের তাড়া আছে। আর সর্বোপরি ছিল তাঁর সাংবাদিক জীবনের বিচিত্র শ্রান্তি তাঁকে জীবনে স্থির হতে দেয়নি। শ্রান্তির কথা আমরা আর তুলছি না। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু এর বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।'[১১] এজন্যেই তাঁকে মন্তব্য করতে হয়েছে "তিনি অবলীলায় লিখবার সময়ে লীলাটুকুকে অবহেলা করেছেন অনেক সময়।" এই লীলার অভাববোধেই পাঁচকড়ির রচনায় অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদকে লক্ষ্য করতে হয়েছে ব্যঞ্জনার ক্ষমতার অভাব। তবু যে পাঁচকড়ির রচনায় কখনও কখনও শিল্পশ্রী ফুটেছে তার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যাক্। সেই অত্যন্ত 'গলদিসী মানুষটি'র মধ্যে যেমন নিঃসঙ্গতা ছিল, আবার ঠিক তেমনি ছিল কবি ভাবুকতা। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে বহু মানুষের নিঃসঙ্গতা বোধটিকে বলেছিলেন দ্বিতীয় চেতনার ফল। এই দ্বিতীয় চেতনাই সাংবাদিক পাঁচকড়িকে কখনও কবি পাঁচকড়িতে পরিণত করেছে। আর এই কবি পাঁচকড়ির উন্মোচিত হৃদয়ের বিচিত্র বর্ণাঢ্য দৃশ্য দেখতে দেখতে বার বার মনে পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে। গভীর দেশাত্মবোধ বঙ্কিমসাহিত্যে যে কিভাবে কাব্য রসে উত্তীর্ণ হয়েছে তা তো আমাদের জানা আছেই। 'মাটি নিবি গো' রচনায় যখন গৃহিণী মাটিওয়ালীর কাছ থেকে মাটি নিয়ে সেই মৃত্তিকার স্তূপকে প্রণাম করে বলে "মাটি তুমি সত্যই মা—টি" তখন মনে পড়ে 'বন্দেমাতরম' এর স্রষ্টা 'আমার দুর্গোৎসব' এর রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্রকে। এজন্যেই আমরা প্রবন্ধের ভূমিকায় বলেছিলাম পাঁচকড়ি বঙ্কিমের ভাবশিষ্য। মাটি ও মা—টি'র এই যমক অলঙ্কারের আড়ালে দেশের প্রতি ভক্তিতে প্রাবনত পাঁচকড়িকেই দেখতে পাই। 'রূপোল্লাস' রচনায় সাংবাদিক পাঁচকড়ি কাব্যের নিভৃত পথের নিঃসঙ্গ পথিক। "নব বসন্তের" সূচনার পূর্বেই ভিতরে ও বাহিরে কিসের ও কাহার ডঙ্কা বাজিয়াছে, কাহার কাড়া নাকাড়া পড়িয়াছে, তাই বৃক্ষচর্ম ভেদ করিয়া নব কিশলয় সকল নবানুরাগে লোহিতাভ হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে, কোকিলের রবে পক্ষের শব্দমদিরা কে যেন ঢালিয়া দিতেছে,—আমি নয়নময় হইয়া তোমার নতুন রূপ দেখিতেছি। তুমিও আমায় দেখিতেছ।" এই পরস্পরের রূপ দেখাদেখির ভাব নিবিড় চিত্র ও সঙ্গীত আমরা কত অজস্রবার বৈষ্ণব কবিতায় আর রবীন্দ্রনাথের গানে ও কবিতায় দেখেছি ও শুনেছি! বসন্তের এইরূপ বর্ণনা প্রায় পাঁচকড়ির ভাষায়ই রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পড়েছিলাম,

হে অনঙ্গ, তব ধনুর্ভূমি 'পরে
সুন্দর তার উৎসব করে,
দক্ষিণবায়ু মর্মর স্বরে
বাজায় কাড়া-নাকাড়া।—সহসা, বসন্ত

ফাল্গুনের শালায় বা 'নবীন' নাট্যরচনায় রবীন্দ্রনাথ বসন্তের যে-ভাব চিত্রটি অঙ্কন করেছিলেন সেই চিত্র পাঁচকড়ির শব্দ-তুলির স্পর্শে কিভাবে পাই, তা দেখা যাক্। "ঘোলপূর্ণিমা বাহিরের প্রাকৃত লীলার সহিত অন্তরের প্রাকৃত লীলার সমন্বয় সাধন। বাহিরে নূতন পাতা, নূতন লতা, যেন নবীনতার আভরণ বিধান আছে, নূতনত্বের দোলা টাঙ্গান আছে; সেই দোলায় পুরুষ ও প্রকৃতি দোহাগের দোল খাইয়া—একটু যেন স্পন্দিত হইয়া সৃষ্টির বিস্তার সাধন করিতেছেন।"[১২]

১০। কালীপ্রসন্নের যাত্রা, রচনাবলী ২য় খণ্ড, —৩৮২ পৃষ্ঠা।

১১। দেশ ১০ই আষাঢ় ১৩৭৩, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় শঙ্করীপ্রসাদ বসু।

১২। ঘোলপূর্ণিমা রচনাবলী ১ম খণ্ড।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এসব মিল দেখানোর উদ্দেশ্য একজনের উপর আর একজনের প্রভাব নির্ণয় নয়, পাঁচকড়ির কবি ভাবুকতার স্বরূপ নির্ণয়। তাঁর দুপাঠ্য রচনাবলীর মধ্যে অনেকগুলি রস রচনার সন্ধান পাই। এগুলির অবলম্বন তত্ত্ব, তথ্য বা তর্ক বিচার, বিশ্লেষণ নয়। এগুলি তাঁর মনোজীবনের নিভৃত চিত্র। তিনি যেসব পত্র পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সেগুলির নামকরণ বা উদ্দেশ্য কখনও কখনও এই রচনা গুলিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।[১৩] বাঙালী হিন্দু সমাজের কোন কোন উৎসব তাঁর ভাবলোককে আলোড়িত করেছে। 'আমার কথা' বা 'আমার সাধ' জাতীয় রচনায় বৈষ্ণব পদাবলীর বা শাক্ত সঙ্গীতের কোন কোন অংশ কমলাকান্তী রীতিতে ফিরে ফিরে এসেছে। যদিও তিনি 'দুইটিপান' নামক প্রবন্ধে বৈষ্ণব পদাবলীকে সাধনতত্ত্ব বর্জিত রূপে দেখতে আপত্তি জানিয়েছিলেন, তবু তাঁর নিজের রচনায়ই কমলাকান্তের এই রীতি অনুসৃত হতে দেখি। তাতে ক্ষতি হয়নি, বরং লাভই হয়েছে। এই দুটি রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের মত ভাব গভীরতার সন্ধান পাই। যেমন,—"আমার বন্ধুরা, আন বাড়ী যায়, আমারি আঙ্গিনা দিয়া।" এই গানটি থেকে স্বদেশী ঐতিহ্যত্যাগী ইংরেজী শিক্ষিতের দল যে কিভাবে বিদেশের ঘরে গিয়ে ভীড় জমাচ্ছে এই নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলছেন, "তুমি আমার পরিচয়কে উপেক্ষা করিয়া কোন্ সাহসে আজ ঘরে যাও? সে তো আমাকে মানেনা, আমার পরিচয় চাহে না, আমার ইতিহাসে তাহার শ্রদ্ধাবোধ নাই—তবুও তুমি তাহার কাছে যাও কেন?" এসব রচনায় অজস্র স্মৃতি ঘিরে থেকা দেশের মাটিকে ঘিরে ভক্ত পাঁচকড়ির আরতির সুরভির আঘ্রাণ আমরা পাই। নিছক পাণ্ডিত্যের বিচারে এ যুগের পণ্ডিতদের কাছে এই ভক্তি মূল্যহীন হতে পারে। কিন্তু পাঁচকড়ির যুগে মূল্যহীন ছিল না। তাই সে যুগে আমরা 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত কথা' লেখক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে পেয়েছিলাম, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-এর ভক্ত ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সেনকে পেয়েছিলাম—যাঁর শতবার্ষিকীও এ বছরেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পাঁচকড়ি গল্প লেখক বলেই এবং মূলতঃ সংবাদিক বলেই সহজবোধ্য, বুদ্ধির ভাষায় তাঁকে তাঁর মনের কথা বলতে হয়েছে। তবু যে তাঁর রচনায় ব্যক্তিত্বের অনন্য চিহ্ন, ব্যাখ্যাতার আড়ালে লুক্কায়িত অনুভূতি প্রবণ কবি মানুষটির স্পর্শ নেই এমন কথা আমরা বলতে পারি না। তাঁর ইতিহাস, ভাস্কর্য, ধর্ম ও বাঙালীর উৎসব সম্পর্কে আলোচনাও সৃষ্টির স্বাক্ষরে উজ্জ্বল।

পাঁচকড়ির মনের সঙ্গে পরিচয় লাভের জন্য কয়েকটি মূলকথা প্রথমে জানা চাই। তাঁর দেশাত্মবোধ Nationalism এর উপর ইংরেজীতে লেখা বই থেকে তাঁর মনে জন্মায়নি। বরং এভাবে যারা Nationalism এর মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন তাঁদের প্রতি তিনি বারবার কটাক্ষ করেছেন। দেশের মাটিতে ফিরে গভীর আবেগ থেকেই এদেশের আপামর জনসাধারণের প্রতি নিবিড় ভালোবাসার প্রেরণাই তাঁর মনে জন্মেছিল দেশাত্মবোধ। এই দেশাত্মবোধের মধ্যে কোন ফাঁকি ছিল না। কেন না তিনি ভাবের ঘরে চুরি করতে জানতেন না। রক্ষণশীলতার স্পর্শ থেকেও তিনি মুক্ত ছিলেন। ঐ যে কেদারনাথ বেড়াতে গিয়ে এক বাঙালী যুবতীকে তিনি দেখেছিলেন এক পশ্চিমা সাধুর সঙ্গে। ঐ বাঙালী যুবতীর ষোল বছর বয়সে আশি বছরের এক বুড়োর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার ফলে অকালে বিধবা হতে হয়। আর অবশেষে সে জীবন বিচিত্র ঘাটে ঠেকতে ঠেকতে কেদারনাথে এই রূপ নিয়েছে। এই প্রসঙ্গে পাঁচকড়ির বলিষ্ঠ মন্তব্যটি শ্রদ্ধাভরে স্মরণীয়—"বাসনা নিবৃত্তির বক্তৃতা দেওয়া সহজ, কিন্তু কার্যতঃ পারা বড় কঠিন। ঠাকুরবাবার

১৩। যেমন পৌরাণিকী কথা (১ম খণ্ড)র নারায়ণতত্ত্ব, নববর্ষ (১ম খণ্ড), প্রবাহিণী (২য় খণ্ড) নায়কের তর্পণ (২য় খণ্ড)।

আমলের শাসন বর্তমান যুগে চলে না।"[১৪] নব্য আর্যামির নামে যাবতীয় কুসংস্কারকে দেশাত্ম বোধের ছদ্মবেশে আঁকড়ে রাখার একটা প্রবণতা সে যুগে দেখা দিয়েছিল। পাঁচকড়িকে কেউ কেউ সেই নব্য আর্য্যামি ভাবের পরিপোষক বলতে পারেন। তিনি নিজেকে স্পষ্ট ভাষায় ব্রাহ্ম-বিরোধী রূপে ঘোষণা করেছেন। তার অর্থ এই নয় যে, তিনি নব্য হিন্দুয়ানী দলের যাবতীয় গোঁড়ামির সমর্থক। তাঁর সমাজচিন্তা উদার ও উন্মুক্ত। সমাজ শক্তিকে তিনি সব সময় শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। আত্মশক্তিতে নিষ্ঠাবান একটি সমাজের কল্পনা তাঁর মনে জেগেছে। যে সমাজ গ্রামের পুকুরগুলির জল পানীয় অবস্থায় রাখে, অন্যায়ের প্রতিবিধান করে, চিরকালের উৎসব, মেলা এগুলির শ্রীবৃদ্ধি করে সেই সমাজ তাঁর কাছে অভিনন্দন যোগ্য। আর যে সমাজ ইংরেজী শিক্ষার ফলে দ্বিধা বিভক্ত, মেরুদণ্ডহীন, 'কাপুরুষ বাবুতে ভরা, নিজের দেশের ইতিহাস ও সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাহীন সেই সমাজকে ব্যঙ্গ করতে তিনি কসুর করেন নি। রবীন্দ্রনাথ ও পাঁচকড়ির সমাজচিন্তায় বিশেষ পার্থক্য নেই। রবীন্দ্রনাথের সমাজ-চিন্তা বিষয়ক অজস্র প্রবন্ধের মধ্যে শুধুমাত্র 'স্বদেশী সমাজ' রচনাটির কথা মনে করলেই আমাদের এই বক্তব্য বোধ হয় সমর্থন পেতে পারে।

পাঁচকড়ি নীরস বিদ্যার সাধক ছিলেন না। তাঁর গবেষক মনটির সঙ্গে মিশে ছিল ভাবুক ও প্রেমিক মন। 'বঙ্গের ভাস্কর্য' নামক প্রবন্ধে রাজশাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির যাদুঘরে রক্ষিত প্রাচীন ভাস্কর্যকলার যে বিস্তৃত আলোচনা তিনি করেছেন তার মধ্যে ঐ ভাবুক পাঁচকড়িকে পাই। গরুড় বাহন বিষ্ণুর মূর্তি বা অর্ধ নারীশ্বর মূর্তি ব্যাখ্যায় সেই ভাবুকতার পেলব স্পর্শ আছে। বাঙালী হিন্দুর প্রধান প্রধান উৎসব যেমন দুর্গাপূজা, সরস্বতী পূজা, শিবরাত্রি, দোল পূর্ণিমা, মহালয়া এই সবগুলির তাৎপর্য আলোচনায় তিনি অভিন্ন মনের পরিচয় দিয়েছেন। 'শিবরাত্রি' নামে সুন্দর রচনায় তাঁর অন্তর্দৃষ্টি কবিত্বাত্মকতায় জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। পুরোহিত নেই, গুরু নেই, মন্ত্র নেই, শুধুমাত্র পুরুষের ভক্তি ও শ্রদ্ধাই যে শিবপূজার অবলম্বন সেই দেবতা শিবের গণতান্ত্রিক স্বরূপ তাঁর আলোচনায় ব্যাখ্যাত হয়েছে। মৃত্যুর দেবতা শিবকে দিয়ে তিনি বলিয়েছিলেন, "আমি সর্ববর্ণের সমন্বয়ে রজতগিরিবৎ, কিন্তু যেখানে অজ্ঞেয়তার আধার, সেই খানেই আমি নীললোহিত।"[১৫] এই সূত্র উপলব্ধিই কবির ভাষায় কিভাবে রূপ লাভ করেছে তা মুগ্ধ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করা যাক,—

> মৃত্যুর বরণ নীল – শুনেছিনু কবে সে কোথায়।
> যমুনার জল, না সে প্রাবৃটের নবঘন শ্যাম?
> অথবা গরলজ্যোতি হরকণ্ঠে নয়নাভিরাম?
> উমার কপোল শোভী সে কী নীল অলকের প্রায়?
> 'হেমন্ত গোধূলি'—উপমা, মোহিতলাল বন্ধুবরার।

বসন্ত কালেই শিবরাত্রির পবিত্র অনুষ্ঠান। এই বসন্ত নব নব সৃষ্টি প্রাচুর্যের ঋতু অর্থাৎ জন্মের ঋতু। তাই মৃত্যুর ইঙ্গিত আছে এই ঋতুতে। "দিনের বেলায় মদনমোহনের লীলা, নিশাকাল মদনমথনের মহাদেবের লীলা। একদিকে বিকাশ, অন্যদিকে সঙ্কোচ।" এ বচনের উক্তি শুধু পণ্ডিতের শুষ্ক উক্তি নয়, রসিকের রসসিক্ত উক্তি। সূর্যের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে গতি যথাক্রমে উত্তরায়ণ (মাঘ থেকে আষাঢ়) ও দক্ষিণায়ন (শ্রাবণ থেকে পৌষ) নামে পরিচিত। এই উত্তরায়ণ হচ্ছে জাগরণের কাল, আর দক্ষিণায়ন নিদ্রার কাল। এই জাগরণ ও নিদ্রা আর কিছুই নয়। উত্তরায়ণের সময় আমাদের দেশের প্রকৃতির পত্র ভাবল ফুলে ফলে উজ্জ্বল রূপ। দক্ষিণায়নের সময় বিশ্বপ্রকৃতিতে সৃষ্টির নিঃশব্দ প্রস্তুতি চলে। তাই উত্তরায়ণে যেন প্রকৃতি জেগে ওঠে, আর দক্ষিণায়নে ঘুমিয়ে পড়ে। ঋতু আবর্তনের এই সত্যটির

(১৪) কেদারনাথ রচনাবলী ২য়খণ্ড।

(১৫) শিবরাত্রি।

আলোকে পাঁচকড়ি বাঙালী হিন্দু সমাজের অনেক ধর্মীয় উৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় দুর্লভ নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। মহালয়ার পিতৃতর্পণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাঁর মূল্যবান মন্তব্য স্মরণ করি—"দেবনিদ্রার কালে পাছে মানুষ ঘুমাইয়া পড়ে, আত্মহারা হইয়া বিহ্বলভাব ধারণ করে, তাই পিতৃপক্ষে তর্পণ।"[১৬] তাঁর কাছে এই তর্পণের যুগোপযোগী ব্যাখ্যা শুনি—"তর্পণ জাতীয়তার প্রথম সোপান, সৌভ্রাত্রের বেদী।.....তর্পণ জাতিসংহতির ও বিশ্বসংহতির মূলমন্ত্র—মহাবাক্য, মহাসাধনা।"[১৭] নিজেদের বর্তমান জীবনে পিতৃতর্পণের মধ্যে আছে পূর্বপুরুষের অতীত ঐতিহ্য বহনের বিনম্র চেষ্টা।

বোধ ও বুদ্ধির গগনস্পর্শী আভিজাত্যবোধে বেদ ও উপনিষদের পরবর্তী হিন্দুচিন্তাকে নগণ্য প্রমাণ করার আপ্রাণ চেষ্টার বিরুদ্ধে পাঁচকড়ি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। এইজন্যই তিনি তন্ত্র ও ভক্তিশাস্ত্রের প্রতি এমনভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন। গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্মের সাধনা সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য নয়। তাই তন্ত্র ও ভক্তিশাস্ত্র নির্দিষ্ট অন্য পথানুসরণই তাঁর কাছে শ্রেয় মনে হয়েছে। আমাদের মনে হয় এই শ্রেয় মনে হওয়ার মূলে আছে, পাঁচকড়ির গণতান্ত্রিক মন। এমন বোধ ও বুদ্ধির আভিজাত্যে গুহাহিত সত্যের মধ্যে আশ্রয় সন্ধান করে না। বরং তাঁর এমন আচরণ সম্ভব যেন ধর্মের সন্ধান করে। যে ভক্তিশাস্ত্র বলে, "তোমাকে ছাড়িতে কিছু বলি না, কোন কঠোর কাজ করিতে বলি না, তবে তোমার যাহা, তাহা তোমার নহে, শ্রীকৃষ্ণের।"[১৮] সেই ভক্তিশাস্ত্র পাঁচকড়ির হৃদয়কে শান্ত করে। তাই পাঁচকড়িকে ভক্তি-ব্যাকুল চিত্তে এভাবে বলতে শুনি, "বাহ্যাবরণটিকে! আমার আমিত্বের ক্ষুদ্রতা ঘুচাইয়া দাও, আমার সর্বস্ব আমাতেই লীন করিয়া দাও তাই আমার মাতৃপূজা সকাম পূজা।"[১৯] নিষ্কাম কর্মসাধনার নামে ভাবের ঘরে চুরির চেয়ে এই সকাম পূজার মূল্য তাঁর কাছে বেশি।

পুরাণের আপাত দৃষ্টিতে যে গালগল্পের ছড়াছড়ি, তার মধ্যে পাঁচকড়ি গভীর সত্যসন্ধানের চেষ্টা করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, বেদসম্মত পুরাণে লোকশিক্ষার যে বিরাট আয়োজন হয়েছিল, তার তুলনা বিরল। "পঞ্চকন্যা" নামক প্রবন্ধে শয্যাত্যাগের পূর্বে অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা, মন্দোদরীর নাম নেওয়ার সার্থকতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যেও যে ভক্তির ফলে দৈবভাব জাগতে পারে, সেই অমর বিশ্বাসের পরিচয় তুলে ধরেছেন। "আমি প্রাতঃকালে, শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে স্মরণ করিব কাহাকে? যে আমারই মত স্বেচ্ছাবশে পাপসংলিপ্ত হইয়া আবার সেই স্বেচ্ছাবশে পাপসাগর হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছে।"[২০] এই পঞ্চকন্যার পাপমুক্তির কাহিনী বা সুজন, কসাই, বিল্বমঙ্গল জগাই, মাধাই প্রভৃতির জীবন কথা তাঁকে আশান্বিত করে। অসাধারণত্বের আলোক সাধারণ জীবনকেও উজ্জ্বল করে তুলতে পারে। পাঁচকড়ির এ বিশ্বাসের কথা মনে রেখেই তাঁর গণতান্ত্রিক চেতনার কথা বলেছিলাম। অসহযোগ আর সত্যাগ্রহের আদর্শদীপ্ত দিনগুলির অগ্নিস্বাক্ষরবাহী রচনা গুলিতে পাঁচকড়ির এই গণতান্ত্রিক মনেরই পরিচয় আছে। 'গুরুদেব' রচনায় যৌবনকে যে জয়ধ্বনি জানিয়েছেন, তা আমাদের মনে করিয়ে দেয় 'বলাকা' আর 'ফাল্গুনী'র কবি রবীন্দ্রনাথকে বা বিদ্রোহী কবি নজরুলকে।

দেশবিভাগ আর স্বাধীনতার মর্মন্তুদ মূল্যবোধের ফলে যে যুগে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অস্তিত্ব মানচিত্র থেকে লুপ্ত প্রায়, যে যুগে বাঙালী নামে একটি জাতি দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে যাওয়ার ফলে অভিন্ন পরিচয়ের সুবর্ণ সূত্রটি হারিয়েছে, সেই মর্মান্তিক বেদনার ক্লান্ত ইতিহাসের নিষ্ঠুর প্রহরে দাঁড়িয়ে অশ্রুসজল প্রণাম জানাই বঙ্গোপলব্ধির বলিষ্ঠ ব্যাখ্যাতা পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর জন্ম শতবার্ষিকীতে।

(১৬) মহালয়া—রচনাবলী ২য় খণ্ড।
(১৭) মহালয়া—রচনাবলী ২য় খণ্ড।
(১৮) উপাসনা তত্ত্ব—রচনাবলী ১ম খণ্ড।
(১৯) মাতৃপূজা—১ম খণ্ড।
২০। পঞ্চকন্যা—রচনাবলী ২য় খণ্ড।

দান্তে

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

[বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলীর ১৩৪৭ ও ১৩৫৮র যে সংকলন আমরা দেখেছি তাতে 'দান্তে' প্রসঙ্গে এই বৃহৎ রচনাটি সংকলিত হয়নি। 'দান্তে' পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বৃহৎ রচনা, তৎসত্ত্বেও তাঁর রচনাবলীতে এটি কেন স্থান পেলনা দুর্বোধ্য ও বিস্ময়কর।

১৯৬৫ সালে 'দান্তে'র ৭০০ তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। বাংলা দেশে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এ প্রসঙ্গে প্রবন্ধাদিও প্রকাশিত হয়েছে। এমন কি একটি পত্রিকা 'দান্তে' প্রসঙ্গে বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশ করেছেন। তবু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দান্তে' উপেক্ষিতই রয়ে গেল। অদূর ভবিষ্যতে এই রচনাটি হারিয়ে যাবার আশঙ্কায় আমরা পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এবং 'দান্তে'র জন্মসপ্তমী স্মরণ করে এটি প্রকাশ করছি। ভঃ পঃ]

জীবনকথা

ইতালীর মহাকবি দান্তে ১২৬৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ফ্লোরেন্স নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশের বংশধর ছিলেন; তেমন অর্থস্বচ্ছলতা না থাকাতে, ব্যবসায়-প্রধান ফ্লোরেন্সনগরে দান্তের পূর্ব্ব পুরুষগণ বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন নাই। তবে দান্তের পূর্ব্বপুরুষগণ অর্থাভাব হেতু বংশমর্য্যাদায় কখনও হীন হন নাই। দান্তে (Dante) পুরাতন ইতালীয় দুরান্তে (Durante) শব্দের অপভ্রংশ। দুরান্তেগণ পুরাতন টস্কান (Tuscan) জাতির একটি প্রসিদ্ধ বংশের নাম। কাজেই বলিতে হয় যে, দান্তের দেহে টস্কান-শোণিত প্রবাহিত হইত। দান্তের পিতা আলিঘিয়েরী (Alighieri)* একজন Notary বা ব্যবহার শাস্ত্রের লেখক ছিলেন। তাঁহার জননীর নাম বেলা Bella)। ইঁহাদের আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল ছিলনা; তবে নিতান্ত 'হা-ঘরে হা-ভাতে' ছিলেন না। ফ্লোরেন্স নগরে তাঁদের নিজের বসতবাটী ছিল, নগরের বাহিরে সামান্য একটু ভূসম্পত্তি বা তালুক ছিল।

১২৭৪ খৃঃ অব্দে যখন দান্তের কেবল নয় বৎসর বয়স, তখন তিনি বিয়াত্রিস (Beatrice) নাম্নী এক বালিকার দর্শন লাভ করেন। বালিকার বয়সও নয় বৎসর। নয় বৎসরের বালক-বালিকার মধ্যে প্রেম সঞ্চার হইয়াছিল। এ প্রেম-কাহিনী ইতালীর সাহিত্যে অপূর্ব্ব হইয়া রহিয়াছে। বালিকা বিয়াত্রিস এ প্রেমের প্রতিদান করিয়াছিলেন কিনা, জানি না, উভয়ের মধ্যে যে বিবাহ হয় নাই, ইহা ঠিক। কিন্তু দান্তের যখন আঠারো বৎসর বয়স, তখন তিনি এই প্রেম অবলম্বনে যে অদ্ভুত গীতিকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা ইতালীয় ভাষায় অপূর্ব্ব ও অনুপম হইয়া আছে। এই কাব্যগ্রন্থের নাম ভাইটা

* Alighieri Dante.

য়োভা, (Vita Nuova) অথবা নব-জীবন। নবম বর্ষে নি নবম বর্ষীয়া বালিকার অপরূপ রূপ-দর্শনে মুগ্ধ হন। সে াহে হইতে তাঁহার নবজীবনের সঞ্চার হয়। সে নব-জীবনের বিচিত্র ভাইটা য়োভা কাব্য গ্রন্থে পরিস্ফুট। এই প্রেম-ন্তে নব-জীবন সম্বন্ধেও বলা যায়, 'কাম-গন্ধ নাহি তায়'।

"For him Love and Beatrice are one thing ly, he feels her approach as that of a eity. In her bearing there is ever something ivine—she is no human creature, but yet in he poet's heart ever a Woman.

দান্তের দৃষ্টিতে প্রেম ও বিয়াট্রিস্ একই ছিল। বিয়াট্রিস্ প্রেমময়ী, প্রেমের প্রতিমাস্বরূপা ছিলেন। তিনি দান্তের াছে আসিলে মনে হইত, কোনও স্বর্গের দেবী বুঝি াসিতেছেন। তাঁহার মূর্ত্তিখানি যেন দৈব ভাব মাখান—তিনি যেন পার্থিব জীব নহেন। পরন্তু স্বর্গীয়া হইলেও ানীভাব মণ্ডিতা হইলেও, কবির হৃদয়ে বিয়াট্রিস্ নারী লিয়াই পরিচিতা ছিলেন। নারী বটে, পরন্তু দেবী; ৰপার্থিব ভাব মণ্ডিতা, স্নেহ সুখ-দুঃখের অতীতা দেবী। সে দেবীর দর্শনে সুখ, স্মরণে সুখ, বিরহে সুখ, মিলনে সুখ;—স রূপে দেবী মূর্ত্তিখানি কেবল হৃদয়পটে লুকাইয়া াখিতে হয়। হৃদয়ে যেমন প্রতিমা লুকান থাকিলে মায়ার বিকাশ হয়। পবিত্রতার সঞ্চার হয়, স্বার্থের বংস হয়। ভাইটা য়োভা গীতিকাব্যে প্রেমের এই চিত্রই উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত আছে। অনেকের ধারণা ছিল যে, বিয়াট্রিস একটা কল্পনার প্রতিমা মাত্র; সত্য সত্য বিয়াট্রিস নামে কোনও রমণী ছিল না, নবম বর্ষে বালক-বালিকার দেখাও হয় নাই। কিন্তু বোকাশিও (Boccaccio) বলিয়াছেন যে, বিয়াট্রিস সত্যই এক অনিন্দ্যসুন্দরী নারী ছিলেন; সাইমন-ডি-বার্ডি (Simone dei-Bardi) নামক এ সম্ভ্রান্ত যুবকের সহিত বিয়াট্রিসের বিবাহ হয়, এবং ১২৯০ খৃঃ অব্দে চব্বিশ বৎসর বয়সে বিয়াট্রিসের মৃত্যু হয়।

দান্তে যে বাল্যকালে সুশিক্ষা পাইয়া ছিলেন, এমন কোনও প্রমাণ তাঁহার চরিতকথা হইতে পাওয়া যায় না। সে সময়ে সুশিক্ষিত বলিলে লাটিন ও গ্রীক ভাষায় সুশিক্ষিতকেই বুঝাইত। দান্তে কখনই লাটিন ও গ্রীক ভাষায় সুপণ্ডিত হইতে পারেন নাই। তবে তিনি প্রৌঢ় বয়সে মোটামুটি ভাবে লাটিন ভাষায় অভিভাষণাদি লিখিতে পারিতেন। দান্তে দেশীয় ইতালীয় ভাষায় সুকবি ও সুলেখক হইবার জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি ইতালীয় ভাষাকে কাব্যের ও সাহিত্যের ভাষায় উন্নত করিবার চেষ্টায় একরূপ প্রাণপাত করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ইতালীয় ভাষায় তিনিই প্রধান ও প্রথম মহাকবি। তাঁহার তুল্য মহাকবি ইউরোপেও বিরল। হোমর ও ভার্জিলের পরই দান্তের নাম করিতে হয়; দান্তের পর মিল্টন। দান্তে সঙ্গীত বিদ্যায় পটু না হইলেও, সঙ্গীতের মাধুরী বুঝিতেন, এবং নিজেও গান করিতে পারিতেন। পটুয়ার বিদ্যাও তিনি সামান্য একটু শিখিয়া ছিলেন; প্রিয়জনের মুখাকৃতি পত্রে অঙ্কিত করিয়া তিনি অনেকের প্রতিমাকে স্মৃতিপটে সজীব রাখিয়া গিয়াছেন। বিয়াট্রিসের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দান্তে কেবল প্রেমের কবিতাই লিখিতেন, ধর্ম্মতত্ত্বের ও দর্শন শাস্ত্রের কোন চর্চ্চাই করেন নাই। বিয়াট্রিসের মৃত্যু হইলে তিনি শোকে মুহ্যমান হইয়া ছিলেন; এক বৎসর কাল সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ করিয়া কেবল শোকগাথাই রচনা করিতেন। এ সময়ে তাঁহার চরিত্রগত অবনতিও কতকটা ঘটিয়াছিল। তিনি নিজেই একথা তাঁহার মহাকাব্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

"The things of the present with their false pleasure turned my steps aside as soon as your face was hidden" – Purgatory XXXI, 34.

অর্থাৎ, যখন তোমার মুখখানি মৃত্যুর আবরণে আবৃত

হইল, তখন হইতে কিছুকাল আমি সংসারের বর্ত্তমান সুখে মজিয়া তোমা হইতে কতকটা দূরে যাইয়া পড়িয়া ছিলাম।

দান্তে কেবল কাব্য রসেই মুগ্ধ থাকিতেন না। তিনি ১২৮৯ খৃঃ অব্দে কম্পোলডিনোর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। এই যুদ্ধে ফ্লোরেন্স-নগরবাসীরা আরেট্সোর বিশপকে (Bishop of Arezzo) পরাজিত করেন। তিনি পরে কাপোনার (Capona) দুর্গের অবরোধ ব্যাপারেও লিপ্ত ছিলেন। ইহা হইতেই বুঝাযাইতেছে যে, দান্তে সমর বিদ্যায় যোগ্যতা লাভ করিয়াছিলেন। দান্তে একজন বীর ও তেজস্বী যোদ্ধা ছিলেন। ১২৯৮ খৃঃ অব্দে দান্তে বিবাহ করেন। তাঁহার পত্নীর নাম জেম্মা (Gemma); ইনি মানেত্তো দোনাতির (Manetto Donate) কন্যা ছিলেন। দোনাতি বংশ ফ্লোরেন্সের অভিজাতবর্গের মধ্যে এক প্রবল, সম্ভ্রান্ত ও অশেষ পদমর্য্যাদাসম্পন্ন বংশ ছিল। এই বিবাহের ফলে সামাজিক হিসাবে দান্তের পদোন্নতি ঘটিয়াছিল; তিনি ফ্লোরেন্সের শাসকসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন। রাজনীতির কুটিল আবর্ত্তে এই হেতু তাঁহাকে পড়িতে হইয়াছিল। এই বিবাহের ফলে দান্তের পিয়েত্রো ও জাকোপো (Pietro and Jacopo) নামে দুই পুত্র, এবং বিয়াট্রিস্ ও এণ্টোনিয়া (Antonia) নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। বিয়াট্রিস্ পরে সন্ন্যাসিনী বা Nun হইয়া রাভেনার কনভেণ্টে বাস করিয়াছিলেন। এণ্টোনিয়ার অন্য কোনও পরিচয় কেহ জানে না।

এইবার দান্তের রাজনীতিক জীবনের একটু পরিচয় দিব। যদিও বিবাহ করিয়া দান্তে ফ্লোরেন্সের অভিজাতবর্গ-ভুক্ত হইয়াছিলেন, তথাপি সে সময়ে ফ্লোরেন্সে পুরাতন বনীয়াদী ঘরের প্রাধান্য ছিল না। ব্যবসায়ী ও শিল্পী-সঙ্ঘ সকলের প্রতিনিধিগণ নগর শাসন করিতেন। ছয়জন প্রতিনিধি বা Prior নগর শাসনের ভার লইয়াছিলেন। দান্তে চিকিৎসক সঙ্ঘের সভ্য হইয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, দান্তে চিকিৎসা-শাস্ত্র জানিতেন। ১৩০০ খৃঃ অব্দে দান্তে একজন প্রতিনিধি বা প্রায়ার হইয়াছিলেন। পরে তিনি বিচারকের পদও প্রাপ্ত হন।

প্রজাতন্ত্রমূলক শাসনে দলাদলি থাকিবেই। দান্তে ফ্লোরেন্সের শাসকসম্প্রদায় ভুক্ত হইবার পর এই দলাদলির আবর্ত্তে পড়িয়াছিলেন। ফ্লোরেন্স-রাজনীতির দুই দল ছিল, —the Whites and Blacks, শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের দল। দান্তে শ্বেতাঙ্গ দল-ভুক্ত ছিলেন। ১৩০১ খৃঃ অব্দে শ্বেতাঙ্গ-দল পরাজিত হন; কৃষ্ণাঙ্গের দল নগরের শাসকভার প্রাপ্ত হন। ইহার ফলে ১৩২০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে দান্তে ফ্লোরেন্স নগর হইতে নির্ব্বাসিত হন। অভিযোগ এই ছিল যে, দান্তের দল সাধারণের অর্থের অপব্যবহার করিয়াছিলেন। সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়; ইহাছাড়া ইহাদিগকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হয়। ঐ বৎসরের ১০ই মার্চ তারিখে দান্তের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আজ্ঞা প্রচারিত হয়। এই আজ্ঞা অনুসারে দান্তে ও আরও চৌদ্দ জনকে ভীষণ দণ্ডে দণ্ডিত করিবারও ভয় প্রদর্শিত হয়। ইঁহারা যদি ফ্লোরেন্সে ফিরিয়া আসেন ও ইঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া জীবন্তে পোড়াইবার আদেশ হয়। কেন না, ইঁহারা এক হিসাবে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করিয়াছিলেন। অতএব দান্তেকে এই সময়ে ফ্লোরেন্স হইতে নির্ব্বাসিত হইতে হইল। ইহাই তাঁহার চির নির্ব্বাসন। তিনি ইহারপরে আর নিজ জন্মভূমি দর্শন করিতে যান নাই। খৃষ্টাব্দ ১৩০২-১৩১০ পর্য্যন্ত দান্তে ইতালীর নানা নগরে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। বোধহয়, তিনি একবার ফরাসী দেশে প্যারিস্ নাগরী দেখিতে গিয়াছিলেন। এই নির্ব্বাসন জন্য দান্তের রাজনীতিক জীবনে একটা পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়া গেল। তিনি রাজনীতি ছাড়িয়া সাহিত্যচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিলেন — কাব্য-রচনায় আত্মহারা হইয়া ছিলেন। তিনি সম্রাটের পক্ষ সমর্থন করিয়া কয়েকখানি পত্র ফ্লোরেন্সবাসীদের লিখিয়া পাঠান। ইহা লাটিন ভাষায় লিখিত হয়। এই পত্র লেখার জন্য ১৩১১

খৃষ্টাব্দে যখন নির্ব্বাসিতগণের ক্ষমাদেশ রহিত হয়, তখন দান্তে সে ক্ষমার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন নাই। ১৩১৫ খৃষ্টাব্দে দান্তেকে ফ্লোরেন্সে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা হয়। দান্তে ক্ষতীস্বীকার ও ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায়, এ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। বরং উল্টা ফল ফলিয়াছিল। ঐ বৎসরের ৬ই নভেম্বর তারিখে ফ্লোরেন্সের শাসক সম্প্রদায় আদেশ প্রচার করেন যে, দান্তে ও তাঁহার পুত্রগণকে রানীয়ারীর (Ranieri) দল ধরিতে পারিলে, পিতা ও পুত্রদের শিরশ্ছেদ করিতে পারিবে।

১৩২১ খৃষ্টাব্দে ভিনিস্ ও রাভেনা নগরের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়। দান্তে রাভেনার পক্ষ অবলম্বন করিয়া দূত-রূপে ভিনিসে গমন করেন। এই যাত্রাই তাঁহার শেষ যাত্রা। পথে তাঁহার জ্বর হয়; সেই জ্বরেই তাঁহার দেহত্যাগ ঘটে। তবে আসন্নকাল রাভেনায় তিনি জীবিতাবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিয়াছিলেন। ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে (১৩২১) তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহাই দান্তের জীবন-কথা। সেই বিপ্লব-বিরোধের কালে দান্তে একাধারে গীতি-কবি, প্রেমিক, বীর, যোদ্ধা, রাজনীতিক, শাসক, বিচারক, মহাকাব্য-রচয়িতা, ভাবুক ও ধার্ম্মিক ছিলেন। দেখিতে তিনি মধ্যাকৃতি, বলিষ্ঠ রুক্ষ ছিলেন, চুল কাল, রং লালচে—মুখ শেতাভ নহে, মুখখানি গম্ভীর, নয়নে স্থির দীপ্তি। প্রৌঢ়ে নির্ব্বাসনের নানা ব্যথা সহিয়া তিনি একটু মুহ্যমান ভাব ধারণ করিয়াছিলেন।

গীতিকাব্য ও ভাষা

দান্তে প্রথম জীবনে গীতিকাব্য-রচয়িতা হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিলেন, লাটিন ভাষার প্রাণ নাই; দেশের লোকসাধারণ লাটিনের পঠন-পাঠন ভুলিয়া গিয়াছে; অনেকেই লাটিন বুঝে না। যাহারা বুঝে, তাহারা কেবল শব্দের মার-প্যাঁচে ভুলিয়া বিব্রত। কাজেই তিনি লাটিনে কাব্যরচনার অভিলাষ ত্যাগ করিলেন। এই সময়ে ইতালীর জন কয়েক কবি ফরাসী ত্রুবাদূর (Troubadours) বা গায়কদিগের অনুকরণে প্রভেন্সাল-ফরাসী (Provencal) ভাষায় কবিতা রচনা করিতেছিলেন। রাজপুতানার চারণ কবিগণ যে ভাবে গান রচনা করিয়া গান করিতেন, ত্রুবাদূরগণও কতকটা সেই ভাবে গান রচনা করিতেন। প্রথমে উঁহারা প্রেম ও সমরবিজয়বিষয়িণী গাথা রচনা করিতেন এবং গান করিয়া বেড়াইতেন; শেষে কেবল প্রেমের কবি হইয়া পড়িলেন। ইহাদেরই অনুকরণে গীডো গিনি চেলি (Guido Guinicelli) এবং সর্দ্দেলো (Sardello) প্রভৃতি ইতালীয় কবিগণ গীতিকবিতা রচনা করিতেন। দান্তে এ পথও অবলম্বন করিলেন না। তিনি স্বীয় মাতৃভাষাকে কাব্যের ভাষায় উন্নীত করিবার চেষ্টা করিলেন। সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। সিসিলির ও উম্বানীর প্রাদেশিক ইতালীয় ভাষাকে মিশাইয়া মিশাইয়া তিনি এক অভিনব ইতালীয় ভাষা রচনা করিয়াছিলেন। এই ভাষা সৃষ্টির কাণ্ডটা De Vulgari Eloquentia নামক পুস্তকে তিনি সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে তিনি the science of the vernacular—প্রাদেশিক ভাষার তত্ত্বকথার আলোচনা করিয়াছেন, কবি নিজের ভাষা নিজে ছানিয়া বাছিয়া লইলেন; সে ভাষা ইতালীবাসিমাত্রেরই বোধগম্য হইয়াছিল। পরে সেই ভাষা মহাকাব্যের উপযোগী হইয়াছিল, এবং ইতালীকে ইউরোপ-ধন্য করিয়াছিল।

অথচ গোড়ায় তাঁহার কবিতার বিষয় প্রেমই ছিল। কেন না, তিনি ত্রুবাদূরদের অনুকরণে গীতিকাব্য রচনা আরম্ভ করেন। দান্তে স্পষ্টই বলিয়াছেন "song can-scarce be of any worth unless the song proceed from the heart, nor can song proceed from the heart unless pure and sincere love be there" প্রাণের কথা না হইলে গান হয় না, সে প্রাণ প্রেমে সঞ্জীবিত না হইলে গানও প্রাণ হইতে বাহির হয় না। এ

প্রেম কেমন? অশরীরী, বা নিরবয়ব প্রেম: যে প্রেম নারীর প্রতি প্রযোজ্য, এবং ভগবানের প্রতিও প্রযোজ্য হয় ইহা সেই প্রেম। এই প্রেমের গাথা সর্বাগ্রে ভাইটা সুরোভা বা নবজীবন নামক পদ্যগ্রন্থে ফুটিয়া উঠে। নয় বৎসরের বালিকা বিয়াট্রিসকে দেখিয়া এই প্রেমের প্রথম স্ফুরণ। ইহাতে আকাঙ্খা আছে, পরন্তু তৃপ্তির লালসা নাই। নূতন ভাষা, নবীন ছন্দ, নূতনভাব—তাই দান্তের গীতিকবিতা New Style বা নবপদ্ধতির কবিতা বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল।

ভাইটা সুরোভা বা নবজীবন গীতিকাব্যের পরই দান্তে Odes বা গীতাঞ্জলি নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতিকবিতার বহুধা রচনা করেন। এই গীতাঞ্জলির প্রেম ঠিক অশরীরী নহে। ইহাতে দেহ আছে, দেহের রূপ আছে, অতৃপ্ত বাসনা আছে, বাসনা পূর্ণ করিবার অদম্য আকাঙ্খা আছে। কিন্তু এই গীতাঞ্জলিরও একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইয়াছিল। যাহা হউক, দান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিয়া ভাষাকে নিজের মনের মতন করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার ছন্দেরও একটু বিশিষ্টতা ছিল। সে ছন্দ দেশপ্রচলিত ছন্দ নহে, কতকটা তাঁহার মনগড়া ছন্দ। এই ছন্দ তাঁহার ভাবার সহিত বেশ খাপ্ খাইয়াছিল। লোকে বুঝিয়াছিল যে, দান্তের কবিতা দেশের লোকের হৃদয়কে আকর্ষণ করিবে, সমাজের নিম্নস্তর পর্য্যন্ত নূতন ভাবে আলোড়িত করিয়া দিবে।

দান্তের রাজনীতি

দান্তের মহাকাব্যের প্রকৃত পরিচয় পাইবার পূর্বে তাঁহার রাজনীতি বিষয়ক মতামতের একটু আলোচনা করিবার প্রয়োজন হইবে। কেননা, তাঁহার রাজনীতি ও সমাজনীতি বিষয়ক সিদ্ধান্ত সকল তাঁহার মহাকাব্যে স্থান পাইয়াছে; অনেক ক্ষেত্রে ছন্দের আকারে তিনি এই সকল সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা তাঁহার মহাকাব্য সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

দান্তে এরিষ্টটলের [(Aristotle) মতের পোষকতা করিতেন। এরিষ্টটল বলেন,—মানুষ যখন পরিবারিক জীব, একাকী স্বতন্ত্র ও নির্ম্বভাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, তখন কি সমাজনীতি, কি রাজনীতি কোন বিষয়ের চর্চা করিতে হইলে, মানুষকে সমাজ-সমষ্টির বাষ্টিরূপেই গ্রাহ্য করিতে হইবে। দান্তে বলিয়াছেন—"No man is able to attain felicity by himself without the aid of many, in asmuch as he needs many things which no one is able to provide alone." অর্থাৎ কোনও মনুষ্যই একাকী অন্যের সহায়তা ব্যতিরেকে সুখলাভ করিতে পারে না; কেন না, তাহার সুখের উপাদান ও অনুপান বহু; সে বহু উপাদান ও অনুপান একটা লোকে সরবরাহ করিতে পারে না। ডি মোনার্কিয়া (De Monarchia) বা রাজতন্ত্রীয় পুস্তকে দান্তে স্বীয় রাজনীতিক মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইউরোপীয় সাহিত্যে ইহা একখানি উচ্চাঙ্গের রাজনীতির পুস্তক। ইহাতে দান্তের প্রথম জিজ্ঞাসা এই—সমবায়ে মানব-সভ্যতার ইপ্সিত কি? অর্থাৎ এই যে নানা দেশের নানা জাতি সভা হইতেছে, বিদ্যার চর্চা করিতেছে, জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্মেষ সাধন করিতেছে; এমন কেন করিতেছে? কোন আশায় মুগ্ধ হইয়া সভ্যতার জন্য মানুষ পাগল হইয়াছে?

উত্তরে দান্তে বলিতেছেন—

"It is the realising or actualising of the whole potentiality of the human intellect i, e of the intellect of humanity as a whole, or in other words, the bringing about of that condition of things in which the intellect of all the individuals in the world would be working together in the most effective manner possible."

অর্থাৎ, মানব-মনীষার কূটস্থ শক্তির উদ্বোধন বা বিকাশ

সাধনই হইল মানবসভ্যতার উদ্দেশ্য। মানুষের মনীষা কুণ্ঠিত থাকে; কখন যে কোন ভাবে কোন জাতির মনীষা বিকাশ পায়, তাহা বলা যায় না। আজ যে অসভ্য, কাল সে সভ্য, আজ যে মূর্খ, কাল সে পণ্ডিত। কান্ট বলেন যে, জাতি হিসাবে, বিরোধী ভাবে বা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আধারে মানব-মনীষার কুণ্ঠিত শক্তির (Potentiality) বিকাশ হইলে চলিবে না। সর্ব্বসাকল্যে ও সর্ব্বসামঞ্জস্যে মানব জাতির মনীষার সম্যক বিকাশ ঘটাইতে হইবে। অর্থাৎ, যেদিনীমণ্ডলের সামাজিক বা প্রাকৃতিক অবস্থা এমন ঘটাইতে হইবে, যাহার প্রভাবে প্রত্যেক নরনারীর মনীষার বিকাশ সমভাবে ও সম্যকভাবে হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যের সিদ্ধিপক্ষে সার্ব্বলৌকিক শান্তির (Universal Peace) প্রয়োজন। পৃথিবীর কোনও স্থানে যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইলেই বুঝিতে হইবে, মানব-মনীষা কুণ্ঠিত হইয়াছে, এবং মানব-হৃদয়ে রিপুর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। রিপুর ও আসক্তির অভিবৃদ্ধি মনীষার সঙ্কোচ ঘটায়। মনীষার বিকাশেই সামঞ্জস্য ঘটে; সামঞ্জস্যই মনুষ্য-সভ্যতা। এই সার্ব্বজাতিক শান্তিরাজ্যের জন্য কান্ট একজন পৃথ্বীনাথের কল্পনা করিয়াছেন। তিনি সমগ্র পৃথিবীর মহারাজ-চক্রবর্ত্তী হইবেন; তাঁহার আর জিগীষা থাকিবে না। তিনি শান্ত দান্ত, সমাহিত পুরুষ হইবেন; তিনি ভগবানের অনুরূপ হইবেন —'মহতী দেবতা যেন নরূপেণ তিষ্ঠতি।' ইনি সকলকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখিবেন, সমদর্শী ও সাম্যবাদী হইবেন। এই যে সম্রাজ শক্তির বিকাশ হইবে, ইহা কেমন হইবে? কান্টের মতে—"Imperialism does not mean the supremacy of one nation over others, but the existence of a supreme law that can hold all national passions in check" সম্রাজ শক্তির বিকাশের অর্থ তাহা নহে, যাহার প্রভাবে এক জাতি অন্য জাতির উপর প্রাধান্য করিতে পারে; পরন্তু উহা এমন একটা জগদ্ব্যাপী বিধির প্রাবল্য, যাহার প্রভাবে জাতিগত রিপু ও আসক্তির তীব্র তাড়নাকে সংযত ও সংহত করিয়া রাখিতে পারা যায়। এই বিধির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে জগৎ-সম্রাটকে প্রেমময় হইতে হইবে। কেন না, প্রেমই স্বাধীনতার আধার; রিপু ও আসক্তি পরাধীনতার মূলমন্ত্র। স্বাধীনতা কাহাকে বলি? কান্ট বলিয়াছেন—"A man is free when his will is in absolute equilibrim, not in the slightest degree weighed down by passion or desire, but free to act in accordance with the judgement of his reason," অর্থাৎ সেই মনুষ্যই স্বাধীন, যাহার ইচ্ছাশক্তি পূর্ণসামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে; যাহার ইচ্ছাশক্তি রিপু বা আসক্তি দ্বারা অবনমিত নহে, পরন্তু মনীষার দ্বারা সুবিচারিত পন্থায় স্বাধীন ভাবে কার্য করিতে পারে। যাহার ইচ্ছাশক্তি মনীষার দ্বারা শাসিত, সাধুপথে পরিচালিত, সেই পুরুষই স্বাধীন। এখন বিজ্ঞান-বিচার কাহাকে বলিব? Judgement কি ও কেমন?

উত্তরে কান্ট বলেন —

"Judgement is the link between apprehension and appetite."

অর্থাৎ, বিচার, আকাঙ্ক্ষা ও বোধের মধ্যগত সূত্রধর বা বন্ধনী মাত্র। বোধ বা জ্ঞান সংহরণের নামান্তর মাত্র; আকাঙ্ক্ষা উদ্দাম প্রকৃতির। আকাঙ্ক্ষা বা আসক্তি জ্ঞানের অপেক্ষা রাখেন; জ্ঞান বা বোধ আকাঙ্ক্ষাকে উদ্দাম হইতে দেয় না। যে পদ্ধতিতে বোধ আসক্তিকে সংযতরূপে সে পদ্ধতির নাম বিচার। মানুষের সুবিচারিত চেষ্টাই স্বাধীনতা। এই চেষ্টা যখন ভাগবতী ইচ্ছার অনুগত হয়, তখনই মানুষ পূর্ণ স্বাধীন হয়। শাসনেই স্বাধীনতার বিকাশ হয় উচ্ছৃঙ্খলতা স্বাধীনতা নহে—অতিতীব্র পরাধীনতা, মানুষ

ভগবানের প্রতিনিধিস্বরূপ এক সার্ব্বভৌম সম্রাটের শাসনাধীন থাকিলে, মানব-মনীষার সম্যক উন্মেষ হয়, মানুষ স্বাধীন হইতে পারে।

ইহার পরই দান্তে এই সূত্রের বিস্তার করিয়াছেন :—

"Everything which is good is so in virtue of consisting unity, and consequently that the human race is best disposed when it is most one, that is when it is concordant."

অর্থাৎ, যাহা সৎ পদার্থ, তাহা স্বীয় স্বভাবগত সমতা ও একতার জন্যই সৎ। অর্থাৎ, যাহা অব্যভিচারী ও অ-বিরোধী ভাবে প্রকট, তাহাই সৎ। সুতরাং মনুষ্য জাতি তখনই সুখে অবস্থান করে, যখন সকল জাতির মধ্যে অব্যভিচারী ভাব—সামঞ্জস্যের ভাব প্রকট হয়। এইখানেই দান্তে সাম্যবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দান্তের সাম্যবাদ আর কিছুই নহে, কেবল এক ও অদ্বিতীয় ইচ্ছাশক্তির অধীনে মানবজাতির ইচ্ছার সমন্বয়-ভাব। যেমন আপ্তবাক্যে বা অপৌরুষেয় শাস্ত্র-বচনে ভগবানের ইচ্ছার অভিব্যঞ্জনা ঘটে, এবং সেই আপ্তবাক্য জাতি বিশেষের ইচ্ছাশক্তিকে সংযত ও শাসনে রাখে, তেমনই সাংসারিক ব্যাপারে এক সম্রাটের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সমগ্র জগতের অধিবাসিবৃন্দের ব্যক্তিগত ইচ্ছাশক্তি যখন প্রণালীবদ্ধ বা সংযত হইবে, তখনই সাম্য ফুটিয়া উঠিবে। আসক্তি ও আকাঙ্ক্ষার প্রাবল্য ঘটিলেই বৈষম্য উৎপন্ন হয়, যে ক্ষেত্রে এইআসক্তি ও আকাঙ্ক্ষা বিধিপদ্ধতির দ্বারা শাসিত, সেইখানেই বৈষম্য দূর হয়; সাম্যের বিকাশ হয়। ধর্ম্মে ও বিধিতে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে দান্তে সার্ব্বভৌম পুরোহিত বা পোপের কল্পনা করিয়াছেন।

ডি মনোর্কিয়া পুস্তকের মূল উদ্দেশ্য মানবজাতির মধ্যে সমন্বয়-সাধন, নির্ব্বিরোধিতার প্রতিষ্ঠা, জ্ঞানের প্রসার-বিস্তার। জগতের এই সম্ভাবিত অথচ কাল্পনিক চিত্রটি অঙ্কিত করিয়া স্বীয় সিদ্ধান্ত সকল বিশদভাবে লিখিয়া দিয়া, তবে দান্তে মহাকাব্য-রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন;

মহাকাব্য—The Divine Comedy

এইবার যাহার জন্য দান্তে ইউরোপের অতুল্য কবি বলিয়া পরিচিত, যাহার রচনা করিয়া তিনি ইতালীয় ভাষাকে গ্রীক লাটিনের সমাদর দিয়াছিলেন, সেই মহাকাব্যের আলোচনা করিব। এই মহাকাব্য তিন অংশে বিভক্ত, তিন পর্য্যায়ে খণ্ডিত। প্রথম পর্য্যায়ের নাম The Inferno অথবা নরকের বার্ত্তা; দ্বিতীয় পর্য্যায়ের নাম The Purgatorio বা পাপক্ষয় ভূমির বার্ত্তা; তৃতীয় পর্য্যায়ের নাম The Paradiso অর্থাৎ স্বর্গভোগের বার্ত্তা। এক হিসাবে প্রত্যেক পর্য্যায়েই মহাকাব্যের গুণোপেত। ভাষায়, ভাবে, বিষয়-বিন্যাসে উহারা প্রত্যেকেই অপরাজেয় অতুল্য। পণ্ডিতেরা বলেন যে ইন্‌ফর্ণো ১৩১৪ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। পর্গেটোরিও ১৩১৯ খৃঃ অব্দে এবং প্যারাডিসো ১৩১৬ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। প্রথম ২৩ ও শেষ খণ্ড লেখা শেষ করিয়া তবে তিনি মধ্য খণ্ড লেখেন। লেখার কারিকরী হিসাবে পর্গেটোরিও শ্রেষ্ঠ। দান্তে তাঁহার মহাকাব্যকে কমেডী (Comedy) বলিলেন কেন? কমেডী শব্দটা দুইটি লাটিন শব্দের সমাসে ঘটিয়াছে। Comus অর্থে গ্রাম, Oda অর্থে গীত; গ্রাম্যগীতকে কমেডী বলিত। দান্তের মহাকাব্য গ্রাম্যভাষায়, সাধারণ ইতালীয় ভাষায় লিখিত; তাই উহা কমেডী। যদি উহাকে মিলনাত্মক ভাবে ধর, তাহা হইলে উহা মিলনাত্মক কাব্য বটেইতো। প্রথমে নরক, পরে পাপভোগ ও পাপক্ষয়, শেষে স্বর্গে দেব-মানবের মিলন। মিলনাত্মক নহে কি? দান্তের বিশ্বাস যে, মানুষ যত বড় পাপী হউক না কেন তাহার উদ্ধার আছেই; সে কালে ভগবৎ সান্নিধ্য লাভ করিবেই। এই কথাটা ইউরোপকে বুঝাইবার জন্যই তিনি তাঁহার মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

Providence has set two ends before man to be aimed at by him; the blessedness of this life, which consists in the exercise of his proper power and is represented by the earthly paradise; and the blessedness of eternal life which consits in the fruition of the sight of God, to which his proper power cannot ascend unless assisted by the divine light.

অর্থাৎ, বিধাতা মানুষের সম্মুখে দুইটি উদ্দেশ্য বা সাধ্য বিষয় স্থির রাখিয়াছেন; প্রথম—এই জীবনের ভোগ্য আনন্দ সুখ, যে আনন্দ বা সুখের জন্য মানুষ স্বীয় ক্ষমতার বিধি অনুগত ভাবে প্রয়োগ করিয়া একটা পার্থিব স্বর্গের বা আনন্দ-ধামের সৃষ্টি করিতে পারে। ইহা মানুষের সাধ্য, পুরুষকার প্রয়োগে প্রাপ্য। দ্বিতীয়—অনন্ত জীবনের অনন্ত সুখ; যাহা ভগবদ্দর্শন ব্যতীত লভ্য নহে, যাহা লাভ করিতে হইলে কেবল মানুষের পুরুষকারে কুলায় না, ভগবানের অশেষ কৃপায় ভাগবতী জ্যোতির প্রভাবে মানুষ এই মুক্তি অবস্থা লাভ করিতে পারে। এই তত্ত্বটুকু বুঝাইবার জন্যই দান্তের মহাকাব্য রচনা। দান্তে খৃষ্টান; তিনি জন্মান্তরবাদ মানিতেন না; কর্মের দ্বারা কর্মফল ভোগ তিনি বুঝিতেন না; তাই তাঁহাকে প্রথমে নরকের বর্ণনা দিতে হইয়াছে। এ নরকের অধিবাসী দিগের মধ্যে পাপ বোধ নাই; সুতরাং পশ্চাত্তাপ নাই, অনুশোচনা নাই। আছে কেবল একটা উৎকট যন্ত্রণাদায়ক অবস্থায় জীব-আত্মার অবস্থান। নরকে থাকিয়াও জীবাত্মা অহঙ্কার শূন্য নহেন। এই নরক ভোগের পর যাহাদের অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছে তাহারা পর্গেটরী (Purgatory) বা পাপক্ষয় করিবার স্থানে উপস্থিত হয়। পর্গেটরী প্রায়শ্চিত্তের স্থান, পশ্চাত্তাপ ও অনুশোচনার স্থান। এই খানে পাপক্ষয় হয়, জীবাত্মার কর্মফল মালিন্য বিধৌত হইয়া যায়। শেষে স্বর্গারোহণ; এই স্বর্গে জীবাত্মা ভগবানের সালোক্য ও সামীপ্য লাভ করিয়া মুক্ত হয়। খৃষ্টান শাস্ত্রে সাযুজ্য ও সারূপ্য মুক্তি নাই। জীবাত্মা যখন দেহী বা অবয়ব বিশিষ্ট, তখনও দেহের ভিতরে থাকিয়া তাহাকে এই তিন অবস্থা অতিক্রম করিতে হয়। দেহেই নরকভোগ হয়। প্রায়শ্চিত্ত হয়, স্বর্গবাসও হয়। আবার বিদেহ আত্মাকেও এই ভাবেই তিন অবস্থার মধ্য দিয়া মুক্তি লাভ করিতে হয়। স্বয়ং কবি এই মহাকাব্যের নায়ক। তিনি নরক ভোগ করিতেছেন; নরকের কত আত্মার সহিত কথোপকথন চালাইতেছেন; তিনিই আবার প্রায়শ্চিত্তের আগারে যাইয়া পাপক্ষয় করিতেছেন; সে স্থানের আত্মাদের সহিত পাপ-পুণ্যের আলোচনা করিতেছেন; শেষে তিনিই শুভ্রধৌত, তণ্ডুলকণার মত অমল-ধবল-রূপে স্বর্গারোহণ করিতেছেন। তাঁহার কাব্যে তাঁহাকে দুই রূপে আমরা দেখিতে পাই—

Sometimes he signifies the ideal Christian rescuing himself from the shipwreck that sin has made of his life and toiling in God's appointed way to the two goals of temporal and eternal felicity; sometime, he is the actual Dante, the Florentine of the fourteenth century, the man who in his own person has been through the experience he is describing.

অর্থাৎ কখনও বা তিনি আদর্শ খৃষ্টান; নিয়তির বিধান অনুসারে, বিষয়ী জীবনের এবং আধ্যাত্মিক জীবনের দুই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য ব্যস্ত, এবং দেহজ লোভে ও পাপে যে তাঁহার জীবনকে নির্দ্দিষ্টপন্থা হইতে বিভ্রান্ত করিয়া দিয়াছে, তাহা সামলাইতে ব্যস্ত; আবার কখনও বা তিনি দেহী দান্তের মতন—চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ফ্লোরেন্সবাসী দান্তের

বর্ণন—নিজের ভূয়োদর্শনজাত সকল অভিজ্ঞতার বর্ণনা করিতেছেন। এই মহাকাব্যের মধ্যে দান্তে এমন ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, ভগবানের দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট হইয়াই তিনি যেন কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। লেখা আছে, যেন তিনি "as the consecrated Herald of His will to man" যেন ভগবানের কার্য্যে উৎসর্গীকৃতভূত স্বরূপে ভাস্বরতী ইচ্ছা মানুষকে জ্ঞাপন করিতেছেন।

গল্পের ভঙ্গিটা এই। দান্তে যেন তাঁহার জীবনের পঞ্চত্রিংশ বৎসর বয়সে আবার একটা ভীষণ পথহীন বনময়ো পথ হারাইলেন। এই বনই সেই সমসাময়িক (১৩০০ খৃঃ অঃ) ইউরোপ। তখন অষ্ট্রিয়ার এলবার্ট সম্রাট; তিনি সম্রাটের কর্ত্তব্যপালনে উদাসীন, অযোগ্য, লোভী, বিলাসী সম্রাট। আর অষ্টম বনিফেস্ (Boniface VIII) পোপ, বা ধর্ম্মকার্য্যের পুরোহিত। ইনিও অযোগ্য, বিলাসী ও লম্পট ছিলেন। যাঁহারা দুই জন জীবকে সৎপথ দেখাইবেন, তাঁহারাই অযোগ্য; তাই সংসার মহাবন· পথভ্রষ্ট, গহন, ভীষণ, বিজন অরণ্য। সেই অরণ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে দান্তে সম্মুখে এক সুন্দর পর্ব্বত দেখিলেন। এই পর্ব্বতের শিখর দেশ অরুণোদয়ের সমুজ্জ্বল। সাধুতার সূর্য্যের প্রথম অংশুমালায় গিরিরাজ কনককান্তি ধারণ করিয়াছিল। দান্তে এই পর্ব্বতে আরোহণ করিতে চেষ্টা করিলেন। এই পর্ব্বতেই তাঁহার কাল্পনিক পার্থিব স্বর্গ। দান্তে পর্ব্বতের মূলদেশে উপস্থিত হইয়া আরোহণের চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময়ে, তিনটি ভীষণ হিংস্রক জন্তু তাঁহাকে আক্রমণ করিল। প্রথমটি চিতাবাঘ (Leopard) অর্থাৎ সহজ কাম; দ্বিতীয়টি হিংসাচ্ছ শার্দ্দূল রূপে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তৃতীয়টি এক ভীমকায় সিংহ—অহঙ্কারের মূর্ত্তির স্বরূপ হইয়া অপর পার্শ্ব হইতে আক্রমণ করিল। তিনি ইহাদের আক্রমণ অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতেছেন এমন সময়ে এক ক্ষুধার্ত্ত নেকড়ে বাঘ (wolf) তাঁহাকে কামড়াইয়া ধরিল। লোভই এই নেকড়ে বাঘ। উহার দংশন সহ্য করিতে না পারিয়া দান্তে গিরিপথ হইতে গড়াইয়া পড়িলেন। অর্থাৎ, কাম, ক্রোধ ও লোভ, এই তিন রিপুই স্বর্গারোহণের প্রধান অন্তরায়। লোভের দংশনজ্বালায় দান্তে যখন অধীর হইয়াছেন, তখন মহাকবি ভর্জ্জিলের (Virgil) প্রেতাত্মা আসিয়া দেখা দিলেন। ইনিই দান্তেকে জ্ঞানোপদেশ দিলেন, দান্তের দিব্যচক্ষু হইল; তিনি সচেষ্টায় উদ্ধারের নূতন পথ খুঁজিতে লাগিলেন। এই অন্বেষণে তাঁহার নরক দর্শন হয়; পরে প্রায়শ্চিত্ত আগার (Purgatory) দেখেন; ইহারই শেষ ধারে দান্তে বিয়াট্রিসকে দেখিতে পান। তাঁহার বিশুদ্ধ প্রেম, তাঁহার স্বার্থহীন জীবন, তাঁহার পবিত্রতা ও স্নিগ্ধতা দান্তেকে যেন হেলায় স্বর্গরাজ্যে লইয়া গেল। অর্থাৎ, দান্তে এই মহাকাব্যে এই সিদ্ধান্তেরই প্রতিষ্ঠা করিলেন যে, পুরুষকারের সাহায্যে মনুষ্য নরকযন্ত্রণা ও প্রায়শ্চিত্তের যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। পরন্তু অহেতুক প্রেম না হইলে স্বর্গারোহণ সম্ভবপর নহে। তাই বালিকারূপে বিয়াট্রিস্ আসিয়া তাঁহাকে স্বচ্ছন্দ স্বর্গে লইয়া গেল। এই ভাবগত বর্ণনাতেই মহাকাব্যখানি পূর্ণ। উহার যেমন অনুলনীয় ভাষা, তেমনই অনুপম ভাব। বাইবেলের স্বর্গ-নরক তত্ত্ব অপূর্ব্ব পদ্ধতি অনুসারে ব্যাখ্যাত।

দান্তের নরক—is the representation of the state of impenitence—অনুশোচনাশূন্য পাপোদ্ধত অবস্থাকে বুঝায়। যতক্ষণ অনুশোচনা নাই, ততক্ষণ পাপের প্রাবল্য সমভাবেই থাকিবে; ততক্ষণ আত্মার প্রায়শ্চিত্ত নাই; ততক্ষণ পাপের গতি অবিরাম ভাবে চলিবে। নরকে পাপ নিত্য বিদ্যমান; যখন পাপজ কর্ম্মের জন্য অনুশোচনা হয় তখনই প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়। এই প্রায়শ্চিত্ত Purgatory. The object of the purgatorial discipline is to restore to the penitent the freedom of his will which has been enslaved by sin. প্রায়শ্চিত্ত-

ও কঠোর শাসন পদ্ধতির উদ্দেশ্যই এই যে, উহার প্রভাবে তাহাপরক্ষ পাপাক্ত মানব-আত্মার পুনর্বারে ইচ্ছাশক্তির বা ও বুদ্ধির স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে। পাপচিত্তের ক্ষমতা নষ্ট হয়; এই স্বচ্ছমতা না থাকিলে পুণ্যার্জ্জন ভবপর হয় না, সুতরাং স্বর্গাকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিও হয় না। প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা সে পথ পরিষ্কৃত হয়। এই প্রায়শ্চিত্ত র্বতের সাতটি স্তর আছে; প্রতি স্তরে এক একটা পাপের শোধন হইয়া থাকে। সে সাতটি প্রধান পাপ—Pride, nvy, Anger, Sloth, Greed, Gluttony and ust. স্পর্ধা বা দর্প, ঈর্ষা, ক্রোধ, জাড্য বা অস্থিরতা বা লস্য, অতিলোভ, অতিভোজন, লাম্পট্য। কর্ণফলক ভোগ, ক্ষভোগ, অনুশোচনাজাত প্রার্থনা, কাতর বন্দনা, এই কয় পাপে প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হয়। প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইলে তবে র্গারোহণ।

দান্তের Paradiso নামক শেষ পর্য্যায়ে দুইটি বিষয়ের লোচনা আছে— Eternity and Fruition— নন্ত ও কর্ণফলকথা। অনন্ত কাহাকে বলি? সমস্তাৎ তভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের বিদ্যমানতাকে অনন্ত বলে। ternity is all at once—নিত্যবিদ্যমানতাকেই অনন্ত লে। যেখানে গতি নাই, অপচয় উপচয় নাই, নিত্য সিদ্ধ বিনাশী যাহা, তাহাই অনন্ত। দান্তেকে অনন্ত বুঝাইবার ন্যে বিয়াট্রিসের আত্মা আসিয়া দেখা দিল, সে দান্তের ও ধরিয়া এমন বেগে লইয়া গেল, যে বেগে ক্রমশী নাই — হূর্নিমেষের পরিবর্ত্তন নাই। অর্থাৎ. fixed star বা র্য্যমণ্ডলে লইয়া গেল। সেখান হইতে বিয়াট্রিস দেখাইল -ঐ দেখ, গ্রহনক্ষত্র তারাগণ ঘুরিতেছে, ঐখানে ত্রিকালের াক বিকাশ। আর তুমি যেখানে আছ, সেখানে কালের বিরাম নাই—অথচ বর্ত্তমান নিত্যতন্ত্র বুদ্ধ স্বভাব কাল। ালের অতীত যাহা তাহাই অনন্ত।

Fruition ফলপ্রাপ্তি বা তৃপ্তি ও ভক্তি কাহাকে বলে? The perfect conformity of our will with the will of God, মানুষের ইচ্ছা বা মানবপ্রবৃত্তি যখন ভগবানের ইচ্ছার সহিত পূর্ণভাবে সম্মিলিত হইবে, তখনই জীবনের ঈপ্সিত লাভ হইবে।

"To see God is to see as God sees" ভগবানকে এখন দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে, যে দৃষ্টিতে ভগবান বিশ্বচরাচর দেখিয়া থাকেন। আর স্বর্গ কেমন?—That is 'unbodied light,' 'Light intellectual' 'replete with joy', 'Joy that transcends all sweetness of delight.' অশরীরী জ্যোতিঃ যেখানে নিত্য বিরাজ করে; যে জ্যোতিঃ মনীষার দৃষ্টির ন্যায় প্রেমসৌদামিনী-স্নাত; যে প্রেম নিত্য আনন্দঘন, চিদানন্দ বিকাশ, আর সে চিদানন্দ সংসারের সকল সুখের অতীত—এমন আনন্দময় স্থানই স্বর্গ। এই স্বর্গে থাকে কাহারা? নিত্যশুদ্ধবুদ্ধস্বভাব চিরন আনন্দময় পুরুষ সকল তাহাদের—

"নাই ভেদাভেদ, আনন্দ বেদ, তৃষ্ণা কি রূপের আশা।"

শেষকথা

দান্তের Divine Comedy বা মহাকাব্য পাঠ করিতে করিতে আমাদের পুরাণ সকল মনে পড়ে। পুরাণে যেমন আখ্যায়িকা, উপাখ্যান আছে, যেমন অর্থবাদ ও রোচক আছে দান্তের মহাকাব্যেও তেমনই ভাবে বিষয় সকল বিন্যস্ত আছে, আবার পুরাণে যেমন অধ্যাত্ম-তত্ত্বের ব্যাখ্যা আছে, দান্তের মহাকাব্যেও তেমনই অধ্যাত্ম-তত্ত্বের ও সাধন-ধর্ম্মের ব্যাখ্যা আছে। যে পদ্ধতিতে পুরাণ লিখিত, সেই পদ্ধতি অনুসারে দান্তের মহাকাব্য লিখিত। পুরাণ বেদের ও উপনিষদের ব্যাখ্যা-পুস্তক—দান্তের মহাকাব্য বাইবেলের ব্যাখ্যা পুস্তক, Gospel বা আপ্তবাক্য পুরাণের আকারে পরিবর্ত্তিত। পুরাণের নরক বর্ণনা ও দান্তের নরক বর্ণনা প্রায় একই রকমের। তবে হিন্দুর পুরাণে জন্মান্তরবাদ আছে, দান্তের

যেন তাহা নাই। হিন্দু পাপী জন্মে জন্মে প্রায়শ্চিত্ত ও কর্ম্মসূত্রের পাশ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে। দান্তের ভাগ অনন্ত; প্রায়শ্চিত্তকাল সান্ত হইলেও, জন্ম জন্মান্তরে উহার ছেদটানা হয় না। দান্তের স্বর্গও অনন্ত। স্বর্গ-নরক ভোগ—দুইই সান্ত। হিন্দুর পক্ষে নরক অনন্ত নহে স্বর্গভোগও অনন্ত নহে; কর্ম্মানুসারে দুই সীমাবদ্ধ ও সান্ত। এই মতগত পার্থক্য ছাড়া পুরাণে ও দান্তের মহাকাব্যে অন্য কোনও বিরোধ বা অমিল নাই। দান্তের মহাকাব্য মিল্টনের Paradise স্বর্গচ্যুতি মহাকাব্যের আদর্শস্বরূপ আমাদের হর বৃত্রসংহারে নরক বর্ণনা ও ইন্দ্রাদি দেবগণের সাধনা মহাকাব্যের অনুরূপ নয়। হিন্দুর পুরাণ ছাড়িয়া ধর্ম্মসিদ্ধান্তপূর্ণ এমন মহাকাব্য জগতের আর কোনও ভিন্ন সাহিত্যে নাই, পূর্ব্বেও ছিল না ভবিষ্যতে আর হবে না; কেন না, তথাপি দান্তের মহাকাব্যের সমকক্ষ আর একখানি মহাকাব্য রচিত হইল না। অনেকে কাব্য রচনা বিষয়ে দান্তেকে মেপোলিয়নের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। নিজের প্রয়োজন মত ভাষা গড়িয়া, ছন্দ গড়িয়া তিনি মহাকাব্যের রচনা করিয়া ছিলেন। সেই মহাকাব্যের ফলে ইউরোপের সাহিত্য-জগতে তিনি অতুলনা হইয়া আছেন। নেপোলিয়ন দিগ্বিজয়ী সম্রাট হইয়াছিলেন বটে কিন্তু সে সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন নাই; দান্তের সাম্রাজ্য অক্ষয় ও অবিনশ্বর। বরং দান্তেকে ইতালীর বাল্মীকি বলা চলে। দান্তের আদর্শ লাটিন কবি ভার্জিল হইলেও কাব্যাংশে ঈনীড (Aneid) অপেক্ষা দান্তের মহাকাব্য শ্রেষ্ঠ—ভাষার সজীবতার হিসাবে শ্রেষ্ঠ, ভাবের প্রফুল্লতা হিসাবে শ্রেষ্ঠ।

বাঙ্গালীর সহিত দান্তের তেমন পরিচয় নাই জানিয়া অতিসংক্ষেপে দান্তের মতের ও ধর্ম্মের আলোচনা করিয়া লেখনী সার্থক করিলাম।

[সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০]

হেগেলীয় দর্শন

অমিল রায়

খানেই বিনশনের (negation) মানে দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। ফুল নিজের বিনশনকে স্বীকার (affirm) করছে ন, স্বকীয় বিনষ্টিকে বিঘোষণ করছে না। সে বিঘোষণ করছে নিজের পরিপূরণকে বা বিকাশকে : "affirm their own complement!" সত্যি ফুল ফলে উত্তীর্ণ হচ্ছে, নিজের negation-কে ডেকে আনছে না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, তবে "negation" বলি কেন একে। পূর্ব বস্তুর অভাব বা অত্যন্তাভাব ঘটছে না; ঘটছে যা তাকে বলা যায় change বা পরিবর্তন। অর্থাৎ ফুলের কতকগুলো গুণ-এরই (aspects-এর) অস্তিত্ব আগে ছিল কিন্তু 'ফল' হয়ে পরিণত হবার পরে সে গুণগুলি (aspects) আর নেই। তার মানে ফুলের আংশিকভাবে বিনশন (negation) বলা গেলেও হতে পারে, কিন্তু গোটা ফুলের বিনশন হয়ে গেছে, একথা কোনো মতেই বলা চলে না। ম্যাক্ টাগার্টও শেষে এই ব্যাপারকে পুরোপুরি বিনষ্টি (negation) না বলে, বলছেন আংশিক বিনষ্টি : negation "in some degree."*

* "It is indeed, according to Hegel, no empirical and contingent fact, but an absolute and necessary law that their complement is in some degree their negation" (Art 9. Ibid)

এখানে ম্যাক টাগার্টের এই 'আংশিক' ('in some degree') কথাটি জুড়ে দেওয়ার অর্থ অনেকখানি স্পষ্ট হয়েছে। এখানে ম্যাকটাগার্ট আমাদের ব্যাখ্যাকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। কারণ আংশিক বিনশন (negation in some degree) কথাটার অর্থই সাদা কথায় "পরিবর্তন"। একটি বস্তুর কিছু কিছু বিনশন হয়েছে বললে বোঝা যায় যে বস্তুটি একেবারে নিশ্চিহ্ন বা বিনষ্ট হয় নাই। পূর্ব বস্তুর খানিকটা অভাব ঘটেছে, যার ফলে এর পরবর্তী বস্তুটি ঠিক আগেকার অবিকল বস্তুটি আর নেই। তার অর্থ বস্তুটির পরিবর্তন ঘটেছে। কাজেই হেগেল যে যত্র তত্র বিনশনের ("negation"-এর) দোর তুলেছেন, সে আসতে বিনশন নয়, তাকে পরিবর্তন বললেই ভালো হয়। আমাদের মতে, ম্যাক টাগার্টের এ ব্যাখ্যায় 'বিনশন' (negation) শব্দের মানে 'বিনশন' (negation) থাকে না। এবং 'বিনশন' (negation) অর্থ 'পরিবর্তন' করলে হেগেল-দর্শনের হেগেলীয়ত্বও বজায় থাকে না। সে হয়ে দাঁড়ায় ম্যাক্ টাগার্টীয় দর্শন, হেগেলীয় দর্শন নয়।

'পরিবর্তন' বলতে আমরা যে কোন রকমের নতুন অবস্থান্তর বুঝে থাকি। অবস্থান্তর ছোট হতে পারে ; বড়ও হতে পারে ; ক্ষুদ্র হতে পারে, অক্ষুদ্র হতে পারে। ক্ষতিমূলক

হতে পারে, বৃদ্ধিমূলকও হতে পারে। সাধারণতঃ আমরা দুই শ্রেণীর পরিবর্তন ঘটতে দেখি: এক, বৃদ্ধিমূলক, দুই, ক্ষতিমূলক। কোনো বস্তুর বৃদ্ধি হতে পারে, বিকাশ হতে পারে, পূর্ণতার পথে পরিণতি হতে পারে। আবার তার ক্ষয়ও হতে পারে, বিনশনও হতে পারে। প্রথমটিকে বলতে পারি বৃদ্ধি (growth) বা পূর্ণতা (completion), দ্বিতীয়টিকে বলা যেতে পারে ক্ষয় (decay) বা বিনশন (negation)।

ম্যাক্ টাগার্টের মতে হেগেলীয় পরিবর্তন মানে বৃদ্ধি বা বিকাশ বা পূর্ণতাপ্রাপ্তি (completion)। তার মতে হেগেলের বিনশন আসলে হচ্ছে পূর্ণতাপ্রাপ্তি। এ 'বিনষ্টি'র মানে হচ্ছে "বৃদ্ধি"; পূর্বসত্তার উন্নয়ন; অস্বীকৃতি (denial) বা বিরোধ (contradiction) নয়। ম্যাক্ টাগার্ট বলছেন:

"কিন্তু একটি সত্তা আর একটি সত্তার মূর্ত হয়ে ওঠে, কারণ দ্বিতীয়টি প্রথমটির তাৎপর্যকে পূর্ণতা দান করে, এ-নয় যে তাকে অস্বীকার করে।"*

কাজেই ম্যাক টাগার্টের ব্যাখ্যা অনুসারে দাঁড়ায় এই যে বীজকে চারাগাছ অস্বীকার (deny) করছে না, বিরোধিতা করছে না। ফুলকে deny করে বা contradict করে ফল আবির্ভূত হচ্ছে না। কাজেই অস্বীকার যদি না করে, তবে বিনাশও (negate) করছে না। কাজেই দেখা যাচ্ছে ম্যাক্ টাগার্ট এখন এক জায়গায় এসে পৌঁচেছেন যেখানে হেগেলীয় বিনশন-তত্ত্ব আর টিকছে না। কাজেই ম্যাক্ টাগার্টকে হেগেলের বিনশন (negation) কথাটাকে অর্থ বদলিয়ে নিয়ে কোনো রকমে বাঁচাতে হচ্ছে। তাই বিনশনকে (negation) করতে হয়েছে পূর্ণতাপ্রাপ্তি (completion)। কিন্তু এতে করে বিনশনের (negation) জন্মান্তর বা জাতান্তর হয়ে একেবারে আনকোরা নবকলেবর ধারণ করতে হয়েছে। অর্থাৎ negation আর নেই।

কিন্তু হেগেল কোথাও বিনশনের negation) এমনি ধরণের বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা করেন নাই। তার বিনশনের (negation) ব্যবহারে যে অসঙ্গতি ও অর্থ বিভ্রাটের বীজ লুকিয়ে আছে, সেকথা হেগেলের চোখে ধরা পড়েনি। ধরা না পড়বার কারণ তাঁর বিপুল কাঠামো (system) ও ব্যাপক দর্শন গড়বার ব্যস্ততা তাকে নিজের দর্শনের খুঁটিনাটি সম্পর্কে অন্ধ করে তুলেছিলো। যে ত্রিতাল ছন্দের কর্মূলা তিনি গড়েছিলেন, তার সেবায় সমস্ত জ্ঞান, বিজ্ঞান ও তথ্যকে লাগাতে গিয়ে সর্বত্রই তাঁকে জবরদস্তি ছন্দপাত মানে করতে হয়েছে। negation বস্তুটিকে তিনি সাধারণভাবে প্রচলিত অর্থেই ব্যবহার করে গেছেন। কারণ তাঁর স্থিতি-প্রতিস্থিতি-সংস্থিতি কর্মূলার ভিত্তিই 'বিনশন' এবং বিনশনের মানে জোড়ালো ধরণের বিরুদ্ধতা ও 'বিনশন' না হলে তাঁর কর্মূলা অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। অথচ ম্যাক টাগার্ট এই বিনশনকে উড়িয়ে দিয়ে তার স্থানে পূর্ণতাপ্রাপ্তিকে (completion) বসতে চাচ্ছেন, এতে হেগেলীয় পদ্ধতির বনিয়াদকেই ধ্বংস করা হয়। 'বিনশন' সম্পর্কে হেগেলের এই বিভ্রান্তি, অস্বচ্ছতা ও একদেশদর্শিতা হেগেলীয় দর্শনের গোড়ায় রয়েছে। কোথাও হেগেল বিনশনকে (negation) পূর্ণতাপ্রাপ্তি (completion) এই অর্থে ব্যবহার করেন নাই। ম্যাক টাগার্টও নিজে এ-সম্বন্ধে সচেতন আছেন এবং বলছেন negation মানে completion না করলে হেগেলীয় তত্ত্বের কোনো মানেই হয় না। অথচ হেগেলের কোন উক্তি এ-সম্বন্ধে কোথাও ম্যাক টাগার্টের সমর্থনে পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই ম্যাক টাগার্ট বলছেন, হেগেল এ কথা বলে থাকুন বা না থাকুন, হেগেলের অন্তত ও-কথা বলা উচিত ছিলো,

(শেষাংশ ৩৫ পৃঃ)

---

*"But the one category passes into the other, because the second completes the meaning of the first, not because it denies it.

(Art 9, Ibid)

উপন্যাস

জল মাটি মন

ম হী তো ষ বি শ্বা স

বিয়ে হ'য়ে গেল পদ্মর। আয়োজনের কোথাও কোনো ত্রুটি ঘটেনি। নীলমণি নিজেই লোক দিয়ে, টাকা দিয়ে সব ব্যবস্থাপত্র করিয়েছে। বরযাত্রীদের খাওয়ানো দাওয়ানো সব কিছু নীলমণির টাকাতেই হয়েছে। ভজহরির এক পয়সাও লাগেনি। আড়ালে আবডালে অনেকেই অনেক কথা বলল। টাকার লোভে বাপ হ'য়ে মেয়েটাকে জলে ভাসিয়ে দিল ভজহরি—এমনি আরো নানান কথা। তবে বিয়ে কাজ—শুভ কাজ, বৃহৎ কাজ। ওতে এ-রকম ছোটোখাটো নিন্দা-প্রশংসা অনেক তো রটবেই। ওসবে কান দিতে গেলে চলেনা। ভজহরিও ওসব কথা গায়ে মাখল না।

দুপুর থেকে পদ্মও আর কোনো বাধা দেয়নি। নিজেই বেরিয়ে এসেছিল ঘর থেকে। যে যা বলেছিল, নির্বিকারে তাই করেছিল। পাড়ার বৌ-ঝিরা এসে পিঁড়িতে বসিয়ে ওর গায়ে হলুদ মাখাল। স্নান করাল। আর সারাক্ষণ ওর স্থূলপুষ্ট দেহটা নিয়ে নগ্নভাবে আলোচনা করল। হাসিঠাট্টা করল। পদ্ম কারো কথার কোনো জবাব দিল না। নিজে থেকে কোনো কিছু করবার মতন শক্তিভার আর নেই। সাহসও নেই একতাল নরম কাদার মতন জবুথবু হ'য়ে বসে রইল। আনুষ্ঠানিক কালকর্মগুলো যে যেমন বললো—তেমনি ভাবেই করে গেল।

বিয়ের পরে স্ত্রী-আচার। এবচেটে যখন সেখানে মেয়েদের। পাড়া ঝেঁটিয়ে মেয়েরা আসে বর ঠকাতে। কথার কোনো বাঁধ-বাঁধুনি, লাজ-লজ্জা থাকেনা। ক্রিয়াকলাপও অনেক। সোহাগজলের হাড়িখেলা, কড়িখেলা, পানখেলা—এমনি কত নাম। সবশুদ্ধ মিলিয়ে যেমন ক'রে হোক বরকে নাকানি-চোবানি খাওয়াতে হবে। ঘায়েল করতে হবে। পদ্মর স্ত্রী-আচারেও মেয়েরা কিছু কম আসেনি। চারদিক থেকে সকলে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। ছোটো ঘরখানা যেন ভেঙে পড়তে চাইছিল। কিন্তু নীলমণির মুখের দিকে তাকিয়ে হাসিঠাট্টা রঙ্গ রসিকতা করবার মতন সাহস আর কারো হ'লনা। খিট্‌খিটে মেজাজের লোক নীলমণি। তার সেই খড়ি পাকানো রিমঝিমে চেহারা আর কুত্‌কুতে চোখের দিকে তাকিয়ে সকলে কেমন যেন চুপ্‌সে গেল। বয়সও হয়েছে নীলমণির। প্রায় সব মেয়ে-গুলোরই বাপ-জ্যাঠার বয়স। পুঁচকে মেয়েগুলো নীলমণির সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা করতে ভরসা পাবে কোন্ সাহসে? ক্রিয়াকলাপের যেটুকু নিতান্ত না হলেই নয়, তাই হ'ল। তবুও শেষ অবধি একটি মেয়ে এগিয়ে এলো। পাড়ার মেয়ে। পাশের গাঁয়ে বিয়ে হয়েছে। বর-ঠকানী বলে নাম আছে। বিয়ে-চুরোয় সকলে ডাকে ওকে। মেয়েটা একখানা কাঁসার থালায় একগোছা পান আর কয়েকটা আস্ত শুকনো সুপুরি এনে নামিয়ে রাখল নীলমণির পাশে। মিষ্টি মুখখানা নেড়ে নেড়ে সোহাগী গলায় বলল -

"ও-গো বুনাই, তোমার জন্যি পান আনিচি। কচি কচি টস্‌টসে সুবোরি আনিচি। চাঁচ-মুখখানি দিয়ে টুকুস্ টুকুস্ ক'রে এট্টু পান খাও না বোনাই।"

বলতে বলতে মেয়েটি হাত বাড়িয়ে নীলমণির থুত্‌নি ধ'রে একটু নাড়িয়ে দিল।

কটমট ক'রে তাকাল নীলমণি মেয়েটির দিকে। নীলমণির মুখের সব দাঁতগুলিই প্রায় প'ড়ে গেছে। সামান্য কয়েকটা মাত্র বাকী আছে। দাঁত প'ড়ে গালটা ডুব্‌ড়ে বেঁকে চুরে গেছে নীলমণির। তার সেই ভোব্‌ড়ানো গালকেই যে মেয়েটা ঠাট্টা করছে, এ-কথা বুঝতে বাকী রইল না তার। অন্য জায়গা হ'লে নীলমণি কি করত বলা যায় না। তবে এখানে স্থানকাল-পাত্র সম্বন্ধে চলল সে। চিন্‌সে শরীরটা দুলিয়ে, ফোক্‌লা গালে হাসল খানিকটে। পকেট থেকে গুনে গুনে দশটি টাকা রাখল থালার উপরে।

শরীরে মোচড় দিয়ে চোখ নাচিয়ে মেয়েটা আবার বলল—"কি হলো গো বোনাই? আমার বুনুরে দেইহে ভিম্‌রি গেলে নাকি? এমন রসের পানসুবোরি দেলাম। এট্টু গালে দিয়েই তাহো না হয়।"

বার দু'য়েক কেশে গলাটা পরিষ্কার করে হেসেই জবাব দিল নীলমণি—

"রসের পান সুবোরি খাওয়ার ভাবনা কি? যে খাবে, তারে তো দিয়েই দেলাম।"

থতমত খেয়ে গেল মেয়েটি। তবুও গলা চড়িয়ে জবাব দিল—"বোনাইয়ের কথাডা তো ঠিক বুঝতি পারলাম না।"

এবার গম্ভীর হল নীলমণি। ঘুরে ঘুরে চোখ দুটো দিয়ে একবার পদ্মর দিকে তাকাল। তারপর মেয়েটিকে লক্ষ্য ক'রে বলল—"বুঝতিই যদি না পারবা তো কচ্‌কেদি করতি আসো ক্যানো। রসের সুবোরি আদি না খাই, আমার টাকার খাবে। তোমাগোর সুবোরির চাইতে আমার টাকার দাঁত অনেক বেশী শক্ত। কড়্‌-মড়ায়ে খাবে বুঝতি পারলে?"

মেয়েটি আর কোনো জবাব দিল না। টাকা কটা নামিয়ে রেখে থালাখানা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আর সকলেও চলে গেল। ফাঁকা ঘরে গেল ঘটা। আর গর্ভেবসা ভুত-ভুতে চোখ দুটো দিয়ে নীলমণি গিলতে লাগল পদ্মর ঢলা-পাকানো শরীরটা।

পরের দিন। বিকেল গড়িয়ে এলো। ঘরের যাবার সময় হল। সানাইয়ে সুর উঠেছে। আর যাই হোক, নীলমণি পয়সা খরচ করেছে। কোথাও কোনো কৃপণতা করেনি। পাঁচ-পারের বাজনদের দল ভাড়া করে এনেছে। এ তল্লাটে ওদের জুড়ি নেই। ঢোলে ওরা বোল ফুটোয় অবিকল মানুষের মতন ঢোলে কথা কয়। বাজনা বাড়ি শেষ হয়ে যাবার পর চুলেরা আসে কর্তার কাছে বখ্‌শিষ চাইতে। কিন্তু মুখে বখ্‌শীষ চাওয়া চলবে না। ঢোলের বোলে চাওয়া নিয়ম। ওদের হাতের গুণে ঢোলে কথা বলে

"কত্তা, ঘরে যাও। কত্তা ঘরে যাও।"

অর্থাৎ, কর্তা বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাকে বখ্‌শিষ আনবার জন্য ঘরে যেতে বলা হচ্ছে। এর পরেই ঢোলের মুখে অন্য বোল ফোটে—

"কত্তা, থাল দেবা না কলস্ দেবা।

না, নগদ নগদ পয়সা দেবা।"

সারা উঠোন জুড়ে নেচে নেচে চুলিরা ঢোল বাজিয়ে চলে। পাড়া ভেঙে লোক আসে দেখতে। ঢোলের চেয়েও মজাদার ওদের সানাই। বড়ো পরাণ-কাড়া বাজনা। বাপের বাড়ীর যাত্রা কাটিয়ে বরের সঙ্গে মেয়ে যায় শ্বশুরবাড়ী। চুলি আর সানাইদারেরা সাথে যায় বাজনা বাজিয়ে নৌকার পথ হ'লে ওরা সানাইয়ে সুর ধরে। বড়ো করুণ সে সুর। মা বাবা আর মেয়ের বিচ্ছেদের ব্যাথা যেন গুমরে গুমরে ওঠে। সুরের ছোঁয়ায় দুলে দুলে ওঠে গাছের জল। দুই পাড় দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাজনা শোনে ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েরা। সে বাজনা শুনতে শুনতে

নতুন বিয়ে হওয়া কল্পবয়সী বউগুলো ঘোমটা টানতে ভুলে কিংভোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। হয়তো বা মনে প'ড়ে যায় তাদের নিজেদেরই বিয়ের দিনটির কথা আর আইবুড়ো মেয়েগুলোর লজ্জা রাঙা বুকের মধ্যে গুর-গুর করে ওঠে। কবে আসবে তাদেরও ঐ সানাই-বাজা দিন। ও সানাইয়ের সুরে বড়ো বেদনা। আবার সুখও যে অনেক।

গাঙ্-পারের সেই ঢুলি আর সানাইওয়ালাদের আনিয়েছে নীলমণি। বেলা গড়াতেই ওরা বাজনা শুরু করেছে। সুরের দোলায় সমস্ত পাড়াটার আকাশ বাতাস যেন দুলে দুলে কেঁপে কেঁপে উঠেছে চারদিকে লোকজন ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছে। বেলাবেলি রওনা হবে বর। আকাশকে বিশ্বাস নেই। এখন অবশ্য ভালো আছে। কিন্তু নামতে কতোক্ষণ।

রান্না ঘরের পিছনে বুনো আমড়া গাছের গোড়াটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পদ্মর মা। সারাদিন হাত জোড়া গেছে। কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে হয়েছে। কোনোদিকে তাকাবার ফুরসৎ পায়নি। বিকেলের দিকে মোটামুটি সব কাজ মিটে গেছে। লোকজনের খাওয়া-দাওয়ার পাট শেষ হয়েছে। পড়ন্ত বেলায় তাই যেন পদ্মর মা একটুখানি হাঁফ ছাড়বার জন্য নিরিবিলিতে একা একা এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কয়েকটা বাড়ীর পরেই বলরামদের বাড়ী। আমড়া গাছটার তলায় দাঁড়ালে পরিষ্কার দেখা যায়। পদ্মর মার মুখখানা বলরামদের বাড়ীর দিকে ফেরানো। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। মনের মধ্যে কতো কি যে তার ভাঙ্-চুর হচ্ছে। কতো কথাই যে মনে পড়ছে। বলরামের মার সাথে সে সই পাতিয়েছিল। দুজনে সে কি ভাব! লোকে বলতো—দুই বোন। পদ্ম জন্মাবার পর ওকে কোলে নিয়ে বলরামের মা বলেছিল—"তোর মাইয়েডারে আমি নিলাম বুন। দিবি তো?"

পদ্মর মা বলেছিল—"কানলো দিদি, তোর আবার মাইয়ে লাগবে কোন্ কম্মে?"

পাশেই দাঁড়িয়েছিল বছর আটেকের বলরাম। ওকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলেছিল বলরামের মা—"তাখতো দুতোতে ক্যামোন মানাবে! যামোন যুগ্যি ছল, তেমনি যুগ্যি মাইয়ে!"

তারপর থেকে দুই সাই-তে মিলে কতো স্বপ্নই যে দেখেছে। এর চেয়ে বড়ো সাধ, বড়ো কামনা ওদের আর ছিল না। কিন্তু একদিন কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল! সাঁঝবেলায় ঘাটে জল আনতে গেল বলরামের মা। ফিরল গোঙাতে গোঙাতে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শরীরটা ওর নীল হয়ে গেল। কি কান্নাটাই না সেদিন কেঁদেছিল পদ্মর মা! কিন্তু হলে হবে কি! সেই থেকেই কেমন যেন ভাঙন ধরে গেল। আর পীরিতটা থাকবেই বা কার সাথে! বলরামের বাবা আবার বিয়ে করেছিল। কিন্তু মেয়েমানুষটা বড়ো ক্যাটকেটে। সবসময় একটা মুখপোড়া ভাব। দুই বাড়ীর ভাবসাব আর রইল না। কিন্তু তবুও আশায় আশায় ছিল পদ্মর মা। বিয়েটা নিশ্চয় আটকাবে না। যেমন করে হোক, বলরাম আর পদ্মর দুটো হাত এক হবেই। কিন্তু হঠাৎই একদিন কানে গেল কথাটা পদ্মর মা'র। রাত্রে স্বামীকে খেতে দিতে দিতে শুধালে—"তুমি নাকি নীলে ঘোড়লের সাথে পদ্মর বিয়ে দেবা ঠিক করতিচো।"

ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে গিয়ে থমকে গেল ভজহরি—

—"কেডা কলো তোমারে?"

থেমে থেমে বলেছিল পদ্মর মা—"যেই কোক, কথাডা সত্যি কিনা তাই কও।"

ভজহরি জবাব দিয়েছিল—"হয়, ভাবতিচি তো তাই।" ফস্ করে বলে উঠেছিল পদ্মর মা—"আমি শুনিচি সব। লজ্জা লাগে না তোমার পাঁচ বিঘে জমির জন্যি ঐ বুড়োর কাছে মাইয়েডারে বেচতি?"

হেসে বলেছিল ভজহরি—"তাদি তোমাগোর স্বপাত্তরডা কেডা তাই কওনা দেহি।"

'ক্যানো বলরাম?"—জবাব দিয়েছিল পদ্মর মা।

বলরাম?"—ঘর কাঁচিয়ে হেসে উঠেছিল ভজহরি।

"তা তোমার এমন স্বপাত্তর জামাই তোমার মাইয়েরে খাওয়াবে কি, তা ভাবিছো? এদিদি জামাই জামাই বুলে তো এহেবারে ভাংটা হয়ে নাচা আরম্ভ করিছো।"

পদ্মর মা বলেছিল—"ক্যানো, জোয়ান ছেল, ওর আবার প্যাটের ভাতের অভাব নাকি?"

খেঁকিয়ে উঠেছিল ভজহরি—"হেঃ, জোয়ান ছেল! আর কয়াদিন পরে সোনাতন যদি গলা চাকা দিয়ে বারোয়ে যে, তাদি বোঝা যাবে জোয়ান ছেলের মুরোদ কতো।"

বলরামের বাড়ীর অবস্থা জানে পদ্মর মা। তবু ও বলেছিল—"তা তোমারে আমি কইয়ে রাখলাম, পদ্মর সাথে ঐ নীলে মোড়লের যদি বিয়ে হয়, তাদি আমি কিন্তুক অনত্থ বাধাবো।"

এক কথায় দু'কথায় রেগে গিয়েছিল ভজহরি। গোঁয়ার মানুষ। অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিয়ে ব'লে উঠেছিল

"তুই চুপ ক'রে থাক্ মাগী। তোর অতো ছেলাবাৎ মারতি হবে না। মাইয়ে আমার। যারে খুশী বিয়ে দেবো। তোর তাতে কি? কের কথা কবি তো আস্ত রাখবো না।"

আর কথা বলেওনি পদ্মর মা। নীরবে সব দেখে গিয়েছিল। পদ্মর মুখখানার দিকে তাকালে বুকের মধ্যে যেন হু-হু করে উঠতো। স্বামীর লোভের আগুনে পুড়ে মরবে কচি মেয়েটা। কিন্তু কি-ই বা আর করার আছে পদ্মর মার।

তারপর যা হবার তাতো আজ হয়েই গেল।

হঠাৎ চমক ভাঙল পদ্মর মার। পদ্ম এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। ঝলমলে কাপড় পরা। এক গা গয়না। চেনাই যাচ্ছেনা। গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে এক ঝলক রোদ্দুর এসে পড়েছে ওর মুখের উপর। বড়ো সুন্দর দেখাচ্ছে পদ্মকে। শ্বশুর ঘরে যাবার আগে প্রণাম করতে এসেছে মাকে।

নীচু হয়ে প্রণাম করতে গেল পদ্ম। কিন্তু তার আগেই পদ্মর মা জড়িয়ে ধরল পদ্মকে বুকের মধ্যে। উঠোনে তখন সানাইয়ে বিদায়বেলার সুর বাজছে। আকাশে বাতাসে সে কান্নার সুর ভেসে চলেছে। ঝর ঝর ক'রে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল মার চোখ বেয়ে। এতো জল কোথায় ছিল পদ্মর মার দু' চোখে! বুকভাঙা এ-কান্না যেন কোনোদিন আর ওর শেষ হবে না। তুমি মা! জীবধাত্রী বসুমতীর আর এক অংশ তুমি। শুভক্ষণের দিন সন্তানকে বুকে জড়িয়ে তোমার চোখের জল ফেলতে নেই। তাতে সন্তানের অকল্যাণ হয়। ওকে তুমি আশীর্বাদ করো। যা পেয়েছে, তাই নিয়েই যেন ওর সুখ হয়।

কিন্তু অবাক করল পদ্ম। মেয়ে তো নয়—যেন পাষাণ। দু'চোখে কোথাও একফোঁটা জল নেই। শুকনো চোখ নিথর মুখ। যেমন এসেছিল, তেমনিই চ'লে গেল। একটুও রা কাড়ল না।

(ক্রমশঃ)

কণ্ঠ-ভরা বিষ

মিহির মুখোপাধ্যায়

আট

নদী জেলার দেবানন্দপুর গ্রাম। ওপাশে বংশবাটি, পাশে ব্যাণ্ডেল। এককালে পর্তুগীজদের খুব দাপট ছিল ব্যাণ্ডেলে। এখন আর নেই।

দেবানন্দপুরের রামচন্দ্র দত্ত মুন্সী নামকরা মানুষ। অবস্থা যেমন ভাল, তেমনি দান-ধ্যান, বাড়িতে বারোমাসে তের পার্বণ উপলক্ষে পাঁচজনকে ডাকা খোঁজা—সব কাজেই মুন্সী মশাই আদর্শ গৃহস্থ।

বয়স পঞ্চাশ পঞ্চান্নর ঘরে, দোহারা গড়ন। কাঁচাপাকা কদমছাঁটা গোঁফ নিয়ে সকাল সন্ধ্যায় বৈঠকখানা ঘরে বসে থাকেন। প্রজা, খাতক, আশ্রিত, অনুগৃহীত—নানাজনের নানা অভিযোগ শোনেন। সাধ্যমত সাহায্য করেন। গাঁয়ের অনেকেই মুন্সী মশাইর দ্বারা উপকৃত। আবার লোকের দোষ-অভিযোগেরও যেন কমতি নেই, বরং দিন দিন বেড়েই চলেছে।

মুর্শিদকুলীর শাসনে খানিকটা লুটতরাজ অনেকটা কমেছে ঠিক, নবাবী শাসন ব্যবস্থা ভালোই বলতে হবে, কিন্তু লোকের মনে শান্তি নেই। জিনিষপত্তরের দাম ধীরে ধীরে বাড়ছে। ডাচ্, ইংরেজ, ফরাসী বণিকরা দেশের মাটিতে ক্রমশঃ শক্ত হয়ে বসছে। ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমেই বিদেশী বণিকদের এক চেটিয়া হয়ে যাচ্ছে। চাঁদ সদাগর, ধনপতি সদাগর এখন রূপকথার নায়ক।

মুন্সী মশাই তাঁর দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের জীবনে রাজনীতি সমাজনীতির অনেক যাতপ্রতিঘাত অনেক অদল-বদল দেখলেন। নবাব শায়েস্তা খাঁর শাসন দেখেছেন, প্রথম বয়সে। ঢাকা তখন সুবে বাংলার রাজধানী। তারপর শোভাসিং রহিমখাঁর বিদ্রোহ। আজিম-উস-সানের সঙ্গে মুর্শিদকুলির বিরোধ। সম্রাট আলমগীরের মৃত্যু। সেওয়ান মুর্শিদকুলি খেতে বাদশা ফারুখসিয়ারের ফর্মানের জোরে হলেন নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ।

বাংলাদেশের রাজধানী হল মুর্শিদাবাদ। ঢাকার শাসনভার নিলেন নায়েব-নাজিম।

বাংলা দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের বাজারে পর্তুগীজরা হটে গেল জার্মাণীর অষ্টেণ্ড কোম্পানীও সুবিধে করতে পারলো না। এখন চলছে ডাচ্, ইংরেজ আর ফরাসীদের রেষারেষি। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়। যদিও দেবানন্দপুরের শান্ত জীবনধারা দেখে কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু মুন্সী মশাই অনুভব করতে পারেন, দিন বদল হচ্ছে, সমাজের চেহারাও ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে।

সেদিনও বিকেল বেলা নিজের বৈঠকখানা ঘরে বসে নানা কথা ভাবছিলেন তিনি। সামনে ছোট উঠোনের পর রাস্তার পাশে তেঁতুল গাছটার ছায়া শেষ বেলার নরম রোদে ক্রমশ দীর্ঘতর হচ্ছে।

বৈঠকখানার উত্তরে চণ্ডীমণ্ডপে সকাল-বিকেলে পাঠশালা বসে। ছেলেরা নামতা মুখস্থ করছে।

পাঠশালার পণ্ডিত মশাই রামচন্দ্র মুন্সীর অনুগৃহীত।

প্রতিদিন এ বাড়ি থেকে চাল ডাল তেল কলার সিধে পান পণ্ডিত মশাই। পালা পার্বণে প্রণামীর টাকা, কাপড়।

আর একটু পরেই ছুটি হবে পাঠশালা। তারপর বসুমুড়ো আসবেন পাশা খেলতে। আরো অনেকে আসে। অনেকরাত অবধি চণ্ডীমণ্ডপে পাশা খেলা হয়। কখনো পালাপার্বণে কথকতা, চণ্ডীপাঠ-ভাগবত পাঠ হয়। গাঁয়ের লোকেরা ভীড় করে আসে।

মুন্সীমশাই আনমনে ছেলেদের নামতার গুণগুনানি শুনছিলেন। হঠাৎ নজর পড়ল, তেঁতুল তলায় একটি অচেনা ছেলে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। ফুটফুটে সুশ্রী চেহারার ছেলে, পরণে আধময়লা ধুতি-কতুয়া, একটা উড়ুনি কাঁধে হাতে কাপড়ের পুটুলি। পায়ে একহাটু ধুলো, মনে হয় যেন অনেক দূর থেকে এসেছে।

মুন্সীমশাই পড়গড়ার জলটি সরিয়ে রেখে কলাস পাতা তক্তাপোষ থেকে নামলেন। ছেলেটিও বৈঠকখানার দিকে এগিয়ে এসে, দরজার কাছে মুন্সীমশাইকে দেখে হাত জোড় করে নমস্কার করল। তারপর বেশ বিনীতভাবেই জিজ্ঞাসা করল—আজ্ঞে এটা কি মুন্সী মশাইর বাড়ি?

—হ্যাঁ, কাকে চাও তুমি?

—"আজ্ঞে, বাড়ির কর্তা রামচন্দ্র মুনসী মশাইর সঙ্গে"—

—"আমিই রামচন্দ্র মুন্সী, বলো বাবা, কি দরকার?

ছেলেটি আবার নমস্কার করল। একটু ইতস্তত করছে দেখে মুন্সীমশাই আবার অভয় দিলেন—"বলো বাবা, কোন সঙ্কোচ নেই, আমার কাছে কেউ কিছু বলতে কোনরকম সঙ্কোচ করে না।'

—"আজ্ঞে আমি এসেছিলাম আশ্রয় পাবার আশায়, লেখা পড়া শেখবার খুব ইচ্ছে, বাড়ির অবস্থা ভাল নয়, তাই চলে যাচ্ছিলাম যদি কোন সুবিধে হয়। পথে আপনার নাম শুনে এসেছি, আপনি যদি দয়া করে একটা ব্যবস্থা করে দেন তাহলে লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি।"

মুন্সীমশাই অবাক হয়ে গেলেন, চাকরি বাকরি নয়, টাকা-পয়সা, ধনদৌলত নয়, শুধু লেখাপড়া শেখবার আশায় তাঁরকাছে এসেছে এমনটি তো আজকাল দেখা যায় না, ভারী আশ্চর্য কথা বলছে ছেলেটি।

—লেখাপড়া শিখতে চাও, সে তো খুব ভাল কথা, তুমি কোথা থেকে আসছো বাবা, তোমার নাম কি?

—আমার নাম ভারতচন্দ্র রায়, আসুড়ি সুরগুই পরগণার পাণ্ডুয়া থেকে।

—কি গোত্র তোমাদের?

—আজ্ঞে আমরা ব্রাহ্মণ, ভরদ্বাজ গোত্র।

—আরে সর্বনাশ, তুমি একে অতিথি, তায় ব্রাহ্মণ, এতক্ষণ বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছি, ছিঃ ছিঃ যত বয়স হচ্ছে, ততই কি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাচ্ছে।—এসো বাবা তুমি ভেতরে এসে বসো—মুন্সীমশাই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

—ওরে নিধে, নিধিরাম শিগ্‌গির পা ধোবার জল নিয়ে আয়, বাড়ির ভেতর বদ্‌বি একজন ব্রাহ্মণের কলার হবে।

—ভারত লজ্জিত মুখে বললো—অত ব্যস্ত হবেন না, আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ—

—ব্যস্ত হব না কিরকম, তুমি ব্রাহ্মণ-সন্তান, বয়সে ছোট হলে কি হবে, শালগ্রাম শিলার আবার ছোট বড় আছে নাকি—মুন্সীমশাই নিজের হাতে ভারতের পুটুলিটা নিয়ে তক্তাপোষের উপর রাখলেন।

নিধিরাম একঘটি জল, গামছা এনে দিল। রোয়াকের পাশে দাঁড়িয়ে হাতমুখ ধুয়ে মুখ মুছতে মুছতে দেখল ভারত পেছনের দরজা দিয়ে মুন্সীমশাই এলেন। তাঁর এক হাতে শ্বেতপাথরের গেলাসে জল আরেকহাতে শ্বেতপাথরের রেকাবীতে কয়েকটা নারকেলের সন্দেশ।

—"এসব আপনি কি আরম্ভ করলেন—ভারত বিনীত ভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

মুন্সীমশাই বললেন—কিছু না, কিছু না, তুমি বসো,

কটু জল মুখে দাও, তারপর তোমার কথা সব শুনছি, কিরে কি খাবে বলো ত, যদি ভাত খাও সব যোগাড় করে দিচ্ছি নিজে দুটিয়ে নেবে। ভারত ফরাসপাতা তক্তপোষের একপাশে বসতে বসতে বললো—রাতে আর ওসব হাঙ্গামা করবেন না, একটা রাত তো—

মুনসীমশাই তাঁর সামনে রেকাবী খানা রেখে বললেন—কিছু মুখে দেবে না, সেকি হয়। রান্না করতে না চাও, তবে চিঁড়ে দিয়ে কলার ক'রো, ঘরে পাতা দই, মর্তমান কলা রয়েছে সন্দেশ আছে, ভালো আখের গুড় আছে, তাই দিয়ে কেমন, ওরে নিধে শুনছিস তো, বাড়ির ভেতর বলগে যা আর দক্ষিণের পাশের ঘরটা খুলে পরিষ্কার করে বাবাসুব্রের বিছানা করে রাখবি।

ভারত সন্দেশ কটা মুখে দিয়ে চকচক্ করে এক গেলাস জল খেয়ে ফেলল। উঃ এই ভাদ্রের কাট-কাটা রোদ্দুর মাথায় নিয়ে এতটা পথ হাটা। তিনদিন তিনরাত্তির বাড়ি ছেড়ে পথে পথে কাটিয়েছে।

গত পরশু একবাড়ি ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিমন্ত্রণ পেয়েছিল। তারপর থেকে একরকম অনাহারেই কেটেছে। ইচ্ছে ছিল গঙ্গা যাবে, কিম্বা গঙ্গা পার হয়ে কালিঘাটের দিকে। ওসব দিকে অনেক বড়লোকের বাস, ব্যবসা-বাণিজ্যের জায়গা, কটা কাজ হয়তো জুটে যাবে। পথে মুনসী মশাইর নাম-টাক শুনে দেবানন্দপুরের দিকেই চলে এল। ভেবেছিল যদি কাছাকাছি আশ্রয় জুটে যায়, তাহলে, না হয় অন্ততঃ দুএকদিন কটু ঠাঁই নিয়ে ভেবেচিন্তে দেখবে।

এখন বাইরে অন্ধকার ঘন হয়েছে। তেঁতুল তলায় একটা জোনাকি উড়ছে। সন্ধ্যার শেষ পাখিটিও ঘরে ফিরেছে। ওদিকে চণ্ডীমণ্ডপের পাশার আসর থেকে একজন মুনসীমশাইকে ডাকতে এসে ফিরে গেছে।

ভারত তখন ধীরে ধীরে তার সমস্ত কথা বলছিল। ঘরে ঘরে প্রদীপ দিয়ে গেছে।

মুনসীমশাই চোখ বুজে চুপচাপ বসে শুনছিলেন। প্রদীপের আলোয় তাঁর গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে কেন যেন মনে হচ্ছিল, একে বিশ্বাস করে সব কথা বলা যায়, এ যেন পরম নির্ভরের মানুষ।

কিছুই বাদ দিল না ভারত। বর্ধমানের রাজার সঙ্গে বিরোধ, মামাবাড়ি নওয়াপাড়ার জীবন, তাজপুর টোলের পণ্ডিত ভীমদাস আচার্য, সারদাগ্রামের সেই ফুটফুটে মেয়েটি, যার নাম রাধা, যার বাবার নাম : রোত্তম আচার্য শেষ পর্যন্ত বাবা-দাদাদের ব্যবহার—সকলের সব কথাই খুলে বললো ভারত।

সমস্ত কথা শুনে মুনসীমশাই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। মনে মনে উদ্বেগ বোধ করছিল সে। কি জবাব শুনতে হবে। আশ্রয় কি মিলবে না, তার অনুমান কি ভুল হল, এত আশা কি ব্যর্থ হয়ে যাবে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুনসীমশাই বললেন সবই অদৃষ্ট বাবা, অদৃষ্টই তোমাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, না হলে কত বড় বংশের ছেলে তুমি, তোমার কি এভাবে পথে পথে আশ্রয়-ভিক্ষা করে ঘুরে বেড়াবার কথা, আমাদের শাস্ত্রে একটা কথা আছে জানো—ভাগ্যং ফলতি সর্বত্রম, নচ বিদ্যা নচ পৌরুষম, তবে তোমার উদ্যমের আমি প্রশংসা করি, আমি কায়স্থ-সন্তান তোমাকে আশীর্বাদ করার স্পর্ধা আমার নেই, কিন্তু ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি সফল হও, পরম কল্যাণময় তোমার কল্যাণ করুন।"

রামচন্দ্র মুনসী কিছুক্ষণ আবেগ স্তব্ধ হয়ে চোখ বুজে রইলেন। তাঁর চোখের কোণে দু'ফোঁটা জল চিক্‌চিক্ করতে লাগল। ভারত কেমন বিহ্বলের মত একটু সময় চুপ করে থেকে, শেষে বললো—"আপনি তা'হলে আমার একটা ব্যবস্থা করে দেবেন।"

মুনসীমশাই চোখ বুজেই জবাব দিলেন "ব্যবস্থা আর কি, তুমি আমার এখানে থাকবে, লেখাপড়া শিখবে, এতো খুব আনন্দের কথা, কিন্তু"—চোখ মেলে তাকালেন—"একটা

কথা কি জানো বাবা : তুমি বড্ড নাবালক, তোমার বয়স বড় জোর পনের ষোল, বাপ-মায়ের অমতে আমি যদি তোমাকে আশ্রয় দিই, শেষকালে তোমার বাবা যদি নবাব-বাহাদুরের কাছে আমার নামে নালিশ ঠুকে দেন, তখন আমি বিপদে পড়ে যাব, জানোতো মুর্শিদকুলি খাঁ কি রকম জবরদস্ত নবাব" —

ভারত জবাব দিল —"আমি যদি বলি, আমি ইচ্ছে করেই আপনার আশ্রয়ে আছি"

—তাহলেও একটা গণ্ডগোল হতে পারে— মুন্সীমশাই গোঁফে আঙুল বুলিয়ে বললেন—আমাদের ছেলে বয়সে শুনেছি হার্মাদের কথা, হার্মাদরা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ধরে নিয়ে যেত, তারপর তাদের দূরদূর দেশে বিক্রী করে দিত। সেসময় তোমার মত চেহারার অচেনা ছেলে কারো বাড়ীতে এলেই লোকে নানা রকম সন্দেহ করত, অবশ্য সে সব দিন আর নেই, হার্মাদের দিন শেষ হয়ে গেছে অনেককাল আগে, আমরা তখন খুব ছোট, বাবার মুখে শুনতুম হার্মাদের কথা। কত গ্রাম, কত দেশ যে তারা শ্মশান করে দিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই, তারপর সম্রাট আওরঙ্গীবের মামা নবাব শায়েস্তা খাঁ তাদের শায়েস্তা করলেন, এখন আর অবশ্য সে সব দিন নেই, তবে কি জানো,—মুন্সীমশাই এদিক-ওদিক তাকিয়ে গলা নামিয়ে প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে বললেন— হুগলীর ফৌজদার আমাকে খুব ভাল চোখে দেখে না, তার ধারণা আমার হাতে খুব টাকা পয়সা আছে—তারপর একটু হেসে আবার স্বাভাবিক গলায়—আমি সাধারণ গৃহস্থ সামান্য সামর্থ্য তাই দিয়ে বাপ-মায়ের ক্রিয়াকর্ম, পূজা-পার্বনগুলো বজায় রেখেছি, অতিথি অভ্যাগতরা দয়া করে আমার এখানে পায়ের ধুলা দেন, সাধ্যমত তাদের সেবা-যত্ন করার চেষ্টা করি, তাওতো পেরে উঠি না, ইচ্ছামত সব করতে পারি না, টাকার অভাব, অথচ লোকে কানাঘুষো করে, ওঃ দেবানন্দপুরের রায় মুন্সীর মেলা টাকা।"

আবার কিছুক্ষণের চুপচাপ, শেষে মুন্সীমশাই বললেন — থাকো আমার এখানে, ঘরের ছেলের মতো থাকবে, আমি যতটা পারসী আমি সাধ্যমত শেখাবো, মৌলবী সাহেবকেও বলে দেব, তিনিও তোমাকে সাহায্য করবেন, তোমার বাবাকে একটা খবর পাঠিয়ে দেব, যাই হোক বাপ-মায়ের মনে কষ্ট দিয়ে পালিয়ে এসে ভাল করোনি বাবা।"

ভারত অভিমানের সুরে বললো—"তারাও কি আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছেন"—কিন্তু তারা হলেন বাবা-মা— রামচন্দ্র মুন্সী একটু স্নেহের হাসি হাসলেন—আমরা আমাদের সৃষ্টি কর্তা ঈশ্বরকে দেখি না, কিন্তু যাদের অনুগ্রহে যাদের আশীর্বাদ নিয়ে এই জীবন যাত্রা শুরু করেছি, তাদের তো দেখতে পাই, শাস্ত্রে বলেছে, পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, তোমাকে তো বাবা এসব কথা বলার কিছু নেই।" ভারত আবার বললো—"আমি আপনার আশ্রয়ে থাকবো কিন্তু নিষ্কর্মা গলগ্রহ হয়ে থাকতে চাই না, আমায় একটা কাজ দেবেন—

এ ছেলেটি যে পরের গলগ্রহ হয়ে থাকার মতো নয়, প্রথম দেখেই মুন্সীমশাই বুঝতে পেরেছিলেন' একটু হেসে জিজ্ঞেস করলেন —কি কাজ করবে তুমি?

—"যা হোক দেবেন একটা বিবেচনা করে।"

একটু সময় ভেবে জবাব দিলেন মুন্সীমশাই—"আচ্ছা, তা'হলে এক কাজ ক'রো, আমার দুই ছোট নাতি আছে, তাদের পড়াবে তুমি, ওদের সংস্কৃত পড়াবে।"

সপ্ত

দেবের আনন্দধাম দেবানন্দপুর গ্রাম। ভারত মনে মনে কবিতা আওড়ায়। কয়েকদিন আগে একখানা আশ্চর্য পুঁথি হাতে এসেছে। মুন্সীমশাইর ঘরে অনেক পুরনো পুঁথি-পত্তরের মধ্যে এখানা ছিল। চণ্ডীমঙ্গলের পুঁথি। লেখক কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। যত পড়ছে, তত্ই

মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। এরকম একখানা পুঁথি লিখতে পারলে কেমন হয়। পুঁথির মধ্যে কবিকঙ্কণ যেমন নিজের পরিচয় দিয়েছেন, যার কাছে যেটুকু উপকার কিম্বা যা খানি অবিচার পেয়েছেন সব যেমন খুঁটিয়ে লিখেছেন ভারতও তেমনি ভাবে লিখবে, তার নিজের কথা, বাবার কথা, এই দেবানন্দপুরের কথা, রামচন্দ্র মুন্সীর কথা।

মনে মনে কবিতার কলি আওড়ায় ভারত, কিন্তু গুছিয়ে লেখার মত উৎসাহ পায় না। লেখার বিষয়বস্তুও চাই। কোন দেবতার মাহাত্ম্য নিয়ে না লিখলে কেউ তার কাব্য পড়বে না। চণ্ডীদেবীর কাহিনী নিয়ে লেখা যায়, কিন্তু নতুন ভাবে, নতুন চঙে না লিখতে পারলে, সেই পুরনো কথা কে শুনবে। তাছাড়া কবিকঙ্কণের মত এতবড় কবি-প্রতিভা যে কাহিনী লিখে গেছেন, তার পাশাপাশি কিছু লিখতে হলে অনেক পড়াশোনা করা প্রয়োজন। রামায়ণ, মহাভারত পুরাণ, ভাগবত। আবার জীবিকার জন্য নতুন ভাষা শিখতে হচ্ছে। এখন তাই পড়াশোনাতেই মত্ত ভারত। নতুন শিখছে—পারসী। খুব ভোরে উঠেই স্নান করে, সন্ধ্যা-অহ্নিক সেরে, ছোট্ট উনুনে ভাত চাপিয়ে দেয়। ভাত আর বেগুন পোড়া। একটা বেগুন পুড়ে এবেলা আধখানা, ওবেলা আধখানা। মুন্সীবশাই চালডাল, তেল নুনলা, লাউ-কুমড়া নানা তরিতরকারী পাঠিয়ে দেন, কিন্তু অতসব রান্নার ঝামেলা কে করে। ওতে অনেক সময় নষ্ট, আর রান্না করতেও সে অভ্যস্ত নয়। তালপুরের টোলে যে দিন রান্নার ভার পড়তো, সেদিন বিষ্ণু আর বিদ্যাধরকে খোসামোদ করতে করতে প্রাণ বেরিয়ে যেত। ওরাই যারো আনা কাজ গুছিয়ে দিত। কোথায় রইল বিষ্ণুপদ, কোথায় গেল বিদ্যাধর, আর সে এখানে দেবানন্দপুরে প্রায় নির্বাসিতের মত আছে।

এ একরকম ভালই হয়েছে। কোন কিছু আয়ত্ত করতে হলে একাগ্রচিত্ত হতে হয়। বাইরের সমাজ-সংসার থেকে মন গুটিয়ে নিতে হয়। সেই তালপুরের টোলের দিনগুলির মতই সে এখন দিনরাত পরিশ্রম করে। এখানে বিষ্ণুপদ নেই, বিদ্যাধরের কচকচি নেই, ছোটমামার খোশগল্প শুনতে হয় না। এখানে একা-একা পড়াশোনার সুবিধে অনেক বেশি। কোন কোন দিন ভোরবেলা মৌলবী সাহেব আসেন। তারপর প্রায় সারাদিন পারসীর পাঠ-চর্চা চলে। রামচন্দ্র মুন্সী নিজেও ভাল পারসী জানেন। এক এক দিন তিনিও ভারতকে নিয়ে বসেন। সন্ধ্যাবেলা মুন্সীমশাইর দুই নাতিকে একটু সংস্কৃত পড়াতে হয়। তারপর নিজের ছোট ঘরে এসে কোন দিন কোনরকমে তাড়াতাড়ি দুটি ভাত ফুটিয়ে নেয়, কিম্বা কোনদিন শুধু দই-চিড়ের ফলার করে। তারপর প্রদীপ জেলে অনেক রাত অবধি পুথি-পত্তর নিয়ে বসে। কবিকঙ্কণের পুঁথি পড়ে। মনে মনে কবিতার কলি গুনগুন করে। কবিকঙ্কণ যেমন আত্মপরিচয়ে লিখছেন :—

মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয় নন্দন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ।

তেমনি ভারতও তার আত্মপরিচয় লিখবে—ভরদ্বাজ অবতংস, ভূপতি রায়ের বংশ।

তার লেখা পুঁথি নানা জনে নকল করে দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে দেবে। শতাব্দীর সেতু পার হয়ে একজনের খবর আর এক জনে পৌঁছে দেবে, এক জীবনের সংবাদ নিয়ে অন্য জীবনের দুয়ারে যাবে।

কিন্তু একটা উপলক্ষ্য পেলে অন্ততঃ ছোটখাট একখানা পুঁথি লেখা যেত। লিখে কাউকে শোনান যেত, মুন্সীবশাই নিশ্চয় মন দিয়ে শুনতেন, ভাল মন্দ যাহোক কিছু বলতেন। কিন্তু গায়ে পড়ে নিজের কবিতা পড়ে শোনাতে কেমন যেন লাগে।

উপলক্ষ্য একদিন জুটে গেল। ভোরবেলা মুন্সীবশাই ডেকে পাঠালেন। ভারতের কুঠুরিটা চণ্ডীমণ্ডপের পাশে

আবার বৈঠকখানারও কাছে। কুটুরীর পেছনে অন্দরের আঙিনা, সামনে সদরের উঠোন। কিছুদূরে পথের পাশে সেই তেঁতুলগাছটা। কুটুরিটা প্রায় খালিই থাকে সারাবছর। শুধু দুর্গোৎসবের সময় দু'একজন অতিথি এসে দু'একদিনের জন্য আশ্রয় নেয় এখানে। নিরিবিলি এই ঘরটা পেয়ে ভারত ভারি খুশি। চণ্ডীমণ্ডপের লাগোয়া পুজোর ভোগ রান্নার জন্য যে চালাঘর, তার এককোণে নিজের ভাত কটা ফুটিয়ে নেয়। এত ভোরে মুন্সীমশাই ডেকে পাঠালেন কেন? ভারত কিছুটা বিস্মিত ভাবেই বৈঠকখানা ঘরের সামনে এল।

রামচন্দ্র মুন্সী তাকে দেখে বললেন—"এই যে বাবাঠাকুর, তোমার আসতে দেরী দেখে আমি নিজেই যাব ভাবছিলাম।"

—"আপনি এত ব্যস্ত হলেন কেন?"

—"ব্যস্ত ঠিক নয়, একটা ব্যাপারে তোমার অনুমতি নেবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।"

—"আপনি এমন ভাবে কথা বলে লজ্জা দেন—ভারত বিনীতভাবে হাসল—আমার অনুমতি আবার কিসের জন্য, আপনি যা আদেশ করবেন—

—'ছিঃ ছিঃ ওকথা বলো না, বাবাঠাকুর"—রামচন্দ্র মুন্সী জিভ কাটলেন—"ব্রাহ্মণের ছেলেকে আমি কি আদেশ দিতে পারি, কথাটা হচ্ছে কি, আজ আমার এখানে সত্যনারায়ণের পুজো, বরাবর যিনি পুজো করেন, তাঁর অসৌচ হয়েছে, তাই আমার ইচ্ছে আজকের পুজোটা তুমি করো, বাড়ির সবারও সেই মত, তুমি ভোরেই রান্না করে খেয়ে নাও কিনা, তাই আগেই খবরটা পাঠালুম, তুমি আজ ভাত খেও না, যা হোক ফলটল মুখে দিও, সন্ধেবেলা পুজো সারাদিন বাবা তোমার কষ্ট হবে।"

ভারত জবাব দিল—'না না কষ্ট হবে কেন, ওরকম উপোস করার খুব অভ্যেস আছে আমার, আপনি কিছু ভাববেন না।"

—"তা'হলে তোমার কোন আপত্তি নেই তো?'—

—"আপত্তি থাকবে কেন, এতো খুব আনন্দের কথা।"

—"হ্যাঁ বাবা, আমার খুব ইচ্ছে আজের পুজোটা তুমিই ক'রো, আর বাড়ির সমস্তেতো এক কথায় তোমার নামই বললো—মুন্সীমশাই হাসলেন—"পুজোর শেষে সত্যনারায়ণের পাঁচালী পাঠ হয়, ওই পুঁথিও তোমাকেই পড়তে হবে।"

পাচালীর নাম শুনে উৎসুক হলো ভারত—কই পুঁথিখানা একটু দেখাবেন।

—তুমি ব'সো বাবা আমি নিয়ে আসছি—মুন্সীমশাই ভেতরে গেলেন, খানিকবাদে তুলোট কাগজে লেখা একখানা ছেড়া ছেড়া পুঁথি নিয়ে এলেন।

ভারত আগ্রহের সঙ্গে-পালটে দেখল পুঁথিখানা। হাতে লেখা পুঁথি। সামনে-পেছনে কয়েকখানা পাতা নেই। কালির অক্ষর অনেক জায়গায় বিবর্ণ হয়েছে। হাতের লেখাও ভাল নয়। আচ্ছা, এরকম একখানা পুঁথি লিখে আনলে কেমন হয়। খুব বেশি বড় হবে না। আজ দুপুরের মধ্যেই লিখে ফেলা যাবে। আপার আগ্রহে মনে মনে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল। নিজে লিখে আনবে এ কথা সোজাসুজি বলতে পারল না।

একটু ইতি-উতি করে বললো—'এরকম একখানা পুঁথি আমার কাছেও আছে, এর চেয়ে ভাল ছাড়া খারাপ হবে না, আমি ভাবছি আপনি যদি অনুমতি দেন তবে সেই পুঁথিখানাই পড়ব।"

একটু যেন ক্ষুণ্ণ হলেন মুন্সীমশাই, অন্তত: মুখচোখের চেহেরা দেখে তাই মনে হ'ল, বললেন—"কেন, এ পুঁথিখানা চলবে না।"

—"চলবে না কেন, না হয় নতুন পুঁথি একখানা শুনলেন, ক্ষতি কি?

—'না, ক্ষতি কিছু নেই, কার লেখা পুঁথির কথা বলছ তুমি?—মুন্সীমশাইর এ জিজ্ঞাসার জবাব দিল না ভারত, উঠে দাঁড়িয়ে বললো—"সন্ধ্যাবেলা আপনাকে এনে দেখাব, আমি এখন যাই।" কোনরকমে উত্তেজনা চেপে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল সে। রামচন্দ্র মুন্সী একটু অবাক হয়ে তার যাবার দিকে তাকিয়ে রইলেন। (ক্রমশঃ)

(হেগেলীয় দর্শন—৩৪৬ পৃষ্ঠার পর)

কারণ হেগেলীয় তত্ত্বের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করতে হলে বিনশনকে বিনশন রাখলে চলবে না।*

কাজেই হেগেলীয় লজিকতে বাঁচাতে হলে এই 'বিনশন'কে আসন দিলে চলবে না। 'বিনশন' যে হেগেলীয়তত্ত্বে অতি নগণ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে, সেইটি দেখাতে পারলেও একরকম করে আত বাঁচানো চলতে পারে। হেগেল, বিরুদ্ধতা (opposition), বিনশন (negation) ইত্যাদি শব্দগুলিকে নানা স্থানে নানা রকম অর্থে ব্যবহার করেছেন। আগে দেখা গেছে otherness, opposition বা negation এই দুটো পরিভাষাকে হেগেল গণ্ডগোল করেছেন। বিনশনকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্নার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এই অর্থের বিভিন্নতা থেকে ম্যাক টাগার্ট প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে হেগেল সর্বত্রই negation কে নাস্তিমূলক অর্থে ব্যবহার করেন নাই। ম্যাক টাগার্টের মতে, হেগেল বিভিন্ন অর্থে negation কে ব্যবহার করেছেন। কোনো কোনো জায়গায় অবশ্য negation কে নাস্তিমূলক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তার মতে অত্যন্ত নীচু স্তরের ব্যাপারে 'বিনশনকে' বিরুদ্ধতা অর্থে বা নাস্তার্থক ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু পরে উচ্চ ও উচ্চতর ক্ষেত্রে ক্রমেই বিনশনের (negation) নাস্তিমূলক অর্থ বর্জন করে পূর্ণতাপ্রাপ্তির (completion) অর্থ প্রয়োগ করা হয়েছে। হিসাব করলে দেখা যাবে যে আসলে বিনশনের প্রভাব ক্রমেই কমে এসেছে হেগেলের দর্শনে এবং শেষে বিনশন একেবারে বিরুদ্ধ অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ বিনশন (negation) হয়েছে পূর্ণতাপ্রাপ্তি (completion)। এইভাবে ম্যাক টাগার্ট হেগেলীয় negation যে ক্রমেই নখদন্তহীন ও অক্ষম হয়ে পড়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে সমস্ত দর্শনে যে বিনশনের স্থান অতি অকিঞ্চিৎকর, সেইটে দেখাতে চেষ্টা করেছেন; এই অভিনব ব্যাখ্যার ভিত্তি হয়েছে হেগেলের একটি উক্তি।*

হেগেলের এই উক্তিটিকে ভিত্তি করে ম্যাক টাগার্ট তাঁর বিনশনের (negation) নতুন ব্যাখ্যাকে রচনা করেছেন। "The development of the method" নামক একটি সম্পূর্ণ অধ্যায়ে তিনি এই তত্ত্ব বিবৃত করেছেন যে হেগেলীয় ডায়ালেকটীক পদ্ধতিও ক্ষেত্র অনুসারে ক্রমবিকশিত হয়েছে এবং তিনটি পর পর ক্ষেত্রে তিন রকমের রূপ ধারণ করেছে। ডায়লেকটিকের ভিত্তি হচ্ছে 'বিনশন'-তত্ত্ব। কাজেই ডায়লেকটিকের তিনটি ক্ষেত্রে বিবিধ রূপায়নের অর্থ হচ্ছে এই যে negation-এর স্বরূপও ওই তিন ক্ষেত্রে বিবিধ

---

* "This, however, is one of the points at which the difficulty, always great, of distinguishing what Hegel did say from that which he ought in consistency to have said, becomes almost insuperable....on the other hand, the absence of any detailed exposition of a principle so fundamental as that of the gradually decreasing share taken by negation in the Dialectic and the failure to follow out all its consequences seem to indicate that he had either not clearly realised it or had not perceived its full importance."

(Art 9, Ibid)

* "The abstract form of the advance is, in Being, an other and transition into an other; in essence showing or a reflection in the opposite, in Notion the distinction of individual from universality, which continues itself as such into and as an identity with what is distinguished from it."

(Sec 240, Logic-Encyclopaedia)

প্রণালীতে বিবর্তিত হয়েছে। হেগেল মননার (thought) তর বা রূপ কল্পনা করেছেন। Being, Essence এবং Notion এই তিনটি স্তরে Idea-র স্বরূপ তিন রকমের। ম্যাক ট্যাগার্ট দেখিয়েছেন যে Idea-র বিকাশ বা অগ্রগতির মুখে এই তিন ক্ষেত্রে Idea-র যে ডায়লেকটিক গতি-প্রণালী (method) তাও তিন রকম রূপ ধারণ করেছে। ক্ষেত্র অনুপাতে নীতিরও তারতম্য ঘটেছে। কাজেই ডায়লেকটিক নীতির প্রাণ যে বিনশন-তত্ত্ব, তারও তিনটি ক্ষেত্রে তিন প্রকারের আচরণ যে আমরা দেখতে পাবো তাতে বিচিত্র কি? অর্থাৎ সাদা ভাষায় ঐ তিন স্তরে বিনশনের অর্থ তিনরকম বলে বুঝতে হবে। হেগেলের উল্লিখিত উক্তিটি (Sec 240) থেকে ম্যাক ট্যাগার্ট এই তত্ত্বকে উদ্ধার করেছেন। এবং পঞ্জিকের আরও দুটি মন্তব্য (notes on Art 111 & on Art 161 Logic) থেকে এই তত্ত্বের সমর্থন আহরণ করেছেন। Being-এর ক্ষেত্রে স্থিতি ও প্রতিস্থিতির ভেদ ও স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত উগ্র, কিন্তু মৈত্রী ও সম্বন্ধ কম। কাজেই এ-ক্ষেত্রে 'বিনশন' ও অতি উগ্র। তারপরে Essence-এর ক্ষেত্রে স্থিতি ও প্রতিস্থিতির বৈষম্য প্রচুর থাকলেও এদের পরস্পরের সহযোগিতা, অন্যোন্য-অপেক্ষিতা (dependence) বা মৈত্রীভাব বেশী। কাজেই এখানে বিনশন-এর তীব্রতা খর্ব হয়ে গেছে। এর পরেই Notion-এর ক্ষেত্রে স্থিতি প্রতিস্থিতি এর বিরুদ্ধতা বা বৈষম্য ঘোটেই নেই। এমন কি এদের স্বাধীন ও বিচ্ছিন্ন সত্তা পর্যন্ত নাই। এখানে স্থিতি ও প্রতিস্থিতি হচ্ছে একই বিবর্তমান বস্তুর বিকাশের দুটো অবস্থা মাত্র। এখানে negation বা বিনশন নাই। যা আছে তার নাম "development" বা পরিণতি। যা আগে ছিল "অনুদ্ভূত বৃত্তি" বা গুপ্ত, তাই পরে হলো "উদ্ভূতবৃত্তি" বা প্রকাশ্য। যা স্থিতি-রূপে ছিলো গুপ্ত (implicit) তাই হলো প্রকাশ্য (explicit) প্রতিস্থিতিরূপে, কাজেই স্থিতিকে বিনষ্ট করে বা বিরুদ্ধতা করে প্রতিস্থিতির আবির্ভাব হয় নাই। স্থিতির পরিণাম বা বিকাশ বা সার্থকতাই হলো প্রতিস্থিতি। এখানে কাজেই 'বিনশন' হলো পূর্ণতাপ্রাপ্তি (completion)। এর দৃষ্টান্ত হেগেল দিয়েছেন প্রাণিজগতের ক্ষেত্র থেকে "বীজে ও গাছে।"

"The movement of the Notion is 'Development", by which that only is explicitly affirmed which is already implicitly present. In the world of nature it is organic life that corresponds to the grade of the notion. Thus, e.g. the plant is developed from its germ. The germ virtually involves the whole plant ..... in the process of development, the notion keeps to itself and only gives rise to alteration of form without making any addition in point of content." (Notes on Art 161, Logic : Hegel Pp 269, ed Wallace)

(ক্রমশঃ)

পূর্ব গগনে এ কিসের ইঙ্গিত ?

রাজর্ষি

পূর্ববঙ্গ থেকে সংবাদ এসেছে, আশার সংবাদ, সেখানকার বাঙালীরা স্বায়ত্ত শাসন দাবী করেছে; পূর্ব-বাঙলার বাঙালীরা বাঙালী হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার দাবী করেছে। বাঙালীর মসীকৃষ্ণ ভবিষ্যপটে একটু কি আলোর আভাস দেখা যাচ্ছে ?

পূর্ববঙ্গেই বাঙালীরা—মুসলমানবাঙালীরা—তাদের মাতৃ-ভাষার সিংহাসন রক্ষা করেছে জীবন দিয়ে, রক্তাক্ষরে রচনা করেছে মাতৃভাষার পূজাবেদী। বাঙলা ভাষা আজ শুধু পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা নয়, বাঙলা ভাষা আজ সমগ্র পাকিস্তানে দ্বিতীয় সরকারী ভাষা। বাঙালী তার ভাষার জন্য সংগ্রাম করেছে, প্রয়োজন হলে তার বাঙালীত্ব রক্ষা করতে সে জীবন পণ করতে পেছপা হবেনা। নিঃসন্দেহে বাঙালী ও তার বাঙলা ভাষা সসম্মানে বেঁচে থাকবে পূর্ব-বঙ্গ তথা পূর্বপাকিস্তানে।

দেশ-বিভাগোত্তর বাঙলা দেশ, দ্বিধাবিভক্ত বাঙালী জাতি, অবলুপ্তির দ্বারে ঝুঁকছিল, পূর্ব ও পশ্চিম দুই বাঙলাতেই। আশার সংবাদ পূর্ববঙ্গে বাঙালী আজ অবধারিত মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষতে রুখে দাঁড়িয়েছে। ঘসে ঘসে সে আর মার খাবে না, মৃত্যুর পরোয়ানাকে সে করবে বিতর্ক, পরাজিত।

আর পশ্চিমবঙ্গ ? দেশবিভাগের প্রাক্কালে শনিবারের চিঠি পত্রিকার সম্পাদক (সজনীকান্ত দাশ) সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন—"পেঁয়াজের গন্ধ বাঁচাইতে গিয়া আমরা যেন "ছাতু" না বনিয়া যাই"। সে এক আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী ! পশ্চিম বাঙলায় বাঙালী আজ নিঃসন্দেহে "ছাতু" বনে যাচ্ছে। যে পথে আমরা চলেছি তাতে এই পরিণতি অবশ্যম্ভাবী। ভারতের বুক থেকে বাঙালীর ক্রম-বিলুপ্তিই তার ভাগ্যলেখা। বাঁচতে হলে বাঙালীকে নতুন পথের সন্ধান করতে হবে। সেই নতুনের ইঙ্গিতই আজ দেখা যাচ্ছে পূর্ব গগন-কোণে। দুই বাঙলার পুনর্মিলনেই কি সেই পথ ? নতুন বাঙলা পুনর্গঠন করে বাঙালীকে বাঙালী হিসেবে বাঁচতে হবে। সে বাঙালী ধর্মে মুসলমান হোক, খৃষ্টান হোক, বৌদ্ধ বা হিন্দু হোক সে প্রথমে বাঙালী, চিরদিনের, চিরকালের বাঙালী। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান বা যে কোন ধর্মাবলম্বীই হোক বাঙালীর দেশ বাঙলাদেশ, বাঙলা বাঙালীর।

'বাঙলা দেশ বাঙালীর' এই প্রতীতি নিয়ে আমাদের অগ্রসর হতে হবে পুনর্গঠনের পথে। বাঙালী অধ্যুষিত সমস্ত এলাকা একত্র করে নববঙ্গের পত্তন করতে হবে। প্রতিষ্ঠিত হবে বাঙালীর জন্ম, মর্ম ও কর্মভূমি।

এজন্য প্রথমেই চাই দৃঢ় আত্ম-বিশ্বাস, চাই লক্ষ্যের প্রতি অটুট আস্থা। চাই ক্ষুদ্র স্বার্থের চিন্তা বিসর্জন, আর চাই পরস্পরের উপর বিশ্বাস, ক্ষুদ্র ঈর্ষা ত্যাগ, ধর্ম-কর্ম-আচার নির্বিশেষে সমস্ত বাঙালীকে পরমাত্মীয় বলে অন্তর মধ্যে গ্রহণ করা।

একটু পেছনের দিকে তাকালে দেখা যাবে বাঙালী মুসলমান দেশবিভাগের জন্য প্রবল আন্দোলন করেছিল।

দেশ-বিভাগ আন্দোলনের এক ছাত্রার জনক অধ্যায় ছিল ১৯৪৬ সালের কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। আর এই পথেই তৈরী হোলো দেশ-বিভাগের পটভূমিকা ও প্রতিশ্রুতি। এলো সাম্রাজ্যবাদীদের সুযোগ।

ঠিক এই মুহূর্তে পাকিস্তানের সৃতিকাগারে, মুসলমান বাঙালী কী করেছিল? সে কী সত্যিই বঙ্গবিভাগ চেয়েছিল? মুসলমান বাঙালী কী চেয়েছিল সমগ্র বাঙলা নিয়ে পাকিস্তানে যোগ দিতে? ইতিহাসের সাক্ষ্য কিন্তু অন্যরূপ। কী বলে ইতিহাস, কী তার সাক্ষ্য? উল্টে দেখুন ইতিহাসের পাতা। দেখবেন, পাকিস্তান আসন্ন-প্রায় দেখে বাঙালী মুসলমান ধমকে দাঁড়িয়েছে। এ কোথায় চলেছি! আমরা মুসলমান বটে, কিন্তু আমরাও তো বাঙালীও। এ কার নয়া দাসত্ব বরণ করতে ছুটে চলেছি আমরা?—প্রশ্ন করেছে বাঙালী মুসলমান নিজেকে। দৃষ্টি-স্বচ্ছ হয়ে আসে, সম্বিত ফিরে আসে। সর্বনাশের প্রতিরোধ করে ফিরে দাঁড়ায় বাঙালী মুসলমান। চেষ্টা সে করবে, শেষ চেষ্টা, অভিবিলম্বে হলেও শেষ চেষ্টা না করে সে হাল ছেড়ে দেবে না।

এগিয়ে এলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলীম লীগের সম্পাদক আবুল হাশেম, এগিয়ে এলেন যুক্ত বাঙলার লীগ মন্ত্রিসভার ফজলুর রহমান, এলেন বিধান সভার সদস্য আব্দুল মালেক, বগুড়ার মহম্মদ আলি এবং মুসলমান সমাজের নেতৃস্থানীয় আরও অনেকে। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এঁদের নেতৃত্ব নিলেন কলকাতা ধ্বংসলীলার কুখ্যাত নায়ক সহিদ সুরাবর্দি। গেলেন তাঁরা জননায়ক শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের কাছে। সেখানে শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়, সত্যরঞ্জন বক্সী প্রভৃতির সঙ্গে চলল আলোচনা ২৩শা মে, ১৯৪৭ সালের সন্ধ্যা বেলায়, বহুমুখী আলোচনা অন্তে জন্মনিল স্বাধীন সার্বভৌম বঙ্গের পরিকল্পনা।

After much deliberation they evolved a plan of 'Sovereign Bengal, independent of India and Pakistan." (Jinnah and Gandhi, by S. K. Majumdar, p. 269). আবুল হাশেম ঘোষণা করলেন" Whether Hindu or Muslim, Bengalee was a Bengalee, both had equal abhorrence of being ruled by Pakisthanis from over thousand miles away" (Ibid).

সে এক মহাশুভক্ষণ, সামান্য দিনের জন্য হলেও স্বল্প কালের জন্য হলেও বাঙালী আপনাকে চিনতে পারল। চিনতে পারা যায় আপন পথ বেছে নিতে তার বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সঙ্কোচ হল না; ভূ-লুণ্ঠিতা বঙ্গজননীর ললাট আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠল, দৃঢ়মুক্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হলো স্বাধীন বঙ্গের জয়।

কিন্তু বাধা পড়ল। বাধা কিন্তু দেয়নি বাঙলার মুসলমান, বাধা দেয়নি মুসলীম লীগ, বাধা দিলেন না পাকিস্তানের প্রধান স্রষ্টিক মহম্মদ আলি জিন্না। বিশ্বাস করা হয়ত কঠিন হবে, তবু এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, জিন্না বলেছিলেন, "If the Congress and the Muslim League in Bengal could come to an agreement with regard to Sovereign Bengal outside India and Pakistan, he would not stand in their way" (Ibid. p. 269)

তাহলে বাধা এল কোত্থেকে? বাধা এল সেদিনের ভারতের একচ্ছত্র অধিনায়ক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী মহাশয়ের নিকট থেকে। বাধা দিলেন তাঁরই ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী জহরলাল নেহেরু এবং ভারতের লৌহদৃঢ় সৌধের ধারক ও বাহক বল্লভভাই প্যাটেল। গান্ধীর ক্ষমতা তখন নিম্নগামী। তাঁকে পথের পাশে ঠেলে ফেলে নেহেরু, প্যাটেল তখন দেশ বিভাগ ভিত্তিতে দিল্লীর বাদশাহীর দিকে ছুটেছেন। তবু এই ক্ষেত্রে গান্ধীকে প্রয়োজন হল। গান্ধীজি হা, হা, করে উঠলেন, সর্বনাশ, মহাসর্বনাশ; পশ্চিমবঙ্গের খনিজ সম্পদ, কলকাতা বন্দরের-মধুটুকুই যদি তাঁর পুত-

পোষক ধনিক বণিকদের ভোগেই না এল তবে লাভ কি ভারতের স্বাধীনতায় ? তবে তিনি সর্বপ্রথম বরে Cabinet Missionএর plan বানচাল করেছিলেন কেন ? সুতরাং যেমন করে হোক এ বঙ্গ করতেই হবে, সার্বভৌম বঙ্গকে যাদু অস্ত্রেই বিনাশ করতে হবে, করতে হবে রাজনৈতিক ক্রীতদাস। পূর্ববঙ্গের প্রতি এক অসীম ঘৃণা চিরকালই পোষণ করেছেন জহরলাল। জল কাদা জংলে ঢাকা পূর্ববঙ্গের পাঁচ পাঁচে প্রকৃতি জহরলালের মনে সৃষ্টি করেছিল এক বিষম বিরূপতা যার কুৎসিৎ প্রকাশ পেয়েছিল ডঃ রামমনোহর লোহিয়ার সঙ্গে এক আলোচনা প্রসঙ্গে "Mr Nehru spoke of the water, slime, bush and tree he found everywhere in East Bengal. He said that that was not the India he or I knew, and wanted with some vehemence to cut East Bengal away from the main land of India." লোহিয়ার কাছে এই মনোভাব গভীর বিস্ময়কর মনে হয়েছিল। তিনি লিখছেন, That was an extraordinary observation. The man was obviously speaking under an emotional strain. He had set his heart on some thing..." (Guilty Men of India's Partition. p. 17. by Dr. Rammonohar Lohia). এই আলাপ হয়েছিল বাঙালিদের নোয়াখালিতে, ১৯৪৬ সালের শেষের দিকে। তখনই জহরলাল স্থির করেছিলেন (লোহিয়ার কথানুসারে) পূর্ব বাঙলাকে ভারতবর্ষ থেকে ছেঁটে ফেলতে, পাকিস্তানের দাবী মেটাতে নয়, নিজস্ব গভীর ঘৃণাবশে।

কংগ্রেসের শক্ত মানুষ ভল্লভাই প্যাটেল আর যাই হউন সস্তা উচ্ছ্বাসের কারবারী ছিলেন না। তিনি বুঝতেন, তাঁর লক্ষ্য এবং তাকে লাভ করবার উপায়। তাই তিনি কাজে লেগে গেলেন। পরওয়ানা পাঠালেন পশ্চিমবঙ্গের অনুচরদের নিকট। আদেশ এল বাঙলা ভাগ করতেই হবে। তার জন্য যে কোনো মূল্য দিতে হয়, দিতে হবে। কলকাতা সমেত পশ্চিমবঙ্গের 'ধোচাক' রক্ষা করতেই হবে, কংগ্রেসের আসল ধনিকদের ভোগের জন্য। বাংলার কংগ্রেসীরা এবার ক্রুর সর্পরূপে বেরিয়ে এলো। বাঙালীর পক্ষে গভীর বেদনার কথা যে, এ ব্যাপারে মতি বিভ্রম হ'ল শ্যামাপ্রসাদের। তিনিও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জন্য নামলেন।

কিন্তু এত করেও হালে পানি পাওয়া যাচ্ছিল না। 'স্বাধীন সার্বভৌম বঙ্গ' আন্দোলন হিন্দু মুসলমান বাঙালীর দাবী রুখেই দৃঢ়তর হতে লাগল। তখন এগিয়ে এলেন গান্ধী, ছাড়লেন ব্রহ্মাস্ত্র। বল্লেন তিনি "এ আন্দোলন ভুয়া, এ আন্দোলন পাপাশ্রয়ী।" সত্যাগ্রহ মহাত্মা প্রার্থনাবেদী থেকে প্রচার করলেন এবং ঘোষণা দিলেন, "For the unity purchased by corrupt practices would be worse than frank partition (Pyarelal, Last Phase Vol. II. p. 188.)

শক্তিশেলের আঘাত এলো বাঙালীর বুকে। পরাস্ত হয়ে লুটিয়ে পড়ল বাঙালী। দ্বিধা বিভক্ত হল বাংলা। বরণের পথে এগিয়ে চলল বাঙালী জাতি। এক ঢিলে দুই পাখী বধ হল ; কলকাতা সমেত বঙ্কিম বঙ্গ রয়ে গেল জলৌকাদের তৃষ্ণা মেটাতে, আর যেরূপও ভেঙ্গে গেল প্রতিক্রিয়ার চির-প্রতিরোধী, ইতিহাসের চির-বিদ্রোহী বাঙালীর। হোল ভারত বিভাগ-বঙ্গ বিভাগ।

কিন্তু ভগ্নস্কন্ধ হলেও মরেনি বাঙালী। পূর্ব খণ্ডে সে উঠে দাঁড়িয়েছে। রুখে দাঁড়িয়েছে সে তার ইতিহাস নির্দিষ্ট ভূমিকায়, চিরবিদ্রোহীর ভূমিকায়। উঠে দাঁড়াবে পশ্চিমের বাঙালী পূবের হাত ধরে ঐ একই ভূমিকায়।

সে শুভদিনের ইঙ্গিতই কি পাওয়া যাচ্ছে না পূর্ব গগনের ভাস্বর সঙ্কেতে ?

পুস্তক পরিচয়

নাট্যচিন্তা : সুত্রধার সম্পাদিত। ভারতীয় সাহিত্য পরিষদ। দাম ১২'৫০ পয়সা।

বাংলা দেশে গত কয়েক বছরের মধ্যে নাট্য-আন্দোলনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিবর্তন সম্ভবপর হয়েছে। নব-নাট্য আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে, ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ এর যুদ্ধকালীন পরিবেশের মধ্যে। ভারতীয় গণনাট্যসংঘ নাটকের মাধ্যমে সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। উত্তরকালে এই নব-নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত বেশ কিছু শক্তিমান শিল্পী স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন নাট্য প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেন। ফলে, গত বারো-চৌদ্দ বছরের মধ্যে আধুনিক বাংলা নাটকের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকৃত হয়েছে এবং গতানুগতিক নাটক অভিনয়ের পাশাপাশি নতুন, প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীপ্রসূত ছবির মতনভাবে নাট্য পরিকল্পনা সম্ভবপর হতে পেরেছে।

অথচ, মঞ্চ ও অভিনয়কলার বিশেষ উৎকর্ষ সত্ত্বেও আধুনিক নাট্য-আন্দোলন সম্পর্কে খুব বেশী আলোচনা হয়নি। আধুনিক নাট্যকারগণ সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে এসেছেন এবং তাঁদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী নাটক রচনার নতুন উপাদানের সন্ধানে রয়েছেন। পেশাদারী নাটক যেমন এখন পর্যন্ত চর্বিতচর্বন এবং গতানুগতিকতার মাধ্যমে 'বক্স অফিস' সাফল্যে আগ্রহশীল অন্যদিকে তেমনি নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, একালের বাংলা দেশের ছোট ছোট নাট্য সংস্থাগুলো সুস্থ নাট্যচেতনার মাধ্যমে নতুনতর জীবনাদর্শের প্রতীকগুলোকে দর্শকের সামনে উপস্থিত করবার চেষ্টা করছেন।

কিন্তু, তৎসত্ত্বেও কোথায় যেন অভাববোধ আছে। বাংলা উপন্যাসে কিংবা বাংলা ফিল্মযুগে আঙ্গিকের অর্থে জনপ্রিয় তার তুলনায় বাংলা নাটকের সাফল্য এখন পর্যন্ত তেমন উল্লেখ্য নয়। এরূপ অবস্থার সম্ভবত প্রধানতম কারণ এই যে নাট্য-আন্দোলনের ক্ষেত্রে পুরাতন বাংলা নাটকের ঐতিহ্য একালের নাট্যকারদের তেমন কোনো প্রেরণা দিতে পারছে না। পক্ষান্তরে নবা নাটকের সূচনাকাল থেকেই মঞ্চসজ্জা ও নাট্যকলার অভিনয়কলা সম্পর্কিত যে-সব মৌল প্রশ্ন নাট্যকার ও অভিনেতাদের মনে জেগেছিল অদ্যাবধি সে-সব প্রশ্নের সদুত্তর সম্ভবত খুঁজে পাওয়া যায় নি। গত ক'বছরে নতুন বাংলা নাটক রচনায় নবীনতর নাট্যকারেরা যেমন অগ্রণী হয়েছেন এবং কয়েকটি মৌলিক নাটকের অভিনয়ে সাফল্য অর্জন করেছেন, অন্যদিকে তেমনই প্রচলিত বাংলা নাটকের কাহিনীগুলোকে অনেক পরিমাণে বৈচিত্র্যহীন ও নিষ্প্রভ মনে হওয়ায় বিদেশী নাট্যকারদের কাহিনীগুলো থেকে বিষয়-বস্তু সংগ্রহ ক'রে নাটকের মাধ্যমে পরিবেশনের চেষ্টা দেখা যায়। ফলে, বাংলা নাটকের দর্শক সমাজ সঙ্গত ভাবেই নতুন রসের অভিনয়কলা ও দৃশ্যসজ্জার মুখোমুখি হতে পেরেছেন।

কিন্তু বাংলা দেশের নব-নাট্য আন্দোলন প্রকৃত প্রস্তাবে কোন্ ধ্যান-ধারণার অনুবর্তী তার আলোচনা এ যাবৎকাল তেমনভাবে নাট্য অনুরাগিবৃন্দ পাঠকের গোচরে আনা সম্ভব হয় নি। ইতিমধ্যে গত কয়েক বছরের একাঙ্ক নাটক ও কাব্যনাটকের অভিনয় নাটকের দর্শকসমাজের সামনে বিভিন্ন রসের নাট্যচিন্তার উপাদান জুগিয়েছে। ফলত,

বাংলাদেশে নবনাট্য আন্দোলন ইদানীন্তন কালে একটি সর্বাঙ্গীন শিল্প-রূপের সাক্ষ্য এবং সে-কারণেই যে-সব বিষয় এ কালের সার্থক নাটকের সাফল্যের অঙ্গীভূত তার পর্যালোচনা প্রায় অপরিহার্য।

অনুরূপ অবস্থায় সুরেশ সম্পাদিত 'নাট্যচিন্তা' সংকলন গ্রন্থটির প্রকাশ বাঙালী দর্শকসমাজকে সফল নাটকের মূল উপাদানগুলো সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে একথা বলতে পারা যায়। গ্রন্থটির বিষয়-বস্তু মোট চারটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে নাট্যরচনা ও নাট্যরূপ শিক্ষা, দ্বিতীয় পর্বে অভিনয় ও অভিনেতা, তৃতীয় পর্বে নির্দেশনা ও প্রযোজকলা এবং চতুর্থ পর্বে মঞ্চ, দৃশ্যসজ্জা ও মঞ্চস্থাপত্য সম্পর্কে আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। আলোচনাগুলো সবই বিদেশী লেখকদের রচনা থেকে সংগৃহীত। কিন্তু কোনো লেখাই অনুবাদ নয়; বিদেশী লেখকদের মূল বক্তব্য বজায় রেখে দেশী পরিবেশের অনুধাবন ক্ষমতার উপযোগী ক'রে রচনাবলীর সমস্ত অংশই পরিবেশিত হয়েছে বলা যেতে পারে। ভূমিকায় সম্পাদক জানিয়েছেন: 'এ গ্রন্থটিতে একটি ঘরোয়া আলোচনার আবেশ আছে। যেন একটি আসরে বসে বহুবিধ পণ্ডিত ব্যক্তি শিল্পকর্মে স্ব স্ব বোধ ও বিশ্বাসের কথা বলছেন। শ্রোতা তথা পাঠক এর সঙ্গে নিজের বিশ্বাস ও বোধকে মিলিয়ে দেখতে পারে। সে যা ভাবে, যা সত্য মনে করে তার কতটুকু খাঁটি, কতটুকু যুক্তিসহ ও সঙ্গত তা যাচাই করার সুযোগ এখানে উপস্থিত।' এবং এই দিক থেকে গ্রন্থটি নাট্যামোদী শিক্ষিত সমাজের নাট্যচেতনাকে বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ করবে আশা করা যায়। সমগ্র বইটিতে মোট উনত্রিশটি নিবন্ধে একালের নাটকের সমস্যা ও স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের খ্যাতিমান লেখকদের বক্তব্যের সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় ঘটিয়ে দেবার উদ্যোগ সমগ্রভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে, বলা বাহুল্য। গত দু'দশকের বাংলা নাট্য-আন্দোলন সম্পর্কে যাঁরা অনুসন্ধিৎসু 'নাট্যচিন্তা' তাঁদের কাছে নিঃসন্দেহে সমাদর লাভ করবে। বইটির প্রচ্ছদ সুন্দর। কয়েকটি চিত্র ও রেখাচিত্র উল্লেখ্য।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

নট আটট: শঙ্করীপ্রসাদ বসু। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড্। ছ' টাকা।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান অধ্যাপক, পড়ান বৈষ্ণব সাহিত্য, তাঁর প্রভাতের চিন্তার পরিচ্ছন্ন প্রকাশের সন্ধান মেলে 'মধ্যযুগের কবি ও কাব্য' 'বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস' নামীয় গ্রন্থে কিম্বা ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর অগ্রদূত 'বিশ্ববিবেক' বিবেকানন্দের কর্ম ও মর্মজীবনের গভীরতম পরিচয় উন্মোচনের সন্ধানে-সূত্রে; সেই শঙ্করীপ্রসাদ বসু 'ক্রিকেট সুন্দর ক্রিকেট' 'ইডেনে শীতের দুপুর' 'বল পড়ে ব্যাট নড়ে' ইত্যাদি পরম রমণীয় গ্রন্থেরও রচয়িতা—এই বিস্মিত জিজ্ঞাসা আমাদের গভীরতম কৌতূহলকেও সমান ভাবে উচ্চকিত করেছে অনেকদিন। এবং আজ তাঁর এই দ্বিতীয় পরিচয় পাঠকের এমন একটি অন্তরঙ্গ স্বাধিকারে পরিণত হয়েছে যে বিশেষ করে তাঁর এই দ্বিতীয় সত্তার জন্য আমাদের প্রত্যাশা প্রায়শঃই অত্যন্ত তীব্রভাবে উন্মুখ থাকে। তাই তাঁর যে কোন ক্রিকেট-প্রসঙ্গিত রচনাই যুগপৎ 'খেলার রস' এবং 'লেখার রসের' আনন্দিত ভোজকত্বে পাঠকের নির্বাধ নিমন্ত্রণের রসসত্র। প্রকাশককে ধন্যবাদ, তিনি এই গ্রন্থ প্রকাশ করে পাঠকের সেই প্রত্যাশাকে আর একবার চরিতার্থতার সুযোগ দিলেন। পরিসংখ্যানের প্রকীর্ণ তথ্যপুঞ্জ নয়, ক্রীড়াকীর্তির রঙচুবি ছুড়ে শাণ, করুণ, বীর কিম্বা বীভৎস রসের যে বহুধাবিকীর্ণ আয়োজন তার থেকে নানা নন্দিত এবং নিন্দিত চরিত্রকে নির্বাচন করে তিনি ক্রিকেটের পটে জীবনের আলেখ্যদর্শন

করেছেন। কখনো ক্রিকেটের অন্তরঙ্গ পটভূমিতে তিনি পুরাতনী স্মৃতিরঙ্গের পুনঃস্থাপনা করেছেন, 'ঐতিহাসিক ক্রিকেট নাটক' কিম্বা 'পুরানো নামাবলীর কথনো শ্রীযুক্তা লীলা মজুমদারের স্মৃতিকথা বাঙলার ডব্লিউ জি গ্রেস, সারদারঞ্জন রায়, এবং রায় পরিবারকে কেন্দ্র করে বাঙলা-দেশের ক্রিকেট চর্চার আদিযুগের কথাস্মৃতি গ্রন্থনা করেছেন, আবার বাঙলা সাহিত্যের সর্বাপাচী সাহিত্যস্রষ্টা প্রমথনাথ বিশীর পরিহাসবিজল্পিত ক্রিকেট প্রসঙ্গ এবং জীবিকা-সংগ্রহের রম্যকথা, ক্রিকেটের বীরললিত পূর্ব-নায়ক পঙ্কজ রায়ের অবিচল ব্যক্তিত্বের নিষ্কম্প মহিমা; কিম্বা ক্রিকেটের তথাকথিত খাতক চরিত্র লিলক্রিষ্টের অন্তরঙ্গনিষ্কলঙ্ক একটি অবীরোদাত্ত কর্মপ্রতিম চরিত্র তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তাঁর 'ক্রিকেটের বিরুদ্ধে' এবং 'কালো আগুনের ঝলক' নামক অধ্যায় দুটিতে। 'ক্রিকেট তন্ত্র আকাশে' 'গল্পের খেলা' 'সেক্সপীয়র-নিউটন সংবাদ' কিংবা 'ভারত-ইংলণ্ড টেষ্ট-ম্যাচ ১৯৬৬'—ইত্যাদি পরিচ্ছেদে ক্রিকেটের রূপ ও রীতির নানা তথ্যখণ্ড, নানা মৌলিক ভাষ্য তাঁর কল্পনা এবং বোধের জাগ্রত যোগসূত্রের আলোয় দীপ্যমান হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর দ্রুততম ব্যাটস্‌ম্যান জি, এল, জেসপের আকস্মিক কাহিনী কিম্বা পৃথিবীর সেরা বীরগতি লেগ স্পিনার ক্রিমেটের রাজবন্ধুরতমহিমার করুণ মহাপ্রস্থানের কাহিনী আমাদের কৌতূহলকে সর্বদাই অত্যন্ত তীব্র এবং উৎকর্ণ করে রাখে। ক্রিকেটের উপেক্ষিত ছাদশব্যক্তির এ হেন কৌতুক ও বেদনার মিশ্র মূর্তি শঙ্করীবাবু না জানালে আমাদের অভিজ্ঞতা চিরদিনই আর এক করুণ সত্য থেকে বঞ্চিত থাকতো। সাহিত্যের সংজ্ঞা এবং পরিধি আজ প্রতিনিয়তই প্রসারণশীল, অত্যন্ত সুন্দর ছিপ্র এবং দ্যুতি-স্ফুরিত এই রম্যগ্রন্থখানি আমাদের বিচারে সাহিত্যেরই এক নোতুন দিগন্তমুক্তি। সুন্দর আর্ট পেপারে ছাপা এতগুলি সুন্দর ক্রিকেট প্রসঙ্গ এবং ক্রিকেটারদের ছবি, প্রখ্যাত কার্টুনিষ্ট চণ্ডী লাহিড়ীর আঁকা অজস্র কার্টুন এবং ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে টি পর্ণা কর্তৃক পরিকল্পিত ও আঁকা 'বয় উইথ এ ব্যাট' নামক অপরূপ চিত্রটি—সব মিলিয়ে পাঠকের কাছে বলা যেতে পারে, এ গ্রন্থ "বাহু বাহু, পদে পদে।"

শ্রীমন্ত সরকার

বিশ্বাবর্ত

কমনওয়েলথ সম্মেলন

গত ৬ই সেপ্টেম্বর থেকে দশদিন ব্যাপী লণ্ডনে কমনওয়েলথ বৈঠক চলে। এবারকার সম্মেলনে আয়ান স্মিথ পরিচালিত গত দশমাস স্থায়ী বিদ্রোহী রোডেশিয়া সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ সরকারের অবসান করে ব্রিটিশ সরকারের অনিচ্ছা ও অনমনীয়তাকে কেন্দ্র করে যে প্রতিবাদের ঝড় উঠবে তা পূর্বাহ্নেই বোঝা গিয়াছিল। হোলোও তাই। রোডেশিয়া সংক্রান্ত আলোচনাকে কমনওয়েলথ সম্মেলনে অগ্রাধিকারের জন্য আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির দাবী সরব হবার পূর্বেই কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েটই অগ্রণী হয়ে বিষয়সূচী নির্ধারণে রোডেশিয়া সমস্যার আলোচনা প্রথম স্থানে নির্দিষ্ট করে দেয়। জাম্বিয়ার নেতৃত্বে কমনওয়েলথ-অন্তর্ভুক্ত আফ্রিকার কোনো কোনো রাষ্ট্র রোডেশিয়ার সভাপতির আসন থেকে সরে দাঁড়াবার জন্য উইলসনের উপর চাপ দেবার কল্পনা করেছিল চতুর উইলসন নিজেই প্রস্তাব করেন যে রোডেশিয়া সমস্যা আলোচনার সময় অন্য কেউ সভাপতির আসন গ্রহণ করুক, কারণ ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে এই বিতর্কে তাকেই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। উগাণ্ডার রাষ্ট্রপতি ইদিআমিন ওবোটে উইলসনের এই প্রস্তাবে আপত্তি জানালে আর কোনো রাষ্ট্রের পক্ষ থেকেই এই প্রসঙ্গ আলোচনা হয় নাই।

উইলসন প্রবল আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছেন জাম্বিয়ার প্রধানমন্ত্রী এবং সিয়েরা লিওনের রাষ্ট্রপতি আলবার্ট মার্গাই-এর কাছ থেকে। শক্তিপ্রয়োগে আয়ান স্মিথের বিদ্রোহী সরকারের অবিলম্বে পতন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসন কায়েম না হলে রোডেশিয়াকে স্বাধীনতা দেওয়া চলবে না, এই দুই দাবী নিয়ে তারা উইলসন ও ব্রিটিশ সরকারের রোডেশিয়া নীতিকে পর্যুদস্ত করেন। এমন কি এই দুই দাবী স্বীকৃতি না পেলে আরও কয়েকটি রাষ্ট্রসহ এরা কমনওয়েলথ সম্মেলন বর্জন করবেন এমন আভাসও সরব হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আফ্রিকার মালওয়াই রাষ্ট্রের ডঃ হেস্টিং বান্দা জাম্বিয়া ও সিয়েরা লিওনের বিরোধী মত প্রকাশ করেন। হেস্টিং বান্দা বলপ্রয়োগে রোডেশিয়া সমস্যা সমাধানের বিরোধী। রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে বর্তমান স্বেচ্ছামূলক অর্থনৈতিক অবরোধের পরিবর্তে বাধ্যতামূলক অবরোধের প্রস্তাব নিয়েও দীর্ঘ আলোচনা হয়। শেষ পর্যন্ত কানাডার প্রধানমন্ত্রীর মধ্যস্থতায় সামগ্রিক ভিত্তিতে (embargo) বাধ্যতামূলক অর্থনৈতিক অবরোধের পরিবর্তে বাছাই করা পণ্য সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘের সহায়তায় আংশিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই আংশিক প্রস্তাব প্রয়োগেও শেষ পর্যন্ত সামরিক শক্তির ব্যবহার—সামুদ্রিক যাতায়াত বন্ধ করার জন্য অনিবার্য হয়ে উঠবে। সামগ্রিক ভিত্তিতে অর্থনৈতিক অবরোধে রাষ্ট্রসংঘকে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে সংঘাতে প্রবৃত্ত হতে হতো এবং আয়ান স্মিথ সরকারকে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বিদ্বেষী সরকারের আরও নিকটবর্তী করে তুলতো। এই আংশিক আবশ্যিক অবরোধের প্রশ্নে উইলসন সহমত হলেও, স্বাধীনতা ঘোষণার পূর্বে যারা কিছু এক ভোটের ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাতে রোডেশিয়ার ক্ষমতা হস্তান্তরে উইলসন আদৌ সম্মত হয় নাই। সমগ্রভাবে রোডেশিয়ার অধিবাসীদের এই ব্যবস্থায় সম্মতি ও সমর্থন পেলে তবেই

উইলসন এই ব্যবস্থায় রাজী হতে পারে, অবশ্য কমনওয়েলথ সম্মেলনের শেষ সিদ্ধান্তে "The British Government will not consent to independence before majority rule unless the people of Rhodesia as a whole are shown to be in favour of it" যখন অধিবাসীদের সম্মতি নির্ধারণের পদ্ধতিরূপে অধিকাংশ প্রধানমন্ত্রীই গণভোট দাবী করলেও ব্রিটেন এ-বিষয়ে স্পষ্ট ভাবে কিছু বলে নাই।

ব্রিটেনের পক্ষ থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রবর্তনের পূর্বে, রোডেশিয়ার স্বাধীনতার অনুমতির প্রস্তাবের পশ্চাতে এই সর্তটি রয়েছে যে আয়ান স্মিথ সরকার অবিলম্বে বিদ্রোহের অবসান করলে ইতিপূর্বে ব্রিটেন রোডেশিয়া সম্পর্কে যে সকল শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব উত্থাপন করেছে, সেগুলি বাতিল হয়ে যাবে না। অবিলম্বে বিদ্রোহের অবসান না হলে সেগুলি অবশ্যই বাতিল হবে।

গত জানুয়ারী মাসে নাইজিরিয়ার লাগোসে কমনওয়েলথ সম্মেলনে গঠিত অর্থনৈতিক কমিটির রিপোর্টে জানা যায় স্বেচ্ছামূলক অবরোধে রোডেশিয়ার অর্থনীতি ক্ষিষ্ট হলেও বিপর্যস্ত হয় নাই এবং অদূর ভবিষ্যতে হবেও না। সুতরাং যদিও অধিকাংশ রাষ্ট্রপ্রধানেরা রাষ্ট্রসংঘের সনদের সপ্তম অধ্যায় অনুযায়ী চালাও বাধ্যতামূলক অবরোধে সম্মত ছিল, শেষ পর্যন্ত স্থির হয়েছে ১৯৬৬ সালের মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদে ব্রিটিশ সরকার কমনওয়েলথ প্রতিনিধিদের সহায়তায় রোডেশিয়ার রপ্তানী পণ্যের উপর আবশ্যিক অবরোধ আরোপের প্রস্তাব গ্রহণ করবেন।

এই আবশ্যিক অবরোধের এবং স্বাধীনতার পূর্বে সংখ্যা-পরিষ্ঠের শাসন প্রবর্তনের প্রস্তাব, এই দুই ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকার মননীয় হলেও, সামরিক শক্তি প্রয়োগে অবিলম্বে আয়ান স্মিথের বিদ্রোহী সরকারকে পরাস্ত করতে ব্রিটেনের অসম্মতি এই বিদ্রোহী শ্বেতশাসন সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের প্রচ্ছন্ন সহানুভূতির ইঙ্গিতই বহন করে। ব্রিটেন ইচ্ছেমোনে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে তৎপর, মালয়েশিয়ার সাহায্যে তৎপর হয়ে উঠতে পারে কিন্তু ৪০ লক্ষ আফ্রিকাবাসীদের ওপর ২ লক্ষ শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার ও পীড়ন বন্ধ করতে দ্বিধাগ্রস্ততার পরিচয় দিয়ে এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য করে তুলেছে। রোডেশিয়ার সমস্যায় জাম্বিয়া প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপন্ন সুতরাং লণ্ডন কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জাম্বিয়ার প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেবেই, জাম্বিয়ার উদ্বেগ ছিল স্মিথ সরকারের সঙ্গে কোনো গোপন বন্দোবস্ত করে উইলসন সরকার প্রাক্তন উপনিবেশগুলির স্বাধীনতার ভিত্তিমূলেই কুঠারাঘাত না হানে। জাম্বিয়ার অর্থমন্ত্রী ও লণ্ডন সম্মেলনে জাম্বিয়ার প্রতিনিধিদের নেতা আর্থার উইনা এই আশঙ্কাই প্রকাশ করেছেন: "……the real fear of the people of Zambia was that Mr Wilson's strategy and plans represented a clear sacrifice on the altar of expediency of the fundamental principle upon which independence had been granted to all former British Colonial territories since the independence of India.

১৬. ৯. ৬৬

২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

জয়শ্রী

৩১ বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা শারদীয়া ১৩৭৩

সম্পাদকীয়

হু হু করে ছুটে চলেছে ট্যাক্সী ওয়েলেসলী স্ট্রীট দিয়ে। লেখিকা বাদে আরো দুজন আরোহী গাড়ীতে। দূর থেকে ফুটপাথের নীচে রাস্তার ধারে "একটা কিছু"কে পড়ে থাকতে দেখছি। কলকাতার রাস্তার পরিচিত দৃশ্য, ডাস্টবিনের উপচে-পড়া আবর্জনা দেখবার জন্য দৃষ্টি, মন প্রস্তুত হয়ে উঠেছে—ধাবমান গাড়ীটি সেই "একটা কিছু"র নিকটে আসতেই আতঙ্কে উঠে মুখ দিয়ে অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে গেল নিজের অজ্ঞাতেই। পড়ে-আছে—অসংবৃত, অর্ধনগ্ন অবস্থায়, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, মাথা-ভরা কালো এলায়িত কোঁকড়ানো চুল, সুন্দরী একটি যুবতী নারী। বিবশ, মৃতবৎ বা মৃত। গাড়ীর অন্য আরোহীরা ফিরেও তাকালো না—ফিরেও তাকাচ্ছে না—রাস্তার দুপাশের অগণ্য বিচিত্র, বিবিধ পথচারী। নেমে পড়ে কিছু অন্ততঃ করবার জন্য এক তীক্ষ্ণ তীব্র অনুভূতি, বিবেক বুদ্ধি মনকে সজোরে ধাক্কা দিতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল এদেশে-এই রাস্তায়-পড়ে-থাকা নারীর জন্য কাকে, কোথায় বলবো? কে কিছু করবে? না সরকার, না প্রখ্যাত সেবা প্রতিষ্ঠানগুলি। মুহূর্তে দৃশ্য, মানসিক অস্থিরতা, প্রশ্ন অতিক্রম করে চলে এলাম—দৃশ্যান্তরে। কিছুই করা হল না—হয় নি। একটি সমাজ-সচেতন নাগরিক, মানুষ জীবনের এই অপচয়ের সামনে কিছু করবার পথ পায় নি। সীমাহীন গ্লানি মনকে করেছে আচ্ছন্ন, ভুলতে পারি না সে দৃশ্য, মুহূর্তের সে জাগ্রত-বিবেক এবং তার পরের অতলস্পর্শী অবসাদ, হতাশা।

পরের দিন খবরের কাগজ খুঁজি, কোনো কাগজের কোনো কোণায়, পথপ্রান্তে-পড়ে থাকা উপেক্ষিত একটি জীবনের অপচয় নিয়ে কোনও প্রশ্ন, কোনও মন্তব্য, কোনও সমাধানের ইঙ্গিত আছে কি? না, এই ত্রিশ লক্ষাধিক নাগরিকের বাস ও কর্মস্থল এই কলকাতা মহানগরীর সমুদ্রতুল্য সুবিশাল বক্ষে সামান্যতম বুদবুদও তোলেনি এই ঘটনা। না, এ কোনও সংবাদই নয়।

মনের বিচিত্র বিস্ময়কর গতিতে কি ভাবে যেন একাকার হয়ে গেল পথ-প্রান্তে পড়ে থাকা ঐ বিবশা নারী ও আমার মাতৃভূমি। কোথায় যেন অদ্ভুত মিল রয়েছে উভয়ের। ও কি মুমূর্ষু অহল্যা? শাপ-মোচনের আশায় অপেক্ষা করছে?

* * * *

এদিকে শুধু কলকাতায় নয় ভারতের দিকে দিকে নিত্য চলেছে দুর্বলের উপর সবলের, সর্ব-রিক্তের উপর স্বিত-স্বার্থের হাজার প্রকারের অত্যাচার ও অবিচার আর তার বিরুদ্ধে অসহায়

মানুষের ক্ষোভ ও ক্রোধের দুর্দমনীয় বহিপ্রকাশ। অন্য শত সহস্র সমস্যা, প্রশ্ন, লক্ষণ, ইঙ্গিত, 'কোয়েশ্চনস্ ও সিমটমস্'কে বাদ দিয়ে, উল্লেখ করছি শুধু দ্রুত আগতপ্রায় চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পটভূমিকায়—আজ ও আগামী দিনের নাগরিক—যুবক, তরুণ ও কিশোরদের, ব্যবহার। কলকাতা, রাঁচি, পাটনা, লক্ষ্ণৌ এলাহাবাদ, জব্বলপুর ও উজ্জয়নীর পথে পথে অসহায় ক্রোধ ও বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে তারা বার বার। আর এই অশান্তদের শান্ত, না! একেবারে নীরব করবার জন্য গর্জে উঠেছে বার বার ইংরেজের পরিত্যক্ত গদীর ইংরেজী-মেজাজের-উত্তরাধিকারীদের, রাইফেলের গুলি, কাঁদুনে গ্যাস। বর্ষিত হয়েছে ঝাঁকে ঝাঁকে ইট পাথর লাঠি ঐ গরম কিন্তু নরম মাথাগুলোকে লক্ষ্য করে। লুটিয়ে পড়েছে, রক্তাক্ত কিশোর, তরুণ ও যুবকের দল, লুটিয়ে পড়ছে এই মুহূর্তে। সকল সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে বিশ্বাসী (?) ও বিশ্বের সর্বত্র সে নীতি অনুসরণের প্রবক্তা ও উপদেষ্টা—আজকের ভারতের দিকদর্শক গান্ধিজীর তথাকথিত অনুগামী, অনুসারী ও উত্তরাধিকারের দাবীদারদের জিজ্ঞাসা করছি—এই কুড়ি বছরে নিরবধি জনহত্যা—নারী, শিশু, কিশোর, বৃদ্ধ—কেউ বাদ যায়নি—কি গান্ধীবাদের বাস্তব-প্রয়োগের পরিচয়, গান্ধীবাদের জন্মভূমি এই অহিংস ভারতবর্ষে? গান্ধীবাদের উত্তরাধিকারের দাবীদারেরা গুণে দেখুন এই কুড়ি বছরে কতজনকে হত্যা করা হয়েছে "গণতন্ত্র রক্ষা করার নামে?" আর এদেশের ব্যক্তিগত আয়ের সর্বনিম্ন নিরিখে তথাকথিত কংগ্রেসী সমাজতন্ত্রীরা অঙ্ক কষে দেখুন বর্তমান মূল্যমানের সূচকে কি পরিমাণ নিম্নতম মানের খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে এদেশের লক্ষ লক্ষ কৃষক, নিম্ন ও মধ্যবিত্তেরা!

ইতিমধ্যে একটার পর একটা তদন্ত কমিশন গঠিত হয়ে চলেছে—খাদ্য নিয়ে সারা বাংলা দেশে—এই কলকাতা মহানগরীতে গত ফেব্রুয়ারি, মার্চের প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও সে-বিক্ষোভ দমনে বেপরোয়া নির্লজ্জ সরকারি তাণ্ডব—সে বিক্ষোভের কারণ, তথ্য ও সমাধান নির্ণয়ের জন্য গঠিত হোল যথাক্রমে সরকারি লাহিড়ী কমিশন এবং আসানের অবসর প্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সরযূপ্রসাদের নেতৃত্বে বে-সরকারি তদন্ত কমিশন। সরকারি কমিশনের রায় কবে প্রকাশিত হবে তা সরকারই জানেন। বে-সরকারি কমিশনের রায় প্রকাশিত হয়েছে। সে কমিশনের মতে পশ্চিমবঙ্গে ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ই মার্চের ঘটনার মূল কারণ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভ্রান্ত ও বন্ধ্যা খাদ্যনীতি এবং মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রী সভায় তাঁর অনুগামীদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার 'overbearing attitude of the Chief Minister and his followers in the ministry'। পুলিশী অত্যাচার সম্পর্কেও এ কমিশনের রায় স্বার্থহীন! কমিশনের মতে "অনেক ক্ষেত্রেই পুলিশী গুলির কোনো সঙ্গত কারণ ছিল না বরং বহু ক্ষেত্রে নির্বিচার গুলি চালানোর উদ্দেশ্য ছিল 'আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা'র নামে গুলি করে নির্বিচার হত্যা।

জনতার দ্বারা অভিনন্দিত কমিশনের এই রায় নির্লজ্জ শাসক শ্রেণীর মনোভাব বা কর্মপদ্ধতিতে সামান্যতমও রেখাপাত করেনি বা পরিবর্তন আনেনি। আর একটি দৃষ্টান্ত, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি জীবনলাল কাপুরের সভাপতিত্বে গঠিত মাইনরিটি কমিশনের ২০০০ পৃষ্ঠার রিপোর্ট গত ৩রা জুলাই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নিকট পেশ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগের কারণ নির্ণয় করার জন্য। তার পূর্ণ বিবরণ আমাদের হাতে আসেনি, সরকারও তা প্রকাশ করেননি। তবে যতটুকু প্রকাশ পেয়েছে তাতে কমিশন বলেছেন "যদি পূর্ব বাংলার সীমান্ত জোর করে বন্ধ করে দেওয়া না হতো তা হলে পূর্ব বাংলা থেকে সমস্ত সংখ্যালঘু ভারতে চলে আসতো।" এ অপেক্ষা কঠিন সুস্পষ্ট মন্তব্য আর হতে পারে না। পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘুদের রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে কমিশন ভারত সরকারের নিকট কোন পথ অবলম্বনের সুপারিশ করেছেন প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত বিবরণে সে সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ নেই। ডঃ কোঠারির সভাপতিত্বে গঠিত সর্বভারতীয়-শিক্ষা-কমিশন ২১ মাসের পরিশ্রমের পর তাদের রিপোর্ট পেশ করেছেন। অর্থাৎ তাদের সুপারিশগুলি জানিয়েছেন। সে সম্পর্কে চলতি অক্টোবর মাসে হায়দারাবাদে শিক্ষামন্ত্রীদের বৈঠক বসবে। সেখানে কমিশনের মন্তব্যগুলো সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। ইতিমধ্যে পশ্চিম বাংলার মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষকেরা নিজেদের দাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে ডালহাউসী স্কোয়ারের রাজপথে ২৬ দিন যাপন করেছেন অশেষ কষ্ট সহ্য করে। আইন অমান্য করে দুই সহস্রাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা করেছেন কারাবরণ। কিন্তু 'গণতান্ত্রিক ভিত্তি'র উপর প্রতিষ্ঠিত অচলায়তন টলেনি। শেষ পর্যন্ত-আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয়েছে গত ৭ই অক্টোবর।

এই পৃষ্টপটে বাংলায় এসেছে মাতৃপূজার আহ্বান। বাঙ্গালীর জাতীয় পূজার আয়োজন। কলকাতার পার্কে পার্কে শোভা পাচ্ছে সুউচ্চ মণ্ডপের কাঠামো, মঞ্চ ও আলোক সজ্জার প্রস্তুতি-পর্ব। নির্বাচনের প্রাক্কালে পাড়ায় পাড়ায় উৎকণ্ঠ-প্রতীক্ষা করছেন ভোট-প্রার্থীর দল—উদ্বোধক, প্রধান-অতিথি, সভাপতি সাজবার তোড়জোড়ে। শক্তিরূপিণী মা আসছেন বাংলায়। মনের কোণে বারবার উঁকি দিচ্ছে পথপ্রান্তে শায়িত সেই নারীমূর্তি। এখনো কি সেই বিবশা নারী শুয়ে আছে পথপ্রান্তে? কে সে? সে কি আমাদের মাতৃভূমির প্রতীক, দোসর?

এই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা চলছে স-সর্ত, নি-সর্ত, দর কষাকষি চলছে ভারতের—বিশেষ বাংলার-রাজনৈতিক মঞ্চের অসংখ্য দাবীদারদের মধ্যে। প্রধান দুই পক্ষ ও প্রতিপক্ষ। কংগ্রেস ও কংগ্রেস-বিরোধী। পশ্চিম বাংলায়—চৌদ্দ বাম, বাংলা-কংগ্রেস, দক্ষিণ ও বাম কমুনিষ্ট, পি, এস, পি, ফরওয়ার্ড ব্লক। নির্বাচক-মণ্ডলীর ভোট প্রার্থনায় কোলকাতার বাড়ীর দেয়াল ইতিমধ্যে বিবৃতি, ইস্তাহার, প্রতিশ্রুতি, সভা, সমাবেশের বিজ্ঞপ্তিতে বিজ্ঞপ্তিতে ছয়লাপ। প্রধান দুই শিবিরে বিভক্ত রাজনৈতিক দলগুলির ঐক্যের পশ্চাতে চলেছে পরস্পরের বিরুদ্ধে ক্ষুর অভিযান, কংগ্রেসের মধ্যে

অন্তর্বিরোধ, উপলক্ষ্য ডিভ্যালুয়েশন, গোয়া, মহারাষ্ট্র-মহীশূরের সীমানা, মুখ্যমন্ত্রীদের বিরুদ্ধে মন্ত্রীদের অনাস্থাসূচক পদত্যাগ, বাংলায় অজয় মুখার্জী এবং উড়িষ্যায় মহাতবের কংগ্রেস ত্যাগ, এবং উত্তরপ্রদেশের চিরন্তনী অন্তর্বিরোধ। এসব অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে আদর্শ ও নীতিগত বিরোধ আবিষ্কার করা কঠিন। সঙ্ঘ-কংগ্রেস-ত্যাগীদের মধ্যে কে কত নৈষ্ঠিক গান্ধীবাদী, গান্ধীবাদকে কে কত বেশী নির্ভুল বাস্তব রূপায়নে সক্ষম, তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে। আর একদিকে দক্ষিণ ও বাম কম্যুনিষ্ট দলের মধ্যে চলেছে কংগ্রেস থেকে কে কত বেশী দূরে বা নিকটে, আবার কে কত বেশী মার্কস-লেনিনের যথার্থ বা সেকী অনুগামী বা অনুসারী ইত্যাদি। এই বিশ্লেষণের ঝড়-এর ভেতরে হবু-প্রার্থীদের নিজ নিজ দল থেকে ভাঙ্গিয়ে নিয়ে অন্যদলের প্রার্থীরূপে দাঁড় করাবার হীন প্রচেষ্টা—সেই গান্ধীবাদ বা মার্কসবাদের দোহাই দিয়ে। আশ্চর্য, নাম করছেনা কেউ সুভাষচন্দ্রের, তাঁর আদর্শের দাবীদার নেই কেউ, মিথ্যা-আপোষের পথ পরিত্যাগ করে সুস্পষ্ট সুদৃঢ়, নীতির নিশান নিয়ে দাঁড়াবার সাহস, মুরোদ, আত্মত্যাগ বা দেশপ্রেম নেই কারো! অথচ দেশ-বিভাগ ও অহিংস শান্তিপূর্ণ স্বাধীনতার শিকার হয়েছে গত কুড়ি বছর ভারতের প্রায় ৪৯ কোটি জনসাধারণ। তারা কি তাদের লক্ষ্যে পৌঁচেছে এই পথে? এই স্বাধীনতা কি দিয়েছে তাদের নিজ প্রতিভা-অনুযায়ী আত্মবিকাশের অবাধ অধিকার? মানুষের মত বাঁচবার সুযোগ ও বিশ্বসভায় মর্য্যাদা ও স্বীকৃতির আসন সঙ্ঘ-কংগ্রেস-ত্যাগীদের জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় এত দীর্ঘদিন প্রয়োজন হোলো কেন তাঁদের, কংগ্রেস ত্যাগ করতে? কোন্ নীতি বা কর্মপন্থা তাঁরা অনুসরণ করবেন? গান্ধীবাদের কোন্ নবতম রূপ তাঁরা অবলম্বন করবেন? আর উভয় কম্যুনিষ্ট দলকে জিজ্ঞাসা করবার কিছুই নেই আমাদের, কমিউনিজম-এর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দাবীদার—রুশ ও চীনের মধ্যে কাকে অনুসরণ করবে ভারতের জনসাধারণ - ভারতের নির্ব্বাচক-মণ্ডলী—কি আশায় ও কোন ভরসায়? এই লক্ষ্যহীন, আদর্শহীন 'গেটটুগেদার'—এর আমরা নীতিগতভাবে বিরোধী। তবে অনেকের চাইতে তীব্রতরভাবে কংগ্রেসের পরাজয় চাই আমরা—চাই জনস্বার্থ-বিরোধী 'ভগবান প্রেরিত ভারত উদ্ধারে'র ভূমিকা থেকে চিরতরে তাকে বিচ্যুত করতে। তার দাম্ভিকতা ও আত্মতৃপ্তির ফানুশটাকে ফুটো করে দেওয়া প্রত্যেক ভারতবাসীর পবিত্র কর্ত্তব্য।

আহ্বান করছি দেশপ্রেমিক প্রতিটী ভারতবাসীকে নূতন করে ভারতইতিহাসের ধারা—অতীত ও সাম্প্রতিক—অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করে নিজ নিজ পথ-নির্দ্দেশ লাভ করবার জন্য। জয়শ্রীর পাতায় প্রতি মাসে সাধ্যানুযায়ী আমরা সে কর্তব্য পালন করে আসছি। ভাদ্র সংখ্যায় ভারতের ও বাংলার ভবিষ্যতে অটুট-বিশ্বাসী নিষ্ঠাবান আদর্শবাদী মনস্বী পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়ের শতবার্ষিকী সংখ্যায় সম্পাদকীয় অনুল্লেখের অনার্জ্জনীয় অপরাধকে স্বীকার করে সে সংখ্যার বিশিষ্ট লেখকদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। আর শারদীয়া জয়শ্রীর লেখক-লেখিকাদের বুদ্ধিদীপ্ত, তথ্যনির্ভর, ইতিহাস-বিশ্লেষণ, —যুগযন্ত্রণার প্রেতচ্ছবির বাস্তব প্রতিফলনকে জানাচ্ছি আমাদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা। আর ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বিজ্ঞাপনদাতা ও সমর্থকদের। জয়শ্রীকে সমর্থন করবেন, করছেন স্বার্থহীন দেশপ্রেমিক, বিশেষভাবে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অনুগামী-অনুসারী তাঁর নেতৃত্বে বিশ্বাসীরা।

১১ই অক্টোবর, ১৯৬৬

নেতাজীর জাগরণ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

সাংবাদিকদের কেউ স্রষ্টা বলে না। কিন্তু সাংবাদিক স্রষ্টা হনও। আমার জানা একটি ক্ষেত্র আছে।—

"সুতরাং তারা আশা ও আনন্দ অজস্রধারে বৃষ্টির মত বর্ষণ করতে লাগল জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং-এর গর্বিত মস্তকের উপরে, তুরী ও ভেরীর শব্দে যিনি তাদের নৈরাশ্য ও নির্জীবতাকে জয় করেছেন—যিনি প্রভাতের বিজয়ী বীরের বেশে দাঁড়িয়ে ছিলেন মোটর গাড়ীর উপরে উন্নত মহিমায়। কে তাঁকে দৃষ্টির বাইরে রাখবে? কোন্ ক্যামেরা তাঁকে অস্বীকার করবে? অধিনায়কের গরিমায় তিনি ছিলেন গতিশীল গাড়ীর উপরে—কখনো বা তাঁর দোলায়িত হস্তের ইঙ্গিতে নির্দেশ ঘোষিত হচ্ছিল—সর্বাধিনায়ক তাঁর বাহিনীকে যেমন করে চালিত করেন সংগ্রামে। ···সত্যই তিনি সর্বাধিনায়ক—প্রতি বিন্দুতে—আত্মচেতনার পরিমণ্ডল, আত্মবিশ্বাসের নীরব চাহনি, বীরের আত্মসন্তোষের সুনিশ্চিত মুদ্রণ—তাঁর মুখে এবং দেহে।·····এ কী দৃশ্য! না, 'দর্শন',—ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি।"

১৯২৮ সালের কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক দলের জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং সুভাষচন্দ্রের বর্ণনা। জি, ও, সি, বাংলা দেশের চতুর রসনায় 'গক্' হয়েছিল। কিন্তু 'গক্'-এর মধ্যে নেতাজীকে দেখবার প্রতিভা ছিল বাংলা দেশের সংবাদপত্রসেবীর। অপরদিকে কাণ্ড দেখে গান্ধীজী বলেছিলেন, পার্ক সার্কাসের সার্কাস।

পনের বছর পরে পার্ক সার্কাসের ট্রোজান ঘোড়ার উদর থেকে ইউলিসিসের অবতরণ ঘটবে। আমাদের স্বাধীনতার ইউলিসিস—নেতাজী সুভাষচন্দ্র।

রবীন্দ্র-সুভাষ সম্পর্কের বিশ্লেষণ থেকে কিছু সময়ের জন্য বিদায় নিচ্ছি। এখানে ১৯২৮ সালের সংবাদপত্রের কিছু প্রত্যক্ষ বিবরণী আমি যথাযথভাবে উদ্ধৃত করব। প্রথমে কংগ্রেস অধিবেশনের প্রস্তুতি পর্ব। "নিখিল ভারত রাষ্ট্রমহাসভার অধিবেশন"—পঞ্চম পৃষ্ঠায় এই পাতা জোড়া শিরোনামার তলায় কংগ্রেস অধিবেশনের আয়োজনাদির বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে আনন্দবাজারে অনেকদিন ধরে। তার অংশ উদ্ধৃত করছি।

লেখকের প্রকাশিতব্য "রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র" গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদ, এই প্রবন্ধ।

আনন্দবাজার পত্রিকা : ১২ ডিসেম্বর ১৯২৮

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী

অশ্বারোহী বিভাগ

কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর জন্য যাহারা অশ্বারোহী স্বেচ্ছাসেবক হইতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, ১৪ই তারিখের পরে আর কাহাকেও স্বেচ্ছাসেবক দলে ভর্তি করা হইবে না।

বহুসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক অশ্বারোহী দলে ভর্তি হইয়াছেন এবং অশ্বারোহণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইঁহাদের অনেকেরই অশ্ব নাই। যাঁহাদের ঘোড়া আছে, তাঁহাদিগকে আমাদের অশ্বারোহী দলের জন্য ৫০টি অশ্ব ধার দিতে আমি নিবেদন জানাইতেছি।

১১ই তারিখ হইতে অশ্বারোহীদলের রীতিমত শিক্ষাদান চলিতে থাকিবে। প্রেসিডেন্টের পৌঁছিবার দিবস যে শোভাযাত্রা হইবে তাঁহারা সেই শোভাযাত্রায় যোগদান করিবেন। ইহা ছাড়া ২০ তারিখ হইতে পাহারা এবং যানবাহন, লোকজনের চলাফেরা নিয়ন্ত্রিত করিবার কার্যেও তাঁহারা নিযুক্ত থাকিবেন। ঘোড়াগুলি প্রত্যহ পার্ক-সার্কাসে প্রেরিত হইতে পারে। কার্যের পর সেগুলি আস্তাবলে পাঠান যাইতে পারে অথবা তিন সপ্তাহের জন্য কংগ্রেস ময়দানস্থ আস্তাবলে সেগুলি রক্ষিত হইতে পারে। ঘোড়াগুলির বিশেষ যত্ন লওয়া হইবে। আমি আশাকরি, যাঁহাদের ঘোড়া আছে তাঁহারা আমাদের এই কার্যে সাহায্য করিবেন।

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং

'দুঃখের বিষয় অনেকের অশ্ব নাই'—যুদ্ধের সময় সাধারণ মানুষের অন্নাভাব এবং সৈনিকদের অশ্বাভাব। তা নিয়ে সেনাপতিদের অসুবিধায় পড়তেই হয়—তা তিনি রাজসিংহই হোন বা সুভাষচন্দ্রই হোন।

অন্যদিনের সংবাদ—

আনন্দবাজার ১৩ ডিসেম্বর ১৯২৮

কংগ্রেসস্বেচ্ছাসেবক

বাহিনী

সহরের ভিতর দিয়া রুট মার্চ

অভূতপূর্ব দৃশ্য

সুশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী এ বৎসরের কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির একটি প্রধান কৃতিত্বের বিষয় হইবে।

কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর আহ্বানে প্রায় দুই হাজার যুবক এ পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবক দলভুক্ত হইয়াছে। সেনাবিভাগের ভূতপূর্ব সেনানীদের অধীনে বিভিন্ন পার্কে সকালে এবং বিকালে শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে।

গতকল্য বুধবার অপরাহ্ণকালে এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর দুই দল—একদল শ্রদ্ধানন্দ পার্ক হইতে এবং অপরটি

ছাত্ররা পার্ক হইতে বাহির হইয়া বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে সহরের রাজপথ দিয়া স্কচকাওয়াজ করে। উত্তর দল কলেজ স্কোয়ারে মিলিত হইয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া মার্চ করিতে করিতে বিডন স্কোয়ারে গমন করে। বিডন স্কোয়ার ঘুরিয়া তাহারা শ্রদ্ধানন্দ পার্কে প্রত্যাবর্তন করে।

রাজপথ সমূহের উভয় পার্শ্বে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়াইয়া এই অপূর্ব দৃশ্য উপভোগ করে।

সবচেয়ে উপভোগ করেছিলেন এই দৃশ্য—সুভাষচন্দ্র বসু। রোমাঞ্চিত হচ্ছিলেন গর্বে এবং ভাবী ভারতের কল্পনায়, যে-ভারতের চোখে দীপ্তি, বুকে সাহস এবং হাতে শত্রুনিপাতের অস্ত্র আছে। ইংরেজ সৈনিকদের উদ্ধত পদবিক্ষেপ মনে পড়ছিল তাঁর। আর মনে পড়ছিল নিজের একটি অভিজ্ঞতার কথা, যখন কলেজের ছাত্ররূপে ইউ, টি, সি-র দলভুক্ত হয়ে মার্চ করে গিয়েছিলেন পথে পথে।

সুভাষচন্দ্রের স্বপ্ন, দুই সহস্র স্বেচ্ছাসেবকের চার সহস্র পদের মুদ্রণে লেখা হতে লাগল কলকাতার রাজপথে।

এবার নগরসজ্জার বিবরণ এবং স্বেচ্ছাসেবকদের অন্য কার্যকলাপ।—

আনন্দবাজার ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৮

দেশবন্ধু নগরে সজ্জা

শিবিরসমূহের সামরিক দৃশ্য

আলাদীনের ঐন্দ্রজালিক প্রদীপের শক্তিতেই যেন চক্ষের নিমেষের মধ্যে দেশবন্ধু নগরের মত একটি সুন্দর স্থান অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়াছে। বাস্তবিকই দেশবন্ধু নগরের বিরাট মনোমুগ্ধকর ব্যবস্থা দেখিয়া এই কথাই মনে হয় যে, নগরপরিচালকারিগণ এত অল্প সময়ের মধ্যে ঐরূপ একটি সুন্দর স্থানের সৃষ্টি কি প্রকারে সম্ভব করিয়াছেন! নগরের নির্মাণ প্রায় শেষ হইয়া আসিল এবং প্রত্যেক ঘণ্টায়ই দৃশ্যের পরিবর্তন দেখা যাইতেছে। কংগ্রেস মণ্ডপ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির চারহাজার প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট দর্শকবৃন্দের জন্য বিরাট মঞ্চ নির্মাণ শেষ হইয়া গিয়াছে এবং এক্ষণে খদ্দর দিয়া আচ্ছাদনের কার্য আরম্ভ হইয়াছে। ভারতীয় শিল্পকলা অনুসারে নগরসজ্জার কার্য শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।…

নগরটি এক্ষণে সামরিক শিবিরের আকার ধারণ করিয়াছে এবং উহার প্রতি প্রবেশদ্বারে স্বেচ্ছাসেবকগণ রীতিমত কড়া সামরিক কায়দায় পাহারা দিতেছে। প্রত্যেক আগন্তুক, তিনি যতই খ্যাতনামা হউন না কেন, প্রবেশদ্বারে পরিচয় না দিয়া এবং অনুমতি না লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন না—এমনকি অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান মিঃ জে, এম, সেনগুপ্ত এবং জেনারেল সেক্রেটারী ডাঃ বি, সি, রায়কে পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ করা হইয়াছিল এবং প্রবেশ করিতে দিতে অস্বীকার করা হইয়াছিল। স্বেচ্ছাসেবকদিগের নিয়মানুবর্তিতা অতিশয় প্রশংসনীয়। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু সর্বদা উপস্থিত থাকিয়া তাহাদিগকে জাতির সেবায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছেন, এই জন্য শ্রীযুক্ত বসু ধন্যবাদার্হ। সায়াহ্নের

সঙ্গে সঙ্গে কুচকাওয়াজের মাঠে ডাক এবং বিউগিল বাজিয়া ওঠে, ইহাতে সামরিক যুদ্ধের একটা উৎসাহজনক ভাব লোকের মনে জাগিয়া ওঠে।

আনন্দবাজার ১৯ ডিসেম্বর ১৯২৮

প্রেসিডেন্টের শোভাযাত্রা

প্রেসিডেন্টের শোভাযাত্রা নিম্নলিখিত রূপ হইবে :—

(১) মোটর সাইকেল আরোহী দল, (২) সাধারণ সাইকেল আরোহী দল, (৩) পতাকাবাহী দল, (৪) পরিপূর্ণ সামরিক উর্দি পরিহিত জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং ; (৫) পুষ্পবাহী বালকদল ; (৬) পতাকাবাহী স্বেচ্ছাসেবক দল ; (৭) ব্যাণ্ড ; (৮) পদাতিক দল ; (৯) অশ্বারোহী দল ; (১০) অশ্বযানে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতি ; (১১) মোটর গাড়ীতে মিসেস্ নেহেরু ; (১২) অশ্বারোহী দল ; (১৩) স্বেচ্ছাসেবক দল ; (১৪) পদাতিক দল ; (১৫) অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণ ; (১৬) মোটর শ্রেণী এবং তৎপশ্চাতে জনসাধারণ।

উদ্যোগ আয়োজন

প্রত্যহ হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক মার্চ করিতেছে, এবং অশ্বারোহীদলকে শিক্ষিত করা হইয়াছে। মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা জয়ঢাক এবং বিউগিল, বাজাইয়া প্যারেড করিতেছে। দেশবন্ধু নগরের দিকে অবিরল জনস্রোত বহিতেছে। সেখানে রীতিমত উৎসবের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

মফঃস্বল হইতে ৫০০ স্বেচ্ছাসেবক

গতকল্য কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে এবং মফঃস্বল হইতে প্রায় ৪ শত স্বেচ্ছাসেবক তাহাদের পোষাক এবং কাপড়চোপড়সহ দেশবন্ধু নগরে পৌঁছে। তাহাদের সামরিক কেতায় চালচলন এবং নিয়মানুবর্তিতা হইতেই পরিচয় পাওয়া যায় যে, তাহারা সুন্দররূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে।

বালিকা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী

গতকল্য সন্ধ্যাবেলা প্রায় একশত বালিকা কংগ্রেস ময়দানে ড্রিল করে। বালিকারা যখন তাহাদের নেত্রীর অধীনে মার্চ করিতেছিল, তখন তাহাদিগকে দেখিয়া বৈদিক যুগের শক্তিকাদের কথাই স্মৃতিতে উদয় হইতেছিল। ভারতের সন্তানগণই শুধু নহে কন্যাগণও স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানকরিবেন, সেদিন অধিক দূরে নহে।

বর্ণনাগুলি পুরাতন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধার করার কারণ—এগুলি ১৯২৮ সালের কলকাতার ঘটনা, না ১৯৪৩ সালের পূর্ব এশিয়ার কোনো জায়গার ব্যাপার সে বিষয়ে আমার বিভ্রম হয়েছিল একসময়।

সুভাষচন্দ্র কত অনৌলিক ! ১৯২৮ সালে যা করেছিলেন, ১৯৪৩ সালে ঠিক তাই করলেন। বদলালেন না চিন্তায়, চরিত্রে বা কার্যে ! সেই পুরুষবাহিনী এবং নারীবাহিনী, সামরিক শৃঙ্খলা, তীব্র দেশপ্রেম জাগানোর চেষ্টা—সব এক রকম।

১৯২৮ সালে সুভাষচন্দ্র খেলা করেছিলেন, ছোটমেয়েরা যেমন পুতুল নিয়ে সংসারখেলা করে। বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ উপন্যাসে আছে—চঞ্চলকুমারী বলছেন —

'ছেলেরা পুতুল খেলিয়া সংসারের সাধ মিটায়।··· ছেলেদের সাধ মিটে ; সময়ে তাহাদের সত্যের ঘরসংসার হয়। আমার কি সাধ মিটিবে না ?'

১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে স্বেচ্ছাসেবকদের কি বলে সুভাষচন্দ্র উদ্বুদ্ধ করতেন জানি না, কিন্তু ঠিক একবৎসর পরে ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে অমরাবতীতে মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের ছাত্র সম্মেলনে স্বপ্নবিলাসী মানুষটিকে দেখা গেল—

"কেহ কেহ ভাবিতেছেন আমি একজন স্বপ্নবিলাসী যদি ইহাই আপনাদের মনে হয় আমি নাচার।..... আমি নিজেকে স্বপ্নবিলাসী বলিয়া স্বীকার করিতেছি।·····আমার নিকট কিন্তু স্বপ্নই সত্য বলিয়া মনে হয়। এই স্বপ্ন হইতেই আমি উদ্দীপনা লাভ করি, কাজ করিবার শক্তি আমার প্রাণে জাগে। স্বপ্ন না থাকিলে আমার পক্ষে জীবনধারণ করাই অসম্ভব।

আমি যে-স্বপ্ন ভালবাসি—সে হইতেছে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন, আপনার প্রভায় গৌরবান্বিত সমুজ্জ্বল ভারতের স্বপ্ন। আমি চাই এই ভারত তাহার নিজ সংসারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হউক।·····আমি চাই এদেশে একটা স্বাধীন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হউক তাহার সৈন্য, তাহার নৌ-বল, তাহার বিমানপোত সমস্তই স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র হউক। আমি চাই—পৃথিবীর স্বাধীন দেশসমূহে স্বাধীন ভারতের দূত প্রেরিত হউক। আমি দেখিতে চাই—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যাহা কিছু মহত্তর, তৎসমস্তেরই গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া এই ভারতমাতা সমগ্র জগতের সমক্ষে বরেণ্যবরদায়িনীরূপে দণ্ডায়মান হউক। আমি চাই—এই ভারত দেশে দেশে পরিপূর্ণ সত্যের বাণী, সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার বাণী প্রেরণ করুক।" [নূতনের সন্ধান—৬১-৬২] * ১

স্বপ্নের ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র 'রক্ষণশীল' ছিলেন। কেন না অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র ১৯৪৩ সালে একই কথা উচ্চারণ করবেন। তাঁকে স্বপ্নবিলাসী বলে ঘোষণা করা হয়েছিল দিল্লী রেডিয়ো থেকে। তদুত্তরে তিনি আত্মগত কণ্ঠে বলেন —

"ওরা বলে আমি স্বপনচারী। আমি স্বীকার করছি আমি স্বপনচারীই বটে। সারা জীবন আমি স্বপ্ন দেখেছি ;

---

* ১ অনুরূপ স্বপ্নের কথা - নূতনের সন্ধান - পৃঃ ৯০-৯৩

শিশুকাল থেকেই এ আমার এক রোগ। কত স্বপ্নই না আমি দেখেছি। কিন্তু আমার সকল স্বপ্নের সেরা স্বপ্ন—আমার জীবনের সব চাইতে প্রিয় স্বপ্ন—ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন। ওরা মনে করে স্বপনচারী হওয়া বুঝি খুব একটা অগৌরবের কথা। আমি কিন্তু গৌরব বোধ করি তাতে। আমার স্বপ্ন ওরা ভালবাসে না—সে আর নতুন কথা কি? আমি যদি ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন না দেখতাম তাহলে চিরদিনের জন্য বরণ করে নিতাম দাসত্বের শৃঙ্খল। প্রশ্ন হচ্ছে, আমার স্বপ্ন কি সফল হবে—হতে পারে? আমি বলছি আমার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিয়ে ফুটে উঠছে দিনে দিনে। তার প্রমাণ এই সৈন্যবাহিনী। না স্বপনচারী হতে আমার লজ্জা নেই। স্বপনচারীদের স্বপ্নই পৃথিবীকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। বিশ্বের প্রগতি তাদের স্বপ্নের ফলে সম্ভব হয়েছে। সে স্বপ্ন অন্যকে শোষণের স্বপ্ন নয়, ব্যক্তিগত ধনসম্পদ বা সম্মানবৃদ্ধির স্বপ্ন নয়—সে স্বপ্ন, প্রগতির স্বপ্ন, প্রচুরতম লোকের প্রচুরতম সুখসাধনের স্বপ্ন, সকল জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির স্বপ্ন।"

সুভাষচন্দ্রের 'রক্ষণশীল' স্বপ্নবিলাসের মধ্যেই বিপ্লবী চরিত্রের প্রকাশ। জগতের বড়ো বিপ্লবীরা সকলেই এই জাতীয় স্বাপ্নিক। তাঁরা একটা কিছু দেখেন কল্পনায় এবং তাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করে যান, কিংবা রূপ দেবার সংগ্রামে দেহপাত করেন। কবিদের সঙ্গে বিপ্লবীদের ঐক্য স্বপ্নবিলাসে, পার্থক্য কল্পনার নিষ্ঠারক্ষার ব্যাপারে। কবিদের কল্পনা নিত্য অসতী, বিপ্লবীর কল্পনা সমুদ্রপারের একমাত্র রাজকন্যার পাণিপ্রার্থী।*২

১৯২৮-এর ডি, ও, সি, সুভাষচন্দ্র যে নেতাজীর প্রথম প্রকাশিত সংস্করণ (দ্বিতীয় সংস্করণ যদিও অনেক পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত) তার আরো একটা দৃষ্টান্ত দিই। ১৯২৯ সালের স্বপ্ন বিলাসের পিছনে ছিল বিপ্লবীর কঠোর বাস্তব বোধ। মর্ত্যকে যদি অমরাবতী করতে হয় দানবগুলোকে মারা দরকার যারা স্বর্গকে টানছে পাতালের কর্দমে। সুভাষচন্দ্র ঐ ১৯২৯ সালের ছাত্র-সম্ভাষণে বলেছেন—

"আমি যে জীবনের চিত্র আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি তাহাতে দুঃখ কষ্ট এবং নির্যাতন আসিতে পারে—একথা অস্বীকার করি না। তবে একথার বিশ্বাস করুন যে, ইহাতে আনন্দও কম পাইবেন না। আমি যে পথের কথা বলিলাম তাহা কণ্টকাকীর্ণ হইতে পারে, কিন্তু এই পথই কি একমাত্র গৌরবের পথ নহে? আমি তাই আপনাদিগকে আহ্বান করি,—আসুন আপনারা, আমরা সকলে একদলে মিলিত হইয়া হাত ধরাধরি করিয়া সম্মুখ পথে যাত্রা করি।...দুঃখ কষ্ট নির্যাতন ও নিরাশার অন্ধকারের মধ্যে পা ফেলিয়া আমাদিগকে চলিতে হইবে বটে, তবে শেষ পর্যন্ত আমরা অবশ্যই চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিব, পরমানন্দ এবং অমৃত লাভ করিতে পারিব।" [—নূতনের সন্ধান]

এরও কয়েক বৎসর আগে সুভাষচন্দ্রের রচনা—

"ভাই সকল, কে তোমরা আত্মবলির জন্য প্রস্তুত আছ, এসো। মায়ের হাতে তোমরা পাবে শুধু দুঃখ কষ্ট।

---

*২ বিপ্লবীদের ক্ষেত্রে আমি 'স্বপ্ন' অপেক্ষা 'ধ্যান' শব্দটির অধিক পক্ষপাতী। স্বপ্ন বা কল্পনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য তা অবস্থান পরিবর্তনে উৎসুক—'ধ্যান' অপরকে একটা মহান কিছুকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, পরে তার জন্য অর্পণ করে মনপ্রাণ।

অনাহার ও দারিদ্র্য যন্ত্রণা।.....ভগবান যদি করেন, তোমরা যদি শেষ পর্যন্ত জীবিত থাক, তবে স্বাধীন ভারত তোমরা ভোগ করিতে পারবে। আর যদি স্বদেশ সেবার পুণ্য প্রচেষ্টায় ইহলীলা সংবরণ করতে হয়, তবে মুক্তির স্বর্গের দ্বার তোমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হবে। তোমরা যদি প্রকৃত বীর সন্তান হও তো এগিয়ে এসো।

[তরুণের স্বপ্ন]

নেতাজী সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ সৈনিকদের সম্বোধন করে বললেন—

I assure you that I shall be with you in darkness and in sunshine, in sorrow and in joy, in suffering and in victory. For the present I can offer you nothing except hunger, thirst, suffering, forced marches and death. It does not matter who among us will live to see India free. It is enough that India shall be free and that we shall give our all to make her free.

অনুবাদের প্রয়োজন নেই, সকলেই লক্ষ্য করবেন, সুভাষচন্দ্র তাঁর পুরানো কথাই বলছেন নতুন পরিস্থিতিতে। এরই নাম স্থির কল্পনা এবং অতন্দ্র সাধনা। 'বারি যাহাকে সিক্ত করিতে পারে না, বায়ু যাহাকে বিচলিত করিতে পারে না, অগ্নি যাহাকে দগ্ধ করিতে পারে না'—সেই পরম প্রতিজ্ঞা।

সুভাষচন্দ্রের চিন্তার ধারা নির্দেশ করতে আমরা কিছু সময়নিলাম। পুনরায় ১৯২৮-এর জীবন্ত ইতিহাসে প্রত্যাবর্তন করা যাক। যে-কংগ্রেসের জন্য এত উদ্যোগ আয়োজন—সেই কংগ্রেস সুরু হোল। সুরুরও সুরুতে সভাপতির আগমন এবং তাঁর ঐতিহাসিক শোভাযাত্রা। সংবাদপত্রের বিবরণ এই প্রকার।

আনন্দবাজার ২২ ডিসেম্বর ১৯২৮, শনিবার

কংগ্রেসের নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে কলিকাতায় অভূতপূর্ব সংবর্ধনা।

৪৩ ঘোড়ার গাড়ীতে পণ্ডিত মতিলাল

সামরিক কেতায় স্বেচ্ছাসেবক দলের মিছিল

শহরের রাজপথে নরনারীর অপূর্ব উৎসাহ-প্রবাহ

পুরনারীগণের শঙ্খধ্বনি ও পুষ্পবর্ষণ

রাষ্ট্রনেতাকে অভ্যর্থনায় শহরের উল্লাস-সজ্জা

৪৩ তম ভারতীয় জাতীয় মহাসভার নির্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে গতকল্য সকালে কলিকাতা-বাসিগণ রাজসম্বারোহে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। জাতির শ্রদ্ধাভাজন নেতা জাতির হৃদয় কতটা অধিকার করিয়াছেন তাহা গতকল্যকার মহানগরীর উৎসব অনুষ্ঠান হইতে অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এইরূপ উৎসব, লোকসমূহের এরূপ শৃঙ্খলা সত্যই অপূর্ব। বাস্তবিক কংগ্রেসের ইতিহাসে সভাপতিকে এরূপ বিপুলভাবে অভ্যর্থনা

করিবার দৃশ্য আর দেখা যায় নাই। এ যেন দেশের বীর সেনানী দিগ্বিজয়ের শেষে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন—দেশবাসীরা তাঁহাকে বরণ করিয়া লইল, পুরবাসীরা তাঁহাকে অর্ঘ দিল, এবং নাগরিকেরা তাঁহাকে আনন্দ ও উত্তেজনার মধ্যে সংবর্ধিত করিল। সহস্র সহস্র নরনারীর আনন্দদীপ্ত ললাটে প্রভাতের সূর্য কিরণ পড়িয়া যেন মহাভবিষ্যতের এক হাস্যোজ্জ্বল চিত্রলোকের সৃষ্টি করিয়াছিল। অশ্বারোহী স্বেচ্ছাসেবকদিগের অগ্রগতির পদধ্বনি, পদাতিকদিগের সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ও বীরোচিত পদক্ষেপ, মহিলা স্বেচ্ছাসেবকদিগের প্রভাতী সূর্যকরদীপ্ত গতিভঙ্গিমা, পণ্ডিত মতিলালের সুসজ্জিত অশ্বরথ, রণবাদ্যের ধ্বনি এবং সহস্র সহস্র শোভাযাত্রীর প্রবল উৎসাহ যুগপৎ নাগরিকদের মনে আনন্দ, উত্তেজনা এবং স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা দিয়াছিল।

প্রায় ৮ টার সময় পণ্ডিত মতিলালের হাওড়া পৌঁছিবার কথা ছিল কিন্তু রাজপথের দীপাবলী ভাল করিয়া নির্বাপিত হইবার পূর্বেই সহস্র সহস্র লোক হাওড়া স্টেশনের দিকে ছুটিতে থাকে; তাহারা জানিত যে, স্টেশনের মধ্যে তাহাদের প্রবেশাধিকার নাই, তথাপি তাহাদের শ্রদ্ধাভাজন নেতাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য তাহারা দলে দলে স্টেশনের সম্মুখে সমবেত হইয়াছিল।

নিদারুণ পৌষের ঠাণ্ডা অতি প্রত্যূষে যানবাহনে দূর হইতে আসিবার কষ্ট, কিন্তু তাহারা ভ্রূক্ষেপ করে নাই। বয়স্কা এবং বৃদ্ধামহিলারা পর্যন্ত এই অভিনন্দন উৎসবে অপরিসীম অসুবিধা সহ্য করিয়া যোগদান করিয়াছিলেন।

মাঝে মাঝে নগরের সুসজ্জিত তোরণদ্বারে এইরূপ লেখা ছিল—"হে যুবক, দেশের বেদনা কি তুমি সত্য সত্যই উপলব্ধি কর? এই বেদনায় কি তোমার ক্ষুধা নষ্ট হইয়া গিয়াছে? তোমার নিদ্রা দূর হইয়াছে? তোমার স্বপ্ন দুর্ভাবনার পূর্ব হইয়াছে?"—"স্বাধীনতা চাই, স্বাধীনতা মানবের জন্মগত অধিকার।"

এই প্রকারে শোভাযাত্রার এবং কলিকাতাবাসীদের অভিনন্দনের সর্ববিষয়ে একটি জাতীয় ভাবের সমাবেশ হইয়াছিল। সর্বোপরি শোভাযাত্রার সামরিক আবহাওয়ার মধ্য দিয়া যে স্বদেশপ্রেম, সৌন্দর্যজ্ঞান, ও শৃঙ্খলাশক্তি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা বাস্তবিকই বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎকে আশায় ও আনন্দে ভরিয়া তুলিয়াছে।

[এর পরে কলমে বিভক্ত সংবাদ। সেই সংবাদের কিছু অংশ—]

নিখিল ভারত রাষ্ট্রসমিতির কলিকাতা অধিবেশনের নির্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু গতকল্য সকাল ৭-৪০ মিনিটের সময় হাওড়া স্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হন। স্টেশনে তাঁহাকে বিপুল আন্তরিকতার সহিত সংবর্ধনা করা হয়।

সভাপতির উপস্থিতি

যথাসময়ে স্পেশাল গাড়ীখানি তুমুল বন্দেমাতরম্ ধ্বনির মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। স্টেশনে অভ্যর্থনা সমিতি যদিও ব্যবস্থার ত্রুটি করেন নাই, তথাপি স্পেশাল আসিয়া পৌঁছানমাত্র জনতা প্রেসিডেন্টকে দর্শন করিবার জন্য বিষম ভীড় করিয়া যখন অগ্রসর হইল তখন তাহাদিগকে সংযত রাখা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল—সভাপতির গাড়ী আসিয়া পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে বহু তোপধ্বনি করা হয় এবং স্টেশনে সমুপস্থিত মহিলাবৃন্দ শঙ্খধ্বনি করিয়া ওঠেন।

সভাপতির এই মিছিল বাস্তবিকই অভূতপূর্ব হইয়াছিল। দুই হাজার সুশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক, মহিলা স্বেচ্ছাসেবক,

অশ্বারোহী দল, পদাতিক দল লইয়া এই মিছিল গঠিত হইয়াছিল। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু সামরিক পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া—প্রেসিডেন্টের গাড়ী ঐ স্থানে পৌঁছিবামাত্র তাঁহাকে সামরিক কেতায় অভিবাদন করেন।

মিছিলের গঠন

অতঃপর মিছিল চলিতে আরম্ভ করে। প্রথমে খাকি পোষাক পরিহিত মোটর সাইকেলারোহী স্বেচ্ছাসেবক দল; তৎপরে পতাকাবাহী পথপ্রদর্শক সওয়ারগণ ও বিউগেলারগণ যাইতে থাকে। ইহাদের পশ্চাতে একখানা মোটর গাড়ীতে জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং-এর পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহার হাতে একখানা চাবড়া বাঁধান ছড়ি ছিল। সতর্কদৃষ্টি সহকারে মিছিলের গতির উপর লক্ষ্য রাখিতেছিলেন। তাঁহার পশ্চাতে পতাকাবাহী স্বেচ্ছাসেবকগণ, তৎপশ্চাতে ড্রামারগণ, ড্রামের পিছনে ব্যাণ্ড, ব্যাণ্ডের পিছনে পদাতিক দল, তৎপর অশ্বারোহ দল চলে। অশ্বারোহী দলের পশ্চাতে প্রেসিডেন্টের যান আসিতে থাকে। প্রেসিডেন্টের অশ্বচালিত যানের পিছনে একখানা মোটর গাড়ীতে দিলেন নেহেরু এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের পত্নী ছিলেন। ইহার পর আবার অশ্বারোহীদল, পদাতিকদল, সুনিয়ন্ত্রিত পদক্ষেপে চলিতেছিল। তাহাদের পশ্চাতে ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণ; তৎপর পতাকাবাহীগণ এবং সর্বশেষে সাধারণের মোটরগাড়ী সকল চলিতে থাকে। একজন সাইকেলারোহী স্বেচ্ছাসেবক শোভাযাত্রার সর্বাগ্রে গমন করিয়াছিল।

শোভাযাত্রা যাত্রা করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত প্রকার যানবাহনাদির চলাচল বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে তখন হাওড়া সেতুর দিকে অগ্রসর হয়, সেতুর দুই ধার দিয়া অসংখ্য লোক শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান হয়, বহু খেতাঙ্গ ভদ্রমহোদয়, ও মহিলাও তাঁহাদের বাঙ্গলার ছাদে দাঁড়াইয়া এই অপূর্ব দৃশ্য দর্শন করিতেছিলেন। হ্যারিসন রোড স্ট্র্যাণ্ড রোডের মোড়ে এক বিরাট জনতা সংরুদ্ধ মহাসাগরের ন্যায় উৎসুক নেত্রে প্রতীক্ষা করিতেছিল। আশে পাশে বাড়ীর ছাদে, বারান্দায়, গাছে, স্তম্ভে, প্রাচীরে যে দিকে তাকাও—অসংখ্য নরমুণ্ড ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টি গোচর হয় না। এইস্থানে এক সুদৃশ্য বিজয়তোরণ নির্মিত হইয়াছিল, তোরণ-স্তম্ভদ্বয়ে বিভিন্ন প্রসিদ্ধ নেতৃবৃন্দের জ্বালাময়ী বাণীসমূহ শোভা পাইতেছিল—হ্যারিসন রোডের উভয় পার্শ্বস্থ দোকানবাড়ী ও অট্টালিকাসমূহ পত্রপুষ্পমালা পতাকায় পূর্ণ কদলীবৃক্ষে শোভিত হইয়া অপূর্ব উৎসব বেশ ধারণ করিয়াছিল। উভয় পার্শ্বের গৃহ ছাদ ও বারান্দা-সমূহে সমবেত নরনারী বালকবালিকারা বিপুল জনতা শোভাযাত্রীদের উপর অবিরত, গোলাপ জল ও পুষ্প বর্ষণ করিতে থাকে এবং মুহুর্মুহু বন্দেমাতরম ধ্বনিতে গগন পবন মুখরিত করিতে থাকে।...

মিছিলটি এই স্থানে [কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে] এরূপ বিরাট আকার ধারণ করে যে,... ...সমস্ত রাজপথ নরমুণ্ডে পরিণত হয়। যতদূর নরমুণ্ড থৈ থৈ করিতেছিল।.....একদল মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা এইস্থানে মিছিলের সঙ্গে যোগদান করেন। তাঁহারা হরিৎবর্ণের খদ্দরের শাড়ীতে সজ্জিতা ছিলেন। তাঁহারা ত্রিবর্ণরঞ্জিত খদ্দরের ব্যাজ ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠদেশে লম্বিত বেণী শোভা পাইতেছিল। [শোভাযাত্রার এইরূপ বর্ণনা পার্কসার্কাসে পৌঁছান পর্যন্ত]...

[শোভাযাত্রা পার্কসার্কাসে পৌঁছিলে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের অভ্যর্থনা-ভাষণের পরে—]

উত্তরে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু বলেন, অদ্যকার যে অপূর্ব শোভাযাত্রার কথা আপনারা শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের মুখে শ্রবণ করিলেন, তাহাতে বঙ্গে উগ্র জাতীয়তাবাদের বিশেষত্ব এবং বঙ্গের নরনারীর দেশপ্রেম অভিব্যক্ত হইয়াছে। আমাদের পরলোকগত নেতা দেশবন্ধু দাসের এই সহর বাস্তুভূমি ছিল। হাওড়ার সেতু হইতে এই চন্দ্রাতপ পর্যন্ত আমি সর্বত্র তাঁহার প্রগাঢ় সেই স্বদেশপ্রেমেরই অন্ত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। স্বেচ্ছাসেবক দলের অপূর্ব বিধিব্যবস্থা অশ্বারোহী পদাতিক দলের শৃঙ্খলা ও গঠননৈপুণ্য, সর্বোপরি সর্বত্র অধিবাসীদের স্বদেশপ্রেমের যে উদ্বেল লহরীনর্তন লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাতে স্বরাজের স্বপ্নই আমার মনে উদিত হইয়াছে। আমি দেখিলাম, এখানকার প্রত্যেকেই এই অনুষ্ঠানটি সফল করিবার জন্য সাহায্য করিতেছেন। আজ মনে হইতেছে আমরা সত্যই বুঝি স্বাধীন, ভারতভূমি সত্যই বুঝি সুখ ও সম্পদশালী হইয়াছেন। আপনারা আজ প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে আপনারা সত্যই দেশবন্ধু দাসের সম্পদের যোগ্য উত্তরাধিকারী—সেই উত্তরাধিকার বলে স্বরাজ নিশ্চয়ই আপনাদের করতলগত হইবে।

সুবিখ্যাত সভাপতির শোভাযাত্রার বিবরণ এই পর্যন্ত। এই শোভাযাত্রায় সকলের সহযোগিতা থাকলেও সংগঠনের মূল গৌরব যে জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং-এর, তা তাঁর শত্রুপক্ষও স্বীকার করবেন। সুভাষচন্দ্র প্রথমাবধি সংগঠনে পারদর্শী। রাজনৈতিক জীবনের প্রথম প্রভাতে যুবরাজের আগমন-বিরোধী হরতালে সারা সহরের অধিবাসীদের পথ থেকে তুলে ঘরে ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন। আবার আজ রাজনৈতিক জীবনের মধ্যাহ্নমুখী প্রহরে সহরের সকল অধিবাসীকে ঘর থেকে টেনে পথে নামিয়েছেন কংগ্রেসরাজের আগমন-সংবর্ধনায়। সকলেই সুভাষচন্দ্রের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রশংসা করল—ফরোয়ার্ড লিখিল, *৩ "তিনি তুরী ভেরীর শব্দে জাতির তামসিকতা দূর করেছেন"। আনন্দবাজার 'শোভাযাত্রার সামরিক আবহাওয়ার মধ্য দিয়া যে স্বদেশপ্রেম সৌন্দর্যজ্ঞান ও শৃঙ্খলাশক্তি আত্মপ্রকাশ' করেছে তা দেখে বাঙালী জাতির আশাপ্রদ

---

*৩ ফরোয়ার্ড পত্রিকার এই শোভাযাত্রা প্রসঙ্গে যে সব কথা লেখা হয় তার মধ্যে বৈষম্যবাদীর মহিমা আছে। আমি অল্পস্বল্প উদ্ধৃত করছি :

(২২শে ডিসেম্বরের সম্পাদকীয়তে) : It was a short-lived experience—a brief spell of glory. It was the vision of a free India. ...It was a projection of soul that was inspiring. The General Officer Commanding, the infantry, the cavalry, and the citizen worshippers—was all this a life of probation, a preparation for a new life or was it not a life felt along the blood and felt in the soul, a life lived, an ideal realised, a vision that came true ?

(সংবাদের অংশ) : The General Officer Commanding in full military uniform directing the movements of the procession. The military dress, the majestic look, the stately stature and the commanding pose of this outstanding personality was a sight to see and brought to mind the vision of the coming National Militia of India.

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশ্বাসী হয়ে উঠল, স্বয়ং কংগ্রেস সভাপতি মতিলাল অনুভব করলেন 'ভারত যেন সত্যই স্বাধীন।'

সুভাষচন্দ্র যদি এইখানেই থামতেন। তাঁর এই সামরিকতা যদি বিবাহ-উৎসবের সামরিক ব্যাণ্ড পার্টি হোত (পরে দেখব, সেই কথা বলে তাঁকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে), তাহলে আশা করা যেত, এমন আর একটা 'সার্কাস'সাজাবার জন্য কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনে তাঁকে ডাক দেওয়া হয়েছে। কোন্ সভাপতি না এমন একটা সংবর্ধনা কামনা করবেন! কিন্তু হায়, সুভাষচন্দ্র যে অভ্যর্থনার বিনিময়ে সভাপতির কাছ থেকে সত্যই 'স্বাধীনতা' দাবী করলেন—দাবী করলেন, আমরা স্বাধীন তা প্রমাণ করতে হবে কথায় এবং কাজে, আশু সংগ্রামের ডাক দিয়ে পরাধীনতার সঙ্গে লড়াই করতে হবে।

কংগ্রেসের অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র পূর্ণ স্বাধীনতা জ্ঞাপক প্রস্তাব উত্থাপন করলেন।

সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব পরাভূত হল ৯৭৩—১৩৫০ ভোটে।

প্রস্তাবের পটভূমিতে কিছু কৌতূহলজনক তথ্য আছে।

পূর্বেই দেখেছি, ১৯২৭ সালের মাদ্রাজ কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। গান্ধীজী প্রস্তাবটি সম্বন্ধে বলেছিলেন, তাড়াহুড়ার তৈরী—বিনাচিন্তার ফল। ইতিমধ্যে সাইমন কমিশনের চ্যালেঞ্জের জবাবে ভারতের 'সর্বসম্মত শাসনতন্ত্র' প্রণয়ন করতে নেহেরু কমিটি গঠিত হয়েছে। সুভাষচন্দ্র সেই কমিটির সদস্য। কমিটি এমন শাসনতন্ত্র তৈরী করেছে যা পূর্ণ স্বাধীনতা এবং ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস—যে কোনো বস্তু সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হতে পারে। পূর্ণ স্বাধীনতার সম্পূর্ণ সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র ঐ 'দুমুখী' শাসনতন্ত্রে সই দিয়েছেন কারণ সর্বদলের সম্মতি তাতে পাওয়া যাবে। কিন্তু তিনি এবং জহরলাল নেহেরু দেশকে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে জাগ্রত করবার জন্য গঠন করলেন ইণ্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স্ লীগ, যাতে শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার যোগদান করলেন। ১৯২৮, নভেম্বরে দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনেও পূর্ণ স্বাধীনতার প্রশ্ন নিয়ে বামপন্থীনেতারা ঐক্যে ফাটল ধরাতে চাইলেন না। কিন্তু ইতিমধ্যে সহসা পরিস্থিতি বদলে গেল। কলকাতার মোসলেম লীগ সম্মেলন এবং সর্বদলীয় সম্মেলনে বিভেদ দেখা দিল—নেহেরু কমিটির 'সর্বদলের গ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্র' দলীয় বিবাদে বাতিল পুস্তকে পরিণত হোল। সুভাষচন্দ্র জোড়তালি দেওয়া ঐক্যের জন্য অনেকখানি আপোষ করেছিলেন। আর বিবেক-বিরোধিতা করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে উঠল। ৪৪

এই সময়ে আরো একটি ঘটনা ঘটল, যা সুভাষচন্দ্রকে ফিরিয়ে দিল তাঁর 'নিজ নিকেতনে'। সে ইতিহাসটা সত্যরঞ্জন বক্সীর মুখেই শোনা ভাল।—

---

৪৪ প্রথমে মনে হয়েছিল সর্বদলীয় সম্মেলনের দ্বারা সর্বসম্মত প্রস্তাব নেওয়ানোর চেষ্টা করে কংগ্রেস ভালই

"১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসের কথা উঠল। আমি (বর্তমান লেখক) সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধ পক্ষের একটি সমালোচনার উল্লেখ করলুম। সুভাষচন্দ্র নাকি গান্ধীজীর ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস সমর্থন করতে রাজী হয়েছিলেন, পরে দলে পড়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সত্যবাবু বললেন, ব্যাপারটা হয়েছিল কি, ইণ্ডিপেনডেন্স লীগের জহরলাল, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার গান্ধীজীর চাপে পড়ে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রশ্নে নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত করলেন। নিজের দলের লোকদের এই ব্যাপার দেখে সুভাষচন্দ্র নৈরাশ্যে বিরক্তিতে বলে ফেললেন—তাহলে উপায় কি, আমিও নিরপেক্ষ থাকব। পণ্ডিত মোতিলাল অত্যন্ত বুদ্ধিমান—তৎক্ষণাৎ সুযোগ পেয়ে বললেন, সেই ভাল, তুমি 'নিউট্রালই' থেকো। বাংলা দেশের চরমপন্থীরা পড়ল মুস্কিলে। সুভাষবাবু ছাড়া পূর্ণ অধিবেশনে প্রস্তাব উত্থাপনের যোগ্য লোক নেই। কংগ্রেস প্যাণ্ডালের একপাশে বি, পি, সি-র কর্মকর্তা সভা ডেকে প্রস্তাব পাস হোল—আমাদের নেতা সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব উত্থাপন করবেন। সুভাষবাবু দলের নির্দেশ মান্য করে প্রস্তাব তুললেন।

"ভোট গণনা চলল রাত আড়াইটে পর্যন্ত। আমি গণনাকারীদের দলে ছিলুম। সুভাষবাবু বারবার আমার কাছে আসেন আর বলেন—কাল আড্ডা করে ফেরোয়ার্ডে লিখবেন। আমি বললুম, অসম্ভব, রাতারাতি ঘরে গেছে; কখন অফিসে যাব, লিখব, আর কখন তা ছাপা হবে। সুভাষবাবু না-ছোড়।—সত্যবাবু আপনাকে যেতেই হবে, কলমে যত জোর আছে সব দিয়ে লিখতে হবে। আড়াইটের সময় ভোট গণনা শেষ হতে দেখা গেল আমরা হেরেছি। আমাদের ভোট ৯৩ এবং ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের ভোট ১৩৫০। সুভাষবাবুর তাগিদে ওখানে ভীড় ঠেলে বেরিয়ে পড়লুম। তিনটে নাগাদ বৃটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রিটের অফিসে পৌঁছলুম। কম্পোজিটরকে ডেকে তৈরী প্রথম এডিটো-

---

করেছে. কিন্তু, সুভাষচন্দ্র লিখেছেন, "পরবর্তী ঘটনার অভিজ্ঞতায় দেখা গেল এই পথ নেওয়া কংগ্রেসের পক্ষে ভুল হয়েছে, যেমন গোল টেবিল বৈঠকে বসতে রাজি হওয়াও ভুল, কেননা সেখানে এমন সব লোকের সঙ্গে বসতে হল, যাদের বসবার কোনই অধিকার ছিল না। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সম্পূর্ণ দায়িত্ব যে-দল স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ, সেই দলের।···ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী দিল্লী ফরমুলাকে (যাতে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসপন্থী ও পূর্ণ স্বাধীনতা পন্থীদের মধ্যে কাজ-চলা গোছের আপোষ হয়) মেনে নিতে অস্বীকার করলেন।···ফলে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে মতভেদ অপরিহার্য হয়ে উঠল। মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু আপোষের চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁরা সবচেয়ে বেশী যা ছাড়তে রাজী, তা বামপন্থীরা সবচেয়ে কম যা চাইতে পারে, তারও কম। বামপন্থী নেতারা খোলাখুলি বিরোধ এড়াতে চাইলেও দলের সাধারণ কর্মীরা আপোষের প্রশ্নে একেবারে গররাজী। ফলে মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক প্রস্তাবিত মূল প্রস্তাবটি সমগ্র বামপন্থী দলের বিরোধিতার সম্মুখীন হল। তাঁরা, বর্তমান লেখক (সুভাষচন্দ্র) কর্তৃক উত্থাপিত সংশোধনী প্রস্তাবটি সমর্থন করলেন। সংশোধনী প্রস্তাব ৯৭৩—১৩৫০ ভোটে অগ্রাহ্য হলেও এই ভোটকে কোন মতে স্বাধীন ভোট বলা যায় না, কেননা মহাত্মার সমর্থকেরা একে মহাত্মার প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব বলে দাঁড় করিয়াছিলেন, বলেছিলেন যে, যদি এই প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহলে মহাত্মা কংগ্রেস থেকে অবসর নেবেন।" (ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল)

রিয়াল ভেঙে ফেলতে বললুম। এক স্লিপ করে লিখব আর সঙ্গে সঙ্গে তা কম্পোজ হবে—এই ঠিক হোল। রাত—চারটের সময় লেখা আর কম্পোজ দুই শেষ হোল।

তার পরদিন এবং তারও পরের দিন যে সব সম্পাদকীয় বেরুল, তাতে গান্ধীজীর অতি কঠিন সমালোচনা ছিল। মোতিলাল নেহেরুর ভাষণের প্রশংসা ছিল, অংশ-বিশেষের সমালোচনা ছিল। সেসব সম্পাদকীয় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলো সর্বদিকে।"

১৯২৯-এর ২৪শে জানুয়ারী তারিখের ফরোয়ার্ডে প্রধান সম্পাদকীয়ের শিরোনামা 'Muddled' অংশ তুলে দিচ্ছি :

'It will be a grievous blunder on the part of the older leaders of Congress if they run away with the idea that the numerical voting strength in favour of Gandhiji's resolution is any index of its popularity.....He who runs must take note of the determined and articulate rebellion against authority ; he who runs must take note of the rebellion against popery, political or otherwise. No one is content to-day to take things as accepted or trim one's convictions to the conveniences or fancies of men however reputed .... It is no doubt true that persons and personalities do count, and the old order does not change in a day. A course of action that has to secure the approval of the ballot box by marshalling on its sides all sorts of distinguished names in the country—revered Pandits and Maulanas, and above all, the mysterious spell of Sabarmati, does not seem to show intrinsic strength. It is a losing cause, and principles do not take long to defeat personalities.

There is nothing so dissipating and so demoralising as the confusion of thought and ideas .....A programme of "muddling on" does not encourage or inspire. ..... It was hoped that the mental weaknesses and the itellectual hypocrisies involved in impossible compromises would be got over.....The older leaders have again sought refuge in reservations and subterfuges. Sj. Subhas Chandra Bose's amendment made the issue both clear and straight... That is the begining of the struggle. The next few months will show whether subterfuges and mental reservations win or a bold idea boldly conceived grips the heart, the intellect and the imagination of the country.

চাঞ্চল্য বলে চাঞ্চল্য ! ঘরে বাইরে আলোড়ন। ঘরের মধ্যে ফরোয়ার্ড সম্পাদক সত্যরঞ্জন বক্সীর কোর্ট মার্শাল, বাইরে তরুণ-বিরোধী দলের নির্মম সমালোচনার। সমালোচনার আরো কারণ সুভাষচন্দ্র সর্বদিকে জল ঘুলিয়ে তুলেছেন। তিনি ইতিমধ্যে যুব সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রূপে একটি বক্তৃতা দিয়েছেন - তার জ্বালায় অস্থির করে দিয়েছে বিরোধী পক্ষকে। এই 'খোকা ভগবান' খোকা হলেও ভগবান, সুতরাং ঐশ্বরিক শক্তির অধীশ্বর এবং ভগবান হলেও খোকা, সুতরাং মাড়ির জোর দারুণ। যুব সম্মেলনে সুভাষচন্দ্রের সেই চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী বক্তৃতাটির ঐতিহাসিক মূল্য আছে। অংশবিশেষে উদ্ধৃত করা যাক।—

আনন্দবাজার ২৬ ডিসেম্বর ১৯২৮ বুধবার

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর অভিভাষণ

[যুব সমস্যা এবং যুব আন্দোলনের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা। তারপরে—]

বন্ধুগণ, আজ কেবল জার্মেনী, রাশিয়া বা চীনের যুবক নহে বরঞ্চ মুসলীর পারস্য এবং ক্ষুদ্র আফগানিস্থানের যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যেই চাঞ্চল্য জাগে নাই, এই ভারতবর্ষে সকলশীল দেশেও জাগরণ আসিয়াছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ইহা বাহ্য চাঞ্চল্য নহে, ইহা অন্তরাত্মার জাগরণ। ভারতের যৌবন আর প্রবীণ পক্ষকেশ নেতাদের স্কন্ধে সব ভার নিক্ষেপ করিয়া যোড় হস্তে মূক মেষপালের মত অনুগমন করিতে প্রস্তুত নহে। তাহারা বুঝিয়াছে, স্বাধীন মহান্ শক্তিমান্ ভারত তাহারাই গড়িবে,—সে দায়িত্ব তাহারা গ্রহণ করিয়াছে।.....

আজ আমি আমার চারিদিকে দুটি বিভিন্ন চিন্তাধারার গতি দেখিতে পাইতেছি। আমি যত ক্ষুদ্র, যত তুচ্ছ হইনা কেন, নির্ভয়ে ও অসঙ্কোচে সে কথা আমি বলিব। আমি এই দুই পৃথক ভাবধারার কেন্দ্র রূপে সবরমতী ও পণ্ডীচেরীকে লক্ষ্য করিতেছি। ইহাদের মূল দার্শনিক ভিত্তির কথা বলিতেছি না। দার্শনিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্র ইহা নহে। আমি আজ বাস্তববাদীরূপে, এই দুই ভাবধারার দার্শনিক তত্ত্ববিচার করিব না। আমি কর্মক্ষেত্রে উহার ফলাফল বিচার করিব।

সবরমতীর ভাবধারা—তাহার প্রচারমুখে এই ধারণা জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছে যে, আধুনিকতা মন্দ, কলকারখানার পরিণাম দুরবস্থায়, অভাব বৃদ্ধি করা অনুচিত, জীবনযাত্রার প্রয়োজন ও প্রাচুর্য বর্ধিত করা উচিত নহে। সর্বপ্রকারে গোরুর গাড়ীর যুগে ফিরিয়া যাওয়াই শ্রেয় এবং দৈহিক উন্নতি অথবা সামরিক শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করিয়া কেবল আত্মার উন্নতি সাধনাই লক্ষ্য হওয়া উচিত।

আর পণ্ডীচেরীর ভাবধারা প্রচারমুখে, বাস্তব ক্ষেত্রে ইহাই প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে যে শান্তিপূর্ণ ধ্যানানন্দ অপেক্ষা উন্নততর মহত্তর কিছু নাই। যোগের অর্থই প্রাণায়াম এবং ধ্যান। কর্ম মন্দ নহে, কিন্তু এই বিশেষ যোগসাধনাই উৎকৃষ্টতর। এই প্রচারের ফলে অনেকে ভুলিয়া গিয়াছেন যে, বর্তমান অবস্থায় আধ্যাত্মিক উন্নতি কেবল অক্লান্ত নিষ্কাম কার্যেই সম্ভব, প্রকৃতিকে জয় করিবার উৎকৃষ্ট উপায় তাহার সহিত যুদ্ধ করা—চারিদিকে বিপদ ও বিঘ্নের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ধ্যানের নিরাপদ নীড়ে আশ্রয় গ্রহণ করা দুর্বলতা মাত্র। দার্শনিক নহে, বাস্তব কর্মক্ষেত্রে এই নিষ্ক্রিয়তা যে সকল ভাবধারা আনিয়া দিতেছে, আমি তাহার প্রতিবাদ করি। আশ্রমের এই কর্মক্ষেত্রে আশ্রমও নূতন নহে, যোগী সন্ন্যাসীও নূতন দৃশ্য নহে। তাঁহারা সমাজে চিরদিন সম্মানিত ছিলেন, থাকিবেন। কিন্তু যদি আমরা স্বাধীন সুখী এবং মহান ভারত গড়িতে চাই, তাহা হইলে তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিলে চলিবে না। বন্ধুগণ, সরলভাবে কথা বলিতে গিয়া যদি কাহারো মনে আঘাত দিয়া থাকি ক্ষমা করিবেন। আমি এইমাত্র বলিয়াছি যে, এ দুই ভাবধারার দার্শনিক দিক নহে, বাস্তববাদীর দৃষ্টি দিয়া উহার প্রত্যক্ষ ফলই বিচার করিয়াছি। তাহাতে আজ আমরা কর্মযোগের দর্শন চাহি। আমাদের বর্তমান যুগের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া বাঁচিতে হইবে। আমরা সর্বহারা-রুদ্ধ জগতের কোণে বাস করিতে পারিব না। যখন ভারত স্বাধীন হইবে, তখন তাহাকে আধুনিক শত্রুগণের সহিত আধুনিক প্রথাতেই যুদ্ধ

করিতে হইবে—অর্থনীতি এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে গোরুর গাড়ীর দিন গিয়াছে, চিরদিনের মত গিয়াছে। স্বাধীন ভারতকে সর্বদা অস্ত্রে সুসজ্জিত থাকিতে হইবে—কালের প্রতীক্ষায়—যতদিন না জগৎ অস্ত্রশস্ত্র পরিহারের সংকল্প কার্যে পরিণত করিতেছে। যাঁহারা আধুনিকতার মোহে অতীত একেবারেই বিসর্জন দিতে চান, আমি তাহাদের দলে নহি। অতীতের ভিত্তির উপরই আমরা দাঁড়াইব। ভারতের যে বিশিষ্ট শিক্ষা সংস্কৃতি, তাহাকে তাহার বিশেষ ধারার মধ্য দিয়াই পরিপুষ্ট করিতে হইবে। দর্শনে সাহিত্যে শিল্পকলায় বিজ্ঞানে জগৎকে আমাদের যাহা দিবার আছে, তাহার জন্য জগৎ সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে। এক কথায় আমরা অতীত ও আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিব। সমগ্র জগতে আমরাই সেই মহাসমন্বয় সাধনের সর্বাধিক যোগ্যপাত্র। এই মহাকার্যে ইতিমধ্যেই আমাদের কতিপয় শ্রেষ্ঠ মনীষী ও কর্মী আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। আমাদিগকে এক হাতে 'বৈদিক যুগে ফিরিয়া যাও'—এই চীৎকারের কণ্ঠ রোধ করিতে হইবে, অন্যহাতে আধুনিক ইউরোপের দ্রুত পরিবর্তনশীল ভাসান উন্মত্ততার অর্থহীন আবেগ ঠেকাইতে হইবে। কোনো জীবন্ত আন্দোলনকে কোনো নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখা কঠিন কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, যদি এই আন্দোলনের ধারক ও বাহকগণ প্রকৃত পথে থাকেন, তাহা হইলে, সময়ে ইহা সত্যরূপ প্রকট করিবে।

তারপর? জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং রূপে সুভাষচন্দ্র কলকাতার রাস্তায় যে কামান পেতেছিলেন, তা যদিও নকল কামান, তবু যাঁরা সেই কামানকে প্রথমেই নকল বলে চিনেছিলেন, তাঁরাই আর্তনাদ করলেন সবচেয়ে বেশী নকল গোলার ঘায়ে। একটি বিশাল নিন্দার গর্জন ছড়িয়ে পড়ল সর্বদিকে।

বাংলার পূর্বাবধি সমৃদ্ধ নিন্দা-সাহিত্যকে উপাদানরূপে গ্রহণ-সুভাষচন্দ্র আরো সমৃদ্ধ করে তুললেন।

নেতাজীর আগমনের পূর্বে দঃ পূর্ব এশিয়ায় ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের নৈপ্লবিক প্রচেষ্টা

জেনারেল কাওয়াবে

[ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযানের সময়ে বার্মা ফ্রন্টে জাপানী সৈন্য বাহিনীর পরিচালনা করেন জেনারেল কাওয়াবে। সেই জাপ সেনাপতি 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও জাপান' নামে জাপানী ভাষায় একটি বই লিখেছেন। অরুণীতে এই বইটি থেকে এরপূর্বে একটি অংশ অনুবাদ করে প্রকাশ করা হয়েছে। নেতাজী দঃ পূর্ব এশিয়ায় আসার আগে সেখানে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ নেতাজীর আজাদ হিন্দ অভিযানের পক্ষে যে বৈপ্লবিক পটভূমিকা গড়ে তুলেছিল এই প্রবন্ধে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে। অরুণীর সম্পাদক মণ্ডলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত অধ্যাপক সমর গুহ জাপান ও দঃ পূর্ব এশিয়া পরিভ্রমণকালে জেনারেল কাওয়াবে তাঁকে আলোচ্য বইটী দিয়ে ভারতে এর প্রচারের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন। মূল জাপানী থেকে ইংরেজীতে এবং ইংরেজী থেকে বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করেছেন যথাক্রমে বারীন বর্দ্ধন ও সমর গুহ। ঃ সঃ]

১৯৪০ সালে হংকং বৃটিশ জেল থেকে তিনজন ভারতীয় পালিয়ে গিয়ে জাপানী সেনাবাহিনীর হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কিছুদিন পরে মিংহই নাম যাক জাহাজে করে তিনজন ভারতীয়কে ব্যাংককে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের হেড কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ব্যাংককে জাপ মিলিটারী অফিসার মিঃ টামুরা এদের গোপনে ব্যাংককে থাকার ব্যবস্থা করেন এবং ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের নেতা অমর সিং ও প্রীতম সিংএর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন। এই সময়ে সুভাষচন্দ্র বসুর ভারত থেকে পালিয়ে যাওয়ার চমকপ্রদ সংবাদ প্রকাশিত হয়। এই সংবাদ পাওয়ার পরে কি ভাবে চন্দ্র বসুকে জাপানে আনা যায় জাপানী কর্তৃপক্ষ সেকথা চিন্তা করতে আরম্ভ করেন।

ইঙ্গ-মার্কিনের সঙ্গে যুদ্ধ সুরু হওয়ার আগে জাপ বাহিনীর চীফ অব-দি ষ্টাফ কর্ণেল সুগিয়ামা জাপ সেনা বাহিনীর কাছে একবার্তায় একথা জানান যে "নতুন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সমৃদ্ধশালী অঞ্চল গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বাদদের স্বাধীনতাকে আমাদের সমর্থন করতে হবে এবং ভারতীয়দের স্বাধীনতা অর্জনের সহায়তাদানের জন্য জাপ-ভারত সমৃদ্ধশালীতা ঘনিষ্ট করে তুলতে হবে।"

এরূপ ঘোষণার পরে ব্যাংককে জাপ সামরিক অফিসার টামুরা ও ভারতীয় ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের একটি বৈঠক হয়,

এবং এই বৈঠকে প্রীতম সিং বলেন, "ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতারা বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণে ইচ্ছুক নয়,—তারা বৈদেশিক সাহায্য সম্বন্ধে সংশয়াত্মক মনোভাব পোষণ করেন। তাঁরা সর্বপ্রকার বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত স্বাধীন ভারত গঠন করতে আগ্রহী, বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করতে গিয়ে যদি ভারতীয়দের মনে এরূপ ধারণা হয় "আমরা জাপ তাবেদার মাত্র তা হলে আমরা ভারতীয় জনসাধারণের সমর্থন ও সহানুভূতি হারাবো। তবুও, ভারতীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এই যুদ্ধের সুযোগ আমাদের গ্রহণ করতেই হবে।" এই সময়ে ব্যাংককের ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ বার্লিনে অবস্থিত চন্দ্র বসুর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয় এবং প্রীতম সিংয়ের কণ্ঠে বসুর কথারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

এশিয়ার যুদ্ধ সুরু হওয়ার পরে ব্যাংককে টামুরা ও ও ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের সঙ্গে কয়েকটি গোপন বৈঠক হয় এবং এই বৈঠকে স্থির হয় যে জাপ সরকার ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্বপ্রকার সাহায্য দেবে এবং টোকিও বেতার কেন্দ্র থেকে ভারতীয় স্বাধীনতার পক্ষে বৃটিশ বিরোধী প্রচারের সুযোগ দেওয়া হবে। এই বৈঠকগুলিতে আরও ঠিক হয় যে জাপ সরকারের মাধ্যমে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে তাঁর নির্দেশ গ্রহণ করবে।

জাপ অভিযানের প্রাক্কালে জাপানী বৈদেশিক বিভাগের অধিকর্তা মেঃ তুসিহারা দঃ পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য এবং ফরাসী ডাচ ও ইংরেজের অধীনস্থ দেশগুলির জনগণকে উৎসাহিত করার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরী করছিলেন। জাপ বাহিনী পাশ্চাত্য শক্তিদের হাত থেকে দঃ পূর্ব এশিয়া মুক্ত করে এই অঞ্চলে বিভিন্ন স্বাধীন দেশের সমন্বয়ে শান্তি, মৈত্রী, সাম্য ও সহযোগিতার ভিত্তিতে দঃ পূর্ব এশিয়ার একটি পারস্পরিক সহযোগী অঞ্চল গড়ে তুলবে,—এরূপ একটি যুক্তির দ্বারা এশিয়াবাসীদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টায় অগ্রণী হয় জাপ বৈদেশিক দপ্তর।

ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ ও জাপ বৈদেশিক দপ্তরের সহযোগিতায় থাইল্যাণ্ড; মালয়, বার্মা ও দঃ পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে ভারতীয়দের স্বাধীনতা সংগ্রাম সংঘবদ্ধ করার, যুদ্ধক্ষেত্রে ও যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ক্ষেত্রে ভারতীয়দের রক্ষা করার বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে স্বদেশ প্রেমের মনোভাব সৃষ্টি করার এবং যুদ্ধ বন্দীদের নিয়ে একটি ভারতীয় জাতীয় বাহিনী গঠন করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ ও জাপ নেতা টামুরার মধ্যে একটি চুক্তি হয়। এই চুক্তির দলিলটী নিম্নরূপ:

"নিম্নলিখিত লক্ষ্যগুলি পূর্ণ করার জন্য আমরা পরস্পরের সাহায্য করবো এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকবো।

১] আমরা জাপান ও ভারতের সাম্য ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে এবং পরস্পরকে দুইটি সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে গণ্য করে পরস্পরের সাহায্য করবো এবং আমাদের অন্তিম লক্ষ্য হবে শান্তি, সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে একটি বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া গঠন করা।

২] ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য সর্বপ্রকার বাস্তবসম্মত উপায়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করবে এবং এই কাজে জাপানের সাহায্য সাগ্রহে গ্রহণ করবে। কিন্তু এরূপ সাহায্যের ক্ষেত্রে জাপান এই সুনিশ্চয় আশ্বাস দিচ্ছে যে স্বাধীন ভারতের উপর জাপানের কোন ভৌগলিক, সামরিক, রাজনৈতিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক, ধার্মিক বা অন্য কোনরূপ দাবী থাকবে না।

৩] এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ কঠিন উচ্চতম সংগঠন গড়ে তুলবে এবং জাতি-বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে সকল ভারতীয়দের যুদ্ধক্ষেত্রে অথবা অসামরিক ক্ষেত্রে সুসংবদ্ধ করে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করবে।

৫] জাপ বাহিনীর সঙ্গে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের সভ্যেরা মালয়ে বার্মা থাইল্যাণ্ডে যাবে এবং সর্বত্র ব্রিটিশ-বিরোধী প্রচার চালাবে, ভারতীয়দের মধ্যে সংগ্রামী মনোভাব সৃষ্টি করবে এবং জাপানী বাহিনী ও ভারতীয়দের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্বন্ধ গড়ে তুলবে।

৫] ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ মালয় ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে সাহসী ব্যক্তিদের রিক্রুট করবে এবং ভারতীয় যুদ্ধ বন্দীদের ভিতর থেকে অফিসার ও সৈন্য সংগ্রহ করে একটি ভারতীয় বাহিনী গড়ে তুলবে। এই ভারতীয় জাতীয় বাহিনী ভাবী স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হবে।

৬] যথার্থ সুযোগ উপস্থিত হওয়া মাত্র ভারতীয়দের সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের সভ্যেরা সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে।

৭] জাপ বাহিনী নিম্নোক্ত কার্যক্রম অনুযায়ী আই, আই, এলকে (Indian Independence League) সাহায্য করবে :

(i) যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সমস্ত কর্তৃত্ব ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের হাতে দেওয়া হবে এবং ভারতের মুক্তি সংগ্রামে জাপান সর্বপ্রকারে সাহায্য করবে।

(ii) জাপ বাহিনী জাপ বৈদেশিক বিভাগ ও ভারতীয় ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করে আই-আই-এল এর আন্দোলনের ক্ষেত্র সহজতর করার প্রচেষ্টায় অগ্রণী হবে।

(iii) জাপ বাহিনী সামরিক এলাকা থেকে শত্রুদের পৃথক করে নিয়ে ভারতীয়দের ধন, সম্পত্তি ও মর্যাদা রক্ষা করবে। ভারতীয়দের সমস্ত মন্দির জাপ বাহিনী রক্ষা করবে এবং এরূপ কোন মন্দির ব্যবহারে এই বাহিনী বিরত থাকবে।

(iv) আই, আই, এল প্রতিষ্ঠানের বৃটিশ-বিরোধী প্রচার কার্যকরী করার জন্য টোকিও, ব্যাংকক ও অধিকৃত অঞ্চলের ব্রডকাস্টিং কেন্দ্রগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করার সুযোগ দেওয়া হবে।

(v) বার্লিনে অবস্থিত 'চন্দ্র বসুর' সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য জাপ সরকার আই, আই, লীগকে সাহায্য করবে।

(vi) ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জাপ সরকার আর্থিক, বৈষয়িক এবং অন্যান্য সাহায্য দিতে প্রস্তুত থাকবে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতীয়দের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণে আই, আই, লীগ কোন বাধা দেবে না।

১৯৪১ সালের ৮ই ডিসেম্বর একটি ঐতিহাসিক দিবস। এই দিনেই জাপবাহিনী বৃটিশ সেনাবাহিনীর উপরে আঘাত হেনে মালয় ও সিঙ্গাপুরের দিকে এগিয়ে যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের কর্মতৎপরতাও সুরু হয়। ১০ই ডিসেম্বর আই, আই, লীগ দক্ষিণ থাইল্যাণ্ডে সর্বপ্রথম ব্যাঙ্কক শহরে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। এই জাতীয় পতাকা কাঁধে নিয়ে ভারতীয়েরাও জাপ-বাহিনীর সঙ্গে অধিকৃত মালয় ও সিংগাপুরের পথে এগিয়ে যায়।

মালয় দখলের পরে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের কার্যক্রমের পরিধি বিস্তারিত হয়। ভারতীয়দের রক্ষা করা এবং গোপনে বৃটিশ বাহিনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের বাণী প্রচারে লীগ সাহসী কর্মপন্থা গ্রহণ করে। জাপান যে ভারতের স্বাধীনতা চায় এবং স্বাধীনতা অর্জনে ভারতীয়দের সাহায্য করতে বদ্ধপরিকর,—একথা প্রচারের ফলে মালয়, বার্মা ও সিঙ্গাপুরের ভারতীয়দের মধ্যে এক বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

যে সকল বৃটিশ ভারতীয় কৌজ জাপানের হাতে বন্দী হয় তাদের ভিতর থেকে ক্যাপ্টেন মোহন সিং নামে এক শিখ

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসে। ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর নেতৃত্বে প্রথমে প্রায় ৮০ জন এবং পরে ১০০ জনেরও বেশি ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করে দেওয়া হয় প্রচার কার্য চালাবার জন্য। দেখা যায় যে মুক্তি পাওয়ার পরে এই ভারতীয় সৈন্যদের একজনও কর্তব্যচ্যুত হয়ে দল ত্যাগ করে পালিয়ে যায়নি। ভারতীয় সৈনিকদের এরূপ স্বদেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত জাপবাহিনীর উপরে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। সামরিক সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ক্যাপ্টেন মোহন সিং। বার্লিনে অবস্থিত চন্দ্র বসুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে, কিভাবে তাঁকে দূর দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ায় আকর্ষিত করা যায় সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি জাপ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান। চন্দ্র বসুর প্রতি দক্ষিণ-পূর্ব-এসিয়ার সমস্ত ভারতীয়দের অগাধ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল এবং সে সময়ে সবাই একথা অনুভব করতে আরম্ভ করে যে বহুকে বার্লিন থেকে এখানে আনা সম্ভব হলে ভারতীয়দের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিপুল শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠবে।

বাদরের পতনের পরেই ক্যাপ্টেন মোহন সিং এবং ভারতীয় লীগের প্রীতম সিং অভিযানকারী জাপবাহিনীর সেনাধ্যক্ষ কর্ণেল ইয়াসুটার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই বৈঠকে স্থির হয় যে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের দ্বারা একটি আজাদ-হিন্দ-ফৌজ ভারতীয় মুক্ত সৈন্যদল (Indian National Army I. N. A) গঠন করা হবে। এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে :

(i) ক্যাপ্টেন মোহন সিং ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের দ্বারা একটি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মী গঠন করবেন।

(ii) জাপানী আর্মী সর্বভাবে এই আই, এন, এ বাহিনীকে সাহায্য করবে।

(iii) আই, এন, এ এবং আই-আই লীগ পরস্পরে আলাদা থেকে পরস্পরের সাহায্য করবে।

(iv) জাপ আর্মী ভারতীয় সৈন্য ও অফিসারদের নেতৃত্ব অর্পণ করবে ক্যাপ্টেন মোহন সিংহের উপরে।

(v) জাপ আর্মী ভারতীয় সৈন্য ও অফিসারদের প্রতি সুষ্ঠুপূর্ণ ব্যবহার করবে এবং যে সকল ভারতীয় যুদ্ধবন্দী আই, এন, এ বাহিনীতে যোগ দিতে ইচ্ছুক তাদের মুক্ত করে দেবে।

(vi) জাপ আর্মীর একটি মিত্র বাহিনীরূপে আই, এন, এ বাহিনী সংগঠিত হবে।

এরূপ চুক্তির পরে আই, এন, এ গঠন ও এই ভারতীয় বাহিনীকে সামরিক শিক্ষাদান এবং প্রচারের কাজে ক্যাপ্টেন মোহন সিংহ দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেলেন। আই, এন, এ এবং আই, আই, এল্ যুক্তভাবে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের বাণী প্রচার করতে আরম্ভ করলো। জাপান এই আই, এন, এ সংগঠনের মধ্যে ৩০ কোটি ভারতীয়ের মুক্তির ভাবী সংকেত দেখতে পেলো। জাপানের মুখ্য লক্ষ্য ছিল বার্মা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে বৃটিশ শক্তিকে পদানত করা এবং ভারতের অভ্যন্তরে যুদ্ধকে টেনে না নেওয়া। জাপ কর্তৃপক্ষের ধারণা ছিল যে ভারতের অভ্যন্তরে যুদ্ধ প্রসারিত করলে ভারতীয়েরা জাপানের বিরোধী মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়বে। তাই, জাপানের নীতি ছিল আই, এন, একে সর্বভাবে সাহায্য করে আই-এন-এ'র সাহায্যে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার সুযোগ দেওয়া।

প্রথম আই,এন, এ গঠন করার পরে ক্যাপ্টেন মোহন সিং এই ভারতীয় বাহিনীকে নতুনভাবে যুদ্ধ-বিদ্যায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। এজন্য জাপ আর্মী প্রথম পর্যায়ে দুইটি ভারতীয় কোম্পানীকে সুসজ্জিত করার জন্য অস্ত্রদান করে। আই, এন, একে এবং আই,আই, লীগকে সাইগন বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারের সুযোগ দেওয়া হয়। সিঙ্গাপুর ও বার্মার পতনের পরে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায় এবং এদের আই, এন, এ বাহিনীর কর্তৃত্বাধীনে ছেড়ে দেওয়া হয়।

বার্মা ও সিঙ্গাপুর বিজয়ে আই, এন, এ জাপ বাহিনীর পক্ষে প্রচারের কাজে বিশেষ সহায়তা করে যার ফলে বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে ভাঙ্গন সংক্রমণ করার আভাস দেখা দেয় এবং তার ফলে জাপ বাহিনীর পক্ষে বার্মা ও সিঙ্গাপুর জয় করা সহজসাধ্য হয়। ১৯৪২ ফেব্রুয়ারীর পরে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার এবং এই ভারতীয় বাহিনীকে আই, এন, এর শক্তি বৃদ্ধি করার কাজে নিয়োগ করা হয়।

বার্মা, মালয় ও সিঙ্গাপুর জয়ের পরে আই, এন, এ বাহিনীর হেড কোয়ার্টার সিঙ্গাপুরে স্থানান্তরিত করা হয় এবং এই সময়ে ভারতীয় স্বাধীনতার সমর্থনে প্রাইম মিনিষ্টার তোজো টোকিও থেকে যে নীতির কথা ঘোষণা করেন তার সঙ্গে ৯: পূর্ব সিয়ার ভারতীয়দের মনে এক প্রবল আশা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। আই, এ গঠনের পরেই সমস্ত ভারতীয়েরা চন্দ্র বসুর নেতৃত্বের জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব হয়ে ওঠে এবং বার্লিন থেকে তাঁকে সিঙ্গাপুরে আনার জন্য ইতিহাস ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ ও আই এন, এ জাপ সরকারের কাছে বারবার অনুরোধ জানাতে থাকে। ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল, অপেক্ষা ছিল শুধু ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবী নেতা সুভাষচন্দ্র বসুর ৯: পূর্ব এশিয়ায় আগমন।

সরকার চুলা

বৈজ্ঞানিক কুকিং রেঞ্জ

২, লেক টেরেস

কলিকাতা-২৯

ফোন : ৪৬ ২১৬১

INSURE & BE SECURE

The New India Assurance Company Limited.

Transacts

General Insurance business of every description including Fire, Marine, Hull, Machinery and Guarantee.

Head Office :
New India Assurance Building,
Mahatma Gandhi Road, Fort
BOMBAY.

Regional Office :
New India Assurance Building,
4, Lyons Range,
CALCUTTA-1

জিন্না ও গান্ধী

ইতিহাসনিষ্ঠ

১৯৭৭ সালে ভারত-বিভাগের প্রায় বিশ বছর পর আজ আবার নতুন করে দেশভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর সংক্রান্ত ঘটনাবলীর মূল্যায়ন সুরু হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসেরও পুনর্বিচার করার উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে—শুধু দেশের ঐতিহাসিক বা গবেষকদের পক্ষ থেকে নয়, বিদেশী স্বার্থানুসন্ধানীদেরও পক্ষ থেকে। গান্ধীজী, গান্ধীবাদ, গান্ধী-যুগ, নেহরু ও কংগ্রেসী নেতৃত্ব ইত্যাদির ভাবের বাষ্পমুক্ত নিরভ্র আকাশে ইতিহাসনিষ্ঠ পুনর্বিচার হচ্ছে এ যেন আশার কথা, তেমনি দেশভাগের পশ্চাৎপট সম্পর্কেও নূতন আলোকপাতের প্রয়োজন ছিল। কেন দেশ বিভাগ হলো? কেন এদেশে দ্বিজাতিতত্ত্বের উদ্ভব হল? স্বাধীনতা-আন্দোলনের জাতীয়তার প্রবল ধারা সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িকতাবাদ দেশের রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা পেল কেন? জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের কাছে পরাজয়ই বা বরণ করল? ভারত-পাক উপমহাদেশের সকল সম্প্রদায়ের জ্ঞানীল ব্যক্তিদেরই এ বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত। সম্প্রতি শ্রী এস. কে. মজুমদার কর্তৃক লিখিত এবং কার্ণা কে এল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত "Jinnah and Gandhi" নামক পুস্তকখানি এই নতুন মূল্যায়নের দাবী নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থকারের তথ্যনিষ্ঠা, বিশ্লেষণক্ষমতা ও নিরপেক্ষ বিচার পাঠককে নিঃসন্দেহ মুগ্ধ করে। আরো প্রশংসার বিষয় নিজে হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও গান্ধীজী ও জিন্নার ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য মনোভাব দেখিয়েছেন। হিন্দুদের পক্ষ হতে এ ধরণের তথ্যনিষ্ঠ মূল্যায়ন-প্রচেষ্টা সুলক্ষণ নিশ্চয়ই, কিন্তু এই উপমহাদেশের মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের নিকট হতেও এরকম অসাম্প্রদায়িক, পক্ষপাতহীন বিচার ও বিশ্লেষণ পেলে আরও আনন্দের কারণ হত। আশাকরি তাও আমরা একদিন পাব। কিন্তু এখন যে কথাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় তা এই যে স্বাধীনতালাভের বিশ বছর পর ইতিহাস যেন আবার নতুন সুরে কথা বলছে, তাই প্রায় সমকালীন ইতিহাসের পুনর্বিচারও অনিবার্য হয়ে উঠেছে। আলোচ্য গ্রন্থখানির মতো এতৎসংক্রান্ত আরও যেসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি একটা গভীর ইঙ্গিতও বহন করছে মনে হয়। তা এই যে এই উপমহাদেশের ভবিষ্যৎ হয়তো নতুন কোন সম্ভাবনার অভিমুখী; আর তারই তাগিদে অতীত ও সমকালের পুনর্বিচারের এই আয়োজন।

(১)

ভারতে প্রচলিত ধারণা এই যে দেশবিভাগের জন্য মুখ্যত দায়ী মহম্মদ আলি জিন্না। গোঁড়া সাম্প্রদায়িকতাবাদী-রূপেই আমাদের কাছে তাঁর পরিচয়। দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রবক্তা হিসাবে তাঁকে আমরা সমালোচনাই করে থাকি। পক্ষান্তরে, গান্ধীজীকে দেখি জ্ঞান, প্রেম ও শুভবুদ্ধির প্রতিমূর্তিরূপে।

কিন্তু স্বাধীনতা-আন্দোলনে সমকালীন ঘটনাবলী মূল্যায়ন নিয়ে বিচার করলে জিন্না ও গান্ধী সম্পর্কে এই প্রচলিত ধারণা সমর্থন করা কঠিন হয়ে পড়ে।

গান্ধীজীর (জন্ম ১৮৬৯) চেয়ে জিন্না (জন্ম ১৮৭৬) বয়সে কনিষ্ঠ। ১৮৯২ সালে জিন্না যখন ষোলো বছর বয়সে আইন পড়তে বিলাত যান। সে সময় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা দাদাভাই নৌরজী ছিলেন ইংলণ্ডে। তিনি তখন বৃটিশ পার্লামেন্টের হাউস অফ কমন্সের সদস্য। জিন্না তাঁর সঙ্গে প্রায়ই বৃটিশ পার্লামেন্টে যেতেন ও নিবাচনের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে মিশতেন। দেশে ফিরে এসে আইন ব্যবসায়ে সাফল্যলাভের পর তিনি ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন। তার কিছুদিন পূর্বে ফেরোজ শা মেটা ও গোপাল কৃষ্ণ গোখেল ছিলেন যথাক্রমে কংগ্রেসের নরমপন্থী দলের নেতা আর বাল গঙ্গাধর তিলক ছিলেন চরমপন্থী দলের নেতা। জিন্না নরমপন্থী দলেই যোগ দেন। ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন দাদাভাই নৌরজী। জিন্না ঐ অধিবেশনে একজন প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন ও নৌরজীর একান্ত-সচিবরূপে কাজ করেন। তখন তাঁর ত্রিশ বছর বয়স। ১৯১০ সালে ইম্পিরিয়াল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে জিন্না সদস্যরূপে নির্বাচিত হন। সেখানে গোখেল ছিলেন বেসরকারী দলের নেতা। জিন্না গোখেলের নেতৃত্বকে স্বীকার করে নেন ও তাঁর কাছ হতে সংসদীয় রাজনীতিতে নতুন করে দীক্ষা লাভ করেন।

জিন্না করাচীর এমন একটি মুসলমান পরিবারের বংশধর, অতীতে যে পরিবারটি ছিল গুজরাটি হিন্দু পরিবার। জিন্নার মানস-সংস্কার তাই অনেকাংশে হিন্দু সংস্কার; তাছাড়া ঔদারনৈতিক ভাবধারার আশ্রয়ে তিনি মানুষ। রাজনীতিতেও তাঁর শিক্ষাগুরুরূপে হিন্দু নেতাদেরই তিনি বেছে নিয়েছিলেন। জিন্নার মানসিক গঠন ও রাজনৈতিক চিন্তাধারায় হিন্দুবিদ্বেষ স্থান পায়নি, বরং হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরাগ ও সহনশীলতাই ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে একদিন যেন নিজের চরিত্রের বিপরীত আচরণেই তিনি নিজ হয়ে উঠেছিলেন, দ্বিজাতি-তত্ত্বের প্রবক্তারূপেই সেদিন তাঁর নতুন আবির্ভাব ঘটে। লেখক এর কে মজুমদার তাই বলেছেন যে জিন্না ছিলেন মূলত জাতীয়তাবাদী। কিন্তু গান্ধীজী ও গান্ধীগোষ্ঠীর অসহিষ্ণু মনোভাবের ফলেই সাম্প্রদায়িক শিবিরে তাঁকে যোগ দিতে হয়েছিল।

পক্ষান্তরে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের অধিকার লাভের আন্দোলনে নেতৃত্ব দানের পর বিপুল খ্যাতি নিয়ে এদেশে আসেন ১৯১৫ সালে। কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে মধ্যে মধ্যে যোগ দিলেও কংগ্রেসের নেতৃত্ব তিনি করায়ত্ত করেন ১৯২০ সালে। বস্তুত: তারপর থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর নেতৃত্ব অচলপ্রতিষ্ঠ ছিল। তাঁরই নেতৃত্বকালে পাকিস্তানের দাবী উত্থাপিত হয় এবং সে দাবী সফলও হয়। এই ঘটনার জন্য গান্ধী ও জিন্নার ঐতিহাসিক দায়িত্ব কতখানি লেখক শ্রীমজুমদার সেকথাই আলোচনা করেছেন।

(২)

১৯০৯ সালে ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে জিন্না দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজ সরকারের আচরণের কঠোর সমালোচনা করে একটি ভাষণ দেন। ইতিপূর্বে আর কোন সদস্যই কাউন্সিলে সরকারের বিরুদ্ধে এত কঠোর ভাষা ব্যবহার করেননি। ফলে সারা ভারতে জিন্না একজন বিশিষ্ট দূরদৃষ্টা রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। গোপাল কৃষ্ণ গোখলে ও অন্যান্য নিজন কাউন্সিলে তখন বিশেষ প্রভাবশালী বেসরকারী গোষ্ঠীগঠনে সহায়তা করে।

১৯১০ সালে জেলা বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি ও অন্যান্য

আঞ্চলিক সংস্থায় হিন্দু ও মুসলমানের পৃথক নির্বাচনের জন্য একটি আইন পাশ করার চেষ্টা হয়। সেবছর এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে জিন্না পৃথক নির্বাচনরীতির বিরুদ্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের পক্ষে তীব্র ভাষায় বক্তৃতা করেন। ঐ অধিবেশনের পর হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সম্মেলন ডাকা হয় এবং জিন্নাই সে সম্মেলনে সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। সারা দেশে জিন্নার খ্যাতি এত ছড়িয়ে পড়ে যে মুস্লিম লীগ তাঁকে নেতৃত্ব দানের জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকে। ১৯১৩ সনে জিন্না লীগে যোগ দিয়েই লীগের আদর্শ ও উদ্দেশ্য নতুনভাবে স্থির করে দেন; এই আদর্শ কংগ্রেসের সঙ্গে অভিন্ন ছিল। ১৯১৩ সালেই জিন্নার পরামর্শে লীগ প্রস্তাব গ্রহণ করে যে সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে কাজ করা হবে তার লক্ষ্য। গোখেল জিন্নার কার্যকলাপ লক্ষ্য করে বলেছিলেন: "জিন্না একেবারে খাঁটি লোক এবং সমস্ত সাম্প্রদায়িক সংস্কার ও বিদ্বেষ হতে তিনি মুক্ত। ফলে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের শ্রেষ্ঠ রাজদূত হবেন তিনিই।" জিন্না লীগে যোগ দিয়ে লীগকে যে কংগ্রেসের সঙ্গে ঐক্যের দিকে নিয়ে এসেছিলেন, কংগ্রেসও সেকথা বুঝে ১৯১৬ সালে করাচী অধিবেশনে লীগকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করে। অতঃপর জিন্নার উদ্যোগে স্থির হয় যে কংগ্রেস ও লীগ ১৯১৫ সালে বোম্বাই শহরে পাশাপাশি তাদের অধিবেশন বসাবে। এই অধিবেশন সত্যই বসেছিল এবং কালে দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সৌহার্দ্য এতই বেড়ে ওঠে যে পরের অধিবেশনও লক্ষ্ণৌতে পাশাপাশি বসবে স্থির হয়। বোম্বাই অধিবেশনে এই স্থির হয় যে মুস্লিম লীগের সহযোগে কংগ্রেস ভারতের স্বায়ত্ত-শাসনের একটি স্কীম তৈরী করবে। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌতে অম্বিকাচরণ মজুমদারের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের ও জিন্নার সভাপতিত্বে লীগের অধিবেশন পাশাপাশি বসে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন: "কংগ্রেস ও লীগ যৌথভাবে স্বায়ত্ত-শাসনের যে স্কীম তৈরী করেছে তাতে এটাই প্রমাণ হয় যে দুই সম্প্রদায়ের ভিতর ঐক্য ধীরে ধীরে গভীরতর হচ্ছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতারা দুহাত খুলে হিন্দুদের বুকে টেনে নিয়েছেন, তাদের অভিনন্দন জানাতেই হবে।" মুস্লিম লীগের পক্ষ হতে জিন্নাই কংগ্রেসের সঙ্গে যৌথভাবে স্বায়ত্ত-শাসন স্কীমটি রচনা করেছিলেন এবং লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে সভা-পতির ভাষণে তিনি বলেন যে ভারত হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই মাতৃভূমি, এবং মাতৃভূমির উন্নতির জন্য উভয় সম্প্রদায়ের ভিতর মধুর সম্পর্ক একান্তভাবে প্রয়োজন। এই লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেস ও লীগের ভিতর একটি চুক্তি হয়—"লক্ষ্ণৌ চুক্তি" নামে ইতিহাসে সেটি বিখ্যাত হয়ে আছে। পরে মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার প্রস্তাবের বিবেচনার উদ্দেশ্যে গঠিত পার্লামেন্টারী কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্যদান করতে গিয়ে জিন্না ঘোষণা করেন: "আমি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী হিসাবেই কথা বলি। রাজনৈতিক জীবনে হিন্দু ও মুসলমানের যথোচিত পার্থক্য দূর হয়ে গেলে আমি যত খুশি হব আর কোন কিছুতেই তত খুশি আমি হব না।" ১৯১৭ সালে মিসেস অ্যানি বেসান্ত অন্তরীণাবদ্ধ হলে জিন্না সরকারের এই কার্যের ঘোরতর প্রতিবাদ শুরু করেন এবং মিসেস বেসান্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হোম রুল লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করে সংগঠনটির সভাপতি হন। হোম রুল লীগের সভাপতিরূপে তিনি বলেন: 'মুসলমানদের আমি বলব তোমরা হিন্দুদের সঙ্গে যোগ দাও। হিন্দুদের আমি বলব তোমরা তোমাদের পশ্চাৎ-পদ ভাইকে টেনে তোল।"

গান্ধীজী ইতিপূর্বেই, অর্থাৎ ১৯১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা হতে ভারতে চলে এসেছেন। জনসেবক রূপে তাঁর খ্যাতি তখন শীর্ষে। জিন্নাই এক সভায় প্রস্তাব করেন যে গান্ধীজীকে হোম রুল লীগের সভাপতি করা হোক। সেই প্রস্তাব মতে গান্ধীজীকে সভাপতি ধরা হল। সভাপতি হয়েই গান্ধীজী চাইলেন হোম রুল লীগকে নিজের মতবাদ প্রচারের বাহন

রূপে গড়ে তুলতে। তিনি সংগঠনটির নাম পালটে "স্বরাজ্য সভা" নাম রাখার প্রস্তাব করলেন। জিন্না ও আর কয়েক জন সদস্য এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। কিন্তু গান্ধী সভাপতিরূপে তাঁর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে সমস্ত আপত্তি অগ্রাহ্য করে দিলেন এবং পরিষ্কার ভাষায় বললেন যে যাঁরা তাঁর মত মেনে নিতে রাজি নন তাঁরা যেন অবিলম্বে সংগঠনটি হতে বিদায় নেন। জিন্না ও হোম রুল লীগের অনেক নেতা ও সদস্য এর ফলে সংগঠনটি হতে পদত্যাগ পত্র দিয়ে চলে যান। বিপিন বেপাল এবং জিন্না গান্ধীজীর এই বিশ্বাসঘাতকতামূলক ও সুবিধাবাদী আচরণকে কোনদিনই ক্ষমা করেননি।

শুধু ১৯১৯ সালে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অমৃতসর অধিবেশনে গান্ধীজী কর্তৃক উত্থাপিত এক প্রস্তাবকে সমর্থন করতে দাঁড়িয়ে জিন্না গান্ধীজীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁকে 'মহাত্মা' রূপে আখ্যায়িত করেন। এবং ঐ একই সময়ে অমৃতসরেই অনুষ্ঠিত মুস্লিম লীগের অধিবেশনে কংগ্রেসের অনুরূপ প্রস্তাবাবলী গৃহীত হয়।

কিন্তু গান্ধীজী জিন্নাকে পছন্দ করেননি। জিন্নার পাণ্ডিত্য, ব্যক্তিত্ব, বৈদগ্ধ ও বিচক্ষণতাকে গান্ধীজী সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখেছিলেন এই কারণে যে জিন্নার মতো লোক কোনোদিন গান্ধীজীর তাঁবেদারি করতে পারবে না। ফলে জিন্নার কোনো কার্যক্রমের সঙ্গেই গান্ধীজী নিজেকে জড়িত করেননি। জিন্নার নেতৃত্বে মুস্লিম লীগ যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের চেষ্টা করে আসছিল, গান্ধীজী তাকেও কোনরকম স্বীকৃতি দেননি। অথচ ১৯১৯ সালে মহম্মদ আলি, সৌকত আলি ও মৌলানা আজাদ যখন খিলাফত আন্দোলনে গান্ধীর সমর্থন চাইলেন, তখন সেই একান্ত সাম্প্রদায়িক আন্দোলনকে গান্ধীজী শুধু সমর্থনই করেননি, নিঃশেষে সেই আন্দোলনে তিনি ঝাঁপ দিলেন। তুরস্কে খলিফার হাত, সেখানেই কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে খলিফার শাসন হতে দেশকে মুক্ত করার আন্দোলন গড়ে ওঠে। অথচ ভারতে খিলাফত আন্দোলন এই বলে চালানো হয় যে খলিফার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতেই হবে, নতুবা ইসলাম বিপন্ন হবে। এই "ইসলাম বিপন্ন"—মতবাদে আশ্রয়ে পুষ্ট ও লালিত সাম্প্রদায়িক আন্দোলনই পরে ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জিন্না প্রথম হতে ছিলেন এই খিলাফত আন্দোলনের বিরোধী। কিন্তু গান্ধীজীই মুসলমানদের কাছে জনপ্রিয় হবার আশায় এই আন্দোলনকে ভারতবর্ষে একটা স্থায়ী, শক্তিশালী, সঙ্ঘবদ্ধ ইস্লামিক অভ্যুত্থানে পরিণত করে যেন। গান্ধীজীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক গোখলেও এই কারণে গান্ধীজীর ওপর বিরক্ত হয়ে ওঠেন।

গান্ধীজী জিন্নাকে পছন্দ করলেন না, তাঁকে এড়িয়ে চলতে চাইলেন; কিন্তু তিনি বন্ধুত্ব করলেন আলি ভ্রাতৃদ্বয় ও মৌলানা আজাদের সঙ্গে। জিন্না জাতীয়তাবাদী দেশ-প্রেমিক ও মাতৃভূমি ভারতের স্বাধীনতা চান। পক্ষান্তরে, মৌলানা আজাদের জন্ম মক্কায়, ভারত তাঁর স্বদেশ নয় ঘটনাচক্রে ভারতে তাঁকে আসতে হয়। তিনি আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা পাননি, ঐস্লামিক শিক্ষায় দীক্ষিত ও ঘোরতর সাম্প্রদায়িক। বিপন্ন ইস্লামকে রক্ষা করাই তাঁর জীবনের ব্রত। আলি ভ্রাতৃদ্বয়ও শিক্ষায় ও মনোভাবে গোঁড়া সাম্প্রদায়িক। ভারতের জাতীয়তাবাদের প্রতি এঁরা কেউই সহানুভূতিসম্পন্ন নন। আরব, তুরস্ক ও অন্যিকৃত-উল-আরবের সমস্যা নিয়েই এঁরা মাথা ঘামাতেন, ভারতের স্বাধীনতার কথা কোনদিন চিন্তা করতেন না। গান্ধী এঁদের পছন্দ করলেন কেন? কারণ গান্ধী জানতেন এঁরা কেউই তাঁর সমকক্ষ নন, এঁরা গান্ধীর নেতৃত্ব অনুসরণ করবেন, তাছাড়া এঁরা রাজনীতির চেয়ে ধর্মটাকেই বড় করে জানেন।

(শেষাংশ ৬৭৫ পৃষ্ঠায়)

ধারাবাহিক রচনা

.....

সুভাষচন্দ্র

পবিত্রকুমার ঘোষ

প্রেসিডেন্সি কলেজ

গান্ধী ও সুভাষচন্দ্র

ইংরেজের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের প্রথম সংঘাতই একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ঘটনার মর্যাদা লাভ করেছিল—তাঁর বয়স তখন মাত্র উনিশ। গান্ধিজী ইংরেজের সঙ্গে প্রথম সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হন ১৮৯৭ সালের জানুয়ারী মাসে—গান্ধীজীর বয়স তখন আটাশ বছর। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবান বন্দরে। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর সেই দ্বিতীয়বারের যাত্রা। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় গান্ধীজীর প্রতি রুষ্ট হয়েছিল সেখানকার ভারতীয়দের সঙ্ঘবদ্ধ করা ও অধিকার-সচেতন করে তোলার দরুণ। গান্ধীজী জাহাজ থেকে অবতরণ করার আগেই শত শত শ্বেতকায় ব্যক্তি জাহাজঘাটায় উপস্থিত হয়েছিল, তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে। গান্ধীজীর জীবনীকার ডি. জি. তেণ্ডুলকরের বর্ণনানুসারে ঘটনাটি ঘটেছিল এইরকম: "কস্তুরবাই ও ছেলেমেয়েদের আলাদাভাবে পাঠিয়ে দেওয়া হল এবং তাঁরা পাদ্রি রুস্তমজী নামে একজন ভারতীয় ধনী বন্ধুর গৃহে আশ্রয় লাভ করলেন। কিন্তু গান্ধী নামার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজন বালক তাঁকে চিনে ফেলল ও তারা চেঁচিয়ে উঠল। "গান্ধী, গান্ধী" বলে তারা চেঁচাতে লাগল, "মারো ফিরে ফেলো"—ভিড়ের মধ্য হতে এইসব কথা শোনা গেল। নামার জায়গাটিতে বিরাট ভিড় জমা হয়েছিল, ক্রমে তারা ভীতিপ্রদ হয়ে উঠল। লাউটন একখানি রিক্সা ভাড়া করলেন, কিন্তু রিক্সাওলাকে এমন ভয় দেখাল লোকেরা যে সে বেচারী ছুটে পালাল। গান্ধী ও লাউটন হেঁটে এগোতে লাগলেন, ভিড়ও সেইসঙ্গে ক্রমশঃ বাড়তে লাগল, শেষে এমন অবস্থা হল যে আর হাঁটা যায়। সেই গোলমাল ও ঠেলাঠেলির মধ্যে লাউটনকে কোথায় টেনে সরিয়ে ফেলল, আর গান্ধীর চারদিকে পড়তে লাগল পাথর, মাদু ও পচা ডিম। কে একজন তাঁর পাগড়ি টেনে খুলে নিল, অন্যেরা তাঁকে মারতে লাগল কিল, ঘুষি, লাথি। তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন, একটা বাড়ির সামনের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে শুধু কোনমতে শ্বাস নেবার তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু জনতা তাঁকে রেহাই দিল না, চড় ঘুষি চলতে লাগল।

গান্ধীর পরিচিত পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের স্ত্রী সেই পথে যাচ্ছিলেন। তিনি নিজের ছাতাটি মেলে ধরে দাঁড়ালেন জনতা ও গান্ধীর মাঝখানে। জনতার ক্রোধবর্ষণ তাতে ধ্বনিত হল। ইতিমধ্যে একটি ভারতীয় বালক পুলিশের উদ্দেশ্যে ছুটতে লাগল এই বলে যে লোকেরা [illegible] মেরে ফেলল; ফলে চরম সঙ্কটময় মুহূর্তে ঘটনাস্থলে আবির্ভূত

হল কয়েকজন কনেস্টবল।... পুলিশ পরিবৃত হয়ে গান্ধী এসে পৌঁছলেন রুস্তমজীর বাড়িতে। আমার পথে আর কোনো আঘাত তিনি পাননি।.....

রাত ঘনিয়ে এল। শ্বেতাঙ্গরা দলে দলে ঘিরে ফেলল রুস্তমজীর বাড়ি। "গান্ধীকে আমরা চাই"—হিংস্র হয়ে উঠল তাদের চীৎকার। পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট গোপনে গান্ধীর কাছে পাঠালেন এই বার্তা: "যদি আপনি আপনার বন্ধুর বাড়ি-সম্পত্তি বাঁচাতে চান, যদি নিজের পরিবারকেও রক্ষা করতে চান, তবে আমার পরামর্শ এই যে ছদ্মবেশে বাড়ি হতে পালিয়ে যান।" সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের পরামর্শক্রমে গান্ধী ভারতীয় কনস্টেবলের বেশধারণ করে, মাথায় পাগড়ির নিচে একটি ধাতুনির্মিত মজবুত শিরস্ত্রাণ পরে পালালেন।... তিনি উঠলেন যেয়ে থানায়।" (D. G. Tendulkar: Mahatma, vol 1 pp. 59-60)

সমস্ত ঘটনাটির ফলে গান্ধীজীর মানসিক প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল? তাঁর অভিজ্ঞতা তাঁকে কোন সত্যেই বা পৌঁছে দিল? তার কিছু পরিচয় আমরা পাই দু বছর পরই ১৮৯৯ সালের ১০ই অক্টোবর যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় সুরু হল বুয়র যুদ্ধ। বুয়ররা প্রথম দিকে বিজয়ী হয়। উইনস্টন চার্চিলও তাদের হাতে বন্দী হন। ডারবান শহরে তখন তীব্র উত্তেজনা। টেণ্ডুলকরের বর্ণনা এই: "গান্ধীর সমস্ত সহানুভূতি ছিল বুয়রদের দিকে, কিন্তু তাঁর মনে এই প্রতীতি জন্মাল যে, এরকম সঙ্কটের সময় ব্যক্তিগত মতামতের কোনো দাম থাকা উচিত নয়। নিজের মতামত প্রয়োগ করার অধিকার তাঁর নেই। সাম্রাজ্যের প্রতি তাঁর আনুগত্যের ফলে তিনি বৃটিশ পক্ষেই যোগ দিলেন—যদিও তাঁর বহু দেশবাসী এ ব্যাপারে তাঁকে বাধা দেয়। গান্ধী মনে করলেন—যদি তিনি নাগরিক হিসাবে অধিকার দাবী করেন, তবে সাম্রাজ্য রক্ষার প্রচেষ্টায় তাঁর অংশ গ্রহণ করাটাও কর্তব্য। সুতরাং তিনি ১১০০ লোকের একটি বাহিনী গঠন করে ফেললেন - ৪০ জনের নেতৃত্বে বাহিনী টি বিভক্ত ও পরিচালিত হত।" এই সঙ্গে গান্ধীজীর ঘোষণাটিও হল চমৎকার। তিনি বললেন: 'The motive underlying this humble offer is to endeavour to prove that, in common with other subjects of the Queen Empress in South Africa, the Indians too are ready to do duty for their sovereign on the battlefield. The offer is meant to be an earnest of India's loyalty." (পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ৬১) গান্ধিজীর বাহিনীটি কিন্তু সামরিক বাহিনী ছিল না, কেননা ইংরেজ তাঁকে সামরিক বাহিনী গঠন করতে দিতে রাজি হয়নি। এটা ছিল অ্যাম্বুলান্স বাহিনী। এটাও গঠন করতে দিতে ইংরেজরা সহজে সম্মত হয়নি টেণ্ডুলকর লিখেছেন: গোড়ায় ইংরেজরা গান্ধীর সাহায্য নিতে রাজি হয়নি। গান্ধী যখন বারবার যুদ্ধে ইংরেজকে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ-উপরোধ ও শেষে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, তখন ইংরেজরা তাঁকে বলল: "তোমরা ভারতীয়রা যুদ্ধের কী জানো? তোমাদের নিয়ে তোমরা হয়ে দাঁড়াবে আমাদের সৈন্যদের ওপর বোঝার মতো; আমাদের সাহায্য করার বদলে, তোমাদেরই দেখাশোনা করতে আমাদের প্রাণান্ত হবে।" ইংরেজরা চারদিকে এই বিদ্রূপোক্তিও করতে লাগল। "বিপদ যদি দেখাই দেয় তবে প্রথম পালাবে ভারতীয়রা। কিন্তু একের পর এক যখন পরাজয় সুরু হল, তখনই ভীতসন্ত্রস্ত ইংরেজরা গান্ধীর সাহায্য নিতে আগ্রহান্বিত হল।" (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৬৪) গান্ধীর অ্যাম্বুলেন্স বাহিনী যুদ্ধের সময় প্রাণপাত পরিশ্রম করেছে, সাধারণ শিওন বা আরদালির বেশি মাইনে তারা পায়নি, এবং বাহিনীর চল্লিশ জন নেতা বিনা বেতনেই কাজ করেছেন। তাদের কাজের প্রশংসা বৃটিশ সংবাদপত্রগুলিও না করে পারেনি, কিন্তু ১৯২০ সালে যুদ্ধে জয়লাভ ঘটার

সঙ্গে সঙ্গে বাহিনীটিকে ভেঙে দেবার আদেশ দিতেও সরকার ইতস্ততঃ করেনি। গান্ধীজী তাঁর যুদ্ধে সহায়তা দানের পুরস্কার স্বরূপ লাভ করেন একটি যুদ্ধ বেতের ; বেতের প্রহণেও তাঁর বিন্দুমাত্র আপত্তি হয়নি।

গান্ধী আশা করেছিলেন যুদ্ধকালে আন্তরিকভাবে ইংরেজকে সাহায্য করার ফলে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অভিযোগগুলির একটা মীমাংসা করতে ইংরেজরাই এগিয়ে আসবে এবং যুদ্ধের সময় ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল তা চিরকাল অটুট থাকবে। এই আশা নিয়েই গান্ধী চিরকালের মত দক্ষিণ আফ্রিকা হতে বিদায় নিয়ে ভারতবর্ষে বসবাস ও কাজ করার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন ১৯০১ সালের শেষ দিকে। কিন্তু তাঁর আশা যে কত ভুল তা প্রমাণিত হল অচিরে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের আহ্বানে ১৯০২ সালে ডিসেম্বর মাসেই তাঁকে আবার ফিরে যেতে হয়েছিল নাটালে। এবং ১৯১৫ সালের আগে আর তিনি ভারতে ফিরতে সক্ষম হননি—দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার হতে ভারতীয়দের মুক্ত করার আন্দোলনে এই সুদীর্ঘ কাল তাঁকে সেখানে নিযুক্ত থাকতে হয়েছিল।

বুয়র যুদ্ধে ইংরেজকে অযাচিত সাহায্য দানের পুরস্কার স্বরূপ ইংরেজ দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের কী দিল? টেণ্ডুলকরের ভাষায় : "Any Indian could at any time enter the Transvall before the Boer War. But now every Indian had to apply for a permit to the newly created Asiatic Department—the object of which was to segregate the Indians from the Whites. Gandhi on his arrival secured his permit through the good offices of his old friend, the Police Superintendent of Durban" (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৭৩)

গান্ধীজী চেম্বারলেনের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। ইনি হচ্ছেন তখনকার ইংলণ্ডের রক্ষণশীল সরকারের উপনিবেশ সংক্রান্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী জে. চেম্বারলেন। বুয়র যুদ্ধ সমাপ্তির পর বুয়রদের হৃদয় জয় করতেই তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় এসেছিলেন শ্বেতাঙ্গদের নিকট জনপ্রিয় হবার উদ্দেশ্যেও তাঁর ছিল। বস্তুতঃ দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর আগমন উপলক্ষেই ভারতীয়রা গান্ধীজীকে তারবার্তা মারফৎ ভারতবর্ষ হতে শীঘ্র আসতে অনুরোধ করেছিল এবং গান্ধীজী সেই অনুরোধ রক্ষার্থেই আসেন। যাই হোক, গান্ধীজী-পরিচালিত ভারতীয় প্রতিনিধি দলের কোনো বক্তব্যই চেম্বারলেন শুনতে রাজি হননি এবং স্পষ্ট বলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের ব্যাপারে বৃটিশ সরকার মাথা ঘামাবেন না। গান্ধী অতঃপর নাটাল হতে যান প্রিটোরিয়া এবং সেখানে ইংরেজ অফিসারদের দ্বারা তিনি অপদস্থ ও অপমানিত হন।

সুভাষচরিত্রের সঙ্গে গান্ধীচরিত্রের মৌল পার্থক্য এই সব ঘটনায় দুই রূপে ধরা পড়ে। ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন সুভাষ প্রথম কলকাতার ট্রামে, তারপর প্রেসিডেন্সি কলেজে। ট্রামের ঘটনাগুলি ঠিক কী জাতীয় ছিল এবং মুষ্টিযোগের ব্যাপার তাতে ছিল কিনা জানি না ; কিন্তু একথা সত্য যে অধ্যাপক ওটেনকে প্রহারের সময় সুভাষ নিজে অংশ নেননি, যদিও ঘটনাস্থলে তিনি উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক ওটেনকে শাস্তিদানের ব্যাপারে তাঁর সমর্থন ছিল এবং সমস্ত ঘটনার দায়িত্বও তিনিই স্বীকার করে নেন। সুভাষের বয়স যখন উনিশ তখনকার এই ঘটনারই প্রমাণ হয়ে যায় যে অপমানিত হয়ে মুখ বুজে সহ্য করার লোক তিনি নন, যদি সে অপমান হয় বিদেশীর দ্বারা কৃত এবং ভারতবর্ষের জাতীয় সত্তার কোনো বিষয়কে উপলক্ষ করে। পক্ষান্তরে গান্ধীজী পুনঃপুনঃ অপমানিত হতে ভালবাসেন, নিজের দেশ ও জাতির মর্যাদার প্রশ্ন সে অপমানের সঙ্গে জড়িত থাকলেও

তিনি অপমানকারী উদ্ধত প্রতিপক্ষের কাছে নতজানু হয়ে আবেদন জানানোই উচিত মনে করেন। গান্ধীজী যার হুকুম করতে বিলক্ষণ জানেন, শক্তিমানের দম্ভ ও অত্যাচারী নীতিকে শক্তির দ্বারাই পরাস্ত ও প্রতিহত করার মানসিকতা তাঁর নেই; আপোষ ও মিটিয়ে ফেলা এই দুই নরম পন্থার ওপর নির্ভর গান্ধীজী, শক্তিমান শত্রুর হৃদয় ও বিবেকের নিকট আবেদন করাই কর্তব্য মনে করেন।

সুভাষচন্দ্রের বয়স যখন সতেরো তখন প্রথম মহাযুদ্ধ বাধে এবং তিনি সে সময় টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী, যুদ্ধের কারণ, পটভূমি পরিণাম ইত্যাদি বিচার করে তিনি সেই অসুস্থ অবস্থায়ই একটি মাত্র সিদ্ধান্তে আসেন। তা এই যে, কোনো পরাধীন দেশের পক্ষে স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে যেমন নিজস্ব সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা দরকার, তেমনি কোনো স্বাধীন দেশ যদি তার স্বাধীনতা রক্ষা করতে চায় তবে প্রথম দরকার একটা শক্তিশালী, সুসজ্জিত জাতীয় সৈন্যদল। তাঁর এই সিদ্ধান্তের মধ্যেই ওতপ্রোত ছিল ভারতবর্ষের জাতীয় সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার স্বপ্ন; সেদিনকার বৃটিশ শাসিত ভারতে বৃটিশ আর্মি ছিল, কিন্তু ছিলনা ভারতীয় জাতীয় আর্মি,—আর তা গড়ার কথা সেদিন কেউ কল্পনাও করেনি। সুভাষচন্দ্র তাঁর সেই স্বপ্নকে আজীবন লালিত করেছেন, এবং তাঁর সীমিত সুযোগের মধ্যে বাস্তবে সেই স্বপ্নকে রূপায়িতও করেছিলেন উত্তরকালে; কিন্তু গান্ধীর জীবনে যুদ্ধ নিয়ে এসেছিল একেবারে ভিন্নতর প্রশ্ন, যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত ঘটনাও তাই ভিন্নরকম। বুয়র যুদ্ধ যখন বাধে তখন গান্ধীজীর বয়স ত্রিশ, তখনই তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের নেতা এবং একজন প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যারিস্টার। বুয়র যুদ্ধ বাধে ১০ই অক্টোবর, আর ১৯শে অক্টোবর গান্ধীজী বৃটিশ কলোনিয়াল সেক্রেটারিকে এক পত্রে লেখেন: "We do not know how to handle arms. It is not our fault; it is perhaps our misfortune that we cannot, but it may be there are other duties no less important to be performed on the battlefield and, no matter of what description they may be, we would consider it a privilege to be called upon to perform them and would be ready to respond to the call at any time appointed by the Government. If an unflinching devotion to duty and extreme eagerness to serve our Sovereign can make us of any use on the field of battle, we trust we would not fail." (The Collected Works of Mahatma Gandhi, vol. III, Govt of India, pp. 112-113) গান্ধীজীর এই পত্রে লক্ষ্য ব্যবহার লক্ষণীয়; হিংসা বা অহিংসার কোনো প্রশ্ন এই পত্রে নেই, যুদ্ধ জিনিসটা যে একটা মারাত্মক অপরাধ এ ধরণের কথা কোথাও নেই, বুয়রদের সঙ্গে আপোষে ঝগড়ার মিটমাট করে ফেলার সদুপদেশও নেই। ভারতীয়রা যে অস্ত্র ধারণে সক্ষম নন এটা গান্ধীজীর মতে একটা দুর্ভাগ্যের বিষয়, এবং এ দুর্ভাগ্যের জন্য তাঁরা নিজেরা দায়ীও নন। ইংরেজ ভারতীয়দের হাতে অস্ত্র দিতে নারাজ, তারই ফলে অস্ত্রচালনায় ভারতীয়রা শিক্ষা পায় না। কিন্তু যুদ্ধের জন্য অস্ত্রধারণ ছাড়া আরও অনেক প্রয়োজনীয় কাজ থাকে, তার যে কোনো একটাতে যে কোনো সময়েই সর্বস্বপণ ডাক দেবা মাত্র গান্ধীজী ও তাঁর দল লেগে যাবেন। এবং উদ্দেশ্যটাই বা কী? সে বিষয়েও গান্ধীজী খুব স্পষ্ট: "We are all fired by one spirit, viz the imperial"—১০ই নভেম্বর, ১৮৯৯ তারিখে উইলিয়াম পামারকে লেখা একখানি পত্রে গান্ধীজী এই কথা লিখেছিলেন। (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১২১)।, তবু অ্যাম্বুলেন্স বাহিনী গঠন করাই

নয়, গান্ধীজী ভারতীয়দের নিকট হতে অর্থ সংগ্রহ করে তাও যুদ্ধের জন্য ইংরেজকে দিয়েছিলেন।

গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিক গঠনের এই ভিন্নতাই পরবর্তী কালে ভারতীয় রাজনীতিতে অনেক আলোড়ন ও সংক্ষোভের কারণ হয়ে উঠেছিল। বলা যেতে পারে যে গান্ধীজী তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন বৃটিশের একজন সহযোগী রূপেই, এবং তাঁর সেই সহযোগিতার স্বীকৃতি স্বরূপ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত যুদ্ধ মেডেল তিনি বেশ গৌরবের সঙ্গেই গ্রহণ করেছিলেন।

গান্ধীজীর এই মনোধর্মকে বাংলা দেশ প্রথম হতেই সমর্থন করতে পারেনি; আর সুভাষচন্দ্রকে তাঁর ছাত্র-জীবনের ঘটনাবলীর মারফৎ বাংলাদেশ প্রথম যে শ্রদ্ধার চোখে দেখেছিল, সে দৃষ্টি আজও ম্লান হয়নি। ১৮৯৯ সালে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা হতে ভারতবর্ষে আসেন—তাঁর বক্তব্য শোনাবার চেষ্টাও তিনি সেবার বহুস্থানে করেছিলেন। সোৎসাহে, কিরোজশা মেটার মতো দেশনেতারা তরুণ গান্ধীকে সেদিন সম্মান জানিয়েছিলেন; মাদ্রাজ, বোম্বাই, গুজরাট, এলাহাবাদ সর্বত্রই গান্ধী অনুরক্ত সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, পারেননি শুধু বাংলায়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সমস্ত বক্তব্য শুনে স্বল্প কথায় বিদায় জানিয়েছিলেন; 'অমৃত বাজার পত্রিকা' ও 'বঙ্গবাসী' পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদকরাও গান্ধীজীর বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হতে পারেননি। কিন্তু গান্ধীজীকে সেদিন সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিল কলকাতার দুটি বিশিষ্ট সংবাদপত্র—ইংরেজস্বার্থের বিশ্বাসিত রক্ষক তারা;—টেণ্ডুলকরের ভাষায়: "Gandhi was well received by the editor of Statesman and Englishman. Mr. Sanders, the editor of Englishman, placed his office and journal at Gandhi's disposal, after subjecting him to a searching examination. He allowed Gandhi even the liberty of making whatever changes he liked in the editorial on South Africa." হয়তো ঘটনাটি ছোট, কিন্তু স্মরণীয় এই কারণে যে দুখানি সংবাদপত্রই—Statesman ও Englishman ১৯১৬ সাল হতে ধারাবাহিক ভাবে সুভাষ-বিরোধী ছিল। অধ্যাপক ওটেনের ঘটনা মারফৎ সুভাষ এদেশে প্রথম পরিচিতি লাভ করেন, আর ঐ ঘটনার দরুণ সুভাষ ও তাঁর অনুবর্তীদের উপর তীব্রতম ও হিংস্রতম আক্রমণ চালায় ঐ দুখানি পত্রিকা। অথচ এই দুটি পত্রিকাই ভারতবর্ষে গান্ধীজীর সর্বপ্রথম সমর্থকদের অন্যতম। এই যোগাযোগটি কাকতালীয় নয়, এর তাৎপর্য যথেষ্ট গভীরই বটে।

দুই

কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে সুভাষচন্দ্রের জীবন ও চরিত্র আলোচনা করতে যেয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে এই প্রতিতুলনা কেন। তার প্রয়োজন আছে এই কারণে যে এই প্রতিতুলনার সাহায্যে সুভাষ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নিবিড়তর রূপে উপলব্ধি করা যায়। তাছাড়া, ইতিপূর্বে আমরা বলেছি যে ভারতীয় রাজনীতিতে দ্বন্দ্ব মূলতঃ দুই ভিন্ন ধর্মবোধের দ্বন্দ্ব; ভারতে জাতীয় জীবনের বিকাশের ইতিহাসে সেই দ্বন্দ্ব, আলোড়ন ও সংক্ষোভ বিশেষ তাৎপর্য মণ্ডিত হয়ে আছে; সেদিনের সমকালীন দৃষ্টিকোণের মাঝখানে সেই দ্বন্দ্বের গ্লানি ও শোচনীয় কুশ্রীতা হয়তো আমাদের পীড়িত করে, কিন্তু আজ অনেকখানি দূরত্বে এসে গান্ধী-সুভাষ সংঘাতকাহিনী নতুনতর দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সুভাষচন্দ্রের জীবন অথবা ভারতবর্ষের জাতীয় জীবন—যাই আমরা আলোচনা করতে বসি না কেন, গান্ধীচরিত্র ও গান্ধীজীর কর্মপন্থার সঙ্গে সুভাষচরিত্র ও সুভাষীয় কর্মপন্থার বিরোধ ও উদ্ভূত সংঘর্ষের কথা আলোচনা না করে পারা যায় না। সেই বিরোধের উৎস ও স্বরূপ—দুই-ই আমাদের বোঝা দরকার।

ভারতীয় রাজনীতিতে নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন বহু ব্যক্তি; ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা বা আন্তর্জাতিক খ্যাতি তাঁদের মধ্যে অনেকেরই ছিল। রূপে, ঐশ্বর্যে, বাগ্মিতায়, লেখনীশক্তিতে, জনপ্রিয়তায় ও প্রতিভায় জহরলাল নেহেরুর স্থান অন্ততঃ আর কারও নিচেই নয়। কিন্তু ভারতীয় রাজনীতির সুবিশাল প্রেক্ষাপটে দুটি মাত্র মানুষ গান্ধী ও সুভাষ,—বয়সের বহু ব্যবধান সত্ত্বেও, প্রায় একই সময়ে আবির্ভূত হয়ে একই কালে নেতৃত্ব দান করে—ভারতের জীবন ও সংস্কৃতির দুটি ভিন্ন দিককে, ভারতের সুদূরপ্রসারী ধর্মসাধনা ও উপলব্ধির দুই বিপরীত সিদ্ধান্তকে নিজেদের জীবনে ও কার্যে প্রতিবিম্বিত করেছিলেন। গান্ধীজী ভারতবর্ষের রাজনীতিতে প্রবেশ করেন পঞ্চাশ বছর বয়সে, যখন তাঁর মানস পরিণতি সম্পূর্ণতা লাভ করার কথা; আর সুভাষ রাজনীতিতে যোগ দেন মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে। রাজনীতিতে যোগদানের সঙ্কল্প নিয়ে প্রথম তিনি দেখা করেন গান্ধীজীর সঙ্গে—আর সেই প্রথম সাক্ষাতেই গান্ধীজীর অসম্পূর্ণতার দিকটি তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত হয়ে যায়। গান্ধীজী ভারতীয় রাজনীতিতে যোগদানের পূর্বেই দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্য-আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছেন, ভারতবর্ষে মহাত্মা' রূপে বন্দিত হয়েছেন এবং ভারতেই পাঁচবার সাফল্যের সঙ্গে সত্যাগ্রহ পরিচালনা করেছেন। আর এরই পাশাপাশি, সুভাষ ছিলেন একজন সদ্য যুবক, প্রেসিডেন্সি কলেজেই একমাত্র ছাত্র-আন্দোলনের নেতৃত্ব করার অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল, এ ছাড়া ছিল সমাজসেবার কিছু অভিজ্ঞতা। ১৯২১ সালের মে মাসে আই, সি, এস পদ ত্যাগ করে ভারতে তিনি পৌঁছন ১৬ই জুলাই; বোম্বাই সহরে নেমেই তিনি মহাত্মার দর্শনপ্রার্থী হন, উদ্দেশ্য ছিল: "To get from the leader of the campaign I was about to join, a clear conception of his plan of action (The Indian Struggle, Thacker, Spink & Co, p. 79) কিন্তু রাজনীতিতে যোগদানের পক্ষে সুভাষ-চন্দ্রেরও নিজস্ব প্রস্তুতি ছিল কিছুটা, সেটা সাধিত হয়েছিল গোপনে। রাজনীতি ক্ষেত্রে বাস্তব বহু অভিজ্ঞতা লাভের বয়স তখনও তাঁর হয়নি, কিন্তু এ বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয় করেছিলেন প্রভূত পরিমাণে। তাঁর ভাষায়: "During the last few years I had made some study of the methods and tactics employed by revolutionary leaders in other parts of the world" (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৮০) এই জ্ঞানের আলোকে তিনি মহাত্মা গান্ধীর মন ও উদ্দেশ্য বুঝতে চেয়েছিলেন।

এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন: "বিদেশী বুরোক্রেসীর হাত থেকে চূড়ান্ত ক্ষমতা কখনের দিকে ধাপে ধাপে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে গান্ধীজীর এমন কী প্ল্যান আছে—তার পর পর স্তরগুলিই বা কী কী—সেই প্ল্যানের বিষয়গুলি বিশদভাবে বোঝার ইচ্ছা আমার ছিল। সেই উদ্দেশ্যেই মহাত্মাজীকে আমি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করি এবং তিনিও তাঁর স্বাভাবিক ধৈর্য্যের সঙ্গে জবাব দেন।.....তাঁর প্রকৃত প্রত্যাশা যে কী তা আমি বুঝতে পারিনি।..... he did not have a clear conception of the tactics whereby the hands of the Government could be forced. Altogether, his reply to the second question was disappointing and his reply to the third was no better. What was to him a question of faith—namely, that Swaraj would be won within one year—was by no means clear to me.....my reason told me clearly, again and again, that there was a deplorable lack of clarity in the plan which the Mahatma had formulated and that he himself did not have a clear idea of the

successive stages of the campaign which would bring India to her cherished goal of freedom. (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৮০-৮২) গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সেই প্রথম সাক্ষাৎই শুধু নয়, গান্ধীজী সম্পর্কে সেই তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়াও বটে। গান্ধীজী এই ঘটনার দু বছর আগেই কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। পঞ্চাশোর্ধ্ব সেই সর্বজনমান্য নেতার দৃষ্টি, জ্ঞান ও চিন্তার স্বচ্ছতার অভাব সুভাষচন্দ্রকে সেদিন সবচেয়ে বেশী পীড়িত করেছিল। পীড়িত করেছিল, তার কারণ সুভাষ নিজে অর্জন করেছিলেন সেই দৃষ্টির স্বচ্ছতা, চিন্তা ও অনুভবের স্বচ্ছতা—আর জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি সেই বয়সেই গান্ধীজীর চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে ছিলেন। ফলত গান্ধীজীকে দেখে তাঁর আশা ভঙ্গ হয়েছিল: তিনি বুঝেছিলেন গান্ধীজীর পথ তাঁর পথ নয়, গান্ধীজীর মানসিক গঠনের সঙ্গেও তাঁর মিল নেই।

তিন

কেন প্রথম দর্শনেই গান্ধী ও সুভাষের মধ্যে পার্থক্য এত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল? সেই পার্থক্যের স্বরূপই বা কী?

গান্ধীচরিত্র ও সুভাষচরিত্রের মৌলমিল ছিল এই কয়টি বিষয়ে: (১) ভারতীয় রাজনীতিতে একমাত্র এই দুজন নেতারই ছিল নিজেদের mission of life সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয়। অন্যান্য বিখ্যাত ও জনপ্রিয় নেতারা দেশপ্রেমিক ছিলেন নিঃসন্দেহে, কিন্তু উৎসাহে তাঁদের কাম্য ছিল নিজেদের রাজনৈতিক উত্থান। গান্ধীজী কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও ক্ষমতালাভকে কোনো সময়ই উচ্চস্থান দেননি, এবং সুভাষচন্দ্রেরও জীবনের উদ্দেশ্য তা ছিল না। গান্ধীজী তাঁর mission of lifeকে অনুসরণ করতে করতে ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে এসে পৌঁছান, এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বও তাঁর করায়ত্ত হয়; সুভাষচন্দ্রের জীবনের ঘটনাও অনুরূপ। (২) গভীর ধর্মীয় প্রত্যয়ই ছিল এই দুজন নেতার জীবনের ভিত্তি (৩) এঁরা দুজনেই ছিলেন বিশ্বজনীন চেতনার অধিকারী: কিন্তু দুজনেরই সত্তা যেন পরিপূর্ণভাবে গঠিত হয়েছিল আবহমান কালের ভারতীয় সংস্কৃতির ধারায়; ভারতবর্ষের দুটি ভিন্ন ভাবধারার প্রতিনিধি ছিলেন এঁরা। বিরোধেরও সূত্রপাত সেখানেই।

গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের অমিল এই যে গান্ধী তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হন পরিণত বয়সে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব দানের ফলে যখন তাঁর যশ চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেছে ও সাফল্য এসেছে হাতের মুঠোয়, তখন। ১৯০৯ সালে "হিন্দ স্বরাজ" নামে একখানি গ্রন্থ লেখার সময়ে তাঁর জীবন-দর্শন একটা সুস্পষ্ট রূপ নিয়ে তাঁর কাছে ধরা দেয়। গ্রন্থখানি তিনি লিখেছিলেন লণ্ডন থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফেরার সময় জাহাজে বসে। ভারতের স্বরাজ সাধনার উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য স্বরাজলাভের উপায় থেকে আরম্ভ করে আধুনিক বিশ্বসভ্যতার বিচার পর্যন্ত আছে এই গ্রন্থে: এবং গান্ধীজী যে নতুন মানবসভ্যতার বিকাশ চান তারও বর্ণনা তিনি এই বইয়ে দিয়েছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত হল: This civilisation is irreligious—It must be shunned (The Collected Works of Mahatma Gandhi, Volume Ten, Govt of India, p. 21)……railways, lawyers and doctors have impoverished the country—To arm India on a large scale is to Europeanise it,—that is to say, to make the holy land of of India unholy—— (পূর্বোক্ত গ্রন্থ) গান্ধীজী তাঁর জীবন-দর্শন নির্ধারণ করার পর বাস্তবে তা রূপদানের উদ্দেশ্যে স্থাপন করেন টলস্টয় ফার্ম ১৯১০ সালে। এবং গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁর জীবন-দর্শনের প্রয়োগ-কৌশল রূপে অহিংস অসহযোগ, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা সত্যাগ্রহকেই বেছে নেন।

গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় যতদিন ছিলেন (১৯১৪ সাল পর্যন্ত) ততদিন তিনি ছিলেন সেখানকার ভারতীয়দের একচ্ছত্র নেতা, ভারতবর্ষে সেই কারণেই তাঁর যশ বিস্তৃত হয়েছিল এবং তাঁর সঙ্গতনোচিত আচরণের ফলে বিদেশী ওপনিবেশী বন্ধুও তাঁর লাভ হয়েছিল। এই সকল সাফল্যের মধ্যে বসে তাঁর ধারণা হয়েছিল যে তাঁর জীবন-দর্শনই তাঁকে সাফল্য এনে দিচ্ছে, সুতরাং তাঁর জীবনদর্শনে নিশ্চয়ই সুসংগতা নিহিত আছে ; এবং তাই যদি হয় তবে আধুনিক সভ্যতার সমস্ত ব্যাধি হতে মুক্ত করে মানবসমাজকে আদর্শ সভ্যতার ভিত্তিতে গঠন করার পক্ষে তাঁর জীবন-দর্শন নিশ্চয়ই সক্ষম। তাঁর এই রকম মত দুটবন্ধু হয় টলস্টয়ের পুনঃ পুনঃ প্রশংসা-পত্র পেয়ে এবং সোধেরের পৃষ্ঠপোষণা লাভ করে। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতেই গান্ধীজীর ধারণা হয়েছিল যে বিশ্ব-মানবের দরবারে একটি নতুন বাণী, সভ্যতার একটি নতুন আদর্শ উপস্থিত করার জন্যই তিনি আবির্ভূত হয়েছেন, বস্তুতঃ একটি নতুন ধর্মই হয়তো তিনি প্রচার করতে এসেছেন ;—এই তাঁর বিধি-নির্দিষ্ট ভূমিকা। গান্ধীজী বুঝেছিলেন যে বৃহৎ বিশ্বের পটভূমিতে তাঁর এই ভূমিকা পালন করতে হলে দক্ষিণ-আফ্রিকার পড়ে থাকলে তাঁর চলবে না ; কারণ দক্ষিণ-আফ্রিকা একটা সামান্য স্থান এবং সেখানে অল্প সংখ্যক অশিক্ষিত ভারতীয় ভিন্ন আর কেউ তাঁকে কোনো গুরুত্বও দেবে না। অতএব তাঁকে আসতে হবে ভারতে—সে তাঁর স্বদেশও বটে, তাঁর মতবাদ প্রচারের সমস্ত সুযোগও সেখানে উপস্থিত। এবং ভারত যদি তাঁর মতবাদ ও নেতৃত্ব মেনে নেয় তবে কালে জগতে সেই মতবাদের প্রসার হওয়া অসম্ভব হবে না। এই পরিকার উদ্দেশ্যবোধ নিয়েই ১৯১৫ সালে গান্ধীজী চিরস্থায়ীরূপে ভারতে এসেছিলেন।

গান্ধীজীর চিন্তাধারার সঙ্কীর্ণতা ও অসচ্ছতা ছিল এইখানে যে তিনি এই সহজ সত্যটি বুঝতে চাননি যে, জগৎকে কোনো নতুন বাণী বা আদর্শ দেবার যোগ্যতা তাঁর ছিল না ; যুদ্ধ বা ঈশ্বরের মতো ধর্মপ্রবর্তক হওয়া দূরে থাকুক, ধর্ম প্রচারক হবার যোগ্যতাও তাঁর ছিল না ; ধর্ম যে একটা মনগড়া theory মাত্র নয়, টলস্টয়, রাস্কিন বা থোরোর মতো ভাবপ্রবণ ব্যক্তিদের কল্পিত আদর্শবাদও নয় ; প্রগাঢ় অনুভব ও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির আলোয় ধর্মের গভীর তত্ত্ব লাভ করতে হয়—গান্ধীজীর মনে এই সরল সত্যগুলি কখনো দোলা দেয়নি। তাঁর চিন্তাধারা ছিলনা গভীর, ইতিহাসসমন্বিত অথবা বাস্তবসম্মত। মানব ইতিহাসের dynamics সম্পর্কে ছিলনা তাঁর কোনো ধারণা—বি ঙনের কোনো মূল্য ছিলনা তাঁর কাছে, জগৎ যেন একটা স্থিরস্থিত পদার্থ - এই ছিল তাঁর প্রত্যয়। তাঁর পছন্দ-অপছন্দ, তাঁর অর্ধগঠিত নীতিবোধ, তাঁর প্রাচীন সংস্কার এবং তাঁর মনঃকল্পিত ছাঁচ যেন জগৎ একটা চিরস্থায়ী স্থাবর রূপ নেবে—এই সম্পূর্ণ ছেলেমানুষি বিশ্বাস তাঁর ছিল। গান্ধী বৈষ্ণব পরিবারে লালিত ও বৈষ্ণব আচার পালনে অভ্যস্ত হওয়ায় বৈষ্ণব ভাবধারায় শ্রদ্ধাবান ছিলেন ;—তাঁর অহিংসাবাদ হয়তো সেই সূত্রেই তিনি পেয়েছিলেন। বস্তুতঃ গুজরাটে প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম নয় ; চৈতন্যদেব শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং অহিংসাবাদের সমর্থক ছিলেন না,—কালি দমনের ঘটনায় তার প্রমাণ আছে। গান্ধী যে বৈষ্ণবধর্ম পেয়েছিলেন তা একটা লোকাচার মাত্র, গূঢ় কোনো সত্যের উপলব্ধি তাতে ছিলনা।

পক্ষান্তরে, সুভাষচন্দ্র ছাত্রজীবনেই পুনঃ পুনঃ নিজ জীবন-দর্শন নানাভাবে স্থির করতে চেষ্টা করেছিলেন, গান্ধীজীর মতো চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত সেজন্য তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়নি। স্কুলের উঁচু ক্লাসগুলিতে পড়ার সময়ই পরম সত্যের উপলব্ধির জন্য তিনি ব্যাকুল হয়েছিলেন। অধ্যয়ন ও তদুপরি তর্কের বাস্তবজীবনে প্রয়োগ—এই উভয় বিষয়েই তিনি ছিলেন আন্তরিক, উদ্যমী ও কুশল সাধক। সুভাষ উপলব্ধি ও নিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধি—এই দুই-ই তত্ত্বপরম্পরায় লাভ

করেছেন; তাঁর চিন্তা ও কর্ম তাই সর্বত্রই হয়েছে যেমন স্বচ্ছ, তেমনি তাতে প্রামাণ্যতার (authenticity) স্পর্শ লেগেছে। ১৯২৬ সালের জানুয়ারি মাসে অধ্যাপক ওটেনের আচরণের প্রতিবাদে যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি ছাত্রদের ধর্মঘট পরিচালনা করেছিলেন এবং তার পরের মাসেই অধ্যাপক সাহেবের আচরণকে সংযত করার উদ্দেশ্যে ছাত্রদের প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা গ্রহণেও নেতৃত্ব করেছিলেন তখন তিনি পরিষ্কার জানতেন তিনি কী চান, তাঁর কর্মের ভিন্ন পরিণাম যখন দেখা গেল তখন একথা বোঝা গেল যে তিনি তজ্জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত; কোনো অনুতাপ বা সংশয় তাঁর চিত্তে সংক্রামিত হয়নি। অথচ, ১৯১৩ সালে, চুয়াল্লিশ বছর বয়সে গান্ধীজী যখন দক্ষিণ-আফ্রিকায় তাঁর শেষবারের আন্দোলন পরিচালনা করছেন তখনো দেখা গেছে প্রথমবারের মতোই তিনি পদে পদে অনিশ্চিত, সংশয়াচ্ছন্ন কোন পদক্ষেপের পর কোন পদক্ষেপ নিতে হবে তা তিনি জানেন না এবং তাঁর আন্দোলনের ফলে যে প্রতিক্রিয়া ও পরিণাম দেখা দেয় তার জন্যও তিনি প্রস্তুত নন। ভারতবর্ষে ফিরে এসে তাঁর সুদীর্ঘকালের রাজনৈতিক নেতৃত্বের কালে এই দোলায়িতভাব ও সংশয়, কৃতকর্মের জন্য পশ্চাত্তাপ ও ভুল স্বীকার, কর্মের পরিণাম দর্শনে অপ্রস্তুত হয়ে পড়া—এ-সবই বারবার আমরা দেখেছি। গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের পার্থক্য এইখানে যে সুভাষ পৌঁচেছিলেন সেই অসংশয়িত সত্যোপলব্ধিতে যাতে তিনি স্পষ্ট জেনেছিলেন যে এই জগৎসংসার প্রকৃতপক্ষে শক্তিরই ক্রীড়াঙ্গন; কোনো এবপেশে দৃষ্টি বা মতবাদ দিয়ে জগতের ব্যাখ্যা করা চলে না; যুদ্ধ, বিপ্লব, শক্তির সঙ্গে শক্তির সংঘর্ষ এখানে অনিবার্য; এবং তাই শক্তির সঙ্গে শক্তি দিয়েই এখানে মোকাবিলা করতে হয়। ইতিহাস-বিবর্তনের ধারা চলে অগ্রগতির দিকে; ইতিহাসের গতিময়তাকে অস্বীকার করা বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়—আর জগতের পটভূমিতে স্থিরবিশ্বাস কিছু হওয়া সম্ভব নয়। গতিবাদী মানবইতিহাসের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে যে শক্তিময়ী সত্তার ইঙ্গিত—সুভাষ ছিলেন তাঁরই উপাসক এবং ফলে গতিবাদী, শক্তিবাদী, বাস্তববাদী। তিনি বিশ্বাস করতেন সেই সমন্বয়বাদে যার ভিতর সত্য তার সাগ্রহিক রূপ নিয়ে ধরা পড়ে, সকল আপাত-বিরোধিতার চিত্তের প্রতিফলিত সত্যের সমগ্র অবয়ব যে সমন্বয়বাদে স্থান পায়; পক্ষান্তরে, গান্ধীজীর অহিংসা ও প্রেমতত্ত্ব অস্পষ্ট, অপরিণত, ব্যর্থ সত্য ও অর্ধ কল্পনার আধার যায়।

চার

কিন্তু গান্ধীবাদ ও সুভাষবাদের পার্থক্য আমাদের আলোচনার বিষয় নয়; সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবনের আলোচনা প্রসঙ্গেই গান্ধীজীর কথা উত্থাপন করেছি। সুভাষচন্দ্রের জীবন কীভাবে গঠিত হয়েছিল, পাঠকের দৃষ্টি সে বিষয়ে আকৃষ্ট করাই আমার উদ্দেশ্য। সুভাষচরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য সেই ছাত্র বয়সেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। সে তাঁর গোপন আত্মপ্রস্তুতির দিক, বাইরের কোনো ব্যক্তি বা কখনো জানতে পারেনি, এমন কি তাঁর সহচরগণও যে বিষয়ে অজ্ঞই থেকে গেছেন। প্রতি পদক্ষেপটি নেবার আগে গভীর ভাবনা, ধৈর্য, অধ্যবসায় ও নিখুঁত নিপুণতায় কোনো ভাব ও তার বাস্তব প্রয়োগকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে নেবার তাঁর প্রয়াস পরিণত বয়সেই যে দেখা গেছে তা নয়, ছাত্রজীবনেই এই স্বভাবটী তাঁর গড়ে উঠেছিল। এলোমেলো পথচলা বা ঘটনার মুখাপেক্ষী আত্মসমর্পণ করে ক্রমে ক্রমে তারই ভিতর হতে একটা মতবাদ সন্ধান করে নেওয়া—এ তাঁর স্বভাব-বহির্ভূত; ভারতীয় রাজনীতির অন্যান্য নায়কদের সঙ্গে, এমনকি গান্ধীজীর সঙ্গেও এখানে তাঁর পার্থক্য সুস্পষ্ট। সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ, তিলক, লাজপত রায় ও জওহরলাল প্রভৃতির সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁর তো পার্থক্য আছেই, এমনকি তাঁর রাজনৈতিক গুরু দেশবন্ধু হতেও এবিষয়ে সুভাষ স্বতন্ত্র।

সুভাষের জীবনের আদিপর্বের একটি ঘটনা বা তাঁর কোনো আচরণ আমাদের এতখানি চিন্তা আজ দাবী করে এইজন্য যে কোনোটিকেই তাঁর সমগ্র জীবন হতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না ; এর কোনটাই হঠাৎ উদ্ভিপ্ত নয়। ষোল বছর বয়সে কটক হতে কলকাতায় চলে আসার সময় তিনি স্পষ্ট জানতেন এই আসার উদ্দেশ্য কী, - উনিশ বছর বয়সে প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাড়ার সময়ও তাঁর আচরণের উদ্দেশ্য তাঁর কাছে স্পষ্ট ছিল। উদ্দেশ্য সম্পর্কেও যেমন তাঁর ধারণা থাকত স্পষ্ট, তেমনি উদ্দেশ্য সাধনের উপায় সম্পর্কেও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ সচেতন ও আত্মপ্রত্যয়ে স্থির। অস্ফুট, অসম্পূর্ণ, অপরিণত ও অর্ধসত্য ভাবধারার অনুসরণ করার দায় কোনোদিন তাঁকে স্বীকার করতে হয়নি। তাঁর সমকালীন নেতৃবৃন্দ তাঁর এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির পরিচয়ে খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন বলে মনে হয়না।

(ক্রমশঃ)

Industries Corporation of Bengal Ltd.

60/1, HAZRA ROAD

CALCUTTA-19

DYERS AND BLEACHERS
OF
KNITTED FABRICS

মূল্যবান বোধগুলো সব

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

বৃক্ষ, তুমি আরো দূরে
সরে যেতে পার।
নদী, তুমি আরো দূরান্তরে
ঢেউয়ের গভীরে
লীন হতে পার।
পথ, তুমি কুণ্ডলীপাকানো
অত্যন্ত আদিমকার
সরীসৃপ হয়ে শুয়ে শুয়ে
দিগন্তের দিকে
মিশে যেতে পার।

সমস্তই ধীরে ধীরে যেন
আবছা ছায়ার মতো
সরে যাচ্ছে দূর অন্তরালে।
কুণ্ডলীপাকানো অন্ধকার
পাহাড়ে, মন্দির গাত্রে
প্রোথিত পাষাণে। নদীজল
একটি ভীষণ গল্প শুতোর মতন ;
বালুময় তটে-তটে,
সব দৃশ্যে স্মৃতি রোমন্থন।

স্নায়ু থেকে মূল্যবান বোধগুলো সব
ঝরে ঝরে পড়ছে এখন ;
একটি দুটি ফুলের মতোন
টুপটাপ শব্দাবলী অন্তরটৈতন্যে
নিরন্তই মিশে যাচ্ছে সন্তপ্ত বালুতে।

হত্যা যাদের উৎসব

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যেন রোদ বাড়তে থাকলে তারা
আয়নার মুখোমুখি না দাঁড়ায়।

আলোর উজ্জ্বল আয়না তেমিদের
ভোরবেলার মুখ দেখায়, রমণীর রাত শেষের
মধুর ক্লান্তিকে ধরে রাখায়। এখানে
লাম্পট্যের হিংসায় কুৎসিত লালগুলি
বড় বেমানান।

যত রোদ বাড়ে, দেশে দেশে ঘরে ঘরে কিশোর কিশোরী
বধূ বৃদ্ধ শিশু
স্নান সেরে শুচি হয় ; তারা নিজেদের ভালবাসার মুখশ্রী
আয়নার সামনে আনে পর্যন্তরে।

তারা যেন নিষ্পাপ ভালবাসার মধ্যে প্রেতাত্মার
অভিশাপ আনে না ! যেন মানুষের হীনতার প্রতিশোধের
আগুনে
আমাদের ঘরে ঘরে গর্ভের সন্তানরাও ঘৃণায় না জ্বলে।

কিছুই বুঝি না

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কবে কোথায় কোন্ অখ্যাত স্টেশনে
একটা কৃষ্ণচূড়ার স্পর্ধা দেখে অবাক মেনেছিলাম।
স্টেশনটার নাম পর্যন্ত মনে নেই,
কিন্তু গাছটা আজও স্মৃতির মধ্যে
হানা দেয়।
কী যে কাণ্ড, কিছুই বুঝি না।

কবে কোথায় কোন্ গাছতলায় কাকে
দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম।
সেটা কি আম জাম না আকন্দ?
মনে নেই।
কিন্তু গাছতলার সেই মানুষটিকে আজও
মাঝেমাঝেই মনে পড়ে।
কী যে কাণ্ড, কিছুই বুঝি না।

কবে কোথায় চমকে দিয়ে কে যেন একবার
পিছন ফিরে তাকিয়েছিল।
সে কি আমার বন্ধু, না শত্রু?
মনে নেই।
কিন্তু সেই চাউনিটা এখনও
মাথার মধ্যে বিঁধে আছে!
কী যে কাণ্ড, কিছুই বুঝি না।

পায়রা

অরুণকুমার সরকার

আজিকালের বাড়ি, ছোট্ট ঘর, সরু অন্ধকার গলি
তুমি তো এ-সব ভাঙতেই চেয়েছিলে।
বলেছিলে বড়ো বড়ো ইমারত বানাবে
আর উজ্জ্বল রাজপথ।
সরলচোখ শীর্ণ বধূ, অর্ধনগ্ন শিশু, ঈশ্বরবিশ্বাসী গৃহস্থ
তুমি তো এদের বদলে চেয়েছিলে চতুর নাগরিক
হৃষ্টপুষ্ট, সুবেশ, সুকান্ত।
আর ঐ ঢাকা জলাভূমিতে আগন্তুক
হাঁসেদের গোপন ডানার আড়ালে
তুমিই তো একটা বিরাট কারখানার স্বপ্ন দেখেছিলে,
শুনেছিলে হাজার মানুষের পদধ্বনি।
তুমিই তো শুনেছিলে।
তা হ'লে এই বিশাল ফ্ল্যাট বাড়ির জানলা দিয়ে
ওই বন্ধন রাজপথের আলো আর আরো আলোর দিকে
তাকিয়ে
কেন, কেন তুমি আবার পায়রাগুলোর কথা ভাবছ
ধানের আড়ালে সেই ধূসর পায়রাগুলোর কথা?

শিউলি গাছটাকে নিয়ে

অরুণ ভট্টাচার্য

শিউলি গাছটা সারারাত্রি ধরে বিরক্তি জানায়।
ঘুম ভাঙে। ঘুম ভাঙলে মনে হয় আমার বিছানায়
ফুলগুলি শুয়ে আছে, মনে হয় আমার চারপাশে
অলৌকিক গন্ধ দিয়ে জানালা ঘাট বসারির কোণে
স্মৃতিগুলি নাড়াচাড়া করে।

পারিনা তোর আলায় আর। উঠে পড়ি।
মনে হয়, ডাকছিস্ আমাকে।
বারান্দায় চলে যাই, হাতে যাই। গাছটাকে কাছেটানি।
হাত বুলাই শিরাগুলোয়, হাত বুলাই ফুলের পাঁপড়িতে।

ভোরবেলা উঠে দেখি বিছানায় চাপ চাপ রক্ত জমে আছে
আর একটা মুখের ছাপ বীভৎস সৌখীন।

সেই দরদালানে

দুর্গাদাস সরকার

পুরানো সেই দরদালানে থমকে দাঁড়ালাম।
জোড়-ভাঙা এক পায়রা একা বকম্ বকম্ করে।
দাঁড়িয়ে আছে স্তব্ধ নীরব চুণ উঠা সব থাম।
কে শুধালো "কে গো তুমি ? কিই বা তোমার নাম ?

"কেউ আসে না অনেক ডাকেও মরুর মতন বড়ে।
শুকনো বালি যায় উড়ে যায়, ভাঙে ছাদের টালি।
অনেক কালের রক্ত-চাওয়া বিবর্ণ, প্রস্তরে
মুখ চেকেছে ভাঙা কবাট পুরানো সব ঘরে।"

আমি বলি, "তোমার আমি প্রাচীন কালের মালী।
আমার ঘরে ফুল ফোটে আজ, ধান আছে মাঠ ভরে।
খাজনা দিতে এসে দেখি—এই ও পরিণাম।"

পুরানো সেই দরদালানে আবার দাঁড়ালাম !!

জল ও আগুন

কৃষ্ণ ধর

জল ও আগুন দুইই আকাঙ্ক্ষিত ছিল
জল ও আগুন নিয়ে প্রত্যাশার শেষ ছিল না তো
তখন শুধুই ছিল অবিরল স্রোতধারা জল
কাছে তার গিয়েছিল তৃষ্ণার্ত মানুষ –নিঃসম্বল।

মনে হয়েছিল মানুষের ভাইগণ এই জল আস্বাদন করে
মনে হয়েছিল এই জল কয়েকটা পাপহীন পৃথিবীর তরে
প্রবাহিত হয়, উৎস তার ছিল জানা আজ মনে নাই
এই জল পান করে মানুষের ভাই।

জলের সুঘ্রাণ আছে, গন্ধ তার বাতাসে ছড়ায়
ছিন্ন ফুলের পাপড়ি মাটিতে পড়ায়
জলের মাদকী গন্ধে পরিলিপ্ত সন্ধ্যার আকাশ
পৃথিবীর অনন্ত বাতাস।

এই সব শব্দ গন্ধ মানুষের ক্রাইসিসে শ্রুত হয়েছিল
সুরভিত তৃষ্ণায় শ্রুত হয়েছিল
সামনেই ছিল মরু ধূ ধূ বালি, ছিল মরিচীকা
জ্যোৎস্নার টলমল কম্পমান নাটকের রক্ত যবনিকা
মানুষ অনেক দিন পিপাসিত ছিল।

পিপাসার শেষ নেই—করপুটে জলের অমৃত
আগুনের মাঝখানে নিশ্চিত আশ্বাস
সে জলের উৎসে যাই
আমরা সব মানুষের ভাই
ডেকে বলি, এইবার জ্বালাও আগুন
জল ও আগুন দুই-ই আকাঙ্ক্ষিত ছিল।

একটি প্রতিবিধান

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

কণ্ডাক্টর বললেন
একবার
ডবল ডেকার
থামিয়ে ঐ হ্রদের মধ্যে
স্নান করতে চাই।

হাঁ হাঁ করে উঠলেন সবাই,
উপস্থিত যতো
সুভদ্রমণ্ডলী,
ততক্ষণে আরেক যাত্রি সন্তরি'
বাসের হাতল ধরে
ঝুলে পড়ে
বললেন
'ব্যাপার কী ?
জনকল্যাণে ?'

ইয়াঙ্কি'
বলে একজন
কিংবং
কালীমন্দিরের সামনে গিয়ে
ডবলডেকার থামিয়ে
কালিঘাট পার্কে
হত্যা ক'রে রেখে এলেন কণ্ডাক্টরকে।

দিন যায়

অরবিন্দ গুহ

দিনগুলি নিয়ে যাচ্ছে আমাকে কোথায়,
আমি যেতে চাই না ওদিকে ;
দিন যায় নাকি দিন আমাকে সাজায়
ক্রমে-ক্রমে নিঃসঙ্গ পৌরিকে।

উঠোনে ফুটিয়েছিল শিষ্ট সন্ধ্যামণি,
শ্রাবণে দিয়েছে ধারাপাত ;
আশা ছিল, পৃথিবীর যাবতীয় ধ্বনি
স্নেহময়, স্বজনবৎসল।

পুকুরে সুচারু বৃত্ত বুনে-বুনে যাব,
কে হতে চেয়েছে সেনাপতি ;
মাঝে-মাঝে চোখ তুলে আকাশে তাকাব
চিনেছি সপ্তর্ষি, অরুন্ধতী।

কী যে চমৎকার জ্যোৎস্না শেলপাতার চালে,
সকালে শিশির ঘনঘাসে।
বন্ধুরা, কোথায় গেলে ? আমি ইহকালে
বসতে পারব তোমাদের পাশে ?

কোথায় আমাকে নিয়ে যাচ্ছে দিনগুলি,
ওদিকে যাব না, যাব না, না।
কে ওদিকে যেতে চায়, ওদিকে গোধূলি,
অন্যদিকে আমার ঠিকানা।

দ্বীপান্তর

নচিকেতা ভরদ্বাজ

পা'র নীচে ভূমি নেই। তাহলে যে দাঁড়াব কোথায়?
কার কাছে যাব? কাকে বলব যে হৃদয়ের কথা?
এর চেয়ে ঢের ভালো ছিল বুঝি পর্বতে, গুহায়
আদিম জীবনরীতি। এ সব নিপুণ অস্পষ্টতা,
এই ক্লান্ত অসহায়, রাত্রির সর্বগ্রাসী রূপ
সেকালে ছিল না হয়তো। প্রাত্যহিক চেতনার দিন
জ্বালাতন এততীব্র, ব্যক্তিত্বের পুরুষ স্পর্ধায়
এমন ধারুণ হয়ে দেখা দিয়ে সমস্ত আকাশ
পোড়ত না। সমর্পণ ছিল। ছিল অখণ্ড বিশ্বাস।
অন্ততঃ স্পষ্টতা ছিল। মুখোমুখি সোজাসুজি সব।
যন্ত্রণাও সহজিয়া। ভান কিংবা ভণিতা ছিল না।
এমন অসহ্য জ্বালা, অন্তহীন বিধিনিষেধের
কঠিন দুর্লঙ্ঘ্য বাঁধা করেনি রচনা
মানুষে মানুষে এত দূরত্বের নির্মম পরাভব,
এত ব্যাপ্ত ব্যবধান। দুরূহ এ সামুদ্রিক মোনা
দ্বীপান্তর ঘটায় নি স্থির শান্ত মহাজীবনের।

কী যেন প্রত্যাশা ছিল,—আরোজিত আলোর উৎসব!
আজ সব ভুলে গেছি। এখন কেবল ক্লান্ত সোনা
ধূপে ধূপে জমছে— রক্ত। অস্থিতার আদিম কুহকে
অস্তিত্বই ভুলে যেতে বসেছি এখন।
বহু বিনিময়ে আজ নির্বাসিত মানুষের মন।
শিশুর মতন আমরা বহু খেলনা, চলতি সড়কে—
রঙিন পুতুল, আলো ঝলমল, আনব অসুখ—
আরম্ভ করেছি বহু। নিহত ভাইয়ের রক্তে তবু—
লাল হয়ে গেছে মাটি। অবিশ্বাসী নখরে যে ক্ষত।
চারিদিকে অন্ধকার আজ তাই প্রভু।
যে যার সংগ্রহে মত্ত—কাউকে আর করি না বিশ্বাস।
ষড়যন্ত্র চারিদিকে। শুরু সব অতীন্দ্রিয় আলোক, উল্লাস।

সিঁড়ি নেই গোলঘরে

বাসুদেব সেন

'বৃষ্টি এসে গেছে, চলো তাড়াতাড়ি'
বনতুলসীর ঝোপে ঐ আধো পড়োবাড়ী।
ও বাড়ীতে থাকতো কারা
কে জানে কার বা বাড়ী কে দেয় পাহারা!
তবু বিস্মৃতির বনস্থলী ভেঙ্গ করে কোন কোন বাড়ী
জেগে থাকে দু একটা কথা অবরকারী।
এ বাড়ীর সিঁড়ি নেই কেন শুধু অজস্র দরোজা
কোথাও পাথর চাপা রয়ে গেছে কেয়ারী কিরোজা।
এ ঘরে ঢোকে নি কেউ যায় নি কি ঘরের বাহির
রাজমিস্ত্রি সিঁড়ি গুলো ভেঙে দিয়ে অসুস্থ অস্থির
পালিয়ে গিয়েছে ভয়ে। শ্বেত করবীর
গাছের নিচেই ঐ মন্দন ছায়ারও নেই সিঁড়ি
অথচ নিশ্চয়ে জ্যোৎস্না অধিকার করে অশরীরী
ঐ গোলবাড়ী শ্বেতকরবীর বন পেয়ারাবাগান খোলা মাঠ
যাবার সময় খুলে যায় হাজার কপাট।
আমি যাবো ও বাড়ীর ছাতে।
আর কে কে চলো যাবে সাথে।

আফোটা ভাত

ক্ষিতীশ দেব শিকদার

কেন উনুনে চড়ানো হাঁড়িতে হাত ফুটছে আর আমরা গোল হয়ে বসে আছি
রান্নাঘর-ঠাসা বাষ্প, উপচে-পড়া ধোঁয়ার প্রতিবেশীদের চোখ জলছে
কেরোসিন কুপীর ভলানীর তেলটুকু নিঃশেষ হয়ে এল বলে,
সমস্ত রান্নাঘরখানা ধীরে ধীরে অন্ধকার কুয়াশার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে
এবং আমাদের মাথার উপর দিয়ে যবনিকা পতনের পর্দা নামছে
কিন্তুকণের মধ্যে ভাগ ভাগ খোপের মধ্যে আমাদের সম্পর্ক হারিয়ে ফেলব
কিন্তু গোগ্রাস খিদের সময় পার হলেও ভাত আর ফোটে না।

আমরা বুঝতে পারিনা যে মায়ের দরাজ হাত রান্নাঘরে অমল খুলে দিত
সে এখন হাত গুটিয়ে বারবার আমাদের আড়ালে চলে যায় কেন
এবং কেন আমাদের উনুনের দিকে মুখ-করিয়ে হাঁড়ি বসিয়ে রাখে
কিন্তু গোগ্রাস খিদের সময় পার হলেও ভাত আর ফোটে না।

উনুনের সামনে বসে থেকে থেকে আমরা সারাক্ষণ যথেষ্ট উষ্ণ হয়েছি
তিন তিন জোড়া ছেলেমেয়েদের আত্মহননের অভিযোগ আমাদের মুখে শুনে
মা এখন পাগলের মত 'ভাত ভাত' করে চেঁচাচ্ছেন
আমাদের চোখের সামনে এখন প্রবল ভিড়
দেখতে আমাদের চেনাশোনা ছেলেমেয়েদের সব মা রান্নাঘর ছেড়ে রাস্তায় এসে
পুরুষের মত বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন
শুধু সেই দলে আমার পলাতক বাবার মত অন্যান্যরাও সামিল হলেন না—
এ এক আশ্চর্য ঘটনা। সাবাস মা, তোমার পিছনে ছেলেমেয়েরা বেঁচে আছে।

কাব্যাক্ষয়ী দেবেন্দ্রনাথ

সরোজেন্দ্র নাথ রায়

১৯০৫ সালের মাঘ মাসে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লোকান্তরিত হন। তাঁহার মৃত্যুর কিছু দিন পর তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের যে সভা হয় তাহাতে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সভাপতিত্ব করেন। কিন্তু সভাপতিত্ব করিতে গিয়া তিনি এক মহা বিড়ম্বনায় পতিত হন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রধানতঃ সাহিত্য লইয়াই কারবার করে। তাহার একটি সভায় একজন ধর্ম্মীয় নেতার স্মৃতি তর্পণ কি করিয়া করা যায়? এই সমস্যায় সম্মুখীন হইয়া ত্রিবেদী মহাশয় ধর্ম্মের সঙ্গে সাহিত্যের যোগাযোগ কোথায় এই প্রশ্নের সমাধানে ব্যাপৃত হন ও পরিশেষে মহর্ষি সম্বন্ধে দুইচারটী দামুলী কথার প্রলাপ করেন। তাঁহার প্রবন্ধটি পড়িয়া এই ধারণা মনে হয় যে মহর্ষির সাহিত্যে যে-স্থান তাহা প্রধানতঃ তাঁহার কৃতী পুত্রদের জন্যই: তিনি রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথের পিতা বলিয়া। বঙ্গসাহিত্যে এই তাঁহার প্রধান অবদান। "তাঁহার অসামান্য-ক্ষমতাশালী পুত্রগণ বঙ্গসাহিত্যে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, পুত্রগণের সেই কৃতিত্ব পিতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার কোন উপায় নাই।" কবিত্ব-শক্তি বংশগত নয়। ব্যাস, বাল্মিকী, কালিদাস, হোমার, ভার্জ্জিল, দান্তে, শেকসপীয়র, গোটে কেহই সে সৌভাগ্য লাভ করেননি। কিন্তু দ্বিজেন্দ্র, সত্যেন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পরম সৌভাগ্য যে বাংলার এক নব বসন্তে একটি কাব্যলীলাময় নীড়ে তাঁহাদের জন্ম হইয়াছিল এবং সেই নীড় যিনি পক্ষীমাতার ন্যায় উষ্ণ রাখিয়া ছিলেন তিনি তাঁহাদের জনক।

অথচ যখনি সাহিত্যক্ষেত্রে যে-শ্রেষ্ঠ অবদান তাঁহার আত্মজীবনী তাহা ১৮৯৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। মনে হয় তাহা বহুদিন ধরিয়া পাঠক-সাধারণের বিশেষতঃ ব্রাহ্ম-সমাজের বাহিরের পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নি। তখনকার দিনের ব্রাহ্মসমাজ ও প্রাচীনপন্থী হিন্দুসমাজের মধ্যে বিরোধ যে, তাহার কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। ত্রিবেদী মহাশয় তাহার কারণ নিজেই নির্ণয় করিয়াছেন: "সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মহর্ষিকে বঙ্গসাহিত্যের সেবকরূপে প্রতিপন্ন করিতে গেলে, তাঁহাকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু তিনি সমাজমধ্যে যে-ভাবের আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, যে-আন্দোলনে আমাদের শিক্ষিতসমাজ এককালে খুব ওতপ্রোত ও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রভাব বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ীভাবে বর্ত্তমান থাকিবে।" তিনি অবশ্য বলিয়াছেন: সেই বর্ষাকালের "কটিকারুর্ঘোগ এখন প্রশান্তভাব ধারণ করিয়াছে", কিন্তু তাহা যে একদিন "কটিকা-বুর্ঘোগ" রূপে প্রতিভাত হইয়াছিল, আজ তাহা মনে করিলে বিস্ময় লাগে ও এ যুগের লোক তাহা বুঝিতে পারে না। কিন্তু এইটুকু বোঝা যায় যে সেই কটিকাবুর্ঘোগের অন্ধকারে মহর্ষির অপূর্ব গ্রন্থখানি লোকচক্ষুর আলোচরে পড়িয়াছিল। এমন কি যে-রামেন্দ্রসুন্দর বলিতেছেন "তখন যে সকল ভাবের উৎস খুলিয়া গিয়াছিল, তাহাদের ধারা প্রবাহে যে কলনাদিনী স্রোতস্বতীর উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বঙ্গের সাহিত্যভূমিকে সুজলা, সুফলা শস্যশ্যামলা করিয়াছে", সেই রামেন্দ্র

তখনও সেই প্রত্নবাণির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। থাকিলে তাহার অপূর্ব্ব কাব্যানুভূতি তাঁহাকে স্পর্শ না করিয়া পারিত না।

এদেশের পাঠকদের মনে যে-ধারণাই হউক, একজন বিদেশী মনীষী এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন যে মহর্ষির ধর্মানুভূতির উৎস হইতেছে তাঁহার কাব্যপ্রেরণা। এই মনীষি হইতেছেন সুবিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক ও কবি রমাঁ্যা রোলাঁ। যে-পাঠক মহর্ষির আত্মজীবনীটি পাঠ করিয়াছেন তাঁহার মনে এই ধারণা না হইয়াই পারে না। তাঁহার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে কাব্যানুভূতিই সেগুলির উৎস। দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিলাসের ক্রোড়ে লালিত-পালিত। বিলাসের মধ্যে অবগাহন করিয়া হৃদয়ে তৃপ্তি আসিল না—আসিল না সেই বিমল আনন্দ যাহা তিনি এক পূর্ণিমা রাত্রিতে পাইয়া ছিলেন নিমতলার শ্মশানঘাটে চাঁচের আসনে বসিয়া। মাতৃসমানা প্রিয়তমা দিদিমা যাঁর ক্রোড়ে তাঁর শৈশব ও বাল্যকাল কাটিয়াছে, তাঁহার গঙ্গাযাত্রা হইয়াছে, তখন দিদিমার নিকট নাম সঙ্কীর্ত্তন হইতেছে: "এমন দিন কি হবে, হরিনাম বলিয়া প্রাণ যাবে।" তাঁহার মনে এক আশ্চর্য্য উদাস ভাব আসিল। ঐশ্বর্যের উপর একবারে বিরাগ জন্মিল। পালিচা তুলিচা সকলই হেয় বোধ হইল। মনের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপস্থিত হইল। তখন তাঁহার বয়স আঠারো বৎসর। শ্মশানে প্রাপ্ত এই অভিনব আনন্দই তাঁর জীবনের অনাঘ্রাত কুসুমগন্ধ যাকে সারা জীবন বারে বারে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন। কবি ওয়ার্ডস্বার্থের মতো তিনিও জিজ্ঞাসা করিয়াছেন: কোথায় গেল সেই আনন্দ? কেমন করিয়া আবার তাহা পাওয়া যায়?

"Whither is fled the
Visionary gleam?
is it now, the glory
and the dream?

পরবর্ত্তী জীবনে তিনি শিবনাথ শাস্ত্রীকে বলিয়াছিলেন: "তুমি আমার ধর্ম্মজীবনের নিগূঢ় একটি রহস্য যদি জানিতে চাও, তবে আমি বলি যে, সেই শ্মশানে বসিয়া যে আনন্দকে আমি পাইয়াছি তাহাকেই চিরকাল আমি খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। যখনি কোন আনন্দের উপলব্ধি হয়, অমনি ভাবি, বুঝি সেই আনন্দকে পাইলাম।"

এই আনন্দের সন্ধানই তাঁহার সাধকজীবনের প্রধান প্রেরণা। তাঁহার আরাধনার প্রধান মন্ত্র হইতেছে: আনন্দ-রূপমমৃতং যদ্বিভাতি। এই আনন্দকে পাইবার জন্য তাঁহার অশেষ সাধনা চলিয়াছিল। দেশী ও বিদেশী দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিলেন সেই বিমল আনন্দ ফিরিয়া পাইবার জন্য। কিন্তু যে অভাব সে অভাবই রহিয়া গেল। অনন্ত তারকাখচিত নীল আকাশের দিকে চাহিয়া যখনও কখনও মনে সেই আনন্দ আসিত। জ্যোৎস্না প্রকৃতিও আনন্দের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিত। কিন্তু তাহা চিরস্থায়ী হইতনা। পিতার আদেশে ব্যবসাতে মন নিবিষ্ট করিতে লাগিলেন কিন্তু মনের উদাস ভাব কিছুতেই গেলনা।

এমনি সময়ে হঠাৎ একখানা সংস্কৃত পুস্তকের শুষ্ক পত্র তাঁহার সম্মুখ দিয়া উড়িয়া যাইতে দেখা গেল। ঔৎসুক্য বশতঃ তিনি তাহা ধরিলেন। কিন্তু তাহাতে যাহা লেখা আছে তাহার কিছুই বুঝিলেন না। "ব্রহ্মসভা"র রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সেই পাতা পড়িয়া বলিলেন যে তাহা ঈশোপনিষদের পাতা ও শ্লোকটি হইতেছে:

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং।

"ঈশ্বর দ্বারা সমুদায় জগৎকে আচ্ছাদন কর।" "তিনি যাহা দান করিয়াছেন তাহাই উপভোগ কর। তিনি কি দান করিয়াছেন, তিনি আপনাকেই দান করিয়াছেন। সেই

পরম ধনকে উপভোগ কর। আর সকল ত্যাগ করিয়া কেবল তাঁহাকেই লইয়া থাক।" "স্বর্গ হইতে অমৃত আসিয়া আমাকে অভিষিক্ত করিল।" তাঁহার অন্তরের নিবিড় অন্ধকার উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন একের পর এক উপনিষদ পাঠ চলিতে লাগিল। উপনিষদের সুললিত সংগীতলহরী তাঁহার চিত্তকে মোহিত করিল। বহুদিনের বহু সাধনালব্ধ কবিবাক্য সমূহ তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিল। তাঁহার চিত্ত উদ্বেল হইয়া উঠিল। বহুদিন ধরিয়া তিনি বেদান্তকে আপ্তবাক্য জ্ঞান করিয়া নিঃসঙ্কোচে তাহা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যতই তাহার চর্চা চলিল তাঁহার মনে এই ধারণা উপস্থিত হইল বেদান্তও একান্ত প্রমাণশূন্য নহে। তত্ত্বের দিক দিয়া বেদান্তের মূল্য কমিয়া গেল বটে কিন্তু ইহার গভীর আত্মদৃষ্টি তাঁহাকে চিরদিনই মুগ্ধ করিয়া রাখিল - নবজীবন দান করিল। ব্রাহ্মধর্ম নামক যে গ্রন্থে তিনি তাঁহার জীবন দর্শন প্রকাশিত করিয়াছেন তাহার ভাবধারা তাঁহার নিজের কিন্তু তাহার বহিরবয়ব ঔপনিষদিক। উপনিষদের উদাত্ত সঙ্গীত ও তাহার অন্তর্নিহিত গভীর ব্রহ্মজ্ঞান চিরকালই তাঁহার হৃদয়কে মুগ্ধ ও আলোকিত করিয়াছে। তাঁহার ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থে উপনিষদের যাহা কিছু সুন্দর ও গভীর তাহা চুম্বকাকারে পাওয়া যায়। এই গুলিই তাঁহার হৃদয়কে সঞ্জীবিত করিয়াছিল ও নবধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিল।

বিখ্যাত ইংরেজ কবি ও সাহিত্যিক ম্যাথু আরনল্ড বলিয়াছিলেন যে কবিতা তাঁহার ধর্মগ্রন্থ। তাঁহার জীবনে যা কিছু ধর্মবোধ সঞ্চিত হইয়াছিল তা দেশবিদেশের কবিতা হইতে। মহর্ষির জীবনের উপলব্ধি হুবহু সেই প্রকারের না হইলেও আরনল্ডের সঙ্গে তাঁর কিছু মিল আছে। ভারতের প্রাচীন কবিতা যা শাস্ত্রাকারে তিনি পাইয়াছিলেন তা তাঁর প্রাণকে উদ্বোধিত করিয়াছিল— তাহাদের সুললিত স্বরলহরীর মধ্য দিয়া—তাহাদের গভীর অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা। মধ্য যুগের নিখ আরাধনার সঙ্গীতও তাঁহার অন্তরের গভীর স্থান স্পর্শ করিয়াছিল। অন্তরঙ্গের স্বর্গমন্দিরে গীত :

"গগনমে থাল, রবিচন্দ্র দীপক বনে,
তারকা-মণ্ডল জনক মোতী।
ধূপ মলয়ানিলো পবন চমরো করে,
সকল বনরাই ফুলন্ত জ্যোতি।"

সকলের সঙ্গে আকুলভাবে গাহিতে গাহিতে তিনি মন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে নবপ্রাণ সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। সে গান তাঁর কাছে প্রতিদিনের গাওয়া নিত্য পরিচিত গান ছিল না। তা তাঁর হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে উত্থিত হইয়াছিল। শুধু তাই নয় তাঁহার পুরদিগের সঙ্গীতও তাঁহার ভাবলোকের দ্বার খুলিয়া দিত। তাঁহার ধর্ম ছিল জিজ্ঞাসুর ধর্ম—বিশুদ্ধ হৃদয়ের আত্মপ্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। জিজ্ঞাসু মনের অবস্থা ছিল নিত্য প্রতীক্ষা, নিত্য আলোক, নিত্য তৃপ্তি। মনের এই ভাবটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি বিখ্যাত সঙ্গীতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাই আত্মজীবনীতে মহর্ষি সেই সঙ্গীতটি দিয়া তাঁর উন্মুখ চিত্তের ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন :

পরিপূর্ণ জ্ঞানময়।
নিত্যনব সত্য তব শুভ্র আলোকময়
কবে হবে বিভাসিত মম চিত্ত-আকাশে।
রয়েছি বসি দীর্ঘ নিশি, চাহিয়া উদয় দিশি,
ঊর্ধ্বমুখে করপুটে
নব সুখ নব প্রাণ নব দিবা আশে।

৪১ বৎসরের অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার আত্মজীবনী সমাপ্ত হয়। ইহার পরও তিনি বহুদিন জীবিত ছিলেন ও ধর্মজীবনের বহু কথা বিভিন্ন সময়ে ব্যক্ত করিয়াছেন। আত্মজীবনীও পরবর্তীকালে স্মৃতি হইতে লেখা। এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে তিনি জীবনে যত কিছু পাইয়াছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গীতে :

কত যে তোমার করুণা, ভুলিব না জীবনে।
নিশিদিন রাখিব গাঁথি হৃদয়ে, কত যে তোমার করুণা!

শুধু কি তাই? তিনি যেন জহুরীর ন্যায় রত্নের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন! একটি বাংলা কবিতা, একটি হিন্দী প্রবচন, উর্দু সঙ্গীতের একটি পদ তাঁর প্রাণকে গভীরভাবে নাড়া দিত ও তা তিনি প্রাণে গাঁথিয়া রাখিতেন। সিন্ধুদেশ হইতে গুলশাহী যাইবার পথে সুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়াছেন, সঙ্গে কোন আহার্য্য নাই, পথেও কিছুই পাওয়া গেল না, তখন তাঁর ঝাঁপানবাহীরা তাহাদের এক খণ্ড শুষ্ক রুটি তাঁহাকে উপহার দেয়। তাহারা বলিল—"হমলোগকী পসন্দকী রোটী বড়ী মিঠী হ্যায়।" তিনি তাহা পাইয়া পরম করুণাময়ের দয়ার কথা স্মরণ করিয়া মনে মনে বলিলেন: রুখা সুখা পসন্দকা টুকড়া, লোনা অউর অলোনা ক্যা? সির দিয়া তো রোনা ক্যা?" (রুখা শুখা পসন্দের টুকরা তা লোনা হউক আর অলোনা হউক। তাতে কি আসে যায়? যে শির দিয়াছে সে কাঁদে কিসের জন্য?) অনুতসরে শিখদের সঙ্গ করিতেন নূতন প্রেরণার আশায়। কিন্তু শিখদের মদ্যপানের অভ্যাস ও নিতান্ত সাংসারিকতা তাঁহাকে নিরাশ করিল। এমন সময় একটি সাধারণ গোছের ব্যক্তি অতি সাধারণভাবে তাঁহাকে শুনাইল: "জো অমৃতরস চাখা নহীঁ, সো সো মুয়া তো ক্যা হুয়া।" এ বাক্যটি-যে বলিল তার প্রাণ হয়তো শীতলই রহিয়া গেল, কিন্তু শ্রোতার হৃদয়ে বিদ্যুৎস্পর্শ হইল। তাঁর একখানি পত্রে তিনি পরে লিখিলেন: "ঈশ্বরের প্রেমরস না পাইয়া, পর্যটক হইয়া, কেবল ভিক্ষা দ্বারা জীবন পোষণ করিলে, দুঃখে চক্ষুর অশ্রুদ্বারা বস্ত্রাঞ্চল ভিজাইলে, হাহাকার করিয়া মরিয়া গেলে কি ফল?"

যখন দ্বারকানাথের ঋণশোধ করিতে গিয়া সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি ট্রাস্টীদের হাতে চলিয়া গেল তখন তিনি যেন মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। "আমি যা চাই, তাই হইল। বিষয় সম্পত্তি সকলি হাত হইতে চলিয়া গেল। যেমন আমার মনে বিষয়ের অভিলাষ নাই, তেমনি বিষয়ও নাই। বেশ মিলে গেল!

দর্দ আঁ হবা কে হুজ্‌র্ বরদ্ অন্দর তবব্, না বাশদ্
গর খিরমনে বেসোজদ্ চন্দে অজব্ না বাশদ্।
(জীবনে হাফিজ)।

……বিদ্যুৎ পড়ুক, বিদ্যুৎ পড়ুক, বলিতে বলিতে যদি বিদ্যুৎ পড়িয়া সব জ্বলিয়া যায়, তবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমি বলি যে 'হে ঈশ্বর, আমি তোমা ছাড়া আর কিছুই চাই না।' তিনি প্রসন্ন হইয়া এ প্রার্থনা গ্রহণ করিলেন, গ্রহণ করিয়া আমার নিকট প্রকাশ হইলেন, এবং আর সব কাড়িয়া লইলেন। 'অঙ্গড়ীকী টুক্কিয়াঁ মুয়েসুদর নহীঁ কে চিবাকে পানী পিঁয়ূ।' (এ ঘাঘড়ীর চাউলভাজাও আবার হাতে নাই, যে চিবাইয়া একটু জল খাইব)।" স্নানের সেই আনন্দ আবার ফিরিয়া আসিল।

তাঁহার হৃদয় এইরূপ সংস্কৃত হইতে বাংলা, বাংলা হইতে হিন্দী-উর্দু ও উর্দু হইতে ফারসী কবিতার মধ্যে রত্নের সন্ধানে চলিল। একবার যাহা শুনিলেন একবার যাহা পড়িলেন তাহা তাঁহার হৃদয় ফলিকায় গ্রথিত হইয়া রহিল। সেই মালা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া তাঁহার স্তব-আরাধনা চলিতে লাগিল।

বিদেশী কবিদের মধ্যে হাফিজের স্পর্শ তিনি অতি নিবিড়-ভাবে পাইয়াছিলেন। জীবনের মোড়ে তীব্র অনুভূতির মুহূর্তে হাফিজ দাঁড়াইতেন তাঁহার প্রাণস্পর্শী সমর্থন ও সহানুভূতি লইয়া। শুধু তাপের রিক্ততার মধ্যে নহে, শুধু প্রতিভার দৃঢ়তার মধ্যে নহে, কিন্তু আনন্দের মধ্যে ভগবৎ করুণার মধ্যে হাফিজ আনিতেন তাঁহার অযোধ বাণী, তাঁহার সংকল্প।—সান্ত্বনা, আহ্লাদ ও আত্মবিসর্জন।

সিন্ধুদেশ হইতে গুজরাট যাইবার পথে ঘন অরণ্যের মধ্যে নানা বর্ণের পত্রপুষ্পের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার কবিহৃদয় বলিয়া উঠিল: "আমি সেই ছোট ছোট শ্বেত পুষ্পগুলির উপরে অখিল-মাতার হস্ত পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলাম। এই বনের মধ্যে কেবা সেই সকল পুষ্পের সুগন্ধ পাইবে, কেবা

তাহাদের সৌন্দর্য্য দেখিবে ; তথাপি তিনি কত যত্নে, কত স্নেহ তাহাদিগকে সুগন্ধ দিয়া, লাবণ্য দিয়া, শিশিরে সিক্ত করিয়া, লতাতে সাজাইয়া রাখিয়াছেন তাঁহার করুণা ও স্নেহ আমার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। নাথ ; যখন এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পগুলির উপর এত করুণা, তখন আমাদের উপর না জানি তোমার কত করুণা।

হরগিজম্ মেহ্রে তো অস্ত্ দস্তহে দিল্, ও জাঁ ন-রবদ্।
• • • • • • •
আঁচুনাঁ মেহ্রে তো অস্ত্ দর্ দিল্ ও জাঁ জায়ে গিরিফ্ত্,
কে গর্ অস্ত্ দর্ বে-রবদ, মেহ্রে তো অজ্ জাঁ ন-রবদ্।
(দীবান-হাফিজ)।

"তোমার করুণা আমার মন প্রাণ হইতে কখনই যাইবে না।

তোমার করুণা আমার মন প্রাণে এমনি বিদ্ধ হইয়া আছে যে, যদি আমার মস্তক যায়, তথাপি প্রাণ হইতে তোমার করুণা যাইবে না।"

তিনি অমৃতসরে একটা পোড়ো বাগানের মধ্যে একটা ভাঙ্গা বাড়ীতে স্থান পাইয়াছিলেন। কিন্তু যখন বসন্ত আসিল তখন এই পোড়ো বাগানটি ফুলে ফলে অপূর্ব্ব সুষমায় মণ্ডিত হইল। পাপিয়ার গান ও ময়ূরের নৃত্যে হৃদয় নাচিতে লাগিল। একদিন প্রভাতে উঠিয়া দেখেন যে একটি ফুলের গাছ অপূর্ব্ব শোভায় শোভান্বিত হইয়াছে। আনন্দে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইল। কাল পাত্র ভুলিয়াগিয়া হাফিজের বয়েৎ গাইতে গাইতে নাচিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল আর একজন আসিয়া তাঁহার সঙ্গ লইয়াছেন। সেই অপূর্ব্ব দৃশ্যের কিছু আভাষ তাঁর লেখার মধ্যে পাই :

"আমি অমৃতসরে রামবাগানের নিকট যে বাসা পাইয়াছিলাম, তাহা ভাঙ্গা বাড়ী, ভাঙ্গা বাগান, এলোমেলো গাছ, — জঙ্গলা রকম। কিন্তু আমার নবীন উৎসাহ, তাজা চক্ষু, সকলি তাজা, সকলি নূতন সকলি সুন্দর করিয়া দেখিত। অরুণোদয়ে প্রভাতে আমি যখন সেই বাগানে বেড়াইতাম, যখন আফিমের শ্বেত-পীত লোহিত ফুল-সকল শিশির জলের অঞ্জলি দিত, যখন বাগের রক্তত কাঞ্চন পুষ্পদল উষার ভূমিতে কবির মহানন্দ বিছাইয়া দিত, যখন স্বর্গ হইতে বায়ু আসিয়া বাগানে মধু বহন করিত, যখন দূর হইতে পাঞ্জাবীদের সুমধুর সঙ্গীতস্বর উষাকে সকরুণ করিত, তখন তাহাকে আমার এক গন্ধর্ব্বপুরী বোধ হইত। কোন কোন দিন ময়ূর ময়ূরীরা বন হইতে আসিয়া আমার ঘরে ছাদের একতলায় বসিত, এবং তাহাদের চিত্রবিচিত্র দীর্ঘ পুচ্ছ সূর্য্যকিরণে রঞ্জিত হইয়া মৃত্তিকাতে লুটাইতে থাকিত।..... একদিন মেঘ উঠিল, আর দেখি যে ময়ূরেরা মাথার উপর পাখা উঠাইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। একি আশ্চর্য্য দৃশ্য! আমি যদি বীণা বাজাইতে জানিতাম, তবে তাহাদের নৃত্যের তালে তালে তাহা বাজাইতাম।..

ফাল্গুন মাস চলিয়া গেল, চৈত্র মাস মধুমাসের সমাগমে বসন্তের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, এবং অবসর পাইয়া দক্ষিণ বায়ু আম্রমুকুলের গন্ধে সদ্য প্রস্ফুটিত লেবু ফুলের গন্ধ মিশ্রিত করিয়া কোমল সুগন্ধের হিল্লোলে দিগ্বিদিক আমোদিত করিয়া তুলিল। ইহা সেই করুণাময়ের নিশ্বাস। চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে দেখি যে, আমার বাসার সংলগ্ন জলাশয়ে কোথা হইতে অপ্সরারা আসিয়া রাজহংসীর ন্যায় উল্লাসের কোলাহলে জলক্রীড়া করিতেছে।"

অমনি আর এক বসন্তে দেবেন্দ্রনাথকে দেখি শান্তিনিকেতনে। এখন তিনি বৃদ্ধ। কিন্তু যৌবনের সেই উদ্বেল উচ্ছ্বাস কিছুই কমেনি। তাঁহার সঙ্গীত "পুণ্য-পুঞ্জেন যদি প্রেষ্যসং কোঽপি লভেৎ, তস্য তুচ্ছং সকলং" রচিত হইয়াছে। বারপুরের বৃদ্ধ জমিদার শ্রীকণ্ঠ সিংহ এখন তাঁর সহচর হইয়াছেন। একতারা বাজাইয়া দুই বৃদ্ধ

গান করিয়াছেন 'পুণ্য-পুরের যদি প্রেমধন কোইসি লভে, তত্ত্ব তুচ্ছং সকলং'। সম্মুখে কুলত্ত বৃক্ষ। দুই বৃদ্ধ পাগলের মত নাচিতে আরম্ভ করিলেন। চক্ষু বহিয়া প্রেমাশ্রু প্রবাহিত।

দেবেন্দ্রনাথের পরিচিত রূপ হইতেছে—রুক্ষ, শুষ্ক, কঠোর, কৃপণী হইতে বিচ্ছিন্ন—দূর, আত্মবিহারী আত্মরত। কিন্তু তাঁর লেখা ও তাঁহার কবিতা হইতে তাঁহাকে দেখি প্রাচীন বৈষ্ণবের ন্যায় ভাবগদ্গদ, সংবেদ ও দীনাত্মা—প্রেম-ভিখারী। তাঁহার সঙ্গীত দেহজ্ঞান, বিশ্বজ্ঞান, দেহ প্রীতি শুদ্ধ প্রীতি" সেই ভাবই বহন করিয়া আনে।

তাঁহার এইসব লেখা পড়িয়া, তাঁহার কাব্যময়ী ভাষার সঙ্গে পরিচিত হইয়া তাঁহার গান শুনিয়াও কি বলিব যে সাহিত্যে তাঁহার কোন স্থান নাই? তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যে স্থান নাই একথা যাহারা বলেন তাঁহাদের সাহিত্যের সংজ্ঞা কি?

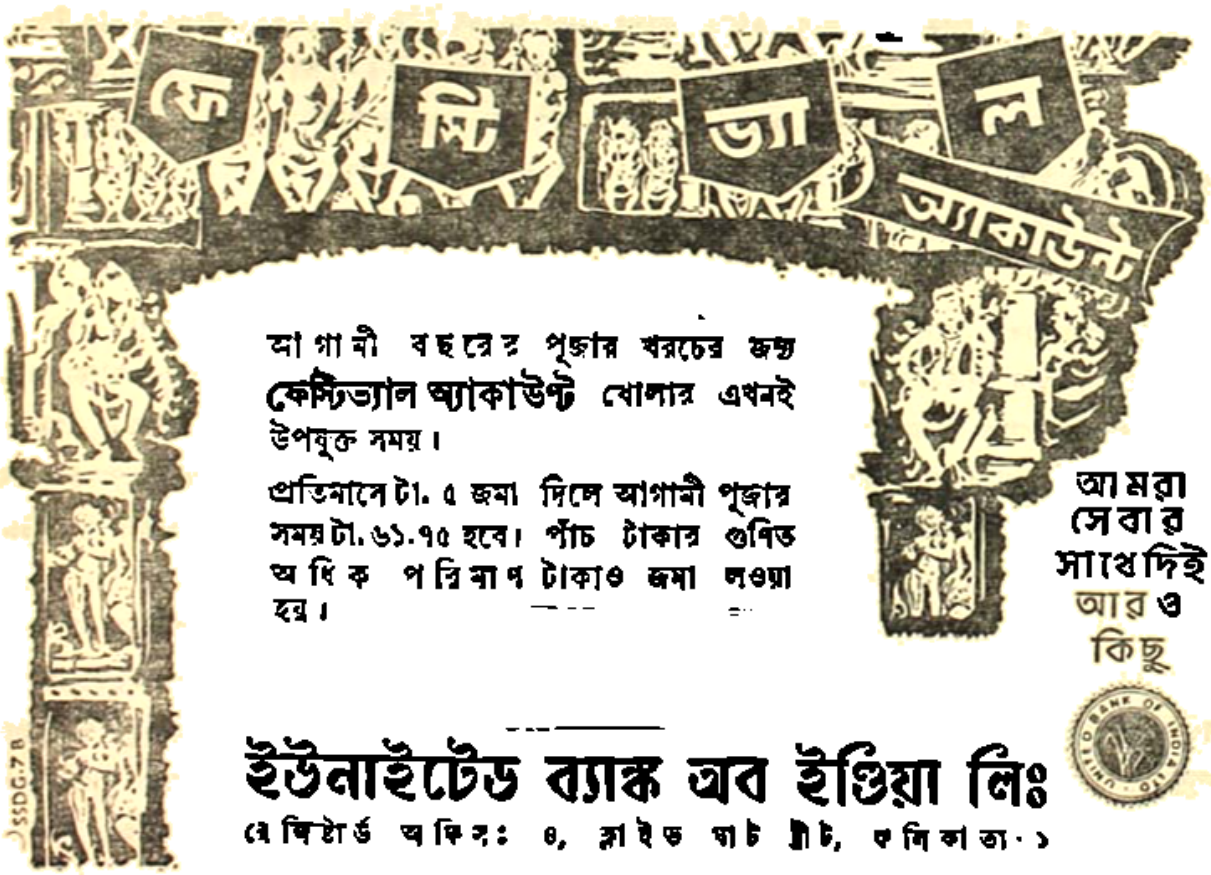

Please Contact

MECHANICAL ENGINEERING CO
PRIVATE LTD

5, MISSION ROW
CALCUTTA-1

FOR ALL TYPES OF TRAILERS,
TROLLEYS AND WHEEL-BARROWS.

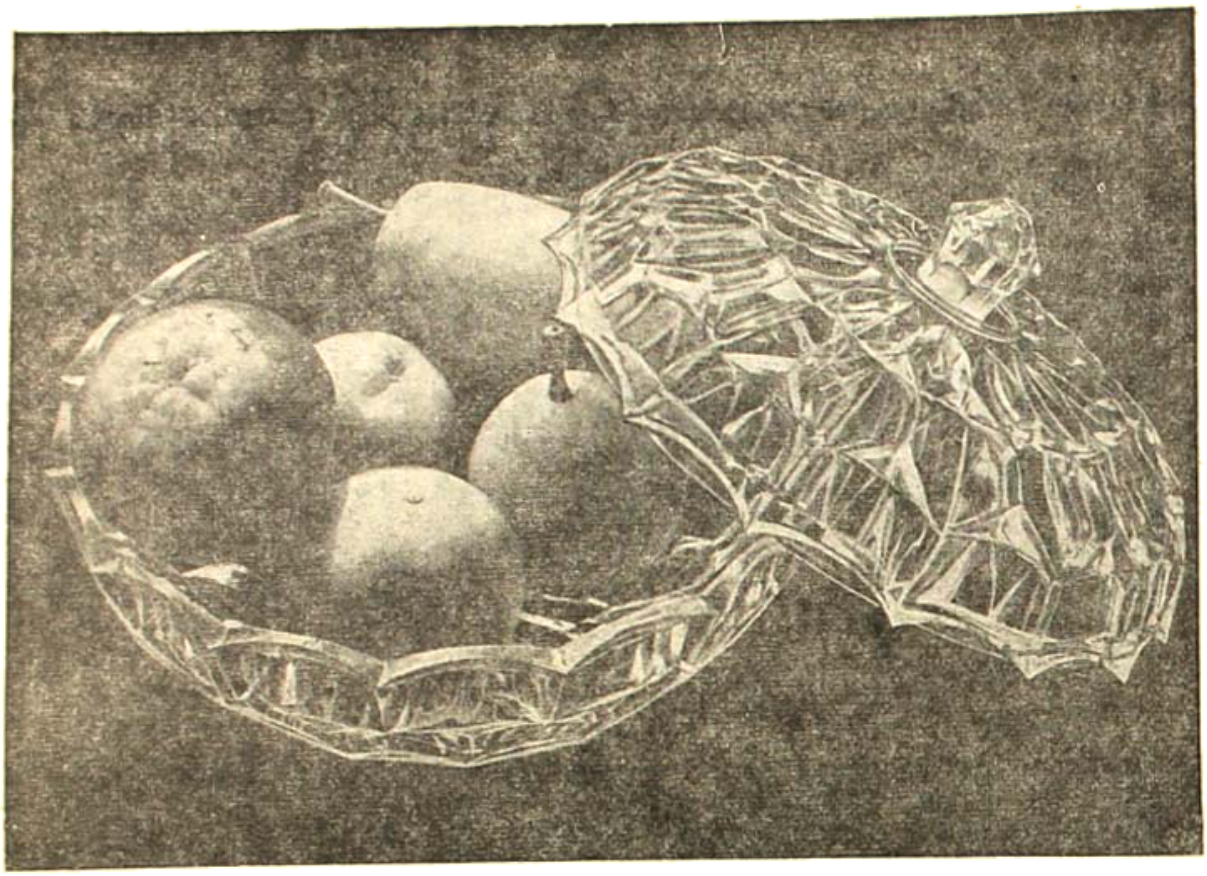

SPARKLE, SPARKLE, KRISTAL BOWL,
YOU LIGHT THE HEART OF YOUNG AND OLD,
YOU BRING A DAZZLE TO THE EYE,
LIKE A DIAMOND IN THE SKY.

KRISTALWARE

MANUFACTURERS
INDUSTRIAL PLASTICS (INDIA)
5, RUSSEL STREET CALCUTTA-16

SOLE SELLING AGENTS :

KERAMIC AGENCIES,

20, POLLOCK STREET, CALCUTTA-1.

ডিভ্যালুয়েসন ও মূল্যবৃদ্ধি

সত্যেন্দ্রনাথ সেন

গত ৪ই জুন হইতে টাকার বৈদেশিক মূল্য হ্রাস করা হইয়াছে। এই ঘটনার পর ডিভ্যালুয়েসন কি এবং মূল্য-স্তরের উপর ইহার কি প্রতিক্রিয়া হইতে পারে এই বিষয়ে নানা বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে। সরকারী পক্ষ হইতে বলা হইতেছে যে ডিভ্যালুয়েসনের ফলে আমদানি দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্যান্য জিনিসের দাম বাড়িবার কোন কারণ নাই। যদি তাহা বাড়ে তবে ইহার কারণ ব্যবসায়ীদের সমাজবিরোধী আচরণ। আবার যাহারা ডিভ্যালুয়েসনের বিরুদ্ধে তাহাদের মত হইতেছে যে ইহার ফলে মূল্যবৃদ্ধির গতি আরো দ্রুত হইবে এবং দেশের সাধারণ লোকের দুর্দশা আরো বাড়িবে। এই বিতর্কের মধ্যে সত্য কতটুকু আছে ইহার আলোচনা হওয়া দরকার।

ডিভ্যালুয়েসনের অর্থ দেশীয় মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য হ্রাস করা। পূর্বে ১৩ টাকা কয়েক পয়সা দিয়া এক পাউণ্ড (যাহা ইংলণ্ডের মুদ্রা) কেনা যাইত। বর্তমান ডিভ্যালুয়েসনের পরে এক পাউণ্ড কিনিতে ২১ টাকা দিতে হইবে। পূর্বে এক টাকার পরিবর্তে ২১ সেণ্ট (আমেরিকার মুদ্রা) পাওয়া যাইত। নূতন বিনিময় হার অনুযায়ী এখন পাওয়া যাইবে ১৩·৩ সেণ্ট মাত্র। ডিভ্যালুয়েসনের পিছনে অনেক উদ্দেশ্য থাকে সন্দেহ নাই। তবে সাধারণভাবে বলা চলে যে ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে বৈদেশিক বাণিজ্যে সমতারক্ষা করার চেষ্টা। সাধারণতঃ দেখা যায় যে ডিভ্যালুয়েসনের পূর্বে বেশ কিছুদিন ধরিয়া সেই দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থা খুবই প্রতিকূল থাকে। অর্থাৎ সেই দেশের মোট আমদানি দ্রব্যের পরিমাণ রপ্তানি হইতে অনেক বেশি থাকে। আমরা বিদেশ হইতে যে পরিমাণ দ্রব্য আমদানি করি বিদেশে রপ্তানি দ্রব্য বিক্রয় করিয়া তাহার দাম শোধ করি। যদি মোট আমদানির মূল্য মোট রপ্তানির মূল্য অপেক্ষা অধিক হয়, তবে আমাদিগকে উদ্বৃত্ত বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহ করিতে হইবে। নচেৎ বিদেশ হইতে আমদানি দ্রব্যের দাম শোধ করা যাইবে না। বিদেশে আমাদের মুদ্রা চলে না। সুতরাং বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহ করিতে হইলে আমাদিগকে বিদেশে সোনা বিক্রয় করিতে হইবে। উপযুক্ত পরিমাণ সোনার তহবিল না থাকিলে ইহা করা সম্ভব নয়। দু এক বৎসর হয়ত এইভাবে কষ্ট করিয়া কিংবা বিদেশে ঋণ করিয়া চালান যাইতে পারে। কিন্তু এই অবস্থা কেন হইতেছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে এবং কারণগুলি দূর করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। আমদানি হইতে রপ্তানি কম হইবার প্রধান কারণ আমাদের দেশে প্রস্তুত জিনিসের উৎপাদন ব্যয় ও দাম এত বেশি যে বিদেশীরা ইহা কিনিতে চাহে না। কিংবা বেশি পরিমাণে কিনিবে না। কারণ তাহারা অন্য দেশ হইতে

ইহা কম দামে পাইতে পারে। আমাদের দেশে যদি পরপর কয়েক বৎসর ধরিয়া ইন্‌ফ্লেশন হইয়া থাকে তবে জিনিসপত্রের দাম অত্যন্ত চড়িয়া যাইবে। বিদেশে ইন্‌ফ্লেশন না হইলে বা কম ইন্‌ফ্লেশন হইলে তাহাদের জিনিসের দাম কম থাকিবে বা কম বাড়িবে। সুতরাং বিদেশের বাজারে আমাদের প্রস্তুত জিনিস বিক্রয় করা শক্ত হয়। ফলে আমাদের রপ্তানি বিশেষ বাড়িতে পারে না। এই অবস্থায় যদি ডিভ্যালুয়েশন করা যায় তবে বিদেশের বাজারে ভারতীয় দ্রব্য কম দামে বিক্রয় করা সম্ভব হয়। আমাদের দেশে এক পাউণ্ড চায়ের উৎপাদন ব্যয় ৫ টাকা করিয়া পড়ে। যখন বিনিময় হার এইরূপ ছিল যে ৫ টাকায় এক ডলার পাওয়া যাইবে তখন এই চা আমেরিকায় এক ডলার দামে বিক্রয় হইত। কিন্তু ডিভ্যালুয়েশনের পরে ডলারের বিনিময় হার দাঁড়ে সাত টাকা হইয়াছে। এখন ভারতীয় চা বিক্রেতা আমেরিকায় ৬৬ সেন্ট দরে চা বিক্রয় করিলে বিনিময়ে ৫ টাকা পাইবে। সুতরাং সে আমেরিকার বাজারে এক ডলারের কম দামে চা বিক্রয় করিতে পারিবে। তাহা হইলে আমেরিকায় ভারতীয় চা-এর চাহিদা ও বিক্রয় বাড়িবে। এইভাবে আমাদের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইবে।

এখন কথা হইতেছে যে ডিভ্যালুয়েশনের ফলে মূল্যবৃদ্ধি হইবে কিনা। ডিভ্যালুয়েশনের পর বিদেশ হইতে আমদানি দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া যাইবে। ইহার ফলে মূল্যস্তর কিভাবে প্রভাবান্বিত হইতে পারে তাহা জানিতে হইলে আমরা কি কি শ্রেণীর জিনিস আমদানি করি তাহার বিচার করিতে হইবে। প্রথমত, আমরা প্রচুর পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য আমদানি করি। এই সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি পাইবে। সাধারণ নিত্য-ব্যবহার্য খাদ্যদ্রব্যের—যেমন চাল, গম, প্রভৃতির—দাম বাড়িলে লোকেদের সাংসারিক ব্যয়বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহারা বেতন-বৃদ্ধির জন্য সরকার ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর চাপ দিবে। এই বেতনবৃদ্ধির দাবী মানিয়া নেওয়া ছাড়া উপায় নাই এবং অধিকাংশ স্থলে বেতনবৃদ্ধির ফলে জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে ডিভ্যালুয়েশনের ফলে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক। তবে সরকার যদি দেশের মধ্যে খাদ্যশস্য পূর্বেকার দামেই বিক্রয় করার ব্যবস্থা করে তবে খাদ্যশস্যের মূল্য বাড়িবে না। ইহার অর্থ সরকারকে প্রতিবৎসর খাদ্যশস্যের মূল্যের সমতারক্ষার জন্য প্রভূত অর্থব্যয় করিতে হইবে। এখন প্রতি ডলার কিনিতে বিদেশী সরকারকে সাড়ে সাত টাকা দিতে হইতেছে এবং এই দামে কেনা গম ভারতের বাজারে ৪'৭৫ টাকা দরে বিক্রয় করিতে হইতেছে। সুতরাং ভারত সরকার পি এল ৪৮০ আইনে আমেরিকা হইতে যে গম ও অন্য খাদ্যদ্রব্য আমদানি করিতেছে তাহার মূল্য ডলারের নূতন দামে শোধ করিতে হইতেছে। ইহা এই দেশে পূর্বেকার দামে বিক্রয় করার ফলে ভারত সরকারকে বহু লোকসান দিতে হইতেছে। এই লোকসান পূরণ করিতে হইলে হয় নূতন কর বসাইয়া রাজস্ব সংগ্রহ করিতে হইবে। নচেৎ সরকারী ব্যয় প্রয়োজন মত কমাইতে হইবে। এই দুইটির কোনটিই সহজসাধ্য নহে সুতরাং এইভাবে বৎসরের পর বৎসর লোকসান দিয়া আমদানি খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করা কতদিন সম্ভব হইবে তাহা বলা শক্ত। এই অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে হয় বিদেশ হইতে খাদ্যশস্যের আমদানি বন্ধ করিতে হইবে। নচেৎ খাদ্যশস্যের দাম বাড়াইয়া দিতে হইবে।

শিল্পে ব্যবহার্য কাঁচামালও আমদানি করা হয়—যেমন কাঁচা পাট, তুলা প্রভৃতি। এই সমস্ত কাঁচামালের দাম বাড়িলে উৎপাদন ব্যয় বাড়িয়া যাইবে। ইহার ফলে মোট উৎপাদন ব্যয় কতটুকু বৃদ্ধি পাইবে ইহা নির্ভর করে কাঁচা-মালের গুরুত্বের উপর। আমদানি কাঁচামাল কিনিতে যাহা ব্যয় হয়, তাহা যদি মোট উৎপাদনব্যয়ের অতি সামান্য অংশ হয় তবে মোট উৎপাদনব্যয় বিশেষ বাড়িবেনা এবং ব্যবসায়ীরা হয়ত ইহার ফলে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি নাও

করিতে পারে। কিন্তু আমদানি কাঁচামালের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ যদি মোট উৎপাদন ব্যয়ের একটি মোটা অংশ হয় তবে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য না বাড়াইয়া উপায় নাই। সাধারণ ভাবে বলা যায় যে বর্তমানে ইনফ্লেশনের প্রভাবে বাজারের যে অবস্থা তাহাতে যে সমস্ত দ্রব্য উৎপাদনে আমদানি কাঁচামাল ব্যবহৃত হয় ইহাদের দাম বাড়িবে।

এই দুই শ্রেণীর জিনিস ছাড়া আমরা বহু পরিমাণে যন্ত্র ও যন্ত্রের অংশ আমদানি করিয়া থাকি। ইহাদের মূল্যও বৃদ্ধি পাইবে যাহার ফলে এই সব যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ দ্বারা প্রস্তুত জিনিসের দাম কিছু কিছু বাড়িতে পারে। মোটামুটি বলা যায় যে ডিভ্যালুয়েশনের ফলে সমস্ত আমদানি দ্রব্য এবং যে সমস্ত দ্রব্য উৎপাদনে আমদানি কাঁচামাল ও যন্ত্রাদি ব্যবহার করিতে হয় তাহাদের দাম বাড়িয়া যাইবে।

ডিভ্যালুয়েশনের ফলে রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারে কি ভাবে প্রভাবান্বিত হইবে? রপ্তানির মধ্যে সব চেয়ে বেশি মূল্যের জিনিস হইতেছে চা এবং ইহা দেশের মধ্যে ও বিদেশে সর্বত্রই বিক্রয় হয়। ডিভ্যালুয়েশনের পূর্বে এক পাউণ্ড চায়ের উৎপাদন ব্যয় পড়িত ধর ৪'৭৫ টাকা। দেশের মধ্যে এই দামে ও আমেরিকায় ১ ডলার দামে এই চা বিক্রয় হইত। এখন ডিভ্যালুয়েশন করার জন্য ডলারের দাম ৭'৪০ হইয়াছে। ডিভ্যালুয়েশনের উদ্দেশ্য রপ্তানি বৃদ্ধি করা এবং তাহা করিতে হইলে বিদেশের বাজারে দাম কমাইয়া দিতে হইবে। ধর চা-এর ব্যবসায়ী আমেরিকায় ৮০ সেন্ট দরে চা বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। বর্তমানে বিনিময় হারে সে ৮০ সেন্টের বদলে ৬'০০ টাকা পাইবে। যেহেতু বিদেশের বাজারে বিক্রয় করিয়া লাভ বেশি পাওয়া যায় ও কম দামে বিদেশের বাজারে বেশি চা বিক্রয় করা সম্ভব হইতেছে বলিয়া চা-এর ব্যবসায়ী দেশের বাজারে কম চা ও বিদেশেই বেশি চা বিক্রয় করিবে। ফলে এ দেশে যোগান কমিয়া যাইবে এবং ইহার দাম বৃদ্ধি পাইবে। দেশের বাজারে রপ্তানি দ্রব্যের দাম কতটা বাড়িবে তাহা (ক) বিদেশে কতটা বেশি পরিমাণে জিনিস বিক্রয় করা সম্ভব হইবে, (খ) রপ্তানি দ্রব্যের উৎপাদন কত পরিমাণ বাড়ান সম্ভব হইতে পারে এবং (গ) বেশি উৎপাদনের ফলে উৎপাদন ব্যয় কতটা বাড়িতে পারে—এই সমস্ত বিষয়ের উপর নির্ভর করিবে। যাই হোক, ডিভ্যালুয়েশনের ফলে রপ্তানি জিনিসের দাম বৃদ্ধি পাইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আর বাকি রহিল যাহাদের সম্পূর্ণভাবে দেশী জিনিস বলা হয়। অর্থাৎ যাহা উৎপাদন করিতে আমদানি দ্রব্যের প্রয়োজন হয় না এবং যাহা রপ্তানি করা হয় না। এই দ্রব্যগুলি কেবলমাত্র দেশীয় বাজারেই বিক্রয় করা হয়—যেমন মাছ, মাংস, তরকারী প্রভৃতি দৈনন্দিন সংসারের জিনিস, বাড়ি ঘর ইত্যাদি বহু প্রকারের দ্রব্যাদি। সাধারণত বলা হয় যে ডিভ্যালুয়েশন-এর ফলে এই শ্রেণীর জিনিসের দাম বাড়াইবার কোন কারণ নাই। কাজেই বিষয়টি ঠিকমত বিবেচনা করা প্রয়োজন। এর মধ্যে কিছু কিছু জিনিস আছে যাহা আমদানি দ্রব্যের বিনিময়ে ব্যবহার করা যায়। আমদানি জিনিসের দাম বাড়িলে এই শ্রেণীর জিনিসের দাম বাড়িয়া যাওয়া স্বাভাবিক। আমদানি দ্রব্যের দাম বাড়িয়াছে। সুতরাং অনেকে ইহার পরিবর্তে দেশী জিনিস ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিবে। ফলে এই জিনিসের চাহিদা বাড়িবে ও দামও চড়িয়া যাইবে। দ্বিতীয়ত, এইরূপ রপ্তানি দ্রব্যের পরিবর্তে ব্যবহার করা যায় এমনও কিছু কিছু জিনিস থাকিতে পারে। ধর আমরা চা এবং কফি দুই-ই উৎপাদন করি। কিন্তু কেবলমাত্র চা রপ্তানি করি—কফি যাহা উৎপন্ন হয় তাহা দেশের বাজারেই বিক্রয় হইয়া যায়। চা-এর রপ্তানি বাড়িবার ফলে ইহার দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনেকে যাহারা চা-পান করিত তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এখন চায়ের দাম বাড়ে নাই বলিয়া কফি কিনিতে সুরু করিল। ফলে কফির চাহিদা ও দাম বাড়িয়া যাইবে।

অংশটা একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে বাজারে আমদানি বা রপ্তানির পরিবর্তে জিনিসের চাহিদা ও দাম বাড়িলে ইহার উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। যদি উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে জিনিসটির গড়পড়তা উৎপাদন ব্যয় কমিয়া যায় তবে ইহার দাম ক্রমে কমিয়া যাইতে পারে। তবে ইহা অনেক সময় সাপেক্ষ। কাজেই আপাতত অন্তত কিছু দিনের জন্য এই শ্রেণীর জিনিসের দাম যে বাড়িয়া যাইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অন্যান্য জিনিসের দাম কি বাড়িতে পারে? ইহার সদুত্তর পাইতে হইলে দেশটি পূর্ণনিয়োগ অবস্থায় আছে কিনা ইহা দেখিতে হইবে। পূর্ণনিয়োগ অবস্থার অর্থ দেশের সর্বক্ষম লোক প্রায় সকলেই কোন না কোন কাজে নিযুক্ত আছে, প্রায় সব জমিই চাষবাস অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হইতেছে এবং সব যন্ত্রপাতিও কাজে লাগান আছে। সেই অবস্থায় যদি ডিভ্যালুয়েশন করা হইয়া থাকে তবে রপ্তানি দ্রব্য ও আমদানির পরিবর্তে ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইতে হইলে এই শ্রমিককে দেশী জিনিসের উৎপাদন হইতে সরাইয়া লইয়া রপ্তানি ও আমদানির পরিবর্তে জিনিসের উৎপাদন শিল্পে লাগাইতে হইবে। কারণ দেশে বাড়তি শ্রমিক পাওয়া যায় না—সকলেই কোন না কোন কাজে নিযুক্ত আছে। রপ্তানি শিল্পের উৎপাদন বাড়াইতে হইলে বেশী শ্রমিক নিয়োগ করা দরকার। যেহেতু দেশে বেকার শ্রমিক নাই সেই হেতু অন্য শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক ভাঙাইয়া আনিয়া রপ্তানি শিল্পে লাগাইতে হইবে। ফলে যতই রপ্তানি দ্রব্যের উৎপাদন বাড়িবে ততই দেশী জিনিসের উৎপাদন কমিবে—কারণ দেশী শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা কমিয়া যাইবে। দেশী জিনিসের উৎপাদন কমিলে তাহার দামও বাড়িয়া যাইবে। পূর্ণনিয়োগ অবস্থায় ডিভ্যালুয়েশনের প্রভাবে দেশী জিনিসেরও মূল্যবৃদ্ধি হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা যায়।

এখন কথা হইতে পারে যে যদি দেশে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা না থাকে—অর্থাৎ যথেষ্ট বেকার লোক পাওয়া যায়—তবে কি দেশী জিনিসের দাম বৃদ্ধি পাইবে? পূর্ণনিয়োগের সংজ্ঞায় আমরা তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি—প্রায় সমস্ত শ্রমিক, জমি ও যন্ত্রপাতির পূর্ণ নিয়োগ। ধর যদি এমন অবস্থা হয় দেশের মধ্যে বেকার শ্রমিক বা বেকার যন্ত্র অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু জমি বিষয়ে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা রহিয়াছে। এইরূপ ক্ষেত্রে যে সমস্ত জিনিস রপ্তানিজাত—তাহাদের দাম বাড়িবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। বেশী পাট উৎপাদন করিতে গেলে অনেক সময়েই কম পরিমাণ জমিতে ধান চাষ করা চলে। চাষের কমন বাড়াইতে হইলে সারের প্রয়োজন খুব বেশি। কিন্তু দেশের মধ্যে যে পরিমাণ সার পাওয়া যায় ইহার অধিকাংশই যদি চা-এর বাগানে চা-এর উৎপাদন বৃদ্ধিতে লাগান হয় তবে পূর্বাপেক্ষা কম সার, ধান বা অন্যান্য জিনিসের চাষে লাগান যাইবে। সুতরাং চা-এর উৎপাদন বাড়াইতে হইলে হয়ত ধান কি আলু প্রভৃতি জিনিসের উৎপাদন কমিয়া যাইবে। কিংবা যে পরিমাণ বাড়ান প্রয়োজন তাহা করা যাইবে না। কারণ সার আমরা বেশী উৎপাদন করি না এবং ডিভ্যালুয়েশনের পরে চড়া দামে বিদেশ হইতে বেশী সার আমদানি করাও সম্ভব না। ডিভ্যালুয়েশনের ফলে চাবাগানের মালিকদের লাভ বৃদ্ধি পাইবে। তাহারা চা-এর রপ্তানি ও উৎপাদন বাড়াইবার জন্য বেশী দাম দিয়াও কালোবাজার হইতে সার কিনিয়া নিবে। সাধারণ চাষবাসে কম পরিমাণ সার পাওয়া যাইবে ও তাহাতে বহু কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হার কমিয়া যাইবে—এমনকি উৎপাদনের পরিমাণও কমিতে পারে। এই অবস্থায় বহু কৃষিজাত জিনিসের দাম বাড়িয়া যাইবে। যাহা হয়ত কোনদিনই রপ্তানি হইবে না তাহারও কিছু অংশ রপ্তানিবৃদ্ধির যূপকাষ্ঠে পড়িয়া বলি হইয়া যাইতে পারে। এইভাবে মূল্যবৃদ্ধির ধ্বনি নানা রন্ধ্রপথে আসিয়া পড়ে।

ডিফ্ল্যাশুয়েশনের একটি প্রধান কারণ—ইন্‌ফ্লেশন। ইন্‌ফ্লেশনের প্রভাবে দেশের রপ্তানি কমিয়া যায় ও আমদানি বাড়ে। ফলে বহির্বাণিজ্যের সমতা নষ্ট হয়। আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে এই অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য অনেক ক্ষেত্রে মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য হ্রাস করিতে হয়। ডিফ্ল্যাশুয়েশনের ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে বহির্বাণিজ্যের সমতা হয়ত আবার ফিরিতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যদি ইন্‌ফ্লেশনের উৎপাত সমানে চলিতে থাকে তবে ডিফ্ল্যাশুয়েশনের সুফল ত পাওয়া যাইবেই না, বরঞ্চ মূল্যবৃদ্ধির গতি আরো বাড়িতে থাকে। ইন্‌ফ্লেশন যদি সমানে চলিতে থাকে তবে লোকের আর্থিক আয় বাড়িয়া যায়। আয় বাড়িলে জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি উৎপাদন বাড়ান সম্ভব না হয় তবে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতে বাধ্য। ডিফ্ল্যাশুয়েশনের ফলে সাধারণ কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন কমিবার আশঙ্কা আছে। অথবা কম হারে বৃদ্ধি পাইবে। ইহার সহিত যদি আবার আয়বৃদ্ধির গতি অব্যাহত থাকে তাহা হইলে মূল্যবৃদ্ধি রুখিবার কোন উপায় থাকে না।

ডিফ্ল্যাশুয়েশন হইতে যদি সুফল লাভের আশা করা যায় তবে ইন্‌ফ্লেশনের পিচ্ছিল পথ ছাড়িতে হইবে এবং উৎপাদন-বৃদ্ধির দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিতে হইবে। বহির্বাণিজ্যের সমতা হানি রোগে ডিফ্ল্যাশুয়েশন একটি মূল্যবান ঔষধ সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার সহিত ঠিকমত অনুপান না দিলে কাজ না হইয়া ক্ষতিও হইতে পারে। সবচেয়ে আশংকার কথা এই যে ঠিকমত অনুপান সংগ্রহ করা বোধহয় সম্ভব হইয়া উঠিতেছে না।

"Self-reliance would build up an independent, swadeshi economy and give us the necessary prestige, pride and power."

—LAL BAHADUR SHASTRI

ছিন্ন পৃষ্ঠা

অন্নদাশঙ্কর রায়

হেলেবেলার একটি বিলিতী সাবানের বিজ্ঞাপন আমাদের সুপরিচিত ছিল। একটি বাচ্চা মাইবার টবে বসে প্রাণপণে চেষ্টা করছে হাত বাড়িয়ে ধরতে। মেঝের উপর পড়ে আছে সেই প্রসিদ্ধ সাবান। ছবির নিচে লেখা আছে, "ও সুখী হবে না যতক্ষণ না সেটি পাচ্ছে।" আমারও আজ তাই মনে হয়। ও সুখী হবে না যতক্ষণ না সেটি পাচ্ছে। চীন সুখী হবে না যতক্ষণ না আলাই লাদাখে পাচ্ছে। প্রাণপণে হাত বাড়িয়েছিল তেজপুরের অভিমুখে। হাত ফিরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু হাতে রেখে দিয়েছে নেফার গোটা দুই ঘাঁটি। আর লডাখের বেশ কিছু অংশ। আবার হাত বাড়াবে কি না আমি হাত গুনে বলতে পারব না। আমি গণৎকার নই। কিন্তু যেসব জায়গা সে হাতে রেখে দিচ্ছে সেসব জায়গা তাকে আলাপ আলোচনার বৈঠকে "আপার হ্যাণ্ড" দেবে। তার "বার্গেনিং পাওয়ার" বাড়িয়ে দেবে। যাদের করে চীন যা পেতো না হামলা করে তাই পেলো। অবাক্তর যে রেগে লাল হবেন এটা খুবই স্বাভাবিক। লাল চীন আমাদের সবাইকে লাল বানিয়ে দিয়েছে। মতবাদে লাল নয়, রাগে লাল। এখন ওরা "পোজিশন অফ স্ট্রেংথ" থেকে বার্গেন করতে চাইবে।

আমাদের সামনে দুটি রাস্তা খোলা আছে। দুটির একটি নিতে পারি। একটি হলো সোজাসুজি অসহযোগ করা। হামলাবাজের সঙ্গে আমরা কথাবার্তা চালাব না। আগে সে যা কেড়ে নিয়েছে তা ফেরৎ দিক। তার পর বাক্যালাপ করব। আরেকটি হলো লড়কে লেজে লডাখ। কিন্তু লড়কে লেজে লডাখ করতে গেলেই ওরা লড়কে লেজে নেফা বলে নেমে আসবে। ইচ্ছা করলে গল কম্বলের মতো একশো বছর লড়াই করা যায়। ইচ্ছা করলে লড়াইটাকে আরো উচ্চ স্তরে তোলা যায়। অর্থাৎ ষোল হাজার ফুট পর্বতের উপর না করে বাইশ হাজার ফুট আকাশে করা যায়। আজকাল জেট বিমান হয়েছে। আরো ঊর্ধ্বে উঠে পুষ্পবৃষ্টি করতেই বা অসুবিধে কিসের? কিন্তু যুদ্ধ জিনিসটা যদি নিছক যুদ্ধের খাতিরে না হয়ে থাকে, যদি তার দ্বারা বিশেষ একটা স্থান ফিরে পাওয়ার উদ্দেশ্য থাকে, তা হলে আমি বলব আগে তার জন্যে ভালো করে প্রস্তুত হও। হিসাবটা খতিয়ে দেখ।

খোকা এখনো সাবানটা হাতে পায়নি। পেয়েছে শুধু সাবান হাতে পাবার জন্যে একটা আঁকশি। তাই দিয়ে সে সাবানকে আকর্ষণ করবে। মায়ের কোলে বেটা সে পেয়েছে সেটা দিয়ে সে ধরাধরি করবে ও ধরাধরি করে সে তার প্রিয় সাবানটি পাবে। যদি সে না পায় তবে আবার হামলা করতে পারে। সে রকম একটা সম্ভাবনা যতদিন আছে ততদিন আমাদের সাবধান থাকতে হবে। দ্বিতীয়বার অতর্কিতে হানা

দেবার অবকাশ রাখা চলবে না। দেশ জেগেছে। জাগ্রত থাকবে। ইতিমধ্যে মামলাটা যদি আন্তর্জাতিক আদালতে পাঠানো সম্ভব হয় তবে পাঠালে ভালো হয়।

দেশ আক্রান্ত হলো, বহু লোক হতাহত হলো, দেশের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি বেদখল হলো, এর জন্যে আমাদের মন আলা করছে। আমিও সকলের মতো জ্বলছি। কিন্তু ওদের দিকটাও ভেবে দেখা উচিত। তিন বছর আগে দালাই লামা যখন ওদের হাতছাড়া হন তখন ওরাও হেরে লাল হয়েছিল। ওদের মনেও জ্বালা ছিল। সে জ্বালা ওরা পুষে রাখে। প্রস্তুত হয়। তার পরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইচ্ছা করলে আমরাও আমাদের জ্বালা পুষে রাখতে পারি, প্রস্তুত হতে পারি তার পরে গায়ের জোরে ঘাঁটি ফেরৎ নিতে পারি। রাতারাতি প্রস্তুত হওয়া যায় না। প্রস্তুত না হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া ভুল। মনের জ্বালাকে গায়ের জোরে রূপান্তরিত করতে দীর্ঘকাল লাগে। কোনো শর্ট কাট নেই। চীনারাও দীর্ঘকাল ধরে প্রস্তুত হয়েছে, দিন গুনেছে। দিনক্ষণ অনুকূল দেখে আঘাত হেনেছে!

তবে দীর্ঘকাল ধরে প্রস্তুত হতে হতে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বদলে যেতে পারে, ওরাও বদলাতে পারে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক চিরকাল একই রকম থাকে না। কখনো ভালোর দিকে যায়, কখনো মন্দের দিকে যায়, কখনো আবার ভালোর দিকে যায়। পেণ্ডুলাম অনবরত দুলছে। আমাদের দিক থেকে শান্তির জন্যে দ্বার খোলা রাখতে হবে। রাগ করে দ্বার বন্ধ করে দেওয়া ভুল। যুদ্ধ জিনিসটা কেউ নিছক যুদ্ধের জন্যে করে না। করে কোনো একটা উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে। সেই উদ্দেশ্য যেই সিদ্ধ হয় অমনি শান্তি হয়। সেটা যদি বিনা যুদ্ধেই সিদ্ধ হয় তবে যুদ্ধের দরকারটা কী? আন্তর্জাতিক রাজনীতির চালেই হোক আর অন্তঃপরিবর্তন ঘটার ফলেই হোক চীন ইতিমধ্যেই পশ্চাৎ অপসরণ করতে শুরু করেছে। সবটা ছাড়তে রাজী হচ্ছে না, আক্রমণের ফল কিছু কিছু হাতে রাখছে। সেটুকু বোধহয় দালাই লামার সমান ওজনের সোনা। আমার নিজের প্রাইভেট বিশ্বাস দালাই লামার ভারত আগমনের পরের দিন থেকেই চীন ভারত আগমনের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। অবিকল সেই একই মহাপ্রবেশের পথ দিয়েই দালাই লামার পলায়ন ও চীনের পশ্চাদ্ধাবন। মাঝখানে তিনটি বছর। সেটা প্রস্তুতির সময়। এখন তো ভারতও প্রস্তুত হচ্ছে। তা দেখে তিব্বতীরাও বল পাচ্ছে। চীনও নাছোড়বান্দা, ভারতও নাছোড়বান্দা, তিব্বতও নাছোড়বান্দা। কে জানে হয়তো আর ম্যাকমহোনের মতো একজনকে ডাক পড়বে। এমন একটি সূত্র আবিষ্কার করতে হবে যাতে তিন পক্ষেরই ন্যায়বোধ চরিতার্থ হয়।

আমার উপর এখন আর শাসনভার নেই, কিন্তু দেবার ভারটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। দেশকে যদি ভুল যুক্তি বা ভুল উক্তি দিই তা হলে আপৎকালে সে ভুল আর সংশোধন করা চলবে না। শান্তির সময় তাতে হয়তো খুব একটা অনিষ্ট হতো না, কিন্তু যুদ্ধকালে প্রত্যেকটি ভুলের পরিণাম অশুভ। আর ভুগবে তো নিরীহ নিরক্ষর দেশবাসী। আমরা চালাক নাগরিকরা কি দুর্ভোগের দিন তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াব? এই পরিস্থিতিতে আমারও রক্তে আগুন ধরেছে, আমিও জ্বলছি, কিন্তু আমার বুকের রক্ত মাথায় ওঠেনি, উত্তেজনা দমন করেছি, মাথা ঠাণ্ডা রেখেছি। আমি কি এমন কিছু করতে পারি যার ফলে আগুন আরো ছড়াবে, আরো গভীরে যাবে? গত পনেরো বছর ধরে আমি প্রাণপণে আপনাকে শাসন করেছি, যাতে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আরো তিতিয়ে না যায়। দেশশাসনের ভার আমার ঘাড়ে নেই। কিন্তু দেশকে অপ্রশস্ত রাখার দায় কি তার চেয়ে কিছু কম? আমার লেখার নীট ফল কি এই হবে যে লোকে আরও উত্তেজিত হবে, আরো বিদ্বিষ্ট হবে? কোনো প্রকার অতিবৈরকেই আমি প্রশ্রয় দিইনি, বরং

কমিউনিজম যেন কিছুটা হটে গেল। বলতে পারা যায় বাধা দিয়েছি। সেই আমি কী করে চৈনিক ও ভারতীয়দের অতিথির জাদিয়ে তুলি?

চীনও ভারতেরই মতো পাঁচ হাজার বছরের পুরাতন সভ্যতার অধিকারী। ভারতের মতো চীনও পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা। ভারতের বুদ্ধকে সে তার অন্যতম গুরু বলে মেনে নিয়েছে। এখন সে যদি গুরুমারা চেলা হয়ে থাকে তবে তার সেই গুরুদক্ষিণাও ইতিহাসের এক ট্র্যাজেডী। কেন যে তার এমন মতিভ্রম হলো এ নিয়ে দেশবিদেশের লোক গবেষণা করছে। আমিও করছি। দায়ী আমার করার এই বিটলারী পদ্ধতি রাশিয়ার মতো কমিউনিস্ট রাষ্ট্রও সমর্থন করছে না। এটা কমিউনিস্ট পদ্ধতিও নয়। এর ফলে চীন যে পরিমাণ এগিয়েছে কমিউনিজম সেই পরিমাণ পেছিয়েছে। লাভলোকসানের হিসাবনিকাশ যেদিন হবে সেদিন চীন দেখবে সে কমিউনিজমকেই দুর্বল করেছে। যে ডালে বসেছে সেই ডালকেই কেটেছে। বোধহয় এটা আমার ঢুকতেই সে তার চাল ফিরিয়ে নিয়েছে পূর্বপ্রান্তে।

চীনাদের বিশ্বাসঘাতকতায় আমি স্তম্ভিত হয়েছি। তাদের অনুসন্ধিৎসার ও হয়েছি। কিন্তু তাদের অকুপরিবর্তনের আশা ছাড়িনি। গান্ধীজীর কাছে আমি শিখেছি, আমরা যদি ঠিক থাকি ওরাও ঠিক হবে, আমরা যদি ঠিক কাজটি করি, ওরাও ঠিক কাজটি করবে। এই মূলনীতিতে বিশ্বাস হারানো মানে মানবচরিত্রে বিশ্বাস হারানো। শুধু তাই নয়, আত্মবিশ্বাস হারানো।

প্রবন্ধ

শিক্ষা সংস্কারের গোড়ার কথা

সুষমা সেনগুপ্ত

একথা সর্বজনবিদিত যে একটা মজবুত ইমারত গড়তে হলে প্রথমে ঠিক করতে হবে কি রকম ইমারত বানানো হবে, তার উদ্দেশ্যই বা কি, সেটা কি হবে বাসের বাড়ী, না অফিস বিল্ডিং, না প্রমোদভবন, সে বাড়ী হবে দোতলা নাতলা না পঞ্চাশতলা। সে কথা ঠিক হলে সেই অনুযায়ী মালমশলা সংগ্রহ করতে হবে, সেই অনুযায়ী ভিত গড়তে হবে। ভিত পাকা না হলে, বাইরে থেকে যতই কেননা সুদৃশ্য হোক সে সৌধ টিঁকবে না।

শিক্ষা সম্বন্ধে বলতে গেলেও এ কথা বলা চলে। প্রথমে চাই শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা, তারপরে চাই সেই অনুযায়ী মালমশলা সংগ্রহ করে অগ্রসর হওয়া।

শিক্ষার উদ্দেশ্য হোল মানুষ গড়া। এ আদর্শের যে সর্বদেশে এবং সর্বকালে একটা নির্দিষ্ট মাপকাঠি ছিল তা বলা যায় না। প্রাচীন গ্রীস চাইতো দার্শনিক তৈরী করতে, রোমান ও স্পার্টা চাইতো আদর্শ সৈনিক তৈরী করতে, প্রাচীন ভারতের দৃষ্টি ছিল আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দিকে। কালে কালে অনেক ভাঙা গড়ার মধ্যে দিয়ে দেশে দেশে শিক্ষার আদর্শ বদলেছে। পশ্চিমজগতে বহু বিতর্ক হয়েছে শিক্ষার সঙ্গে ধর্মশিক্ষার যোগ থাকবে, না থাকবে না; তারপর ধীরে ধীরে যখন জনগণের ওপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রসারিত হয়েছে তখন প্রশ্ন উঠেছে মানুষ রাষ্ট্রের জন্য, না রাষ্ট্র মানুষের জন্য। এ প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আজকের দিনে কমিউনিষ্ট ও ডিমক্র্যাটিক রাষ্ট্রের মধ্যে চলেছে বহু বাদানুবাদ এবং তার ঢেউ এসে লেগেছে শিক্ষাজগতেও। শিক্ষার সঙ্গে রাজনীতির যোগাযোগ নেই একথা আজকের দিনে আর বলা চলে না। রাষ্ট্রকর্তৃত্বের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি রাষ্ট্রই আপন আপন রাজনৈতিক আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে চেয়েছে ও চাইছে। আমাদের ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থাতেও যে এর প্রভাব পড়েনি তা নয়।

মুদালিয়র কমিশন রিপোর্টের মুখবন্ধে বলা হয়েছে যে, আমাদের প্রস্তাবিত নূতন শিক্ষানীতি দেশের রাজনৈতিক কাঠামোকে অনুসরণ করবে। অর্থাৎ শাসনতন্ত্রে বলা হয়েছে যে ভারত গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র এবং সেই সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ বা সেকুলার, এর ওপর পরবর্তী যুগে যুক্ত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ, কাজেই কমিশন বলেছেন যে শিক্ষাব্যবস্থা চরিত্রের সেইসব গুণাবলীর বিকাশসাধনে সচেষ্ট হবে, যা ভবিষ্যৎ জাতিকে তার গণতান্ত্রিক নাগরিকের দায়িত্ব পালনে উপযুক্ত করে তুলবে এবং সেইসঙ্গে তৈরী করবে তাদের সমাজের সবরকম বিভেদমূলক বা নাশকতামূলক গতিকে প্রতিরোধ করবার উপযুক্ত করে। এমন শিক্ষা তাদের দিতে হবে যাতে তারা নিজেরা মানুষ, জাতির ও পৃথিবীর উপযুক্ত নাগরিক হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশকে তার অর্থনৈতিক

অনগ্রসরতা থেকে উদ্ধার করে তার উপযুক্ত সম্মানের আসনে তাকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

এরপরে এই আদর্শ রূপায়িত করবার জন্য তাঁরা যে সমস্ত ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছেন তার কতটা কার্যকারিতা বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব, সে দিকের খুঁটিনাটির মধ্যে না গিয়ে আমি গোটাকয়েক গোড়ার কথা বলব।

প্রথম কথা, আমাদের রাষ্ট্র শুধু গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র নয়, এর ওপর সেটা আবার "সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের" এবং এই আদর্শের ওপর ভিত্তি করেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা। এই বড় বড় কথাগুলোর মূল কথাটা কি? গণতন্ত্র মানে কি?—না জনগণের জন্য জনগণের দ্বারা গঠিত যে রাষ্ট্র। আমরা গর্ব করি যে আমরা পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম গণতন্ত্র। আমাদের প্রতি প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার আছে এবং প্রতি নির্বাচনে কোটি কোটি লোক ভোট দিয়ে আমাদের শাসকবর্গকে নির্বাচিত করে। এ ভোটদানের মূল্য কি? যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ভারতীয় ভারতের গ্রামে গ্রামে, তার কৃষিক্ষেত্রে, কল-কারখানায় ছড়িয়ে রয়েছে তারা এই ভোট মানে কি বা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির নীতি বা আদর্শ কি তার কোন খবর রাখে, বা রাখলেই তা বোঝবার কতটুকু ক্ষমতা তাদের আছে? কংগ্রেস থেকে শুরু করে P. S. P; S. S. P; R. S. P; R. C. P. I; বাম ও দক্ষিণ C. P. I; মার্ক্সবাদী F. B; Bolshevic Party সবারই আদর্শ সমাজতন্ত্র, এদের মধ্যে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভেদ তা শিক্ষিত লোকই বুঝতে অক্ষম, আর দূর গ্রামবাসী বা সাধারণ লোক এর কি বুঝবে? কাজেই এদের ধাপ্পা দেওয়া সব পার্টির পক্ষেই সহজ। কেউ অর্থে বশ করে, কেউ বা কবে নানা প্রলোভন দেখিয়ে; এই শাসনব্যবস্থাকে গণতন্ত্র বলার কোনই সার্থকতা নেই।

দ্বিতীয় কথা সমাজতন্ত্র,—যে স্তরে রাষ্ট্রের সমস্ত সম্পদে কেবলমাত্র রাষ্ট্রের অধিকার, যে রাষ্ট্র জনগণের একমাত্র প্রভু, যে স্তরে ব্যক্তিগত মালিকানা বলে কোন কথা নেই। যেখানে আমরা মিশ্র অর্থনীতি নামে একটা উদ্ভট জগা-খিচুড়ী অর্থনীতি স্বীকার করে নিয়েছি, চোখের ওপর যেখানে প্রাসাদের পাশে ভগ্নকুটির, ঐশ্বর্যের-প্রাচুর্যের পাশে অভাবের হাহাকার চোখের ওপর অহরহঃ দেখতে পাচ্ছি, সেখানে সমাজতন্ত্রের নাম উল্লেখ না করাই ভালো।

তাহলে সেই গোড়ার কথায় আসতে হয়। এই গণতন্ত্রকে সার্থক করতে হলে প্রথমে দরকার শিক্ষার এবং যে শিক্ষা মুষ্টিমেয়ের জন্য নয় বা উচ্চশিক্ষা নয়, যে শিক্ষা হবে সার্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষা, যার শুরু হবে প্রাথমিক স্তরে এবং যাকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। দেশের এই শিক্ষিত জনগণ গণতন্ত্রকে করে তুলবে সার্থক এবং তারাই দেশকে সমাজতন্ত্রে পৌঁছে দেবে, মুষ্টিমেয় ওপরতলার লোকের সদিচ্ছার ফলে এর রূপায়ন সম্ভব নয়। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার নব রূপায়ন করতে হলে কি ধরণের মানুষ আমরা ভবিষ্যতে চাই সে সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণার প্রয়োজন ও তা শুরু করতে হবে প্রাথমিক শিক্ষা দিয়ে। সেটাই হল শিক্ষাসৌধের ভিত্, এ ভিত্ শক্ত করে গড়ে উঠলে এর ওপর তুলতে হবে মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌধ, তবেই হবে শিক্ষাব্যবস্থা সার্থক।

কিন্তু আমরা শুরু করেছি উল্টো পথে। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে, বিশবৎসরে পা দিয়েও স্বাধীন সরকার এ কাজে হাত দিয়ে উঠতে পারেনি। আমাদের সর্বপ্রথম গঠিত হল ইউনিভার্সিটি কমিশন, তারপর এলো মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন, প্রাথমিক শিক্ষা কমিশন এখনো বাকী। একতলা তৈরী হোল না, দোতলা, তেতলা তৈরী করতে আমরা ব্যস্ত। শিক্ষাক্ষেত্রে কি কোন পরিবর্তন হয় নি? নিশ্চয়ই হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পর বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী হচ্ছে, মাধ্যমিককে উচ্চমাধ্যমিক করা হয়েছে, কলেজের এক ক্লাস স্কুলের সঙ্গে জোড়া হয়েছে,

ইন্টারমিডিয়েট উঠিয়ে পি. ইউ ও তিন বছরের ডিগ্রীকোর্স হয়েছে। উচ্চমাধ্যমিকে বহুমুখী শিক্ষাক্রম চালু হয়েছে, মাধ্যমিক শিক্ষালয়ের গৃহনির্মাণ ও উপকরণাদি উপলক্ষ্যে সরকার মুক্ত হস্তে খরচ করেছে। এসবের কিছুটা প্রয়োজন ছিল না তা নয়, কিছু এর সুফলও যে না হয়েছে তা নয়, কিন্তু দেশের প্রয়োজনে প্রায়রিটি বা প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা বলে যে একটা জিনিষ আছে, সেটার কথা চিন্তা করা হয় নি।

এ বিষয়ে আমরা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হুবহু অনুসরণ করেছি ইংলণ্ডকে। সেখানেও শিক্ষাক্ষেত্রে প্রথম প্রাধান্য লাভ করেছে ইউনিভারসিটি। দেশের শাসক, বিচারক ধর্মযাজক, আইনজীবী ইত্যাদি তৈরী করবার জন্য দরকার ছিল ইউনিভারসিটির। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সেখানে উৎকর্ষ লাভ করেছে প্রথমে, সাধারণ শিক্ষা প্রথমে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার হাতেই ছাড়া ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠেছে অভিজাতশ্রেণীর জন্য পাব্লিকস্কুল, জনসাধারণের জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা এসেছে সবার শেষে। ইংলণ্ড প্রথমে রক্ষণশীল দেশ, তারপরে গণতান্ত্রিক দেশ, গণ অভ্যুত্থানের ফলে হঠাৎ সেখানে কিছু হয় নি, গণতান্ত্রিক দেশে জনগণের কল্যাণ করা উচিৎ এই শুভবুদ্ধির থেকেই এবং কালের প্রয়োজনে সেখানে গড়ে উঠেছে নানা জনকল্যাণমূলক সংস্থা। গণশিক্ষার সঙ্গে গণইচ্ছা প্রতিফলিত হয়েছে তাদের পার্লামেণ্টে। অন্যদিকে যদি সোভিয়েট রাশিয়ার অত্যাশ্চর্য বৈষয়িক উন্নতির মূল আমরা অনুসন্ধান করি, দেখতে পাব বিপ্লবের শুরুতেই তারা সারা দেশটাকে শিক্ষাদেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। শুধু ইংরিজীতে যাকে বলে "রি_ আর্ন্" বা লেখা, পড়া এবং সামান্য অঙ্ক তা নয়, রীতিমতো শিক্ষা, সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে কৃষি ও শিল্পশিক্ষা, কলাশিক্ষা, স্বাস্থ্যোন্নয়ন সমাজোন্নয়নের শিক্ষা, শিক্ষার পাঠ্যক্রম বহির্ভূত নানা বিষয়ের শিক্ষা নানা ভাবে। চারিদিকে খোলা হয়েছে মিউজিয়ম, লাইব্রেরী, কৃষ্টিভবন। প্রমোদশালা। এতে আপামর সাধারণের অধিকার। এ বিরাট প্রচেষ্টা পশ্চিম রাশিয়ার উরল পর্বত থেকে বিস্তৃত হয়েছে মধ্য এশিয়ার মরুভূমির মধ্যেকার অর্ধবর্বর মঙ্গোলীয় জাতি অধ্যুষিত দেশ পর্যন্ত। এদেরও ধর্মগত, জাতিগত, বর্ণগত বিভেদ, আমাদের দেশের চাইতে কোন অংশে কম ছিল না।

বিপ্লবের মাত্র সতেরো বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া গিয়ে তাদের শিক্ষাব্যবস্থা দেখে চমৎকৃত হয়েছেন, তারমধ্যে তাদের অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু, দুর্ভিক্ষ, ধর্মীয় গোঁড়ামি, অশিক্ষা সকলের সঙ্গেই লড়াই করে এগুতে হয়েছে। সেই কর্মপ্রচেষ্টা চলেছে তাদের অব্যাহত গতিতে, এর মধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলা তাদের বুকের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে, এবং সে ধাক্কাও তারা সামলে উঠেছে। ১৯৫৫ সালে আমি সেখানে গিয়ে এসেছি শিক্ষার কি বিপুল আয়োজন, লেনিনগ্রাদ মস্কো থেকে, সুদূর তাসখন্দ পর্যন্ত। রাজার প্রাসাদ কেড়ে নিয়ে তারা বানিয়েছে মিউজিয়ম, চিত্রশালা; বিশ্ববিদ্যালয়কে তারা গড়েছে রাজপ্রাসাদের মত ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে। রবীন্দ্রনাথ যখন দেখে এসেছেন তখনকার দারিদ্র্য তাদের আর নেই। এখন তাদের ভোগবিলাসের উপকরণ অনেক বেড়েছে, তবে তাতে সবার সমান ভাগ।

আমরা কুড়িবছরেও শিক্ষাসমস্যার আপাত সাধ্য জলের হিটে দিতে শুধু সক্ষম হয়েছি, গোড়ার কাজ কিছুই করতে পারি নি। কথায় কথায় আমরা চীন পাকিস্তানের যুদ্ধের দোহাই পাড়ি, সে সংগ্রাম কি হিটলারী যুদ্ধের চাইতেও ভয়ঙ্কর? চীন জাপানের লড়াইএর সময়ও পড়েছি, চীনা ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের বইএর বোঝা, আসবাবপত্র ঘাড়ে করে নিয়ে পাহাড়পর্বত পার হয়ে নিরাপদ স্থানে রেখে এসেছে, শিক্ষাকে বোমার আঘাতে ধ্বংস হতে দেয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিরাট ধ্বংসের পরে, আপান দেশটাকে কি রকম

ভাবে পুনর্গঠন করল তার মূল আমরা অনুসন্ধান করতে পারি না কেন ?

আসল কথা সবকিছুরই গোড়ায় একটা গলদ রয়ে গেছে।

অন্য কথা ছেড়ে শিক্ষার কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে এই কুড়ি বছরে আমরা জনশিক্ষার জন্য উল্লেখযোগ্য কিছুই করিনি।

রাশিয়ার বিপ্লবের পর লেনিন বলেছিলেন "Each one teach one." আজই সারা দেশে ইস্কুল করতে যদি না পারি, যার পেটে একটু শিক্ষা আছে, অন্ততঃ আর একজনকে সে শিক্ষা দান করু।

উজবেকিস্তানের ভাইস প্রেসিডেন্ট (১৯৪৪ সালে) মাদাম সাবিকভার মুখে শুনেছি যে যখন তাঁর বয়স ষোলো তখন তিনি বিবাহিতা, সন্তানের জননী, অক্ষরজ্ঞানহীনা। তাঁর দেশে বয়স্ক শিক্ষা অভিযানের কথায় তিনি বলেন, গ্রামের একটি ঘরে সব মহিলারা সমবেত হতেন, পালা করে একজন সন্তান রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিতেন, এমনি করে চলত শিক্ষাদান। বইখাতা, শ্লেট পেন্সিল যোগাত রাষ্ট্র, শিক্ষক কাছাকাছি যাকে পাওয়া যেত তিনিই ভার নিতেন। আজ তিনি রাষ্ট্র কর্ণধার হবার মত শিক্ষায় শিক্ষিতা। বয়স্ক শিক্ষার সেখানে এখনো কি বিপুল আয়োজন। ফ্যাক্টরী শ্রমিকের জন্য আছে সন্ধ্যাকালীন ক্লাস, কলেজ ইউনিভার্সিটির অবকাশকালীন ক্লাস, correspondence ক্লাস, কত কি, যার ফলে শ্রমিক হয়ে প্রবেশ করে আজ কারখানার ডিরেক্টর হয়েছে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

'৪৫ সালে ২৮ বছর রাষ্ট্রগঠনের পরেও তাদের দেশের নরনারীর সারাদেশকে গড়ে তোলার কাজে অপরিসীম উৎসাহ, মহিলাগণের সহজেই চোখে পড়ে। আমরা কুড়ি বছরেই কেন হতাশার মুখে পড়ছি ? বেশ যে আমাদের দেশ হল, এ জ্ঞান না হয়েছে আমাদের রাষ্ট্রকর্ণধারদের, না এ বোধে উদ্দীপিত হচ্ছে দেশবাসী। আন্দোলন না করলে আজও জনগণের দাবী আদায় হয় না, রক্তচক্ষু না দেখিয়ে শাসক শাসন করতে পারে না। এর নামই কি গণতন্ত্র ?

গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রকে কার্যকর করতে হলে যেমন চাই জনগণের সার্থক শিক্ষা, তেমনি দেশের অর্থনীতিকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করতে হলে চাই, কৃষি ও কারিগরী নানা শিল্প ও দৃষ্টিমূলক শিক্ষা ও শিক্ষান্তে নিয়োগের উপযোগী বিচিত্র সংস্থা।

আমরা পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা করে চলেছি, কিন্তু এ পরিকল্পনা থেকে বাদ গেছে মানুষ। পরিকল্পনার "সমাজসেবা ও বিধি"-এর কার্যসূচীর মধ্যে শিক্ষা পড়ে ঠিকই, কিন্তু আমাদের দেশে কত শিশুর শিক্ষার প্রয়োজন, সে জন্য কত শিক্ষালয় আছে ও আর কত শিক্ষালয় সকলের প্রয়োজন মেটাতে পারে, তারজন্য প্রতিবৎসর কতগুলি করে শিক্ষালয় স্থাপন করলে কত বছরে সকলকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা সম্ভব এ জন্য কত শিক্ষক, কত গৃহ, কত পুস্তক-পুস্তিকা প্রয়োজন তার একটা সম্পূর্ণ সমীক্ষা হয়েছে বা নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান আজও প্রস্তুত হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

সাধারণ শিক্ষাদানের সঙ্গে নিম্ন বা উচ্চস্তরে বৃত্তিমূলক বিশেষ শিক্ষাদানের জন্যও স্থান দরকার। তাছাড়া দরকার যে পাঁচবৎসরে দেশে কত ইঞ্জিনীয়র, কত ডাক্তার, কত কৃষি-বিজ্ঞানবিদ্, কত শিক্ষক বা অন্যান্য উচ্চ ও নিম্নস্তরের কর্মী দরকার এবং সেই মুখে শিক্ষাদানের প্রকল্প তৈরী করলে, শিক্ষান্তে বেকারীর প্রশ্ন উঠবে না। অন্ততঃ বেকার সমস্যা এত ভয়াবহরূপে দেখা দেবে না। যেমন অপরিকল্পিত উৎপাদনের ব্যবস্থায়, উৎপাদন চাহিদার মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে দেশের বহু সম্পদ ও পরিশ্রম অযথা নষ্ট হয়, তেমনি অপরিকল্পিত বৃত্তিশিক্ষাদানেরও পরিণতি ঘটে স্বাভাবিক।

আজকে ইঞ্জিনীয়ার হবামাত্র ভাল রোজগার হচ্ছে, সবাই ছেলেকে ইঞ্জিনীয়র করতে চায়, এর ফলে একদিন আসবে যখন বেকার ইঞ্জিনীয়রের অভাব হবে না।

আজ ১৪ বছর পর্যন্ত শিক্ষার দাবী আমরা জানাচ্ছি, কিন্তু এই সঙ্গে এও চিন্তা করতে হবে যে ১৪ বছরে যাদের শিক্ষা সমাপ্ত হবে, তারা হয়ত ১৬ বা ১৮ বছরের আগে কাজে নিযুক্ত হতে পারবে না, এই সময়টা তারা করবে কি? এই বয়সটা যাকে ইংরাজীতে বলে 'টীনেজ' (Teen age) কিশোরদের পক্ষে সে এক সংকটের কাল, তাদের এ সময়ে কোন উপযুক্ত কাজে অন্ততঃ পার্ট টাইম নিযুক্তির কথাও ভাবতে হবে।

সবার জন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার দরকার নেই। তবে যারা মেধাবী ছাত্র তারা যাতে বৃত্তিলাভ করে অবৈতনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এদিকে অবিশ্যি কিছু কিছু বৃত্তি সম্প্রতি দেওয়া হচ্ছে।

তবে সব চাইতে বেশী নজর দেওয়া দরকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ওপর, যে শিক্ষার শেষে অধিকাংশেরই শিক্ষা শেষ হবে। মানুষ তৈরী হবার পথে জীবনের এই বৎসর গুলো সবচাইতে দামী। এই সময়ে তৈরী হবে তার দেহ, মন ও আত্মা, তাকে উপযুক্ত করতে হবে কোন বৃত্তিমূলক শিক্ষা দিয়ে নিজের ও দেশের উন্নয়নে সার্থকভাবে নিজেকে নিয়োজিত করবার জন্ত, তাকে দিতে হবে চারিত্রিক শিক্ষা, সমাজে, রাষ্ট্রে যথাযথ ভাবে তার কর্তব্য প্রতিপালন করতে, এককথায় তাকে গড়ে তুলতে একটা পুরো মানুষ করে।

এরজন্ত দুটো বিষয় এ পরীক্ষায় ছুড়ে আর ও পরীক্ষায় বাদ দিলেই শিক্ষার সংস্কার হবে না, ছেলেমেয়েরা তিনটে ভাষা শিখবে না চারটে ভাষা সেটাও বড় কথা নয়। সবাই এক ভাষা শিখলেই এক জাতীয়তাবোধ গড়ে ওঠে না, তা হলে ইংলণ্ড আমেরিকা লড়াই করে পৃথক হ'তো না। ইস্কুলে রোজ প্রার্থনার সময় "আমরা ভারতবাসী, আমরা এক জাতি, আমরা আমাদের দেশকে ভালবাসিব, দেশের জন্ত প্রাণ দিব", বলে বলেও National Integration শেখানো যায় না। জগতে শিক্ষা এত তাড়াতাড়ি নানাদিকে এত বেড়ে উঠছে যে সব কিছুই আমরা ছাত্রদের মাধ্যমিক স্তরেই শিখিয়ে দেব, অন্ততঃ কিছুটা করেও, এ আশা বাতুলতা। এতে শিক্ষার বোঝার ভারে ছাত্রকে জর্জরিত করা হয়, শিক্ষার প্রতি তার যেটুকু আগ্রহ বা উৎসাহ থাকে তাকে অঙ্কুরে বিনাশ করা হয়।

শিক্ষক হাতে ধরে ছাত্রকে শুধু সেখানে নিয়ে যাবেন যেখান থেকে যা কিছু শিখতে সে চায় তা সে নিজেই সংগ্রহ করবে। তার সেই শিখতে চাওয়াকে উদ্বুদ্ধ করবেন শিক্ষক, এবং নিজে সংগ্রহ করবার উপাদান যোগাতে হবে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা তথা জাতীয় সরকারকে।

শিক্ষাব্যবস্থার জন্ত আমাদের সরকার কতকিছু করছেন সে কথা বলতে গেলেই তাঁরা পরিসংখ্যান উল্লেখ করে দেখান স্বাধীনতার আগে ও পরে কত শিক্ষালয় ছিল বা হয়েছে, তাতে কত ছাত্রছাত্রী পড়ছিল বা পড়ছে, কিন্তু সেই সঙ্গে, এতে সরকারের কৃতিত্বের অংশ কতটুকু তা উল্লেখ করেন না। এই যে এত শিক্ষালয় হয়েছে এর কটা সরকারী বা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় আর কত বিদ্যালয় বেসরকারী প্রচেষ্টায় খোলা হয়েছে তার উল্লেখ তাঁদের বিবৃতিতে থাকে না। যত বিদ্যালয় দেশে চালু আছে তার পুরো খরচের কতটা অংশ সরকারকে বহন করতে হয় সেকথাও বলা হয় না। বলা বাহুল্য শিক্ষার ক্ষেত্রেও আমাদের মিশ্রনীতি।

সমস্যা বহুমুখী এবং দুরূহ সন্দেহ নেই, কিন্তু অসম্ভব বলে যোগ বললে অন্যায় করা হবে। আমাদের সুবিধে এইটুকু যে আমাদের আগে যারা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, বিরোধিতার মধ্যে দিয়ে, দারিদ্র্য ও বহু বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে নিজেদের দেশকে লক্ষ্যস্থলের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, তাদের আদর্শ, তাদের উদাহরণ আমাদের চোখের সামনে আছে। আমাদের পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতার ওপর দাঁড়িয়ে আমাদের চলার পথ প্রস্তুত করতে হবে, তাদের কাছ থেকে আমরা পথের নিশানা পাব।

কিন্তু সবার আগে মনে রাখতে হবে, গোড়ার কাজ আগে করা চাই।

ভোর

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

ভোরবেলা মাঠের ওপরে আলো আসে।
ভোরবেলা, সকল আকাশে
কিছু খেলা হয়। ঘাসে
দু'একটা নিশানা-ফুল খড়ুরে-কাগজ প'ড়ে থাকে।

যতো স্বাভাবিক, কিংবা সহজ সরল ব'লে
গালি খাও, এদেরই ধরণে
কিন্তু বাড়িঘর, বৃষ্টি ও জীবন। চলে
সহজ পিঁপড়ে, ঋজু সাইকেল, যেখানে কলহ
চলে তার ফাঁকে-ফাঁকে—

আলো আসে, মাঠের ওপরে আলো আসে।

টিকিট

শান্তি লাহিড়ী

এ হাতে বিষণ্ণ বিকেল তুলি ধরে, অন্য হাতে মুখ—
দ্বিধিত আবেগ মনে গড়াগড়ি খাবে।
স্পটলাইট জ্বলে উঠবে স্টেজে,
স্বাভাবিক সুখদুঃখ ভুলে গেলে
একদিন নাটক শুরু হবে।
তখনই নাটক শুরু হয়,
দর্শকে আসনগুলি সমসম মন্থর বিবশ।
আলো নিভে যেতে-না-যেতেই,
হাততালি বেজে উঠবে,
বাঁশির নির্দেশ পেলে ড্রপসিন নেমে আসবে স্থির
চকিত দুইয়ের মধ্যে কে কোথায় অন্য কাউন্টারে?

কাল সারারাত

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

কাল সারারাত এক ডোঙার ভিতর কাটিয়েছি। কোন
লণ্ঠন ছিল না কাল সারারাত।
কেবল জোনাকিগুলি, কেবল জোনাকি, সর্বে ক্ষেত
নিষ্প্রভ আগুন কোন বিয়োগান্ত নাটকথার।
কেবল ঘুরেছি রাতভর মাঠে মাঠে, ধানক্ষেতের ভিতরে
এদিকে সেদিকে, লগি ঠেলে ঠেলে পৌঁছোতে পারি নি
কোনখানে। আমা অশরীরী সত্তা আমাকে ঘুরিয়ে
যেন কী খেলার মত্ত ছিল। তোমাকেও হঠাৎ দেখেছি
স্বপ্নে, জাগরণে, যেন দুচোখে স্বপ্নের এত ভিড়ে
চোখ ব্যথা হয়ে যায়। কত পাখির চিৎকার শুনেছি
বুকি বা,
জলতরঙ্গের গানে তোমার পুরনো গানগুলি
বারবার মনে পড়েছিল। গাছ, পাখি, জল, অন্ধকার
সমস্ত একাত্ম হয়ে আমাকেও তুলে নিয়ে লোফালুফি খেলে
ফুরিয়ে দিয়েছে গোটা রাত।...
সকালে দেখেছি ডোঙা ধানের শিশিরে ভিজে গেছে।
তালডোঙা মনে হল সেই বেহালাটি
বাজাতে বাজাতে যার তার ছিঁড়েছিল—
তুমিও হারিয়ে দিয়েছিলে সেইদিন।

শঙ্খগুলি

সুশান্ত বসু

কিছু শঙ্খ ভুলে গেলে ভালো হতো, শঙ্খ যত অপরার মত
বাঁধা মঞ্চে নেচে যায় প্রত্যাহের মুখরো মেটাতে,
অথবা অভ্যাসবশে আসন্নমত্তা থাকে মেদস্ফীতিভারে
ক্রমশঃ প্রবীণ ক'রে প্রৌঢ়ের প্রণয়ে করে একক রক্ষিতা।
সেইসব শঙ্খগুলি ভুলে নবজাতকের নগ্নতা অন্ততঃ
সঞ্চারিত হোক কিছু শঙ্খের শরীরে, যার বিশুদ্ধ দুহাতে
জ্যোতির্বলয়িত দূর নন্দনের অঞ্জলি-সম্ভারে
কৃতার্থ প্রত্যহে বাঁচে জ্যোতির্ময়ী অর্থের দুহিতা।

কিছু শঙ্খ বড়ো বেশি বিবাস, অঙ্গনাদেহ-কামার্ত, রবির
পুরুরবা নয় শুধু উর্বশীর দয়িত-ভূমিকা
নিপুণ স্ব-অভিনয়ে রঙ্গমঞ্চ আলো ক'রে জ্বলে
ভ্রষ্ট আদমের আর্তনাদে তার আহত ক্রৌঞ্চীর
বেদনার শব্দ বাজে, বীরোদাত্ত শঙ্খে ফোটে লোচন, কারিকা—
আলাদের দুলালেরা শঙ্খগুলি শুদ্ধ হোক বিপন্ন অবলে।

অবসাদ

আলোক সরকার

কোলাহল কোনোখানে নেই। একটি মানুষ
অপর মানুষ তার পাশাপাশি শুধু
চীৎকার নেই, নেই আলিঙ্গন, পঙ্কিল কলুষ
প্রতিবাদ নেই, কলহ সন্দেহ ঈর্ষা ঘৃণা।

বাড়ির পিছনে লাল মালতীফুলের গুচ্ছ জ্যোৎস্নায় বিষাদ
ক্ষেত্র তবুও দাদা নিস্পৃহ সজল। কখনো ভাবি না
কান অশ্রু। নিরন্তর আলোড়িত শব্দহীন বিবিক্ত নির্জন—
বাধি দাদা আলোর প্রখর দ্যুতি মূক অবসাদ।

হে স্বদেশ, বসুন্ধরা!

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

এ স্বদেশ, ব্যাপ্ত বসুন্ধরা
চিরায়ত আত্মার আকাশে—
রূপে বর্ণে আলিম্পনে ভরা
প্রত্যাশায় দিগন্ত উদ্ভাসে।

কী-মন্থন ওঠে দেশে-কালে,
অমৃত সাগরে হলাহল—
বিচিত্রের স্বর্ণোজ্জ্বল ভালে
জ্বলে এ-কী ধ্বংসের অনল।

এ সমুদ্র চেয়ে দেখো ফিরে
দিগন্তে খুলেছে তার দ্বার—
বাহিতের অমরাবতীরে
এনেছে নিকটে এইবার।

কী-উদাত্ত স্পন্দিত আহ্বান
কবির প্রদিপ্ত দিনে শোনো
সঞ্জীবন অগ্নিগর্ভ গান
ব্যর্থ আর হবে কি কখনো?

স্মারক গ্রন্থের মতো

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

লিখে দিতে হবে ; শেষপর্যায়ের শ্লোক এইবার স্পষ্ট লিখে দিতে হবে।
ভয়ানকভাবে ভালবাসা হ'লো এতদিন, অন্তত যৌবন নিয়ে দাবীদাওয়া চেষ্টা।
করা হ'লো,

বৃষ্টি ভুল করে থেমে থাকলো অনেকশ্রেণী নারী
অর্থাৎ শব্দ অর্থাৎ ছন্দে মৃত্যুসহোদর ধারাবিবরণী শুনে।
এখন দর্শন নেই অথচ নগ্ন আছে, এই
বনতিবহুল বয়সবরের জাইক্ষু পোয়ের অঙ্কুরস্ত
বিরুদ্ধতায় এখন শুধু শরীর ধ্যা নারীশরীরের
সুবিখ্যাত বাৎসায়নে বাধ্য হয়ে থাকতে, কখনো
খানিকটা পানীয় কৃষিরশুদ্ধে পান করে নিতে হচ্ছে আর
বিরক্ত হলেও ভালবাসা শব্দটিকে বিছু স্থিত
নতুন উপমা চেয়েচিন্তে এনে লিপিবদ্ধ করি, যেন যেদনার কাছে কর্জ ছিল।

কিন্তু আর না, এখন সূর্যের পশ্চিমে
তাকিয়ে আমার মন কেমন করছে।
যাকে পেয়েছি, অথবা যাকে পেলাম না
যাকে ছুঁয়েছি অথবা যাকে ছুঁলাম না
সেই মিথ্যুক রোদন ভরা কবিতাবলীই যেন
অনড় দাঁড়িয়ে দাবী করছে আমার স্নায়ু ভাঙা অবশিষ্ট
ইচ্ছা, সেকি মৃত্যু, সেকি মনুষ্যজন্মের থেকে
নতুন প্রাণের ছলে নিসর্গে নীলিমা হয়ে থাকা,
—সঠিক জানিনা, আজ বিছুই আমার পক্ষে সত্য
বা মিথ্যা ঘোষণা করা সম্ভব হচ্ছে না।

বোধহয় এইভাবেই ক্রমশ মানুষের জন্ম
ফুরিয়ে নিঃশেষ হয়ে আসে
আর স্মারকগ্রন্থের মতো অপঠিত পড়ে থাকে মর্ত কবিতার মেধা,
ব্যক্তিত্ব একদা এসে গ্রাস করে তাকে।

ঢেউ

সুনন্দা বাগগুপ্ত

আকাশে তখন শেষবেলাকার রক্তআলোর রশ্মি,
গোধূলিলগনে লাগে রক্তিম দিঘধূ দিশাহারা।
ওপারের আলো তারার মতন ফুটে ওঠে ধীরে ধীরে,
সারাদিনস্বপ্নে গলার ঢেউ উথাল পাথালপাথা

চক্রবালের ঐ দূর কোণে ওড়ে যাযাবর পাখি
ডানায় তাদের নিরুদ্দেশের পুরবীর রঙ মাখা।
মনে পড়ে যায়— পদ্মা, মেঘনা, কীর্তিনাশার গান,
ডানা কাপটায় সোনার ঝাঁপিতে ঘনসবুজের পাখা।

পাশার দানেতে হেরে গেছি। তবু বারবার মনে পড়ে
সুপারীবীথির বেড়া দিয়ে ঘেরা পূর্ববাংলার গ্রাম।
মেঘছায়াঘোরা রূপালি দুপুরে শঙ্খচিলের ডাক।
জলাঙ্গী আর ইচ্ছামতী নদী – সেই মধুকরা নাম।

দু দু বালুচর। কর্ণফুলী ও রূপসার কল্লোল,
ভৈরব আর ধলেশ্বরীর উথাল ভোর যত,
নীলফুলে ছাওয়া পায়ে চলা পথ, উড়ন্ত মাছরাঙা,
দামালবাতাসে কাঁপে বেতবন প্রজাপতিটির মত।

গলার ঢেউয়ে মিশে গেছে আজ সাতসাগরের ঢেউ,
নীলকণ্ঠের রঙীন পালকে কতনা কাহিনী আঁকা—
হৃদয়লিখিত স্মৃতিবেদনার বিধুর বাসনাগুলি
দীপমুঠোনো শুক্তি মাঝে সযত্নে আছে রাখা।

বোধি

বিজয়কুমার দত্ত

মনেতেও ঠাণ্ডা লাগে—
পীত অপচয়ে রিক্ত করানো পাতার
ভালোবাসা দারুণ বিষাদ,
অরণ্যের আর্তনাদ
কানে বাজে।
তবুও তোমার, নিশ্চল মুখের রেখা
কাজে ও অকাজে
কেমন সহজভাবে, আমি কেও
ঘুরে ঘুরে রাখে।
মনে হয় সব মিথ্যা,
অথবা মিথ্যার মত রমণীর ঘনিষ্ঠ ছলনা
তোমার ওষ্ঠের স্পর্শে ছিল এতকাল।
সত্য তবু দুরান্তরে স্রাবিমা রেখার
চলাচলে সমুদ্র সকাল
হ'তে চায়—
আমার চোখের জলে হারানো নিঃশ্বাস,
তোমার বুকের মধ্যে পাহাড়ের শিলা ছিল,
পাথর-কঠিন, রুক্ষ অসম্ভব উষরতা ছিল
একথা বুঝিনি কেন, দিকশূন্য উথাল বাতাসে ?

এমন নিরুপদ্রবে

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

এমন নিরুপদ্রবে সারাদিন অনড় উদ্ভিজ্জচিত্রলেখার মতন হয়ে আছে :
বিছানার গায়ে শাদা ছাতকুড়ো-পায়ের পরে অনুজ্জ্বল সময়যাপনী—
জার্মানি পানার ভারে মজা পাঠ নির্বিঘ্নে এখানে-সেখানে
আমলকীর মতো হাসাদিয়ে জাগিয়ে—মাঠের মধ্যে বয়স্ক মালিক কবিতা—
উত্তরমেরু প্রকল্পের অকস্মাৎ বরফচুড়ি নীল হয়ে কিছুদূর ছড়িয়ে রয়েছে—
কেশগুচ্ছ দুলে উড়ে যায় কিছুদূর ট্রাকের পিছনে—
শুধু দিগন্তাল—ছাপনাল হাইওয়ে
হলদিয়া তফাৎ রেখে ধীরে ধীরে কিতে খুলে যায়—সব চলে যায়—
এত বিচক্ষণ ধীর নিস্তরঙ্গিত তরঙ্গবিহীন সব ভেসে চলে যায়—
এত কম আলো-মমাবিরহিত নিস্বাদ নীরব স্থির উদ্ভিজ্জজীবন
চিত্রার্পণে ভীষণ ফুরিয়ে দিয়ে বিবর্ণ স্তরের বর্ণাতীতে
ভেসে চলে যায়—
ওর মধ্যে আমার বাগান কুটীরের ছায়া অস্তিত্বনিকাশ-করা মেঘ ভেসে যায়—
ওর মধ্যে ভেসে যায় আমার স্বপ্নের পল্লী আঙিনা পুকুর—
ওর মধ্যে কবেকার সুধার দু-চোখ ভিজে পাঁ-দুখানি ফুটন্ত সোনালী স্তন
ভেসে চলে যায় ;
ওরা কেন আমায় এমন করে বর্শক সাক্ষিয়ে পাশে রেখে
স্থির দু-চোখে আমার যত ভবিতব্য ঢেলে রেখে অকাতরে
ভেসে চলে যায়।

রাজহাঁস

শশিভূষণ ভট্টাচার্য

পাহাড়ে অথবা জলে ছায়াময় মেঘস্নিগ্ধ দিনে
সৈনব লালিত হয়, প্রতিধ্বনি জেগে ওঠে, আমি
চায়ের টেবিল থেকে খুঁটে খাওয়া লক্ষ্য করি, আমি
ঘুরাগত পরিবেরে ভালোবেসে সংসার হারাই
যেমন তোমাকে দেখে জললীলা শিখি, দুপুরের
প্রবল বাদের বাধা ভেদ ক'রে ছুটে আসি, আর
দেখি সে বন্ধুর গতি জলস্থল একাকার ক'রে
ঝিলের ভাওলা ভেঙে ঢেউ তুলে গম্ভীর আওয়াজে
জলচর পক্ষীদের প্রয়োজনে তুমি নেমে পড়,
ততক্ষণে গৃহিণীরা দুপুরের সংসার গোছায়—
হয়তো আমারও কোন ঘর ছিল, গুছিয়ে নেবার
অভিপ্রায় ছিল, বুঝি, সেকি জলস্তম্ভে দুর্যোধন
ভয়ে কিংবা অভিমানে স্তম্ভিত কোনো নৈব আলোড়নে ?
অথবা তুমিই কক্ষ বন্ধুর জলজ প্রস্তাবনা ?

এবারও সে এসেছিলো

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

এবারও সে এসেছিলো। ফিরে গেছে. নিজ নাম লিখে।
দেয়ালে পোস্টার আঁটা, কিছু কথা গাছের ছুতায়
রেখে গেছে সন্ধিহীন
যন্ত্রনার মতো। নাকি কোন্ প্রত্যাখ্যানে
বাতাস প্রচার করে শারীরিক দাবী.
তাই চিঠি রেখে গেছে অবিশ্বস্ত পিয়নের হাতে!
কেননা, কলকাতা থেকে সেই সব সংবাদের খোঁজে
কেউ কেউ গিয়েছিলো
গ্রামে কিংবা ঘুঘুর পাহাড়ে। কেউ কেউ
হাওয়া বদলের নামে গিয়েছিলো পুরী কোনারক।

ঘন্টা বাজতে. সকলেই, ফিরে এলো।
কলকাতার বুকের সমাজে,
রয়ে গেছে তারই কিছু বৈধ গোপনতা.
বঙ্গোপসাগর থেকে ধরে আনা পাখিদের ডাক—
মেঘের বিচিত্র কারু কাজে
কলকাতার চিত্রিত আকাশ।

অথচ অনেক দূর ট্রেনে চেপে
কেউ তার কোনো খোঁজ পায়নি কোথাও।

যুগ-যন্ত্রণা

শান্তশীল দাশ

পাশাপাশি আছি তবু কেউ যেন কাউকে চিনি না ;
দেখা হয় থামি, হাসি, দু'চারটি কথা বিনিময়,
তারপর ছাড়াছাড়ি আপন আপন কাজে সব—
এমনি করেই কাটে দিন মাস কত না বছর।

প্রতিদিন একই মতো দেখা হাসা, কথা লেনদেন,
তবুও আমরা কেউ এতটুকু কাউকে চিনি না ;
অচেনা, অচেনা ঘড়ো, যাত্রী যেন দেশবিদেশের—
একটু আলাপ শুধু ক্ষণকাল কামরার মাঝে।

আমার মনের মাঝে কত কথা, কাকেই বা বলি,
সে-কথা আমার কথা, সে কথা শোনার কেউ নেই।
মন খুঁজে খুঁজে মরে আর এক মনের মত মন,
যে-কাঁদে যে হাসে আর কেঁদে হেসে কাঁদায় হাসায়।

সে-মন কোথাও নেই, মিলবে না কোনদিন হায়,
একটি জীবন্ত মন এ-হৃদয় তবু পেতে চায়।

নীল ভালোবাসায়

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আমি সোনার একটি মাছি খুন করেছি রাজপুরে
তাকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম, আঁধার-সমুদ্রে নৌকা
যেমন ভাবে বেঁচে ফিরতো—তাকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম
আমি সোনার একটি মাছি খুন করেছি রাজপুরে,
হঠাৎ ছুরি দৌড়ে এলো—হাতের মুঠো জব্দ করে
আঁধারে চালাতে বললো, যেমনভাবে মারে বৈঠা
সুখে ওপার হেঁকে বলছে, দুঃখমোচন করতে এসো
আমার পদ্মদীঘির কাছে শান-বাঁধানো ঘাটটি আছে
সেখানে কেউ কাপড় কাচে, দুঃখগ্লানি তুচ্ছ হলো—
নেশা আমার লাগলো চোখে, কে তুই মাছি দুঃখদায়ক
আমাকে বাঁধনে বেঁধে ফেলে রেখেছিস্ তোর কোটরে
হেঁটোয় কাঁটা-ওপরে কাঁটা, এই কী দীর্ঘ জীবনযাপন ?
এই কি রোমাঞ্চকর যামিনী, হায় মাছি তুই সোনার বরণ।
খুন করেছি হঠাৎ আমি বাঁচবো বলে একা-একাই
দূর সমুদ্রে পাড়ি দেবোই, পাহাড়চূড়োয় থাকবো বসে
চিরটাকাল চলবো ছুটে—পিছনে নেই, পশ্চাতে নেই
তবুও ক্ষুর পায়ের শব্দ, আমার ওরা ছেড়ে দিয়েছে

ছেড়ে দিয়েছে বলেই আমি সোনার মাছি জড়িয়ে আছি
দীর্ঘতম জীবন এবার তোমার সঙ্গে ভোগ করেছি
এই তো রোমাঞ্চকর, যামিনী—সোনার কোনো গ্লানি লাগে না
খুন করে নীল ভালোবাসার চক্রপ্রহর জড়িয়ে গেলাম।

কে কাকে

শিবদাস চক্রবর্তী

কে কার শুশ্রূষা করে ?
অন্ন আর বিকারের ঘোরে
ঘরে ঘরে শান্তিপ্রিয় সমস্ত মানুষ
আজকে বেহঁস — ।
পারা বেয়ে উঠে ওঠে যত দেহ-তাপ
কণ্ঠে জাগে বিশ্রান্তের অযুত প্রলাপ।

সান্ত্বনা কে দেবে কাকে ?
একই জবাব আসে প্রশ্ন করি যাকে।
সকলেরি চোখে জল
প্রত্যেকেই বুঝি বেশী নৈরাশ্যে বিহ্বল।
চেয়ে চেয়ে না-পাওয়ার প্রচ্ছন্ন বেদনা
আচ্ছন্ন করেছে যেন প্রত্যেকের আপ্রাণ চেতনা।

কে কারে ধিক্কার দেবে আজ ?
অপরাধ বোধে ত্রস্ত সমগ্র সমাজ।
মুখে মুখে বড়ো কথা যে যা'ই বলুক
মনে মনে প্রত্যেকেই যেন কোনো কিছুর ভিক্ষুক
বলিরাজ দৌজন্যের ছলে
ঈর্ষা ও বিদ্বেষ-বহ্নি ধিকি ধিকি জ্বলে।

চিন্তাধারা

হরেন্দ্রনাথ সিংহ

অতীতের যত চিন্তা আসিয়া
হৃদয়ে আঘাত হানে,
জীবনের সাথে আকুল করিয়া
কতো কি কহিছে কানে।
বুঝিতে পারিনা কি যে তা'র ভাষা,
ব্যথিত পরাণে জাগায় দুরাশা ;
এমনি করিয়া দিন যায় খালি—
বিরহ দহন দানে।

যতদিন যাহা হোয়ে গেছে গত
অতীতের পথে হারা,
কিসের ছলনে ভুলাতে আবার
কোথা হোতে আসে তা'রা।

কাহারে শুধাই কে শুনিবে কথা,
চিন্তা নীরবে জানায় বশ্যতা ;
চিরসাথী বুঝি হবে শত ব্যথা—
জীবনের অবসানে।

লাল পাশবালিশ বুকে ঝিঁঝিপোকাদের

সুনীল বসু

ওরে ঝিঁঝিপোকা যদ্যি ঝিহি ঝিলিঝিলি তাল কতবার তুই ফেলিস
রাত্রির কাঁচের মঙ্গল নদীতে
ঘড়ির টিকটিক শব্দ, কালের ডাইনী বুড়ির ক্রমাগত
নড়বড়ে দাঁত তোলা
ঘড়ির ঝিকমিক শব্দ, জাহাজের কাতর চিৎকার
দিগন্ত কাটানো
প্রসূতি-সদনে প্রথম পোয়াতির চাপা স্পষ্ট হাহাকার
রিক্সার টুন্‌ঠুন্ শব্দের আশ্চার্য ঘুম
ঘরে ছায়াপিণ্ড দিয়ে চোখহীন ভূত
এয়ারগানে ফাঁসি লাগা চাঁদ
খুট করে নাকচাবি সদৃশ ছোট হীরে-শব্দ, আলো জ্বালবার,
উদ্ধার অলঙ্ক এক রঙিন পেন্সিল
পাথুরে শ্লেটের বুকে,
শোন্ ঝিঁঝিপোকা, এতো সরু সুতো দিতে তুই রেশমের হাত চালাস
ক্রমাগত, আমি ঘুমতে পারিনা
ত্রিতলের চিল্-কুঠরীতে অন্ধকার জল হয়ে থাকে
চাঁদের খুশির অবিরলে
লাল পাশবালিশ বুকে কার কথা মনে পড়ে আফ্‌রান শরীর
আজ রাত্রি শনিবার হার্মোনিয়াম কেঁদে যায়
আজ রাত্রি, সাদা জোছনার অ্যালুমিনিয়াম করে যায়
কাল ছুটি রক্তলাল মধমল রবিবার
বৃষ্টির মশারি ফেলে রোগীর ওষ্ঠের মত তিতো দিন দিও না ঈশ্বর
ঝিঁঝিপোকা-বংশ, তোরা শিরিষ কাগজ ঘষা, একটুকু থামা
লাল পাশবালিশ বুকে আমি একটুকু স্বর্গে,
ভূস্বর্গে ঘুমোই ।

তোমার চতুর্দিকে

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

আমি চেয়ে আছি, কোথায় ফেরাবে আঁখি ?
উত্তরে শোক, দক্ষিণে সম্মোহ
পুবে পশ্চিমে রক্তে রচিত ব্যূহ —
আমি চেয়ে আছি, কোথায় ফেরাবে আঁখি ?

আমি ঘিরে আছি, কোন দিকে যাও দেখি ?
উত্তরে ক্ষোভ, দক্ষিণে করতালি
পুবে পশ্চিমে রেখেছি বনস্থলী
আমি ঘিরে আছি, কোন দিকে যাও দেখি ?

আমি বসে আছি দুয়ারের কাছাকাছি
রাত্রি ফুরিয়ে প্রভাত হলেই বাঁচি
সন্ধ্যায় শুধু সন্ধ্যাবলিটি বাঁচি
আমি বসে আছি দুয়ারের কাছাকাছি।

কে আছো সংসারে স্থায়ী সুখ নিয়ে

যতেশরঞ্জন গুপ্ত

কে আছো সংসারে স্থায়ী সুখ নিয়ে ?

মূর্খ তুমি, মূর্খ আমি, তাই
যা কিছু সম্মুখে হাতে পাই
খাঁমচে ধরি,
চিরকাল হয়ে থাক, স্মৃতির কাঙাল ;

সবি যদি কেবল ক্ষণিক
তবে আর ফেরাবো না তাকে,
চিঠি দেব প্রত্যুষের ডাকে।
নিজের শূন্যতা নিয়ে এখনো শ্মশান হয়ে আছি,
ধু ধু করে শুধু ধুলো, বালির পাহাড়,
মৃত্যুগুলি কেবল নীরবে এসে করছে প্রহার
মুক্তি চাই এ নিষ্ঠুরতার।

সম্পর্ক

অনিল রায়চৌধুরী

তেমন সৃষ্টির কথা নিজেই বলিনা
কী যেন কী যেন ভয়ে সারাদিন কাঠ হয়ে আছি
বক্ষঃস্থলে ভোরবেলা পুরোন দৈনিক খুঁড়ে তুমি সব জানতে পারো কিনা
গুলব ছড়িয়ে পড়ে কোন স্বপ্ন থেকে আমি কোন সত্য বাছি—
তেমন সৃষ্টির কথা ঘুমের চাদরে মুড়ে আলমারিতে রাখিনি গোপন
নতুন বাড়ির গন্ধ তীব্রতা চুলের ঝাঁজ আর্দিশে অচেনা কোন পাখী
বিপদ-সংকুল সব জন্মের বোঝাপড়া শুয়ে শুয়ে তুমি টের পাও সারাক্ষণ
খেলা আমি একা একা অনেক খেলেছি শুধু জানলার গায়ে ঢিল ছোড়া আছে বাকি
রংয়ের বদলে মনে হয় কিছু সৃষ্টি হতে পারে
কে জানে কেমন ছন্দে হাওয়ার নূপুর তুমি বাজাতে চেয়েও রহস্যের
তোমার বিছানা ছেড়ে অনর্থক দেখে আসা ছেঁড়া ক্যালেণ্ডারে
প্রত্যহ কি রবিবার ? সারাদিন বিকেল পড়ানো আলস্যের
তোমার রয়েছে ছাপে কিছুই হয়নি সৃষ্টি বুঝি কাগজের লেট সিটি এডিসনে
তোমার আয়ের আসে আমার হাড়ের মধ্যে অতি-সন্তর্পণে।

নারী-বন্দনা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

তুমি অপরূপ, তুমি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ পূজা পেয়েছ জীবনে ?
তুমি শুভ্র, বন্দনীয়, নারীর ভিতরে নারী, আপাতত একমাত্র তুমি।
বাথরুম থেকে এলে স্নিগ্ধ পায়ে, চরণকমলযুগল চুম্বনে মোছার যোগ্য ছিল —
তিনমাইল ঘুরে আমি ওষ্ঠ খুলে আছি,—পূজার জবার মত ওষ্ঠাধর
আমি পুরোহিত, দেখো, আমার চামর বাহু অতোৎসার শ্লোক
হৃদয় অহিংসু, মুখ সেমেটিক, প্রেমে ভিন্ন কপটিক খৃষ্টান —
আশৈশব থেকে আমি পুরোহিত হয়ে উঠে তোমার রূপের কাছে ঋণী,
তোমার রূপের কাছে অগ্নি, হোম, শঙ্খ, হবি,—পদাঘাতে পূজার আসন
ছড়িয়ে লুকাও তুমি বারংবার, তখন চণ্ডাল ক্রোধে লুব্ধ হয় আমার বাসনা।
নবলে তোমার বুকে বসি প্রেত সাধনার, জীবন জাপাতে চেয়ে জীবনের ক্ষয়,
ওষ্ঠের আর্দ্রতা থেকে রক্ত ঝরে, নারীর বদলে আমি স্ত্রীলোকের কাছে
যাবা খুঁড়ি, পুরোহিত ভ্রষ্ট হয়, পুরুষের মতো চোখে ক্রূরতা ছড়িয়ে
আঙুলে আকাশ ছুঁই, তোমার জঙ্ঘা থেকে নক্ষত্রের জন্ম হলে
আমি তাকে কণ্ঠপের পাশে রেখে আসি।

এ রকম পূজা আর খেলা হয়, দেখো, ত্রিশিরা ছায়ার ফাঁপে ইহকাল
এমন ছায়ার মধ্যে রূপ তুমি, নারীর ভিতরে নারী, রূপময় রূপ —
আমি ঋণী, শুধু ক্রীতদাস নই, তোমাকে পবিত্র করে যেন এক জন্ম স্বাধীনতা,
বিলোল কটাক্ষ থেকে জ্যোৎস্নালোক ঝরে পড়ে, একদিন জ্যোৎস্না থেকে
বৃষ্টিপাত হবে
নিহত পশুর রক্ত মেখে এসে, আমি স্নান সেরে চলে যাবো।

রবীন্দ্রনাথের ঔঁই-বকুল

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথ যখন কখনো কখনো অসুস্থ হতেন তখন ডাক্তারবাবুর নির্দেশে রবীন্দ্রদর্শন-প্রার্থীদের তাঁর কাছে যাবার অনুমতি সহজে দেওয়া হ'ত না। ডাক্তারবাবুর নির্দেশ সব সময় তিনি মেনে চলতেন না। যারা তাঁর পার্শ্বচর ছিলেন তাঁদের রাগ ক'রে বলতেন—"আমি এখন অসুস্থ নই যে যারা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারব না, দুটো কথা বলতে পারব না। তোমরা এত কড়াকড়ি ক'রনা।"

একবার যখন এইরকম ভাবে তিনি কিছু অসুস্থ ছিলেন তখন হঠাৎ কী একটা কাজে বোধহয় তাঁর ই কোন একটা নাটক কোলকাতার কোন একটা প্রেক্ষাগারে মঞ্চস্থ হবার কথা ছিল। তাঁর কোন নাটক অভিনয়ের জন্য মঞ্চস্থ হলে সেই মঞ্চে উপস্থিত থাকবার যথেষ্ট আগ্রহ তাঁর ছিল এবং কয়েক ক্ষেত্রে তিনি উপস্থিত থাকতেন, সামান্য অসুস্থতাকে অগ্রাহ্য করেও।

কোলকাতায় যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর ব্যস্ততা সত্ত্বেও আমরা তাঁর কোলকাতা যাবার অভিপ্রায়ে বাধা দিলাম। তবু আমাদের মনে হল তাঁকে বাধা দিয়ে শান্তিনিকেতনে আটকে রাখলে তিনি খুবই বিরক্ত হবেন। কাজেই ঠিক করা হল যে আমি তাঁকে কোলকাতায় নিয়ে যাব এবং সেখানে গিয়ে স্বাস্থ্যের অবস্থা বুঝে তিনি যথা কর্তব্য স্থির করবেন।

এই সব ঠিকঠাক্ হয়ে যাবার পর, আমাদের প্রবল আপত্তি আছে বুঝতে পেরে তিনি নিজেই স্থির করলেন যে সে যাত্রা কোলকাতায় যাবেন না। কিন্তু কোলকাতায় না যেতে পারার অভিমান তাঁর মনে থেকেই গেল। আমাকে ডেকে বললেন—"আমার শরীর যখন অসুস্থ এবং যখন আমাকে কেউ দেখতে এলে তোমরা তাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে দেবে না স্থির করেছ তখন আমিও স্থির করলাম তোমাদের সঙ্গে আর দেখা করব না। তোমরা আর আমার কাছে এসো না। আমি চুপ-চাপ নিজের ঘরে বসে থাকব। সামান্য ঘর-চারটে কাজ যা তোমরা করে দাও আমি নিজেই করে নিতে পারব।" তাঁর কথা শুনে মনে মনে হেসে গম্ভীর হয়ে বললাম "বেশ, কাল থেকে আর আসব না যদি আপনি ডেকে না পাঠান।" এই বলে সেদিনকার মতন আমি তাঁকে প্রণাম করে নিজের বাড়ী চলে এলাম।

আমি নিজের বাড়ী ফিরে আসার বোধহয় ঘণ্টা দু-এক পরেই আমাকে সংক্ষেপে একটা অভিমানপূর্ণ চিঠি লিখে পাঠালেন তাঁর পরম স্নেহের ভৃত্য বনমালীর হাত দিয়ে। আমি প্রায় রোজই সকালে-বিকেলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জনযোগে যোগ দিতাম। হয়ত তিনি ভেবেছিলেন তার পরদিন সকালে আমি তাঁর চা খাবার সময়ও যাব না। এই কথা ভেবেই তিনি আমাকে ঐ চিঠি লিখেছিলেন। ঐ চিঠিতে এক জায়গায় 'কেতু মেথরের' নামের উল্লেখ আছে, —চিঠিতে কেন কেতু মেথরের নামের উল্লেখ আছে সে বিষয়টা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি।

সে আজ অনেকদিনের কথা। তখন একদিন শান্তিনিকেতনের নীচু বাংলায় যেখানে টালি দিয়ে ছাওয়া একটা পাকা বাড়ীতে ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর থাকতেন। সেই বাড়ী এবং সেই বাড়ীর বড় কম্পাউণ্ডে আরও দু-একটি খড়ে-ছাওয়া মাটির বাড়ী ছিল। সেই খড়ে-ছাওয়া বাড়ী গুলিতেও দু-একজন গৃহস্থ সপরিবারে থাকতেন। যদিও দ্বিজেন্দ্রনাথ যে বাড়ীতে থাকতেন সেই বাড়ীটিকেই বিশেষভাবে নীচু বাংলা বলা হ'ত তবুও গোটা কম্পাউণ্ডটাই সাধারণ ভাবে সকলের কাছে নীচু বাংলা বলেই পরিচিত। একটি খড়ে-ছাওয়া মাটির বাড়ীতে শান্তিনিকেতনের জনৈক শিক্ষক সপরিবারে বাস করতেন।—সেই বাড়ীতে একবার ছোট-খাট একটা ডাকাতি হয়েছিল মধ্য রাত্রিতে। ডাকাত দলের যারা পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল তাদের মধ্যে একজন খুব বলিষ্ঠ ছিল, নাম তার ছিল 'কেষ্টু'। কেষ্টু ছিল এক সময় শান্তিনিকেতনের কলাভবনের পাহারাদার।

রবীন্দ্রনাথের যে চিঠির নকল এই প্রবন্ধে দেওয়া হল তা ১৩৩২ সালে লিখিত। কিন্তু এই ডাকাতিটা হয়েছিল তারও অনেক আগে। এই কথাটা তাঁর মনে ছিল সেইজন্যেই চিঠিতে পরিহাস করে কেষ্টু মেথরের নাম উল্লেখ করেছেন যদিও তখন কেষ্টু ইহলগতে নাই—জেলের থেকে ছুটি পেয়ে কিছুদিন পরেই সে নিজের দেশে গিয়ে একটা কঠিন রোগে মারা গিয়েছিল। কেষ্টু মারা গেলেও তার নাম আশ্রমবাসী তখনকার অনেকেরই মনে ছিল।

রবীন্দ্রনাথের চিঠি :—

"থাক তোকে কলকাতায় যেতে হবে না। গ্রাউকরকে লাগা, ছাড়াও ওঠা প্রভৃতি নড়া-নড়ির ব্যাপার আবার দ্বারা অসাধ্য। যদি ঠাঁই বদল করতেই হয় তো কিছুদিনের জন্যে কোনার্কের কোণের ঘরে শয়ন নেব—তাতে লাগাব বাইরের ধরলায়। কলা ভবনের কেষ্টু মেথরকে রাখব আমার ঘটি-বাটি সাফলাবার কাজে। তুমি প্রত্যহ প্রভাতে এক পেয়ালা চা পাবে—সঙ্গে থাকবে কিছু চাট্।

ইতি ত্রয়োদশী আশ্বিন ১৩৪২"

এই প্রসঙ্গে আর একটু বলি—চিঠি পেয়েই আমি সঙ্গেই উদয়নে গিয়ে উপস্থিত হলাম। শান্তিনিকেতনের উত্তরায়ণ-এর কম্পাউণ্ডের মধ্যেকটি ছোটবড় বাসগৃহের একটি ছোট বাড়ী হচ্ছে 'কোনার্ক'। এই ছোট বাড়ীতে সব সময়ই যে তিনি থাকতেন তা নয়। উত্তরায়ণের 'উদয়নে', 'শ্যামলীতে', 'গুহাগৃহে' এবং 'উদীচীতেও' থাকতেন—অর্থাৎ যখন যে বাড়ীতে ইচ্ছে থাকতেন। 'পুনশ্চ' বাড়ীতেও থাকতেন। এই বাড়ীগুলিতে সময় সময় তাঁর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বান্ধবরাও এসে থাকতেন। কোনার্কের বাড়ীতে যখন তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অনিলকুমার চন্দ সস্ত্রীক থাকতেন তখন একবার পণ্ডিত জহরলাল নেহরুজী ঐ বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের অতিথি হিসাবে কয়েকদিন ছিলেন। তাঁর তত্ত্বাবধান করতেন অনিল বাবু। 'পুনশ্চ' বাড়ীতে দীর্ঘ দিন প্রমথ চৌধুরী এবং তাঁর সহধর্মিণী ইন্দিরা দেবীও ছিলেন একবার দুদিনের জন্য লর্ড লোথিয়ান ও ছিলেন আরো ছিলেন একবার বেশ কয়েক দিনের জন্য আওয়াধের রাজা সূর্যপাল সিং। এই সব শ্রেণীর ব্যক্তিরা যখন যখন ঐ সব বাড়ীতে থাকতেন তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাঁই বদল করে উদয়ন বাড়ীতে থাকতেন। শ্যামলী বাড়ীতে মহাত্মা গান্ধীজি যখন যখন এসে থাকতেন তখন রবীন্দ্রনাথ হয় উদয়নে অথবা পুনশ্চ ঠাঁই বদল করিতেন। একবার উদয়ন বাড়ীতে সুভাষচন্দ্র বসু এবং তাঁর দাদা শরৎচন্দ্র বসু রবীন্দ্রনাথের অতিথিরূপে দু-তিন দিন ছিলেন। সেই সময় অবশ্য রবীন্দ্রনাথ উদয়ন বাড়ীতেই ছিলেন। শ্যামলী বাড়ীতে একবার আইীয় অধ্যাপক ডাক্তার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সস্ত্রীক রবীন্দ্রনাথের অতিথিরূপে ছিলেন। সেই সময়ও

রবীন্দ্রনাথ শ্যামলী বাড়ীতেই ছিলেন। বলতে ভুলে গেছিযে পুনশ্চ বাড়ীতে দীর্ঘদিন 'এণ্ড্রুজ' সাহেবও ছিলেন। এই সব বাড়ীতে মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে আরও কয়েকজন তাঁর অতিবিশ্বস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের থাকতে দেখেছি। আমাকে দেখে তিনি প্রসন্ন হলেন —বললেন 'আমি তাবলুম অভিমান করে তুই কাল সকালে আসবি না আমার অভিমানের পাল্টা জবাব দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি তাই চিরকুট লিখে পাঠালাম। ভেবে দেখলাম সত্যিই এই স্বাস্থ্য নিয়ে কোলকাতায় যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করাই উচিত। তুই যখন এসেই পড়েছিস, আর কিছুক্ষণ বোস্—দু'জনে মিলে জলযোগ করা যাবে। আমি খাব টী— অর্থাৎ যাকে বলে হালকা টী' আর তুই খাস তোর মনের মত 'টা'। রবীন্দ্রনাথ ছাকনীর উপরে চা রেখে তাতে গরম জল ঢেলে যে চা এর রস বার হত তাই কখনও দুধ দিয়ে কখনও বা সামান্য লেবুর রস দিয়ে খেতেন। এই দুই প্রকার চাতেই পরিমাণ মত চিনি দিতেন। বিনা চিনিতে চা খেতে তাঁকে কখনো দেখি নি। এই রকম হালকা চা যাকে ইংরেজীতে বলে লাইট টী তাকে বলতেন টী—আর কড়া চাকে পরিহাস-ছলে তিনি বলতেন 'টা'। আমি সামান্য কড়া চা পছন্দ করতাম বলে তিনি আমাকে 'টা' খেতে বলতেন। তাঁর সঙ্গে চা খেতে বসে সব দিনই যে "টা" খাবার সুযোগ পেতাম তা নয়, তাঁর হাতে তৈরী "টী" ও খেতে হতো।

রবীন্দ্রনাথের চিঠিকে উপলক্ষ করে এত কথা বলবার কারণ হচ্ছে এই যে বুঝতে পারছি আজ কাল রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধীয় খুঁটিনাটি বিষয়ও জানবার আগ্রহ অনেকের রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিতে 'ঠাঁই' বদলাবার কথা আছে। তিনি এক জায়গায় একবাড়ীতে বেশীদিন একটানা থাকতে চাইতেন না। তাই উত্তরায়ণেই কখনো এ বাড়ীতে, কখনো ও বাড়ীতে ঠাঁই বদল করতেন। আবার এক বাড়ীতেই এঘর-ওঘর বদলাতেন—কখনোশোবার ঘরের জন্য কখন লেখা পড়ার ঘরের জন্য। এ ছাড়া শান্তিনিকেতনের বাইরে মাঝে মাঝে ঠাঁই বদল করতেন কখনো জোড়াসাঁকোতে কোলকাতায়, কখনো বেলঘরিয়ায় অধ্যাপক শ্রীপ্রশান্ত মহলানবীশের বাড়ীতে, কখনো বা দার্জিলিং-এর পর্বত অঞ্চলে কালিম্পং-এর গৌরীপুর লজে, কখনোও মঙপুতে মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়ীতে। মঙপুতে কুইনিন কারখানার চীফ কেমিষ্ট তখন ছিলেন মৈত্রেয়ী দেবীর স্বামী শ্রী এস্ সেন।

একবার মঙ্পু পাহাড়ের চেয়ে আরও উচ্চে মেরুল পাহাড়ে কয়েকদিনের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাঁই বদল করেছিলেন। মঙপুতে তো তবু আশে পাশে দু-এক ঘর বাঙালী সরকারী অফিসারেরা থাকতেন। তাঁদের মধ্যে দু-এক জন শ্রী সেনের বাঙলোয় রবীন্দ্রনাথের দর্শনে আসতেন, আমি তাদের বাসায় গিয়ে অবসর মত মাঝে মাঝে আড্ডা দিয়ে আসতাম। কিন্তু বিপদ হল মেরুল পাহাড়ে গিয়ে। মঙপু হতে সেই পাহাড়ের উপরে ওঠবার পথ বেশ খাড়া। সেই খাড়াই পথে উপরে উঠতে ছোট মোটরকারেরও দম বেরিয়ে যায়। আর সেই পথের একদিকে পাহাড়ের দেয়াল, অন্য দিকে পথের গা ঘেঁসে চলে গেছে নিচে বন-জঙ্গলে ভরা গভীর খাদ। পথে চলতে অসাবধানতার জন্য পা ফসকালেই সোজা পাতালপুরীতে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। পথও খুব চওড়া নয়। কোনো রকমে ছোট মোটরকার খানা পাশে বাঁচিয়ে উপরে নিচে যাওয়া আসা করতো। এইসব জেনে শুনেও রবীন্দ্রনাথ মঙপু থেকে ঠাঁই বদল করে গেলেন মেরুলের পর্ব্বত শিখরে। শুনেছি মেরুলের উচ্চতা দার্জিলিঙের ঘুম পাহাড়ের চেয়েও অনেক বেশি।

মেরুলের যেখানে যে বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল সে বাড়ীটি ছোতলা বাঙলো প্যাটার্নের বাড়ী। ভালই বাড়ীটি। কিন্তু ঐ বাড়ীর কাছাকাছি বাঙালী কারো বাড়ী তো ছিলই না, অন্য কারও বাড়ী ছিল বলে মনে

পড়ে না। শ্রীসেন, মৈত্রেয়ী দেবী, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅনিল কুমার চন্দ আর আমি,—আর চাকর-বাকর, দু-একজন পাহারাদার—ব্যাস্ এই ক'জন। আমরা এই ক'জন—ছাড়া ঐ বাড়ীতে সহজে নিচের থেকে উপরে উঠে যাবার উপায় ছিলনা। উপর থেকে নিচে বেশ সহজে নেমে আসা যায়, কিন্তু তার পর উপরে উঠে যাওয়া বড়ই কষ্টসাধ্য হলেও আমি আর অনিল মাঝে মাঝে উপরের এই কয়েকটা এক-ঘয়ে ঘরে থাকার একঘেঁয়েমি থেকে হাঁপ ছাড়বার জন্য নিচে নেমে যেতাম মহুপুর ঐ দু-একজন ভদ্র লোকদের বাসায়। সেখানে দু এক ঘণ্টার বেশি আড্ডা দেবার অবসর হত না—কেননা ঐ চড়াই বা খাড়াই ভেঙে তো আবার ফিরে যেতে হবে হাঁপাতে হাঁপাতে।

সত্যি বলতে কি, ঐ রকমে থাকবার, খাবার ভাল ব্যবস্থা থাকলেও এবং শ্রীসেন ও মৈত্রেয়ী দেবীর কাছ থেকে সব সময় আদরযত্ন পেলেও আমি তো মনে মনে ভাগ্যদেবতার কাছে, সেখানে থাকার কয়েকদিন পরেই প্রার্থনা করতাম—কবে রবীন্দ্রনাথের মনে এখান থেকে "ঠাঁই" বদল করে আবার মহুপুতে কিম্বা কলকাতায় বা শান্তিনিকেতন ফিরে যাবার ইচ্ছে হবে।

খুব বেশিদিন ঐ জঙ্গলে জনমানবহীন নির্জনতা সইল না বলেই হোক আর যে কারণেই হোক, রবীন্দ্রনাথ সেখান থেকে ঠাঁইনিল ক'রে মহুপুতে নেমে এলেন। তারপর ফিরে এলেন কলকাতায়, কলকাতা হ'তে শান্তিনিকেতনে।

এই স্মৃতিকথা শেষ করবার আগে এইটুকুও বলে রাখি যে রবীন্দ্রনাথ যেমন এক এক সময় নির্জনতা পছন্দ করতেন আবার লোকজন তাঁর কাছে এসে বসুক গল্প-সল্প করুক এটাও চাইতেন। কাজেই এই দুই রকম চাওয়াও ছিল তাঁর মানসিক রাজ্যে "ঠাঁই" বদল করার মতন।

SREE MA TYPE FOUNDRY

QUALITY PRINTING MONO-TYPE FACES

&

WOODEN PRESS FURNITURE

MANUFACTURERS

●

259, Rabindra Sarani
Calcutta-5

22-0312 : Office
55-3547 Factory
65-9028 : Residence

রন্ধ্রপথে — শনি

আশাপূর্ণা দেবী

'মেয়ের বিয়ে? পাগল হয়েছিস্?' নতুনদা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমানের ভঙ্গীতে একটু গর্বিতহাসি হেসে বলেন।'

'মেয়ের বিয়ে দিচ্ছি টিচ্ছিনা! কেন, বিয়ে দিয়ে ঘরের মেয়েটাকে পরের হাতে তুলে দিতে যাবো কেন? মেয়ে আমার কী পাকাধানে মই দিচ্ছে, যে তাকে বাড়ী থেকে তাড়াতে হবে? তোর বুঝি এখনো ওই সেকেলে কুসংস্কারটা ঘোচেনি? মেয়ের বিয়ে দিয়ে করে পাগল হওয়া!'

নতুনদার এই প্রবল মতবাদে মিইয়ে যাই, ক্ষীণ স্বরে বলি, 'যাঃ কুসংস্কার আবার কি? বিয়েটাতো একটা স্বাভাবিক নিয়ম।

'স্বাভাবিক?' নতুনদা উদ্দীপ্ত হন, 'স্বাভাবিক মানে? আমিতো এর চাইতে অস্বাভাবিক কিছু দেখিনা! আমার মেয়েটাকে আমি খাইয়ে পরিয়ে বড় করে তুলবো, এখন কিনা তার ওপর সব দাবি দাওয়া ত্যাগ করে আর একজনের ঘরে তুলে দেব!'

'তা চিরকাল তাই-তো দিয়ে আসছে লোকে,' হেসে বলি, 'বৌদিকেও তুমি অন্য বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছ।'

নতুনদা এ হেন অকাট্য যুক্তিতেও দমেন না।

তীব্র স্বরেই বলেন, বৌদি! হুঁঃ। ছেড়ে দে আমাদের কালের কথা! বুদ্ধি সুদ্ধি বলে ছিল বালুর কিছু! আমি বাবা বুদ্ধি খেটে খাই। যা করবো পাকা বুদ্ধি দিয়ে করবো। আমার আদরের মেয়েগুলোকে পরের ঘরে পাঠাতে যাব না। দেখ দিকি তিনটি বোনে একসঙ্গে কেমন হেসে খেলে বেড়াচ্ছে! আর বিয়ে দাওতো কে কোথায়। 'সেই' রাজার রাজার দেখা হয়তো বোনে বোনে না দেখা' না কি বলিস তোরা। তাই হবে তো? দরকার কি দেখে দুঃখ ডেকে এনে? শুধু কি তাই, বিয়ে হলেই তো সঙ্গ হয়ে যাবে কাছা বাচ্ছা, কাঁথা কানি, ফুড মেলেনা, ঝি মোটেনা বামেলা কত! কী দরকার ওই কাঁটাবনে পা বাড়ানোর?'

নতুনদার অকাট্য যুক্তিতে আমি বিহ্বল হই! মেয়ের বিয়ে দেবার বিপক্ষে, অথবা না দেবার সপক্ষে যে আরো অনেক যুক্তির স্টক করে ফেলেছেন নতুনদা, তা তাঁর সদ্য গোলাপের উৎফুল্ল ও স্থিতপ্রজ্ঞ, মুখশ্রী দেখেই বোঝা যাচ্ছে!

তবু স্বভাব যায় না মলে।

সেই সেকেলে কুসংস্কারে বিশ্বাসী আমি মৃদু গুঞ্জনে বলি, 'যুক্তিগুলি সবই, কিন্তু—

'উঁহুঁ, উঁহুঁ, ওতে আর কিন্তু নেই। ও একেবারে স্থির সভা। মেয়ের বিয়ে দিয়ে করে বাস হয় বুঝতুম! এ শর্মা তা হবেনা।

আর একবার বুদ্ধি গর্বের মধুর হাসিটি হাসেন নতুনদা।

আমার অবশ্য এ ক্ষেত্রে আর কোনো ভূমিকা থাকবার কথা নয়, কিন্তু ব্যাপার অন্য। আমি এসে পদার্পণ করা মাত্রই বৌদি আমার শরণ নিয়েছেন, 'তোর কথা শুনু নেয়, তুই একবার বলে দেখ দিকি। এই মতিচ্ছন্ন মানুষকে নিয়ে আমার কী জ্বালা বোঝ! ধরাশে হতুম দিয়ে রেখেছেন, 'মেয়ের বিয়ে দেবনা। বলেন কি জানিস, বেশ আছে হেসে খেলে। বিয়ে দেওয়া মানেই তো দুঃখের অদৃষ্টের চিকিৎ

দিয়ে দেওয়া।'... এদিকে তিন তিনটে যাদিনী মেয়ে গলায় করে আমার প্রাণ রাতদিন খাঁচা ছাড়া হচ্ছে! সময়ে বিয়ে না হওয়া মেয়ে যে কী আগুনের খাপরা, সে তুই আর কী বুঝবি! বাপ দিচ্ছেনা বিয়ে, আমিই যেন চোর! খাওয়া পছন্দ হয় না, পরা পছন্দ হয় না, একটু কাজ করতে হলে মাতটা বছর দেয়, অপমানের জ্বালায় ইচ্ছে হয় বিষ খাই! তুই একটু বলে কয়ে দাখ ভাই!'

অতএব নিজের ভূমিকায় অবতীর্ণ হই। ক্ষীণকণ্ঠকে উচ্চ করে বলি—'তুমি তো নিজের হিসেবে অঙ্ক কষছো নতুনদা, বলি ওদেরও তো বিয়ের ইচ্ছে টিচ্ছে হতে পারে?

'বিয়ের ইচ্ছে!' নতুনদা যেন আকাশ থেকে পড়েন! যেন এমন অভূতপূর্ব কথাটা সহজে পরিপাক করতে পারছেন না। কষ্টে সামলে নিয়ে বললেন, 'বিয়ের ইচ্ছে! ভদ্রলোকের মেয়ের বিয়ের ইচ্ছে হবে, এমন কথা তুই ভাবলি কি করে বল তো? আমার মেয়েরা অমন অসভ্য নয় বুঝলি?'

কন্যা গর্বে গৌরবান্বিত নতুনদা আর একটু হাসেন, আর একবার বলেন, অমন ইচ্ছুতে নয়। বিয়ের ইচ্ছে! ছি! ছি! তবে আর মানুষ করার মহিমা কি রে? ওইসব উদ্ভুটে ইচ্ছে জাগবার ভয়ে ওদের আমি একখানা নাটক নভেলে হাত দিতে দিই না তা জানিস? একটা সিনেমা দেখতে দিই না। রেডিওটাকে পর্যন্ত চাবির তেতর রেখে দিয়েছি, পাছে যদি তখন প্রেম সঙ্গীত শুনতে বসে। একটা পরিকল্পনার সাফল্যেসফুল হতে হলে কত আটঘাট বেঁধে কাজ করতে হয়, জানিস তা?'

আর কিছু বলার ছিলনা। অথচ ওদিকে জানালার বাইরে থেকে বৌদি অনবরত ইসারা চালিয়ে যাচ্ছেন, 'আর একটু বল, আর একটু বল।'

তাই আর একটু বলি, 'সবই বুঝছি নতুন দা, তোমার শিক্ষাদীক্ষা উচ্চদরের, তাও অস্বীকার করছিনা—।

'করছিলনা তো? করবি কোথা থেকে? অস্বীকার করার উপায় আছে? মেয়েগুলো আমার ইস্কে নিজের মেয়ে বলে বলছিনা, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতেই বলছি, খুব সরল আর সৎ, বুঝলি? একেবারে দেবকন্যাদের মত! ওসব ছোট কথা ছোট চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামায় না ওরা!

উঠবার চিন্তা করি।

নিজের ক্ষুদ্রত্ব সম্পর্কে লজ্জিত হয়েই করি। কিন্তু জানলার বাইরে বৌদি। নতুনদার উদ্দেশে বিকৃত মুখভঙ্গী করছেন, এবং আমার উদ্দেশে মোহাই পাড়ছেন।

আবার অতএব যুক্তি দেখাতে হয়।

তা তো বুঝলাম, কিন্তু ওদের তো একটা অবলম্বনেরও দরকার, লেখাপড়াও তেমন এমোনি যে চাকরী বাকরী—

'চাকরী বাকরী!' নতুনদা যেন মরমে মরে যান, 'ছি ছি, তোর মুখে এই কথা! চাকরী করতে যাবে এই মুখুয্যে বাড়ির মেয়ে! কেন বাড়িতে অবলম্বনের অভাব? গেরস্তর কাজ নেই? ওদের ওই অবলম্বনের কথা ভেবেই আমি লোকজন সব ছাড়িয়ে দিয়েছি তা' জানিসনা বুঝি? ওরা যখন ইস্কুলে কিস্কুলে যেত, তখন তো তোর বৌদি তিন তিনটে লোক ভিন্ন চালাতেই পারতনা। ছি চাকর ঠাকুর! দিয়েছি তিনটেকেই জবাব'- নতুনদা নাকে একটিপ নস্যি টুসে কাপড়ে ঝরেপড়া নস্যির গুড়ো ঝাড়তে ঝাড়তে বলেন, 'নে, তিনবোনে কত কাজ করবি কর। নিজের সংসারের কাজ, মর্যাদার জিনিস; পরের চাকরীর মত 'ছোট' নয়।'

আর আমি বৌদির ইসারার প্রতি দৃকপাত মাত্র করিনা, 'যাক তা বলে তো ভালই—' বলে উঠে পড়ি।

নতুনদা বৃদ্ধ বন্ধ হাতে বলেন, 'শিক্ষা-দীক্ষা দিতে জানা চাই, বুঝলি! পদ্ধতির ভুলে সবাই সাকসেসফুল হতে পারে না। নইলে চাইতো সকলেই আমার ছেলেটি কৃতী হোক, আমার মেয়েটি লক্ষ্মী হোক! ছেলে তো যেমনি ভগবান,

দিলে বেঁধিয়ে দিতাম, কাকে বলে ছেলে তৈরী। সবাইয়ের মুখে শুনি ছেলে মেয়ে নিয়ে সমস্যা। ছেলেরা অবাধ্য, মেয়েরা সদা অসন্তুষ্ট. এই নাকি যুগের হাওয়া. আমি তাদের বলি তবে বাপু আমার বাড়ির দরজা জানলা সীল্ করা? যুগের হাওয়া ঢুকতে পারেনা। নচেৎ আমার মেয়েদের মধ্যে সদা-সন্তোষ কেন?'

হঠাৎ নতুনদার বড়মেয়ে রমা এসে ঘরে ঢোকে। তীব্র স্বরে বলে, 'বাবা: ছাড়বে তুমি এবার পিসিমাকে? সারাক্ষণ তো এইখানেই—।

'এই দেখো পাগলী মেয়ের কাণ্ড!' হা হা করে হেসে ওঠেন নতুনদা. 'দেখছিস রে? সাধে বলছিলাম পিতৃর অধম! পিসির সঙ্গে গল্প করতে পাচ্ছে না. বাপের ওপর তম্বি করতে এল। যাচ্ছে বাবা যাচ্ছে। পিসির কাছে তোদের কথাই বলছি— '।

'আমাদের কথা? আমরা বুঝি খুব একটা প্রসঙ্গ?' বড়মেয়ে ভুরু কুঁচকে তাকায়।

নতুনদা আবার হা হা করে হাসেন 'তা নয় কেন? আমার কাছে তোরাই সবসেরা প্রসঙ্গ। যা যা পিসিকে নিয়ে ভেতরে।

ভিতরে।

একেবারে খোদ রান্নাঘরেই নিয়ে আসে। দেখি রান্নাঘরের দরজা ভেজিয়ে বৌদি খুব সন্তর্পণে প্রায় নিঃশব্দে রুটি সেঁকছেন।

ভাবটা লুকোচুরির মত।

আমাকে দেখেই নীরবতা অবলম্বনের ইঙ্গিত করেন। ইশারায় বলেন 'বোস্।'

তারপর বলেন, 'রুটি কখানা সেঁকেই যাচ্ছি - ওদের ঘরে যোস গে।'

'আহা এখানেই না হয় বসলাম, কিন্তু এমন চুপি চুপি ভাব কেন?'

নতুনদার মেজ মেয়ে ঘরের মেঝেই বসে চা বানাচ্ছিল বাসনপত্র ছড়িয়ে। কাজটাই যে তার জীবনের পরম অবলম্বন মুখ দেখে এমন মনে হলনা। বলে উঠলো. 'চুপি চুপিই দরকার। এত রুটির খবর বাবাকে জানাবো হয় না, বাবা জানে রুটি শুধু বাবার, আমরা দু বেলা ভাত খাই।'

রুটি শুধু বাবার!

অতুল অন্ধকারে ভাসি।

দূর শৈশবের কথা মনে পড়ে। তখনতাম এ ভাষা। 'রুটি শুধু জ্যেঠামশাইয়ের।' শিশুদের কাছে পরমতম দুর্লভ ছিল বস্তুটা। কিন্তু এ যুগে? যে যুগে নাকি 'অন্নই' সর্বাপেক্ষা দুর্লভ?

স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিশ্চয় কোনো নতুন থিয়োরি পোষণ করেন নতুনদা। মেয়েদের জন্যে পিতৃহৃদয়ের উদ্বেগ নিয়ে অধিক মূল্যে সংগ্রহ করে আনেন সেই দুর্লভকে।

অবাক হয়ে বলি. 'তাই বুঝি? তাহলে তো চা জোগাড় করতে—'

'পাগল হয়েছিস!' বৌদি বলে ওঠেন, জোগাড়? তোদের দাদা দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষকতা করবে? রেশন ছাড়া জিনিস কিনবে? বলেছে, ওই চালেই টেনে টুনে চালাতে হবে।'

'কিন্তু রুটি কি বোষ করলে—'

মেজ মেয়ে আমার সামনে চায়ের পেয়ালা আর প্লেটে চারটি আলুভাজা ধরে দিয়ে বলে. 'আছে দোষ! সে রহস্য বুঝবেনা তুমি পিসি। ছেড়ে দাও।'

বৌদি বলেন. 'হ্যাঁ. শুনতে আর হবে না, পাগলের পাগলামী! কিন্তু এ কি চিনি যে টেনেটুনে চালাবো? লুকিয়ে রুটি করতে হয়, এই রান্নাঘরে বসিয়ে খাওয়াতে হয়।'

ছোট মেয়ে আস্তে এসে উঁকি মারে, 'চা আর আছে নাকি মেজদি ?'

'থাকবেনা কেন।' মেজদি রাগ তিক্ত গলায় বলে, 'চিনি ফ্যালাফেলা হলেই হয় !'

বৌদি অপ্রতিভ গলায় বলেন, 'আহা অমন করে বলছিস কেন ? দে না একটু।'

'দিচ্ছি. দিতে আপত্তি কি ! আপত্তি তোমাদেরই বুঝলে পিসি, পাশের বাড়ির বাবুরাদা পাড়া সুদ্ধু লোককে চিনি সাপ্লাই করছে. এ বাড়ির পরকা মাড়াবার হুকুম নেই তার। বেশী দামে যেখানেছাড়া জিনিষ কিনে দুর্নীতি করবেন না।

'আহা সে নীতি মানছিস তো কত ? বৌদি সহসা হেসে ওঠেন ! অথচ যেন হাসিটা মুখভঙ্গীর সঙ্গে খাপ খায় না। শুধু সেই বেখাপ্পা হাসির সঙ্গে বলেন, 'বুঝলে ভাই. মেয়েরা আমার পিতৃ আদেশ পালন করে ! বাবুরাদের ছাত থেকে এ বাড়ির ছাতে লাঠির আগায় প্যাকেট ঝুলে চিনি চালাচালি করে !'

অনেক কাল নতুনদার বাড়িতে আসিনি, দেখলাম অনেক কৌতুক জমা ছিল আমার জন্যে।

কারণ চিনিচালাচালি শব্দটার সঙ্গে সঙ্গেই নতুনদার সরল শিশু মেয়ে দুটির মুখে এমন একটু অলৌকিক হাসি ফুটে উঠলো যে—আচ্ছা থাক্ অলৌকিককে লোক চক্ষে টেনে না আনাই ভাল। চায়ে মনোনিবেশ করলাম।

'চল ঘরে গিয়ে বসি—

বৌদি নিয়ে গেলেন আমার মেয়েদেরই ঘরে, যে ঘরে বৌদির ছোট মেয়ে খাটের উপর উপুড় হয়ে পড়েছিল পুস্তক পরিবৃতা হয়ে।

হাঁ বহু বিচিত্র চিত্র শোভিত একরাশ পত্রিকা। হাস্যময়ী লাস্যময়ী স্ফূর্তিভাবরা. শিথিলবাসা সেই সব ললনা মূর্তি শোভিত পত্রিকা গুলিকে শীতা বা ভাগবত বলে সন্দেহ করবার হেতু নেই। বুঝলাম ছাতে ছাতে লাঠির আগায় ঝুলে শুধু যে চিনিই চালাচালি হয় তা নয়। অনেক কিছুই চালাচালি হয়।

সন্দেহ নেই, নতুনদার অজ্ঞাতসারে। কিন্তু বৌদি ?

এ বিষয়ে তাঁরতো চোখকান বন্ধ থাকাই স্বাভাবিক।

'তা ঠিক,' বৌদি বলেন চুপি চুপি. সিঁড়ির তলায়. স্বামীকে লুকিয়ে মেয়েদের লুকিয়ে, 'মা হয়ে এসবে চোখ কান বুজে থাকা উচিত নয়. কিন্তু করি কি বল ? তিন মিনিটে সনসনে উনুনের ঝাঁজে যদি সব করতে হতো তোকে তো বুঝতিস।'

হয়তো বুঝি।

এবং 'সনসনে উনুনের'ও দোষ দিতে পারি না। শুধু বলি, 'কিন্তু নতুনদা যে রকম নীতিবাগীশ, হঠাৎ যদি ওই সব ছবিদার পত্রিকা টত্রিকা গুলো চোখে পড়ে যায়—

হঠাৎ বৌদির মুখে একটা অলৌকিক হাসি ফুটে ওঠে। আরো রোঁয়াটে, আরো রহস্যময়। বলেন, 'চোখ বুজে থাকলে চোখে পড়াতে পারে কার সাধ্য ? ওঁর চোখে পড়বার ভয় নেই !'

বেরিয়ে আসছি, আবার ধরলেন নতুনদা। 'যাচ্ছিস ? একটু চা টা পেলি, না পালালি ? চিনির ব্যাপারতো জানিস ? আর আমার বাড়িতে তো ব্ল্যাকে' জিনিষ চোকবার জো নেই।'

'তা জানিনা, মোটকথা চা খেয়েছি—।'

নতুনদা বৃদ্ধমন্দ হাসেন।

নতুনদা নস্যির কৌটাটি খুলতে খুলতে বলেন, 'তা' বিদ্যে বলব না, ওটা তোর বৌদির বাহাদুরী। কী করে যে চালিয়ে নেয় ! অথচ আছে তো সব ? তার ওপর আমার বাতিকটি আছে।'

নতুনদা নস্যির টিপটি হাতে নিয়ে গায়ে ঝরে পড়া গুঁড়ো গুলো ঝাড়তে থাকেন।

'নতুনদা—যাই—'

'হ্যাঁ, এই চলনা স্টাণ্ড পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি।' টিপটা হাতে নিয়েই চটিটা পায়ে গলান নতুনদা। সেই গৌরবোজ্জ্বল মুখে বলেন, 'দেখলি তো মেজেদের? আছে অসন্তোষ? হয়েছে এযুগেরমত বিজী অবাধ্য উদ্ধত, বেপরোয়া, অসভ্য, গুরু-লঘুজ্ঞানহীন? হয়নি। হবে কেন? হতে দিলে তো? যুগের হাওয়া ঢুকতে দিইনি বাড়িতে।···গবেষণা করে দেখলাম বুঝলি, কোথা দিয়ে ঢোকে? কোন রন্ধ্রপথে। ভাবতে ভাবতে যুক্তি খুলে গেল।

নতুনদা এতক্ষণের টিপটা এতক্ষণে নাকে ঠুসে বলে উঠলেন, দেখতে পেলাম। রুটি!'

রুটি!

রান্নাঘরের সেই দৃশ্যটা মনে ধাক্কা দিয়ে যায়। বিস্ময় বিস্ফারিত লোচনে বলি, 'রুটি?'

'হ্যাঁ! ওইটিই তো আসল!'

নতুনদার মুখে লাভরঙের আলো, 'ওই তো শনির প্রবেশ পথ। আমাদের ঠাকুমা বলতেন, 'যার অন্ন যায়, তার গুণ গায়।' অতি খাঁটি কথা! তোদের এযুগের বিজ্ঞান অনেক শিখেছে ওটা শেখেনি। অনেক জেনেছে, ওটা জানেনি।—'খাদ্যপ্রাণ' নিয়ে মাতামাতি করছে, 'খাদ্যগুণ' নিয়ে বিচার করছে না। অথচ ওটিই হচ্ছে মূলাধার। 'চণ্ডালের ভাতে চণ্ডালের গুণ', তা ছাড়া রুটি একই। কি বলিস; কিন্তু রুটিটি হচ্ছে কি থেকে গম থেকে, কেমন? সে গম আসে কোথা থেকে? দেশের গমে তো কুলোয় না? আসে মার্কিন মুলুক থেকে।—ব্যাপ মিলিয়ে দেখ দুই আর দুইয়ে চার! ওদের গম খেয়ে ওদের গুণ ধরেছে।···সারা দেশটার চরিত্র বদলে গেল। বিশেষ করে ইয়ং জেনারেশান, যাদের পেটে আগের গুণের কিছুও বদল নেই। সব মার্কিনী স্টাইল! আমি তাই 'আমার মেজেদের রুটিখেতে দিই না! থাক ভাত খেয়ে খেয়ে ভেতো বাঙালীর মতেই থাক! রন্ধ্রপথে শনি ঢুকিয়ে কাজ নেই।···তা' চালিয়ে তো দিচ্ছে তোর বৌদি!'

আমি অকপটে বলি 'তা সত্যি! খুব চালাচ্ছেন। বাহাদুরী আছে।"

নতুনদা হা হা করে হেসে ওঠেন।

পিছন থেকে বাজতে থাকে হাসিটা।

মনে হয় একযোগে যেন অনেক ধস হা হা করে হাসছে।

কেন?

কাকে লক্ষ্য করে?

তা' জানি না।

UPPER GANGES SUGAR MILLS Ltd.
THE OUDH SUGAR MILLS Ltd.
NEW INDIA SUGAR MILLS Ltd.
THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS Ltd.
BHARAT SUGAR MILLS Ltd.
GOBIND SUGAR MILLS Ltd.

Manufacturers of

PURE CRYSTAL CANE SUGAR

Managing Agents :

BIRLA BOMBAY PRIVATE LTD.

(FORMERLY THE COTTON AGENT PRIVATE LTD.)

INDUSTRY HOUSE,

159, Churchgate Reclamation,

BOMBAY—1

জানকীর জন্মস্থানে

সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ। আমি তখন বিশ্বভারতীর ছাত্র। আমাদের ব্যাকরণাচার্য মৈথিলী মিশ্রজী আমাকে তাঁর দেশে নিয়ে যেতে চাইলেন। বয়স তখন অল্প, দেশ দেখবার উৎসাহ প্রচুর। বিশেষ জানকীর জন্মস্থান। তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলাম।

পূজার ছুটি এসে পড়েছিল। মিথিলা রওনা হলাম। দ্বারভাঙা জেলার উজিয়ারপুর স্টেশনে নেমে—মিশ্রজীর গ্রাম সালামপুরে পৌঁছালাম। পৌঁছেই বাড়ীতে সংবাদ পাঠালাম। কারণ বাড়ী ছেড়ে এই আমার প্রথম বাঙলার বাইরে আগমন। গ্রামে পোষ্টাফিস ছিল না। গ্রাম হ'তে কয়েক মাইল দূরে পোষ্টাফিসে গিয়ে নিজেই চিঠি ডাকে দিয়ে এলাম। ডাকঘরের নাম "ঘটোহো"। নামটি বিচিত্র। শুনে তখন খুব মজা লেগেছিল।

মিশ্রজীর গ্রাম সালামপুরে মাত্র কয়েকদিনই ছিলাম। আমাকে তখন জানকীর জন্মস্থান জনকপুর আকর্ষণ করছে। মিশ্রজী ও সম্বন্ধে লৌকিক অলৌকিক নানা কাহিনী বলে আমার মনে এক রূপকথার রাজ্য সৃষ্টি করেছিলেন। সুতরাং জনকপুর যাওয়ার জন্য তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললাম।

মধুবনীর নিকট এক গ্রামে মিশ্রজীর এক খুড়তুত ভাই-এর বাস। তাঁর সঙ্গে শান্তিনিকেতনে আলাপ হয়েছিল। তিনি এস, ডি, ও; প্রায়ই বিদেশে থাকেন। তাঁর অন্য এক ভাই দেশে থাকেন। তাঁর কাছেই আমাকে পাঠানো হলো। জমিদার এবং অবস্থাপন্ন ব্যক্তি।—কয়দিন তো বেশ আরামে চর্ব্যচোষ্য চলতে লাগল।

তারপর জনকপুর যাবার প্রস্তাব করলাম। ভদ্রলোক শুনেই চমকে উঠলেন—"সর্বনাশ! আপনি বিদেশী অতিথি, —জানে শুনে আপনাকে যমের বাড়ী পাঠাব?" আমি তো অবাক। জনকের বাড়ী, "যমের বাড়ী" হলো কিরূপে? তিনি বললেন—"সে কি ইংরেজ-রাজ্য? সে যে নেপাল-রাজ্য। তাও সীমান্ত প্রদেশ!—যত চোর ডাকাতের উৎপাত।—বিদেশী দেখলে বুঝবে সঙ্গে টাকা আছে। সুতরাং আর কথা নাই, একেবারে মাথাটি নিয়ে নেবে। বাঙালীর মাথা পেলে তো আর পড়তে পাবে না।"

আমার কিন্তু যাবার উৎসাহ এতে কমলো না। কিন্তু আমার যাবার উৎসাহে হবে কি! কেউ আমার সঙ্গী হতে চায় না। দীর্ঘাকৃতি জোয়ানগণও জনকপুরের নামে ভয় পেয়ে যায়।

সাতদিনের মধ্যেও "পাইক" সংগ্রহ করতে পারলাম না। তখন হঠাৎ মনে হলো—জগদীশ মিশ্র নামে এক মহারাজ (পাচক) শান্তিনিকেতনে কাজ করে। সে ছুটিতে দেশে এসেছে। পূর্বে সে প্রায়ই বলতো তার দেশে এসে তাকে খবর দিলে সে সমস্ত মিথিলা ঘুরিয়ে দেবে।

জমিদারবাবুকে তার কথা বললাম। তিনি অনুসন্ধান করে পরদিন প্রভাতেই তার গ্রামে লোক পাঠালেন।

সন্ধ্যাতেই সে এসে পড়লো—খবর পেয়ে তাকে দেখতে গিয়ে কিন্তু একেবারে নিরাশ হয়ে পড়লাম। দেখলাম সে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। তার নাকি জ্বর এসেছে। ম্যালেরিয়া জ্বর। সে কী কাঁপুনি। তার মধ্যেই সে বলল—"আজ ভোরেই রওনা হব!"

আমি তাতে মোটেই উৎসাহিত হলাম না। এ ব্যক্তি যে আজ ভোরে হাঁটতে পারবে—তা বিশ্বাস হলো না। পাঁচ-ছয় ক্রোশ রাস্তা। এই ম্যালেরিয়া রোগীকে নিয়ে গিয়ে কি বিপদে পড়বো! নিতান্ত নিরাশচিত্তে আহার সেরে শুয়ে পড়লাম। ঘুমের ঘোরে কার ডাক শুনলাম। কিন্তু তাতে আমার তন্দ্রা ছুটে নাই। শেষে ঠেলাঠেলির চোটে উঠে পড়লাম।

জগদীশ মিস্ত্রি। অনকপুর রওনা হবার জন্য তৈরি হয়ে এসেছে। জ্যোৎস্নারাত। সঙ্গে ঘড়ি নাই। বোধহয় শেষ রাত।—ভোর হতে নাকি তেমন আর দেরি নাই।—তাই আমায় তাগিদ দিচ্ছে।

আমি জামা কাপড় নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছি—হঠাৎ জগদীশ বলে বসলো—"জামা নেবেন না। খালি পায়ে নোংরা ধুতি পরে রওনা হতে হবে। মাত্র দু'খানা নোংরা ধুতি, তার বেশি আর কিছু নয়।" ধুতি যদি নোংরা না হয়ে থাকে—সে এখুনি তা নোংরা করে নেবে। আর রওনা হবার আগে আমার চুলও কাটতে হবে। নাপিত সে নিয়ে এসেছে।

শান্তিনিকেতনে থেকে বড় চুল রাখা অভ্যাস করেছিলাম। বেশ কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। সেই চুল নাকি কেটে ফেলতে হবে! এ বলে কি? মাথা নাড়া করে আবার নাকি একটি টিকি রাখতে হবে! এই অদ্ভুত, অকল্যাণকর প্রস্তাবে আমি তো হতভম্ব! সে বলে—"না হলে মাথা কাটা যাবে! চোর ডাকাতদের বোঝাতে হবে যে আপনি মোটেই বিদেশী বাঙালী নন—বেহারী কুর্দি! বাঙালীর মাথা পেলে—তারা তা নেবেই নেবে।"

মাথা নাড়া করতে আমি কিছুতেই রাজি হলাম না। যদি তারা আমার মাথা নিতান্তই নেয়—তবে ঐ কেশবিন্যস্ত মাথাটিই নেবে। নাড়া টিকিওয়ালা মাথা।—জীবিত বা মৃত অবস্থায় আমি তা বরদাস্ত করতে পারবো না।

বরফ ঘুতি পরতে বা নিতে আমার অমত নাই। কিন্তু একটি পেন্সি চাই। আমার দেহখানা তখন বেশ শীর্ণ। আমি তাকে কখনো অনাবৃত রাখি না। সুতরাং পেন্সি আমার চাই-ই। আমার জেদে, চুল এবং পেন্সি দুই-ই রাখার অনুমতি পেলাম। কিন্তু পেন্সি এবং জামা কাপড়ের যে দুর্দশা হবে—তা বলবার নয়।

মুহূর্তের মধ্যে তাদের এরূপ রূপ-পরিবর্তন কল্পনা করতে পারি নাই। জগদীশ অসাধ্য সাধন করলো।

তারপর রওনা হওয়া গেল।—সঙ্গে যৎসামান্য অর্থ। তাও জগদীশ অত্যন্ত গোপনে রাখবার ব্যবস্থা করে দিল।

চলেছি তো চলেইছি! ঘণ্টার পর ঘণ্টা। রাস্তা তো শেষ হয়ই না—এমন কি রাতও শেষ হয় না। জ্যোৎস্নারাত্রে এবং ম্যালেরিয়া জ্বরে বিভ্রান্ত, জগদীশ বোধহয় রাত বারোটার আগেই যাত্রা শুরু করে। যাক্! রাত যদি বা শেষ হলো, রাস্তা শেষ হবার নাম নাই। জগদীশ নিজেও এ রাস্তায় বোধহয় কখনো আসে নি! লোকমুখে শুনেছিলাম, পাঁচ-ছয় ক্রোশ রাস্তা। কিন্তু কখনো তা নয়। পাঁচ-ছয় ঘণ্টায় পাঁচ-ছয় ক্রোশ রাস্তা নিশ্চয়ই শেষ হয়ে যেতো!

সকাল হলো। রোদ উঠলো। বেলা বেড়ে চললো—নটা—দশটা—এগারোটা!—খিদে পেয়ে গেছে! ক্লান্ত হয়ে পড়েছি! এমন সময় ইংরেজ রাজ্য পার হলাম।

ইংরেজ রাজ্যের সীমান্তে এক কাঁড়ি, এবং তার কাছেই দোকান পেলাম। ছাতু ও চিঁড়ের দোকান। গুড় পর্য্যন্ত

নাই! দুধ দুরে থাক্। লংকা পাওয়া গেল। তাই দিয়ে জলসহযোগে ছাতু খেলাম। এখন নাকি এইভাবেই চলতে হবে। কুচ্ পরোয়া নেই। যখন "হুমের বাড়ী" রওনা হয়েছি, তখন আর খাওয়া পরার কথা ভেবে কি হবে!

কিন্তু একি ব্যাপার! দুপুর উত্তীর্ণ হলো!—কিকেল এগিয়ে আসছে! কিন্তু জনকপুর কোথায়? রাস্তায় যার সংগে দেখা হয়, সে-ই বলে, আর আধ ক্রোশ। সে আধ-ক্রোশ কি আর শেষ হবে না!

শেষে, যখন সূর্য পাটে বসছে—তখন একজন বল্লে—"ঐ জনকপুর।" দূরে এক মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে—ঐ নাকি জনকপুর! তখনও আধক্রোশ হবে! এটা সত্যিকারের আধক্রোশ। আমিও ক্লান্ত, জগদীশও ক্লান্ত! সুতরাং দু'জনেই এক আমবাগানে শুয়ে পড়লাম। উঠতে আর ইচ্ছা হয় না। ভুখা এসেছে!—শরীরে যেন আর কিছুমাত্র শক্তি নাই। সূর্য অস্ত যাচ্ছে—সুতরাং আমাদের উঠতে হলো। শেষ পর্যন্ত জনকপুরে পৌঁছালাম। অপূর্ব সুন্দর এক মন্দির! চূড়োগুলি স্বর্ণাভ। সূর্যের শেষ রশ্মি যেন সেখানে আটকে গেছে!

মন্দির-প্রবেশের পূর্বে জগদীশ এক দুঃসংবাদ দিল। "রাত্রে জেগে থাকতে হবে।" এর চেয়ে ভয়ঙ্কর সংবাদ পূর্বে কখনো শুনি নাই! সমস্ত রাত ঘুমোই নাই, বোধহয় কুড়ি-পঁচিশ মাইল রাস্তা হেঁটেছি। চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে। মনে হচ্ছে টলে পড়ে যাব। এ-অবস্থায় রাত্রে ঘুমুতে পারবো না—একি একটা কথা হলো!

"ঘুমুলে মাথা কাটা যাবে।"

মাথা কি প্রাণের চেয়ে বড়ো হলো! না ঘুমোলে যে প্রাণে যাবে!—তার চেয়ে ঘুমিয়ে মাথা যাওয়া ভালো।"

জগদীশ ভীষণ চটে গেল। বল্ল—"আপনি বড় বেয়াড়া। এমন জানলে আমি কখনো আসতাম না।"

আমি তখন খোসামুদি করে তাকে শান্ত করলাম। লোকটি সরল এবং সত্যই ভাল। যেমন সহজে রেগে যায়, তেমনি সহজে ঠাণ্ডা হয়। বল্ল—"এবার থেকে বাংলা কথা বন্ধ করুন। দেখুন, আপনার মাথার দিকে সকলে তাকাচ্ছে। এরপর বাংলা কথা শুনলে আর রক্ষা থাকবে না!"

আমার মাথাটি যে এমন দুষ্টবাবস্ত তা বাংলাদেশে থাকতে তেমন অনুভব করি নাই। মিথিলায় পদে পদে তা অনুভব করেছি। বিরাট মেলার মধ্যে যেখানে কেউ কারো দিকে ফিরেও চায় না—সেখানেও মানুষ থমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেছে—"আপ বাঙালী হ্যায়?" জনকপুরেও সকলের লক্ষ্য আমার মাথার দিকে। সুতরাং মাথাটি বোধহয় আর রক্ষা করা যাবে না। আজ রাত্রেই এস্পার ওস্পার হয়ে যাবে!

যাক্! মন্দিরে প্রবেশ করলাম। মন্দির সম্বন্ধে কিন্তু ধারণা বদলে গেল। এই নাকি মন্দির!—আরে এ যে রাজপ্রাসাদ! মহলের পর মহল পার হয়ে তবে দেবস্থানে প্রবেশ লাভ করলাম। রামসীতার স্বর্ণময় মূর্তি। অপূর্ব সুন্দর! চারদিকে পাহারাদার ঘোরাফেরা করছে। রাত্রে সেখানে কাউকে থাকতে বা শুতে দেওয়া হয় না। মূর্তি চুরি যাবার আশঙ্কা আছে।

যাই হোক দেবদর্শনের পর বাজারে যাওয়া প্রয়োজন। পেটের ভিতর আগুন জ্বলছে!

মন্দিরের শেষমহলে পদার্পণ করেছি—এমন সময় এক বিচিত্র মূর্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকার! খর্বাকৃতি, কৃষ্ণকায়—নগ্ন-দেহ—মুণ্ডিতশির—স্কন্ধে ভূটকম্বলবাহী এক মূর্তি! তাঁরও দৃষ্টি আমার মাথার দিকে এবং তৎক্ষণাৎ সেই বহুশ্রুত প্রশ্ন—"আপ্ বাঙালী হ্যায়?"

উত্তর দেবার পূর্বেই জগদীশ বলে ওঠে

হামারা ভাই হ্যায়।"

সেই ভূটকম্বলধারীর পুনরায় প্রশ্ন—"আপনি বাঙালী?"—একেবারে বাঙালীকণ্ঠের পরিষ্কার বাংলায় প্রশ্ন! আর

যায় কোথা! শেয়ালের ডাক শুনে সেই নীলবর্ণ পশুরাজ-সাজা শেয়াল যেন ডেকে ওঠে—আমিও তেমনি বলে উঠি—"হাঁ, হাঁ আমি বাঙ্গালী।"

জগদীশ হতভম্ব এবং আগুন। আমাদের দু'জনের কারোই সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। বহুকাল পর বাঙ্গালী পেয়ে দু'জনেই অনর্গল বকে চলেছি!

জগদীশ যখন বুঝলো—সাধুটি বাঙ্গালী, তখন অনেকটা শান্ত হলো। তিনজনে বাজারের দিকে অগ্রসর হলাম। রাত্রে জেগে থাকতে হবে শুনে সাধুটি বিস্মিত হলেন। তারপর জেগে থাকার কারণ শুনে হো হো করে হেসে উঠ্‌লেন। তাঁর হাসিতে জগদীশ ও আমি উভয়েই চমকিত। আরে! লোকটা হাসে কেন?

সাধু অনেকক্ষণ প্রাণভরে হেসে নিয়ে বল্লেন—"আরে মশাই, একি যুগের মুলুক! এ নেপালের সুরক্ষিত রাজ্য। জনকপুরে নেপালের পুলিশ বাহিনী রয়েছে। আমার সঙ্গে তাদের খুব ভাব। আমি এখানে আজ পনেরো দিন রয়েছি—এমন কথা কোথাও শুনি নাই!—তবে হাঁ, দশবছর আগে নাকি কতকটা এরূপই ছিল!"

এর চেয়ে সুসংবাদ বোধহয় আর কখনো শুনি নাই। বুঝলাম—জগদীশের যেখানে বাড়ী সে-অঞ্চলের কোনো লোক দশবছর এদিকে যাতায়াত করেনি। দশবছর পূর্বের বিভীষিকা মনে পুষে নিয়ে তারা দেশে বসে আছে।

এখন নিশ্চিন্ত হয়ে আহারের জন্য বের হলাম। সাধু বল্লেন—"খাবার মধ্যে তো ছাতু ও চিঁড়ে। সে আর এখন বেশি খেয়ে পেট ভার করবেন না—রাত্রে মন্দিরে প্রসাদ খাওয়া যাবে। ভাত—ডাল, তরকারী।"

এরপর এক সুসংবাদ এবং এমন লোভনীয় সংবাদ সাধু দিতে লাগলেন যে তাঁকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে হলো। বয়সেও সাধু আমার সমবয়সী। শুনলাম, পাবনা জেলায় বাড়ী, বি, এ পাস। হঠাৎ এ বয়সে কেন যে এমন বৈরাগ্য এলো, তা অবশ্য তিনি বল্লেন না। বি, এ পাশ সাধুর নেপালী পুলিশের সঙ্গে বড় খাতির। মন্দিরের বাইরের মহলে শোবার ব্যবস্থা হলো।

প্রসাদ পাওয়া যাবে রাত দশটায়—তারপর শোওয়া। যদিও ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে—তবু ক্ষুধা শান্তির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

জগদীশের সেদিকে কোনো আকর্ষণ নাই। সে তখন মুড়ি দিয়ে কাঁপছে। জ্বর এসে গেছে।—ম্যালেরিয়া জ্বর। সেই জ্বরের ঘোরেই চিঁ চিঁ করে বলে—"কাঁছা-খোলা (লুঙ্গির মত কাপড় পরা) নেপালী বামুনের হাতের রান্না আমরা খাই না।"

সাধুর এবং আমার যে-কোন জাতের হাতের রান্নায় আপত্তি নাই। তা সে কাছা-খোলা মুসলমান হলেও! এরা কাছা-খোলা হ'লেও বামুন। এতে আর কথা কি?

কিন্তু খেতে বসে হতাশ হলাম। ভাত তো পেলাম। কিন্তু ডাল তরকারি কই? তরকারির বদলে ঘনে পাতার চাটনির মত আধচামচ কিছু একটা পদার্থ পেলাম। তা এক গ্রাস অন্নেরও অনুসঙ্গী হবার যোগ্য নয়। স্বাদ বুঝবার পূর্বেই তা নিঃশেষ! এরপর ডালের নামে যা দিল, তা স্রেফ জল এবং তাও এত সামান্য যে ভাত ভিজলো না। যতই ক্ষিদে পাক সে-ভাতের অর্ধেকও শেষ করতে পারলাম না। আমাদের সঙ্গে অনেকগুলি সাধু খেতে বসেছিলেন—আমরা বাঙ্গালী দু'জনে তাঁদের দিকে চেয়ে দেখি, সব ভাত নিঃশেষ করে ফেলেছেন। পুনরায় তাঁদের ভাত দেওয়া হলো—ভাও তাঁরা নিঃশেষ করলেন। আমাদের পূর্বের ভাতেরই অধিকাংশ রয়ে গেছে দেখে, পাচক অনুগ্রহ করে আরও কিছু ডাল দিলেন। অধিকারীর নির্দেশে সেই অর্ধচামচ-পূর্ণ বস্তুও পুনরায় পেলাম। শুনলাম তাই নাকি 'শাক' অর্থাৎ তরকারি। যাই হোক কোনোরূপে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে উঠে পড়লাম।

রাত্রে বেশ সুনিদ্রা হলো। ফলে ভোরবেলা কেউ উঠতে পারলাম না। যখন জাগলাম তখন বেশ বেলা উঠে গেছে। আসলে রোদই আমাদের উঠিয়ে দিয়েছে। আমরা বারান্দায় শুয়েছিলাম।

একে বেলা হয়ে গেছে—তাতে সকলেই ক্লান্ত; তাই স্বয়ং জগদীশই ফতোয়া দিল—"আজ এখানেই থাকা হবে। এখানেও দ্রষ্টব্য বস্তুর অভাব নেই; সারাদিন তাই দেখা যাবে।"

কাল আমাদের ভাল করে খাওয়া হয় নাই—তাই জগদীশ প্রস্তাব করলো, সেই আজ রান্না করবে। তা না হ'লে সেওতো খেতে পাবে না। কাজ-খোলা বাবুদের হাতে তো সে খাবে না। আমাদেরও আর সে খাওয়ার উৎসাহ নাই।

এর মধ্যে একটা কথা বলা হয় নি। আমার টাকাকড়ির কিছু অংশ নেপালী পয়সাতে পরিণত হয়েছে।—নেপালী পয়সা বড় বিচিত্র। একজন পরিণত পুরুষের তর্জনীর প্রথম 'পাব' যদি কেটে নেওয়া হয়—তবে তা যে-আকৃতি ধরে, নেপালী পয়সার আকৃতি তাই।—এক টুকরো তাম্রখণ্ড—তাতে কোন রাজকীয় ছাপ নেই। এমন ৬৪টি পয়সাতেই ট্যাঁক বেশ ভারী হয়ে যায়। তবে জিনিষপত্র এতই সস্তা যে সেই চৌষট্টি পয়সাই খরচ করা বেশ কঠিন।

চাল, ডাল কিনতে হলো না—সাধুই এনে দিলেন। বিচুড়ীর জন্য কিছু ঘি আনতে হবে। জগদীশ আমার কাছে পয়সা চাইলো। আমি সোটা আষ্টেক পয়সা দিচ্ছিলাম। জগদীশ অবাক! "এত ঘি কি হবে? বাড়ী নিয়ে যাবেন?" আমি তো অবাক। "বাড়ী নেব কেন? বিচুড়িতে দেব এবং খাতে পাব।" জগদীশ বল্ল—"তাহলে এক পয়সাই যথেষ্ট।" পাগল নাকি? এ বলে কি? সাধুও তার কথা সমর্থন করলেন। আমি তবু দু'পয়সা দিলাম।

দু'পয়সার ঘি দেখে বুঝলাম পোলাও রাঁধা চলে। যাইহোক খেচুড়ী বেশ রাজকীয় হলো। তারপর গাছতলায় বিশ্রাম।

অপরাহ্নে জনকপুরের দ্রষ্টব্য স্থান দেখে' বেড়াতে লাগলাম। কাল ভোর "ধনুখা" যাব। এখন "ধনুখার" কিছু পরিচয় দিই। রাম যখন হরধনু ভঙ্গ করেন, তখন তার কতকটা অংশ ছিটকে পাঁচ-ছয় ক্রোশ দূরে পড়ে। যেখানে সেই ধনুক খণ্ড পড়ে, সেই জায়গার নাম "ধনুক" বা "ধনুখা"। সেখানে নাকি সেই ধনুকখণ্ড এখনও আছে—পাথর হয়ে গেছে। এ জিনিস না দেখলে চলে! সুতরাং জনকপুরের চেয়ে "ধনুখা"র আকর্ষণই বেশি। এদিকে আবার শুনেছিলাম ধনুকের বাকি অংশ নাকি জনকপুরেই আছে। কোন এক পুকুরের জলে। জনকপুরে পুকুরের অভাব নেই। বিরাট, বিরাট অতলস্পর্শী জলাশয়। এর কোনটায় নাকি দশরথ রাজা স্নান করেছিলেন—কোনটায় রাম-লক্ষ্মণ, কোনটায় বিশ্বামিত্র। আমাদের কিন্তু লক্ষ্য যার সন্ধানে ধনুক সেই পুষ্করিণী। প্রত্যেক জলাশয়ই পুষ্করিণী। পুষ্কর বা পদ্মে ভরা। কী সুগন্ধি সে জল। তার পাশের কূয়োর জল পর্যন্ত পদ্মগন্ধি। আমরা জল খেয়ে অবাক!

যাক্! এখন কোন পুকুরে ধনুক আছে, তা জানতে হবে। এক সাধুর দেখা পেলাম। জনকপুরের পথে ঘাটে সাধু। মেলার সময় নাকি ষাট হাজার সাধু আসেন। এখনও শ'খানেক আছেন।

নতুন সাধু আমাদের বল্লেন যে তিনি ধনুকখণ্ড দেখাবেন—কিন্তু আমাদের একআনা পয়সা দিতে হবে। আমরা সামান্য দরদস্তুর করলাম—কিন্তু সাধু কিছে রাজি নন—ধনুক দেখবার উৎসাহে খুসী হয়েই এক আনা দিতে রাজি হলাম। তবে, তা ধনুক দেখা হ'লে দেব—এই হলো শর্ত।

সাধু নানা দ্রষ্টব্য স্থান দেখান—কিন্তু ধনুক আর দেখান না। যা দেখান তা দেখবার মত—কিন্তু মন আমাদের পড়ে

আছে ধনুকের দিকে। এক জায়গায় সাধুদের বাসস্থান দেখলাম—সে সত্যই দেখবার মত।—একটা বৃহৎ পুষ্করিণীর চারপাড়ে কলাগাছ আর তার মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঝোপড়ি—তাতে এক একটি সাধু! একটিতে একটির বেশি সাধু থাকবার উপায় নাই—কারণ সে নিতান্ত সংকীর্ণ। একজন তাতে কোনরূপে শুতে পারে। এবং বসতে পারে, দাঁড়াতে পারে না—কেননা উবু হয়ে বসলেই প্রায় চালে মাথা ঠেকে। এক একটি ঝোপড়িতে উবু হয়ে হনুমানের মত সব সাধু বসে আছেন!

মাঝে মাঝে আমাদের সেই এক কথা—"ধনুক কই?" সাধু সব দেখান কিন্তু ধনুক আর দেখান না। আমরাও পয়সা দিই না।—এদিকে রাত হ'য়ে এলো। ডেরায় ফিরতে হবে এবং কিছু আহার করে শুয়ে পড়তে হবে। কাল ভোরে রওনা! শেষে সাধু আমাদের বল্লেন—"ধনুক এখন দেখা যাবে না। যখন 'বরধা' হবে তখন ধনুক আপনি 'তালাও'-এর জল থেকে উঠে 'আসমানে' যাবে। 'আসমানের' দুইধার জুড়ে 'তোড়া' রামজীর 'ধনুখ্' দেখতে পাওয়া যাবে।"

এরচেয়ে অবাক জীবনে হই নি। এই রামধনু দেখবার জন্য জনকপুরে আসবার দরকার আছে কি? সাধু বোধহয় জীবনে জনকপুরের বাইরে যান নি। তাঁর মধ্যে কোন চাতুরী নাই—তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস জনকপুর ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও এ জিনিস দেখা যায় না।

হায় ভগবান! এমন লোকও সংসারে আছে! আমরা বিনা আপত্তিতে একআনা পয়সা সাধুকে দিলাম। তিনি আমাদের প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন।

ভোরবেলা "ধনুখা" রওনা হলাম। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ। বিরাট জঙ্গল। আমাদের সকলের কাছেই তা অদৃষ্টপূর্ব। তবে শুনলাম—এ জঙ্গল এখন নাকি অনেক ফাঁকা হয়ে গেছে। পূর্বে এখানে সূর্যরশ্মিও প্রবেশ করতো না—এবং হিংস্র জানোয়ারের দেখা মিলতো পদে পদে। এখন যে একেবারেই তাদের দেখা মিলবে না—এমন কোনো কথা নাই। সুতরাং অতি সন্তর্পণেই আমরা চলতে লাগলাম। মাঝে মাঝে এখনো অসুর্যম্পশ্য স্থাপনের সাক্ষাৎ মিলতে লাগলো। তবে সৌভাগ্যক্রমে জানোয়ারের দেখা পাওয়া গেল না।

বেলা বারোটা নাগাদ "ধনুখা" পৌঁছালাম। খুব শান্ত পরিবেশ। এখানেও এক বৃহৎ পুষ্করিণী। তার পাড়ে দুই-একটি কুটির, যেখানে সাধু থাকেন। পুকুর পাড়ে এরূপ একটি সাধুর দেখা পেলাম। হয় তিনি সাধক, নয় পাগল। তাঁর মুখে একমাত্র বুলি—"সীয়া-রাম", "সীয়া-রাম"। তিনি পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে, ঊর্ধ্বে এবং অধোদেশে, অতি সন্তর্পণে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন—আর ঐ 'সীয়ারাম' 'সীয়ারাম' বলে চলেন।—বোধহয় দিবারাত্রি ঐ করছেন। তাঁকে প্রশ্ন করে কোনো লাভ নাই। কেননা তিনি সব বুলি ভুলে গেছেন। আজ চল্লিশ বছর পরেও তাঁকে আমি মনশ্চক্ষে পূর্বের মতই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—হয়তো আজও তিনি তাই করে চলেছেন। সেই নির্জন শান্ত পৌরাণিক পরিবেশে সাধুর সেই অদ্ভুত আচরণ আমাদের মানসপটে অঙ্কিত হয়ে গেছে।

যাই হোক, এরূপ এক সাধুর কাছে আর কতক্ষণই বা থাকা যায়। আমরা খাবার চেষ্টায় দোকানের সন্ধান করলাম। একটি দোকান পেলাম, যেখানে ছাতু ও চিঁড়ে পাওয়া যায়। কিন্তু জগদীশ আমাদের সেখানে কিছুই কিনতে দিল না। সে দোকান নাকি এক সাহার। সেখানে ব্রাহ্মণ খাদ্যদ্রব্য কিনতে পারে না। ব্রাহ্মণ হওয়ার যে এমন ফেসাদ আগে বুঝি নাই। যাই হোক। জগদীশ অন্যত্র আমাদের আহারের ব্যবস্থা করলো। ঐ দোকানের কাছেই সে এক বৈষ্ণবিনী ব্রাহ্মণের দেখা পায়। তিনি এখানে পৌরহিত্য করেন। তাঁর কুটীরে আমাদের যথাযথ ভোজন।

আপাতত, সক্ত, ও চিপিটক আহার বন্ধ রেখে স্নান করে নিলাম।

স্নানের পরই ধনুকদর্শন। একটু দূরে, একটি গাছের নীচে, দুইখণ্ড ধনুক। চারিদিকে পাকা দেওয়াল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। ধনুক বলে বোঝবার উপায় নাই। বেশ কয়েক হাত লম্বা,—বিরাট একজোড়া অজগরের মত, দুই সারি কালো পাথর। কাঠের ধনুর টুকরো নাকি পাথর হয়ে গেছে। কালো কাঁকর-জমা পাথর। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়ার এবং মানভূমের বহু জায়গায় যে ধরণের পাথর দেখা যায়! অনেকক্ষণ ধরে দর্শন করলাম। এতবড় প্রকাণ্ড ধনুক কোনো মানুষের পক্ষে তোলা এবং ভাঙা সত্যই এক অসম্ভব ব্যাপার, রাক্ষস রাবণ পর্যন্ত নাকি তা পারে নি। চুপি চুপি দু'এক টুকরো ধনুক চূর্ণ সংগ্রহ করলাম। বহুদিন তা গৃহে রক্ষিত ছিল। হয়তো এখনো কোথাও তা পড়ে আছে।

দুপুরে ভাত মিললো। ভাত এবং লাউ-এর তরকারী। "গন্ধরীকা চাউল আউর সজনকা শাক।" গন্ধরীর চাল সেই যে দেখেছি আর জীবনে দেখি নাই। জানি না আর কোনোদিন তার দেখা মিলবে কি না। মোটা মোটা বড় বড় লাল চাল। বেহারী মজুর ছাড়া সে চাল নাকি অন্যেরা হজম করতে পারে না। বেহারী মজুরেরা সে চাল খুব পছন্দ করে—কেননা তা দম-ভারি। একবার খেলে বেশ কয়েক-ঘণ্টা না খেলে চলে। আমরা দুই বাঙালী ভদ্রলোক এবং এক মৈথিলী ব্রাহ্মণ, অন্য এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে তাই খেলাম। অন্য কোনোরূপ চাল সেখানে বোধহয় মেলে না। তাই মজুর না হয়েও তাঁরা তাই খান। আর আমরা তো এ কয়দিন মজুরের মতই হয়ে গেছি! —পোষাকে, পরিচ্ছদে চেহারায় এবং পরিশ্রমে, বেহারী মজুরের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ কোথায়? তাই নির্ভয়েই এবং পরম-তৃপ্তিভরেই আমরা সেই "গন্ধরীর" চালের ভাত কেবলমাত্র "সজনের শাক" দিয়ে আহার করলাম। তারপর জল খেতেই বেশ ভারি হয়ে পড়লাম। তখন আর বসে থাকা গেল না—তিনজনেই বারান্দায় শুয়ে পড়লাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না—হঠাৎ গৃহস্থের কণ্ঠস্বরে ঘুম ভেঙে গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করছেন—রাত্রে আমরা কোথায় থাকবো! তাঁর একটি মাত্র ঘর—সেখানে তাঁরা সস্ত্রীক থাকেন—সেখানে তো আর থাকা যাবে না!

আমরা শুয়ে শুয়েই পরমনিশ্চিন্তে উত্তর দিলাম—"আমরা এই বারান্দাতেই থাকব।"

গৃহস্থ বলেন—"সেকি। বারান্দায় থাকবেন কেমন করে!"

আমরা বললাম—"তাতে কি! এখন তো শীতকাল নয়—আমরা বেশ ঘুমুবো।"

এরপর গৃহস্থ যা বল্লেন—তাতে আমাদের সকলের শরীরের শিরা দিয়ে বিদ্যুৎতরঙ্গ বয়ে গেল। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতই আমরা চমকে লাফিয়ে উঠলাম—এবং তৎক্ষণাৎ অনির্দিষ্ট নিরাপদ স্থানের উদ্দেশে রওনা হলাম।

রাত্রে নাকি ওখানে মাঝে মাঝে হাতী আসে। হাতী! বুনো হাতী! বাঘ শুনলেও বোধহয় অতটা ভয় পেতাম না।

গৃহস্থের নির্দেশ মত আমরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রাস্তা করলাম। সন্ধ্যার পূর্বে গ্রামে পৌঁছানো চাই।

"গন্ধরীর চাল নাকি হজম করা বেশ কঠিন"—এই কথা একেবারে বর্ণে বর্ণে সত্য বলে মনে হল যখন প্রায় সন্ধ্যার দিকে এক গ্রামে পৌঁছালাম। গ্রাম দেখেই মনে হল যেন প্রাণ পেলাম। "প্রাণ নিয়ে তো সটকেছিরে, করবি এখন কী!" "বাল্মিকী প্রতিভার" ঐ লাইন দুটি বার বার মনে আসতে লাগলো। কিন্তু তখনও যে কত দুঃখ কপালে আছে তা কি জানতাম! জগদীশ মিশ্র খোঁজ নিয়ে জানলো—সেটা সাহার গ্রাম—অতএব সেখানে থাকা চলে না।

"তাতে কি। আমরা না হয়, না খাব—কেবল শোব।"

ভগবান মধুর এই বরপুত্রটির মতে তাও চলে না। বিদ্রোহ

করবার অবকাশ পেলাম না। আমাদের দু'জনকে দু'হাতে ধরে সে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চললো। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত মৈথিলী আমাদের মত দু'জন বাঙ্গালীকে সংযত করবার শক্তি রাখে।

হঠাৎ এক অশ্বারোহীর আবির্ভাব। সে যেন এক রূপকথার রাজপুত্র। সেখানে যে এক সম্ভ্রান্ত অশ্বারোহীকে পাওয়া যাবে—এ নিতান্তই অপ্রত্যাশিত।

তিনি আমাদের আশ্বাসিত করে বল্লেন—"এরপরেই আর একটি গ্রাম পাওয়া যাবে—সেখানে এক মহন্ত থাকেন। তাঁর পাকা দালান। সেখানে বেশ আরামেই আপনারা রাত কাটাতে পারবেন।"

অশ্বারোহীর নির্দেশমত গিয়ে সন্ধ্যার সময় আমরা মহন্তের আস্তানা পেলাম। এখানে যে এমন একখানা পাকাবাড়ি পাকাবারান্দা ও মস্ত চাতাল পাওয়া যাবে—তা কে কল্পনা করেছিল! জগদীশ আত্মপ্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলো—"আমার কথা শুনলে আপনাদের কোনো কষ্ট পেতে হবে না। এ আপনারা দেখে নেবেন।"

আমরা সে কথা স্বীকার করলাম। দাওয়ায় তিনজনেই আরামে শুয়ে পড়লাম। ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত। শুধু তৃষ্ণার্ত বলে বোধহয় বোঝানো যাবে না—"তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে' এ কথা বল্লেই বোধহয় ঠিক হয়। পাঁচগজ দূরে পাকা কুয়ো—সেখানে বড়ি ও বালতি রয়েছে—কিন্তু কারো সাধ্য নাই উঠি। কিন্তু উঠতে হলো—শুধু উঠতে হলো না—ছুটতে হলো—প্রাণপণে ছুটতে হলো।

বাড়ীর উত্তর দিকে হুঙ্কার শোনা গেল। হুঙ্কার না বলে গর্জন বলা উচিত। ভাষা না বুঝলেও ভাব বুঝতে অসুবিধা হলো না। আমরা নাকি চোর-ডাকাত। আমাদের এখুনি মেরে তাড়াতে হবে—তারজন্য লাঠি আনতে বলা হচ্ছে।

স্থানটি নাকি অরাজক। মহন্ত সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরে যখন শুনলেন দাওয়ায় তিন বিচিত্রমূর্তির আবির্ভাব, তখন তাঁর মনে তিলমাত্র সংশয় রইলো না—যে এই তিনজন ডাকাত। বিনা অস্ত্রে ডাকাতের সম্মুখীন হওয়া সমীচীন নয়—এইকথা ভেবে তিনি লাঠি সড়কি খুঁজছেন।

আমরা পলকে তড়াক করে উঠে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটতে লাগলাম। কোথায় গেল ক্লান্তি—কোথায় বা অবসাদ। কাঁটা খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে আমরা যেখানে প্রথম হাঁফ নিলাম—সে এক মুসলমানের আঙ্গিনা—বাড়ীর মালিক একেবারে আমাদের মুখোমুখি! বুঝলাম, এবার আর নিস্তার নাই। যেখানে ব্রাহ্মণ মহন্ত লাঠি সোটা নিয়ে তেড়ে আসে, সেখানে মুসলমান কি জবাই না করে ছাড়বে।

কিন্তু বিচিত্র এই দেশ! বিচিত্র তার মানবচরিত্র। আমরা যখন করজোড়ে অনধিকার প্রবেশের জন্য ক্ষমা এবং দয়া ভিক্ষা করছি তখন গৃহস্বামী আমাদের স্তম্ভিত করে বলে উঠলেন—"আপনারা বলেন কি? মানুষ বিপদে পড়ে' মানুষের আশ্রয়ে এসেছেন তাঁদের মারবো। আমি কি মানুষ নই?"

মহন্তর বিবরণ শুনে তিনি বড়ই দুঃখিত হলেন। বল্লেন—"অতিথিকে আশ্রয় দেবার জন্যই তো তাঁর ঐ বাড়ী। তাঁর নিজের জন্য নয়। যাইহোক অন্যত্র আপনাদের আশ্রয় দিচ্ছি। কিন্তু আজ রাত্রে বোধহয় আর খাওয়া জুটবে না।"

আমরা এখানে একটা মিথ্যা কথা বল্লাম। ঐ সজ্জন মুসলমান ভদ্রলোকটিকে ঝামেলায় না ফেলার জন্যই আমরা সেই মিথ্যার আশ্রয় নিলাম—বল্লাম, "আমাদের আহার হয়ে গেছে—কেবল বাসস্থানের প্রয়োজন।"

তিনি তখন আমাদের নিয়ে গেলেন অন্য এক হিন্দু বাড়ীতে। সেখানে এক চালায় মাচানের উপরে, আমাদের শোবার ব্যবস্থা হলো। আমরা দু'দিন ভূমিশয্যায় নিদ্রা দিয়েছি—আজ মাচান পেয়ে কৃতার্থ হলাম। সেও সাহার বাড়ী—আরও স্পষ্ট করে বলে বলতে হয় শুঁড়ির বাড়ী—

যেখানে মদ চোলাই করা হয়। সারারাত মদের গন্ধ নাকে গেছে—কিন্তু জগদীশ সে সম্বন্ধে কোনো কথাটি কয় নি।

মাঝে মাঝে উত্তেজিত হয়ে কেবলমাত্র বলেছে—"মহন্ত ব্রাহ্মণ হলেও চণ্ডাল এবং ঐ মুসলমান ব্রাহ্মণ।"

জগদীশের এই বোধিপ্রাপ্তিতে আমরা সেই বিপর্যয়ের মধ্যেও পরমআনন্দ লাভ করলাম।

ঐ ক্ষুদ্র গ্রামে—হিন্দুদের ঐ একটি মাত্র কূপ। সুতরাং সাহা দেহরক্ষী পরিবৃত জগদীশ নিজেই মহন্তর কূপ হ'তে জল নিয়ে এলো। সেই জলেই ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণ করে আমরা শুয়ে পড়লাম এবং সঙ্গে সঙ্গে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হলাম।

অতিপ্রত্যূষে আমরা জয়নগর স্টেশন অভিমুখে যাত্রা করলাম। বেলা দশটা নাগাদ স্টেশনে পৌঁছালাম। মনে হলো, এইবার জীবলোকে প্রত্যাবর্তন করলাম।

এইখানেই আমাদের ঐ সাধুর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটলো। তিনি নেপাল যাবেন বলে ভিন্নদিকে এবং আমরা রাজনগরের দিকে রওনা হলাম।

ধারভাঙার দই বিখ্যাত এবং সস্তা। আমি আবার অত্যন্ত দধিপ্রিয়। কয়েকদিন দধি জোটে নাই—আজ স্টেশনে সেই অতি লোভনীয় দধি লাভ করে, সের খানেক দধি পরিতৃপ্তিভরে ভোজন করলাম।

ব্যস্! ওতেই হয়ে গেল! স্টেশন থেকে কোনোরূপে বের হয়ে নির্জনে এক গাছের তলায় বসে পড়লাম। বসে আর থাকতে হলো না—তৎক্ষণাৎ শুতে হলো। যেন জ্বরবর হয়ে আসছে।—সত্যই তখন জ্বর বন্ধ হবার জোগাড়। ব্যাপার গুরুতর দেখে জগদীশ কান্না শুরু করে দিল। অত্যন্ত সরল হৃদয় ব্রাহ্মণ। সত্য সত্যই আমাকে সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে।

আমি মরে যাচ্ছি—এ বিষয়ে আমার বা তার আর কোনো সন্দেহ নাই। মা-বাবা, ভাই-বোন—মামা-মামী, মাসীপিসি অসংখ্য আত্মীয় স্বজনকে ছেড়ে, বিদেশে বিভূঁয়ে নির্জন গাছতলায় যৌবনে পদার্পণ করেই আমার মৃত্যু হচ্ছে, এ কথা মনে করে আমার প্রাণ বিদলন। কিন্তু তখন চিন্তা-শক্তিও অবশ হয়ে আসছিল। দেহ এবং মনের শক্তি যখন নিঃশেষ—ধীরে ধীরে যখন আমি চৈতন্য শূন্যতার ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করছি তখনও জগদীশের করুণ ক্রন্দন আমার কর্ণে প্রবেশ করছে।—মনে তখন একমাত্র সান্ত্বনা একেবারে নিঃসহায় অনাথ ভিক্ষুকের মত মরছি না—আমার জন্য কাঁদবার লোক রয়েছে—যার কান্না, মৃত্যুতেও আমায় সান্ত্বনা দিচ্ছে।

কিন্তু মরি নাই।—মরলে কি আর আজ গল্প বলতে পারতাম। ধীরে ধীরে চোখ মেলে দেখি, জগদীশ আমার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে আছে—তার চোখের জল আমার মুখ ভাসিয়ে দিচ্ছে।

প্রথম চোখ মেলে তার মুখে কী এক অপূর্ব ভাবই না দর্শন করেছিলাম! আত্মীয়স্বজন ছাড়া মানুষ যে মানুষকে কেমন ভালবাসতে পারে, সেদিন সে-কথা হৃদয়ঙ্গম করি।

একটুপরে আমি উঠে বসলাম। সে বল্লে—"ঐ কাছেই শহর। আমাকে ধরে ধরে যেতে পারবেন কি? "না গাড়ী আনবো?" আমি বল্লাম—"গাড়ীর প্রয়োজন নেই। তোমাকে ধরে ধরেই যেতে পারবো।" পরে শুনলাম—আমাকে একা ফেলে রেখে, গাড়ী বা ডাক্তার আনতে সে যেতে পারে নি। পাছে আমার শেয়াল-কুকুরে খায়।

যাই-হোক, শেয়াল-কুকুরকে নিরাশ করে আমি রাজনগরে পৌঁছালাম। বন থেকে নগরে!—একেবারে রাজনগরে!

ধারভাঙার রাজা নতুন রাজধানী বানাচ্ছেন। রাজনগরে—তার বিরাট আয়োজন চলেছে। এর পূর্বে মাসিকপত্রে রাজনগরের একটি অপূর্ব মন্দিরের ফোটো দেখেছিলাম—মন্দিরটি আগাগোড়া শ্বেতপাথরে নির্মিত।

ইটের উপর এবং মার্বেল পাথরের উপর প্রাচীন ধরণের নানারূপ চিত্রকলা খোদাই করা হচ্ছে।—শিল্পপ্রিয় মহারাজের নির্দেশে।

সমস্তই চিত্তাকর্ষক, দর্শনযোগ্য। কিন্তু এদিকে আমি যে কিরূপ দ্রষ্টব্য হয়ে পড়েছি—সে বিষয়ে হুঁশ হলো বন থেকে নগরে ঢুকে।

বাঙালী ভদ্রসন্তান। বিশ্বভারতীর কলেজের ছাত্র! তার একি বেশভূষা!

কাপড়ে চিমটি কাটলে ময়লা ওঠে—গেঞ্জিতেও তাই। শীর্ণ মলিন মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সেই চাঁচর রাবীন্দ্রিক কেশ জটায় পরিণত। কয়দিন পরে দর্পণে নিজের চেহারা দেখে নিজেই চিনতে পারছি না। এই নগরে, কোথায় আশ্রয় নেব—আমায় আশ্রয় দেবে কে?

জগদীশ মিশ্র এ বিষয়ে নির্বিকার। সে বোধহয় আমার মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করতে পারলো না। বল্লে—"এখানে বড় বড় বাঙালী অফিসার আছেন। রাজবাড়ীর ডাক্তার-সাহেব বাঙালী, ইঞ্জিনীয়ার-সাহেব বাঙালী।—আরও অনেক বাঙালী রয়েছেন।—কার বাড়ী যাবেন বলুন, আমি আপনাকে পৌঁছে দিই।"

আমি তাকে বাধা দিয়ে বললুম—"রাখ বাপু তোমার সাহেব। সাহেব-বাড়ীতে যাব না। তাদের আর্দালীও আমাকে তার ঘরে জায়গা দেবে না। কোন ছোটখাট বাঙালীবাবুর কথা বল—দেখি তিনি জায়গা দেন কিনা।"

জগদীশ একবার ভয়ানক চটে গেল। "ঠাকুরবাবুর শান্তিনিকেতনের বাবু। তাকে জায়গা দেবে না। স্বয়ং মহারাজ পর্যন্ত আপনাকে লুকে নেবেন!" "এখানে কেউ আমাকে লুকে নেবে না বাবা—ডাক্তারসাহেব, ইঞ্জিনীয়ারসাহেব, এঁদের নীচুদরের কোনো বাঙালী বাবু থাকলে তাঁর কাছে বরং নিয়ে চলো।"

জগদীশ বল্লে—ঐ তো সামনেই, ওভারসিয়ার বাবুর কাজ করছেন—উনিও বাঙালী। চলুন, ওঁর কাছে নিয়ে যাই।"

আমি তবু সংকুচিত। বল্লাম—"আচ্ছা আগে তুমি গিয়ে আমার কথা ওঁকে বলো। তারপর তিনি কি বলেন তাই দেখা যাক।"

জগদীশ মিশ্র ওভারসিয়ারবাবুর কাছে গেল। কাছেই ছিলেন তিনি। দেখি, তাঁকে জগদীশ আমার পরিচয় দিচ্ছে এবং মাঝে মাঝে আঙুল দিয়ে আমার দিকে দেখাচ্ছে।

তারপরেই আমার ডাক পড়লো। ভদ্রলোক মহা-সমারোহে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন এবং তৎক্ষণাৎ লোক দিয়ে আমাদের বাংলোয় পাঠিয়ে দিলেন।

সেই নোংরাবেশে ভদ্রলোকের বাংলোয় উঠলাম। আমার জন্য চেয়ার, ক্যাম্প খাট ইত্যাদির ব্যবস্থা হোলো। জগদীশ দিল ভূমিশয্যা। সেইরাত্রে অসহ্য পায়ের ব্যথা। ঘুমুতে পারি না। জগদীশ মিশ্র তেল দিয়ে আমার পা মালিশ করতে লাগলো। তার সেই চমৎকার "ম্যাসাজে" বড়ই আরাম পেলাম এবং শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়লাম।

প্রত্যূষে জগদীশের সঙ্গেও বিচ্ছেদ। জরুরী কাজে তাকে তার গ্রামে ফিরে যেতে হবে। আমি এবার সঙ্গীহীন একা। যাব অহল্যাপীঠ। যেখানে অহল্যা পাষাণ হয়ে গেছলেন—সেইখানে।

বেলা দশটায় ট্রেন। ভাতে-ভাত খেয়ে রওনা হবার কথা। কিন্তু ওভারসিয়ার গিন্নী অত সকালেই বহুরকম তরকারী, মাছ, মাংস রান্না করেছেন। আমি তো অবাক। দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িতের সম্মুখে নানা লোভনীয় খাদ্য।—আবার কেবার দরকার নাকি? ভয়ে ভয়ে খেতে লাগলাম।

আশ্চর্য হয়ে গেলাম—গৃহিণীর প্রশ্নস্রোতে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। প্রশ্নের আর শেষ নাই। মনে হলো বহুকাল খাস বাংলার কোনো বাঙালীর সাক্ষাৎ পান নি। প্রশ্ন অবশ্য আমাকে করছেন না, "মহারাজের" বাধবে প্রশ্ন চলেছে—

কিন্তু প্রত্যেক প্রশ্নই আমি শুনতে পাচ্ছি এবং "মহারাজ" বলবার আগেই তার উত্তর দিচ্ছি।

কিন্তু এদিকে যে আবার ট্রেন ফেল করবো। "মহারাজের" মাধ্যমেই তাঁকে সেকথা জানালাম। কে কার কথা শোনে! যে-বাকাযাত্রা এতদিন প্রাণের নিভৃতে আবদ্ধ ছিল তা আজ ফোয়ারার মত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে—তার প্রতিরোধ করবে কে?

শেষে যখন ট্রেন ফেলের ভয়ে উঠে পড়ছি—তখন গৃহিণীর শেষ সনির্বন্ধ অনুরোধ—"বাবু তো নানাস্থানে ঘুরে বেড়ান—ঘুরতে ঘুরতে নিশ্চয়ই একদিন 'বগড়ী কৃষ্ণনগর'ও যাবেন—সেই আমার বাপের বাড়ী। সেখানে যেন আমার মা বাবাকে বলেন যে তাঁদের মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল—সে ভালো আছে।"

স্টেশনে যাবার পথে ভাবছি—কে বাবা—কে মা—তাঁদের নাম কি? সে সব কথা না বলে এইরূপ অনুরোধ, ব্যাপার কি? পাগল নাকি?

পাগল নয়, পরে একথা জলবৎ তরলং হয়েছিল। মেঘদূতের যক্ষও পাগল ছিল না—কিন্তু মেঘকে দিয়ে সেও এইরূপ বার্তা পাঠিয়েছিল। হয়তো আমারও একদিন এইরূপ অবস্থা হবে। ভবিষ্যৎ কে জানে! কে বলতে পারে?

অহল্যাপীঠে যেতে হ'লে মহম্মদপুর কিংবা কমতোল ষ্টেশনে নামতে হবে—একথা জগদীশ জানিয়েছিল।

কমতোলের টিকিট কেটে ট্রেণে চড়লাম। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দীর্ঘাকৃতি, পুষ্টকায়, কৃষ্ণশ্মশ্রু এবং অতোধিক ঘর্ম এক পুরুষ আমার পাশে এসে বসলো। তাকে দেখেই আমার গা ছমছম করে উঠলো। অকস্মাৎ বাজখাঁই তার প্রশ্ন—

"কাঁহা যাইয়েগা?"

ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলাম ..."কমতোল।"

"অ—ছ্যা হ্যায়!"

উত্তর শুনে চমকে উঠলাম!—কমতোলে নামলে ওর পক্ষে বেশ সুবিধা হবে বলেই মনে হলো। কিন্তু সুবিধাটা কি, ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো!—আমি তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে নিলাম—

"নেহি—নেহি মহম্মদপুর।"

অধিকতর গম্ভীরকণ্ঠে উত্তর এলো—

"ও তো অউর ভি অচ্ছা হ্যায়।"

ওরে বাবা! এ বলে কি। তাতে ওর আরও বেশি সুবিধা হবে? কেন সেখানেই ওর দলবল আছে নাকি? একটিতেই রক্ষা নাই, এই যমদূতের মত আরও কয়েকটি জুটলে তো দেখেই মরে যাবো!

সর্বনাশ! এ আমার হলো কি? আমার সে সাহস গেল কোথায়? মৃত্যু আমাকে ছুঁয়ে গেছে, তার ছায়া দেখি এখনো আমাকে ছাড়েনি। পরের ষ্টেশনে নেমে পড়তে চাই—বাজখাঁই আমাকে টেনে ধরে বলে—"এখানে কোথায়! এতো মহম্মদপুর বা কমতোল নয়!"

আমি বল্লাম—"না-না আমার এক দোস্তের কাছে যাচ্ছি! —সে অন্য কামরায়—" বলেই ছুটে যতদূর সম্ভব দূরের এক কামরায় লুকিয়ে পড়লাম।

মহম্মদপুর এসে গেল। আমি উঁকি মেরে দেখলাম—সেই বাজখাঁই-জাঁদরেল নামছেন। যখন দেখলাম সে একেবারে ষ্টেশনের বাইরে চলে গেল—তখন নিশ্চিন্ত হলাম। এরপরে কমতোলে নেমে পড়লাম।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তখন আর অহল্যাপীঠে যাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই ষ্টেশনেই ছাতু খেয়ে প্লাটফর্মের মাটীতে কুলিদের মত শুয়ে পড়লাম। নিদ্রা হতে বিলম্ব হলো না।

যাক্ রাত তো কাটলো। প্রাণ যায় নি! হয়তো আশঙ্কা আমার সম্পূর্ণ অমূলক। দেহে এবং মনে বিতীষিকা

উৎপাদন করলেও হয়তো মানুষটি নিতান্তই সরল এবং সাধু।

কিন্তু আজ চল্লিশ বছর পরেও তাকে আমি কি ভুলতে পেরেছি! আজ সে বেঁচে আছে কিনা জানিনা—থাকলেও সে হয়তো আমাকে সম্পূর্ণ ভুলে গেছে। কিন্তু আমি তাকে প্রতিদিন স্মরণ করছি—প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষের মত নয় নিতান্ত দুঃস্বপ্নের মত।

পরদিন সকালে অহল্যাপীঠ দেখতে গেলাম। সেখানে পাণ্ডারা বল্লেন—"প্রথমে গৌতমপীঠ দেখে আসুন, তারপর অহল্যাপীঠে আসবেন। গৌতমজীর দর্শন না করে অহল্যা-দর্শন করতে নাই।"

কিছু দূরেই গৌতমপীঠ। সেখানে গিয়ে দেখি এক কুঁজো বাবাজী বসে আছেন। তিনি আমায় বল্লেন—"প্রথমে গৌতমকুণ্ডে স্নান করুন—তারপর মন্দিরে গৌতমজীর পূজা করুন।"

কুণ্ডের জলের রং দেখে স্নানের প্রবৃত্তি উবে গেল। সর্বনাশ! এ জলে পা ডুবাতে ইচ্ছা হয় না—স্নান করবো কি? বাবাজীকে বল্লাম—"তবিয়ত আচ্ছা নেই।" "মালোড়িতে" ভুগছি - স্নান নিষেধ।"

চেহারাখানা সেইরূপই হয়ে পড়েছিল। সুতরাং বাবাজী সহজেই তা বিশ্বাস করলেন এবং অন্য বিধি দিলেন—অর্থাৎ 'মাথায় সামান্য জল দিয়ে মন্দিরে পূজা দিন।"

মন্দিরে পূজা দিতে গিয়েই ফেসাদ বাধলো। মাত্র চৌকাঠ পার হয়েছি—এমন সময় তর্জন গর্জন শোনা গেল। কোথা থেকে এক বলিষ্ঠ যুবক এসে হাজির। সে আমাকে এই মারে তো সেই মারে। বেশ জোয়ান। মেরে আমার ছাতু বানিয়ে দিতে পারে।

"ভেইয়া, লাঠি আনু, – বাঙালী মন্দিরে ঢুকছে।"

আমার মত লোককে 'রোখতে' কেন যে তার লাঠির দরকার, তা বুঝতে পারলাম না—পরে অবশ্য তা বুঝেছিলাম।

পূজার ইচ্ছা তেমন ছিল না—কিন্তু বাধা পেয়ে সে ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠলো। পূজা করবোই—এতে প্রাণ যায়, তাও স্বীকার—এইরূপ সংকল্প নিয়ে আমি মন্দিরে প্রবেশ করলাম।

যুবকের সে কী গুরুপানি। সে কী চীৎকার—এবং হুঙ্কার। একলাই বলে চলেছে "ভেইয়া লাঠি আন, জলদি, লাঠি আন।"

এত হুঙ্কার! এত তর্জন! কিন্তু আমায় গাত্র স্পর্শ করবার সাহস নাই। সেদিন বুঝেছিলাম—শারীরিক বল, মনোবলের নিকট কত তুচ্ছ।

পূজা শেষ করে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম। তার গুরুপানি তখনও চলছে—কিন্তু গায়ে হাত দেবার সাহস নেই। ঐরূপ সুগঠিত শরীরের শক্তিও এক শীর্ণ নিঃসহায়, ব্যক্তির সাহসের কাছে ব্যর্থ হয়ে গেছে।

অতঃপর অহল্যাপীঠে ফিরে এসে অহল্যাজীর মন্দিরে পূজা দিলাম। মন্দিরের মৈথিলী পুরোহিত আপত্তি করলেন না—তিনিই পূজার নির্দেশ দিলেন এবং প্রসাদ বিতরণ করলেন।

গৌতমপীঠের ঐ যুবক-পুরোহিতের দুর্ব্যবহারের কথা তাঁকে বল্লাম। তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বল্লেন—"ও মূর্খ পুরোহিত মৈথিলী নয়। মৈথিলীগণ এত অসভ্য হয় না। মিথিলায় এসে আপনি দুর্ব্যবহার পেলেন—এরজন্য আমি লজ্জিত। ওঁর দুর্ব্যবহারের জন্য আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।"

এই বলে সত্য সত্যই তিনি করজোড়ে আমার কাছে ক্ষমা চাইলেন। আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

মৈথিলীদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় এইভাবে বহুস্থানে আমি পেয়েছি। তা আমার স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে।

যাক্! এবার ফিরে যাবার পালা। মিত্রজীর গৃহে ফিরে যাব। স্টেশনে এসে 'ঘটোহো'এর টিকিট চাইলাম। স্টেশন-মাস্টার অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। পাগল নাকি! বেলচুয়াতে তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এরূপ সন্দেহ হবার কারণ কি! তিনি বল্লেন—"ঘটোহো" বলে কোনো স্টেশন নাই।

লোকটা বলে কি। দিন পনেরো আগে ঘটোহো স্টেশন থেকে এসেছি—এর মধ্যেই সে স্টেশন উঠে গেল!

আমি ইংরাজিতে একথা তাঁকে বল্লাম। ইংরাজি বলায় আমার উপর ভদ্রলোকের অনাস্থা কমলো—কিন্তু তথাপি তাঁর বিস্ময় কমলো না।

ইংরেজিতেই বল্লেন, তিনি গত পঁচিশ বছর যাবৎ B. N. W. R. এ কাজ করছেন—কোনোদিন ঐ স্টেশনের নাম শোনেন নি।

তখন আমি বলে পড়লাম। সর্বনাশ! এখন আমি যাব কি করে? স্টেশনের নামটা ভুলে গেলাম। "ঘটোহো" পোস্টাফিসের নাম এতক্ষণে তা স্মরণ হলো।

স্টেশনমাস্টার বল্লেন—"গেওয়ালে টাঙানো স্টেশনের ঐ ছাপা লিস্ট দেখুন—যদি মনে পড়ে।—গাড়ী এই এল বলে।"

এই গাড়ী না পেলে আর একদিন এখানে থাকতে হবে! দ্রুতগতিতে চোখ চলেছে স্টেশনের লিস্টের উপর।... ওদিকে গাড়ীর শব্দও শোনা যাচ্ছে। গাড়ী এসে পড়লো। এতে আরও ঘাবড়ে গেলাম—চোখ কি দেখছে, তাই যেন বুঝছি না।

গাড়ী স্টেশনে এসে গেছে। এখানে মিনিটখানেকও দাঁড়ায় কিনা সন্দেহ। হঠাৎ চোখে পড়লো—"উজিয়ার-পুর"! অমনি মনে পড়ে গেল—এই আমার স্টেশন!

উজিয়ারপুরের টিকিট কেটে চলন্ত ট্রেণে কোনোরূপে উঠে পড়লাম।

সৌন্দর্যে ও সংরক্ষণে

ইষ্ট ইণ্ডিয়া পেইণ্ট এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস প্রাইভেট লিঃ

ক্যালকাটা, মাদ্রাজ

"এ শুভ লগন, করিলাম পণ
লব স্বদেশীর দীক্ষা।"

দেশের অর্থনৈতিক সংকট মোচনের একমাত্র পণ স্বদেশীব্রত উদ্‌যাপন। স্বদেশীর অর্থ গৃহে গৃহে পল্লীতে পল্লীতে উপজাতদ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহার। অভয় আশ্রমের নিজস্ব উৎপাদন কেন্দ্রে প্রস্তুত খাদি ও গ্রামীণ শিল্পজাত পণ্যের ব্যবহার স্বদেশীব্রত উদ্‌যাপনের সহায়ক।

দেশবাসী সকলেই মনে প্রাণে স্বদেশী হউন।

অভয় আশ্রম

। প্রধান কার্যালয়—শিলাজী। কলিকাতা-৫৯।

গল্প

শচীন্দ্রনাথ বসু

মধু ও মদিরা

গ্রীষ্মের সন্ধ্যা। দক্ষিণ থেকে ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। দুই বন্ধু অসিত মিত্র ও বরুণ রায় তিন তলার অন্ধকার বারান্দায় বসে। বরুণ ছ' বছর বিলেতে থেকে সবে দেশে ফিরেছে, এখন পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। নানা আলাপের পর সে প্রশ্ন করলে, "অন্তুদের কাছে ইরা চৌধুরীর সঙ্গে তোমার রোমান্সের গল্প কিছু শুনলাম। মাঝে কলহের পর আবার নাকি মিলন হয়েছে। বিয়ে করছ কবে?"

অসিত হেসে বললে, "দশ বিলেত ফেরতের মুখে এ কি কথা! ও দেশে কি মেয়ে পুরুষে ভাব হলেই বিয়ে হয়? অবশ্য বিয়ের কথা আমরা যে ভাবি নি তা নয়।"

"ব্যাপারটা রহস্যময় শোনাচ্ছে।"

অসিত তখন নিজের গল্প বললে।

এম এ পাশ করেই তুমি তো বাইরে চলে গেলে, আমি কিছু দিনের মধ্যে এই ব্যাঙ্কের চাকরি পেলাম। কাজটা ভালই লাগছিল, মাইনে পত্রও মন্দ না। কিন্তু মেয়ে চাকুরে ছিল, কিন্তু মামুলী এক রাস্তায় বাঁধা তাদের চিন্তা ভাবনা—শাড়ি গয়না বিয়ে এই সব বার খোরাক। তার চেয়ে আমাদের ক্লাসের রক্তিমা দাশগুপ্ত ছিল অনেক ইন্টারেস্টিং। যাক, চারটি বছর বেশ কেটে গেল। বন্ধু বান্ধব বই সিনেমা ইত্যাদি নিয়ে। বাড়িতে মাঝে মাঝে বিয়ের কথা বলত, কিন্তু আমি কান দিই নি।

যারা একই পাড়ায় নিয়মিত সিনেমা দেখে তাদের মধ্যে ক্রমশ মুখ চেনাচেনি হয়ে যায়। এই রকম একটি মেয়েকে প্রায়ই দেখতাম, আমারই মত সেও একলা আসত এবং সাধারণত পিছনের দিকে অন্যদের থেকে একটু দূরে বসত। দীর্ঘ গড়ন, মুখে বুদ্ধির ছাপ, পোশাক প্রসাধন অপ্রকট, পরিচ্ছন্ন।

মাঝে মাঝে মৃদু বিস্ময়ে ভাবতাম কে এই মেয়ে একলা আসে নিজের মনে! দেখে ঠিক ছাত্রী মনে হত না। লক্ষ করতাম আমিও তার নজরে পড়েছি। ক্রমে দু জনের মধ্যে এক অনুচ্চারিত আত্মীয়তার ভাব গড়ে উঠল —ভাবতাম, বারে বারে একই ঘরে বসে আমরা একই ছবি দেখছি, ছবির বাছাই সম্বন্ধে আমাদের রুচিও এক রকম—অবশ্য যদি না এমন হয় যে সে সব ইংরেজি ছবিই দেখে।

কদাচিৎ আমি আমার বোনকে নিয়ে যেতাম যদি মনে হত ছবিখানা ওর ভাল লাগতে পারে। এই রকম এক দিন শেষ মুহূর্তে ও সামান্য অসুস্থ হয়ে পড়ল, টিকিট-খানা বেচে দেব ভেবে সিনেমায় এসে সেই মেয়েটির সঙ্গে দেখা; আমার মত বোধ হয় তার আগে কেনা ছিল না, জায়গা নেই দেখে সে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম।

"আমার একখানা বাড়তি টিকিট আছে।"

যেন একটুখানি ইতস্তত করে মৃদু হেসে সে পয়সা বার করল, ধন্যবাদ জানাল।

ঘরে পাশাপাশি বসে নিজের পরিচয় দিলাম, জানা গেল ওর নাম ইরা চৌধুরী। আর বেশী কিছু আলাপের আগেই পরদায় ধারে ছবি পড়ল। লক্ষ করে

খুশী হলাম যে আর দশ জনের মত জড়সড় হয়ে বসে নি সে মোটেই।

বিরতির সময়ে সিনেমা জগৎটা নিয়েই আরও কিছু আলাপ হল। বোঝা গেল সেও আমার মত বিদেশী ছবি বাছাই করে দেখে, আমাদের যে এত ঘন ঘন দেখা হয় তার কারণ রুচির মিল; দেখা গেল মামুলী প্রেমের গল্প দু জনেরই অরুচি, এবং দু জনেরই পছন্দ ঘোরালো কাহিনীযুক্ত রহস্য কাহিনী, বিজ্ঞানধর্মী গল্প, ইত্যাদি। মেয়েদের পক্ষে তা একটু আশ্চর্য বই কি। ইংরেজি ভাষায় তৈরি ছবি ছাড়া আর কোনও বিদেশী চলচ্চিত্র যে বড় একটা এ দেশে আসে না তাও দু জনের বড় আক্ষেপ।

অনতিবিলম্বে আমরা একযোগে ছবি দেখা শুরু করলাম, কখনও বা আগে বা পরে কাছাকাছি রেস্তরাঁয় বসা হত দু দণ্ড। জানা গেল ইরা থাকে তার দাদার ক্ষুদ্র পরিবারের সঙ্গে, কাজ করে রেডিওর আপিসে। ক্রমে আপিসের পর আমরা মাঝে মাঝে কোথাও দেখা করতাম—বেড়িয়ে, গল্প করে, চা খেয়ে সন্ধ্যাটা কাটত। কখনও সঙ্গে করে হয়তো আনতাম কোনও বই যা আমার ভাল লেগেছে—ওকে পড়াবার জন্য। কয়েক দিন পরে সে যখন ফেরত দিত তখন তা নিয়ে আলোচনা হত; ইরা অবশ্য বি এ পাশ করেছে, কিন্তু সে রকম তো কত ছেলে মেয়েই দেখেছি, ওর সঙ্গে আলোচনায় মৌলিকতার চিহ্ন পেয়ে মন প্রসন্ন হয়ে উঠত। প্রায়ই দেখা যেত একই কারণে দু জনের বইখানা ভাল লেগেছে, এবং কারণটা হয়তো আর দশ জন পাঠকের মনে দাগ কাটবে না।

মনে আছে এক দিন চায়ের পাত্র সামনে নিয়ে বিশ্বের সেরা বই সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল। ইরা বললে হঠাৎ, "আমি কিন্তু এই তালিকায় দান্তের ডিভাইন কমেডিকে স্থান দিতে নারাজ; কাউকে বলবেন না, কিন্তু বিশেষ সহিষ্ণুতা সত্ত্বেও বইখানায় কয়েক পাতার বেশী এগোতে পারি নি। মধ্যযুগীয় ইয়োরোপের ভাবনা ক্যাথলিক খৃষ্ট ধর্মের প্রাবাদিক খুঁটিনাটিতে মগ্ন ছিল, এই বিষয় নিয়ে লেখা এই প্রকাণ্ড বই এ কালে ভারতীয় পাঠকের কি করে ভাল লাগতে পারে আমি তো বুঝি না।"

আমি বললাম, "শুধু ভারতীয় পাঠক কেন, এইচ জি ওএল্‌স পর্যন্ত লিখেছেন বইখানি অতীব নিরস। তবে আমি ইটালীয় কাব্যখানির মাধুর্য নাকি অপূর্ব।"

আর একটি জগৎ আমরা আবিষ্কার করলাম—সহরের নানা অঞ্চলে তখন তরুণ অভিনেতা অভিনেত্রীর দল দেশী বিদেশী নানা রকম নাটক নিয়ে পরীক্ষা করছে, তার মধ্যে কখনও কখনও নতুন ভাবনা ও কৌশলের নিদর্শন মিলত। রবি বারের সকাল বেলা তাপনিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে এই সব দেখতে মন্দ লাগত না। আবার ছুটি কাটাতে কখনও বা ট্রেনে বা ভাড়া করা গাড়িতে আমরা সহরের বাইরেও চলে যেতাম, সন্ধ্যা বেলা ক্লান্ত হয়ে যে যার বাড়িতে ফিরতাম।

এমনি এক সন্ধ্যায় ইরা আমাকে তাদের বাড়িতে টেনে নিয়ে গেল, যদিও আমার একটুখানি সংকোচ ছিল, কারণ আমার নিজের বাড়ির ভীড়ের মধ্যে আমি কখনও তাকে নিতে চাই নি; আমার কেমন ভয় হত যে তাতে আমাদের বন্ধুত্বের সূক্ষ্ম সুরটি ব্যাহত হবে। যাই হক, সে দিন ওর দাদা বৌদির সঙ্গে পরিচয় হল, শিষ্টালাপ সহযোগে চা পান হল।

পরের দিন প্রসঙ্গত ওদের কথা উঠতে ইরা বললে, "বৌদিকে দেখে মনে হয় আধুনিকার প্রতিমূর্তি, কিন্তু কোনও বিষয়ে স্বাধীন মৌলিক চিন্তার কোনও চিহ্ন

পাই নি আজ পর্যন্ত। সবাই বলে ঈশ্বর আছে আত্মা আছে পরকাল আছে—সুতরাং ও সব আছে। দাদা কিন্তু অনেকটা নিজের মতে চলেন, তাঁর সঙ্গে দশটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা চলে।"

বললাম, "কিন্তু স্বাধীন চিন্তাই তো ব্যতিক্রম—কি ছেলে কি মেয়েদের মধ্যে; তা নিয়ে এক জনকে দোষ দিলে চলবে কেন?"

এমনি করে দিনে দিনে গাঢ়তর হয়ে চলল আমাদের বন্ধুত্ব। শুধু যে দিন ঘাপনের যাবতীয় কাজের মধ্যে ওর স্মৃতি ওর বাক্য বারে বারে হঠাৎ নতুন উৎসাহ ও আনন্দ যোগাত তাই না, মনে হত আজ ওর মধ্যে আরও একটা নতুন কিছু আবিষ্কার করব, আমাদের জানা হবে সম্পূর্ণ। মনে আছে ওর মধ্যে যে একটা ক্লান্ত বিষণ্ণ দিকও আছে তা জেনেছি অনেক দিন পরে। যে মানুষটি জানতে দেখতে করতে সাধারণত উৎসাহী, এক দিন দেখলাম সেও জীবনের ভারে কিছুটা ক্লান্ত, নিরাশার মেজাজে আচ্ছন্ন।

"এক এক সময়ে মনে হয় কিছুরই কোনও অর্থ হয় না। জন্মের আগে ও মৃত্যুর পরে অসীম অন্ধকার, তার মধ্যে এক আলোর বুদবুদকে আশ্রয় করে শুধু 'জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি ভণ্ডে ভণ্ডে ক্ষয়'।"

ইতিপূর্বে ইরার এই মেজাজ কখনও দেখি নি, একটু অবাক হলাম বই কি; ভালও লাগল এই কারণে যে আমাকেও মাঝে মাঝে এই রকম অবসাদ পেয়ে বসেছে, কাজ করতে করতে বই পড়তে পড়তে হঠাৎ সব উৎসাহ মরে গিয়েছে। এ যাবৎ ইরার সাহচর্যে যতক্ষণ থেকেছি ততক্ষণ এই কৃতটা ঘুরে ঘুরেই থেকেছে, কিন্তু যখন দেখলাম এখানেও আমাদের মিল আছে তখন আত্মীয়তা গাঢ়তর হল, এও মনে হল হয়তো দু জনে মিলে জোট পাকালে তাকে জয় করা সহজ হবে।

অনাত্মীয় তরুণ তরুণীর মধ্যে তার জমলে প্রেমের কল্পনা বিয়ের স্বপ্ন অনিবার্য, বিশেষত আমাদের দেশে যেখানে তারা পরস্পরের ঘুরে ঘুরে মানুষ হয়। আমাদের মনেও এই সব কল্পনা জেগেছে, যদিও কথায় ও কাজে তা কখন প্রকাশ পায় নি; হাত ধরাধরি বা মধুরালাপের দরকার বোধ করি নি, কারণ তা ছাড়াই আমাদের মন থাকত প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ। কিন্তু মিষ্টির স্বাদ পেলে মানুষ আরও চায়। বন্ধু বান্ধবরা ইতিমধ্যে অবশ্য আমাদের প্রেমিক প্রেমিকার দলে ফেলেছে, ইরার বৌদি বিয়ের দিন গুনছেন। প্রথমে আমরা এ নিয়ে হাসাহাসি করতাম, তারপর ক্রমশ প্রায় অজানতে আমরাও তা গ্রহণ করলাম। কথাবার্তা 'আপনি' থেকে 'তুমি'র স্তরে এসে নামল, দৈহিক ঘনিষ্ঠতাও বাড়ল। দু জনের মধ্যে দাবি দাওয়া আদর আবদার মান অভিমান শুরু হল। মন্দ লাগল না এই নতুন সম্পর্কের মাদকতা—আমি এক জনের, সে আমার, দুইয়ের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণ এই ভাবনার উত্তেজনা।

অবশ্য চট করে বিয়ের কথা তখন আমি ভাবতে পারি নি। নিজের সংসার হলে পরিবারের সঙ্গে থাকব না এই রকম ইচ্ছা, অথচ সচ্ছল স্বাধীন গৃহস্থালির পক্ষে রোজগার যথেষ্ট নয়। মাস কয়েক পরে একটা পদোন্নতির আশা আছে, সেই দিকে চেয়ে আছি। তা ছাড়া মনে হত এই তো বেশ চলছে, তাড়া কি—গতানুগতিক সাংসারিকতার মধ্যে বরং রোমান্স কেটে যাওয়ার ভয়। অবশ্য এ কথা ইরাকে বলি নি।

কিন্তু রোমান্স ঠিক রূপকথার জগতে থাকতে চাইল না। ক্রমে ক্রমে কিছু কিছু অস্বস্তি দেখা দিল মনে। আগে সপ্তাহে সপ্তাহে রোজ দেখা হত না, বাকি দিন-গুলি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বা পড়াশুনা নিয়ে কাটত, এখন আর হাতে নিজের বশে কোনও সময়ই থাকল

না। উপরন্তু আপিসের পর ইরার সঙ্গে দেখা করবার জায়গায় গিয়ে পৌঁছাতে দেরি হলে কৈফিয়ৎ দিতে হত—যা আগে হয় নি; বোধ হয় সে ভয় করত আমি তাকে অবজ্ঞা করতে শুরু করেছি, তার প্রতি অবসাদ এসে গিয়েছে। এ ভয় অবশ্য সম্পূর্ণ ভুল।

পরস্পরের সান্নিধ্যে এই যে বেশী সময়টা কাটত, প্রথম দিকে তা কোথা দিয়ে খরচ হত টের পেতাম না; মনের আগল খুলে যাওয়ার ফলে এমন অনেক কথা হত যা আগে চাপা ছিল—পারিবারিক ইতিহাস, অতীতের ঘটনাবলী, ভবিষ্যতের আশা···। কিন্তু ক্রমে এই সব কথা ফুরিয়ে গেল, দু জনে চুপচাপ বসে থাকতাম পাশাপাশি; তখন দীর্ঘনিশ্বাস চেপে ভাবতাম নিজের বাড়িতে সামনের বারান্দায় অন্ধকারে ইজিচেয়ারে পা ঢেলে দিতে পারলে এখন মন্দ লাগত না। অবশ্য শুধু শুধু হয়ত ইরার কথাই মনে পড়ত—ওর চোখ, ওর ঠোঁট···।

সে দিন কথা ছিল সন্ধ্যায় নিউ মার্কেটে ঘোরাঘুরি করে ইরার কিছু দরকারী জিনিস কেনা হবে। ওকে কথা দেবার সময়ে মনে ছিল না যে সেই দিনই এক বন্ধুর বিয়ের নিমন্ত্রণ আছে, বিয়েও সন্ধ্যার দিকে। আপিস থেকে ইরাকে টেলিফোনে প্রস্তাব করলাম কেনাকাটি পরের দিন করা যাবে। সে রাজী হল এবং বেশী কথা না বলে টেলিফোন রেখে দিল। তার কথার সুর থেকে কিন্তু আমার মনে একটুখানি অস্বস্তি থেকে গেল। পরের দিন দেখি তার মুখ গম্ভীর, কথা বার্তা রুক্ষ ও তির্যক। আমার দিক থেকে আলাপের নানা চেষ্টায় পর মন্তব্য শুনলাম, "পুরুষদের সর্বদা বন্ধু সবচেয়ে বড়।"

হেসে বললাম, "একটা তো মোটে সন্ধ্যা; হিচ্‌কক্‌এর ছবিটায় ঢুকে পড়লেই পারতে, অনেক দিন থেকেই তো দেখব দেখব করছ।"

হিমশীতল গলায় ইরা জবাব দিলে, "আমার তো মনে পড়ে কথা ছিল দু জনে এক সঙ্গে দেখব; তা ছাড়া আগে টিকিট না কিনলে ও ছবি এখন দেখা সম্ভব নয় তুমি ভালই জান।"

কথা হচ্ছিল তাপনিয়ন্ত্রিত চায়ের দোকানের এক আধ-অন্ধকার কোণে বসে। ভাগ্যক্রমে কাছাকাছি বেশী লোক নেই, গলা নামিয়ে বললাম, "তুমি কি চাও তোমার জন্য আমি সব বন্ধু বান্ধব ত্যাগ করব? তা আমি পারব না এমনিতেই কথা শুনতে হচ্ছে।"

"তা আমি চাই না, কিন্তু দু জনকেই যখন কথা দিয়েছ তখন আশা করেছিলাম আমারটার দাম বেশী হবে।"

এমনি চলল নিচু সুরে কথা কাটাকাটি। তার পর আমরা মার্কেটে গেলাম, জিনিসও কেনা হল, কিন্তু তার মধ্যে কোনও আগ্রহ উৎসাহ থাকল না; থাকল যেন আমার সন্ধ্যাবিবাহিত বন্ধুর সশ্রু উপস্থিতি। বিষণ্ণ মনে বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবলাম এ রকম কেন হল···আমারই কি দোষ?···ইরাকে এমন তো কখনও দেখি নি।··

লোকে বলবে প্রণয়ের কলহ। এতে প্রেমের রস আরও ঘন হয়, ইরার ব্যবহারে প্রকাশ পেল আমাকে ছাড়া তার এক দিনও চলে না, আমার বরং খুশীই হওয়া উচিত। হয়তো তাই, নয়তো এ সব অতি তুচ্ছ, কিন্তু আমার মনে অস্বস্তি বাড়তে লাগল। শুধু নিজের সময় নিয়ে নয়, অন্যান্য জিনিস নিয়েও। আগে আমি নিজের খুশি মত খরচ করতাম—পাতলা মলাটের বই না কিনে কঠিন মলাটের সংস্করণ, সিনেমার টিকিট কিনতে হলে লম্বা লাইনে না দাঁড়িয়ে উপর তলার আসন, চা খেতে হলে পাখার তলায় না বসে ঠাণ্ডা ঘরে বসা, ইত্যাদি বিলাস স্বাধীন উপার্জনের পর থেকে

আমার ধাতস্থ হয়ে গিয়েছিল। এখন জানতে আরম্ভ করলাম যে একটু বুঝে শুনে চলা উচিত, মদের ভাল দিয়ে যদি চলে তবে সবচেয়ে ভালটাকে বাদ দেওয়া উচিত। ইরা অবশ্য স্পষ্ট করে কিছু বলে নি, কিন্তু ভাবে মনে হয়েছে সে ভাবছে ভবিষ্যৎ গৃহস্থালির কথা, সাচ্ছল্যের চেয়ে বরং সঞ্চয়ের দিকে তার বেশী লক্ষ। সেই দিনের প্রতি লক্ষ করে সে আবার এমন ইঙ্গিতও করেছে যে বিয়ের পর চাকরির বোঝাটা সে ঘাড় থেকে নামাবার পক্ষপাতী।

এ দিকে অনেক দেখে শুনে আমার ধারণা হয়েছে বিবাহিত বা অবিবাহিত মেয়েদের নিয়মিত কাজ করা দরকার, টাকার জন্য নয়, মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য। এখনকার মেয়েরা ঘরকন্নার পরিশ্রম পছন্দ করে না বলে এই সমস্যা আরও প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাই হক, সামাজিক সমস্যা নিয়ে বক্তৃতা করা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমার নিজের সময় পয়সা স্বাধীনতা নিয়ে যে সব ক্ষুদ্র সমস্যা দেখা দিল তার ফলে নিজেকে সর্বদা কিছুটা শাসনে রাখতে হত, যাতে মন যায় দিতে চাইত না।

আবার এক এক সময়ে এই সব অস্বস্তি ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। মনে পড়ে এক শীতের সন্ধ্যা—তার বিস্ময় ও আনন্দ কোনও দিন ভুলব না। সিনেমার থেকে বেরিয়ে ইরা বললে, "আজ একটা ট্যাক্সি করা যাক।" একটুখানি অবাক হলাম বই কি; প্রথমত খরচ বাঁচাবার দিকে তার ঝোঁক, আমি ট্যাক্সির কথা বললে সেই আপত্তি করে; তা ছাড়া আমি নাকি গাড়িতে ওকে জ্বালাতন করি। এখানে জ্বালাতন মানে দৈহিক আক্রমণ। বলে রাখা ভাল আমাদের প্রেম অনেক দিন হল তার নিরামিষ চরিত্র বর্জন করেছে। সেটা হয়েছে স্বাভাবিক ভাবে, আমরা কেউই তার জন্য লজ্জিত ছিলাম না, বরং মনে হত তাতে আমরা আরও পরিপূর্ণতা লাভ করেছি। 'জ্বালাতন' সম্বন্ধে ইরার আপত্তি সুতরাং কিছুটা মেয়েলি ভান।

গাড়িতে উঠে সে তার থলে থেকে বার করল এক লম্বা কাগজের বাক্স, তার মধ্যে অতি সুন্দর এক হাত ঘড়ি। আমায় দিয়ে বললে, "তুমি দীর্ঘায়ু হও।"

হঠাৎ মনে পড়ল সেটা আমার জন্ম দিন। এই তারিখটি নিয়ে কোনও দিনই আমি বা অন্য কেউ বাড়াবাড়ি করে নি, বয়স হওয়ার পর উপহার বড় একটা পাই নি। কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়লাম, কিছুক্ষণ ওর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারলাম না। সেই বললে, "পছন্দ হয়েছে?"

"খুব পছন্দ হয়েছে। কিন্তু এত দামী জিনিস না দিলেই কি চলত না?" এতে যে তার সঞ্চয়ের এক বড় অংশ খরচ হয়েছে তা'তে আমার সন্দেহ ছিল না।

মিটিমিটি হেসে সে বললে, "দামী লোককে দামী জিনিসই দিতে হয়।" তোমার ঘড়িটা অনেক পুরনো হয়ে গিয়েছে, ওটাকে এবার বাদ দাও।"

হাত থেকে সেটা খুলে নতুনটা পরে বললাম, "আচ্ছা, আমার জন্ম দিন তুমি জানলে কি করে?"

"ও সব আমরা জানতে পারি। তুমিই বলেছ ছেলে বেলার কথা বলতে বলতে।"

"তোমার জন্ম কোন তারিখে?"

"ঐটি বলা হবে না। বোধ দিলে সব মাধুর্য নষ্ট হয়ে যাবে। তা ছাড়া তুমি আমাকে কিছু কম দাও নি।"

হঠাৎ আমার হাত দুটি এগিয়ে গিয়ে ওকে বুকে টেনে আনল, মনে হচ্ছিল আরও কাছে চাই। বাইরের ঘোলাটে আকাশটার দিকে চেয়ে কতক্ষণ যে বসে রইলাম জানি না। ইরার মুখ আমার কাঁধে। আমার চকল রক্ত, হৃদ্‌পিণ্ডের ধাপাধাপি সে টের পেল।

তারই সঙ্গে আমার ব্যবহারের অসামঞ্জস্য লক্ষ করেই বোধ হয় ঠাট্টার সুরে ফিস ফিস করে বললে, "আজ একেবারে গুড বয় দেখছি!"

কিছু বললাম না, ঐ রকম বসে থাকতেই ভাল লাগল।

অথচ এর মাস কয়েকের মধ্যেই আমাদের চরম বিচ্ছেদ হয়ে গেল। সন্ধ্যার পর আমরা ময়দানের এক নির্জন কোণে বসে, ইরা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি রক্তিমা দাশগুপ্তকে চেন?"

"তাকে কে না চেনে।" হেসে বললাম।

"সেই চেনার কথা বলছি না, তুমি কি তার সঙ্গে অনেক দিন মিশেছ?"

"সে বহু কাল আগের কথা।"

"কই আমাকে তো বল নি?"

একটু অসহিষ্ণু সুরে বললাম, "তোমাকে কে কি লাগিয়েছে বল তো?"

"কিন্তু এখন বুঝছি যা শুনেছি তা সত্যি, নয়তো নিজের সম্বন্ধে এত কথা বলেছ, এটাও বলতে।"

প্রায় ধৈর্য হারিয়ে বললাম, "না বলবার কারণ কিছুই নেই, হয়তো এখনই বলতাম, যদি না তুমি বিচারকের মত জেরা শুরু করতে।"

ইরা জবাব না দিয়ে স্তব্ধ হয়ে রইল। অনেকটা পরে আমি বললাম, "আমাদের সম্পর্কটার মধ্যে কিছু গলদ আছে। সব সময়ে আমাকে নিজের দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হয়, সাবধানে চলতে হয়। যাদের মধ্যে ভালবাসা তাদের মধ্যে ভয় থাকবে কেন?"

"তাহলে হল যে তবু গলদটা ধরা পড়ল—দোষ অবশ্য আমারই। এই রকম আশঙ্কা করেই বোধ হয় বিয়ের দিনটা যথা সম্ভব ঘুরে রেখেছিলে?"

এমনি চলল কথা কাটাকাটি; অনেক কটু বাক্য বেরিয়ে এল যা নিয়ে পরে অনুশোচনার শেষ থাকে না। বাড়ি ফিরবার আগে শুধু এইখানে মতের মিল হল যে আমাদের এই সম্পর্ক অচল।

এর পরে কয়েক দিন কাটল অসহ্য মনযাতনার মধ্যে, বিশেষত সন্ধ্যার দিকে। অনেক বার ভেবেছি ওকে একটা ফোন করি—কিন্তু মনে হয়েছে সেও তো করতে পারে, নিজে যখন ঝগড়াটার সূত্রপাত করেছে। তা ছাড়া শান্ত মুহূর্তে যখন ভাবতাম, আমাদের সম্পর্কের মধ্যে শান্তির আশা দেখতে পেতাম না। যা ছিল সরল তা হয়ে পড়েছিল জটিল। শেষের দিকে পুরোপুরি স্বস্তি নিয়ে ওর সঙ্গ উপভোগ করতে পারতাম না। ঐ দিনের মত কটু কলহ আরও হয়েছে, যেমন হয়েছে প্রায় একই রকম উত্তেজনাপূর্ণ পুনর্মিলন, যখন মনে হয়েছে এ-ই সত্য, আর সব মিথ্যা।...

ক্রমে আমার মনে ছটফটানি কমল, এল ঝড়ের পরে শান্তি। আমার স্বাভাবিক জীবনের মধ্যে আবার ফিরে গেলাম, বহু কালের আধপড়া বই শেষ হল, বন্ধুরা আসা শুরু করল, যদিও চোখে অনুচ্চারিত প্রশ্ন নিয়ে। সিনেমায়ও ইরাকে আর দেখতাম না, বোধ হয় আমাকে এড়িয়ে চলছে। মৃদু বিস্ময়ে এও লক্ষ করলাম যে ইরার প্রতি যত রাগ বা অভিযোগ তা ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে, ওর থেকে যে মাধুর্য যে আনন্দ পেয়েছি তাই মনে পড়ছে ওর কথা ভাবলে।

এর পরের অধ্যায়টা খুবই সংক্ষেপে শেষ করা যায়। প্রায় মাস আষ্টেক পরে এক বিয়ে বাড়িতে হঠাৎ ইরার সঙ্গে দেখা, চোখাচোখি হতে সে-ই নিঃসঙ্কোচে এগিয়ে এল আমার দিকে। এক কোণে পাশাপাশি দুটি চেয়ারে বসে আলাপ হল। কুশল বার্তার পরে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি কি সিনেমা ত্যাগ করেছ?"

"না, অনেক দিন বাইরে ছিলাম, মামার কাছে

যেতে। কিছু দিন হল ফিরেছি। ফিরে দেখছি এখানকার সব ছবিই সেখানে দেখা।"

মনে হল আমারই মত ওর মনে কোনও তিক্ততা নেই, ব্যবহারেও নেই কোনও জড়তা। শুনলাম রেডিওর চাকরি ছেড়ে সে এখন বিদেশী দূতাবাসে কাজ নিয়েছে।

এর পরে ইরার সঙ্গে বন্ধুত্ব আবার নতুন করে গড়ে উঠল, সেই পুরনো দিনের মত। এখন আমাদের মধ্যে আবার বইয়ের আলোচনা হয়, নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের বদলে বাইরের দশটা বিষয় নিয়ে কথা হয়। এখন আমাদের রোজ দেখা করবার দায় নেই, পরস্পর সম্বন্ধে কোনও বশ্যতা বাধ্যকতা নেই। প্রণয়ের মাদকতা নেই বটে, কিন্তু আছে সখ্যের মাধুর্য। ক্ষুব্ধ সাগরের পরে শান্ত হ্রদ।···

অসিত ঘরের ভিতর থেকে এক পাতলা বই নিয়ে এল, আলো জেলে এক চৈনিক কবিতা :

তখন তুমি আমায় ভালবাসতে না : তোমার স্বর ছিল মধুর ;
তোমার চোখভরা হাসি ; হাতদুটি কোমল।
তারপর তুমি ভালবাসলে আমায় : তোমার স্বর হল কটু ;
তোমার চোখ ভরা জল ; হাতদুটি নিষ্ঠুর।
ভালবাসা তোমায় বানাল ভালবাসার অযোগ্য
—কি দুঃখ, কি দুঃখ তা !

বরুণ রায় জিজ্ঞাসা করলে, "কিন্তু তোমাদের এই নতুন বন্ধুত্বের ভবিষ্যৎটা কি ?"

অসিত বললে, "হয়তো ওর বিয়ে হবে, হয়তো আমার। ইতিমধ্যে আমাদের আনন্দ কেউ কেড়ে নিচ্ছে না। কি হবে ভবিষ্যতের কথা ভেবে—শুধু জানি আমরা আর অতীতের পথে চলব না।"

শচীন্দ্রনাথ বসু
রচিত
রবীন্দ্র পুরস্কার
প্রাপ্ত বই
প্রাগৈতিহাসের মানুষ
•
শ্রেষ্ঠ গল্পের সংকলন
শনিবারের সন্ধ্যা
কার্যা কে এল মুখোপাধ্যায়
৬/১এ, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন
কলিকাতা-১২

কান্তা সুগন্ধি

আপনার মনোরঞ্জনের মন্ত্র জানে

কান্তা সুগন্ধি মেখে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। সন্ধ্যেতারা ফুলের মত আপনি সৌরভ ছড়াবেন। আপনি পাশ দিয়ে গেলে সংবেদনশীল মানুষ সচেতন হয়ে, আপনাকে সচেতন হয়ে দেখবে। এমন যেমন আরো কেউ কিনে খেতে পারে—যার কাছে সেই মুহূর্তে হবেন অনন্য আপনি পাবেন শুধু শ্রীময়ী আপনি।

ক্যালকাটা কেমিকেল-এর তৈরী

JWTCCKA 2999

(জিন্না ও গান্ধী—১৯৪ পৃষ্ঠার পর)

গান্ধী রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রশ্নকে নিয়ে এলেন, ফলে 'নন্‌কো অপারেশন' মুলে কুঠারাঘাত হল। গান্ধীজীর অদূরদর্শিতা ও অস্বাভাবিক আচরণের ফলে জিন্নার ভাবীনেতা-রূপে বিকাশ হল। এরপরে হল বিলাফত আন্দোলনের মৃত্যু। মহম্মদ আলি ও "ইসলাম বিপন্ন" – এই চিৎকার।

১৯২০ সালে ১৯শে জুলাই দিল্লীর জামা মসজিদে বিরাট সভা হয়েছে। পরদিন সকালবেলা গান্ধীজী ঘোষণা করলেন, বিলাফত আন্দোলনের সমর্থনে তিনি অসহযোগ আন্দোলন চালাবেন। এই সময়ে এক বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন, "But Muslims have special Koranic obligations in which the Hindus may or may not join. They, therefore, reserve to themselves the right, in the event of the failure of non-co-operation cum non-violence, in order to enforce justice, to resort to all such methods as may be enjoined by the Islamic scriptures. I venture heartily to associate myself with this resolution." গান্ধী অহিংসায় বিশ্বাসী এবং সৌজন্য অসহযোগের সহিংস বিপ্লবীদের ঘোরতর বিরুদ্ধতা তিনি প্রতিপন্ন করেছেন। এমন কি অসহযোগ স্থগিত রাখার মূল যে তাঁর কম ক্ষোভ জ্ঞাপন করেছেন তিনি রাখি হননি। এই গান্ধীজী কোরানের দোহাই দিয়ে মুসলমানদের সমর্থন করেন সহিংস পন্থা অবলম্বনের সময় ঘোষণা করলেন কিভাবে তা বোঝা মুস্কিল। অন্তত: এ যে তাঁর ও তিনিধার জিন্নার নয়, সেবিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতারা এই উপলক্ষে নানা ভাবে মুসলমানদের খুশী করার চেষ্টা করতে লাগলেন ও বহু ক্ষেত্রে অন্য যে মুসলমানদের স্বার্থ নষ্ট হচ্ছে তাদের উপেক্ষিত করে চললেন। হাজার হাজার মুসলমান দলে দলে তাদের ভাগ্য যে তাঁরা নিজে নিজেই নির্ধারণ করবেন তাই উপেক্ষা করা হল। কিন্তু আফগানিস্তান সীমান্তে পৌঁছান মাত্র আফগান সৈন্যেরা তাদের উপর গুলি চালাতে লাগল। অনেকে মারা গেল, অনেকে ফিরে এল নিজ নিজ গ্রামে। যত বাড়ি আগুন দিয়ে জিনী করে দেওয়ার দায়ে সর্বস্বান্ত হল।

হিন্দুর বিরুদ্ধে এই নির্মম রোষের ফলে মালাবারের মোপলা মুসলমান বিদ্রোহীরা হাজার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মালা-য়ালাম ভাষা ভাষা করে দেয়। বহু হিন্দু খুন হয়। হিন্দু মন্দির বিধ্বস্ত হয় এবং অনেক হিন্দুকে মুসলমান ধর্মে জোর করে দীক্ষিত করা হয়। বিলাফত আন্দোলনের ফলে তাদের হিন্দু-বুদ্ধির ঔদ্ধত্য আরও বৃদ্ধি হয়ে গেল। বহু স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে গেল। কোহাটে হিন্দুদের ধ্বংস মুসলমানরা অকথ্য অত্যাচার চালাল। কোহাটের সমস্ত হিন্দু সেখান ছাড়া করে ঝেলম আসতে বাধ্য হোল। হিন্দুদের বাড়ি ও সম্পত্তি লুট হতে লাগল চারদিকে। ফলে অগ্নি সংযোগের ঘটনাও ঘটতে লাগল, হিন্দুহত্যাও চলতে লাগল। হিন্দুরা স্বভাবতই গান্ধীজীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনল যে বিলাফত আন্দোলনের সময় যে উগ্র মুসলমানী সাম্প্রদায়িক বিষের প্রচারিত হয়েছে তারই ফলে মুসলমানরা আজ ক্ষেপে উঠেছে। মুসলমানরা অভিযোগ আনল যে গান্ধী নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য অমি ভাতৃত্ব ও সৌলাদ্য আমাদের অবহেলা করেছেন।

১৯২১ সালে আলি ভ্রাতৃদ্বয় ধরা পড়ে। গান্ধী নানা দেশে এই নিয়ে আন্দোলন করেন। এমনকি কংগ্রেসকে দিয়ে আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের সমর্থনে প্রস্তাব পাশ করান। বোম্বাইতে কংগ্রেস নেতৃত্বের এক সম্মেলনে গান্ধীজী সেখানে কংগ্রেসকে দিয়ে একটা ঐতিহাসিক প্রস্তাব করান। যাতে সমস্ত ভারতীয় সৈন্য ও অফিসারদিগের সরকারী চাকরি ছেড়ে দেবার আহ্বান জানানো হয়। রবীন্দ্রনাথ এই উদ্যোগের বিরোধিতা করেন। তিনি

একটা পাল্টা ইশতেহার প্রকাশ করে গান্ধী ও গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে দেশকে সতর্ক করে দিয়ে লেখেন :

An outside influence seemed to be bearing down on the people, grinding them and making one and all speak in the same tone, follow the same groove. Everywhere I was told that culture and reasoning should abdicate, blind obedience only reign ·····A cause so great as India's should not be dependent on the will of a single master.·····এর উত্তরে গান্ধীজী লেখেন : My modesty has prevented me from declaring from the house-top that the Message of Non co-operation, Non-violence,···is a message to the world. It must fall flat if it does not bear fruit in the soil where it has been delivered. অর্থাৎ পৃথিবীতে তিনি একটি মহৎ আদর্শ প্রচারের জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে আগে সেই আদর্শকে প্রতিষ্ঠা দিতে না পারলে, জগৎ সে আদর্শ নেবেনা। সুতরাং তাঁর কাজ তিনি করে যাবেনই।

১৯২০ সালে কলকাতায় কংগ্রেস ও মুস্লিম লীগের অধিবেশন একই সময় পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হয় জিন্নার উদ্যোগে।

মনে রাখতে হবে, জিন্না মুস্লিম লীগের সভাপতি হলেও কংগ্রেসেরও একজন নেতা ছিলেন। উক্ত অধিবেশনে গান্ধীজী বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে নন-কোঅপারেশনের প্রস্তাব আনেন। চিত্তরঞ্জন দাস সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। জিন্নাও বিরোধিতা করেন। কিন্তু গান্ধী ধর্মের নামে, ইস্লাম রক্ষার নামে আবেদন করতে থাকেন। ফলে জিন্না বাতীত আর সব মুসলমান প্রতিনিধির ভোট গান্ধীর পক্ষে যাওয়ায় তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপ হতে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বিবৃতি দেন। ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে পুনরায় কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। সেখানেও জিন্না গান্ধী-প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। বক্তৃতাকালে জিন্না গান্ধীজীকে 'মিঃ গান্ধী' বলে উল্লেখ করেন। গান্ধী-সমর্থকের দল তখন একযোগে চেঁচিয়ে উঠে দাবী করে যে গান্ধীকে 'মহাত্মা গান্ধী' বলতে হবে। জিন্না বলেন তাঁকে জোর করে বা ভয় দেখিয়ে 'মহাত্মা' বলানো যাবে না। গান্ধী সমর্থকরা জিন্নার আর কোন কথা শুনতে চায়নি, তাঁর বক্তৃতাও বন্ধ করে দিতে বাধ্য করে। জিন্না গান্ধীজীকে পরিষ্কার ভাষায় বলেন : "আপনি এ পর্যন্ত যে যে প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন সর্বত্র এনেছেন দলাদলি ও ভাঙন, ভারতের জাতীয় জীবনেও বিশৃঙ্খলা এনেছেন আপনি···অশিক্ষিত, অজ্ঞ, জনসাধারণ ও অনভিজ্ঞ যুবকদের ভুল পথে আপনি উত্তেজিত করেন। ফলে আসে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ। আপনার কর্মধারার পরিণাম কী হবে তা ভাবতেও আমার ভয় হয়।"

গান্ধীজীর নন-কো অপারেশন আন্দোলনে ছাত্রদের স্কুল-কলেজ ত্যাগের আহ্বানও ছিল। আধুনিক শিক্ষালাভ করা ছাত্রদের পক্ষে পাপ বলে তিনি মনে করতেন। ইংরেজি শিক্ষার চেয়ে কোন শিক্ষাই না লাভ করা তিনি শ্রেয় বলে ঘোষণাও করেছেন। শিক্ষার প্রসারের বিরুদ্ধে এই যে গোঁড়ামিপূর্ণ গান্ধীবাদী অভিযান—এর ঘোর বিরোধিতা করেন স্যার আশুতোষ মুখার্জি। দেশের ছাত্র ও তরুণ-সমাজকে শিক্ষাবিমুখ করে তোলার গান্ধী-পরিকল্পনাকে জিন্নাও তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন। সোথেদের ৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে পুণার ফার্গুসন কলেজে অনুষ্ঠিত এক সভায় জিন্না বলেন যে গান্ধীজীর নন-কোঅপারেশন আন্দোলনের শিক্ষাবয়কটনীতি দেশকে আত্মনাশের পথে নিয়ে যাবে। রাজনীতির ক্ষেত্রে আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে অযৌক্তিক, অসংলগ্ন ও অবাস্তব ভাবধারার আমদানী না করে বাস্তবের জন্য প্রতিটি ভারতবাসীর হৃদয়ে যে বেদনা

ও অনুরাগ আছে তারই ওপর ভিত্তি করে পরিষদের নীতির ওপর রাজনৈতিক আন্দোলন গড়তে হবে; যতক্ষণ তা না হয় ততক্ষণ ভারতীয় রাজনীতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্নই থাকবে। জিন্না গান্ধীজীর নেতিবাচক মনোভাবজাত কর্মপন্থাকে যুক্তির-আলোয় বিশ্লেষণ করে তার ত্রুটির দিকটি সযত্নে দেখিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথও জিন্নার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হন ও প্রকাশ্যে গান্ধীজীর কর্মপন্থার সমালোচনা করেন। জিন্না ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই গান্ধীজীর চরখা নীতিরও সমালোচনা করেন।

১৯২০ সালের ৩১শে জুলাই তিলক মারা যান। পরের বছর তিলকের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীর দিন গান্ধীজী বোম্বাই শহরে এক বাড়ির আঙিনায় বহু দামী দামী বিদেশী বস্ত্রের স্তূপ সাজিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেন। বিদেশী বস্ত্র পোড়ানোর এই নীতিকে রবীন্দ্রনাথ ও জিন্না উভয়েই কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন।

চিত্তরঞ্জন দাস ১৯১৯ সালে অমৃতসর কংগ্রেস অধিবেশনে ও ১৯২০ সালে কলকাতার অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গান্ধীবাদের বিরোধিতা করেন। কিন্তু ১৯২০ ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন ও গান্ধীজীর মধ্যে বোঝাপড়া ও মিটমাট হয়। তবু দেশবন্ধু গান্ধীজীর নন-কোঅপারেশন আন্দোলনের সব কথা মেনে নেননি। তিনি বয়কট নীতির বিরোধী ছিলেন। ১৯২২ সালের গয়া কংগ্রেসে গান্ধী-দেশবন্ধু বিরোধ প্রকট হয়ে পড়ে। ফলে দেশবন্ধু স্বরাজ্য পার্টি নামে একটি দল গঠন করেন।

দেশবন্ধুর স্বরাজ্য পার্টির প্রথম কাজই হল বাংলা দেশে একটা হিন্দু মুসলমান চুক্তি করা। সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান স্বরূপ এই চুক্তি বাংলা দেশে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করে। কিন্তু ১৯২৩ সালে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের কোকোনদ অধিবেশনে গান্ধীবাদী দল এই চুক্তিকে সমর্থন করেনি। শুধু দেশবন্ধুর প্রতি মুসলমানরা আনুগত্য জানায়। ফলে কলকাতা কর্পোরেশন ও বঙ্গীয় আইন সভার নির্বাচনে স্বরাজ্য পার্টি বিজয়ী হয়।

জিন্না গান্ধীর নন-কোঅপারেশনের বিরোধিতা করলেও ইংরেজের পক্ষে যোগ দেননি। তিনি ইংরেজশাসনের বিরোধিতাই করেন। ১৯২২ সালের জানুয়ারি মাসে বোম্বাই শহরে এক সর্বদলীয় সম্মেলনও তিনি আহ্বান করেন। ১৯২৩ সালে কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্যপদের জন্য তিনি নির্বাচন-প্রার্থী হলে স্বরাজ্য পার্টি তখন তাঁর বিরুদ্ধে প্রার্থী দেয়। কিন্তু পরে জিন্নার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে সেই প্রার্থীকে প্রত্যাহার করে নেয়। জিন্না বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আইন সভায় নির্বাচিত হন। ১৯২৩ সালে জিন্না মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। সেই অধিবেশনের পূর্বাহ্নে একটি বিবৃতিতে তিনি ঘোষণা করলেন যে ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ চুক্তির মত একটি সাম্প্রদায়িক চুক্তি মারফৎ হিন্দু মুসলমান ঐক্যের জন্য তিনি বিশেষভাবে সচেষ্ট হবেন। স্বায়ত্তশাসন লাভও হবে তাঁর লক্ষ্য। মুসলিম লীগের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণেও জিন্না একই মত ব্যক্ত করেন। ঐ সময়ের একটি বিবৃতিতেও তিনি বলেন যে পৃথক নির্বাচন নীতির তিনি পক্ষপাতী নন এবং কংগ্রেস বিরোধী প্রতিষ্ঠান রূপেও মুসলিম লীগকে তিনি গড়তে চাননা। তাঁর নিজের ভাষায়: "I, therefore, hope that the Hindus will not misunderstand me, as I still stand as a tried nationalist and if the Muslims ought to be organised it is not with a view to prejudicing national advance, or national interest, but on the contrary, to bring them into line with the rest of India." জিন্না কেন্দ্রীয় আইন সভায় ভারতীয় জাতীয়তাবাদীর দৃষ্টিকোণ হতে বিতর্ক উত্থাপন করতেন এবং সৈন্যদলের ভারতীয়করণ বিশেষভাবে দাবী করেন। সংবিধান সংশোধনের উদ্দেশ্যে গঠিত মুডিম্যান কমিটিতে জিন্না স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু, স্যার শিবস্বামী আয়ার ও ডাঃ পরাঞ্জপের মতো নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একত্রে কাজ করেন ও কোন পক্ষেই তাতে কোন তিক্ততা দেখা দেয়নি।

(ক্রমশঃ)

গত বছর পূজাসংখ্যায় আমরা শরৎচন্দ্র সম্পর্কে অমর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের প্রতিনিধি সত্যব্রত বসুর সাক্ষাৎকার প্রকাশ করি। এ বছরের সাক্ষাৎকার কবি কালিদাস রায়ের সঙ্গে: কিন্তু আলোচনা সম্পূর্ণ নয়। তাঁর ৬৪ সালের নোটবই থেকে শ্রীযুক্ত যতটুকু উদ্ধার করে দিয়েছেন, আপাতত তাই প্রকাশ করা হল।

শরৎচন্দ্র স্মরণে

[কবি কালিদাস রায়ের মুখ থেকে]

সত্যব্রত বসু

২৪ জুন, ১৯৬৪ : অনেকদিন আগে তাঁর বাড়িতে একবার গিয়েছিলাম,—১৯৫১-তে ; প্রায় বারো বছর পরে আবার সেদিন গেলাম।

চেহারা প্রায় সেইই : শুধু বারো বছরে সামান্য ধূসর।

নীচের ঘরে একটি তক্তার বিছানা পাতা, সেখানে একটি কোলবালিসে হাতের ভর দিয়ে ধবধবে পায়ে বসে সামনের চেয়ারে বসা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কবি কথা বলছিলেন। ঢুকেই সামনে ঐ তক্তা, বাঁদিকে বড়ো একটা টেবিল,—কয়েকটি চেয়ার ওপাশে দেওয়াল-আলমারির কোল ঘেঁষে সাজানো। দেওয়ালে খুব সুন্দর একটি ক্যালেণ্ডার,—স্থান-চিত্র,—বিপুল বিস্তার জুড়ে নীলাভ জল, লাল ছাউনি দেওয়া ঘুরে সারি সারি কুটির। গাছ, জল, আকাশ, সবই এত উজ্জ্বল, সুন্দর, যেন সজীব।

তাঁদের আলোচনা চলছিল কবিতা বিষয়ে।

দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের একটি ছবি। রবীন্দ্রনাথের মুখ তখন ভারি, চোখের দৃষ্টিও ভারি, যেন অভিমানে আচ্ছন্ন। চুল শাদা। ছবিটার দিকে পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের ছবি। কবি যেখানে বসে তার পিছন দিকের দেওয়ালে ফ্রেমে ভরা সুন্দর হাতের লেখায় কবির উদ্দেশে তিনখানি মানপত্র। তাদের মধ্যে একটি তেলেগু ভাষায় : অন্ধ্র সাহিত্য পরিষদের কলকাতা শাখা থেকে দেওয়া।—কোনো বাঙালী কবি বা সাহিত্যিকের প্রতি এই তাঁদের প্রথম মানপত্র।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হয় "যমুনা" অফিসে। বার্মা থেকে তখন মাঝে মাঝে কলকাতা আসতেন। কবি তখন স্কটিশচার্চ্ কলেজে ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র।

কলকাতায় শরৎচন্দ্র পরে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকার কালে দেখাসাক্ষাৎ নিয়মিত হত। রাজা বসন্ত রায় রোডে কবির তখনকার বাড়িতে রসচক্রের আসর বসতো প্রতি রবিবার। শরৎচন্দ্র আসতেন। তাঁকে ঘিরে তরুণ প্রবীণ সাহিত্যিক, সাহিত্যানুরাগী ও ভক্তবৃন্দের মজলিশ জমজমাট হয়ে উঠত। শরৎচন্দ্র তখন বালিগঞ্জে অশ্বিনীগুপ্ত রোডে বাড়ি করছেন, পাড়ি আছে। বসন্ত রায় রোডের বাড়িতে স্থানসংকুলান হচ্ছে না, তখন ঠিক হল চিত্রকর সতীশ সিংহের যতীনদাস রোডের বাড়িতে রসচক্রের আসর বসবে।

শরৎচন্দ্র বলেন, "কাছেও হবে, আবার নিরিবিলি।" শরৎচন্দ্রের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা,—একটি গড়গড়া, একটি তাকিয়া,—"তামাকের খরচটা ওর ওপরেই চাপিয়ে দেওয়া যাবে"—আর ছিল মেজের ওপরে পাতা কার্পেট পাতা, পাখা : 'শরৎচন্দ্র তাতে খুব কমফর্ট্ ফীল করতেন।'

সেখানে প্রায় সকল সাহিত্যিকই, যাঁরা পরে খ্যাত হয়েছেন, সমবেত হতেন। তারাশঙ্কর ও প্রথম দিকে ছিলেন "শনি"-দশক, ওখানে আসতেন না। সজনীকান্ত দাস দু একবার এসেছিলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, দীনেশকুমার রায়চৌধুরী, প্রবোধকুমার সান্যাল,—এঁরা প্রায়ই আসতেন। গজেন্দ্র মিত্রর বয়স তখন কম : ১৬, ১৭ হতেই বৈঠকে আসতেন। তিনি কালে সাহিত্যিক হবেন কেউ সেদিন ভাবেনি। অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী মজলিশ জমিয়ে রাখতেন। প্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, সুরথ ঘোষ, কুমুদ রায়চৌধুরী,—কবি এঁদেরও নাম করবেন।

যুদ্ধদেব বসু কখনো আসেন নি। তাঁর ভক্তবৃন্দের একটি স্বতন্ত্র দল ছিল,—তিনি তাদের নিয়েই থাকতেন। এঁদের সম্পর্কে তাঁর ঔদাসিক মনোভাব ছিল। "কল্লোল"-—অফিসে যদিও মাঝে মাঝে গেছেন।

এই বৈঠকে শরৎচন্দ্র সাহিত্য-সম্পর্কে কোনো গম্ভীর আলোচনা পছন্দ করতেন না। অবতারণা দেখলেই অন্য গল্প এনে ফেলে আলোচনা ঘুরিয়ে দিতেন। "সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারো করো, কিন্তু সপ্তাহে একদিন জড়ো হই, এসো সকলে মিলে গালগল্প করা যাক, আনন্দ করে কাটাই—সাহিত্য আলোচনা করে কি হবে। সাহিত্য তাতে এক ইঞ্চিও বাড়বে না।"

প্রকৃতিতে অধৈর্য ছিলেন। 'বেশিক্ষণ গান শোনা, ছবি দেখা বা সাহিত্য আলোচনা সহ্য করতে পারতেন না। অধৈর্য হয়ে পড়তেন।....একথায় নিজের লেখার ক্ষেত্রে তাঁর ধৈর্য ছিল

তাঁর বাড়িতে আলমারি ভর্তি বই দেখিয়ে কবি জিজ্ঞাসা করতেন, 'দাদা, এত বই সব কিনে পড়েছেন?'

'আরে না না, ওসব বার্মায় থাকতে নিলামে কিনেছিলাম।'

বিদেশী বই, বিশেষত নভেল পড়ায় তাঁর একেবারে উৎসাহ ছিল না।

'কী হবে ওসব পড়ে! আমি কি ওদের থেকে লেখা শিখব! না ওদের কথা লিখব! ওসব করলে আমার অরিজিনালিটি আমার নিজস্ব স্টাইল নষ্ট হয়ে যাবে। তার চেয়ে এখন ছ মাস আমার দেশে গিয়ে থাকতে পারলে ভাল হয়। আমি ত লিখব এদের কথা। এদেশের মানুষের কথা আমার নিজের ভাষায়।'

এই প্রসঙ্গে বিপত্র রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ছিল : তাঁকে অলডাস হাক্সলির 'ব্রেভ্ নিউ ওয়ার্লড্' পড়তে বলা হয়েছিল। পড়া দরকার বৈকি, অবশ্যই.—কিন্তু কাদের! কখন! কেন!

শরৎচন্দ্র সভা এড়িয়ে যেতেন, বক্তৃতা লিখে আনতেন। কিন্তু এই সূত্রেও তাঁর কথার মধ্যে সূক্ষ্ম তীর আছে, সুর অভিমানের ধ্বনিও :

'ভাখো কালিদাস, সভা টভা খুবই ভালো কিন্তু আমাকে তার মধ্যে বক্তৃতা দিতে টেনো না। আমি ওসব পারি না। দেশে কত গণ্যমান্য ব্যক্তিরা রয়েছেন, পণ্ডিতরা আছেন, ওঁদের নিয়ে যাও। আমি কী। সামান্য কয়েকটা গল্প লিখে খানিকটা খ্যাতি পেয়েছি। আমি ত তোমাদের ইউনিভার্সিটির অধ্যাপকদের মত গণ্যমান্য নয়, আমাকে কেন টানো।'

তাঁর চিঠা, লেখা, এসব সম্পর্কে বলতেন, "ঘুমোবার আগে ভাবি"। লিখতেন সকালে। "শরৎচন্দ্র একেবারে

আসুক, থাকতে পারতেন না", কবি বললেন, লিখলাম, লিখলাম ; তারপর মানুষ চাই।"

তাঁর অনুজ প্রিয় কবি সাহিত্যিকদের প্রতি তাঁর দরদী স্নেহপ্রায়ণ মনের তীক্ষ্ণ নজর ছিল। প্রতিবছর কলকাতার বাইরে কোনো বাগানবাড়িতে তাঁরা একত্রিত হতেন। কোন্ সাহিত্যিককে অভিনন্দন দিতে হবে সে ঠিক করবেন তিনি। এসব ব্যবস্থার ভার ছিল কবির স্বর্গত ভাই "রাধেশের উপর"। রবীন্দ্রনাথের থেকে দুঃখ পেয়ে অসময়ে একবার ভারি মনখারাপ ; শরৎচন্দ্র বললেন, "এসো, ওকে একটা অভিনন্দন দিয়ে দিই"... তারপর, "ভাখো কালিদাস, আমি অভিনন্দন পেতেও ভালবাসি, দিতেও ভালবাসি।" অসময়ের পর ঠিক হল কবিকে অভিনন্দন দেওয়া হবে, কবি এ কথা শুনেই,

'দাদা আমি আপনার পায়ে ধরছি, ও কাজটি করবেন

'কেন হে!'

'আপনি অভিনন্দন নিতে পারেন, কিন্তু আমার ও তা সাজেনা। লোকে যে হাসবে।'

কিন্তু অভিনন্দনের ব্যবস্থা হল ঠিকই, কবিকে রাজী হতেও হয়েছিল।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'দেখতে কেমন ছিলেন। ছবিতে যা দেখি বলে দিতে হয় না যে ইনি শিল্পী। দেখলে মনে হত না।'

'না' সেটা পরে হয়েছিল, লক্ষ্মীশ্রী আসার পরে। প্রথম দিকে সেটা ছিলনা। তবে চেহারার ধার ছিল। [কবি এই 'ধার' কথাটা সমর্থন করেননি, পরে যখন শুনিয়েছিলাম লেখাটা,— কিন্তু আর কোনো শব্দ এই আলোচনায় খুঁজে পাচ্ছি না। স. ব.] আগে দাড়ি ছিল।' [অন্নদাশঙ্করের একটি রচনার কথা মনে পড়ছে : তাঁর বিদেশিনী স্ত্রীর চোখে প্রথম দৃষ্টিতেই ধরা পড়েছিল ইনি শিল্পী,—চিনতেন না যদিও। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ওঁরা সেবার ট্রেনে এক-কামরায় যাচ্ছিলেন।]

'আর চোখ?'

'হ্যাঁ, চোখ খুব ব্রাইট ছিল।'

তাঁর সুরাপানের কথা উঠল। কবি বললেন, 'সব নেশাই তাঁর পরখ করা হয়ে গিয়েছিল। শেষে আফিম ধরেছিলেন। আফিম একটা খেতেন যা খেলে মানুষ মরে যায়।'

একবার কবির একটি ছেলের অসুখ, খুব কান্নাকাটি করছে, এমন সময় শরৎচন্দ্র এলেন।

'ছেলে এত কাঁদছে কেন হে।'

শুনে বললেন, 'দাও দেখি আমার কাছে একটু।'

বলে তাকে কোলে নিয়ে ঘুরতে লাগলেন। তোলাতে লাগলেন, আদর করতে লাগলেন। কবিসহ বাড়ি শুদ্ধ সবাই ওটস্থ, অবাক, হতবাক,—অভিভূত। ছেলেটি যারা যেতে কবি কদিন বেরোননি একদিন বিকেলে শরৎচন্দ্রই এলেন। কবি চুপ করে বসেছিলেন, এসে তাঁর পাশে বসে পিঠে হাত রাখলেন।

'তোমার মতো এমন ধীমান লোক শোকে এত বিচলিত হলে কি চলে কালিদাস। জীবনে সেব কত আছে ; কত শোক, কত দুঃখ, বেদনা, এইসব নিয়েই জীবন, এসব সয়েই চলতে হবে, এতে মুষড়ে পড়লে কি চলে? চলো আজ্, গ্যালারীতে ছবি দেখে আসি। আর কালিদাস, এ তোমার একারই নয়, এ অভিজ্ঞতা আমারও আছে। মন শক্ত করো।'

বার্মায় তাঁর বিবাহ এবং একটি কন্যার জন্মের কথা উল্লেখ আছে এখানে। কন্যাটি মারা যায় পরে, তাঁর প্রথম স্ত্রীও। কন্যানির্ভর বৃদ্ধদের প্রতি তাঁর বিশেষ দরদ তাঁর সৃষ্ট চরিত্র আশুবাবু, কেদার, বন্দনার বাবা প্রভৃতিদের কল্পনা থেকে বোঝা যায়। বুড়ো বয়সে এমনি একটি মেয়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকার নিষ্ঠুর যাতনা থেকেই তিনি

সাহিত্যে এই মনোরম ভাববিলাসিতার পরিচয়টুকু রেখে যেতে পেরেছেন। এই দিক দিয়ে তাঁর অন্তর যে ভিতরে ভিতরে বুলুক ছিল তা অনুভব করা কঠিন নয়।

রাধারাণী দেবী সম্পর্কে কথা তুলনায়। কবি বললেন, 'হ্যাঁ, রোজই দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর রাধারাণীর বাড়িতে চলে আসতেন। রাধারাণী লিখতেন ভালো, কথা বলতেন খুব সুন্দর করে, শরৎচন্দ্র খুবই পছন্দ করতেন তাঁকে। রাধারাণী তাঁর সম্বন্ধে অনেক বলতে পারবেন। রাধারাণীর অবারিতদ্বার ছিল রবীন্দ্রনাথের কাছেও।'

রচনার নিন্দা প্রশংসা দুয়েরই মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে তাঁকে আমরণ। এ সম্পর্কে তাঁর যে প্রতিক্রিয়া তাতে তাঁর কোমল সহিষ্ণু ভদ্র মনের পরিচয়ই ফুটে আছে। কবি কালিদাস তাঁর লেখার দোষগুণ নিয়ে তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনা করেছেন। শরৎচন্দ্র শুনতেন এবং মানতেনও। বলতেন, 'ধরেছ ঠিকই, তোমার কাছে ত কিছু লুকোবার যো নেই! তবে সেব নিয়ে এখন লিখতে যেয়ো না, টু আরলি হবে, তাছাড়া আমি বেঁচে থাকতে সব কথা খুলে লিখতেও পারবে না। আমি মরলে লিখো। জায়গায় ঢের হয়েছে, ওসব আর ভাল লাগেনা,—আমার রচনার যা যথার্থ মূল্য তোমার কাছে ধরা পড়ে তা তখন লিখো ভাল করে।'

কবি বলতেন, 'কিন্তু ঠিক কি দাদা যে আগে আমিই যাব না।'

'আরে না না কালিদাস, তুমি অনেকদিন বাঁচবে, আমার কথা রেখে নিও! আমার শরীর যে ভিতরে ভিতরে খারাপ হয়ে গেছে, আমি নিজে বুঝিনা। ভিতরে ভিতরে সব ক্ষয়ে গেছে, দেখে নিও, আমি আর বেশিদিন নেই।'

এসব কথা বলতেন যখন তাঁর বয়স পঞ্চাশের ঘরে।

প্রবোধকুমার সান্যাল তাঁর কাছে প্রায়ই আসতেন। একবার শরৎচন্দ্রকে অপ্রোভন ভাবে আক্রমণ করে কলেজের ছাত্রদের অখ্যাত কাগজ "শ্রীহর্ষ"তে তিনি একটি প্রবন্ধ লেখেন।

"কাগজটা ভাল হয়নি। শরৎচন্দ্র শুনে ও পড়ে লাল হয়ে গেলেন। [শরৎচন্দ্রের অশেষ প্রিয় ও স্নেহভাজন ছিলেন শ্রী সান্যাল। স. ব.] আমিও তাকে অনেক গালাগাল দিয়েছিলাম। প্রবন্ধটা এত খারাপ যে মনে হল এর একটা প্রতিবাদ করা উচিত। প্রতিবাদ একটা লিখে একদিন সকালবেলায় তাঁর বাড়িতে গেলাম। দরকারী বা জরুরী কথাবার্তা সকালবেলা তাঁর বাড়িতেই হত। তিনি তখন গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিলেন। "কই দেখি" বলে লেখাটা নিয়ে পড়তে লাগলেন। বললেন, "বেশ লিখেছ কালিদাস, খাসা হয়েছে" বলে প্রবন্ধটি ছিঁড়ে কলকের আগুনে ফেলে দিলেন। বললেন, "আরে মুখ, ক্ষেপেছ তুমি! কে কোথায় কি লিখল তাই নিয়ে আবার প্রতিবাদ ছাপতে হবে! তুমিও যেমন!'

'মরবার পর,' কবি বললেন, 'প্রবোধই দেখি আগে কাঁধ দিতে এগোচ্ছে। আমি বললাম, "কিরে হতভাগা, তুই যে!" হা হা করে হেসে বললে, "সে সব ত হয়ে গেছে দাদা, আর কেন ওসব মনে পড়িয়ে দিচ্ছেন!'

[শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে প্রবোধ সান্যালের অতি উৎকৃষ্ট একটি রচনা অনেকদিন আগে পড়েছিলাম,—কোনো একটি সঙ্কলনে আছে। কবি কালিদাসের চরিত্র এঁকেছেন তিনি আর একটি অনবদ্য রচনায়,—কথাসাহিত্য'র বিশেষ কালিদাস সংখ্যায়। এ দুটি রচনা, যাঁদের পড়া নেই, পড়তে অনুরোধ করি। স. ব.]

সমালোচনা প্রসঙ্গে কবির মুখের আর একটু কথা আছে, সেটুকু তুলে দিয়ে এ প্রসঙ্গের ইতি করি :

'একটা কাগজে তাঁকে আক্রমণ করে ভারি বিশ্রী একটা

প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। বড় দুঃখ পেয়েছিলেন পড়ে। বলেছিলেন, 'আমি ত রুগ্ন মুমূর্ষুপথযাত্রী, আমার আর বদলাবারও সময় নেই, উত্তর দেবারও জোর নেই, আমাকে আঘাত করে কি হবে! বরং যারা তরুণ, লিখছে, সম্ভাবনা আছে,তাদের রচনা নিয়ে লিখুক, তাতে কাজ হবে। কিন্তু এ ভাবে মানুষের মনে দুঃখ দিয়ে যে-লেখা, যে-লেখা অসহিষ্ণু, ক্রুদ্ধ এবং অন্ধ, সে-লেখা লিখতে নেই, তাতে কারো উপকারও নেই। এদের আর মহাকালের অপেক্ষা যেন সয় না, ভাবে যা হয় এখনই একটা রায় দিয়ে দিই। তাতে শুধু ভুল হয়, আর কিছুই লাভ হয় না।"

কথা বলতে বলতে কখন সূর্য অস্ত গেছে, রাস্তায় আলো জ্বলছে, কিছুই খেয়াল করিনি। যেন এক মোহনিদ্রা থেকে জেগে উঠলাম। পিওন জানালা দিয়ে পিছনের বড় টেবিলটায় চিঠি এবং মোড়কে ভরা একটা মোটা পত্রিকা রেখে গেল।

একবার লক্ষ্য করলাম কবি কথা বলতে বলতে উঠে গিয়ে ঐ টেবিলের ড্রয়ার থেকে নস্যির টিন বের করে আনলেন। নস্যি বেশ ভালই নেন, ডিবে নয়, টিন। এবারও উঠে চিঠি এবং কাগজ আনলেন। আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, 'আমাকে বলছেন না কেন! আপনি কেন বার বার কষ্ট করে উঠছেন!' উত্তরে মুখে কিছু বললেন না তবিতে ফুটলো যে ও কিছু না, সামান্য ব্যাপার, তুচ্ছ করে দাও।

চিঠিগুলি আগে দেখলেন। তারপর মোড়ক খুলে পত্রিকা একটু নাড়াচাড়া করে আমার সামনে ফেলে দিলেন। এই নির্বাক ভঙ্গিগুলি, যার ভিতর দিয়ে তাঁর সহজ স্নিগ্ধ স্নেহ ঝরছিল, আমার ভারি ভাল লাগল, মনে গাঁথা হয়ে গেল।

প্রণাম করে যখন উঠলাম, একটু উষ্মভাবেই বললেন, 'তোমাদের আসা উচিত, বুঝলে! আমরা যারা বেঁচে আছি এখনো তাদের কাছে এসে সব জেনে নেওয়া এবং লিখে নেওয়া উচিত।' তাঁর কণ্ঠস্বরের 'আরজেন্সি' আমাকে সচকিত করল।

শান্তস্বরে বিনীতভাবে বললাম, 'আবার আসবো।'

নীলপাড়া নির্জন

প্রবোধবন্ধু অধিকারী

ষ্টেশনে নামলে মনে হবে, কী ভয়ানক নিস্তব্ধতা এখানে! কী দুঃসহ নির্জনতা যে, যদি কোনো সমস্যার কি ভাবে তন্ময় হয়ে না পড়েন, অথবা এই মাঠ দিগন্তপ্রসারী সবুজের সমারোহ, মাথার ওপরের বিশাল নীল আকাশে ডানা মেলা পাখির মতন সাদা মেঘের ভিড় দূর প্রান্তের প্রান্তরেখার সৌন্দর্য আপনার চোখে মধুর স্বপ্নলেখা না আঁকে, তবে নিশ্চয় হঠাৎ, হঠাৎই এক সময় সারা গায়ে শিহরণ অনুভব করবেন আপনি—ভীরু আতঙ্কের উপলব্ধি আচমকা সারা গায়ে কাঁটা দেবে, যেন মনে হবে অন্ধকারে লুকনো বোধের শিকারী বাঘটা পা ফসকে পড়ে গেছে গহীন, গভীর কোনো গর্ত-দেশে।

জায়গার নাম নীলপাড়া; স্টেশনেরও।

সকাল দুপুর কি সন্ধ্যে, অথবা রাত্রির কোনো গাড়ি যেন এই স্টেশনের প্লাটফরম ছুঁয়ে আধ মিনিটটাক দাঁড়িয়ে, যেমনি এসেছিল ঠিক তেমনি ভাঙা সরু গলায় চিকন একটা হুঙ্কার দিয়ে রেল আর চাকার ঘর্ষণের ছন্দোময় যান্ত্রিক সুর তুলে, বাঁয়ে বেঁকে ক্রমে দ্রুতগতিতে চলে যাবে দূরে বহুদূরে, ঠিক তখন আশপাশ এবং গোটা, লম্বা সুদীর্ঘ এই প্লাটফরমের ওপর দেখবেন, বেশিরভাগ দিন কেবল আপনি একা, একা দাঁড়িয়ে আছেন। তিন শো কুড়ি ফুটের টানা প্লাটফরম আপনার পায়ের নীচে পড়ে রয়েছে মরা সাপের মতন। ঠাণ্ডা শক্ত হিম।

গাড়িটা চলে গেলে চারপাশটা একবারে ফাঁকা ধু ধু। কতক্ষণ থাকবে, মনে হবে এক চোখা দৃষ্টির সামনে, খুব কাছে আনা একটি আঙুলের বাধা। ওপারের দূরবিস্তারী সবুজ মাঠ সুদূর দিগন্তে নরম পেন্সিলে আঁকা অস্পষ্ট ছায়া ছায়া প্রান্তরেখা, নির্বাধ আকাশ কি সবুজের সীমাহীন সমারোহের আস্তরণ কিছুই চোখে পড়বে না তখন: বাধা সরে গেলে দেখবেন তাজা ছবির মতন সবকিছু, প্রাণবন্ত একটি ল্যাণ্ডস্কেপের হুবহু প্রতিরূপ।

জুতোর শব্দ উঠবে। প্লাটফরমের খটখটে সিমেন্টে সশব্দ। আর সেই শব্দ তুলে তুলে আপনি যখন স্টেশন এসে দাঁড়াবেন ঢালাও শেড, রাই ভাষার অনুত্তা মুসাফির খানায় খুঁজে পেতে একটিও মানুষের অস্তিত্ব পাবেন না। টিকিট-জানলার দিকে এগিয়ে গিয়ে গলা বাড়িয়ে দিলে ভেতরের ছায়াছায়া অন্ধকারে একজন মানুষ দেখতে পাবেন। ওই মানুষটি একাই স্টেশন মাস্টার, বুকিংক্লার্ক, টালিবাবু এবং গেটে টিকিট কালেকটর। প্রয়োজনে সুখোতে পারেন কিছু। নইলে মুসাফিরখানার সীমা অতিক্রম করে নেমে আসুন। আকাবাঁকা এক সরু পথ আপনাকে বড় রাস্তাতক টেনে আনবে। এখানে দু'একটি ছোট দোকানপাট আছে, অদূরে রিকশা স্ট্যাণ্ড।... নীতা চৌধুরীর স্যানাটোরিয়ামে আসতে মাত্র মিনিট সাতেকের সময় দরকার। হ্যাঁ, রিকশাতেই।

নীলপাড়ায় বাস্তবিক আর কোনো দ্রষ্টব্য বস্তু নেই। আছে ওই স্যানাটোরিয়াম। চারপাশে প্রশস্ত সবুজ মাঠ, ইতস্তত গাছগাছালির জড়াজড়ি, সারা দিনমান নানান পাখির ডাক। তিন দিক থেকে গোটা তিনেক চওড়া পথ এবং কয়েকটি সরু, প্রায় পায়ে-চলা রাস্তা এসে সোজা উঠেছে

এই স্যানাটোরিয়ামের বারান্দায়। মাথার ওপর অবাধ নীল আকাশে হালকা মেঘের খেলা, অদূরের নদীতীরের সৌন্দর্য এই নির্জনে দাঁড়িয়ে একান্ত মনে দেখতে দেখতে যে কোনো মানুষ বিমনা হবে, ভীরু বাতাস তার মনের দিকে হাত বাড়িয়ে, যেন মন্ত্রবলে উদাস করে তুলবে তাকে।

নীতা চৌধুরীর স্যানাটোরিয়ামের অবস্থিতিটি যেন, যেন, বিশাল মাঠের সবুজ শস্যের সীমা ছাড়িয়ে কেবল একটিমাত্র মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। চারপাশে, কাছে কি দূরে কোনো ঘরবাড়ি নেই। দক্ষিণমুখী বড় রাস্তাটা যেখানে মোড় নিয়েছে, সেখানে একটি দোকান; প্রায় মালটিপারপাস শপ বলা চলে। রাস্তায় গাড়িঘোড়ার দেখা প্রায়শ মেলে না। মাঝে মধ্যে হঠাৎ আসা যেরাদী কোনো গাড়ির শব্দ কি হর্ণ তন্দ্রিত নৈঃশব্দ্যের নির্জনতাকে আচমকা ছিন্ন করে দেয়।

যদি কখনও শুধোন, হ্যাঁ নীতা চৌধুরীকেই, 'এত জায়গা থাকতে এই মরুভূমির মতন ……'। শুনে নীতা চৌধুরী হাসবে। পাখির মতন মুখ উদ্ভাসিত হবে নীতা চৌধুরীর। তার প্রখর নাকটি তখন আরও প্রখর এবং প্রকট হবে, না থাকার মতন তার ঠোঁট দুটি তখন খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। '…সারা বাঙলা দেশের মধ্যে এত ভাল জায়গা আমি আর কোথাও খুঁজে পাই নি।' গম্ভীর গলায় বলবে নীতা। এবং তখুনি তার চোখ দুটি কেমন ভাসাভাসা উদাস হবে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আশ্চর্য শান্ত অথচ ভাবুকের গলায় বলবে, 'এত সবুজ এখানে যে কোনোদিন বয়তে সাধ যাবে না মানুষের।'

প্রথমে একটা হাসপাতাল গড়ে তোলার কথা ভেবেছিল নীতা চৌধুরী। হ্যাঁ ছোটখাটো একটা হাসপাতাল। কিন্তু পরে মত পালটেছে। জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছে তার স্টেথস্কোপ গলায় নিয়ে, হাতে ছুরি ধরে, নাড়ি টিপে, পেট দেখে, কণ্ঠায় টর্চের আলো ফেলে আর সিরিঞ্জ ফেটে ফেটে। বাকি জীবন একটু শান্তিতে কাটাতে চেয়েছিল নীতা চৌধুরী। অতএব স্যানাটোরিয়ামের প্রতিষ্ঠা। রোগী থাকবে তাঁদের দেখাশোনা এবং মোটামুটি চিকিৎসা করার জন্যে একজন ডাক্তার রাখা হবে। নীতা চৌধুরী কেবল সকাল এবং বিকেল এই দু'বেলা এক আধটু খোঁজ খবর নেবেন রোগীদের। রান্নাবান্না, খাওয়া-দাওয়া ঘর আঙিনার প্রতি সব সময় নজর রাখবেন। স্যানাটোরিয়াম প্রতিষ্ঠিত হবার পর কিন্তু অবস্থাটা দাঁড়াল অন্য। প্রথম দিকে দু'চার জন রোগী যে আসেনি তা নয়। শেষে দেখা গেল, গোটা স্যানাটোরিয়ামটা শেষ বয়সের বুড়োদের আশ্রম হয়ে দাঁড়াল। এখন এখানে কেবল বুড়োদের ভিড়। কেবল বুড়ো।

এমন কিছু দূরে নয় নীতা চৌধুরীর এই স্যানাটোরিয়াম তথা বার্ধক্য আশ্রম। হাওড়া স্টেশন থেকে গাড়িতে চেপে সময় দেখে রাখুন, দেখবেন, মাত্র দু'ঘণ্টা পঁচিশ মিনিটের ছোট একটি জার্নি। একটা পুরো ঘুমের আয়ু পর্যন্ত নয়। লোকমুখে 'নীতা চৌধুরীর স্যানাটোরিয়াম' নামটা চালু হলেও এখানে ঢুকবার মুখে যে রাধাকৃষ্ণমন্দিরের লতা ছাওয়া ফটক, তার মাথার দিকে তাকিয়ে দেখবেন, বড় একটা সাইনবোর্ড। তাতে মোটা অক্ষরে গোটাগোটা করে লেখা, 'আরোগ্য আবাস'। নীতা চৌধুরী বলে, 'আমার বাবা শেষ বয়সে খুব রুগ্ন হয়ে পড়েন। ক্রনিক ডিজিজের রোগী, দিনকে দিন শুকিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁকে একটা ভালো স্যানাটোরিয়ামে যখন আনা হ'ল, দিন কয়েক খুব আনন্দের মধ্যে থাকলেন, তারপর হঠাৎ 'যাত্রা যান।' একটু বলে অল্প খানিক সময় চুপ করে থাকবে। আনমনা হবে। তারপর বলবে, ঠিক মৃত্যুর আগ-মুহূর্তে বাবা বলেছিলেন, আমার যদি আর একটা মাস আগে এখানে আসতাম, আমি তবে ভালো হয়ে উঠতে পারতাম।…সেই থেকে এরকম একটা কিছু করবার বাসনা আমার ছিল। তাই এই আরোগ্য আবাস।' যতীন, এই

বাড়ির যেন নাম', কাম দারভেন্ট, কাম পিয়ন কিন্তু সুযোগ পেলে আড়ালে আবডালে অন্য কথাই বলে থাকে। এই বাড়িতে থাকা যে কোনো সুস্থের আত্মীয়-স্বজন যতই বলুক না কেন, এই বাড়ি প্রকৃত আরোগ্য-আশ্রম যতীন বলে, একটি রোগীও যদি কোনোদিন ভালো হয়ে ওঠে তবে বলব সত্যি সে বেচারী বাঁচল। আরোগ্য আবাস না, যমের আবাস।'

এখানে, এই আশ্রমে যতীনের খুব একটা সুনাম নেই। ও যদি মনে করে থাকে, নীতা চৌধুরী কিছুই বোঝে না, তবে ভুল করেছে। কী জানতে বাকি আছে নীতার? দুপুরে যখন প্রায় সকলের দিবা বিশ্রাম নেবার সময়, ঠিক তখন যতীন টুক করে কেন কেটে পড়ে, এবং কোথায় যায় তা মোটেই অজানা নেই নীতা চৌধুরীর। এবং নীতা চৌধুরী জানে পুরা দু'টি ঘণ্টা টানা এ বাড়ির চৌহদ্দীর মধ্যে থাকতে পারে না যতীন।'...ও আবার মাসতুতো বোন—','এ দাদার শালী', অথবা 'মেজদিদির দেল ননদ' বলে প্রায় হিকেলে ও যাদের পরিচয় দেয়, তারা সত্যি সত্যি কে এবং কী দিল চৌধুরীর তা বুঝতে কষ্ট হয় না। যতীন যদি ঠিক ঠিক দিনগুলোতে পাটভাঙা ধুতি জামা পরে কিট ব্যাগটি না সাজত তবেও না হয় ওদের আত্মীয় বলে ধরে নেবার মধ্যে একটা যুক্তি থাকত।

জনা তিরিশ বৃদ্ধ নিয়ে নীতা চৌধুরীর এই আশ্রম তথা সংসার। অবিবাহিত, কাজ থেকে অবসর নেবার পর বাকি জীবনটা শান্তিতে কাটাতে চান এমন লোক কিছু আছে। স্ত্রী আছে, অথচ তার স্বামীর সঙ্গে বনিবনা নেই, কারণ উভয়েই সন্তানের ওপর নির্ভরশীল, সুতরাং স্বামী শেষের দিনগুলি কাটাতে এসেছে অনেক। দু'একজন সন্তিকারের রুগ্ন বৃদ্ধ যে নেই তা নয়। বাকি সব আর এক দলের এঁরা পক্ষীহীন। মেয়েদের বিয়ে যা হবে গেছে, ছেলেরাও সকলে উপযুক্ত—পেছনের মানুষ বলে একালের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেন না নিজেকে। খিটিমিটি লাগে। অতএব এখানে আসা। কার্যকারণ ভিন্ন ভিন্ন হলেও, একটি জায়গাতে প্রায় সকলেই এক। এঁরা বড় নিঃসঙ্গ, বড় একাকী। এবং প্রায় প্রত্যেকের অবস্থাই ভাল। আর্থিক দিক থেকে। মধ্যবিত্ত ঘরের কেউ নেই একথা সত্য নয়। অরবিন্দ পুরকায়স্থ রয়েছেন। ধর্মদাস মল্লিক, যিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে পাকা টেররিস্ট বলে পরিচিত ছিলেন; পরে, দেশ স্বাধীন হলে সোস্যাল এডুকেশনের ডেপুটি ডাইরেক্টর হিসাবে কাজ করেছেন বেশ কয়েক বছর। অবসর নেবার পর তার আশ্রয় হয়েছে এই স্যানাটোরিয়াম। অনন্তবিলাস বসুমদার বাহাত্তরের পরেও তেজী সাত্ত্বিক পুরুষ। যেমন দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, তেমনি গলা। স্পষ্টবক্তা, আধুনিকতা-বিরোধী। তার একমাত্র ছেলে প্যারী ঘুরে আসার পর থেকে মতান্তরের সৃষ্টি। বাপ যা করেন, বিশ্বাস করেন তার সবকিছুকেই সংস্কার বলে উপেক্ষা করে তার ছেলে। স্বেচ্ছতা বাপের অপছন্দ। সুতরাং অনন্তবিলাস চলে এসেছেন নীলপাড়ার নির্জনে। স্বর্গতা স্ত্রীর স্মৃতি নিয়ে, এখানে তিনি বেশ বহাল তবিয়তে বাস করছেন। এমনি সকলেই প্রায় বিশিষ্ট, স্বতন্ত্র। যেন ওঁদের কাছে এই বার্ধক্য আশ্রমটির একান্তই প্রয়োজন ছিল।

প্রায় সকলের জন্যেই এখানে আলাদা আলাদা ঘর। কারো ছোট, কারো বা সামান্য বড়। যে যেমন চাইবে, খরচ করবে তার জন্য তেমনই ব্যবস্থা। বাড়িটি তোলবার আগে, প্ল্যান করার সময় নীতা চৌধুরীর মনে পড়েছিল, কেবল বড় বড় ঘরের রোগীরাই মোটা খরচে এখানে থাকতে পারবে না, নিম্নবিত্তের জন্য সরকারী হাসপাতাল, হেলথ সেন্টারের অভাব নেই। কিন্তু মধ্যবিত্তর রোগীদের জন্য অন্তত কিছু ব্যবস্থা তার রাখা উচিত। যাতে কিছু কম খরচে তারাও এখানে আরোগ্য লাভের সুযোগ পায়। সুতরাং থিডল ওয়ার্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দু'টি বড় ঘর, সেখানে ৪টি অন্তত বেড বসে। এখন, গোটা আরোগ্য

আবাসটি ক্রমে ক্রমে বার্ধক্য আশ্রমে পরিণত হ'লে মিস চৌধুরী বড় ঘরগুলোকে আধাআধি করে পার্টিশন তুলে দিয়েছেন। তাই এখন মিঃ বেডের রুমের সংখ্যা এখন চার। এবং তার কয়েকটি বেডেই লোক এসেছে। আছে।

ছোট ঘরগুলো, জন তিরিশ বৃদ্ধ, তবু এখানে দু'টি দল। এস্ট্যাব্লিশমেন্ট গ্রুপ, ইয়ং রে জেনারেশন। কম নম্বর সাতের সাহাবাবু একে বিভক্ত করেছেন। ভদ্রলোকের বয়স আশীর ওপর। স্বভাব মিতুকে। তবু ইয়ংস্টারদের সঙ্গে সকল বিষয় নিয়ে মতা করতে তাঁর বাধে। ফলে এখানে যাদের বয়স পঞ্চাশটির মধ্যে তাঁরা ইয়ংস্টার জেনারেশনের লোক। ছেষট্টি বছরে এসে এস্ট্যাব্লিশ গ্রুপে পড়ল। এই বিভাগ কেবল বেড়ানোর ক্ষেত্রে এবং বৈঠকী আনন্দের বেলায়। নইলে সব ঘরের সকল বাসিন্দাই মিলেমিশে থাকে। খাবার টেবিলে একসঙ্গে বসে সবাই। লাইব্রেরীতেও একসঙ্গে। প্রয়োজন, সময় কাটাবার তাগিদে এ ওর ঘরে গিয়ে বসে। গল্পগুজব করে।

এই বাড়ির ইতিহাসে একটি বড় ঘটনা ঘটেছিল। হ্যাঁ একজন নতুন বোর্ডার নিয়ে। খাবার টেবিলে সকলে যখন উপস্থিত, ঠিক তখন নীতা চৌধুরীর প্রবেশ। দরজা ডিঙিয়ে নীতা ডাইনিং হল-এ ঢুকে পড়েছিল। 'আপনারা সম্ভবত কেউই জানেন না। যে, আমাদের এখানে একজন নতুন মানুষ আসছেন।' নীতা চৌধুরীর গলা শুনে সদ্য-ধোওয়া, প্লেট সামনে টানা হাতগুলো থেমে গেল আচমকা। দু' ডজনে বসা সবগুলো মানুষ একসঙ্গে তাকালো দরজার দিকে, চোখে প্রশ্ন নিয়ে। '...আমার, আপনাদের নতুন সঙ্গী।' নীতা চৌধুরী দু'পা এগিয়ে এল সামনে। নিশ্বাস নেবার মতন সময় থেমে থেমে বলল, 'প্রবাসজীবন গুহ। তিনি এখানে, আপনাদের সঙ্গে থাকবেন।' গোটা ডাইনিং হল-জুড়ে একটি চাপা কলরব উঠল। 'প্রবাসজীবন···প্রবাসজীবন গুহ···' ওরা নীতা চৌধুরীর বলা নামটা প্রত্যেকে উচ্চারণ করল। তাকাল সকলে, সকলের দিকে। নামটা শোনা, পরিচিতও, তাই বলে প্রবাসজীবন গুহকে এ দেশের একজন ধনপতি বলে আখ্যায়িত করা যায় না। এমন কি অন্য কোনো দিক থেকেও তিনি মাতৃভূমির বরেণ্য সন্তান নন। তবু নীতা চৌধুরীর স্যানাটোরিয়ামের প্রায় সকলেই তাকে চেনেন এ-কারণে যে, এই নামের একজন বোর্ডার আসি আসি করেও আসছিলেন না। অথচ তার জন্য একটি ঘর আলাদা করে রাখা হয়েছে। খবর নিয়ে জানা গিয়েছিল, তিনি না এলেও, না থাকলেও, স্যানাটোরিয়ামের পুরো পাওনা তিনি প্রতি মাসে নিয়মিত মণিঅর্ডার করে পাঠিয়ে গেছেন। মাস পাঁচেক আগে ওই ঘরের দরজার প্রবাসজীবনবাবুর নেম প্লেটটা সেঁটে দেওয়া হয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে দরজার পড়েছিল তালা। সেই বন্ধ তালা। তা হ'লে এবার খুলছে ভেবে সকলে খুশী হতে পেরেছিল।

কারও ধারণা প্রবাসজীবন নিশ্চয় একজন জাঁদরেল ব্যবসায়ী। কেউ মনে করেছেন তিনি কোটিপতি ধনাঢ্য ব্যক্তি। কারো বিশ্বাস প্রবাসজীবন একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক। মণিলাল মল্লিক তাঁর দু'টি শাদা ভুরু কুঁচকে, আলগা হয়ে আসা কপালের চামড়ায় চিন্তার ভুকুন ফুটিয়ে বললেন; 'প্রবাসজীবন? হ্যাঁ ওই নামের এক ছোকরার সঙ্গে জেলে আমার পরিচয়। ভুগোর ছেলে। দু'হাতে বন্দুক চালাত। টেররিস্টদের মধ্যে প্রবাস অল্পায়াসে সাড়া আনতে পেরেছিল।' কৃপাহরি তরফদার, নর্থ সুবারবণের ডাক সাইটে হেড মাষ্টার ছিলেন। তাঁর ধারণা শিক্ষাবিদদের মধ্যে তিনি কেবল বিশিষ্ট নন, অনন্য। নামটা শোনার পর থেকে তিনি ভাবছিলেন। বললেন, 'প্রবাসজীবনবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় দিল্লিতে সেন্ট্রাল এডুকেশন মিনিস্ট্রির উনি ছিলেন ডেপুটি সেক্রেটারী। খুব মাই ডিয়ার লোক। গান বাজনা বলতে পাগল একেবারে।'

অক্টোবরের প্রথম রবিবারে প্রবাসজীবন এখানে এলেন। আগের সপ্তাহের রবিবারে তাঁর একমাত্র ছেলে প্রভাতজীবন এসেছিলেন এখানে। প্রভাতের বয়স চল্লিশোর্ধ অথচ পঞ্চাশ নয়। মাথায় মেঘবহুল চেহারা, মাথায় প্রশস্ত গোছের টাক, মুখাবয়ব প্রায় গোলাকৃতি। তবু সব মিলিয়ে তার চেহারাটা বেশ আকর্ষক গোছের। একটু বেশি দ্রুত কথা বলে, গলাটা যেন সব সময় চড়েই রয়েছে। ফলে এই স্যানাটোরিয়ামের প্রায় সকলেই জানার পায় প্রভাত এলো। কারণ লোকটির কথাবার্তা নির্জন নীলপাড়ার এই শান্ত স্তব্ধতাকে পলার জোরে সচকিত করে তুলেছিল।

'এই স্যানাটোরিয়ামটা আমার মনোমতন। আর মিস চৌধুরী আপনার সেবাযত্নের ব্যবস্থার তুলনা হয় না।' প্রভাত আরোগ্য নিবাস আর নীতা চৌধুরীর প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ। 'এখানে বাবা খুব আনন্দে থাকতে পারবেন। মা খুব খুশী হবেন সত্যি।' শেষে গলা ছোট করে, প্রভাতের চিন্তানুযায়ী কেবল কথাগুলো নীতা চৌধুরীকে শোনাবার জন্য বলেছে, 'কাজে কাজেই আমি নিজে আর একবার চলে এলাম মিস চৌধুরী। সত্যিসত্যি আমার মনে হচ্ছে, এখানে এলে বাবা একেবারে পরমানন্দে থাকবে। সেই যে সেবার এসে জ্বরটা বুক করে গেলাম না? তারপর থেকে জানেন, বুড়োকে কিছুতে কনভিন্স করতে পারি না। বাবা, কী ভয়ানক কষ্ট যে গেছে ওঁকে সন্তুষ্ট করাতে সে একমাত্র ভগবান জানেন। কিছুতেই আসতে চায় না। আপনি তো জানেন মিস চৌধুরী, এই সব বুড়োরা কেমন বেয়াড়া ধরণের হয়। কিসে যে সত্যিকারের ভাল হবে, সে বোধটুকু লোপ পায়।'

'হ্যাঁ, সে রকম তো হয়ই।' নীতা চৌধুরী প্রভাতকে সমর্থন করছে যেন গলার কথা বলল।

'হয় মানে। হচ্ছে।' প্রভাত তার মুখটা আরও সরিয়ে আনলো নীতা চৌধুরীর কানের কাছে। 'ব্যাপারটা কি জানেন? সব সময় কিছু না কিছু ঝামেলা করা চাই। বুড়ো হয়েছে, এ-সব ঝঞ্ঝাট যে ওর সইবে না, এই কথাটা কিছুতেই ওঁকে বোঝানো যায় না। বাড়িতেও বাস্তবিক এমন কোনো নিরিবিলি ঘর নেই যে, পরম শান্তিতে সেখানে বাকি দিন ক'টা কাটাতে পারেন বাবা। আপনার এই স্যানাটোরিয়াম কিন্তু সেদিক থেকে সত্যি স্বর্গ। আমি জানি বাবা এখানে এসে নতুন জীবন ফিরে পাবেন।

প্রবাসজীবন এলেন পরের রবিবারেই। তখন দুপুর হয়নি। বেলা সাড়ে এগারোটা বেজেছে সবে। আরোগ্য আবাসের জুনিয়ার আর সিনিয়ার বোর্ডারদের সকলে এসে বসেছেন ডাইনিং হল-এ। স্নান শেষ সকলের। টেবিলে খাবার পড়েছে। পরিচ্ছন্ন হয়ে সবাই এসে বসেছেন। এমন সময় নীতা চৌধুরী প্রবাসজীবনকে সঙ্গে নিয়ে এ-ঘরে ঢুকলেন। '...প্রবাসজীবন গুহ' মিস চৌধুরী বললেন। আর সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহলের চোখ মিছে তাকাল, দেখছিল নবাগত সঙ্গীকে। বেঁটেখাটো দেখতে, পরনে খদ্দরের ধুতি, গায়ে লম্বা গোছের গলাবন্ধ কোট গলায় মাফলার। ভদ্রলোক ঈষৎ গম্ভীর, তবু ওরই মধ্যে মনে হচ্ছিল স্বাস্থ্যের দিক থেকে মোটামুটি শক্ত সমর্থ। মাথায় টাক। সাদা চুলের একটি অস্পষ্ট রেখা এ কান থেকে ও কান পর্যন্ত অর্ধবৃত্তাকারে মাথা জড়িয়ে আছে।

প্রবাসজীবন এগিয়ে এসে সকলের হাতে হাত মেলালেন। মাথা নেড়ে যাচ্ছিলেন সঙ্গে সঙ্গে। তার হাত গরম এবং শক্ত।

বসলেন প্রবাসজীবন। পরিচয় হ'ল, অল্প কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনাও। মনুষ্য জীবনের সার্থকতা মেলামেশার দাম, ব্যবহারের মূল্য, আধুনিককালের সমাজ ব্যবস্থার অবনতি, সরকারী উদ্যোগের সাফল্য ও ব্যর্থতা। অতি আধুনিকত্বের কুফল ছিল এই আলোচনার বিষয়।

টেবিলে খাবার, অথচ কেউ খেতে পারছেন না। নীতা চৌধুরী বললেন, 'গুহ সাহেব আপনি বরং সবের সঙ্গে বসে

কফি খান। খেতে খেতে সকলে গল্প করতে পারবেন। বসুন আপনি, কফি আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি এক্ষুণি।'

'আপনার এখানে সময় কাটবে ভাল।' অনন্তবিলাস বলছিলেন। 'সত্যি সত্যি দেখবেন, দিনটা কী চমৎকারভাবেই না শেষ হয়ে যাবে।'

'বিকেলের দিক একটু বেড়ানোটেড়ানো ভালো। মন ফ্রেস থাকে ওতে। ঘুমটাও ভাল হয়। আপনি আমার সঙ্গে নদীর দিকে যেতে পারেন। পরশুদিন আমি গিয়েছিলাম···।' অরবিন্দ পুরকায়স্থ বললেন, 'জানেন, খালি খালি অনেক বক আর বালিহাঁস, শুধে শেষ করতে পারবেন না।'

'কতটা দূর?' নিবারণ চক্রবর্তী যাঁর ডান অংশটা হাফ প্যারালাইজড, তিনি বললেন। কৌতূহলের চোখ মেলে তাকালেন পুরকায়স্থের দিকে।

'প্রায় আধ মাইলের মতন।'

'ওরে বাস্, আধ মাইল!' চক্রবর্তী যেন ধপ করে আকাশ থেকে পড়লেন। মাছের কাঁটা বাছতে বাছতে বললেন, 'অল্পকালে দিনে বত্রিশ মাইল হেঁটেছি। এখন সিকি মাইলও সহ্য হয় না। বুড়ো বয়সে, বুঝলেন প্রবাস-জীবনবাবু, নিবারণ চক্রবর্তী সরাসরি তাকালেন নতুন লোকটির দিকে, 'সিকি মাইলটাক হাঁটাও আমাদের ক্ষতিকর···।'

'আপনি থামুন তো মশাই।' জোর না হলেও ছোট করে একটা ধমক দিলেন অরবিন্দ পুরকায়স্থ। 'নিজে ভুগছেন বলে সবাইকেই রোগী মনে করার একটা খারাপ স্বভাব···'

'খারাপ স্বভাব মানে!' প্লেট থেকে আধ অচল হাতটা সরিয়ে নিলেন চক্রবর্তী।

'খারাপ স্বভাব মানে, বদ স্বভাব···'

'আপনি কি ভদ্রভাবে কথা বলবেন?'

'আশ্চর্য লোক আপনি···' পুরকায়স্থ আরও কিছু হয়ত বলত। কিন্তু থেমে গেল। দরজায় নীতা চৌধুরী এসে দাঁড়িয়েছে। যেন খুব অন্তরঙ্গভাবে কথা বলছে, এমন ভাব নিয়ে পুরকায়স্থ সামান্য ঝুঁকলেন প্রবাসজীবনের দিকে। 'সত্যি কি অতদূর যেতে আপনার কষ্ট হবে?'

'ঠিক জানিনা।' কফির পেয়ালায় ঠোঁট রেখে প্রবাস-জীবন আলতো করে ঘাড়টা কফি মুখে টানলেন। 'কিন্তু বাসায় থাকার সময় প্রায় বিকেলে আমি মেয়ের বাসায় বেড়াই। তার দূরত্বটা ধরুন বাসের অন্তত: চারটে স্টপ হবেই।'

'চারটে স্টপ!' টেবিলের সকলে প্রায় সমস্বরে বলেন, যেন ওঁরা সকলে এরই মধ্যে কত অন্তরঙ্গ হয়ে পড়েছে প্রবাস-জীবনের সঙ্গে।

নীতা চৌধুরী, একটি চেয়ার টেনে সকলের মধ্যে বসল। একে একে দেখলো সবগুলো মুখ। 'মিস্টার গুহর আগমন দিনকে স্মরণীয় করবার জন্য আমাদের কিছু করা দরকার।' থামল নীতা, যেন গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছে এমন গলা নিয়ে বলল, 'আমি ভাবছি···'

ডাইনিং হলের সবগুলো বুড়োর হাত থেমে গিয়েছিল। মুখে মুখে প্রশ্নময়তার ঔজ্জ্বল্য। ওঁরা জানতে চায় মিস চৌধুরী কী ভাবছে।

'কাল একটা স্পেশাল মেনু করলে··'

অনন্তবিলাস নীতা চৌধুরীর কথার মধ্যেই উঠে দাঁড়িয়েছিল। 'বরং একটা কিস্টটিটিট করতে পারি আমরা....।'

'ছোটখাটো একটা অনুষ্ঠান করলে দোষ কী?' কপাহরি তরফদার উঠে বললেন। 'আমরা যে যতটা জানি, গান বাজনা আবৃত্তি ক তে পারি··।'

নানা মুনির নানা মত। অরবিন্দ পুরকায়স্থ কাঁক বুঝে তাঁর প্রস্তাবটি ঠিক উপস্থিত করেছিল। 'বিকেলে সবাই মিলে নদীর ধারে ধারে··'। সঙ্গে সঙ্গে কলিয়ে উঠেছে

নিবারণ চক্রবর্তী। মুখে এমন শব্দ করল, যেন তার শরীরের কষ্টটা এই মুহূর্তে হঠাৎ বেড়ে গেল।

পরদিন সকালে যতীন যখন সকালের খাবার নিয়ে সপ্তরো নম্বর ঘরে ঢুকল, প্রবাসজীবনকে দেখেছে ইজি-চেয়ারে। ঘরটা নিস্তব্ধ বাইরের দিকের একেবারে কোণের ঘর। লম্বা রিডিং রুমটা যেন এই ঘরকে কলরোলের মুখ থেকে ঘুরে সরিয়ে রেখেছে। অন্যান্য ঘরের তুলনায় মোটা-মুটি প্রশস্ত ও স্পেশাস ঘর। ল্যাট্রিন, বাথ সঙ্গেই। লাইট-গ্রীণ কলারের ডিসটেম্পারড করা। চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে প্রবাসজীবন পড়ছিলেন। বই। ডানা মেলা পাখীর মতন খোলা বইটি প্রবাসবাবুর মুখকে আড়াল করে রেখেছে।

'আপনার খাবার....' যতীন ব্রেকফাস্ট-ট্রেটা টিপয়ের ওপর রাখল।

বই বন্ধ করে, কোনোদিকে না তাকিয়ে প্রবাসজীবন ইজিচেয়ারের হাতল থেকে টাওয়েল টেনে কোলে মেলে দিলেন। কাঁচের বাটিতে দেওয়া ঈষদুষ্ণ গরম জলে হাতের আঙুল ডুবিয়ে নিলেন তারপর মুখ নীচু করে নিঃশব্দে খাচ্ছিলেন। তৃপ্তির সঙ্গে।

দেখেশুনে যতীন অবাক। সকালের খাবার বাস্তবিক এ-বাড়ির এক জোর আলোচনার বস্তু। পোঁচ বেশি আলসা হয়েছে অথবা খুব হার্ড। ওমলেটে নুন কম। হয় নরম, নয় বেশি ভাজা হয়েছে। মাখনের পরিমাণ এত বেশি থাকে কেন? পাউরুটির পিস কড়া ভাজা হচ্ছে আজকাল। এবং প্রত্যহের চা নিয়েও অভিযোগের অন্ত নেই। কেউ বলেন, এত পরম! ঠাণ্ডা চা বলে কেউ কেউ দোষ দেন। চিনি কম, দুধের পরিমাণ বাড়ানো দরকার প্রভৃতি। কিন্তু প্রবাস-জীবন কোনো কথাটি বললেন না। একটি শব্দও ফুটল না তাঁর মুখে। কী অসুবিধে হয়েছে গতকাল, রাত্রির ঘুমটা কেমন হল, অথবা আজ কী রকম মেনু হবার সম্ভাবনা সকলের মতন তা না বলাতে ও না জিজ্ঞেস করাতে যতীন অবাক হ'ল। অল্পক্ষণ ও নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল, পরে খুব হতাশ হয়ে ফিরে গেল।

কিছুক্ষণ পরে, বেলা প্রায় পৌনে আটটা নাগাদ যতীন আবার সপ্তরো নম্বর ঘরে ঢুকল। এখন তার ঘর গোছগাছ করে ফেলার ডিউটি। আলনা ঘাট চেয়ার টেবিল মুছবার। কারণ ঠিক আটটায় মোহিনী বাউড়ী আসবে। এ আশ্রমের পুরনো ঝি। এক এক করে সবগুলো ঘরের মেঝে ও ফ্লাইপ করে যাবে। নিজের কর্তব্যটুকু করতে এসে যতীন আবার অবাক হ'ল। গোটা ঘরের চেহারা এমন হয়ে আছে, যেন ঝকঝকে পরিষ্কার এবং ঘর করে গোছানো। প্রবাসজীবন ঘরে নেই, যতীন দেখল, যে বইটা ভদ্রলোক এতক্ষণ পড়ছিলেন, তা টিপয়ের ওপর বন্ধ করা রয়েছে। মলাটে লেখা: "ভেবো না মৃত্যুর কথা।" অক্ষর কটা যদিও বহু ব্যবহারের ফলে ঝাপসা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে, তবু ওই নামটা পড়ে নিতে কষ্ট হ'ল না যতীনের। মৃত্যু! যতীনের ভেতরটা যেন কেমন করে উঠল। ভয় ভয় করছিল। সারা গায়ে শিরশির শিহরণ অনুভব করল ও, কিন্তু কি আশ্চর্য, সে কিছুতেই বইয়ের মলাটের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারছিল না। মনে মনে যতীন অবাক হ'ল, মৃত্যু কী, কেন তাকি কেউ বলতে পারে নাকি? যদি নাই পারবে তবে কেমন করে এত বড় একটি বই লিখে ফেলেছে! দরজাটা দেখে নিয়ে, হাতে বইখানা তুলল যতীন, পাতা ওলটাল, ঠিক মলাটের পরের পাতায় লেখা রয়েছে "মৃত্যু বিষয়ক প্রাথমিক জ্ঞান"। অনুভব করল যতীন, তার সারা শরীর কেমন জুড়িয়ে আসছে। রক্ত বুঝি বরফ হ'ল—এই কথা যেই না ভাবা, অমনি ও বইটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল টিপয়ে। ছিটকে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছিল। এমন সময় দরজায় দেখা।

'কী ব্যাপার যতীন?' প্রবাসজীবন ঘরে ঢুকলেন। আস্তে আস্তে। 'চারপাশটা খুব মনোরম, কী বলো?' আলমারীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, 'এত সবুজ আর নিভৃত যে মনে হয় ঘুমের ঘোরের স্বপ্ন···।' প্রবাসজীবন আলমারি খুলে আর একটা বই নিয়ে গিয়ে ইজিচেয়ারে বসলেন। কোনো কথা না বলে যতীন বেরিয়ে আসতে পেরে যেন বাঁচল। ছুটে বেরিয়ে আসবার সময় দরজাটা টেনে দিতে ভোলেনি যতীন।

খানিক বাদে দরজায় টোকার শব্দ পেয়ে বই থেকে মুখ তুললেন প্রবাসজীবন। 'কাম ইন···,' নাকের ডগায় নেমে আসা চশমার ওপর দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, 'ইয়েস···।'

নীতা চৌধুরী এবং সীমা কেলরিওয়াল। সীমা এই স্যানাটোরিয়ামের নার্স। গত রাত কেমন কেটেছে, ঘুমটা ঠিকমত হয়েছিল কিনা, ব্রেকফাস্টের আয়োজনে কোনো ত্রুটি ছিল নাকি, আজকের মাখনের স্বাদটা ফ্রেশ ছিল কিনা, এ-সব কথা এবং শরীরের অবস্থা কেমন যাচ্ছে এ সম্পর্কে আলোচনা করতে ওরা সতেরো নম্বর ঘরে ঢুকেছিল। কিন্তু আশ্চর্য, প্রবাসজীবন কেবার চোখ তুলে তাকালেন না পর্যন্ত। হাতচেঙে রাংতা কিছু, গোটা কয়েক পেন্ট বোর্ডের টুকরো, রঙিন কাগজ, ছুরি, কাঁচি এবং গঁদের শিশি নিয়ে প্রবাসজীবন ব্যস্ত। তন্ময় হয়ে তিনি কাজ করেছিলেন। সম্ভবত খেলনা টেলনা কিছু বানাচ্ছেন। ওরা অবাক হয়েছিল। কিন্তু যতীনের মতন বিস্মিত কি ওরা পায় নি। কিছুক্ষণ পরে, দু'জন মহিলা যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন, তেমনি নির্বাকভাবে, সামান্য আহত মন নিয়ে ফিরে গেল।

এখানে, এদিন থেকেই প্রবাসজীবনের নতুন জীবন আরম্ভ। প্রথম দিন প্রায় নিঃসঙ্গভাবে একাকী ঘরে কাটালেন। বিকেলে এ বাড়ির সকলে বেড়াতে বেরোবার আগেই বেরিয়ে পড়েছিলেন প্রবাসজীবন। ফিরলেনও সকলের আগে। একাকী। যাদের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়েছিল, তাঁদের কারো কারো সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গ এবং ঘনিষ্ঠ হ'লেন। একটি কি দু'টি কথা কিংবা মুখে প্রশান্ত একটু হাসির আভাস টেনে এনে প্রবাসজীবন সেই অন্তরঙ্গতা প্রকাশ করেছেন।

স্বভাবগম্ভীর লোক, মুখে বুঝি সব সময়েই মুখোশ। শুধু এই বার্ধক্য আশ্রমের লোকেরা, প্রবাসজীবনের মনকে ছুঁতে না পারলেও কেউ অসন্তুষ্ট নয়। মানুষটা যদি কথা বলে, নীরব কুশল বিনিময় করে তবে তার মধ্যে অদ্ভুত রকমের ঘনিষ্ঠতার আঁচ পাওয়া যাবেই। এবং যদিও প্রবাসজীবন কখনও, কোনোদিন এ-আশ্রমের অন্য কোনো ঘরে যান না, কেবল নিজের ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে নিজেকে বন্দী রাখেন শুধু এই মানুষটিকে ভালোবাসেন না এমন বৃদ্ধ এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রবাসজীবন হৈ চৈ কি আসর বসিয়ে গল্পগুজব করতে পছন্দ করেন না। লাইব্রেরী ঘরে তাস দাবা কি ক্যারামের আসরে কদাচ তাঁকে দেখা যায় নি। পরন্তু তিনি, শ্রীপ্রবাসজীবন শুধু বোধহয় খুব প্রীত এবং খুশী হয়ে ওঠেন না, যদি তার ঘরে কেউ গিয়ে, যে কোনো কারণেই হোক উপস্থিত হয়। সামান্য আত্মকেন্দ্রিক গোছের মানুষ; একটু নিঃসঙ্গ, স্বতন্ত্র। এমন কি তাঁকে কখনও আর ডাইনিং হলে পর্যন্ত দেখা যায় নি।

নিজের ঘরটুকুই পৃথিবী; জগৎ। প্রায় সারা দিনমান জুড়ে প্রবাসজীবন ওই সতের নম্বর ঘরে একাকী থাকেন। আপন মনে। প্রথম সপ্তাহ প্রায় প্রত্যহই বিকেলের দিকে তিনি খুশীমতন বেড়িয়েছেন। একা একা। অনেকটা খেয়ালের বশেই। পরে দু'একদিন পরে পরে বেরোতেন। এবং শেষদিকে কদাচিৎ তাঁকে স্যানাটোরিয়ামের বাইরে দেখা গেছে।

'একা একা বেড়ানো যায় না, তা-ছাড়া এখানে বেড়াবার মতন জায়গাই বা কোথায়? তার চেয়ে বরং আমি ঘরেই

থাকব। থাকতে ভাল লাগবে আমার।' তৃতীয় সপ্তাহ শেষ হলে প্রবালজীবনবাবু তাঁর ছেলেকে বললেন।

ছেলে, প্রভাত সত্যি এক আদর্শ সন্তান। সকাল এগারোটায় নিজের অফিস চেম্বারে ঢুকেই প্রথমে একটি টেলিফোন বুক করে। নীলপাড়ায়। কথা বলে নীতা চৌধুরীর সঙ্গে। তাঁর বাবা কেমন আছে, গতরাত্রে কেমন ঘুম হয়েছে, সঠিক বেড়াতে বেরোচ্ছে কিনা খাবার সময়ের ঠিকমতন খাচ্ছে কি না-খাচ্ছে, ডাক্তার কি বলে এ-সব খুঁটিনাটি কিছু জিজ্ঞেস করতে কোনোদিন তার ভুল হয় না। উত্তরে নীতা চৌধুরী সবিস্তারে খুলে বলে সব। জবাব দেয়। এমন কি গতকালের মেনু, আজ কি মেনু হবে। কবে ভালো। যখন ওলো না বলে তিনি প্রবালজীবনের জন্য আলাদা ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করলেন তা পর্যন্ত।

'এমন একজন চমৎকার মানুষ কদাচিৎ মেলে—আমরা সকলে ওঁর ব্যবহারে বাক্তিত্বে একেবারে মুগ্ধ।' রোজ একথা বলে টেলিফোনে বাক্যালাপ শেষ করে, নীতা চৌধুরী প্রবাল-জীবনকে ডেকে পাঠায়। ছেলে ডাকছে খবর পেলে, বুড়ো সারা মুখে অদ্ভুত হর্ষ আর প্রশান্তি নিয়ে ছুটে আসে। রিসিভার তুলে হাসেন, 'কে প্রভাত? তোরা কেমন আছিস? বৌমাকে বলিস আমি বলছি, যেন বেশীমাত্রায় উত্তেজিত না হয়। প্রবাল আর হাসি ঠিকমতন কলেজে যাচ্ছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, হাজার কাজের মধ্যেও তোমাকে এ-সব দেখতে হবে বৈ কি। ওরা ভাল হ'লে তবে তোমার শান্তি। আমায় দেখে বুঝতে পারছ না? আমি যদি তোমার মতন হতাম, ভেবে দেখ তোমায় কুলীগিরি করে খেতে হত। বাপ হওয়ার দায়িত্ব কম না। ছোটদের টিউটরদের ওপর একটু কড়া নজর রাখিস—' কত কথা, কত আদেশ নিতার মতন, পরামর্শ বন্ধুর মতন যে প্রভাত রিসিভার রেখে দেবার আগ্রহ চেষ্টা করেও পারে না। অবশেষে, প্রায় আধঘণ্টা ধরে কথা বলে যখন প্রবালজীবন ফোনটা রেখে দিতে বাধ্য হয়, অল্পক্ষণ শুম ধরে থাকে। শেষে মিনা চৌধুরীকে মিষ্টি একটু হাসি দেখিয়ে বেরিয়ে আসেন নিজের ঘরে।

প্রতি রবিবার প্রভাত ছেলেমেয়েদের নিয়ে নীলপাড়ায় আসে। কেবল সেইটুকু সময় কেউ যদি দেখে প্রবালজীবনকে, বাস্তবিক সে অবাক হবে। বুড়ো যেন তিরিশ বছরের যুবক, কী চটপটে, কী উদ্যম, কী হাসি কথা আনন্দ আর উত্তেজনা। দুপুর শেষ হলে প্রবালজীবন নিজের হাতে ঘর সাজান। যতীনকে ডেকে পরদা পালটান। সকালে কাছের ওই দোকান থেকে দিবি বড়রকমের বাজার করে ফেরেন। ফল, মিষ্টি, খেলনা, জামাটা মোজাটা, কেক, বিস্কুট প্রায় সব। এবং বিকেলের মধ্যে নিজেও ছোটাছুটি পোশাক পালটে তটস্থ হয়ে থাকেন। জানলায় তাঁর চোখ দুটো আটকে থাকে সারা বিকেল। যেই না দেখতে পেলেন, ওরা আসছে, প্রবালজীবন প্রায় ছুটে দৌড়ে এগিয়ে যান। গিয়ে একসঙ্গে জাপটে ধরেন নাতি-নাতনীদের। ছেলের মাথায় হাত রাখেন। তারপর হাসিতে খুশীতে আনন্দের সঙ্গে ওদের প্রায় পাহারা দিয়ে নিয়ে আসেন নিজের ঘরে।

'রোজ রোজ তুমি অমন করে ছুটে এসোনা বাবা···' প্রভাত বলে। 'বুড়ো বয়সে যদি হঠাৎ পড়েটড়ে যাও তা হ'লে খুব বিপদ হবে।'

প্রবালজীবন হাসেন। যেন এই অভিযোগ কোনো শিশুর। চেয়ারে বসে নাতি-নাতনীদের কাছে টেনে নেন। রাখতে চান গায়ে গায়ে। প্রভাতের আট বছরের শেষ সন্তান টিকলুকে কোলে তুলে আদর করেন।

'টিকলুটা একটু বেশি রকমের রোগা হয়ে যায় নি বাবা? আর তোমার আদরের হাসির কথা শুনবে। ও এসব কথা শোনে না বাবা।'

'ভেবো না, ওসব ঠিক হয়ে যাবে।' নাতিনাতনীদের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে প্রবাসজীবন তাঁর একমাত্র ছেলে প্রভাতের দিকে চোখ রাখেন। 'বাপ দায়িত্বশীল হ'লে ছেলেমেয়েদের ভাল হয়, ভাল থাকে। তোমাকে এ-কথাটা আমি বলে বলে হয়রান হয়ে গেলাম।'

'তুমি শুধু আমার দোষই দেখ—' প্রভাত যেন আহত হয়।

'দেখি কারণ দোষটা আমার নয়।'

কথাপ্রসঙ্গে মেয়ের কথাটাও তুলিয়ে নেন প্রবাসজীবন। 'হ্যাঁরে, সুতপার খবর কি? ওরা ভাল আছে তো?'

'আছে।' প্রভাত বলে। 'কাল ই তো কলেজ থেকে ফেরার পথে প্রবাল গিয়েছিল। তোমার বৌমা সপ্তাহে দিন দুই অন্তত যায়।'

মাঝে মাঝে নাতি নাতনীদের মধ্যে কেউ না এলে, প্রবাসজীবন কিছু লজেন্স চকোলেট, দু একটা কেক, নিজের হাতে বানানো খেলনা তুলে দেন ছেলের হাতে। ফলটলও কিছুকিছু। প্রভাত এ-সব নিতে চায় না। 'তুমি বাবা ছেলেপুলেদের আদর দিয়ে একেবারে মাথায় তুলছ।'

অভিযোগ করে ছেলে, বাপ তার ওপর বিন্দুমাত্র পাত্তাও দেয় না। প্রবাসজীবন প্রায় সারা সময় তাঁর নাতিনাতনীদের নিয়ে ব্যস্ত।

'তুমি কেন দাদু বাড়ি যাচ্ছ না' যেন নাতি প্রশান্ত বলে। 'তুমি না থাকলে একদম ভালো লাগে না।' প্রশান্ত দাদুর আদরে যোতায় খোঁটে। 'কবে তুমি ভাল হবে দাদু, কবে যাবে আমাদের সঙ্গে?'

'চুপ করো—' প্রভাত ধমক দেয়। 'দাদু অসুস্থ, ওঁর বিশ্রাম দরকার। বাসায় তোমারা কেউ কি ওঁকে শান্তিতে থাকতে দাও নাকি?'

'তুমি চুপ করো।' প্রবাসজীবন জোর গলায় ধমক দেন প্রভাতকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড উত্তেজনা নিয়ে নাতিনাতনীদের জড়ান, আদর করে।

দেখতে দেখতে পাঁচটা মাস কেটে গেল। প্রবাসজীবনের আর সময় কাটে না। প্রভাত আগে সপ্তাহে তিন দিন আসত। দু'দিন একা। রবিবারে ছেলেমেয়েদের কাউকে না কাউকে নিয়ে। এখন গত দু' মাসে মাত্র একবার এসেছে তারা। প্রভাত কেবল প্রতি রবিবার আসে। হ্যাঁ একা। 'তুমি জানোনা বাবা, প্রশান্তটা কী ভীষণ দুরন্ত হয়ে উঠেছে। ওকে নিয়ে আসতে আমার ভয় করে। তা ছাড়া দিনকাল এমন, ওয়েদার বড় খারাপ—ওদের প্রতি রবিবার আনাও ঠিক না। হাসিটার ধাতে আদি সহ্য হয় না। সুতরাং তুমি ওদের আশা নিয়ে বায়না করো না।'

না, নিশ্চয় নয়। প্রবাসজীবনের বায়না করার কীইবা থাকতে পারে! চুপচাপ বসে থাকেন তিনি। ছেলের কথা শোনেন। প্রায় সারা সময় প্রভাত একা কথা বলে। টানা বকবক করে যায়। কখনও চোখ বুঁজে থাকেন প্রবাসজীবন। কখনও বইয়ে চোখ রাখেন, ছেলে কথা বলে যায়। নিজে থেকে সে সব কথার কোন উত্তর দেন না। উৎসাহও প্রকাশ করেন না।

সপ্তাহে অন্যান্য দিনও কিছু কিছু ভিজিটর আসে সতেরো নম্বর ঘরে। দূর সম্পর্কের কোনো আত্মীয় স্বজন, নিকট-আত্মীয় কেউ কেউ। এবং কর্মজীবনের বন্ধু, পাড়ার বুড়োদের কেউ কেউ। প্রবাসজীবন কথাটথা বলতে বলতেই নিজের ছেলের গতিবিধি এবং কর্মকাণ্ড প্রসঙ্গে খবর নেন।

বড় কিছু বলেন না। কিন্তু একদিন আর ধরে রাখতে পারলেন না নিজেকে। কথাটা শুনেছিলেন পাশের বাসার ন-কড়িবাবুর কাছে। প্রবাসজীবনকে দেখতে এসে ভদ্রলোক বলে গেছেন। সেই থেকেই উত্তেজিত হয়েছিলেন প্রবাসজীবন।

ছেলে এলে কথাটা তুললেন তিনি। 'তুমি আজকাল সবকিছু কি লুকোতে চাও আমার কাছে?'

'লুকোতে!' প্রভাত আকাশ থেকে পড়ে। 'না বাবা···'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু কি আবার লুকোলাম আমি?'

দম নিলেন প্রবাস। ছেলের দিকে তাকালেন সোজা-সুজি। 'বাসায় কাউকে এনে তুলেছিলে তুমি?'

'ও হ্যাঁ', প্রভাত যেন স্বস্তি পেল। 'তুমি অমরেশের কথা বলছ তো?'

'হ্যাঁ।'

'দুষকা থেকে বেচারী হঠাৎ এসে উপস্থিত। অফিসের জরুরী কাজে এসেছে। বলছিল হোটেলে উঠবে। আমি বারণ করলাম।'

'তা হ'লে তুমিই তাকে বন্ধু করে ঘরে জায়গা দিয়েছ?'

প্রভাত অবাক।

'অমরেশের কথা, তার স্বভাবচরিত্রের পরিচয় তোমার অজানা নেই।' খুব গম্ভীর গলায় বলছিলেন প্রবাসজীবন। 'তবু তুমি তাকে –'

'কিন্তু দোষটা কী তার?'

'অনেক দোষ। প্রবাসজীবন থেমে গেলেন। একটু চুপচাপ। 'তোমার বন্ধু হতে পারে সে, তার বান্ধবীকে তুমি বিয়ে করেছ সেও ভালো। কিন্তু ওই রকম একটা অসৎ লোককে সাতদিন ধরে ঘরে রাখা আমি নিরাপদ মনে করি না।'

'কিন্তু বাবা, তুমি কেন বুঝছ না··'

'চুপ করো।' প্রবাসজীবন জোর করে ধমক দিলেন। 'এ-সংসারের কিছুই বোঝ না তুমি। বয়েস হচ্ছে অথচ সেই ছেলেমানুষটিই রয়ে গেলে। তুমি জানো না, তোমার স্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্কটা কী? সেবার আমি নিজের চোখে দেখেছি···'

'এ সব নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না।' প্রভাত যেন একটু বিরক্ত হয়েছে। 'এ বয়সে তোমার অত চিন্তা করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো না।'

'তবু আমাকে বলতে হয়। তোমার স্ত্রী যা খুশি তাই করুক আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু আমার বংশধররা খারাপ হবে এ আমি সহ্য করব না। তোমার ধারণা নেই, শুদ্ধ বংশের সন্তান মর্যাদা সুনাম কতটা!' থামলেন প্রবাসজীবন। চুপচাপ বসে থাকলেন খানিকক্ষণ। শেষে অনেকটা অভিমানের গলায় আবার বললেন, 'তোমার উচিত ছিল এসব আমাকে খুলে বলা। বললে ভাল করতে এই আর কি। যাক ··। ঠিক বলেছ তুমি, এসব···এসব নিয়ে আমার মাথা না ঘামানোই মঙ্গল।'

তারপর থেকে একবারে চুপ করে গেলেন প্রবাসজীবন। সারা সপ্তাহ ধরে যারা দেখতে আসে, সঙ্গে কত রকমের উপহার আনে প্রবাসজীবন আর তা নাতিনাতনীদের জন্য জমিয়ে রাখেন না। নিজে কখনও আর যান না দোকানের দিকে। ছেলে আসে দু'একটি কথা হয়। তারপর চলে যায়। সঙ্গে করে প্রভাত যা খাবার দাবার ফলমূল আনে, ছেলে চলে যাবার পর, যতীনকে ডেকে তার সবকিছুই দিয়ে দেন প্রবাসজীবন। বলেন 'নিবারণবাবুকে কিছু দিও। এগারো নম্বর রুমের চ্যাটার্জিবাবু কেকটেক বড় ভালবাসেন ওঁকে দিও।'

ছোটোখাটো টুকরো টাকরা জিনিস দেওয়ার ব্যাপারে প্রায় ডাকতে হয়। এবং সেই সূত্রেই কখন যেন প্রবাসজীবন যতীনকে মোটামুটি কাছে টেনে নিয়েছিলেন। মানুষটা আর কারও সঙ্গে মিশতেন না—বন্ধুবান্ধব এলেও খুশী হতেন না আগের মতন। কেমন যেন সরে গেলেন সব কিছু থেকে। কিন্তু নীতা চৌধুরী লক্ষ্য করছিল অদ্ভুত স্বভাবের এই লোকটি কখন যেন সদয় হয়ে পড়েছেন যতীনের ওপর। বাস্তবিক যতীন না হ'লে এই আনাটোরিয়াম চলা মুস্কিল।

সে কেবল কাজেই করে না, কোনটা কাকে দিয়ে করাতে হবে তাও লোকটার জানা। বলতে গেলে বিনা যতীনে নীতা চৌধুরী অসহায়। শুধু যতীন ঘড়টা সম্ভব সময় পারে দিক না প্রবাসজীবনকে। এদিকে কাজের অনেক অসুবিধে হলেও, নীতা চৌধুরী চেয়েছে, অন্ততঃ প্রবাসজীবন ওই নামের এই অদ্ভুত মানুষটি যেন যতীনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, তাকে কাছে পাবার চিন্তায় নিজেকে মশগুল রাখতে পারে।

প্রবাসজীবন বরাবরই বোধ হয় চেয়েছে, তার কাছে কাছে যেন কোনো বৃদ্ধ না থাকে। নিজে বৃদ্ধ হয়েও যুবা বয়সকে তিনি ভালবাসেন। কারণ ই সঙ্গ তাকে বেশি স্মরণ করার অবকাশ দেয় না যে তিনি নিজে সত্যি শেষ-কালের ধাপে এসে দাঁড়িয়েছেন। নীতা চৌধুরী এ আশ্রমের প্রায় সকলকেই বলে রেখেছেন, যেন যতীনকে কেউ বেশি ডাকাডাকি না করে।

সেই কালো বইটা প্রায় নজরে পড়ে যতীনের। 'বলো না মৃত্যুর কথা।' একটি অদ্ভুত রকমের শিহরণ যেমন অনুভব করে যতীন, ভয়ে জুড়িয়ে আসতে চায় ঠিক তেমনি ওই বইটির তীব্র আকর্ষণের কথাটাও অস্বীকার করবার নয়। কেমন যেন ভয়ানক রকমের এক টান আছে—যতীন তার হাত থেকে কিছুতে নিষ্কৃতি পাচ্ছিল না। তবে কি মরতে আমার ভয়, যতীন ভাবে। কিন্তু আশ্চর্য, ওই ভয়াবহ বইটি নিয়ে প্রবাসজীবন কত সহজভাবে নাড়াচাড়া করে। যখন বুড়ো বইটি পড়ে, মন দিয়ে, যতীন দেখছে প্রবাসজীবনের মুখে কোনোদিন কোনো ছায়া পড়ে না। মন নির্বিকার নিরাসক্ত অনীহ প্রায় ঈশ্বরের মতন। একজন সাধারণ শিক্ষিত মানুষ যেমন করে মেয়েদের গৃহস্থালীর পত্রিকা পড়ে কি ক্যাশন সংক্রান্ত গ্রন্থের পাতায় চোখ বুলোয়, প্রবাসজীবনের এ বই পড়া ঠিক যেন এক।

কিছুই বুঝতে পারে না যতীন, কিছু না। শুধু প্রবাসজীবন যখন ওই বইটি পড়ে, যতীনের মনে হয়, উনি ভয় পাওয়া সত্ত্বেও তা প্রকাশ করছেন না। কাঁকতুক পেলে বইটা নাড়াচাড়া করে মাত্র যতীন। কৌতূহল থাকা সত্ত্বেও তা পড়ে না, কারণ ওর মনে হয় যেদিন এই গ্রন্থটি পড়ে সে কিছু অন্তত বুঝতে পারবে, ঠিক তখনই যেন ভয়ঙ্কর পোকের বীভৎস এক মৃত্যু বেরিয়ে আসবে। এবং সেই মৃত্যু যতীনকে না নিয়ে কিছুতেই চলে যাবে না। যত বেশি করে এ সব কথা ভুলে যেতে চায়, চিন্তার বোঝাটা নামিয়ে মাথা হালকা করতে চায়, ঠিক ততখানিই উৎসাহ অনুভব করে যতীন। আশ্চর্য।

একদিন সত্যিসত্যি এই অলীক ভয় যতীনকে গ্রাস করল। ভয়কে সে দেখতে পেল জীবন্তরূপে। একদিন হঠাৎ কী খেয়ালে অসময়ে প্রবাসজীবনের ঘরে ঢুকে পড়ছিল যতীন। ঘরে মালিক নেই। স্নান ঘরের দরজা বন্ধ না করে প্রবাস-জীবনবাবু স্নান করতে ঢুকলেন এইমাত্র। তাঁর সারা দেহের কোথাও কাপড়চোপড় কি পোষাক-আশাকের বালাই ছিল না। যতীন ওই শরীর দেখে শিউরে উঠেছিল। এবং তার মনে হ'ল, প্রবাসজীবনবাবু এতকাল নকল চামড়া এবং দামী পোষাকে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। আসলে যেমনভাবে, যে চেহারায় প্রবাসজীবনবাবুকে দেখা যায়, সেটা তার আসল রূপ নয়। তাঁর সারা গায়ের রঙ ফ্যাকাশে হলুদ। গায়ের কোথাও মাংস প্রায় নেই বললেই চলে। শুধু চিলেচালা কুচকে-আসা শরীরের চামড়ায় চিতাবাঘের মতন কালোকালো দাগ। যতীনের মনে হ'ল—সে মানুষ দেখছে না, এইমাত্র একটি জীবন্ত কঙ্কাল যেন বাথরুমে ঢুকে গেল।

প্রচণ্ড রকমের আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও যতীন এ ঘর ছেড়ে চলে যেতে পারল না। চোখ দুটি তার অস্বাভাবিক বড়, বিস্ফারিত। সারা গা থরথর করে কাঁপছিল। গায়ের লোমগুলো সজারু-কাঁটার মতন দাঁড়িয়ে পড়েছে। মৃত্যু···মৃত্যু···মৃত্যু যতীনের ভেতর থেকে কে যেন এই একটা কথা বলে যাচ্ছিল। সমস্ত মন চেতনা দিয়েও ছুটে বেরিয়ে যেতে

চাইল কিন্তু পারল না। গোটা মেঝে যেন কেমন করে তার পা দু'টি প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রয়েছে।

অল্পক্ষণ পরে যতীনের মন হালকা লঘু পাখার মতন স্রোতের জলে ভাসতে লাগল। ও ভাবল, একদিন তার জীবনেও বার্ধক্য আসবে। বার্ধক্যের পর মৃত্যু। এবং সেই মৃত্যুর নাম প্রবাসজীবন। নিয়তির এই ভয়ঙ্কর নিয়ম থেকে তাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। যতদিন শরীরের মাংস ভালো থাকবে, চামড়া মসৃণ ঝকঝকে থাকবে, শরীরের কোথাও দাগ পড়বে না, চামড়া ভাঁজ পড়বে না—ততদিনই জীবন। নিজের সমস্ত দেহটার ওপর অত্যন্ত মায়ার সঙ্গে যতীন দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। আমার বয়স বয়স এখন ছাব্বিশ হ্যাঁ ছাব্বিশই— কতদিন আর কতদিন আছে সে দিনটি আসতে?

যতীন তার বাবার কথা ভাবতে পারল। মাত্র চল্লিশে তিনি ভয়ঙ্কর রকমের বুড়িয়ে গিয়েছিলেন। তবু তার বাবা প্রায় ষাট বছর পর্যন্ত কর্মঠ ছিলেন। কাজ করে গেছেন। তার মধ্যে নিজের শরীরের দিকে কোনোদিন তাকাবার অবকাশ পর্যন্ত পাননি বাবা। কিন্তু আমি—যতীন ভাবল। ভাবল যে বার্ধক্যের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে আমি আমার সারা শরীর ও মনকে তাজা রাখবার জন্যে সব রকমের চেষ্টা করে যাবো। বাস্তবিক মানুষের যৌবনের খাদ্য টাকা, অনেক টাকার সুখ, কিছু স্বাচ্ছন্দ্য এবং মনের অপার সজীবতা। সেই সজীবতার উৎস আর এক যৌবন। কুমারী দেহ। ওরকমই কুমারী দেহের পরশ বাস্তবিক যৌবনের বয়েস বাড়ায়। যতীন ভাবল, উমাকে সে আরো নিবিড় করে কাছে টেনে নেবে। খপ করে বুকে জড়িয়ে ধরবে—তার দেহের সবটুকু উত্তাপ সে শুষে নেবে নিজের শরীর দিয়ে। সে টুকুই যৌবন।

অনেকক্ষণ পরে, প্রবাসজীবনের কঙ্কালটা যখন স্নান শেষ করে ফেলেছে, তখন ঠিক সেই সময় যতীন এ-ঘর থেকে পালিয়ে যেতে পেরে বাঁচল।

প্রবাসজীবন যতীনের ওপর চোখ রেখেছিলেন। তার আকস্মিক পরিবর্তন দেখে খুশী হলেন। যতীন সদাসর্বদা ঝকঝকে থাকে। কথা প্রসঙ্গে হয়তো বা মনের অগোচরে ও বারবার মেয়েদের কথা তোলে। কুমারী মেয়েদের। একদিন প্রবাসজীবন আলমারী থেকে তার বহুদিনের পুরনো এলবামটা টেনে বার করলেন। যতীনের সামনে খুললেন। এবং এক এক করে বলে যাচ্ছিলেন, এই আমার বড় মেয়ে সুধন্য বারাকপুরে বিয়ে হয়েছিল। খুব বড় ঘরে। মেয়েটা সুখেই ছিল। কিন্তু একদিন হঠাৎ মারা গেল। এই যে দেখছো এ হচ্ছে আমার বড় জামাই। এরা তিনজন তার ছেলেমেয়ে। এটা হ'ল প্রভাতের ফোটো। চিনতেই পারছ। এ-পাশে তার স্ত্রী দেবযানী। ইউনিভার্সিটির নামকরা মেয়ে। এই আমার ছোট মেয়ে সুতপা।...

'বাঃ, খুব সুন্দরী তো, অপূর্ব সুন্দরী—। মুখে খুব প্রসন্নতা আছে কিন্তু। আপনার স্ত্রীর মুখের আদল আসে অনেকটাই। মেয়ে নিশ্চয় আপনাকে খুব ভালবাসে?'

'হ্যাঁ—' প্রবাসজীবন গর্বের সঙ্গে মাথা নাড়লেন।

'তা হ'লে তো আপনি তার কাছেই থাকলে পারতেন। বেশ ভালো থাকতেন...'

'হ্যাঁ।' প্রবাসজীবন চুপ করে গেলেন। একটা মুহূর্ত ধরে কি ভাবলেন। পরে বললেন, 'তা থাকতে পারতাম। কিন্তু ডাক্তার বলেছে, আমার একটু আলাদা থাকা দরকার। নিরিবিলি, একাএকা...'

এক সপ্তাহ পরে প্রবাসজীবনের একটি ফোন পেল

প্রভাত। 'হাঁ৷ হাঁ৷, তাই নাকি? ও, আচ্ছা··· আচ্ছা আচ্ছা আমি দেখি। আমি যাবো, হাঁ৷ গেলে কথা হবে···। ছেলেমেয়েরা? না, তারা কী করে এখন যাবে? জানতো অনেকদিন ধরে এদের বড় সাধ দার্জিলিঙ যাবে। পাহাড়টাহাড় দেখে নি কোনোদিন, তাই। হাঁ৷ বাবা ঠিক হ'য়ে গেছে সব। না না, তোমার পক্ষে এ কষ্ট সহ্য হবে না। একে দং জানি, তার কষ্টের অবধি নেই। তা ছাড়া তোমার তো আবার ব্লাডপ্রেসার। হাঁ৷ ফিরতে দেরি হবে। দিন পনেরো অন্তত থাকার কথা।'

পরদিন প্রভাত এলো অন্যান্য দিনের তুলনায় ঘণ্টাখানেক আগে। 'তুমি নিশ্চয় খুব ভালো আছ বাবা।' প্রভাতকে খুব হাসিখুশী লাগছিল। 'ছেলেমেয়েরা সকলে আসবার জন্যে বায়না ধরেছিল, বিশেষ নিতে। কিন্তু জানিতো বড় দীর্ঘ—হাতেও সময় নেই একেবারে।' প্রভাত সঙ্গ আনা ফল ও খাবারের বাক্সগুলো বাড়িয়ে দিল বাবার দিকে। এবং প্রবাসজীবন প্রায় ছোঁ মেরে বাক্স দু'টো কেড়ে নিয়ে আক্রোশে রাগে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন মেঝের ওপরে! তোরা আর এলো না। আমি চাই না। এই বয়সে কী অদ্ভুত-ভাবে মুখোস পড়তে শিখেছ আশ্চর্য।'

পরের পাক্কা সপ্তাহ প্রবাসজীবন বোবা হয়ে থাকলেন। জীবন আনমনাও। খেতে বসে সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেছে। স্নান করতে যাওয়ার নামে লাংটেরীতে ঢুকে পড়েছেন। জামা পরতে গিয়ে ধুতি জড়িয়েছেন গায়ে। ধাংসের বদলে থালায় দুধ ঢেলে নিয়েছেন। এবং যতীনকে কতবার যে কতনামে ডাকলেন তার ইয়ত্তা নেই। সকলে বলাবলি করছিল নিবারণ চক্রবর্তীর আকস্মিক মৃত্যুই প্রবাস-জীবনের এই পরিবর্তনের মূলে। বাস্তবিক তা হতেও পারে। খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল না ঠিক, কিন্তু নিবারণ চক্রবর্তীর জন্যে একটা টান ছিল প্রবাসজীবনের। সেই লোকটা হঠাৎ এতদিন পরে রাত্রে ঠাণ্ডা হিম হয়ে গেল। লাল পশমের বালাপোষ আটকানো পায়ের বড় চোখের পাতা দু'টো সেই যে বুজে এক হয়ে থাকল, আর খুলল না। আহা, নিবারণ! মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে প্রবাসজীবনের চোখ দু'টি ভিজে এলো। স্থির কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন অনেকক্ষণ। তারপর এক সময় নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। সেই যে এলেন, ব্যাস্, প্রায় বোবা।

হেমন্ত চলে গিয়েছিল, গোটা শীতকালটাও নীরবে কেটে গেল প্রবাসজীবনের। বসন্তের তখন যাই যাই ভাব কিন্তু প্রবাসজীবনের মনের মেঘ আর কাটছিল না। এত যে সৌখিন, আড়ম্বরপ্রিয় এবং পরিষ্কার মানুষ, গত কয়েকমাসে তিনি কদাচিৎ পোপহুরস্ত পোশাক পরেছেন। নীতা চৌধুরী বোঝাত, যতীন অনুরোধ উপরোধ করে, ডাক্তার বলে, 'মিষ্টার গুহ, শরীরের সঙ্গে মনের একটা সূক্ষ্ম সম্পর্ক রয়েছে। আপনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না থাকলে মনের চেহারাটা কিছুতেই পালটাবে না।' কিন্তু কার কথা কে শোনে। প্রবাসজীবন সে পথ ধরেই হাঁটেন না।

আত্মীয়-স্বজন, পরিচিত বন্ধুবান্ধব আসে—গোটা ভিজিটিং আওয়ার্স তিনি তাঁদের নিয়ে প্রায় নিঃশব্দে ঘরে বসে থাকেন। এমন কি প্রভাত এলেও। ডাক্তার প্রভাতকে পরামর্শ দিয়েছিল যে, সে যেন মিস চৌধুরীর ঘরে বসে মাঝে মাঝে ডেকে পাঠায় বাপকে। কিন্তু প্রবাসজীবনবাবু সেদিকে ওই ডাকেও উপেক্ষা করতে লাগলেন। ডেকে পাঠালে বলতেন, আমি ঘুমবো এখন।

'চিন্তা করার কিছুই নেই আপনার।' প্রেসার টেস্ট করে নিয়ে ডাক্তার বলেছিল, 'মিষ্টার গুহ, আপনার স্বাস্থ্য দ্রুত উন্নতির দিকে। চোখে রক্ত এসেছে, আঙুলেও। হলপ করে আমি বলতে পারি সবচেয়ে ছোটনাভির বিয়ে পর্যন্ত আপনি বেঁচে থেকে যেতে পারবেন।' কিন্তু তারপর, ঘর থেকে বেরিয়ে এসে, মিস চৌধুরী আর প্রভাতকে আড়ালে

ডকে ডাক্তার বলল, 'শরীরের অবস্থা বাস্তবিক আশাপ্রদ
য়। প্রেসারটা বাড়ছে। গোল জায়গায় মুক্ত হাওয়াটা
এখন ওঁর দরকার।'

প্রথমে যান নি ; গোঁ ধরে বসেছিলেন। প্রভাত অনেক
রে বুঝিয়েছে। নীতা চৌধুরী, ডাক্তার এবং শেষ পর্যন্ত।
অবশেষে রাজি হলেন। কিন্তু নদীতীরে ধানিক ঘুরে
বড়াবার পর, নিবারণ চক্রবর্তীর কথা আর স্মৃতি মনে পড়ায়
মস্তরে খুব কষ্ট অনুভব করলেন। কিন্তু প্রকাশ করলেন
া কিছুই। প্রভাত তাঁকে নানা অছিলায়, আশাজনক
খাটখায় ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রবাসজীবন
কিছুতেই আর বাইরে থাকতে রাজি হলেন না।
লেন, 'শরীরের ভেতরটা এমন করছে, মনে হয় প্রেসার
ড়ল। আমি বোধ হয় আর ঘরে ফিরে যেতে পারব
রে প্রভাত '

ফিরে এসে, ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ চুপ
রে থাকলেন প্রবাসজীবন। চোখ বুজে। যেন তৈরি হয়ে
চ্ছিলেন। প্রায় মিনিট কুড়ি পরে তিনি ডাকলেন।
শির মতন গলায় একটু শব্দ তুলে নিয়ে থামলেন।
প্রভাত,' প্রবাসজীবনবাবু ছেলেকে ডাকলেন। ছেলে
াগ্রহ সহকারে বাপের দিকে তাকাল। 'তোমার সঙ্গে
ামার কয়েকটি কথা আছে....' প্রবাসজীবন পিঠ তুলে
লেন।

'বলা।' প্রভাত আগ্রহ দেখাল। 'কিছু হয়েছে
কি তোমার, এখানে ?'

'না মানে·· হ্যাঁ ; প্রভাত—' খুব দ্রুত গলায় প্রবাস-
বন প্রায় আচমকা বলে ফেলল কথাটা। 'এখানে আমি
র কিছুতেই থাকব না।'

'কেন বাবা, কী হয়েছে ?'

'না না, কিছুই হয় নি। এই বাড়িটা আর এক মুহূর্তও
ামার সহ্য হচ্ছে না।'

'তোমায় কেউ কিছু বলেছে নাকি বাবা ?'

'আঃ, সে সব কিছুই না। কথাটা তুমি শোনো প্রভাত।
এখানে আমি থাকব না '

'কিন্তু ডাক্তার বলছেন, তোমার স্বাস্থ্যটাস্থ্য....'

'ডাক্তারে আমার দরকার নেই। আমার কোনো অসুখ
সত্যি নেই ছিলও না প্রভাত। এই হাসপাতালে শুধু
আমাকে থাকতে হচ্ছে কেন ?'

'এটা হাসপাতাল নয়।' প্রভাত প্রতিবাদ করল। এটা
একটা স্যানিটোরিয়াম ··মানে আশ্রম মানে একটা বোর্ডিং
হাউস

'তুমি থামো।' প্রবাসজীবন ধমক দিলেন ছেলেকে।
'আমি বাড়ি ফিরে যাবো।'

'বাড়ি।' প্রভাত যেন আকাশ থেকে পড়ল।

'হ্যাঁ, বাড়ি।' প্রবাসজীবনের গলায় জেদ।

'কিন্তু এখানে তো তুমি অনেক ভাল আছ। তোমার
কত সঙ্গী···'

'আমায় তুমি অবুঝ দেখো না।' গম্ভীরগলায় বললেন
প্রবাসজীবন। 'এই সব বুড়োবুড়ি সঙ্গীরা আমার আয়ু
খাবলে খাবলে খাচ্ছে। ওরা কিছুতেই আমায় ভুলতে দেয়
না যে, আমি বৃদ্ধ হয়েছি।'

'তাই তো স্বাভাবিক, বাবা।' প্রভাত বলল। 'যে
বয়সে যা সাজে। আমি কি এখন আমার ছেলেদের সঙ্গে··'

'আমি জানি, বুঝিও।' প্রবাসজীবন আবার গা এলিয়ে
দিলেন ইজিচেয়ারে। 'কিন্তু আমি এটা কিছুতে বুঝি না
বয়েস কেন মানুষকে পর আর শত্রু করে তোলে।···হয়তো
আমি ভুল, ভুলই বুঝে থাকব। কিন্তু প্রভাত, আমি কিছুতেই
এখানে থাকতে পারছি না। রাত্রে আমার চোখে ঘুম পর্যন্ত
আসে না।'

'তা হ'লে ডাক্তারকে কিছু ঘুমের ওষুধ দিতে বলতে
পারো তুমি। আসলে নানারকম দুশ্চিন্তার জন্যে···'

'না, তা নয়। আমার কিছু একটা করা দরকার। যে কোনো একটা কাজটাজ…'

'কাজ!' প্রভাত অদ্ভুতভাবে নিজের কাঁধটি ঝাঁকালো। 'এই বয়েসে?

'কোন বয়েসে কি সেটা তুমি ভালই বুঝি।' প্রবাসজীবন আবার পিঠ তুলে বসলেন। 'তুমি আমার বাড়ি নিয়ে চলো প্রভাত। আমি তোমাদের বোঝা হবো না।'

'কে বলেছে তুমি আমাদের বোঝা?' প্রভাত জোর গলায় প্রতিবাদ করল। বাড়িতে কি যে শান্তি তাও আমি বুঝি না। ছেলেপুলেরা সারাদিন হৈচৈ, চেঁচামেচি করছে…'

'তুমিই তাদের ঘুরে সরিয়ে নিয়েছ। আমার কাছ থেকে।'

'হ্যাঁ নিয়েছিলাম। কিন্তু এখন ওরা আসতে পারবে যখন খুশি।'

'ওই একটুক্ষণের জন্যে আসা? না, আমি ওদের সঙ্গেই থাকব।'

'কিন্তু তুমি ভেবে দেখ বাবা;' প্রভাত ওদের গলায় বলল। কিছু একটা যুক্তি হাতড়াচ্ছিল মনে মনে।… বেচারী, প্রভাত ভাবল। কিন্তু কী করে তাকে বাড়ি নেওয়া যায়? বুড়ো মানুষটা কেবল অশান্তিই আনে না সংসারে, ছেলেপুলেদের সর্বনাশও করে। আদর দিয়ে, প্রশ্রয় দিয়ে। 'নিজের ভবিষ্যতের দিকটা একবার ভেবে দেখ বাবা। তা ছাড়া বাড়ি গিয়ে তুমি থাকবেই বা কোথায়? সব মিলিয়ে তো পাঁচখানা ঘর। একটায় ছোটদের নিয়ে আমি থাকি। তোমার নাতি নাতনী দুজন বড় হয়েছে তাদের দুটি আলাদা ঘর লাগছে। একটা তো মাত্র ড্রইং রুম। তার ওপর এত লোকজনের যাওয়া-আসা যে একটা আলাদা বসবার ঘর না হলেই চলে না।'

'দোতালার কোণার দিকের ছোট ঘরটা…'

'সেটা স্টোর রুম। সংসার বড় হয়েছে…'

'নীচতলার বারান্দার দিকের সেই ছোট ঘরটা?

'ওখানে কি থাকে; জানো।'

'কি?'

'হ্যাঁ। তোমার বৌমার পক্ষে দরকার করে এতবড় সংসার টানা—'

প্রবাসজীবন নিজেকে সামান্য টেনে আনলেন সামনের দিকে। খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন তিনি 'প্রভাত, বাড়ির অন্য কাজ আমিও করতে পারব। কি পার্মানেন্ট নাই বা রইল।'

'এবার তুমি সত্যি ছেলেমানুষের মতন কথা বলছ বাবা। চাকরবাকরদের ঘরে তুমি থাকতে যাবে কেন? আর আমিই বা তোমায় ওখানে কেমন করে তুলি। তা ছাড়া…তাছাড়া …প্রভাত কিছু ভেবে নিল। 'স্বাতী কি না বলে তোমার বৌমার এক মিনিট চলে না। তার শরীর খারাপ · তুমি বাবা একটু বুঝবার হও…'

'হ্যাঁ', কেমন মিয়ানো হতাশার গলায় বললেন প্রবাসজীবন। মাথা নাড়ছিলেন, 'আমার এখন বুঝবার হওয়া উচিত। তুমি সত্যি বলেছ সত্যি কথাটা আগে কোনোদিন ভাবিনি আমি।'

চুপ করে গিয়েছিল ছেলে। বাবাও। আশ্চর্য, প্রবাসজীবন ভাবলেন, সারাজীবনের পরিশ্রমের মূল্যে গড়া তাঁর নিজের বাড়ি, নিজের ঘরে তাঁর জায়গা নেই।

অনেক পরে প্রভাত উঠল। প্রবাসজীবন দুই হাতের তালুতে মুখ ঢেকে কাঁপছিলেন। 'আমি যাই বাবা…', প্রভাত বলল। 'তুমি কিছু ভেবো না। মাঝে মাঝে ওদের সবাইকে নিয়ে আমি আসব।' দরজা খুলে বেরোতে গিয়ে যতীনের সঙ্গে দেখা। সব কথাই শুনেছে যতীন।

[(শেষাংশ ৫২৩ পৃষ্ঠায়]

গল্প

এমন হয়

নীলিমা দাশগুপ্ত

'বুঝলি বড়দি, পাশ করা নার্সরা সকাল বিকেল যখন বদলি হতে থাকলো, তখনই বুঝলুম শশুরের মনের তলায় আরো কিছু আছে···যতোই চোপ ফেলুক আর যতোই কায়দাদি করুক রমলা, বুড়োর উদকানি না পেলে কী—ছিঃ, ছিঃ মরতে মরতেও সন্তানের সঙ্গে বাপে এমন শত্রুতা করে···ছিঃ।··' ঊষা হাত মুখ নেড়ে বিকৃত ভঙ্গি করলো,···আর বলিহারি ঐ রমলা নার্সকে, চল্লিশ পেরিয়েও মা হতে লজ্জা হলো না—'

ঊষার চোখের তারায়, কপালের রেখায় ও ঠোঁটের আভাসে যেন গনগনে আগুনের হলকা। সে দিকে তাকিয়ে বড়দি আশা কোনো একটা সিদ্ধান্তের মুখে পৌঁছোনোর চেষ্টা করছিলেন। চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'রমলা মা হতে চলেছে শুনলি কার কাছে? তোদের তো শুনি মুখ দেখা দেখিও বন্ধ—'

'বম্বি ··বম্বি···বম্বির শব্দে—, ঐ নার্স যেখানে, সেখানকার চৌকাঠ আমি ডিঙুবো নাকি ভেবেছিস—ঊষার নাকের পাশের রেখা কটি প্রখর হলো, 'তখন ওকে আমি পাখি পড়ার মতো পড়ালুম, বাবাকে গিয়ে সোজা বলো,—এমন বিয়ে হয়না, হতে পারেনা···নার্স বলে কথা, কত জায়গায় ঢুঁ মেরেছে কত জায়গায় বিকিয়েছে ঠিক আছে তার···।

—কিছুতেই বিয়েটা যাতে না ঘটে সেই চেষ্টা তুমি ছাখো। তা তখন আমাকে স্তোক্ দিলেন, তুমি ভেবোনা—আমি দেখছি, তারপর বিয়ের দিন সকালে বলেন কিনা, বাবার অন্তিম ইচ্ছের বাধা দেয়াটা ঠিক হতো না—। মেনীমুখো পুরুষ কোথাকার।···' সামনের দেয়ালে আক্রোশভরা চোখে চাইলো ঊষা। যেন ওখানে ওর স্বামী অম্বর দাঁড়ানো। অম্বরের ওপরে ক্ষোভের ঊষার আরো গূঢ় কারণ ছিলো একটা, যেটা দিদিকে ও বলতে পারলোনা। অম্বর ভরসা দিয়েছিলো ঊষাকে, রমলার মা হবার বয়েস নেই, আর থাকলেও দাদা পিতা হতে রাজি হবেন না···দাদার টাইপ জানি তো—বই পাগল আগোছালো মানুষটির খবরদারীর জন্ত একজন গোছানো মানুষের দরকার ছিলো, বাবা তাই···

কাদম্বিনী বালিকা বিদ্যালয়ের তৃতীয় শিক্ষিকা আশা, মানে, বড়দি চুপচাপ বোনের মুখের দিকে চেয়ে ধীরে-সুস্থে পানের-বই-ভিবে খুলে দু খিলি পান গালে ঠেলে দিয়ে বললেন,

'তা অবিশ্যি—বাপের অন্তিম ইচ্ছের বাধা দেয়াটা···'

'তুই থাম্—'ঝনন্···কণাৎ·· ঊষার হাতের চাবির গোছাটা সশব্দে মেজেতে পড়লো। বড়দির সমর্থনের জন্ত অসহিষ্ণু প্রতীক্ষাটা দুঃসহ ক্রোধে পরিণত হলো?··· নাকি বড়দির মুখ বন্ধ করতে চাইলো—কে জানে!

বড়দি ডিভানের নরম গদীতে গা ডুবিয়ে বসে, পানের রস গলায় নিয়ে চোখ বুজে এ বাড়ির ঐশ্বর্য আর আরাম উপভোগ করছিলেন একটু।

বোনের কাণ্ডে এবং রুঢ় স্বরে তাকালেন।

ঊষাকে দেখতে পাচ্ছেন না। সে জায়গায় দেখতে পেলেন স্থির-সহিষ্ণু আশ্চর্য শক্তিময়ী একটি মেয়েকে।

যে মেয়েটির শ্রান্তি ক্লান্তির লেশ নেই—আছে কেবল অক্লান্ত উদ্যমতা আর আনন্দময় হাসি। সেবা যে এমন ভরাট এবং এত নিপুণ হতে পারে, রমলাকে দেখার আগে আশার তা জানা ছিলো না। প্রথম দিন রমলার সেবা এবং আচরণ দেখে আশার যা মনে হয়েছিলো, তা হলো —সী ইজ্ গ্রেট····। সত্যি, রমলার সেবায় শুধু জীবন্ত আগ্রহ নেই, শুধু সুষমা নেই, যেন যাদু আছে।···পেসেন্ট অতি দ্রুত আরোগ্য লাভ করে এবং যার শেষ নোটিশ এসে গেছে, সেই পেসেন্টও রমলার সেবার সম্মোহনে যেন বেদনা বিস্মৃত হয়ে হাসিমুখে শেষ বিদায় নেয়। সেই রমনীয়ত্বকে—

'···তুই শ্বশুরের সেবা করলি না বা পারলি না—সে যাই হোক—' বড়দি বিড় বিড় করলেন '···তুই অন্ততঃ কৃতজ্ঞ তো থাক রমলার কাছে····, আর অমন ছেলে শংকর, অমন ধীমান-বুদ্ধিমান অথচ সকলের সঙ্গে কী মিষ্টি ব্যবহার,···এক ফোঁটা দেমাক নেই—অমন রত্ন ছেলের সারাটা জীবন ফাঁক্ থেকে যাবে···ফাঁক্ নয় তো কী—স্নেহ ভালবাসা ছাড়া এ ফাঁক ভরাট হয় না, পিতৃ-হৃদয় বুঝেছিলো তাই মৃত্যুর মুহূর্তে—

'কী?···হলো কী তোমার বড়দি? অমন ধারা বিড় বিড় করছো কেন?' 'তুই এমন ক্ষেপা ক্ষেপা হয়েছিস কেন বলতো?' মুখের ওপর পড়ে থাকা বোনের ধারালো দৃষ্টিটাতে বড় বিরক্তি বোধ করলেন বড়দি। সুখ আর প্রাচুর্য ওপ্‌চানো বোনের গোল্‌গাল্ চেহারায় চোখ রেখে বললেন,

'তোর অসুবিধেটা কী? মস্ত বাড়ি পেয়েছিস, ভাল রোজগেরে স্বামী তার ওপরে টাকাও তো মন্দ পাসনি শুনলাম—আর দিয়ে হবে কী?'

'আর দিয়ে হবে কী—' উষা ভেঙ্গিয়ে উঠলো, রমলা নাগালের বাইরে তাই মনের বিষ বড়দির ওপরেই ঢাললো,

'তুই কী মানুষ? তোর তো এক ভিবে পান হলেই সব পাওয়া হয়ে গেলো···সাধে কী আর তোর এই হাল—'

বড়দির মনে বোনের কোনো কথার সমর্থন নেই। কথার ধারে বড়দিকে টুকরো করতে পারলো না উষা। মুখ ভার না করে বড়দি হেসে বললেন, ভাল কথা মনে করেছিস তুই, তোদের মোড়ের পানআলাটা পান বানায় ভাল, যাবার সময় আরেক ভিবে নিতে হবে—

'আমার কত দিনের পরিকল্পনা—' হাতে চাবির গোছা লুফতে লুফতে প্রমাণ সাইজের আয়নার সামনে গিয়ে নিজেকে দেখতে লাগলো উষা··

বড়দি বোনের পরিকল্পনা শুনতে কোনো কৌতূহল প্রকাশ করলেন না। বেশভূষা, নিজের রূপ আর অলঙ্কারের চমক্ দেখে আয়নায় হাসলো উষা। মুখ ফেরালো উদ্ধত রাণীর ভঙ্গিতে—

'ভেবেছিলাম ভাসুরের অবর্তমানে' পালিত ভবনে'র ওদিকটায় পাকাপাকি ভাবে মা-বাবাকে এনে রাখবো···

যেন স্তব্ধ হয়ে গেলেন বড়দি। সমস্ত শরীরটা শির শির করে উঠলো।···

ভাসুরের অবর্তমানে—মানে, শংকরের মৃত্যু চাইছে উষা—হলো কী মেয়েটার!···সেই উষি··· কোনোমতে খেয়ে পরে সাত বোনের মধ্যে বড় হওয়া উষি—সারা মাসে কখনো কদাচিৎ এক টুকরো মাছের মুখ দেখেছে কী না দেখেছে···

নিজের সংসার গড়ার কথা বড়দি ভাবেন নি, ভাবতে পারেন নি···সাত সন্তানের কেরানী পিতা অবসর গ্রহণের পর অসহ্য অস্থির ছিলেন, ব্যাকুল ছিলেন। আশা চাকরী নিয়ে ট্যুশানি নিয়ে বাবার পাশে শক্ত পায়ে দাঁড়ালো। আশা ছেলে হলে যতটা আশা করতেন বা রাখতেন বরদা ঘর, তার থেকে অনেক বেশীই পেলেন মেয়ের কাছ থেকে।...

রূপ? রূপ ও ছিলো আশার। বরং ঊষার চেয়ে বেশীই ছিলো। কতবার কতজন স্থায়ী ভরসার আশ্বাস নিয়ে, অদৃশ্য নীড়ের স্বপ্ন নিয়ে বড়দির কাছে এসেছিলেন, বড়দির মন টলেনি। মনটা সামান্য বিক্ষিপ্ত হয়নি পর্যন্ত।·· চাকরী করেও সংসার-বয়েসে কাদম্বু এক আধলা নিজের জন্য খরচ করতে পারেননি বড়দি। বোনগুলিকে বিয়ে দিয়েছেন একে একে, তারপর কবে থেকে যে সম্বল করেছেন পানকে তা বুঝি বড়দির নিজেরও মনে নেই।

বিমূঢ়-বেদনায় বড়দি চুপ। এমন বোনের দিদি বলে গ্লানি বোধ কচ্ছেন। ঊষা হঠাৎ ছুটে গেলো পুব জানলার কাছে। একটা শালিক উড়তে উড়তে জানলার পাল্লায় পা রেখেছিলো, মার বুঝি মেরাজে পাখিটাকে উড়িয়ে জলতে জলতে স্বস্থানে ফিরে, বড়দির নীরবতা চীরে, কটুগলায় মন্তব্য শেষ করলো, ভেস্তে গেলো আমার সব পরিকল্পনা।

ঘরে আস্তে পাখা ঘুরছে। বাতাসে মৃদু সুগন্ধ। ডানলোপিলোর, ডিভানে শরীর বিছিয়ে আয়েস করে হাওয়া খাওয়া, ঘ্রাণ নেওয়া বড়দির মাথায় উঠলো। নড়ে চড়ে দ্রুত দোমড়ানো ভাঙেলে পা-গলাতে গলাতে দৃঢ় গলায় বললেন, 'ছিঃ ছিঃ ঊষি, টাকা পয়সার মুখ দেখে এই মতি হয়েছে তোর···আর আসছিনে তোর এখানে—'

বড়দি সামান্য হাঁফাচ্ছিলেন, 'ছিঃ!—ভাসুরের অবর্তমানের কথা তোর আগেভাগে মনে আসে কী করে? ··'

বিমর্ষ বড়দি উঠে দাঁড়ালেন। কপালে ভুকুন, চোখে-মুখে ক্রোধ। বোনের মুখের দিকে আর তাকালেন না। ক্ষিপ্রপায়ে ঘর ছেড়ে সিঁড়ি, সিঁড়ি ছেড়ে করিডোর, করিডোর ছেড়ে পথে নেমে এলেন।

বড়দি দরজার আড়াল না হওয়া পর্যন্ত ঊষা সক চোখে তাকিয়ে ছিলো। 'এঃ!···' তারপর ঠোঁট ওল্টালো, 'না এসে তো বলেই গেলো, ঊষা কী তোমাকে দিব্যি দিয়ে রেখেছে নাকি হপ্তায় হপ্তায় পালিত-ভবনে আসতেই হবে?···'

পালিত-ভবনকে অনেকেই চেনেন।

কেয়াতলা লেনের সব চেয়ে বেশী জায়গা নিয়ে সব চেয়ে সুন্দর বাড়ি। নামী এ্যাড্‌ভোকেট্‌ দিগম্বর পালিতের বাড়ি। এর আগে পালিত-ভবন ছিলো হরিশ মুখার্জি রোডে। সে বাড়ি বেচে হাল আমলে কেয়াতলায় বাড়ি করেছিলেন। করেছিলেন বড় বৌমা শান্তির ঝোঁকে। গিন্নী-বিহীন সংসারে সতেরো বছরের শান্তি এসে নিপুণ হাতে হাল ধরেছিলো। ঐটুকু মেয়ের বুদ্ধি-বিবেচনা, ধৈর্য আর সহিষ্ণুতা দেখে, প্রৌঢ় দিগম্বর পালিত, যাকে নাকি সবাই আদু এ্যাড্‌ভোকেট্‌ বলতো—মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন।

শান্তি ওঁর এক বন্ধুকন্যা। বন্ধুটি দরিদ্র স্কুলমাষ্টার। শান্তির বাবা অজিতরঞ্জন কল্পনাও করেননি দিগম্বর পালিতের সঙ্গে তাঁর কুটুম্বিতা সম্ভব হতে পারে। ভাবতে পারেননি দিগম্বর পালিতও। এ অসম্ভব! ··বন্ধু অজিতকে উপেক্ষা না করলেও—কুটুম্বিতা অসম্ভব।···

একটা কানাঘুষা ওঁর কানে এসেছিলো, বড় পুত্র শংকর নাকি অজিতরঞ্জনের বাড়ি মাঝে মাঝেই যায় এবং শান্তিকে পড়ার সাহায্য করে। এ সংবাদ দিগম্বর পালিতের তিনরাত্রির ঘুম কেড়ে নিয়েছিলো। কেতাব-পাগল শংকর—আবার-খাবার সময় নেই যার, সে সময় খরচ করে শান্তিকে পড়ায় যখন ·· । শুধু অনিদ্রা নয়, ছট্‌ফট্‌ করেছেন তিনরাত্রি। তিনদিন পরেই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছিলেন দিগম্বর পালিত।

তারপরেই সানাই বাজলো পালিত-ভবনে।

শাঁখা-সিঁদুর ছাড়া আর কিছুই নেননি বেয়াইয়ের কাছ থেকে।

সম-মানের কুটুম্ব পেলেন না—এর জন্য ওঁর অন্তরে হয়তো ক্ষোভ হয়েছিলো, তবে সে ক্ষোভ দিন সাতেকও ছিলো না বোধ হয়।

দিগম্বর পালিত বুঝলেন, শান্তি আসার আগে পালিত-ভবনে আর সবই ছিলো, শুধু সত্যিকার শান্তি ছিলো না।

সেই দীঘল সরল ছিপছিপে গৌরাঙ্গী সতেরো বছরের মধুর স্বভাবের শান্তি সাত বছর পরে হঠাৎ তিন-দিনের জ্বরে ছ্যাম্ করে মারা গেলো। সবে মাস আষ্টেক হলো এম. এ. পাশ করেছিলো শান্তি। শংকর সীনিয়ার সেক্‌চারার তখন।

একবছর, দুবছর, তিনবছর গেলো। তিন বছর বাদে ছোটো ছেলে অম্বর এনজিনীয়ারিং পাশ করে যখন বিদেশী একটা কার্মে ঢুকলো, তখন দুভাইয়ের জন্যই ঘটকের আনা গোনা শুরু হলো।

আর একবার শুরু হয়েছিলো, শান্তির মৃত্যুর এক বছরও পার হয় নি তখন। দিগম্বর পালিত একবাক্যে ভাগিয়ে দিয়েছিলেন ঘটকদের। তিনি নিজেই তখন ভাবতে পারছিলেন না—শান্তির জায়গায় আর কাউকে আনার কথা। অম্বরের বিয়ের জন্য আত্মীয়স্বজন এবং ঘটকের দল চারপাশ থেকে যখন অস্থির করে তুললো তখন ওঁর বাল-বিধবা দিদি সবকে দিলেন, আগে শংকরের পাত্রী ভাখো।...অম্বরের বিয়ে হয়ে গেলে শংকরকে কোনোকালেই আর বিয়েতে রাজি করানো যাবে না। তোমার ঐ ভোলানাথকে দেখবে কে?...অম্বুর বিয়েটা আটকে রেখে বলো,—তুই বিয়ে না করলে অম্বুও করবে না, তবে যদি—।—তাই তো।... দিগম্বর পালিত দ্বিধান্বিত হলেন।

কিন্তু কোনোপথেই শংকরকে কিছুতেই রাজি করানো গেলো না। এতে খুব যে একটা অখুশি হলেন দিগম্বর পালিত—তা নয়।—ঠিক আছে। ছোটো বউ দেখে-শুনে আনবেন শান্তির মতো। সে-ই দেখে রাখবে পালিত-ভবন। ধনীঘরের সব দম্ভ নাকচ করলেন। গরীবের মেয়ে আনবেন...শান্তির মতো। ম্যাট্রিক পাশ হলেও ক্ষতি নেই—শান্তির মতো বাড়িতে পড়াবেন তাকে।

অবশেষে মার্চেন্ট অফিসের অবসর-প্রাপ্ত কেরাণী বরদা ধরের ছোটো মেয়ে উষা পালিত-ভবনের ছোটো বউ হয়ে এলো। উষা আরো রূপসী এবং আই. এ. পাশ।

মাস ছয়েকের মধ্যেই দিগম্বর পালিত বুঝলেন—মারাত্মক ঠকে গেছেন তিনি। অন্তের ছকে মানুষকে মেলানো যায় না। দরিদ্র-কন্যা উষার সবই দরিদ্র। মন যেমন ছোটো, নজরও তেমনি নিচু। শুধু তাই নয়, উষা পরচর্চায় পটু এবং কলহপরায়ণাও বটে। উষার জিভের ধারে কত বিক্ষত হয়েই যে বোন তরঙ্গিনী কাশী-বাসিনী হলেন—তা বুঝলেন। যাবার সময় চোখের জল লুকিয়ে দাদাকে বলে গেলেন, পালিত-ভবনের ইজ্জত বজায় রাখতে চাও যদি, শংকরকে জবরদস্তি রাজি করিয়ে দেখে-শুনে শান্তির মতো একটি বউ আনো।

তরঙ্গিনীর কথাটা ভুলতে পারেননি দিগম্বর পালিত। তরঙ্গিনীর মৃত্যুর পরেও না—পালিত-ভবনের ইজ্জত।... কিন্তু পাত্রীর খোঁজ করবেন কী করে, শংকর রাজি হলে তো। তাছাড়া মেয়েটি প্রকৃতই ভাল কিনা বুঝবেন কী করে?...সে ক্ষমতা যে ওঁর নেই...তা তাঁরই বুঝে-ছেন। ছোটো বউকে দেখে শুনে উনি নিজেই তো এনেছিলেন। শান্ত-শ্রী মুখে মেখে কী সুন্দর লক্ষ্মী প্রতিমাটি হয়ে বসেছিলো উষা, ভক্তি-গদগদ গলায় গেয়েছিলো রাম-প্রসাদী গান।

—মানুষ চিনতে দিগম্বর পালিতের কতক্ষণ লাগে—সে গর্বের ছিটেফোঁটাও যে ওঁর আর নেই।··· বছরের পর বছর গড়ালো। শংকরকে রাজি—করানো গেলো না।

বিশবছর বাদে হঠাৎ মস্ত দুর্ঘটনা।

প্রেসারের স্ট্রোকে বাঁদিকটা অসাড় হয়ে গেলো। বিছানা নিলেন পালিত। পিতার সম্পূর্ণ শুশ্রূষার ভার নিলো শংকর। কোনো কথা শুনলো না, লম্বা ছুটি নিলো। দিগম্বর পালিতও মানলেন না, অবরদস্তি নার্স রাখলেন। নার্সও আছে ছেলেও আছে আবার অনেক দিনের পুরোনো চাকর পাঁচুও আছে। নার্সের কাজ এদিক ওদিক হলেই শংকর ক্ষেপে যেতো। এ বিষয়ে ছেলেকে বোঝাতে গিয়ে হঠাৎ দিগম্বর পালিত কী ভাবলেন কে জানে—থেমে গেলেন। তারপর নার্সের অগোচরে ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান ডাঃ মুখার্জির সঙ্গে কথা বললেন। পরদিনই বদল হলো নার্স। তারপর কেবলই বিভিন্ন নার্সের আনাগোনা। বোধ হয় একজন নার্সকে সাতদিনের বেশী পালিত-ভবনে দেখা গেলো না।

শংকরও অবাক মানলো বাবার কাণ্ডে!

প্রথম নার্সটির কাটখোট্টা ব্যবহার ওকে পীড়িত করেছিলো ঠিকই—কিন্তু তারপর আর যে ন'টি নার্স এলো তারা কেউই তো রুক্ষ নয়, বেশ মোলায়েম ব্যবহার। কাজেও বেশ পটু। কিন্তু বাবার কাজের ওপর কথা বলার অভ্যেস ওদের নেই। ওরও না, অম্বরেরও না।

একাদশ নার্স রমলা বিশ্বাস টিকে গেলো। দুজনে আড়ালে বললো,—সুন্দরী যে! সুন্দরী যে এতে অতিশয়োক্তি নেই এক ছিঁটে। রমলা পরমাসুন্দরী। চল্লিশে এসেও সৌন্দর্য চোল্ খায়নি। না তনুশ্রীতে, না দিগারে। মাঝে মাঝেই রমলার দিকে তাকিয়ে দিগম্বর পালিত অবাক হয়ে ভাবেন,—রমলার রূপের মর্যাদা কেন দিলো না কেউ? যে মেয়ের ঘর আলো করে থাকার কথা, সে জীবিকার জন্য দোরে দোরে সেবা করে বেড়াচ্ছে।···ইচ্ছে যায়, ভারি ইচ্ছে যায় পালিতের, রমলাদেবের সংসারের খবর খুঁটিয়ে জানতে—একদিন ঘুমের ওষুধ খেয়েও ঘুম আসছিলো না। রমলা মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে অস্ফুট সুরেলা গলায় যেন ঘুম পাড়ানি গানের মতো আবৃত্তি করেছিলো—'দ্য ক্লাউডস পার্ট, দ্য মরনিং স্টার এ্যাপীয়ার্স্ ইন্ দ্য ইষ্ট, এ ব্রিজ্ অফ সীলিক স্প্রিংস্ আপ্···'

কেমন যেন আনন্দময় বেদনায় সিক্ত হয়ে ঘুমের ভেতর তলিয়ে যেতে যেতে পালিত ভাবছিলেন, আমার অসুখটা আরো আগে কেন হলো না?—···

অবশ্য জিজ্ঞাসা না করেও এটুকু বুঝতে দিগম্বর পালিতের কষ্ট হয়নি,—রমলাই সংসার চালাচ্ছে, নার্সদের সাধারণ যা রেট, তার প্রায় ডবল রমলার, টাকা কমানো নিয়ে কেউ বেশী পীড়াপীড়ি করলে, রমলা খোলাখুলিই বলে,—অর্থের আমার অত্যন্ত প্রয়োজন, যিনি দিতে পারবেন···। বলাবাহুল্য ঐ রেটেও রমলা কাজ ছাড়া বসে থাকেনি একদিন। শুধু নার্সিং-এ দক্ষ নয় রমলা, ওর সেবাতে সহৃদয় একটা স্পর্শ আছে। আর মুখে লেগে আছে স্নিগ্ধ হাসি এবং সে হাসি কৃত্রিম নয়, হৃদয়-উৎসারিত হাসি।····· প্যারালিটিক্ রোগীর তো আরোগ্য হবার প্রশ্ন ওঠেনা, যতদিন পরমায়ু ততদিন বিছানায় এভাবে পড়ে থাকা।···

—বাবার সেবা-যত্ন তো পুরোনো চাকর পাঁচুই পারে—এটা বলেছিলো অম্বর। দিগম্বর পালিতের অসুখের গোড়ার দিকটা অম্বর বিদেশে ছিলো। ফিরে এসে রমলার রোজের রেট শুনে দাদার কাছে বলেছিলো এ কথা। শংকর জবাব দিয়েছিলো,—আমার মনেও যে এ কথা একেবারে

আসেনি তা নয়, কিন্তু মিস্ বিশ্বাসের সেবাটা তুই একদিন নজর করে ছাখ্, দেখলে আর ও-কথা মনে আসবে না তোর··· । লম্বা ছুটি ফুরোতে শংকর নিশ্চিন্ত হয়ে কলেজের কাজে মন দিলো। রবিবার কিম্বা ছুটির দিনগুলোতে বাবার কাছে এসে খানিকটা সময় কাটিয়ে যায়।

সেদিন রবিবারের দুপুর। সময়টা গ্রীষ্মকাল। শংকর খবরের কাগজ থেকে কিছু কিছু পড়ে শোনাচ্ছে বাবাকে। রমলা ঠাণ্ডাকরা ডুমাণ কমলার রস নিয়ে ঘরে ঢুকলো। দিগম্বর পালিতের দাম্পিকাল বেডের পাশে টিপয়ের ওপর গ্লাস দুটো রাখলো। চাবি ঘুরিয়ে খাটটি সামান্য উঁচু করে দিগম্বর পালিতের ডানহাতে সাবধানে একটি গ্লাস দিয়ে আর একটি শংকরকে দিতে গেলো।

'আমাকে কেন?—' প্রায় ধমক দিয়ে উঠলো শংকর, কুঞ্চিত চোখে তাকোলো, 'স্ত্রীজে রেখে দিন, পরে আবার বাবাকে দেবেন—'

'দেখুন তো—' রমলা মুখ ঘুরিয়ে দিগম্বরের দিকে তাকালো, 'কমলাগুলো পচে যাচ্ছে, গুচ্ছের কমলা জমেছে ···রোজ কেনাও হচ্ছে আবার রাশি রাশি দিয়েও যাচ্ছে লোকে···এক গামলা রস করে আমি তো বাড়ির সবাইকে দিয়ে এলুম, উনি কেন খাবেন না?'

'ঠিক্···ঠিক্ ঠিক্ করেছো মা—'দিগম্বর পালিত প্রশ্রয় দেয়া হাসি হাসলেন, 'খেয়ে নে খোকা···শং—কর ··' বিষম খেয়ে খেয়ে গেলেন।

'—বাবার কাণ্ডই আলাদা'—শংকরের গাম্ভীর্য চিড় খেলো। অপরের সামনে খোকা বলতে নিষেধ আছে শংকরের···তাই সামলাতে গিয়ে বিষম টিপয় খেয়ে একখানা কাণ্ড—

গ্লাস হাতে রমলা তেমনি দাঁড়ানো। শংকর হাত বাড়িয়ে গ্লাস নিয়ে বোধকরি একটু আগেকার নিজের রূঢ়তাটুকু মুছে দেবার জন্য বললো, 'আপনি খেয়েছেন?'

'আমি—!··' রমলা যেন বিস্ময়ে চোখ বিশাল করে রইলো। আর আশ্চর্য, শংকরও চেয়ে আছে দুচোখ টান করে।····

দিগম্বর পালিতের দৃষ্টি ছিলো ছেলের মুখের দিকে। নিষ্পলক দৃষ্টি। ছেলের চোখের-খুশি নজর এড়ালোনা তাঁর।···দিগম্বর পালিতের ভেতরের অভিজ্ঞ-মানুষটা কথা বলে উঠলো।

বড় বড় কয়েকটা শ্বাস ফেলে, চুমুকে চুমুকে রসটুকু শেষ করে—রমলার দিকে তাকালেন, 'আর আধ গেলাস্ মতো রস দাও তো মা –' রমলা চলে গেলো গ্লাস নিয়ে।

'খোকা—' ছ'মাস ধরে দিগম্বর পালিত সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে আসছেন, ওঁর উপলব্ধি পুরো পুরি ভরসা দিলো আজ।

শংকর সপ্রশ্ন চোখে বাবার দিকে চাইলো।

'তোর বাবা মরার আগে একটা ভিক্ষে চাইবে তোর কাছে—দিবি?'

'কী হলো?···' হো-হো হেসে উঠলো শংকর,

'তোমাকে মরতে দিচ্ছে কে?···এখন তো নিজের হাতেই খেতে টেতে পারছো দিব্যি, বাঁহাতটাও তো নাড়তে পারছো বেশ···দেখোনা, আর ছ'মাসের মধ্যেই মিস্ বিশ্বাস পুরোপুরি তোমাকে চাঙ্গা করে তুলবেন—

'আচ্ছা, সে না হয় হলো, আমার একটা ভিক্ষে আছে···শেষ ভিক্ষে—'

'বাবা, তোমার হলো কী আজ,—এসব হাবি জাবি বলছো কী তুমি···বলো, তোমার আদেশ—' আরেক প্রস্থ হেসে উঠেই থেমে গেলো শংকর। রমলা ঘরে ঢুকেছে।

'·····অন্ধকার রাত্রি, ভয়ের সবখানি পথ পার হয়ে এসে, ঠিক এ্যারোড্রামে ওঠার মুখে—মাকে নিয়ে আমরা

চার ভাই বোনে উঠেছি, বাবা উঠতে গিয়েছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে বাবার বুকে ছোরাটা এসে বিঁধলো। শুধু শুনলাম হুমুরে—, তারপরেই দেখি প্লেনটা চলছে

আমি মার মুখ চেয়ে, ছোটো ভাইবোনেদের মুখ চেয়ে কোনোদিন কাঁদতে পারিনি, কোনোদিন না—। বাবার জন্য এক ফোঁটা চোখের জল—' সংযত-বুদ্ধিমতী রমলা আচমকা ভুলে গেলো সব। ভুলে গেলো, ও অপরের বাড়িতে —মাইনে করা সামান্য একজন নার্স মাত্র· ·শুনতে চাইলেও সব বলা এখানে চলেনা। অন্ততঃ কান্নাকাটিতো কিছুতেই না—।

দিগম্বর পালিতের বাঁপাশে বসা ছিলো রমলা।

'বাবাগো—'বিছানার পাশে মাথা নামিয়ে, বিছানার চাদর দুহাতে খামচে ধরে হু-হু করে কাঁদতে থাকলো রমলা।·····

শংকর ডুবে গেছলো এজিটেশনের জোরালো কলমে। শেষটুকু কানে এসেছে। চেয়ে আছে কাগজ সরিয়ে। আবেক রমলাকে দেখছে। রমলার কান্না চেউয়ে -চেউয়ে আঘাত করেছে শংকরের বুকে। তোলপাড় করছে বুকটা।

তার এক সপ্তাহ পরেই বিয়েটা হয়ে গেলো।

শংকর প্রতিবাদ করেনি।···রমলাকে ওর ভাল লাগে কিনা··· ছুটির এই যে দুপুরগুলো পিতার ঘরে বসে বসে কাগজ পড়ে কাবার করা, এর পেছনে ওর ইচ্ছুক মনের কোনো ভূমিকা আছে কিনা—এটা শংকর নিজের কাছে স্বীকার করুক না করুক, ওর পেছনের মন বেশ চাক পিটিয়ে সামনের মনকে বললো,—পিতার অন্তিম ইচ্ছে পালন করলো শংকর পালিত।···

প্রতিবাদ করেছিলো রমলা। ওর দায়িত্ব এখনো কিছু রয়ে গেছে বলে। সে দায়িত্বের ভার নিলো শংকর। তাতেও রমলার প্রতিবাদ ছিলো। টেকেনি। সে প্রতিবাদ খণ্ডিত হলো—দিগম্বর পালিতের সওয়ালে।

দিগম্বরের ইচ্ছে মতো ওঁর ঘরের ভেতরে, ওর একেবারে চোখের সামনে বিয়েটা হলো। উৎসবও হলো তবে ঘটা করে নয়। পিতার একথা মানতে কিছুতেই রাজি হলোনা শংকর।···

আর আশ্চর্য এই, যেন শংকরের বিয়েটা ঘটানোর জন্যই প্রাণটাকে এতদিন জীইয়ে রেখেছিলেন দিগম্বর পালিত। বিয়ের পনেরো দিন পরেই মারা গেলেন। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান শেষ হবার পরই পালিত-ভবনের দুটো ব্লক পুরোপুরি আলাদা হয়ে গেলো। রমলার পেছনে উষা কোমর বেঁধে লাগলো।

—মাইনে করা নার্সও যা, ঝি-রাঁধুনিও তা, তাকে দিদিও ডাকতে পারবো না সম্মানও দিতে পারবো না। কাজেই·····

মানতেই হবে দিগম্বর পালিতের দূরদৃষ্টি ছিলো। দুই পুত্রের জন্য এমন ভাবে বাড়িখানি করেছিলেন, মাঝখানের দরজাটা বন্ধ করলেই যেন দুটি আলাদা বাড়ি।

শান্তির বড় সখ ছিলো। বি. এ. পাশ করার পর আর সে পড়বে না—এবার খোকা খুকুর মা হবে।·····শান্তির এম. এ. পড়া শুধু শংকরের একান্ত ইচ্ছেয়।

মৃত্যুর মুহূর্তে ডিলিরিয়ামের ভেতরে শান্তি বলেছিলো, —আমি মরবো না ··ঐ ছাখো টুব্‌লো টুব্‌লো—গালফুলো খোকা কচি কচি হাত বাড়াচ্ছে আমার কোলে আসার জন্য·····শান্তির কথা বুকে পুরে বিশবছর জীর্ণ হয়েছে শংকর।

এবার হয়তো টুব্‌লো-টুব্‌লো, গালফুলো—শান্তির সেই আকাঙ্খার খোকাই আসছে।

গল্প

ফুলমতির খোন্‌চে

মহীতোষ বিশ্বাস

ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়লো দলটা।

রেললাইনের দু'পাশের চালু নীচু জমি বেয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছিল। প্রত্যেকেই সতর্ক। বন্য শ্বাপদের মতো গাছপালার আড়ালে নিজেদের যেন নিঃশেষে মিলিয়ে দিয়েছিল। শুধু ছোটোবড়ো নানা আকারের ছায়ামূর্তিগুলো হেলেদুলে এগিয়ে চলেছিল। হঠাৎ সামনের জঙ্গল ভেদ করে তীব্র তীক্ষ্ণ একটা হুইসেলের শব্দ বেজে উঠতেই আচমকা গায়ে গা লাগিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো দলটা। কিন্তু সে নিমেষমাত্র। পরক্ষণেই শুরু হয়ে গেল ঝাপটাঝাপটি। আতঙ্কিত দলটা এলোমেলো হয়ে গেল। যে যেদিকে পারল ছুটতে লাগল। ওরই মধ্যে যে ছায়ামূর্তিগুলো মাথায় একটু উঁচু তারা তখন উঠে গেছে রেললাইনের উপরে। প্রাণপণে রেললাইনের খোয়া তুলে ছুঁড়ে মারতে লাগল সামনের ঝোপ লক্ষ্য করে। কিন্তু ও-পক্ষও তখন সতর্ক হয়ে গেছে। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসে ধরে ফেলল কয়েকজনকেই। বেপরোয়া দেখে চীৎকার করে উঠল একজন—"পালা সবাই, শালারা দল বেঁধে এসেছে রে—"

মাঠ ভেঙে এবার সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। কাঁধে, মাথায় ভারী ওজনের পোঁটলা। ছুটতে কষ্ট হচ্ছে। তবু প্রাণপণে পোঁটলাগুলো সামলে সবাই ছুটে চলল। এ-পাশের ঝোপের ফাঁক দিয়ে পালাচ্ছিল দু'জন। ফুলমতি আর তার বছর দশেকের ছেলে খোন্‌চে। বাঁ হাতে কাঁধের কাছে বড়ো একটা পোঁটলা প্রাণপণে আগলে রেখে ডান হাত ধরে ছুটছিল ফুলমতি। খন্‌চের মাথাতেও একটা বোঝা। চাপা-গলায় ছেলেকে তাড়া দিল ফুলমতি—"তাড়াতাড়ি চল্‌নারে আবাগের ব্যাটা—দিনেরেরা ধরে ফেলল যে—"

লম্বা একটা লাফ দিয়ে খানিকটে জায়গা পার হয়ে খন্‌চে বলল—

"খোয়েই অমনি হলো—না? এমন একখান খোঁয়া ছোড়ব যে বাছাধনের আর চোখ মেলতে হবে না।"

ফুলমতি ছেলেকে কাছে টেনে এনে ছুটতে ছুটতে বলল—"না বাবা, তোর আর পাথর ছুঁড়তে হবে না, তুই তাড়াতাড়ি চল।

হঠাৎ শব্দ—হুম—গুড়ুম্—গুড়ুম—।

ওপাশ থেকে হাঁকড়ে উঠল জগদীশ—"শালারা গুলি চালাচ্ছে রে। হুশিয়ার সবাই।"

—আর এক ঝাঁক পাথরের খোয়া গিয়ে ছিটকে পড়লো ওপাশে।

উদ্‌ভ্রান্ত পুলিশগুলো এবার এলোমেলো গুলি চালাতে শুরু করেছে। দলটা আস্তে আস্তে পিছু হটছে। পালাচ্ছে সবাই। কিন্তু একটাকেও আজ আর রেহাই দেওয়া হবে না। পুলিশের একটা বিশেষ দল আজ ঘিরে ফেলেছে জায়গাটাকে। বেশ কিছুদিন থেকেই পুলিশ ওৎ পেতে আছে। কিন্তু কিছুতেই দলটাকে এঁটে উঠতে পারে না। রাতের অন্ধকারে কোন্ ফাঁকে যে চোখে ধুলো দিয়ে বেরিয়ে যায়, তার হদিশ পাওয়া যায়। কর্ডনিং-এর বেড়া ভেঙে এক জোনা থেকে আর এক

কেলয়ে চাল পাচারকারী একটা মস্তবড় গ্যাং। আজকে বোধ হয় পুরো দলটাকেই মুখোমুখি পাওয়া গেছে। এতো বড়ো সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। কিন্তু পুলিশগুলোও প্রথমে একটু অবাক হল। অনেক নামকরা দাগী আর পাচারকারী আছে নাকি দলটায়। কিন্তু এদের মধ্যে শুধু দু'পাঁচজনকে একটু বা বয়স্ক মনে হচ্ছে। আর সবই ছোটো ছোটো ছেলে। আর মাঝবয়সী বুড়ীর দল। তা হোক, এদের ঘরেই আজ গায়ের ঝাল ঝাড়তে হবে।

দলটাকে পালাতে দেখেই পুলিশ এবার এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। কিন্তু ওরাও সতর্ক। ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে গা বাঁচিয়ে দ্রুত পায়ে পালিয়ে যেতে লাগল।

ছুটতে ছুটতে হঠাৎ কাঁটা ঝোপের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ল খোনুচে। ফুলমতি একটু এগিয়ে গিয়েছিল। ছেলেকে তুলে নেবার জন্য পা ফেরাল। খোনুচে ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই "উঃ" বলে একটা বুকফাটা আর্তনাদ তুলে লুটিয়ে পড়ল। মাথার চালের পুঁটলিটা ছিটকে পড়ল ধুলায়। ফুলমতি ততক্ষণে ছুটে এসে জাপটে ধরেছে ছেলেকে! একটা বুলেটেই এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে গেছে বুকখানা। কচি বুকের তাজা রক্তে ভিজে জবজবে হয়ে উঠেছে গায়ের তলার মাটি। বুক ফাটিয়ে চুকরে কেঁদে উঠল ফুলমতি—"ওরে আমার কি সব্বোনাশ হলোরে—"!

ততক্ষণে ওদিক থেকে শিকার বাগে-পাওয়া একটা পুলিশ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ফুলমতির উপর। হ্যাচ্‌কা একটা টান মেরে ছিনিয়ে নিল ওর কাঁধের চালের পুঁটলিটা। ডান হাত ধরে মোরে আর একটা টান মারতেই শক্ত মাটির পরে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ফুলমতি। আধপেটা খাওয়া শীর্ণ শরীর অতোবড়ো ধকল সইতে পারল না। জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

ওদিকে পুলিশগুলোর চোখে তখন ভয়ের ছায়া নেমেছে। জানাজানি হবার আগেই লাশ লুকিয়ে ফেলতে হবে। তা না হলে এই নিয়ে আবার নানা হুজ্জুতে পড়তে হবে। কয়েকটা নির্দেশমাত্র। তার মধ্যেই খোনুচের মৃতদেহটা কোথায় হারিয়ে গেল। হাজার তল্লাস আর অনুসন্ধানেও ওর ছোট্ট দেহটা কেউ কোনোদিন আর খুঁজে পাবে না। প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে ওদিকে দলটার সবাই যে যেদিকে পেরেছে, ছুটে পালিয়েছে। বেশ কয়েকটা বড়ো বড়ো চালের পোঁটলা আর জ্যান্ত আসামীকে গ্রেপ্তার ক'রে পুলিশগুলো বীরদর্পে ফিরে গেলো।

অনেক রাতে জায়গাটা নিঝুম হয়ে এলে দলের দু'একজন আবার ফিরে এলো। ঝোপঝাড় খুঁজে খুঁজে ফুলমতির অসাড় দেহটা বের করল। সকলে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে চলল। মাইল কয়েক গেলেই তাদের গাঁ। এই সব অনাহারী দলে মানুষগুলোর বাসস্থান। ফুলমতিকে ঘরে নিয়ে এসে ওরা ওকে নামিয়ে রাখল ওর ঘরের দাওয়ায়, ভাববার বা কাঁদবার কেউ নেই। মা আর ছেলের সংসার। ছেলে তো বানিক আগেই সব কিছুর বাইরে চলে গেছে। তবু পাড়াপ্রতিবেশী সাধ্য অনুযায়ী করল। চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনল ফুলমতির। তারপর একে একে সকলেই চলে গেল। সকলেই নানা ধান্ধার মানুষ। রাতে যা কাণ্ড ঘটল, তাতে কাল আবার গাঁয়ে পুলিশের হামলা হতে পারে। পুলিশের চোখে যারা সন্দেহভাজন, ভোর হবার আগেই তাদের লুকিয়ে পড়তে হবে।

কখন রাত গড়িয়ে দিন হল, নিথর নিস্পন্দ ফুলমতি তা টেরই পেল না। দিনটাও যেন গড়িয়ে

আসবার উপক্রম করল, তখন যেন চমক ভাঙল ফুলমতির। আর তখনই তার মনে যার কথা ভেসে উঠল, সে খোনচে নয়, সে তার কাকন। তার কেবল হাঁটতে-শেখা পায়ে মল-পরা অতি আদরের কাকন। পর পর দুটি ছেলে মারা যাবার পরের সন্তান। স্বামী নাম রেখেছিল কাকন। প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক ছিলেন বেণুবাবু। পূর্ব-বাংলার ভিটেমাটি ছেড়ে এসে প্রায় ভেসে যেতে বসেছিলেন। তারপর এই ফুলমাটারীর ঘর আবার খড়কুটো ধরে আবার ভেসে উঠতে চেয়ে ছিলেন। উঠেছিলেনও। শুকনো মুখে আবার হাসি ফুটেছিল। স্কুল থেকে ফিরে এসে হাসি-হেওয়া জামাটা সাবধানে খুলে বাঁশের বেড়ার গায়ে টাঙিয়ে রাখতে রাখতে কোলে তুলে নিতেন কাকনকে। ছেলের গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলতেন—"বুঝলে মতি—এ আমার কাকন—একেবারে মণি-কাকন! একে কি ধুলোয় ফেলতে আছে!" সেই বেণুবাবু গিয়েছিলেন শহরে মাসকাবারী মাইনে আনতে। সেখানে সরীর বাজার সব দেনাপাওনার হিসেব মিটিয়ে বিদায় নিয়েছিলেন। তারপর কাকন কখন আস্তে আস্তে খোনচে হয়ে গেল। অভাবে দুঃখে দিন আর কাটে না। মানইজ্জত ঘুচে গেল। উপোষী মানুষের আবার মানইজ্জত! খোনচের হাত ধরে অবশেষে চোরাচালানকারবারীদের দলে মিশে গেল ফুলমতি। ইজ্জত ওতে নেই। তবে পেটের জ্বালাটা তো যাবে। ফুলমতির খোনচে তো বাঁচবে।

কিন্তু কাকনও বাঁচল না। খোনচেও বাঁচল না।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল ফুলমতি। ঘর ছেড়ে বাইরে এলো। সারা গ্রামটাই যেন খাঁ খাঁ করছে। কিন্তু কোনোদিকেই নজর গেলনা ওর। যেমন হাঁটছিল তেমনই হেঁটেই চলল। হাঁটতে হাঁটতে কখন গ্রাম ছাড়িয়ে বাইরে চলে এলো। দূর দূর মাঠ আর ঝোপজঙ্গল পার হয়ে এলো রেল লাইনের বরাবর সেই কারখাটায়। ঐ তো—ঐ তো দেখা যাচ্ছে সে চারপাটা। ওখানেই কালকে ওরা খোনচেকে গুলি করে মেরেছিল।—'ওরে কাকন—আমার খোনচেরে"—হুমড়ি খেয়ে গিয়ে ঝাপিয়ে পড়ল সেই চারপাটার পরে ফুলমতি। বুক খালি করে কাঁদল খানিক্ষণ। তারপর দুই হাত ভরে মুঠো মুঠো করে ধুলো তুলে বুকে মাথায় ঘষতে লাগল পাগলের মত। হঠাৎ অঞ্জলিবদ্ধ হাতের দিকে তাকিয়েই থেমে গেল ফুলমতি। হাতভরা ধুলোর মধ্যে ডুবু ডুবু সূর্যের লাল আলোয় চিক্‌চিক্ করছে অনেকগুলো চালের দানা। হঠাৎই যেন মনে পড়লো ফুলমতির—কাল থেকেই সে কিছুই খায়নি। পেটের মধ্যে অসহ্য একটা যন্ত্রণা পাক দিয়ে উঠেছে। আর হ্যাঁ, খোনচেও খায়নি। সকালেই মা ও ছেলে বেরিয়ে গিয়েছিল চালের সন্ধানে। ফুলমতি এবার দুইহাতে মুঠো মুঠো করে চারপাশের সব ধুলো একত্রিত করল। ধুলো ঝেড়ে চালগুলো বেছে বের করে আঁচলে বাঁধল। তারপর যত জোরে পারল পা চালিয়ে ফিরে এলো ঘরে। আগুনের মতো কখন উনুন ধরাবে। বাটিতে ক'রে চালগুলো ধুয়ে করে ধুলো। লালচে চালের বং খোনচের জমাটবাঁধা রক্তে কেমন যেন কালচে হয়ে গেছে। বাটির গা বেয়ে চাল আর খোনচের রক্তধোয়া জল চিন্‌চিন্ করে মাটিতে গড়িয়ে দিল ফুলমতি। তারপর চালগুলো হাঁড়িতে চাপিয়ে সরা দিয়ে ভালো করে হাঁড়ির মুখ আটকে দিল। কিছুক্ষণ বাদেই চাল ফুটে উঠে বুক্ বুক্ করে মৃদু একটা শব্দ উঠল। সাবধানে হাঁড়ির ঢাকনা সরিয়ে দিল ফুলমতি।

আঃ! কি মিষ্টি সুবাস দিচ্ছে!

সব গন্ধটুকু বুকের মধ্যে শুষে নিল ফুলমতি।

খোনচে? হ্যাঁ, খোনচেও পাচ্ছে বৈ কি মিষ্টি সুবাসটুকু!

একটি মঞ্চ ও কয়েকটি দৃশ্য

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

বাড়ির নাম মানক !

কবেকার দেওয়া এই নামটুকু যেন গেটের ধারে দেয়ালে পাথরের গায়ে বর্ষিত হ'য়ে থাকার পর অনেকদিনের জল ঝড় বিদ্যুৎ-এর আঘাত খেয়ে নষ্ট হ'য়ে গেছে অক্ষরগুলি। গাছপালার পাতা কাঁচা ফুলের ক্রমাগত ঠোকর খেয়ে খেয়ে অক্ষরগুলি বর্তমানে মুছে গেছে কিছুটা। বাড়ির নামটুকু কালের প্রবাহ সম্পূর্ণভাবে মুছে দিতে পারেনি। এখন কেবল 'মক' এই লেখাটুকু রয়েছে। এই লেখাটুকুর প্রতি দৃষ্টি নিয়ে এসে এ বাড়ির কর্তা, একদা যিনি প্রচুর সৌখিন ও সুন্দর পুরুষ ছিলেন—বর্তমানে চল্লিশ উর্দ্ধ বয়েস নিয়ে এই নামের ব্যাপারে চিন্তা করলেন না মোটেই। কোনদিন নাম নিয়ে চিন্তা করেন না। এই নামটা বাড়ির পক্ষে ক্ষতিকারক হ'য়ে উঠছে কি না! যাই হোক তবুও একটা পছন্দসই নাম ছিল বাড়িটার। কর্তাদের দেওয়া নাম—মালঞ্চ। আজ নামের মাঝখানের কিছু অক্ষর আ-কার মুছে গিয়ে যে ছোট, সুন্দর ও সাবলীল নামটুকু দাঁড়িয়েছে সেটুকু তাঁর জীবনে হেঁয়ালী নয়—গল্প নয়—মঞ্চ, রঙ্গমঞ্চ যেন মনে হয়।

অনেকদিন পর এ বাড়ির পুরুষমানুষটি হাসেন। সুন্দর মুঠাম তাঁর চেহারা। চল্লিশের উর্দ্ধে যাওয়া বয়েস। দুপাশের জুলফির কাছ থেকে সামান্য এক গোছা ক'রে চুল পাকা হ'য়ে যাওয়ায় মুখের শক্ত বুনোনের ওপর কেমন সুন্দর বয়েসের রং পড়েছে।

খুব পুরানো আমলের বাড়ি! বাড়ির সামনে পিছনে চারপাশে ফুল বা ফলের বাগান। বাগানের ভিতর সরু আঁকা বাঁকা রাস্তা। বহু দেশী-বিদেশী বাহারে গাছ রয়েছে। ফুল গাছের আধিক্যই বেশী পরিমাণে। সেই অনুপাতে বাড়ির চেহারা খুব ছোট মনে হয়। বাগান; বাগানের মধ্যে পুকুর। বাগানের শেষে প্রাচীরের সঙ্গে লাগোয়া মালী ও চাকর-বাকরদের থাকবার টুকরো টুকরো ঘর রয়েছে। আরো কিছু ঘরে জালের আবেষ্টনীতে কুক্কুর,—ময়ূর ময়ূরী থাকবার আস্তানা রয়েছে। সেখান থেকে অন্যদিকে গঙ্গানদী। গঙ্গাতীরেই এ বাড়ির অবস্থান। চওড়া ঘাট। ঘাটের কাছ থেকে বাড়ি পর্যন্ত সারিবদ্ধ কয়েকটি পাথরের নারীমূর্তি। গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত-শীত-বসন্ত প্রভৃতি ঋতু বৈচিত্রের বিভিন্নতা মাখান পাথরের নারীমূর্তিগুলি। দেহসৌষ্ঠব অঙ্গভঙ্গীর চারু বৈভবে ঋতুঋতুর বিভিন্নতা মাখান নারী-মূর্তি। বাড়ির পাশেই একটি কৃত্রিম ঝর্ণা। বর্তমানে ঝর্ণাটি শুষ্ক। গেটের ধার থেকে বাড়ি ও বাড়ি থেকে গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত টানা রাস্তাটুকু সিমেন্ট ও টুকরো টুকরো রকমারি রঙিন পাথরে শক্ত বুনোন করা।

বর্তমানে এ বাড়ির সবটুকুই নষ্ট, ক্ষত, পুরনো দিনের আভিজাত্যে ঘেরা। নষ্ট ক্ষত দাগ, হাড় জিরজিরে। লাল ইটের সর্বাঙ্গ একটি পুরনো মন্দিরের মত। শালি খড়-খড়ি ভাঙাচোরা। কাঁচের লাল নীল টুকরো দিয়ে জানালা ও দরজার মাথা অর্দ্ধবৃত্তাকার করা। দোতলার গাড়ি বারান্দাটি বিরাট। বারান্দায় দাঁড়িয়ে এই

দক্ষিণেশ্বর অঞ্চল, আড়িয়াদহ, গঙ্গাবক্ষ, দেখা যায়। এ-বাড়ির বাগানের বর্তমানের মলিন চেহারা দেখা যায়। যেন এই গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ-বাড়ির অতীতের চেহারা থেকে আরম্ভ করে বর্তমানের মলিন দৃশ্যের অবস্থাটি পর্যন্ত যে-কেউ দেখে নিতে পারবেন।

বাগানের মালীর ঘরগুলি বর্তমানে শূন্য পড়ে আছে। গঙ্গাতীরের প্রস্তর নির্মিত নারীমূর্তিগুলি ম্লান, অবক্ষয়ে রিক্ত। ঘাট আছে কিন্তু কেউ সেখানে বড় একটা যায় না। পূর্বপুরুষরা অনেকেই সেখানে যৌবনের কবিতা পড়েছিলেন। আজ সব শূন্য পড়ে আছে। বাগানের অধিকাংশ গাছপালা বুনো ঝোপ-ঝাড় জঙ্গল-এ পরিণত হয়েছে। এলোমেলো গাছপালারা বাড়ির পরিষ্কার পথ-টুকুতে লতিয়ে লতিয়ে ঘন হ'য়ে এসেছে। পাখির কলরব উঠছে সর্বদা। যেন এই অবক্ষয়ের জন্য কেউ দোষী নয়। এ-বাড়ির বর্তমানের মালিক এ ব্যাপারে কাকেও দোষী সাব্যস্ত করতে পারেন না। রিক্ত শূন্য হাহাকারের মত সব আভিজাত্য ঝুলছে চারিদিকে। ময়ূর ময়ূরী উড়ে যাবার পর থেকে ময়ূরের ঘর ছায়াময়—বনের আলোয় মাখান, রিক্ত আকাশের দিকে করুন চেয়ে রয়েছে।

এই রং-জলা আভিজাত্যের বাড়ি, ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রস্তর মূর্তিগুলি যেন বাড়ির মধ্যে একটি বিগত যৌবনের দৃশ্যকে ঘোষণা করছে সর্বদা। আগে কয়েকটি নার্শারীর দোকান ছিল এ-বাড়ির কর্তাদের। বর্তমানে সেই সব দোকান জলাঞ্জলি হ'য়ে গিয়ে একটি কি দুটি দোকান টেকেছে। অন্যান্য কারবার ফার্ম সব নষ্ট হ'য়ে গেছে। একা রাম অক্ষয়ের পক্ষে এসব চালনা করা শক্ত। অর্থ ও সামর্থে কুলিয়ে না-ওঠায় এখন কারবার কার্যেও কেমন মন্দাক্রান্তা অবস্থা।

গতকাল থেকে রামঅক্ষয়ের কেবলি একটি দুষ্প্রাপ্য ফুলের নাম মনে হয়েছে। যে ফুলের গন্ধ আজও রামঅক্ষয়ের নাকের কাছে লেগে রয়েছে, ফুলের চেহারাটি পর্যন্ত চোখের গোড়ায় ভাসছে। রামঅক্ষয়ের পিতা রামানন্দ রায় একবার লোকজন পাঠিয়ে জামালপুর সাহেবগঞ্জ কিংবা মুঙ্গের এমনি কোন জায়গার এক বাগান থেকে এই ফুল সংগ্রহ করে এনেছিলেন। আজ রাত্রে হঠাৎ রামঅক্ষয়ের মনে সেই ফুলের নাম মনে হওয়াতে রাত্রে ভাল ঘুম হ'ল না তাঁর। ভোর হবার কিছু আগেই ঘুম ভেঙে যাওয়ায় গাড়িবারান্দায় ঘুরে ঘুরে ভোরের হাওয়া, গঙ্গার নৌকোর ম্লান চেহারা, পাখির কলরব, ঘষা কাঁচের মত অস্বচ্ছ আকাশ দেখতে দেখতে বারবার ফুলের কথাটাই ভাবলেন তখনও ছেলেমেয়েরা কেউ বিছানা ছেড়ে ওঠেনি। স্ত্রী বিভাবরী ওঠেনি। ভোর আরো একটু স্বচ্ছ হ'য়ে উঠলে রামঅক্ষয় নিচের ঘরে চলে এলেন।

নিচের কয়েকখানি ঘর: লাইব্রেরী। বৈঠকখানা ঘর। গাছপালা বসানোর সরঞ্জামে পূর্ণ একখানি ঘর—যা একটি নার্শারীর সংগ্রহশালা রয়েছে। বিভিন্ন গাছপালার ফুলের নমুনা ও বিবরণাদি সহ খাতাপত্র। কিছু বিদেশী বই জার্নাল রয়েছে এই সংগ্রহশালায়। কয়েকটি ক্যাকটাসের চেহারা এ-ঘরে অবস্থিত আছে। রামঅক্ষয় প্রথমে দু-একখানি আলমারির মধ্যে সেই দুষ্প্রাপ্য ফুলের নমুনা খুঁজতে লাগলেন। পেলেন না। অন্য একটি আলমারি খুলে কিছু বই টেবিলে ছড়িয়ে রাখলেন। কিছু বই কার্পেটে ছড়িয়ে পড়ল। রাম-অক্ষয় তাতে দৃষ্টি দিলেন না। তারপর মনে হ'ল ঘরে অন্ধকার আছে। এই ভেবে পুরনো অনেক দিনের না খোলা জানালা খুলে দিলেন। পুরনো জানালার কাঁচের শার্শি থেকে মুড় মুড় ক'রে কয়েক টুকরো কাঁচ মেঝের পড়ে গেল। রামঅক্ষয় ব্যস্তভাবে সিগারেট ফেলে দিয়ে আরো কয়েকটি খাতার পাতায় ঝুঁকে সংগ্রহ ক'রে রাখা ফুলের বা পাতার শুষ্ক নমুনা ও বিবরণ দেখতে দেখতে

পাতা ওলটাচ্ছিলেন। খুব বিরক্তির সঙ্গে এসব ঘাঁটছিলেন বলে রামঅক্ষয়ের চোখ মুখ আরো গাঢ় গম্ভীর ও ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল।

যেন মনে হবে যৌবনের সেই সুন্দর একরাশ চুলের স্তবকে সাজান' রামঅক্ষয়ের মুখখানা সাদা কয়েকটি চুলের বর্ণ বৈষম্যে কিছুটা প্রভেদ হয়ে গেছে। এতদিন ঘরে এই সংগ্রহশালায় চোকেননি বলে সব অপরিচিত লাগছে তাঁর কাছে।

হয়ত চোখের চশমার পাওয়ার বেড়ে যাওয়ায় খুঁজে পাচ্ছেন না দুষ্প্রাপ্য ফুলের ইতিহাস। হয়ত চুলের শাদাটে হ'য়ে যাওয়াটা কিছু নয়, কিংবা চোখের দৃষ্টির ঘনত্ব নষ্ট হ'য়ে যাওয়াও আসল কারণ নয়; আসলে হয়ত স্মৃতিশক্তি নষ্ট হ'য়ে গেছে রামঅক্ষয়ের। স্মৃতিশক্তি বিলুপ্তি।

যখন আলমারি খুঁজে দুষ্প্রাপ্য ফুলের ইতিহাস রামঅক্ষয় খুঁজে পেলেন না তখনই ব্যস্তভাবে ঘরে চলাফেরা করতে করতে দরজায় বিভাবরীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন।

বিভাবরী চা নিয়ে এসেছে। রামঅক্ষয় চায়ের কাপ বিভাবরীর হাত থেকে নিতে গেলেন। কাঁপা কাঁপা ক্রোধ ও আক্ষেপের হাত বাড়িয়ে দেবার আগে রামঅক্ষয় বিভাবরীর গলা শুনলেন। 'চা চেয়ে অমন ছটফট করে চলে এলে কেন! তোমায় এমন উদ্বিগ্ন ত কোনদিন দেখিনি। এমন হ'য়ে উঠলে কেন!'

রামঅক্ষয়ের হাত যেন ব্যর্থতায় এখনও কাঁপছে। রাম অক্ষয়ের চা নেবার হাত ও বিভাবরীর চা দেবার জন্য হাতটা কাছাকাছি হ'তে গিয়ে মাঝখান থেকে ব্যর্থতায় চায়ের পেয়ালা পড়ে চূর্ণ হয়ে গেল।

রামঅক্ষয় সামান্য ক্রোধ দমন ক'রে ভাবলেন—অন্যায়। কিন্তু অন্যায়টা কার। আমার নয়, বিভার নয়। তবে—তবে! যেন ব্যর্থতার জয় হ'ল। রামঅক্ষয় বিভাবরীর কাছ থেকে একটু অন্ধকারে সরে গেলেন। স্ত্রীকে ভাল করে দেখলেন।

বিভাবরী ভাবল—হয়ত স্বামীর গম্ভীর প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখতে গিয়েই এমনি চায়ের কাপ পড়ে গেছে।

রামঅক্ষয় বেগে গিয়ে ঈষৎ চাপা গলায় বললেন—'যাও, মাথা গরম আমার, আর তোমারও কি দেবার মত মন আছে। থাকলে এমন হ'ত না। যাও বেরিয়ে যাও। আমাকে বিরক্ত কোরো না।'

বিভাবরী পিছন ফিরেছে। দরজা শূন্য,—গাঢ়পাতার দৃশ্যে পড়ে রয়েছে। রামঅক্ষয়ও ব্যস্তভাবে ঘরের মধ্যে পুনরায় ঢুকে পড়লেন। খোলা আলমারি, খোলা জানালার শার্শি। ভাঙা কাঁচ। ছড়ানো বইপত্রের ভিতর দিয়ে চলতে গিয়ে কার্পেট ও চটি'র মাঝখান থেকে পা এলিয়ে পড়ে কাঁচের টুকরোয় রামঅক্ষয়ের সুন্দর পা রক্তাক্ত হ'ল। 'ওঃ'।

রামঅক্ষয় এ জায়গায় থামলেন। রক্তপড়ার পর রক্তকরা দেখতে দেখতে দরজা পেরিয়ে শান্ত ছায়ার সিঁড়ি মাড়িয়ে মাড়িয়ে আলতার দাগ-এর মত রক্ত ছড়িয়ে রামঅক্ষয় স্ত্রীর কাছে দাঁড়ালেন। 'আমায় একটু সাহায্য করত বিভা। রক্তটা বন্ধ করে দাও ত।'

বিভার শরীরের মধ্যে বর্ষার ঘন গাছপালার মত এক রূপ আছে। রামঅক্ষয় সে রূপের কাছে বারবার হার মেনেছেন। তার রাত্রি রং-এর ভিতর থেকে চোখের তারা ঘন পল্লব চিবুক হাতের সৌষ্ঠব কেমন রাত্রির মাদকতা মাখান। নক্ষত্র ও ছায়াপথের মত। পৃথিবীর ওপর গাছের ঘন ছায়ার মত বিভার কেশভার। বিভা ন্যাকড়া ও ডেটলের শিশি নিয়ে এলে রামঅক্ষয় বিছানায় দেহটা এলিয়ে দিলেন।

এই কেটে যাওয়াটা যেন কিছু নয়—ব্যস্ততা। এই

চায়ের পেয়ালা পড়ে যাওয়াটা কারো পক্ষে তেমন অপরাধ সূচক নয়। দেওয়া ও নেওয়ার মধ্যে কোথায় একটু ফাঁক ছিল—সেই ব্যর্থতা নিয়তি যেন লুকে নিয়েছে। এবং এই দুটো যা পারে কাকেও দোষী সাব্যস্ত না করে দোষ দেওয়া উচিত দুষ্প্রাপ্য ফুলটিকে। দোষ দেওয়া উচিত ফুলটির ইতিহাস খুঁজে না পাওয়াটাকে। কিংবা ফুল খুঁজে না পাওয়াটাও কিছু নয়, এই খুঁজে না পাওয়াটাই ত হ'ল একটা 'সময়', 'নিয়তি।' আমার সেই পাওয়ার সময়টুকু আসে নি। রামঅক্ষয় ভাবলেন—কিন্তু তাহলে কি ব্যাপার! আমার স্মৃতিশক্তি খর্ব হ'য়ে গেছে!

যেন এই স্মৃতিশক্তির কাছেই মনটা বোকার মত দাঁড়িয়ে পথ খুঁজছে। রামঅক্ষয় পথে বেরিয়ে ভাবতে লাগলেন।

পথে বেরিয়ে আড়িয়াদহ দক্ষিণেশ্বরের গাছপালা মন্দির শহরের গাড়ি ঘোড়া ট্যাক্সি সবকিছুতে দৃষ্টি বুলিয়ে এক-সময় রামঅক্ষয় দাঁড়ালেন একটি পোষ্ট অফিসের সামনে।

পোষ্ট অফিসের দিকে চেয়ে বাস ষ্টাণ্ডে দাঁড়িয়ে ছিলেন রামঅক্ষয়। সামনে সবুজ ক্ষেত পড়ে আছে। কাঁটাতারের বেড়া। কাঁটা তারের ফাঁকফোকর দিয়ে উঁচু বাঁধ দেখা যায়। বাঁধের ওপর ইলেকট্রিক ট্রেন শব্দ করে চলেছে। ট্রেন বিবেকানন্দ সেতু অতিক্রম করবে। ইঞ্জিনে শাঁখের শব্দ উঠছে।

রামঅক্ষয় পোষ্ট অফিসের দিকে তাকিয়েছিলেন অনেকক্ষণ। অনেকক্ষণ ধরেই একটি সুন্দরী মহিলার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলেন রামঅক্ষয়। নিতান্ত অশোভন দেখালেও রামঅক্ষয় চোখ ফেরাতে পারছিলেন না। কারণ ভদ্রমহিলার শরীরে একটি অদ্ভুত আভিজাত্য রয়েছে। চোখের মধ্যে দীপ্তি। মুখ যেন কয়েকোর একটি স্নিগ্ধতায় পরিতৃপ্ত। যদিও কোন অলঙ্কার নেই, তবুও রং ও উজ্জ্বলতা রয়েছে। বৈধব্যের মূর্তি হলেও ভদ্রমহিলার কাছ থেকে চোখ ফেরাতে পারলেন না রামঅক্ষয়। এবং একটি অন্য রমণীর দিকে তাকিয়ে থাকার ফলে মনের মধ্যে যে দীর্ঘ অস্বস্তি বেরিয়ে আসে রামঅক্ষয়ের চেহারায় চোখে মুখে তেমন কিছু ফুটে উঠল না। রামঅক্ষয় কিছু ভাবলেন না। বরং তাঁর মনের মধ্যে ঔৎসুক্য জেগে রইল ভদ্রমহিলার জন্য।

কাউন্টার থেকে বেরিয়েই ভদ্রমহিলা রিকশা ধরে রামঅক্ষয়ের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল। রামঅক্ষয়কে সে দেখল না।

ভদ্রমহিলা চলে যাবার পর রামঅক্ষয়ের সম্বিৎ ফিরে এল—ভদ্রমহিলা গেল কোথায়। সঙ্গে তার কিছু মালপত্র ছিল। এই রমণী এতক্ষণ ধরে যেন রামঅক্ষয়কে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল। অথচ যতটুকু তিনি দেখেছেন তা যেন সত্যি। এর মধ্যে কোথাও ভুল ত্রুটি নেই। একেবারে নিতান্ত সহজভাবে তিনি যেন একটি নায়িকার চলে যাবার দৃশ্য দেখলেন।

নায়িকা অদৃশ্য হবার পর রামঅক্ষয়ের মনে কেমন যন্ত্রণা প্রকাশ পেল। ভদ্রমহিলার শরীরে কোথায় যেন সামান্য দারিদ্র্যতা গ্রাস করেছে। যে দারিদ্র্যতাটুকু বর্তমানে রামঅক্ষয়ের শরীরে মনে ও গৃহ প্রাঙ্গনে পড়ে আছে। ঝরঝরে কর্মী রং। স্বাস্থ্যবতী। চোখে আবেশ মাখান। কেমন বিষণ্ণ বেশে ভদ্রমহিলা রামঅক্ষয়ের পাশ দিয়ে অন্যমনস্ক হ'য়ে বেরিয়ে গেল।

ঠিক এই চিন্তায় রামঅক্ষয়ের জীবন যেন কাঁচের গ্লাসের মত ভেঙে টুকরো হ'য়ে গেল। তাঁর সংগ্রহ-শালায় ভোরের ঘন আর্দ্র অন্ধকারের মত—মনের মধ্যে তিনি হাতড়ে হাতড়ে ঘুরছিলেন। ভদ্রমহিলা তাঁর দিকে তাকায় নি। কিন্তু রামঅক্ষয় যা দেখেছেন তাতে কোন ভুল নেই। সারারাত তাঁর ঘুম হল না। বিছানায় কাছে এলে রামঅক্ষয় কিছু বলতে পারলেন না। ছেলেমেয়েদের

সঙ্গে তিনি একটু তফাৎ রেখে চললেন। সহকারী বাবুকে কাজকর্ম বুঝিয়ে দিয়ে তিনি গঙ্গার দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন। রামঅক্ষয় ভাবলেন গতকাল বেলা ১০।১১ টা নাগাদ তিনি ভদ্রমহিলার দেখা পেয়েছিলেন। কিন্তু আজ আর কি দেখা হওয়া সম্ভব।

পরের দিন সেই আগের দিনের মত একই সময়ে রাম অক্ষয় বেরিয়ে পড়লেন পথে। সেই বাস ষ্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়ালেন। এবং সেখানে আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি সেই আগের দিনের পূর্বানুবৃত্তি দেখে আশ্চর্য হ'য়ে গেলেন। সেই গম্ভীর সুন্দরী ভদ্রমহিলা বাস ষ্ট্যাণ্ডে আসার পর একটি রিকশা ধরেছেন।

রামঅক্ষয় আর দেরী না করে আর একখানি রিকশা নিয়ে রিকশাকে ভদ্রমহিলার পিছন পিছন চলতে নির্দেশ দিলেন। খুব সন্তর্পণে ছুটলেন—যাতে ভদ্রমহিলা না টের পেয়ে তুল পথে গিয়ে রামঅক্ষয়ের মধ্যে না বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। রামঅক্ষয়ের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনরকম দ্বিধা সংকোচ ছিল না। তিনি যতটুকু ভেবেছেন তা ঠিক। চোখে কালো গগলস্ পরে তিনি রিকশায় বসেছিলেন।

রামঅক্ষয় একটু দাঁড়ালেন। ভদ্রমহিলা সামনের কোন একটি দোকানে ঢুকেছে। হয়ত দেরী হতে পারে ভেবে রিকশা ছেড়ে দিলেন এবং আড়ালে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরিয়ে মাঝে মাঝে আড় চোখে ভদ্রমহিলার কার্যবিধি লক্ষ্য রাখলেন।

সঙ্গে কিছু জামাকাপড়ের বাণ্ডিল রয়েছে। সেগুলি দোকানে দেবার পর নতুন কিছু ছিটের থান নিয়ে টাকাকড়ি নেবার পর বাইরে বেরিয়ে এল নায়িকা।

রোদ্দুরে বেরিয়ে আসার পর সেই নায়িকা চোখে গগলস্ লাগিয়ে নিয়েছে। ধীর পায়ে এসে রিকশায় উঠল। কোনদিকে তাকিয়ে কিছু দেখতে চাইল না।

রামঅক্ষয় আবার একটি রিকশায় উঠে অনুসরণ করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য, ভদ্রমহিলা মালক বাড়ির কাছেই আসছে। মালকর কাছে এসে রিকশা থেকে নামল। এবং পয়সা গুণে দেবার পর সরু গলির ভিতর দিয়ে চলে গেল। এখানেই কোথাও থাকে বোধ হয়।

রামঅক্ষয় এটুকু দেখার পর তাঁর চোখের দৃষ্টিশক্তি ও স্মৃতিকে যেন খুঁজে পেলেন। পরদিন কেবল মনে হ'ল—যা দেখেছেন তা যেন সত্যি। সবটুকু সার্থক। ভদ্রমহিলা যে 'মানসী' এটা ঠিকই। তবে মানসী রামঅক্ষয়ের দিকে তাকাল না কেন? হয়ত অন্যরকমের হ'য়ে গেছে। রামঅক্ষয়ও অনেকখানি পাল্টে গেছেন হয়ত। বিভাবরীকে ডেকে এসব কথা বলতে পারলেন না। সারাদিন বর্ষার আবহাওয়ায় বিছানায় শুয়ে-বসে কাটিয়ে দিলেন।

বিছানায় উঠে বসেছেন রামঅক্ষয়।

বিভাবরী সামনে এসে দাঁড়াল।

রামঅক্ষয় বিভাবরীকে বললেন—'বিভা, আমার স্মৃতিশক্তি কি হঠাৎ পাকিয়ে গেছে! কিছু বুঝতে পারছ।'

—কেন, বলে বিভা চুলের গোছ ডান হাতে ধরে বাম হাতে ছেলেকে কোলে ক'রে খাটে বসিয়ে দিল।

—তোমার দশবছর বা বারোবছর আগেকার কোন কথা মনে আছে। তোমার বিয়ের আগেকার সব কথা মনে আছে কি!

—তা জোর ক'রে বলতে পারব না। হয়ত অনেক কথা ঘটনা আমার একদম বিস্মৃত। অনেক কথা চেষ্টা করলে মনে করতে পারব। অনেক কথার ওপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস নেই—এসব কথা সত্যি বলেছিলাম কি! হয়ত বলিনি। বিভা থামল।

—আমি কিন্তু এ বিশ্বাস রাখি। আমি জোর গলায় বলতে পারি—এসব কথা আমার নিজস্ব। আমার

নিজের কণ্ঠস্বরকে পর্যন্ত আমি খুঁজে পাই। আমার বিশ্বাস আছে।

কিছু ভনিতা করলেন রামঅক্ষয় তারপর বললেন—'আমাদের বাড়িটা বিরাট দেখে অনেক সাধারণ মধ্যবিত্ত লোক যেন এড়িয়ে চলে যায়। ভাবে, না জানি কি বড় লোক। কিন্তু আমি ত জানি আমাদের বাড়ির এই আভিজাত্যটুকু নষ্ট হ'য়ে যেতে বসেছে। আমি কোনদিন এসব সহ্য করতে পারি না। আমি সব সময় মধ্যবিত্ত জীবন যাপন করতেই ভালবাসি। সকলের সঙ্গে মেলামেশায় অংশ গ্রহণ করতে চাই।'

রামঅক্ষয় বললেন, 'আমাদের পাড়ায়, ঠিক আমাদের বাড়ির পিছন দিকেই সুভাষদের টিনের বাড়িটা যোধহয় ভাড়া হ'য়ে গেছে। আজ একজন ভদ্রমহিলাকে যেন ও বাড়ির দিকে যেতে দেখলাম। আমার কেমন ভদ্রমহিলাকে দেখে সন্দেহ জাগল। তুমি একটু খোঁজ খবর নিও ত। বেড়াবার অছিলায় সব কিছু জেনে আসবে।'

বিভা বলল, 'সব জেনে আসব। কেন, কি মনে হয় তোমার।'

'এমনি। আমার একজন বন্ধু ঘর ভাড়া চাইছিল—তাই। তাছাড়া ভদ্রমহিলা কেমন, এটা জানতেই দোষ কি!

বিভা কথাটা কোনরকমে এড়িয়ে দিতে পারবে না। রামঅক্ষয় ভাবলেন, বিভা নিশ্চয় যাবে এবং সব কথা শুছিয়ে জেনে আসবে। সারাদিন রামঅক্ষয়ের মনে এই কথারই পুনরাবৃত্তি চলল। কাজে মন বসল না।

ভদ্রমহিলাকে দেখে রামঅক্ষয়ের মানসীর কথাই মনে হ'ল। মানসী অর্থাৎ রামঅক্ষয়ের স্ত্রী। মানসী বিবাহের পর একটি ছমাসের বাচ্চা ছেলে কোলে নিয়ে স্বেচ্ছায় তার বাড়ি ত্যাগ ক'রে চলে যায়। এর পিছনে কোন ঘটনা নেই। রামঅক্ষয় দু-বছরের বিবাহিত জীবনের মধ্যে কিছুতেই নিজের স্ত্রীর অভিপ্রায় জানতে পারেনি। এবং মানসীর সেই অন্তর্ধান হওয়ার পর থেকে আজ ২২।২৩ বছর ধরে স্ত্রীর চলে যাওয়ার কোন কারণ বা ইতিহাস জানতে পারেন নি। সবটুকু কেমন যেন অজ্ঞাত হয়েছিল। সেই অজ্ঞাত কারণের মাঝখানে বসে রামঅক্ষয় কেবল বয়সে প্রৌঢ় হয়ে গেছেন শুধু। আর এই বয়েসেও স্ত্রীর চলে যাওয়ার আশ্চর্য ফাঁকা ইতিহাসটা তাঁর কাপসা চোখের কাছে দিবারাত্র পড়ে আছে।

বাড়িতে ফেরার পর চা জলখাবার খেলেন না। মনের মধ্যে সমস্ত আবেগ ইচ্ছা জানবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা যেন প্রকাশ করতে পারছেন না বিভার কাছে রামঅক্ষয়।

বিভা বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বসেছে।

চেয়ারে অন্ধকারে বসে রামঅক্ষয়।

বিভা কোল দোলাতে দোলাতে বলল, 'তোমার কথামত সুভাষদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। দেখলাম—বাড়িটা ভাড়া হ'য়ে গিয়েছে। ভদ্রমহিলার নাম কেকা। স্বামী মারা গেছে। বিধবা। একটিমাত্র ছেলে—সুব্রত। ছেলেটিকে ওই অবস্থায় ডাক্তারি পড়াচ্ছে। এ বছর ফাইন্যাল পরীক্ষা। নিজে দর্জির কাজ ক'রে ছেলের পড়ার খরচ যোগাচ্ছে।'

রামঅক্ষয় আশ্চর্য হ'য়ে গেলেন—'সত্যি! তারপর?'

বিভা বলল, 'নিজে অহোরাত্র পরিশ্রম ক'রে জামা-কাপড়ের ছাঁট ক'রে দোকানে দোকানে দিয়ে ছেলের ডাক্তারি পড়ার খরচ যোগাচ্ছে। ছেলে মানুষ হ'য়ে গেলে বিয়ে থা দিয়ে সংসারী হবে। খুব আলাপ পরিচয় হ'ল। তবে দেখলাম—ভদ্রমহিলা খুব গম্ভীর আর সুন্দরী।

এটুকু জানার পর রামঅক্ষয় অন্যমনস্কের মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। নিচে নেমে এসে লাইব্রেরী ঘরে ঢুকলেন। ঘর অন্ধকার। চেয়ারের ওপর চুপ ক'রে বসে পড়লেন রামঅক্ষয়।

বিভার এ ব্যাপারে খুব বেশী আগ্রহ নেই। স্বামীর এ বয়সে এমন একটি পরিবারের ঘটনা জানতে চাওয়ার আগ্রহে বিভা সাধারণভাবে এই পরিবারের মধ্যে গিয়ে হাজির হ'য়েছিল। কিন্তু যতটুকু সময় জেনেছে ব্যাস। তারপর আর মনে কোনরকম রেশ ছুঁয়ে নেই।

অন্ধকার ঘর-এ কিছুক্ষণ বসে থাকলেন রামঅক্ষয়। অন্ধকার থেকে গঙ্গার দিকে তাকালেন। ধূসর গঙ্গায় একটি মাত্র নৌকো যেন পাড়ের দিকে বাঁধা আছে। স্থির, স্বপ্নের মত। ম্লান অন্ধকারের পটে নৌকা বাঁধা আছে। নিস্তব্ধ বাড়ির বাগানের ঘুম রাত্রে ভয়ঙ্কর। মানসীর একটি ছেলে হ'য়েছিল। সেই ছেলেকে নিয়ে সে চলে গিয়েছিল। তখন ব্রজ ছিল চাকর। চাকরদের ঘরে সে শুয়েছিল। রাম অক্ষয় কোথায় ঘুরে চলে গিয়েছিলেন। ফিরতে রাত হবে বলে গিয়েছিলেন। বাইরে থেকে বাড়িতে রাত্রে ফিরে আসার পর আর মানসীকে দেখতে পান নি রামঅক্ষয়। মানসী ঘরে তালা চাবি দিয়ে ঘুমন্ত ব্রজকে ডেকে তার হাতে চাবি দিয়ে বলেছিল—'সবই রইল, দাদাবাবুকে বলিস আমি চলে যাচ্ছি। খোকাকেও নিয়ে যাচ্ছি সঙ্গে। কোনরকম চিন্তা যেন না করে দাদাবাবু।' ব্রজ হঠাৎ ঘুমের ঘোরে এত কথা শুনতে পায়নি। চাবি নিয়ে আবার শুয়ে পড়েছিল ব্রজ। পর মুহূর্তেই ব্রজর ঘুম ভেঙে যেতে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল সে। পরের কথাগুলি ব্রজর কাছ থেকে শুনেছিলেন রামঅক্ষয়। ব্রজ বলেছিল—'বিছানা থেকে ওঠবার পর দেখলাম চারদিক। তারপর দিদিমণির চলে যাওয়ার কথাটা শুনে গঙ্গার ধারে গেলাম। ওখানে কিছুক্ষণ আগে একটা নৌকো বাঁধা ছিল। একজন ভদ্রলোককেও যেন দেখেছিলাম নৌকায়। তারপর আর কিছু মনে নেই। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। দিদিমণিকে খুঁজতে গিয়ে গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে দেখলাম—নৌকো তখন মাঝগঙ্গায় মিশে গেছে। হালকা জ্যোৎস্নার ভিতর মিলিয়ে গেছে। বাড়ীতে কেউ নেই তাই কিছু করতে পারলাম না।'

রাম অক্ষয় এসে দেখেছিলেন ঘর শূন্য। এবং সেই শূন্য ঘর অনেকদিন ধরে রইল। তারপর ব্রজ দেশে গিয়ে আর ফিরে এল না। মারা গেল। অন্য চাকর একজন এল। রাম অক্ষয়ের মনে মানসীর শূন্যতা প্রখর হ'য়ে উঠল। মানসীর আর একটি নাম ছিল অবশ্য কেকা। কেকা নামে তাকে এ বাড়িতে কেউ ডাকত না। নামটায় মরচে ধরে গিয়েছিল। আজ বিভার কাছে মানসী তার 'কেকা' নামের পরিচিতি দিয়েছে।

কয়েক বছর কাটল। রামঅক্ষয় এবার কি করবেন। মানসীর কোন হদিশ পেলেন না। তাছাড়া যতটুকু হয়েছে তাতে তাঁর বিশ্বাস হল—মানসীর সবটুকুই পূর্ব পরিকল্পিত। হয়ত মানসীর পূর্বেকার কোন ভালবাসা ছিল। সেখানেই সে চলে গেছে। এ জগতে সকলেই আত্মসুখী। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে, সামান্য এই দুটি মানুষের অন্তরাত্মার মিলন হয় না, যারা এই ভালবাসাটুকু তৈরী করতে পারে না তাদের আত্মা কলুষিত হয়েছে বলে রামঅক্ষয় মনে করেন। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এই মিলন এই স্বৈত সুরকে উপেক্ষা করতে যারা চায় তারা জীবনে ভালবাসা সৃষ্টি করতে পারে না। তারা আত্মসুখী। তারা চায় তৈরী ভালবাসাকে ভোগ করতে। ভালবাসার ঘর পৃথিবীতে তৈরী হ'য়ে পড়ে থাকে না। অনেক ত্যাগ স্বীকার করে উভয় পক্ষকে সেই ভালবাসার ঘর তৈরী করে নিয়ে তবে তাতে বাস করা চলে।

অনেকদিন অপেক্ষা করার পর বিভাকে বিয়ে করেছিলেন রামঅক্ষয়। বিভার রং কালো। ওদের অবস্থা ভাল হওয়া সত্ত্বেও অধিক বয়েস পর্যন্ত বিভার বিয়ে হয়নি। বিবাহ উত্তীর্ণ বয়েস। বিভার বাবা মা কেউ নেই।

অথচ অনেক বড় যৌথ পরিবার। বিভার দাদামশাই ওকে অনেক সম্পত্তি লিখে দিয়েছে। বিভাকে বিয়ে করার সময় বিভার দাদামশায়ের কাছে রামঅক্ষয় সব কথা খুলে বলেছিলেন। কিন্তু মানসীর চলে যাওয়াটুকু ছাড়া তার সঙ্গের ছেলেটির কথা উল্লেখ করেন নি।

রামঅক্ষয় ঘরে খাবার জন্য এলেন।

বিভা বলল, 'টুকু তোমার সঙ্গে খাবে বলে জেগে থেকে থেকে ঘুমিয়ে পড়ল।'

'ওহো, তাই নাকি ওকে একবার ডাক—টুকুকে', বলে রামঅক্ষয় ডাকলেন টুকু—টুকু!

বিভা বলল, 'থাক, ঘুমিয়েছে ডেকো না আর।'

রামঅক্ষয় বিভার পা দেখলেন আলতা পরা। সুন্দর পায়ের গড়ন। খাটে টুকু সীমা নীতা ঘুমিয়ে পড়েছে।

নিস্তব্ধ হ'য়ে ভাত খেলেন। মাছের তরকারি, শুক্তো ভাত, ভাজা। শেষের দিকে পায়েস খেয়ে উঠে পড়লেন। বিভা বাতাস করছিল, হঠাৎ বলে উঠল—'একি! তুমি সব ফেলে পায়েসটা শেষ করেই উঠে পড়লে যে! তবে আর একটু পায়েস দি।'

'না!'

তখন রামঅক্ষয়ের হাতে জল ঢেলে দিচ্ছে চাকর হাবু।

খাওয়ার পর মুখে মশলা ফেলে চেয়ারে বসে আছেন রাম অক্ষয় গাড়ি বারান্দায়। অন্ধকারে মাঝে মাঝে পায়চারি ক'রে পুনরায় চেয়ারে বসে সিগারেট ধরালেন। অন্ধকার ভয়ানক ক্লান্ত অসহায় ক'রে তুলছে তাঁকে। বিভা তখন আসন ভাজ করে ব'সে স্বামীর পাতে খেতে বসেছে। কি চমৎকার মনে হচ্ছে। রামঅক্ষয় ভাবলেন মেয়েরা যেমন মানানসই তেমনি বেমানান। এক এক অবস্থায় এমনি মনে হয়। এই জায়গায় এমনি ক'রে একদিন মানসী বসত। আজ বিভা। মনে হয় সবটা চোখে অভ্যস্ত গেলে তবে মানানসই হয়, নচেৎ কেমন বেমানান লাগে।

রাত্রে শুয়েও একই চিন্তা। মোটেই ঘুমোতে পারছেন না রামঅক্ষয়। অন্ধকার আকাশের দিকে চোখের তারা বাড়িয়ে এমনি একটি রাত্রে পোষার মানুষের মত মিথ্যে শুয়ে আছেন। অনেকক্ষণ। বিভার হাত পড়ল বুকে। হাতটা আস্তে ক'রে বিছানায় নামিয়ে রাখলেন রামঅক্ষয়। তখনই বিভা জেগে উঠেছে। ছেলেরা ঘুমন্ত।

'তোমার কি হয়েছে আমায় সত্যি করে বলবে। বড্ড অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে।'

রামঅক্ষয়ের বুকটা কেঁপে উঠল। 'কৈ না ত! কিছুই হয়নি। একটা দুঃস্বপ্ন দেখলাম।' এমনি মিথ্যা কথা ব'লে রামঅক্ষয় নিজেকে চাপা দিলেন।

বিভা বলল, 'আমার যেন মনে হয় তুমি কিছু সমস্যায় পড়েছ।'

'না।'

অন্য একদিন রাত্রে টুকুর ঘুম ভেঙে গেলে বিভা জেগে উঠল।

কিন্তু জেগে উঠেই বিভা চোখ বাড়িয়ে দেখল রামঅক্ষয় বিছানায় শুয়ে নেই। কি হ'ল, গেল কোথায়। দরজা খোলা। দরজা দিয়ে বিভা দেখতে পেল গাড়ি-বারান্দায় রামঅক্ষয় ছায়ার মত নিস্তব্ধ হ'য়ে গঙ্গার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আস্তে আস্তে বিভা উঠে দাঁড়াল। দূর থেকে বিভা রামঅক্ষয়কে দেখে বারান্দার দিকে এগিয়ে এল।

রামঅক্ষয় তখনও গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন। বিভার ডাকে পিছন দিকে ফিরলেন রামঅক্ষয়।

'আমার মনে হচ্ছে তুমি এমন কিছু চিন্তা করছ

যা আমাকে বলতে পারছ না। তুমি সত্যিই কি খুব রুগ্ন হয়ে গেছ!'

ঠিক সে রকম কিছু নয়। তবে কেমন যেন আমার কাছে সবকিছু নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। কিছুই আর ভাল লাগছে না।'

তার পর আর একদিন রাত্রে গঙ্গার ঘাটে এসে রামঅক্ষয়কে খুঁজে বার করেছিল বিভা। এবং তার পর থেকে প্রায়ই সন্দেহ হচ্ছিল বিভার রামঅক্ষয় এমনি একটি ঘটনার মধ্যে আটকে গেছে যা সে কিছুতেই বিভার কাছে বলতে পারছে না। বিভা চুপ ক'রে গিয়েছিল। আর কিছু জানতে চায়নি।

রামঅক্ষয় একের পর এক সন্ধান নিয়ে মানসীর যাবতীয় খবর নিয়েছিলেন। এবং তারপর সত্যিকার নায়িকার ঘোমটা খুলে পরিচয় করবার জন্য তিনি রিকশা বিদায় দিয়ে মানসীর পিছন পিছন গলির মধ্যে ঢুকে পড়লেন। মানসী অদূরেই চলেছে।

রামঅক্ষয় গম্ভীর চাপা প্রৌঢ়ের গলায় ডাকলেন—'মানসী!'

মানসী পিছন না ফিরেই বলল, 'তুমি কেমন আছ!'

—যদি বলি তোমাকে দেখার পর থেকে ভাল।

—কেন, তার আগে থেকে নয়।

—না। তাছাড়া—।

—কি তাছাড়া!

—তুমি আমাকে না দেখেই কি করে জানতে পারলে যে আমি এসেছি!

—তোমাকে আমি ত সব সময়েই দেখতে পাচ্ছি।

—আমি কি পরিচিত তোমার কাছে।

—খুব। পৃথিবীটা বরং অপরিচিত!

—কিন্তু বড্ড বেশী দেরী হয়ে গেল যে মানসী।

—মানসী সামনে ফিরলো। 'হ্যাঁ বড্ড দেরী হয়ে গেছে।'

—কিন্তু তুমি বিধবা হয়েছ। তোমার ত অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

—তোমারও ত বিয়ে হয়েছে। অনেক পরিবর্তন হয়নি!

বাড়িতে ডাকল মানসী। 'এস। ঘর দেখো। বড্ড গরীব হয়েছি।'

—আমার মনটাও এমনি গরীব হ'য়ে গিয়ে ঘুরছে।

রামঅক্ষয় উঠে পড়তে চাইল। 'আজ উঠি। অন্যদিন আসব।'

অনেকদিন অনেককাল পরে দেখা হওয়ার পর এটুকু কথা তোমার।

রামঅক্ষয় লজ্জিত হলেন। 'কৈ তোমার খবর দিলে না।'

—দেব।

—কবে।

—অন্য একদিন।

—না একটু খবর দাও। তুমি এমন হয়ে গেল কেন।

—আগেকার প্রেম ছিল। তোমায় সেকথা বলতে পারিনি।

—তারপর।

—তোমার কাছ থেকে চলে আসার পর সে মারা যায়।

—কে। সে!

—আমার প্রেমিক।

রামঅক্ষয় চা খেতে খেতে চা ফেলে দিলেন।

—চা ফেলে দিলে।

—ও কিছু নয়। তুমি বল।

—মাত্র বছর তিনেক সে বেঁচেছিল।

—তারপর

—মাথা গেলে বড় একা হ'য়ে গেলাম।

—ছেলেপুলে!

—কিছু হয়নি।

—সে কি, তার মানে!

—ওই, একটি যা!

—কি একটি!

—তোমার দেওয়া উপহার ঘেটিকে রাত্রে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম।

—আমি তাকে দেখেছি খুব বড় অবস্থায় একেবারে

—দেখেছ। সত্যি!

—হ্যাঁ, চুরি ক'রে দেখেছি। পরে আলাপও হয়েছে সাধারণ মানুষ হিসেবে।

—আচ্ছা! মানসী হাসল।

—এবার কি করবে! রামঅক্ষয় প্রশ্ন করলেন।

—ওকে অনেক দুঃখ করে মানুষ করেছি এবার হয়ত সুখ পাব।

—সুখ পেতে বড় ইচ্ছে হয় তাই নয়!

—হ্যাঁ, ভীষণ। অনেকদিনের সাধ। ছেলে আমার জীবনে সুখ দেবে।

—ও যদি মিথ্যে করে দেয় জীবনটা। সুখ ত ও না-ও দিতে পারে।

—তাহলে দুঃখ সারাজীবন রয়েছে। দুঃখ সইব।

—তোমার আমার কাছ থেকে নেবার কিছু নেই।

—না, আর কিছু চাই না। অনেক ত নিয়েছি।

—কি আর এমন।

—কয়েক বছরের ভালবাসা।

—শুধু ওইটুকু!

—হ্যাঁ।

—আর কিছু নেবে না!

—না। সেই ভালবাসাটাই ত বড় হচ্ছে।

—কোথায়!

—কেন, পথে ঘাটে দেখোনি। পরিচয় হয়নি তোমার সঙ্গে সুব্রত রায়।

—চমৎকার নাম ত!

—হ্যাঁ।

—কিছুই ত পাল্টাওনি দেখছি।

—না, সবই অক্ষয় রেখেছি। শুধু পারলাম না নিজেকে অক্ষত রাখতে।

—যা হয়ে গেছে সেজন্য কিছু ভেব না।

—তুমি আসবে একদিন।

—কেন আসতে বলছ?

—আমাকে শাস্তি দিয়ে যাবে।

—না, তোমাকে শাস্তি দিতে পারব না।

—তোমার স্ত্রীর নাম কি!

—বিভা। বিভাবরী।

—কেমন করে সে তোমাকে! ভালবাসে ত!

—খুব। সে ভালবাসা আদায় করে নেয়। দাবী। সে খুব সুখী।

—আর আমি ভালবাসা পেয়েও চিনতে পারলাম না। অন্ধ আমি।

—হ্যাঁ, আমি বিভার কাছে শক্ত মানুষ। আর তোমার কাছে যেন কাঙাল হ'য়ে ছিলাম।

—তোমাকে আর দেরী করতে বলব না।

—কেন, সুব্রত এসে পড়বে বলে বলছ।

—হ্যাঁ—কি ভাববে সে মনে মনে।

—যা সত্যি তাই ভাবতে।

—তা আমি জানাতে চাই না।

—কিন্তু আমাকে হয়ত জানতেই হবে। যাক চললে!

—হ্যাঁ।

রাম অক্ষয় চলে এলেন। কিন্তু দিনের পর দিন তাঁর মনের মধ্যে মানদীর চিন্তা ঘন হ'য়ে উঠল। রামঅক্ষয় গাছপালার মত নীরব হ'য়ে গেলেন। সর্বদা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। ছেলেমেয়েদের ভিতর, বিভার মধ্যে আর কোনরকম আনন্দ পান না রামঅক্ষয়।

অন্ধকারে বসেছিলেন রামঅক্ষয়। পিছন ফিরে দেখলেন বিভার ছায়া। অনেকক্ষণ বিভা এসে দাঁড়িয়ে আছে। রামঅক্ষয় কাছে ডাকতে বিভা পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াল।

'তোমার জীবনে কোন দুঃখ আছে কি!'

কেন, প্রায়ই আমাকে এসব প্রশ্ন করে বিব্রত করছ বিভা।'

'বলছি কারণ তোমাকে কিছুদিন যাবৎ দেখে দেখে আমার কেমন লাগছে।'

'কেমন লাগছে। ভয়ের মত!

'না।'

'তবে!'

যদি তোমার আর্থিক অনটন হয় আমাকে নিঃসঙ্কোচে বলতে পার আমি মিটিয়ে দেবার চেষ্টা করব। আর যদি তা না হ'য়ে তোমার জীবনের কোন আলাদা সমস্যা হ'য়ে থাকে তাহলে আমি তা কেমন করে মেটাব; তা তোমাকেই বলতে হবে।'

রাম অক্ষয় কোন কথা বললেন না, পরে বললেন, 'তোমাকে ওসব নিয়ে মাথা খারাপ করতে হবে না বিভা। তুমি আমার এ সমস্যা মেটাতে পারবে না।'

কিছুদিন পর রাম অক্ষয় বাড়িতে এসেই আশ্চর্যভাবে বিভাকে জড়িয়ে ধরলেন। বিভার শরীর স্পর্শ করে গন্ধ নিয়ে তাকে বিছানায় গড়িয়ে দিলেন। বিভা স্বামীর এ ধরণের ভালবাসায় অভিভূত হ'য়ে স্বামীকে বাধা দিতে গেল। কিন্তু রামঅক্ষয় বিভার কোনরকম বাধা আজ স্বীকার করতে পারলেন না।

অনেকক্ষণ পর বিভা স্বামীর বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নেবার পর বলল, 'তুমি আমাকে স্পর্শ করে আর অপমানিত কোরোনা। এতদিনে আমি সব বুঝতে পেরেছি। তোমার দুঃখ আর সমস্যা কি! তুমি আমার কাছে সব লুকোতে গিয়েছিলে। আমি দিনের পর দিন এসব লক্ষ্য করেছি। এবং লক্ষ্য করার পর তোমাকে কিছু বুঝতে দিতে চাইনি। আজ আর আমি তোমাকে সহ্য করতে পারছি না। আজকের দিনে কোন্ মানুষ এ ধরণের অপমান সহ্য করবে বল!'

রামঅক্ষয় যেন আঘাত পেলেন। সহসা যেন পথের মাঝখানে বিদ্যুতের ঝলকে চোখে অন্ধকার দেখলেন। বিভার দিকে তাকিয়ে থাকতে অসহ্য বোধ হচ্ছিল তাঁর। রামঅক্ষয় তবুও পরিষ্কার করে নেবার জন্যে জিজ্ঞেস করলেন, কিসে তোমার অপমান বোধ হচ্ছে। কেন! আমি কি এমন সমস্যা নিয়ে ভুগছি। কি জেনেছে, কি দেখেছ তুমি বল!'

বিভার দু' চোখে আগুন। আমার কাছে কোনরকম ফাঁকি দিতে পারবেনা। ভেবেছ আমি ছেলেমানুষ। কিছু বুঝি না ভেবেছে! ওই কেকা বা মানদী মেয়ে মানুষটাকে নিজে চোখে দেখে আসার পর বুঝেছি আমার জীবনটাকে শেষ করতে মেয়ে মানুষটা এখানে এসেছে। তবুও স্থির হ'তে পারতাম তোমার দিক বিচার করে। যদি দেখতাম তুমি ওদের সঙ্গে মিশতে চাইছ না ওদের ঘৃণা করছ।'

'না, আমি কোনরকম অশোভন কিছু করিনি। যাতে সংসারের ক্ষতি হতে পারে কোনরকম কিছু করতে চাইনি।'

বিভা ঘরের মধ্যে চিৎকার করে বাসন ছুঁড়ে কাচ

কাটিয়ে বলল, 'কি বলছো। ও সব কবিতা তুমি আমার কাছে শোনাতে এসনা!'

রামঅক্ষয় ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। 'বিভা তুমি সব কথা বুঝে আমাকে বোঝবার চেষ্টা কর। তুমি নিজেকে শান্ত করলে আমি সব বুঝিয়ে বলতে পারি।'

'আর আমাকে শান্তি দেবার চেষ্টা কোরো না। আমি জীবনে এত বড় অপমানিত আর কোনদিন হইনি। তুমি একটা কথা স্বীকার করবে।'

'কি!' রামঅক্ষয় ভীক চোখে তাকালেন বিভার দিকে।

'মানসী তোমার আগেকার স্ত্রী নয়।'

'হ্যাঁ। তাতে কি হয়েছে।'

'তুমি ওখানে দিনরাত যাতায়াত করছ না। কয়েক-মাস যাবত?

'যাচ্ছি।'

'সুব্রত ছেলেটি তোমার নিজের ছেলে নয়।'

হ্যাঁ, সুব্রত আমার ছেলে।'

'তুমি ওদের সংসারে এতকাল ধরে সাহায্য করছ না! অর্থ দিয়ে সাহায্য করছ না!'

রামঅক্ষয় এখানে থামলেন। একেবারে অসহায় হ'য়ে খামের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, যদি সাহায্য করে থাকি সেটা কি খুব দোষের! একজন চেনাশোনা গরীব লোককে সাহায্য করা কি দোষের।

'প্রচণ্ড দোষের! আমার অপমান। সংসারের অমঙ্গল! আসলে তুমি ওদের ভীষণ ভালবাস। এখন আমার কাছে স্বীকার করতে পারছনা!'

রামঅক্ষয় আর কিছু বললেন না। স্থির হ'য়ে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গিয়ে একা বাগানের মধ্যে বসে রইলেন। এখানে বসে থেকে অনেকক্ষণ ধরে তিনি কিছুই ভাবতে পারলেন না। অনেকটা রাত পর্যন্ত অন্ধকারে জোনাকি ও গঙ্গার ধূসর চেহারা দেখলেন। বসের মধ্যে কেমন দুঃস্বপ্নের মত বসে থাকলেন। চাকর চা নিয়ে এল। খেলেন না। চাকর বাড়িতে ডাকল। রামঅক্ষয় গেলেন না। চাকর আবার কিছুক্ষণ পরে জানাল—'মা চলে গেলেন ছেলেদের নিয়ে বাপের বাড়ি।' রামঅক্ষয় কিছুই বললেন না। অনেক রাত পর্যন্ত রামঅক্ষয় এখানে বসে থাকার পর একসময় ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। নিস্তব্ধ ঘর। রাত শেষ হ'য়ে এসেছে। খাবার ঢাকা পড়ে আছে। কিছু না খেয়েই শুয়ে পড়লেন শেষ রাতে।

রামঅক্ষয়ের কোথায় একটু ভুল হ'য়ে গিয়েছিল। রামঅক্ষয় কি একটা জিনিস মিলিয়ে জোড়া লাগাতে গিয়ে গোটা অবস্থাটি ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেল। কাজের ভিতর ডুবে গিয়েছিলেন রামঅক্ষয়। একবার শেষ চেষ্টা ক'রে বিভাকে আনার উদ্দেশ্যে তাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন রামঅক্ষয়। বিভার ঠাকুর্দা যথেষ্ট অপমান করেছেন ও স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন—'বিভা ওখানে আর যাবে না। এতবড় অপমান সে কোনদিন সহ্য করতে পারবে না। তুমি চলে যেতে পারো। কোনদিন এ বাড়িতে আর আসার চেষ্টা কোরো না।' ঠাকুর্দা জানালেন, 'আমার যা সম্পত্তি আছে তাতে বিভার পক্ষে যথেষ্ট; সুতরাং স্বামী ও অর্থ—কোনটাই তার পক্ষে আর প্রয়োজন নেই। বিভার আত্মসম্মানবোধ যথেষ্ট।'

অনেকদিন পর রামঅক্ষয় বাড়ি ফিরে আসছিলেন। অন্ধকারে বাড়ির গাছপালার ভিতর দিয়ে ধীর পায়ে ফিরে আসছিলেন। সংসারটা একবার ভাঙন ধরলে সেই

ভাঙন আর জোড় লাগে না। সারাজীবন চেষ্টা করতে হয়। গঙ্গার পাড়টা প্রতি মুহূর্তে ধসে ধসে পড়ছে। ওপরের ঘরে আর গেলেন না। বিভা নেই অনেকদিন। ওপরের ঘরে এখন মানসী রয়েছে। মানসী এসেছে আজ দুদিন। খুব বেমানান লাগছে কি মানসীকে! হয়ত সময়ের জন্য অনভ্যস্ততায় সব মানানসই হ'য়ে যায়। সুব্রত এখনও জানতে পারেনি। দিনকতক সে হাসপাতালেই ছিল। আজ সে কয়েকদিনের পর এ বাড়িতে সরাসরি আসবে। মানসী তাকে চিঠিখানা দিয়ে জানিয়েছে। রামঅক্ষয় অন্ধকার লাইব্রেরী ঘরে ঢুকে বসেছিলেন। তাঁর চোখে কান্না। সংসার ও সংসারের মানুষ সম্বন্ধে অদ্ভুত অসম্ভব চিন্তা করছিলেন। রামঅক্ষয়ের মনে হচ্ছিল ওপরের ঘরটি যেন একটি মঞ্চবিশেষ। অলক্ষ্যে রামঅক্ষয় এইসব অদ্ভুত অভিনয় দেখে যাচ্ছেন। সুব্রতর জুতোর শব্দ হচ্ছে। যেন নবাগত নায়কের মত। অনেকক্ষণ ধরে রামঅক্ষয় বাড়ির এই নতুন শব্দ, গলার আওয়াজ, গঙ্গার জলের প্রবাহ আবহসঙ্গীতের মত শুনতে শুনতে যেন নতুন নাটকের সূত্রপাত দেখছিলেন। ঘরের দরজা খোলা। অন্ধকার। রামঅক্ষয়ের চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছিল। কতদিনের এই অভিনয়ের শরীর নিস্তেজ হ'য়ে পড়ছিল। রামঅক্ষয় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলেন—বন্দ, প্রতিপত্তি, সম্মান, কান্না, দুঃখ, অনাচার, জিনিসপত্র ভাঙার শব্দ পাচ্ছিলেন।

অনেকক্ষণ পর জুতোর চমৎকার শান্ত শব্দ পেয়ে দরজার চাইলেন রামঅক্ষয়। ছায়া। যুবক। 'কে ওখানে!' রামঅক্ষয় ডাকলেন।

রামঅক্ষয় আবার ডাকলেন—'কে!'

'আমি সুব্রত।'

গম্ভীর গলায় রামঅক্ষয় প্রশ্ন করলেন—'তুমি! তোমার মায়ের কাছে সব শুনেছ!'

'আজ্ঞে হাঁ, সব শুনেছি।'

'সবটুকু শুনেছ!'

'হ্যাঁ, সব।'

'সব শুনে আমার সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ তোমার নেই ত!'

'না।' বলার পর সুব্রত 'বাবা' বলে কাছে এসে—রামঅক্ষয় সেই নবাগতকে জড়িয়ে তার গায়ের গন্ধ নিলেন।

তখন মানসী ঘরে আলো জেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে সেখানে।

Phone : 47-5165

TARDS

MANUFACTURERS

of

Grille, Collapsible Gates & Steel Windows

Regtd Office : 136D, Ashutosh Mukherjee Road

Calcutta-25

[Back Portion of SRIPATIR SONAR DOKAN]

দীপ্তি

আপনার নিত্য প্রয়োজনে

দীপ্তি লণ্ঠন—এর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন, এর অসাধারণ জনপ্রিয়তার পেছনে আছে মজবুতী গঠন, সুন্দর আলো আর কম কেরোসিন খরচ।

খাস জনতা কেরোসিন কুকার—নিত্য প্রয়োজনের একটি আবশ্যকীয় জিনিষ। এই কেরোসিন ষ্টোভ ব্যবহারে কোন ঝামেলা নেই। গঠনে মজবুত, দেখতে সুন্দর, খরচে সামান্য। অল্প সময়ে যে কোন রান্না করা যায়।

'দীপ্তি' মার্কা এনামেলের বাসন—অল্প দিনের মধ্যে তার বৈশিষ্ট্য আর গুণের দ্বারা সমাদৃত হচ্ছে।

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড

৭১ ও ৭৭ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

দীপ্তি লণ্ঠন

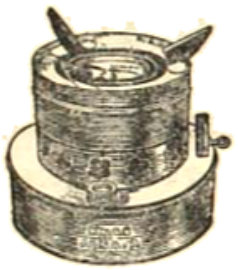

খাস জনতা

এনামেলের বাসন

Kalpana ganguly

ভারতের পরমাণু-অস্ত্র

বিমলেন্দু মিত্র

[বঙ্গ বিজ্ঞান মন্দির]

১৯৭৪ সালের শেষভাগে আমেরিকা প্রথম পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করার পর দুই দশকেরও বেশী সময় কেটে গেছে। বলা বাহুল্য যদিও আমেরিকাই এখনও পর্যন্ত একমাত্র দেশ যে যুদ্ধে পরমাণু-অস্ত্র ব্যবহার করেছে, তবুও আজ আরও অন্ততঃ চারটি দেশ পরমাণু-অস্ত্র তৈরী ও পরীক্ষা করেছে। যথা ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও সম্প্রতি লালচীন।

প্রশ্ন উঠেছে যে ভারত ঐ পারমাণবিক দৌড়ে অংশ নেবে কি না। অন্যান্য বেশীর ভাগ পশ্চিমী দেশের মত ভারতও তার পারমাণবিক শক্তি-সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। বস্তুতঃ ভারত অন্যান্য বহুদেশ অপেক্ষা বেশ কিছু আগেই ঐ সংস্থা গড়ে তুলেছে। এশিয়ার উন্নতিকামী অন্য দেশগুলির মধ্যে ভারতই সর্বপ্রথম পারমাণবিক চুল্লী বা রিঅ্যাক্টর চালু করেছে। ভারতের প্রথম রিঅ্যাক্টর কার্যকরী বা ক্রিটিক্যাল হয় ১৯৪৬ সালের ৪ঠা আগষ্ট। তারপর আসে কলম্বো প্ল্যান অনুসারে কানাডার সঙ্গে সহযোগিতায় কানাডা-ইণ্ডিয়া রিঅ্যাক্টর বা CIRUS। 'সাইরাস' চালু হয় লালচীনের প্রথম রিঅ্যাক্টর বসবার অন্ততঃ দু' বছর আগে এবং সে রিঅ্যাক্টরও রাশিয়ার দান। বস্তুতঃ ডঃ হোমি ভাবার অসাধারণ দূরদৃষ্টি, কর্মক্ষমতা ও প্রশাসনিক দক্ষতা দুনিয়ার পারমাণবিক শক্তি-সমৃদ্ধ অগ্রসর দেশগুলির সমকক্ষ করে গড়ে তুলেছে ভারতের পরমাণু-সংস্থাকে। শুধুমাত্র ট্রম্বের 'এস্‌ট্যাবলিশমেণ্টে' আজ দু' হাজারেরও বেশী বিজ্ঞানী কাজ করছেন। প্রাথমিক প্রাণকেন্দ্র টাটা-গবেষণাগার ও কোলকাতার সাহা-গবেষণাগার বা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগারে পরমাণু-সংস্থার যোগাযোগে কর্মরত অন্য বিজ্ঞানীদের হিসেব নিলে আরও সহস্রাধিক কর্মীর খোঁজ পাওয়া যাবে যাঁরা পরমাণু-সংস্থার হয়ে কোনও না কোনও কাজ করছেন।

ট্রম্বেতে শুধু যে কেবল তিনটি রিঅ্যাক্টর চালু আছে ('অপ্সরা', 'সাইরাস' ও 'জারলিনা' Zerlina) তা নয়, ট্রম্বের চৌহদ্দির মধ্যে রয়েছে থোরিয়াম কারখানা, ইউরেনিয়াম-fuel বা রিঅ্যাক্টরের জ্বালানীরও গড়ার কারখানা, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি তৈরীর কারখানা এবং সম্প্রতি চালু হওয়া 'প্লুটোনিয়াম' কারখানা। শেষোক্তটির সম্বন্ধে পরে বিশদ আলোচনা করছি। তাছাড়া বিভিন্ন পরীক্ষাগার ও যন্ত্রপাতি গড়ার কারখানা তো আছেই। এছাড়া আমাদের পরমাণু-সংস্থার হাতে রয়েছে বহুতর থোরিয়াম-ইউরেনিয়াম কারখানা। তাকুরার ভারী জলের কারখানা অবশ্য সরাসরি সংস্থার তাঁবে নেই। পরমাণু-সংস্থার আরও যোগ রয়েছে 'ইণ্ডিয়ান রেয়ার আর্থ' ও 'বিরাকুর-মিনারেলস্' প্রভৃতি কারখানার সঙ্গে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভারতীয় পরমাণু সংস্থার বিচিত্র ও সুদূর প্রসারিত কর্মধারার সামঞ্জস্যের অভাব নেই যা তাকে ক্রমশঃ পরিপূর্ণতার পথে নিয়ে না যাবে। অর্থাৎ ভারত পরমাণু শক্তির রহস্য অবগতির জন্যে যথেষ্ট সংখ্যক বিজ্ঞানী গড়ে তুলেছে। পরমাণু শক্তি কার্যকরী করার জন্য অনেক প্রযুক্তি বিদ্যায় শিক্ষিত কর্মীও গড়ে তুলেছে। রাসায়নিক প্রযুক্তি বিদ্যায় শিক্ষিত ঐহোমি শেঠনা এখন ট্রম্বের কর্মধার। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে পরমাণুবিদ্যার ক্ষেত্রে ভারত প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা চলে। এর জন্যে পরমাণু-সংস্থার প্রাক্তন সর্বাধিনায়ক ডঃ ভাবা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নেহরুকেই যথার্থ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। যে পরিমাণ অর্থ ও কালের স্বাধীনতা এই দ্রুত উন্নতির জন্যে দরকার ছিল নেহরু সম্পূর্ণভাবে তা ডঃ ভাবার হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

কিন্তু ভারতের পরমাণু প্রকল্প ভারতসরকারের নীতি অনুযায়ী পরমাণুশক্তির শান্তিকালীন ব্যবহারের মধ্যেই নিবদ্ধ। পরমাণু-অস্ত্র তৈরীর কথা উঠেছে চীনের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত-হাঙ্গামার পর। বলা হচ্ছে যে চীনের রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ যখন এক নয়, চীন যখন ভারতের বিরুদ্ধবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করছে, এবং চীন যেহেতু সামরিক বলে ভারতের চেয়ে শক্তিশালী ও তার হাতে পরমাণু বোমা রয়েছে—তার সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্যে ভারতকে পরমাণু-অস্ত্রে সজ্জিত হতে হবে।

এর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংঘাতের সমালোচনা খুবই হচ্ছে। আপাততঃ বৈজ্ঞানিক বিচারে দেখা যাক পার্লামেন্টের নির্দেশমাত্রেই ভারত বর্তমান অবস্থায় পরমাণু-অস্ত্রে সজ্জিত হতে পারবে কিনা।

পরমাণু বোমার উপাদান কি? মূল উপাদান অবশ্য রিঅ্যাক্টরের বর্জ্য—দ্রুত বিভাজনশীল নিউক্লিয়াস সমন্বিত পদার্থ বা ফিসন-যোগ্য মৌল। ইউরেনিয়ামের ২৩৫ ভর-যুক্ত সমস্থানিক (Isotope) বা সংক্ষেপে ইউ-২৩৫, অথবা প্লুটোনিয়াম-২৩৯ আইসোটোপ। সাধারণ ইউরেনিয়াম ধাতুতে ইউ-২৩৮ সমস্থানিকের প্রাধান্যই বেশী। সুতরাং ইউ-২৩৫ ব্যবহার করতে হলে তাকে ইউ-২৩৮ থেকে আলাদা করে নিতে হবে। যথেষ্ট পরিমাণ ইউ-২৩৫ পাওয়া প্রচুর ব্যয়সাধ্য। আমেরিকা তার প্রথম বোমার জন্যে সরাসরি বিরাট বিদ্যুৎ-চুম্বক তৈরী করে বিভিন্ন ভরযুক্ত ইউরেনিয়াম আলাদা করে নিয়েছিল। এই ইলেকট্রো-ম্যাগনেট তৈরীর কাজে নাকি তৎকালীন আমেরিকার ব্যবহার যোগ্য সমস্ত রুপো গলিয়ে তার (wire) তৈরী করতে হয়েছিল। পরে ডিফিউশন পদ্ধতিতে আইসোটোপ পৃথকী-করণে খরচ কম খরচে ইউ-২৩৫ পাওয়া গিয়েছে। বোধ-হয় ঐটিই এখনও সবচেয়ে সস্তা উপায়। যাই হোক, ইউ-২৩৫ ছাড়াও আছে প্লুটোনিয়াম-২৩৯ যা দিয়ে পরমাণু-অস্ত্র তৈরী করা যেতে পারে। খনি থেকে প্লুটোনিয়াম পাওয়া যায় না, কিন্তু ইউরেনিয়াম ব্যবহারকারী রিঅ্যাক্টরের জ্বালানী থেকেই প্লুটোনিয়াম-২৩৯ পাওয়া যায়। ফিসন-যোগ্যতায় প্লুটোনিয়াম-২৩৯, ইউ-২৩৫ এরই মত কার্যকরী। আমাদের সাইরাস-রিঅ্যাক্টর ইউরেনিয়াম জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করে। সুতরাং ঐ জ্বালানী থেকে প্লুটোনিয়াম নিষ্কাশন করা চলতে পারে। এটিও যে খুব সহজ কথা তা অবশ্য নয়। চীনের প্রথম পরমাণু-বোমায় ইউ-২৩৫ ব্যবহার করা হয়েছিল। বলা হচ্ছে যে চীন দেরীতে পরমাণু-চুল্লী চালু করায় যথেষ্ট প্লুটোনিয়াম সংগ্রহ করতে পারেনি, তাই তাকে অধিকতর ব্যয় সাপেক্ষ হলেও ইউ-২৩৫ পৃথক করার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। এও হতে পারে যে ঐ পরিমাণ ইউ-২৩৫ রাশিয়াই চীনকে দিয়েছিল,—যদিও এই সম্ভাবনার রাজ-নৈতিক সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে না। আবার এও হতে পারে যে ঐ আইসোটোপ পৃথক করার জন্য কোনও সহজ উপায় চীন আবিষ্কার করেছে। কারণ ডিফিউশন পদ্ধতিও এখন

সস্তা নয় যে গরীব বা উন্নতিকামী দেশ সহজেই বাজেটের অন্য দিক থেকে টাকা সরিয়ে এনে এই কাজে ঢালবে। অন্ততঃ চীনের আভ্যন্তরীন যে ছবি আমাদের সামনে মাঝে মাঝে মেলে ধরা হয় তাতে তো তার অর্থনীতি দেশকে দারিদ্র্যের হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে নি বলেই মনে হয়।

ভারতের বিজ্ঞানীদের সামনে এই ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে। সহজ কোনও পদ্ধতি আবিষ্কার করা প্রয়োজন যাতে আইসোটোপ পৃথকীকরণের খরচা খুব কমে যাবে। কিছুকাল আগে জার্মানীতে একটি সহজ পদ্ধতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল। গুরু পদার্থের পরমাণুকেন্দ্র ও লঘুপদার্থের কেন্দ্র একই সঙ্গে মিশ্রিত থেকে কোন উপায়ে একই দিকে দ্রুত বেগ দান করলে-অবশেষে অপেক্ষাকৃত লঘু কেন্দ্রকগুলি গুরু কেন্দ্রের ধাক্কায় সরে গিয়ে যাত্রাপথের শেষে শুধুমাত্র গুরু পদার্থকেই পৌঁছতে দেবে। খুব সরলভাবে বললে প্রায় এই রকমই একটি উপায়ে সহজে ইউ-২৩৫ ও ইউ-২৩৮কে তফাৎ করা যেতে পারে। জানি না এই পদ্ধতিকে সত্যিই কার্যকরী করে নির্দিষ্ট আইসোটোপ সংগ্রহ করা সম্ভব কি না। এ বিষয়ে দেশীয় পরমাণু-বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ করার রয়েছে।

রিঅ্যাক্টরে ব্যবহার করা জ্বালানী অর্থাৎ ব্যবহৃত ইউরেনিয়াম দণ্ড থেকে প্লুটোনিয়াম-২৩৯ আলাদা করাও খুব সহজ নয়। প্রথমত, প্লুটোনিয়াম ও ইউরেনিয়ামের রাসায়নিক ধর্ম্ম প্রায় হুবহু এক। সুতরাং যেসব রাসায়নিক পদ্ধতিতে ওদের আলাদা করা কি দুঃসাধ্য ব্যাপার। ভারতের সাইরাস রিঅ্যাক্টর প্রায় ২০০টি ইউরেনিয়াম দণ্ড ব্যবহার করে। কিন্তু এটি কেবল গবেষণা-সংক্রান্ত রিঅ্যাক্টর হওয়ার জন্যে যদিও এতে নিউট্রন শক্তির হার বেশ ভাল, তবুও উৎপাদন হিসেবে এর শক্তি ৪০ মেগাওয়াট মাত্র। একটা হিসেব নেওয়া যেতে পারে এইরকম একটি রিঅ্যাক্টর থেকে কতদিনে কি পরিমাণ প্লুটোনিয়াম পাওয়া যাবে, তার। হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে যদি এটি ৩৬৫ দিন সমানে ২৪ ঘণ্টা চালু থাকে (থাকতেই পারে!) তবে জ্বালানী দণ্ডে মাত্র ৯০০ গ্রামের মত প্লুটোনিয়াম জমা হতে পারে! সুতরাং দেখা যাচ্ছে রিঅ্যাক্টর চললেই যথেষ্ট পরিমাণে প্লুটোনিয়াম আমাদের ঘরে জমা হয়ে আমাদের প্রচুর পারমাণবিক অস্ত্রে সমৃদ্ধ হতে দেবে তা নয়, এটি সময় সাপেক্ষ। আরও বেশী শক্তিশালী রিঅ্যাক্টর চালু হলে অবশ্য অন্য কথা। তারাপুর, রাণা প্রতাপসাগর বা মাদ্রাজে কয়েকটি রিঅ্যাক্টর তৈরী হতে ও 'ক্রিটিক্যাল' হতে অনেক দেরী। অবশ্য ঐ সবকটি রিঅ্যাক্টরই ইউরেনিয়াম-রিঅ্যাক্টর ও প্রত্যেকটির তাপীয় শক্তি ৪০০ মেগাওয়াট করে হবে।

যাই হোক, সবচেয়ে বড় কথা যে ট্রম্বেতে আমরা প্লুটোনিয়াম কারখানা বসাতে পেরেছি। এটিকে প্রথমে ছোট বা "পাইলট-প্ল্যান্ট" হিসেবে বসানো হয়, প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা খরচে। দেখা গেল বছরে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ টন জ্বালানী দণ্ড থেকে এ কারখানা প্লুটোনিয়াম নিষ্কাশন করতে পারে। পরে আরও বড় কারখানা বসানোর চিন্তা পরিত্যাগ করা হয়েছে ও পাইলট-প্ল্যান্টই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়েছে। ১৯৬৫ সাল থেকেই এ কারখানা চলছে।

প্লুটোনিয়াম কারখানা চালু হবার পরেই বোম্বাইতে ডঃ হোমী ভাবাকে (উপের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধিকর্ত্তা) জিজ্ঞাসা করেছিলাম—আমরা এখন পরমাণু বোমা তৈরী করতে পারি কিনা! ভাবাজী বলেছিলেন—"Theoretically we can!" ডঃ ভাবা চেয়েছিলেন ৬ মাস সময় ও ৩৫ লক্ষ মাত্র টাকা। তাঁকে অবিশ্বাস করবার কোন কারণ যখন ঘটেনি তখন বলা যেতে পারে শুধু Theoretically নয়, Practicallyও we can। প্রথমেই কিছুটা বলেছি পরমাণু-সংস্থা যথেষ্ট সুদূরপ্রসারী কর্ম্মপন্থা নেওয়ার ফলে আমাদের বিজ্ঞানীরাও গড়ে উঠেছে আর তার সঙ্গেই প্রযুক্তি বিদ্যা বিশেষজ্ঞরাও গড়ে তুলেছে প্রয়োজনীয় শিল্প-সংস্থা।

ফলে বর্তমানে পরমাণুশক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা স্বয়ং-সম্পূর্ণ বলা চলে। কিন্তু মূলপদার্থ ইউরেনিয়ামে আমাদের ঘাটতি। সুতরাং মূলেই মুস্কিল হয়েছে। 'সাইরাসে'র জন্যে তৈরী ইউরেনিয়াম ধাতুর অর্দ্ধেক সংখ্যক সরাসরি কানাডা থেকে এসেছে, বাকি অর্দ্ধেকও কানাডার দেওয়া ইউরেনিয়াম, —আলানী ধাতুর আকার দেওয়া হয়েছে ট্রম্বের নিজস্ব কারখানায়। আমাদের নিজেদের খোরিয়াম-ইউরেনিয়াম কারখানা চালু হওয়ার পর আমাদের প্রোগ্রাম হচ্ছে নগদ দামে ইউরেনিয়াম-সংপৃক্ত পদার্থ (Concentrate) দুনিয়ার অন্যান্য দেশ থেকে কিনে এনে উপযুক্ত আলানী ধাতু তৈরী করে নেওয়া। বলা বাহুল্য, নিজেরা নিজেদের আলানী তৈরী করে নেওয়াও অনেক অগ্রসরমানতার পরিচায়ক। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য ছিল কেরালার সমুদ্রতীরের অফুরন্ত মোনাজাইট বালু থেকে থোরিয়াম ও ইউরেনিয়াম নিষ্কাশিত করে নিয়ে এই ইউরেনিয়ামের অভাব মেটানোর। কতদূর কি হয়েছে জানি না, কারণ গত জুলাইমাসে পরলোকগত ডঃ ভাবার যে প্রবন্ধ Science and Culture পত্রিকায় ছাপা হয়েছে তাতে তিনি তিনটি পাওয়ার-রিঅ্যাক্টরের জন্যেও পৃথিবীর অন্যান্য বাজার থেকেই ইউরেনিয়াম-কন্সেন্ট্রেট কেনারই পরামর্শ জানিয়েছেন। শ্রীশেঠনার নিজে হাতে গড়া যাদুগুড়ার ইউরেনিয়াম কারখানার মোনাজাইট বালু থেকে নিষ্কাশিত থোরিয়াম-২৩৩ পাওয়া যাচ্ছে, ইউরেনিয়াম উৎপাদন কতদূর কি হচ্ছে জানি না। থোরিয়াম-২৩৩ও রিঅ্যাক্টরে ব্যবহার চলে।

পরমাণু বোমা তৈরীর মধ্যে আজ আর এমন কোনও রহস্য নেই বা আমরা অর্থাৎ ভারতীয় বিজ্ঞানী বা ইঞ্জিনিয়াররা সমাধান করতে না পারি। এর মূল-রহস্যটি হচ্ছে এমন একটি 'ট্রিগার'-ব্যবস্থা যা ব্যবহারের ফলে কঠিন প্লুটোনিয়াম অথবা ইউ-২৩৫ এর "সাব-ক্রিটিক্যাল" কতকগুলি ছোটো টুকরো নিমেষ মধ্যে একত্র হয়ে গিয়ে "ক্রিটিক্যাল" বা "চরম-তাপ" যুক্ত হয়ে দাঁড়াবে এবং তৎক্ষণাৎ দ্রুতগতি নিউট্রনের ধাক্কায় বিভাজিত হয়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটাবে। তথাকথিত ট্রিগার-ব্যবস্থা আসলে একটি প্রাথমিক বিস্ফোরণ ব্যবস্থাও হতে পারে।

অবশ্য এই সব বিশেষ কারিগরী-ব্যবস্থা সম্ভব করতে প্রচুর অর্থ ব্যয় অবশ্যম্ভাবী। ডঃ ভাবা হিসেব দিয়েছিলেন অবশ্য মাত্র ২৫ লক্ষ টাকা খরচে প্রথম পরমাণু-বোমা হতে পারে। আবার বলছি তাঁকে অবিশ্বাস করার কোনও হেতু নেই।

সামরিক দিক থেকে পরমাণু বোমা আজ কতখানি প্রার্থনীয় তা জানি না। আমি জানি আমাদের সামরিক বাহিনীকে পরমাণু অস্ত্র-সম্ভার সজ্জিত করতে হলে তথাকথিত ডেলিভারী সিস্টেম চাই। আমাদের ঐ ধরণের বিমান বহর সৃষ্টি বা মিসাইল প্রভৃতি তৈরী সম্ভব হয়নি। অথচ যে দেশকে আমরা নিউক্লিয়ার শত্রু হিসাবে স্থির করেছি তার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে হলে ও সবই চাই।

পরমাণু-অস্ত্র না হয় তৈরী করা গেল। প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, পরীক্ষা চালাব কোথায়? আমাদের পরীক্ষা-ভূমি নেই। অন্ততঃ একশো মাইল ব্যাসার্দ্ধ নিয়ে বৃত্তাকার আয়তন সর্ব্বাত্মক ধ্বংসের জন্যে তৈরী থাকতে হবে। রাজস্থানের মরুভূমি সত্যিই তেমন মরুভূমি নয়। আমাদের "চৈনিচৌরিয়াল সমুদ্রে" তেমন কোনও দ্বীপ নেই,—সুদূর মহাসমুদ্রে একক কোনও ফেলনা দ্বীপের ওপরে আমাদের কর্তৃত্ব নেই।

এক মহাকাশের অনেক উঁচুতে বিস্ফোরণ ঘটান যেতে পারে। কিন্তু যে তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশি বায়ুতাড়িত হয়ে নামবে—মৌসুমী মেঘের সঙ্গে মিশে বৃষ্টিধারায় ধুয়ে বর্ষিত হবে বা বহু উচ্চতা দিয়ে প্রবাহিত 'জেট ষ্ট্রীমের' সঙ্গে বাহিত হয়ে অবশেষে সারা দেশের বহু-বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রে ও জনাঞ্চলে নেমে আসবে, তার প্রতিকার কি? আমাদের আবহাওয়া-

বিশ্বের পক্ষ থেকে বিস্তীর্ণ অকল জুড়ে সম্ভাব্য তেজস্ক্রিয় ফল-আউটের বিষয়ে পরীক্ষা ও গবেষণা করা একান্ত প্রয়োজন।

অবশেষে আমি এই বিতর্ক তুলতে চাই যে পরমাণু-অস্ত্র সত্যিই কোনও deterrent কি না। অর্থাৎ কেবলমাত্র পরমাণু-অস্ত্রের অধিকারই ভারতকে পারমাণবিক শক্তি সমৃদ্ধ অন্য দেশের ভবিষ্য আক্রমণ থেকে নিরাপদ করবে কি না। আমরা যখন প্রথম আক্রমণের কথা কখনই ভাবব না, সমস্যা যখন শুধু আত্মরক্ষার, তখন এ প্রশ্ন একেবারে মৌলিক প্রশ্ন। পরমাণু-অস্ত্রের অধিকারকে আজ আন্তর্জাতিক মর্যাদার প্রশ্নও করে তোলা হয়েছে। একটা যুক্তি প্রায়ই দেওয়া হয় যে ফ্রান্স আজ পরমাণু-অস্ত্রের অধিকারী হওয়ার ফলে বিশ্ব-রাজনীতিতে সে মর্যাদা আদায় করে নিয়েছে। সুতরাং ভারতও পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী হলে মর্যাদা লাভ করবে। কথাটা সম্পূর্ণ সত্যি নয়। কারণ ফ্রান্সের বর্তমান আসন লাভ সম্ভব হয়েছে তার অর্থনীতির উন্নতির জন্যে ও রাষ্ট্রশক্তির স্থায়িত্বে ক্রমশঃ দ্বিতীয়ীল বিশ্বাসের ভাব ফিরে আসার জন্যে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে ১৯৩৯ পর্যন্তও ফ্রান্সই ইউরোপে প্রধান-তম সামরিক শক্তিধর রাষ্ট্র ছিল, অন্ততঃ শ্রেষ্ঠ striking force তারই হাতে ছিল। তবুও হিটলারী বাহিনীর হাতে সম্পূর্ণ পরাজয় তাকে মেনে নিতে হয়েছিল। শ্রেষ্ঠ striking force কোন deterrent হিসেবে কাজ করেনি। কারণ হিটলারের বিশ্বাস ছিল যে ফ্রান্সের রাষ্ট্রনিয়ন্তাদের ঐ শক্তি ব্যবহারের সংকল্পের জোর নেই। ভারতের আত্মরক্ষার্থে পরমাণু-অস্ত্রও যথেষ্ট deterrent না হতে পারে, কারণ, ঐ অস্ত্র আক্রমণাত্মক কাজে প্রথম ব্যবহারের সংকল্পের জোর ভারতের বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর আছে একথা শত্রু বা বন্ধু কেউই বিশ্বাস করে না। সর্বাত্মক ধ্বংস ও মানবজাতির অবলুপ্তির ভয়ই এখনও পর্যন্ত এর ব্যবহারের সত্যিকারের বাধা হয়ে রয়েছে। বর্তমান আন্তর্জাতিক অবস্থায় যে কোন পরমাণু-অস্ত্রধর রাষ্ট্র যেদিন এই শুভবুদ্ধি হারাবে সে তৎক্ষণাৎ ধ্বংসের চেন-রিঅ্যাকশন ডেকে আনবে ও অচিরে ধ্বংস পৃথিবীব্যাপী হবে। ভারতের পরমাণু অস্ত্র এ সম্ভাবনাকে নষ্টও করবে না, একে বাড়িয়েও তুলবে না। আমেরিকা যে আজ চীনের deterrent কে ভয় করে পরমাণু-অস্ত্র ব্যবহার করছে না তা নয়। চীনও তা জানে। শুভবুদ্ধিই এখনও পর্যন্ত কার্যকরী রয়েছে।

ভারতের পরমাণু-অস্ত্র তৈরী হলে বিশ্বরাজনীতির মোড় বর্তমানে ফিরবে না বলেই মনে হয়। কিন্তু বিশ্বের বাজারে ইউরেনিয়াম পাওয়া ভারতের পক্ষে মুস্কিল হয়ে পড়বে। পাওয়ার-রিঅ্যাক্টর চালু হওয়াও মুস্কিল হবে। অর্থনীতিতে আরও দুর্বল হয়ে পড়ব।

একটি বা দুটি বোমা এখন তৈরী করা যায়। অর্থনীতিতে বিরাট আঘাত সেজন্যে হয়তো পড়বে না। কিন্তু পরমাণু-অস্ত্রে সজ্জিত striking force তৈরী করতে গেলে আমাদের প্রায়-দেউলে অর্থনীতি সম্পূর্ণ বিকল হয়ে পড়বে। পাকিস্তান ও ভারত যদি না যুক্তভাবে সদ্য উপনিবেশীয় আত্মরক্ষার জন্যে তৈরী হয়, এ দুটির যে কোন একটি দেশের পক্ষে পরমাণু-অস্ত্রে সজ্জিত হতে চাওয়ার ফল কখনই ভাল হবে না।

আমি কিছুতেই খুঁজতে পারছি না যে মহাযুদ্ধ শেষ করবার জন্যে খেতকায় জার্মান নরনারীর ধ্বংসে আমেরিকা অ্যাটমবোমা ব্যবহার করেনি; করেছে অখেতকায় পূর্ব দুনিয়ার আত্মসমর্পণে ইচ্ছুক জাপানের নরনারীকে নির্বিচারে ধ্বংসের উদ্দেশ্যে। ভবিষ্যতেও হয়ত খেতকায় কমিউনিষ্ট রাষ্ট্যে আমেরিকার পরমাণু-অস্ত্রের ব্যবহার নির্বিচার হবে না, কিন্তু শুভবুদ্ধির হ্রাস হলে যদি আবার অ্যাটমবোমা পড়ে তা পড়বে অখেতকায় কমিউনিষ্ট নরনারীর ওপরে। অন্ততঃ ভিয়েৎনামে তারই অশুভ ইঙ্গিত। তাই মূলসমস্যা আজ ভারত-পাকিস্তান শত্রুতা নয়, এমন কি চীন-ভারত বিরোধও

নয়—যে জন্যে ভারতকে পরমাণু অস্ত্রসজ্জা করতে হবে। আন্তর্জাতিক সমস্যা একটিই, তা হচ্ছে পূর্ব ও পশ্চিম দুনিয়ার পোলারাইজেশন। ভারত জনগণ ও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের ঘড়ি টানাটানিতে যদি বেড়ার ওপর বসে থাকে বা ভাগ্যবান পার্টি ও রাষ্ট্রচালকদের দিকে দড়ির লোরের ফলে যদি পশ্চিমের দিকে বেশী করে ঝোঁকে, তবে মধুরপুচ্ছটা ডগই বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। সে বিপদ ভারতের নিজস্ব পরমাণু বোমার মিটবে না, পরমাণুছত্রচ্ছায়াতেও নয়: ভারতের নিজস্ব সমস্যা এখন একটিই—তা হল আভ্যন্তরীন গোষ্ঠীশোষণ নিবারণ। পরমাণু অস্ত্রসজ্জার নামে এ শোষণ বেড়েই যাবে।

With best Compliments of :

Patsons Corporation
AHMEDABAD

Distributors for
SUMANA SEWING MACHINE

গভীর নিশীথে

অপরাজিতা গোস্বামী

সমস্ত পৃথিবী যখন ঘুমে অচেতন,
তখন কি এক দুর্নিবার আকর্ষণ
আমার মনকে নিয়েছে ছিনিয়ে
স্বপ্নময় পৃথিবীর ওপারে।

সেখানে নদীর ঢেউয়ের বুকে
গানের সুরের মত ভেসে যেত মন;
দূরন্ত সাগরের বুকে মুখ রেখে
দিনান্তের শেষ সূর্য
ডুবে যেত বিস্মৃতির সন্ধানে।

তবু হে শর্বরী
তুমি বেঁধেছিলে আমায়
কঠিন মায়ার বন্ধনে,
তাই তোমার সুর ছেড়ে
অন্য কোন সুর
পারিনি জীবনের বীনায় বেঁধে নিতে।

বর্ষার প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

ঘোর বর্ষাতে দার্জিলিং আসছি শুনে হিতৈষিবর্গ চিন্তিত হলেন। কিন্তু কলকাতা ছাড়ব যখন স্থির করেছি তখন কলকাতায় বর্ষা জেঁকে নামার আগেই পালানো ভালো। পালিয়ে এসে খবরের কাগজে বর্ষা-প্লাবিত কলকাতার যেসব ছবি দেখলাম তাতে নিজের বুদ্ধির উপরে শ্রদ্ধা জাগল। আজকের কলকাতায় যাঁরা বাস করেন তাঁদের পক্ষে কালিদাস, বৈষ্ণবকবিকুল এমন কি রবীন্দ্রনাথের বর্ষাপ্রীতির কারণ বোঝা কঠিন। কালিদাস যে বর্ষার উপরে একটি আস্ত কাব্য রচনা করেছিলেন তা ই নয় শুধু, আষাঢ়ের সাহিত্যের একটি বড়ো অংশই বর্ষাগুরুর অবদান। বর্ষা যেমন কবিকে প্রেরণা দিয়েছে তেমনই বাইরের জগৎ থেকে শারীরিক ও মানসিক দু অর্থেই তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে আপন ঘরের কোণে আপন শিল্প-লোক গড়ে তোলাতে সাহায্য করেছে। কিন্তু আজকের যাঁরা কবি অথবা সাহিত্যিক এবং যাঁদের বেশির ভাগ কলকাতাবাসী তাঁরা বর্ষার কাছ থেকে সে-প্রেরণা সে-সাহায্য কোনটাই পান না। চাঁদি-ফাটা গরমের পরে প্রথম দু-একটা বর্ষণ কলকাতাবাসী সাহিত্যিকের মনে হয়তো কিছু আনন্দের শিহরণ জাগায়, কিন্তু তা বর্ষার সমস্তার অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায় আতঙ্কের শিহরণ। বর্ষার অজুহাতে তাঁর পক্ষে ঘরে বসে থাকা চলে না, পেটের ধান্ধার কর্মস্থলে তাঁকে বেরোতে হয়, এবং বর্ষার কলকাতায় বিচরণ করা যে কী বিচিত্র অভিজ্ঞতা, ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন। বোধকরি স্বর্গে প্রবেশের মুখে যুধিষ্ঠির যে-নরক দর্শন করেছিলেন তা ছিল বর্ষা-প্লাবিত কলকাতার বর্তমান রূপ।

আশ্চর্যের বিষয় আজও আমাদের সাহিত্যের বেশির-ভাগটাই বর্ষার অবদান অর্থাৎ বর্ষাকালে রচিত। প্রকৃতির প্রেরণা ও সাহায্য না থাক, অন্য নানাবিধ প্রয়োজনা আছে বর্ষাকালে সাহিত্যরচনা করার জন্যে। এবং তাঁর মধ্যে প্রধান হচ্ছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার শারদীয়া সংখ্যার জন্যে দাবি। পশ্চিম বঙ্গের প্রধান উৎসব দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে কলকাতা ও মফঃস্বল শহরগুলি থেকে কম করে চার শ-টি পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ভালো করে খোঁজখবর নিলে ওই সংখ্যার সেই গুণ বৃদ্ধি পাওয়াও কিছুমাত্র অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এটা দেশের সংস্কৃতির পক্ষে সুলক্ষণ কি কুলক্ষণ তা বাজি রেখে বলা কঠিন।

আগে বাংলার গ্রামে গ্রামে দুর্গাপূজা হতো জমিদার বা অবস্থাপন্ন গৃহস্থবাড়ির উদ্যোগে। মাত্র বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শিবলাপাড়া ব্যায়াম সমিতিতে তরুণ বন্ধুর উদ্যোগে প্রথম সর্বজনীন দুর্গাপূজার প্রচলন হয়। অচিরেই সর্বজনীন দুর্গাপূজা অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তবে চাঁদাপ্রার্থী নব্যযুবকদের দুষ্ট করার পরে কজন বাঙালী মধ্যবিত্তের

কাছে ওই জনপ্রিয়তা আজ সত্য তাতে সংশয় প্রকাশ করা যেতে পারে। কিন্তু সর্বজনীন দুর্গাপূজা যেকালে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তখনই বিলিতী কায়দায় বড়োদিন সংখ্যার মতো নানা পত্রপত্রিকা পূজা সংখ্যা প্রকাশ করতে শুরু করে। কোন্ পত্রিকা প্রথম পূজা সংখ্যা প্রকাশ করে তা আমার অজানা। আনন্দবাজার পত্রিকা দোল পূর্ণিমার দিন প্রতিষ্ঠা-দিবস স্মরণ-করে বার্ষিক সংখ্যা বের করত। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই আনন্দবাজারের দোল সংখ্যার চাইতে পূজা সংখ্যা বিখ্যাত হয়ে ওঠে। আনন্দবাজারের সঙ্গে তখনকার দিনে পাল্লা দিত দৈনিক বসুমতীর শারদীয়া সংখ্যা। ছোটদের জন্য বেরুতো বার্ষিক শিশুসাথী, দেব সাহিত্য কুটীরের বছরে বছরে নতুন সংকলন, বার্ষিক রংমশাল প্রভৃতি। দেখতে দেখতে সব পত্রপত্রিকারই পূজার সময় একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের রেওয়াজ চালু হয়।

তখনকার লেখাপড়া জানা বাঙালীর ঘরে ঘরে পূজার বাজারের যে-তালিকা তৈরি হতো তাতে নিশ্চয় একটি পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা থাকত। মনে আছে ছোটবেলায় আমরা ক্যালেণ্ডারের পাতাতে মহালয়ার দিনটির দিকে তাকিয়ে থাকতাম কী উগ্র আগ্রহ নিয়ে। ওইদিন থেকে যেমন স্কুলের ছুটি শুরু হতো, ওইদিন ভোরে যেমন শিউলি ফুলের ঠাণ্ডা গন্ধের সঙ্গে বাতাসে ভেসে আসত রেডিয়োতে প্রচারিত মহিষাসুর-বর্ধনের পাঠ, তেমনি ওইদিন ঘরে আসত টাটকা ছাপা একটি কি দুটি পূজা সংখ্যা। কে আগে পড়বে তাই নিয়ে বাড়িতে পূজা সংখ্যার কাড়াকাড়ি পড়ে যেত, পূজা আসতে না আসতেই হাতে হাতে ফিরে তার বাঁধাই ঢিলে হয়ে যা ছিঁড়ে যেত। তখনকার পূজা সংখ্যাগুলিতে থাকত মাত্র একটি উপন্যাস আর বাছাই-করা লেখকদের সেরা রচনা। সে সব উপন্যাস গল্প কবিতা পড়ে মনে হতো, হায়, আমি যদি এরকম লিখতে পারতাম। নতুন লেখকদের রচনাও থাকত, আর সেসবে থাকত সত্যিকার নূতনত্ব। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ উৎকৃষ্ট রচনা তখনকার পূজাসংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত। যেসব প্রবন্ধ থাকত সেগুলি হতো জ্ঞানগর্ভ। তার অনেকগুলি ছিল রীতিমতো বিশেষজ্ঞদের গবেষণামূলক নিবন্ধ। পূজার ছুটিতে বাবা ঘরে বসে সে-সব প্রবন্ধ কেটে কেটে বিষয় অনুসারে কতকগুলি খামের মধ্যে পুরে রাখতেন পাছে আমাদের পড়ার পরে এবাড়ি ওবাড়ি ঘুরে পত্রিকাটা শেষপর্যন্ত খোয়া যায়। আমরা বড়ো হয়ে পড়ব বলে তিনি প্রবন্ধের কাটিংগুলো পরে একত্রে বাঁধিয়ে নিতেন। জলপাইগুড়িতে পঞ্চাশের বন্যাতে সে-সব নষ্ট হয়ে যায়।

উনিশ শ পঞ্চাশ সালটা আমার কাছে একটি স্মরণীয় বছর। ওই বছরেই আমি ম্যাট্রিক পাশ করি। তার তিন বছর আগে দেশ স্বাধীন হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকেই বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে নতুন হাওয়া বইতে শুরু করে। সবদেশেই যুদ্ধকালে বাজারে টাকার আমদানী বাড়ে। বাংলাদেশেও হয়েছিল। দেখা গেল টাকা দিয়ে স্বর্গও কেনা যায়। বইয়ে পড়েছি, অর্থই অনর্থের মূল। টাকার অত্যধিক আমদানী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমল থেকে কেমন করে চরিত্রকে নষ্ট করতে লাগল তা সমাজতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়। কিন্তু সাদা চোখে দেখা গেল জিনিসপত্রের দাম হঠাৎ বেড়ে যেতে শুরু করেছে, একজন ভদ্রলোকের সংসার যে আয়ে চলত তাতে আর কুলোচ্ছে না। সবাইকেই ভাবতে হলো আয় বাড়াবার কথা। সাহিত্যিককেও। লোভে পড়ে নয়, ঠেলায় পড়ে সাহিত্যিক একই সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে লিখতে শুরু করলেন এবং এমন ভাবে লিখতে লাগলেন যাতে তা সহজে পাঠককে আকৃষ্ট ও আমোদিত করতে পারে।

সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষক হলেন কারা? যুদ্ধের বাজারে অনেকের হাতে টাকা এসেছিল। তাঁদের কেউ কেউ পুস্তক প্রকাশনায়, কেউ পত্রিকা প্রকাশনায় পুঁজি নিয়োগ করতে চাইলেন। কোন কোন প্রকাশকও কাগজ নিয়ে কালো-

বাজারী করে টাকা অধিয়েছিলেন। পত্রপত্রিকার জন্যে বাঙালীদের একটা বিশেষ দুর্বলতা আছে। অনেক তরুণ সাহিত্যপ্রেমী পত্রিকা প্রকাশ করতে চান। তাঁরা টাকা পেলেন এসব নতুন বড়লোকদের কাছ থেকে। স্বাধীনতার পরে সরকারও শিক্ষা-সংস্কৃতি বিস্তারের জন্যে অর্থব্যয়ের পরিকল্পনা করলেন। এই প্রথম সুষ্ঠুভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলন শুরু করা হলো। পত্রিকা প্রকাশের জন্যে অর্থ-সাহায্যের পরিকল্পনাও নেওয়া হলো। এরই পাশাপাশি বেড়ে চলল অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের সংখ্যা। চারিদিকে স্কুল-কলেজ স্থাপিত হতে লাগল। লেখাপড়ার সার্টিফিকেট ছাড়া কাজকর্ম পাওয়া দুষ্কর হয়ে যেতে লাগল। কলেজের রাস্তা মাড়ায়নি যে-মেয়ে তার বিয়ে দেওয়া অভিভাবকদের মাথাব্যথার কারণ হলো। এই যে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে শুধুমাত্র কোনও দপ্তর অথবা বাসর ঘরে প্রবেশের ছাড়পত্র নেওয়ার জন্যে লেখাপড়া শিখল—এদের অবসর সময় কাটবে কী করে যদি এদের জন্যে পাঠ্যবস্তু ভূরি ভূরি রচিত না হয়? বলা বাহুল্য, শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে এরাই সংখ্যায় বেশি। পুস্তক বা পত্রিকার প্রকাশক তো লোকসান দেওয়ার জন্যে টাকা খাটাচ্ছেন না। সুতরাং তাদের কাজ হলো এই অধিকসংখ্যক অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন সম্প্রদায়ের বোধগম্য রচনা প্রকাশ করা। সেরূপ সাহিত্যের করমাশ দিয়ে তাঁরা সাহিত্যিকদের দাদন দিতে বা নগদ টাকার লোভ দেখাতে থাকলেন।

যখন শিক্ষকতা করে বা কোনও দপ্তরে কলম পিষে ভদ্রলোকের মতো সংসার চালানো অসম্ভব, যখন শিক্ষকতা করে, পরীক্ষার খাতা দেখে বা একাধিক দপ্তরে খণ্ডকাল কাজ করা অনিবার্য হয়ে পড়ল যখন, তখন সাহিত্যিক ভাবলেন, এভাবে যদি বাড়তি আয়ের ধান্দাতেই সারাদিন কাটাতে হয় তাহলে তিনি চিন্তা করবেন কখন, লিখবেন কখন; সময়াভাবে লিখতে না পারলে নিজের লোকেরাই তাঁকে সাহিত্যিক বলে মানবে না, অন্যে পরে কা কথা। সুতরাং সাহিত্যিককে বেছে নিতে হয়, একেবারে লেখা ছেড়ে জীবনযাপনের তাগিদে টাকা রোজগার করবেন, না, লিখেই টাকা রোজগার করবেন। যেহেতু তিনি জানেন ও ভালবাসেন লেখা, তাই তাঁর কাছে লেখার মাধ্যমে টাকা রোজগার করার পথটাই অপেক্ষাকৃত সরল মনে হয়। তা সত্ত্বেও যদি কেউ গোঁ ধরে থাকেন যে তিনি সত্যিকার সাহিত্যরুচিসম্পন্ন পাঠকবর্গের জন্যেই লিখবেন তাহলে তিনি ভাগ্যদেবীর অশেষ কৃপা ছাড়া রচনা প্রকাশ করতে পারবেন না। উপরন্তু দেখবেন যে নিকৃষ্ট রচনা লিখে অনেকে প্রকাশক ও সম্পাদকের কাছে কত খাতির পাচ্ছেন, সভাসমিতিতে কত সম্মান পাচ্ছেন, যেমন গাড়ি-বাড়ি হাঁকাচ্ছেন। আর যাঁর লেখা ছাপা হয় না তাঁকে সাহিত্যিক বলে কে গোঁছে! শুভাকাঙ্ক্ষীরাই তাঁকে কাগজ-কালি-সময় নষ্ট করার জন্যে দোষী করবেন। সত্যিকার সাহিত্য-রুচিসম্পন্ন পাঠকবর্গ বলে কোনও ছাপ-মারা গোষ্ঠীও নেই। অনেক পাঠক আছেন যাঁরা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, যাঁরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তিগুলিকেই একমাত্র সাহিত্য মনে করেন অথচ সময় কাটান যেসব বইয়ের অভিযান-কাহিনী পড়ে। যদি বা গুটিকয়েক পাঠক থাকেন, যাঁরা বাংলাসাহিত্যের সম্বন্ধে আগ্রহী, তাঁদের পক্ষে বই কিনে পড়া অর্থাৎ গোঁ-ধরা সাহিত্যিকদের সমর্থন জানানো সম্ভব হয় না। সম্ভব হলেও এবং তেমন ভালো বই বের হলেও অনেক সময় তাঁরা খোঁজই পান না সে-বইয়ের। খোঁজ পাওয়ার পথ তো পত্রিকার পাতার বিজ্ঞাপন বা পুস্তক আলোচনা। ভালো করে বিজ্ঞাপন সাধারণত সেসব বইয়ের দেওয়া হয় সেসব বই মাত্র অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন পাঠকদের কল্যাণে বেশি চলে। নির্ভরযোগ্য পুস্তক-সমালোচনাই বা কোন্ পত্রিকাতে নিয়মিত-ভাবে বেরোয়? ফলে সত্যিকার সাহিত্যরুচিসম্পন্ন পাঠক-

বর্গের জন্যে ছাড়া লিখবেন না এই গোঁ। অন্নদাশঙ্কর রায় বা তাঁর মতো দু' একজন ছাড়া কারও পক্ষে রক্ষা করা কঠিন। এ সঙ্গে ভুললে চলবে না যে অন্নদাশঙ্কর রায় এমন গুণমুগ্ধ প্রকাশক পেয়েছেন যিনি তাঁর বইয়ের বাণিজ্যিক সাফল্য সম্বন্ধে বিবেচনা করেন না।

নির্ভরযোগ্য পুস্তক আলোচনার কথা বলেছি। বহুল প্রচারিত দৈনিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকাতে উচ্চ প্রশংসিত বইয়েরও সর্বদা ব্যবসায়িক সাফল্য হয় না, অথচ অনেক সময় নিন্দিত বইয়ের হয়। এর একটি কারণ, পাঠকগোষ্ঠী নির্বোধ নয়, তারা জানে যে পত্রিকার নিন্দা-প্রশংসা সব সময় নিরপেক্ষ-ভাবে করা হয় না এবং সে-সব রচনা সব সময় যোগ্য ব্যক্তিকে দিয়ে করানো হয় না। সাহিত্যালোচনার ক্ষেত্রে যোগ্যতার কোনও বাপকাঠি নেই। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট প্রাপ্ত বিদ্বানেরাও এমন সব বইয়ের প্রশংসা করেন বা পুরস্কারের জন্যে সুপারিশ করেন যে লেখাপড়ায় বেরা ঘরে যায়। এর উপরে আছে এ যুগের শিক্ষিত সম্প্রদায়। অতি প্রচণ্ড তাঁদের শিক্ষাভিমান এবং তাঁদের ধারণা যেহেতু তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহরাঙ্কিত একটি কাগজ পেয়েছেন অতএব সাহিত্য সম্বন্ধে পবিত্র বিচার করার অধিকার তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আরোপিত। অরসিক শিক্ষিতজনকে রস নিবেদনের নিষ্ফলায় দায়িত্ব আজকের সাহিত্যিকদের। কোন্ বই চলবে, কোন্ বই চলবে না তার সব চাইতে নির্ভরযোগ্য আলোচনা বা রায় আজ এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের রুচিতে।

এতক্ষণ যা লিখলাম তার থেকে কিছুটা বোঝা যাবে উনিশ শ পঞ্চাশের থেকে বাঙালী সাহিত্যিকরা কোন্ খাটির উপরে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর সামনে অর্থের প্রয়োজন ও প্রলোভন দুটোই প্রচুর; তদুপরি সাহিত্যিক হিসেবে মান রক্ষার জন্যেও তাঁকে অর্থকরী রচনা লিখতে বাধ্য করা হচ্ছে। আজকের সাহিত্যিকেরা যদি সাহিত্যকে ব্যবসায়ের একটা পণ্য হিসেবে গণ্য করেন তবে সেজন্যে আপনি আমি আমরা প্রত্যেকে দায়ী। এই জমানাই তো ব্যবসায়ের জমানা। কোন জিনিসটাকে আজ পণ্যরূপে ব্যবহার করা হচ্ছে না? অথচ শিল্পক যদি তাঁর শিল্পপণ্যের জন্যে আর একটু বেশি মূল্য যাচ্ঞা করেন তবে রাঘববোয়ালদের ধিক্কারপত্র দৈনিক পত্রিকাতে বেরোবে। আমরা চাই নিত্য নতুন ঔপন্যাসিক উপন্যাস, কিন্তু তেমন ঔপন্যাসিককে নাক-উঁচু সমালোচক বলেন ব্যবসায়ী আর সাধারণ পাঠকরা এক ঘুষ দিয়ে তাঁর উপন্যাসের কথা ভুলে যান।

ফলে আজকের দিনে একজন লেখকের প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্যে ও পাওয়ার পরে সে প্রতিষ্ঠাকে টিকিয়ে রাখার জন্যে সংগ্রাম অস্বাভাবিক রূপ নিয়েছে। এই সংগ্রামে গতর খাটানো যে-গুরুত্ব পাচ্ছে তা দু' দশক আগে অজানা ছিল। অরসিক পাঠক-সম্প্রদায়ের উদ্দেশে তাঁকে লিখতে হবে। প্রচুর লিখতে হবে। পাঠক-সমাজের স্মরণ শক্তি দুর্বল। সাধারণ চোখের সামনে লেখক হাজির না থাকলে তাঁকে ভুলতে পাঠকের পক্ষে একটি তন্দ্রাই যথেষ্ট। তাছাড়া প্রচুর লেখার পেছনে আরিক কারণ তো আছেই। শুধু প্রচুর নয়, তরল করে লিখতে হবে। যাতে খবরের কাগজ পড়ার মতো চোখ বুলিয়ে লেখাটা পড়া যায় এবং যাতে তার ছাপ মনের উপরে গভীর হয়ে না বসে। লেখা এমন হবে যা ক্ষণিক আমোদ দেবে, ক্ষণিক চমক জাগাবে। একটি রচনা নিয়েই যদি পাঠক তন্ময় হয়ে যান তাহলে লেখকের অন্যান্য লেখাগুলি মাঠে মারা যাবে। তার মানে আখেরে লেখকের আয় কমে যাবে। আর লেখক যাতে প্রচুর পরিমাণে লিখতে পারেন সেজন্যে আছে প্রচুর পত্রিকা।

আগেকার দিনে পূজা সংখ্যাতে একটি উপন্যাসই যথেষ্ট ছিল। আজকাল নাম-করা পত্রিকাগুলির মধ্যে কে কত বেশি সংখ্যক উপন্যাস দিতে পারে তার পাল্লা চলে। কোনও কোনও পত্রিকা চার-পাঁচটি উপন্যাস প্রকাশ করে। সবগুলি উপন্যাসই আবার পূর্ণাঙ্গ বা সম্পূর্ণ। সেগুলি গ্রন্থাকারে

বেরোলে পত্রিকার দামের থেকে পাঁচ-ছ-গুণ বেশি দাম তো হবেই যে-পত্রিকা যত বেশি অর্থমূল্যের বস্তু যত সস্তায় দেবে তার বিক্রির সম্ভাবনা তত বেশি। পত্রিকাতে পত্রিকাতে আর একটি পাল্লা চলে: কে কার আগে বের করতে পারছে। যে-পত্রিকা যত তাড়াতাড়ি বের করতে পারে তার সম্পাদকীয় দক্ষতা তত বেশি। দেখাদেখি পুরনো বনেদী পত্রিকাগুলিও মহালয়ার আগেই বাজারে এসে হাজির হয়।

নতুন ইংরাজী বছর পড়ামাত্র সম্পাদকেরা লেগে যান ঔপন্যাসিক পাকড়াতে। একজন ঔপন্যাসিককে ধরলেই হবে না। কয়েকজনকে ধরতে হবে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার আগের বছর থেকে অন্য এক পত্রিকার কাছে উপন্যাস দেওয়ার জন্যে প্রতিশ্রুত। কিন্তু জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকের পক্ষে অপরের প্রিয়তা হারানো মানেই মূলধন হারানো। সুতরাং দ্বিতীয় প্রার্থীকেও একটি উপন্যাস দেবেন বলে কথা দেন। দ্বিতীয়-র পরেও কিন্তু আরও অনেক প্রার্থী আছে। তৃতীয়-র সঙ্গে রফা হয় ছোট উপন্যাসের এবং চতুর্থের সঙ্গে বড়ো গল্পের জন্যে। বিজ্ঞাপনে বড়ো গল্পই আখ্যা পায় উপন্যাসের। অষ্টম প্রার্থী পর্যন্ত উপন্যাসের নামে বড়ো গল্প চালানো যায়। অর্থাৎ পূজার সময় একজন লেখককে ছোট-বড়ো মিলে আটটি উপন্যাস তৈরি করতে হতে পারে। তার উপরে এক ডজন ছোট গল্প। আর ডজন খেচ আভীর রচনা। এটা গড় হিসেব। শুনেছি একজন জনপ্রিয় লেখক নাকি এমনভাবে উপন্যাস লেখেন যার প্রতিটি পৃষ্ঠা স্বয়ং-সম্পূর্ণ। ধরা যাক তাঁর লেখার এক এক পৃষ্ঠার দাম দশ টাকা। যে-পত্রিকা হাজার টাকা দেবে তাকে দেবেন এক শ পৃষ্ঠা। চুনো পত্রিকা দশ টাকা দিলে পাবে একটি পৃষ্ঠা। তার মানে একটি ছোটগল্প। কেনো কড়ি মাখো তেল। যার যেমন মুরোদ সে তেমন টাকা দেবে, তেমন লেখা পাবে। কাউকেই তিনি বিমুখ করেন না। কারও প্রতি তাঁর পক্ষপাতও নেই। স্বভাবতই তিনি সকলের কাছে প্রিয়।

সাধারণত নতুন ইংরেজী বছর শুরু হলেই লেখকদের সঙ্গে সম্পাদকেরা যোগাযোগ করেন, বিশেষ যে-লেখকের কাছ থেকে পত্রিকা উপন্যাস চায়। দরকার মতো লেখককে তাঁরা আগাম কিছু বা পুরো টাকাও দেন। বাংলা নতুন বছর শুরু হলে কুমোরটুলির মতোই লেখকদের ঘরে ঘরে তোড়জোড় শুরু হল। গ্রীষ্ম গিয়ে বর্ষা এলে তৎপরতা জোরদার হয়। তখন পূজা সংখ্যা ছাপা শুরু না হলেও কম্পোজ করা প্রুফ দেখা শুরু হয়ে যায় অনেক পত্রিকার। ঘরের বাইরে লেখকের দর্শন পাওয়া ক্রমে দুর্ঘট হয়ে আসে। অনেক লেখক দপ্তরের কাজের ফাঁকে ফাঁকে লেখা শুরু করেন এবং রাত জেগে লেখার দরুণ ট্রামেবাসে ঢুলতে আরম্ভ করেন। কিন্তু বেশিদিন এভাবেও চলে না। তখন দপ্তর থেকে একেবারে ছুটি নিতে হয়। বর্ষাতে বাইরে বেরোতে প্রবৃত্তি হয় না। ঘরে বসে সারাক্ষণ লেখা চলে। দেখা করতে গেলে লেখকের স্ত্রী বা ছেলেমেয়েদের কেউ এসে জানাবেন, লেখকবাবু বাড়ি নেই। তখন লেখকের দর্শন-প্রার্থীমাত্রকেই লেখকের আপন জনেরা কাবুলের অধিবাসী-তুল্য জ্ঞান করেন। লেখককে অতদূর ভাববার কোনও কারণ নেই। সত্যিই তাঁর তখন ঘর ছাড়বার ফুরসত নেই। যম এলেও তাঁকে বলতে হবে যে লেখকবাবু বাইরে গেছেন।

কিন্তু লেখকবাবু বাইরে গেছেন বলে আর থাকেই খুশ দেওয়া যাক না কেন, পত্রিকার সম্পাদককে দেওয়া যাবে না। তাঁকে বোঝায় এতো পারিবারিক ব্যূহ রচনা করার ক্ষমতা কম লেখকেরই থাকে। বর্ষার ঘনঘটা দেখলেই সম্পাদক মশায়ের মনে পড়ে যায়, 'এমন দিনে তারে বলা যায়।' কারে বলা যায়? লেখককে। কী বলা যায়? না, লেখার জন্যে তাগাদা। তাই তিনি ফোন তুলে নেন।

বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে, লেখকের ঘরে ঝনঝন

করে ফোন বেজে উঠল। কিন্তু রিসিভার তোলার জন্যে হাত বাড়াতে লেখকের ভরসা হয় না। তিনি জানেন এ সেই সম্পাদকের ফোন যাকে পূর্বাহ্ন উপন্যাসের অর্ধেক কপি দিয়েছেন, বাকি অর্ধেক দেওয়া হয়নি, লেখাও হয়নি। অন্য এক পত্রিকার জন্য তিনি এখন বড়ো গল্প অর্থাৎ ছোট উপন্যাস লিখতে ব্যস্ত। বাড়ির কাউকে ডেকে বলেন, তিনি বাড়ি নেই বলে দিতে। কিন্তু অত সহজে সম্পাদককে ঠেকানো যায় না। গরজ বড়ো বালাই। অন্যান্য পত্রিকার ছাপার কাজ কী রকম এগিয়ে চলেছে সে-খবর নিত্য পাচ্ছেন। আর লেখকদের চরিত্র চালাকিও তাঁর নখদর্পণে। অগত্যা রাত দুটোর সময় কয়েক কর্মার প্রিন্টঅর্ডার দিয়ে বাড়ি যাওয়ার আগে আবার ফোন করলেন লেখককে। এবার সাড়া মিলল লেখকের। তাঁর তখনও ঘুমোতে যাওয়ার অবসর হয়নি। সম্পাদককে ওজন আশ্বাস দিলেন এতক্ষণ তাঁর উপন্যাসেরই বাকি অর্ধেকটা লিখছিলেন রাত জেগে। কিন্তু আসলে তিনি লিখছিলেন তৃতীয় একটি পত্রিকার জন্যে ছোটগল্প। একটা রাতের জন্যে সম্পাদক মশায়কে ঠাণ্ডা করে লেখক শুতে গেলেন।

এদিকে সম্পাদক দুদিন অপেক্ষা করে ভাবলেন, মিথ্যা কথা লিখে যাঁরা খ্যাতিমান হয়েছেন তাঁদের কোনও কথায় বিশ্বাস করতে নেই। আবার ওই দুপুর রাতেই ফোন করলেন। কিন্তু ওপার থেকে এনগেজড-ফোনের শব্দ এল। খানিকক্ষণ পরে আবার চেষ্টা করেও একই শব্দ পেয়ে বুঝতে বাকি থাকল না, লেখকবাবু সম্পাদকের ভয়ে রেস্ট থেকে রিসিভার নামিয়ে রেখেছেন। কিন্তু এভাবে সম্পাদকের হাত এড়ানো যায় না। ভোর রাতে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে সম্পাদক মশায় ট্যাকসি থেকে নামলেন লেখকের দুয়ারে। সম্পাদকের বিনিদ্র রক্তচক্ষু দেখে প্রমাদ গণলেন লেখকবাবু। হাতের কাছে যা পেলেন তা-ই তুলে দিলেন সম্পাদকের হাতে। সেটা হয়তো অন্য কোনও পত্রিকার জন্যে লেখা অপর একটি উপন্যাসের অংশ। বলেও দিলেন যাতে প্রুফ দেখার সময় পাত্রপাত্রীর নাম আগের অর্ধেকের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়। সম্পাদক জানেন পাঠকবর্গের বোধবুদ্ধির দৌড়। হৃষ্টচিত্তে সেই কপিটাই তিনি প্রেসে দিলেন।

সেদিন গত যখন পূজা সংখ্যার বিজ্ঞাপন ছোটকরে অন্য কোনও পত্রিকাতে ছাপা হতো। আধুনিক প্রমোদের পরাকাষ্ঠা। চলচ্চিত্রের মতো করে আজকাল পূজা সংখ্যার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। বিজ্ঞাপনে কখনও কখনও লেখকের ছবিও থাকে। অমুখ পত্রিকাতে অমুখ লেখকের সম্পূর্ণ নতুন ধরণের উপন্যাস—এই বক্তব্যকে অবিশ্বাস্য রকমের চটকদার করে রাস্তার মোড়ে মোড়ে বড়ো বড়ো বিজ্ঞাপন পড়ল। দুখানা উপন্যাসের দুটো আধখানা জুড়ে একখানা উপন্যাস ছাপা হলে তার অভিনবত্বকে টেক্কা দেবে কোন্ উপন্যাস? ব্যানারের প্রসাদে যথারীতি উক্ত পত্রিকার এজেন্সীর জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। পত্রিকা প্রকাশের দু দিন আগে থেকে বিক্রয় কেন্দ্রের সামনের দৃশ্য দেখবার মতো। লঙ্গর খানার সামনে দুর্ভিক্ষের সময় যেমন লাইন লাগত তেমনই লাইন লোল এজেন্টের দোকানের সামনে। অবশ্য বুভুক্ষার ধরনটা আলাদা। তা ছাড়া লাইনের দু পাশে আছে চানাওয়ালা ঝুলাওয়ালাদের ভিড়। প্রকাশের দিন সকাল থেকেই ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি। ট্রামেবাসে যেতে যেতে সবাই নিজ্জাহভাবে তাকান। বাছাকাছি স্টপ থেকে যাঁরা উঠলেন তাঁদের কাছ থেকে খোঁজ নিতে নিতে মুখে মুখে আরও প্রচার হয়ে গেল। এবং এই প্রচার এযুগে বস্তুর প্রকাশের চাইতে বহুগুণ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। প্রচুর প্রচার চাই—যেমন লেখকের তেমনই পত্রিকার। প্রচুর লেখাটা লেখকের প্রচারের সহায়ক আর পত্রিকার প্রচার প্রধানই প্রচুর বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভরশীল।

প্রকার তথা রচনার গুণাগুণ একালে গৌণ। পাঠক

চায় উত্তেজনার খোরাক, তাও অনাহত বিস্তের মোহময় জগতে কল্পনাতে বিচরণের অবাধ সুযোগে চিত্তের বিনোদন, সে-সঙ্গে বিত্তবানদের অসুখী জীবনের বিপরীতে নিজের অনটনে ক্লিষ্ট ক্ষুব্ধ জীবনের মধ্যে এক কৃত্রিম সান্ত্বনা বা আত্মতুষ্টি। যতদিন দেশবাসী স্বাধীনতার জন্যে লড়েছে ততদিন মনে হয়েছিল বিদেশী শাসনই আমাদের সমস্ত সুখ শান্তির অন্তরায় এবং আশা ছিল দেশ স্বাধীন হলেই আকাশ থেকে স্বর্গ নেমে আসবে মাটির ধরাতে। কিন্তু স্বাধীনতার পরে দুঃসহ কঠিন বাস্তবের উপরে আছাড় খেয়ে পড়ে আমাদের সে-আশা ভেঙে ঝিলমার হয়ে গেছে। তাই বাস্তবের যথার্থ রূপ ও পরিচয়কে আমরা ডরাই অর্থাৎ জীবনযাত্রার গ্লানি ও হীনমন্যতা থেকে পালিয়ে মুক্তি খুঁজছি কথাশিল্পের কল্পলোকে, উপন্যাসে চরিত্রের উন্মোচন কিংবা ছোটগল্পের একাগ্র ব্যঞ্জনা আজ আমাদের কাছে অনাবশ্যক, অনর্থক, অগম্য। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কাছে জনৈক পাঠক নাকি দাবি করেছেন: বিশ্লেষণ-ও-বর্ণনা-বর্জন, অনুচ্ছেদের সংক্ষেপীকরণ, ঘটনার মুষল-বর্ষণ। আমাদের মতো পাঠকের এসব চাহিদা মেটাবার জন্যে আজ রাজরাজড়া নবাববাদশা বড়োবাড়ি বা বড়োলোক-দের কেচ্ছার জোগান দিচ্ছেন লেখকেরা। যেমন চাহিদা তেমনই জোগান। পাঠক বেচারাই বা কী করবেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সুপারিশ ছাড়া না হয় চাকরি না হয় বিয়ে। আগ্রহ থাক বা না থাক লেখাপড়া শিখতে হয় এবং শিক্ষাভিমানকে লালন করতে হয়। সাহিত্যপাঠে মানে আমাদের কাছে না জীবনকে আরও ভালোভাবে জানা, না আনন্দ পাওয়া, ও সে-আনন্দের রক্ষা করা। সাহিত্যকে তলিয়ে বোঝার সময় ও শক্তি কোনটাই আমাদের নেই। দুখানা উপন্যাসের ছুটো আখখানার সমাহার বা একখানা পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস যখন আমাকে একই বাস্তবের নৈমিত্তিক নির্যাতনের থেকে পলায়নের পথ করে দিচ্ছে তখন ছুটোই আমার কাছে তুলামূল্য, ছুটোতেই আমার উপন্যাস পঠনের একই উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে।

আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা, সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি, রুচি ও শিক্ষার মান সমস্ত সমাজকে এমন এক রূপ দিয়েছে যখন সাহিত্যসৃষ্টিও পরিণত হয়েছে পণ্য উৎপাদনে। পুরনো আদর্শ ও ধারণার সঙ্গে নতুন আচার ও পদ্ধতিকে মেলানো যাচ্ছে না। পূজা সংখ্যার ঘরগুষ্টে সাহিত্যিককে লিখতে হচ্ছে পাইকারি হারে এবং পাইকারি হারে উৎপন্ন পণ্য একই রকমের হতে বাধ্য। ফলে যা হওয়ার তা-ই হচ্ছে—পূজা সংখ্যার প্রায় সমস্ত লেখাই খোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি খোড়। সাহিত্যিকের পক্ষে গুণপনা চর্চার অবকাশ অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে গেছে, আমরা পাঠকরাও গুণপনার মূল্য দিতে অপারগ। গুণপনাযুক্ত রচনার ব্যবসায়ী-ব্যর্থতার সম্ভাবনাই বরং বেশি অর্থাৎ তাতে লোকসানের ঝুঁকি অনেক। আমরা চাই নতুন নতুন রচনা, এবং নতুন রচনা হলেই যে তাতে নূতনত্ব থাকবে এমন কথা নেই, বরং নতুন রচনার মধ্যেই নূতনত্বের অভাব বিশেষ প্রকট। নূতনত্ব না থাকলে সাহিত্য হয় না। সাহিত্য মানেই তো সেই নতুন জিনিস যার সহিত একাত্ম হয়ে আমাদের অভিজ্ঞতার সীমানা প্রসার পায়। পূজা সংখ্যাগুলির পাতায় পাতায় অজস্র পাত্রপাত্রীর সুখ-দুঃখের কাহিনী থাকে সত্যি, কিন্তু সে-সব পাত্রপাত্রীর সঙ্গে আমরা কদাচ একাত্মবোধ করতে পারি। তাদের কাহিনী পড়ে আমাদের খবরের ঝুলি ভারি হলেও অভিজ্ঞতা বাড়ে না এক তিলও। আজকাল পূজাসাহিত্য নামে যেসব রচনা প্রকাশিত হয় সে-সব সাধারণত খবরের কাগজের উপযুক্ত বিভিন্ন ঘটনার ফাঁপানো বিবরণমাত্র, যদিও কথাশিল্পের ভান থাকে পুরোমাত্রাতে।

এপ্রসঙ্গে দেখা যাচ্ছে আজকাল পূজাসংখ্যাতে গল্প-উপন্যাসের স্থান গ্রহণ করছে ইতিহাস-বা-সত্যঘটনা-আশ্রয়ী কাহিনী: দেবদাসী বা ঠগী বা হিটলার বা অমনই কোনও

বাস্তব চরিত্রের সম্বন্ধে নানা কৌতূহলোদ্দীপক। কাল্পনিক কাহিনীর চাইতে তথ্যপূর্ণ সুখপাঠ্য রচনার চাহিদা যে দিনে দিনে বাড়ছে এটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এবং হয়তো সুলক্ষণও। এজন্যে সুলক্ষণ বলছি যে এতে অবাস্তব অলীক চরিত্রের দমবেশ ধরে গল্প ফাঁদার প্রতি এক শ্রেণীর পাঠকের বিমুখতা পরোক্ষে প্রকাশিত হচ্ছে। অর্থাৎ একাধীন রচনার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা কথাশিল্পীদের আপন আপন দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার জন্য চেতাবনী। যদি কথাশিল্পীরা সে-চেতাবনী অগ্রাহ্য করেন তাহলে তথ্যপূর্ণ সুখপাঠ্য রচনা একদিন কথাশিল্পীকে ছুটিয়ে দেবে পুরা-সাহিত্যের আসর থেকে। কিন্তু একজন কি দুজন কথাশিল্পীর পক্ষে নব্যশিক্ষিত পাঠকসম্প্রদায়ের রুচিকে অস্বীকার করা কঠিন। তাঁদের লড়তে হবে স্রোতের উজানে। সুতরাং সমস্যা খুব ঘোরালো। কোনও উপন্যাসে যাথার্থ্য থাকলে তার জন্যে কোথাও-না-কোথাও একটি পাঠকসমাজ অনন্তকালের গর্ভে অপেক্ষা করে আছে—এই অটল প্রত্যয় ছাড়া স্রোতের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে সাহিত্যিকের অন্য কোনও সম্বল নেই। তা না হলে কী হবে তা তো ঔপন্যাসিকরা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছেন। নতুন বই বেরোলে হু হু করে বিক্রি হয় যাকে বলে উড়ে যায় কিন্তু বছর কয়েক যেতে-না-যেতেই তার ওড়ার দম ফুরিয়ে যায়। লেখক যখন জীবদ্দশায় রাশি রাশি লিখে পাঠকের সামনে পুনঃপুনঃ হাজিরা দিয়েও এক-একটি উপন্যাসকে বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারছেন না তখন তাঁর মৃত্যুর পরে বইগুলির কী দশা হবে অনুমান করা সোজা। অত্যন্ত জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকও পুরনো উপন্যাসের নাম পালটে নতুন উপন্যাস বলে চালাচ্ছেন। কিন্তু মৃত্যুর পরে তো লেখকের এ জারিজুরি চলবে না।

অবশ্য দেখেশুনে মনে হয় না যে মৃত্যুর পরে তাঁদের রচনার চাহিদা থাকবে কি থাকবে না এ নিয়ে আজকের সাহিত্যিকের বিশেষ মাথাব্যথা আছে। সাহিত্যসৃষ্টি তাঁদের কাছে নির্ঝঞ্ঝাট জীবিকার একটি বৃত্তিমাত্র। হাতে নগদ নারায়ণ এলে আর কিছু চাইনে, যদি পস্টারিটি ভুলে যায় তো বয়ে গেল। পুজো এলে যেমন দোকানীরা পসরা জমাবার জন্যে, যেমন অনেকে স্ত্রীর গয়না বাঁধা দিয়ে বা অন্য কোনও ভাবে ছুটো টাকা জোগাড় করে কলেজ স্কোয়ারে গড়িয়াহাটের মোড়ে ভাববাজারের পাঁচ মাথায় ফুটপাতে দোকান পাততে তৎপর হয়ে ওঠে, তেমনই প্রায় সমস্ত সাহিত্যিকই বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতে লিখে জীবনধারণের জরুরি প্রয়োজনটা জোগাড় করতে চান এবং সেটি ছাড়া লেখনী চালনার অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই। কুমোরের ছাঁচে ঢালা প্রতিমার মুখের মতোই সেসব রচনার ধরন একই এবং সে-সবের বৈচিত্র্য শুধু সেটুকুই যত্নহীন হাতে বারবার শিব গড়তে গেলে যেটুকু ফেরফের হয়। এতে যিনি যত কৃতী লেখক হিসেবে পরিচিত তিনি তত সফল। বৈষয়িক সাফল্যই হ'ল অধুনা সাহিত্যিক সাফল্যের অধিষ্ঠান মানদণ্ড। এবং সত্যি বলতে আজ কিসের সাফল্য বৈষয়িক সাফল্য ছাড়া বিচার করা হচ্ছে না!

Always Use :

"FLYING HORSE" Brand

STAINLESS STEEL, ALUMINIUM & BRASS UTENSILS

The Kandivli Metal Works

Dhobiwadi Thakurdwar, Bombay-2

JEEKA INDUSTRIES

In Regular Production of

JEEKATHOL ASG

along with

Fast Bases, Direct Acid, Chrome Colours and Turuoise Blue

●

For Your Requirements

of

RHODAMINE BT EXTRA

(Brilliant, Fluffy and Greenish Powder Appearance)

Please Contact

Manufacturers

Bhagwanlal Tejaji Kharawala Private Ltd.

Astodia Road, Ahmedabad.

THE

CENTRAL BANK OF INDIA LTD

[Estd-December 1911]

Head Office : Mahatma Gandhi Road, Fort, Bombay-1

Authorised Captial ---Rs. 10,00,00 000 - **Subscribed Captial** ---Rs. 5,94,31,750/-

Paid up Captial Rs. 4,75,40,67?/- **Reserve Fund and other Reserve**---Rs 6,7?,33,209

Deposits as at 31. 12 1965 ---Rs. 3,18, 65, 60,311/-

DIRECTORS

Sir Homi Moly, K. B. E. (Chairman)
C. H. Bhabha, Esq. (Vice-Chairman)
Dharamsey Mulraj Khatau, Esq
Chimanlal Bapalal Parikh, Esq.
Sir Jamsetjee Jejeebhey, Bart
Jaykrishna Harivallabhdas, Esq.
Shiavax Sorabji Khambata, Esq.
Nityanand Mangesh Wagle, Esq.
Nawab Prince Mukarram Jah Bahadur.
Nariman Kaikhusbru Karanjia, Esq.
Akbar Hydari, Esq.

Branches and Pay-offices in all important commercial centres of India.

London Branch : Orient House 42/45, New Broad Street, London, E. C. 2

New York Agents : Morgan Guaranty Trust Co of New York, The Chase Manhattan Bank

Banking business of every description transacetd
on terms which may be ascertained on application.

CALCUTTA MAIN OFFICE : 33, NETAJI SUBHAS ROAD.

LOCAL BRANCHES : Ballygunge, Bhowanipur, College St Kidderpore, Harabazar, Brabourne Rd.. Hatkhola, New Market, Esplanade, Park Street, Bowbazar, Shyambazar, Tollygunge, Rabindra Sarani, Postabazar Br., Howrah, Manicktalla.

BRANCHES IN WEST BENGAL : Asansol, Bankura, Burdwan, Durgapur, Jalpaiguri, Kalimpong, Purulia, Raiganj, Siliguri.

BRANCHES IN ASSAM : Gauhati.

BRANCHES IN BIHAR : Arrah, Betliah, Bhagalpur, Chapra, Darbhanga, Deoghar, Forbesganj, Gaya, Jamshedpur, Jaynagar, Jharia, Katihar, Khagaria, Laheriasarai, Lakhiserai, Motihari, Monghyr, Muzaffarpur, Patna, Patna City, Ranchi, Raxaul, Samastipur, Sahibganj, Sasaram, Sitamarhi, Sewan & Dhabad.

BRANCHES IN ORISSA : Sambalpur, Cuttack, Rourkela.

V. C. Patel
GENERAL MANAGER

B. C Sarbadhikari
CHIEF AGENT, CALCUTTA.

লেখাপড়া

দেবদাস জোয়ারদার

একটি বিখ্যাত লেখায় পড়ছিলাম, বই জীবনের নীরক্ত বিকল্প।[১] ধরা যাক্, সাহিত্যের কথা। সাহিত্য তো সবচেয়ে জীবনের কাছাকাছি। তবু কি সাহিত্যও জীবনের মতো বড়ো? যতো বড়োই সাহিত্য হোক্ না কেন? জীবন তার আনন্দে বেদনায় অনেক সত্য। সেই সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলময় জীবনের কতোটুকু আজ পর্যন্ত যুগযুগান্তরের দেশ দেশান্তরের সাহিত্যে ধরা পড়েছে? একদিন পুথির প্রতাপ এমন ছিল না। জীবনের সত্যকে জ্ঞানীরা সংহতরূপে জেনেছিলেন। আজ পুথির প্রতাপও বেড়েছে। কিন্তু বই জীবনের লাভালাভের সঙ্গে, জয়-পরাজয়ের সঙ্গে এমনভাবে জড়ানো যে সে বই আত্মিক উৎকর্ষ সাধনে কাজে লাগছে না। তবু এযুগে ঘোড়-দৌড়ের মাঠের বিবরণ থেকে সব কিছুকেই বিদ্যা ব'লে চালানো হচ্ছে। জীবনের লাভালাভের সঙ্গে জড়ানো বইয়ের মূল্য যে নেই, তা নয়। তবে সে বইয়ে আহৃত জ্ঞান জীবনে যতো কাজেই লাগুক না কেন, সে বিদ্যা নয়। কেননা বিদ্যা হচ্ছে তা, যা আমাদের মুক্তি দেয়। সে মুক্তির যে দার্শনিক ব্যাখ্যাই থাকুক না কেন, মুক্তি আমাদের স্বার্থান্ধতা থেকে, আত্মাদর থেকে, নিজের সুখ দুঃখে বন্দী জীবন থেকে, মানুষের প্রাণস্পর্শবঞ্চিত জীবনের দিকার থেকে। সে মুক্তি যখন লাভ করি, তখনই এমন প্রেরণা অনুভব করি,

> মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
> নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সভোরে করিয়া ধ্রুবতারা,
> মৃত্যুরে না করি শঙ্কা।

মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গস্পর্শে স্নিগ্ধ মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-দর্শনকে জীবনবিচ্ছিন্ন ভাবলে এদের প্রতিও অবিচার করা হয়। তখনই পেয়ে বসে একধরণের বুদ্ধি-জীবীসুলভ বিচ্ছিন্নতাবোধ যাকে এ যুগের আত্মঘাতী বিচ্ছিন্নতাপ্রয়াসী পণ্ডিতের দল গর্বভরে বলছেন intellectual isolation। এই বিচ্ছিন্নতার অভিশাপ থেকে অন্যের কথা বাদই দিলাম, সাহিত্যের স্রষ্টা ও নিষ্ঠাবান পাঠকরাও কি মুক্ত? ক'জনের বেলায় আমাদের কল্পনা কাজ করছে যে তাঁদের যতোটুকু দেখছি তার বাইরে যে বৃহত্তর অজানা অন্ধকার মানুষটি আছেন, সেখানে কল্পনার আলো ফেলে তাঁদের সম্পূর্ণ মানুষরূপে জানতে পারছি? সম্পূর্ণ মানুষরূপে এ জানা সামাজিক মর্যাদায় বিচিত্র পর্যায়ক্রমে স্তরে স্তরে বসিয়ে মানুষকে জানা নয়, একটি বিশিষ্ট মতাদর্শের আলোকেও মানুষকে জানা নয়। এ জানা আনন্দে বেদনায়, ভুলে ভ্রান্তিতে, লাঞ্ছনা ব্যর্থতায় ভরা রক্তমাংসের মানুষকে জানা। এ জানার পালা চুকিয়ে আমরা কৃত্রিম বস্তু বিশেষে পরিণত হচ্ছি। বুদ্ধিজীবীদের কাছে জীবনানন্দের কবিতার এ চরণটি ধ্রুব মন্ত্র হওয়া উচিত 'তবুও কোথাও তার প্রাণ

---

১ ষ্টিভেনসনের An Apology For Idler

২ মোহিতলাল মজুমদারের 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এর অন্তর্ভুক্ত 'পুথির প্রতাপ' শীর্ষক প্রবন্ধ।

নেই ব'লে অর্থময় জ্ঞান নেই আজ এই পৃথিবীতে ; জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই।'৩ ঐ সম্পূর্ণরূপে মানুষকে জানারই আরেক নাম প্রেম। ঐ প্রেমের পথে বাধা সামাজিক স্তর ভেদ, কল্পনার অভাব, ধনের বৈষম্য, তথাকথিত জ্ঞানের পার্থক্য, স্বার্থান্ধতা—এমনি আরো কতো কিছু।

বইকে যাঁরা জীবনের নীরক্ত বিকল্পরূপে না জেনে জীবনের সবটুকু ব'লে জেনে বসে আছেন, তাঁরা এক আত্মপ্রতারণার পথ বেছে নিয়েছেন। আর সেখান থেকেই জীবনের স্পর্শবঞ্চিত এক ধরণের বিবর্ণ জ্ঞানসাধনা জন্ম নেয়। এই বিবর্ণ জ্ঞানসাধনায় মানুষের যতো ক্ষতির কারণ হয়েছে, এমন আর কিছুতে হয় নি। এই বিবর্ণ জ্ঞানসাধকের দল বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে যুদ্ধের মারণাস্ত্র প্রস্তুত করেন, ইতিহাসের আলোচনায় একটি জাতি বিশেষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে পৃথিবীতে ত্রাস সৃষ্টি করেন। আর একদলের জ্ঞানসাধক আছেন যাঁরা জীবনের সঙ্গে বইয়ের কোনো যোগ খুঁজে পান না। তাঁরা ঐ প্রথম দলের মতো বইকে জীবনের সবটুকু ব'লে স্বীকার ক'রে ভুল করেন না। তাঁদের ভুল অন্য ধরণের। তাঁরা ভাবেন, বই জীবনে ব্যবহারিক প্রতিষ্ঠালাভের একটি উপায় মাত্র। লেখাপড়া তাঁদের কাছে একটি খেয়া নৌকো। ছাত্রজীবনের তীর থেকে কর্মজীবনের তীরে গিয়ে তাঁরা পৌঁছান ঐ খেয়া নৌকোয় উঠে। কর্মজীবনের তীরে উঠে লাথি মেরে সরিয়ে দেন এই খেয়া নৌকোটি। তারপর ছুটে চলেন হন্ হন্ ক'রে স্বার্থ-পঙ্কিল জীবনের কানাগলি ঘুরে ঘুরে অজস্র ঘুরপাক খেতে খেতে। আর পিছনে পড়ে থাকে বিচিত্র মেডেলশোভিত ছাত্রজীবন। পরবর্তী জীবনে মেডেল শুধু গর্বে বক্ষ-স্ফীতির কারণ হয়ে উঠে, আর বিদ্যা জীবন থেকে নির্বাসিত হয় কৃতিত্বপূর্ণ ছাত্রজীবনের ধূসর স্মৃতিলোকে। বইয়ের পৃষ্ঠায় আহৃত জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে তাঁরা এমন এক মানসিকতাকে লালন করেন যে তাঁরা বলবেন—'হ্যাঁ, বইয়ে অনেক ভালো ভালো কথা লেখা আছে। তার সঙ্গে জীবনের যোগ কোথায়?' তাঁদের কাছে জীবন স্থূল, জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-দর্শন এমনই সূক্ষ্ম যে ঐ স্থূল জীবনে ঐ সূক্ষ্ম বোধবুদ্ধি অনুভূতির অনুপ্রবেশ তাঁদের কাছে অসহ্য।

যাঁরা পুথিকে জীবনের সর্বস্ব ব'লে জানেন, আবার যাঁরা পুথিকে জীবনবহির্ভূত ব'লে জানেন—এই দুই দলের হাতে জীবন ও জ্ঞান দুইই সমভাবে লাঞ্ছিত হচ্ছে। বৃহৎ সচল জীবনপ্রবাহের তুলনায় বই অনেক অকিঞ্চিৎকর এই বিনম্র অনুভূতি, জ্ঞান সম্পর্কে কোনো আত্মাভিমানকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। আবার জীবন ও বইয়ের মধ্যে নিবিড় যোগ আছে, বই জীবনেরই বিকল্প, হোক না নীরক্ত—এই বোধ আমাদের জীবনের আপাত-সুলভতা থেকে মুক্তি দিতে পারে। এই দুই দলের কেউই এই মুক্তিলাভ করতে পারেন না।

যাঁরা জীবনের স্বার্থপঙ্কিলতায় ঘুরপাক খান না, সৎ-পথেই জীবন কাটান, তাঁরাও কিন্তু পুথিপত্রের আদর্শকে ব্যর্থ নমস্কারে ফিরিয়ে দেন। যা হলে খুশি হতে পারতেন ব'লে তাঁরা কল্পনা করেন, সেখানে ত্যাগীরা স্থান পান না ; স্থান পান আর্থিক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ও উচ্চপদস্থের দল। এ কথা সত্য, তাঁদের বৈঠকখানায় শোভা পায় ত্যাগীদের ছবি। এমন একজন শিক্ষিত ভদ্রলোকের কথা বলা হচ্ছে, যিনি তাঁর গ্রামের কৃতী সন্তানদের নামের তালিকা আরেক জনের কাছে তুলে ধরছিলেন। তিনি ঐ কৃতী সন্তানদের মধ্যে ব্রিটিশ আমলের একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করলেন তাঁর গ্রামের অনেক জানীগুণীর নামের সঙ্গে। তখন

---

৩ জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, '১৯৪৬-৪৭'

তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো, স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন বীর শহীদের প্রতি। কেননা এই শহীদও ঐ গ্রামেরই সন্তান। তখন তিনি কতীছাচ্ছল্য অবজ্ঞাভরে বললেন, 'ও কিছু ছিল না, ক্লাশ সেভেন বা এইট্ পর্যন্ত ওর বিদ্যে, আর করতো স্বদেশী।' এই মনোভাব শুধু ঐ এক ভদ্রলোকেরই নেই এই মনোভাব আমাদের মজ্জাগত। কিন্তু আমরা তো জানি, ভালো ছাত্র হওয়ার অনায়াস পথ ছেড়ে ঐ স্বদেশী যুগের কতো ক্লাশ সেভেন-এইট্ পর্যন্ত পড়া তরুণের দলের আত্মোৎসর্গের ফলে স্বাধীন ভারতে অনেক ভালো ছাত্রের দল ভালো ভালো চাকরি বাগাতে পারছেন! আমরা ডিগ্রি, সামাজিক মর্যাদা, আর্থিক প্রতিষ্ঠার আলোকে মানুষকে দেখছি, একজনের ত্যাগ ও আদর্শ, ধ্যান ও ধারণা, কর্ম ও ভাবনার আলোকে দেখছিনা। কেননা ত্যাগ ও আদর্শকে নিতান্ত পুথি-পেঁথা বলে জানতেই আমরা অভ্যস্ত। এগুলির অস্তিত্ব পুথির বাইরে জীবনে আছে বলে আমরা স্বীকার করতে চাই না। নিজের জীবনে তো স্বীকার করিই না, এমন কি অন্যের জীবনে দেখতে পেলেও তাঁকে অবজ্ঞা বা বিদ্রূপের পাত্র হিসেবেই জানি। কিন্তু এককালে ত্যাগীদের ভাগ্যে কিছুটা সম্মান বোধহয় জুটতো; নইলে শিক্ষকরা তো চিরকালই এদেশে আর্থিকজীবনে পিছনের সারিতে। কিন্তু ঐ হাটু পর্যন্ত কাপড় পরা শিক্ষকদের মধ্যে কেউ কেউ তো বেশ সম্মান পেতেন।৪ অথবা বলা যেতে পারে, ঐ ক্লাশ সেভেন-এইট পর্যন্ত পড়া স্বদেশীকর্মরত ত্যাগীরাও তো সকলের কাছে না হলেও কিছুলোকের কাছে সম্মান পেতেন। কারো প্রতি কটাক্ষ না করেও বলা যায়, এযুগে কেন সব সম্মান গিয়ে জমা হচ্ছে কালোবাজারি আর কটকাবাজিতে? কালো বাজারিতে সিদ্ধ পুরুষ বা রাজনীতিক জীবনে সকল পুরুষদেরই তো দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রজয়ন্তীর সভাপতির আসনকে অলঙ্কৃত করতে! কিন্তু একদিন দরিদ্র শিক্ষকের দলের ডাক পড়তো এসব সাংস্কৃতিক কর্মে। কিন্তু আজ শিক্ষা সংস্কৃতির বরাত অস্তিত্ব কোথায়? আর্থিক প্রতিষ্ঠা আর রাজনীতিক সিদ্ধি কবলিত শিক্ষা সংস্কৃতির শোচনীয় পরিণাম আজ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে।

ঐ যে বলা হচ্ছিল, পুথিকে জীবনবহির্ভূত বলে মেনে বসে আছেন একদল লোক। আসলে বিদ্যা অজানা বহির্বিশ্বের ও মানব জীবনের স্বরূপসন্ধানে মানবাত্মার এক ক্লান্তিহীন অভিযান। এ দৃষ্টিতে যাঁরা বিদ্যাকে দেখেন, তাঁদের লেখাপড়া কখনো পরীক্ষা পাশের তাড়ায় আনন্দবঞ্চিত হতে পারে না, হতে পারে না বিস্ময়বোধের অভাবে জরাজীর্ণ। আগ্রহ, আনন্দ, বিস্ময়বোধ এগুলিইতো বিদ্যাকে সজীব করে তোলে। আমাদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের বলা হচ্ছে, লেখাপড়া না করলে কি ক'রে খাবি? বলা হচ্ছে, 'লেখাপড়া করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে।' এই ঘৃণ্যবাক্য দিয়ে যাদের লেখাপড়া আরম্ভ করানো হয়, তাদের কাছ থেকে লেখাপড়াকে ঘিরে ঐ আনন্দ ও বিস্ময়বোধ কিভাবে আশা করা যায়? তারা কিভাবে অনুভব করবে যে বিদ্যা অজানা বহির্বিশ্বের ও মানবজীবনের স্বরূপসন্ধানে মানবাত্মার এক ক্লান্তিহীন অভিযান? ঐ ঘৃণ্যবাক্যে যে লেখাপড়ার আরম্ভ সে লেখাপড়া জাগিয়ে তোলে এক ধরণের শ্রেণী-চেতনা। ধরেই নেওয়া হচ্ছে, কিছুলোক লেখাপড়া জেনে গাড়ি ঘোড়া চড়বে। আর বাকি লোক গাড়ি টানা

---

৪ স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে আছে, বেশ কয়মাস আগে নিরঞ্জন মজুমদার তাঁর একটি প্রবন্ধে চাঁদপুর মহকুমার অন্তর্গত বাবুরহাট স্কুলের পূজনীয় প্রধান শিক্ষক সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মতো শিক্ষকের সম্মানিত ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন।

পড়বে। চাপা না পড়লেও তাদের গায়ের উপর ওদের গাড়ি বৃষ্টির দিনে জল ছিটিয়ে যাবে, শুকনো দিনে ধুলো উড়িয়ে যাবে। ভেবে দেখুন, এভাবে আমাদেই লেখা-পড়া এক ধরণের শ্রেণী-চেতনা জাগিয়ে তুলছে কিনা।

লেখাপড়া জানা এই শ্রেণীটির যেন দেশের মানুষের উপর অত্যাচার চালানোর একটি বিধাতা-নির্দিষ্ট অধিকার জন্মে তাই দেখা যায়, এই শিক্ষিতের দল স্বার্থসিদ্ধির জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রতি তোষামোদ আর নিম্নস্তরের মানুষদের প্রতি অবিচারের দুমুখো নীতি অনুসরণ করে চলেন। শুধু অবিচার নয়, কর্মজীবনে সামান্য কাজের পরিবর্তে ঘুষ নিতেও এদের বিবেকে বাধেনা। এঁরা হচ্ছেন শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক নাটকের এ যুগের শর্বিলক। এই শর্বিলকের মতো চোরের দল সিঁধ কাটার মাপ-জোকের কাজ সারেন পৈতা দিয়ে, আর চুরির সমর্থনে এককালে পড়া বা শোনা বইয়ের একেকটি যুক্তি দেখান! মৃচ্ছকটিকে শর্বিলক নিজের চুরির পক্ষে মনে মনে যুক্তি সাজিয়ে ছিলেন, চুরি আর যাই হোক, একটি স্বাধীন জীবিকা। এ যুগের ঘুষখোরদেরও বোধ হয় এই একই যুক্তি! শর্বিলক চুরির স্বপক্ষে মহাভারতের ঘটনা উদ্ধার করেছিলেন। বিশেষতঃ মহাভারতে দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামা যুধিষ্ঠিরের নিদ্রিত পুত্রদের বধের সময় চুরির এই পথ আবিষ্কার করে গেছেন। স্বাধীন জীবিকা চুরির স্বপক্ষে শর্বিলকের আত্মাভিমান আর মহাভারতের যুক্তি দেখে আমাদের যেমন হাসির কারণ ঘটে, তেমনি এ যুগে শিক্ষিত ভদ্রজনের মধ্যে শর্বিলকের সংখ্যা বৃদ্ধিতে লজ্জাও জাগা উচিত। চারুদত্তের প্রতি নিজের ভুলের অনুশোচনায় শর্বিলকের যে বিবেকস্নিগ্ধ ব্যবহারের পরিচয় পেয়েছিলাম এ নাটকের শেষ দিকে, তার বিন্দুবিসর্গও দেখতে পাই কি এ যুগের শর্বিলকদের চরিত্রে? সত্যিতো একটি কথা ভাববার মতো। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচিত্র মেজেন্টাশোভিত উচ্চশিক্ষিত ছাত্রের দলকেই পরবর্তী প্রশাসনিক কর্মজীবনে শর্বিলকের মতো চোর হতে দেখছি। তাহলে কোথায় উচ্চশিক্ষার মূল্য? কেন এমনটি ঘটছে? আগেই বলা হয়েছে বিদ্যাকে এঁরা জীবনবহির্ভূত ব'লে জেনে-ছেন। এখানেই যতো সব অনর্থের মূল। ওঁদের বিদ্যাকে তাঁরা জেনেছেন প্রতিযোগিতামূলক চাকরির পরীক্ষার রচনাপত্রের রচনা লেখার উপকরণ হিসেবেই শুধুমাত্র। তাঁরা চলছেন চাকরির উন্নতির একেকটি ধাপ পেরিয়ে। তাঁদের দক্ষিণ হস্তটি তোষামোদে ব্যস্ত, আর, বামহস্তটি উৎকোচগ্রহণে। একহাতে 'হাঁ, হাঁ, স্যার, স্যার,' অন্যহাতে অন্যায় আর দুর্নীতির প্রশ্রয়দান। এঁরাই এ যুগের যথার্থ সব্যসাচী। কেননা এঁদের দুহাতেই সমানে চলছে। বঙ্কিমের যুগের এমন মানুষের ছবি পাই তাঁর 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত' রচনায়। এযুগে মুচিরাম গুড়রাই দেশ ছেয়ে ফেলছে। মুচিরাম গুড় না হলেও অনেক মুচিরামের পৃষ্ঠপোষক (কেননা অফিসে অফিসে মুচিরামরা সদলবলে আছেন) একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কথা এবারে বলা হচ্ছে। তাঁর কাছে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কথা বলা হচ্ছিল। তিনি ইন্টেলেকচুয়েল-সুলভ উদাসিকতা মুখমণ্ডলে ঘনিয়ে তুলে বললেন 'That angry youngman!' সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আর যাই হোক আমরা সমকালীনতার অতিপরিচয় কাটিয়ে এসেছি। কালের ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ঐ ইন্টেলেকচুয়েল যে এমন কথা বলতে পেরেছিলেন তার কারণ কেরিয়ারের বাইরে মানুষের জীবনে যে আদর্শ ব'লে কিছু থাকতে পারে, এই বোধের জন্যে ইন্টেলেক-চুয়েলিজমই যথেষ্ট নয়।

যে ভাবেই হোক, লেখাপড়া এক ধরণের শ্রেণী-চেতনা জাগিয়ে তুলেছে। ১৯৬৬ সালের ২৬এ এপ্রিল তারিখ

যেওয়া নয়াদিল্লী থেকে স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। লোকসভার এষ্টিমেট্‌স কমিটির সাম্প্রতিক রিপোর্টে ধনী পরিবারের শিশু ও অন্য পরিবারের শিশুদের দু'ধরণের শিক্ষার পার্থক্য যে উচ্চপরিবারের ছেলেমেয়েদের মনে সর্বনাশা আত্মাভিমান জাগিয়ে তুলবে, এমন আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। প্রায়ই শিক্ষার ক্ষেত্রে এই পার্থক্যের নিন্দা এখানে সেখানে করা হয়ে থাকে। গণতান্ত্রিক দেশে গণতান্ত্রিক-চেতনাসঞ্চারী শিক্ষার মূল্য কি স্বীকৃত হয়েছে, এমন কি সম্প্রতি প্রকাশিত শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টেও? এই রিপোর্টেও তো কিছু কিছু উচ্চস্তরের বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজি ভাষা রাখার কথা বলা হয়েছে। আমাদের অনেকের অকারণ ইংরেজি প্রীতির মূলেও আছে শাসকশ্রেণী সুলভ আত্মাভিমান। আমাদের ধারণা, ব্রিটিশপূর্বযুগে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এখনকার চেয়ে ঢের বেশি গণতান্ত্রিক ভিত্তি ছিল। সমাজের তথাকথিত উচ্চ ও নিম্নস্তরের ছেলেমেয়েরা একই পণ্ডিত মশাই বা মৌলবি সাহেবের টোলে বা মাদ্রাসায় মোটামুটি একই ধরণের শিক্ষা পেতেন। প্রতিযুগেই চট্টোপাধ্যায়-বৈশম্পায়নের জন্যে সমাজ-বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে। তাঁদের কথা বাদ দিয়েই এই মন্তব্য করা হচ্ছে। সে যুগে ধনী পরিবারের ছেলেমেয়েরা সঙ্গে দুঃসহ দারিদ্র্যের পরিচয় হতো তাঁদের দরিদ্র সহপাঠীদের দিনের পর দিন দেখে দেখে। এভাবে আর কিছু না হোক ঐ ধনীরা সহানুভূতির সূত্রে বাঁধা পড়তো সাধারণ মানুষের সঙ্গে। এ যুগে বক্তৃতা আছে, প্রবন্ধ আছে; নেই শুধু সহানুভূতির এই বন্ধনসূত্র। এ যুগে শিক্ষার ক্ষেত্রেও শতসহস্র বৈষম্য বেড়ে যাচ্ছে। কনভেন্ট, রামকৃষ্ণ মিশন, সরকারি ও বেসরকারি ইস্কুল কলেজের হরেকরকমের শিক্ষা, শিক্ষার মানে ও তার চেয়েও বেশি শিক্ষার্থীর মনের অভিমানে ভারতমা সৃষ্টি করছে। শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের কথায় এলে বৈষম্যের চিত্রটি আরো নৈরাশ্য দেখতে পাই।

শিক্ষিত-অশিক্ষিতের পার্থক্য ব্রিটিশ যুগেই বিশেষভাবে দেখা গেল। ব্রিটিশসাম্রাজ্যবাদের তল্পিবাহী একদল বিশ্বস্ত অনুচর সৃষ্টির বাস্তব প্রয়োজনে বাংলাদেশে উনিশ শতকে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটে। এই ইংরেজি শিক্ষার শুভ দিকটি কিছু মানুষের জীবনে রেনেসাঁসী চেতনার আলোকস্পর্শ। অশুভ দিকটি হচ্ছে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে সর্বনাশা বৈষম্যবোধ। এই বৈষম্যবোধের ফলে সমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়লো। Filtration Theory শেষ পর্যন্ত বাস্তবে রূপ নেয়নি। সমাজের উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তরে বিদ্যার রসস্রোত চুঁইয়ে পড়ার স্বপ্নটি স্বপ্নই থেকে গেল। বঙ্কিম যাদের 'হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত' বলতে বুঝিয়েছেন, তাঁদের জীবনে বিদ্যার রসস্রোত যখন চুঁইয়ে পড়ছেনা, তখন কথা উঠলো উচ্চ শিক্ষার খরচ বাঁচিয়ে জনসাধারণের জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রাথমিক শিক্ষার খাতে ঐ টাকা খরচ করা হবে। তখন ১৮৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দ। তখনকার বিখ্যাত 'ভারতবর্ষীয় সভা'র জমিদার ও উচ্চশিক্ষিত বাঙালী সদস্যরা একবাক্যে এই সরকারি প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। অন্যদিকে "বঙ্কিমচন্দ্র জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে প্রাথমিক শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন।" ৫ "ভারতবর্ষীয় সভা"র আভিজাত্য বোধের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়ে কি এযুগেও আমরা সর্বসাধারণের শিক্ষার কথা ভাবতে পারছি? না ভাবতে পারলেও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে এ বিষয়ে কাজ করছি? এ যুগে আমরা নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের নামে বিশ্ববিদ্যার লয় সাধন করছি, তবু জনশিক্ষার জন্যে কিছু করছি না।

---

৫ বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ সং, যোগেশচন্দ্র বাগলের ভূমিকা।

আমার বঙ্কিমের কথাই মনে পড়ে, "সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ভাবিয়া কিছু কিছু বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত হয়।"[৬]

অথচ ভারতবর্ষে একদিন লোকশিক্ষার বিচিত্র উৎসস্রোত সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবাহিত ছিল। বিরাট পুরাণসাহিত্য পণ্ডিতজনের ভাবনাগুলি দেশময় ছড়িয়ে দেওয়ার সঙ্কল্প থেকেই রচিত হয়েছিল। এই বাংলাদেশেও সংস্কৃত শিক্ষাভিমানীর উপেক্ষা কুড়িয়েও 'সর্বনেশে' কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস সর্বসাধারণের জন্যে রামায়ণ-মহাভারতের ভাবানুবাদ করেছিলেন। মেলায়, যাত্রায়, পাঁচালিতে, কথকতায় গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে, বটের ছায়ায়, পণ্ডিতের টোলে, মৌলবির মাদ্রাসায় শিক্ষার ধারা বয়ে চলছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রে অভিজাত-অনভিজাতের এমন দুস্তর ব্যবধানও ছিল না। স্বীকার করি, কখনো জনসাধারণের মুখের ভাষার চেয়েও সংস্কৃতের দাপট চলেছে বা রাজসভায় আরবি ফারসীর জোর চলন ছিল। অভিজাত-অনভিজাতের শিক্ষার বিভাষিকতা অর্থাৎ ভাষাগত পার্থক্য প্রাচীন ও মধ্যযুগেও ছিল। কিন্তু আধুনিক যুগের বিদ্যা যেভাবে ইংরেজি পোষাক পরে সারা দেশের চিত্ত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, এমনটি বোধহয় ইতিহাসে কোনো যুগে আগে হয়নি। শিক্ষায়-সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে অভিজাত-অনভিজাতের দু'টি সংস্কৃতি দাঁড়িয়ে গেল উনিশ শতকেই প্রথম। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি, যে মৈমনসিংহ গীতিকা বা পূর্ববঙ্গগীতিকা সম্পাদনা ক'রে দীনেশচন্দ্র সেন, রোমাঁ রোলাঁ থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিশ্বের অনেক মনীষীর সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ঐ অঞ্চলের অর্ধভুক্ত নগ্নপ্রায় কৃষকদের প্রতি, সেই গীতিকা-সাহিত্যকে মৈমনসিংহের অধিকাংশ শিক্ষিত ভদ্রজন চাষাভুষোর গান ব'লেই অবজ্ঞা করে থাকেন। লোক-সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি মনের টান আমাদের অনেকেরই গভীর নয়। অনেক সময় এ কৌতূহল বিদ্যায়তনিক, তাই পোষাকি ও ডক্টরেট ডিগ্রিলাভের উপায়মাত্র। তার কারণ, দেশের মানুষের প্রতি গভীর অবজ্ঞা ও অনাদর আর সর্বসাধারণের সঙ্গে আত্মিক-যোগের অভাব। এই অবজ্ঞা ও অনাদরের মধ্যে মাঝে মাঝে রাজনীতিক দলে টানা বা ভোটে জয়লাভের তাড়ায় শিক্ষিত ভদ্রজনেরা সাধারণ মানুষকে 'ভাই' বা 'বন্ধু' ব'লে ভাবে গদগদ হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়টি নিয়ে বিস্তর চিন্তা করেছিলেন। দীর্ঘকালের ভারত-ইতিহাসের সবচেয়ে বেদনাবহ ঘটনা দেশবিভাগের অনেক কারণের মধ্যে নিঃসন্দেহে একটি প্রধান কারণ হচ্ছে, অনুন্নত মুসলমান সম্প্রদায়ের হীনমন্যতাবোধ আর পক্ষান্তরে উন্নত হিন্দুসম্প্রদায়ের অপর সমাজের পক্ষে পীড়াদায়ক আত্মাভিমান। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই নিম্নস্তরে এ পার্থক্য না থাকায় মিলন সম্ভব হয়েছিল। মধ্যযুগের সাধক কবীর বলেছিলেন, কাদায় কাদায় মিলন সম্ভব। বিদ্যা ও অর্থের আগুনে পোড়ানো ইটের মতো শিক্ষিত হিন্দু আর ইটের মতো শিক্ষিত মুসলমানের মিলন এযুগে সম্ভব হয়নি। ভারত ও পাকিস্তানের মতো দু'টি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের উদ্ভবের মূলেও আছে ঐ দু'টি ইটের ঠোকাঠুকি।

অভিজাত ও অনভিজাত সংস্কৃতির মিলন কিভাবে সম্ভব, এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিস্তর চিন্তা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, "যদি বিদ্যাসুন্দরের গল্প আমাদের দেশে যাত্রায় প্রচলিত হইতে পারে, তবে পৃথ্বীরাজ, গুরুগোবিন্দ, শিবাজী, আকবর প্রভৃতির কথাই বা লোকের মনোরঞ্জন না করিবে কেন? এমনকি, আনন্দমঠ,

৬ লোকশিক্ষা, বিবিধ প্রবন্ধ।

রাজসিংহ প্রভৃতির ন্যায় উপন্যাসই বা মুগায়ক কথকের মুখে পরম উপাদেয় না হইবে কেন?"[1] কথকতায় ও যাত্রায় যদি এ যুগে রচিত ইতিহাস, কথা ও সাহিত্যকে আমরা সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারতাম তাহলে ঐ শিক্ষিতে অশিক্ষিতে মিলন সম্ভব হতো। একদিন জনসাধারণের জীবন যাত্রা-পাঁচালি-কথকতা-রামায়ণ-মহাভারত পড়া ও তার চেয়েও বেশি শোনার ফলে যেমন সজীব ও স্নিগ্ধ ছিল, আমরা এ যুগে রামমোহন—বিদ্যাসাগর—মধুসূদন—রামকৃষ্ণ—বঙ্কিম—রবীন্দ্রনাথ—বিবেকানন্দ—অরবিন্দ—শরৎচন্দ্র—সুভাষচন্দ্রের জীবন, ভাবনা ও সৃষ্টির সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় স্থাপনের তেমন কোন ব্যবস্থা করতে পেরেছি? আমরা এ যুগে কোটি কোটি মানুষকে রেখেছি নিরক্ষর। এ যুগের নিরক্ষরতা সে যুগের নিরক্ষরতার চেয়েও ভয়াবহ। কেননা সে যুগের নিরক্ষরদের অশিক্ষিত বলা যেতনা। পড়তে না জানলেও শুনে শেখার ব্যবস্থা তাঁদের ছিল।

আমাদের নিশ্চিন্ত বিশ্বাস, রবীন্দ্রসাহিত্যকে যতোই এ সাহিত্যের ব্যাখ্যাতারা বালিগঞ্জীয় আভিজাত্যের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে বন্দী করার চেষ্টা করুন না কেন, এ সাহিত্য মহান্ এ জন্যেই যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিজাত সাংস্কৃতিক চেতনাকে মেলাতে পেরেছিলেন জনভিজাত লোকসংস্কৃতির চেতনার সঙ্গে। আমরা যদি রবীন্দ্রসৃষ্টির রসস্রোত বইয়ে দিতে পারতাম কৃষকের কুটিরে, শ্রমিকের বস্তিতে, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে আত্মার আত্মীয় রূপে জেনে আনন্দ পেতেন। তাহলে তাঁরা অচলায়তন নাটকের কোণপাংশুদের গান 'আমরা চাষ করি আনন্দে। মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধ্যে' গেয়ে মাঠে মাঠে চাষের কাজ করতে পারতেন। অথবা কলে-কারখানায় শ্রমিকরা 'কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন। ও তার ঘুম ভাঙাইনুরে' গান গেয়ে লোহা-ইস্পাতের কাজ করতে পারতেন। ধরা যাক, শ্রীচৈতন্যের মতো পণ্ডিতের ভাবধারাতো শুধুমাত্র পাণ্ডিত্যের সঙ্কীর্ণ গুহায় বন্দী থাকেনি! এই ভাবতো একদিন কীর্তনের সুরে সুরে বাংলাদেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল। তাহলে এ যুগের মনীষীদের ভাবধারা বিদ্যায়তনের চারদেওয়ালের বাইরে ছড়িয়ে দিতে বাধা কোথায়? বাধা হচ্ছে, এ যুগের পাণ্ডিত্যাভিমানীদের বৃহত্তর সমাজ থেকে এক ধরণের আত্মঘাতী বিচ্ছিন্নতা-বোধ। রবীন্দ্রনাথের কথা বাদই দিলাম। তিনি ধর্মগুরু নন। কিন্তু এ যুগের ধর্মগুরু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকেই কি দেশের সাধারণ মানুষ আত্মীয় ব'লে জানতে পেরেছেন? যদিও ধর্মের আবেদন এদেশে সাহিত্য-রাজনীতির চেয়ে অনেক বেশি সর্বজনীন। বিবেকানন্দ সবচেয়ে জোর দিয়েছিলেন লোকশিক্ষার উপর। অথচ তাঁর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের সাম্প্রতিক কর্মকর্তারা লোকশিক্ষার জন্যে যা করছেন, তা কি বড় বড় দালান কোঠায় সাজানো নানা কলেজ ইনস্টিটিউটে শিক্ষিতজনের তেলা মাথায় বা কিছু শুকনো মাথায় তেল ঢালার তুলনায় নিতান্ত যৎসামান্য নয়? বিবেকানন্দ কম খরচের কম উপকরণের শিক্ষার কথা বলেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, এই দরিদ্র-দেশে এমন শিক্ষারই প্রয়োজন বেশি। অথচ এ যুগে দেখছি, বেশি খরচের উচ্চমানের শিক্ষার ছড়াছড়ি। উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়নকে নিশ্চয়ই অবহেলা করা উচিত নয়। কিন্তু সারা দেশব্যাপী শিক্ষাদানের মূল্যই বা কম কি? আরেকটি কথা। উচ্চশিক্ষা বিস্তারের নামে উচ্চশিক্ষার জন্যে বিদ্যানুরাগে অযোগ্যের দলকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ ক'রে দিতে পারছি নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় দালান তুলে, অথচ জনশিক্ষার

---

১ ইতিহাস, ইতিহাস কথা।

জন্যে টাকা খরচ করতে পাচ্ছিনা! এ কেমন কথা?

আমাদের ভাষায় লেখাপড়া ও পড়াশুনো এই দু'টি শব্দ একই অর্থে প্রচলিত। শব্দ দুটির মধ্যে লেখা, পড়া ও শোনা তিনটি কথা পাচ্ছি। শ্রেষ্ঠবিদ্যাকে এ দেশে একদিন শ্রুতি বলা হয়েছে। এ বিদ্যা মুখে মুখে ঘুরেছে। কান পেতে শুনে এ বিদ্যাকে মনে ধারণ করতে হয়েছে। কান পেতে শোনার যে কি মূল্য এ দেশে স্বীকৃত হয়েছিল, তার প্রমাণ আছে পণ্ডিত অর্থে আমাদের ভাষায় 'বহুশ্রুত' শব্দ সৃষ্টিতে। এ যুগে যেন লেখাটাও উঠে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে ঐ অমূল্য শোনার অভ্যাসটাও; পড়ে রইল শুধু পড়া। একজনকে ঘিরে সকলের কান পেতে শোনার সকলে মিলে এক হয়ে ওঠার সুযোগ ছিল। এ যুগে আমরা সংক্ষেপেই বড় বেশি বিশ্বাস। এ যুগে শোনা যেখানে বা আছে, সেখানেও বক্তা ও শ্রোতার আত্মিক মিলন হয়নি। বক্তা বড় বেশি দূরে—কখনো সভামঞ্চে, আবার আকাশবাণীর কেন্দ্রে। মেঘদূতের বৃদ্ধ-কথা কোবিদ্ বা চারণ কবিদের বোধহয় এ যুগে আর ফিরে পাওয়া অসম্ভব। দেশি ছাঁদের মেলা, যাত্রা-কথকতা বা আধুনিক কালের বেতার-চলচ্চিত্রকেই লোকশিক্ষার মাধ্যম করতে হবে। আমাদের এই অনুন্নত দেশে টেলিভিশনের প্রয়োজন একমাত্র স্বপ্নবিভোররা ছাড়া আর কেউ ভাবতে পারেন না। 'আকাশবাণী'র 'পল্লীমঙ্গল আসর' জাতীয় অনুষ্ঠানে জনসাধারণের বোধগম্য করার জন্যে যে ধরণের ক্যারিকেচারের আয়োজন চলে, এমনটি অন্য। আকাশবাণীতে, প্রচারবিভাগে, জনশিক্ষাকেন্দ্রে, গ্রামোন্নয়ন বিভাগে সর্বত্র জনসাধারণের জন্যে যাঁরা যা কিছু করছেন, তাঁদের পরিচিত থাকতে হবে জনসাধারণের প্রবাদ, প্রবচন, বাগ্‌ভঙ্গী সব কিছু মিলিয়ে ঐ সজীব ভাষার সঙ্গে। তাহলে আমরা বৈঠকখানায় (অধুনা চেম্বারে বা পার্লারে) যে ভাষায় লিখি বা কথা বলি, সেই প্রাণহীন ভাষাকে ক্ষীর ভেবে জল ঢেলে দুধ হিসেবে জনসাধারণকে খাওয়ানোর বিড়ম্বনা থেকে দূরে থাকবো। আমরা বাবু—এই ঘোর কাটিয়ে ওঠা দরকার। যারা কৃষি দপ্তরে বা কলে-কারখানায় উচ্চপদে বসে আছেন, তাঁরাও কি সব সময় শ্রমের মর্যাদা অনুভব ক'রে দেশের কৃষক-শ্রমিকদের আপনজন হিসেবে জানতে পাচ্ছেন? যাঁরা গ্রামোন্নয়নের মহত্তম কর্মে নিযুক্ত তাঁদেরও, ফাইল ওয়ার্কের বাইরে, যে গ্রামে আছেন সেটিকে শহরে বাবুর ঘোর কাটিয়ে ভালোবাসতে হবে। ভাষার ক্ষেত্রে অশোকের যুগের গণতান্ত্রিক চেতনাকে আমাদের আত্মস্থ করা চাই। সেই সুদূর অতীতে অশোক ভারতের প্রতি অঞ্চলের নিজ নিজ ভাষায় তাঁর অনুশাসন লেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর এ যুগে দেখছি, বাংলাদেশে রেলওয়ে ষ্টেশনের নাম লেখা হচ্ছে বড় হরফে দেবনাগরীতে! এই হচ্ছে আমাদের গণতান্ত্রিক চেতনার নমুনা।

এখন পর্যন্ত দেশের তথাকথিত শিক্ষিত-অশিক্ষিতের যোগাযোগ সম্পর্কে বলা গেল। এবারে শিক্ষিতদের মধ্যে পরস্পরের যোগাযোগ নিয়ে ভাবা যেতে পারে। বিদ্যাকে জীবিকার সঙ্গে আমরা এমন ভাবে জড়িয়ে ফেলেছি যে প্রত্যেকের বিদ্যা হয়ে উঠছে একক ও বিচ্ছিন্ন ব্যাপার। পরস্পরের প্রতি আমাদের এমনই অবিশ্বাস ও সন্দেহ আর সর্বোপরি এমনই আত্মাভিমান যে পরস্পরের আলোচনায় যাতে বিদ্যার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হতে পারে এই সহজ, সরল বোধটি পর্যন্ত হারিয়েছি। এজন্যেই দেখি, নিজের বিষয়ের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অনড় ধারণা, অন্যের বিষয়ের প্রতি অবজ্ঞা। এভাবে বিদ্যার ক্ষেত্রে একধরণের অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত হচ্ছে। জগদীশচন্দ্র বসু নিজে পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে যখন জীববিজ্ঞানের গবেষণায় অগ্রসর হলেন, তখন এমন

অস্পৃশ্যতার সম্মুখীন হওয়ায় তিনি বিদ্রূপের পাত্র হয়েছিলেন। এ কথা আমরা তাঁর একটি বক্তৃতা থেকে জানতে পারি। স্যার চার্লস স্নো নাকি সাহিত্য-সংস্কৃতিসেবী ও বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই অস্পৃশ্যতার ফলে দুই সংস্কৃতির ভিত্তিতে দুই পরস্পর-বিরোধী স্বতন্ত্র জগৎ কিভাবে গড়ে উঠছে, তার এক ভয়াবহ চিত্র এঁকেছেন। এই প্রবন্ধের সামান্য লেখকের মোর ঐ বই পড়া নেই। তবে আমরা এটুকু বলতে পারি যে গতযুগে বঙ্কিমচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দরের মতো বাংলা দেশের মনীষীরা বিদ্যার পবিত্রক্ষেত্রে এই অস্পৃশ্যতা স্বীকার করেন নি। কিন্তু এযুগে বিশেষীকরণের ধোঁয়ায় দেশ এমনই ছেয়ে যাচ্ছে যে একজন ইঞ্জিনিয়ার ও একজন সাহিত্য-সাধকের মধ্যে চালডালের আলোচনা ছাড়া আর কোনো বিষয়ের আলোচনা চলতে পারে না। এ ব্যাপার সব ক্ষেত্রে না ঘটলেও অনেকক্ষেত্রে ঘটছে। দৈনিক পত্রিকার ঘটনা নিয়ে এই দুজন কিছুক্ষণ আলোচনা করতে পারতেন। কিন্তু পত্রিকা পড়ার অভ্যাসও যে এঁদের দুজনেরই অনেকক্ষেত্রে নেই। কেননা এই ইঞ্জিনিয়ার ও সাহিত্যিক দুজনই এতোবড়ো ইন্টেলেকচুয়াল যে সর্বজনবোধ্য এই পত্রিকা পড়লে তাঁদের মান থাকে না! তাঁরা যে অনেক অনেক বড়ো বড়ো বই পড়বেন! তাই কোনো কোনো জ্ঞানীগুণীর কাছে পত্রিকা অস্পৃশ্য। অতীতের ইতিহাস নিয়ে যিনি অনেক তথ্য ও তত্ত্বের আলোচনা করছেন, তাঁর কাছে বর্তমান কি এমনই অস্পৃশ্য যে তিনি বর্তমানের ঘটনা ধারার সঙ্গে পরিচিত থাকবেন না? পণ্ডিতরা যেন এমনই কি সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বিদ্যার 'চিরকালের জড়তা'র মধ্যে আকণ্ঠ মগ্ন হয়ে আছেন যে তাঁরা সংবাদপত্রের 'চলতিকালের চঞ্চলা'কে উপেক্ষা করে যাবেন? জানিনা, আর কোনো দেশে পাণ্ডিত্যের এ লক্ষণ আছে কি না। কিন্তু এদেশে যে আছে তা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই জানি। সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্র যে আমাদের জ্ঞানের সর্বোচ্চস্তরে পৌঁছিয়ে দেয়, এমন ধারণা নিশ্চয়ই কারোর নেই। তবে এগুলি থেকে সব বিষয় সম্পর্কে আমরা একটা মোটামুটি ধারণা পেতে পারি। তার মূল্যই বা কম কি?

আসলে বিদ্যার কোনো শাখাই বিচ্ছিন্ন নয়, সব শাখা মিলিয়েই এই বৃহৎ ও মহৎ বনস্পতি। অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে কিছু ধারণা না থাকলে নিজের বিষয়েও পণ্ডিত হওয়া অসম্ভব। বিদ্যার ক্ষেত্রে বিশেষীকরণ এই ক্রম-প্রসরমান বিদ্যার যুগে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, এ কথা মানি। পণ্ডিতদের মধ্যে পরস্পরের আলোচনার ব্যবস্থা থাকলে অল্প পরিশ্রমে নিজের বিষয়ের জন্যে প্রয়োজনীয় অন্য বিষয়ের ধারণা লাভ সম্ভব হতে পারতো। কিছু লোক নিজের বিদ্যাকে এমনই পরমগুহ্য ক'রে রাখেন যেন এ বিদ্যা অসূর্যম্পশ্যা—অফিসের ফাইল ওয়ার্ক, ক্লাশ বা লেবরেটরির বাইরে এনে তাকে সূর্যকিরণস্পর্শ দেওয়া নিষিদ্ধ! বিদ্যাকে অন্যের সঙ্গে আলোচনায় ও সর্বোপরি জীবনাচরণে নিয়ে আসা সম্পর্কে এ ধরণের বিদ্বানদের এই স্পর্শকাতরতার মূলে আছে বিদ্যাকে শুধুমাত্র সাধন অর্থাৎ উপায় রূপে জানা (তাও চাকুরি পাওয়ার স্থূল উপায় রূপে)। কিন্তু এমন চেতনাও চাই যে বিদ্যা শুধু সাধন নয়, সাধ্যও অর্থাৎ লক্ষ্য বা উপেয়। সুস্থ বিদ্যাচর্চায় থাকা চাই 'বৈষ্ণব দর্শনের পরিভাষায়' সাধ্য-সাধনতত্ত্বের বোধ। য়ুরোপীয় ধারণায় বিদ্যা আমাদের শক্তি দেয় (বেকনের বিখ্যাত উক্তি Knowledge is Power), আর ভারতীয় ধারণায় মুক্তি। তবে শক্তি ছাড়া মুক্তিলাভ সম্ভব নয় একথা আমাদের পূর্বপুরুষরা জানতেন। তাই তাঁরা পরা ও অপরা বিদ্যার মিলনের কথা বলেছিলেন। শক্তিই মুক্তি দিতে পারে। কেননা

। নায়মাত্মা বলহীনেন
দর্শন-বিজ্ঞান, শিব অর্থাৎ
-বিদ্যার বিভিন্ন শিক্ষা
ন, সমাজ-বিজ্ঞান

তখনই বলা যায় বঙ্কিমের মতো "অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত "এ জীবন লইয়া কি করিব? লইয়া কি করিতে হয়?" এযুগে পাণ্ডিত্য আছে, নেই শুধু এই জীবন-জিজ্ঞাসা। আজকের লেখাপড়া এই জীবন-জিজ্ঞাসা জাগাতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। এই লেখাপড়া জাগাচ্ছে শ্রেণী-চেতনা আত্মাভিমান ও বৃহত্তর সমাজজীবন থেকে সর্বনাশা বিচ্ছিন্নতা-বোধ। সবচেয়ে আশ্চর্য, এজন্যে শিক্ষিতদের বিন্দুমাত্র মনোবেদনা নেই।

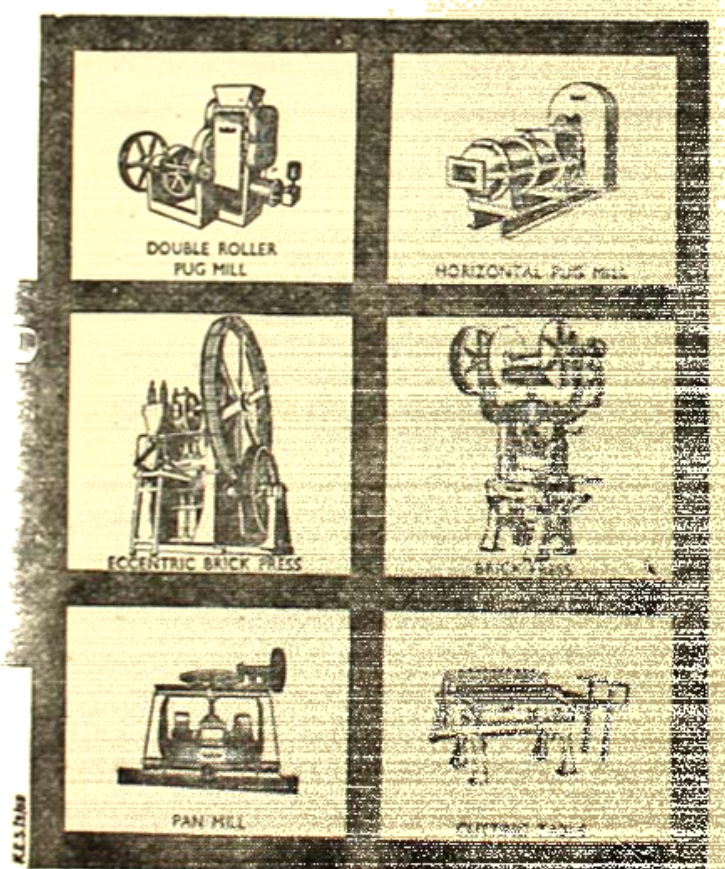

আত্মহত্যা

বিজন ঘোষ

বিকেল হলেই আমার মনটা কেমন হয়ে যায়। ভাল লাগে না এতটুও। আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয় ভীষণ। ইচ্ছে হয় এক গাদি ঘুড়ি নিয়ে চলে যাই রাস্তার ওধারের বড় শিমুল গাছটার কাছে। দিনের বেলাতেই ডালপালায় অন্ধকার। সন্ধ্যা ঘোর হলে লক্ষ লক্ষ জোনাকি জলতে থাকে তার নিচে। জলতে জলতে নিভতে নিভতে ওরা ইশারা করে; ইশারা করে যত রাত গভীর হয়। আমার ভাল লাগে। ওই জায়গাটা সব সময়েই কেমন রহস্যময়। রহস্যের তীরগুলি সোজা বুকে এসে লাগে। ছিঁড়ে গুড়ো গুড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে হাওয়ার চুমকি জোনাকির মত। ওই জোনাকিগুলো এক সঙ্গে করলে আমার হৃৎপিণ্ডের সমান হয়। কান পাতলে একেক সময় তাই পাখার শব্দে হৃৎস্পন্দন শোনা যায়। আকাশ ঢাকা গাছটার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকলে আমার চোখে জল আসে। আমার সমস্ত লোমকূপ খাড়া হয়ে যায়। বেশী কিছু না, জোনাক-জ্বলা অন্ধকার আর এক গাছা ঘুড়ি। পরদিন সাদা শিমুলতলা লোকে লোকারণ্য। আমিহীন আমার বীভৎস দেহটা শুকনো খড়ের মত ডালের সঙ্গে ঝুলে আছে। কয়েকটা লাল পাগড়ি অতি সন্তর্পণে নিচে নামাবে। আমি লাশ কাটা ঘরের টেবিলে শুয়ে থাকব।

বাবা মা হাউ মাউ করে কাঁদবে। ধারার রুমাল ভিজে যাবে। কলেজে পড়া বোন একেক সময় পেঁয়ো মেয়ের মত চেঁচাবে, পরক্ষণে বুঝতে পেরে আঁচলের আড়ালে মুখ লুকোবে শহুরে হয়ে। সব ছবি চোখে ভাসে। কিন্তু তাই বলে সত্যি সত্যি আমি ঘুড়ি হাতে শিমুল-তলায় যাই না। জোনাকিরা বৃথাই সারা রাত ধরে ইশারা করে। ওদের পাখা ব্যথা হয়, আগুন নিভে আসে। আমি ঘুম চোখে বিছানার মাঝখানে চলে যাই। কোনদিন যে ওখানে যাব তারও সম্ভাবনা নেই। তবু আত্মহত্যা ভালবাসি। প্রতি নিয়ত নিজেকে গাছের ডালে ঝোলাতে আমার মন অধীর হয়। আমি যে আছি, মনে হয় চুরি করে বেঁচে আছি। চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি, আমি ফাঁসির আসামী। অনেক দিন থেকেই আমার জীবনের কোন অধিকার নেই। কেননা, অনেক দিন থেকেই আমি আত্মহত্যার প্রেমে পড়েছি। যখন একা থাকি, দেখেছি ওই একটি মাত্র চিন্তা আমাকে পাগলের মত আনন্দ দেয়। আমার চোখের সামনে যখন গাছের অস্তিত্ব থাকে না তখন কল্পনার সিঁড়ি বেয়ে ছুটতে ছুটতে হাজির হই শিমুল-তলায়। জোনাকিরা আমার চারপাশে উচ্ছ্বসিত হয়ে জলতে থাকে। আমাকে ঘিরে বীভৎসের নিরন্তর দুন্দুভি দেয় ওরা।

(২)

আমি বেকার। অনেক দিন ধরে বেকার আছি। প্রায় জান হওয়া ইস্তক। আরো কত দিন থাকব জানি না। মন যে সব সময় তার জন্যে খারাপ হয়ে থাকে

তা নয়। কেবল দুপুর বেলায় গম্ভীর হয়ে যখন চিন্তা করি তখনি খারাপ লাগে। পাই না চেষ্টা করি তবু। কেউ দেয় না। অবশ্য 'দেব না' এ কথা কেউ বলে না। তাদের ক্ষমতা আছে। তারা চেষ্টাও করেন খুব শুনতে পাই। কিন্তু আমি বছরের পর বছর বেকার থাকি। তাই হতাশ হয়ে প্রায় চুপচাপ ঘরেই বসে থাকি আজকাল। ঘরই আমার ভাল। ঘরের ভিতর মুক্তি পাই। বাইরে বেরিয়ে মাঝে মাঝে ট্রাম বাসের ভিড় দেখি। এই নোংরা ভিড়ে নিজেকে জড়াই না ভেবে একেক সময় খুশিই হই। আবার জড়াতে না পেরে দুঃখিত হই। রাস্তায় বেরিয়ে আমি শুধু ভিড়ই দেখি না। সত্যিই, অনেক কিছু দেখবার আছে কলকাতার রাস্তায়। তাই ঘরের মত রাস্তাও আমার প্রিয়। হয়ত চলেছি, দেখি রাস্তার এক পাশে গোলাকৃতি ভিড়। কাছে গিয়ে দাঁড়াই। দাঁতের মাজনের অজস্র গুণ বর্ণনা চলেছে। সাপ খেলা। কি বস্তায় দুর্গতদের সাহায্যার্থে সিনেমা-নায়িকার চাঁদা তোলা—সবই ভাল লাগে। দাঁড়াই। দেখি। তবু একেক সময় অসহ্য মনে হয়। তখন ট্রাম লাইনের ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কোন পার্কে এসে উপস্থিত হই। অথবা লেকের ধারে। উত্তর-পূব কোণই আমার পছন্দ। কেননা ওখানে সব সময়েই লোকজন কম থাকে। আর থাকলেও আমার দিকে নজর বিশেষ রাখে না। আমার তাতে সুবিধে। খালি বেঞ্চি যদি না থাকে ঘাসের ওপরেই বসি। ভাল লাগে ভারী। অনেক দিন আগে মামার সঙ্গে পুরী বেড়াতে গিয়েছিলাম। সমুদ্রের পারেই সুন্দর কাউরীঝি। দুপুর বেলায় গিয়ে সেখানে বসতাম। সমুদ্রের ডাক উঠলে অর্থাৎ হাওয়া উঠলে, ঝাউপাতার সব চিরুণী সেই ডাক চিরে দিত। তখন আরেক রকমের অসহ্য শব্দ উঠতো শো-শো। আমার মনেও ওই রকম রহস্যময় শব্দ ওঠে যখন তখন, যখন একা থাকি। তাই নির্জনতা আমার ভাল লাগে। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে যেতে চাই না তাই বলে। সবটুকিয়া বইঠারের অরণ্যে যত সৌন্দর্যই থাকুক, আমি ফিরেও তাকাই না। আমার সেই রকম জায়গা ভাল লাগে, যা নাকি নির্জন অথচ দু'পা হাঁটলেই ট্রাম বাস ভিড় গায়ের ঘামের মধ্যে মিশে যাওয়া যায়। কেননা, ভিড়ও যে ভাল লাগে!

(৩)

বহুদিন পর প্রায় আশ্চর্যের মত সেদিন হঠাৎ রেখার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। হয়ত অনেকে মনে করতে পারে এই দেখা হওয়ার পিছনে আমার কিছু কারসাজি ছিল। নাহলে ছুটি হবার মুখে অফিসের অত কাছ দিয়ে হাঁটবো কেন? কিন্তু আসলে তা নয়। ইদানীং রেখার কথা প্রায় সব সময়েই ভুলে থাকতাম। ও আমাকে ভীষণ ভালবাসে, তবু কেন যেন আমার ভালবাসতে ভাল লাগে না। চিঠি পাই মাঝে মাঝে, উত্তর দিতে আমার সমস্ত স্নায়ু ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। বস্তুত, ভালবেসে আমি ফুটো গাছটি নাড়তে পর্যন্ত রাজী নই। কেমন যেন এক ঘেয়ে বিরক্তিকর আর ছেলেমানুষী মনে হয়। ঘুম পায়। তবে রেখা যখন হাতের কাছে থাকে, চোখের সামনে, তখন ওর উজ্জ্বল দেহটা আমার কাছে অদ্ভুত লাগে। একটা আশ্চর্য উন্মাদনা কিলবিল করতে থাকে সাপের মত আমার সমস্ত শরীরে। আরো কাছে পাবার জন্যে আমার হাত দুটো আমাকে না জানিয়ে হঠাৎ এগিয়ে যায়। আর তখনি মনে হয়, ভালবাসলে ক্ষতি কি। আর এই সময় রোজ রেখা কোল থেকে ভ্যানিটি ব্যাগটা অতি সন্তর্পণে ঘাসের ওপর রেখে প্রশ্ন করবে, আর কতদিন—কতদিন—? রেখার শাড়ির আঁচলের কি অদ্ভুত গন্ধ! সন্ধ্যার বাতাস সেই সুরভির গন্ধ মেখে আমার চারপাশে উদাস হয়ে উড়তে

থাকে। আর রেখার কথায় এই সময় আমার ভীষণ কান্না পায়। নিঃশব্দে শুকনো চোখে খানিকক্ষণ কাঁদি। রেখা মনে করে আমি বুঝি ভীষণ হেসে পড়েছি। গায়ের কাছে এসে ও প্রকাণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। ঘাস থেকে ব্যাগটা তুলে নিয়ে অভয় দেয়—হবে—হবে—

রেখার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। খুব স্বাভাবিক ভাবেই। পড়ন্ত রোদে ট্রাম লাইন ছেড়ে যখন মাঠের ভিতর নেমেছি তখন আমার নামটা হঠাৎ আমার কানে গেল। ফিরে দেখি রেখা হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আমি হাসি। ও কাছে এসে গড় গড় করে প্রচুর অভিযোগ আবৃত্তি করে গেল। আমি উত্তরে আমার পাটকাঠি [আঙুল দিয়ে ওর ফরসা ফোলা ফোলা আঙুলগুলি ধরলাম। চাকরী করলে এমন সুন্দর আঙুল হয় নাকি? আমরা হাঁটতে আরম্ভ করলাম গভীর মাঠের দিকে। হঠাৎ একটা সুন্দর ছেলে দেখলাম। তুলোর মত। লাল সিল্কের জামা গায়ে। লাল ইজের। বছর দেড়েক হবে। বিচ্ছিরী আয়ার সঙ্গে পেরাম্বুলেটর ঠেলতে ঠেলতে চলেছে। আপেল গালে রেশমের মত চুল এসে পড়েছে উড়ে। আদর করতে ইচ্ছে হয়। চুমু খেতে ইচ্ছে হয়। হঠাৎ আমাদের সেই পুরাণো খেলাটার কথা মনে পড়ে গেল। একটা টিমটি কেটে জিজ্ঞাসা করলাম, কি রকম ছেলে চাও বল তো, এমনি? রেখা হাসল। বলল, উঁহু, আমার ছেলে আরো ভাল আরো সুন্দর হবে। শুনে আমি হাসলাম। আগেও হেসেছি অনেক পুরোনো খেলা নিয়ে। আকাশের মত আশা দেখে বিস্মিত হয়েছি। রেখা কি জানে না, ওদের মা বাবা মাখনের বিছানায় শোয়, নদীর কৌচে বসে, কুমড়া সাগরীর আপেল সিদ্ধ রস পান করে? আমার গায়ের রং আলকাতরার মত। তাই দেখে মা পর্যন্ত হাসে। আমার এখন আর দুঃখ হয় না। রোদে পুড়ে পুড়ে চেহারার যা অবস্থা হয়েছে, গরু না খাওয়া শজনের মত। তবে রেখার চেহারাই যা একটু ভাল। তবু এই সামান্য পুঁজি সম্বল করে যে টুসুল থাকতে গোলাপফুলের স্বপ্ন দেখে কেন রেখা? সত্যি ওর জন্যে একেক সময় দুঃখ হয়।

এরপর আমরা মাঠের হৃৎপিণ্ডে এসে বসলাম। পাশাপাশি। ঘন অন্ধকার আমাদের নিঃশেষে মুছে নিয়েছে। আমরা অন্ধ হয়ে গেছি। হাওয়ার মত নিঃশব্দে খানিকক্ষণ বসে থেকে আমরা আবার পুরোনো খেলায় মনোনিবেশ করলাম। অর্থাৎ ওর গরম নিঃশ্বাস আমার মুখের ওপর, আমার কসাইখানার ছবি দেখা, ওর অধীর প্রশ্ন, আমার জলহীন কান্না, ওর গা ঘেঁষে অভয় দেওয়া—ইত্যাদি।

কিছুদিন পর দুপুর বেলায় আমি একটি সংবাদ পেয়ে চমকে উঠেছিলাম। ওই পর্যন্তই। কিন্তু মাঠের শূন্য হাওয়া আমার বুকে একটুও ঢোকেনি। বরং প্রাণপণে হেসেছি। রেখা এক বৃদ্ধ অক্ষম এ্যাডভোকেটকে বিয়ে করেছে। তিনি নাকি বিলেত গেলে পোষা বিড়াল ছানাটিকেও সঙ্গে নিয়ে যান। এটি তাঁর তৃতীয় পক্ষ। আগের দুই স্ত্রীই স্বর্গতা। মনে মনে হেসেছি। গোলাপ-ফুলের ভাবনা রেখার মত বড় ভাওতা ছাড়া আর কি?

(৪)

আজ আমি ভীষণ ক্লান্ত। পা' দুটো ভীষণ ব্যথা আর ভারী। অনেক হেঁটেছি আজ। শহরের পাঁচ পাঁচটি জায়গায় হানা দিয়েছি। একই বাংলা ভাষায় পাঁচ রকম রূপ দেখে অবাক মেনেছি। (১) আগে যদি আসতে; (২) ইউনিয়ন হয়েছে, পূর্বের মত ক্ষমতা নেই আর; (৩) এখন নয় পরে এসো; (৪) বি. এ. টা

যদি পাশ করতে; (৪) ভদ্রলোকের ছেলে এত কম মাইনের চাকরী করবে কি রকম, খাও খাও ইত্যাদি। আমি জানি, আরো কয়েক জায়গায় যদি যেতাম তো ওটার আরো বিচিত্র রূপান্তর লক্ষ্য করতাম। তবে একদিনে সব ফুরিয়ে উঠতে পারিনি। অন্ত দিনের জিম্মায় কিছু রেখেছি। প্রায় সব জায়গায় আজ হেঁটেই মেরে দিয়েছি। দু'বার মাত্র বাসে উঠেছিলাম। তার ভিতর একটাতে খুব ভিড় ছিল। চোরের মত কন্ডাকটরের দিকে দু'বার তাকিয়ে নেমে পড়েছিলাম।

রাস্তায় ভীষণ ভিড়। কয়েকজন পুলিশ, অন্ধকারের মত কালো গাড়ি। আমার পা টনটন করছে। এই দৃশ্য তো আমি হামেশাই দেখি। একটুও কৌতূহল নেই। কিন্তু এ যে আমাদের রাস্তায়। আর যে বাড়িটা পাকিয়ে এত ভিড়টা জমেছে সেটাও যে আমার চেনা। আত্মহত্যা। —সুবলবাবুর বৌ আত্মহত্যা করেছে।—বাতাসে কে একজন ফিসফিসিয়ে উঠল। একটা জীবন্ত ভয় মুখ থেকে মুখে উড়ে বেড়াচ্ছে। আমার পা অসাড় হয়ে গেল। এদিকে আলো নেই। আধ মাইল পর পর মিটমিটে লাইট পোস্ট। তার ভিতর কালো গাড়ি, লাল পাগড়ি, লাঠি, বিপুল অসঙ্গতির মত দাঁড়িয়ে আছে। আমার পা ভাঙতে চাইল। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এলাম। আমার খাবার ঢাকা দেওয়া ছিল। ভাগ্যক্রমে বিছানাটাও পাতা ছিল। মশলা আরেকটু হলেই বুকে আটকে যেত। শুয়ে পড়লাম। শো শো ঝড়ের শব্দের মত খুব আসছে দূর থেকে। আমার গায়ে তার ঠাণ্ডা হাওয়া লাগছে। কিন্তু সুবলবাবু তো খুব সুখি-ই ছিলেন তার পরিবার নিয়ে। দুই ছেলেই চাকরী করে। একটা মাত্র মেয়ে কলেজে পড়ছে। তাহলে কাকীমা কেন অন্ধের অধিকারে মাথা গলালেন? সুবলবাবু বাড়ি বসে প্রাকটিশ করতেন। আমরা কাকীমা ডাকতাম। সুন্দরী ছিলেন। বয়েস তাই কম দেখাত। কিন্তু কেন, কেন, কে-ন, কে—ন··· ···আমার দেহটা ভীষণ হালকা হয়ে গেছে। বাতাসের তীব্র স্রোতের মধ্যে হলুদ পাতার মত হালকা। এই তো দেহটা বিছানায় ছিল—বিছানায় নেই। শিরীষ গাছের ঘন পাতার ভিতর আমার অদ্ভুত শরীর দুলছে। কাকের ঠোঁটের মত অন্ধকার ঠোকরাচ্ছে চারপাশ। হাজার হাজার—অসংখ্য জোনাকি উড়ছে ৮৫ ফেলে শিরীষের তলায়। তার ভিতর একটি—আমার মন—আমি চিনলাম; উড়ছে, আমার পরিত্যক্ত দেহটাকে ঘিরে। আমার দেহের ভাঁজে ভাঁজে, কোষে কোষে কতদিনের ঘেঁওলান অন্ধকার। জোনাকিটা তার ভিতরে গিয়ে জ্বলছে। ওইটুকু আলো নিয়ে কি দেখে? কি খুঁজে বেড়ায় ওখানে? ও কি জানে?

আমি জানি না।

FOR ALL YOUR
SURGICAL INSTRUMENTS

Enquire :

Zenith Surgical Co

206/3C, Mangaldas Road

Kitchen Garden Lane
Bombay-2

চেষ্ট অফ ড্রয়ার্স

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মজুমদার

অনেক ঘুরে আজ দিনকয় হ'ল কলকাতায় ফিরে এসে দেখি, আমার জন্য দুখানি চিঠি অপেক্ষমান। একটি লিখছেন জড়কীর অধ্যাপক নৃপেনবাবু, খনার ছেলে হয়েছে খবর দিয়ে। সেই সঙ্গে আমাকে অনেক সাধুবাদ দিয়েছেন। খনার আজকের এ আনন্দের দিনে, কৃতজ্ঞ-চিত্তে তাঁরা বিশেষ করে স্মরণ করেছেন তাঁদের মিত্রাবৌদি ও আমার আধালোর মানসীকে।

দ্বিতীয় চিঠি বেলফাই থেকে ভোরামাসীর কোন এক দূর সম্পর্কের ভাই ভোরামাসীর' গুরুতর পীড়ার খবর দিয়ে লিখেছেন। তিনি নাকি আমাকে দেখবার জন্যে ব্যাকুল, আমার কথা বলে চোখে জল ফেলেন। পড়তে পড়তে আমারও দুচোখ ঝাপসা হয়ে এল। অতীতের স্মৃতির আলোয় ভেসে উঠলো সেই শৈশবের ছোট পাটের শহর, নেইজার সাহেব, শহর বেলফাই ও তার নদী, পথ, ঘাট, আরো কত কি।

সে অনেক দিনের কথা, বয়েস বড় জোর তখন পাঁচ কি ছয় হবে। সব যেন হুবহু চোখের সামনে ভাসছে। ঝকঝকে মেঝের ওপর নিজের চকচকে ছায়ার মত যেন দাঁড়িয়ে আছে। পূর্ণিমার আলো কৃষ্ণচূড়া গাছের পাতা চুঁইয়ে পিচের রাস্তার ওপর যেমন চকচক করে, মনের সৌন্দর্যের অভিপ্সুর মধুর ওজন তোলে, তেমনি আপন মৌন সুষমায় সে চোখের সামনে দাঁড়িয়ে।

আমি মা-বাবার প্রথম ছেলে। আমার ওপরে তিন বোন। আমার আসা ত নয়, যেন আবির্ভাব; আসার বহু-প্রতীক্ষিত আশা যখন খুসির বিকসতায় মিশে একাকার হয়ে গেছে, স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে আসার সময় কেটে গেছে, ঠিক এমন সময়ে হঠাৎ 'আমি' এলাম। বাড়ীতে আনন্দ যেন আর ধরে না। মা-ই সব চেয়ে খুশি হয়েছিলেন বেশী। সেই খুশির আনন্দে তিনি যেন আরো সুন্দর হয়ে উঠলেন। আজ যেন দেখছি মা এ ঘর ও ঘরে ঘুর ঘুর করে কাজ করে চলছেন—তাঁর আনন্দ-লাবণী সমস্ত দেহ-মনে উপচে শাড়ীর আচল বেয়ে সমস্ত বাড়ীময় বিকিরণ করছে। আমাদের বাংলোর সামনে বকুল গাছটিতে সেবারই প্রথম ফুল ধরলো। মায়ের হাসি, আনন্দ, আবেগ, খুশি আর প্রার্থনা মূর্ত হয়ে বকুল গাছ-টিকে পুষ্পলাবী করে তুললো। সে বছরই বাবা আবার সাব-ম্যানেজার হলেন এক বিলিতি কোম্পানীতে। সব আনন্দের উৎস আমাকেই ঘিরে। আমার বড় আত্তি গেল এত বেড়ে যে রোগ যেন আমাকে চেপে ধরলো। আর্দ্ধেক রোগ—রোগের সম্ভাবনা, বাকীটা হলো যত্নের ছড়াছড়ি। এমন হয়ে দাঁড়ালো যে মাকে ত লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে বুকের দুধ খাওয়াতে হতো। ডাক্তারের রকমারি হুকুমজারীর আওতায় পড়ে আমি যেন শুকিয়ে উঠলাম। এভাবে পৌঁছলাম পাঁচ কি ছয়ে। যে খ্রীষ্টান মহিলার উপর আমার দেখবার ভার পড়লো তার নাম 'কালোদি'। দিনে পাঁচবার ছয়বার জামা কাপড় পালটানো যখন তখন সেন্ট, পাউডার মাখানো, হেন তেন সব জড়িয়ে একাকার কাণ্ড।

ছোট নদীর ধারে, ছোট এক পাটের শহর। থাকবার মধ্যে ছিল দশ থেকে বারোটি পাটের অফিস, গুদাম, বাংলো, বাংলোর সঙ্গে লাগোয়া টেনিস কোর্ট, ডাক ও তারঘর। আর ডাক্তারখানার এক কোণ ঘেঁষে ঢাকার নবাবের কাছারিবাড়ী ও তার গায়ে এক অতি পুরানো কালীমন্দির। কালীবাড়ীর গা ঘেঁষে সরকারী ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডারদের কোয়ার্টার। আর একদিকে রয়েছে পাটের কোম্পানীর বাবু, ছোট কর্মচারীদের মর্যাদা অনুযায়ী ছবির মতন বাড়ী। বাবা সাব-ম্যানেজার, প্রথম সারিতেই ছিল আমাদের বাংলো। পাশেই আমাদের কোম্পনীর ম্যানেজার নেইজার সাহেবের বাংলো। বাড়ীর ফটকে কালো বোর্ডে সাদা হরফে লেখা R. L. Naizor Esq.

আমি কড়া পাহারার মধ্যে মানুষ হচ্ছি। বাইরের ছেলেদের সঙ্গে মিশবার পথ কালোদিদি প্রায় বন্ধ করে দিলেন। দিদিদের কোল ছেড়ে আসলে কালোদিদির হাতে গিয়ে পড়তুম। সব সময়েই সেজে গুজে থাকি—শীত-গ্রীষ্ম সব সময়েই মোজাপরা। এখনও যেন দেখতে পাচ্ছি পাঁচ ছয় বছরের ছেলে বিলিতী ধোপদস্ত কাপড়ের জামা ও সাদা প্যাণ্ট, নোংরা পায়ে মারবেল হাতে বাংলোর মেঝেতে অবাক করা ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। মারবেল খেলার সুযোগ আমার ছিল না—। মারবেল নিয়ে যেন ঝকঝকে মেঝেতে নিজেকে তাক করেই হঠাৎ টুক করে ছুঁড়ে মারলুম। আজ মনে হচ্ছে, মা ও বাবা সে শব্দ শুনে যেন চোখ কান বন্ধ করে অন্ধকারে কি খুঁজে দেখতেন। বাইরে বেরুবার হুকুম নেই—দিদিদের সঙ্গে নদীর ধারে এক আধবার ঘোরা কেয়ার মধ্যেই তা সীমিত।

ছয় পেরিয়ে সাতে পড়লুম। পরিবারের বাইরে নেইজার সাহেবই আমার একমাত্র বন্ধু। তাঁকে দেখতে বড্ড ভাল লাগতো। যেমন সুন্দর দেখতে, তেমনি একটা সদানন্দ ভাব তাঁকে ঘিরে থাকতো। আমাকে তিনি খুব ভালবাসতেন, দেখলেই হাত তুলে "গুডমর্নিং খোকা-বাবু" বলে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতেন। একদিন আমাকে কোলে নিয়ে তাঁর বাংলোয় ঢুকে পকেট ভর্তি করে চকলেট দিয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিলেন। আমি যে এক স্বপ্নপুরীতে এসে দাঁড়ালাম। বাংলোটা যেন রূপের ঝলমল আলোয় নেয়ে উঠেছে। সেই আলোর পুলকে রাস্তা হারিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। সম্বিৎ ফিরে আসতেই অবাক হয়ে ঘরের সাজ-সজ্জা দেখছি—দামী দামী আসবাব, ছবি, ঘড়ি পুতুল আরো কত কি টুকিটাকি দিয়ে, কোন এক রূপসী পরী যেন বাংলোটিকে সাজিয়ে মানিয়ে ধরেছে। মনে হলো, কারা যেন আসছে, গান শুনবে—সব যেন উৎকর্ণ হয়ে আছে তাঁদের আগমনের অপেক্ষায়। কে যেন ইসারায় জানিয়ে গেল তাঁরা আসছে। সবাই যেন তাদের প্রতীক্ষায় ক্ষণ গুনছে। হঠাৎ চোখে পড়ল ঘরের এক কোণে সুন্দর একটি চেষ্ট-অফ-ড্রয়ার্স। তার সুঠাম গড়ন ও স্বর্গীয় শ্রী দেখে মুগ্ধ হলাম। আমি সেই অনির্বচনীয় মুগ্ধ রাজ্যে হারিয়ে গেলাম। কোথাও কিছু নেই—শুধু চেষ্ট-অফ-ড্রয়ার্স। আমাকে হাতছানি দিয়ে নিয়ে গেল সে তার দেশে। ঘরের সব জিনিষ পত্তর, খাট, টেবিল, আলমারী, সোফা কোন জাদুতে যেন লুকিয়ে পড়লো। ড্রয়ারের উপর সুন্দর কাজ-করা টেবিলক্লথ, তার ওপর ফ্রেমে-আঁকা কয় কোটো। সেই ফোটোর জাদু চুম্বিসারে টেনে নিয়ে আমাকে তুললো এক অজানা দেশে। সেখানে যাত্রা ঘাটের নামের নিশানা সাদা বোর্ডে কালো হরফে লেখা—চোখের সামনে ফুটে উঠলো—অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট। মন্ত্রমুগ্ধের মতো মনে হল আমি যেন ঘুরতে ঘুরতে

[শেষাংশ ৪৭১ পৃষ্ঠায়]

ঝ ন্ধ ন্ধ ন্ধ

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

'হালভাঙা পাল-ছেঁড়া-বাবা'র মতো জাহাজটা সেদিন বন্দরের কাছে গিয়ে ছমড়ি খেয়ে প'ড়েছিল। সমুদ্রে ঘূর্ণি-ঝড় যে কী সাংঘাতিক বস্তু, তার আস্বাদ পেয়েছিলাম সেদিন। 'সেদিন' বলেই মনে হয়, মনে হয় একেবারে কালকের ঘটনা, চোখের সামনে জল জল ক'রে জ্বলছে। অথচ, ঘটনাটা ঘটে ছিল বারো বছর আগে। বারো বছর আগেকার সেই জাহাজও আর নেই বলে শুনেছি, সেই বন্দরের চেহারাও গেছে বদল হয়ে, হয়ত বা পোষাক-আশাক-চরিত্রে সেই মানুষগুলিকেও আজ আর চেনা যাবে না।

জাহাজের কনিষ্ঠ কেরানী বলে ছোট থেকে বড়ো সবার সঙ্গেই আমার যোগাযোগ ছিল। আমরা 'মিনিকয়' দ্বীপ ছেড়ে আফ্রিকার উপকূলের দিকে চলছিলাম। অবশ্যই পূর্ব উপকূল। আমার জানা ছিল, জাহাজ দুটি ছোট বন্দরে গিয়ে থামবে। একটি, আফ্রিবার। অপরটি, মোম্বাসা! প্রথমে কোথায় যাবো, জানা নেই। কিন্তু দূরে অগ্রসর হবার পর রেডিও-অফিসার 'মোম্বাসা'কে বেতারে জিজ্ঞাসা করবে, কথা ছিল।

আমার মনটা ছিল আজন্ম মিনিকয়ের স্মৃতিতে। বারবার আমাকে অন্যমনস্ক ক'রে দিচ্ছিল মিনিকয়ের সেই লাইট্-হাউস আর সেই মেয়েটির কথা। জাহাজের মধ্য-অংশের বাঁ-দিককার রেলিং ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলাম আমি আর একটি ইঞ্জিন-বিভাগের খালাসী, আকবর। সময়টা বেশ মনে আছে, দুপুর বেলা। দিগন্তে সাদা মেঘের দল বলাকার মতো দল বেঁধে চললেও সারা আকাশটা একেবারে প্রগাঢ় নীলিমার রঙ্ ঘন্ করছে। কে যেন সারা আকাশটা জুড়ে ছোপাতের নীল কালি উপুড় ক'রে ঢেলে দিয়েছে। বাতাসে জোর ছিল, আমাদের গায়ে এসে চুলগুলি এলোমেলো ক'রে দিচ্ছিল। আর সমুদ্র-ভর্তি ছিল ছোট ছোট ঢেউ। সেই সংখ্যাতীত ঢেউগুলির মাথায় জমছিল ধবধবে সাদা ফেনা—ধীরের চুনরোর মতো।

দুজনে দাঁড়িয়ে আছি নির্বাক যে-যার চিন্তায় নিবিষ্ট, হঠাৎ মনে হলো, দিগন্তের নিশ্চিন্ত মেঘের দলে একটা সাড়া প'ড়ে গেছে। কয়েকটা মেঘকে মুছে দিয়ে সমুদ্র পর্যন্ত একটা ঝাপ্‌সা ধূসর বর্ণ সঞ্চারিত হয়ে প'ড়েছে। বেশ কয়েক মুহূর্ত ধরেই ব্যাপারটা আমি লক্ষ্য করছিলাম। ক্রমে ক্রমে মনে হলো, দিগন্তরেখার কাছাকাছি প্রায় সব মেঘ-গুলোকেই গ্রাস করেছে ঐ অদ্ভুত ধূসরতা। হাওয়ায় তখন একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব: দূরে বৃষ্টি হলে যে রকম স্পর্শ পাওয়া যায়, ঠিক সেই রকম। দেখতে দেখতে সেই আদিগন্ত ধূসরতা আমাদের জাহাজের দিকে ছুটে আসতে লাগলো। আমার সঙ্গীটি মুখ নীচু করে কী যেন ভাবছিল, হঠাৎ মুখ তুলে দিগন্তে ঐ নিঃশব্দ বিবর্ণতার আবির্ভাব লক্ষ্য ক'রে রেলিং ছেড়ে দিয়ে ছুটে চলে গেল ভিতরে,—সম্ভবতঃ তার ইঞ্জিন-বিভাগে। আমি ওর দ্রুত ত্রস্ত ভাব দেখে একটু বিস্মিত হ'লাম। দিগন্ত থেকে তখন কিন্তু সমুদ্রের নীলিমা পর্যন্ত ধূসর ক'রে দিয়ে কী একটা ছুটে আসছে আমাদের

দিকে। টের পেলাম, সারা জাহাজ জুড়ে একটা ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি প'ড়ে গেছে। ওপরে হুইস্‌ল-হাউসে ঘন ঘন শব্দ হচ্ছে—ক্রি-রি-রিং—ক্রি-রি-রিং!

আমি একটু বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়লেও মনে মনে বলতে লাগলাম,—ভয় পাচ্ছে কেন ওরা! এ নিশ্চয় বৃষ্টি! মেঘের কাজল ঘুরে বৃষ্টি আসছে দিগ্‌দিক কাপ্‌সা ক'রে দিয়ে।

কিন্তু না, একটু পরেই আমার ভুল ভাঙ্‌লো। অফিসারদের কে একজন যেন আমার কাছে ছুটে এসে আমার বাহু ধরে হ্যাঁচ্‌কা টানে একেবারে ভিতরে এনে ফেললো। তারপরে তাড়াতাড়ি এঁটে দিলো লোহার দরজা। অতর্কিতে অমন ক'রে টান দেওয়ায় হোঁচট খাচ্ছিলাম। বললাম,—কী ব্যাপার!

সে বললে,—তোমার কেবিনে যাও।

ব'লে, সে ছুটে অন্য দিককার দরজা বন্ধ ক'রতে শুরু করলো।

জাহাজটা তৎক্ষণে কিসের ধাক্কা খেয়ে যেন প্রবল বেগে ন'ড়ে উঠলো। তারপর, প্রচণ্ড দোলা পেলে জাহাজের যা' অবস্থা হয়, তা-ই হলো। ভিতরকার অলিন্দের গলি দিয়ে নিজের কেবিনে যে হেঁটে যাবো, তা-ও পারছিলাম না। মাতালের মতো টলতে টলতে কেবিনে এলাম। কেবিনের জিনিষপত্র সব ছত্রাকার। ঘ্যানহোল দিয়ে তাকিয়ে দেখি, ডেকের উপরে জল এসে প্রবল বেগে আছড়ে প'ড়ে চারিদিকে ছিটিয়ে যাচ্ছে। যেন কাঁচের টুকরো ভেঙে ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে। ভয়ে পেয়ে 'ঘ্যানহোল-ডোর'টা বন্ধ করলাম, তা-ও অতি কষ্টে।

কতক্ষণ কেটে গেছে জানি না, প্রচণ্ড একটা শব্দ হলো জাহাজের কোনো অংশে, জাহাজটা হঠাৎ-ই কাত্‌ হয়ে জলের ওপর হুড়মুড় ক'রে পড়বার মতো হলো। আমি বসেছিলাম চেয়ারে, ছিট্‌কে গিয়ে আমার খাটের কিনারে পড়লাম। বুকের নীচের দিকে ভীষণ লাগলো, আর সঙ্গে সঙ্গেই মুখ দিয়ে বমি ছিট্‌কে বেরুলো। তারপরে আর কিছু মনে নেই।

বুকের পাঁজরটায় অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব ক'রে যখন চোখ মেললাম, তখন দেখি, শুয়ে আছি বিছানায়, পাশে স্টুয়ার্ড। বুকের বাঁ-পাশে পাঁজরার নীচের দিকে ব্যাণ্ডেজ করা। যন্ত্রণায় কাত্‌রাতে কাত্‌রাতে ডানদিকে মুখ ফেরালাম। ঘ্যানহোলটা খোলা, আকাশটা কালো। কিন্তু সেই রহস্যময় কৃষ্ণ-যবনিকার ওপরে ফুটে উঠেছে অসংখ্য তারা। জাহাজটা যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাওয়ার সেই মুহুর্মুহু সোঁ-সোঁ শব্দ নেই।

বুঝলাম, সেই 'অতর্কিতে-ওঠা ঝড়'টা থেমে গেছে। স্টুয়ার্ডের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালাম। লোকটা পোয়ানীঞ্জ, বছর চল্লিশের মতো বয়স হবে। বেঁটে খাটো গোলগাল চেহারা। আমার দিকে উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছে। বললাম,—থেমেছে ঝড়?

—হ্যাঁ।

—এ রকম ঝড় ত কখনো দেখি নি।

মনে আছে 'ঝড়'-বোঝাতে ইংরেজী 'সাইক্লোন' কথাটা ব্যবহার ক'রেছিলাম। স্টুয়ার্ড বললে,—একে ঠিক 'সাইক্লোন' বলে না, এ-হচ্ছে অনেকটা 'টাইফুন'-এর মতো। ঘূর্ণি-ঝড়। আরব সাগরের বিশেষত্ব। হঠাৎ আসে, হঠাৎ যায়। তবে, বড়ো হিংস্রধরণের, সামনে যা পড়ে তছ্‌নছ্‌ করে দিয়ে যায়। ভাগ্য খুব ভালো, যে, জাহাজটা কাত্‌ হতে হতেও বেঁচে গেছে, ডুবে যায় নি।

বললাম—একটা প্রচণ্ড শব্দ শুনেছিলাম। ইঞ্জিন-টিঞ্জিনের কিছু হয়নি ত?

স্টুয়ার্ড মুখ কালো করে বললো,—হালটাই ভেঙে গেছে। জাহাজ আর চলতে পারবে না। চারিদিকে 'এস্‌-ও-এস্‌' পাঠিয়েছে রেডিও অফিসার।

ধড়মড় করে উঠে বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু পাঁজরায় যন্ত্র

করে লাগায় আবার কাত্‌রাতে কাত্‌রাতে শুয়ে পড়লাম। বললাম—আমার পাঁজরার হাড়টা ভেঙে গেছে?

ও বললে,—ডাক্তার না আসা পর্যন্ত বলি কী করে? আমরা 'ফার্ষ্ট-এড্' দিয়েছি। সে ত প্লাষ্টার দেখেই বুঝতেই পারছো।

মনটা দমে গেল। একটুক্ষণ থেকে থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম,—আমার বমি হয়েছিল। সে-গুলি—

বাধা দিয়ে স্টুয়ার্ড বলে উঠলেন,—পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। 'বমি' নয়, 'রক্ত।'

আর্ত্তনাদ করে উঠলাম.—রক্ত।

—ভয় পাবার কিছু নেই, স্টুয়ার্ড বললো—বুকের নীচে আচম্‌কা চোট পেলে 'ব্লাড' বেরিয়ে আসতে পারে মুখ থেকে। ক্যাপ্টেনের কাছে এর ওষুধ ছিল, তোমার ঠোঁট ফাঁক ক'রে মুখে ঢেলে দিয়েছি। কাজ হয়েছে। নইলে, এতো তাড়াতাড়ি চোখ মেলতে না, বা, কথাও বলতে পারতে না।

আরও কিছুক্ষণ কাছে বসে থেকে স্টুয়ার্ড উঠে গিয়েছিল। একজন 'কুক্' এসে আমাকে গরম দুধ খাইয়ে গিয়েছিল এক গ্লাস।

উঠতে পারছিলাম না, আমার কেবিনের ছোট্ট গোলাকার জানালা বা 'স্যানহোল্'ই ছিল আমার সম্বল। সেখান থেকে যতটুকু দেখছিলাম ততটুকু দেখার অনুভূতির সাহায্যে বলতে পারি, জাহাজটা আবার নড়তে আরম্ভ করছিল প্রায় তেরো চৌদ্দ ঘণ্টা পরে। স্যানহোল্ দিয়ে দেখলাম, দিনের আলো নিভে গিয়ে রাত্রি এলো। স্টুয়ার্ড দিয়ে আমাদের দেশের পায়েসের মতো একটা কিছু তৈরী ক'রে আমাকে রাত্রে খাইয়ে দিয়ে গেল সেই কুকটি, একবার আমাকে ধরে ধরে বাথরুমে নিয়ে গিয়েছিল সেই ইঞ্জিন-খালাসী আকবর। স্টুয়ার্ড এসে একটা বড়ি খাইয়ে দিয়ে গেল, ফলে রাত্রে ঘুমোলাম 'মৃত মানুষ'-এর মতো।

সকালে ঘুম ভেঙেছিল একটু দেরীতে। আস্তে আস্তে নিজেই উঠে 'বাথরুম' ঘুরে এলাম। এসে চেয়ারটিতে বসা-মাত্রই মনে হলো, জাহাজটা নড়ছে। স্যানহোল দিয়ে যতটুকু দেখতে পেলাম, তাতে মনে হলো, অন্ত'ছোট স্টীমার, যাকে জাহাজী ভাষায় টাগ্ বলে, সেইরকম 'টাগ' এসে সোহার শক্ত রশি আমাদের জাহাজের সঙ্গে লাগিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে মনের অবস্থা এমন হলো, যে আর বসে থাকতে পারলাম না। ধীরে ধীরে উঠে 'অ্যালিওয়ে' বা ভিতরকার গলিপথে-এ এসে দেওয়াল ধরে ধরে বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। স্টুয়ার্ড ওখানে দাঁড়িয়ে জলের দিকে ঝুঁকে কী যেন দেখছিল, আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে ধমকে উঠলো,—পাগল হয়েছো নাকি, অ্যা? অসুস্থ শরীরে উঠে এলে?

বললাম,— দেখতে এলাম। কোন্ বন্দরে যাচ্ছি জানো?

স্টুয়ার্ড বললে,—মোম্বাসা।

আমি তখন 'টাগ' দেখছিলাম। এ-পাশে ওপাশে দুটো টাগ, জাহাজ-রূপ পথিককে যেন দুজনে দুদিক থেকে দুহাতে ধরে সন্তর্পণে বন্দরের দিকে নিয়ে চলেছে।

দৃশ্যটা বড় অদ্ভুত লাগছিল আমার কাছে। যেন জাহাজকে নয়, আমারই ভাগ্যহত জীবনটাকে ধরে কেউ তীর-ভূমিতে নিয়ে চলেছে। আমি রেলিং-এর ওপর একটু ঝুঁকে একটি টাগকে ভালো ক'রে দেখতে গেছি, হঠাৎ খচ্ করে বুকের প্রান্তে একটা প্রবল ব্যথা জেগে উঠলো। আর যাবে কোথায়? দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম। জলে ডুবলে মানুষ যেমন একটুকু নিঃশ্বাস পাবার জন্ত আকুলি-বিকুলি করে, আমার হলো ঠিক তেমনি অবস্থা। বাকীটা মনে নেই, শুধু এটুকু মনে আছে, স্টুয়ার্ড দুটি হাত পেতে আমার পতন-শীল দেহটা ধরে ফেলেছিল।

মোম্বাসার একটি ছোট হাসপাতালে চোখ মেললাম। জাহাজের স্টুয়ার্ড বা অন্তকেউ আমার আশেপাশে ছিল না,

একটি নিগ্রো নার্স আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। বললে (কথাবার্তা অবশ্য হয়েছিল ইংরেজীতেই)—কেমন বোধ করছেন।

ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম,—আমি কোথায়?

—হাসপাতালে।

একটুক্ষণ থেমে তারপর একটু ঘন নিয়ে বললাম—,আমার বুকে চাস্টার, না?

—হ্যাঁ।

—পাঁজরার হাড় ভেঙে গিয়েছিল, না?

নার্সটি তরুণী, বললে,—সেট করে দেওয়া হয়েছে। মাসখানেক শুয়ে থাকলেই সেরে উঠবেন।

—আমার জাহাজ কোথায়, জানো?

নার্স বললে,—পোর্টে। মেরামত হচ্ছে।

আর কোনো কথা হয়নি তখন। নার্সটি আমাকে একটা ওষুধ খাইয়ে চলে গেল। শুনলাম 'ভিজিটার্স আওয়ার' হচ্ছে বিকেলে। আগ্রহে সেই বৈকালিক সময়টুকুর দিকে তাকিয়ে রইলাম, কিন্তু কেউ এলো না আমাকে দেখতে। পরদিন। না, কেউ না। তারপর দিন। কেউ না। সেই নার্সটি সেদিন এসে বললো আমার পাশে, টুল টেনে নিয়ে। বললো,—বাবা, (ওদের ভাষায় সম্মানসূচক 'বাবু' না, মশায়কে 'বাবা' বলে) দেশে চিঠি লিখবেন?

—কে লিখে দেবে?

—আমি লিখ্‌ছি। আপনি বলুন, আমি টুকে নিচ্ছি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম,—না থাক্।

নার্সটি আমার কপালে তার হাতখানা রাখলো। ধীরে ধীরে বুলোতে বুলোতে বললো,—আপনি ত ইণ্ডিয়ান?

—হ্যাঁ।

—কোথাকার লোক, আপনি? বম্বে না, ক্যালকাটা?

বললাম,—কলকাতা।

নিগ্রো মেয়েদের যেমন চেহারা হয়, তেমনি চেহারা কালো রঙ, নীচের ঠোঁটটা একটু পুরু, নাকটা একটু চ্যাপ্‌টা, চোখ দুটো গোলগোল। মাথায় কিন্তু চুল আছে। খোঁপার ওপর নার্সদের সাদা কাপড় যেমন জড়ানো থাকে, তেমনি জড়ানো। মুখখানিতে কিন্তু অদ্ভুত কোমলতা মেশানো। যেন আমার কতোদিনের আত্মীয়, এমনি অন্তরঙ্গতার সুরে বললো,—খুব একা-একা লাগে, না? আমার চোখদুটো ছল ছল করে এলো ওর কথা শুনে। কোনক্রমে বললাম—না। ঠিক আছে।

বলতে-বলতে মুখখানা পাশের দিকে ফিরিয়েছিলাম। ও আমার চিবুকের কাছটা ধ'রে মুখখানা ওর দিকে ফেরালো, বললে,—আমি একজনকে পাঠিয়ে দিতে পারি। ভাব করবে?

—কে?

ও একটু হাসলো,—তোমার কথা সে শুনেছে। তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়।

—কে সে? অন্য কোনো নার্স?

ও বললে,—না। হাসপাতালের সে কেউ নয়।

—তবে?

নার্সটি বললে,—কাল 'ভিজিটার্স আওয়ার'-এ তাকে ডেকে নিয়ে আসবো।

বলা বাহুল্য, পরদিনও জাহাজের কেউ এলো না আমাকে দেখতে। হাসপাতালের সাধারণ বেডে এ-ভাবে শুয়ে থাকা যে কী মর্মান্তিক, তা' শুশ্রূষাকারী ছাড়া কেউ উপলব্ধি করতে পারবে বলে মনে হয় না। আফ্রিকা কেমন দেশ জানা হলো না, জানা হলো না কেমন শহর—মোম্বাসা। অন্য-অন্য রোগীরা বিদেশী বলেই বোধহয় কাছে আসতে চায় না, দ্বিতীয়তঃ, ভাষাও একটা অন্তরায়। ডাক্তার-নার্সরা সময়ই বা পাবেন কোথায় আমার সঙ্গে বসে গল্প করবার? তারই মধ্যে ঐ তরুণী নার্সটি যতদূর সম্ভব আমার সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে যায়। কিন্তু তারই বা অবসর কোথায়? আমার

নিঃসঙ্গতার বেদনা সে যে বুঝেছে এটুকুই যথেষ্ট। এবং বুঝেছে বলেই কোনো-একজনকে ডেকে আনবার প্রস্তাব ক'রে গেছে সে।

সে-দিন বিকেল চারটে বাজবামাত্রই তরুণী নার্সটি এলো আমার কাছে অপর একটি তরুণীকে নিয়ে। গাউন পরা আমাদের কলকাতার অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মতো চেহারা। গায়ের রঙ কালো, তবে আমাদের থেকে বেশী কালো নয়। ভুরু দুটি একটু মোটা, মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত একটু কোঁকড়ানো। নীচের ঠোঁটের ঘনত্ব নার্সটির মতোই চোখ গোলাকার একটু বড়ো। আয়র্ল্যাণ্ড থেকে আগন্তুকা আয়র্ল্যাণ্ডবাসিনীই মনে হয়। তবে, দৈহিক গঠনে তন্বী, বয়সে তরুণীই। একটা ছাপা সিল্কের ফ্রক্ প'রে এসেছিল। হাতে একটা প্যাকেটে কিছু ফল। নার্সটি আলাপ করিয়ে দিলো,—আমার বান্ধবী, যার কথা তোমায় বলেছিলাম, মিস্ ডায়া।

নার্সটি চলে যাবার আগে ওকে টুল টেনে আমার কাছে বসিয়ে দিলো।

মহিলাটি সপ্রতিভ। ফলগুলো আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে,—খান।

আমি সম্পূর্ণ অজানা অচেনা একটি মানুষ, আমাকে এ-ভাবে কেউ দেখতে আসতে পারে, এ-আশার কল্পনার অতীত। চোখের পাতা ভিজে উঠলো, মুখখানা অন্যদিকে ফিরিয়ে অশ্রু গোপন করতে লাগলাম। উনি তা' লক্ষ্য করলেন কিনা জানি না, বলতে লাগলেন (অবশ্য ইংরেজীতেই)—আপনার কথা আমার বান্ধবীর কাছ থেকেই শুনছিলাম। কী আশ্চর্য, আপনার আত্মীয়ের কেউ আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসে না?

কোনক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে উত্তর দিলাম,—আত্মীয়দের রকমই এই। যতক্ষণ জাহাজে আছি, ততক্ষণ কাছের মানুষ, বন্দরের অর্ধ নেই, চোখের বাইরে গেলেই কেউ কারুর নয়।

মহিলাটির মুখে অদ্ভুত একটা কোমলতা ফুটে উঠলো। আমার দিকে একটু ঝুঁকে বললে,—খুব কষ্ট হচ্ছিল ত, একা-একা?

আমি মহিলাটির দিকে এবার সোজাসুজি তাকালাম; বললাম,—মিস্ ডায়া, আপনারা কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়েছেন। আমাকে দেখেন নি কোনোদিনও; জানা নেই, শোনা নেই দেখা করতে এলেন কীভাবে?

ঈষৎ একটু হাসলেন মিস্ ডায়া, বললেন,—আমার 'প্রফেশন' কী জানেন? নিঃসঙ্গকে সঙ্গ দান করা।

অবাক হয়ে বললাম,—মানে।

কণ্ঠস্বর একটু নামিয়ে বললেন,—রোজ বিকেলে চারটে নাগাৎ আমি বেরিয়ে পড়ি। কিন্তুতে রাত দশটা। মোম্বাসা টাউনটা বোধহয় দেখেননি আপনি?

(কথাবার্তা হচ্ছিল ইংরেজীতে। সুতরাং 'তুমি' 'আপনি'র ব্যঞ্জনা এ-ভাষায় পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু বলার ধরণে লক্ষ্য করছিলাম, এমন একটা সম্ভ্রমের সঙ্গে উনি কথা বলছিলেন, যাতে ক'রে 'আপনি' 'আপনি'র ভাবটি এসে পড়া স্বাভাবিক। তারই সূত্র ধ'রে আমি এখন 'আপনি' 'তুমি'র প্রয়োগ ক'রে চলেছি।)

ওঁর কথার উত্তরে বললাম,—না।

উনি বললেন,—সহরের কেন্দ্রে কতগুলি অভিজাত হোটেল ও রেস্তোরাঁ আছে। একটি হোটেলের সঙ্গে আমি সংশ্লিষ্ট। অনেক অতিথিই আসেন নিঃসঙ্গ। তাঁদের 'সঙ্গ-দান' অর্থাৎ তাঁদের সঙ্গে গল্পগুজব করাই আমার উপ-জীবিকা। সুতরাং, বুঝতেই পারছেন, আপনাকে সঙ্গদান করে আমি আমার ডিউটিই করছি।

ভীষণ অবাক হয়েই ওঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। সেই দৃষ্টিতে উনি বোধহয় একটু বিব্রতই বোধ করতে লাগলেন। চোখদুটি মুহূর্তের জন্য নত ক'রে নিজের বুকের দিকে তাকিয়ে আবার মুখ তুললেন, বললেন, অন্তত

অবাক হচ্ছেন কেন? জাহাজে-জাহাজে ঘুরছেন, এসব কথা শোনেন নি কখনো?

—না।

মহিলাটি আমার চোখের দিকে তাকালেন, কোমলকণ্ঠে বললেন,—কে-কে আছেন, দেশে?

—মা-বাবা, ভাই-বোন।

—বিয়ে করেন নি?

উত্তর দিলাম,—না।

মহিলাটি মুখ টিপে একটু হাসলেন, বললেন,—দেশে এমন কোনো মেয়ে নেই, যাকে আপনি ভালোবাসেন? এমন কেউ নেই যার স্মৃতি—

বাধা দিয়ে বলে উঠলাম,—না মিস্ তারা—না।

উনি বললেন,—বিয়ে করবেন না দেশে ফিরে?

বললাম,—জানি না। বাপ মা হয়ত—

এবার স্পষ্টতই একটু হেসে উঠলেন, বললেন,—বাপ-মা দেখেশুনে কনে ঠিক ক'রে দেন আপনাদের, তাই না?

—হ্যাঁ।

উনি বললেন,—আমাদেরও তাই ছিল। এখন আমরা বড্ড 'ওয়েস্টার্নাইজ্‌ড্' হয়ে গেছি। আমি কিন্তু বৃটান, আপনি নিশ্চয় হিন্দু?

—হ্যাঁ।

বললেন,—ঐ যাঃ, কলগুলো ঘুরেই গেল। কেটে দেবো? খাবেন?

বললাম,—নিশ্চয়ই খাবো, আপনি নিজে এনেছেন হাতে ক'রে। এখন নয়, পরে। নার্স দেখে'খন। ও খুব যত্ন ক'রে আমার।

বললেন,—হ্যাঁ ও বড়ো ভালো মেয়ে।

উনি চুপ করে কী যেন ভাবতে লাগলেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে। আমি বলে উঠলাম—মিস্ তারা?

—হ্যাঁ?

বললাম,—এই যে নিঃসঙ্গকে সঙ্গ দান করেন, এর জন্য 'ফি' নেন ত? না, হোটেল থেকে—

উনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন,—না মশাই, হোটেলকেই উল্টে কমিশন দিতে হয়। আমার উপার্জন ঐ অতিথিদের কাছ থেকেই।

বললাম,—আচ্ছা, একটা কথা বলবো? মনে কিছু করবেন না?

মিস্ তারা মাথাটা সামান্য একটু দুলিয়ে বলে উঠলেন, —না—না—বলুন না আপনি?

বললাম,—আমার টাকাকড়ি সব জাহাজে। আপনি আমাকে সঙ্গ দান করছেন—

বাধা দিয়ে তারা বলে উঠলেন—বেশ ত, ভালো হয়ে উঠে পরে দেবেন।

ওর অন্তরঙ্গ আলাপনের স্পর্শে তখনই আমি সহজ হয়ে এলাম। সত্যি বলতে কী, কোনো-একজনের সঙ্গ আমার সত্যিই কাম্য ছিল সেই সময়।

'ভিজিটিং আওয়ার' শেষ হতেই উনি পরের বিদায় নিলেন। যাবার সময় উঠে দাঁড়িয়ে মৃদু কণ্ঠে বললেন,—আসি?

সাগ্রহে বলে উঠলাম,—কাল আসছেন ত?

মুখ টিপে হাসলেন, বললেন,—আমার সঙ্গ ক্লান্তিকর লাগলো না ত?

—মোটেই না।

উনি আমার হাতটা চেপে ধরলেন, বললেন,—আসবো।

এবং সত্যিই। পরদিনও এলেন। এবং সেইরকম ফল হাতে। বললাম,—এসব আনেন কেন, বলুন ত?

উনি হেসে বললেন,—বেশ ত, পরে দাম দেবেন।

সেদিন কথায়-কথায় আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—আপনার বাড়ীতে কে কে আছেন, বললেন না ত?

মিস্ তারার মুখখানা ঈষৎ ম্লান দেখালো। বললেন,

—আমার মা-বাবা, ভাই-বোন সব আছে দেশে। এখান থেকে প্রায় একশো মাইল দূরে। এখানে প্রায় একাই থাকি বলতে পারেন।

—বিয়ে-থা করেন নি কেন?

অল্প একটু হাসলেন, বললেন,—হয়তে পরে করবো। এখন সম্ভব নয়।

—কেন?

মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল মুখখানা। তারপরে একটু ইতস্তত: করবার পর বললেন,—মিঃ ব্যানার্জী, আপনাকে আমি বলবো, কিন্তু এখন নয়, পরে। ভালো হয়ে উঠুন, তারপরে।

আমি ওর হাতের ওপর হাতখানা রেখে বলে উঠলাম, কেন এখন বলতে দোষ কি?

—দোষ কিছু নেই,—মিস্ তারা বললেন,—তবে সব দিকে সতর্ক চোখ রেখেই গোপন কথা বলা উচিত। আপনাকে আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু হাসপাতালের মতো 'পাবলিক প্লেস'-এ এ প্রসঙ্গ না তোলাই ভালো। অন্য কেউ শুনলে বিপদ হতে পারে।

আমার কৌতূহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল, কিন্তু বারবার মিনতি করা সত্ত্বেও উনি সেদিন বলেন নি। যে একটা মাস আমি হাসপাতালে ছিলাম, উনি প্রতিদিন এসেছেন, হাসি-ঠাট্টা—গল্পগুজব করেছেন, কিন্তু মুহূর্তের জন্যও ও-প্রসঙ্গ তোলেননি বা আমাকে ভুলতে দেননি।

যে দিন ছুটি পাবো, তার আগের দিন সেই নার্সটি এসে বললে,—তোমার আদালে চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছি লোক মারফৎ। কাল বেলা দশটায় তোমাকে এসে নিয়ে যাবে।

বিকেলে তারা এলে ওঁকে বললাম আমার ছুটির কথা। বললাম দেখা হবে কি করে?

একটা কার্ড তাঁর ছোট্ট ব্যাগটা থেকে বার করে আমার হাতে দিলেন, তাতে হোটেলের নাম লেখা ছিল। বললাম, এখানে গেলে দেখা হবে ত?

উনি উত্তর দিলেন,—নিশ্চয়।

বললাম অনেক টাকা পাবেন আপনি আমার কাছ থেকে, এবার দয়া দিতে হবে।

উনি বললেন, বেশ দেবেন।

পরদিন সকাল দশটায় চিফ্ অফিসার স্বয়ং এসেছিলেন আমাকে নিতে। অভিমান করে বললাম, এই মাসখানেকের মধ্যে আপনারা কেউ আমাকে একবার দেখতে এলেন না?

চিফ উত্তর দিলেন, কে আসবে? জাহাজ মেরামত করা হচ্ছে। ড্রাই ডকিং হচ্ছে, পেন্টিং হচ্ছে। যে যার কাজে ব্যস্ত। আট ঘণ্টার ডিউটির বারো ঘণ্টার ডিউটি সব। তারপর আর বাইরে বেরুনোর মেজাজ থাকে।

বললাম—জাহাজ ছাড়তে আর কতদিন?

চিফ বললেন,—সপ্তাহখানেক। তার বেশী দেরী হবে না। কাল 'ড্রাই ডক্' থেকে জাহাজ বেরুবে।

—বোম্বাইয়ে ড্রাই ডক্' আছে?

চিফ বললে,—নিশ্চয়। বোম্বাই ছোটখাটো নয়। ভাবো কী? বেশ বড়ো টাউন এই বোম্বাই।

বললাম, স্টুয়ার্ড কেমন আছে?

চীফ বললে,—স্টুয়ার্ডকেও হাসপাতালে পাঠাবার কথা হয়েছিল। বাইরে জীপে করে বেড়াতে গিয়েছিল, কীভাবে যেন 'জিটনী ফ্লাই'তে কামড়ে দেয়। প্রবল জ্বর। বেশ ভুগলো বেচারী।

'জিটনী ফ্লাই' কী?

চীফ বললে,—বোম্বাইয়ে এসেছো, আর 'জিটনী ফ্লাই'-এর নাম শোনো নি? বিষাক্ত মাছি। কামড়ালেই হলো আর কী।

বোম্বাইয়ে আছে নাকি সে-মাছি?

চীফ বললে,—না টাইনে নেই, আছে জঙ্গলের দিকে। তুমি যেন আর ভালে পড়ে জঙ্গলে বেড়াতে যেও না।

বললাম্—ওরে বাবা, এই শরীর নিয়ে বেড়াবো কোথায়?

চীফ বললে,—বাজে বকো না। বিবি নাদুস-নুদুস চেহারাটি হয়েছে। অসুখ আর তোমার কোথায়?

জাহাজে ফিরে এসব গল্পই হতে লাগলো। সেদিন কেন, তার পরদিনও বেরুনো হয়নি, জাহাজ 'ড্রাই ডক্' ছেড়ে একটি জেটীতে এসে লাগলো। জেটি বা বার্থ, যতদূর মনে পড়ে, পোটা আষ্টেক ছিল। তার মানে, আটটি জাহাজের ব্যবস্থা হতে পারে। সমুদ্রের জলকে কৃত্রিম উপায়ে ভিতরে টেনে এনে এই 'ডক'টি করা হয়েছে। এখানে সবশুদ্ধ 'ডক' নাকি পোটা চারেক। বোম্বাইয়ের মতো বড়ো নয়, তবে বোম্বাইয়ের মতো একটি দ্বীপের ওপরই অবস্থিত 'মোম্বাসা' সহর। পোর্টের কাছেই সহরের 'ক্যাসানেব্‌ল' পাড়া। অর্থাৎ কলকাতার চৌরঙ্গী আর কী। শুধু তা-ই নয়, একটা ব্যাপার দেখতে অবিকল আমাদের সেই পুরানো এস্‌প্ল্যানেডের মতো। তেমনি ঝাঁকড়া মাথা গাছ, আর তলা দিয়ে ঘুরছে ট্রামগুলো। ট্রামগুলো সেকেলে, আর বিশ্রি উজ্জ্বল রঙ করা। আমাদের কলকাতার 'হোয়াইট-ওয়ে-লেইড ল'-র বাড়ীর মতো (এখন নাম বদলে গেছে) প্রায় দেখতে এমন বাড়ীও দেখেছিলাম ও অঞ্চলে।

সঙ্গে ছিল কোর্ট অফিসার সাহানী। একটা হোটেলে ঢুকতে যাচ্ছি, ও বললে—, ওখানে ঢুকতে যেও না, 'ইয়োরোপবাসীদের জন্য' লেখা রয়েছে দেখছো না?

চমকে গেলাম। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়লো। পকেট থেকে তাড়াতাড়ি কার্ডটা বার করে ওকে দেখালাম, বললাম্—এটি চেনো?

ও নামটা পড়ে নিয়ে বললে—নিশ্চয়। ওখানেইত যাচ্ছিলাম। জানো, একজন 'বন্ধু'—পেয়েছি ওখানে।

ঠাট্টা করে বললাম,—বন্ধু না, বান্ধবী?

ও বললে,—অবশ্যই বান্ধবী। এসো।

কাছেই একটা ছোট রাস্তা ওপরে। একদিকে 'বার',—অন্যদিকে ছোট ছোট টেবিল পাতা। তারই একদিকে এগিয়ে গেল সাহানী। কার উদ্দেশে যেন বললে—হ্যালো?

এগিয়ে গিয়ে দেখি, আর কেউ নয়, সেই তিনি, মিস্ তারা। একটা কালো সিল্কের গাউন পরে বসে আছেন একটি খালি টেবিলের প্রান্তে। পূর্ব-ব্যবস্থা মতো এঁরা নাকি আগে থেকেই রিজার্ভ করে রেখে গিয়েছিল সাহানী।

তারা হাসিমুখে ওকে স্বাগত জানালো। সাহানী আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে যখন পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে, তখন তারা চোখের ইঙ্গিতে আমাকে জানালেন,—খবরদার, চেনা দিওনা।

আমিও তাই নব পরিচিতের মতো ওঁর সঙ্গে করমর্দন করে একটা চেয়ারে বসলাম। যখন গিয়েছিলাম, তখন সন্ধ্যা হয়েছে সবে। প্রায় ঘণ্টাখানেক আমরা বসে বসে খাবার দেখলাম আর গল্প করতে লাগলাম। বলা বাহুল্য ওরা দুজন চেয়ার কাছাকাছি টেনে এক্‌টু ঘনিষ্ঠ হয়েই আলাপ-আলোচনা করছিল। মিস তারার একখানা হাত ছিল সাহানীর হাতে। ঘণ্টাখানেক সময় পার হতেই হঠাৎ ঝট্ করে উঠে দাঁড়ালেন তারা, বললেন,—একটুকিউজ মি. মিঃ ব্যানার্জীর সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে। মিঃ ব্যানার্জী, দয়া করে একটু আসুন না আমার সঙ্গে?

সাহানী অবাক হয়ে গেছে, বললে,—তুমি ওকে চেনো।

মিস তারা বললেন—না, এই চিনলুম। উনি কলকাতার লোক, সেই হিসাবেই ওকে আমার একটু দরকার আছে। তুমি বসে থাকো, আমি এক্ষুনি আসছি। চুক্তি অনুযায়ী, রাত দশটা পর্যন্ত তোমাকে সঙ্গ দান করতে আমি বাধ্য। আসুন মিঃ ব্যানার্জী। বলে, আমাকে সঙ্গে নিয়ে হন্‌হন্ করে হোটেল থেকে বেরিয়ে এলেন তারা। হাত তুলে

একটা ট্যাক্সী ডাকলেন তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, —উঠে আসুন। এক যায়গায় যেতে হবে। কাছেই।

যন্ত্রচালিতের মতো আমি গাড়ীতে উঠে বসামাত্রই উনি চট্ করে এসে আমার পাশে বসলেন। ট্যাক্সীকে স্থানীয় ভাষায় কী নির্দেশ দিয়ে আমারদিকে মুখ ফেরালেন, বললেন,—সাহানীর সঙ্গে দিন তিনেক হলো আমার আলাপ হয়েছে। ও-ও ভারতীয়, তবে, আপনি কলকাতার লোক, আপনার সঙ্গেই আমার দরকারটা বেশী।

বললাম,—যেমন মিস ডামা, আজ আমি কিন্তু এসেছিলুম আপনার সঙ্গে দেখা করতে। সাহানীর সঙ্গে আপনার আলাপ-পরিচয় না থাকলেও আমি আপনার হোটেলে গিয়ে আপনাকে খুঁজে বার করতুম।

—কেন বলুন ত!

বললাম,—আমি কিছু টাকা সঙ্গে করে এনেছি। আপনার 'বিস্'টা আমি শোধ করতে চাই।

মহিলাটি অল্প একটু হাসলেন, বললেন,—বেশ ত, শোধ করবেন।

—কিন্তু, আমরা যাচ্ছি কোথায়?

—আমার ডেরায়।

বলে, সামনে তাকিয়ে ট্যাক্সীকে আবার কী যেন বললেন। ট্যাক্সী চলতে চলতে বাঁ-দিকে মুখ ঘুরিয়ে একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকে পড়লো। আমাদের কলকাতার তালতলা অঞ্চলের মতো অনেকটা দেখতে যায়গাটা। উনি বললেন,—আমার একজন বন্ধুকেও আজ, জানেন? আমি তারই সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেবো বলে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি। সে-ও আপনার মতো 'এশিয়ান।'

—এশিয়ান!

মিস্ ডামা বললেন,—হ্যাঁ। মিঃ ব্যানার্জী, সমস্ত জিনিষটা আপনি কিন্তু খুব গোপনে রাখবেন। এখানে অনেক ইণ্ডিয়ান আছেন, কিন্তু তাদের ওপর ভরসা করতে পারিনি। সাহানী ইণ্ডিয়ান, হয়ত আমাদের সাহায্যে আসতে পারতো, কিন্তু আপনি কলকাতার লোক, আপনি উপকার করতে পারবেন সব থেকে বেশী।

ততক্ষণে ট্যাক্সীটা বড়ো গলির মধ্যে একটা অপরিসর উপ-গলিতে ঢুকে পড়েছে। মিস্ ডামা সোজা হয়ে বসে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর নির্দেশ মতো একটা যায়গায় ট্যাক্সীটা থেমে গেল। মিস্ ডামা বললেন,—এসে গেছি মিঃ ব্যানার্জী, নামুন।

আমাদেরই বস্তীর মত মাটির দেওয়াল-ওয়ালা বস্তী। তবে, দেওয়ালগুলো আমাদের থেকে অনেক উঁচু, জানালাগুলোও উঁচুতে অবস্থিত, মাথার টালির ধরণ অন্য ধরণের। সুসজ্জিত মেক্সোপা শহরের মধ্যে যে এ-রকম গলি আর এ রকম বাড়ী থাকতে পারে সেটা বিদেশীদের চোখে বিস্ময়ের বস্তু হওয়াই স্বাভাবিক, আমি কোলকাতার লোক বলেই অবাক হলাম না।

গাড়ী থেকে উতরে নামামাত্র আমি বললাম,—কতো দিতে হবে ট্যাক্সীকে? আমি দেবো।

বাধা দিয়ে বলে উঠলেন মিস্ ডামা—না, আমি এক্ষুণি ফিরে যাবো ট্যাক্সীটা দাঁড়িয়ে থাকবে।

অবাক হয়ে বললাম,—তারপর? আমি ফিরবো কী করে?

মিস্ ডামা হেসে আমার হাত ধরলেন। ঘরে একেবারে ভিতরকার একটি ঘরে। ছোট একটি কেরোসিনতেলের টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় বই পড়ছিল একটি মানুষ একটা খাটিয়ার মতো বস্তুতে শরীরটা এলিয়ে দিয়ে। তার পাশে একটা বেতের ইজিচেয়ারে আমাকে বসিয়ে দিলেন মিস্ ডামা। ততক্ষণে আমার পরিচয় পর্ব সমাধা করে দিয়েছেন তিনি। আমি মানুষটির দিকে তাকালাম। অতি দীর্ঘকায় একটি মানুষ, মাথার চুলগুলি খুব ছোট করে ছাঁটা। গায়ের রং কদ্দাই, কিন্তু দেখাচ্ছে খুবই পাণ্ডুর, চোখদুটি উজ্জ্বল

কিন্তু কাটরাগত। আমাকে দেখেই স্মিত হাসিতে মুখ তার ভরে উঠেছিল। বললেন,—আমার নাম 'হিদে,'—আমি জাপানীজ্।'

মিস্ তামা স্থানীয় ভাষায় ওঁকে কী যেন বললেন, উনিও উত্তর দিলেন সেই দুর্বোধ্য ভাষায়। মিস্ তামা তারপরে ঝুঁকে আমার হাতের ওপর হাত একখানা রেখে বলে উঠলেন,—আমি চললুম, সাহানী ওদিকে বসে আছে। আপনার খাবার ব্যবস্থা 'হিদে' করে দেবে'খন।

আপনার টাকা?

আমার হাতের ওপর মৃদু একটু চাপড় দিয়ে মিস্ তামা বললেন,—পরে দেবেন।

বলে, আর দাঁড়ালেন না, দ্রুত চলে গেলেন বাইরে। একটু পরেই আমি ট্যাক্সীতে স্টার্ট দেবার শব্দ শুনলাম।

মিঃ হিদে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। আমার মুখ ফিরিয়ে ওঁর দিকে তাকাতেই বললেন,—শুয়ে আছি বলে মাপ করবেন। আমার বাঁ-পা-টা সম্পূর্ণ অকেজো। বাঁ-হাতটা অবশ্য এখনো পড়ে যায় নি, অল্প অল্প নাড়তে পারি।

বললাম,—দেখুন, সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে বড়ো অদ্ভুত লাগছে।

মিঃ হিদে বললেন,—ব্যাপারটা অদ্ভুতই মিঃ ব্যানার্জী। যখন আফ্রিকায় এসেছিলাম, তখন আমি যুবক আর আজ প্রৌঢ়। আমার বয়স এখন আটচল্লিশ। শরীর গেছে ভেঙে। জঙ্গলে সিংহের মুখ থেকে বেঁচেছি, শত্রুর বর্শার খোঁচা খেয়েও মরিনি, শেষ পর্যন্ত কাবু করলো 'জিটলি ব্যাধি'তে। ভুগে ভুগে শরীরের এই অবস্থা।

বললাম,...কিন্তু আমি আপনার কী করতে পারি মিঃ হিদে?

মিঃ হিদে শরীরকে টেনে টেনে দেওয়ালের ওপর পিঠ রেখে সোজা বসবার চেষ্টা করলেন। বাঁ-পা-টার ওপর থেকে আবরণ একটু সরে গেল। কর্সা মানুষ, কিন্তু পা-খানি একেবারে নিকষ কালো। একটা ছোয়াকাটা পায়জামা ছিল পরণে, পায়ের যতটুকু দেখা যায়, ততটুকু দেখে আমি বিস্ময়ে অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে উঠলাম। সরু একটা কাঠির মতো পা।

বললেন,—আপনি আমার অশেষ উপকার করতে পারেন মিঃ ব্যানার্জী।

আমি কথা বলতে পারছিলাম না। উনি আমার দিকে তাকিয়ে একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন,—আফ্রিকায় এসেছিলাম উনিশ শো একচল্লিশ সালের এপ্রিল মাসের তেরো তারিখে। তারিখটা আমি কখনো ভুলবো না। তখন যুদ্ধের সময়। না, মিঃ ব্যানার্জী, তখনকার জাপানী সরকারের গুপ্তচর হয়ে আমি আসি নি। আমি এসেছিলাম অন্য একটা কাজ হাতে নিয়ে। আমার পাসপোর্ট ছিল না, কিছু ছিল না, ভাবতে পারেন ব্রিটিশ-আফ্রিকার সতর্ক প্রহরা এড়িয়ে কীভাবে আমি জীবন কাটিয়েছি? একবার ধরে ফেলেও পুরেছিল। কিন্তু রাখতে পারেনি, আমি পালিয়েছিলাম। বছর পাঁচেক হলো আমি তামার আশ্রয়ে আছি। তামা না থাকলে আমি বেঘোরে প্রাণ দিতাম। মেয়েটা আত্মীয়-স্বজন সবাইকে ছেড়ে মোম্বাসা সহরে আছে আমাকে নিয়ে। কাছের একটা গ্রামের স্কুলে ও মাস্টারী করতো। সে-সব ছেড়ে ছুঁড়ে—

বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, মাস্টারী করতো! তাহলে তো উনি নিশ্চয় শিক্ষিতা?

—হ্যাঁ। গ্রাজুয়েট। কিন্তু আমার জন্য—

কথাটা শেষ করতে পারলেন না, চোখদুটো জলে ভরে এলো। নিজেকে কোনোক্রমে সামলে নিয়ে বলে উঠলেন,—কিন্তু থাক সে-সব কথা। আমি টোকিওতে ফিরে যেতে চাই। কতো বছর আমি দেশ-ছাড়া, ভাবুন তো? আমাকে আপনি একটু সাহায্য করবেন?

—কী ভাবে?

বললেন,—আপনার জাহাজ ছাড়ছে সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই। যদি আমাকে নিয়ে যেতে পারেন! আমার পাশপোর্ট নেই, লুকিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

প্রস্তাবটা শুনে শিউরে উঠলাম। জাহাজের আমি সামান্য কেরানী, আর তা ছাড়া, এ-কঠিন কাজের জন্য আমাকেই বা কেন উনি বেছে নিলেন, তা-ও সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য আমার কাছে। একটুক্ষণ চিন্তা ক'রে তারপরে বললাম,—আমার জাহাজ যাচ্ছে বোম্বে।

উনি সাগ্রহে বললেন,—বোম্বেতে পৌঁছে দিলেই হবে। সেখান থেকে কলকাতায় যাবো ট্রেনে। কলকাতায় পৌঁছতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত। অনেক বাঙালী আছেন সেখানে, নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন। ওখান থেকে প্লেনে টোকিও পৌঁছতে আমি পারবোই।

বললাম,—কিন্তু জাহাজে বোম্বাই বা আপনাকে নিয়ে যাই কী করে! আপনি এখানকার জাপানী রাজদূতের অফিসে—বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, সে চেষ্টা তারা যে না করেছে এমন নয়। সেটা সম্ভব হয়নি। সে-সব রাজনৈতিক জটিলতার কথা না আলোচনা করাই ভালো। আপনাকে ত আগেই বলেছি, জাপান সরকারের গুপ্তচর হয়ে আমি আফ্রিকায় আসি নি। রাজনৈতিক কারণেই এসেছিলাম, কিন্তু সরকারী কাজ নিয়ে নয়।

বললাম—মিঃ হিথে, আপনার কথা কিন্তু আমি এখনো ঠিক বুঝতে পারছিনা।

বললেন,—মিঃ ব্যানার্জী, আপনি বাঙালী, সেইজন্যই আপনাকে ডেকে আনিয়েছি। আমার সব কথা শুনলে আপনি নিশ্চয় সমবেদনা অনুভব করবেন। সেই ১৯৩১ সালে আমি আফ্রিকায় এসেছি কোন একটা বিশেষ 'মিশন' নিয়ে, একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। বুঝতেইত পারছেন, আমি একজন বিপ্লবী ছিলাম। আমরা বুঝেছিলাম, আফ্রিকা এশিয়ার সংহতি না গড়ে উঠলে, 'আফ্রিকা ও এশিয়ার মুক্তি না ঘটলে সমগ্র প্রাচ্যদেশ মুক্তি পাবে না, স্থায়ী শান্তিও অর্জন করতে পারবে না।

আমি অবাক হয়ে মানুষটির মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। মিঃ হিথে আবার বললেন,—আমাদের আদর্শের প্রসারণ আমি এখানে যথাসাধ্য ক'রেছি। এখন আমার শরীর অসুস্থ। আমার বুড়ী মা আজও বেঁচে আছেন, আমি দেশে গিয়ে তাঁরই কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চাই।

সত্যি কথা বলতে কী, আবেগে আমার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কোনক্রমে বলছিলাম,—আমি ক্ষুদ্র মানুষ, কিন্তু আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো আপনাকে আমার দেশে নিয়ে যেতে।

আর কোনো কথা হয়নি। একটা ওদেশীয় ছেলেকে ডেকে ট্যাক্সী আনালেন, সেই ছেলেটিই ট্যাক্সীওয়ালাকে বলে দিলেন আমার গন্তব্য স্থান, সেই হোটেলটির নাম।

তখনো রাত দশটা বাজতে অনেক দেরী, হোটেলে পৌঁছে আমি সাহানী কিম্বা মিস্ ভাণ্ডা, কাউকেই দেখতে পেলাম না। সেই টেবিলটি ঘটনাচক্রে শূন্য ছিল, তারই একটি চেয়ারে বসে রইলাম। একটি ওয়েটার এসে বললেন,—এখানে বসবেন না। সংরক্ষিত আসন। মিঃ সাহানী এও পার্টি, দেখছেন না কার্ড রয়েছে?

বললাম,—সেই পার্টিরই আমি একজন। সাহানী কোথায়?

ওয়েটার আমার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন, তারপরে কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো,—একটু বসুন। এখুনি আসছে। কী খাবেন ততক্ষণ?

এক কাপ কফি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। কতো লোকজন—কতো সুবেশ তরুণ ও তরুণী, কিন্তু আমার কোনোদিকে মন ছিল না। অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলাম, কখন মিস্ ভাণ্ডা আসবেন। তা' প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা

করবার পর ওরা এলেন, হাসতে-হাসতে, হাত ধর ধরি করে। একটু দূর থেকেই আমাকে দেখতে পেয়েছিলেন মিস্ তামা; হাসি থামিয়ে ওর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি আমার কাছে ছুটে এলেন। কিস্ কিস্ করে বললেন,- সব ঠিক আছেত?

বললাম,—হ্যাঁ।

ততক্ষণে সাহানী এসে পড়েছে। চোখ ছোট ক'রে হাসতে হাসতে বললে,—কেমন কাটলো? মিস্ তামা তোমাকে তাঁর এক বান্ধবীর কাছে নিয়ে গিয়েছিল ত? কেমন খেলেটা?

সংক্ষেপে বললাম,—ভালো। সাহানী, তুমি আজকে ফিরবে ত?

নিশ্চয়।

—এখুনি?

—এখুনি।

উঠে দাঁড়ালাম,—সাহানী, তুমি তাহলে যাও, আমি মিস্ তামার সঙ্গে একটু কথা বলবো। আপত্তি আছে?

—আরে না-না, সাহানী আনুষ্ঠানিক ভাবে মিস্ তামাকে 'কাল দেখা হবে' বলে অভিবাদন জানিয়ে মুখে একটা শিস্ তুলে হোটেলের কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল।

মিস্ তামা বললেন'—ও বোধ হয় পেমেন্ট করছে। হোটেলে আর থাকা চলে না। এসো বাইরে, একটি পার্কে গিয়ে বসি। আমাদের কলকাতার সেকেলে 'কার্জন পার্ক'-এর মতো একটা পার্ক ছিল কাছেই। তার সমস্ত আসনই ছিল ভর্তি। আমরা একটু নির্জনতা খুঁজে নিয়ে ঘাসের ওপর গিয়ে বসলাম। বললাম,—মিঃ হিথের সবকথা আমি শুনেছি। আমি ক্যাপ্টেনকে গিয়ে আজই বলবো। ক্যাপ্টেন ইচ্ছে করলে সবই পারে। ওকে একটা ছাচের 'টুইন ডেকে' লুকিয়ে রাখলে পুলিশ কিম্বা কাস্টমস্ কেউ টের পাবে না। মনে হয়, একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবেই।

মিস তামা সব ভুলে আমার হাত দুটো চেপে ধরলো, বললে,- ওকে নিয়ে যাও - ও আর বাঁচবে না।

বলতে বলতে ঝরঝর্ করে কেঁদে ফেললেন মিস্ তামা।

বললাম,—ওকে তুমি খুব ভালোবাসো, না?

মুখ তুললেন তামা, বললেন,—ও-কথা থাক। তুমি পারবে ত?

– চেষ্টা করবো, বললাম,—তোমার কথাও শুনেছি মিঃ হিথের কাছ থেকে। তুমি এক আশ্চর্য মেয়ে।

—না-না ওসব কিছুই নয়, তামা বললেন,—সামান্য তুচ্ছ একটা মেয়ে আমি।

—বললাম,—কোথায় গেছলে সাহানীর সঙ্গে?

তামা বললেন,—এই পার্কের দিকেই এসেছিলাম। ও বললে,—একটু বাইরে চলো, হোটেলের ঘর 'দম-বন্ধ করা' বলে মনে হচ্ছে। আমি রাজি হয়ে ওর সঙ্গে গেলাম। কিন্তু, পরে বুঝলাম, ওর উদ্দেশ্য ছিল অন্য। আমি না হেসে গিয়ে ওকে ধীরে সুস্থে বুঝিয়ে বললাম, আমার প্রফেশনের কথা। আমি শিক্ষিকা। Intellectual companionship দান করাই আমার জীবিকা। অন্যকিছু নয়। ও চলে যাবে, ওর হাতে বেশ কিছু টাকা তুলে দেওয়া দরকার।

বললাম, —ও বুঝলো?

তামা বললেন,—সমবেদনার সঙ্গে বুঝিয়ে বললে বুঝবে না কেন? আমি আমাদের দেশের চলিত কয়েকটি গল্প বলে দৃষ্টান্ত দেবার চেষ্টা করলাম। বললাম, স্ত্রী পুরুষের মধ্যে নির্দোষ বন্ধুত্ব নিশ্চয়ই গড়ে উঠতে পারে।

ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম কয়েক মুহূর্ত। কালো চেহারা, নীচের ঠোঁটটা পুরু। কিন্তু সব ছাপিয়ে কী এক অনির্বচনীয় আভা যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে সেই পবিত্র মুখখানা থেকে।

আমি মুখ নীচু করলাম। পকেট থেকে ব্যাগটা বার করে বললাম,—আমার কাছেত তোমার কিছু টাকা পাওনা

। আমরা আহাজে উঠ্‌লাম সেটিই ছিল মোম্বাসা
াজের শেষ-সন্ধ্যা, এবং সেই শেষ-সন্ধ্যাতেই সাহানী সে
হোটেলে, রাত দশটা পর্যন্ত তার বান্ধবীর সঙ্গে 'সুখে
টিয়ে আসতে। কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে এসেছি
ানী মনের মধ্যে অসীম বিরক্তি আর বিতৃষ্ণাকে বহ
ে। বললে,— জানো মিঃ ব্যানার্জী, সেই মেয়ে মানুষটা
া আর পেলাম না। আমার সঙ্গে 'এন্‌গেজমেণ্ট' করে
থায় চলে গেছে, কে জানে! স্রেফ গল্প করতাম, আর ত
ু নয়। এ-কথা সত্যি, ভদ্রমহিলা কথা বলতে পারেন
তে! কী যে বলো, আমি তাকে টাকা দিতাম, তাঁর
ার দরকার ছিল। কিন্তু কোথায় কে? সন্ধ্যাটাই মাটি।

কিন্তু আমার মন সেই মেয়ে মানুষটির উদ্দেশেই ধাবমান
াবে আনাগো।

হাজে এনে তুলেছিলাম,
কা'র টুইন ডেকে, বড়ো-বড়ো
সে অন্য ইতিহাস, অন্য কাহিনী।
য়োজন, যে-সন্ধ্যায় মিঃ হিদেকে

(নীলপাড়া নির্জন-এর শেষাংশ ৪৯৮ পৃষ্ঠার পর)

শান্ত নির্জীব প্রায় বোবা হয়ে আসা মানুষটা হঠাৎ ক্ষেপে উঠল কিছুদিন পরে। খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল তাঁকে। ভয়ানক অস্থিরতার মধ্যে তিনি সারা ঘরময় দ্রুত পায়চারী করে বেড়াচ্ছিলেন। ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল যতীন। কিছু একটা নিশ্চয় ঘটেছে—যতীন ভেবে নিতে পারল। কিন্তু কিছু শুধালো না। চুপ চাপ এসে দাঁড়াল। ঘরে।

'এই যে যতীন। প্রবাসজীবন কেমন অদ্ভুত গলায় বললেন। প্রায় ছুটে গেলেন বিছানার দিকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে বালিশের তলা থেকে একটি চিঠি বের করে আনলেন। 'জানো আমার নাতনীর বিয়ে . '।

'তাই নাকি।' এগিয়ে গেল যতীন। 'দারুণ সুখবর ··'

'আর দারুণ।' প্রবাসজীবন ইজিচেয়ারে বসলেন। 'কী আশ্চর্য ওরা একটা খবর পর্যন্ত আমার আগে জানায় নি। আমায় জিজ্ঞেস করলে কি বাধা দিতাম নাকি আমি? প্রভাত আমার কোনো দিন এ সম্পর্কে কিছু বলে নি। অথচ কী আনন্দের খবর তুমিই বলো যতীন। ওরা···ওরা আর আমার, আশ্চর্য মানুষ বলেই গণ্য করেছে না—কেন, আমি কী তোদের কেউ নই!' আচমকা প্রায় লাফিয়ে উঠলেন চিঠিটা খুললেন। পড়ছিলেন। 'বিয়ে বাড়িতে গোলমাল খুবই হবে, তুমি এলে খুব মুস্কিলে পড়বে বাবা। এ-সব তোমার স্বাস্থ্যে সইবে না—' পড়তে পড়তে চিঠিটি ভয়ানক আক্রোশে দলা পাকালেন প্রবাসজীবন। জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। লাথি মেরে টিপয় উলটে ফেললেন। কাঁচের গ্লাস কাপটাপ আছড়াচ্ছিলেন। ভয় পেয়ে যতীন বেরিয়ে এসেছিল তাড়াতাড়ি।

পরদিন সকালে, খোঁজ করতে এসে যতীন দেখল, দরজায় গোড়ায় দু' একজন লোক। হেঁটমুখে ডাক্তার বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

'কী হ'ল, কী—' ভয়ঙ্কর উৎকণ্ঠা উদ্বেগ নিয়ে ছুটে এলো যতীন। 'কী হয়েছে ডাক্তারবাবু?'

'সব শেষ।'

'সব?' যতীন অবাক, যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। দমবন্ধ করে যতীন চোখের জল চাপলো। তারপর দরজা ঠেলে ঢুকল এই ঘরে। আশ্চর্য, এই প্রথম যতীন প্রবাস-জীবনকে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখল। তার সারা মুখে কোনো পরিবর্তনের নেই। মুখে প্রশান্তি, চোখ নিমীলিত, শুকনো ঠোঁট দু'টি এক হয়ে আছে—তার মধ্যে একটি মোটা রেখা। সারা ঘর টিপটাপ পরিচ্ছন্ন গোছানো—মনে হচ্ছে যেন কিছুই হয় নি। জানালা খোলা, বইয়ের উন্মুক্ত মাঠের শীতল হাওয়া ঘরে এ-ঘরে আছড়ে পড়ছিল। যতীন ভাবতে পারল না। হৃদ্‌যন্ত্রের চাপ মাত্র কয়েকটা ঘণ্টার মধ্যে কী করে একটা জীবন কেড়ে নিল? যতীন কাঁদছিল।

সব শেষ। যে নদীতীরে নিবারণ চক্রবর্তীর পরম শত্রু ছিল, প্রবাসজীবনকে দাহ করা হ'ল সেখানে। গোটা স্যানাটোরিয়ামের সবাই এসেছিল শ্মশানে। প্রভাত তার স্ত্রী, ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসেছিল। কলকাতা ও আশপাশ থেকে এসেছিলেন প্রবাসজীবনের কয়েকজন বন্ধু আর জ্ঞাতিরা। শেষ কৃত্য সমাপ্ত হ'লে সবাই এলো স্যানিটোরিয়ামের লাইব্রেরী ঘরে। ছোট একটি সভার ব্যবস্থা।

সবাই কিছু কিছু বললেন। বললেন, প্রবাসজীবন ছিলেন ঈশ্বরের মতন। মহৎ, উদার, পবিত্র, জ্ঞানী, কর্মনিষ্ঠ, আদর্শবান, স্নেহপ্রবণ। প্রভাত নিজে চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'আমার বাবার সবচেয়ে বড় পরিচয় এই যে তিনি

বিবেকবান, ধুরন্ধার ছিলেন। একা থাকতে ভালবাসতেন। কতদিন আমি বলেছি, বাবা শেষ কটা দিন তুমি কেন আলাদা থাকবে। সংসারে বটগাছের মতন তুমি। তোমার কাছে থেকে তার ছায়ায় আমাদের শান্তি পেতে দাও। কিন্তু আশ্চর্য, বাবা কিছুতে রাজি হন নি ...'

'মিথ্যেবাদী।' কে যেন চিৎকার করে উঠেছিল। সবাই তাকাল, খুঁজল কিন্তু খুঁজে পেল না মানুষটিকে। কারণ যতীন, দরজার পাশ থেকে চিৎকার করে উঠে ছুটে বেরিয়ে এসেছিল। এসেছিল গোরা মাঠে। মাঠ ছেড়ে নদী-তীরে। শ্মশানে। জলভরা চোখ নিয়ে সেই নিঃশব্দ নির্জন শ্মশানে বসে কাঁদল যতীন। যেন অদৃশ্য সেই ঘুমন্ত মানুষটাকে বলছিল, 'বাবু, কোনোদিন মানুষকে তুমি বিশ্বাস করো না! মানুষের মধ্যে তুমি থেকো না। তার চেয়ে এই নীলপাড়ার নির্জন নদীতীরে একলা ঘুমিয়ে থাকা অনেক ভালো। অনেক।'

With the best Compliments of

A. R. PRIVATE LTD.

IMPORTERS & DISTRIBUTORS OF
MOTOR VEHICLE PARTS & ACCESSORIES

59, BENTINCK STREET
CA_CUTTA-1

[৫৫৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

পৌঁছে গেছি বেলফাষ্ট শহরের ফ্রিং ফিল্ড রোডে। বাড়ীর দরজায় লেখা রয়েছে "House of Naizors" দরজায় নেইজার সাহেবের মা আমাকে পেয়েই কোলে তুলে নিলেন। নেইজারের ছোট ভাই-বোনেরা সব আমাকে ঘিরে গল্প জুড়ে দিল। আবার দেখছি নেইজার সাহেবের মা আমাকে চুমু খাচ্ছেন। আর তাঁর ছেলের জন্য কাঁদছেন। কতবছর বেলফাষ্ট শহর ছেড়ে বাংলাদেশের কোন্ এক অজ পাড়াগাঁয়ে শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে. তাঁর ছেলে। ভাবছেন আর কাঁদছেন। তাঁর চোখ বেয়ে-পড়া জল আমার দু'গাল ভাসিয়ে দিচ্ছে। দুপুরে খবর পেয়ে নেইজার সাহেবের মাসীমা ডোরাগ্রীন দৌড়ে এলেন। অনেকদিন বিয়ে হলেও ছেলে পুলে তাঁর হয়নি। আমাকে দেখেই কোলে তুলে বুকে চেপে ধরলেন। স্নেহের স্পর্শে চোখ বুজতেই যেন দেখলাম আলমারী খুলে আমাকে মস্ত একটা পুতুল হাতে তুলে দিচ্ছেন। বিহ্বলতা কাটতেই দেখি নেইজার সাহেব আমার হাতে মস্ত বড় একটা পুতুল দিয়ে আমাকে কালোদির কোলে সঁপে দিচ্ছেন। এরপর ছাড়া পেলেই লুকিয়ে লুকিয়ে সাহেবের বাংলোয় ঢুকে আবোল তাবোল বকবক করে যেতাম; আজ যে কথা ভাবলেও পুরানো স্মৃতি আমাকে আনমনা করে তোলে। এ যেন এক নেশার বাসা—সুযোগ পেলেই সাহেবের বাংলোয় ঢুকে চোরের মতন পা টিপে টিপে ড্রয়ারের পাশে দাঁড়ান। ছোট্ট ছোট্ট হাত দিয়ে তাকে আদর করা, জামার কোণ দিয়ে ড্রয়ার্সের ধুলো ঝাড়া আর জেগে জেগে স্বপ্ন দেখা। এ যেন এক অদ্ভুত ভালবাসা। মসৃণ বার্নিশের ওপর নিজের ছায়া দেখে তন্ময় হয়ে যেতাম এবং সেই তদ্গত অবস্থায় বেলফাষ্ট শহরের নেইজার পরিবারে এসে উপস্থিত হতাম। নেইজার সাহেবের মায়ের কোলে উঠে গাল পেতে দিতুম তিনি কাঁদতেন আর তাঁর চোখের জল আমার গাল বেয়ে টপ টপ করে পড়ে আমার দেহ ও মনকে এক অজানা লোকে নিয়ে অদ্ভুত রহস্যের নেশা ধরিয়ে দিত। মাঝে মাঝে ধরাও পড়ে যেতাম, নেইজার সাহেব পিছন থেকে এসে আমাকে আচমকা শূন্যে তুলে ধরে, পত্রপাঠ সেই ড্রয়ার্সের ওপর বসিয়ে দিতেন। ছবির পাশে ছবিটি হয়ে বসতে বেশ ভালই লাগত। এভাবে কাটলো পোটা বছর। আরও বড় হলাম। স্কুলে ঢুকবার সময় এসে গেল।

চলে এলাম, সবাইকে ছেড়ে, দেশের বাড়িতে। স্কুলে ভর্তি হয়ে বোর্ডিংএ এসে উঠলাম। দু'তিন বছরের মধ্যেই বাবা ম্যানেজার হয়ে চলে গেলেন আর এক নতুন শহরে। তবু সেই ছোট্ট পাটের শহর আর সেই চেষ্ট-অফ-ড্রয়ার্স আমাকে যখন তখন হাতছানি দিয়ে ডাকতো—সব ভুলে যেতাম। আবার সেই কল্পনার দেশ—শহর বেলফাষ্ট, নেইজার সাহেবের মা, ডোরামাসী। এবার আমার চোখের জল ঝর ঝর করে গাল ও ঠোঁট বেয়ে গলার কণ্ঠিতে এসে যেন এক তারার ফুল হয়ে আমাকে আচ্ছন্ন করে এক তারা ফুলের সাগর সৃষ্টি করত। সাগরের জলে অস্তগামী সূর্যের লালিমার পরশ আশ্চর্য মায়ার সৃষ্টি করত। আর নেইজার সাহেবের সেই স্নেহ-সিঞ্চিত মুখ আমাকে আবিষ্ট করত। আমরা যে পৃথিবীর দু'প্রান্তের লোক ভুলে যেতাম। এ যেন এক অচ্ছেদ্য সূত্রে গাঁথা মানুষের আত্মা।

ম্যাট্রিক পাশ করে এলাম কলকাতায়। সাহেবদের কলেজ। ছোট্ট ছেলে সবাই যেন আদর করছেন। এক দিন অধ্যাপক এক্রয়েড সাহেবের ঘরে ঢুকে আবিষ্ট হয়ে দেখলুম এক চেষ্ট-অফ-ড্রয়ার্স। সেই আবেশে মন আমার ফিরে গেল অতীতে। সেই পাটের শহর, গোমতী নদী, ছোট্ট ছোট্ট ষ্টীম লঞ্চ, রঙ বেরঙের ডিঙ্গি নৌকো, সাহেবের বাংলো—নেইজার সাহেব, সস্ত্রীক ফিরতেই দেখি

একদৃষ্টে সাহেব গভীর স্নেহে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

বড় হয়ে উঠছি, কৈশোর আর যৌবনের সোনার হিন্দোলায় যেন দুলছি ও দুলাচ্ছিই। বি. এ. পড়ি—টেনিস খেলি, দামী দামী সাবান সেণ্ট মাখি—কি বুঝি আর কি বুঝি না বা কিছুই বুঝি না ঠিক এমনি সময়ে চলে গেলাম দেশের বাইরে। সাতবছর পরে যখন দেশে ফিরলাম বয়েস তখন পঁচিশের কোঠায়।

বাড়ীতে সবাই আমাকে পেয়ে খুশি। বাবা জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করলেন। যিনি সব চেয়ে বেশী খুশি হতেন আমাকে দেখলে, মা তিনিই তখন নেই। কাঁদলাম না, শুধু আমাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে মায়ের সেই ফোটোর দিকে তাকিয়ে রইলাম। ছায়া ছবির মত সব ভেসে চললো—কত স্নেহ, আদর, ভালবাসা—যেন একখানা আস্ত বই। সে-বই শ্বেতপাথরের বাক্সে বন্ধ করে মা যেন আমার জন্যে লুকিয়ে রেখে গেছেন সামনের ঐ কালো পালিশ করা আলমারীতে, আলমারীর দিকে তাকাতেই সব যেন ভুল হয়ে গেল। সেতারের বাঁধি ঠাঁট যেন টং টাং করে ছিঁড়ে ভেঙে আলগা হয়ে এল, প্রকৃতিস্থ হতেই বাবার কাছে গিয়ে বসলাম।

পরেরদিন বাবা আমাকে দুখানা পুরোনো চিঠি ও একটি এলবাম দিলেন। চিঠি দুখানা বেলকাষ্ট থেকে ডোরামাসী, নেইজার সাহেবের অসুখ ও তাঁর মৃত্যুসংবাদ দিয়ে দিয়েছিলেন।

এলবাম খুলতেই নেইজার সাহেবের নাম সই। চোখের সামনে ভেসে উঠলো নেইজার সাহেব,—দুঃখের আলোতে বেয়ে চললো শহর বেলকাষ্ট, লেগান নদী, অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট, এলবার্ট ষ্ট্রীট, প্রিংফিল্ড রোড—নেইজার সাহেবের মা, ডোরামাসী। আবার দেখছি সেই নদীর পারের ছোট্ট সাজানো গোছানো পাটের শহর, রাস্তার পাশে ছোট্ট ছোট্ট বাংলো, ফুলের বাগান, টেনিস কোর্ট। রাস্তার পাশে নারকেল গাছের বৃক্ষবলয়, নদীর গায়ে অসংখ্য ছোট ছোট ষ্টীম লঞ্চ, বড় বেরঙের ডিঙ্গি। চাঁদনী রাতে যেন এক রূপকথার পুরী। নদীর ওপারে পুরানো ভাঙ্গা নীলকুঠি ও লাগোয়া ঠাসা বন। সব মিলিয়ে রাত্রির এক অপরূপ রূপ। চাঁদের আলো নারকেল বনের ওপর পড়ে ঠিকরে উঠে আকাশের কোণে এক আলোর ছায়াপথ তৈরি করে কিছুক্ষণের জন্য চাঁদকে ধরে রাখলো। আকাশের গায়ে এক জোড়া চাঁদ যেন আমাদের সামনে ভেসে চললো—চললো তার সঙ্গে এগিয়ে এক স্বর্গভূমি। আলো আর শ্রীর উৎস। উৎসারিত হচ্ছে এক অপূর্ব সুর। আমি ও নেইজার সাহেব সে সুরের মূর্ছনায় দেখতে পেলাম সেখানে বসে গেছে স্বর্গের দেবতাদের নাচ-গানের আসর। সেই দেবলোকের সভায় শুনতে পেলাম:

ইদং সত্যং সর্ববাং ভূতানাং মধু
ইদং অমৃতং ইদং ব্রহ্ম, ইদং সর্বম্।

দমকা বাতাসে হঠাৎ দরজাটা শব্দ করে বন্ধ হয়ে সুর কেটে দিয়ে গেল। নিয়ে এল আবার মর্তভূমিতে।

দু'এক দিনের মধ্যেই বাড়ীর ও গ্রামের প্রায় সবার সঙ্গেই দেখা হল। অনেকদিন পরে দেশে এসেছি একটা কিছু করতে হবে জানি কিন্তু কোন তাড়াহুড়ো নেই। তাই ফিরিয়ে দিচ্ছি নিশ্চিন্তে। বাড়ীতে লক্ষ্য করলাম একটি চালাক চতুর ছুতোর মিস্ত্রি কাজ করছে। বুঝলাম অনেকদিন ধরেই বড়লোকের বাড়ীর একাজ-সেকাজ করে দিন কাটাচ্ছে। আমি মাঝে মাঝে কৃষ্ণমিস্ত্রিকে ডেকে একটু আধটু কথা বলি। আবার হয়তো এক সপ্তাহ পর দু'চারটে কথা বলি। এভাবে কেটে গেল প্রায় একমাস। কৃষ্ণমিস্ত্রি আমাকে দেখলেই একটু আলাপ করবার জন্য এগিয়ে আসে। প্রশ্ন করি মিস্ত্রি তোমার বাড়ী কোথায়?

উত্তর আসে—আজ্ঞে বিক্রমপুর। এভাবে একথায় সেকথায় কেটে গেল আরো একমাস। আমার কেমন মনে হল, আমাদের কথাবার্তা আমাদের অজ্ঞাতে কোথায় যেন নিয়ে চলেছে। এর পিছনে কার যেন এক অলক্ষ্য হাত কাজ করছে কিন্তু সঠিক কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি।

মিস্ত্রির সঙ্গে প্রায়ই এখন দেখা হয় বা স্বেচ্ছায় দেখা করি এবং এটা-ওটা প্রশ্ন করি—সে কি কাজ জানে এবং কোথায় কোথায় কাজ করেছে তাও। মিস্ত্রিও জবাব দিয়ে এগিয়ে চলছে আমার মনের সঙ্গে। সেও যেন বুঝতে পেরেছে বাবুর মনের মধ্যে কিসের ঝড়। আরো কিছুদিন পর কৃষ্ণমিস্ত্রি বুঝে নিল যে আমি মনে মনে একটা ফার্নিচারের নক্সা এঁকে চলছি। একদিন সে আমাকে প্রশ্নই করে বসল 'বাবু কিছু বানাইবার মতলব করছেন নিকি?' 'না, তেমন কিছু না বলে সেদিন চুপ ক'রে গেলাম।'

আরো বেশ কয়দিন কেটে গেল। একদিন বাড়ীর বাইরের যে ঘরটাতে মিস্ত্রি কাজ করে সেখানে গিয়ে আমি তার কাজ দেখতে লাগলাম। মিস্ত্রি যেন অনেকটা বুঝতে পারলো যে আজ আমি কিছু স্থির করেই তার কাছে এসেছি। সে কোন কথা না বলেই গভীর মনযোগের সঙ্গে কাজ করতে লাগল। আমাকে সময় দিলো যাতে আমার মনের ভাব তাকে ঠিকমত বলতে পারি। আমিও একটু এদিক ওদিক দেখে বললাম কৃষ্ণমিস্ত্রি এর আগে আর কোথায় কোথায় কাজ করেছ। কৃষ্ণমিস্ত্রি সে ইশারা বুঝল। সে অনর্গল এ-বাড়ী সে বাড়ীর নাম করে গেল—এমন কি সে আমার বাবার অফিসের ছোট সাহেব পিটার সাহেবের একগাদা ফার্নিচারের কর্ম দিলো। আমি ছোট একটু "ও" বলতেই মিস্ত্রি কি ভেবে যেন বলে উঠলো 'তা ক্যান বাবু; একা পিটার সাহেবের কাম করম ক্যান। ঐ যে আর্ভিন কোম্পানীর করবেট সাহেবের তামাম বাংলোর কাজ আমিই করছি। জানেন তো ডেভিড অফিসের সাইমন সাহেবের অমন যে কেট-কেটে মেম তাইনও কিন্তু আমার কামের কোন খুঁত ধরতে পারে নাই'। অনেক কথা সে বলে গেল সেদিন। আমি আর কিছু বললাম না। গড়িয়ে গেল আরও দিন পনর। এভাবে প্রায় তিন মাসের বেশী কেটে গেল। অনেক ভেবে চিন্তে মনকে অনেকটা তৈরি করে নিয়ে একদিন সন্ধ্যার পর মিস্ত্রিকে বললাম "কৃষ্ণমিস্ত্রি একটা ভাল চেষ্ট-অফ-ড্রয়ার্স তৈরি করতে পারবে কি?" মিস্ত্রি আমার গলার স্বর শুনে একটু চমকে গেল। সে যেন আমার এ স্বর আগে আর শোনে নি। তার মনেও যেন ঘুরের একটা ঢেউ এসে লাগলো। সে যেন একেবারে মুছে গিয়ে বলে উঠলো—"কিরকম বানাইবার চান বাবু?" কিছুই যেন তার বলবার নেই। এই সেদিনকার বলা পিটার সাহেব, আর্ভিন কোম্পানীর করবেট সাহেব, ডেভিড কোম্পানীর সাইমন সাহেবের কেটকেটে মেম, সব যেন সে ভুলেই বসলো। আমি একটু থেমে শুধু বললাম—"ঠিক আছে মিস্ত্রি তোমাকে দিন কয়েক পরে বলবো।"

এভাবে দিন কাটতে লাগলো। নিজেকে অনেকটা তৈরী করে নিতে লাগলাম। দেখলাম শৈশবের সেই নেইজার সাহেবের বাংলোর চেষ্ট-অফ-ড্রয়ার্স আমার মনে এক গভীর ছাপ রেখে গেছে। একদিন মিস্ত্রিকে ডেকে আমাদের দালানে নিয়ে এসে কেমন ড্রয়ার্স হবে, তার কি রঙ হবে এবং ঘরের কোন বায়গায় তা থাকবে তাও তাকে বলে কয়েকদিন পরে যেন সে আমার সঙ্গে আবার এসে দেখা করে এই নির্দেশ দিয়ে তাকে বিদায় দিলাম।

দু একদিন পর বাবার কাছে আমার এই মনের বাসনা নিবেদন করলাম। বাবা বেশ খুশি হলেন। তিনি যেন দেখলেন আমি সেই পাঁচ ছয় বছরের প্যান্টপরা ছেলে সেই

ছোট্টো পাটের শহরের এ-বাংলো সে-বাংলো ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমাকে খুঁজে না পেয়ে মা যেন বলছেন "যাবে আর কোথায়? দেখ গিয়ে নেইজার সাহেবের বাংলোর দেরাজের সামনে ঘুর ঘুর করছে।" বাবার মুখের দিকে তাকাতেই যেন মায়ের সেই স্নিগ্ধ হাসির আলো ভেসে উঠলো। জ্যোৎস্নার আলোয় যেন মায়ের আশীর্বাদ আমার চোখেমুখে এক আঁজলা শান্তিজল ছিটিয়ে দিল। বাবাও যেন মায়ের কথা ভেবে দুফোঁটা চোখের জল ফেললেন। সব ঘটে গেল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে। এরপর বাবার উৎসাহ গেল বেড়ে। আমার সঙ্গে এনিয়ে কথা বলতে লাগলেন—মিস্ত্রিকে টাকা দিলাম কিনা? শহরে নিজে খুঁজে পেতে যেন ভাল কাঠ কিনি, আজকাল আর সে আগের বর্মার সেগুন নেই। সব তিনি বলছেন যেন ড্রয়ার্সের কাজে আমি নিরুৎসাহী না হয়ে পড়ি। এ না হলে যেন তাঁর বড় কষ্ট হবে। এর মধ্যে যেন তিনি মায়ের নিবিড় সান্নিধ্য পাচ্ছেন। আমরা দুজনে যেন চুপি চুপি ড্রয়ার্সের নক্সায় আত্মস্থ হয়ে উঠলাম।

এমনি করে আরো কিছুদিন কেটে গেল। কাল-ক্ষেপণ নয় এ যেন প্রস্তুতি পর্ব। মাঝে মাঝে আমি যেন চোখের সামনে উদ্ভাসিত সেই ড্রয়ার্সটি দেখতে পেতাম এবং সে-দেখা পরে বিশেষ কাজে লেগেছিলও মিস্ত্রিকে টুকটাক উপদেশ দেওয়ার পথে। প্রথম দিকে কাজ খুব তাড়াতাড়ি এগোতে লাগল, কিন্তু পরে আমি ও মিস্ত্রি দুজনেই বুঝে নিলাম, তাড়াতাড়ি করার এ জিনিষ নয়। তাড়াহুড়োয় তা নিজস্ব অনন্যতায় রূপ নেবে না উল্টো নষ্ট হয়ে যাবে। এ আসবাবকে অনেক সুরের গান শুনাতে হবে। শুধু রঙ্গিন নয়, রঙ্গছটও; এর চাহিদা অনেক। শুনবে এ ভৈরবী, বেহাগ, ভীমপলশ্রী, ঠুংরী, গজল কিছুই বাদ পড়লে চলবে না। তৈরী করতে গিয়ে দেখা গেল, দিন ভর মিস্ত্রিকে বাড়ীর একাজ সেকাজ করে বেড়াতে হচ্ছে আর রাত্রে আমি ও মিস্ত্রি সেই আসবাবের স্বপ্নে মশগুল। অনেক রঙ্গ বেরঙ্গের কথা মিস্ত্রিকে আমার বলতে হচ্ছে। কেমন মনে হত নিমীয়মাণ ড্রয়ার্সও যেন, মিস্ত্রিকে দেওয়া আমার উপদেশ মন দিয়ে শুনছে এবং এক তিল এদিক ওদিক হলেই সব কিছু যেন ভেস্তে যেত। মিস্ত্রি ও আসবাব যেন একই মোহরের এপিঠ আর ওপিঠ। আমাকে সে বুঝিয়ে বলত—ঠিক সুরে কথা চলছেনা। আমি আবার সুর ঘুরিয়ে ওদের সঙ্গে মিশে চলতাম। বেশী রাত্রেই কাজটা জমত ভালো। রাত্রের অন্ধকারে যেন আমাদের বন্ধুত্ব ঘন হত। ড্রয়ার্সও এখন আমাদের ত্রয়ীর একজন হয়ে উঠলো; চলার পথে সেও দু'একটা কথা শুনিয়ে যেতে লাগলো। মিস্ত্রি যখন খুব সূক্ষ্ম কাজের যায়গাগুলোতে হাতুড়ি ছেড়ে হাত দিয়ে আস্তে ঠুক ঠুক বাটালি চালিয়ে যেত, আসবাব নিজেই যেন মিস্ত্রিকে নিশানা দিয়ে চলতো—কোথায় কোন যায়গায় বাটালি কি ভাবে ঠুকতে হবে। আমি যেন দেখতে পেতাম মিস্ত্রি একটানা ড্রয়ার্সের দিকে চেয়ে কাজ করে যাচ্ছে। একটু অসাবধান হলেই সৌকুমার্য অবহেলিত হত। সে যেন কোথায় কি ভাবে কি করে বাটালি চালাতে হবে ফিস ফিস করে বলত। রাত্রির গভীরতা কতটা, ড্রয়ার্স যেন মাঝে মাঝে মুখ তুলে দেখে নিত পাছে অন্য কেউ তাকে দেখে বা তার কথা ধরে ফেলে। মিটমিটে হারিকেন লণ্ঠনটি পাহারাওয়ালার কাজ করত। মিস্ত্রির যে এতে কোন কৃতিত্ব নেই, এ যেন ড্রয়ার্স তার কাজ একাই করে চলছে। একথা মিস্ত্রি বুঝতে পেরেও এবং আমিও যে সে তথ্য জানি জেনেও মিস্ত্রির যেন কোন ক্ষোভ ছিল না। আমরা এক

চেতনার রাজ্যে উত্তীর্ণ হয়েছি, ঘোরাফেরা করছি এক নতুন আলোর মেলায়। সে আবার এমন মজার রাজ্যি যেখানে বোধি ও বুদ্ধি নিয়ে মাথার একছত্র রাজত্ব। দেহের অন্যান্য অবয়বের সেখানে ঠাঁই নেই। আশ্চর্য্য মাথার রাজ্যি: সে এক বিরাট মহাদেশ, এক নতুন পৃথিবী। কোথায় যা এর শুরু আর শেষ তা খুঁজে মেলা ভার। মাকড়সার জালের মত সোনা মণি ও মাণিক্যের তারের কাজ করা সূক্ষ্ম ও সুকুমার জালে যেন সমস্ত মগজের দেশটি ছেয়ে আছে। কত যে এর বিচিত্র অলিগলি কত রং বেরঙ ভাবের যে আনাগোনা তার অন্ত নেই। যা দেখতে বা শুনতে চাও সব সেখানে পাবে। নদীর বিস্তার, পাহাড়ের সুনীলিমা, সাধু-সন্তের বিভূতি, যাদুকরের ভেল্কি, সুরশিল্পী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, কবি চিত্রীর স্বপ্ন ও সত্য সব আছে সে নব সৃজনে—সব জিনিষের ঠাসাঠাসি। তুমি যাকে দেখতে চাও সেই এসে হাজির হবে—যেমনটি চাই তেমনটি। শুধু দরকার গভীর নিষ্ঠা ও আবেগ।

সে যেন এক অদ্ভুত স্পর্শকাতর দেশ। সেখানে জোরে বাঁশী বাজালে সব বেসুরো ঠেকে। এ যেন লজ্জা-বতী লতা।

মনে পড়ে গেল আমাদের বাড়ীর দক্ষিণের পুকুর পারের টকো আমগাছটার কথা। সেই গাছতলায় অনেক যায়গা জুড়ে ছিল লজ্জাবতীর বন। সেই বনে ফুটে থাকতো লাল চুনীর মতো ফুল। এক চোখ বুজে দেখলে মনে হত যেন চুনীর বন। মগজের দেশও যেন এক মণি-মাণিক্যের খনি। এক রূপকথার অচিনপুরী।

এগিয়ে চললো আমাদের ড্রয়ার্সের কাজ মুক্ত আবেগে ও বেগে। রাত্রির এক অপরূপ রূপ নতুন সুরে আমাদের কাছে ধরা দেয়, দিনের বেলায় তা মনের সঙ্গে লুকোচুরি করে, ছোঁয়া যায় না, কেমন অদ্ভুত ঠেকে।

বাড়ীর ছেলে মেয়েদের হল এক মজার ব্যাপার, ঘুম ভেঙে উঠে সকালবেলায় ওরা নব নব রূপে দেখছে ড্রয়ার্সকে। কে করে যাচ্ছে কি করে হচ্ছে ভেবেই ওরা কূল পেত না। পরী ও জাদুর দেশের ছোঁয়া নেমে আসে সেখানে। ভাই বোনদের কুড়িতে যেদব পরী ও জাদু কাহিনী লুকানো ছিল তারা চোখ বড় বড় করে সব একে অন্যকে শুনিয়ে আসর জমিয়ে রাখতো। ড্রয়ার্স এসব শুনে শুনে আরো গম্ভীর হয়ে যেত, এ যেন কালো আলপাকা কোট গায়ে জাদুকর মঞ্চে দাঁড়িয়ে হাতে জাদুর ছড়ি।

এভাবে মাস দুয়েকের মধ্যেই আসবাব প্রায় তৈরি হয়ে উঠলো। এখন পালিশ চলছে। মিস্ত্রি প্রাণপণ করেও যেন আমার মন পাচ্ছে না। আমিও ঠিক তাকে বুঝাতে পারছি না আমি কি চাইছি, বা কি আমার শেষ? দেখতাম বলার অধীরতায় আমার দেহ যেন নিরাশ্রয় হয়ে শূন্যে ভাসছে। আজ আর সে ভাবনা কাউকে বলা যায় না। কিন্তু নতুন দিগন্তের বীজ সেদিন সেখানে ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই ড্রয়ার্স মনের মতো হয়ে আমার মানসী হয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে তুললো। এ উৎকণ্ঠতার রহস্য খুঁজতে গিয়ে অনেকেই আমাকে মিষ্টিক বানিয়ে ছাড়লেন। এমনি সময়ে শান্তিনিকেতন থেকে আমার এক দাদা এলেন। তিনি আমার মানসীকে দেখে খুশী নয়, প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। প্রশংসায় আমায় কিঞ্চিৎ উদাসীন দেখে কি ভেবে হঠাৎ বলে উঠলেন—"খোকা তোর আবদুল চৌকিদার লেখাটা পড়লাম রে, খুব চমৎকার হয়েছে। লিখে যা।"

মানসীকে ঘরে এনে তুললাম। সবাই আমরা খুশি। মনে হলো নেইজার সাহেবের দেনা কিছুটা শোধ হল। বেলকাই শহর, সেগান নদী, অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট, এসপ্লেনেড রোড, স্ট্রেণ্ড্রিড রোড যেন কাপসা হয়ে এল। সেই

বিধুর কুয়াশার মধ্যে শুধু নেইমার সাহেব জলজল করে উঠলেন। ভেসে উঠল গভীর এক আত্মীয়তার রূপ নেইমার পরিবারকে ঘিরে। মানসীকে ভাল টেবিলক্লথ দিয়ে ঢেকে মায়ের একটি ছবি তার ওপর রাখলুম।

দুতিন বছর পরে কলকাতা গিয়েছিলাম কোন কাজে কিন্তু ফিরে এলাম বিয়ে করে। বিয়ের পর স্ত্রী মিত্রা ঘরে ঢুকে মানসীকে দেখে অবাক হয়ে গেল। এমন সুন্দরের সীমানায় সে যেন তার আঠারো বছরের জীবনে কখনও পৌঁছয়নি। কিছুক্ষণ সে অপলক চোখে চেয়ে হঠাৎ মায়ের ফোটো দেখিয়ে আবিষ্ট কণ্ঠে বললো, এই আমাদের মা? আমি তার সহজ আত্মীয়তায় মুগ্ধ হয়ে, তাকে বুকে টেনে নিয়ে মুখখানা তুলে ধরতেই মায়ের আশীর্বাদের মধ্যে আমরা ডুবে গেলাম।

পরেরদিন সকাল থেকেই মিত্রা উঠে পড়ে লেগে গেল ঘর-দোর গোছাতে। বাক্স খুলে নিজের হাতের কাজকরা একটি টেবিলক্লথ পেতে নিলো ড্রয়ার্সের ওপর। আমাকে কোলে-করা মায়ের ফোটোখানা না ঘরে নতুন করে ফ্রেম ও গ্লাসে বাঁধিয়ে তার উপর রেখে, বারে বারে এসে মা ও মানসীকে দেখাই যেন তার একমাত্র কাজ হয়ে উঠলো। মানসীকে নতুন করে প্রতিদিন তুলে ধরাই তার একমাত্র নেশা। কোনদিন দেখতুম, ড্রয়ার্সের ছয়টা চাবির ঘরে ছয়টি চাবির রিং এর সঙ্গে সুন্দর করে রং বেরংএর ফুল ঝুলিয়ে দিত। কখনও তিনটি চাবির ঘরে শুধু রিং আর অন্য তিন ঘরে ফুলের রিং জ্যামিতিক নক্সা মানিয়ে সাজাতো। মিত্রা এই আসবাব সাজানোয় কখনও ক্লান্তি বোধ করত না। মাঝে মাঝে শুধু আমাকে যৌন দেখলে ঈষৎ লজ্জিত হয়ে আমার বুকে নিজেকে লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করতো। এবার আবার আমার পালা—শুনিয়ে যেতাম তাকে শৈশবের সেই নেইমার সাহেব, কাশোদি, বেলাগাঙী আমাদের বলাই বাবুচি, গোমতী নদী, গৌরীপুরের ছোট্ট পাটের শহর, তার লোকজন হাট-বাজার, নদীর পাড় ও রঙ বেরঙের ডিঙ্গি নৌকো আর তার মাঝি মাল্লার—তাদের পোষাক-আশাক। গল্প করতাম সেই ফেলে আসা অনির্বচনীয় শৈশবের। আমি নিজেও যেন এক নতুন মানুষ হয়ে উঠতাম। আস্তে আস্তে লুকানো দুঃখ বের করে বড় বড় চোখে সে-সব কথা মিত্রা যেন গিলে খেত। দিদিদের কথা, পাড়াপড়শীর গল্প সব যেন তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলত। হাঁ করে ছোট ছেলের মতন সে আমার কোলে মাথা রেখে মায়ের গল্প শুনতে শুনতে আনমনা হয়ে উঠত। সে-কথা আজ ভাবতেও আমার নেশা লাগে।

মানসী যেন আমাদের জীবনের এক মিলনের রঙিন রাখী। আমাদের প্রথম ছেলের জন্ম এই সময়ে। মিত্রা ছেলে কোলে করে ফোটো তোলালো, হুবহু আমার মায়ের ফোটোর ভঙ্গিতে। সেই ছবি বাঁধিয়ে মায়ের ফোটোর মুখোমুখি সাজিয়ে রাখলো। ঠাকুরমা আর নাতী মিলে আর এক নূতন প্রণয়ের শুরু হল সেখানে। আমার আর ঠাঁই নেই, তা মিত্রার পুরো একতিয়াৎ। তার কাছ থেকে আমাকে সব শুনতে হবে বিনা দ্বিধায় এবং সায়ও দিতে হত হাসিমুখে। ঠাকুরমা কখন নাতীকে দেখে হাসছেন, কথা কইছেন, খেলনা দেবার প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছেন তাও আমাকে শুনতে হতো! ঠাকুরমা যে নাতীকে ঘরবাড়ি তৈজস পত্তর, সব দান করে সেই শ্বেত-পাথরের বাক্সে বন্ধ করে সামনের আলমারীতে রেখে গেছেন নাতীর জন্য তাও আমাকে বলতে সে ভুলতো না। আমি চুপ করে গেলে মানসীকে দেখিয়ে বলতো—জিজ্ঞেস করে দেখনা আমি ঠিক বলছি কিনা? ওর কথায়, মায়ের স্মরণে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে আমাকে ধুয়ে মুছে ঊর্ধ্বগতির পথে তুলে ধরত। ভাল লাগতো।

মিত্রা দিনে দিনে মিলে মিশে নতুন করে যেন

আমাদের পরিবারের মানুষ হয়ে উঠলো। বাড়ীর ঝি-চাকর, লোকজন সবই তার এখন হাতের মুঠোয়। টাকা পয়সা, সোনা দানা, বাক্স-পেটরা মায় সিন্দুকের চাবিও তার দখলে, ভাবতেও আমার অবাক লাগত। কলেজ ছুটি হতে না হতেই কলকাতার ইস্তাজা দিয়ে তেড়ে বাড়ী চলে এসে আবার সংসারের লাগাম তুলে নিত। বাবা তো বেজায় খুশি। মিত্রা বাবার খাটে বসে মায়ের গল্পে গল্পে দিন কাটিয়ে দিত। হঠাৎ বছর কয়েক বাদে দেশ বিপর্যয়ের তীব্রতায় আমরা বিমূঢ় হয়ে পড়লাম। সব ছেড়ে ছুড়ে কলকাতায় আসতে হল।

মোটামুটি আমাদের পরিবার ছিল যাকে বলা যায় সম্পন্ন ; চিরদিনের মতন দেশ ত্যাগ করে আসতে কষ্ট হয়েছিল সত্য, কিন্তু মানসীকে ফেলে আসার দুঃখ সেদিন তীব্র হয়ে বিঁধেছিল। বাড়ী ছেড়ে আসার আগে প্রথম যেন জীবনে বুঝতে পারলুম ভগবানের স্পর্শ যে কোথায় নেই বলা বড় শক্ত। আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি মানসীর কষ্ট ; দেখেছি তার নিশব্দ চোখের জল। সে বিচ্ছেদের তীব্রতা আমাদের মনের গভীরে বিস্তারের মাত্রা বাড়িয়ে চলল। মিত্রারই দুঃখ হয়েছিল বেশী। তার শোক ভোলাতে প্রায় প্রাতরাশেই আমাকে পুরানো দিনের কথা নতুন করে বলতে হত।

তারপর জীবন যুদ্ধের অনিবার্য সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লাম। বছর দশেক চরম দুঃখের মধ্য দিয়ে মিত্রা আর আমি এগিয়ে গেলাম। সে জীবনের অভিজ্ঞতার স্বাদ গন্ধ ও ধার হল আলাদা। সে দুঃখের মধ্যেও রূপ ও রসের যৌন মাধুরীর যে ছোঁওয়াচ ছিল না, তা নয়। সেও এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। সে বেলে ধরেছে তার পাঁচমিশেলী ভালো। দাবীও এক নয়, অনেক। সুখে আসলে সে রূপ শোধ করে আদতে হবে ; চিনতে হবে তার ভাল ও মন্দ, আলো ও আঁধার। সে-দুঃখের দুস্তর পাঁকের মধ্যেও পুরানো দিনের মানসী আমাদের মন ভোলাতে ঝোলা দিয়ে যেত আশায় ও ভরসায়, অভাবের কশাঘাত সইতে না পেরে মিত্রা এক একদিন চোখের জল ফেলতো। সে-চোখের জল আমার বুকে ভারী হয়ে পড়ে পড়ে আবার এক নতুন সুর নিয়ে ঘুর ঘুর করে এক নীহারিকা বলয়ের রূপ নিয়ে ঘুরতে থাকতো। আমিও সে আবর্তে ঘুরতাম, সে ঘূর্ণিপাকে আবর্তিত হত সেই ছোট পাটের শহর, সেইজার সাহেব, গোমতী নদী আরো কত কি ; সঙ্গোপনে ঘুরতো সেই সঙ্গে আমার মানসী। সে ঘূর্ণিপাকের চেউতে তাল-কানা হয়ে, তারসাম্য হারিয়ে ছিটকে পড়তাম মিত্রার বুকে। মিত্রা হঠাৎ যেন এক নতুন সুরে আচমকা তুলে ধরতো আমার পুরানো মানসীর গল্প। সে ছোঁওয়াচে সমস্ত দুঃখের মেঘকে সরিয়ে, তুলে ধরতো নতুন ভোরের আলো। আমরা নত মস্তকে স্বাগত করতাম।

দশবছর অবিচ্ছিন্ন দুঃখের পর একটু নতুন কাজের সুযোগ পেলাম। বেরুতে হল এক বিচিত্র ভারত পরিক্রমায়। কাজের ফাঁকে ফাঁকে দেখা দিত এক নতুন জিজ্ঞাসা অনেক কিছু দেখলাম-শিখলাম। পাঁচ বছর এক নাগাড়ে ঘেরোর পর নিশ্বাস ফেলার অবসর হল মাথা তুলে আকাশের দিকে চাইতেই এক নতুন পৃথিবীর দেখা পেলাম। শিশুর প্রথম বিস্ময় নিয়ে যেন তাকালাম মিত্রা পাঁচবছরে অভাবকে একটু মানিয়ে নিয়েছে। পুরানো হাসি-খুশির ঝিলিক ফিরে আসছে। ছেলে মেয়েদের নিয়ে সে কলকাতাতেই থাকে। আমাকে কাজের তাগিদে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ঘুরে বেড়াতে হয়। চলার পথে কত চেনা ও অজানার সঙ্গে নতুন আত্মীয়তা গড়ে উঠলো তার ইয়ত্তা নেই। সে আত্মীয়তা মনকে প্রসারিত করে, নতুন দিগন্তের ইঙ্গিত বয়ে আনে। কিন্তু স্বচ্ছন্দতার সঙ্গে সঙ্গে মানসী যেন আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে। শুধু গ্লানি নয় এ

উপলব্ধিতে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিতও হতাম করবার কিছুই ছিল না। মধ্যে মধ্যে সচেতন ভাবে তাকে চোখের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু সে ক্রমেই ভিন্ন ভিন্ন করে যবনিকার আড়ালে সরে যাচ্ছিল। খুব কষ্ট হত। চোখের জল গড়িয়ে ছোট্ট ছোট্ট অসমাপ্ত গল্পের চরি হয়ে ভেসে উঠতো। আমেদাবাদে এসে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। একটু সুস্থ হয়ে উদয়পুরের পথে আবাবলীর মেখলার মাঝ দিয়ে যাওয়ার সময় শুধু মনে হয়েছিল যে মোটরকারের সঙ্গে তালরেখে পাহাড়ের কোল ঘেঁসে আমার রূপসী মানসীও যেন ছুটে চলেছে। মন আরো উদাস করে দিয়ে গেল। রাজপুতনার মরু-প্রান্তরে দুএকবার চকিতে তাকে দেখলাম সে যেন রাজপুত নারীদের জহরব্রতের অব্যবহিত মুহূর্তে শাঁখ বাজিয়ে চলেছে। দিল্লীতে পৌঁছে একেবারে পুরো দস্তুর অসুস্থ হয়ে পড়লাম। মাসখানেক ভুগে উঠার পর ডাক্তার দুমাস ঠাণ্ডায় বিশ্রাম নেবার ব্যবস্থাপত্র দিয়ে বিদায় নিলেন।

দিন পনের বিশ্রামের পর হরিদ্বারের পথে রুড়কীতে অধ্যাপক নৃপেনবাবুর বাসায় উঠলাম। বন্ধুপত্নী নীলাদেবী সাদর অভ্যর্থনা করে ঘরে নিয়ে যেতেই চমকে উঠলাম। সেখানে একুশ বাইশ বছরের একটি মেয়ে, অপূর্ব তার তনুর তনিমা। সে রূপের আলো ও মাধুরী আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। সে বিস্ময়াবিষ্ট আকাশে ফুটে উঠল অগুনতি ফুলের তারা, আর তারার বৃষ্টি। সে তারার নীলাভ আলোয় দেখতে পেলাম মানসী এক অবিস্মরণীয় রূপ নিয়ে খনার পাশে দাঁড়িয়ে। মনে হল ফুলের দেশ হতে দুজন কন্যা বীণা হাতে উপস্থিত। মানসীর এমন রূপ ও ভাবাবেগ আগে আর কখনো দেখিনি। বিস্মিত ভাবটা কাটতেই দেখলাম খনা অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছে। এ চাউনী নীলাদেবীকে কেমন যেন বিস্মিত করল। কিছু পরেই কলেজ থেকে বন্ধু ফিরলেন। অনেক কথা হল। সব কথাই তাঁর বোন খনাকে নিয়ে। খনা বর্তমানে অপ্রকৃতস্থ। মাস ছয়েক আগে সন্তান জন্মের কয়েক দিন আগে থেকেই খনা কেমন যেন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থাতেই খনা সন্তান প্রসব করেছিল। সে থেকেই খনার মাথায় দোষ দেখা দেয়। ডাক্তার-বৈদ্যি অনেক দেখান হল কিন্তু কিছুতে যেন কিছু হল না। বলতে বলতে নৃপেনবাবু নিশব্দে কাঁদতে লাগলেন। নীলাদেবী চা নিয়ে আসতেই হুঁশ ফিরল। মনে হলো অনেকক্ষণ ধরে মানসীর গা ঘেঁসে বসে ছিলাম। গুন গুন করে সে অনেক কথা আমার কানের কাছে বলে গেল। সব মিলিয়ে বেশ সুস্থ বোধ করলাম। যে-গ্লানি আজ কয়েক মাস ধরে আমাকে অসুস্থ করে তুলেছিল তা যেন অনেকটা উবে গেল। আমি ঘুরে ফিরেই খনাকে দেখতে লাগলাম। একটু গভীরভাবে নজর করতেই যেন মানসীকে খনার চোখে মুখে ভেসে উঠতে দেখতাম। বুঝলাম কোথায় যেন এর এক যোগসূত্র রয়েছে। অন্ধকারে খুঁজে কিছু পেলাম না কিন্তু মনে একটা প্রশান্তি ঘুরে ফিরে বইতে লাগলো।

অনেকদিন পর রাত্রে খুব ভাল ঘুম হল। ভোর বেলার দিকে মনে হলো মানসী আমার মাথার কাছে বসে বাতাস করছে। পরের দিন সকাল থেকেই খনার সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গেল। অনেক গল্প করলুম, কখন যে আমার মানসীর কাহিনী আমার অজান্তে তার কাছে তুলে ধরেছিলুম তা নিজেও বুঝতে পারিনি। মনে হল কে যেন গভীর আবেগে আমার সে শৈশবের রূপকথা শুনিয়ে যাচ্ছে। আমার ভাই-বোনে যেন ফুলের বিছানায় সে রূপকথা শুনছি, সব ঝাপসা হয়ে গেল। সেই পাটের শহর, গোমতী নদী, নদীর গায়ে অসংখ্য ছোট ছোট

P, রং বেরংএর ছিপ্পি নৌকা। চাঁদনি রাতের , নেইজার সাহেব, তার বাংলো, চেষ্ট-অফ-ড্রয়ার্স, স্নেহময়ী মা। আবার ভেসে উঠলো অক্সফোর্ড । ষ্ট্রীট, হাওয়ার্ড ষ্ট্রীট, প্রসভেনর রোড, ডারহাম গ্রেঞ্জ ফিল্ড রোড, নেইজার সাহেবের মা, স্নেহময়ী মাসী। সব ভেসে চললো। সঙ্গী হারিয়ে ম। জ্ঞান ফিরতেই দেখি বিছানায় শুয়ে আছি, শে বসে বাতাস করছে আর শাড়ীর আঁচল দিয়ে । জল মুছছে। দুতিন দিন পর অনেকটা ভাল উঠলাম। কড়কীর অনেক বাঙালী ভদ্রলোক ক দেখতে এসেছিলেন। খনার কাজ ছিল গভীর আগ্রহে তাঁদের কাছে মানসী ও তার মিত্রবৌদির কাহিনী আবৃত্তি করা। ছবিষায় রওনা হবার আগেই বুঝলাম যে খনা অনেকটা ভাল হবার পথে। সুখ ছুঁয়েছিল আমাকে।

এর পর নৃপেনবাবুর দুএকটি চিঠি পেয়েছিলাম। তিনি লিখতেন খনার মস্ত বড় কাজ হয়েছে যে আসবে তাকেই মানসী আর তার মিত্রবৌদির কথা বলা! কি যে ভাল লেগেছিল তা আর বলার নয়···শুধু সুখক্ষণ যে খনা প্রায় সম্পূর্ণ আরোগ্যের পথে।

• •

তারপর আজকের এই চিঠি।

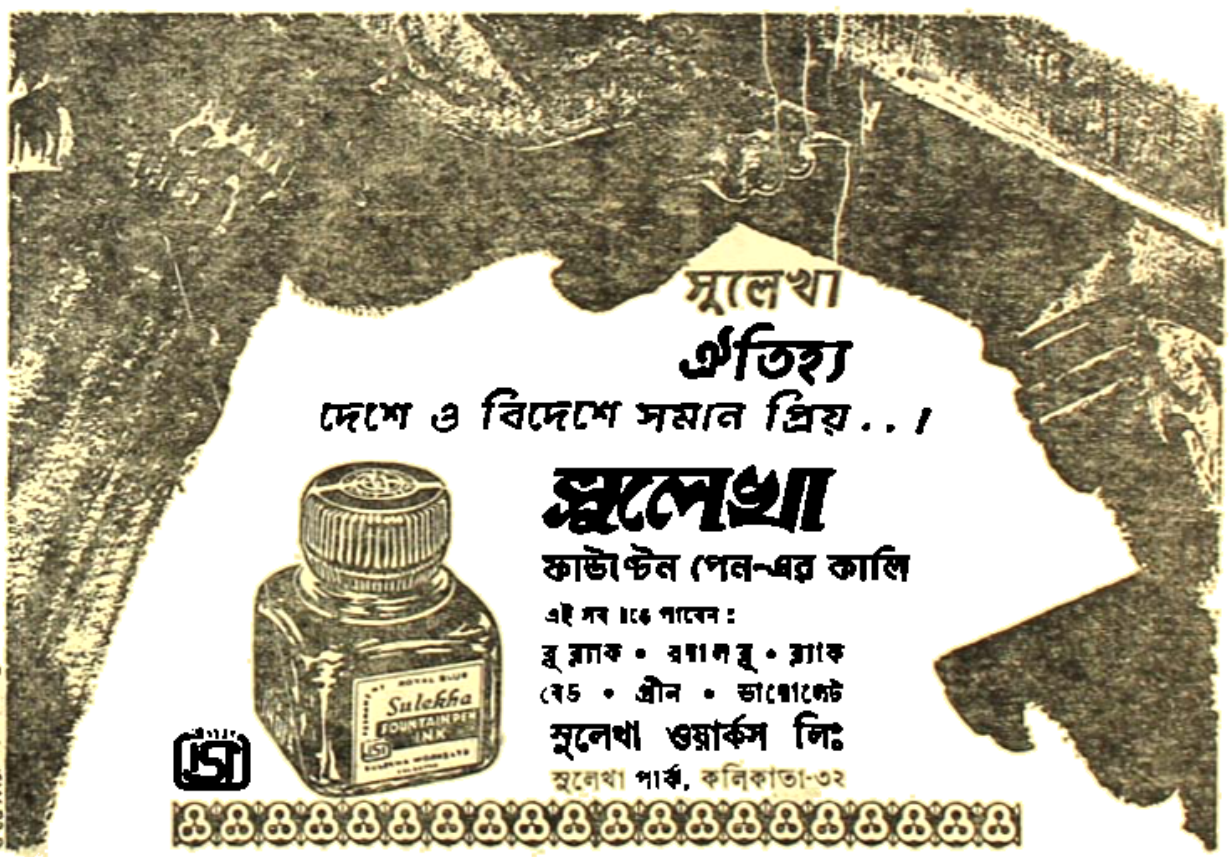

মঁসিও কর্ণি

লেখক : আলফঁস দোদে
অনুবাদ : সুবীরকান্ত গুপ্ত

বৃদ্ধ বংশীবাদক ফ্রাঁসে মিস্ত্রাই মাঝে মাঝে আমার বাড়ীতে আসেন সন্ধ্যের দিকে আড্ডা জমাতে। সেদিন বিকেলে মদ খেতে খেতে তিনি এই গ্রামেরই একটি ছোট নাটক শোনালেন যার সাক্ষী রয়েছে আমারই এই মদের মিলটা। ঘটনাটা ঘটেছিল বিশ বছর আগে। কাহিনীটি আমায় খুব বিচলিত করেছিল এবং ঠিক যেমনটি আমি শুনেছি তেমনই বলতে চেষ্টা করব।

প্রিয় পাঠকবর্গ! কল্পনা করুন কিছুক্ষণের জন্য আপনারা যেন একটি সুগন্ধি মদ পাত্রের সম্মুখে বসে রয়েছেন এবং বৃদ্ধ বংশীবাদকই আপনাদের কাহিনীটি শোনাচ্ছেন।

আমাদের এই সহরটা আজকের মত চিরকালই সংগীতবর্জিত মৃত ছিল না। আগে এখানে ময়দার কল-অলাদের জমজমাট ব্যবসা ছিল। সহরের চারিদিকের পঁচিশ মাইলের ভেতরে যত খামারের লোকেরা গম নিয়ে আসতো বলে শুঁড়িয়ে নিতে। গ্রামের চারিদিকের পাহাড়-গুলি বায়ু চালিত কলে ভর্তি ছিল। ডাইনে বাঁয়ে দেখা যেত শুধু মিলের ডানাগুলি পাইন গাছের মাথা ছাড়িয়ে হাওয়ায় ঘুরছে।....ছোট গাধার দলগুলি পিঠে বস্তা নিয়ে পাহাড়ী পথ বেয়ে ওপরে উঠত আর নামত।....সারা সপ্তাহ ধরে ওপর থেকে শোনা যেত চাবুকের শব্দ আর মিলের লোকেদের 'দিয়া হু' শব্দ...বেশ ভালই লাগত।...

রবিবার আমরা দল বেঁধে মিলে যেতাম। ওপরে মিলের মালিকরা আঙুরের রাস দিতেন সেদিন। মিল মালিকদের শিল্পীরা রাণীর মত সুন্দরী ছিলেন—জামায় লেস লাগানো আর তার ওপর ঝুলতো সোনার ক্রুশ। আমি আমার বাঁশীটা নিয়ে যেতাম এবং অন্ধকার রাত পর্যন্ত চলত ফারাঁদোল নাচ।...কাজেই বুঝতেই পারছেন মিলগুলি আমাদের গ্রামের আনন্দ এবং সম্পদের উৎস ছিল।

দুর্ভাগ্যক্রমে প্যারী সহরে ফরাসীরা 'ভারাসক'র পথে বাষ্পচালিত মিল বসাল। চমৎকার! একেবারে নোতুন! লোকেরা সেখানেই তাদের গম পাঠাতে লাগল আর এদিকে বায়ুচালিত মিলগুলিতে আর কোন কাজ রইল না। বাষ্পচালিত মিলগুলির বিরুদ্ধে তারা কিছুকাল সংগ্রাম চালাল কিন্তু বায়ুর চাইতে বাষ্পের শক্তি বেশি—বায়ুচালিত মিলগুলির দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

গাধার দলকে আর আসতে দেখা গেল না। মিল-মালিকদের রূপসী শিল্পীরা তাদের সোনার ক্রুশগুলি বিক্রি করে দিল -- বন্ধ হল আঙুর আর ফারাঁদোল নাচ... বৃথাই হাওয়া বইতে লাগল কারণ মিলের ডানাগুলি স্থির হয়ে রইল। তারপর একদিন সবাই মিলে মিলগুলি ভেঙে ফেলে সেখানে আঙুর আর জলপাই-এর চাষ সুরু করল।

এই বিপর্যয়ের মুখেও একটি মিল সংগ্রাম করছিল।

বাষ্পচালিত মিলগুলির নাকের ডগাতেই ডানাগুলি সগর্বে সজোরে ঘুরছিল। এই মিলের মালিক হলেন মঁসিও কবি! ঠিক এই মুহূর্তে আমরা যেখানে বসে গল্প করছি এইটিই হল সেই মিল।

মঁসিও কবি ষাট বছর ধরে ময়দার কলে কাজ করে এখন নিজের অবস্থার জন্য ভীষণ রেগে গেলেন। বাষ্পচালিত মিলগুলির প্রতিষ্ঠা হওয়াতে তিনি যেন খেপে গেলেন। আটদিন ধরে গ্রামে ঘুরে ঘুরে সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে লোকেদের এই বলে উত্তেজিত করতে লাগলেন—ওরা বাষ্পচালিত মিলের ময়দা দিয়ে সমস্ত দেশটা বিষিয়ে দিতে চাইছে। রুটি তৈরী করবার জন্য ঐ ওভাদের কাছে যেও না। ওই বাষ্পযন্ত্র হচ্ছে শয়তানের আবিষ্কার আর আমার যন্ত্র কাজ করে উত্তর আর পশ্চিমের হাওয়ায় —যে হাওয়া করুণাময় ভগবানের নিঃশ্বাস…' তিনি অনেক সুন্দর কথায় বাষ্পচালিত মিলের অনেক সুখ্যাতি গাইলেন কিন্তু কেউ তাঁর কথা শুনল না। অবশেষে বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হয়ে মিলের ভিতরেই নিজেকে বন্দী করে রাখলেন এবং হিংস্র জন্তুর মত বাস করতে লাগলেন। এমন কি পিতৃমাতৃহীন পনেরো বছরের নাতনী জিভেতকেও নিজের কাছে রাখলেন না। বেচারী জিভেত! জীবিকার জন্য জলপাই-এর খেতে কাজ করতে লাগল। কিন্তু বৃদ্ধ খুব ভালবাসতেন নাতনীটিকে এবং প্রায়ই তিনি প্রচণ্ড রোদে দশমাইল পথ পায়ে হেঁটে নাতনীটিকে দেখতে যেতেন। কর্মরত নাতনীকে দেখতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা আর কাঁদতেন…

কিন্তু দেশে সবার ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে কৃপণতার জন্য বৃদ্ধ তাঁর নাতনীটিকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিয়েছিল।

কিশোরী মেয়েটি এক খামার থেকে অন্য খামারে কাজ করবে এবং কর্মীদের দলপতির কাছে লাঞ্ছিত হবে এটা মঁসিও কবির পক্ষে গৌরবের ব্যাপার নয়। এটা জীবন বিসর্জন ব্যাপার যে কবির মত খাতনামা এবং সম্মানীয় ব্যক্তি খালি পায়ে এবং ছেঁড়া টুপি পরে যাযাবরের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবেন।

রবিবার দিন যখন আমরা গির্জায় প্রার্থনা করতে যেতাম তখন তাঁকে দেখে আমি এবং আমার মত অন্যান্য বৃদ্ধদেরও লজ্জা হত। মঁসিও কবিও সেটা বুঝতে পেরে আমাদের সঙ্গে বেঞ্চিতে বসতেন না—গির্জার ভেতরে একেবারে 'পুত বারি'র কাছে গরীবদের সঙ্গে বসতেন।…

মঁসিও কবির জীবনটা কেমন যেন রহস্যময় ছিল। বহুদিন ধরে কেউ কোন গম নিয়ে যায়নি তাঁর কাছে কিন্তু তবুও তাঁর মিলের ডানাগুলি সমানে আগের মতই ঘুরছিল… একদিন বিকেলে দেখা গেল প্রকাণ্ড কয়েক বস্তা ময়দা গাধার পিঠে চাপিয়ে তিনি গাধাটাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলেছেন। তাঁকে দেখে গ্রামের লোকেরা বলল—'শুভরাত্রি মঁসিও কবি! মিলটা তাহলে চলছে।'

'হ্যাঁ সর্বদাই চলছে। ভগবানকে ধন্যবাদ, কাজের তো কোন অভাব নেই।' খোস মেজাজে জবাব দিলেন তিনি।

যদি তাঁকে জিজ্ঞেস করা হত এত কাজ কোথা থেকে আসছে, তখন তিনি ঠোঁটের ওপর তর্জনী রেখে গম্ভীর হয়ে বলতেন—'আমি যে রপ্তানীর ব্যবস্থা করি—এর চাইতে লাভজনক আর কিছু নেই।'

কিন্তু তাঁর মিলের ভেতর ঢোকবার কথা কেউ

চিন্তাই করতে পারে না এমন কি কিশোরী ভিতেতও নয়।

মিলের সামনে দিয়ে গেলে দেখা যায় দরজা গুলো সব বন্ধ রয়েছে এবং মিলের বড় বড় ডানা গুলো সর্বদা ঘুরছে।...বুড়ো গার্ডটা ঘাস খাচ্ছে আর একটা প্রকাণ্ড রোগা বেড়াল জানলার ওপর বসে রোদ পোহাচ্ছে আর দুইজনী তারা দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।...

এ সমস্তই কেমন যেন রহস্যময় ব্যাপার বলে মনে হয়। লোকেরা নানা কথা বলতে লাগল এবং প্রত্যেকেই নিজের মত করে এই গোপন রহস্যের ব্যাখ্যা করতে লাগল। কিন্তু সাধারণের ধারণা যে মিলের ভেতরে মজুরদের মজুরী চাইতে টাকা পয়সার বড়াই বেশি।

অবশেষে সমস্ত রহস্যটা জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। ভিতেত আমার বাঁশীর সংগে নাচত। একদিন লক্ষ করলাম সে আর আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে। এতে আমি রাগ করিনি কারণ মঁসিও কর্ণি আমাদের দেশে একজন সম্মানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাছাড়া ভিতেতের মুখী স্বপ্নোত্তটি আমারই বাড়িতে ঘুর ঘুর করবে এই ভেবে খুশীই হলাম। ব্যাপারটা অনতি-বিলম্বে চুকিয়ে ফেলবার উদ্দেশ্যে মঁসিও কর্ণির মিলে উঠে গেলাম তাঁকে দুটো কথা বলতে।

বুড়ো ভেল্‌কিবাজ। আমায় কি রকমভাবে অভ্যর্থনা করলেন। কিছুতেই তাঁকে দরজা খোলাতে পারলাম না। দরজার চাবির ফুটো দিয়ে আমার বক্তব্য পেশ করলাম। আমি যখন কথা বলছিলাম হতভাগা বেড়ালটা মাথার ওপর থেকে ফোঁস ফোঁস করছিল।

বুড়ো আমাকে কথা শেষ করতে দিলেন না। রেগে অতি অভদ্রভাবে চেঁচিয়ে আমায় ফিরে গিয়ে বাঁশী বাজাতে বললেন এবং যদি ছেলের বিয়ে দেবার তাড়া থাকে তাহলে যেন বাষ্পচালিত মিলের মালিকদের ওখানে পাত্রীর খোঁজ করি।

এই অযাচিত ভাষা শুনে শরীরের রক্ত গরম হয়ে উঠেছিল কিন্তু বিজ্ঞের মত নিজেকে শান্ত করলাম। বুড়ো গার্ডদার ওখান থেকে ফিরে এসে ছেলেমেয়েদের বললাম ব্যাপারটা। বেচারী মেয়েগুলো কিছুতেই আমার কথা বিশ্বাস করতে চাইল না বরং তারা আমার অনুমতি চাইল ঠাকুরদার সংগে দেখা করবার জন্য। প্রত্যাখ্যান করতে আমার সাহস হল না।

ওরা ঠিক যখন ওপরে গিয়ে পৌঁচেছে তার আগেই মঁসিও কর্ণি বেরিয়ে গিয়েছিলেন। দরজা বেশ ভাল করেই বন্ধ ছিল। কিন্তু বৃদ্ধ সরল মানুষটি সইটা বাইরে রেখে গিয়েছিলেন।...তক্ষুণি তারা ভাবল জানালা দিয়ে ভেতরে চুকে দেখলে হয় কি আছে এই বিখ্যাত মিলটার ভেতরে।...

অদ্ভুত ব্যাপার। মিলের যে ঘরটাতে গম গুঁড়ো করা হয় সেটা একেবারে শূন্য...গমের বস্তা বা একটি দানাও নেই! দেয়ালের গায়ে অথবা মাকড়সার জালেও ময়দার কোন চিহ্ন নেই...এমন কি যে পরম গুঁড়ো গমের গন্ধ সারা মিলটাকে আমোদিত করে রাখে তারও কোন হদিস পেলাম না। ধূলি ধূসরিত একটা যন্ত্রের ওপর প্রকাণ্ড রোগা বেড়ালটা ঘুমোচ্ছিল।

নীচের তলার ঘরেরও ঐ একই অবস্থা—শূন্য...শোচ-নীয়—একটা জীর্ণ খাট, ছেঁড়া কম্বলের টুকরো রয়েছে সেখানে। সিঁড়ির একটা ধাপের ওপর রয়েছে এক টুকরো রুটি।...এককোণে তিন চারটে বস্তা রয়েছে...তার ফুটো দিয়ে পলস্তারার গুঁড়ো আর সাদা মাটি গড়িয়ে পড়ছে।...

এই হচ্ছে মঁসিও কর্ণি-এর গোপন রহস্য। মিলের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য এবং লোকেদের বোকাবার জন্য যে মিলে কাজ চলছে তাই তিনি পলস্তারা ভর্তি বস্তাগুলি

সন্তোষ সময় রাস্তা দিয়ে নিয়ে যেতেন। বেচারী মিল! বেচারী কর্মি! বহুদিন পূর্বেই শেষ পদ্ধেরটিকেও বাষ্প-চালিত মিলের লোকেরা সংগ্রহ করেছিল তবুও কর্মি-এর মিলের ডানাও ঘুরছিল এবং শেষণ যন্ত্রের চাকাও বুথাই ঘুরছিল '...

ওরা ফিরে এসে যা দেখেছে সজল নয়নে আমার কাছে আনুপূর্বিক বর্ণনা করল। শুনে আমার বুক ভেঙে গেল। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে আমি প্রতিবেশীদের বাড়ীতে দৌড়ে গিয়ে দু'কথায় সব বললাম। আমরা ঠিক করলাম আমাদের বাড়ীতে যা গম আছে তাই নিয়ে তক্ষুণি রওনা হতে হবে। গাধার পিঠে গমের বস্তা চাপিয়ে আমরা গ্রামবাসীরা সবাই শোভাযাত্রা করে মঁসিও কর্নি-র মিলে রওনা হলাম।...

দেখলাম মিলের দরজাগুলো পুরোপুরি খোলা... দরজার সামনে একটা পলস্তারার বস্তার ওপর বসে দুই হাতের ভেতরে মাথা গুঁজে মঁসিও কর্নিই কাঁদছেন।... ফিরে এসে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর অনুপস্থিতিতে মিলের ভেতরে কেউ ঢুকেছিল এবং তাঁর গোপনীয় ব্যাপারটা জেনে গিয়েছে।

'হতভাগ্য আমি। এখন মৃত্যু ছাড়া আর কোন উপায় নেই—মিলটার অসম্মান হল।' মঁসিও কর্নি শোক করতে লাগলেন।...মিলটার নাম ধরে ডাকতে লাগলেন যেন সত্যিকারেরই মানবীয় সত্তা সেটি...তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অতি করুণভাবে কাঁদতে লাগলেন।

গাধাগুলো যখন মিলের সামনে এসে হাজির হল তখন আমরা আগের মত জোরে চেঁচিয়ে বলতে লাগলাম—'তোমার মিলের জন্য এনেছি...ও মঁসিও কর্নি! কোথায় গেলে।

তাঁর দরজার সামনে বস্তার পাহাড় করা হল...সুন্দর লাল গমের দানাগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল...

মঁসিও কর্নি চোখ দুটো বিস্ফারিত করে খানিকটা গমের দানা হাতের তালুর গর্তের ভেতরে নিয়ে একই সংগে হাসতে হাসতে এবং কাঁদতে কাঁদতে বললেন: গম ...প্রভু! ভগবান!...ভালো গম।...আমার ভালো করে দেখতে দাও।...'

'আমি জানতাম তোমরা সব আমার কাছে আসবে... বাষ্পচালিত মিলের লোকেরা সব ভোজোর।' আমরা বিজয়গর্বে তাঁকে গ্রামে নিয়ে যেতে তিনি বললেন: 'না না বাছারা শোন, আগে মিলটাকে খেতে দিতে হবে... ভেবে দেখত কতদিন তার পেটে কিছুই পড়েনি।'

তিনি ব্যস্তভাবে চাবিটা বার করে কুঁকে বস্তাগুলো খুলতে লাগলেন...তারপর মিলের পেষণযন্ত্রের চাকাটার দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করলেন...গমের দানাগুলো গুঁড়ো হয়ে ধুলোর মত উড়ে গিয়ে সিলিং-এ জমতে থাকল।...

সেইদিন থেকে আর তাঁর কাজের অভাব হল না।...

অবশেষে একদিন প্রভাতে মঁসিও কর্নি পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন আর সেই সংগে মিলের ডানাগুলিও স্থির হয়ে গেল চিরতরে।... *

* মূল ফরাসী থেকে অনূদিত।

২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পূজোয় চাই
নতুন জুতো

Bata

৩১ বর্ষ সপ্তম সংখ্যা কার্তিক ১৩৭৩

সম্পাদকীয়

ভগিনী নিবেদিতা

গত ২৮শে অক্টোবর ভগিনী নিবেদিতার জন্মশতবার্ষিকী সুরু হয়েছে। ১৮৯৭ সালের ২২অক্টোবর স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম সাক্ষাৎ হয় এবং ১৮৯৮-৯৯ ২৫শে মার্চ স্বামীজি নিবেদিতাকে দীক্ষাদান করে সন্ন্যাসিনীর জীবনে ব্রতী করেন। বিবেকানন্দের আদর্শে স্ত্রীশিক্ষার দায়িত্ব নিয়ে নিবেদিতা জনসেবার কাজ সুরু করে অল্পকালের মধ্যে বাংলাদেশের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। বস্তুতপক্ষে, বাংলার অগ্নিযুগের দীক্ষায় নিবেদিতার বহুমুখী অনুপ্রেরণা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসে প্রোজ্জ্বল হয়ে আছে। শুধু বৈপ্লবিক রাজনীতিতে নয়, বিদেশিনী হয়েও অল্পকালের মধ্যেই ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও আদর্শ গ্রহণ করে তারই আলোতে কি অপরূপ পরিপূর্ণতায় তিনি মূর্ত হয়ে উঠেছিলেন, তাঁর রচিত 'Footfalls of Indian History' এবং 'The Web of Indian life' চিরকাল তার সাক্ষর বহন করবে। ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এই মহিয়সী মহিলার অবদান স্মরণ করে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী পালনের মধ্য দিয়ে তাঁকে আমার আত্মীয়রূপে ফিরে পেতে উদ্যোগী হবে এই আবেদন জানাচ্ছি।

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন

গত ৩রা নবেম্বর বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস প্রণেতা ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেনের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন সাহিত্যে ও গবেষণায় নূতন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছিলেন এবং তার চর্চাতেও অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন বাঙালী-মানসে নূতন জাগরণের স্পন্দন তুলে, বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎস সন্ধানের মধ্য দিয়ে ও তার ইতিহাসের ক্রম রচনায়। বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের যে অজস্র সম্ভার—পল্লীগীতি, গাঁথা ও পুঁথিতে জড়িয়ে ছিল, তাদের উদ্ধার করে যেমন অবলুপ্তির হাত থেকে বাঁচিয়েছেন তেমনি নূতন সৃষ্টির সংযোজনায় বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন করে গেছেন। ডঃ দীনেশ সেন অতীতসম্পদ উদ্ধারে গবেষণায় যে ঐতিহ্য

রচনা করেছিলেন তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরবর্তীকালের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞানপিপাসুরা অগ্রসর হয়েছেন। ডঃ সেনের প্রদর্শিত পথ আজ শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলাকে যে প্রতিষ্ঠা দান করেছে বাঙালী জাতি সশ্রদ্ধচিত্তে তা চিরকাল স্মরণ করবে। আমরা তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এই সাহিত্যাচার্যের অবদানের বহুল প্রচার কামনা করি।

অধ্যক্ষের আত্মাহুতি

গত ১৬ই নভেম্বর ইটাচুনা কলেজের প্রবীণ অধ্যক্ষ গোপালচন্দ্র মজুমদার হুগলী জেলার খন্যান স্টেশনের নিকটবর্তী একটি লেভেল ক্রসিং-এ চলন্ত ট্রেনের ধাক্কায় নিশ্চিত মৃত্যু থেকে একটি বালককে রক্ষা করতে গিয়ে সেই ট্রেনের তলায় আত্মাহুতি দিয়েছেন। একটি জীবন রক্ষার জন্য জীবনদানের এই বিরল দৃষ্টান্ত মনুষ্যত্বের অপূর্ব মহিমায় চিরদিন ভাস্বর হয়ে থাকবে। জাতির জীবনে ত্যাগের মূল্যবোধের পুনরাগমনের জন্য এই আত্মদান জাতীয় সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য। অধ্যক্ষ মজুমদারের অক্ষয় স্মৃতির প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাচ্ছি।

ডঃ কালিদাস নাগ

ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম প্রতিনিধি ও শিক্ষাবিদ ডঃ কালিদাস নাগ গত ৮ই নভেম্বর চুয়াত্তর বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। ডঃ নাগ অধ্যাপনার কাজ সুরু করে ১৯২০ সালে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার পর 'ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশন্স অফ এনসেন্ট ইণ্ডিয়া' বিষয়ের জন্য ১৯২৩ সালে ডি. লিট পান। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন এবং মনীষী রমাঁ রলাঁকে তাঁর 'মহাত্মা গান্ধী', 'রামকৃষ্ণ' ও 'বিবেকানন্দ' এই তিনটি রচনায় সাহায্য করেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীরূপে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে তাঁর ভ্রমণও স্মরণীয়।

আমরা বাঙলার এই লোকান্তরিত কৃতী সন্তানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের সমবেদনা জানাচ্ছি।

মিহির সেন

জিব্রাল্টার, বসফোরাস, ডারডেনেলিস ও পানামা খাল সাঁতার দিয়ে শ্রীমিহির সেন কলকাতায় ফিরেছেন। আমরা এই দুর্গমের দুরন্ত যাত্রীকে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাঁর পানামাখাল সন্তরণ নিয়ে বিলিতি পত্রিকায় মুখরোচক আলোচনা বর্ণবৈষম্যের একটি উদ্দীপন মাত্র। এই ধরণের নিম্নরুচি সমালোচনা বিশ্বের দুর্গমের অভিযাত্রীদের কাছ থেকে তীব্র নিন্দায় ডুবে যাবে এই আশা করি।

নন্দা বিদায় : মন্ত্রীসভার রদবদল

ভারত মন্ত্রী গুলজারীলাল নন্দা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে ৮ই আগষ্ট তারিখে বিদায় নিয়েছেন; বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছেন বলাই সঙ্গত হবে। তার আগের দিন, অর্থাৎ ৭ই আগষ্ট দিল্লীতে এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে গেছে। পার্লামেন্ট ভবনের সম্মুখে বিশাল সাধু সমাবেশের নেতৃত্বে কয়েক লক্ষ লোকের—কারো মতে সাতলক্ষ—একটি শোভাযাত্রা ভারতবর্ষে গো-হত্যা নিবারণের দাবীতে অগ্রসর হওয়া কালীন চরম উচ্ছৃঙ্খলতার মুখে পার্লামেন্ট ভবনের নিকটবর্তী বাড়ী, ঘর, মোটর, স্কুটার আক্রমণ করে তাণ্ডব সুরু করে দেয়। কংগ্রেস সভাপতি কামরাজের গৃহও এইভাবে আক্রান্ত হয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়। পুলিশ এই উচ্ছৃঙ্খলতা দমনে ব্যর্থ হয়ে গুলি করে, ফলে ৮ জন নিহত হয়েছে ও শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছে।

পার্লামেন্ট ভবনের সম্মুখে এ যাবৎ যত বিক্ষোভ

মিছিল পরিচালিত হয়েছে। বৃহৎ জমায়েত হয়েছে, কিন্তু গো-হত্যা বন্ধের দাবীতে গত ৭ই নভেম্বরের মিছিল নিঃসংশয়ে বৃহত্তম। বেশ কিছুদিনের ব্যাপক প্রস্তুতির ফলে এই মিছিল সম্ভব হয়েছে। ট্রেন ও বাসে হাজার হাজার সাধু ও অন্যান্য বিক্ষোভকারীর দল দিল্লীতে এসে পৌঁছেছে; এদের সব আয়োজন প্রকাশ্যে সম্পূর্ণ হলেও যে বিশৃঙ্খলার বিস্ফোরণ অকস্মাৎ ঘাস দিল্লীতে পার্লামেন্টের নাকের ডগায় গণতন্ত্রের ঠাটের প্রতি জনতার চরম অবজ্ঞার আত্মপ্রকাশ করলো তাকে প্রতিরোধের প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও অপ্রস্তুতি, সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে ব্যবধান যে কতো দুস্তর তা সপ্রমাণ করে শাসক দল ও সরকারের অভ্যন্তরে ভূকম্পন সৃষ্টি করেছে। এই ভূকম্পনের আঘাতে নন্দাকে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বিদায় দিয়ে শাসক দল টাল সামলাবার চেষ্টা করেছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরূপে ৭ই নভেম্বরের ঘটনার জন্য নন্দার অনস্বীকার্য দায়িত্ব রয়েছে, কিন্তু সমস্ত দেশে যে বিস্ফোরক পরিস্থিতির পটভূমিকায় দিল্লীতে ৭ই নভেম্বরে: বিশৃঙ্খলা ঘটা সম্ভব হলো, পার্লামেন্ট ভবনের চতুষ্পার্শ্বের নিস্তরঙ্গ শান্ত পরিবেশ আকস্মিক রক্তের ছাপটায় চুরমার হয়ে আতঙ্কের শিহরণ ছড়িয়ে দিল, তার জন্য দায়ী শুধু নন্দা নন, দায়ী কংগ্রেস সরকারের অনুসৃত নীতি এবং সমগ্রভাবে কেন্দ্রীয় সরকার। সুতরাং, এই ঘটনার জন্য শুধু নন্দার নয়, সমগ্র মন্ত্রীসভারই বিদায় নেওয়া অনিবার্য ছিল। কিন্তু কংগ্রেসের অভ্যন্তরে একটি শক্তিশালী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠি, যাদের বিরুদ্ধে নন্দার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীত্বের আমলে দুর্নীতির অভিযোগে ব্যবস্থা গৃহীত হবার ফলে তারা হতমান হয়ে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন, যাদের বিরুদ্ধে এই অভিযান এখনও অব্যাহত ছিল, কিম্বা নন্দার দুর্নীতি বিরোধী অভিযান যাদের পথের কাঁটা ছিল, তাদের প্রবল চাপে নন্দা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে কার্যত বিতাড়িত হয়েছেন। এই সঙ্কটে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এদের চাপের সামনে যেভাবে নতি স্বীকার করেছেন, যে কোনো কারণেই হোক অর্থমন্ত্রী ও বাণিজ্য মন্ত্রীর পদত্যাগ আদায় করেও তাদের মন্ত্রীসভায় বহাল রাখতে বাধ্য হলেন, যে ভাবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীচ্যবনকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভার দিতে মনস্থ করেও উপদলীয় টানাপোড়েনে কয়েকদিনের বিলম্বে বাধ্য হলেন তাতে একথাই সপ্রমাণ হয়ে গেছে যে দায়িত্ব ও নেতৃত্ব, উপদলীয় চক্রের বেনামীতে প্রধানমন্ত্রী বহন করছেন। ডিভাল্যুয়েশনের সময় এ-সম্পর্কে যেমন অশোক মেটা-সুব্রমনিয়ম চক্রের কথা উঠেছিল, নন্দা বিতাড়ন ও মন্ত্রীসভার রদবদলে তেমনি অতুল্য ঘোষ-এস, কে, পাতিল চক্রের নাম শোনা গেছে। কাজেই অবশ্য মন্ত্রীসভার রদবদলের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রধানমন্ত্রীর এক্তিয়ারে ছেড়ে দিয়ে অন্তত বাহ্যত সাংবিধানিক মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন এবং একই সঙ্গে নন্দাকে সাধারণ নির্বাচনের ভার দিয়ে তার প্রতি আস্থা ব্যক্ত করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর পরনির্ভরতা ও দৃঢ়তার অভাব, মন্ত্রিসভার দুর্বলতা এবং কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের উপদলীয় কোন্দল, নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে ৭ই নভেম্বরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। কংগ্রেসের ভেতরে দুর্নীতির চক্র এই বিভ্রান্তির সুযোগ নিয়ে আসল সমস্যা চাপা দিয়ে তাদের পরম শত্রু নন্দা-নিধনে অগ্রণী হল।

নন্দার দক্ষতা সত্ত্বেও, তার ভূমিকাও খুব গৌরবের নয়। পদত্যাগের পর নন্দা প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন—তার প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আস্থাহীন আচরণের জন্য। নন্দা একজন প্রবীণ কংগ্রেসী মন্ত্রী, মন্ত্রীসভায় সব চাইতে প্রবীণ এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দায়িত্বভার প্রধানমন্ত্রীর পরেই। তা সত্ত্বেও শ্রীমতী ইন্দিরার সঙ্গে তার পারস্পরিক সম্পর্ক যদি গভীর আস্থাজ্ঞাপক না হয়ে থাকে—লালবাহাদুর শাস্ত্রীর আমলে যা ছিল- সে ক্ষেত্রে নন্দার বহুপূর্বেই এ-

সম্পর্কে প্রতিকারের পথ খুঁজে নেওয়া কর্তব্য ছিল। পরত্যাগে বাধ্য হয়ে এই ধরণের অভিযোগ অন্তত নন্দার মতন প্রবীণ মন্ত্রী ও কংগ্রেসী নেতার মুখে শোভা পায় না। তাছাড়া স্বরাষ্ট্র সচিবের অসহযোগিতা সম্পর্কে নন্দার অভিযোগ নন্দার অসহায় অবস্থাই সূচিত করেছে। সে অবস্থায় নন্দার হয় এই সচিব পরিবর্তন অনিবার্য করে তোলা উচিত ছিল, না হয় বহুপূর্বেই মর্যাদা ও সম্মান নিয়ে মন্ত্রী-সভার বাইরে চলে আসা উচিত ছিল। এ বিষয়ে নন্দার আচরণ শোচনীয়ভাবে দুর্বল এবং প্রধানমন্ত্রীর আচরণও তীব্রভাবে নিন্দনীয় কারণ যে প্রধানমন্ত্রী তার প্রবীণ ও সম্মানিত সহযোগীদের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়োজন বোধ করেন না তার হাতে ক্যাবিনেটের সম্মান এবং দেশের সম্মান ভঙ্গুর। সেই প্রধানমন্ত্রীরও বিদায় হওয়া অনিবার্য। নন্দার মন্ত্রীসভা থেকে নিষ্ক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই কামরাজ তাকে সংগঠনের গুরুদায়িত্ব দিয়ে যেভাবে তার উপর আস্থা ও সম্মান দেখিয়েছেন, কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বৈপরীত্য এই ঘটনায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

গো-হত্যা বন্ধ আন্দোলন ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠেছে, কেন্দ্রীয় সরকার সে-সম্পর্কে অবহিত আছেন। এর পশ্চাতে যে সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল অংশ শক্তি যোগাচ্ছে তাও কেন্দ্রীয় সরকারের অজানা নেই। গো-হত্যা বন্ধের অর্থনীতি, তার অন্যান্য আনুসঙ্গিক ঘাত-প্রতিঘাত ধীর-স্থির আলোচনার মধ্যে দিয়ে বহুপূর্বেই জনমনকে সরকারী তরফ থেকে প্রচারের অবকাশ ছিল। যারা ভেজালের বিষ দিয়ে মানুষ-হত্যাতে পশ্চাদপদ হয় না, গো-হত্যা বন্ধের পেছনে তারা কেন অর্থনীতি নিয়ে দাঁড়ায় সে-কথা সহজেই অনুমান করা যায়। এই জটিল ভাবাবেগসম্পন্ন সমস্যাটির গ্রন্থিগুলি ধীরে ধীরে উন্মোচিত হলে এই অবস্থা এতো গুরুতর হতো না। এ-সম্পর্কে কেন্দ্রের যেমন, রাজ্যসরকারগুলিও দায়িত্ব রয়েছে। তাছাড়া সংবিধানের নির্দেশ সম্পর্কেও যদি দেশের সংশ্লিষ্ট জনসাধারণকে সময় থাকতে অবহিত করা হতো, এই আন্দোলন এই অবস্থা ধারণ করতে পারতো না। এ বিষয়ে ব্যর্থতা কোনো দল বিশেষের নয়। সমগ্রভাবে শাসকগণের এবং তার সরকারের। এখানে দায়গ্রিক ব্যর্থতা আজ গো-হত্যা নিরোধ আন্দোলনের ছিদ্রপথে এই নভেম্বরের দুর্যোগ ঘনিয়ে এনেছে।

নির্বাচনী ঐক্যে ভাঙন

অবশেষে তের পার্টির নির্বাচনী ঐক্য প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। পিকিং-পন্থী কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে মস্কোপন্থীদের সঙ্গে আসনের ভাগাভাগি নিয়ে যে বিরোধ গত তিনমাস যাবৎ এই তেরটি পার্টির নির্বাচনী ঐক্যের অন্তরায় হয়ে ছিল, শেষ পর্যন্ত আদর্শনৈতিক বিরোধের রূপ নিয়ে তা আত্মপ্রকাশ করেছে। আসলে এই আদর্শনৈতিক বিরোধ বরাবরই ছিল এবং গত যে মাসে পিকিংপন্থী কম্যুনিষ্টদের রাজ্য পার্টির সম্পাদক শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের বিবৃতিতেই জানা গিয়েছিল যে তারা এই নির্বাচনে বিকল্প সরকারের পক্ষ ঘোষণা করবেন না, তাদের আশু উদ্দেশ্য কংগ্রেসের সংখ্যা গরিষ্ঠতার পরিমাণ হ্রাস করা মাত্র। তাছাড়া মস্কো-পন্থীদের —যাদের তারা কম্যুনিষ্ট না বলে ডাঙ্গেপন্থী নামে অভিহিত করেন—সঙ্গে যে আদৌ কোনো সমঝোতায় আসবেন না, এই মনোভাবও তারা বরাবরই সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে এসেছেন। তের পার্টির নির্বাচনী ঐক্যের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ঘটলোও তাই—পিকিংপন্থীদের সঙ্গে মস্কোপন্থীদের আদর্শগত বিরোধ এই বিরোধী দলগুলির ঐক্যপ্রচেষ্টার ছেদ টেনে দিল।

অতঃপর দুই কম্যুনিষ্ট পার্টির চারপাশে দুইটি নির্বাচনী মোর্চার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের আদর্শগত দ্বন্দ্ব যে শেষ পর্যন্ত পশ্চিম বাংলার

নির্বাচনী রাজনীতিতে পড়িয়ে গেছে এই বাস্তবকে পশ্চিম বাংলার জনসাধারণ ভুলে যান, বিভিন্ন বিরোধীদলগুলিও সম্যকরূপে বুঝতে পেরেছে কিনা সে সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ আছে। কারণ, যদি তাই হোতো সেক্ষেত্রে বহুপূর্বেই যে-সকল বিরোধীদল জাতীয় নিরাপত্তা ও সমাজবাদী আদর্শের অনুসারী, বহু পূর্বেই তারা এই পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত হয়ে নিজ নিজ নির্বাচনী বূহ রচনা করতো এবং পশ্চিম বাংলার জনসাধারণকে এ সম্পর্কে অবহিত করে জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষে সহায়তা করতো। সে-দায়িত্ব পালনে উল্লেখযোগ্য দৃঢ়তা নিয়ে কোনো দলই অগ্রসর হয় নাই। ফলে বাস্তবকে আড়াল দিয়ে ঐক্যের ভাবানুতা ছড়িয়ে সাধারণ মানুষের মনে এই দলগুলি ঐক্যের জন্য প্রবল আবেগ সৃষ্টি করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত প্রচ্ছন্ন দ্বন্দ্বকে অনাবৃত করে সেই আবেগে আঘাত হেনে জনসাধারণের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে কংগ্রেসের জয়ের পথই সুগম করে দিল। বিরোধীদলগুলি স্বেচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, আদর্শ জয়ের প্রবল প্রলোভনে এই দ্বন্দ্বের শরীক হয়ে, হয় সিকিং-পন্থীদের, নয়তো বঙ্গোপন্থীদের শিবিরের অনুসারী হবার পথে অগ্রসর হচ্ছে। এই অনৈক্যের ফলে বিরোধী রাজনীতি কংগ্রেস ও কংগ্রেসবিরোধী বৈপরীত্যের চাইতে সিকিং ও বঙ্গের বৈপরীত্যে বিভক্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে,—জাতীয় জীবনের পক্ষে যা অতীব দুর্ভোগের। জাতীয়তাবাদী দলগুলি বিধ্বংসী ঐক্যের বায়ালাল বিস্তার না করে জাতীয়তার আদর্শে সুপ্রতিষ্ঠিত, কংগ্রেসবিরোধী ঐক্যবদ্ধ নির্বাচনী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে কংগ্রেসবিরোধী দুর্জয় দুর্গ সংগঠন করে কংগ্রেসের অন্তিম পরাজয়ের পথ সুগম করতে পারতো। বর্তমান পরিস্থিতি কংগ্রেসের আয়ু দীর্ঘায়িত করে জাতীয় জীবনে সিকিং ও বঙ্গোমুখীনতাকেই অগ্রাধিকার দেবে।

ছাত্র বিক্ষোভ

সমগ্র দেশ গত কয়েক মাসে ছাত্র বিক্ষোভের আঘাতে বিপন্ন হয়ে গেছে। ছাত্র বিক্ষোভের নামে ও ছাত্র-বিক্ষোভের আড়ালে অ-ছাত্রদের তাণ্ডব, ছাত্র-জীবন বহির্ভূত সমস্যা নিয়ে কোথাও ছাত্রদের দ্বারা এবং ছাত্রদের নামে অছাত্রদের প্রচণ্ড আন্দোলন, শিক্ষাক্ষেত্রে বিপর্যয় ডেকে এনেছে, সামাজিক শৃঙ্খলাবোধ বিনষ্ট করেছে, মূল্যমানের মূলোৎপাটন করেছে এবং ছাত্র ও যুবজীবনকে দিগভ্রান্ত করে তাদের ধ্বংসের রাজপথে নামিয়ে এনেছে। সামাজিক ও আর্থিক কাঠামোতে বৈষম্য, লাঞ্ছনা ও পীড়ন, শিক্ষাক্ষেত্রে আদর্শ ও লক্ষ্যহীনতা, শিক্ষার সহিত কর্মসংস্থানের বিচ্ছেদ, সমগ্রভাবে জীবনবোধের গভীরতার অবক্ষয় এবং নৈতিক মূল্যমানের অবলম্বন ও সর্বগ্রাসী ব্যর্থতাবোধ আজ ছাত্র ও যুবকদের মনে সংহারের প্রচণ্ডতা নিয়ে দেখা দিয়েছে। উনিশ বছরের স্বাধীন সরকারের শাসনের এই ফলশ্রুতি উপেক্ষা করবার ক্ষমতা শাসকবৃন্দেরও নাই।

তাই মূল্যায়ন শুরু হয়েছে এই বিক্ষোভের। কারণ নির্ণয়ের জন্য কমিশন-কমিটির সুপারিশ লাভাস্রোতের মত বয়ে চলেছে। এই ব্যাপারে অগ্রণী হয়েছিলেন ভারত সরকারের তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দা, যেন সমস্যাটা কেবলই আইন ও শৃঙ্খলার। অত্যন্ত পরিতাপের ও লজ্জার কথা পুলিশী কর্তারাই প্রথম বৈঠক করে রায় দিলেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের প্রশাসনিক ক্ষমতা দিয়ে ছাত্রবিক্ষোভ দমনের উদ্যোগ করতে হবে। শিক্ষা-মন্ত্রীর উদ্যোগে অতঃপর বৈঠকে শোনা গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বয়ং-শাসন অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা দাবী করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশী হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে, শিক্ষার ক্ষেত্র নিষ্কলুষ রাখতে হবে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখা এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে রাজনীতির প্রাঙ্গণে

পরিণত না হতে দেবার শুভেচ্ছাও উচ্চারিত হয়েছে। এ-ছাড়া ছাত্র-কল্যাণ, শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কের নবায়ন, শিক্ষাসূচির বহির্ভূত ছাত্রদের উপযুক্ত কর্মসূচী প্রভৃতি নানা বিষয়েরও অবতারণা হয়েছে। কেউবা ইন্দোনেশিয়া, জাপান কিম্বা কোরিয়ার ছাত্রদের আচরণের সঙ্গে আমাদের ছাত্রদের আচরণের তুলনামূলক আলোচনা করে নিজেদের দেউলিয়াপনা ও ব্যর্থতা ঢাকবার চেষ্টা করেছেন।

আসলে বিচ্ছিন্নভাবে এই দুরন্ত সমস্যার সমাধান খুঁজে বার করবার ব্যর্থ চেষ্টায় কোনো কাজ হবে না। এই সমস্যার সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক ও মানসিক সমস্যার সম্পর্কবোধের মধ্য দিয়ে সমস্যার সামগ্রিকরূপটি সম্বন্ধে অবহিত হয়ে সামগ্রিক সমাধানের দিকে অগ্রসর হতে হবে। ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন থেকে রাষ্ট্রিক জীবন পর্যন্ত যে নীতিবোধের অবক্ষয় আমাদের জীবনে ঘুণ ধরিয়েছে, সেখান থেকে কাজ শুরু করতে হবে। যে কিশোর, যে যুবক, যে ছাত্র, জীবনের ভিতের সন্ধান পায়নি, জীবনের কোনো ভিত আছে বলে বোধ জন্মাতে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র যার সহায়ক হয় নি, তার দুঃসহ মানসিক অপূর্ণতা তাকে ভাঙনের পথে পরিচালিত করবেই। আজ এই মৌলিক প্রশ্নটির চারিপাশে অন্যান্য সমাধানগুলিকে সন্নিবেশিত করতে হবে। এ-ছাড়া কোনো সহজ পথ নেই।

পাক-চীন চক্রের সামরিক উদ্যোগ

ভারতে সীমান্তের পাক চীনের সামরিক উদ্যোগ উল্লেখযোগ্যরূপে যে বৃদ্ধি পেয়েছে, কিছুদিন যাবৎই তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। গত এপ্রিলে একবার এবং সেপ্টেম্বরে দুইবার চীনাবাহিনীর ভুটানে পরিকল্পিত অনুপ্রবেশ, ভারত-ভুটান সম্পর্ক অস্বীকার করে চীন-ভুটান সীমান্ত সীমাংসার জন্য ভুটানের সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় চীনের দাবী ও এই সম্পর্কে ভারতের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য, কাশ্মীরের পাক-অধিকৃত এলাকায় চীনের সাহায্যে তিনটি সামরিক বিমানঘাঁটি নির্মাণ এবং কয়েকটি হেলিকপ্টার ঘাঁটি নির্মাণ, চীনের ভারী সামরিক যন্ত্র পাঠাতে কারাকুরমের পথ দিয়ে গিলগিটের সঙ্গে রাওয়ালপিণ্ডির যোগাযোগস্থাপনের জন্য রাস্তা নির্মাণ, পূর্ব-বাংলায় চীনা ঘাঁটি ও চীনা অনুপ্রবেশের অবাধ সুযোগ দান, ত্রিপুরার কেলো নিমা সীমান্তে আবার গুলিবর্ষণ প্রভৃতি ছোট-বড় নানা ঘটনা ভারত সীমান্তে পাক-চীন সামরিক চক্রের তৎপরতার বৃদ্ধির সাক্ষ্য বহন করছে। গত সেপ্টেম্বরে পশ্চিম ও পূর্ব সীমান্তেও পাকিস্তানের সামরিক তৎপরতা এতে বৃদ্ধি পেয়েছিলো, যে শেষপর্যন্ত তাসখন্দের চাপে দুই পক্ষের সেনাধ্যক্ষদের দিল্লীতে বৈঠক করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তারপর অবস্থার আরও অবনতি যে হয়েছে তা বোঝা যায় গত ১৫ই নভেম্বর নূতন পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীচাগলার রাজ্যসভায় সাম্প্রতিক ঘোষণায়: "We know the threat to us as a result of this alliance between China and Pakistan এবং চীন ও পাকিস্তান সর্বক্ষেত্রেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে: Pakistan and China were getting closer to each other in all fields. In science, technology and military matters they were getting closer and closer together."

গত ৮ই নভেম্বর রাজ্যসভায় প্রশ্নের উত্তরে প্রতিরক্ষা উৎপাদন দপ্তরের মন্ত্রী এ. এম. টমাস বলেছেন পাকিস্তানের সেনাবাহিনী লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ('sizeable increase')। লণ্ডনের Institute of Strategic Studies প্রকাশিত সামরিক প্রসঙ্গের বার্ষিকী "The Military Balance, 1966-67" এই সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য সপ্রমাণ করছে। পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে গত সেপ্টেম্বরের যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি ইতি-মধ্যেই পূরণ করে ফেলেছে, তার পদাতিক বাহিনী ৯ ডিভিশন থেকে ১১ ডিভিশনে উন্নীত হয়েছে। পাক-

অধিকৃত কাশ্মীরে সেনাবাহিনী প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছে। টাঙ্ক ছাড়াও দুইটি গোলন্দাজ ডিভিসনের উপযোগী অস্ত্রশস্ত্রের চীন সরবরাহ করেছে। পাকিস্তান একটি ফরাসী প্রতিষ্ঠান থেকে তিনটি সাবমেরিন ক্রয়ের জন্য উদ্যোগী হয়েছে।

গত ২৭শে অক্টোবর ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে চীন চতুর্থ আনবিক বোমা বিস্ফোরণ করে চীনের দুই হাজার কিলো-মিটারের মধ্যে অবস্থিত দেশগুলিকে—তার মধ্যে ভারত, পাকিস্তান, জাপান রয়েছে—বিপন্ন করে তোলা সত্ত্বেও পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব পীরজাদা এই বিস্ফোরণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। চীনের পক্ষ থেকে আনবিক বিপদ কোন পর্যায়ে পৌঁচচ্ছে তা বোঝা যায় বিখ্যাত মার্কিনী আনবিক বিজ্ঞানী র‍্যালফ্, ই. ল্যাপ-এর সাম্প্রতিক বিবৃতিতে। র‍্যালপ বলেছেন: আগামী বছরের মাঝামাঝি চীনের হাতে ১০০টি আনবিক বোমা এবং ক্ষেপণাস্ত্র মজুদ হবে। এই বাস্তব সম্ভাবনার মুখে চীনের বিস্ফোরণে পাকিস্তানী অভিনন্দন, দুই রাষ্ট্রের সামরিক চক্রান্ত কত গভীর তারই পরিচয় দেয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে তাসখন্দ চুক্তির ভিত্তিতে পাক-ভারত আলোচনার সূত্রপাত করবার ভারতীয় প্রচেষ্টা পাকিস্তান কর্তৃক বারবার প্রত্যাখ্যাত হবার উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতবর্ষের দিক থেকে কোনো নমনীয় পূর্বসর্ত ব্যতিরেকে পাক-ভারত বৈঠকে পাকিস্তানের অসম্মতি একটি মাত্র ইঙ্গিতই বহন করে। সেটা হোলো পাকিস্তান চীনের সাহায্যে কাশ্মীর পুনরুদ্ধারের আর একটি উদ্যোগে সচেষ্ট হবে। বিকল্পে সিকিউরিটি কাউন্সিলে এই প্রশ্ন উত্থাপন করে যে কোনো সুবিধা হবে না, সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেই পাকিস্তান আবার সশস্ত্র প্রস্তুতির পথ ধরেছে। সুতরাং পাক-চীনের আঘাত আবার ভারতের দিকে উদ্যত হয়ে উঠেছে, তা সন্দেহাতীত।

সীমান্তে উত্তেজনা

আসাম-পূর্বপাকিস্তানে পাক অনুপ্রবেশের আর এক পর্যায় শুরু হয়েছে। দুজন পাকিস্তানী গোপনে আসামে অনুপ্রবেশের জন্য আসাম-পূর্বপাকিস্তান সীমান্তে অপেক্ষা করছে, এই মর্মে আসাম সরকার ভারত সরকারকে জানিয়েছেন। এদের একটা বড় অংশ কিছুদিন পূর্বেও আসামে বাস করছিল এবং এদের আসাম সরকার অবৈধ অনুপ্রবেশকারী সাব্যস্ত করে ওপারে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু পাকিস্তানী সরকার এদের সীমান্তেই অপেক্ষা করিয়ে আবার ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন।

পশ্চিম বঙ্গেও পাক-অনুপ্রবেশের চেষ্টার নজীর পাওয়া গেছে। কুচবিহার দিয়ে হাজার হাজার পাকিস্তানী ভারতে অনুপ্রবেশের জন্য সক্রিয়। সিনহাটা মহকুমার সাহেবগঞ্জ সীমান্তে কিছু লোককে ঠেলেও দিয়েছিল। ভারতীয় সীমান্ত পুলিশ তাদের রুখে দেয়। বসিরহাটের বিভিন্ন কারবার সীমান্ত পেরিয়ে আসার জন্য ৩১ জন পাকিস্তানী সম্প্রতি গ্রেপ্তার হয়েছে।

বসিরহাটের ঘোজাডাঙ্গা সীমান্তে সাম্প্রতিক পাকিস্তানী তৎপরতা পূর্ববঙ্গে আর একটি পর্যায়ে হিন্দু বিতাড়নের উদ্যোগের আভাস বহন করে এনেছে। কয়েকটি হিন্দু-পরিবারকে এই সীমান্ত দিয়ে পাকিস্তান ভারতে ঠেলে দিয়েছিল। ভারত সরকার এই অসহায় মানুষগুলিকে গ্রহণ করে তাদের নিরাপত্তা বিধান করা তো দূরের কথা, সীমান্তে পাকিস্তানী উত্তেজনা সৃষ্টির সহায়ক ভূমিকায় এই হতভাগ্য পরিবারগুলিকে পুনরায় পাকিস্তানে ঠেলে তাদের মৃত্যুর হাতে তুলে দিয়েছে। ভারত সরকারের এই নির্লজ্জ, নির্মম ও নীতিহীন অমানবীয় আচরণ পাকিস্তানী বর্বরতার ইন্ধন যুগিয়ে সীমান্তের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছে। ভারত সরকারের এই আচরণ আত্মহত্যার সামিল।

নাগা-বৈঠক

২৯শে অক্টোবর বিদ্রোহী নাগাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর আলোচনা বৈঠকের চতুর্থ পর্যায় সমাপ্ত হলেও নাগা-সমস্যার কোনো দীর্ঘাংশের সম্ভাবনা দেখা যায় নাই। অথচ, বৈঠক আরও চলবে, এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়েছে, যদিও পরবর্তী কিস্তির দিন নির্দিষ্ট হয় নাই। সুযাটো সুযাই পরিচালিত নাগা প্রতিনিধিদের দাবী সার্বভৌম নাগাভূমির প্রতিষ্ঠা এবং ভারত সরকারের বক্তব্য ভারতীয় সংবিধানের কাঠামোতে চূড়ান্ত স্বয়ং-শাসন। এই দুই পরস্পর-বিরোধী লক্ষ্যের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য দফায় দফায় আলোচনায় কি সার্থকতা, অন্তত ভারত সরকার সে কথা দেশের মানুষকে বোঝাতে পারে নাই এবং এই আলোচনার বিস্তৃতিতে এই আশঙ্কাই সৃষ্টি হয়েছে যে ভারত সরকারের অনিশ্চিতি বিদ্রোহী নাগাদের অভীষ্টসিদ্ধির আয়োজনই সম্পূর্ণ করবার দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। অথচ এদিকে নাগাভূমির কোনো কোনো অঞ্চলে যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি ভেঙে পড়বার সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে। সার্বভৌমত্ব না স্বয়ং-শাসন, নাগাসমস্যার আলোচনার এই টানাপোড়েন যত দীর্ঘায়িত হবে, নাগা-এলাকার স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন যেমন বিলম্বিত হবে, তেমনি পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি, শৃঙ্খলা ততো বিঘ্নিত হবে। আসামের সীমান্তের অঞ্চলে চীন-পাকিস্তানের যুক্ত উদ্যোগে জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যে বিপদ দেখা দিয়েছে, নাগা-সমস্যার আলোচনার অনিশ্চিতি তার জটিলতা দ্রুত বৃদ্ধি করবে।

মিলিটারি ট্রেন দুর্ঘটনা

গত ১১ই নভেম্বর শিলিগুড়ির ২৫ কিলোমিটার দূরে একটি মিলিটারী স্পেশাল ট্রেন বিধ্বস্ত হয়ে ১৪ জন সামরিক কর্মচারী নিহত হন এবং ৩১ জন আহত হন, তার মধ্যে ১০ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। দুর্ঘটনার স্থানের কাছে কয়েকটি রিসপ্লেট অপসারিত অবস্থায় এবং টে লাইনের তারও কাটা পাওয়া গেছে। শেষরাত্রে এই গাড়ীটির প্রায় দেড় ঘণ্টা পূর্বে একটি মালগাড়ী এই লাইনের ওপর দিয়ে অক্ষত অবস্থায় চলে যায়।

ভারতীয় রেললাইনে পৌনঃপুনিক রেল দুর্ঘটনা সত্ত্বেও দুর্ঘটনার কারণ নির্ণয়ে মামুলী অনুসন্ধান ছাড়া রেল ভ্রমণ নিরিঘ্ন করবার ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নাই। রেলবিভাগের প্রশাসনিক ব্যর্থতার জন্য কয়েক শত মানুষের জীবননাশ এবং আরও কয়েকহাজারের যে অঙ্গহানি হয়েছে, সে দায়িত্ব এড়িয়ে রেলমন্ত্রী পাভিস পদত্যাগে বার বার অস্বীকার করেছেন। কিন্তু এবারকার ঘটনার প্রকৃতি বিভিন্ন, এই দুর্ঘটনা দেশের নিরাপত্তার গোড়ায় আঘাত করেছে এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অন্তর্ঘাতের জালটুক কতদূর প্রসারিত হয়েছে, তার আভাসও পাওয়া যাচ্ছে। লোকসভায় অভিযোগ উঠেছে যে রেলপথ পাহারার ব্যবস্থা ছিল না। এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে রেল রাষ্ট্রমন্ত্রী ও রেল উপমন্ত্রী বিভিন্ন বিবৃতি দিয়েছেন এবং একটি সামরিক অফিসার অভিযোগ করেছেন যে ট্রেনটি পাহারার উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল না। শিলিগুড়ির এই দুর্ঘটনার জন্য অবিলম্বে রেলমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত অন্যথায় নিরাপত্তার বিপদের সম্মুখে সরকারী তৎপরতার কোনো প্রতিশ্রুতি জনসাধারণ কিম্বা সামরিক বাহিনীর কাছে পৌঁছাবেনা। মন্ত্রীর পদত্যাগের দাবীর তাৎপর্য এইখানে।

ধারাবাহিক রচনা

সুভাষচন্দ্র

পবিত্রকুমার ঘোষ

কার নেতাজী ?

বাংলা দেশে ও বাংলা ভাষায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনপ্রসঙ্গ আলোচনার সার্থকতা সম্পর্কে সংশয় জাগে। কারণ যদিও তিনি বাঙালী ছিলেন তবু তিনি বাংলা দেশেরই নেতা ছিলেন না, রাজনৈতিক জীবনের প্রায় প্রথম হতেই তিনি সর্বভারতীয় নেতৃত্ব লাভ করেছিলেন – এবং তাঁর চিন্তা ও কল্পনা, কর্মপন্থা ও সংগ্রাম কখনোই শুধু বাংলা দেশকে কেন্দ্র করে আবদ্ধ থাকেনি ; তাঁর ভূমিকা ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশাল প্রেক্ষাপটে বিস্তারিত হয়েছিল। তাঁর 'নেতাজী' নামের সার্থকতা শুধু বাংলা দেশের পটভূমিতে নয়, পরন্তু সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কিন্তু ইতিহাস যাঁরা লেখেন তাঁরা,—দেশী ও বিদেশী প্রায় সমস্ত ঐতিহাসিকই – ইতিহাসের পৃষ্ঠা হতে তাঁর সাধনা ও কীর্তির কথা মুছে ফেলার প্রয়াসে রত ;—জানিনা এর পিছনে ভারত সরকারের ঔদাসীন্য, প্ররোচনা কিংবা ষড়যন্ত্র কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে আছে। আমাদের বাংলা ভাষায় যদি তাঁর জীবন ও কর্মের আলোচনা করি তবে একথা নিশ্চিত যে বিশ্বের ইতিহাস-রচয়িতাদের ভুল বা মিথ্যাচারকে সংশোধন করা তদ্দ্বারা সম্ভব হবে না ; বাঙালীর চিত্তে সুভাষ-প্রসঙ্গের আবেদন যতই থাকুক, তাঁর সমগ্র জীবনের কর্মাবলীর প্রকৃত মূল্যায়ন, বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-কালে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা ও অবদানের পূর্ণ কীর্তি বাংলা ভাষার মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব নয়। কেননা বিশ্বইতিহাস-প্রসঙ্গ বিশ্বজনের নিকট উপস্থাপিত করতে হলে বাংলা ভাষায় তা করা যায় না ; আর নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবন-কথা বিশ্বইতিহাসের পটভূমি ভিন্ন আলোচনা করা অন্যায় ও ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

কেন এই প্রসঙ্গ আজ বিশেষভাবে তুলতে হল তার কারণ সংক্ষেপে বলা যাক। ১৯৬৬ সালে লণ্ডন হতে Cassell and Company Ltd. নামক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত এবং Arthur Swinson কর্তৃক লিখিত Kohima নামে একখানি ইতিহাসগ্রন্থ আমরা সম্প্রতি পড়েছি। ইতিপূর্বে Sir Geoffrey Evans এবং Antony Brett-James নামক দুজন গ্রন্থকারের লেখা Imphal নামে একখানি ইতিহাসগ্রন্থ মাকমিলান কোম্পানী কর্তৃক ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৫৬ সালে Arthur Campbell কর্তৃক লিখিত কোহিমা যুদ্ধ সম্পর্কে The Siege নামে আরেকখানি বই জর্জ অ্যালেন এণ্ড আনউইন লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল। এই তিনখানি গ্রন্থের মধ্যে দুইখানিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে কোহিমার যুদ্ধ ও আরেকখানিতে ইম্ফলের যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। আমরা জানি যে কোহিমা ও ইম্ফলের যুদ্ধে

স্বাধীন ভারত সরকারের ভারতীয় জাতীয় সৈন্যবাহিনী অংশ গ্রহণ করেছিল,—বীরত্ব ও ত্যাগ, দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার আদর্শ, জীবনের মূল্যে তারা সেই দুই রণাঙ্গনে লিপিবদ্ধ করে গেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই দুই যুদ্ধক্ষেত্রের যুদ্ধ কাহিনীর অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ মূল্য আছে এবং নেতাজীর জীবনপ্রসঙ্গ আলোচনা করতে গেলে এই দুই রণক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ কীভাবে মূর্ত হয়েছিল একদিন সেকথা বিশদভাবে বলা দরকার। বিদেশী ঐতিহাসিকরা কিন্তু শুধু ঐ দুই রণক্ষেত্রের কথাই নয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস আলোচনা করতে বসেই নেতাজী ও তাঁর আই. এন. এর সমগ্র কীর্তিকথা বেমালুম মুছে দিতে চান, আমাদের আলোচ্য তিনখানি গ্রন্থ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে এ যাবৎ যত গ্রন্থ বেরিয়েছে সে সমস্ত একত্রে আমার বক্তব্যকে সুপ্রমাণিত করে।

স্থইনসনের মোট ২৭৫ পৃষ্ঠার গ্রন্থে সুভাষচন্দ্র ও তাঁর আই. এন. এর উল্লেখ আছে মাত্র দুবার—এবং সে উল্লেখও প্রকৃত তথ্য বিকৃতভাবে পরিবেশন করার দায়েই করা হয়েছে। তিনি লিখেছেন যে কোহিমা বা ইম্ফলের যুদ্ধ জাপানের যুদ্ধ, ভারতবর্ষকে দখল করার উদ্দেশ্যেই এই যুদ্ধে তারা প্রবৃত্ত হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য বঙ্গানুবাদ করলে এই রকম দাঁড়ায়; "একের পর এক প্রশান্ত মহাসাগরে গুয়াডালকানালে, বিসমার্ক দ্বীপে ও নিউগিনিতে পরাজিত হবার ফলে যুদ্ধপরিস্থিতি পাল্টে যাচ্ছিল। আমেরিকার রুদ্ধ বেষ্টনী ক্রমেই জাপানকে ঘিরে ফেলছিল, জাহাজ ধ্বংস বেড়েই চলছিল, জনসাধারণের নৈতিক মনোবলকে চাঙ্গা করে তোলার প্রয়োজনও দেখা দিয়েছিল বিশেষভাবে। ব্রহ্মদেশে কোন যুদ্ধ জিততে পারলে এদিক হতে বিশেষ সুবিধা হবে, তাছাড়া বাস্তব লাভও তাতে অনেক হবার সম্ভাবনা। উত্তর ব্রহ্মের সীমান্তে চীনা সৈন্যবাহিনী অপেক্ষা করছে, যেমন করে আকাশে শকুনিরা অপেক্ষা করে নীচে কোন মড়া পাবার আশায়,—জাপান ব্রহ্মে জিতলে সেই লোভাতুর চীনাদের দ্রুত লয়ে যেতে হবে; আর ইংরেজ যদি ইম্ফল হারায়, তবে ভবিষ্যতে কোন আক্রমণ পরিচালনার পক্ষে তারা অশক্ত হয়ে পড়বে; এবং ভারতেও বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে।" (পৃঃ ২২) সুতরাং এই সব যুক্তি বিবেচনা করে জাপানের পঞ্চদশ সৈন্য ডিভিশনের কমাণ্ডার মুতাগুচি ইম্ফল আক্রমণ করা স্থির করেন, কিন্তু Burma Area Army-র সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল কাওয়াবে তাঁকে ইম্ফল আক্রমণ হতে বিরত থাকতেই পরামর্শ দেন। মুতাগুচি সরাসরি টোকিওর উচ্চতম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর পরিকল্পনা মঞ্জুর করিয়ে নেন। স্থইনসন লিখেছেন: "৭ই জানুয়ারি তারিখে এই ব্রহ্মদেশীয় যুদ্ধের সপক্ষে টোকিও হতে এক্সিকিউটিভ আদেশ এসে পৌঁছয় জেনারাল কাওয়াবের নিকট, এবং একপক্ষকাল বিলম্ব করার পর কাওয়াবে মুতাগুচিকে এবিষয়ে তাঁর আদেশ জানান। (ঠিক ঐ সময়ই চার্চিল জেনারাল ইসমেকে একটি মেমোয় লিখছিলেন: বার্মার জাপানীদের মতলব সম্পর্কে যুদ্ধ গুপ্তচর বিভাগের যে রিপোর্ট আমার কাছে এসেছে তা পড়ে আমার এই মত আরও দৃঢ় হল যে জাপান কর্তৃক আক্রমণের আশঙ্কা আর নেই।" (পৃঃ ২৪) ঠিক এই প্রসঙ্গেই স্থইনসন সুভাষচন্দ্রের কথা উল্লেখ করেছেন দুবার:

১। Subhas Chandra Bose, Commander of the renegade 'Indian National Army' was confidently predicting that revolt was simmering just beneath the surface, and with one more British reverse nothing could stop it bursting into fury from Bombay to Calcutta, from Madras to Delhi. Mutaguchi believed him; and the High command believed Mutaguchi (পৃষ্ঠা ২২-২৩)

২; A month later (চার্চিলের উপরোক্ত মন্তব্যের একমাস পর) Chandra Bose was exhorting the

I. N. A. troops with a 'Special Order of the Day.' 'Comrades, Officers and men of India's Army of Liberation ! Let there be one solemn resolve in your hearts—"Either Liberty or Death." And let there be but one slogan on your lips—"Onward to Delhi"..... "Victory will certainly be yours." Three days later Mutaguchi issued his own Order (পৃষ্ঠা ২৪-২৫)

প্রথম উল্লেখটিতে যে সুভাষচন্দ্র ও আই. এন. এ সম্পর্কে বিকৃত সত্য পরিবেশন করার চেষ্টা হয়েছে সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেন না কে এই সুভাষ বসু, I. N. A. রেনিগেডই বা কেন? এ সব বিষয়ে কোনো আলোকপাতই গ্রন্থে করা হয়নি। অথচ এই সুভাষ বসুর পরামর্শেই মুতাগুচি ভারত আক্রমণ করা স্থির করলেন। এই সুভাষ বসু ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কেও জাপানী কম্যাণ্ডারকে সংবাদ দিচ্ছেন। ইনি কি তবে জাপানী পক্ষের একজন গুপ্তচর? কিংবা কম্যাণ্ডার মুতাগুচির আশ্রয়ে পুষ্ট একজন ইনফর্মার? সুইনসন সেসব বিষয়ে কিছু না বললেও, উপরোক্ত উল্লেখটি হতে পাঠকের পক্ষে সেই ধারণাই করে নেওয়া স্বাভাবিক। দ্বিতীয়বারের উল্লেখটি আরও অসংলগ্ন, খাপছাড়া। জেনারেল কাওয়াবে, মুতাগুচি, চাটিল ও জেনারেল ইসমের পাশাপাশি হঠাৎ সুভাষ বসুর নাম কেন? মুতাগুচি ভারত আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন, সঙ্গেসঙ্গে সুভাষ বসু রেনিগেড আই. এন. এর লোকদের খেপাতে লাগলেন কেন? তিনি তাঁর লোকদের যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করলেন এবং তারপরই মুতাগুচি ভারত আক্রমণের আদেশনামা জারি করলেন? এই দুই ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক কী? লেখক সুইনসন এবিষয়ে আর পাঠকের মনে কোন দ্বিধার অবকাশ রাখেননি; কেন না তিনি লিখেছেন যে, সুভাষ বসু যখন কিছু ভারতীয়কে উত্তেজিত করলেন যুদ্ধের জন্য তখনই মুতাগুচি তাঁর আদেশে বললেন :

আমাদের সৈন্যদল বর্তমানে অপরাজেয় হবার পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং সেদিন সুদূর নয় যখন ভারতে আমাদের সুনিশ্চিত জয় ঘোষণা করে জাপানের পতাকা হবে উড্ডীন।

সমস্ত বিশ্ববাসীর নজর আকর্ষণ করবে এই যুদ্ধটি এবং ১০০,০০০,০০০ জন জাপানবাসী অধীর আগ্রহের সঙ্গে ঐ যুদ্ধের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছে।.....সম্রাটের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে জয়ের সঙ্কল্পে আমরা হব দৃঢ় এবং এই যুদ্ধের লক্ষ্য আমাদের পূরণ করতেই হবে। সম্রাট এবং আমাদের দেশবাসীদের ইচ্ছা পূর্ণ হবেই।" সুভাষ বসু তাঁর সৈন্যদলকে যুদ্ধে যেতে আহ্বান করেছেন : সেই যুদ্ধ কোহিমা ও ইম্ফলে ইংরেজের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত হবে : জাপানী কম্যাণ্ডার সেই যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য রূপে যা বর্ণনা করেছেন তা হল সম্রাট ও জাপানের উগ্র জাতীয়তা-পন্থীদের ইচ্ছাকে ফলবতী করা, অর্থাৎ ভারতবর্ষকে জয় করা, ভারতবর্ষকে জাপানের পদানত করা। সুইনসন পাশাপাশি এই সব কথার অবতারণা করে এটাই বোঝাতে চান যে সুভাষ বসু শুধু জাপানের গুপ্তচর নয়, মুতাগুচির আশ্রয়ে রক্ষিত ব্যক্তিই নয়, তিনি জাপানী সৈন্যদলের ভারত অভিযানের সমর্থক ও সহায়ক ও বটে। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়েই পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে কোহিমা যুদ্ধটি হচ্ছে ইংরেজ বনাম জাপানের যুদ্ধ। সুভাষ বসু ও I. N. A.র কোন নিজস্ব ভূমিকা তাতে নেই। তারপর দ্বিতীয় অধ্যায়েই সুকৌশলে সুভাষ বসুর কথা তুলে এটাই দেখানো হচ্ছে যে আসলে তাঁর ভূমিকা ছিল ভারত দখলের অভিযানে জাপানকে সাহায্য ও সমর্থন করা। এই হল কোহিমা যুদ্ধের ইতিহাসলেখকের বক্তব্য। আরও লক্ষণীয় বিষয় আছে। কোহিমা ইম্ফল যুদ্ধের প্রাক্কালে আরাকান সীমান্তে আজাদ হিন্দ ফৌজ ইংরেজের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে ভারতের

সীমার ভিতর ইতস্তত ছড়িয়ে পড়েছিল—আরাকান যুদ্ধের মুখ্য গৌরব ঐ আজাদ হিন্দ ফৌজেরই প্রাপ্য ;—মিঃ স্টেনসন সম্ভবতঃ সেই কারণেই এই আরাকান যুদ্ধটির কথা এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন, শুধু এই সংক্ষিপ্ত উল্লেখটি ছাড়া :

By this time the Arakan diversion launched by the 55 th Division on the 4th February had shot its bolt, but learning that the 5th Indian Division was now committed, Mutaguchi was not unsatisfied. The second stage of the plan could go ahead as scheduled.

অর্থাৎ আরাকান যুদ্ধটি জাপানের ৫৫ তম ডিভিশন দ্বারা হত এবং সে যুদ্ধের সাফল্য বা ব্যর্থতার জন্য তারাই একমাত্র দায়ী। সুতরাং বহু বা আই. এন. এ-র ভূমিকা সেখানে আদৌ কিছু ছিল না।

এই মিথ্যা ইতিহাসের প্রতিবাদ বাংলা ভাষায় রচনা করে কোন ফল পাওয়া যাবে কি ?

আর্থার ব্যাম্বেসের The Siege বইটিতে কোহিমা যুদ্ধের একটা বিশদ বিবরণ আছে। ১৯৫ সালে বইখানি রচিত ও ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও লেখক বিশেষ অনুসন্ধান করেও কোহিমা যুদ্ধে নেতাজী ও তাঁর আজাদ হিন্দ সৈন্যদলের ভূমিকার কথা কিছুই জানতে পারেননি মনে হয় —কেননা কোথাও তাঁদের সম্পর্কে কোনো উল্লেখ তিনি করেননি। সমস্ত লড়াইটা যে জাপানীদের আক্রমণ ও ইংরেজের প্রতিরোধকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়েছিল, বৃটিশপক্ষীয় বৃটিশ ইতিহাস আদি ভিন্ন ভারতের জাতীয় কোনো সৈন্যদল ঐ রণাঙ্গণে অংশ গ্রহণ করেছিল কি না সেবিষয়ে লেখক সম্পূর্ণ নীরব। কিন্তু এই নীরবতা যে অজ্ঞতাপ্রসূত নয়, বরং ইচ্ছাকৃত—তার প্রমাণ আছে ঐ বইয়েই। গ্রন্থের মধ্যে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করছি।

১। Meanwhile the bashas were now all afire and in some of them were Japs not yet dead : in others were Indians whom they had captured in the depot and had forced to fire on the attacking soldiers. পৃষ্ঠা, ৮২

২। As I dozed off the loudspeaker started blaring again. "Hindusthan ke jawan, Hindustan ke jiwan....' পৃষ্ঠা ১৫

৩। Propaganda broadcasts blaring out from the fort, day and night, "Hindustan ke jiwan, Japani Fauz apke irl gird chakkar lagiya zain·····" পৃঃ ১৯৪

প্রথম উদ্ধৃতিতে স্পষ্ট হয় যে ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতীয়রাও লড়াই করেছিল, এবং সেই ভারতীয়রা ছিল জাপানীদের হাতে বন্দী ভারতীয়দের দল ; জাপানীরা তাদের বাধ্য করেছিল গুলি চালাতে। বস্তুতঃ পক্ষে এই ভারতীয়রা কারা ? এরাই ভারতীয় জাতীয় সৈন্যবাহিনীর (I. N. A.) লোক, এবং এরা যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জনও দিয়েছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় উদ্ধৃতিতে যে ঘোষণাগুলির কথা বলা হয়েছে ঐগুলি জাপানী সৈন্যদলের ঘোষণা নয়, আই. এন. এর পক্ষ হতেই ঐ ঘোষণাগুলি প্রচার করা হত। পরে এবিষয়ে আমরা তথ্য পেশ করছি। উপস্থিত এটুকু শুধু লক্ষণীয় যে লেখক আই. এন. এর অস্তিত্বের কথা পুরোপুরি জানেন, কিন্তু তা সম্পূর্ণ গোপন করে যাচ্ছেন।

স্যার লিওনেল ইভান্স ও আন্টনি ব্রেট-জেমসের 'ইম্ফল' নামক বইখানিতে ইম্ফল যুদ্ধের কথা সবিস্তারে বলা হয়েছে। এই গ্রন্থের কোন কোন স্থানে নেতাজী বা তাঁর সৈন্যদলের কার্যকলাপের কথা আছে, যেমন :

১। The troops made available to him (মুতাগুচি) were 15, 31, 33 Divisions (জাপানী ডিভিশন) and the best part of 1 Division Indian National Army. (পৃঃ ৫৯)

২। The Indian National Army was an

unknown quantity. It was the military organ of the Indian Independence League headed by Subhas Chandra Bose an extreme Nationalist, who had fled from India in 1941 and was now working in close collaboration with the Japanese. The object of the League was what its name implied : complete independence for India.

The I. N. A. of which Bhose took personal command, was made up from civilians and Indian officer and other rank prisoners of war, chiefly from those taken during the invasion and occupation of Malaya. Some had been persuaded to join by peaceful means, others by means which were far from peaceful, while some saw that by joining, an opportunity might present itself of rejoining their old comrades should they have to go into action against them. The officers were all very junior in the Regular Indian Army and now hold ranks far above those for which they had been trained. At this period only one division was in being and had received some training, the second was forming in Malaya and plans were in hand to raise a third. (পৃ: ৩০)

৩। Large numbers of Japanese and Indian National Army had crossed three miles north of Tabaw, (পৃ: ১৪৭)

৪। There followed a lull during which ammunition in the forward posts was replenished, and the enemy sent forward some members of the Indian National Army to call on the Gurkhas to surrender. The replies they received are unprintable ! (পৃ: ২০৭)

এছাড়া ২৩৭ পৃষ্ঠাতেও আই, এন, এ সম্পর্কে একটি উল্লেখ আছে। মোট ৩৬৮ পৃষ্ঠার গ্রন্থে এই চার পাঁচ বার ছাড়া আই, এন্ এর উল্লেখ অপর্যাপ্ত,—আমার আপত্তির মূল কারণ তা নয়। ইম্ফল যুদ্ধের ফলেই পূর্ব এশিয়ার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হয়ে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির সাফল্যের সূচনা করেছিল ; কিন্তু ইম্ফল যুদ্ধের সবচেয়ে বড় তাৎপর্য হল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পর ভারত ভূখণ্ডের সীমানার মধ্যে সেই প্রথম স্বাধীন ভারত সরকারের পতাকা উড়েছিল, সম্মুখ যুদ্ধে সেই প্রথম ভারতীয় জাতীয় বাহিনী ইংরেজ সৈন্যবাহিনীকে পরাস্ত করে নিজ দেশের অঞ্চলকে স্বাধীন করেছিল। এইখানে আর্থার সুইনসনের ভ্রান্তিরও নিরসন করা দরকার, কেননা ইম্ফল বা কোহিমার যুদ্ধ ছিল ভারত সীমান্তের ভিতরের যুদ্ধ—ওটা ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ নয় ও জাপানী সৈন্যের ব্রহ্ম অভিযানের সঙ্গে তার কোনো যোগও নেই - যদিও সুইনসন সেরকমই আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন। ইতালো ও ব্রেট জেমসের মতো অভিজ্ঞ লেখক মোটা ইম্ফল যুদ্ধকে ইংরেজ বনাম জাপানের যুদ্ধ বলে দেখানোর ভ্রান্তি আরও বেড়েছে ; কেননা ঐ যুদ্ধটা যদি মূলত ইংরেজ বনাম জাপানের যুদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে জাপান কোহিমা বা ইম্ফল অভিযান করেছিল কোন উদ্দেশ্যে ? নিশ্চয়ই ভারত জয়ের উদ্দেশ্যে। তাহলে সুভাষ বসু ও তাঁর আই, এন, এ সেখানে কেন গিয়েছিল—জাপানকে সাহায্য করতে, অর্থাৎ নিজের দেশকে নতুন করে জাপানের পদানত করতে কি ? লেখকদ্বয়ের মূল বর্ণনা ও ঘটনার উপস্থাপনা হতে অন্য কোনো সিদ্ধান্তই করা চলে না। প্রকৃতপক্ষে, তাঁরা এই আলোকেই সুভাষ বসু ও আই, এন, এর কীর্তিকে দেখাতে চান এছাড়া অন্য উদ্দেশ্য তাঁদের নেই। কেননা, তাঁদের বর্ণনানুসারে ভারতের অভ্যন্তরে এই অভিযান পরিচালনা করার সঙ্কল্প করলেন কমাণ্ডার মুতাগুচি, তাঁকে সমর্থন করলেন টোকিওস্থিত উচ্চতম সামরিক কর্তৃপক্ষ ; যুদ্ধ করল জাপানী সৈন্যরা, পরাজিতও হল তারাই ;—সুভাষ বসু ও আই, এন, এর কথা এখানে উত্থাপিত হয়েছে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে। জাপানের চর রূপে চিত্রিত করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য এই উল্লেখের পিছনে নেই। (ক্রমশঃ)

ঘনিষ্ঠ আঁধারে

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

যেন মঞ্চে অভিনয়। অভিনেতা অভিনেত্রী আমরাই সবাই,
ঘনিষ্ঠ আঁধারে যতো শিষ্ট হই, অমল আলোতে
যতো বার ফিরতে চাই, ভেঙে যাই প্রতিকূল স্রোতে ;
আকাশকুসুম ভাবি : পরাভূত মীনকেতু, পথ হাতড়ায়।
প্রাণহীন শেত-খামার, আফিস-কারখানা কিংবা মলজিদ-মন্দির
হোটেলে, সরাই-এ, খানে পথে, মাঠে পাইনা তৃপ্তির
দেশ। নিজসৃষ্ট জালে ইচ্ছাবন্দী ঊর্ণনাভ আমরা পরস্পর।
আশ্চর্য ফুলদানী নারী নিজেকে সাজায়, প্রেম কোথায় হারায়!
কোনো মঞ্চে আলো নেই ; কে আলো জ্বালাবে অতঃপর!

আজন্ম আঁধারে ঘর। কান্না কার যন্ত্রণায় সমুদ্রে সাঁতরানো?
অবাহিত দুঃস্বপ্নের শোক দুঃখ ক্ষতি ভয়ে দিন গুজরানো?—
ভালোবাসা গড়তে দেখুতে, প্রেম রেলষ্টেশন, পাহাড় শিরায়
উঠে গেলে ফিরতে হয় খেয়াঘাটে,—পুনরায় পুরানো ঢেরায়।
আপনার সৃষ্টজালে ইচ্ছাবন্দী ঊর্ণনাভ, অন্বেষী ঈশ্বর!
মনে পড়ে মেহাতী মেয়ের চোখ, গ্রাম্য পাখা, নির্জন প্রান্তর ;
হয়তো দেখার ভ্রম, আলোহীন সারা দেশ—পাড়াগাঁ, শহর।

অন্য পথ

মঞ্জুর দাশগুপ্ত

কিছু পথ ছেড়ে গেছে ক্রমে ক্রমে অরণ্যের দিকে
আর কিছু পথ যেন পথ হারায় সমুদ্রের তীরে
আমি কোন্ পথে যাব পা ভিজিয়ে রাত্রির শিশিরে
অরণ্যে সমুদ্রে কি বা যে পথে যাইনি কোনো দিন।

বালিকা নীলিমা কবে ফুল তুলে দিয়েছে আমাকে
স্থপ্রিয় শ্যামল কবে বিমুকের রাশি রেখে গেছে
ফুলগুলি বড়ো ম্লান বিমুকের রঙ গেছে ঘরে
তবুও তারাই ডাকে—দূরে থেকে ডাকে শুধু ডাকে।

সমস্ত অচেনা লাগে—তীক্ষ্ণতম অন্ধকার নীলা
সে পুরোনো পথে যাব তার আর উপায় দেখি না।

প্রার্থনা, জলের জন্য

পরিমল চক্রবর্তী

জলের মতন জলকে যে চাই।
জলের মতন জল
পাইনি আমি জীবনে আজো ;
তীব্র হলাহল
জীবনভোর করেছি পান —
আজকে তাই,
আমি যে চাই
জলের মতন জল :
তৃষ্ণাতুর জঠরের অতিশয় সফল।

খুকি

বিনোদ বেরা

কার্ত্তিকের শিশির কুঁড়ি তোরে
খুকি এখন নেবে রোদের আদর,
কচি শরীরে জড়িয়ে রাঙা চাদর
ধারাপাত পড়বে জোরে জোরে।

খুকি যোলো দাওয়ার মাদুর পেতে
আনো তোমার শ্লেট পেনসিল বই
উঠোন ভরা রক্ত্র খই খই
ইচ্ছে করলে পারো সেথায় যেতে

লক্ষ্মী, খুকি প'ড়বে বিঠে ঘরে
যখন তখন দুষ্টুমি করবে না
কাঁচের রাঙা চুড়ি বেলার কেনা
ছোট হাতে জমবে সোহাগ ভরে।

কি অপরূপ ভালোই লাগে তোরে
কোঁকড়ানো চুলগুলি রেশম রুখু
দুলিয়ে যখন নামতা পড়ো খুকু
রৌদ্র ওঠা শিশির কুঁড়ি তোরে।

সময়ের উজ্জ্বল উৎসব

চিত্রভানু

সময়ের উজ্জ্বল উৎসব নিত্যতই
মেলি আর অর্থহীন প্রতিভাত হ'লে,
সব তার প্রসাধন মন ভোলাবার
যাদু ধরা প'ড়ে গেলে চোখে উপহাস
বাসি রঙ চঙের মতন, মোহিনী
কটাক্ষ তার প্রতিহত হলে তব
তৃতীয় নয়নে, নিঃস্ব নিঃসম্বল
সেই শূন্যতায় কী রবে তোমার অবশেষ?
বর্ণহীন দে-দিগন্তে দিনরাত্রি তব
হারাবে সকল রূপ রস, মনে হবে
অন্তহীন মুহূর্তের পিঁপড়ের সারি
চলেছে অনন্তকাল পিল্‌পিল্ করে'
নিরর্থক পৌনঃপুনিকতার আবেশে।
তখন বুদ্বুদে তুমি দেখবে যথার্থ
রূপে তার, শূন্যতার থেকে মুক্তি
পূর্ণতার মাঝে, অর্থহীনতার শেষে
লভ সার্থকতা, একমাত্র শুচিরনির্ঝর
সাধনাসুস্নিগ্ধ সৃষ্টি সুস্থির তিমিরে।

28-2101/2

Please Contact

MECHANICAL ENGINEERING CO
PRIVATE LTD

5, MISSION ROW
CALCUTTA-1

FOR ALL TYPES OF TRAILERS,
TROLLEYS AND WHEEL-BARROWS.

জিন্না ও গান্ধী

ইতিহাসনিষ্ঠ

১৯২৭ সালে সাইমন কমিশন নিয়োজিত হয়। ঐ বছর মাদ্রাজে কংগ্রেস অধিবেশনে একটি সর্বদলীয় সম্মেলন ডাকার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই সম্মেলনে সর্বদলের স্বীকৃত একটি ভারতীয় সংবিধান প্রণয়ন করাই ছিল উদ্দেশ্য। ১৯২৮ সালের ১৯ মে বোম্বাইয়ে এই সম্মেলন বসে। সম্মেলন মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করে তার উপর নতুন সংবিধান রচনার নীতি স্থির করার দায়িত্ব ন্যস্ত করে। সেই কমিটি যে সর্ববাদীসম্মত রিপোর্ট দেয় সেটাই নেহরু রিপোর্ট নামে খ্যাত হয়। ঐ রিপোর্ট সম্পর্কে সকল দলের মত জানার জন্য কলকাতায় ১৯২৮ সালের ২২শে ডিসেম্বর একটি সর্বদলীয় কনভেনশন ডাকা হয়। ঐ একই সময় কলকাতায় কংগ্রেস ও মুস্লিম লীগের অধিবেশনও বসে। এদিকে সাইমন কমিশন বয়কটের প্রস্তাব আনে কংগ্রেস। জিন্না সে প্রস্তাব সমর্থন করেন। কিন্তু মুস্লিম লীগের একটি অংশ সাইমন কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করা স্থির করে। তারা কলকাতা অধিবেশনে না এসে লাহোরে পৃথক অধিবেশন করে। জিন্না কলকাতার মুস্লিম লীগ অধিবেশনে কংগ্রেস ও লীগের পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য মুস্লিম লীগকে অনুপ্রাণিত করেন ও সর্বদলীয় সম্মেলনে যোগ দেন। জিন্নার পরামর্শে মুস্লিম লীগ পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার দাবী প্রত্যাহার করতেও রাজি হয়। সর্বদলীয় কনভেনশনে জিন্না বলেন: "হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান আজ হোক, কাল হোক আমাদের করতেই হবে, কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা যত দেরি করব ততই আমাদের জাতীয় স্বার্থের ক্ষতি হবে। আমরা একই দেশের সন্তান। আমাদের এক সঙ্গে বাস করতে হবে, একত্রে কাজ করতে হবে, এবং আমাদের মধ্যে যত মতভেদই ঘটুক না কেন, পরস্পরের মধ্যে যেন ভুল বোঝাবুঝি ও শত্রুতা সৃষ্টি না হয়। যদি আমাদের মধ্যে ঐক্যমত না-ও হয় তবু যেন আমরা বন্ধুই থাকি। যতদিন পর্যন্ত মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে একতা না আসে ততদিন ভারতের উন্নতি হবে না। কোনো যুক্তি, কোনো দর্শন এবং কোনো ঝগড়াই যেন আমাদের আলোচনা-বীমাংসার পথে বিঘ্ন না হয়ে দাঁড়ায়। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের চেয়ে আর কোন কিছুতেই আমি বেশি খুশি হব না।" কিন্তু এই কনভেনশনে গান্ধীপন্থীরা জিন্নার প্রতি এমন দুর্ব্যবহার করে যে জিন্না ভগ্নহৃদয়ে কনভেনশন ত্যাগ করে চলে যায়। ফলে কনভেনশনও ব্যর্থ হয়।

১৯২৯ সালের মার্চ মাসে দিল্লীতে মুস্লিম লীগের একটি সভায় নেহরু-রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা হয়। সেখা গেল লীগের ভিতরে এবিষয়ে বহুরকম মত রয়েছে। জিন্না সমস্ত মতের সমন্বয় করে তাঁর বিখ্যাত "চতুর্দশ দফা" দাবী উত্থাপন করলেন। গান্ধীপন্থী কংগ্রেস জিন্নার বক্তব্য সহানুভূতির সঙ্গে শোনা দূরে থাকুক, জিন্নার কোনো প্রস্তাব প্রতিপত্তি যেশে আছে বলেই স্বীকার করলেন না। জিন্নার সঙ্গে আলোচনার জন্য তাঁরা অনাবশ্যক বলে মনে করলেন। মনে রাখতে হবে যে জিন্না তাঁর "চতুর্দশ দফা" দাবীতে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা তুলে দিতেও সম্মতি জানিয়েছিলেন। সদিচ্ছার অভাব জিন্নার তরফে অন্তত: দেখা যায়নি।

১৯২৯ সালের ২৩শে ডিসেম্বর ভাইসরয় লর্ড আরউইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান গান্ধীজী। পণ্ডিত মতিলাল, স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু, মিঃ জিন্না ও ভিটলভাই প্যাটেল। সাক্ষাৎকারটি প্রধানত জিন্না, স্যার তেজবাহাদুর ও ভিটল ভাইয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। ইংরেজের সঙ্গে একটা আপোষের সম্ভাবনা তখন দেখা দিয়েছিল। কিন্তু গান্ধীজীর একরোখা ও একপেশে দৃষ্টিভঙ্গী ও উদ্ধত মনোভাবের ফলে আলোচনা ভেঙে যায়। আলোচনার উদ্যোক্তারা এতে গান্ধীজীর প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্ট হন। কয়েকদিনের মধ্যেই লাহোরে জহরলালের সভাপতিত্বে কংগ্রেস অধিবেশন বসে। লাহোর কংগ্রেসে গান্ধীজীর আচরণকে সমর্থন করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। জিন্না লাহোর প্রস্তাব দেখেই কংগ্রেসের ওপর গান্ধীজীর একাধিপত্য সম্পর্কে নিঃসংশয় হন। গান্ধীজী যে কোনো-দিন যুক্তি ও বুদ্ধির পথ ধরে চলতে পারবেন, এ আশাও চিরতরে পরিত্যাগ করেন। গান্ধীবাদ সম্পর্কে জিন্না তাঁর চরম সিদ্ধান্ত এই ঘটনার ফলে নিতে বাধ্য হন। গান্ধীবাদ যে দেশের পক্ষে শুধুই ক্ষতিকর হবে এ বিষয়েও তাঁর মনে আর কোন সংশয় থাকেনা।

১৯৩০ সালের ১২ই নভেম্বর লণ্ডনে প্রথম গোল-টেবিল বৈঠক বসে। মুস্লিম লীগ তাতে যোগ দেয়, কিন্তু কংগ্রেস যোগ দেয়নি। সে বৈঠক ব্যর্থ হয়। গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হবার পর দ্বিতীয় গোল-টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসও যোগদানের সিদ্ধান্ত নেয় এবং গান্ধীজীকে কংগ্রেসের একক প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়। এই বৈঠকে ইংরেজের হাতের তাস হয়ে দাঁড়ায় মুস্লিম লীগ। সাম্প্রদায়িক দাবী-দাওয়া উত্থাপন করে কংগ্রেসকে অসুবিধায় ফেলাই ছিল বৃটিশ সরকার ও লীগের গোপন চুক্তি। গান্ধী সে ষড়যন্ত্রের কাছে সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়ে শূন্য হাতে দেশে ফিরে আসেন। সম্ভবত এই সময়ই দেশ-বিভাগের প্ল্যান তৈরী হয়ে যায়। মুস্লিম লীগের অনেক নেতাই ইংরেজের সঙ্গে ভারতবিভাগের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন, কিন্তু জিন্না কিছুতেই এ ধরণের প্রস্তাবে রাজি হননি। গোল-টেবিল বৈঠকে মুস্লিম লীগের নেতৃত্ব করেন আগা খাঁ, জিন্না ছিলেন একজন নীরব দর্শক মাত্র। মুস্লিম লীগের উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও ইংরেজের সঙ্গে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র তিনি পছন্দ করেননি। তাছাড়া, অল্প দিন আগে তাঁর পত্নীর মৃত্যুও তাঁকে কম আঘাত দেয়নি। তিনি তখনকার ভারতীয় রাজনৈতিক পরিবেশে এত অতৃপ্ত হন যে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে চিরতরে ইংলণ্ডেই বসবাস করবেন স্থির করেন। আলিগড়ে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় তিনি বলেন: "গোল টেবিল বৈঠকে যেয়ে আমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আঘাত পেয়েছি। হিন্দু মনোভাব ও হিন্দু মানসিকতার যে পরিচয় আমি পেয়েছি তাতে মনে হয় হিন্দু-মুসলমান ঐক্য আর সম্ভব নয়। আমার দেশ সম্পর্কে আমি অত্যন্ত হতাশ হয়েছি। এ এক দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি। মুসলমানরা আজ হয় বৃটিশের চর, নতুবা কংগ্রেসের অনুচর। আমার মনে হয় আমি ভারতের কোনো উপকারে আসতে পারবনা, হিন্দুদের মনোভাবেরও পরিবর্তন করতে পারবনা, মুসলমানদেরও তাদের অবস্থা কী তা বোঝাতে পারবনা। আমি এত হতাশ ও বিমর্ষ হয়েছি যে লণ্ডনেই বাস করা স্থির করেছি। আমি ভারতবর্ষকে ভালোবাসি না তা নয়, কিন্তু নিজেকে বড় অসহায় বোধ হয়।" জিন্না আগা খানের নেতৃত্ব ও মনোভাবকে পছন্দ করেননি।

এরপর জিন্না দেশে ফেরেন ১৯৩৫ সালে। ভারতীয় লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির সদস্যরূপে। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ সম্পর্কে আইন সভায় তিনি বলেন যে ঐ রোয়েদাদ তিনি চান না এবং হিন্দুদের সঙ্গে বোঝাপড়াই তিনি চান। জিন্না এই বোঝাপড়ার জন্য কংগ্রেসের তদানীন্তন সভাপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এক নাগাড়ে আলোচনা চালান। কিন্তু সে সময়ে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা তাঁকে গুরুত্ব দেয়নি, মুস্লিম লীগের একাংশ

তাঁকে হিন্দুঘেঁষা বলে মনে করত এবং ইংরেজও তাঁকে সুনজরে দেখত না। জিন্না এই সময়ে লাহোরে শিখ ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনেও বিশেষ অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী ও ও সাম্প্রদায়িক ঐক্যকামনার পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সাল—এই দুটি বছর ধরে জিন্না পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করেন গান্ধীজীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সৌহার্দ্য স্থাপনের, যাতে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যেকার বিরোধ সহজে নিষ্পত্তি হয়ে যায়। কিন্তু গান্ধী ও গান্ধী-অনুচররা জিন্নাকে কোনো পাত্তা দিতে চাননি, জিন্নাকে রূঢ় আঘাত দিয়েই তাঁরা ফিরিয়ে দিয়েছেন। গান্ধীজী বলেন জিন্নার সঙ্গে আলোচনা করার পক্ষে তাঁরও নির্দেশ তিনি পাননি। এমনকি তিনি এও বলেন যে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক ঐক্য সম্পর্কে তাঁর নিজের কোন মত নেই। আবুল কালাম আজাদ তাঁকে যা করতে বলবেন তিনি তাই করবেন। পক্ষান্তরে, ১৯৩৭ সালে বোম্বাই শহরে মুসলমানরা জিন্নাকে যে অভ্যর্থনা জানায়, সেই সভাতেও জিন্না বলেন যে লীগ ও কংগ্রেসের একই লক্ষ্য—সুতরাং উভয়ের মধ্যে বোঝাপড়াই তাঁর কাম্য। কিন্তু গান্ধী ও গান্ধীপন্থীদের দুর্ব্যবহারই তাঁকে তিক্ত ও বিরক্ত করে তোলে।

১৯৩৭ সালে নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতাসহ কংগ্রেস জয়লাভ করায় কংগ্রেসের মনোভাব আরও অনুদার, রুক্ষ ও প্রভুত্বকামী হয়ে পড়ে। কংগ্রেস ও লীগের বোঝাপড়ার আর কোন সম্ভাবনাই তখন রইল না। তারপর আসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। তখন সমগ্র পটভূমিটাই পরিবর্তিত হয়ে গেল। ১৯৪০ সালে লীগ 'পাকিস্তান' প্রস্তাব গ্রহণ করল। ইংরেজের সঙ্গে অন্তরালে নিষ্ফল বোঝাপড়া অনুসারে সেই দাবীকে বাস্তব রূপ দিতে লীগ একটি নতুন ও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করল। সেই প্রসঙ্গটি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করছি।

১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর ইংলণ্ড জার্মেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ঐ দিনই ভারতের বড়লাট লর্ড লিনলিথগো ভারতবর্ষকেও যুদ্ধযুক্ত দেশ বলে ঘোষণাপত্র জারি করেন। গান্ধীজী বড়লাটের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁকে তিনি বলেন যে যুদ্ধে ইংলণ্ডের যে ক্ষতি হবে সেই কথা ভেবেই তিনি মুষড়ে পড়েছেন, এমন কি ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নও তিনি বিসর্জন দিতে রাজি আছেন যতদিন পর্যন্ত ইংলণ্ড না বিপদমুক্ত হয়। ১৪ই সেপ্টেম্বর ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভা বসে। গান্ধীজী ঐ সভায় ইংরেজকে বিনা সর্তে যুদ্ধে সমর্থন ও সাহায্য করার প্রস্তাব আনেন। তাঁর পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও কংগ্রেস ঠিক ঐভাবে প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে রাজি হয় নি; ইংরেজের ঘোষিত যুদ্ধের লক্ষ্য কী তা আগে জানাতে হবে—কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাবের এই ছিল সারমর্ম। মুস্লিম লীগও যুদ্ধ সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। তারা ইংরেজকে যুদ্ধে সমর্থন জানায় ও দাবী করে যে ভবিষ্যতে ভারতের শাসনতন্ত্রের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন আনতে হলে গভর্ণমেণ্ট মুস্লিম লীগের সঙ্গে আগে আলোচনা করবেন।

ইংরেজ যুদ্ধের লক্ষ্য সম্পর্কে যা প্রচার করল, কংগ্রেস তাতে খুশি হয় নি। অক্টোবর মাসের শেষ দিকে তাই বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলী পদত্যাগ করলেন। জিন্না ২২শে ডিসেম্বর "মুক্তি ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের দিবস" পালন করতে মুস্লিম লীগকে নির্দেশ দিলেন। কংগ্রেস মন্ত্রীদের অত্যাচার হতে মুক্তি পাওয়া গেল বলেই ঐ দিবস পালনের উদ্যোগ। বড়লাট মুস্লিম লীগকে জানালেন যে যুদ্ধকালে মুস্লিম লীগ সরকারের প্রতি যে সদিচ্ছা দেখাল তা সরকার মনে রাখবে ও লীগের দাবীর কথাও ভুলবে না। লীগের সম্মান ভারতের মুসলমানদের মধ্যে বেড়ে গেল ও বহু মুসলমান লীগে যোগদান করল।

ইংরেজের প্রতি কংগ্রেসের মনোভাব ক্রমেই কঠোরতর হয়ে উঠল এবং গান্ধীজীর মনেও পরিবর্তন দেখা দিল। তিনি বললেন যে তিনি ইংরেজকে বিনাসর্তে সমর্থনের যে কথা বলেছিলেন তা অহিংস নৈতিক সমর্থন মাত্র। ১৯৪০ সালে

মৌলানা আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের রামগড় অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে ভারত গবর্ণমেণ্টের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীও করা হয়। সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য নিয়ে যে যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে, সে যুদ্ধে কোন প্রকারে অংশ নিতেই কংগ্রেস অসম্মতি জ্ঞাপন করে। তাছাড়া পূর্ণ স্বাধীনতা আদায় করার জন্য সারা ভারত-ব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলনের সম্ভাবনার কথাও প্রস্তাবে জানানো হয়। ভারত গবর্ণমেণ্ট গান্ধীর মত-পরিবর্তন দেখে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হলেন; মিত্র ও নিরপেক্ষ মহল হয়ে উঠল তাঁদের প্রিয়পাত্র: unequivocal assurance was given to the League that its viewpoints would always be respected.

য়ুরোপে যুদ্ধের অবস্থা দিনে দিনে খারাপ হতে লাগল, জার্মানীর পরাক্রমে ফ্রান্স পদানত ও ইংলণ্ড যে-কোন মুহূর্তে আক্রমণের ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল,—সেই সময় গান্ধীজী ইংলণ্ডবাসীদের নিকট আবেদন জানালেন যে যেন তারা বিনা যুদ্ধে হিটলারের কাছে আত্মসমর্পণ করে ও হিটলারের সমস্ত আদেশ মেনে চলে। পক্ষান্তরে তারা যেন তাদের আত্মাকে কখনো পরাভূত হতে না দেয় —প্রাণ দিয়েও আত্মার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখে:

You will invite Herr Hitler and Signor Mussolini to take what they want of the countries you call your possessions. Let them take possession of your beautiful island with your many beautiful buildings. You will give all these, but neither your souls nor your minds. If these gentlemen choose to occupy your homes, you will vacate them. If they do not give you free passage out, you will allow yourself, man, woman and child, to be slaughtered, but you will refuse to owe allegiance to them.

গান্ধীজী কংগ্রেসকেও নানারকম অহিংসার উপদেশ দিতে লাগলেন। বললেন যে ভারত যদি শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হয় তবে তিনি যুদ্ধের বদলে আত্মসমর্পণ করে মৃত্যু বরণ করতেই বলবেন। (If the Afghans came, let us die before them. Even if I have the whole of India today I should do the same) এমনকি কংগ্রেস রাষ্ট্রক্ষমতা পেলে দেশের ঠগ ও ডাকাতদের দমন করবে না, বরং ডাকাতদের কাছেও রাষ্ট্র আত্মসমর্পণ করবে। যদি কংগ্রেস এই অহিংস নীতি না অনুসরণ করতে পারে তবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতেও সে চাইতে পারবে না।

মহাত্মাজীর এই সব কথা শুনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই মর্মে প্রস্তাব পাশ করল যে মহাত্মা তাঁর নিজের পথ ও মত নিয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু কংগ্রেসের প্রোগ্রাম ও কার্যধারার সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্কই থাকবে না। ওরা ও ৭ই জুলাই দিল্লীতে ওয়ার্কিং কমিটির এক জরুরী বৈঠকে এই প্রস্তাব গৃহীত হল যে ভারতে যদি কংগ্রেসকে একটি অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠন করতে দেওয়া হয় তবে কংগ্রেস ইংরেজকে যুদ্ধে সাহায্য করবে। জুলাই মাসের শেষ দিকে অনুষ্ঠিত আর এক বৈঠকে ওয়ার্কিং কমিটি ঐ একই প্রস্তাব পুনরায় পাশ করে। কংগ্রেসের এই আপস প্রস্তাব দেখে ৮ই আগস্ট ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে মিঃ আমেরিও কংগ্রেসকে একটি আপস প্রস্তাব দেন। কিন্তু সেই প্রস্তাবের কোন কোন কথায় কংগ্রেস অতীব অসন্তুষ্ট হয়। ফলে ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস কমিটির এক সভায় সভাপতি মৌলানা আজাদ ঘোষণা করেন যে বৃটিশ সরকার যে মনোভাব দেখিয়েছেন তাতে কংগ্রেস আর তাঁদের সঙ্গে আপস করতে চায় না, বরং এখন আন্দোলনই করবে এবং সেজন্য গান্ধীজীকে আবার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে আহ্বান জানাবে। গান্ধীজীও সেই আহ্বানে সাড়া দেবেন বলে পূর্বাহ্নেই কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে জানিয়ে দিয়েছেন।

গান্ধীজী কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করে কোন গণ-আন্দোলনের ডাক দিলেন না। তিনি ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করার কথা বললেন এবং তাঁরই আশ্রমের লক্ষ বিনোবা ভাবে হলেন প্রথম ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহী। গান্ধীজী বললেন যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই এই ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ। তিনি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা চান, কেননা যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাঁর মতামত তিনি অবাধে প্রকাশ করতে চান :

I must have the right to state freely what I feel about this war....I claim the liberty of going through the streets of Bombay and saying that I shall have nothing to do with this war, because I do not believe in this war.

কিন্তু ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে কোন সুফলই পাওয়া যায়নি, বেশিদিন তা চলেওনি। দেশবাসীও তাতে উৎসাহ দেখায়নি। ইতিমধ্যে ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর জাপান পার্ল হার্বার বন্দর আক্রমণ করে ও মালয় ও সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দখল করে নেয়। কংগ্রেস নম্রভাবে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে আপস মীমাংসায় আসার আর এক দফা চেষ্টা করার উদ্দেশ্যে গান্ধীজীকে আবার নেতৃত্ব হতে সরে যেতে অনুরোধ করে। গান্ধীজীও রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছেড়ে গঠনমূলক কাজে মন দেবেন জানান। সেক্রেটারী অব স্টেট মিঃ আমেরি কংগ্রেসের আপসকামী মনোভাব দেখে পুনরায় তাঁর পূর্বের আপস প্রস্তাব গ্রহণ করতে কংগ্রেসকে আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন যে পূর্বে যে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল সেজন্য দুঃখিত এবং কংগ্রেসের পক্ষে যা গ্রহণের অযোগ্য তেমন কথা তিনি আর বলবেন না। তাঁর এবম্বিধ ঘোষণায় মুস্লিম লীগ অসন্তুষ্ট হয় ও এক প্রস্তাবে সেই অসন্তোষের কথা তারা জানায়। লক্ষণীয় এই যে এই প্রস্তাবেও মুস্লিম লীগ পাকিস্তানকে ভারতের বাইরে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠার কথা বলেনি—বরং বলে যে Musalmans of India are proud to be Indians and firmly believe in India for the Indians. It is in that spirit that the Lahore resolution was adopted, because the Musalmans are convinced that it is the only solution of India's constitutional problems which will ensure peace, harmony and satisfaction among all elements, interests and inhabitants of this vast country. এখানে যে লাহোর প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটি হল লাহোরে গৃহীত মুস্লিম লীগের বিখ্যাত পাকিস্তান প্রস্তাব। জিন্না ও মুস্লিম লীগ স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্রের কথা যখন ভাবেন নি, কংগ্রেস তখনও তাঁদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসার কোন চেষ্টাই করে নি,—এবং পদে পদে মুস্লিম লীগকে বিরক্ত করে তুলেছে অবজ্ঞাসূচক আচরণের দ্বারা। গান্ধী ও গান্ধীপন্থীদের এই অপরিণামদর্শিতা ও হঠকারিতার ফলে পরিণামে ভারত বিভাগ হয়েছিল।

১৯৪২ সালের ১৪ই জুলাই কংগ্রেস 'ভারত-ছাড়' প্রস্তাব গ্রহণ করে। জিন্না তার বিরোধিতা করেন। জিন্না ছিলেন নরমপন্থী ও শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতির ভক্ত, গণ-আন্দোলনকে তিনি ভয় পেতেন। তাছাড়া তিনি এ ভয়ও পেয়েছিলেন যে যুদ্ধের মাঝে কংগ্রেস ব্যাপক আকারে কোন গণ-আন্দোলন করলে ইংরেজ হয়তো তাদের সঙ্গে কোন মীমাংসায় আসতে বাধ্য হবে এবং সেক্ষেত্রে জিন্না ও মুস্লিম লীগের অসুবিধা হবে। '৪২-এর আন্দোলন যখন পরে থেমে গিয়েছিল তখন বৃটিশ স্পষ্ট বুঝেছিল যে ভারতে তার প্রকৃত বন্ধুদের মধ্যে জিন্না ও মুস্লিম লীগ অন্যতম। ভারত থেকে যদি একদিন চলে যেতেই হয় তবে তার আগে পাকিস্তান সৃষ্টি করে যেতে হবে, কেননা পাকিস্তান হবে প্রকৃতপক্ষে ইংরেজের নিজস্ব স্থান।

১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে কারারুদ্ধ হয়ে গান্ধীজী মুক্তি লাভ করেন ১৯৪৪ সালের মে মাসে। মুক্তি লাভ করেই তিনি বড়লাটের কাছে একটা আপস প্রস্তাব পাঠান।

বড়লাট লর্ড ওয়াভেল প্রস্তাবটি নাকচ করে দেন। ইতিমধ্যে রাজাগোপালাচারির মারফৎ গান্ধীজী জিন্নার সঙ্গে পাকিস্তান দাবী সম্পর্কে আলোচনা করতে স্বীকৃত হন। ১৯৪৪ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর বম্বে শহরে জিন্নার বাসভবন মালাবার হিলে এই সভা বসে; ১৮ দিন ধরে একটানা জিন্না ও গান্ধীর মধ্যে আলোচনা চলেছিল। ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে গান্ধীজী লিখিতভাবে জানান যে দেশবিভাগে তিনি সম্মত ও কংগ্রেসকেও পাকিস্তান মেনে নিতে তিনি পরামর্শ দেবেন; তবে তাঁর শর্ত হচ্ছে এই যে দেশভাগ হবার আগে ভারতকে স্বাধীন হতে হবে, কংগ্রেস ও লীগ যুগ্মভাবে বৃটিশ বিতাড়নে নামবে। কিন্তু জিন্না এই শর্তে রাজি হননি। তাঁর ভয় হল ইংরেজ ভারত ছেড়ে চলে গেলে কংগ্রেস হয়তো তাঁর কথা ফিরিয়ে নেবে এবং পাকিস্তানের দাবী আর মানবেনা। তাঁর দাবী হল ইংরেজরা থাকতে থাকতেই দেশ ভাগ করে নিতে হবে। আলোচনা এইখানে এসে ভেঙে গেল।

আলোচনা ভাঙল, কিন্তু এই সাক্ষাৎকারের পূর্ণ সুযোগ জিন্না নিলেন। সারা ভারতে তাঁর সম্মান ও প্রতিপত্তি বেড়ে গেল, কেননা সকলেই বুঝল যে ইংরেজ তো তাঁকে সমর্থন করেই, উপরন্তু কংগ্রেস ও গান্ধীও তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে চান। সকলে এটাও বুঝল যে পাকিস্তানের দাবী আর কল্পনার স্তরে নেই, বাস্তবে তা শীঘ্রই রূপ পরিগ্রহ করবে। ভারতের মুসলমানদের চোখে জিন্না, মুস্লিম লীগ ও পাকিস্তান অকস্মাৎ খুব সম্ভাবনাময় সামগ্রী হয়ে উঠল ও দলে দলে মুসলমানরা লীগে যোগ দিতে লাগল। গান্ধীর দৌত্যের এই হল মর্মান্তিক পরিণাম।

এই ঘটনার কিছুকাল পর কেন্দ্রীয় আইন সভায় কংগ্রেস দলের নেতা ভুলাভাই দেশাই ও লীগ দলের নেতা লিয়াকৎ আলির মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন সম্পর্কে একটি চুক্তি হয়েছিল। গান্ধীজীকে সমস্ত বিষয়টি জানিয়ে তাঁর অনুমতি নিয়েই ভুলাভাই এই বোঝাপড়ায় এসেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড, বিশেষত সর্দার প্যাটেল ভুলাভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন যে তিনি লীগের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। নির্বাচনের সময় ভুলাভাইকে আর টিকিটও দেওয়া হল না। দুঃখে ভুলাভাই মারা গেলেন। গান্ধীজী যদিও জানতেন ভুলাভাই নিষ্পাপ এবং লিয়াকৎ আলির সঙ্গে বোঝাপড়ার আসার ব্যাপারে তাঁর নিজ দায়িত্বও কম নয়, তবু ভুলাভাইয়ের স্বপক্ষে একটি কথাও তিনি বলেননি। কোন নীতি দিয়েই তাঁর এ আচরণ ব্যাখ্যা করা যায় না।

বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ১৯৪৫ সালের ১৪ই জুন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সমস্ত সদস্যকে জেল হতে মুক্তি দিলেন। ২৫শে জুন সুরু হল সিমলা সম্মেলন। এই সম্মেলন ভেঙে গেল মুখ্যত জিন্নার অনমনীয় মনোভাবের ফলে। কিছুতেই তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে আপসে এলেন না। অনেকেই সন্দেহ করে যে প্রধানমন্ত্রী উইন্স্টন চার্চিল ও লর্ড ওয়াভেলের গোপন নির্দেশেই জিন্না এরূপ অযৌক্তিক মনোভাব দেখিয়েছিলেন। সিমলা সম্মেলন নষ্ট হওয়ায় জিন্না ও ইংরেজ—উভয়েরই লাভ হল। ইংরেজ ভারতবিভাগের চক্রান্তের দিকে আর এক ধাপ এগোবার সুযোগ পেল। জিন্নাও লোকের কাছে অতিশয় শক্তিশালী পুরুষ বলে গণ্য হলেন। কেননা দেখা গেল যে তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছাই ভারতের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। কংগ্রেস ও ভাইসরয় একমত হওয়া সত্ত্বেও শুধু জিন্নার প্রতিবাদের ফলেই দেশের শাসনতন্ত্রের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সমস্ত পরিবর্তন আটকে গেল।

১৯৪৫ সালের ৮ই মে য়ুরোপের যুদ্ধ শেষ হল। ১৫ই আগস্ট শেষ হল জাপানের যুদ্ধ। ইতিমধ্যে জুলাই মাসে ইংলণ্ডে নির্বাচনে রক্ষণশীল দলকে পরাস্ত করে শ্রমিক দল ক্ষমতা দখল করল। নতুন প্রধানমন্ত্রী হয়ে মিঃ অ্যাটলি ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে সকল পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করতে একটি ক্যাবিনেট মিশন পাঠালেন। তার

স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস, লর্ড পেথিক লরেন্স ও মিঃ এ, ভি, অ্যালেকজাণ্ডারকে নিয়ে গঠিত এই কমিশন ভারতে আসেন ১৯৪৬ সালের ২৪শে মার্চ। ইতিমধ্যে ভারতেও একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং মুস্লিম লীগ নির্বাচন মারফৎ একটি বৃহৎ ও শক্তিশালী দল রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। জিন্নার প্রতিপত্তি তখন ক্রমবর্ধমান। ক্যাবিনেট মিশন ভারতে আসার ঠিক পূর্বাহ্নে মুস্লিম লীগের সারা ভারতের নির্বাচিত সদস্যদের একটি সম্মেলন ডাকলেন তিনি। সেই সম্মেলন স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র দাবী করল এবং ক্যাবিনেট মিশনকে সাবধান করে দিল যে এই দাবী না মেনে নিলে তাদের ভারতে আসা ব্যর্থ হবে। ক্যাবিনেট মিশন মুস্লিম লীগের দাবী মেনে নিয়ে এমন একটি আপসমূলক প্রস্তাব দিল যা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দও মেনে নিতে উৎসুক হলেন। কিন্তু গান্ধীজী একা ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবের বিপক্ষে দাঁড়ালেন। কংগ্রেস যতই ক্যাবিনেট মিশনের আপস প্রস্তাব গ্রহণের জন্য উন্মুখ হয়, গান্ধীজীর প্রতিরোধও ততই বাড়তে থাকে। অবশেষে ১৯৪৬ সালের ২৪শে জুন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। গান্ধীজী তখন প্রকাশ্যে কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে মেনে নিলেন, কিন্তু ভিতর থেকে তাকে বানচাল করার সঙ্কল্প করলেন। ৬ই জুলাই জহরলাল নেহরু কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন গান্ধীজীর ইচ্ছায়। কংগ্রেস কমিটির যে সভায় জহরলাল সভাপতি নির্বাচিত হলেন সেই সভাতেই তিনি একটি বক্তৃতা করলেন যার ফলে জিন্না ও মুস্লিম লীগ সম্পূর্ণ খেপে গেল, কংগ্রেসের সঙ্গে কোন আপসে আসতে তারা আর রাজি হল না। জহরলাল বলেছিলেন যে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব কংগ্রেস সাময়িকভাবে মেনে নিচ্ছে, কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর সে প্রস্তাব নাও মানতে পারে। জিন্না মুস্লিম লীগকে আহ্বান জানালেন: "We have learnt a bitter lesson—the bitterest, I think, so far. Now there is no room left for compromise. Let us march to our cherished goal of a sovereign Pakistan."

এর পরই মুস্লিম লীগ ১৬ই আগষ্ট Direct Action দিবস রূপে উদযাপনের সঙ্কল্প নেয়। বস্তুত পক্ষে ঐ দিনে কলকাতায় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানো হয় বাংলা দেশের মুস্লিম লীগ মন্ত্রীসভার উদ্যোগে। কলকাতার পর নোয়াখালি, বিহার, পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘোরতর আকারে দেখা দেয়। বড়লাট লর্ড ওয়াভেল দাঙ্গার পর কলকাতা দেখতে আসেন। দিল্লী ফিরে যেয়ে ২৭শে আগষ্ট তিনি গান্ধী ও নেহরুকে সাক্ষাতের জন্য আহ্বান করেন। ঐ সাক্ষাতে ওয়াভেল গান্ধী ও নেহরুকে বলেন যে ভারতে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দিয়েছে এর পর কংগ্রেস ও লীগের একটা বোঝাপড়া একান্ত আবশ্যক ও ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব গান্ধী ও নেহরু মেনে নিলেই তা হতে পারে। এই সাক্ষাতের পরই গান্ধীজী ইংলণ্ডে প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলিকে এক টেলিগ্রাম করে জানান যে ওয়াভেল এখন ভীত হয়ে পড়েছেন, সব দিকের আলোচনা চালাবার পক্ষে তিনি অশক্ত। অ্যাটলি এর পর ওয়াভেলকে ভাইসরয়ের পদ হতে সরিয়ে দিয়ে সেখানে লর্ড মাউন্ট-ব্যাটেনকে নিয়োগ করার কথা ঘোষণা করেন ১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি। মাউন্টব্যাটেন দিল্লী আসেন ১৯৪৭ সালের ২২শে মার্চ।

তিনি এসেই ক্ষমতা-হস্তান্তর ও ভারতবিভাগের তোড়-জোড় সুরু করেন। গান্ধীজী মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ৩১শে মার্চ, তারপর ২রা জুন। মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে দেশভাগের প্রস্তাব নিয়ে তিনি বিতণ্ডা করেননি, কেননা তিনি বুঝতে পারলেন যে নেহরু ও প্যাটেল দেশভাগের বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। দেশভাগের মূলে আছেন নেহরু—গান্ধীজীর এই হল ধারণা। নেহরুকে ব্যঙ্গভরে

'রাজা' নামে অভিহিত করে গান্ধীজী সরাসরি দেশবাসীকে নেহরুর অপরাধ সম্পর্কে সচেতন হতে আহ্বান জানিয়ে বললেন :

We shall not be impressed by everything the king does or does not do. If he has devised something good for us, we should praise him. If he has not, then we shall say so.

গান্ধীজী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ও কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে দেশভাগের সম্মতি জানালেন—কেননা তাঁর প্রিয় সহচরেরা সবাই তখন দেশভাগের পক্ষে। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে দেশভাগের বিরুদ্ধেই তিনি মতামত প্রকাশ করতে থাকলেন। নেহরু প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ সকলেই শেষ দিকে গান্ধীজীর বিরুদ্ধতা করে তাঁর শেষ মানসিক কষ্টের কারণ হয়েছিলেন। জিন্না শেষ পর্যন্ত একজন সফল রাজনৈতিক নেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, আর গান্ধীজীর চারদিক ঘিরে দেখা দিল ব্যর্থতা, হতাশা, পরাজয়ের লজ্জা ও গ্লানি। এরকম শোচনীয় মানসিক অবস্থার ভিতরেই গান্ধীজী নিহত হয়েছিলেন। জিন্না তখন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারাল।

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·৩০
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	১·২৫
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.

বিদ্যাসাগর	২·২৫
মানুষের মত মানুষ	·৭৫
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা—১২

হেগেলীয় দর্শন

অনিল রায়

কাজেই হেগেলের স্বকীয় উক্তিই হয়েছে যে negation প্রাণীজগতে (organic life) সত্তা সত্তার বিনশন (negation নয়। এখানে বিনশন শব্দটি প্রকৃত অর্থ হচ্ছে পূর্ণতা (completion)।

এখানে anti-thesis আসলে 'anti' নয়, নিতান্ত স্বজন। "The other which it sets up is in reality not another." (Hegel : Logic : pp 289)। সুতরাং ম্যাক টাগার্ট বলছেন যে ডায়ালেকটিকের আসল স্বরূপ এবং প্রকৃত বিশেষত্ব আমরা এখানেই দেখতে পাই। আসলে ডায়ালেকটিকের ত্রিলীলাসার মধ্যে বিনশনের (negation) তেমন কোন প্রাধান্য নেই ; আসল প্রাধান্য ও প্রাবল্য হচ্ছে পূর্ণতার (completion-এর)। কারণ দেখতেই তো পেলাম বীজের দৃষ্টান্তে।*

কাজেই ম্যাক টাগার্টের মতে হেগেলীয় ডায়লেকটিকের ইতিহাসে বিনশনের (negation) স্থান অকিঞ্চিৎকর এবং উপেক্ষণীয়। স্থিতি, প্রতিস্থিতির মধ্যে এক্ষেত্রে কোন দ্বন্দ্ব নেই।**

কাজেই যেখানে নিরবচ্ছিন্ন, সূক্ষ্মধারায় পরিবর্তন ঘটে চলেছে সেখানে বিশেষ করে তিনটে অবস্থাকে স্থিতি, প্রতিস্থিতি ইত্যাদি নাম দেবার কোন সার্থকতাই নেই। কোনো অবস্থা থেকে কোনো অবস্থাকেই খণ্ডিত করে দেখা হয় না এবং একটা অবস্থা অপরকে negate করছে বলারও নিতান্ত অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। আমরা বহু দৃষ্টান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে আগেও এই কথা বলেছি এবং সর্বত্রই দেখিয়েছি যে প্রকৃতপক্ষে বিনশন (negation), যেখানে যেখানে হেগেল বলেছেন, সেখানে নেই। প্রতিস্থিতি (Anti-thesis) কথাটারও কোনো মানে হয় না এই অর্থে। ম্যাক টাগার্ট সেই কথাটিই স্বীকার করছেন এখানে। তিনি বিনশনকে (negation) কোনো আসনই দিতে চান না। তিনি শেষে এই বলে সিদ্ধান্ত করেছেন যে :

"...The steps are indeed discriminated from one another, but they can scarcely be said to be in opposition." (Mc Taggart, 109 Art)

**"And as a consequence, the third term merely completes the second, without correcting the onesidedness in it, in the same way as the second term merely expands and completes the first. As this type is realised, in fact, the distinction of the three terms gradually lose their meaning. There is no longer an opposition produced between two terms and mediated by a third. (Mc Taggart Art 109).

"The presence of negation, therefore, is only a mere accident of the dialectic but an accident whose importance continuously decrease as the dialectic progresses.

(Mc Taggart Art 117.)

এখন ম্যাক টাগার্ট-এর এই ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ, ম্যাক টাগার্ট বিনশনকে (negation) প্রগতির পূর্ণতা (completion) হিসেবে বুঝতে বলেছেন। বিনশন-এর মানে করতে হবে পূর্ণতা। এতে আমাদের প্রধান আপত্তি হ'ল এই যে এতে "negation" শব্দটির ব্যবহারের কোনো মানে হয় না। একটা ভাবের শব্দ তার বিপরীত ভাবদ্যোতক শব্দের দ্বারা কি ভাবে প্রকাশিত হবে? প্রত্যেক শব্দের একটা নির্দিষ্ট মানে আছে; প্রত্যেকটি পরিভাষা এক একটি বিশিষ্ট ভাবের প্রতিনিধি। yes বললে যা বোঝা যায় No বললে তার বিপরীত ভাব বোঝা যায়। 'আছে' বললে যে ভাব প্রকাশ পায়, 'নাই' বললে তার একেবারে পুরোপুরি উল্টো অর্থ টাই সূচিত হয়। কাজেই negation-এর মানে completion করলে ঠিক তেমনি হয় যেমন হয় yes মানে no করলে কিম্বা 'আছে' মানে 'নাই' করলে। জগতে আমরা দু'রকমের পরিবর্তন দেখতে পাই; ক্ষয় ও বৃদ্ধি, অপচয় এবং পরিপূর্তি। এই দুটো process-এর একটি অপরটি থেকে একেবারে বিপরীত। এখানে যদি "ক্ষয়" মানে "বৃদ্ধি" বলতে হয় কিম্বা 'অপচয়' মানে 'পরিপূর্তি' বুঝতে হয়, তবে যে অর্থ ও ভাষা বিভ্রাট ঘটবে তাতে সমস্ত লজিক ও ভাষা-বিজ্ঞানের মূলে কুঠারাঘাত পড়বে। যদি সত্যি সত্যি বৃদ্ধি বা পরিপূর্তি মানক processটিকেই বোঝাতে হয়, তবে 'বৃদ্ধি' বা পরিপূর্তি এই দুটো শব্দই প্রয়োগ করা সঙ্গত। সেখানে বিপরীতার্থক শব্দ টেনে এনে জোর করে ব্যবহার করলে ভুলুম বই আর কিছু হয় না। এ-ক্ষেত্রেও ম্যাক টাগার্টের পূর্ণতা (completion) অর্থে বিনশন (negation) শব্দ ব্যবহার করা নিতান্ত অযৌক্তিক অধরপন্থি বলে আমাদের আপত্তি। তবে ম্যাক টাগার্টকে অবশ্য দোষ দিয়ে লাভ নেই, কারণ হেগেল যেরকম জোরালো ভাবে negation শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন তাতে অর্থটাকে উল্টে না দিলে আর উপায়ান্তর নেই।

দ্বিতীয়তঃ, ম্যাক টাগার্ট-এর মতের সঙ্গে আমাদের অমিল নেই। কারণ জগতের সর্বত্রই যে বিনশনের (negation) রাজত্ব নয়, এই বিষয়ে আমাদের সঙ্গে ম্যাক টাগার্টও একমত। আমরাও বলেছি যে কোনো স্থানে বিনশন (negation) থাকলেও, সর্বত্র negation নেই। এমন কি বেশীর ভাগ বস্তু, ঘটনা ও ব্যাপারেই বিনশন-এর (negation) প্রভাব নেই। বহুল ব্যাপারে পূর্ণতা (fulfilment or completion) ঘটছে: কোনো কোনো স্থানে আবার পূর্ণতা (completion) ঘটছে না, বিনশনও (negation) ঘটছে না। সেখানে বিরাজ করছে শুধুমাত্র নিছক 'পার্থক্য' বা বিভিন্ন সত্তার পারস্পরিক ভেদ বা স্বকীয়তা (distinctness)। ম্যাক টাগার্ট এ-ক্ষেত্রে আমাদের মতেরই সমর্থক হয়েছেন। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে ম্যাক টাগার্টের মত হলেও হেগেলের মত নয় কখনো। ম্যাক টাগার্ট নিজেও এ-সম্বন্ধে সন্দেহ মুক্ত নন, এমন কি তিনি হেগেলের ওপর অবিমিশ্র অভিমানও প্রকাশ করেছেন হেগেলের বিনশন (negation) সম্বন্ধে এই অনবধানতা বা অন্ধতা দেখে। হেগেল আগাগোড়াই কেবল 'বিনশন' এর ওপরই নির্ভর করে তাঁর দর্শনকে গড়ে তুলেছেন, 'বিনশন'-এর মানে negation না হলে তার প্রতিস্থিতি-তত্ত্ব (antithesis) এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত ডায়ালেকটিক ফর্মুলাই সাধারণ ক্রমবিকাশ তত্ত্বে পরিণত হয় এবং অতএব অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।

তৃতীয়তঃ, negation শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থ করার

আমাদের আপত্তি আছে। অর্থান্তরই যদি ঘটে থাকে, তবে তার শব্দান্তরও করা উচিত ছিলো। এই সব ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বোঝাবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শব্দ বা পরিভাষা ব্যবহার করলে কোনো গোলমাল হোতো না। যদি negation-এর মানেই পরিবর্তন হয়ে গিয়ে অন্য অস্তিত্বভাবকেই সূচিত করে, তবে negation বাইরের কাঠামোতে negation থাকলেও ভিতরের অর্থ-বৈভবে (content) negation নেই। একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে কল্পনা করা নিতান্ত অযৌক্তিক ও আপত্তিজনক। এখানেও ম্যাক টাগার্টকে বাধ্য হয়েই এই প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিতে হয়েছে। কারণ হেগেল নিজে তাঁর কর্মপা-প্রীতির বশে সর্বত্র বিনশন (negation) ও প্রতিস্থিতি (anti-thesis) প্রয়োগ করতে গিয়ে এই শব্দগুলির অর্থের ওপরে অত্যাচার করেছেন। শব্দ ঠিক রাখতে গিয়ে অর্থকে বগলে নিয়ে বিশ্বসংসারকে তার ত্রি-অঙ্গ ছাঁচে ঢালতে হয়েছে। কাজেই আসল গলদ রয়েছে হেগেলের বিবৃতি ও ব্যাখ্যায়। সেখানে বিনশন (negation), বিরোধ (contradiction), বৈপরীত্য (opposition) অন্যতরতা (otherness), ইত্যাদি শব্দ ছড়িয়ে রয়েছে স্তরে স্তরে, অথচ এদের অর্থ নিয়ে হেগেল করেছেন বিস্তর গণ্ডগোল ও বিভ্রাট। ম্যাক টাগার্ট-এর ব্যাখ্যায় অভিনবত্ব ও মৌলিকতা আছে, একথা স্বীকার্য। কিন্তু হেগেলকে বাঁচাতে গিয়ে তাঁর প্রচেষ্টা ফলবতী হয় নাই। একথা বলতেই হবে। হেগেল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিনশন নিয়ে যে রকম বাড়াবাড়ি করেছেন এবং যতো প্রাধান্য আদায়োড়া দিয়েছেন তাতে বিনশন-ক (negation) তুচ্ছ করে উড়িয়ে দেবার এই চেষ্টায় ম্যাক টাগার্টের খুব কৃতকার্য হবার সম্ভাবনা নেই।

প্রফেসর ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ হেগেল-শিষ্য। তিনিও হেগেলের বিনশন অত্যয় (negation) তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং একে সরাসরি অস্বীকার করেছেন। হেগেলীয় বিনশন (negation) সম্বন্ধে ডঃ শীলের মতামত আমাদের মতামত ও আলো মাকেই সমর্থন করছে। তাঁর মতে হেগেলের দুটো মারাত্মক ভুলের মধ্যে তাঁর বিনশন-তত্ত্বও একটা প্রধান ভুল।

বীজ থেকে চারাগাছ বিকশিত হচ্ছে। এখানে আগের স্তরকে (বীজ) বিনাশ (negate) করে পরের স্তর গাছ আবির্ভূত হচ্ছে, একথা ঠিক নয়। ডঃ শীলের মতে পরিণমন বা evolution হচ্ছে একটা অবিচ্ছিন্ন ও সম্পূর্ণ বিকাশ। এই সম্পূর্ণ ও সমগ্র পরিণতির ধারাটি থেকে কোনো স্তর বা অবস্থাকে আলাদা দিক (aspect) বা মুহূর্ত হিসেবে খণ্ডিত করে দেখাটা অবাস্তব এবং অন্যায়। সমস্ত বিধানটি বা পদ্ধতিটি (process, সমগ্রভাবে ও অখণ্ড সম্পূর্ণতায় বিবর্তিত হচ্ছে। কাজেই পরের স্তরটি যেমন সত্য, আগেকার স্তরটিও তেমনি সত্য। আগেকার ধাপটিকে বিনাশ (negate) করে তার পরের ধাপটি আসবে ক্রমবিকাশ-তত্ত্বের এ একেবারে কৃত্রিম ও বিকৃত ব্যাখ্যা। অথচ হেগেলীয় ক্রমবিকাশকে পর পর বিনশন-এর (negation) ফল এবং প্রত্যেকটি স্তরকে পূর্বস্তরের প্রতিস্থিতি (anti-thesis) হিসেবে কল্পনা করার সেই কৃত্রিমতাই প্রকট হয়েছে।

ডঃ শীলের ভাষায়:

"The real is a whole, the abstraction of phases, aspects, moments, is unhistorical; and organs and functions evolve, never ind-pendently but always as participating in and dominated by the life of the organism as a whole. Development must therefore, be conceived and explained and a passage from the whole to the whole, from the implicit to the explicit, from a less coherent to a more coherent, whole. The earlier stages are as real as the later ones." (Preface to 'New Essays in Criticism' by Dr B.N, Seal 1903)

স্থিতি (thesis), প্রতিস্থিতি (anti thesis) বলে পরিবর্তনকে খণ্ড খণ্ড করে দেখাটাকে তিনি বলছেন 'abstraction'। তাঁদের এই তত্ত্ব বা phase গুলিকে একটি অন্যটিকে বিনাশ (negate) করছে বলে হেগেল যে বিকাশের ক্রম দেখিয়েছেন, তাকেও ডাঃ শীল বলছেন অবাস্তব। যেখানে বিকাশ, বিবৃতি বা পরিপূর্ণতা প্রাপ্তি, সেখানে বিনাশ (negation) হতে পারে না। কারণ আগেকার স্তরের (stage) পরিপূর্ণতাই (fulfilment, হেগেলে পরের স্তর (stage)। যা আগে ছিল নিহিত (implicit) তাই পরে হেগেলে পূর্ণ মহিমায় ও সর্বাঙ্গীন সমৃদ্ধিতে বিকশিত। বিনাশ (negate করছে কে কাকে? বিনাশ negate করা নয়ই, 'the earlier stages are as real as the later ones.' বীজকে বিনাশ (negate) করে গাছের জন্ম হয়।

তবে হেগেল যে দুটো ধাপ (Thesis ও antithesis, আলাদা আলাদা করে এদেরকে তত্ত্বের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছেন সে কেবল 'abstraction'-এর সাহায্য করেছেন। ডাঃ শীল একে 'logical fiction' বলে আখ্যাত করেছেন। ব্যাকহ্যামার্ট যেমন বলেছেন যে স্থিতি (The-is) প্রতিস্থিতি (anti-thesis) এ সব শব্দ নিরর্থক '(lose their meaning'), কে যে যেমন ইঙ্গিত করেছেন হেগেল একটা উপমার (metaphor) মোহে পড়ে বিনাশন (negation), প্রতিস্থিতি (anti-thesis) ইত্যাদি নিয়ে গোল পাকিয়েছেন; তেমনি ডাঃ শীলও বলছেন:

"Anti-thesis as a mere negation is a mere logical fiction." (Ibid, Dr Seal)

তবে ক্রমবিকাশের বিভিন্ন কতকগুলি অবস্থাকে আমাদের চোখে যে পৃথক ও স্বতন্ত্র স্তর বলে মনে হয় (যেমন বীজ ও গাছ) তার কারণ ঐ ঐ স্তরে কতকগুলি বিশেষ প্রকাশ আমাদের কাছে ধরা দেয়। 'গাছ' অবস্থায় আমরা এমন কতকগুলি দিক দেখতে পাই যে দিকগুলি 'বীজ' অবস্থায় প্রকট হয় নাই। কাজেই ডাঃ শীল বলেন যে ক্রমবিকাশের পথে [illegible] একটা বিশেষ স্থিতি থেকে পরের স্তরে যে বৈশিষ্ট্যকে ছিনিয়ে নেওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। তবে পূর্ব অবস্থার পরিপূরণ ও পূর্ণতা পরের অবস্থাগুলিতে। একে বিনাশ ক্রমই বলা চলে না। কারণ মিলিত না হয়েও কোথাও বিনাশন ঘটেনি।*

ডাঃ শীল বলছেন যে বস্তু অবস্থায় বিকাশের যে গতি সে আর বিচ্ছুরণ নয়, কেন্দ্রে আকর্ষণ অপরিণত অবস্থা থেকে অধিকতর [illegible] উত্তরণ। এবং এটাও লক্ষ্য করবার বিষয় যে [illegible] একটি স্তর থেকে তার বিরুদ্ধ বা বিপরীতমুখ বিবর্তিত হচ্ছে অনুকূলের দিকে (concord) অর্থাৎ যে বা [illegible] পূর্ণতা বা fulfilment, না নয়। এ জন্যই ডাঃ শীল [illegible] হেগেলের 'dialectic' বদলান দরকার, "requires a radical correction." (ডাঃ শীল এবং এ সংশোধন না করলে আধুনিক জগতে তত্ত্ব সচল।

তাঁরা যে ম্যাকট্যাগার্ট যে হেগেলীয় বিনাশনকে (negation) বর্জন বা উপেক্ষা করে হেগেলকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন, সে ব্যর্থ প্রয়াসও ডাঃ শীলের-এর চক্ষু

---

* "The organic whole develops and passes from a relatively less stable to a relatively more stable equilibrium and the balance of powers which maintains the whole life corrects undue emphasis in one direction by developing a counter-emphasis in a complementary direction (Ibid Dr Seal)

এড়াননি। এখানেও—অর্থাৎ ম্যাক টাগার্টের ব্যাখ্যা সম্বন্ধেও—আমাদের মতামতই সমর্থিত হচ্ছে ডঃ শীলের মতামতের দ্বারা। তাঁরও মতে ম্যাক টাগার্ট যতোই না কেন চেষ্টা করুন বিনশন (negation) এড়াতে হেগেলীয় দর্শনের সর্বাঙ্গে ছড়ে জড়িয়ে রয়েছে এই বিনশন-তত্ত্ব এবং 'ম্যাক টাগার্ট-এর এ প্রয়াস বিফল পরিশ্রম মাত্র। কারণ হেগেলের অর্থ অতি স্পষ্ট এবং তার ভুল-গুলিও অতীব পরিষ্কার ও প্রকট। ডঃ শীল বলেছেন :

"……and though, as Dr Mc Taggart perceives, Hegel, in the later categories more or less discards the anti-thesis as an abstraction, his teaching as a whole marks too much of the mere formal process and is bound to lose sight of the organic unity of the whole in the contradictions of opposed moments." (Ibid Dr Seal)

ডঃ শীল-এর মতে সমস্ত হেগেলীয় দর্শন ও সমাজতত্ত্ব দুটো যুগ্মভ্রমের ("twin errors") দ্বারা ত্রুটি-দুষ্ট ও ব্যর্থ হয়েছে এবং বিনশন (negation) বা প্রতিস্থিতি (anti thesis) তত্ত্ব তার মধ্যে অন্যতম।

বহুদিন আগে ১৯ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইমানুয়েল হারমান ফিক্‌টেও (Immanuel Hermann Fichte) বলেছিলেন যে আসলে সত্যিকারের বিরোধ-এর (contradiction) উদ্ভব হয় না, এটা হেগেলের স্বকপোল কল্পনা-মাত্র। সি, এইচ ব্রানিশও (C. H. Branish) প্রকারান্তরে ঐ কথাই উল্লেখ করে বলেছিলেন যে contradiction শব্দটা অপপ্রয়োগ' সত্যিকারের ব্যাপার contradiction নয়, বা বিরোধ-প্রতিষ্ঠ ডায়ালেকটিক নয়। সত্যিকার প্রক্রিয়া বা বিষয়টী হচ্ছে "construction"-গঠন। ডঃ শীলও "contradiction of opposed moment" কে logical fiction বলে আখ্যাত করেছেন এবং হেগেলের এই পরিকল্পনাকে অনৈতিহাসিক ও অবাস্তব বলেছেন। হেগেল দাবী করেছেন যে বিনশন পৃথিবীর ও সকল ব্যাপারের সার্বলৌকিক ও সার্বকালিক মূল সূত্র এবং বিশ্বব্যাপারের অন্তরালের অদ্বিতীয় গুরুত্ব। হেগেলের এই দাবি উপরের আলোচনার সমূলে খণ্ডিত হয়েছে ও ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে।

(ক্রমশঃ)

এখন থেমেছে ঝড়

প্রভাকর মাঝি

এখন থেমেছে ঝড়। ফুটে উঠল ছুটো একটা তারা।
কাঁচের আয়নার মতো টলটলে আকাশ দেখা যায়।
অথচ একটু আগে আঁটো-সাঁটো নীলাম্বরী শাড়ি
কি ভীষণ বেসামাল হচ্ছিল যে, চিনতে পারা যায়।

কালো ওর ধারি থাকে। নড়ছিল কি ঘুড়ো বটগাছ।
হেরালে লম্বিত চিত্র পড়ে গিয়ে তমুশি চুমুরায়।
টুক করে নিবে যেতে অনুক্ষণ বিদ্যুৎ বাতিটি—
মুখ থুবড়ে পড়ল এসে এক রাশ গাঢ় অন্ধকার।

ঝড়, ঝড় —বৈ হল্লায় তেড়ে আসে তাহার দস্যুরা—
বুকের সমুদ্র করে উদ্বেলিত, উথাল-পাথাল।
সব শব্দ ডুবে গেল, সব স্মৃতি—ইন্দ্রিয়ানুভূতি—
শুধুই নিরাট উষ্ণ শোনিতের প্রবাহ উত্তাল।

এখন থেমেছে ঝড়—রেখে গেছে প্রশ্ন ইতস্তত
তুমি কি তেমনি আছ, আমিও কি আছি সেই মতো?

পাখী, দিস তারে : মণিদীপা বিশ্বাস

নিরালা বিকেল জলাটিতে হু-হু করে
কতকাল হলো ফিরে গেছে ঘুরগ্রামে
রাঙাপথ আলো রাধাচূড়া ফুলে সাজে
নীল পাখী, সে এখন কোন মুখ খোজে

রংয়ের বাহার নিয়ে আলো আসে উড়ে কত পাখী
পালকে ঘামের শুধু ইন্দ্রধনি হায় কত আঁকা
এই মন রামধনু হয় নারে আর
বল্ পাখী, হবে নাকি চোখে চোখ রাখা

খোঁপায় জোনাক জ্বেলে বসে থাকি একা
রোদ নিতে এলে ম্লান হবে পথরেখা
নীল পাখী, এ মনের সব হীরে সব সোনা
তুলে নিয়ে যারে
আমার অধর ছোঁয়া নরম পালক ছুটি
তুই দিস তারে।

॥ মাশরুম ॥

হেনা হালদার

বর্ষার পরেই ঝাঁকে ঝাঁকে ফুটতে থাকে ওরা
অরক্ষিত মাটির ডিলিরিয়মের মত।
ধরণ্ডনী মাশরুম……কৌলিক পরিচয় যার :
ব্যাঙের ছাতা।

কিশোরী বিশ্বাসী শৈশবে যাকে ভেবেছি
ভবঘুরে ভেকের আশ্রয়-শিবির বলে।
প্রথম যৌবনে যাকে দেখে আক্রান্ত হয়েছি
বিষাপত্তির মত দাদুরীর বন্দ্যাক্রান্তায়।

এখন অনেক কিছুতেই বিশ্বাসের প্রবণতা হারিয়েছি
তাই দ্বিধা করিনা
ব্যাঙের সঙ্গে ছাতার সন্ধি-বিচ্ছেদ ঘটাতে।

শরতের আরম্ভেই সাথে সাথে করতে থাকে ওরা
নিস্পৃহ মাটির বিবর্ণ স্বপ্নের মত।
তারপর পোলিথেনের ছুধসাদা—গ্র্যাটারে
ব্রাউন করে ভাজা বেটুলির সঙ্গে মাখামাখি হয়ে
ব্যাঙেদের বাদ করতে করতে চলে আসে
নৈশ-ভোজের টেবিলে।

অখিল ব্লাকের
সময়োপযোগী দুইটি বই

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ : ৩·৫০ টাকা

"...সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থ-নৈতিক মতবাদ এবং দর্শনগ্রাহ্য। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাদ্য।" ... (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনবাদ : ১·২৫

"...নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের সম্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।

পাওয়া যাবে :

জয়শ্রী—৩১২, গাঙ্গুলী বাগান, কলি:-৪৭ (ডাকে)

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী,

২০৯বি বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

জয়শ্রীর নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্য

জয়শ্রী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক সডাক ৯·৫০। ষাণ্মাসিক ৫·৭৫। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে হয় না।

লেখকদের জন্য

শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ সর্বাগ্রে দেওয়া হয়।

লেখা পরিষ্কার হরফে ফুলস্ক্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। কারণ, হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই।

কবিতা সম্বন্ধেও তাই নিয়ম।

উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে রচনা ফেরত দেওয়া হয়।

শক্তিশালী নূতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহযোগিতার জন্য আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কলকাতার সব স্টলে জয়শ্রী পাওয়া যায়

প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী
৩১২, গাঙ্গুলিবাগান
কলিকাতা-৪৭

দ্বিবিধ উপকারী
কেশ তৈল

- মাথা ঠাণ্ডা রাখে
- স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কেশবর্দ্ধনে সাহায্য করে

জীবনের বিভিন্ন বৃত্তিতে আজ নরনারী নির্বিশেষে সকলকেই মাথা ঘামাতে হয়। তাই তাঁদের পক্ষে এমন কেশ তৈলই বিশেষ উপযোগী যা একাধারে তাঁদের মাথা ঠাণ্ডা রাখবে এবং স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কেশবর্দ্ধনে সাহায্য করবে। আয়ুর্বেদীয় মতে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রস্তুত ভৃঙ্গরাজ মহা ও অন্যান্য গাছগাছড়ার ভেষজ গুণসম্পন্ন সেই অতুলনীয় কেশ তৈল হ'ল—

ক্যালকেমিকোর

ভৃঙ্গকেশ

স্বরভিত

মহাভৃঙ্গরাজ কেশ তৈল

ক্যালকাটা কেমিকেল কর্তৃক প্রস্তুত

: উপন্যাস :

কণ্ঠ ভরা বিষ

মিহির মুখোপাধ্যায়

॥ দশ ॥

ভারতের মন উত্তেজনায় অস্থির। মনে হচ্ছে, জল-মাটি-আকাশ-বাতাস—এ বিশ্বের সমস্ত কিছু যেন এক নতুন সম্ভাবনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সাগ্রহে অপেক্ষা করছে। এই দেবানন্দপুরের মাটিতে কাব্যলক্ষ্মী যেন এক নতুন জন্মের সার্থকতা লাভ করবে। দিনের প্রথম প্রহরের রোদ, বনপাতায় তেঁতুল গাছ আর নীল নির্মেঘ আকাশ যেন এক নতুন কাব্য শোনার আগ্রহে মৌন প্রতীক্ষায় স্তব্ধ।

নিজের কুঠুরিতে এসে প্রথমে দোরটা ভেজিয়ে দিল ভারত, কম্বলের আসনে বসল। কাঠের ছোট চৌকির ওপর পুঁথিপত্তর। খাগের কলমের ধার পরীক্ষার জন্য দু'এক অক্ষর লিখে দেখল। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে রইল সামনের দেয়ালের দিকে। দেয়ালের কুলুঙ্গিতে সিদ্ধিদাতা গণেশের মাটির মূর্তি। বাইরে পাঠশালার ছেলেদের গুণ গুণ শোনা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ একমনে কি ভাবল ভারত। তারপর মাথা নীচু করে কয়েকটা পংক্তি লিখল—

শুন সবে একচিত্ত সত্যপীর গুণগীত
দুই লোক পাবে প্রীত দিন্ধ মনস্কামনা।
গণেশাদি দেবগণ বন্দ সত্যনারায়ণ
দিন্ধ দেহ অনুক্ষণ যারে যেই ভাবনা॥

মুক্তোর মত অক্ষর। আনন্দ আর উত্তেজনায় সমস্ত চেতনা কেমন আচ্ছন্ন। বাইরের পৃথিবী থেকে মন গুটিয়ে এনেছে শুধু শব্দ আর ছন্দের মধ্যে। ছন্দপতন হল কার ডাকাডাকি শুনে। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকছিল নিধিরাম—ও দাদাঠাকুর, দরজা বন্ধ কেন, আজ আর খাওয়া দাওয়া কিছু হবে না?

ভারত কিন্তু লেখার জায়গা ছেড়ে উঠল না। দরজা ঠেলে ভেতরে এল নিধিরাম। তার হাতে ছোট একটি ডালার মধ্যে একটি পাকা বেল, একছড়া মর্তমান কলা, দুটো খাঁখ আলু কলাপাতায় মোড়া খানিকটা আখের গুড়।

বললো—কর্তামশাই, এই ফল কটা পাঠিয়ে দিলেন—

মনে মনে বিরক্ত হলেও মুখে হাসি টেনেই জবাব দিল ভারত—আমার তো আজ উপোস নিধিরাম—

—সারাদিন নির্জলা উপোস দেবে কেন, দুটি ফল মুখে দিও, পুজো হবে তো সেই সন্ধে বেলা, পুজোর পর পাচালী পড়বে, তারপর যা হোক কিছু মুখে দিতে পারবে—ঘরের একপাশে ফলের ডালাটি নামিয়ে রেখে আবার বললো নিধিরাম—কর্তামশাই আমাকে ডেকে বললেন, যা নিধে, বামুনঠাকুরকে এই ফল কটা দিয়ে আয়, শুধু শুধু বেল খাবে কি করে, খুব মিষ্টি বটে তাই একটু আখের গুড়ও এনেছি, ভাল গুড়, সনাতনের দোকান থেকে এনেছি—একটু বেশি বকে নিধিরাম।

অন্তরঙ্গ ভারত তার সমবদার শ্রোতা। কিন্তু এখন আর বাজে বকুনি বেশি ভাল লাগছে না।

—আচ্ছা তুমি যাও, দরজাটা টেনে দিয়ে যেও—

কয়েক পা দিয়েই কিন্তু আবার ফিরে এলো—কলসিতে জল আছে কি না দেখতে এলুম—

কি জ্বালা! এবার আর বিরক্তি চেপে রাখতে পারল না, একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বললো ভারত—ওইতো কলসি রয়েছে জল আছে কি না ভাখো না—

নিধিকার মুখে চলে গেল নিধিরাম, খানিকবাদে ভরা কলসি নিয়ে এল।

ভারতের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললো—দাদাঠাকুর রাগ করেছ, লেখাপড়ায় বাধা হচ্ছে, কি লিখছ শুনি—

নিরক্ষর নিধিরাম একটু সামনে ঝুঁকতেই তাড়াতাড়ি দুহাত দিয়ে লেখার পাতাটা ঢেকে ফেলে, ভুরু কুঁচকে বললো ভারত—আঃ, নিধিরাম, বিরক্ত করো না, এখন যাও দেখি, দরজাটা বন্ধ করে যাও—

যেতে যেতেও খানিকটা বললো সে—তোমাকে সেই কথাটা বলা হলনি দাদাঠাকুর, সনাতন বলছিল, ও গিয়েছিল গঙ্গা পার হয়ে কালিঘাটে পুজো দিতে, তাজ্জব ব্যাপার সেখানে—এত জ্বালার লোকটা! এখন উৎপাতও জোটে। একটু সময় চুপ করে মনটা গুছিয়ে নিল। নিধিরাম দরজা ভেজিয়ে গেলেও একটু ফাঁক ছিল।

দুই ছেলের হাসির মত একফালি দুপুরের রোদ যেন কিশোর কবিকে জ্বালাতন করার মতলবে উঁকি দিচ্ছে। পাঠশালা বোধহয় এবেলার মত ছুটি হয়ে গেল।

ঘরের কোণে কুলুঙ্গিতে ধুলো আর মাকড়সার জালের মধ্যে গণেশঠাকুর অনেকী মহিমায় উদাসীন। কে যে এই মূর্তিটি এনেছিল, কতদিন ধরে যে ওখানে আছে, কে জানে। আরো কয়েকটি পংক্তি লেখার পর ভাবল, শুধু বাংলা নয়, বিদেশী শব্দ কিছু ঢোকালে কেমন হয়। কয়েকবার কাটাকুটির পর লিখল—

লেগায় হামায়া পাড়ে, ধুপদে ধোম্ কাহে ধাড়ে
পেয়ে দান খেয়ে বাড়ে মেরে বাত ধরতো।
লিনি বাদে পির বা, সভি হাথছো থির বা
মোকামে চালির বা, ধরব হস্ত তপতো।

একাসনে সারা দুপুর বসে লিখল্। একবারও উঠল না। একফোঁটা জলও খেল না। লেখা যখন শেষ হল, বিকেলের পাঠশালাও তখন ছুটি হবার মুখে।

রোদের রেখা কোন ফাঁকে পালিয়ে গেছে, খেয়াল ছিল না। ডালাভর্তি ফল কটা তেমনি পড়ে আছে। ঘরের মধ্যে শেষ বেলার ঠাণ্ডা ছায়া।

সমস্ত লেখাটা বারদুই মনে মনে পড়ল ভারত। মাথা নেড়ে নেড়ে সুর করে পড়ল। নেহাৎ মন্দ মনে হল না। এখন লেখা যাক্, মুন্সী মশাই কি বলেন।

পুঁথিপত্তর গুছিয়ে রেখে উঠল ভারত। সারাদিন স্নান করা হয়নি। পেটেও কিছু পড়েনি। চোখ দুটো টন্ টন্ করছে। প্রতঙ্কণ একনাগাড়ে মাথা নীচু করে লিখেছে, যেন এক নেশার ঝোঁকে লিখে গেছে। এখন স্নান করা দরকার। মুন্সীবাড়ির কাছেই বড় পুকুর। তেল-গামছা নিয়ে সেই দিকে চলল ভারত।

এ জায়গাটির নাম বকুল তলা। দেবানন্দপুরের বকুলতলা। অথচ বকুলগাছ নেই। হয়তো আগে ছিল। এখন একটি মাত্র কুড়ো গাছ আছে ওই পুকুরটার পুরনো ঘাটের পাশে।

স্নান সেরে এসে পরিপাটি করে চুল আঁচড়াল। আচার্যের টোল থেকে ফেরার পর চুল ছাটা ছেড়েই দিয়েছে ভারত। আবার সেই ছোটবেলার মত কাঁধ পর্যন্ত লুটিয়ে পড়া কোঁকড়া চুলের বাহার হয়েছে। চুলের বড় সখ ভারতের। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল। পাশের চণ্ডীমণ্ডপেই পুজোর আয়োজন। নানাজনের আনাগোনার সাড়াশব্দ শোনা যাচ্ছিল। এক সময় নিধিরাম এসে ডেকে নিল।

বাথার উপর কাড়-বাতির আলো, কয়েকটা ঘিয়ের প্রদীপ। ধূপ-গুগ্গুলের গন্ধ। বড় বড় তামার পুষ্পপাত্রে রাশি রাশি ফুল।

শঙ্খ, ঘণ্টা, রুপো বাঁধানো চামর, চন্দনের বাটি, পঞ্চপ্রদীপ। চাল-কলার নৈবেদ্য থেকে শুরু করে চিনির ছাঁচ, বাতাসা, কোন কিছুরই অভাব নেই। ষোড়শোপচারে পূজোর আয়োজন।

সামনে সোনার সিংহাসনে শালগ্রাম শিলা। ভারতের কেমন ভয় ভয় করছিল। মণ্ডপের একপাশে চিক-টাঙানো, ওপাশে অন্দরে যাবার গেট খোলা।

বাড়ির মেয়েরা একমুখ ঘোমটা টেনে যাওয়া আসা করছে। আর একদিকে শতরঞ্চি বিছিয়ে, ফরাস পেতে পুরুষদের বসবার জায়গা।

পুঁথিখানি আসনের পাশে রেখে পূজোয় বসল ভারত।

ধ্যান-গম্ভীর পরিবেশে পূজো শেষ হল। প্রায় দুইঘণ্টা সময় লাগল। এবার পাঁচালী পাঠের আয়োজন। একটু উঁচুতে একখানি চৌকির উপর আসন হল ভারতের।

শ্রোতার দল বসল দু'ভাগ হয়ে, ফরাসের ওপর পুরুষেরা, ওপাশে চিকের আড়ালে মেয়েদের জায়গা। তাকিয়া ঠেস দিয়ে রামচন্দ্র মুন্সী বসেছেন পুরুষমণ্ডলীর মধ্যমণির মত। তাঁর দুপাশে দুই ছেলে—কেশবরাম, হীরারাম। তাদের পেছনে ঘিরে বসেছে আরো আত্মীয়-স্বজন, আশ্রিত-বান্ধব, জ্ঞাতি-কুটুম্ব প্রতিবেশী।

সত্যনারায়ণকে প্রণাম করে, সমবেত শ্রোতাদের নমস্কার জানাল ভারত।

তারপর প্রদীপের সলতে উসকে দিয়ে ধীরে ধীরে পড়া শুরু করল—শুনু সব একচিত, সভাপীর গুণগীত।

সমস্ত গুজন বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল, সমস্ত বিস্ময় যেন মুগ্ধ প্রতীক্ষায় উৎসুক হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে আড়ষ্ট ভাবনা কাটল ভারতের। ধূপ গৌরভপূর্ণ মণ্ডপগৃহ তার মধুর গম্ভীর সুরে গমগম্ করতে লাগল। মুন্সীমশাই তাকিয়া ছেড়ে সোজা হয়ে বসলেন। তামাকটানার প্রয়োজনও ভুলে গেলেন। ছেলেটির বাচন-ভঙ্গি সত্যিই চমৎকার। কণ্ঠস্বর পর্দায় পর্দায় ওঠানামা করছে। শ্রোতাদের মুগ্ধবিস্ময় সেই সঙ্গে ওঠে। যখন শেষের দিকে পড়ছিল ভারত—

ভরদ্বাজ অবতংস, ভূপতি রায়ের বংশ
সদাভাবে দত্ত কংস, ভূরসুটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত ভারত ভারতীযুত
ভূদেব মুখটি খ্যাত দ্বিজপদে সুমতি॥
দেবের আনন্দধাম দেবানন্দপুর গ্রাম
তাহে অধিকারী নাম রামচন্দ্র মুন্সী।
তাহাতে নরেন্দ্র রায় দেশে যার যশ গায়
হয়ে মোরে কৃপাদায়, পড়াইল পারসী॥

সমস্ত মুখের ভাষা হারিয়ে গেছে, সমস্ত চোখের মুগ্ধবিস্ময় যেন প্রশংসার প্রদীপ জেলে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মুন্সীমশাই উত্তেজনায় দু'হাতে ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকে বসলেন। থরথর করে কাঁপছিল তাঁর হাত দুটো। ভারতের গলাও কাঁপছিল একটু একটু—

সবে কৈল অনুমতি সংক্ষেপে করিতে পুঁথি
তেমনি করিয়া গতি না করিও দূষণা
গোষ্ঠির সহিত তায় হরি হন্ বরদায়
ব্রতকথা সাঙ্গ পায় সনে রৌদ্র চৌত্রিশা॥

পুঁথি বন্ধ করে, সত্যনারায়ণকে প্রণাম করে মুখ তুলতে না তুলতেই মুন্সীমশাই এগিয়ে এসে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন ভারতকে। এতক্ষণে তাঁর চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে নামল। প্রায় রুদ্ধ ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন—এ আমি জানতুম, আগেই জানতুম, এ না হয়ে পারে না, হতেই হবে, তুমি শ্রেষ্ঠ কবি হবে, এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, কিন্তু একি করেছ বাবাঠাকুর, তোমার কাব্যের মধ্যে আমার নাম দিয়েছ, এতটা সম্মানের কি যোগ্য আমি, তোমার জন্য কতটুকুইবা করেছি আমি, বলতে গেলে কিছুই করতে পারিনি, আমার

যে কি আনন্দ হচ্ছে, মুখে বুঝিয়ে বলতে পারব না—কাপড়ের খুঁটে চোখের জল মুছে আবার বললেন—শত শত বছর পরেও তোমার কাব্যের পাঠকরা আমার নাম জানবে, পরিচয় জানবে, এই দেবানন্দপুরের বুড়ো রামমুন্সী বেঁচে থাকবে, তোমার অমর কাব্যের মধ্যে বেঁচে থাকবে, শত বছর পরে তোমার কাব্যের পাঠকরা এই বুড়ো অধমের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতার নমস্কার জানাবে, আমি কি তার যোগ্য, এ তুমি করেছ কি বাবাঠাকুর—রামচন্দ্র মজুমুন্সী যেন আনন্দে আবেগে উদ্বেল হয়ে উঠলেন।

॥ এগারো ॥

আরো কয়েকটি মাস কাটল। শীত-বসন্ত-গ্রীষ্ম গেল। এখন বর্ষাকাল। মেঘমান আষাঢ়ের বেলা। দেবানন্দপুর প্রবাসের দ্বিতীয় বছরও শেষ হয়ে এল।

আরবী-ফারসী শেখার সঙ্গে সঙ্গে ভারতচন্দ্র এখন নানা কাব্যপাঠে নিমগ্ন। সত্যপীরের পুঁথিটিকে ঘষে করে রেখেছে। আরেকখানা আলাদা পুঁথি লিখতে হল হীরারামের অনুরোধে। মুন্সীমশাইর ছোট ছেলে হীরারাম এসে একদিন বলল একদিন—তোমার কাব্যের ভনিতায় আমার নামটাও ঢুকিয়ে দাও।

হাসি পেয়েছিল ভারতের। অমরত্বের লোভ। সবাই খ্যাতি চায়, যশ চায়, অর্থ চায়, তাতেও তৃপ্তি নেই, শেষে অমরত্ব কামনা করে।

ভারতের ঠোঁটে হাসি দেখে বলেছিল হীরারাম—তুমি কি ভাবছ আমি জানি, ভাবছ শুধু বাপের নামে হবে না, ছেলেও নাম চায়, তা যাই ভাব, আমার নামটা তোমায় রাখতে হবে, আমি কি তোমার বন্ধু নই—

কথাটা মিথ্যে নয়। যদিও বয়সে কিছু বড় হীরারাম। তবুও সত্যিই বন্ধুতা হয়েছে। আরবী-ফারসী ছাড়াও ভালো উর্দু-হিন্দী জানে হীরারাম। তার মুখেই ফারসী-কবি আমির খসরুর নাম প্রথম শুনেছে ভারত। আরো শুনেছে ইন্দ্রাণী সাহিত্য-সংস্কৃতির অমূল্য রত্নখনির খবর, আলবেরুনী, ফারদৌসী, ওমর খৈয়ামের পরিচয়।

অনেকবার বলেছে সে—মৌলভি সাহেবের কাছে তো প্রায় দু'বছর পড়লে, ভাষাটা মোটামুটি শিখেছ, হাতের লেখাও সুন্দর হয়েছে, এখন যদি আরো কিছু শিখতে চাও, কাব্য-ইতিহাস-অলঙ্কার শাস্ত্র পাঠ করতে চাও তবে বাবাকে বলো, বাবার কাছে শেখো, জানোতো বাবার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে দিল্লীর বাদশা মুহম্মদ শাহ বাবাকে মুনশী উপাধি দিয়েছেন—কথাটা বন্ধ বলেনি হীরারাম। শুধু চাকরির সুবিধের জন্য যে ভাষা শিখতে শুরু করেছিল, তার মধ্যে যে এত রস, এত রহস্য, এত আনন্দ থাকতে পারে আগে বুঝতে পারেনি ভারত। এখন আর ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু মুন্সী মশাইর কি সময় হবে। নানা কাজ, নানা দায়-দায়িত্বের ভাবনা তাঁর মাথায়। তাই একটু ইতস্তত করে বলেছিল ভারত—উনি কি রাজি হবেন—

—আমি বলে দেব বাবাকে, তোমার কিছু ভাবতে হবে না—নিঃসন্দেহে প্রকৃত বান্ধব হীরারাম। অতএব তার বাসনা পূরণের জন্য আরেকখানি পুঁথি লেখা উচিত। কয়েকদিনের মধ্যে দ্বিতীয় একখানি সত্যনারায়ণের পুঁথি লিখে ফেলল ভারত। ভনিতায় লিখল—

দেবানন্দপুর গ্রাম দেবের আনন্দধাম
হীরারাম রায়ের বাসনা।

সেদিন ভোরে, সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে পুঁথি পত্তর নিয়ে বসবে ভেবেছে, এমন সময় ডাক দিলেন মুন্সী মশাই—বাবাঠাকুর, একটা খবর শুনেছো—

—আজ্ঞে কি খবর?—তাড়াতাড়ি বাইরে এল ভারত।

—নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ মারা গেছেন, এসো বৈঠকখানায় বসবে এসো, আরো কথা আছে—মুন্সী মশাইর পেছন পেছনে এল ভারত।

যেতে যেতে আবার বললেন তিনি—গণ্ডগোল বাঁধবে মনে

হচ্ছে; নবাব তাঁর নাতি সরফরাজকে মসনদ দিয়ে গেছেন, এরকম কথা নাকি শোনা যাচ্ছে, ওদিকে উড়িষ্যার নায়েব-নাজিম শুজাউদ্দৌলা হ'ল সরফরাজের বাপ, সেও নাকি লোক-লস্কর নিয়ে মুর্শিদাবাদের দিকে আসছে, এবার বাপে-ব্যাটায় ভালোরকম লেগে যাবে মনে হচ্ছে—

—এসব রাজনীতির খোঁজ-খবর বেশি রাখে না ভারত, রাখার তেমন ইচ্ছেও নেই। দেশ-গাঁয়ের সাধারণ মানুষ প্রায় সবাই এই রকম। কোথায় কটক, কোথায় পাটনা, কোথায় মুর্শিদাবাদ, সেখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে অত খোঁজে দরকারটা কি।

অনেক জায়গা-জমি, তালুক-মুলুক যাদের আছে, নবাব সরকারে যারা খাজনা জমা দিতে যায়, কিম্বা ব্যবসা-বাণিজ্য যারা করে, শহরে বন্দরে যাদের যেতে হয়, তারাই কিছু খোঁজ-খবর আনে। নাদেল চাষ-আবাদ করো, জমিজমা রাখো, তালুকদার-জমিদারের খাজনা মিটিয়ে দাও, ব্যস, বৈষয়িক কাজ হয়ে গেল। তারপর মাছ ধরো, পাশা খেলো, দলাদলি করো। একটু সামাজিক হলে দোল-দুর্গোৎসবে ধুমধাম ক'রো। একটু ধর্মভীরু থাকা ভাল, সেজন্য নামগান করো, কথকতা শোনো, ভাগবত শোনো—এই তো জীবন। গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের সাদামাটা সহজ জীবন।

তবে জমি-জায়গা যাদের আছে, ব্যবসা-বাণিজ্য যারা করে, বাইরের পাঁচরকম খোঁজ-খবর তাদের রাখতে হয়। মুন্সী দশাইও রাখেন। হুগলীতে ফৌজদারের দরবারে তাঁর মোক্তার আছে। মুর্শিদাবাদে, বর্ধমানে কলকাতায় চেনাশোনা লোক হয়েছে। দেবানন্দপুরে বসে বাইরের খোঁজ খবর তিনিই নিয়মিত পান।

তাঁর পেছন পেছন বৈঠকখানায় এসে বসলো ভারত। তাকিয়া ঠেস দিয়ে একটু কাত হয়ে বসে বললেন মুন্সী দশাই—তোমার পড়াশোনা কেমন হচ্ছে—

—আজ্ঞে ভালই হচ্ছে, মৌলভী সাহেব বেশ যত্ন করে পড়ান—

—হীরারাম সেদিন বলছিল, তোমার নাকি আরো পড়ার ইচ্ছে—তারপর গড়গড়ার নলটি তুলে একটু হেসে বললেন—আমার কাছে নাকি পড়তে চাও, আমি আর কি জানি, আরবী-ফারসী সাহিত্য তো মহাসমুদ্র, এক আলবেরুনীর কথা ভাবলেই অবাক হতে হয়, তারপর ওমর খৈয়াম, এক একটি রুবাই কি ঠাসা ঘুনোট কবিতা, ফারদৌসির 'শাহনামা' —কি বিপুল গ্রন্থ, তারপর আমীর খসরু আছেন, কৈফী আছেন, ইতিহাসের গ্রন্থই বা কত, জিয়াউদ্দীন বরণী আছেন, আবুল ফজল আছেন, বদাউনীর মন্তাখাব-উল-তোয়ারিখ আবদুল হামিদ লাহোরীর পাদশাহনামা, কত নাম করব, কত পড়বে তুমি, এতো দুচার বছরের কাজ নয়—

—আপনি যদি অনুগ্রহ করেন, অনুমতি দেন, আমার দিক থেকে কোন ত্রুটি হবে না, প্রাণপণ পরিশ্রম করবো আমি—

—সে তুমি পারবে, তোমার নিষ্ঠা আছে, মেধা আছে, আমার কাছে বাংলা-সংস্কৃত কাব্য গ্রন্থও কিছু পাবে, অলঙ্কার শাস্ত্রের গ্রন্থও আছে, জ্যোতিষের গ্রন্থ, ভক্তমালের রূপমঞ্জরী, রূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি, বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্য দর্পণ, এসবও পড়তে হবে। মহৎ কিছু সৃষ্টির আগে নিজেকে প্রস্তুত করতে হয়, তেমনভাবে তৈরী হতে হয়—গড়গড়ার নল টানার ফাঁকে ফাঁকে থেমে থেমে বললেন—বেশ ভাই হোক, যতদিন ইচ্ছে তুমি থাকো এখানে, আমি পড়াব তোমাকে। তবে একটা কথা কি জানো—মুখ তুলে সোজাসুজি তাকালেন মুন্সী দশাই—আমার এখানে এসেছো প্রায় দু'বছর, এতদিন বাড়িতে কোন খবর দাওনি, তারাও কোন খবর নেয়নি, তবে তুমি যে এখানে আছো তারাই বা জানবেন কি করে। আমি ভেবেছিলুম রাগ করে গেলে তুমি নিজেই তাদের খবর জানার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠবে, কিন্তু পড়াশোনায় এমন মশগুল হয়ে আছো, বাইরের কোন খবরই জানতে বিশেষ উৎসাহ নেই তোমার। এতো ভাল কথা নয় বাবা, বাপ-মায়ের প্রতি

তোমারও একটা কর্তব্য আছে, তারপর তুমি বিবাহিত, এই দুটি বছর শ্বশুরবাড়ির কোন খোঁজ নিলে না, এটাও ভাল কাজ করনি, বাবাঠাকুর। সে যাই হোক্, আমার তো একটা দায়িত্ব আছে, তুমি না হয় ছেলেমানুষ অভিমান করে আছো, কিন্তু আমি তো আর বেশিদিন চুপ করে থাকতে পারিনা। তাই তোমার বাড়িতে আমি খবর পাঠিয়েছিলুম—চমকে চোখ তুলে তাকাল ভারত। গড়গড়ার নল ঠোঁটে ঠেকিয়ে বলে যাচ্ছেন মুনসী মশাই—তুমি এখানে আরবী-ফারসী শিখবে শুনে তোমার বাবা নাকি খুশি হয়েছেন। একজন লোক পাঠিয়েছেন তুমি কেমন আছো দেখে যাবার জন্য। এই নিধি, সেই লোকটিকে ডেকে আনতো—মুনসী মশাইর কথা শুনতে শুনতে মুখ নিচু করে বসেছিল ভারত। এবার নিধিরাম যাকে নিয়ে এল, তাকে দেখে উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল। বিশু দাদা! উঃ কতদিন পরে বিশুদার সঙ্গে দেখা। কাছে এসে তার হাত ধরল ভারত। বিশুদার শরীর কেমন খারাপ হয়ে গেছে, অতবড় লম্বা মানুষটা একটু যেন কুঁজো হয়ে গেছে। মাথার প্রায় সবটাই সাদা, ঘোলাটে চোখ, ফ্যাকাসে ঠোঁটে এক ফোঁটা মরা হাসি।

—তোমার চেহারা এরকম হল কেন, বিশুদা,—ভারতের আনন্দ আগ্রহ কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল।

—অম্বলের অসুখে বড় কষ্ট পাচ্ছি, কিছুটি খাতি পারিনা, পেটের মধ্যি বড় জ্বালা করে, চোখিও ছানি পড়িছে, রোদ্দুর সহ্যি হয় না, মনের বেসায় কাজ কাম করতি পারি কিন্তু রাত্তির হলি পর বড় কষ্ট তুমি কেমন আছো দাদাভাই—

—আমি তো ভালই আছি, এ বাড়িতে ঘরের ছেলের মত রয়েছি, তা তুমি এত কষ্ট করে এলে কেন?

—তোমারে দেখতি আলাম—বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে বোধহয় কষ্ট হয় বিশুদার।

ধীরে ধীরে দরজার কাছেই মেজেতে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসল।

পরম আগ্রহে তাকিয়ে রইল দাদাঠাকুরের দিকে—তোমার খবর পাইয়ে মা-ঠান কত কান্নাকাটি লাগল, মেজদা-ছোড়দার বিয়ের সময় একটা খবর দিতি পালাম না—

—মেজদা-ছোড়দার বিয়ে হয়ে গেছে! একটু সময় বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে রইল ভারত। তারপর ভাবল, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। সময় চলে যাচ্ছে। কেউ তো তার জন্য অপেক্ষা করবে না। মা-বাবা, বড়দা, মেজদা, ছোড়দা—কেউ না। সময়ের ব্যবধানে ফুরফুটের বাড়ি থেকে সে যেন অনেক দূরে চলে এসেছে। নওয়াপাড়া তাজপুরের জীবনও অনেক পেছনে চলে যাচ্ছে। কোথায় গেল বিষ্ণুপদ, বাসন্তীদি, বিদ্যাধর, আচার্য মশাই, ছোটমাধো—আর কি কোন দিন দেখা হবে।

সময়ের অভিশাপে বিশুদাদাও কেমন বুড়ো হয়ে গেল। তার অমন স্বাস্থ্যসমৃদ্ধি শরীরের বর্তমান বিশালতা কেমন পঙ্গু, শ্রীহীন, বিবর্ণ। সময় যেন এক নিষ্ঠুর শিল্পী। নির্মম নিয়মে সংসারের সবকিছুর চেহারা বদলে দেয়।

মুনসী মশাই জিজ্ঞেস করলেন—ওর সঙ্গে তুমি যাবে নাকি ভারত, মা-বাবাকে দেখে আসবে—

ভারত ঘাড় নাড়ল - না, যাব না।

অকারণ অভিমানে মনটা বিরূপ হয়ে উঠল। মনে হল, সংসারের আত্মীয়স্বজন কেউ তাকে চায় না। মা-বাবা, বড়দা-মেজদা—কেউ না। যাবে না সে। কাদের কাছে যাবে, কিসের জন্য যাবে। মুনসী মশাইকে নিশ্চিত করে জবাব দিল ভারত না এখন যাব না, লেখাপড়া শেষ হলে পর যাব।

লেখাপড়া শেষ হতে এখনো অনেকদিন, অনেক দেরি।

তাড়াদনেই ফিরে গেল বিশ্বনাথ।

(ক্রমশঃ)

ছোট গল্প

বাস্তব-অবাস্তব

বিহারীলাল বড়ুয়া

"যদি ইহজগতে একটি বারের জন্য তার দেখা পাই তবে তাকে বলতে পারতাম আমি ভুল করেছিলাম মুহূর্তের অবিবেচনার জন্য, কিন্তু তার প্রায়শ্চিত্ত করেছি সারা জীবন দিয়ে।"

সুব্রতর জরুরী আহ্বানে তার পরম এবং একমাত্র বন্ধু অখিল এসেছে তার কাছে। শোবার আগে দুই বন্ধুর মধ্যে আলাপ হচ্ছে, সুব্রতর মুখে অখিল এ কথাটি অনেকবার শুনেছে। আজ সুব্রত আবার সমস্ত কাহিনী সবিস্তারে ও পরিষ্কার করে বলতে আরম্ভ করল।

"জানো অখিল কত নারী ত কাছে এসেছে, জীবনের চলার পথে কত নারীর সাথে অন্তরঙ্গতা ঘটেছে কিন্তু প্রথার মত কেউ দিতে পারেনি সেই আশ্চর্য্য এবং অনির্বচনীয় আন্তর-নিবিড়তা। তার সান্নিধ্য শুধু সুখময় ছিল না, কিংবা মোহময় ছিল না, ছিল মহা রহস্যময়—যা ভাষা দিয়ে বোঝানো যায় না, এ শুধু অনুভবেরই জিনিষ।" কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইল সুব্রত। স্মৃতির অতলে যেন সে ডুব দিতে থাকে। বলতে লাগল "কারও কাছ থেকে খবর পেয়ে বাবা আমাকে এম, এ পরীক্ষার কয়েকদিন আগে ডেকে পাঠালেন, তিনি শুনতে পেয়েছিলেন, আমারই কোন সহ-পাঠিনী মেয়ের মায়াজালে জড়িয়ে পড়ে নিজের পড়াশুনার ক্ষতি করতে চলেছি। আমি আগে কিছুই আন্দাজ করতে পারিনি, পরে বাড়ী এসে আমার ছোট বোনের মুখে সব জানতে পারলাম। বাবা তাঁর প্রিয় বন্ধুর সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন, তাঁর মেয়ের সাথে আমার বিয়ে দেবেন, বাবার বন্ধু ছিলেন বড় লোক এবং মেয়েও ছিলো সুন্দরী, বিয়ের পরেই আমাকে বিলেতে পাঠাবেন এই ছিল তাদের মতলব। আমার এম, এ, পরীক্ষা দেওয়া বন্ধ হল এবং বিলেতে যাওয়ার তোড়-জোড় চলতে লাগল। ইতিমধ্যে কোন একটা অছিলায় বাবার কাছ থেকে মাত্র পাঁচ দিনের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এলাম, দেখা করলাম প্রথার সাথে, আর সমস্ত ঘটনাই তাকে বললাম। তুমি মনে করতে পার এতে প্রথা কান্নাকাটি করেছিল, কিংবা রেগে গিয়েছিল। কিন্তু তা মোটেই নয়, সবই সে শান্তভাবে শুনল, তারপর বলল কি জানো?" "তুমি সুখী হও, ঠিকই করেছ তুমি।" "আমি বলেছিলাম তুমিও সুখী হবে একদিন, তোমার মনের মত বর তুমিও খুঁজে পাবে"। শান্ত কণ্ঠে সে উত্তর দিয়েছিল, "তোমাকেই আমি ভালবেসেছি, একমাত্র তোমাকেই ভালবাসব।" "তার পর সে চলে গিয়েছিল, আমি আরও কি বলবার জন্য তাকে ডাকলাম, 'শোন শোন প্রথা,' একটি বারও সে আর ফিরে তাকায় নি।"

পাশের কুঁজা থেকে জল খেয়ে সুব্রত আবার আরম্ভ করল: "তার পরের ঘটনা হল বাবার বন্ধুর মেয়ের সাথে আমার বিয়ে হতে পারে নি। কারণ হঠাৎ একটা কঠিন রোগে মেয়েটি মারা গেল। তার পর একটি বছর নষ্ট করে কলকাতায় ফিরে এলাম এম, এ পড়তে। কিন্তু শত চেষ্টাতেও প্রথার সাথে দেখা করতে পারিনি। আজ ভাবি কেন আমি দ্বিতীয়বার কলকাতায় গিয়েছিলাম প্রথার সাথে দেখা করতে। নিয়তির

এক বিচিত্র খেলা। আমি যদি কলকাতায় না যেতাম প্রমার সাথে দেখা না করতাম, তাহলে আপনা থেকেই সব কিছু মিটে যেত। প্রমা জানতেই পারত না বাবার বন্ধুর মেয়ের সাথে আমার বিয়ের প্রস্তাবের কথা এবং প্রমাকেও চিরতরে হারাতে হত না। কেন এমন হয় বলতে পার অখিল?" প্রশ্ন করে সুব্রত। অনুশোচনায় তার অন্তর ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। গলার আওয়াজে তা টের পাওয়া যায়।

অখিল কি বলবে ভেবে পায় না, শুধু সান্ত্বনার সুরে বলে "কি জানি ভাই ওসব নিয়তি বা ভাগ্যের উপর আমার বিশ্বাস নেই। তবে মনে হয় যা হবার তা হয়ে গিয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা না করে মন থেকে সমস্ত ঘটনাই মুছে ফেওয়া ভাল। What cannot be cured must be endured."

সুব্রত হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে বলে "তুমি বলছ মন থেকে সমস্ত ঘটনাই মুছে ফেলে দিতে। সে চেষ্টা কি করি নি ভেবেছ? কিন্তু প্রমার স্মৃতি যতই মন থেকে মুছে ফেলতে চাই ততই আমি অভিভূত হয়ে পড়ি, এ এক দুর্নিবার অভিজ্ঞতা।"

অখিল জিজ্ঞেস করে "প্রমার ঠিকানা কি তুমি জানতে না। তার পারিবারিক বিষয় নিয়ে কোন দিন কি তোমাদের আলোচনা হয় নি?"

সুব্রত বলে "তেমন কোন আলোচনা আমাদের হয়নি। তবে আমি জানতাম, সে থাকত তার এক আত্মীয়ের বাসায়। সেখানে প্রমা আমাকে কোনদিন নিয়ে যেতে চায় নি, তারা কিছু মনে করবে বলে। আর আমিও বিশেষ উৎসুক হইনি তার কলকাতার অবস্থান সম্বন্ধে। কলকাতায় ফিরে এসে তার খোঁজ নিতে অনেক চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু সব ব্যর্থ হয়েছিল। তারপর এম, এ পাশ করে একটি স্কলারশিপ পেলাম এবং আমেরিকায় চলে এলাম। সেখানকার কাহিনী শোন তবে।" সুব্রত কিছুক্ষণের জন্যে নীরব হয়ে স্মৃতির পাতা উল্টাতে লাগল,—বলতে আরম্ভ করল পুনঃ :—'সেখানকার এক বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি কাজযুক্ত করলাম, ক্রমে ক্রমে অনেক বন্ধু এবং বান্ধবী জুটে গেল। তাদের মধ্যে ডরোথি বলে একটি মেয়েকে আমার ভাল লাগত। ফলে তার সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম, এবং বুঝতে পারলাম ডরোথি আমার কাছ থেকে কি চায়। সে আমাকে তাদের বাড়ীতে নিয়ে যেত, তার বাবা মা আমাকে তাদের ছেলের মতই দেখতেন। আমাদের ব্যবহারে তারা বুঝতে পারতেন ডরোথি আমাকে ভালবাসে। এতে তাদের কোন আপত্তি ছিল না বরং তারা খুশীই ছিলেন। ডরোথির বাবা বেশ পয়সা ওয়ালা ছিলেন এবং ডরোথি তাদের একমাত্র কন্যা। কিন্তু এতৎ সত্বেও আমাদের সম্পর্কের মধ্যে বিরাট একটা ব্যবধান থাকত। ডরোথি যখন নিবিড় করে আমাকে কাছে পেতে চাইত, তখন কখনও আমি হঠাৎ কোন অছিলায় কখনও বা বিনা কারণে দূরে সরে যেতাম। এতে ডরোথি ব্যথা পেত এবং আরও নিবিড় হওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করত। এমনি করে প্রায় দু'বছর চলে গেল। তারপর ডরোথি যখন বুঝতে পারল আমাকে সম্পূর্ণভাবে সে কখনও অধিকার করতে পারবে না তখন একদিন আপনা হতেই সে মিলিয়ে গেল।"

অখিল জিজ্ঞেস করল "তুমি তাকে বিয়ে করলেই ত পারতে?"

সুব্রত বলল "সেখানেই ত ছিল আমার মুস্কিল। যখনি কোন নারীর কাছে নিজেকে নিঃশেষে বিলীন করে দিতে গেছি এক দুর্নিবার বেদনায় আমার মন প্রাণ হাহাকার করে উঠত। কী ডরোথি যখন স্বপ্নালু বিলোল দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইত তখন আমার অন্তরের নিভৃতে অনুভব করতাম প্রমার আত্মিক বা সূক্ষ্ম আবির্ভাব। প্রমা যেন বলত 'ছিঃ ছিঃ করছ কি? আমাকে না তুমি ভালবাসতে?' তুমি বুঝতে পারবে না অখিল সে কী যন্ত্রণা। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে গেলে আমার আগেকার

সে সব আত্মহারা মুহূর্তগুলির জন্য কী যে গ্লানি অনুভব করতাম, সে সব দুঃখময় দুঃসময়ের দিনগুলি হয়ে উঠত আমার কাছে অন্ধকার। রাত্রিগুলি হয়ে উঠত শ্মশানের আগুনে জ্বালাময়। সারাদিন কাজে ব্যস্ত থেকে আমার দুঃখকে ভুলে থাকবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু রাত আসলে প্রমার সহস্র স্মৃতি এসে আমাকে পাগল করে তুলত। বাক্স থেকে প্রমার ছবি বের করে দেখতাম, বিছানায় ছট ফট করে মনে মনে বলতাম, 'প্রমা, প্রমা, ফিরে এসো,—আমাকে বাঁচাও!' আর চোখ বুজলেই দেখতে পেতাম প্রমা কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, কৌতুক ভরে হাসছে। তার এই অশরীরি আকর্ষণ কত যে দুর্বার তোমার ধারণাতেই আসবে না অখিল। কেন এমন হয় বলতে পার? কত নারীর সান্নিধ্যে আসতে হয়েছে, কিন্তু বার বার সেই একই অভিজ্ঞতা, বার বার অসহ গ্লানিময় বেদনার আবির্ভাব। গিয়েছি ইউরোপে এবং সেখানেও আমাকে কাজ করতে হয়েছে। অনেক বড় বড় শিক্ষা-পারদর্শীদের সাথে মিশতে হয়েছে তাঁদের অনেকের পরিবারের মধ্যে পেয়েছি আদর ও যত্ন। যৌবনের দিনগুলি কেটেছে কালচারড্ নরনারীদের সাহচর্য্যে, কিন্তু আমার অন্তর ও বহির্জীবনের শূন্যতা কেউ পূর্ণ করতে পারে নি। এর একমাত্র কারণ হল প্রমা। আমার সমস্ত অন্তর চেতনা কী এক দুর্জ্ঞেয় বন্ধনে বেঁধে রেখেছে সে। তার অবিচ্ছিন্ন উপস্থিতি আমার সমস্ত অন্তরলোককে আবৃত করে আছে। ভারতবর্ষে ফিরে এসেও আমার সে অবস্থার পরিবর্তন হয় নি। প্রমার নিত্য আবির্ভাব এতটুকু ম্লান হয় নি এতদিনেও। এক মুহূর্তের জন্যও ভাবতে পারি না সে নেই। ভাবতে গেলেই মনে হয় আমার সকল অস্তিত্বই নিঃশেষে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেছে।" থামল সুব্রত। অখিল ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখে, তখন রাত্রি বারোটা হতে চলেছে। "তোমার কাহিনী শুনতে শুনতে অনেক রাত হয়ে গেছে, চল এবার ঘুমিয়ে পড়ি। ডাক্তার আগেই খেয়ে নিয়েছিলাম। নয়ত, তোমার গল্প আহার করেই রাত কাটিয়ে দিতে হত।"

সুব্রত হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পায়, বলল "সত্যই, বন্ধু, তোমার উপর অত্যাচার হয়ে গেছে কতদূর থেকে এসেছ। তোমাকে বিশ্রাম দেওয়াই উচিত ছিল। তোমাকে ডেকেছি কেন জানো? আজ কয় রাত্রি স্বপ্নে দেখেছি প্রমাকে—সে বলেছে তোমাকে কয়েকদিনের জন্য আমার কাছে নিয়ে আসতে। তাই ত তোমাকে জরুরী টেলিগ্রামে ডেকে পাঠিয়েছি। তোমার মত বন্ধু আমার কেউ নেই। তোমাকে অন্তরের কথা বলে আমি কত যে ভার মুক্ত হই এবং শান্তি লাভ করি, তুমি হয়ত জানো না। আমি যেন শুনতে পাচ্ছি প্রমা আমায় ডাকছে। আর মন বলছে তাকে এবার ফিরে পাব আর বেশী দিন নেই।

অখিল প্রশ্ন করে "কিন্তু এ সব ত তোমার স্বপ্ন জগতেরই কাহিনী, তুমি ত জানোনা না সে এখনও বেঁচে আছে কি নেই।"

সুব্রত বলে "আমার কাছে দুইই সমান হয়ে গেছে, অন্তর ও বাহির, বাস্তব ও অবাস্তব বলে আমার কাছে আর কিছু নেই। সে সশরীরে কাছে থাকলে যেমন ভাবে তাকে পেতাম, এখনও তাকে সেভাবেই পাচ্ছি। তুমি বিশ্বাস কর অখিল যদি তাকে আজ সশরীরে ফিরে পাই, তা হলেও এই ফিরে পাওয়াটা নূতন বলে মনে হবে না।"

তারপরের দিন, সুব্রত হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। অখিল ডাক্তার ডেকে আনল, ডাক্তারও এখন কঠিন কিছু দেখতে পেলেন না। শুধু বলে গেলেন সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে।

রাত্রি তখন নয়টা। অখিল সুব্রতর বিছানার পাশে একখানি ইজি চেয়ারে বসে আছে, সুব্রতর চোখ দুটি বন্ধ। হঠাৎ এক সময় অখিল শুনতে পেল সুব্রত বিড় বিড় করে বলছে "ও প্রমা শোন শোন,"—ইলেকট্রিক আলোটা এ সময় মিট মিট করে নিভে গেল। অন্ধকারে অখিল দেখতে পেল শুভ্র বসনা একজন নারী সুব্রতর পাশে এসে বসেছে। কয়েকটি সেকেণ্ড মাত্র, তারপর আলো জ্বলে উঠল। অখিল দেখল সুব্রত গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। কাছে এসে যখন অখিল সুব্রতর কপালে হাত রাখল তখন সব শেষ হয়ে গেছে। সুব্রতর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চিরতরে থেমে গেছে।*

* গল্পটি শেষ করতে পারলাম না বাস্তবের সঙ্গে অবাস্তবের সংঘাতে। এত আমরা দুঃখিত। —লেখক

UPPER GANGES SUGAR MILLS Ltd.
THE OUDH SUGAR MILLS Ltd.
NEW INDIA SUGAR MILLS Ltd.
THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS Ltd.
BHARAT SUGAR MILLS Ltd.
GOBIND SUGAR MILLS Ltd.

PURE CRYSTAL CANE SUGAR

Managing Agents :

BIRLA BOMBAY PRIVATE LTD.
(FORMERLY THE COTTON AGENT PRIVATE LTD.)
INDUSTRY HOUSE,
159, Churchgate Reclamation,
BOMBAY — 1

জল মাটি মন

ম হী তো ষ বি শ্বা স

৮

ভাদ্দরের প্রায় দিন পনেরো পার করে বাড়ী ফিরল বলরাম। বুড়ী পিসী ওকে দেখেই ছুটে এলো। হুমড়ি খেতে খেতে জড়িয়ে ধরল বলরামকে—"আ বাবা বলা—তুই ক'নে গিলি আমারে কালায়ে। আমি যে তোর জন্যি কান্দে মরতিচি—"

বিরক্ত হ'ল বলরাম। কোথায় বাড়ীর হাল অবস্থাটা একটু আড়ালে শুনে নেবে বলরাম, তা না, বুড়ী এসেই কান্না জুড়ে দিল। ধমকে উঠল বলরাম—"চুপ করনা বুড়ী। ভেউ ভেউ করিস্‌নে। আমি কি মরিছি নাকি যে মড়াকান্না জুড়ে দিলি?"

কিন্তু বুড়ী পিসীর কান্না তাতে থামল না। গলা চড়িয়ে আরো জোরে কাঁদতে লাগল। বলরামের মৃত মাকে উদ্দেশ করে ইনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল—ও ভাগ্যবানি বউরে, তোর ছেলের কথাডা একবার শুনে যা। আমি সগোলের দুই চোখির বিষ হইছি রে। আর কতো নাথি ঝাঁটা খাবো আমি মানুষির দুয়োরে দুয়োরে—"

ঘরের ভিতরে ছিল সনাতন। কান্না শুনে বাইরে এলো। সনাতনকে দেখেই চুপ করে গেল বুড়ী। বাপের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে মাথা নীচু করল বলরাম। বাপ-ছেলের মধ্যে একটা ঝগড়া হবার আশঙ্কা আছে। মনে মনে নিজেকে শক্ত করল বলরাম। কিন্তু সনাতন ঝগড়া-ঝাটির ধার দিয়ে গেলনা। শান্ত গলায় বলল—"বাড়ীর কথাডা তাহি মনে পড়ল এ্যাদ্দিন বাদে। তা যাওয়া হইলো ক'নে শুনি?"

শত্রুর উত্তরে শক্ত হওয়া যায়। যে নরম হ'য়ে কথা বলে, তাকে তুমি গরম কথা শোনাবে কিভাবে! বলরামের মনটা সিঁটিয়ে ছিল রাগে। কিন্তু বাপের ঠাণ্ডা কথায় রাগটা যেন অনেক খানি ঢিলে হ'য়ে এলো। বাপের মুখের দিকে না তাকিয়েই জবাব দিল বলরাম—"যাবো আর ক'নে? অনেক দিন মামাগের বাড়ী যাই না। তাই ভাবলাম, কয়ডা দিন এট্টু ঘ্যাড়ায়ে আসি গো।"

তেমনি শান্ত গলাতেই আবার কথা বললো সনাতন—

"যা খুশী তোমাগের করো। কাজকামের চাপাচাপি। আর এইডা হলো কিনা তোমার শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার সোমায়। আমার আর কি! কয়ডা দিনই বা আর আছি। তোমাগের সংসার। ভালো হলি তোমাগেরই হবে। আর মন্দ হ'লিও তোমাগেরই হবে।"

অবাক হ'ল বলরাম। বাপ তো তাকে এমনধারা কথা বলেনা কোনোদিন। বাপের কথা মানেই তো তুই তোকারি, গালাগালি। বলরামেরও অভ্যেস হয়ে গেছে এসব। কিন্তু বাপের কথাগুলো আজ যেন কেমন ধরণের। চন্‌চন্‌ ক'রে উঠল বলরামের বুকখানার মধ্যে। আজকাল সংসার নিয়ে বাপের প্রায়ই একটা মন কষাকষি চলে। মাঝে মাঝে

ঝগড়াঝাটিও হয় দুজনের মধ্যে। অমন যে দাপরাগের মানুষ সনাতন কিন্তু দ্বিতীয়পক্ষের বউয়ের মুখের সামনে একেবারে কেঁচো হয়ে থাকে। যেমন দুখু, তেমনি স্বভাব মেয়েমানুষটার। হাজার ক'রেও মন পাওয়া ভার।

বাপের মুখের দিকে তাকাল বলরাম। খুঁটিটায় হেলান দিয়ে বসে আছে সনাতন। একসঙ্গে এতোগুলো কথা বলে হাঁফাচ্ছে। বুড়োবয়সে হাঁফানীতে ধরেছে। নিঃশ্বাসের টানে গলার শিরাগুলো ফুলে উঠছে। বুকটা হাপরের মতোন ওঠানামা করছে। কির কির করছে বুকের হাড় ক'খানা। চোখদুটো কেমন স্তিমিত। তালশাঁসের মতোন ভিজে। অবসন্ন।

বলরামের কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেল হঠাৎ। বাপের বিরুদ্ধে একটা তুচ্ছ অভিমান সে অনেকদিনই পুষে রেখেছে মনের মধ্যে। যার আক্রোশে বাপের সঙ্গে সে ভালোভাবে কথা বলতে পারে না। এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। নিজের যন্ত্রণার আগুনে পুড়ে মরে। আর সকলকে তার শত্রু মনে হয়। বাপকেও এতোদিন তার তাই-ই মনে হয়েছে। কিন্তু আজকে বাপের এই অসহায় চেহারার দিকে তাকিয়ে সব রাগ—অভিমান যেন জল হয়ে গেল বলরামের। কি মানুষটা কি হয়ে গেছে! কার উপর রাগ করে থাকবে বলরাম! অসহায় ক্লান্ত বুড়ো মানুষটা যেন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মিনতি জানাচ্ছে। ক্ষমা চাচ্ছে। জীবনযুদ্ধে হেরে গিয়ে ক্ষত-বিক্ষত মুখখানা লুকিয়ে হাঁফাচ্ছে। আর একখানা শক্ত বাহুর আশ্রয়ের জন্য চারিদিকে অন্ধের মতোন হাতড়াচ্ছে। কাতরাচ্ছে। এইতো সংসারের নিয়ম। মুনিপুরুষেরা বলে—পদ্মপত্রে নীর। এই আছে, এই নেই। শরীরের ভেঙে তুমি কালকেউটের মতন ফোঁস দিয়ে কণা মেলে দাঁড়ালে। শক্তির উত্তাপে তুমি তেঁতুল কাঠের আগুনের মতন গন্‌গন্ করে উঠলে। কিন্তু সে কদিন। ভেতরে ভেতরে যে তুমি ক্ষয় হ'য়ে যাচ্ছো। তোমার প্রাণপুরুষকে নিয়ে যে একমহাকালের দেবী দিনরাত খেলা ক'রে চলেছে। তোমাকে সংসারের নানান খেলায় খেলিয়ে হাসিয়ে কাঁদিয়ে তোমার শক্তি ক্ষয় করছে। তা তো তুমি জানোনা। যেদিন জানবে, সেদিন হাড়গোড় ভেঙে একেবারে হুড়মুড় ক'রে পড়িয়ে পড়বে। উঠবার শক্তি আর থাকবে না। ডাকসাইটে লেঠেল সনাতনও জানতে পারেনি, তার শরীরের গাঙে কখন থেকে ভাঁটার টান শুরু হয়েছে। ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে যাচ্ছিল। ভাঙন শুরু হয়েছে এইবারে।

বাপকে উদ্দেশ ক'রে ঝুলে বলরাম—"তোমার শরীলডা য্যানো ক্যামোন খারাপ ঠেকতিচে বাবা।

সনাতন উত্তর দেয়—"হয় শরীলডা বড়ো বিদ্যুৎ নাগ্‌চিতে কয়দিন। হাঁপানীডাও বাড়িচে।"

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ঝুলে বলরাম—"তুমি ঘরে যাইয়ে শোওগে। কালকম্মের জন্তি তোমার ভাবতি হবে না। আমি তো বাড়ী আইছি। একভাবে চালায়ে নেবো।"

আউশ ধান আগেই কাটা হয়ে গিয়েছিল। বাকী ছিল সামান্য কিছু পাট কাটতে। সনাতন নিজে পারে না, তাই লোক দিয়ে পাটগুলো কাটিয়ে 'জাগ' দিয়ে রেখেছিল। খুব খাটল কদিন বলরাম। সেই 'জাগ' দেওয়া পচা পাট তুলল। সারাদিন ব'সে বসে পাটগুলো বাছলো। ধুলো। শুকিয়ে 'গাঁইট' বেঁধে ঘরে তুলল। কদিনের মধ্যেই ভাদুরে কাজ যা ছিল শেষ হয়ে গেল। এখন কিছুদিনের মতন বিশ্রাম। আর বিশ্রাম মানেই তো বলরামের জ্বালা। কাজকাম নিয়ে থাকা যায়, মনটা খানিকটে ভুলে থাকে। ডুবে থাকে। কাজকাম হাতে না থাকলে মনটা উদাস হ'য়ে পড়ে। পাঁজুইরে পোকার মতন সেই যন্ত্রণা সারা মনটাকে কুরে কুরে খাবলে খাবলে খায়।

এবারে জলটা যেন একটু তাড়াতাড়ি এসে পড়ল।

ভাদ্দরের শেষাশেষি। এর মধ্যেই চারিদিক জলে ডুবে গেছে। মাঠ-ঘাট-ভাগাড় কোথাও একফোঁটা জায়গা শুকনো নেই। বসতবাড়ীর ভিটেগুলো বেশ খানিকটে উঁচু। জলের হাত এড়ানোর জন্যেই মাটি ফেলে ফেলে ভিটেগুলোকে উঁচু করে তোলা হয়। তাই চারিদিক ডুবে গেলেও বাড়ীগুলো শুধু দ্বীপের মতন ভাসতে থাকে। আর ভাসতে থাকে মাঠঘাট পথের উপর দাঁড়িয়ে থাকা বড়ো বড়ো গাছগুলো এক কোমর জল নিয়ে। আর সব জায়গা ভাদালু-জলে সমতল। একেবারে জলময়। ভাদ্দর আশ্বিন আর কাত্তিকের মাঝামাঝি—এই কটা মাস এইরকমই থাকবে। নৌকা ডোঙা ছাড়া চলাচলের আর কোনো পথ থাকে না। কম-বেশী সব বাড়ীতেই নৌকা আছে। অন্ততঃ একটা-দুটো করে তালগাছের ডোঙা। শুকনোর সময় ওগুলোকে বড়ো বড়ো ডোবার জলে ডুবিয়ে রাখা হয়। শ্রাবণভাদ্দরের শুরুতে জল একটু বাড়তেই তোলা হয়। আর এই তিন-চারটে মাস নৌকা-ডোঙা ছাড়া একেবারেই সব অচল।

দুপুরটা হেলে পড়তেই একখানা বৈঠা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল বলরাম। আগে ওদের নৌকা ছিল না। ডোঙাতেই কাজকর্ম চলত। গত সন একখানা নৌকা গড়ানো হয়েছে। বলরাম গিয়ে নৌকার 'চরাটে'র উপর বসল। 'চরাট' হল নৌকার একেবারে পিছনে কাঠের তিনকোনা আসন—যার উপর বসে নৌকা বাইতে হয়।

কোন্‌দিকে যাবে বলরাম, কিছু ঠিক করা নেই। আস্তে আস্তে এলোমেলোভাবে বেয়ে চলল। খানিকদূর যেতেই দেখল, একটা সাপ জলকেটে এগিয়ে চলেছে। ডাঙার সন্ধানে। আশ্রয়ের জন্য। চোড়া, বোড়া, শানি, লাউডগা, কালকেউটে, গোখরো—যা কিছু হতে পারে। হোকগে, ওদিকে এখন তুমি নজর দিওনা। ও তোমার শত্রুর হতে পারে, কিন্তু এই জলময় বসুমতীতে এখন ও আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে। নিজে মৃত্যুর জীবন্ত দূত হয়েও ও-নিজেই এখন মৃত্যুর ভয়ে অস্থির। তুমি নিজে বিপদে প'ড়ে প্রাণ বাঁচাতে চাও। পায়ের তলায় মাটির আশ্রয় চাও। ও নিজেও এখন সেই আশ্রয় খুঁজছে। প্রাণে বাঁচতে চাচ্ছে। ওকে তুমি পথ ছেড়ে দাও। ও তোমার শত্রুতা করবে না।

নৌকাটাকে একটু ঘুরিয়ে পাশ কাটিয়ে বলরাম এগিয়ে চলল। এখান দিয়ে সবই ছিল পাট আর আউশ ধানের ক্ষেত। সেগুলো কেটে নেওয়া হয়েছে। এখন শুধু থৈ থৈ করা জল। মাঝে মাঝে একটা দুটো সবুজ রঙের লম্বা সরু কাঠির মতন চেঁচো গাছ মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাতাসের দোলায় অল্প অল্প দুলছে। লালচে রং-য়ের চেরা ফড়িংগুলো তার মাথার উপর উড়ে উড়ে পড়ছে। খেলা করছে।

আস্তে আস্তে বলরামের নৌকা এগিয়ে চলল। এ জায়গাগুলো বেশ নীচু। জলও তাই থাকে অনেক বেশী। কাচের মতন ঝকঝকে তলতলে জল। একটু ভালো ক'রে নজর করলেই দেখা যায় অনেক নীচে মাটির গা ঘেঁষে নানান জাতের শ্যাওলা জন্মেছে। জলের মধ্যে রোঁয়া আর পাতা-গুলো ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বড়ো সুন্দর দেখায়। ডিঙ্‌পুটি, চাঁদা, চুঁচড়ো—এমনি নানান রকমের কুচো মাছ ঝাঁক বেঁধে বেঁধে শ্যাওলার মধ্যে খেলা করে বেড়ায়। জলের সংসারে এখন ওরা সাবালক। কোথাও কোনো বাধা নেই। যেমন খুশী চ'রে বেড়াও। জলময় জগতে ওরা হাসে, ভাসে। জলো শ্যাওলার বুকে মুখ মিলিয়ে লুকোচুরি খেলে।

আর একটু এগিয়েই বলরাম বৈঠাখানা তুলে রাখল নৌকার উপরে। আপন ইচ্ছায় ভাসুক এবার নৌকা। ওরা যুবতীর দেহের মতন টলটলে, স্থির, অটুট জল। বাতাসের দোলায় সোহাগের কাঁপুনির মতন মাঝে মাঝে একটু আধটু শিরশির ক'রে উঠছে। স্রোত নেই। ভেসে যাবার ভয় নেই নৌকার। বৈঠা তুলে পলুইয়ের উপর মাথা রেখে

চরাটের উপর শরীর এলিয়ে দিল বলরাম। ঝিম্ ধরে পড়ে থাকতে ইচ্ছে করছে। জলের থেকে সুন্দর একটা ঝিরঝিরে হাওয়া উঠছে। ডুবু-ডুবু সূর্যের ডালিম-রঙা রোদ ছড়িয়ে পড়েছে জলের উপর। মাথার উপরে প্রকাণ্ড একটা কড়াইয়ের মতন উপুড় করা আকাশ। একটুও মেঘ নেই। কি শান্ত, শুভ্র চারিদিকটা। আর একটু বিলের গভীরে এগিয়ে গিয়েই আমন ধানের ক্ষেত। চলে গেছে যতদূর দৃষ্টি যায়। জল বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে ধানগাছের শরীরগুলোও বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে এখন প্রায় আট দশ হাত লম্বা হয়েছে। জল বাড়লে ওরাও আরো বাড়বে। বিলের মধ্যে এখানে ওখানে দু' চারজন মানুষ ঘোরাঘুরি করছে। কেউ নৌকায়। কেউবা ডোঙায়। নতুন জল। মাছের বড়ো আমদানী এ সময়। 'চার' ফেলে সোতানী দিয়ে বড়শীতে মাছ ধরছে সবাই। কেউ বা ঘুরে ঘুরে শাপলা তুলছে; খানিক দূরে একটা পানকৌড়ি ঝুঁপ্ করে ডুবছে। আবার ভেসে উঠছে।

শুয়ে শুয়ে বলরাম তাকাল দূরের দিকে। বিলের একেবারে ও-প্রান্তে পাশাপাশি দুটো গ্রাম। বেনাখালি আর কদমকাপুর। গাছপালার জড়িয়ে দীর্ঘ দুটো ঘোটা রেখার মতন পড়ে আছে। বেনাখালিতে নীলমণি মোড়লের বাড়ী। ঐখানে বিয়ে হয়েছে পদ্মর। ভালো করেই চেনে বলরাম বাড়ীটা।

মাথার মধ্যে সব কথাগুলো আবার জট পাকাচ্ছে। শিরা—উপশিরা মেলে ভাবনার জাল ওর স্নায়ুগুলোকে জড়িয়ে ধরছে। সেদিন পালিয়ে গিয়েছিল বলরাম পদ্মর নিকট থেকে। কিন্তু সেই থেকে ওর কি যে হয়েছে! পদ্মর কাছ থেকে পালাতে পেরেছে, কিন্তু নিজের কাছ থেকে কিছুতেই যে পালাতে পারছে না। লজ্জায়, সঙ্কোচে, প্রতি মুহূর্তে যেন কুঁকড়ে যাচ্ছে বলরাম। এ-লজ্জা,—পৌরুষের বড়ো নিদারুণ লজ্জা। তুমি পুরুষমানুষ। তুমি হচ্ছ শাল-কাঠের শক্ত গুঁড়ির মতন। ঝড়ে ভাঙবে না। বাতাসে বেঁকবে না। আপদে-বিপদে, ভয়ে-ভাবনায় অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। পদ্মবিনী লতার মতন মেয়েমানুষ তোমাকে জড়িয়ে জড়িয়ে লতিয়ে লতিয়ে বেড়ে উঠবে। তার লালসা-বাসনা, স্বপ্নকামনা তোমাকে ঘিরে বড়ো হবে। পূর্ণ হবে। মেয়ে-জীবনের সব সার্থকতার স্বাদ সে তোমার মধ্যে খুঁজে পাবে। তবেই না তুমি পুরুষমানুষ। আর অন্ধকারের মধ্যে মেয়ে-মানুষের পিছল বুকের স্পর্শ লাগবার উত্তেজনায় যদি তোমার বুকের মধ্যে বুকপুকানি ওঠে, তুমি ভয়ে ছুটে পালাও—তাহলে তুমি কিসের পুরুষ।

বলরামেরও যে সেই লজ্জা। সেই একই লজ্জার আগুনে এবার দগ্ধাচ্ছে বলরাম। পদ্ম তাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চেয়েছিল। তার মেয়েজীবনের একক পুরুষ বলরামের মধ্যে সব আপদ-বিপদে সাহস খুঁজেছিল। নিজেই সে এসেছিল তার কাছে। মেয়েমানুষ,—বুক কাটে তবু মুখ ফোটে না। আর যেখানে ফোটে, সেখানে বুঝতে হবে অনেক জ্বালা। অনেক টান। সে জ্বালার তীব্র টানে মেয়েমানুষ আর নিজেকে সামলে রাখতে পারে না। বুকের বাধা মুখ ফুটে বেরিয়ে আসে। বিভোল পুরুষকে সে নিজেই জাগিয়ে তোলে। হাত পেতে তার কাছে আশ্রয় চায়। বুকে ঠাঁই মাগে। পদ্মরও বুক ফেটেছিল। মুখও ফুটেছিল সঙ্গে সঙ্গে। আর বলরাম তো তার যে সে পুরুষ নয়! ছোটো-বেলা থেকে দু'জনের চোখে দুজনে বড়ো হয়েছে। দুজনে দু'জনকে চিনেছে। ভালবেসেছে। শালকাঠ তো শালকাঠ। তার চেয়েও শক্ত, জোরদার পুরুষ বলরাম। তার কাছে মুখ ফুটতে লজ্জা কি পদ্মর! কিন্তু বলরাম এ কি করে বসল! পদ্মর সব বিশ্বাস ভালবাসাকে ডুবিয়ে দিল ভাদরের বেপো জলে। কোন মুখে আর বলরাম গিয়ে দাঁড়াবে পদ্মর সামনে!

সেদিনের ব্যাপারটা আজো ঠিক বুঝে উঠতে পারে না

বলরাম। সব কিছুই কেমন ঘোরালো আর রহস্যময় বলে মনে হয়। কাঠুখালির বিলটা যেন ওকে আচ্ছন্ন, সম্মোহিত করে ফেলেছিল। নিজের আলাদা সত্তা বলে আর কিছু ছিল না। পদ্মকে আসতে দেখে তাই ওর মনটা সেদিন অমন ক'রে কেঁপে উঠেছিল। কি একটা অজানা ভয়ে শুধু ছুটে পালানোর কথাই মনে হয়েছিল। পুকুর পাড়ে তালগাছের তলায় দাঁড়িয়ে পদ্ম আর্তনাদ করে ডেকেছিল। কিন্তু সে ডাকের একটুও যেন কানে যায়নি সেদিন—বলরামের। শুধু ছুটে পালিয়েছিল। ছুটতে ছুটতে অনেক রাত্রে গিয়ে পৌঁচেছিল মামার বাড়ী। কিন্তু সেখানেও শান্তিতে টিকোতে পারেনি। অনুশোচনায় আত্ম-গ্লানিতে দিন রাত্তিরগুলোকে বিষ বলে মনে হত। হাতের ঢিল, মুখের কথা আর কর্মফল,—একবার বেরিয়ে গেলে আর তাকে ফেরানো যায় না—বুঝে উঠতে পারে না বলরাম, কেন তার এমন হল সেদিন। সেই একই আকাশ-বাতাস, গ্রাম-গাঁও, কাঠুখালির বিল, দিগন্তর জোড়া ধানক্ষেত—সবই তো এখনো রয়েছে তার সামনে। কিছুই বদলায়নি। যেমনটি ছিল, ঠিক তেমনটিই রয়েছে। কিন্তু কই, আজকে তো ওরা তেমন ক'রে পারছে না, বলরামের মনকে পাগল করে দিতে। পদ্মর কথাই কেন বারবার মনে আসছে? পদ্মর বিয়ে হয়ে গেছে। পদ্ম শ্বশুরবাড়ী চলে গেছে। সে আর তার কেউ নয়। কিন্তু শুধু পদ্মর কথা তো বলরাম ভুলতে পারছে না। পদ্মকে হারিয়ে ওর মনের মধ্যে যে আনুপাতিক যন্ত্রণা, কোনো কিছু দিয়েও তো বলরাম তাকে জুড়োতে পারছে না। এতোবড়ো জগৎ সংসার, জলে টলোমলো মা-বসুমতীর পুণ্যের শরীর—সব কিছু ছাপিয়ে বারবার মনের মধ্যে ভেসে উঠছে চোখের জলে ভেজা পদ্মর মুখখানা। কতো করুণ, কতো হতাশ সে মুখ! পদ্ম এখন পরস্ত্রী। মুনিঋষিরা বলে,—পরস্ত্রীকে মাতৃজ্ঞানে দেখবে। কিন্তু মাতৃজ্ঞান তো বলরামের আসছে না। জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে বলরাম যাকে তার ঘরের মেয়েমানুষ ব'লে ভাবতে শিখেছে, তার জন্যে আজ বলরাম মাতৃজ্ঞান আনবে কি করে। সে যদি তার অপরাধ হয় তো হোক। উপর-ওয়ালা ভগবানের হাতে সে অপরাধের শাস্তি নেবে বলরাম। দোষ স্বীকার করবে। হাত জোড় ক'রে ক্ষমা চাইবে। কিন্তু পদ্মর কাছে বলরাম আর মুখ দেখাবে কি করে? বলরামকে কি আর কোনোদিন ক্ষমা করবে পদ্ম? বলরাম বিশ্বাস-ঘাতক! বলরাম কাপুরুষ!

পরের খাওয়ার জন্য আরশি ধান কাটতে গিয়েছিল সুখলাল। ছোট ডোঙাটা ধানে ভরে টুপ্‌টাপ্‌ ক'রে লগি বেয়ে বাড়ী ফিরছিল। হঠাৎ চোখে পড়লো একখানা নৌকা ভাসছে। নৌকায় লোক নেই। এ-রকম হয় মাঝে মাঝে। ঘাটে নিয়ে নৌকা রাখল। ভুলো মন। বেঁধে রাখল না। জলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে ঘাট ছেড়ে নৌকা তখন চলে যায় অনেক দূরে। পরে অবশ্য আবার খুঁজে আনতে হয়। সুখলালও ভাবল, তেমনি কারো ভেসে-যাওয়া নৌকা হয়ত। ডোঙা বেয়ে নৌকাখানার দিকে এগোলো। কাছে যেতেই ভুল ভাঙল। পলুইয়ে মাথা রেখে চরাটের উপর কে যেন শুয়ে। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। দূর থেকে সুখলাল ঠিক ঠাহর করতে পারল না। গলাটা চড়িয়ে হাক দিল—"কেডা, শুয়ে কেডা নৌকোয়?"

বলরাম প্রথমটায় শুনতে পায়নি। ভাবনায় ডুবে ছিল। সুখলালের ডাকাডাকিতে চোখ কচ্‌লে উঠে বসল। সুখলালকে ডোঙা বেয়ে আসতে দেখে বলল—"কি হইছে সুখলালকাকা? আমি বলরাম।"

"ওঃ, বলরাম। আমি বুঝিতে ঠিক বুঝতি পারিনি। তা এর'ম ভাবে শুয়ে আছো কানো এালো এ্যালা? দেহি না আজ কয়দিন। শোনলাম বাসার বাড়ী দিঁলে। কামোন আচে ওরা সগোলে?"

—বলতে বলতে সুখলাল ডোঙাটাকে নৌকার গা ঘেঁষে এনে দাঁড় করাল।

"হয়, বাবার বাড়ী গিলাম। ভালো আছে সগোলে।" —বলল বলরাম। বলেই চুপ করল। বলবার মতন আর কোনো কথা যেন খুঁজে পাচ্ছে না।

তাকিয়ে আছে সুখলাল। সুখলালের চোখ দুটোর মধ্যে কি যেন আছে। কেমন ভাবে যেন তাকিয়ে থাকে। ছেলে দুটো মারা যাবার পর থেকে সুখলাল সত্যিই যেন কেমন হয়ে গেছে। পাড়ার কোনান ছেলেগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে হা ক'রে। দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। বলরামের সঙ্গে কথা বলতে গেলে ওর এই ভাবটা যেন আরো বেশী হয়। মনে হয়, সুখলালের চোখ দুটো যেন বলরামের অন্তরটার একেবারে তল পর্যন্ত দেখতে পায়। বলরামের মনের সব ভাঙাচোরা, দোপাকাঁপা যেন ওর নজর এড়ায় না। বলরামকে যেন বলে—বলরাম, তুমি আমার কাছে কিছু লুকিও না। আমি জানি। আমি সব জানি বলরাম। আমারও যে দুটো ছেলে ছিল। ওরা নেই। থাকলে যে আজ তোমারই মতন হত। ওদের সুখদুঃখের খবর আমাকেই রাখতে হ'ত। ওদের কোনো কিছু আমি জানতে পারিনি। কিন্তু তোমার সুখদুঃখের খবর আমি জানি বলরাম।

বলরামকে আর কোনো কথা বলতে না দেখে সুখলাল বলল—"তো বাড়ী যাও। এরঁম ভাবে এ্যালা এ্যালা ব'সে থাইকে না। রাত হয়ে আসছিচে।"

ডোঙাটা বাইতে বাইতে চলে গেল সুখলাল।

একটু বাদে বলরামও বৈঠাখানা তুলে নিল। আস্তে আস্তে বাইতে শুরু করল। রাত হয়ে এসেছে। আর দুদিন বাদেই পূর্ণিমা। ভরা জোৎস্নার ঝলমলে আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। ছোটো ছোটো ঢেউগুলোর উপর চাঁদের আলো প'ড়ে চিক্‌মিক্ ঝিক্‌মিক্ করছে। বাড়ীর কাছাকাছি যেতেই গানের সুর কানে এ লা। সন্ধ্যে হ'লে নৌকার নৌকার পাড়ার ছেলেবুড়ো সকলে বেরিয়ে পড়ে। জলের উপর ভেসে ভেসে দল বেঁধে হাওয়া খেয়ে বেড়ায়। সঙ্গে থাকে দোতারা। বাজায় আর গান গায়।

বলরাম আস্তে আস্তে নৌকাখানা নিয়ে ওদের পাশে দাঁড় করাল। হারাধন, কেষ্ট, অনন্ত, বংশী, নিতাই, ভোলা —সকলেই এসেছে। দোতারা বাজিয়ে গান ধরেছে বংশী। কবিয়াল বিজয় সরকারের ভাটিয়ালী গান। পল্লীবালা কবির উদ্বেল বেদনা মাখা গানটার মধ্যে হারিয়ে যায়। আর সত্যিও বটে বংশীর। সুরে যেন ওর যাদু আছে। চাঁদের আলোর সঙ্গে সে-সুর মিশে যেন গ'লে গ'লে প'ড়ছে চারিদিকে। অবাধ জলের উপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে চলেছে সুর ঘুরাতে। একবার ক'রে দোতারার সুরটা বাজাচ্ছে। আর তারপরেই গান ধরছে—

পোষা পাখী উড়ে যাবে—
সজনী, একদিন ভাবি নাই মনে।.....

শুনতে শুনতে বলরামের মনটা উদাস হয়ে উঠল। তারও যে আজ পোষা পাখী উড়ে গেছে!

তাড়াতাড়ি চোখ মুছে নৌকার মুখ ফেরাল বলরাম বাড়ীর দিকে।

(ক্রমশঃ)

স্বপ্নলোকের ভাবি

মিহির মুখোপাধ্যায়

এখন দুপুর। মাথার উপর পাখা ঘুরছে। ঠাণ্ডা ঘরের সিমেন্টে শুয়ে আছে মধু। মাথায় শুধু মলমল বালিশ। ঠাণ্ডা সিমেন্টের উপর শুয়ে থাকতে ভারী আরাম।

কিন্তু ঘুম আসে না সেদিন। দুপুরে ঘুমোবার অভ্যেস নেই।

ঘরদোর-আসবাব সব বড়। শুধু ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে কিছু আলো এসে পড়েছে উল্টো দিকের দেয়ালে। সেই আলোর মধ্যে পাখার ছায়াটা ঘুরছে, ঘুরছে। ঠিক বায়স্কোপের মত। দাদাবাবুর সঙ্গে একবার দেখতে গিয়েছিল সে। মা বলে, বায়স্কোপ। দাদাবাবু বলেন, সিনেমা।

আজ আটমাস এখানে কাজ করছে মধুসূদন। থাকা-খাওয়া, জামা-কাপড় সব যেন দাদাবাবু। তার উপর দশ টাকা মাইনে। মাইনের টাকাটা পুরোপুরি মায়ের হাতে তুলে দেয়।

প্রায় একবছর এই পাড়ায় এসেছেন দাদাবাবু। একা থাকেন। এই বাড়িটাও নতুন। দোতলার কাজ এখনো শেষ হয়নি। একতলার এই ঘরটা ভাড়া নিয়েছেন দাদাবাবু। পাশেই বাথরুম। পেছনের ছোট উঠোনে চাপাকল, একটা চৌবাচ্চা। সব সময় জল। একতলার অন্য ঘরগুলি তালাবন্ধ। সব ঘরে এখনো চুণকাম হয়নি, ঘরদোর-আসবাব রঙ করেনি।

কোনো ঘরে বালি-সিমেন্টের বস্তা। কোনোটায় লোহা-লক্কড়।

প্রথমদিকে মা এসে টিকে-কাজ করে যেত। দাদ-বাড়িতে টিকে-কাজ করে মা।

আধ-ঘণ্টার মধ্যে দাদাবাবুর ঘর ঝাড়ামোছা করে ফুলের জল ভরে, কিছু সামান-কাচার কাজ করে মায়ের বাড়ি ছুটতো। কিছুদিন পরে দাদাবাবুই নাকি বলেছিলেন—সব সময়ের জন্য লোক দিতে পার, খুব বিশ্বাসী হওয়া চাই, ছোট ছেলে হলেও চলবে, সব কাজ করবে, ঘরদোর পাহারা দেবে, আমি তো সব সময় বাড়ি থাকি না—

মা' তো এক কথায় রাজি ছেলে আমারই আছে বাবু, সব কাজ পারবে—

পরের দিন কিন্তু মধুকে দেখে একটু আপত্তি করেছিলেন দাদাবাবু—ওই টুকু ছেলে, ওকি পারবে—

—খুব পারবে, আপনি রেখে দেখুন—

—ওর বয়স কত হ'ল—

—এই বারোয় পা দিল—

মধু তখন অবাক চোখে দাদাবাবুর ঘরখানা দেখছিল।

সেই প্রথম দিন দেখেই যেমন ভালো লেগেছিল, আজও তেমনি আছে। বরং সেই ভাল লাগার টান আরো বেড়েছে। কি সুন্দর সাজানো ঘর। সুন্দর খাট, পরিপাটি বিছানা। ওপাশে বইএর আলমারি, পড়ার টেবিল চেয়ার। কিন্তু আলমারির উপরে তাকিয়েই সবচেয়ে খুশি, সবচেয়ে অবাক হয়েছিল মধু। তিনটি মাটির ঘোড়া। মধ্যেরটি লাল, দুপাশে দুটি কালো।

— কিরে থাকবি আমার এখানে—দাদাবাবু তারপর দোজাসুজি জিজ্ঞেস করেছিলেন—সব কাজ পারবি তো—একটু হেসে ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিল মধু। সেই দিনই কাজে লেগেছিল। ভারিতো কাজ।

খুব সকালে ওঠে সে। ঘর ঝাঁট দেয়, তারপর হিজে ন্যাকড়া নিঙড়ে, জলভর্তি বালতি টেনে টেনে ঘর মোছে, জানালার সার্শী মোছে। এই ঝাড়া-মোছার কাজ অন্ততঃ তিনবার করতে হয়। যা ধুলো! চাপা-কল থেকে কুজোয় ভরে জল রাখে। দাদাবাবু ততক্ষণে হাতমুখ ধুয়ে আসেন।

মধু ষ্টোভ জেলে চায়ের জল চাপায়! দাদাবাবু নিজেই চা করেন, বিস্কুটে মাখন মাখান।

মধু চা খায় না. সকালবেলা মাখন খেতেও ভালো লাগে না। রোজ সকালে মাখন খাবার অভ্যাসটি ভাল নয়। বস্তির ঘরে যখন মায়ের কাছে থাকত তখন, মাখন পেত কোথায়। মাখন ঘুতের কথা দু'বেলা ভাত জোটানো মুস্কিল ছিল। তারপর দাদাবাবুর কাছ থেকে যদি কোনদিন চলে যায়, যেতে হয়, তখন মাখন খাওয়াবে কে?

কিন্তু এখান থেকে কোনদিন যাবে না মধুসূদন। এই সুন্দর সাজানো ঘর। চমৎকার মানুষ দাদাবাবু। কিন্তু সবচেয়ে মন টানে ওই লাল-কালো ঘোড়া তিনটি। উঠে বসল মধু। মুখ উঁচু করে তাকাল। বুক সমান বইয়ের আলমারীর মাথায় ঘোড়া তিনটি স্থির।

সমান মাপের তিন ঘোড়া। লম্বা গলা, লম্বা কান, কেমন তেজি আর কি চমৎকার পালিশ। আবছা অন্ধকারেও কেমন চকচক করছে। মুখ তুলে দেখতে দেখতে মনে হল, এক্ষুণি যেন লাফিয়ে নেমে পড়বে, তারপর ছুটবে কিম্বা পক্ষীরাজ ঘোড়ার মত হাওয়ায় উড়ে যাবে। আবছা অন্ধকার ঘর। পেছনের শাদা দেয়ালে একটু তেরছাভাবে তিন ঘোড়ার লম্বা লম্বা কানের ছায়া। বাইরে একটা ফেরীওয়ালার ডাক। দুপুরবেলা ভারী অদ্ভুত শোনায়।

জানালার কাছে সরে এল মধু। ঘড়িটি তুলে দেখল, কাঁচি কাপড়ের গাঁইরি নিয়ে ফেরীওয়ালা চলেছে। লোকটার মুখ লাল, ঘামে ভেজা। বোকার ভাবে একটু সামনে ঝুঁকে আছে। একটু থেমে মুখের কাছে মুঠো তুলে আবার হাঁক দিল—কাপ্‌পেয়ালা। আসলে লোকটা বলছে, কাপড়ে-ওয়ালা। শোনাচ্ছে ঠিক কাপ্‌পেয়ালা। প্রথম প্রথম খুব ভাল লাগত।

প্রথম দিন, সেই বুধবার থেকেই কাজে লেগেছিল মধুসূদন। সেদিন থেকেই লক্ষ্য করেছে। রোজ দুপুর আর বিকেলের মধ্যে অনেক রকম ফেরিওয়ালা এই ছোট গলিটার রাস্তায় এসে নানারকম শব্দ করে ডেকে যায়। ঘুন্ ঘুন্ পায়ের ঝুমুর বাজিয়ে নেচে নেচে গান গেয়ে চানাচুরওয়ালা। বাঁশীওয়ালা মুখে কিছু বলে না শুধু বাঁশী বাজায়।

বেলুনওয়ালা কোলানো লম্বাযত বেলুনের গায়ে আঙুল ঘষে ঘষে অদ্ভুত একটা শব্দ তোলে। ঠংঠং-ঠংঠং-শব্দ শুনলেই বোঝা যায় কাঁসা-পেতলের বাসনওয়ালা যাচ্ছে।

আবার এক একদিন, হয়তো মাসে মাত্র দু'তিনবার, দুপুর ফুরিয়ে যাবার আগে সেই মিষ্টি ঘণ্টার টুনটুন শব্দ শুনে জানালার কাছে ছুটে আসে মধুসূদন, কখনো বা সদর দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়।

খাকি হাফপ্যান্ট পরা একটা হাফশার্ট গায়ে সেই আশ্চর্য খাবারওয়ালা আসে।

বুকের কাছে চৌকো কাঁচের একটা বাক্স। তার মধ্যে গোলগোল নরম পাকানো সুতোর মত সোনালীরঙের খাবার। জড়ো করা ন্যাকড়ার জালের মতো ওই খাবার একটিবার চেখে দেখতে ইচ্ছে করে মধুর। হাতে পয়সা থাকে না। কখনো হয়তো দাদাবাবুর বন্ধুদের কাছ থেকে দু'চার পয়সা বখ্‌শিস জোটে। তখন খাবারওয়ালা আসে না।

তারপর হয়তো দশবারোদিন এ গলিতে সে এলোই না।

আবার হঠাৎ একদিন দুপুরের দিকে টুনটুন শব্দ শুনে জানালার কাছে ছুটে আসে মধুসূদন, কিন্তু তখন আর হাফ-প্যান্টের পকেটে একটি পয়সাও জমা নেই। লজেন্স খেয়ে, চানাচুর কিনে কিংবা ছোট দুইবোন গীতা-সীতার আবদারের জন্য কখন যে খরচ হয়ে যায়, নিজেরও খেয়াল থাকে না।

প্রতি রোববার সকালে দাদাবাবুর দু'চারজন বন্ধু আসেন। খুব গল্প-গুজব হয়।

ইংরেজি-বাংলা খবরের কাগজ নিয়ে জোর কথা কাটাকাটি। তখন দু'তিনবার চা করতে হয়। আর কতবার যে দোকানে যেতে হয় তার হিসেব নেই। খালি সিগারেট আসে।

প্যাকেটের পর প্যাকেট। এক একজন সিগারেটও টানতে পারে, বাব্বাঃ। সেই খাচ্ছেতো এই খাচ্ছে। একটা শেষ হতে না হতে আরেকটা। দেশলাইও জ্বালায় না।

ঘরভর্তি ধোঁয়ার ধোয়াকার। ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে তর্ক জমে। কথার পিঠে কথা বাড়ে।

সবকিছুর সব কথা বুঝতে পারে না মধুসূদন। দু'চারটে চেনা শব্দ ডাংগুলির মত ছিটকে আসে, চীন-আমেরিকা-পাকিস্তান।

একজন আসেন, একটু বয়স বেশি। মাথায় মস্ত টাক। তাকে সবাই দাদা ডাকে—শ্যামদা—নাম বোধহয় শ্যামাকান্ত, কি শ্যামাপদ। তিনি আবার জর্দাপান ভালবাসেন।

প্রথম রোববার মধুকে দেখে বলেছিলেন—ছেলেটিতো বেশ, ওকে পেলে কোথায়, জীবন—দাদাবাবুর নাম জীবন বসু। হেসে বলেছিলেন—ওর মা ঠিকে কাজ করতো আমার এখানে দেখেছেন বোধ হয়, ওকে রাখলুম সব সময়ের জন্য—

—বাঃ বেশ ছেলেটি—মধুর চিবুকে আঙুল ছুঁয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন দাদাবাবুদের সেই শ্যামদা'—তোমার নাম কি খোকা—

—মধুসূদন দাস—

—তুমি পান নিয়ে এসোতো, দুই খিলি পান, হাতে করে চুন আর জর্দা আনবে এই এতটা—

একটা পুরো টাকা নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল মধু, পেছন থেকে দাদাবাবু বলে দিলেন—এক প্যাকেট সিগারেট আনবি—

যেতে যেতে শ্যামদা'র কথা শুনতে পেয়েছিল—বেশ ছেলেটি পেয়েছো জীবন—

কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নয়, যে দেখে সে-ই বলে মধুর চেহারাটা নাকি ভাল। গোলগাল শাঁসে-জলে চেহারা। অভাবের ঘর হলেও একটিমাত্র ছেলে, মা সাধ্যমত ভাল মন্দ এনে খাওয়ায়। একটা দিদি ছিল, মরে গেছে। মধুর পর দুইবোন। গীতা আর সীতা।

সীতাকে পেটে নিয়ে মা বিধবা হয়েছে। তখন মধুর নাকি বয়স ছিল চারবছর। বাবার কথা কিছুই মনে নেই। তারপর এই আটমাস দাদাবাবুর কাছে তোফা আরামে থেকে চেহারার আরো চেকনাই খুলেছে।

জানালার কাছ থেকে সরে এল মধু। আবার চিত হয়ে শুল। সোজা পাখাটার দিকে তাকিয়ে রইল একটুকাল। তারপর উপুর হ'ল। বুকের নিচে মাদুলিটা বিঁধছে, চাবি দুটো কেমন ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা। কালো সুতোর সঙ্গে গলায় বাঁধা একটি মাদুলি আর দুটি চাবি। একটা এই ঘরের চাবি আরেকটা সদর দরজার। সদর দরজায় লোহার গেট। দু'পাশ থেকে দুটো পাল্লা হুস্ হুস্ করে টেনে এনে তালা লাগায় মধুসূদন। এই পাল্লা টানাটা ভারি মজার। আবার খোলার সময় হুস হুস্ করে ঠেলে একটা এপাশে আরেকটা ওপাশে নিয়ে যায়।

দাদাবাবু বারবার বলে দিয়েছেন—এই চাবি দুটো খুব সাবধানে রাখবি, খবরদার হারাবি না, কোথাও যেতে হলে ঘরের দরজায় আর সামনের গেটে তালা দিয়ে যাবি, আমি যখন থাকবো না, তখন সব সময় সামনের গেটে তালা মেরে রাখবি—

দাদাবাবুর কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে মধুসূদন। হারিয়ে যাবার ভয়ে চাবি দুটো মাদুলির সুতোয় সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। প্রথম দিনই জিজ্ঞেস করেছিলেন দাদাবাবু—ওর গলায় ওটা কিসের মাদুলি?

—ওটা আমাদের গুরুদেব দিয়েছেন, রোগ বালাই না হয় সেই জন্য—আসল কথাটা মা এড়িয়ে গেল। গুরুদেব দিয়েছেন ঠিকই, আসলে এটা হাঁপানির মাদুলি। বাবার নাকি খুব হাঁপানি ছিল।

মধুরও আছে, তবে এখনো তেমন বাড়াবাড়ি হয়নি। কোন ভারী কাজ করলে, ছুটোছুটি করলে কিংবা ঠাণ্ডা লাগলে, এক একদিন বেশ টান ওঠে। যদি অসুখের কথা শুনে দাদাবাবু না রাখেন। যদি বলেন—না বাপু, অসুখ-বিসুখের ঝামেলা আমি রাখব না—

সেইজন্য আসল কথাটা চেপে গেল মা। চুপিচুপি সাবধান করে বলেছিল—কাউকে বলিস্ না, সাবধানে থাকবি, ভারী কাজ করবি না, বড় বালতি ভরে জল টানবি না, অল্প অল্প জল এনে ধোয়া-মোছার কাজ করবি—আরো কত কথা মায়ের—ঠাণ্ডা লাগাবি না, বেশি ছুটোছুটি করবি না, রোদ্দুরে যাবি না—জানো-অজানো সাত-সতেরো উপদেশ। অত কথা মেনে কেউ কি কোন কাজ করতে পারে! মা খুব জ্ঞান দিতে জানে। এই "জ্ঞান-দেওয়া" কথাটি মধু শিখেছে তাদের বস্তির পল্টু দা'র কাছে। পলটুদা' বাস কনডাক-টরের কাজ করে। ঘণ্টার ঘড়ি টেনে বাস চালায়, বাস থামায়। ভারী মজা। ও কাজ এমন কিছু শক্ত নয়, মধুও পারবে।

এই যে ঠাণ্ডা মেঝেতে শুয়ে আছে মধু, এটি উচিত নয়। কিন্তু আশ্চর্য, দাদাবাবুর কাছে এসে এই আট মাসের মধ্যে একবারও তার শ্বাসটানের কষ্ট হয় নি। আসলে বস্তির ওই স্যাঁতসেঁতে ঘরের জন্যই তার অসুখ ছাড়তো না। গীতা-সীতাও ওই জন্যই অত ভোগে।

আহা গীতা-সীতাকে যদি এখানে এনে রাখা যেত। কত-গুলি ঘরতো এখানে এমনি পড়ে আছে। মা কিন্তু আসবে না, কিছুতেই আসতে চাইবে না। বস্তির ওই ভাঙা ঘরটাই মায়ের প্রাণ-পাখির খাঁচা। মা নিজেই বলে এই কথাটা, ভাঙা হোক, টুটো হোক, ফুটো হোক, এই ঘরেই আমার পেরাণ-পাখি বাঁধা। কত কত জিনিস যে মা টুকটাক যোগাড় করে আনে। কত কষ্ট করে যে অভাব, ঘর দাআর, সংসার চালায়। মধু তার কিছুই জানে না, টেরও পায় না, মা-ও সাধ্যমত জানতে দেয় না। আস্তে আস্তে কত জিনিষ করেছে মা। সাতবাড়ির কাজ সেরে অল্প অল্প করে জমিয়েছে। তারপর এই আট মাস মধুর মাইনের পুরোটা জমেছে। মাসে মাসে দশ টাকা। সেই টাকায় সেল মাসে মা একটা তক্তপোষ কিনেছে। এনামেলের হাঁড়ি, লোহার কড়াই, চিনে-মাটির কাপ-ডিস। গীতা-সীতার ফ্রক, মধুর একটা জামা, নতুন গামছা। সবদিকে লক্ষ্য মায়ের। এই যে এখানে এমন ভাল জায়গায় প্রথম কাজ পেল মধু। তা'তেও কি মায়ের ভাবনা কম ছিল।

—তুইতো কোনদিন আমাকে ছেড়ে থাকিস নি, একা-একা রাত্তিরে শোয়ার অভ্যেস নেই, ভোর যদি তেমন ভয় করে রাত্তিরে, তবে আমি বাবুকে বলি, রোজ রাতে সব কাজের পর বাড়ি এসে আমার পাশে শুবি, আবার খুব ভোর-ভোর সময় কাক-ডাকার আগে চলে যাবি।

মেও মায়ের যত বাজে কথা। এ সব কথা শুনলেও হাসি পায়। মধু কি আর সেই মধু আছে। সেই ছোট-বেলায় যেমন মায়ের আঁচল মুঠ করে ধরে বসে থাকতো। যাকে কোথাও যেতে দেবে না, কোন কাজ করতে দেবে না। কি বোকাই ছিল তখন। এখন সে কত বড় হয়ে গেছে। তার মতো বয়সে তো পলটুদা' বাড়ি থেকে পালিয়ে হিন্দি-দিল্লী ঘুরে এসেছিল। পলটুদা'র মুখেই তো সে গল্প কতবার শুনেছে।

খানিকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে আবার জানলার কাছে এল মধুসূদন। একটা পাল্লা খুলে দিল। উঃ কি রোদ। কটি মাসের ঘুরন্ত ঘুপুর। রোদ্দুর যেন আর ফুরোয় না। টেবিল ঘড়িটার দিকে তাকাল। বেলা মোটে দেড়টা। ঘড়ির কাঁটা কেমন করে ঘোরে, কোন্ ঘরে গেলে ঘুপুর বাজে। কখন বিকেল হয় সব দাদাবাবুর কাছে শিখেছে মধু।

দাদাবাবু কিরতে কিরতে সেই সন্ধে ছটা। বিকেলের এই সময়টাই বেশ খারাপ লাগে।

দাদাবাবু না এলে এক পা' বেরোবার হুকুম নেই। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মধু।

ডানদিকে একটু কোণাকুণি রাস্তার ওপারে একটা ঝকঝকে নতুন রঙ্ করানো তেতলা বাড়ি।

আরো অনেকক্ষণ পরে সূর্য যখন আরো নিচে নেমে ওই তেতলা বাড়ির ছিলে কোঠার কার্নিশে দাঁড়াবে ঠিক তখন এই জানালার পাশ দিয়ে একফালি বাঁকারোদ তিন ঘোড়ার গায়ে এসে পড়বে। তিন ঘোড়ার চমৎকার পালিশ আরো চকচকে দেখাবে!

মধ্যের ঘোড়াটা নতুন পোড়া ইটের মতো লাল, দু'পাশের দুটো হেল চুকচুকে কালো। পেছনের শাদা দেয়ালে তিন ঘোড়ার অদ্ভুত লম্বা লম্বা আর লম্বা লম্বা কানের ছায়া কিছুক্ষণের জন্য আরো ঘন, আরো স্পষ্ট হয়ে থাকবে। কতদিন বিকেল থেকে সন্ধ্যার আবছা আলোর সঙ্গে তিন ঘোড়ার রঙ বদলের খেলা দেখেছে মধুসূদন। এক একদিন গীতা-সীতাও এসে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। হয়তো বেলা আটটা কি নটা। দাদাবাবু কলঘরে গেছেন। তাড়াতাড়ি স্নান করে নেবেন।

মধু হয়তো তখন টিফিন কৌটোর বাটিগুলি ঘুরে মুছে গুছিয়ে নিচ্ছে। গলির মুখে বড় রাস্তার হোটেল থেকে দু'জনের ভাত-ডাল-মাছ-তরকারী নিয়ে আসবে। কখন সময় হয়না খোলা পেয়ে গীতা-সীতা টুপ করে ঢুকে পড়েছে। ঘরের দরজার সামনে এসে পর্দা সরিয়ে অবাক চোখে দেখছে, কি সুন্দর সাজানো ঘর, যেমন চমৎকার তিন-তিনটে ঘোড়া।

—কেমন সুন্দর না রে দাদা গীতার কথা শুনেই চমকে লাফিয়ে উঠে তাড়া দিয়েছে মধু—এই তোরা এসেছিস্ কেন, যা যা ভাগ, এই খবরদার ঘুলো পায়ে ঢুকবি না—

—একটু হাত দিয়ে দেখবো দাদা, এই একটিবার, এইটুকুন—গীতার কথা শুনে ধমক দিয়েছে মধু—না না হাত দিতে হবে না, ভারী আবদার, ফের আবার—

—আচ্ছা আচ্ছা, আসবোনা খুব তো—গীতা মুখ ভেঙচে বলেছে—তুই ভারী ইয়ে হয়েছিস মাকে বলে দেবো—

—যা, যা, বলগে যা—ওদের একরকম তাড়া করে গেটের বাইরে দিয়ে এসেছে মধু, তারপর টানা পাল্লা দুটো টেনে বন্ধ করেছে।

কিন্তু প্রতি রোববার শেষ ঘুপুরে যিনি আসেন সেই হিমহাম চেহারার সুন্দর মত দিদিমণিকে কিছুই বলতে পারে নি। এ বাড়িতে মধুসূদনের সেদিন প্রথম রোববার। দাদাবাবুর বন্ধুরা সব চলে গেলেন বেলা বারোটা নাগাদ। তারপর স্নান করলেন দাদাবাবু। ততক্ষণে হোটেল থেকে ভাত নিয়ে এল মধু। দাদাবাবুর খাওয়ার ফাঁকে কিছু দামান কাঁচার কাজ করে নিল। তারপর নিজে স্নান করল, খেয়ে নিল। আরেক প্রস্থ ঘোরাঘোরার কাজ সারল। একটা ইংরেজি বই হাতে শুয়েছিলেন দাদাবাবু। পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। প্রতি রোববার দুপুরে এই সময় ঘণ্টা দুয়েক ঘুমোন। সারা সপ্তাহ দুপুরে আরাম করার সুবিধে হয় না।

এ সময় ডাকাডাকি করলে বিরক্ত হবেন। এ সব কথা পরে জেনেছে মধুসূদন। সেই প্রথম রোববার এত সব জানার কথা নয়। দাদাবাবুকে ঘুমিয়ে পড়তে দেখে চুপচাপ সিঁড়ির

কাছে এসে বসেছিল। সামনে লোহার গেটের পাল্লা বন্ধ ছিল।

তখন আশ্বিন মাস। হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টির পর বেশ চনমনে রোদ উঠেছে। আকাশের রঙ অদ্ভুত নীল, মেঘের রঙ কেমন ফ্যাকাশে। একটা লাল ঘুড়ি উড়ছিল। অনেক উঁচুতে গোল হয়ে কয়েকটা শকুন উড়ছে। ঘুরতে ঘুরতে উড়ে যাচ্ছে। এক, দুই, তিন, চার—

ঠিক তখন সেই দিদিমণি এলেন। রঙিন ছাতা, কালো চশমা, লাল জামা, লাল পাড়, কিংবা হলুদ শাড়ি, লাল রঙের ব্যাগ। খুউব কলসা রঙ। রোদ্দুরে যেন চমকাচ্ছে।

হকুমের সুরে বললেন—এই ছেলেটা দরজা খুলে দে—

হাঁ করে তাকিয়েছিল মধুসূদন, তাড়াতাড়ি উঠে এসে একটা পাল্লা একপাশে টেনে দিল।

ছাতা গুটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—তুই কে রে—

—আমি দাদাবাবুর কাছে থাকি—

—ও, তোকে রেখেছে বুঝি, নাম কি তোর—

—মধুসূদন দাস—

কালো চশমা খুলে ব্যাগের ভেতর রাখলেন। তারপর সোজা দাদাবাবুর ঘরের দিকে।

একবার ক্ষীণ সুরে আপত্তি করেছিল মধু—দাদাবাবু ঘুমিয়েছে—

—ঘুমিয়েছে তো হয়েছে কি আমি ডেকে তুলছি—

তারপর চুপচাপ ফুরিয়ে গেল, বিকেলও মিতে এল, কিন্তু দু'জনের কথা আর ফুরোয় না।

দোকান থেকে গরম সিঙ্গাড়া কচুরি নিয়ে এল মধু। মিঠে পান আনল। দু'বার চা হ'ল।

দিদিমণি নিজেই চা করলেন। মধুকে এটা ওটা গুছিয়ে দিতে বললেন।

সন্ধ্যার পরে বেরোলেন দুজনে। রাত প্রায় দশটার সময় ফিরে এলেন দাদাবাবু।

মধু হোটেল থেকে রুটি-মাংস নিয়ে এল। দাদাবাবু খেতে বসলেন।

জল, মুন এগিয়ে দেবার সময় জিজ্ঞেস করেছিল মধু—দিদিমণি আপনার কে হন—

মাংসের ঝোলে রুটির টুকরো ভিজিয়ে মুখ তুলে তাকালেন দাদাবাবু। একটুকাল তাকিয়ে থেকে মুখ টিপে হেসে বলেছিলেন—এখনো কেউ হননি, ভবিষ্যতে হবেন—

মধুর মনে কোন ঘোরপ্যাঁচ নেই, বাবুমানুষদের কথার কায়দা সে বোঝে না, বুঝতে পারে না। তবে এই আট মাসে অনেকটা শিখে নিয়েছে। সেদিন সরল মনেই আবার জিজ্ঞেস করছিল—তাহলে উনি আপনার কে হবেন—

—তোর বৌদি হবেন—বলতে বলতে হেসেছিলেন দাদাবাবু। এই হাসিটির অর্থ তেমনভাবে কিন্তু বুঝতে পারেনি মধুসূদন। পরের রোববার কিন্তু মুস্কিলে পড়েছিল।

তখন আশ্বিনের বিকেলে ঝুরঝুরে হাওয়া দিচ্ছিল। রোদ্দুরে চাঁপাফুলের রঙ।

এমন সময় দিদিমণি এলেন। সেই কালো চশমা, রুচি কলাপাতা রঙের শাড়ি।

আজ ছাতা ছিল না। হাতে সেই লাল ব্যাগ। তাড়াতাড়ি দরজা খুলেছিল মধু।

ঘুম থেকে উঠলেন দাদাবাবু, হাত-মুখ ধুতে যাবার সময় বললেন—মধু, ওই মোটা বইটার নিচে টাকা আছে, গরম সিঙ্গাড়া নিয়ে আয়—

দিদিমণি বললেন—আমি টাকা দিচ্ছি—

মধু তখন মহা উৎসাহে পেয়ালা পিরিচ ধুয়ে এনেছে, দুধ-চিনি চায়ের কৌটো গুছিয়ে দিয়েছে।

কোমরে আঁচল জড়িয়ে স্টোভ ধরালেন দিদিমণি, কেতলিতে চায়ের জল চাপালেন।

তারপর ব্যাগ খুলে টাকা দেবার সময় খুব ঘনিষ্ঠ সুরে সরল বিশ্বাসে বলেছিল মধু—বড় রাস্তার ওপারে একটা দোকানে

পরম পরম কাটলেট ভাজে, জানবো বৌদি—

—কি বলে ডাকলি তুই—ভুরু কুঁচকে তাকালেন দিদিমণি।

একটু থতমত খেয়ে জবাব দিয়েছিল মধু—বৌদিমণি—

ডান হাত বাড়িয়ে তার বাঁ-কানটা খপ্ করে ধরে ধমক দিলেন—হতভাগা, পাজি ছেলে, কে শেখাল তোকে—

মধু কাঁদ কাঁদ হয়ে বলেছিল—কেউ না—

দাদাবাবু এসে বাঁচালেন—কি হয়েছে, কি বলেছে—

—শোনো না, পাজি ছেলেটা কি বলে ডাকল—তখনো কান ধরে টানছেন দিদিমণি।

—কি বলেছিস, তুই—দাদাবাবু অবাক।

জলছল্ চোখে মিনমিন করে বললো মধু—বৌদিমণি—

হাহা করে হেসে উঠলেন দাদাবাবু। হাসি আর থামে না। দিদিমণিও মুখে আঁচল চুলে হাসি লুকোলেন। একছুটে বাইরে এল মধু। বাব্বাঃ, বাঁচা গেছে। বড় মানুষদের ভাব-সাব কিছু বোঝা যায় না।

কোন কথার মানে যে কি হবে, কখন রাগ করবেন আর কোন্ কথায় যে হেসে উঠবেন, তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। এলো-মেলো পুরনো কথা ভাবতে ভাবতে অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করলো, মধুসূদন। ঘুম আর এলো না। পাখাটা ঘুপ্পর থেকে সমানে ঘুরছে। বাইরে বিকেলের আলো। রাস্তায় জল দেওয়ার ছড়ছড় শব্দ। পাখাটা বন্ধ করল মধু। আস্তে আস্তে ঘুরে ঘুরে এক সময় স্থির হ'ল।

ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে এক চিলতে রোদ পড়েছে পাখাটার গায়ে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বড় রাস্তার ট্রামের ঘন্টা শুনতে পেল মধু। চঙ্, চঙ্, চঙ্, চঙ্। শব্দটা দ্রুত কাছে আসছে।

এতো ট্রামের ঘন্টা নয়। দমকলের গাড়ি। তাড়াতাড়ি উঠে জানালা খুলে দিল।

দমকলের লাল গাড়িটা ঘন্টা বাজাতে বাজাতে তাদের গলিতে ঢুকছে। জানালার পাশ দিয়ে ছুটে গেল। ডানদিকে পাঁচের বাড়ির পর ভবেশবাবুদের বাড়ির পাশে সরু সুড়কির রাস্তাটার মুখে দাঁড়িয়ে ঘন্টা বাজাতে লাগল। সামনের একতলা-দোতলা বাড়িগুলির ছাদে অনেক মানুষ।

আগুন, আগুন! রাস্তা দিয়েও অনেকে ছুটছে। কোথায় আগুন লাগলো। ভালো করে দেখার জন্য ছাদে উঠল মধু। সামনের একতলা-দোতলা একসার বাড়ির পেছনে তাদের বস্তি। তারপর উঁচু রেল-রাস্তা। ওদিকে বালীগঞ্জ এদিকে কালীঘাট স্টেশন। কিছুদূরে গঙ্গার উপর রেলের পুল। রেল রাস্তার গায়ে তাদের বস্তিটা অনুছে। গলগলে ধোঁয়া, আগুনের ঝলকি। দিশেহারার মত একবার এদিক-ওদিক তাকাল মধুসূদন। তার মা, মা রয়েছে ওখানে, ওই আগুনের মধ্যে। গীতা-সীতা।

তিনলাফে সিঁড়ি টপকে নিচে নামল। গেটের তালা খুলে বাইরে ছুটে এল। কয়েক পা' যেতে মনে পড়ল, দরজায় তালা দেয়নি। ফিরে এল। প্রথমে ঘরের দরজা তারপর বাইরের গেটের পাল্লা টেনে তালা আটকাল। মিনিট তিনেক দেরি হয়ে গেল। আর কিছু ভাবারও সময় নেই। মা হয় তো এবেলার ঠিক কাজে বেরিয়ে গেছে। গীতা-সীতা হয়তো ঘরের ভেতর ঘুমিয়ে আছে। কালো হাফ-প্যান্ট, খালি গা, বুকের কাছে কালো সুতোয় বাঁধা ছুটি চাবি আর বাদুলি ঝুলছে, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল মধুসূদন।

আরো একটা দমকলের গাড়ি এসেছে। লম্বা পাইপে করে জল ছড়াচ্ছে। সব মাটীর ঘর, দরমার বেড়া, বাঁশের খুটি, খড়, পন আর খাপরার ছাউনি। জৈষ্ঠের খরায় আগুন যেন মওকা পেয়েছে।

বস্তির বারোয়ারী ডোবাটায় তেমন জল নেই। পলটুদা', ভাড়া, হাবলা, হরিচরণ হাতে হাতে বালতি করে ডোবার কাদা-গোলা জল তুলছে, ছুড়ে দিচ্ছে আগুনের দিকে। সাধুকাকার ঘর জ্বলছে, টগরমাসীর ঘর অর্ধেক পুড়ে সাফ। যে যেমন পারে জিনিষপত্তর টেনেটুনে বার করে আনছে।

পথের উপর বাক্স-বিছানা, মাটির হাড়ি, লোহার বালতি, থালা-বাসনের ডাঁই। দমকল গাড়ির শব্দ। চারপাশে চেঁচামেচি কান্নাকাটি। হুলস্থুল কাণ্ড। মধুর মাথার মধ্যে যেন সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

ঘরের সামনে এসে দেখল, মা প্রায় পাগলের মত ছুটোছুটি করছে। ছুটে ছুটে হাতে হাতে ঘরটা পারে জিনিষপত্তর বাইরে এনে রাখছে। সরু মাটির রাস্তার উপর সিলি কৌটো, বালিশ-বিছানা, কাথা কাপড়, হাঁড়ি-কড়াই, থালা-বাটি। একজোড়া চিনেমাটির পেয়ালা পিরিচ ভেঙে চুরমার। জিনিষ পত্তরের পাশে দাঁড়িয়ে সীতা কুঁপিয়ে কুঁপিয়ে কাদছে সীতা বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

ঘরের চাল জ্বলছে, পেছনের বরষার বেড়া, বাঁশের খুঁটি ধিকিধিকি পুড়ছে।

ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করে। দমবন্ধ হয়ে আসে। উৎকট পোড়া গন্ধ। মা সেই আগুন আর ধোঁয়ার মধ্যে ভারী টিনের তোরঙ্গটা টেনে টেনে বাইরে আনার চেষ্টা করছিল। এক ছুটে মধু গিয়ে হাত লাগাল। মধুকে দেখে মা আবার একচোট হাউ হাউ করে উঠল—মধুরে সব্বোনাশ হ'ল—মায়ের চোখ মুখ কোলা কোলা। ঘাম আর কান্নার জল। পিঠে রুক্ষ চুলের বোঝা।

সারা গায়ে মাথার মুখে খরপোড়া ছাই। দু'জনে ধরাধরি করে তোরঙ্গটা বাইরে আনল।

মা আবার ছুটে ভেতরে গেল। দড়িতে ঝোলানো গামছা-কাপড় নিয়ে এল! মায়ের চেহারা দেখে মায়ের সামনে সংসারের অবস্থা দেখে কান্না পাচ্ছিল মধুর। কিন্তু কান্না চেপে আবার যেতে হ'ল।

এবার মায়ের সেই প্রিয় ওক্তাপোষটা টেনে বার করতে হবে। ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করছে।

ঘরের ছাই, আগুনের ফুলকি এসে গায়ে পড়ছে। হাতে-পায়ে, বুকে-পিঠে কয়েকটা ফোস্কাও পড়েছে। ঘরের চাল এখন দাউদাউ করে জ্বলছে। সেদিকে এক পলক তাকিয়ে মধু মুহ্যমান হয়ে গেল। চালের বাতায় আগুনের লকলকে জিভ। ঠিক যেন দাদাবাবুর সেই লালরঙের ঘোড়াটা।

এক মুহূর্ত মনে হ'ল মধুর মাথার উপর উড়ন্ত আগুনের শিখায় শিখায় যেন সেই লাল মাটির ঘোড়াটা পক্ষীরাজ হয়ে উড়ে যাচ্ছে।

টগরমাসীর ছেলে হরিচরণ ধমকে উঠল—হাঁ করে চেয়ে দেখছিস কি—

হরিচরণ, মা আর সে। তিনজনে ধরাধরি করে কোন রকমে বাইরে আনল ওক্তাপোষটা।

ঘরের চাল তখন জ্বলতে জ্বলতে নিচে পড়ল। দরমার বেড়াগুলিও দেখতে দেখতে ছাই হয়ে গেল।

লোহার টুপি মাথায় দমকলের লোক দুটো তখনো লম্বা নলে করে জল ছুড়ছে।

জলে ভেজা পোড়া কঙ্কালের মত কাঠের দরজা আর বাঁশের খুঁটি কটা শুধু দাঁড়িয়ে রইল।

ছুটোছুটিতে হাফ ধরেছে মধুর। টিনের তোরঙ্গটার উপর বসতে বসতে মনে হ'ল সেই পুরনো হাঁপানির টানটা বুঝি আবার উঠবে। বুক ভেঙে উঠে আসবে। দুহাতে বুক চেপে ধরেই চমকে উঠল মধুসূদন।

মাদুলিটা নেই, চাবি দুটো নেই। কালো মোটা সুতোটা কখন ছিঁড়ে কোথায় ছিটকে পড়েছে।

কি করে ছিঁড়ল। হয় তো আগুনের ফুলকিতে পুড়ে গেছে কিম্বা ছুটোছুটির সময় ছিঁড়ে গেছে কিম্বা—পর মুহূর্তে সেই ছাইচাপা আগুন আর ধোঁয়ার মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মধুসূদন। পোড়া বাঁশের খুঁটি আর আধপোড়া কাঠের কপাটের আশেপাশে হামাগুড়ি দিয়ে ক্যাপার মতো খুঁজতে লাগল।

চেঁচিয়ে কি যেন বললো মা। সীতা-সীতাও চেঁচিয়ে উঠল। কিছুই কানে ঢুকল না। সারা গায়ে মুখে পোড়া ঘরের ছাই, হাঁটু ছড়ে ঘর ঘর রক্ত।

হরিচরণ ছুটে এসে তাকে টেনে তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করল—কিরে কি খুঁজছিস—

—আমার চাবি, দাদাবাবুর চাবি—একটা পোড়া বাঁশের খুঁটি ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো মধুসূদন। সেই পুরনো হাঁপানি টান। তার ফুসফুসটা বুঝি ফেটে যাবে, পাঁজরের হাড়গুলি গুঁড়ো হয়ে যাবে। বুকের সমস্ত জোর দিয়ে অল্প অল্প ধোঁয়া আর উৎকট পোড়া-গন্ধ ভরা বাতাস টানতে টানতে মনে হ'ল মধুর, সে বুঝি এবার চিরকালের মত অজ্ঞান হয়ে যাবে।*

---

* আজ মেয়েকে পাঠাতে স্থানাভাবে পাঠাতে না পারায় মেয়ে সম্ভবতঃ দুঃখিত। এজন্য আমরা দুঃখিত। ৫: সঃ

পুস্তক পরিচয়

তিমিরান্তর : জগবন্ধু ভট্টাচার্য

লেখক কর্তৃক মহাজাতিনগর ২নং ব্লক কলিকাতা- ১ হতে প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ টাকা।

উষার জীবনের পটভূমিকায় জীবন সত্যের গভীর রূপকে দেখার চেষ্টা করেছেন লেখক জগবন্ধু ভট্টাচার্য তাঁর "তিমিরান্তর" উপন্যাসের আরম্ভনে। এখানে বহু চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। মুখুজ্জে বাড়ীর মেয়ে প্রৌঢ়া সারদার ব্যক্তিগত ভাবনার মাঝে মাঝে স্মৃতিগুলো জেগে উঠে উদ্বেলিত করে তুলবে। আবার কখনো তাকে আত্মিগতা সম্বন্ধে সচেতন করেও রেখেছে। অথচ তার বোধের জগতে যে অতীহুত ব্যর্থতা, বাসনা তাই তাকে বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে। সেখানে কোটী বছর আগের আদিনারী যেন সারদাচরিত্রে রূপান্তরিত হবে মহাবিপ্লবের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। তার চারদিকে বাস্তবপীড়িত লাবণ্য, সরলা, জ্ঞানদা, সর্বাণী, তারা সবাই নারীত্বের সোপানে আরোহণের জন্য ব্যর্থ কান্নায় ভেঙে পড়ছে। স্বামীজী জীবন থেকে পলাতক হয়েও জীবনের চারদিকে পায়চারি করছেন তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সত্যেন, সতীশ, রমেশ।

লেখক যে বিষয়ের অবতারণা করেছেন তা প্রধানতঃ গভীরতা ও উপলব্ধির ব্যাপকতার অভাবে সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি। দ্বিতীয়তঃ জীবনে সংঘাত ও ঘটনার বদলে বক্তৃতার ভেতর দিয়ে বিষয়কে তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে বলে ক্রটী স্বাভাবিক ভাবে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তৃতীয়তঃ কোথাও কোথাও সংলাপ ও ভাবনা পরিবেশ ও চরিত্রানুগ হয়নি।

সতীশ, রমেশ, সাবিত্রী, জ্ঞানদা ও প্রতীক হিসেবে তিনজন চরিত্র অঙ্কনে লেখকের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। তা' ছাড়া উষার পরিবেশও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সেখানে তিনি সার্থক।

সত্যেন, সরলা প্রসঙ্গে অবান্তরতা ভীড় করে আছে, স্বামীজী চরিত্র অসম্পূর্ণ।

লেখকের বক্তব্য বৈচিত্র্যময় তা স্বীকার করতেই হয়।

রূঢ় বাস্তবের প্রভাব পেরিয়ে যেন সেই আদিনারীকেই দেখতে পাওয়া যায় মুখুজ্জে বাড়ীর মেয়ে সারদার মধ্যে।

ভাষা সহজ, বইখানি ত্রুটীমুক্ত না হলেও কৌতূহলপ্রদ, শালীনতার প্রতি যেন লেখক অহেতুক ভাবে সচেতন বলে মনে হয়। প্রচ্ছদপট মনোরম।

বিজয় দেব

বিশ্বাবর্ত

তিনটি সম্মেলন

তিনটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অল্প সময়ের ব্যবধানে কিছুদিন আগেই হয়ে গেল। সম্মেলনগুলির উদ্দেশ্য সঙ্কটায়ণের পথনির্দেশ, যে-সঙ্কটের প্রকৃতি ও স্বরূপ বিবিধ হলেও তাদের পরিণতি একবৈশিষ্ট্য—হয় যুদ্ধ, না হয় শান্তি। এবং এই শান্তি নিবিঘ্ন করবার জন্যে সম্মেলনগুলি আহ্বানের আশু উদ্দেশ্য।

মস্কৌ

সম্মেলনগুলি যেন পর পর অনুষ্ঠিত হয়ে গেল, পাশাপাশিও বলা চলে। প্রথম সম্মেলনটি বসেছিল সোভিয়েট রুশ এ; সোভিয়েট ব্লক-এর অন্তর্ভুক্ত নয়টি রাষ্ট্রের এই সম্মেলন সপ্তাহব্যাপী আলোচনার পর গত ২১শে অক্টোবর সমাপ্ত হয়। সোভিয়েট রুশের নয়া সিঁথাটি (Semodrome) বৈকোনুর-এ মহাকাশ-উৎক্ষেপণ প্রত্যক্ষ করবার আমন্ত্রণ নিয়ে এই নয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা সমবেত হলেও বিশ্ব-পরিস্থিতি, চীনের সোভিয়েট বিরোধী উগ্র প্রচারের এবং চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মুখে আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট মৈত্রী ও ভিয়েৎনাম সমস্যা সুনিশ্চিতভাবেই অগ্রাধিকার পেয়েছে। এ-ছাড়া সোভিয়েট ব্লক অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির প্রতি রুশের আর্থিক সাহায্যের প্রশ্নও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কিন্তু চীন ও ভিয়েৎনামই যে এই কম্যুনিষ্ট শীর্ষ-সম্মেলনের প্রধান উপজীব্য ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়। সেই সঙ্গে সোভিয়েট-আমেরিকার পারস্পরিক সম্পর্কের প্রশ্নটিও। সম্প্রতি জনসন রুশ ভাষায় প্রকাশিত 'আমেরিকা' নামক পত্রিকার দশমবার্ষিকী সংখ্যায় আমেরিকা ও সোভিয়েতের মধ্যে বৈরিতার চাইতে বন্ধুত্বের সম্পর্কই প্রবল —'are more natural friends than enemies' মন্তব্য লিখে মস্কৌতে তোলপাড় তুলেছিলেন। প্রেসিডেন্ট কেনেডি ১৯৬৩ সালে আমেরিকান ইউনিভারসিটিতে বক্তৃতার পূর্ব ও পশ্চিমের ঠাণ্ডা লড়াই অবসান কামনা করে বলবার পর আনবিক অস্ত্র পরীক্ষা আংশিক বন্ধের চুক্তি সম্পাদিত হয়ে পূর্ব-পশ্চিম রাইসোষ্টির সম্পর্কের যে উন্নতি হয়েছিল, জনসনও সেই উদ্দেশ্য নিয়েই অগ্রসর হচ্ছেন। সম্প্রতি মস্কৌ-নিউইয়র্কের মধ্যে বিমান চলাচলে মার্কিন সম্মতি এদিকে একটি নিশ্চিত পদক্ষেপ এবং মহাকাশে রুশ-মার্কিন সহযোগিতার প্রচেষ্টাও আর একটি পদক্ষেপের সম্ভাবনায় চিহ্নিত হয়ে আছে।

কিন্তু এই উদ্যোগ সত্ত্বেও ভিয়েৎনাম সমস্যা এই দুই রাষ্ট্রের সম্পর্ক উন্নয়নে প্রবল অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভিয়েৎনাম সঙ্কট চীন-সোভিয়েত দ্বন্দ্বের উগ্রতা আরো বৃদ্ধি করেছে এবং অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে সোভিয়েত রুশের পক্ষ থেকে হানয়-এর সম্মতি ব্যতীত ১৯৫৪-সালের জেনেভা সম্মেলন আহ্বান করে এই সমস্যা মীমাংসার উদ্যোগ সোভিয়েত রুশের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সোভিয়েতের পক্ষ থেকে এ-বিষয়ে কোনো উদ্যোগ কিম্বা অনুযোগ, চীনের কাছ থেকে সোভিয়েত রুশকে আমেরিকার দালাল আখ্যায় লাঞ্ছিত হতে হয়েছে।

সোভিয়েত রুশও এই লাঞ্ছনার প্রত্যুত্তর দিয়েছে। গত ১৫ই অক্টোবর সোভিয়েত পোল্যাণ্ড সৌভ্রাত্রমূলক দর্শাবেশে

সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রধান ব্রেজনেভ চীনকে সরাসরি আক্রমণ করে বলেন যে ভিয়েৎনামকে সাহায্য করবার জন্য সমাজবাদী দেশগুলির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ শিবির গঠন করার পরিবর্তে চীন এই দেশগুলিকে আক্রমণ করে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজদেরই সহায়তা করছে, তাদের ওথাকথিত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ফলেও তাই ঘটছে। এই সপ্তাহেরই আরও কয়েকদিন পূর্বে কোসিজিন সার্ভলভস্ক-এ বক্তৃতাদান করেছেন চীন হানয়কে সামরিক সাহায্যদানে প্রতিবন্ধকতা করছে। গত ৭ই নভেম্বর বিপ্লবের ৫৯ তম বার্ষিকীতে মার্শাল ম্যালিনভস্কিও এই অভিযোগেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন: ভিয়েৎনাম মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদকে উস্কানি দিচ্ছে: "encourage U. S. Imperialism to commit more crimes." নভেম্বরের বিপ্লব উদ্‌যাপনের আয়োজনে এবার চীনের সঙ্গে ঐক্যের শ্লোগান কুশ উদ্যোক্তারা বর্জন করেছে। সম্প্রতি চীনের ঐক্য-বিরোধী ভূমিকা সমালোচনার জন্য বিশ্ব কম্যুনিষ্ট সম্মেলন আহ্বানের যুসপেরিন-উদ্যোগকে ব্রেজনেভ স্বাগত জানিয়েছেন।

চীনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সোভিয়েত সমালোচনা, ভিয়েৎনাম-যুদ্ধ সম্পর্কে সোভিয়েতের নূতন কোনো নীতির ইশারা কিনা অদূর ভবিষ্যৎ সে-কথা উদ্‌ঘাটিত করবে। ১৯৬৫-র জানুয়ারীতে হানয়-এ শেলেপিনের নেতৃত্বে যে কুশ-মিশন গিয়েছিল, তা হানয়কে আলোচনা বৈঠকে সম্মত করাবার শেষ কুশ-চেষ্টা বলা যেতে পারে। সাম্প্রতিক পূর্ব-ইউরোপীয় কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রসম্মেলন যে নূতন করে সেই চেষ্টার সূত্রপাত করতে পারে, তা বোঝা যায় বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ব্রাউনের ভিয়েৎনাম-সম্পর্কিত ব্রাইটন সম্মেলনে উত্থাপিত ৬ই অক্টোবরের প্রস্তাবে সোভিয়েতের আগ্রহে।

দিল্লী

২১শে অক্টোবর যেদিন, কম্যুনিষ্ট নয় প্রধানের বৈঠক শেষ হল, দিল্লীতে যুগোস্লাভিয়া, সংযুক্ত আরব রিপাব্লিক ও ভারতবর্ষ—এই তিনরাষ্ট্রের শীর্ষ-বৈঠক সুরু হয়। ১৯৬৬ সালে এই তিনরাষ্ট্রের প্রথম বৈঠক বসে ব্রিয়নীতে। ১৯৬১-তে কায়রোতে বসে দ্বিতীয় বৈঠক। সাম্প্রতিক বৈঠকটি তৃতীয়। ২১শে থেকে ২৫শে অক্টোবর এই বৈঠক চলে।

ভিয়েৎনামের যুদ্ধ ব্যাপকতর যুদ্ধে পরিণত হবার আশঙ্কা সম্পর্কে অবহিত হলে, দিল্লী বৈঠক বিনাসর্তে উত্তর ভিয়েৎনামে বোমাবর্ষণে বিরতি দাবী করেছে এবং ১৯৫৪ সালের জেনেভা চুক্তির পূর্ণ প্রয়োগ, ভিয়েৎনাম থেকে সকল বৈদেশিক সেনাবাহিনীর অপসারণ এবং ভিয়েৎনাম-আলোচনা বৈঠকে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম মুক্তি ফ্রন্টের যোগদান, ভিয়েৎনামে শান্তিস্থাপনের পক্ষে অনিবার্য বলে ঘোষণা করেছে। ইতিপূর্বে ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কায়রো-বেলগ্রেড সফরের পূর্বে জেনেভা বৈঠক আহ্বান ও বৈদেশিক সেনাবাহিনী অপসারণের দাবী জানালেও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম মুক্তি ফ্রন্টের আলোচনা-বৈঠকে যোগদানের সর্ত আরোপ করেন নাই। সেদিক থেকে দিল্লী বৈঠকের সিদ্ধান্ত আরও বাস্তবানুগ। কিন্তু দিল্লী বৈঠকের বিবৃতিতে বৈদেশিক সেনাবাহিনী বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কে অস্পষ্টতা আছে বলে মনে হয়। যদিও প্রেসিডেন্ট নাসের দিল্লীর সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন যে বৈদেশিক সেনাবাহিনী বলতে মার্কিন সেনাবাহিনীই বোঝায়, অন্য দুই রাষ্ট্র-প্রধান এ-সম্বন্ধে নীরব ছিলেন। বৈদেশিক সেনাবাহিনী শব্দের প্রয়োগ যদি মার্কিনী বাহিনীতেই নিবদ্ধ থাকতো, তবে যুক্ত বিবৃতিতে তার সুস্পষ্ট অনুল্লেখ কেন? উত্তর ভিয়েৎনাম থেকে যে দক্ষিণে সমরাস্ত্র সরবরাহ হচ্ছে, সেরিলা বাহিনী শুধু নয়, নিয়মিত সেনাবাহিনীও যে দক্ষিণে অভিযান করেছে, সে-কথা আজ সুবিদিত।

দিল্লী বৈঠকের আর একটি বক্তব্যের মধ্য দিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলির ওপর উন্নত দেশগুলির আর্থিক চাপের

বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে উন্নয়নশীল দেশগুলির বৈষয়িক উন্নতি তাদের আর্থিক ও রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অপরিহার্য। উন্নত দেশগুলির পক্ষে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে আর্থিক সাহায্যদান অবশ্য কর্তব্য কেন না এই দেশগুলির ঔপনিবেশিক আমলে এদের শোষণ করেই উন্নত দেশগুলি সমৃদ্ধ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রসঙ্ঘ থেকে স্বীকৃত দায়িত্বও যে উন্নত দেশগুলি উন্নয়নকামী দেশগুলির প্রতি পালন করেনা তার উল্লেখ করে দিল্লীর যুক্ত-বিবৃতিতে বলা হয়েছে : The modest target of 1 percent of gross national product set by the United Nations for the transfer of net resources from developed to developing countries had not been reached and the terms and conditions for the transfer of these resources impose fresh burdens on the limited capacity of weaker economies.

দিল্লী বৈঠকে আর্থিক সাহায্য- দানকারী দেশগুলির রাজনৈতিক চাপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ মূর্ত হয়ে উঠেছে।

চীন সম্পর্কে যুক্ত-বিবৃতিতে কোন উল্লেখ না থাকলেও, চীন অবশ্যই বৈঠকের অনেকটা স্থান জুড়ে ছিল। চীন ভারত সংঘাতের দ্বারা শান্তিপূর্ণ আলোচনার মধ্য দিয়ে মীমাংসা চান, প্রেসিডেন্ট নাসের তাদের হতাশ করে বলেছেন এ-সম্পর্কে তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, চীন কোনো আলোচনা-বৈঠকে আসতে রাজী নয়।

এ-ছাড়া চীনের আভ্যন্তরীণ সঙ্কট ও চীনে যন্ত্র-চালিত আনবিক অস্ত্র বিস্ফোরণে যে আনবিক অস্ত্রের প্রতিযোগিতায় নূতন সঙ্কট দেখা দিয়েছে, আফ্রো-এশীয় দেশে চীন নীতি ইত্যাদি প্রসঙ্গও রয়েছে। চীনে সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণ ও বুদ্ধিমূলক সেনাবাহিনী গঠনের পক্ষপাতীদের সঙ্গে মাও সে-তুং এর গেরিলা ও রাজনীতি-নিয়ন্ত্রিত সেনাবাহিনীর পরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব, চীন কম্যুনিষ্ট পার্টির অভ্যন্তরে ক্ষমতাদ্বন্দ্বের যে ভূমিকা রচনা করেছে সাংস্কৃতিক ও রেড গার্ড বাহিনীর অভ্যুত্থান তারই পরিণতি। এই রেড গার্ডের ঝাপ্টা চীনের সীমানা অতিক্রম করে অন্যত্র-ও পৌঁছে, অকম্যুনিষ্ট বিশ্বে তো বটেই, কম্যুনিষ্ট বিশ্বেও ত্রাসের সঞ্চার করেছে। এই উপসর্গের সঙ্গে চীনের ক্ষেপণে নবম আনবিক বিস্ফোরণ নূতন উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। এই নিয়ে চীনে চতুর্থবার আনবিক বিস্ফোরণ সংঘটিত হল। সম্প্রতি রেডিও ব্রাটিস্লাভার সংবাদে প্রকাশ চীনে হিরোসিমা জাতীয় ৩০ থেকে ৪০টি আনবিক বোমা মজুত আছে। এই বেতার ঘোষণায় রুশ-চীন সীমান্তের ম্যাপ রূপায়ণের সংবাদও পাওয়া গেছে। প্রাগ রেডিও বলেছে : Sino-Soviet frontier is no longer a border of friendship.

এই পরিপ্রেক্ষিতে দিল্লী বৈঠক পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ ও আনবিক অস্ত্র বিস্তাররোধের আহ্বান জানিয়েছে। বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে সোভিয়েত রুশের উদ্বেগ, যাতে ন্যাটোর multi-lateral nuclear force-এর সাহায্যে পশ্চিম জার্মানীর হাতে আনবিক অস্ত্র না পৌঁছায় আর ব্রিটেনের উদ্বেগ, কোনো এশীয় রাষ্ট্রের হাতে, বিশেষ করে ভারতবর্ষ, কোনো আনবিক অস্ত্র তৈরীর সুযোগ না পায়। এ-সম্বন্ধে ব্রিটিশ পত্রিকা 'Times' কিছুদিন পূর্বে বলেছে :

"For the Russians the aim is primarily to prevent nuclear armament in Europe, that is Germany. For the British the urgent need is to forestall proliferation in countries such as India, where the capacity to make nuclear arms is acknowledged and where the desire is increasing in view of the Chinese threat."

জেনেভার সাম্প্রতিক নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকেও যুক্তরাষ্ট্র-সোভিয়েত-ব্রিটেনের এই মনোভাব আনবিক অস্ত্র বিস্তার-বিরোধী চুক্তির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। জেনেভা নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে আনবিক-অস্ত্র-বিস্তারবিরোধী (non-proliferation) চুক্তির যে খসড়া এই তিন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত হয়েছে, তাতে বাদ দেওয়া হয়েছে ভারতবর্ষ। এই খসড়াতে অ-আনবিক শক্তিগুলিকে সমুপদেশ দেওয়া হয়েছে আনবিক-অস্ত্রবিস্তারবিরোধিতার কিন্তু নিজেদের বেলায় এই বিস্তারের সুযোগ রাখা হয়েছে। কিছুদিন পূর্বে ব্রিটিশ নিরস্ত্রীকরণ সচিব লর্ড চ্যালফন্ট দিল্লীতে এসে প্রস্তাবিত বিস্তার-বিরোধী চুক্তি (non-proliferation treaty) নিয়ে আলোচনা করতে এসেছিলেন। তখন ভারতবর্ষের নীতি পরিষ্কার তাকে বুঝিয়ে বলা হয়েছিল, যে ভবিষ্যতে আনবিক অস্ত্র বিস্তাররোধ করলেই চলবে না, যাদের আনবিক অস্ত্র রয়েছে, তাদেরও মজুত (stockpile) কমিয়ে আনবিক নিরস্ত্রীকরণের দিকে অগ্রসর হতে হবে। চীনও এই রাষ্ট্রগুলির অন্তর্ভুক্ত হবে, এই অনুমান নিয়েই ভারতের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু ভারতের এই প্রস্তাবে বৃহৎ শক্তিবর্গ অসন্তুষ্ট হয়েছে, তাদেরও বোমার পুরোদমে হ্রাসের প্রস্তাব মনঃপুত হয় নাই। অথচ এই পারস্পরিক ব্যবস্থা ব্যতিরেকে শিগ্‌গির চীনের বোমা নিয়ে ভারতবর্ষ নিরুদ্বেগ হবে কি করে? দিল্লীর বৈঠক আনবিক নিরস্ত্রীকরণের এই নীতি সমর্থন করেছে এবং এই নীতির ভিত্তিতে যদি জেনেভার আনবিক অস্ত্রবিস্তাররোধ চুক্তি গৃহীত না হয়, ভারতবর্ষের পক্ষে বোমা তৈরী করা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকবে না।

ম্যানিলা

দিল্লীর বৈঠক ২৩শে অক্টোবর সমাপ্ত হলো এবং ম্যানিলার সাত রাষ্ট্রের বৈঠকও সেদিনই শুরু হলো দুদিনের জন্য। যারা ভিয়েৎনাম যুদ্ধে আমেরিকার সহায়ক ফিলিপাইনস, থাইল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম—আমেরিকাসহ ম্যানিলাতে তাদেরই বৈঠক বসেছিল। মালয়েশিয়া আমেরিকার ভিয়েৎনাম নীতির সমর্থক হয়েও বৈঠকে যোগ দেয় নাই, কারণ তাদের সামরিক সাহায্য দেবার সামর্থ্য নেই। জাপানও এই বৈঠকে থেকে দূরে রয়েছে। হয়তো বা কোন সময় যদি শান্তিপ্রস্তাবের দূতিয়ালী করতে হয় এই কারণে ম্যানিলা সম্মেলন ভিয়েৎনাম সমস্যা নিয়েই সীমাবদ্ধ ছিল। গত ২২শে সেপ্টেম্বর রাইসভে আমেরিকার স্থায়ী প্রতিনিধি আর্থার গোল্ডবার্গ যে নূতন শান্তিপ্রস্তাব দিয়েছিলেন পিকিং ও হানয় তাকে আলিয়াতী —sainlo—বলে ব্যাখ্যাত করেছে। দেশের বাইরে এবং ভেতরে ভিয়েৎনাম নীতির চারপাশে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ, সেনেট ও হাউস অফ রিপ্রেসেন্টেটিভস-এর মধ্যকালীন নির্বাচন এবং দিল্লীতে মনু-এলাইনড রাষ্ট্রের বৈঠকে ভিয়েৎনাম-নীতির সম্ভাব্য সমালোচনার মুখেই ম্যানিলা সম্মেলনের পট তৈরী হয়েছিল। ম্যানিলা সম্মেলনের প্রচ্ছদে শান্তির ছোঁয়া থাকলেও তার আসল উদ্দেশ্য ভিয়েৎনাম যুদ্ধে একটি এশীয়-সংহতি গড়ে তোলা। এই সম্মেলনে আমেরিকার এই দুই উদ্দেশ্যই সাধিত হয়েছে। বর্তমান সামরিক উদ্যোগ অক্ষুণ্ণ রাখবার সঙ্কল্প ম্যানিলায় গৃহীত হয়েছে, যতদিন না উত্তর ভিয়েৎনামের আক্রমণের পরিসমাপ্তি ঘটে: As firmly and as long as may be necessary in close consultation among ourselves until the aggression is ended.

এ-ছাড়া উত্তর ভিয়েৎনামের 'সামরিক ধ্বংসাত্মক বাহিনী ও অনুপ্রবেশ' দক্ষিণ ভিয়েৎনাম থেকে অপসারিত হবার জন্য বলের জন্যে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম থেকে তার মিত্রবর্গ তাদের সামরিক সাহায্য ও সামরিক ঘাঁটিগুলি সরিয়ে নিয়ে যাবে।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামে কম্যুনিষ্টদের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ ভিয়েৎকংদের সামরিক উদ্যোগ নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত যে আমেরিকা ও তার বিশ্বস্ত দক্ষিণ ভিয়েৎনাম থেকে সৈন্যসামন্ত সরিয়ে নেবে না, তা এই বিবৃতি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, যদিও বিবৃতিতে বলা হয়েছে : At the same time our united purpose is peace—peace in south Vietnam and in the rest of Asia and the Pacific.

ভিয়েৎকংদের সম্পর্কে মার্কিণ সরকারের মনোভাব, টাউনসেণ্ড হপস, ডেপুটি এসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী অব ইন্টারন্যাশনল সিকিউরিটি এফেয়ার্স, কংগ্রেসম্যান লেয়ার্ড-এর প্রশ্নের উত্তরে যা বলেছেন, তাতেই স্পষ্ট হয়েছে : Let me assure you the Department of Defence believes the Ambassador Goldberg's speech (to the United Nations on September 22) includes the intent that Viet cong military units would be deactivated in any proposed withdrawal of external forces from South Vietnam. "Deactivation" কথাটির অর্থ আদৌ জটিল নয়। ভিয়েৎকং এর বিলোপই এই শব্দটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে।

ম্যানিলা সম্মেলন ভিয়েৎনাম সঙ্কটের মূলত সামরিক সমাধানেরই চূড়ান্ত প্রস্তুতি। ইতিমধ্যে ভিয়েৎনাম যুদ্ধে মার্কিনী 'ফাইটার' বোমারু হয়েছে প্রচুর। পাইলট-এরও ঘাটতি দেখা দেছে। এই ঘাটতি পূরণের আয়োজনও চলছে। ভিয়েৎনামে মার্কিনী সেনাবাহিনী, এই বছর ফুরোবার আগেই চার লক্ষের সীমা ছাড়িয়ে যাবে। এদিকে আগামী দুই বছরের মধ্যে আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পালা, তার অন্তত: দেড় বছর পূর্বেই জনমনকে ভিয়েৎনাম যুদ্ধের বিনাত্রা করতে হবে। কারণ এবারকার মধ্যকালীন মার্কিনী নির্বাচনে ডেমোক্রাটদের বিরোধী হাওয়া বইতে দেখা গেছে। সুতরাং আগামী ছয়মাসের মধ্যে হানয়-পিকিং-এর পক্ষেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়। আমেরিকার প্রবল আক্রমণের মুখে হানয়ের প্রতিরোধ এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনামে হানয়-সমর্থকদের দুর্বার সংগ্রামে, ম্যানিলা সম্মেলনে ১৭অক্ষরেখার এই সংঘাতের সীমানা টানতে আমেরিকা বাধ্য হয়েছে। উত্তর ভিয়েৎনাম আক্রান্ত হবে না, এই আশ্বাস ম্যানিলা প্রস্তাবে নিহিত রয়েছে। কিন্তু এই অনুচ্চারিত আশ্বাসই হানয়-পিকিং-এর পক্ষে যথেষ্ট নয়। ফাইটার এবং পাইলটের ঘাটতি সত্ত্বেও আমেরিকার বিমান শক্তি এখনও প্রচণ্ড। আমেরিকার এই প্রচণ্ড শক্তি সত্ত্বেও এবং যুদ্ধান্তে আর্থিক সমৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের আভ্যন্তরীণ জীবনকে আমেরিকার ভিয়েৎনাম নীতি স্পর্শ করতে ব্যর্থ হয়েছে। আমেরিকার কোনো কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি দক্ষিণ ভিয়েৎনামের আভ্যন্তরীণ জীবন সম্পর্কে যে রূপরেখা অঙ্কন করেছেন ভিয়েৎনাম সমাধানে সেগুলিও উপেক্ষণীয় নয়, যদিও সে মতামতের চূড়ান্ত মূল্যায়ন আজই সম্ভব নয়। 'নিউ ইয়র্ক' টাইমস-এর সাংবাদিক নীল শীহান (Neil Sheehan) বলেছেন : In Vietnam, only the communists represent revolution and social change for better or for worse according to a man's politics"

শীহান-এর সঙ্গে একমত না হয়েও বলা যায় দক্ষিণ ভিয়েৎনামের আভ্যন্তরীণ জীবনে যদি কম্যুনিষ্টদের বৈপ্লবিক প্রবণতা অন্বিতীয় হয়ে থাকে তবে আপোষ-আলোচনায় হানয়-পিকিং-এর এতো ভয় কেন? নীল শীহানের সিদ্ধান্তকে মেনে নিলে আলোচনা বৈঠককে অনিবার্য করে তোলা উচিত এবং কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রদের পিকিং-হানয়ের এর ওপর চাপ দেওয়া উচিত।

১২. ১১. ৬৬

২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এজেন্সীজ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জয়ন্তী

৩১ বর্ষ অষ্টম সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩৭৩

সম্পাদকীয়

খাদ্যসংকটের তীব্রতাবৃদ্ধি

তীব্র খাদ্যসঙ্কট আসন্ন প্রায়। তার পূর্বাভাস এরই মধ্যে সুরু হয়ে গেছে। পশ্চিম বঙ্গে রেশনের চাল গমে টান পড়েছে। বিহারে খরার দুর্যোগ লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনাহারে মৃত্যুর মুখাপেক্ষী করে তুলছে এবং এই খরা অঞ্চলের রিলিফ নিয়ে সেখানে নির্বাচনী রাজনীতি চলছে। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী দাবী করেছেন চার লক্ষ টন খাদ্য কেন্দ্রকে দিতে হবে, বিহারের প্রয়োজন মেটাবার জন্য। কেন্দ্রের পক্ষে যা আদৌ সম্ভব নয়। তাছাড়া বিহারের মুখ্যমন্ত্রী খোলাখুলি অভিযোগ করেছেন। কেন্দ্র-সরকার রাজ্য সংকারকে সময়মত প্রয়োজনানুযায়ী খাদ্য সরবরাহ না করে বিপন্ন করে তুলেছেন। বিহারের প্রশাসনিক অব্যবস্থার জন্য বারবার বিরোধীদের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের দাবী উঠলেও কেন্দ্র সেই দাবী মানতে সম্মত হয় নাই। অথচ অবস্থা যা দেখা যাচ্ছে তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় বিহারের মন্ত্রীসভা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে নির্বাচনী রাজনীতির অতলে তলিয়ে গেছে। তাদের সুষ্ঠু প্রশাসনের না আছে অবসর বা আগ্রহ। তাই কেন্দ্র থেকে ক্যাবিনেট সেক্রেটারীর নেতৃত্বে ভারত সরকারের একটি পরিদর্শক দল বিহারের খরা অঞ্চল সরেজমিনে পরিদর্শন করে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিহার সরকারের যৌথ জরুরী কমিটি গঠন করে বিহারের দুর্গত অঞ্চল সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের আয়োজন হয়েছে।

খাদ্য পরিস্থিতির সঙ্কট তীব্রতর করে তুলেছে সম্প্রতি মার্কিনী খাদ্য প্রেরণে জনসনের নীতি। গত পাঁচমাস যাবৎ ভারত সরকার আমেরিকার কাছে বিশলক্ষটন খাদ্য আমদানীর জন্য তদ্বির করে আসছে। আমেরিকার সঙ্গে পি. এল ৪৮০ অনুযায়ী ভারতে মার্কিনী গম—মাইলো ইত্যাদি আমদানীর চুক্তি ডিসেম্বরের মাঝামাঝি ফুরিয়ে যাবে। সুতরাং ডিসেম্বরের পূর্বেই যদি নূতন চুক্তি সম্পাদিত হয়ে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে খাদ্য আমদানী সুরু না হয়, জানুয়ারীর মাঝামাঝি থেকে দারুণ খাদ্যসঙ্কট দেখা দেবে। নূতন মার্কিনী খাদ্য আসছে না, এ-খবর বহুপূর্বে জানা গেলে সেই অনুযায়ী ভারত সরকারকে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণে অনেক আগেই উদ্যোগী হতে হোতো। কিন্তু আমেরিকার পক্ষ থেকে এই চাপ অকস্মাৎ এসে পড়ায় সঙ্কটও হঠাৎ মূর্ত হয়ে উঠেছে। জনসন স্বয়ং-ই নূতন চুক্তি সম্পাদনে অনিশ্চয়তা ও বিলম্ব সৃষ্টি করেছেন এবং কারণ স্পষ্টতই রাজনৈতিক। ভিয়েৎনামে মার্কিনী বোমাবর্ষণের বিরুদ্ধে ভারতীয় প্রতিবাদ আজ কারণ হলেও, ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ জীবনে খাদ্যের ঘাটতির সমবন্টনের অভাব, ঘাটতি রাজ্যগুলিকে বাড়তি রাজ্যগুলির সাহায্যদানে কার্পণ্য। ঘাটতি রাজ্যগুলির প্রয়োজনাতিরিক্ত সাহায্যের দাবী উত্থাপন, কৃষি উৎপাদনের অব্যবস্থা, খরা নিয়ে রাজনীতি, প্রশাসনিক দুর্নীতি প্রভৃতি ঘটনাবলীর সমবেত ফলশ্রুতিও মার্কিনী চাপের ইন্ধন যুগিয়েছে। তাছাড়া সার কারখানা স্থাপনে মার্কিনী সহায়তার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের সূক্ষ্ম চাপও নিহিত রয়েছে জনসনের এই সিদ্ধান্তে। জনসনের আরও অভিযোগ রয়েছে ভারতবর্ষ কেবলই মার্কিনী খাদ্যের উপর কেন নির্ভরশীল হয়ে থাকবে, কিন্তু, সোভিয়েট রাশিয়াতেও

এবার প্রচুর খাদ্য উৎপাদিত হয়েছে, তাদের কাছে ভারতবর্ষ কেন সাহায্য প্রার্থী হবে না। প্রকৃতপক্ষে ভারতের খাদ্য আমদানীর জন্য মার্কিন মুখাপেক্ষিতা আতঙ্কের এই সঙ্কট এগিয়ে এনেছে। মার্কিনী চাপের পর ভারত সরকার চতুর্দিকে ছুটোছুটি শুরু করেছে। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া এবং এমন কি সোভিয়েট রুশের নিকটও সাহায্যপ্রার্থী হয়েছে। ভারত সরকারের খাদ্যনীতি ইতিমধ্যে পুনর্নির্ধারণের প্রয়োজন ছিলই, কেননা, অতঃপর ভারতবর্ষ মার্কিনী গম খয়রাতী পাবেনা, নগদ টাকায় তাকে গম কিনতে হবে, যদিও টাকা দেবার মেয়াদ চল্লিশ বছর পর্যন্ত ধার্য থাকতে পারে। মার্কিনী চাপ খাদ্য আমদানীর এই অনিশ্চয়তার মধ্যে ভারত সরকারের জাতীয় খাদ্য পরিবন্টনার ব্যবস্থাটি একটি হাস্যকর পরিচ্ছেদ। গত ১৫ই নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে জাতীয় খাদ্য-পরিবন্টনার নামে একটি রাজ্যে একটি খাদ্য এলাকার গতানুগতিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং কোন বাড়তি এলাকা থেকে কোন ঘাটতি এলাকায় কত খাদ্য সরবরাহ করা হবে, খাদ্য-পরিবন্টনার পরিসমাপ্তিতে সেই লক্ষ্যটি স্থির করে কার্য সমাধা করা হবে। বলাবাহুল্য পরিবন্টন খাদ্য-পরিবন্টনার আওতায় যে আদৌ নেই তা বোঝা যায় খাদ্যমন্ত্রী সুব্রহ্মনিয়মের এই স্বীকৃতিতে যে যেখানে বাড়তি এলাকার মাথা পিছু সরবরাহ দৈনিক ১৮ আউন্স যেখানে কোনো কোনো ঘাটতি এলাকার এই পরিমাণ ৬ আউন্সের সীমানার উর্ধ্বে নয়। অথচ এই পরিবন্টনার ব্যবস্থাই গত তিন বছর যাবৎ চলে আসছে।

গত ২৬শে নভেম্বর প্রেস ক্লাব অব ইণ্ডিয়ার বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী কোনো কোনো রাজ্যে রেশনের বরাদ্দ হ্রাসের সম্ভাবনার কথা বলেছেন। গম সম্পূরকের জন্য চাউলভোজী রাজ্যে গমের বরাদ্দ কমিয়ে দেবার কথাও উঠেছে। পশ্চিম বঙ্গে ইতিমধ্যে রেশনে গমভোজীদের চাউলের বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কোনো কোনো সপ্তাহে চাউলের সরবরাহ অনিশ্চিত হয়ে উঠেছিল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুব্রহ্মনিয়ম বলেছেন গত বছরের চাইতে এ বছর খাদ্যের অবস্থা আরও সঙ্কটজনক, যদিও গত বছরের সাত কোটি বিশ লক্ষ টনের তুলনায় এবার খাদ্য উৎপাদন ৮ কোটি থেকে ৮ কোটি ৫০ লক্ষ টন হবার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ খরার ফলে সরবরাহের সুতরাং পথে যে সম্পদ ছিল তা অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যয়িত হয়ে গেছে।

জাতীয় স্তরে খাদ্যের যেখানে এই অবস্থা রাজ্যস্তরে পশ্চিম বঙ্গে আগামীবার এই বছরের চাইতে আরও দুঃসহ অবস্থা হবে। পশ্চিম বঙ্গে গত বছরের ৪৯ লক্ষ চাউলের উৎপাদনের সঙ্গে ১৫ লক্ষ টন গম ও প্রায় দুই লক্ষ টন চাউলের কেন্দ্রীয় সরবরাহ যুক্ত হয়ে কোনো মতে ৮৫ লক্ষ লোকের ট্যাটুটায়ী রেশনিং সমেত খাদ্য প্রয়োজনের জন্য পাওয়া গিয়েছিল। এবারকার উৎপাদন ৩৮ লক্ষ টন হবে অনুমিত হয়েছে, প্রয়োজন হিসাব করা গেছে ৬৮ লক্ষ টন, সুতরাং ঘাটতি হবে ৩০ লক্ষ টন। এই বিপুল ঘাটতি মেটাবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রয়ে গেছে। কারণ, গমের আমদানী অনিশ্চিত, চাউলের সরবরাহও তাই।

এই ঘাটতির মুখে গত ১লা নভেম্বর থেকে একটি নূতন সংগ্রহনীতির ভিত্তিতে খাদ্য কর্পোরেশনকে পশ্চিম বঙ্গে খাদ্য সরবরাহের ভার দিয়েছে। এই নূতন সংগ্রহনীতিতে গত বছর নভেম্বরে যে আবশ্যিক সংগ্রহনীতি সরকার গ্রহণ করেছিল সেই নীতি বর্জন করে সেচযুক্ত এলাকায় দশ একরের উর্ধ্বে এবং সেচযুক্ত এলাকায় সাত একরের উর্ধ্বে জমির উপর লেভি ধার্য করেছে এবং গতবছরের ন্যায় চাউল কলগুলি থেকে শতকরা ১০০ ভাগ উৎপাদন লেভি না করে শতকরা ৫০ ভাগ উৎপাদন লেভির নীতি গ্রহণ করেছে। চাউলের সংগ্রহ মূল্য গত বছরের দর প্রতি ১৪, ১৫, ১৬ টাকার স্থলে ১৬, ১৭, ১৮ টাকা ধার্য করা হয়েছে। ধান-চাউলের সর্বোচ্চ বিক্রয়মূল্য এবার রদ করে

দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই নূতন নীতির পরিণাম এখনই স্পষ্ট হতে সুরু করেছে। ১৯৬৭র ডিসেম্বরে নূতন চাউল ওঠার সময় সরকার নির্ধারিত দর ১৫ টাকা মণ মূল্যে গরীব কৃষকরা তাদের নূতন ফসল বিক্রয়ের সুযোগ পেয়েছিল, যেখানে এদের অন্যান্যবার ৯।১০ টাকা করে বাধ্যতামূলক বিক্রয় (distress sale) করে ঘরে ফিরতে হোতো। অবশ্য ধানের দর কালোবাজারে ৩৫ টাকাও উঠেছিল। এবার সুরুতেই বৃহৎ ব্যাপারীরা ২৫ টাকা মণ দরে ধান কিনতে সুরু করেছে। ফলে গত বছর কো-অপরেটিভগুলি নির্ধারিত মূল্যে প্রায় ১৬ কোটি টাকার চাউল কিনে গরীব কৃষকদের বাঁচানোও এবার সরকারী নির্ধারিত মূল্যের চাইতে বেশী দামে তাদের জন্মের অধিকার না থাকার ফলে এই কালোবাজারের ব্যাপারীদের সঙ্গে তারা এঁটে উঠতে পারবে না। ফল যা হবার তাই হবে ; নূতন ফসলের সুরুতেই এবার চাউলের দাম আকাশচুম্বী হবে। তাছাড়া চাউলকল ওয়ালারাও কালোবাজারের ব্যাপারীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় উঁচুদরে ধান কিনে তার পঞ্চাশ ভাগ সরকার নির্ধারিত দরে সরকারের নিকট বিক্রয় করে বাকী পঞ্চাশ ভাগ অত্যন্ত চড়া দরে খোলাবাজারে বিক্রি করে শুধু লোকসান মেটাবে না, লাভও করবে। সুতরাং অবস্থা কি হতে পারে সহজেই অনুমেয়। সরকারের লক্ষ্য শুধু ৮৫ লক্ষ লোকের রেশনের প্রয়োজনীয় চাউল সংগ্রহ। এই পরিমাণ চাউল প্রায় ৫ লক্ষ টন—৮৫ লক্ষের জন্য ১০ লক্ষ টন ধানের অর্থেক পরিমাণ চাউলের প্রয়োজন—এই হিসাব ধরে। বাকী অর্ধেক সম, সেই সমের পরিমাণও নির্ভর করবে কেন্দ্রীয় সরবরাহের উপর, যে সরবরাহের বহুলাংশ বিহারের ও উত্তর প্রদেশের খরা অঞ্চলের জন্য প্রয়োজন হবে। সুতরাং খাদ্য পরিস্থিতির বিভীষিকা সহজেই অনুমান করা যায়।

ছাত্র আন্দোলন ও শিক্ষা সংহার

প্রায় তিন মাস যাবৎ দেশের ওপর দিয়ে ছাত্র আন্দোলনের ঝড় বয়ে চলেছে এবং সেই সঙ্গে শিক্ষা-ব্যবস্থা ধ্বংসোন্মুখ ও শিক্ষার পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে পড়েছে। একটি সরকারী বিশ্লেষণে দেখা গেছে অন্ধ্র বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিম বাংলার ছাত্র আন্দোলন প্রবল রূপ নিয়েছিলো। সেই সঙ্গে এ-ও দেখা গেছে শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্ক রহিত কারণে আন্দোলনের প্রকোপও বৃদ্ধির দিকে এবং সেই আন্দোলন অনায়াসেই ধ্বংসাত্মক পরিণতি নিচ্ছে। এই ধরণের আন্দোলন সমগ্র আন্দোলনের শতকরা ৩ ভাগ ছিল ১৯৬৪, ১৯৬৫-এ সেই অনুপাত দাঁড়ায় শতকরা পাঁচ-ভাগে এবং ১৯৬৬তে এই সংখ্যা শতকরা ১৭-৪এ পৌঁছায়। ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক থাকবে কি থাকবে না, সে প্রশ্ন আজকের ভারতবর্ষে অবান্তর। কেন না, স্বাধীনতার যুগে যেমন স্বাধীনতা-উত্তর যুগেও তেমনি বিপন্ন জাতীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কিম্বা অনস্বার্থের সঙ্কট দেখা দিলে জাতীয় জীবনের ও জনজীবনের অংশরূপে ছাত্রদেরও এগিয়ে এসে বিপদের ঝুঁকি নিঃসন্দেহে নিতে হবে। ছাত্রদের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কিত সঙ্কট কিম্বা ছাত্রদের শিক্ষা-জীবনের সীমিত স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজন হোলে আন্দোলনের পথ গ্রহণ তাদের পক্ষে অনিবার্য হয়ে উঠবে।

কিন্তু ছাত্র-স্বার্থ রক্ষার নামে ছাত্র-জীবন ও শিক্ষা-ব্যবস্থার মূলেই যদি কুঠারাঘাত করা হয়, সেক্ষেত্রে এই আন্দোলন জাতীয় জীবনে এক নূতন সঙ্কট ডেকে নিয়ে আসবে। সম্প্রতি কলকাতায় শিক্ষা-জীবনে এই সঙ্কট দেখা দিয়েছিলো কিনা সেটাই বিচার্য। কিছু সংখ্যক ছাত্র প্রায় সত্তর দিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ পিকেটিং করে অচল করে রেখে প্রায় লক্ষাধিক ছাত্রের ভবিষ্যৎ শিক্ষাজীবন বিপন্ন করে তুলেছিল। তাদের দাবী ছিল বিভিন্ন কলেজে সাম্প্রতিক বহিষ্কৃত ছাত্র-ছাত্রীদের নিজ নিজ কলেজে পুনর্বহালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তক্ষেপের দাবী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-

কানুন এই হস্তক্ষেপের প্রতিকূল হলে, সেই আইন-কানুনের পরিবর্তনসাধন করে বহিষ্কৃত ছাত্রদের পুনর্গ্রহণ। এই আইন-কানুনগুলির পরিবর্তনসাধন সিনেট সিন্ডিকেটের এক্তিয়ার-ভুক্ত একথা জেনেও ছাত্রদের পিকেটিং বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ অচল করে রেখেছিল। রেজিস্ট্রার এই বিষয়টি সিন্ডিকেট সিনেটকে বিবেচনার জন্য বলবেন এই আশ্বাস পাবার পর পিকেটিং বন্ধ হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় ১৫ই ডিসেম্বর থেকে খুলেছে। এই আশ্বাসের জন্য এতোদিন ইউনিভার্সিটির কাজ অচল করার কোনো প্রয়োজন ছিল কি না, ছাত্র-সমাজের পক্ষে সেটা বিচার্য। যে ছাত্র দল—যারা নিঃসন্দেহে কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্কিত—দুই-মাসের ওপর পিকেটিং করে ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ দিয়ে এবং লক্ষাধিক ছাত্রের শিক্ষাজীবন বিপন্ন করে এই কর্তৃপক্ষের এক্তিয়ার বহির্ভূত কাজে বাধ্য করতে চেষ্টিত হয়েছে, অনায়াসেই তারা সিন্ডিকেট সিনেটের নিকট দাবী উত্থাপন করতে পারতো। বৃহত্তর ছাত্রসমাজের শিক্ষাজীবন বিপন্ন না করেও,—সে পথ তারা গ্রহণ করে নাই।

প্রেসিডেন্সী কলেজের ঘটনা আরও মর্মান্তিক। এই কলেজে ছাত্র বহিষ্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পরিণতিতে অমূল্য জাতীয় সম্পদ কলেজের 'বেকার লেবরেটরী' লুণ্ঠিত হয়েছে। মূল্যবান যন্ত্রপাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, এমন কি বরেণ্য বিজ্ঞানসাধক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও আচার্য জগদীশ চন্দ্রের মূর্তি বিকৃত করা হয়েছে। ইডেন হোস্টেলে সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও তাঁর পরিবারবর্গের সহিত যে অশালীন আচরণ করা হয়েছে, বর্তমান চীনের রেডগার্ডদের আচরণ সম্পর্কে যা সংবাদ বেরিয়েছে, সে ছাড়া সভ্যজগতের আর কোথাও কোনো নজীর নাই। কর্তৃপক্ষের কোনো ত্রুটি কিম্বা কোনো অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মর্যাদা, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের মর্যাদা ও শিক্ষার মূল্যবোধ বজায় রেখে নানা আন্দোলনের পথ খোলা ছিল। সে-পথ গ্রহণ না করে যে পথে এই আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে, সে-পথ শিক্ষা-ব্যবস্থা সংহারের পথ। অবশ্য গোড়াতেই যদি ইডেন হোস্টেলের ঘটনার গতিমুখ রোধের জন্য প্রিন্সিপালে অগ্রসর হতেন এবং শাসন ও সহৃদয়তা দিয়ে ছাত্র-বিক্ষোভের উত্তেজনা স্তিমিত করতে অগ্রসর হতেন, তবে হয়তো প্রেসিডেন্সী কলেজের ঘটনাকে এবং সেক্রেটরী ভবনের তাণ্ডবকে সিকিং রেডিও থেকে চীনের রেডগার্ডের অনুকরণে 'সাংস্কৃতিক বিপ্লবের' বহড়ারূপে প্রচারিত হওয়ায় যারা উল্লসিত হয়েছেন, জাতীয় জীবনে তাদের বিষবাষ্প সঞ্চারণের সুযোগ খুঁজে পেতেন না। সিকিং রেডিওর এই প্রচার কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, এই উচ্ছৃঙ্খলতার ইন্ধন যোগাতে তাদের প্রস্তুতির পূর্বাভাস আছে।

মেননের মনোনয়ন

উত্তর-পূর্ব বোম্বাই লোকসভা আসনে কৃষ্ণ মেননের মনোনয়নে পালিত-অতুল্যঘোষ চক্রের প্রতিরোধ সফল হয়েছে। এই ভোটে মোরারজী দেশাই এবং সি. বি. গুপ্তও যোগ দিয়েছেন। কৃষ্ণ মেননের পক্ষে কামরাজ এবং ইন্দিরা গান্ধীর, কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিটির এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও মেননের এই ভাগ্যবিপর্যয় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে পালিত চক্রের সংহতি বৃদ্ধি ও ইন্দিরা গান্ধী কামরাজের শিথিল সম্পর্ক সপ্রমাণ করেছে। নির্বাচন-উত্তর পরিস্থিতিতে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্ব যে কতটা বিপন্ন হতে পারে মেননের পরাজয়ও তারই ইশারা। মেননের পরাজয়ের আর একটি ইঙ্গিতও প্রনিধানযোগ্য। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে মার্কিনমুখীনতা ও সোভিয়েটবিরূপ মুখীনতারও একটি প্রচ্ছন্ন দ্বন্দ্ব রয়েছে—মেননের পরাজয়ে মার্কিন দিকে পাল্লা ভারী হলো বলা চলে।

রোডেশিয়া

দুবছর পাগলের উপর ডিসেম্বরের ২রা ও ৩রা নাটকীয় ভাবে রিটিশ যুদ্ধজাহাজ 'টাইগারে' অধিরাজ সোপনীয় আলোচনা

করে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী উইলসন ও রোডেশিয়ার বিদ্রোহী প্রধান মন্ত্রী আয়ান স্মিথ যে খসড়া শীর্ষসোটি রচনা করেছিলেন রোডেশিয়া কর্তৃক সে-খসড়া বাতিল করে দেবার পর গত ১৭ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘে রোডেশিয়ার সকল প্রকার তৈল ও তৈলজাত দ্রব্য রপ্তানি নিষিদ্ধ করে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির পক্ষ থেকে বৃটেনের উপর সর্বতোভাবে রোডেশিয়ার তৈল চালান নিষীদ্ধকরণের একটি প্রস্তাব ব্রিটেন গ্রহণ করে নাই, কারণ ব্রিটেনকে সেক্ষেত্রে সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করে এই দায়িত্ব পালনে একাকী অগ্রসর হতে হয়। আর একটি আফ্রিকান প্রস্তাবেও বৃটেন সম্মত হয় নাই। সে প্রস্তাবটি হচ্ছে মেজরিটি শাসন স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত ব্রিটেন রোডেশিয়াকে স্বাধীনতা দানে বিরত থাকবে। এই প্রস্তাবটিতে ব্রিটেনের অসম্মতি ব্রিটেনের অন্তিম উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রাখবে যদিও সামরিক অবরোধ বৃটেনের একক দায়িত্ব না হয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল রাষ্ট্রের দায়িত্ব হওয়া উচিত।

নির্বাচনে বিরোধীদের দ্বন্দ্ব

নির্বাচন এগিয়ে আসছে। আগামী ১৯শে ফেব্রুয়ারী সমস্ত পশ্চিম বঙ্গে একদিনে নির্বাচন সম্পন্ন হবে। কিন্তু, নির্বাচন এগিয়ে এলেও অন্যান্যবারের নির্বাচনের মত এই চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে উৎসাহ ও ঔৎসুক্য এখনও সরব হয়ে ওঠে নাই। নির্বাচকদের এই নিস্পৃহতার কারণ বিরোধীদের মধ্যে প্রবল বিরোধ, এবং সভা-সমিতিতে কংগ্রেসকে কার্যত রেহাই দিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আক্রমণ। নভেম্বরের মাঝামাঝি কম্যুনিষ্ট পার্টির দুই শরীকের নেতৃত্বে যে ঐক্য প্রচেষ্টা চলেছিল তা ব্যর্থ হবার পরই পারস্পরিক আক্রমণ তীব্র হয়ে উঠেছে এবং দুই কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে দুইটি জোট তৈরী হয়েছে। সিকিং পন্থী কম্যুনিষ্টদের শিবিরে আরও ছয়টি ছোট ছোট দল একত্র হয়ে সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট করেছে এবং মস্কোপন্থী কম্যুনিষ্ট পার্টি বাংলা কংগ্রেস ফরোয়ার্ড ব্লকের সমাবেশে সংযুক্ত বামপন্থী গণফ্রন্ট গঠিত হয়েছে। পার্লামেন্ট ও বিধান সভার উভয় ক্ষেত্রেই এই দুই জোটের সংঘর্ষ বৃদ্ধির দিকে। সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট ২৯টি এবং সংযুক্ত বামপন্থী গণ ফ্রন্ট ২৪টি লোকসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, তার মধ্যে পাচটি আসনে সিকিং ও মস্কোপন্থীরা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত। বিধান সভার কতগুলি আসনে এদের পরস্পরের বিরোধ রয়েছে তা এখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠে নাই। কারণ সম্প্রতি সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট থেকে হুমকি দিয়ে সংযুক্ত বামপন্থী গণফ্রন্টকে জানানো হয়েছে যে ত্রিশটি আসন থেকে এই ফ্রন্ট যদি তাদের প্রার্থী সরিয়ে না নেয়, সেক্ষেত্রে সংযুক্ত গণফ্রন্টের বিরুদ্ধে অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রার্থী দাঁড় করানো হবে।

এ-ছাড়াও অন্যান্য দল রয়েছে। পি. এস, পি কোনো ফ্রন্টেরই অন্তর্ভুক্ত নয়। যদিও পি. এস, পি আসন মুক্তির জন্য সকল দলের সঙ্গেই আলাপ আলোচনা করেছে। নিজের শক্তিতে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে একক ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের যে পরিচ্ছন্ন নীতি পি. এস, পি গ্রহণ করেছিল, বিভিন্ন দলের সঙ্গে আলোচনা ও ফ্রন্টে যোগদানের প্রবণতা দেখিয়ে পি, এস, পি তা থেকে নিঃসন্দেহে বিচ্যুত হয়েছে। ১৯৬২ সালের নির্বাচনে পি, এস, পি যে নীতি গ্রহণ করেছিল নির্বাচনী বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে সেই নীতির অনুসরণই পি. এস, পির পক্ষে এবং দেশের পক্ষেও এক পরিচ্ছন্ন নীতির বাহক হিসাবে গৌরবের এবং মঙ্গলের ছিল। এ-ছাড়া অন্যান্য দলও রয়েছে. জনসংঘ, হিন্দুমহাসভা প্রভৃতি। জনসংঘের সংগঠন এ-রাজ্যে কিছু দানা বাঁধতে শুরু করেছে, কর্পোরেশনের গত উপনির্বাচনে জনসঙ্ঘের প্রার্থীর জয়ে তার পরিচয় পাওয়া গেছে।

আমরা পূর্বেই বলেছি, বিশ্ব কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের সংঘাত বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতিতে গড়িয়ে এসেছে।

চীন-রুশ দ্বন্দ্বের সাম্প্রতিক পরিণতি এই দ্বন্দ্বকে আরও তীব্র, তিক্ত ও কঠোর করে তুলেছে। চীনের আভ্যন্তরীণ জীবনে তথাকথিত সাংস্কৃতিক বিপ্লব, রেড গার্ডদের তাণ্ডব এবং এই রেড গার্ড সংগঠনের আন্তর্জাতিক রূপায়ণের প্রচেষ্টা চীনপন্থীদের মানসিকতার নিয়ামক। এ-ছাড়া স্থানীয় চীন-পন্থীদের সঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের কংগ্রেসের নেতৃত্বের অন্তত যোগাযোগের প্রসঙ্গও সরল হয়ে উঠেছে। পশ্চিম বঙ্গের নির্বাচনে বিরোধী জোট পার্টির জোট দিয়ে যে উদ্যোগ সুরু হয়েছিল সে উদ্যোগ অব্যাহত থাকলে কংগ্রেসের এই রাজ্যে ক্ষমতাচ্যুত হবার সম্ভাবনা ছিল, যদিও নির্বাচনোত্তর কালে সরকার গঠনে এবং এই জোটের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ ছিল। কিন্তু, আসলে মস্কোপন্থী ছাড়াও অন্যান্য দল যারা নির্বিচারে সায় দিয়ে তাদের শিবিরের অন্তর্ভুক্ত হতে সম্মত নয় এমন দলের সঙ্গেও পিকিং পন্থীরা আদৌ জোট গঠনে আগ্রহী ছিল না। যেটুকু জোট ও ঐক্যে আলোচনা হয়েছে, তা নিছক লোক-দেখানো। জনমতের কিছুটা মনোরঞ্জন মাত্র। আসলে তাদের সর্তে জোট হয় তো ভাল, নইলে নয়। পিকিং-পন্থীদের এই মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাছাড়া, নির্বাচনে এদের বিশ্বাস নেই, নির্বাচনের অপেক্ষায়ও এরা নেই। সরকার গঠন করে দেশের আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থার স্থিতি ও উন্নতির আগ্রহ এদের কতটা সে সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কারণ তাদের চীনমুখীনতা সীমান্তের ওপারে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছে, কবে চীনা সামরিক বাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করে শস্ত্র সরবরাহের দ্বারা অন্তর্বিপ্লবের সহায়তা করবে সেই পথেই তাদের প্রস্তুতি সেই দিনের জন্যই তাদের অপেক্ষা। কংগ্রেস শাসন আরও কিছুদিন চালু থাকলে দেশের অভ্যন্তরে সঙ্কট আরও গভীর ও ব্যাপ্ত হবে। বিশৃঙ্খলতার পটভূমি ব্যাপকতর হবে এবং ফলে যে power vacuum হবে, সেই শক্তিক্ষেত্রের শূন্যতায় অন্তর্বিপ্লবের পথ অপেক্ষাকৃত সরল হবে। সুতরাং, আরও কিছুদিন ক্ষমতায় কংগ্রেসের অবস্থান তাদের কাম্য হওয়াটা অবিশ্বাস্য নয়। এই কৌশলের প্রয়োগে এই রাজ্যের কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে গোপন সমঝোতাও তাই স্বাভাবিক ঘটনা। পশ্চিম বঙ্গে কংগ্রেস শাসনের আরও কিছুদিন স্থায়িত্ব এই প্রস্তুতির সহায়ক ভূমিকা রচনা করবে। তার পরই পিকিং-পন্থীদের শেষ লড়াইয়ের দিন অপেক্ষা করছে। গত ২৭শে সেপ্টেম্বরের কলকাতার ময়দানের বক্তৃতায় পিকিং পন্থী নেতা রশদিভের মুখে তাই উচ্চারিত হয়েছে, 'হয়তো বা এটাই ভারতের শেষ নির্বাচন'।

বিক্ষত ঃ বিকাশ দাশ

আমার শপথ ছিল ফুলগুলি ফুটিয়ে দেবার।
আমি ফুল ফোটাতে চেয়েছি,
ফুল তবু ফোটাতে পারিনি—
ফোটাতে পারি নে আমি আর ;
আমার চারপাশ থেকে সাপদের মতো এসে
আমাকে ঘিরেছে অন্ধকার।

ভোর হয়ে গেছে ভেবে ডেকে-ওঠা পাখির মতন,
আমিও উজ্জ্বল আলো চতুর্দিকে ছড়ানো ভেবেছি।
অথচ প্রান্তরে এসে সে' আলোর কণা-তলায়
স্নান সেরে নিতে গিয়ে নিহত সূর্যের ম্লান শব
দেখেছি রয়েছে পড়ে। রক্তমাখা-মাটি মাঠ
রক্ত ঝরে স্বপ্নিল সন্ধ্যায়।

মুখ গুঁজে পড়ে আছে শরবিদ্ধ নিরীহ হরিণ,
শোকাচ্ছন্ন, নিশেহারা হরিণী অরণ্যে ঘোরে একা ;
ব্যাধ-অধ্যুষিত বন,—অবরুদ্ধ পথ—বনরেখা।
নিষ্ঠুর নিষাদ ঘোরে নিরুত্তাপ, চতুর, যত্নে।

চতুর্দিকে দলিত কুসুম,
নিগৃহীত স্নেহ-প্রেম, শুভ্র মানবতা, ভালোবাসা,
তবু কেন রক্তে ফোটে ফুল কিংবা ফুলের পিপাসা।

আমার শপথ ছিল ফুলগুলি ফুটিয়ে দেবার।
আমি ফুল ফোটাতে চেয়েছি,
ফুল তবু ফোটাতে পারিনি,
ফোটাতে পারিনে আমি আর—
আমার বুকের মধ্যে জমে হু-হু মরুভূমি
হাউ হাউ তীব্র যন্ত্রণায়
শুধু রাত্রিদিন ধ'রে। কার অভিশাপে, বলো, কার?
জ্বলে যায় ঘর-বাড়ি, সন্তান-সন্ততি, নারী,
ঈশ্বরের সাজানো সংসার।

সূর্যের কোঠায়

দুর্গাদাস সরকার

চিরকাল একজন ডাক দিয়ে যায়
গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। কে অবলীলায়
অঙ্ক কষে' সে ডাক মিলায়। প্রতি শ্বাসে ঘণ্টা বাজে
নিজের মনেই—সে জানে না। তাই
মাইল-স্টোনের মতো দূরত্বের মাপকাঠি দিয়ে
মনুষ্য সমাজে
শুনতে চায় কোথায় সে ডাক।
অথচ এমন কোনো মুহূর্তই নেই সেই আদিকাল থেকে
যখন বাজে না ভেরী,
পড়ি-মরি ছুটতে গিয়ে তখন কেবল বলে :
'হয়ে গেছে বড় বেশি দেরী'।
অসমাপ্ত উইলটা কাঁদে,
উইপোকা হেসে মরে তখনই আহ্লাদে।

কেবল দূরের বৃক্ষ, নদী, নদ নিশ্চুপ বাতাসে :
কেননা তারাই জানে—ধ্রুব এক ডাক শুধু ভাসে।
তাই তারা মরতে গিয়ে নিয়ত প্রস্তুত
কবরের মৃত্তিকায়, শ্মশানের কাঠে।
তারি জন্যে বেদ রচে আকাশের উদার ললাটে
যে-মাইল-স্টোন থাকে কঠিন মাটির বুক চিরে
একদিন লুপ্ত হয় সেও ধীরে ধীরে।
মনে হয় ওৎক্ষণাৎ, সবি যেন শূন্য হয়ে যায়।

তখনো কে যেতে পারে সূর্যের কোঠায়?

নতুন রূপে

লিলি
থিন এরারুট

সবচেয়ে প্রিয় বিস্কুট

লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৪

ধারাবাহিক রচনা

সুভাষচন্দ্র

পবিত্রকুমার ঘোষ

কার নেতাজী ?

নেতাজী ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাঁর ভূমিকাকে ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে মুছে ফেলার বা অতিশয় বিকৃতভাবে দেখানোর প্রয়াস শুরু হয়েছে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ইঙ্গিতেই অল্পভোগ। মাউন্টব্যাটেন তখন ভারতের বড়লাট; ১৯৪৭ সালের ৩০শে জুন মধ্য দিল্লীতে ভাইসরয়ের প্রাসাদে বসেই তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধকাহিনীর একটি রিপোর্ট প্রণয়ন শেষ করেন। এটি একটি বিশদ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ যুদ্ধ-দলিল। ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্ট এই রিপোর্টটি প্রকাশ করেন ১৯৫১ সালে (Report to the Combined Chiefs of Staff by the Supreme Allied Commander, South East Asia, 1943-1945, Vice-Admiral the Earl Mountbatten of Burma) ঐ রিপোর্টের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে সকল পক্ষের সৈন্যবল ও সৈন্যসমাবেশের যে নিপুণ চিত্রটি পাই তার কোথাও অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার বা আই. এন. এর কথা নেই। কিন্তু তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা পাচ্ছি এই উল্লেখটি :

62. The invasion plan, known to the Japanese High Command as operation "C" was a Grand Design. It is now known that at the end of 1942 the Japanese Imperial General Headquarters had already begun to consider a thrust into India ; that the plan had begun to develop, at Burma Area Army level, by the middle of 1943 ; and at Army level in September, 1943. In January, 1944, Imperial General Headquarters had finally authorised detailed planning to proceed. The invasion of India was to be achieved by splitting open the British-Indian front, sealing off the eastern from the western half, and cutting the lines of communication of both. Each sector was then to be destroyed separately ; and the roads through Chittagong and Dimapur laid open to the Japanese Army—at which stage enemy hoped to incite a general uprising in Bengal.

63. In Phase 1, on the Arakan front, the port of Chittagong was to be seized ; and Lieut-General Slim's reserves were to be drawn off and kept fully committed in Arakan before phase 2 began. In phase 2, which was timed to begin on the central front about one month after phase 1, the objectives were :

(a) to capture our bases at Imphal and

Dimapur, and so to forestall our own offensive;

(b) to maintain pressure on North-East India and, if possible, to cut the Assam line of communication, on which supply to China depended; and

(c) to exercise political influence over India in particular, to install Subhas Chandra Bose as head of a puppet Government in conquered Indian territory.

ফুটনোটে সুভাষচন্দ্র বসুর পরিচয়টুকু বলা হয়েছে: Leader of the Indian National Army. (পৃ: ৩৯)

৬৬ নং অনুচ্ছেদে মাউন্টব্যাটেন লিখছেন যে আরাকানের যুদ্ধে আই. এন. এ যে অংশ নেবে তা তাঁরা গুপ্তচর মারফৎ আগেই খবর পেয়েছিলেন (while it was learned from captured documents that a detachment of the Indian National Army had been ordered to concentrate east of the Mayu Range —পৃ: ৪০)

৬৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: Along the··· tunnels road and to the south of it, was 55 Japanese Division, with elements of another Japanese Division and of the Indian National Army. The task of these forces was to check the southward advance of 15 Corps and to divert its attention and strength from the Central front. (পৃ: ৪০)

৬৮ অনুচ্ছেদে পাই এই উল্লেখটি: We discovered later that Lieut-General Hanya had reorganised his 55 Japanese Division, and elements of the Indian National Army into three Task Forces, for the initial action.

(পৃষ্ঠা ৪০)

মাউন্টব্যাটেন ইম্ফল ও কোহিমা যুদ্ধের বিস্তৃত ও প্রামাণ্য বিবরণ দিয়েছেন এই রিপোর্টে—এবং এই রিপোর্টটি ঐ যুদ্ধ সম্পর্কে একটি মূলবান দলিল রূপে স্বীকৃত হবে উত্তরকালের ঐতিহাসিকদের দ্বারা। যেসকল ঐতিহাসিক বা লেখক ইম্ফল ও কোহিমা যুদ্ধের ইতিহাস ইতিমধ্যেই লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁরা সকলেই উক্ত রিপোর্টটিকে তাঁদের প্রধান অবলম্বন বলে ধরে নিয়েছেন। ঐ রিপোর্টে যুদ্ধের যে চিত্র দেওয়া হয়েছে তা হতে ভিন্ন চিত্র অপর কোন লেখকই পেশ করেননি। মাউন্টব্যাটেন তাঁর এই রিপোর্টে কোহিমা ও ইম্ফলের যুদ্ধকে জাপানের ভারত আক্রমণের প্রয়াস এবং জাপানকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে মিত্রশক্তির সংগ্রাম বলেই উপস্থাপিত করেছেন। বস্তুত পুনঃ পুনঃ লিখিত বিবরণ ও মানচিত্রের সহায়তায় কোহিমা ও ইম্ফল যুদ্ধকে জাপানের ভারত-বিজয় অভিযানের অঙ্গ রূপেই তিনি প্রমাণিত করেছেন। সুতরাং গোটা যুদ্ধটাকে তিনি দেখিয়েছেন ইংরেজ বনাম জাপানের যুদ্ধ—ভারতের ধরণীধর নিয়ে দুটি অভারতীয় পক্ষের লড়াই রূপে। প্রশ্ন এই যে যদি প্রকৃত সত্য তাই হয়ে থাকে তবে এই যুদ্ধের মাঝখানে অংশ নেবার জন্য সুভাষ বসু এসে দাঁড়ালেন কেন? কেনই বা এল অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারের ভারতীয় জাতীয় সৈন্যবাহিনী? যে যুদ্ধ মূলতঃ ইংরেজ বনাম জাপানের যুদ্ধ সে যুদ্ধে জাপানী সৈন্যদলের সহায়ক হয়ে এঁদের আসার উদ্দেশ্য একটাই হতে পারে; তা হল, জাপানীদের দাসত্ব করে আখেরে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করা। জাপানের যদি জয় হয় তবে তাদের সহায়তায় কিছু সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে পারাই হয়ে দাঁড়ায় তাহলে সুভাষচন্দ্র বসুর ভারত ত্যাগ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় আগমন ও সৈন্যদল গঠনের উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ মাউন্টব্যাটেন সুভাষচন্দ্র বসুকে এর চেয়ে অধিক মর্যাদা কোথাও দেননি, এবং দেশের প্রতি বিশ্বাস-

থাকুক, কুলাঙ্গার স্বার্থপর এক ব্যক্তি রূপে তাঁকে চিত্রিত করেছেন। তাই কোহিমা ও ইম্ফলের যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণের কোথাও নেই সুভাষ বসু বা তাঁর আই. এন. এ-র উল্লেখ। আছে জাপানের আক্রমণের কথা আর সেই আক্রমণ-প্রতিরোধে ইংরেজের কূটবুদ্ধি, রণকৌশল, সৈন্যশক্তি ও বীরত্বের কথা।

মাউন্টব্যাটেন এই রিপোর্ট যখন প্রণয়ন ও পেশ করছেন তখন জহরলাল-প্যাটেল প্রভৃতি নেতারা দিল্লীতে তাঁর সঙ্গে গভীর প্রীতি-আলোচনায় মগ্ন। সেই আলোচনার উদ্দেশ্য দেশভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর। কেন মাউন্টব্যাটেন দ্রুত ভারত-বিভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর চাইছিলেন তা বোঝা শক্ত নয়; আরাকান, কোহিমা, ইম্ফল, রেঙ্গুন সর্বত্র তিনি ভারতে ইংরেজ রাজত্বের চরম বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করে এসেছেন; তাই দ্রুত বৃটিশ স্বার্থ রক্ষাকল্পে একটা শেষ বন্দোবস্ত করার তাগিদ ছিল তাঁর। নেহরু-প্যাটেল দেশভাগ ও ক্ষমতা-হস্তান্তর বিষয়ে এত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কেন? এ ব্যাপারে তাঁদের সবচেয়ে বেশি মিল হল মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গেই বা কেন? আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে মাউন্টব্যাটেনের নিকট হতে জহরলাল পেয়েছিলেন তিনটি পবিত্র ব্রতে দীক্ষা ও তিনটি পবিত্র কর্তব্য উদযাপনের ভার। তা এই; (১) ভারত ভাগ (২) ইঙ্গ-মার্কিণ স্বার্থ রক্ষা (৩) নেতাজীর চরিত্র-হনন ও তাঁর মৃত্যু সম্পর্কিত রটনাকে প্রতিষ্ঠিত করা। যে সময় মাউন্টব্যাটেন তাঁর আলোচ্য রিপোর্টটি প্রণয়ন করেছিলেন সেই সময়ই জহরলাল বলতে দ্বিধা করেননি যে অস্থায়ী স্বাধীন সরকার ও আই, এন, এ গঠনের পিছনে সুভাষ বসুর যে রাজনীতি ছিল তা ভ্রান্ত (শানওয়াজ খান লিখিত I. N. A. and its Netaji গ্রন্থের জহরলালের লিখিত ভূমিকা দ্রষ্টব্য।) এবং জহরলালের এই বচনের অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত অনুধাবন করে জনৈক সুপরিচিত ইতিহাসবিদ লিখেছেন: Subhas Chandra Bose..... did not have Nehru's ideological clarity and grasp of world issues, and was even drawn towards certain meretricious features of fascism (Hiren Mukherjee The Gentle Colossus. p 73) সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে মাউন্টব্যাটেন, জহরলাল ও জহরসমর্থকদের বক্তব্যের এই ঐক্য একটা বিচ্ছিন্ন বা আকস্মিক ঘটনা বলে মনে করার কোন কারণই নেই। কেননা ঐক্য শুধু তাঁদের বক্তব্যের ক্ষেত্রেই নয়, আচরণের ক্ষেত্রেও। সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ বাহিনীর শহীদদের স্মরণে নেতাজী যে শহীদ স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন, ভারতের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের

প্রতীক সেই শহীদ স্তম্ভটিকে জহরলালের উপস্থিতিতেই ভেঙে ফেলার আদেশ দেন মাউন্টব্যাটেন এবং জহরলাল তা সমর্থন করেন। হিউ টোয় লিখেছেন; "১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে মিঃ নেহরু যখন সিঙ্গাপুরে ভ্রমণে গিয়েছিলেন তখন তাঁকে প্রাক্তন আই. এন. এ. সদস্য সহস্র সহস্র নাগরিক একটি বেসরকারী সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। এরা একদা আই. এন. এ'র সদস্য ছিল সেকথা প্রকাশ করার পক্ষে কোনো ভয় বা বাধা তখন ছিল না। তাই তারা তাদের পুরাণো সামরিক পোষাক পরে নেহরু যে পথ দিয়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে যাবেন সেই পথের পাশে দাঁড়িয়েছিল। নেহরু তাদের দেখে খুশি হলেন না, তাঁর হোটেলের বাইরে অপেক্ষমান এরকম একটা মিলিটারি পোষাকে সজ্জিত প্রাক্তন আই. এন. এ. সদস্যদের দলকে তিনি খুব ধমকে দিলেন।" (Hugh Toye: The Springing Tiger, পৃষ্ঠা—৭৪-৭৫)।

সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে মাউন্টব্যাটেন ও জহরলালের মধ্যে কোন চুক্তি হয়েছিল কি না জানি না; কিন্তু ক্ষেত্রভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের উভয় পক্ষের অতিব্যস্ততা যে সুভাষ বসুর পুনরাবির্ভাবের ভীতির কারণে দেখা দেয়নি, তা কে বলবে? সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে জহরলালের নীতি জহরলালের শাসকক্লের দ্বারাও সানোৎসাহে অনুসৃত হতে দেখে এই সন্দেহ দৃঢ়তর হয় যে ক্ষমতা হস্তান্তরের গোপন সর্তাবলীর মধ্যেই মাউন্টব্যাটেন এবিষয়ে এমন একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করে গেছেন, যার বাধ্যবাধকতা হতে নেহরুর উত্তরাধিকারীদেরও মুক্তি নেই। এ সন্দেহ কতদূর সত্য জানিনা, কিন্তু এই কথাটি নিশ্চিতভাবে জানি যে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে মাউন্টব্যাটেনের বক্তব্য ও নীতি এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বক্তব্য ও নীতি অবিসম্বাদীভাবে এক। তার প্রমাণ মিলবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে জাপানের সঙ্গে মিত্রশক্তির যুদ্ধ বিষয়ে পাঁচটি সুবৃহৎ খণ্ডে সমাপ্ত বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত বিশালকায় গ্রন্থখানিতে (Major-General Woodburn Kirby: The War Against Japan, published by Her Majesty's Stationery Office, London)। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে এইটিই বৃটিশ সরকারের অনুমোদিত ভাষ্য। এই গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৫৮৩-৮৪ পৃষ্ঠায় আই. এন. এ. সম্পর্কে এই উল্লেখটি আছে: Meanwhile Mr. Amery (The Secretary of State for India) had been considering the morale of the Indian Army from an entirely different point of view. For some months it had been becoming plain that great efforts were being made by the Japanese to undermine its loyalty. They had set up a school at Penang for training Indian nationals as agents who, on completing their training, were to be sent to India to create internal unrest and promote sabotage. They had formed an 'Indian National Army' (I. N. A.) from Indian prisoners of war and Indian civilians resident in Malaya and Burma. They were giving assistance to an organization styled the 'Indian Independence League'

(I. L. L), which had been formed round a nucleus of certain notorious political absconders who for many years had found refuge and support in Japan and elsewhere.

বস্তুতঃ এই প্রেক্ষিতেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সুভাষচন্দ্র ও তাঁর আই. এন. এ'র ভূমিকা ও কর্মধারাকে দেখেছে শুধু বৃটিশরাই নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সকল ঐতিহাসিকই। মাউন্টব্যাটেনের ইঙ্গিতই এক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে কার্যকরী হয়েছে। বিশ্বের ঐতিহাসিক ও সুধীবৃন্দের দ্বারা সুভাষচন্দ্রের যে চিত্রণ আমরা পাই তাতে 'নেতাজী' শব্দটিই সম্পূর্ণ অবান্তব ঠেকে। ক্ষমতালোভী, স্বার্থলোভী, traitor, renegade, puppet ইত্যাদি বহুই বিশ্বজনের কাছে সাড়ম্বরে ও সর্বানুমোদিত রূপে উপস্থাপিত হয়েছেন; আর আমরা ভারতবাসী বিশেষ বাঙালীরা কেবল নিজেদের ঘরের কোণে আঁচল দিয়ে চোখ ঢেকে নাকি কান্নায় বলছি: "নেতাজী, মহান নেতাজী ফিরে এসো।" কিন্তু বিদেশী ঐতিহাসিকেরা যে ঠিক ভিন্ন কথা প্রচার করেন ও বিশ্বের ইতিহাসের পাঠক, ছাত্র ও অনুসন্ধিৎসুরা সে প্রচারকেই একমাত্র সত্য বলে জানেন—সেই খবরটুকুও রাখার প্রয়োজন হয়তো আমরা অনুভব করি না। ছাত্রছাত্রীদের জন্য রচিত ইতিহাসের পাঠ্য পুস্তকেও এই বিষয়কে কিভাবে স্থান দেওয়া হয়েছে তার নমুনা আমরা নিচে দিচ্ছি। Louis L. Synder লিখিত The War: A Concise History, 1939-45 (published by Robert Hale Limited, London, 1962) গ্রন্থে সুভাষচন্দ্রের এই পরিচয় দেওয়া হয়েছে:

"In November 1943, when the American counter-offensive was getting under way in the Pacific, the Greater East Asia Conference assembled in Tokyo to consolidate power for the coming critical days. To this meeting came all the puppets, collaborators, and the renegade Subhas Chandra Bose, head of the "Provisional Government in Free India." (পৃষ্ঠা ২৬৩)

আই. এন. এ'র পরিচয় দিয়ে সিরিল ফলস লিখেছেন: "জাপান প্রকৃতপক্ষে চেয়েছিল ভারত আক্রমণ করতে। কিন্তু ব্রহ্মদেশে তার যে সৈন্যবাহিনী ছিল শুধু তার সাহায্যে যুদ্ধে ভারত জয় করা ছিল অসম্ভব,—তাই সে আর একটি উপায়ে কাজ হাসিল করবে বলে আশা করেছিল। সেই উপায়টি হচ্ছে ভারতের অভ্যন্তরে ব্যাপক বিদ্রোহ ঘটানো। তারা জানত যে ভারতে কংগ্রেসের ভিতরে যারা বামপন্থী তারা ইংরেজকে সমর্থন করে না; যুদ্ধে তারা হয় নিরপেক্ষ থাকতে চায়, নতুবা ইংরেজের বিরুদ্ধে জাপানীদেরই সক্রিয়ভাবে সমর্থন করে। ভারতীয় সৈন্যবাহিনী যদিও ইংরেজবিরোধী নয়, শুধু তাদের মধ্যে যারা জাপানীদের হাতে যুদ্ধবন্দী হয়েছিল তাদের এবং দক্ষিণ এশিয়ার জাপ অধিকৃত অঞ্চলের ভারতীয়দলকে নিয়ে জাপানী কর্তৃপক্ষ 'ভারতীয় জাতীয় সৈন্যবাহিনী' নামে একটি বাহিনী তৈরী করে এবং এই বাহিনীটিকে বেশ বড় করে তোলার কথাও তারা ভেবেছিল। ভারত দখল করতে হলে প্রথমে জাপানের প্রয়োজন ছিল আসামে চূড়ান্তভাবে জয়লাভ করা। তারপর ভারতে তারা ইংরেজবিরোধী প্রচার ও "এশিয়াবাসীদের জন্য এশিয়া"—এই মিথ্যা কুহকবাক্যের প্রচার করার দ্বারা কাজ হাসিল করার কথাও ভেবেছিল।" (Cyril Falls: The Second World War, Metluen & Co. Ltd, London, 1948, পৃঃ ৮৮-৮১)

এই হচ্ছে ঐতিহাসিকের চোখে আই. এন. এ'র ভূমিকা,—জাপানীদের স্বার্থে ও জাপানীদের দ্বারা গঠিত, জাপানের ভারত দখল অভিযানের সহায়ক এবং জাপানের সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে ক্রীড়াপুত্তলস্বরূপ এই ভুয়াকথিত "ভারতীয় জাতীয় সৈন্যবাহিনী,"—এবং এরই নায়ক সুভাষ বসু।

এই যেমন একদিকে সুভাষচন্দ্রের মিথ্যা ও বিকৃত পরিচয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, তেমনি এর পাশাপাশি হয়েছে তাঁর নাম ও তাঁর ভূমিকার কথা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দেবার প্রয়াস! জেনারাল ম্যাকার্থারের স্মৃতিকথায় জাপানের যুদ্ধ কথাই প্রধান অংশ পেয়েছে; কিন্তু তার কোথাও সুভাষচন্দ্র বা তাঁর আই. এন. এ'র উল্লেখ নেই। সেও বুঝা যায়,কেননা ম্যাকার্থার ইঙ্গ-মার্কিনী পক্ষের সৈন্যাধ্যক্ষ, এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গন ছিল তাঁর যুদ্ধক্ষেত্র, যেখানে সুভাষচন্দ্রের কর্মধারা বিস্তৃত হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তোগো শিগেনরির স্মৃতিকথায়ও নেতাজী বা তাঁর আই. এন. এ'র বিন্দুমাত্র উল্লেখ কেন নেই (To-go SHigenori : The Cause of Japan, Simon and Schuster, 1956) তা বোঝা দুষ্কর। সুভাষচন্দ্র ও আই. এন. এ সম্পর্কে ম্যাকার্থারের মাত্র দাহ ছিল, কেননা যে যুদ্ধে পরাক্রান্ত জাপান আত্ম-সমর্পন ক'রে তাঁরই কাছে নতজানু হয়ে ক্ষমাভিক্ষা চাইল, সেই যুদ্ধেই সামান্য সহায়সম্বল নিয়ে সুভাষ বহু চির-অপরাজেয়ের মর্যাদা নিয়ে অক্ষত শরীরে নিজের কর্মসাধনের পথে চলে গেলেন। বিজয়ী ম্যাকার্থারের বিজয় সম্পূর্ণ হয়নি এই দুর্বোধ্য মানুষটির জন্য, যে চতুর্দিকের বিশাল পরাজয়ের মধ্যে দাঁড়িয়েও আত্মসমর্পণ করতে স্বীকৃত নয়। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সভায় জাপসম্রাট থেকে সুরু করে জাপসরকারের সদস্যদেরও হাজির করা গিয়েছিল, তাঁদের কঠোর শাস্তিও দান করা গেছে,—কিন্তু কোনমতেই গ্রেপ্তার করা যায়নি সেই ব্যক্তিকে যিনি ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে স্বাধীন ভারত সরকারের হয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। ম্যাকার্থারের গভীর মনোবেদনার তাই সঙ্গত কারণ ছিল; কিন্তু জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ক্ষেত্রে তো সেরকম কোনো কারণ ঘটেনি!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র অস্থায়ী ভারত সরকার এবং আই. এন. এ.র ভূমিকায় পূর্ণ স্বীকৃতি যদি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আমরা পেতে চাই তবে আমাদের উদ্যোগী হওয়া দরকার। ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সুভাষচন্দ্রের কার্যকলাপ ও তাঁর আই. এন. এ.র কীর্তি একটা অতি উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছে। বিদেশী ঐতিহাসিকদের সমবেত প্রয়াসে আজ সেই অধ্যায়টি ইতিহাসের পৃষ্ঠা হতে অবলুপ্ত হতে চলেছে। দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ায়, ভারতসীমান্তে, এমনকি ভারতের ভিতরে বীরত্ব ও আত্মত্যাগ, দেশপ্রেম ও আত্মশক্তির যে নতুন পরিচয় সেদিন লিখিত হয়েছিল রক্তের অক্ষরে, আমরা ইতিমধ্যেই তা যে কতখানি বিস্মৃত হয়েছি তা আমাদের জাতীয় জীবনের বর্তমান পরিণাম হতেই উপলব্ধি করা যেতে পারে। কিন্তু ইতিহাস গ্রন্থের পাতা হতেও আমরা আজাদহিন্দের অমর কাহিনীকে নির্বাসিত করতে কেন রাজি হলাম তা বোঝা যায় না। বিদেশী লেখকদের কথা আগেই উল্লেখ করেছি, কিন্তু আমাদের দেশের লেখকদের আচরণও এ বিষয়ে কম বিস্ময়কর নয়। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন: "হিটলার যে ভাবে সমস্ত পোর্ট-ফোলিওগুলি নিজের হাতে রাখিয়া সর্বনিয়ন্তার কাজ করিতে ছিলেন, সুভাষও সেই নীতি অবলম্বন করিয়া "নেতাজী" পদ প্রাপ্ত হইলেন। (ভারতে জাতীয় আন্দোলন, ৩য় সংস্করণ, পৃ: ৩০১) আলোচ্য লেখক একজন মননশীল ব্যক্তি এবং তথ্যনিষ্ঠ লেখক বলেই সুপরিচিত, কিন্তু তিনি এই সাধারণ

সত্যটুকুও গোপন করেছেন যে "নেতাজী" একটা পদ নয়, অপরিত ভারতীয়ের শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের নিদর্শন স্বরূপ ঐ নাম। সুভাষ হিটলারের নীতি গ্রহণ করেছিলেন এ একটা মিথ্যা-কথনের নিকৃষ্ট নমুনা; দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয়দের আহ্বানে সুভাষ সেখানে গিয়েছিলেন কৌশল করে ক্ষমতা-লাভের জন্য নয়—লেখক এ বিষয়েও বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন পাঠককে। সুভাষচন্দ্রের কর্মধারার মূল্যায়ন করতে যেয়ে লেখক লিখেছেন: "সুভাষচন্দ্র ভাবিয়াছিলেন যে তিনি জাপানের সহায়তায় ভারত উদ্ধার করিবেন। জাপানী শাসক সরকার তাঁহাকে এই ভরসা দিয়াছিল যে, তাহারা ভারত উদ্ধারের জন্য সহায়তা করিবে—ভারতের প্রতি তাদের কোনো লোভ নাই। সুভাষচন্দ্র ইতিহাসের ছাত্র এবং বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতি-অভিজ্ঞ।—তিনি কী করিয়া ভাবিতে পারিয়াছিলেন যে, যে জাপানীরা যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া গত পাঁচ বৎসর চীনের উপর পাশবিক নৈরাচার করিতেছে, যে জাপানীরা আমেরিকানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া অতর্কিতভাবে পার্ল-হার্বার ধ্বংস করিতে চেষ্টা করে, যে জাপানীরা ১৯১৬ সালে সিঙ্গাপুরে ভারতীয় সৈন্যরা বিদ্রোহী হইলে ইংরেজের মিত্ররূপে সিপাহীদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধোদ্যমকে কঠোরভাবে দমন করিয়াছিল—জাপানের সেই যুদ্ধ রণকামী দল যাহারা বিশ্বযুদ্ধে জাপানকে নামাইয়াছে, তাহারা ব্রিটিশদের হাত হইতে ভারত উদ্ধার করিয়া সুভাষচন্দ্রের হাতে উহা সমর্পণ করিয়া দেশত্যাগ করিবে! তাহা হইলে মুঘল-সর্দার বাবর ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করিয়া বহলুলকে মসনদে বসাইয়া কাবুলে প্রত্যাবর্তন করিতেন। দক্ষিণ ভারতে এই কণ্টক দিয়া কণ্টক উৎপাটনের নীতি অবলম্বন করিতে গিয়া নবাবরা ইংরেজ ও ফরাসীদের আহ্বান করেন—তাহাদের কেহই দেশ ছাড়িয়া যায় নাই। সাম্রাজ্যলোলুপ রাজনীতিজ্ঞরা এমন বৈরাগিক নহেন যে, যে দেশ রক্ত দিয়া অর্থ দিয়া জয় করিবে—তাহা অপরকে ভোগের জন্য ছাড়িয়া দিয়া আসিবে।" (উক্তগ্রন্থ পৃঃ ৩০২-৩)

আমাদের স্বদেশীয় ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্র ও আই. এন. এ'র এই মূল্যায়ন আমাদের হতবাক করে না, কেননা এরকম বিচারধারা এদেশে নতুন নয়। ইংরেজি গ্রন্থে যে দৃষ্টিভঙ্গী সুলভ, এদেশের লেখক তাকেই সর্বথা গ্রাহ্য বলে মনে করবেন—এটা অপ্রত্যাশিত নয়।

কিন্তু আমাদের মূল বক্তব্য তা নয়। আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে বাংলা ভাষায় সুভাষচন্দ্রের জীবন ও কর্মের কথা আলোচনা করে তাঁর সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মিথ্যা প্রচারের কোনো প্রতিকার পাওয়া সম্ভব নয়। ইংরেজি ভাষায় এই আলোচনা হওয়া দরকার। কিন্তু ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই আলোচনার কাজটি সম্পাদিত ও প্রকাশিত হলে—যত প্রামাণ্য বিবরণই উপস্থাপিত করা যাক না কেন, পশ্চিমী পণ্ডিতরা তাকে ব্যক্তির মত বলে পাশ কাটিয়ে যাবেন বা উপেক্ষা করবেন। নেতাজী ও আই এন. এ. সম্পর্কে ভারত সরকারের তরফ হতেই প্রামাণ্য গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হওয়া দরকার। একটা দেশের সরকারের সীলমোহরে চিহ্নিত হয়ে যদি বিস্তৃত আলোচনা সহ প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তবে তাকে উপেক্ষা করা বিদেশীয় বিদ্বান ও তাঁদের স্বদেশীয় অনুকারীদের পক্ষে সম্ভব হবে না। যদি আমরা আমাদের জাতীয় সরকারকে একাজটি করাতে বাধ্য না করতে পারি তবে বৃথা সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে আমাদের উচ্ছ্বসিত হওয়া। এবং আমাদের জাতির ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও সে হবে একটা বৃহৎ প্রবঞ্চনার নজির।

আমাদের জাতীয় সরকার আজ পর্যন্ত বহু বিষয়ে গ্রন্থাদি রচনা ও প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন—তাঁদের বহু গ্রন্থ প্রামাণ্য

প্রশ্নের মর্যাদা ও স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে তাঁরা এ পর্যন্ত নীরব। এই নীরবতার প্রকৃত কারণ নেহরুর নীতি; সুভাষ ও আই. এন. এ. সম্পর্কে জহরলাল বেশ পরিষ্কারভাবেই তাঁর বক্তব্য জানিয়ে গেছেন এবং স্বাধীন ভারত সরকার সেই বক্তব্যের মর্যার্থ মেনেই চলছে আজ পর্যন্ত। সুভাষ বসু ও আই. এন. এ. সম্পর্কে জওহরলাল বলেছিলেন: "Three years ago I was asked in Calcutta what I would do if Subhas Bose led an army into India on the plea of liberating India. I replied then that I would not hesitate to resist this invasion even though I did not doubt that Subhas Bose and his Indian colleagues and followers were motivated by the desire to free India, and were in no way mere tools of the Japanese. Nevertheless, they had put themselves on the wrongside, and were functioning under Japanese auspices. No person could come to India in this way or under such foreign auspices. Therefore, whatever the motive behind such people, they had to be resisted in India or outside." (Dorothy Norman, Nehru, the First Sixty years, Vol II, P. 175).

নেহরু পরে পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুসারে নানারকম কথাই বলেছেন নানাসময়ে, কিন্তু সুভাষ বসু ও তাঁর কর্মধারা সম্পর্কে এই হচ্ছে তাঁর আদি, অকৃত্রিম, নির্ভেজাল বক্তব্য। নেতাজী সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতির মূলে আছে এই বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গী। সুতরাং দেশে ও বিদেশে নেতাজী ও আই. এন. এ সম্পর্কে যেসব অভিযোগ প্রচারিত হয় বলে আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি তার পিছনে ভারত সরকারের সমর্থন আছে বলে মনে করা অযৌক্তিক নয়। এই সমর্থনটিকে এবার ভেঙে দেওয়া দরকার, নতুবা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়ের অবলুপ্তি করার দায় হতে আমরাও অব্যাহতি পাবনা! আর তাছাড়া সুভাষচন্দ্রকে "নেতাজী" উল্লেখ করাটাও একটা বিদ্রূপাত্মক ব্যাপার হয়ে উঠবে নাকি?

(ক্রমশঃ)

ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

ভারতবর্ষের ইতিহাসকে সাধারণত তিন যুগে ভাগ করা হয়; প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক। আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস শুরু হয়েছে ইংরেজের দেশী বিজয় থেকে। কিন্তু যথার্থ আধুনিকতার সূচনা উনবিংশ শতাব্দীতে। আধুনিক যুগে ভারতবর্ষের ধর্মচিন্তা সমাজব্যবস্থা সাহিত্যাদর্শ ইত্যাদিতে আমূল পরিবর্তন আসে। সে-পরিবর্তন এতই বৈপ্লবিক যে তাকে রেনেসাঁস আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর আগে, রাজনৈতিক চেতনা বলে কিছু ছিল না। তখন রাজনীতি আবদ্ধ থাকত শুধু রাজপুরুষদের মধ্যে। রামমোহনের নেতৃত্বেই সর্বপ্রথম দেশের সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রপরিচালনার ব্যাপারে আগ্রহ নিতে শুরু করে এবং সে-ব্যাপারে যে সাধারণ মানুষও অংশ নিতে পারে এই বোধ জাগে। তত্ত্বগতভাবে রামমোহন ছিলেন দিল্লীর বাদশাহের প্রজা কিন্তু তথ্যগতভাবে দিল্লীর বাদশাহ ছিলেন ইংরেজ মুকুটের অধীন। কমন্স সভাতে একজন প্রজা যে ভারতবর্ষের প্রজাশাসনীর অভাব ও অভিযোগ ব্যক্ত করেছেন এটা উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেও অকল্পনীয় ছিল। ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা অভিনব এই রাজনৈতিক চেতনার আবার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো সাম্প্রদায়িকতা বা দ্বিজাতিতত্ত্ব। এটা একটা ধাঁধা যে আমাদের জাতীয়তাবোধ ও দ্বিজাতিবাদ প্রায় একই সঙ্গে জন্মগ্রহণ করে।

একথা সর্বজনবিদিত যে ভারতবর্ষে বহু মানবধারার সংমিশ্রণ হয়েছে। সিন্ধুসভ্যতার ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে উঠেছে আর্য সভ্যতা; তাতে মিলিত হয়েছে শক, হূণ প্রভৃতি মানবধারা; ভারতবর্ষের উত্তরপূর্ব ও পূর্ব সীমান্ত দিয়ে এসেছে মঙ্গোল রক্ত। এমনইভাবে বিভিন্ন মানবধারা ভারতভূখণ্ডে এসে মিলিত হয় ও তার ফলে আস্তে আস্তে এক মিশ্র মানবসমাজ গড়ে ওঠে ভারতবর্ষে। আদিকালের কোনও বিশিষ্ট ধর্মমত বা বিধিবদ্ধ ধর্মীয় অনুশাসন ছিল না। ফলে নানা গোষ্ঠী ও ধারার সংমিশ্রণের মতোই নানা গোষ্ঠী-কুল ও ধারার আচার-আচরণ, আধ্যাত্মিক ও পারত্রিক মতামতের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে হিন্দুসমাজ হিন্দু ধর্মমত হিন্দু আচাররীতি। বেদ বেদান্ত মহাকাব্য গীতা পুরাণ ও অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে রূপ ফুটে উঠেছে তা যেমন বৃহৎ তেমনই জটিল, এবং এই হিন্দুত্বের বিবিধ মতাকে একই অঙ্গে ধারণের অতুলনীয় নিদর্শন। বিভেদ সত্য ছিল বলেই ভারতবর্ষে মিলনের সাধনা এত প্রকট।

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের হিন্দু নামে কথিত অধিবাসীদের সঙ্গে ভূমধ্যসাগরীয় ইউরোপ, আরব, ইরাণ ও মধ্যপূর্ব এশিয়ার অধিবাসীদের মুখ্যত বাণিজ্যিক ও গৌণত সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান ছিল। তখন না ছিল খ্রীস্টধর্ম না ইসলামধর্ম। সেই আদানপ্রদানের সূত্র ধরে ভারতবর্ষের সমাজজীবনে ও শিল্পে যতটা বৈচিত্র্য এল ততটা বিরোধ জাগল না। বিরোধ জেগে ওঠে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ওপারে যেসব দেশ আছে সেখান থেকে কোন কোন ভাগ্যান্বেষী দল যখন ইসলামের ধ্বজা উড়িয়ে ভারতভূখণ্ডে প্রবেশ করতে শুরু করে। মনে রাখা দরকার যে এদেশে তারা

ধর্মপ্রচারে আসেনি, এসেছে বণীকের মতোই কেবলমাত্র লুটতরাজ করতে। চর্যাপদে বলা হয়েছে নিজের মাংস দিয়ে হরিণ নিজের বৈরী সৃষ্টি করে। তেমনই ভারতবর্ষ তার বিপুল ধনসম্পদ ও খাদ্যসম্ভার দিয়ে বিদেশী হানাদারদের বরাবরই প্রলুব্ধ করেছে। কিন্তু বারবার এসে লুটতরাজ করে নিজেদের শ্রীহীন রুক্ষ দেশে ফিরে যাওয়ার চাইতে একটা সমৃদ্ধ দেশে স্থায়ীভাবে থাকাটা যে বুদ্ধিমানের কাজ এটা বুঝতে আগন্তুকদের বেশিদিন সময় লাগেনি। তখন থেকেই ভারতবর্ষের মাটিতে মুসলমানদের পত্তনী শুরু হয়। এই পত্তনীর মূলে ধর্মপ্রচারের চাইতে ব্যবহারিক ও বৈষয়িক সুখ-সুবিধার ব্যাপারটাই বড়ো ছিল।

ভারতবর্ষে বিদেশী এসেছে প্রচুর এবং তার ফলে সকলকে স্থান দেওয়ার ও স্বীকার করার একটা সাধনা ভারতবর্ষের ইতিহাসে চলে আসছিল। কিন্তু এবার বাইরের থেকে যারা এল তারা সঙ্গে করে একটি নতুন ধর্মও নিয়ে এল। যে ভারতবর্ষ অজস্র আগন্তুককে অক্লেশে বরণ ও গ্রহণ করেছে সে ভারতবর্ষের ধরনধারণ তার গ্রহণশক্তি ও সমন্বয়সাধনার কাছে একটা দারুণ চ্যালেঞ্জ দিয়ে এই নতুন ধর্ম উপস্থিত হলো। এবং অনতিকালের মধ্যেই দাদু রামানন্দ রবিদাস, কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি সাধকগণ এগিয়ে এলেন ওই চ্যালেঞ্জের সঙ্গে মোকাবিলা করতে। রাজপুত মুঘল কাংড়া মিনিয়েচর দেখে অনেকেই বলতে পারবেন না কোনটি হিন্দু কোনটি মুসলমান শিল্পীর কাজ। মুসলমানদের অবদান যেমন ঠুমরি হলো ভরতমুনির সংগীত শাস্ত্রের অন্তর্গত। আউল-বাউল সাধু-ফকির সাঁই দরবেশ ওঝা-মুশকিলআসান, হেকিম-কবিরাজ সত্যপীর-সত্যনারায়ণ প্রভৃতি সাধারণ মানুষের জীবনে এমনভাবে মিশে গেল যে ইসলামী-হিঁদুয়ানি নিয়ে কারও মাথাব্যথা থাকল না। মুসলমানদের প্রতি বর্ণ-হিন্দুরা সাধারণত নিম্নবর্ণের হিন্দুর মতো ব্যবহার করতেন। কিন্তু মুসলমানরা দেশের শাসকবর্গ বলে হিন্দুদের কাছ থেকে আলাদা খাতিরও পেতেন। হিন্দু জমিদারের দুর্গা পুজোতে কাজী সাহেব যাত্রা শুনতে এসে বসতেন সম্মানিত আসনে। ইদের সময় হিন্দু মুসলমানে কোলাকুলি করতেন অকাতরে।

আবার এসবের পাশাপাশি হিন্দু-মুসলমানে বিরোধও ছিল নিত্যকার ঘটনা। সেযুগে ধর্মই ছিল সমাজের ভিত্তি। স্বভাবতই দেশবাসীকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করতে পারলে মুসলমানদের সুবিধে হয় দেশশাসনে। শুধু কি দেশশাসনের সুবিধের কথা ভেবে তারা ধর্মান্তরণের পথ নেয়? আপন ধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা কে না চায়! সম্রাট অশোক তো ধর্মপ্রচার করেই মহনীয় হয়েছেন আর শংকরাচার্য কী করেছিলেন? বৌদ্ধধর্মকে নির্মূল করে বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। সুতরাং ধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যে সচেষ্ট হওয়া ভারতীয় মূল্য-বোধেও স্বীকৃত। মুসলমান শাসকরাও স্বধর্ম প্রচারে ও প্রতিষ্ঠাতে সচেষ্ট ছিলেন নিছক ধর্মীয় কারণেও। তবে একাজে তাঁরা অস্ত্রকে একটু বেশি ব্যবহার করেছিলেন। ভুললে চলবে না যে তাঁরা অহিংসবাদী ছিলেন না। আর অহিংসবাদী সম্রাট অশোকেরও ধর্মপ্রচারের প্রধান সহায় ছিল অস্ত্র তা সাম্প্রতিক গবেষণাতে প্রমাণিত। সুতরাং ধর্মপ্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যে সচেষ্ট হওয়ার ব্যাপারে বৌদ্ধ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোনও মৌল পার্থক্য নেই, পার্থক্য শুধু কে কতখানি অস্ত্রের বা বলের সাহায্য নিচ্ছে এবং সেক্ষেত্রেও পার্থক্যটা ডিগ্রীগত মৌল নয় যতখানি মাত্রার। সবক্ষেত্রে যে বলপ্রয়োগ করে ইসলাম ধর্মের প্রচার করা হয়েছে এটা ভাবা ভুল। বর্ণহিন্দুরা মধ্যযুগে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের নিচু নজরে দেখত। আবার সাধারণভাবে বৌদ্ধদের উপরে হিন্দু সমাজ প্রচুর নিপীড়ন করত। নিম্নবর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধদের বিপুল অংশ ইসলাম ধর্মে পরিত্রাণ খোঁজে ও মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে।

হিন্দুজনগণের মধ্যে বহু মানবধারার রক্তের সংমিশ্রণ হয়। মুসলমান জনগণের মধ্যেও রক্তের অনুরূপ সংমিশ্রণ দেখা যায়। নৃতত্ত্ব ও শারীরতত্ত্বের দিক থেকে ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। ধর্ম ও কতকাংশে সংস্কৃতির বিভেদ সত্ত্বেও ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান একই মানবগোষ্ঠীর অন্তর্গত। বৌদ্ধ রাজাদের অধীনে যেমন বৌদ্ধরা, হিন্দু রাজাদের অধীনে তেমন হিন্দুরা, তেমনই মুসলমান নবাবের অধীনে মুসলমানরা কিছু বাড়তি সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছে। এতে মনুষ্যচরিত্রের স্বাভাবিকতাই পরিস্ফুট। এই বিভেদকে সাম্প্রদায়িক বিভেদ বলা চলে না। সম্প্রদায় বলতে তখন তো হিন্দু বা মুসলমানকে বোঝাত না, বোঝাত শাক্ত বা শৈব বা বৈষ্ণব অথবা শিয়া বা সুন্নীদের। সেযুগে হিন্দুধর্মাবলম্বী ও ইসলামধর্মাবলম্বীরা বিভিন্ন বিবাদী ও বাদী সুর ও সুর জুড়ে একটা ঐক্যতানসৃষ্টি করেছিল। তারা পরস্পরের থেকে স্বতন্ত্র ধারায় জীবনযাপন করলেও সে-স্বাতন্ত্র্যকে এতদূর বড়ো করে দেখেনি যে পরস্পরের থেকে সম্পর্কশূন্য ও পরস্পর-নিরপেক্ষভাবে জীবন যাপন করার কথা ভাবতে পারত। জাতি হিসেবে হিন্দু এক জাতি আর মুসলমান অন্য জাতি সে-সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার সুযোগও তাদের ছিল না, কেননা তখন ভারতবর্ষে জাতিতত্ত্বের জন্মই হয়নি।

হিন্দু ও মুসলমান সমাজ ও ধর্মের আলোকে পরস্পরের থেকে পৃথক এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যে একটা বড়ো ব্রত এবং সেটা সমগ্র ভারতীয় সাধনার অন্তর্গত এবং সে-সমন্বয় সাধনার উপরে ভারতীয় রাজনীতির সাফল্য মুখ্যত নির্ভর করছে এ-কথাটা সর্বপ্রথম হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন আকবর এবং তাঁর দীন-ই-ইলাহি ওই সাফল্য অর্জনেরই একটি বৃহৎ প্রচেষ্টা। প্রচলিত ধারণা এই যে আরংজিব ছিলেন অত্যন্ত সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন; এর কারণ আমরা আরংজিবকে বিচার করি ইংরেজ ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি দিয়ে। যেসব ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ আরংজিবকে সাম্প্রদায়িক চরিত্ররূপে চিত্রিত করেছেন তাঁরা কতটা আন্তরিকভাবে আরংজিবকে বোঝবার চেষ্টা করেছেন এবং কতটা ইংরেজ সরকারের বিভেদমূলক কূটনীতির সহায়ক হিসেবে ইতিহাস রচনা করেছেন তা বলা মুশকিল। কিন্তু আরংজিবের উপরে যাঁর গবেষণা সব চাইতে প্রামাণ্য সেই আচার্য যদুনাথ সরকার আরংজিবের মধ্যে সাংকীর্ণ ধর্মনীতির চাইতে বিস্তীর্ণ কূটনীতির ক্রিয়াই দেখেছেন বেশি।

সেই কূটনীতির ফলে মুঘল সাম্রাজ্যে যে ফাটল ধরে সেখান দিয়েই ইংরেজরা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জগতে প্রবেশ করে। ইংরেজরা যখন বাংলা দেশে ক্ষমতা দখল করে তখনও উত্তর ভারতের শাসন ব্যাপারে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রতিপত্তি অব্যাহত। পলাশীতে নবাবকে অপসারণের যে-চক্রান্ত হয়েছিল তাতে হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্মাবলম্বীর প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজরা যখন সত্যি সত্যি ক্ষমতা দখল করে নিল তখন মুসলমানদের টনক নড়ল। তারা অবশ্য ধর্মের ভিত্তিতে কোনও প্রবল প্রতিরোধ ইংরেজদের দিতে পারল না, শুধু সব বিষয়ে ইংরেজদের সঙ্গে অসহযোগিতা শুরু করল। কিন্তু ইংরেজরা শুধু সাম্রাজ্যবাদের নয়, আধুনিকতারও প্রতিভূ হিসেবে এদেশে এসেছিল। তাদের সঙ্গে অসহযোগিতার অর্থ আধুনিকতার সঙ্গেও অসহযোগিতা। তাদের এই অসহযোগিতার পিছনে কাজ করছিল পরাভূতের মনস্তত্ত্ব। তাদের হাত থেকে দেশের শাসন ক্ষমতা কার্যত ইংরেজরা কেড়ে নিল। শাসনকার্যের জন্যে মুসলমান আমলে ফার্সী ব্যবহৃত হতো। তার স্থান নিল ইংরেজী। হিন্দুদের যেমন মাতৃভাষা ছাড়া শিখতে হতো শাসক শ্রেণীর ভাষা আরবী ও ফার্সী, এখন শিখতে হলো ইংরেজী। হৃতক্ষমতা মুসলমানদের পক্ষে ইংরেজী শেখা শুধু দুরূহ নয়, অপমানকরও মনে

হলো। পক্ষান্তরে হিন্দুরা আগেকার মতোই মাতৃভাষার অতিরিক্ত একটি ভাষা শিখে একই সঙ্গে ইংরেজ-প্রবর্তিত শাসন-ব্যবস্থায় মুসলমানদের হটিয়ে স্থান করে নিতে লাগল ও আধুনিকতার সঙ্গে সরাসরি পরিচিত হতে থাকল। অর্থাৎ ইংরেজের ক্ষমতা দখলে হিন্দুদের দ্বিতীয়বার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হলো না, কিন্তু মুসলমানদের বিলক্ষণ হলো। কেননা তাদের স্থান ইংরেজরা নেওয়াতে তারা পড়ে গেল হিন্দুদেরও নিচে।

এ-সময় মুসলমানদের অবস্থা কী হলো তা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ১৮৯৬র কলকাতা অধিবেশনে মুসলমান সভাপতি জনাব আর, এম, সয়ানীর ভাষণে বর্ণিত হয়েছে: "Of course, they (the Mussalmans) grumbled and groaned, but the irony of fate was inexorable. The stern realities of life were stronger than fiction. The Mussalmans were gradually ousted from their lands, their offices; in fact everything was lost save their honour. The Hindus, from a subservient state, came into the lands, offices and other wordly advantages of their former masters. Their exultation knew no bounds, and they trod upon the heels of their former masters. The Mussalmans would have nothing to do with anything in which they might have to come into contact with the Hindus. They were soon reduced to a state of utter poverty. Ignorance and apathy seized hold of them while the fall of their former greatness rankled in their hearts."

ফল হলো এই যে আধুনিক ভাষা, আধুনিক সাহিত্য, আধুনিক দর্শন, আধুনিক বিজ্ঞান, আধুনিক শিক্ষা, আধুনিক মূল্যবোধ প্রভৃতির থেকে মুসলমান জনসাধারণ অনেক পেছনে পড়ে থাকল আর হিন্দু জনসাধারণ ইংরেজদের দালালী ও সাগরেদীর সূত্রে এসব জিনিসের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকল। হিন্দু জনসাধারণ যখন এ দেশে ইংরেজদের স্বার্থ কায়েম করতে ব্যস্ত তখন ওয়হাবীরা তলে তলে ইংরেজ বিতাড়নের পরিকল্পনা করে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে তাদের ইংরেজদ্রোহী কার্যকলাপ শুরু হয় এবং তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম দশক পর্যন্ত তা পুরাদমে চলে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি স্যার সৈয়দ আহমেদ খান ও কোনও কোনও মুসলমান নেতা ওয়হাবী আন্দোলনকে সিপাহী বিদ্রোহী আন্দোলন বলে প্রচার করেন। তাঁদের মত যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত তা নয়, তবে তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ওয়হাবী ও সিপাহী আন্দোলনকে ইংরেজরা খুবই কঠোর ভাবে দমন করে। ওয়হাবী সন্দেহ করে প্রচুর নিরপরাধ মুসলমানের উপর নির্যাতন চালায়। তাই পরবর্তীকালে মুসলমান নেতারা প্রমাণে সচেষ্ট হন যে ওয়হাবী আন্দোলন ইংরেজদের বিরুদ্ধে নয়, শিখদের বিরুদ্ধে করা হয়েছিল; তাঁরা একথাও বলেন যে সিপাহী অভ্যুত্থানেও মুসলমানরা অংশ গ্রহণ করেনি এবং করে থাকলে অতি মুষ্টিমেয় সংখ্যক করেছিল। তাঁরা যে ওয়হাবী আন্দোলন ও সিপাহী অভ্যুত্থানের দরুণ ইংরেজদের আক্রোশ থেকে মুসলমান জনসাধারণকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন তা স্পষ্ট। স্যার উইলিয়ম হাণ্টার "The Indian Mussalmans" গ্রন্থে বলেছেন ওয়হাবী আন্দোলন ছিল মুখ্যত ইংরেজ-বিরোধী এবং ওয়হাবীরা ছিল ঘোর ইংরেজ বিদ্বেষী এবং ইংরেজদের ক্ষমতা দখলের পরে মুসলমানদের উপরে যেসব অবিচার হয়েছিল তাতে তাদের পক্ষে ঘোর ইংরেজ-বিদ্বেষী হওয়াটাই ছিল একান্ত স্বাভাবিক।

ওয়হাবীরা যে-বছর থেকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয় তার আগের বছরে রামমোহন পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চালু করার জন্যে আবেদন জানিয়ে আমহার্স্টের কাছে এক চিঠি লেখেন। আধুনিক শিক্ষা প্রচলনে সে-চিঠি ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৮১৭ সালে

কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। বৈষয়িক সুখ-সুবিধার জন্যে হিন্দুদের ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ থেকে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা। সে-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল শুধু হিন্দুদের জন্যে। রামমোহন বাঙালীর মূল্যবোধের চেতনাতে যে-চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন তাকে একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যায় হিন্দু কলেজের ক'জন ছাত্র। এই ছাত্রদলকে বলা হতো ইয়ং বেঙ্গল। হিন্দু কলেজের জনৈক শিক্ষক হেনরি ডিরোজিয়োর অনুরাগী হিসেবে তাঁদেরকে ডিরোজিয়োন বলেও অভিহিত করা হয়। রামমোহন যে রাজনৈতিক চেতনার জন্ম দিয়েছিলেন তাকেও ডিরোজিয়োনরা ব্যাপকতর রূপ দেন। রামমোহন বাঙালীর সাংস্কৃতিক সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে যে অগ্রগতির সূচনা করেন তাকে কতকাংশে ডিরোজিয়োনরা কতকাংশে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কতকাংশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি আরও সমৃদ্ধ করে তুলতে থাকেন। ইংরেজরা দেশের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে তুলছে এবিষয়ে কোনও কোনও প্রগতিবাদী সচেতন হয়ে থাকলেও তাঁদের সকলেই বুঝেছিলেন যে দেশের ইতিহাসে এক নতুন গৌরবময় অধ্যায় উন্মুক্ত হতে চলেছে ইংরেজ শাসনের পরিণাম হিসেবে। তাই সিপাহী অভ্যুত্থান যখন ইংরেজদের উৎখাত করতে চাইল তখন প্রগতিবাদীদের যথার্থই ওই অভ্যুত্থানকে দেশের বৃহত্তর প্রগতির পরিপন্থী মনে হলো। এই প্রগতিবাদীরা সকলেই ছিলেন হিন্দু সমাজের অন্তর্গত। প্রগতিশীলদের যদি একটি সম্প্রদায় বলে অভিহিত করা যায় তাহলে সেই সম্প্রদায়ের ধর্মকে বলতে হয় হিন্দু ধর্ম। সবার অলক্ষ্যে প্রগতির সঙ্গে হিন্দুত্বের সামুজ্য হতে থাকে। ফলে সিপাহী অভ্যুত্থান দমিত হলে আলোকপ্রাপ্ত সমাজের মনে হলো ইংরেজরা প্রগতি তথা হিন্দুত্বকে রক্ষা করেছে। তাই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ওই সমাজের মনের কথা প্রকাশ করলেন:

"ভারতের প্রিয়পুত্র হিন্দু সমুদয়।
মুক্তমুখে বল সবে ব্রিটিশের জয়।

অর্থাৎ ১৮৫৭ সালের জনসাধারণের মধ্যে হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম নিয়ে বিভেদের উপরে পাশ্চাত্য ভাবধারার আলোক নিয়েও আর একটা বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। হিন্দুমাত্রেই আলোকপ্রাপ্ত না হলেও দেখা গেল যে মোটামুটি ভাবে আলোকপ্রাপ্ত মাত্রেই হিন্দু। আর পশ্চাদবর্তী মানেই যে মুসলমান তা না হলেও সাধারণভাবে মুসলমানদের মধ্যে পশ্চাদবর্তিতা বেশি। তার উপরে সিপাহী অভ্যুত্থানের পেছনে যেমন প্রগতিবাহক ইংরেজদের উৎসাদনের, তেমনই ছিল দিল্লীর বাদশাহকে তাঁর পুরনো গৌরবে পুনর্বাসন করার পরিকল্পনা। ফলে শাসক ও শাসিত উভয় মহলেই ধারণা জন্মায় যে ওয়হাবী আন্দোলনের মতোই উক্ত অভ্যুত্থান মুসলমান-শক্তি পুনরুদ্ধারের এবং মধ্যযুগে প্রত্যাবর্তনের একটা মুসলমানী প্রচেষ্টা। যদিও প্রকৃতপক্ষে সিপাহী অভ্যুত্থান ছিল হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত উদ্যম।

সিপাহীরা মধ্যযুগে প্রত্যাবর্তন করতে চেয়েছিল যে-অর্থে তার বিপরীতঅর্থে শিক্ষিতরা মধ্যযুগকে ডিঙিয়ে চলে গেল একেবারে প্রাচীন যুগে। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণের একটা বিশেষ প্রসঙ্গ হলো প্রাচীন ভারতবর্ষের আবিষ্কার। এখানেও রামমোহন পথপ্রদর্শন করেন হিন্দু ধর্মের উচ্চতর দর্শনের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারপরে ডিরোজিয়োর কবিতা ও তাঁর শিষ্যদের কার্যাবলী, আলোচনা, বক্তৃতা ও রচনাদি ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজকে অনুসন্ধিৎসু করে তোলে। কিন্তু আলেকজাণ্ডার কনিংহমের অধীনে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান এবং প্রাচ্যতত্ত্ববিদ ম্যাক্সমুলর, উইলসন, কার্ণ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির গবেষণার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আবিষ্কার করল পূর্বপুরুষদের গৌরবময় উত্তরাধিকার। কিন্তু এই উত্তরাধিকার একান্তভাবে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির জিনিস। ইংরেজরা পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠতার যে-চমক সৃষ্টি

করেছিল তার সামনে সাধারণভাবে বাঙালী সমাজ হীনমন্যতা বোধ করেছে এবং হিন্দুত্বকে আঁকড়ে ধরে থেকেছে নিছক রক্ষণশীল মনোভাব থেকে। হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি যে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির চাইতে কোন অংশে হীন নয় তা রামমোহন প্রমুখ মাত্র কয়জন মনীষীর প্রত্যয়ে থাকলেও জনসাধারণ কুযুক্তি ও কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু দিয়ে ওই পাশ্চাত্য অভিঘাত প্রতিরোধে সমর্থ হয়নি। তাই উনবিংশ শতাব্দীর সমাজে যখন প্রাচ্যের উত্তরাধিকার একে একে উদ্ধৃত হতে থাকল তখন তা বাঙালীর তথা ভারতীয়দের চেতনাতে এমন এক গৌরব-ও ঐক্য-বোধ সঞ্চার করল যাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠতে লাগল আধুনিক জাতীয়তা-বোধ। আর যেহেতু এই ভিত্তি ছিল হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি তাই ওই জাতীয়তাবোধের হিন্দুত্ব দিয়ে আক্রান্ত হওয়াটা অনিবার্য হয়েছিল। ডঃ সুরেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষাতে "The revelation of India's past was one of strongest foundations on which Indian nationalism was built, and gave it that stamp of Hindu character which made its influence felt in many ways at different stages of political evolution in India."

যখন এভাবে এদেশে জাতীয়তাবোধের জন্ম হচ্ছে তখন ইউরোপে চলেছে জাতীয়তাবাদের জয়জয়কার। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে ইউরোপেও জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়। ইংরেজদের সূত্রে সে-সংবাদ এদেশের শিক্ষিত সমাজের কাছে পৌঁছয় ও সেসময়ে আগ্রহ জাগিয়ে তোলে। তারপরে দেখা গেল জাতীয়তাবাদের মন্ত্রগুরু প্রথমে ইটালী ও দশ বছর পরে জার্মানী দুটি ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন শক্তিশালী দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এটাও একটা বিচিত্র যোগাযোগ যে দু-বছরে ইটালী ঐক্যলাভ করে সে-বছরেই কবিগুরু বাটি খুঁড়ে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন উদ্ধার করা শুরু করেন। বাঙালীদের মধ্যে ইংলণ্ড ও ইউরোপ ভ্রমণের প্রবণতাও বেড়ে যায়। পাশ্চাত্যের সঙ্গে সাহিত্য ও ভ্রমণের মাধ্যমে যোগাযোগ যত ঘনিষ্ঠ হতে থাকে ততই পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ এদেশের মাটিতে পুষ্টি লাভ করে। ইংরেজ-সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ থেকে আমেরিকার মুক্তিলাভ ও আয়রলণ্ডের মুক্তি-সংগ্রাম বিশেষভাবে আমাদের রাষ্ট্র-নেতাদের অনুপ্রাণিত করে। একই সময় খ্রীস্টান মিশনারীদের সঙ্গে বিতর্কে কেশবচন্দ্র সেনের বিজয় এবং ইংলণ্ডের অধিবাসী ও সংবাদপত্রগুলি কর্তৃক কেশবচন্দ্রকে মানবমুক্তির দোতা রূপে সংবর্ধনা দেশবাসীর জাতীয়জীবনে ইন্ধন জোগায়। বিপিনচন্দ্র পালের সাক্ষ্য এই :

"The old paralyzing sense of superiority of their new political masters over them was visibly replaced by a new self-confidence in our educated countrymen in consequence of Keshab's successful missionary propaganda in England." কেশবচন্দ্রের ইংলণ্ড-ভ্রমণের মতো ভারত-ভ্রমণও জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কেননা বিভিন্ন ভাষাভাষী বিভিন্ন অঞ্চলবাসী বিভিন্ন মতবাদী ভারতীয় জনগণকে একসূত্রে গ্রথন করার সেটাই একালের প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রয়াস। প্রকৃতপক্ষে পরবর্তীকালের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবসত্ত্বেও আধুনিক সর্বভারতীয়তার প্রথম মহান প্রতীক কেশবচন্দ্র।

ওই প্রতিক্রিয়াশীলতা প্রকাশ পায় কেশবচন্দ্রের মধ্যে শেষজীবনে যুক্তিহীন ভক্তিবাদ ও আত্যন্তিক পাশ্চাত্য মনোভাবে এবং তখন তিনি ও তাঁর অনুসারিবৃন্দ দেশীয় জনসাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। এই সংকটকালে রাজনারায়ণ বসুর আবির্ভাব। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ রোধ করার জন্যে তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দেশীয় ঐতিহ্য

ও আচরণ পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। দেশীয় ক্রীড়া ও ব্যায়াম, দেশীয় সংগীত, দেশীয় চিকিৎসা-পদ্ধতি, দেশীয় রন্ধন ও খাদ্য, লজ্জা ও ভব্যতা, দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা ছিল এই সমিতির লক্ষ্য। রাজনারায়ণ বসুর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর সহায়তায় নবগোপাল মিত্র হিন্দুদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেম ও আত্মনির্ভরতা জাগাবার উদ্দেশ্যে হিন্দু মেলা নামে একটি সম্মিলনীর ব্যবস্থা করেন। এই মেলার নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে এটি ছিল হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং কেশব যে-সর্বভারতীয়তার বীজ বপন করেছিলেন তা ১৮৬৭ সালের মধ্যে বিনষ্ট হয়েছে। হিন্দু জাতীয়তাবাদের আদর্শকে নবগোপাল নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন।

"Hindu nationality is not confined to Bengal. It embraced all of Hindu name and Hindu faith throughout the length and breadth of Hindusthan; neither geographical position, nor the language is counted a disability. The Hindus are destined to be a religious nation."

হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে পাশ্চাত্যের সংযোগ, হিন্দুদের মধ্যে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে আধুনিকতার আলোকপ্রাপ্তি, ইংরেজ কর্তৃত্বের আশ্রয়ে হিন্দুদের বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধি, প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার মহান ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার এবং সে সঙ্গে মুসলমান জনসাধারণের হীনমন্যতার জগদ্দল পাথরের নিচে চাপা পড়ে থাকা একটা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া; আর এরই ফলে হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে একটা কাটল সমাজের উপরের স্তরে সৃষ্টি হলো যদিও গ্রামীণ স্তরে তখনও জাতিগত ভিত্তিতে বিভেদ দেখা দেয়নি। কেশবচন্দ্রের মধ্যে সর্ব-ভারতীয়তার আদর্শে যে-নেতৃত্বের সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল তার পূর্ণ বিকাশ হলে ঘটনাস্রোত কোনদিকে যেত বলা যায় না; ইতিহাসের গতি ইংরেজদের ক্ষমতা দখলের পর থেকে যেদিকে ধাবিত হতে শুরু করে, তাতে বোধ করি কেশবচন্দ্রের পক্ষে অভ্রান্ত ও লক্ষ্যে স্থির থাকা অসম্ভব ছিল। রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র প্রভৃতি ইতিহাসের স্রোতের নিচে বিভেদের যে-শক্তি কাজ করছিল সবার দৃষ্টির আড়ালে তাকেই ব্যক্ত করে তুললেন।

সেই শক্তি আরও স্পষ্ট হলো বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের মধ্যে। আনন্দমঠ একদা বাংলার মুসলমানকে যেরকম প্রভাবিত ও প্রণোদিত করেছে তা আগে বা পরে আর কোনও বই করেনি। উপন্যাস ও যে-রূপ প্রচলিত তাতে মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে হিন্দু সন্ন্যাসীদের প্রতিরোধের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে; তাতে হিন্দু দেবী শক্তিরূপিণী কালী দেশমাতা হিসেবে বন্দিতা। এ-কথা ঠিক যে বঙ্কিমচন্দ্র যেরূপ যত্ন সহকারে ও নিরপেক্ষভাবে উপন্যাসগুলিতে মুসলমান চরিত্র অঙ্কন করেছেন তার তুলনা নেই এবং কোনও মুসলমান লেখকও অতখানি যত্নের সঙ্গে কোন অধর্মীর চরিত্র অঙ্কন করতে পারেন নি। কিন্তু ঐতিহাসিক বিলাসীর বাংলা বিজয় বা রাজপুতদের সঙ্গে মুঘল বাদশাহের সংঘর্ষের ভিত্তিতে যেসব উপন্যাস তিনি লিখেছেন সেগুলি পড়লে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্বলতা বা শ্রদ্ধা কোন দিকে ছিল। প্রকৃতই বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী তৎকালীন শিক্ষিতমানসে একটা ইসলাম-বিরোধী মনোভাব গড়ে তুলেছিল এবং বিপিনচন্দ্র পাল স্বীকার করেছেন যে যৌবনে তাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পাঠে কোনও মুসলমান চরিত্রের সাক্ষাতে কতখানি সুখী বোধ করতেন। পরবর্তীকালে দেশপ্রেমের মন্ত্র ও জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে বন্দেমাতরম গৃহীত হয় এবং তার চাইতেও বড়ো কথা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার যুগে বন্দেমাতরম পাল্টা হিন্দুদের হিংসাত্মক কাজের আওয়াজ।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বিবেকানন্দও ছিলেন যুক্তিবাদী উদার পরমসহিষ্ণু। এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বিবেকানন্দের বাণীও

পরবর্তীকালে একটা পর্যায়কে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বিবেকানন্দকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনকও বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমকে তিনি একটি উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত করেন। ভারতের তরুণদের ডেকে তিনি বলেছিলেন: "হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে! এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে! হে ভারত, ভুলিওনা—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথসর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র, ভুলিও না—নীচজাতি মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিনরাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।" স্পষ্টতই বিবেকানন্দের আহ্বান একান্তরূপে হিন্দুধর্মাবলম্বীর কাছে এবং এখানে হিন্দুর ধর্মীয় কল্পনা ও সংস্কারকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যা ভিন্নধর্মাবলম্বীর মনে বিরাগ জাগাতে বাধ্য। অথচ মূর্খ দরিদ্র ভারতবাসীকে তিনি যেভাবে স্বীকার করেছেন তা তাঁর উদার সমাজতান্ত্রিক আদর্শের পরিচায়ক হলেও এই সমাজতন্ত্রে অহিন্দুর প্রবেশ অসম্ভব।

ভারতবর্ষ প্রাচীন কাল থেকে বহু মানবগোষ্ঠীর মধ্যে যে বিভেদ তার মধ্যে ঐক্যের এবং মধ্যযুগ থেকে বহু ধর্মমতের মধ্যে যে বিরোধ তার মধ্যে সমন্বয়ের সাধনা করে এসেছে। কিন্তু আধুনিক কালে এসে যখন ভারতবর্ষের ইতিহাস জাতীয়তাবাদের পর্যায়ে প্রবেশ করে তখন সে-সাধনার স্রোত শুকিয়ে গেল; এবং ঐক্য ও সমন্বয়ের চাইতে বড়ো হয়ে উঠল স্বাতন্ত্র্য। অবশ্য জাতীয়তাবাদের মূল কথাই হলো শ্রেষ্ঠতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ। এক শ বছর ধরে ইংরেজদের সেবা করে ভারতবাসীর মনে যে হীনমন্যতা এসেছিল তার থেকে মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে হলো জাতীয়তাবাদে দীক্ষা। এই জাতীয়তাবাদকে সর্বধর্মের ভিত্তির উপরে স্থাপন করতে পারলে ইংরেজের প্রভুত্বকে খর্ব করা সোজা হবে একথা সর্বপ্রথম যিনি প্রবলভাবে ঘোষণা করেন তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। একই রাজনৈতিক স্বার্থ ও স্পৃহাকে সিদ্ধ করার জন্যে ধর্ম-গোষ্ঠী-বর্ণ-নিরপেক্ষ ভারতবর্ষের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে শিবনাথ শাস্ত্রীর অনুগামী ব্রাহ্ম যুবকদের সহায়তায় ইণ্ডিয়ন অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় সাধনাকে রাজনৈতিক স্তরে কতকটা পুনরুজ্জীবিত করেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের গণ্যমান্য ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তিদের সঙ্গে ইণ্ডিয়ন অ্যাসোসিয়েশন যোগাযোগ স্থাপন করে এবং এর আদর্শকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচারের সচেষ্ট হয়। এজন্যে দু'বছর ধরে সুরেন্দ্রনাথ সমগ্র ভারত পরিক্রমা করেন, তাঁর এই পরিক্রমা সমস্ত ভারত জুড়ে একটি অখণ্ড ও সর্বব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

ইণ্ডিয়ন অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকলাপ ও জনপ্রিয়তাতে ব্রিটিশ সরকার শঙ্কিত হয়ে উঠলে এবং প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও প্রয়াসকে ব্যর্থ করার জন্যে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড ডাফরিনের পরামর্শে অ্যালান অক্টোভিয়ন হিউমের পরিকল্পনা অনুসারে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হলো। ব্রিটিশ সরকার আশা করেছিল কংগ্রেস দেশীয় শিক্ষিত সমাজে তাদের গণতান্ত্রিক সংসদীয় ব্যবস্থার গুণগান করে তাদের জনপ্রিয় করে তুলবে। কিন্তু কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে ব্রিটিশ সরকারের গুণগ্রাহী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তথাকথিত রাষ্ট্রদ্রোহী প্রতিষ্ঠান ইণ্ডিয়ন অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সমঝোতা হয় এবং সুরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য ইংরেজবিরোধী নেতাগণ ইণ্ডিয়ন অ্যাসোসিয়েশনের পৃথক অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে কংগ্রেসের মাধ্যমে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া স্থির করেন। আপন আশীর্বাদপুষ্ট কংগ্রেসের এই রূপান্তরে লর্ড ডাফরিনের উষ্মা ও বিরাগ বিস্ফোরিত হলো ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের শেষে নভেম্বর সেন্ট অ্যাণ্ড্রুজ ডে ডিনারে প্রদত্ত ভাষণে। শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের নিয়ে গঠিত কংগ্রেসকে তিনি বর্ণনা করলেন "microscopic minority" রূপে এবং এই অনুপরিমাণ সংখ্যালঘুদের যে দেশবাসীর পক্ষ নিয়ে কিছু অভিযোগ করার অধিকার থাকতে পারে তা তিনি অস্বীকার করলেন। ইতিমধ্যে দেশবাসীর মনে যে-দেশপ্রেম জেগেছিল সেইটেই কংগ্রেসের ওই রূপান্তর সম্ভব করেছিল। বাংলার নেতাগণও প্রাদেশিক ও দলীয় স্বার্থকে ত্যাগ করে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে নিজেদের পুরাতন প্রতিষ্ঠানকে কংগ্রেসকে মধ্যে বিলীন করে দিলেন।

ইংরেজ কূটনীতিকগণ দেখলেন যে-উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতে তাঁরা উৎসাহ দিয়েছিলেন তা ব্যর্থ হতে চলেছে. দিনে দিনে কংগ্রেস হয়ে উঠছে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সমস্ত দেশপ্রেমিক ভারতবাসীর মিলনক্ষেত্র। তখন তাঁরা কংগ্রেসের স্বাভাবিক শ্রীবৃদ্ধিকে বিনষ্ট করার জন্যে অন্য পথের সন্ধান করলেন। সেই অন্য পথ হলো দেশবাসীর মনে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের জাগানো। বাংলা দেশে জাতীয়তাবোধের মধ্যে একটা হিন্দুত্বের ছাপ সেই সিপাহী অভ্যুত্থানের সময় থেকেই প্রকট হতে সুরু করে। ওদিকে পাঞ্জাবে দয়ানন্দ সরস্বতী যে-আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন তার মধ্যেও মুসলমান-বিরোধী মনোভাব অতিমাত্রায় সুস্পষ্ট; সত্যার্থ-প্রকাশে দয়ানন্দ খ্রীস্টধর্মের চাইতে ইসলাম ধর্মকে অনেক বেশি প্রচণ্ডতার সঙ্গে আক্রমণ করেছেন। ইংরেজ কূটনীতিবিদগণ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন। কেননা তাঁরা বুঝলেন ক্রমবর্ধমান ইংরেজ-বিরোধিতাকে রোধকরা সম্ভব তাকে বিপথে অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পথে পরিচালিত করে। হিন্দুরা তো মুসলমানদের থেকে নিজেদের আলাদা করে নিয়েইছে, এবং মুসলমানরাও সবদিক থেকে হিন্দুদের তুলনাতে পেছিয়ে পড়েছে, এখন যদি মুসলমানদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগানো যায় তাহলেই ইংরেজের কেল্লা ফতে করা সম্ভব। এই মতলব নিয়ে ইংরেজরা এসে দাঁড়ালেন তৎকালীন মুসলমান নেতা সৈয়দ আহমেদের পাশে কল্যাণ-কামী বন্ধুরূপে।

সিপাহী অভ্যুত্থানের পরে সৈয়দ আহমেদ ও অন্যান্য মুসলমান নেতাগণ কীভাবে ইংরেজের আক্রোশ থেকে মুসলমান জনসাধারণকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তা আগেই বলা হয়েছে। কলকাতায় যেবছর হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয় সে-বছর সৈয়দ আহমেদ জন্মগ্রহণ করেন। সরকারী চাকুরির সূত্রে ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে তিনি আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় পান এবং রামমোহনের মতোই অনুভব করেন যে আধুনিকতাই ভারতবর্ষের মুক্তির পথ। সেসঙ্গে দুঃখের সঙ্গে আবিষ্কার করেন যে উত্তর ভারতের অধিবাসীরা কেমন করে নিজেদের মূঢ়তা দিয়ে সে-পথকে রুদ্ধ করে রেখেছে। ১৮৬৯ সালে তিনি দিল্লীর সন্নিকট গাজীপুরে

ট্রান্সলেশন সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন যা পরবর্তীকালে বিবর্তিত হয় সায়েন্টিফিক সোসাইটি অব আলিগড়। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা আধুনিকতাকে ভারতবর্ষের জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া। নিজেই বলেছেন, "to cultivate our intellects and to conform ourselves to the age" হলো গৌরব অর্জনের অদ্বিতীয় পন্থা। মুসলিম জনসাধারণকে তিনি বোঝাতে চাইলেন যে ধর্মে বলপ্রয়োগ করা হবে না এটাই হলো ইসলামে বিশ্বাসের মূল কথা। ধর্ম পালনে কেউ বাধা দেয় যদি শুধু সেক্ষেত্রেই অস্ত্রের প্রয়োগ সিদ্ধ: "Mahammedanism grasped the sword, not to destroy all infidels and pagans, not to force men to become Moslems at the sword's point, but only to proclaim that eternal truth the unity of Godhead, throughout the whole extent of the then known globe." এবং যারা অনুরূপ আচার করেছে তারা জন্মসূত্রে মুসলমান হতে পারে, কিন্তু ধর্মসূত্রে তারা অমুসলমান। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "The Mahammedan Social Reformer" নামে পত্রিকা প্রকাশ করে স্বদেশীয়দের ধর্মান্ধতা দূরীকরণে ও আধুনিক বিজ্ঞান দর্শন সাহিত্য শিল্পের প্রচারে সচেষ্ট হন। এসময় থেকেই তিনি এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন যার উপরে ইংরেজ সরকারের কোনও হাত থাকবে না এবং সেখানে আধুনিক জ্ঞানের সঙ্গে নীতিশিক্ষাও দেওয়া হবে। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর স্বপ্ন সফল হলো। মহামেডান অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ মুসলমান, হিন্দু ও ইংরেজ শিক্ষাপ্রেমিকদের অর্থ সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হলো। যে সকল হিন্দু অর্থ সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে পাতিয়ালা, ভিজিয়ানাগ্রাম ও বেনারসের মহারাজা ও মহারাণী স্বর্ণময়ীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলকাতার হিন্দু কলেজে মুসলমানদের স্থান ছিল না, কিন্তু আলিগড় কলেজে সব ধর্মের ছাত্রছাত্রীদের জন্যেই দরজা খোলা ছিল। স্যর উইলিয়ম হান্টার যখন সাত বছর পরে আলিগড় কলেজ পরিদর্শন করেন তখন সেখানে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা সাতাশ। তবে একথা সত্যি যে সৈয়দ আহমেদ আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের জন্যে বিশেষভাবে আবেদন জানিয়েছিলেন মুসলিম যুবকদের কাছে, কেননা মুসলিম সমাজ ছিল হিন্দুদের তুলনায় পশ্চাদপদ এবং আধুনিকতা সম্বন্ধে অজ্ঞতাহেতু মুসলমানদের সঙ্গে ইংরেজদের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি চাইছিলেন যে ভারতীয়রা ইংরেজের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে যোগ দিক এবং সেখানে আধুনিকতায় দীক্ষিত হিন্দু মুসলমান সমান মর্যাদা পাক। তিনি সচেতন ছিলেন, "respect will be commanded only when my countrymen will be holding positions equal to those of the ruling race."

১৮৮৩ সালে আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ হলেন থিওডোর বেক। সৈয়দ আহমেদের উপরে অতি অল্পকালের জন্যেই তিনি অপ্রত্যাশিত প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হন। এবং এই প্রভাবই কালে হিন্দু-বিরোধী মনোভাবের জন্মদেয় সৈয়দ আহমেদের মনে। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয় ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের বিপরীতে ইংরেজ সরকারের সমর্থক একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে। কিন্তু পরের বৎসরেই কংগ্রেসের চরিত্র একেবারে পালটে যায় এবং ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনকে আত্মসাৎ করে তা সুস্পষ্টভাবে একটি সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে। মিঃ বেক বোঝালেন সৈয়দ আহমেদকে যে কংগ্রেস যেহেতু ইংরেজ-সরকার-বিরোধী তাই তাতে যোগ দিলে মুসলমানরা আধুনিকতা-বিরোধী হয়ে যাবে এবং আধুনিকতার জয়যাত্রাকে অব্যাহত রাখতে হলে রাজনীতি থেকে দূরে থাকা দরকার। শুধু এটুকুই নয়, মিঃ বেক আরও বোঝালেন যে

রাজনীতিতে ইংরেজ বিরোধিতা করতে গিয়ে হিন্দু জনসাধারণ আধুনিকতা অর্জনে আর অগ্রসর হতে পারবে না এবং মুসলিম জনসাধারণের পক্ষে এইটেই সুবর্ণ সুযোগ রাজনীতির থেকে দূরে সরে একাগ্র হয়ে আধুনিকতা অর্জনের দৌড়ে হিন্দুদের ধরে ফেলার ও ছাড়িয়ে যাওয়ার। এর পরে কংগ্রেস যখন প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের প্রস্তাব তুললেন তখন মিঃ বেক বোঝালেন যে এর তাৎপর্য হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের শাসন এবং মুসলমানরা যেহেতু সংখ্যালঘু তাই শাসনব্যবস্থাতে তাদের কোনও অংশ থাকবে না, যতই তারা শিক্ষায় চিন্তায় আধুনিক হোক না কেন, উপরন্তু পাঞ্জাবের আর্য সমাজ ও বাংলার হিন্দু সমাজ যে চিন্তাধারা অনুসরণ করছে তাতে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের প্রথম সুযোগেই হিন্দুরা চেষ্টা করবে মুসলমান প্রগতিকে রুদ্ধ করার।

আধুনিকতা ছিল সৈয়দ আহমদের সবচাইতে বড়ো দুর্বলতা এবং তিনি জানতেন যে জ্ঞান-বিজ্ঞান আধুনিকতার সারাৎসার তার তীর্থক্ষেত্র হলো ইউরোপ, বা, আরও স্পষ্ট করে, ইংলণ্ড। যখন একজন খাস ইংরেজ ভারতবর্ষের সমাজ-ব্যবস্থা ও রাজনীতির এরূপ বিশ্লেষণ দিচ্ছেন তখন তা স্যার আহমদের কাছে অকাট্য ও অমোঘ মনে হলো। অতঃপর তিনি মুসলিম জনসাধারণকে রাজনীতি তথা কংগ্রেস থেকে দূরে সরে যাওয়ার আহ্বান জানালেন। তাছাড়া তিনি ধরে নিলেন যে, যে-কংগ্রেস প্রতিনিধিমূলক সরকারের পরিকল্পনা করে কার্যত হিন্দুদেরই হাতে শাসনক্ষমতা তুলে দেওয়ার কথা ভাবে সে কংগ্রেসও শুধুমাত্র হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান না হয়ে যায় না। স্যার আহমদের মাথায় ঢুকল হিন্দুরা কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত করছে এবং তার পরিণামে মুসলিমের প্রগতি ব্যাহত হবে অনির্বাচভাবে। এর থেকে রাজনীতি জিনিসটার উপরেই তাঁর বিদ্বেষ এসে গেল। শুধু কংগ্রেস থেকে নয়, রাজনীতি থেকেই মুসলমান জনসাধারণকে দূরে থাকার আবেদন জানালেন। মাত্র ১৮৮৭ সালে স্যার আহমেদ এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে হিন্দু ও মুসলমান শব্দ দুটি কেবল ধর্মীয় পার্থক্য নির্দেশ করে, কিন্তু তারা উভয় মিলে একটি অখণ্ড জাতি। কিন্তু ১৮৮৮ এ তিনি বললেন: "I Consider the experiment which the Indian National Congress wants to make fraught with dangers and suffering for all the nationalities of India specially for the Muslims" এবং "The aims and objects of the Indian National Congress are based upon an ignorance of history and present day realities; they do not take into cosideration that India is inhabited by different nationalities." একই বছরে মিঃ বেকের পরিকল্পনাতে সৈয়দ আহমেদ ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ন পেট্রিয়টিক অ্যাসোসিয়েসন প্রতিষ্ঠা করেন শুধুমাত্র কংগ্রেস —বিরোধিতার উদ্দেশ্য নিয়ে। ১৮৯৩ সালে এই সম্মিলনীর নাম পালটে মিঃ বেক নতুন নাম দিলেন মহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েসন অব আপার ইণ্ডিয়া। বেক হলেন এর সম্পাদক এবং সম্মিলনীর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো অন্যান্য ভারতীয় সম্প্রদায়ের থেকে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করে ইংরেজদের সঙ্গে যুক্ত করা। এক প্রবন্ধে মিঃ বেক ঘোষণা করলেন তাঁর উদ্ভাবিত তথ্য: "The objective of the Congress is to transfer the political control of the country from the British to the Hindus."

আলিগড় আন্দোলন ও তার প্রতিষ্ঠাতা স্যর সৈয়দ আহমেদকে দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রবক্তা হিসেবে সাধারণ সমালোচনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু যুক্তি দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাতে যে নবজাগরণ হয় তারই সম্প্রসারণ হলো আলিগড় আন্দোলন। ওই নব-জাগরণের সুফল দেখা দেয় হিন্দু সমাজে আর আলিগড়

আন্দোলনের সুফল দেখা দেয় মুসলীম সমাজে। প্রকৃতপক্ষে আলিগড় আন্দোলনই মুসলিম সমাজকে আধুনিকতার দীক্ষা দেয়। এজন্যে রক্ষণশীল মুসলমানদের কাছ থেকে রামমোহন বিদ্যাসাগরের মতোই সৈয়দ আহমদ প্রচণ্ড বিরোধিতা পান। যখন তিনি আলিগড় আন্দোলন শুরু করেন তখন মুসলমান গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা ছিল মাত্র ছাব্বিশ আর হিন্দু গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা এক হাজার ছশ বাহান্ন। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে এটা ছিল নিতান্ত অসম প্রগতি। সৈয়দ আহমেদের কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাবের পেছনে কতকগুলি কারণ ছিল। প্রথমত, তিনি স্বভাবতই ছিলেন একজন অত্যন্ত অনুগত ও গুণমুগ্ধ ব্রিটিশ প্রজা এবং ইংরেজ-শাসন যে এদেশকে মধ্যযুগের দৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিয়েছে সেই বোধে ইংরেজের প্রতি অন্তর থেকে কৃতজ্ঞ, ফলে কোনও ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন জানানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল; দ্বিতীয়তঃ, অনগ্রসর মুসলিম জনগণের পক্ষে প্রাগ্রসর ইংরেজদের রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক স্তরে বিপক্ষতা করা মূঢ়তা সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন, অর্থাৎ তিনি চেয়েছিলেন যে আধুনিক ইংরেজ ও আধুনিক হিন্দুর পাশে মুসলমানরা আধুনিক মানুষ হিসেবে সসম্মানে দাঁড়াক, মুসলমানরা যেন অনাধুনিক বলে কারও কাছে অপমানিত না হয়; সর্বোপরি, তিনি জানতেন যে ভারতবর্ষের এক চতুর্থাংশ জনসংখ্যা নিয়ে মুসলমান সমাজের পক্ষে কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার দাবিতে সুর মেলালে ওই সমাজ চিরদিনের জন্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়রূপে অবহেলিত থাকার ব্যবস্থা করবে।

কিন্তু এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফল হলো হিন্দুমুসলমানের মধ্যে দুস্তর ব্যবধানের সৃষ্টি। ইতিহাসই বিষবৃক্ষের বীজ বপন করেছিল। একে ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য বলে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। সেসঙ্গে একথাও স্মরণীয় যে ওই বীজে জল সেচন ও অঙ্কুরের পরিচর্যা করেছে ইংরেজ—এখানে ইংরেজের ভূমিকা ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। "Divide et impera should be the motto of our administration" এই প্রস্তাব প্রথম করা হয় ১৮২১সালে এশিয়াটিক জর্নালের পৃষ্ঠাতে এবং উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরা তা সমর্থন করেছিলেন। সপ্তম দশক পর্যন্ত ইংরেজদের পক্ষপাত ছিল হিন্দুদের প্রতি এবং হিন্দু প্রগতিতে তারা সাহায্য করেছে। কংগ্রেস গঠনের পরে যখন ইংরেজরা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝেছে হিন্দু জাতীয়তাবাদকে তাদের স্বার্থের পরিপোষক শক্তি হিসেবে পাওয়ার কোনও আশা নেই তখনই তারা নজর ফিরিয়েছে মুসলমানদের প্রতি, চেষ্টা করেছে মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়ে সাম্রাজ্য রক্ষায় সমর্থন ও সহায়তা আদায় করতে এবং তাদের সে-চেষ্টা সফল হয়েছে বহুলাংশে। এই পক্ষপাতমূলক নীতি প্রকট হলো ১৮৯২এর ইণ্ডিয়নকৌউনসিলস আক্টে। তৎকালীন গভর্ণর-জেনারেল লর্ড লানসডাউন ওই আইনকে বর্ণনা করলেন চারটি ধারায়:

"(1) It is not expected of us that we shall attempt to create in India a complete and symmetrical system of representation.

(2) It is expected of us that we shall make a bonafide endeavour to render the Legislative Councils more representative of the different sections of the Indian Community than they are at present.

(3) For this purpose we are at liberty to make use of the machinery of election wherever there is a fair prospect that it will produce satisfactory results.

(4) The ultimate selection of All Additional Members rests with the Government and not with the electors.

প্রকৃতপক্ষে চতুর্থ ধারাতেই সেই ছিদ্র রাখা হলো যেখান দিয়ে সরকার পছন্দমতো সদস্য প্রবেশ করাতে পারবে এবং এই আইন হলো দ্বৈত নির্বাচনপদ্ধতির ভিত্তি।

অতঃপর রঙ্গমঞ্চে লর্ড কার্জনের আবির্ভাব। বাংলাদেশে তখন জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের বন্যা বইতে শুরু করেছে। কূটবুদ্ধিতে লোক কার্জন দেখলেন এ-বন্যা রোধ করার চাইতে ভালো উপায় হলো প্লাবনকে বিভক্ত করা। স্যর হেনরী কটনের ভাষাতে, "it was a part and parcel of Lord Curzon's policy to enfeeble the growing powers and to destroy the political tendencies of a patriotic spirit." ১৯০৩এর ডিসেম্বর মাসে ঢাকা ও চট্টগ্রাম ডিভিশনকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ও আসামের সঙ্গে যুক্ত করে একটি মুসলিম প্রদেশ গঠনের অভিপ্রায় কর্জন ব্যক্ত করলেন। স্বয়ং পূর্ব বাংলার বিভিন্ন শহরে ঘুরে ঘুরে মুসলমান জনসাধারণের সকাশে তাঁর এই পরিকল্পনার স্বপক্ষে বক্তৃতা করে বোঝাতে লাগলেন যে এতে মুসলমানরা কতখানি লাভবান হবে, কত অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধে ও সম্মান পাবে। কোনও মুসলমান নেতা বা ইংরেজ রাজপুরুষের কাছ থেকে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির জন্যে এরকম জোরালো প্ররোচনা আসেনি। ১৯০৫এর ২৯শে সেপ্টেম্বর বিল পাশ হলো ও ১৬ই অক্টোবর থেকে আইন কার্যকর হলো।

একই বছরে লর্ড মিন্টো ভাইসরয় হয়ে এসে দেখলেন যে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে শিক্ষিত সমাজে ও বিশেষ করে কংগ্রেস মহলে প্রচণ্ড বিক্ষোভ। তাঁকে তখন ভাবতে হলো একটা "possible counterpoise to Congress aims." এবং তখন থেকেই কংগ্রেসের প্রতিপক্ষ হিসেবে শিক্ষিত মুসলমানদের সংঘবদ্ধ করার কাজ শুরু হলো। আলিগড় কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ মিস্টর আর্চবোল্ড এর উপরে এর জন্যে কলকাঠি নাড়ার নির্দেশ গভর্ণর জেনারেলের একান্ত সচিব কর্ণেল স্মিথ দিলেন। আর্চবোল্ডের প্রস্তাব-ও-ব্যবস্থাক্রমে তাঁরই কৃত বঙ্গভঙ্গের ভিত্তিতে স্মারকপত্র নিয়ে একটি সত্তর জন সদস্য বিশিষ্ট মুসলিম প্রতিনিধি মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন আগা খান, অন্তত স্মারকপত্রটি ভাইসরয়ের সামনে পাঠের দায়িত্ব তিনি পালন করেন। তাতে উচ্চ সরকারী পদে, উচ্চ আদালতের বিচারক পদে, বিভিন্ন পৌর প্রতিষ্ঠান ও জেলা পরিষদের সভ্যপদে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলীর ও ভাইসরয়ের একজিকিউটিভ কৌন্সিলের সদস্যপদে মুসলমানদের জন্যে বিশেষ প্রবেশ প্রার্থনা করা হয়। আরও বলা হয় যে গভর্ণর জেনারেল যেন ইংরেজ শাসনের পূর্বে মুসলমানদের যে-অবস্থা ছিল তাতে কতকটা ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়টা বিবেচনা করেন। তদুপরি তাঁরা ধর্ম ও মননচর্চার কেন্দ্র হিসেবে একটি একান্তভাবে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্যে আবেদন জানালেন। প্রতিনিধির আবেদনের উত্তর অনিবার্যভাবেই আন্তরিক আশ্বাসে পূর্ণ ছিল এবং মিন্টো নীতিগতভাবে প্রকাশ্যে ওই আবেদনের বক্তব্যকে সমর্থন করলেন। এই ঘটনা সম্বন্ধে একজন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ মিন্টোকে অভিনন্দন জানিয়ে লেখেন, "I must send your Excellency a line to say that a very very big thing has happened to-day. A work of statesmanship that will affect India and Indian history for many a long year. It is nothing less than the pulling back of sixty-two millons of people from joining the ranks of the seditious opposi-

tion." ওই গণপ্রতিনিধির পরবর্তী রূপ হলো ১৯০৬এর ডিসেম্বর মাসে ঢাকা ইতিহাস মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা। মুসলমান প্রধান প্রদেশের প্রধান শহর ঢাকাতে তার অধিবেশনে যে-সব প্রস্তাব গৃহীত হয় তার মূল কথা হলো যে এই প্রতিষ্ঠান যেমন একদিকে মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করবে তেমনই অন্য দিকে মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশের প্রতি বিশ্বস্ততা বৃদ্ধির চেষ্টা করবে।

স্যর সৈয়দ আহমেদ চেয়েছিলেন মুসলমানরা রাজনীতিতে যেন কোনও অংশ না নেয়। মিন্টোর সকাশে গণপ্রতিনিধি প্রেরণই একটা রাজনৈতিক পদক্ষেপ বলে গণ্য হতে পারে: কংগ্রেসের প্রতিপক্ষ হিসেবে একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের পরিকল্পনা মিন্টোর গোড়া থেকেই ছিল এবং যেমন করে আলিগড় আন্দোলনকে মিন্টো-মিল্ড-আর্চবোল্ডের যোগসাজসে 'ব্রিটিশ স্বার্থে ব্যবহার করা হয় তা রাজনীতিরই খেলা। ব্রিটিশের প্রতি বিশ্বস্ততা-বৃদ্ধির কল্পনা সৈয়দ আহমেদের চিন্তাধারার অনুসারী বটে, কিন্তু রাজনৈতিক দল হিসেবে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা আবার সে-চিন্তাধারার অস্বীকৃতি। অর্ধের প্রচ্ছদে একবার মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বার্থে সংঘবদ্ধ করার পরে আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসের গতি নির্ধারিত হয়ে গেল।* ৫

* কাশীশ্বরী গ্রন্থাগার, দার্জিলিঙের প্রদত্ত ভাষণ।

---

* [উপরোক্ত প্রবন্ধটিতে লেখকের তথ্যানুসন্ধানে সবিশেষ যত্ন, গভীর নিষ্ঠা ও প্রচুর পরিশ্রম স্বীকারের পরিচয় রয়েছে। লেখকের প্রতিটি মন্তব্যের সহিত সহমত না হয়েও একটা মূল্যবান রচনা হিসাবে পাঠকদের নিকট আমরা এটি উপস্থিত করছি। এ-কথা সর্বথা স্বীকার্য যে, আমাদের জাতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের তথ্য ও ধারণা বহুলাংশে বৃটিশ শাসকদের দ্বারা বিকৃত ও পরিবেশিত। কাজেই গত পঞ্চাশ বছরের শিক্ষিত সমাজের চিন্তা ও মানসিক গঠন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে পুনর্বিবেচিত হওয়ার দাবী রাখে। আমরা আনন্দের সহিত লক্ষ্য করছি আধুনিক ভারতের ইতিহাস, বিশেষভাবে দেশবিভাগের পূর্বপট আলোচনায় ও মূল্যায়নে কিছু প্রবীণ ও নবীন ঐতিহাসিক ও শিক্ষিত ব্যক্তি বর্তমানে প্রবৃত্ত হয়েছেন ; এই শুভ প্রচেষ্টাকে আমরা সবিশেষ অভিনন্দিত ও উৎসাহিত করি। অ. স.]

শিক্ষার মাধ্যম

রাজর্ষি

পশ্চিমবঙ্গে উচ্চশিক্ষা কোন্ ভাষার মাধ্যমে হওয়া উচিত তা নিয়ে বর্তমানে আলোচনা হচ্ছে। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সুতরাং এর যথোপযুক্ত পর্যালোচনা হওয়া আবশ্যক কর্তব্য। বর্তমানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমেই পরিচালিত হচ্ছে পশ্চিম বঙ্গে, সুতরাং প্রশ্নটি কার্যতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং ঐ পর্যায়ের শিক্ষা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

এই আলোচনার প্রারম্ভেই একটি বিষয়ের প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই নজর পড়ে। মাতৃভাষার মারফৎ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনান্তে শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেই এক বিষম বাধার সম্মুখীন হয়। ভাষার বাধা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বাহন হল ইংরাজি ভাষা, তদুপরে অনার্স পরীক্ষার উত্তর ইংরাজি ভাষায় দেওয়া বাধ্যতামূলক, যদিও পাস কোর্সে পরীক্ষার্থীর ইচ্ছানুযায়ী ইংরাজী অথবা মাতৃভাষার উত্তর দেওয়া যায়। বাংলা ভাষার মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করে এসে বেশীর ভাগ ছাত্রই কলেজের শিক্ষকদের পঠনপাঠন বুঝতে পারে না, অথবা বুঝতে খুব বেশী বেগ পায়, এইখানে তথাকথিত 'ইংরাজি' স্কুলের ছাত্রেরা বিশেষ সুবিধা পায়, এবং বহুক্ষেত্রেই 'বাংলা' স্কুলের ছাত্রদের উপর সহজেই টেক্কা দেয়: শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষার এই দ্বৈতবিধি (Diarchy) বহু ছাত্রের সর্বনাশের কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষা মাতৃভাষাতেই হওয়া উচিত, এবিষয়ে বর্তমান যুগে কোন মতদ্বৈধ নেই। পৃথিবীর সর্বদেশ এ তত্ত্ব মেনে নিয়েছে; এ বিষয়ে আলোচনার অবকাশ আছে বলে মনে হয় না, সুতরাং বর্তমানে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ও অন্যান্য সমস্তরের বিদ্যাপীঠ সমূহে শিক্ষার মাধ্যম কি হওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের মাতৃভাষা হচ্ছে বাংলা ভাষা, সুতরাং বাঙ্গলাভাষা স্বাভাবিক নিয়মেই এই রাজ্যে উচ্চশিক্ষার বাহন হবে স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই এটা মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু সমস্যা ঠিক এটা নয়। আসল প্রশ্ন হচ্ছে বাংলা ভাষার উপযুক্ততা নিয়ে, এই ভাষা কি উচ্চ শিক্ষার বাহন হবার উপযুক্ততা অর্জন করেছে? বাঙ্গলা ভাষা কি যথেষ্ট ঐশ্বর্যবান যাতে করে যুক্তিসহ ভাবের বাহন হতে পারে, পারে আধুনিক বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম ও সুষম প্রকাশ করতে?

এই প্রশ্নই উঠেছিল বাঙ্গলা ভাষা সম্বন্ধে, প্রায় একশ তিরিশ বছর আগে, একটু ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে। তখন প্রশ্ন উঠেছিল বঙ্গদেশের আদালতের ভাষা কি হবে। প্রচলিত ফারসীই কি চলবে আরও বহু কাল ধরে, না নবাগত শাসকের ভাষা ইংরাজি নেবে সেই স্থান? সেদিন বাঙ্গলাভাষার দাবী নিয়ে এগিয়ে এসেছিল শ্রীরামপুরের পাদরী মিশনারী পরিচালিত ইংরাজী ভাষার পত্রিকা The Friend of India, ১৮৩৪ খৃঃ ১৯শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় "Bengali Language" শীর্ষক প্রবন্ধে তারা ঐ দাবী উত্থাপন করেন এবং সমস্ত দিক বিবেচনা করে "The Friend of India' বাংলাই বাংলা দেশের আদালতের ভাষা হইবার যোগ্য এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। (শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়;

'বাংলা ভাষা' শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৪০ পৃঃ ২০২-২০৬)। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে তাঁরা তিনটি যুক্তির আশ্রয় নিয়েছিলেন। "প্রথমত বাংলা ভাষা তিনকোটিরও অধিক লোকের লিখিত ও কথ্য ভাষা।" "দ্বিতীয়ত সংস্কৃত হতে উৎপন্ন সমস্ত ভাষার মধ্যে বাংলাই সর্বাপেক্ষা শক্তিমতী; ইহার সাহায্যে সরল ও দুরূহ ভাব সুন্দর রূপে প্রকাশ করা যায়, (নিম্নরেখা লেখকের)। "তৃতীয়তঃ বাংলা ভাষার যত গ্রন্থ আছে, ভারতীয় অন্যকোন ভাষার তত নাই। প্রায় দেড়শ বছর আগে বাংলা ভাষার সপক্ষে যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শিত হয়েছিল, আজ সেই যুক্তিগুলি শক্তিগুণ জোর দিয়ে নিঃসন্দেহে উত্থাপন করা চলে। কোনও অত্যুক্তির আশঙ্কা আছে বলে মনে হয় না। এই যুক্তিত্রয়ের দ্বিতীয়টির প্রতি সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। বিশেষ করে শেষ অংশটির প্রতি—'ইহার সাহায্যে সরল ও দুরূহ ভাব সুন্দর রূপে প্রকাশ করা যায়। দেড়শ বছর আগেই বিদেশী চিন্তানায়কগণ এটা উপলব্ধি করেছেন এবং বিগত দেড়শ বছরে বাংলা ভাষা নিশ্চয়ই এই সম্পর্কে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করেছে এ কথা মনে করা অন্যায় হবে না। শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের এবং তৎকালীন আরও মহাশয়গণের এই বহু প্রচেষ্টা অবশেষে সাফল্য লাভ করে। এই সব আন্দোলনের ফলে ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী সিদ্ধান্ত দ্বারা রাজস্ব সম্পর্কীয় কার্যে এবং ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রচারিত নির্দেশবলে এক বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস হইতে জেলার আদালত সমূহে বাংলা ভাষা প্রচলন বিষয় নির্ধারিত হয়।" (শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, আদালতে বাংলা ভাষা শনিবারের চিঠি, ফাল্গুন ১৩৪০, পৃঃ ৪৪৯-৪৫১)।

উপরের উদ্ধৃতিগুলির উল্লেখের বিশেষ কারণ আছে; মনে হয় এগুলি অবাঙ্গের বর্তমান সমস্যার দিক্‌দর্শনে সাহায্য করবে। এখানে বিশেষ লক্ষণীয় হচ্ছে যে ফারসীর স্থলে বাংলা প্রচলন কালে পরিভাষা নিয়ে বিব্রত বোধ করেননি তৎকালীন ব্যবস্থাপকরা, কিম্বা বিধায় উপযুক্ত ফারসী শব্দ-সমূহ তাঁরা বাংলা ভাষাতে গ্রহণ করে আদালতে বাংলার প্রচলন সুগম ও সহজবোধ্য করেছেন। আদালতে আইনকানুন নিয়ে উকীল মোক্তার মুহুরী পেস্কাররা অতি সুনিপুণ ভাবে ফৌজদারী তথা দেওয়ানী মামলা মোকদ্দমার ফয়সালা করেছেন। তাতে বাংলা ভাষার জাতিপাত ত হয়ইনি, পরন্তু নয়া স্রোতে বঙ্গভাষার নদীনালা ফুলে ফেঁপে উঠে দেশ ও জাতিকে সজীব ও উর্বর করেছে। বাংলা ভাষার শব্দ সম্পদ তথা পরিভাষার প্রশ্নই আজ আবার উঠেছে। বিজ্ঞজন প্রশ্ন করছেন বাংলাতে কি যথেষ্ট সুষ্ঠু শব্দ রয়েছে যা দিয়ে বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্ব প্রকাশ করা সম্ভব? এরই সুস্পষ্ট ও উপযুক্ত উত্তর রয়েছে উদ্ধিখিত আদালতের ভাষা বিচারে। আর কিছু বলার প্রয়োজন আছে মনে করি না।

পরিভাষা অত্যাবশ্যক হবে কেন? এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা শুধু অবান্তর নয় অত্যাবশ্যকও বটে, যে ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে বর্তমানে পঠনপাঠন চলছে সেই ইংরাজি ভাষাতেও বৈজ্ঞানিক এবং প্রাযোগিক (technical) শব্দগুলি বেশীর ভাগইত মূলত ইংরাজি শব্দ নয়। তাদের বেশীর ভাগ গ্রীক অথবা ল্যাটিন শব্দ, কিছু ফ্রেঞ্চ ও জর্মন ও অন্যান্য অনুইংরাজি শব্দ। আদৌত কিন্তুমাত্র দ্বিধান্বিত হইনি তাতে। সজ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে ইংরাজি ভাষাতে সেই শব্দগুলি অবলীলা ক্রমে ব্যবহার করে যাচ্ছি। ইংরাজির বেলায় যদি এই স্বাধীনতা স্বীকার করতে কোনও দ্বিধা না থাকে তাহলে বাংলার বেলায় এ রীতি প্রচলনে কি আপত্তি থাকতে পারে, এবং কেনই বা থাকবে? এখানে অবান্তর হলেও উল্লেখযোগ্য যে সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র মহাশয় সাম্প্রতিক এক ভাষণে বলেছেন যে ইংরাজি ভাষায় বর্তমানে চারহাজার ভারতীয় শব্দ আছে, তাতেও' ইংরাজের পক্ষথেকে কোন আপত্তি উঠেনি। অতএব পরিভাষার জন্য

অনর্থক উদ্বিগ্ন না হয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন বিদেশী শব্দ সমূহ বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করে বাংলা ভাষাকে যেমন সম্পদশালী করা উচিত, তেমনি সেই সমৃদ্ধ বাংলা ভাষার মাধ্যমেই পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা পরিচালিত হওয়া উচিত।

মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা পরিচালিত হওয়া উচিত এবং বাংলাভাষা এ গুরুদায়িত্ব বহনে সম্পূর্ণ সক্ষম এ কথা মেনে নিলেও আর একটি বিরুদ্ধযুক্তির মোকাবেলা করতে হচ্ছে। যুক্তিটি মূলত রাজনৈতিক। আমাদের দেশ ইণ্ডিয়া তথা ভারত, কতকগুলি খণ্ডরাজ্যের সংযুক্ত রাষ্ট্র। প্রায় প্রত্যেকটি খণ্ডরাজ্যেরই বিশেষ উন্নত নিজস্ব ভাষা আছে। ভারতীয় যুক্ত রাষ্ট্রে এরকম চৌদ্দটি প্রধান ভাষা। বিভিন্ন খণ্ড রাজ্যবাসীরা সাধারণতঃ একে অপরের ভাষা বোঝেনা। এই বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের জন্য একটি কার্যকর যোগসূত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন। এই যোগসাধন হবে কোন ভাষার মারফতে? উল্লিখিত চৌদ্দটি ভাষার কোন একটিকে দিয়ে একাজ চলবেনা। সৌভাগ্য ক্রমে ঐ ১৪টি প্রধান ভাষা ছাড়াও একটি জীবন্ত ঐশ্বর্য্যশালী ভাষা ভারতের প্রতিটি খণ্ড রাজ্যে প্রচলিত হয়েছে সেটি হল ইংরাজি ভাষা। এই ইংরাজিতেই এত দিন কেন্দ্রে এবং খণ্ডরাজ্য গুলিতে রাজকার্য্যাদি সবকিছুই সুনিপুন ভাবে নির্বাহিত হচ্ছিল। উচ্চশিক্ষাও প্রতিটিরাজ্যে এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ইংরাজির মাধ্যমেই পরিচালিত হচ্ছিল।

এই ভাষাই স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে সমগ্র ভারতকে এক সূত্রে বাঁধতে পেরেছিল, এবং স্বাধীনতা লাভের পরেও এই কাজ সুসম্পন্ন করে যাচ্ছিল। সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রে সুশিক্ষার প্রয়োজনে মাতৃভাষা প্রচলিত করলেও, অন্যান্যক্ষেত্রে এই সংযোগ সূত্র ছিন্নকরবার কোন কারণও নেই, প্রয়োজনও নেই, প্রয়োজন হবে মাতৃভাষা শিক্ষাস্তরের সঙ্গে সঙ্গেই বাধ্যতামূলক ভাবে ইংরাজি ভাষা শিক্ষা শুরু করা। ইংরাজি কেবলমাত্র ভারতের বিভিন্নরাজ্যের মধ্যে যোগসূত্র নয়, ইংরাজি ভাষাই বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতের একমাত্র যোগ সেতুও বটে। সুতরাং সারাভারতের সঙ্গে যোগ রাখতে হলে ইংরাজি শিখতেই হবে। বেশ ভাল করেই শিখতে হবে। অতএব ভারতীয় নাগরিককে শিক্ষারম্ভের প্রথম মুহূর্ত থেকেই দুটি ভাষা সম্পূর্ণ রূপে আয়ত্ব করতে হবে। সে দুটি মাতৃভাষা এবং ইংরাজি ভাষা। তখন সম্পূর্ণ শিক্ষা মাতৃভাষাতেই পরিচালিত হতে পারবে। পশ্চিমবঙ্গে হবে বাংলা ভাষার মাধ্যমে।

আমাদের দুর্ভাগ্য এতেও সমস্যার সমাধান হবে না। সমস্যার মূল নিহিত রয়েছে এই সতন্ত্র ভাষাভাষী খণ্ডরাজ্যের এবং ভারতীয় যুক্ত রাষ্ট্রের মধ্যে যৌগিক ভাষা। প্রত্যেকটি খণ্ডরাজ্যে উচ্চশিক্ষা যৌগিক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে। প্রত্যেকটি খণ্ড রাজ্যে উচ্চশিক্ষা যদি আঞ্চলিক মাতৃভাষাতে পরিচালিত হয়, তাহলে বিভিন্ন খণ্ডরাজ্যের অধিবাসীরা নিজ নিজ রাজ্য ভিন্ন অপর কোনও রাজ্যে উচ্চশিক্ষা লাভে বঞ্চিত হবে নাকি? প্রখ্যাত অধ্যাপকগণের কার্যক্ষেত্র এইভাবে সীমাবদ্ধ হবার আশঙ্কাও পুরোপুরি ভাবেই থাকবে: এক্ষেত্রে করণীয় কি? ঘুরে ফিরে আমাদের ইংরাজির কথাই ভাবতে হচ্ছে;

ভারতের যৌগিক ভাষা হিসাবে যার প্রয়োজন একটু আগেই স্বীকার করা হয়েছে। কার্য্যতঃ দেখা যাচ্ছে একমাত্র ইংরাজি ভাষাই সমগ্র ভারতে প্রচলিত এবং সমস্ত অন্য-রাজ্যের দ্বিতীয় আঞ্চলিক ভাষা স্থানীয়। প্রতিটি অন্যরাজ্যে শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই ইংরাজি ভাষায় অধিকার আছে। প্রায় সবগুলি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সমস্তস্নাতকের বিদ্যাপীঠগুলিতে বর্তমানে ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে পঠনপাঠন চলছে। অবস্থাগতিকে তাই একরকম বাধ্য হয়েই আমাদের উচ্চশিক্ষার মাধ্যমের কথা পুনর্বিবেচনা করতে হচ্ছে। ঐতিহাসিক অনিবার্য্যতায় আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষা

মাতৃভাষার মাধ্যমে পরিচালিত হওয়ার কঠিন বাধা আছে। সমস্ত তথ্য পর্যালোচনা করে, সকলদিক বিবেচনা করে যে গ্রহণীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাচ্ছে তা হচ্ছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম ইংরাজি ভাষাই হওয়া সম্ভব। এবং স্বতঃসিদ্ধ ভাবে একথাও মানতে হবে যে ইংরাজি ভাষা শিখতে হবে একেবারে শৈশব থেকে প্রায় দ্বিতীয় মাতৃভাষারূপে। ইংরাজি ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি থাকলে মাতৃভাষার মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষাতে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজির মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা লাভে বিশেষ অসুবিধা হবে না।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু একটি প্রশ্ন রয়েই গেল। আপাত দৃষ্টিতে প্রশ্নটি একান্তই অভিমানের। আসলে কিন্তু শুধু অভিমানেরই নয় একান্ত প্রয়োজনেরও বটে। প্রয়োজন একটি সর্বভারতীয় ভাষার। কেবলমাত্র সংযোগের ভাষা নয়, সকল ভারতবাসীর প্রাণের ভাষা। ভারতের চতুর্কোণের সকল ভারতীয়ের মনে এক ভারতীয়ত্ব বোধ, এক জাতিত্ববোধ ঐকাত্ম্যবোধ আসতে হ'লে এক ভাষার প্রয়োজন। বিভিন্ন ভাষাভাষীর মধ্যে কুটুম্বিতা হতে পারে, আত্মীয়তা সহজ নয়। আত্মীয়তার জন্য আত্মজ হতে হয়—এক ভাষা জননীর সন্তান।

দুঃখের সঙ্গে এটা মেনে নিতে হচ্ছে যে বর্তমানে আমাদের ঐ রকম একটি ভাষা নেই। প্রচলিত ভাষাগুলির মধ্যে কোন একটিই এই অত্যাবশক কাজের উপযুক্ত নয়। এটা যত তাড়াতাড়ি স্বীকার করে নেওয়া যায় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক। এই যদি পরিস্থিতি তা হলে আমাদের কর্তব্য কি? কর্তব্য হবে আমাদের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের পেছনের সব ছোট ছোট বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে অগ্রসর হওয়া। আমাদের সৃষ্টি করতে হবে এমন একটি সর্বগ্রাহ্য সর্বভারতীয় ভাষা যার মাধ্যমে আমাদের জাতীয় চরিত্রের সম্যক প্রকাশ করা যাবে, আমাদের মানসিকতার সার্বিক স্ফুরণ সম্ভব হবে। আপনাদের কাছে আমার একান্ত আবেদন—এই ভাষার নাম হোক "ভারতী", ভারতের আপামর সাধারণের ভাষা ভারতী।

এই ভাষা সৃষ্টি কি ভাবে সম্ভব হতে পারে তারই একটু আভাষ দিতে প্রয়াসী হচ্ছি। এখানে কেবল মাত্র কাঠামোটি বর্ণনা করার চেষ্টা হবে। একে রক্ত মাংসে যুক্ত সাজিয়ে প্রাণরসে সঞ্জীবিত করে মহিমা ভাস্বর করা হবে বিজ্ঞ পণ্ডিত জনের কাজ। এই নব প্রচেষ্টার মূলসূত্র গুলি এরূপ হবে:—

১। আমাদের জাতীয় ভাষার নাম হবে "ভারতী"।

২। "ভারতী" রোমক লিপিতে লেখা হবে।

৩। 'ভারতী'র বাক্যগঠন রীতি অত্যন্ত সহজ ও সরল হিন্দির অনুসারী হবে।

৪। ইংরাজী এবং সংস্কৃত সমেত ভারতের প্রধান ১৪টি ভাষা থেকে ভারতীর জন্য শব্দ, বাক্যাংশ (phrase) বিশিষ্টার্থক বাক্যাবলি (idiom) এবং অলঙ্কারাদি আহরণ করতে হবে।

ভারতীর সৃষ্টি রূপায়িত করতে হলে নিম্নোক্ত প্রকল্পগুলি নিয়ে অবিলম্বে কার্য সুরু করা দরকার:

১। প্রথমেই আমাদের ফিরে যেতে হবে ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৬৬ সনের পূর্বাবস্থায় এবং সেই স্থিতাবস্থায় ইংরাজীই আমাদের একমাত্র সংযোগের ভাষা হিসাবে চালু থাকবে।

২। অবিলম্বে হিন্দী ইংরাজী+১৪টি প্রধান ভাষার অভিধান রচনা করে প্রকাশ করতে হবে, পাঁচ বছরের মধ্যে।

৩। এই সময়ের মধ্যেই Roget's Thesaurus এর অনুসরণে সর্বভারতীয় ভাষার Thesaurus অভিধান রচনা ও প্রকাশ করতে হবে।

৪। এই সময়কালে প্রত্যেকটি খণ্ডরাজ্য তাদের নিজের ভাষা-ইংরাজী+১৪টি ভাষার অভিধান এবং Thesaurus প্রকাশ করবেন।

৫। এই প্রকাশের শুরু থেকেই এই প্রচেষ্টার কথা যত প্রকারে সম্ভব সর্বিস্তারে প্রচার করে ভারতীয় অনুকূলে সর্বসাধারণের মনোভাব তৈয়ারী করে রাখতে হবে। এই প্রচারণার গুরুত্ব অসীম ; এখানে কোন গাফিলতি চলবে না।

৬। অভিধানগুলি প্রকাশিত হওয়ার পরেই শুরু করতে হবে ভারতীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনা। এর জন্য এক বছরের বেশী সময়ের দরকার হবে বলে মনে হয় না।

৭। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর বছর খানেক ধরে প্রাথমিকস্কুলের শিক্ষকদিগকে এই পাঠ্য পুস্তকগুলি সম্বন্ধে তালিম দিতে হবে। শিক্ষকবৃন্দ সম্যক ভাবে ওয়াকিবহাল হলে পরে সারা ভারতে প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে কেবলমাত্র এই পাঠ্যপুস্তকই বাধ্যতামূলক ভাবে চালু করতে হবে।

৮। এই ভাবে মাধ্যমিক স্কুলের পাঠ্যপুস্তকও প্রণয়ন করা হবে যাতে করে প্রাথমিক স্কুলের ছাত্ররা মাধ্যমিক স্কুলে প্রবেশ করে এই সকল পুস্তক ব্যবহার করতে পারে।

এই প্রথায় প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রেখে উচ্চ হতে উচ্চতর ক্লাসের পাঠ্যপুস্তক রচিত হবে, যাতে যে ছাত্র নিম্ন-প্রাথমিক ক্লাসে ভারতীতে রচিত পাঠ্যপুস্তক দিয়ে লেখাপড়া শুরু করেছিল, সে পরপর উচ্চক্লাসে ভারতীর মাধ্যমেই পড়াশুনা করতে পারবে।

৯। এরপরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক রচিত হবে।

১০। বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার যখন এই পরিবর্তন শুরু হবে, সেই সময়েই আমাদের রাজপুরুষ ও কর্মচারীদের বাধ্যতামূলকভাবে এই জাতীয় ভাষা শিক্ষা করতে হবে।

১১। আমাদের রাজনীতিবিদরা বিশেষ করে যারা কেন্দ্রীয় বা ধওরালা সমূহের আইন সভাগুলিতে প্রবেশ করতে চান তাদের পক্ষে এই ভাষাজ্ঞান অবশ্য প্রয়োজনীয় হবে। এই ভাষার দখল না থাকলে তাঁরা নির্বাচনে দাঁড়াবার উপযুক্ত বিবেচিত হবেন না।

এই ভাবে আশাকরা যায় অন্যূন পঁচিশ বছরের মধ্যে এক নবীন ভারতীয় যুবকদল ভারতীর মাধ্যমে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করে জীবনের ও জগতের সাথে মোকাবিলা করতে যথা উঁচু করে এগিয়ে আসবে।

কালক্রমে নবসৃষ্ট ভারতী দিনে দিনে পুষ্টি লাভ করে পূর্ণ কলেবরে আপন মহিমায় সগৌরবে আপন সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হবে। আর সেইদিন মহিমান্বিত ইংরাজী ভাষা—আপন মহৎ কর্তব্য সুসম্পন্ন করে সসম্মানে সিংহাসন থেকে নেমে আসবে। সেদিও কিন্তু ইংরাজীর প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে না। ইংরাজী থাকবে আমাদের সারাবিশ্বের সঙ্গে যোগসূত্র হয়ে।

সেই শুভদিনে, ভারতের বিজয়লাভের দিনে, শুধু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যমেই নয়, ভারতের সমস্ত শিক্ষার মাধ্যমই হবে ভারতী।

কর্কট রোগ

ডাঃ শৈলেশ রায়

[প্রবন্ধ লেখক ডাঃ শৈলেশ রায় বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজের জীবরসায়ন বিভাগের অধ্যক্ষ। লেখক দীর্ঘকাল ক্যানসার রোগ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আসছেন। এ সম্পর্কে কয়েকবৎসর পূর্বে তিনি আমেরিকা যান। ১৯৬৬র অক্টোবরে টোকিওতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ক্যানসার কংগ্রেসে ভারতের যে ১৫।১৬জন বিজ্ঞানী যোগদান করেন তাঁদের মধ্যে বর্তমান লেখক ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি। ভবিষ্যতে এঁর নিকট থেকে এবিষয়ে আরো লেখা জনপ্রিয় পাঠকদের জন্য পরিবেশন করবার আশা আমরা রাখি। ডঃ সঃ]

কর্কট রোগের প্রাদুর্ভাব বর্তমান কালে বিভিন্ন দেশে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেকের ধারণা এ রোগের প্রকট পূর্বেও প্রায় এরূপ ছিল এবং রোগ নির্ণয়ের পদ্ধতি তেমন উন্নত না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে তা ধরা পড়ত না, যার ফলে ক্যানসারের মৃত্যু সংখ্যা আমাদের কাছে অজ্ঞাত থাকত। এ ধারণার সমর্থনে যে তেমন কিছু সত্য আছে মনে হয় না। পরিসংখ্যানের সাহায্যে দেখা যায় বর্তমান কালে এ রোগের প্রকট সব দেশেই সবচেয়ে বৃদ্ধি লাভ করেছে। কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে অনেকে খুব হাল্কা ভাবে বলে থাকেন ইহা বর্তমান সভ্যতার রোগ, যেমন হৃদ্ বা রক্তের চাপ বৃদ্ধি জনিত অন্যান্য রোগ। এ কথা একবারেই সত্য নয়, কারণ প্রাগৈতিহাসিক যুগেও এ রোগের অস্তিত্ব সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে, যেমন অতীত যুগের মানবশিশুর বা মিশরীয় মমির অস্থিসংস্থায় বা অন্যান্যে। কাজেই বর্তমান সভ্যতা ও আধুনিক জীবনযাত্রার সংঘাতপূর্ণ পরিবেশে এ রোগের উৎপত্তি হয়েছে একথা বলা চলে না। তবে অতীতের নিদর্শন হতে একথা প্রমাণিত হয় যে সে সময় এ রোগের প্রাদুর্ভাব অনেক কম ছিল।

কর্কট রোগের একটা বড় বিশেষত্ব এই যে প্রাণিজগতের প্রায় সর্বস্তরে এমন কি উদ্ভিদ জগতেও এর প্রকোপ দেখা যায় কিম্বদধিক। প্রাণী ও উদ্ভিদ গোষ্ঠির জীবকোষের বিকাশ ও অনুবর্তনে অনেক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। আচার্য জগদীশ চন্দ্র সে জন্য দু জগতের মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট সীমারেখা আছে স্বীকার করতেন না এবং তাঁর বৈজ্ঞানিক জীবনের পরবর্তী কালের যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা সে সীমা রেখার অবলুপ্তি করণেরই প্রয়াস ছিল।

প্রাণীজগতের মধ্যে এ রোগের অস্তিত্ব প্রায় সর্ব স্তরেই পরিলক্ষিত হয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অধুনা লুপ্ত কিছু কিছু প্রাণীর অস্থিতে, এমন কি পাঁচ কোটি বছর পূর্বের অধুনা লুপ্ত ডাইনসর প্রাণীর অস্থাবশেষে এ রোগের চিহ্ন সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। সর্ব প্রকার মেরুদণ্ডী, অমেরুদণ্ডী, পোকা মাকড় এমন কি কোন কোন জীবাণুর মধ্যেও কর্কট রোগ বা অনুরূপ লক্ষণ সম্বলিত রোগের চিহ্নাবশেষে পাওয়া গেছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার ক্রমপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীব গোষ্ঠির বিবর্তন সাধিত হয়েছে। বিশাল জলধি প্রাণিজগতের

প্রথম আবির্ভাব ও আবাসস্থল এ বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রায় সর্ব-স্বীকৃত। সমুদ্রের সুগভীর তলদেশ অনেকটা শান্ত, পরিবেশ প্রায় পরিবর্তনহীন ও শীত-তাপ-নিয়ন্ত্রিত মৌলিক উপাদানে সমৃদ্ধ। সেজন্য জড় পদার্থে প্রথম প্রাণের সঞ্চার বোধ হয় ওখানে সম্ভব হয়েছিল কিন্তু পরিবেশের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জীবজগতের আপন বিবর্তন সুরু হয়েছে। যেখানে তার অভাব সেখানে আবর্তনের গতি স্থির বা মন্থর।

অনুসন্ধানে যতটা জানা গেছে সমুদ্রের গভীর তলদেশের জীব গোষ্ঠিতে কর্কট রোগের কোনরূপচিহ্ন আজ পর্যন্ত ধরা পড়েনি। কাজেই অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে সামুদ্রিক পরিবেশ ত্যাগ করে আবর্তন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রাণিকুল পরিবর্তিত নৈসর্গিক পরিবেশে নিজেদের স্থায়িত্ব বিস্তার ও সংরক্ষণে সমর্থ হয়েছিল পরবর্তি যুগে তাদের মধ্যেই কর্কট রোগের আক্রমণ সুরু হয়েছে।

ক্যানসার একটি ল্যাটিন শব্দ হতে উদ্ভূত, অর্থ Crab বা কাঁকড়া. সংস্কৃত প্রতিশব্দ কর্কট। গ্রীক Karakinos। অতএব দেখা যাচ্ছে নামের মধ্যে ভাবাগত সাদৃশ্য অনেক এবং সুপ্রাচীন কালে রোগের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ নিহিত আছে। কাঁকড়া যেমন তার সুতীক্ষ্ণ নখী বিদ্ধ করে পথে অগ্রসর হয় এবং যন্ত্রণার প্রতীক রূপে আমাদের মনে আসন্ন হয়, ক্যানসার রোগের অগ্রগতি ও পরিণতি তুলনায় অনেকটা তেমন। সেজন্য কাঁকড়া ক্যানসারের প্রতীক চিহ্ন হিসাবে গৃহীত হয়েছে। ক্যানসারের আরো কতকগুলি প্রচলিত নাম আছে: Malignant growth. Neoplasm ইত্যাদি। malignant শব্দটি বিশেষণ, যার শব্দগত অর্থ—যার কোন চিকিৎসা নেই এবং চরম পরিণতি মৃত্যু। Neoplasm একটি গ্রীক শব্দ হতে উদ্ভূত। Neos অর্থ নূতন Plasma যার উদ্ভব হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন অর্থে Sarcoma Carcinoma ইত্যাদিও ব্যবহৃত হয়। ক্যানসার একটি দুরারোগ্য ব্যাধি এবং জীব জগতের আবর্তন বিবর্তনের সুরুতে এ রোগ প্রাণিকুলের বিভিন্ন স্তরে বিস্তার লাভ করে। গত কয়েক দশকের মধ্যে এ নিয়ে যত গবেষণা ও অর্থব্যয় হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো হবে, অন্য কোন ব্যাধি নিয়ে তা হয় নি। বিভিন্ন ক্ষেত্রের গবেষক ও মণীষীবৃন্দ আজ ক্যানসার রোগের রহস্য উদ্ঘাটনে আত্মনিয়োগ করেছেন অথচ এ রোগের প্রকৃত নিদান সম্বন্ধে আজও আমরা প্রায় অজ্ঞ। এর রহস্য এত দুর্জ্ঞেয় বলেই বোধ হয় ক্যানসার গবেষণায় বৈজ্ঞানিকগণ এত প্রবল ভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন। তাছাড়া মানব কল্যাণের দিক দিয়ে এর একটা মস্ত আকর্ষণ রয়েছে। এজন্যেই দেখা যায় চিকিৎসাবিদ্, রাসায়নিক, জীব রাসায়নিক, জীবাণুবিদ, ভাইরাস বিশেষজ্ঞ, সুপ্রজননবিদ্ (genetics), শারীরবিদ, পশু চিকিৎসক এমন কি অনেক পদার্থবিদ পর্যন্ত আজ ক্যানসার গবেষণায় নিযুক্ত। অল্প কিছুদিন হয় টকিওতে একটি আন্তর্জাতিক ক্যানসার কংগ্রেস হয়ে গেল। যদিও এ কংগ্রেসে ক্যানসার সম্বন্ধে কোন নূতন তত্ত্ব বা নির্দেশ পাওয়া যায়নি তবু ক্যানসার রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য বিভিন্ন দেশের নানা গবেষণা কেন্দ্রে কি বিরাট প্রচেষ্টা ও আয়োজন চলছে তার একটা বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

ক্যানসার সম্বন্ধে কিছু বলার আগে এ রোগের গবেষণার ক্রমবিকাশ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যুক্তরাজ্য ক্যানসার গবেষণার সবদিক দিয়ে এখন অগ্রণী, কিন্তু কয়েক দশক আগেও সেখানে ক্যানসার গবেষণার জন্য সামান্য অর্থব্যয়ও অপব্যয় মনে করা হতো, কারণ রোগের চিকিৎসাই সে সময় লোকের কাছে মুখ্য ছিল, কাজেই চিকিৎসার উন্নতি বিধানই তখন একমাত্র কাম্য ছিল। গবেষণার গৌন এবং অনিশ্চিত ফলের উপর অনেকেরই সে সময় আস্থা ছিল না। কেবল লক্ষণ অনুযায়ী রোগের প্রকৃত চিকিৎসা সম্ভব নয়।

রোগের নিদানতত্ত্ব সম্বন্ধে সঠিক ধারণা একান্ত দরকার। একমাত্র গবেষণাই রোগের প্রকৃত কারণ উদ্‌ঘাটন করতে পারে। এ সত্য ধীরে ধীরে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। সুদূর অতীত কাল হতে বহু গবেষকের একনিষ্ঠ সাধনায় সে সত্যের পথ রচিত হয়েছে। খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ সালে মিশরীয়রা কর্কটরোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে। চরকসংহিতা বা তৎপূর্ববর্তী কালেও কর্কটরোগের শুধু উল্লেখই পাওয়া যায় না, চিকিৎসা পদ্ধতিরও বিস্তৃত বিবরণ দেখা যায়। খৃষ্টপূর্ব ৪৬০-৩৭৪ সালের মধ্যে ক্যানসারের প্রথম শ্রেণীবিভাগ করা হয়। ১৫০ খৃষ্টাব্দে গ্যালেন ক্যানসারের যে শ্রেণীবিভাগ করেন তা অদ্যাবধি মোটামুটি চলে আসছে। তাছাড়া ক্যানসারের কারণ সম্বন্ধে গ্যালেন যে মতবাদ প্রচার করেন বর্তমান কালেও তার আংশিক সত্যতা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাঁর মতে পিত্তের (bile acids) বিকারের ফলে ক্যানসার রোগের উৎপত্তি হয়। পিত্তের সাথে ক্যানসার উদ্দীপক (stimulant) মিথাইলকলানথ্রিনের (methylcholanthrene) এর গঠন বিন্যাসের (structure) অনেক সাদৃশ্য আছে।

১৭৭৫ সালে ইংরেজ চিকিৎসাবিদ পার্সিভাল পট (Percival Pott) আবিষ্কার করেন যে ক্যাব্‌টরীর চিম্‌নি পরিষ্কার কার্যে রত শ্রমিকদের অণ্ডকোষের ত্বকে এক প্রকার ক্যানসার দেখা যায়। চিম্‌নিতে আলকাতরা জাতীয় জিনিষ থাকে এবং উঠানামার সময় শ্রমিকদের অণ্ডকোষের ত্বকে অনবরত ঘষা লাগে, যার ফলে ক্যানসার উদ্ভব হয়। ক্যানসার গবেষণা ক্ষেত্রে ইহা একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার। কারণ এর পরবর্তী যুগে ক্যানসার গবেষণার পথ অনেক সুপ্রশস্ত হয়। এ আবিষ্কার হতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় আলকাতরার মধ্যে কোন জিনিষ আছে যা প্রাণিদেহে ক্যানসার রোগের উৎপত্তির কারণ হতে পারে। কাজেই আলকাতরার মধ্যে সে জিনিষের অনুসন্ধান সুরু হয়। দেখা গেল আলকাতরার মধ্যে বিশেষ গঠন বিন্যাসযুক্ত (structure) একরূপ জিনিষ আছে যার ক্রমাগত সংঘর্ষণের ফলে ত্বকে ক্যানসার উদ্ভব হয়। কিন্তু এক বড় আশ্চর্যের বিষয় এই যে একই গঠন বিন্যাস আবার বিভিন্ন জিনিষে দেখা যায়, যেমন ভাইটামিন ডি, কলেষ্টরল (cholesterol) পিত্ত, করটেক্স হরমোন্ (cortical hormone), প্রজনন হরমোন (sex hormone), ব্যাঙের ছাতার বিষ ইত্যাদি আরো কিছু কিছু জিনিষ এ সকল জিনিষের ক্রিয়া প্রক্রিয়া নির্ভর করে শুধু বিশেষ গ্রুপ বা সাইড চেনের বিশেষ ধারণার অবস্থান বা অভাবের জন্য।

১৮৩৯ সালে শোয়ান (Schwann) আবিষ্কার করেন প্রাণীর দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসংখ্য জীবকোষ দ্বারা গঠিত। এ জীবকোষের মধ্যে যাবতীয় রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া চলে যার ফলে জীবনের গতি সম্ভব। এ আবিষ্কার ডারউইনের বিবর্তন বাদেরই সমকক্ষ। পরবর্তী যুগে ক্যানসার জীবকোষের রোগ বলে স্বীকৃত হয়েছে। ১৮৬৩ সালে ভিরকাউ (Virchow) প্রচার করলেন শরীরের স্থান বিশেষে ক্রমাগত প্রদাহ (irritation) সৃষ্টির ফলে ক্যানসার উদ্ভব হতে পারে। সে মতবাদ বহুলাংশে সত্য বলে আজও নানাভাবে প্রচলিত আছে। ১৮৮৯ হানো (Hanau) এক দেহ হতে অন্য দেহে ক্যানসার সেল স্থানান্তরণ ও বর্দ্ধনের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এ আবিষ্কারের ফলে ক্যানসার গবেষণার বিশেষ অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। ১৯০১ সালে প্রাণি দেহে ক্যানসার উদ্ভব করান সম্ভব হয়। ফ্রিবেন (Frieben) লক্ষ্য করলেন যে একসূত্রে টিউবে যারা কাজ করেন তাদের হাতের ত্বকে অনেক সময় ক্যানসার রোগের আক্রমণ হয়। রঞ্জন-রশ্মি আবিষ্কারের পরে একই ব্যাপার দেখা গেল। বেডিয়ামের আবিষ্কারক ম্যাডাম কুরিও রক্তকণিকার ক্যানসারে আক্রান্ত

হন। এ সকল দৃষ্টান্ত হতে বুঝা যায় একসরে বিকিরণ জনিত প্রদাহের সঙ্গে ক্যান্সারের কোন নিকট সম্বন্ধ আছে। মানুষ ছাড়া আর অন্য প্রাণীর মধ্যে ক্যান্সার উদ্ভব করান ক্লুনেট (Clunet) একসরের সাহায্যে। ১৯১১ সালে রাউস (Rous) ভাইরাস (virus) ক্যানসারের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। এ অবিস্মরণীয় ক্যানসার গবেষণা। বিরাট অবদান। এ বৈপ্লবিক আবিষ্কারের স্বীকৃতি আজ এতদিন পরে রাউস পেলেন প্রায় জীবনের প্রান্তদেশে এসে। তিনি ছিয়াশী বছর বয়সে বৈজ্ঞানিকের দুর্লভ সম্মান নবেল পুরস্কার এবার পেয়েছেন। ১৯১৮ সালে জাপানী গবেষক ইয়ামাগিওয়া (Yamagiwa) প্রাণিদেহের ত্বকে আলকাতরা ঘষে ঘষে ক্যান্সার উদ্ভব করতে সমর্থ হন। ইহাও ক্যান্সার গবেষণা ক্ষেত্রে একটা বিরাট আবিষ্কার। জাপানীরা কাজের লোক, কথা বড় একটা বলেনা। এরূপ একটা বিরাট আবিষ্কারের পর তাঁর মনে যে আনন্দ হয়েছিল তা তিনি দু লাইন কবিতায় প্রকাশ করেন, যার অর্থ "আজ হতে ক্যানসার গবেষণা দৃঢ়-পদক্ষেপে চলতে পারবে।" ইয়ামাগিওয়া বেঁচে থাকলে বোধ হয় এ সম্মানের অধিকারী হতেন। এ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে তিনভাবে প্রাণিদেহে ক্যানসার প্রকট করান সম্ভব—যথা একসরে (physical), আলকাতরাজাত জিনিষ দ্বারা (chemical) এবং ভাইরাস (biological) এর সাহায্যে।

যারান্তে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করার ইচ্ছা রয়েছে। গত অক্টোবর মাসে টকিওর আন্তর্জাতিক ক্যানসার কংগ্রেস ও নভেম্বর মাসে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় ক্যানসার কংগ্রেসের খুব সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে এ প্রবন্ধ শেষ করা হলো। ক্যানসার রোগের আন্তর্জাতিক ইউনিয়ন (International Union against Cancer) নামক সংস্থা ও জাপান-বিজ্ঞান-সংসদের সহযোগিতায় গত অক্টোবর মাসে টোকিওতে নবম আন্তর্জাতিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। পৌরহিত্য করেন প্রখ্যাত জাপানী ক্যানসার গবেষক ডাঃ টমিজ যোশিদা। তাঁর আবিষ্কার চিরকালের জন্য 'যোশিদা সারকোমা" (Joshida Sarcoma) নামের সহিত যুক্ত থাকবে। তিনি ক্যানসার গবেষণার বিখ্যাত পথ প্রদর্শক ইয়ামাগিওয়ার উত্তরসাধক। পৃথিবীর প্রায় সব দেশ হতে চার হাজারেরও বেশী প্রতিনিধি এ সম্মিলনে যোগদান করেছিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ৩৪ জনের মধ্যে ১৪।১৬ জনের বেশী প্রতিনিধি এ কংগ্রেসে যোগ দিতে সমর্থ হন্ নি। ব্যক্তিগত বা বিদেশী মুদ্রা পাওয়ার অভাব এর কারণ হতে পারে। প্রখ্যাত ক্যানসার গবেষক ও আমাদের জাতীয় অধ্যাপক ডি. আর. থালোলকার আরো কয়েকজন ক্যানসার গবেষক এ কংগ্রেসে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হতে ছিলেন বর্তমান প্রবন্ধ লেখক। এ ধরণের আন্তর্জাতিক ক্যানসার কংগ্রেস ১৯৩২ সালে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিশ বৎসর পূর্বে ক্যানসার রোগের আন্তর্জাতিক ইউনিয়ন নামক সংস্থা প্রথম গঠিত হয়। উদ্দেশ্য ক্যানসার রোগ জয় করে মানব সমাজকে এ দুরারোগ্য ব্যাধির কবল হতে রক্ষা করা। সে উদ্দেশ্য এখনও সফল হয়নি সত্য কিন্তু সে সফল খুব দূরে অবস্থিত নয়, গবেষণার বর্তমান অগ্রগতি ও সাফল্য দেখে ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

টোকিও কংগ্রেসে ক্যান্সার রোগ আন্তর্জাতিক সমস্যা এবং গবেষণা ক্ষেত্রে ও প্রতিরোধকল্পে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়। বিরাট আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের ব্যবস্থা পরিচালনা যেরূপ নিখুঁত ভাবে সাধিত হয়েছে তাতে জাপানী কর্মদক্ষতা ও নিষ্ঠার এক অপূর্ব পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। ক্যানসার গবেষণার বর্তমান অবস্থা ও অগ্রগতি সম্বন্ধে নানা দিক দিয়ে আলোচনা

হয়েছে, তার মধ্যে আবার অনেক মনোজ্ঞ জাপানী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়েছে। শিল্প প্রধান জাপানে দেশবাসীদের কারুকলার প্রতি এরূপ অনুরাগ ও সূক্ষ্ম রুচি বোধ সত্যই বিস্ময়কর। তার কয়েকদিন পরই নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ভারতীয় ক্যানসার সোসাইটির উদ্যোগে কলিকাতাস্থিত চিত্তরঞ্জন ক্যানসার গবেষণা কেন্দ্রে তৃতীয় সর্বভারতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। সৌরহিতা-করেন প্রখ্যাত ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডঃ অমিয়কুমার সেন। ভারতের নানা স্থান হতে অনেক গবেষক ও বিশেষজ্ঞ এ কংগ্রেসে যোগদান করেন। বৈদেশিক প্রতিনিধির সংখ্যাও খুব কম ছিল না। উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন রুশ বিশেষজ্ঞ ডঃ নিকলাই এন. ব্লুখিন। তিনি ক্যানসার রোগের আন্তর্জাতিক ইউনিয়নের বর্তমান সভাপতি। ডঃ অমিয়কুমার সেন তাঁর সভাপতির ভাষণের প্রারম্ভেই যে উক্তি দিয়েছেন তা উল্লেখ করলেই কংগ্রেস সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হলো।

"শূন্যমাপূর্ণতাবেতি মৃত্যুরমৃতায়তে।
বিপৎ সম্পদিবাভাতি বিদ্বজ্জন সমাগমাৎ।" অর্থাৎ বিদ্বৎসমাগমে শূন্যের মধ্যে পূর্ণতা, মৃত্যু যেন অমৃত, বিপদের মধ্যে কল্যাণের আলো প্রতিভাত হয়।

না-সর্বনাশ, না-সফলতা— সাবলীল হক

প্রকৃত সমুদ্র কোন নিয়তির মধ্যে পরাজিত?
বোধের আহাজে দীর্ঘ নিশ্চিন্ত যাত্রণ
গলায় ঝুলিয়ে চাঁদ সব সর্বনাশ পার হয় —
কোথায় সমুদ্র, বোধি আহাজ, যাত্রণ?

তবে অনর্থক কেন প্রবেশ প্রস্থান?
অনর্থক জরায়ু ও শ্মশানের গান।
সর্বনাশ পার হ'লে সফলতা পার হ'তে হয়,
ফিরে চলো, এখানে এ-বাড়ী আর নয়।

শুধু শব্দ থেকে যায়, শুধু স্মৃতি, অর্থনীতি থাকে,
হর্ষ ও কবিতা এক পদে থেকে যায়,
কেন যে আহাজ চাওয়া, কেন যে সমুদ্র খোঁজা, আর,
কেন রাত্রে মনে হয় সারা দেহে ঘিরে আছে পাপ।

গলায় ঝুলিয়ে চাঁদ সর্বনাশ পার হওয়া যায় না কখনো,
সর্বনাশ পার হ'য়ে সফলতা পাওয়া যায় নাকি?

উপন্যাস

জল মাটি মন

মহীতোষ বিশ্বাস

ধীরে সুস্থে আশ্বিন মাসের দিনগুলো গড়িয়ে যেতে লাগল। আশ্বিন মাসের শেষাশেষি "বড়ো পুজো" অর্থাৎ দুর্গাপুজো হ'ল। এ-তল্লাটে এতোদিন বড়োপুজোর চল্ ছিল না। পুজো দেখতে যেতে হ'ত অনেক দূরে নায়েব-বাবুর বাড়ী। অতোদূরে কজনেই বা যেতে পারে। এবার পুজো হ'ল বাবুণী গ্রামে। চারিদিকে জল। পুজোর জায়গা পাওয়া মুশকিল। বারোয়ারী পুজো। অনেক জায়গার দরকার। ভেবেচিন্তে অবশেষে বাবুণী গ্রামের বউতলার জায়গা ঠিক করা হ'ল। বউতলায় অনেকখানি জায়গা। উঁচুও বেশ। জলে নাগাল পাবেনা। দুর্গা-প্রতিমার খান বানানোর বেশ কুৎসই জায়গা। পুজো এবার নতুন হ'লে কি হবে। জমজমাটি কিছু কম হ'ল না। বিরাট মেলা বসল। ওরা বলে 'আড়ং'। খলিহারী দোকান, মিষ্টির দোকান— আরো দুরেক রকমের দোকানপাট বসল। তিনদিন সমান তালে দশ বারো গাঁয়ের লোক নৌকা ভর্তি ক'রে পুজো দেখতে যাওয়াআসা করল। কদিনের জন্য শ্বশুর-ঘর থেকে বউতলো বাপের বাড়ী এলো। ঘোমটা খসিয়ে ঘেরে হ'য়ে। আমোদ-আহ্লাদ ভালোই হ'ল।

বিয়ের পরে পদ্ম একবার মাত্র বাপের বাড়ী এসেছিল। 'বেলাত্তি' অর্থাৎ দ্বিরাগমনে। নীলমণি সঙ্গে ক'রে এনেছিল। আবার নীলমণিই সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছিল। বাপের বাড়ী আর আসেনি পদ্ম। আসতে দেয়নি নীলমণি। নীলমণির বিরাট সংসার। সংসারে লোকজন অনেক। নীলমণির আপনার দুই পক্ষ। প্রথম পক্ষে ছেলেপুলে নেই। দ্বিতীয় পক্ষে দুই মেয়ে একছেলে। আর একটি হতে গিয়ে এ-বউটাও মারা যায়। তারপরে নীলমণি বিয়ে করে পদ্মকে। নীলমণির ভাই আছে তিনজন। তাদের ও কাচ্চাবাচ্চা অনেকগুলো। ভাইয়ে ভাইয়ে বনাবনি কম। ঠোকাঠুকি লেগেই আছে। তবে হাঁড়ি এখনো আলাদা হয়নি। একসাথেতেই চলছে। বিয়ের পরে পদ্মর উপর পড়েছে সংসারের হাড়িঠেলার ভার। প্রথম প্রথম ঝক্কা কষ্ট হ'ত। কতোদিন হাতে ছাঁকা লেগেছে। এখন অনেকটা স'য়ে গেছে। সারাদিন সংসারের বেদকা খাটনীর পরে আর বাপের বাড়ীর কথা ভাববারই অবকাশ পায়না পদ্ম। আর যাওয়ার কথা ভাবলেই বা কে তাকে অমনি নিয়ে যাচ্ছে! তাই খুব যেদিন মনটা খারাপ লাগে, সেদিন রাত্রে বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। বেশী শব্দ করার উপায় নেই। এখনই হয়ত লোকটা জেগে উঠবে। ঘুম বড়ো পাতলা। ঘুম ভেঙেই খেঁকিয়ে উঠবে—"রাত তো দুপোর হলো। তা ফোঁৎ-ফোঁতানির জ্বালায় কি একটু ঘুমোনিও যাবে না?"

এর পরে আর কান্না আসেনা পদ্মর। বালিশে মুখ গুঁজড়ে প'ড়ে থাকে নিঃশব্দে।

বাবুণী গ্রামে এবার বড়োপুজো হচ্ছে শুনে পদ্মর মনটা

নেচে উঠেছিল। এই সুযোগে একবার বাপের বাড়ী বেড়িয়ে আসতে পারবে। পুজোটাও অমনি দেখা হয়ে যাবে। পদ্ম ঝড়োপুজো দেখেছে মাত্র একবার। ছোটো ছিল তখন পদ্ম। ওদের পাড়ার সকলে নৌকাভরে নায়েববাবুর বাড়ী গিয়েছিল। পদ্মও গিয়েছিল মা বাবার সাথে। এখনো মনে আছে পদ্মর। ভোর রাতে নৌকা রওনা হয়েছিল। দুপুর কাবার ক'রে তবে পৌঁছেছিল। নদীর কূলে টক্‌টকে রাঙা দালানবাড়ী নায়েববাবুর। মণ্ডপে পুজো হচ্ছিল। সে কি ভীড়! কতো লোকজন! ছোটো ছেলেমেয়েরা কেউ আর নৌকা থেকে নামতেই পারেনি। পদ্মরও প্রতিমা দেখতে যাওয়া হয়নি। যারা নেমে দেখতে যেতে পারেনি, সবাই জ্যাঠা ওদের কাছে এসে গল্প করেছিল—"সেইহে আ'লাম গো পিছিমে। এহেবারে পেথম সারিতি দাঁড়ায়ে দেখিচি। মাথার উপরে রইছেন এট্টুসখানি শিব-ঠাউর। তলায় দাঁড়ায়ে আছেন ঝড়ো-ঠারুণ। উঃ, ঝড়ো-ঠারুণের সে কি মুত্তি। দেখলি পরে চক্ষা নাগে। বাঘের পিঠি দাঁড়ায়ে অসুরডারে কোবারে ধরিচেন। আর বাঘডারে কি বানাইচে। মনে হ'লো, বাঘো ছা'ড়ে দিলি এখে খাবেনে। ঝড়ো ঠারুণির দুইপাশে রইছেন নক্কী-ঠারুণ আর সরোস্বতী-ঠারুণ। আর রইছেন গোনেশ-ঠাউর আর কাত্তিক-ঠাউর। সরোস্বতী ঠারুণির গার রোংখান কি ধলা। আর প্যাট্ দেখতি হবে গোনেশ-ঠাউরির। এহেবারে আমাগের পশ্চিম পাড়ার নক্কোনের প্যাটের মতন। নাদা প্যাটে হাতির মুত্তুতি কি ছিরিখানেই না খুলিচে। আর কাত্তিক-ঠাউর মোষেরের পিঠি চো'ড়ে ধনুবান হাতে নিয়ে চলিছেন নোড়োই কয়তি। ওঃ, নয়ন সার্থক হলো আজকে।"

যারা দেখতে যেতে পারেনি, তারা হাঁ ক'রে শুনেছিল সেই বর্ণনা। মনে মনে বড়ো সখ হয়েছিল পদ্মর,—একটিবার যদি দেখে আসতে পারত।

এবার আশ্বিনে সেই ঝড়োপুজো হবে ওদের গাঁয়ে। খবরটা শুনে পর্যন্ত মনে বড় সুখ ঠেকছে। কাজকর্মের ফাঁকে সময় পেলেই ঘাটে গিয়ে দাঁড়ায়। বাড়ীর চারপাশ দিয়ে ভাসন্ত জল। এ-গ্রাম সে-গ্রাম থেকে নৌকা করে বউগুলো বাপের বাড়ী যাচ্ছে। কতো আনন্দ ওদের মনে। কাল বিকেলে বাড়ীর পাশ দিয়ে একখানা নৌকা যাচ্ছিল। দেখেই পদ্ম ঘাটের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। গিয়েই চিনতে পেরেছিল। সৈরভী। ওদের বাকুলী গাঁয়ের দক্ষিণ-পাড়ার মেয়ে সৈরভী। ওর বাবার সাথে বাপের বাড়ী যাচ্ছে। পদ্মকে দেখেই সৈরভী হেসে বলেছিল—"ও পদ্ম, তুই বাপের বাড়ী যাস্‌নি আজো! তা কবে যাচ্ছিস তুই?"

পদ্মর মুখখানা একটু মলিন হয়ে পড়েছিল। তবু হেসে বলেছিল—"আস্থো দুই একদিনির মধ্যি যাবো। বাবা আসে আমারে নিয়ে যাবে।"

হঠাৎ পিছন থেকে একটা খরখরে গলা শোনা গেল—

"ঘাটে পথে দাঁড়ায়ে অতো কথা কিসির? বেহায়া বউডা নাজ-লজ্জা পোড়ায়ে খাইছে সব।"

পদ্ম চমকে ফিরে দেখে— ওর মেজ জা। বয়সে ছোটো। কিন্তু বয়সে পদ্মর চেয়ে অনেক বড়ো। এজমালী সংসারের গিন্নী। মুখের জোরে এতোবড়ো সংসারটাকে হাতের মুঠোয় করে রেখেছে।

পদ্ম তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে স'রে গেল সেখান থেকে।

তবু সব সময়েই পদ্মর মনটা আহ্লাদে ভ'রে থাকল। বাবা নিশ্চয়ই ওকে পুজোর আগে নিতে আসবে। সব মেয়েই বাপের বাড়ী যাচ্ছে। সেও নিশ্চয়ই যেতে পারবে। আর বাপের বাড়ী যাবার কথা মনে হ'তেই আরো একটা লোকের কথা মনে পড়ল পদ্মর। ভুলতে কি আর পেরেছে। ও যে আগুন। ছাইচাপা আগুন। ছাইটা একটু স'রে গেলেই আগুনটা বেরিয়ে পড়বে। কতো আর ঢেকে রাখবে। অনেক রাগ দুখ আছে পদ্মর মানুষটার পরে। তবু মনে হয়,

কতোদিন যেন ওকে দেখেনা। বড়ো দেখতে ইচ্ছে হয় মানুষটাকে একবার।

নীলমণির সঙ্গে এখনো ভালো করে কথাবার্তা বলে না পদ্ম। যেমন লজ্জা করে, তার চেয়েও ভয় করে বেশী। মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে বুকটা যেন কাঁপে। আর দিনের বেলায় বাড়ীতেও থাকে খুব কম সময় নীলমণি। নানান কাজে ব্যস্ত মানুষ। সলা-পরামর্শর জন্যে নায়েববাবুর বাড়ীতে তো যাতায়াত লেগেই আছে। পদ্মর সঙ্গে নীলমণির দেখা-সাক্ষাতের একটুখানি সময় তাই রাতের বেলাটা। তাও কাজকাম সেরে পদ্ম যখন ঘরে আসে, তখন নীলমণি ঘুমিয়ে পড়ে। খাটার মতন নাকটা ডাকতে থাকে। বাস ছাড়বার সময় তোর ডানো গালটা ফুলে-ফুলে ওঠে। ফস্ বেয়ে লালা গড়িয়ে পড়ে।

মাগো! পদ্ম ভয়ে ভয়ে গুটিসুটি মেরে খাটের এক কোণে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

সেদিন অনেক রাতে পদ্ম ঘরে এলো। এসে দেখে, তখনো নীলমণি জেগে। খাটের উপর বসে কি-সব এক গাদা কাগজ পত্র দেখছে। দলিল-পরচা হবে আর কি! খানিকক্ষণ খাটের কোণে দাঁড়িয়ে থাকল পদ্ম। তারপর সাহস ক'রে বলে ফেলো কথাটা—"বাকুনী এবার বড়ো পুজো হ'বে। বাবা যদি নিতি আসে, তালি আমি এট্টু যাবো কিন্তুক বাপের বাড়ী।"

অন্যমনস্ক ছিল নীলমণি। পদ্মর কথা শুনে চোখ তুলে ভুরু কুঁচকে বলল—"ক'নে যাবা ক'লে?"

গলা শুকিয়ে এসেছিল পদ্মর। নখ খুঁটতে খুঁটতে বলল আবার—

"এট্টু বাপের বাড়ী যাতি চাচ্ছিলাম।"

—"হুঁ, বাপের বাড়ী। বাপের বাড়ী না গেলি নাগরের সাথে পীরিতটুক জমবে কালো? জানো, বিয়ের আগে চলানি যা দেছো, - দেছো, আর ওসব চলবে না। কথাবার্তা চলাকেরা এট্টু সাবধানে করবা। অতো বেচাল-পানা চলবে না। পুজো দেখতি যাতি হয়, এগের সগোসের সাথে যাইয়ে সেইছে আসবা। বাপের বাড়ী যাওয়ার নামডাও করবা না কলাম।"

—বলতে বলতে নীলমণি আবার কাগজ পত্রে মন দিল।

পুজো হয়ে গেল।

পুজোর দুদিন আগে ভজহরি এসেছিল পদ্মকে নিতে। নীলমণি বাড়ী ছিল না। পদ্মকে নিতে হ'লে নীলমণিকে জানানো দরকার। অগত্যা রাতটা থেকে গিয়েছিল ভজহরি। অনেক রাতে বাড়ী এসেছিল নীলমণি। দুজনে কথাবার্তা হ'ল। ভজহরির চেয়ে বয়স কয়েকের বড়ো নীলমণি। সম্পর্কে ভজহরি নীলমণির গুরুজন। মান্যব্যক্তি। তা নীলমণি ভজহরিকে মান্য করেই চলে। আর ভজহরি নীলমণিকে জামাই বলে ডাকলেও, মনে মনে বেশ সমীহ করেই চলে। খাওয়া-দাওয়ার পর কাজের কথা তুলল ভজহরি—"বুঝলে জামাই, গেরামে এবার বড়োপুজা হচ্ছে! আকৃ-জমকাই ভালোই হবে মনে কর। তা, মাইয়ে-ভারে নিতি আলাম। ওর মা বড়ো কান্দাকাটি করতিছে। কয়ডা দিন মাইয়ে এট্টু ঘুরে-ফিরে আসুক।"

মুখ ভার করেছিল একথা শুনে নীলমণি। বলেছিল—পুজো-আচ্চার সোমায় বাপের বাড়ী যাবে—সে তো ভালো কথা। কিন্তু আমারও এট্টা কথা আছে। এই নিয়ে যে পাচ্জনে পাঁচটা আকথা-কুকথা রটাবে, তা আমার ভালো লাগবে না। তাচ্ছেয়ে আমার মনে কয়, না যাওয়াই ভালো।

অবাক হয়েছিল ভজহরি। থতমত খেয়ে বলেছিল—"এতে পাচ্জনের পাঁচকথা রটানির কি আছে তাতো বোজলাম না।"

নীলমণি বলেছিল—"সব কথা আমি জানি। কানে

আমার আইচে সব। তা আমার মত যদি ছাও, তাপি কই—বাইরের তোমার না যাওয়াই ভালে।"

আর কোনো কথা বলতে পারল না ভজহরি। খানিক বাদে নীলমণি উঠে গেল। ভাবতে লাগল ভজহরি—কি বলতে চায় নীলমণি। ছোটো-খাটো মান-অপমান কোনোদিন গায়ে মেখে না ভজহরির। কিন্তু আজকে নীলমণির কথাগুলো মনে ঝুড়ো লাগল ওর। সে গরীব হ'তে পারে, লোভী হতে পারে,- কিন্তু বাপ তো!

পরেরদিন চলে যাবার সময় ভজহরি আর একবার দেখা করতে চাইল পদ্মর সঙ্গে। কাজে ব্যস্ত ছিল পদ্ম। অনেকক্ষণ বাদে এলো। এসে দাঁড়ালো বাপের কাছে। মেয়ের মুখের দিকে তাকালো ভজহরি। কালকে ভালো করে দেখার সময় হয়নি মেয়েটাকে। পদ্মর মুখের দিকে তাকিয়ে ছ্যাঁৎ করে উঠল ভজহরির বুকটা। একি চেহারা হয়েছে পদ্মর। চোখের কোল ছুটো কালো দেখাচ্ছে! চোয়ালের হাড়টা উঁচু হয়ে উঠেছে। মেয়ের সুখদুঃখ ভালোমন্দ নিয়ে কোনোদিনই মাথা ঘামায়নি ভজহরি। বদরাগী আর লোভী সে। কিন্তু তার লোভের আগুনে যে মেয়েটাকে এইভাবে পুড়তে হবে, তা সে ভাবতে পারেনি কোনোদিন। পদ্ম কাছে এসে দাঁড়াতে বলল—"তোরে তো পাঠাতি চাচ্ছে নারে। কি কত্তি কো'স তুই।"

—"আমি শুনিচি সব বাবা। তা তুমি বাড়ী যাও। আমি যাবো না। আমার জন্যি ভাবে আর করবা কি।"

ঠেলে আসা উদ্যত কান্নাটা কোনোমতে আঁচল চাপা দিয়ে বেরিয়ে গেল পদ্ম।

অনেকক্ষণ তেমনিভাবে বসে রইল ভজহরি। উঠোনের কোণে চোখে পড়ল একটা শিউলি ফুলের গাছ। রাশি রাশি শিউলি ফুলে তলাটা একেবারে সাদা হয়ে গেছে। স্নিগ্ধ একটা গন্ধ এসে লাগল নাকে। অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে সারা শরীর যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল ভজহরি। আর মনের মধ্যে কে যেন বারবার বলতে লাগল—"ভালো হয়নি! ভালো হয়নি কাজটা!"

আশ্বিন মাস শেষ হ'ল। আস্তে আস্তে কার্তিকও পার হয়ে গেল। কার্তিকের প্রথম থেকেই জলে টান ধরল। মাঠ-ঘাট পথ-ভাগাড় আবার জেগে উঠতে লাগল। রাস্তা-ঘাটে প্রথমে কাদা ছিল। আস্তে আস্তে রোদ লেগে লেগে শুকিয়ে ট'কো হ'য়ে উঠতে লাগল। দেখতে দেখতে খাল-বিল খানা-খন্দ ছাড়া কোথাও আর জল রইল না। কার্তিকের মাঝামাঝি থেকেই রবি-শস্য বোনা শুরু হয়ে গেছে। ক্ষেতের সর-কাদার উপর ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে খেসারী, মটর, তিল, তিসি, সরষে—এমনি সব রবি-শস্যের বীজ। কার্তিকের ফসল। তাই নাম হল 'কা'তের ফসল" বড়-আড়ি কম করলেও চলে এদের। একেবার পাক ধরলে কেড়ে মুছে তুললেই হল। তবে তার এখনো দেরী আছে। সে হল মাঘ ফাল্গুনের কাজ।

আস্তে আস্তে এসে পড়ল অগ্রহায়ণ মাস। কাটুখালির দিগন্তর-জোড়া বিল জুড়ে ঝিকিয়ে উঠল পাকা ধানের রাঙা হাসি। সোনার বরণ ধান। যতদূর চোখ যায়, শুধু ধান আর ধান। মা-লক্ষ্মীর কাঁপি-খোপা, আঁচল-ছোঁয়া ধান।

এবার শুরু হবে ধান কাটার পালা।

১০

পুরোদমে ধান কাটার কাজ শুরু হয়ে গেল।

ভোর-ভোর থাকতেই নতুন ধানের ফেনা-ভাত খেয়ে সকলে কাস্তে হাতে বেরিয়ে পড়ে। অগ্রাণ মাস। নতুন শীত পড়েছে। রাত্রে শিশিরও পড়ে বেশ। শুকনো ধান গাছগুলোর উপর শিশিরের কোঁটা-কোঁটা জল জমে থাকে।

সকালবেলা বেশ শীত করে। কিন্তু সে আর কতোক্ষণ! বেলা একটুখানি বাড়লেই শিশিরের জল শুকিয়ে যায়। রোদের তাপও বাড়ে। বেশ মিঠে লাগে রোদ্দুরটা তখন। কাজেও বেশ হুৎ আসে। আখন ধান কাটা বেশ শক্ত কাজ। জল অনুপাতে ধান গাছগুলো বাড়ে। যত জল—ধানের 'নাড়াও' তত লম্বা। ধানগাছের খড়ের শরীরটাকে বলে 'নাড়া'। যতদিন জল থাকে, ততদিন জলের মধ্যে নাড়াও সোজা হয়ে থাকে। জল শুকিয়ে যেতেই লম্বা লম্বা নাড়া গুলো এলোমেলো ভাবে লুটিয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে নাড়াগুলো শুকিয়ে যায়। প্রতিটি নাড়ার মাথায় থাকে ধানের 'বাইল'। সেই নাড়ার স্তূপের মাঝখান থেকে একটুখানি নাড়া বাঁধিয়ে বেছে বেছে ধানের বাইল-গুলোকে কেটে আঁটি বাঁধা বেশ শক্ত কাজ বইকি!

ধান-কাটার সঙ্গে সঙ্গে ধান গুলোকে বাড়ী নেবারও ব্যবস্থা করতে হয়। ক্ষেত বাড়ীর কাছে হ'লে ধানের আঁটি গুলোকে মাথায় করে নিলেই চলে। দূরে হ'লে গরুর গাড়ীতে হবিবে। ধানের আঁটিগুলোকে বাড়ীর উঠোনে নিয়ে সাজিয়ে পালা দিয়ে রাখা হয়। ওরা বলে 'পালা-দেওয়া'। যাদের ধান বেশী, তাদের বাড়ীর উঠোনে কুলোয় না। বাড়ীর কাছাকাছি কোন একখানা ক্ষেত চেছে-ছুলে পরিষ্কার ক'রে গোবর দিয়ে নিকিয়ে উঠোন বানানো হয়। এ উঠোনকে বলে 'খোলেন'। ধান বেশী হ'লে খোলেনে পালা দেওয়া হয়। ধান কাটার কাজ একটু এগোতেই শুরু হয় 'মলন মলা'র কাজ। আঁটির বাঁধন খুলে ধানের গাছগুলোকে গোল ক'রে ছড়িয়ে দেওয়া হয় সারা উঠোনে। মাঝ-উঠোনে থাকে খুঁটি পোতা। সেই খুঁটিতে লম্বা মোটা দড়ি বেঁধে তার সাথে জুড়ে দেওয়া হয় সাত আটটা গরু। তারপর ঘোরানো শুরু হয়। গরুর পায়ের চাপে আস্তে আস্তে ধানের ঝোঁটাগুলো আলগা হয়ে যায়। ঝোঁটা থেকে খ'সে পড়ে পাকা ধানগুলো। তখন খড় বেছে ধান ঝেড়ে গোলায় তুলতে হয়। বকবকে পরিপুষ্ট ধানে ভ'রে ওঠে বড়ো বড়ো গোলা। আর সেই সাথে ভ'রে ওঠে কাঠুখালির মানুষ-গুলোর বুক। মুখে তাদের হাসি ফুটে ওঠে।

বলরামদেরও ধান কাটার কাজ ভালই চলছে। অনেকখানি জমির ধান কাটা হয়ে গেছে এর মধ্যেই। এই দুই মাসের জন্য একটা বাঁধা কিষাণ রাখা হয়েছে। এছাড়া প্রায়ই তো কিষাণ কেনা হচ্ছে। কাজ ভালোই চলছে।

সেদিন ভোর ভোর থাকতেই বলরাম বেরিয়ে পড়ল কাস্তেখানা হাতে নিয়ে। আজ বিলকান্দার জমিতে পৌঁছ দিতে হবে। বাড়ীর কিষাণটা তো আছেই। আরো চারটে কিষাণ কেনা হয়েছে। একটু বেলা হলেই সকলে ক্ষেতে চলে আসবে। কাজ আরম্ভ করবে। কিন্তু বলরাম সকলের আগেই বেরিয়ে পড়েছে। ওদের আর কি। পরের কাজ। পয়সা পাচ্ছে,-খাটছে। কিন্তু বলরামের তো আর তা নয়। নিজেদের কাজ। যত তাড়াতাড়ি শেষ করা যায়, ততই লাভ। খুব ভোরেই তাই বেরিয়ে পড়েছে বলরাম।

বলরামের একটু দেরীই হয়ে গেল ক্ষেতে পৌঁছাতে। ক্ষেতখানা বেশ দূরে। একেবারে বিলের ও-পাশে। তাই এর নাম বিল-কান্দার ক্ষেত। ক্ষেতে যখন পৌঁছালো বলরাম, তখন বেশ একটুখানি বেলা উঠে গেছে। এখানে ও-খানে দু'এক ক্ষেতে লোকজন কাজও আরম্ভ করে দিয়েছে।

ক্ষেতের কাছে পৌঁছেই ভীষণ অবাক হ'ল বলরাম। ক্ষেতের একেবারে দক্ষিণ কোণে জন-পাঁচেক লোক মাথা বেঁকিয়ে মাথা নীচু ক'রে ধান কেটে চলেছে। আবছা-আবছা কুয়াশা রয়েছে। দূর থেকে ঠিক চিনে উঠতে পারল না বলরাম। কিন্তু তখান থেকেই গলা উঁচু করে হাক দিল—"কারা তোমরা? ধান কাটতিছো কানো?"

বলতে বলতে বলরাম ছুটে এলো। এসে দাঁড়ালো ওদের কাছে। কাছে আসতেই চিনতে পারল। দু'জন হ'ল নীলমণির ভাই। আর একজনকে চিনতে পারল না।

কিন্তু বাকী দু'জনকে ভালো করেই চেনে বলরাম। মহাদেব আর অন্তা। ওরা হল নীলমণির ডান হাত। অনেক কুকর্মের ভাগীদার ওরা নীলমণির। বিপদ-আপদের মুখে নীলমণি ওদের ছাড়া এক পা-ও এগোয় না। দাঙ্গাবাজি, ঘর জ্বালানো—এমন কি, দু'-একটা খুন জখম করতেও ওদের হাত কাঁপেনা। ধান ওরা কাটছে বটে, কিন্তু হাতের কাছে কেলে লাঠি, সড়কি কিম্বা চকচকে রামদা তুলে নিতে বেশীক্ষণ দেরী হবে না ওদের। বলরাম তাই খুব অবাক হল ওদের দেখে। গলা চড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল—"কার কথামতন তোমরা আমাগের দু'য় ধান কাটতিছো? ধান কাটবা না বলছি।"

"ক্যান্? ধান কাটতি হ'লি তোর অনুমতি নিতি হবে নাকি? যা যা—বাড়ী যা, কাজের সময় ক্যাচাং ক্যাচাংনে।"

চমকে ফিরে তাকালো বলরাম। পাশেই আলের পরে চাদর গায়ে বসে আছে নীলমণি। এতোক্ষণ নজরে পড়েনি বলরামের। নীলমণি এবার উঠে এসে ওদের পাশে দাঁড়াল বলরামকে ডেকে বলল—"এ-দু'ই আমার। ধানও আমার। আমার ধান আমি কাটতিছি হাতে তোর এতো মাথাব্যথা কিসির?"

"তোমার দু'ই, তোমার ধান? কথাডা তো ঠিক যুক্তি পারলাম না তোমার! এ দু'ই কবেতে তোমার হলো। ধানই বা তুমি বুনলে কবে।"

—অবাক হয়ে জিজ্ঞাস করে বলরাম।

চিবিয়ে চিবিয়ে বলে নীলমণি—"অতো তক্ক্ পারনে। বাড়ী যাইয়ে দলিল-পত্তরগুলো এট্টু উল্টোয়ে পাল্টায়ে দেখ্‌গে যা।"

—"দলিলি আবার তাহার কি হল শুনি? গত সন ধানের আ'সে তো ক'য়েই গ্যালো—বিলকান্দার দু'ই আমাগে।" —বিস্মিত হয়ে বলে বলরাম।

—"নায়েব ক'য়ে গ্যালো আর অমনিই হ'য়ে গ্যালো? আর নায়েব কি তোগের কানে কানে কইয়ে গেছে নাকি?"

—"ক্যানো, কানে কানে কবে ক্যানো? সগোলের সামনেই তো ক'য়ে গেছে। তুদ্দো তো শুনিলে সে কথা। আর এ-দু'য় ধান তো এবার আমরাই বুনিচি।"

—"দু'ই তোর কোন্ গুষ্টির রে হারামজাদা? ধান অমনি বুনলিই হলো?"—বলেই একটা অশ্লীল গালাগালি দিয়ে উঠল নীলমণি। উদ্ধত রাগে এবার ফুঁসে উঠল বলরাম। চীৎকার করে বলে উঠল—"খাহো, মুখ খারাপ করবা না। গালাগালি দিলি ভালো হবে না ক'লাম।"

খিঁচিয়ে উঠল নীলমণি—"না, গালাগালি দেবে না! আরাম দিয়ে গাবলার বসায়ে আর না খাওয়ায়েনে।"

চেঁচামেচিতে সকলে কাজ বন্ধ করে দাঁড়িয়েছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল। নীলমণি তাড়া দিল ওদের—

"আই, তোরা আবার কাজ বন্ধ করলি ক্যানো? নে, নে,—তাড়াতাড়ি হাত চালায়ে কাজ কর।"

নীচু হয়ে আবার ওরা ধানে পোঁচ দিতে শুরু ক'রল। বলরাম দাঁড়ালো গিয়ে একেবারে ওদের সামনে। দু'হাত বাড়িয়ে দিল দু'দিকে। শক্ত গলায় বলল—

"না, দেবোনা আমি তোমাদের ধান কাটতি। গা'র জোরে ধান কা'টে নিয়ে যাবা বলিই অমনি হলো।"

ফিরে দাঁড়ালো নীলমণি। বলরামের দিকে তাকিয়ে বলল—

"সরে যা কচ্ছি। তানা হলি কিন্তুক ভালো হবে না।"

—"না, আমি সরবো না। ধান তোমাদের আমি কাটতি দেবো না।"

—"সরবি না তা'লি দুই?"

—"না।"

নীলমণি তাকালো ওর দুই সাকরেদের দিকে। মহাদেব আর অন্তা ওড়াক করে কাস্তে কেলে সরে এলো এ-ধারে।

'মাড়া'র তলা থেকে টেনে বের ক'রল টকটকে দু'খানা পাকা বাঁশের লাঠি। লাঠি দু'খানা নিয়েই দু'জনে গিয়ে দাঁড়ালো বলরামের দু'পাশে।

হুকুম দিল নীলমণি—"এ্যাই, কাট্ এবার তোরা যান।"

তিনজন কিষাণ নীচু হয়ে আবার ধানে পোঁচ দিল।

বাঘের মতন জ্বলে উঠল বলরামের চোখ দুটো। কব্জিতে মাংসপেশীর গুলি দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। প্রকাণ্ড একটা হাঁপরের মতন বুকখানা উঠানামা করতে লাগল। ফিরে দাঁড়ালো। মহাদেব আর অন্তার একেবারে মুখোমুখি। জলন্ত চোখ দুটো মেলে তাকালো—

"তালি তোমরা এটা গোলমাল না বাধাতে ছাড়বা না ঠিক করলে?"

আর একটা অশ্লীল খিস্তি আউড়ে জবাব দিল নীলমণি—

"তোর সাথে আবার গোলমাল কিসির রে ছুঁচোর বাচা। চাষ-বাদুর! বেশী কথা ক'বি তো এহেবারে ছাতু বানায়ে দেবানি।"

নীলমণির কথা শেষ না হতেই একটা প্রকাণ্ড ধাক্কা মারল বলরাম অন্তাকে। তৈরী ছিল না লোকটা। আচমকা ধাক্কা খেয়ে হুমড়ি দিয়ে পড়ে গেল। ছিটকে পড়ল হাতের লাঠিখানা। লাফ দিয়ে লাঠিখানা তুলে নিতে গেল বলরাম। কিন্তু তার আগেই মহাদেবের হাতের লাঠি এসে পড়ল ওর ডান কাঁধের উপর। তাক্ ছিল মাথার দিকে। কিন্তু একটুতে বোধহয় ফস্কে গেছে। যন্ত্রণায় যেন কঁকিয়ে উঠল বলরামের ডান কাঁধটা। ঝিম্‌ঝিম্ ক'রে উঠল সারা শরীর। কিন্তু তৎক্ষণে দেহের সমস্ত শক্তি যেন এসে জমা হয়েছে বলরামের দুই বাহুতে। ঝুলিয়ে নিয়েছে অন্তার লাঠিখানা। আর পরমুহূর্তেই বলরামের দুই বাহুর সমস্ত শক্তি নিয়ে লাঠিখানা ঝাঁপিয়ে পড়ল মহাদেবের মাথার পরে। কানের একটু উপরে—একেবারে বাঁ কপাল ঘেঁষে। ফিন্‌কি দিয়ে উঠল রক্ত। আর্তনাদ ক'রে লুটিয়ে পড়ল মহাদেব। তাজা রক্তে জলজলে রাঙা হয়ে উঠল ধান গাছ গুলো। সকালবেলার সূর্য আর রক্তের রঙে বীভৎস হয়ে উঠল জায়গাটা।

অন্তা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে ওদিকে। হাতে লাঠি নেই। মহাদেবের লাঠিখানা তুলে নেবার জন্য নীচু হয়ে হাতে বাড়াল। সঙ্গে সঙ্গে ছুঁদে উঠল আবার বলরামের হাতের লাঠি। লকলকে ময়ালের জিভের মতন সেই লাঠির দিকে তাকিয়ে প্রাণ উড়ে গেল অন্তার। চকিতে কাত হয়ে কোনোমতে মাথাটা বাঁচাল। আর তার পরেই প্রাণ ভয়ে যত জোরে পারে দৌড় মারল।

কিষাণ তিনজন কাস্তে ফেলে তাড়াতাড়ি তুলে নিল মহাদেবের রক্তে-ভেজা জবজবে অচেতন দেহটা। তুলে নিয়েই ছুটতে শুরু করল।

অন্তাকে পড়ে যেতে দেখে নীলমণি আগেই খানিকটে ঘুরে সরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কা'জে দাঙ্গার সময়। বিপদ হ'তে কতক্ষণ। মহাদেবের মাথা কাটতেই বুক শুকিয়ে গেল নীলমণির। সনাতন পাকা লেঠেল ছিল। কিন্তু ছেলেটা যে বাপকেও ছাড়িয়ে গেল। ভয় ধ'রে গেল নীলমণির। মহাদেবের অচেতন দেহটা নিয়ে সকলে যখন ছুটতে শুরু করল, তখন নীলমণিও আর দাঁড়ালো না। ছুটতে শুরু করল ওদের সঙ্গে। শুধু দূর থেকে বলরামকে শুনিয়ে বলে গেল—"ভাবিস্‌নে যে সব শেষ হয়ে গ্যালো। এর শোধ যদি না তুলি তো আমার নাম নীলমণি না। বাড়ী যাইয়ে এবার মহোদ্ধারের টাকা জোগাড় করগে যা।"

ওরা চলে যেতেই লাঠিটা ঘুরে ছুঁড়ে ফেলে দিল বলরাম। ধ' হয়ে বসে থাকল ধানগাছগুলোর উপরে। একটু ঘুরেই ধানগাছের সাথে মাখামাখি করা মহাদেবের রক্ত। জায়গায় জায়গায় জমাট বেঁধে কাদার মতন থকথক করছে।

মা-লক্ষ্মীর সোনার অঙ্গ। সে-অঙ্গে রক্ত মাখাল বলরাম।

ততক্ষণে খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। এ-ক্ষেতে ও-ক্ষেতে যারা কাজে ব্যস্ত ছিল, সকলে ছুটে এলো। বাড়ীর কিষাণগুলোও এসে গেল। হৈ চৈ প'ড়ে গেল চারিদিকে। বলরামের হাতে মার খেয়ে নীলমণি আর তার দলবল যে পালিয়ে যাচ্ছে, সে ঘটনাটা কারোরই চোখ এড়াল না। নীলমণি মোড়লের পরাজয়ে সকলেই যে খুশী। উত্তেজিত কথাবার্তা শোনা যেতে লাগল।

—"শালা নীলে মোড়ল আচ্ছা জব্দ হইছে। ব্যাটার চ্যাড়্ ব্যাড়ানিডা এইবার এট্টু কোমবে।"

—"আরে এ্যাট্টুকে কি আর হয় নাকি? দরকার ছেলো ঐ হারামজাদাডারই মাথাডা ব্যাল্ কাটান কাটায়ে দেয়া।"

—"আমি এট্টু এট্টু দেহিচি সব। বলরামের আর দোষ কি! বলরামতো আগে মারামারি করতি চায়নি। ওরাই আগে 'মাড়া'র তলাতে দুইজোনে লাঠি বা'রোরে বলরামরে মারতি চাইলো। বলরাম-ও দেছে সেইর'ম। মহাদেবডার আর উঠতি হবে না।"

—"তোরা যাই কোস্ আর তাই কোস্, খ্যাল্ এট্টা গুছাইছে আজকে বলরাম। বাবারে বাবা: শালা অন্য আর মহাদেব মাতুল তো না,—খানো যোমরাজার দুই দুনো ষোল। এরে গুঁতোয় কি তারে গুঁতোয়! সেই দুডোরে আজকে বলরাম ঘাবড়ায়ে উঠোয়ে দেলো। খ্যামোতা আছে বটে বলরামের!"

ভীড়ের মধ্যে কখন এসে দাঁড়িয়েছে সুখলাল। ওদের কথার মাঝখানে বলে—"খ্যামোতা তো আচেরে। কিন্তুক ও খ্যামোতায় কি আর ঝুলোবে? নীলমণি অতো সোজা লোক না। ও কি ছা'ড়ে কথা কবে! মামলা—মহোদ্দামা এট্টা না বাধায়ে ছাড়বে না।"

তড়বড় ক'রে ব'লে উঠল বলরামের সমান-বয়সী একটা কোয়ান ছেলে—"রাইখে দাও তোমার মহোদ্দামা। নজ্জা থাকলি আর নীলে মোড়ল মহোদ্দামার কথা কবেনা। এট্টা মানুষি অতোগুলোনরে ঘাবড়ায়ে উঠোয়ে দেলো—আবার মহোদ্দামার কথা কয়।"

আস্তে আস্তে বেলা বাড়ছে। সকলেরই ক্ষেতে কাজ আছে। বেশীক্ষণ ব'সে থাকা যায় না। একে একে সকলেই চলে গেলো যে যার ক্ষেতে। যাবার সময় সকলেই আর একবার বলরামকে বাহবা দিয়ে গেল। বলরাম কারো কথার কোনো জবাব দিল না। একভাবে ব'সে রইল। সকলে চলে গেলে উঠে দাঁড়াল। কাঁধটা যন্ত্রণায় টন্ টন্ করছে। কিষাণগুলো কি করবে বুঝে উঠতে না পেরে দাঁড়িয়ে আছে। বলরাম ওদের দিকে ফিরে বল্লো—

"কি কত্তি চাও তোমরা? গোলমালের মধ্যি ধান কাটতি চাও?"

ওদের মধ্যে একজন জবাব দিল—"ধান না কাটার কি আছে। ধান আগে কা'টে ফ্যালা হোক। তারপরে যা হয় হবে।"

দিনেকের মধ্যেই বিলকান্দার ক্ষেতের ধান কাটা হ'য়ে গেল। সন্ধ্যে নাগাদ সব ধান গরুর গাড়ীতে বোঝাই ক'রে বাড়ী নিয়ে এলো বলরাম।

(ক্রমশঃ)

: উপন্যাস :

কণ্ঠভরা বিষ

মিহির মুখোপাধ্যায়

॥ বারো ॥

এক বর্ষার শেষে বালক ভারতচন্দ্র দেবানন্দপুর এসেছিল। তারপর বারোটি বর্ষা-বসন্ত তাকে পরিপূর্ণ যৌবনের আসনে অভিষিক্ত করেছে। পনেরো বছরের সেই কিশোর এখন সাতাশ বছরের যুবক। আরবী-ফারসী শেখা শেষ হ'ল। ভারতের ইচ্ছে ছিল রাজধানী মুর্শিদাবাদ কিম্বা অন্য কোন শহরে বন্দরে গিয়ে কাজ-কর্মের চেষ্টা করবে।

কিন্তু এক সন্ধ্যায় রঘুনাথ এসে উপস্থিত। তেঁতুলতলার পাঠচারী করছিল ভারত।

মুন্সীবাড়ীর পেছনে পশ্চিম আকাশটা কিছুক্ষণ লাল হয়ে রইল।

সেরস্তাবাড়ির তুলসীতলায় সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলে উঠল। চণ্ডী-মণ্ডপে পাশার আড্ডায় এখনো কেউ আসেনি। মুন্সীমশাইর শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না। বুড়ো হয়ে পড়েছেন। কয়েকদিন আগে সর্দি-কাশিতে বেশ কষ্ট পেয়েছেন।

পাঠচারী করতে করতে এক একবার বৈঠকখানা ঘরের কাছাকাছি যাচ্ছিল ভারত, আবার উল্টো মুখে তেঁতুলতলায় ফিরে আসছিল। মাথায় নানা চিন্তা। আরবী-ফারসী শেখা হ'ল। শহরে-বন্দরে এখন ভালভাবেই কাজ কারবার চালানো যাবে। এবার একটা শুভদিন দেখে এখান থেকে যাত্রা করতে হবে। মুন্সীমশাইর গলগ্রহ হয়ে থাকাটা আর ভাল দেখায় না। তাঁর নাতি-নাতনী, বড় ছেলে কেশবরামের ছেলে-মেয়ে দুটিকে এই ক'বছর ভারতও পড়িয়েছে বটে, কিন্তু সে-তো নামমাত্র। যেন পড়া-পড়া খেলা। যে রকম আদর-যত্ন সুযোগ-সুবিধে পেয়েছে, তার বিনিময়ে পড়ানোর পরিশ্রমটা কিছুই নয়।

গেল বছর নাতনিটির বিয়ে হয়ে গেছে। নাতিটিও সাবালক হয়েছে, যা শিখেছে ওই ঢের। জমি-জায়গা, ব্যবসা-বাণিজ্য দেখাশোনার জন্য ওইটুকুই যথেষ্ট।

ভারত এবার ছুটি নেবে। নতুনভাবে এবার জীবন শুরু করতে হবে। পুরোপুরি নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। মুন্সী মশাই যথেষ্ট করেছেন। তার শিক্ষা-জীবনকে সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন। শাস্ত্রে বলে, শুধু জন্মদাতাই পিতা নয়, অন্নদাতা, শিক্ষাদাতা—এরাও পিতৃতুল্য। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ভীমদাস আচার্য যেমন, ঠিক তেমনি কায়স্থ দু-খানী রামচন্দ্র দত্ত মুন্সীও পিতার মতই সম্মানের যোগ্য। অন্নদাতা নরেন্দ্রনারায়ণ যে কর্তব্য পালনে অক্ষম হয়েছেন, এরা সেই কর্তব্য পালন করেছেন নিঃস্বার্থভাবে, তার জীবনকে গড়ে দিয়েছেন সম্পূর্ণরূপে। এদের কথা সে ভুলতে পারবে না। ভবিষ্যতকালের একজন পাঠকও যদি তার সত্যপীরের পুঁথি পড়ে আনন্দ পায় কায়স্থ-কুল-তিলক রামচন্দ্র দত্ত মুন্সীকে কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারবে না।

মুন্সীমশাই ঠিকই বলেছিলেন—তিনি বেঁচে থাকবেন তার কাব্যের মধ্যে।

কালজয়ী কাব্য সৃষ্টি করতে হবে। আরো লিখতে হবে। ভাল লিখতে হবে। কিন্তু তার আগে একটা চাকরি দরকার।

অন্নসংস্থানের উপায় না থাকলে কিছু হবে না। দারিদ্র্যের তুলনায় নাস্তি। কোন বিত্তবান শিক্ষিতলোকের কাছে অন্ততঃ শিক্ষার মূল্য বুঝবেন, সমাদর করবেন, এমন কোন মানুষের আশ্রয়ে একটা কাজ-কর্ম পেলে ভাল হত।

এবার মুন্সীবাবাকে নমস্কার জানিয়ে যেতে হবে কোন শহরে-বন্দরে। হুগলী, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান কিম্বা গঙ্গা পেরিয়ে কোম্পানীর শহর কলকাতায়।

পায়চারীর একপ্রান্ত শেষ করে আবার উল্টোমুখে তেঁতুলতলার দিকে যেতে যেতে দেখল ভারত, কে যেন এদিকে আসছে। অনেক সময়, অনেক অসময়ের অতিথি এসে মুন্সীবাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে রাত কাটিয়ে যায়। তেমন কেউ হবে হয়তো।

কিন্তু কাছাকাছি আসতেই দেখল রঘুনাথ। বছর দুই আগে আরো একবার এখানে এসেছিল রঘুনাথ।

—কিরে রঘু, হঠাৎ এলি কেন, বাড়ির খবর সব ভালোত?

—আজ্ঞা হাঁ—পায়ের ধুলো নিয়ে মুখ তুলে বললো রঘু—আপনারে নেবারতি আলাম—

—কেন, আমাকে নিয়ে যেতে এলি কেন, কে পাঠালো তোকে, মা না বাবা?

একটু ইতি-উতি করে বললো রঘু—বাবা?

—বাবা! কা'র বাবা, আমার বাবা! কেন কি হয়েছে?

—আজ্ঞা না, পাঠালো মা'ঠান, আমার বাবা আপনারে দেখতি চায়, বড় অসুখ তার।

—বিত্তবাবার অসুখ! উদ্বেগে-উত্তেজনায় আরো কাছে এল ভারত—কি অসুখ?

রঘু জবাব দিল—কবরেজমশায় বলেছেন, কর্কট রোগ, অম্বলের অসুখ থেইকে পেটের ধন্যি যা হয়েছে, আর বোধহয় বাঁচাতি পারব না—

কর্কট রোগ। বিস্ময়ে বেদনায় নির্বাক হয়ে রইল ভারত। বড় দুরারোগ্য ব্যাধি। কর্কট রোগ হওয়া আর ফাঁসীর হুকুম হয়ে যাওয়া, একই ব্যাপার। অমন স্বাস্থ্য বিত্তবাবার শেষে এই রোগ হ'ল। সেই যে দেবার এসেছিল, সেতো বহুকাল, প্রায় বছর দশেক আগে, তখনই তার অমন স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছিল।

রঘু কাঁদতে শুরু করেছে। কাপড়ের খুঁটে ঘন ঘন চোখ মুছে পঁচিশ বছরের জোয়ান ছেলেটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

—কাঁদিস না রঘু, কাঁদিস্ না—ভারতের গলাও ভারি হয়ে এল—আমি যাব তোর সঙ্গে, আজ রাত্তিরে ঘুমের বলে করে রেখে কাল খুব ভোরেই আমরা বেরিয়ে পড়ব।

খুব ভোরেই অন্ধকার থাকতে বেরিয়ে পড়ল দু'জনে। ভারতচন্দ্র আর রঘুনাথ। দেবানন্দপুর পেছনে রেখে হাটাপথে ব্যাণ্ডেল। সেখান থেকে নৌকো করে ত্রিবেণীর পথে। শেষ দুপুরে পাণ্ডুয়া পৌঁছুল। বাড়িঘর যেন একটা মায়া পড়ে গেল।

এতটা আনন্দ আগ্রহ আশা করেনি ভারত। বৈঠকখানা ঘরে নরেন রায় তখন বৈষয়িক কাজকর্ম শেষ করেছেন। এবার স্নানাহারের জন্য অন্দরে যাবার উদ্যোগ করছিলেন।

ভারত এসে প্রণাম করে দাঁড়াল।

—আয় বাবা আয়, কত বড় হয়ে গেছিস—ছেলেকে তিনি কাছে টেনে বসালেন। মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে আবার বললেন—তুই এত তাড়াতাড়ি চলে আসবি ভাবতে পারিনি—

তক্তাপোষের ওপর ফরাস পাতা। একপাশে বসেছে ভারত। বাবার মুখে এমন নরম কথা, আদরের ভাষা কোনদিন শুনেছে বলে মনেই পড়ে না। বারো বছর পরে দেখা। বাবা কেমন বদলে গেছেন। মুখে বয়সের রেখা। মাথার চুলও অনেক শাদা।

—হাঁ, বিত্তবাবার অসুখের খবর শুনে তাড়াতাড়ি চলে

এলাম—বলতে বলতে চারধারে তাকিয়ে ঘরদোরের চেহারা দেখছিল ভারত।

—বিশুর খুব অসুখ, কবরেজ মশাই বলেছেন কর্কট রোগ—নরেন রায় ম্লানমুখে বললেন—আর বয়সও হ'ল অনেক, আমার বাবার আমলের লোক, ওকি আজকের মানুষ, সেই ছোটবেলায় দেখেছি লেঠেলদের সর্দার বিশ্বনাথের কি স্বাস্থ্য, কি শক্তি।

কপালের ওপর ঘোমটা টেনে মা এলেন। মায়ের মুখ আর তেমন নেই। কেমন বিবর্ণ, রুক্ষ। সিঁথির কাছে চুলের রঙ্ ধূসর। মায়ের জন্য মনে মনে যতটা অস্থির হয়েছিল, যতটা আনন্দ, যতটা আগ্রহ তাকে চঞ্চল করে তুলেছিল, কাছাকাছি এসে তার কোন কিছুই প্রকাশ পেল না। ভারত কেমন শান্ত, স্থির, অচঞ্চল। সহজভাবেই মাকে প্রণাম করে দাঁড়াল।

মায়ের ঠোঁট কাঁপছিল, চোখের কোণে জল জমতে দেখে ভারত মুখ ঘুরিয়ে দাদাদের দিকে তাকাল। মাথা নিচু করে বড়দা'র পায়ের ধুলো নেবার জন্য হাত বাড়াবার আগেই তিনি জড়িয়ে ধরলেন—থাক, থাক কেমন দাড়ি হয়েছিস্, একটু রোগাও হয়ে গেছিস।

অর্জুন আর নারায়ণও হাসিমুখে তাকিয়েছিল। ভবানীদেবী আঁচলের খুঁটে চোখের জল মুছে ভাঙা-ভাঙা গলায় বললেন—আয়, ভেতরে যাবি। বাড়ির ভেতর নানা আত্মীয়-পরিজন। নতুন বৌদি'দের সঙ্গে দেখা হ'ল। দু জনেই ভারতের চেয়ে বয়সে ছোট। ছেলে কোলে নিয়ে বড় বৌদি এলেন। চতুর্ভুজ রায়ের স্ত্রী। প্রথমে চিনতে পারেনি ভারত। সেই কতকাল আগে একবার মাত্র বিয়ের সময় দেখেছিল। ভাল করে মনেও নেই ভারতের। তখন তার বয়স ছিল আট, বৌদির দশ। তারপর অনেককাল বাপের বাড়িই ছিলেন বৌদি। বিয়ের দু'বছর পরে বর্ধমানরাজের সঙ্গে হাতাহাতি। বৌদি তখনো বাপের বাড়ি। অনেকদিন পরে যখন ভূরশুট এলেন বৌদি, ভারত তখন পালিয়ে গেছে দেবানন্দপুর।

বৌদি একটু হেসে বললেন—ঠাকুর পো, কত বড় হয়ে গেছ, কেমন পণ্ডিত-পণ্ডিত চেহারা হয়েছে, কত ছোট দেখেছি—

ভারত পাল্টা জবাব দিল—আপনাকেও তো আমি ছোট দেখেছি, আপনি আর ক'ত বড় হবেন আমার চেয়ে—

কান্নাকাটি সবাই ভুলে উঠল। বৌদি বললেন—আহা, মেয়েরাতো কুড়ি পেরোলেই বুড়ি—ভারত কোন জবাব দেবার আগেই ভবানীদেবী বললেন—ওসব কথা এখন থাক্ বাবা, আগে চান্ করে এসে দু'টি মুখে দে'—

—না, মা—ভারত রাজি হল না—আমি আগে বিশুদা'কে দেখে আসি, রঘু দাঁড়িয়ে আছে—রঘুর সঙ্গে বিশ্বনাথের কুঁড়ে ঘরের সামনে এল ভারত। মাটির ঘর, বাঁশের খুঁটি, খড়ের ছাউনি। ময়লা বিছানায় শুয়ে আছে বিশুদা'। মাছি ভন্‌ভন্ করছে, দুর্গন্ধ।

—এত ময়লা হ'ল কি করে?—জিজ্ঞেস করল ভারত।

রঘু জবাব দিল—আমি ফেলাই না, ও পাড়ার বাগ্‌দিবুড়িকে দেখ্‌তি করেছেলাম - কুঁড়ে ঘরের পেছনে বাঁশবাগান, তারপর বাগদিপাড়া। সে সব দিনে ভোম বাগদিরাই পাইক-পেয়াদা, পাল্‌কি-বেয়ারার কাজ করতো। নরেন রায়ের বাড়ির বাঙ্গালী পাইকেরা থাকত এই বাগদি-পাড়ায়। কিন্তু বিশ্বনাথ জাতে বাগদি নয়, নাপিত। তাই বাগদি-পাড়ার একটু দূরে তার কুঁড়ে ঘর।

ভারত বললো—তাড়াতাড়ি সব সাফ্ কর, কিছু ধূপ-ধুনো জ্বালিয়ে দে', দাঁড়া আমি হাত লাগাচ্ছি।

—না, না, আপনার হাত দিতি হবে না—বাধা দিল রঘুনাথ। নিজেই মাটির কলসিতে জল এনে ঝাঁটা দিয়ে সব সাফ করল। বিশ্বনাথের কাঁথা বদলে দিল। দুর্গন্ধ দূর করবার জন্য কয়েকটা ধূপকাঠি জেলে দিল। বিশুদা'র বুকখানা

হাপরের মত ওঠানামা করছে। অতবড় মানুষটা শুকিয়ে দড়ির মত হয়ে গেছে।

বিছানার পাশে বসে ডাকল ভারত—বিশুদা, ও বিশুদা,—

—কে, কে—যেন অনেকদূর থেকে ডাক শুনে সাড়া দিল বিশ্বনাথ।

ভারত তার ডান হাতখানি নিজের দু'হাতের মধ্যে ধরে আবার বলল—আমি ভারত চিনতে পারছো?

চিনতে পেরেছে কিনা ঠিকমত বলতে পারল না বিশ্বনাথ। ঘোলাটে চোখ মেলে অতিকষ্টে একবার তাকাল, তারপর প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে বলল—দেখতে পাই না, সব আন্ধার লাগে। ওই শেষ কথা বিশ্বনাথের।

কিছু রাত হয়েছিল তখন। ভবানীদেবী বলছিলেন—বৌমাকে নিয়ে আয় এবার, আমি তো এখনো বৌমাকে দেখতেই পেলাম না, তুই নিয়ে আয় বাবা, চারছেলের বউ আমার এক ভারপায় থাকবে, মিলেমিশে সংসার করবে—

খেতে বসেছিল ভারত। রান্নাঘরের সামনেই লম্বা টানা বারান্দা। সেখানে বাড়ির সবাই এক সঙ্গে বসে খেতে পারে। ভারত আগেই একলা বসেছিল। সারাদিন আজ কিছু খাওয়া হয়নি। বিশ্বনাথকে দেখাশোনা করে ফিরে আসতে আসতে বিকেল গড়িয়ে গিয়েছিল। তারপর স্নান করে, সন্ধ্যা-আহ্নিক শেষ হ'তে হ'তে সন্ধ্যা উতরে গেছে।

বড়বৌদি ভাতের থালার চারপাশ বাটি সাজিয়ে দিলেন। অনেকরকম রান্না হয়েছে। মায়ের কথা শুনে ভারত কেমন অনমনা হয়ে গেল।

সারদাগ্রামের সেই ফুটফুটে মেয়েটি, যার নাম রাধা, যার বাবার নাম নরোত্তম আচার্য্য। কেমন আবছায়া মনে হচ্ছিল। কিছুতেই সেই দশবছরের মেয়েটির মুখ তেমন স্পষ্টভাবে মনে আসছে না। প্রায় বারো-তেরো বছর হয়ে গেল।

—ওকি খাচ্ছো না যে, রান্না ভালো হয়নি—বড় বৌদির কথা শুনে খেয়াল হ'ল।

খেতে শুরু করলো ভারত, মুখে বললো চমৎকার রান্না হয়েছে—

কিন্তু খাওয়ার দিকে আর তেমন মনোযোগ নেই। সেই বিয়ের রাত্রি। কেমন ভীত কথা বলতো মেয়েটি। একটু চঞ্চল, কিছুটা সরল, গ্রাম্য কিন্তু সপ্রতিভ, ভারী সুন্দর। সুন্দর, কি জানি, কেমন সুন্দর কিছু মনে পড়ছে না। রাত্রিবেলার দেখা। প্রদীপের আলো, চন্দনের গন্ধ, ধূপের ধোঁয়া, ফুল, ফুলের মালা। চার-পাঁচদিন বোধহয় শ্বশুরবাড়ি ছিল ভারত। বাসি বিয়ে, ফুলশয্যা সেখানেই হয়েছিল। দিনের বেলা দেখা হয়নি মেয়েটির সঙ্গে। কালরাত্রি বাদ বিয়ে তিনটি রাত শুধু কাছাকাছি ছিল দু'জনে।

ভাল করে তাকায়নি ভারত, ভালভাবে কথাও বলেনি। কিছুটা সঙ্কোচ, লজ্জা আর ছিল দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ। কেমন কেমন করে যেন হয়েছিল বিয়েটা। মন থেকে খুব উৎসাহ পায়নি, আনন্দবোধ করেনি। মামাদের আগ্রহে, পণ্ডিত মশাইর অনুরোধে যেন দায়মুক্ত হবার জন্য অনুষ্ঠানের সব কাজ করেছিল সে। বাবা-দাদাদের জন্য দুশ্চিন্তা ছিল, মায়ের জন্য ভাবনা ছিল।

আজ এতদিন পর মায়ের কথায় মনে পড়ল সব। রাধার প্রতি সে অবিচার করেছে, স্বামীর কর্তব্য পালন করেনি। দেবানন্দপুরের মুনসীমশাইও একদিন কথা প্রসঙ্গে এই ইঙ্গিত করেছিলেন। রামচন্দ্র মুন্সীর মত মানুষ হয় না। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, বিচার-বিবেচনায় তাঁর তুল্য মানুষ আজ পর্যন্ত চোখে পড়ল না ভারতের। বিয়ের পর একাই সে ফিরে এসেছিল মামার বাড়ি। রাধা রয়ে গেল মা-বাবার কাছে। টোলের পড়া শেষ হয়েছিল। ভেবেছিল আরো পড়াশোনা করার জন্য, ছোটমামার সঙ্গে নবদ্বীপ যাবে। কিন্তু তার আগেই, এক সপ্তাহের মধ্যে বিশ্বনাথ গিয়ে উপস্থিত। বাবার

হকুম, ভুবনটে ফিরে যেতে হবে। বিশুদা'র সঙ্গে বাবা-মা'র কাছে ফিরে এসেছিল ভারত। এতদিন পরে আবার বিশুদাকে দেখার জন্যই ফিরে আসতে হ'ল? সেই বিশুদা'ও মৃত্যুশয্যায়। আজ রাতটা কাটবে কিনা সন্দেহ।

—ফিরে আমার কথার জবাব দে'—মায়ের কথায় মুখ তুলে তাকাল ভারত—কি কথার জবাব দেব?

—কবে বৌমাকে আনতে যাবি, বল—মায়ের কথা শুনে একটুকাল চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বললো—সে হয় না, মা।

—কেন, হবে না কেন?

একটু ইতস্তত: করে বললো ভারত—বাবা, বড়দা, এদের মত হবে না—

ভবানী দেবী বললেন—তাদের মতামতের ভাবনা আমার, তুই আমার কথা শোন্—

—না মা, তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রো, বাবা-বড়দা-মেজদা, এরা কেউ আমার বিয়েতে খুশি নন, তা'ছাড়া আমার নিজের কোন উপার্জন নেই, যদি কোনদিন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি—কথা শেষ করতে পারলো না। বাইরের রোয়াকে দাঁড়িয়ে অর্জুন খবর দিল—মা, বিশুদা' মারা গেছে, আমরা যাচ্ছি সেখানে।

তাড়াতাড়ি খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়ল ভারত।

অন্ধকার আকাশে অগণ্য গ্রহ নক্ষত্র। শ্মশান-ভূমিতে চিতার আগুন।

বলিষ্ঠ, সাহসী, বিশ্বাসী বিশুদা চিতার আগুনে জ্বলছিল। দুরারোগ্য ব্যাধির, নিদারুণ যন্ত্রণার শান্তি হয়েছে। অতবড় মানুষটার দেহ শুকিয়ে কতটুকু হয়ে গিয়েছিল। ইচ্ছে থাকলেও সেই শবদেহ ছুঁতে পারেনি ভারত। যে বিশুদা' দেখা হলেই বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরত। সেবারের মত তাকে ছোঁয়ার কোন উপায় ছিল না। দেশাচার বড় কঠিন। ব্রাহ্মণের সন্তান শূদ্রের শবদেহ স্পর্শ করতে পারবে না। শববাহকদের অনেকটা পেছনে মেজদা-ছোড়দার সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু করে শ্মশানে এসেছে ভারত। কাণা নদীর কিনারায় চুপ করে বসেছিল। অন্ধকার নদী, নদীর স্রোত। সতেরো বছর আগে এমনি এক অন্ধকার রাতে নওয়াপাড়া পালিয়ে যাবার সময় বিশুদা সারারাত জেগে তাদের পাহারা দিয়েছিল। কত কথা মনে পড়ছে, কত ছোট ছোট ছবি, কত সুখ, কত দুঃখের স্মৃতি। একপাল শেয়াল ডেকে রাত্রি: মধ্যপ্রহর ঘোষণা করল। অন্ধকার আকাশে কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্রের আলো। অন্ধকার শ্মশান-ভূমিতে চিতার আগুন। নদীর জলে চিতা নিভিয়ে সবাই যখন বাড়ি ফিরল, তখন পুব আকাশ কর্সা হয়ে আসছে।

॥ তেরো ॥

মায়ের আগ্রহ আর অনুরোধে শেষ পর্যন্ত রাজি হতে হল। শ্বশুরবাড়ি যাবে ভারত। রাধাকে নিয়ে আসবে। একটা শুভদিন দেখে যেতে হবে। বাবার অনুমতি প্রয়োজন। ভবানী দেবী তাঁর অনুমতি চাইবেন। ভারত কিছু বলতে পারবে না। কিন্তু সব ওলট-পালট হয়ে গেল বড়দার কথায়। দিন কয়েক পর এক সকাল বেলা নরেন রায় ডেকে পাঠালেন। ভারত ভাবল, তার শ্বশুর বাড়ি যাবার কথাটা মা বোধ হয় বলেছেন। বাবা এখন কি বলবেন, কে জানে। বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে দেখল বাবা আর বড়দা বসে আছেন। কথা শুরু করলেন বড়দা। নরেন্দ্রনারায়ণ চুপচাপ গড়গড়া টানছেন।

চতুর্ভুজ রায় বললেন—ভারত, শুনেছ বোধহয়, বর্ধমানরাজ সরকারের সঙ্গে মিটমাট করে আমরা কিছু জমি ইজারা নিতে পেরেছি, সে সব জমিতে প্রজাবিলি করতে হবে, এসব ব্যাপারে তদ্বির-তদারক, খোঁজ খবর রাখার জন্য বর্ধমান রাজসভায় আমাদের একজন বিশ্বাসী লোক থাকা দরকার, আমরা বহুর বহুর রাজ-সরকারে খাজনা পাঠাব, সে সব

টাকা ঠিকমত জমা দেওয়া, প্রয়োজনমত খোঁজ-খবর করা, এসবের জন্য লোক দরকার—

চতুর্ভুজ রায় একটু থেমে আবার বললেন,—এবার একটু নিচু সুরে—রাজবল্লভ রায় সেখানে আছেন, সুযোগ পেলেই আমাদের সর্বনাশ করতে ছাড়বেন না, তাই বিশ্বাসী এবং আপনজন দরকার, আমি ভাবছিলুম তোমার কথা, তোমাকে বাবা আমমোক্তার নামা লিখে দেবেন, তুমি বর্ধমান গিয়ে থাকবে, খবরাখবর করবে, অবস্থা বুঝে যখন যেমন ব্যবস্থা করা দরকার খবর পাঠাবে, আমরা সেইরকম ব্যবস্থা করব—

ভালোমন্দ কিছু বললো না ভারত। শুধু বুঝলো তার কপালে ঘরের সুখ নেই।

অনেকদিন আগে বড়দাদা একবার তাঁর কোষ্ঠি বিচার করে বাবার কাছে অনেক ভাল ভাল কথা বলেছিলেন। কিন্তু এই কথাটা বোধহয় বলতে পারেননি যে, সারাজীবন তাকে ঘর ছেড়ে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতে হবে। কোন্ গ্রহ তাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, কে বলবে। শনি কিম্বা রাহু হবে হয়তো। রাহুর অগ্র, শনির শেষ, প্রাণে মারে ছাড়ায় দেশ। রাহুর দশার প্রথমে আর শনির দশার শেষে মানুষকে হয় প্রাণে মারে, না হয় দেশ-ছাড়া করে ঘোরায়।

বিনা দ্বিধায় ভাগ্যকে মেনে নিয়ে বর্ধমান যাবার জন্য তৈরী হল ভারত।

বড়দাই সব ব্যবস্থা করে দিলেন। প্রয়োজনীয় দলিল-পত্তর কি কি সঙ্গে নিতে হবে, কে কে সঙ্গে যাবে। আটজন পালকি-বেহারা আর রঘুনাথ সঙ্গে যাবে। পালকি-বেহারারা অবশ্য ফিরে আসবে। রঘুনাথ থাকবে ভারতের কাছে।

একমাস পরে অশৌচ শেষ হল রঘুনাথের। নেড়া মাথায় জাল সালুর পাগড়ি, হাতে বাঁশের লাঠি নিয়ে পালকির সঙ্গে সঙ্গে চললো রঘুনাথ। জমি-জায়গা সংক্রান্ত দলিল-পত্তর ছাড়াও নিজের কিছু দ্রব্য সঙ্গে নিয়েছে ভারত। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলের একখানা নকল সে করেছিল দেবানন্দপুরে। কালপুরাণের বাংলা অনুবাদ কাশীখণ্ডের পুঁথি আর চূড়ামণি তন্ত্রের পুঁথি ছোটমামার কাছ থেকে পেয়ে নকল করে রেখেছিল। তাছাড়া নিজের লেখা সত্যপীরের পুঁথি দু'খানা। রামচন্দ্র দত্ত মুনসীকে শোনাবার জন্য লেখা হয়েছিল প্রথম পুঁথিখানা। দ্বিতীয়খানা লিখেছিল মুনসী-মশাইর ছোটছেলে হীরারাম রায়ের অনুরোধে। মুনসীমশাইর দুই ছেলে কেশবরাম, হীরারাম। অনেক কথাই মনে পড়ছে। বাদশাহী সড়ক ধরে পালকিতে যেতে যেতে ভাবছিল ভারত। নওয়াপাড়া, ভালপুর, সারদাগ্রাম, দেবানন্দপুর। অদৃষ্ট তার হাত ধরে কত জায়গা ঘুরিয়ে আবার কোথায় নিয়ে চলেছে, কে জানে! বাবার ইচ্ছে ছিল দুখনী কিম্বা কলকাতা চাকরির খোঁজে। ফিরে আসতে হল দুরদৃষ্ট। বাবের অনুরোধ ভেবেছিল, যাবে সারদাগ্রামে, যেতে হচ্ছে বর্ধমান।

সেখানে আরো কি ঘটবে, আরো কি আছে অদৃষ্টে, কে জানে। ভাগ্যদেবতা বড় রসিক। তাকে নিয়ে কি খেলা যে খেলছেন, কে বলবে।

মনে মনে হাসল ভারত, ভেবে আর কি হবে, যা হবার তাই হবে।

বলা হৃষিকেশ হৃদয়েস্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

পালকির দুলুনিতে চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছে। বেহারারা একঘেয়ে সুরে হুম্‌হুম্ হোহো করছে। পায়ে পায়ে ধুলো উড়ছে। বেলা দুপুর। শরতের শেষ। রোদ তেমন প্রখর নয়। মাঠে মাঠে ফসলের কাজ সবে শুরু হয়েছে।

সন্ধ্যার আগেই পথের পাশে কোন চটিতে বা গ্রামে আশ্রয় নিতে হবে।

বাদশাহী সড়কে চোর-ডাকাতের তেমন ভয় নেই বটে, তবে খুব একটা ভরসাও নেই। সর্বত্র সমান নিরাপদ নয়।

সুলাউদ্দিন খাঁ সুলাউদ্দৌলার স্বভাব স্বভাব মুর্শিদকুলি খাঁর ঠিক উল্টো।

বিলাস-ব্যসনে উদাসীন ফকির গোছের মানুষ ছিলেন মুর্শিদকুলি। কঠোর স্বভাবের জবরদস্ত নবাব। সুজাউদ্দৌলা কিন্তু নাচ-গান আমোদ-ফূর্তি নিয়েই মত্ত। স্বভাব-চরিত্র কোনকালেই ভাল নয়। মদ আর মেয়েমানুষ।

মুর্শিদকুলি খাঁর মেয়ে জিন্নতউন্নিসা বেগম বিরক্ত ছিলেন স্বামীর উপর। স্বামীর কাছে যেতেন না। একমাত্র ছেলে সরফরাজকে নিয়ে বাপের কাছে মুর্শিদাবাদেই থাকতেন। মুর্শিদকুলিও জামাইএর ওপর প্রসন্ন ছিলেন না। তাই যাবার সময় নাতি সরফরাজকেই মসনদ দিয়ে গেছেন, এমন গুজব ছড়িয়ে পড়ল। সরফরাজও বাপকে টপকে দাদামশাইর গদিতে বসতে চাইলেন। সুজাউদ্দৌলা তখন উড়িষ্যার নায়েব নাজিম। নাচ-গান আমোদ-ফূর্তি নিয়ে মশগুল থাকতেন সুজাউদ্দৌলা। কিন্তু কপালগুণে দুজন কর্মচারী পেয়েছিলেন খুব বিশ্বাসী আর চতুর। দু'ভাই তাঁরা। হাজী আহম্মদ আর আলিবর্দী খাঁ। সেপাই-শান্ত্রী, লোক-লস্কর নিয়ে কটক থেকে মুর্শিদাবাদের পথে রওনা হলেন সুজাউদ্দৌলা।

সরফরাজও তৈরী হলেন। সহজে অধিকার ছাড়বেন না। লেগে গেল বাপ-ব্যাটায়। কিন্তু বেগম-সাহেবা মাঝে পড়ে থামিয়ে দিলেন। মা আর বিবিমার কথা মেনে নিলেন সরফরাজ। সুজাউদ্দৌলা বসলেন সুবে-বাংলার মসনদে। ভারত তখন ছিল দেবানন্দপুরে, মুনসীখানাইর মুখে মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনেছিল। সুজাউদ্দৌলা, সরফরাজের খবরও শুনেছিল। কিন্তু তেমন মন দেয়নি সে সব কথায়। রাজধানীর রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাবার উৎসাহ পায়নি কোনদিন। কাব্য-ব্যাকরণ অলঙ্কার নিয়ে মেতে রয়েছে। সংস্কৃত শ্লোক আর ফারসী বয়েৎ পড়ে যে আনন্দ পেয়েছে, তার তুলনা নেই। ভেবেছিল জীবনটা কাব্যচর্চা করেই কাটবে। জীবিকার জন্য, কোন এক জায়গায়, কোন উচ্চ-বংশজাত, রুচিবান্ মানুষের আশ্রয়ে সামান্য কিছু কাজ যদি প্রয়োজন হয়, করবে।

তাই বাবসা-বাণিজ্য, জায়গা-জমি, কিম্বা নবাব-বাদশার রাজনীতির খোঁজ খবর রাখেনি কোনদিন। এখন এসব বুঝতে হবে, জানতে হবে, শিখতে হবে।

বর্ধমান রাজদরবারের আদব-কায়দা, কূট-কৌশল শিখতে হবে, সাবধানে সতর্ক থাকতে হবে। বাবা আর বড়দা' বারবার সাবধান করে দিয়েছেন। মহারাজ কীর্তিচাঁদ কোন কালেই নরেন্দ্রনারায়ণের উপর তেমন প্রসন্ন নন। দেওয়ান রাজবল্লভ তার কান ভারী করেন।

ভবিষ্যতের কথা ভেবে, পরিবার ও সম্পত্তির স্বার্থরক্ষার জন্যই, শিক্ষিত, রসিক, বুদ্ধিমান বিবেচনা করে বাবা আর বড়দা' তাকে বর্ধমান পাঠালেন। অনেক দায়িত্ব। শুধু রাজপরিবারের নয়, সমস্ত ভুরশুট পরগণার প্রজা সাধারণের সম্মান ও নিরাপত্তা নির্ভর করছে তাঁর উপর। সাবধানে সতর্ক থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। কে জানে, পান থেকে চুণ খসলেই হয়তো মহারাজার সম্মান নষ্ট হবে আর তার ফলে ভুরশুটের সর্বনাশ।

যে দেবতার যেমন যজ্ঞ, এখন তেমনি উপায়ে মহারাজা এবং তাঁর মূর্ত দেওয়ান, দুজনকেই তুষ্ট রাখতে হবে।

(ক্রমশঃ)

UPPER GANGES SUGAR MILLS Ltd.
THE OUDH SUGAR MILLS Ltd.
NEW INDIA SUGAR MILLS Ltd.
THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS Ltd.
BHARAT SUGAR MILLS Ltd.
GOBIND SUGAR MILLS Ltd.

Manufacturers of :

PURE CRYSTAL CANE SUGAR

Managing Agents

BIRLA BOMBAY PRIVATE LTD
(FORMERLY THE COTTON AGENT PRIVATE LTD.)
INDUSTRY HOUSE,
159, Churchgate Reclamation,
BOMBAY — 1

হেগেলীয় দর্শন

অনিল রায়

এই হেগেলীয় 'বিনশন' সম্বন্ধে আর একটি লক্ষ্য করবার বিষয় রয়েছে। সেটি বিনশনের কর্মপটুত্ব (function)। অপন্যাপারের সকল বিকাশের দায়িত্ব এই বিনশনের স্কন্ধে চাপিয়ে হেগেল এই বিনশনের ক্ষমতা সম্বন্ধে অযৌক্তিক আতিশয্য করেছেন। এই বিনশন শুধুমাত্র নাস্তিবাচক নয়, অস্তি-বাচকও বটে। বিনশনের ফল শূন্যতা নয়, পূর্ণতা।*

বিশ্বের সকল ঘটনা যদি একে অন্যকে নিঃশেষে 'বিনাশ' (negate) করেই চলতে থাকে তবে এই একটানা সর্বব্যাপী বিনশন-এর ফল কি দাঁড়াবে? একান্ত শূন্যতা ও অশেষ প্রলয় নয় কি? বিনশন-এর ফল পূর্ণতা কি করে হতে পারে তা হেগেল কোথাও দেখান নি। ম্যাক টাগার্ট বলেছেন যে বিনশন শব্দটা ঠিক নয়। বিনশন বললেও ব্যাপারটি যা ঘটেছে তার সঠিক বর্ণনা করতে বলতে হয়, পূর্ণতা (completion)। কিন্তু হেগেল তা বলেন না। হেগেলের ভাষায় বিনশনই ঘটবে, কিন্তু সব বিনশনের প্রভাব এমনি আশ্চর্য যে ফলে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে পূর্ণতা (Completion)। এই অসম্ভব কল্পনা যুক্তির ত্রিসীমানার বাইরে। হেগেল এই অবাস্তব ও অসঙ্গত কল্পনার উপর তাঁর ডায়লেকটিক-ভিত্তিক ক্রমবিকাশকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। শূন্যতা থেকে বেরিয়ে আসছে পূর্ণতা; নাস্তি থেকে জন্ম নিচ্ছে অস্তি। ফলে বিনশন (negation) সত্ত্বেও পরিবর্তিত হয়ে উঠেছে বিচিত্রতম ক্রমবিবর্তন। বিনশনের এই ম্যাজিক রচনা করবার ক্ষমতা হেগেল তাকে দিয়েছেন বটে, কিন্তু বাস্তবে এই যাদু এবং এই মায়া বিনশনের নেই। উইলিয়ম জেম্‌স বলছেন: শুধুই বিনশন চিন্তার সমর্থক অগ্রগতির কারণ হতে পারে না।*

সমস্ত বিশ্ববিবর্তনে ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ, সহজ থেকে জটিল, বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর সত্তা বিকশিত হয়ে উঠেছে; লক্ষ কোটি বছর ধরে, যুগের পর যুগ, এই সৃষ্টির বুকে কত সমৃদ্ধি জমে উঠেছে, কত সঞ্চয় পুঞ্জিত হয়ে উঠেছে, তার ইয়ত্তা নেই। নব নব সৃজনের পথে বিবর্তনের বিবিধ ধারা ছুটে চলেছে কুটিল গতিতে; এই সমস্ত সমৃদ্ধি ও সঞ্চয়, সমস্ত বৈচিত্র্য ও জটিলতা, সবই বিনশনের শূন্যগর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছে? নহে নহে। এ একেবারে অবাস্তব; স্বপ্নলোকের কথা; যুক্তির কথাও নয়, বাস্তবতার কথাও নয়। বিনশন

* "For the negative which emerges as the result of dialectic, is at the same time positive." (Logic, p. 152)

* "A chasm is not a bridge in any utilisation sense, that is, no mere negation can be the instrument of a positive advance in thought." (Ibid, James)

থেকে প্রগতির (advance) উদ্ভব কি করে হবে? এ জিজ্ঞাসার জবাব হেগেলের নেই। বিনশন যে বিশ্বগতির একমাত্র উৎস, সকল সচলতার জনন-ক্ষেত্র বিনশনের এই গতিবেগ (dynamism) কোথা থেকে এল? হেগেল কিন্তু কোথাও এ তত্ত্ব প্রকাশ করেন নি।৩

বিনশনকে হেগেল প্রগতির মূল বলে নির্ধারণ করেছেন, হেগেলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তি হ'ল এই। ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে হেগেলের এই ভ্রান্ত কল্পনার বিরুদ্ধে ডঃ শীলও প্রতিবাদ করেছেন।৪ বিনশন ও বিরোধের মধ্য দিয়েই প্রকৃতি ও সমাজক্ষেত্রে বিশ্বের যাবতীয় প্রগতি বিকশিত হয়ে উঠেছে। এ-কথা প্রকৃতি-বিজ্ঞানে বা সমাজ-বিজ্ঞানে, কুত্রাপি স্বীকৃত হয় নি।

হেগেলীয় ডায়লেকটিক সম্বন্ধে উপরোক্ত আলোচনায় এই তত্ত্বটুকু নির্ণীত হয়েছে যে হেগেলীয় দর্শনের আর যে গুণই থাক, তাঁর "বিরুদ্ধ সমন্বয়" বা ডায়লেকটিক নীতি সত্যও নয়, যুক্তিসহও নয়। ডায়লেকটিক নীতির যে ধারণা ও পরিকল্পনা হেগেল তাঁর লজিকে দিয়েছেন, তা নিতান্ত অবাস্তব এবং ভিত্তিহীন। উপরোক্ত আলোচনার সিদ্ধান্তগুলিকে সূত্রাকারে সংক্ষেপে নীচে দেওয়া যাচ্ছে :

(১) অকারগত তর্কশাস্ত্রের উপরে হেগেলের আক্রমণ অযৌক্তিক। অভেদ-নীতি (Law of Identity) এবং বিরোধ-নীতি (Law of Contradiction) সম্বন্ধে হেগেলের আপত্তি যুক্তিতে টেকে না।

(২) বিরোধ (contradiction), বিনশন (negation) বৈপরীত্য (opposition) ইত্যাদি সংজ্ঞাগুলো হেগেল যে অর্থে ব্যবহার করেছেন সে অর্থে এ শব্দগুলো উপযোগী নয়।

(৩) জগতের সকল ব্যাপারেই বিরোধ (contradiction) ইত্যাদি সর্বত্রই ক্রিয়াশীল হয়ে বিবর্তন ঘটাচ্ছে, একথা ঠিক নয়। Contradiction, opposition—এ সব জগতে কোনো কোনো স্থলে ক্রিয়াশীল হয় বটে; কিন্তু এদের প্রভুত্ব সর্বত্র একথা বললে অতিশয়োক্তি হয়; অর্থাৎ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিরোধ (contradiction) ইত্যাদি আছে বটে, কিন্তু সর্বত্র ও সর্বদা নয়।

(৪) বিরোধ (contradiction) এবং অপরত্ব (otherness বা distinctness) নামে দুটো স্বতন্ত্র পদার্থ আছে। জগতের বস্তু ও ঘটনাগুলির মধ্যে কোথাও distinctness এবং কোথাও-বা বৈপরীত্য (opposition) বা বিরোধ (contradiction) রয়েছে। হেগেল এই দুটো সংজ্ঞার মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন; যেখানে distinctness সেখানেও opposition আরোপ করেছেন। হেগেলের এই পণ্ডগোলের ফলে তাঁর সমস্ত দর্শনের মধ্যে মারাত্মক ভুল বাসা বেঁধেছে।

(৫) জগতের প্রত্যেকটি বস্তু বা ঘটনা অন্য প্রত্যেকটি বস্তু বা ঘটনার বিরুদ্ধতা (contradict) করছে, একথা ঠিক নয়।

(৬) জগতের প্রত্যেকটি বস্তু বা ঘটনা স্ববিরোধী (self-contradictory) একথা ঠিক নয়। সকল সত্তাই নিজে নিজেকে বিরুদ্ধতা (contradict) করছে এ-কল্পনা ভ্রান্ত। Inter-penetration of Opposites নীতি যুক্তিযুক্ত নয়। একই বস্তু একই কালে দুটো বিরুদ্ধ উক্তির বিষয় হতে পারে না। 'হাঁ' ও 'না' একই কালে একই অর্থে প্রয়োগ করা চলতে পারে না। এ-বিষয়ে অকারগত তর্কশাস্ত্রের (Formal Logic) নীতিগুলি অকাট্য ও চরম।

(৭) হেগেল বিরোধনীতি (Law of Contradic-

---

৩ "But, if the man asks how self-contradiction can do all this, and how its dynamism may be seen to work, Hegel can only reply by……saying 'Lo Thus!'" (W. James, ibid)

৪ "These conceptions require a radical correction." (Dr. Seal, ibid)

tion) অস্বীকার করেন নি. ব্যাড ট্র্যাপার্টের এই উক্তি সত্য নয়। হেগেল বরাবরই Formal Logic-এর নীতিগুলিকে অস্বীকার করেছেন এবং তাঁর ডায়লেকটিক লজিকের মূল কথাই হল এই অস্বীকৃতি।

(৯) বিনশনকে (negation) ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায় ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা চলে না।

(৯) কোনো পরিবর্তনশীল বস্তু বা প্রাণীর বিবর্তনের একটি স্তর বা অবস্থা অপর একটি স্তর বা অবস্থাকে সর্বদাই নস্যাৎ (negate) করে আবির্ভূত হয় না। প্রকৃতপক্ষে প্রাণিজগতের বিবর্তনে পূর্বস্তরের পরিণতি ও পূর্ণতাই পরের স্তরে দৃষ্ট হয়। কাজেই প্রতিস্থিতি (anti-thesis) কথাটা এ-ক্ষেত্রে অপপ্রয়োগ মাত্র, যেমন বিনশন বা নস্যাৎ-করণ (negation) শব্দটা অপপ্রয়োগ।

(১০) আগেই বলা হয়েছে যে অপর (other) ও বিপরীত (opposite) এবং প্রভেদ (distinction) ও বিনশনের (negation) মধ্যে হেগেল বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন। ক্রোচে, কেম্‌প্‌ স্মিথ দুজনেই এ-ত্রুটির উল্লেখ করেছেন। অপর (other) শব্দটা কোথাও বসেছে বিপরীত (opposite) অর্থে, আবার কখনো চলেছে প্রভিন্নের (distinct) অর্থে।

আমাদের খণ্ড চিন্তাগুলি অসম্পূর্ণ। কাজেই একটি খণ্ড চিন্তাকে সঠিক বুঝতে হলে স্বভাবতই মন এই খণ্ড চিন্তা থেকে অন্য একটি চিন্তাতে গড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ, জগতের সব খণ্ড চিন্তাগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। একে Principle of Relatedness বলা হয়ে থাকে। খণ্ড সত্তাগুলো পরস্পরের সঙ্গে যোগে সম্পূর্ণ এবং পরস্পরের সঙ্গে বিচ্ছেদে অসম্পূর্ণ। এটা দর্শনের অতি সাধারণ সূত্র। এখানে এই অসম্পূর্ণতাকে হেগেল 'বিরুদ্ধতা' বা বিনশন (negation) বলে স্থূল করেছেন। খণ্ড সত্তাগুলো একে অন্যকে সীমিত বা অবচ্ছিন্ন (limit) করছে, কিন্তু তাই বলে বিনশন বা বিরুদ্ধতা (negate বা oppose) করছে কেন? অবচ্ছেদ নীতিকে (principle of limit) বিনশন-নীতি (principle of negation) বলে হেগেল নির্দেশ করেছেন। একটি খণ্ড চিন্তা স্বভাবতই অপর চিন্তার সঙ্গে জড়িত ও সম্পর্কিত। একটিকে ভাবতে গেলে অন্যটি স্বতঃই মনে এসে পড়বে। চিন্তার এই সম্বন্ধিতার (relatedness) মধ্যে হেগেল বিনশন (negation) দেখেছেন। একটি চিন্তা অপর একটি চিন্তায় গড়িয়ে পড়ে, তাকেই তিনি বলছেন: বিরোধী হয়ে পড়বে—"must fall into contradiction—the negative of itself." (p.46, Introduction-Logic, Art. 11)

(ক) ডায়লেকটিক তত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে হেগেল বলেছেন যে খণ্ড সত্তাগুলো তাদের বিপরীত সত্তায় উত্তীর্ণ হয়।*

এখানে খণ্ড সত্তাগুলোকে পরস্পরের বিপরীত (opposite) বলা হচ্ছে। সীমা বা খণ্ডতা (limit) মানেই এখানেও বিনশন (negation) করা হয়েছে।

(খ) আরো বলছেন: অবিচ্ছিন্নতা মানেই বিনশন।**

এখানেও স্পষ্টই আছে যে খণ্ডত্ব বা অবচ্ছিন্নতাই (limitation) বিনশন (negation)। একটি সত্তা অপর থেকে আলাদা হলেই তাকে নস্যাৎ (negate) করছে এবং তার বিপরীত (opposite) হিসেবে কাজ করছে।

---

* "Finite characterisations……pass into their opposites. "(p.147, Art. 81 [B]); "veers round to its opposites" (p. 146, notes—Art. 160)

** "One-sidedness and limitation of the predicates of understanding is……shown to be the negation of them (p. 147, Art. 81)"

(গ) ডায়লেকটিক মানে আরো আছে যে, খণ্ডসত্তা তার 'অপর' রূপে হঠাৎ তার বিপরীত সত্তায় পরিণত হয়।*

এখানেও খণ্ড সত্তা হলেই একটিকে অপরটির বিপরীত (opposite) বলা হচ্ছে এবং এখানেও অপর (other) মানে বিপরীত (opposite) করা হয়েছে।

(ঘ) সীমা বা খণ্ডত্ব মানেই বিনশন (negation) ধরা হয়েছে।**

এখানে অপর-এর (other) অর্থ করা হয়েছে বিপরীত (opposite)।

(ঙ) আবার Being—Nothing আলোচনায় Being ও Nothing উভয়কে বিপরীত (opposite) কল্পনা করা হয়েছে। এখানেও other অর্থ করা হয়েছে opposite।‡

র‍্যাক ট্যাগার্ট ও Being ও Nothingএর মধ্যে উগ্র ও প্রখর বিরুদ্ধতা স্বীকার করেছেন এবং বলেছেন যে হেগেলও এখানে স্পষ্ট negation বা বিনশন স্বীকার করেছেন।§

এখানে Being ও Nothing পরস্পরকে নস্যাৎ বাতিল (negate) করছে, (cancel) করছে। এখানেও হেগেল আবার বলছেন, বিনশন (negation) অর্থ অপরত্ব (otherness)।*

উপরে দেখা যাচ্ছে যে হেগেল other শব্দটাকে কোথাও opposite অর্থে ব্যবহার করেছেন (যেমন Being-Nothingএর বেলায়), আবার কোথাও distinct অর্থে ব্যবহার করেছেন। আমাদের মতে যখন তিনি বলেন, যে কোন খণ্ড চিন্তা বা সত্তা স্বতঃই অপর একটি সত্তা বা চিন্তার সঙ্গে জড়িত এবং একটি অপরটিতে নিয়ে যায় তখন তিনি পৃথিবীর সকল খণ্ড সত্তার কথাই বোঝাতে চান, যারা একাকী অসম্পূর্ণ ও অপরের সঙ্গে যোগে সম্পূর্ণ। এখানে আমরা যাকে distinct আখ্যা দিয়েছি সেই শ্রেণীর সত্তাগুলোকে বোঝানো হচ্ছে।

আমরা দেখিয়েছি যে, জগতে সকল বস্তু বা সত্তাই একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং সম্পর্কহীন, বিভিন্ন অবস্থায় তারা সবাই অসম্পূর্ণ। পৃথিবীর এই সর্বব্যাপী সম্পর্ক-বন্ধন (universal relatedness) সবাই স্বীকার করে থাকেন। এই সম্বন্ধও দুই রকমের সম্পর্ক হতে পারে: (১) distinctness বা otherness রয়েছে; কিন্তু opposition কতক-

---

* finite, as implicitly other than what it is, is forced beyond its own···to turn suddenly into its opposite" (p. 150, note)

** "This negation is what we call a Limit (Boundary). A thing is what it is, only in and by reason of its limit. If we take a closer look at what a limit implies, we see it involving a contradiction and thus evincing its dilectical nature. On the one side, the limit makes the reality of a thing; on the other, it is its negation——gives something and up starts an other to us·····a something is implicitly the other of itself. (pp. 172-173)

‡"·· the shape which dialectic takes in them ·····is a passing over into another". (P. 157, Art 84)।

§ "In all cases of difference there is some common point which comprehends both things.....But in the case of mere Being & Nothing distrinotion is without a bottom to stand upon." (P. 162, notes on Art. 87)

"The one is not what the other is." (P. 104, Art. 88 Expt)

"These two are always changing into each other and reciprocally cancelling each other. (P. 110, notes on Art 89)

* "It is an otherness" (At 91-P 171) এবং "Somethig becomes an other" (Art 98, p. 171)

গুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে খাটে আছে। যেখানে distinctness রয়েছে সেখানেও হেগেল যেমন other শব্দ প্রয়োগ করেছেন তেমনি যেখানে opposition বর্তমান সেখানেও other শব্দ ব্যবহার করেছেন। এই কারণে সর্বত্রই গোলযোগ ঘটেছে এবং এই কারণেই ইউলিয়ম জেমস বলেছেন: 'other' শব্দ নিয়ে হেগেলের এই বাক্‌চাতুরী একই হেত্বাভাসের দৃষ্টান্ত।*

(১১) উপরে হেগেলের ত্রুটিগুলি দেখানো হয়েছে। কিন্তু এই সকল মারাত্মক ত্রুটির অন্তরালে হেগেল দর্শনে সর্বত্রই একটি পরম সত্য নীরবে প্রবাহিত হয়েছে, যার জন্য হেগেলের চিরকালের পাওনা বলে আমরা মনে করি। আগেও আমরা বলেছি, পৃথিবীর কোনো মতবাদই হয়তো নিখুঁত নয় এবং হেগেলীয় দর্শনও নিখুঁত নয়। কিন্তু হেগেলের দর্শনকে আমরা 'সম্পর্ক-বদ্ধ সমগ্রতার মতবাদ' (doctorice of totality & relatedness) বলে মনে করি এবং এটাই দর্শনক্ষেত্রে হেগেলের অবদান। বিশ্বের সকল সত্তা এক সর্বব্যাপী সম্পর্কের জালে বিধৃত হয়ে আছে এবং যেমন দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন একখানা "হাত"কে এরিষ্টটলের মতে সত্যিকার হাত বলা যেতে পারে না তেমনি খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন সত্তাগুলোকে সত্যিকার সত্তা বলা চলে না। সমগ্র দৃষ্টিতে ও সমগ্রতার দিগন্তভূমি থেকে বিশ্বের সকল বস্তু ও ঘটনাকে দেখতে ও বুঝতে হবে। হেগেলীয় তত্ত্বের এটাই মূলকথা। কিন্তু এই কথাটাকে বলতে গিয়েই হেগেল একটা কাষ্ঠ-কঠিন ফর্মুলা গড়েছেন এবং সব কিছুকেই প্রতিবিধিতি (antithesis) কল্পনা করতে গিয়ে জগতের সর্বত্রই বিনশনের (negation) রাজত্ব অনুমান করে নিয়েছেন। খণ্ড সত্তাগুলি অসম্পূর্ণ; কিন্তু অসম্পূর্ণ বলেই তারা একে অন্যকে নস্যাৎ (negate) করবে কেন? একটি খণ্ড সত্তা অন্য একটি খণ্ড সত্তাকে খণ্ডিত (limit) করছে কিন্তু নস্যাৎ (negate) করছে না। শুধু খণ্ডিত (limit) করাকেই বিনশন (negate করা বলা চলতে পারে না। যেখানে বাস্তবিক বিনশন বা নস্যাৎ করণ (negation) রয়েছে, যেখানে একটি অপরটিকে নস্যাৎ (negate) করছে সেখানে বিনশনের (negation) অস্তিত্ব কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু বিশ্বের সর্বত্রই হেগেল বিনশন (negation) দেখেছেন—এতে হেগেলের দৃষ্টিভঙ্গিই ভুল প্রমাণ হয়। হেগেলীয় নীতিকে doctrine of relativity বললে ভুল হয় না। কিন্তু হেগেল একে বিশেষ এক ধরণের relativity বলে যে একদেশদর্শী rigid ফর্মুলায় ফেলতে চেয়েছেন তাতেই আমাদের আপত্তি। বিখ্যাত দার্শনিক Pringle-Pattison-ও হেগেলকে এই রকম অর্থেই বুঝেছেন। খণ্ড সত্য যে অসম্পূর্ণ সেই কথাটি বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন: এরকমের 'doctrine of relativity' বিশেষ পর্যায়ের সত্যোদ্ভাসকে অপ্রমাণ না করলেও পূর্ণ বা অখণ্ড সত্যকে উদ্ভাসিত করতে পারে না। এ-দ্বারা যে-সত্যে পৌঁছানো যায় তা চিরদিনই খণ্ডিত সত্য এবং তা অখণ্ড সত্যের তুলনায় অতিমাত্র লঘু।*

---

* "Hegel's quibble with this word 'other' exemplifies the same fallacy." (p. 283, ibid., W. James).

* "...It may be taken up and superseded in a wider and fuller truth. And in this way we might pass, in successive cycles of finite existence, from sphere to sphere of experience, from orb to orb of truth: and even the highest would still remain a finite truth; and fall infinitely short of truth. But such a doctrine of relativity in no way invalidates the truth of the revelation at any given stage." (Two Lectures on Theism—by Pringle Pattison, Pp. 61-62).

জগতের কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিলম্বন ঘটছে এবং সেই সেই ক্ষেত্রে হেগেলীয় ফর্মুলা খাটতে পারে। যে নীতি কেবলমাত্র কয়েকটি সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে খাটতে পারে সেই নীতিকে বিশ্বলৌকিক এবং সর্বকালীন বলে কল্পনা করে হেগেল বাস্তবিক ভুল করেছেন। বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক পি, সোরোকিন (P. Sorokin) হেগেলের ফর্মুলাকে সমাজ-বিবর্তনের ক্ষেত্রেও যাচাই করে দেখেছেন। তাঁর অনুসন্ধানের ফলেও প্রমাণিত হয়েছে যে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিগত বিবর্তনে মানব সভ্যতা হেগেলীয় ফর্মুলার কোনো কাঠকঠিন, অনমনীয় ধারা ধরে বিকশিত হয় নি। বহু বিচিত্র পথে ও বিবিধ প্রণালীতে সভ্যতা ও সংস্কৃতির মুকুলকে পার হয়ে বর্তমান স্তরে এসে পৌঁছেছে। একে কোন একটিমাত্র ফর্মুলায় বাঁধতে চেষ্টা করা এক-দেশদর্শিতা ও সঙ্কীর্ণতা বৈ আর কিছু নয়।

বিশ্বজগতের সকল গতিই স্থিতি-প্রতিস্থিতি-সংস্থিতির মাত্র তিনটি পর্যায়কে অবলম্বন করে সামনে এগিয়ে চলেছে, এবং এই ডায়লেকটিকের ত্রিতালকে মেপে নিয়েই বিশ্ব-লোকের সকল সঙ্গীতই ছন্দিত হচ্ছে—এ-কথা আজকের জগতের সমাজতত্ত্ব কিম্বা কোনো তত্ত্বই স্বীকার করবে না। সোরোকিন এই উক্তি করেছেন যে:

যে বিচিত্র ও বহুতর ছন্দে বিশ্বগতি আবর্তিত হয়ে চলেছে সেই অসংখ্য বৈচিত্র্যের মধ্য হতে হেগেল একটি মাত্র ছন্দকে ত্রিমাত্রিক ধরতে পেরেছেন এবং সেই সঙ্কীর্ণ ছন্দের পরিমাপে এই জটিল বস্তুস্রোত ও জীবন প্রবাহকে বুঝতে চেয়েছেন। *

এইখানেই তাঁর ভুল হয়েছে এবং এই ভুলের দ্বারা তাঁর সমস্ত দর্শনতত্ত্ব অনেকখানি বিকৃত হয়েছে। আকারগত তর্কশাস্ত্রের (Formal Logic) অভেদনীতি (Law of Identity) ও বিরোধ নীতিকে (Law of Contradiction) হেগেল অস্বীকার করেছেন এবং বিরোধ বা বিলম্বনতত্ত্বের সাহায্যে বিশ্বলোকের সকল জটিলতাকে বিশ্লেষণ ও নিরূপণ করতে চেয়েছেন। আমরা বিস্তৃত আলোচনা করে দেখলাম যে তাঁর সমস্ত বাগ্‌ বিস্তার ও তর্কজাল অর্থ-বিভ্রাট ও পরিভাষাগত অপপ্রয়োগ দ্বারা ব্যর্থ ও বিকৃত হয়েছে। আজকে মোটামুটি-ভাবে তাঁর মূল সমগ্রতা-তত্ত্ব (totality) ও আপেক্ষিকতা-তত্ত্ব (relativity) সবাই স্বীকার করলেও তাঁর বিশেষ ধরণের অস্বাভাবিক ও সঙ্কীর্ণ ডায়লেকটিক ফর্মুলা সার্বজনীনভাবে অগ্রাহ্য হয়েছে। সর্বশেষে হেগেলের বিরাট কল্পনা, বিশাল বুদ্ধি ও ব্যাপক দৃষ্টিকে সশ্রদ্ধ সম্মান দান করেও তাঁর একদেশদর্শিতা স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এই ত্রুটির উল্লেখ করে উইলিয়াম জেম্‌স্ বলেছেন যে তাঁর ত্রিনীতি (স্থিতি-প্রতিস্থিতি-সংস্থিতি) দ্বারা তাঁর প্রতিপাদ্য সিদ্ধ বা প্রমাণিত হয় না।*

---

* The data also lead to a correction of the Hegelian or similar 'dialectical' formula, concerning the types of rhythm and the number of 'beats' in recurring processes. The famous formula of a three-beat rhythm 'Thesis-antithesis synthesis', to which it is maintained all process can be reduced, is not universally applicable." (Social and Cultural Dynamics : Sorokin Vol II. P 208)

"Hegel's formula describes only one of the many varities of rhythms.....—It exceeds legitimate generalisation."

(P 205, Ibid : Sorokin, Vol II)

* "Hegel's own logic, with all senseless hocus-pocus of its triads utterly fails to prove his position."

(ক্রমশঃ)

পুস্তক পরিচয়

অনুবাদ প্রসঙ্গে

অন্তরূপ-রূপান্তর। সম্পাদক—শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী, সুবিমল মিশ্র। ১৭ দুর্গাপুর লেন। কলিকাতা ২৭।

বাংলা ভাষায় আট শ'র বেশি পত্রপত্রিকা আছে। সেখানে আর একটি নতুন কাগজের আবির্ভাবে উল্লসিত হবার মত কোনো কারণ নেই। সংখ্যা গণনায় আর একটি বাড়ল কি কমল তাতে কিছুই আসে যায় না। কিন্তু কোনো কোনো মুখ থাকে যা ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাবার নয়। পত্রিকাটি দেখে আমার যেন কেন এই কথা মনে হল। ক্ষুদ্র অবয়ব নিয়েও জন্মলগ্ন থেকেই আপন স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল।

—বাংলা পত্রপত্রিকার ইতিহাসে কেবল একটি সংখ্যা বাড়িয়েই এ কাগজ শেষ হয়ে যাবে বলে মনে হয় না। প্রথমেই এর বিষয়ের অভিনবত্ব চোখে পড়ে। কেবলমাত্র অনুবাদ কবিতার সাময়িকী হিসেবে 'অন্তরূপ-রূপান্তর' এক নতুন ইতিহাস রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করল। কেবলমাত্র সাম্প্রতিককালেই নয়, অনুবাদ সম্পর্কিত এ ধরণের কোনো সাময়িক পত্র আমাদের দেশে কোনো কালে ছিল কিনা জানা নেই। এবং এ মন্তব্য বোধ হয় ভারতীয় অন্যান্য ভাষা সম্বন্ধে রেখেও করা চলে। সেদিন থেকে পথিকৃতের সম্মান এর প্রাপ্য।

বিজ্ঞানের ক্রম প্রসারের ফলে মানব সমাজ এবং সভ্যতা ক্রমশই একটি ঘন সন্নিবিষ্ট সংহত রূপ নিয়ে জেগে উঠেছে। এক পৃথিবী-এক জাতির স্বপ্ন আজ আর নিছক কল্পনা-বিলাস মাত্র নয়। শুধু প্রতিবেশী দেশের সঙ্গেই নয়, পরন্তু আজ আমরা দূর দূরান্তের দেশ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে নানাভাবে আযুক্ত হয়ে এক পৃথিবীর দিকে ধীরে অথচ স্থির সংহত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছি। মানুষ সম্পর্কে মানুষের ঔৎসুক্য চিরন্তন। তার উপর আজ ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক আমরা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে একে অপরের উপর নানাভাবে নানা দিক থেকে নির্ভরশীল। পৃথিবীর এক প্রান্তের ঘটনা অন্য প্রান্তে তরঙ্গ তোলে। বিভিন্ন দেশের শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে আমরা তাই উৎসাহী। কারণ শিল্প সাহিত্যের মধ্যেই মানুষের সত্যরূপটি ধরা পড়ে। বস্তুতঃপক্ষে এই সব কারণেই বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে দেখতে পাই মানুষ যেন মানুষের আরো কাছাকাছি এসে গেছে। এবং এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সাহিত্যেই অনুবাদ শাখা বৈচিত্র্যে, পরিমাণে এবং উৎকৃষ্টতায় বিশেষভাবে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে ও করছে। ছোট দেশ ভিয়েতনামের মানুষের অপরাজেয় এবং অনন্য চারিত্র শক্তির উৎস সন্ধানে আজ আমরা তার সাহিত্যের সন্ধানে তৎপর। লুমুম্বার দেশ কঙ্গোর মানুষ কী করছেন, কী ভাবছেন—কী তাঁদের আশা আকাঙ্খা—তাঁদের সাহিত্যে আমরা তার সন্ধান করি। নবজাগ্রত আফ্রিকার হৃদয়ে যে আগ্নেয় শপথ দুর্বার হয়ে উঠেছে, তাঁদের সাহিত্যে তার প্রতিফলন কতটা আমরা জানতে চাই। আমেরিকান নিগ্রোদের জীবনযন্ত্রণা তাঁদের সাহিত্যে কী ভাবে রূপ নিচ্ছে আমরা তার অনুসন্ধানী।

সুতরাং আজকের যুগে এ রকম একটি কাগজের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তাই যুগের প্রয়োজনেই "অন্ত রূপ-রূপান্তরের" জন্ম। বিশাল দেশ ভারতবর্ষ। এখানে

নানা ভাষা। নানা সাহিত্য। নানা সংস্কৃতি। পরস্পর সবাইকে না জানালে, অথও ভারতের পরিকল্পনা হবে ব্যর্থ। এবং সাহিত্যের মাধ্যমেই এই জানাশোনা হয় সার্থক। এক দেশ জানতে পারে আর এক দেশকে, এক জনগোষ্ঠী আর এক জনগোষ্ঠীকে। সুতরাং ঘরে বাইরে এই মানুষকে জানার আগ্রহ ও আনন্দ থেকেই "অন্তরঙ্গ-রূপান্তরের" যাত্রা হল শুরু। যে কোনো সৎ সংস্কৃতিবান বাঙালীর কাছে তাই অন্তরঙ্গ-"রূপান্তরে"র সম্পাদক এবং পরিচালকগোষ্ঠী অভিনন্দন পাবার যোগ্য। বিশেষ করে এই ভয়াবহ অবিশ্বাসের যুগে,—এই অন্ধকারের আবর্তে নিশ্চিত এটি একটি আলোকসংবাদ।

কাগজটির প্রথম সংকলন কেবলমাত্র বের হয়েছে। ২য় সংকলন প্রস্তুতির পথে। প্রথম সংখ্যারই সম্পাদকের যে নিষ্ঠা, জীবনের প্রতি ভালোবাসা এবং জ্ঞানের পরিচয় মেলে তা আমাদের মুগ্ধ করেছে। কতগুলি বিভিন্ন রচনা একত্র করে মেলে দেয়াই যে সম্পাদকীয় কর্তব্যের শেষ নয়, পরন্তু সমগ্রতার ঐক্যে কাগজটির মধ্যে বিশেষ একটি চরিত্রের উন্মীলন ঘটানোই যে আদর্শ সম্পাদকের অদ্বিষ্ট, একথা আজকের যুগে অনেক সম্পাদকই স্মরণে রাখেন না। তাই এখান থেকে, সেখান থেকে পাঁচমিশালী কিছু গল্প, কবিতা প্রবন্ধ সংগ্রহ করে একটি কভারের ভিতরে ঢেলে দিয়েই বহু সম্পাদক তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করেন। কিন্তু এ কাগজটি একটি উজ্জ্বলতর ব্যতিক্রম। প্রতি পৃষ্ঠায় সম্পাদকের পরিশীলিত মননের, সহৃদয়, সম্পন্ন বোধের এবং সুগভীর জ্ঞানের ও সুন্দর সাহিত্যপ্রীতির পরিচয় মেলে। রচনা নির্বাচনে, উপস্থাপনায়, অনুবাদপ্রসঙ্গে বিভিন্ন লেখকের বক্তব্য সংযোজনায়, নাতিদীর্ঘ কবি পরিচিতির আনুক্তিতে এবং ভূমিকায় সম্পাদকীয় বক্তব্যে সর্বত্রই পরিমার্জিত, সত্যসন্ধানী অথচ সহৃদয় সামাজিক সত্তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রয়েছে।

৩২পৃষ্ঠার ছোট্ট কাগজটি। দাম ৫০পয়সা। অনুবাদকেরা প্রায় সকলেই প্রতিষ্ঠিত কবি। প্রায় প্রতিটি কবিতাই সু-অনূদিত। একদিকে বৈদিক সংস্কৃত, প্রাকৃত থেকে শুরু করে উর্দু, তামিল, পাঞ্জাবিয়ান—এমন কি ওঁরাও এবং মাগধী —এবং অন্যদিকে আমেরিকান, জার্মান, ফরাসী, ইতালিয়ান, গ্রীক প্রভৃতি বিদেশী সাহিত্য সম্ভারে কাগজটি পূর্বতার ঐশ্বর্যে ঝলমল করছে। পত্রিকাটি দীর্ঘায়ু লাভ করে—সহৃদয় বাঙালীর মনোরঞ্জনে সার্থক হোক, বৃহৎ ভারতবর্ষ এবং বিশাল পৃথিবীর সাহিত্য সম্ভার বাঙালীর কাছে পরিবেশন করে—এক পৃথিবী এক জাতির স্বপ্নসাধনা সফল করুক এই প্রার্থনা করি।

নচিকেতা ভরদ্বাজ ॥

উপন্যাস

সূর্যসাক্ষী। নরেন্দ্র মিত্র। পৃ ৫২৭। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা ৯। মূল্য ১৪·০০ টাকা।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র কিছুদিন হলো এই দীর্ঘ উপন্যাস-খানি লিখেছেন। এখানকার নায়ক হলেন জনৈক কৃষ্টিবান লম্পট, আর নায়িকা—মুগ্ধা অন্ঢ়া ও অনভিজ্ঞা। এক উত্তীর্ণ কৈশোর, কিন্তু এই দু-জনের চাইতেও বড় ভূমিকা হলো তৃতীয় আর একটি চরিত্রের—যে আপাতত মূক ও বধির হলেও আসলে ভয়ানক ভাবে প্রখরবুদ্ধি ও তীক্ষ্ণভাষী, এবং যাকে নিয়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরেও বিশেষ করে অনেক লেখক প্রচণ্ড উদ্বিগ্ন থেকেছেন—সে হলো সমাজ। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সমাজটি অবশ্য একটু জটিলতর, সে পাশাপাশি অনেকগুলি চেহারা নিয়ে উপস্থিত থেকেছে। কখনো যোগরঞ্জনের মতো নীতিবাগীশ, পুরোণোপন্থীর চেহারায়, কখনো বিধিরের মতো বিবেকের চেহারায়, কখনো সনাতের

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.

বিদ্যাসাগর	২·২৫
মানুষের মত মানুষ	·৭৫
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·৩০
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	১·২৫
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা—১২

পোড়া ··· কাটা ··· পোকার কামড়

এই সব আকস্মিক **দুর্ঘটনায়**

হাতের কাছে রাখুন

এ্যাক্রিমেণ্ট

নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য
চর্বিবর্জিত এ্যাক্টিসেপটিক মলম
সংক্রমণ প্রতিরোধক
সত্বর আরামদায়ক

শিশুদের কোমল ত্বকের পক্ষেও নিরাপদ দাগ লাগে

বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী

মতো ইন্দ্রিয়রসিকের ভূমিকায়। এবং এঁরা শুধু বৈচিত্র্যের উদাহরণ হয়েও আসেননি, এই তিনটি প্রবল অস্তিত্বের প্রকলত্তর প্রভাবে দুর্বল চরিত্রটি—যা কিনা নায়িকা চরিত্র—দীর্ণ হয়ে গেছে, কখনো বস্তুনির্ভর হতে পারেনি। এই তিনটি চেহারাই প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ভাবে চূড়ান্ত সত্যের মতো আবির্ভূত হয়েছে। আর, তিনটি ভয়ানক আলাদাভাবি উদ্ঘাপন করেছে।

বৈচিত্র্যের জন্য কিছু চরিত্রকে লেখক পূর্বসূরিদের কাছ থেকে ছেঁচে নিয়েছেন। পাঠক তাঁদের চিনতে পেরে স্বস্তি পাবেন। তাদের মধ্যে খুব উল্লেখযোগ্য নিশিবাবু বোধকরি এসেছেন রবীন্দ্রনাথ থেকেও, ঠাকুরদার নব্যসংস্করণ হয়ে, আর মুরারিদাকে দেখেই চেনা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের দেবেন্দ্রবাবু ও রমেশবাবুর ঘাঁড়েশ্বরের বিশিষ্ট চেহারা। কিন্তু এঁদের দুজনকেই লেখক নিরভিমান পার্শ্বচরিত্রের মতো ঠেলে রেখেছেন, ভিতর থেকে প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব নেননি। অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রগুলিও সবাই এসেছে সনাতন টাইপ-চরিত্রের মতো, কারোর ওপরে লেখকের মনোযোগ পড়েনি, তারা সবাই এই কাহিনীর কিছু ঘটনার সাক্ষী থেকে আর যথেষ্ট পরিমানে পৃষ্ঠাক বাড়িয়ে চলে গেছে। দীর্ঘ সময় হাজির থেকেও তারা নিজেদের ভূমিকার কোনো গুরুত্বই প্রমাণ করতে পারেনি, এমন কি তারা মূল চরিত্রগুলোকে বা মূল ঘটনাধারাতেও কোনো উপকারী সাহায্য করেছে বলে মনে হয় না। সংসারে উৎসর্গিত সেই যুবকটি—প্রণব, ও তার সংসার হয়তো অতি পরোক্ষভাবে সমাজের জন্য একটি-আধটি প্রয়োজনীয় সূত্র তৈরি করলেও করতে পারে, কিন্তু জ্ঞানপ্রভা ও তাঁর আত্মনির্বাসনের পুরো পর্বটি অভিজ্ঞতাবর্জিত অপ্রাসঙ্গিকতার জন্য উদাহরণ তৈরী করে রেখেছে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র এই উপন্যাসের পটভূমিকায় আকর্ষণীয়তর ও দীপ্ততর ভাবে জীবন আর একটি অস্তিত্বকে প্রণয়িত করে রেখেছেন—সেটি হলো আধুনিকতা বলতে বিশেষ কিছু ধারণা ও বোধ নরেন্দ্রনাথের আছে—সেইগুলি তিনি অধিকাংশত সমাজের জবানীতে এবং কিছু অন্য সূত্রে ব্যক্ত করেছেন, সেই মতো উপন্যাসটিরও শোনিতসঞ্চার করেছেন। আমরা প্রথমে এই বইয়ের যে-তিনটি চূড়ান্ত অস্তিত্বের কথা লিখেছিলাম, তার অপর দুটি যে বারংবার পৌনঃপুন্যহীন, নির্লিপ্ত ও মাঝে মাঝে বিরক্তিকর পর্যন্ত আমাদের মনে হয়েছে তার কারণ লেখকের অসম পক্ষপাত ছাড়া আর কিছু নয়। সেই কারণে যোগেশ্বরের মতো সম্পন্ন ব্যক্তিত্বকে আমাদের উপদ্রব এবং মিহিরের মতো আপ্রাণত শ্রমিষ্ঠ নির্বাভিপ্ত যুবকটিকে বাবুদর্বস্ব বলে বারংবার আমাদের মনে হয়েছে লেখক সমাজকে সবখানি ভালোবেসে ও সমর্থন করে এমনকি মিহিরের জন্য অপরিহার্যভাবে প্রার্থিত সহানুভূতিটুকুও সংবরণ করে নিয়েছেন বলে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ঐ চরিত্রটি—যার মধ্যে আধুনিক সত্তা সবচেয়ে প্রমূর্ত হয়ে ওঠার সুযোগ ছিল—সে পর্যন্ত আমাদের কাছে পার্শ্বচরিত্রের বেশি অধিকার নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি।

আধুনিকতা বলতে নরেন্দ্রনাথ মিত্র যা বুঝেছেন ও বারংবার স্থানে-অস্থানে বিবৃত করেছেন, সেই অংশগুলিতেই এই উপন্যাসের দুর্বলতম গাঁথুনি। প্রথমত, ঐ বিবৃতিগুলি এত অর্ধশিক্ষিত যে বারংবার ওর কূটতর্কের সম্মুখীন হওয়া প্রায় আত্মপরীক্ষার সামিল। ঐ সব তর্কের বক্তাদের তিনি নিজে যে-সব গুণে ভূষিত করেছেন তা বোধকরি আর একটু বিশ্বাস্য হয়ে উঠতো যদি তারা একটু কম কথা বলতো। বস্তুত, তিনি তাঁর প্রিয়তম চরিত্রকেও আত্মস্থ হবার মতো গভীর হবার মতো একমুহূর্তের নীরবতা দেননি। তা যদি নরেন্দ্রনাথ মিত্র যদি শরৎচন্দ্রকেও তাঁর পূর্বাচার্যের সম্মান দেন, তাহলে অন্তত তাঁর শেষ-প্রশ্ন-এর উদাহরণ তাঁর মনে থেকে থাকবে। আর দ্বিতীয়ত ঐ অর্ধ-বুঝে-ওঠা-কঠিন তর্কের আড়ম্বরে এই বই পুরোপুরি পড়ে ওঠাও দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। প্রবীণ ও খ্যাতিমান উপন্যাসলেখক নরেন্দ্রনাথ নিশ্চয় জানেন, উপন্যাসের প্রথম প্রধান শর্ত তারআগাগোড়া নিরঙ্কুশ বহমানতা। তীব্রতম দুরূহতম দার্শনিক আলোচনা দিয়েও তার বিকল্প তৈরী করা যায় না।

সনাতন চৌধুরী

২০৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থিত গোকর্ণ প্রেস হইতে শ্রীবিমলচন্দ্র মিত্র এজতোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

ভায়শ্রী

৩১ বর্ষ নবম সংখ্যা পৌষ ১৩৭৩

সম্পাদকীয়

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচকমণ্ডলীর কর্তব্য

১৯৬৭ ২৩শে জানুয়ারি নেতাজী সুভাষচন্দ্র ৭১তম বৎসরে পদার্পণ করলেন। এই ৭১টি বৎসরের পরিক্রমায় দেশ, জাতি ও বিশ্ব তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে পেয়েছে ১৯৪১ সনের ১৬ই জানুয়ারি পর্যন্ত অর্থাৎ তাঁর জীবনের ৪৫টী বৎসর। তারপর দীর্ঘ ২৫ বৎসর ধরে তাঁকে আমরা প্রত্যক্ষভাবে পাইনি। তাঁকে ঘিরে বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও স্বার্থোপ্রণোদিত গবেষণা ও রহস্যজাল সৃষ্টি হয়ে চলেছে বিভিন্ন পক্ষ থেকে, কিন্তু ভারতবর্ষের বর্তমান শাসকদের তরফ থেকে সম্পূর্ণ উদাসীনতাই শুধু নয় উপেক্ষা চলে আসছে তাঁর সম্পর্কে। তার কারণ অনুমান করাও কঠিন নয়। বর্তমান শাসকগণ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধাতু দিয়ে গঠিত। উভয়ের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মপদ্ধতিও সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

এই সংখ্যায় শ্রীশঙ্করী প্রসাদ বসুর নেতাজীর আদর্শ, লক্ষ্য, ও কর্ম পদ্ধতি সম্বন্ধে অতি নিপুণ তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা ও ডাঃ পালের মূল্যায়ন, নেতাজী সম্বন্ধে রোমান্টিক ভাসা ভাসা মতামতকে সুস্পষ্ট সুদৃঢ় তাত্ত্বিক ভিত্তি দিয়েছে। অপরপক্ষে বর্তমান ভারতের নেতৃবৃন্দের লক্ষ্য সম্বন্ধে অস্পষ্টতাই ও শুধু নয়—লক্ষ্য থেকে লক্ষ্যান্তরে অতি সহজে পরিক্রমণ তাঁদের বৈশিষ্ট্য। অগ্র-পশ্চাত বিবেচনাহীন কাজ দ্বারা তাঁরা একটার পর একটা সমস্যা সৃষ্টি করে চলেছেন এবং সেই নতুন সৃষ্ট সমস্যাকে যে কোন উপায়ে সমাধানের উদ্দেশ্যে জটিলতর সমস্যার জন্ম দিচ্ছেন। অতি আধুনিক কালে পাঞ্জাব সম্বন্ধে। এবং সর্বশেষ আসামকে পার্বত্য অঞ্চল ও সমতল অঞ্চলে বিভক্ত করে একটি অভিনব জগাখিচুড়ী ফেডারেশনের সৃষ্টি করে। যাতে কোন পক্ষই সন্তুষ্ট হয়নি এবং কোন সমস্যারই মীমাংসা হয়নি। স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে বিদেশী শাসনের অবসানে ঐক্য ও সংহতি স্থাপিত হবে বলেই সকলে আশা করেছিল, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় ভারত ও প্রদেশ বিভাগ দিয়েই স্বাধীন ভারতের জন্ম সুরু হোলো এবং মুখে যত

সংহতি সম্বন্ধে বক্তৃতা উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে উঠছে অপরদিকে সংহতির ব্যাঘাতকারি নীতি ততই স্তূপীকৃত হচ্ছে। ফলে দেশে শোচনীয় অবস্থা ক্রমশঃই বেড়ে যাচ্ছে। আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিপর্যয় সর্ববিষয়ে। জীবন-ধারণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অপরিহার্য খাদ্য-সমস্যার কথাই ধরা যাক্—বিদেশ থেকে ভিক্ষা করে দেশের কোটি কোটি বুভুক্ষুর ক্ষুধা মেটান হচ্ছে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে কুড়ি বছর পরেও। ভিক্ষা ছাড়া অন্য কোনো সক্রিয় পন্থা আজও বর্তমান শাসকেরা বের করতে পারেননি। এরপরও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সদম্ভে ঘোষণা করেছেন তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা গত একবছরে অনশনে কেউ মারা যায় নি। এর অপেক্ষা নির্লজ্জতর উক্তি যে কি হতে পারে ভাবা যায় না। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের ক্রমবর্দ্ধমান ও যথেচ্ছ মূল্য-নিয়ন্ত্রণে সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, ফলে জনসাধারণের অবর্ণনীয় অভাব ও দুঃখ সহজে অনুমেয়, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর হিসাবে যদিও তাঁর প্রধান মন্ত্রীত্বকালে দেশে কোনো লোক নাকি অনশনে মারা যায়নি! এত দীর্ঘদিন এদেশের জনসাধারণ জীবন্মৃত অবস্থায় থুকছে, মৃত্যু ও জীবনে তফাৎ করা কঠিন বটে!

এই পরিবেশে ৪র্থ সাধারণ নির্বাচন আগতপ্রায়। এবারকার নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য—যদিও প্রায় তিনমাসের উপর কংগ্রেসকে পরাজিত করবার তাগিদে কংগ্রেস-বিরোধী দল—সমূহের সংযুক্ত মোর্চা গঠনের কথা-বিশেষ বামপন্থী ঐক্যের তোড়জোড় চলেছিল, শেষ পর্যন্ত বহুপ্রকারের টানাপোড়েনের পর বামপন্থী ঐক্যের আহ্বান রূপায়িত হয়েছে ডান ও বাম কমিউনিস্ট দলের দুটি সরিকের পরস্পরের মুখোমুখি অবস্থানে। কংগ্রেসকে হারাবার তাগিদ এখন অনেক পেছনে পড়ে গেছে—দুই সরিকের পরস্পরের প্রতি চোখা চোখা বাক্যবাণে আসর মাৎ হয়ে আছে। তা সত্ত্বেও বামপন্থী ঐক্যের জন্য সরব চিৎকারের কমতি নেই। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর অন্যান্য দলগুলো এই ঝগড়ার দোসর হয়ে স্ব স্ব দলীয় স্বার্থ রক্ষায়ও ইস্তাফা দিয়ে ডান ও বামের স্বার্থ সিদ্ধিতে মেতে উঠেছে। কাজেই ৪র্থ সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে জনসাধারণের উৎসাহিত অথবা আশান্বিত হবার কিছু আছে কি? এ কথা গত ২০ বৎসরে প্রমাণিত হয়েছে নির্বাচনের মাধ্যমে কোনো পরিবর্তন আসা অসম্ভব এদেশে বরং প্রতিবারই শাসকশ্রেণীর দম্ভ বেড়েই চলেছে আর দেশের দুরাশাও তার সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে বাড়ছে। এই অবস্থায় এদেশের মুক্তি ও মঙ্গল কোন পথে আসবে এপ্রশ্ন স্বাভাবিক বাঁচার তাগিদেই সর্বস্তরে ব্যাপ্ত হয়ে আছে।

এর উত্তর দিতে গিয়ে এই সংখ্যায় প্রকাশিত উপরোক্ত ২টী প্রবন্ধের দিকে পাঠকদের

মনোযোগ আকর্ষণ করছি। একটি নিপুণ বিশ্লেষণমূলক অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের-অপরটী গভীর অন্তর্দৃষ্টিপ্রসূত মূল্যায়ন ও দিকদর্শন—ভারতের-মর্যাদার অবিচলিত ধারক প্রখ্যাত আইনজ্ঞ—সম্প্রতি পরলোকগত ডাঃ রাধাবিনোদ পালের। ১৯৭৯ সনের অর্থাৎ আজ হতে আঠারো বৎসর আগের লেখাটী পড়ে মনে হয় ১৯৬৭ সনের ভারতবর্ষের নিখুঁত ছবি! মনে হয় যেন ভারতবর্ষে এই দীর্ঘ ১৮ বৎসর সময় স্তব্ধ হয়ে ছিল। কেবলমাত্র ব্যতিক্রম ডাঃ পালের সেদিনের বিশ্বাস, যে ক্ষমতাসীনদল তাদের প্রতি দেশবাসীর আস্থার অভাব জানতে পারলে ক্ষমতার লোভে গদী আঁকড়ে থাকবে না, স্বেচ্ছায় গদী ত্যাগ করে দেশের কল্যাণকে ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থের উপরে স্থান দেবে। কিন্তু সেই সরল সুন্দর বিশ্বাস বিরাট পরিহাসে দাঁড়িয়েছে। লোভ, দম্ভ, মিথ্যাচার ও ভণ্ডামির জমাট অন্ধকার ভারতের দিকে দিকে। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র বলে সদম্ভ গর্জনে এই শ্মশানকে সরব করে রেখেছে এই ভণ্ডের দল। বৃহত্তম গণতন্ত্রকে অর্থের মূল্যে বেচা কেনা যায়। গত তিনটি নির্বাচনে কত কোটী অর্থ এই রিক্ত, দরিদ্র্য বুভুক্ষুর দেশে ব্যয় হয়েছে হিসেব করলে তা স্পষ্ট হবে। কোনো যথার্থ আত্মত্যাগী নির্ধন দেশপ্রেমিকের এই বিপুল অর্থের লেন-দেনের মধ্যে কোনো ভূমিকা থাকতে পারে না—কাজেই বৃহত্তম গণতন্ত্রের নির্বাচনের অর্থ হচ্ছে সেই চিরাচরিত প্রথায় বিপুল অর্থের বিনিময়ে ভোট ও কর্মী ক্রয় করবার সরব কোলাহল। এরই মধ্যে ভারতবর্ষকে চীন, রুশ অথবা মার্কিন—কোন্ পক্ষপুটে ভিড়ান যায় তারই মহড়া চলছে প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে। এই নেপথ্যের অভিনয় ক্ষণে ক্ষণে প্রবল বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে প্রত্যক্ষে। কখনো খাদ্য, কখনো জীবিকা, কখনো শিক্ষার দাবীতে যুবক-সমাজ উত্তাল হয়ে উঠে বুক পেতে দিচ্ছে বুলেট টিয়ারগ্যাস ও লাঠির সামনে। আর ক্ষমতাসীন দল গুরুগম্ভীর নামের একটার পর একটা এন্‌কোয়ারী কমিশন বসিয়ে চলেছে ঘটনার পশ্চাতের কারণ ও তার সমাধানের পথনির্দেশ পাবার জন্য, ফলে কাগজের পাহাড় জমে উঠছে দপ্তরে দপ্তরে!—গত একবছরের মধ্যে কতগুলো কমিশন বসেছে তার হিসেব রাখাও কঠিন। কবে কমিশনের এন্-কোয়ারি শেষ হবে, কবে সেই অনুযায়ী সংশোধন ঘটবে, এবং দেশের লোক তার ফলভোগী হবে সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই দেশের। বৃটিশের-পরিত্যক্ত-গদীর নিপুণ অনুসারীরা এভাবে জনসাধারণের উত্তেজনা, বিক্ষোভ, অসন্তোষকে ধামাচাপা দিয়ে সমাজের প্রত্যক্ষদৃষ্টির আওতা থেকে সেগুলিকে ক্রমাগতই ঠেলে দিচ্ছে সমাজের অ-প্রত্যক্ষ গভীরে। ডাঃ পাল তাঁর লেখাতে একটি অতি মূল্যবান কথা বলেছেন যে, যেকোনো বিক্ষোভ অসন্তোষকে কমিউনিস্ট—প্ররোচনা অথবা প্রভাব—প্রসূত আখ্যা দিয়ে যে কোনো উপায়ে তাকে নিশ্চিহ্ন করবার প্রবণতা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এভাবে কোনো

জাতীয় সমস্যার মীমাংসা নিশ্চয়ই হবে না—এবং তাঁর সঙ্গে আমরা একমত যে এই সমস্যার মুখোমুখি আমাদের আসতে হবে এবং এই সব ঘটনা বাইরের প্রভাবপ্রসূত এই বিশ্বাস থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেশের অভ্যন্তরের কোন্ কোন্ কারণ ও অবস্থা এর উৎস তা অনুসন্ধান করে সে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন আনতে পারলেই, তবে এর যথার্থ মীমাংসা হওয়া সম্ভব। ডাঃ পালের আর একটী মতের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, সব দেশের সবকালের পক্ষে সে দেশের সে কালের শক্তি ও অগ্রগতির উৎস তার—তরুণসমাজ। তাকে নিষ্পেষিত করে কোনো অগ্রগতি সম্ভব নয়। অথচ বর্তমান ভারতবর্ষে দেশের তরুণদের স্থান কোথায়? হয় তারা দেহে মনে স্থবির স্বিত-স্বার্থের ঘৃণ্য তল্পীবাহক হয়ে নিজেদের বিক্রীত করছে, না হয় বিশ্বক্ষমতার লড়াইয়ে তারা হয়েছে পাশার গুটি। এ দুটি অবস্থা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে না পারলে যুবসমাজের যথার্থ শান্তি ও পরিবর্তনের উৎস হওয়া অসম্ভব। কে সেই অবস্থার সূচনা করবে? ভারতের যুবসমাজের সামনে আত্ম-প্রত্যয়, ঐক্য ও বলীদানের আদর্শ নিয়ে দুর্জয় শক্তিতে কার আহ্বান দুর্বার হয়ে উঠবে? ভারতের মুক্তিযজ্ঞের হোতাদের মধ্যে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষ সকলকে লাভ করেছে একে, একে। গান্ধীজীর নেতৃত্ব, নেহেরু ও তাঁর অনুসারী, অনুগামীদের এবং আরো বহু ব্যক্তির যৌথ অথবা একক নেতৃত্ব, নির্দ্দেশ ও পরিচালনা লাভ করেছে ভারতবর্ষ। কিন্তু কোনো সমস্যার সমাধান অথবা সমাধানের পথ কি সে পেয়েছে? আশ্চর্য এ বিষয়ে কোনো মতদ্বৈধতা নেই যে স্বাধীনতা লাভের পৃষ্ঠপট রচনা ও স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষ গঠনে নিজ নিজ ভূমিকা গ্রহণের সুযোগ সব নেতারাই পেয়েছিলেন, কেবলমাত্র একজন বাদে—যাঁর সম্বন্ধে ডাঃ পাল গভীর অন্তর্দৃষ্টির সহিত বলেছেন—"সম-লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ তাঁর সহকর্মীদের উপর দেশসেবার সকল দাবী অর্পণ করে সুভাষচন্দ্র নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন কি বিপুল আত্মবিলুপ্তি, মহত্ত্ব ও মাধুর্যে" সেই ভারত-পথিক আ-শৈশব যাঁর ধ্যান-জ্ঞান-সাধনা ছিল ভারতের মুক্তি। বর্তমান ভারতবর্ষের—বিশেষ ক্ষমতাসীন দলের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই আত্ম-অবলুপ্তি থেকে সেই মহান ভারত-সেবককে তাঁর যোগ্যস্থানে পাবার বরং তাদের এই শোচনীয় নীচ মনোভাবকে কূটকৌশলের জয় বলে নিঃসন্দেহ তারা আত্মতৃপ্তি লাভ করছে। কিন্তু তাদের এই আত্মতৃপ্তি ভারতকে শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে পারবে তো? সে বিশ্বাস রাখার কোনো কারণ নেই, ডাঃ পালের সহিত কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গভীর প্রত্যয়ে আমরাও ঘোষণা করছি—ভারতের প্রয়োজন নেতাজীর নেতৃত্বের। সে নেতৃত্ব লাভের জন্য কোন পথ আমাদের অনুসরণ করা কর্তব্য সেটাই আজকের প্রধানতম প্রশ্ন। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে যে, সে নেতৃত্ব লাভ বিন্দুমাত্র অগ্রসর হবে না

সে সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত কাজেই আশাহীন। তবে এই নির্বাচনের মাধ্যমে যদি দেশবাসী নেতাজী অনুসারি—কোনো দল নয়—কারণ সেরূপ কোনো দল ভারতবর্ষে নেই—কেবলমাত্র বর্তমান আছেন কিছু ব্যক্তি—এই চতুর্থ নির্বাচনের মাধ্যমে তাদেরকে নির্বাচিত কোরে গতানুগতিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে যদি নির্বাচকমণ্ডলী রায়দেন তবে সেটাও হয়তো হবে একটি সম্ভাবনাময় ইঙ্গিত —যত সামান্যই হোক না কেন। ৪র্থ সাধারণ নির্বাচনের বৈতরণী পার হয়ে ভারতের মুক্তির পথ অনাবৃত হবে এ বিশ্বাস কারো বিন্দুমাত্র আছে বলে আমরা মনে করি না—কারো কারো স্ব স্ব মুক্তি আসতে পারে মাত্র—তাইতো আমরা দেশবাসীকে আহ্বান করছি নেতাজীর নেতৃত্বকে ভারতে সম্ভব করতে একনিষ্ঠ দৃঢ়তার সহিত তাঁদের কর্তব্য করবার জন্য দেশের স্বার্থে! এই একমাত্র বাঁচবার পথ।

২৩শে জানুয়ারী, ১৯৬৭

ডাঃ রাধাবিনোদ পালের লোকান্তর

৮১ বৎসর বয়সে চরিত্রে, জ্ঞানে, সম্মানে পরিপূর্ণ জীবন যাপন করে ভারতের এই মহান সন্তান গত ১০ই জানুয়ারী, ১৯৬৭, সুখলাল কারনানি হাসপাতালে লোকান্তরিত হয়েছেন। তাঁর জীবনের মহত্তম কীর্তি ১৯৪৮ সালের এপ্রিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তে যখন পরাজিত জাপানী নেতাদের আমেরিকার মুখ্য ভূমিকায়, বিচারের প্রহসন কালে পৃথিবীর সব দেশের বিচারকদের রায় জাপানের বিরুদ্ধে গেল, কিন্তু জাপানকে সম্পূর্ণ নির্দোষ ঘোষণা করে ৮০০ পাতার সুদীর্ঘ রায় বেরোলো ভারতীয় বিচারকের। সমস্ত বিশ্ব ভারতীয় বিচারকের অনমনীয় দৃঢ়তা ও স্বাধীন চিন্তার পরিচয়ে বিস্মিত ও হতবাক হোলো। ভারতমাতাকে সেদিন তাঁর এই সুসন্তান পরালেন সম্মান ও মহত্ত্বের মুকুট। তাঁর এ কীর্তি ভারত চিরদিন গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণে রাখবে। তাঁর এই রায় পরোক্ষে ভারতের শ্রেষ্ঠতম দেশপ্রেমিক নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অমর কার্যাবলীর প্রতি এক শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ। কী গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল ডাঃ পালের নেতাজীর প্রতি। এবারকার জয়শ্রীতে প্রকাশিত ১৯৪৯ সালের তাঁর এক বক্তৃতা—'India needs his guidance' এর ছত্রে ছত্রে তা' ভাস্বর। আমরা মাথা নত করছি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় এই বিরাট পুরুষের স্মৃতির প্রতি। তাঁর স্মৃতি চিরজীবী হউক।

২৬।১।৬৭

ভারতের প্রয়োজন নেতাজীর নেতৃত্ব

ডাঃ রাধাবিনোদ পাল

বাংলার মহান সন্তান ভারতের মুক্তি-যজ্ঞের দুর্ধর্ষ সংগ্রামী, দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ার সুভাষচন্দ্র বসু বা চন্দ্র বসুর ৫৩ তম শুভ জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত আজকের এই বিশেষ সভায় আপনাদের স্বাগত জানাতে পেরে আমি নিজেকে সবিশেষ সম্মানিত বোধ করছি। তাঁর বিচিত্র ঘটনাবলী সম্বলিত জীবনকে একটিমাত্র সংক্ষিপ্ত ভাষণে যথার্থরূপে প্রকাশ করা আমার ক্ষুদ্র সাধ্যের অতীত। সুতরাং আমি তাঁর চরিত্রের মাত্র বিশিষ্ট দিকগুলি নিয়ে কিছু বলবো। কিন্তু সে কাজও কম কঠিন নয়।

একথা সর্বস্বীকৃত যে ইতিহাসে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের চরিত্র মূলতঃ তাঁদের স্বীয় প্রতিভার ভাস্বর, কিন্তু এ কথাও সত্য যে তারা নিঃসন্দেহে নিজ নিজ পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত স্ব স্ব যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিও বটেন। যে যুগের আওতায় আমাদের প্রিয় নেতাজী তাঁর মানসিক গঠনকে লাভ করেন তার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য কি? সংক্ষেপে নেতাজী এবং তাঁর সমসাময়িকেরা জন্মলগ্ন থেকেই এক বিরাট বিপ্লবের দ্বারায় বেড়ে উঠেছেন। সেদিনের ভারতে কি রাজনৈতিক, সমাজিক বা ধর্মীয় এক সর্বাত্মক বিধ্বংসী আলোড়ন এসেছিল পুরাতনজীর্ণ সব বাধানিষেধকে নস্যাৎ করে দিয়ে তার ধ্বংস স্তূপের উপর এক নূতন পৃথিবী গড়ে তোলার আহ্বান নিয়ে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র এই বিপ্লুব যুগের সন্তান। চারিত্রিক যে দৃঢ়তা পরবর্তী সারাজীবন তাঁকে সর্বাপেক্ষা বিশিষ্টতা দান করেছিল জীবনের প্রত্যুষেই তার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। এ সভায় তাঁর শৈশবের কথা আলোচনা করার অবকাশ কম তবুও তাঁর ছাত্রজীবনের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারা যাবে না। সে ঘটনা ১৯১৬র প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন ইংরেজ অধ্যাপক দ্বারা সুভাষচন্দ্রের কিছু সতীর্থদের আত্মমর্যাদাকে আহত করাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়। ঘটনাটির স্থায়ী তাৎপর্য রয়েছে। নেতাজীর নিজের ভাষায় ঘটনাটি তাঁর সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনকে নির্দিষ্ট করে দেয়। এই ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে আত্ম-বিশ্বাস ও নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা তাঁর মধ্যে বিকশিত হয়। এই একটি ঘটনা তাঁর চরিত্রকে স্থায়ী ভাবে প্রভাবিত করে এবং অবিচল দৃঢ়তায় তিনি ভবিষ্যতের সম্মুখীন হন।

একথা অনুমান করতে বিশেষ বুদ্ধিমত্তার সাহায্যের প্রয়োজন নেই যে চিন্তায় ও ব্যবহারে স্বাধীন ও বলিষ্ঠ অগ্র-পশ্চাত ফল সম্বন্ধে উদাসীন সুভাষ চন্দ্রের মত ধাতুতে গড়া ছেলেরাই চিরদিন সর্বদেশে নির্যাতিত হয়ে থাকে। এই ধরণের যুবকেরাই বিদেশী আমলাতান্ত্রিক শাসকদের চোখে উপদ্রব বিশেষ, যাদের কিছুমাত্র বিবেচনা নাদেখিয়া যখন তখন যে কোনো ভাবে নির্যাতিত করা যেতে পারে। যদিও যে কোনো সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তির উৎস সেদেশের তারুণ্য শক্তি, যার সংহত উপযুক্ত ব্যবহারের উপরেই সেই সমাজের জীবনী শক্তি নির্ভর করে; কিন্তু বিদেশী শাসকদের চোখে পরাধীন দেশের যুবশক্তি সর্বকালে একটি বিপজ্জনক বস্তু। বস্তুতঃ সে যুগে আমাদের তরুণ সম্প্রদায় ছিল বহুৎ স্বদেশীয় আত্মত্যাগের শক্তিতে ভাস্বর। মুহূর্তমাত্র ও বিলম্ব না করে নেতাদের

আহ্বানে তারা সাড়া দিত। তাদের এই সদাপ্রস্তুত ভাব ব্রিটিশ শাসককুলকে এমন বিচলিত করে তুলেছিল যে তারা সামান্যতম সন্দেহ মাত্রে দেশের তরুণদের বিনষ্ট করে দিতে দ্বিধামাত্র করতোনা, যদিও আমাদের নিকট তা ছিল মানব-জীবনের নিষ্ঠুরতম অপচয়।

সৌভাগ্যক্রমে আজ আমরা স্বাধীন ভারতে বাস করছি। কিন্তু মুহূর্তের জন্য আমরা যেন ভুলে না যাই যে সমাজ ও তরুণ সম্প্রদায় পারস্পরিক সূত্রে আবদ্ধ। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বিশেষ করে বিভাগোত্তর ভারতে এই মুহূর্তে যুবসমস্যাই প্রধানতম সমস্যা। সমস্যাটিকে যথাযথ বুঝতে হলে সহনশীলতা এবং এদের আদর্শ ও লক্ষ্যকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখে এই তারুণ্যশক্তিকে কার্যকরি খাতে প্রবাহিত করতে হবে। তারুণ্যের উচ্ছলতাকে বিদ্বেষ প্রসূতরাজনৈতিক কোনরূপ ছাপদিয়ে তাকে গুলিবিদ্ধ করে নিষ্ঠুর ভাবে দমন করার দ্বারা কোনো সুফল হবে না।

এই সূত্রে একটি অতি পরিচিত ব্যাপক সমস্যাকে বহুপ্রচলিত আখ্যায় আখ্যায়িত করবার প্রবণতা সম্বন্ধে উল্লেখ না করে পারছিনা। যে কোনো অ-সমর্থনীয় নীতিকে কমিউনিস্ট দমনের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত বলে সমর্থনীয় প্রতিপন্ন করা হয়ে থাকে। বর্তমানে বিভিন্ন প্রদেশে কমিউনিজম ভীতি থেকে যে 'গেল গেল' রব উঠেছে সেটা কোন বাইরের ধ্বংসাত্মক শক্তির প্রভাব থেকে উদ্ভূত ততটা নয় যতটা সমাজের স্বতোথিত সংহতির অভাবের আভ্যন্তরীণ ফল। এই বিভীষিকার মনোভাব এবং তাকে নির্মূল করার জন্য যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হচ্ছে তা থেকে এ-কথাই প্রমাণিত হয় যে আভ্যন্তরীণ সংহতির হানিকর লক্ষণগুলিকে যথাসম্ভব সৌপস্থান দিয়ে অথবা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বাইরের প্রভাবকেই প্রাধান্য দান করা হয়ে থাকে।

কেবলমাত্র বল-প্রয়োগের দ্বারা এই বিভীষিকা দূর করা যাবেনা। সময় এসেছে যখন এই আদর্শগত সংঘর্ষের মুখোমুখি হতে হবে এবং বলপ্রয়োগ ব্যতীত অন্য উপায়ে তার মীমাংসা করতে হবে।

নেতাজী প্রসঙ্গে ফিরে এসে দেখি ১৯২১ সালে তিনি একটি স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। সেদিনের কলকেরই প্রায় সমস্ত প্রতিভাবান ভারতীয় যুবকের আই, সি, এস হওয়া লক্ষ্য থাকা সত্ত্বেও, স্বভাবতই অনমনীয় স্বাধীনচিত্ত নেতাজীর পক্ষে এই বন্ধন স্বীকার করে নেয়া সম্ভব ছিলনা। সুবিধা-বাদকে তিনি নিজের জীবনের মূলমন্ত্র কখনো করেননি উচ্চমহলের প্রশংসা বা প্রশ্রয় তাঁর নিকট কিছুমাত্র লোভনীয় ছিলনা।

এই আপোষহীন আদর্শবাদ দ্বারাই নেতাজীর প্রতিটি চিন্তা ও কর্ম চিহ্নিত। মহাত্মা গান্ধি ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এই দুই গুরুর সংস্পর্শে তাঁর চিন্তা ও কর্ম বাস্তব রাজনীতি ক্ষেত্রে রূপায়িত হয়। কিন্তু এই অনমনীয় আদর্শবাদই শেষ পর্যন্ত তাঁকে গান্ধিজীর পথ থেকেও সরিয়ে নিয়ে যায়। এই দুই বিরাট ব্যক্তিত্বের মধ্যে আসল বিরোধ ছিল এই যে, গান্ধিজী কি আক্রমণাত্মক কি আত্মরক্ষামূলক সকল ক্ষেত্রেই বল প্রয়োগের বিরোধী ছিলেন। ব্যক্তি-মানসে নানারূপ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দেখা যায় যা পূর্বাহ্নে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরিমাপ করা অসম্ভব, অথচ যে কোনো বিরোধেই ফলাফল নির্দ্ধারিত হয় এই শক্তিগুলির দ্বারা। বয়সে এবং অভিজ্ঞতায় প্রবীণ গান্ধিজী এ সম্বন্ধে গভীর ভাবে সচেতন ছিলেন।

অপর পক্ষে আক্রমণাত্মক হিংসা ও অপরটির মধ্যে যে প্রভেদ আছে নেতাজী তাকে অস্বীকার করেননি। এই দুই ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন এবং তাঁর নিকট উদ্দেশ্যেই ছিল নৈতিক নিয়ন্ত্রণ। উভয়ক্ষেত্রে ক্রিয়া অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও লক্ষ্য এবং নৈতিক দৃষ্টিতে উভয় প্রকারের কাজের মধ্যে প্রচুর প্রভেদ আছে। যৌবন-সুলভ দ্রুতফলাকাঙ্ক্ষী হওয়া সত্ত্বেও লক্ষ্যের প্রতি অবিচল বিশ্বাস ও

নিষ্ঠা দ্বারা সুভাষচন্দ্রের আদর্শবাদ চিহ্নিত হয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের এই আদর্শনিষ্ঠা গান্ধিজীর সাবধানী পরিচালনায় কিছুদিন অবদমিত ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা নিজস্ব ভিন্ন পথ করে নিল। কিন্তু একই উদ্দেশ্যে আত্মনিবেদিত সহকর্মীদের জন্য কি উদার মানুষে তিনি তাঁর নিজের স্থান পরিত্যাগ করে চলে গেলেন।

আমাদের অতিপ্রিয় নেতাজীর মত নিষ্ঠাবান দেশ-প্রেমিকের নিকট মাত্র একটি বস্তুই মূল্যবান ছিল, মানুষের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেসের সভাপতি অথবা একজন সাধারণ কর্মী হিসেবেই তাঁর কি ভূমিকা হবে সেটা ছিল সম্পূর্ণ অবান্তর। এধরণের যথার্থ দেশ প্রেমিকেরা নিজেদের রাজনৈতিক জ্ঞানের একচেটিয়া অধিকার অথবা নিজের অবলম্বিত পথের নির্ভুলতা কখনো দাবী করেন না। সর্বসম্মত লক্ষ্যে পৌঁছাবার নির্ভুলতম পথ নিয়ে যতক্ষণ বাদানুবাদ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত বিশেষ অসুবিধা নেই, এতে তিক্ততা অথবা অসহিষ্ণুতার কোনো প্রয়োজনও নেই।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর দেশবাসীর জন্য ত্যাগ ও বিনয়ের যে শিক্ষা নেতাজী রেখে গিয়েছিলেন যদি তাঁর স্বদেশবাসী আজ তা স্মরণে রাখতো! ভারত যদিও আজ বিদেশী শাসনমুক্ত তবুও একথা জোরের সহিতই বলা সম্ভব যে যে নূতন পৃথিবীর স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম সুখে ও শান্তিতে বাসকরতে হলে যাকে নিশ্চিত আমাদের রূপ দিতে হবে, তার কিছুমাত্র সমীপবর্তী আমরা হইনি।

আমাদের আসল বিপদ হোলো দীর্ঘদিন বিদেশী শাসনাধীন থাকার ফলে দেশের শাসন ভার এমনহাতে পড়া স্বাভাবিক যারা দেশ-শাসনের উপযুক্ত ক্ষমতা ব্যবহারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞই শুধু নয় ক্ষমতালাভে ক্ষমতা-লিপ্সার জন্ম দেওয়াও স্বাভাবিক। প্লেটো যথার্থই বলেছেন 'ক্ষমতার ক্ষুধা সর্বগ্রাসী মানবক্ষুধার মধ্যে অন্যতম' এবং এ ক্ষুধাযন্ত্রে বেড়েই চলে। ক্ষমতা-চর্চার মধ্যে যে আনন্দ নিহিত রয়েছে কেবলমাত্র তা লাভ করার জন্যও কোন ব্যক্তি নিজের বা প্রজাদের কল্যাণের জন্য ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে। ক্ষমতালিপ্সা যে কত অনিষ্টকর হতে পারে আধুনিক বিশ্বই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আধুনিক উদ্বোধের নেতারা ক্ষমতার মোহেই মোহাচ্ছন্ন। মানুষ অথবা প্রকৃতির যত ক্ষতিই হোক না কেন, নতুন কিছু করার নেশাটাই বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। এর ছোঁয়াচ সমস্ত পৃথিবীতেই ছড়িয়ে পড়ছে। ভারতবর্ষও ব্যতিক্রম নয়। ক্ষমতার এই শোচনীয় প্রহসনীতে আমরা যেন দিশেহারা হয়ে না পড়ি। ক্ষমতার মোহ হতে মুক্ত থাকবার যে মহান আদর্শ নেতাজী আমাদের সামনে রেখে গেছেন আশাকরি তা বৃথা যাবেনা। নেতাজীকে মিথ্যা মর্যাদার মোহ কখনো আচ্ছন্ন করেনি। তাঁর নিকট মর্যাদার যথার্থ অর্থ মানবিকতা। মানবিকতা বলতে তিনি বুঝতেন সত্যবাদিতা, দুর্বলের প্রতি সৌহার্দ্য, অন্যের প্রতি দরদ এবং স্বদেশসেবায় একনিষ্ঠতা। আমি নিশ্চিত যে, এখন যাঁরা দেশের উন্নতির জন্যে সচেষ্ট আছেন তাঁদের নীতি দেশবাসীর মনঃপুত নয় বলে যে মুহূর্তে তাঁরা নিশ্চিত হবেন তাঁরা গদী ছেড়ে দেবেন। বর্তমান অনুসৃত নীতি সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ সম্পূর্ণ দুটি বিভিন্ন কারণে দেখা দিয়েছে। এগুলি ভারতবর্ষেরই বৈশিষ্ট্য নয়। সদ্য-স্বাধীনতা প্রাপ্ত প্রতিটি দেশেই এই কারণগুলি দেখা দেয়। সকল স্বাধীনতা সংগ্রামের পরেই এগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে। হয়তো এগুলি ঐ অবস্থার সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

প্রথম কারণটি নেতৃত্ব সংক্রান্ত। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারীরাই স্বাধীনতা-উত্তর কালে দেশশাসন করে থাকে। সংগ্রামের ভিতরদিয়ে তারাই নেতৃত্ব লাভ করে থাকে যারা কোন যুদ্ধ পরিচালনায় দক্ষ। যতক্ষণ না জঙ্গলাকের চাবিকাঠি খুঁজে পাওয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত যে কোনো অবস্থায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং প্রয়োজনে তা পরিবর্তন করতে,

নিত্য নূতন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে হয়। এসব গুণ যুদ্ধ জয়ের পক্ষে অনুকূল কিন্তু দেশ শাসনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত নাও হতে পারে। যুদ্ধকালীন সেনাপতি শান্তির সময়ে ভাল শাসক নাও হতে পারে।

দ্বিতীয় কারণ অতীতের ছায়া। এর ফলে যুদ্ধপূর্ব প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি যুদ্ধোত্তর কালেও দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রাখে এবং ফলে পরিবর্তিত অবস্থার জরুরী বিষয়গুলির দিকে মনোযোগ থাকে না। একথাও মনে রাখা ভালো যে নতুন নতুন প্রশ্নগুলির নির্ভুলতা সম্পর্কে এই স্বল্প সময়ের মধ্যে জোর করে কিছু বলা যায় না। তবে আমরা যেন আমাদের সমস্যাগুলিকে সঠিক কোণ থেকে বিচার করতে পারি; একথা ভুললে চলবেনা যে আমাদের সমস্যা ও বিশ্ব সমস্যাগুলিও ১৯১৪ সালের যুদ্ধ-পরবর্তী সমস্যাগুলির জটিলতর সংস্করণ মাত্রই নয়; নূতন সমস্যাগুলি কেবলমাত্র বিশ্ব-সমস্যাই নয় আসলে সেগুলি মানবিকতারও সমস্যা।

এশীয় বিপ্লবে নেতাজীর মুখ্য ভূমিকার কথা অনুল্লিখিত থাকলে নেতাজীর মহত্ত্ব সম্পর্কে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। যুদ্ধোত্তর এশিয়া যে সম্পূর্ণ ভাগ্রত সাম্প্রতিক ঘটনাবলীই তার প্রমাণ। এশীয় জনগণের মনে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করার কাজে নেতাজীর নেতৃত্বে আই এন এ বাহিনীর অভিযানের একটি মহান ভূমিকা রয়েছে একথা বললে ভুল হবেনা। এই ভারতীয় জাতীয় বাহিনী একক প্রয়াস করেছে যে এশীয়বাসীরাও প্রচণ্ডবিপর্যয়ের মধ্যেও সামরিক ও সাংগঠনিক কুশলতা প্রদর্শনে সক্ষম। দূর প্রাচ্যের যেখানেই তারা গিয়েছে এই আশা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে যে এশীয়বাসীর ভাগ্য এশীয়দের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। তাদের উত্তরাধিকার ধীরে ধীরে নিশ্চিত ভাবে ফলপ্রসূ হচ্ছে। আই এন এ সংগঠনের মাধ্যমে নেতাজী প্রাদেশিক ও সাম্প্রদায়িক সকল ভেদবুদ্ধির অবসান ঘটিয়েছিলেন। এটা তাঁর মহত্তম কীর্তি। এই সার্থকতা ভারতের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের জনগণের একথা বোঝা দরকার যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি দেশের মৌলিক সমস্যাগুলি থেকে দৃষ্টিকে সরিয়ে নেয়। তার ফলে কোনো বিশেষ কালের বিশেষ অবস্থায় উদ্ভূত সমস্যাগুলিকে চিরন্তনী সমস্যার গুরুত্ব দান করে। এইখানেই আমার বিশ্বাস নেতাজীর অনন্যসাধারণ কীর্তিকে সমসাময়িক অন্যকোনো ব্যক্তির কীর্তিই ম্লান করে দিতে পারবে না।

সাম্প্রদায়িকতা যদি ভারতের পক্ষে গুরুতর ব্যাধিস্বরূপ হয়ে থাকে, তাহলে সমস্ত বিশ্ব এই ধরণের আরো গুরুতর ব্যাধিতে ভুগছে। একমাত্র কোনো অলৌকিক শক্তি পৃথিবীকে এই ব্যাধিমুক্ত করতে পারে।

বিশ্বের প্রতি আমাদের বৃহত্তর নৈতিক কর্ত্তব্যের সহিত আমাদের স্বদেশপ্রেমের সামঞ্জস্য সাধন করতে হবে। নেতাজীর মত দেশ প্রেমিকের পক্ষেই একমাত্র তা সম্ভব। নেতাজীর নেতৃত্বের প্রতি যেন আমাদের চিরস্থায়ী বিশ্বাস থাকে এবং এই আশা আমরা যেন পোষণ করি যে এখনো আমরা তাঁর নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হইনি। নেতাজী দীর্ঘজীবী হোন।*

---

* ২৩।১।৪৯ নেতাজীর ৫৩তম জন্মতিথি উদ্‌যাপন উপলক্ষে কায়রোতে অনুষ্ঠিত একটি ভোজ-সভায় ডাঃ রাধা বিনোদ পালের India needs his guidance নামীয় ইংরেজী বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ ইংরেজী ফরোয়ার্ড ব্লক সাপ্তাহিক পত্রিকা হতে গৃহীত।

তেইশে জানুয়ারী

আনন্দ রায়চৌধুরী

রৌদ্রে ভরে গেছে চতুর্দিক আকাশ ও ফুটপাত
তবু কেন চৈতন্যে আঁধার কৃষ্ণাবরী—
সারা দেশ ঘুরে ঘুরে দেখি শুধু বোধ ক্ষোভ আর মনস্তাপ
স্বদেশ আমার এত রক্তহীন এর আগে ভাবিনি কখনো।
এই তো সেদিন গেছি উড়িষ্যার প্রান্ত ছুঁয়ে, অন্ধ্র ও মাদ্রাজ
শত শত মানুষের দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দে ঘুমোতে পারিনি
নির্ভুল প্রত্যুষে শুধু ভেবেছি কোথায় আছি
নেতা ও মানুষ কই ? এপার ওপার শুধু শব্দের প্রবাহ
ডিসেম্বরে দীর্ঘ দিনগুলি আমি মাটীর সমীপবর্তী
যথার্থ দেশের কাছে পেতেছি দুহাত—
বলেছি, আশ্বাস দাও, কবচকুণ্ডল দাও পত্রকার
শহীদের রক্তপাত ইতিহাস স্মৃতিতে জাগাও একবার
যাতে সব অর্থহীনতার আর নির্বেদে নিশ্চিত ফেরে মূল্যের চেতনা
তেইশ, ছাব্বিশ সব লোকোত্তর দিনগুলি যেন কালেণ্ডার থেকে নেমে
আমাকে জাগিয়ে যায় মূর্খ ঘুমঘোর থেকে
যেন নাম, তোমার নামের অর্থ আরো একবার পাই নিদ্রাসন বুকে
নেতার মুখশ্রী আর চাইনা, সমস্ত মোহ অনুশাসনের স্পৃহা হারিয়েছি কবে
শুধু খুঁজি মানুষের মহিমায় যথার্থ উদ্ধার এই স্বপ্নের রৌদ্রে জলে মনে
তোমার সংকল্প, বোধ সূক্ষ্মতম বিশ্বাসের বীজগুলি যেন পুনর্বার পায়
সুস্থ পটভূমি।

মহানায়ক

বিজয় কুমার দত্ত

ইতিহাস নীরব সাক্ষীর
ভূমিকায় রয়েছে দাঁড়িয়ে :
নায়কের প্রতিভার, অসজলে হীরের তীব্র আশ্চর্য ঝলক
চতুর্দিক আলিয়ে দেয়। যাদের দৃষ্টির
সম্মুখে লোভের ছায়া—যারা দু'হাত বাড়িয়ে, শুধু
নিতে জানে, কেবল তারাই
সেই আলো বিচ্ছুরণে, অন্ধ চিরদিন।

অথচ আশ্চর্য! দেখো, সেইসব দৃষ্টিহীন মানুষেরা আজ
কেমন রাজত্ব করে! দেশে দেশে কথার ফুলঝুরি
আলেয়া আলোর মত নিরন্তর জ্বালায় মোহার,
এমন কি ইতিবৃত্ত লিখে রাখে নিপুণ অক্ষরে—
চোখ দুটি সেও,—থাক্—কুটিল হাতের
কারুকার্যে, ঘটনার উত্থান পতন,
মনোরম মিথ্যা ছলনার স্থির বিশ্বাস্য নাটকে
রূপ দেয়। অনন্ত স্পর্ধায়
দেখায় অযোগ্য সেই নাটকের অভিনয় করে।

বীরত্বগাথায়, ভারতবর্ষের মাটি, উষ্ণ নিঃশ্বাস বাতাস
চিরদিন সঞ্জীবিত। শুধু, বিংশ শতাব্দীর, সব
স্বদেশপ্রেমিক, বক্তৃতামুখর মঞ্চে, যেন তীক্ষ্ণ অভিনেতা—
সংবাদপত্রের স্থূল অশোভন হেডলাইনে প্রলাপোক্তি করে।
অথচ এদেশে এক নিঃসঙ্গ নায়ক
"সাজো, সাজো" সৈনিকের দামামা বাজিয়ে
চেয়েছিল মৃত্যুপণে, স্বাধীনতা—চির অধিকার :
সে কথা ভুলেছে কারা? আপন বিস্মৃতি পাপ, তারো চেয়ে ঢের
ক্ষমাহীন পাপ, আত্মগ্লানি। স্থবির এদেশে তাঁর
বজ্রকণ্ঠ দারুণ ধ্বনিত ; তার শোন, প্রতিধ্বনি
তোমার বুকের মধ্যে : চলো দিল্লী, ওঠো, অস্ত্র ধরো
দিল্লীর রক্তাক্ত পথ, স্বাধীনতা নামাঙ্কিত পথ"।

মানুষের শ্রুতি বন্ধ—কারা শুনবে সেই কণ্ঠস্বর?
ইতিহাস নীরব সাক্ষীর
ভূমিকায় রয়েছে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট রক্তের অক্ষরে,
সমগ্র ভারতবর্ষে তামসিক অহঙ্কারে আজ
অন্ধের উল্লাসস্তরে আস্ফালন করে।

সবি ছিল

স্বদেশ রঞ্জন

সবি ছিল,
কয়েক কোটি বাহু আর মুঠি
কয়েক কোটি বুক আর পেশী
শুধু একজন নেই সাহস দেবার।

সবি ছিল,
মুক্ত বাতাস, মাথা তুলে দাঁড়াবার
দূরদূরে বিস্তৃত খোলা ময়দান
একজন নেই পথ দেখিয়ে দেবার।

সবি ছিল,
শিরায় শিরায় স্রোত, প্রচুর সামর্থ্য
বুক ভর্তি সাহসের স্বপ্ন,
শুধু একজন নেই এগিয়ে দেবার।

কয়েকটা লোভীর ঔদ্ধত্য
ভণ্ডর আস্ফালন সহ্য করছি
কোটি কয়েক মানুষ
কয়েকটা পশুর তাণ্ডব নৃত্যে জর্জরিত
বেঁচে আছি কোটি কোটি মানুষ।

শুধু অপেক্ষায় আছি তিনি বলবেন
এগিয়ে এসো।
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পিছু হটে যাওয়া মানুষগুলিকে
যিনি এগিয়ে দেবেন সামনে।

মৃত্যুঞ্জয় হে মহাপ্রাণ

শান্তশীল দাশ

দেশপ্রেমের বিগ্রহ তুমি মানবরূপে,
দুর্ধর্ষ তুমি, দুর্দম তুমি, অকুতোভয়,
মায়ের মুক্তি মন্ত্রটী লয়ে ছুটেছ সদা,
মৃত্যু এসেছে, পথ ছেড়ে দূরে গিয়েছে সরে।

অশ্রান্ত তুমি, অন্তরে নিয়ে বহ্নিজ্বালা
অস্ত্র হয়ে দেশ হতে দেশে ঘুরেছ কত ;
শৃঙ্খল-ডোর ভাঙতেই হবে—জননী কাঁদে,
সেই ক্রন্দন করেছে তোমারে শান্তিহারা।

সারাটি জীবন শুধু সংগ্রাম, ক্লান্তি নেই ;
অন্তর ভরে আছে জননীর মূর্তিখানি
চির প্রসন্না অন্নপূর্ণা—সে স্বপ্নের
রূপ দিতে হবে, জীবন অথবা মরণ পণ।

বিশ্বজনের বিস্ময় তুমি ; দেশের বুকে
স্বর্ণ আখরে তোমার ও নাম ; স্বতোৎসার।
তোমার মন্ত্র 'জয় হিন্দ' কোটি কণ্ঠে জাগে,
অমর নেতাজী, মৃত্যুঞ্জয় হে মহাপ্রাণ।

সুভাষচন্দ্র

চিত্তভানু

মৃত্যুর দক্ষিণ হস্তে জীবনের দীপ্ত অগ্নিটিকা
না করিলে দান বাঁচা হয় বঞ্চনাই, রিক্তশিখা
প্রদীপের লজ্জাস্তব্ধ একান্ত নিঃস্বতা দীপালনে।

তাই তুমি হে সুভাষ, মৃত্যুস্নাত নূতন জীবনে
স্বদেশেরে করিলে আহ্বান, জরণ-উর্মিল ঘোর
ভীষণের পথে ; অগ্নিপরিশুদ্ধ প্রাণ, দ্বিধাডোর,
জাগে যেন শঙ্কাহীন পৌরুষের প্রোজ্জ্বল মহিমা,
লুপ্ত করে আপনার ব্যর্থতার কলঙ্ক কালিমা।
প্রচণ্ড ইচ্ছার তব যুগান্তরের সঞ্চিত জড়তা
লজ্জা-পরাহত হয়, জেগে ওঠে পেশল যুবতা
দেহে মনে ইচ্ছার প্রয়াসে, জন্ম লয় মহাজাতি
যুগি স্থির জীর্ণ ইতিহাসে, দৃপ্ত পদক্ষেপ গাঁথি
মৃত্যুর তোরণ-শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত করে আপনারে।

বিশ্বের প্রভার অর্ঘ্যে অভিষেকে দেশমাতৃকারে।

রাজা

শান্তি লাহিড়ী

তোমাকে দেখিনি কোনদিন,

জনের আড়ালে রয়ে আছো,
আমাত্য উজীর পারিষদ
যে যার চাকের শব্দকরে
বলে গেল তুমি নেই তুমি নেই, নেই,

তুমি আছ—অথচ বলার ছিল এই।

যে যার প্রবৃত্তি মতো তোমাকে রঙীন ক'রে তোলে,
আমি সেই কবে থেকে নতজানু হয়ে বসে আছি,
তুলি ও রঙের বাটি ফেলে,
একদিন কলোৎসব থেমে গেলে যার কড়া-নাড়া,
জেনে নেব তৎক্ষণে
তুমি আছো
তোমাকে দেখিনি কোন দিন।

তেইশে জানুয়ারী স্মরণে

শংখানন্দ মুখোপাধ্যায়

তোমাকে নিয়েই কোন কাব্যভাষা অবলম্বন,
তোমার মধ্যেই সেই রহস্য অপার।
সবাই এসেছে ফিরে বার বার বাহ্যিত স্বরূপে
গৌতম, যুদ্ধের মূর্তি নিয়ে
নিমাই, চৈতন্য ঘরে কবে……
তুমি কি ইংগিতমাত্র রেখে গেলে
তুমি কি ইতিহাসের ভূমিকা লিখেই
বিদায় নিয়েছ যাত্রাপথে—
নাকি তাই ইতিহাস তোমার অমনভাবে যাওয়া
নাকি তাই ইতিহাস সমাস্তরালের চিন্তারাশি
তুমি থাকলে কী যে হত…
তোমার প্রতিভা আজ লাঞ্ছিত কোথায় …?
হয়ত এমন যাওয়া খুব ভাল খেলার মধ্যেই
হয়ত এমন যাওয়া খুব ভাল জীবন থাকতেই
কারণ তোমার কথা ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে যায়
যাকে বাঁচা বলি সে কি মৃত্যুরই সমান—

তুমিই দেখিয়েছিলে বিরাট জীবন।

ধারাবাহিক রচনা

সুভাষচন্দ্র

পবিত্রকুমার ঘোষ

কার নেতাজী ?

প্রেসিডেন্সী কলেজ

১৯১৬ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয় :

প্রেসিডেন্সি কলেজে জানুয়ারি মাসে যে ছাত্র-বিক্ষোভ হয়েছিল এবং তারপর সম্প্রতি অধ্যাপক ওটেনের ওপর যে আক্রমণ ঘটে গেছে বিশেষত সেই বিষয়ে ও প্রেসিডেন্সি কলেজে শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্যা সম্পর্কে সরকার যে তদন্ত কমিটি নিয়োগ করেছেন গতকাল (সোমবার) অপরাহ্ণ ২-৩০ মিঃ এ হাই কোর্টে স্যার আশুতোষ মুখার্জির চেম্বারে সেই কমিটির প্রথম অধিবেশন বসেছিল। স্যার আশুতোষ মুখার্জি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এবং অন্যান্য সকল সদস্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। (পাঠকের স্মরণের জন্য পুনরায় এই সদস্যদের নাম উল্লেখ করছি : স্যার আশুতোষ মুখার্জি, —সভাপতি ; ডব্লিউ. ডব্লিউ হর্ণেল ; অধ্যক্ষ এইচ, আর জেমস ; রেভারেণ্ড কে. মিচেল ; হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ; আর বি স্টীল ; —সদস্যগণ)। অধ্যক্ষ জেমস অধিবেশনে যোগ দেননি, কিন্তু অধ্যাপক পিক এসেছিলেন। পরে জানা গেল যে অধ্যক্ষ জেমস কমিটিতে থাকতে আর রাজি নন বলে তাঁর স্থলে অধ্যাপক পিককে নিয়োগ করা হয়েছে। আরও জানা গেল যে গতকাল অপরাহ্ণে তদন্তের বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটা প্রথাসাফিক আলোচনা ছাড়া আর কিছুই হয়নি। তদন্তের পরিধি খুব ব্যাপক বলে মনে হওয়ায় কমিটি স্থির করেছেন যে কিছুকালের জন্য কমিটির অধিবেশন প্রতিদিন বসবে, আশা করা যাচ্ছে যে, কলেজের কয়েকজন অধ্যাপক ও ছাত্রকে সাক্ষীরূপে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সম্ভবত কমিটির কাজ চলাকালে কমিটির সদস্যরা কলেজে যাবেন ও সেখানে অধ্যাপক ওটেনকে প্রহার করা হয়েছিল সেই স্থানটিও পরীক্ষা করে দেখবেন।

ঐ একই মর্মে দৈনিক 'ইংলিশম্যান' পত্রিকাও ২২ তারিখে একটি সংবাদ প্রকাশ করে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি সম্পাদিত The Bengalee সংবাদপত্রে উক্ত সংবাদের সঙ্গে আর একটি সংবাদও প্রকাশিত হয়। সংবাদটি এই যে, প্রেসিডেন্সি কলেজের গভর্নিং বডি অধ্যাপক ওটেনের প্রহার সম্পর্কিত ঘটনাটির বিষয়ে তদন্ত করেছেন ; তদন্তের পর তাঁরা ঐ প্রহারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুজন কলেজের ছাত্রকে বহিষ্কৃত করেছেন এবং তৃতীয় একজন ছাত্রকে সাম্প্রতিক ছাত্র বিক্ষোভের সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে শাস্তি দিয়েছেন। গভর্নিং বডির কমিটিটির এই রিপোর্ট সম্ভবত আজই সদস্যদের দ্বারা স্বাক্ষরিত হবে ও সরকারের নিকট পেশও হবে। সরকার আর একটি যে কমিটি নিয়োগ করেছেন, যাদের উদ্দেশ্য হল প্রেসিডেন্সি কলেজের সাধারণ নিরাপত্তা বিষয়ে তদন্ত করা,—সেই কমিটির সঙ্গে গভর্নিং

বডি কর্তৃক অবলম্বিত এই ব্যবস্থার কোনো যোগাযোগ নেই।

এই সংবাদের নিচে অধ্যক্ষ বেভারলের একখানি পত্রও প্রকাশিত হয়। পত্রের নং ৩৮৭, তারিখ ২১শে ফেব্রুয়ারি, পত্রের প্রাপক সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, ইডেন হিন্দু হোস্টেল। পত্রখানি উক্ত ছাত্রাবাসের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শিত হয়েছিল। অধ্যক্ষ পত্রে লিখছেন :

"কলেজের গভর্নিং বডি বাবু অনঙ্গ মোহন দাসকে কলেজ হতে বহিষ্কৃত করেছেন, পরিষ্কারভাবে তাঁকে ইডেন হিন্দু হোস্টেলের দ্বারপথে পুনঃপ্রবেশ করতে নিষেধ করা হচ্ছে। হোস্টেলের আবাসিগণকে নিষেধ করা হচ্ছে যে তাঁরা যেন তাঁর সঙ্গে কোনোপ্রকার যোগাযোগ স্থাপন না করেন, অথবা (সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের অনুমতিসহ) তাঁর বই, খাতাকাগজ, ও অন্যান্য সম্পত্তি তাঁকে দিয়ে দেবার জন্য একান্ত আবশ্যক ভিন্ন আর কোনোরকম কথাবার্তাও না বলেন; ঐ সব সম্পত্তি তিনি যাতে সরিয়ে নিতে পারেন সেজন্য যুক্তিযুক্ত সর্বপ্রকার উপায়ে তাঁকে সাহায্য করতে হবে। যদি তাঁর টাকার দরকার হয় তবে অধ্যক্ষ তাঁকে টাকা দেবেন। তাঁকে আজই সন্ধ্যায় তাঁর দেশে (সিলেট) ফিরে যেতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।—(স্বাঃ) এইচ, আর, জেমস।"

প্রেসিডেন্সি কলেজের যে গভর্নিং বডি অনঙ্গ-মোহন দাস ও সুভাষচন্দ্র বসুর কলেজ হতে বহিষ্কারের সুপারিশ করলেন তার সদস্য ছিলেন কে কে? 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় সেই সদস্যদের নামগুলিও প্রকাশিত হয়েছে :

১। ডাঃ ডি, পি, সর্বাধিকারি (কোনো সভায় তিনি আসেননি) ২। অধ্যক্ষ জেমস ৩। ডাঃ পি, সি, রায় ৪। অধ্যাপক টার্নার ৫। অধ্যাপক পিক ৬। অধ্যাপক স্টার্লিং। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে গভর্নিং বডিতে ছজন ভারতীয় সদস্য ও চারজন য়ুরোপীয় সদস্য ছিলেন। তাঁদের একজন ভারতীয় সদস্য সভায় আসেননি। অতএব সুভাষ বসু ও অনঙ্গ দাসকে বহিষ্কারের সুপারিশ ছিল অবধারিত; আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আপত্তি থাকলেও (ছিল কি না জানা নেই) তা কার্যকরী হতনা, ৪ : ১ ভোটে তিনি হেরে যেতেন। সুতরাং বলা যায় যে সুভাষ বসু ও অনঙ্গ দাসের বহিষ্কার ছিল য়ুরোপীয়দের দ্বারা অনুষ্ঠিত একটি প্রতিশোধাত্মক ব্যবস্থা; —স্বকীয় অধ্যাপক ওটেনের প্রহারে এদেশস্থ য়ুরোপীয় সমাজ যতখানি চকিত, ভীত, নিষ্ঠুর প্রতিশোধকামী হয়ে উঠেছিল তা আমরা আগেই আলোচনা করেছি;—গভর্নিং বডির য়ুরোপীয় সদস্যরা সেই প্রতিশোধবাসনা দ্বারাই চালিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়, ছাত্রদের কর্মের নিরপেক্ষ বিচার ও মূল্যায়ন ও প্রকৃত অপরাধী কে তা সাব্যস্ত করা সেদিন তাঁদের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

The Bengalee পত্রিকা উপরোক্ত সংবাদের পাশাপাশি আরও একটি সংবাদ পরিবেশন করেছেন,—প্রসঙ্গান্তর ঘটলেও সেই সংবাদটির উল্লেখ করছি এই কারণে যে তখনকার বাংলা দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া তথা বাঙালীর মানসিকতার পরিচয় তাতে পাওয়া যাবে। সংবাদটি এই :

"চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ স্টেনহো সোমবার একটি মামলার শুনানি সুরু করেছেন। ঐ মামলায় বঙ্গবাসী কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীনিশিকান্ত লাহিড়ী অল্প আইনানুসারে এই মর্মে অভিযুক্ত হয়েছেন যে, হ্যারিসন রোডে যে মেসের ঘরে তিনি থাকেন সেই ঘরে তার বিছানার নিচে দুই পকেট মদার গোলাবারুদ ধরা পড়ে; বে-আইনীভাবে ঐ বারুদ তিনি রাখিয়াছিলেন। সরকার পক্ষে রায় বাহাদুর টি, এন, সাধু এবং অভিযুক্তের পক্ষে মিঃ এস, সি, মিত্র ও বাবু সত্য শরণ চক্রবর্তী আদালতে হাজির হন। অভিযুক্ত ছাত্রটি যে ঘরে গ্রেপ্তার হন সেই ঘরের একটি নক্সা উপস্থিত করেন সরকারে নক্সা-অফিসার বাবু আশুতোষ চ্যাটার্জি।"

যে দেশে কলেজের প্রথম বর্ষের কিশোর ছাত্রের বিছানার নিচে বে-আইনী অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায়—এবং যে অস্ত্রশস্ত্র রাখার একমাত্র উদ্দেশ্য সরকারের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক অভিযানে তা ব্যবহার করা সেই দেশেরই প্রথম সারির প্রধান কলেজের ছাত্র সুভাষ বসু ও অনঙ্গ ধাম একজন ব্রিটিশ অধ্যাপককে প্রহারের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে বিনা শাস্তিতে ছাড়া পাবেন—অন্ততঃ তখনকার সরকার ও ব্রিটিশ বাসিন্দারা এতখা কল্পনাই করতে পারতেন না। কলেজ হতে বহিষ্কার ছাড়াও আরও কঠোর শাস্তির দাবীই সেদিন ইংরেজরা করেছিল, তাদের মুখপাত্র পত্রিকাগুলির সম্পাদকীয় নিবন্ধের মর্মার্থ অন্তত তাই। কিন্তু সেকথায় আমরা পরে আসছি।

প্রেসিডেন্সি কলেজের ২য় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীঅনঙ্গ মোহন ধাম কলেজ ও হিন্দু হোস্টেল হতে বহিষ্কৃত হলেন, কিন্তু এনিয়ে গুরুতর বিতর্ক বেধেছিল। অনঙ্গমোহন অধ্যাপক ওটেন সাহেবের ঘটনার সম্পর্কে নিজের কোনো-রকম দায়িত্ব বা যোগাযোগের কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারি তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকা তাই একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখেন :

"প্রেসিডেন্সী কলেজের গভর্নিং-বডির সমক্ষে অনঙ্গমোহন ধাম অধ্যাপক ওটেনের প্রহারের দিনে নিজের গতিবিধির একটি পূর্ণ বিবরণ দেন এবং তাঁর সেই বিবৃতির যাথার্থ্যের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারেন এমন গুরুমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা জানেন কি কেবল অনঙ্গ মোহনের এই বিবৃতি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কেন? তিনি কি এই বিবৃতির সত্যাসত্য যাচাই করেছেন? এই বিবৃতির সত্যতা সম্পর্কে যাঁরা সাক্ষ্য দিতে পারেন তিনি কি তাদের কাছে কোনোরকম অনুসন্ধান করেছেন? আমরা যতদূর জানি এসব কিছুই করেননি,—যদি আমাদের এই সংবাদ সত্য না হয় তবে আমাদের ভুল স্বীকার করতে আমরা রাজি থাকব। আমরা বিশ্বাস রাখি যে তদন্ত কমিটি এই ত্রুটির সংশোধন করবেন এবং অনঙ্গমোহন ধামের বিবৃতি তাঁরা চেয়ে পাঠাবেন ও বিবৃতিটি তাঁরা পরীক্ষা করে দেখবেন; এবং ঐ ছাত্রটি যে ভদ্রলোকদের কথা উল্লেখ করেছেন তাঁদেরও তাঁরা পরীক্ষা করবেন।"

শুধু তাই নয়, অনঙ্গমোহনকে প্রকৃতই কী শাস্তি দেওয়া হয়েছিল তা নিয়েও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। কেউ কেউ বলে যে অনঙ্গমোহনকে কলেজ ও ইডেন হিন্দু হোস্টেল হতে বহিষ্কৃত করা হয়। আবার অন্য কেউ কেউ বলেন যে তাঁকে রাস্টিকেট করা হয়েছে। ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় অনঙ্গমোহন নিজেই এ বিষয়ে প্রকৃত সত্য কী তা জানতে চেয়ে একটি পত্র লেখেন। তিনি লিখেছিলেন : "I don't myself know the real nature of the punishment inflicted upon me and I ask the newspapers not to trust any rumour unless emanating from the authorities.

এর পরেই অমৃত বাজার পত্রিকায় আর একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, ঐ একই তারিখে। সেই সংবাদ হতে জানা যায় যে কলেজ হতে সুভাষচন্দ্র বসুকে বহিষ্কার করা সম্পর্কে কোনো সংবাদই কারো মনে ছিল না। তাঁর সম্পর্কে কোনো অস্পষ্টতা সৃষ্টি হয়নি। সংবাদটি এই :

Presidency College Imbroglio

Babu Subhas Ch. Bose

We are authoritatively informed that Babu Subhas Ch. Bose, another student of the Presidency College has been expelled from the Presidency College. He has received the following notice :—Resolved that Subhas Chandra Bose be expelled from the College for taking leading part in the assault on Prof. Oaten.

এই দুটি সংবাদকে কেন্দ্র করে অমৃত বাজার পত্রিকা ঐ

(শেষাংশ ৭৮০ পৃষ্ঠায়)

'তোমাকে সংবর্ধনা করি'

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[লেখকের প্রকাশিতব্য গ্রন্থ 'রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র' থেকে এখানে 'তোমাকে সংবর্ধনা করি', 'একজন আধুনিক মতবাদী সভাপতি চাই' এবং 'হরিপুরা-ভাষণ : মূল্যবান দলিল'—এই তিনটি অধ্যায় মুদ্রিত হল। শেষের অধ্যায় দুটি পরস্পর সংলগ্ন।—ভঃ সঃ]

প্রদানন্দ পার্কের বিশাল জনসভায় রবীন্দ্রনাথের বাণী পঠিত হল।

"সমস্ত দেশের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমি তোমাকে সংবর্ধনা করি।"

দীর্ঘ চার বৎসর পরে মুক্তি পেয়েছেন সুভাষচন্দ্র। তাঁরই অভিনন্দন সভা। সভাপতি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। বাংলাদেশ তার প্রিয়তম সন্তানকে আবার ফিরে পেয়েছে। সেই ভাবোদ্বেল আনন্দের মধ্যে কবির বাণী এসে সস্নেহে শিরশ্চুম্বন করে গেল সুভাষচন্দ্রের।

সুভাষচন্দ্র রম্যা রঁলার ভিতরে দেখেছিলেন শিল্পীর মধ্যে বিপ্লবীকে; হয়ত আরও পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ হয়েছিল তাঁর মন। রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ পূর্ণ ক'রে দিল চিত্ত।

রবীন্দ্রনাথ-সুভাষচন্দ্রের সম্পর্কের দ্বিতীয় অধ্যায় সুরু হল এইবার। এই অধ্যায়ের ব্যাপ্তিকাল বেশী নয়—মাত্র কয়েক বৎসর—১৯৪১ সালের জানুয়ারীতে সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান পর্যন্ত। কবির দেহও বেশীদিন আর থাকে নি। কিন্তু এই কয়েক বৎসরে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে সুভাষচন্দ্র যা পেয়েছেন—সীমা নেই তার। মহাকবি তাঁর ডায়ার একটি পালক তরুণ রাজকুমারের মুকুটে লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

সুভাষচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ কাছে টেনে নিলেন কেন, যখন বয়োধর্মে দূরে সরিয়ে দেওয়া স্বাভাবিক ছিল? অশীতিপর বৃদ্ধ কবি—সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্য দিয়ে রাত্রির তারকার আহ্বান তাঁর কাছে ছুটে আসছে—তখন তিনি সন্ধ্যা-বন্দনা ত্যাগ করে কেন পিছন ফিরে উগ্র উজ্জ্বল অগ্নিযজ্ঞের দিকে তৃষিত দৃষ্টিপাত করলেন? কারণ—রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি বিস্ময়কর অথচ সর্বজ্ঞাত বার্তা হল—বয়সের সঙ্গে তিনি নূতন, নূতনতর হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ সত্যই তাঁর বার্ধক্যে তাঁর যৌবনের দিনগুলিকে আবাহন করেছিলেন। কাব্যজীবনে, ভাবজীবনে এই প্রত্যাবর্তনকে দেখিয়েছেন রবীন্দ্রকাব্যের সমালোচক. রাজনীতির ক্ষেত্রে তাই ঘটেছিল। কিভাবে ঘটেছিল—রাজনীতির ক্ষেত্রে সেই প্রত্যাবর্তনের রূপ কি - সুভাষচন্দ্রের প্রতি পক্ষপাত কেমন করে তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল, যথাস্থানে তার আলোচনা করব। এখানে আরও কিছু সময়ের জন্যে ঘটনার ধারাকে অনুসরণ করাই উচিত।

ভগ্ন দেহ এবং ভগ্নমন নিয়ে—সুভাষচন্দ্র ইউরোপে গিয়েছিলেন। ইউরোপে যথার্থই তাঁর স্বাস্থ্যোদ্ধার হয়েছিল—দেহের ও মনের। বরং দেহ তখনও দুর্বল, মন কিন্তু উদ্দীপনায় ও সম্ভাবনায় বিস্ফোরণের মুখে। নূতন ভাব, নূতন প্রণালী, নূতন প্রয়াস, নূতন নেতৃত্বের প্রতিজ্ঞা.—যদি পুরোনো গাড়ি চলতে না চায়। এই সময়ে ও পরবর্তীকালে তাঁর মানসিক অবস্থার একটা ছক কাটবার চেষ্টা করা যায়:

(১) নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন অনেক দিনই চলল। শুধু বিনয় আন্দোলনও ব্যর্থ হয়েছে;

(২) গান্ধীজী জাতীয় জাগরণ এনেছেন ব্যাপক ভিত্তিতে ১৯২০ সাল থেকে;

(৩) কিন্তু পরবর্তীকালে সাধারণের স্বাধীনতাস্পৃহাকে দ্রুত সংগ্রামের পথে চালিত করতে তিনি অনিচ্ছুক বা অপারগ; অহিংসা তাঁর কাছে স্বাধীনতার চেয়ে কম মূল্যবান নয়;

(৪) কিন্তু স্বাধীনতা চাই, যত দ্রুত সম্ভব—সুতরাং প্রয়োজন বিকল্প নেতৃত্ব;

(৫) অথচ ভারতের গণমানসে গান্ধীজীর অমোঘ আসন, ব্যাপক সংগ্রাম গান্ধীজী ছাড়া সম্ভব নয়; গান্ধীজী দীর্ঘদিন ধরে যে নেতৃত্ব গড়ে তুলতে পেরেছেন, সে সময় আমার নেই হাতে;

সুতরাং পথ—

(ক) গান্ধীজীকে তাগিদ দিয়ে সত্বর সংগ্রামে প্রণোদিত করা; (হরিপুরায় সুভাষচন্দ্রের মনোভাব);

(খ) গান্ধীজীকে চাপ দেবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের ভিতরে বামপন্থী শক্তিসমূহকে সংগঠিত করা; (ত্রিপুরীতে সুভাষচন্দ্রের মনোভাব);

(গ) তাও সম্ভব না হলে উপায়ান্তরহীন হয়ে সংগ্রামীর পুরাতন পথ গ্রহণ: শত্রুর শত্রুরূপ নিজের সাহায্য গ্রহণ (ত্রিপুরী-উত্তর কালে সুভাষচন্দ্রের মনোভাব)।

যে কোনো ক্ষেত্রেই হক, বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ ছাড়া চলবে না (সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা যুদ্ধকে আসন্ন রূপে অনুভব করেছিল) কারণ, যুদ্ধ "পরাধীন দেশের পক্ষে অবিমিশ্র অমঙ্গল নয়" (রোঁলাঁর সঙ্গে কথোপকথন)।

সেইজন্য তিনি জহরলালের দিকে ঝুঁকে পড়লেন তাঁর সমর্থন যদি পাওয়া যায়। জহরলাল পূর্বে ছিলেন 'ইন্টিগেনডেন্সওয়ালা'; লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণের পরে সে ভূমিকা স্বভাবতঃ বন্ধ হওয়ায় সোসিয়ালিজমের প্রচারক। সুভাষচন্দ্র জানতেন, জহরলাল গান্ধীবাদী নন কিন্তু গান্ধীপ্রেমিক। ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসের সভাপতির আসনে বসিয়ে গান্ধীজী কিভাবে জহরলালকে নিজের আসনের কাছে টেনে নিয়েছেন তা তাঁর জানা ছিল। কিন্তু তবু জহরলালের মধ্যে মুক্ত চিন্তার শক্তি আছে, আধুনিক জীবনদৃষ্টি ও বৈজ্ঞানিক প্রগতিবাদের প্রতি আসক্তি আছে, তাঁকে যদি পুনরায় জয় করে বামপন্থী শিবিরে ফিরিয়ে আনা যায়, তাহলে সুভাষচন্দ্রের অভিপ্রেত জাতীয় সংগ্রামে বেগসঞ্চার হয় এখনি। সুভাষচন্দ্র চাইলেন—মুখে নয় কাজে বামপন্থীদের নেতা হোন জহরলাল।

ত্রিপুরীর তিক্ত অধ্যায়ের পরে সুভাষচন্দ্র জহরলালকে একটি লাভা-গড়ানো চিঠি লিখেছিলেন। তার সুরুতে আছে—"১৯৩৭ সালে অন্তরীণ থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকে আমি তোমার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে এবং গণজীবনে পরম শ্রদ্ধা ও বিবেচনার সঙ্গেই ব্যবহার করেছি। রাজনীতি: দিক থেকে আমি তোমাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং নেতার মতই দেখেছি, এবং প্রায়ই তোমার পরামর্শও চেয়েছি। গতবছর তুমি যখন ইউরোপ থেকে এলে, তুমি আমাদের কিভাবে নেতৃত্ব দেবে সেই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে আমি এলাহাবাদ যাই।" (২৬ মার্চ ১৯৩৯)।

সুভাষচন্দ্র জহরলালের ব্যক্তিচরিত্রে সহসা মুগ্ধ হয়ে এমন করেছিলেন মনে করবার কারণ নেই—তাঁর একটি বাস্তব আবেদনের ব্যাপার ছিল—ভারতের স্বাধীনতা—তার জন্য তিনি ভেবেছিলেন, জহরলালের প্রগতিশীল নেতৃত্বের প্রয়োজন আছে, তদনুযায়ী তাঁর ঐ 'কনিষ্ঠ ভ্রাতার' ব্যবহার।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সমর্থন পাবার জন্য কনিষ্ঠ ভ্রাতার একান্ত বিনীত প্রয়াসের কিছু নমুনা দেওয়া যায়। ১৯৩৬ সালের মার্চ মাস, জহরলাল লখনৌ কংগ্রেসের সভাপতি। সুভাষচন্দ্র ইউরোপে, ভারতের দ্বার তাঁর কাছে রুদ্ধ; অথচ ইউরোপে থাকতে অনুভব করেছেন—সংকট আসছে। নষ্ট করবার সময় নেই। এখনি বামপন্থী নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে। তার সুন্দর সুযোগ উপস্থিত—জহরলাল কংগ্রেস সভাপতি—দক্ষিণ ও বামকে মেলাবার যোগ্য ব্যক্তি—গান্ধীবাদীদের দ্বারা সম্পূর্ণ অধিকৃত হবার আগে জহরলালের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো দরকার,—সুভাষচন্দ্র স্থির করলেন নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ভারত যাত্রা করবেন, তার পূর্বে চিঠি লিখছেন জহরলালকে—

সুরহস্ হকদাও
বাডগাস্টীন অস্ট্রিয়া
১৩ মার্চ, ১৯৩৬

প্রিয় জওহর,

ভিয়েনার বৃটিশ কনসালের কাছ থেকে এইমাত্র আমি জরুরী এক চিঠি পেয়েছি। চিঠিখানা এই—

"আপনার নিকট এই মর্মে এক সাবধান-বাণী প্রেরণের জন্য পররাষ্ট্র সচিবের নিকট হইতে আজ আমি নির্দেশ পাইয়াছি যে, আপনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিতে ইচ্ছুক বলিয়া সংবাদপত্রে যে বিবৃতি বাহির হইয়াছে, ভারত সরকার তাহা দেখিয়াছেন, এবং ভারত সরকার স্পষ্টভাবে আপনাকে জানাইয়া দিতে চাহেন যে, আপনি যদি তাহা করেন, তাহা হইলে মুক্ত থাকিবার আশা আপনি করিতে পারেন না।

(স্বাঃ) ভব্লু টেলর
হিজ ব্যাজেস্টিস্ কনসাল।

যাত্রার ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ করতে চলেছি, এমন সময়ে এই চিঠি পেলাম। বস্তুত, সমুদ্রপথে গেলে আমার বেশী সুবিধা, না বিমানপথে, এই নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছিলাম বলেই তখনও আমি টিকিট বুক করিনি। বিমান পথে গেলে এখানে আমার পুরো কোর্সের চিকিৎসা সম্পূর্ণ হতে পারত। চিকিৎসার মোট ২৪ দিন লাগে।

এ ব্যাপারে পরামর্শ করতে পারি, এমন কেউ এখানে নেই। কন্টিনেন্টেও এমন কেউ আছেন বলে আমার মনে হয় না। তোমারও নিজের প্রতিক্রিয়া থেকেই তুমি অনুমান করতে পারবে যে, এই সতর্কবাণীকে উপেক্ষা করে দেশে যেতেই এই মুহূর্তে আমি ইচ্ছুক। শুধু একটা বিষয় বিবেচনা করে দেখা দরকার: জনস্বার্থ কিসে অক্ষুণ্ণ থাকবে। ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছাকে আমি আদৌ আমল দিই না; এবং জনস্বার্থের খাতিরে যে-কোনো পথ অবলম্বনেই আমি প্রস্তুত। জনসেবার ক্ষেত্র থেকে এত দীর্ঘকাল ধরে আমি দূরে রয়েছি যে, কী ব্যবস্থা অবলম্বন করলে জনসাধারণের অধিকতর মঙ্গল হবে, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া আমার পক্ষে শক্ত। এই ধরনের সংকটের মুহূর্তে আর একজনকে উপদেশ দেওয়া যে তোমার পক্ষেও শক্ত তা আমরা জানি। তবে ব্যক্তির কথা তুমি বিস্মৃত হতে পার—জনস্বার্থ সংক্রান্ত প্রশ্ন দেখা দিলে তা যে তুমি পার তা আমি জানি। এবং শুধু জনস্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে দেশকর্মীকে তুমি উপদেশ দিতে পার। আমাদের দেশের জনসেবার ক্ষেত্রে যে অসামান্য প্রতিষ্ঠা তোমার রয়েছে, তাতে এই রকমের অদ্ভুত ও অস্বস্তিকর অবস্থায় কাউকে উপদেশ দেবার প্রয়োজন দেখা দিলে তোমার দায়িত্বকে তুমি এড়িয়ে যেতে পার না।

এরকম একটা ব্যাপারে তোমাকে বিরক্ত করার সপক্ষে আমার একমাত্র যুক্তি এই যে, এমন আর কারও কথা আমি ভাবতে পারি না, যার উপর আমি অধিকতর আস্থা রাখতে পারি। সময় এতই অল্প যে, একপাতা লোকের কাছেও উপদেশ চাইতে পারছিনা। আমার নিজের আত্মীয় স্বজনদের কাছে উপদেশ চেয়ে লাভ নেই। তার কারণ ব্যাপারটাকে জনস্বার্থের দিক থেকে বিচার করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। সুতরাং একটিমাত্র পথ আমার কাছে খোলা রয়েছে, সে হল তোমার উপদেশের উপর নির্ভর করা। ২০ তারিখ নাগাদ এই চিঠি তোমার হাতে পৌঁছবার কথা। তার অব্যবহিত পরেই তুমি যদি আমাকে একটা তার পাঠাও, তাহলে সময়মতই তা আমার হাতে এসে পৌঁছবে। কে. এল. এম. বিমান ২রা এপ্রিল তারিখে রোম থেকে রওনা হবে। সে বিমান আমি ধরতে পারি। সুতরাং শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষে রওনা হব বলে ২১ তারিখ এমন কি ২২ তারিখেও যদি আমি সিদ্ধান্ত করি, তাহলে ২রা এপ্রিল তারিখে যে-বিমান রোম ছাড়ছে, তাতে একটা আসন পাব বলেই আমার বিশ্বাস। এমনও সম্ভব যে, ২৯ মার্চ তারিখে যে-বিমান রওনা হচ্ছে, তাতেও একটি আসন পেয়ে যেতে পারি।

লখনৌ কংগ্রেসে যোগদানের জন্য সমরমত দেশে যাব বলে যখন সঙ্কল্প করেছিলাম তখন অবশ্য এমন সম্ভাবনা ছিল যে, দেশের মাটিতে অবতরণ করা মাত্র আমাকে কারারুদ্ধ করা হবে। কিন্তু অন্তত কিছুকালের জন্য আমাকে মুক্ত থাকতে দেওয়া হবে, এমন সম্ভাবনাও তখন ছিল। শেষোক্ত সম্ভাবনাটি এখন সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হল এবং এখন দেশে যাওয়ার একমাত্র অর্থ হল কারাগারে যাওয়া। অবশ্য জনস্বার্থের দিক থেকে কারাগারে যাওয়ারও একটা উপযোগিতা আছে, এবং এই ধরনের একটা সরকারী আদেশ অমান্য করে জেনেশুনে কারাবরণ করার সপক্ষেও অনেক কিছুই বলা যেতে পারে।

যথাসম্ভব বিনয়ের একটা উত্তর দিও। এই ঠিকানায় তার পাঠাতে পার: বোস, কুরুলস হকল্যাণ্ড, বাডগাস্টাইন, অস্ট্রিয়া।

তোমাকে সংবাদ দিচ্ছি

আশাকরি তোমার ভ্রমণ পথ আরামদায়ক হয়েছে এবং তোমার স্বাস্থ্যও ভালো আছে।

স্নেহানুরক্ত

সুভাষ

সবে গতকাল সংবাদপত্রে একটি বিবৃতিতে আমি এই ইঙ্গিত দিয়েছিলাম যে, এখানকার চিকিৎসা সম্পূর্ণ হবার পর আমি বিমানযোগে রওনা হতে পারি।

এই চিঠি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় সুভাষচন্দ্র সত্যই জহরলালকে এই কালে রাজনীতির দিক থেকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতই দেখেছিলেন। ১৯ উদ্ধৃত পত্রের মাত্র ৯ দিন আগে লেখা একটি পত্রে জহরলালের প্রতি সুভাষচন্দ্রের 'সুবিবেচনাপূর্ণ' ব্যবহারের কারণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

কুরহস হকস্যাও

বাডগাস্টিন (অস্ট্রিয়া)

৪ মার্চ, ১৯৩৬

প্রিয় জওহর,

দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর পথের শেষে গতকাল সকালে এখানে এসে পৌঁছেছি। জায়গাটা সুন্দর, এবং শান্ত। বর্ষের আবর্তে আবার ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে তুমি যদি ইউরোপে কিছুদিন বিশ্রাম নিতে পারতে, আমি খুশী হতাম।

তোমাকে যে সকল কথা বলেছি, সেই মত একটা বিবৃতি দেব কিনা, তোমার কাছ থেকে আসার পর থেকে সেই কথাই ভাবছি। দেওয়াই উচিত বলে আমার মনে হয়, তার কারণ আবার কারারুদ্ধ হবার সম্ভাবনা রয়েছে; এবং এমন কিছু লোক হয়তো আছে যারা আমার পরামর্শ কামনা করে। আমার বিবৃতি যথাসম্ভব ছোট হবে এবং তাতে স্পষ্টভাবে এই কথাই আমি বলব যে, তোমাকে আমার পূর্ণ সমর্থন দানের সিদ্ধান্তই আমি করেছি।

বর্তমানে যাঁরা অগ্রগণ্য নেতা, তাঁদের মধ্যে একমাত্র তোমার কাছেই আমরা এই আশা করতে পারি যে, কংগ্রেসকে প্রগতির পথে পরিচালনা করা হবে। তাছাড়া তোমার প্রতিষ্ঠাও অসাধারণ এবং আমার মনে হয় যে, মহাত্মা গান্ধীও তোমার কথাকে যতখানি মেনে নেবেন, অন্য আর কারও কথাকে ততখানি মেনে নেবেন না। আমি খুবই আশা করছি যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে জনচিত্তে তোমার প্রতিষ্ঠাকে তুমি পুরোপুরি কাজে লাগাবে। যেটুকু শক্তি সত্যই তোমার রয়েছে, তার চাইতে কম শক্তিশালী বলে তুমি নিজেকে মনে করনা। তুমি যাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পার, এমন মনোভাব গান্ধীজী কখনও অবলম্বন করবেন না।

● পত্রগুচ্ছ : ১৪৪-৪৫

৪৪৮, সৌধ ১৭৫

আমাদের সর্বশেষ আলোচনায় তোমাকে জানিয়েছি তোমার আশু কর্তব্য হবে দু'টি : (১) শহর প্রচারে সর্বতোভাবে বাধা প্রদান করতে হবে, ও (২) ওয়ার্কিং কমিটির সংগঠনকে প্রশস্ত ও উদার করে তুলতে হবে। তা যদি তুমি করে তুলতে পার তো নৈতিক অবনতির হাত থেকে কংগ্রেসকে তুমি বাঁচাবে, দুর্গতি থেকে তাকে উদ্ধার করবে। বড় বড় সমস্যাগুলিকে ভবিষ্যতের জন্য মুলতুবি রাখা যেতে পারে ; নৈতিক অবনতির হাত থেকে কংগ্রেসকে রক্ষা করা আমাদের আশু কর্তব্য।

শুনে আমি অত্যন্ত সুখী হয়েছি যে, কংগ্রেসে তুমি একটি বৈদেশিক বিভাগ খুলতে চাও। তোমার অভিমতের সঙ্গে এই কাজের সম্পূর্ণ মিল রয়েছে।

যাত্রার জন্য তুমি নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত আছ, যাত্রার আগে নিশ্চয়ই টুকিটাকি নানান কাজও তোমার রয়েছে। তাই এই চিঠিকে আর দীর্ঘ করতে চাই না। কামনা করি, নির্বিঘ্নে যেন তুমি স্বদেশে ফিরতে পার, এবং যে দুশ্চিন্তার কর্মভার তোমাকে তুলে নিতে হবে তাতে ভাগ্য যেন তোমার সহায় হয়। আমাকে যদি লখনৌ-এ যেতে দেওয়া হয়, তাহলে তোমাকে সাহায্য করবার জন্য আমি প্রস্তুত থাকব।

স্নেহানুষক্ত

সুভাষ

এখানে আমাদের কয়েকটি কথা স্মরণ রাখতে হবে। প্রথমত এই চিঠি লেখার মাত্র সওয়া এক বছর আগে 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' প্রকাশিত হয়েছে ; জহরলাল সে গ্রন্থ পড়েছেন,[১] এবং সেই গ্রন্থে জহরলালের বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, জনপ্রিয়তা ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রচুর প্রশস্তির পরেও তাঁর রাজনীতি সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য করা আছে। জনপ্রিয়তার সঙ্গে জহরলালের জনপ্রিয়তার লোভ, বুদ্ধির সঙ্গে স্থিরবুদ্ধির অভাব, সাহসের সঙ্গে ধীরতার সঙ্গে সংযোগ, সাধারণ প্রশ্নের সঙ্গে ব্যক্তির প্রশ্ন জড়িয়ে ফেলার অভ্যাস ইত্যাদি বিষয়ে জহরলালের দুর্বলতাকে সুভাষচন্দ্র আঘাত করেছেন। এ সমালোচনা কেবল সুভাষচন্দ্রেরই ছিলনা—যুক্তিবাদী ও বিপ্লবীরা একই মনোভাব পোষণ করতেন।[২] তা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র যে লখনৌ কংগ্রেসে জহরলালকে সাহায্য করবার জন্য প্রতিশ্রুত এবং তাঁর প্রতি 'পূর্ণ সমর্থন'-সূচক বিবৃতি প্রকাশ করেছেন এই কালে, তার কারণ—(১) নেতৃবৃন্দের মধ্যে জহরলালই একমাত্র প্রগতিশীল, (২) সাধারণ লোকের মধ্যে জহরলালের প্রতিষ্ঠা অসাধারণ, (৩) সেই কারণে গান্ধীজী তাঁকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে পারবেন না। এক কথায়, বামপন্থী আন্দোলনের সংগঠনের জন্যই জহরলালকে সম্পূর্ণভাবে বামপন্থী দলের শিবিরে বসাবার চেষ্টা।

সুভাষচন্দ্র ব্যর্থ হয়েছিলেন শোচনীয়ভাবে। নেতৃত্বের আসন দিয়ে জহরলালকে তিনি জয় করতে পারেননি—কারণ সুভাষচন্দ্র গান্ধীজী নন। মানবিক জহরলালের ব্যক্তি-চরিত্রে মানব সম্পর্কের প্রতি স্বাভাবিক সৌজন্য আছে,—ব্যথিত ও বিচলিত হয়ে, রাজনৈতিক আদর্শকে মননীয় করেও, তিনি সেই ব্যক্তি সম্পর্কের মাধুর্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন বহুবার। সুভাষচন্দ্র এ ব্যাপারে নীরস স্বভাব। তাই আলোচ্য পর্যায়ে জহরলালের রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য—

১—পত্রগুচ্ছ—পত্র সংখ্যা—১০৮। ২—পত্রগুচ্ছের, ৩০, ৬৪, ৬৬, ৬৯, ৮৫, ৯০, ১০১, ১০৪ পত্র পঠিতব্য

"১৯৩৫ সালের শরৎকালে পণ্ডিত নেহেরু সহসা মুক্তি পেলেন ; ইউরোপে তাঁর পত্নী মৃত্যুশয্যায়—তাঁর পাশে যাতে উপস্থিত হতে পারেন তার জন্যই এই মুক্তি।.....১৯৩৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত তাঁর য়ুরোপবাস কালে তিনি লণ্ডন ও প্যারিসে সংযোগ স্থাপন করেন, যে-সংযোগ তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মনীতিকে প্রভাবিত করবে। তিনি কিন্তু বৃটিশ-বিরোধী রূপে পরিগণিত রাশিয়া বা আয়ারল্যাণ্ডে গেলেন না, যদিও তিনি তাঁর পূর্ববর্তী ভ্রমণে সেখানে গিয়েছিলেন। ইটালি বা জার্মানীর মত দেশের সঙ্গে সংযোগ তিনি সযত্নে পরিহার করলেন, তার কারণ হল ফ্যাসিজম বা নাজীজম্ সম্বন্ধে তাঁর বিরাগ, কিংবা তিনি ইংলণ্ডের ও ফ্রান্সের বন্ধুদের চটাতে চাননি। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তিনি তাঁর আত্মজীবনী প্রকাশ করলেন, যা তাঁকে বৃটিশ জনসাধারণের উদারনৈতিক অংশের মধ্যে প্রচুরভাবে জনপ্রিয় করে তুলল।

"১৯৩৬ সালে নেহেরু ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন এবং লখনৌ-এ এপ্রিল মাসে তার সাধারণ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করলেন। বৎসরের শেষে তিনি সভাপতির পদে পুনর্নির্বাচিত হলেন এবং বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত ফৈজপুরের পরবর্তী সাধারণ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করলেন। সভাপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রেই নেহেরু কংগ্রেসের গান্ধীবাদীদের পূর্ণ সমর্থন পেলেন। সভাপতিরূপে তিনি গান্ধীদল এবং কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির মাঝামাঝি একটা অবস্থায় রইলেন—দুদলের কারোরই অসন্তোষ সৃষ্টি করলেন না—তবে দ্বিতীয় দলকে কিছু পরিমাণ নৈতিক সমর্থন জানালেন।"

পণ্ডিত নেহেরুর সভাপতিকাল উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল, তিনি কংগ্রেস কর্মকর্তাদের মধ্যে কয়েকজন সোস্যালিষ্টকে প্রবেশ করাতে সমর্থ হয়েছিলেন কিন্তু নৈতিক আপত্তি সত্ত্বেও ১৯৩৭ সালে কংগ্রেসের প্রাদেশিক মন্ত্রীত্ব গ্রহণ নিবারণ করতে পারলেন না।—

"সেই সময়ে মন্ত্রীত্ব-বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠছিল ক্রমে, কিন্তু কংগ্রেসের পার্লামেনটেরিয়ান (বা গান্ধীবাদী) নেতৃবৃন্দ এমন সর্বাত্মক নিপুণতার সঙ্গে ঘটনাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করলেন যে, ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে তাঁরা মন্ত্রীত্ব বিরোধী আন্দোলনকে সাফল্যের সঙ্গে টর্পেডো মেরে ডুবিয়ে দিলেন, এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সমর্থন পেয়ে গেলেন বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পক্ষে।"

সুতরাং পণ্ডিত নেহেরু সুভাষচন্দ্রের অভিপ্রেত নেতৃত্ব দিতে পারলেন না। ১৯৪১-৪২ সালে লিখিত রচনায় সুভাষচন্দ্র পণ্ডিত নেহেরুর ঐকালের ভূমিকা সম্বন্ধে লিখছেন—

"কিন্তু পণ্ডিত নেহেরু আরও বেশী কিছু করতে পারতেন। ১৯৩৬-৩৭—এই দুই বৎসরে তাঁর জনপ্রিয়তার তরঙ্গ উর্ধ্বসীমা স্পর্শ করেছিল ; এবং একদিক দিয়ে তাঁর অবস্থা তখন মহাত্মা গান্ধীর চেয়েও সুদৃঢ়, কারণ তাঁর পক্ষে তখন পরিপূর্ণ বামপন্থী সমর্থন—যা গান্ধীর পক্ষে ছিল না। কিন্তু সংগঠনের ব্যাপারে মহাত্মার অবস্থা বিশেষ সুদৃঢ়, কারণ তিনি কংগ্রেসের মধ্যে নিজের দল, গান্ধীবাদী দল, গড়ে তুলতে পেরেছেন, যে-গান্ধীবাদী দলের সাহায্যে তিনি কংগ্রেসে আধিপত্য করতেন। অপরপক্ষে প্রভূত জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও নেহেরুর নিজের দল ছিল না। ইতিহাসে যদি স্থান পেতে হয় তাহলে তাঁর সামনে খোলা ছিল দুটি পথ,—হয় গান্ধীবাদের নীতি স্বীকার করে

কংগ্রেসের গান্ধী দলে যোগ দিতে হয়, নচেৎ গান্ধীদলের বিরুদ্ধে নিজের দল গড়ে তুলতে হয়। প্রথম কাজটি তিনি করতে পারেন না, কারণ গান্ধীজীর প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্য সত্ত্বেও তিনি গান্ধী-নীতি সর্বাংশে মানেন না, অপর পক্ষে তিনি নিজের দল গঠন করলেন না, কারণ তাতে গান্ধীদল অসন্তুষ্ট হোত, এবং মহাত্মার বিরুদ্ধে কিছু করবার সাহস পণ্ডিত নেহেরুর জীবনে কখনো ছিল না। সুতরাং নেহেরু অবিরত নড়ে চড়ে বেড়াতে লাগলেন, চেষ্টা করতে লাগলেন যাতে দক্ষিণ ও বাম দু' পক্ষই সন্তুষ্ট হয়, তিনি গান্ধীদল বা চরমপন্থীদল কোন দলেই যোগ দিলেন না.—ফলে কংগ্রেসের নিঃসঙ্গ ব্যক্তি হয়ে রইলেন। এখন—১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে এই তাঁর অবস্থা। ১৯৩১ সালের পর থেকে তিনি অবশ্য গান্ধীর দিকেই বেশী ঝুঁকেছেন, যার ফলে ১৯৩৯ সালে তিনি কার্যত গান্ধীদলের সদস্য হয়ে পড়েন এইজন্য তিনি মহাত্মার দ্বারা পুরস্কৃত হন; মহাত্মা ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসে নেহেরুকে নিজের উত্তরাধিকারীরূপে ঘোষণা করেন।[১]

জহরলাল-সুভাষচন্দ্রের সম্পর্ক সম্বন্ধে আরো কিছু কথা আমাদের ক্রমে বলতে হবে। বর্তমানে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, ১৯৩৬-৩৭ সালে এবং ১৯৩৮ সালেও সুভাষচন্দ্র জহরলালের প্রতি প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ভ্রাতৃত্ব এবং আনুগত্য দেখিয়ে গেছেন যদিও ক্রমেই দেখেছেন – জহরলাল আর যাই পারুন,—যথাযথভাবেই সবচেয়ে ভাল পারেন—বামপন্থীদের যথাযোগ্য নেতৃত্ব দিতে পারবেন না। সুভাষচন্দ্র বেদনার সঙ্গে উপলব্ধি করলেন, জহরলাল তাঁর অসাবধান প্রতিভায় বামপন্থীদের পালে হাওয়া ভরে দেবেন, হাওয়া কেড়ে নেবার জন্যই।

জহরলালের আচরণ সম্বন্ধে বামপন্থীদের মনোভাবের কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে নেহেরু-অনুগত রফি আহম্মদ কিদোয়াই-এর এক পত্রে। বামপন্থীদের প্রেরণামূর্তি পণ্ডিত জহরলাল কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছেন কিন্তু তার ফলে ওয়ার্কিং কমিটি থেকে নাম কাটা গিয়েছে বামপন্থীদের। একই জিনিস ঘটেছিল ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে। গান্ধীজী জহরলালকে দল থেকে টেনে, দলকাটা-সেনাপতি করে কংগ্রেসের সভাপতি বানিয়ে দিয়েছিলেন—সেবার কোনো বামপন্থী ওয়ার্কিং কমিটিতে প্রবেশ করতে পারেনি। এর বিপরীত ছবি ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরীতে– ওয়ার্কিং কমিটির চরিত্র নিয়ে গান্ধীজী ও গান্ধীপন্থীদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র সংঘর্ষ—যার পরিণতি সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগে।

কিদোয়াই-এর চিঠি

২০ এপ্রিল, ১৯৩৬

প্রিয় জওহরলালজী,

বিগত কয়েক দিন আমি মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছি। আপনিই ছিলেন আমাদের একমাত্র ভরসা, কিন্তু সে ভরসা কি অলীক বলে প্রতিপন্ন হতে চলল? অবশ্য গান্ধীবাদের সম্বন্ধে বিরুদ্ধতা ও প্রভাবকে আপনি কতখানি ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন, কিছু কিছু লোকের মনে সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল। নতুন করে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের সুযোগ আপনি পেয়েছিলেন। টাণ্ডন, নরীম্যান, পট্টভী ও শার্দুল সিংকে আপনি বাদ দিয়েছেন। গোবিন্দদাস ও শরৎবাবুকে না নিয়ে আপনি ভুলাভাই ও রাজগোপালাচারীকে নিয়েছেন। অথচ

১. Indian Struggle Part 2 page 17-18

তাঁদের নিজে আপনার শক্তিবৃদ্ধি হত। বাদালদের কাছ থেকে আপনাকে দূরে রাখবার জন্যই এঁরা চেষ্টা করেছেন। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি ও প্রতিনিধি প্রেরণ, উভয় ব্যাপারেই আমরা দুর্বল হয়ে পড়েছি। যে-ওয়ার্কিং কমিটি আপনি গঠন করেছেন, আগের ওয়ার্কিং কমিটির চাইতে তা আরও বেশী প্রতিক্রিয়াশীল হতে বাধ্য।

হতে পারে আমারই দৃষ্টি সংকীর্ণ। মতবাদ নিয়ে আলাপ আলোচনার চাইতে সংখ্যার উপরে আমি বেশী আস্থা রাখি। তবে অবস্থা দেখে আমার মনে যে-প্রতিক্রিয়া ঘটেছে, তা আপনাকে জানাতে আমি উদ্‌গ্রীব ছিলাম। অতঃপর আর এ বিষয়ের কোনো উল্লেখ আমি করবো না।

রবি

সুতরাং মুক্তিপ্রাপ্ত সুভাষচন্দ্র যখন পুনশ্চ স্বাস্থ্যসন্ধানে (বলাবাহুল্য জাতীয় স্বাস্থ্যসন্ধানেও বটে) প্রবৃত্ত হয়েছেন, তখন ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসের এক শুভ মুহূর্তে শুনলেন, তিনি সর্বসম্মতিক্রমে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। সুভাষচন্দ্র গভীর কৃতজ্ঞতা বোধ করলেন মহাত্মাজীর উপরে তাঁকে সুযোগ দিয়েছেন। ইউরোপের আকাশ কালো। ভারতের বাটিতে মশাল জ্বালতে হবে। সে মশাল জ্বালাতে পারতেন জহরলাল—তিনি মশালের স্বপ্নেই বিভোর রইলেন—সুভাষচন্দ্র নিজের মধ্যে প্রচণ্ড বেদনা বোধ করছেন—নেতৃত্ব, দ্বিতীয় নেতৃত্ব চাই—যা প্রথম নেতৃত্বকে হয় উত্তোলন করবে, নয় করবে অপসারিত। সুভাষচন্দ্র সম্ভবতঃ অনুভব করলেন,—সুভাষচন্দ্রের নির্বাচন গান্ধীজীর শ্রেষ্ঠ প্রগতিকর্ম।

এই নির্বাচন কেন করা হয়েছিল—সে বিষয়ে অনেকের, সুভাষচন্দ্রেরও, কিছু ভিন্ন ধারণা ছিল অবশ্য।

---

(১) ২৪শে নভেম্বর, ১৯৩৭, গোবিন্দবল্লভ পন্থকে এক গোপনীয় পত্রে নেহেরু লিখেছিলেন—"সারা ভারত জুড়ে কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি সম্পর্কে ঘটনাবলী যে মোড় নিয়েছে, তাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের কাছে আমার যে চিঠিগুলি পাঠানো হয়েছিল, আপনার কাছেও তার একখানি নকল গেছে, তাতে আমি আমার মনের কথা ব্যক্ত করেছিলাম। সে মতের প্রকাশে সংযম ছিল। কিন্তু সংযমের আড়ালে বিশ্বাসের তীব্রতাও ছিল। প্রয়োগিক ভাষায় বলতে গেলে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাগুলি প্রতিবিপ্লবী হতে চলেছে।"

এই পত্রে জহরলাল মন্ত্রীত্ব গ্রহণে কংগ্রেসের শক্তিলাভ হয়েছে তা স্বীকার করেছেন, তাঁদের গৃহীত প্রাথমিক নীতির ফল ফলেছে তাও বলেছেন, কিন্তু তাঁর ধারণায় অগ্রগতিকে যথেষ্ট জোরদার করা হয়নি, পিছিয়ে যাবার ঝোঁক দেখা দিয়েছে। অপরপক্ষে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা অবিকল বৃটিশ নীতি গ্রহণ করেছে বিভেদ সৃষ্টির ব্যাপারে। 'বিভেদ সৃষ্টি করে কংগ্রেস বা কংগ্রেসের একটি অংশকে বস্তুতই সাম্রাজ্যবাদ তাবেদার নীতি গ্রহণ করাচ্ছি।'

সবই ঠিক, শুধু জহরলালের আদেশেই মন্ত্রীত্ব গৃহীত হয়েছিল !!!

প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের চরম বিরোধী জহরলালের[১] সভাপতিত্বে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন গৃহীত হয়েছিল, ফেডারেশনের চরম বিরোধী সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে যদি ফেডারেশনের ব্যাপারে আপোষ করা যায়।

সুভাষচন্দ্র হা হা করে হেসে উঠলেন। সত্যরঞ্জন বক্সীকে বললেন, 'সত্যবাবু, আমি নাকি গান্ধীর পকেটস্থ হয়েছি। হা হা হা—'সুভাষচন্দ্র আবার অট্টহাস্যে ভেঙে পড়লেন।

কংগ্রেস সভাপতি হবার আগে সুভাষচন্দ্র ইউরোপ চষে বেড়িয়েছেন—মনীষী-সংযোগ করেছেন—সে-সব খবর নিশ্চয় এসে পৌঁছেছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে। রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রের 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল্' পড়েছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই, ভারতে তখন গ্রন্থটি নিষিদ্ধ, কিন্তু তিনি খুব সম্ভবত মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত রঁলা সুভাষ সংবাদ পড়েছিলেন। সেখান থেকে হয়তো জেনেছিলেন, ভারতীয় সংগ্রামে নতুন পথের বিষয়ে সুভাষের চিন্তার সংবাদ। শ্রমিক ও কৃষকের স্বার্থে গঠিত চরমপন্থী দলের প্রয়োজনীয়তার কথাও সেখানে ছিল। রবীন্দ্রনাথ হয়ত আরও অনুভব করেছিলেন, গান্ধীবাদ তার সমস্ত আধ্যাত্মিক মহিমা সত্ত্বেও আর নূতন গতির সঞ্চারে অসমর্থ; গান্ধীজীর বহু রাজনৈতিক আচরণ সম্বন্ধেও তাঁর মনে সন্দেহ জেগেছিল; সর্বোপরি তিনি দেখেছিলেন, গান্ধীজীর জীবৎ কালেই গান্ধীবাদ শাস্ত্রীয় হয়ে উঠে গান্ধী মন্দির ও মোহন্তের সৃষ্টি করছে; তখন রবীন্দ্রনাথ একমাত্র ভরসা দেখেছিলেন ভারতের যৌবনশক্তির দুই প্রতিভূর মধ্যে—জহরলাল ও সুভাষচন্দ্র।

রবীন্দ্র-জীবনীতে আছে—

"প্রশান্তচন্দ্রের বাড়ীতে (বেলঘরিয়া) একদিন সুভাষচন্দ্র বহু কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি য়ুরোপ হইতে সদ্য ফিরিয়াছিলেন, সেখানকার রাজনীতি সমাজনীতি সম্বন্ধে অনেক কথাই তাঁহার সঙ্গে হইয়াছিল, কিন্তু আমরা তাহার কোনো বিবৃতি পাই নাই।" (অক্টোবর, ১৯৩৭)

১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে সুভাষচন্দ্র আবার তাঁর প্রিয় স্বাস্থ্যনিবাস অস্ট্রিয়ার বাডগাস্টিনে যাবেন, সেখান থেকে যাবেন ইংলণ্ড-ভ্রমণে, সেখানে বৃটিশসভার লর্ড হ্যালিফক্স, লর্ড লেটন্যাণ্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। শ্রমিক ও উদারনৈতিক দলের মিঃ এটলি, মিঃ আর্থার গ্রীনউড, মিঃ বেভিন, স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপস্, মিঃ হ্যারল্ড ল্যাসকি, লর্ড আলেন প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হবেন, এবং তাঁরা ভারতের প্রতি সহানুভূতি জানাবেন তারপর ফিরে আসবেন, হরিপুরায় কংগ্রেসে সভাপতিত্বের জন্য।

যাঁর অভিজ্ঞতা দেশের সীমাকে অতিক্রম করেছে। যাঁর প্রাণশক্তি জয় করেছে মৃত্যুর আক্রমণকে—সেই সুভাষচন্দ্রের জন্য রইল রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ—

"সমস্ত দেশের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমি তোমাকে সংবর্ধনা করি।"

'একজন আধুনিক মতবাদী সভাপতি চাই'

১৯৩৯ সালের ত্রিপুরী কংগ্রেসের জন্য একজন আধুনিক মতবাদী সভাপতি চাই,—রবীন্দ্রনাথ জহরলালকে জানিয়েছিলেন তাঁর ইচ্ছার কথা। সুভাষচন্দ্র তেমন একজন 'আধুনিকবাদী'। রবীন্দ্রনাথের মতে, কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে জহরলালই তাঁর একমাত্র জুড়ি।

রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রের মধ্যে যে আধুনিকতা দেখেছিলেন তার স্বরূপ কি? কিসের জন্য গান্ধীজীর ইচ্ছার বিরোধিতায় তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন? ঐ সুভাষচন্দ্রীয় আধুনিকতাকে রবীন্দ্রনাথ কি সর্বপ্রকারে সমর্থন করতেন?

শেষ প্রশ্নের উত্তর সর্বপ্রথমে দেওয়া যায়: না, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সুভাষচন্দ্রের কর্মদর্শনকে পূর্ণভাবে সমর্থন করা সম্ভব ছিল না; তবু রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন ভারতের রথের চাকায় গতি আসুক, চরখার ঘর্ঘরের চেয়ে চলন্ত চাকার ঘর্ঘর শব্দই তিনি শুনতে চেয়েছিলেন। অশান্তির আওয়াজ উঠুক 'শান্তির পলিতবাণীর' পরিহাসকে স্থির করে।

এখানে সুভাষচন্দ্রের ভাব ও কর্মদর্শনের বিষয়ে কিছু বলা উচিত। আমি নমুনারূপে হরিপুরার সুভাষচন্দ্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি-ভাষণকে গ্রহণ করব। কিন্তু হরিপুরারও আগে সুভাষচন্দ্রের ধ্যান ও ধারণার কিছু রূপ দেখে নেওয়া যায়।

ভারতের পূর্ণাঙ্গ মুক্তি যে সুভাষচন্দ্রের ধ্যানের বস্তু, তা না বললেও চলবে। পূর্ণাঙ্গ মুক্তির গোড়ায় আছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, তারপরে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা। এই সকল বিভিন্ন স্বাধীনতার যথার্থ প্রকৃতি কি, কিভাবে তাদের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর—এই সকল প্রশ্ন ও উত্তরের উপর নির্ভর করে সুভাষ দর্শন গড়ে উঠেছে।

সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের প্রথম দিককার রচনা ও ভাষণাদির মধ্য থেকে পরিপূর্ণ কোনো কর্মদর্শনের রূপ পাওয়া যায় না, যদিও সেখানে কর্মদর্শন যথেষ্ট আছে। মানুষ গড়ার মন্ত্রে বিশ্বাসী, মানুষের জীবনের অন্তর্নিহিত দেবত্বে আস্থাবান, যৌবন-ভেড়া যৌবনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, যৌবনের বেদনার প্রতি সহানুভূতিপর, স্বাধীনতার জন্য "পাগল হইবার উপক্রম" এক যুবকের সন্ধান সেখানে পাওয়া যায়। সেখানে সুভাষচন্দ্র অবশ্য বারবার ভারতের তিন সম্প্রদায়ের (নারী, শ্রমিক ও অনুন্নত) উন্নতির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন এবং স্বাধীনতা যে কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতায় সীমাবদ্ধ নেই—অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাও যে তার সঙ্গে যুক্ত—এ কথাগুলিও জোরের সঙ্গে কথিত আছে। তাছাড়া ভারতের যুব আন্দোলনের সূচনা কার্যত তাঁর দ্বারা হয়েছিল বলে যুব-আন্দোলনের আদর্শ-প্রকৃতি কি, তাও তিনি নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। এই সকলের মধ্য থেকে আমরা একজন ভাবপ্রবণ কর্মীকে খুঁজে পাচ্ছি, যিনি প্রচলিত জীবনযাত্রা ও রাজনীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তৃপ্ত নন, তাকে ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়তে ব্যাকুল, অথচ তখনো ব্যাকুলতাই তাঁর সম্বল, আত্মোৎসর্গের অধিকারই তাঁর অধিকার, কিন্তু কিভাবে 'আধুনিকতা'র প্রতিষ্ঠা করা যাবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট পরিকল্পনা গড়ে তুলতে পারেন নি।*

---

* তুলনার জন্য এষ্ট দ্রষ্টব্য

কিন্তু একই সঙ্গে আমরা পূর্বে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি ('নেতাজীর আগমন' ইত্যাদি অধ্যায়ে), সুভাষচন্দ্রের মনে গান্ধী-আন্দোলনের বিকল্প আন্দোলন সৃষ্টির বাসনা জাগরূক হয়েছে। অহিংসাকে বাইরে রেখে নিয়েও আধুনিক পন্থায় দলগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা ভাবছেন। শুধু ভাবছেন নয়, তাকে কার্যে পরিণত করবার জন্য দল গঠনও করছেন সাময়িক কায়দায়।

১৯৩৩ সালে ইউরোপে যাওয়ার পর থেকেই সম্ভবত সুভাষচন্দ্রের মনে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে নূতন দল গঠনের কার্যকরী বাসনার উদয় হয়। এই নূতন দলের আদর্শ ও কর্মপন্থাকে সর্বদেশীয় সর্বহারা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার অভিপ্রায়ে রাশিয়ার কাছে তাঁর দলের নীতির খসড়া পেশ করেছিলেন। সে খসড়া অনুমোদিত হয় নি। অনেকের অনুমান, রাশিয়ার দপ্তরে সে খসড়া এখনও পাওয়া যেতে পারে। খসড়া অনুমোদিত না হওয়ার কারণ—সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। মার্ক্সবাদের প্রয়োজনীয় অংশে তাঁর প্রয়োজন ছিল, কিন্তু মার্ক্সবাদের কর্মপদ্ধতিকে স্বীকার করতে গিয়ে ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা কি করে তিনি গ্রহণ করবেন—যা তাঁর সমস্ত জীবনদর্শনের বিরোধী? তাছাড়া আত্মগঠনে ব্যস্ত রাশিয়া তখন ভারতের স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে অনুকূল হস্তপ্রসারে আগ্রহী নয়, অথচ রাশিয়ার মুক্তিতে বিশ্বের শ্রমিকের মুক্তি, এই শ্লোগানের উপর সর্বস্ব সমর্পণ করতে তাঁর বাধা ছিল। ভারতের মুক্তি তাঁর আশু অত্যন্ত প্রয়োজন—যেটা রাশিয়ার কাছে কাল বা পরশুর ব্যাপার।

সুতরাং এটা খুবই স্বাভাবিক যে, নতুন বিপ্লবের অতি নৈষ্ঠিকতায় আবদ্ধ রাশিয়া সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা গ্রহণ করবে না, বিশেষত সুভাষচন্দ্র যেখানে রাজনৈতিক দর্শনের ক্ষেত্রে ভারতের নতুন 'অবদানে' বিশ্বাসী। সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস করেছিলেন, আগামী ইতিহাসে ভারত নতুন ভূমিকা নেবে। সপ্তদশ শতাব্দীতে নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ব্যাপারে ইংলণ্ড, অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'স্বাধীনতা সাম্য মৈত্রী'র ব্যাপারে ফ্রান্স, উনবিংশ শতাব্দীতে মার্কসীয় দর্শনের ব্যাপারে জার্মানী, বিংশ শতাব্দীতে সর্বহারা বিপ্লবের ব্যাপারে রাশিয়া—পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসকে এইসব দেশের ভূমিকা সমৃদ্ধ করেছে। পরবর্তী সম্পদ আসছে ভারতের ভূখণ্ড থেকে।

রাশিয়ার পক্ষে এই ভাবী-ভারতীয় সম্পদকে মূল্যবান মনে করা তখনি সম্ভব ছিল না। রাজনীতির পণ্ডিতেরা দেখাতে পারেন, মার্কসবাদ থেকে প্রয়োগব্যাপারে রাশিয়া কতখানি সরে গিয়েছে—কিন্তু সেই সরে যাওয়াটিকে রাশিয়া একই সঙ্গে তাত্ত্বিকভাবে মার্কস্-বেদের সঙ্গে যুক্ত রেখেছে। রাশিয়ার মতে মার্কস্‌বেদকে বেদরূপে স্বীকার করার পরেই তবে সেখান থেকে সরে যাওয়ার স্বাধীনতা কারও আসতে পারে।

সুতরাং সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা গৃহীত হয়নি। রাশিয়ার 'অজ্ঞাত' সংরক্ষণশালা থেকে তাঁর খসড়া পরিকল্পনা উদ্ধার না পেলেও। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের একটি ভাষণে এই দলের প্রস্তাবিত রূপ আমরা পেয়েছি।* সেটি ছিল তৃতীয় ভারতীয় রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ। ভাষণের স্থান, ফ্রাঙ্কার হল, লণ্ডন, কাল ১০ জুন ১৯৩০। ভাষণের পটভূমিকা ১৯৩০-এর অসহযোগ আন্দোলনের শোচনীয় ব্যর্থতা, যে ব্যর্থতার মূলে আছে, সুভাষচন্দ্রের মতে, নেতৃত্বের ভ্রান্তি এবং আন্দোলনের অবৈজ্ঞানিকতা। বীতশ্রদ্ধ অথচ আশাবাদে ও কর্মপ্রেরণায় অম্লান সুভাষচন্দ্র এই পরিস্থিতিতে নূতন দল গঠনের পরিকল্পনা করেছেন।

* The Struggle and after. Indian Struggle, 2nd Edition 65-75

দলের প্রস্তাবিত নাম—'সাম্যবাদী সংঘ।

দলের প্রয়োজন কেন? সুভাষচন্দ্র বলেছেন—ভারতের বিপুল জনজাগরণ সত্ত্বেও স্বাধীনতা এখনো ভবিষ্যতের বস্তু। তাই বৃহত্তর আকারে এবং তীব্রতর প্রকারে নতুন আন্দোলন সুরু করতে হবে। সে আন্দোলনের "বুদ্ধিগত এবং বস্তুগত প্রস্তুতিকে অবশ্যই বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে, অবশ্যই তা বাস্তবভিত্তিক হবে।" গান্ধী-নেতৃত্ব এই বৈজ্ঞানিকতা ও বস্তুভিত্তি দিতে অসমর্থ। তাই—

"আমাদের পরবর্তী প্রয়োজন হবে স্থির প্রতিজ্ঞ নরনারীর এমন একটি দলের, যে দল সর্ববিধ অত্যাচারের মুখে, আত্মবলিদানের মূল্যে ভারতের মুক্তির দায়িত্ব গ্রহণ করবে। ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে স্থান লাভ করতে পারবে কিনা, তা নির্ভর করছে তার প্রয়োজনীয় নেতৃত্বসৃষ্টির ক্ষমতার উপরে। ভারতের প্রাণশক্তির এবং স্বরাজের অধিকারের নিদর্শন হবে এই প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব সৃষ্টির সামর্থ্য।"

কাদের নিয়ে এই দল গঠিত হবে? সুভাষচন্দ্রের উত্তর—"এটি হবে ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতিনিধি-স্থানীয় জনসাধারণের দল।" এটি হবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীন, সুসংবদ্ধ সর্বভারতীয় দল। এই দল সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে কাজ করবে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, কৃষক প্রতিষ্ঠান, নারী প্রতিষ্ঠান, যুব প্রতিষ্ঠান, ছাত্র প্রতিষ্ঠান, এবং বৃহত্তর স্বার্থে যদি প্রয়োজন হয়, সাম্প্রদায়িক বা খণ্ড স্বার্থের প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে এই দলের প্রতিনিধিরা সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকবে।

"এই দল অনুরূপ লক্ষ্যে অংশতঃ বা পূর্ণতঃ চালিত অন্য দলসমূহের সহযোগিতা করবে।"

শ্রমিক স্বার্থে গঠিত এই দল স্বাধীনতার পূর্বে সংগ্রাম কালে অন্য স্বার্থের সঙ্গে বিশেষ বিবাদ না করলেও স্বাধীনতা-উত্তরকালে ঐ দলের নেতৃত্বে শ্রেণী সংগ্রাম সুরু হবে (an inter class fight under the leadership of the same party)। সংগ্রামের সেই দ্বিতীয় পর্যায়ে "সকল বিশেষ সুবিধা, অবস্থার পার্থক্য, কায়েমী স্বার্থের বিলোপ ঘটাতে হবে যাতেকরে দেশে পূর্ণ সাম্যের অবস্থা (রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক) প্রতিষ্ঠিত হয়।"

দেখা যাচ্ছে, সাম্যবাদী দলের কর্মবিধিকে সুভাষচন্দ্র দুই পর্যায়ে ভাগ করেছেন—স্বাধীনতা-পূর্ব ও স্বাধীনতা-উত্তর। এই দল একদিকে জাতীয় সংগ্রামের সৈনিক ও সেনাপতি হবে, অন্যদিকে হবে নতুন ভারতের স্থপতি।

জাতীয় সংগ্রামের 'বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিসম্পন্ন' সৈনিক কিভাবে হওয়া যাবে, তার কিছু পথনির্দেশ করেছেন তিনি। দলের সদস্যদের জন্য চাই সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক শিক্ষা। ঐ শিক্ষার মধ্যে থাকবে (১) ভারতে বৃটিশ শাসনের সবল ও দুর্বল দিকের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা (২) ভারতীয় জনগণের দুর্বলতা ও সবলতার রূপ নির্ধারণ (৩) পৃথিবীর অন্য অংশে সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস পর্যালোচনা এবং ঐসব দেশে স্বাধীনতা ধারণার ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে ধারণা। এই 'বুদ্ধিগত রাজনৈতিক শিক্ষা' গ্রহণ করেছে এমন "নৈতিকভাবে প্রস্তুত" 'সর্বসময়ের কর্মী' নিয়ে দল গঠিত হবে, যারা "স্বাধীনতার অভিযাত্রায় সন্তানদল।"

এই রাজনৈতিক নিদনারীরা কোন্ পর্যায়ে কিভাবে লড়াই সুরু করবে সে বিষয়ে ঐ ভাষণে কোনো বিস্তৃত পরিকল্পনা সুভাষচন্দ্র পেশ করেন নি। কেবল তখনি সম্ভব একটি বিষয়ের কথা বলেছেন—বৈদেশিক প্রোপাগ্যাণ্ডা। ভারতবর্ষ বহিঃপৃথিবীতে বৃটিশের গ্লানি বহনে কুৎসিত আকারে পরিচিত। অন্য দেশের, ইংলণ্ডের শুভবুদ্ধিরও, সমর্থন

পেতে হলে ভারতের পক্ষে বৈদেশিক প্রচারের আশু প্রয়োজন। সুভাষচন্দ্র ঐ ভাষণে তাঁর প্রস্তাবিত দলের কর্মবিধির মধ্যে এই প্রচারকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন।

'সাম্যবাদী সংঘের' পরিকল্পনার বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশ হল—স্বাধীনতা-উত্তর কালে এই দলের ভূমিকা বিষয়ে বক্তব্য। এই দল ভাগ্যের হাতে কিছুই ছেড়ে দেবে না—সংগ্রামোত্তর পুনর্গঠনকে তো নয়ই। যদি সংগ্রামোত্তর নেতৃত্ব পূর্ব থেকে যথাযথভাবে সংগঠিত হয়ে না থাকে, তাহলে ফরাসী বিপ্লবোত্তর বিশৃঙ্খলার পুনরাবৃত্তি ভারতেও ঘটতে পারে। তাই যুদ্ধকালের সেনাপতিদের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে প্রধান করতে হবে, তাঁদের প্রতিশ্রুতি মিথ্যা ছিল না, এবং যে-উদ্দীপনা তাঁরা জাগিয়েছিলেন তাকে অপব্যয়িত হতে দিতে তাঁরা প্রস্তুত নন।

আগেই বলেছি স্বাধীনতা-উত্তর আন্দোলনকে সুভাষচন্দ্র "প্রেমীসংগ্রাম" রূপে চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁর মতে "মুক্ত ভারত যখন স্থির জমিদার বা উচ্চবর্ণের ভারত হবে না; মুক্ত ভারত হবে রাজনৈতিক ও সামাজিক গণতন্ত্র।" এই বিশেষ ধরণের গণতন্ত্র নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছাড়া সম্ভবপর নয়। নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই ভারতের দারিদ্র্য দূর করতে সমর্থ হবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভিন্ন এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তনও অসম্ভব। তাই অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্নের সঙ্গে রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্নটি জড়িত। এবং এই কারণেই সুভাষচন্দ্রের বিশ্বাস, বাধ্য না হলে ইংরেজ ভারতকে স্বাধীনতা দেবে না। ইংলণ্ডের কেবল ধনিক শ্রেণীই ভারতের শোষণে উপকৃত নয়—শ্রমিক শ্রেণীও। তাই ইংলণ্ডের শ্রমিক সরকারও ভারতের স্বাধীনতাকে বাধা দিয়েছে সর্বপ্রকারে। তাই একদিকে, সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য, ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে, অন্যদিকে মানসিকভাবে ভারতের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নব-রূপায়ণ সম্বন্ধে প্রস্তুত থাকতে হবে। সে ব্যাপারে সোভিয়েট রাশিয়া ইত্যাদি দেশের জাতীয় অর্থনীতির নতুন পদ্ধতি ইত্যাদি মূল্যবান আলোক দেবে।

এই হল মোটামুটি সাম্যবাদী দলের পরিকল্পনা।

১৯৩৩ সালের জুনমাসের এই ভাষণের প্রায় দেড় বৎসর পরে (১৯৩৪ সালের নভেম্বর শেষ) সুভাষচন্দ্রের 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' প্রকাশিত হয়। "A glimpse of the future" নামক শেষ অধ্যায়ের একেবারে শেষাংশে পুনশ্চ নতুন দল গঠনের কথা বললেন—

> "ভারতের ভবিষ্যৎ শেষ পর্যন্ত নির্ভর করছে এমন একটি দলের উপরে যার পরিষ্কার নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মপন্থা রয়েছে—যে দল কেবল স্বাধীনতার জন্যই সংগ্রাম করবে না। একই সঙ্গে সংগ্রামোত্তর পুনর্গঠনের সমগ্র পরিকল্পনাকে কার্যকরী করে তুলবে,—যে দল বিচ্ছিন্নতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে বিশ্বসভায় ভারতকে স্থাপন করবে এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে যে, মানবতার ভাগ্যের সঙ্গে ভারতের ভাগ্যও অবিচ্ছেদ্যরূপে যুক্ত।"

১৯৩৪ সালের শেষের দিকে সুভাষচন্দ্র বলছেন, কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি খুব বেশী অগ্রসর হতে পারবে না, কারণ এর গঠনে সংহতি নেই, এবং এর ভাবধারাতেও বহু বাতিল বস্তু আছে; তবু যে-তাগিদে এই দলের সৃষ্টি হয়েছে সেটা সত্য তাগিদ, এবং তারই জোরে ভবিষ্যতে স্পষ্ট নীতি ও কর্মপদ্ধতির ভিত্তিতে নতুন পার্টি গড়ে উঠবে। এই পার্টির যে-খসড়া এখানে সুভাষচন্দ্র উপস্থিত করেছেন তার সঙ্গে যে সাম্যবাদী সংঘের নীতি ও কর্মপন্থার ঐক্য আছে সে

তা বলাই বাহুল্য। সে ঐক্য বৈদেশিক প্রচারের প্রয়োজনীয়তা কথনে, অন্যান্য প্রগতিশীল দলের সঙ্গে সহযোগিতা স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে নিশ্চয় আছে। ভারতীয় জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিপূর্ণ মুক্তির কথাও সেখানে পাওয়া যাবে। নতুন দল যে, কৃষক-শ্রমিকের স্বার্থে গঠিত হবে, এ যে ধনিক, বণিক, মহাজন ও জমিদারদের কায়েমী স্বার্থের বিরোধিতা করবে এবং আধুনিক পৃথিবীর বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরীক্ষার ভিত্তিতে নতুন অর্থব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেষ্টা করবে—তাও বলা আছে। কিন্তু আরো দু'একটি বিষয়কে বর্তমান পর্যায়ে স্পষ্টতরভাবে বলা হয়েছে। সেগুলি এই—

(ক) এই দল ফেডারেল গভর্নমেন্টকে চরম লক্ষ্য বলে গ্রহণ করে, কিন্তু একই সঙ্গে কিছুকালের জন্য এক-নায়কের শক্তিসম্পন্ন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজন অনুভব করে, যাতে ভারত আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে ;

(খ) এই দল দেশের কৃষি ও শিল্পব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য সুনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে ;

(গ) এই দল জাতিভেদ ইত্যাদি বর্তমান সামাজিক ব্যবধানের বিলোপ সাধন ক'রে নতুন সামাজিক কাঠামো নির্মাণে প্রয়াসী হবে ; ঐ নতুন সামাজিক কাঠামো পূর্বতন গ্রাম-পঞ্চায়েতের ভিত্তিতে গঠিত হবে ;

(ঘ) এই দল বর্তমান-ডিক্টেটারীয় গণতন্ত্রের পোষকতা করবে না ; অপরপক্ষে সামরিক শৃঙ্খলায় গঠিত শক্তিশালী পার্টির দ্বারা চালিত সরকারে বিশ্বাস করে, যে-সরকার স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে সম্ভাব্য বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হয়ে ভারতকে ঐক্যবদ্ধ ও অশান্তিমুক্ত রাখতে পারবে।

কয়েকটি নতুন কথা পেলাম। সুভাষচন্দ্র বিশেষভাবে ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং-এর কথা ভাবতে শুরু করেছেন। গ্রাম-পঞ্চায়েতের প্রয়োজনীয়তাও তিনি স্বীকার করেছেন। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, তিনি কিছু সময়ের জন্য সামরিক শৃঙ্খলায় গঠিত দলীয় একনায়কত্বের কথা ভাবছেন।

আরও একটি চিন্তাগত নবভাবনা তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছে। তিনি পরিষ্কার জানিয়েছেন, রাশিয়ার পথ ভারতের পথ নয়। ভারতের নিজস্ব পথে তিনি পৃথিবীর কর্ম-চিন্তাকে আহ্বান করেছেন। সেইটেই তাঁর রাজনৈতিক সমন্বয়বাদ।

সুভাষচন্দ্রের এই রাজনৈতিক সমন্বয়বাদ সম্বন্ধে কিছু বলার আগে একথা বলে নেওয়া চলে, এই সমন্বয়বাদ তিনি তাঁর বাল্যশিক্ষা থেকে পেয়েছিলেন। আবার বিবেকানন্দ—রামকৃষ্ণ-শিষ্য বিবেকানন্দ। সুভাষচন্দ্রকে অনেকে রাজনৈতিক বিবেকানন্দ বলেছেন। যাঁরা বলেছেন তাঁদের মনে ছিল সুভাষচন্দ্রের বিবেকানন্দানুরূপ মানবপ্রেমের কথা। শুধু মানবপ্রেমেই নয়—জীবনদর্শনেও সুভাষচন্দ্র বিবেকানন্দ-শিষ্য। সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক সমন্বয়বাদ তার একটি দৃষ্টান্ত।

বিচিত্র কথা এই, সমন্বয়ী সুভাষচন্দ্র কিন্তু আপোষ-বিরোধী ছিলেন। সেটা আবার প্রমাণ করছে সমন্বয়বাদ আপোষবাদ নয়—অথচ ঐ ধারণাগত ভ্রান্তি অনেক বুদ্ধিজীবীর মধ্যেও দেখা যায়।

কিন্তু 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগলে'র শেষ অংশে কথিত রাজনৈতিক সমন্বয়তত্ত্বের জন্য সুভাষচন্দ্রকে বিশেষ সমালোচনার

সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রকে এক সময়ে স্বীকার করতেও হয়েছিল তিনি ভুলটি প্রকাশ করবার সময়ে যথেষ্ট সাবধান হননি, শব্দ বা নাম ব্যবহারে।

সুভাষচন্দ্র রাজনৈতিক সমন্বয় চেয়েছিলেন কমিউনিজম ও ন্যাশনালিজমের মধ্যে।

ন্যাশনালিজমের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপক ঘৃণা। ভারতবর্ষে এই ঘৃণা প্রচারে ইংরেজ সরকারও সক্রিয় সাফল্য দেখিয়েছিল, যার ফলে নাৎসীদের নীল রক্তের তুলনায় অনেকে ইমপিরিয়ালিস্টদের রীতিমত উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেখতে শুরু করেছিল।

দেখা যাক্ সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য কি ছিল?

সুভাষচন্দ্র জহরলালের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করেছেন। ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে আন্তরিক ঘৃণা প্রকাশ করবার পরে জহরলাল (১৯৩৩, ১৮ই ডিসেম্বর) বলেছিলেন—পৃথিবীর সামনে খোলা আছে দুটি পথ—ফ্যাসিজম্ ও কমিউনিজম্। এর একটিকে বেছে নিতে হবে। জহরলাল জানালেন, আমি কমিউনিজমের পক্ষে; আমি তার মূল দর্শন ও ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করি।

সুভাষচন্দ্র বললেন, জহরলালের প্রথম কথাটা মূলে ভুল। কমিউনিজম ও ফ্যাসিজমের মধ্যে যে-কোনো একটিকে বেছে নিতেই হবে—এ কথাটা তখনি সত্য হতে পারে যখন মেনে নেওয়া যাবে যে, ইতিহাসের গতি চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেছে। ইতিহাস যদি স্থবির না থাকে তাহলে কমিউনিজম্ ফ্যাসিজমের কোনটিই শেষ কথা থাকবে না। সুভাষচন্দ্রের মতে, কমিউনিজম্ বা ফ্যাসিজমের সমন্বয় হল ইতিহাসের পরবর্তী বক্তব্য; (কিন্তু নিশ্চয়ই সর্বশেষ বক্তব্য নয়।) ইতিহাসের ঐ পরবর্তী বক্তব্য হবে রাজনৈতিক দর্শনে ভারতের বিশেষ দান।

এই নূতন দানের যোগ্যতা ভারতবর্ষের আছে, কারণ ভারতবর্ষ তার প্রাচীন ইতিহাসের বর্তমান সন্তানরূপে বেঁচে আছে ভারতবর্ষ পরাধীন অবস্থাতেও তার প্রাণশক্তির প্রমাণ দিয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস সত্যাগ্রহ ভারতের উদ্ভাবনী প্রতিভার এক বিশেষ প্রমাণ।—সুভাষচন্দ্র জানিয়েছেন।

এখানে একটি প্রশ্ন ওঠানো যায়, সুভাষচন্দ্র কমিউনিজম্ ও ফ্যাসিজমের মধ্যে সমন্বয় চাইলেন—গান্ধীবাদের সঙ্গে সমন্বয় চাইলেন না কেন? উত্তরে তিনি বলেছেন, গান্ধীবাদও কমিউনিজমের উদ্দেশ্য পৃথক; গান্ধীজী দিয়েছেন স্বাধীনতা সংগ্রামের নূতন পথ—অহিংস সত্যাগ্রহ, কমিউনিজমের মত সামাজিক পুনর্গঠনের কোন নূতন কার্যসূচী দেননি। তা দিলেই কমিউনিজমের বিকল্প মতবাদ হতে পারত। তাছাড়া, গান্ধীবাদকে গ্রহণ না করার অন্যান্য কারণ প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র জানিয়েছেন—গান্ধীজী যন্ত্রসভ্যতার বিরোধী, কুটীরশিল্পের পুরাতন অনুন্নত প্রত্যাবর্তনের পক্ষপাতী; স্বরাজের তত্ত্বব্যাখ্যার সময়ে তিনি মধ্য-ভিক্টোরীয় গণতন্ত্রের ভাষায় কথা বলেন এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন না, শিল্পপতিরা সেই কারণেই তাঁর অনুগত। বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পূর্ণ পরিবর্তনের পক্ষপাতী তিনি নন, কারণ মূলে তিনি সংস্কারবাদী, বিপ্লববাদী নন। ক্ষমতা পেলে তিনি বর্তমান ধনতান্ত্রিক শিল্পব্যবস্থার কাঠামোর পরিবর্তন না করে দেশে যন্ত্রশিল্পের সর্বাত্মক বিস্তারে আপত্তি করবেন।

এখন দেখা যাক্ সুভাষচন্দ্রের সমন্বয়বাদের মূল কথা কি? তাঁর কথাই উদ্ধৃত করছি—

"কমিউনিজম ও ফ্যাসিজমের বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও কয়েকটি ব্যাপারে ঐক্য আছে। কমিউনিজম্ ও

ফ্যাসিজম উভয়ই ব্যক্তির উপরে রাষ্ট্রের অধিপত্য বিশ্বাস করে। উভয়েই পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করে। উভয়েই পার্টি শাসনে, পার্টির একনায়কত্বে, এবং মতবাদের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের কঠোর দমনে বিশ্বাস করে। উভয়ই পরিকল্পনানুযায়ী যন্ত্রশিল্পের পুনর্গঠনের আকাঙ্ক্ষী। এইসব সাধারণ গুণ উক্ত নূতন সমন্বয়ের ভিত্তিভূমি হবে। এই সমন্বয়কে আমি একটী পুরাতন ভারতীয় শব্দে চিহ্নিত করতে চাই—'সাম্যবাদ'। এই সমন্বয়কে কার্যকরী করা ভারতের দায়িত্ব।"

এরপরে সুভাষচন্দ্র কমিউনিজম্ কেন ভারতের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়, তার বিশ্লেষণ করেছেন। বিশ্লেষণের শেষে তিনি জানিয়েছেন, ভারত রাশিয়া আমেরিকা ইত্যাদি থেকে চিন্তা ও পরিকল্পনাগত প্রভাব গ্রহণ করলেও 'সোভিয়েট রাশিয়ার নতুন সংস্করণ হয়ে উঠবে না।'

ভারতে কমিউনিজমের প্রবর্তনের বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের যুক্তির আলোচনা স্থগিত রেখে এখানে বলা যায়, 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগলে'র শেষাংশে তাঁর পরিকল্পিত সমন্বয়ী সাম্যবাদ সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র যা বলেছেন, তার বিরুদ্ধে সমালোচনার বিশেষ অবকাশ আছে। প্রথম কথা, এ ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের রচনা অপ্রচুর। তিনি কমিউনিজম্ ও ফ্যাসিজমের মধ্যে যে-সব সাধারণ গুণ দেখিয়েছেন, যার উপর তাঁর সমন্বয় নির্ভরশীল, সেই গুণগুলি তো কমিউনিজম্ ও ফ্যাসিজম উভয়ের যে-কোনো একটির মধ্যেই আছে। সে ক্ষেত্রে সমন্বয়ের কথা ওঠে কোথায়? বললেই চলত, আমি কমিউনিজম্ বা ফ্যাসিজমের এই গুণগুলিকে গ্রহণ করেছি। কতকগুলি সাধারণ-গুণের নির্বাচন মানেই সমন্বয় নয়। সমন্বয়ের মধ্যে সাধারণ গুণের নির্বাচন, আপত্তিকর 'গুণের' প্রত্যাখ্যান এবং নিজস্ব গুণের সংযোজন—এই তিনটি বস্তু থাকা চাই। সুভাষচন্দ্র, দুঃখের বিষয়, ঐ রচনায় কমিউনিজমের দোষ দেখিয়েছেন, কিন্তু ফ্যাসিজমের দোষ দেখাননি, এবং বলেন নি তাঁর এই নতুন সমন্বয়ে ভারতের নিজস্ব দান কোন্ জিনিষ হবে।

এ রকম ঘটল কেন? তাড়াহুড়োয় গ্রন্থ সমাপ্ত করার জন্যই এমন ঘটেছে অথবা সুভাষচন্দ্রের মনে সেইকালে নাজীজমের সম্পর্কে পক্ষপাত প্রবল হয়েছিল? সুভাষচন্দ্রের রচনার এই অংশ যে বিশেষভাবে সমালোচিত হয়েছিল তা না বললেও চলবে। এমন লেখার কারণ সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র কিছু কৈফিয়ৎ দিয়েছেন এবং কিছু মত পরিবর্তনের কথাও পরে জানিয়েছিলেন। 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' গ্রন্থরচনার তিন বৎসর পরে ইংলণ্ডে ইংরেজ-কমিউনিস্ট রজনী পাম দত্তের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষাৎকারের বিবরণ প্রকাশিত হয় ডেইলি ওয়ার্কারে, ২৪ জানুয়ারী ১৯৪৮। তার অংশবিশেষ—

"প্রশ্ন: আপনার ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল গ্রন্থের শেষের দিকে ফ্যাসিজম্ সম্বন্ধে বক্তব্যের বিষয়ে বহু প্রশ্ন উঠেছে। ফ্যাসিজম্ সম্বন্ধে আপনার মত জানাবার কষ্ট স্বীকার করবেন কি?

কমিউনিজম্ সম্বন্ধে আপনার সমালোচনাও একই সঙ্গে বহু প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে। এ বিষয়েও আপনার মত জানাবেন কি?

উত্তর: তিন বছর আগে রচিত গ্রন্থের পরে আমার রাজনৈতিক ধারণার আরও বিকাশ ঘটেছে।

আমি আসলে যা বলতে চেয়েছিলুম তা হল, আমরা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা চাই; এবং স্বাধীনতা অর্জনের পরে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হওয়া আমাদের অভিপ্রায়। এই কথাই আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম, যখন আমি

কমিউনিজম্ ও ফ্যাসিজমের সমন্বয়ের কথা বলেছিলাম। হয়ত আমার ভাষাব্যবহার সুষ্ঠু হয়নি। কিন্তু আমি একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই.—আমি যখন গ্রন্থটি লিখছিলাম, ফ্যাসিজম্ তখন তার সাম্রাজ্যবাদী অভিযান আরম্ভ করেনি এবং তখন ফ্যাসিজমকে ন্যাশন্যালিজমের উগ্র রূপ বলে মনে হয়েছিল।

"আমি আরও বলতে চাই, ভারতে যারা কমিউনিজমকে অবলম্বন করেছে বলে মনে হয়, তাদের অনেককে জাতীয়তা-বিরোধী মনে হয়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সম্বন্ধে তাদের কিছু অংশের শত্রুভাব থেকে ঐ ধারণা জোরদার হয়েছে। অবশ্য অবস্থা আজকে পুরোপুরি বদলে গেছে।

"আমি আরও যোগ করে দিতে চাই, মার্কস্ ও লেনিনের রচনায় এবং কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশন্যালের নীতি-বিবৃতিসমূহে কমিনিজমের যে-মত প্রকাশিত হয়েছে, সে মত যে, জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামকে পুরোপুরি সমর্থন করে এবং তাকে নিজেদের বিশ্বনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে বিশ্বাস করে—এ বিষয়টিকে আমি সর্বসময়ে উপলব্ধি করেছি এবং তা আমাকে গভীর সন্তোষ দিয়েছে।

"আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ব্যাপকতম সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার সংগঠিত হবে এবং তার দুটি উদ্দেশ্য থাকবে—রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রস্থাপন।

দেখা গেল সুভাষচন্দ্র নিজের রাজনৈতিক মতের আংশিক পরিবর্তনের কথা স্বীকার করেছেন এবং ফ্যাসিজমের যথার্থ চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর কিছু বিচারভ্রান্তি ঘটেছিল তাও মেনে নিয়েছেন। রজনী পাম মতের সঙ্গে সাক্ষাৎ-বিবরণ থেকে পাওয়া যাচ্ছে, তিনি ফ্যাসিজম্ থেকে উগ্র জাতীয়তার অংশটুকু নিতে চেয়েছিলেন, যে-জাতীয়তা কমিউনিজম্ তাঁকে সরবরাহ করেনি। সুভাষচন্দ্র আরও স্বীকার করেছেন—কমিউনিজমের জাতীয়তা-বিরোধী চরিত্র সম্পূর্ণ সত্য নয়। তাঁর এখন স্বীকারোক্তির কারণ কি—জাতীয় সংগ্রামে কমুনিষ্টদের সেইকালে কংগ্রেসকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি?

যাইযোক, কমিউনিজমের বিরুদ্ধে 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' গ্রন্থে লিখিত আপত্তির চেহারা দেখা যাক। সুভাষচন্দ্র পাঁচটি আপত্তি তুলেছেন :

(১) আজ কমিউনিজমের কোনোপ্রকার জাতীয়তার প্রতি কোনো সহানুভূতি নেই, অপরদিকে ভারতের আন্দোলন, জাতীয়তার আন্দোলন, জাতীয় স্বাধীনতার জন্য।

(২) রাশিয়া এখন আত্মস্বার্থে গুটিয়ে আছে; বিশ্ববিপ্লবের চেষ্টা সে ত্যাগ করেছে। যদিও কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যালের দ্বারা বাইরে মুখরক্ষার চেষ্টা করছে (সে-চেষ্টাও সে পরে ত্যাগ করবে); রাশিয়া ও অন্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সাম্প্রতিক চুক্তি এবং লীগ অব নেশনস্-এ তার অংশগ্রহণ (যা ইংরেজ ফরাসীর কুক্ষিগত) রাশিয়ার বৈপ্লবিক ভূমিকা যথেষ্ট সংকুচিত করেছে। অধিকন্তু রাশিয়া তার আভ্যন্তরীণ যান্ত্রিক পুনর্গঠনে, জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশরক্ষায়, এবং বৃহৎ শক্তিসমূহের সঙ্গে বন্ধুত্বরক্ষায় এতই ব্যাপৃত যে, ভারতের মত দেশের ব্যাপারে সে কোনো সক্রিয় আগ্রহ দেখাতে প্রস্তুত নয়।

(৩) ভারতের কাছে কমিউনিজমের কতকগুলি অর্থনৈতিক ধারণার বিশেষ আকর্ষণ থাকলেও কতকগুলি ধারণা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ায় সুসংগঠিত চার্চ ও স্টেটের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলে কমিউনিজম্

ধর্ম-বিরোধী ও নাস্তিক হয়ে উঠেছে, অপর পক্ষে ভারতে সুসংগঠিত ধর্ম না থাকার, ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে আবশ্যিক সংযোগ না থাকায়, রাশিয়ার অনুরূপ ধর্মবিদ্বেষ ভারতে নেই। উপরন্তু ভারতের জাতীয় জাগরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্ম ও সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে ঘটেছে।

(৪) কমিউনিজমের মূল তত্ত্ব ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল; ভারতবর্ষে এ বস্তু সম্পূর্ণ সমর্থন পাবে না, এমনকি যারা অর্থনীতির ব্যাপারে কমিউনিজমকে মানতে চায় তাদের সকলের মধ্যেও নয়।

(৫) রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় কমিউনিজমের অর্থনীতি বিশেষ সাফল্য অর্জন করলেও অন্য ক্ষেত্রে গতানুগতিক অর্থ-তন্ত্রকে বজায় রেখেছে। সাধারণভাবে বিশ্বের মুদ্রানীতি ত্রুটিপূর্ণ, কমিউনিজমেরও।

কমিউনিজমের এই বিরোধী সমালোচনার ভিতর থেকে কিছু তত্ত্ব আহরণ করবার চেষ্টা করা যেতে পারে। প্রথম কথা; পুরাতন প্রশ্নটি উত্থাপন করছি; সুভাষচন্দ্র কমিউনিজমের সমালোচনা করলেন, অথচ ফ্যাসিজমের সমালোচনা করলেন না কেন? আমার বিশ্বাস কারণটা রাজনৈতিক। পূর্বেই বলেছি, ভারতের জন্য সুভাষচন্দ্র 'সাম্যবাদী সংঘের' থীসিস প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি সেই থীসিস কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালে দাখিলও করেছিলেন। কিন্তু অভিপ্রেত ফল পাননি। রাশিয়া রাজী হয়নি তাঁর বস্তুবাদহীন (কিন্তু বস্তুহীন নয়) সাম্যতত্ত্ব গ্রহণ করতে কিংবা ভারতীয় রাজনৈতিক সংগ্রামে প্রত্যক্ষ সাহায্য করতে। কমিউনিজম সম্বন্ধে যা হলেও কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে সন্দেহ তাঁর মনে আরও প্রবল হয়েছিল যখন তিনি দেখেছিলেন ১৯৩৯ সালের আন্দোলনের সময়ে সে—আন্দোলনকে প্রতি-বিপ্লবাত্মক বলে কমিউনিস্টরা তার থেকে সরে থেকেছিল। সে ক্ষেত্রে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বৈদেশিক সাহায্যের কি হবে? সুভাষচন্দ্র তাই বোধহয় জার্মানী বা ইতালীর কাছ থেকে সাহায্য আশা করছিলেন, যে যে জার্মানী বা ইটালীর সাম্রাজ্যবাদী অভিপ্রায় তখনো পূর্ণ প্রকটিত হয়নি এবং জার্মানী 'হয়ত' ইংরেজ তার শত্রু, সেই কারণে ভারতকে স্বাধীনতার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে। তাই জার্মানীর সমালোচনা করে তিনি বিরোধিতার সৃষ্টি করতে চাননি।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন, যদি ফ্যাসিজমের সমালোচনা না করলেন, কমিউনিজমের সমালোচনা করলেন কেন? তার উত্তর দেবার আগে একটি কথা বলে নিই, ১৯৩৮ সালে রজনী পাম দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎকার কালে সুভাষচন্দ্র যে 'সাম্রাজ্যবাদী অভিপ্রায় সম্পর্ক' বলে জার্মানীর নিন্দা করেছেন, এবং কমিউনিজম্ সম্বন্ধে নিজ মত কিছু সংশোধন করেছেন, তার কারণও রাজনৈতিক। ইতিমধ্যে দেখা গিয়েছে, জার্মানী ইংরেজের সঙ্গে মিতালীতে আগ্রহী, অপরপক্ষে জার্মানী ও ইংলণ্ড রাশিয়াকে পরমশত্রুর শত্রু বলে মনে করছে। রাশিয়ার সেই সংকট অবস্থায় ভারতের কমিউনিস্টরা ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসাহী হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, বৃটিশ কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নীতি সমর্থন করছে, যে-ব্যাপারটিকে পরম সন্তোষজনক বলে উল্লেখ করেছেন সুভাষচন্দ্র তার হরিপুরা ভাষণে। সুভাষচন্দ্রের কাছে ভারতের স্বাধীনতাই সবচেয়ে বড় কথা। তাই পরিবর্তিত অবস্থায় তিনি নিজের মত পরিবর্তনও ঘটিয়েছেন। ঐকালে জার্মানীর চেয়ে ইংরেজের বড় শত্রু রাশিয়া তাঁর অধিকতর মানসিক মিত্র হয়েছে।

'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল'র শেষে কমিউনিজমের সমালোচনার কারণরূপে বলা যায়—ঐখানেই সুভাষচন্দ্রের সমন্বয়-তত্ত্বের মূল কথা আছে। সুভাষচন্দ্র ভারতের পক্ষে ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা গ্রহণে অনিচ্ছুক। ভারতের সাধনা

ও ইতিহাসের ধারার সঙ্গে বস্তুবাদী ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ সহযোগ নেই। ভারতের জাতীয় আন্দোলন মূলত ধর্মীয় ও সংস্কৃতির আন্দোলন। স্বয়ং সুভাষচন্দ্রও যে-আন্দোলনের সৃষ্টি, তারও মূলে আছে ভারতীয় ধর্মান্দোলনের প্রভাব। সুতরাং ইতিহাসের এই ধর্মমুখিতাকে তিনি অস্বীকার করেন কি ভাবে? সুভাষচন্দ্র যে রাজনৈতিক দর্শনের ব্যাপারে সমন্বয়-তত্ত্বের কথা বলেছেন তার কারণ ভারতের ইতিহাস-সাধনের সঙ্গে এই সমন্বয়ধারণার ঐক্য আছে। যদি তিনি বলতেন, তিনি সংশোধিত আকারে কমিউনিজমের প্রবর্তন চান, তাহলে সেটা 'সংশোধিত কমিউনিজমই' হত, কোনো ভারতীয় বস্তু হয়ে উঠত না: বিদেশের প্রভাব গ্রহণে সম্পূর্ণ প্রস্তুত থেকেও অনুভূতিযোগে ভারতের প্রাণের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন কোনো মত প্রচারে তিনি উৎসুক ছিলেন না। *

এই সমন্বয় দর্শনের ব্যাপারটি সুভাষচন্দ্র শেষবারের মত ব্যাখ্যা করেন ১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসে, টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে। দশ বছর আগে 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' গ্রন্থেও এ বিষয়ে যা বলেছিলেন, কয়েকটি বিষয়কে এখানে আরও পরিষ্কার করে তোলেন। সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক দর্শনের এইটেই সর্বশেষ রূপ—এ পর্যন্ত যা পাচ্ছি।

ইমপিরিয়ালিষ্ট জাপানের 'ইম্পিরিয়াল ইউনিভার্সিটি'তে দাঁড়িয়ে অস্থায়ী ভারত সরকারের সভাপতি ও সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র পরিষ্কার জানিয়েছিলেন, ভারতের লক্ষ্য সমাজতন্ত্র। স্বাধীন ভারতের সামনে তিনটে সমস্যা বড় হয়ে দাঁড়াবে—দেশরক্ষার ব্যবস্থা, দারিদ্র্য নিবারণ এবং শিক্ষাবিস্তার। এই সমস্যাগুলির সমাধানের দায়িত্ব তিনি ব্যক্তি-প্রয়াসের উপর অর্পণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। কারণ এই জাতীয় সমস্যাগুলি মূলত অর্থনৈতিক-সমস্যা। রাষ্ট্র ছাড়া আর কারো পক্ষে এই অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। 'দেশের শিল্পায়ন যা কৃষির যান্ত্রিক পদ্ধতি, যাই হোক না কেন, আমরা চাই রাষ্ট্র এগিয়ে এসে দায়িত্ব গ্রহণ করুক এবং অল্প সময়ের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করুক, যাতে করে অতিদ্রুত ভারতবর্ষ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে উঠতে পারে।'

নেতাজীর পরবর্তী বক্তব্য, দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো যদি সমাজতান্ত্রিক করাই লক্ষ্য হয়, তাহলে তথাকথিত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সে লক্ষ্য সিদ্ধ করা যাবে না। তিনি বললেন "তাই আমাদের সিদ্ধান্ত, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার দ্বারা স্বাধীন ভারতের সমস্যার সমাধান করা যাবে না। ভারতের প্রগতিশীল আধুনিক ভাবধারা সর্বাত্মক রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের পক্ষে, যা জনগণের মুখপাত্ররূপে, যথার্থ বলতে গেলে ভৃত্যরূপে কাজ করবে, মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক ধনিকের স্বার্থে কাজ করবে না।"

---

* সাম্যবাদ সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের আগ্রহ মূলত মানবপ্রেমের সৃষ্টি। সেই মানবিকতা তিনি ভারতবর্ষের মহান্ পুরুষদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। রাশিয়া থেকে তিনি নিতে চেয়েছিলেন তার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। এ বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের যৌবনের রচনার কিছু অংশ উদ্ধৃতি যোগ্য—"The Socialism did not derive its birth from the books of Karl Marx. It has its origin in the thought and culture of India. The Gospel of Democracy that was presented by Swami Vivekananda has manifested itself fully with writings and achievements of Deshbandhu Das, who said that 'Narayana' lives amongst those who till the land, prepare our bread by the sweat of their brow, those who in the midst of grinding poverty have kept the torch of our civilisation, culture and religion burning"...

প্রথম অধ্যায়ে সাম্যবাদী সংঘের যে পরিকল্পনা দেখেছি তাতে রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ছিল না, শুধু পূর্ণ সমাজতন্ত্রকে আদর্শ বলে ঘোষণা করা ছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে 'ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল'র [প্রথম খণ্ডে] মধ্যে রাষ্ট্র গঠনের প্রকৃতির কথা আছে: স্বাধীনতা-উত্তর পুনর্গঠনের জন্য কিছুকাল সামরিক শৃঙ্খলায় গঠিত একনায়কত্ব প্রয়োজন। তৃতীয় পর্যায়ে এই তৌকিও বক্তৃতায় দেখলাম, তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেছেন, সমাজতন্ত্রকে সফল করতে হলে জনগণের স্বার্থে গঠিত কর্তৃত্ববাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়োজন। দেখা যাচ্ছে সুভাষচন্দ্র গণতান্ত্রিক গণতন্ত্রের নিতান্ত বিরোধী। তাঁর গণ-তন্ত্র প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের চেয়ে বেশী কিছু।

এবার আবার প্রত্যাবর্তন করা যাক রাজনৈতিক সমন্বয়বাদের পুরাতন প্রশ্নে। কমিউনিজমের সঙ্গে ন্যাশনালিজমের সমন্বয়ের কথা তিনি এখানেও বলেছেন।

এই প্রস্তাবিত রাজনৈতিক সমন্বয়ে ভারতের ইতিহাসের প্রবর্তনার কথা সুভাষচন্দ্র তৌকিও ভাষণে বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন: ভারতের ইতিহাস অন্তত তিন হাজার বছরের পুরণো। যেখানে ইজিপ্ট, ব্যাবিলন, কিনিসিয়া বা গ্রীসের প্রাচীন সংস্কৃতির ধারা ঐসব দেশের বর্তমান জীবনে লুপ্ত হয়ে গেছে, সেখানে ভারতবর্ষ এখনো তার পুরাতন সংস্কৃতির মধ্যে জীবন্ত। 'দু হাজার, তিন হাজার বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে জীবনাদর্শ ভাবনা, এবং অনুভূতির মধ্যে বাস করতেন, আমরা ভারতীয়রা, আজও মূলগতভাবে সেই একই আদর্শ ভাবনা ও অনুভূতির মধ্যে বাস করছি। অর্থাৎ সেই প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে আসছে একই ইতিহাসের ও সংস্কৃতির ধারা। ইতিহাসে এটা খুব বিরল বস্তু।"

এই ইতিহাসের উপরে সুভাষচন্দ্র বিভিন্ন দেশীয় রাষ্ট্রনীতির নমুনাকে আমন্ত্রণ করেছেন এবং সমন্বয় করতে চেয়েছেন। নাজীজমের নিরপেক্ষ সদ্‌গুণ তিনি দেখলেন জাতীয় সংহতিবৃদ্ধিতে ও সাধারণের অবস্থার উন্নয়নে। কমিউনিজমের বিশেষ সদ্‌গুণ তার সুপরিকল্পিত অর্থনীতিতে ও দ্রুত শিল্পায়নে। সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধানেও কম্যুনিষ্ট রাশিয়ার সাফল্য স্বীকৃতিযোগ্য। এই ভাষণে নেতাজী ন্যাশনাল সোসিয়ালিজমের একটি বিশেষ দোষের কথা বলেছেন, [যা 'ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগলে' (১ম) বলেন নি] বাইরে ধনতান্ত্রিকতা-বিরোধী হলেও এই রাষ্ট্রনীতি 'ধনতান্ত্রিক ভিত্তিতে গঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চূড়ান্ত সংস্কারে সমর্থ হয়নি।'

কমিউনিজম সম্বন্ধে নেতাজী যে সব আপত্তি উত্থাপন করেছেন, তার একটি আপত্তি পুরাতন,— কমিউনিজম্ জাতীয় সেন্টিমেন্টের সম্মান করে না। তাছাড়া আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি আছে। প্রথমত তাঁর মতে, ভারতে শ্রেণী সংগ্রামের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন হলেও না, যদি স্বাধীন ভারতের সরকার জনসাধারণের মুখপাত্র ও সেবকরূপে কাজ করতে থাকে। করবে বলেই নেতাজীর বিশ্বাস।

দ্বিতীয়ত, রাশিয়ার শ্রমিক সরকার উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ভারতে ঐ অধিক গুরুত্বের দরকার নেই, কারণ ভারত মূলত কৃষিজীবী।

তৃতীয়ত, মার্ক্সবাদে মানবজীবনের অর্থনৈতিক ভূমিকার উপর অত্যধিক জোর দেওয়া আছে, অর্থনীতির বিশেষ প্রভাবের কথা মেনে নিয়েও অতখানি গুরুত্বের পক্ষপাতী নেতাজী নন।

এইখানে এবার আমরা কিছু মন্তব্য করতে পারি। আমরা প্রথমেই সুভাষচন্দ্রের চিন্তাধারায় একটি লক্ষণীয় পরিবর্তনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সাধারণী সংঘের পরিকল্পনায় নেতাজী মুক্তিপ্রাপ্ত ভারতে শ্রেণী সংগ্রামের কথা বলেছিলেন। সর্বশেষ ভাষণে তার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করলেন। এখন, মত পরিবর্তনের কারণ, আমরা যতদূর অনুমান করতে পারি, সুভাষচন্দ্রের ধারণা ছিল, ভারতের মুক্তি গান্ধীবাদীরা আনতে পারবে না—আনবে 'শ্রমিক ও কৃষকের স্বার্থে গঠিত বামপন্থী দল'। এই বিশ্বাস তিনি নানা জায়গায় প্রকাশ করেছেন এবং সেই বিশ্বাসের বশেই জানিয়েছেন, জনসাধারণের স্বার্থে ও দেবার গঠিত সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী দল রাষ্ট্রক্ষমতা পেলে শ্রেণী-সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। বলা বাহুল্য সুভাষচন্দ্রের ধারণা সম্পূর্ণ সত্য হয়নি, কিংবা তাঁর এই ধারণা মিথ্যা হয়ে আর একটি ধারণা সত্য হয়েছে। সুভাষচন্দ্র এও বলেছিলেন, ইংরেজ দেশবিভাগ করে দক্ষিণপন্থীদের হাতে ক্ষমতা অর্পণের চেষ্টা করবে।

এবার কমিউনিজম ও ন্যাশন্যাল সোসিয়ালিজম-এর মধ্যে সমন্বয়বাদনা সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি উত্থাপন করছি। সুভাষচন্দ্র সহজেই বলতে পারতেন তিনি ন্যাশনালিজম্ ও কমিউনিজমের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে চান, এবং সেই কথা তিনি উক্ত টোকিও ভাষণে বলেছেনও, তিনি 'ন্যাশন্যাল সোসিয়ালিজমের' যে বিশেষ গুণের কথা বলেছেন—জাতীয় সংহতিবৃদ্ধিতে তার সাফল্য—সে সাফল্য ন্যাশন্যালিজমও দিতে পারত।* আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যতে বলবার সুযোগ হলে সুভাষচন্দ্র তাই বলতেন।

সুভাষচন্দ্র তাঁর টোকিও ভাষণে বাস্তবতঃ মৃদুভাবে করলেও বাস্তবতঃ নাজীজমের একটি বিশেষ দিকের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নাজীরা ধনতান্ত্রিক ভিত্তিতে গঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার করতে পারেনি। তাই যদি সত্য হয়, তাহলে 'ন্যাশন্যাল সোসিয়ালিজমের' মধ্যে সমর্থনের আর কি রইল, তার ন্যাশন্যালিজম্ ছাড়া, যা ধনতান্ত্রিক দেশেও প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। টোকিও ভাষণে সুভাষচন্দ্র স্পষ্টই বলেছেন, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তনই তাঁর মূল লক্ষ্য, সেই মূল লক্ষ্যের পূরণ যেখানে নেই—সে বস্তুর সঙ্গে সমন্বয়ের কথা ওঠে কেন?

কেন ওঠে, কোন্ রাজনৈতিক প্রয়োজনে, তার ইতিহাস পূর্বে বিস্তারিত বলেছি, এখানে পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই। এখানে শুধু বিস্ময় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব—জার্মানীর নিজ সাম্রাজ্যবাদী জঙ্গী ভাবনে বসে নেতাজী কিভাবে জার্মানীর অর্থব্যবস্থার ধনতান্ত্রিক কাঠামোর সমালোচনা করলেন এবং নিজের সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে তুলে ধরলেন। টোকিও ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা যদি নির্বোধ না হয় তাহলে বুঝবে যে, সুভাষচন্দ্র রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থায় জাপান-জার্মানীর শত্রু রাশিয়ার আদর্শকেই মূলত নিজের আদর্শ বলে ঘোষণা করেছিলেন।

---

* জার্মানী তার শুদ্ধ রক্তের আওয়াজ তুলে জাতীয় গর্ব ও সংহতি বাড়িয়েছিল। সুভাষচন্দ্র কি জাতীয় সংহতিবৃদ্ধির জন্য ভারতের ঐতিহ্যের মহিমার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার কথা ভেবেছিলেন? দেশপ্রেম বৃদ্ধির জন্য তিনি হিন্দু এবং মুসলমান-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ দিকগুলি সম্বন্ধে ভাবাবেগ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন তার সর্বশেষ সংগ্রাম—জীবনে, তা আমরা জানি।

সর্বশেষ কথা, নেতাজী কমিউনিজমের জাতীয় সেন্টিমেন্টের বিরোধিতার কথা বলেছেন। কথাটা বোধ হয় আংশিক সত্য। আধুনিক ইতিহাস প্রমাণ করেছে, যেখানে কমিউনিস্টদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা গিয়েছে, সেখানে জাতীয়তার ব্যাপারে তারা অন্ধ জাতীয়তাবাদী, ক্ষেত্রবিশেষে অন্ধতর। অন্ধতার আড়ালে বিপ্লবের আত্মরক্ষা। তবে যেখানে কমিউনিষ্টরা সংখ্যালঘু সেখানে তারা কিছু 'দূর'-দৃষ্টি সম্পন্ন। ভবিষ্যতে এবিষয়ে হয়ত কিছু আলোচনার প্রয়োজন হবে।

রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের জন্য একজন আধুনিক মতবাদী সভাপতি চেয়েছিলেন। সেই আধুনিক রাষ্ট্রপতির রাষ্ট্র-দর্শনের রূপ দেখলাম। এই রাষ্ট্রপতি তাঁর প্রথম সভাপতিত্ব কালে ১৯৩৮ সালে হরিপুরায় যে ভাষণ দিয়েছিলেন, ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে তা গুরুত্বপূর্ণ ভাষণগুলির অন্যতম বলে গৃহীত হবার যোগ্য। রাষ্ট্রপতির সেই ভাষণ এবং পরবর্তী কার্যকলাপ থেকে তাঁর আধুনিকতায় রবীন্দ্রনাথ আস্থা বোধ করেছিলেন। পরবর্তী অধ্যায়ে হরিপুরা ভাষণটিকে আমরা পরীক্ষা করব।

হরিপুরা-ভাষণ : মূল্যবান দলিল

রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই হরিপুরা-ভাষণ পড়েছিলেন, নিশ্চয় খুশী হয়েছিলেন এই ভেবে যে, তাঁর প্রেরণাময় আশীর্বাদ নতুন ভারতবর্ষের একজন উপযুক্ত নাগরিকের মস্তকেই বর্ষিত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দূরদৃষ্টি কি আশঙ্কিত হয়নি — সু-দর্শনচক্রের আধুনিকতাকে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধ সত্ত্ব করবে? সত্যই সত্ত্ব করেনি।

১৯৩৮ সালের পরে বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। ভারতবর্ষ স্বাধীনও বেশ কিছুদিন। বর্তমান ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে দেখছি। কবি সুভাষচন্দ্র সেদিন সত্যই কবি হয়ে গিয়েছিলেন। এরই নাম প্রেমের অন্তর্দৃষ্টি— বুদ্ধির দ্বারা শাসিত, কর্মের দ্বারা উদ্দীপ্ত। ভবিষ্যৎ ভারত তার গোটা রূপ নিয়ে সুভাষচন্দ্রের চোখের সামনে ধরা দিয়েছিল। সদ্য-স্বাধীন দেশের সমস্যা, তার থেকে মুক্তির উপায়, আদর্শ ভারতের রূপ ও সেই আদর্শকে রূপান্তরিত করার পথ, সব কিছুই সেই ৪২ বছরের প্রেমের প্রতিভা তুলে ধরেছিল দেশের সামনে। সুভাষচন্দ্রের হরিপুরা-ভাষণ ভারতীয় রাজনীতির অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত। ও ভাষণ সাহিত্যের সৃষ্টি নয়, জীবনের সৃষ্টি। হরিপুরা-ভাষণ না পড়ে যাঁরা আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়বেন, তাঁরা দ্বারের দীপ না দেখেই প্রবেশ করবেন ঘরে।

হরিপুরা-ভাষণে দেখা গেল সুভাষচন্দ্র এমন একজন রাজনীতিক যিনি স্বাধীনতার পূর্বে ও স্বাধীনতার পরে—এই দুই কাল-ভূবনে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তাঁর কাছে যুদ্ধ-পরিষদ এবং দ্বায়ী মন্ত্রীসভা— দুই-ই। ভারতবর্ষের অনাগত বিধাতার কণ্ঠে বেজেছিল বিরাটের গান—'আমরা ভারতবর্ষের জন্যই সংগ্রাম করছি না, মানবতার জন্যও আমাদের সংগ্রাম। ভারতের মুক্তি—মানবতার ত্রাণ।'

ভারতের মুক্তিতে মানবতার উদ্ধার কিভাবে, সে কথাটা রাষ্ট্রপতি কিছু অংশে ব্যাখ্যা করেছিলেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সকল সাম্রাজ্যবাদের চাবিকাঠি। বৃটিশ সাম্রাজ্যের মৃত্যু অপর সাম্রাজ্যের মৃত্যুর পথ পরিষ্কার করে দেবে। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, বৃটেন সমাজতান্ত্রিক না হলে শক্তি থাকতে স্বেচ্ছায় কখনো ভারতকে স্বাধীনতা দেবে না। ভারত

যদি স্বাধীনতা আদায় করে নিতে পারে তাহলে সাম্রাজ্যবিহীন বৃটেন অর্থনৈতিক কারণে সমাজতন্ত্রের আশ্রয় নিতে বাধ্য হবে। স্বাধীন ভারত বৃটিশ জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির সহায়ক হবে এইভাবে।

বৃটেন যদি স্বেচ্ছায় ভারতকে স্বাধীনতা দেয় সেটা হবে ইতিহাসের অলৌকিক কাহিনী, কিন্তু সে স্বেচ্ছায় কিছু দেবেনা—সুভাষচন্দ্র কালের আঙুলী তুলে দেখালেন সপ্তশত সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপ পথে—বৃটেনকেও ঐ ভাঙা ইতিহাসের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হতে হবে। 'জার সাম্রাজ্য ১৯১৭ সালে ধ্বসে পড়েছিল, কিন্তু ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে উঠে এসেছিল সোভিয়েট রিপাবলিক। রাশিয়ার ইতিহাসের একটি পাতা বৃটেনও তুলে নিতে পারে, কিন্তু নেবে কি?'—সুভাষচন্দ্র প্রশ্ন করেছেন।

সুভাষচন্দ্রের ভাবনাকে দুটি মূল অংশে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে, ভারতের স্বাধীনতালাভের সমস্যা, দ্বিতীয় ভাগে স্বাধীনতাকে সার্থক করার পন্থা।

ভারত তখনো স্বাধীন হয়নি, কিন্তু স্বাধীনতার দ্বারে সে,—সুভাষচন্দ্র অনুভব করেছিলেন। স্বাধীনতার বিরোধিতা করবার জন্য বৃটেন তৎপরতা করছে। তার চক্রান্তের একটা রূপ ফেডারেশন, অন্যটি পাকিস্তান। দুটোরই উদ্দেশ্য ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে বৃটিশ স্বার্থ সুরক্ষিত রাখা। "An internal partition is necessary in order to neutralise the transference of power……I have no doubt that British ingenuity will seek some other (other than Federal scheme) constitutional device for partitioning India and thereby neutralising the transference of power to the Indian people."—দৈববাণী।

বৃটিশ ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে কিন্তু বিচ্ছেদের রক্তনদী রূপে প্রবাহিত হচ্ছে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে। পাকিস্তান পরিকল্পনার পূর্বে বৃটিশ সরকার জোর দিয়েছিল ফেডারেল পরিকল্পনায়। এতদিন দেশীয় রাজারা নিজ রাজ্যে স্বৈরাচার চালাচ্ছিল, ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা সমগ্র ভারতে বৃটিশ স্বৈরাচারের কনিষ্ঠ ভ্রাতৃত্বের অধিকার লাভ করল। ফেডারেশন পরিকল্পনা …… ১৯৩৫ সালের ভারতবর্ষ শ্বেতপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাষণে।

প্রয়োজন হলে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করতে হবে। সে সত্যাগ্রহের মধ্যে থাকবে সর্বাত্মক আইনঅমান্য, অহিংস হলেও তাকে কোনো ক্রমে বলা চলবে না নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ—তা সক্রিয় প্রতিরোধ। এই সত্যাগ্রহ একদিকে স্বাধীনতার প্রয়োজনে, অন্যদিকে ফেডারেশনের প্রতিরোধে। কংগ্রেস বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রীত্ব স্বীকার করেছে। এর ফল ভাল হয়েছে, মন্দ হয়েছে। ব্যুরোক্রাসির গঠন ও চরিত্র এই নিয়মতান্ত্রিক পথে বদলানো সম্ভব নয়। তবু, সুভাষচন্দ্র বলেছেন, কংগ্রেস নিশ্চয় নিয়মতান্ত্রিকতার প্রলোভন ত্যাগ করবে সংগ্রামের প্রয়োজনে বিশেষত সেই পুরাতন সর্বশক্তিশালী বৃটেন যখন আর নেই। একদিকে যুদ্ধকেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়েছে জলপথ-স্থলপথ থেকে আকাশে, অন্যদিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে অশান্তি। বাইরে নবজাগ্রত বিস্তারলোভী জাতি সমূহের কোলাহল; বিশেষত সর্বনাশের মত সোভিয়েট রাশিয়ার অবস্থিতি, 'যার অস্তিত্বের চিন্তা বৃটেনের শাসক-সম্প্রদায়ের বুকে আতঙ্কের শিহরণ এনে দেয়।' বৃটেনের মাটিতে বিরোধী শক্তির উৎপাত, বৃটেনের আকাশ উন্মুক্ত বৃহদ্বাহী বিমানের পক্ষে। 'বিশালকায় সাম্রাজ্য দৈত্যের মাটির পা এখন যেভাবে উদ্ঘাটিত হয়ে আছে, এখন আর কখনও হয়নি।

শুধু সাম্রাজ্যবাদ পথ ছেড়ে দেয় না সহজে, পথ ছেড়েনি সহজে। লড়াই করতেই হবে। তার জন্য সুশৃঙ্খলার দরকার, দরকার সব-উদ্দেশ্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার। ট্রেড ইউনিয়ন, কিষাণ সভা ইত্যাদিকে আকর্ষণ করে আনতে হবে জাতীয় আন্দোলনে। এই পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয়ে।

এরপর আমি হরিপুরা-ভাষণে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিষয় বা পরিকল্পনা যে-সব জায়গায় উপস্থাপিত করা হয়েছিল, সেগুলির উল্লেখ করব। স্বাধীনতা সংগ্রামের কালেও এর কোনো কোনোটির প্রয়োজনীয়তা ছিল।

কংগ্রেস পার্টি গঠন

কংগ্রেস দলহিসাবে অনেকটা সংঘবদ্ধ হলেও আধুনিক রাজনৈতিক দলের পূর্ণাঙ্গ সংগঠন অর্জন করতে পারেনি। দেশে বিপুল উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। তাকে নিয়ন্ত্রিত এবং চালিত করতে গেলে সুশৃঙ্খল স্বেচ্ছাসেবকদলের প্রয়োজন। সেই স্বেচ্ছাসেবকদলে কর্মী এবং পরিচালক দুই-ই থাকবে। তাদের জন্য রাজনৈতিক ও অন্যান্য ব্যাপারে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ইউরোপীয় দেশগুলি থেকে এ ব্যাপারে শিক্ষা নেওয়া দরকার। যদি এই সংগঠন এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় তবেই ভবিষ্যতের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক নেতার সৃষ্টি করা যাবে।

সুভাষচন্দ্র জোরের সঙ্গে বললেন, স্বাধীনতার পরে কংগ্রেসকে ভেঙে দেওয়ার কোনো কথাই ওঠে না। যারা স্বাধীনতা আনবে তারাই স্বাধীনতার পরে পুনর্গঠনের দায়িত্ব নেবে। না মিলে শুরু হবে বিশৃঙ্খলা। শক্তি যে অর্জন করেনি, সে যথাযথভাবে শক্তিকে ব্যবহার করতেও অসমর্থ। স্বাধীনতা অর্জনকারী দল যেখানে পরবর্তিকালে কর্তৃত্ব করেছে দেশে, সেখানেই উন্নতি অব্যাহত থেকেছে।

সংগ্রামজয়ী পার্টির রাষ্ট্রক্ষমতায় অবস্থানের বিপদ হল—তাতে দেশে গণতন্ত্র বিঘ্নিত হয়—কর্তৃত্ববাদী একপার্টি-শাসন এসে যায়। সুভাষচন্দ্র আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, তাহতে তেমন হবে না, কারণ কংগ্রেস দল নাৎসী জার্মানীর মত নেতা-নীতি-নির্ভর নয়; কংগ্রেস পার্টির আভ্যন্তরীণ গঠন গণতান্ত্রিক। এই দলে উপর থেকে নেতাকে চাপিয়ে দেওয়া হয় না, জনতাই তলা থেকে তার নেতাদের নির্বাচন করে।

পার্টির সংগঠনও বজায় থাকা সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের বক্তব্যে কোনো ত্রুটি নেই। কিন্তু কংগ্রেস দলের আভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিকতা? কংগ্রেসের অ-গণতান্ত্রিক চেহারা যখন প্রকাশ পাবে তখন তিক্ত আত্মপরিহাসের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র তাঁর এই বক্তব্যের আংশিক উপভোগ করবেন। কংগ্রেসের গণতান্ত্রিকতা সম্বন্ধে এই প্রশস্তি, আবার মনে হয়, গণতান্ত্রিকতার প্রয়োজনীয়তার পক্ষে প্রচার।

কংগ্রেস পার্টির মধ্যে সোস্যালিস্ট পার্টির অস্তিত্বের বিষয়ে তিনি কিছু বলেছেন। সোস্যালিস্ট পার্টির সদস্য না হলেও তিনি তার বিরোধী নন, বরং সমর্থক, কারণ বামপন্থীদের সংঘবদ্ধ হবার প্রয়োজন আছে এবং বামপন্থীরা সোসিয়ালিস্ট ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র এই রকম দলের বিরোধী নয়। স্বাধীনতার পূর্বে সমাজতন্ত্র যদিও আশু প্রশ্ন নয়, তবু পরবর্তী সমাজতন্ত্রকে সফল করতে হলে সমাজতান্ত্রিক প্রচারণার প্রয়োজন আছে। সোস্যালিস্ট পার্টি সেই সমাজতন্ত্রের প্রচার ও বামপন্থী সংগঠন, উভয় দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে।

কংগ্রেস নিজের ভিতরে সোস্যালিস্ট পার্টিকে গঠনতন্ত্রানুযায়ী গড়ে উঠতে দিয়েছে। কিন্তু বাইরে যে-সব দল

গড়ে উঠেছে, যেমন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস বা কিষাণ সভা, কংগ্রেস তাদের নিজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে দেবে কিনা? এই collective affiliation এর প্রশ্নে সুভাষচন্দ্র অনুমোদন দেওয়ার পক্ষপাতী, যদিও অনেকে তার ঘোর বিরোধী। সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য, এরা ঐতিহাসিক প্রয়োজনে উদ্ভূত হয়েছে, আমাদের অনিচ্ছার সম্মান রাখতে এরা বিদায় নেবে না, এবং এরা প্রগতিশীল শক্তি। সুতরাং কংগ্রেস যদি এদের স্বীকার করে, যদি নিজের ক্ষেত্রে এদের অর্থনৈতিক আন্দোলনের অধিকারকে মেনে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বৃহত্তর ক্ষেত্রে এদের সহযোগিতাকে গ্রহণ করে, তবে বিশেষ মঙ্গল হবে, যে মঙ্গল হয়েছিল রাশিয়ার ক্ষেত্রে যখন সোভিয়েট শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের যুক্ত ফ্রন্ট অক্টোবর বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কংগ্রেসের কর্তব্য, সুভাষচন্দ্রের মতে, যতদূর সম্ভব ট্রেড ইউনিয়ন এবং কৃষক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করা।

এখানে দেখা যাচ্ছে সুভাষচন্দ্র খুব নম্রভাবে মারাত্মক কথা বলতে পারেন কংগ্রেসের আহ্বানে যে আপামর জনসাধারণ সমবেত হয়েছে, তারা হয়েছে স্বাধীনতার প্রেরণায়, নিশ্চয়, কিন্তু সে স্বাধীনতা ধনিকের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক স্বাধীনতার একটুও বেশী নয়। জনসাধারণের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে মালিকের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অবশ্যই মূলগত পার্থক্য আছে। সুভাষচন্দ্র চাইছেন, কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থী প্রগতিপন্থী শক্তির প্রতিষ্ঠা—তার জন্য তাঁর সোশিয়ালিষ্ট পার্টির অবস্থিতির সমর্থন, তারই জন্য ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস বা কিষাণ সভার সহযোগ বন্ধুত্বের পক্ষে ওকালতি।

স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রের রূপ

স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক হবে তাতে সন্দেহ নেই। আগেই বলা হয়েছে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে সফল করতে হলে রাষ্ট্রকেও সমাজতান্ত্রিক হতে হয়। এখানে প্রশ্ন, সে রাষ্ট্র প্রচলিত অর্থে গণতান্ত্রিক হবে কিনা? হরিপুরা ভাষণে সুভাষচন্দ্র সে প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন, যেতে বাধ্য হয়েছেন, কারণ দক্ষিণপন্থীদের পক্ষে একেবারে দুঃসাহ্য কিছু তিনি তখনি পরিবেশন করতে চাইছিলেন না। সামনে ছিল সমবেত জাতীয় সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা। তবু সুভাষচন্দ্র ওরই মধ্যে তাঁর মূল বক্তব্য জানিয়েছেন। তিনি চান স্বাধীনতার পরে কংগ্রেস পুনর্গঠনের দায়িত্ব নিক। কিন্তু ধরা যাক, যদি জনসাধারণ তাকে, যে-কারণে হোক, দায়িত্ব না দেয়? দায়িত্ব নিতেই হবে, সুভাষচন্দ্রের কথা। এখানেই আসে এক পার্টির কর্তৃত্বের কথা। সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগত ভাবে গণতান্ত্রিক। তাঁর মতে, দেশে কিছু দিনের জন্য অন্তত এক পার্টির শাসন চলা দরকার এবং এক পার্টি শাসনের মন্দ ঘটবার সম্ভাবনা এখানে নেই কারণ ঐ পার্টি নিজস্ব গঠনে গণতান্ত্রিক।

স্বাধীনতা-উত্তর পুনর্গঠন

এখানেই সুভাষচন্দ্রের সবচেয়ে মূল্যবান বক্তব্য।

স্বাধীন ভারতের সামনে কতকগুলি সমস্যা প্রধান হয়ে দাঁড়াবে। একদিকে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, ব্যাধি, অন্যদিকে সংখ্যালঘু সমস্যাসহ আভ্যন্তরীণ বিভেদ। এই সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য তিনি স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী এই দুটি জাতীয় পরিকল্পনার কথা বলেছেন।

সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক বাস্তব বুদ্ধির একটা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যাবে তাঁর স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনার ব্যাপারে। এই অবিলম্ব-পরিকল্পনা তিনটি বিষয় স্থির করার চেষ্টা করবে,—তা দেশকে প্রস্তুত করবে (১) আত্মত্যাগে (২) ভারতের ঐক্যবোধে (৩) বিভিন্ন স্থানীয় সংস্কৃতির বিকাশে। সুভাষচন্দ্রের মতে প্রথমেই ঐ তিনটি বিষয়ের জন্য সর্বোচ্চ তৎপরতা দেখাতে হবে কারণ "বিদেশী শাসন আমাদের নীতি মান এবং সংহতিবোধকে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ করেছে।"

ভারতের ঐ সংহতি-চেষ্টা যে বিশেষ প্রয়োজনীয়, তা না বললেও চলবে। হরিপুরা কংগ্রেসে অহিংস গান্ধী-নীতির প্রতি সামগ্রিক সুভাষচন্দ্র দেশরক্ষার ব্যাপারে সশস্ত্র প্রতিরোধের কথা তুলবার স্বাধীনতা গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি নিরুপায়ে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়ে ছিলেন—অহিংস উপায়ে স্বাধীনতা আসবে এবং যে-অহিংসা ইংরাজকে তাড়াবে সেই অহিংসার সামনে হিংসা হারিয়ে ফেলবে সকল হিংসা। সেক্ষেত্রে স্বাধীনতার পরে ভারতের আত্মরক্ষার পথ একমাত্র ঐক্যবোধে। সুভাষচন্দ্র তাই ঐক্যের উপরে জোর দিয়েছেন। কারণ তিনি অধিকন্তু জানতেন, জাতি যদি ঐক্যবদ্ধ, থাকে তাহলে সে মুষ্টি-ওঠানো বা মুষ্টি-নামানো যে-কোনো প্রতিরোধকেই সফল করতে পারবে।

এইখানে একটি কথা বলা চলে, জাতীয় নেতৃবৃন্দ—সুভাষচন্দ্রও তার অন্তর্ভুক্ত—ভারতের অনৈক্যের জন্য ইংরেজকে দায়ী করে যে প্রচার চালিয়ে এসেছেন, তাতে মনে হয়েছে ইংরেজ সরে গেলেই আমরা 'এক জাতি এক প্রাণ একতা'—সেক্ষেত্রে জাতীয় সংহতির জন্য সুভাষচন্দ্রের উদ্বেগ কেন?

এইখানে আবার সেই বাস্তব রাজনীতিককে দেখতে পাচ্ছি। ইংরেজ ভারতের অনৈক্যের হেতু সত্য, কিন্তু বাঘের কামড় কি বাঘ পালিয়ে যাওয়া মাত্র সেরে যায়? ইংরেজ অনৈক্যের হেতু, এই কথার অর্থ, ইংরেজ থাকলে কোন ভাবেই সম্পূর্ণ ঐক্য আনা সম্ভব হবে না। আর ইংরেজ চলে গেলে ঐক্য আসবে, তার মানে সেই ঐক্য 'সম্ভবপর'—সত্যই সম্ভবপর যদি তার জন্য আমরা, সচেষ্ট হই। প্রথম ক্ষেত্রে চেষ্টা সত্ত্বেও ঐক্য অসম্ভব। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ঐক্য চেষ্টার সম্ভব। সুভাষচন্দ্র সেই চেষ্টার প্রয়োজনের দিক তুলে ধরেছেন।

এবং সেইটাই হবে প্রাথমিক প্রয়াস—ঐ ভারতের সংহতি। বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দক্ষিণপন্থী নেতাদের মানসিক পার্থক্য এখানে। সুভাষচন্দ্র বুঝতেন কি ঘটবে—কি ঘটা স্বাভাবিক—এবং তার জন্য দেহে মনে প্রস্তুত থাকতেন, কিছু অন্যান্যরা পালে বাঘ পড়লে তবে প্রস্তুতি শুরু করেন। ভারতের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বার্ষিকী পালিত হবার পরে তবে নয়াদিল্লীতে 'সুসংঘবদ্ধ সংহতি' সম্মেলনের বিবরণ পাওয়া গেছে সংবাদপত্রে।

একটু অপ্রাসঙ্গিক হলে বলা ভালো, স্বাধীনতা পাবার পরেই জনৈক দেশপ্রাণ ব্যক্তি আমাকে বলেছিলেন স্মরণ আছে,—বড় বড় পরিকল্পনা হোক ক্ষতি নেই, কিন্তু এখনি প্রয়োজন, দেশের প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রতিদিন জাতীয় পতাকা উঠানো—প্রতিটি ছেলেকে তার সামনে দিয়ে যাবার সময় নমস্কার করতে বাধ্য করা। তিনি বলেছিলেন মনে আছে, এর ফলে দেশের যারা ভবিষ্যৎ তাদের কাছে জাতীয় পতাকা কাপড়ের টুকরো থেকে জাতীয় সম্মানচিহ্ন হয়ে উঠবে। সেদিন তাঁর কথার গুরুত্ব বুঝিনি, আজ বুঝছি যখন দেখছি আর পাঁচটা বস্তুর মত জাতীয় পতাকা অর্থাৎ জাতির উত্তোলিত আন্দোলিত চেতনার প্রতীক আমাদের কাছে উৎসবের আর পাঁচটা দর্শনীয় বস্তুর মত হয়ে গিয়েছে।

সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন, স্বাধীনতা-প্রাপ্ত অথচ তখনও নিরন্ন অশিক্ষিত, ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের ভিতরকার চেতনা-শক্তিকে আহ্বান করতে, ভারতের ঐক্যে উদ্বুদ্ধ করতে, তাদের মধ্যে সচেতন দেশপ্রেমকে অচেতন সংস্কারে রূপান্তরিত

করতে। সুভাষচন্দ্র তাই চেয়েছিলেন কারণ ভারতীয় আদর্শবাদীদের মধ্যে তিনি সর্বাধিক আদর্শবাদী হয়েও চরম বাস্তব-বাদী ছিলেন।

স্বাধীন ভারতের অ-বিলম্ব পরিকল্পনার প্রথমে তিনি রেখেছেন ত্যাগের জন্য আহ্বান, তারপর ঐক্যচেষ্টা এবং সেই ঐক্যকে পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্তি দেবার জন্য স্বাধীনতা ঘোষণা। মনে পড়বে পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধকালে সুভাষচন্দ্রের 'ঐক্য—বিশ্বাস—বলিদানে'র আহ্বান। সমগ্র জাতির আশু প্রয়োজনকে ঐ তিনটি শব্দের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার মধ্যে ছিল তাঁর নেতৃত্ব-প্রতিভা। ঐক্যচেষ্টা কিভাবে করা হবে তারও কিছু ইঙ্গিত তিনি দিয়েছিলেন। যেমন, রেডিয়ো, টেলিভিশন, ফিল্ম, বিমান ইত্যাদির সাহায্যে ভারতবর্ষকে নিকটতর করা। যেমন, রাষ্ট্রভাষা হিন্দুস্থানী-কে সমগ্র ভারতবর্ষে চালু করা। যেমন, সমগ্র ভারতে একই শিক্ষানীতি প্রবর্তন করা।

এ সকল অ-বিলম্ব পরিকল্পনার মধ্যে পড়ে। এই ব্যাপারগুলিকে অ-বিলম্ব পরিকল্পনারূপে ঘোষণা করা—পাঠক আমার পুনরুক্তি ক্ষমা করবেন—সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রমাণ—অবশ্য সেই রাজনীতি বৈপ্লবিক।

শিক্ষার মত ব্যাপারকে পরবর্তী ব্যাপার করতে সুভাষচন্দ্র প্রস্তুত ছিলেন না—বিশেষতঃ শিক্ষার ঐক্যবিষয়ক অংশটিকে। দেশের সামনে দারিদ্র্য একটা মস্ত বড় সমস্যা, কিন্তু দারিদ্র্য দূর করতে হলে উৎপাদনের ও বণ্টনের ব্যবস্থার যে উন্নতি প্রয়োজন তাকে অগ্রাধিকার দিতে তিনি রাজী নন। সেটা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ব্যাপার, এবং রাতারাতি জনগণের জীবনের মানোন্নয়ন সম্ভবপর নয়, সে বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের ধারণার প্রমাণ তাঁর ত্যাগের আহ্বানের মধ্যে রয়ে গেছে। সর্বভারতের জন্য সাধারণ শিক্ষানীতির সঙ্গে তিনি রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটিকেও সামনে এগিয়ে এনেছেন। রাষ্ট্রভাষাকে অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে—অসুবিধা সত্ত্বেও। রাষ্ট্রভাষার ক্রমিক প্রবর্তন সম্ভব নয়। অন্ততঃ সে চেষ্টা অন্য ভাষাভাষী জনসাধারণের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হবেই, যদি প্রথম স্বাধীনতালাভের উন্মাদনাকে বিলিত হতে দেওয়া হয়। রাষ্ট্রভাষা না হলে রাষ্ট্র চলে না, অথচ হিন্দী বা হিন্দুস্থানী রাষ্ট্রভাষা হলে তার দ্বারা মত স্বার্থের পোষকতা ঘটবে এই আশংকা আছে। সংখ্যাগুরুত্বের কারণে সুভাষচন্দ্র যেমন হিন্দুস্থানীর পক্ষপাতী তেমনি তিনি এর দ্বারা অন্য ভাষাভাষীদের স্বার্থহানির সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তাই তাঁর প্রস্তাব, একদিকে আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করা হোক; অন্য দিকে হিন্দীভাষীদের আত্মাভিমান ও স্বার্থাভিমানের শাসনের জন্য এবং সর্বভারতের সুবিধার জন্যও বটে—নাগরী লিপির বদলে রোমক লিপির প্রবর্তন। নাগরী-লিপিহীন হিন্দী—হিন্দীর আঞ্চলিক অভিমানকে সংযত রাখবে এবং ঐ ভাষাকে মাত্র সর্বজনবোধ্য সাধারণ ভাবপ্রকাশের বাহন করবে; অন্যদিকে ঐ রোমক লিপি পাশ্চাত্য ভাষা-শিক্ষার পথে প্রথম পদক্ষেপ—যে পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার মধ্যে ছিল (১) জনসংখ্যা সমস্যা (২) ভূমিব্যবস্থা (৩) রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প।

জনসংখ্যার ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী। ভারতবর্ষে জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধি ঘটবে কিনা এই অর্থনৈতিক তর্কের মধ্যে না গিয়েও তিনি বলেছেন, ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় দারিদ্র্য দূর করতে হলে কোন না কোনভাবে জনসংখ্যার স্ফীতিরোধ করতে হবে।

ভূমিব্যবস্থা এবং শিল্পব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি তাঁর পুরাতন আদর্শের কথা জানিয়েছেন—"সমাজতান্ত্রিক ধারায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎপাদন ও বণ্টন।" ভূমিব্যবস্থার ক্ষেত্রে তিনি চূড়ান্ত সংস্কারের পক্ষপাতী। তার মধ্যে পড়ে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ, কৃষকদের পুরাতন ঋণ মকুব, কম সুদে ঋণের ব্যবস্থা, সমবায়ের প্রসার, এবং চাষের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্তন।

শিল্পায়নের ব্যাপারে—দেশে নতুন শিল্পব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে কারণ বৃটিশ-শিল্পের বিপুল যান্ত্রিক উৎপাদনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এবং বিদেশী সরকারের অত্যাচারে দেশীয় শিল্প নষ্ট হয়ে গেছে। প্ল্যানিং কমিশনকে বিশেষভাবে বিচার করে দেখতে হবে।—কোন্ কোন্ কুটীরশিল্পের পুনরুজ্জীবন সত্যই সম্ভবপর। সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য, বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের যতই নিন্দা করা যাক না কেন, তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। দেশ শিল্পবিপ্লবের পূর্ব অবস্থায় ফিরে যেতে পারে না। সুতরাং পথ হল—বৃহৎ যন্ত্রের মন্দের অংশ সংযত রাখবার চেষ্টা করে যন্ত্রশিল্পের প্রসার ঘটিয়ে যাওয়া। এই মন্দাংশ কমবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনায়। তাছাড়া ভারতবর্ষের মত দেশে কুটীরশিল্পের সুযোগ সব সময় থাকবে, এবং কুটীরশিল্পের সুপরিকল্পিত বিকাশ যন্ত্রসভ্যতার গ্লানি নাশ করবে অনেকাংশে।

হরিপুরা ভাষণে আরো বহু প্রয়োজনীয় বিষয় আছে; যেমন, বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের রূপ, বৈদেশিক প্রচারের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি। রাষ্ট্রগঠনের যুগে অপর রাষ্ট্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পরিমাণে অবহিত থেকে দেশের উন্নতির প্রয়োজনে বিশ্ব-পরিস্থিতির সুযোগ ব্যবহার করেও, সুভাষচন্দ্রের মত হল, অপর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ গঠনব্যবস্থা সম্বন্ধে ভারতবর্ষের বেশী মাথাব্যথা নো, উচিত হবে না। তাঁর কাছে এ ব্যাপারে আদর্শ রাষ্ট্র রাশিয়া, যে-রাশিয়া ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে গোড়ায় জন্ম নিয়েও নিজের প্রয়োজনে ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের সঙ্গে নানাবিধ চুক্তি করেছে। এক্ষেত্রে রাশিয়ার চেয়ে অধিক বিপ্লবী হতে সুভাষচন্দ্রের বাসনা ছিলনা। বৈদেশিক প্রচার সম্বন্ধে তাঁর মূল্যবান বক্তব্য ছিল।* দীর্ঘদিন ধরে ভারতবর্ষের পরাধীনতা ভারতের নিন্দা ছেপে ইংরেজ বিশ্বজগতে রিটি করেছে। তার ফলে বিশ্বের কাছে ভারতবর্ষ একটা আজব চিড়িয়াখানা, ভারতবর্ষীয় জীবগুলিকে খাঁচার মধ্যে পুরে ইংরেজ পৃথিবীকে বিনামূল্যে দেখিয়েছে। এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজের সত্য-পরিচয় তুলে ধরা একটা বিপুল কাজ। সুভাষচন্দ্র জানতেন, পৃথিবীর অন্য জাতিরা ভারতবর্ষের রোমান্টিক প্রণয়ী নয় যে, রাগ ক'রে অভিমান ক'রে মুখ ফিরিয়ে থাকলে তারা মুখ দেখবার জন্য সাধাসাধি করবে। ভারতবর্ষকে নিজের সুন্দর সাজে দাঁড়াতে হবে। যা প্রকাশযোগ্য নয় অন্ততঃ লজ্জার খাতিরে তাকে না উদ্ঘাটিত করে যেখানে ভারত গরীয়ান, বাঙালী হতে সচেষ্ট—তার বিষয়ে প্রচার চালাতে হবে। প্রচার—'প্রোপাগাণ্ডা' নয়—সুভাষচন্দ্র বলেছেন, কারণ প্রোপাগাণ্ডার মধ্যে মিথ্যার ভাব আছে।

হরিপুরা ভাষণকে তুলে ধরলুম। আধুনিক ভারতবর্ষের প্রবেশপথের উপরে যে নির্দেশনামা লেখা হয়েছিল, তাকে যথাযথভাবে পাঠ করার যে কর্তব্য আছে সকল শিক্ষিত ভারতবাসীর—সে কর্তব্যকে সামান্যভাবে, বলা উচিত অযোগ্য ভাবে, পালন করবার চেষ্টা করা হয়েছে বর্তমান অংশে।

---

*বৈদেশিক প্রচার সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের একটি মূল্যবান রচনা (১৯৩৫ সালের শেষের দিকে লিখিত) আছে। ঐ প্রবন্ধে তিনি (১) ভারতের বিরুদ্ধে বৃটিশের প্রচারের, চেষ্টারা (২) অন্যান্য স্বাধীন বা পরাধীন জাতির প্রচারের প্রয়াস (৩) এবং বৈদেশিক প্রচারের গুণাগুণ ও ভারতের পক্ষে উপযুক্ত প্রচারের পথনির্দেশ করেছেন। তৎকালীন প্রচারকদের মধ্যে তিনি বিঠলভাই প্যাটেলের উদ্যোগ শ্রদ্ধা জানিয়ে ছিলেন। পূর্বকালের প্রচারকদের মধ্যে নামোল্লেখ করেছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর। See Speeches & Writings of Subhas Bose—J. C. Bright.

জয়শ্রীর নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্য

জয়শ্রী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক সডাকে ৯·৪০। ষাণ্মাসিক ৪·৭৫। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে হয় না।

লেখকদের জন্য

শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ সর্বাগ্রে দেওয়া হয়।

লেখা পত্রিকার হরফে ফুলস্ক্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। কারণ, হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই। কবিতা সম্বন্ধেও তাই নিয়ম।

উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়।

শক্তিশালী নূতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহযোগিতার জন্য আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কলকাতার সব স্টলে জয়শ্রী পাওয়া যায়

প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী
৩১২, গাঙ্গুলিবাগান
কলিকাতা-৪৭

আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নেতাজী

জেনারেল কাওয়াবে

[ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযানের সময়ে বার্মা ফ্রন্টে জাপানী সৈন্য বাহিনীর পরিচালনা করেন জেনারেল কাওয়াবে। সেই জাপ সেনাপতি 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও জাপান' নামে জাপানী ভাষায় একটি বই লিখেছেন। এতদিনে এই বইটি থেকে ইতিপূর্বে কয়েকটি অংশ অনুবাদ করে প্রকাশ করা হয়েছে। এই অংশটি তাঁর গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদ। এর অংশ মূল জাপানী থেকে ইংরেজীতে এবং ইংরেজী থেকে বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করেছেন যথাক্রমে বারীন বর্দ্ধন ও পবিত্রকুমার ঘোষ। ডঃ সঃ।]

১৯৪২ সালের মার্চ মাসে রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে টোকিওতে একটি সম্মেলন হয়। দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয়গণ মাতৃভূমির স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশ নেবার উদ্দেশ্যে এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন।

টোকিওর অবস্থিত জাপানের সর্বোচ্চ সামরিক কর্মীও এ বিষয়ে আগ্রহশীল হলেও স্পষ্ট কোনো নীতি তাঁরা নেননি। বার্লিনে স্থাপিত ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের (I. I. League) সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ছিল। বার্লিনে চন্দ্র বসুর কার্য-কলাপ সম্পর্কেও তাঁরা স্থানীয় দূতাবাসের মারফৎ সমস্ত খবর রাখতেন। ভারতীয় স্বাধীনতার লক্ষ্য ভারতীয়দের মধ্যে প্রচার-কার্য চালানোও ফল তাতে আশানুরূপ হয়নি; জাপানের সামরিক কর্তৃপক্ষ তাঁদের কাজের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ওপর খুব বেশি আশা রাখতেও পারেননি। চন্দ্র বসুর নেতৃত্ব প্রতিভার কথা তাঁরা জানতেন, তাঁর সঙ্গে সহযোগিতার মূল্যও তাঁরা বুঝতেন; কিন্তু প্রশ্ন হল তাঁকে ইয়োরোপ থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় কিভাবে আনা যায়— পথ ও যাত্রা যেমন বিপদসঙ্কুল, তেমনি এব্যাপারে তাড়াতাড়ি কিছু করতে পারা সম্ভবও ছিল না। প্রথমত, জার্মান সরকার সহজে চন্দ্রবসুকে নিজ নাগালের বাইরে যেতে দিতে চায়নি, দ্বিতীয়ত জার্মানী হতে দক্ষিণ এশিয়ায় আসার জলপথ, স্থলপথ বিমান পথ—কোনো পথই খোলা ছিল না। সুতরাং জাপান রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে পরিচালিত ভারতীয়দের ওপরই নির্ভর করতে বাধ্য হল। রাসবিহারী জাপানে এসেছিলেন অনেক দিন আগে, এক জাপানী পরিবারে বিবাহ করেছিলেন এবং বৃটিশ গুপ্তচরের সদাসতর্ক চক্ষুকে এড়িয়ে প্রায় গোপনেই বসবাস করতেন। ত্রিশ বছর ভারত থেকে দূরে থাকলেও তাঁর দেশপ্রেম বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। তাই জাপান যখন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল তখন তিনি সেই ঘটনাকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে ঈশ্বরপ্রেরিত সুযোগ বলে মনে করলেন। তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু তাঁর অন্তরে ছিল বিপ্লবীর তেজ ও বীর্য, বৈপ্লবিক কর্মের সুযোগ পেয়ে মনে হল তাঁর তারুণ্য আবার ফিরে এসেছে। স্বভাবিকভাবেই সর্বোচ্চ সামরিক কর্মীও হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটল, তাঁর পক্ষে জাপানীদের বুঝতে কোনো অসুবিধা ছিল না, জাপানীরাও তাঁকে সহজে বুঝতে পারত। জাপান ভারতবর্ষ হতে বৃটিশ রাজত্বের বিদায় এবং

তৎকালে ভারতের স্বাধীনতা লাভ চাইত এবং সে ব্যাপারে ভারতীয়দের সে সাহায্য করতেও প্রস্তুত ছিল; বিনিময়ে সে চাইত যে দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয়গণ তাদের যুদ্ধ ব্যাপারে কিছু সাহায্য বা সহযোগিতা করুক। তবে জাপান চেয়েছিল যে ভারতীয়গণ স্বেচ্ছায় ও স্বতপ্রণোদিত হয়ে যদি সহযোগিতার প্রস্তাব দেয় তবেই সে সহযোগিতা কার্য্য বলে মনে করবে। রাসবিহারী বসু সেই সহযোগিতার প্রস্তাবই দিয়েছিলেন—আর তাকেই বাস্তব রূপ দানের উদ্দেশ্যে টোকিও সম্মেলনের আয়োজন। এই সম্মেলনকে সুপ্রীম কম্যাণ্ড হেডকোয়ার্টার সমর্থন করে ও রাসবিহারী বসু সম্মেলনে যোগদেবার জন্য সুদূরপ্রাচ্যের বাসরত সমস্ত ভারতীয়গণকে আহ্বান করেন। সম্মেলনে নিম্নোক্ত প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকার কথা ছিল:

ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের (I. I. League) প্রতিনিধি—	প্রীতম সিং, গুহ, মেনন রাঘবন, স্বামী ও আয়ার
ভারতীয় জাতীয় আর্মির (I. N. A) প্রতিনিধি—	ক্যাপ্টেন মোহন সিং, কর্ণেল গিল ও ক্যাপ্টেন অগ্রাদ
বিদেশস্থ ভারতীয় মিশনগুলির প্রতিনিধি	ও সমাল
হংকংয়ের প্রতিনিধি	কাল

উপরোক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে স্বামী ছিলেন ব্যাঙ্কক সংস্কৃতি-কেন্দ্রের একজন নেতা, এবং প্রীতম সিং সহ আই. আই লীগের অন্য প্রতিনিধিরা ছিলেন স্বামীর পদাঙ্কানুসারী। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত টোকিও আসার পথে এক বিমান দুর্ঘটনায় স্বামী, প্রীতম সিং, আয়ার ও অগ্রাদ—এই চারজন মারা যান। বিশেষত আই. আই. লীগের নেতা প্রীতম সিং ছিলেন সেই মুহূর্তে অতি প্রয়োজনীয় একজন মানুষ।

'জান ও হোটেলে' সম্মেলনটি শুরু হয়। পূর্বেই বলেছি যে জাপান ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের প্রতিনিধিরা সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। সম্মেলনের আবহাওয়া ছিল বিমান দুর্ঘটনার শোকে ভারাক্রান্ত, কিন্তু ইংরেজের পরাজয়ে উল্লাস ও ভারতীয়দের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্কল্প সেদিন সেই শোকাচ্ছন্নতাকে প্রশমিত করেছিল। সম্মেলনে দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ার ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয়দের স্বাধীনতা-সঙ্ঘগুলিকে স্বীকৃতি দান করা হয় এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ তোজোর সঙ্গে আলোচনার পর জাপানের সদিচ্ছা সম্পর্কে নিশ্চিন্ততা প্রকাশ করা হয়। যে মাসের মাঝামাঝি সময়ে ব্যাঙ্ককে আরেকটি সম্মেলনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। উক্ত সম্মেলনের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচনের কাজও সমাপ্ত করা হয়। জাপানের পক্ষ থেকে মেজর ফুজিয়ারা এবং কর্ণেল ইশিগুরো এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের পক্ষ হতে এ ধরণের সম্মেলন ছিল এই প্রথম; তাই এতে উৎসাহ জেগেছিল প্রচুর, কিন্তু জাপানে বাসরত ভারতীয় সম্প্রদায় ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের ভারতীয়দের মধ্যে একটা চাপা মন কষাকষির ভাবও সম্মেলনে পরিলক্ষিত হয়। রাসবিহারী সম্পর্কেও একটা চাপা বিক্ষোভ ছিল না তা নয়।

ফুজিয়ারা ও ইশিগুরো এর পর জাপানের সুপ্রীম কম্যাণ্ড হেডকোয়ার্টার্স ও ভারতীয়দের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। প্রধান মন্ত্রী তোজোর ঘোষণার ভিত্তিতে জাপান সরকারের ভারত সংক্রান্ত নীতির বাস্তব রূপ দান তখনো সম্ভব হয়নি, কিন্তু ভারতকে জাপানের নিঃসর্ত সাহায্যদানের কথা সারা জগতে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়।

ইতিমধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। ৮ই মার্চ তারিখ জাপ সৈন্যদল বার্মার প্রধান সহর রেঙ্গুন দখল করে ও উত্তর ব্রহ্ম আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। ১লা মার্চ তারিখে আকাশ থেকে যে জাপ সৈন্যদল প্রবেশ করে তাদের কাছে পরাস্ত হয়ে ৯ই মার্চ তারিখে ডাচ-ইস্ট ইণ্ডিজ সৈন্যদল

আত্মসমর্পণ করে। এবং ১৩ই মার্চ তারিখে আর একটি আপবাহিনী সুবাত্রায় প্রবেশ করে। ২৫শে মার্চ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ জাপানের অধিকারে আসে।

টোকিও সম্মেলন হতে সিঙ্গাপুরে ফিরে এসেই কাপ্তেন মোহন সিং পূর্ণ উদ্যমে কাজকর্ম সুরু করেন। আই, এন, এ সংগঠনকে তিনি দৃঢ়তর করতে থাকেন। কিন্তু আই, আই, লীগ বিশেষ কর্মোদ্যোগ দেখাতে পারেনি। তার কারণ প্রীতম সিং প্রভৃতির মৃত্যু, দ্বিতীয়ত কর্ণেল ফুজিয়ারা, যিনি আই, আই, লীগকে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন তাঁর ভিন্ন ক্ষেত্রে স্থানান্তরণ। তাছাড়া নানারকম অসুবিধা সম্পর্কে হঠাৎ যেন উগ্রমাত্রায় সচেতনতা দেখা দিল এবং একটা সন্দেহ ও সংশয়ের আবহাওয়াও গড়ে উঠল।

সিঙ্গাপুরের পতনের পর বার্লিনে চন্দ্র বসু দক্ষিণ এশিয়ায় চলে আসার জন্য ব্যস্ত হলেন। তিনি মনে করলেন যে বিপদ ও বাধা যতই থাকুক দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ায় তিনি নিশ্চয়ই পৌঁছতে পারবেন। আই, আই, এল এবং আই, এন, এর কার্যাবলীর কথা সমস্তই তাঁকে জানানো হত। জাপান চন্দ্র বসুর কথা জানত, তাঁর খ্যাতি জাপানে বহু পূর্বেই পৌঁছেছিল। বিশেষত জাপান সরকারের পক্ষে যারা ভারত-সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করতেন তাঁরা অন্তর দিয়ে কামনা করতেন যে চন্দ্র বসু দক্ষি -পূর্ব-এশিয়ায় এসে স্বাধীনতা-সংগ্রাম সুরু করুন। ফুজিয়ারা এবং তাঁর পরবর্তী কালে ইশিগুরো চন্দ্রবসুর দক্ষিণ এশিয়ায় আগমনের সম্ভাবনার ওপর ভিত্তি করে ভারতীয়দের বৃহৎ কর্মোদ্যোগের একটা পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন। সুপ্রীম কম্যাণ্ড হেডকোয়ার্টার বা প্রধানমন্ত্রী তোজো অপেক্ষাও ইশিগুরো এবিষয়ে বেশি তৎপরতা দেখিয়াছিলেন। বস্তুত সেসময় জাপানে অনেকেই মনে করত যে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বই দক্ষিণ-এশিয়ার ভারতীয় গণের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু টোকিও বার্লিনের মধ্যে যে সব বার্তা বিনিময় হত তাতে চন্দ্র বসুর কথাও উল্লিখিত হতে লাগল—তিনি কি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চলে আসতে পারেন না? চন্দ্র বসু ও রাসবিহারী বসুর মধ্যে স্বার্থবোধ আদৌ ছিল না, তাই তাঁদের মধ্যে দেখা দেয়নি নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব, তাঁরা একত্রে এগিয়ে যাবার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। ভারতের স্বাধীনতার জন্যই তাঁরা উন্মুখ ছিলেন আত্মনিবেদিত, তাই তাঁরা হলেন সকলের শ্রদ্ধাভাজন।

কর্ণেল ইশিগুরো ছিলেন ভারতের স্বাধীনতার বিষয়ে উৎসাহী। মালয় যুদ্ধে একটি অগ্রগামী ডিভিশনের কম্যাণ্ডারস্বরূপে আহত হয়ে হাসপাতালে ছিলেন, সেখান হতে তাঁকে টোকিও আনা হয় এবং টোকিও সম্মেলনে তিনি যোগও দেন। ইশিগুরো প্রথম হতেই চাইছিলেন যে চন্দ্র বসু দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ায় আসুন। ইশিগুরোর নেতৃত্বে পরিচালিত একটি এজেন্সিতে একটি রাজ-নৈতিক বিভাগ যোগ হয়। ভারতের বিষয়ে গবেষকদের সেখানে নিযুক্ত করা হয়। ইশিগুরো স্থির করেন যে সেপাল শহরের বিশিষ্ট আইনজীবি রাঘবনকে কেন্দ্র করে স্থানীয় ভারতীয়দের সম্মিলিত করা যায়। আই, আই, লীগের সঙ্গে তিনি সামরিক অফিসার, জাপানী গবেষকমণ্ডলী প্রভৃতিদের সঙ্গে যোগাযোগও ঘটিয়ে দেন। আই, আই, লীগে ভারতীয় তরুণদের সামরিক শিক্ষা দান ও সাবমেরিণে করে তাদের ভারতে পাঠাবার ব্যবস্থাও স্থির হয়।

ব্রিটিশ আধিভুক্ত যে সব ভারতীয় সৈন্যরা যুদ্ধে আত্ম-সমর্পন করেছিল, তাদের নিয়ে একটি ভারতীয় সামরিক বাহিনী গঠিত হয়েছিল। তিনটি পরিখা রেজিমেণ্ট ছিল তার অন্তর্ভুক্ত। ভারতের ভিতর পাঠাবার জন্য গুপ্তচর-বাহিনীও গড়া হয়। ইংরেজবাহিনীর ভিতর গোপনে ঢুকে তাদের ভিতর ধ্বংসাত্মক কাজ চালাবার জন্যও একটি বিশেষ রেজিমেণ্ট গঠিত হয়। এই সকল বিভাগ নিয়ে গঠিত আই'

এন, এর প্রধান সেনাপতিরূপে মেজর মোহন সিংকে নির্বাচিত করা হয়েছিল।

মোহন সিং ছিলেন আই. এন. এর লোক এবং গোড়া হতেই পূর্বোক্ত ইউনিটগুলির সুপ্রীম কম্যাণ্ড হেডকোয়ার্টারে তিনি ছিলেন একজন অফিসার। তাঁর আন্তরিকতা ও কর্মোদ্যোগের জন্য তিনি ছিলেন বিশেষ সম্মানের পাত্র এবং অফিসারদের মধ্যেও তিনি ছিলেন উর্ধ্বতন। এই সব কারণেই তাঁকে প্রধান সেনাপতি মনোনীত করা হল।

প্রচার বিভাগ :—এই বিভাগের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হল বিমান হতে ইশতেহার ও প্রচারপত্র ছড়ানোর এবং সিঙ্গাপুর, পাইনাম ও রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থল হতে বেতার মারফৎ প্রচারের।

ইসিওসো একেলির প্রথম হতেই আই, আই, লীগের মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠা ও লীগকে শক্তিশালি করার দিকে মন দিল। ১৯৪২ সালের জুলাই মাস হতে সুরু করে দু'মাসের মধ্যেই এই লক্ষ্য অনেকাংশে সিদ্ধও হল। অতঃপর এই একেলির কাজ হল সামরিক বিভাগটিকে সংগঠিত করা এবং ৪২সালের নভেম্বর মাস নাগাদ সামরিক বিভাগের পুনর্গঠনের কাজ অনেকখানি এগিয়েও গেল। এই সময়ে একেলির মুখ্য কীর্তি হল যে মাসের মাঝামাঝি ব্যাঙ্ককে দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয়দের প্রতিনিধি সম্মেলন সংগঠিত করা এবং একে জনগণের সম্মেলন বলাও চলে। টোকিও সম্মেলনের প্রস্তাবানুসারেই ব্যাঙ্কক সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

১৫ই মে রাজকীয় থিয়েটার সিলভাকলের সন্নিকটবর্তী দুই হাজার বছরের পুরানো বিখ্যাত উদ্যানে এই সম্মেলনের উদ্বোধন ঘটে ; হাজার হাজার ভারতীয় সম্মেলনে যোগ দেয়। জাপানের রাষ্ট্রদূত মিঃ সুযোগাদি ছাড়াও জার্মান ও ইটালিয়ান কন্সালদলও নিমন্ত্রিত অতিথিরূপে সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন। হংকং, মালয়, বোর্ণিও, শ্যাম, আভা, ফিলিপাইনস্ প্রভৃতি অঞ্চল হতে অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ার বসবাসকারী বিশ লক্ষ ভারতীয়ের পক্ষ হতে আগত প্রতিনিধিদের সম্মেলন এই প্রথম ; এবং শুধু তাই এর, মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সঙ্কল্পবদ্ধ ছিলেন ভারতীয় সমাজের এই প্রতিনিধিগণ। রাসবিহারী বসু ছিলেন এই সম্মেলনের সভাপতি এবং তাঁর অনুপস্থিতকালে সভাপতিত্ব করেছিলেন জাপানে বসবাসকারী ভারতীয়দের প্রতিনিধি শ্রীসহায়। সমবেত প্রতিনিধিবৃন্দ প্রত্যেকে সম্মেলনে আলাদাভাবে যোগ দিলেন, তারপর জাপান সরকার, বিভিন্ন সামরিক কর্তৃপক্ষ এবং ব্যক্তিগণ যেসব অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছিলেন সেগুলিও পড়া হল। সর্বশেষে সমবেত সকলে উৎসুক হয়ে শুনল বার্লিন হতে প্রেরিত সুভাষ চন্দ্র বসুর বাণী। তিনি লিখেছিলেন : "বিদেশে আঠারো মাস অবস্থান করে আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তাতে আমি এটুকু বলতে পারি যে বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তিনটি দেশ লড়াই করছে—জাপান, জার্মানী ও ইটালী। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম আমাদেরই উদ্যাপন করতে হবে। আমরা যারা ভারতীয় অগ্রগামীর দল, আমরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে অস্ত্র ধারণের আবশ্যকতায় বিশ্বাস করি। ভারতের স্বাধীনতার অর্থ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিতাড়ন—আর আমাদের বন্ধুদেশ জাপানেরও সেই একই লক্ষ্য। আমাদের এই মহতী সম্মেলনের সাফল্য আমি প্রার্থনা করি ; আমাদের জয়লাভের পথে এই সম্মেলন একটি পদক্ষেপ।"

সম্মেলনের শেষে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের কার্যকরী সমিতির সদস্যদের নির্বাচিত করা হয়। জাপানের ভারতীয়দের প্রতিনিধি রাসবিহারী বসু, আই, এন, এর প্রতিনিধিদের ক্যাপ্টেনমোহন সিং ও কর্ণেল জিলানী, মালয়ের প্রতিনিধি রাঘবন ও যেনন—মোট এই পাঁচজন সদস্য নির্বাচিত হন এবং রাসবিহারী বসুকে সমিতির সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। সম্মেলনের সিদ্ধান্ত হয় যে আই, আই, এল গঠিত হবে,

নিম্নোক্ত বিভাগগুলিসহ, যথা, লোকবিনিয়োগ পরিষদ, প্রতিনিধি পরিষদ, আঞ্চলিক পরিষদ, আঞ্চলিক শাখা; এগুলির মধ্যে প্রতিনিধি-পরিষদের ওপরেই কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব বর্তায়। এই পরিষদে জাপান, ফিলিপাইন, থাইল্যাণ্ড, ইস্ট ইণ্ডিজ, ব্রহ্মদেশ, মালয়, করাণী ইন্দোচীন, হংকং, ক্যান্টন, ম্যাকাও, আন্দামান প্রভৃতি অঞ্চলের চল্লিশ জন প্রতিনিধি ও সৈন্যদলের চল্লিশ জন প্রতিনিধি স্থান পান। আরও স্থির হয় যে, প্রধান কার্যালয় থাকবে ব্যাঙ্ককে এবং ইণ্ডিয়া আপিস কুয়ালাও স্থানান্তরিত হবে শ্যামে।

সম্মেলনের পর তিন দিন ধরে গোপন বৈঠক বসেছিল। সেই বৈঠকে বাইটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবগুলি জাপান সরকারের নিকট প্রেরিত হলে তাঁরা যথাসম্ভব শীঘ্র উত্তর দেন। একটি প্রস্তাবে স্বাধীন ভারতে সরকার স্থাপনের উদ্দেশ্যে জাপান সরকারের নিকট টাকা ধার চাওয়া হয়। জাপান সরকার তাতে রাজি হন। ভারত স্বাধীন হলে ঐ টাকা শোধ দেওয়া হবে, এই ছিল ঋণের শর্ত। সমান মর্যাদার ভিত্তিতে জাপানের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে আই. এন. এ যোগাযোগ রেখে চলবে এবং পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সন্তোষজনক ভাবে যেসব বিষয়ের মীমাংসা করা সম্ভব সেই সব বিষয়ের একটি তালিকা প্রণয়ন করা হবে বলেও স্থির হয়। কিন্তু জাপান সরকার তাঁদের দ্রব্যাদি সরবরাহের প্রাক্‌শর্ত হিসাবে কয়েকটি প্রশ্ন করে পাঠালেন এবং তার উত্তর চাইলেন। প্রধানমন্ত্রী তোজোর মতো উচ্চ ক্ষমতায় আসীন জাপানীদের মনে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রিত করার ইচ্ছা ছিল এবং তা বুঝতে পেরে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ খুব অস্বস্তির মধ্যে পড়েন ও অসন্তুষ্ট হন। জাপানী কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতার এই অভাব ভারতীয়দের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি করায় তাদের আন্দোলনের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। জাপান ও ভারতের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা স্থাপনের ব্যাপারেও এতে বাধা সৃষ্টি হয়।

১২ আগস্ট তারিখে সোনানে নিখিল মালয় ভারতীয় সঙ্ঘের আই. আই. এল ২৫,০০০ সদস্যকের এক সম্মেলন ঘটে। ১০ই এপ্রিল রেঙ্গুনেও আই. আই. এল-এর ব্রহ্মদেশস্থ শাখার সমর্থকদেরও আর একটি সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এই সব সম্মেলনে ব্যাঙ্কক সম্মেলনের প্রস্তাবের প্রতিই আনুগত্য জানানো হয়।

দিল্লী হতে বেতার মারফৎ ইংরেজরা দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয়দের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে জাপানের দ্বারা পরিচালিত বলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করে, কিন্তু তাতে ফল বিশেষ কিছু হয়নি। কিছুদিন পর ভারতের ভিতরেই জ্বলে উঠল আগুন, ইংরেজের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের লড়াই নিল এক ভয়াবহ রূপ।

ব্যাঙ্কক সম্মেলনের পর দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয়দের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। তাদের মধ্যে বিরোধ তবু গেলনা। রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে একটি অস্থায়ী সরকার গঠিত হল। মোহন সিং হলেন সেই অস্থায়ী সরকারের সৈন্যবিভাগের নায়ক। রাসবিহারী ও মোহন সিংয়ের সঙ্গে বিরোধ বাধার পরিণামে শেষে এমন রূপ নিল যে মোহন সিংকে গ্রেপ্তার করে পাবার দ্বীপে অন্তরীণ অবস্থায় রাখা হয়। সিঙ্গাপুরের পতনের পর মোহন সিং মুক্ত হন ও আই. এন. এর প্রধান নায়কের পদটি ফিরে পান। কর্ণেল গিলেরও ঘটেছিল অনুরূপ অবস্থা। এই সব ঘটনার মধ্যে জাপান সরকারের আন্তরিকতার অভাব ও দ্বৈত নীতির অনেকখানি প্রকট হয়ে পড়ে। রাসবিহারী যেমন নিঃস্বার্থ ভাবে আমৃত্যু দেশসেবা করেছেন, মোহন সিংও তেমনি তাঁর স্বকেন্দ্রিকতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের আন্তরিকতা ও শত চেষ্টা সত্ত্বেও কাজ যথাযথভাবে এগোচ্ছিলনা এবং পুনরায় গোলযোগ বাধার সম্ভাবনাও ছিল। তাই সকলে মিলে সুভাষচন্দ্র বসুকে আহ্বান জানালেন ভারতীয়দের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করতে। অবশেষে যখন তিনি এলেন তখন সকল ভারতীয়ের চক্ষু নিবদ্ধ হল তাঁর প্রতি। রাসবিহারী বসু সুভাষচন্দ্র বসুকে দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ায় নিয়ে আসার প্রসঙ্গে বলেছিলেন: "আমরা সকলে সম্মিলিতভাবে যা করতে পারবোনা সুভাষচন্দ্র একা তা পারবেন; ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বার্থে তাঁকে এশিয়ায় নিয়ে আসতেই হবে। এবং তিনি এলে আমার সমস্ত ভার আমি তাঁর ওপর ছেড়ে দেবো।" পরে সুভাষচন্দ্র বসু হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন প্রশান্ত মহাসাগরীয় মহাযুদ্ধের কেন্দ্রপুরুষ।

রবীন্দ্রনাথের চক্ষে বিপ্লবী তরুণ

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

"অমৃতের পুত্র মোরা"—কাহারা শুনালো বিশ্বময়।
আত্মবিসর্জন করি আত্মারে কে জানিল অক্ষয়।
ভৈরবের আনন্দেরে
দুঃখেতে চিনিল কে রে,
বন্দীর শৃঙ্খলছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়।
বঙ্গসাহসিক রাজবন্দীদের প্রতি (১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮)

সন্ধ্যাবেলায় উদয়নের চত্বরের দক্ষিণ পূর্বকোণে আবছা আলো-অন্ধকারে রবীন্দ্রনাথ বসে আছেন। আচার্য ক্ষিতি-মোহন সেন মহাশয়, শিশু (লেখক) সহ সেখানে নিঃশব্দে আসন গ্রহণ করলেন।

কবি দেশকর্মীদের দুঃখবরণের কথা তুললেন,। তারপর কতকটা যেন নিজের মনেই বলে চলেন—"তাদের সঙ্গে এদের তুলনা হয় না। সে কী সহ্য শক্তি! কী আশ্চর্য মনোবল! সে যে না দেখেছে সে বুঝবে না।"

সেকালের বিপ্লবীদের এবং একালের অহিংস যজ্ঞে কর্মীদের নির্যাতনের প্রসঙ্গে তিনি ঐ মন্তব্য করলেন। তিনি যেন স্বয়ং অনেক কিছুই প্রত্যক্ষ করেছেন—এমন ভাবে কথা বলছিলেন।

আচার্য যেখানে নীরব শ্রোতা সেখানে তাঁর অন্তেবাসী আমি প্রশ্ন করবো কি! অবাক বিস্ময়ে শুনে গেলাম।

১৯৩১ সালের অক্টোবর মাস। রবীন্দ্রনাথের শরীর তখন ভাল যাচ্ছিল না। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য তিনি ধলিলিদ যাবেন মনস্থ করেছেন—এমন সময় (১২ই অক্টোবর) হিজলীর বন্দী শালায় 'কলঙ্ক রাত্রিমাঝে' "নিঃসহায়ে" তরুণদের উপর শেতাঙ্গ প্রহরীদের গুলিচালনা। দুজন বন্দী নিহত এবং অনেকের আহত হবার সংবাদ এলো।

সে রাত্রে রবীন্দ্রনাথ ঘুমুতে পারেন নি। সকালে বলেন —"সমস্ত রাত বুকের উপর কে যেন হাতুড়ি পিটেছে! একী অত্যাচার। নিরস্ত্র নিঃসহায় বন্দীদের রাত্রির অন্ধকারের আবরণে এমনি করে হত্যা! এ কী বর্বরতা!"

অসুস্থ শরীরেই তিনি কলকাতা গেলেন। সেখানে মহাদানের বিরাট জনসমাবেশে তিনি তাঁর অন্তরের বেদনা প্রকাশ করলেন। দেশশাসকের প্রতি তাঁর ধিক্কার জানালেন।[১]

---

১ এই সময় এক ইঙ্গ-ভারতীয় পত্রিকায় শেতাঙ্গ প্রহরী (warder) দের উপর সহানুভূতি প্রকাশ করা হচ্ছিল। পত্রিকার বক্তব্য—এইসব বন্দী ছোকরার দল প্রহরীদের স্নায়ুর উপর ক্রমাগত এমনি চাপ দিচ্ছিল যে তাদের ধৈর্য রক্ষা করা অসম্ভব হয়েছিল। হাজার হোক—তারা মানুষ তো (They "certainly cannot be expected to retain judicial calm")!

Statesman পত্রিকায় (শ্রীঅমল হোমের মাধ্যমে) রবীন্দ্রনাথ (২রা নভেম্বর) একখানা প্রতিবাদপত্র পাঠান। সেই পত্র সম্পাদক Sir Alfred Watson ফেরত পাঠান।

তাঁর সেই অন্তরের আবেগ যে-অনুপম ভাষায় যে-অপূর্ব ভঙ্গিতে পরে কাব্যরূপে নিষ্পন্দিত হয়—তা এখানে উল্লেখযোগ্য :

ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত, পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে,
তারা বলে গেল 'ক্ষমা করো সবে', বলে গেল
'ভালোবাসো—
অন্তর হতে বিদ্বেষ-বিষ নাশো।'
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ-নমস্কারে।

আমি-যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে,
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী-নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি-যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সঙ্গীতহারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে,
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?

পৌষ, ১৩৩৮ (১৯৩১-৩২)

সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয়বার কংগ্রেস-সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার সময়কার কথা।

আচার্য বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় এসেছেন কলকাতা থেকে। অপরাহ্ণে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। আমাকে সঙ্গে নিলেন।

কবির কাছে গিয়েই চোখে পড়লো—সেদিনকার খবরের কাগজ তাঁর হাতে। শাস্ত্রীমহাশয়কে দেখেই বললেন—"আজ মন বড় ব্যথিত। সুভাষের জয়কে মহাত্মাজী বলেছেন—তাঁর পরাজয়—"my defeat।"

"সুভাষ তাঁর পুত্রের মত। তার জয়কে তিনি নিজের পরাজয় মনে করেন কেমন করে?..

"আমার শ্রদ্ধার আসন থেকে তিনি যেন আজ অনেকটা নেবে গেলেন[২]।"*

---

২ নানা মতভেদ সত্ত্বেও মহাত্মাজীকে তিনি যে কী শ্রদ্ধা করতেন—যাঁরা তাঁর অন্তরঙ্গ তাঁরা জানেন। তাঁর বহু রচনার মধ্যেও তা প্রকাশিত ("মহাত্মা গান্ধী"—রবীন্দ্ররচনাবলী-শতাব্দীসংস্করণ; ১১শ খণ্ড, ৪৪৩-৬৪পৃঃ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং তাঁর সেদিনের সেই বেদনা, সহৃদয়-সংবেদনীয়।

নেতাজী ও হিটলারের সাক্ষাৎকার

ডাঃ অশোককুমার মজুমদার

নেতাজী ১৯৪১ জানুয়ারী মাসে ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন ও আফগানিস্থান হইয়া রাশিয়ায় পৌছান। কিন্তু রাশিয়ায় সময় নষ্ট না করিয়া জার্মানিতে যান এবং সেখানে উপযুক্ত সম্মানের সহিত জার্মান সরকার কর্তৃক গৃহীত হন। এই সকল ঘটনা সুবিদিত, সুতরাং বিস্তৃত বিবরণের প্রয়োজন নাই। যাহা হউক, নেতাজীর এই সময়ের কার্য্যাবলী আলোচনা করিলে স্বতঃই এই প্রশ্ন মনে হয় যে জার্মানির সহিত কি তাঁহার পূর্ব হইতেই কিছু যোগাযোগ ছিল? না থাকিলে তিনি জার্মানিতেই গেলেন কেন? রাশিয়া তখনও ইংরাজের পক্ষে ছিল না, সুতরাং Third International-এর কেন্দ্র রাশিয়াতে কিছুদিন কাটাইয়া, রুশ সরকার কি করে তাহাও দেখিতে পারিতেন।

সুতরাং সহজেই মনে করা যাইতে পারে যে দেশত্যাগ করিবার পূর্বেই নেতাজী জানিতেন যে জার্মান সরকার তাঁহাকে সাহায্য করিবেন। এ বিষয়ে কিছু প্রমাণ অন্যত্র দিয়াছি। কিন্তু নেতাজী যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য ইউরোপে ছিলেন, তখনই তাঁহার সহিত হিটলারের দেখা হয়, এ বিষয়েও ভাল প্রমাণ আছে।

অটো জারেক (Otto Zarek) তাঁর আত্মজীবনীতে নেতাজীর সহিত হিটলারের সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সেই বর্ণনা দিবার আগে জারেক সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

১৮৯৮ সালে জারেক এক মধ্যবিত্ত জার্মান ইহুদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদান করিতে পারেন নাই, কিন্তু ঐ সময়েই Charles V-এর উপর এক নাটক লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। কিছুদিন পরে এই নাটক বার্লিনে তৎকালীন জার্মানীর শ্রেষ্ঠ Producer Max Reinhardt মঞ্চস্থ করেন। ফলে জারেক Munich থিয়েটারে সহকারী Producer-এর পদ পান। দুর্ভাগ্য বশতঃ Munich-এই Naziদের প্রথম অভ্যুত্থান : ইহুদিদের প্রতি নাজিদের ব্যবহার দেখিয়া জারেক ভিয়েনায় চলিয়া যান। ভিয়েনাতেই নেতাজীর সহিত জারেকের পরিচয় হয়।

পরে জারেক ভিয়েনা ত্যাগ করিয়া বুডাপেষ্টে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। সেখানে ঐতিহাসিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করার ফলে ইংলণ্ডে এক পুস্তক প্রকাশকের আহ্বানে আসেন এবং সেখানেই স্থায়িভাবে বসবাস আরম্ভ করেন।

জারেক যে সময়ে ভিয়েনাতে ছিলেন, সে সময় ভিয়েনার একটি বিশেষত্ব ছিল, কাফে। পণ্যমান্য বিশিষ্ট প্রত্যেক লোকেরই একটি কি দুইটি নির্দিষ্ট কাফেতে যাতায়াত ছিল; সেই কাফেতে তাঁহারা কেবল চিঠিপত্র লিখিতেন না, কেউ কেউ গ্রন্থ রচনাও করিতেন। অবশ্য কাফের মালিক এবং waiter সর্বতোভাবে সাহায্য করিত বলিয়াই ইহা সম্ভব ছিল।

একই কাফেতে যাহারা যাইতেন, তাঁহাদের মধ্যে পরিচয় হইত, অনেক সময় বন্ধুত্বও হইত। এইভাবে জারেকের সহিত ঐতিহাসিক Rene Fulop-Muller এর সহিত পরিচয় হয়।

ইহার পরের ঘটনা কায়েকের ভাষায় বলাই ভাল। তাঁহার লিখিতেছেন :

"But before I left for Budapest –not knowing that I would decide to stay there for some years—I saw a good deal of my friend Fulop-Muller. He was a veritable living encyclopædia ; he had a passion for historical fact, and, unlike many of his colleagues, he was never guilty of the slightest inaccuracy in order to 'dramatize' the story he had to tell. This love of correctness was also inherent in everything he said, and I remember the many discussions I had with him were the most exciting and interesting things that happened to me in Vienna.

One day he asked me to lunch to meet an important foreign friend of his. I was rather surprised to find this foreigner an Indian, a rather small man with sharp features. He looked ill, but his eyes glowed like living coals. His name was Sandra Bose ; in his younger days he had been Mayor of Calcutta, but he disagreed with British policy as well as with Gandhi's attitude and had consequently thought it better to leave his country. He had come to Vienna to undergo an operation, apparently of a serious nature. For many weeks he stood on the danger list at the hospital. I visited him quite often, thinking he was lonely. Only a few Indians, young men, obviously scholars seemed to be on intimate terms with him.

Ill though he was, he would always discuss European politics with me, and with astonishing insight. He knew all about the economic and social structure, the history and traditions of the various countries ; diverse national characteristics were no bar to his understanding. A European could not have known more about Europe. He also spoke vividly about India, and for the firsttime in my life I learned something of the problems of the Far East as seen by a cultured Oriental. But there was one point upon which neither Fulop-Miller nor I could sympathise with him : his implacable hatred of the British. In vain I asked him what would have happened to his country if the British had not taught the Indians the rudiments of modern civilization. He answered that India did not need modern civilization and ought to be satisfied with her own genuine culture which was old and deep and suited to the best instincts of the people. No matter what I said in defence of the British, he always disagreed. But he never ceased smilling and politely answered every question—and there were many questions I put to him.

One day soon after he had recovered from his illness, he disappeared. Both the Attache and Imperial * seemed quiet to me now that he and his young friends had gone. Two weeks passed, then he suddenly entered the smoky room of the Attache, smiling and merry as ever.

'Where was I ? In Berlin, you know. I met Hitler.'

This was news, indeed. I expected him, the representative of Indian youth, to say the worst of Germany and the Nazis. But I was

---

* দুইটি কাফের নাম।

wrong. Almost everything in the Reich had pleased him enormously. How this man Hitler had worked to prepare the 'resurrection' of Germany !

'What kind of a resurrecion ?' I couldn' t help asking.

'The war, of course ! The war with Britain. He has no wish but that, and he is the man to get what he wants.'

It was this that made him friendly towards the Nazis : their goals were the same, war with Britain He seemed non-committal concerning the persecution of the Jews which was then the main form of suppression in Germany.

'You want to fight for what you call the freedom of your race, and yet you can agree with one who oppresses other races ?' I asked.

It was the first time in our many conversations that he was at a loss for an answer.

'Anyhow,' he said at last, 'Hitler is our natural ally. And he knows it. I put before him detailed plans for an agreement between Germany and the Indian Free State which is to come into force when we gain our freedom. He is studying the project. We shall get his support when we revolt.'

Soon afterwards he left for India. He was certainly a remarkable personality ; I feel sure he will have his part to play in the future.

But I should like to hear his opinion on Hitler to-day."

Otto Zarek (with the assistance of J. Eastwood) : German Odessey ; Jonathan Cape, London : First Published, April. 1941 ; 2nd Impression July 1941 : p p. 202 05.

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·৩০
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	১·২৫
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.

বিদ্যাসাগর	২·২৫
মানুষের মত মানুষ	·৭৫
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা—১২

: উপন্যাস :

কণ্ঠ ভরা বিষ

মিহির মুখোপাধ্যায়

। চৌদ্দ ।

বাঁকা নদীর কূলে বর্ধমান শহর। বাংলা দেশে তখন চারঘর জমিদারের খুব নাম-ডাক, প্রভাব প্রতিপত্তি। নাটোর, নদীয়া, বিষ্ণুপুর, বর্ধমান।

বর্ধমানের জাঁকজমকের অন্ত নেই। নানা ধর্মের, নানা বর্ণের মানুষ, মানুষের মেলা। এতবড় শহর এই প্রথম দেখল ভারত। রঘুনাথের মুখেও কোন কথা নেই।

প্রভু-ভৃত্য দু'জনেরই সমান অবস্থা। ভুরশুট থেকে রওনা হবার পর একরাত পথে কাটিয়ে পরের দিন যখন বর্ধমান পৌঁছুল, তখন অপরাহ্ণ বেলা।

কুলপুরোহিত গোবর্ধন ভট্টাচার্যের গুরুভাই নন্দলাল চক্রবর্তী বর্ধমানের লোক।

রাজসরকার থেকে কিছু ব্রহ্মোত্তর জমি ভোগ করেন। শহরের উপকণ্ঠে কতগুলা পাকা দালান, আর কয়েকখানা বড় বড় মাটির ঘর নিয়ে চক্রবর্তী মশাইর বসত বাড়ি।

আগেই খবর দিয়েছিলেন চতুর্ভুজ রায়। বর্ধমান এলে তিনি দু'চারদিন চক্রবর্তী মশাইর অতিথি হন।

সন্ধ্যার মুখে ভারতের পাল্‌কি এসে চক্রবর্তী-বাড়ির বাইরের উঠোনে থামল।

আদর-অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি নেই মহাসমাদরে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন চক্রবর্তী মশাই। বর্ধমানের মহারাজ কীর্তিচাঁদ বীর্যবান পুরুষ। জমিদারীর সীমানা বাড়াবার জন্ত সবসময় সচেষ্ট। সুযোগ পেলেই হ'ল। বাহুবল কিম্বা কূটকৌশল। যখন যেখানে যেমন প্রয়োজন। বাহুবলে অনেক পরগণা দখল করেছেন। ছাতুয়ান, ভুরশুট, বরদা। ঘাটালের কাছে চন্দ্রকোণা আর বরদা'র রাজার সঙ্গে লড়াই করে নিয়েছেন কীর্তিচাঁদ। বলাগড়ের রাজারও কয়েকটা জমিদারী কেড়ে নিয়েছেন। বাপ-ঠাকুরদার আমলে অনেক বিপদ-আপদ সহ্য করতে হয়েছে বর্ধমান রাজ-পরিবারকে। সেই ক্ষয়-ক্ষতি পুষিয়ে নেবার জন্ত যেন উঠে পড়ে লেগেছেন কীর্তিচাঁদ।

এমন মানুষকে খুশি রাখা সহজ নয়। সঙ্গে আছেন আবার দেওয়ান রাজবল্লভ। সদাশিব রায়ের ছোটভাই রাজবল্লভ রায়। সম্পর্কে নরেন্দ্রনারায়ণের কাকা, ভারতচন্দ্রের ঠাকুর্দা। একে গুরুজন, মান্যব্যক্তি, তার আবার ক্ষমতাবান লোক।

বিনীতভাবে প্রণাম করে দাঁড়িয়েছিল ভারত। রাজবল্লভ রায় কিন্তু বসতে বললেন না। ফরাসের ওপর তাকিয়া ঠেস দিয়ে পড়গড়া টানতে টানতে বললেন—ওঃ তুমিই নরেনের ছোট ছেলে, তুমি আসবে আমি জানতুম, কিন্তু এসব কাজ পারবে কি, বড় কঠিন জায়গা—

একটু সময় চুপ করে আবার বললেন—তুমি তো ছেলে মানুষ, তাই ভাবছি

—আপনার আশীর্বাদ পেলে, সাহায্য পেলে, পারবো না কেন—মাথা নিচু করে জবাব দিল ভারত।

রাজবল্লভ রায় একটু হাসলেন—নরেন তো আমাকে বিশ্বাসই করে না, তার ধারণা, আমিই বুঝি মহারাজার কাণে তার নামে নানা রকম লাগাই, যাকগে সেসব কথা, কই দেখি তোমার আম-মোক্তারনামা।

কাগজ-পত্র বার করে দেখাল ভারত। সব দেখে শুনে আবার সেই পুরণো কথার রেশ টেনে বললেন রাজবল্লভ রায়—আসল কথা কি জানো, নরেন বড়ো ধার্মিক আর বলতে নেই বেশ বদরাগী, তোমার হয়তো শুনতে খারাপ লাগবে, কিন্তু রাজবল্লভ রায় সত্যি কথা বলতে কারো মুখ চেয়ে বলে না—রোগা চেহারা, গায়ের রং খুবই ফর্সা, চোখের রং কটা, শাদা পোঁফ, কামানো গাল একটু তোবড়ানো, বয়সের রেখা, গায়ে চোগা-চাপকান, মাথায় শামলা। কেমন বিমুনিভাব চোখে, বোধহয় অক্ষিগোলকের নেশা আছে। বয়স অনুমান সত্তরের এদিক-ওদিক। কথার ভঙ্গি, চোখের ভাব, মুখের হাসি—সমস্ত যেন ধূর্তামির ছবি। দেখে দেখে শৃগালের উপমা মনে হচ্ছিল ভারতের। দেওয়ানজীর বাড়িতে এসেছে ভারত। তখন শেষ বেলা। আগের দিন সন্ধ্যায় বর্ধমান পৌঁছেছিল। কখন এসেছে, কোথায় উঠেছে, সঙ্গে কে আছে, সব বলতে হলো ভারতচন্দ্রকে। রাজবল্লভ রায় খুটিয়ে খুটিয়ে জিজ্ঞেস করে সব জেনে নিলেন। তারপর কিছুক্ষণ গড়গড়া টেনে বললেন—ও তুমি নন্দ-পণ্ডিতের ওখানে আছো, বেশ ভাল কথা—আবার কিছু সময় গুড়ুক গুড়ুক শব্দ করে গভীর ভাবে কি যেন ভেবে নিয়ে বললেন—একটা কথা কি জানো, তুমি যেখানে রয়েছো অনেকটা দূর হয়ে যাচ্ছে, তোমার রোজ কাছারিতে আসা দরকার, মহারাজ কখন ডেকে পাঠাবেন ঠিক নেই, তাই বলছিলাম অতটা দূরে না থেকে তুমি বরং শহরের মধ্যে চলে এসো—আরো একটু কাল তামাক টেনে, শেষে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—সেই ভাল হবে, আমি না হয় একটা বাসা ঠিক করে দেব, আমার চেনাশোনা এক ধনী ব্যবসায়ী আছেন, তাঁর দু'তিনখানা বাড়ি, ইচ্ছা করলে তার একখানি ভাড়া নিয়ে থাকতে পারবে তুমি, অবশ্য অতবড় গোটা বাড়িতে তোমার দরকার কি, একটা অংশ ভাড়া নিলেও হবে, তোমার সঙ্গে লোকজনতো আর বেশি নেই, তবে তুমি হলে ভূরশুট রাজবংশ, আমাদের বংশের ছেলে, তেমনভাবে যদি থাকতে চাও—

—আজ্ঞে না, রাজসিক আড়ম্বরের প্রতি আমার কোন অনুরক্তি নেই—বিনীত ভাবে আপত্তি জানাল ভারত—তেমনভাবে আদি থাকতেও অভ্যস্ত নই—

—আচ্ছা বেশ তুমি যা বলবে তেমনি ব্যবস্থাই হবে। আমি সব ঠিক করে দেব, আমার আবার রাজবাড়ি যাবার সময় হ'ল—বলতে বলতে করাস থেকে উঠলেন রাজবল্লভ রায়—আচ্ছা ভাই এসো, আবার দেখা হবে—প্রণাম করে বাইরে এল ভারত। একটু বাদেই রাজবল্লভ রায়ের পালকি ছুটল রাজবাড়ির দিকে। ভারতও রওনা হ'ল নন্দলাল চক্রবর্তীর বাড়ির পথে। যাবার আগে অবশ্য শহরের পথ ঘাট দোকান-পাট একটু ঘুরে ঘুরে দেখে যাবে। দেওয়ানজীর পালকি ভারতের পাশ দিয়েই বেরিয়ে গেল। সকাল-সন্ধ্যা দু'বেলা রাজবাড়ির কাজ।

সকালে দরবার বসে, কাছারির কাজকর্ম হয়। খুব সকালে উঠে রাজবাড়ি যেতে হয়। দুপুরে বাড়ি ফেরেন রাজবল্লভ রায়। আবার সন্ধ্যাবেলা যান। সে সময় মহারাজার খাস কামরায় পরামর্শ সভা হয়। সারাদিনের কাজকর্ম, খবরাখবর মহারাজকে বুঝিয়ে দিতে হয়। নানাবিধ হুকুমনামায় সই করেন, পাঞ্জা দেন, মহারাজ।

তারপর কোন কোনদিন অনেক রাত অবধি নাচগানের আসর বসে। সে সময় অবশ্য থাকেন না দেওয়ানজী। সেখানে ছেলে-ছোকরাদের মজলিশ, মহারাজার ইয়ারবক্সীদের, আড্ডা। এসব বিবরণ অনেকদিন ধরে অল্প অল্প করে দেওয়ানজীর খাস-মুনশী বক্সীপদর মুখে শুনেছিল ভারত।

৫ পনেরো ৫

দেওয়ানজীর সঙ্গে দেখা করে ঘরের দিকে ফিরছিল ভারত। ফেরার পথে ঘুরে ঘুরে শহর দেখছিল। ঘুরতে ঘুরতে কৃষ্ণসাগর দীঘির কাছে এল। অপরাহ্ণ বেলা। দীঘির কালো জলে বিকেলের আলো।

মহারাজ কীর্তিচাঁদের পিতামহ রাজা কৃষ্ণরাম এই বিশাল দীঘির প্রতিষ্ঠাতা। অদৃষ্টের কুটিল খেলায় হার-জিত, ভাল-মন্দ, সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য—দুটোই সমান ভাবে এসেছিল কৃষ্ণরামের জীবনে।

আলমগীর বাদশাহের অনুগ্রহ পেয়েছিলেন রাজবংশের চতুর্থ পুরুষ রাজাকৃষ্ণরাম। আবুরায়ের প্রপৌত্র, বাবুরায়ের পৌত্র, ঘনশ্যামরায়ের পুত্রকে প্রায় তিরিশটি নতুন পরগণার অধিকার আর চৌধুরী উপাধি দান করেছিলেন দিল্লীর সম্রাট আবুলফজল মহম্মদ মুহিউদ্দীন আলমগীর বাদশাহ গাজী।

বাদশাহর ফরমানে লেখা ছিল—বঙ্গদেশের সুবার এলকাধীন, পরগণে বর্ধমান ও পরগহার জমিদারী চৌধুরাই বাবুর পৌত্র কিষণরামকে প্রদান করিলাম। কৃষিকর্মের প্রতিবিধান, প্রজাগণের সহিত সদ্ভাব স্থাপন, কোন প্রকার নতুন কর গ্রহণ না করা এবং নিকটবর্তী এলাকায় কোন প্রকার অত্যাচার না হয়, সেই দিকে বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখাই তাহার কর্তব্য। সরকারের প্রাপ্য দুইলক্ষটাকা নজরানা, ধার্য কিস্তি অনুসারে উল্লিখিত সুবার তোষখানায় প্রদান কর্তব্য।

শাহানশাহ আওরঙ্গজেব আরো হুকুম দিলেন—বর্তমান ও ভাবী হাকিম, কানুনগু ও মুৎসুদ্দিগণের কর্তব্য যে, ইহাকেই ঘরের পরগণার জমিদার ও চৌধুরী বলিয়া মান্য করেন এবং ইহার জন্য প্রতি বৎসর নতুন সনদ দাখিল করিতে না বলেন।

ফরমানে তপসিল মহাল হিসেবে উল্লেখ ছিল, সরকার সরিফাবাদ এলেকা পরগণে বর্ধমান ও পরগহা—পরগণা সাহাবাদ, সুজাপুর, বাঘা, রেকাবিবাজার, বাজারইব্রাহিমপুর, আজমতসাহি, সুখারপুর।

সরকার সলিমাবাদ, পরগণা সাহাপুর, মালঞ্চপুর, চৌমহা, হাসাতপুর। পরগণা লক্ষ্মীপুর, ঘনশ্যাম, বাগদাইনা।

সরকার মন্দারণ, পরগণা সেনপাহাড়ি, ধানজুড়ি, আমিরাবাদ, পরগণা শেরগড় ও সলিমপুর, আমিরপুর।

সরকার গোয়ালভুম, পরগণা আজমপুর, মহাল সাহপুর, মানিয়াকুড়ি, সুখানগরী, জাঁহাবাদ। এতগুলি পরগণার অধিকার পেয়ে বর্ধমানরাজের ক্ষমতা বেড়ে গেল চতুর্গুণ।

আশপাশের জমিদার, তালুকদার, ইজারাদারেরা ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন।

তাদের আতঙ্ক আর ঈর্ষার কেন্দ্র হলেন কৃষ্ণরাম।

কে জানে, হয়তো আরো পরগণা দখল করে নিতে চাইবেন, হয়তো বাদশাহের হুকুমে ঢাকার সুবেদার ইব্রাহিম খাঁ কিম্বা হুগলীর ফৌজদার লোক লস্কর পাঠাবেন কৃষ্ণরামকে দমন দেবার জন্য। সেই অন্ধকার মধ্যযুগের স্বাভাবিক নিয়মেই গোপন পথে ষড়যন্ত্র শুরু হল। নায়ক তিনপক্ষ। চেতুয়া বরদা পরগণার জমিদার শোভা সিংহ, বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহ, চন্দ্রকোণার জমিদার রঘুনাথ সিংহ।

গোপন খবর চালাচালি শুরু হল। অনেক শলা-পরামর্শ হ'ল। কিন্তু কেউই একা-একা কিম্বা একসঙ্গে আলমগীর বাদশাহের অনুগ্রহভাজন বর্ধমান রাজের মোকাবিলা করতে সাহস পেলেন না। শেষ পর্যন্ত অগ্রণী হলেন শোভা সিংহ। বিষ্ণুপুর আর চন্দ্রকোণা রইল নেপথ্যে। উড়িষ্যা থেকে পাঠান-সর্দার রহিম খাঁকে আমন্ত্রণ করে আনলেন শোভা সিংহ। রতনে রতন চেনে। একদিকে যেমন ক্রূর ও হিংস্র প্রকৃতি আরেক দিকে তেমনি চরিত্রহীন, লম্পট বলে কুখ্যাতি ছিল শোভা সিংহের। আর সুযোগসন্ধানী, উচ্চাভিলাষী, বেপরোয়া দুর্দান্ত প্রকৃতির পাঠান-সর্দার রহিম খাঁ।

দুই দোস্ত মিলে আক্রমণ করলেন বর্ধমান। অপ্রস্তুত কৃষ্ণরাম পরাজিত হলেন। কোনদিক থেকে কোন সাহায্য পাবার সম্ভাবনা ছিল না, সময়ও ছিল না।

আশ্চর্য, এমন কি কাছাকাছি হুগলীর ফৌজদারের কাছ থেকেও কোন সাহায্য এল না। সেদিন পৌষমাসের অমাবস্যা। এই কৃষ্ণনগরের দীঘির কিনারায় বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হলেন রাজা কৃষ্ণরাম। অমাবস্যার অন্ধকারে ডুবে গেল বর্ধমান।

রাজকুমার অনন্তরাম কোনরকমে প্রাণ নিয়ে পালালেন; পালিয়ে গেলেন সুবে-বাংলার রাজধানী জাহাঙ্গীর নগর ঢাকার পথে আশ্রয়ের আশায়, সাহায্যের সন্ধানে।

নালিশ জানালেন তাঁদের সুবার দণ্ডমুণ্ডের মালিক দিল্লীর বাদশাহের প্রতিনিধি সুবেদার ইব্রাহিম খাঁর কাছে। কিন্তু সত্তর বছরের বৃদ্ধ সুবেদার বিশেষ কিছু করলেন না। সুবা-শাসনের চেয়ে নিরিবিলি কোরাণ-কেতাব পাঠেই তাঁর আগ্রহ আনন্দ বেশি।

হয়তো ভেবেছিলেন, ওরকম একটু-আধটু হাঙ্গামা মাঝে মধ্যে হয়েই থাকে।

সময়ে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, ধীরে-সুস্থে দেখা যাবে।

কিন্তু আওরঙ্গজেবের বাদশা অত সোজা পাত্র নন। সময়ের অপেক্ষায় বসে থাকেননি কোনদিন, ধীরে-সুস্থে দেখার জন্য হাতের কাজ ফেলে রাখার মানুষ নন তিনি। ডাক-চৌকির মারফত বিদ্রোহের খবর পেয়ে রেগে আগুন হয়ে গেলেন।

অপদার্থ ইব্রাহিম খাঁকে তৎক্ষণাৎ বরখাস্ত করলেন। নিজের মাতি আলিব-উস্-সানুকে পাঠালেন বিদ্রোহ দমনের ভার দিয়ে, সুবে-বাংলার নতুন সুবেদার করে।

ওদিকে শোভাসিংহেরও মরণ ঘনিয়ে এসেছিল। অন্যায় লোভ আর লালসাই তার কাল হ'ল।

রাজা কৃষ্ণরামের মৃত্যুর ঠিক সাতদিন পরে এক সন্ধ্যাবেলা বর্ধমান রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন শোভাসিংহ। ধনসম্পদ বা লুণ্ঠন করার, তা আগেই শেষ হয়েছে। এবার রাজ-পরিবারের মেয়েদের মান-ইজ্জত, ধর্ম-সম্ভ্রম লুঠ করার জন্য এলেন কামুক, লম্পট শোভাসিংহ। পৌষমাসের শুক্লা সপ্তমী তিথি। অন্ধকার রাজপ্রাসাদের শিখরচূড়ায় ভাঙা চাঁদ যেন লজ্জায় কুয়াশার বসিন হয়ে আছে।

শোভাসিংহের আগমন-সংবাদ পেয়েই তেরজন মহিলা বিষপানে আত্মহত্যা করলেন।

এঁদের মধ্যে তিনজন বিধবা, দশজন সধবা। সধবাদের মধ্যে দু'জন ছিলেন কৃষ্ণরামের মহিষী। কেউ কেউ পূর্ণযৌবনা, কেউবা যৌবনউত্তীর্ণা। সকলেই সম্ভ্রান্ত সৌন্দর্যময়ী।

তেরজন অসহায়া রমণীর ভূলুণ্ঠিত মৃতদেহগুলির সামনে দাঁড়িয়ে নিষ্ঠুর, অত্যাচারী শোভাসিংহও বোধহয় মুহূর্তের জন্য বিচলিত বোধ করেছিলেন।

কিন্তু পরক্ষণেই অন্য একটি সংবাদে তিনি উল্লসিত হয়ে উঠলেন। বর্ধমান রাজকন্যা আত্মহত্যা করেননি। রাজকন্যা সত্যবতী। যাঁর রূপ-লাবণ্যের খ্যাতি প্রায় প্রবাদের মতো লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছিল। তিনি আত্মহত্যা করেননি। কেন? হয়তো সুযোগ পাননি, কিংবা হয়তো ভেবেছিলেন সসম্মানে প্রাণরক্ষা করতে পারবেন, পালিয়ে যেতে পারবেন, কিংবা হয়তো—

অতশত ভেবে দেখার মতো মনের অবস্থা ছিল না শোভা-সিংহের। কামনায় তখন তিনি উন্মাদ, অস্থির। একটি নির্দিষ্ট, নির্জন কক্ষে রাজকন্যাকে নিয়ে আসার হুকুম দিলেন। ঘনিষ্ঠ দেহরক্ষীগণ সে আদেশ পালন করলো। প্রশস্ত কক্ষে ঝাড়বাতির আলো জ্বলছিল। পদ্মকোরকের ন্যায় গাত্রবর্ণ, আলুলায়িত কুন্তলা, অপরূপ সুন্দরী রাজকন্যা। নতমুখে, মাটিতে চোখ রেখে স্থিরভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। ইঙ্গিতে অনুচরদের বাইরে অপেক্ষা করার আদেশ দিলেন শোভাসিংহ। তারপর হাসি-হাসি মুখে মধুর সম্ভাষণ করে রাজকন্যার নিকটে গেলেন। নতমুখে নীরব রইলেন সত্যবতী।

এই বীরত্বকে সম্ভ্রমের লক্ষণ বলে ভাবলেন শোভাসিংহ। কিছু ব্রাক্ষাসব পান করে তার দুইচোখে তখন গোলাপী নেশার আবেশ। ধীরে ধীরে আরো কাছে এলেন। মুখ তুলে তাকালেন সত্যবতী। চোখে মুখে এক কঠিন সংকল্পের ছবি। স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছেন, মুখে কোন বিকার নেই, কোন আতঙ্কের ছায়া নেই। শুধু দুই চোখে তীব্র ঘৃণার আগুন জ্বলছিল। গোলাপী নেশার ঝোঁকে সে আগুন দেখতে পাননি শোভাসিংহ। দুইহাত তুলে যেই আলিঙ্গন করতে যাবেন, অমনি পলকের মধ্যে কাপড়ের ভাঁজ থেকে তীক্ষ্ণধার ছোরা বার করে শোভাসিংহের বুকে আমূল বসিয়ে দিলেন রাজকন্যা। পরক্ষণেই ছোরাটা টেনে নিয়ে কয়েক পা' পিছিয়ে এলেন, প্রয়োজন হলে আবার আঘাত করবেন। কিন্তু আর দরকার হ'ল না।

ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। শোভাসিংহের বুকের রক্তে সত্যবতীর শুভ্র হাত লাল হয়ে গেল। একটা আকুল আর্তনাদ করে শূন্যে হাত ছুড়ে কিছু ধরতে চাইলেন হতভাগ্য শোভাসিংহ, তারপর মাটিতে পড়ে একটু ছটফট করে স্থির হয়ে গেলেন। নিশ্বাস নেবার চেষ্টায় মুখটা একটু খোলা, চোখ দুটো বিস্ফারিত।

আকস্মিক চিৎকার শুনে হতভম্ব দেহরক্ষীদের ছুটে আসতে কয়েক মুহূর্ত বিলম্ব হ'ল। আর কোন উপায় নেই, অন্য কোন পথ নেই। শোভাসিংহের রক্তমাখা ছুরিকা নিজের বুকে বসিয়ে দিলেন রাজকন্যা। তার মুখে তখন বোধহয় একটা নিশ্চিন্ত তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠেছিল। আপন সত্য রক্ষা করলেন সত্যবতী, নিজের ধর্ম রক্ষা করলেন, পিতৃহত্যার নিপুণ প্রতিশোধ নিলেন। পুণ্যবতীর হাতে মৃত্যুবরণ করে বোধহয় প্রায়শ্চিত্ত হ'ল শোভাসিংহের। একটা অস্থির উত্তপ্ত লালসা আর শুচিশুভ্র প্রণয় পবিত্রতা পাশাপাশি প'ড়ে রইল।

সেদিন দেওয়ানজীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে অনেক পথ ঘুরে ঘুরে অনেক রাতে বাড়ি ফিরল ভারত। দরজার পাশে দাওয়ায় বসে ঝিমুচ্ছিল রঘুনাথ। ঝিমুচ্ছে আর বৃথা তাড়াচ্ছে। পায়ের শব্দে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।

ভারত বললো—কিরে ঘুমিয়ে পড়েছিলি—

—আপনার দেরি দেখে ভাবনা হচ্ছিলো—বস্ত একটা হাই তুলে বললো রঘুনাথ—ভাবলেম নতুন জায়গা, পথ হারিয়ে ফেলিছেন—

—হ্যাঁ, খুব ভাবনা হয়েছিল তোর. দেখতেই পাচ্ছি, ভাবতে ভাবতে একেবারে ঘুমিয়ে পড়েছিলি—

চক্রবর্তী-বাড়ির বাইরের দিকে একখানি চৌচালা মাটির ঘরে অতিথির আস্তানা।

পাশেই রান্নার চালা। ঘরের ভেতর উত্তাপোষে ভারতের বিছানা। বিছানার পাশেই বেড়ার গায়ে ঝোলানো কাঠের তাকে পুথি-পত্তরের বাণ্ডিল।

মাটিতে খড়ের ওপর কাঁথা-কম্বল পাতা রঘুনাথের বিছানা।

কাছেই পুকুর থেকে চাল-ডাল ধুয়ে আনল রঘুনাথ। লাউ, বেগুন কুটলো। কাঠের উনুন ধরিয়ে দিল। রান্না চাপাল ভারত। দু'জনের খাওয়া শেষ হতে হতে রাত দুপুর গড়িয়ে গেল। চক্রবর্তী-বাড়ির সব চুপচাপ। সবাই বোধহয় শুয়ে পড়েছে।

বাইরে মেটে মেটে জ্যোৎস্না। উঠোনের পাশে খেজুর গাছটার ছায়া পড়েছে।

ঘরের পেছনে শিউলি ফুলের গাছ থেকে কেমন অস্পষ্ট একটা গন্ধ আসছিল। (ক্রমশঃ)

জল মাটি মন

মহীতোষ বিশ্বাস

এ-রকম ঘটনা নীলমণির জীবনে এই প্রথম। অমিলমা থাকলে লোকজনের সঙ্গে গোলমাল হয়। মারামারি হয়। হারজিত দুইই আছে তাতে। নীলমণি যে চিরদিন সকলের সাথে জিতে এসেছে তা নয়। হারতেও দু'-একবার হয়েছে বৈকি! কিন্তু এমন গো-হারা কোনোদিন হারেনি নীলমণি। হারুক আর জিতুক, অন্ততঃ শেষ কামড় একটা দিয়েই এসেছে। কিন্তু এবার দুই দু'টো লেঠেল আর অতোগুলো লোক নিয়েও এইভাবে হেরে আসতে হল নীলমণিকে। আর তাও কিনা সেদিনের একটা পুঁচকে ছোঁড়ার কাছে। অপমানে মুখটা কালো হয়ে গেছে নীলমণির। শুধু তাই নয়। মহাদেবের মাথাটা জখম হয়েছে সাংঘাতিক। কবে ভালো হবে কে জানে। কবিরাজ এনে চিকিৎসা করাতে হচ্ছে নীলমণিকেই।

এতোবড়ো অপমানের শোধ যেমন করে হোক নিতেই হবে। কিন্তু কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছেনা নীলমণি। পরামর্শের জন্য গিয়েছিল নায়েববাবুর বাড়ী। নায়েববাবু বাড়ীতে ছিলেন। খবর শুনে বাইরে এসেছিলেন। ওকে দেখেই বলেছিলেন—

"কি খবর নীলমণি! এতো ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছ কোথায়?" নীলমণি হাত-জোড় করে বলেছিল—"হুজুরির কাছে আসান এট্টা পরামশ্‌ণ দিতি হবে।"

"পরামর্শ? কিসের পরামর্শ? ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন নায়েব মশাই?

নীলমণি তখন সব ঘটনাই খুলে বলেছিল। শুনে অবাক হয়েছিলেন নায়েববাবু।

"বল কি তুমি নীলমণি? সনাতনের ছেলে একা তোমাদের এতোগুলো লোককে হটিয়ে দিল।"

—"হয় হুজুর, তাই তো কচ্ছি। ও ব্যাটা বাপের চাইতেও বড়া হইছে। যে অস্তা মহাদেবের গায় কেউ কোনোদিন হাত তুলতি পারিনি, সেই মহাদেবের মাথাডা ফাটায়ে দেছে।"

ঘাড় নেড়ে বলেছিলেন নায়েববাবু—"তাইতো দেখছি। সনাতনের ছেলে বাপকা ব্যাটা হয়েছে। বাহাদুর বটে। তা তুমি এখন কি করবে ঠিক করলে?"

ব্যগ্র হয়ে বলেছিল নীলমণি—'সেই পরামর্শির জন্যিই তো আসা হুজুরির কাছে? এর এট্টা বিহিত আমি করবই। ও-ব্যাটার ত্যাল আমি না বা'রে ছাড়বো না। পাঁচটা বচ্ছোর ওরে দিয়ে আমি গারদের ঘানি ঘুরোব—তবে ছাড়বো।"

"তার মানে তুমি মামলা করতে চাও - তাইত?"

— জিজ্ঞাসা করেছিলেন নায়েব বাবু।

ঘাড় নেড়েছিল নীলমণি—"হয় হুজুর।"

গড়গড়ার নলটা আস্তে আস্তে হাত থেকে নামিয়ে রেখে বলেছিলেন নায়েববাবু—"কিন্তু তাতে কি খুব সুবিধে হবে? আমার তো তা মনে হয় না বরং তোমাকেই বিপদে প'ড়তে হ'তে পারে।"

—"কেনো হুজুর?"

—"ও জমির মালিক তো সনাতন। অনেক কাল আগে অবশ্য ও-জমির মালিক ছিল তোমার বাবা। কিন্তু তোমার বাবাই আবার সনাতনের বাপকে লিখে পড়ে দিয়ে যায়। সে দলিল-ও আছে ওদের কাছে। সেই থেকে সনাতনই ও-জমি চাষ করছে। এখন তুমি যদি ও-জমি দাবী করতে যাও, তাহলে চলে কি ক'রে? তাছাড়া, তুমি তো গায়ের জোরেও দখল নিতে পারবে না।"

—"তা'লি আপনি বলতি চান, মকোদ্দমা করা যাবে না?"

—"মামলা কেস্ অবশ্য তুমি একটা দায়ের করতে পারো। কিন্তু তাতে সুবিধে কতটুকু হবে, তা বলা কঠিন।"

—গড়গড়ার নল মুখে তুলতে তুলতে বলেছিলেন নায়েববাবু।

এর পর চলে এসেছিল নীলমণি। এটুকু ভালো করে বুঝতে পেরেছে, নায়েববাবু যেখানে সায় দিচ্ছেন না, সেখানে মামলা চালাতে যাওয়া বৃথা। কিন্তু গায়ের জ্বালা কিছুতেই মিটছে না। অন্য কেউ হ'লে এতোক্ষণে দেখতে হতো না। নীলমণির একটু চোখের ইশারাতেই অন্তা আর মহাদেব সব ঠাণ্ডা ক'রে দিত। ও-দুটো হ'ল সাক্ষাৎ যমদূত। এ-তল্লাটে সকলে ওদের ভয়ে কাঁপে। কিন্তু ওদেরও শেষকালে এই দশা হ'ল। ভাবতেই খুবড়ে পড়ে নীলমণির মনটা। সনাতনের ওপরে এতোদিন কিছু করতে পারেনি। সনাতনের লাঠির জোর একটু কমতেই অন্তা মহাদেবকে লাগিয়ে বিলকান্দার জমিটা নিজের ভাগে নিয়ে আসবে ব'লে ভেবে রেখেছিল নীলমণি। কিন্তু কালকেউটে ফনা না নামাতেই তার বাচ্চাটার বিষ-দাঁতে যে এতো বিষ জমা হয়ে উঠবে, সে-কথা কে ভাবতে পেরেছে। সিং-ভাঙা ষাঁড়ের মতন ফুঁসতে থাকে নীলমণির রাগটা। বলরামের পরে যেন রাগটা ফেটে বেরুতে চাচ্ছে। অথচ পথ পাচ্ছে না।

এ-রাগ তো আছেই নীলমণির। তাছাড়া আরো একটা চাপা রাগ আছে বলরামের পরে। সেটা হ'ল পদ্মকে নিয়ে। নানাজনে নানান কথা বলে। কানে আসে নীলমণির। মুখের পরে হয়ত কেউ কিছু বলেনা। কিন্তু আড়ালে আবডালে কেউ তো আর মুখ চেপে রাখে না।—পদ্মর আসল বর বলরাম। দুজনে বড়ো ভাব ছিল। টাকার জোরে নীলমণি পদ্মাকে কেড়ে এনেছে।—এমনি সব নানা কথা। এসব উড়ো কথার কোনো জবাব দেওয়া যায় না। তবে শুনতে বড়ো খারাপ লাগে। কিন্তু না শুনেও উপায় নেই। শুনতে হয় আর চাপা রাগে জ্বলতে হয়। এসব কথার ধরণই হ'ল তাই। কাউকে দোষী করা যায় না। ধরা যায় না। মারা যায় না। সকলেই বলবে—শোনা কথা। এ শোনেনি, সে শুনেছে। সে শোনেনি, ও-শুনেছে। কাকে এখন ধরবে তুমি? কাউকেই ধরতে পারবে না। শুধু নিজের মনের মধ্যে চাপা আগুনের ধোঁয়া উঠবে। জ্বালায় জ্বলবে তোমার চোখ নাক মুখ। সর্ব অঙ্গ।

কিন্তু এ-রাগের জ্বালা বের ক'রে দেবার পথ কোথায়? দু'দিকেই কাঁটা। দু'দিকেই বাধা। কোনোদিকেই এগোবার পথ নেই নীলমণির। যেখানে মামলা করার পথ থাকে না, সেখানে লাঠির জোরে কাজ সারে। আর লাঠির জোরে যেখানে পেরে ওঠেনা, সেখানে কাগজ পত্রের প্যাঁচ ক'ষে আইনের পাকে জড়ায়। কিন্তু আজ দু'পথের কোনোটাতেই এগোতে পারছেনা নীলমণি। শুধু অপমানের জ্বালায় ওর টাক-মাথার কোঁচকানো চামড়া পর্যন্ত ঝিরি করে জ্বলছে। মারামারি অনেক দেখেছে সে। কিন্তু এমন তাজ্জব হয়নি

কোনোদিন। ছোঁড়াটার গায়ে যেন অসুরের জোর। অন্তার মতন লেঠেলকে ঠেলে ফেলে দিয়ে লাঠিটা কেড়ে নিল। আর কেড়ে নিয়েই একেবারে তেলকি দেখিয়ে দিল। লেঠেলি ক'রেই জীবন কাটল মহাদেবের। কিন্তু এতোখানি গায়ের রক্ত আজো কেউ ওর ফেলতে পারেনি।

বলরামের সেই ক্ষ্যাপা চেহারাটা এখনো যেন ভাসছে নীলমণির চোখের সামনে। ভয়-ডর বোধহয় নেই ওর মনে। থাকলে কি আর অমনি ক'রে ছুই ছুটো লেঠেলের সামনে লাফিয়ে পড়তে পারে। তাও একেবারে খালি হাতে! চেহারাটা হয়েছে অবিকল ঠাকুর্দাকে বসানো। ওই-রকমই দেখতে ছিল বলরামের ঠাকুর্দা। পাকা বাঁশের লাঠির মতন টান-টান। পোক্ত। গুলবাঘের মতন জলজলে ছুটো চোখ এমনিতে চুপচাপ থাকে। কথা বলে কম। কিন্তু কারো পরে রাগলো তো রাগলো। ওর একদিন কি তার একদিন হয়ে যাবে তখন। ভাবতেই পারেনি সেদিন নীলমণি,-অমন ক'রে ছোঁড়াটা লাফিয়ে প'ড়ে অন্তার হাতের লাঠিখানা কেড়ে নিতে পারবে। ছেলে ভাগ্য সত্যিই ভালো সনাতনের।

বসে বসে ভাবে নীলমণি! ভাবতে ভাবতে রাগটা যেন একটু কমে। কিন্তু আস্তে আস্তে প্রকাণ্ড একটা ঈর্ষার মনটা ভ'রে ওঠে। কোথায় যেন হেরে যাচ্ছে। পিছিয়ে যাচ্ছে নিলমণি। জোয়ান বয়সের সেই রক্তের জোর যেন আর নাই একটুতেই হাত কাঁপে। পা কাঁপে। হাঁপিয়ে ওঠে। মনের সেই জোরটাও যেন কেমন কমে আসছে। একটা কাজ করতে গেলে সাত পাঁচ ভাবনা এসে মনে জমা হয়। ভালোমন্দ ভাবে। একবার এগোয় তো তিনবার পেছোয়। শরীর আর মন। একটার সাথে আর একটা বাঁধা। এটাকে বাদ দিয়ে ওটা চলতে পারেনা। নীলমণির শরীরটা পেছুতে শুরু করেছে কিছুদিন থেকেই। মনের জোরে কতো আর এগোনো যায়। তবু এগোচ্ছিল নীলমণি। কিন্তু এবার থেকে সেই মনটাও যেন আর এগোতে চাচ্ছে না। বারবার পিছিয়ে পড়ছে। একটুতেই ভয় খেয়ে যাচ্ছে। টাল্ সামলাতে পারছে না। যে-নীলমণির দাপটে একদিন তল্লাটের লোক কেঁপেছে, সে নীলমণিকে আর কিছুদিন পরে কেউ মানবে না। চিনবে ও না। অসহায় পঙ্গু শরীরটা নিয়ে ঘরের কোণে ব'সে থাকতে হবে। চোখে ছানি পড়বে। কানে শুনতে পাবে না। নড়বড়ে শরীরটাকে নিয়ে সকলে ঠাট্টা করবে। ঘরের লোক ও ভালো চোখে দেখবে না। হেলাছেদ্দা করবে।

ভাবতে ভাবতে মনের মধ্যে যেন একটা ভয় লাগে নীলমণির আর এই মুহূর্তে যেন একবার ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে সনাতনকে। সনাতনও কি আজ ওর মতন বুড়ো হ'য়েগেছে? ওর মতন অসহায় আর দুর্বল হয়ে পড়েছে? সনাতন কি পারে এখন আর তেমনি ক'রে লাঠি ধরতে? ভীষণ ইচ্ছে করছে একবার সনাতনকে দেখতে। পাশাপাশি দুই গাঁয়ে বাকী। কিন্তু কতোদিন দেখা হয়না দু' জনের সঙ্গে। ঝগড়া বিবাদ হ'য়ে মনোমালিন্য হয়েছে। মুখ দেখাদেখিও বন্ধ। কিন্তু এই মুহূর্তে সনাতনকে কেমন যেন বড়ো আপন মনে হয় নীলমণির। ঝগড়া বিবাদ আছে, কিন্তু তবু মনে হয় কোথায় যেন একটা বাঁধন ও আছে। একই সঙ্গে দুজনে কাটিয়েছে ছেলেবেলাটা। খেলেছে। ভাব জমিয়েছে। জোয়ান বয়সের অনেকগুলো দিন পর্যন্তও সে ভাবটুকুতে ফাটল ধরেনি। তারপর কোথা থেকে যে কি হয়ে গেল। আজ বুঝতে পারে নীলমণি, ফাটলটা সেই-ই আগে ধরিয়েছে। তারপর সে আলগা বাঁধনে আর জোড়া লাগেনি। বরং ক্রমেই বেড়েছে। তবুও মনে হয় নীলমণির—ভালবাসার-শক্ততায় যেন তার জীবনের অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে সনাতন। অমন শত্রু হয় না। অমন মিত্রও হয় না। সেই সনাতনের ছেলে বলরাম। লোহার মতন শরীর। বাঘের মতন সাহস। বাপ-ঠাকুর্দার

রক্তের তেজ পারা অঙ্গে ফুটছে। কাঁপছে। উপচে পড়ছে টলটলানি। এমন ছেলে সনাতনের!

নিজের রোগা-প্যাংলা ছেলেটার কথা মনে পড়ল নিলমণির। বিতৃষ্ণায় মনটা ভরে ওঠে। ঈর্ষা হয় সনাতনকে। শরীর বুড়ো হয়ে গেলে, রক্ত ঝিমিয়ে এলে—মন আশ্রয় চায়। একটা শক্ত হাতের পরে অচল শরীরটার ভার ছেড়ে দিয়ে জগৎটাকে দেখতে সাধ যায়। সংসারের আর-এক জনের মধ্যে নিজের হারানো জোয়ান বয়সের রূপটা দেখতে বড় ভালো লাগে তখন। ঘসা-কাচের মতন ছানিপড়া চোখ কিছুই ভালো করে দেখেনা। তবু মনে হয়, কতো দেখছে। কতো যেন ভালো লাগছে। বুড়ো-বয়সের সে আশ্রয় বল জোয়ান-ছেলে। নিজের রক্ত-মাংসে গড়া। স্নেহে—আদরে বড়ো করে তোলা। ছেলে হ'ল বুড়ো বয়সে নির্ভাবনায় ভর দেবার পাকা বাঁশের লাঠি। তবে কথা আছে। লাঠি যদি পাকা হয়, তাহলে তো ভালো। নিশ্চিন্তে ভরটা তুমি ছেড়ে দিতে পারো তার উপরে। নিজের কাঁধে তোমার দায় ভার সে ব'য়ে নিয়ে বেড়াবে। আর লাঠি যদি কাঁচা হয়, দুদিনেই তাতে ঘুণ ধরবে। তোমার ভার তো দূরের কথা, নিজের ভারও সে বইতে পারবে না। দুদিনেই ফাঁকরা হয়ে যাবে। বলরাম বড়ো পাকা লাঠি সনাতনের। জীবনের বাকী কয়টা দিন নিশ্চিন্তে ওর উপর ভর দিয়ে কাটিয়ে যেতে পারবে সনাতন। আর নীলমণি! হেরে গেছে নীলমণি। নীলমণির বুড়ো বয়সের লাঠি—ঐ কাঁচা বাঁশের লাঠি। বড়ো ঘুণ ধরা। বড়ো অপুষ্ট। ওর পরে ভর দেওয়া যায় না। আশ্রয় চাওয়া যায় না।

সেদিন মারামারিতে হেরে এসেও নীলমণির মনটা অতো ভাঙেনি। নেতিয়ে পড়েনি। কিন্তু আজ মনে হলো, সত্যিই সে হেরে গেছে। সনাতন সত্যিই তাকে হারিয়ে দিয়েছে। জীবনের জমি দখল করতে বড়ো কাঁচা বাঁশের লাঠি নিয়ে এসেছে নীলমণি। ওর উপর ভর দেওয়া যায় না। জীবনের দায়-কাজের ও-লাঠি নিয়ে পাকসাট দিতে ভরসা হয় না।

সেদিনেরই রাত-বেলার কথা। মনটা ভালো নেই। শরীরটাও যেন বইতে চাইছে না। সকাল সকাল শুয়ে পড়েছে নীলমণি। কাজ-কাম সেরে একটু রাত ক'রে শুতে এলো পদ্ম। ঘরের কোণে হারিকেন জ্বলছে। শিষ উঠে উঠে চিমনীটা কালো হয়ে গেছে। আলো তেমন পরিষ্কার হয় না। ঘরের মধ্যে টুকটাক এটা ওটা কাজ করছে পদ্ম। একটুখানি ঘুমের মতন এসেছিল নীলমণির। ঘুমটা ভেঙে গেল। ঘরের মধ্যে দেখতে পেলো পদ্মকে। বালিশের ফাঁকে পদ্মর মুখের দিকে তাকাল নীলমণি। সংসারে বড়ো খাটতে হয় ওকে। চোখেমুখে একটু রুখু-রুখু ছাপ পড়েছে। কিন্তু শরীরটা যেন দিনে দিনে ভরাট হয়ে উঠছে। আশ্বিনের জলে-ভরা পুকুরের মতন পারা শরীর ছুড়ে কিসের টলমলানি। বড়ো শান্ত। কিন্তু বড়ো আধৈ!

আস্তে আস্তে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে খাটের উপর উঠে এলো পদ্ম। রোজ-দিনের মতন খাটের এককোণে গুটি-সুটি মেরে শুয়ে পড়ল। ও-পাশে লোকটা ঘুমোচ্ছে। ঘুমোক। পদ্মর রাত একভাবে কেটে গেলেই হ'ল। সারাদিনে বড়ো খাটুনি। ক্লান্ত শরীর। খানিকটা ঘুমুতে পারলেই হ'ল। আর কিছুর আশা করেনা পদ্ম।

কিন্তু হঠাৎ চমক ভাঙল পদ্মর। নীলমণি কথা বলছে—

"ঘুমোলে নাকি? শুনতিচো? এট্টা কথা শোনবা—"

ভয়ে ভয়ে চোখ মেলে তাকায় পদ্ম। বলে—"কিছু কচ্চো নাকি আমারে?"

"হয়, কচ্চিলাম। এদিপি এট্ট আলোয়ে শোওনা আমার কাছে।"

ইতস্তত: করে পদ্ম। বুকের মধ্যে কেমন যেন গুর গুর করছে। নিশ্বাসের শব্দটা জোরে-জোরে ওঠানামা করছে।

তেমনি ভিজে-ভিজে কাঁপা-কাঁপা গলায় ব'লে চলে নীলমণি—"কথাডা আমার শুনলে না! এদিগি আসো! আমার কাছে আ'সে এটু শোও।"

বাইরে শীতের শিরশিরে উত্তুরে হাওয়া। বিছানার উষ্ণ আমেজ কি একটা রহস্যের লোভনীতে বুকের মধ্যে যেন দুক-দুক করে পদ্মর।

শুধু যেন বড়ো অবাক হয় পদ্ম! ও লোকটা তো এমন ভাবে কথা কয়না কোনোদিন। এতো শান্ত! এতো নরম সুর!

অন্ধকার ঘর। অন্ধকার বিছানা। চোখ দিয়ে শরীর দেখা যায় না। শুধু নড়াচড়ায় অনুভব করা যায়।

পদ্ম আস্তে আস্তে স'রে গিয়ে নীলমণির পাশে শোয়। অন্ধকারে নীলমণির একখানা হাত এসে ঠেকে পদ্মর গায়ে। নীলমণির গলা শোনা যায়—

"বলরামের সাথে গোলমালের কথা শুনিচো?"

কি বলতে চায় নীলমণি বুঝে উঠতে পারে না পদ্ম। বলরামের কাছে হেরে এসে শোষকালে গায়ের ঝালটা কি তার উপরেই ঝাড়তে চায় নাকি?

পদ্ম উত্তর দেয়—"শুনিচি। তা আমি মাইয়েমানুষ, এসব কথা শুনে আমি কি করবো?

—"করতি আমি কচ্চি না কিছু। এমনিই বলাম কথাডা—।"

পদ্ম চুপচাপ থাকে। নীলমণি আবার বলে—

"যুকতি কি আর আমি পারি না কিছু! যুকতি পারি সবই! বলরাম আমাদের হারায়ে দেছে, বহাদেবের মাথা কাটাইছে,—খবরডা শোনাতেই তোমার আহ্লাদের সীমে নেই। বুঝি—সবই আমি বুঝি।"

কাঠের মতন অনড় হ'য়ে শুয়ে থাকে পদ্ম।

খানিকক্ষণ কেটে যায়। নীলমণির হাতটা জড়িয়ে ধ'রে থাকে পদ্মর হাতখানা।

একটা দীর্ঘনিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আবার নীলমণির গলা শোনা যায়— বুঝলে বড় বউ, আজকালডায় যে এমন এটা যা খাতি হবে কেবোনে, তা ভাবতি পারিনি কোনোদিন। অদেষ্টে আমার এই ছাহা ছেলো!"

গলাটা কেমন ধ'রে আসে নীলমণির!

চমক খেলো পদ্ম। হ'ল কি আজ লোকটার। চোট্-পাট আর দাবড়ানি ছাড়া যার মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না, সেই লোকটাই আজ যেন কেমন ঝিমিয়ে পড়েছে। কি-একটা কথা বলতে গেল পদ্ম। কিন্তু গলাটা আটকে এলো।

নীলমণি আবার কথা বলে—"আর বেশীদিন বাঁচবো তা তো মনে করনা! কিন্তুক ভাবি তোমার কথাডা! তোমারে ছাহার কেউ থাকবে না। কার কাছে যে ক্যালায়ে যাবো তোমারে! বুড়ো বয়সে ক্যানো যে আবার তোমারে ঘরে আনতি গেলাম। তোমার জেবোনডারে নষ্ট করলাম।"

একটা খোচড় লাগল পদ্মর মনে। এই কাঠখোট্টা স্বার্থপর আর বিনুকুটে লোকটার মনটা এতো নরম! পদ্মর জন্য তার এতো মায়া! মনটা অনুশোচনায় ভরে ওঠে পদ্মর। বিয়ের আগে স্বামী সম্বন্ধে কতো কথাই শুনেছে। স্বামীকে ভক্তি করতে হয়। ভালবাসতে হয়। স্বামী হ'ল মেয়েমানুষের ইহকাল, পরকাল; স্বামীর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে মরা,—মানে অখণ্ড স্বর্গবাস। কিন্তু সেই স্বামীকে ভক্তি-ভালবাসা দেওয়া দূরে থাক, তার দিকে কোনোদিন একটু সুনজরে তাকায়-ও নি পদ্ম। খানিকটে ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা ছাড়া কিছু দিতে পারেনি স্বামীকে। কিন্তু বলরাম তার কে? কোনো সম্বন্ধ নেই তার সাথে আজ আর। একরকম বলরাম মুছে গেছে তার জীবন থেকে। শুধু সেই বলরামকে কেন তাড়াতে পারছে না মন থেকে। বলরাম তার স্বামীকে হারিয়ে দিয়েছে শুনে খুশী হয়েছে।

স্বামীর অপমানে মনে আনন্দ পেয়েছে। আর সে-আনন্দ উপচে পড়তে চেয়েছে ওর চোখে মুখে। স্বামীর চোখেও তা এড়ায়নি। কি লজ্জা! পাপ করেছে পদ্ম। সাত-পাকের মন্তর-পড়া স্বামীর পরে মন বসাতে পারেনি। মনের মধ্যে বড়ো গ্লানির তাপ অনুভব করল পদ্ম। আর তাই কোনদিন যা সে করেনি তাই সে করল। নীলমণির শিরাওঠা হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিল। অন্ধকারের সাথে গলা মিলিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে বললো—"আমারে তুমি ক্ষ্যামা করো। মনডায় আবার বড়ো পাপ ঢেলো।"

নীলমণি পদ্মকে কাছে টেনে নেয়। বলে—"কি জানো বড়বৌ, মনডা মোটে ভালো লাগতিচে না। মাথাডা আমার একেবারেই কাটা গেছে। সব মানুষি এই নিয়ে হাসাহাসি করে। কয়—এবার নীলে ষোড়লের বিষদাঁত ভাঙিচে। গলায় কলোস বাঙ্কে এবার খানার মধ্যি ডুবে মরুকগে।—এতো বড়ো অপমান হবো স্বাধকালডার ভাবিনি।"

ঘন হয়ে আসে পদ্ম নীলমণির গায়ের কাছে। মনডায় গলাটা জড়িয়ে আসে। বলে—"মানুষির কথায় তুমি কান দিয়ে না। কুনোকে কু-কথা তো কবেই। তাতে অতো ভা'ঙে পড়লি চলে নাকি? তুমি বুঝো মানুষ। তোমারে কি আমি বুঝোতি পারি! সে খ্যামোতা আমার নেই। তবু তোমারে কই—তুমি এট্টু শক্ত হও। মনডায় এট্টু জোর আনো।"

বুকখানা যেন ভ'রে ওঠে নীলমণির। একটা আশ্বাসের তৃপ্তিতে আবিষ্ট হ'য়ে যায় মনটা।

বাইরে শীতের রাত বেড়ে চলেছে। কুকুরকুণ্ডলী চরাচর ঘুমে নেতিয়ে পড়েছে।

গায়ে-গা-লাগানো অন্ধকারে পদ্মর শরীরটা টের পাচ্ছে নীলমণি! আশ্বিনের ভর-ভর পুকুরের মতন টলমলে।

কানাঘ কানায় ভরা। পদ্মর বুকটা উঠছে নামছে। নিশ্বাসের শব্দ পড়ছে। বুঝতে পারে নীলমণি—পদ্ম ঘুমোয়নি। অন্ধকারের মতন ওর গায়ে গা লেপ্‌টে পড়ে আছে। এই নিশুতি-রাতের হিমেল উষ্ণতার মধ্যে কি যেন চায় পদ্ম ওর কাছে। কিন্তু নিরুপায় নীলমণি! সারা শরীরটার মধ্যে খুঁজে খুঁজে স্বামিকটে শিথিল উত্তেজনা ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পেলো না সে। যৌবনের রক্তের গায়ে কখন যে চড়া প'ড়ে গেছে।

হঠাৎ মনে হল নীলমণির, দরজার পাশটায় কে যেন দাঁড়িয়ে। মহাদেবের মাথাটা কাটিয়ে দিয়ে এসে সেই গুলবাঘের মতন চোখ দুটো মে'লে তাকিয়ে আছে বলরাম। একদৃষ্টে, অপলকে। কি টগ্‌বগানো জোয়ান শরীরটা। টলমলে ভরা পুকুরে অবাধে সাঁতার কাটার মতন দুটো নিশ্‌পিশে জোয়ালো হাত। দেখলে যেন চোখ জুড়োয়।

মাথাটা উঁচু ক'রে দরজার দিকে তাকালো নীলমণি।

কিন্তু নাঃ। কেউ তো নয়! কাঁঠাল কাঠের শক্ত দরজা। আর সে দরজা তো ভালো ক'রেই বন্ধ করা আছে। কেউ তো আসেনি।

আশ্বস্তিতে নীলমণির শরীরটা যেন ঝুমড়ে ঝুঁকড়ে আসে।

আস্তে আস্তে পাশ ফিরে শোয় পদ্ম। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসতে চাইছিল। কিন্তু তার আগেই পদ্ম বালিশের মধ্যে মুখ গোঁজে।

(সুভাষচন্দ্র—১২৮ পৃষ্ঠার পরে)

হাস্থিথ একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করেন,—যার শেষ দিকে কিছু অভিনব সংবাদ ছিল। মন্তব্যটি এই :

From the letter of Babu Ananga Mohan Dam published elsewhere, it will be seen that he has not been rusticated but "expelled" by the Governing Body of the Presidency College. It is not clear whether he has been expelled from the Hindu Hostel or the Presidency College. It will be also seen from the report published in another column that Babu Subhas Chander Bose has also been expelled, though in his case, it has been distinctly stated that he has been expelled from the Collge. It seems that the Governing Body subsequently changed their mind, for we learnt from a very reliable source that they had rusticated both Ananga Mohan and Subash in connection with the assault of Professor Oaten. In the meantime, information reaches us that Mr. James has submitted a representation to the Government objecting to the appointment of Sir Asutosh Mukherjee and Mr. Hornell as Members of the committee of Enquiry on personal grounds.

এই সংবাদ হতে জানা যাচ্ছে যে সুভাষচন্দ্রকে প্রথমে করা হয়েছিল কলেজ হতে বহিষ্কার, পরে তাকেও বোধ করি মনে না করে তাঁকে ও শ্রীঅনঙ্গমোহন দাসকে রাস্টিকেটও করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে কোনো ভুল বোঝার আর অবকাশ রইল না যে তদানীন্তন য়ুরোপীয় সমাজ সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বকে গুরুত্বের সঙ্গেই স্বীকার করে নিয়েছেন —এবং শিক্ষাক্ষেত্রের চৌহদ্দি থেকে তাঁকে চিরতরে বহিষ্কার না করা পর্যন্ত তাঁদের প্রতিশোধ বাসনা তৃপ্ত হয়নি। অনঙ্গ মোহন পরে নানা ভাবে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে তাঁকে বৃথা অধ্যাপক ওটেন সংক্রান্ত অভিযোগে জড়ানো হয়েছে। তাঁর চেষ্টা যে ব্যর্থ হয়েছিল তাও বলা যায় না।

অমৃত বাজার পত্রিকা অভিনব যে তথ্যটি পরিবেশন করেছিলেন তা হল সরকার কর্তৃক নিয়োজিত তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান রূপে স্যার আশুতোষের নিয়োগ সম্পর্কে অধ্যাপক মহলের আপত্তি—এবং তাও ব্যক্তিগত কারণে। এই আপত্তির পরিণাম কী ঘটেছিল তা আমরা জানতে পারি Statesman পত্রিকার ২৪ ফেব্রুয়ারির সংখ্যা হতে। সংবাদটি এই :

Presidency College Affair

Sensational Sequel

Appointment of New Principal

Mr. James Superseded

The following communique has been sent to us with a request for its publication :—

"We are desired by Government to state that as soon as Mr. James, Principal of the Presidency College, received information of the appointment of the Committee of Enquiry into discipline at Presidency College, with a request that he would serve on the Committee, he paid a visit to the Hon. Mr. Lyon, Member of council in charge of Education, and subjected him to gross personal insult. Mr. James also sent to the Secretary of the committee, with the request that it should be placed before the Committee of bias against himself. The Governor-in-Council considers that Mr. James has shown himself to be unfit to retain the post of Principal of Presidency

College ; he has accordingly transferred him from that post and has placed him under suspension pending further orders. Mr. Wordsworth, Inspector of Schools, Presidency Division, has been appointed Principal of the Presidency College."

চমৎকৃত হবার মতো সংবাদ বটে! প্রবল প্রতাপান্বিত অধ্যক্ষ জেমস, যিনি পুনঃ পুনঃ প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন য়ুরোপীয় অধ্যাপক কর্তৃক ভারতীয় ছাত্রদের অপমানিত হতে দিয়েছেন এবং যিনি নিজে ছাত্রদের মধ্যে বৃটিশ-ভক্তি প্রচারের অগ্রদূত, যুদ্ধে সরকারের যে কোনো উপায়ে সাহায্য করার জন্য ছাত্রদের আহ্বান জানিয়ে ফিরতেন যিনি—তিনিও অধ্যাপক ওটেনের প্রহার কেন্দ্রিক ঘটনার সূত্রে সুভাষচন্দ্রকে কলেজ হতে বিতাড়নের দু একদিনের মধ্যেই নিজে ও সপরিষদ পরিষদ কর্তৃক বিতাড়িত হলেন। একে নিয়তির পরিহাস বললে ব্যাপারটাকে লঘু করে দেখা হয়। কেননা অধ্যক্ষ মহাশয়ের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যটি এই ঘটনাতে এমনভাবে উদ্ঘাটিত হয়ে গেছে যে নিয়তির নামে তাকে আর ঢেকে রাখা যায় না। অধ্যক্ষ জেমস নিজেই কলেজে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছিলেন কলেজের পরিচালন বিধির সদস্যদের নিয়ে—এবং সেই কমিটিতে একমাত্র আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন যিনি আর সবাই ছিলেন তাঁর নিজের লোক। প্রায় কোনোরকম তদন্ত না করেই তাঁরা দু জন ছাত্রকে প্রথমে কলেজ হতে বহিষ্কার, পরে রেসিডেন্সি হতে তাদের রাস্টিকেট করে দিলেন;—ইতিমধ্যে সমগ্র ঘটনাটি কি এদেশীয় য়ুরোপীয় সমাজ কি আমাদের দেশের শিক্ষিত শ্রেণীকে এমন প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়ে গেল যে সরকার বাধ্য হলেন একটি বড় আকারের তদন্ত কমিটি ঘোষণা করতে এবং কমিটি যাতে জনসাধারণের আস্থা অর্জন হয় সেজন্য তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে করা হল তার চেয়ারম্যান। অধ্যক্ষ জেমসকেও ঐ কমিটির সদস্য রূপে মনোনীত করলেন সরকার। কিন্তু অধ্যক্ষ জেমস ক্ষুব্ধ হয়ে বসলেন যে তাঁর দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত কলেজের অন্তরঙ্গ কমিটির প্রতিই এইভাবে সরকার অবজ্ঞা দেখালেন ও সেই কমিটির রায়কেও অপমান করেছেন। জেমস সাহেব একজন প্রবীণ, পরিমার্জিত ও দায়িত্বশীল ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও আহত অভিমান ও স্বার্থবোধ-বশত সরাসরি ছুটে গেলেন শিক্ষামন্ত্রী মিঃ লায়নের কাছে, তাঁকে বাড়ি বয়ে গিয়ে গালিগালাজ ও অপমান করার উদ্দেশ্যে; তিনি তা করলেও। তার আশুতোষ, যিনি সারা ভারতবর্ষে একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী রূপে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত হতেন এবং যিনি দেশপ্রীতি সত্ত্বেও কখনো ইংরেজরাজ বিরোধী ছিলেন না,—তাঁর বিচারের উপর আস্থা পোড়াতেই হারিয়ে বসলেন অধ্যক্ষ জেমস। তিনি অভিযোগ করলেন যে স্যার আশুতোষ তাঁর প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ পোষণ করেন। কী সেই ব্যক্তিগত বিদ্বেষ তা আমরা জানিনা, কিন্তু জেমসের কথা যদি সত্য হয় তাহলে সন্দেহ ঘটে যে ইতিপূর্বে এমন কোন অপরাধজনক আচরণ তিনি করেছেন তার দরুণ আশুতোষ তাঁকে ভালো চোখে দেখতে পারেননি। প্রেসিডেন্সি কলেজের সাম্প্রতিক ইতিহাসকারগণ তাঁদের গ্রন্থে বহু সময় ও স্থান ব্যয় করেছেন অধ্যক্ষ জেমসের মহানুভবতা প্রমাণ করতে কিন্তু তাঁর চারিত্রিক এইসব স্খলন সম্পর্কে কোনো আলোচনা করেননি।

অধ্যক্ষ জেমস সেদিন কলেজের অধ্যক্ষপদ হতে অপসারিতই হননি, তদন্ত কমিটির কাজকে সাময়িকভাবে স্থগিত করে রাখতেও পেরেছিলেন। স্টেটসম্যান ও অন্যান্য দৈনিক সংবাদপত্র ২৫শে ফেব্রুয়ারি তারিখে সেই সংবাদ পরিবেশন করেই লিখেছেন: "মঙ্গলবার দুপুর ২-৩০ মিঃ এ পূর্বদিনের মতোই কমিটির অধিবেশন বসেছিল, কিন্তু কাজকর্ম বেশিক্ষণ চলতে পারেনি। মিঃ ওটেন, মিঃ মহলানবিশ এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের অন্য কয়েকজন অধ্যাপককে হাইকোর্টে সেদিন দেখা গিয়েছিল, সম্ভবত কমিটির সমক্ষে সাক্ষ্য দিতে

তাঁদের ডাকা হয়েছিল ; কিন্তু মঙ্গলবার কোনো সাক্ষই গ্রহণ করা হয়নি। বুধবার কমিটির সভা বসেনি গতকালও (বৃহস্পতিবার) না। যেহেতু গোড়ার পরিকল্পনা ছিল যে কমিটির সভা প্রতিদিন বসবে তাই হঠাৎ তার কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাওয়া যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি কমিটির ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও কোনো কোনো মহলে সন্দেহ জেগেছে ইতিমধ্যে, জানা গেছে যে, অধ্যক্ষ জেমস কমিটির সদস্যরূপে স্যার আশুতোষ মুখার্জি ও মিঃ হর্পেলের নিয়োগ সম্পর্কে আপত্তি জানিয়ে বঙ্গ সরকারকে একটি প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছেন, এবং মনে হয় যে ঐ পত্রের কপি কমিটির সদস্যদের নিকটও পাঠানো হয়েছে এবং তারই ফলে কমিটির কাজকর্ম সাময়িক-ভাবে স্থগিত হয়ে গেছে। আরও অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল যে, কমিটির অধিবেশন আজ (শুক্রবার) আবার বসবে।" The Englishman ঐ একই তারিখে উপরোক্ত সংবাদের সঙ্গে আরেকটি অতিরিক্ত তথ্যও প্রকাশ করেন : "It is interesting to note here that Sir Asutosh Mookerjee was noticed being driven in a Government House motor-car towards Barrackpore on Wednesday evening." স্যার আশুতোষকে সরকারী গাড়িতে করে ব্যারাকপুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কেন? সম্ভবত তিনি গিয়েছিলেন লাটসাহেবের কাছে। আগেই বলেছি, লাটসাহেব অধ্যক্ষ জেমসকে শুধু তদন্ত কমিটি হতেই নয়, প্রেসিডেন্সি কলেজ হতেও সাময়িক দেন। অধ্যক্ষ সাহেবের তার আশুতোষ সম্পর্কিত আপত্তি লাটসাহেব কর্তৃক গ্রাহ্য তো হয়ইনি, পরন্তু প্রকাশ্যে গাড়ি পাঠিয়ে স্যার আশুতোষকে স্বসকাশে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে অধ্যক্ষ জেমসের অহংবোধের স্ফীত বেলুনটিকে লাটবাহাদুর ফাঁসিয়ে দিয়েছেন। এই হচ্ছে অধ্যক্ষ সাহেবের অকৃত আচরণের ফল।

কিন্তু অধ্যক্ষ জেমস সাহেবই সেদিন ভারতীয় ছাত্রদের বিদ্রোহী মূর্তি দেখে ক্রুদ্ধ ও অসংবৃত হয়ে পড়েছিলেন তা নয়.—সেটা য়ুরোপীয় সমাজই য়ুরোপীয়দের দ্বারা কৃত অন্যায়ের প্রতিকারার্থে যুবশক্তির এই আচরণ দেখে ভীত, হতাশ, ক্রুদ্ধ ও যাত্রাজ্ঞানহীন হয়ে পড়েছিল। তার প্রমাণ আছে তাদের দ্বারা পরিচালিত সংবাদপত্রের পাতায়।

ঘটনাটি সম্পর্কে প্রথম সম্পাদকীয় মন্তব্যেই The Englishman লিখেছিল (১৭ই ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার) : "Attacking the Professor from behind when he was descending the staircase, they struck him senseless and left him bleeding and unconscious. The attack was as inexcusable as it was cowardly and the incident reflects the gravest discredit upon the Presidency College. There are evidently a number of students in the Presidency or other Colleges for whom dismissal with disgrace far too mild a punishment." এদেশী য়ুরোপীয় সমাজের মুখপত্র ইংলিশ-ম্যানের বক্তব্যটি অনুধাবন যোগ্য এর অন্তর্নিহিত কয়েকটি ইঙ্গিতের জন্য। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের আচরণ সংবাদপত্রটির মতে (১) অক্ষমণীয় (২) কাপুরুষ সদৃশ কেন? অধ্যাপক ওটেনকে তাঁর অসতর্ক মুহূর্তে ভূপাতিত করা হয়েছে বলে। অধ্যাপক ওটেন যে এই ঘটনাটি ঘটিয়ে তোলার পিছনে কতখানি অপমানজনক ব্যবহার ও উক্তির দ্বারা ইন্ধন জুগিয়েছে সেটা বিচার্য বিষয় নয়, একমাত্র বিচার্য বিষয় হল কেন তাঁকে অসতর্ক মুহূর্তে আঘাত করা হল।

সুতরাং নিজে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলেও প্রহারব্যাপারে অংশগ্রহণ করেননি,—কিন্তু এই ঘটনার সমস্ত দায় ও দায়িত্ব তিনি একলা ঘাড়ে পেতে নিয়েছিলেন। সুতরাং বস্তুতঃপক্ষে ইংরেজ সম্পাদক তাঁকেই কাপুরুষোচিত ও অক্ষমণীয় ব্যবহারের দায়ে দায়ী করেছেন। ঘটনার পারম্পর্য ভঙ্গ করে

একটি মন্তব্য এখানে করতে ইচ্ছা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে সুভাষ ভারতবাসীকে আহ্বান করেছিলেন ইংলণ্ডের ঘোরতর বিপদের পূর্ণ সুযোগ নিয়ে তার চরম সঙ্কটের সময় তাকে চূড়ান্ত আঘাত করতে; ইংরেজদের সঙ্গে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গান্ধী, নেহরু ও রুক মেননের মতো বিচক্ষণ ভারতীয়রাও একে কাপুরুষোচিত ও অক্ষমনীয় ব্যবহার বলে অভিহিত করেছেন। গান্ধী, নেহরু, মেননের মতে ইংলণ্ডের বিপদের সময় তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করাই উচিত, সঙ্কটের মুহূর্তে অনতর্কভাবে তাকে আঘাত করাটা অন্যায়। সুভাষচন্দ্রের জীবনে এই অন্যায়টি বহু পূর্ব হতেই সুরু হয়েছে—জীবনীকার শুধু এটুকু লক্ষ্য করেই সন্তুষ্ট; এবং তার সঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন আসে, তা এই যে, ভারতের শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলার ক্ষেত্রে শত্রুর সময় ও সুযোগটা যে আদৌ বিবেচ্য বিষয় নয়, বরং তার দুর্বলতার মুহূর্তটিই আঘাত হানার জন্য বেছে নিতে হবে,—এই চিরন্তন বৈপ্লবিক নীতিতে সুভাষের অকুণ্ঠ বিশ্বাস প্রথম বয়সেই তাঁর জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল, আর এখানেই গান্ধীবাদধর্মী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তাঁর ঘটেছিল আমূল তফাৎ।

সুভাষ তো তাঁর শত্রুকে সরাসরি চিনেছিলেন সেই কৈশোর বয়সেই, কিন্তু এদেশস্থ ইংরেজরাও যে তাঁকে পরম নম্বরের দুশমন রূপে চিহ্নিত করতে পেরেছিল সেই সময়েই, সেটুকুও বিস্ময়ের বিষয়। তাই 'ইংলিশম্যান' দাবী করেছেন যে তাঁকে শুধু কলেজ হতে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে চলবেনা, তার চেয়েও কঠোরতর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। কলেজ হতে বহিষ্কার ছাড়াও কঠোরতর শাস্তির দাবী জানিয়ে ইংলিশম্যান ২১শে ফেব্রুয়ারী আবার তাঁদের সুদীর্ঘ প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখেন: "Everyone of the students concerned deserves—as a few have already received—instant expulsion, and the assault being of a criminal nature, their punishment ought not stop there." এদেশস্থ ইংরেজ সমাজের এই কঠোরতর শাস্তির দাবীর চাপে পড়েই সুভাষচন্দ্রকে সেদিন প্রথমে কলেজ হতে বহিষ্কারের আদেশ দেবার পর পুনরায় মত পালটে তাঁকে রাস্টিকেট করা হয়। কলেজের গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত সর্বার অন্তরালে কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল, আগেই সেকথা উল্লেখ করেছি।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে ভারতীয় ছাত্রদের কঠিনতম শাস্তির দাবী করেছিলেন যে 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা, অথবা জেমস সম্বন্ধে তাঁরাও আর প্রশংসা করতে পারেননি। ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে আরেকটি প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তাঁরা লিখলেন: সপরিষদ সভর্নর তাঁকে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ পদে বহাল থাকার অযোগ্য মনে করেন। It is one of the most crushing reproofs that we remember to have been publicly administered to a public servant" খুবই ক্ষোভের সঙ্গে 'ইংলিশম্যান' লিখেছেন: "Who could have imagined that the first important result of the search for the students guilty of assaulting Professor Oaten would be the suspension of the principal? It suggests that discipline is lacking from top to bottom···there is something radically wrong with the management of this College, and that the time has come when Government must insist upon the house being set in order."—সমস্ত ঘটনার পিছনে কারা যে প্রকৃত দোষী তা শুধু ইংরেজ সমাজের এই মুখপাত্রটির স্বীকারোক্তি হইতে ধরা পড়েনি, সরকার কর্তৃক অধ্যক্ষ জেমস এবং অধ্যাপক ওটেনকে প্রেসিডেন্সি কলেজ হতে অপসারণের মাধ্যমেও তা বোঝা গিয়েছিল। সমস্ত বিতর্কের যিনি মধ্যমণি সেই অধ্যাপক ওটেনকেও বা সরকার কলেজ হতে সরালেন কেন? দোষ চাপানো হলো ছাত্রদের ঘাড়ে, কিন্তু সেটা কর্তৃপক্ষের প্রথাগতিক চাল মাত্র; আসল দোষীরা অভিযুক্ত হলনা বটে, কিন্তু অচিহ্নিত রইল না। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের আন্দোলন জয়যুক্ত হল তাই।

(ক্রমশঃ)

UPPER GANGES SUGAR MILLS Ltd.
THE OUDH SUGAR MILLS Ltd.
NEW INDIA SUGAR MILLS Ltd.
THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS Ltd.
BHARAT SUGAR MILLS Ltd.
GOBIND SUGAR MILLS Ltd.

PURE CRYSTAL CANE SUGAR

Managing Agents
BIRLA BOMBAY PRIVATE LTD
(FORMERLY THE COTTON AGENT PRIVATE LTD.)
INDUSTRY HOUSE,
159, Churchgate Reclamation,
BOMBAY — 1

পুস্তক পরিচয়

নেতাজি সঙ্গ ও প্রসঙ্গ। দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী। গ্রন্থ প্রকাশ, ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ছয় টাকা। পৃঃ ১৯৪।

জেলে ত্রিশ বছর ও ভারতের বিপ্লব-সংগ্রাম। ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী। প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী। ১৪ কলেজ স্কোয়ার কলি-১২। মূল্য পাঁচ টাকা। ২৬৯।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কয়েকটি উজ্জ্বল অধ্যায়ের ওপর আলোকপাত করেছেন আলোচ্য গ্রন্থ দুখানির লেখক দ্বয়। লেখক হিসাবেই এঁদের দুজনের প্রধান পরিচয় নয়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামে উভয়েই বিশেষ অংশ গ্রহণ করে স্মরণীয় হয়েছিলেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী প্রথমত নেতাজী সুভাষচন্দ্রের একজন অন্তরঙ্গ সহকর্মী রূপেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন এবং শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ১৯০৪ সালের সময় হতে অনুশীলন সমিতির একনিষ্ঠ কর্মীরূপে বাংলার বৈপ্লবিক রাজনীতির কেন্দ্রস্থলে এসে পড়েন এবং পরে ঐ সমিতির প্রধান নেতা হন। তিনিও পরবর্তী কালে সুভাষচন্দ্রের সমর্থক রূপে দেশবাসীর নিকট পরিচিত হন। উভয় লেখকই এখনও জীবিত। ত্রৈলোক্যনাথ পাকিস্তানে বাস করেন ও আশি বছর বয়স অতিক্রম করা সত্ত্বেও পাক সরকার তাঁকে এখনও বিপজ্জনক ব্যক্তি বলে মনে করেন ও মাঝে মাঝে তাঁকে জেল বা হাজতে রাখেন। এই বর্ষীয়ান স্বাধীনতা বিপ্লবীকে উভয় বাংলার মানুষ সমভাবে শ্রদ্ধা করে।

নরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের সমালোচনা প্রসঙ্গে আমরা তাঁর রচনার সাধুবাদ করেছিলাম। দ্বিতীয় খণ্ডের জন্যও সেই সাধুবাদই তাঁর প্রাপ্য। এই খণ্ডে তিনি সুভাষচন্দ্রের জীবনের খুবই একটি সময়ের কথা আলোচনা করেছেন। ১৯৪১ সালের ২রা জুলাই ভারত-রক্ষা বিধির ১২৯ ধারা অনুসারে সরকার সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে প্রেসিডেন্সি জেলে হাজতে রাখে। হলোয়েল মনুমেন্ট অপসারণের দাবীতে ওরা জুলাই সভা সমিতি মিছিল হবার কর্মসূচী ছিল, তার পূর্বাহ্নেই এই গ্রেপ্তার; কিন্তু আপাতকারণ এই হলেও গ্রেপ্তারের আসল কারণ হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজ তাঁকে জেলের বাইরে রাখা অতীব ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করেছিল। এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র সিদ্ধিকী করেছিলেন, বম্বে কর্পোরেশন করেছিল, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকও অ্যাসেম্বলিতে দাঁড়িয়ে সুভাষচন্দ্রের প্রতি গভীরতম শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। সারা দেশে অসংখ্য সভা-সমিতি, সমাবেশ হতে এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ ওঠে। কিন্তু প্রতিবাদ করেননি কংগ্রেস, গান্ধী, নেহরু, প্যাটেল বা আজাদ। ওরা জুলাই দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভা বসে এবং সেই সভায় নেহরু যুদ্ধে ইংরেজকে সক্রিয় ও পূর্ণ সমর্থনদানের প্রস্তাব করেন। তাঁর ও মৌলানা আজাদের উদ্যোগে ঐ মর্মে ওয়ার্কিং কমিটিতে প্রস্তাব গৃহীতও হয়। গান্ধী ও আবদুল গফুর খান এই প্রস্তাবকে অহিংসাবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু শুধু সুভাষ বসুর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ না-করার ব্যাপারে গান্ধী ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে একমতই হন। তিনি বলেন: Subhas Babu did not defy the

law with the permission of the Congress. He has frankly and courageously defied even the Workingy Committee. সুতরাং ওয়ার্কিং কমিটি কেন তাঁর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদটুকুও করবে?

সুভাষের গ্রেপ্তারের সঙ্গে সুরু হল সারা ভারতে তাঁর অনুগামীদের গ্রেপ্তারের পালা। সেই সূত্রে নরেন্দ্রনারায়ণও গ্রেপ্তার হন ৬ই জুলাই। তাঁকেও পুলিশ নিয়ে আসে প্রেসিডেন্সি জেলে। এই জেলেরই দুরোপিয়ান ওয়ার্ডে পাশাপাশি কামরায় থাকার সুযোগে সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন লেখক এই ডিসেম্বর পর্যন্ত;—এইদিন সুভাষচন্দ্র জেল হতে মুক্ত হয়ে ঘরে আসেন। এই মুক্ত হবার পিছনে ছিল মুক্তির দাবীতে তাঁর অনশন—২৯শে নভেম্বর হতে যা সুরু হয়েছিল ও এই ডিসেম্বর মুক্তিদানের ঘোষণার পর যা সমাপ্ত হয়েছিল। এরপরই তিনি এলগিন রোডের বাসায় অন্তরীণাবদ্ধ হন ও সেখান হতেই ছদ্মবেশে বিদেশে চলে যান।

কয়েকটি মাস লেখক সুভাষচন্দ্রের প্রাত্যহিক জীবনধারা ও তাঁর অনাবৃত রূপ দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। এরকম কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা সাধারণত মধুর হয় না, একজন শক্তিশালী নেতা বা বিখ্যাত ব্যক্তিকে দূর থেকে দেখে যে শ্রদ্ধা রাখা সম্ভব কাছ থেকে নিবিড় পরিচয়ের আলোয় সে শ্রদ্ধা নষ্ট হবার সম্ভাবনাই বেশি থাকে। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থখানিতে এই সত্যটি ধ্বনিলাবদ্ধ হয়ে রইল যে জাতীয় জীবন ও ব্যক্তিগত জীবনের এক চরম সঙ্কট লগ্নেও সুভাষচন্দ্রের প্রতিদিনকার চিন্তাভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আচার-ব্যবহার তাঁর সহজ ও স্বাভাবিক মহত্ত্বের স্পর্শে দীপ্ত হয়েই উঠেছিল —লেখক এই ব্যক্তিটির নিবিড় নৈকট্যে এসে আরও অভিভূত, আরও শ্রদ্ধাবান হয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রের চরিত্রের নতুন কয়েকটি দিক তিনি দেখেছিলেন যা কোনো রাজনৈতিক নেতার জীবনের পক্ষে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত—আর সেখানেই সুভাষ তাঁর সমকালীন অন্যান্য সকল নেতা হতে স্বতন্ত্র। এই দিকগুলির আলোচনার জন্যই বইখানি অসাধারণ মূল্য লাভ করেছে। যেমন, লেখক-বর্ণিত জেলের একজন কয়েদী সম্পর্কিত একটি ঘটনায়, একজন সহকর্মীর পারিবারিক সমস্যার বিষয়েও সুভাষচন্দ্রের তীক্ষ্ণ সচেতনতার সাক্ষ্য, ইত্যাদি। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যুদ্ধকালে ইংরেজকে চরম আঘাত হানার উদ্দেশ্যে অভাবিত বৈপ্লবিক কর্মপন্থা গ্রহণের জন্য সুভাষচন্দ্রের অভিনব গোপন আত্মপ্রস্তুতির কথা, এবং সুভাষচন্দ্রের নিভৃত সাধনা ও তার সিদ্ধির কথা। এরই সঙ্গে মিলেছে তদানীন্তন ভারতীয় রাজনীতির উত্থান পতনের নিপুণ বিশ্লেষণ; গান্ধীবাদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মতাদর্শের সংঘাতের কাহিনীও। কোনো কোনো সমকালীন ব্যক্তি—যেমন হেমন্তকুমার সরকার ও দিলীপকুমার রায় সুভাষ-চরিত্রের যে বিকৃত পরিচয় তাঁদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন তার কঠোর প্রতিবাদ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির সম্পর্কে সত্য উদ্ঘাটনেও লেখক কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন।

কিন্তু এই গ্রন্থে লেখক প্রসঙ্গত তাঁর দুটি মত আমাদের জানিয়েছেন—যে বিষয়ে আপত্তি করা দরকার মনে করি। তিনি বলেছেন যে সুভাষচন্দ্র বিবাহিত এবং অনিতা তাঁর কন্যা; দ্বিতীয় মত এই যে সুভাষ মৃত। এই দুটি মতের সপক্ষে লেখক কোনো তথ্য বা যুক্তি দেননি, সেজন্যই এরকম মত প্রকাশ অর্বাচীনের উক্তির মতো লাগে। লেখক বসুপরিবারের এমন কয়েকজন ব্যক্তির প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত যাঁরা বর্তমানে উক্ত দুইটি মতের ধারক ও বাহক বলে দেশবাসীর নিকট বিদিত। লেখকের উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত কতখানি সৎ, সে বিষয়ে তাই আমাদের সন্দেহ জাগে। আরও একটি প্রশ্ন এই যে লেখক সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কথোপ-কথনগুলি সুললিত সংলাপের মাধ্যমে উপস্থিত করেছেন, এই সংলাপগুলি কি তাঁর স্মরচিত নয়? গ্রন্থরচনার কাল হতে সাতাশ বছর আগের সময়ের কথা লেখকের আলোচনায়

বিবরবস্তু ; এবং সে সময়ের ঘটনাগুলি ও আলাপচারিতার কোনো দিনপঞ্জীও রক্ষিত হয়নি ; সেক্ষেত্রে যথাযথ ভাবে কাহিনী ও সংলাপ লেখক এতদিন পর লিখলেন কী করে ? এর অনেকাংশই তাই তাঁর কল্পনাপ্রসূত বলে সংশয় জাগে। তারও সঙ্গে যদি লেখকের কোনো ভিন্নতর মতলব যুক্ত হয় তবে সুভাষ চরিত্রের বর্ণনায় বিকৃতি ঘটার আশঙ্কা বেড়েই যায়। সুভাষচন্দ্রের সহযোগী বলে একদা যাঁরা পরিচিত হয়েছিলেন তাঁরা অনেকেই ছিলেন প্রচণ্ড বিশ্বাসঘাতক। সুভাষচন্দ্রের সমস্ত কর্মোদ্যম ও আদর্শকে পশ্চাৎদেশ হতে ছুরিকাঘাত করার দায়ে এঁরা অনেকেই দায়ী। বর্তমান গ্রন্থের লেখক সম্পর্কে এই মন্তব্যগুলি প্রযোজ্য কিনা তা আমরা জানিনা এবং তা আমাদের আলোচনার বিষয়ও নয় ; কিন্তু সুভাষচন্দ্রের মুখে এমন কিছু কিছু সংলাপ তিনি বসিয়েছেন এবং সুভাষচন্দ্রের এমন দুয়েকটি আচরণের কথা লেখক বলেছেন যা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়। যেমন,

"শোনো। তুমি জানতে চাইছো আমি কোন নারীকে জীবনে কামনা করেছি কিনা। এই তো ?"

"বলুন।"

"করেছি। অনেক করেছি। দিন-রাত ছটফট করেছি। ভুলে যাও কেন যে, আমিও মানুষ। মানুষ ওটা চাইবেই।"

"তবে বিয়ে করলেন না কেন ?"

"কেন ? সে অনেক কথা।···সময় পেলাম কোথায় ?" (পৃঃ ১৪৭) লেখকের মতে এই নারীই এমিলি শেঙ্কল, যাঁকে সুভাষ পরে বিবাহ করেছিলেন এবং এই বিবাহের ফলে সুভাষচন্দ্রের একটি কন্যালাভও ঘটে। লেখক আরও জানাচ্ছেন যে ছেলে থাকাকালে সুভাষ লেখককেই রাশিয়ায় ও জার্মানীতে যুদ্ধের সময়ে পাঠাতে চেয়েছিলেন, এবং তাঁর নিজের যাত্রার কথা তাঁর সঙ্গে আলোচনাও করেছিলেন। পাঠককে এসব কথা বিশ্বাস করে নিতে হবে কেন, লেখক সে পক্ষে কোনো যুক্তি বা তথ্য দেননি। আশা করি ভবিষ্যৎ সংস্করণে লেখক এইসব ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত হবেন।

ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী মহাশয়ের গ্রন্থও তাঁর স্মৃতিকথা—কিন্তু বহু প্রামাণ্য তথ্য সঙ্কলনের সাহায্যে বইখানিকে তিনি ইতিহাস-গ্রন্থের মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। বাংলা দেশের বিপ্লব-আন্দোলনের বিশদ চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে বৈপ্লবিক সংগ্রামের যে অংশ এখন প্রকাশ্য ইতিহাস বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে সেই অংশগুলিও সুন্দররূপে আলোচিত হয়েছে এই গ্রন্থে। মান্দালয় জেলে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে একত্রে কারাবাসের কাহিনী, রামগড় কংগ্রেসের সমকালীন কিছু অপ্রকাশিত ঘটনা, আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য পত্র এবং বাংলা দেশের সকল বৈপ্লবিক দলগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই গ্রন্থের বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয়। প্রকাশক বইখানির মূল্য অল্প ধার্য করায় বহুল প্রচারের পক্ষে সুবিধা হবে : বাংলা দেশের লাইব্রেরীগুলির উচিত এই বইখানি নিজেদের সংগ্রহে রাখা।

২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিতগোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Gram DEVICE

Please Contact

MECHANICAL ENGINEERING CO

PRIVATE LTD

5, MISSION ROW
CALCUTTA-1

FOR ALL TYPES OF TRAILERS,
TROLLEYS AND WHEEL BARROWS

জয়শ্রী

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

৩১ বর্ষ দশম সংখ্যা মাঘ ১৩৭৩

সম্পাদকীয়

চতুর্থ নির্বাচনোত্তর ভারতবর্ষ

কুড়ি বছরের কংগ্রেসী শাসনের একাধিপত্যে বঞ্চনা দুর্নীতি ও পীড়নের যে দুর্বিসহ বোঝা সাধারণ মানুষের জীবনকে অসহনীয় করে তুলেছিল, চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয়ে তার অবসানের সম্ভাবনায় উদ্বেলিত জাগ্রত জনতাকে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাদের ঘরের মত রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেসী শাসন ধূলিসাৎ হয়ে যাবে, কায়েমী স্বার্থ এত দ্রুত পরাজয় বরণ করে নিয়ে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ জীবনে শক্তির ভারসাম্যে এতো আকস্মিক পরিবর্তন আনবে, নির্বাচনের পূর্বে সেকথা ভাবা যায় নি। নির্বাচনোত্তর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মানচিত্রের এই কল্পনাতীত পরিবর্তন, তাই নূতন দায়িত্ব নিয়ে আমাদের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছে।

কুড়ি বছরের কংগ্রেসী শাসনের একাধিপত্য নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে আদৌ পরিবর্তিত হবে কিনা, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক শক্তি সমাবেশের পরিবর্তন ও সামাজিক পরিবর্তনের গতিবেগ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে অবলম্বন করে অগ্রসর হতে পারবে কিনা, চতুর্থ নির্বাচনের মুখে এই উদ্বিগ্ন প্রশ্ন মানুষের মনে ভীড় করেছিল। এই সংশয় এবং গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গভীর উদ্বেগ মানুষের মন যে হতাশা ও ব্যর্থতাবোধে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছিল, এই নির্বাচনের ফলাফলে তার মোড় ফিরেছে। কংগ্রেসী একাধিপত্য থেকে এই বন্ধন মুক্তির আনন্দ স্থায়িত্ব পাবে কিনা, দেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিরাপদ কিনা, তা নির্ভর করবে নির্বাচনোত্তর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তি সমাবেশ নূতন ভারসাম্যের গতিবেগ নিয়ে কোন পথ বেয়ে অগ্রসর হবে তার উপর। যে দুর্নীতির আবর্ত মানুষের জীবনে সকল মূল্যবোধকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে, যে দারিদ্র্যের বঞ্চনা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অভ্যাসগত হয়ে গেছে, বাস্ত, আশ্রয়, শিক্ষা স্বাস্থ্য ও উপার্জনের নিরাপত্তার অনিশ্চয়তা যেখানে দুরন্ত অধৈর্য অনিবার্য করে তুলেছিল, তাদের জীবনে নিরাপত্তার পরিপূর্ণতাবোধ ধৈর্য ফিরিয়ে আনবে নূতন ভারসাম্যে তাদের পৌঁছে দেবে কিনা প্রতিটি দেশপ্রেমিককে তার প্রতি সজাগ থাকতে হবে। নির্বাচনোত্তর ভারতবর্ষ সাধারণ মানুষের জীবনে সামাজিক ন্যায়বিচারবোধ ও স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করে তুলতে পারলেই কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয় ভারতবর্ষের মানচিত্রে যথার্থ বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করবে। অন্যথায় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে।

কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচনোত্তর পরিবর্তনের গতিবেগ কোন দিকে অগ্রসর হবে তা সুনিশ্চিতভাবে এখনই বলা সম্ভব না হলেও আটটি রাজ্যে কংগ্রেসের

ক্ষমতাচ্যুতি. এই পরিবর্তনের পটভূমি রচনা করতে সুরু করেছে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, কেরল ও রাজস্থানে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে। এই রাজ্যগুলির মধ্যে একমাত্র রাজস্থান কংগ্রেসই সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাবার পরও অ-কংগ্রেসীদের ভাঙিয়ে ৯২ জন সদস্য সংগ্রহ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবী করেছে। পশ্চিম বাংলায় অকংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে ২৪৭ জন সদস্যের সমর্থনে; ২৮০ জন সদস্যের মধ্যে কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা (পশ্চিম বাংলা বিধান সভায়) ১২৭। মাদ্রাজে দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজাগম দল ২৩৪জন সদস্যের মধ্যে ১৩৮ জন সদস্য নির্বাচিত করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে, এখানে কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা মাত্র ৩৯ জন। বিহারে ৩১৮ জন সদস্যের মধ্যে কংগ্রেসের সংখ্যা ১২৮। উড়িষ্যায় স্বতন্ত্র ও জনকংগ্রেসের যুক্ত মন্ত্রীসভা গঠিত হলে, উত্তর প্রদেশেও কংগ্রেস ৪২৪টির মধ্যে ১৯৮টি আসন পেয়ে সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়েছে। কেরলায় ১৩৩টি আসনের কংগ্রেসের ভাগ মাত্র ৯টি পাঞ্জাবেও ১০৬টির মধ্যে মাত্র ৪৮টি। দিল্লীতেও জনসঙ্ঘের নিকট কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে। এছাড়া কেন্দ্রে ৫১০টি ঘোষিত আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছে ২৭৯টি মাত্র আর ১০টি আসনের ফল ঘোষণা অবশিষ্ট আছে। সুতরাং কেন্দ্রেও বিরোধীদের সঙ্গে আসনের ব্যবধান ৫০টির বেশী হবার সম্ভাবনা নাই।

শুধু তাই নয় রাজ্যে রাজ্যে মন্ত্রীপাত হয়েছে। প্রায় একশতটি মন্ত্রী পরাজিত; পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মাদ্রাজ, পাঞ্জাবে মুখ্যমন্ত্রীদের পরাজয় এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর দুইটি আসনে পরাজয় এবং জামানত খোয়ানো। কেন্দ্রের মন্ত্রী পাতিল, সুব্রহ্মনিয়ম, বাসুভাই পা, শচীন চৌধুরী, দেবের চাঁদ খান্না, রাজা বাহাদুর, শানওয়াজ, টমাস প্রভৃতির পরাজয় এবং সর্বোপরি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক দ্যানিয়েল, কোষাধ্যক্ষ অতুল্য ঘোষ এবং সভাপতি কামরাজের পরাজয় কংগ্রেসী শাসনের ভিতে ভূমিকম্প সৃষ্টি করেছে। এই বিপর্যয়ের গ্রাস থেকে কংগ্রেসকে উদ্ধার পেতে হলে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হবে—কংগ্রেসকে আগাগোড়া ঢেলে সাজতে হবে।

কংগ্রেসের এই পরীক্ষা সুরু হবে, কেন্দ্রে কংগ্রেসী শাসনের নূতন দৃষ্টিভঙ্গি প্রবর্তনে। এবারকার লোকসভায় কংগ্রেস প্রান্তিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিরোধীদের সম্মুখীন হবে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যদি কেন্দ্রীয় সরকার গুরুতর জাতীয় সমস্যাগুলি সম্পর্কে অন্যান্য দলের মতামত গ্রহণ করে নীতি নির্ধারণে অগ্রসর না হয়, লোকসভায় প্রবল বাধার সম্মুখীন হবে। গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যায় কংগ্রেসের দিক থেকে জাতীয় মানসিকতার ঐক্য (National Consensus) খুঁজে বার করবার দায়িত্ব নিতে হবে। এ-ছাড়া বিভিন্ন দল বিভিন্ন রাজ্যে মন্ত্রিসভা পরিচালনা করার ফলে রাজ্য-কেন্দ্র সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দুগুলি উত্তপ্ত হয়ে উঠবার সম্ভাবনা দেখা দেবে। পূর্বে কেন্দ্রে এবং রাজ্যে একই দলের শাসন চলার ফলে এই সমস্যার মীমাংসা প্রশাসনিক স্তরে সম্ভব না হলে, দলীয় স্তরে সম্ভব হতো। এখন দলীয় স্তরে রাজ্য-কেন্দ্র সংঘাত নিরসনের সম্ভাবনা অনেক ক্ষেত্রেই অন্তর্হিত হয়েছে। কেরলে নাম্বুদ্রিপদের নেতৃত্বে সাত পার্টির সরকার, পশ্চিম বাংলায় অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে যুক্ত ফ্রন্টের সরকার, উড়িষ্যায় স্বতন্ত্র-জন-কংগ্রেসের সরকার এবং সম্ভবত বিহার, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবে বিরোধীদের সম্মিলিত সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রের সম্ভাব্য বিরোধ মেটাবার জন্যও কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী সরকারের নূতন প্রশাসনিক মানসিকতার প্রয়োজন হবে। ভারতবর্ষের সংবিধান একদিকে যেমন কেন্দ্রাভিমুখী অন্যদিকে তেমনি কেন্দ্রমুখীন,—শক্তিশালী

কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থা নিহিত রয়েছে ভারতীয় সংবিধানে। চতুর্থ নির্বাচনের পর বিভিন্ন রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকার গঠিত হওয়ায় ফলে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের নূতন টানা-পোড়েনে সংবিধানের ব্যবস্থাপনারও পরীক্ষা হবে, তবে সেই পরীক্ষায় সাংবিধানিক ব্যবস্থা উত্তরাবে যদি কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী সরকারের পরিবর্তিত অবস্থার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়, অন্যথায় সাংবিধানিক সঙ্কট কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতকে কেন্দ্র করে, অনিবার্য হয়ে উঠবে।

চতুর্থ নির্বাচনোত্তর ভারতবর্ষে শক্তি-বিন্যাসের নূতন রূপ কি হবে তার রূপরেখা স্পষ্ট না হলেও কিছুটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে, নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে। হিন্দিতে, উত্তর প্রদেশে ও মধ্য প্রদেশে জন সঙ্ঘের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে, উড়িষ্যা, রাজস্থান, গুজরাট ও অন্ধ্রপ্রদেশে স্বতন্ত্রদলের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে এই দুই দলের গতিপথ সমাজবাদের বিপরীতমুখীন। বিহার ও উত্তর প্রদেশে সংযুক্ত সমাজতন্ত্রীদের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। এই দল কেরালায় এবং অন্যান্য রাজ্যে বামপন্থী সকল দলের সঙ্গেই সমঝোতা করে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছিল, এদের মধ্য দিয়ে সমাজবাদের প্রভাব হ্রাস বৃদ্ধির তাই সঠিক পরিমাপ পাওয়া মুস্কিল। কমিউনিষ্টদের প্রভাব পশ্চিম বঙ্গে ও কেরালায় বৃদ্ধি পেয়েছে। উত্তর ভারতে এদের প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি না পেলেও বিহার মহারাষ্ট্রে বৃদ্ধি পেয়েছে। পি, এস, পির বৃদ্ধি পেয়েছে উড়িষ্যাতে। কেন্দ্রে স্বতন্ত্রদল ৪৮টি আসন পেয়ে কংগ্রেসের পরেই স্থান করে নিয়েছে, জনসঙ্ঘ ৩৫টি আসন পেয়ে তৃতীয় মাদ্রাজের ডি, এম, কে শুধু মাদ্রাজ থেকেই ২৫টি আসন পেয়ে চতুর্থ এস, এস, পি ২৩টি আসন পেয়ে পঞ্চম, কম্যুনিষ্ট পার্টি (দক্ষিণ) ২২টি আসন পেয়ে ষষ্ঠ, মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্টরা ১৯টি আসন পেয়ে সপ্তম এবং পি, এস, পি ১৩টি আসন পেয়ে অষ্টম স্থান অধিকার করেছে। সুতরাং নূতন শক্তিবিন্যাসে সমাজবাদের বিরোধীরাও অগ্রণীর ভূমিকায় স্থাপিত হয়েছে। সমাজবাদীরা পিছিয়ে পড়েছে এবং দেশের প্রতি যাদের আনুগত্য সংশয়ান্বিত তাদের প্রভাব বৃদ্ধির পরিসরও সীমিত। কংগ্রেসের ধ্বংসস্তূপ থেকে গণতন্ত্র, সমাজবাদ, জাতীয় নিরাপত্তা ও জাতীয় সার্বভৌমিকত্ব, নিবিড় হবার শক্তি উৎসারিত করবার দায়িত্ব গ্রহণ করে ভারতীয় জনসমাজকে সচেতন ভূমিকায় স্থাপন করে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনোত্তর বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে সার্থক করে তুলতে হবে।

চতুর্থ নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গ

যে আটটি রাজ্যে কংগ্রেস পরাজিত হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ তাদের মধ্যে অন্যতম। নির্বাচনের পরও পশ্চিম বঙ্গের কংগ্রেসী কর্তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতার স্বপ্ন দেখেছিলেন, কিন্তু ভোট গণনার পর সেই আশা ধূলিসাৎ হয়ে এই কর্তাদের চূড়ান্তরূপে হতমান করেছে। বাংলা কংগ্রেসের নেতা শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের নিকট আরামবাগে মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের ৮৮১ ভোটে পরাজয়, বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রে সংযুক্ত বাম ফ্রন্টের প্রার্থী শ্রী পি, এম, বিশ্বাসের নিকট ২৯,১৭০ ভোটে শ্রীঅতুল্য ঘোষের পরাজয়, মন্ত্রী শ্যামাদাস ভট্টাচার্য, অন্নদিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, শুক্লকান্তি ঘোষ, অর্ধেন্দু নস্করের পরাজয় এবং পশ্চিম বাঙ্গলার বিধান সভায় কংগ্রেসের ২৮০টী আসনের মধ্যে মাত্র ১২৭ টি আসন লাভে কংগ্রেসের বিপর্যয় সম্পূর্ণ হয়েছে।

পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসের এই বিপর্যয়ে সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট এবং শ্রীঅজয় মুখার্জির কৃতিত্বই বেশী। সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট ও সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট অধিকাংশ বিরোধী-দলগুলি নির্বাচনের পূর্বে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। বাংলা কংগ্রেস, দক্ষিণ-পন্থী কম্যুনিষ্ট পার্টি ও ফরোয়ার্ড ব্লক ও

বলশেভিক পার্টি সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট এবং বামপন্থী কম্যুনিষ্ট পার্টি, আর, এস, পি, এস, এস, পি, ওয়ার্কার্স পার্টি, আর, সি, পি, আই, এস, ইউ, সি, ব্লাঙ্কিষ্ট ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি দলের সমষ্টি সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট গঠন করে। সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টের পক্ষ থেকেই অজয়বাবু তমলুকে তাঁর নিজস্ব কেন্দ্র ছাড়াও আরামবাগে প্রীতকুল সেনের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে এগিয়ে আসেন। সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট থেকে সেদিন অজয় বাবুর এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোনো সমর্থন আসে নাই। তেমনি বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রে প্রীঅতুলা ঘোষের বিরুদ্ধে সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টের সমর্থন পাওয়া যায় নাই। পি, এস, পি এই দুই ফ্রন্টের বাইরে থেকেও এই দুই কেন্দ্রে কংগ্রেসের পরাজয়ের জন্য সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে। অন্যান্য কেন্দ্রেও মন্ত্রীপতনে: কৃতিত্ব সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট অন্তর্ভুক্ত বাংলা কংগ্রেসের। মন্ত্রী শ্যামাদাস ভট্টাচার্য, অতুলিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তপদকান্তি ঘোষ এদের হাতেই পরাস্ত হয়েছেন।

সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট ও সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট. যথাক্রমে ৬২ ও ৬৩ টি আসন পেয়েছে, অথচ বামপন্থী কম্যুনিষ্ট পার্টি পশ্চিমবঙ্গে অধিকতর শক্তির দাবীতে বাংলা কংগ্রেস ও দক্ষিণপন্থী কম্যুনিষ্ট পার্টির আসনের দাবী অস্বীকার করে এদের সঙ্গে নির্বাচনী ফ্রন্ট গঠনে বিরত থাকে। এই ফ্রন্ট দুইটির অন্তর্ভুক্ত দলগুলির মধ্যে বামপন্থী কম্যুনিষ্ট পার্টির শক্তির দাবী ভোটাররা প্রত্যাখান করেছে বলা চলে। বামপন্থী কম্যুনিষ্ট পার্টি ১০৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৪৩ টি পেয়েছে। দক্ষিণপন্থী কম্যুনিষ্ট পার্টি ৫৮ টিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পেয়েছে ১৬টি। বাংলা কংগ্রেস ৮২ টি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পেয়েছে ৩৪টি, ফরোয়ার্ড ব্লক ৪২ টিতে পেয়েছে ১০টি, এস, এস, পি, ২৬ টিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পেয়েছে ৭টি আর, এস, পি ১৮টিতে ৬ এস, ইউ, সি ৮টিতে ৪, গান্ধীবাদীফরোয়ার্ড ব্লক ৩ টিতে ১, ওয়ার্কার্স পার্টি ২টিতে ২টি। এছাড়া এই দুই ফ্রন্টের বাইরে থেকে পি, এস, পি ২৬টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৭টি পেয়েছে, জনসঙ্ঘ ৫৮টিতে ১টি, স্বতন্ত্র ২১টিতে ১টি, লোকসেবক সঙ্ঘ ৬টিতে ১টি, গোর্খা লীগ ৩টিতে ২টি পেয়েছে। কংগ্রেস ২৮০টী আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ১২৭টী আসন পেয়েছে। ১৯৬২ সালে পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেস বৈধ ভোটের শতকরা ৪৭.২৯ ভাগ পেয়েছিল—সর্বভারতে এই হার ছিল ৪১.৩৮। এই নির্বাচনে পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসের শতকরা হার দাঁড়িয়েছে ৪১.২০। ১৯৬২ সালে পশ্চিম বাংলায় অবিভক্ত কম্যুনিষ্ট পার্টির বৈধ ভোটের হার ছিল শতকরা ২৪.৯৮, তাদের সর্বভারতীয় হার ছিল শতকরা ৮.৫১। এই নির্বাচনে ডান কম্যুনিষ্টরা পেয়েছে শতকরা ৬.৬৩ এবং বাম কম্যুনিষ্ট পেয়েছে শতকরা ১৮.২৭ ভাগ, দুইয়ে মিলিয়ে শতকরা ২৪.৯০ ভাগ। অর্থাৎ ১৯৬২ সালের তুলনায় এবার কম্যুনিষ্টদের ভোট বাড়ে নাই। বাংলা কংগ্রেস পেয়েছে শতকরা ১০.০৮ ভাগ। অন্যান্য দল ও নির্দলীয়রা মিলে পেয়েছে শতকরা ২৩.৮১ ভাগ।

পশ্চিমবঙ্গে লোকসভার ৪০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ১৪টি আসন পেয়েছে ভোট পেয়েছে শতকরা ৩৮ ভাগ, বাম কম্যুনিষ্ট ৪টি আসন ও শতকরা ১৫ ভাগ ভোট পেয়েছে, ডান কম্যুনিষ্ট ৪টি আসন ও শতকরা ১.৪৪ ভাগ ভোট পেয়েছে, এস, এস, পি ১টি আসন ও শতকরা ১.৮৩ ভাগ ভোট পেয়েছে; পি, এস, পি ১টি আসন ও শতকরা .৬১ ভাগ ভোট পেয়েছে, বাংলা কংগ্রেস ৫টি আসন ও শতকরা ৯.৮৯ ভাগ ভোট পেয়েছে, ফরোয়ার্ড ব্লক ২টি আসন ও শতকরা ৩.৯৫ ভাগ ভোট পেয়েছে, আর, এস, পি ১টি আসন ও শতকরা ১.৯৪ ভাগ ভোট পেয়েছে, এস, ইউ, সি ১টি আসন ও ১.৫৮ ভাগ ভোট এবং এস, এস, এস ১টি আসন এবং ৭০ ভাগ ভোট পেয়েছে।

এই নির্বাচনে তিনটি জেলায় কংগ্রেসের ব্যর্থতা

কংগ্রেসের বিপর্যয়ের অন্ত নেই। ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর ও হুগলী এই তিনটি জেলায় ১৯৬২ সালে কংগ্রেস ৮৯টি আসনের মধ্যে ৭০টি আসন পেয়েছিল, এবার এই ৩টি জেলায় আরও ১০টি আসন যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এবারকার নির্বাচনে কংগ্রেসের আসন দাঁড়িয়েছে ৩২টি। নদীয়া ও পুরুলিয়াতে কংগ্রেসের আসন হ্রাস পেলেও মুর্শিদাবাদ, কুচবিহারে বর্ধমানে এবং বীরভূমে কংগ্রেসের আসন বৃদ্ধি পেয়েছে। মেদিনীপুর জেলায় কংগ্রেস ৬২ সালে ৩২টি আসনের মধ্যে ২৭টি, ২৪ পরগণায় ৪২টির মধ্যে ৩৩টি, হুগলীতে ১৫টির মধ্যে ১০টি আসন পেয়েছিল। আর এবারকার নির্বাচনে যথাক্রমে ৩৪টির মধ্যে ১০টি, ৪০টির মধ্যে ১২টি এবং ১৮টির মধ্যে ৭টি আসন পেয়েছে মেদিনীপুরের অধিকাংশ আসন বাংলা কংগ্রেস ও দক্ষিণপন্থী কম্যুনিষ্টদের হাতে গেছে এবং ২৪ পরগণার অধিকাংশ আসন বামপন্থী কম্যুনিষ্ট ও বাংলা কংগ্রেসের হাতে গেছে। বারাসত, বসিরহাট ও ডায়মণ্ড হারবার মহকুমায় কংগ্রেস শোচনীয়-ভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস ও বাম কম্যুনিষ্ট উভয় দলই শক্তির ভারসাম্যের দুই বিপরীত বিন্দুতে সংহত হয়ে অন্যান্য বিরোধীশক্তিগুলিকে বিধ্বস্ত করে দেবার জন্য নির্বাচনী প্রচারের মধ্য দিয়ে উদ্যোগী ছিল। এদের চেষ্টা সত্ত্বেও শক্তির এই পোলারাইজেশন ঘটাতে এরা ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতারোধে বাংলা কংগ্রেস ও অন্যান্য বিরোধী শক্তির ভূমিকা নিঃসন্দেহে কার্যকরী হয়েছে। নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে যদি পশ্চিম বাংলায় শক্তিগুলির সংহতি সাধনের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদের পুনরুজ্জীবন হয়, তবেই পশ্চিম বাংলার জনজীবনে আগামী দিনের সঙ্কট উত্তরণ সম্ভব হতে পারে, সমাজবাদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলির আশু সংহতির অনিবার্যতা রয়েছে।

পশ্চিম বাংলায় অ-কংগ্রেসী মন্ত্রীত্ব

নির্বাচনোত্তর পশ্চিম বঙ্গে অ-কংগ্রেসী শক্তিগুলি দ্রুত পদক্ষেপে একত্রিত হয়ে ১৪৬ জন বিধান সভার সদস্যের সমর্থনে শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়কে নেতা নির্বাচন করে অকংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠন করেছে। এই মন্ত্রিসভা গত ২রা মার্চ কার্যভার গ্রহণ করেছেন। আমরা শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত এই মন্ত্রীসভাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। বিশ বছর কংগ্রেসী কুশাসনে জর্জরিত হয়ে মুক্তির আনন্দে পশ্চিম বাংলার মানুষ কি পরিমাণ উদ্বেল হয়ে উঠেছে, তার সার্থক পরিচয় পাওয়া গেছে গত ১লা মার্চ কলকাতার ময়দানে অনুষ্ঠিত লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশে। পশ্চিম বাংলার সকল বিরোধী দলের সমর্থনে গঠিত এই মন্ত্রীসভা আট দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে কার্যভার গ্রহণ করেছেন। তার মধ্যে দুর্নীতির অপসারণ, খাদ্য, আশ্রয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উপার্জনের সুযোগ অগ্রাধিকার পেয়েছে। খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিক, উদ্বাস্তু, অনুন্নত সম্প্রদায় ও জাতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতিও এই আঠার দফা কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ-ছাড়া বাংলার সরকারী ভাষারূপে প্রতিষ্ঠা এবং দার্জিলিং-এর আঞ্চলিক ভাষারূপে নেপালীর প্রতিষ্ঠা দ্রুত কার্যকর করার সঙ্কল্পও এই কর্মসূচীতে ঘোষিত হয়েছে। ধান ও চালের পাইকারী ব্যবসায় রাষ্ট্রায়ত্তকরণ, প্রকিওরমেণ্ট ও রেশন মূল্যের ব্যবধান হ্রাস, কেন্দ্রের নিকট থেকে অধিকতর আর্থিক সুযোগ লাভ এবং পরিচ্ছন্ন প্রশাসনও এই কর্মসূচীর অন্তর্গত ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষার প্রতিশ্রুতিও এই কার্যসূচীতে স্থান পেয়েছে, অনেক বিতর্কের পর। আসলে পশ্চিম বঙ্গের ক্ষেত্রে সীমান্ত নিরাপত্তার নিশ্চিতি-ই বড় প্রশ্ন। সরাসরি সেই প্রতিশ্রুতি এড়িয়ে যুক্তফ্রন্টের টানাপোড়েনে সার্বভৌমত্বের প্রতিশ্রুতি কর্মপন্থায় স্থান পেয়েছে।

এই মন্ত্রীসভার দুই শরীক—বামপন্থী কম্যুনিষ্ট ও দক্ষিণ-

পন্থী কম্যুনিষ্ট—নির্বাচনের পূর্বে পরস্পরের বিরোধিতায় সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিল। বস্তুতপক্ষে বামকম্যুনিষ্ট নেতৃত্ব তাদের শিবিরযাত্রীদের বাইরে অন্য সকল বিরোধীশক্তিকে নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর ছিল। তাতে কংগ্রেসের জয় হলেও তাদের দ্বিধা ছিল না। নির্বাচনের পর জনতার চাপে বাম কম্যুনিষ্ট তাদের নীতির পরিবর্তনে এবং যে বাংলা কংগ্রেসকে নস্যাৎ করে দিয়েছিল নির্বাচনের পূর্বে, যাকে কংগ্রেসের দোসর বলে চিহ্নিত করেছিল, তাদেরই নেতার নেতৃত্বে এবং দক্ষিণ পন্থী কম্যুনিষ্ট পার্টির সহযোগে মন্ত্রীত্বে স্থান নিতে বাধ্য হয়েছে। এই মন্ত্রীত্বের মধ্য দিয়ে বাম-কম্যুনিষ্টদের পরীক্ষা হয়ে যাবে। গণতন্ত্রে অবিশ্বাস, মন্ত্রীত্বের অন্যান্য শরীকদের প্রতিক্রিয়াশীলতার অপরাধে চিহ্নিত করবার প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে যদি দূর না হয়, তবে মন্ত্রীত্বের অভ্যন্তরে আপাতসুপ্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব মাথা চাড়া দিয়ে উঠে বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষের মূর্ত আশা-আকাঙ্খাকে চুরমার করে দেবে। বামপন্থী কম্যুনিষ্টরা দক্ষিণ বাংলার কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার শরীক হবার পরও বামপন্থী কম্যুনিষ্টদের সাধারণ সম্পাদক সুন্দরায়া, দক্ষিণপন্থী কম্যুনিষ্ট, বাংলা কংগ্রেস ও ফরোয়ার্ড ব্লকের বিরুদ্ধে গত ১লা মার্চ ত্রিবান্দ্রমে যে বিষোদ্গার করেছেন তা থেকেই ভবিষ্যতের বিপদ সূচিত হচ্ছে। এই অন্তর্নিহিত সুপ্ত সংঘাত সম্পর্কে সজাগ থেকে নূতন নেতা শ্রী অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় নিশ্চয়ই অগ্রসর হবেন এবং দৃঢ়তার সঙ্গে আভ্যন্তরীণ-বিরোধী আঘাত—সে আঘাত বাইরে থেকেই আসুক কিম্বা ভেতর থেকেই আসুক—প্রতিহত করে অকংগ্রেসী আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলিকে তাঁর প্রশাসনিক ক্ষমতার প্রয়োগে স্থায়িত্ব দেবার জন্য বদ্ধপরিকর হবেন, এই আশা করছি।

কংগ্রেসের শক্তি-বিন্যাস ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

আগামী মে মাসে নূতন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্পর্কে বিভিন্ন মহলে আলোচনা সুরু হয়ে গেছে। তার কারণ রাজ্য বিধান-সভাগুলি ও লোকসভার আসন মিলিয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অর্জনে কংগ্রেস ব্যর্থ হওয়ায়। কংগ্রেসের দলীয় শক্তিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অসম্ভব হয়ে পড়ায় বিভিন্ন দল ঐ গুরুত্বপূর্ণ পদে সহমতের সমর্থনে নির্বাচনের পক্ষপাতী হয়ে উঠেছেন। যদিও বা দলীয় শক্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্ভব হয়, এই প্রকার নির্বাচনে বিরোধীদের সংখ্যাও প্রবল হবে। রাষ্ট্রপতির মত গুরুত্বপূর্ণ পদে প্রান্তিক সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রার্থী নির্বাচিত হলে জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রতীকরূপে তাঁর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ পাবে, তাই সকল দল থেকেই দাবী উঠেছে পারস্পরিক মত বিনিময়ের ভিত্তিতে ঐকমত্যভাবে দলীয় আওতার বাইরে কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিকে এই সর্বোচ্চপদে নির্বাচিত করা যায় কিনা। এই প্রসঙ্গে জয়প্রকাশ নারায়ন, সি, ডি, দেশমুখ, সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি গজেন্দ্রগদকরের নামও প্রস্তাবিত হয়েছে। জয়প্রকাশ নারায়ন অবশ্য ঐকমত্য হয়ে উপরাষ্ট্রপতি জাকির হোসেনকে এই উচ্চপদে নির্বাচনের সম্মান দেবার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

কংগ্রেস বর্তমান নির্বাচনের পর সারা ভারতবর্ষে কি পরিমাণ হিন্নভিন্ন হয়েছে এই প্রসঙ্গে সে প্রশ্নও আলোচিত হয়েছে। ৩৪৪১টি বিধান সভার আসনের মধ্যে যে ১৫৮৫টি আসনের ফল জানা গেছে তার মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছে ১৬৮৪, স্বতন্ত্র: ২৫৬, জনসঙ্ঘ: ২৬৬ কম্যুনিষ্ট পার্টি: ১২২, মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি: ১২৬, পি, এস, পি: ১০৬, এস, এস, পি: ১৭১ এবং অবশিষ্টগুলি আঞ্চলিকরা পেয়েছে। কংগ্রেস লোকসভার ২৭৯টি আসন পেয়েছে। ১৯৬২ সালে লোকসভায় কংগ্রেস ৩৬৮টি এবং বিধান সভায় ১৭৪৯টি আসন পেয়েছিল।

তুলনামূলকভাবে আলোচনা করলে দেখা যাবে কংগ্রেস ১৯৫৭ সালে শতকরা ৬৪ আসন পেয়েছিল, ১৯৬২ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা ৬২ এবং ৬৭ সালে ৫৭ ভাগ। জনসঙ্ঘের শতকরা হার ১৯৬২ থেকে ১৯৬৭র মধ্যে ২ থেকে

৮ ভাগে বৃদ্ধি পেয়েছে, সি, এস, পির শতকরা হার ঐ সময়ের ৭ থেকে ৬·২ হ্রাস পেয়েছে, এ. এস. পির বৃদ্ধি পেয়েছে ২ থেকে ৪-এ। কমুনিষ্ট পার্টির ১৯৫৭ সালে শতকরা ৬ থেকে ১৯৬২ সালে শতকরা ৪-এ নেমে এসেছিল। এই নির্বাচনে দুই কমুনিষ্ট পার্টির সম্মিলিত শতকরা হার ৮-এ পৌঁচেছে। এ ছাড়া স্বতন্ত্র পার্টি এবার দ্বিতীয় দলের মর্যাদা পেয়েছে।

ভূতবল কংগ্রেসের পক্ষে ভারতীয় সংবিধানের সর্বোচ্চ বলীয় প্রার্থী মনোনয়নে এ আসনের মর্যাদা অনিবার্য-ভাবে হ্রাস করবে এবং কেন্দ্রে এবং অকংগ্রেসী রাজ্যগুলিতে কংগ্রেসের সঙ্গে সংঘাত বৃদ্ধি করে কেন্দ্রে যেমন অচলাবস্থার সৃষ্টিতে সহায়তা করবে তেমনি কেন্দ্র-রাজ্য বিরোধ তীব্রতর করে তুলে ফেডারেশনের ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে সাংবিধানিক সঙ্কট সৃষ্টি করবে। লোকসভায় কংগ্রেসের ভূতবল সংবিধান পরিবর্তনের অব্যাহত সুযোগ লোপ করে দিয়েছে। সুতরাং, ঘন ঘন সংবিধান পরিবর্তন করে সঙ্কট এড়াবার দিনও ফুরিয়ে গেছে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জাতীয় ঐক্যমতের (National Consensus) সন্ধান তাই অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

বৈদেশিক পত্রিকার দৃষ্টিতে নির্বাচন

ব্রিটেন ও আমেরিকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ভারতীয় নির্বাচন সম্পর্কে নানা মন্তব্যে বোঝা যায় নির্বাচনী ফলগুলির প্রচণ্ড আঘাত ভারতীয় রাজনীতি ও অর্থনীতির ভারসাম্যে বিপর্যয় ডেকে এনেছে, তার ফলে বিশ্বপরিস্থিতিতে ভারতের স্থান কালিমায় ম্লান হয়ে গেছে। নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকা পরিষ্কারই বলেছে ভারতবর্ষ নিজের ঘর সামলাতে না পারলে এশিয়ায় বৃহৎ শক্তিরূপে পরিগণিত হবে না। নিউ ইয়র্ক টাইমস আরও বলেছেন ভারতীয় নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপর্যয়ে পৃথিবীর শক্তি সমাবেশের গুরুতর এবং নিশ্চিত পরিবর্তন ঘটে গেছে.....

বিশ্বপরিস্থিতিতে সোভিয়েট ব্লকের শক্তি হানি, মস্কো-পিকিং সংঘাত, চীনের অন্তর্বিদ্রোহ, ইন্দোনেশিয়ার পতন এবং ভিয়েৎনাম যুদ্ধে মার্কিনী নিমজ্জনের মধ্যে শক্তির ভারসাম্যের গুরুতর পরিবর্তন সত্ত্বেও ভারতবর্ষকে এখনও প্রবল নিহিত শক্তির আধাররূপে গণ্য করা হবে।

লণ্ডনের গার্ডিয়ানও মন্তব্য করেছে শক্তি দ্বন্দ্বে ভারতবর্ষে ভূকম্পন হয়ে গেল। সেই সঙ্গে একথাও গার্ডিয়ান বলেছে চীনের শক্তি দ্বন্দ্বের চাইতে ভারতীয় শক্তি দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার হস্তান্তর অনেক শ্রেয়।

বৈদেশিক পত্র-পত্রিকাগুলি ভারতীয় গণতন্ত্রের এই রুদ্র-মূর্তিতে বিমূঢ় হয়ে গেছে। এতদিন কংগ্রেসী একাধিপত্যে ভারতীয় আভ্যন্তরীণ শক্তি-সমাবেশে অনড়তা, ভারতীয় গণতন্ত্রের স্বরূপ সম্বন্ধে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল, সে ঘোর কাটতে সুরু করেছে। বিবিধের মধ্যে এক, বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যে, ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশে ফেডারেল কাঠামোতে গণতন্ত্রের যে পরীক্ষা হবে, চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন তার গোড়াপত্তন করেছে। এখনই কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিতান্তই ভ্রান্ত হবে।

Gram : DEVICE

23-2161/2

Please Contact

MECHANICAL ENGINEERING CO

PRIVATE LTD

5, MISSION ROW
CALCUTTA-1

FOR ALL TYPES OF TRAILERS,
TROLLEYS AND WHEEL BARROWS

ধারাবাহিক রচনা

সুভাষচন্দ্র

পবিত্রকুমার ঘোষ

প্রেসিডেন্সি কলেজ

১৯১৬ সনের ২৪শে ফেব্রুয়ারি তারিখে The Statesman পত্রিকায় এই সংবাদটি প্রকাশিত হয় :

Presidency College Affair
Sensational Sequel
Appointment of new Principal
Mr. James Superseded

...The Governor-in-Council considers that Mr. James has shown himself to be unfit to retain the post of Principal of Presidency College; he has accordingly transferred him from that post and has placed him under suspension pending further orders. Mr. Wordsworth, Inspector of Schools, Presidency Division has been appointed Principal of the Presidency College.

এই সংবাদের পাশেই 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা ঘটনাটি সম্পর্কে একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করে। এবং অধ্যক্ষ জেমসের বিতাড়নের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে পত্রিকাটি একটি গোপন কথা ফাঁস করে দেয়। তা এই যে বঙ্গ-সরকারের শিক্ষাবিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব মাননীয় মিঃ লায়নস বরাবর অধ্যক্ষ জেমসের শত্রুতা করে আসছেন, ডি. পি. আই হবার আশা সুযোগ হতে তাঁকে বঞ্চিত করেছেন, প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলা সম্পর্কে অধ্যক্ষ জেমস কর্তৃক নিয়োজিত তদন্ত কমিটির বিচার শেষ হবার আগেই একটা পৃথক উচ্চস্তরের তদন্ত কমিটি নিয়োগ করেছেন এবং সেই তদন্ত কমিটিতে এমন সব সদস্য নিয়েছেন অধ্যক্ষ জেমসের সঙ্গে যাঁদের পুরানো বিবাদ আছে। জেমস সাহেবের ছাব্বিশ বছরের উজ্জ্বল ও আন্তরিকতাময় কার্যকালের পর তাঁকে অকস্মাৎ বিতাড়িত করাটা ক্ষোভের বিষয়।

এ দেশস্থ য়ুরোপীয় সমাজের মুখপত্র The Englishman পত্রিকা ২৫ তারিখেই উপরোক্ত চাঞ্চল্যকর সংবাদটি প্রকাশ করে, কিন্তু এ বিষয়ে তাদের সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি প্রকাশ করে পরদিন ২৬ তারিখে। ভারতীয়দের কোন দুরভিসন্ধিতে এতদ্দেশীয় য়ুরোপীয়রা সেদিন শেষত তার পরিচয় ঐ প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। অধ্যক্ষ জেমস সরকারী তদন্ত কমিটি সম্পর্কে বঙ্গ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী মিঃ লায়নসের কাছে সরাসরি আপত্তি জানাতে গিয়েছিলেন ঐ কমিটিতে দুজন সদস্যের অন্তর্ভুক্তির কারণে; একজন, কমিটির সভাপতি স্যার আশুতোষ মুখার্জি ও অপরজন ডি. পি. আই মিঃ হর্মেস। জেমস সাহেবের বক্তব্য ছিল এই যে ঐ দুজন ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পুরানো বিবাদ রয়েছে এবং তার ফলে কমিটির বিচার ও রায় তাঁর বিরুদ্ধে যাবে (অর্থাৎ ছাত্রদের স্বপক্ষে!)। বিবাদের ঘটনাটি হচ্ছে স্যার আশুতোষ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার থাকাকালে জেমস তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করেছিলেন এবং মিঃ হর্ণেলকে অন্যায়ভাবে ডি. পি. আই করা হয়েছিল জেমস সাহেবের দাবীকে নস্যাৎ করে, ফলে উভয়ের মধ্যে তিক্ততা জন্মেছিল। 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা সম্পাদকীয় নিবন্ধে এইসব তথ্য উপস্থাপিত করে লিখলেন যে জেমস সাহেবের বিতাড়ন ঘোরতর অন্যায়; বরং সরকারের উচিত ছিল তাঁর মতো উচ্চপদকীর্তির অধিকারী ব্যক্তির মান রক্ষা করা; এবং সে মান রক্ষা করাও ছিল সরকারের পক্ষে সহজসাধ্য। মিঃ হর্ণেলকে কমিটিতে নেওয়া হয়েছে ভালো কথা, কমিটিতে তাঁর থাকাটা "desirable and necessary" কিন্তু এই স্যার আশুতোষ লোকটিকে না রাখলেই তো চলত—সাহেবের আপত্তির মর্যাদা তাতে রক্ষিত হত। "Although Sir Asutosh has taken an active interest in educational affairs in Bengal, it might have been possible, we think, to obtain a more suitable chairman for the Committee of Enquiry." বাংলাদেশে যে সব সংবাদপত্র ছাত্রদের সমর্থনে সেদিন সংবাদ, চিঠিপত্র ও সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করছিল 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে লিখল: the Bengali press raises ridiculous howl over every erring student that is punished.

এই হচ্ছে একদিক হতে, এদেশাগত য়ুরোপীয়দের দিক হতে, ঘটনাটিকে দেখার দৃষ্টান্ত। বাঙালী সমাজ সেদিন কিভাবে দেখেছিল এই ঘটনাকে? নিঃসন্দেহে কিছু সংখ্যক শিক্ষিত বাঙালী ছাত্রদের কর্মের ঘোর বিরোধিতা ও প্রেসিডেন্সি কলেজ হতে সুভাষ বসুর বহিষ্কারকে সমর্থন করেছিল। এঁরাই সংবাদপত্রে কর্তৃপক্ষের সমর্থন করে চিঠিপত্র লিখত। কিন্তু এরা সেদিনের বাঙালী সমাজের প্রকৃত মনোভাবের প্রতিনিধিত্ব করেনি; এরা মুষ্টিমেয় বৃটিশ-ভক্ত কয়েকজন মাত্র। বাংলাদেশের বাঙালী পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি করেছিল ছাত্রদের সমর্থন ও কর্তৃপক্ষের কঠোর ও একতরফা আচরণের ঘোরতর প্রতিবাদ।

কমিটিতে স্যার আশুতোষের নিয়োগের বিরুদ্ধে ইংরেজ পরিচালিত সংবাদপত্রগুলিতে যা লেখা হয়েছিল সুরেন্দ্রনাথ বাঁড়ুজ্জে তাঁর The Bengalee পত্রিকায় তার তীব্র প্রতিবাদ করেন। 'স্টেটসম্যান' লিখেছিল: স্যার আশুতোষের স্কুল ও কলেজের সুখ্যাতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দিন বহুকাল আগে গত হয়েছে। যদি বিচার বিভাগের কাউকে কমিটির চেয়ারম্যান করার প্রয়োজন সরকার বোধ করে থাকেন তবে তাঁর বদলে এমন কোনো বিচারপতিকে নিযুক্ত করাই শোভন ও সঙ্গত ছিল স্কুল ও কলেজের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আরও নিকটতর এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ সংক্রান্ত গোলযোগে যিনি আদৌ নিজে জড়িত নন। 'স্টেটসম্যান' মিঃ হর্ণেলের নিয়োগের বিরুদ্ধেও মৃদু আপত্তি তোলে। বস্তুতঃ প্রেসিডেন্সি কলেজের ব্যাপারে সরকার যে কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন, প্রতিটি বিষয়েই ছিল 'স্টেটসম্যানের' আপত্তি এবং অন্যত্র জেমসের কার্যক্রমকেই তাঁরা সমর্থন করেছিলেন। আলোচ্য সম্পাদকীয় প্রবন্ধটির (২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯১৬) প্রথম বাক্যেই তাঁরা দেখেন যে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতা সংক্রান্ত ঘটনাটি সম্পর্কে সরকার যেসব ব্যবস্থা নিয়েছেন যত তলিয়ে সেগুলির বিষয়ে বিচার করা যায় ততই "the more dubious appears the wisdom of the policy that has been pursued." এই ব্যবস্থাগুলি কী কী? 'স্টেটসম্যানের' মতে (১) কলেজ বন্ধ করে দেওয়া। কাজটি অতিশয় অন্যায় হয়েছে কেননা কয়েকটি দুষ্ট বালকের দরুণ কলেজের অধিকাংশ ভদ্র ও বিনয়ী ছাত্রদের কষ্টভোগ ও ত্যাগস্বীকার করতে হচ্ছে। কলেজ বন্ধ করার আরও মারাত্মক ফল হল এই যে প্রকৃত অপরাধী ছাত্রদের আর

খুঁজে বের করা যাবে না। "The closing of the college and the dispersal of the students will obviously interfere with the work of detection and help the young barbarians to escape scot free. If the students had been kept in attendance at their classes and were available for examination and cross-examination the truth might have been found. But no inquiry can be made when they are scattered all over the town and out of the reach of the college authorities. These considerations are so plain that it is difficult to think that they can have been overlooked by the Member of the Bengal Government who has the matter in hand."

(২) কলেজের গভর্ণিং বডি যে তদন্ত কমিটি গঠন করেছিলেন তাঁদের বিচারকার্য শেষ হবার আগেই উচ্চ পর্যায়ের একটি সরকারী তদন্ত কমিটি নিয়োগ। যদি কলেজের গভর্ণিং বডি কর্তৃক নিযুক্ত কমিটি বিচারশেষে কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে না আসতে পারতেন তাহলে কলেজ কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব দেবার তবু যুক্তি থাকত। কিন্তু বাস্তবে ঘটেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। কলেজের কমিটিটি তদন্ত সুরু করতে না করতেই সরকার তাকে বাতিল করে দিয়ে একটি অভূতপূর্ব কমিটি নিজ উদ্যোগে গঠন করেছেন। "But the Governing Body had barely begun their work when the Goverment intervened and introduced a form of inquriy which, so far as we know, is without precedent in the educational annals of India." 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার এই অভিমত যদি সত্য হয় তাহলে আমাদের মনে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা না দিয়ে পারে না। তাঁদের এই অভিযোগ সত্য যে প্রেসিডেন্সি কলেজের গভর্ণিং বডি কর্তৃক নিযুক্ত তদন্ত কমিটি (যে কমিটির গঠন, উদ্দেশ্য ও রায় সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি) তদন্তের কাজ সুরু করতে না করতেই তাকে সরকারের শিক্ষাসচিব বাতিল করে দেন। অর্থাৎ ঐ কমিটির তদন্ত শেষ হয়নি বেং কোনো সিদ্ধান্তে তার পক্ষে আসাও সম্ভব হয়নি; যদি তাই হয় তাহলে ঐ কমিটি প্রেসিডেন্সি কলেজ হতে সুভাষচন্দ্রের বহিষ্কারের আদেশ দিলেন কী করে? তিনি যে দোষী এবং তাঁর দোষের পরিমাণ কতখানি সেসব বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ না হয়েই শুধু কলেজ হতে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়, রাস্টিকেট করা হয়েছিল। বোঝাই যাচ্ছে এই শাস্তিদানের পিছনে না ছিল যুক্তি, না ন্যায়বিচার; ছিল শুধু আহত য়ুরোপীয় সমাজের প্রতিশোধ স্পৃহা। প্রতিশোধ কামনায় এ দেশস্থ য়ুরোপীয় সমাজ যে সেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল তার প্রমাণ রয়েছে 'ইংলিশম্যান' ও 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলিতে; কেননা তাঁরা বহুদিক হতে ঘটনাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন, সরকারী হস্তক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করতেও ছাড়েননি তাঁরা সেদিন; কিন্তু উপযুক্ত তদন্ত ও বিচার ব্যতিরেকেই সুভাষচন্দ্রের কলেজ হতে বিতাড়ন বা রাস্টিকেটের সমর্থনেই তাঁরা করেছেন, কমিটির ন্যায্যতা সম্পর্কে কোনোরকম প্রশ্ন তাঁরা তোলেননি। পূর্বোক্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার লিখেছেন: "the closing of the college has the grave drawback of hindering and even baffling all attempts to find out who were guilty." যদি তাই হয়, যদি হঠাৎ কলেজ বন্ধ করে দেবার ফলে কে প্রকৃত দোষী তা খুঁজে বের করাই অসম্ভব হয়ে থাকে তবে শাস্তিদানের ব্যাপারে মুহূর্তের বিলম্বও সহ্য হল না কেন? এ প্রশ্নের জবাব নিয়ে 'স্টেটসম্যান' বিব্রত হয়নি। অথচ একই

নিশ্বাসে তাঁরা বলেছেন যে ছাত্র-বিশৃঙ্খলার ব্যাপার সেদিন সমাজে ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে, প্রেসিডেন্সি কলেজের ঘটনার সমসময়ে আরও দুইটি কলেজে ছাত্র ধর্মঘট প্রায় একই রকম কারণে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সুতরাং মূল কারণের সন্ধান করতে হবে সেদিনকার সমাজের ভিতর বা রাষ্ট্রশাসনতন্ত্রের ভিতর। সরকারী তদন্ত কমিটিকে শুধু প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র বিশৃঙ্খলার কারণ অনুসন্ধান করতে ভার দেওয়ায় 'স্টেটসম্যান' ঐ একই সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখেছিলেন :

The investigation is limited, however, to the Presidency College, as if the discipline elsewhere were perfect, and only the state of affairs at one college called for examination. যদি তাই হয়, অর্থাৎ ছাত্র অসন্তোষ ও ছাত্র বিশৃঙ্খলা সেদিন সমাজে ব্যাপক আকারেই দেখা দিয়ে থাকে এবং সেহেতু ব্যাপকতর অনুসন্ধানের প্রয়োজন ঘটে থাকে তবে সারা বাংলা দেশে একমাত্র সুভাষচন্দ্র বসুর মতো উনিশ বছরের একটি ছাত্রকে দায়ী করে তাকে শাস্তিদান করাটা—তাও বিনাবিচারে—কতটুকু যুক্তি বা ন্যায়সঙ্গত? 'স্টেটসম্যান' লেকথা যে শুধু ভাবেনি তা নয়,—সরকার কর্তৃক নিযুক্ত তদন্ত কমিটি যদি এই কথাটি ভেবে বসে ও তার ফলে সুভাষ বসুর ওপর আরোপিত শাস্তি তুলে নেয়, যদি তাঁকে কঠোর কোন শাস্তির আওতা হতে বের করে নিয়ে আসে—সেই ভয়ে 'স্টেটসম্যান' আতঙ্কিতও হয়েছিল। তাই কমিটির চেয়ারম্যান পদে স্যার আশুতোষের নিয়োগ 'স্টেটসম্যান', 'ইংলিশম্যান' বা অন্যান্য জেলস কেউই সেদিন বরদাস্ত করেননি। কমিটির গঠন পালটাতে হবে এই ছিল তাঁদের সম্মিলিত দাবী। 'স্টেটসম্যান' লিখেছিল : "The composition of the committee cannot but excite some amount of surprise"

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি তাঁর 'বেঙ্গলী' সংবাদপত্র মারফৎ উপরোক্ত বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন। ২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখে তিনি তাঁর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখেন : The personnel of the committee is satisfactory, and the association of Sir Asutosh Mookerjee with its work as President will inspire public confidence. ২৪শে ফেব্রুয়ারি আর একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 'স্টেটসম্যান' পূর্বোক্ত বক্তব্যকে সুরুচির পরিচায়ক বলে বক্তব্য করে সুরেন্দ্রনাথ লেখেন : "The Government very wisely……appointed an eminent ex-Vice Chancellor to preside over the Committee. The decision commends itself to Indian public opinion, which after all, is the most important factor in the case." ২৫শে তারিখে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি আর একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করেন সুভাষচন্দ্রের কলেজ হতে বহিষ্কার প্রসঙ্গে। আমরা পূর্বে 'স্টেটসম্যান' ও ইংলিশম্যানের' বক্তব্য ও অন্যান্য জেলসের হঠকারী সিদ্ধান্ত সম্পর্কে যে প্রশ্ন উপস্থাপিত করেছি, সুরেন্দ্রনাথ ঠিক সেই প্রশ্নই কলেজের কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং সুভাষচন্দ্রের বহিষ্কারের তীব্র নিন্দা করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন :

Babu Subas Chandra Bose…has received the following notice :—Resolved that Subas Chandra Bose be expelled from the College for taking a leading part in the assault on Professor Oaten."

Subas Chandra has been expelled from the College.…The Governing Body of the Presidency College may be quite within their rights in expelling from the College any student whom they consider undesirable. But as the ground of the punishment is the partici-

pation of the students in the assault on Mr. Oaten which forms a subject matter of investigation by a Committee appinted by the Government for the purpose, the action of the Governing Body has the appearance of being ultra vires. Whether a committee should have been appointed over the shoulders of the Governning Body need not be discussed in this connection. But when the Government has apppirently taken the view that recent happenings in the Presidency College should be thoroughly gone into by a competent committee in order to strike at the very roots of the present deplorlable state of things there is again going to be we are afraid, a repitition of that error of judgment which has been responsible for the whole pother. The public, we think, have also a right to know how the Governing Body of the Presidency College arrived at the conclusion that students punished did actully take a leading part in the assault before seeing their way to recognize the justice of their action. Nobody will object to their punishment if the charge has been really brought home to them. But as the matter has excitel considerable interest outside the precincts of the Presidency College it should be dealt with in a manner that will leave no room for further dissatisfaction either among the students or their friends and guardians." সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে একখানি প্রধান দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় সেই সময়েই লিখিত হয়েছিল একথা ভাবতে আজ অবাক লাগে। কলকাতায় তখন ছাত্রসংখ্যা কম নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ছাত্র ছিলেন অনেকে, স্বদেশী ও বিপ্লবী ছাত্রেরও অভাব ছিল না। কিন্তু সংবাদপত্রের প্রধান সংবাদ এবং সম্পাদকীয় প্রবন্ধের আলোচিতব্য বিষয় হয়ে ওঠার সামর্থ্য বা তাদের কারও সেসময় হয়নি। যে গোষ্ঠিতে সে সময় সুভাষচন্দ্রের মেলামেশা ছিল ঘনিষ্ঠ সেই গোষ্ঠির দলপতিরাও সংবাদপত্রের নজরে আসতে পারেননি। এঁকে কী বলব? "সকালের চেহারা দেখে দিনের বেলার বোঝা যায়"—এই ইংরেজী প্রবচনটির কথাই হয়তো মনে আসে। এবং আরও উল্লেখযোগ্য এই যে উপরে যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি সবিস্তারে উদ্ধৃত করেছি তার রচয়িতা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বাানার্জী। সেদিন ইতিহাসের ইঙ্গিত ছিল এই ঘটনার যোগাযোগের মনে: এ যেন এক যুগের নায়ক কর্তৃক ভবিষ্যৎ যুগের আর এক নায়কের সম্বর্ধনা। রবীন্দ্রনাথ তাই পরবর্তীকালে লিখেছিলেন যে বাংলা দেশের রাষ্ট্রনায়কের পদে তিনি একদা সুরেন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করেছিলেন, আবার একদিন সেই পদেতিনি সুভাষচন্দ্রকেই আহ্বান করেছেন।

সে যাই হোক, প্রেসিডেন্সী কলেজ হতে সুভাষচন্দ্রের বহিষ্কারের বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথের তীব্র প্রতিবাদ ও অকাট্য যুক্তির মধ্য হতে এই কথাটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে শাস্তিদানের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কোনো ন্যায় নীতিবোধ অবশিষ্ট ছিল না, ছিল অন্ধ প্রতিশোধকামনা।

'অমৃত বাজার পত্রিকা' কলেজের গভর্ণিং বডি কর্তৃক বিনাবিচারে ছাত্রদের শাস্তিদানের কঠোর সমালোচনা করে ২৩শে ফেব্রুয়ারি তারিখের প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখেন: "The way in which the governing body has dealt with two of the students has led the public to lose all confidence in their judgment. Fancy, Babu Anangs Mohon Dam B. A. a brilliant sixth year studnet in Philosophy, has not only been expelled from the Hindu Hostel but rusticated for one year. Similarly another brilliant third year student,

Babu Subhas Chandra Bose has also been rusticated for one year. They were charged with having assaulted Prof Oaten. They denied the charge emphatically. Nay, they were prepared to prove their innocence, but they were not given an opportunity to do so. It has now transpired, we understand, that the governing body has no power of rusticating a student for more than a month. They are thus in a nice fix. We are told they now intend to request the syndicate to carry out their recommendation as a matter of special favour. Then again we think they should not have taken this hasty step when the committee appointed by government is holding its sittings." এই সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধটীতে অমৃত বাজার দেখান যে প্রেসিডেন্সি কলেজ কর্তৃপক্ষের আচরণ সেদিন শুধু ন্যায়নীতি ও শোভনতা বর্জিতই হয়নি, নিজেদের অধিকার সীমাকেও তাঁরা ডিঙিয়ে গেছেন। তাঁদের এমন কোনো অধিকার নেই যার বলে তাঁরা কোনো ছাত্রকে এক মাসের অধিক কালের জন্য রাস্টিকেট করতে পারেন ; রাগের মাথায় উত্তেজনা প্রণোদিত হয়ে, হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে কাজটি তাঁরা করে বসার পর নিজেদের সেই অবৈধ কর্মকে বৈধ করিয়ে নেবার তাগিদে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় হাজির হয়ে সিণ্ডিকেটের কাছে এই আবদার ধরেন যে তাঁদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করা হোক এবং তাঁরা দুটি ছাত্রকে যে শাস্তিদান করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় তা অনুমোদন করুক। স্পষ্ট বোঝা যায় কলেজ কর্তৃপক্ষ তখন সমাজে হাস্যাস্পদ হয়ে উঠেছেন, নিজেদের পেটোয়া কিছু লোক ও কয়েকখানি বৃটিশ পরিচালিত পত্রিকা ভিন্ন বৃহত্তর দেশ, এমনকি স্বয়ং সরকারও তাঁদের কর্মের কোনোরকম যৌক্তিকতা স্বীকার করতে পারছেনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পেলে শুধু খানিকটা মুখ রক্ষা হয়। প্রশ্ন এই যে কোনো-দিক বিবেচনা না করেই, অতি দ্রুত শাস্তিদানের ছলে এমন একটা কাজ তাঁরা করে বসলেন কেন, যার ফলে তাঁরাই পড়লেন উভয় সঙ্কটে এবং সরকারী তদন্ত কমিটি গঠন হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের প্রায় মূর্ছা যাবার অবস্থা হল? অধ্যক্ষ কেমস্ মহাশয়তো সরকারের শিক্ষা দপ্তরে যেয়ে শিক্ষা-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্যের সঙ্গে প্রায় হাতাহাতি করে এলেন, এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকদের পক্ষেও তাঁর এ হেন ক্রোধান্ধ ব্যবহারের সমর্থনের পক্ষে সদযুক্তি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠল।

'অমৃত বাজার পত্রিকা' ২৪শে ফেব্রুয়ারির প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধে অধ্যক্ষ জেমসের অসৎ বুদ্ধির ও দুষ্ট আচরণের স্বরূপ প্রকাশ করে দিয়ে লেখে যে অধ্যক্ষ জেমস অনঙ্গ মোহন দাসকে হিন্দু হোস্টেল ছেড়ে ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখ সন্ধ্যাবেলা তাঁর দেশ শ্রীহট্টে ফিরে যেতে আদেশ দেন। হিন্দু হোস্টেল হতে ছাত্র বহিষ্কার করার অধিকার তাঁর যদিও বা থাকে, কিন্তু দেশে ফিরে যাবার আদেশ দেবার অধিকার বর্তায় তাঁর কোন আইন বলে? ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে আদেশ জারি করে তিনি বলেছেন যে সেদিন সন্ধ্যায় অনঙ্গমোহনকে দেশের ট্রেণে চাপতে হবে। কেন এই তাড়াতাড়ি কলকাতা হতে অনঙ্গমোহনকে অপসারিত করার উদ্যোগ? 'অমৃত বাজার' লিখছেন : অনঙ্গমোহন প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন শ্রেষ্ঠ ছাত্র বলেই সবার নিকট পরিচিত এবং সে কারণে অন্যান্য ছাত্ররা তাঁকে অতিশয় সম্মানের চোখে দেখে। ধরে নেওয়া যাক যে এ তথ্য অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু আমরা জানতে চাই এই প্রশ্নটির উত্তর যে কেন তাঁকে "আজ সন্ধ্যায়ই (২১শে ফেব্রুয়ারি) দেশে ফিরে যাবার" আদেশ দেওয়া হয়েছে? ধরে নেওয়া যাক যে অনঙ্গমোহন অপরাধ করেছেন, তাহলে তো তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করার সুযোগ তদন্ত কমিটির পাওয়া আরও

দরকার। কিন্তু তাঁকে যদি কলকাতা হতে সরিয়েই দেওয়া হয় তাহলে প্রকৃত পক্ষে তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণের সুযোগ হতে তদন্ত কমিটিকে বঞ্চিত করা হবে। তার ফলে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ কমিটি হারাবেন। অতএব এই যে তাঁকে এখনই কলকাতা হতে সরে পড়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে এটা একটা কুশ্রী ব্যাপার হয়ে উঠছে। এই নির্দেশটিকে এভাবেও ব্যাখ্যা করা চলে যে গভর্ণিং বডি কলকাতা হতে একজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীকে সরিয়ে দিতে চাইছেন তদন্ত কমিটির অনুসন্ধান কার্যকে ব্যর্থ করে দেবার উদ্দেশ্যেই। এবং একথা কি সত্য যে অনঙ্গমোহনকে এই ইঙ্গিতও স্পষ্ট-ভাবে করা হয়েছে যে যদি তিনি কলকাতা ছেড়ে না যান তাহলে পুলিশের স্নেহদৃষ্টি তাঁর ওপর পড়বে? কোন সম্ভাব্য সাক্ষীর ওপর কোনরকম সন্ত্রাস ও চাপ সৃষ্টি করা অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয়।"

এইসব ভয়ানক অভিযোগের পর "অমৃত বাজার পত্রিকা" অধ্যক্ষ জেমসের পেটোয়া পত্রিকা 'স্টেটসম্যান' সম্পর্কেও গুরুতর অভিযোগ এনেছেন ঐ একই সম্পাদকীয় প্রবন্ধে। লিখেছেন: "স্টেটসম্যান নিজেকে 'ভারত বন্ধু' বলে প্রচার করে। কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ ও স্নেহপূর্ণ যোগাযোগের কথা বিচার করলে তার যথাযথ নাম হওয়া উচিত "মিঃ জেমসের বন্ধু।" লোকের ধারণা এই যে মঙ্গলবার ঐ কাগজে যে প্রধান সম্পাদকীয় বেরিয়েছে তা মিঃ জেমসের নিজেরই রচনা, কিংবা তাঁর নির্দেশক্রমে লেখা। ঐ সম্পাদকীয় প্রবন্ধটিতে যে সব অভিযোগ করা হয়েছে তন্মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে তদন্ত কমিটির নিকট মিঃ জেমস সুবিচার পাবেন না। অথচ আমরা জানি যে কমিটির অধিকাংশ সদস্যই ইংরেজ এবং একজন সদস্য তো তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি চান যে ন্যায়বিচারের যানদণ্ডটি যেন সবসময়েই ঠিক থাকে। ভারি সুন্দর তাঁর এই মনোভাব, কিন্তু গত দু বছরের মধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজে যে তিনটি ছাত্র-গোলযোগ ঘটেছে তাতে মিঃ জেমস নিজের প্রিয় সহকর্মীগণ এবং ছাত্রদের বিষয়ের বিচারে এই যানদণ্ডটি কতখানি ঠিক রেখেছিলেন তা হিসাব করে দেখা দরকার।

প্রথম ঘটনাটি ঘটে যখন একদিন একটি ক্লাস শেষ হয়ে যাবার পর কয়েকজন ছাত্র তাঁদের ভারতীয় অধ্যাপকের সঙ্গে কথা বলছিল, তখন ডাঃ হ্যারিসন তাই দেখে এত অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হন যে তিনি ক্লাসে ঢুকে ছাত্রদের মারধোর করেন ও যাদের বলে গালি দেন। ছাত্রেরা ঘটনাটি অধ্যক্ষ জেমসের নিকট নিবেদন করে প্রতিকার প্রার্থনা করে। কিন্তু তিনি তাদের কোন কথায় কর্ণপাত করেন নি। ফলে ছাত্ররা ধর্মঘট করে ও ডঃ হ্যারিসন ক্ষমা চাইবার পর সে ধর্মঘট তারা প্রত্যাহার করে।

অধ্যক্ষ জেমস যে কতদূর সুচতুর ব্যক্তি তা ধরা পড়ে যেদিন তিনি সরকারের নিকট আন্তরিকভাবে জানান যে সরকার যেন অধ্যাপক ও ছাত্রদের সম্পর্ক মধুরতর করার উদ্দেশ্যে ডঃ হ্যারিসনকে একটি বিশেষ পদ দান করে নিরোপ-পত্র দেন। স্মরণীয় এই যে ঐ পদের জন্য ডঃ হ্যারিসনকে মোটা রকমের টাকা দেবার কথাও জেমস সাহেব বলেন। অধ্যক্ষ জেমসের এই ধরণের সুবিচার দর্শনে পুলকিত ও উৎসাহিত অধ্যাপক ওটেন নিজে থেকে ছাত্রদের সঙ্গে এক কাণ্ড বাধিয়ে বসলেন। হিন্দু হোস্টেলে একটি উৎসবে ছাত্ররা তাঁকে সভাপতিত্ব করার আমন্ত্রণ জানায়। সভাপতির আসনে অতি ঠাণ্ডা মাথায় স্বচ্ছ যুক্তির সাহায্যে তিনি প্রমাণ করতে থাকেন যে ইংরেজদের আগমনের আগে এ দেশটি ছিল অতি অসভ্য এবং গ্রীকরা যেমন প্রাচীন বর্বর জাতিদের ভিতর সভ্যতার বিস্তার করেছিল ইংরেজরাও তেমনি এদেশে এসেছে সভ্যতার আলো দেখাবার জন্য।

তারপর সম্প্রতি অধ্যাপক ওটেন ঘটিয়েছেন আর এক কাণ্ড। তিনি ছাত্রদের সঙ্গে এমন দুর্ব্যবহার করলেন যে ছাত্ররা আবার ধর্মঘট করল এবং ওটেন সাহেবকে ক্ষমা চাইতে হল। কিন্তু অধ্যক্ষ জেমস উপরি-পড়া হয়ে প্রত্যেক ছাত্রের

৫পয় ৫ টাকা করে জরিমানা ধার্য করলেন এবং ওটেনকে দিলেন পিঠ-চাপড়ে। ওটেন তাতে উৎসাহিত হয়ে আবার একদিন তাঁর ক্লাস হতে বেশ কয়েকজন ছাত্রকে দিলেন তাড়িয়ে। ছাত্ররা অবশ্য জেলদের কাছে গেল বিচার পাবার আশায়। কিন্তু নিরপরাধ ছাত্রদের ওপর জরিমানা ধার্য করার সাহস অবশ্য সাহেবের থাকলেও নিজের সহকর্মীকে সংযত করার সাহস তাঁর নেই। এই অবাক সাহেবই আবার বিচারের মানদণ্ড ঠিক রাখার কথা বলেন এবং ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র গঠন সম্পর্কে উপদেশও দেন। বস্তুতঃ প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররা অপরিসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে। তারা বহুবার অধ্যাপকের দ্বারা কৃত অপমানের প্রতিকার প্রার্থনায় অবাকের কাছে গেছে কিন্তু তারা অবাকের কাছে পেয়েছে আরও অপমান। মিঃ ওটেন স্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইবার পর ছাত্রদের ওপর জরিমানা ধার্য করার পক্ষে যুক্তি কোথায় ছিল? এতে ছাত্রদের অপমানিত ও উত্তেজিতই করা হয়েছে। এই ঘটনার পরও অধ্যাপক ওটেন আবার ছাত্রদের অপমানিত করার সাহস পেলেন এবং অবাক অবশ্য তাঁকে সমর্থন। তার অনিবার্য ফলশ্রুতি দেখা দিল ছাত্র-বিক্ষোভে। আমরা জিজ্ঞাসা করি করদাতাদের অর্থ কি খরচ করতে হবে এদের মত লোককে নিয়ে আসার জন্য যাঁরা সৌম্য অধ্যাপক হবার বদলে দুর্বিনীত ও উদ্ধত জাতিবিদ্বেষী ছাত্রশত্রু হয়ে উঠবেন এবং আমাদের ছাত্রদের নরিয়া হবার পথে ঠেলে দেবেন?

প্রেসিডেন্সি কলেজে সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন কেটেছিল এরকম একটি প্রেক্ষাপটে। অন্যায়, জাতিনিন্দা ও জাতীয় অপমানের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিল সেখানে তাঁকে। এবং তার ভিতর হতে প্রখর প্রকাশলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল তাঁর দীপ্ত নেতৃরূপ। সেই নেতৃত্ব ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আপসহীন আদর্শে দীক্ষা, সংগ্রামের স্থিরনিশ্চয় শপথে উদ্বুদ্ধ এবং নিঃশেষ আত্মত্যাগব্রতের অঙ্গীকারে সমুজ্জ্বল। নবজাগ্রত বাংলা দেশ যদি তার শ্রদ্ধার অর্ঘ্য এমন নেতৃত্বের প্রতি নিবেদন করতে আগ্রহী হয় তবে তাতে অবাক হবার কারণ নেই। বস্তুতঃ ১৯১৬ সালেই বাংলা দেশের প্রধান সংবাদপত্রগুলি, নেতা ও মনীষীগণ সুভাষ-বন্দনা করেছিলেন, এবং সেই সূত্রে বাংলা দেশ সুভাষের নবীন নেতৃত্বের প্রখর উদ্ভাস প্রত্যক্ষ করেছিল। সে কাহিনী অতি সংক্ষেপে আমরা বিবৃত করেছি। এখন নিঃসঙ্কোচে আমরা প্রবেশ করতে পারি তাঁর পূর্ণ কর্মজীবনে—আই. সি. এস পদত্যাগ করে যেদিন তিনি ভারতে এলেন সেইদিন হতে যে জীবনের সুরু। আগামী অধ্যায়ে আমরা ছাত্রজীবনের অবসানে তরুণ দেশকর্মী ও নেতা সুভাষচন্দ্রের জীবনপ্রসঙ্গ আলোচনা করব। ভারতবর্ষের ইতিহাসে সুভাষ-যুগ কিভাবে একদিন সূচিত হয়েছিল, আজকের পরিস্থিতিতে তা অতীব প্রাসঙ্গিক একটি বিষয়। কেননা সুভাষ-যুগের সূচনা হয়তো অতীতে কিন্তু তার সম্ভাবনা প্রসারিত বর্তমানে ও বর্তমানকে অতিক্রম করে সুদূরের ভবিষ্যতেও। আমরা স্বীকার করি, ও শ্রদ্ধাভরে বরণ করি সেই নবযুগকে—ভারতবর্ষের ইতিহাসের নতুন উজ্জ্বল অধ্যায়কে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত

কয়েকটি কিশোরের স্মৃতি : কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

ওরা বেশ হাসছে সহজে। ওরা কাঁদতেও জানে
হাসবে বলেই। ভয়ঙ্কর গম্ভীর মুখের
কালো কালো মেঘগুলো
এখন কোথাও নেই নীলাভ দর্পণে।
ওরা বেশ হাসছে সহজে। একটু বাদেই
বাড়ি ফিরে ঠাণ্ডা বাসি ঘরে
সাপের নিঃশ্বাস যেন অন্ধকারের,
কালো কালো ছায়াগুলো
সনাতনের আবছা আড়ালে।

ওরা বাড়ি ফিরে ঠাণ্ডা ঘরে এখন মাটিতে
শুয়ে পড়বে, ভাববে অন্তত
বাসি রুটি না মিললেও কাল ভোর হলে
কিছু মিলতেও পারে ; কিংবা কোথাও

আবার মিলতে পারে পথের মিছিলে।
আপাতত মিছিলের বিক্ষোভের শেষে
ওরা বেশ হাসছে সহজে।
ভয়ঙ্কর গম্ভীর মুখের
কালো কালো ছায়াগুলো কোনোখানে নেই।

চোখ বুজলে বাসুদেব দে

চোখ বুজলে আমার সামনে
ছাওয়ার দুয়ারী পথ খুলে যায় মন্ত্রবলে।
তখন যে কোন দিকে যাওয়া যায় খুশী মত, যেতে ইচ্ছা হয়—
যুবতীর সিঁথির মতন লোভনীয়, গ্র্যাণ্ডট্রাংক রোডের থেকেও
দীর্ঘ দীর্ঘ সব পথগুলি রহস্য ঘনের মত
পরিক্রমণের ছন্দ পড়ে থাকে—দুই দিকে দেবদারু বন,
মাঝে মাঝে গ্রাম, মাঠ, ফসলের খেত, মন্দিরের চূড়া—
রমণীর মুখচ্ছবি, টেলিগ্রাফ থামের সঙ্কেত,
নিটোল পুকুরে আকাশের মুখ দেখা, মাছরাঙা পাখির উড়াল
কোন কোন পথ পৌঁছে যায় দিগন্ত ছুঁয়ে ঝরে
অন্ধকার দুর্গের ভিতর, দুর্গেশনন্দিনী
যেখানে প্রদীপ জ্বালে কোন পথ রূপালি নদীর
ভিতরে গুপ্তক হয়ে জেগে ওঠে, কোন কোন পথ
গ্রামকে দলিতে শুধু বেড়ে ওঠে, গুচ্ছ গুচ্ছ শান্তির আশ্রয়
সৃষ্টি হয় ; কোন পথ বিস্মৃতির ভিতর দিয়েও
চলে যায় আলোক রশ্মির মত একমাত্র পরমীয় লোকে :
আমি আর সেই সব পথে কিছুতে পারি না যেতে—
মনের ইঞ্জিন স্টার্ট দিতে না দিতেই
সামনে ট্রাফিক জ্যাম, ষড়যন্ত্রমূলক রাস্তায়
দুরারোগ্য স্থবিরতা ছোবল হানতে থাকে
গোড়ালিতে—এ্যাকিলিস্, এ্যাকিলিস,—
কাদের চীৎকার !

প্রকাশিত হয়েছে

উ ত্ত র ণ

বাংলা দীর্ঘ কবিতা

প্রথম পর্যায়

বিশেষ সংকলন

লেখক—সূচী

জীবনানন্দ দাশ

অমিয় চক্রবর্তী

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

মণীশ ঘটক

প্রেমেন্দ্র মিত্র

অজিত দত্ত

বুদ্ধদেব বসু

বিষ্ণু দে

অরুণ মিত্র

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

অশোকবিজয় রাহা

বিমলচন্দ্র ঘোষ

চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়

বিনেশ দাস

সুশীল রায়

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

সমর সেন

সম্পাদক : কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

উত্তরণ : ২/৮১ নাকতলা গভর্নমেণ্ট স্কীম, কলিকাতা-৪৭

দাম : একটাকা

সংগঠন মানস রায় চৌধুরী

উত্তরের নির্জনতা ক্রমশ: বাগান হয়ে ওঠে
ভিতরের নির্বিশেষ ভাষাহীনতায় জাগে ফুলের লৌকিক মুখচ্ছবি
নিহরণ যেন রাত্রি ঘুম ভাঙা বালিশে অস্ফুট এক দুরান্ত সুবাস
বাতাস ভাসায় দূর প্রথম প্রেমের নীল ঘ্রাণ
উত্তরে ক্রমশ: চিনি আপন আপন মুখ প্রকৃতির মাঝখানে এমন সহজে

জীবন কতোই দেয় খোয়াই-এর রাস্তা ঘুরে একটি উঠোনে ফিরে আসা
জানি সবই সীমান্বিত শতকাল, এইমাত্র কিন্তু রাত্রিশেষ করে স্পষ্টতঃ সকাল
তাও নির্ধারিত আছে বর্ণার নীল জলে সাবান ডুবিয়ে রেখে ধারাতে ধারাতে
যায় বেলা

তোমাকে ঘুরোতে থাকি ঘুমে জাগরণে এই আপাত মৃত্যুর কথা ভেবে
নশ্বরতায় মুছে যায় অক্ষতা সৃষ্টির ধ্যান বস্তুর সমীপে এসে দেখি
উত্তরের মাঝখানে বাগান সত্তার ছবি এতো অলৌকিক !

প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য : সন্তোষ চক্রবর্তী

বাউবন কেঁপে ওঠে, জানালার কাছে রোদ্দুর
কলরব শোনে
সারাদিন মর্মর। দু চোখে সমস্ত তুচ্ছ
এখন জোয়ার এসে গেছে
এখন রোদ্দুরে ভাসে তীব্র চাঁপাফুল।

কোথাও দুরের গাছ ফুটন্ত কি না
কি হবে, বরং
তাস্কর্য-নিরিবিলি সেই গুহা থেকে
তানুমতী সাঁওতালী রাত্রি এনে দাও।

কথোপকথনে মৃত হলুদের ছন্দ।

UPPER GANGES SUGAR MILLS Ltd.
THE OUDH SUGAR MILLS Ltd.
NEW INDIA SUGAR MILLS Ltd.
THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS Ltd.
BHARAT SUGAR MILLS Ltd.
GOBIND SUGAR MILLS Ltd.

Manufacturers of :

PURE CRYSTAL CANE SUGAR

Managing Agents

BIRLA BOMBAY PRIVATE LTD.

(FORMERLY THE COTTON AGENT PRIVATE LTD.)

INDUSTRY HOUSE,

159, Churchgate Reclamation,

BOMBAY — 1

হেগেলীয় দর্শন

অনিল রায়

ডায়ালেকটীক এবং জড়বাদীগণ

১৯ শতকে ডায়ালেকটীক ভস্মস্তূপের নীচে চাপা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ছাই-চাপা পড়লেও যে ডায়ালেকটীক উজ্জ্বলরশ্মি বিকীরণ করছিলো, সে একমাত্র Mathewর চোখে পড়েছিল। Mathew তাকে সযত্নে উদ্ধার করে কয়ারবাকীর জড়বাদের সঙ্গে জুড়ে দিলেন, একথা আগেই আলোচিত হয়েছে। জড়বাদী Mathew একে কেন নিলেন তার কারণও আগেই দেখানো হয়েছে ; তিনি একে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রে কার্যকর ও উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়ক বলে নিজের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কর্মপ্রণালীর ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করলেন। Mathewর পরে Fengler এবং অন্যান্য জড়বাদীগণ এই নীতি নিয়ে কিছুটা আলোচনা করেছেন। কিন্তু কোথাও তাঁদের বিস্তৃত ও গভীর আলোচনা নেই এবং ডায়ালেকটীক নীতির বিরুদ্ধে যে সব গুরুতর যুক্তি রয়েছে, তার জবাব কোথাও দিয়েছেন বলে জানিনা। অবশ্য এরা হেগেলীয় নীতিকে স্বয়ংসিদ্ধ ও অকাট্য বলেই ধরে নিয়েছেন এবং হেগেল নিজেই একে প্রমাণ করেছেন মনে করে হয়তো বা তেমন গরজ বোধ করেননি বিস্তৃত যুক্তি-প্রমাণের অবতারণা করতে। শুধু আমরা Mathewর পরবর্তি Mathewan দের বক্তব্য থেকে কিছু আলোচনা করবো। এরা কেউ কেউ অবশ্য ডায়ালেকটিকের স্বপক্ষে অস্ত্র ধারণ করেছেন ; Plekhanov একজন প্রবীণ ও প্রখ্যাত Mathewan এবং ডায়ালেকটীক ভক্ত। তিনি ডায়ালেকটীক লজিক এবং formal লজিক সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, যদিও সে আলোচনার যুক্তির থেকে জল্পনা এবং প্রমাণের থেকে প্রশংসাই বেশী আছে। হেগেল যে সব যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তার চাইতে নতুনতর ও প্রবলতর কোনো যুক্তি এই সব জড়বাদী ডায়ালেকটীক সমর্থকেরা দিয়েছেন বলে কোথাও দেখতে পাইনা। যাহোক, প্লেখানভ কী বলতে চান দেখা দরকার ; কারণ তিনি হচ্ছেন "one of the greatest Mathewans"

(১) Plekhanov এর প্রথম যুক্তি হচ্ছে এই যে Heraclitus Hegal এবং Mathew নামক বিখ্যাত ব্যক্তিগণ ডায়ালেকটীক নীতিকে Formal Logic এর নীতিগুলো থেকে অধিকতর গ্রাহ্য বলে মনে করেছেন।

"Thinkers as profound as Heraclitus, Hegal & Mathew have found it more satisfactory than the formula "yes is yes & no is no" a formula solidly

based upon the three fundamental laws of thought...'[১]

(২) Plekhanov এর দ্বিতীয় যুক্তি একটু গুরুতর। গতিতত্ত্ব থেকেই Dialectics প্রমাণ হয়, এবং গতিতত্ত্বের ক্ষেত্রে পুরোণো লজিকের নীতিগুলো খাটবেনা। তিনি বলেছেন :

"The movement of matter underlies all the phenomena of Nature. But what is movement? It is an obvious contradiction."

কোনো বস্তু যখন গতিশীল, তখন সে স্ববিরোধের একটা জলন্ত দৃষ্টান্ত কারণ এখানে তার বেলায় Weberwegএর নীতি অর্থাৎ পুরোণো Law of Identity ইত্যাদি খাটবে না। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, একটী চলমান বস্তু কোনো একটী বিশেষ মুহূর্তে কোনো একটী বিশেষ স্থল-বিন্দুতে আছে কি না, তবে এ প্রশ্নের জবাবে ভদ্রভাবে যে বলবে বস্তুটী তথায় "আছে" কিংবা "নাই" তা চলবে না। এখন সত্যানুগতিক ধরণের সঠিক ও সোজা উত্তর এসব অবস্থায় বিকোবে না। এখানে বলতে হবে "আছে এবং নেই" দুই-ই। বস্তুটি তথায় আছে বটে এবং নেইও বটে।

"A body in motion is at a given point and at the same time, it is not there."[২]

গতি জিনিষটি নাকি প্রথম দৃষ্টিতেই contradiction বলে ধরা পড়ে যায়, "obvious contradiction" এবং বস্তুটি একই স্থানে একই কালে আছেও এবং নেইও। কিন্তু কি কোরে যে এই আশ্চর্য ঘটনাটি ঘটলো তার কোনো হদিশ এখন পর্যন্ত Plekhanov দেননি। তবে ঘটনাটি যে কিছুটা হেঁয়ালী গোছের এবং অস্বাভাবিক তা তিনিও বুঝতে পারছেন; "we seem to be between the horns of a dilemma." কারণ হয় পুরোণো নীতিকে স্বীকার করো, নয় গতিকে স্বীকার করো। গতি এবং পুরোণো নীতি, এ দুই এর একটিকে স্বীকার করা চলবে। গতিকে স্বীকার করলে পুরোণো logic এর Identity নীতি স্বীকার করা চলবে না। তবে এ হেঁয়ালীর সমাধানের আশ্বাস Plekhanov দিয়েছেন। "Let us see if there is no way of escaping it." কিন্তু আশ্বাস দিয়েও শেষটায় কোনো সমাধান দিতে পারেন নি। কেবল সেই একই কথা পুনরুক্তি করেছেন যে গতি মাত্রেই contradiction গতি যে কী বস্তুতে contradiction হয়ে দাঁড়ায়, সেই অন্ধকার সমস্যাটির উপরে কোনোই আলোকপাত করেননি। প্রবল ভাবে বলছেন তার বারবার পুনরুক্ত সেই প্রমাণ সাপেক্ষ উক্তিটি।

The movement of matter underlies all the phenomena of Nature. **But motion is a contradiction—we must consider** the question dialectically, i e. to say, as Bernstein would phrase it, in accordance with the formula "yes is no & no is yes."

Hence, we are compelled to admit that as concerns this basis of all phenomena we are in the domain of the "logic of contradiction."[৩]

যাকে প্রমাণ করতে হবে, সেই সংশয়-স্থল বিষয়টিকে প্রমাণ না করে বারবার পুনরুক্তি করলেই তো আর সংশয় মিটলো না। But motion is a contradiction, we must consider···ইত্যাদি বলে বিবি নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করে বলছেন "হাঁ-ই না" এবং "না মানেই হাঁ"। অতএব

১ Dialectic & Logic by Plekhanov in Fundamental Problems of Marxism"

২ Idid, Plekhanov

৩ Ibid Plekhanov

we are compelled to admit ইত্যাদি ইত্যাদি। কী করে motion contradictory সেইটেই যে নিজাস্ত ও প্রমাণ সাপেক্ষ। কিন্তু তার জবাব নেই।

পরে অবশ্য দুটো দৃষ্টান্ত উত্থাপন করে Plekhanov গতির অবিরোধী স্বভাবকে দেখাতে চেয়েছেন। যথা :—

(a) But when an object is as yet only in a course of becoming, we often have a good reason for hesitating as to our reply. When we see a man who has lost most of the hair from his cronium, we say that he is bald. But how are we to determine at what precise moment the loss of the hair of the head makes a man bald ?

স্পষ্ট করে না বললেও Plekanov এর ইঙ্গিত হচ্চে এই যে যখন স্পষ্ট বোঝা যাবে টাক পড়েছে তখন সঠিক জবাব দেয়া যাবে বটে ; কিন্তু যখন অতো স্পষ্ট নয় ও নিশ্চিত করে বলা চলবে না এবং যখন অনবরত চুল পড়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি, তখন হাঁ এবং না দুই ই বলা চলে ; মানে সেই ব্যক্তি bald এবং not-bald দুইই একই সঙ্গে এবং একই কালে। এখানেও Plekhanov এর ভুল অতি স্বতঃপ্রতিভাত। এখানেও সেই "refuging to distinguish" James এর ভাষায়। যেহেতু ঠিক কোন্ মুহূর্ত থেকে টাক পড়েছে, বোঝা যায় না, সে হেতু দু কথাই বলতে হবে, টাক পড়েছে এবং পড়েনি। এ কেমন ধারার যুক্তি। bald বলতে একটা সঠিক মানে বোঝা যায় ; যখন তার definition ঠিক হয়ে যায়' অর্থাৎ কথাটির connotation স্থির হয়ে যায়, তখন একই অর্থে bald এবং not-bald একই কালে বলা চলে না। যদি একবার লোকটিকে bald বলা হয়, তবে তাকে not bald একই কালে বলা চলে না। অবশ্যি bald বলতে যা বুঝি তা যদি স্পষ্ট না হয়, যদি মানে সুনির্দিষ্ট না থাকে, তবে ওরকম দ্বিধা ও সংশয়ের অবকাশ থাকে বটে।

(b) A youth on whose chin down is beginning to sprout is certainly growing beard, but we cannot for that reason speak of him as bearded. Down on the chin is not a beard, although it gradually changes into a beard. If the change is to become qualitative, it must reach a quantitative limit.৪

এখানেও সেই একই confusion. beard এবং down যে এক নয় এবং তারা যে দুটো আলাদা জিনিষ, একথা Plekhanov স্বীকার করেছেন। কাজেই যতক্ষণ down উঠ্‌ছে ততক্ষণ তাকে bearded বলা চলতে পারে না। আবার যখন beard হয়েছে, তখন আর তাকে not-bearded বলা চলে না। Beard এবং Down এর মানে সুনির্দিষ্ট থাকলে, একই কালে bearded এবং not-bearded বলা অযৌক্তিক। তবে ভিন্ন অর্থে দুটো আখ্যাই ব্যবহার করা চলতে পারে। down গজানোর অবস্থাতও, "এক অর্থে" যাকে bearded বললেও, পরে যখন bearded বলা হবে তখন bearded মানে সম্পূর্ণ আলাদা। একই অর্থে bearded ব্যবহার করলে bearded এবং not-bearded দুটো আখ্যাই এক সঙ্গে একই কালে প্রয়োগ করা অর্থহীন। Quantitative পরিবর্তন একটা স্থানে এসে পৌঁছালে, তখন গুণগত qualitative পরিবর্তন ঘটে, বস্তুটি আলাদা জিনিষে পরিণত হয়ে যায়, একথা মেনে নিলেও, একই কালে দুটো সংজ্ঞা ব্যবহার করা চলতে পারে না। পরিবর্তন-বিন্দুর আগেকার অবস্থা এবং পরের অবস্থা qualitatively স্বতন্ত্র। কাজেই আগেকার অবস্থা যতক্ষণ চলবে, ততক্ষণ তার

৪ Idid Plekhanov

ওপরে পড়েছে অবস্থা আরোপ বা কল্পনা করলে অপ-প্রয়োগ হবে। "Downed" অবস্থাকে bearded বলা কিছুতেই চলবে না। কাজেই তরুণকে একই কালে সশ্মশ্রুমান এবং অ-সশ্মশ্রুমান দুই বলা ভুল। হেগেলের আলোচনা প্রসঙ্গে এসব ধরণের দৃষ্টান্তকে বিচার করা হয়েছে। সর্বত্রই হেগেলের এবং জড়বাদী হেগেলীয়দের—একই ত্রুটী দেখা-যাচ্ছে। Time-factor কে এরা কেউ গণনায় আনেননি। কাজেই একই অবস্থাতে তারা দুটো বিপরীত গুণের সমাবেশ কল্পনা করতে পেরেছেন। একটা এই যে মুহূর্তে একটা স্থান-বিন্দুতে আছে তার পর মুহূর্তে সে পরের স্থান-বিন্দুতে সরে গেছে। যেখানে সে একটি স্থান-বিন্দুতে আছে, পর মুহূর্তে সে সেই স্থান-বিন্দুতে নেই এসব ঠিক্। কিন্তু একই মুহূর্তে সে at a given point & at the same time it is not there, হোতে পারে না। এখানে at the same time কথাটা মিথ্যা এবং অপপ্রয়োগ এবং যেটি হবে সেটি হচ্ছে "at the next point of time."

কাজেই দুটো contradictory অবস্থা সত্য হতে পারে successive moments এ, একই মুহূর্তে নয়। Professor E F Carritt (University College, Oxford) এ সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তিনি এই time factor এর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং বলেছেন যে পুরোণো লজিকের—(যাকে তিনি realistic logic বলেন—) বিরুদ্ধে এই হেগেলীয় বিরোধ-কেন্দ্রিক লজিক যে আক্রমণ করেছে তা ভিত্তিহীন।

"Hegalians & Malhewists often unite in asserting the necessity for this dialectic logic if we are to give any account of change, which they assert could not be done by the "old" or as I should say, realistic logic, because it denied that the same thing could have contradictory statements made about it. But the realistic logic never made any such assertion. It simply denied that the same thing could have contradictory statements made about it truly "at the same time."

If it was true that a thing was moving it was not at the same time true that it was at rest. And if you question that, you question the possibility of real change. And it was Aristotle himself, a formulator of realistic logic, who added that of every changing thing contradictory statements must be true at successive moments. If it was moving then it "was" here & now is not here."[৫]

কোনো বস্তু একই সময়ে চলমান এবং অচল, moving ও at rest দুই হোতে পারে না। যদি কেউ মনে করে এ হোতে পারে, তবে পরিবর্তনকে অস্বীকার করতে হবে তার। কারণ সত্যিকার পরিবর্তন তাহলে অসম্ভব হয়ে যাবে। Uberweg ও তাহাই বলা যেতে পারে।

"To every definite question, understood in a definite sense, as to whether a given characteristic attaches to a given object, we must reply either yes or no; we cannot answer yes and no. [৬]

কিন্তু Plekhanov বলতে চান yes and no একই সঙ্গে বলা যেতে পারে। তাঁর মতে "yes is no and no is yes" অথচ Plekhanov এর কোনো প্রমাণই দিতে পারেননি। হেগেলেরই মত দুটো বাহ্যতঃ দৃষ্টান্ত

[৫] "Aspects of Dialectical Materialism Carritt
[৬] System of Logic Uberweg

দিয়েছেন যাতে time factor কে আনা হয়নি এবং বিশ্লেষণ কর্মে যা একেবারেই খোপে টেঁকে না।

(৩) Plekhanov এর তৃতীয় বক্তব্য আরও চমৎকার। গতিতত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে তাঁকে শেষটায় Formal Logic কেও স্বীকার করতে হয়েছে। Formal Logic এর নীতিগুলোও খাটবে এবং কতকগুলো ভায়লেক্‌টিকের খণ্ডিয়েও। তবে Plekhanov অবশ্য এই দুইয়ের মধ্যে ভায়েলিটিককেই ব্যাপকতর এবং মৌলিক লজিক বলে নির্দেশ করেছেন এবং Formal Logic হচ্ছে, তাঁর মতে ভায়লেক্‌টিক লজিকেরই একটা দৃষ্টান্ত বা special case মাত্র। এই নূতন তত্ত্ব তিনি নিম্নলিখিত ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

Matter হচ্ছে অনাদি; এবং matter এর পরিবর্তন হচ্ছে, সেও অনাদি, অফুরন্ত গতিতে। কিন্তু গতির ফলে এই matter এর কণিকাগুলো (molecules) সর্বদাই পরস্পরের সঙ্গে সম্বেত হয়ে এক একটা বস্তু রূপে দানা বেঁধে যাচ্ছে। এই বস্তুগুলো মোটামুটি ভাবে কিছুকালের জন্য স্থায়ী হচ্ছে এবং যতক্ষণ তারা স্থায়ী stable থাকছে এবং নিজের রূপকে হারিয়ে ফেলছে না, ততক্ষণ তাদের সম্বন্ধে Formal logic এর নীতিগুলোই খাটবে। Plekhanov এর ভাষায়:

"But the molecules of matter in motion, becoming conjoined one with another form certain combinations; things, objects, such combinations are distinguished by more or less marked solidity; They exist for a longer or shorter time, & then disappear to be replaced by others------But as soon as a particular temporary combination of matter has come into existence as a result of the eternal movement of matter, and as long as it has not yet disappeared owing to the same movement, the question of its existence must necessarily be solved in a positive sense" [৭]

যতক্ষণ বস্তুটী একটি বিশিষ্ট সত্তা হিসেবে থাকছে, যতক্ষণ বস্তুটী লোপ পায়নি, "has not disappeared ততক্ষণ এর সম্বন্ধে সঠিক জবাব দিতেই হবে; অর্থাৎ হাঁ কিম্বা না, একটি বলতে হবে ভায়লেক্‌টিকের কারবার দুটোই এক সঙ্গে বললে চলবে না। যেমন যেখানে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে Venus গ্রহটি আছে কি না, তবে বিনা দ্বিধায় বলতে হবে "হাঁ", যদি কেউ তেমনি জিজ্ঞেস করে ভূত আছে কি না, তবে অকোচে বলতে হবে "না"। কিন্তু কেন? Plekhanov জবাব দিয়েছেন: —

It means that when we are concerned with distinct objects, we must, in our judgments about them, follow the above mentioned rule of Weberweg's and must in general conform to the fundamental laws of thought. In that domain there prevails the formula agreeable to Bernstein, "yes is yes and no is no" [৮]

Plekhanov অনেক কিছু বুঝিয়ে গেছেন, কিন্তু আমাদের খটকা লেগেই থাকছে, সংশয়ের নিরসন হচ্ছে না। তাঁর মতে distinct object হলেই, তার সম্বন্ধে ভায়লেক্‌টিক বিকল। তিনি distinct বস্তু বলতে কী বোঝেন তা বলেননি কোথাও। পরে আবার তিনি বলেছেন—

When we are asked a question as to the reality of an object which already exist, we must give a positive answer" আরো বলছেন:

---

৭ Ibid Plekhanov

৮ Ibid Plekhanov

"To every definite question as to whether an object has this characteiristic or that, we must respond with a yes or no. As to that there can be no doubt whatsoever ৯

যদি কোনো বস্তু সত্যি সত্যি অস্থিরশীল হয়ে থাকে, তবে তার সম্বন্ধে বলতেই হবে সে আছে। তেমনি যদি কোনো বস্তুর কোনো গুণ-characteristic-থেকে থাকে, সেইগুণ সম্বন্ধেও বলতে হবে যে গুণটি আছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, "distinct object" এর মানে তাঁর মতে কি? যদি এর মানে অপরিবর্তনশীল বা স্থায়ীবস্তু হয়, তবে Plekhanov এর কথা ঠিক নয়। কারণ বিজ্ঞান এবং Plekhanov এর ডায়ালেকটীক্ এই দুইই বলে যে জগতের সকল বস্তুই নিত্য পরিবর্তনশীল। যদি তাইই হয়, তবে তো Formal Logic এর কোনো স্থানই নেই সংসারে। কারণ Plekhanov এর কথায়, যে বস্তুটী "in the course of becoming" এবং যে গুণটিকে কোনো বস্তু in the act of losing···or in the course of acquiring···' সেই বস্তু ও গুণ সম্বন্ধে Formal Logic বেকার। আমরা জানি এবং Plekhanovও অন্যত্র ঘোষণা করেছেন যে জগতের বস্তুগুলো সবাই অহরহ পরিবর্তিত হচ্ছে অর্থাৎ "in the course of becoming." কাজেই Formal Logic এর স্থান কোথায়?

এর একটা জবাব পরে Plekhanov দিয়েছেন। যতক্ষণ আলোচনার সমবায়টি ঠিক আগেকার সমবায়ই থেকে যায় ততক্ষণ Formal Logic খাটবে। আবার পরিবর্তন হতে হতে যখন দেখা যাবে যে গভীর রূপে তারা বদলে গেছে এবং আগেকার মতন সমবায় আর নেই, তখন Dialectic লজিকের এখ তিয়ারে তারা পড়বে।

"The combinations which we speak of as objects are permanently in a state of more or less rapid change. In proportion as such combination remain the same combination, we can judge them accordance with the formula "yes is yes and no is no". But in proportion as they change to a degree in which they cease to exist as formerly, we must appeal to the logic of contradiction···"১০

এ সম্বন্ধে আমাদের প্রথম আপত্তি এই যে কোনো সমবায় বা বস্তুই কখনোই "Same combination" থাকেনা। তবে যদি বেশী বা কম স্থায়ীত্ব বলে একটা পার্থক্য করা হয়, তবে Plekhnov হয়তো বলতে পারেন যে "বেশী" স্থায়ী বলে তাকে Formal Logic এর অন্তর্গত ধরা হবে। আগেও বস্তুর "more or less marked solidity" র উল্লেখ তিনি করেছেন। কিন্তু Plekhanov এর এ পার্থক্য নিতান্ত ধনপড়া বই আর কিছু নয়। "more or less solidity" যেমন অস্পষ্ট, তেমন অস্পষ্ট "cease to exist as formerly." বস্তুগুলো প্রতি পলে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটে চলেছে অবিশ্রান্ত গতিতে ঠিক কোন্ মুহূর্তে বস্তুটী আর আগেকার মতন নেই "ceased to exist as formerly" বলা যেতে পারে? প্রত্যেক মুহূর্তেই সে আগের মুহূর্তের স্বরূপ থেকে ভিন্ন, প্রত্যেক মুহূর্তেই সে তার পূর্ব্বের রূপ থেকে পৃথক ও নতুন, ceased to exist as formerly" পরিবর্তনের কোন্ ডিগ্রিতে এসে পৌঁছুলে তাকে পূর্ব্ব সত্তা থেকে বিভিন্ন বোলবো? কাজেই একটা বস্তু যখন বিশেষ রূপে পরিবর্তিত হয়নি, তখন তাকে Formal logic দিয়েই বিচার করতে হবে এবং যখন থেকে তার পরিবর্তন খুব গভীর ও স্পষ্ট, তখন থেকে তাকে বুঝতে হলে ডায়ালেকটিকের আশ্রয় নিতে হবে। Plekhanov এর

৯ Ibid

১০ Ibid Plekhanov

বক্তব্যের মানে তা হলে এই হয় যে পরিবর্তন যতক্ষণ চোখে তেমন ধরা না পড়ে ততক্ষণ তাকে "সেই বস্তুই" (Samething) বলে ধরতে হবে; এবং যেই মাত্র পরিবর্তন আমাদের চোখে ধরা পড়তে শুরু করবে, তখন থেকে বলতে হবে বস্তুটি আগেকার বস্তু বটে এবং আগেকার বস্তু নয়ও বটে (Samething and not the same thing)

এ রকম অর্থ করলে Plekhanov এর বক্তব্য বিজ্ঞানের বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। কারণ বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে জগতের সকল বস্তুই প্রত্যেক মুহূর্তেই বদলে যাচ্ছে এবং কোনো সময়েই একটি বস্তু ঠিক অবিকল বস্তুটি থাকছে না। তারপরে আর একটা কথা আছে। Plekhanov এর কথা হেগেলীয় এবং তথা দ্বন্দ্ববাদীয় ডায়ালেকটিক্ নীতির বিরুদ্ধেই যায়। কারণ ডায়ালেকটিক নীতির সার কথাই হলো এই যে জগতের সকল বস্তু সর্ব্বক্ষণই ডায়ালেকটিকের প্রভাবাধীন, প্রত্যেকটি বস্তুই প্রত্যেকটি মুহূর্তে নিজেকে negate বা contradict করছে; বিশ্বের সকল সত্তাই চিরদিন স্ববিরোধী, কারণ সকল সত্তাই অবিরাম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে। কাজেই Plekhanov যে আবার কোনো অবস্থায় বস্তুগুলোকে কয় পরিবর্তনশীল বলে স্থায়ী ধরে নিয়েছেন এবং তারা ডায়লেকটিকের বাইরে বলে কল্পনা করেছেন, এ তত্ত্ব তাঁর স্বকীয় দ্বন্দ্ববাদকেই খণ্ডিত করছে।

কিন্তু Plekhanov যখন বলেছেন Formal Logic আবার ডায়েলেকটীকেই একটা বিশেষ অবস্থা মাত্র, তখন তাঁর বক্তব্য একেবারেই হেঁয়ালী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর কথায় "Just as inertia is a special case of movement, so thought is conformity with the rules of formal logic (in conformity with the fundamental laws of thought) is a special case of dialectical thought. ১১

১১ Ibid Plekhanov

এখানে Plekhanov এর এই দাবী বিস্ময়কর। Inertia এবং movement এর যে সম্পর্ক, Formal logic এবং ডায়ালেকটিকের মধ্যে কি সেই রকমের সম্পর্ক? inertia এক রকমের movement এরই নাম;—কাজেই inertia একটি special case হতে পারে। কিন্তু Formal Logic কি ডায়ালেকটিক শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত? এদের মধ্যে কোথায়ই বা সাদৃশ্য আছে এবং কোথায়ই বা সাধর্ম্য হয়েছে যার জোরে পুরোপো নীতিগুলোকেও এক বিশেষ রকমের ডায়ালেকটিক বলা চলে? হেগেল Formal Logic এর নীতি তিনটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেই তাঁর ডায়ালেকটি লজিকের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। জগতের সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেই contradiction অব্যাহত হয়ে আছে, এই তত্ত্বই না Dialectic এর প্রাণ? তাহলে Formal Logic ডায়ালেকটিকেরই বিশেষ একটা অবস্থা মাত্র কী কোরে হোতে পারে?

দ্বিতীয়তঃ Formal Logic কে দোষ দেয়া হয় এই বলে যে এই Logic বস্তুগুলোকে স্থিতিশীল ও স্থায়ুবৎ ধরে নেয় বলেই বস্তুর পরিবর্তন সত্ত্বেও identical বলে মনে করে। আসতে Identity বলে কোনো জিনিষ সংসারে নেই, কারণ সব বস্তুই পরিবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু একথার জবাবে বলা চলে যে Formal Logic এর ওপরে এই দোষারোপ অন্যায় ও ভিত্তিহীন পুরোনো লজিক যা বলেনি তাকে তার ওপরে আরোপ করে তারপরে তাকে অনুযোগ দেওয়া অযৌক্তিক। Formal Logic পরিবর্তনকে স্বীকার করে না, একথা মিথ্যা। Formal Logic এর Identity মানে successive মুহূর্তের Identity নয়। same মুহূর্তের Identity. Ram is Ram বললে এইমাত্র বুঝতে হবে; ঠিক যে মুহূর্তে রামকে রাম বলা হোলো, ঠিক সেই মুহূর্তে সে "রামই"; পরের মুহূর্তে নয়। এবং সেই মুহূর্তে তাকে not-Ram বলা নিষিদ্ধ। কিন্তু Formal logic এর একথা

স্বীকার করে বাধা নেই যে successive moments এ রাম পরিবর্তিত হচ্ছে সুতরাং রাম ঠিক সেই বিকল রাম নয়। Ram is not-Ram একথা successive moments এ খাটে। তারপরে এতটুকুতে লক্ষ্য করতে হবে যে successive moments এর যে বলছি Ram is not-Ram, এখানেও রাম নয় (Not-Ram) মানে "ঠিক" অর্থাৎ আগেকার Ram নয়। রামের সম্পূর্ণ negation হয়নি এখানে। রামের কতকগুলো aspect এ বদল হয়ে গেছে যেমন, তেমনি কতকগুলো aspect এ রামের পরিবর্তন হয়নি; রাম সেই রামই রয়ে আছে। যে aspect এ পরিবর্তন হয়নি, সেই aspect এ রাম রামই আছে (Ram is Ram) এবং যে aspect এ রাম পরিবর্তিত হয়েছে সেই aspect এ রাম রাম নয় (Ram is not-Ram). কাজেই Formal logic এর মতে Ram কতকগুলো successive moments এ কতকগুলো aspect এ ঠিক আগেকার রাম নয়। রামের পরিবর্তন হয়েছে। সুতরাং Formal logic পরিবর্তনকে স্বীকার করে না এবং identity বস্তুগুলোকে স্থাণুবৎ করে নেয় (takes them in repose) এই অভিযোগের কোনোই ভিত্তি নেই। Formal Logic কখনো বস্তুকে in repose করে নেয় না।

বরং ডায়লেকটিকের সমর্থকেরা যে যখন বস্তুগুলোর relative ও temporary repose (আপেক্ষিক বা সাময়িক স্থায়ীত্ব) স্বীকার করে নিয়ে Formal logicকেও কিছুক্ষণের জন্য স্বীকার করা চলে, একথা অমূলক। এবং অবিশ্রান্ত গতির মাঝখানে ঐ সাময়িক বা আপেক্ষিক repose গতিরই একটা অংশমাত্র ও ডায়লেকটিকেরই অবস্থান্তর মাত্র, তাঁদের এই মত সমান অলীক। কারণ repose কোনো সময়েই নেই, সাময়িক ভাবেও না। আর আপেক্ষিক repose আসলে repose নয়। আসতে গতিই। repose বস্তুটা কল্পনা এবং fiction মাত্র। কাজেই তাদের এই দাবী যে Formal Logic ডায়লেকটিকেরই অবস্থা বিশেষ নিতান্ত অসঙ্গত। বিশেষতঃ এই দুই ধরণের logicকেই আপোষ করে প্রকারান্তরে স্বীকার করে নেওয়া তাদের inconsistancyর দৃষ্টান্ত বই আর কিছু নয়। এখানে Kornilov এর একটা উক্তি তুলে দিচ্ছি যাতে তিনিও Plekhanov এর মতের প্রতিধ্বনি করেছেন;

"Laws of dialectics are distinguished in this way from the analogous & well-known laws of formal logic—the logic of Identity, the law of Contradiction, & the law of the exclusion of the third. The last-named law applies to things & processes in their complete form, as if they were in a state of repose" ১২

এখানে Kornilov, ডায়ালেকটিকের সঙ্গে formal logic এর পার্থক্যের কথাই বলেছেন তাদের দুইয়ের প্রকৃতি এবং প্রক্রিয়া দুই-ই বিপরীত। একটী দেখে পরিবর্তনই বস্তুর স্বরূপ; অপরের চোখে বস্তু হচ্ছে অপরিবর্তনীয়। কিন্তু এর পরেই আছে:

But it is hardly worthwhile to say much about this—to say that nothing in the world is in absolute repose & that the very conception of repose has a relation & conditional meaning, being only a particular & temporary part of motion—From the point of view of dialectical meterialism, the laws of formal logic are only particular instances of the laws of dialectic logic. ১৩

১২ Psychologies of 1930 pp 260
১৩ Ibid p. 260

প্রথম উক্তিটির সঙ্গে Kornilov এর দ্বিতীয় উক্তিটির সঙ্গতি নেই ; এর অসঙ্গতি কোথায় একটু আগেই আলোচনা করা হয়েছে। Formal logic কে ডায়ালেকটিকেরই বিশেষ একটি অবস্থা বলা হয়েছে, মূলতঃ একেবারে বিভিন্ন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার বলা হচ্ছে যে এরা পরস্পর-বিরোধী।

Thus we see that the laws of dialectic differ radically from the laws of formal logic ... ১৪

(৪) Plekhanov এর চতুর্থ বক্তব্যও বিচিত্রতর। Formal logic এবং ডায়ালেকটিকের এই অদ্ভুত-পূর্ব্ব আপোষ আরো একটি ক্ষেত্রেও প্রধাবিত হচ্ছে। Plekhanov বলেন, motion এর বেলায়ও Formal logic কখনো কখনো খাটবে। সবাই জানে, উত্তাপ heat একরকমের গতি (movement) ; তবে সাধারণ গতি অর্থাৎ বস্তুর বেগ (mechanical movement) আর উত্তাপ, দুটো আলাদা আলাদা ধরণের গতি (movement) Plekhanov বলেছেন, যখন একরকমের গতি অন্যরকমের গতিতে পরিণত হয়, তখন ডায়ালেকটিক নীতি খাটবে না। যেমন mechanical motion যখন heat এ পরিণত হয়, তখন Uberweg এর পুরোনো নীতি অনুসারে বলতে হবে "এই গতি হয় mechanical motion—না হয়—উত্তাপ।" এখানে ইহা উত্তাপও বটে এবং উত্তাপ নাও বটে (it is heat & mechanical motion both) একথা বলা চলবে না।

"When we have to do with the passage from one kind of movement to another (let us say, with the passage from mechanical movement to heat) we must also reason in accordance with Uberweg's fundamental rule. We must say "this kind of motion is either heat, or else mechanical movement or else—& so on. That is obvious. But if so, it signifies that the fundamental laws of formal logic are, within certain limits, applicable also to motion." ১৫

এখানেও Plekhanov পরিষ্কার করে বলেননি motion এর ক্ষেত্রে ও বা কেন ডায়ালেকটিক খাটবে না। শুধু that is obvious এই একটি কথা বলে ক্ষান্ত হয়েছেন। ডায়ালেকটিকের মূলনীতি অনুসারে সকল রকমের movement এই স্ববিরোধ আছে এবং ডায়ালেকটিকও কাজেই খাটবে। Plekhanov এর উপরের উক্তিটি ডায়ালেকটিকের মূল নীতির বিরোধী নয় কি ?

তারপরে আরো দেখা যাচ্ছে যে ডায়ালেকটিক তা'হলে formal logic এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হতে পারছে না। অধিক সংখ্যক স্থানে ও ব্যাপারেই Formal logic এর আধিপত্য অব্যাহত আছে তা হলে। যে সব বস্তু চলনশীল নয় বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, সেই সব বস্তুর বেলায় যেমন পুরোনো লজিকের মূলনীতিগুলো খাটবে, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে movement এর বেলায়ও সেই বহু নিন্দিত নীতি-গুলোই খাটবে।

Plekhanov এর সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই।

The inference once more is that dialectic does not suppress formal logic, but merely definis the laws of formal logic of the absolute value which metaphysics have ascribed to them. ১৬

Plekhanov নরম সুরে বলেছেন, Formal logic সম্বন্ধে আপত্তির শুধু এই যে তার absolute বা সর্ব্বকালীন মূল্য ও প্রয়োগ হতে পারে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ডায়ালেকটিকের আধিপত্য স্বীকার করতে হবে। আমরা

১৪ Ibid : Korilov p 201

১৫ Ibid Plekhanov

১৬ Ibid Plekhanov

এর অবাব আগেই দিয়েছি। কোনো ক্ষেত্রেই যে ডায়ালেক-টিকের হেগেলীয় ধরণটি খাটেনা এবং সর্ব্বত্রই যে Formal logic এর মূল নীতি তিনটে অপরিবর্ত্তনীয়, এ কথা আমরা আগেই প্রমাণ করেছি। Formal logic এর নীতিগুলোকে বাদ দিয়ে মানবজীবনের কোনো চিন্তা কোনো মনন ও কোনো ব্যাপারই যুক্তিসঙ্গত ভাবে কার্য্যকরী হতে পারে না। Plekhanov এর আগেই বলেছেন :—

While we pay to the fundamental laws of formal logic the homage which is their due, we must remember that these laws are only valid within certain limits, within limits which leave us free to pay homage also to dialectic. ১৭

লজিকের ক্ষেত্রে এই দ্বৈরাজ্য যুক্তির ক্ষেত্রে অচল এ আমরা আগেই দেখিয়েছি। Formal logicকে মনগড়া গোছের একটু আংশিক আনুগত্য দিলেও ডায়ালেকটিকের কোনো প্রবাদই Plekhanov উপস্থিত করেননি। তাঁর আসল প্রতিপাদ্য যে বস্তু তাকে যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ না করে তিনি কেবল কয়েকটি বিঘোষণা করেছেন মাত্র। কেবল বিঘোষণা দ্বারা কোনো সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয় না।

"That motion is a contradiction in action, and that, consequently, the fundamental laws of formal logic cannot be applied to it." ১৮

এই তত্ত্ব বা সিদ্ধান্তকে তাঁর প্রবন্ধের কোথাও তিনি প্রমাণ করেননি। আগাগোড়া কেবল এই তত্ত্বের পুনর্বাচনই করেছেন। আমরা হেগেলের যুক্তিগুলোর প্রসঙ্গে এতত্ত্বের পুরোপুরি বিচার করেছি এবং দেখিয়েছি যে motion এর ক্ষেত্রেও ডায়ালেকটিকের দাবী অযৌক্তিক ও অবাস্তব ভুল ধারণার ওপরে এবং অর্থ ও ভাষাগত বিভ্রাটের ওপরে নির্ভর করছে। (ক্রমশঃ)

১৭ Ibid Plekhanov
১৮ Ibid Plekhanov

অনিল ব্রাহ্মের
সময়োপযোগী দুইটি বই

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ : ৩·৫০ টাকা

"...সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থ-নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রাহ্য। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাদ্য।" ... (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনদর্শন

...নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের সম্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।

পাওয়া যাবে :
জয়শ্রী—৩১২, গাবুলী বাগান, কলি:-৪৭ (ডাকে)
ভারতীয় সাহিত্য প্রকাশনী,
২০৯বি বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কয়েকটি স্মৃতি কথা

সুধাকান্ত রায় চৌধুরী

"কালিমপঙে রবীন্দ্রনাথের পতন"—

সে আজ অনেকদিনের কথা। জার্মান সৈন্যরা ফরাসী দেশে যুদ্ধ অভিযান চালিয়ে ভার্দুন দখল করেছিল, সেই সংবাদ নানা খবরের কাগজে এই বলে প্রচারিত হয়েছিল যে—ভার্দুনের পতন। এই ঘটনা ঘটেছিল যখন হিটলারের সৈন্যরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভার্দুন দখল করে। এই সময়ের কিছুদিন পরে বায়ুপরিবর্তনের জন্য রবীন্দ্রনাথ কয়েকদিন কালিমপঙে গৌরীপুর লজে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুত্রবধূ শ্রীমতী প্রতিমা ঠাকুর আর ছিলাম আমি। আমরা এই ক'জন ছাড়া আরও দু চার জনও ছিল যেমন পাচক, রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ভৃত্য বনমালী এবং দু একজন আরও যারা ঘর পরিষ্কার করতো, খাবারের টেবিল সাজাতো আর হাট বাজার করতো। এই ক'জন মিলেই আমাদের রাতদিন কাটতো কালিমপঙের ঐ গৌরীপুর লজ পাহাড়ে। জায়গাটা ছিল নির্জন; নির্জন হলেও সেখানে রবীন্দ্রনাথ থাকা-কালে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য তাঁর মুখের দু'চারটি কথা শোনার জন্য স্থানীয় দু চারজন বাঙালীরা এবং যারা পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে সেখানকার "ব্যানার্জী"র হোটেলে গিয়ে থাকতেন তাঁদের মধ্যেও অনেকে রবীন্দ্রনাথের কাছে যেতেন। যারা যেতেন তাঁদের সকলের নাম মনে পড়ছে না তাঁদের নাম মনে পড়ছে তাঁদের মধ্যে ছিলেন রায় বাহাদুর নিবারণচন্দ্র ঘোষ (নিবারণবাবু কিছুদিন ভারতীয় রেল বিভাগের জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন), ধনাধ্যক্ষ দিলীপকুমার রায়। আরও মনে পড়ছে কয়েকজন পাহাড়ী সুশিক্ষিত ব্যক্তি, কালিমপঙ হোমের দু একজন সাহেব মেম। একদিন আমার পরিচিত একটি মাড়োয়ারী বন্ধু—শ্রীমতিলাল খাওয়ার—সপরিবারে রবীন্দ্রনাথকে দর্শন করবার জন্য গৌরীপুর লজে গিয়েছিলেন। সেই পরিবারের মেয়েরা রূপোর থালায় নানা রকম ভোজ্য বস্তুর ডেট সাজিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের শ্রদ্ধা দেখে এবং তাঁদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথ খুবই তৃপ্তি লাভ করেছিলেন। তাঁরাও পরম তৃপ্তি লাভ করে নিজেদের বাসায় ফিরলেন।

কালিমপঙের ঐ নির্জন জায়গায় কতকটা একঘেঁয়েমি কাটাবার জন্য আমি প্রায় প্রতিদিন বিকালে ঐ ব্যানার্জীর হোটেলে গিয়ে নিবারণবাবু এবং অন্যদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে আসতাম। একদিন ঐখান থেকে আড্ডা দিয়ে যখন গৌরীপুর লজে ফিরলাম তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। যথা সময় রাত্রিতে ভোজনের জন্য টেবিলে আমরা সব খেতে বসলাম। রবীন্দ্রনাথ কখনও কখনও আমাদের সকলের সঙ্গে এক টেবিলেই মধ্যাহ্ন ভোজন, রাত্রি ভোজন করতেন আবার কোন কোন দিন তাঁর বসবার ঘরে একাই খেতেন—একা খেলেও তাঁর কাছে আমি কিংবা শ্রীমতী প্রতিমা ঠাকুর এই দুজনের মধ্যে কেউ না কেউ থাকতাম। সেদিন রাত্রি ভোজনের সময় রবীন্দ্রনাথ আমাদের সঙ্গে টেবিলে খেতে বসলেন। সেদিন তাঁকে যেন নানা রকম গল্প করবার নেশায় পেয়ে বসেছিল, সাধারণতঃ খাওয়া দাওয়ার পরও ঐ খানেই বসে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করতেন বা কিছুক্ষণ গল্প করে

নিজের শোবার ঘরে চলে যেতেন। কিন্তু সেদিন খাওয়া দাওয়ার পাট চুকে যাওয়ার পরও আর চেয়ার থেকে উঠবার নামও করেন না, নানা প্রসঙ্গ নিয়ে এক একটা আলোচনা পাড়তে লাগলেন। সেই আলোচনা বা প্রসঙ্গে থাকতো পাহাড়ী অঞ্চলের লোকদের জীবনযাত্রার কথা। সেখানকার বাঙালী সমাজের কথা। এসব কথার মধ্যে সেদিন তাঁর আলোচনার বিষয় ছিল এক একজন মুদ্রাস্ফীতিলাভী ব্যক্তির বুদ্ধ জয়ের সীমাহীন ক্ষুধা, আর সেই ক্ষুধার উদর ভরাবার জন্য শত শত মানুষের জীবন বলি. আরও কত ছোটখাট বিবিধ প্রসঙ্গ। যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে যে একটা নিরাকরণ নিষ্ঠুরতা থাকে, অ-মানবিকতা থাকে সেই সব বিষয় নিয়েই তিনি তীব্রভাবে সেদিন আলোচনা করছিলেন। এই আলোচনা চলল প্রায় রাত্রি নটা পর্যন্ত। পাহাড়ে শীত—খাওয়া দাওয়ার পর এতক্ষণ একটানা সিগারেট না খেয়ে আমার পক্ষে থাকাটা একটু কষ্টকরই হচ্ছিল। লক্ষ্য করলাম রবীন্দ্রনাথের অবস্থা প্রায় আমারই মতন। আর লক্ষ্য করলাম যারা টেবিলের পাট চুকে যাবার পর বাসনপত্র যথাস্থানে তুলে যে যার জায়গায় চলে যায় তারাও যেন ভাবছে কখন এই গল্পের আসর শেষ হবে। নিজের মনেই অগত্যা আমি রবীন্দ্রনাথকে দু একটি কথায় ইঙ্গিত করলাম রাত হয়ে গেছে, তাঁর শোবার সময় হয়েছে। ইঙ্গিতটা তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চেয়ার থেকে ওঠে নিজের শোবার ঘরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। তখন তাঁর বয়স বেশি হলেও এবং স্বাস্থ্য একটু দুর্বল হলেও সেটা তিনি সহজে স্বীকার করতে চাইতেন না। তাঁর স্বাস্থ্য দুর্বল ছিল বলেই তিনি যখন এ ঘর থেকে ওঘরে যেতেন তখন আমি কিংবা বৌদি (বৌদি অর্থে প্রতিমা ঠাকুর) তাঁর হাত ধরে কখনও কখনও সাহায্য করতাম, সে সাহায্য তিনি পছন্দ করতেন না। যখন তিনি চেয়ার থেকে উঠে নিজের শোবার ঘরে যাচ্ছিলেন আমি তখন তাঁর হাত ধরে সঙ্গে যাবার চেষ্টা করতেই তিনি বিরক্ত হয়ে যা বলেছিলেন তার মর্ম হচ্ছে— আমি কি এতই পরাধীন যে তোমার সাহায্য না নিয়ে এঘর থেকে ওঘরে যেতে পারব না. আমার কি একটুও স্বাধীনতা নাই, যাও রাত হয়েছে শোও গিয়ে।" কি আর করি আমি আমার ঘরেই চলে গেলাম এই ভরসায় যে বৌদি ওঁর সঙ্গে আছেন,—কিন্তু আমি আমার শোবার ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই রবীন্দ্রনাথের শোবার ঘরে ধড়াম করে পড়ে যাবার একটা শব্দ শুনতে পেলাম। শব্দ শুনেই তাঁর ঘরে দৌড়ে গেলাম। দৌড়ে গিয়ে জানতে পারলাম তিনি তাঁর শোবার খাটের পাশে রাখা ইজিচেয়ারে হোঁচট খেয়েছেন। ভাগ্যিস বৌদি সঙ্গে ছিলেন তাই গুরুতর কিছু হতে পারেনি; তিনি বৃদ্ধ শ্বশুরের হাত ধরে তাঁকে ইজিচেয়ারে বসতে সাহায্য করলেন। যেটুকু হোঁচট খেয়েছিলেন তাতেই তাঁর বাঁ পায়ের হাঁটুতে একটু লেগেছিল। আমাকে দেখেই বিরক্ত হয়ে বললেন— "আবার কেন এলি তোদের তো রাত হয়েছে শুতে যা।" বেশ বুঝতে পারলাম তাঁর মেজাজ বিরক্তিতে ভরা, তাই আর কোন কথা না বলে আমার ঘরে ফিরে এলাম। বৌদি ঐ ইজিচেয়ারের পাশেই মোড়ায় বসে রইলেন। আমার ঘরে গিয়েই সেখান থেকেই শুনতে পেলাম বৌদি বলছেন—আপনার হাটুতে লেগেছে একটু আমাক মালিশ করে দিই। এই কথা শুনতে পেয়ে আবার ভয়ে ভয়ে তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। গিয়ে দেখি বৌদি তাঁর শ্বশুর মহাশয়ের হাটুতে আমাক মালিশ করছেন। ঐ দেখে আমি কতকটা বেহায়ার মতনই বললাম—আপনি অশক্ত হয়ে পড়েছেন, তবু নিজেকে খুব শক্ত মনে করেন, যদি কিছু বেশি আঘাত লাগতো তাহলে তো আমাদেরই সকলে নিন্দে করতো। এবার রবীন্দ্রনাথ পরিহাস করে বললেন—"বেশ হয়েছে তোর তো একটা খোরাক জুটেছে।" আমি বললাম—"আপনার হাঁটুতে চোট লেগেছে তাতে আমার খোরাকের সঙ্গে কি সম্বন্ধ।" তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—"কালকেই

সংবাদ পত্রে লিখে পাঠা—ওদিকে ফ্রান্সে তাড়ুনের পতন এদিকে "কালিমপঙে রবীন্দ্রনাথের পতন।"

সন্ধ্যের সময় খাবার আগে এবং খাবার পরেও দেখেছি সাধারণতঃ রবীন্দ্রনাথ ঘরের লোকজনদের সঙ্গে এবং একেপড়া পরিচিত লোকজনদের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প স্বল্প করতে ভালবাসতেন। তিনি সাধারণতঃ সন্ধ্যে সাতটা সাড়ে সাতটার সময়েই সন্ধ্যে ভোজন শেষ করতেন, কোন কোন দিন দেরীও হয়ে যেত। এইবার আরেকদিন সন্ধ্যের সময় কাটাবার গল্প বলি—

দার্জিলিঙে রবীন্দ্রনাথের তাশ খেলা :— সেও আজ অনেকদিনের কথা। দার্জিলিঙের মাউন্ট এভারেষ্ট হোটেলের অনতিদূরে গ্লেন ইডেন্ নামক একটি বাংলোয় তিনি মাঝে মাঝে গিয়ে থাকতেন। সঙ্গে থাকতেন কখনো কখনো তাঁর পুত্র, পুত্রবধূ, দৌহিত্রী নন্দিতা (এখন মিসেস, নন্দিতা কৃপালনী) আর পৌত্রী নন্দিনী। আর আমি ওঁদের সকলের সঙ্গে তো থাকতামই। দু একবার এমনও হয়েছে যে তাঁর সঙ্গে আমি আর তাঁর পুত্রবধূ সেখানে থেকেছি। একদিন (যে বার তিনি ও আর তাঁর পুত্রবধূ এবং আমি কিছুদিন ছিলাম সেখানে) সন্ধ্যের সময় আমাকে তিনি বললেন—আয় সময় কাটাবার জন্য কিছুক্ষণ তাশ খেলা যাক। কিন্তু ঐ তাশ খেলায় কাঁই বীচির (তেঁতুল বীচি) দরকার হয়, কারণ বেট্ রেখে খেলতে হয়। এক সেট তাশ তো যোগাড় করা গেল কিন্তু ঐ সন্ধ্যের সময় তেঁতুল বীচি আর কোথায় পাওয়া যাবে। কাজেই ঐ একসেট তাশের থেকেই কয়েকটি তাশ আলাদা করে বের করে রাখা হল। তারপর আমরা দুজনে তাশ খেলা সুরু করলাম। ব্যাপারটা হলো হার-জিতের খেলা। এ খেলার কলা কৌশল আমার কিছুই জানা ছিল না, তিনি মোটামুটি আমাকে খেলার নিয়ম কিছুটা বুঝিয়ে দিলেন। যা বুঝলাম সেই অনুসারেই খেলতে লাগলাম। খেলতে লাগলাম বটে, কিন্তু ক্রমাগতই হারতে লাগলাম। এই রকম করে পর পর দু তিন দিন সন্ধ্যে কাটানো তাশ খেলা হলো। আমি ক্রমাগত হারছি এটা তাঁরও মনঃপুত হল না আমারও মনঃপুত হল না। এই খেলা ভাল করে খেলতে হলে যে আঙ্কিক কৌশলের প্রয়োজন সে কৌশল আমার মাথায় কিছুই ঢোকেনি। এর কয়েকদিন পরে যখন তিনি টের পেলেন যে পাশের বাড়ীর ভূপতি বাবুর সঙ্গে আমি পরিচিত এবং তাঁদের ওখানে গিয়েও গল্প স্বল্প করি। তাই একদিন সন্ধ্যের সময় আমাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অর্থাৎ সৌজন্যভাবে বললেন ভূপতি বাবুকে যদি আনতে পারিস তাহলে চারজনে মিলে একদিন খেলা যাক। (সেদিন সন্ধ্যের সময় রবীন্দ্রনাথের সান্ধ্যভোজন শেষ হয়েছিল কিংবা সান্ধ্য ভোজনের পূর্বেই) তাঁর কথামত আমি আর মুহূর্তবিলম্ব না করেই পাশের বাড়ীতে ভূপতি বাবুর কাছে গিয়ে তাঁকে রবীন্দ্রনাথের এই ইচ্ছার কথা বললাম। তিনি তো আমার কথা গোড়ায় seriously নিতে চাইলেন না। তারপর আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করলাম যে যেতেই হবে অগত্যা তিনি যেতে রাজী হলেন। গোড়ায় তিনি হয়তো ভেবেছিলেন আমি তাঁর সঙ্গে পরিহাস করছি। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি শ্রীযুক্ত ভূপতি মোহন সেন একসময় কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন।

ভূপতিবাবু রবীন্দ্রনাথের ঘরে ঢুকতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বললেন বাঃ, সুধাকান্ত সত্যি সত্যিই ধরে এনেছে তা বেশ হয়েছে। দু একদিন তাশ খেলা যাক। এই বলে তাঁকেও কিছু নিয়ম কানুন বলে দিলেন। বলতে ভুলে গেছি যে ঐ দিন সকালে কিংবা তার আগের দিন সকালে অনেকগুলো তেঁতুল বীচি জোগাড় করে এনেছিলাম। ঐ তেঁতুল বীচি দিয়ে খেলা সুরু হলো। কয়েক দান খেলায় আমার মতন ভূপতি বাবুও হারলেন, কিন্তু কয়েক দানের পরেই তিনি বুঝতে পারলেন জিতবার প্রকৃত কৌশলটা কি। তারপরেই

তিনি ভিজতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন বললেন—'আমার বিছে তোমার কাছে ধরা পড়ে গেল, তুমি অতঃপরে পণ্ডিত ভাই চট্ করে ধরতে পারলে। সুধাকান্তকে রোজই হারিয়ে দিতাম। যাক তোমাকে নিয়ে সন্ধ্যাটা কাটবে ভাল ইত্যাদি।" তারপরেও আরও কয়েকদিন তাস খেলার আনন্দ উপভোগ করা হয়েছিল। এই তাস খেলা সম্বন্ধে আমার স্মৃতিকে ঝালাই করে নিবার জন্য আমি ভূপতি বাবুকে তাঁর কলকাতার ঠিকানায় একটা চিঠি লিখেছিলাম। তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন তার অবিকল নকল এই—

"শ্রীতিভাজনেষু,

আপনার কথা আমাদের খুব মনে আছে। আপনি কবির Private Secretary ছাড়াও কবির নাতনির গৃহ শিক্ষক ছিলেন। আপনাকে রাস্তায় দেখতে পেলে নন্দিনী মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে এসে লুকিয়ে থাকতো আর কবি হাসি মুখে বলতেন কেন বেচারার উপর এত অত্যাচার। মাঝে মাঝে তাস খেলার জন্য আমাদের ডেকে পাঠাতেন। ২।৩ দিন আপনিও আমাদের দলে ছিলেন মনে আছে।

আশাকরি শারীরিক কুশলে আছেন। আমরা মোটের উপর ভালই। ইতি ভবদীয়

শ্রীভূপতি মোহন সেন"

ভূপতি বাবুর উপর্যুক্ত পত্র প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল যে মাঝে মাঝে আমি তাস খেলার আসর থেকে পা চাকা দিয়ে এদিক ওদিক বেড়িয়ে আসতাম। আমি রবীন্দ্রনাথের স্নেহের পাত্র বলে অনেকেই বলতেন আমার পূর্বজন্মের বহু পুণ্যফলের জন্য এই জন্মে রবীন্দ্রনাথের স্নেহ পাবার সৌভাগ্য পেয়েছি। তাঁদের কথা শুনে আমি মনে মনে বলতাম (যেন নিজের সঙ্গেই নিজে পরিহাস করছি) নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে কোন বাঁধা ধরা নিয়মের মধ্যে থাকিনি তাই এইজন্মে রবীন্দ্রনাথের সংস্রবে এসে কর্তব্য পালনের কঠিন বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে পড়ে গেছি। রবীন্দ্রনাথের মতন একজন অসাধারণ ব্যক্তির কাছে আমার বয়স অতি সাধারণ ব্যক্তির প্রায় সর্বক্ষণ থাকা সত্যই একটা দুঃসাধনা। যাঁদের আমার মতন এইরকম অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা নিশ্চয়ই আমার কথায় সায় দেবেন। এই প্রসঙ্গে আর একটা স্মৃতির কথা মনে পড়ে গেল। একবার দার্জিলিঙে ঐ বাড়ীতেই আমি আর রথীদা (রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর) এই দুজনে ছিলাম কিছুদিন। ঐ সময় আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ঐ অঞ্চলেই ঐ বাড়ীর কিছুদূরেই তাঁর বাড়ীতে এসেছিলেন। তিনি কোন কোন দিন বিকেলে সাদা টাট্টু ঘোড়ায় চেপে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতেন। বেড়িয়ে বাড়ী ফেরবার পথে মাঝে মাঝে রেন ইটেনে রবীন্দ্রনাথের বাসায় কিছুক্ষণের জন্য, এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দু চার কথাবার্তা বলে যেতেন ঘোড়ার চেপেই। আচার্য জগদীশ চন্দ্র কি জানি কেন আমাকে স্নেহ করতেন ভালবাসতেন। আমার বয়স যখন বার কিংবা তের তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। কলকাতায় তাঁর বাড়ীতে প্রায়ই যেতাম। সেই পরিচয় সূত্রে দার্জিলিঙেও তিনি আমাকে তাঁর "মায়াপুরী" বাড়ীতে ডেকে নিয়ে যেতেন এবং সুখাদ্য জলযোগও খাওয়াতেন গল্পসল্পও করতেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে গল্পগুজব করার এই সৌভাগ্যকে আমি ষোল আনা উপভোগ করতে পারিনি, কারণ তিনি যে সব প্রশ্ন করতেন সে সব প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। শুধু তাই নয়, তাঁর সঙ্গে দার্জিলিঙে কয়েকদিন গল্প গুজব করার বেশ চাল করেই বুঝতে পেরেছিলাম যে আমাদের চারিদিকে অর্থাৎ শান্তিনিকেতনের চারিদিকে যতরকমের গাছপালা লতাগুল্ম আছে যেগুলিকে রোজই ছোট বেলার থেকে অর্থাৎ ১১।১২ বছর বয়স থেকে দেখছি, অথচ সেগুলি সম্বন্ধে আমাদের, (বিশেষ করে আমার) জ্ঞান বলতে গেলে কিছুই নাই। তাঁর প্রশ্নগুলি ছিল এই রকমের যেমন, তোমাদের ওখানে বড় বড় কত জাতের গাছ আছে? তাদের নাম কি? তাদের ফল কি রকম? কোন্ কোন্ গাছের পাতা কোন্

ঝড়ুতে ঝরে পড়ে আর নতুন পাতা গজায়? কত রকমের ফুলের গাছ আছে? সেই সব গাছের নাম বল, ফুলের বর্ণনা দাও, ইত্যাদি কত রকমেরই উদ্ভিদ সম্বন্ধে কত প্রশ্ন। এইসব প্রশ্নের সঠিক কোন জবাবই দিতে পারিনি। সঙ্গে সঙ্গে লজ্জাও অনুভব করেছি। লজ্জা এই ভেবে অনুভব করতাম যে, রবীন্দ্রনাথও তো শহর থেকে দূরে শান্তিনিকেতনে পল্লী অঞ্চলে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই উদ্দেশ্য নিয়েই যে ছেলেমেয়েরা তাঁর বিদ্যালয়ে শুধু যে পরীক্ষায় পাশ করার জন্যই লেখাপড়া শিখবে তা নয়—লেখাপড়া শেখার সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয় প্রকৃতির সঙ্গে অর্থাৎ স্থানীয় গাছপালা কীট পতঙ্গাদির সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটবে।' এই জন্যই তিনি শান্তিনিকেতনে ভেজেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে উৎসাহ দিতেন ছেলেদের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করাবার কাজে। ভেজেশবাবুর উদ্ভিদতত্ত্ব জানবার বিশেষ আগ্রহ ছিল। শুধু উদ্ভিদ কেন তিনি আশ্রমে কতরকমের পাখী চিরস্থায়ীভাবে থাকে আর কতরকমের পাখীই বা মাঝে মাঝে কোন কোন ঋতুতে আসে আর চলে যায় তাও নিজে পর্যবেক্ষণ করতেন এবং যে সব ছেলেদের ঐ দিকে একটু ঝোঁক ছিল তাদেরও ঐ সব পর্যবেক্ষণ করতে উৎসাহ দিতেন। ভেজেশ বাবুর তত্ত্বাবধানে একটি ছোট কিচেন গার্ডেনও ছিল। সেই কিচেন গার্ডেনে ছেলেদিগেরই সহায়তায় নানা রকম শাকসব্জির চাষ করতেন। এই সব কাজের জন্য সেই কিচেন গার্ডেনে তাঁর একটি ছোট্ট খড়ো ঘর ছিল, যে ঘরে কয়েক রকমের কোদাল, খুরপী আর কাওড়া থাকতো। কি কি কাজের জন্য এই সব জিনিস কেমন করে হাতে কলমে চাষের কাজে ব্যবহার করতে হয় সে বিষয় তিনি তাদের শিক্ষা দিতেন নিজে তাদের সঙ্গে হাতে কলমে কাজ করে, মুখে উপদেশ দিয়ে নয়। রবীন্দ্রনাথের বাচনিক উপদেশে এবং আর্থিক সাহায্যে এই কিচেন গার্ডেনটি বহুদিন চালু ছিল। এই কিচেন গার্ডেনের মাধ্যমেই ছেলেরা (এই ছেলেদের বয়স নয় বছর থেকে তের চৌদ্দ বছর পর্যন্ত মোটামুটি ছিল। বড় ছেলেরা ঐ কাজে যোগ দিত এটা আমার মনে পড়ে না। হয়তো দু একজন বড় ছেলেরাও যোগ দিতো। নিত্য ব্যবহার্য শাকসব্জির বিষয় কিছু কিছু জ্ঞান অর্জন করতো। এই কিচেন গার্ডেনে উৎপন্ন কয়েক রকম সব্জি যেমন জাপানী মূলো, বেশী বরবটি, ঝিঙ্গী বেগুন, মটরশুটি, আলু ইত্যাদি ছোট ছেলেরা মাঝে মাঝে তাদের পিকনিকেও ব্যবহার করতো। এ ছাড়া কয়েকটি ছেলে ভেজেশ বাবুর সহায়তায় স্থানীয় কয়েকটি পাখীরও পরিচয় পেতো। এই সব কারণেই রবীন্দ্রনাথ ভেজেশ বাবুকে খুবই স্নেহ করতেন। আমাকেও স্নেহ করতেন রবীন্দ্রনাথ। আমি আশ্রমে এবং আশ্রমের আশে পাশে কয়েক জাতীয় গুটিপোকার (অর্থাৎ যে সব পোকা কয়েকরকম প্রজাপতিতে এবং পতঙ্গে রূপান্তরিত হয় তাদের) প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করতাম এবং তাই নিয়ে কখনও "ভারতবর্ষে" কখনও "তত্ত্ব-বোধিনী" পত্রিকায় প্রবন্ধও লিখতাম। রবীন্দ্রনাথ আমাকে দু একটা বইও কিনে দিয়েছিলেন কীট পতঙ্গাদি সম্বন্ধে। আমার সঙ্গে শিশুবিভাগের কয়েকটি ছেলেরাও গুটিপোকা পর্যবেক্ষণ করতো আমার নির্দেশ মতো। এই পর্যবেক্ষণ বিষয়ে তাদের উৎসাহ এবং আনন্দ কম ছিল না; আমি কীট পতঙ্গ সম্বন্ধে কিছু কিছু পর্যবেক্ষণ করলেও গাছপালা সম্বন্ধে বিশেষ করে জানবার কৌতূহল বা আগ্রহ আমার ছিল না। কাজেই আমি আচার্য জগদীশচন্দ্রের কাছে বালিগিতে ঐ কদিন একটু অল্প হয়েই ছিলাম। যাই হোক এই বিপদ কাটাবার নানা রকম ফন্দি ফিকির উদ্ভাবন করবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কয়েকদিন পরেই আমার এক বন্ধু H. W. Tucker (যিনি শান্তিনিকেতনে কলেজের সংস্রবে কিছু দিন ছেলেদের ইংরেজী পড়াতেন) সাহেবের সঙ্গে ঘটনা চক্রে আচার্য বসুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম—বালিগিতে ঐ টাকা ইজেনের বাড়ীতে একদিন বিকেলে।

সেই বিকেলেও আমি এবং টাকার সাহেব আচার্য বসুর অনুরোধে তাঁর মাণিকপুরী বাড়ীতে গেলাম। যাবার সময় পথে মনে মনে এই ভেবে আনন্দ উপভোগ করছিলাম যে আজ টাকার সাহেবের উদ্ভিদতত্ত্ব সম্বন্ধে কি জ্ঞান আছে তার পরীক্ষা হবে। কিন্তু "মাণিকপুরীতে" গিয়ে জলযোগ করতে করতে সাহেবের সঙ্গে আচার্য বসুর যে সব খোস গল্প হলো সেই গল্পে উদ্ভিদ সম্বন্ধে ছিটেফোঁটা কোন প্রসঙ্গই ছিল না। কাজেই আমার কল্পিত আনন্দ কল্পনায় মিলিয়ে গেল। কিন্তু একটা লাভ হলো এই যে আরও দু একদিন আমি টাকার সাহেবকে "মাণিকপুরীতে" ভিড়িয়ে দিয়ে অন্তত দু এক জায়গায় ঘুরে বেড়াবার অবসর পেয়েছিলাম।

আবার রবীন্দ্র প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যাঁরা কিছু খোঁজখবর রাখেন তাঁরা অনেকেই নিশ্চয়ই জানেন যে রবীন্দ্রনাথ হোমিওপ্যাথিক এবং বাইওকেমিক ঔষধের দ্বারা রোগ চিকিৎসার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এই দুই রকম ঔষধ সাহায্যে চিকিৎসাশাস্ত্রে অনেক বইও তিনি পড়েছিলেন। আশ্রমে যাঁদের হোমিওপ্যাথিক এবং বাইওকেমিক ঔষধ সম্বন্ধে বিশ্বাস ছিল তাঁদের ঐ বিশ্বাসকে আরও বাড়িয়ে দেবার জন্য তিনি তাঁদের সঙ্গে ঐ বিষয় নানা রকমের আলোচনা করতেন এবং তাঁদের উৎসাহ দিতেন তাঁদের বাড়ীতে অসুখবিসুখ হলে হোমিওপ্যাথিক এবং বাইওকেমিক মতে চিকিৎসা করবার, শুধু এই-ই নয় আশ্রমে তিনি কারোর অসুখ বিসুখ হয়েছে শুনলে স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে তাঁদের ঔষধও দিতেন নিজের বিচার বিবেচনা মতো। বলা বাহুল্য এসব ঔষধ তাঁদেরই দিতেন যাঁদের এ বিষয় কোন বিশেষ আপত্তি ছিল না। যে সব রোগীর তিনি হোমিওপ্যাথিক এবং বাইওকেমিক মতে চিকিৎসা করার প্রয়োজন মনে করতেন তাঁদের সকলের চিকিৎসার ভার নিজে নিতে পারতেন না। তাঁদের চিকিৎসার জন্য প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত সুশীল ভদ্র মহাশয়কে (সুশীলবাবু বিশ্বভারতী সঙ্গীত ভবনের একজন শিক্ষক, কিছুদিন তিনি সঙ্গীতভবনের অধ্যক্ষও ছিলেন) অনুরোধ করতেন চিকিৎসার ভার নিতে। হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসার অনেকটা পক্ষপাতী সুশীলবাবু। যাঁরা তাঁর কাছে হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসিত হতে চান তিনি তাঁদের সানন্দে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেন। সুশীলবাবুর প্রতি এইজন্য রবীন্দ্রনাথের বেশ একটু টান ছিল। তাঁকে রবীন্দ্রনাথ হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক সম্বন্ধীয় ইংরেজী বইও দুই একটি উপহার দিয়েছিলেন। বেশ মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ একবার কোন একজনের অসুখ সম্বন্ধে এবং সেই অসুখের চিকিৎসার জন্য কি ঔষধ দেওয়া যেতে পারে এ বিষয় আলোচনার জন্য সুশীলবাবুকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন আমাকে দিয়েই—বলেছিলেন "যা, ডাক্তার সুশীল ভদ্রকে ডেকে আন;" যাদের যাদের চিকিৎসার ভার সুশীলবাবু রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ মতো নিতেন তাঁদের রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের কাছে সুশীলবাবুর ডাক পড়তো। কোন রোগীর রোগ তাড়াতাড়ি না সারলে রবীন্দ্র নাথ খুব ব্যস্ত হয়ে উঠতেন এই ভেবে যে হয়তো ঠিক ঔষধ পড়ছে না কিংবা রোগী ঠিকমত ঔষধ খাচ্ছে না ভেবে।—এইসব কথা ভেবে নিজেই বই ঘেঁটে রোগের লক্ষণ বিচার করে ঔষধ নির্বাচন করতেন এবং তদনুযায়ী চিকিৎসা করে কি রকম ফল পাওয়া গেল সেটা জানবার জন্যও সুশীল বাবুকে মাঝে মাঝে ডেকে পাঠাতেন। ডেকে আনা সম্ভব নাহলে ভৃত্যমারফৎ সুশীলবাবুকে দু-এক লাইন চিঠি লিখে পাঠাতেন।

কয়েকদিন হলো আমি সুশীলবাবুর কাছ থেকে ঐ জাতীয় তিনটি চিঠি সংগ্রহ করেছি। চিঠি তিনটি এই—"কাল রাত্রে সংবাদ পেলুম ধনিষ্ঠা নাচের শিক্ষক কঠিন জ্বরে ভুগচে। এ রকম অবস্থা আমি সহ্য করতে পারিনে—যথোচিত বিধান করতে বিলম্ব কোরো না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

দ্বিতীয় পত্র—"তোমার রোগীটি কেমন আছে খবর দিয়ো —দ্রুত আরোগ্য অত্যাবশ্যক।"

তৃতীয় পত্র—"সুশীল ভদ্রকে আমার এই অনুরোধ যে তিনি যেন সুধাকান্তর চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন।

রবীন্দ্রনাথ"

এই তৃতীয় চিঠিটি তাঁকে লেখবার এই কারণ ছিল যে আমি বেশ কয়েকদিন জ্বরে কাতর ছিলাম। সেই জ্বর পেয়ে তিনি হঠাৎ একদিন আমার বাসায় এসে উপস্থিত হলেন এবং যখন জানতে পারলেন যে এলোপ্যাথিক ঔষধ খেয়েও বিশেষ কিছু ফল পাওয়া যাচ্ছে না তখন বললেন-"হোমিওপ্যাথিক কিংবা বাইওকেমিক ঔষধ খা" এই বলে দু-একটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের নাম করলেন। যতদূর মনে পড়ে ঔষধ দুটি নেট্রামফস্ এবং লাইকোপোডিয়াম। তাঁর এই নির্দেশ শুনে, আমি গৌণভাবে তাঁকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম যে এলোপ্যাথিক ঔষধ খেয়ে অসুখ যখন আর বাড়েনি সুতরাং আর কয়েকদিন এলোপ্যাথিক মতেই ঔষধ খেলে জ্বর সেরে যাবে। আমার কথা শুনে তিনি বললেন—"এলোপ্যাথিক ঔষধ খাচ্ছিস খা, তার সঙ্গে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খেলে উপকার না হোক অপকার তো হবে না, আমার মনে হয় উপকারই হবে।" তারপরেই তিনি নিজের বাসগৃহে গিয়েই সুশীলবাবুকে উপর্যুক্ত চিঠি লিখে পাঠালেন। সুশীলবাবু আমাকে এসে দেখে-টেখে তাঁর বিচার মতো ঔষধ দিয়েছিলেন। কি ঔষধ দিয়েছিলেন জানি না। যাইহোক দু চারদিন পরে আমার জ্বর ছাড়ল, ভাল হয়ে ওঠলাম। ভাল হয়ে যখন রবীন্দ্রনাথের কাছে দেখা করলাম তিনি বললেন—"গোড়ার থেকেই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খেলে এ কদিন আর তোকে ভুগতে হতো না।" উত্তরে আমি বললাম—"এলোপ্যাথিক আর হোমিওপ্যাথিক দুই প্যাথিকই তো এক সঙ্গে খাচ্ছিলাম কাজেই হোমিওপ্যাথিকের জোরেই যে জ্বর ছেড়েছে, এলোপ্যাথিক ঔষধে কোন ফল হয়নি নিশ্চিতরূপে একথা কেমন করে বলবো।" আমার এই কথা শুনে তিনি বললেন—"হোমিওপ্যাথিকেই নিশ্চিত সেরেছে" ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে পড়ে আমিও হোমিওপ্যাথিক মতে রোগ-চিকিৎসার কতকটা পক্ষপাতী হয়ে ওঠলাম এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে হাতের কাছে পাওয়া দু-চারটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন পোটেন্সির কয়েকটি হোমিওপ্যাথিক এবং বাইওকেমিক ঔষধ কিনে এনে বাড়ীর লোকদের ছোটখাট অসুখের, যেমন সামান্য সর্দি কাশি, পেট ভাঁপা, অম্বলে বুক জ্বালা, ঠাণ্ডা লেগে গায়ে হাত পায়ে ব্যথার চিকিৎসা সুরু করে দিলাম—শুধু বাড়ীতেই যে এসব চিকিৎসা সুরু করলাম তা নয় দু একজন বন্ধু-বান্ধবেরও বাড়ীতে এই জাতীয় রোগের চিকিৎসা মাঝে মাঝে করতে লাগলাম। আমার এই মতি-পরিবর্তন দেখে রবীন্দ্রনাথ খুবই খুশী হলেন এবং আমাকে আন্তরিক উৎসাহ দিতে লাগলেন হোমিওপ্যাথিক এবং বাইওকেমিক মতে চিকিৎসিত হবার এবং চিকিৎসা করবার জন্য। শুধু উৎসাহ দিয়েই তিনি নিরস্ত হননি। আমাকে দু-চারটে বইও কিনে দিলেন এবং অনেকগুলো হোমিও প্যাথিক ঔষধ এবং বাইওকেমিক ঔষধ কেনবার জন্য কিছু টাকাও দিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই আনুকূল্যে হোমিওপ্যাথিক এবং বাইওকেমিক শাস্ত্রের প্রতি আমার মনে শ্রদ্ধাও জন্মাল। এর ফলে আমাকে কিছু অসুবিধারও পড়তে হলো—শিকারী যেমন শিকার খুঁজে বেড়ায় রবীন্দ্রনাথও তেমনি খোঁজ নিতে লাগলেন আশ্রমে কার কার কি কি অসুখ হয়েছে এবং তদনুযায়ী আমাকে নির্দেশ দিতেন, তাঁর পরামর্শ মতো সেই সব রোগীদের হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করবার। তাঁর এই নির্দেশ পালনে বড় বড় একটা অসুবিধা হয়েছিল এই যে আমাকে রোগীর কাছে গিয়ে গিয়ে একটা কাগজে তাঁদের রোগের বিস্তারিত সিম্পটম্স্ লিখে সেগুলো নিয়ে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে

দিতে হতো। রবীন্দ্রনাথ তদনুযায়ী বেশ পরিশ্রম করেই মেটিরিয়ামেডিকা ঘেঁটে ঘেঁটে এক একটি রোগীর জন্য ঔষধের নাম বেছে বেছে বলে দিতেন। ঐসব ঔষধ রোগীদের দিয়ে কি রকম ফল পাওয়া গেল সেবিষয় দৈনিক রিপোর্ট দিতে হতো রবীন্দ্রনাথের কাছে। কোন কোন দিন সকালে বিকেলেও রিপোর্ট দিতে হতো। তিনি পরিহাস করে বলতেন "যদি এই চিকিৎসায় রোগী সারে তাহলে ক্রেডিট আমার—আর যদি না সারে তাহলে ডিস্‌ক্রেডিট তোর।" তাঁর এই মন্তব্য শুনে আমি বললাম 'তা কেন হবে—চিকিৎসা করছেন আপনি, ঔষধ দিচ্ছেন আপনি ক্রেডিট আর ডিস্‌ক্রেডিট আপনারই প্রাপ্য।" উত্তরে তিনি বললেন—"বাঃ, আমি তো তোর মুখে সিম্‌টম্‌স্ শুনেই ঔষধ নির্বাচন করি, তুই যদি সব সিম্‌টমস্ ঠিক করে না লক্ষ্য করিস তাহলে তো ঔষধও ঠিক কাজ করবে না ইত্যাদি।" রবীন্দ্রনাথের যে সব কাজ করবার জন্য আমাকে নিয়োগ করা হয়েছিল, এইভাবে চিকিৎসা করার কাজ আমার ঐ সব Dutyর অন্তর্গত ছিল না; অন্তর্গত না হলেও এই ধরণের কাজ নিয়ে আমাকে বেশ কিছুদিন মাথা ঘামাতে হতো, থেকে থেকে রোগী কেমন আছে দেখতে যাওয়া, দেখে এসে রবীন্দ্রনাথকে বলা কি দেখলাম, কি বুঝলাম। তারপর তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যাপারে যা করণীয় তাই করা।

আমাকে যখন হাতের কাছে না পেতেন তখন চিঠা মারফতে দু এক লাইন চিঠি লিখে খোঁজ খবর নিতেন আর প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেন।

এই ধরণের চিঠি চিরকুটের কয়েকটি নমুনা এই—

"তাতুর আর কেমন আছে খবর দিস—আর আশার সঙ্গে দেখা করিস।" এই চিরকুটে 'তাতু' শান্তিনিকেতনের ছাত্রী, তাতু ডাক নাম। 'তাতু'র ভাল নাম ললিতা আর 'আশা' হচ্ছেন —শ্রীমতী আশা আর্যনায়কম্। শ্রীমতী আশা শান্তিনিকেতনে বহুদিন শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। এখন তিনি আচার্য বিনোবাজীর "ভূদান" কর্মীদের একজন। এই চিরকুটের তারিখ ১৭।৩।৩২। পূর্বেই বলেছি রবীন্দ্র-নাথ কারো চিকিৎসা ব্যাপারে সামান্য শৈথিল্য পছন্দ করতেন না, তাই এই চিরকুট আমাকে পাঠাবার সম্ভবত কারণ ঘণ্টা পরেই ভৃত্য মারফত আর একটি চিঠি লিখে পাঠালেন—

"সুধাকান্ত

আশাকে, তাতুকে কি আজ দেখেছিস? কেমন আছে তারা?

রবীন্দ্রনাথ"

দ্বিতীয় চিঠি—

"হৈমন্তী

যে মেয়েটির skin eruption হয়েছে তার ওষুধ আমার কাছে আর নাই, সুধাকান্তকে ওর চিকিৎসার জন্যে পাঠাচ্ছি। একবার দেখতে দিয়ো।

রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর"

এই চিঠির 'হৈমন্তী' হচ্ছেন কবি ও সুসাহিত্যিক ডাঃ অমিয় চক্রবর্তীর সহধর্মিণী। ইনি কিছুদিন শান্তিনিকেতনে ছাত্রীদের হোস্টেলে সুপারিন্টেনডেন্ট ছিলেন। যে মেয়েটির skin eruption হয়েছিল তার চিকিৎসা হোমিও প্যাথিক ঔষধের দ্বারাই করছিলেন। চিকিৎসায় ভাল ফলও পাওয়া গিয়েছিল। দু-একদিন চিকিৎসা বন্ধ ছিল। ইচ্ছে করেই রবীন্দ্রনাথ ঐ কদিন চিকিৎসা বন্ধ রেখেছিলেন। তারপর সেই ঔষধই আবার দেবেন কিনা ভেবে মেটিরিয়ামেডিকা দেখে যে ঔষধ দেবেন স্থির করলেন সে ঔষধ তখন তাঁর কাছে ছিল না, শুধু নাই নয় রোগের লক্ষণ আবার ভাল করে দেখে কি ঔষধ দেওয়া প্রয়োজন ঠিক স্থির করতে না পারায় আমাকে পাঠালেন শ্রীযুক্তা হৈমন্তী দেবীর কাছে যথা কর্তব্য করার জন্য। আমি সেই মেয়েটির চর্মরোগের অবস্থা ভাল দেখে এবং তাকে যেসব প্রশ্ন করেছিলাম তার উত্তরসহ সব বিবরণ রবীন্দ্র নাথকে গিয়ে দিলাম। তিনি আমার যৌক্তিক

রিপোর্ট শুনে বললেন —"আচ্ছা, আমি ভেবে দেখি কি ঔষধ দেওয়া প্রয়োজন। তুমিও ভেবে দেখো তোমার মতে কোন ঔষধ দেওয়া যেতে পারে।" যতদূর মনে পড়ে তাঁর নির্বাচিত ঔষধই মেয়েটিকে দেওয়া হয়েছিল এবং মেয়েটির অসুখ সেরেও গিয়েছিল।

আর একটি চিরকুট এই –

"Kali Phos আমার নিত্য সেবনীয়। ওটা না হলে চলে না। অতএব আজকাল দুদিনের মতো আমাকে কিছু পাঁড়ি দিয়ে বাকি শিশিটা তুই রাখতে পারিস। দরকারী ওষুধগুলি আনিয়ে রাখিস যে কেন? আমার অনেক গুলো ওষুধই অন্তর্ধান করেছে।

রোগীর খবর কি?

রবীন্দ্র"

আর একটি চিরকুট এই—

"ও

উপায় সচিব

যে ওষুধগুলোর জন্যে দীর্ঘকাল ধরে তোকে আজি জানিয়ে স্নেহছিলুম আশা করেছিলুম বৌমার সঙ্গে আসবে। বোধ হচ্চে আসনি। আর একবার স্মরণ করিয়ে দিই। Madaus এর Sabata এবং Alfalfa। শেষোক্ত ওষুধটার বিশেষ ফল পাচ্ছিলুম। নিঃশেষপ্রায় হওয়ায় ভীত আছি। তোমার আনুকূল্যে কবে পৌঁছবে ভেবে পাচ্চিনে। ধৈর্য-ধরে থাকবো। এক বোতল Stubles Bath Ammonia পেলে খুসি হব।

মেয়েরা যখন আসবে লক্ষ্মৌর কাঁচীর কিছু সৌখনীয় মিঠাই পাঠিয়ে দিস।

ওষুধগুলো যদি শীঘ্র পৌঁছয় তাহলে যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হব। আর কোনো দরবার আমার নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

পরের এই চিঠিটি তিনি আমাকে কলকাতার দিকে পাঠিয়েছিলেন। তখন কয়েকদিনের জন্য আমি তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ছিলাম; আর ছিলেন তাঁর পুত্র শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পুত্রবধূ শ্রীমতী প্রতিমা ঠাকুর। আমি শান্তিনিকেতনে ফিরে আসবার তিন চার দিন আগেই শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আশা করেছিলেন যে তাঁর প্রয়োজনীয় ঔষধগুলি আমি শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবীর সঙ্গেই পাঠিয়ে দেব। কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে তাঁর বৌমা কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসবার মাত্র দুদিন আগেই আমি কলকাতায় গিয়েছিলাম। আমি কলকাতায় যাবার আগের দিন তাঁর ফরমাশ মতো ঔষধপত্র কলকাতা থেকে কিনে শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবীর সঙ্গে পাঠিয়ে দেবার জন্য আদেশ আমাকে দিয়েছিলেন। তাঁর ফরমাশ মতো জিনিস পত্র সংগ্রহ করতে কোন অনিবার্য কারণে আমি দু-দিনের মধ্যে পারিনি। সেজন্যে সেগুলি শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবীর সঙ্গে পাঠাতে পারিনি। – কিন্তু তার তিন চার দিন পরেই আমি কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে সেইসব জিনিস নিয়ে এসেছিলাম। এই উপলক্ষ্যে, যতদূর মনে পড়ে আমি কলকাতায় সাতদিনের বেশি ছিলাম না। এই সাতদিনে কলকাতায় আমাকে শুধু ঔষধপত্রই কিনতে হয়নি, ঔষধ কেনার সঙ্গে আরও কতকগুলি অত্যাবশ্যক কাজও ছিল—এই অত্যাবশ্যক কাজ মানে বিশ্বভারতীর অর্থকোষে কোন কোন ব্যক্তির কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা এবং তার উপায় উদ্ভাবন করা। আমাকে প্রায়ই আমার পরিচিত রাজস্থানী ব্যক্তিদের কাছে পাঠাতেন বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজে। এই জন্যই তিনি মাঝে মাঝে চিঠিতে আমাকে সুধাকান্ত না লিখে "উপায়সচিব" বলে লিখতেন। এই চিঠিতেও তাই আমাকে উপায়সচিব বলে সম্বোধন করেছেন।

তাঁর কাছে শান্তিনিকেতনের শিশু ছাত্রীরা মাঝে মাঝেই এক একটা উপলক্ষ্যে হাজির হতো। তিনি তাদের লজেন্স আর চকোলেট দিয়ে সন্তুষ্ট করতেন—তাই এই চিঠিতে লজেন্সের কথাও লিখেছেন।

এই প্রসঙ্গ শেষ করার পূর্বে মনে পড়ে গেল একবার তিনি বনবাসরত সাহিত্যিক বনফুলকে কয়েকটি দুরারোগ্য রোগ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খেয়ে সারতে দেখেছেন তার বিবরণ অনেকক্ষণ ধরে দিয়েছিলেন। বনফুল (ডাঃ বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়) এলোপ্যাথিষ্ট ডাক্তার হলেও হোমিওপ্যাথিক সম্বন্ধে তাঁর বিরুদ্ধ মনোভাব নাই একথা সেদিনকার আলোচনায় বুঝতে পেরেছিলাম। ব-ফুলকে রবীন্দ্রনাথ শুধু সাহিত্যিক হিসাবে শ্রদ্ধা করতেন তাই নয় বনফুল শান্তিনিকেতনে এলে তিনি বনফুলকে ফলযোগের নিমন্ত্রণ করতেন। তাঁকে খাইয়ে তৃপ্তিলাভ করতেন।

পৌষ সংখ্যায়
ভুল সংশোধন

জানুয়ারির পাঠ্যপুস্তক ছাপার মরসুমে প্রেসের সময় অভাব এবং জয়শ্রীর সম্পাদিকার অসুস্থতার জন্য পৌষ সংখ্যা জয়শ্রীতে নানাভাবে কয়েকটী গুরুতর ভুল থেকে গেছে। লেখক ও পাঠকদের নিকট এজন্য আমরা লজ্জিত। নীচে সে ভুলগুলি সংশোধন করে দেয়া হোলো।

লেখকের নাম	পৃষ্ঠা	ভুল	সংশোধন
ভারতের প্রয়োজন নেতাজীর নেতৃত্ব	৭১৯, ২য় কলম ২৭ লাইন	নিয়ন্ত	নিয়ন্ত্র
সবি ছিল (কবিতা)	৭২২	লেখকের নাম আছে	
		স্বদেশ রঞ্জন	স্বদেশরঞ্জন দত্ত
সুভাষচন্দ্র (কবিতা)	৭২৩ ২য় পংক্তি নবম লাইন	যুগান্তরের	যুগান্তের
সুভাষচন্দ্র (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	৭২৬, সাব্ হেডিং	কার নেতাজী ?	প্রেসিডেন্সি কলেজ
পুস্তক পরিচয়	৭৮৫, সন্ত-প্রসঙ্গ	সমালোচকের নাম নেই	পবিত্র ঘোষ

উপরোক্ত ভুলগুলি ছাড়াও যদি অন্য গুরুতর ত্রুটী থেকে থাকে তার জন্য আমরা দুঃখিত।

জঃ সঃ

ঝড়ো মাটি মন

মহীতোষ বিশ্বাস

১২

পৌষ পার্বণের দিন এসে গেল।

পৌষ মাস যাবার দিনে হ'ল পৌষ পার্বণ। বাস্তুপুজো। এ-দিনটার আগেই ধান কাটার কাজ সব শেষ করতে হবে। মলা-ঝলার কাজ কিছুটা বাকী থাকতে পারে। কিন্তু কাটা-কুটির কাজ সব এ-দিনটার মধ্যেই শেষ করতে হবে। কাঠুখালির চাষী মানুষ তুমি। মা বসুমতীর অঙ্গ কর্ষণ ক'রে সেখানে তোমার জীবনধারণের অন্ন ফলাও। নেচে-কুঁদে সে অন্ন ঘরে তোলো। কিন্তু তারও সময়-অসময় বাধা নিষেধ আছে। মা বসুমতীর বড়ো সহের শরীর। মুখ বুজে সয়ে যায়। তবু অশান্ত সন্তানের মতন সব সময় তুমি তার বুকের উপর দিয়ে দাম্‌পাতে পারো না। একটা সময় তাকে জিরেন দিতেই হবে।

কাঠুখালির চাষী-মানুষ গুলো তা জানে। মানে। পৌষ পার্বণের দিনটার আগেই তাই সব কাটাই-বাছাই শেষ করে ফেলে।

আর পৌষ পার্বণের দিনটা ওদের বড়ো আহ্লাদের দিন। পুরুষ-মানুষের কাজ বড়ো একটা থাকেনা সেদিন। কিন্তু কাজ বাড়ে ঘরের মেয়ে-মানুষের। রাত ভোর ভোর থাকতেই বাড়ী বাড়ী ঢেঁকির পাড় শুরু হয়ে যায়। থাকা থাকা নতুন ধানের ভিজানো আতপ চাল কোটা হতে থাকে ঢেঁকিতে। সুবাসে ভরে ওঠে বাতাস। বিকেল থেকেই শুরু হয় পিঠে আর পায়েস বানানো। অনেক রাত পর্যন্ত তার ধুম চলে। ভক্তি ক'রে বাস্তুদেবতার পুজো দেওয়া হয়। ঘর-গেরস্থালী, জন-মনিষ্যির ভালো-মন্দের কর্তা হলেন বাস্তুদেবতা। তাঁর আশীর্বাদেই ঘরের লক্ষ্মী অচলা হবে। নতুন চালের নৈবেদ্য সাজিয়ে তাই কাঠুখালির বউ-মানুষেরা মানত জানায়—"ঠাউর, বাস্তো-ঠাউর। তুমি থানে ব'সে কানে শোনো। ঘর-গেরস্থালীর কল্যাণ করো। গোয়ালী-পুকুরির ভালো করো।"

শুধু বাস্তুদেবতার পুজো দিয়েই ওদের কাজ শেষ হয় না। যে মানুষগুলো সম্বৎসর খাটলে, রোদে-জলে গায়ে গতরে এক করলো, তাদেরও একটু সাধ-আহ্লাদের ব্যবস্থা করতে হয়। পিঠে-পায়েসের থালা হাতে অসুরাদের মিঠে হাসি দিয়ে ভরিয়ে দিতে হয় খাটুয়ে মানুষগুলোর শরীর মন। ঘরে ঘরে নিমন্ত্রণ। মধুর ভালবাসার আপ্যায়ন।

বাহুতের হাট থেকে নতুন কেনা শীত চাদরটা গায়ে দিয়ে বিকেল বেলায় বলরাম বেরিয়েছিল পাড়া বেড়াতে। এ-বাড়ী ও-বাড়ী ঘুরে খানিক বাদে ফিরে আসছিল। পথের পাশেই সুখলালের বাড়ী। বলরামকে দেখে সুখলাল ডাক দিল—"ও বলরাম, চলে যাচ্ছো কানো? আসবা না আমাদের বাড়ী?"

দাঁড়িয়ে পড়ল বলরাম। জিজ্ঞাসা করে—'কিছু কচ্ছো নাকি সুখলাল কাকা?'.

"—না. কবো আর কি? যাচ্ছো তাই ডাক দেলাম।"

অগত্যা বলরাম রাস্তা ছেড়ে বাড়ী ওঠে। উত্তরপোতার খড়ে-ছাওয়া ছোটোখাটো শোবার ঘর। শোবারঘরের লাগালাগি আর একখানা চালাঘর। গরু থাকে ওখানে। পশ্চিমপোতার রান্নাঘর। পুরোনো খড়ের ছাউনি। সময় মতন খড় বাঁশ পালটিয়ে তুলিয়ে উঠতে পারে না সুখলাল। উঠোনের কোণে একপালা ধান। এখনো মলা হয়নি।

বলরাম উঠোনে পা দিতেই সুখলাল ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বলে—"আসো আসো বাবা, বসো। ওরে ও বাতাসী, সেলি ক'নে? তোর বলরামকাকে একখান পিঁড়ে আনে দে।"

"তুমি অতো ব্যস্ত হয়োনা সুখলালকাকা। আমি নিজেই বসতিচি।"

বলতে বলতে বলরাম রান্না-ঘরের বারান্দাতেই একখানা পিঁড়ি টেনে নিয়ে বসে পড়ল।

পাট-কাঠির বেড়া রান্নাঘরে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভিতরে একটু একটু ধোঁয়ার ঝলক দেখা যাচ্ছে। বলরাম সেদিকে লক্ষ্য ক'রে বলে—"ও খুড়ি, পিঠে-টিঠে বানাচ্ছো না?"

ভিতর থেকে শোনা যায়—"আর কত্ত কানো বাবা! বচ্ছোরকার দিন। এট্টু কিছু না বানালিও তো হয়না। তা তুমি এট্টু বসো বাবা। সরা পিঠে বানাচ্ছি। তক্তো-তক্তো দুইখেন পালে দিয়ে যাইয়েনে।"

সুখলাল কলকের আগুন দিচ্ছিল। বাঁ হাতে হুঁকোটা ধরে ডান হাতে কল্কেটা মুখের কাছে এনে ফুঁ দিতে দিতে এসে বসলো বলরামের কাছে।

হুঁকো টানতে টানতে জিজ্ঞাসা করে সুখলাল—"বলা ভালার কাল বদ্দুর তোমাগের?"

"পেরায় হ'য়ে গেছে। আর এক বগোনের মতন হতি পারে। তোমারও তো দেখ্‌তিচি বগোন দুই হয়েনে।"

"কি আর করি কও? এ্যালা এ্যালা পারে উঠিনা।"

কথায় কথায় সময় কাটে। তারপর একসময় সুখলাল রান্নাঘরের ভিতরে লক্ষ্য করে বলে—"হলোনা তোমাগের পিঠে বানালি? বলরামরে আর কতোক্ষোণ বসায়ে রাখবা?"

জবাব আসে রান্নাঘর থেকে—"আর এট্টু সুখানি দেরা করো। এই খোলা নামাতেই দিচ্ছি।"

একটু বাদেই রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো একটি মেয়ে। সুবাসী। সুখলালের বড়ো মেয়ে। বছর চোদ্দ পনেরো বয়স। একটুখানি ফুলো ফুলো গোল-গাল চেহারা। শ্যামলা রং। ডাগর দুটো সরল চোখ। আধময়লা একখানা ডুরে শাড়ী পরনে। বাঁ হাতে জলের ঘটি আর ডানহাতে বড়ো একটা কাঁসবাটি ভর্তি পিঠে আর একটু গুড় এনে নামিয়ে রাখল বলরামের পাশে। গায়ের কাপড়টা সামলে জড়সড় হয়ে আবার গিয়ে ঢুকল রান্নাঘরে। কতটুকু দেখেছে সেদিন বলরাম এদের। এর মধ্যেই কতো বড়োটি হয়ে উঠেছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে লজ্জাও বেড়েছে।

হঠাৎ নজর পড়ল কাঁসবাটিটার দিকে। চেঁচিয়ে উঠল বলরাম—"ও খুড়ি; করিছো কি? আমি কি রাক্ষোস্ নাকি? না, আমার প্যাটে নাও-ডোঙা আইছে যে তুমি এতো গুলোন্ পিঠে দেছো?"

বলরামের কথা বলার ধরণ শুনে ঘরের মধ্যে ফিক্ করে হেসে ফেলে সুবাসী। হেসে ফেলে সুবাসীর মা-ও। বেড়ার ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে বলে—"পাগোলডার কথা শোনো। ঐ কয়খান পিঠে খাতি কি আর প্যাটে নাও-ডোঙার দরকার হয় নাকি?"

বলরাম খেতে থাকে। পিছনে এসে দাঁড়ায় বাতাসী। সুখলালের ছোটো মেয়ে। বছর আটেক বয়স। বলরামের

মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বলরাম ওকে দেখেই বলে—

"তুই এক্কান খাবি নাকিরে? এইনে।"—বলে বলরাম ওর দিকে একখানা পিঠে এগিয়ে ধরে।

বাঙালী চোখ বড়ো বড়ো করে বলে—"আমার আর খাইয়ে দরকার নেই। তুমি খাও। তোমার প্যাটে নাও-ভোঙা আইচে। আর তুমি তো নাটেল মানুষ। সব কয়খান না খালি তোমার প্যাট ভরবে ক্যানো?"

বলরাম অবাক হয়ে বলে—"ওরে ছিষ্টিছাড়া, তুই তো বেজায় কথা কতি পারিস! আমি নাটেল মানুষ তো দারা, তোর ঘাড়ডাই আগে ভাঙে নি।"

—"ঘাড় ভাঙলিই অমনি হলো—তাই না? ঘাড় ভাঙা অতো সোজা না।"—বলেই ছুটে পালায় বাঙালী।

বলরাম হাসে আর খায়।

একটু বাদে সুখলাল বলে—"নীলমনি আর কিছু কয়লো—টয়লো নাকি—শুনিছো কিছু?"

বলরাম খেতে খেতে জবাব দেয়—"কিছুই তো বুঝতি পারতিছি না। নীলমনি মোড়ল শোনলাম নায়েববাবুর বাড়ী গিলো। তা নায়েববাবু নাকি বহোদ্দারা করতি বারণ করিছে। আর কোনো খবর-অবর তো পাইনি কিছু। গতিক-সতিক কিছু বুঝতি পারতিচি না।"

ভাবনা-চিন্তায় জড়ানো গলায় সুখলাল বলে—"মানুষটা বেজায় প্যাচালে। কোনো কাজ ওর হাতে আটকায়না। তাই ভাবতিছি এট্টা কিছু গোলমাল না বাধায়ে বসে। তা এবার জব্দ হইয়ে বেড়ায়। বুঝতি পারিছে যে, বাবারও বাবা আছে। অন্তা মহাদেব অসুর বুড়োও ম্যানো এট্টু নরম হইছে। তা, থাকো কয়ডা দিন সাবধানে সাবধানে। থাকো কি হয়।"

বলরামের খাওয়া হ'য়ে গিয়েছিল। ঢক্ ঢক্ ক'রে খানিকটে জল খেয়ে ঘটিটা নামিয়ে রাখল পাশে। সুবাসী আবার বাইরে এলো। বাটি আর জলের ঘটিটা নিয়ে গেল।

বলরাম ডেকে বলে—"আরেট্টু জল দে দেহি সুবাসী। হাতখান ভালো ক'রে ধোয়া হলোনা। গুড় না'গে রইছে।"

আরেক ঘটি জল দিয়ে গেল সুবাসী।

আস্তে আস্তে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে থাকে। শীতের সন্ধ্যা। বড়ো তাড়াতাড়ি এসে পড়ে।

কি যেন ভাবছে সুখলাল। বাঁটু দুটো এক ক'রে থুতনিটা ঠেকিয়ে কি যেন ভেবে চলেছে।

বলরাম তাকালো সুখলালের মুখের দিকে। কাপড়ের খুঁট দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলে—"এট্টা কি ম্যানো ভাবতিছো সুখলালকাকা।"

মাথা নাড়তে নাড়তে সুখলাল বলে—"হয় বলরাম। ভাবতিছি। ভাবতিছি এট্টা কথা মনে মনে।"

—"কি কথা? কও না শুনি।"—উৎসুক গলায় বলে বলরাম।

—"কথাডা যে তোমারে কিভাবে কবো, ঠিক করতি পারতিছি না। তুমি আবার কিছু মনে টনে করবা না তো বাবা?"

কি এমন কথা বুঝে উঠতে পারেনা বলরাম। একটু ভাবনাও হয়। বলে—"এর মধ্যি আবার মনে করাকরির কি হলো! তা কথাডা তোমার কি তাই কওনা আগে।"

একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলে সুখলাল—"মনে তোমার এট্টা দুঃখু আছে বলরাম। তা জানি। তাই কথাডা তোমারে ক'তি ক্যামোন ম্যানো বাধো বাধো ঠেকতিছে।"

সুখলালের গলার স্বরটা বড়ো শান্ত আর করুণ শোনায়।

১৩

রাত শেষ হয়ে আসছে। শীতের বাতাসে রুক্ষতা যেন বেড়েছে। থরথরে হাওয়ায় হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে তোলে। ঠোঁট-মুখ ফেটে চৌচির হচ্ছে। হাতে-পায়ে খড়ি উঠছে।

কাঠুখালির বিলে কোনো ক্ষেতে এখন আর ধান কাটতে বাকী নেই। ধান তোলার কাজ একরকম শেষ। এবার তুলতে হবে কার্তিকের কাতের ফসল। ধানকাটার ফাঁকে ফাঁকে এতোদিনে বেড়ে উঠেছে ক্ষেতে ক্ষেতে রবি শস্যের সমারোহ। ধান কাটার জোরালো মরশুমে ওদের যেন এতোদিন তেমন চোখেই পড়েনি। কিন্তু এবার কাকা মাঠ পেয়ে ওরা পা ঝাড়া দিয়ে উঠল। রূপ ছড়ালো নিজেদের। কাঠুখালির বিলের এ আর এক বড়ো চোখ জুড়ানো শোভা।

কোনো কোনো ক্ষেতে প্রায় হাঁটু সমান উঁচু হয়েছে খেসারী কলাইয়ের গাছ গুলো। ঘন সবুজ লকলকানো ডগা। একটার পরে আর একটা। যেমন ঘন তেমনি পুরু। উপর দিয়ে হাঁটতে লাগলে মনে হয় পর্দা পর্দা নরম কম্বলের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। একটুও লাগেনা পায়ে। শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে সেই নরম সবুজ বিছানার পরে। আর দুপুরবেলায় যেন আগুন ধরে যায় তিল-ক্ষেতে। সূর্যমুখী ফুলের মতন গাঢ় হলুদ রঙের ছোটো ছোটো তিল ফুলে ভরে যায় ক্ষেতের পরে ক্ষেত। শীতের সোনা রং রোদ্দুর এসে ছড়িয়ে পড়ে তার পরে। রং যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসে। সে রূপের দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখ যেন ঝলসে যেতে চায়। মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করে ওঠে। বিলের নেশায় যেন চোখ দুটো আপনা-আপনি বুজে আসে। এ-ছাড়াও আছে রাই সরষে আর তিসির ক্ষেত। নানান রূপে রূপময় হয়ে ওঠে কাঠুখালির বিল।

প্রায়-ডুবু-ডুবু সূর্যটার দিকে তাকিয়ে খেসারী ক্ষেতের মধ্যে পা এলিয়ে দিয়ে ব'সে ছিল বলরাম। সুখলালের কথাটার কি জবাব দেবে ভেবে পাচ্ছেনা। বড়ো ভাবনায় পড়েছে। সংসারি ভাবে হাঁ বা না কোনোটাই যেন বলতে পারছেনা। অথচ মনস্থির করে একটা কিছু জানানো দরকার সুখলালকে। সুখলালের সেই শান্ত করুণ গলার কথাগুলো এখনো ভাসছে মনে মনে।

প্রথমটায় একটুখানি ইতস্তত: করেছিল সুখলাল কথাটা বলতে। বলরামের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত বলে ফেলেছিল। কথাটা শোনবার আগে অনেক কিছু ভেবেছিল বলরাম। কিন্তু এ-কথাটা সে কোনোক্রমেই ভাবেনি। ভাবা দূরে থাক, সাড়াই দেয়নি ওর মনে কোনো সময় কথাটা।

সুখলাল ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অস্পষ্ট ধরাগলায় বলেছিল —"মনডার মধ্যি কথাডা কামোন যানো ডাক দিয়ে ওঠলো। সুবাদীরে তুমি ছাও বাবা। মাইরেডারে তোমার হাতে দিতি পারলি বড়ো শান্তি পাতাম।"

চমকে উঠেছিল বলরাম। মস্ত বড়ো একটা কেউটে সাপ যেন ওর সামনে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

যা হয় পরে জানাবে বলে পালিয়ে এসেছিল সেদিন বলরাম।

কিন্তু পরে জানানোর কি যে আছে তার হদিশ পাচ্ছে না বলরাম। কথাটা ভাবতেই যেন অলক্ষ্যে একটা ভয়ে মনটা দুলে উঠছে। ওকে ঘর বাঁধতে হবে। সুখে-দুঃখে আনন্দ-বেদনায় একটা মেয়েমানুষ তার শরীর নিয়ে মন নিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়াবে। তাকে সংসারের সুখ চেনাবে। দুঃখ চেনাবে। সেই মেয়েমানুষটিকে জীবনের পাকে পাকে জড়িয়ে এক করে নিতে হবে বলরামকে। এই সাধ আর স্বপ্নের তাড়নায় একদিন পাগল হয়ে উঠেছিল বলরামের মন। কিন্তু আজ আর যেন সেকথা ভাবতে পারেনা বলরাম। বোশেখের ঠাঠা রোদ্দুরে কাদা-খাওয়া ক্ষেতের মতো মনের মধ্যে কোথায় যেন বড়ো একটা ফাটল ধরে গেছে। সে ফাটল বুজছে না কিছুতেই। পদ্মর মুখখানা মনে পড়ে। সে মুখ এখন অনেক দূরে। বলরামের ধরা-ছোঁয়া মাপালের বাইরে। কিন্তু তার জন্য দায়ী কে? কেউ তো নয়। সব বাধা ঠেলে

ফেলে দিয়ে পদ্ম তো আসতে চেয়েছিল তার কাছে। কিন্তু বলরাম পারল কই তাকে তুলে নিতে? কাউকে দায়ী করতে পারবে না বলরাম। কিন্তু তাতে তো মনের আগুন নিভবে না। আজ সুখলাল তাকে নতুন করে ঘর বাঁধতে বলছে। কিন্তু মনটা যে শ্মশান বলরামের। ধিকি ধিকি করে চিতা জ্বলছে সেখানে। সেই চিতার আগুনে শান্তিলতা ছিটিয়ে বলরাম কেমন করে ভালবাসবে সুবাসীকে।

হঠাৎ গানের সুর শুনে পিছন ফিরে তাকালো বলরাম। বংশী আসছে। যেখানে যাক, গান ওর মুখে লেগেই আছে। গান পেলে আর কথা নেই। রাতদিন ডুবে থাকতে পারে। রাগ বলে কিছু নেই যেন ওর। মনটা সব সময় গানের আনন্দে ভরে আছে। বংশীকে আসতে দেখেই সোজা হয়ে বসল বলরাম। কলাই ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে পায়ে হাঁটা ছোটো পথটা ধরে এগিয়ে আসছে বংশী। বলরাম ডাক দেয়—"বোংসে নাকি রে? যাস্ ক'নে?"

বংশী আগে বলরামকে দেখতে পায়নি। হঠাৎ ওর ডাক শুনে গান থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর ওকে দেখতে পেয়ে পথ ছেড়ে ওর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। করদা একখানা কাপড় আর আদা পরনে। গায়ে একটা হলদে রঙের চাদর। পাট করে সিঁথি কেটেছে। বংশীর রং বেশ করদা। পাতলা মানুষটা। সাজলে-গুজলে বেশ বাবু-বাবু দেখা যায়। বংশী এসে দাঁড়ায় ওর পাশে। হাসতে হাসতে বলে—"এছেবারে ভয় পাওয়ারে দিছিস্। তাইতো ভাবি যে, মানুষ নেহি না জন নেহি না, তাহে কেডা? তা এই সন্ধ্যের সোমায় ক'লোর ভূঁ-র মধ্যি ভূতির মতন বসে করিস কি?"

বলরাম ওর কথার জবাবটা এড়িয়ে যায়। একটুখানি হেসে বলে "সে যা হয় করতিছি। তা তুই এই সন্ধ্যে বেলায় বাবু সাজে চল্লি ক'নে?"

চোখমুখে একটা চাপা আনন্দ চকমক করছে বংশীর। কিন্তু গলার স্বরটা করুণ করে বলে—"আর ফোস্ ক্যানো ভাই। ক্যাচাং এটা না এটা বা'ধেই আছে। তা তুই এক-বস্ আছিস ভালো। কারো কোনো কথার ধার ধারতি হয় না। খালায়-খালায় দিব্যিসুখে ব্যাড়ালায়।"

বংশীর মনের কথাটা বুঝতে পারে না বলরাম। বলে—"বাজে ভ্যাদ্ভ্যাদানি রাখ দেহি। আসল বিত্তেন্তটা কি তাই ক।" বংশী গম্ভীর হবার ভান করে। বলে—"রাগতিছিস ক্যানু। সেই কথাডাই তো কতি যাচ্ছি। তা তুই দেহি ফোস্-মনোসায় শতন রাগে পেন্নায় বাধেয়ে দিলি।"

বলরাম এবার শান্ত গলায় বলে—"তো ক" দেহি এবার কনে যাচ্ছিস।"

খুব যেন একটা গোপন কথা। এদিক ওদিক তাকিয়ে গলা নামিয়ে বলে বংশী—"যাচ্ছি বউডারে আনতি। বাস্তো-পুজোর দিন সেই যে বাপের বাড়ী গেছে, আর আসার নাম নেই। যাওয়ার সোমায় কতোবার কানে গুতোরে গুতোরে কয়ে দিছি—তাড়াতাড়ি চলে আসবা। তা কথা কি আমার শোনে নাকি? আরো কয়ে গেছে কি জানিস? আমি আনতি না গেলি নাকি আসবে না। আমি শউরবাড়ী যাতি চাই নাতো! তাই বুদ্ধিখান খাটাইছে কি-র'ম ভাখ! আস্থো তোরা কলাম বলরাম,—এবার গ্যালাম তো গ্যালাম! আর যাই যদি কোনোদিন! আমার মুখে অতো চালাকি খাটবে না।"

বলরাম হাসতে হাসতে বলে—"তা এডা বুঝি তোর ক্যাচাং-এর কথা হলো। বউ আহ্লাদ করে তোরে যাতি কইছে, আর তুই কোস্ ক্যাচাং?

বংশীও হাসে। বলে—"তাই বুলেই তো যাচ্ছিরে। আর ক'দি হলতো পেত্যার যাবি না বলরাম, আজ করদিন বউডারে না দেইখে মনডার মধ্যি ক্যানো খাপাচ্ছে।"

ঠাট্টা করে বলরাম—"তালি তুই যা তাড়াতাড়ি। বউও

হয়তো দেখ্‌তে তোর জন্যি পথের দিদি তাদায়ে বসে আছে।"

হাসতে হাসতে এগোয় বংশী। একটুখানি গিয়েই আবার ফিরে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে বলে—"আর এট্টা কথা শোন্ বলরাম। আমি বাড়ী আস্‌লি তুই কে সোমার সনুকে ব্যালায় যাস আমাগের বাড়ী। এট্টা গান বাঁধিছি। কালকে শুয়ে শুয়ে বউটার কথা মনে পড়ে মনডা বড়ো খারাপ লাগ্‌তিলো। ভাবতি ভাবতি এট্টা গান বাদ্ধে ফেল্লাম। তুই যাস্। তোরে শুনোবো। গানডা শুনলি বউ যা রাগা রাগ্‌বে না! আমারে এ্যালা খুয়ে বাপের বাড়ী যাওয়ার নামও আর কর্‌বে না কোনোদিন।

বংশী চলে যায়।

অনেকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকলো বলরাম। নতুন বিয়ে হয়েছে বংশীর। পাশের গুনোখালি গাঁয়ে ওর শ্বশুর-বাড়ী। বউকে আনতে যাচ্ছে। বংশী আনতে না গেলে ওর বউ আসবে না। বউয়ের জন্য বংশীর মন খারাপ লাগে। গান বেঁধেছে বংশী।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে এলো বলরামের বুক চিরে।

কদিন পরের কথা।

সুখলাল প্রস্তাবটা তুলল সনাতনের কাছে। কাঁথা গায়ে দিয়ে সনাতন বারান্দায় বসে ছিল। শীতের দিন। হাঁপানি বেড়েছে। বসে বসেই বেশীর ভাগ সময় কাটে। সুখলাল গিয়ে বসলো মাদুরটার এককোণে। সনাতনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—"কি রম্ আছো সোনাতনদা?"

হাঁপানির দমকে টেনে টেনে বলে সনাতন—"আর ভাই থাহা আর না থাহা। শরীলির অবস্থাডা তো দেখ্‌তিই পারতিছিস্। পরাণডা গেলিই বাঁচে যাই।"

দুঃখবোধ করে সুখলাল। মাথা নাড়তে নাড়তে বলে—"শরীলডা তোমার সত্যিই বড়ো কাহিল হয়ে পড়িছে এবার সনাতনদা। আর এবার জাড় পড়িছে কি-রম দেহিছো। এতো যে কাঁথা-কাপড় গায় দি, তা কিছুতি ঘ্যানো ঘানাতি চায় না। কাঁপাতি লাগে।"

খানিকক্ষণ এটা ওটা কথা চলে তারপর একসময় সুযোগ বুঝে সুখলাল বলে—"তোদীর কাছে কিন্তুক এট্টা কথা নিয়ে আইলাম সোনাতনদা। যদি ভরসা দাও তো কই।"

সনাতনের কাশি এসেছিল। কাশিটা একটু থামতেই বলে—"আমার অবস্থাডা তো দেখতিই পারতিছিস। নড়ে বসার খামোতা নেই। সংসারের কাজকম্মো সব বলা'-র পরে ছাড়ে দিচ্ছি। ওই সব করে কম্মে। দিন-বিদিনি ঠ্যাহা বাধার কিছু দরকার হলি ওর কাছেই কোস্।

সুখলাল একটু আমতা আমতা করে বলে—"না সোনাতনদা, আমি সেসব কিছু কত্তি আসিনি। আমি আইলাম এট্টা পেস্তাব নিয়ে।

—"পেস্তাব? কিসির পেস্তাব?"

একটুখানি কিন্তু কিন্তু করে সুখলাল। তারপর বলে—"পেস্তাবডা হলো গিয়ে তোমার বলরামের বিয়ের ব্যাপারডা। কোনো আগার কিছু ঠিকঠাক করিছো নাকি?"

নিরাসক্ত গলায় উত্তর দেয় সনাতন—"ঠিকঠাক আর কনে যা করলাম। আর ও ছলের তো মতিগতি কিছু বুঝতি পারি না। মনডা উড়ো উড়ো করতিই আছে। তা, আছে নাকি তোর জানাশোনা তেমন ভালো মাইয়ে?"

"ভালো মন্দের কথা কত্তি পারিনা সোনাতনদা। সে তুমি নেইছে শুনে নিও। তা মাইয়েটা হেলো। যদি কও তো কত্তি পারি।"

—"কেডা? কার মাইয়ে?"—কাশতে কাশতে জিজ্ঞাসা করে সনাতন।

একটু যেন লজ্জা পায় সুখলাল নিজের মেয়ের কথা

বলতে। কিন্তু লজ্জাটা কাটিয়ে বলে—"আমার বড়ো মাইনেডা জানা হইছে। ওর কথা কচ্ছিলাম। সুবাসীরে তো তুমি দেখিছো।"

একটুক্ষণ চুপ করে থাকে সনাতন। তারপর বলে—"মাইনেডা তো তোর ভালই সুখলাল। আমার আপিত্তি নেই। কিন্তুক বলা কি রাজী হবেন? একবার না ধরি করলো তো করলো। আর যত করানির সাধ্যি হবে নানে কারো। কি যে এটা হইছে ওডা।"

সে ভয় যে সুখলালের মনেও নেই, তা নয়। সুখলালেরও ভাবনা বলরামকে নিয়ে। বলরামকে রাজী করানো যাবে বলে মনে হয়না। তবু সনাতনকে বলে—"সে তুমি যা হয় করো। তুমি কলি মনে কয় আর না করে না যে। ওর যাই কও আর তাই কও সোনাতনদা, হল কিন্তুক তোমার নাম রাহিছে। গেরামসুদ্ধ লোকে বলরামের সুখ্যেত করে।"

সনাতনের মনটা তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। সন্তান—তা সে যতই অবাধ্য হোক, অবহেলা করুক বাপকে, বাপের মনে কোথায় যেন এমন একটা জায়গা আছে, যেখানে তার কোনো কিছুই গিয়ে পৌঁছুতে পারেনা। অবাধ্য বেপরোয়া সন্তানেরও একটুখানি গৌরব আর প্রশংসার কথা শুনলে সে জায়গাটি আনন্দে ভরে ওঠে। তার সব অপরাধ ক্ষমা করে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে।

সনাতন উত্তর দেয়—"আচ্ছা, তুই বাড়ী যা সুখলাল। দেখি, বলরামকে আজকে কবানি কথাডা।"

সুখলাল উঠতে উঠতে বলে—"বৌঠারওনরে দেখতিছি না যে। বাড়ী নেই নাকি?"

"না, ওরা বাড়ী নেই। খদ্দেরাণী সেছে। ছিদেমের মামা নিতি আইলো। ছিদেমের মাগীর নাকি অসুখ। এদিদি সোংসার তো অচল হ'তি বইছে। ফেত্তি পারে ওঠে না সব দিগ সামলায়ে। বলা-র বিয়েডা দিতে পারলি সোংসারের অবস্থাডা বোধায় এট্টু ফেরতো।"

বলতে বলতে সনাতন ঘড়্ ঘড়্ করে খানিকটে কাশে। তারপর কাঁথাটা টেনে নিয়ে মুচি দিয়ে শুয়ে পড়ে।

সুখলাল বাড়ীর দিকে পা বাড়ায়।

সেই রাত্রেই সনাতন কথাটা বলে বলরামকে।

খাওয়া দাওয়া সেরে বলরাম একবার বংশীর কাছে যাবে বলে ঠিক করেছিল। বংশী গান শুনতে যেতে বলেছিল। যাব-যাব করেও এ-কদিন যাওয়া হয়নি বলরামের।

চাদরটা গায়ে জড়িয়ে কেবল বেরোতে যাবে। বেরোনোর মুখে পিসী বুড়ী এসে বললো—"কনে যাচ্ছিস সন্নুরে ব্যাপার? তোর বাবা তোরে এট্টু ডাকতিছে। শুনে যা।"

বাবা পেয়ে বলরামের মনটা যেন একটু বিরক্ত হল। পিসীর দিকে ফিরে বল্লো—"বাবার আবার কি হলো? ডাকতিছে ক্যান্?"

খন্‌খনে গলায় বুড়ী উত্তর দেয়—"ডাকতিছে ক্যান্ তা কি আমারে কইছে নাকি? তা তোর এট্টু আগোরে শুনে আসতি কি এমন ঠ্যাংয়ে ব্যাথা হলো? বুড়ো মানুষ। বিছেন-ধরা হইয়ে পড়ে রইছে। এট্টু ওষ্তো-বাত্তা তো নিতি পারিস। এ্যাটুক্ আক্কেল হয় না ক্যান্?"

গজ গজ করতে করতে বুড়ী রান্নাঘরে ঢোকে;

বলরাম গিয়ে দাঁড়ায় বাপের বিছানার পাশে।

কানমুখ ঢেকে বেশ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে সনাতন। হাঁপানির টানটা একটু কম মনে হচ্ছে।

বলরাম একটুখানি কেশে গলার সাড়া দিল।

বাপকে ডাকল—"কিছু কবা নাকি বাবা আমারে? ডাকতিছো শোন্‌লাম।"

বলরামের ডাক শুনে সনাতন উঠে বসল। লেপটা

ভালো ক'রে গায়ে জড়িয়ে বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে বসল —"হুঁ, ডাকছিলাম। এট্টু কথা কওয়ার ছেলো তোরে।"

বলরাম বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সনাতন বলে—"কচ্ছিলাম কি, সোংসারের অবস্থাডা তো দেখতিই পারতিছিস। সব থাকতি সোমার মতন মুডো রাক্ষা ভাত কপালে জোটেনা।"

বলরামের মনে খট্‌কা লাগে। বাপের মনের কথাটা ঠিক বুঝতে পারেনা। কিন্তু কোনো উত্তর দেয়না। চুপ ক'রে থাকে।

সনাতন আবার বলে—"তাই কচ্ছিলাম কি, ভালো একঘর কুটুম দেইখে তোর কোনো আগার এট্টা সম্বন্ধ করি।"

—অর্থাৎ তার বিয়ের কথা বলছে বাবা। নিমেষে মনটা কঠিন হয়ে উঠল বলরামের। একটা শক্ত কথা জিভের আগায় এসে গেল। কিন্তু সামলে নিল বলরাম নিজেকে। শোনবার দরকার শুনে যাচ্ছি,—এমনি ভঙ্গী করে দাঁড়িয়ে রইল।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সনাতন বলে—"মুখপালে আইলো আজকে। ওর বড়ো বাইল্লেডারে বিতি চায়। তা তুই যদি মত করিস তো ক'। কথাবার্তা কই ওর সাথে।"

একটু কাল থামে সনাতন। তারপর কাতরানো নিস্তেজ গলায় বলে—"তোর বিয়েডা দেইখে যাতি পারলি বড়ো শান্তি পতাম মনে। ভগমান কি আর সে সুখ লেহিছে আমার কপালে।"

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে সনাতনের।

নিশ্চুপ বলরাম দাঁড়িয়ে থাকে। চারপাশে এতোক্ষণ যে অন্ধকার ছিল, বলরামের মনে হলো ওরা যেন শুধু অন্ধকার নয়। ওই অন্ধকারের মধ্যে কে যেন প্রকাণ্ড একটা বেড়াজাল বিছিয়ে রেখেছে। গাঁয়ের আঠার ছোপানো—ঘন নিকষকালো রং। সে জাল একটু একটু করে গুটিয়ে আসছে। আর অসহায় বলরামের হাত পা গুলো অবশ হয়ে যাচ্ছে। অনেকদূরে গাঙের মধ্যে কোথায় যেন ছোট্টো একটা চর ভাসছে। পলির স্মৃতি নিয়ে সে চরটা যেন ক্রমেই দূরে—আরো দূরে স'রে যাচ্ছে। বলরাম আর তার নাগাল পাবে না।

(ক্রমশঃ)

: উপন্যাস :

কণ্ঠ ভরা বিষ

মিহির মুখোপাধ্যায়

ষোল

পরের দিন খুব সকালেই আট বেহারার এক পাল্‌কি এসে হাজির। পাল্‌কির সঙ্গে একজন পাইক। নাম বললো, কালাচাঁদ। আরো বল্‌লো—দেওয়ানজী পাঠিয়ে দিলেন, আপনাকে নতুন বাড়ীতে নিয়ে যাব।

দেওয়ানজীর এতটা আগ্রহ কেন? এত তাড়াতাড়ি করার কি দরকার ছিল?

দু'দিন পরে দেখেশুনে বাড়ি বদল করলে কি আর এমন মহাভারত অশুদ্ধ হত। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলো না ভারত। এখানে যাদের বাড়িতে রয়েছে, তারা মানুষ ভাল। আপ্যায়নের কোন অভাব নেই। কোন অসুবিধেই হচ্ছিল না এখানে। অবশ্য খাল শহর থেকে কিছুটা দূর হয়। তা'তে এমন আর কষ্ট কি? এক ক্রোশ রাস্তা ভারত পায়ে হেঁটেই পুষিয়ে নিত। পাল্‌কি ভাড়া লাগত না। ধড়ম খটখট্ করে নন্দলাল চক্রবর্তী এলেন। কালাচাঁদকে চেনেন তিনি। সব শুনে জিজ্ঞেস করলেন—ওহে কালাচাঁদ, কোথায় বাসা ঠিক করলে, না দেওয়ানজীর বাড়িতেই—

কালাচাঁদ জবাব দিল—আজ্ঞে না, সরকার মশাইর বাড়িতে থাকবেন উনি, সেখানেই নিয়ে যাব—গোকুল সরকারের বাড়ি—নন্দলাল ভুরু কুঁচ্‌কে ঘরের ভেতর সরে এলেন, যেন নিজের মনেই নিচু গলায় বললেন—বংশজ বামুন তায় আবার মুদিখলীবী, টাকার কুমীর—তারপর ভারতকে লক্ষ্য করে বললেন—ব্যাপারটা আমার ভাল ঠেকছে না হে, তোমাকে এখান থেকে সরাতে চাইছে, মনে হয় দেওয়ানজী তোমায় চোখে চোখে রাখতে চান, যার বাড়িতে থাকার কথা বল্‌লো সে মানুষটা সুবিধের নয়, দেওয়ানজীর হাতে ধরা লোক—

ভারত বিপন্ন মুখে বল্‌লো—তা'হলে আমি যাব না, ওদের চলে যেতে বলি—

—সেটা ঠিক হবে না—নন্দলাল বাধা দিলেন—দেওয়ান রাজবল্লভের আদেশ অমান্য করে এমন বুকের পাটা বর্ধমানে কারো নেই, স্বয়ং মহারাজা তাঁর কথামত চলেন, আমি বলি কি, তুমি আজ দিয়ে হালচাল বুঝে এসো, যদি ভালো না লাগে অসুখের অজুহাত দিয়ে শুয়ে থাকবে, এখানে, তারপর দেখা যাবে—

নন্দলাল চক্রবর্তী বড় হুঁসিয়ার মানুষ, সময় থাকতে সাবধান করে দিলেন।

বর্ধমানের রাজনীতি বড় জটিল খেলা, সেই জটিল জালের সুতো রয়েছে দেওয়ান রাজবল্লভের হাতে। নাবালক কীর্তিচাঁদকে সিংহাসনে বসিয়ে মানুষ করেছেন রাজবল্লভ।

নাবালক মহারাজার প্রতিনিধি হয়ে নিজে গেছেন মুর্শিদাবাদ। মোটা টাকা নজরানা দিয়ে খুশি করেছেন নবাব মুর্শিদকুলি খাঁকে। জমিদারী বন্দোবস্ত পাকা করে এসেছেন। সাতাশটা পরগণার বর্ধমান রাজের অধিকার মেনে নিয়েছে মুর্শিদাবাদের নবাব-সরকার। সুবেদার ইব্রাহিম খাঁ বরখাস্ত হবার পর

নতুন সুবেদার হয়ে এলেন আওরঙ্গজেব বাদশার মাতুল আজিম-উস্-সান। বিদ্রোহীদের নেতা তখন একা রহিম খাঁ। শোভা সিং, আগেই মারা গেছেন। শেষে সেই রহিম খাঁকেও মরতে হ'ল। নিয়তি কাউকে ছাড়ে না। ভবিতব্য সকল পাপ, সকল পুণ্যের হিসেব কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নেয়।

যুদ্ধে হেরে পালাতে পালাতে চন্দ্রকোণার জঙ্গলের কাছে শেষ লড়াইয়ে মৃত্যু হল রহিম খাঁর। আজিম-উস্-সানের আরবী সেনাপতি হামিদ খাঁ নিজের হাতে রহিম খাঁর মুণ্ডুটা কেটে এনেছিল। তারপর তিন বছর বর্ধমানে ছিলেন আজিম-উস্-সান। সুশাসনের ব্যবস্থা করলেন। যুবরাজ জগতরাম রায় বাপের জমিদারী ফিরে পেলেন। কিন্তু এই জগতরামও মারা গেলেন আওরঙ্গজেব বাদশা মারা যাবার বছর পাঁচেক আগে। দেওয়ান রাজবল্লভ তখন যুবক। বর্ধমান রাজ-সরকারের নতুন নায়েব।

তারপর আপনগুণে, কিংবা মহারাণীর সুনজরে পড়ে নাবালক নতুন রাজার আমলে দেওয়ান হয়ে বসলেন। সেই প্রবলপ্রতাপ দেওয়ান রাজবল্লভের পালকিতে যাচ্ছে ভারত। পালকির একপাশে রঘুনাথ, আরেকপাশে কালাচাঁদ। বেহারাদের হন্‌হন্ শুনে, দেওয়ানজীর পালকি দেখে লোকজন সব সরে যাচ্ছে। বড় ভাবনা হয়েছে ভারতের। কোনদিকে তেমন লক্ষ্য নেই। কোথায় যাচ্ছে, কি হবে, এসব ঝামেলা হবে জানলে কে আসতো এই বর্ধমানে। বাবা-মারা কোনকালে তার দিকে ফিরে তাকায়নি, নিজেরা স্বার্থপরের মতো পা বাঁচিয়ে বিপদের মধ্যে পাঠিয়ে দিল তাকে।

সংসারে তার আপনজন কেউ নেই। কেউ তার ভাল চায় না। যেমন জীবন সে চেয়েছিল, যেমন নিশ্চিন্ত মনে নিরিবিলি লেখাপড়া নিয়ে থাকতে চেয়েছিল, তেমনটি আর হ'ল না। সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করে যেন হতে দিল না।

কৃষ্ণসায়র দীঘির কাছেই গোকুল সরকারের বাড়ি। দু'মহলা বাড়ি। বাইরের মহলে কাছারীদালানের পাশে অতিথিশালার পাকা ঘর, সামনে লম্বা রোয়াক।

বৈঠকখানার সামনে পালকি থামল। একগাদা দুর্ভাবনা মাথায় নিয়ে নামল ভারত। কিন্তু বৈঠকখানায় ঢুকে অবাক হয়ে গেল। ফরাস তাকিয়া জুড়ে দামী শাল-বেনিয়ান গায়ে যে মোটাসোটা মানুষটি বসে গড়গড়া টানছিল, সেও একটুকাল তাকিয়ে থেকে আশ্চর্য হয়ে বললো—আরে ভারতচন্দ্র না, আমাদের ভারত মনে হচ্ছে যে—

বিস্মিত ভারত শুধু বলতে পারলো—বিদ্যাধর, তুমি!

বিদ্যাধর উঠে এসে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল ভারতকে, হাত ধরে ফরাসে বসাল। নিজেও বসতে বসতে বললো—কালরাতে দেওয়ানজী আমাকে বললেন, ফুরসুটের এক রাজার ছেলে আমাদের এখানে থাকবে তার ব্যবস্থা করতে, তখন থেকেই মনে হচ্ছিল, ফুরসুটের কাকে যেন আমি চিনতাম, কোথায় যেন আলাপ হয়েছিল, তোমার কথা ঠিক মনে পড়েনি, তাহলে আমি নিজেই তোমাকে আনতে যেতুম—

—কিন্তু বিদ্যাধর, তুমি এখানে এলে কি করে?—ভারতের বিস্ময় তখনো কাটেনি॥

—সে অনেক কথা, অনেক কিছু বলার আছে তোমাকে, উঃ কতকাল পরে দেখা, সেই যে তোমার বিয়েতে বরযাত্রী গিয়েছিলুম, মনে আছে, প্রায় তেরো বছর হতে চললো, কি বলো—তা হবে নিশ্চয়, সেই তাজপুরের টোল ছেড়েছি কতদিন, কিন্তু তোমাকে এখানে দেখবো আশা করিনি—ভারতের কথা শুনে জবাব দিল বিদ্যাধর—আমিও কি ভাবতে পেরেছি, তোমার সঙ্গে এতকাল পরে এমনভাবে দেখা হয়ে যাবে, বলছি সব, একটু ধৈর্য ধরো, পান-তামাক খাও, ওরে কে আছিস্—

ভারত বললো—পান তামাকে আমার আসক্তি নেই, তোমার ব্যস্ত হতে হবে না, তুমি আগে আমাকে খুলে বলো

সব, গোকুলদাস সরকার তোমার কে হন, তুমি কি তার কর্মচারী—

বিদ্যাধর হো হো করে হেসে উঠল—কাজ করি বটে তবে কর্মচারী নই, কর্মচারীরা কি এই ভাবে তাকিয়া ঠেস দিয়ে গড়গড়া টানে—বিদ্যাধরের হাসি আর থামে না। সরকার মুখে চাকর এসে দাঁড়াল, পেছনে কালাচাঁদ। প্রথম কালাচাঁদকে লক্ষ্য করে বললো বিদ্যাধর—ওহে, তুমি এখন যেতে পারো দেওয়ানজীকে আমার নমস্কার দিও, তাঁকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলো, রাজকুমারকে আমি যথাসাধ্য যত্ন করব—নমস্কার করে চলে যেতে যেতে শুনতে পেল কালাচাঁদ, চাকরকে হুকুম দিচ্ছে বিদ্যাধর—কোথায় থাকিস সব, বাড়িতে অতিথি এসেছে, পান তামাক নিয়ে আয়, ভাব কেটে আন্—

মৃদুস্বরে আপত্তি করল ভারত—তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন—

চোখের ইশারায় তাকে চুপ করতে বলে কালাচাঁদের যাবার পথের দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইল বিদ্যাধর। তারপর দেওয়ানজীর পালকি বেহারাদের চলে যাবার শব্দ শুনে নিশ্চিন্তভাবে সহজ গলায় বললো—না, ব্যস্ত হব কেন, তুমি আমার আপন মানুষ, মনে আছে সেই ভীমপত্তিতের টোলে তুমি, আমি, বিষ্টুপদ, নিত্যগোপাল, তখন নতুন তামাক খেতে শিখেছি লুকিয়ে লুকিয়ে তামাক খেতুম, কি সব দিন গেছে—গড়গড়ায় আলতোভাবে দুটি টান দিয়ে আবার বললো বিদ্যাধর—হ্যাঁ, যা বলছিলুম, তোমাকে আর অন্ধকারে রাখব না, যোগাযোগটা খুলেই বলছি, আমি হলুম এ বাড়ির জামাই, সরকার মশাই হলেন আমার শ্বশুর, তুমি হয়তো ভাবছো একাজ কেন করলুম, বংশজ বামুনের মেয়ে—

ভারত তাড়াতাড়ি বললো—"আমি কি ভাবছি তুমি জানলে কি করে, আমার ওসব সংস্কার নেই, তুমি অসংকোচে সব বলতে পারো—"

তোমার কাছে সঙ্কোচ করবো কেন, দেশশুদ্ধ লোক জানে, আমি ওসব পরোয়া করিনা—গড়গড়া টানতে টানতে সব খুলে বললো বিদ্যাধর।

গোকুলদাস সরকার নিছু বামুন, বংশজ। তার কুলীন আটপুরুষে বংশজ হয়। তারপর দুইপুরুষের তেজারতি কারবার, আরো পাঁচরকম ব্যবসাও আছে। হুগলী, কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমানে ব্যবসা ছড়ানো আছে। কোটিপতি না হলেও লক্ষপতিতো বটেই। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে ছত্রিশজাতের মানুষের সঙ্গে চলাফেরা ওঠা বসা করতে হয়। হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ, ফরাসী, ডাচ, পর্তুগীজ, আরমানী। ছোঁয়াছুয়ি, খাওয়া-দাওয়ার অত বাছ-বিচার করলে, মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করা যায় না। মেলামেশা না হলে ব্যবসা থাকেনা। আর ব্যবসা না থাকলে, ব্যবসার বাড়-বাড়ন্ত না হলে, পয়সাও হয় না।

নানা জাতের নানা রুচির ব্যবসায়ীর সঙ্গে লেনদেন করতে হয়, বন্ধুত্ব করতে হয়। দরকার হলে তাদের সঙ্গে মদ্যপানে বসতে হয়, খানা-পিনাও করতে হয়। গোঁড়া বামুনরা এসব বরদাস্ত করবে কেন? আদি নিবাস ত্রিবেণীর ব্রহ্মণ সমাজে তাই গোকুল সরকারের হুকো-নাপিত বন্ধ। সমাজ তাকে পতিত করেছে। যার পয়সা আছে তার ভাবনা কি। পয়সার জোরে সমাজের বিধান অগ্রাহ্য করেছিলেন সরকার মশাই। ত্রিবেণীর সমাজকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বর্ধমানে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছেন।

অসময়ে মহারাজ কীর্তিচাঁদকে অর্থঋণ দিয়ে সাহায্য করেছেন। ষোলবছর আগে নবাব মুর্শিদ কুলিখাঁর সঙ্গে নতুন জমিদারী বন্দোবস্তের সময় দেওয়ান রাজারামের সঙ্গে গোকুলদাস গেলেন মুর্শিদাবাদে। নাবালক মহারাজার পক্ষ থেকে নবাব সরকারে নতুন ধার্য খাজনা জমা দিয়েছেন বিশলক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো ছয়টাকা।

মহারাজা এবং দেওয়ানজী, দু'জনেরই অগাধ বিশ্বাস সরকার-

মশাইয়ের ওপর। মুর্শিদাবাদে যেমন জগৎশেঠ, বর্ধমানে তেমনি গোকুল সরকার। লোকে সমীহ করে। হয়তোবা একটু ঠাট্টার সুরে বলে—গোকুলশেঠ। এত প্রভাব-প্রতিপত্তি সত্ত্বেও কিন্তু মুস্কিল হয়েছিল মেয়েদের বিয়ে দেবার সময়। দুই মেয়ে গোকুল সরকারের। কোন ছেলে নেই। অতি কষ্টে, অনেক খুঁজে, প্রচুর টাকা পণ দিয়ে দুটি পাত্র যোগাড় হ'ল। দুটিই লেখাপড়া তেমন কিছু শেখেনি, বাড়ির অবস্থাও শোচনীয়। এর মধ্যে ছোট মেয়েটির বর কিছু চালাকচতুর। তাকেই সিঁদিয়ে পড়িয়ে নিলেন গোকুল সরকার। বিষয়-সম্পত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্যের ভার দিলেন। এই ছোট জামাই হ'ল বিদ্যাধর।

গরীবের ছেলে বিদ্যাধর। তালপুকুরের টোলে দীর্ঘদিন থেকেও লেখাপড়া তেমন কিছু শিখতে পারল না। কিন্তু নৈকষ্য কুলীন, বিষয়বুদ্ধি টনটনে, চেহারাটিও মোটামুটি। ঘটক আনল বিয়ের সম্বন্ধ। অনেকটাকা পণ। ভারপর বুদ্ধেগুনে নিতে পারলে, বিষয়-সম্পত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্যেরও অন্ততঃ অর্ধেক। টাকার লোভে বিদ্যাধরের বাবা রাজি হলেন। টোলের গুরু মশাইকে প্রণাম করে বর্ধমানে শ্বশুর বাড়িতে এসে কায়েম হল বিদ্যাধর। তাও প্রায় সাত আট বছর হয়ে গেল।

নিশ্চিন্ত মনে পুরনো আস্তানায় ফিরে এল ভারত। জিনিষ পত্তর গুছিয়ে নিয়ে নতুন জায়গায় যাবার জন্য তৈরী হ'ল। নন্দলাল চক্রবর্তীকে ডেকে বললো—ভাবনার কিছু নেই, সরকার মশাইয়ের ছোটজামাই আমার বাল্যবন্ধু, অভাবনীয় যোগাযোগ ঘটে গেল। যদিও কথাটা প্রকাশ করতে বারণ করেছিল বিদ্যাধর।

—আমরা যে বাল্যবন্ধু এসব কথা গোপন রাখাই ভাল, কারণ—একবার এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে মুখের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলেছিল বিদ্যাধর—দেওয়ানজী বোধহয় তোমাদের উপর প্রসন্ন ন'ন, তোমাকে চোখের সামনে রাখতে চান, আর আমাকে দিয়েছেন তোমার ওপর নজর রাখার ভার—কথার শেষে একটু হেসেছিল—তোমার কোন ভয় নেই ভারত, আমার এখানে চলে এসো, কাছারি-বাড়ীর পাশেই অতিথিশালার সবচেয়ে ভাল ঘরটিতে থাকবে তুমি—ভারত জানতে চেয়েছিল—তোমার শ্বশুরমশাই কোথায় আছেন?

—উনি আপাততঃ আছেন হুগলী বড়ো মেয়ে-জামাইর কাছে, ছ'মাস এখানে থাকেন, ছ'মাস ওখানে, শাশুড়ি ঠাকরুণও সেখানে আছেন, আমাকেও ব্যবসার জন্য কখনো মুরশিদাবাদ, কখনো হুগলী যেতে হয়, তবে বছরের বেশিরভাগ সময় আমি বর্ধমানেই থাকি—

সন্ধ্যার আগেই শহরের মধ্যে গোকুল সরকারের বাড়ির অতিথিশালার সবচেয়ে ভাল ঘরটায় উঠে এল ভারত। জাজিম, তাকিয়া, পালঙ্ক, শিকদান, আলবোলা, আতরদান দামী আসবাবে ঘরখানি সাজানো। ব্যবস্থার কোন ত্রুটি রাখেনি বিদ্যাধর। এরকম বিলাসিতায় অভ্যস্ত নয় ভারত। তার কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল। পাশেই একটা ছোটঘরে রঘুনাথের আস্তানা হ'ল।

সতেরো

শুভদিনে রাজদর্শন প্রার্থনা। সপ্তাহখানেক পরে ভালো একটা দিন দেখে মহারাজা কীর্তিচাঁদের দরবারে গিয়েছিল ভারত। রেশমী রুমালের ওপর রূপোর রেকাবিতে নজরের মোহর রেখেছিল মহারাজার সিংহাসনের নীচে পায়ের কাছে। আভূমি নত হয়ে সেলাম করেছিল। কিন্তু মহারাজা প্রসন্ন হলেন কিনা ঠিক বোঝা গেল না। নিবিকার মুখে তাকালেন একবার। দেওয়ান রাজবল্লভ পাশে দাঁড়িয়ে পরিচয় দিলেন। দরবারে নানা প্রার্থী-প্রত্যাশীর ভীড়। বেশিক্ষণ মহারাজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকার সুযোগ পেল না ভারত।

তারপর দেওয়ানজীর সেরেস্তায় এসে বসল। দেওয়ানজীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। প্রায় দুইদণ্ড পরে দেওয়ানজী এলেন দরবার থেকে। ধূর্ত হাসির সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি করে সাবধানের কথা বলে মনে ভয় ধরিয়ে দিলেন,—খুব ভালো ভাই ভারত, তুমি আমার নাতি, তাই বলছি ছেলেমানুষ তুমি বুঝে শুনে চলো। তোমার বাবার উপর মহারাজার বিশ্বাস নেই, যে সব জায়গা তোমরা ইজারা নিয়েছ, সে সব জায়গা ঠিকঠিক প্রজাবিলি করে সেরেস্তায় চুক্তিমত টাকা জমা দিতে নাপারলে মুস্কিল হয়ে যাবে—একটু থেমে গড়গড়ায় নলটা তুলে কয়েকটা টান দিলেন, আবার শুরু করলেন—তোমার বাবা স্বর্গে গেছে ভালোকথা, তুমি আছ এখানে তার জমিদারি, কিন্তু হালে তোমাকেই অবাবদিহি করতে হবে, তাই বলছিলাম একটু বুঝে শুনে—

কি বুঝবে আর কি শুনবে ভারত, কিছুই ভেবে পেল না। মহালে আদায়-উশুল করে বড়বা' কোন বিশ্বাসী লোকের মারফৎ চুক্তিমত রাজসরকারের প্রাপ্য টাকা পাঠাবেন, সেই টাকা রাজ-সেরেস্তায় জমা দিয়ে রসিদ নেবে ভারত। তারপর সেই রসিদ পাঠাবে রঘুনাথের হাতে। মাঝে মাঝে ভূরশুট যাবে রঘুনাথ, খোঁজ-খবর দেয়া-নেয়া করবে।

এর মধ্যে আর জটিল বোঝাবুঝির কি আছে? দেওয়ানজী কি বলতে চান? মনে মনে খুশি পেল না ভারত। মনে হচ্ছে, সে যেন একটা ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়ে গেছে। তার চারপাশে এক অদৃশ্য জাল পাতা হচ্ছে, আর সেই জালের সুতো রয়েছে দেওয়ান রাজবল্লভের হাতে। তবে দেওয়ানজীর প্রথম কৌশলটা নষ্ট হয়ে গেছে। অদৃষ্টের কাছে অন্তত: এইটুকু সুবিচার পেয়েছে ভারত। অকস্মাৎভাবে বিদ্যাধরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কিন্তু বিদ্যাধর একা আর তাকে কতখানি রক্ষা করবে। স্বয়ং মহারাজা আর তাঁর হিংসুটে দেওয়ান যদি পেছনে লাগে। বর্ধমান শহরটাই ভাল লাগছে না ভারতের। এই শহরের বাতাসে বিষ আছে। মানুষগুলি সব স্বার্থপর, ঈর্ষাপরায়ণ, পরশ্রীকাতর। সবাই হয়তো নয়, কিন্তু রাজদরবারের কাছাকাছি যারা থাকে, তারাতো বটেই। শুধু বর্ধমান কেন, সারা বাংলাদেশ জুড়ে এই ব্যাপার। ঢাকা, পাটনা কটক, কলকাতা, মুর্শিদাবাদ। সুবে-বাংলার এক একটা শহর একএকটা চক্রান্তের কেন্দ্র। অবিশ্বাস, সন্দেহ আর ষড়যন্ত্র। লোভ আর স্বার্থের টানাটানি।

একদিকে বাংলা মুলুকে ফরাসী সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখছেন চন্দননগরের ফরাসী গভর্ণর মঁসিয়ে জোসেফ ডুপ্‌লে সাহেব। আরেক দিকে কলকাতার ইংরেজ বণিক কোম্পানী তখন খুব সাবধানে খুব সতর্ক হয়ে ধীরে ধীরে নিজেদের পাকাপোক্ত করছে।

ওদিকে মুর্শিদাবাদে নাচগানের আসরে মশগুল হয়ে আছেন নবাব সুজাউদ্দিন মহম্মদখান সুপাউদ্দৌলা আলাদ জঙ্গ বাহাদুর। নবাব সরকারের কাজকর্ম চালান তিনজন—জগত শেঠ ফতেচাঁদ, রায়রায়ান আলমচাঁদ আর হাজী আহম্মদ।

সুবা-শাসনের কলকাঠি এই তিন প্রধানের হাতে। আর এই জন্যই বোধহয় হাজী আহম্মদের ছোট ভাই আলিবর্দী খাঁ পাটনার ছোট নবাব হতে পারলেন। পাটনা, ঢাকা আর কটকের শাসন কার্য চালান তিনজন নায়েব-নাজিম। চলতি কথায় তাঁদের বলা হয় ছোট নবাব। মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে কটকের নায়েব-নাজিম ছিলেন তার জামাই সুজাউদ্দৌলা। এই সুজাউদ্দিনের আমলেই বিহার সুবে-বাংলার মধ্যে এল। মুর্শিদাবাদের নবাব এখন সুবে-বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবেদার হলেন। পাটনায় নতুন নায়েব নাজিম পাঠানো দরকার। নবাব সুজাউদ্দিনের ইচ্ছে ছিল বড় ছেলে সরফরাজ খাঁ পাটনার ছোট নবাব হয়ে যাক। কিন্তু নিয়তউন্নিসা বেগমসাহেবা আপত্তি করলেন। তিনি তার নয়নের মণি সরফরাজকে চোখের আড়াল করতে

চাইলেন না। অপত্যা কাকে পাঠানো যায় পাটনা। এই নিয়ে অনেক শলাপরামর্শ হ'ল। তদ্বির-তদারক, উমেদারি আরম্ভ হয়ে গেল। নানারকম গুজব রটলো। অনেকেরই লোভ ছিল, অনেকেরই গোপন ইচ্ছে ছিল পাটনার নায়েব-নাজিম হবার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিত হ'ল আলিবর্দি খাঁর। কাজেকর্মে চতুর, সাহসী, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ মানুষ বলে সুনাম হয়েছিল আলিবর্দির। আরো ছিল মুরুব্বীর জোর। এই সময় তাঁর ছোট মেয়ে আমিনা বেগমের প্রথম ছেলে হল। আলিবর্দি ভাবলেন এই নাতিটি খুব পয়মন্ত। নাতির দৌলতেই ছোট নবাব হতে পারলেন তিনি। আদর করে নাম রাখলেন সির্জা মহম্মদ।

তখন কে জানতো, পাটনার নায়েব নাজিম এই আলিবর্দি খাঁই কয়েকটা বছর পরে সুবে বাংলার নবাব হয়ে বর্গীর সঙ্গে লড়াই করবেন। নাগপুরের রঘুজী ভোঁসলার সেনাপতি দুর্দান্ত ভাস্কর পণ্ডিতকে কৌশলে খুন করাবেন।

তখন কে ভাবতে পেরেছিল আলিবর্দি খাঁর এই আদুরে নাতি সির্জা মুহম্মদ একদিন নবাব সিরাজদ্দৌলা নামে বিখ্যাত হবেন আর পলাশীর মাঠে রবার্ট ক্লাইভ নামে এক ইংরেজ সেনাপতির সঙ্গে লড়াই করে হেরে যাবেন।

সেই আঠারো শতকের তৃতীয় দশকে বাংলাদেশের রাজনীতির খেলায় তখন পর্যন্ত আলিবর্দি খাঁ ছিলেন দ্বিতীয় সারির খেলোয়াড়। রাজনীতির অনেক খবর কানে আসতো ভারতের। দেওয়ানজীর সেরেস্তায় বসেই অনেক খবর পেতো। কিন্তু সে সব খবরে তেমন উৎসাহ ছিল না তার। রাজনীতির খেলায় জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছে হয়নি কোনদিন। ইচ্ছে ছিল কাব্যচর্চা করে, নাটক-অলঙ্কার পাঠ করে সময় কাটায়। কিন্তু কপালের দোষে বাধ্য হয়েই থাকতে হচ্ছে এখানে, বাধ্য হয়েই শুনতে হচ্ছে এসব কথা জানতে হচ্ছে রাজনীতির কূটকৌশল। থাকা-খাওয়ার কোন অসুবিধে নেই। মহা আরামের ব্যবস্থা করে দিয়েছে বিদ্যাধর। নিজে সে সব সময় দেখাশোনা করতে পারে না। ব্যবসার কাজে ব্যস্ত থাকে। মাঝে মাঝে বাইরেও যেতে হয়। কিন্তু চাকর-বাকরদের ঢালাও হুকুম দিয়ে রেখেছে, ভারতের যেন কোন অসুবিধা না হয়।

কয়েকমাস পরে। শীতের শেষে এক ফাল্গুনের সকালে বিদ্যাধর তাকে পাকড়াও করে জেরা শুরু করলো—তুমি অত মনমরা হয়ে থাকো কেন? কি হয়েছে তোমার?

—কই কিছু হয়নি না তো—ভারত মাথা নাড়ল।

—নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে, বিদ্যাধরের শর্মাকে ফাঁকি দিতে পারবে না, আমি জানি তোমার কি হয়েছে?

—কি জানো তুমি?

—ভাখো এটা ফাল্গুন মাস, সামনে দুরন্ত বসন্ত কাল, এমনিতেই এসময় যুবকদের মন কেমন করে, তারওপর তুমি বিবাহিত, দীর্ঘকাল বিদেশে আছো, সুতরাং প্রোষিতভর্তৃকা স্ত্রীর কথা ভেবে—

—কি সব যা তা বলছো তুমি লজ্জিত মুখে হাসল ভারত।

—এই যে চাঁদ, তোমার হাসি দেখেই বুঝতে পারছি—ভারতচন্দ্রের পিঠে চাপড় মেরে বললো বিদ্যাধর— আমার কাছে লুকিয়ে কোন লাভ নেই, আমি যা বলছি ভেবে ভাখো, তুমি যদি চাও, তোমার স্ত্রীকে এখানে আলাদা বাসা করে থাকবে, তবে আমি সে ব্যবস্থা করে দিতে পারি—বিদ্যাধরের প্রস্তাব শুনে একটুকাল চুপ করে রইল ভারত, তারপর ম্লানমুখে বললো—

—সে হয় না বিদ্যাধর—

—কেন হবে না কেন?

তোমার বোধহয় মনে আছে আমার বিয়েতে আমার বাড়ির কেউ উপস্থিত ছিল না—আস্তে আস্তে সব খুলে বললো ভারত—আমার বাবা-মা কিম্বা বড়দা' মেজদা' ছোটদা' কারো মত ছিল না এই বিয়েতে, তোমার এখানে আছি বলে থাকা-খাওয়ার কোন অসুবিধে নেই, নাহলে তারা যে মাসোহারা

পাঠান, তুমি তো জানো, সব মাসে সমান আসেনা, সময়মতো আসে না, সেই মাসোহারার ভরসা করে কি ভদ্রভাবে সংসার পাতা যায়, তুমিই বলো, আমার নিজের যদি কোন উপার্জনের ব্যবস্থা থাকতো, তাহলে এসব কথা ভেবে দেখা যেত।

একটুকাল চুপ করে থেকে বললো বিদ্যাধর—তাহলে তুমি কি এইভাবে একাএকা সন্ন্যাসীর মতো জীবন কাটাবে?

—না সন্ন্যাসী হয়ে জীবন কাটাবার ইচ্ছে আমার নেই, আপাতত কোন উপায় দেখছি না বটে, কিন্তু সংসারধর্ম পালন করবার ইচ্ছে আমারো আছে, আমারো কামনা আছে, আসক্তি আছে, প্রেম আছে, মমতা আছে—বলতে বলতে হাসছিল ভারতচন্দ্র। কিন্তু সে হাসি কেমন ম্লান কেমন বিষণ্ণ মনে হ'ল বিদ্যাধরের।

—এভাবে মনমরা হয়ে থাকলে, শেষে একটা কঠিন অসুখ বাধাবে তুমি—দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে বললো বিদ্যাধর।

—কোথায় আর মনমরা থাকি, নিজের কাজকর্ম করি, কিছু পুঁথিপত্তর আছে, তাই নাড়াচাড়া করি, বেশতো আছি, তোমার ভাবনা নেই বিদ্যাধর, মনের অসুখ আমার হবে না।

—কি সব বই পড়ো তুমি বলোতো?—বিদ্যাধরের প্রশ্ন শুনে হাসি পেল ভারতের। পুঁথিপত্তরের প্রতি চিরকাল বীতশ্রদ্ধ বিদ্যাধর। পাঠচর্চার ব্যাপারটাই তার কাছে বিরক্তিকর, সেইজন্য আবার বললো বিদ্যাধর—দিনরাত পুঁথি মুখে নিয়ে বসে থাকো কি করে, ভাজপুরের টোলেও দেখতুম ওই করছো, কি পুঁথি তুমি পড়ো বলত—

একটু হেসে জবাব দিল ভারত—নতুন পুঁথি আর পাবো কোথায়, পুরনো পুঁথি যে কখানা আছে তাই নাড়াচাড়া করি, কবিকঙ্কণের চণ্ডী, কাশীখণ্ড, চূড়ামণিতন্ত্র—

—ওসব তন্ত্রমন্ত্র পড়ার মতো বয়েস হয়নি তোমার, এসব দেব-দেবীর পুঁথি পড়ে অকালে বুড়ো হয়ে যাবে দেখছি, তার চেয়ে আমার সঙ্গে যাবে একদিন, গান শুনিয়ে আনবো, বাজে গান নয়, উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত, রাগরাগিনীর আলাপ, আর যার গলায় শুনবে মনে হবে যেন কিন্নরী কণ্ঠ—বিদ্যাধরের কথা শুনে অবাক হ'ল ভারতচন্দ্র। বিদ্যাধরকে যতটা রসবোধহীন কাজ-পাগলা মানুষ ভেবেছিল, ততটাতো সে নয়। আশ্চর্য, বিদ্যাধরেরও গান-বাজনা শোনার মন আছে, সময় আছে! শুধুমাত্র টাকার চিন্তা ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাবনা ছাড়াও সে তাহলে অন্য কিছু ভাবে শোনে। সঙ্গীতের কথা শুনে উৎসুক হয়ে ওঠে ভারত। শিল্পকলার এই একটা দিক সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানে না সে। অথচ তার কণ্ঠস্বর তাল, সুর, ছন্দ, তান, লয় সম্বন্ধে জ্ঞান আছে। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও নিয়মিত সঙ্গীতচর্চার সুযোগ পায়নি কোনদিন।

আগ্রহের সঙ্গে বললো ভারত—যাবো আমি বিদ্যাধর, কেমন গান কোথায় যেতে হবে, কবে যাব—

—ব্যস্ত হয়ো না, সে বড় রসের আসর, সময় মত নিয়ে যাব আমি, তবে কথাটি গোপন রেখো—স্বভাব মতো হো-হো করে হাসতে লাগল বিদ্যাধর।

আঠারো

গান শুনছিল ভারতচন্দ্র। মিশ্র রাগ বসন্ত-বাহার। মধুর সময় বড় চৈত্র মধুমাস। শুক্লপক্ষ। সামনেই পূর্ণিমা। মধুবাতা ঋতায়তে, মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। এই মধুমাসে বাতাস মধুময়, আকাশ মধুময়। মধুময় শুক্লতা, মধুময় পৃথিবীর ধূলি। বাইরে নবমীর জ্যোৎস্না। ঘরের ভেতর অগুরু আর চন্দন ধূপের সৌরভ। জানালায় জানালায় রেশমী পর্দা। মেঝেতে পারস্য গালিচা। উপরে ঝাড়লণ্ঠনের আলো। সাচ্চা জরির কাজকরা ওড়না, ঘাঘরা। গায়িকার কণ্ঠে সপ্তসুরের ইন্দ্রধনু। সঙ্গে সারেঙ্গির ছন্দ আর তবলার মিঠে বোল যেন মায়াজাল সৃষ্টি করেছে। যেন স্বর্গলোকের সভায় কিন্নরীর কণ্ঠসঙ্গীত। ওও ঠিক হলনা। সভা মানেই অনেকজনের আসর। মানুষ না হয়, দেবতাদের ভীড়। কিন্তু এখানে শুধু পাঁচজন। বুড়োমত সারেঙ্গিওয়ালা, মাঝ-বয়সী তবলচী আর অল্পবয়সী-

তুল্যা গায়িকা: শ্রোতামাত্র দুজন—বিদ্যাধর দেবশর্মা আর ভারতচন্দ্র রায়। এ কোন, স্বপ্নালোকে তাকে নিয়ে এল বিদ্যাধর। আসতে হয়েছে চোরের মতন চুপিচুপি। বিদ্যাধরের পালকিতে মুখোমুখি বসতে হয়েছে। পরপর তিনপ্রস্থ রেশমী কাপড় দিয়ে চোখ বেঁধে দিয়েছিল বিদ্যাধর।

—একি চোখ বাঁধলে কেন—অবাক হয়েছিল ভারত।

—গোপন রাখার জন্য, কোথায় যাচ্ছ, কোন পথে যাচ্ছ, কেউ যেন জানতে না পারে, এমন কি তুমিও জানতে পারবে না, আমাকে ছাড়া যেতে পারবে না, আসতে পারবে না; আপাততঃ এই ব্যবস্থাই থাকুক, পরে না হয় খুলে দেব—বিদ্যাধরের কথা শুনে আর কিছু বলেনি ভারত, কোন আপত্তি করেনি।

পালকির আন্দোলন, বাহকদের পদশব্দ, কণ্ঠধ্বনি, রাজপথের কলরব। পথের বাঁক ঘোরার সময় বোঝা যাচ্ছে। একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে, আবার ডাইনে। একসময় মনে হল চারপাশ নির্জন। বাহকরাও যথাসম্ভব নীরব। পালকি থামল। বিদ্যাধরের হাত ধরে নামল ভারত। দোতলার উঁচুউঁচু ধাপের সিঁড়িতে সাবধানে পা ফেলে ফেলে বিদ্যাধরের পাশাপাশি আস্তে আস্তে উঠল। তারপর মনে হল লম্বা বারান্দা। কয়েক পা বাঁদিকে ঘুরে দাঁড়াল বিদ্যাধর, বললো —জুতো খুলে রাখ এখানে।

কোনো ঘরের খোলা দরজা মনে হল। আতর আর ধূপের গন্ধ। জরির কাজ করা নাগরা দিয়েছে বিদ্যাধর। মূল্যবান বেলভুয়ার সাজিয়ে এনেছে ভারতচন্দ্রকে। শুধু মাথায় পাগড়ি নেই আর বিদ্যাধরের মতো আট আঙুলে আটটা আংটিও নেই। বিদ্যাধরের কথামতো বাইরে জুতো রেখে ভেতরে এল ভারতচন্দ্র। পায়ের নিচে নরম গালিচা। তখনো হাত ধরে ছিল বিদ্যাধর। নারী কণ্ঠের অভ্যর্থনা শুনতে পেল ভারত—আসুন, আসুন, একি চোখ বেঁধে কাকে নিয়ে এলেন।

মানুষের কণ্ঠস্বর কি এত মধুর, এত স্নিগ্ধ হয় এইবার হাত ছেড়ে দিল বিদ্যাধর। ভারতের মনে হল, সে যেন অপরিচিত এক রূপহীন অন্ধকারে শুধুমাত্র গন্ধ শব্দ আর স্পর্শের ভুবনে কোন্ অপরূপের অপেক্ষায় একা দাঁড়িয়ে আছে। বিদ্যাধরের কথা কানে এল—আমি যার কথা বলেছিলুম, আমার সেই বাল্যবন্ধু—

—ও, ইনিই সেই ভূরশুটের রাজপুত্র, প্রণাম হই রাজকুমার —মেয়েটির কথা শুনে মনে হল যেন এমন সুরেলা এমন মধুর কণ্ঠ আর কখনো শোনেনি ভারত, হাত তুলে আশীর্বাদ করল—কল্যাণ হোক্।

বিদ্যাধরকে লক্ষ্য করে বলল মেয়েটি—একে এমনভাবে চোখ বেঁধে আনলেন কেন?

—চোখ খুলে প্রথমেই তোমাকে দেখবে, দেবীদর্শন করতে হলে কষ্ট করতে হয়, অন্য কিছু দেখতে পাবে না, কাউকে লক্ষ্য করতে পারবে না, চোখ খুলেই তোমাকে দেখবে—বিদ্যাধরতো বেশ কথা বলতে পারে, লেখাপড়া তেমন না শিখলেও ছোটবেলা থেকেই কথাবর্তায় বেশ পটু সে। ভারত একটু হাসল।

—কিযে বলেন আপনি—মেয়েটিও হেসে উঠল—তা'হলে এবার খুলে দিন, আমি তো সামনেই আছি—

—আমি খুলব না, তুমি নিজের হাতে খুলে দাও—বেশ রসের কথাও বলতে পারে বিদ্যাধর—চোখের বাঁধন খুলে, মনের বাঁধন দাও—কথার শেষে হো হো করে হেসে উঠল বিদ্যাধর। মেয়েটির হাসির শব্দও শুনতে পেল ভারত, যেন জলতরঙ্গের ধ্বনি। পায়ে পায়ে এগিয়ে এল মেয়েটি। পায়জোরের রুনঝুম্ শব্দ। খুব কাছে এসেছে। অঙ্গে অগুরু চন্দন গন্ধ, কেশসংস্কার ধূপের সৌরভ। এক এক প্রস্থ বাঁধন খোলার সঙ্গে সঙ্গে বাহুলগ্ন অলঙ্কারের ধ্বনি। তখনো চোখ বন্ধ ভারতের, চোখেমুখে মেয়েটির সুরভিত উষ্ণ নিশ্বাসের স্পর্শ। কালিদাসের পূর্বমেঘের বর্ণনা মনে পড়ল—

আলোকদীপৈরুপচিত বপুঃ কেশসংস্কার ধূপৈ—
বন্ধুপ্রীত্যা ভবন শিখিভিরস্ত নৃত্যোপহারঃ।

বাঁধন খোলার পর একটুকাল যেন বাঁধা লাগল। তারপর সেই অপরূপের দিকে পরিপূর্ণ চোখে তাকিয়ে রইল ভারত। আবার উত্তরমেঘের যক্ষপত্নীর রূপবর্ণনা মনে পড়ল। মহাকবি ছাড়া আর কাকেই বা মনে পড়বে, আর কেইবা পেরেছে এমনভাবে বলতে—তন্বীশ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী।

মধ্যেক্ষামাচকিতহরিণী প্রেক্ষণা নিম্ননাভি।

মেয়েটিও কিছুক্ষণ মুগ্ধচোখে তাকিয়ে থেকে বিভাধরকে লক্ষ্য করে বললো—আপনি বড় নিষ্ঠুর।

—কেন বলোতো—তাকিয়া ঠেস দিয়ে তৎক্ষণে বসে পড়েছে বিভাধর :

মেয়েটি জবাব দিল—এমন সুন্দর চোখ দুটো বেঁধে রেখেছিলেন—

হাসতে হাসতে বললো বিভাধর—প্রথম দর্শনেই সুন্দর চোখের প্রেমে পড়ে গেলে—

ভারত লজ্জিতভাবে ধমক দিল—তখন থেকে কি সব যা-তা বলে যাচ্ছ বিভাধর, মুখে কিছু আটকায় না, ছিঃ ছিঃ—

ওর কথা বাদ দিন, আপনি বসুন রাজকুমার—মেয়েটির কথা শুনে বসতে বসতে বললো ভারত—আমি রাজকুমার নই, বাপ-ঠাকুর্দা এককালে রাজত্ব করেছেন বটে, কিন্তু এখন কিছু নেই আমার, ধন-সম্পদ, বিষয়-বৈভব কিছুই নেই—

—আপনার সব আছে—মেয়েটি বাধা দিল—আপনার চেহারা দেখলে যে কেউ বলবে আপনি রাজার ঘরের ছেলে, আপনার চোখ দেখেই বোঝা যায় অন্তরের ঐশ্বর্যে আপনি পরিপূর্ণ, বাইরের কিছু নাইবা থাকল—

কোন জবাব দিতে পারল না ভারত, শুধু মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

বিভাধর বললো—শুনলে তো ভারত, ওর সঙ্গে কথায় পারবে না, এরপর একটু গান শোনো, মাথা ঘুরে যাবে—

মেয়েটির ইঙ্গিতে সুসজ্জিতা পরিচারিকা এসে রূপোর রেকাবীতে কিছু ফল, মিষ্টি, বাদাম, পাপড়ভাজা আর রূপোর ঝুঁঝারে পানীয় রেখে গেল। আতরদান, পিকদান পাশেই ছিল। একটি রূপোর গেলাস হাতে তুলে বললো বিভাধর—একটু পান করবে নাকি, ভায়া—

—কি জিনিস—নাক কুঁচকে একবার নিশ্বাস টানল ভারত।

বিভাধর হাসলো—নাক কোঁচকালে কেন, ফরাসডাঙার ফরাসীকুঠির মাল, বিশুদ্ধ পাশ্চাত্যসুরা খাঁটি ব্রাণ্ডিসব—

—না ভাই, ও আমার চলবে না—ভারত একটু সরে বসল। যেন একটা অশুচি স্পর্শ থেকে বাঁচাতে বসতে চাইল।

বিভাধর বললো—তাহলে থাক, জোর করবো না, তুমি শুধু গলায় বসে বসে শুধু গান শুনেই খুশি থাকো—

—আপনি তাহলে ফল মিষ্টি কিছু মুখে দিন—একটু যেন অপ্রতিভ ভাবে বললো মেয়েটি।

ভারত বললো—হ্যাঁ ফল খাচ্ছি বটে, তবে ভাল গান শুনতে পেলেই খুব খুশি হব, তৃপ্তি পাব—তারপর যেন মেয়েটির আপত্তি দূর করার জন্যই আবার বললো—তুমি প্রাণ খুলে গাও বিভাধর, আমার জন্য সঙ্কোচ ক'রো না—

পরপর কয়েক চুমুকে পাত্র নিঃশেষ করে সুনম্বাথা শশার টুকরো চিবুতে চিবুতে বললো বিভাধর—তুমি আমার ঘরের মানুষ, তোমার কাছে সঙ্কোচ করবো কেন, তা'হলে এবার একটু গান-বাজনা হোক, কি বলো—

ভারত সায় দিল—হ্যাঁ, গান শুরু হোক, কিন্তু গায়িকার নামটি এখনো জানতে পেলুম না—

বিভাধর আরেকপাত্র নিয়ে বললো—ওর অনেক নাম, এক এক ঋতুতে এক এক নামে ডাকি আমি, এখন বসন্তকালে রূপমঞ্জরী, গ্রীষ্মে রূপবতী, বর্ষায় রূপকারিনী, শরতে রূপধারিণী—

কয়েকটা আঙুর মুখে দিতে দিতে একটু হেসে বললো ভারত—আমিও তাহলে একটা নতুন নাম দেব ভাবছি—

—কি নাম দেবেন, বলুন—আগ্রহে তাকাল মেয়েটি

—আগে গান শুনি, তারপর বলবো—

তারপর সারেঙ্গি আর তবলা এলো। গান ধরলো রূপমঞ্জরী। রাগ বসন্ত-বাহার। বাইরে নবমীর জ্যোৎস্না। মৃদু দক্ষিণের হাওয়ায় রেশমী পর্দা দুলছে, আতর, অগুরু আর চন্দন ধূপের সুবাস ছড়িয়ে পড়ছে।

দেওয়ান রাজবল্লভ রায় তখন নিজের বাড়ির খাস কামরায় বসেছিলেন। কিছুক্ষণ আগে মহারাজা কীর্তিচাঁদের গোপন পরামর্শ সভা থেকে ফিরেছেন। একরত্তি আফিম খেয়ে একবাটি দুধ পান করছেন। গোঁফ জোড়া সযত্নে মুছে, তাকিয়া ঠেস দিয়ে গড়গড়ার নলটি হাতে নিয়েছেন, এমন সময় পাইকদের সর্দার কালাচাঁদ এসে ফিস্‌ফিস্ করে খবর দিল—সরকার মশাইয়ের ছোট জামাই বিদ্যাধর ঠাকুর ভুরশুটের রাজকুমারকে নিয়ে রূপাবাঈজীর বাড়িতে গেছেন—

চকিতে চোখ মেলে তাকালেন দেওয়ানজী, একটু নড়েচড়ে বসে বললেন—কখন গেছে?

—সন্ধ্যে উতরে যাবার পর—

—তুই খবর পেলি কোথায়?

—আজ্ঞে সরকার বাড়ির খানসামা লোচন দাস খবর দিল—

—আচ্ছা যা তুই, একটু লক্ষ্য রাখবি—দেওয়ানজী আবার চোখ বুজলেন। সেলাম ঠুকে ছায়ার মত সরে গেল কালাচাঁদ, রাগ বসন্ত বাহার সবে এসে থামল। তখনো সুরের ইন্দ্রজাল যেন জড়িয়ে আছে সমস্ত চেতনা।

আচ্ছন্নের মতো চোখ তুলে তাকাল ভারত, অস্ফুটস্বরে বললো—অপূর্ব। তারপর যেন মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল—

—বহুত্, বহুত্ আচ্ছা বিবিজান—

তাকিয়া ঠেস দিয়ে প্রায় শুয়ে পড়ে ভুঁড়ি দুলিয়ে খল্‌খল্ করে হাসল বিদ্যাধর, ঈষৎ জড়িত-কণ্ঠে বললো—বেড়ে বলেছিস্ ভাই—

বিদ্যাধরের প্রায় বেসামাল অবস্থা দেখে রূপমঞ্জরীর দিকে চোখের ইঙ্গিত করে মুখ টিপে হাসল ভারত।

রূপমঞ্জরী বললো—কই, আমার ইনাম কোথায়, গান যদি ভাল লেগে থাকে তবে মেহেরবানী করে বখ্‌শিশ দিন—

সেলাম দিয়ে হাত পাতল সে।

চাপকানের জেব থেকে রেশমী থলি বার করল বিদ্যাধর। থলির মুখ খুলে উপুড় করে ধরল রূপমঞ্জরীর সামনে ফরাসের ওপর। ঠুন্‌ঠুন্ শব্দে একমুঠো মোহর ছড়িয়ে পড়ল।

ভারতের দিকে তাকাল রূপমঞ্জরী। একটু লজ্জিত মুখে বললো ভারত—আমি গরীব মানুষ, সোনারুপো কিছু দিতে পারবো না—

—আরে থাম দিকি—বিদ্যাধর ঝিমুনিধরা গলায় বাধা দিল—তুই আমার সঙ্গে এসেছিস, ওসব কথা বলছিস্ কেন—তুমি থেকে 'তুই'-তে নেমেছে বিদ্যাধর, আর বোধহয় সামলানো যাবে না।

ভারত বললো—আমার অবস্থাটা শুধু বলেছি দামী জিনিস কিছু দিতে পারবো না, ভেবেছি একটা নাম দেব, যদি ভাল মনে নাও, তবে বলি—

—আপনার দেওয়া নাম আমি মাথা পেতে নেব—রূপমঞ্জরী একবার মাথা নিচু করে আবার চোখ তুলে তাকাল। কাজলটানা সেই আয়ত চোখের দিকে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললো ভারত—তোমার নাম দেব ভেবেছি রসমঞ্জরী। রূপমঞ্জরী ডান হাতে ভারতের পা ছুঁয়ে কপালে ঠেকাল।

বিদ্যাধর চেঁচিয়ে উঠল—বাঃ বাঃ বেশ নাম, চমৎকার—

এতক্ষণে পঞ্চম পাত্র নিঃশেষ হয়েছে। প্রায় বেসামাল বিদ্যাধর জড়িয়ে জড়িয়ে বলতে লাগলো - চমৎকার, রসমঞ্জরী, চমৎকার নাম বলেছিস, রসের মঞ্জরী, কোন সমাস হল রে, ষষ্ঠীতৎপুরুষ না, ভীম পণ্ডিতের টোলে তুই তো পড়েছিলি, বলনা ভাই কি হবে, না রসরূপ মঞ্জরী হবে।

ভারত শুধু বললো—আর খেওনা, বিদ্যাধর।

একটু চটুল হেসে বললো রূপমঞ্জরী—রাজকুমার, যদি কিছু মনে না করেন, একটি কথা জিজ্ঞেস করি, আপনি এই নামটি দিলেন, তাই বলছি, বলবো—

—নিশ্চয় বলবে, নির্ভয়ে বলতে পারো—কিছুটা বিস্ময়ের সঙ্গে আশ্বাস দিল ভারত।

—আপনি রসশাস্ত্র নিশ্চয় পড়েছেন?

—কিছু কিছু পড়েছি, কেন বলোতো?—আরো বিস্মিত হলো ভারত?

—ভানুদত্তের গ্রন্থ পড়েছেন, বাৎস্যায়নের কামসূত্র, ভরতের রতিমঞ্জরী—প্রশ্ন শুনে চমকে উঠল ভারত। সামান্য পারিকার কাছে এমন প্রশ্ন আশা করেনি সে। জবাব দিল—কিছু কিছু পড়েছি—

—নায়িকার প্রকার ভেদ জানেন?—রূপমঞ্জরীর জিজ্ঞাসার জবাবে বললো ভারত—তুমি আমাকে পরীক্ষা করতে চাও?

—হিঃ হিঃ হাত জোড় করে জিভ কাটল রূপমঞ্জরী—আমি আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই শিখতে চাই—

—মৃদু হেসে বললো ভারত—নায়িকা তিন প্রকার, স্বকীয়া, পরকীয়া, সামান্যবনিতা।

—পরকীয়ার প্রকার ভেদ বলুন—

—তুমি নিশ্চয় এসব জানো, তবু আমাকে দিয়ে বলাতে চাইছ, আচ্ছা বলছি, পরকীয়া আটপ্রকার, উঢ়া, অনূঢ়া, বিদগ্ধা, লক্ষিতা, গুপ্তা, কুলটা, মুদিতা, অনুশয়ানা।

—তোমরা এসব কি কচ্‌কচি আরম্ভ করলে হে—আঁতেলোদ্যা-ভাবে বাধা দিল বিদ্যাধর—

—নায়িকার আবার প্রকারভেদ কি, ফরাসী মাল খাও বুঝতে পারবে সব নায়িকা একাকার, কোন ভেদাভেদ নেই, ওসব বাজে কথা রেখে একখানা গান শোনাওতো বাবা খৃষ্টউৎপুরুষ—

ভারত হেসে উঠল। রূপমঞ্জরীও হাসতে হাসতে বললো—কি গাইব বলুন?

তাকিয়ায় মাথা রেখে টানটান হয়ে বললো বিদ্যাধর—একখানা শুদ্ধ রাগ, ভীমপলশ্রী কিম্বা আলকোশ। রাত্রির মধ্যপ্রহর উত্তীর্ণ শুক্লা-নবমীর আধো ভাঙ্গা চন্দ্র পশ্চিম আকাশ প্রান্তে অস্ত গমনের অপেক্ষায় ম্লান। আলকোশের মধুর আলাপ যেন অলৌকিক আবেশ ছড়িয়ে দিল।

নেশার ঝোঁকে তাল ঠুকছিল বিদ্যাধর, আর মৌন স্তব্ধতায় সমাহিত ভারতচন্দ্র।

আসর ভাঙলো রাত্রির অন্তিম প্রহরে। ফাল্গুনের আকাশে তখন রাগ আলিঙ্গের শেষ ঘনিয়ে এসেছে। এবার বিদায়ের পালা। রূপমঞ্জরী বললো—আবার দর্শন পাবোতো, রাজকুমার।—কি জানি, যদি বিদ্যাধর অনুগ্রহ করে নিয়ে আসে, নিশ্চয়ই আসব—ভারতচন্দ্রের জবাব শুনে বিদ্যাধরের দিকে তাকিয়ে বললো রূপমঞ্জরী—আশিও অনুগৃহীত হ'ব তা'হলে—

—আচ্ছা, আচ্ছা আনবো, আনবো, দুজনকেই অনুগ্রহ করবো—নেশার ঝোঁকে একটু একটু টলছে বিদ্যাধর, কিন্তু বেহুস নয়, আসলে ঠিক আছে, বললো—ওর চোখটা বেঁধে দাও রূপা আর আলোয়ান দিয়ে ভাল করে ঢেকেঢুকে দিও, বলাতো যায় না, দেওয়ানজীর স্পেশ্যাল এরা হয়তো পেছনে লেগে আছে, ওই কালাচাঁদটা হাড়ে হারামজাদা—

এসব কথার তাৎপর্য ঠিক বুঝল না ভারত, রূপমঞ্জরীর দিকে বিস্মিত চোখে তাকাল।

রেশমী কাপড়ে ভাঁজ করে চোখ বেঁধে দিতে দিতে পেছন থেকে বললো রূপমঞ্জরী—এসব আপনি হয়তো বুঝবেন না, কেউ নামে গুপ্তচর, দেওয়ানজীর চেয়েরা হয়তো লক্ষ্য রেখেছে, আপনাকে যাতে চিনতে না পারে, তাই এই ব্যবস্থা, সাবধানে থাকবেন, সুযোগ সুবিধে মতো আবার আসবেন, কেমন—

(ক্রমশঃ)

একটি অবিস্মরণীয় আত্মত্যাগ

ঋষি গোপালচন্দ্র মজুমদার স্মরণে

ঋষি গোপালচন্দ্রকে আমরা নাই মনে রাখলাম, তাঁর স্মৃতি পূজা নাই-বা কোরলাম—তাতে সেই মহামানবের, সেই অমর আত্মার কিছু এসে যায় না। কিন্তু নিজেদের স্বার্থেই, নিজেদের কল্যাণকল্পেই তাঁর স্মৃতি-পূজা ক'রে আমরা নিজেরা ধন্য হবো। তাই এই স্মৃতি-চারণ—স্মৃতি দিয়ে তাঁর মৃত্যুকে ঢেকে রাখার প্রচেষ্টা মাত্র।

"রঘুনাথ, তোমার বইয়ের লিস্ট্‌টা আমাকে দিও। দেখবো চেষ্টা করে কিছু করা যায় কিনা।"

"গজাগতি, কেমন পড়াশুনা করছো? তোমার তো স্পেশাল কেমিস্ট্রী অনার্স। খুব ও পরিশ্রম করে পড়ো। বেশী নম্বর না পেলে তো এম. এস-সি. তে চান্স্ পাবে না।"

"গোপাল, তোমাকে কিন্তু ফিজিক্স অনার্সে ভালো রেজাল্ট করতেই হবে।"

"রামপ্রসাদ, তোমার ফার্স্ট-ক্লাস অনার্স পাওয়া চাই-ই।"

"কি হয়েছে? হোস্টেলে থাকার অসুবিধে হচ্ছে? আচ্ছা, আমি দেখছি,—তোমরা যাও।"

"কল্যাণবাবু, আপনাকে মর্নিং গার্লস স্কুলানে দয়া করে একটা কি দুটো দিন সকালবেলায় এসে ফিলজফির ক্লাস নিতে হবে। টাকা এখন কিছু দিতে পারব না। তবে ডি. পি. আই. গ্রান্ট দিলে আপনার প্রাপ্য সব দেব। এটুকু কষ্ট আপনাকে কলেজের জন্য করতেই হবে।"

"অনুকূল, তোমার বাড়ী থেকে কলেজে যাতায়াতে অসুবিধে। এক কাজ করো—তুমি প্রতুলের সঙ্গে একসাথে কলেজ হোস্টেলে থাকো। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এতে তোমার রিলার্জের ও পড়ানোর—দু'য়েরই সুবিধে হবে।"

"মুরারীবাবু, পরীক্ষার হলে যেন কোনও গোলমাল না হয়—দেখবেন। প্রয়োজন হলে ছেলেদের এক্সপেল করতে হবে।"

"আপনি যদি প্রি-ইউনিভার্সিটির ক্লাসটা নেন, তবে খুব ভাল হয়, আজ কিজিক্সের staff short, নইলে ছেলেরা খুব গোলমাল করবে।"

"এই যে বিভূতিবাবু, ছেলেদের ক্ষতি না হয় দেখবেন।"

"আপনি সত্যিই এ কলেজ ছেড়ে চলে যাবেন? অনেক আশা করে আপনাকে এনেছিলাম, ভেবে দেখুন একটু। অবশ্য আপনার 'Future prospect'-এ—আমি বাধা দেব না। তবে থাকলে, আপনার গবেষণা ইত্যাদির সুযোগ-সুবিধা করে দেবো।"

"কালীপদ কেমন আছে? ও আমার দৌলতপুর কলেজের মেধাবী ছাত্র—কতদিন দেখি না। দার্জিলিঙে ওর শরীর ভাল থাকে তো? ঐ গভর্ণমেণ্ট স্কুলেই আছে তো?"

"আচ্ছা, যা আপনি আশ্রন। আপনার ছেলের ভার আমি নিলাম। ওর বাইরে, বইয়ের ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না।"

"দেখুন, ছেলেটিকে আমি একরকম কথা দিয়েছি। ওকে যদি নিতে পারেন, তবে মান রক্ষা হয়—আর কি?"

স্মৃতির দুয়ারে ভিড় করে এমনি আরো কতশত কথা, কত ঘটনা, কত অভিভাষণ—কত উপদেশ—কত অনুরোধ—।

এই মহাপ্রাণ গোপালচন্দ্র মজুমদার ছিলেন পূর্ব্ববঙ্গের সু-সন্তান খুলনাজেলার মহেশ্বরপাশা গ্রামের সংস্কৃতিবান মজুমদার বংশের কৃতী সন্তান। তাঁর পিতা ছিলেন পূর্ব্ববঙ্গ বাগেরহাট কলেজ ও দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক। স্বদেশী-আন্দোলনে অরবিন্দ-বিবেকানন্দের ত্যাগপূত-আদর্শের তরঙ্গে তখন রংপুর, দৌলতপুর ও বাগেরহাট কলেজ তরঙ্গায়িত; সে তরঙ্গে স্বীয় মানসিকতার উৎকর্ষের ও স্বীয় জীবনাদর্শের উৎস-সন্ধানে পেলেন এক তরুণ আদর্শ-পাগল-সেবাব্রী-প্রতিভাবান্ একনিষ্ঠ ভক্তিমান বিনয়ী বালক। কি বিতর্কে, কি প্রবন্ধ রচনায় কি শ্রেণিকক্ষের ক্লাসে সর্বত্রই এই তরুণ বালকের একাধিপত্য। তবু তার মন মাঝে মাঝে কোন্ ভাবালুতার ভরে যায়, চোখের সামনে ভেসে ওঠে কোন্ দূর বিদগি স্বপ্ন—সে স্বপ্ন মানব কল্যাণে মহামানবের স্বপ্ন—পরহিতার্থে আত্মোৎসর্গের স্বপ্ন—স্বামিজীর আদর্শে দেশসেবার স্বপ্ন, জনসেবার স্বপ্ন—"To revive the National life, to increase the material prosperity of the country."

গোপালচন্দ্র যে ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন মেধাবী ও কৃতীছাত্র ছিলেন দৌলতপুর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ডে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। গোপালচন্দ্র সেবার ইংরাজী অনার্সে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করে দৌলতপুর কলেজের মুখোজ্জ্বল করেন। অতঃপর তিনি ইংরাজীতে প্রথম শ্রেণী সহ এম এ পাশ করেন। এম, এ, পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই দৌলতপুর কলেজ কর্তৃপক্ষের সাদর ও সস্নেহ আহ্বানে ঐ কলেজে ইংরাজী অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেন। দীর্ঘকাল-বঙ্গবিভাগের পূর্ব পর্য্যন্ত—কৃতি অধ্যাপকরূপে তিনি ঐ কলেজে সংযুক্ত থাকেন।

ঐ কলেজে যোগদানের স্বল্পকাল পরেই ছাত্রের স্বপক্ষের মত তাঁর অধ্যাপনার কৃতিত্ব, তাঁর পাণ্ডিত্য তার মধুর চরিত্রের কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। পঠনে ও অধ্যাপনায় তিনি ছিলেন ধীর-স্থির স্থিতধী—একাগ্রচিত্ত। ছাত্রদের ক্লাশ নেওয়ার সময় তিনি তাঁর বিষয়ে বক্তৃতায় এতই তন্ময় থাকতেন, যে তাঁর অন্যদিকে ভ্রূক্ষেপ থাকতো না। কি কলেজ লাইব্রেরীতে কি স্বগৃহে তাঁকে জ্ঞান-পিপাসু অবস্থায় অধ্যয়নে নিমগ্ন থাকতে দেখা যেত গ্রন্থরাজির অগাধ সাগরে। তাঁর গৃহ বা কলেজ কক্ষ সর্বদা ছাত্র সমাগমে পরিপূর্ণ থাকতো।

বর্ষে বর্ষে দলে দলে যে ছাত্ররা তাঁর সংস্পর্শে আসতো, তিনি তাদের সুখে-দুঃখে সমদুঃখী—সম দুঃখী হতেন। যে-কোনও ভাবে তাদের অভাব অভিযোগ দূরীকরণে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করতেন। ছাত্রদের জন্য তাঁর উদার হৃদয় যেমন স্নেহ-মায়া-মমতায় পরিপূর্ণ ছিল, তেমন দুঃখী অনাথ-আতুর-অভাবগ্রস্তদের দুঃখের কাহিনী শুনলেও তাঁর হৃদয় সমবেদনায় উদ্বেল হয়ে উঠত। কুসুম কোমল এই মানুষটিও কুলিশ-কঠোর হয়ে উঠতেন দুর্জনের প্রতি। তখন তাঁর রোষানল দেখে সকলে স্তম্ভিত হয়ে যেত। একবার কলেজ-ইন্‌স্‌পেকটারকে সমুচিত ভীতি প্রদর্শন করতে তিনি কার্পণ্য করেন নি। আবার কোনও ছাত্র-অধ্যাপকের জন্যে কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মনোমালিন্যে নিজের কর্মে ইস্তাফা দিতেও এগিয়ে এসেছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে অধ্যাপক মজুমদার ছিলেন অকৃতদার, স্বামী-বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত। পরবর্তী জীবনে প্রবুদ্ধ ভারত সংঘের সঙ্গে আমরণ সংযুক্ত। বিবেকানন্দের "উত্তিষ্ঠিত জাগ্রতের" বাণী তিনি নূতনভাবে শোনালেন—"হয় মরিব নয় বাঁচিব, এই কথাই ভাল। মরিবার ভয়ে বাঁচিয়া থাকিবার দরকার নাই·····নিরুদ্যমেই প্রকৃত মৃত্যু। আমরা না হয় বাঁচিব, না হয় মরিব —তাই বলিয়া কাজকর্ম ছাড়িয়া দিয়া দাবাখেলায়ের

কোলের কাছে বসিয়া সমস্ত দিন উপকথা শুনিতে পারিব না।"

কাহিনীচক্রে নির্দিষ্ট, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ধরাদেশসূত্র, কপট, নাস্তিক, কাপুরুষদের সঙ্গে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও সাদৃশ্য ছিল না।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর তিনি পশ্চিমবঙ্গে আগমন করেন। গৌরীপুরে তাঁর জীবনে ও মননে তাঁর ভাগ্যবিধাতা যে বীজ রোপন করেছিলেন, এখানে আসার পর তা মহীরুহের আকার ধারণ করে—বেগবতী স্রোতস্বিনীর ন্যায় উদ্দাম-উত্তাল গতিতে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন এক বিরাট কর্মকাণ্ডে—"keeping always the rudder of his life-boat fixed," তাঁর শিক্ষাব্রতের আদর্শকে রূপ দেওয়ার প্রাথমিক কাজে তিনি শুরু করেছিলেন হুগলী-হুগলী পূর্ব-বঙ্গের মাটিতে। এখানে এসে স্ব-আদর্শকে রূপায়িত করার অভিপ্রায়ে এই কর্মবীর খুঁজি একাগ্রচিত্ত ও একনিষ্ঠ হলেন। তিনি বেছে নিলেন তাঁর কর্মস্থানরূপে নদীমাতৃক হুগলী জেলাকে তথা গঙ্গা-সরস্বতী-হুগলী নদীর রসসিক্ত পল্লী-মৃত্তিকাকে—বিশেষ করে—ইটাচুনার দিগন্তপ্রসারী উর্বরা মৃত্তিকাকে। এই ভূমিকে অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে আছে বহু ইতিহাসখ্যাত নগর—উপনগর যথা—পাণ্ডুয়া, হিন্দুতীর্থ ত্রিবেণী, নিত্যানন্দের লীলা পার্ষৎ ও শিল্প উদ্ধারণ ঠাকুরের জন্মভূমি ও একদা বাণিজ্য সমৃদ্ধ আদি-সপ্তগ্রাম, শিল্প নগরী ব্যাণ্ডেল এবং বিপ্লবীতীর্থ খ্যাত অরবিন্দ-শিষ্য মতিলাল-রাসবিহারী—কানাইলাল-পদরজঃপুত চন্দননগর। স্থান নির্বাচনে গোপালচন্দ্র বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন—একথা অনেকেই স্বীকার করবেন। তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল—এই ভূমি থেকে সুফল ফলবেই—এখানথেকে গ্রামবাংলার বুকে তথা সর্বত্রলে শিক্ষার আলো পৌঁছোবেই। সমাজের তথাকথিত অন্ত্যজ নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সমাজের যারা বিরাট অংশ অথচ অবজ্ঞাত-অবহেলিত তাদের মধ্যে ছুটে এলেন জ্ঞানের আলো বিস্তারে। তিনি প্রত্যক্ষ করলেন—মহানন্দি ডাফ্ প্রতিষ্ঠিত চুঁচুড়ার বিখ্যাত ডাফ্ স্কুল, দানবীর মহসীন প্রতিষ্ঠিত হুগলী মহসীন কলেজ, বেলুড় মঠ, বেলুড় কলেজ, চন্দননগর প্রবর্তক সংঘ—প্রবর্তক স্কুল, আরো কত স্কুল কলেজ তথাকার শিক্ষাধারা। প্রবীণ বিদ্বৎ-জনের সঙ্গে হোল কত যুক্তি, তর্ক, আলোচনা, পরামর্শ। এগুলি তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মধারাকে নিয়ন্ত্রিত করল। সংঘাশ্রয়ী বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলি গোপালচন্দ্রের ভাবমুকুরে প্রতিবিম্বিত হ'ল—তাঁর ভাবকল্পনাকে উজ্জীবিত ক'রল—জীবনাদর্শের ভিত্তিকে সুদৃঢ় ক'রল।

এই সময়েই দেবতার আশীর্বাদের মতই ইটাচুনার জমিদার দানবীর বিজয়নারায়ণ কুণ্ডুর বংশধরগণ তাঁকে সাহায্য করার কাজে অগ্রণী হলেন। শুরু হল কাজ আর কাজ—

ইটাচুনার স্থানীয় স্কুলগৃহের সংকীর্ণ অপরিসর দু' একটি কক্ষে সর্বপ্রথম কলেজের কাজ শুরু করলেন তিনি—ঐ গ্রামের ও তৎসন্নিকটস্থ অধিবাসীগণের তুচ্ছ সাহায্য ও সহানুভূতিকে তখন তিনি তুচ্ছ মনে করেন নি, বরং সাদর অভিনন্দন জানিয়েছেন। গ্রামবাংলার গুটিকয়েক শ্রীহীনকীর্ত ছাত্র ও কূটরাজনীতির চক্রে পিষ্ট বাস্তুত্যাগী, কয়েকজন অকৃত্রিম শিক্ষক - সর্বোপরি গোপালচন্দ্র—এই নিয়েই কলেজ। অনতিবিলম্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলির প্রথম সারির মধ্যে আসন পেল এই কলেজটি। প্রথমতঃ ইন্টারমিডিয়েট স্তরে আই. এ. ও আই. এস-সি. খোলেন গোপালচন্দ্র। অধ্যাপকের অভাবে তাঁকে একাকী বহুবিষয়ে অধ্যাপনা করতে হোত। অস্বাভাবিক পরিশ্রমে ধীরে ধীরে তিনি ইন্টারমিডিয়েট স্তর থেকে কলেজটিকে প্রথম শ্রেণীর (ক্লাস-ওয়ান) ডিগ্রী কলেজে উন্নীত করেন। তখন এই কর্মযোগীর দিবা-রাত্রির স্বপ্ন ও ধ্যান ছিল কলেজের উন্নতি বিধান ও ছাত্রদের মঙ্গল বিধান—যথার্থ শিক্ষার দ্বারা যথার্থ খাঁটি ছাত্র সৃষ্টি করা। ছাত্রবৎসল শিক্ষাব্রতী জানতেন

ছাত্ররাই দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাতা—নবাবন্ধ তথা নবা ভারত নির্মাণে ও রূপায়নে তারাই হবে শ্রেষ্ঠ উপাদান। তারা নবজীবনে নির্মল দীপ জেলে আলোক-বর্তিকা হস্তে অমৃতের ও কল্যাণের গীত-ধ্বনিতে দিগ্বিদিক মুখরিত করবে। কিন্তু কোন্ মহাপ্রাণ—তাদের যৌবনের উজ্জ্বলদীপ্তিময়ত্বে নেবে তাদের চিত্ত শতদলে জ্ঞানের ইন্ধন জোগাবে। কে তাদের কর্ণকুহরে অমৃতের বাণী পৌঁছে দেবে—?

কলেজের প্রথম পর্যায়ে এই মহর্ষি কত অভিভাবকের দ্বারে গিয়ে তাদের সন্তান-সন্ততিদের ভিক্ষা চেয়ে নিয়েছেন। তাদেরকে নিজের স্নেহচ্ছায়ায় টেনে নিয়েছেন, তাদের কল্যাণ-কল্পে সুধীজনের প্রতি পরম সৌজন্যে বিনম্রভাবে আহ্বান জানিয়েছেন এই মহাবিদ্যালয়ে যোগদানের জন্যে। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলেন কত প্রবীণ ও তরুণ সুধীবৃন্দ। এলেন রংপুরের বিখ্যাত বিপ্লবী সুরেশচন্দ্র রায়চৌধুরী, উদার-হৃদয় রমারঞ্জন বিশ্বাস, শ্রীসুশীলচন্দ্র নাগ, কবি ও সুপণ্ডিত শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সেন, শ্রীবনমথ দাস, ফরিদপুরের ডঃ নিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, ডঃ রাধারমন বসাক, বিভূতি মুখার্জী, সদিতে তারাপদবাবু, ইতিহাসে কামাখ্যাবাবু প্রভৃতি এবং এই কলেজের ছাত্র প্রফুল্ল দে, বৈদ্যনাথ মুখার্জী ও ছাত্রসদৃশ শান্তিবাবু, মুরারী দাস, অনুকূল দাস, কল্যাণ সেনগুপ্ত, শিবানী মৈত্র ও আরও অনেকে। এদের তিনি উদাত্তকণ্ঠে বলেন "শিক্ষাদানকে আপনারা ব্রত হিসেবে গ্রহণ করুন আর সঙ্গে সঙ্গে আপনারা নিজ নিজ বিষয়ে গবেষণা কাজে লিপ্ত হয়ে নব নব আবিষ্কারে দেশমাতৃকার মুখোজ্জ্বল করুন।" তাঁর অবিরত উৎসাহে ও প্রেরণায় এবং সুযোগদানের ফলে কেন কিছু সংখ্যক নবীন ও দু'একজন প্রবীণ অধ্যাপক গবেষণা কার্যে লিপ্ত হন।

স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারেও তাঁর দান প্রণিধানযোগ্য। তিনি নিজ দায়িত্বে ডে, বোর্ডিং সেকসানের কাজের ওপরে আবার মনিং সার্কল সেকসান খুললেন। এতো ব্যস্ততার মধ্যেও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের একান্ত অনুরোধে তাঁকে ইংরাজী বিভাগের গুরু দায়িত্ব নিতে হ'ল। প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ পক্ষে একবার তাঁকে ইটাচুনা থেকে সুদূর বর্ধমানে ছুটোছুটি করতে হ'ত এম, এ, ক্লাস নেওয়ার জন্যে, কিন্তু সেজন্যে কোনও কাজে তাঁর শৈথিল্য বা ত্রুটি থাকত না। অধ্যক্ষ হিসেবে তাঁর সুপরিচালনা ঐ অঞ্চলের অন্যান্য কলেজ-গুলিতেও আলোচনার বিষয় বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।

কলেজীয় পরিবেশে ও অন্যান্য আলোচনা চক্রে তাঁকে অনেক সময় বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুলবোর্ড নিয়ন্ত্রিত মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার সমালোচনা করতেদেখা গেছে :—"সময় ও ছাত্রদের বয়সের দিকে লক্ষ্য রেখে সতর্কতার সঙ্গে যুগোপযোগী সিলেবাস তৈরী হওয়া প্রয়োজন।" কেন প্রতিবৎসর ফাইন্যাল পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রের বিভ্রাট হবে? সিলেবাসের বাইরে থেকে কেন প্রশ্ন আসবে? মডারেটারগণ তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে কি সচেতন নন্!" শিক্ষাবিস্তারের নামে যারা ছাত্রনিধন যজ্ঞে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্যাপৃত, তাঁদের তিনি কখনও ক্ষমা করতে পারেন নি।

একদিকে ছাত্র, অন্যদিকে অধ্যাপক থেকে শুরু করে কলেজ অফিস ও সেক্রেটারীর কর্মীদের যে কোনও অভাব-অভিযোগ মোচনে তিনি সর্বদাই এগিয়ে আসতেন, ছাত্র ও অধ্যাপক তথা অধ্যক্ষের তথাকথিত দূরত্বের ব্যবধান কাটিয়ে গোপালচন্দ্র একেবারে তাঁদের অন্তরের কাছে এসে পৌঁছেছিলেন। তাই আজকের 'STUDENTS' UNREST"—এর দিনগুলিতে অধ্যক্ষ শিক্ষাব্রতী গোপাল-চন্দ্রকে বেশী করে মনে পড়ে। বারংবার বহুসভা-সমিতিতে, বহু আলোচনাচক্রে তিনি ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা বলেছেন। এই কলেজটির মাধ্যমেও তা পরিস্ফুট হয়েছে। "ডিগ্রীর মোহে অন্ধ হয়ে আপনারা ছাত্রদের কাছে থেকে দূরে সরে থাকবেন না"—এই আকুতি বহুভাবে প্রকাশ করেছেন তিনি। নানাবিধ ডিবেটিং ক্লাস

সেমিনার ক্লাস, এক্সকারসান্, আলোচনাচক্র প্রভৃতির ওপর তিনি বিশেষ জোর দিতেন। ছাত্ররা যাতে অবসর সময়ে জনহিতকর কার্য্যে, যথা লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা, নৈশ-স্কুল স্থাপন ও সেখানে পঠন-পাঠন করার সুবিধা পায়, সেইরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা তিনি বারংবার প্রচার করেছেন।

ছাত্রবৎসল শিক্ষাব্রতী এই মহামনীষীকে আর দেখতে পাব না এ-চিন্তা অসহনীয়। দুটি শিশুকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজে মৃত্যুবরণ করেছেন—একটিকে তিনি রক্ষা করতে পেরেছিলেন,—এ সংবাদ যেমন তাঁর সুমহান আত্মোৎসর্গ প্রমাণিত করে, তেমনি এক মর্মন্তুদ হাহাকার বাণী বয়ে আনে—

গোপালচন্দ্র নেই!

এই প্রসঙ্গে আমার বয়োজ্যেষ্ঠ সহকর্মী, বিশিষ্ট বন্ধু, অধ্যাপক বসুমদারের দৌলতপুর কলেজের ছাত্র, বর্তমানে দার্জিলিং গভর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রবীণ শিক্ষক শ্রীকালিপদ চক্রবর্তীর নিকট, অধ্যাপক বসুমদারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র বসুমদারের লেখা একটি পত্রের একাংশ উদ্ধৃত করে এই প্রবন্ধ উপসংহার করছি:—

ইটাচুনা

২৬।১১।৬৬

স্নেহের কালীপদ,

"যাহা ঘটিয়া গেল তাহার আঘাত তোমাদের পক্ষেই যথেষ্ট আর আমার যে কি হইয়াছে, তাহা কি লিখিব। সবচেয়ে মর্মন্তুদ ওইভাবে মৃত্যু।

তাই আমার সকলের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল আর ঠিক সেই আদর্শ নিয়া স্বেচ্ছায় জীবন দিল। দুর্বারগতি ৫০।৬০ মাইল বেগে গাড়ী আসিতেছে আর তাহা দেখিয়াও জীবনরক্ষায় ছুটিয়া যাওয়া, এতো জীবনের জন্য জীবনকে তুচ্ছ করা; এ মরণ অবশ্য সাধারণের নহে। তাহার মহৎ জীবনের মহৎ পরিসমাপ্তি—এই ভাবটুকুই আমাদের বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।.....

এখানে মানুষ দিবারাত্রি চোখের জল ফেলিতেছে। উপযুক্তভাবে স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা হইতেছে Memorial Committee গঠিত হইয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী Chairman হইয়াছেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে শোক প্রকাশ করিয়া আমাকে চিঠি দিয়াছেন।

ভগবান নানাভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন। তিনি তাঁর প্রিয় সন্তান গোপালকে এইভাবে গৌরব দান করিলেন।".....

দেহ নশ্বর, কিন্তু আত্মা ও আদর্শ অবিনশ্বর। ঋষি গোপালচন্দ্রের অমর আত্মা ও আদর্শের প্রতি প্রণাম জানাই। •

• "দার্জিলিং কালীশ্বরী পাঠাগারে" আলোচনা চক্রে এই রচনাটি পঠিত হয়। অঃ সঃ

ত্রয়ী

৩১ বর্ষ একাদশ সংখ্যা ফাল্গুন ১৩৭৩

সম্পাদকীয়

নির্বাচনের পর একমাস

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর একমাস উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এই একমাসের মধ্যে ভারতবর্ষের নির্বাচনোত্তর ছবিটি ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। নির্বাচনে পরাজিত হয়েও কংগ্রেসদলের ক্ষমতা দখলের আসক্তি রাজস্থানের ঘটনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রাজস্থানে কংগ্রেসের ৮৯ জন এবং একজন কম্যুনিষ্ট সদস্যসহ বিরোধীদের পক্ষে ৯২ জন সদস্য নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও রাজ্যপাল সম্পূর্ণনন্দ কংগ্রেস দলনেতা সুখাড়িয়াকে মন্ত্রীসভা গঠনে আহ্বান জানিয়ে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি লঙ্ঘন করে ঐ রাজ্যে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা ডেকে আনেন।

জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র জোট রাজস্থানে ৭১ টি আসন দখল করে কংগ্রেসের চাইতে ১৯ খানিমু এই অজুহাতে রাজ্যপাল কংগ্রেসকেই মন্ত্রীসভা গঠনে ভার দিয়েছিলেন। তার এই কাজের পেছনে কামরাজের সায় ছিল। কামরাজের বক্তব্য সবচাইতে সংখ্যাগরিষ্ঠ যারা তাদেরই মন্ত্রীসভা গঠনের প্রাথমিক অধিকার। তাদের বিরুদ্ধে প্রবল সুযোগে অন্যরা প্রস্তাব গৃহীত হলে অন্যদলের সুযোগ আসবে। রাজস্থানে বিধান সভার ১৪ জন নির্দলীয়ের রাজনৈতিক সততাকে এবং বিরোধী দলের গঠিত ফ্রন্টে ৯২ জনের অস্তিত্ব উপেক্ষা করে চতুর্থ নির্বাচনের গণতান্ত্রিক অভিব্যক্তিকে রাজ্যপালই যে শুধু পক্ষপাত দ্বারা বিষিষ্ট করেছেন তা নয়, নূতন কেন্দ্রীয় সরকারও রাজস্থানে রাষ্ট্রপতির শাসন ঘোষণা করে অগণতান্ত্রিক কাজের মধ্য দিয়ে তাদের কার্যভার সুরু করেছেন। রাজস্থানে অবিলম্বে রাষ্ট্রপতি শাসন অবসান করে এবং বিরোধী ফ্রন্টের নেতা মাহারাওয়াল লক্ষ্মণ সিংকে মন্ত্রীসভা গঠনের দায়িত্ব দিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রত্যাবর্তন অনিবার্য। ৯২ জন বিরোধী সদস্য দলবদ্ধভাবে দিল্লীতে রাষ্ট্রপতির দরবারে হাজির হয়ে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার অকাট্যতা প্রমাণ করেছেন।

পাঞ্জাবেও রাজস্থানের পুনরাবৃত্তির উপক্রম হয়েছিল। সকল বিরোধীদল এবং ছয় জন নির্দলীয়—মোট ৫৩ জন—সংযুক্ত ফ্রন্ট গঠন করে কংগ্রেসের ৪৮ জনের (বিধান সভার মোট সদস্য সংখ্যা ১০৪ জন) চাইতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবীতে মন্ত্রীসভা গঠনের অধিকারী হলেও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মন্ত্রীসভা গঠনের উদ্যোগ চলেছিল। পাঞ্জাব বিধান-সভার স্পীকার নির্বাচনেও দলের টানাপোড়েনের নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। যুক্ত ফ্রন্টের তিনজন যুক্তফ্রন্ট নির্বাচিত প্রার্থীর বিরুদ্ধে এবং তিনজন কংগ্রেসী সদস্য তার পক্ষে ভোট দিয়ে দলীয় রাজনীতির শোচনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

আরও একটি রাজ্যে এবং একটি কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে কংগ্রেসের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছে, যদিও কংগ্রেস এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। ৮১ সংখ্যাবিশিষ্ট সভায় কংগ্রেস ৪৩জন সদস্য নিয়ে হরিয়ানায় ভগবৎদয়াল শর্মার নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা গঠনের কয়েকদিনের মধ্যেই কংগ্রেস দলে ভাঙন দেখা দেয়

হরিয়ানা বিধান সভার স্পীকার নির্বাচন কেন্দ্র করে। কংগ্রেস মনোনীত দয়া কিষেনকে পরাজিত করে ১২ জন অসন্তুষ্ট কংগ্রেসীদের সহায়তায় বিরোধীরা রাও বীরেন্দ্র সিংকে স্পীকার পদে নির্বাচিত করেছে। অতঃপর কংগ্রেসদলের ১৩ জন বিরোধীদল হরিয়ানা যুক্ত ফ্রন্টে যোগ দিয়ে এদের সংখ্যা ৪৮ জনে বর্ধিত করে দেয়। কংগ্রেসী মন্ত্রী-সভার পদত্যাগের পর হরিয়ানায় যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে।

কেন্দ্র শাসিত পণ্ডিচেরীতে অনুরূপ কারণেই কংগ্রেস মন্ত্রীসভার পতন হয়েছে। ২৯ জন সদস্য-বিশিষ্ট পণ্ডিচেরী বিধান সভায় কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা ছিল ২০ জন। কংগ্রেস মন্ত্রীসভা থেকে ২ জন এবং কংগ্রেস পরিষদীয় দল থেকে সাত জন পদত্যাগ করায় কংগ্রেস মন্ত্রীসভারও পতন হয়েছে। দক্ষিণপন্থী কমুনিষ্ট, কংগ্রেস দলত্যাগী এবং নির্দলীয়দের মিলিত শক্তিতে সংযুক্ত ফ্রন্ট গঠিত হয়েছে। এদের সংখ্যা এবং কংগ্রেস দলের সংখ্যা বিধান সভার সমান সমান হওয়ায় পণ্ডিচেরীতে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী দল এবার সংসদের নেতা নির্বাচনে একমত হয়ে শ্রীমতী গান্ধীকে ঐ পদে পুনর্বহাল করেছে। এই নির্বাচনে ঐকমত্যের লেনদেনে শ্রীমতী গান্ধীকে ডেপুটি প্রধান মন্ত্রীরূপে শ্রীমোরারজী দেশাইকে মেনে নিতে হয়েছে এবং দেশাইকেও শ্রীমতী গান্ধীর সহকারীর আসন স্বীকার করে নিতে হয়েছে। দলীয় স্বার্থের টানাপোড়েনে এই লেনদেনের মধ্যে জাতীয় স্বার্থের কোনো মহত্তম প্রতিফলন নেই। কংগ্রেসের গোষ্ঠিপ্রভাবের সমন্বয় সাধন করে নূতন লোকসভায় প্রবলতম বিরোধিতার সম্মুখীন হবার উদ্যোগই এই মিলনের পরিবেশ রচনা করেছিল।

ব্যক্তির ঐক্য মতে নীতির ঐক্য স্থাপন করবে কি না তার পরীক্ষা চলবে কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটে। কিন্তু দল রক্ষার তাগিদে কংগ্রেসের নেতৃমহলে কতটা প্রবল হয়ে উঠেছে তার পরিচয় পাওয়া গেছে শ্রীমতী গান্ধীর মন্ত্রীসভা গঠনে। ১৯ জন পূর্ণ মন্ত্রী, ১৭ জন রাজ্য মন্ত্রী এবং ১৫ জন উপমন্ত্রী—মোট ৪১ জনকে নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠনে দলীয় রাজনীতির চূড়ান্তরূপ প্রকাশিত হয়েছে। আর, এদিকে মোরারজী দেশাই-এর সভাপতিত্বে Administrative Reforms Commission সুপারিশ করেছেন ছোট ক্যাবিনেট গঠনের জন্য-জন পনের মন্ত্রী নিয়েই। সুতরাং, প্রশাসনিক সংস্কার কমিটির এই মূল সুপারিশ সম্বন্ধে মোরারজী কি করে সায় দেন সেটাও লক্ষ্য করবার মত।

উত্তর প্রদেশেও কংগ্রেস সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেস পরিষদীয় নেতা সি, বি, গুপ্তই মন্ত্রীসভা গঠন করেছেন। উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল বলেছেন বিরোধীদের সংযুক্ত-বিধায়ক দল ২৭ জন নির্দলীয়ের সমর্থন দাবী করলেও একজনের সমর্থন ছাড়া আরও কারুরটা সংগ্রহ করতে পারে নাই। উত্তর প্রদেশ বিধান সভার স্পীকার নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী জগদীশ শরণ আগরওয়াল নিকট তার প্রতিদ্বন্দ্বী গণারাম তালওয়ারের ২২৬-১৮৮ ভোটে পরাজয়ে উত্তর প্রদেশ বিধান সভায় আপাতত কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সপ্রমাণ হয়েছে। কিন্তু চরণ সিং-এর সি, বি গুপ্ত মন্ত্রী সভার যোগদানে অসম্মতিতে, উত্তর প্রদেশেও হরিয়ানা কিম্বা পণ্ডিচেরীর পুনরাবৃত্তি হবে কি না সে-সম্পর্কে শেষ কথা এখনই বলা যায় না।

কেন্দ্রে বিরোধীদের সহমতে সর্বসম্মতিক্রমে স্পীকার নির্বাচনের প্রচেষ্টা সুরু করে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী অকস্মাৎ কংগ্রেস সংসদীয় সভায় ঐ পদের জন্য সঞ্জীব রেড্ডীর নাম প্রস্তাব করে সকলকে হতবাক্ করে দেন। সঞ্জীব রেড্ডীকে মন্ত্রীসভায় ইন্দিরা গান্ধী স্থান না দেওয়াতে তার বিরোধিতাকে এবং সেই সঙ্গে কংগ্রেসের উর্ধ্বতন মহলে সিন্ডিকেটের প্রভাব খর্ব করতে চেয়েছেন কি না, বোঝা

গেল না। সিণ্ডিকেটের অপর সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত অতুল্য ঘোষ ও পাটিলের প্রভাব অক্ষুণ্ণ আছে। সঞ্জীব রেড্ডীকে স্পীকারের আসনে বসাবার মধ্যে কামরাজকেও বশ করবার কৌশল নিহিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিরোধী রাজনীতিতে অনেক পরিবর্তন দেখা গেছে। পশ্চিম বাংলার বামপন্থী কম্যুনিষ্টরা 'শোধনবাদী' দক্ষিণ পন্থী, 'প্রতিক্রিয়াশীল' বাংলা কংগ্রেস, পি, এস, পি প্রভৃতি দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে একযোগে মন্ত্রীসভা গঠনে দ্বিধাবোধ করেন নাই এবং এই মন্ত্রীসভাকে স্থায়িত্ব দানের জন্যও তারা সচেষ্ট হচ্ছেন। বিহারের জনসঙ্ঘ ও কম্যুনিষ্ট পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করেছেন। পণ্ডিচেরীতে দক্ষিণ পন্থী কম্যুনিষ্টরা দল-ভাঙা কংগ্রেসীদের সঙ্গে একত্রিত হয়েছেন। পি, এস, পি বিহারে জনসঙ্ঘ ও কম্যুনিষ্ট এবং পশ্চিম বঙ্গে কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে মন্ত্রীসভায় বসেছেন। এই ঘটনাগুলির মধ্যে বিভিন্ন বিরোধীদলের নীতি-পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। এই পরিবর্তন স্থায়ী কি না, কিম্বা আপাত-সুযোগের ব্যবহার কি না, তার উপর নির্ভর করবে ভবিষ্যৎ রাজনীতির শক্তি-বিন্যাস। নির্বাচনের পর এই আপাত মৈত্রীগুলির মেয়াদ সম্বন্ধে চূড়ান্ত নির্ণয় দেওয়া সম্ভব না হলেও এই বন্ধনের অন্তর্নিহিত বিরোধগুলি সম্বন্ধে জন-সাধারণের সজাগ ও সচেতন প্রহরার প্রয়োজন রয়েছে। ভবিষ্যৎ শক্তি-বিন্যাসের স্থায়ীত্ব দান করবে আঞ্চলিকতাবাদীদের ঐক্য। এই আঞ্চলিকতাবাদের অপসারণে বিভিন্ন দলের প্রত্যাবর্তন না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনোত্তর রাজনীতির টানাপোড়েন থেকেই যাবে।

পশ্চিম বঙ্গের নূতন খাদ্যনীতি

পশ্চিম বঙ্গের খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ নূতন সরকারের খাদ্যনীতি ঘোষণা করেছেন। পশ্চিম বঙ্গে এবার ফলনের পরিমাণ গত বছরের চাইতে ৭১০০০ টন কম এবং পশ্চিম বঙ্গ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পনের লক্ষ টন খাদ্য—১২ লক্ষ টন গম ও ৩ লক্ষ টন চাউল চেয়েছেন যদিও গতবার কেন্দ্র থেকে পাওয়া গিয়েছিল প্রায় ১৬ লক্ষ টন। এ ছাড়া নূতন আমলে বিধিবদ্ধ রেশনিং চালু থাকবে, লেভি, লেভী ও অন্তঃ লেভী কর্তন তুলে দেওয়া হবে। ধানের সংগ্রহ মূল্য মণ প্রতি ২১, ২২ ও ২৩ টাকা ধার্য্য হলেও রেশনে চাউলের দাম বৃদ্ধি করা হবে না। চাউলের দাম ধার্য হয়েছে ৩৫, ৩৬.৫০ ও ৫৮ টাকা মণ। বাধ্যতামূলক সংগ্রহের পরিবর্তে স্বেচ্ছামূলক সংগ্রহ করবে ফুড কর্পোরেশন। ধানের দাম বৃদ্ধি ও বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্যোগে সংগ্রহ সফল হবে বলে সরকার মনে করেন। সংগৃহীত ধান মেট্রিকের জন্য ২.৫০ টাকা হারে চাউল কলগুলি ভেঙে কর্পোরেশনের হাতে দেবে। ঘাটতি এবং ধরা এলাকায় সংগ্রহ সেই এলাকার জন্যই রাখা হবে এবং অন্যান্য এলাকার সংগ্রহের অন্তত এক চতুর্থাংশ সেই এলাকায় মজুত থাকবে। কিন্তু রেশনিং এলাকার বাইরে ধান চাউলের অবাধ চলাচলের ফলে সর্বত্র মূল্যস্তরে সমতা আসবে। বিধিবদ্ধ রেশনিং এলাকার এবং রাজ্যের চারপাশে কর্ডনিং বজায় থাকবে। যারা উৎপাদক নয় তাদের কাছে ১০০ মণ ধান কিম্বা তদুপযুক্ত পরিমাণ চাউল মজুত থাকলে তা ঘোষণা করতে হবে।

আভ্যন্তরীণ সংগ্রহের এবং কেন্দ্রীয় সাহায্যের উপর এই নূতন নীতির সাফল্য নির্ভর করবে; তাছাড়া খোলাবাজার থাকবে কি না সে-সম্পর্কেও খাদ্যনীতি সুস্পষ্ট নয়। মজুত নিরোধ এবং মূল্যস্তর স্থির রাখতে জনসাধারণের সহযোগিতা স্বভাবতই নূতন সরকারের প্রতি প্রসারিত হবে। খাদ্যনীতির সাফল্য এই সহযোগিতার উপর সর্বাংশে নির্ভর করছে।

অপূর্বকুমার চন্দ

গত ১৪ই মার্চ ৭৪ বছর বয়সে কৃতী শিক্ষাবিদ অপূর্বকুমার চন্দ দিল্লীতে লোকান্তরিত হয়েছেন; স্বদেশী যুগের

অন্যতম জাতীয়তাবাদী নেতা বিপিনচন্দ্রের প্রতিষ্ঠাবান আইনজীবী, কামিনীকুমার চন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র অপূর্বকুমারের ছাত্রজীবনে স্বদেশীযুগের হাওয়ার ছোঁয়াচ লেগেছিল। বিপিনচন্দ্র গভর্ণমেণ্ট স্কুলে ছাত্র থাকাকালীন 'বন্দে মাতরম' গাইবার অপরাধে তাকে কর্তৃপক্ষ ক্ষমা চাইতে বল্লে কামিনীবাবু ছেলেকে সরকারী স্কুল ছাড়িয়ে শান্তিনিকেতনে ভর্ত্তি করে দেন।

অপূর্বকুমার বিলেত থেকে ফিরে এসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারারের পদে নিযুক্ত হন এবং পরে ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসে যোগ দেন। অপূর্বকুমারই প্রথম ভারতীয় যিনি অখণ্ড বাংলার ডাইরেক্টর অফ পাব্লিক ইনস্ট্রাক্সন পদে নিযুক্ত হন; প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষরূপে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারী কলেজের অধ্যক্ষরূপে অপূর্বকুমারের ছাত্র-বাৎসল্য সুবিদিত ছিল। অপূর্বকুমার ১৯৪১ সালে পশ্চিম বঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সভাপতি হন। পরবর্তীকালে ফিল্ম সেন্সার বোর্ডের সদস্যরূপে ফিল্ম জগতের সহিত সম্পর্কিত হন।

সদা হাস্যময়, বন্ধুবৎসল, অমায়িক চরিত্রের মানুষ অপূর্বকুমার চন্দের লোকান্তরে তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি আমরা গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি ও তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। ৩০. ৩. ৬৭

সম্পাদকীয় বিজ্ঞপ্তি

জয়শ্রীর পাঠক পাঠিকারা লক্ষ্য করে থাকবেন শ্রীপবিত্র ঘোষের লিখিত ধারাবাহিক জীবনী "সুভাষচন্দ্র" গত মাসে (মাঘ ১৩৭৩) প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের সময়-সূচী ১৯২০ সনে সুভাষচন্দ্রের আই, সি, এস পাস এবং তৎপর ত্যাগ করে দেশে প্রত্যাবর্তন ও সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান থেকে সুরু করে ২য় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে ১৯৪১ এর ১৬ই জানুয়ারি দেশত্যাগ পর্যন্ত। সুভাষচন্দ্রের জীবনীর যে অংশের সাক্ষাৎভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে লেখক স্বভাবতই অক্ষম অর্থাৎ তাঁর বিলাতে পাঠ্যাবস্থা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আজাদ-হিন্দ-ফৌজ সংগঠন ও অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ঘটনা লেখক তাঁর এই জীবনীতে দেবেন না যেহেতু এসব ঘটনার সাক্ষাৎ তথ্য সংগ্রহ লেখকের পক্ষে সম্ভব নয়। ধারাবাহিক জীবনী "সুভাষচন্দ্র" পাঠক মহলে বিশেষ সমাদৃত হয়েছে এজন্য লেখককে গভীর পরিশ্রমে করে পুরোণো সংবাদপত্র, ফাইল ইত্যাদি থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। এ কাজ বিশেষ শ্রম ও সময় সাপেক্ষ। ২য় অধ্যায়ের কাজ কিছুটা অগ্রসর করার জন্য লেখককে কিছু সময় দেবার উদ্দেশ্যে ফাল্গুন, চৈত্র এই দুই মাস ধারাবাহিক জীবনী "সুভাষচন্দ্র" স্থগিত রাখা হোলো। বৈশাখ ১৩৭৪ থেকে পুনরায় প্রকাশিত হবে। আশা করি পাঠক পাঠিকাগণ আমাদের সহিত সহমত হয়ে এই ব্যবস্থাকে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করবেন।

ভুল স্বীকার

গত মাঘ মাসে "একটি অবিস্মরণীয় আত্মত্যাগ" শীর্ষক কবি গোপালচন্দ্র মজুমদারের স্মৃতিতর্পণে লেখক শ্রীগোপালচন্দ্র সেনগুপ্তের নাম ভুলক্রমে অনুল্লিখিত রয়ে গেছে এজন্য আমরা লজ্জিত এবং লেখক ও পাঠকদের নিকট ত্রুটা স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। জঃ সঃ

নির্বাচনোত্তর চতুর্থ লোকসভা

সমর গুহ

ভারতের সরল ও অধিকাংশ নিরক্ষর জনতা যে চতুর্থ নির্বাচনে দায়িত্বশীল এক অভ্যাশ্চর্য ভোটের খেলা দেখাতে পারে সেই বিশ্বাস বা প্রত্যাশা কংগ্রেস বা বিরোধী দল,—কোন পক্ষেরই ছিল না। নির্বাচনী ফলাফলে তাই দু'পক্ষেরই স্নায়ু-কম্পন সুরু হয়েছে। তিন তিনটি নির্বাচনে প্রায় সমস্ত রাজ্যে 'মনোনিধিক' ক্ষমতা লাভ করে দেশ ও কংগ্রেস, গণতন্ত্র ও কংগ্রেসরাজ এবং কংগ্রেসী শাসন ও স্বাধীনতাকে সমার্থে পরিণত করে কংগ্রেস-নেতৃত্ব যাবপাহী মনোবৃত্তির এক ক্ষমতাগর্বী ঔদ্ধত্যে আত্মম্ভরী হয়ে উঠেছিল। পক্ষান্তরে বিরোধী দলগুলির প্রধান লক্ষ্য ছিল এই ক্ষমতাগর্বীদের চ্যালেঞ্জ করে কংগ্রেসী একচ্ছত্রের মর্মমূলে আঘাত হানা। তাই এই নির্বাচনে কংগ্রেসের মুখ্য রাজনৈতিক ধ্বনি ছিল—'গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও ভারতীয় সংহতি রক্ষার জন্য কংগ্রেসকে ভোট দাও।' অন্যদিকে বিরোধী দলের 'চুনাও-কা আওয়াজ' ছিল—'কংগ্রেসকে হটাও ; দেশ বাঁচাও।'

কংগ্রেস যে ভারতীয় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও জাতীয় ঐক্যের জিম্মেদার নয় এবং জনতা যে কংগ্রেসকে ভারত শাসনের রাজকীয় সনদ দিয়ে রেখে দেয় নি,—জনতার অভিপ্রায় তথা 'সিপলস উইল'ই যে ভারতীয় সার্বভৌমিকতার উৎস,—এই নির্বাচনে ভারতীয় জনতা সুদৃঢ় প্রত্যয়ে সেকথা প্রমাণ করে দিয়েছে। ষোলটি রাজ্যের মধ্যে আটটি রাজ্যে কংগ্রেসকে পরাজিত করে এবং দিল্লীর ইউনিয়ন শাসিত এলাকায় কংগ্রেসকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে জনতা এমন এক ভোটের-বিপ্লব ঘটিয়েছে যা ভারতের মত শান্তি ও ভাগ্যবাদের দেশে খুব সহজ কাজ ছিল না। অন্যদিকে একই সঙ্গে এতগুলি রাজ্যে যথার্থই যে কংগ্রেস হটে যাবে সেই প্রত্যাশাও ছিল না বিরোধী দলগুলির সামনে। কেন্দ্রে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে—কিন্তু মাত্র ৪৮ জন অধিক সদস্যের জোরে এবং ৩৮ শতাংশ ভোট পেয়ে।

এই নির্বাচনের ফলাফলে বিদেশে, দেশে ও ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। যে বিদেশীরা এতদিন কংগ্রেসকে ভারতীয় গণতন্ত্রের অনড় ও স্থায়ী স্তম্ভ বলে মনে করেছিল, তারা তাই কংগ্রেসের পতন-পতনে ভারতে গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতির আসন্ন পতনের আকস্মিকতা বলে আশঙ্কা করছে। ভারতীয় জন মন কংগ্রেসের রাজকীয় ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধতায় উল্লাসে উদ্বেল হয়ে উঠেছে। কংগ্রেস যে জনমতকে পোষকতা করার প্রয়োজনীয়তা বিস্মৃত হয়েছিল, জনতা ক্ষমতাগর্বী কংগ্রেসকে এক চরম শিক্ষা দিয়ে এক উন্নসিত মুক্তির আস্বাদ অনুভব করছে। আর বিরোধী দলগুলি অপ্রত্যাশিত বিজয়ের সঙ্গে অপ্রস্তুত মন নিয়ে ছয়টি রাজ্যে এবং দিল্লীর কেন্দ্রীয় অঞ্চলে শাসনভার গ্রহণ করেছে।

কিন্তু এবারের নির্বাচনী জয়-পরাজয়ের মৌলিক তাৎপর্য কি? ভারতীয় গণতন্ত্রের এই নয়া পদযাত্রার লক্ষ কোথায়? এই মূল প্রশ্নের উৎস সন্ধানে বলিষ্ঠ উত্তরের যে দু'পক্ষেই অভাব রয়েছে চতুর্থ লোকসভার গতি-প্রকৃতিতে তার লক্ষণ সুস্পষ্ট।

ভারতীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতির কাঠামে যে এক প্রচণ্ড স্নায়ু-কম্পন সুরু হয়েছে চতুর্থ লোকসভার মনোবৃত্তি ও ফলাফলে তার ইঙ্গিত অস্পষ্ট নয়। কংগ্রেস আজ আত্মার সংকটে চরমভাবে নিমজ্জিত। কংগ্রেসের নেতৃত্ব ও ভবিষ্যতের প্রতি কংগ্রেসীদের মূল আস্থাই শিথিল হয়ে গেছে। তারই ফলে হরিয়ানা ও পণ্ডিচারীতে কংগ্রেস সংখ্যাধিক্য লাভ করে এবং সরকার গঠনে উদ্যোগী হয়েও এক দল কংগ্রেসীর

বিদ্রোহের ফলে এই অঞ্চল দুটিতে কংগ্রেসের হাত থেকে শাসন ক্ষমতা ছিটকে গিয়ে বিরোধী পক্ষের কবলে চলে গেছে। ভারতীয় গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য কংগ্রেস কোন্ বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করবে—সে সম্পর্কেও এই দলের নেতৃত্ব কোন দৃঢ় পদক্ষেপ করতে পারে নি। লোকসভার আপাতদৃষ্টিতে কংগ্রেস বিরোধী দলের সঙ্গে একটি বোঝাপড়া করে চলার নীতি অনুসরণের চেষ্টা করছে। কিন্তু কংগ্রেসের এই নীতি যে আন্তরিক ও প্রত্যয়-ভিত্তিক—সে কথা বাস্তব আচরণে কংগ্রেস বিরোধী দলের কাছে প্রমাণ করতে পারে নি।

যে নীতি অনুযায়ী দুটি রাজ্যে বিরোধী সরকার গঠনে কংগ্রেস কোন বাধা দেয়নি—সেই নীতির ঠিক বিপরীত আচরণ অনুসরণ করে রাজস্থানে কংগ্রেস নেতৃত্ব, কংগ্রেসী সরকার গঠনের লজ্জাকর প্রচেষ্টা করে এই রাজ্যে এক চরম আইন শৃংখলার সমস্যা সৃষ্টি করেছে। রাজস্থানে সংযুক্ত বিরোধী দল যে সংখ্যাগরিষ্ঠ—রাষ্ট্রপতির কাছে বিরোধী সদস্যেরা দলবদ্ধভাবে মিছিল করে সেকথা প্রমাণ করে দিয়েছে। ফলে রাজস্থানে আজ অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। উত্তর প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যালঘু হয়েও রাজ্যপালের চক্রান্তের ফলে ক্ষমতাসীন হয়েছে। রাজস্থান ও উত্তর প্রদেশের এই ঘটনা লোকসভায় কংগ্রেস ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে এক প্রবল অবিশ্বাসের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে,—যার পরিণামে চতুর্থ লোকসভার সূচনাতেই বিরোধী পক্ষ রাষ্ট্রপতির ভাষণ বয়কট করা এবং পাঁচদিনের সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব আনার সরকার-বিরোধী কার্যক্রম গ্রহণে বাধ্য হয়েছে।

লোক সভায় যথেষ্ট সংখ্যার ভারী বিরোধী পক্ষের সঙ্গে 'সমঝোতা করে শাসন পরিচালনার' নীতি উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী একটি বৈঠকের আয়োজন করেন এবং সম্মিলিত ভাবে লোক সভার স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচনের প্রস্তাব করেন। বলা হয় যে সর্বসম্মতিক্রমে কংগ্রেস থেকে স্পীকার এবং বিরোধী পক্ষ থেকে ডেপুটি স্পীকার মনোনীত করা হবে। কিন্তু দলের আভ্যন্তরীণ ভার-সাম্য রক্ষার জন্য বিরোধী পক্ষের মতামত যাচাই না করে কংগ্রেস শ্রীসঞ্জীব রেড্ডির ন্যায় একজন পোড়া কংগ্রেসী নেতা,—যাকে মন্ত্রীত্বে নেওয়া সম্ভব হয়নি বলেই—বিরোধী পক্ষকে আগাম কোন সূচনা না দিয়ে স্পীকার মনোনীত করা হয়েছে। তার সঙ্গে বিরোধী পক্ষ থেকে ডেপুটি স্পীকার করার কংগ্রেসী 'অফার' এখন কার্যক্ষেত্রে মূল্যহীন হয়ে গেছে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়েও কংগ্রেসের অভ্যন্তরে এবং বিরোধী পক্ষের সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে। কংগ্রেস তিনটি বিরোধী দল কর্তৃক প্রস্তাবিত শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণকে গ্রহণ করতে রাজী নয়। কারণ শ্রীজয়প্রকাশ প্রাক্তন সোস্যালিষ্ট এবং সংকীর্ণ দলের স্বার্থক বা গোষ্ঠী সমর্থক নয়। স্বাস্থ্যের অজুহাত পেশ হওয়া সত্ত্বেও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, ডঃ রাধাকৃষ্ণানকে দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি মনোনয়নে রাজী নয়, —কারণ বর্তমান রাষ্ট্রপতি স্বকীয় ব্যক্তিত্বে বৈশিষ্ট সম্পন্ন এবং কংগ্রেসী নীতি ও শাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে 'ক্রিটিক্যাল'। পক্ষান্তরে পরাজিত কাবরাজগোষ্ঠী ডঃ রাধাকৃষ্ণানের দ্বিতীয় নির্বাচনের পক্ষপাতী। সমগ্র ভারতের লোকসভা ও আইন সভার সদস্যের মধ্যে কংগ্রেসীদের মাত্র সামান্য সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও ভারতের রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার সর্বোচ্চ আসন সম্বন্ধে একটি সঠিক বোঝাপড়ার মনোভাব প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার মধ্যে এখনও দেখা যায় নি।

লোকসভায় কংগ্রেসী দলের সংহতিও এক আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান। একথা কারও অজানা নয়, যে লোকসভা নির্বাচনে ইন্দিরা-নেতৃত্বের বিরুদ্ধে শতকরা ৬২ ভোট দাতা অনাস্থা জ্ঞাপন করলেও, প্রাক-নির্বাচনী ১৩ মাস ভারতীয় জনজীবন এক অভূতপূর্ব অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলায় বিপর্যস্ত হলেও এবং আটটি রাজ্য ও একটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে কংগ্রেসী পরাজয়ের মাধ্যমে ইন্দিরা

নেতৃত্বের লোচনীয় ব্যর্থতা প্রমাণিত হলেও,—নিতান্ত ঘনঘন ক্ষমতা হস্তের 'পাবলিসিটি'র জন্যই যে ইন্দিরা-নেতৃত্ব প্রধান মন্ত্রীত্বের গদী পুনরায় লাভ করতে সমর্থ হয়েছে, সেকথা লোকসভা মহলে বিশেষ কোন গোপনীয় তথ্য নয়। চ্যবন-মোরারজী দ্বন্দ্ব এবং ডি পি মিশ্রের ইন্দিরা সমর্থন ও অতুল্যের সঞ্জীব রেড্ডি-বিরোধী গোষ্ঠির কূটচক্রের ফলেই যে ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে পুনরায় গদী লাভ করা সম্ভব হয়েছে —সেকথাও সুবিদিত। শ্রীমোরারজী দেশাই যে উপ প্রধান মন্ত্রীর গদী পাঁচ বছরের স্থায়ীপদ হিসেবে গ্রহণ করেননি,—সেকথাও লোকসভা মহলে অজানা নয়।

আর্থিক জীবনে বিপর্যস্ত জনমনের বিক্ষোভের গভীরতা যে কতখানি,—এবারের ভোট-যাদুর বিস্ময়ের গুরুত্ব যে কত তাৎপর্যপূর্ণ, কংগ্রেস দল যে সেকথা এখনো অনুভব করেনি, সেকথা রাষ্ট্রপতির ভাষণে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভারতের ফেডারেল গঠনতন্ত্র যে আকস্মিক ও বিপুলভাবে এক অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে বিশবছরের ক্ষমতার মনোপলী ভোগ করে কংগ্রেস এখনও তা উপলব্ধি করেনি। কেন্দ্রের কংগ্রেসী শাসনের সঙ্গে রাজ্যের বিরোধীপক্ষের যে অন্তঃসংঘাত সৃষ্টি হতে বাধ্য এবং এরূপ সংঘাত সৃষ্টি করার জন্য বিশেষানুগত একটি দল যে দায়ী তৎপর,—সে সম্বন্ধেও কংগ্রেসী নেতৃত্বের সচেতনতা প্রকাশ পায়নি রাষ্ট্রপতির ভাষণে। গভর্নমেন্টের রাজ্যপালের অফিস, ন্যাশন্যাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল এবং আঞ্চলিক কাউন্সিল গুলি যে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় ও সংহতির সম্পর্ক স্থাপনে পর্যাপ্ত নয়—কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সেকথা অনুধাবন করেনি বলে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে স্থিতি রক্ষার নতুন কোন পদ্ধতি উদ্ভাবনের ইংগিত দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার। ১৯৭১ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা, মূল্যবৃদ্ধির গতিরোধ, ১৯৭৬ সালের মধ্যে বিদেশী সাহায্য গ্রহণ বন্ধ করার জন্য আর্থিক প্রগতির ঘোষণা এবং হাওয়ার ৩০ থেকে অন্যূন ২৫ সংখ্যায় নামিয়ে আনার যে চতুর্দশ লক্ষ্য কংগ্রেস রাষ্ট্রপতির ভাষণের মাধ্যমে ঘোষণা করেছে,—তা' ভারতীয় আর্থিক সংকট বোধ এবং আর্থিক প্রগতির স্বপক্ষে নিতান্তই এক সক্ষম ও লঘু ঘোষণা মাত্র।

এই ঘোষণা যে কার্যকরী হবে না,—সেকথা ভাষার মত দুর্বুদ্ধি ও মানসিক সচেতনতা এবারের নির্বাচনী আঘাতের পরেও কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে সৃষ্টি হয়নি।

অন্য দিকে বিরোধী পক্ষের মনোভাব কি? অনাস্থা প্রস্তাবের আলোচনায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চ্যবন বিরোধী পক্ষকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করেন' কংগ্রেস তো পরাজিত হলো এবং এই দলকে আপনারা হটাতে চান—কিন্তু ভারতীয় গণতন্ত্রের আধাররূপে কোন বিকল্প সংগঠন আপনারা গড়ে তুলছেন? এই অভাব বিরোধী পক্ষ দিতে পারেনি। স্বতন্ত্র, জনসংঘ, কমুনিষ্ট মোর্চার আদর্শ নৈতিক ভিত্তি সম্বন্ধেও কোন জবাব বিরোধী পক্ষের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। স্বতন্ত্র দল বিরোধী অব কোয়ালিশন সম্বন্ধে খুব মুখর হয়ে উঠেছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই কোয়ালিশন বিরোধী পক্ষে প্রযোজ্য হলেও,—স্বতন্ত্রের দৃষ্টি কংগ্রেস-স্বতন্ত্র কোয়ালিশনের দিকে। জনসংঘ আদর্শ নৈতিক সংকটে দ্বিধাগ্রস্ত। সংযুক্ত সোস্যালিষ্ট পার্টি বিরোধী দলের সাধিক সহমতির পক্ষপাতী। বামপন্থী কমুনিষ্ট দল স্বতন্ত্র ও জনসংঘের সঙ্গে কোয়ালিশন নীতিকে 'ট্যাকটিক্যাল' বলে প্রকাশ্যে আখ্যা দিয়েছে। বিরোধী পক্ষ প্রাক্তন 'কংগ্রেস হঠাও' ধ্বনিকেই প্রাধান্য দিচ্ছে লোক-সভায়—কিন্তু কংগ্রেসকে হটিয়ে কিভাবে ঐকাবদ্ধ বিরোধী সরকার গঠন সম্ভব সেই গঠনমূলক চিন্তাধারা বিরোধী পক্ষে নেই।

কংগ্রেস অর্ধাংশে পরাজিত,—আটটি রাজ্যে গদীচ্যুত,—দুইটি রাজ্যে গদী পেয়েও গদীহারা। অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা ও অনাস্থা আজ কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সুস্পষ্ট। এই লক্ষণ

দেখেই বিরোধী পক্ষের কেউ কেউ ভবিষ্যত বাণী করছেন যে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এক বছর বা দু বছরের বেশি টিকবে না। কিন্তু কংগ্রেসের বিষয় কি? বিরোধী পক্ষের মধ্যে কি আজ আদর্শ নৈতিক সংহতি গড়ে উঠবে? লোকসভার বিরোধী বহুলে এটাই আজ সবচেয়ে দুঃখ প্রশ্ন। কংগ্রেসের একটি অংশ ও স্বতন্ত্র পরস্পরকে আকর্ষণ করছে। কংগ্রেসের আরেক পক্ষ বামবাদী। জনসংঘও আদর্শ নৈতিক সংকটে নিমজ্জিত। এরাংশ চাইছে স্বতন্ত্র-জনসংঘের একীকরণ এবং কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠন। অপর পক্ষ এই নীতির ঘোর বিরোধী।

লোকসভায় বিরোধী শক্তির সংহতি সম্বন্ধে দুটি নীতি ও পথ তুলে ধরা হয়েছে। পি, এস, পি চাইছে জাতীয়তাবাদী ভূমিকায় গণতান্ত্রিক সমাজবাদী শক্তিগুলির আদর্শ নৈতিক সংহতি। পক্ষান্তরে এস, এস, পি চাইছে সমস্ত বিরোধী দলের সাময়িক ব্লক গঠন। স্বতন্ত্র দল এই পথ গ্রহণে রাজী নয়। চীনপন্থী কম্যুনিষ্টরাও এই সাময়িক ব্লক গঠনের পথ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। জনসংঘ ও রুশপন্থী কম্যুনিষ্টরা এখনও দ্বিধাগ্রস্ত। তাই লোকসভায় বিরোধী সংহতি বা ব্লক গঠনের রাজনীতি এখনও অনিশ্চিত আবর্তে বিভ্রান্ত হয়ে রয়েছে।

বামপন্থী দলগুলির মধ্যে তিনটি দলের ভূমিকা সুস্পষ্ট। স্বতন্ত্র দল কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন গঠনের দৃষ্টি নিয়ে এগিয়ে চলছে। চীনপন্থী কম্যুনিষ্টদের দৃষ্টি ভারতের বহুগুলি অঞ্চলে সম্ভব একচ্ছত্র কম্যুনিষ্ট নেতৃত্ব গড়ে তোলা এবং দলীয় সংগঠনকে বিস্তৃত ও সুসংহত করা। পি, এস, পির লক্ষ্য জাতীয়তাবাদী ভূমিকায় সমাজবাদী সংহতি। এস, এস, পির পক্ষে আদর্শ নৈতিক মানদণ্ড পুনঃ সংস্থাপিত করা সম্ভব হলেই এই সমাজবাদী সংহতির পথ সুগম হতে পারে। বিভিন্ন দলের আদর্শ নৈতিক সংহতির পরে বিরোধী দলের কো-অর্ডিনেশন গড়ে তোলা অনেক সহজসাধ্য হবে। কিন্তু বিরোধী পক্ষ সংহতির পথে এখনও বাস্তব পদক্ষেপে সক্ষম হয়নি।

ভারতীয় গণতন্ত্র আজ এক চরম সংকটের সম্মুখীন। ক্ষুরধারের উপরে দাঁড়িয়ে আছে ভারতের ভাগ্য। কংগ্রেস ও বিরোধী পক্ষ—উভয়ের মধ্যেই আজ সংহতি ও আস্থার অভাব। দু'পক্ষেই এক অনিশ্চয় সম্ভাবনায় স্নায়ু-কম্পন সুরু হয়েছে। যদি বাস্তবধর্মী ও গঠন মূলক এবং প্রবলভাবে জাতীয়তাবাদী মন নিয়ে কংগ্রেস ও বিরোধী দলগুলি চতুর্থ লোক সভাকে কার্যকরী করার জন্য অগ্রসর না হয়—তা' হলে ভারতের গণতান্ত্রিক ভাগ্যে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটবে এবং এই বিস্ফোরণে কংগ্রেস ও অকংগ্রেস উভয় পক্ষের গণতান্ত্রিক ভাগ্যই চরমভাবে বিপর্যস্ত হবে। ভারতের গণতন্ত্র আজ যথার্থই এক চরম সংকটের সম্মুখীন।

ভিয়েৎনাম

ডঃ অশোক মজুমদার

ভিয়েৎনাম নামটি দশ পনর বছর পূর্বে কাহারও প্রায় জানা ছিলনা। সুতরাং নামের ইতিহাস জানাও প্রয়োজন।

কিছুদিন পূর্বেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এক বিস্তৃত ভূখণ্ডকে ইণ্ডো-চায়না বলা হইত। বার্মা, শ্যাম (থাইল্যাণ্ড), মালয়, লাওস, কাম্বোজ (কাম্বোডিয়া), কোচিন চায়না, আনাম এবং টঙ্কিন্ ইণ্ডো-চায়নার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহাদের মধ্যে লাওস, কাম্বোজ, কোচিন-চায়না, আনাম এবং টঙ্কিন্ ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকায়, এই কয়টি দেশকে একত্র ফরাসী ইণ্ডো-চায়না বলা হইত। কোচিন চায়না, আনাম, এবং টংকিংই ভিয়েৎনাম। সংক্ষেপে কোচিন-চায়না এবং দক্ষিণ-আনাম দক্ষিণ-ভিয়েৎনাম, এবং উত্তর-আনাম এবং টংকিং উত্তর-ভিয়েৎনাম।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার পূর্বপ্রান্তে এই লম্বা দেশটির আয়তন ১২৭,৩০০ বর্গমাইল, এবং লোকসংখ্যা প্রায় ২কোটি ৪০ লক্ষ। অর্থাৎ প্রতি বর্গ মাইলে জনসংখ্যা ১৯০। প্রতিবেশী বর্মার প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যা ৭৬ ও থাইল্যাণ্ডে ১০০। বর্মার আয়তন ২৬১,৭৮৯ বর্গ মাইল, ও লোক সংখ্যা ১ কোটি ৯০ লক্ষ, থাইল্যাণ্ডের আয়তন ২০০,১৪৮ বর্গমাইল, ও লোকসংখ্যা প্রায় দুই কোটি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে—আয়তনে ছোট হইলেও, লোকসংখ্যার দিক দিয়া দেখিতে গেলে ভিয়েৎনামের গুরুত্ব এই অঞ্চলে সর্বাধিক।

• • •

ভিয়েৎনামের কথা লিখিতে গিয়া, ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী সার ইডেনী ইডেন, (বর্তমানে লর্ড এডন) লিখিয়াছেন :

'As its name implies, Indo-China is the meeting-place of two civilisations. The ancient Hindu temples of Angkor, in Cambodia, contrast with the predominantly Chinese culture of Annam and Tokging. The line of demarcation has ebbed and flowed : the political reality has not changed. China and India confront one another in these disputed lands as surely as in Tibet, if less obviously. This was the underlying truth in Vietnam, Laos and Cambodia. ১

ইহাই ঐতিহাসিক সত্য; সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া ইহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াই, যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েৎনামে অশান্তির দাবানল জ্বালাইয়া রাখিয়াছে।

• • •

প্রাচীন কালে দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ার যে কয়টি হিন্দু সাম্রাজ্য গড়িয়া ওঠে, তাহার মধ্যে দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য : একটি চম্পা, আর একটি কাম্বোজ। মোটামুটি ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে বর্তমান দক্ষিণ ভিয়েৎনামই প্রাচীন চম্পা

১ Sir Anthony Eden : The Memoirs of Sir Anthony Eden, Full Circle (London 1960) pp. 78-9.

সাম্রাজ্যের ভিত্তি। চম্পার উত্তরে চীন ভিয়েৎনামের এক অংশ দখল করিয়া সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল, বর্তমানে তাহা টঙ্কিং নামে সুপরিচিত।

চম্পায় হিন্দুসভ্যতার বিকাশ কোন সময় হইয়াছিল তাহা জানা যায় না, তবে ২২০ খৃঃ চম্পা উত্তর-ভিয়েৎনাম আক্রমণ করে, এবং চীনাদের পরাজিত করিয়া এক অংশ জয় করিয়া লয়। ইহার পরবর্তী সাতশত বছরের ইতিহাসকে চম্পা ও চীনের যুদ্ধ বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি হইবে না।

চীনারা কোন সময়ে উত্তর ভিয়েৎনাম দখল করে তাহা জানা যায় না; তবে তাহারা প্রায় ১০০০ বছর এই অঞ্চলে সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল, এবং কোনো সময়ে চম্পাকে পর্যুদস্ত করিয়াছিল। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে তাং বংশের পতন আরম্ভ হইলে, চীন অধিকৃত ভিয়েৎনাম বিদ্রোহ ঘোষণা করে, এবং ৯৩৯ খৃঃ ভিয়েৎনামীরা চীনাদের দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। Ngo Quyen নামক বীর এই যুদ্ধে ভিয়েৎনামের নেতা ছিলেন, এবং চীনারা পরাজিত হইলে, তিনি আনামের বা উত্তর ভিয়েৎনামের রাজ্যপদ গ্রহণ করেন, ও প্রথম ভিয়েৎনামের রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। যাহা হউক এই বংশ বেশীদিন রাজত্ব করে নাই; কিন্তু অন্তর্বিদ্রোহ সত্ত্বেও ভিয়েৎনাম চীনের আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এমনকি চীনের পরাক্রান্ত মোঙ্গল সম্রাট, কুবলা খানও, দুইবার আক্রমণ করিয়া উত্তর ভিয়েৎনাম জয় করিতে পারেন নাই (১২৮৩ ও ১২৮৭ খৃঃ)

এই সময়ে উত্তর ভিয়েৎনামের সহিত বহুবার চম্পা ও কাম্বোজের যুদ্ধ হয়। পূর্বে বলা হইয়াছে যে কাম্বোজেও একটি শক্তিশালী হিন্দুসাম্রাজ্য গঠিত হয়। প্রাচীন কাম্বোজ দেশ বর্তমান কাম্বোডিয়া ও ভূতপূর্ব কোচিন-চায়নার এক অংশ লইয়া গঠিত ছিল। চম্পার ন্যায় এখানেও কখন হিন্দু সভ্যতা অনুপ্রবেশ করে তাহা জানা যায় না, তবে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতেই যে এদেশে হিন্দু রাজা ছিল তাহার প্রমাণ আছে। চীনা ইতিহাস মতে কাম্বোজ একসময়ে উলঙ্গ অসভ্যদের বাসস্থান ছিল, পরে একজন হিন্দু আসিয়া এই দেশে সভ্যতার বিস্তার করেন। ক্রমে কাম্বোজে হিন্দু সভ্যতা বিশেষভাবে বিস্তারলাভ করে এবং এমনও সম্রাট দ্বিতীয় সূর্যবর্মণ নির্মিত আংকোর ওয়াট (১১১৩-১১৫৫ খৃঃ) এবং সপ্তম জয়বর্মণের (১১৮১-১২১৮ খৃঃ) আংকোর থম-তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। চম্পাতেও হিন্দু স্থাপত্যের কীর্তি চিহ্ন স্বরূপ অনেক মন্দির এখনও বিদ্যমান, তবে তাহারা এত বিখ্যাত নহে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্যের সাক্ষাৎ শিষ্য শিবসোম, কাম্বোজ রাজ ইন্দ্রবর্মণের (৮৭৭-৮৮৯ খৃঃ) গুরু ছিলেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই চম্পারাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। এই সময় আনাম অর্থাৎ উত্তর ভিয়েৎনাম বিশেষ শক্তিশালী হইয়া পড়ে, এবং চম্পা আক্রমণ করে। আনামের আক্রমণ প্রতিরোধ না করিতে পারিয়া চম্পারাজ ভদ্রবর্মণ চীন সম্রাটের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন (১৪০৩ খৃঃ) চীনে সাহায্যে চম্পা কিছুকালের জন্য আনামীদের হাত হইতে রক্ষা পায়, কিন্তু ১৪৭১ খৃঃ আনামীদের হাতে চম্পারাজের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। ইহার পর ১৮২২ খৃঃ পর্যন্ত চম্পারাজ দেশের এক কোণে নাম মাত্র রাজত্ব করিতেন, এবং ঐ বৎসর আনামীদের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া, কাম্বোজে পলাইয়া যান।

প্রায় এই ভাবেই কাম্বোজ রাজ্যেরও পতন ঘটে। নবম জয়বর্মণের পর হইতে কাম্বোজের ইতিহাস ভাল জানা যায় না। ১৩৫০ খৃঃ থাই রাজ রামাধিপতি কর্তৃক অযোধ্যা (আইদিয়া) রাজ্য স্থাপিত হইবার পর হইতেই, থাই নরপতিগণ বারম্বার কাম্বোজ আক্রমণ করেন, এবং পূর্বদিক

হইতে আনামীরাও কাম্বোজ আক্রমণ করে। এইভাবে দুইটি শক্তিশালী বিবদমান রাষ্ট্রের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া হতশ্রী কাম্বোজরাজ ১৮৬৩ খ্রীঃ ফরাসীদের শরণাপন্ন হন এবং এইসময় হইতে কাম্বোজে ফরাসী আধিপত্য স্থাপিত হয়।

• • •

ভিয়েৎনামে ফরাসী অনুপ্রবেশের ইতিহাস অন্যরকম। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া চীনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ফলে স্বদেশপ্রেম ভিয়েৎনামীদের মজ্জাগত হইয়া পড়ে। এইখানে আপ্রাসঙ্গিক হইলেও, বোধহয় একটি কথা বলা প্রয়োজন: ভিয়েৎনামের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে চীন চিরকাল ভিয়েৎনামের শত্রু, আমেরিকান রাজনীতিই চীন ও ভিয়েৎনামকে বন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ করিয়াছে। মজের চীনের হাত হইতে যাহারা ভিয়েৎনামকে মুক্ত করিয়াছে তাহারাই ভিয়েৎনামের ইতিহাসে বীর খ্যাতি পাইয়াছে যেমন, লি বন (৪৩৯ খৃঃ); দ্বিতীয় লি (১৪২৭খৃঃ) প্রভৃতি। তবে উনবিংশ শতাব্দীতে যখন চীনে পাশ্চাত্য জাতি অনুপ্রবেশ করিতে এবং ক্রমে ক্রমে ইন্দো-চীনকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করে, তখন হইতেই পাশ্চাত্য-বিদ্বেষ সুরু হয়।

১৮৩৯ খৃঃ চীন সরকার ইংরাজের আফিমী আফিম্-ধ্বংস করায় ইংরেজ চীনের 'বিরুদ্ধে আফিম যুদ্ধ (Opium War' ঘোষণা করে। যুদ্ধে চীনের পরাজয় হয়, এবং নানকিং সন্ধির সর্তানুসারে ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি ভিন্ন হংকং দ্বীপটিই ইংরাজকে দিতে হয় (জুন ১৮৪২)। নানকিংএর সন্ধির অব্যবহিত পরেই, যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স, চীনের সহিত ইংরাজের ন্যায় বাণিজ্য-চুক্তির দাবী করে, এবং নানাবিধ সুবিধাজনক সর্ত আদায় করিতে সক্ষম হয়। আমেরিকা ও ফ্রান্স ইংরাজের মতন কোনো মহল দাবী করে নাই, তবে তাহারা এক নূতন চাল দিল; সন্ধির সর্তানুসারে ক্রিশ্চান মিশনারীদের অবাধে কার্য করিবার দাবী অতি কুক্ষণে চীন সরকার মানিয়া লইলেন। চীন সরকারের নির্বুদ্ধিতার দোষ দিয়া লাভ নাই, স্বাধীন ভারত সরকারও-নাগাদের সহিত মীমাংসা করিতে ডাঃ মাইকেল স্কটকে আনিয়া সম্প্রতি নাকানিচুবানি খাইয়াছেন। আসল কথা ক্রিশ্চান মিশনারি কি বস্তু, সে সম্বন্ধে এশিয়াবাসীদের ধারণা ছিল না এবং নাই।

যাহাহউক চীনে কোন অংশ করায়ত্ত করিতে না পারিলেও ফরাসী বৈদেশিক মন্ত্রী গিজো (Guizot) এই সময় হইতেই চীনের আশেপাশে, বিশেষতঃ ইন্দোচীনের একটি বন্দর অধিকার করার কথা চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তৎকালীন বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতে তাঁহার কল্পনা কার্যকরী হয় নাই।

নানকিংএর সন্ধিতে ইংরাজ তুষ্ট হয় নাই। কিন্তু ক্রিমিয়া যুদ্ধের ফলে চীনে বলপ্রয়োগ করা সম্ভব হয় নাই। ইতি মধ্যে চীনে তাইপিং বিদ্রোহ আরম্ভ হয় (১৮৫১ খৃঃ)। পাশ্চাত্য জাতিগুলি প্রথমে চীন সম্রাটকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়, সাহায্যের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইলে তাহারা বিদ্রোহীদের সাহায্য করিতে উদ্যত হন; কিন্তু নানা কারণে শেষ পর্যন্ত করে নাই। কিন্তু নানা প্রকার অছিলায় ও বলপ্রয়োগ করিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ১৮৫৬ খৃঃ চীনকে তিয়েনসিন-সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করে।[২] যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যক্ষ ভাবে না হইলেও পরোক্ষে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষ সমর্থন করে। চীন সরকার এই চুক্তিপত্র স্বীকৃতিদানে (ratification) অস্বীকার করাতে, আবার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এতদিনে দিশাহী বিদ্রোহ শেষ

২ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত Treaty of Wanghia, 3 July 1843 ও ফ্রান্সের সহিত Treaty of Whampoa, 24 October, 1844

হইয়া গিয়াছে, সুতরাং ইংরাজের পক্ষে উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্য পাঠাইতে বাধা নাই। ফলে ইংরাজ ও ফরাসী সৈন্য পিকিং অধিকার করে, এবং চীন সম্রাটের গর্ব খর্ব করিবার জন্য অপরিধ্যাত "গ্রীষ্ম-প্রাসাদ" আগুন লাগাইয়া ধ্বংস করে। (৭, অক্টোবর, ১৮৬০)। চীন পিকিং-সন্ধিতে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হয় (২৫ অক্টোবর, ১৮৬০)।

এই সময়ে ইংলণ্ড, বার্মাতেও প্রভুত্ব বিস্তার করে। প্রথমে ১৮৫২ খৃঃ রেঙ্গুন এবং দক্ষিণ বার্মা জয় করিয়া লয়। ১৮৮৬ খৃ ইংলণ্ড স্যামের (বর্তমান থাইল্যাণ্ড) সহিত একটি সুবিধাজনক সন্ধি করে। বাকি রহিল, কাম্বোজ, শ্যাম ও ভিয়েৎনাম।

• • •

ফ্রান্সের দৃষ্টি পড়িল আনামের উপর। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভিয়েৎনামের রাজসভায় ফরাসী পাদ্রিরা বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করে, কিন্তু ১৮৫৩ খৃঃ এক আইন জারি করিয়া তাহাদের দেশ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। ফলে পাদ্রিরা ফ্রান্সে ফিরিয়া যাইয়া, ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রাজনৈতিক মহলে বিশেষ আন্দোলন আরম্ভ করে। ফ্রান্সও সুদূরপ্রাচ্যে একটি শক্তিকেন্দ্র (point d'appui) স্থাপনের জন্য অনেকদিন উদগ্রীব, কারণ হংকং এবং সিঙ্গাপুর —এদিকে ভারতবর্ষ ও বর্মা—ইংরাজদের হাতে থাকিলে প্রাচ্যে ফরাসীদের কোনো প্রাধান্যই থাকে না। সুতরাং ধর্ম-প্রচার, অর্থলাভ ও শক্তিপ্রসারের প্রেরণায় ফ্রান্স ভিয়েৎনাম জয়ে প্রবৃত্ত হইল। পাদ্রিরাও অকুণ্ঠ ভাবে তাহাদের দেশের রাজনীতিকে জয় যুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। বস্তুতঃ পাদ্রিদের সহিত 'গানবোট বাহিনী'র কোনো তফাৎ নাই; উভয়েই ধর্মান্ধ, এবং বিবেকহীন। এইখানেই বিশুদ্ধ ধর্ম প্রচারক ও অন্য ধর্ম প্রচারকদের পার্থক্য।

• • •

কি উপায়ে ফ্রান্স ভিয়েৎনাম জয় করে, তাহার সম্পূর্ণ ইতিহাস এখনও জানা যায়না, কারণ ফরাসী সরকার এখন সে সময়কার সমস্ত দলীল কাহাকেও দেখিতে দেন না।

১৮৫৮খৃঃ ফরাসীরা ভিয়েৎনামে, তুরেন (Tourane) নামক বন্দরটি দখল করে। ইহাতে বিশেষ ফল না হওয়াতে ১৮৫৯ ফেব্রুয়ারী মাসে, ফরাসীরা সাইগন শহর দখল করে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামেই অধিকাংশ চাউল উৎপন্ন হয়; সুতরাং ফরাসীরা আশা করিয়াছিল যে সাইগন হইতে উত্তরভিয়েৎনামে চাউলের রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিলে, উত্তর ভিয়েৎনাম সহজেই ফরাসী সর্ত মানিয়া লইবে।

ইতিমধ্যে চীনে যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়াতে অধিক সংখ্যক ফরাসী সেনা ভিয়েৎনামে পাঠানো সম্ভব হইল, এবং তাহারা ধীরে ধীরে কোচিন-চায়নার, অর্থাৎ দক্ষিণ ভিয়েৎনামে, আপনাদের অধিকৃত এলাকার সীমানা বাড়াইতে লাগিল। এই সময়ে টংকিংএ একটি বিদ্রোহ আরম্ভ হয়, সুতরাং ভিয়েৎনামের সম্রাট (ইঁহাকে তখন আনামের সম্রাট বলা হইত) ১৮৬২,৫ই জুন তারিখে দক্ষিণ-ভিয়েৎনামের তিনটি প্রদেশ (Bien-Hoa, Gia-Dingh, এবং Dinh-Thong,) ফরাসীদের ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন; এই সূত্রে ফরাসী পাদ্রিদেরও সমস্ত দেশে অবাধে ধর্মপ্রচার করিবার সুযোগ দেওয়া হইল। ইহা ভিন্ন ফরাসীরা নানারকম বাণিজ্যের সুবিধা পাইল, এবং ভিয়েৎনাম সম্রাট অঙ্গীকার করিলেন যে ফরাসী ভিন্ন অন্য কাহাকেও তাঁহার সাম্রাজ্যের কোনো অংশ প্রদান করিতে পারিবেন না। অর্থাৎ ভিয়েৎনাম ফরাসী প্রভাবের অধীনস্থ হইল। ফলে ফরাসী অধিকৃত এলাকায় বিদ্রোহ হয়, এবং বিদ্রোহ দমন করিবার সময় ফরাসীরা আরও কয়েকটি প্রদেশ দখল করিয়া লয়।

এই সময়ে ফরাসীদের ধারণা ছিল যে মেকং নদী দিয়া চীনে পৌঁছান যায়, সুতরাং তাহারা মেকং নদীর মোহনা অধিকার করিবার জন্যই প্রচেষ্টা করে, এবং সফল হয়। ১৮৬৬ খৃঃ দুইজন ফরাসী মেকং নদী দিয়া চীনে যাইবার

চেষ্টা করে ১৮৬৮ খৃঃ তাহারা ইউনান প্রদেশে পৌঁছায়, কিন্তু দেখা গেল যে মেকং নদীতে যাতায়াতের পথে বাধা আছে যে এই পথে চীনের বাণিজ্য সম্ভার আমদানী বা রপ্তানী অসম্ভব। তখন ফরাসীরা স্থির করিল যে লাল নদীর (Red River) উপত্যকা অধিকার করিতে হইবে। ১৮৫২ খৃঃ যখন উত্তর-ভিয়েৎনামে আনামের সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়, তখন বিদ্রোহীরা ফরাসীদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। কিন্তু তখন উত্তর ভিয়েৎনাম—অর্থাৎ লালনদীর গুরুত্ব সম্বন্ধে ফরাসীদের ধারণা ছিলনা, সুতরাং তদানীন্তন ফরাসী কর্তৃপক্ষ সাহায্য করিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু ১৮৬৯ খৃঃ যখন দেখা গেল যে মেকং নদী বাহিয়া চীনে অনুপ্রবেশ অসম্ভব, তখন লালনদী এলাকা দখল করিবার জন্য ফরাসী কর্তৃপক্ষ সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু ১৮৭০ খৃঃ জার্মানীর কাছে নিদারুণ পরাজয়ের ফলে এই সময়ে কিছু করা সম্ভবপর হয় নাই। ১৮৭০ খৃঃ ফরাসী স্থানীয় কর্মচারীরা হঠাৎ আক্রমণ করিয়া আনাম সম্রাটকে হারাইয়া দেয়, এবং ১৮৭৪, ২৫ মার্চ তাঁহাকে এক নূতন সন্ধিতে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করে। নানাকারণে আনামী সম্রাট তু ডুক্ এই সন্ধির সমস্ত সর্ত মানিতে পারেন নাই; ফলে ১৮৮২ খৃঃ ফরাসীরা আবার আনাম আক্রমণ করে। প্রথম অভিযানে সৈন্য কম থাকায়, ফরাসীরা আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই। সুতরাং পরের বৎসর—১৮৮৩ খৃঃ ফরাসীরা আনাম জয় করিবার জন্য উপযুক্ত সমরবাহিনী পাঠায়। ফলে আনামীরা নিম্নলিখিত সর্তে সন্ধি করিতে বাধ্য হয়: ৬ই জুন, ১৮৮৪। ফরাসীরা "কেবল টংকিং নহে, আনামের যতদূর ইচ্ছা সামরিক ঘাঁটি বসাইতে পারিবে (১৮৭৪ এর সন্ধিতে কোচিন-চায়না সম্বন্ধে অনুরূপ অধিকার পাইয়াছিল); টংকিংএর শাসন ভবিষ্যতে ফরাসীদের কর্তৃত্বাধীনে হইবে এবং আনামের বৈদেশিক বাণিজ্য শুল্ক এবং public works ফরাসীদের দ্বারা পরিচালিত হইবে। ১৮৭৪ খৃঃ সন্ধির সর্তানুসারে, ফ্রান্স আনামীদের বৈদেশিক নীতি পরিচালনার ক্ষমতা পাইয়াছিল। সুতরাং ৮৪ খৃঃএর সন্ধিতে ভিয়েৎনাম সম্পূর্ণ-ভাবেই ফরাসীদের করায়ত্ত হইল।

এই সময়ে ভিয়েৎনাম, তিব্বত ও কোরিয়ার ন্যায়—চীনের সার্বভৌমিকত্ব স্বীকার করিত। সুতরাং ফরাসী ও ভিয়েৎনামের এই সন্ধিতে চীন আপত্তি করে; কিন্তু ফরাসীদের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, সন্ধি মানিয়া লইতে বাধ্য হয় ৯ই জুন ১৮৮৫,[৩] এখন হইতে ভিয়েৎনাম সম্পূর্ণ ভাবে ফরাসীর করায়ত্ত হইল, এবং ফরাসীরা, দেশকে তিন ভাগ করিল, টংকিং, আনাম, ও কোচিন-চায়না। কয়েক বছরের মধ্যেই বহির্জগৎ ভুলিয়া গেল, যে দেশটিকে এক সময়ে সংযুক্ত ছিল। নৃতত্ত্ববিদদের মতানুসারে ভিয়েৎনামে বিভিন্ন জাতির বাস; কিন্তু প্রায় হাজার বছর ধরিয়া ইহারা দেশকে একীকরণের চেষ্টা করিয়াছে। যখন চম্পারাজ্য ও কোচিন-চায়না শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তাহারা উত্তর ভিয়েৎনামে রাজ্য বিস্তার করিয়াছে; পরে আনাম শক্তিশালী হইলে তাহারা দক্ষিণ ভিয়েৎনাম দখল করিয়াছে। যেভাবে ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলস্ এক রাষ্ট্রে সংগঠিত হইয়াছে, ফরাসী আক্রমণ না হইলে, ভিয়েৎনামও ঠিক সেই ভাবেই একরাষ্ট্র বলিয়া গণ্য হইত।

---

৩ এই যুদ্ধে ফরাসীরা অত্যন্ত নৃশংস আচরণ করে। D.G.E. Hall লিখিয়াছেন: "He (French General Bonet) was up against Chinese regulars, but he chose to regard them as insurgents and hence beheaded all his prisoners. D. G. E. Hall: **History of South-East Asia**, p. 573

• • •

এই ভাবে ফরাসীরা ভিয়েৎনামের উপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিলেও,৪ দেশ অধিকার করিতে অনেক বাধা পাইয়াছিল। ১৮৮৫ খৃঃ হইতেই উত্তর ভিয়েৎনামে ফরাসীদের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহ আরম্ভ হয়। এক বৎসর পর (১৮৪) হুয়ের বালক সম্রাট Nam Nghia regent Ton That Thyuet এই বিদ্রোহে যোগ দেন কিন্তু ব্যর্থ হন। অতঃপর ফরাসীরা Nam Nghiকে সরাইয়া, তাহার স্থলে Dong Khanh কে সম্রাট পদে অভিষিক্ত করে। ফলে সমস্ত আনামে বিদ্রোহের আগুন ছড়াইয়া পড়ে এবং ১৮৯৬ খৃঃ পর্যন্ত বিদ্বান্ত পণ্ডিত Phan Dinh এর নেতৃত্বে উত্তর ভিয়েৎনামে বিদ্রোহ চলিতে থাকে এবং ১৮৯৭ খৃঃ ফরাসীরা অপরাজিত বিদ্রোহী নেতা De Tham এর সহিত একটি সাময়িক চুক্তি করিতে বাধ্য হয়।

ফরাসীরা কি ভাবে বিদ্রোহ দমন করিয়াছিল তাহার কিছু বিবরণ ইন্দো-চায়নার ফরাসী গবর্ণর জেনারেল De Lanessan এর বিবৃতি হইতে পাওয়া যায়। ১৮৯ খৃঃ অবসর গ্রহণ করিবার নির্দিষ্ট সময়ের দু বৎসর পূর্বেই কোশল নীতি অনুসরণ করার অজুহাতে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়। পদচ্যুত হইয়া তাঁহার অভিজ্ঞতা বর্ণনার প্রসঙ্গে De Lanessan লিখিয়াছেন :

"It seemed to me, that the burning of villages, the mass shootings, the bayonet slaughters, and the executions of notables should be replaced by other less violent procedures." ৫

ফরাসী ঐতিহাসিকদের মতে গবর্ণর-জেনারেল Paul Doumer (১৮৯৭-১৯০২) ভিয়েৎনামে শান্তি স্থাপন করেন। এই 'শান্তির' অর্থ যে এই সময় হইতে (১৯০০) পরবর্তী চল্লিশ বৎসর, ফ্রান্স ভিয়েৎনাম হইতে প্রচুর লাভবান হয়। কিন্তু ভিয়েৎনামে অন্তর্বিদ্রোহ চলিতে থাকে।

এই সময়ে ফরাসী শাসনের নমুনা একজন ফরাসী লেখক এরূপ দিয়াছেন :

If the fisherman lacks salt, he had better discard his fish, which the sun will quickly ruin……It is not rare to see a fisherman, with tears in his eyes, abandon the produce of a day's labour on the shore, simply because he did not have enough money to acquire, at its exorbitant price, the condiment he sees in abundance, a few hundred metres away, in the forbidden zone of the marshes." ৬

---

৪ ১৮৯৩ খৃঃ ফরাসীরা Laos জয় করিয়া ফরাসী-ইন্দোচায়নার বিস্তৃতি করে। ইংরাজেরা বাধা দেওয়াতে ফরাসীরা শ্যামদেশে হানা দিতে সাহস করে নাই; ২০ জুন ১৮৯৪ খৃঃ ফরাসী ও ইংরাজেরা এই এলাকায় আপন আপন শক্তির সীমারেখা স্থির করিয়া লয়।

৫ L. de Lanessan: La colonisation francaise in Indochina (Paris, 1895) p. 80 quoted by, J. Buttinger: The Smaller Dragon, (New York, 1958), p 384. Buttinger আরও লিখিয়াছেন যে: "De Lanessan was particularly incensed by the practice of beheading village notables who either did not know or refused to say which way had been taken by a group of rebels that had gone through their village. (p. 422)

৬ Pierre Gourou: Les Paysans du delta Tonkinois (Paris, 1936) quoted by Buttinger, op cit p. 424

বলাবাহুল্য Doumer আইন করিয়া লবণ তৈয়ারীকে সরকারী monopoly করিয়াছিলেন, এইভাবে অর্থ উপার্জন করিয়া শাসন ভার চালাইতেন।

• • •

১৯০৫ খৃঃ ভিয়েৎনামের নির্বাসিত নেতা Phan Boi Chou চীন হইতে প্রচার কার্য্য আরম্ভ করেন। ১৯০৪ খৃঃ তিনি জাপান যান, এবং জাপানীদের সাহায্যে ভিয়েৎনামের মুক্তির কল্পনা করেন। ১৯০৫ খৃঃ জাপান রাশিয়াকে হারাইয়া দিলে, ভিয়েৎনামে এক নবীন প্রেরণা আসে, এবং এই সময়ে ভারতবর্ষে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন তাহাদের এক নূতন পথ দেখায়। ফলে চতুর্দিকে বিদ্রোহের বহ্নি ছড়াইয়া পড়ে। এই সময়ে (১৯০৮ খৃঃ) ফ্রান্স জাপানকে ৩০০, ০০০, ০০০ ফ্রাঙ্ক ধার দেয়, এবং বিনিময়ে জাপান ফরাসী অধিকৃত এলাকার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভিয়েৎনামের বিদ্রোহী নেতা Prince Cuong De বার্লিনে গিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু ইহাতে কোন ফল হয় নাই। তৎ-সত্ত্বেও অষ্টাদশ বর্ষীয় সম্রাট Duy Tan ফরাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ফরাসীরা এই বিদ্রোহ দমন করে, এবং পরাজিত বিদ্রোহীদের হয় প্রাণদণ্ড না হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। সম্রাট Duy Tanকেও ফরাসীরা Reunion Island এ নির্বাসিত করে, এবং তাঁহার স্থলে Khai Dinhকে রাজপদে অভিষিক্ত করে। Khai Dinh এর পুত্র (Bao Dai) বাও দাই ভিয়েৎনামের শেষ সম্রাট।

ইহাতেও বিদ্রোহ শেষ হয় নাই। ১২৫ ও ১৯৩০ খৃঃ বিশেষ ভাবে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১৯৩০ খৃঃ ফরাসীরা এরোপ্লেন হইতে গ্রামে বোমা বর্ষণ করে। বোমা ফেলার অধিনায়কত্বে একটি কমিটি হিসাব করিয়া দেখেন যে কেবল ১৯৩০ খৃঃ বিনা বিচারে ৬৯৯ জন বিদ্রোহীর প্রাণদণ্ড হইয়াছে, অতিরিক্ত ৩০০০ লোককে গ্রেপ্তার, ৪৮৩ জনের প্রাণদণ্ড এবং ৫০৬ জনকে বিচার করিয়া দ্বীপান্তর কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছে। এই সময়েই ভিয়েৎনামে কম্যুনিষ্ট ভাবধারা প্রবেশ করে। কারণ জাতীয় মুক্তির আন্দোলনে একমাত্র কম্যুনিষ্ট রাশিয়া ভিন্ন আর কাহারও কাছে সাহায্য পাইবার বিন্দুমাত্র আশা ছিল না।

১৯৩০ খৃঃ বিদ্রোহ তখনকার মত বন্ধ হয়। কিন্তু এই সময়ে (১৯৩৫) Cao Dai ধর্ম সম্প্রদায় রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। ইহাদের কার্যকলাপ দক্ষিণ ভিয়েৎনামেই সীমাবদ্ধ ছিল, এবং ১৯৫৮ খৃঃ ইহাদের সভ্য সংখ্যা ছিল তিন লক্ষ। সকল রাজনৈতিক আন্দোলনের পথ ফরাসী দ্বারা বন্ধ হইবার ফলেই যে ধর্মযাজকগণ রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ক্রিশ্চিয়ান পাদ্রিদের ব্যবহারেও বৌদ্ধ ভ্রমণদের কর্মপন্থা এই নূতন ধারায় প্রবাহিত করিয়া থাকিতে পারে।

• • •

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতির আমূল পরিবর্ত্তন করে

ফ্রান্সের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দোচায়নার ভাগ্যের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। ২০ জুন, ১৯৪০, ইন্দোচায়নার গবর্ণর জেনারেল, General Catroux, নদীপথে এবং বিমানপথে যাতায়াতের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা জাপানীদের হাতে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। পরবর্ত্তী ৫০শে

আগষ্ট তারিখে ফরাসী সরকার নূতন এক চুক্তিতে ইন্দোচীনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাপানের সর্বাংগণ্য স্বার্থ (dominant interest) মানিয়া লইলেন, এবং 'সামরিক সুবিধা' দিতেও প্রতিশ্রুত হইলেন। পরিবর্তে জাপান অঙ্গীকার করিল যে তাহারা ইন্দোচীনের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবে। অতঃপর ৪ঠা এবং ২২শে সেপ্টেম্বরের দুইটি নূতন চুক্তিতে স্থির হইল যে জাপানী সৈন্য হাইফং (Haiphong) বন্দরে অবতরণ করিতে পারিবে রেলপথে চীনের অভিমুখে যাইতে পারিবে।

ইতিমধ্যে জাপান থাইল্যাণ্ডের সহিত মিত্রতা সূত্রে মিলিত হইবার জন্য দুইটি সন্ধিতে অঙ্গীকার করে ডিসেম্বর, ১৯৪০, এবং ২১ ডিসেম্বর ১৯৪১। জাপানের সাহায্যের আশায় বলীয়ান থাইল্যাণ্ড তখন দাবী করিল যে ফ্রান্স তাহার নিকট হইতে (১৯০৪ ও ১৯০৭ খৃঃ) যে সকল প্রদেশ (Lonang Prabang, Bassac, Krait (Puri) Battambang এবং Angkor) দখল করিয়াছিল, তাহা থাইল্যাণ্ডকে ফিরাইয়া দিতে হইবে।[৭] ২৩শে নভেম্বর ১৯৪০, থাইল্যাণ্ড ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, এবং যুদ্ধ আরম্ভ হয়, কিন্তু জাপানের মধ্যস্থতায় ফ্রান্স থাইল্যাণ্ডের সমস্ত দাবী মানিয়া লইতে বাধ্য হয় (১৩ই মার্চে ১৯৪১)।[৮] ফরাসী পরাক্রম পূর্বেই চূর্ণ হইয়াছিল, থাইল্যাণ্ড কর্তৃক অপদস্থ হইয়া ফরাসী মর্যাদা পূর্ব-এশিয়া হইতে লুপ্ত হইল।

২৯ জুলাই, ১৯৪১ ফ্রান্স জাপানের সহিত আর একটি সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। এই সন্ধির সর্তানুসারে ইন্দোচীনের সামরিক সংরক্ষণের জন্য ফ্রান্স জাপানের সাহায্য লইতে বাধ্য হইল, এবং এই সাহায্যদানের জন্য জাপান দক্ষিণ ইন্দোচীনায় যথেচ্ছ সামরিক বাহিনী ও উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রের, বিমানপোত ও নৌবাহিনী আনিবার ক্ষমতা পাইল। এক কথায় ফ্রান্স ইন্দোচীনাকে (কাম্বোজ ও ভিয়েৎনাম) জাপানের হাতে সমর্পণ করিয়া দিল।

ভিয়েৎনামের পরবর্তি ইতিহাস বর্ণনা করিবার পূর্বে, তাহার নেতা হো চি মিনের সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

• • •

হো চি মিনের জীবনের অনেকাংশেই এখনো রহস্যাবৃত। তাঁহার সম্পূর্ণ জীবনী এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

যতদূর জানা যায় ১৮৯০ কি ১৮৯২ খৃঃ নানদান জেলার কিম লিয়েন গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। এই জেলা বহুকাল যাবৎ স্বদেশী আন্দোলনের জন্য বিখ্যাত ছিল। হো চি মিনের পিতা চাষীর ঘরে জন্মাইলেও মান্দারিন পরীক্ষায় পাশ করেন, ও কিছুকাল এক সরকারী পদে বহাল ছিলেন।[৯]

---

৭ ফ্রান্স এই সকল প্রদেশ Cambodiaর সহিত যুক্ত করিয়া দেয়; কিন্তু Cambodia ফরাসী অধীন বলিয়াই থাইল্যাণ্ড এইগুলি ফিরাইয়া দিবার দাবী করে। আসলে বস্তুতঃ Cambodiaর অংশ; কিন্তু ১৮৬৭ খৃঃ থাইল্যাণ্ড যখন Cambodiaর উপর ফরাসী সার্বভৌমত্ব মানিয়া নেয়, তখন সন্ধির সর্তানুসারে ফ্রান্স থাইল্যাণ্ডকে Angkor দান করে, এবং পরে ১৯০৭ খৃঃ Angkor ফিরাইয়া লয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে থাইল্যাণ্ড Cambodiaর সার্বভৌমত্ব স্থাপন করিয়াছিল। বস্তুতঃ থাই অত্যাচারের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্যই কাম্বোজরাজ ফরাসী সাহায্য প্রার্থনা করেন।

৮ থাইল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সন্ধি ৯মে, ১৯৪১ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়।

৯ ফরাসী জয়ের পূর্বে মান্দারিন শ্রেণীই সমস্ত রাজকীয় পদ অধিকার করিত। ফরাসী জয়ের পর, মান্দারিনদের সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর কাজে নিযুক্ত করা হইত, কখনও কখনও বিশেষ উচ্চশ্রেণীর পদেও নিযুক্ত করা হইত, যেমন ইংরেজরা ভারতবর্ষে করিত।

পরে ফরাসী বিরোধী আন্দোলনে যোগ দান করাতে তাঁহাকে পদচ্যুত করা হয়।

এই ফরাসী বিদ্বেষী আবেষ্টনের মধ্যে হো চি মিনের জীবনের প্রথমভাগ অতিবাহিত হয়। কিন্তু তাঁহার জীবনের এই সময়কার ঘটনাবলী সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না। আনুমানিক কুড়ি বছর বয়সে, তিনি 'বা' ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়া এক জাহাজে 'বয়' হইয়া ফ্রান্সে যান। এইখানে বলা আবশ্যক যে তাঁহার আসল নাম সম্বন্ধে কিছু মতভেদ আছে। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম বোধ হয় Nguyen Van Thanh; বিদ্রোহে যোগদান করিলে তিনি Nguyen Ai Quoc (Nguyen স্বদেশপ্রেমী) নাম নেন। ১৯১১ খৃঃ তিনি হো চি মিন (প্রজ্ঞাবান হো) নাম গ্রহণ করেন।

ফ্রান্স হইতে হো চি মিন লণ্ডনে যান এবং প্রথম মহা যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডেই ছিলেন (১৯১৪—১৯১৮)। যুদ্ধের পর ফ্রান্সে ফিরিয়া আসেন, এবং এই সময়েই Nguyen Ai Quoc নাম গ্রহণ করেন। হো চি মিন ইংলণ্ডে এক হোটেলে বাসন মাজিয়া জীবিকানির্বাহ করিতেন, এখন তিনি প্যারিসে এক ফটোগ্রাফারের দোকানে কটা রিটাচিংএর কাজ গ্রহণ করিলেন। এই সময়েই তিনি ফরাসী উপনিবেশ সমূহ হইতে ফ্রান্সে আগত যুবকদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, ও সোশ্যালিষ্ট দলের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করেন।

১৯২০ খৃঃ তুর-কংগ্রেসে (Tour Congress) ফরাসী সোশ্যালিষ্ট পার্টি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায়। একদল Third International এর সহিত মিলিত হন; হো চি মিন এই দলে ছিলেন। ১৯২৩ খৃঃ হো চি মিন মস্কো যান এবং সেখানে কিছুদিন প্রাচ্য শ্রমিক বিশ্ববিদ্যালয়ে (University of the Workrs of the East) অধ্যয়ন করেন। রাশিয়া হইতে তিনি চীনে যান, এবং সেখানে কিছুকাল রাশিয়ান-পরামর্শদাতা বোরোডিনের অধীনে কাজ করেন। এই সময়ে তিনি দক্ষিণ চীনে প্রবাসী ভিয়েৎনামীদের সংঘবদ্ধ করিয়া একটি পার্টি গঠন করেন, তাহার নাম হয় Vietnam Thanh-Nien Cach-Menh Dong-Chi-Hoi (League of Vietnamese Revolutionary youth.)[১০]

১৯২৭ খৃঃ চিংকাইশেকের সহিত কম্যুনিষ্টদের বিবাদ আরম্ভ হইলে, হো চি মিন চীন ত্যাগ করেন। কিন্তু দুই বৎসর পর দক্ষিণ চীনে ফিরিয়া আসেন, এবং পরবর্তী বছরে (১৯৩০) ভিয়েৎনামের তিনটি কম্যুনিষ্ট দলকে একত্রিত করিয়া 'ভিয়েৎনাম কম্যুনিষ্ট পার্টি' (Communist Party of Vietnam) গঠন করেন।

এখন হইতে ১৯৪৩ খৃঃ পর্যন্ত হো চি মিনকে পলাতকের জীবন যাপন করিতে হয়। কখনও কখনও তিনি লুকাইয়া ভিয়েৎনামে প্রবেশ করিতেন, এবং সেখানে ফরাসী পুলিশের হাত এড়াইবার জন্য আবার তাঁহাকে চীনে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। সেখানেও নিস্তার ছিল না, কারণ চিয়াং কাই শেকের পুলিশ তাঁহার পিছনে লাগিয়াই ছিল। অবশেষে চীনা পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে, এবং কারাগারে নিক্ষেপ করে। কারাগারে সুকঠিন জীবনের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য এককালে ভঙ্গ হয়, এমন কি একসময়ে তাঁহার প্রায় মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। যাহা হউক, ১৯৪৩ খৃঃ কারাগারের বাহিরে আসিয়া তিনি আবার নবীন উৎসাহে কর্মভার গ্রহণ করেন.

---

১০ অনেকে ভিয়েৎনাম নামটিকে অর্বাচীন মনে করেন; কিন্তু বস্তুতঃ ইহা অতি প্রাচীন। খৃঃ পূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে এই দেশকে "নাম ভিয়েৎ" বলা হইত। ১৮৯ খৃঃ চীনাদের বিতাড়িত করিবার পর হইতে 'ভিয়েৎ' শব্দটি নানারূপে নাম হিসাবে 'ভিয়েৎ' শব্দটি নানা ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৮০২ খৃঃ এক সরকারী ঘোষণায় 'ভিয়েৎনাম' শব্দটিই ব্যবহার করা হয়।

এবং হো চি মিন নামে নবগঠিত Vietnam Doc Lap Dong Minh Hoi (সংক্ষেপে Viet Min অথবা Independence League) নামক সংযুক্ত পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এই ভিয়েৎমিন দলই ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ খৃঃ ভিয়েৎনামকে, গণতন্ত্র (Democratic Republic of Vietnam) বলিয়া ঘোষণা করে, এবং হো চি মিনকে রাষ্ট্রপতির President পদে বরণ করে।

• •

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে যুক্তরাষ্ট্র (U. S. A.) ভিয়েৎনামকে কোনো প্রকার গুরুত্ব দেয় নাই। ১৯৪০-এর জুন মাসে যখন জাপানীরা ফরাসীদের ভিয়েৎনাম আক্রমণের ভয় দেখাইতেছিল, তখন ভিয়েৎনামের গবর্নর জেনারেল জাপানীদের বাধা দিবার জন্য ১২০টি বিমান ও বিমান বিধ্বংসী কামান যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে প্রার্থনা করেন। যুক্তরাষ্ট্র এ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন, ও ফরাসীদের অনুনয়ের উত্তরে একবাক্যে জাপানীদের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে উপদেশ দেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কালীন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, রুজভেল্ট মনে করিতেন যে ফরাসী সরকার তথা জাতি জার্মানদের বিরুদ্ধে তাহাদের কর্তব্য পালন করিতে পারে নাই; এবং তিনি যুদ্ধান্তে তাহাদের উপনিবেশগুলি ফিরাইয়া দিবার বিরোধী ছিলেন; কিন্তু তিনি ফরাসীর এশিয়াস্থিত উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা দিবার পক্ষপাতীও ছিলেন না। ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫ একটি সাংবাদিক বৈঠকে নিম্নলিখিত বক্তৃতা দেন :

"The first thing I asked Chiang was, 'Do you want Indo-China? He said, It's no help to us. They are not Chinese. They would not assimilate into the Chinese people.' I said 'What are you going to advocate? It will take them a long time to educate for self-government." ১১

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের পুত্র লিখিয়াছেন যে তাঁহার পিতা কাসাব্লাঙ্কা (Casablanca) কনফারেন্সে যাইবার পথে বলেন :"

The native Indo-Chinese have been so flagrantly down-trodden that they thought to themselves: Anything must be better than to live under French colonial rule! ...Don't think for a moment...that Americans would be dying tonight if it had not been for the shortsighted greed of the French, the British and the Dutch."

আর বছর দুই বাঁচিয়া থাকিলে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট নিশ্চয়ই তাঁহার মত পরিবর্তন করিতেন, এবং অকপটে স্বীকার করিতেন যে বর্তমানে আমেরিকানদের অতিসোভাই, তাহাদের সৈন্যদের মৃত্যুমুখে ঠেলিয়া দিতেছে। তবে ইহার জন্য প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের যে কোনও দায়িত্ব ছিল না তাহা বলা যায় না। প্রথমতঃ পাশ্চাত্য উপনিবেশের উৎপীড়িত জাতিদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দানের তিনি পক্ষপাতি ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধোত্তর বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব স্থাপনই ছিল তাঁহার কূটনীতির মূল উদ্দেশ্য। এই বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ডি গলের (De Gaul) সাক্ষ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯৬০ জুন মাসে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া ডি গল যুক্তরাষ্ট্রে যান, এবং সেখানে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সহিত দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের সুযোগ ভোগ। এই সম্বন্ধে ডি গল লিখিয়াছেন :

---

১১ Robert Scheer : How the United

"During our meetings, he (Roosevelt) avoided any reference to immediate issues, but permited me to glimpse into the political objectives he wished to achieve through victory His conception seemed to me an imposing one although disquieting for Europe and for France. It was true that the isolationism of the United States was, according to the President, a great error now ended. But passing from one extreme to the other it was a permanent system of intervention that he intended to institute by international law. In his mind, a four-power directory—America, Soviet Russia, China and Great Britain—would settle the world's problems. A parliament of the allied nations would give a democratic appearance to the authority of the 'big four.' But short of handing over the quasi-totality of the earths' surface to the other three, such on organisation, according to him, would have to involve the installation of American forces on bases distributed throughout the world and of which certain ones would be located in French territory," ১২

ফরাসী ইন্দোচায়না (কাম্বোডিয়া, লাওস, ও ভিয়েৎনাম) সম্বন্ধে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের অভিপ্রায় ছিল যে একটি আন্তর্জাতিক গোষ্ঠি এই এলাকায় শাসনভার গ্রহণ করিবে। কিন্তু তাঁহার অকালমৃত্যুতে এই সংকল্পের প্রতি কেহই মনোযোগ দেয় নাই। কিন্তু তাঁহার বিপ্লবী ক্ষমতার মোহ যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির মূলমন্ত্র হইয়া···রহিয়া গেল; অথচ প্রেসিডেন্টের উত্তরাধিকারীগণ তাঁহার মানসিক ঔদার্য্য এবং নৈতিক সংস্কারগুলি পাইলেন না; ফল হইল ভয়াবহ।

• •

পূর্বে বলা হইয়াছে যে হো চি মিন ১৯৪১ খৃঃ পর্যন্ত চীনের কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। চীন সরকার ভিয়েৎনামে একটি প্রবল জাপানী বিরোধী দল সৃষ্টি করিতে অপারগ হইয়া ঐ বৎসর হো চি মিনকে মুক্তি দেন, এবং তিনি একটি শক্তিশালী দল গঠন করিতে সমর্থ হন। এই সময়ে তিনি চীনাদের নিকট হইতে অর্থ ও আমেরিকার নিকট হইতে নানাবিধ অস্ত্র সাহায্য রূপে প্রাপ্ত হন। এইখানে দ্রষ্টব্য এই যে, হো চি মিন যে কমুনিষ্ট, এবং তিনি যে তাঁহার দল 'ভিয়েৎমিনকে' শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছেন, ইহা চীন ও যুক্তরাষ্ট্র সরকার ভালভাবেই জানিতেন। তথাপি তাঁহারা হো চি মিনকে সাহায্য করিতেন, কেন না, হো চি মিন এবং তাঁহার ভিয়েৎমিন দল ভিন্ন অপর কোন নেতা বা দল, জাপানের বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জন করিবে এমন আশা ছিল না।

বোধ হয় ১৯৪৪, অক্টোবর মাসে হো চি মিন চীন হইতে ভিয়েৎনামে প্রত্যাবর্তন করেন। পরবৎসর ৯ই মার্চ জাপানীরা ফরাসী সেনাবাহিনীকে নিরস্ত্র করিয়া আটক করে, এই দিন হইতেই ভিয়েৎনামে ফরাসী শাসনতন্ত্রের অবসান হইল বলা যাইতে পারে। দুই দিন পরে (১১ই মার্চ) সম্রাট বাও দাই ভিয়েৎনামের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, তবে কার্যতঃ জাপানীদের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন, এবং ভিয়েৎনামে অনেক রাজনৈতিক নেতা প্রকাশ্যে জাপানীদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। হো চি মিন ইহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন না।

২৪ মার্চ ১৯৪৫ তারিখে জেনারেল (বর্তমানে

States got involved in Vietnam. A Report of the center for the Study of Democratic Institutions. p. 4.

১২ The complete War Memoirs of Charles de Gaul, Simon and Schuster, New York, 1954, p, 573.

প্রেসিডেন্ট) ডি গলের অধিনায়কত্বে ফরাসী সরকার একটি ঘোষণায় ভিয়েৎনামকে স্বাধীনতার প্রলোভন দেখান। ভিয়েৎনামীরা এই ঘোষণায় কর্ণপাত করেন নাই, এবং জেনারেল ডি গলের আত্মজীবনে পাঠে জানা যায় যে এই সময়ে ফরাসী উপনিবেশ গুলিকে স্বাধীনতা দিবার কোনো প্রকার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না।[১৩] তবে এই সময়ে আমেরিকানদের সাহায্য পাইলে, হয়ত ফ্রান্স ইন্দোচায়নায় জাপানীদের বাধা দিতে পারিত, কিন্তু ডি গলের অনুরোধ সত্ত্বেও আমেরিকানরা স্বাধীন ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে ফরাসীদের সাহায্য করিতে রাজি হয় নাই। পরে অবশ্য আমেরিকানদের মত পরিবর্তিত হয়।

সম্রাট বাও দাই সরকার, সংযুক্ত ভিয়েৎনামের জন্য একটি constitution প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন (৮ মে, ১৯৪৫); ফরাসী শাসকদের পরিবর্তে ভিয়েৎনামীদের রাজ কার্যে নিযুক্ত করেন; ফরাসী ভাষার পরিবর্তে ভিয়েৎনামী ভাষা (Quoc Ngu) রোমান হরফে চালু করেন, এবং নানাবিধ অত্যাবশ্যক শাসন সংস্কার করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু দেশ যুদ্ধে বিধ্বস্ত হওয়ায় বিশেষ কার্যকরী হইতে পারেন নাই।

১৯৪৫, ৭ আগষ্ট তারিখে আমেরিকানরা হিরোশিমায় আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে। সেই দিনই হো চি মিন, গিয়াপের (Vo Nguyen Giap)[১৪] অধীনে "স্বাধীনতার সৈন্যদল" (Army of Liberation) সৃষ্টি করেন। এই সময়ে ভিয়েৎমিন কর্তৃক 'জাতীয় কংগ্রেস' সম্মিলিত হয় এবং Committee for the Liberation of the Vietnamese People" সৃষ্ট হয়। ১০ই আগষ্ট (১৯৪৫) জাপান আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করিলে ভিয়েৎমিন বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কয়েকদিন পরে (১৪ই আগষ্ট) দক্ষিণ ভিয়েৎনামে দক্ষিণ এবং বামপন্থীদল মিলিয়া একটি 'যুক্ত জাতীয় দল' গঠন করেন। ১৫ই আগষ্ট জাপান আত্মসমর্পণ করে, ও পরদিন সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেয়।

১৭ই আগষ্ট তারিখে হ্যানয় (Hanoi) সহরে ভিয়েৎমিন নেতাগণ প্রকাশ্যে আন্দোলন সুরু করেন, এবং ভিয়েৎমিনের পতাকা উত্তোলন করেন। জাপানীরা তাহাদের কিছু অস্ত্রশস্ত্র দেয়। ভিয়েৎমিন দল সরকারী বাড়ী গুলি দখল করে, এবং কয়েকদিনের মধ্যে বিনা যুদ্ধে উত্তর ভিয়েৎনাম নিজেদের করায়ত্ত করে। সম্রাট বাও দাইর প্রধান মন্ত্রী[১৫] তর পাইয়া পদত্যাগ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, এবং তাঁহার অধীনস্থ টংকিং সরকার হো চি মিনের সহিত যোগদান করেন।

২১ শে আগষ্ট তারিখে হো চি মিন হ্যানয়তে আসেন; পরদিন বাও দাই তাঁহার প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেন, এবং হ্যানয়ের ভিয়েৎমিন নেতাদের নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করিতে আহ্বান করেন। সাইগনের ভিয়েৎমিন নেতাগন ইহাহার আর্থি করিয়া প্রচার করেন যে হ্যানয় সরকার যুক্তশক্তি (ইংরাজ, ও আমেরিকার) পৃষ্ঠপোষকত্ব লাভ করিয়াছে, এবং তাঁহারা 'দক্ষিণের কমিটি' Committee of the South) স্থাপন করেন। হ্যানয় সরকারের প্রতিপত্তি ও জন সমর্থন দেখিয়া পূর্বোক্ত 'যুক্ত জাতীয় দল' ভিয়েৎমিনের আনুগত্য স্বীকার করে। ফলে ২৩ আগষ্ট তারিখে বাও দাই রাজপদ ত্যাগ করেন, এবং হ্যানয় সরকার, অর্থাৎ ভিয়েৎমিন, বা হো চি মিনের হাতে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করেন। পরদিন (২৪ আগষ্ট), হ্যানয় সরকারের অনুগত কম্যুনিষ্ট পরিচালিত "Provisional Executive Committee of South Vietnam" স্থাপিত হয়। এইভাবে

১৩ The complete War memoirs of Charles de Gaul pp. 655-85৫, 910-11.

১৪ গিয়াপ পূর্ব জীবনে কলেজ অধ্যাপক ছিলেন।

১৫ প্রধান মন্ত্রীর নাম Tran Trong Kim.

আপানের পরাজয়ের দশ দিনের মধ্যেই ভিয়েৎমিন বিনাযুদ্ধে সমস্ত দেশটিকে আপনার অধীনে আনে।

২৯ আগষ্ট (১৯৪৫) হানয়ে একটি অস্থায়ী সরকার (Provisional Government) গঠিত হয়, এবং হো চি মিন তাহার প্রেসিডেন্ট হন। ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে হো চি মিন ভিয়েৎনামকে স্বাধীন ও গণতন্ত্র (Democratic Republic) ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় হো চি মিন American Declaration of Independence হইতে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি উদ্ধৃত করেন :

All men are created equal. They are endowed by their creator with certain unalienable rights, and among these are life, liberty and the pursuit of happiness."

বর্তমানে আমেরিকানরা বলেন যে হো চি মিন আমেরিকানদের ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু এই উক্তির স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ নাই। বরঞ্চ এই সময়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, যে তখন আমেরিকানদের প্রতি, এশিয়ার অন্যান্য প্রপীড়িত জাতির ন্যায়, ভিয়েৎনামও অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিত। অল্পকালের মধ্যেই এই ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইল।

* * *

ভিয়েৎনামীরা আশা করিয়াছিল যে মিত্রশক্তি তাহাদের স্বাধীনতা মানিয়া নিবে। কিন্তু সে আশা নিষ্ফল হইল। Potsdam চুক্তি অনুসারে ১৬ অক্ষাংশের (Sixteenth Parallel) উত্তরে জাপানী সৈন্যদের হটাইয়া চীন সৈন্যরা আসিল এবং দক্ষিণে ইংরাজ সৈন্য দেশ দখল করিল (১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫)। ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫ ফরাসী সৈন্য ইংরাজের জাহাজে আসিয়া ভিয়েৎনামে অবতরণ করিল। ফরাসীরা আবার ভিয়েৎনাম জয় করিতে আরম্ভ করিল, এবং এই দুর্ভাগা দেশে একমাস শান্তির পর আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল; যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নাই।

আমেরিকানরা ইংরাজের মত ফরাসীদের প্রথমে প্রত্যক্ষ সাহায্য না করিলেও, পরোক্ষে করিয়াছিল। আগষ্ট মাসে ডি গলকে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান বলিয়াছিলেন : "In any case my Government (U. S. A.) offers no opposition to the return of the French Army and authority in Indo-china."[১৬] ডি গলের বই পড়িয়া মনে হয় যে তিনি ইংরেজ সৈন্যের ইন্দোচায়নায় উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় মনে করেন নাই, এবং আমেরিকার সহায়তায় শীঘ্রই ইংরেজ সৈন্যদের ইন্দোচায়না হইতে বিদায় করিতে পারিয়াছিলেন। ইংরাজরা ভিয়েৎনাম দখল করিতে একদল ভারতীয় সৈন্যও পাঠায়, কিন্তু পণ্ডিত নেহেরু প্রবল আপত্তি করাতে তাহাদের ফিরাইয়া আনিতে বাধ্য হয়। ইংলণ্ডেও ইংরাজের ইন্দোচায়না নীতির বিরুদ্ধে প্রবল সমালোচনা হয়; এবং অল্পদিন পরেই ইংরাজ সৈন্য ইন্দোচায়না হইতে ফিরিয়া আসে।

এই সময় চীন সরকারও ভিয়েৎনামের পক্ষ অবলম্বন করেন, এবং ফরাসীদের ইন্দোচায়নায় পুনঃপ্রবেশের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। চীনাদের স্বপক্ষে আনিবার জন্য ফরাসীরা এক নূতন চাল চালিল। পুরাতন সন্ধিগুলির সর্ত অনুসারে, ফরাসীদের চীনে অনেকরকম অধিকার ছিল। ফরাসী সরকার এখন সমস্ত অধিকার ত্যাগ করিলেন, এবং বিনিময়ে চীন সরকার চীনা সৈন্যদের উত্তর ভিয়েৎনাম হইতে সরাইয়া নিলেন এবং পরোক্ষে ইন্দোচায়নায় ফরাসীদের দাবী মানিয়া নিলেন (২৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬)।

এইবার হো চি মিন বিষম বিপদে পড়িলেন। তিনি এতদিন চীনাদের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি চীনাদের সাহায্যলাভের আশায় ভিয়েৎনামের কমুনিষ্ট পার্টিকে ভাঙিয়া অন্যান্য পার্টির সহিত মিলিত

১৬ The Complete War Memoirs of General de Gaulle 1910-46, p. 910.

করিয়া মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার মন্ত্রীসভার বাস্তবিক পক্ষে চীনাদের মনোনীত বা সমর্থিত কয়েকজন মন্ত্রীও ছিলেন। এই সময়ে চীন সরকার হাত গুটাইয়া লওয়াতে, ফরাসীদের সহিত আপোষ মীমাংসা করা ভিন্ন গত্যন্তর রহিল না। সুতরাং হো চি মিন প্রস্তাব করিলেন যে অল্প সংখ্যক ফরাসী সৈন্য উত্তর ও মধ্য ভিয়েৎনামে থাকিতে দেওয়া হইবে, পরিবর্তে ফরাসীরা ভিয়েৎনামের ভবিষ্যতে পূর্ণ স্বাধীনতার সম্বন্ধে ভিয়েৎনামী নেতাদের সহিত আলোচনা করিবেন, এবং যতদিন এই আলোচনা চলিবে ততদিন ফরাসী সৈন্য ভিয়েৎনামে থাকিতে পারিবে।

ফরাসীরা প্রথম এই প্রস্তাবে রাজি হইল না। তাহারা নরমপন্থী ভিয়েৎনামী নেতাদের লইয়া ফরাসী সরকারের অনুকূল একটি মন্ত্রীসভা গঠনের চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল, কারণ হো চি মিনের বিরোধী দলের নেতাও ফরাসীদের সহিত একত্র রাজ্য পরিচালনা করিতে অস্বীকার করিলেন।

৬ই মার্চ ১৯৪৬ হো চি মিন, ফ্রান্সের সহিত একটি সন্ধির খসড়ায় (preliminary convention) সহি করিলেন। হাইফং (Haiphong), হানয় ও আরও কয়েকটি উত্তর ভিয়েৎনামের শহরে ফরাসী সৈন্যদের প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল, ফ্রান্সও ভিয়েৎনামকে স্বাধীন রাষ্ট্র (Free State) বলিয়া স্বীকৃতি জানাইলেন, এবং প্রতিশ্রুতি দিলো যে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে (কোচিন-চায়না) ও দক্ষিণ আনামে গণমত (referendum) গ্রহণ করা হইবে, এবং গণমতের রায় সাপেক্ষে দক্ষিণ উত্তর ভিয়েৎনামকে সংযুক্ত করা হইবে। ফরাসীরা যদি এই চুক্তি মানিয়া চলিত তবে আজ ভিয়েৎনামে কোনো অশান্তি থাকিত না। কিন্তু ফরাসীদের উদ্দেশ্যই ছিল ভিয়েৎনামে তাহাদের অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা।

৬ই মার্চের চুক্তিকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য ১৮ এপ্রিল (১৯৪৬) দালাতে (Dalat) ফরাসী ও ভিয়েৎনামী-গণ এক বৈঠকে সম্মিলিত হন। কিন্তু ফরাসী হাই-কমিশনার দার্জেনলু (D' Argenlieon) ৬ই মার্চের চুক্তি এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করাতে এই বৈঠক কোন সমস্যার সমাধান করিতে পারে নাই। ভিয়েৎনামীগণ তখন প্যারিতে একটি বৈঠক করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই বৈঠক জুন মাসে প্যারিসে আহূত হয় এবং হো চি মিন ইহাতে যোগদান করেন।

ইতিমধ্যে জনপ্রিয় হইবার জন্য হো চি মিন এক নূতন পন্থা ধরিলেন। ৬ই জানুয়ারি, ১৯৪৬ প্রথম নির্বাচন হয়, এবং এই নির্বাচনে ভিয়েৎমিন অন্তর্ভুক্ত হয়, কিন্তু বিরুদ্ধবাদী দলগুলি কতকগুলি আসন পায়, কিন্তু ভিয়েৎনামের ভয়ে বা যে কোন কারণে হোক তাহারা ছাপান্নটি এসেম্ব্লীতে আসন গ্রহণ করে নাই। ছাপান্নটি আসনশূন্য এসেম্বলীর অবশ্য কোনো কার্যকরী ক্ষমতা ছিলনা, কারণ ফরাসী ছাড়াছাড়ার জন্য কোনোরকম constitution প্রস্তুত করা সম্ভব হয় নাই। এই সকল নানাবিধ কারণে ভূতপূর্ব সম্রাট বাও ১৯৪৬ পদত্যাগ করিয়া ভিয়েৎনাম ত্যাগ করেন। তিনি এতদিন স্বেচ্ছায় হো চি মিনের পরামর্শদাতারূপে কাজ করিতেছিলেন। যে মাসে হো চি মিন সমস্ত বামপন্থী দলের সহিত মিলিত হইয়া লিয়েনভিৎ (Lien Vit) অথবা ভিয়েৎনামের জাতীয় দল গঠন করিলেন। ১৯৪১ খৃঃ ভিয়েৎমিনের সম্প্রসারণ করিয়া উহাকে লিয়েনভিতের সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয়। সুতরাং বাস্তবিকপক্ষে এখন আর ভিয়েৎমিন নামে কোনো পার্টি নাই; অথচ হো চি মিনের দল বহির্জগতে এখনো ভিয়েৎমিন নামেই পরিচিত, এবং এই প্রবন্ধে এই নামটিই ব্যবহৃত হইবে।

ফরাসীদের সহিত আপোষমীমাংসার জন্য হো চি মিন রওনা হইবার পরেই, দার্জেনলু দক্ষিণ ভিয়েৎনামে একটি স্বয়ং শাসিত রাষ্ট্রের (Autonomous Republic) প্রতিষ্ঠা

করেন, এবং Dr. Nguyen Van Trinh নামে একজন দক্ষিণপন্থী নেতার নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীসভা গঠন করাইতে সমর্থ হন। কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁ: ত্রিন ফরাসীদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া আত্মহত্যা করেন।

এই সময়ে হো চি মিন কেন জনগণের সমর্থন পাইলেন তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। সার এন্টনি ইডেন লিখিয়াছেন :

"In Vietnam the Communist had been able to absorb most of the nationalist movement. During the war, they had taken a prominent part in the resistance (against the Japanese). Moderate nationalists were consequently forced to choose between a goverment which, though Communist, stood form dependence, or a return of colonial rule. ১৭

এই প্রসঙ্গে ফরাসী শাসনতন্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে সার এন্টনি ইডেন লিখিয়াছেন : "In the last years of French rule, there were more French officials in Indo-China than there had been British serving in all India at any period of our rule." ১৮

কিছুদিন পরে একজন আমেরিকান ঐতিহাসিকও প্রায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া মন্তব্য করেন : "On the whole Communism is at present rather to be found on the side of the nationalist forces in Asia than on the opposite side, while capitalism is prone to play upon regionalism and provincialism, as it has done already for a century." ১৯

ফরাসী কুশাসনের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ভিয়েৎনামীরা যে কমুনিস্টদের সহায়তা লইবে ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কোন কারণ নাই। যদি এই সঙ্কটকালে ফরাসীগণ কিছুমাত্রও বুদ্ধির পরিচয় দিত তাহা হইলে হয়ত অবস্থা অন্যরকম হইত। কিন্তু ফ্রান্সের বুর্বণ রাজাদের মত, ফরাসী রাজনৈতিকগণ কিছু ভুলিলেনও না, এবং কিছু শিখিলেনও না।

যাহা হউক ফরাসীদের সহিত সীমাংসার সূত্র যাহাতে একেবারে ভাঙিয়া না যায়, তাহার জন্য হো চি মিন ফরাসী সোস্যালিষ্ট ঔপনিবেশিক মন্ত্রী মারিয়াস মনের (Marius Monet) সহিত একটি 'কার্যকরী ব্যবস্থা' (modus vivendi) সহি করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। হো চি মিন আশা করিয়াছিলেন যে ফ্রান্সের সোশালিষ্ট দল হয়ত ভিয়েৎনামের প্রতি সহানুভূতিশীল হইবে। কিন্তু তাঁহার আশা বিফল হইল।

(ক্রমশঃ)

১৭ The Memoirs of Sir Anthony Eden : Full circle p. 80.

১৮ ঐ, p. 80.

১৯ W. F. Wertheim : Indonesian Society in Transition, (New York, 1956) pp. 324-25

একটি দম্পতির ক'টি সন্তান থাকা উচিত ?

আমরা সকলেই স্বাভাবিক, সুখী জীবন যাপন করতে চাই—কোন হাঙ্গামা বা সমস্যা চাইনা। ● কোন সুখী পরিবারে ক'টি ছেলেমেয়ে থাকে ? বর্তমানে যাঁদের তিনটি ছেলে-মেয়ে রয়েছে তাঁদের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগেরও বেশী দম্পতি আর ছেলেমেয়ে চাননা। ● অনেকগুলি ছেলেমেয়ের বাবা হয়ে গর্ব্ব বা আনন্দ অনুভব করার দিন আর নেই। নানা রকম পদ্ধতিতে পরিবারের আকার "স্বাভাবিক" রাখা যায়।

● মহীশূর, উঃ প্রঃ, বিহার ● বাংলার জনসংখ্যা পর্য্যালোচনা থেকে

পরামর্শ এবং বিনামূল্যে সেবার জন্য

পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা কেন্দ্রে যান।

DA 66/77 BEN

অন্ধকার অনুভবে

বিজয়কুমার দত্ত

১. কিছুতে ভাঙেনা সেই পাথরে আবৃত স্থির অস্তিম দুয়ার,
পরিণতি শুধু মাথা ঠোকা। যেন, রক্তে চারিয়ার
কলঙ্কিত ক'রে রাখা। তবু, শেষ নিঃশ্বাসের আগে
বাকী কিছু ছিল নাকি দীপ্ত অনুরাগে
যথোপকথন সব ভোরবেলা আশ্বিনের রোদে ?
হায়, আজন্ম লালিত সাধ, এই শোভন আলোতে
তোমাকে হবেনা বলা জানি কোনদিন
তুমি কি জেনেছ' কেন তোমাকেই হৃদয়ে সেদিন
রাজসিংহাসনের চেয়ে, আরো শুভ্র বেদীর আসনে
বসাতে চেয়েছি ? তবু, আমি কত সাধারণ, এইটুকু রেখেছ' স্মরণে।

২. দ্বিতীয় জন্মের ছিল সাধ, ছিল ভয়ঙ্কর রাত্রিশেষ হলে
নীহারিকা মণ্ডলীর অনির্দেশ পথরেখা ঘুরে
দিকচক্রে সুচিহ্নিত সূর্যের উদয়ে
যাবার অস্থির বেলা। আমাকে বোঝাতে পারো, কেউ
কেন আরেক জন্মের সাধ, বুকের ভিতরে জ্বলে ?
অথচ, এখনো, প্রথম জন্মের ভোর, দুপুরের স্থির আলো
অদ্ভুত 'এক্সরে'র মতো চলাচল করে।

৩. নিয়তি কোথাও বাধা মানে না। নিয়তি
ডবল ডেকার হ'য়ে রাজপথে ছোটাছুটি করে
ঝুলন্ত যাত্রীর হাতে দুটবোর্ডে দ্রুতগামী ট্রামে
কে যেন ভীষণ সব নিদারুণ ঘটনাপ্রবাহে
রক্তের প্রবল চাপে শিরায় শিরায়
ভয়ঙ্কর আকর্ষণে হাত ধরে নিয়ে যেতে চায়।

সে কি নিয়তি তোমার ? পাশাপাশি হেঁটে চলে, ছায়ার মতন
কেউতো চায়নি তাকে ভোরবেলা বিশ্ব বাতাসে,

তবু তার আশা চাই। তবু তার সূক্ষ্ম চলাচল
নিয়মিত পদচারণায়, প্রতিটি উৎসব বেলা
অদৃশ্য নূপুরে বাজে শোভিত সন্ধ্যায়
যখন নিওন শাইন, জ্বলে ওঠে নাগরিক ভীড়ে
নিয়তি, তোমার কি'বা আবার দারুণ শ্লেষ তীব্রতর শোকে,
অথচ কিছুই, বোঝা যায়নি মুহূর্ত আগে! ঘন অন্ধকারে
শরীরের অস্থি মাংসে—শোনিত সজ্জায়,
নিয়তির ভ্রূণবিন্দু পরিবর্তনের স্রোতে বেড়ে ওঠে বিশাল আকার।

ফরাসী-ছুটির অবকাশে
অমিতাভ দাশগুপ্ত

স্বজন-উৎসবে নাকি আমাকেও ডেকেছিলে কাছে—
সন্ধ্যায় চিঠির থালা, তিনটি পায়রা এসে বসেছে চাতালে,
আমার সাইকেলে ঘন্টি বেজে উঠল অকস্মাৎ,
দরোজা-জানালা
হাট হয়ে খুলে গেল—কয়েক জন্মের পার থেকে
স্বজন-উৎসবে নাকি অবশেষে ডেকেছ আমাকে।

ভীড়ের ভিতরে
বড়ো একা যেতে হবে, সকল কাজের থেকে ফরাসী-ছুটির
অবকাশ খুঁজে নিয়ে;
আহা, ওরা কতকাল ঘুমোয়নি, ঘড়িগুলি ঘুমোবে এবার,
কারা বলে—'তোমার নেবার
কিছু আছে?' ফানারিল্ পাখি
কি রকম হেসে হেসে বলে গেল—'কিছু নেই নাকি'?

অথন ডাকলে পরে কুঁড়ি গুলি কেঁটে যায়, মেঘ কেটে রোদ
রোটারি-মেশিনে যেন সাংঘাতিক জ্বলে ওঠে···ফ্লাশ···ফ্লাশ···ফ্লাশ···
দেয়ালে অসংখ্য চিত্র—কার স্পর্শ, ঘরে বসে থাকে,
অনেক জন্মের পারে কে হে তুমি ডাকছ আমাকে?

আমি বারে বারে

শহিদরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

মেয়েরা যেমন ক'রে অপরাহ্ণ দুপুরে
কপালের থেকে চুল দূরে ঠেলে দেয়
আমি বারে বারে তেমনি দুঃখকে—
আমি বারে বারে তেমনি দুঃখকে সরিয়ে দিতে চাই
বই এর পাতার থেকে, সিনেমার পর্দা থেকে
ভালোবাসা বিবাদ সমস্ত থেকে সারাদিনভর,

মেয়েরা যেমন ক'রে বালমতী থেকে খুঁটে কাঁকর
আলাদা ক'রে নেয়
আমি বারে বারে তেমনি ফুলদানি থেকে
বাঁসুড়ার ঘোড়া থেকে হাওয়া গাছপালা
থেকে সারাদিনভর
দুঃখকে সরিয়ে দিয়ে ভালোবাসার ঘরোয়ায় ফিরে
যেতে চাই।

অসংযত

হেনা হালদার

আমার উঠোন ঘিরে যত বাঁধি কাঁটাতারে বেড়া···—
যত টানি সীমিত পাঁচিল,
এবং উদ্দাম সমুদ্রের ডাকে কিছুতেই ফেরা
হবেনা সংকল্প রাখি। তবু অনাবিল
নীলকান্ত মরিচীকা গাঢ় দ্যুতি তীব্র সমুজ্জ্বল
সমুদ্র আমাকে ডাকে : অতলান্ত সংকার ভিঙিয়ে
আলোর স্মারক লিপি। ঘনবদ্ধ গোলাপের দল
সৌরভে কণ্টকে কোটে। বিবেকের আগ্রহ শিথিলে
ধরা-প্রেম হানা দেয়। মধ্য দিনে উদ্ধার আবেগ
আগ্নেয় রেখায় ছেঁড়ে : সুসজ্জিত বর্ণালির বেশ।

ইচ্ছাকে ফেরাতে চাই : নিষেধের উদ্যত তর্জনী
বাঁশরীর মূর্ছা ঘরে সাধে ঘর ছাড়াবার ধ্বনি।

Gram : DEVICE

Phone : 23-2161/2

Please Contact

MECHANICAL ENGINEERING CO

PRIVATE LTD

5, MISSION ROW
CALCUTTA-1

FOR ALL TYPES OF TRAILERS,
TROLLEYS AND WHEEL BARROWS

ধারাবাহিক প্রবন্ধ

হেগেলীয় দর্শন

অনিল রায়

আগে বলা হয়েছে মার্ক্স কোথাও ডায়ালেকটিক সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন নি। এঙ্গেলস্‌ই এ-সম্বন্ধে তাঁর তিনখানা বই-এ খানিকটা বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। অপর সমর্থকগণ সবাই এঙ্গেলস্‌কেই অনুসরণ করেছেন। অনুমোদন এবং অনুভাষণ করেছেন। তারপরে ১৯৩০ সনে 'Psychologies of 1930' নামক সংগ্রহ-গ্রন্থে কে. এন. কর্নিলভ বিস্তৃত প্রবন্ধে ডায়ালেকটিক সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করেছেন। ঐ প্রবন্ধে আগাগোড়াই এঙ্গেলস্‌-এর উক্তিগুলির পুনরুক্তি করা হয়েছে মাত্র; তবে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত যোগ করা হয়েছে আধুনিক মনোবিজ্ঞান থেকে। আমরা নতুন দৃষ্টান্তগুলিকে বিচার ও পরীক্ষা করে দেখবো এদের দ্বারা কোনো নতুনতর আলোকপাত হয়েছে কি না ডায়ালেকটিক লজিকের ওপরে। কর্নিলভের (Kornilov) প্রবন্ধকে বিচার করবার কারণ এই প্রবন্ধ অতি আধুনিক এবং আধুনিক বিজ্ঞানের সমর্থন ডায়লেকটিক পেয়েছে বলে এই প্রবন্ধ দাবী করে।

এঙ্গেলস্ ডায়লেকটিকের তিনটে সূত্রকে সব চাইতে মৌলিক ও গুরুতর বলে মনে করেন। ডায়ালেকটিকের এই তিনটে প্রধান সূত্র হচ্ছে ১) Mutual penetration of opposites ২) Negation of Negation এবং (৩) Transformation of quantity into quality and vice versa। আমরা একটা একটা করে তিনটে সূত্রকে বিচার করছি।

(১) Interpenetration of opposites :

এই সূত্রের সব চাইতে ভাল ব্যাখ্যা লেনিন করেছেন। তাঁর মতে এই নীতিই হচ্ছে ডায়ালেকটিকের সর্বপ্রধান নীতি এবং এই নীতি তিনি হেগেলকে অনুবর্তন করেই ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর ভাষায় :

"The bifurcation of unity and the knowledge of its contradictory parts is the main point, one of the essentials, one of the chief—if not the principal—peculiarities or features of dialectics. This is how Hegel viewed the question. The identity of opposites (or nature, their "units") is the recognition of contradictory, mutually excluding, opposite tendencies in all the phenomena and processes of nature, spirit and society." ১

১ 'Psychologies of 1930' : Kornilov : pp 255

এখানে সকল সত্তাই দ্বিধাবিভক্ত রূপে কল্পনা করা হয়েছে এবং দুইয়ের মধ্যে প্রখর বিরুদ্ধতা আছে, এ-কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। যখন হেগেলের মতকেই সমর্থন করা হচ্ছে তখন এই সূত্র যে Law of Identity and Cotradiction-এর বিরোধী সেই কথাটাই বোঝা যাচ্ছে। "Identity of opposites" শব্দটাই Formal Logic-এর মূলনীতিকে অস্বীকার করছে। এখানে contradictory মানে সম্পূর্ণরূপে বিপরীত। Formal Logic-এর পরিভাষায় contrary বললে যা বোঝা যায়, এ তাই। "Mutually Excluding" কথাটার আরো স্পষ্ট হয়েছে এই তত্ত্ব যে একটির অস্তিত্ব অপরের নাস্তিত্বকে সূচিত করে। তবুও এই সূত্র এই রকমের পরস্পরবিরোধী দুটো সংজ্ঞাকে identical বলে নির্দেশ করছে। "Is এবং Is not" একই সঙ্গে হতে পারে। অর্থাৎ, Formal Logic কে সজোরে এবং সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হচ্ছে। কর্নিলভ (Kornilov) এই কথার প্রতিধ্বনি করে বলছেন যে এঙ্গেলস্ এর দৃষ্টান্তগুলি থেকেই এই সূত্রের অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেছে।

"It is clear from Engels' examples that actual reality, which begins with mechanics and ends with the complicated phenomena of social, life is saturated with mutual penetration of opposites." ২

এঙ্গেলস্ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, "attraction" এবং "repulsion".

(ক) "All chemistry is based on the phenomena of attraction & repulsion." ৩

সংকর্ষণ ও বিকর্ষণ যে অন্তর্বিরোধের দৃষ্টান্ত কী করে হয় বোঝা দুষ্কর। রাসায়নিক উপাদানগুলির মধ্যে দুই রকমের সম্বন্ধ দেখা যায়। কোনো উপাদান কোনো উপাদানকে আকর্ষণ করে আবার কোনো উপাদানকে বিকর্ষণ করে। ডায়ালেকটীক নীতি বলতে 'a thing is itself and not itself at the same time,' আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ পরস্পরবিরোধী বা 'mutually exclusive'। একই উপাদান একই সময়ে অন্য কোন উপাদানকে যদি আকর্ষণ ও বিকর্ষণ এই দুই-ই করে, তবে ডায়ালেকটিক নীতি খাটবে। যে শক্তি আকর্ষণ, তাহাই simultaneously বিকর্ষণও যদি হয়, তবেই এই নীতি সত্য হবে। কিন্তু রসায়ন শাস্ত্রে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ একই বস্তু, এমন কথা তো বলে না। ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের বেলায় এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আকর্ষণ ও বিকর্ষণে এ দুই শক্তি ক্রিয়া করতে পারে, কিন্তু একই সময়ে একই বস্তুর সম্বন্ধে এই দুটো বিরুদ্ধ শক্তি কোনো বস্তুই প্রদর্শন করে না।

(খ) কর্নিলভ বলছেন: "As to organic life, the clevere-t proofs of the second law of dialectics are the phenomena of life and death. 'The negation of life', says Engels, "is by its very nature, founded in life itself so that life is always thought about in relation to its unavoidable result, included in it from the embryo—death. The dialectic comprehension of life is just this—to live means to die." ৪

এঙ্গেলস্ এখানে হেগেলের দৃষ্টান্তটিই নিয়েছেন এবং তার কথারই (life···involves the germ of death :

২ Ibid Kornilov, P256
৩ Ibid Kornilov, p 256

৪ Engels, Dialectics of Nature : p 15
Kornilov : pp 256

Hegel, 'Logic', p148) প্রতিধ্বনি করেছেন। কপিলতের কাছে যা "cleverest proof" বলে মনে হয়েছে, তা যে কত ভ্রান্ত তা আমরা হেগেলের প্রসঙ্গেই দেখিয়েছি। ডায়ালেকটিক সূত্র অনুসারে হওয়া উচিত: Life is life and not life (—is death) কিন্তু এঙ্গেলস্ নিজেই বলেছেন মৃত্যু হচ্ছে জীবনের unavoidable result, ভবিষ্যৎ পরিণতি। জীবন ও মৃত্যু identical হয় না এতে: Life and Death একই সত্তা বা বস্তু নয়। জীবন সম্বন্ধে ভাবতে গেলে মৃত্যুর কথাও এসে পড়ে, কারণ এদের দুই-এর সম্বন্ধ আছে। "সম্বন্ধ" থাকা আর "Identity" এক কথা নয়। এখানেও সেই একই পরিভাষা ও অর্থের confusion ঘটেছে।

(গ) "Struggle of Heredity and adaptation" (Engels)

এই দৃষ্টান্তটিকে কপিলত উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ব্যাখ্যা করেন নি। Heredity এবং adaptation—এ দুটো যে বিরুদ্ধ শক্তি, এ কথা স্বীকার্য নয়। Heredity কোনো কোনো ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিকের অনুকূলও হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে বিরুদ্ধতার কথা ওঠে না।

তাছাড়া Heredity এবং adaptation-এর মধ্যে ডায়ালেকটিক কবিং স্ববিরোধ কোথায় আছে? যদি এদের একই সত্তা ধরি তবে তবুও তারা একই অর্থে ও কালে বিভিন্ন হতে পারে না।

(ঘ) "Unity of movement & equilibrium." (Engles)

(ঙ) Labour & Capital:

সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতি থেকে কপিলত দৃষ্টান্ত এনেছেন —Capital & Labour। মার্ক্স ও তার বইতে একে দৃষ্টান্ত হিসেবে দিয়েছেন। বস্তুত পক্ষে মার্ক্সের সমস্ত ডায়ালেকটিক দর্শনই এই দৃষ্টান্তটিকে প্রমাণ করবার জন্যেই গৃহীত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। মার্ক্স-এর মতবাদে অর্থনীতিরই অধিতীয় প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে এবং অর্থনৈতিক জীবনের বিবর্তনে contradiction দেখাবার জন্যেই ডায়ালেকটিক নীতিকে এতখানি সম্মান দেওয়া হয়েছে। মার্ক্সের ঐতিহ্যের ব্যাখ্যায় অর্থনৈতিক শ্রেণীবিরোধকেই সমাজবিবর্তনের মূল বলা হয়ে থাকে। সমাজবিবর্তনে পৃথিবীর সর্বত্র শ্রেণীবিরোধের মধ্য দিয়েই মানুষ নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান গড়ে চলেছে এবং উচ্চ ও উচ্চতর সমাজ-ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে। Opposite শক্তির উচ্চতর সামঞ্জস্য—ইহাই সমাজজীবনের মূলতত্ত্ব। সমাজব্যাপারে এই দ্বন্দ্ব-সম্বন্ধ বা ডায়ালেকটিক দেখাতে মার্ক্স একে একটা বিশ্বজনীন নীতিতে পরিণত করেছেন, হেগেলকে অনুসরণ করে। এঙ্গেলস্-এর ভাষায় এই নীতি হলো 'Law of the Development of nature, history & thought" (Engels)। প্রকৃতিরাজ্যে—জীববিজ্ঞানে বা জড়বিজ্ঞানে হেগেল কিম্বা হেগেলীয়গণ এই নীতিকে অপপ্রয়োগ করেছেন, এ আমরা দেখেছি। মার্ক্স সমাজবিজ্ঞানে এর যা প্রয়োগ করেছেন সে সম্পর্কে পরে বিস্তৃত আলোচনা করবো। এখন শুধু তার অর্থনীতির ক্ষেত্রে ডায়ালেকটিকের প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত হয়েছে কি না সেইটেই দেখবো।

এখানে একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। হেগেলীয় synthesis of opposites ইত্যাদির আলোচনার সময়ে আমরা বলেছি যে জগতে ও মননক্ষেত্রে দুই রকমের সম্বন্ধই, (relation) আছে: distinctness ও opposition। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে opposition নামক সম্বন্ধ রয়েছে, একথা সকলেই স্বীকার করবে। কিন্তু হেগেল এই opposition কে অধিতীয় এবং একমাত্র বিশ্বলৌকিক তত্ত্ব বলে দাবী করেন এবং বলেন সর্বত্র সর্বকালে সকল সত্তাই সকল সত্তাকে oppose করছে। আমাদের আপত্তি হেগেলের এই ব্যাপক দাবীর বিরুদ্ধে।

আর একটি কথাও এখানে উল্লেখ করা দরকার। ডায়ালেকটিক নীতি অনুসারে পরিবর্তন বা গতি (motion) যেখানে আছে, সেখানেই পরিবর্তনশীল বস্তুটি সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী উক্তি করা চলতে পারে, একই কালে। Formal Logic বলে পর পর কালে বিরুদ্ধ উক্তি করা চলতে পারে। একই কালে নয়। এখানে লক্ষ্য করবার এই টুকু আছে যে একটি বস্তুর অন্তর্গত দুটো অংশ পরস্পর বিরোধী হতে পারে, অর্থাৎ একই বস্তুর বুকে দু'টো বিরুদ্ধ শক্তির স্থান হতে পারে। এ-ক্ষেত্রে Law of Identityর বাধা নেই। কারণ Law of Identity and Contradiction বলে যে একই সত্তা সম্বন্ধে দুটো বিরুদ্ধ সংজ্ঞা প্রয়োগ করা চলতে পারে না। কিন্তু যেখানে দুটো আলাদা সত্তা রয়েছে, তাদের বিরোধী হতে কোনো বাধা নেই। কোনো মানুষের গায়ে সাদা এবং কালো, এই দুটো পরস্পর বিরোধী রঙ একই কালে বর্তমান থাকতে পারে। তারা পাশাপাশি আছে। কিন্তু একই স্থানে, একই কালে 'সাদা' এবং 'কালো' দুই-ই হতে পারে না। তাহলে Law of Identityর বাধা এসে উপস্থিত হয়। কাজেই দুটো বিরুদ্ধ বস্তু পাশাপাশি আলাদা আলাদা কোনো ব্যাপকতর বস্তুর অংশ হিসেবে থাকলে সেখানে ডায়ালেকটিক নীতির কোনো সম্পর্ক নেই।

প্রফেসার ই. এফ. ক্যারিট্ট (E. F. Carritt) এই তত্ত্বটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি Formal Logic-এর এই তত্ত্বটুকুকে বুঝিয়ে বলেছেন।

"And of course, of any part or element of a thing a statement can and must be true which is contradictory of a statement true of any other part or element. If this element is distinguished as A then that other element is not-A." ৪

৪ E. F. Carritt. Ibid

বর্তমান দুনিয়ার labor এবং capitalকে দুটো পরস্পরবিরোধী সত্তা বলে স্বীকার করলেও হেগেলীয় ডায়ালেকটিক নীতি এখানে খাটে কিনা তাহাই আমাদের বিচার্য। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়ে এই দুটো opposite শ্রেণী মুখোমুখী হয়ে রয়েছে। সমাজ হচ্ছে ব্যাপক সত্তা যার দুটো অংশ হচ্ছে labour ও capital। পরস্পর-বিরোধী হলেও এরা আলাদা আলাদা সত্তা। কাজেই এদের পরস্পর-বিরোধে ডায়ালেকটীক নীতির কোনোই সম্পর্ক নেই। কারণ "Identity of opposites" এক্ষেত্রে অনুপস্থিত। Labour এবং Capital-এর ঐক্যতা বা Identity যদি প্রমাণ করতে পারা যেতো, তবেই ডায়ালেকটীকের দৃষ্টান্ত বলে গ্রাহ্য হতে পারতো। কাজেই সমাজের বুকে যে Labour এবং Capital এর শ্রেণী-বিরোধ ঘটছে, তাকে ডায়ালেকটীক interpenetration of opposites-এর দৃষ্টান্ত বলা চলে না।

তেমনি করে "The Competition among capitalists" এবং "Imperialistic wars between separate countries", ইত্যাদিও এই কারণে ডায়ালেকটীককে প্রমাণ করছে না।

(৫) Human Personality; Organism & Enviornment :

মানুষের চারদিকে রয়েছে তার পারিপার্শ্বিক যার সঙ্গে তার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে মুহূর্তের আগে পর্যন্ত। এই দুই সত্তাই পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করছে এবং এই পারস্পরিক প্রভাবের ফলে উভয়েই বিবর্তিত হচ্ছে। কর্নিলভ বলেন যে এই তত্ত্বও ডায়ালেকটীকেরই দৃষ্টান্ত।

"The dialectic laws mentioned above find their reflection in psychology also." ৬

৬ Kornilov Ibid Pp 256

কর্নিলভ (kornilov) এই উদ্ধৃতে মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে প্রমাণ করেছেন: human behaviour হচ্ছে দ্বন্দ্বিরোধের জলন্ত দৃষ্টান্ত। কর্নিলভ (Kornilov) বলছেন:

"The question arises: what kind of struggle between opposite conditions the unity and the development of human personality and its behaviour, and in what form does this struggle express itself? ..... the starting-point lies in its interaction with environment. This interaction may be reduced to the struggle of two opposing tendencies, which in their unity form what we call the behaviour of the living organism." ১

পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মানুষের সংঘর্ষ চলছে, যাকে কর্নিলভ বলছেন 'continuous life-conflict of man' কিন্তু এখানেও পূর্ববৎ একই fallacy ঘটেছে। Environment এবং human personality, এরা দুটোই আলাদা আলাদা সত্তা, এদের মধ্যে যদি বিরুদ্ধতা বা opposition থেকেও থাকে, তবুও "identity of opposites" নামক ঐক্য বা অভেদ কোথায় হচ্ছে এখানে? একই বস্তু দুটো বিরুদ্ধ সংস্থার অধিষ্ঠান এখানে কোথায় দেখতে পাচ্ছি? কর্নিলভ বলছেন Human Behaviour হচ্ছে সেই unity। কিন্তু Human behaviour দুটো opposite সত্তার অভেদ সূচিত করছে কি? মানুষের পরের ব্যবহার, তার previous behaviour, এবং environment-এর প্রভাব, এই দুইয়ের resultant. "Ram is Ram and not-Ram at the same time" যখন বলি তখন Interpenetration বা Identity of opposites স্পষ্ট। কিন্তু এখানে যদি organism itself and not-itself একই কালে হতে পারত, তবে একে identity-এর দৃষ্টান্ত বলে মানা যেতো। এখানে যে ব্যাপারটি হয়েছে সেটি হচ্ছে এই যে previous behaviour-এর কিছুটা পরিবর্তন ও নূতনত্ব ঘটেছে। কিন্তু এখানে Environment হচ্ছে সম্পূর্ণ বাইরের সত্তা এবং পৃথক বস্তু। সে দূর থেকে মানুষকে প্রভাবিত করছে। মানুষের behaviour এর ভেতরে Environment অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়ে যায় নি। organism এবং Environment identicale নয়। হয়তো কেউ বলবেন যে Environment মানুষের behaviour-এর মধ্যে কিছুটা contribute করেছে এবং কিছুটা element তো পারিপার্শ্বিকেরই অবদান; কাজেই environment এক অর্থে behaviour এর মধ্যে বাস করছে বই কি? একথার উত্তর হল এই যে বাস্তবভাবে environment মানুষ বা মানুষের ব্যবহারের মধ্যে অন্তর্বর্তী হয়ে বাস করে না। তার প্রভাব আর বাস্তব দেহরীয়ে অধিষ্ঠান একই জিনিষ নয়। যদি একে অভেদ বলতে হয়, তবে সে নিতান্ত আলংকারিক বা metaphorial অর্থে অভেদ। বস্তুতঃ organism ও environment এর অভেদ বা identity কোথাও হয়নি।

আর যদি ধরেও নেওয়া হয় যে দুদিকের অবদান বা প্রভাবগুলিই স্থান পেয়েছে Behaviour এর মূলে, তবে তাতেও ডায়ালেকটীক identity খাটে না। আগেকার দৃষ্টান্তে যেমন, তেমনি এখানেও ঠিক দুটো বিরুদ্ধ ও আলাদা সত্তা বা element একটা বৃহত্তর ও ব্যাপকতর সত্তার (i, e behaviour) অন্তর্ভুক্ত হয়ে বাস করছে। এতে Law of Identityর কোনো বাধা উপস্থিত হয় না। দুটো বিরুদ্ধে বস্তু বা element আলাদা থাকতে পারে পাশাপাশি, কিন্তু তারা একই কালে অভিন্ন সত্তা বলে গ্রাহ্য হতে পারে না। তা যদি হোতে পারতো তবে ডায়ালেকটিকের Identity of opposites নীতি খাটতে পারত বই কি। তারপরে organism এবং Environment যে দুটো বিরুদ্ধ

১ Kornilov, ibid-Pp 257

সত্ত্বা বলে থাকলেই বা কেন? তারা সর্বদাই কি "mutually exclusive?" তাদের সংঘর্ষ বা opposition কি সার্বকালিক? তা নয়। সংঘর্ষ কখনো যেমন ঘটছে তেমনি আবার কখন-কখনও এদের সম্পর্ককে সহযোগিতাও বলা যেতে পারে। কাজেই Human Behaviour দুটো বিরুদ্ধ (opposite) সত্ত্বার ঐক্য বা অভেদ হিসেবে ডায়ালেকটীককে প্রমাণ করছে একথা সর্বদার জন্য সত্য নয়। বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিক যেমন হোতে পারে, তেমনি সহায়ক পারিপার্শ্বিকও তো হোতে পারে? এবং সহায়ক পারিপার্শ্বিককে মানুষ বিরুদ্ধতা না করে তাকে assimilate বা absorb করে থাকে। মাছকে ডাঙায় আনলে সে বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিকে এলো; কিন্তু জল তার পক্ষে সহায়ক পারিপার্শ্বিক। আবার জলের ভেতরেও বিপরীত স্রোত তার বিরোধী এবং অনুগামী স্রোত তার সহায়ক পারিপার্শ্বিক। কাজেই পারিপার্শ্বিক organism-এর opposite category হিসেবে ধরাটাও একটা logical fallacy।

(ছ) "Equilibrium and upsetting of this Equilibrium:"

"Thus the fact of the equilibrium of the individual with his environment and the upsetting of this equilibrium—are two antagonistic tendencies dialectically joined in unity of behaviour—constitute the main psychological fact." ৮

এখানে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সাম্য এবং এই সাম্যকে ভাঙবার প্রবৃত্তি এই দুইয়ের মধ্যে opposition কল্পনা করা হয়েছে। কাজেই মানুষের ব্যবহার বা কর্ম যখন এই দুইয়ের সংঘর্ষের ফলে হয়, তখন মানব কর্মকে identity of opposite বা দুটো বিরুদ্ধ সত্ত্বার অভেদ বলে আখ্যাত করা যায়। Law of identity অনুসারে একই বস্তু দুটো বিরুদ্ধ আখ্যার বিষয় হতে পারে না। এখানে unity র সঙ্গে identity কে গোলমাল করা হয়েছে, যেমন হয়েছে আগেকার কটা দৃষ্টান্তেও। দুটো বিরুদ্ধ জিনিষ একটা ব্যাপকতর সত্ত্বার অংশ হিসেবে থাকতে পারে—"in perfect peace,—James-এর ভাষায়—সেখানে তাদের মধ্যে একটা ঐক্য বা সামঞ্জস্য ঘটেছে। কিন্তু তাদের identity of opposites বলা কোনো ক্রমেই চলতে পারে না। "A is A & not-A simultaneously."—এই দাবীই ডায়ালেকটীক করছে Law of Identity র বিরুদ্ধে। উক্ত দৃষ্টান্তে "সাম্য" ও "অসাম্যের প্রবৃত্তি" এই দুটোর অভেদ প্রমাণিত হয় নি। এদের result হিসেবে একটা জিনিষের পরিবর্তন ঘটা আর এদের "অভেদ"—একই জিনিষ নয়।

Instinct and Habit

(জ) Heredity ও Acquired Reactions:

কর্ণিলভ এর মতে এই দুইয়ের মধ্যে বিরুদ্ধতা আছে কারণ এরা antagonistic tendencies" এবং মানুষের কর্মে বা স্বভাবে এই দুই বিরোধী শক্তির ঐক্য ঘটেছে।

"The structural unity of human personality together with its development consists of this mutual penetration of innate and acquired forms of behaviour." ৯

এখানে প্রথমতঃ Heredity এবং acquired স্বভাব, Instinct এবং Habit পরস্পরের বিরোধী বা opposite নয়। যারা এই দুটোকে অত্যন্ত খণ্ডিত দৃষ্টিতে দেখেন, তাদেরই কাছে এরা অত্যন্ত rigid এবং অনড় ও অচল সত্ত্বা

৮ ibid, Kornilov, Pp 257

৯ ibid, Kornilov, Pp 258

বলে মনে হয় এবং তারাই এদের মধ্যে বিরোধ কল্পনা করে থাকেন। আসলে এদের মধ্যে সর্বকালীন বিরুদ্ধতা নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে Instinct এবং Habit পরস্পরের বিরুদ্ধতা করতে পারে বটে, কিন্তু সর্বদাই এরা বিরোধী এটা ঠিক নয়।

দ্বিতীয়তঃ দুটো শক্তি বা সত্তার বিনিময়ে একটি তৃতীয় সত্তার উদ্ভব হলে, এই সম্বন্ধকে বিরুদ্ধতার ফল বা ঐক্য বলা চলে না। মার্ক্সবাদীরা এবং কর্নিলভ (Kornilov) এই একই ভুল করেছেন তাদের সংগৃহীত সবগুলি দৃষ্টান্তেই। Instinct এবং নবলব্ধ Habit এই দুইয়ের সহযোগ বা সমবায়েই ও Interaction-এই মানুষের ব্যক্তিত্ব ও ব্যবহার দুই-ই গড়ে ওঠে। সর্বত্রই এদের বিরোধ ও সংঘর্ষই ঘটছে একথা কেবল বলা চলে তখনই, যখন মন গড়া ফর্মুলায় জগতের সবকিছুকেই ভেঙে-চুরে চালাতে উৎসুক হয়ে ওঠে মন। সর্বত্রই এদের একই ত্রুটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। Antithesis এবং opposition-negation এর পাথর ছাঁচে সব কিছুকে ঢেলে সাজতে হবে, তাতে বাস্তবকে যতই না কেন বিকৃত করতে হয়।

তৃতীয়তঃ, এদের বিরুদ্ধ বলে স্বীকার করে নিলেও এদের Identity কি করে সাধিত হয় তা দুর্বোধ্য। দুটো বিরুদ্ধ সত্তাই মানুষের কর্ম ও ব্যবহারে স্থান পেলেও এদের identity প্রতিষ্ঠা হয়ে যায় না। মানব-ব্যক্তিত্ব ব্যাপকতর সত্তা এবং তার ভেতরে দুরকমের বিরুদ্ধ element বিধৃত হয়ে থাকলেও Law of Identity-র নিরসন হয় না। কারণ আগেই দেখেছি, দুটো বিরুদ্ধ বস্তুর একই ব্যাপকতর বস্তুর অংশ হিসাবে থাকার কোনো যৌক্তিক বাধা নেই।

(খ) Conscious ও unconscious :

এখানেও উপরোক্ত ত্রুটি ঘটেছে। conscious ও unconscious দুটোকে বিরুদ্ধ কল্পনা করা হয়েছে কিন্তু এদের বিরোধ থেকেই মানব-ব্যক্তিত্ব ফোটে তা নয়। এদের Interaction-এর ফল স্বরূপ Behaviour রূপ ধারণ করে কিন্তু সর্বত্রই opposition-এর ফলে নয়। কর্নিলভ (Kornilov) নিজেই বলেছেন : "what are called conscious & unconscious, are no more than the transitory & interacting factors in behaviour" ১০

এখানে "Interacting" স্বীকার করতে বাধা নেই কিন্তু "opposing" বলতে বাধা আছে ; 'Interacting' এবং 'opposing' একার্থক নয়। unconscious-এর নানা রকম মানে করা হয়েছে মনোতত্ত্ববিদদের মধ্যে ; এবং Freud ও Mystic কি না সে সম্বন্ধে কোনো আলোচনা আমরা করবো না, Freud ই তার জবাব দেবেন ! কিন্তু আমরা শুধু উল্লেখ করবো যে উপরের তিনটে সমালোচনাই এই দৃষ্টান্তের বেলায়ও খাটে।

এধরনের কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যার সাহায্যে সর্বত্রই opposition নামক সম্বন্ধ আরোপ করা হয়েছে এবং জগতের সকল রকম processকেই পরস্পরের opposite বলে ফর্মুলার ছকে ফেলা হয়েছে। Inhibition এবং Excitation, Irradiation এবং Concentration, Strain এবং Relaxation, পরিশ্রম ও বিশ্রাম, ইত্যাদি সবই মানুষের মধ্যে অনবরত ঘটছে, কাজেই Identity of opposites অহরহই মানব মনের ও দেহের সকল প্রক্রিয়াতেই পাওয়া যাচ্ছে। কি করে এ বিরুদ্ধতার অভেদ হচ্ছে, তার কোনো প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা বা প্রমাণ নেই, কেবলি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে সর্বত্র।

এখানে Engels এর Anti-During থেকে দু'টো কথা উল্লেখ করছি ; এখানেও সেই পুরানো দৃষ্টান্তের পুনরুক্তি এবং Identity of opposites এর সত্যের বিঘোষণা দেখতে পাওয়া যাবে ; কিন্তু যৌক্তিক প্রমাণের

১০ Ibid Pp 258

কোথাও চিহ্নমাত্রও নেই। Engels এই নীতি সম্বন্ধে বলছেন :

"He (মানে metaphysician) thinks in absolutely irreconcilable anti-thesis. For him a thing either exists or it does not exist, it is equally impossible for a thing to be itself and at the same time some thing else." ১১

যে ব্যক্তি ডায়ালেকটিক নীতিকে মানে না, তার কাছে কোনো বস্তু একই সঙ্গে দুটো বিপরীত অবস্থা বা গুণের বিষয় হতে পারে না। Formal Logic-এর সমর্থকও তাহোলে এই যথার্থিক 'metaphysician' শ্রেণীর মধ্যে পড়ছে। কিন্তু Engels জোর করেই বলেছেন, যে কোন বস্তু "exists" এবং 'does not exist' আছে এবং নাই, দুই-ই একই সঙ্গে। তাঁর মতে সকল বস্তুই জগতে একই কালে 'itself' এবং 'not-itself' এরই নাম ডায়ালেকটীক। এবং ডায়ালেকটীকের কৃতিত্ব এই যে এই অসম্ভবকেও সম্ভব বলে প্রমাণ করেছে। তবে Commonsense-এর ক্ষমতার বাইরে এই ডায়ালেকটীক-তত্ত্ব। সাধারণ বুদ্ধিতে প্রাকৃত লোকে এই Identity of opposites কে পাঁয়াচপুরী বলেই মনে করবে, তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ বিজ্ঞান চিরদিনই নাকি Commonsense-এর গণ্ডীর বাইরে এবং অন্তরব দর্শন বা লজিক শাস্ত্রেরও এলাকার বাইরে। কাজেই প্রাকৃত বুদ্ধির কাছে যা অসম্ভব বলে মনে হবে বিজ্ঞান ও দর্শনের রাজ্যে সে সবই সম্ভব। Engels রসিকতা করে বলছেন :

"At first sight this mode of thought seems to be extremely plausible, because it is the mode of thought of so called sound commonsense. But sound commonsense respectable fellow as he is within the lonely precincts of his own four walls, has most wonderful adventures as soon as he ventures into the wide world of scientific research." ১২

সাধারণ লোকের কাঁচা বুদ্ধির কাছে Red হয় Red হবে, নয় Not-Red হবে; কিন্তু যদিও sound commonsense এর কাছে এই তত্ত্বটিই অতি সহজ, স্বাভাবিক ও সত্য বলে মনে হয়, তবু সে কাঁচা বুদ্ধি যায়। কিন্তু ডায়ালেকটীকের পাকা বুদ্ধির কাছে Red একই সঙ্গে দুমুখো রূপ ধারণ করে আছে : মানে Red এবং Not-Red একই কালে এবং একই সঙ্গে। কিন্তু এই অসম্ভব কি ভাবে সম্ভব হোতে পারে তার কোনো প্রমাণ বা সমাধান আমরা কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। তবে এর প্রমাণ স্বরূপ একটি জীবতাত্ত্বিক দৃষ্টান্ত Engels দিয়েছেন :

".....Every organic being is at each moment the same and not the same, at each moment it is assimilating matter drawn from without and excreting other matter, at each moment the cells of the body are dying and new ones are being formed, in fact, within a longer or shorter period the matter of its body is completely renewed and is replaced by other atoms of matter, so that every organic being is at all times itself and yet something other than itself." ১৩

Engels-এর এই দৃষ্টান্ত এবং তার ডায়ালেকটীক Identity of opposite নীতির ব্যাখ্যা Law of Identity র তীব্র প্রতিবাদ। কিন্তু এই biological

১১ Anti-During

১২ Anti During

১৩ Anti-During

দৃষ্টান্তটী নিয়ে আমরা এর আগেই আলোচনা করেছি। এই যুক্তি যে কত ভিত্তিহীন তা একটু বিশ্লেষণ করলেই চোখে পড়বে।

'At each moment' দুটো বিরুদ্ধ সংজ্ঞা কোনো organic being সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়; তবে successive moments-এ হতে পারে বটে। "Itself and not itself", "the same and not the same" "exists and does not exist"—at the same moment —ইত্যাদি হোলো ডায়ালেকটীকের মূল তত্ত্ব। কর্ণিলভ (Kornilov)-এর মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টান্তগুলির একটারও এই Identity of opposite নীতির সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই। কোনো পৃথক দুটো বস্তুর সংঘাতে, বা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় বা সমবায়ে যদি কোনো তৃতীয় বস্তু বা বিভিন্ন বস্তুর আবির্ভাব হয়, তবেই কর্ণিলভ তাকে Identity of opposites বলে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারে যে তা নয়, আমরা তা দেখিয়েছি।

আমরা আগেও বলেছি, otherness ও opposition মানে দুটো আলাদা সংজ্ঞা আছে এবং এদের মধ্যে অর্থ-বিভ্রাট বা confusion-এর ফলেই হেগেলীয় এবং মার্ক্সীয়দের এই গুরুতর অযৌক্তিকতা দোষ ঘটেছে। ডায়ালেকটিককে যদি এই সার্বকালীন ও সার্বলৌকিক opposition-negation তত্ত্ব এবং anti-thesis তত্ত্বের সৌহৃদয়ন থেকে মুক্তি দেওয়া যায় তবেই ডায়ালেকটিকের সত্যিকার নির্দোষ রূপ একটা পাওয়া যায়। তখন ডায়ালেকটীক হয়ে দাঁড়ায় doctrine of change এবং Doctrine of Relationalism. পৃথিবীর সব বস্তুই বিবর্তিত হচ্ছে এবং এ-সব বস্তু পরিবর্তনকে খণ্ডিত করে দেখলে সত্যিকারের দেখা হবে না, কারণ সব বস্তু এবং সব পরিবর্তনই পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধের জালে জড়িয়ে, মিলে মিশে আছে। এই সব বস্তুগুলি পরস্পরকে প্রভাবিত করছে এবং ফলে নানা বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের আবির্ভাব ঘটছে। সব বস্তুই সব বস্তু থেকে বিভিন্ন বা other, এই যুক্তিযুক্ত অর্থে অনেকেই dialecticকে বুঝেছেন। ডায়ালেকটীক যে বিশ্বব্যাপারকে process হিসাবে দেখতে নির্দেশ দেয়, একথা মার্ক্সীয়রাও বলেন, কিন্তু তাঁদের এবং হেগেলের মতে এই process একটা বিশেষ ধরণের thesis-antithesis নামক ছকের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হচ্ছে। এখানেই গোলযোগ। কারণ এই বিশেষ ধরণের রূপায়নটির কোনো সমর্থন বাস্তব বা যুক্তি কোথা থেকেও পাওয়া যায় না। প্রফেসর ই. এফ. ক্যারিট তাঁর আলোচনায় আমাদের মতেরই সমর্থন করছেন:

"To repeat, the only element of truth I can find in the doctrine: change is always going on in the inter-connected system of things, in virtue of its instability or capacity for change, which consists in this that there are 'different' i,e contradictory elements in the world which come to affect one another..... And the resulting change is always 'to' something different i,e cotradictory. But we have no ground for supposing change always to arise from interaction of 'contraries' i,e points furthest apart in the same scale." ১৪

এখানে Prof Carrit মানে করেছেন different এবং এই অর্থে Formal Logic ও এই শব্দ ব্যবহার করে থাকে। opposite সবাই জানতে পারে কোনো কোনো বস্তুর মধ্যে বিরুদ্ধতার সম্পর্কও (opposition) রয়েছে, সেই স্থানে সেই সেই বস্তুগুলো পরস্পরের বিপরীত অর্থাৎ 'Formal Logic' এর ভাষায় contrary' (যাকে হেগেলীয় ও মার্ক্সীয়রা opposite বা contradictory বলে থাকেন)।

১৪ Ibid, E. F. Carritt

তবে সর্বত্র সকল বস্তুই সকল বস্তুর বিপরীত। এবথা ভুল। Prof Carritto বলছেন :

"of course in any situation you can find two elements which you can call opposites or contraries, simply because they are the most dissimilar in that situation. But there is no uniform pattern in all change ..." ১৫

একই ছাঁচে বিশ্বলোককে ঢালাই করার ফলে হেগেল যেমন দোষী, তেমনি তাঁর মার্ক্সীয় বিশ্লেষণও দোষী হয়েছেন। তাঁদের প্রথম সূত্রের আলোচনা করা গেলো। এখন দ্বিতীয় সূত্র সম্বন্ধে কর্নিলভের বক্তব্য কি দেখা যাক্।

(২) Negation of negation নীতি :

"According to this law, the separate processes of material reality (thesis) change in their dialectic development into factors of their direct negation (anti-thesis). The negation of which, in their turn, lead to the confirmation of the primary situation of the thesis but at a higher stage (synthesis) ১৬

এখানে Thesis-anti thesis-synthesis কর্মূলাটীকেই negation-এর সাহায্যে বোঝানো হয়েছে কারণ negation-ই হচ্ছে এই হেগেলীয় ছকের ভিত্তি। দুটো negation-এর ফল দাঁড়ায় একটা positive এবং একেই বলা হয়েছে 'synthesis' এই synthesis আবেকার thesis এরই একটা উচ্চতর সংস্করণ মাত্র। এখানে লক্ষ্য করবার আছে যে contradiction, opposition ইত্যাদি শব্দ না ব্যবহার করে এখানে আনা হয়েছে 'negation' শব্দটা।

১৫ E. F. Carritt

১৬ Kornilov : P 218

প্রথম বক্তব্য এই যে হেগেল এবং তথা মার্ক্সীয়রা সবাই opposition, contradiction, negation, conflict, otherness, ইত্যাদি শব্দ সবই ব্যবহার করেছেন কিন্তু এই পরিভাষার অর্থ বাস্তব নিয়ে পরিষ্কার আলোচনা করেন নি। এই পরিভাষাগুলির মধ্যে তাত্ত্বিক পার্থক্য রয়েছে, অথচ এদের একই অর্থে সর্বত্র ব্যবহার করা হয়েছে, একথা আমরা আগেও বলেছি। কখনো ব্যবহার করা হয়েছে Formal লজিকে যাকে বলা হয় 'contrariness,' তারই অর্থে কখনো বা তারা যাকে 'contradiction' বলে থাকে সেই অর্থেই বোঝানো হয়েছে। এদের এই পরিভাষাগত বিভ্রাট বহু দার্শনিকই উল্লেখ করেছেন, এবং এই বিভ্রাটের ফলে হেগেলীয় দর্শনের অনেক অপ্রিয় অবাঞ্ছনীয় পরিণতিও ঘটে ছে। negation শব্দটার ব্যবহার যে গণ্ডগোলের সৃষ্টি করেছে, তার বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। Dr Seal, Mc Taggart 'negation' শব্দটার মানে বদলে দিয়ে কোনো রকমে হেগেলীয় কর্মূলাকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছেন। এ যেন negation শব্দটাকে মার্ক্সীয়রা বাঁচাতে চাচ্ছেন এবং তার সমর্থনে কর্নিলভ (Kornilov)-এবং এঙ্গেলস (Engels) যা বলেছে তারই বিচার আমরা করবো।

কর্নিলভ (Kornilov) তুলেছেন negation-এর অর্থের কথা। তার মতে ডায়ালেকটিক লজিকে negation-এর একটা স্বতন্ত্র মানে আছে যার সঙ্গে Formal Logic-এর মানের পার্থক্য আছে।

"In order to understand the meaning of this law, it is necessary first of all to analyse carefully what is meant by negation. It may be pointed out here that the term negation should in no case be viewed from the point of view of Formal Logic, where negation

between 'a' & 'not-a' always excludes the mutual relation and transition of these objects into each other, because Formal Logic is concerned with objects in a static condition." ১৭

কর্ণিলভের উক্তির প্রতিবাদ করে একথা বলা সমীচীন যে (১) Formal Logic, "a" এবং "not-a" এই দুইয়ের মধ্যে কোনো পারস্পরিক সম্বন্ধ স্বীকার করে না, একথা মিথ্যা। Negationও এক ধরণের সম্পর্ক বই আর কিছু নয়; "রাম শ্যাম নয়", এখানে 'নয়' কথাটিও একটি সম্পর্ককেই সূচিত করে দিচ্ছে, রাম ও শ্যামের মধ্যে যে সম্পর্কটি বর্তমান রয়েছে।

(২) Formal Logic, 'a' এবং 'not-a' এই দুইয়ের মধ্যে একটী অপরটিতে পরিণত হতে পারে না, একথা কখনই বলে না। কোন বস্তু পরিবর্তন হতে থাকলে আগেকার মুহূর্তে সে যেমনটি আছে, পরের মুহূর্তে আর সে ঠিক সেই বস্তুটি থাকছে না। কাজেই রাম হয়ে যাচ্ছে not-Ram পরমুহূর্তে। 'a' পরমুহূর্তে 'not-a' হয়ে যাচ্ছে একথাই Formal Logic-এর বক্তব্য। Formal Logic একই মুহূর্তে 'not-a' ও 'a' এই দুই-ই হতে পারে বলে স্বীকার করে না। কিন্তু পরমুহূর্তে 'a'র "not-a" তে পরিণতি স্বীকার করে। কাজেই কর্ণিলভ-এর "excludes .....transition of these objects into each other" এই কথা ভিত্তিহীন ও অন্যায়।

(৩) Formal Logic বস্তুগুলিকে স্থাণুবৎ অনড় মনে করে একথাও যে ঠিক নয়, এ আমরা আগেও আলোচনা করেছি। Formal Logic গতি বা পরিবর্তন স্বীকার করে, কিন্তু পরিবর্তনের মূলে যে Time Factor আছে সেই তত্ত্বকেও সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ করে; অপরপক্ষে ডায়লেকটীক তথাকথিত গতিবাদের ভক্ত হলেও Time Factor কে উড়িয়ে দিয়ে এই অবান্তর ডায়লেকটীক তত্ত্বের অবতারণা করেছে।

আমরা বলেছি যে Formal Logic, 'a' এবং 'not-a' পরস্পরকে exclude করে "at the same moment"-এ; কিন্তু successive moments-এ এই দুই বিরুদ্ধ বা opposite সংজ্ঞা পরস্পরকে exclude করে না। এখন দেখা যাক কর্ণিলভ কি নতুন অর্থ negation শব্দতে আরোপ করতে চান। তাঁর মতে ডায়লেকটিকের negation হচ্ছে সেই ক্ষেত্র,

"_____where the inter-negation and contradiction existing between actual processes never exclude, although they may limit each other." ১৮

কর্ণিলভ বলছেন Anti-thesis পূর্বের Thesis কে negate করছে কিন্তু exclude করছে না। 'good' exclude করছে না not-good কে, 'not-good' exclude করছে না 'good' কে: তবে এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, not-good যদি exclude না করে, তবে কী করছে? এদের সম্পর্ক কী তা হলে? Not-good মানে বুঝি good কে বাদ দিয়ে জগতের আর সব সম্বন্ধে। কিন্তু কর্ণিলভ 'Not good' বলতে কী বোঝেন? এ সম্বন্ধে কোনো আলো তিনি দেন নি। তবে তিনি আর একটি অর্থপূর্ণ substitute ব্যবহার করেছেন; exclude না করে তিনি বলছেন, "not good" 'good' কে limit করছে। এ-সম্বন্ধে আমরা হেগেলের সমালোচনা প্রসঙ্গেই এই confusion-এর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। Limit করা এবং negate করা একই অর্থ নয়। জগতের বিভিন্ন বস্তুগুলি খণ্ডিত বলে পরস্পরকে পরস্পর limit করে আছে। যেমন good এবং true;

১৭ Ibid Kornilov, Pp 258

১৮ Ibid, pp 158

এরা পরস্পরকে limit করছে কিন্তু এদের মধ্যে opposition বা negation নেই। কারণ এদের একটি অপরটিকে বিনাশ করে না, exclude করে না। কিন্তু good এবং not-good, একে অন্যকে exclude করে। good যেখানে থাকবে, সেখানে not good থাকতে পারেনা। good এবং bad, true এবং false-এর মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে, good এবং true কিম্বা true এবং beautiful-এর মধ্যে সেই সম্পর্ক নেই। কাজেই limitation জগতের সেই সব বস্তুর সম্বন্ধেই খাটে যাদের আমরা বলেছি other বা distinct। কিন্তু negation খাটবে সেই ক্ষেত্রে যেখানে opposition-এর সম্বন্ধ বর্তমান আছে। এই দুটো relation-এর মধ্যে হেগেল যেমন গোল করেছেন তেমনি কর্ণিলভ প্রভৃতি মার্ক্সীয়েরাও করছেন।

দ্বিতীয়তঃ কর্ণিলভ বলছেন "never exclude"; কিন্তু লেনিনই তাকে খণ্ডন করে বলছেন যে thesis ও anti-thesis পরস্পরকে exclude করছে: পূর্বোদ্ধৃত উক্তিতে Identity of opposites বোঝাতে গিয়ে লেনিন বলছেন "The recognition of contradictory, mutually excluding opposite tendencies in all the phenomena..... ১৯

তৃতীয়তঃ কর্ণিলভ সমর্থক হিসাবে এঙ্গেলস-এর উক্তি উদ্ধৃত করে প্রমাণ করতে চান যে এঙ্গেলসও negation মানে সম্পূর্ণ বিনশন বা 'No' বোঝেননি।

"This is why Engels says" "Negation in dialectics does not mean simply 'no' and is not a declaration of the non-existence of something or its arbitrary destruction. The character of negation is determined here, first, by the general, and secondly, by the special nature of the process. It must not only negate but also remove the negation. It must consequently construct the first negation so that a second negation remains or becomes possible. How is this done? It depends upon the nature of every separate case. If I crush a barley seed or an insect, I commit the act of the first negation but make the second negation impossible. For each series of things there is a peculiar species of negation which makes development possible. This applies also to each species of representations and ideas." ২০

এঙ্গেলস যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন 'negation'-এর তা যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণীয় নয়। negation সম্বন্ধে আগে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে এঙ্গেলস-এর বক্তব্যের বিচার করা যাচ্ছে।

১৯ Ibid Kornilov, P255

২০ Anti-During, p 128

(ক্রমশঃ)

ভুল সংশোধন

মাঘ, ১৩৭৩ সংখ্যার অন্তর্গতে প্রকাশিত 'হেগেলীয় দর্শন' প্রবন্ধে কয়েকটি নামের ভুল রয়ে গেছে। সেগুলি এখানে সংশোধন করে দেওয়া হল। এই প্রবন্ধের ৮০৯ পৃষ্ঠার প্রথম কলমের তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, দশম, একাদশ লাইনে এবং দ্বিতীয় কলমের অষ্টাদশ ও অষ্টাদশ লাইনে 'Mathew'র পরিবর্তে Marx পড়তে হবে। প্রথম কলমের ঊনবিংশ লাইনের এবং দ্বিতীয় কলমের তৃতীয় ও একাদশ লাইনে 'Mathewan'-এর পরিবর্তে Marxian' পড়তে হবে। এ ছাড়া, প্রথম কলমের দশম লাইনের Fenger-এর পরিবর্তে 'Engels' পড়তে হবে। এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। অঃ সঃ

উপন্যাস

জল মাটি মন

ম হী তো ষ বি শ্বা স

মহাকালের রথের চাকা গড়িয়ে চলেছে।

দিনের পরে রাত আসে। রাত চলে যায়। আবার দিন আসে। দিন জমে জমে মাস হয়। মাস জমে হয় বছর। মাস যায়। বছর যায়। মহাকালের ইতিহাসের পাতায় দুর্বোধ্য লেখায় হিজিবিজি দাগ পড়ে।

কাঠুখালির বিলেও সূর্য ওঠে। ডোবে। কাঠুখালির বিলের উপর দিয়েও সময় পার হ'য়ে যায়। সুখ দুখ নিয়ে কাঠুখালির বিল হাসে। কাঁদে। আর সে হাসি-কান্নার দোলায় দোলে কাঠুখালির বিলের গাঁও-গেরাম আর মানুষগুলো।

মহাকালের সেই দেবতা তার ইতিহাসের পাতা থেকে কাঠুখালির বিলের পাঁচটি বছরের কাহিনীকে পিছনে ফেলে এসে দাঁড়ালো।

অনেক অবস-বদল, ভাঙাগড়া, অনেক জন্মমৃত্যুর মুখ দেখেছে এই ক'বছরে কাঠুখালির মানুষেরা। কাঠুখালির ভাগ্যদেবতা আপন খেয়ালে চলে। মানুষের সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনার পরোয়া নেই তার। মানুষগুলো তাই কখনো যা চেয়েছে দেবতা তার উল্টোটা করে বসে আছে। আবার কখনো বা চাওয়ার অতিরিক্ত অনেক বেশী পাওয়া দিয়ে তাদের দুটো হাত কানায় কানায় ভরে দিয়েছে।

এই পাঁচ বছরে বলরামেরও কি কম অবস-বদল হ'ল নাকি। সেও কি সংসারে ভাঙাগড়া ওঠানামা কম দেখল নাকি।

আধশোয়া হয়ে সেই সব কথাই ভাবছিল বলরাম।

বাইরে চড়চড়ে রোদের খা খা করা রোদ্দুর। তাকানো যাচ্ছে না। উঠোনের কোনে বড়ো একটা আমগাছ। পাতার ফাঁকে ফাঁকে এখানে-ওখানে দু-একটা কাঁচা আম চোখে পড়ছে। উঠোনের অনেকখানি জায়গা জুড়ে ঠাণ্ডা ছায়া পড়েছে। বছর তিনেকের ছেলেটা সারা গায়ে ধুলো মাখিয়ে আদুড় গায়ে ব'সে আছে। কি একটা মুখে দিয়ে চুষছে। বেশ বাড়ন্ত চেহারা হয়েছে ছেলেটার। একটু ঘুরে ফিরে ছবালী। কাঁথা পেতেছে। পা গুটিয়ে ব'সে মুখ নীচু করে কাঁথা সেলাই করছে। মাঝে মাঝে ছেলের দিকে তাকিয়ে ওকে নজরে রাখছে।

ঘুম-ঘুম চোখ দুটো মেলে বলরাম ওদের দেখে। ওর ছেলে। ওর বউ। ওর সংসার। ভাবতে যেন অবাক লাগে বলরামের। কোথায় ছিল ওরা কটা বছর আগে। অচেনা অচেনা দুটো মানুষ। অথচ এই কটা দিনের মধ্যে কত আপন হয়ে গেছে ওরা। বলরামের জীবনে ওরা শিকড়ের মতন পাক দিয়ে দিয়ে জড়িয়ে গেছে। মায়ার মমতায় ওরা

বলরামকে নিবিড় করে ভরে দিয়েছে। ওদের বাদ দিয়ে বলরাম আজ আর যেন ভাবতে পারে না কোনো কিছু।

কিন্তু বছর পাঁচেক আগে কোথায় ছিল সুবাসী। আর কোথায়ই বা ছিল ঐ টলমলে ছেলেটা। সুবাসীকে বিয়ে করা দিয়ে সে কি কম ঝামেলাটাই করেছিল। সুধলাল, সনাতন—সবাই মিলে কতো বুঝিয়েছিল। কিন্তু বেঁকে দাঁড়িয়েছিল বলরাম। মনের মধ্যে ওর লেগে ছিল পদ্ম-কাঁটা। খেতে-শুতে, উঠতে-বসতে সে কাঁটা বিঁধত খচ্ খচ্ করে।

কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত নরম হতে হয়েছিল বলরামকে। বাপের শেষ বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে কথা দিতে হয়েছিল। বুড়ো বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে ঘরে নিতে হয়েছিল সুবাসীকে। কিন্তু ছেলের বউয়ের হাতের ঘর আভা পাওয়া ভাগ্যে ছিল না সনাতনের। বলরামের বিয়ের মুখাস বাদেই চোখ বুজেছিল সনাতন। মরবার আগেই সনাতন বুঝতে পেরেছিল,—দিন তার শেষ হয়ে এসেছে। মরার আগে ভাই বড়ো ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। নায়েব বাবুকে খবর দিতে আনিয়েছিল। পাড়ার মাতব্বরদের ডেকেছিল। বলরাম আর শ্রীধাম—দুই ভাইয়ের মধ্যে অমিলমা সমান দুই ভাগে ভাগ করে দিয়েছিল। দলিল পত্তরের কাজটা পাকাপাকি হয়ে যেতে একেবারেই যেন হালকা হয়ে গিয়েছিল সনাতন। মনের মধ্যে আর কোনো গ্লানি ছিল না। সকলের সঙ্গে হেসে কথা বলতো। খবরাখবর নিত। শরীরটাও যেন অনেকটা চাঙা হয়ে উঠেছিল। সকলে ভেবেছিল, এ-যাত্রা হয়ত ও'রে গেল সনাতন। কিন্তু তেল ফুরিয়ে যাওয়া প্রদীপের হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠে নিভে যাওয়ার কথাটা যেন ভুলে গিয়েছিল সকলে। সনাতনের প্রাণটা বেরিয়ে যেতেই মনে পড়ল আবার।

সনাতন মারা যাবার পরে শ্রীধামকে নিয়ে মাসছয়েক এক সংসারে ছিল বলরামের বৌদি। কিন্তু তার পরেই ভাইয়ের পরামর্শে আলাদা হ'য়ে গিয়েছিল। বিষয় সম্পত্তি দু'ভাগ হল। বাড়ী ভাগ করবার আর দরকার হলোনা। শ্রীধামকে নিয়ে ওর মা গিয়ে উঠেছিল ভাইয়ের বাড়ী সুদেষ্ণারী।

সে সব দিনগুলো কেমন যেন ঝাপসা হয়ে গেছে বলরামের কাছে। মনে হয় যেন কতকাল আগের কথা।

বাড়ীর সামনে কৃষ্ণচূড়া গাছটায় থোকা থোকা ফুল ফুটেছে। জায়গাটায় যেন আগুন ধরে গেছে। দুপুরের রোদে গাছটা নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আনমনে সেদিকে তাকিয়ে থাকে বলরাম। ছোটোবেলায় নিজের হাতে পুতেছিল বলরাম গাছটাকে। আস্তে আস্তে বড়ো হয়ে উঠেছে। কতো ডালপালা ছেড়েছে। অনেকদিন পর্যন্ত ফুল হতো না। এই ক-বছরে ফুল-হওয়া ধরেছে। আর ফুল মানে ফুল? ডাল-পাতা যেন একেবারে ঢেকে যায়। ঐ রং-বাহার ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলে বলরাম যেন ওর ছোটোবেলার দিনগুলোকে দেখতে পায়।

টিপ্ করে একটা আম পড়ল উঠোনের কোনে। হাম্ হাম্ করে ছেলেটা ছুটে গেল আমটা কুড়িয়ে আনতে। আমটা কুড়িয়ে নিতেই পিছন থেকে এসে ওকে জড়িয়ে ধরল পদ্ম। হাসতে হাসতে কোলে তুলে নেয়। ছোটো ছোটো হাত দু'খানা থেকে আমটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু ডান হাতে আমটাকে ধরে পিঠের পিছনে লুকোয় ছেলেটা। আর বাঁ হাতখানা সামনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলে—

"নেই—নেই—নেই—নেই"

সুবাসী কাঁথা থেকে চোখ তুলে বলে—"আয় পদ্মদি, বস।"

কাঁথাখানায় সেলাই করা পাখিটায় এসে বসে পদ্ম। ছেলেটাকে আস্তে আস্তে কোল থেকে নামিয়ে বলে—"ছলের তোর বুদ্ধি হইছে কি-রম্ ভাখ্ সুবাসী। বাঁচে-বত্তিরে থাকলি দেহিস ও নাটসাহেব হবে।"

ছেলের দিকে একটুখানি তাকিয়ে হাসে সুবাসী। বাৎসল্যে চোখ দুটো মেদুর হয়ে আসে।

পদ্মকে বলে—"নাট্টাদাদের হবে না হাতি হবে। তাখ্‌না ক্যামোন হাতির মতন প্যাট প্যাট করে তাকাচ্ছে।

"তুই থান্ দেহি"—কানুড়ি দিয়ে ওঠে পদ্ম। "অমন সোনার চাঁদ ছল,—ওরে কোল তুই হাতি? ও হাতি হতি যাবে ক্যান্? হাতি তো তুই! পতর নাড়াতি নাগে আড়াই মাস!"

—"তা তুই যে-না পদ্মদি দু'তো ফোঁড় দিছে। সেই কোন্ আলে বইছি—মাজাডা ব্যানো ক'টে যাচ্ছে।"

বলতেই পদ্ম ঘুরে বসলো। সুচে গুতো পরানোই ছিল; সুবাসীর পাশে বসে সেও ফোঁড় দিতে লাগল। লম্বা একটা ফোঁড় দিয়ে সুতোটাকে টেনে তুলতে তুলতে বলে—"তা তোর এ্যাতো কাঁথা সিরেনির ভাড়া পড়ে গ্যালো ক্যান্? ছল বিয়ে দিলি নতুন বিয়েই আসবে—তার তো অনেক দেরী। এ্যাতো সব নতুন কাঁথার শোবে কেডা তোর?"

মুখখানা রাঙা হয়ে ওঠে সুবাসীর। বলে—

"শোয়ার মানুষির তুই অভাব দেখলি নাকি পদ্মদি। বিয়েই না আসুক, তোর বোনাই তো আছে। সে মানুষটারে বুঝি তোর আর নজরেই পড়লো না।"

হাসতে হাসতে পদ্ম জবাব দেয়—"তা বুন্ তুই কথাখান কইছিস মন্দ না। বাড়ীর ধারের চাঁদা-পুটি, আর বিল-গাঙের রুই-কাতলা,—ও সোমান কথা। ঘরের মানুষির কথাই আলাদা। যে যত পেছান আসুক, ঘরের মানুষির থালার ভাত আগে বাড়তিই হবে।"

বেলা অনেকটা পড়িয়ে এসেছে। উঠোন জুড়ে ছায়া নামছে। খরস্রোতের তাপ আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে আসছে।

বলরামের ঝিমুটা যেন কাটতে চাচ্ছে না। ওরই মধ্যে এলোমেলো স্মৃতিগুলো মনের পর্দায় ন'ড়ে ন'ড়ে বেড়ায়। আধ-বোজা চোখে সুবাসী আর পদ্মর কাঁথা সেলাই দেখে তাকিয়ে তাকিয়ে। পদ্মর মুখখানা পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে না। একটা পাশ দেখা যাচ্ছে। সাদা একখানা থান কাপড় পরনে। এলোমেলো চুলগুলো দিয়ে আলগা একটা খোপা বাঁধা। সুবাসীর মতন অতটা মোটাসোটা নয়। তবুও আগের চেয়ে অনেক ভারী হয়েছে পদ্মর চেহারাটা। ঝাঁটাসাঁটো শরীরের মধ্যেও কেমন একটা আলগা-আলগা ভাব।

পদ্মর মুখের দিকে নজর পড়তেই কেমন যেন উদাস হয়ে আসে বলরামের মন। এই ক-বছরে শুধু কি কাঠুরালি আর বলরামের জীবনেই অদল-বদল ঘটেছে! পদ্মর জীবনের উপর দিয়েও তো কম ঝই-ঝাপ্‌টা গেলনা অমন যে বাপের মানুষ নীলমণি—শেষ বয়সে তাকে কি কম হেনস্থাটাই পোয়াতে হল। রোগ ব'লে রোগ! একটার পর একটা যেন লেগেই থাকত। নিত্য রোগীকে কে আর অতো টানে! ভাইদের মন আগেই ফাঁক ফাঁক হয়ে ছিল। নীলমণি বিছানা নিলে সকলেই যে যার মত স'রে পড়ল। মেয়ে দুটোর তো আগেই বিয়ে হয়ে গেছে। তবে লোকে বাহবা দিয়েছিল পদ্মকে। দুহাত দিয়ে পদ্ম সেবা করেছিল নীলমণির। সেবা-শিশ্রূষার বাদাই ছিল না। পেটরোগা রোগীর সব যন্ত্রণা নিজের হাতে পরিষ্কার করত পদ্ম। বাটির মতন নীলমণির সব বায়নাক্কা সহ্য করত। কিন্তু ফলে হবে কি? ঘুণো বাঁশে ঘষাঘষা করতে গেলে তা আরো ফোঁপ্‌রা হয়ে যায়। ফোঁপরা হ'তে হ'তে এক সময় ভেঙেও যায় হঠাৎ করে। নীলমণির ঝাঁঝরা দেহ থেকে পরাণটা অমনি করেই বেরিয়ে গিয়েছিল একদিন। পদ্ম কাঁদতে চায়নি। কিন্তু শুধু ওর দুটো চোখ ছাপিয়ে জল নেমেছিল। ঐ বিটবিটে বুড়ো মানুষটা যে ওর মনের মধ্যে অতোখানি জায়গা দখল করে নিয়েছে, একথা কোনদিনই ভাবতে পারেনি পদ্ম। সংসারটাই হয়ত এইরকম। বেঁচে থাকতে যে লোকটাকে সকল সুখের কাঁটা ব'লে মনে হয়, সেই

লোকটাই যখন সব কিছু ফেলে চিরদিনের মতন চলে যায়, তখন আর কিছু মনে থাকে না। তার দোষ ত্রুটি নিন্দামন্দ সব চাপা পড়ে যায়। লোকটা চলে যাওয়ার ব্যাথাটাই তখন সবচেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে; পদ্মর বুকের মধ্যেও সেই ব্যাথাটাই অনেকক্ষণ ধরে গুমরে গুমরে কেঁদেছিল।

বিধবা হবার পরেও পদ্ম ছিল কিছুদিন শ্বশুরবাড়ী। কিন্তু দেওরদের অতিসতি বুঝতে ওর দেরী হয়নি। কেউ হাত বাড়িয়েছিল ওর যৌবনের দিকে। আর কেউ বা অসিজমার দিকে। যৌবন বাঁচাতে পারেছিল। কিন্তু ওদের লোভের আগুন থেকে বিজমাগুলো সব বাঁচাতে পারেনি পদ্ম। পলিস-পস্তরের খানাখন্দ ডিঙিয়ে যা সামান্য অবশিষ্ট ছিল। সেগুলো সবই পেলো নীলমণির দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে। ছেলের সঙ্গে বনলো না পদ্মর। নীলমণির দিয়ে যাওয়া পাঁচ বিঘে জমির বাদিকানা নিয়ে পদ্ম তখন ফিরে এসেছিল বাপের সংসারে। কাঠুখালির আর দশটা বিধবা মেয়ের মতন বাপ-ভাইয়ের সংসারে মাথা গুঁজে একটা বছর কাটিয়ে দিল পদ্মও। প্রথম প্রথম বলরামকে দেখে সঙ্কোচ হত। মুখোমুখি হলে দুজনেই চোখ নামিয়ে নিত। তারপর আস্তে আস্তে কখন সব সহজ হয়ে এলো। প্রতিদিনের কাজে কর্মে দেখাশোনায় সারাঘাটা জীবনের রং-টা আবার ফিরে এলো। কাঁচা বয়সের সেই দিনগুলোর স্মৃতি কিকে কখন হয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল। এখন আর যেন মনেও পড়তে চায় না। সংসারের আর পাঁচটা কথার মতন এটাও যেন একটা পুরোনো শোনা কথা মাত্র। আর এসব কথা কি কেউ কোনদিন মনে করে ধরে রাখে। না, রাখতে পারে। বলরাম এখন পদ্মদের বাড়ী যায়। পদ্মও কাজে পদ্মকে বলরামদের বাড়ী আসে। বলরামকে বোনাই বলে ডাকে। ছেলেটাকে আদর করে। সুধাদীর হাতের কাজ কেড়ে নিয়ে ওকে সাহায্য করে।

সংসারের এই ভাঙাচুরো বদলাবদলির কথাগুলো আপন-মনে তোলা পাড়া করতে থাকে বলরাম।

হঠাৎ উঠোনের কোণের দিকে বংশীর গলা শোনা যায়। রোগা কর্শা কর্শা চেহারাটায় কেমন যেন একটা পাক ধরেছে বংশীর। কিন্তু ওর সেই আমুদে মনটা একটুও বদলায়নি। ঘরের দিকে আসতে আসতে গলা চড়িয়ে বলে বংশী—"বলরাম বাড়ী আছিস নাকি কে?"—

বংশীর গলা শুনে পদ্ম নড়েচড়ে বসে। সুধাদী একটুখানি ঘোমটা টেনে দেয় মাথার উপরে। পাড়ার ছেলে। কিন্তু ওর লজ্জাটা যেন বড়ো বেশী। সবসময়েই জড়োসড়ো ভাব। চেহারাটাও একটু ভারী ভারী। লোকজন দেখলে তাড়াতাড়ি কাপড়-চোপড় সামলাতে গিয়ে আরো যেন বেসামাল হয়ে পড়ে।

বংশীর ডাক শুনে উঠে বসল বলরাম। হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলে—"আয় বোংশে, চলি কমে?" যাওয়ার পরে একখানা আসন টেনে নিয়ে বসতে বসতে বলে বংশী—

"যাবো আর কনে? তুই তো কুম্ভকর্ণের মতন পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিস। সংক্রান্তির আর কয়টা দিন আছে তা জানিস্?"

চৈত্র সংক্রান্তি। তা বটে। মাস তো প্রায় শেষ হয়ে এলো। বলরামকে চুপ করে থাকতে দেখে বংশী বলে —"পাট-জাগানির কি করতিছিস? এগারো দিনের দিন তো হল না। নয়দিনিরডাও বাদ গ্যালো। সাত দিনির দিনডা আর পাছোল না। যা হয় এট্টা কিছু কর।"

বলরাম ঠাণ্ডা গলায় জবাব দেয় -"এবার ভাবতিছি আমি আর ওসব কই-জাগেনার মধ্যি থাকবো না। তোরাই যা হয় কর।"

বংশী যেন আকাশ থেকে পড়ে—"কোন্ কি তুই বলরাম? আর কয় বোছোর ধরে তুই-ই তো হালরা

সন্ন্যাসী হচ্ছিস। তুই ছাড়া বেডা আর হাজরা-সন্ন্যেসী হবে ক'?

একথা ঠেলতে পারে না বলরাম। বাকুলী গ্রামের চড়ক-পুজোর হাজরা সন্ন্যেসীর পদটা যেন ওর বাঁধা। বড়ো দায়িত্বের কাজ। খুব নিষ্ঠা-কাঠার মধ্যে থাকতে হয়। আর এ ব্যাপারে বলরামের জুড়ি নেই। কেউ কোনোদিন ওর কোনো খুঁত ধরতে পারেনি।

তবু বলরাম আপত্তি জানায়। বলে—"এবার না-হয় নতুন কারো হাজরা-সন্ন্যেসী বানা। সেব কাজকাম তো দুই একজনের জা'নে শুনে রাখতি হবে।"

ধমক দেয় বংশী—"তুই থাম দেহিনি বদা। ফজায় কথা শুনলি পিত্তি জ্বলে। ওরে, ঘরে দেখবার, সে আপনি দেখবে। সে ভাবনায় তোর মাথা গোরানি লাগবে না। আমরা পুজোর মদ্যি যে কয়ডা দিন আছি, সে কয়ডা দিন তোর হাজরা সন্ন্যেসী হতিই হবে।"

বংশীর কথা শুনে ঘোমটার আড়ালে হাসি চাপে সুবাসী। পদ্ম মুখ বাড়িয়ে জবাব দেয়—"কানো, নারানের বাবা না হলি বুঝি আর কেউ হাজরা-সন্ন্যেসী হতি পারে না? তা, নারানের বাবার আমতের কারপড়া কি একবার বাস্তা ভাঙ না।

বলরামের ছেলের নাম নারান পদ্ম মাঝে মাঝে বলরামকে ডাকে নারানের-বাবা। গ্রাম গাঁয়ের ঐ রীতি। জোরালবন্ধ একটা পুরুষমানুষকে নাম ধরে ডাকবে। সেটা ভালো দেখায় না। তাই মাঝখানে এই আর ডালটুকু। ছেলের নামটা জুড়ে দিয়ে তার বাপ বলে ডাকা। যে ডাকে, তারও চক্ষুলজ্জায় বাধে না। আর যাকে ডাকা হয়, তারও ভালো লাগে।

পদ্মর কথার কোনো জবাব দিল না বলরাম। বংশী শুধু পদ্মর কথার সায় দিয়ে বলে—"তুই-ই ক' দেহি পদ্মদি। বলরামের এই জানো না তানো না করাডা কি ঠিক হচ্ছে? তাবেডা কি কত্তি পারিস বলরাম?"

পদ্মকে বংশী পদ্মদি বলে ডাকে। কারণটা যে কি, তা কেউ জানে না। বংশী নিজেও ভালো ক'রে বুঝে উঠতে পারে না। বংশীর চেয়ে পদ্ম বয়সে বেশ ছোটোই হবে। তবু বংশী পদ্মকে পদ্মদি ছাড়া আর যেন কিছু বলতে পারে না। সেই পুরানো দিনের কথাগুলো যেন এখনো গাঁথা কেটে আছে বংশীর মনে পদ্ম আর বলরামের জীবনের সেই দিনগুলোর কথা আর সকলে ভুলে গেছে। কিন্তু বংশী যেন এখনো ভোলেনি। পদ্ম আর বলরামকে একসঙ্গে দেখলেই যেন সেই পুরোনো দিনগুলো আবার তার মনে ভেসে ওঠে। বলরামের চেয়ে বংশী বয়সে কিছু ছোটো। শরীরের গড়নপাতির দিক দিয়েও বংশী মানুষটা বেশ ছোটো-খাটো। বলরামের চাউল শরীরটার পাশে ওকে বেশ পুঁচকে মনে হয়। একসঙ্গে কাজকাম, ওঠ-বস্ করতে হয়। তাই কাজেদিনে—কচ কেবি চলে দুজনের মধ্যে। কিন্তু হলে হবে কি! বংশী তার মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা জায়গায় বলরামকে বেশ সমীহ ক'রেই চলে। বড়ো ভাইয়ের মতনই ভয় করে। মান্য করে। আর তাই বলরামের সঙ্গে পদ্মকে জড়িয়ে সেই যে পদ্মদি নামটা তার মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল, আজো তা মন থেকে মুছতে পারেনি।

বংশীর কথা শুনে হেসে ফেলে বলরাম। বলে—"নে হ্যামড়া, থাম দেহিনি! তোর আর পঞ্চগোপার মানুষ সালিশ ডাকতি হবে না।"

"তালি তুই রাজী হচ্ছিস ক'?",—প্রশ্ন করে বংশী।

"দিচ্ছি রে দিচ্ছি। তোর মতন এরম বা'দের আঠা আর জন্মে দেহিনি। একবার লাগলি তো আর ছাড়তি চাস্‌না।"

বলরামের কথা শেষ হতে না হতেই বংশী খপ্ করে শুয়ে

পড়ে যাচ্ছিতে। চার হাত পা ছড়িয়ে দেয় চারিদিকে। সাষ্টাঙ্গে বলরামের পায়ের কাছে প্রণাম ক'রে চীৎকার করে ওঠে—"জয় বাবা যুড়ো শিবির জয়। জয় বাবা হাজরা-সন্ন্যাসীর জয়। জয় বাবা বলা ঠাউরির জয়।"

বংশীর কাণ্ড দেখে হেসে কুটি পাটি যায় সুবাসী আর পদ্ম।

বলরামের ছেলেটাও যেন বড়ো মজা পেলো। নড়বড়ে পা দুটো নিয়ে ছুটে এসে দাঁড়ালো বংশীর পা ঘেঁষে। সামনের মাড়িতে ওর ছোটো ছোটো দুধ-দাঁত বেরিয়েছে। হা করলেই দাঁতগুলো দেখা যায়। ধবধবে দাঁতগুলো বের করে সেও চেঁচিয়ে উঠলো "জয় বাবা যুড়ো শিবির জয়—"

তড়াক্ করে উঠে দাঁড়ালো বংশী। ছুটে গিয়ে নারানকে কাঁধে তুলে নিয়ে বলে—"এ্যা, এহেবারে বাপ কা ব্যাটা। যেমন বাবা ভীমেনাথ, তেমনি ব্যাটা ঘটোৎকচ।"

অমনি নারানকে নিয়ে হৈ হৈ করে নেচে বেড়ায় সারা উঠোন জুড়ে। আর গলা ফাটিয়ে চেঁচায়—"জয় বাবা যুড়ো শিবির জয়। জয় বাবা ভূতে চাউরির জয়।"

বংশীর কাঁধে চড়ে নারান দুই হাতে সমানে হাততালি দিয়ে চলে।

আর ওদিকে বলরাম, সুবাসী আর পদ্ম হেসে গড়াগড়ি যায়।

১৫

চৈত্র মাসের শেষ। কাঠুখালির বিলের সব গাঁয়েই পাট-পুজোর হিড়িক পড়ে গেছে। চড়কপুজোর আর এক নাম হল পাট পুজো। তিন, পাঁচ, সাত, নয়, এগারো—এমনি যে কোনো একটা বেজোড় দিনে পাট আগানোর রীতি। প্রায় সব গাঁয়েই পাট আগানো হয়ে গেছে। ঢাকের কড়কড়ে শব্দে কাঠুখালির আকাশ-বাতাস ভরে উঠেছে।

বাকুলী গ্রামে এবার ওদের পাট লাগাতে একটু দেরী হয়ে গেল। তবু তড়িঘড়ি ক'রে সাতদিনের দিনই কাজ আরম্ভ হলো। পাট ছিল কেষ্টদের গোয়ালঘরে মাচানের পরে। পাট রাখার নিয়মই হ'লো তাই। প্রতি চৈত্র-সংক্রান্তিতে পাট পুজোর কাজ শেষ হয়ে যায়। তারপর যত্ন ক'রে পাট তুলে রাখতে হয় কোনো গোয়ালঘরে। পরের পুজোর অপেক্ষায়। পাট বের করবার আগে একজনকে 'বালা' সাজতে হয়। 'বালা' বা 'বালাই'। পাটের নানা তত্ত্ব আর আগম-নিগমের ব্যাখ্যান করে বালা। মন্তর পড়ে সব আলাই-বালাই সরিয়ে দেয়। এসব কাজে তাই ছেলে-ছোকরার চেয়ে একটু ভার-ভারিক্কি মানুষ হ'লেই ভালো হয়। বাকুলী গাঁয়ের পাট লাগানোর আগে এই ডাক পড়ে নকুল যুড়োর। মানুষটা সংসারের অনেক কিছু দেখেছে। শাস্তর-তত্ত্বটাও বোঝে ভালো।

পহর দুই রাতের সময় সকলে চল্ল কেষ্টদের গোয়াল ঘরে। একজন দু'জন করে দলটা বেশ ভারী হয়ে উঠেছে। সকলের চোখে মুখে একটা উত্তেজনার ভাব। মস্ত বড়ো চাকটা কাঁধে তুলে বংশী চলেছে সকলের আগে আগে। সারাদিন উপোষ করে থেকে নকুল যুড়ো একটু কাহিল হয়ে পড়েছে। তবু বিড়বিড় করতে করতে এগিয়ে চলেছে ওদের সঙ্গে। সকলে এসে হাজির হলো গোয়াল ঘরের বারান্দায়। ঘুরঘুট্টি রাত। তার মাঝখানে টিম্‌টিম্ করছে কালি-পড়া কয়েকটা হ্যারিকেন। আলোছায়ার মাঝখানে মানুষগুলোকে কেমন যেন অচেনা ব'লে মনে হতে লাগলো। বালাকে মাঝখানে রেখে সকলে একে একে ঢুকল গিয়ে গোয়াল ঘরে। এবার পাট বের করবার মন্তর বলবে বালা। নকুল চুপচাপ দাঁড়িয়ে একটুকাল কি যেন ভাবল। সকলের দিকে চোখ বুলিয়ে নিল একবার। তারপর যেন নিজেকেই শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল—"তোমরা বাবা আমারে এ-সগোল কালের মধ্যি ডাকো। না আলেও পারি না। তা তোমরা

বাবা এটু নজর রাইখো। যাখনো রীত-কানুনগুলোর কোনো হেলাচ্ছেদ্দা না হয়। বুড়ো বয়েসটায় যাখনো আর ধন্মের কোপে না পড়তি হয়।"

নকুল বালার কথায় কেউ কোনো জবাব দিল না। সকলে নিশ্চুপ হয়ে মাথানীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। মনে মনে সকলে যেন সায় দিল নকুল বালার কথায়। শপথ নিল,—জানতঃ রীত-কানুনের কোনো হেলা-ছেদ্দা তারা করবে না।

সারা ঘরের মধ্যে থম-থম করছে আবছা আলো-অন্ধকার। উৎকর্ণ হ'য়ে সকলে অপেক্ষা করছে। নকুল-বালা আবার কথা বলে উঠল—। গলার স্বরে এবার জোর ফুটে উঠেছে—"আরে স্যাখ্ তো, কাণ্ডখানা স্যাখ্। তোরা সব এমন ধারা ঝিমোরে পড়লি চলবে ক্যান্? এ হলো গিয়ে বাবা ভূতনাথ বুড়ো শিবির পুজো। আর তোরা হলি গিয়ে তেনার নন্দী ভিঙ্গী। যেই যেই ক'রে নাচবি, আর বুড়ো শিবির জয় দিবি। কইরে,—বালা—বালা—"

বলবার সঙ্গে সঙ্গেই বংশী ঢাক নিয়ে এগিয়ে এলো সামনে। পেল্লায় ঢাকের ভারে ওর পাতলা শরীরটা বেঁকে গেছে। কিন্তু হলে হবে কি! ওর পাকা হাতের কাঠি পড়তেই ঢাকটার যেন প্রাণ দেখা দিল। নিশুতি রাতের স্তব্ধতা ভেঙে খানখান্ হয়ে গেল ঢাকের শব্দে।

খানিকক্ষণ বাজিয়ে থামল বংশী। আবার চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে এলো।

নকুল এগিয়ে এলো। ভক্তিভরে প্রণাম করল মাটীতে। বিড়বিড় করে কি যেন বলল খানিকক্ষণ। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার গলায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল—

"এলারো বাপ ছিলেরে পাট শয়ান নিদ্রা ঘরে।
স্বপ্নযোগে শিবের পূজা যখন তলব পড়ে।
পাট চৌয়র বান বসনে ঝাঁপিয়ে।
সরোবরের তীরে চল পাট পূজি গিয়ে।"

এমনি ধারা এক একটা স্তবের শেষ হয়। আর ঢাকের পিঠে কড় কড় করে বাড়ি পড়ে। তারপর এক সময়ে সকলে মিলে হাতে হাতে ধরাধরি করে বেশ করে ফেলা পাট। দশ বারো হাত লম্বা বেল কাঠের তৈরী পাট। পাটের আর এক নাম হল 'দেশ'। কথাটি হয়ত এসেছে দেউল বা দেবালয় থেকে। পাট হল শিবের আসন বা মন্দির। গায়ে নানারকম কারুকাজ করা। বছর বছর তেল সিঁদুর খেয়ে পাটের ছিপছিপে শরীরখানা চক্‌চক্ করছে। লাল শালু কাপড় জড়িয়ে এতোদিন ধুলো ময়লায় গোয়ালের মাচানের উপর তোলা ছিল। ভক্তের পুজো পাবার লোভে নিকষ-কালো দীর্ঘ শরীরখানা আবার যেন চিকিয়ে উঠেছে।

সোরগোল করে সকলে পাট মাথায় নিয়ে এগিয়ে চললো। কিন্তু পাট স্নান সহজে হয় না। পথে বাধা আসে অনেক। পথের কিছুদূরে অন্তর অন্তর দাঁড়িয়ে থাকে এক একজন ক'রে। এরা হল এক একটা বাধার প্রতীক। শীন, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, ভৃগুপতি, রঘুপতি, রোহিনীনন্দন—এমনি ভিন্ন ভিন্ন নাম এদের। এক একজনকে এক একটা রূপে সাজতে হয়। অন্ধকারের মধ্যে বিচিত্র অঙ্গ-ভঙ্গিমায় এরা অবস্থান করে। এদের সেই বিচিত্র ভঙ্গীর সামনে গিয়ে পাট নিয়ে সকলে দাঁড়িয়ে পড়ে। অমনি বালা শোলোক বলতে শুরু করে। বালাইয়ের শোলোক শুনবার সঙ্গে সঙ্গে পথের বাধা সরে যায়। যে লোকটা বাধার রূপ ধরে অবস্থান করছিল, সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে পড়ে।

এমনি করে সব বাধা সরিয়ে দিয়ে বালা পাট নিয়ে এলো পুকুর পারে। পাটকে স্নান করানো হল। ধোয়া-মোছা পেয়ে ঝকমক করে উঠল পাটের অঙ্গ। পাট চানের পরে পুকুর পাড়ে ভিজে কাপড়ে সকলে বসল গোল হয়ে। বালা আবার শোলোক বলা শুরু করল—

"গোয়ালে ছিলরে পাট, পাটে হলো কালী।
সেই পাট ধোয়াতি নিলাম বোরো ছুঁয় আলি।
বোরো ছুঁয় আলিরে ভাই কট্‌কটে ব্যাঙ।

নাকার আ'লে ধরলরে ভাই রাম-বালাইয়ের ঠ্যাং।
রায়বালা ধম অবতার—
বুড়ো শঙ্কর ভাজ ধরে-কুম্ভ নাশ্ ভ্যাং-আ-ভ্যাং ভ্যাং।

এর পরে পুজো শুরু হ'ল। পাট নিয়ে বাড়ীতে প্রতিষ্ঠা করবার আগে এখানেই একবার পুজো সেরে নিতে হবে। তাই হল নিয়ম।

পুজো শেষ হতে বেশীক্ষণ লাগল না। অল্পক্ষণেই শেষ হয়ে গেল। নিজে কাপড়ে বসে বসে সকলেই উস্‌খুস্ করছিল। বালার অনুমতি পাবার সঙ্গে সঙ্গে সবাই উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে চলল পাট মাথায় নিয়ে। এবার পাটের থান বসবে কেষ্টদের বাড়ী। পাটের থান বসানোর কোনো বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই। যে কারো বাড়ী হতে পারে। কেষ্টর বাবা ঈশ্বরচরণের বড়ো ইচ্ছে,—এবার ওদের বাড়ীর উঠোনেই থান বসানো হোক। সারা বছরটা ওদেরই গোয়ালঘরে পাট তোলা ছিল। বুড়ো মানুষের কথাটা কেউ ফেলতে পারল না। এক কথাতেই রাজী হয়ে গিয়েছিল সকলে।

পাট নিয়ে যখন থানে পৌঁছলো সকলে, তখন রাত আর বেশী নেই। পুব-দিকটা প্রায় ফরসা হয়ে এসেছে। এখানে ওখানে গাছের ডালে পাখিগুলো ঘুম ভেঙে নানা স্বরে ডেকে উঠছে। নিকানো-মোছানো মাটির বেদীর উপর বসিয়ে পাট প্রতিষ্ঠা করা হোল। আজকের রাতের মতন এখানেই বিরাম। দিনেও আর কোনো কাজ নেই। পরের দিন থেকেই আবার যথারীতি পুজোর কাজ শুরু হবে।

দেখতে দেখতে কেটে গেল মাঘের দিনটা। পরের দিন থেকেই যথারীতি পাটের পুজো শুরু হয়ে গেল। সকাল সন্ধ্যে দু'বেলাই পুজো হবার নিয়ম। দুটো গানের দল তৈরী হ'ল। একটার নাম বালাইয়ের দল বা ঢাকের সুর। আর একটা হল অষ্টক গানের দল বা হরগৌরীর দল।

বালাই গানের মধ্যে দেবদেবীর বৃত্তান্ত আর শাস্ত্র পুরাণের কথা। দুটোর মধ্যে হরগৌরী বা অষ্টক গানের আকর্ষণটাই যেন বেশী। ছোটো ছোটো ছেলেগুলো—যাদের মিঠে গলা—চেহারা ভালো—তাদের সাজানো হয়। কেউ সাজে কৃষ্ণ। কেউ সাজে রাধা। কেউ কেউ বা সাজে সখী। কাউকে বা সাজানো হয় হর-গৌরী। এদের পিছনে থাকে বড়োরা। এরা হল দোহার। চৈত্রের খর-রোদের বাতাসে আগুন ধরে। সমস্ত দুপুরটা যেন ঝিমোতে থাকে। আর তারই মাঝখানে অষ্টকের দল এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে গান গেয়ে গেয়ে বেড়ায়। এক এক বাড়ীতে পাট নিয়ে নামানো হয়। সে বাড়ীর মেয়েরা পাট-পুজোর উপচার জোগাড় করে দেয়। পাটে তেল-সিঁদুর দেয়। আতপ চাল, পাকা-কলা, আর বাতাসা দিয়ে ভোগ দেয়।

একদিকে পাট-পুজোর কাজ চলে। অন্যদিকে শুরু হয় অষ্টক দলের গান। কাহিনী প্রায় সবই রামায়ণ-মহাভারতের; কিম্বা অন্য কোনো পরিচিত পুরাণ উপাখ্যানের। সকলের পরে থাকে ঘুড়ুর বাঁধা। নেচে নেচে একবার সামনে এগোয়। আবার পিছিয়ে আসে পিছনে। দীর্ঘ ত্রিপদীর বিলম্বিত সুর। কিশোর কণ্ঠের সুরেলা ধ্বনিতে বসন্তের বাতাস যেন আরো মাতাল হয়ে ওঠে। গ্রামে-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে সে সুর। দলের পরে দল। সুরের পরে সুর। সুরে সুরে সারা কাঠুরালির বিলের গাঁও-গ্রামগুলো যেন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে। এ-সময়ে মাঠের কাজকর্ম বেশী কিছু থাকেনা। ছেলেবুড়ো সকলের গলা তাই সমানতালে মেতে ওঠে।

ও-দিকে বালাই গানের আসরে শাস্ত্রের ব্যাখ্যান করে চলে নকুল :—"বাবা বুড়ো শিবির পুজো। রীত্-কানুনির অমান্যি যানো না হয়। তিনি যেমন ছালান, তেমনি কাঁদান। তেনার নীলের তো শেষ নেই। তিনি সব দেবতার সেরা দেবতা। দেবাদিদের মহাদেব। হাতে তেনার

ত্রিশূল। নয়নে তেনার অগ্নি। চোখে চোখ রেখে কথা বলে হেন সাধ্যি নেই কোনো দেবতার। আবার তিনিই শ্মশানে মশানে বসে গাঁজা টানেন। ভূত নাচিয়ে বেড়ান। কতই না তার লীলে। অন্নহীন হ'য়ে দুয়োরে দুয়োরে ভিখ্ মাগেন। হাতের ত্রিশূল তাজেন লাঙল গড়েন। সেই লাঙলে মা বসুমতীর অঙ্গ কর্ষণ করেন। ফসল ফলান। মা-অন্নপূর্ণার অফেল খাদ্ পুরো হয়। মানুষির মুখি অন্ন জোটে। সেই বাবা বুড়ো শিবির পুজো। খবদ্দার। রীতকাহুনির অমজ্ঞেদা যানো না হয়।"

সংক্রান্তির শেষ তিন দিন থেকে পুজোর কাজকর্ম আরো বেড়ে গেল। শেষ তিন দিনের প্রথম যে রাত, ঐ রাত হল অধিবাসের রাত। সারা রাত জেগে বসা পুজোর আনুষঙ্গিক সমস্ত জিনিষের জন্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে চলল। অধিবাসের রাতের পরের দিন থেকে কাজ শুরু হবে হাজরা সন্ন্যাসীর। কাজ বড়ো কঠিন কাজ। শুচি-শুদ্ধ মন নিয়ে দেবতার কাজ করতে হবে। দেবতাকে ভোগ দিতে হবে। তার হাত দিয়েই দেবতার খানে গিয়ে পুজোর প্রসাদ পৌঁছবে। একটু ত্রুটি হলেই সর্বনাশ দেবতার কোপ নেমে আসবে।

অধিবাসের রাত্তিরে বলরাম বুড়ো শিবের কাছে মানত মানল মনে জোর চাইল। এ-কদিন পাটের পিছনে হৈ হৈ করে বেড়িয়েছে। সময়-অসময়ে গাজা-ভাঙ টেনেছে। মাতলামি করেছে। কিন্তু কাল থেকে সব ধুয়ে মুছে ফেলতে হবে। শুদ্ধ পবিত্র করতে হবে মনকে। কোনো জায়গায় একটুখানি পাপ থাকলে চলবে না। অশুচি থাকলে চলবে না। গ্রামের সব লোক তাকে হাজরা সন্ন্যাসী বানিয়েছে। বিশ্বাস ক'রে তার হাতেই পুজোর সব ভার তুলে দিয়েছে। সে বিশ্বাস ভাঙা যাবে না কোনোমতে।

অনেক রাত পর্যন্ত বলরাম বুড়ো শিবের কাছে প্রার্থনা করল। মানত মানল। (ক্রমশঃ)

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.	
শ্রীগীতা	৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.	
বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·৩০
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	১·২৫
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.

বিদ্যাসাগর	২·২৫
মানুষের মত মানুষ	·৭৫
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : কলকাতা—১২

: উপন্যাস :

কণ্ঠ ভরা বিষ

মিহির মুখোপাধ্যায়

উনিশ

মুঘল সাম্রাজ্যের তখন অন্তিম প্রহর। আওরঙ্গজেব বাদশার আমল থেকেই ভাঙন শুরু হয়েছিল। ভাইদের খুন করে, বাপকে বন্দী করে মসনদ দখল করেছিলেন আওরঙ্গজেব। কিন্তু সুখে রাজত্ব করতে পারেননি। একদিনও বিশ্রাম নেই একদিনও শান্তি নেই। সারাজীবন যেন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছেন আলমগীর বাদশাহ। সারাজীবন ধরে লড়াই করেছেন, বিদ্রোহ দমন করেছেন। নিজের অন্ধ ধর্মবিশ্বাস, আর পৌঢ়ামিও এই অশান্তির আগুনে ইন্ধনের কাজ করেছে। দার-উল-হারব অর্থাৎ অমুসলমানের দেশ হিন্দুস্থানকে তিনি দার-উল-ইসলাম অর্থাৎ মুসলমানের দেশে পরিণত করতে চেয়েছিলেন।

অমুসলমান জিম্মিদের ওপর জিজিয়া কর বসিয়েছেন। দার-উল-ইসলামে বসবাসের কোন অধিকার নেই জিম্মিদের। জিজিয়া কর দিয়ে সেই অধিকার তারা কিনে নিতে বাধ্য থাকবে।

ফল যা হবার তাই হ'ল। বিশাল সাম্রাজ্যের নানা জায়গায়, এখানে ওখানে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল। জাঠ মুঘেলা, সংনামী সম্প্রদায়। আর দিল্লীর কাছাকাছি শিখ আর রাজপুত।

দিক্ষিণে বাকিপাতে মারাঠা। বাদশাহ একএক দিকে একএক জন সেনাপতি, একএক দল সৈন্য পাঠিয়েছেন। রণনিপুণ খাতিমান সেনাপতি সব। বাদশাহের আপন মামা, মমতাজের সহোদর শায়েস্তা খাঁ, মির্জা রাজা জয়সিংহ দিলির খাঁ, যশোবন্ত সিংহ, বীর দুর্মদ।

সেনাপতিরা সব জান দিয়ে লড়াই করেছেন। কখনো জিতেছেন, কখনো হেরেছেন। কিন্তু যুদ্ধ থামেনি। নিশ্চিন্ত শান্তি আর ফিরে আসেনি। কেউ বলেন বাদশাহর গোঁড়ামি এর জন্য দায়ী, কেউ বলেন বাদশাহর মনের অবিশ্বাস আর সন্দেহ দায়ী, আবার কেউ বলেন সাম্রাজ্যের বিপুল ব্যাপ্তিই এই ভাঙনের কারণ। কিন্তু যে যাই বলুন, ভাঙন রোধ করা যায়নি।

মহাকাল তার নিজের নিয়মে ভাঙা-গড়ার খেলা খেলেছে। মহা অশান্তি আর ব্যর্থতার মধ্যে এক একজন দিকপাল সেনাপতির মৃত্যু হয়েছে। মির্জা রাজা জয়সিংহ মরেছেন, যশোবন্ত সিংহ মরেছেন, বীরদুর্মদা মারা গেছেন। সাম্রাজ্যের এক একটা স্তম্ভ ভেঙে পড়েছে। বাদশাহ নিজে বৃদ্ধ হয়েছেন। শুভ্র কেশ, শুভ্র বেশ। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ-পিঙ্গল চক্ষু-তারকা ধূসর। আগুনের মত গায়ের রঙ ম্লান, নিষ্প্রভ। বয়সের ভারে দীর্ঘদেহ নুয়ে পড়েছে। তবুও লড়াই চালাতে হয়েছে। বিশ্রাম নেই, শান্তি নেই। একটার পর একটা যুদ্ধ। একদিকের যুদ্ধ থেমেছে, সন্ধি হয়েছে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে না ফেলতেই আরেকদিকের আগুন জ্বলে উঠেছে। প্রায় নব্বুই বছরের বৃদ্ধ বাদশাহ জীবনের শেষ দিনগুলি

কাটিয়েছেন, কাটাতে বাধ্য হয়েছেন দিল্লী থেকে বহুদূরে দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ শিবিরে। শেষ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যের মাটিতেই চিরবিশ্রাম নিলেন শাহানশা মুহিউদ্দিন মুহম্মদ আওরঙ্গজেব বাদশাহ আলমগীর। তখনো উত্তরে দুর্ধান্ত শিখ, দক্ষিণে প্রবল মারাঠা। তার উপরে রয়েছে গৃহবিবাদের আগুন দরবারের ষড়যন্ত্র, ষড়যন্ত্র, ঈর্ষা আর লোভের চক্রান্ত। বাদশাহ নিজেও বুঝেছিলেন, ইতিহাসের নাটককে বারবার একই নাটকের অভিনয় হবে।

এক দৃশ্য, এক ঘটনা, এক পরিণাম। সম্রাট শাহজাহানের চার ছেলে—দারা, সুজা, আওরঙ্গজেব, মুরাদ যেমন অভিনয় করে গেছেন, ঠিক তেমনি অভিনয়ই করবেন বাদশাহ আওরঙ্গজেবের তিন ছেলে মোয়াজ্জেম, আজম ও কামবক্স।

গৃহযুদ্ধের অশান্তি এড়াবার জন্য বাদশাহ তাই উইল করে তিনছেলের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই ইচ্ছা-পত্রকেও বাদশাহর সঙ্গে কবর চাপা দিয়ে তিন ভাই লড়াইএ মেতে উঠলেন।

প্রথমে আজম, পরে কামবক্স প্রাণ দিলেন এই গৃহযুদ্ধের আগুনে। মোয়াজ্জেম বসলেন গদীতে। বাহাদুর শাহ নাম নিয়ে রাজত্ব করলেন চারবছর। মোয়াজ্জেমের চার ছেলে —জাহান্দর শাহ, আজিম-উস-সান, রফি-উস-সান, জাহানশাহ। তারপর আবার সেই এক দৃশ্য, এক অভিনয়, শুধু পাত্রপাত্রীরা ভিন্ন নামের। সাত বছরের মধ্যে চারজন নামমাত্র বাদশাহ উজীরদের হাতের পুতুল হয়ে বসলেন আর নেমে গেলেন। শক্তিহীন ব্যক্তিত্বহীন বাদশাহদের মাথার উপর ছড়ি ঘোরাতে লাগল দরবারের আমীররা। আমীরদের মধ্যে তখন প্রধান দুটো দল—ইরানী আর হিন্দুস্তানী। ইরানীদলের নেতা জুলফিকার খাঁ বসলেন জাহান্দার শাহকে, নিজে হলেন প্রধান উজীর। কিন্তু বেশিদিন টিকতে পারলেন না। আজিম-উস-সানের ছেলে ফারুখসিয়ার দু'জনকেই খুন করে বসলেন দখল করলেন। তার সহায় তখন হিন্দুস্তানী ওমরাও দলের নেতা সৈয়দ ভাই দুইজন। একজন হলেন মীরবক্সী, আরেকজন প্রধান উজীর, যার সহকারী নাম দেওয়ান-ই-আলা। এই ফারুখসিয়ারের কর্মফলের জোরেই সুবেবাংলার নবাব হয়েছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁ। আবার পাঁচটা বছর না যেতেই ফারুখসিয়রের সঙ্গেও ঝগড়া হল সৈয়দ ভাইদের। মাড়বারের রাজা যশোবন্ত সিংহের পুত্র রাজা অজিত সিংহ ছিলেন ফারুখসিয়রের শ্বশুর। সেই শ্বশুর মশাইও সৈয়দভাইদের সঙ্গে যোগ দিয়ে জামাইকে খুন করলেন। বড় বদনাম হয়েছিল অজিত সিংহের। লোকে তাকে দামাদ-কুশ বলে বিদ্রূপ করত। দিল্লীর রাস্তার ছোট ছোট কাজিল ছেলেগুলি পর্যন্ত সেপাই-শান্ত্রীদের পরোয়া না করে অজিত সিংহের পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটত আর হাততালি ছুড়ে ছুড়ে চেঁচাত —দামাদ-কুশ, দামাদ-কুশ।

দামাদ-কুশ মানে জামাই খাওক।

তারপর রফি-উস-সানের দুই ছেলে রফি-উদ্-দরাজত আর রফি-উদ-দৌলা পরপর কয়েকমাসের জন্য বাদশাহ হলেন। শেষে জাহানশাহর ছেলে রৌশন আখতার বাদশাহ মুহম্মদ শাহ নাম ধারণ করে তখৎ-ই-তাউস এ বসলেন। সম্রাট শাহজাহানের তৈরী ময়ূর সিংহাসনে সেবারের মত একজন মুঘল সম্রাটের অভিষেক হ'ল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সৈয়দভাইদের প্রভুত্বের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন মুহম্মদ শাহ। চিনকিলিচ খাঁ নামে এক আমীরের সাহায্যে খুন করালেন তাদের। এই চিনকিলিচ খাঁই প্রথম নিজাম-উল-মুলুক। স্বাধীন হায়দ্রাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। এত করেও কিন্তু সাম্রাজ্যের গৌরব, সম্রাটের মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে পারলেন না মুহম্মদ শাহ। সঙ্গীত প্রিয় ছিলেন সম্রাট। বহু বিখ্যাত গায়কের সমাবেশ হতো তাঁর দরবারে।

খান-বাজনার মজলিশে মশগুল থাকলে কোনমুলেই রাজ্য চালানো যায় না। অন্ততঃ সেই অরাজক আঠারো শতকে একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার ছিল। একেই দেশের মধ্যে নানা অশান্তি, ষড়যন্ত্র, দলাদলি। তার ওপর বিদেশ থেকে লুটপাটের মতলবে এলেন নাদির শাহ্।

দরিদ্র তিন্তিওয়ালার ছেলে নাদির শাহ। সাফাবী বংশের সম্রাটকে সরিয়ে পারস্যের সিংহাসন দখল করেছিলেন। হিন্দুস্তানের ওপর নজর ছিল তাঁর। কান্দাহার অঞ্চলের অধিকার নিয়ে সম্রাট শাহজাহানের আমল থেকেই বিরোধ চলছিল। অনেকবার হাত বদল হয়েছে এই কান্দাহার দুর্গ। উত্তর পশ্চিম-সীমান্ত অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ ঘাটি। কাবুল আর কান্দাহার জয় করলেন নাদিরশাহ। কিছু আফগান পলাতক মুঘল রাজ্যের এলাকায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের ধরিয়ে দেবার জন্য, বন্দী করে ফেরত পাঠাবার জন্য মুহম্মদ শাহর দরবারে দূত পাঠালেন নাদির শাহ।

আঠারো মাসে তখন দিল্লী দরবারের বছর যায়। সবাই অলস, অশ্লীল আমোদ-ফূর্তি আর বিলাস-ব্যসনে মত্ত। ওমরাও দলের মধ্যে শুধু স্বার্থ আর দলাদলির ষড়যন্ত্র।

নাদির শাহ বছরখানেক চুপচাপ দেখলেন। তার দূতের কাছ থেকে কোন খবর এল না।

তখন বারম্বার করে পারস্য সম্রাটের বাহিনী সীমান্তের সেই পুরনো পথে এসে হিন্দুস্তানে ঢুকল।

যে পথে গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট এসেছিলেন, যে পথে শক-হূণ-কুষাণরা এসেছিল, যে পথে তৈমুরলঙ, মুহম্মদ ঘোরী, সুলতান মামুদ, এমন কি প্রথম মুঘল বাবর জহিরুদ্দীন বাবর শাহ এসেছিলেন, ইতিহাসের সেই পুরনো পথেই মহাকালের রথের চাকার ধুলো উড়িয়ে নাদির শাহ এলেন।

পাঞ্জাব অবশ্য বাতবাড়া হবার পর হুঁশ হল দিল্লী দরবারের। লাহোরের তখন ভাল সৈন্য নেই, অস্ত্র নেই, গোলাবারুদের অভাব, রাজভাণ্ডারও প্রায় শূন্য। তবু যাহোক যেমন তেমন করে একদল সৈন্য নিয়ে মুহম্মদ শাহ দিল্লী থেকে বেরোলেন। বেশীদূরে আর যেতে হ'ল না। পানিপথের কাছেই কর্ণালের ময়দানে লড়াই হল। মান-ইজ্জত বাঁচাবার জন্য লড়াই করলেন মুহম্মদ শাহ। কিন্তু ইজ্জত আর বাঁচলো না। বন্দী অবস্থায় নাদির শাহের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীতে ফিরে এলেন অসহায় বাদশাহ। সম্রাট শাহজাহানের ময়ূর সিংহাসনে বসলেন নাদির শাহ। বিদেশী সৈন্যদের দাপটে দিল্লীবাসীদের যখন কণ্ঠাগত প্রাণ, এমন সময় একদিন গুজব রটলো নাদির শাহ মারা গেছেন। উল্লাসে উত্তেজনায় পরদিন সৈন্যদের উপর হামলা করল দিল্লীর অধিবাসীরা। হাতের কাছে যে যা অস্ত্র পেল, তাই নিয়ে পথে নামল জনসাধারণ মরিয়া হয়ে উঠেছিল। চমকে উঠলেন নাদির শাহ। ক্রোধে অন্ধ হয়ে হুকুম দিলেন, শায়েস্তা করো বেয়াদব হিন্দুস্তানীদের, খুন করো, লুঠ করো, ধ্বংস করো। শিশু বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ নির্বিচারে নিহত হ'ল। হাজার হাজার বন্দী হল। মুঘল সাম্রাজ্যের চিতার আগুনে দিল্লীর আকাশ লাল হয়ে উঠল।

তখন গান গাইছিল রূপবল্লরী। রাগ অম্বরবল্লী। রাত্রির মধ্যপ্রহরে ঘুমিয়ে আছে বর্ধমান সহর। আতর অগুরু আর চন্দন ধূপের সৌরভ। জানালায় জানালায় রেশমী পর্দা। কাচবাতির আলো। তাকিয়া ঠেস দিয়ে আধশোয়াভাবে বসেছিল বিদ্যাধর। নেশার ঝোঁকে মাথা নাড়ছিল, রূপোর পেয়ালায় গায়ে আঙুরের টোকা দিয়ে তাল ঠুকছিল। কাছেই সোনা হয়ে স্থিরভাবে বসেছিল ভারতচন্দ্র ; শরীরের প্রতিটি শিরায় যেন ঘূর্ণিত রক্তের প্রবল স্রোত। চোখ জ্বালা করছে, মনে মনে কিছুটা অপরাধবোধের যন্ত্রণা। আজ নিয়ে এই পঞ্চম দিন রূপবল্লরীর গান শুনতে এল ভারত। আজই প্রথম একপাত্র বিদেশী সুরা পান করল। তীব্র আস্বাদ। তরল আগুন যেন বুকের ভেতর দিয়ে জ্বলতে জ্বলতে নেমে গেল। একরকম জোর করেই

খাওয়াল বিভাধর। না খেয়ে উপায় ছিল না। নেশাগ্রস্তদের কোন বিষয়ে জোর চাপলে থামানো মুস্কিল।

তাকে খাওয়াবেই বিভাধর। প্রবল বাধা দিতেও তেমন তৎপরতা পায়নি ভারতচন্দ্র। বিভাধরের আশ্রিত সে। বিভাধরের হাত ধরেই রূপমঞ্জরীর কাছে আসার সুযোগ পায়, গান শুনতে পায়।

রূপমঞ্জরী শুধু গান শোনায় না। রাগ রাগিণীর পরিচয় বুঝিয়ে দেয়। শিক্ষার্থীর মত মনোযোগ দিয়ে শোনে ভারত।

গান শেষ করে বললো রূপমঞ্জরী—জয়জয়ন্তী খাম্বাজ মেলের রাগ, বুঝলেন রাজকুমার, খাম্বাজ মেলের নিষাদ কোমল, অন্তসব শুদ্ধ স্বর, লক্ষ্য করেছেন বোধহয় আরোহণে তীব্র গান্ধার, তীব্র নিষাদ আর অবরোহণে কোমল নিষাদ, কোমল গান্ধার—

—আহা, আবার আরম্ভ করলে তোমরা—নেশায় আচ্ছন্ন চোখে তাকাল বিভাধর, একটু নড়েচড়ে বসল—গানের ব্যাকরণ শুনে কি লাভ বলোতো ভারত, তার চেয়ে গান শোন শুধু গান, আর এক খানা হোক কি বল—বলতে বলতে রূপোর গেলাসটা আবার হাতে নিল বিভাধর। রূপমঞ্জরী হাতটা ধরে বললো—আর খাবেন না, শেষে একটা কেলেঙ্কারী হবে—

রক্তাভ চোখ তুলে একটুকাল তাকিয়ে রইল বিভাধর, তারপর একটু হেসে গেলাসটা নামিয়ে রেখে বললো—আচ্ছা তোমার কথাই রাখলুম, আরেকখানা গান শোনাও, কি হে ভারতচন্দ্র—মুখভার করে বসে আছ কেন, কিছু বলো।—

ভারত একটু হাসল। রূপমঞ্জরী বললো—কেন ওকে জোর করে খাওয়ালেন, ওর বোধ হয় শরীর খারাপ লাগছে—

—ওইটুকুতে কিছু হবে না, অমন তাগড়া জোয়ান—বিভাধর হেসে উঠল, হাসতে হাসতে বললো—ওর জাত মেরে দিয়েছি—

—কেন দিলেন রূপমঞ্জরীর অনুযোগ শুনে ধমকে উঠল বিভাধর—দিয়েছি, বেশ করেছি, এখানে এসে অত পুরুপুরু কিসের জন্য, আমার সঙ্গে এসে অমন বকধার্মিক সেজে থাকা চলবে না, আমি যেমন সোনার পেয়ালা, তেমনি আমার সঙ্গে যে আসবে তাকেও সোনার হতে হবে—

এবার একটু হেসে বললো ভারত—আমি কি কিছু বলেছি, তুমি রাগ করছো কেন বিভাধর

রূপমঞ্জরী তাড়াতাড়ি বললো—আমি আরেকখানা গান গাইছি শুনুন—

ভারত জিজ্ঞেস করল—কি রাগ নাম বলো—

—আগে বলবো না, আগে শুনুন ধরতে পারেন কি না দেখুন, লক্ষ্য করবেন, এরাগে তীব্র গান্ধারের ব্যবহার বেশী, মধ্যমকেও বিস্তার বেশী, জয়জয়ন্তীর সঙ্গে যেন মিল আছে—

গান শুরু হ'ল। বিভাধর শান্তভাবে শুয়ে আছে। সোজা হয়ে বসে চোখ বন্ধ করে গান শুনছে ভারতচন্দ্র। বর্ষা শুরুর আবাহন সঙ্গীত। যেন আকাশে মেঘ জমেছে। বাইরে ঝিরঝির বৃষ্টির শব্দ। কেতকী-কদমের সুবাস।

গান শেষ হলে পর জিজ্ঞেস করল ভারত—ঠিক ধরতে পারলুম না, মনে হচ্ছে যেন মল্লার, এ রাগের নাম কি?

মুখ নিচু করে সলজ্জ সুরে জবাব দিল গায়িকা—রূপমঞ্জরী মল্লার।

বিশ

বিভাধর বললো—তুমি কি পাগল হলে ভারত, রূপমঞ্জরীর কাছে যখন তখন-যাবার উপায় নেই, মহারাজার দরবারের বাঁধা গায়িকা, মাস মাস মোটা মাসোহারা পায় দেওয়ানজীও ওর বাড়ীতে মাঝে মাঝে পায়ের ধুলো দেন, আমি খুব সাবধানে, সবদিক সামলে, খুব গোপনে তোমাকে নিয়ে যাই—কিন্তু আমি যে গান শুনতে চাই, গান শিখতে চাই, বিভাধর, ছুতিন মাস অন্তঃ তুমি নিয়ে যাও, বর্ধমানে এসে

এই তিন বছরে মাত্র সাত কি আটবার বাবার-মুখোপ পেলুম. এভাবে কি সঙ্গীতশাস্ত্রের কিছু জানা যায় না, শেখা যায়, তুমিই বলো—

ভারতচন্দ্রের কথা শুনে একটু হাসল বিদ্যাধর, অবিশ্বাসের হাসি—আমার কাছে লুকিয়ে লাভ কি, শুধু সঙ্গীতশাস্ত্র শিখতেই কি তুমি যাও. অনেক শাস্ত্র শিখেছ তুমি, আরবী ফারসী, সংস্কৃত, কাব্য-ব্যাকরণ-অলঙ্কার পুরাণ-ভাগবত, আর কি বাকি আছে তোমার, এ বয়সে নতুন করে সঙ্গীত-শাস্ত্র শিখে আর কি হবে, আসল কথা রূপা বাইজীর রূপে মজেই তুমি, সুন্দরী তোমার মাথা খারাপ করে দিয়েছে—

—হিঃ হিঃ কি বলছো বিদ্যাধর—বাধা দিল ভারতচন্দ্র—বিশ্বাস করো. রূপের মোহ আমার নেই, প্রথমে যেটুকু ছিল, ওর গান শুনে অন্যরকম হয়ে গেছে, এমন গায়িকা আর হবে না, রসশাস্ত্রে, সঙ্গীতশাস্ত্রে কি গভীর জ্ঞান, শুধু-শুধু কি আমি ওর নাম দিয়েছি রসময়ী—

বিদ্যাধর বলুলো—আমাকে বুঝিয়ে কি হবে, নিজের মনকে বোঝাও, তোমার চোখ-মুখের চেহারাই মনের খবর বলে দিচ্ছে—

গুম হয়ে বসে রইল ভারত। তাকে বিশ্বাস করছে না বিদ্যাধর। কি করে বোঝাবে তাকে।

স্থূলরুচির মানুষ বিদ্যাধর। মোটা মোটা হিসেবের লাভ-লোকসান বুঝতে পারে, মোটা টাকা ঢেলে ফূর্তি করার ব্যাপারটা বোঝে সে, গান শোনাটাও সেই আমোদের অঙ্গ। কিন্তু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সূক্ষ্ম কারুকাজ যে একজন খাঁটি সমঝদার মানুষকে পাগল করে দিতে পারে, তার খোঁজ বিদ্যাধর জানে না। বললেও বিশ্বাস করবে না। বিশ্বাস করার মত মন নেই, শিক্ষা নেই, উপলব্ধি নেই বিদ্যাধরের। কিন্তু তার সন্দেহ কি নিতান্তই অমূলক, সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন? মনে মনে খুঁজল ভারত। তার নিজের মনের কোণে কোথাও কি কোন দুর্বলতা নেই? এত তীব্র আকর্ষণ কেন, এত প্রবল আগ্রহের উৎস কোথায়? শুধু কি সঙ্গীত, শুধু কি সুরের নেশা। গায়িকার রূপ-যৌবন, কটাক্ষ, কণ্ঠস্বর, বাচন-ভঙ্গী। সব কিছু মিলিয়ে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা, অদ্ভুত উন্মাদনা। এসব কি অস্বীকার করা চলে?—তুমি নিজের কালকর্ম অবহেলা করছো—বিদ্যাধরের কথা শুনে চমকে উঠল ভারত।

বৈঠকখানা ঘরে বসে কথা হচ্ছিল। গড়গড়ার নলে মুখ ঠেকিয়ে বলল বিদ্যাধর—যে কাজের জন্য তোমার বর্ধমান আসা, সেই কাজেই মন নেই তোমার, তোমাদের পরগণা থেকে রাজ সরকারে এ বছর খাজনার টাকা জমা পড়েনি, এজন্য তোমাকেই জবাবদিহি করতে হবে—

—কিন্তু আমি কি করতে পারি বলো, প্রজারা যদি ঠিকমত টাকা না পাঠান—বিপন্নমুখে বলুলো ভারত।

—সে কথা তো দেওয়ানজী শুনবেন না, মহারাজও বুঝবেন না—একটু থেমে থেমে প্রত্যেকটি কথা যেন ওজন করে বলতে লাগলো বিদ্যাধর—তুমি হচ্ছ আমমোক্তার, মহাল থেকে টাকা ঠিক সময়ে না এলে, তোমার উচিত রূপ-সংগ্রহ করে তারপর প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়া, তারপর মহাল থেকে টাকা এনে খাল শোধ করা—

—কিন্তু আমি তো রঘুনাথকে পাঠিয়েছি ফুরফুরা থেকে খবর আনার জন্য—

—খবর দিয়ে কি হবে, আসল কথা হল টাকা, তুমি সেই টাকার ব্যবস্থা কি ভাবে করবে কিছু ভেবেছ—

বিদ্যাধরের কথাশুনে চুপ করে রইল ভারতচন্দ্র।

একটু সময় চুপচাপ থেকে আবার বলুলো বিদ্যাধর—আমি দু একদিনের মধ্যেই মুর্শিদাবাদ যাচ্ছি, ফিরতে কিছুদিন দেরি হতে পারে, খুব সাবধানে থাকবে—

—হঠাৎ মুর্শিদাবাদ কেন—ভারতের জিজ্ঞাসার জবাবে একটু হেসে বলুলো বিদ্যাধর—নতুন নবাব আলিবর্দী খাঁর কেমন মানুষ, দরবারের হাল-চাল কি, সেসব দেখে শুনে আসতে

হবে। কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠিতেও কিছু কাজ আছে. যা বলছিলাম শোন. খুব সাবধানে থাকবে, পারলে দেওয়ানজীর সঙ্গে দেখা করে কিছু সময় চেয়ে নাও, যদি মুরশুট থেকে টাকা না আসে, তবে আমি ফিরে এসে টাকার জন্য চেষ্টা করব, আমার নিজের কাছে এখন অত টাকা নেই, দেখব যদি শ্বশুর মশায়ের কাছ থেকে কিছু পাওয়া যায়—

সব শুনে চিন্তিত মুখে চুপ করে রইল ভারতচন্দ্র।

আবার বললো বিদ্যাধর—এখন যাও. রাত হয়েছে অনেক, ঘরে ফিরে বিশ্রাম করো, টাকার ব্যবস্থা একটা করতেই হবে, না হলে দেওয়ানজী ছাড়বে না এটা মনে রেখো—

ঘরে এসে প্রদীপ নিভিয়ে শুয়ে পড়ল ভারত। কিন্তু ঘুম এল না। মাথায় নানা চিন্তা। এ বছর বর্ধমান রাজসরকারে খাজনার টাকা জমা দেয়া হয়নি। মুরশুট থেকে টাকা আসেনি। রঘুনাথকে পাঠানো হয়েছে খবর জেনে আসার জন্য। প্রায় পনের দিন হয়ে গেল। কোন খবর আসেনি। কি হয়েছে কে জানে। গতবছর নাদির শাহ যে মাসে দিল্লীতে এসে হাউমি ফেলেছিলেন, সেই মাসই বাংলার নবাব শুজাউদ্দীন মহম্মদ খাঁন শুজাউদ্দৌলা আসাদ জঙ্গ বাহাদুরের হুকুম কাল হ'ল। তাঁর ছেলে, মুর্শিদকুলি খাঁর দৌহিত্র সরফরাজ খাঁ নবাব হলেন। মাত্র একবছর নবাবী করার ভাগ্য হয়েছিল সরফরাজ খাঁর। শাসনকার্যে মন ছিল না তেমন যোগ্যতাও ছিল না। দিনরাত পাঁজা ভাঙ আফিম মদ আর মেয়েমানুষ। জেনানা মহলে নাকি দেড়-হাজার জেনানা ছিল সরফরাজের। লঘুগুরু জ্ঞান ছিল না। সম্ভ্রান্ত ঘরের বৌঝিদের নিয়েও টানাটানি করতে কসুর করেন নি সরফরাজ। সুবে বাংলার সবচেয়ে ধনী, সবচেয়ে ক্ষমতাশালী মানুষ জগৎশেঠ ফতেচাঁদের পুত্রবধূর উপরেও কুনজর দিয়েছিলেন। টাকা-পয়সার লেনদেন নিয়েও জগৎশেঠের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল সরফরাজ খাঁর। সরবারের ওমরাও যদি তাই মান ইজ্জত বাঁচাবার জন্য এমন একজন উপযুক্ত মানুষ খুঁজতে লাগলেন, যিনি বীরত্বিত, দায়িত্বশীল এবং বুদ্ধিমান, যাকে বিশ্বাস করে নবাবী বদনদ দেয়া যায়। সকলের নজর পড়লো হাজী আহম্মদের ছোট ভাই, পাটনার নায়েব নাজিম আলিবর্দি খাঁর উপর। যেমন বিচক্ষণ এবং পরিশ্রমী, তেমনি অনেক বছরের অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধ মানুষ আলিবর্দি খাঁ। সামান্য অবস্থা থেকে নিজের গুণে পাটনার ছোটনবাব পর্যন্ত হয়েছিলেন এবার চূড়ান্ত সম্মান, আর বিপুল দায়িত্বের অধিকার নেবার জন্য, সুবে বাংলা-বিহার উড়িষ্যার, নবাবী বদনদে বসার জন্য ডাক পড়ল আলিবর্দি খাঁর। এই কিছুদিন, মাত্র মাস তিনেক আগে গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজকে হারিয়ে নবাব হয়েছেন আলিবর্দি খাঁ। যুদ্ধ ক্ষেত্রেই মারা গেলেন সরফরাজ খাঁ। তেরো মাসের মধ্যেই তাঁর নবাবী খেল খতম। কাজটা একদিকে নিমকহারামি হয়েছে। বোধহয় বিবেকের দংশন বোধ করেছিলেন আলিবর্দি খাঁ। কারণ শুজাউদ্দিনের অনুগ্রহেই ভাগ্যোন্নতি হয়েছিল তাঁর। পাটনার ছোট নবাব হতে পেরেছিলেন। আশ্রয়হীন দুই ভাই, হাজী আহম্মদ আর আলিবর্দি খান যখন ভবঘুরের মত এদেশে এলেন, তখন এই শুজাউদ্দিনই তাঁদের কাছে ডেকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, সম্মানের সঙ্গে সরকারী কাজে বহাল করেছিলেন। এই উপকার ভুলতে পারেননি আলিবর্দি খাঁ। নিরুপায় হয়ে নিমকহারামি করতে হয়েছে তাঁকে। নয়তো বাংলা দেশ উৎসন্নে যেত। সরফরাজকে সংযত রাখার আর কোন উপায় ছিল না। বাধ্যহয়ে এই বেইমানি করার জন্য মনে মনে অনুতপ্ত হয়েছিলেন আলিবর্দি। তাই মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করে প্রথমেই পায়ে হেটে চেহেল-সুতুনের সামনে এসে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিলেন। মুর্শিদকুলি খাঁর কন্যা, শুজাউদ্দিনের বেগম, সরফরাজের মা জিন্নতউন্নিসা বেগম-সাহেবার কাছে ক্ষমা প্রর্থনা করেছিলেন। ওদিকে দিল্লীর বাদশা মুহম্মদ শাহকে চুরাশী লাখ টাকা নজরানা

পাঠিয়েছেন। এই নজরানার বদলে সুবে বাংলার নবাবী করবার ফর্মান পাবেন মুহম্মদ আলিবর্দি খাঁন মুহম্মত জঙ্গ বাহাদুর বিদ্যাধর যাবে মুর্শিদাবাদ। নবাব-দরবারের হালচাল দেখে আসবে। ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে গেলে এসব খোঁজ-খবর রাখা দরকার। নজরানার সেই চুরাশী লাখ টাকা এখন আলিবর্দি খাঁ বাংলাদেশের জমিদারদের ঘাড় ভেঙে উশুল করে নেবেন। নদীয়া, নাটোর, বিষ্ণুপুর বর্ধমান থেকে শুরু করে ছোটবড় কোন জমিদারই রেহাই পাবে না। বর্ধমানের মহারাজা এ বারের নজরানা বাবদ তাঁর দেয় অংশের টাকা আদায় করে নেবেন অধীনস্থ ইজারাদার, তালুকদার, পত্তনিদারদের কাছ থেকে।

এমনি করে ধাপে ধাপে শেষ পর্যন্ত আঘাতের চাপটা এসে পড়বে গরীব চাষাভুষোদের উপর। বাদশাহী নজরানার টাকা শেষ পর্যন্ত ভাগ করে দিতে হবে এই বাংলাদেশের গরীব মানুষদের। হয়তো বিদেশী বণিকদের কাছ থেকেও কিছু অংশ আদায় হবে। ইংরেজ, ফরাসী, ডাচ কোম্পানী রয়েছে আর টিম্‌টিম্ করে এখনো টিকে আছে জার্মানীর অষ্টেণ্ড কোম্পানী।

যেখান থেকে হোক, যেমনভাবে যাই আদায় হোক্, তা নিয়ে ভারতচন্দ্রের মাথা ঘামাবার দরকার নেই। চুক্তিপত্র তাদের সম্পত্তির খাজনার টাকাটা জমা দিতে পারলেই আপাততঃ নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। বিদ্যাধর ঠিকই বলেছে, টাকাটাই আসল। মহারাজা কিছু বুঝবেন না, বুঝতে চাইবেন না আর দেওয়ানজীও কিন্তু বুঝতে চাইবেন না। সমস্ত বোঝাপড়া, সমস্ত জানাশোনার মূল কথা হ'ল টাকা। কিন্তু ভুবনেশ্বর থেকে টাকা না এলে কি উপায় হবে। অতগুলি টাকা এখন কোথায় পাবে ভারত।

ঘুম আসছে না। ভেবে ভেবে মাথা গরম হয়ে উঠল। কেন শুমোটভাব, একটুও হাওয়া নেই।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ। বিছানা ছেড়ে বাইরের বারান্দায় এল ভারত। আকাশে অল্প অল্প মেঘ জমেছে। সামনে রাস্তার ওপাশে সজনে গাছের ডালপাতার পেছনে ভাঙা চাঁদ। শহর নিঝুম। পশ্চিম দিকে বাড়ি-ঘর গাছ-গাছালির পেছনে আকাশের সীমানায় মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। শেষ রাতে ঝোড়ঝড় হবে। কিছুদিন আগে বৈশাখ মাসেও দু একবার ঝড়ের মত হয়ে গেছে। এই গরমের পর বৃষ্টি হওয়া ভাল। বৃষ্টি বৃষ্টি। বৃষ্টির কথা ভেবে, আকাশের অবস্থা দেখে খুশি হল ভারত বৃষ্টির গান মেঘ-মল্লার। রূপমঞ্জরীর কণ্ঠে অপূর্ব শোনায়। পাঁচ ছয় রকমের মল্লার আছে। শুদ্ধ মল্লার, মেঘ-মল্লার, নট-মল্লার, সুরদাসী মল্লার, মিঞা তানসেনের তৈরী মিঞা-কি-মল্লার, সাহানা-মল্লার, আরেকটির নাম রূপমঞ্জরী মল্লার। প্রথমবার এই রূপমঞ্জরী মল্লার গাইবার পর কেমন লজ্জিতভাবে একটু হেসেছিল রূপা।

যারা গান শোনে, গান ভালবাসে, তারা কি মানুষ খুন করতে পারে, তারা কি মানুষের গলা টিপে খাজনা আদায় করতে পারে, তারা কি রাজনৈতিক হত্যাকে আইন-মোতাবেক করার জন্য নজরানার নামে ঘুষ দিতে পারে? অথচ নবাব-বাদশা, রাজা-মহারাজারাই তো গান শোনেন, গান ভালবাসেন। তাঁদের দরবারেই তো নাচ গানের মজলিশ বসে। তারাইতো নানাদেশের গায়ক-গায়িকাদের আমন্ত্রণ করে আনেন, ইনাম-বখশিশ দেন।

গুরু গুরু করে মেঘ ডাকল। আকাশের কোন্ প্রান্ত থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া ছুটে এল। ঝিরঝির বৃষ্টি শুরু হ'ল। ঘরে এসে বিছানার ওপর পড়ল ভারত। শুয়ে শুয়ে আধোঘুম, আধোতন্দ্রার মধ্যে বৃষ্টির ছন্দে, বাতাসের সুরে যেন রূপমঞ্জরী মল্লার শুনতে পেল।

একুশ

কয়েকমাস পরের কথা। হেমন্তকাল। বর্ধমান রাজপ্রাসাদে

উৎসবের ঘুম। এমনিতেই রাণীবাড়িতে বারোমাসে তেরো-পার্বণ লেগে আছে। কিন্তু এবারের উৎসব অন্য কারণে। বিষ্ণুপুরের রাজার সঙ্গে তিনপুরুষ ধরে, সেই দুর্জয়রাজের আমল থেকে রেষারেষি চলছে। সম্প্রতি হাম্বীরের সীমানা নিয়ে মহারাজা কীর্তিচাঁদের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই বাঁধার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু দেওয়ান রাজবল্লভের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত আর যুদ্ধ হয়নি, সন্ধি হয়েছে। বিষ্ণুপুর আর বর্ধমান। দুই পক্ষই বিবাদভুলে মিটমাট করে নিয়েছেন, নিতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ, নতুন এক ভয়ঙ্কর বিপদ ঘনিয়ে আসছে। সমস্ত বাংলাদেশের পক্ষেই চরম সর্বনাশের সূচনা। গুজব শোনা যাচ্ছে, নাগপুরের ভোঁসলা বংশের মারাঠা সর্দার রঘুজী ভোঁসলা নাকি বাংলাদেশ থেকে জোর জবরদস্তি করে চৌথ আদায় করবার জন্য বর্গী পাঠাচ্ছেন। ভারতের নানা জায়গায় সুবাদার ফৌজদার, নবাব আর রাজা-মহারাজার কাছ থেকে জোর-জবরদস্তি করে চৌথ আদায় করে নেয় মারাঠারা। যেখানে চৌথ না পায়, দাবী পূরণ না হয়, সেখানেই লুঠপাট, খুন-জখমের আগুন জ্বলে।

দিল্লীর দুর্বল বাদশা মুহম্মদশাহ নিরুপায়। হায়দ্রাবাদের নিজাম-উল-মুলুকও মারাঠাদের ভয়ে তটস্থ। অযোধ্যার মুসলমান নবাবই হোক কিম্বা মধ্যভারতের হিন্দু রাজাই হোক মারাঠাদের হাত থেকে কারো রেহাই নেই। মারাঠা-বর্গীরা নাকি এবার সুরু বাংলার হামলা করবে। গোপন খবর এসেছে বর্ধমান রাজ-দরবারে। এমন বিপদের মুখে নিজেদের ঘরে লড়াই হলে সমূহ সর্বনাশ।

দেওয়ানজীর পরামর্শে মহারাজা কীর্তিচাঁদ আপোষ করেছেন, সন্ধি হয়েছে বিষ্ণুপুরের মহারাজার সঙ্গে। বর্ধমান রাজ-প্রাসাদে তাই উৎসবের সমারোহ। মহারাজার গানের আসরে ডাক পড়েছে রূপমঞ্জরীর। সারেঙ্গি, তানপুরা আর তবলার সঙ্গে একটার পর একটা গান গেয়েছে রূপমঞ্জরী।

প্রহরের পর প্রহর ঘনিয়েছে। তারপর একসময় আসর ভাঙলো। রাত দুপুর গড়িয়ে গেছে। রূপমঞ্জরীর পাল্কি-বেয়ারাদের সঙ্গে দুজন পাইক, একজন মশালচি।

মাথার ওপর মশাল তুলে আগে আগে যাচ্ছে মশালচি, দু'পাশে পাইক দুজন।

বেয়ারাদের মুখে হুমহাম-হোহো। পর্দা ঢাকা পাল্কি। ক্লান্ত রূপমঞ্জরী।

নানা পথ ঘুরে ঘুরে বাড়ির দেউড়িতে ঢুকল পাল্কি। একটি ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে অনুসরণ করে সকলের পেছন পেছন এল। দরজার সামনে থামলো পাল্কি। দাসি-চাকরেরা ছুটে এলো। কাছেই মাধবীলতাবিতানের আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল ছায়ামূর্তিটি।

দোতালায় এসে বসবার ঘরেই আলিম-পাতা চারপাইচৌকির উপর এলিয়ে পড়ল রূপমঞ্জরী, ক্লান্তস্বরে ডাক দিল—দামিনী, আমাকে এক গেলাস ঠাণ্ডা জল এনে দে—

একটু পরে জল-মিছরি নিয়ে এল দামিনী। রূপমঞ্জরী উঠে বসে জলের গেলাসটা সবে হাতে নিয়েছে। সামনের খোলা দরজায় কার ছায়া পড়লো। বারান্দা ঘিরে কে যেন চুপচুপি এসে পর্দার ওপাশে দাঁড়াল। বারান্দার সিঁড়ির মুখে একটি দেয়ালগিরি জ্বলছে। ঘরের ভেতর পেতলের সিলমুজের উপর দুটি প্রদীপের আলো। আবছায়া দীর্ঘ মূর্তি দেখে চমকে উঠল রূপমঞ্জরী—কে, কে ওখানে?

—ওমা, কই কে—দামিনী দরজার দিকে পেছন ফিরেছিল, হাউমাউ করে রূপমঞ্জরীর গায়ের কাছে সরে এল, দরজার দিকে বড়বড় চোখে তাকিয়ে রইল।

রূপমঞ্জরী উঠে দাঁড়াল, কঠিন গলায় বললো—কে ওখানে, সাড়া দাও—

—আমি গো আমি, ভয় পেলে নাকি, রসমঞ্জরী—পর্দা তুলে দীর্ঘকায় মানুষটি ভেতরে এল। আপাদমস্তক দামী শালে ঢাকা। মুখের ঢাকা সরিয়ে একটু হেসে বললো—চিনতে পারলে না?

—একি রাজকুমার আপনি হঠাৎ এভাবে, এরাতে—রূপমঞ্জরীর বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি।

একটু হেসে বললো ভারত—খুব অবাক হয়েছ না, প্রায় দুবছর বাদে দেখা হল তোমার সঙ্গে—

—কিন্তু আপনি এলেন কি করে?

—রাজবাড়ির সেউড়ি থেকে তোমার পাল্‌কির পেছন নিয়েছি—

—এভাবে আসা আপনার উচিত হয়নি রাজকুমার—রূপমঞ্জরী যেন ভয় পেয়েছে।

—কি করবো বল, কতকাল তোমাকে দেখিনা, তোমার গান শুনতে পাই না, বিদ্যাধরও এখানে নেই, তুমি হয়তো জানো, আষাঢ় মাসের গোড়ায় সে মুর্শিদাবাদ গেছে, কবে ফিরবে কে জানে, তোমার বাড়িও চিনি না, কি করি কিছু ঠিক পাচ্ছি না, শেষে ভাবলুম, রাজবাড়ির গান-বাজনার আসরে তুমি নিশ্চয়ই আসবে, তাই শেষ পর্যন্ত—

—কিন্তু আপনি কি পাগল হলেন রাজকুমার, এভাবে আপনার আসা মোটেই উচিত হয়নি—রূপমঞ্জরীর কথা শুনে বললো ভারত—কিন্তু তোমাকে না দেখে, তোমার গান শুনতে না পেয়ে, আমি যে সত্যিই পাগল হয়ে যাচ্ছিলুম—

ওদিকে রঘুনাথ তখন ছটফট করছিল একবার বাইরে যাচ্ছে, আরেকবার ভেতরে আসছে।

সেই দুপুর থেকেই পাত্তা নেই ভারতচন্দ্রের। দুপুরে রান্না-খাওয়ার পর কোথায় যে বেরিয়ে গেলেন ছোটকর্তা, কে জানে। আজ সকালেই ভুরশুট থেকে ফিরেছে রঘুনাথ। ভুরশুটের খবর ভাল নয়। নরেন্দ্রনারায়ণ খুব অসুস্থ। চতুর্ভুজ রায় গেল সনের খাজনার টাকা সব আদায় করে উঠ্‌তে পারেন নি। যা আদায় হয়েছিল বাপের অসুখেই সব খরচ হয়েছে। তার উপর ভুরশুটের বাড়ির খরচ কম নয়। এবার রঘুনাথ আশেরবারই এনেছিল। গত দুই-বারের মধ্যে দুবার ভুরশুট ঘুরে এসেছে রঘুনাথ। প্রথমবার গিয়েছিল চৈত্র মাসের মাঝামাঝি, বিদ্যাধর মুর্শিদাবাদ রওনা হবার কিছুদিন আগে। একমাস পর ফিরে এসেছিল। দ্বিতীয়বার গিয়েছিল আশ্বিনমাসে, পুজোর সময়। কিছুই আনে সকালে, কিন্তু ভাল কোন খবর নিয়ে আসতে পারেনি। এবার কিছুদিন সময় চেয়েছেন চতুর্ভুজ রায়। ভারতকে খবর পাঠিয়েছেন, দেওয়ানজীকে সে কথা জানাবার জন্য। কিন্তু ছোটকর্তার ভাবটা যেন কেমন-কেমন মনে হল। খাজনার টাকা আসেনি, তার উপর রাজামশাইর অসুখ। এসব খবর শুনেও খুব যেন অস্থির হলেন না। কেমন যেন অন্যমনস্ক। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে বললেন —আমি একটু বেরোচ্ছি রঘু, তুই ঘরে থাকিস।

—আপনি চললেন কই?

—তোর সে খবরে কাজ কি, আমি শহরে ঘুরতে যাচ্ছি—ধুতি-বেনিয়ান পরে, পায়ে বিদ্যাধরের দেওয়া সেই কারুকাজ করা নাগরা, কাঁধে একখানি দামী শাল ভাঁজ করে নিল।

আর কিছু বলেনি রঘুনাথ। ছোটকর্তার মন মেজাজ ভাল মনে হচ্ছে না। কারণটা যে কি ঠিক বুঝতে পারা গেল না। তবে কি টাকার খোঁজে বেরোলেন, না দেওয়ানজীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। ব্যাপারটা কিছু পরিষ্কার হল না. দুপুরে এক লম্বা ঘুম দিয়ে যখন বাইরে এল রঘুনাথ, তখন বিকেল হয়ে গেছে। সেউড়ির বাইরে একজন অচেনা মানুষ উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল।

এগিয়ে গেল রঘুনাথ—কাকে চান আপনি?

দীর্ঘাকার, গৌরবর্ণ, পিঙ্গল-পক্কিত চেহারা, কলম-ছাঁট চুল, মস্ত এক টিকি, কপালে চন্দনের ফোঁটা, পায়ে খড়ম, জবাব দিল মানুষটি—এখানে ভুরশুটের ভারতচন্দ্র থাকেন?

—আজ্ঞে থাকেন বটে, কিন্তু এখন বাড়ি নেই।

—কখন ফিরবেন উনি?

—কখন ফিরবেন কিছু ঠিক নেই, এখনো ফিরতি পারেন,

আবার দু'দণ্ড দেরিও হতি পারে, আপনি কোথায় যে আসতিছেন, আপনের পরিচয়—

—আমি আসছি খানাকুল থেকে. আমার নাম বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য. ভারতচন্দ্র আমার কুটুম. আমার স্ত্রীর ছোটবোনের বর. বর্ধমানে কাজে এসেছিলুম. ভাবলুম দেখা করে যাই—পণ্ডিত-মশাইর কথা শুনে বললো রঘুনাথ আপনি তাহলে ছোটকর্তার ভায়রাভাই হলেন, আজ্ঞে, এখেনের খোঁজ পালেন কোথায়?

—নন্দলাল চক্রবর্তী আমার চেনালোক, তার মুখেই খবর পেলুম, কিন্তু কপাল খারাপ দেখা বোধহয় হল না, আমি কাল সকালেই দেশে ফিরে যাব—

—আপ্‌নে একটু বসা করে বসুন আজ্ঞে, পান-তামুক খান, ওরে লোচন. বাবুমশের হুকোয় তামাক দে' যা- অতিথিশালার খানসামা লোচনদাস তামাক সাজতে বসল। রঘুনাথ বারান্দায় কম্বলের আসন বিছিয়ে দিল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, কয়েক ছিলিম তামাক টেনে জিজ্ঞেস করলেন বাণীকণ্ঠ —তোমার নাম কি?

—আজ্ঞে অধীনের নাম রঘুনাথ শীল।

—আমি তাহলে এবার উঠি. সন্ধ্যে হয়ে গেল, ভারতচন্দ্র এলে পরে বোলো আমার কথা, যদি একবার পায়ের ধুলো দেয় আমাদের বাড়ি, খুব খুশি হব, মনে থাকবে তো খানাকুলের ভট্টাচার্যবাড়ি—

—আজ্ঞে বলবো, অবিশ্যি বলবো, কোথায় যে গেলেন উনি, নানা ভাবনা চিন্তের বড় অস্থির থাকেন কিনা—রঘুনাথ সঙ্গে সঙ্গে দেউড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিল। হতাশ মনে বিদায় হলেন বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য। সন্ধ্যা উতরে গেল। বর্ধমান শহরের বাড়িতে বাড়িতে দোকানে দোকানে প্রদীপ জ্বলে উঠল। রাস্তায় মোড়ে পানের দোকানে ভীড়। খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াল রঘুনাথ। ছোটকর্তার দেখা নেই। আবার বাড়ির দিকে ফিরে এল। কাছারী ঘরে গোমস্তা গোপাল দত্ত বসাই সারাদিনের হিসেব পত্তর লিখছেন। সেদিকে সামান্য আলো। প্রশস্ত অঙ্গন অন্ধকার। ওদিকে দারোগামশেয়র ঘর থেকে পাড়েজীর গলার রামায়ণ-পাঠ শোনা যাচ্ছে। মিশিরজী বোধহয় রোটি পাকাচ্ছে। হঠাৎ নজরে পড়ল, অতিথিশালার অন্ধকার বারান্দায় ছায়ামূর্তির মত দুজন লোক। বারান্দার পাশে কামিনীফুল গাছের আড়ালে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দু'জনের কথা শোনার চেষ্টা করল রঘুনাথ। গলা শুনে চিনতে পারলো, একজন লোচনদাস আর একজন দেওয়ানজীর পাইক কালাচাঁদ। কালাচাঁদ বলছিল—সেই নাপিত-ব্যাটাই বা গেল কোথায়?

—এই তো ছিল এখেনে. কোথায় গেল যেন এই বাজার, আসবে বোধহয় এক্ষুণি—জবাব দিল লোচন।

আবার কালাচাঁদের গলা শোনা গেল—তুই ঠিক বলছিস, আজ দুপুরের পর আর ব্যাটাকে দেখতে পাসনি।

—ঠিক বলছি সেই দিছে কলা নয়, খুঁজে ছাখো না তুমি—লোচনের জবাবটা শুনতে পেল রঘুনাথ। কামিনী গাছের আড়ালে প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে সে দাঁড়িয়ে আছে।

—যাই গিয়ে দেওয়ানজীকে খবরটা দিয়ে আসি, সারা মুলুক তোলপাড় করে খোঁজ খোঁজ পড়ে যাবে—বারান্দা থেকে নেমে প্রায় রঘুর পাশ দিয়েই গজগজ করতে করতে চলে গেল কালাচাঁদ। ঝোঁকের মাথায় হনুহনু করে দেউড়ি পার হয়ে গেল। যদি ধীরেসুস্থে যেত, কিম্বা একবার পেছন ফিরে তাকাত, তাহলে হয়তো দেখতে পেত। রঘুর গায়ে ছাই রঙের আলোয়ান। তাই অন্ধকারে লক্ষ্য হয়নি। বুক ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করছিল রঘুনাথের। লোচন চলে গেল অন্য পথে অন্দরের দিকে। এরা সব দেওয়ানজীর চর। কি মতলবে তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে, কে জানে।

আস্তে আস্তে নিজের ঘরে এল রঘুনাথ। প্রদীপ জ্বালালো। প্রদীপ হাতে পাশে ছোটকর্তার ঘরে উঁকি মেরে দেখল, তারপর দুই ঘরেরই দোর টেনে শেকল তুলে দিয়ে প্রদীপটা

নেবাল। বারান্দায় একটা মোটা থামের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে রইল।

মশার ঝাঁক পিন্‌পিন্ করছে। চাদর মুড়ি দিয়ে নাকমুখ ঢেকে বসল।

কালাচাঁদের মুখে খবরটা শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন দেওয়ান রাজবল্লভ রায়।

চোখ পাকিয়ে বললেন—কোথায় পালালো, কোথায় যাবে, ভালো করে খুঁজে আখ্, কাল সকালেই তাকে আমার সামনে হাজির করবি, না-হলে তোকেই আমি কয়েদ করে রাখ্‌বো—

সেলাম ঠুকে বাড়ীর মুখে বেরিয়ে এল কালাচাঁদ। এবার ছুটল ক্রোশ ঘুরে নন্দলাল চক্রবর্তীর বাড়ি। সেখান থেকে ফিরে এসে নিরুপায়ের মতো আরো কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে। আবার গেল গোকুল সরকারের বাড়ি। বেশ রাত হয়েছে; দেউড়ি বন্ধ, কোন আলোও নেই। দেউড়ির বড় কাঠের কপাটের গায়ে ছোট দরজাটা তখনো বন্ধ হয়নি, শুধু ভেজানো ছিল। নিঃশব্দে দরজাটা একটু ফাঁক করে প্রায় বেড়ালের মত লঘুপায়ে ভেতরে এল কালাচাঁদ।

অতিথিশালার অন্ধকার বারান্দায় তখনো চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল রঘুনাথ।

কালাচাঁদ জিজ্ঞেস করল—কে ওখানে?

—আমি রঘুনাথ।

—ও তুমি, তোমার ছোটকর্তা কোথায়?

—বাড়ি নেই।

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু এই অসময়ে গেলেন কোথায়?

—জানিনে।

—কখন বেরিয়েছেন?

—সে খোঁজে তোমার কাজ কি—বেশ ঝাঁঝালো গলায় জবাব দিল রঘুনাথ।

—কাজ আছে বৈকি, নয়তো কি এমনি এই রাত দুপুরে এসে খোঁজ করছি—কালাচাঁদের কথা শুনে আরো কঠিন হল রঘুনাথ—কাজটা কি আগে কও—

কালাচাঁদ আরো কাছে সরে এল। দেওয়ানজীর পাইকদের প্রধান কালাচাঁদ। বর্ধমান শহরে তাকে চেনে না, এমন মানুষ বেশি নেই। সাধারণ মানুষেরা তাকে ভয়ও করে। বেশন-তেমন কারো সঙ্গে কথা বলার অভ্যাস নেই তার। অন্ধকার বারান্দা। মুখোমুখি উঠে দাঁড়াল রঘুনাথ।

মাথায় একটু লম্বা বটে কালাচাঁদ, কিন্তু রঘুনাথও কম নয়। লাঠিয়াল বাপের স্বাস্থ্য পেয়েছে রঘুনাথ। চওড়া বুকের ছাতি, মোটা মোটা হাতের কব্জি।

চড়া গলায় বললো কালাচাঁদ—তোমার যে খুব গরম গরম কথা—

—গরম কথা আর কি কইলাম—রঘুও সমান জোরে জবাব দিল—কি জন্যি ছোটকর্তার খোঁজ করতিছ জানবা চাইছি—

কালাচাঁদ বললো—খোঁজ আমি করিনি, খোঁজ করেছেন দেওয়ানজী।

—সে কথাডা আগে বলতি হয়, ছোটকর্তা আসি পরে খবর দিমুনে—

—ওখানে কারা কথা বলছে—অন্দরের দিক থেকে আলো হাতে লোচনদাস এল। দু'জনের মুখ চোখের ভাব দেখে অবাক হয়ে বললো—কি হয়েছে?

চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে ছিল কালাচাঁদ। রঘুনাথ নির্বিকার। রঘুর মুখের উপর চোখ রেখেই লোচনের কথার জবাব দিল কালাচাঁদ—ওর ছোটকর্তাকে দেওয়ানজী ডেকেছেন, সেই খবরটা শুধু বলতে এসেছি, তাই শুনে ব্যাটার গরম গরম কথা—

—গায়ে পড়ি ঝগড়া করতি চাও, ভালো হইবো না কইলাম—রঘুনাথ গরগর করে উঠল।

—কি, কি করবি তুই—গর্জন করে ঘুষি তুলে এক পা এগিয়ে এল কালাচাঁদ।

রঘুও ঘুষি পাকাল। হাতাহাতি হয়ে যেত। মাঝে পড়ে দু'জনকে দু'দিকে সরিয়ে দিল লোচন—আহা করো কি, রাত দুপুরে তোমরা শুরু করলে কি—

দুমদুম্ পা ফেলে চলে গেল কালাচাঁদ। যেতে যেতে শাসিয়ে গেল—কাল সকালেই আসব।

রূপমঞ্জরী তখন বলছিল—এভাবে আর আসবেন না, রাজকুমার, এতে আপনারও বিপদ, আমারো বিপদ, আপনি আর দেরি করবেন না, যামিনী আপনাকে সদর রাস্তায় এগিয়ে দিয়ে আসুক—

—একবার বলতেও বল্‌বে না, ঘুণো পায়েই বিদায় দেবে—তারতের বিষণ্ণ কণ্ঠ শুনে বল্‌লো রূপমঞ্জরী—আমাকে আজ ক্ষমা করুন রাজকুমার, আমি বড় ক্লান্ত, তা'ছাড়া আমার ভয় করছে,

ভীষণ ভয় করছে—

—কেন, কিসের ভয়—

—তা আমি আপনাকে বোঝাতো পারবো না, আপনি একা-একা এভাবে আর আসবেন না, আমিও তা'হলে বিপদে পড়বো, আজ আপনি আসুন গিয়ে, যা তো যামিনী রাজকুমারকে সদর রাস্তা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আয়। প্রণাম হই রাজকুমার—

আর কোন কথার অবসর না রেখে অন্য দরজা দিয়ে ভেতরের দিকে চলে গেল রূপমঞ্জরী। আলো হাতে আগে আগে চল্‌লো যামিনী। হতাশ বিমূঢ় তারতচন্দ্র যেন পুতুল নাচের পুতুলের মতো বেরিয়ে এল। এত ভয় পেল কেন রূপমঞ্জরী? কিসের ভয়, কার ভয়? না সমস্তটাই মিথ্যে, ছলনা অভিনয়। হতাশার সঙ্গে একটা তীব্র অভিমান প্রবল হয়ে উঠল। রূপমঞ্জরীর কাছে তার আগ্রহের তার আকাঙ্ক্ষার কোন মূল্যই নেই। তার জন্য এতটুকু বিপদের ঝুঁকি নিতে রাজি নয় রূপমঞ্জরী কেনই বা নেবে? পেশাদার গায়িকা। বাজারের বাঈজি। টাকা নিয়ে গান শোনায়, নাচ দেখায়। আরো টাকার জন্য হয়তো আরো কিছু দিতে পারে। কিন্তু মন দেবে সে কি করে? স্থূল দেহের সীমার অতীত, ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের ঊর্ধ্বে যে গভীর অনুভূতি, যে অলৌকিক উপলব্ধি, সেই বিশুদ্ধ প্রেমের ঐশ্বর্য সে পাবে কোথায়? ঈশ্বরের আশীর্বাদে সে সুকণ্ঠের অধিকারিণী হয়েছে। হয়তো কোন আকস্মিক যোগাযোগের ফলে সুশিক্ষিত শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ পেয়েছে। হয়তো পূর্ব-জন্মের কোন পুণ্যের ফলে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের জগতে অবাধ বিচরণের অধিকার পেয়েছে। কিন্তু যত গুণই থাকু রূপের দোষ যাবে কোথায়? জাত-ব্যবসার ঊর্ধ্বে সে উঠবে কি করে? শুধু শুধু কেন সে আত্মবিস্মৃত হল। ভূরশুট রাজবংশের ছেলে, রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র, কেন এক বাঈজীর কাছে হৃদয়ের দুর্বলতার কথা প্রকাশ করতে গেল, ছিঃ ছিঃ! অন্ধকার নির্জন শহরের পথে পথে উদভ্রান্তের মত ঘুরতে ঘুরতে কখন যে নিজের আস্তানায় ফিরে এল ভারত, নিজেরই খেয়াল নেই। দেউড়ির দরজা বন্ধ। ডাকাডাকি করার পর বড় কাঠের দরজার পাশে ছোট কপাটটি খুলে দিল দারোয়ান সিপাহজী। তার হাতে একটি মশাল পেছনে রঘুনাথ। দারোয়ান সিংবন্দন সিপাহ নিবেদন করলো—রাতজী আপ কাঁহা থে—

কোন জবাব না দিয়ে নিজের ঘরে এল ভারতচন্দ্র। কোনরকমে হাতমুখ ধুয়ে নমো নমো করে আহ্নিক শেষ করলো, তারপর বল্‌লো—আমি কিছু খাবো না রে রঘু, এত রাতে আর রান্নার হাঙ্গামা করবো না, চিঁড়ে-দই যা আছে ঘরে দুই খেয়ে নে—

—রাইত উপাসে হাত্তি শুকায়—রঘু বল্‌লো—কি জন্যি খাতি চাস্ না—

অনিল রায়ের

সময়োপযোগী দুইটি বই

নেতাজীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ : ৩·৫০ টাকা

"...সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থ-নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রাহ্য। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাদ্য।" ... (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনদর্শন

নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের সম্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।

পাওয়া যাবে :

জয়শ্রী—৩১২, গাঙ্গুলী বাগান, কলিঃ-৪৭ (ভাকে)

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন

২০৯বি বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

বর্তমান যুগের রুচিসংকট

মীরা বালসুব্রমনিয়ন

ভাগ্যক্রমে সভ্যতার এমন একটা স্তরে আমরা পৌঁচেছি যখন শুধুমাত্র আর্থিক সমৃদ্ধি বা জাগতিক বিকাশই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে পরিগণিত হয় না। কার্যতঃ যাই হোক, মুখে অন্ততঃ প্রায় সবাই স্বীকার করেন যে সাংস্কৃতিক বিকাশও জীবনের মুখ্য না হলেও অন্যতম লক্ষ্য বলে পরিগণিত হওয়া উচিত। এই মূলবোধ অবশ্য কতটা সংস্কৃতির প্রতি আন্তরিক মমত্ববোধ থেকে এবং কতটা বা নেহাৎ স্বভ্যতালুর জন্য তা বলা কঠিন। কিন্তু কারণ যাই হোক,—শিক্ষা, সংস্কৃতি ও চারুশিল্পকে সভ্যতার অন্যতম বাহন বলে স্বীকার করা হয়।

একথা অনস্বীকার্য যে এযুগে আমরা "সংস্কৃতি" বিষয়ে যতটুকু সচেতন ততখানি হয়তো কোন যুগেই ছিলাম না। কিন্তু এই সচেতনতা সত্ত্বেও আমাদের চার পাশে রুচির এমন উন্নার্গগামীতা দেখা দিয়েছে কেন? কী সাহিত্যে, কী চারুশিল্পে, কী সংগীতে, "হাল্‌কা" এবং "সেনসেশন্যাল" এরই প্রাধান্য এযুগে। সিরিয়াস সাহিত্য, চিত্রকলা ইত্যাদি ক্রমশঃই মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ও গোষ্ঠির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। এর থেকে অনেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে গণতন্ত্র সম্ভব হলেও সংস্কৃতি থাকবে মুষ্টিমেয়ের করায়ত্ত।

একথা বলা বাহুল্য যে শিল্পে সাহিত্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা, যথা মৌলিক সৃষ্টি, সমালোচনা ব্যাখ্যা ইত্যাদি মুষ্টিমেয়ের পক্ষেই করা সম্ভব। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে সেই জনকয়েক ব্যক্তি কোন বিশেষ ক্ষমতা বা প্রতিভা-সম্পন্ন। ব্যক্তিগত ভাবে একজন প্রথম শ্রেণীর কবিকে আমি প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে একাসনেই বসাবো। কিন্তু মৌলিক সৃষ্টির ক্ষমতা জনকয়েকের মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও সেই সৃষ্টির স্বাদ গ্রহণ থেকে জনসাধারণ কেন বঞ্চিত হবেন? অথচ বর্তমানে এদেশে রুচির যে প্রবণতা দেখছি তাতে শীঘ্রই হয় তো সিরিয়াস সাহিত্য ও শিল্পের স্রষ্টার মতো তার সমজদারেরাও সংখ্যায় মুষ্টিমেয়ে পর্যবসিত হবেন।

ইংরেজীতে যাকে এক কথায় cheapening of sensibilities বলা যায়, আমাদের মধ্যে আজ তারই আবির্ভাব ঘটেছে। এর কারণ খুঁজতে গেলে অনেক সমাজ-তাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক তত্ত্ব ঘাটতে হবে। তবে এককথায় বলা যায় যে বর্তমানে সংস্কৃতি বা কালচার আমাদের দৈনন্দিন জীবন হতে আলাদা হয়ে শুধু একটা শৌখিনতার বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে—তার ফলেই রুচির এই উন্নার্গ-গামীতা সম্ভব হয়েছে। আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি হচ্ছে উৎপাদন ও মুনাফা এবং এক্ষেত্রে উৎপাদনের সংখ্যাগত বা পরিমাণগত বৃদ্ধিই আজ প্রায় প্রতিটি সমাজের লক্ষ্য,—তা সে সমাজ ধনতন্ত্রবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ বা সাম্যবাদ যাতেই বিশ্বাস করুক না কেন। উৎপাদনের পরিমাণগত বৃদ্ধিই অন্যতম লক্ষ্য হওয়ায় উৎপাদিত বস্তুর শিল্পগত উৎকর্ষের কথা চিন্তা করার অবকাশ যেন না কারুরই।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রণালীতে আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহৃত তৈজসপত্রে যদি শৈল্পিক সৌকুমার্যের অভাব হয়, তবে অজ্ঞাতসারেই ধীরে ধীরে আমাদের সুকুমার অনুভূতিগুলো ভোঁতা হয়ে আসে। অপর পক্ষে, যতদিন আমাদের শিল্পকলা আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল ততদিন যে শুধু জীবনের প্রাণস্পন্দন সহজেই শিল্পকলায় প্রতিফলিত হোতো তা নয় শিল্পকলা ও জীবনযাত্রার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের ফলে আমাদের সুকুমার অনুভূতিগুলিও আপনা থেকে প্রস্ফুটিত হোতো। শিল্পকলা তখন শুধু মুষ্টিমেয়ের লোভার্থক বৈশিষ্ট্য বলে পরিগণিত হোতো না।

প্রসিদ্ধ কলা সমালোচক হার্বার্ট রীড তাঁর "To hell with culture" নামক এক প্রবন্ধে এই মত ব্যক্ত করেছেন যে শিল্পকলা ও সংস্কৃতি যদি আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে মিশে না যেতে পারে—যদি তা শুধু একটা বাইরের পালিশ মাত্রে পর্য্যবসিত হয় তাহলে—to hell with that culture।" প্রবন্ধটি নানাদিক দিয়েই উল্লেখ যোগ্য। শ্রী রীড দেখিয়েছেন কী ভাবে সংখ্যাগত উৎপাদনের তাগিদে শৈল্পিক সৌকুমার্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা হতে বিদায় নিয়েছে। তিনি আরো বলেছেন যে প্রাচীন গ্রীসে "কালচার" বা 'সংস্কৃতির' কোন পরিভাষা ছিলনা। অর্থাৎ কালচার বলতে যে একটা পৃথক কিছু বোঝায় তা অজ্ঞাত ছিল। কালচারকে জীবন-যাত্রা হতে পৃথক করে দেখা রোমান সাম্রাজ্যের আমলেই সুরু হয়। রোমীয়রাই 'গ্রীক কালচার' নিজেদের দেশে আমদানী করে এবং পরে দেশ বিদেশে রোমীয় কালচার রপ্তানীতে উদ্যোগী হয়। শ্রী রীডের মতে ধনতন্ত্রবাদের উদ্ভবের সংগে-সংগেই কালচার পণ্যভিত্তিক হতে সুরু করেছে।

শ্রী রীডের সব মতামতের বিস্তারিত আলোচনা এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নয়। কিন্তু তাঁর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়—সংস্কৃতি আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অংশীভূত হলে তবেই যথার্থ সংস্কৃতি সৃষ্টি হতে পারে—এ প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অনুসন্ধিৎসু পাঠক প্রবন্ধটি আগাগোড়া পড়ে দেখলে ভালো করবেন।

বলা বাহুল্য আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থা এবং আমাদের জীবনাদর্শের আমূল পরিবর্তন না ঘটলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে সংখ্যার পরিষ্ঠতার চেয়ে শৈল্পিক সৌকুমার্যের ওপর জোর দেওয়া সম্ভব হবে না। তাছাড়া পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান এত নিম্নে যে অদূর ভবিষ্যতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিমাণগত ও সংখ্যাগত বৃদ্ধিই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হবে,—তা সে উৎপাদন ব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক যাই হোক না কেন। আর তা হওয়াই উচিত। কারণ যেক্ষেত্রে যথোপযুক্ত উৎপাদনের অভাবে পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ জীবনযাত্রার ন্যূনতম উপকরণ হতে বঞ্চিত সেক্ষেত্রে শৈল্পিক সৌকুমার্যের দোহাই দিয়ে উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস করা সম্পূর্ণরূপে অসমর্থন যোগ্য।

তবে কী একথাই মেনে নিতে হবে যে আর্থিক সমৃদ্ধির সংগে সংগে সংস্কৃতির দিক দিয়ে দেউলে হওয়া ছাড়া আমাদের জনসাধারণের কোন গত্যন্তর নেই? এ কথাই কী মেনে নিতে হবে যে অতঃপর সংস্কৃতি শুধু মুষ্টিমেয়ের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে—যে সৌভাগ্যশালী মুষ্টিমেয়ের হাতে সংস্কৃতি চর্চা করার সময় ও সুযোগ রয়েছে?

আমার কিন্তু মনে হয় এতখানি হতাশ হবার কারণ নেই। এ কথা অনস্বীকার্য যে বর্তমান যুগে আমাদের জনসাধারণের দিক দিয়ে সত্যি সত্যিই cheapening of sensibility ঘটেছে। এক যুগ আগেও এদেশের জনসাধারণ রামায়ণ বা মহাভারতের (যা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অন্যতম) রসগ্রহণে সক্ষম ছিল। আজ সেই জনসাধারণ হয়তো সস্তা রোমান্টিক উপন্যাস বা অপরাধ-

মূলক হালকা কাহিনী পড়ে অবসর বিনোদন করছে। কিন্তু বর্তমানে সংখ্যা যাই হোক না কেন, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের সুকুমার অনুভূতি যাতে পূর্ণ বিকশিত হয় তার চেষ্টা কী আমরা করতে পারি না? জন্মের পর থেকেই শিশুর চার পাশে এমন সব জিনিষের সমাবেশ করি না কেন যা সুন্দর শিল্পসম্মত? রেখা, রঙ, ও সুরের যাদুর্যের প্রতি শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেষ্টা করি না কেন? এককালে যেমন সন্ধ্যাবেলায় গৃহবাসীরা একত্র বসে রামায়ণ মহাভারত পাঠ করতেন, তেমনি দৈনিক একটা নির্দিষ্ট সময় আমরা সংসাহিত্য পঠন-পাঠনে ব্যয় করি না কেন—যাতে আমাদের নিজেদের এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের রুচিও উন্নত হয়? আমাদের বাসস্থান, আমাদের পারিপার্শ্বিক, সব কিছুকেই একটু সুন্দর করে তুলতে চেষ্টা করি না কেন?

শ্রীহার্বার্ট রীড ও তাঁর Civilization from under নামক প্রবন্ধে এই মতই ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে—"the instinct for what we call good design is an innate possession of every unspoilt human being." উপরোক্ত প্রবন্ধে তিনি একথাই বলেছেন যে অন্ততঃ আমরা এই চেষ্টা করতে পারি যাতে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের এই instinctটা নষ্ট না হয় - চেষ্টা করতে পারি যাতে তা পূর্ণ বিকশিত হয়।

বিদ্যালয় মারফৎ এই প্রচেষ্টা বর্তমানে সফল হবে বলে মনে করিনা—অন্ততঃ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু সমস্যাটির গভীরতা যদি আমরা অনুভব করতে পারে তবে হয়তো তার প্রতিকারের পথে অন্ততঃ কিছুটা এগুনো যেতে পারি। নিজ নিজ ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে, তা সে যত সীমিতই হোক না কেন, সেই চেষ্টা কেন করি না? ফল হয়তো ফলবে অনেক পরে,—তবু চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী?

ত্রৈমাসিক পত্রিকার স্বত্ব ও অন্যান্য বিষয়ে বিবৃতি

[সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন রুলের ৪নং ফরম অনুযায়ী]

(৮নং রুল দ্রষ্টব্য)

১। যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয় তাহার ঠিকানা : ২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

২। প্রকাশের কাল : ত্রৈমাসিক

৩। মুদ্রাকরের নাম, জাতি, কিরণচন্দ্র মিত্র, ভারতীয়,

ঠিকানা : ১০।১৯এ, হেদোতলা লালবাজার রোড, কলিকাতা-৩১

৪। প্রকাশকের নাম, জাতি, কিরণচন্দ্র মিত্র, ভারতীয়,

ঠিকানা : ১০।১৯এ হেদোতলা লালবাজার রোড, কলিকাতা-৩১

৫। সম্পাদকের নাম, জাতি, লীলা রায়, ভারতীয়,

ঠিকানা : ৩১২, গাঙ্গুলী বাগান, কলিকাতা-৪৭

৬। স্বত্বাধিকারীর নাম, জাতি, লীলা রায়, ভারতীয়,

ঠিকানা : ৩১২, গাঙ্গুলী বাগান, কলিকাতা-৪৭

আমি কিরণচন্দ্র মিত্র, ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত বিবরণ সমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য। স্বাঃ

কিরণচন্দ্র মিত্র

প্রকাশক

১৬।৩।৬৭

বিশ্বাবর্ত

ভিয়েৎনামে সঙ্কটের জটিলতা বৃদ্ধি

সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী কোসিগিনের সাম্প্রতিক লণ্ডন সফরের সময় ভিয়েৎনামে শান্তি স্থাপনের জন্য ব্রিটেনের সহযোগে ১৯৫৪ ও ১৯৬২ সালের জেনেভা সম্মেলন উদ্বোধনের আয়োজন যখন সম্পূর্ণ প্রায়, ঠিক সেই মুহূর্তে হ্যানয়ের দিক থেকে উপযুক্ত সাড়ার অভাবে সেই সুযোগ উত্তীর্ণ হয়ে গেল—"needed a small gesture of political will in Hanoi"। ভিয়েৎনামের নববর্ষ উপলক্ষ্যে ৩৬ ঘণ্টার জন্য মার্কিনী বোমাবর্ষণে বিরতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা সূত্রে শান্তি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল এবং মার্কিনের পক্ষ থেকে হ্যানয়-সূত্রে শান্তিস্থাপনের জন্য সাগ্রহ অপেক্ষার পরও বাস্তব সাড়া এলোনা—এটাই মার্কিনীপক্ষের আক্ষেপ। শুধু তাই নয়, তাদের অভিযোগ এই ছত্রিশ ঘণ্টার বোমাবর্ষণ বিরতির পূর্ণ সুযোগ নিয়ে উত্তর ভিয়েৎনাম থেকে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে ভিয়েৎকং-এর খোরাকো শস্ত্র যোগান দিয়ে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

কোসিগিনের সাম্প্রতিক লণ্ডন সফরের সময় ভিয়েৎনাম যুদ্ধে শান্তিস্থাপনে ব্রিটেন ও সোভিয়েটের যৌথ দায়িত্ব সোভিয়েটের পক্ষ থেকে স্বীকৃত হয়েছে বলে মনে করবার সঙ্গত কারণ রয়েছে। কিন্তু সেই মুহূর্তে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলসন ও সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন একযোগে জেনেভা সম্মেলন আহ্বানের জন্য উদ্যোগী হতে মনস্থ করেছেন, সে-সময়ই মার্কিনী পক্ষ থেকে উত্তর ভিয়েৎনামে বোমাবর্ষণ সুরু করা হোলো। নূতন বছর উপলক্ষে উত্তর ভিয়েৎনামে মার্কিনী বোমাবর্ষণ বিরতিকে স্থায়িত্ব দেবার জন্য নানা পক্ষ থেকে আশা ও আবেদন উত্থাপিত হলেও—বিশেষভাবে ঐ ধারের পক্ষ থেকেও—মার্কিনী বোমাবর্ষণ তাতে ছেদ টেনে দিলো। ফলে একদিকে যেমন বৃটিশ হাউস অফ কমন্সে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ ব্রাউন উত্তর ভিয়েৎনামকে এজন্য সর্বতোভাবে দায়ী করেছেন—failure to prolong the Tet truce was entirely the responsibility of North Vietnam which had carried out re-inforcements during the 36 critical hours—" তেমনি সোভিয়েট রাষ্ট্রপ্রধান পডগরনী যুক্তরাষ্ট্রের শান্তি অভিযানকে মিথ্যাচরণ ও ছলনা বলে অভিযুক্ত করতেও দ্বিধা করেন নাই : "Washington has again shown the world the hypocrisy and falseness of its widely publicised peace proposals and quest for peace in Vietnam."

বিরতির পর এবারকার বোমাবর্ষণ সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে মার্কিনী শস্ত্র-অভিযানের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দক্ষিণ ভিয়েৎনাম থেকে যুদ্ধবলিত এলাকা পেরিয়ে উত্তর ভিয়েৎনামে কামানের গোলাবর্ষণ সুরু হয়েছে, উত্তর ভিয়েৎনামের সমুদ্র উপকূলে মাইন পোতা হয়েছে এবং সপ্তম নৌবাহিনী থেকে উত্তর ভিয়েৎনামে কামান দাগা সুরু হয়েছে। উত্তর ভিয়েৎনামের উপর চাপ বৃদ্ধি করে উত্তর থেকে দক্ষিণে শস্ত্র সরবরাহ ও যুদ্ধপ্রচেষ্টার পরিসর বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য নিয়েই মার্কিনীদের এই নূতন যুদ্ধোদ্যম। মার্কিনী প্রতিরক্ষা বিভাগও এই কথা বোঝাতে গিয়েই

সম্প্রতি বিবৃতি দিয়ে বলেছে : উত্তর ভিয়েৎনামের বাস্তব জ্ঞান নাই। তারা উত্তর ভিয়েৎনামে বোমাবর্ষণ বিরতি চায় কিন্তু নিজেদের যুদ্ধ প্রচেষ্টা বন্ধের কোনো প্রতিশ্রুতি দেবার প্রয়োজন বোধ করে না। সুতরাং উত্তর ভিয়েৎনামের নিকট থেকে আক্রমণের বাস্তব আশ্বাস করতেই হবে : The U. S. A will continue to make North Vietnam pay a price for aggression. এবং আমেরিকা বোমা-বর্ষণে আবার ছেদ টানবে যদি উত্তর ভিয়েৎনামও আক্রমণ বন্ধ করে দেয় : It will stop bombing in return for an appropriate de-escalation of military action by the North Vietnamese. গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী ভৌগিওতে রাষ্ট্রসংঘে স্থায়ী মার্কিনী প্রতিনিধি গোল্ডবার্গ আমেরিকার ভিয়েৎনাম নীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, দুই পক্ষই জেনেভা সম্মেলনের দোহাই দিচ্ছে নিজ নিজ পক্ষ সমর্থনে। জেনেভা প্রস্তাব দুই পক্ষকেই সমর প্রস্তুতি প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছে। আমেরিকা এই নির্দেশ মানতে সম্মতি জানিয়েছে কিন্তু উত্তর ভিয়েৎনামের পক্ষ থেকে এ-বিষয়ে তাদের ইচ্ছা প্রকাশ করা হয় নাই।

ভিয়েৎনাম যুদ্ধ পরিচালনায় প্রেসিডেন্ট জনসনের নীতি মার্কিনী সিনেটের অনুমোদন পেয়েছে। তারই পাশাপাশি উত্তর ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করে বোমা বর্ষণ নিষিদ্ধ করার অপর একটি প্রস্তাব সিনেটে খারিজ হয়ে গেছে। ভিয়েৎনাম যুদ্ধে আমেরিকার নীতি শান্তিস্থাপনে সহায়ক হবে, এই ধারণার বশবর্তী হয়েই আমেরিকা ভিয়েৎনামে সামরিক চাপ বৃদ্ধি করেছে। তাদের মতে এটা যুদ্ধসুধীনতা—escalation—নয়। গত ১লা মার্চ আমেরিকার প্রতিরক্ষা সচিব ম্যাকনামারা এবং রাষ্ট্র সচিব ডীন রাস্ক বলেছেন তাঁরা যেমন কমিউনিষ্টদের অবরদস্তির নিকট কখনো ভিয়েৎনামে পরাজয় স্বীকার করবেন না, তেমনি প্রকাশ্যে কৌক গোপনে কৌক চুড়ান্ত মীমাংসার জন্য উত্তর ভিয়েৎনামের সঙ্গে নিঃসর্ত আলোচনা বৈঠকে বসতে সম্মত আছেন। গত ২রা মার্চ প্রেসিডেন্ট জনসন এই মনোভাবেরই পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন : "We have made it abundantly clear that we are willing to have a complete cease-fire any time they (the North Vietnamese) are willing to cease their attacks and aggression. They have made it abundantly clear that they are not willing to do that."

ঈ স্বাট-এর নিঃসর্ত বোমাবর্ষণ বিরতি প্রস্তাব ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলসন সমর্থন দিতে চান নাই কেন না পূর্বেকার বিরতি স্থানের নিকট থেকে কোনো সাড়া আনতে ব্যর্থ হয়েছে। সেনেটর কেনেডীও বোমাবর্ষণ বিরতি প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বোমাবর্ষণ বিরতি দিয়ে সোভিয়েট রুশের মত দেশকে হানয়ের নিকট থেকে সাড়া আদায়ের দায়িত্ব দেবার জন্য কেনেডীর এই প্রস্তাব। যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই সাড়া না আসে আমেরিকার অধিকার থাকবে আবার বোমাবর্ষণ সুরু করবার।

কিন্তু ভিয়েৎনামে শান্তি প্রস্তাব সম্পর্কে চীনের বক্তব্য বিপরীত। গত ২০ ফেব্রুয়ারি চীনের নানা পত্র-পত্রিকায় 'Observor' স্বাক্ষরিত একটি প্রবন্ধে পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদীদের এবং সোভিয়েট শোধন-বাদীদের বিরুদ্ধে বৃহত্তর সংগ্রাম পরিচালনার জন্য ভিয়েৎনাম যুদ্ধ চীনা নেতৃত্বের নিকট অপরিহার্য এবং চীন ভিয়েৎনামে বিপ্লবের শিখা নির্বাপিত করবার জন্য মার্কিনী সাম্রাজ্য-বাদীদের এবং সোভিয়েৎ শোধনবাদীদের ষড়যন্ত্রের তীব্র বিরোধিতা করবে "We resolutely oppose the collusion between U. S. imperialism and Soviet Revisionism to hatch a big scheme

to stamp out the revolutionary flames in Vietnam."

ভিয়েৎনাম যুদ্ধের এই চীনা-সোভেন সোভিয়েট ও ব্রিটেনের যৌথ নাগিকে অবিলম্বে জেনেভা সম্মেলন আহ্বান হলে ভিয়েৎনাম সমস্যার জটিলতা কিছুটা শিথিল হতে পারে। অন্যথায় ভিয়েৎনাম পরিস্থিতির যুদ্ধমুখীনতা অনিবার্যভাবেই বৃদ্ধি পাবে।

সুকর্ণ বিদায়

১৯৬৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিষ্টদের ক্ষমতা দখলের ব্যর্থ প্রচেষ্টার পরে সুকর্ণর সম্পর্ক সুরাব্দিও অন্যান্যদের বিচারের সময় প্রমাণিত হলেও সুকর্ণ সম্পর্কে কোনরূপ গ্রহণ করা যায় নাই। গত ১১ই ফেব্রুয়ারী ইন্দোনেশিয়ার সুপ্রিম কোর্ট ৩০শে সেপ্টেম্বরের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সুকর্ণর ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর সুকর্ণর বিচার আলোচ্য হয়ে ওঠে। গত ২২শে ফেব্রুয়ারীর পর এই দাবীর মুখে সুকর্ণ জেনারেল সুহার্তোর হাতে সর্বময় প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণ করে নামেমাত্র রাষ্ট্রপতির পদে আসীন থাকে। কিন্তু সুকর্ণর শেষপরিণতি কি হবে তা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। গত ৭ই মার্চ অস্থায়ী পরামর্শমূলক কংগ্রেসে সুকর্ণ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রস্তাব আলোচনা হয়। সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সুকর্ণর বিচার হওয়া উচিত। কিন্তু সেনাবাহিনীর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সুরু হতে পারে এই আশঙ্কায় অস্থায়ী কংগ্রেসের দিন যত এগিয়ে গেছে জেনারেল সুহার্তোও সুকর্ণ সম্পর্কে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন। বস্তুতপক্ষে ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান শাসকেরা ধীরে ধীরে সুকর্ণ বিলয়ের ভূমিকা রচনা করেছেন এবং মধ্য ও পূর্ব জাভার সেনাবাহিনীর মধ্যে সুকর্ণর প্রভাব লক্ষ্য করে কোনো দ্বিধাগ্রস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনীর সংহতি বজায় রাখবার জন্য এই মার্চের অস্থায়ী কংগ্রেসের অধিবেশনে সুকর্ণর বিচার কিম্বা অপসারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কি না সে সম্পর্কে সংশয় রয়ে যায়।

শেষ পর্যন্ত অস্থায়ী কংগ্রেসের অধিবেশনে সুকর্ণর ক্ষমতাবিক্ত অবস্থান স্বীকৃতি দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। গত ১২ই মার্চ অস্থায়ী কংগ্রেসের অধিবেশনে বাইশ বছরের একচ্ছত্র অধিনায়ক সুকর্ণর সকল ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে জেনারেল সুহার্তোকে অস্থায়ী রাষ্ট্রনায়ক পদে আসীন করা হয়েছে। এ ছাড়া সুকর্ণর প্রিয় উপাধিটিও—'ইন্দোনেশীয় বিপ্লবের মহান নেতা'—তাও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ১২ই রাত্রেই জেনারেল নসুশিয়ন জেনারেল সুহার্তোকে ১৯৪৫ সালের সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ পাঠ করিয়ে রাষ্ট্রপতি পদে বরণ করে নেন।

সুকর্ণর পদমর্যাদা সম্পর্কে অস্পষ্টতা থাকলেও একথা খুবই পরিষ্কার হয়ে গেছে সুকর্ণ ক্রমে ক্রমে বিস্মৃতির অন্তরালে অপসৃত হবেন। কারণ সুকর্ণর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চূড়ান্ত দায়িত্ব কংগ্রেস সুহার্তোর ওপর অর্পণ করেছে। মারদেকা প্রাসাদে সুকর্ণর অবস্থিতি সম্পর্কে ছাত্রদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা প্রশমনের জন্য সুহার্তোর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে: সুকর্ণর প্রাসাদ ও সুকর্ণ মিউজিয়মে পরিণত হয়েছে "Museum piece, Dr Sukarno is also a museum piece" সুকর্ণ সম্পর্কে সুহার্তোর এই মনোভাবই যদি স্থায়ী হয় সুকর্ণ প্রাণে বাঁচবে কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার আশ্রয় থেকে তাকে নির্বাসিত হতেই হবে।

২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

সূচীপত্র

চৈত্র—১৩৭৩

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৯২৭
উপুড় করা-কাপড় (কবিতা)	মানস রায় চৌধুরী	৯২৯
(শেষ থেকে : কবিতা)		৯২৯
জিজ্ঞাসা চিহ্ন (কবিতা)		৯৩০
অলক্ষ্য কয়েক পংক্তি (কবিতা)		৯৩০
কেন অন্ধকার (কবিতা)	বিজয় কুমার দত্ত	৯৩১
পাক ভারত মিলিটারী ব্যালেন্স (আলোচনা)	সুনীল দাস	৯৩৩
লোক সভায় নেতাজী প্রসঙ্গে (সমালোচনা)	সমর গুহ	৯৩৪
ভিরেৎনাম	ডঃ অশোক বসুমদার	৯৩৭
হেগেলীয় দর্শন (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	অনিল রায়	৯৪৩
জল ঘাটি বন (উপন্যাস)	যতীন্দ্রমোহন বিশ্বাস	৯৬১
কণ্ঠহরা বিষ (উপন্যাস)	মিহির মুখোপাধ্যায়	৯৭৭
বার্ষিক সূচী		৯৮৭—১০০

JAYASREE

Socio-Cultural Bengali Monthly
Founded in 1931

Advertisement Rate Schedule
Current from April, 1966

Ordinary

Full Page : Rs 100·00
Half Page : Rs 55·00
Quarter Page : Rs 30·00

Cover Page

Second Cover : Rs 175·00
Third Cover : Rs 200·00
Fourth Cover : Rs 350·00

For Special Position contact *Advt. Manager* Jayasree.

Advertising Space 20·5Cm × 15·24Cm
(6" × 6")

Contact
Manager, Jayasree
312, Ganguli Bagan,
Calcutta—47
Phone : 46-4116

নূতন বছরের গ্রাহক-চাঁদা

নূতন বছরের গ্রাহক-চাঁদা বৈশাখের মধ্যেই পাঠাতে অনুরোধ জানাচ্ছি। গ্রাহক-চাঁদা না পেলে নূতন বছরের পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হবে না।

পরিচালক, জয়শ্রী

মহাজাতি সদনে

নেতাজীর ডাক

'অগ্রগামী সংস্কৃতি পরিষদের সাহায্যকল্পে নৃত্যনাট্য (চ্যারিটি শো)'

রচনা : অনিল রায়

নেতাজীর অপূর্ব জীবন এবং প্রদীপ্ত বাণী ত্রিশটী গান ও ত্রিশটী নাচের মধ্য দিয়ে এই নৃত্যনাট্যটি জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। বর্তমান কালের সব সমস্যা ও তার সমাধানের ইঙ্গিতসহ নেতাজীর কালোপযোগী মর্মবাণী রসমধুর হয়ে ধ্বনিত হয়েছে এই নৃত্যনাট্যে। বলিষ্ঠ আদর্শবাদ, বাস্তব পরিস্থিতির মর্মস্পর্শী বর্ণনা এবং করুণ আবেদন সকল শ্রেণীর চিত্তকে স্পর্শ করবে।

নৃত্যপরিচালনায় অমাদিপ্রসাদ

সংগীতপরিচালনায় শৈলেন মুখোপাধ্যায়

২৬শে মে, শুক্রবার, সন্ধ্যা সাড়ে ছটা, মহাজাতি সদন

টিকিটের হার : ১০৲, ৫৲, ৩৲, ২৲,

অনুসন্ধান : অগ্রগামী সংস্কৃতি পরিষদ, ৬৩১, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬,
ফোন : ৪৬-৪১১৬

ভারতী

৩১ বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা চৈত্র ১৩৭৩

সম্পাদকীয়

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

কংগ্রেস ও বিরোধীপক্ষের মধ্যে শক্তির পরীক্ষায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সংশয়াতীত গুরুত্বলাভ করেছে। চতুর্থ নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতির রাজনৈতিক অস্থৈর্যের সম্মুখে জাতীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্পর্কের আবেদন, রাজনীতি-সচেতন মানুষের মনে দানা বেঁধে উঠেছিল এবং লোকসভার বিভিন্ন মহল থেকে এই মনোভাব শোচ্চার হয়ে উঠেছিল। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ গ্রহণের প্রত্যাশাও প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু কার্যত প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর অনমনীয়তা ও সঙ্কীর্ণ কৌশল এবং কংগ্রেসের প্রার্থী নির্বাচনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও কংগ্রেস সভাপতি কামরাজের মধ্যে গুরুতর মতভেদ, ঐকমতের ভিত্তিতে প্রার্থী মনোনয়নের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। ফল যা হবার তাই হয়েছে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ডঃ জাকির হোসেন ও ভি. ভি. গিরিকে এবং সাতটি বিরোধীদলের দলের পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সুব্বা রাও এবং অধ্যাপক হাবিবকে যথাক্রমে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির পদে মনোনীত করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রবল অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে এবং কংগ্রেস প্রার্থী ডঃ জাকির হোসেনের জয়-পরাজয়ের উপর কেন্দ্রে কংগ্রেসী শাসন এবং চতুর্থ নির্বাচনে ক্ষতবিক্ষত কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। কংগ্রেস এই নির্বাচনে যেমন সঙ্কীর্ণ দলীয় রাজনীতির আবর্ত টেনে এনেছে, তেমনি সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নটিও জড়িয়ে দিয়েছে ডঃ জাকির হোসেনের প্রার্থীত্বের সঙ্গে। বিরোধীপক্ষ থেকে লোকসভার হুমায়ুন কবীরের প্রোগ্রেসিভ গ্রুপ ডঃ জাকির হোসেনকে প্রায় একই কারণে সমর্থন দিতে অগ্রসর হয়েছে। এছাড়া এই গুরুত্বপূর্ণ ও অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে ডঃ রাধাকৃষ্ণানের মত একজন বিজ্ঞ, প্রবীণ ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রপতির পুনর্নির্বাচনের স্বপক্ষে যে জোরালো মত ছিল, তাকে উপেক্ষা করায় দলে উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের বৈ-রীত্যও কোনো কোনো মহলে এই নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করবে। তার ফলে কিছু কিছু কংগ্রেসী সদস্যের সমর্থনও কংগ্রেস প্রার্থীর খোয়াবার সম্ভাবনা রয়েছে।

কংগ্রেস ও বিরোধীদের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটের মূল্যের তফাৎ এবার খুব বেশী নয়। তাছাড়া, এবারে কংগ্রেস ভ্যাগ করে বিরোধীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রাক্তন কংগ্রেসীরা অকংগ্রেসী সরকার গঠন করেছেন। তার ফলে কংগ্রেসের ভোটের সংখ্যা আরও অনিশ্চিত হয়ে গেছে। মোটামুটি হিসাবে দেখা যায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কংগ্রেস দলের ভোটের মূল্য লোকসভায় ১,৮২,৪৩২ ও রাজ্য সভায় ৯০,১৩২ বিধান সভাগুলির কংগ্রেসী ভোটের মূল্যের চাইতে অকংগ্রেসী ভোটের মূল্য ২২,১৯২ বেশী এবং পার্লামেন্টে—লোকসভা ও রাজ্যসভা মিলিয়ে কংগ্রেসী

ভোটের মূল্য অকংগ্রেসীদের চাইতে ৭৯,৮৮০ বেশী। সুতরাং, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কংগ্রেসের ভোটের মূল্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতা মাত্র ৩৩,৫২৪ বর্তমান পরিস্থিতিতে। এই সামান্য ভোটের ব্যবধান কংগ্রেসের ভবের অনিশ্চিয়তা ঘোষণা করছে।

এই নির্বাচনে বিরোধী প্রার্থীর রাজনীতি সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে। সে প্রশ্নের উত্তরে প্রার্থী শ্রীযুক্তা রাও বলেছেন 'I stand for the nation'—আমি জাতির পক্ষ থেকে প্রার্থী হয়েছি। এই ঘোষণায় দেশপ্রেমের অকুণ্ঠ প্রকাশ থাকলেও তাঁর রাজনীতি ও সমাজনীতির কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে আসীন থাকাকালীন ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত ধারাগুলিকে বিচার-বহির্ভূত রাখার যে সুপারিশ করেছেন তাতে তাঁর চিন্তার মৌলিকত্বের ও বলিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া গেছে।

এই নির্বাচনকে কংগ্রেস রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্তরে নামিয়ে এনে ভারতবর্ষের গুরুতর অকল্যাণ সাধন করেছে। নির্বাচনে কোনো অকল্যাণ নাই। কিন্তু পটভূমি ও পরিস্থিতি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নির্বাচনকে অকল্যাণকর করে তুলতে পারে। বর্তমান নির্বাচন সেই রকম একটি সংশয়াতীত দৃষ্টান্ত। বিরোধীদের কাছে তাই কংগ্রেস প্রার্থীর বিরোধীতা অনিবার্য জাতীয় কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দিল্লীতে পুলিশ ধর্মঘট

সরকারী বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করে গত ১৭ই এপ্রিল দিল্লী পুলিসের হাজার হাজার সভ্য আট ঘাইল ব্যাপী মিছিল করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বাড়ীর সামনে অবস্থান ধর্মঘট করে। দিল্লী পুলিশ কর্তৃপক্ষ আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সৈন্য ও বর্ডার রিজার্ভ কোর্স তলব করে এবং রাষ্ট্রপতি ভবন, প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর গৃহ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পাহারারত সমস্ত দিল্লীপুলিশ বাহিনীকে নিয়ন্ত্রীকৃত করে। পরদিন প্রায় সাতশত ধর্মঘটীদের গ্রেপ্তার করে কঠোরভাবে এই বিশৃঙ্খলা দমনে অগ্রসর হয়।

দিল্লীতে ১৩,০০০ পুলিস ও ৩০০০ সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে বহুদিন যাবৎই ক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে আসছিল এবং তাদের মধ্যে আন্দোলনও দানা বেঁধে উঠেছিল। ১৯৬৯ সাল থেকে এই আন্দোলন ইউনিয়ন গঠনের রূপ নেয় এবং ১৯৬৬ সালে তার তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে সে বছর নভেম্বর মাসে Police Forces (Restriction of Rights) Act নামক আইন পার্লামেন্টে পাশ করিয়ে সরকার পুলিশের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের এবং অন্যান্য আন্দোলনের অধিকার বন্ধ করে দেয়। পুলিসদের অভাব অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য 'ঘোসলা কমিটি' নামে একটি কমিটিও গঠন করা হয়। এই কমিটির রিপোর্ট বাধিলে বিলম্ব হওয়াতে পুলিশদের ঘুমায়িত অভাব-অভিযোগ আন্দোলনে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেয়েছে।

দিল্লীতে পুলিশের এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের শোচনীয় অকর্মণ্যতা এই বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে ফুটে বার হয়েছে। একটি অভ্যুত্থান এই বিক্ষোভের পশ্চাতে ইন্ধন যুগিয়ে ট্রেড পুলিশী সংগঠনে ট্রেড ইউনিয়নের ভিত্তি পত্তন করলো অথচ সরকার জানলো না এবং এতবড়ো একটা বিক্ষোভের আয়োজন সরকারের নাকের ডগায় হওয়া সত্ত্বেও তাদের কাছে কোনো খবর পৌঁছায় নাই!

পুলিশের নিয়মশৃঙ্খলা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। কিন্তু তাদের অভাব-অভিযোগ পূরণের জন্যও তৎপরতা চাই। অবিলম্বে এ-বিষয়ে কার্যকরী সরকারী উদ্যম প্রয়োজন। সেই সঙ্গে এই আন্দোলনে সংশ্লিষ্টদের সম্পর্কে উদার মনোভাব নিয়ে ব্যবস্থা করবেন, সরকারের কাছে জনসাধারণ এই আশাই করবে। নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষার সঙ্গে উদারতার সামঞ্জস্য বিধানই পরিস্থিতির প্রয়োজন মেটাতে পারবে।

বহুজাতিক ফেডারেশন

মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাম্প্রতিক কলকাতা বৈঠকের পর পার্টির সাধারণ সম্পাদক সুন্দরায়া সাংবাদিকদের বলেছেন ভারতীয় সংবিধানের আমূল পরিবর্তন করে ভারতবর্ষকে একটি 'বালটিন্যাশনাল ফেডারেশনে' রূপ দিতে হবে, তবেই ভারতবর্ষের ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব হবে। ভারতবর্ষে বহুজাতিক, কম্যুনিষ্ট পার্টির এই যুক্তি দীর্ঘদিনের। নেশন, সাব-নেশন ইত্যাদি ছকে ভারতীয় ঐক্যের বিশ্লেষণের ঝোঁক যাদের রাজনীতিতে অব্যাহত ছিল, মুসলীম লীগ তাদের মধ্যে অন্যতম এবং এই ঝোঁকের পরিণতিতেই ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়েছে। সেদিন কম্যুনিষ্ট পার্টিও এই রাজনৈতিক ঝোঁকের শরীক ছিল। নেশন ব্যতিরেকে ফেডারেশন হয় না, এই যুক্তি অবান্তর শুধু নয়, সর্বনাশাও বটে এবং এই যুক্তি যারা বেঁধে উঠলে, ভারতীয় ঐক্য খান খান হয়ে যাবে। বহুজাতিক ফেডারেশনের সার্থক প্রয়োগের একাধিক দৃষ্টান্ত যেখানে রয়েছে, সেক্ষেত্রে ভারতবর্ষে বালটি-ন্যাশনাল ফেডারেশন ছাড়া ঐক্য বজায় থাকবে না যারা বলেন, তাদের যুক্তিতে স্বভাবতই সন্দেহের উদ্রেক হবে—পাকিস্তান সৃষ্টির দৃষ্টান্ত সেই সন্দেহকে সুদৃঢ় করবে।

ভারতবর্ষের সংবিধানে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কে কেন্দ্রের হাতে আর্থিক ক্ষমতার সমাবেশের বিরুদ্ধে বালটিন্যাশনাল ফেডারেশনকেই একমাত্র প্রতিষেধক ভাববারও কোনো কারণ নেই। আর্থিক সম্পর্কের প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস করেই তার সমাধান করা যেতে পারে। এই প্রতিবন্ধক দুর্লঙ্ঘ্য নয়। তাছাড়া যে কোনো ফেডারেশনে ফেডারেল ফিনান্স-এর প্রয়োগ ফেডারেশন ও তার শাখাগুলির মধ্যে সম্পর্কের কিছুটা টানাপোড়েন সৃষ্টি করবেই—তা সত্ত্বেও তার সামঞ্জস্য বিধানও সম্ভব। ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটি শক্তিশালী কেন্দ্রের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা রয়ে গেছে। এই মৌলিক প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে অন্যান্য আঞ্চলিক প্রয়োজন মেটানোই ভারতীয় ফেডারেল কাঠামোর অনিবার্য কর্তব্য। কম্যুনিষ্ট পার্টির সুপারিশ এই অনিবার্যতার পরিপন্থী। মার্ক্সিষ্ট কম্যুনিষ্ট দলের কেন্দ্রীয় কমিটির আর একটি প্রস্তাবে সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করবার কথা বলা হয়েছে। কারণ যুক্তরাষ্ট্র তার বর্ষের স্বাধীনতা বিপন্ন করে তুলেছে—'menacing our own freedom'। তাছাড়া ভারত সরকারের ভিয়েৎনাম নীতির বিরুদ্ধেও তাদের অভিযান চলবে। ভারতের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বর্তমানে সত্য সত্যই বিপন্ন বেং বিভিন্ন পররাষ্ট্র শক্তির কূটনৈতিক ও সামরিক সংঘাত এই বিপদকে প্রায় বাস্তব করে তুলেছে। এই বিপদ মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের থেকেও যেমন, চীনা নয়া সাম্রাজ্যবাদের থেকেও তার চাইতেও বেশী বাস্তব। এছাড়া ভারতবর্ষের বৈঠক সাথেও পাকিস্তানের দিক থেকে চীনের ষ্ট্রেটেজিতে ভারতবর্ষের সামরিক বিপদের সম্ভাবনা আর একটি বাস্তব ঘটনা। শুধু ভারতবর্ষের পক্ষে কেন, ভিয়েৎনামের পক্ষেও সোভিয়েট রুশের চেষ্টা সত্ত্বেও ভিয়েৎনাম সংঘাত মীমাংসার জন্য জেনেভা সম্মেলনের বিরুদ্ধে চীনের অমননীয় অনমতি ভিয়েৎনামের স্বাধীনতা যেমন বিপন্ন করেছে, তেমনি আর একটি আন্তর্জাতিক সংঘাতের বীজ ও সুনিশ্চিত পটভূমি রচনা করছে। সুতরাং বর্তমানে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন মার্কিণ ও চীন উভয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বাস্তব রাজনীতির দিক থেকে পরিচালিত হওয়া উচিত। মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্টদের চীন সম্পর্কে নীরবতা তাদের চীনানুগতাই প্রমাণ করছে এবং তাদের আন্তর্জাতিক উদ্দেশ্য যে চীনের আক্রমণাত্মক রাজনীতির পরিপূরক সে-সম্পর্কে সংশয় দৃঢ়তর করছে।

বস্ত্রমূল্য বৃদ্ধি

ভাতে সরকার কাপড়ের দাম টাকায় সাড়ে চার পয়সা

বৃদ্ধিতে সম্মতি দিয়ে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির চক্রটিকে আর একবার পুষ্ট করলেন। গত দু' বছরে চারবার কাপড়ের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ছয়মাস পর এবার পঞ্চমবার বৃদ্ধি পেলো। নিয়ন্ত্রিত কাপড়ের দর এইভাবে বার বার বৃদ্ধি করে বস্ত্র-সঙ্কটের মীমাংসা দূরের কথা, তার মূলেও যাওয়া যাবে না। কাপড়ের কলের মালিকরা টাকায় আট পয়সা মূল্যবৃদ্ধি চেয়েছিলেন এবং এছাড়া তাদের দাবী ছিল কাপড়ের দাম ও উৎপাদনের উপর থেকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করা হউক। আপাতত মালিকদের এই দাবী মেনে না নিলেও ভারত সরকারের দীর্ঘ আত্মসমর্পণ দেখা গেছে মিল মালিকদের কাছে।

কাপড়ের দাম বৃদ্ধিতে, নিত্যব্যবহার্য জিনিষপত্রের দাম আরও বৃদ্ধি পাবে, তার ফলে শ্রমিক-কর্মচারীর ভাতা বৃদ্ধির প্রশ্ন উঠবে এবং ভাতা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি এবং অতঃপর আবার বস্ত্রমূল্য বৃদ্ধি। কাপড়ের কলের প্রয়োজনের তুলনায় দেশে তুলার অভাব রয়েছে, যে অভাব বাইরে থেকে মেটাবার উপযোগী বৈদেশিক মুদ্রার অভাব রয়েছে। ফলে তুলার দাম বাড়ছে। কলগুলির যন্ত্রপাতিও পুরানো। এই কারণে উৎপাদন ব্যয়ও বেশী হয়। সুতরাং বার বার কাপড়ের দাম বাড়িয়ে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণকে পীড়ন করা চলতে পারে, আসল সমস্যার মীমাংসা হবে না। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হতে হবে।

ভারতীয় পরিস্থিতির মার্কিনী মূল্যায়ন

যাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার জন্য ভারতের উপর মার্কিনী চাপের প্রকৃতি কি হবে এবং এই সিদ্ধান্তের পূর্বে ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে মার্কিনীদের মূল্যায়ন কি তার একটি তাৎপর্যপূর্ণ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। রিপোর্টটি তৈরী করেছেন সেনেটর পেইল ম্যাকফি এবং ফ্র্যাঙ্ক মল, চীনা দীর্ঘ বছরের এঁরা দেশগুলি ভ্রমণের পর এরা চীন যুক্তরাষ্ট্র, ইতিয়া এইড প্রভৃতি ও অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্রকে দিয়ে ভারতের উপর চাপ দিতে যাতে ভারতবর্ষ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে বাধ্য হয়।

এই রিপোর্টে বর্তমান ভারতের নেতৃবৃন্দের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে অক্ষমতার কথা উল্লেখ করে ভারতবর্ষে সামরিক একনায়কত্ব বিনা দক্ষিণপন্থী আমলাতান্ত্রিক বৈরশাসন পত্তনের সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে। এরা আরও বলেছেন ভারতে যদি কোন বিকল্প সরকার গঠিত হয়, সেই সরকার আরও অস্থায়ী ও বিদেশ-পরাঙ্মুখ হবে, ভারত সরকারের বর্তমান আমেরিকা নীতি বর্জন করবে এবং গোড়া কম্যুনিষ্ট বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও মার্কিনী স্বার্থকে বরদাস্ত করবে না। এরা বলেছেন যে এই সরকার হিন্দু-ঘেঁষা হবে যার ফলে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটবে।

সেনেটরদ্বয় বলেছেন এই পরিপেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পক্ষে ধৈর্যের সঙ্গে ভারতের বর্তমান সরকারকে সাহায্য করে যেতে হবে। কোনো নূতন সরকার গঠিত হলে খাদ্য-সাহায্যের প্রলোভন দেখিয়েও সেই সরকারকে যুক্তরাষ্ট্র নতি স্বীকার করাতে পারবে না।

মার্কিন সেনেটরদের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি কতদূর প্রসারিত এবং তাদের কূটনীতির পথ কত পিচ্ছিল এই রিপোর্টেরই সুস্পষ্ট প্রতিফলন পাওয়া যাচ্ছে। ভারতবর্ষের উপর মার্কিনী চাপ অতঃপর আরও প্রখরতর হবে।

খ্রোৎলানার রাশিয়া ত্যাগ কেন ?

ষ্টালিন-কন্যা খ্রোৎলানা অবশেষে আমেরিকায় পৌঁছেছেন। তার ভারত বর্ষে আশ্রয় প্রার্থনা নিয়ে যে বিতর্ক উঠেছিল এবং লোকসভার কারণে-অকারণে খ্রোৎলানা-প্রসঙ্গ উত্থাপন অতঃপর বন্ধ হবে অনুমান করা যেতে পারে। খ্রোৎলানা ভারতবর্ষে আশ্রয়প্রার্থী হয়েছিলেন কিনা তার চাইতে বড় প্রশ্ন কম্যুনিজমের

পীঠস্থান সোভিয়েট রুশে পালিত কম্যুনিষ্টরাষ্ট্রের পরাক্রান্ত শাসক ষ্ট্যালিনের স্নেহচ্ছায়ায় বর্ধিত হয়েও অকস্মাৎ কেন সোভিয়েট রুশ থেকে স্বেচ্ছা-নির্বাসন গ্রহণ করলেন এই প্রশ্নগুলি সমগ্র পৃথিবী আলোড়িত করেছে। আমেরিকায় পৌঁছে সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতে স্বেৎলানা এই রহস্যের কিছুটা স্বারোদ্ঘাটন করেছেন। স্বেৎলানা বলেছেন কম্যুনিজমের আবহাওয়ায় বর্ধিত হয়েও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনভাবে চিন্তায় অভ্যস্ত হয়ে পুরানো চিন্তাকে বর্জন করতে শেখেন। তাছাড়া, ধর্মের আবেদনও তার এই মানসিক পরিবর্তনের জন্য বহুলাংশে দায়ী। নিরীশ্বরবাদী আবহাওয়ায় বর্ধিত হয়েও ধর্ম ব্যতিরেকে জীবনধারণ করা অসম্ভব মনে হয়েছে তার পক্ষে—"...it was impossible to exist without God in one's heart." ধর্মের এই আবেদন মানসিক জগতে স্থান করে নেবার পরই স্বেৎলানার কাছে কম্যুনিজমের অন্ধ গোঁড়ামী মূল্যহীন হয়ে পড়ে "..... since that moment the main dogma of Communism lost their significance for me."

কম্যুনিজম-এর অন্ধ ও গোঁড়া অনুসারীদের কাছে স্বেৎলানার স্বপ্নভঙ্গ তাদেরও স্বপ্নভঙ্গ করবে।

আর একটি রুশ বিপ্লবের আয়োজন

মাও সে তুং আর একটি রুশ বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা বোধ করছেন। পিকিং মিউনিসিপাল রিভল্যুশনারী কমিটির উদ্বোধন উপলক্ষে মাও সে তুং এই বিপ্লবের বাণী প্রচার করে বলেছেন অন্তত এই নূতন বিপ্লবের প্রেরণা যেন পিকিং এর এই বিপ্লবী কমিটি থেকে উৎসারিত হয়। পিকিং কমিটিকে উদ্বুদ্ধ করে মাও সে তুং বলেছেন তাদের ঘোষণা যেন সারা পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দেয় এবং ক্ষমতাসীন প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে যেন যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়: "You are a revolutionary body and your declaration must shake the whole earth. Your manifesto must incorporate declaration of war on anti-revolutionaries in power."

চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবই যে মাও সে তুং-এর শেষ কথা নয়, চীন সীমান্ত অতিক্রম করে সোভিয়েট রুশ এবং অন্যান্য দেশের দিকেও যে এই বিপ্লব প্রসারিত হবে, মাও সে তুং-এর এই উদাত্ত আহ্বান সে-কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। বিশেষভাবে চীন সীমান্তে অবস্থিত রাষ্ট্রগুলির প্রতি এই আহ্বান হুঁশিয়ারী বহন করছে।

বিহারে দুর্ভিক্ষ

কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা বিহারের কোন কোন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করতে কুণ্ঠা বোধ করে বাস্তবকে অস্বীকার করছিলেন। বিহারের নূতন মন্ত্রীসভা সেই বাস্তবকে স্বীকার করেছেন। বিহারের এবারকার মত দুর্ভিক্ষ গত একশ বছরের মধ্যেও দেখা যায় নাই। এ-যাবৎ সরকারীভাবে ২৩,৪৬১ বর্গমাইল এলাকা দুর্ভিক্ষ অঞ্চল বলে ঘোষিত হয়েছে। এই এলাকার জনসংখ্যা হবে ১ কোটি ২৭ লক্ষ ১৮ হাজার। গ্রামে পানীয় জলের দারুণ অভাব। বেসরকারী হিসাব মতে কয়েকশত লোক ইতিমধ্যে অনাহারে মারা গেছে।

খাদ্যের সরবরাহ সম্পর্কে বিহার সরকারের কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। কেন্দ্রের হিসাব অনুযায়ী বিহার সরকারের নূনতম প্রয়োজন বছরে ২৯ লক্ষ টন। কিন্তু জানুয়ারী থেকে এপ্রিল পর্যন্ত কেন্দ্র সরকার ৭ লক্ষ টন দিচ্ছেন। রাজ্য সরকার প্রতিমাসে ৪ লক্ষ টন চাইলেও কেন্দ্র মঞ্জুর করেছেন মোট দুই লক্ষ টন। বিহার সরকার অন্য রাজ্য থেকে মোটা চাল কেনার জন্য যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন কেন্দ্র তা অগ্রাহ্য করেছেন। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে বিহার সরকারের বি ডি ওরা গ্রামে খয়রাতি সাহায্য বিলি করতে যেতে অসম্মত হচ্ছে। কারণ

প্রয়োজনের তুলনায় ঐ সাহায্য এত কম যে সাহায্যপ্রার্থীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে কর্মচারীদের আক্রমণ করছে।

গত বছরের অনাবৃষ্টির ফল এতোদিনে প্রকট হয়ে অনাহারে বসন্তে, অপুষ্টিতে শত শত লোক মৃত্যুর কোলে চলে পড়েছে। বর্ষা শুরু হলে নানা রোগে মৃত্যুর ভয়াবহতা বৃদ্ধি পাবে।

সরকার সাহায্য, ধান ও শস্য বাবদ প্রায় ত্রিশকোটি টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা নিলেও বিহারের প্রশাসনিক সামর্থ্য সম্বন্ধে সংশয় আছে। ইতিপূর্বে রেশনের চাল কালোবাজারে উধাও হয়েছে, প্রশাসনিক কাঠামোর এই দুর্বলতা দূর না করতে পারলে—দুর্নীতির ছিদ্র পথে দুর্ভিক্ষ ত্রাণের অর্থ অপচিত হবে।

আগামী ছয়মাস খুবই সঙ্কটময়। ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক ইতিহাসে বিহারের সঙ্কট বৃহত্তম দুর্যোগে পরিণত হবে কিনা, সে-সংশয় দূর হয়ে গেছে। বিহারের পরিস্থিতি একটি জাতীয় দুর্যোগ, প্রকৃত জাতির অভূতপূর্ব প্রচেষ্টার সঙ্গে সামরিক ক্ষিপ্রতা যুক্ত করে অবিলম্বে এই বিপদের মুখোমুখি হতে হবে।

বিদ্রোহী-নাগাদের চীনে প্রবেশ

কিছু সংখ্যক বিদ্রোহী নাগা সশস্ত্র হয়ে প্রত্যাবর্তনের জন্য চীনে প্রবেশ করেছে। এদের সংখ্যা অল্প হলেও সীমান্তের নিরাপত্তার পথে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য নাগাল্যাণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী টি. এন. আজামী এই ঘটনায় খুব উদ্বেগ বোধ করেন নাই। কারণ আজামী মনে করেন একদিকে অধিকাংশ নাগাযারা বিদ্রোহী নাগাদের বিরোধী এবং শান্তি চায়, তেমনি নাগাদের জীবনযাত্রা ও নিয়ন্ত্রণ কায়েম কম্যুনিজমের বিরোধীও বটে। সুতরাং চীনের সাহায্যে যে সকল বিদ্রোহী নাগারা সশস্ত্র হতে চায়, তারা চীন থেকে ফিরে এলেও সাধারণ নাগাদের ঘৃণার উদ্রেক করবে মাত্র। আজামীর এই অনুমানের যাথার্থতা কতটা তা বলা দুষ্কর। আজামীর এই আশাব্যঞ্জক কথা সত্ত্বেও এই নূতন বিপদ সম্পর্কে কঠোর সতর্কতার প্রয়োজন।

অর্থমন্ত্রীদের বৈঠক

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী দেশাই-এর সঙ্গে রাজ্য অর্থ মন্ত্রীদের সাম্প্রতিক বৈঠকে কেন্দ্র-রাজ্যের বৈপরীত্যের গতি ও প্রকৃতির আভাস পাওয়া গেছে। কেন্দ্রের মন্ত্রী পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে-কেন্দ্রের বিপুল ঘাটতি মিটিয়ে রাজ্যগুলিকে আশানুরূপ সাহায্য করা যাবেনা। ফলে নূতন অকংগ্রেসী সরকারগুলি জনসাধারণের মনে যে উন্নয়ন ও পরিবর্তনের আশার সঞ্চার করেছেন, তা তাদের পক্ষে কার্যকরী করা সম্ভব হবে না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর অনমনীয়তা রাজ্যে রাজ্যে বিক্ষোভ সঞ্চার করেছে এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর যুক্তিকে তারা গ্রহণ করতেও প্রস্তুত হন। মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী আন্নাদুরাই বলেছেন ঘাটান—বহির্ভূত ব্যয় হ্রাস করে ২০০ কোটি বাঁচানো যেতে পারে এবং প্রতিরক্ষার বিঘ্ন না ঘটিয়েও ১০০ কোটি টাকা ব্যয় হ্রাস করা যেতে পারে। এদিকে কেরালার প্রধানমন্ত্রী নাম্বুদ্রিপাদ সংবিধান পরিবর্তন করে রাজ্যের হাতে অধিকতর ক্ষমতা চেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী জ্যোতিবসু বলেছেন কেন্দ্রীয় বরাদ্দের ভিত্তির পরিবর্তন প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় বরাদ্দ শতকরা ৭০ ভাগ জনসংখ্যার ভিত্তিতে এবং শতকরা ৩০ ভাগ প্রয়োজনের ভিত্তিতে অনুমোদিত হয়ে থাকে। শ্রীবসু মনে করেন এই ভিত্তিতে যদি কেন্দ্রীয় বরাদ্দ হয়, ১৯৬৭-৬৮ সালের পশ্চিম বঙ্গের জন্য কেন্দ্রের বরাদ্দ ৩১ কোটি টাকার পরিবর্তে ৫২·৫ কোটি টাকা হওয়া দরকার।

কেন্দ্র ও রাজ্যের টানাপোড়েনের মধ্যে ভবিষ্যৎ অনৈক্যের সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে এবং এই অনৈক্য অকংগ্রেসী সরকারগুলির সঙ্গে কেন্দ্রের সম্পর্কের ভিত্তির উপর নির্ভর করবে। কেন্দ্রকেও যেমন নূতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, তেমনি রাজ্যগুলিকেও কেন্দ্রানুগতা অতিক্রম করে সততপথ নির্বাচন করা সম্ভব হবে না। যদি সে-পথে তাদের যাত্রা সুরু হয়, ভারতবর্ষের সংহতি নিয়ে সমস্যা দেখা দেবে। ৩০. ৩. ৬৭.

অনির্বাচিত চারটি

মানস রায় চৌধুরী

১. উপুড়-করা-কাগজ

নীল টেবিলের অন্ধকারে পড়েছিল সাদা কাগজের টুকরো কর্পূর আহাজ
তুমি দেখেছিলে, রয়েছে উপুড় হয়ে মেঝিনার, ভুলে গিয়ে কাজ।
সহসা কলমে কালি হয়ে উঠলো সমুদ্রের ফেনা, অলৌকিক রাজহাঁস
কলমের মুখে স্রোতে দিচ্ছু সঞ্চারিত, কালি ঘুনের আভাস
সহসা কাগজময় রক্তোচ্ছ্বাসে। নির্বাচিত তোমার শরীরতরা হলুদ কার্পাস
কলমের ঢেউ দিয়ে, কেনা দিয়ে ঘুরে দিতে পারি যদি কাগজের মুখ
না দেখে অমনই নত হয়ে থাকতে পাও, যদি পাও পরাসুখ
পড়ে থাকতে কয়েকটি প্রহর ধরে। ওতো চায় শেষ আশ্রয় তোমারই আঙুলে
ছুঁয়ো ওকে শীত রাত্রে অন্ধকারে নিঃসঙ্গ চুলোর নিচে ঘুমন্ত চুকানী কালে।
চুলে

এখন সামান্য ওকে দিতে হবে অস্পৃষ্ট থাকার অধিকার
এখন কলমে কালি অনন্ত নীলিমাভাঙা লক্ষ ত্রেকারের হুংকার

২. শেষ থেকে

শেষ থেকে সুরু হোক বলে জাগো বুলুকা তোমার
সুরু থেকে শেষ হোক বলেনি কখনো।
রাত্রির গহ্বর দিয়ে দিনে যাই, নাকি যাই তার বিপরীত
বুঝি সবুজের আগে ফুটে উঠে রিক্ততার পীত
কে জেনেছে? বিরহের সুরু হয়, বহু পরে আকাঙ্ক্ষিত ভালবাসা আসে

পুরোন কাগজগুলি হয়ে ওঠে ক্রমশ নূতন
বার্ধক্যে নবারই সুরু ক্রমে আসে পরিণতি সুঠাম যৌবন।

শেষ থেকে সুরু হোক বলে অনন্তের দিকে হাত তোলো
বেলা যেতে যেতে শেষে এও ভোর হলো।

৩. জিজ্ঞাসাচিহ্ন

পার্শ্বিপার্শ্বে রেখে যাও ছায়ার বিচ্ছেদ
ছায়ার বিরুদ্ধে বড় শিহরণ লাগে, রক্তে ফেরে ঘুরতর খেদ
নিঃসঙ্গ দিনান্ত শেষ ধ্বনিকা উত্তোলনে নশ্বরতা অনন্তে ঘনালো।
তারপর চতুর্দিকে কায়াহীন অনাকুল আলো—
তুমি কই ? তুমি কই ? বলে যেই আর্তনাদ বাতাসে রেখেছি
অমনি পাথর, গাছ, নীলিমার নিস্তব্ধতা ভাসিয়ে
ভাঙা কাঁধ ছুঁয়ে যায় রেশম লাবণ্যে শুভ্র আঁচলের পাড় —
ছায়ার অভাব কেন এভাবে ঘুচাও ?

৪. জলমগ্ন কয়েক পংক্তি

এই অক্ষমতা যায় প্রতিদিন, ক্ষমা হয়ে ঝরে
অথচ করার বেলা আজ নয়। বহুর বহুর বাদে তোমার মৃত্তিকা
আমাকে প্রণয় দেবে দাহ কাঠে, সুগন্ধী আগুনে
অথবা ভাসাবে কোনো সমুদ্রে সৈকতে ঢেউ, হিংস্র গর্জনের
আহত পৌরুষ গায়ে প্রসন্নতে তুলে নিয়ে বিশাল অকূলে.....
কিন্তু কেন এ মুহূর্তে ? এ বয়স স্বার্থে, শ্রমে, গিরি আরোহণে—
সিসিফাস ! বিষণ্ণ শ্বেদাক্ত মুখ মনে পড়ে পাহাড়ে নিয়ত
ঊর্ধ্বগামী অধোগামী পূর্ণ ব্যর্থতার শেষে তারও প্রাপ্তি ছিলো।

আমার কিছুই নেই, বৃত্তিকায় অভিজাত অনৃত শরীর
ছায়ায় অস্পিতা বাড়ে, আলোর অভাবে হয় দরিদ্র ভীষণ
পরিণাম কীটপতঙ্গের, তবু অন্তর্ধ্বনি শ্রবণের বাসনা সবার
আমিও সবার মত অন্তর্ধ্বনি একবার ঘুরে অগণন
মোমবাতি শয্যাধারে, শেষ বহু ঝরে গেল, তুমি
পড়ন্ত দিনার থেকে আহ্বান করেছিলে, তখন বুঝিনি কতো শুভ্র ছলনায়।

কেন অন্ধকার

বিজয়কুমার দত্ত

মাঝে মাঝে সমস্তই লাগে অন্ধকার।
অথচ শপথ করে বলতে পারি আমি
চিরদিন, সূর্যের প্রখর আলোর দেশে উঠতে চাই।
রক্তাভ মুখের ভাষা, কোন কোন চোখের শিরায়
এতকাল তো পড়তে চেয়েছি।
অন্তরের পাঠে আমি নিরক্ষর আজ।

একঘুঁয়ে অজস্র দেখা বকুল গাছের
ফুল কিংবা পাতাবাহারের
রঙীন ভরে ওঠা রৌদ্র রঙ ছুঁয়ে,
নিখন শিল্পের সূক্ষ্ম আয়োজনে
মিশে যেতে চেয়েছি বিনা আয়াসে, সহজ আহ্বানে—
আমি নক্ষত্র আলোক সভায়, ডুবে যেতে যেতে,
আলিঙ্গন ছাড়া আর অন্য কোন বন্ধুর মিলন
চাইনি ঘনিষ্ঠ, মুগ্ধ মানুষের কাছে।

অথচ জীবন চোর ভুল প্রার্থনার মন্ত্রে, আমি
আকাশে বাতাসে, শুদ্ধ অরণ্য জ্যোৎস্নার
নিমিত দক্ষেন স্থানে, অনন্ত ঈশ্বরমূর্তি কখনো দেখিনি,
বুকের পাথর কেটে যে সব প্রতিমা দেহ গড়েছি ভেঙেছি,
সেইসব ভাস্কর্যের পায়ে মাথা রেখে
শেষরক্ত নীরাঞ্জনে আরতি দিইনি।

জয়শ্রীর নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্য

জয়শ্রী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক সডাক ৯'৫০। ষাণ্মাসিক ৪'৭৫। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে হয় না।

লেখকদের জন্য

শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ সর্বাগ্রে দেওয়া হয়।

লেখা পরিষ্কার হরফে ফুলস্ক্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। কারণ, হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই। কবিতা সম্বন্ধেও তাই নিয়ম।

উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়।

শক্তিশালী নূতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহযোগিতার জন্য আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কলকাতার সব স্টলে জয়শ্রী পাওয়া যায়

প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী
৩১২, পাঁজুলিবাগান
কলিকাতা-৪৭

পাক-ভারত
মিলিটারী ব্যালান্স ?

সুনীল দাস

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে অতঃপর মিলিটারী ব্যালান্স, অর্থাৎ সমরোপকরণের ভারসাম্য রক্ষা হইতে মার্কিনীরা উদ্যোগী হয়েছে। ভারতবর্ষের ভৌগলিক আকৃতির এক চতুর্থাংশ হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষের সঙ্গে সমরোপকরণের ভারসাম্য বজায় রাখবার জন্য পাকিস্তানের প্রতি মার্কিনী দাক্ষিণ্য ১৯৫৩ সালের পাক-মার্কিণ প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পাদিত হবার পর, ১৯৫৪ সাল থেকেই প্রবাহিত হয়ে এসেছে। ট্যাঙ্ক, জঙ্গী বিমান ও অন্যান্য মার্কিনী মারণাস্ত্রের অজস্র ধারা ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে পাকিস্তানে উপচে পড়েছে। পাকিস্তান সিয়াটো সেটো মার্কিনীদের গোলাম। এই শক্তি জোট সৃষ্টি হয়েছিল রুশ ও চীন এই দুই কম্যুনিষ্ট শক্তির প্রসার সীমাবদ্ধ পরিস্থিতে অবরোধের জন্য। সেদিন পাকিস্তানের প্রতি সমরসম্ভারের অবারিত দাক্ষিণ্য মূলতঃ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কম্যুনিষ্ট চীনের বিরুদ্ধে প্রয়োজন-বোধে প্রয়োগের জন্য। সোভিয়েত রুশে ক্রুশ্চেভ-যুগের উপান্তে মার্কিণ-সোভিয়েৎ সম্পর্কের উন্নতি, একদিকে যেমন মার্কিনীদের কতকটা সোভিয়েট রুশ সম্পর্কে উদ্বেগমুক্ত করেছিল, তেমনি কম্যুনিষ্ট চীনের যারমুখীনতা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে নূতন বিপদের সঙ্কেতরূপে দেখা দিয়েছিল। পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য দিয়ে এই বিপদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মহড়া নেবার মুখে দেখা গেল চীনা-মার্কিনী বৈপরীত্য উত্তরোত্তর প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেলেও আয়ুব সরকারের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক ঘনিষ্টতর হয়ে উঠেছে এবং পাকিস্তানের সামরিক উদ্যোগ চীনের সামরিক ষ্ট্র্যাটাজির অংশীদাররূপে প্রবলভাবে ভারতদ্বেষী হয়ে পড়েছে। ফলে মার্কিনীদের কোটি কোটি ডলারের (আঠার বিলিয়ান) সাহায্যপুষ্ট পাকিস্তানী সামরিক মারণাস্ত্র ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্ত আক্রমণে নিয়োজিত হল। সুতরাং মার্কিনী উদ্যোগে পাকিস্তানের বর্ধিত সমরায়োজন শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষের উপরই ঝাঁপিয়ে পড়লো।

ভারতবর্ষ মার্কিনী-সমরাস্ত্রের মুখাপেক্ষী হয় ১৯৬২র চীনা আক্রমণের পর। এই তিনবছরে প্রাপ্ত মার্কিনী সমরাস্ত্রের বেশীটাই এসেছে যানবাহন ও যোগাযোগের সরঞ্জামের মধ্য দিয়ে এবং অন্যান্য যে সমরোপকরণ ভারতবর্ষ চীনা আক্রমণের পর মার্কিনীসূত্রে পেয়েছে সে সবই পার্বত্য এলাকায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর সশস্ত্রীকরণের জন্য, এবং ১৯৬৫র পাক-ভারত সংঘর্ষে এই সমরোপকরণ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ আদৌ ব্যবহার করে নাই, যদিও পাকিস্তানের মার্কিনীসূত্রে প্রাপ্ত সমরোপকরণ পরিপূর্ণরূপে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছে—এ-সম্পর্কে মার্কিনী সরবরাহের সর্ত লঙ্ঘন করেও।

১৯৬৫র পাক-ভারত সংঘাতের পর ভারত ও পাকিস্তানে মার্কিনী অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে আংশিকভাবে এই নিষেধ তুলে নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানে নগদ কিম্বা ধারে অ-মারণাস্ত্র সংবরাহের সুযোগ করে দেওয়া হল। অ-মারণাস্ত্র বলতে পরিবহন ও যোগা-যোগের সরঞ্জাম, ওষুধপত্র এবং ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি বোঝায়। মারণাস্ত্র বলতে বোঝায় সাঁজোয়া বাহিনী, জঙ্গী বিমান, পদাতিক বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র এবং ভারী কামান ইত্যাদি।

পাক-ভারত যুদ্ধে বিধ্বস্ত প্যাটন ট্যাঙ্ক ও স্যাবার জেট পাকিস্তানী সাঁজোয়া বাহিনীর মেরুদণ্ড ধ্বংস করে দিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও লণ্ডনের ইনষ্টিটিউট অফ ষ্ট্র্যাটেজিক ষ্টাডিস কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিকী 'Military Balance 1966-67'-এ দেখা যায় ভারতবর্ষের তুলনায়

পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর দ্রুত বৃদ্ধি হয়েছে। ১৯৬৬ সালের মধ্যেই পাকিস্তান ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে নিয়েছে, পদাতিক বাহিনী পাঁচ ডিভিসন থেকে এগার ডিভিসনে উন্নীত করেছে। এ-ছাড়া চীন থেকে ট্যাঙ্ক ও মিগ-বিমান পেয়েছে। ইরান থেকে ৮৬টি সাবার জেট পেয়েছে, পর্তুগাল, তুর্কী, পশ্চিম জার্মানী ইত্যাদি দেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র পেয়েছে এবং দুই ডিভিসন সেনাবাহিনীর সশস্ত্রীকরণের উপযোগী অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের প্রতিশ্রুতি পেয়েছে চীন থেকে। এর ওপর একটি ফরাসী প্রতিষ্ঠানে তিনটি সাবমেরিনের অর্ডারও দিয়েছে।

পাকিস্তানের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে গত ১২ই এপ্রিল তারিখে নগদ মূল্যে মারণাস্ত্রের বন্টনে বিক্রয়ের মার্কিনী সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের প্রতি সরাসরি ভারত-বিরোধী মার্কিনী আনুকূল্যের সঙ্কেত বহন করে এনেছে। মার্কিনী সূত্রে প্রাপ্ত পূর্বতন সমরসম্ভারের বন্টনে সরবরাহের ক্ষেত্রে পুরোপুরি সুযোগ পাকিস্তানের প্রতিই প্রসারিত হবে। কারণ, পাকিস্তান ভারতবর্ষের চাইতে কুড়িগুণ বেশী মার্কিনী সাহায্য পেয়েছে এবং তারমধ্যে ট্যাঙ্ক, যুদ্ধী বিমান প্রভৃতি মারণাস্ত্রের সংখ্যাই বেশী ; যা বহুল পরিমাণে পাক-ভারত যুদ্ধে খরচ হয়ে যায়। নূতন মার্কিনী সিদ্ধান্তে এই সামরিক উপকরণগুলি মেরামত করে পাকিস্তানী সমরায়োজন আরও শক্তিশালী হয়ে পাক-ভারত সম্পর্কের অবনতি ঘটাবে এবং নূতন ভাবে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা সুরু করে দেবে। তাছাড়া ; সাম্প্রতিক মার্কিনী ব্যবস্থায় তৃতীয় কোন দেশ থেকেও—আমেরিকা বাদে—মার্কিনী সূত্রে প্রাপ্ত সমরাস্ত্র ক্রয়ের অধিকার পাকিস্তানের থাকবে। অবশ্য ইতিপূর্বে ইরান থেকে কিম্বা পশ্চিম জার্মানী থেকে মার্কিনী সূত্রে প্রদত্ত সমরাস্ত্র ক্রয় করে পাকিস্তান সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হয়েছে। নূতন ব্যবস্থায় সদর রাস্তা দিয়ে এই ক্রয়ের পথ পাকিস্তানের কাছে উন্মুক্ত হল। চীনের সূত্রে প্রাপ্ত মোমাক বিমান, ট্যাঙ্ক ইত্যাদিতেও ইতিপূর্বেই শক্তিমান হয়ে ১৯৬৫র চাইতেও শক্তিশালী সমরাস্ত্র পাকিস্তান তৈরী করে রেখেছিল।

মার্কিনীদের এই আকস্মিক পাকিস্তানী দাক্ষিণ্য ও ভারত-বিরোধী মনোভাবের কারণ কি ? চীনের প্রভাব থেকে পাকিস্তানকে মুক্ত করবার যে মূলত কারণ মার্কিনীরা দেখাচ্ছেন তা একেবারে অন্তঃসারশূন্য, কারণ আমেরিকার দাক্ষিণ্যের জোয়ারের মধ্যেই পাক-চীন মৈত্রী প্রায় ১৯৬৫ সংঘাতের কালে দৃঢ় হয়েছে। পাকিস্তান একাধারে মার্কিন, রুশ ও চীনের সঙ্গে মৈত্রী রাখবার কৌশল গ্রহণ করে বহুলাংশে কৃতকার্য হয়েছে, তার ভৌগোলিক রাজনৈতিক অবস্থানের জন্য। কিন্তু চীন থেকে ভারতবর্ষের যে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে এবং পাক-চীনের যৌথ সামরিক কৌশলের ফলে সেই বিপদ যে বৃদ্ধি পেয়েছে মার্কিনীদের মধ্যে সে বিশ্বাস নেই বলেই পাকিস্তানের প্রতি তাদের দাক্ষিণ্য। ভারতবর্ষ সোভিয়েট রুশ ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলি থেকেও সমরাস্ত্র সংগ্রহ করেছে. ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে এই প্রচণ্ড অভিযোগের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রতি মার্কিনী প্রতিকূলতা নিহিত থাকাটা অসম্ভব নয়। বৈদেশিক ও খাদ্য সাহায্যের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের উপর অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তারে মার্কিনীদের তৎপরতা ইতিপূর্বে দেখা গেছে। পাকিস্তানের সামরিক শক্তির সঙ্গে সমকক্ষতায় ভারতীয় সামরিক শক্তিকে টেনে নামিয়ে পাকিস্তান ও চীন উভয় সীমান্তে ভারতবর্ষের বিপদ বাড়িয়ে তুলে সামরিক সাহায্যের জন্য ভারতবর্ষকে মার্কিনী মুখাপেক্ষী করে তোলাটাই মার্কিনীদের পাক-ভারত মিলিটারী ব্যালান্স-এর কৌশল কিনা সে সম্বন্ধে সংশয় দেখা দিয়েছে। ভারতের পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ভারতীয় সেনাবাহিনী, চীনাবাহিনী প্রতিরোধে উদ্যত থাকবে সেই সুযোগে বিধ্বস্ত পাকিস্তানী সাঁজোয়া বাহিনী মার্কিনী-ব্যবস্থায় পুনরুজ্জীবিত হয়ে পশ্চিম সীমান্তে ভারতবর্ষকে বিপন্ন করে তুলবে। সাম্প্রতিক মার্কিনী ব্যবস্থায় এই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি রোধ করা ভারতবর্ষের আশু কর্তব্য।

লোকসভায় নেতাজী প্রসঙ্গে

সমর গুহ

মহাশয়, এই প্রথম আমি এই সভায় বলবার সুযোগ পেয়েছি। গণতন্ত্রের এই মন্দিরে সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করবো ভারতীয় বিপ্লবের প্রতীক ও শিবাজী-উত্তর শ্রেষ্ঠতম ক্ষত্রিয় নেতাজী সম্পর্কে সরকার এযাবৎ যে নীতি অনুসরণ করে আসছেন তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও তীব্র ক্ষোভ ধ্বনিত করে। লোকসভার কেন্দ্রীয় হলে একজন নতুন সদস্য হিসাবে প্রবেশকালে, বর্তমান ভারতের মহাত্মাদের বহু ছবি দেখে স্বভাবতঃই আনন্দিত হয়েছিলাম। আমার চোখ সাগ্রহে আরও একজনের প্রতিকৃতি খুঁজছিল—তিনি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু—কিন্তু নিরাশ হলাম। এই সরকার গত বিশবছর ধরে একের পর এক ভারত নির্মাতাদের বহু প্রতিকৃতি রাখার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ছবি রাখা সম্বন্ধে কোনও অভিপ্রায়ই তাঁদের ছিল না। এই সভার প্রায় সকল সদস্যদের স্মরণ থাকা স্বাভাবিক যে গান্ধিজী একাধিকবার বলেছেন নেতাজী ভারতীয় জনগণকে সম্মোহিত করেছেন। জাতির জনকের হৃদয়ে সে উদারতা ছিল। কিন্তু এই কংগ্রেসী শাসক দল নেতাজীর মহত্বে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হন নি। কেন্দ্রীয় সরকারের এটা অনিচ্ছাকৃত অবহেলা কিনা জানিনা। বরং নেতাজী সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত নীতির পটভূমিকায় আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে নেতাজীকে হেয় ও দ্বিতীয় পর্যায়ের নেতৃত্বে ঠেলে দেবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসী সরকারের এটা সুবিবেচিত ও সুচিন্তিত কার্যক্রম। জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসকেও বিকৃত করার সুচিন্তিত প্রচেষ্টার কথা আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। গান্ধিজীর নেতৃত্ব ও অহিংস সংগ্রামের দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি ঘটেছে দেশে ও বিদেশে এই মনোভাব সৃষ্টি করার বহু প্রচেষ্টা আমাদের সরকার করেছেন। সাম্প্রতিক বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হিসাবে গান্ধিজীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা কারো অপেক্ষা কম নয়, এ সত্ত্বেও আমি বলবো যে মাত্র অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে ভারত স্বাধীনতা লাভ করেনি, এর পাশাপাশি স্বাধীনতা আন্দোলনের আরো একটি ধারা আছে; ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে যার শুরু এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায়ে নেতাজীর ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকায় যার সমাপ্তি। বিশ, ত্রিশ ও চল্লিশ-দশকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত গান্ধির আন্দোলনের পাশাপাশি বিপ্লবীদের ও বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের ভূমিকার মূল্যও কম নয়। ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামে গান্ধির আন্দোলনের যেমন মহান অবদান রয়েছে তেমনি ভারতীয় বিপ্লবীদেরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। সুভাষচন্দ্র ভারতের বিপ্লবী ঐতিহ্যের ও উত্তরাধিকারের মহত্তম প্রতীক। গান্ধির ঐতিহ্যানুসারী শান্তিপূর্ণ জাতীয়তাবাদের কথা যদি স্মরণ করি, তবে সমভাবে বিপ্লবীদের অবদান-পুষ্ট নবজাগ্রত ভারতের অন্য একটি ধারার কথা স্মরণ করতে হবে। বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের এই ধারার পূর্ণতম বিকাশ সুভাষচন্দ্র।

আমি জানি না এই সভার সদস্যদের স্মরণ আছে কিনা স্বাধীনতা লাভের পর বর্তমান ভারতের জীবিত ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রখ্যাততম ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের সভাপতিত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে একটি সমিতি গঠিত হয়েছিল। সকলের অলক্ষ্যে সেই কমিটি

ভেঙে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু জানেন কি কোন্ অপরাধে? সত্য-সন্ধানী ঐতিহাসিক এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের যেমন ভূমিকা রয়েছে তেমনি বিপ্লবীদের এবং নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের বিপ্লব আন্দোলনেরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে এই বিশ্বাস পোষণ করায় সেই কমিটির মৃত্যু ঘটেছিল। এবং কর্তৃপক্ষের মতে মতদানকারীদের নিয়ে নতুন একটি কমিটি গঠিত হল যাতে কর্তৃপক্ষের—নির্দেশানুযায়ী ইতিহাস রচিত হতে পারে।

এভাবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে বিকৃত করার সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা চলেছিল। কারণ কতিপয় নেতার ধারণা জন্মেছিল, ভারতীয় বিপ্লবের ইতিহাস যদি স্বাধীনতার ইতিহাসে প্রকৃত স্থান পায় তাহলে অনেক নেতাই দ্বিতীয় স্তরের নেতৃত্বে নির্বাসিত হবেন। সেই কারণেই নেতাজীর প্রতি এত অবজ্ঞা ও অবহেলা। এই কারণেই যদিও সংসদ ভবনের এদিকে সেদিকে অনেক জাতীয় নেতাদের মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু কেন্দ্রীয় হলে অথবা রাজধানীর কোথাও নেতাজীর একটিও প্রতিকৃতি অথবা মূর্তি নেই। এই কারণেই ভারত সরকার নেতাজীর জন্মদিবস পালন করেন না। একই কারণে দেশের কোথাও সরকারী অফিসে গান্ধিজীর ছবির পাশে নেতাজীর ছবি দেখা যায় না। একই কারণেই আকাশবাণী ভারতীয় বিপ্লবীদের ঐতিহ্যের প্রতি উদাসীন।

এই সভার অনেকেই লালকেল্লার "Sound & Lighting" শীর্ষক প্রদর্শনী দেখে থাকবেন। এই প্রদর্শনীতে গান্ধিজী ও পণ্ডিত নেহেরুর কণ্ঠ রেকর্ডে শোনা যায় কিন্তু দুর্ভাগ্য যে এই সভার কোনো দায়িত্বশীল নেতার মনে এ প্রশ্ন কি জাগেনি যে নেতাজীর কণ্ঠের বহু রেকর্ড থাকা সত্ত্বেও ঐ প্রদর্শনীতে তার অন্তর্ভুক্তি করা যেতো কিন্তু তা করা হয় নি।

নেতাজীর প্রতি এই অবহেলা ও অবজ্ঞার জন্যই জার্মানী ও সারা দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ঘুরে নেতাজী ও আই, এন, এ সংক্রান্ত যে সব ফাইল হারিয়ে গিয়েছিল তা উদ্ধারের চেষ্টা ভারত সরকার করেননি। এই ঔদাসীন্যের জন্যই সিঙ্গাপুরে যে ঐতিহাসিক গৃহে আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, নেতাজী ব্যবহৃত সেই বাসগৃহ দুটি দুজন চীনা নাগরিক কিনে নিয়েছে। সিঙ্গাপুর ও মালয়ে সরকারী প্রতিনিধিদের সহিত বক্তার সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছিল তাঁরা এই বাড়ী দুটি ভারত সরকার চাইলে তাকে প্রত্যর্পণ করিতে স্বীকৃত ছিলেন।

ভারতের অন্তর্ভুক্ত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ দুইটি নেতাজী ও আই, এন, এ, দ্বারা বৃটিশ অধিকার-মুক্ত হয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের অগণিত বীর সৈনিক ও শহীদেরা প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, এই দ্বীপ দুটিতে, তাঁদেরই স্মৃতিপূতঃ এই দ্বীপ দুটির নবনামকরণ করেছিলেন নেতাজী —শহীদ ও স্বরাজ দ্বীপ। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের সরকার, আমাদের জাতীয় সংগ্রামের নেতারা, নেতাজী প্রদত্ত এই নাম দুটিকে স্থায়িত্ব দিতে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখান নি।

নেতাজী সম্পর্কিত অপর একটি দিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। নেতাজী বিপ্লবী-শ্রেষ্ঠ, অনন্যসাধারণ সংগ্রামী, মহত্তম দেশপ্রেমিক কিন্তু নেতাজী শিবাজী-উত্তর মহত্তম সমরপ্রতিভা এবং শ্রেষ্ঠতম সমর অধিনায়ক। আমি আপনাদের নিকট ব্রহ্ম অভিযানের জাপানী সৈন্যাধ্যক্ষ কাওয়াবের নেতাজী সম্পর্কে মূল্যায়ন উদ্ধৃত করবো।

নেতাজীর সমর প্রতিভা প্রসঙ্গে তিনি বক্তার নিকট মন্তব্য করেন, "বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীর সংগঠক ও প্রেরণার উৎস হিসাবে, সমর কৌশলের দক্ষতায়, সমরাভিযানের পরিকল্পনায় যে কোনো দেশ চন্দ্র বোস সম্পর্কে গর্ব অনুভব করতে পারে।"

তিনি আরও বলেন; "চন্দ্র বোস মহান বিপ্লবী কিন্তু

তাঁর নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠতম বৈশিষ্ট্য তাঁর সামরিক প্রতিভার অনন্যতায়।"

যুদ্ধকালীন বহু জাপানী সমরনেতার সঙ্গে আলাপের সুযোগ বক্তার হয়েছিল। নেতাজী সম্পর্কে তাঁদের মূল্যায়নে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর অধিনেতা হিসাবে তাঁর নেতৃত্বের অনন্যতা, দুর্দমনীয় দেশপ্রেম, আত্মমর্যাদা ও শৃঙ্খলাবোধ দ্বারা সৈন্যবাহিনীকে উদ্দীপিত করার অসাধারণ ক্ষমতা,' আক্রমণ অথবা পশ্চাদপসরণে সৈন্যবাহিনীর উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব—বিপ্লবাত্মক সমরধ্বনি সমূহের প্রবর্তন, তার বিদ্যুৎস্পৃষ্ট দৈনন্দিন সামরিক ঘোষণাসমূহ এবং জার্মানী ও দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়ার আজাদ হিন্দ ফৌজকে নেতৃত্ব দানে ও আরো নানা বীরত্বের কীর্তিাবলীতে একথাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে এ যুগের শ্রেষ্ঠতম বিপ্লবী হিসাবেই শুধু নয়, সমর নেতা হিসাবেও নেতাজী গভীর শ্রদ্ধার পাত্র।

সর্বাপেক্ষা শোচনীয় যে, যখন জাতীয় প্রতিরক্ষা, জাতীয়তা এবং নবজাগ্রত দেশপ্রেম দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া সর্বাপেক্ষা জরুরী ছিল, তখন আমাদের স্বাধীন জাতীয় সরকারের নেতাদের জাতীয় সমর বাহিনীর সামনে নেতাজীর আদর্শ তুলে ধরবার কথা মনে পড়লোনা।

সমর অধিনায়ক হিসেবে নেতাজীর ভূমিকা মূল্যায়নের কোনও প্রচেষ্টাই এ পর্যন্ত হয়নি। নেতাজীকে কোনও সামরিক সম্মান প্রদর্শন করা হয়নি, সামরিক বাহিনীতে নেতাজীর ভূমিকা প্রতিষ্ঠার কোনো প্রচেষ্টাই হয়নি। নেতাজীর নামে কোনো সামরিক পুরস্কার, কোনো বীরচক্র, সাহসিকতার জন্য কোনো পদকের ব্যবস্থা হয়নি। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী এবং শিবাজী-উত্তর শ্রেষ্ঠ সামরিক নেতার নামে কোনো সামরিক একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কি লজ্জার বিষয় যে এই সরকার জাতীয় সামরিক বাহিনীর মধ্যে এদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধার ভূমিকার পরিচয় দেয়া সম্পর্কে কোনো উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা করেননি। সামরিক দপ্তরে নেতাজীর ফটো রাখা নাকি নিষিদ্ধ। সমস্ত দেশের লজ্জার বিষয় এই সরকার এমন একটি নির্দেশ জারী করতে পারলেন। বক্তা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চান যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে, চরম কম্যুনিষ্ট স্ট্যালিনও সাম্রাজ্যবাদী জেনারেল সোবরত্ কে শ্রেষ্ঠতম সামরিক সম্মান দিতে দ্বিধা করেন নি। কিন্তু নেতাজীকে সামান্যতম জাতীয় সম্মান প্রদর্শন সম্পর্কে এই সরকারের বিন্দুমাত্র অভিপ্রায়, এমনকি বিবেক-দংশন পর্যন্ত হয়নি।

গান্ধীজী ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগ্রামী কর্মসূচী অবলম্বন করার ফলেই নেতাজীকে দেশত্যাগ করে স্বাধীনতার সন্ধানে বিপদসঙ্কুল পথে যাত্রা করতে হয়েছিল একথা একটি ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু ভেবে দেখুন মহত্ত্বের কোন উচ্চ শীর্ষে সেই মহৎ ব্যক্তি উঠেছিলেন! আজ আমরা সকলে, সমগ্র দেশ গান্ধীজীকে জাতির জনকরূপে গ্রহণ করেছি। কিন্তু কেউ কি মনে রেখেছেন, এই সত্য কি মনে রেখেছেন যে সেই বিদ্রোহী কংগ্রেসী, যিনি দু-দুবার জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন, যাঁকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছিল, যাঁর প্রতি চরম অবিচার করা হয়েছিল, তিনি ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর প্রথম অভিযানকালে গান্ধিজীর আশীর্বাণী প্রার্থনা করেছিলেন, তিনিই প্রথম গান্ধিজীকে জাতির জনক বলে অভিহিত করেছিলেন! নেহেরু, প্যাটেল ও আজাদ চক্রই তাঁকে কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করেছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কত উঁচুতে তিনি উঠেছিলেন যা একমাত্র নেতাজীর পক্ষেই সম্ভব ছিল যে, পূর্ব সহকর্মীদের প্রতি কোনো ব্যক্তিগত বিদ্বেষ অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব তাঁর ছিল না, আই, এন, এ, বাহিনীতে নেহেরু, প্যাটেল ও আজাদের নামে তিনি কয়েকটি ব্রিগেড গঠন করেছিলেন। মহত্ত্বের কোন শীর্ষেই

[শেষাংশ ১৬৪ পৃষ্ঠায়]

ভিয়েৎনাম

ডঃ অশোক মজুমদার *

[ফাল্গুনের পর]

হো চি মিনের সহি করিবার আরও একটি কারণ ছিল। সেপ্টেম্বর (১৯৪৬) মাসের প্রথম হইতে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে ফরাসী ও ভিয়েৎনামীদের মধ্যে গরিলা যুদ্ধ আরম্ভ হয়। হো চি মিন তখন ফ্রান্সে ; ১৪ই সেপ্টেম্বর তিনি মনের সহিত 'কার্যকারী ব্যবস্থায়' সহি করেন। কিন্তু দেশে ফিরিয়া হো চি মিন দেখিলেন যে ঐ ব্যবস্থা বলার রাখা সম্ভব নহে। অক্টোবর মাসে ফরাসীরা যে ভাবে হাইফংএর শুল্ক (customs) ও পুলিশ বিভাগে কর্তৃত্ব করিতে আরম্ভ করে, তাহাতে ৬ই মের কার্যকরী ব্যবস্থার সর্ত ভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া হো চি মিন ধারণা করেন। অতঃপর তিনি গিয়াপের অধীনে ভিয়েৎমিন সৈন্যদল গঠন করেন। ৮ই নভেম্বর স্থানীয় এসেম্বলি উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের ঐক্য ঘোষণা করে, এবং দেশের constitution প্রস্তুত করে।

২০শে নভেম্বর ফরাসীসৈন্যদের সহিত ভিয়েৎনামী সৈন্যদের হাইফংএ সংঘর্ষ হয়, কিন্তু দুই পক্ষের বিশেষ চেষ্টায় শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। এই সময়ে থার্জেনতু ফ্রান্সে ছিলেন। খবর পাইয়া তিনি তার ঘোগে স্থানীয় কর্মচারীদের আদেশ দিলেন যেন ভিয়েৎনামীদের বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়। ২৩শে নভেম্বর দুই ঘণ্টার নোটিশে ফরাসী নৌ বাহিনী ও বিমানপোত হইতে হাইফংএ বোমা বর্ষণ হয় ; ফরাসী নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ আডমিরাল ব্যত্তে (Battet) পরে বলিয়াছিলেন যে এই বোমা বর্ষণে ৬০০০ এর বেশী লোক মরে নাই। অন্যান্যদের মতে এই দিন ২০,০০০ ভিয়েৎনামী নিহত হয়।

এখন হো চি মিনকে বাধ্য হইয়া দীর্ঘ কাল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। ২০শে ডিসেম্বর (১৯৪৬) তিনি ফরাসী সোশালিষ্ট নেতা লিও ব্লাঁর (Leon Blum) নিকট শান্তির জন্য শেষ আবেদন পাঠান ; কিন্তু এই আবেদনের কোন উত্তর আসে নাই। হয়ত সাইগনের ফরাসী কর্তৃপক্ষ এই আবেদন যথাস্থানে পাঠান নাই। উত্তর না পাইয়া হো চি-মিন দেশের লোকদের স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগ দিয়া ফরাসীদের দেশ হইতে দূর করিয়া দিবার জন্য আহ্বান জানাইলেন। দেশবাসী যাহাতে ভ্রান্তধারণার বশবর্তী না হয় সে জন্য তিনি ইহাও জানাইলেন যে এ যুদ্ধ দীর্ঘকালব্যাপী হইবে, দশ বছরও চলিতে পারে। যুদ্ধ কিন্তু দশ বছর চলে নাই। আট বৎসর চলে।

* * *

যুদ্ধের আরম্ভের কয়েক মাস ফরাসীরা সর্বত্রই জয়যুক্ত হয়, এবং ভিয়েৎনামীরা গরিলাযুদ্ধ আরম্ভ করে। ফরাসীরা তখন এই স্বাধীনতার যুদ্ধকে কমুনিষ্ট ও কমুনিষ্ট-বিরোধী যুদ্ধ নাম দেয়, এবং দক্ষিণ-ভিয়েৎনামে একটি ভিয়েৎনামী সরকার গঠনের চেষ্টা করে। কিন্তু কোনো ভিয়েৎনামী ফরাসীদের সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হইল না কারণ এখনও ফরাসীরা ভিয়েৎনামের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা, বা দেশের

একীকরণের সম্বন্ধে কোনো অঙ্গীকার করিতে রাজি হইলো না। অপরপক্ষে ভিয়েৎমিন এখন সম্পূর্ণ জাতীয়তাবাদী দল হইয়া দাঁড়াইল, এবং বস্তুবিত্ত শ্রেণীদের সহযোগিতা গ্রহণ করিয়া ফরাসী বিতাড়নকেই একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিল।

এই সময়ে ফ্রান্সে এক নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়, এবং তাহারা হাই-কমিশনার দার্জেনলুকে সরাইয়া এরিল বোলায়েরকে পাঠাইল। ইনি হো চি মিনের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া দূত পাঠান; কিন্তু সর্ত ছিল যে সন্ধির কথা আরম্ভ হইবার পূর্বে হো চি মিনকে বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ (unconditional surrender) করিতে হইবে। হো চি মিন এই প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করেন।

এই সময়ে (২৮শে মে ১৯৪৭) একটি নরমপন্থী কমুনিষ্ট বিরোধী দল সাইগনে একটি জাতীয়তাবাদী দল স্থাপন করে এবং ভূতপূর্ব সম্রাট বাও-দাইকে ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ জানায়। উত্তরে বাও দাই হংকংএ কমুনিষ্ট বিরোধী ভিয়েৎনামীদের একটি সভা আহ্বান করেন।

বাও-দাই হয়ত একটি কমুনিষ্ট বিরোধী দল সৃষ্টি করিতে পারিতেন, কিন্তু ফরাসী হাই কমিশনার ১০ই সেপ্টেম্বর একটি বক্তৃতায় স্পষ্ট-ভাবে জানাইয়া দিলেন ভিয়েৎনামের ভবিষ্যৎ ফ্রান্সের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।২০ কিন্তু এই সময়ে উইলিয়াম বুলিট—আমেরিকার বিশিষ্ট রাজদূত—হংকংএ বাওদাইকে জানান যে আমেরিকা ভিয়েৎনামে কমুনিষ্ট বিরোধী দলকে সমর্থন করিবে। ফলে বাও দাই, ফ্রান্সের সহিত আপোষ মীমাংসার কথা চালাইতে রাজি হইলেন।

ভিয়েৎনামে ইহার প্রতিক্রিয়া শীঘ্রই দেখা গেল। কমুনিষ্ট বিরোধী জাতীয়তাবাদী দলের প্রতিষ্ঠাতা এবং উত্তর-ভিয়েৎনামের শাসনকর্তার পরিচালক আততায়ীর হাতে প্রাণ হারাইলেন। কিন্তু তাঁহার পরামর্শদাতাদের নিষেধ সত্ত্বেও বাও দাই ফরাসীদের সহিত একটি প্রাথমিক চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী দিয়েম (Ngo Dinh Diem) মন্তব্য করিলেন যে ফরাসীরা যে রকম সুবিধা দিবে বলিতেছে তাহা অত্যন্ত তুচ্ছ।

• • •

এইখানে দিয়েম সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। কারণ কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। দিয়েমের পূর্বপুরুষরা ছিলেন মান্দারিন, অর্থাৎ রাজকর্মচারী। ফরাসীরা ইহাদের সাহায্যে নিজেদের অধিকার কায়েম করিয়াছিল। মান্দারিনরা ফরাসীদের অধীনে চাকরি করিলেও, ভিয়েৎনামের সম্রাটকে শ্রদ্ধা করিত, এবং বিশ্বাস করিত যে সুদূর ভবিষ্যতে আবার দেশ স্বাধীন হইবে। দিয়েমও প্রথম জীবনে সরকারী চাকরী করিয়াছেন।

১৯৫০ খৃঃ যখন হো চি মিন ফরাসীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করেন, তখন তাঁহাকে দমন করিবার জন্য ফরাসীরা অত্যন্ত কঠোর পন্থা অবলম্বন করে। দোষী নির্দোষী, কমুনিষ্ট, জাতীয়তাবাদী, নিরপেক্ষ প্রভৃতি সমস্ত চিন্তাশীল দেশভক্তদের নির্বিবাদে নির্বিচারে ফরাসীদের হাতে অকথ্য অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। ফরাসীদের অত্যাচার দেখিয়া দিয়েমের প্রতীতি হয় যে ফরাসীদের সহায়তায় শাসনতন্ত্রের রূপপরিবর্তন অসম্ভব। সুতরাং তিনি পদত্যাগ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। তার পর দীর্ঘকাল অজ্ঞাত

---

২০ এই সময় ফরাসীরা ফরাসী-ইন্দোচায়নার বিভিন্ন প্রদেশগুলিকে লইয়া একটি ফরাসী ইউনিয়ন গঠিত করে। এবং বোলেয়ার বলেন যে ইহাই ভিয়েৎনামের একমাত্র ভবিষ্যৎ। কিন্তু ভিয়েৎনামের নরমপন্থী নেতারাও প্রতিবাদ করিয়া জানান যে এই ফরাসী ইউনিয়ন গঠন করিবার কালে কোনো ভিয়েৎনামী নেতার মত গ্রহণ করা হয় নাই; সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে এই ইউনিয়নে যোগদান করা সম্ভব নহে।

হইলেও, কোনোদিনও ফরাসীদের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে আন্দোলন করেন নাই। তাঁহার চিন্তাধারা লইয়া কিছু জল্পনা হইয়াছে; কেহ মনে করেন যে তিনি নিয়তিবাদী (fatalist) ছিলেন। যাহাই হউক যুদ্ধের সময় তিনি জাপানীদের এবং পরে আমেরিকানদের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং প্রাপ্ত হন।

এই সময়ে (১৯৪৬ খৃঃ) ভিয়েম ফরাসীদের উপর সম্পূর্ণ আস্থা হারাইয়াছিলেন, এবং তিনি বাওদাইকে ফরাসীদের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে নিষেধ করেন; তৎসত্ত্বেও বাও দাই ফরাসীদের সহিত একটি 'প্রাথমিক চুক্তিতে' স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি সম্বন্ধে ভিয়েমের বক্তব্য পূর্বে উক্ত হইয়াছে।

১৯৪৮ এর প্রারম্ভে (ফেব্রুয়ারী ২২) ভিয়েমের আহ্বানে জাতীয়তাবাদী নেতাগণ, ধর্মসংঘের নেতাগণ, এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের প্রতিনিধিগণ সাইগনে মিলিত হইয়া ফ্রান্সের সহিত কি সর্তে সন্ধি করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করেন। এই সভার প্রতিনিধিরূপে ভিয়েম ফরাসী হাই কমিশনার বোলেয়ার-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন যে অন্ততঃ "Dominion Status" না পাইলে কমুনিষ্ট বিরোধী দল কোনো ক্ষেত্রেই সাফল্য অর্জন করিতে পারিবে না। ইতিমধ্যে বাও দাই ফ্রান্সে গিয়া দাবী করিলেন যে ভিয়েৎনামের ঐক্য মানিতে হইবে। অর্থাৎ ৬ই মার্চ ১৯৪৬ এ হো চি মিন যে সর্তে রাজি হইয়াছিলেন, বাও দাই এখন ভিয়েৎনামের জন্য তদপেক্ষা অধিক সায়ত্ত শাসনের ক্ষমতা দাবী করিলেন। অবশেষে বাও দাই হো চি মিনের দাবীকেই মানিয়া লইলেন। এবং এই সর্তে ৫ই জুন ১৯৪৮ বাও দাই এবং বোলেয়ার হালং সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। স্থির হয় যে অতঃপর একটি ভিয়েৎনাম সরকার গঠিত হইবে।

এই সুযোগে ফরাসীদের অনুগত একজন স্বার্থান্বেষী সৈনিক ফরাসীদের সহায়তায় একটি provisional সরকার গঠন করে। ভিয়েৎনামের কোনো নেতা এই সরকারে যোগদান করিলেন না; জনগণও এই সরকারকে সমর্থন করিলনা; ফরাসীরাও এই সরকারের হাতে শাসনভার দূরে থাকুক একটি শাসনবিভাগও দিতে রাজি হইল না। বাও দাই ইতিমধ্যে ফ্রান্সে চলিয়া গিয়াছিলেন, এই সংবাদ পাইয়া তিনি আর ফিরিতে রাজি হইলেন না।

• • •

১৯৪৯ এর আরম্ভেই প্রাচ্য এশিয়ার ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় সুরু হইল। ২০শে জানুয়ারী চীনা কমুনিষ্ট বাহিনী পিকিং দখল করিল। ৮ই মার্চ, বাও দাই ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার দেশে ফিরিবার সর্ত স্থির করিলেন। তবে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম লোকসভা ভিয়েৎনামের সহিত সংযুক্ত হইবার প্রস্তাব গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি যাত্রা স্থগিত রাখিলেন। ২০শে এপ্রিল উক্ত প্রস্তাবগৃহীত হয়। এবং ২৮শে এপ্রিল বাও দাই দেশে ফিরিলেন। এই প্রস্তাব ফলপ্রসূ না হইলেও, ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য: কারণ ইহা হইতে দেখা যায় যে ভিয়েৎনামের কোন রাজনৈতিক দল বা নেতা ভিয়েৎনামের ঐক্য না হইলে দেশের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হইল বলিয়া মনে করিতেন না। এযাবৎকাল ফরাসীরা যে ভাবে ভিয়েৎনামকে তিন ভাগ করিয়া শাসন করিতেছিল—এবং বর্তমানে আমেরিকানরা যে ভাবে ভিয়েৎনামের দুই ভাগকে স্বাধী করিতে চায়—তাহা ভিয়েৎনামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জনমতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

১৩ই জুন ১৯৪৯ বাও দাই রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক মহলে আশানুরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। ভিয়েম প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন: —"the national aspirations of the Vietnamese people will be satisfied only on the day when

our nation obtains the same political status which India and Pakistan enjoy. ২১"

ইংরাজেরা যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া যাহা করিয়াছিল, ফরাসীরা যুদ্ধে হারিয়াও তাহা করিতে রাজি হইল না। উপরন্তু যাও যাইকে নামেমাত্র ক্ষমতা দিয়া তাহারা এখন হো চি মিনকে ধ্বংস করিবার জন্য উৎপন্ন হইল। ফলত প্রায় তিন বছরের বহু চেষ্টার পরেও ভিয়েৎমিন বাহিনী উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বিস্তৃত অংশ অধিকার করিয়া রহিল, কেবল কয়েক শহর গুলিতে ফরাসী আধিপত্য রহিল।

ফরাসীদের এই নীতির জন্য হয়ত আমেরিকার দায়িত্ব আছে। পূর্বোল্লিখিত উইলিয়াম বুলিট দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নির্বাসিত ফরাসী সরকারের নিকট যুক্তরাষ্ট্রের রাজদূত হিসাবে ছিলেন। ১৯৪৭ খৃঃ হইতে তিনি প্রকাশ্যে হো চি মিনের বিরুদ্ধে এবং যাও বাও দাইর স্বপক্ষে নীতি গ্রহণ করিবার জন্য ফরাসী সরকারকে পরামর্শ দিতে আরম্ভ করেন। বুলিট 'লাইফ' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে লেখেন যে হো চি মিন রাশিয়ার তাবেদার; সুতরাং তাঁহার প্রতিশ্রুতির কোনো মূল্য নাই; স্টালিনের আজ্ঞা পাইলেই তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবেন। সুতরাং এইরকম লোকের হাতে শাসনভার পড়িলে কমুনিষ্টরা ইন্দোচীনের কণ্ঠরোধ করিবে (এই প্রবন্ধ ১৯৪১ অক্টোবরে লেখা)। ফরাসীদের উপদেশ দিয়া বুলিট লিখিলেন যে 'mercantile colonialism' এর যুগ শেষ হইয়া গিয়াছে। অতএব ফ্রান্সের প্রকৃত স্বার্থ বজায় রাখিতে হইলে কিছু পরিবর্তন —relatively simple actions—প্রয়োজন। অর্থাৎ ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভের পরেও আমেরিকান কূটনৈতিক মহলের বিশ্বাস ছিল যে এশিয়ার লোকদের ভাওতা দিয়াই শান্ত রাখা যাইবে।

* * *

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৪৯ চীন লাল ফৌজ কিয়েংনাথের সীমান্তে পৌঁছিল। একমাস পরে (১৬ই জানুয়ারী ১৯৫০) চীন সরকার এবং ৩১শে জানুয়ারী রাশিয়া হো চি মিনের প্রতিষ্ঠিত সরকারকে মানিয়া লইলো। ২রা ফেব্রুয়ারী খবর পাওয়া গেল যে ভিয়েৎমিন বাহিনী চীন প্রদত্ত যুদ্ধ সম্ভারে বলীয়ান হইয়া পূর্বোদ্যমে ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। ৭ই ফেব্রুয়ারী ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্র যাও বাও দাই সরকারকে মানিয়া লইলো। ৮ই যে যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করিলেন যে অতঃপর আমেরিকা ইন্দোচীনের যুদ্ধের জন্য ফ্রান্সকে সাহায্য করিবে। এই সাহায্যের পরিমাণ Robert Scheer লিখিয়াছেন "Between 1950 and 1954, the United States sent 2·6 billion dollars worth of military and economic aid to the French in Vietnam (80 per cent of the cost of the war) —800 million dollars during 1950-52 but 1·8 billion in 1953 and 1954 in response to the imminent French collapse. Senator Mansfield's subcommittee on State Department Organization and Public Affairs reported in 1954 that French forces outnumbered those of Viet-Minh by a fraction of 5 to 3 and 'as a result largely of American assistance.....non-Communist forces possessed great superiority—estimated as high as 10·1 in armaments, and the flow of American aid was constant and increasingly heavy.'" ২২

এই উক্তি হইতে বোঝা যায় যে হো চি মিনের স্বপক্ষে

২১ J. Buttinger: The Smaller Dragon (New York, 1958), p. 460.

২২ ১১নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য Robert Scheer, p. 10.

কি বিপুল জাতীয় শক্তির সমর্থন ছিল, এবং এখনও আছে। আমেরিকা দাবী করে যে কমুনিষ্টদের অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য এই শক্তিকে খর্ব করা প্রয়োজন। তাহা হইলে প্রশ্ন করিতে হয় যে ভারত যখন চীন দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল, তখন আমেরিকা আমাদের এত কম সাহায্য করিয়া সরিয়া পড়িল কেন? সর্বপ্রকারে ফরাসীদের সাহায্য করিয়া তাহাদের লুপ্ত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে আমেরিকার বাধে নাই, কিন্তু চীনাদের বিরুদ্ধে যখন ভারতবর্ষ যুদ্ধ করিতে চাহিল তখন, একের পর এক অছিলায় আমেরিকা অস্ত্র দেওয়া বন্ধ করিল, খুব সম্ভবতঃ ইংলণ্ডকেও বন্ধ করিতে বাধ্য করিল। হয়ত আমেরিকানদের আশা আছে যে এক সময়ে চিয়াং কাই শেক পুনরায় চীন অধিকার করিবেন, এবং তখন তিব্বত ও ভারতের চীন অধিকৃত এলাকা আমেরিকার বন্ধু চীনের হাতে যাইবে। ততদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষকে শুধু বাঁচাইয়া রাখিলেই যথেষ্ট।

• • •

১৯৫০ হইতে ১৯৫৩ পর্যন্ত একটানা যুদ্ধ চলিতে থাকে। আমেরিকার বিপুল রণসম্ভার পাইয়াও ফরাসীরা হো চি মিনকে পরাজিত করিতে পারিল না, বরং অনেক স্থলে হটিয়া আসিতে বাধ্য হইল। ক্রমাগত যুদ্ধে হারাতে ফ্রান্সেও প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, এবং এক দল ফরাসী নেতা ভিয়েৎনামের যুদ্ধ অবিলম্বে শেষ করিয়া দেওয়া উচিত বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। সার এডেন ইডেন লিখিয়াছেন:

"During the early months of 1952, the reports which I received from our Ambassador in Paris, Sir Oliver Harvey, showed that the French mood was pessimistic and confused. There was a unanimous desire to finish the war, and senior officers of the French General Staff were already admitting privately that evacuation would be inevitable in the end. The problem was to compel Ho Chi Minh to negotiate terms which would enable the French to make a respectable withdrawal.....the United States Government considered that it would be disastrous to the position of Western Powers if South East Asia were lost without a struggle." [২৩]

ইতিমধ্যে ১৯৫৩, ১৭ই জুন কাম্বোডিয়ার রাজা সেহানুক স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া থাইল্যাণ্ডে আশ্রয় লইলেন। কিংকর্তব্য-বিমূঢ় ফরাসীগণ এক সপ্তাহ পরে তাঁহাকে অনুনয় করিয়া তাঁহার সমস্ত সর্তে রাজি হইয়া দেশে ফিরাইয়া আনিল। এই সময়েই ফরাসীরা লাওসের সহিত নূতন সন্ধি করিয়া লাওসেরও স্বাধীনতা মানিয়া লয়। অনুরূপ সর্ত যাও থাইকে দিলে অন্ততঃ দক্ষিণ ভিয়েৎনামে একটি কমুনিষ্ট বিরোধী রাষ্ট্র স্থাপন করা যাইত। কিন্তু ১৯৫২র শেষভাগে ফরাসীরা এমন লোককে প্রধান মন্ত্রী করিল, এবং এমনভাবে স্বেচ্ছাচারিতা চালাইতে লাগিল যে যাও লাই বিরক্ত হইয়া ফ্রান্সের রিভিয়েরাতে গিয়া বাসনে জীবনযাপন করাই শ্রেয় মনে করিলেন। অতঃপর ফরাসীরা কতকগুলি অপরিচিত ব্যক্তিকে সাক্ষীগোপাল খাড়া করাইয়া দেশশাসন করিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিতে লাগিল।

১৯৫৪ জানুয়ারী মাসে বার্লিন কনফারেন্সে রুশ প্রতিনিধি মলোটফ প্রস্তাব করিলেন যে বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য চীন সমেত পঞ্চশক্তির (ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা, রাশিয়া) বৈঠক হওয়া প্রয়োজন। এই সভায় কমুনিষ্ট চীনের উপস্থিতি আমেরিকার পছন্দ না হইলেও শেষ পর্যন্ত তাহারা ইহা মানিয়া লইতে বাধ্য হয়, এবং স্থির হয় যে

২৩ Memoirs of Sir Anthony Eden: Full Circle p. 83.

২৬ এপ্রিল জেনিভাতে কন্‌ফারেন্স সুরু হইবে, এবং উপরে উল্লিখিত পাঁচটি শক্তিই উহাতে অংশ গ্রহণ করিবে।

জেনিভা কন্‌ফারেন্সের সাফল্যের কৃতিত্ব ইংলণ্ড ও রাশিয়ার। পৃথিবীর ইতিহাসে ইংলণ্ডের ন্যায় বিশাল সাম্রাজ্য কেহই গঠন করিতে পারে নাই, কিন্তু এখন দেখা গেল যে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের আমেরিকা ও ইংলণ্ডের মধ্যে একটা পার্থক্য বিদ্যমান। বোধহয় ইহা নৈতিক জ্ঞানহীন অপরিণত বুদ্ধির সহিত অসীম ক্ষমতা যুক্ত হ'বার ফল।

সার এন্টনি ইডেন লিখিয়াছেন :

"It was essential that the French should hold their ground militarily, in order that their bargaining position at Geneva should not be weakened. But I did not consider it to be in the best interests of France that the scale of fighting should be increased, or that she should be encouraged to expand her straitened resources in trying to force a military decision. The Americans took a different view. On February 8th, our Ambassador was told at the State Department that :the United States Government were perturbed by the fact that the French were aiming not to win the war, but to get into a position from which they could negotiate." ২৫

এই উক্তি হইতে বোঝা যায় যে আমেরিকা কেন এখনও ইন্দোচীনে শান্তি স্থাপন করিতে পারিল না। আমেরিকার উদ্দেশ্য হো চি মিন কে ধ্বংস করা শান্তিস্থাপন করা নহে। সার এন্টনি ইডেন আরও লিখিয়াছেন :

"It was clear to me that any negotiated settlement was bound to produce either a communist share in the Goverment of most of Indo-China, or complete communist control of part of the country, and I thought that the latter alternative was preferable. Although I had every sympathy with the American view that both these solutions were disagreeable, I thought it unrealistice to expect that a victor's terms could be imposed upon an undefeated enemy." ২৬

যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুকে হার মানাইতে না পারিলেও, তাহাকে পরাজয়ের সর্ত মানিতে হইবে, এই আবদারটি আমেরিকা এখনও ত্যাগ করে নাই।

জেনিভা কন্‌ফারেন্সের পূর্বে আরও একটি জিনিষ পরিষ্কার রূপে দেখা গিয়াছিল : আমেরিকার ভারত বিদ্বেষ। নিজেদের স্বার্থের খাতিরেই হউক, বা যে কোনো কারণেই হউক, ইংলণ্ড বুঝিয়াছিল যে চীন কম্যুনিষ্টদের হাতে চলিয়া যাইবার পর পূর্ব-এশিয়ায় ভারতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কোরিয়ার যুদ্ধের ব্যাপারে তৎকালীন ইংরাজ প্রধান মন্ত্রী এটলীকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল :

Do you think Truman appreciated how essential it was not to antagonise the whole Asian World ?"

Attlee : "I think so. I was very insistent that whatever we did must not be just an American-British action that we must have others in and particularly Asians. And we did.

২৫ ঐ, 90.

২৬ ঐ, p. 91.

We got Indian support; India didn't send troops but she sent Red Cross. The Americans found it hard to realise that in the eyes of Asia they had became a spearhead of imperialism. They'd always thought themselves so pure and clean. They didn't realise that to a lot of people they were now Number One Exploiter—even more imperialist than Britain—and how important it was that they shouldn't allow this feeling to be given further support by their action." ২৬

ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রের এই নীতিটি চার্চিল ও ইডেন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইটি ইডেন যে নতা কন্‌ফারেন্সের ঠিক পূর্বে আমেরিকার পররাষ্ট্র সচিব ডালেসের বক্তৃতা ও ব্যবহার সম্পর্কে বলতা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন :

"Doubts as to the wisdom of the current trend in American policy were increased by the effects it was producing on Indian opinion. In measuring our chances of success at Geneva I felt strongly that the outcome would depend to a considerable extent upon the position taken up by India and other Eastern nations with an interest in a settlement. I knew that China would be reluctant at this stage at any rate, to align India against her, and would make considerable efforts to conciliate Asian opinion in general. India had an abiding interest in the outcome of the conference and could play a considerable part at Geneva behind the scenes. Nobody could tell what the future would hold, but it was essential not to alienate India by our actions in a part of the world which concerned her closely. For those reasons, I was disturbed to hear from our High Commissioner in Delhi that Mr. Dulles' recent speeches had created the worst possible impression there.

.....I emphasized (to Mr. Dulles) that on no account should India and the other Asian Commonwealth countries be deliberately excluded.' ২৭

এই সময়েই ইডেন ও ডালেস দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে একটি স্থায়ী সংস্থার বিষয় আলোচনা করেন। ইহাই পরে S. E. A. T. O. নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রসঙ্গে পরে এইটি ইডেন লিখিয়াছেন :

"It was also becoming obvious that difficulties lay ahead on the subject of the membership of the proposed security system in South-East Asia. I repeatedly emphasized that although India and

---

২৬ Francis Williams : A Prime Minister Remembers, p 230

কমুনিষ্ট চীনকে স্বীকৃতি না দেওয়া সম্বন্ধে লর্ড এইলি বলিয়াছেন :

"Extraordinarily stupid, though, the refusal to recognise Communist China. p. ঐ p. 237. কোরিয়া যুদ্ধের সম্বন্ধেও লর্ড এইলির মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য : It was Mac Arthur who had insisted on going beyond (the 38 parallel) and even apart from this initial folly I thought he had made and awfulness of the strategy in his attack and underestimated what he had to meet." ঐ p. 237.

২৭ Anthony Eden : p. 94, 96.

other Asian countries might well choose to remain outside such an arrangement, they should never the less be given every opportunity to participate and should be kept fully informed. If they could not be with us, we must not put them against us. Mr. Dulles, on the otherhand, hoped that any indication that India might be invited to join would be avoided. He explained that if there was any question of extending the security arrangements westwards to include India, there would be a 'strong demand' in the United States to extend it east wards as well, to include Nationalist China and Japin. .....I did not like this balancing of India against Formosa··· ২৮

পরের ঘটনার বিবৃতি প্রসঙ্গে সার এন্টনি ইডেন আবার লিখিয়াছেন: "the State Deparment had also repeated its warning that any attempt to include India would be countered by the inclusion of Formosa." ২৯

এই প্রসঙ্গে চিয়াংকাইশেকের "জাতীয়তাবাদী চীন" সম্পর্কে লর্ড এঁলির নিম্নলিখিত মন্তব্য উল্লেখযোগ্য: "...the Americans had elevated China to a great place in the United Nations as a sort of American second eleven···" ৩০

পরে কমুনিষ্ট কর্তৃক চীন হইতে বহিষ্কৃত হইয়া ফরমোজায় আশ্রয় গ্রহণ করিলে "জাতীয়তাবাদী চীন" সম্পূর্ণ রূপে আমেরিকার ক্রীতদাস হইয়া পড়ে।

এইভাবে ভারতকে পরোক্ষে অপমান করিয়াই আমেরিকা ক্ষান্ত হইল না। এশিয়ার যে কোনো প্রগতিশীল প্রভাব বিস্তার করিবে ইহা আমেরিকার অসহ্য। যুদ্ধে জাপানকে হারাইয়া এবং চীনকে তাবেদারে পর্যবসিত করিয়া আমেরিকা স্থির করিয়াছিল যে এই এলাকায় অক্ষুণ্ণ প্রতিপত্তি স্থাপন করিতে পারিবে। কিন্তু চীনে কমুনিষ্টরা আসিয়া গেল: তাহাকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য প্রকাশ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে লাগিল ফরমোজার 'জাতীয়তাবাদী চীন" এবং ভিয়েৎনামে ফরাসীদের সাহায্য করিয়া। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতবর্ষ যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে তাহাকে দমন করা যায় কি করিয়া?

ইহারই উত্তর আমেরিকার পাকিস্তানকে অস্ত্রদান। ১৯৫২ বা ১৯৫৩ খ্রীঃ আমেরিকা পাকিস্তানকে অস্ত্রসাহায্য করিবে এই গুজব পাশ্চাত্যের খবরের কাগজে বাহির হয়; ১৯৫৩র শেষভাগে ঐ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে না; ১৯৫৪র ফেব্রুয়ারী মাসে আমেরিকা খোলাখুলি পাকিস্তানের পক্ষে অবতীর্ণ হইল। ৩১ বর্তমান প্রবন্ধে এই বিষয়ে আর অধিক আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই।

২৬ এপ্রিল, ১৯৫৪ জেনিভা সম্মেলন আরম্ভ হয়; কিন্তু ইতিমধ্যে একটি ঘটনায় সমস্ত পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটে; তাহা দিয়েন বিয়েন ফুর যুদ্ধ। ফরাসীদের আশা ছিল যে পরিখা যুদ্ধে হারিলেও সম্মুখ সমরে তাহারা ভিয়েৎমিন বাহিনীকে হারাইতে পারিবে। ১৩ই মার্চ ১৯৫৪ সেই

---

২৮ ঐ, p. 97.

২৯ ঐ, p. 98.

৩০ Francis Williams: Remembers, p. 238.

৩১ পাকিস্তান ও তুরস্ক ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৪ একটি 'pact'এ স্বাক্ষর করে। তিনদিন পরে (২৭শে ফেব্রুয়ারী) পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আমেরিকার সাহায্যপ্রাপ্তির কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন।

সুযোগ আসিল। দিয়েন বিয়েন ফুর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধের প্রথম হইতেই বোঝা গেল যে ফরাসীদের জয়ের আশা সুদূর পরাহত। ২৮শে এপ্রিল ফরাসীরা ঘোষণা করিল যে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন। এই যে তারিখে দিয়েন বিয়েন ফুর পতন হয় এবং ইন্দোচীনের ফরাসী সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার আশা চিরতরে নষ্ট হইয়া যায়।

দিয়েন বিয়েন ফুর যুদ্ধের সময় ফ্রান্স আমেরিকার কাছে আরও সাহায্য প্রার্থনা করে—বিশেষতঃ বিমান বাহিনী। আমেরিকা এই সাহায্য দিতে এই সর্তে রাজি ছিল যে কম্যুনিষ্ট বিরোধী অন্যান্য জাতি, বিশেষতঃ ইংলণ্ড, আমেরিকার সহিত মিলিত হইয়া ভিয়েৎমিন বাহিনীকে আক্রমণ করিবে। এই প্রস্তাবে ইংলণ্ড রাজি হইল না। সার এন্টনি ইডেন লিখিয়াছেন।[৩২]

Sir Winston summed up the position by saying that what we were being asked to do was to assist in misleading Congress into approving a military operation, which would in itself be ineffective, and might well bring the world to the verge of a major war. ৩২

জেনিভা সম্মেলনের বিস্তৃত বিবরণ এন্টনি ইডেন দিয়াছেন; এখানে তাহার পুনরাবৃত্তি সম্ভব নহে। সংক্ষেপে বলা যায় যে আমেরিকা, বিশেষতঃ আমেরিকার পররাষ্ট্র সচিব ডালেস, এই সম্মিলনকে বানচাল করিয়া দিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু ইংলণ্ড ও রাশিয়ার বিরোধিতায় সে প্রয়াস নিষ্ফল হয়। রাশিয়ার পররাষ্ট্র সচিব মলোটভ সম্বন্ধে সার এন্টনি ইডেন লিখিয়াছেন :[৩৩]

Nothing occured to make me modify my original impression that Molotov was genuinely anxious to reach a settlement." ৩৩

ভারতবর্ষের নিকট হইতে তিনি কি সাহায্য পাইয়াছেন তাহাও সার এন্টনি অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করিয়াছেন।

জেনিভা সম্মেলন ভিয়েৎনামে শান্তি স্থাপনের পথা আবিষ্কার করে। প্রথমতঃ যুদ্ধ বন্ধ হয় দ্বিতীয়তঃ উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের এলাকা নির্দিষ্ট হয় (সপ্তদশ অক্ষরেখা); তৃতীয়তঃ এই বলা হয় যে সাময়িক ভাবে মানিয়া লওয়া হয়, এবং ভবিষ্যতে দুইভাগকে একত্র করার জন্য ব্যবস্থা করা হয়। ভারত, পোলাণ্ড ও কানাডাকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়; জেনেভা সম্মেলনের চুক্তির সর্ত পালিত হইতেছে কি না তাহা পর্যবেক্ষণ করা, এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে একীকরণের জন্য জনগণের মতগ্রহণ করা এই কমিটির কার্য্য নির্দিষ্ট হয়।

নিম্নলিখিত সর্তগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

(6).....the demarcation line (17th parallel) is provisional and should not in any way be interpreted as constituting a political or territorial boundary...

(7) The Conference declares that, so far as Vietnam is concerned, the settlement of the political problems, effected on the basis respect for the principles of independence, unity and territorial integrity, shall permit the Vietnamese people to enjoy fundamental freedom, guaranteed by democreatic institutions established as a result of free general elections by secret ballot. In order to ensure that sufficient progress in the restoration of peace

৩২ সার এন্টনি ইডেন p. 105.

৩৩ ঐ p. 121.

has been made and that all necessary conditions obtain for free expression of national will, general elections shall be held in July 1956, under the supervision of an international commission composed of the Member States of the International, Supervisory Commission (India, Canada Poland) .....

(14) Pending the general elections which will bring about the unification of Vietnam, the conduct of civil administration in each regrouping Zone shall be on the hands of the party whose fences are to be regrouped there in virtue of the present agreement.

জেনিভা চুক্তির সর্তগুলি যথাযথভাবে পালিত হইলে ভিয়েৎনামে শান্তিস্থাপিত হইতে পারিত, এবং ১৯৫৬ সালেই, অর্থাৎ এগারো বৎসর পূর্বে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম একত্রিত হইয়া যাইত। তাহা হয় নাই। কাহার দোষে হয় নাই, তাহা বিচার করিতে হইলে, উত্তর ভিয়েৎনাম, অর্থাৎ হো চি মিনের এবং আমেরিকার উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালীর আলোচনা করা আবশ্যক।

হো চি মিনের প্রথম হইতেই উদ্দেশ্য ছিল দেশকে স্বাধীন করা, এবং সংযুক্ত ভিয়েৎনাম সৃষ্টি করা। ফরাসীরা সাম্রাজ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে দেশকে বহুভাগে খণ্ডিত করিয়া শাসন করিত; শুধু হো চি মিন নহেন, তাঁহার বিরুদ্ধবাদী দল এমন কি নিরেরও এই ফরাসী নীতির নিন্দা করিয়াছেন, এবং ভিয়েৎনাম যে একদেশ এবং একরাষ্ট্র হওয়া উচিত তাহা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং হো চি মিন যদি এখনও তাঁহার সঙ্কল্প হইতে চ্যুত না হন, তাহা হইলে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না।

তবে তিনি সাময়িকভাবে দেশ বিভাগ মানিয়া লইলেন কেন? তাহার কারণ মনে হয় যে তিনি প্রথম হইতেই শান্তির পক্ষপাতি ছিলেন। গরীবদেশের নেতা কখনও যুদ্ধ না হইলে যুদ্ধ করিতে চায় না। জনৈক ফরাসী ঐতিহাসিক[৩৪] বলিয়াছেন যে হো চি মিন ভবিষ্যতে এক সময়ে পূর্ণ স্বাধীনতা পাইবেন, ফরাসীদের এই অঙ্গীকারে আত্মবিশ্বাস করিয়া তৎকালে অসম্পূর্ণ স্বাধীনতা লইয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এবং ফরাসীদের সহিত সংঘর্ষ এড়াইবার জন্যই তিনি, ১৯৪৬ ১৪ই সেপ্টেম্বরের সর্তে সন্ধি করিতে রাজি হন।

হো চি মিনের জেনিভা চুক্তি গ্রহণ করা সম্পর্কেও ঠিক সেই কথা বলা হইয়াছে। ডিয়েন বিয়েন ফুর বিজয়ের পর, হো চি মিন পূর্ণোদ্যমে ফরাসীদের আক্রমণ করিতে সর্বতোভাবে প্রস্তুত ছিলেন। সেই সময়ে যে তিনি সন্ধির প্রস্তাবে রাজি হইলেন, ইহাতে অনেকেই আশ্চর্য হইয়াছেন। কারণ তিনি সপ্তদশ অক্ষরেখার দক্ষিণে অনেকাংশ জয় করিয়া লইয়াছিলেন, এবং সে সকল এলাকা দাবী করিলে তাঁহার পক্ষে অন্যায় হইত না। অনেকে মনে করেন যে রাশিয়া এবং চীনের পরামর্শ অনুযায়ী হো চি মিন জেনিভার সর্তে রাজি হন। ইহা সত্য হইলেও ইহাতে লজ্জার কোন কারণ নাই। শান্তি রক্ষার্থে বন্ধুশক্তির পরামর্শ গ্রহণে অগৌরব হয় না; ভারত তাসখন্দে তাহাই করিয়াছে এবং আমেরিকা যদি এই সত্য পন্থা অবলম্বন করিত তাহা হইলে বিশ্বশান্তি আশা করা যাইত। হো চি মিনের শান্তিপ্রিয়তার

---

৩৪ Jean Sainteny : Histoire d'une Paise Manquee (History of a lost peace) (Paris, 1953) p. 167 q. by B. R. Chatterjee : South East Asia in Transition, p. 238.

আর একটি কারণও থাকিতে পারে। ভিয়েৎনামে আমেরিকার সাহায্যপ্রাপ্ত ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইলে চীনের সাহায্য অত্যাবশ্যক। হো চি মিন হয়ত চীনের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করা সমীচিন মনে করেন নাই। কারণ চীন ভিয়েৎনামের পূর্ব বৈরী। ভারত যেমন বারংবার যবন এশিয়ার জাতি সমূহ, যথা শক, হূণ, তুরস্ক, মোগল প্রভৃতির আক্রমণে জর্জরিত হওয়ায়, এখনও অনেকের মনে মুসলমান বিদ্বেষ রহিয়া গিয়াছে, সেইরূপ ভিয়েৎনামেও চীনা বিদ্বেষ আছে। এখন আমেরিকার তাড়নায় উত্তর ভিয়েৎনাম হো চি মিনের নেতৃত্বে চীনকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে, কিন্তু এ বন্ধুত্ব যে সাময়িক এবং নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদে তাহা বেশ ভাল করিয়াই বোঝা যায়। কম্যুনিষ্ট হইলেই অন্য কম্যুনিষ্ট দেশের সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

হো চি মিন সম্পর্কে অভিযোগ করা হইয়াছে, যে তিনি জেনিভা সর্ত সম্পূর্ণ পালন করেন নাই; সপ্তদশ অক্ষরেখার দক্ষিণে ২০০০ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সৈন্য গোপনে রাখিয়া দেন। ইহারাই পরে ভিয়েৎকঙ্গ বাহিনী হইয়া দক্ষিণ ভিয়েৎনামে শান্তি-ভঙ্গ করে, ফলে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই অভিযোগ কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না; তবে মিথ্যা নাও হইতে পারে। পাশ্চাত্যশক্তিগণ এশিয়াবাসীদের এত বেকুব করিয়াছে, যে এশিয়াবাসীদের পক্ষে তাহাদের বিশ্বাস করা কঠিন। সুতরাং হো চি মিন নিজের স্বার্থ অব্যাহত রাখিবার জন্য সপ্তদশ অক্ষরেখার দক্ষিণে কিছু সৈন্য রাখিয়া দিলে, তাঁহাকে আর যাই দোষ দেওয়া হউক, মূর্খতার দোষ দেওয়া যায় না। উপরন্তু আমেরিকার পরবর্তি ব্যবহার আলোচনা করিলে, হো চি মিনের উক্ত সতর্কতা দূরদর্শিতা বলিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন। মনে রাখিতে হইবে যে আমেরিকা জেনিভা চুক্তিতে স্বাক্ষর করে নাই। সুতরাং সতর্কতা অবলম্বন করা হো চি মিনের পক্ষে স্বাভাবিক।

যাহাই হউক ভিয়েৎকঙ্গ যে কেবল হো চি মিনের উত্তর ভিয়েৎনামের সৈন্য, এরূপ অদ্ভুত কথা এখন আর কেহই বিশ্বাস করেন না। উত্তর ভিয়েৎনামের সাহায্য থাকিলেও, ভিয়েৎকঙ্গ যে অধিকাংশই দক্ষিণ ভিয়েৎনামবাসী তাহাতে এখন আর কাহারও সন্দেহ নাই। তবে হো চি মিন তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সাহায্য করেন। যদি আমেরিকা ফরাসীদের পুনরায় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য অস্ত্র দিতে পারে, তবে হো চি মিন কেন নিজ দেশবাসীকে স্বাধীনতার যুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য সর্বপ্রকারে সাহায্য করিতে পারিবেন না?

* * *

পূর্বে বলা হইয়াছে যে আমেরিকা জেনিভা চুক্তিতে সহি করে নাই। বস্তুতঃ পররাষ্ট্র সচিব, ডালেস, সম্মেলন ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান এবং পরে ইংলণ্ডের অনুরোধে সহকারী পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলনে যোগ দেন।

এই সময়কার আমেরিকান নেতাদের বক্তৃতা পড়িলে বোঝা যায় যে তাঁহারা চাহিয়াছিলেন, প্রথমতঃ ভিয়েৎনামে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের অবসান; যখন তাহা সম্ভব হইল না, তখন অন্ততঃ দক্ষিণ ভিয়েৎনাম কম্যুনিষ্টদের হাতে না যায় তাহার জন্য চেষ্টা; ফরাসীদের দ্বারা এই উদ্দেশ্য সফল হইবে না; সুতরাং ভিয়েৎনাম হইতে ফরাসী প্রভাব দূর করিয়া, আমেরিকার অনুগত ভিয়েৎনামীদের হাতে শাসনভার দিতে হইবে।

শেষোক্ত উদ্দেশ্যটি ডিয়েম দ্বারা সাধিত হয়। ডিয়েমের কথা পূর্বে কিছু বলা হইয়াছে। ১৯৫০-খৃঃ ডিয়েম আমেরিকায় যান। সেখানে ওয়েসলি ফিসেল (Wesley Fishel) নামে মস্ এক্সেলসের ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছোকরা সহকারী প্রফেসরের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এই সময়ে ফিসেল মিচিগান সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পান, এবং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুকূল্যে ডিয়েমকে আমেরিকায়

লইয়া আসেন। পরবর্তি তিন বৎসরের বেশীর ভাগ সময় দিয়েম আমেরিকায় ছিলেন; এই সময়ে তাঁহার ভ্রাতা বিশপ কান (Can) তাঁহাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেন। কানের সহিত আমেরিকার রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠতা ছিল, এবং সেই সূত্রে দিয়েম কিছুকাল নিউজার্সি এবং নিউ-ইয়র্কের মেরিনল (Mariknoll) সেমিনারিতে বাস করেন। এইখানে তাঁহার সহিত কার্ডিনাল স্পেলম্যান (Cardinal Spellman) ও অন্যান্য রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। আমেরিকার দিয়েমের কম্যুনিষ্ট বিরোধী নেতা হইবার মূলে কার্ডিনাল স্পেলম্যানের সহায়তা। পরে দিয়েমের সহিত আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের জজ উইলিয়াম ডগলাসের (William Douglas) পরিচয় হয়।

ডগলাস ভিয়েৎনাম সফর করিয়া এই ধারণার বশবর্তী হন যে ফরাসীরা ভিয়েৎনামে কম্যুনিষ্টদের অগ্রগতি রোধ করিতে পারিবে না। এই অগ্রগতি রোধ করিতে হইলে একটি তৃতীয়শক্তি প্রয়োজন। দিয়েমকে পাইয়া তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল যে দিয়েম এই তৃতীয় শক্তির সমস্যা সমাধান করিতে পারিবেন। তিনি দিয়েমের সহিত সিনেটর মাইক মানসফিল্ড (Mike Mansfield) ও জন কেনেডির (John F. Kennedy, পরে প্রেসিডেন্ট) সহিত আলাপ করাইয়া দেন। এই সময়ে কেনেডি ভিয়েৎনামে যুক্তরাষ্ট্রের ফরাসী সাহায্যনীতিকে কঠোর সমালোচনা করিতেছিলেন। ভিয়েৎনামে ফরাসীদের পরিবর্তে ঐ একটি জাতীয়তাবাদী দল কম্যুনিষ্ট পরাজয়ের জন্য অত্যাবশ্যক তা তিনিও মানিয়া লইয়াছিলেন। জেনিভা চুক্তির প্রাক্কালে কেনেডি এই মর্মে একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতাও দেন। সেই সম্বন্ধে আমেরিকান ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন:

"It was a strong attack on French colonialism, as Kennedy was also to make in the case of Algeria, but it made no gesture toward self-determination for the Vietnamese. The future President's concern was 'for the security of the free world, and for the values and institutions which are held dear in France and throughout the non-Communist world, as well as in the United States.'" ৩৫

ইহা হইতে দেখা যাইবে যে কেনেডি যে নীতি অনুমোদন করিলেন, এবং প্রেসিডেন্ট হইয়া যে নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার মূলে ভিয়েৎনাম প্রীতি ছিল না; ছিল যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য আকুল আগ্রহ। (আমেরিকানরা 'free world' বলিতে যুক্তরাষ্ট্র বোঝায়।)

জেনিভাচুক্তির পর একটি সাংবাদিক বৈঠকে পররাষ্ট্র সচিব ডালেসও ঐ নীতির সমর্থন করিয়া বলেন:

"resistance to Communism needs popular support,"

অতঃপর ডালেসের এই উক্তিকেই আমেরিকানরা বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিল, এবং ক্রমে ফরাসীদের সরাইয়া দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সমস্ত ক্ষমতা দিয়েমের হাতে দিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিল।

• • •

জেনিভা সম্মেলনের সময় দিয়েম ফ্রান্সে ছিলেন, এবং সেখানে থাকিতেই তিনি ফরাসী অধিকৃত ভিয়েৎনামের—পরে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম—প্রধান মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন। এই সময় বাও দাই ছিলেন "রাষ্ট্রপতি"। ১৫ই জুন ১৯৫৩ তারিখে দিয়েম সাইগনে পৌঁছিয়া কর্মভার গ্রহণ করেন। (২১শে জুলাই জেনিভা চুক্তিতে সই করা হয়।

দিয়েমের সহিত প্রথম হইতেই ফরাসীদের মতানৈক্য দেখা দেয়। ফরাসীদের তাবেদার সেনাধ্যক্ষ Nguye Van Hinhকে দিয়েম পদচ্যুত করিলে, তাঁহার সহিত ফরাসীদের

৩৫ Scheer, pp, 15-16.

সংঘর্ষ আরও প্রবল হয়, এবং ফরাসীরা দিয়েমকে সরাইয়া তাহাদের অনুগত একজনকে প্রধানমন্ত্রী করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। কিন্তু এই সময় বাও দাই যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য পাইবার আশায় দিয়েমকে সমর্থন করেন, এবং প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ারের দূত জেনারেল কলিন্স সাইগণে আসিয়া দিয়েমকে প্রকাশ্য ভাবে সাহায্য করাতে, তাঁহার শক্তিবৃদ্ধি হয়। ঐ বছর (১৯৫৪) ডিসেম্বর মাসে ভিয়েৎমিন ফরাসীদের অর্থনৈতিক সুবিধাগুলির সমাপ্তি হয়।

১৯৫৫ জানুয়ারী মাসে যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েৎনামকে ফরাসীদের মাধ্যমে সাহায্য না দিয়া সোজাসুজি সাহায্য দিতে আরম্ভ করে। ফেব্রুয়ারী মাসে আমেরিকান সৈন্য মিশন ফরাসীদের হাত হইতে ভিয়েৎনাম সৈন্য বাহিনীর শিক্ষাভার গ্রহণ করে। ইহার পরেই দিয়েম ও বাও দাইর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। তাহার কারণ ও ঘটনাবলী সুস্পষ্ট নহে। তবে মোটামুটি বলা যায় যে বাও দাই ছিলেন ফরাসীদের পক্ষপাতী, এবং দিয়েম, আমেরিকানদের। বাও দাই ফরাসীদের নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য পান নাই, কিন্তু এই এই সময়ে দিয়েম আমেরিকার সাহায্য পাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং বাও দাইর বিরুদ্ধে দিয়েমের সাফল্যে আমেরিকানদের ধারণা হইয়াছে যে দিয়েমের দ্বারা তাহাদের কার্যোদ্ধার হইবে।

১৯৫৫ মে মাসে (৯-১১) ফরাসী প্রধানমন্ত্রী ফোরার (Faure) সহিত পররাষ্ট্র সচিব ডালেসের আলোচনার ফলে ফরাসীরা তাহাদের সৈন্য সমুদ্রবর্তী এলাকায় সরাইয়া নিতে রাজি হয়, এবং আমেরিকার হাতে দিয়েমকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করিতে রাজি হয়। ৬ই জুন তারিখে ভিয়েৎমিন বা উত্তর ভিয়েৎনাম সরকার জেনিভা চুক্তি অনুসারে ১৯৫৬ খৃঃ ভিয়েৎনামকে সংযুক্ত করিবার নির্বাচন প্রসঙ্গে কথাবার্তা চালাইবার প্রস্তাব করেন। ১৬ই জুলাই দিয়েম উত্তর দিলেন যে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম জেনিভা চুক্তিতে সই করে নাই; যাহাহউক নির্বাচন সর্বপ্রকারে বাধাহীন হইবে এই ভরসা না পাইলে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবে না। ভারত, কানাডা, এবং পোলাণ্ডের নির্বাচন পরিদর্শন করিবার কথা জেনিভা চুক্তিতে স্পষ্টভাবে স্থির হয়, সুতরাং মনে হয়, আমেরিকার ইঙ্গিতে দিয়েম এই কমিশনকে উপেক্ষা করিলেন। ইহার ফল তিনি পরে ভোগ করিয়াছিলেন। দুইদিন পরে (১৮ই জুলাই) রাশিয়া উত্তর ভিয়েৎনামকে সাহায্য পরিকল্পে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হইল। যদি দিয়েম জেনিভা চুক্তি প্রকারান্তরে অস্বীকার না করিতেন, তাহা হইলে রাশিয়া উত্তর ভিয়েৎনামকে সাহায্যদানে অগ্রসর হইয়া আসিত কি না কে বলিতে পারে?

২০শে অক্টোবর জনগণের ভোটে দিয়েম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইলেন। তিনি পাইলেন ৬,৭২১,৭৩৫ ভোট আর বাও দাই পান ৬৩,০১৭ ভোট। তিন দিন পরে দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে সাধারণতন্ত্র (Republic) বলিয়া ঘোষণা করা হইল। এখন হইতে দিয়েম দক্ষিণ ভিয়েৎনামের একনায়কত্ব প্রাপ্ত হইলেন; অন্ততঃ তাহাই তাঁহার বন্ধু আমেরিকানদের ধারণা হইল।

* * *

সমসাময়িক আমেরিকানদের ভিয়েৎনাম সম্বন্ধে কি ধারণা ছিল সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আবশ্যক। লিও চার্ণ (Leo Cherne) নামে একজন আমেরিকান, রিসার্চ ইনস্টিটুট এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, এই ইনস্টিটুট ৫০,০০০ ব্যবসায়ী গ্রাহকদের বিশ্বের রাজনৈতিক সংবাদ সরবরাহ করিতেন। ১৯৫৪ সেপ্টেম্বর মাসে চার্ণ ভিয়েৎনামে আড়াই সপ্তাহ ছিলেন, এবং সেখান হইতে তাঁহার গ্রাহকদের নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম পাঠান:

"...have been talking intimately with American officials here, including Ambassador

Heath. Conferred at length yesterday with Vietnam Premier Ngo Dinh Diem……success of effort to hold Vietnam from Communism depends on whether all non Communist Vietnamese can unite for struggle. U. S. Embassy, strongly supporting Diem, views him as key to the whole situation. Political and financial instability……unless Vietnamese Government can organise important forces and U. S. continues pouring in substantial help and money—If free elections held today all agree privately communists would win··situation not hopeless···future depends on organizing all resources to resettle refugees, sustain new bankrupt government, give people something to fight for and unite them to resist Communism.···West can't afford to lose from now on.'' ৩৬

এই সময়ে ভিয়েৎনামে C. I. A. (Central Intelligence Agency) (যুক্তরাষ্ট্রের গুপ্তচর বিভাগ) এর প্রতিনিধি ছিলেন এডওয়ার্ড ল্যান্সডেল। তিনিও কোনো অজানা কারণে ডিয়েমের পৃষ্ঠপোষক হইয়া ওঠেন, এবং C. I. A. র কর্তা অ্যালেন ডালেসকেও (Allen Dulles) ডিয়েমের সমর্থক করিতে সক্ষম হন। অ্যালেন ডালেস ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব জন ফস্টার ডালেসের ছোট ভাই তিনি বড় ভাইকে ডিয়েমের পক্ষে আনিতে সমর্থ হন, এবং পররাষ্ট্র সচিব ডালেস প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারকে ডিয়েমের সপক্ষে নীতি গ্রহণ করাইতে সমর্থ হন।

ডিয়েমের সৌভাগ্যক্রমে আমেরিকায় এই সময় তাঁহার আর একটি সক্রিয় সমর্থক পাইয়াছিলেন; তিনি জোসেফ বুটিনজার৩৭, ইতি পূর্বে আট্টিয়ার সোশ্যালিষ্ট ছিলেন; এখন যুক্তরাষ্ট্রের লিণ্ড চার্চের সহকারী হিসাবে কাজ করিতেছিলেন। বুটিনজার 'টাইমস' ইত্যাদি কয়েকটি সংবাদপত্রকে ডিয়েমের পক্ষে প্রবন্ধ লিখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া কার্ডিন্যাল স্পেলম্যান ও রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের সমর্থন ত ছিলই। সিনেটর কেনেডি (পরে প্রেসিডেন্ট) রোমান ক্যাথলিক ছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে রোমানক্যাথলিকরা বিশেষ প্রভাবান্বিত করিয়াছিল ইহাতে সন্দেহ নাই। তদুপরি ডিয়েম ভিয়েৎনামে কয়েকটি সক্রিয় রাজনৈতিক বৌদ্ধ দলকে কঠোরভাবে দমন করেন; ইহাতে খৃষ্টান ধর্মযাজকদের, বিশেষতঃ রোমানক্যাথলিকদের নিকট তাঁহার সম্মান ও প্রতিপত্তি অনেক বাড়িয়া যায়। ধর্মান্ধতায় খৃষ্টান পাদ্রিরা অনেক সময়ে সোশ্যালিষ্টদেরও হার মানাইয়া দেয়। এইখানে বলা উচিত যে ভিয়েৎনামে তৎকালীন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি জেনারেল কলিন্স্ ডিয়েমের বৌদ্ধদলন নীতির প্রতিবাদ করেন। কিন্তু আমেরিকার ডিয়েম তখন শ্রেষ্ঠ নেতাদের নিকট হইতে এমন সমর্থন পাইয়াছিলেন, যে কলিন্স্ কিছুই করিতে পারিলেন না।

সিমান লিখিয়াছেন:

From the Spring of 1955 on the U. S. commitment to Diem was complete. This

৩৬ ঐ পৃ ২০

৩৭ Joseph Buttinger: 21 no, পাদটীকায় ইহার গ্রন্থ উল্লিখিত হইয়াছে। ইনি এই সময়ে পর্দার আড়ালে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন; তাহার একটি কারণ বোধ হয় যে আমেরিকান রাজনৈতিক নেতাদের ভিয়েৎনাম সম্বন্ধে কোনো ধারণা ছিলনা।

meant that the United States would ignore any French protestations and the Geneva accords—including the provisions calling for reunification through free elections which, as even Diem's most ardent supporters conceded, would bring the Communist-oriented Viet Minh to power. A Cardinal,38 a C. I. A. agent,39 and an ex-Austerlitz Socialist 40 seemed to have carried the day against the instincts of a General turned president. 41 ;

এইভাবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী রাষ্ট্র তাহার ভিয়েৎনাম নীতির ভিত্তি স্থাপন করিল।

দিয়েমকে ভিয়েৎনামের ত্রাণকর্তা বলিয়া ঘোষণা করাই যথেষ্ট নহে, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হো চি মিনের নামে কুৎসা রটনা করিয়া অন্তর যুক্তরাষ্ট্রে তাঁহার প্রতিষ্ঠা নষ্ট করাও প্রয়োজন। দিয়েমের আমেরিকান বন্ধুরা এখন সেই বিষয়ে তৎপর হইয়া উঠিলেন।

জেনিভা চুক্তির একটি সর্ত ছিল এই যে, চুক্তিতে স্বাক্ষর করিবার ৩০০ দিনের মধ্যে যে কোন নাগরিক দেশের একভাগ হইতে অপর ভাগে যাইয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে পারিবে, এবং তাহারা এই বাসস্থান পরিবর্তনে সর্বপ্রকার সাহায্য পাইবে। কার্যতঃ প্রায় এক বছর (১৯৫৪-৫৫) এই বাস্তুহারাদের যাতায়াত চলে। অবশেষে দেখা যায় যে উত্তর ভিয়েৎনাম হইতে প্রায় দশ লক্ষ লোক দক্ষিণে আসিয়াছে, কিন্তু দক্ষিণ হইতে মাত্র কয়েকশত লোক উত্তরে গিয়াছে। এই বাস্তুহারাদের সংখ্যার তারতম্যের উপর ভিত্তি করিয়া আমেরিকায় প্রচার করা হইল, যে উত্তর ভিয়েৎনামীগণ হো চি মিনের শাসনের প্রতি অনাস্থা জানাইয়াছে। কিন্তু দুইটি জিনিষের প্রতি কেহই লক্ষ্য দিলেন না :

প্রথমতঃ হো চি মিন তাঁহার সমর্থকদের দক্ষিণ ভিয়েৎনামে থাকিয়া যাইতে আজ্ঞা দেন।

দ্বিতীয়তঃ উত্তর হইতে যাহারা দক্ষিণ ভিয়েৎনামে আসে, তাহাদের দুই ভাগে ভাগ করা যায়। (১) ফরাসী ঔপনিবেশিক সৈন্যদের পোষ্যবর্গ, সংখ্যায় দুই লক্ষ, (২) রোমান ক্যাথলিক সংখ্যায় ৬৭৯,০০০

ফরাসী আমলে স্থানীয় রোমানক্যাথলিকেরা নানা প্রকার বিশেষ সুবিধা পাইত ; এবং তাহারা শেষ পর্যন্ত ফরাসীদের পক্ষে এবং নিজেদের দেশবাসীর বিপক্ষে যুদ্ধ করে। সুতরাং দেশ স্বাধীন হইলে দেশদ্রোহীরা পলাইয়া আমেরিকার আশ্রয় লইবে তাহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কোনো কারণ আছে কি? আমেরিকানরাও অকাতরে ইহাদের সাহায্য করিয়াছে ; তাহার পূর্ণ বিবরণ দেওয়া বর্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নহে।

যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনী অনেক বাস্তুহারাকে উত্তর হইতে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে লইয়া আসে। এই নৌবাহিনীতে টম ডুলি (Tom Dooley) নামে একজন চিকিৎসক ছিলেন।

---

38 Cardinal Spellman.

39 Edward Lansdale.

40 Joseph Buttinger.

41 President Eisenhower. Schoor. ঐ 25 আইজেন হাওয়ারের আত্মজীবনী Mandate for Change পড়িলে মনে হয় যে ভিয়েৎনামে পরিষ্কার বুঝে হো চি মিনকে পরাজিত করা যাইবে না ইহা তিনি ভাল ভাবেই বুঝিয়াছিলেন।

টব ডুলি ক্যাথলিক ; সুতরাং সহজেই বাস্তহারা ক্যাথলিকদের জন্ত তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, এবং বাস্তহারাদের কাহিনী বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি সত্য মিথ্যা ও কল্পনার জাল বুনিয়া এক গ্রন্থ (Deliver Us From Evil) তাঁর কমুনিষ্ট বিদ্বেষ চরিতার্থ করিলেন। ডুলি ঐতিহাসিক বা লেখক নহেন, এবং তাঁহার বই ইতিহাস বা সাহিত্য নয়, তথাপি আমেরিকার তাঁহার বই অস্বাভাবিক সমাদর লাভ করিল এবং ১৯৬০ খৃঃ Gallup Poll-এ ডুলি আমেরিকার সর্বাপেক্ষা সমাদৃত (most admired) প্রথম দশজনের মধ্যে একজন লেখক বলিয়া গণ্য হইলেন। C. I. A.র প্রতিনিধি এডলাই স্টীভেন্সনের সুপারিশে, বিশেষ ডুলিকে ভিয়েৎনামের সর্বোচ্চ সম্মান দানে পুরস্কৃত করিলেন।

(বৈশাখে সমাপ্য)

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.		শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.	
শ্রীগীতা	৬·০০	বাংলার ঋষি	৩·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫·০০	বাংলার মনীষী	১·৩০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০	বাংলার বিদুষী	২·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০	বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫	ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
Soul of India Speaks	5·00	বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০
		রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.		রবীন্দ্রনাথ	১·২৫
বিদ্যাসাগর	২·২৫	যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
মানুষের মত মানুষ	·৭৫	আচার্য জগদীশচন্দ্র	২·৫০
শিশু রামায়ণ	·৬২	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
শিশু মহাভারত	·৭৫	॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥	

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী ; ১৫ কলেজ স্কোয়ার ; কলকাতা—১২

হেগেলীয় দর্শন

অমিল রায়

(১) এঙ্গেল্‌স্ বলেছেন Negation-এর অর্থ 'non-existence' বা 'arbitrary destruction' নয়। ডায়ালেকটিকের 'negation' হলো সেই 'negation' যার ফলে development হতে পারে। তাহোলে negation দু'রকমের আছে বলতে হয়। একরকম হচ্ছে এমন negation যার অর্থ পরিপূর্ণ বিনাশ এবং যার ফলে নূতন 'পরিণতি' সম্ভব নয়। অন্যরকমের negation হলো সেই negation যাতে পরিপূর্ণ বিনাশ ঘটে না। বরং নবতর পরিণতি ঘটে।

(২) হেগেল 'negation' কে নাস্তিত্ব অর্থেই ব্যবহার করেছেন। "reciprocally cancelling each other" (P 170 : Logic) ইত্যাদি উক্তিতে তার প্রমাণ আছে। হেগেল Being এবং Nothing-এর মধ্যে সম্বন্ধ কল্পনা করেছেন, সে-নাস্তিত্বের সম্বন্ধ।

লেনিনের 'mutually excluding, opposite tendencies'-এর মানেও নাস্তিত্ব বই অন্য কিছু নয়। Thesis এবং Anti-thesis পরস্পরকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রন করে যাতে একটির উপস্থিতি ঘটলে অপরটির উপস্থিতি অসম্ভব।

(৩) এঙ্গেল্‌স্ দু'রকমের negation-এর মধ্যে একরকম negationকে ডায়ালেকটিকের negation বলে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অন্য রকমের negation যে যে স্থলে ঘটছে সেই সেই স্থলে কি তবে ডায়ালেকটিক নীতি খাটবে না। ডায়ালেকটিক নীতির রাজ্যের বাইরে কি সেই সব ক্ষেত্র! অথচ ডায়ালেকটিক হচ্ছে বিশ্বজনীন পরিবর্তনের চিরন্তনী নিত্য দ্বন্দ্ব। জগতের যাবতীয় বস্তু বা ঘটনাই ডায়ালেকটিক রীতিতে বিবর্তিত হচ্ছে। বালির বীজ কি পোকাকে পিষে নষ্ট করে ফেললে, যে ধরণের আত্যন্তিক বিনাশ ঘটে গেল, তাতে ডায়ালেকটিকীয় বিনাশ ঘটলো না। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে ডায়ালেকটিক না খাটলে কোন নীতি খাটবে?

(৪) এঙ্গেল্‌স্-এর এই ব্যাখ্যা নিতান্ত কৃত্রিম, এমন ভাবে negation-এর অর্থ ধরতে হবে যাতে আর একটা negationও দেখানো যেতে পারে। অর্থাৎ ডায়ালেকটিক ফর্মূলাকে প্রমাণ করা যেতো। "I must consequently construct the first negation so that a second negation remains or becomes possible." মানে, ফর্মূলাকে বাঁচাতে হবে আগে এবং তার পরে negation-এর যে গতিই হোক না কেন। ফর্মূলার জন্যই negation।

negation .লতে আছে বলেই যে ডায়ালেকটিক কর্মূলা কল্পনা করা হয়েছে তা নয়। হেগেলের ও মার্ক্সীয়দের এই মনোবৃত্তি থেকেই তাদের ডায়ালেকটিক সম্বন্ধীয় গোঁড়ামীর জন্ম হয়েছে।

(৫) আর একটি গুরুতর কথা হচ্ছে এই যে এঙ্গেলস্-এর মতে negation-এর কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থ নেই। "ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে" এই নীতি অনুসারে যখন যেরকম দরকার হবে negation-এর সেই রকমের অর্থই করে নিতে হবে। আমরা আগেই দেখেছি যে হেগেলও তাঁর এক ঘেয়ে কর্মূলাতে সব কিছুকে ফেলতে গিয়ে negation, otherness ইত্যাদি শব্দের নানারকম বিকৃত ও কৃত্রিম ব্যাখ্যা করেছেন। তার ফলে সর্বত্রই confusion হয়েছে। এই confusion দেখে Mc Taggart, negation-এর একটা সহজ ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নানা অসঙ্গতি দেখে হেগেলের উপরই অভিযোগ করেছেন যে হেগেল negation সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। ম্যাক টাগার্ট negation-এর অর্থ completion করেছেন। ড: শীল কিন্তু এই চেষ্টায় খুশী বা সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। কারণ হেগেল আসলে negation-এর ওপরে অর্থাৎ বিনশনের ওপর এত জোর দিয়েছেন যে তাতে negation-এর দোষ খালন করা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

তাছাড়া একটি শব্দেরই নানা স্থানে সুবিধামত নানা অর্থ করার বিরুদ্ধে logical আপত্তি আছে। পরিভাষায় যদি স্পষ্টতা ও স্থিরতা না থাকে, তবে কোনো আলোচনাই যুক্তিযুক্তভাবে চলতে পারে না। দাঁড়াবার ঠাঁই না থাকলে যেমন মানুষের চলাফেরা ও সকল রকমের গতিই অসম্ভব হয়, তেমনি নির্ভরযোগ্য স্থিতির অর্থব্যঞ্জনা না থাকলে কোনো পরিভাষাই চিন্তার গতির সহায়ক হতে পারে না। ফলে চিন্তা এসে পৌঁছায় এক কুয়াশাময় অনিশ্চিতের রাজ্যে যেখানে কোনো কিছুকেই ধরা ছোঁয়া যায় না বুদ্ধির সাহায্যে। কারণ বুদ্ধি নির্দিষ্ট পরিভাষার অভাবে বিভ্রান্ত ও বাহত হয়ে পড়ে। বার্ণস-র মতে "You may attribute what meaning you like to a word, provided you start by clearly defining that meaning." একটা স্পষ্ট 'clearly defined' অর্থ চাই সর্বত্র। একই কর্মূলা বা সূত্র উপলক্ষ্যে সেই সূত্রের নানা রকম অর্থ-পরিবর্তন যুক্তি-বিরুদ্ধ। এ-সম্বন্ধে কোন মতের পণ্ডিত সমাজে আছে বলে জানিনে। Jung-এর একটা সুন্দর কথা আছে। Psychology-র পরিভাষায় confusion সম্বন্ধে উল্লেখ করে তিনি বলেছেন···its particular idiom must first be fixed. It is well-known that temperature can be measured according to Reaumer, Celsius or Fahrenheit, but we must indicate which system we are using." (pp 105 Modern Man in Search of a Soul)। একটা system বা বিধি সর্বদাই অনুসরণ করতে হবে, একই প্রসঙ্গে। নইলে চিন্তার রাজ্যের সকল গতিই অচল। কিন্তু এঙ্গেলস্-এর এই illogical ব্যাখ্যার কারণ হচ্ছে তার ডায়ালেকটিকের মুখ বন্ধতা। কর্মূলাকে বাঁচাবার দরকার আছে কোনো বিশিষ্ট উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য এবং সেই উদ্দেশ্যমূলক কারণে বাধ্য হয়েই negation কে বার বার বেশ বদল করতে হয়েছে। এঙ্গেলস-এর এই ব্যাখ্যা অযৌক্তিক।

(৬) Negation যে স্থলে 'non-existence' না হবে, সে স্থলে negation হয়ে দাঁড়ায় শুধু পরিবর্তন। বীজ গাছে পরিণত হয়। এখানে বীজের negation মানে বীজের পরিবর্তন হয়েছে, এঙ্গেলস-এর অর্থ অনুসারে। একটা বস্তুর কতকগুলি element-এর অভাব ঘটলো এবং কতকগুলো নূতন elementর আবির্ভাব ঘটলো; এখানে এঙ্গেলস-এর মতে ঘটছে negation; আমাদের মতে এখানে যা ঘটছে তাকে change বললেই সঙ্গত হয়।

Partial negation মানেই change। 'Negation' এবং 'change' এই দুটো শব্দের অর্থগত কোনই পার্থক্য থাকে না, যদি negation-এর এঙ্গেলস-কৃত অর্থ গ্রহণ করা হয়। Negation-এর দুই অর্থ হচ্ছে 'non-existence'. A এবং Not-A ; এখানে Not-A এর মানেই A-এর আত্যন্তিক নাস্তিত্ব। এবং এইখানে A পূর্ণরূপে negated হয়েছে। True এবং Not-true ; এই স্থলেও Not-true হচ্ছে True-র সম্পূর্ণ non-existence. এসব ক্ষেত্রে negation মানে 'change' নয়, এখানে negation মানে non-existence, যদিও এঙ্গেলস-এর এই অর্থটি কিন্তু অনীপ্সিত। এঙ্গেলস বলছেন, একটা পোষাকে কেটে ফেললে যে negation হলো, তা ডায়ালেকটিকের নাস্তিত্ব নয়। কারণ এখানে non-existence ঘটেছে ; কিম্বা 'arbitrary destruction'। কিন্তু জীবতত্ত্বের ক্ষেত্রে এমন কোনো কোনো নিম্ন প্রাণী আছে যারা নিজেরা নষ্ট হয়ে গিয়ে সন্তানকে জন্ম দিয়ে যায়। এ-ক্ষেত্রে mother organism-এর আত্যন্তিক বিনষ্টি বা 'non existence'-ই ঘটেছে ; অথচ নূতন প্রাণী-সৃষ্টি বা development অব্যাহত রয়েছে। এখানে negation মানে 'non-existence'ই হবে নাকি। এঙ্গেলস-এর মতে এখানেও হওয়া উচিত, কারণ ডায়ালেকটিক ধরণের negation তারা এখানেও দেখবেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে negation মানে 'non-existence'ও কোনো ক্ষেত্রে হতে পারে। এতে এঙ্গেলস-এর definition খণ্ডিত হচ্ছে। তারা negation—এর অযৌক্তিকভাবে অর্থপরিবর্তন করেছেন এবং এই পরিভাষার ব্যতিচার, তাদের কর্মূলা যে দুষ্ট, তাই প্রমাণ করছে।

কর্নিলভ-এর দৃষ্টান্তগুলি সম্বন্ধেও আপত্তি হচ্ছে এই যে এগুলির ব্যাখ্যায়ও এই অর্থের বিভ্রাটের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। দৃষ্টান্তগুলি সবই এঙ্গেলস-এর।

(ক) অঙ্কশাস্ত্র : "Let us take any algebraic quantity and call it 'a'. The negation of it brings forward "—a". Should we negate this second quantity, by multiplying—a by-a, we get a^2 i.e. the original positive quantity but a stage higher." ১

এখানে বিয়োগ চিহ্নই negation-এর নির্দেশক ধরা হয়েছে। 'a' কে negate করে যেমন—a হয়েছে, তেমনি—a কে আরো negate করলে আবার+a হতে পারে। —a কে —a দিয়ে পূরণ করতে হবে, এ-দাবী কেবল মনগড়া অযৌক্তিকতা বই কিছু নয়।

(খ) বীজ ও গাছ এ-সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

(গ) Larva—chrysalis—butterfly.

এখানেও negation ঘটেনি, যা-ঘটেছে তাকে completion বলা যায়। negation শব্দ এখানে অপপ্রয়োগ মাত্র। বীজ-গাছের সম্বন্ধে যে আলোচনা, সে আলোচনা এই দৃষ্টান্তেও প্রযোজ্য হবে—কারণ দু'টো একই ধরণের ব্যাপার।

(ঘ) সমাজতত্ত্ব : Communal Ownership—Private ownership—communism :

এই দৃষ্টান্তটি বাস্তবজগত থেকে নেওয়া হয়েছে। মার্ক্স এবং এঙ্গেলস দাবী করেন যে তাঁরা Dialectic নীতি নিয়েছেন বাস্তব জগত থেকে। বাস্তবজগতের সকল ব্যাপারেই ডায়ালেকটিক গতি রয়েছে এবং সেই জন্যই তারা একে জীবন ও জগতের মৌলিক গতি বলেন। কর্নিলভ বলছেন :

Marx and Engels transferred these dialectical principles from the domain of logic

১। (Kornilov : Pp 259)

into the province of actual processes of development of the material world, that is nature and history." ২

এই দৃষ্টান্তটি সম্বন্ধে দুটো জিনিষ দেখবার আছে। প্রথমতঃ, বাস্তব জগতে সত্যি সত্যি এই পর্যায়ের বিবর্তন ঘটেছে কিনা। যদি না ঘটে থাকে, তবে দৃষ্টান্ত ডায়ালেকটিকের প্রমাণ হিসেবে নিরর্থক হয়। দ্বিতীয়তঃ এখানে negation of negation হয়েছে কিনা।

(১) বস্তুজগতে এই পর্যায় স্বীকৃত হতে পারে না। কারণ এঙ্গেল্‌স্-এর এই ক্রমনির্দেশ একেবারে অনৈতিহাসিক। সমাজতত্ত্বের আলোচনার এমন এক যুগ গেছে যখন এই ধরণের ক্রম বা পর্যায়ে পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করতেন। কিন্তু অদ্যকার সমাজতত্ত্ব গবেষণার ক্ষেত্রে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। নব নব গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে আজকে সমাজতাত্ত্বিকেরা এই ধরণের ক্রমিক পর্যায়ে বিশ্বাস করেন না। একথা প্রমাণিত হয়েছে যে মানুষের আদিম যুগে আদিম সম্পত্তিব্যবস্থা communal ছিল না। Robert Lowie প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতেরা বলেন যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং সমূহগত সম্পত্তি, এই দুই রকমের সম্পত্তি-ব্যবস্থাই পাশাপাশি আদিম যুগে ছিল। মর্গান-এর প্রভাবে এককালে unilinear পরিণতি হিসাবে সমাজ-বিবর্তনকে দেখা হোতো এবং বিবাহ, সম্পত্তি, ইত্যাদি সব সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসকে এমনি 'এক-ক্রমিক' বিকাশ বলে মনে করা হোতো। এঙ্গেল্‌স্‌ও মর্গান-এর সমাজতত্ত্বকে অনুসরণ করে তাঁর Origin of Family, Private Property নামক বই লিখেছিলেন। মার্ক্স-ই অবশ্য এঙ্গেলস-এর পথপ্রদর্শক। কিন্তু আজকালকার নবলব্ধ জ্ঞান এই—মর্গান-এর সূত্রগুলোকে বর্জন করেছে। Communal এবং Individual ownership-এর

২। (Kornilov : Pp 261)

অযৌক্তিক এঙ্গেলস-মার্ক্স মতবাদের ভিত্তি হলেও, এই ক্রমে সমাজ-বিবর্তন আজকে আর স্বীকৃত হতে পারে না। আদিম মানবের মধ্যে Communal কিম্বা individual ownership প্রচলিত ছিলো, এর absolute বা একরখা অভিজ্ঞ জবাব আজকে কেউ দেবে না। প্রশ্নঃ কোনটা communally owned এবং কোন সম্পত্তি Individually owned তা নির্ধারণ করা মুস্কিল। Communal সম্পত্তিকে ভাল করে বিশ্লেষণ ও নিরীক্ষণ করলে দেখা যায় তার ভিতরেও এমন কতগুলি সম্পত্তি রয়েছে যা হয়তো individually owned. বিলবার্গ, ধবহাউস এরা বলছেন 'Private Property in personal matters, weapons, dress, ornaments, appears to exist everywhere." ৩

বর্তমান যুগের primitiveদের সম্পত্তি-প্রথা নিরীক্ষণ করে তারা একথা বলেন না যে Communal Property-ই পূর্বেকার আদিমতর প্রথা। তারা বলেন যে সমূহগত সম্পত্তি প্রায়শঃই প্রবলতর দেখা যায় অনগ্রসর lower people-দের মধ্যে। আবার ব্যক্তিগত সম্পত্তি দেখা যায় Higher Agricultural Stages-এর সঙ্গে জড়িত ও সম্পর্কিত। কিন্তু lower এবং higher-দের মধ্যে কারা যে আদিমতর (prior in time) এ-সম্বন্ধে তারা বলেন না যে lower people-রাই আদিমতর। তারা পৌর্বাপর্যের কথা এ-সম্বন্ধে আনেন নি। তাঁরা বলেছেন…

"…Communal principle predominates in the lower stages of culture and retains a small preponderance among the Pastoral peoples and that Private ownership tends to increase in the higher agricultural stages." ৪

৩। (p 243—44 : 'Material Culture'.)

৪। (P253 : Ibid : Ginsberg)

এই উক্তির সঙ্গে তাদের এর আগেকার আর কোন উক্তি বিবেচনা করতে হবে যাতে lower কেই আমরা prior স্তর বলে না ভুল করি। তারা বলছেন :

"This classification does not depend on any theory of the order in time in which the several economic stages have arisen. ৫

তারপরে family-র সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিবিড়ভাবে যুক্ত ও জড়িত, এ-কথা Riversও স্বীকার করেছেন। কিন্তু বর্তমান সমাজতত্ত্ব বিশেষ করে American School-এর গবেষণা—পরিবারকেই আদিমতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলে স্বীকার করে থাকে, যথা :

" it constituted the primal form of human social organisation." ৬

পরিবার যদি আদিমতম বা primal প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকে অর্থাৎ clan, gen-এর আগেকার প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকে তবে Individual ownershipও Rivers-এর বক্তব্যানুযায়ী আদিমতম প্রতিষ্ঠান হওয়া উচিত।

যাহা হৌক Communal – Individual পর্যায়কে একটা rigid ক্রম বলে ধরে নেওয়া কোনোমতেই চলতে পারে না। কাজেই এঙ্গেলস্-এর যুক্তি টিকছে না। কারণ, যে বাস্তব ইতিহাসকে তিনি নজীর এনেছেন, সেই ইতিহাস তার negation নীতিকে সমর্থন করছে না।

আর একটা বিষয় এখানে উল্লেখ করা দরকার। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এঙ্গেলস দাবী করেছেন যে ভবিষ্যতেও Individual Property বিনষ্ট হয়ে সমাজ-সম্পত্তির আবির্ভাব হতে থাকা। কাঠ-কঠিন determinism এবং rigid কর্মূলার ওপরে দাঁড়িয়েই তিনি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই prophecy করতে সাহস পেয়েছেন। কিন্তু ভবিষ্যৎ এখনো আগত হয় নি; কাজেই বিষয়টিই ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে negate করে Communal সম্পত্তির উদয় হতে থাকা, একথা আমার কথা হতে পারে কিন্তু ঐতিহাসিক বাস্তব দ্বারা সমর্থিত আজও হয় নি। কাজেই যা হয়নি তাকে ধরে নিয়ে, তার ঐতিহাসিক বিবর্তনের ডায়ালেকটিক রীতির অবতারণা করা নিতান্ত অযৌক্তিক।

দ্বিতীয়ত : communal ownership-কে negate করে individual সম্পত্তির উদ্ভব হয়েছে, একথা সত্য কি? negation মানে এখানে complete negation হতে পারে না। কাজেই একটা অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে অপর অবস্থায় উত্তীর্ণ হয়েছে। change ঘটেছে বললে যৌক্তিক হোতো। কিন্তু negation বললে ভুল হয়।

তৃতীয়তঃ এ-সব দৃষ্টান্তে ডায়ালেকটিকের inter-penetration of opposites নীতিকে সমর্থন করে না। পরিবর্তনশীল বস্তুর পর পর অবস্থাগুলি আগের অবস্থাকে negate করে পরের অবস্থা আসে একথা স্বীকার করলেও, Interpenetration বা Identity of opposites নীতি এসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। কারণ 'itself & not itself' এই নীতি successive momentsএ সত্য হলেও, একই মুহূর্তে সত্য হয় না। একই কালে দুটো বিরুদ্ধ সত্তা একই ব্যাপকতর সত্তার অংশ হিসেবে থাকতে পারে, এ আমরা দেখেছি। Individual সম্পত্তি যখন ধীরে ধীরে ডানা মেলে উঠছে, এবং পূর্বাপর communal সম্পত্তি আস্তে আস্তে নিষ্প্রভ ও ক্ষীণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সেই কালে দুটো বিরুদ্ধ প্রথাই সমসাময়িক প্রথা হিসেবে বর্তমান আছে। তদানীন্তন সমাজ-ব্যবস্থায় দুটো বিরুদ্ধ প্রথার সহ-অস্তিত্ব ডায়ালেকটিকের Identity of opposites কে প্রমাণ করছে না। Law of Identity কেই বরং প্রমাণ করছে।

৫। (P 26-29 : ibid)

৬। (Goldenweiser : Recent Political Theori Pp 442)

(৪) দর্শনশাস্ত্র : দর্শনতত্ত্বের ইতিহাস থেকেও এঙ্গেলস্ একটা দৃষ্টান্ত নিয়ে negation of negation নীতিকে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন।

"Engels gives examples of the importance of the law of negation in ideology and particularly in philosophy. Ancient philosophy was naively materialistic. It was replaced by idealism i.e. the negation of materialism. Idealism in its turn was negated by contemporary dialectic materialism." ৭

প্রথমত, এঙ্গেলস-এর এই একরৈখিক ক্রমিক বিবর্তন অস্বীকার্য। কোন যুগকেই নিছক জড়বাদ বা আদর্শবাদের যুগ বলা চলে না। প্রায় সকল কালেই দুইটি দর্শনই পাশাপাশি ছিল। তবে কোনো যুগে কোন একটি হয়তো প্রবলতর হয়ে উঠেছিল।

দ্বিতীয়ত, এঙ্গেলস-এর তথ্য-বিবৃতিকে সত্য বলে মানা যায় না। তাঁর নির্দিষ্ট এই ক্রমিক পর্যায় অনৈতিহাসিক। কারণ Ancient Philosophy কে জড়বাদী বললে সত্যের অপলাপ হয়। যদি ইউরোপীয় দর্শনই ধরা যায় তবে ইউরোপের প্রাচীনতম দর্শনকে জড়বাদী বলা অসঙ্গত। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর এবং খৃঃপূঃ পঞ্চম শতাব্দী মাঝামাঝি পর্যন্ত Idealism-এর যুগ বলা চলে কারণ এই যুগের দর্শন "...represent a monistic identification of the Idealistic principle with nature...God and matter represented an undifferentiated oneness." ৮

এর পরে তৃতীয় শতাব্দীতে জড়বাদ প্রবল হয়েছিল। আবার প্রথম শতাব্দী থেকে জড়বাদ ক্ষীণ হয়ে ধরে শেষে প্রায় ১০০০ বৎসর Idealism-ই প্রবলতম দর্শন হয়ে রাজত্ব করেছে। চতুর্দশ শতকে জড়বাদের প্রাবল্য হয় কিন্তু পঞ্চদশ শতকে আবার আদর্শবাদ ফোঁপানো হয়ে ওঠে। পরে ষোড়শ থেকে ১৯ শতক পর্যন্ত চারশ বছর জড়বাদের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু বিংশ শতকে আবার আদর্শবাদের নবোদ্গমের আভাস সৃষ্টিও হচ্ছে নূতন বিজ্ঞানে। কাজেই ইউরোপীয় দর্শনের ২৪০০ বছরের ইতিহাসে জড়বাদ ও আদর্শবাদ ক্রমান্বয়ে বিচিত্র ও বিভিন্ন গতিতে এসে অন্তকার দিনে এসে পৌঁছেছে। এঙ্গেলস বর্ণিত অনবনীয় ও তিনটি অতিসরল ক্রমূর্না ইতিহাসের সমর্থন পায় না। তারপরে ১৯ শতক পর্যন্ত যে জড়বাদ প্রাধান্য বজায় রেখেছিল, ১৯ শতকের শেষ দিকে মার্ক্সীয় ডায়ালেকটীক জড়বাদের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সেই জড়বাদ যে ভবিষ্যতেও প্রাধান্য পাবে, একথা এঙ্গেলস বিনা প্রমাণে ধরে নিয়েছেন। ভবিষ্যতে কোন দর্শন মানবজাতির অধিতীয় দর্শন হবে, তার ভবিষ্যদ্বাণী একমাত্র ডায়ালেকটিকের অন্ধ গোঁড়ামী এবং কল্পিত determinism-এর জোরেই করা যেতে পারে। কিন্তু যা আজো ভবিষ্যতের গর্ভে রয়েছে, তাকে অনুমান করে নিয়ে বিশ্বলৌকিক গতির চরম ও অধিতীয় সূত্র রূপে ডায়ালেকটিককে দাঁড় করানো, optimism এবং আদর্শবাদ হতে পারে কিন্তু বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি নয়।

(৫) মনোবিজ্ঞান : unconscious Instinct—conscious habits-automatic.

Instinct-কে negate করে conscious habit হয়, একথা ভিত্তিহীন। আবার conscious habitকে negate করে automatic habit দাঁড়িয়ে যায়, এ তত্ত্বও অবৈজ্ঞানিক। পুরুষানুক্রমে পাওয়া প্রবৃত্তিগুলি শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিকের সহযোগে conscious ব্যবহার ও অভ্যাসে পরিণত হয়। প্রবৃত্তিগুলিকে negate করে নয়।

অন্যান্য দৃষ্টান্তগুলিও একই ত্রুটিতে বিদুষ্ট। কোন

৭। (Kornilov : P259)

৮। (P191, vol 1, Sorokin)

দৃষ্টান্তই ডায়ালেকটিক নীতিকে প্রমাণিত করছে না এবং এ ক্ষেত্রে এগুলি সবই অপপ্রয়োগ মাত্র।

উপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে ডায়ালেকটিক নীতি নিতান্ত একপেশে এবং কেবলমাত্র opposition বা negation বা contradiction কে কেন্দ্র করেই চক্রিত হবার ফলে, এ নীতি কেবল সামান্য কতকগুলি phenomenaকে বোধগম্য করতে পারে; বিশ্বের সার্বকালীন সকল ঘটনা বা গতিকে বোঝাবার ক্ষমতা এর নেই। সংকীর্ণ ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা থাকলেও সমগ্র জীবনের বিচিত্র ও বহুমুখী জটিলতাকে এই অনমনীয় কর্মপন্থা ব্যাখ্যা করতে পারেনা। প্রফেসার ক্যাফিট বলেছেন, 'no ground for supposing change always to arise from the interaction of 'contraries'...আমরাও এই অভিযোগের সমর্থন করছি। সমাজতত্ত্বও এই অভিযোগকে সমর্থন করছে। জড় প্রকৃতির রাজ্যে যেমন এই সংজ্ঞাগুলি প্রয়োগ হয় না সর্বত্র, তেমনি জীবজগতে এবং সমাজব্যাপারেও এই সঙ্কীর্ণ একঘেয়ে তত্ত্ব অতীত ও বর্তমানের সকল ব্যাপার ও গতিকে সুবোধ্য করতে পারে না। সমাজতান্ত্রিকদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন যারা সমাজবিবর্তনকে কেবলমাত্র conflict বা যুদ্ধ ইত্যাদি দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন, যেমন Ratzenhoufer Gumplowicz ইত্যাদি। আবার অন্যদিকে Co-operation এর সাহায্যেই সমাজ বিবর্তন ঘটেছে, এমন মতের সমর্থকও অনেক রয়েছে সমাজবিদদের মধ্যে; যেমন Novicowo, Kropotkin, Bagehot ইত্যাদি। আমাদের মতে এই দুই মতই একপেশে, কারণ কোনো একটি মাত্র পথে জীবন-যাত্রার ইতিহাস যুগের পর যুগকে পার হয়ে বিংশ শতকে এসে পৌঁছেনি। opposition কিম্বা co-operation এই দুটোর কোনো একটি তত্ত্বই সমাজজীবনের গতিকে বোধগম্য করে তুলতে পারে না।

দ্বিতীয়ত: opposition, contradiction, Negation এ সব শব্দগুলি অত্যন্ত ঘোরালো এবং অস্পষ্টভাবে ব্যবহার করা হয়েছে ডায়ালেকটিক সূত্রের প্রসঙ্গে। এদের অর্থ অত্যন্ত গোলমেলে এবং এদের প্রয়োগও অত্যন্ত confusing ধরণের হয়েছে। এদের বিশ্লেষণের মধ্যে সাধারণত অর্থের পার্থক্য করা হয়। কিন্তু হেগেল কিম্বা মার্ক্সীয়রা এদের একই অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া একটি শব্দকেও নানাস্থানে নানারকমের অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। এই কারণে Sydney Hook ও আপত্তি করেছেন। "The analytical difficulties of orthodox moniatic dialectical materialism are, if any thing, ever greater. For it is questionable whether the basic notions with which it operates—the unity and penetration of opposites, development by contradiction—are meaningful, especially when applied to natural phenomena. "(Mar 4, 1936, Nation)

তৃতীয়ত: সিড্‌নী হুক-এর আপত্তির সূত্র ধরেই বলা চলে যে opposition বা negation-এর ফলে development বা উত্তরোত্তর বিকাশ ঘটতে পারে, এ-দাবী আরো অসঙ্গত। opposition এবং negation বলতে আমরা যা বুঝে থাকি, তাতে এই পরিণতি বা ফল negation থেকে উদ্ভূত হতে পারে না। অবশ্য মার্ক্সীয়রা negation কে একটা অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত অর্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু উইলিয়াম জেম্‌স-এর ভাষায় বলা যেতে পারে:

"We cannot eat our cake and have it, that is, the only real contradiction there can be between thoughts is where one is true, the other false. When this happens, one must go forever, nor is there any 'higher synthesis' in which both can wholly revive.

A chasm is not a bridge in any utilisation sense; i,e no mere negation can be the instrument of a positive advance in thought."[৯]

হেগেল negation বা opposition-এর এই অসম্ভব ক্ষমতা কল্পনা করে একে ক্রমবিকাশের অস্ত্র রূপে প্রচার করেছেন। তাঁর মতে negation-এর ফল হচ্ছে positive। তাকে অনুসরণ করে মার্ক্সীয় জড়বাদীরাও জড়-জীব ও মানব জগতে সর্বত্র এই negation-প্রসূত positive উন্নতির অমোঘ সম্ভাবনাকে সোল্লাসে প্রচার করেছেন। কিন্তু এটা যে contradiction in terms হয় তা তারা চোখ বুজে এড়িয়ে গেছেন। চতুর্থত: পরিবর্তন বা বিকাশের একটা ধনপড়া ছকে বাঁধবার প্রয়াস নিতান্ত অবলম্বি হয়েছে। এই অদ্ভুত ধরণের thesis-anti-thesis-synthesis-এর তিন ধাপের দ্বার দিয়ে সব বিবর্তন গড়িয়ে চলবে, এর যুক্তি নেই কোনোই। প্রথম ধাপে বিনষ্টি হবে এবং কোনো আশ্চর্য কৌশলে আবার পরের ধাপে বিনষ্ট-সত্তার resurrection এবং পুনর্জীবন ঘটবে, এই ধরণের কল্পিত রীতি অবাস্তব। ক্যারিটের মতে এমন কল্পনার পিছনে কোনো কারণ নেই।

"nor yet for supposing that change is at alternate moments to the contrary and at alternate moments to something combining and yet superior to the two countries which existed severally at the last moment and the last moment but one. But this is what is demanded by thesis—antithesis—synthesis, or negation of negation or interpenetration of opposites."[১০]

এই কষ্ট-কল্পিত রীতি ও ছকেই যে বিশ্বগতি চলেছে তার প্রমাণ কি এবং চলতেই হবে তারই বা কারণ কি?

পঞ্চমত: Opposition, Contradiction, Struggle, ইত্যাদি শব্দ জড়-প্রকৃতির রাজ্যে প্রয়োজ্য নয়। অচেতনবস্তুরা পরস্পরকে contradict করছে oppose করছে, এই কথা নিতান্ত অর্থহীন। মানব-সমাজের ইতিহাসে শুধু opposition-এর অর্থ হতে পারে কারণ সচেতন মানুষ পরস্পরকে oppose করতে পারে ও করে থাকে। প্রফেসার ক্যারিট বলছেন:

"Even those who can stomach the Hegelian dialectic in conceptual logic have blushingly abandoned his application of it to science and history...."

Prof Carritt-এর মতে ইতিহাসের ক্ষেত্রেও হেগেলীয় ডায়ালেকটিক অচল; কারণ দু'টো বিরুদ্ধ সত্তা একই কালে প্রয়োজন হতে পারে এ-কথা বিজ্ঞান বা ইতিহাসের ক্ষেত্রে চলতে পারে না।

সিড্‌নি হুক এর মতেও জড়-প্রকৃতির ক্ষেত্রে opposition ইত্যাদির কোন অর্থ হয় না। তাঁর মতে:

"Things cannot contradict each other: only propositions can be contradictory, and these are not natural facts in the sense in which things in space and time are Nor do things struggle with one another except in an obviously metaphorical sense. Struggle is an attribute of living behaviour. (March 4, 1936, Nation, Sydney Hook.)

আমরা আগেও উল্লেখ করেছি যে আলঙ্কারিক অর্থে এ-সব শব্দ ও সূত্রের ব্যবহার চলতে পারে। কিন্তু বাস্তব ও যুক্তির রাজ্যে হেগেলীয় ও মার্ক্সীয় ডায়ালেকটীক অচল।

৯। (W. James. Ibid 293-94)

১০। (Carrit: Ibid)

যথার্থ : Dialectic Idealismই হোক আর Dialectic Materialismই হোক, দুইয়েরই ভিত্তি এই ডায়ালেকটীক। ডায়ালেকটীকের প্রতি এই অন্ধ প্রীতির কারণ কি? এই নৃতীয় ভূলের আদি ও মূল উৎস কোথায়? এর এক কথায় জবাব দেওয়া যায় এই বলে যে system বাঁধবার অসঙ্গত ও অপরিমিত খেয়ালই এই একদেশদর্শিতার প্রধান উৎস। যাবতীয় বিশ্বব্যাপারকে একটিমাত্র system-এ বাঁধতে গিয়ে এরা একটি মাত্র সূত্রকে আবিষ্কার করেছে এবং সেই একটি মাত্র ফর্মুলার লৌহবন্ধনে বিশ্বসংসারকে বাঁধতে গিয়ে যুক্তি ও বাস্তবকে জোর করে বাগ মানাতে হয়েছে। ফলে যুক্তিকে করতে হয়েছে খর্ব এবং বাস্তবকে করতে হয়েছে বিকৃত। কিন্তু হেগেল দাবী করেন যে তাঁর দর্শনতত্ত্ব জগতের অমোঘ ও অবার্থ তত্ত্বকে হুবহু প্রকাশ করছে। হেগেলের এই দাবীকে William James বলেছেন তাঁর "Cardinal Error"। কারণ "Everywhere he is inclined to claim finality." প্রকৃতি বা Nature-এর কথায় ড: হালদার বলছেন যে

"It refuses to be squeezed into his systematically constructed scheme of categories." ১১

জেমস্ বলেছেন যে সমস্ত বিশ্বকে হুকুমের তাঁবেদার মনে করাই এদের বিশেষত্ব এই—ডায়ালেকটীক-ওয়ালাদের "...found insatiate enough to declare that all existence must bend the knees to its requirements..." ১২

একটি মাত্র ফর্মুলার সংকীর্ণ অর্থের মধ্যে বিশ্বসংসারকে ঢোকাতে গিয়ে বাস্তবের ওপরে জবরদস্তি করতে হয়েছে। মার্ক্সীয়দের সম্বন্ধে এই একই অভিযোগ খাটে। তাঁরা সমাজ, প্রকৃতি, ও জীবজগৎ—সর্বত্রই ডায়ালেকটীক নীতিকে প্রমাণ করতে গিয়ে অযৌক্তিক অন্ধতা ও গোঁড়ামীরই প্রকাশ করেছেন। এরাও হেগেলেরই মতন তারই পদানুসরণ করে, তাঁর ভাব, ভাষা ও ভঙ্গীকে হুবহু আত্মসাৎ ও ব্যবহার করে একটা বিশ্বব্যাপক system গড়তে চেষ্টা করেছেন। এই system-buildingএর আনুষঙ্গিক দোষ দুর্বলতাই তাদের মধ্যেও দেখা দিয়েছে। বিশ্বকে একটি মাত্র সূত্রে গেঁথে তোলবার মূঢ়তা এদেরও systemকে একদেশে করে তুলেছে। এঙ্গেলস হেগেলকে তীব্র সমালোচনা করেছেন এই system বাঁধবার মূঢ় গর্ব ও একদেশদর্শিতার জন্যে।

"...it is self-evident that by virtue of the necessities of the 'system" he (Hegel) must very often take refuge in certain forced constructions." ১৩ যে অভিযোগ হেগেলের বিরুদ্ধে এঙ্গেলস করেছেন সেই অভিযোগ তাঁর এবং মার্ক্স সম্বন্ধেও একই অর্থে প্রযোজ্য। এদেরও ডায়ালেকটিকের কাঠবন্ধনে সব কিছুকে বাঁধবার চেষ্টায় সর্বত্রই অনেক 'forced Construction-'র সাহায্য নিতে হয়েছে।

সপ্তমত : ডায়ালেকটিক জড়বাদ দাঁড়িয়ে আছে হেগেলীয় ডায়ালেকটিক নীতির ওপরে। মার্ক্সীয়দের মতে, এই ডায়ালেকটিককেই তাঁদের নতুন জড়বাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং পূর্বযুগের প্রাচীন জড়বাদকে তারা mechanical বলে বর্জন করেছেন। তাদের জড়বাদ mechanical নয়। তাদের জড়বাদ dialectical। এই ডায়ালেকটিকই তাঁদের জড়বাদকে এই অপূর্ব বৈশিষ্ট্য দান করেছে। কিন্তু আমরা দেখেছি যে এই ডায়ালেকটিক গুরুতর logical ত্রুটি দ্বারা বিদ্ধস্ত এবং অসঙ্গতিদোষে দুষ্ট। কাজেই Dialectical জড়বাদের ভিত্তিই যদি অগ্রহণীয় ও অসঙ্গত হয়ে থাকে,

১১। (Haldar : Hegelianism & Human Personality : p 57-58)

১২। (pp 272 : Ibid : W. James)

১৩। (Ludwig Feurbach : pp 49 : Engels)

তবে সেই ভিত্তি-প্রতিষ্ঠ দর্শনও অসঙ্গতি-জর্জর এবং অগ্রহণীয়। সমস্ত ডায়ালেকটিক জড়বাদ নামক মার্ক্সীয় দর্শন একটা illogical construction. আর দর্শনতত্ত্ব অযৌক্তিক হবার দরুণ মার্ক্সীয় সমাজতত্ত্বও যুক্তিদ্বারা বাধিত ও খণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে। কারণ এই দর্শনই মার্ক্সীয় সমাজতত্ত্বের ভিত্তি। আমাদের মতে মার্ক্সীয় দর্শনতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব আপাদোড়া inconsistency এবং contradiction-এর দ্বারা জর্জরিত। অবশ্য contradictionই যাদের দর্শনের মূলমন্ত্র তাদের পক্ষে এই সব contradictoriness দোষের নাও হতে পারে। এমনকি উপাদেয়ও হতে পারে বা। কিন্তু যারা Formal Logic কে যুক্তিসহ ও প্রামাণ্য মনে করেন, তাদের কাছে contradictionটি ভীতিপ্রদ। মার্ক্স J. S. Mill-এর অর্থনীতির একটা contradiction নির্দেশ করে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন :

Although the Hegelian doctrine of opposites, which is the main source of all dialectic, is uncongenial to him, he (Mill) feels perfectly at home in the domain of flat contradiction. ১৪

Mill সম্বন্ধে যে ব্যঙ্গ মার্ক্স করেছেন, সেই বিদ্রূপ-বিদ্ধ অভিযোগটি মার্ক্সের দর্শন ও সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধেও প্রয়োগ করলে দোষের হয় না। কারণ বিশ্ব-সংসারকে ডায়ালেকটিকের ত্রিতালে চালাতে গিয়ে মার্ক্স যে সব বহুল 'forced construction' করতে বাধ্য হয়েছেন তারা যুক্তি ও বাস্তবের দিক থেকে পড়ে "in the domain of flat contradiction." তাছাড়া contradiction যে এদের কাছে uncongenial নয়, তার প্রমাণ এঙ্গেলস-এর কথা থেকেই পাওয়া যায়। হেগেলের system ধরবার ব্যগ্রতা থেকেই তাঁর মতো কৃত্রিম construction অস্ত্র নিয়েছে একথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে জগতের দার্শনিকরা সবাই এমনি forced construction-এর সাহায্য নিতে—অর্থাৎ বাস্তবকে নিয়ে জবরদস্তি করতে বাধ্য হয়; তার কারণ এরা সবাই contradiction কে এড়াতে চান। কোন দার্শনিক নয়, এঙ্গেলস-এর মতে, মানুষ মাত্রেরই এই রোগ আছে যে সে contradiction কে পছন্দ করে।

"as regards all philosophies their system is doomed to perish and for this reason because it emanates from an imperishable desire of the human soul, the desire to abolish all contradictions." ১৫

এই রোগ থেকেই উৎপত্তি হয় মতো দার্শনিক আড়ষ্টতা এবং অচল পদুতা। এর থেকে কি মনে করতে হয় যে এঙ্গেলস্ প্রমুখ মার্ক্সীয়রা contradiction কে abolish করতে চান না এবং তাঁরা এই ডায়ালেকটিকের অটিল contradiction-এর অরণ্যে দিব্যি at home অনুভব করেন? যে ডায়ালেকটিক নানা অসঙ্গতিতে আবিল সেই প্রাচীন বস্তুকে তারা আবার অন্ধকার থেকে টেনে বার করে নবযুগের প্রাঙ্গনে এনে সমারোহে প্রতিষ্ঠা করতে পাচ্ছেন।

যাহোক ডায়ালেকটিকের অসঙ্গতির ফলে সমস্ত মার্ক্সীয় দর্শন অসঙ্গত হয়ে পড়েছে। ডায়ালেকটিক যে অসঙ্গত ও অযৌক্তিক তা আমরা উপরের বিস্তৃত আলোচনায় দেখেছি। মৌলিক নীতিটি যদি illogical প্রমাণ হয় তবে তার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে যে ইমারত তাকে ভিত্তিহীন বলা যেতে পারে। এক ডায়ালেকটিকের ভুলের জন্যেই মার্ক্সীয় দর্শন এবং সমাজতত্ত্বে অসংখ্য ভুলের সমাবেশ ঘটেছে। ডায়ালেকটিক খণ্ডিত হওয়ায় মার্ক্সবাদও খণ্ডিত হচ্ছে। W. James-এর ভাষায় বলা চলে :

১৪। (Marx: Capital, Vol I Allen & Unwin, London 1928 : p 656, Note 1)

১৫। (L. Feurbach pp 49 : Engels)

"It is not necessary to drink the ocean to know that it is salt, nor need a critic dissect a whole system after proving that its premises are rotten."

কেন্‌স্ হেগেলীয় দর্শন সম্বন্ধে এই উক্তি করেছেন: আমরা মার্ক্সবাদ সম্বন্ধেও এই মন্তব্যের সমর্থন করতে পারি। তবে আমরা এই ডায়ালেকটিকের প্রয়োগের ফলে তার সমাজদর্শনে যে একদেশদর্শিতা এবং rigid গোড়ামীর উৎপত্তি হয়েছে সে বিষয়টিও আলোচনা ও প্রদর্শন করবো। *

* এখানেই এই প্রবন্ধটীর সমাপ্তি। এ সম্পর্কে লেখকের আরো যুক্তি প্রদর্শনের সঙ্কল্প পূর্ণ হয় নাই। ১৯৪২ সনের ৬ই জানুয়ারি অকস্মাৎ মৃত্যু এসে সে সঙ্কল্পে ছেদ টেনে দেয়। এই প্রবন্ধের খসড়া বন্দীশিবিরে রচিত হয়েছিল। বন্দীশিবিরে ঘন ঘন তল্লাসী করে বন্দীদের বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি কর্তৃপক্ষ বাজেয়াপ্ত করতেন। তাদের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন অংশে মার্ক্স-এঙ্গেলস এঁদের প্রকৃত নাম গোপন করবার জন্য Mathew, Pengler প্রভৃতি লিখে রেখেছিলেন লেখক। বিভিন্ন সময়ে যাঁরা কপি করেছেন, তাঁদের সকলের সেকথা জানা না থাকায় মার্ক্স, হেগেলের নামই প্রবন্ধের স্থানে স্থানে রয়ে গেছে। — সঃ

অনিল রায়ের
সময়োপযোগী দুইটি বই

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ : ৩·৫০ টাকা

"...সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থ-নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রাহ্য। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাদ্য।" ... (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনবাদ : ১·২৫

নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের সম্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।

পাওয়া যাবে:

জয়শ্রী—৩১২, গাঙ্গুলী বাগান, কলিঃ-৪৭ (ডাকে)

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন

৬৮এ, বেনার সেন, কলিকাতা-৯

[লোক সভায় নেতাজী প্রসঙ্গে—১৯৬ পৃঃ পর]

না তিনি আরোহণ করেছিলেন ! আমাদের নেতৃবৃন্দ—এই সরকার—কি ক্ষুদ্রচেতা যে তাঁরা এই বিপ্লবী শ্রেষ্ঠকে বিন্দুমাত্রও সম্মান প্রদর্শন করেন নি।

বিশ্বের কোনো স্বাধীনদেশ আজ পর্যন্ত একটি বিপ্লবী সামরিক বাহিনীর প্রতি এমন বিশ্বাসঘাতকতা প্রদর্শন করেনি। লালকেল্লায় আই, এন, এর, নেতৃবৃন্দের বিচারের প্রাক্কালে কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের মধ্যে, আই, এন, এর গৌরবের অংশীদার হবার আশায় উকিলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার জন্য প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেল। আমাদের উত্তরপুরুষরা লজ্জাবোধ করবে দেখে যে ক্ষমতালাভের পর জাতীয় নেতার আই, এন, এর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন, একজন বীর যোদ্ধাকেও তাঁরা জাতীয় সামরিক বাহিনীতে গ্রহণ করেননি।

জানেন কি কাদের জাতীয় সমর বাহিনীতে নেওয়া হয়েছিল ? কেবলমাত্র সেই সব লোকেরা জাতীয় সমর বাহিনীতে স্থান পেয়েছিলেন যারা এই বিবৃতি দিয়েছিলেন যে যুদ্ধবন্দী হিসাবে আই, এন, এতে যোগ দিতে তাদের বাধ্য করা হয়েছিল। কিন্তু কোনো কিছু গ্রাহ্য না করে যে সব আই, এন, এর বীরেরা সাহস ও দৃঢ়তার সহিত বলেছিলেন দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে তাঁরা যোগ দিয়েছেন, তাঁদের সমর বাহিনীতে নেওয়া তো হলই না উপরন্তু তাঁদের পেনশন, বাহিনী ও ভাতা সব বাজেয়াপ্ত করা হলো, আজও তা তাঁরা পান নি।

আজাদ হিন্দ ফৌজের ইতিহাস এখনও লেখা হয়নি। আমরা হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কথা বলি। আমরা অনেক প্রকার ধ্বনি তুলি। কিন্তু একমাত্র নেতাজীই রক্তপাত ও অস্ত্রের মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয় ঐক্য সংগঠিত করেছিলেন, কোহিমা, ইম্ফল, বিষ্ণুপুর, বিষ্ণুপুর, চট্টগ্রাম, বুথিডাং, মুথিডাং প্রান্তরে হিন্দুমুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জীবন ও রক্ত দান করেছিলেন। সেই গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য স্বীকৃত পায়নি। এই জাতীয় ঐক্যের ঐতিহ্যকে স্বীকৃতি দেবার প্রয়োজনীয়তা এই সরকার অনুভব করেননি।

বহুদিন ধরে আমরা নাগাভূমির সমস্যাটি নিয়ে চিন্তা করছি। এ সম্পর্কে বহু আলোচনাই হয়েছে। কিন্তু বিদ্রোহী ফিজোর মুখে, 'নেতাজীই আমার নেতা' এই স্বীকারোক্তি কি কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ? নাগাভূমিতে বহু গৃহে যে নেতাজীর ছবি দেখা যায় এর তাৎপর্য কি আমাদের কারো নজরে এসেছে ! আজাদ হিন্দ ফৌজের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে নাগারা রক্ত ঝরিয়েছে। একথা কি কারো স্মরণ আছে ? তারা ভারতীয় কি অন্য কিছু সে সময় সে প্রশ্ন কেউ তোলেন নি। নেতাজী ও আই, এন, এর সঙ্গে নাগাদের সেই গৌরবোজ্জ্বল জাতীয় ভূমিকার স্মারক হিসাবে কোহিমা বা ইম্ফল কিম্বা পুর, চট্টগ্রামে অথবা অন্যত্র কোনও ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয় নি। একটি স্মৃতিফলক পর্যন্তও কোথাও নেই। জাতীয় তীর্থক্ষেত্র হিসেবে সেসব স্থানের চিহ্নিত হওয়া উচিত ছিল। আজ আমি কোনও দলের সদস্য হিসাবে বলছিনা ; আজ বলছি একজন দেশপ্রেমিক ভারতবাসী হিসাবে। ভারতের একটি সন্তান হিসাবে। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা নেতাজী ও ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর প্রতি কংগ্রেস সরকারের এই নীচতা দেখে আমাদের ধিক্কার দেবে।

অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নেতাজী সম্পর্কিত রহস্য। নেতাজী তদন্ত কমিশনের সভাপতি হবার পূর্বে লেফটেনেন্ট জেনারেল শাহনওয়াজ খানের সহিত বহুবার আমার দেখা হয়েছে এবং প্রতিবারই তিনি বলেছেন এরোপ্লেন ভেঙে পড়বার কাহিনী তিনি বিশ্বাস করেন না, ব্রহ্মদেশ থেকে শুরু করে কাম্বোডিয়া, থাইল্যাণ্ড, হংকং, জাপান, ফিলিপিনস্, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া সর্বত্র আমি সাধ্যানুযায়ী অনুসন্ধান করেছি। ডঃ বা মর সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়া মাত্র তাঁকে নেতাজী সংক্রান্ত বিমান

দুর্ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি হেসে বলেন "লাসেনকি টোকিও থেকে রেডিওতে প্রচার করা হয়েছিল যে ঐ বিমান দুর্ঘটনায় আমারও মৃত্যু হয়েছে।"

এবার আমি কিছু চমকপ্রদ তথ্য আপনাদের দেবো। টোকিওতে রেনকোজি মন্দিরে আমি নেতাজী সম্পর্কিত বিমান দুর্ঘটনার বিষয় অনুসন্ধান করি। ডঃ রাধেন্দ্র প্রসাদ এবং পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু নেতাজীর তথাকথিত দেহাবশেষ যে মন্দিরটিতে সংরক্ষিত আছে বলে কথিত আছে তা দর্শন করেছিলেন এবং ভিজিটার্স খাতায় কিছু মন্তব্য লিখে রেখেছিলেন। দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম ডাঃ রাধেন্দ্র প্রসাদ লেখেন :

"এই মন্দির দর্শন করে এবং নেতাজীর সমাধিতে প্রার্থনা করে আমি আনন্দিত হয়েছি"

কিন্তু পণ্ডিত নেহেরু যা লিখেছিলেন তা শুনে আপনারা বিস্মিত হবেন ; নেতাজী সম্পর্কে কোনও উল্লেখই তিনি করেন নি। তিনি লিখেছিলেন 'যুদ্ধের বাধী মানব সমাজে শান্তি আনয়ন করুক।" এ কি বিবেক দংশনের ফল? কারণ তিনিও অন্তরের অন্তঃস্থলে বিশ্বাস করতেন না যে বিমান দুর্ঘটনায় যথার্থই নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে।

তৎপর ঐ ভস্ম রহস্যে মন্দিরের পুরোহিতের নিকটে বিস্ময়কর এক কাহিনী শুনলাম। তিনি বিবৃত করলেন জাপানের আত্মসমর্পণের কয়েকদিন পরে তিন জন ব্যক্তি একটি পেটিকা নিয়ে মন্দিরে উপস্থিত হন। তাদের নাম জিজ্ঞাসা করে জানতে পেলাম তাদের মধ্যে দুজন জাপানী ও একজন ভারতীয় ছিলেন এবং পুরোহিতের বিশ্বাসানুযায়ী তৎকালীন ভারতীয় দূতাবাসের সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন। আমি তাঁর প্রসঙ্গে খোঁজ নিয়েছিলাম, কিন্তু ঐ নামের কোনো লোকের সন্ধান পাওয়া গেল না। জাপানীদের মধ্যে একজনের কোন হদিস পেলাম না, তবে ভাগ্যক্রমে অপরজনের সন্ধান পেলাম। তাঁর নাম হায়াশী, তিনি ছিলেন জাপানী সেনাবাহিনী ও আই. এন, এর সংযোগকারী দোভাষী। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, "জাপানের আত্মসমর্পণের পর মার্কিণদের হাতে আমি বন্দী হই, আমি এর কিছুই জানি না।" পুরোহিত বলেছিলেন ইনিই সেই ব্যক্তি যিনি 'পেটিকা'তে —নেতাজীর তথাকথিত ভস্ম এনেছিলেন। কিন্তু সেই ভদ্রলোক এ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। তারপর তিনি বললেন, "আপনি যদি এ বিষয়ে আগ্রহী থাকেন তবে একদিন আপনাকে জেনারেল কাওয়াবের কাছে নিয়ে যাব, নেতাজী সম্পর্কে তার একটি বই আছে। বইটি গুরুত্বপূর্ণ। জাপানে শাহনওয়াজ কমিশনের নিকট এটী দ্বিতীয় সংস্করণ এবং জাপান সরকারের দলিল হিসাবে পেশ করা হয়েছিল। এই জেনারেল কি বলেন? তিনি বলেছেন "আমি কোনও বিমান দুর্ঘটনার কথা জানি না। আমি কোনও অনুসন্ধান করিনি। পত্র পত্রিকার সংবাদএর স্মৃতি থেকে নেতাজী সম্পর্কে বইটি আমি লিখেছি। তৎসত্ত্বেও শাহনওয়াজ কমিশন বইটিকে একটি মূল্যবান সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে।

তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন সাইগন থেকে করমোজার তাইহোকু যাত্রার নেতাজীর সহযাত্রীর সঙ্গে আপনি দেখা করবেন কি? সেই সহযাত্রী, বর্তমানে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অধ্যাপক লেঃ কর্ণেল আয়াই এর সাথে সাক্ষাৎ হোলে তিনি আমাকে এক দীর্ঘ কাহিনী বিবৃত করলেন। সেই বিমানে ১৪।১৫জন যাত্রী ছিলেন। নেতাজী মাঞ্চুরিয়ার মুকডেন হয়ে সাইবেরিয়ায় যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। মুকডেন হয়ে রাশিয়ায় যাবার জন্যে জাপানের আত্মসমর্পণের পূর্বেই নেতাজী টোকিওস্থিত রাশিয়ার দূত মিঃ জ্যাকব মালিকের মাধ্যমে সরোজিনী নাইডুর রাশিয়ায় আত্মগোপনকারী ভাই শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন।

আয়ার নেতাজীর সঙ্গে ছিলেন, এবং নেতাজীর সহযাত্রীরূপে জাপানী সেনাবাহিনীর নেতা সিদাই-এর যাবার কথা তাঁর কাছে শোনা যায়। আয়ার-এর বিবৃত কাহিনী খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন, ১৪।১৫ জন সহযাত্রীদের মধ্যে বৈমানিক, সহকারী বৈমানিক, বেতার ইঞ্জিনিয়ার, জেনারেল সিদাই ও চন্দ্র বোস—তাঁরা নেতাজীকে চন্দ্র বোস ডাকতেন—ঐ বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। অর্থাৎ নেতাজীর বিমান চালনার কাজে যাদের প্রয়োজন,—বৈমানিক, সহবৈমানিক, বেতার ইঞ্জিনিয়ার এবং জাপানী সেনাবাহিনীর যাদুরীর বিশেষজ্ঞ জেনারেল সিদাই, যার ওপর নেতাজীর প্রহরার ভার পড়েছিল এবং স্বয়ং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেলেন। সমস্ত ঘটনাটির সমাবেশ কি বিস্ময়কর যোগাযোগের আকস্মিকতায় বিন্যস্ত নয়? পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু মৃত্যুর পূর্বে নেতাজীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুরেশচন্দ্র বসু মহাশয়কে লিখেছিলেন, "হুবিদিষ্ট ও প্রত্যক্ষ কোনও প্রমাণ আমাদের নেই।" আমি সেই অংশটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি "যদিও সঠিক ও প্রত্যক্ষ কোনও প্রমাণ নেই তবুও পারিপার্শ্বিক ঘটনার আলোচনা নেতাজীর মৃত্যু সপ্রমাণ করে। কি সেই পারিপার্শ্বিক ঘটনা? ফরমোজায় এই বিমান দুর্ঘটনা ঘটে কিন্তু ক'মশন সেখানে যাননি, কমিশন যুক্তরাষ্ট্র ও সাইবেরিয়াতেও যাননি। আপনারা জানেন বিনা আমিনা, সম্প্রতি শ্রীকাশ্মীর ফরমোজায় গিয়েছিলেন, ফরমোজা সরকার এই বিমান দুর্ঘটনার অনুসন্ধান করছেন। সম্প্রতি জাপান সরকারের পক্ষ থেকে জেনারেল কুজিয়ারা বলেছেন তাঁরা ভারত সরকারের সাথে যুক্তভাবে এই রহস্যের অনুসন্ধান করতে প্রস্তুত আছেন। নেতাজী রহস্যের নতুন অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা ভারত সরকারের মনে ওঠেনি। অবিলম্বে ভারত, জাপান ও ফরমোজা সরকারের মিলিত প্রচেষ্টায় অনুসন্ধান হওয়া উচিত।

মাতৃভূমির স্বাধীনতা যজ্ঞে নেতাজী এক দুঃসাহসী অভিযানের মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। তিনি একজন সাধারণ রাজনৈতিক নন, তিনি ভারতবর্ষের সাধক দেশ-প্রেমিক। তিনি শুধু একজন বিপ্লবী মাত্র নন, মহত্তম আদর্শের জন্য উৎসর্গ প্রাণ সাধক, তিনি শুধু একজন সাধারণ সংগ্রামীমাত্র নন, তিনি চেয়েছিলেন ভারত ইতিহাস তাঁকে একজন ভারত-পথিকরূপে আনুক। আজ আমরা জাতীয় সংকটের ভেতর দিয়ে চলেছি। বর্তমান সংকটে জাতীয় পরিত্রাণের জন্য এই রাজনীতিতে নেতাজীর উদ্দীপনাময় ব্যক্তিত্ব ও তাঁর আদর্শের প্রেরণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই জাতীয় সংকটকালে একমাত্র তাঁর বাণী, তাঁর বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের আদর্শ ভারতবর্ষকে বাঁচাতে পারে। নেতাজী জিন্দাবাদ।*

---

* রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবের প্রতিবাদে লোক সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার প্রথম বক্তৃতার অনুবাদ। ভঃ সঃ

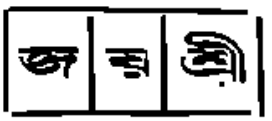

সাহিত্য সংখ্যা : বৈশাখ ১৩৭৪

সুভাষ-প্রসঙ্গ

সুভাষচন্দ্র : দ্বিতীয় অধ্যায় : পবিত্রকুমার ঘোষ

তরুণ সুভাষচন্দ্রের আই. সি. এস. পদ ত্যাগ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদানের ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে নিষ্ক্রমণ যাত্রা পর্যন্ত সুভাষ-জীবনের চাঞ্চল্যকর মুহূর্তগুলিই এই অধ্যায়ের বিষয়। আগামী বৈশাখ থেকে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবে।

রবীন্দ্র ও সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রসঙ্গ

ইংরেজি শিক্ষক এণ্ড্রুজ ও রবীন্দ্রনাথ : সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ও অনুবাদ : শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

জীবনানন্দ : কবিস্বভাব ও কাব্যভাবনা : কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

রাজপথে শুভ্র দীপাধার : অশ্রুকুমার সিকদার

[সাম্প্রতিক প্রকাশিত বহু কাব্যগ্রন্থের আলোচনা]

দুই সংস্কৃতি : দেবদাস জোয়ারদার

ভাবের ঘরে চুরি : সুরজিৎ দাশগুপ্ত

কবিতা

প্রেমেন্দ্র মিত্র, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মনীন্দ ঘটক, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অরুণ কুমার সরকার, গোপাল ভৌমিক, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, অলোক সরকার, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিজয়কুমার দত্ত, শক্তিপদ দাশ, শান্তি লাহিড়ী, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, রুক্ষ ধর, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, যতেশরঞ্জন দত্ত, নচিকেতা ভরদ্বাজ, মানস রায়চৌধুরী ও আরো অনেকে।

দাম : একটাকা

প্রাপ্তিস্থান | প্রচার সম্পাদক | জয়শ্রী। ৬১২, গাঙ্গুলিবাগান, কলিকাতা—৪৭

UPPER GANGES SUGAR MILLS Ltd.
THE OUDH SUGAR MILLS Ltd.
NEW INDIA SUGAR MILLS Ltd.
THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS Ltd.
BHARAT SUGAR MILLS Ltd.
GOBIND SUGAR MILLS Ltd.

Manufacturers of :

PURE CRYSTAL CANE SUGAR

Managing Agents

BIRLA BOMBAY PRIVATE LTD.

INDUSTRY HOUSE,
159, Churchgate Reclamation,
BOMBAY — 1

জল মাটি মন

ম হী তো ষ বি শ্বা স

ভোরবেলায় খুব তাড়াতেই বলরাম তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। ভালো ক'রে স্নান করতে হবে। শুধু মন শুদ্ধ হ'লেই চলবে না। দেহকেও শুদ্ধ হ'তে হবে। ধুয়ে মুছে দেহকেও পবিত্র ক'রে তুলতে হবে।

বিছানা ছেড়ে উঠতে গিয়ে একটু নাড়া লাগল। নারাণ শুয়ে ছিল পাশে। বড়ো ভাওটা হয়েছে। বাপের কাছে ছাড়া শুতে চায় না। একটু নাড়া লাগতেই ছেলেটাও উঠে পড়ল। সুবাসী বিছানা ছেড়ে উঠে গেছে অনেক আগে। এমনিতেই সংসারে নানান্ কাজ। পূজোর কদিনে আরো কাজ বেড়েছে। পূজোর বাসনোয় জড়িয়ে প'ড়ে বলরাম সংসারের কোনোদিকে এখন আর নজর দিতে পারছে না। এ কটা দিন আর পারবেও না। সুবাসীকেই তাই পড়ি মরি ক'রে সব দিক সামলাতে হচ্ছে। বলরামের বুড়ী পিসী এখনো বেঁচে আছে। কিন্তু ন'ড়ে বসার ক্ষমতা নেই। বাতের ব্যথায় বিছানা নিয়েছে। চোখে ছানি প'ড়ে ভালো ক'রে দেখতে পায়েনা। দুর্গতির একশেষ হয়েছে। দুইবেলা পিসী-শাশুড়ীর তত্ত্ব-তালাশও নিতে হয় সুবাসীকে। একা একা হিমসিম খেয়ে যায়।

বলরাম বিছানা ছেড়ে উঠতেই নারাণও উঠে বসল। চোখ দুটো একটু মিট-মিট ক'রে তাকাল। বলরামের দিকে ছোটো ছোটো হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে বলল—"বাবা, আম্মো যাব।"

বলরাম ফিরে তাকাল ওর দিকে—"কনে যাবি তুই?" নারাণ তেমনি করে উত্তর দিল—"আমি পুজো দেক্তি যাবো।" বেরোনোর মুখে বাধা পেয়ে বলরামের মনটা একটু বিরূপ হ'ল। বল্লো—

"পুজো দেখতি যাবি, সে তো বইকেল ব্যালায়। এ্যাতো সকালে কি পুজো হয় নাকি?"

"না বাবা, আমি যাবো। আমি হাজলা-ঠাউল হবো।"

নারাণের আধো-আধো কথা শুনে এবার হেসে ফেলল বলরাম। কোলে তুলে নিল ছেলেটাকে। হাসতে হাসতে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। গোয়াল ঘরের কাজকর্ম সেরে এদিকে আসছিল সুবাসী। বলরাম হাসতে হাসতে বলে—"শুনতিছো, তোমার ছেলের কথাডা শুনতিছো। ও-নাকি হাজলা-ঠাউল হবে।"

বাপের আদরে ছেলের তখন পোয়া বারো। মুখে মুখে হাত দুখানা নেড়ে বলে—"হিঁ মা, আমি হাজলা-ঠাউল হবে। জয় বাবা বুড়ো শিবির জয়।"

স্বামী পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে বুকখানা ভরে ওঠে সুবাসীর। অনেক কিছু ঘোর-প্যাঁচ সে জানেনা। সাদাসাটা

মানুষটা। রাগ-বিরাগের অনুভূতিগুলো বড়ো ভোঁতা। চৌদ্দ দিন খেটে চলেছে। কিন্তু মুখে কোনো প্রতিবাদ নেই। মনে তার কোনো ক্ষোভ-দুঃখও নেই। সংসারের সবচেয়ে বড়ো পাওনা সে পেয়েছে। দেবতার মতন স্বামীর ভালবাসা আর কোলভরা সন্তানের মাতৃস্নেহে বুকটা তার ভ'রে গেছে। আর কিছু চায় না। তার সীমাবদ্ধ অনুভূতির মধ্যে এতো সুখ যেন সে ধ'রে রাখতে পারেনা।

নারায়ণের কথা শুনে সুবাসীর মুখও হাসিতে ভ'রে ওঠে। স্বামীর মুখের দিকে একবার তাকায়। পরক্ষণে চোখটা নামিয়ে নিয়ে নারায়ণকে বলে—"তা হবেনা? তোমাদের আর কি? ভাবনা চিন্তে তো নেই। বাপ-বেটায় মিলে হাজরা ঠাইর হয়ে সেরাসে সেরাসে খান সিদ্ধিতে করে ব্যাড়াও সে। আমি তো আছি শ'ড়া গাছের পেত্নী। ব'সে ব'সে তোমাগের সোংসারের ঘানি ঘুরোই।"

বলরাম হুকুম, ছেলে উপলক্ষ্য। লক্ষ্য সে নিজে। ফিরে দাঁড়িয়ে দু'পা এগিয়ে বলল—"তো চলোনা ক্যানো। দুক্ষো চলো। দুজনে মিলে এমন একখান রাধা-কিষ্টোর নীলে আঁকাবো যে সেরাসের লোক সব ধ' হয়ে যাবে।"

বলরামের কথা শুনে তাড়াতাড়ি ছুটে পালায় সুবাসী। বিশ্বাস নেই বাপু লোকটাকে এমনিতে তো বেশ ভাল-মানুষ। চ্যাংড়ামি ফচ্‌কেমির ধার ধারে না। কিন্তু হ'লে হবে কি! মাঝে মাঝে কি-যে পোকা নড়ে ওঠে। একেবারে লাজ-লজ্জার মাথা খায়।

ছেলেকে কাঁধে তুলে নিয়ে বলরাম হাসতে হাসতে চ'লে গেল স্নান করতে।

চান-টান শেষ ক'রে শুদ্ধ হ'য়ে একটু বাদেই বলরাম গিয়ে পৌঁছালো পুজো-খোলায়। সব দায়িত্ব এবার তাকে বুঝে নিতে হবে। সকাল থাকতেই পাটের পুজো শুরু হ'য়ে গেছে। চারদিকে লোকজন ঘোরাঘুরি করছে। বলরামকে দেখেই নকুল বালা ছুটে এলো। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলাটা যেন একটু ধরে গেছে। ভাঙা গলায় বলল—"বড়ো দেরী হয়ে গ্যালো তোর বলরাম! যে, যে, তাড়াতাড়ি সব যোগাড় যন্তর ক'রেনে। দেহিস্ বাবা, কোনো কাজে ক্যানো হেলা-ছেদ্দাটা না হয়।"

বলরাম পা ছুঁয়ে প্রণাম করল নকুল বালাকে। যে কাজের যা রীতি। নকুল গুরুলোক। বালা। তাকে প্রণাম না করলে দেহে মনে শান্তি আসবে কেন? কঠিন কাজে হাত দিতে যাচ্ছে বলরাম। তাই সবার আগে গুরুকে প্রণাম ক'রে মনে জোর আনতে হবে। আর সব কাজেই তো তাই। রক্তমাংসের শরীর তোমার। কতোটুকুই বা তার শক্তি। আর মন? তাও তো চঞ্চল। পদ্মপাতার জলের মতন সদা সর্বদাই কাঁপছে। টলমল করছে। কখনো ভয়ে। কখনো বা মোহে। সংসারে-ও দুটোর তো আর শেষ নেই। পথে-ঘাটে, ঘরের-বাইরে সব জায়গায় ওরা ফাঁদ পেতে বসে আছে। একটু ফাঁক পেলেই তোমাকে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরবে। দুটোর মধ্যে তেমন কিস্তেও বোধহয় বেশী নেই। একই কুচক্রের দেবী দুই নামে ঘুরে বেড়ায়। যখন তোমার কাছে সে ভয় হ'য়ে দেখা দেয়, তখন তোমার মনের সব শক্তিটুকুকে সে নিংড়ে নেয়। একেবারেই বেহাল ক'রে দেয় তোমাকে। ছিবড়ে হ'য়ে পড়ে থাকো তুমি। আর যখন সে মোহ হ'য়ে দেখা দেয়, তখন তার আগুন আরো বেশী। সে আগুনের জ্বালায় তোমার প্রাণ-পতঙ্গ ধ'ড়ে ধ'ড়ে মরে। আর সে তোমাকে ঝুরে ঝুরে খায়। সংসারের এই ভয় আর মোহ থেকে তোমাকে রক্ষা করবে কে? রক্ষা করবে গুরুজনের আশীর্বাদ। তাদের অভয়বাণী। তাদের মঙ্গল-কামনা তোমাকে সব ভয়ের মধ্যে সাহস দেবে। সব মোহের মধ্যে অচল অটল হ'য়ে থাকতে ভরসা দেবে।

বলরাম প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াতেই নকুল একখানা নতুন গামছা নিয়ে এলো। গামছাখানা দিয়ে ভালো ক'রে

মুখ বেঁধে দিল বলরামের। হাজরা-তলার ভোগ না দেওয়া পর্যন্ত এ-বাঁধন খোলা যাবে না। কথাও বলা যাবে না। গাজনের এ-বাঁধন হল বাক্-সংযমের প্রতীক। এর পরে বলরামের হাতে তুলে দেওয়া হ'ল চার পাঁচখানা বেত একত্র ক'রে বাঁধা পোড়া-ছড়ি।

সব সময় হাতে রাখতে হবে এ ছড়ি। আপদ-বিপদ, বাধা-বিঘ্ন যা আসবে, সব কিছু এই ছড়ির ঘায়ে সরিয়ে দিতে হবে হাজরা-সন্ন্যাসীকে। পানাহারেও অনেক বাধা-নিষেধ। ডাবের জল এবং সামান্য ফলমূল ছাড়া আর কিছু গ্রহণ করা চলবেনা। সম্পূর্ণ নিরাহীন হ'য়ে থাকতে হবে-দিন আর রাত্রিটা। নতুন হাঁড়ি কেনা হয়েছে। তাই দিয়ে বানানো হয়েছে ভিক্ষা-পাত্র। সেই ভিক্ষা-পাত্র হাতে নিয়ে হাজরা-সন্ন্যাসীকে গাঁয়ের বাড়ী বাড়ী ভিক্ষে করে বেড়াতে হবে। কথা বলা চলবে না। সব কাজই ইশারা ইঙ্গিতে সারতে হবে।

মুখ-বাঁধা হাজরা-সন্ন্যাসীকে নিয়ে এবার সকলে চলল হাজরা-তলায়। গ্রামের একেবারে শেষ সীমায় হাজরা-তলা। অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটা পোড়ো ভিটে। ঝড়ো-ঝড়ো তালগাছ, বাব্লার গাছ আর আশ্-শ্যাওড়ার ঝোপ জায়গাটাকে অন্ধকার করে রেখেছে। দিনের বেলাতেও একা একা সে জঙ্গলে ঢুকতে বুকের মধ্যে কাঁপন লাগে। ওদের দলটা ঝোপঝাপ পরিষ্কার ক'রে ঢুকলো গিয়ে মস্ত একটা শ্যাওড়া-গাছের তলায়। এ-জায়গাটায় প্রতি-বছর হাজরা-থান বানানো হয়। ভালো করে জায়গাটাকে নিকিয়ে-মুছিয়ে প্রকাণ্ড একটা ত্রিশূল আঁকল মাটিতে টক্‌টকে সিঁদুর দিয়ে। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল নকুল। নকুলের দেখাদেখি যে যেখানে ছিল সকলেই প্রণাম করল। নকুল হাত জোড় ক'রে চোখ বুজে বিড় বিড় ক'রে ব'লে চলল—"বাবা হাজরা ঠাউর, আমাদের সব দোষ-অপরাধ ক্ষ্যামা কর বাবা। তোমার অনুচরবর্গকে নিয়ে আ'সে তোমার থানে তুমি অধিষ্ঠেন হও। আর সন্ধ্যেবেলায় তোমারে আমরা ভোগ দেবো। তুমি তোমার ভোগ নিয়ে তুষ্ট হও।"

অন্তে আস্তে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলো নকুল বালা। তার পিছনেই হাজরা-সন্ন্যাসী বলরাম। একে একে আর সকলে।

এরই মধ্যে বেলা অনেকখানি বেড়ে গেছে। রোদে মাঠ খই হয়েছে। একহাতে মাটির হাঁড়ি আর অন্যহাতে বেতের ছড়িগাছা নিয়ে বলরাম এবার এগিয়ে চলল। গ্রাম-গ্রামের শেষ বাড়ীটা থেকে ভিক্ষে করা শুরু করতে হবে।

সারাদিন ধ'রে বলরাম ভিক্ষে করে বেড়াল। গ্রামের প্রতি বাড়ীতে ভিক্ষে নেয়ে যখন সে নিজেদের পাড়ায় পৌঁছালো, তখন বেলা গড়িয়ে এসেছে। কাঠফাটা রোদ্দুরে বাড়ী বাড়ী ঘুরে উঁচুরা যেন শুকিয়ে এসেছে। পেটের মধ্যে চনচন করছে। একটু জল পেলে ভালো হত। কিন্তু না। এখন জল খাওয়া চলবে না। একেবারে সেই সন্ধ্যেবেলায় একটুখানি ডাবের জল। তাছাড়া আর কিছু নয়। তার চেয়ে বরং আর কয়েকটা বাড়ী ঘুরে কোথাও বসে একটুখানি জিরিয়ে নেওয়া যাবে।

পুকুরের পাড়টা ঘুরে বলরাম গিয়ে পৌঁছালো পদ্মদের বাড়ীর দিকটায়। আশপাশের বাড়ীগুলো ঘুরে হাজির হ'ল পদ্মদের বাড়ী। সামনের দিকে ছোটো একখানা গোয়াল ঘর। তারপরেই গায়ে গায়ে লাগানো শোবার ঘর আর রান্নাঘর। গোয়াল ঘরের পাশ দিয়ে বলরাম গিয়ে দাঁড়ালো শোবার ঘরটার সামনে। কেউ কোথাও নেই। ঘরের এক কোনে শুধু একটা কুকুর শুয়ে শুয়ে ঝিমোচ্ছে। চৈত্রের রোদ্দুরে ঘর-দুয়োর গুলো খাঁ খাঁ করছে। নিঝুম হ'য়ে আছে চারিদিকটা।

বলরাম ভাবল, হয়ত বাড়ী নেই কেউ। মুখ বাঁধা। শব্দ ক'রে ভিক্ষে চাওয়া যাবে না। তাই অন্য বাড়ী যাবার

তবু নিঃশব্দে পা বাড়াল। কিন্তু একটুখানি এগিয়েই থমকে দাঁড়াল। বারান্দার এককোনে পাটকাঠি দিয়ে ঘেরা ছোটো একটা খুপ্‌রি। দরজার মুখটা এদিকে। রোদের আভায় খুপ্‌রীর ঘরোকার সমস্ত অংশটা স্পষ্ট হয়ে উঠল বলরামের চোখের সামনে। ছেঁড়া একটা চাটাই বিছানো। পদ্ম শুয়ে আছে। গাঢ় ঘুমে সমস্ত শরীরটা নেতিয়ে গেছে। এপাশ ফিরে শুয়ে আছে। বাঁ-হাত খানা মাথার নীচে ভাঁজ করা। বুকের একটা পাশ মাটির সঙ্গে লেপ্‌টানো। ডান হাতখানা কোলের কাছে এলিয়ে রয়েছে। অনাবৃত পিঠের একাংশ দেখা যাচ্ছে। আর তার নীচে দিয়ে দেখা যাচ্ছে পরিপুষ্ট একটি স্তন। নিটোল, মসৃণ। নিশ্বাসের টানে টানে একটু করে নড়ছে পদ্মর শরীরটা।

এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল বলরাম। বুকের যাতখানটা অনেকক্ষণ থেকে তেষ্টায় জ্বলছে। অসুখটা এবার যেন আরো তীব্র, অসহ্য হয়ে দেখা দিল। একবার চোক গিল্‌বার চেষ্টা করল। কিন্তু বলরাম বুঝতে পারল বুকের এ-অসুখটা শুধু তেষ্টার তাড়নায় নয়। পদ্মর ঐ অনাবৃত শরীরের দিকে তাকিয়ে আরো কি একটা যেন চন্‌মন্ করে উঠছে ওর শরীরের মধ্যে। অনেকদিন আগের একটা রাত্রির কথা মনে পড়ল। পদ্মর ঐ অপরূপ শরীরটা সেদিন ঘন হ'য়ে এসেছিল ওর বুকের মধ্যে।

একটা দোভার্ত জান্তব আকর্ষণ যেন বলরামকে টানতে লাগল পদ্মর দিকে। কিন্তু পরমুহূর্তে চমকে উঠে তাকাল নিজের শরীরের দিকে। তাকাল হাতের ভিক্ষাপাত্র আর বেতের ছড়িটার দিকে। মনের মধ্যে বিবেকের তীব্র দংশন অনুভব করল। ছি, ছি, একি করছে সে। হাজরা-সন্ন্যাসীর পবিত্র দায়িত্ব মাথায় নিয়ে একি পাপ চিন্তা তার মনে। তার পাপে সে-গ্রামের লোকের পাপ। সে যে আজ সমস্ত গ্রামের প্রতিনিধি। তার মনের পাপে যে গ্রামে অমঙ্গল নেমে আসবে।

—"বাবা বুড়ো শিব! তুমি আমায় ক্ষ্যামা করো বাবা!"

বলরাম এক নিমেষে জানলাটা থেকে সরে দাঁড়াল। —তাড়াতাড়ি পা বাড়াল সামনের দিকে।

হঠাৎ কুকুরটা ডেকে উঠল ঘেউ ঘেউ করে। সেই শব্দে ঘুম ভেঙে গেল পদ্মর। চমকে উঠে গায়ের কাপড়টা সামলে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়াতেই দেখে, ঘরের পাশের ছোটো পথটা দিয়ে দ্রুতপায়ে চলে যাচ্ছে হাজরা-সন্ন্যাসী বলরাম।

পদ্ম তাড়াতাড়ি বাইরে এলো। বলরামকে শুনিয়ে ডাকলো—"ও সন্ন্যেসী-ঠাউর, আমাদের বাড়ীর ভিক্ষে না নিয়ে চলে যাচ্ছো যে। নিয়েস্তর যে তাতে অমঙ্গল হয়।"

দাঁড়াল বলরাম। হাজরা-সন্ন্যাসী সে। সকলের বাড়ী থেকে তাকে ভিক্ষা মেগে নিতে হবে। কারো দেখে দেওয়া ভিক্ষা ফেলে যাওয়া অপরাধ।

পদ্ম তাড়াতাড়ি ঘরে গেল। বড়ো একটা বাটি ভর্তি চাল এনে নামিয়ে রাখল বলরামের পায়ের কাছে। বলরামের সমস্ত শরীর তখনো যেন কাঁপছে। চোখের চাউনীটা কেমন যেন এলোমেলো। ভয় পাওয়া পশুর মতন বড়ো বড়ো নিশ্বাস পড়ছে। আস্তে আস্তে বাটিটা তুলে চালগুলো ঢালল ঝোলিতে।

বলরামের দিকে তাকিয়ে পদ্ম অবাক হল। কি যুবক কে জানে! বাটিটা ফেরৎ নিতে গিয়ে তাকাল বলরামের মুখের দিকে। বলল—"তুমি বুঝি পলায়ে যাচ্ছিলে গোসাই। আমারে তুমি এ্যাতো ভয় পাও? তা কতো আর তুমি পলাতি চাও কও। আমি কি বাঘ না ভালুক, যে তোমারে একা পাইয়ে খেয়ে ফ্যালা-মি;"

বলরাম তাকাল পদ্মর মুখের দিকে। পদ্ম আর কোনো কথা না ব'লে মাথা নীচু করে ঘরের দিকে পিছন ফিরল।

টলতে টলতে বলরাম আবার এগিয়ে চলল।

ডোবো-ডোবো বেলার সময় কাঁটা-সন্ন্যাসের আয়োজন হল। শেষ্টদের বাড়ীর নীচে একটা ঢ্যাঙা খেজুর গাছ। কাঁটা ভর্তি ঝাঁকড়া মাথা। সবুজরঙের কাঁচা খেজুরের বড়ো বড়ো কান্দি ঝুলছে চারপাশে। গাছের গোড়ায় কাঁটা-সন্ন্যাসীর থান বানানো হয়েছে। ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা চারপাশে ভিড় করেছে। বড়োরাও এসেছে। একপাশে লাল দিয়ে দাঁড়িয়ে বউ-ঝিগুলোও হা করে দেখছে। কড় কড় করে ঢাক বাজছে। ঢাক থামলেই বালা টেনে টেনে সুর করে দেব-মহাত্ম্য ব্যাখ্যান করছে। খেজুর গাছটার একেবারে গোড়ায় দাঁড়িয়ে হাজরা-সন্ন্যাসী বলরাম। তেমনি মুখ বাঁধা। হাতে বেতের ছড়ি। ধূপের ধোঁয়ায় চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

একটু ঘুরে ঘুরে খেজুর গাছটাকে ঘিরে গোল হয়ে বসে আছে আট-দশজন। উবু হয়ে মাটির সঙ্গে মাথা মিশিয়ে অপেক্ষা করছে। মাথার কাঁপানো চুল বাতাসে উড়ছে। সারা দিন ওরা শুদ্ধ রয়েছে, শুদ্ধ মনে রয়েছে। নিরামিষ আহার করেছে। তেল স্পর্শ করেনি। ওরা হল কাঁটা-সন্ন্যাসী। বালাইয়ের মন্ত্র পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা মাতন দিতে শুরু করবে। তারপর বিদ্যুৎগতিতে খেজুর গাছের উপরে উঠে যাবে। চড়ে বসবে একেবারে গাছের মাথায়। কাঁটা পাতা সব দলে পিষে একাকার করে দেবে। কিন্তু ওদের পবিত্র শরীর। মন্ত্রের তেজে একটাও কাঁটা বিঁধবে না ওদের গায়ে। খেজুরের কান্দি থেকে মুঠো মুঠো করে খেজুর ছড়িয়ে দেবে ওরা চারপাশে। আর তলায় যারা রয়েছে তারা কুড়িয়ে নেবে। হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে খেজুর কুড়োতে। ও-খেজুর তো যে-সে খেজুর নয়। সাক্ষাৎ বাবা বুড়ো শিবের আশীর্ব্বাদী খেজুর। যে ঘরে রাখবে, তারই কল্যাণ। ওর দৌলতে সব আপদ বালাই ঘুরে মুছে সাফ হয়ে যাবে।

আনুষ্ঠানিক কাজকর্ম সব সারা হল। নকুল বালা এসে দাঁড়াল কাঁটা সন্ন্যাসীদের পাশে। ঢাকের শব্দ থামতেই চীৎকার করে টেনে টেনে মন্ত্র বলতে লাগল—

'পার্ব্বতী বলেন শুন দেব ত্রিলোচন।
কাঁটা-সন্ন্যেস করে লোক মুক্তির কারণ।
কাঁটা-সন্ন্যেস ক'রে যদি তোমার সেবক হবে।
পদ্ম হস্ত তুলে যাও কাঁটার উপরে।

সঙ্গে সঙ্গে আবার শুরু হল ঢাকের শব্দ। আর তারই সঙ্গে তাল রেখে গাছটাকে ঘিরে ঘুরে-ঘুরে কাঁটা সন্ন্যাসীরা উবু হয়ে মাতন দিতে শুরু করল। হাজরা-সন্ন্যাসী বলরাম সবেগে বেতের ছড়ি ঘুরিয়ে দিতে লাগল ওদের পিঠের উপর দিয়ে। তার হাতের মন্ত্রপূত ছড়ির স্পর্শ কাঁটা-সন্ন্যাসীদের কাঁটার খোঁচা থেকে রক্ষা করবে। পাক দিতে দিতে কাঁটা সন্ন্যাসীদের তিনচারজন উঠে গেল খেজুর গাছের মাথায়। কিন্তু একটু বাদেই দুজন নেমে এলো। যন্ত্রণায় মুখটা কুঁচকে গেছে। তাড়াতাড়ি ওদের ভীড়ের বাইরে নিয়ে যাওয়া হল।

কাঁটা-সন্ন্যাসের বাকী কাজটুকু কোনোমতে নমো-নমো করে সেরে দেওয়া হল। সকলেরই মুখে একটা অজানা আতঙ্কের ছায়া পড়েছে। লোকদুটোর হাত পা কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। কার পাপে এমনটা ঘটল। এ-ওর মুখের দিকে তাকায়। কিন্তু কেউ কাউকে দায়ী করতে পারেনা।

বলরাম নিঃশব্দে একপাশে এসে দাঁড়িয়েছে। অপবিত্র মনের পাপবোধটা তীব্র হয়ে উঠেছে মনের মধ্যে। গ্লানিতে ভিতরটা পুড়ছে। নকুল বালার চোখ এড়াল না। বলরামের দিকে চোখ পড়তেই সমস্ত ব্যাপারটা আঁচ করতে পারল। বলরামের মনে পাপের কালি। তার ছোপ এসে পড়েছে মুখেও। কিন্তু রাগল না নকুল। এখন রাগের সময় নয়। শান্ত মাথায় সব দিক সামলে এগিয়ে চলতে হবে। তা না হলে সে বালা হয়েছে কেন। সব আপদ-বালাই কাটিয়ে ওঠাই তো তার কাজ।

নকুল শিহরে গিয়ে দাঁড়াল বলরামের। বলরামের চওড়া কাঁধের উপর হাত রেখে ধমক দিয়ে বলল—"হুঁশিয়ার বলরাম। হুঁশিয়ার! মনের খবর তোমার আত্মার কানো? নাম জপ। বাবা বুড়ো শিবির নাম জপ। বলো—জয় বাবা বুড়ো শিবির জয়!"

এক নিমেষে বলরাম যেন মনের মধ্যে বল ফিরে পেলো। নকুল বালার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বুড়ো শিবের জয়ধ্বনি দিল।

দেখতে দেখতে সকলেরই মনের অবসাদটুকু কেটে গেল। একটু-আধটু ত্রুটী তো হবেই। এর জন্য তো আর কাজ আটকে রাখলে চলবে না। তাছাড়া, আজকের রাত্রের কাজ আরো বড়ো কাজ। হালরা-তলায় হালরা-ঠাকুরকে ভোগ দিতে হবে। এ-সময় মনের মধ্যে ভয়-অবসাদ আনলে চলবে কি করে?

সারাদিন ধরে হালরা সন্ন্যাসী বলরাম ভিক্ষা করে যে চাল পেয়েছে এবার তা রান্না করতে হবে। তারপর সেই রান্না করা খিচুড়ির হাঁড়ি নিয়ে যেতে হবে হালরাতলায়। গভীর রাতে। চারিদিকে জন-মনিষ্যির আনাগোনা যখন কমে আসবে। সঙ্গে লোকজন বেশী থাকলে চলবে না। বেতের ছড়ি দিয়ে খিচুড়ির হাড়িতে আড়াইটি পাক দিতে হবে। তারপর হাড়ি উপুড় ক'রে ঢেলে দিতে হবে কলা-পাতার উপরে। যে-কটা ভাত একবারে পড়বে, তার চেয়ে আর একটা ভাতও বেশী চালা চলবে না। সেই ভাতের সঙ্গে মেশাতে হবে ঘি। আর পোড়ানো পঞ্চাশ মাছ। সব কিছু দিয়ে নৈবেদ্য সাজাতে হ'বে। এর পরে হালরা সন্ন্যাসী ভাতের হাড়িটাকে ছুঁড়ে মেরে দিবেন দিকে। ঐ-হাড়ির ভাতে বড়ো পুণ্য। কিন্তু ও হাড়ি কেউ নাকি ধরতে পারে না। কোথা থেকে কোথায় যে হারিয়ে যায় হাড়িটা, কেউ আর তার হদিশ পায় না। সব কাজ হয়ে গেলে ফেরার পালা। কিন্তু ফেরার সময় বড়ো সাবধান। ভুলেও কেউ আর হালরাতলার নৈবেদ্যের দিকে তাকাতে পারবে না। সর্বনাশ তাহলে।

বারবার সবাইকে সাবধান করে দেয় বালা—"খবোদ্দার, পেরান যাবে, ওই পেছোন পানে চাবা না। চাইছো কি মরছো। চারদিশি বাবা বুড়ো শিবির অনুচরেরা ঘাপ্‌টি মা'রে বসে আছে। অশরীলি তেনারা। রক্ত-মাংসির চোখ নিয়ে তেনাদের তাহা যায় না। কিন্তুক আজকের দিনি তেনারা রূপ নেবে। মূর্ত্তি ধরবে। মূর্ত্তি ধ'রে আ'সে হালির হবে হালরা তলায়। তোমাদের দেয়া নৈবিদ্যি খাইয়ে তেনাদের আত্মার শান্তি হবে; কিন্তুক, ভোগ দিয়ে ভালোমানুষির মতন সরে আ'সো। রক্ত-মাংসির চোখ নিয়ে ও-দিশি আর তাকাবে না। খাওয়ার সোমায় তনাদের খনিকিবিদিত্তি খাতি দিও। বিরক্ত ক'রে না। তাতি সব্বোনাশ। পরাণ নিয়ে কেউ আর ফিরে আসতি পারবা না। হালরা তলায় যারা আর পরেরদিন যাহান যালায়। যাইয়ে থাকবা, এট্টাও ভাত নেই। নৈবিদ্যির ছিটে কোঁটাও নেই। আর তাতেই তো মঙ্গল। বোঝবা, দেবতা তিরিপ্ত হইছেন। তিরিপ্ত হ'য়ে তোমাদের ভোগের অন্নো পেরোন করিছেন। আর ভোগ যদি না সহলো, তাতি বুঝলে দেবতা রুষ্টো হইছেন। তোমাদের অনুষ্ঠানে ত্রুটি ঘটিছে।"

পহরখানেক রাতের সময় কয়েকজন মিলে চলল হালরা-তলায়। এবার দলে লোক বেশী নেই। জন-ছয়েকের বেশী হবে না। এই ভয়ত্তরালে রাতে হালরাতলায় ভোগ দিতে যাবার মতন বুকের পাটা কজনারই বা থাকে। তাই দুর্ধান্ত সাহসী আর শক্তিমান কয়েকজন ছাড়া একে একে সকলেই পিছিয়ে গেছে। নকুল-বুড়ো—বালা। তার না থেকে উপায় নেই। তাই তাকেও সঙ্গে আসতে হয়েছে।

দলটার একেবারে সামনে চলল হালরা-সন্ন্যাসী বলরাম। তার আর একহাতে খিচুড়ির হাঁড়ি। অন্যহাতে বেতের ছড়ি। বলরামের পাশ ঘেঁষে একটা লোক হারিকেন নিয়ে

চলেছে। তার পিছনে নকুল। হাতে ভোগের অন্যান্য জিনিষপত্র। বাকী লোকগুলো পিছনে গায়ে গা লাগিয়ে এগিয়ে চলেছে। একজনের কাঁধে ঢাক। মাঝে মাঝে বাজাচ্ছে। ঢাকের শব্দে গভীর রাত্রের নৈঃশব্দ্য যেন চিরে যাচ্ছে।

আস্তে আস্তে জঙ্গলের পাশে এলো সকলে। থমকে একবার থামল সবাই। মনে মনে মঙ্গলে যেন বুকে বল সঞ্চয় করে নিচ্ছে। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতেই সামনে বড়ো একটা বান্দার গাছ। লোকজনের সাড়া পেয়ে প্রকাণ্ড একটা পেঁচা বান্দার গাছের ডাল থেকে উড়ে গেল ওদের মাথার উপর দিয়ে। বুকের মধ্যে কেমন যেন কেঁপে উঠল সকলের। হারিকেনের আবছা আলোয় গাঢ় অন্ধকারটা আরো যেন ভয়ানক দেখাচ্ছে। আলো-আঁধারিতে বড়ো বড়ো গাছ গুলোর দিকে তাকালে বুকের মধ্যে দুম্‌দুম্‌ ক'রে ওঠে। ঝোপঝাড় গুলো সরিয়ে এগিয়ে চলল সবাই। একটু যেতেই পৌঁছে গেল হাজরা-তলায়। সকলে মিলে একসঙ্গে চীৎকার ক'রে ধ্বনি দিল—"জয় বাবা বুড়ো শিবির জয়।" —কড়কড় করে ঢাকি ঢাক বাজাল কিছুক্ষণ। বলরাম এবার খিচুড়ির হাঁড়ির মুখের সরাটা সরিয়ে ফেলল। বেতের চুড়িটা হাঁড়ির মধ্যে দিয়ে পাক দিল আড়াইটা। নীচে কলাপাতা আছে। সবেমাত্র হাড়িটা উপুড় করতে গিয়েছে। আর অমনি শ্যাওড়া-গাছের ও-পাশ থেকে জেগে উঠল একপাল রাত্রি-চর শিয়ালের বীভৎস চীৎকার—হুক্কা-হুয়া হুক্কা-হুয়া। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া সমস্ত বনভূমিকে শিরশির করে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। শিউরে উঠল বলরামের বুকের ভিতরটা। সমস্ত শরীর যেন থরথর করে কেঁপে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে ঝপ্‌ ক'রে মাটিতে প'ড়ে গেল খিচুড়ির হাড়িটা। কেউ চৌচির হয়ে গেল। ভাতগুলো ছিটিয়ে পড়ল মাটিতে। আর বলরামের মুখ দিয়ে প্রচণ্ড ভয়ে বেরিয়ে এলো একটা অমানুষিক আর্তনাদ।

দলের লোকগুলোর আগে থেকেই ভয় ধ'রে ছিল মনে। কিন্তু তবু এতোবড়ো ঘটনার জন্য যেন কেউ তৈরী ছিলনা। দুর্বোধ্য ভয়ে যে যেদিকে পারল এক নিমেষেই ছুটে পালাল।

তখনো শ্যাওড়া গাছটার ও-পাশ থেকে শিয়ালগুলো সমানে ডেকে চলেছে—হুক্কা হুয়া—হুক্কা হুয়া—। এবার ওদের মঙ্গব শুরু হবে।

(ক্রমশঃ)

Gram : DEVICE 28-2101/2

Please Contact

MECHANICAL ENGINEERING CO

PRIVATE LTD

5, MISSION ROW
CALCUTTA-1

FOR ALL TYPES OF TRAILERS,
TROLLEYS AND WHEEL BARROWS

: উপন্যাস :

কণ্ঠভরা বিষ

মিহির মুখোপাধ্যায়

বাইশ

পরের দিন সকালেই কালাচাঁদ এসে উপস্থিত। সঙ্গে দু'জন পাইক, আটবেহারার মকরমুখো পালকী। তখন সবে স্নান করে এসে আহ্নিকে বসেছিল ভারত।

কালাচাঁদ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় ডাক দিল—রায়মশাই আছেন।

তাড়াতাড়ি বাইরে এসে জবাব দিল রঘুনাথ—ছোটকর্তা আহ্নিকে বসেছেন।

—বলো দেওয়ানজী তলব দিয়েছেন—কটমট করে তাকিয়ে ছিল কালাচাঁদ। রঘুনাথও চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে রইল। আবার বললো কালাচাঁদ—কি হে, কানে গ্যালো কথাটা—

—খুব গ্যাছে, ছোট কর্তাও শুনতি পাইছেন—রঘুর কথায় বেশ ঝাঁজ।

কালাচাঁদ আরো কিছু বলার আগেই লোচন এসে উপস্থিত। দু'জনের ভাবভঙ্গি দেখে বললো লোচন,—কি হ'ল আবার, তোমার কি হলো-বিড়ালের মতো দেখা হলেই—আরে থাম্ তুই—কালাচাঁদ ধমকে উঠল—কোথাকার বাঙাল গেঁয়ো ভূত, শহরে এসে মাথা গরম হয়ে গেছে। বাপের মুখে শুনেছে রঘুনাথ, তাদের দেশ নাকি ছিল পূর্ব-বাংলায়। সেই দেশ কোনদিন চোখে দেখেনি সে। জন্মেছে, বড় হয়েছে। কিন্তু কথা-বার্তায় পূর্ব-বাংলার টান রয়েছে কিছু। তাই বাঙাল বলে কেউ গাল দিলে রক্ত গরম হয়ে যায়। হুঙ্কার দিল রঘুনাথ—মুখ সামলে কইলাম—আর নড় হ'ল না, কাল রাত্তির থেকেই খেপেছিল কালাচাঁদ—তবে রে শালা—বলে একলাফে বারান্দায় উঠে এসে ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিল। রঘুনাথও সঙ্গে সঙ্গে এক ঘুষি মারলো কালোচাঁদের মুখে। মাথাটা সরিয়েও এড়াতে পারলো না, বেশ জোরেই লাগলো ঘুষিটা। মাথায় একটু লম্বা বলে কিছু সুবিধে ছিল কালাচাঁদের, বাঁ-হাত বাড়িয়ে খপ করে রঘুনাথের চুলের গোছা চেপে ধরলো। মুহূর্তে হৈ চৈ শুরু হ'ল। লোচন ছড়িয়ে দেবার জন্য—আহা করো কি করো কি - বলে দু'জনকে দু'পাশে ঠেলে দেবার চেষ্টা করতে লাগলো। চাকর-দারোগানেরা ছুটে এল। কাছারী-ঘর থেকে গোমস্তা গোপাল বক্সী মশাই এলেন। আহ্নিক ফেলে ভারতচন্দ্রও উঠে এলো।

রাজবল্লভ রায় তখন রাজবাড়ির দেরেস্তায় বসে অপেক্ষা করছিলেন। মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছেন। আর কিছুক্ষণ পরেই দরবার বসবে। মহারাজ কীর্তিচাঁদ নানা-জনের অভাব অভিযোগ শুনবেন। বিভিন্ন পরগণার খবরা-খবর নেবেন, আদায়-উশুলের হিসেব বঝুন করে দস্তখত দেবেন। কিন্তু তার আগেই ভারতচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। ভুরশুটে পরগণার ইজারদার নরেন্দ্রনারায়ণের বহাল থেকে ঠিকমত খাজনা আসছে না। এক সনের বাকি পড়েছে, আরেক এক সনেরও সময় এসে গেল। অথচ

চৈত্রের আগে টাকার ব্যবস্থা না হলে, খাজাঞ্চিখানায় টাকা জমা না পড়লে দেওয়ানজীকেই জবাব দিহি করতে হবে। বর্ধমান রাজসরকারে খাজনার টাকা জমা না দিলে কোন তালুকদার, কোন ইজারাদারই রেহাই পাবে না। উপর থেকে নবাব আলিবর্দির চাপ আসছে। নবাব-সরকারে সময় মত মালগুজারি দিতে হবে। যুদ্ধের আয়োজনের জন্য অনেক খরচ। নবাব বোধহয় উড়িষ্যায় অভিযান করবেন। দেখানকার নায়েব নাজির কৃষ্ণবল্লভ নাকি গোপনে মারাঠা বর্গিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিদ্রোহের চক্রান্ত করছে।

অসম্ভব নয়। কারণ কৃষ্ণবল্লভ হল সম্পর্কে সরফরাজের ভগ্নীপতি। নবাব তাঁকে ছোঁয়ার আঘাই। সুতরাং লড়াই বাধবে এবং বোধহয় বেশি দেরিও নেই। সৈন্য-সামন্ত, লোক-লস্করের বাইনে, যুদ্ধ, গোলাবারুদের দাম থেকে শুরু করে হাতি-ঘোড়ার খোরাকি—অঢেল টাকার ব্যাপার।

নবাব আলিবর্দিখাঁর টাকার দরকার। যুদ্ধের খরচ, নবাবী আদব-কায়দার খরচ। অনেক টাকার ব্যাপার। সে টাকা আসবে কোত্থেকে? আসবে এই সব পরগণা থেকে। রাজমহল আসামের সুবিধের জন্য নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ সারা বাংলাদেশ জরীপ করে সমস্ত জমি তেরোটি চাকলা আর ষোলশত পরগণায় ভাগ করে দিয়েছিলেন। বর্ধমান রাজের অধিকার সাতাত্তরটা পরগণায়, নবদ্বীপের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকার চৌরাশি পরগণায়। এমনি পরগণার অধিকার আছে বিষ্ণুপুরের, আছে নাটোরের।

মহারাজা কীর্তিচাঁদ ছাড়বেন না। খাজনার টাকা না পেলে সৈন্য পাঠিয়ে সম্পত্তি খাস দখল করে নেবেন। মহারাজার দরবার থেকে খাস দখলের হুকুম বেরোবার আগেই নরেন্দ্রনারায়ণের উচিত নজরানার নামে কিছু টাকা জমা দিয়ে সময় চেয়ে নেয়া। কিন্তু সময় নেবার জন্য অনেক তদির তদারক করতে হয়, অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হয়, দরবারে দেরেস্তায় অনেকবার হাঁটাহাটি করতে হয়। আমলা-কর্মচারীদের পান-তামাকের খরচা দিতে হয়। এ সব করে কে? নরেন্দ্রনারায়ণ নিজে অসুস্থ। ছেলেগুলি অপদার্থ।

ছোটছেলেকে আর মোক্তার নামা দিয়ে পাঠিয়েছে, সেতো একেবারে আনাড়ি। কাঁচা-বয়স, সুন্দর চেহারা, কথাবার্তায় ভদ্র, সৌম্য বটে, কিন্তু কেমন যেন ঢিলে-ঢালা। বিষয়-সম্পত্তির কাজে তেমন চতুর মনে হয় না। বিদ্যাধর বলেছিল, ছেলেটা নাকি ভাল লেখা-পড়া জানে, আরবী-ফারসী শিখেছে অনেক শাস্ত্র-টাস্ত্র পড়েছে। আবার নাকি কাব্য রচনাও করতে পারে। এসব কবি-কবি ভাবের ছেলেমানুষ দিয়ে কি আর বিষয়-সম্পত্তির কাজ হয়।

রাজবল্লভ রায় দেরেস্তা থেকে বেরিয়ে টানা বারান্দা ধরে দরবারের দিকে যাবেন। শাল-দোশালা গুছিয়ে বারান্দায় বেরিয়েছেন, পেছনে খাস মুনসী যষ্ঠীপদ হাতলার দলিল-দস্তাবেজ নিয়ে আসছে।

এমন সময় দেউড়ির বাইরে আট-বেহারার পালকি এসে থামল। দেওয়ানজীর পালকি আর পালকির সামনে কালাচাঁদকে দেখে দারোয়ানেরা পথ ছেড়ে দিল। ভারতচন্দ্র কিন্তু পালকি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে দেউড়ির ভেতরে এল। বিশিষ্ট কেউ না হলে পালকি, হাতী কিম্বা ঘোড়ায় চেপে রাজবাড়ির সিংহ দরজার ভেতরে আসতে পারে না। আমার অনুমতি দেওয়া হয় না। সাধারণ কোন ইজারাদারের আম-মোক্তারের পক্ষে পালকি চেপে দেউড়ির ভেতর আসার কথা নয়। কিন্তু দেউড়ির দারোয়ানেরা জানে এই সুন্দর চেহারার যুবকটি ফুরফুরের রাজার ছেলে, দেওয়ানজীর নিকট আত্মীয়। না হলে দেওয়ানজী নিজের পালকি পাঠাতেন না। ভারতচন্দ্র কিন্তু সে সুযোগ নিল না। দেউড়ির বাইরেই পালকি থেকে নামল। পায়ে হেঁটে দেরেস্তার দিকে চলল। বড়লোকের এই সমাদরের কোন স্থায়ীত্ব নেই, স্থিরতা নেই। 'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণেক হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।'

বড়বাবুদের খাতির বাসির বাঁধের মতো। কখনো মাথায় তুলে হাতে চাঁদ এনে দিল, পরক্ষণেই হয়তো হাতে ঘড়ি গুঁজে পায়ের নিচে নামাল। ভারত তাই নিজের ওজন বুঝে চলে। সিংহদরজা পেরিয়ে অনেকটা হেঁটে আসতে হয়। দূর থেকে দেওয়ানজীর সঙ্গে চোখাচোখি হতে হাত তুলে মাথা নিচু করে নমস্কার দিল, কাছে এসে হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিল। রাজবল্লভ রায় আবার সেরেস্তার পাশে খাস-কামরায় এসে ফরাসে বসলেন, বসতে বসতে রুক্ষস্বরে বললেন—এত দেরি কেন, এদিকে দরবারের সময় হয়ে গেল—

—আজ্ঞে আর বলবেন না, আমার চাকর রঘুনাথটা একটু গোঁয়ার, কালাচাঁদের সঙ্গে ঝগড়া করেছে, তাই মেটাতে—পেছন পেছন মাথা নিচু করে ভারত এসে ঘরে ঢুকল।

রাজবল্লভ রায় বললেন—ওরকম গোঁয়ার-গোবিন্দ লোক রাখো কেন, এ জায়গার নাম হল বর্ধমান, বাংলা মুলুকের নামকরা শহর বর্ধমান, এখানে থাকতে হলে তেমন সহবত শেখা দরকার, থাকলে ওসব কথা শোনার সময় নেই এখন, আসল কথা বলো, টাকার কোন ব্যবস্থা করতে পেরেছো? গেল সনের খাজনা দাওনি, আরো এক সনের সময় হয়ে গেল—হাত জোড় করে বললো ভারত—আমার বাবার খুব অসুখ, আপনি আর দুটো মাস সময় দিন—

—তোমার বাবার অসুখের অজুহাত শুনছি আজ একবছর ধরে, আহা থামো, আমাকে কিছু বোঝাতে এসো না, মানছি তোমার বাবা অসুস্থ, কিন্তু তোমার দাদারা কি করছে, তারা কেউ এসে আমার সঙ্গে দেখা করছে না কেন, আমি মহারাজাকে কি বলবো—হাত তুলে ভারতকে থামিয়ে দিয়ে চড়া গলায় বললেন রাজবল্লভ রায়। কর্সা মুখ উত্তেজনায় লাল। দেওয়ানজী রেগে গেছেন। আশ-পাশের আমলা কর্মচারীরা তটস্থ হয়ে উঠল। ষষ্ঠীপদ দরজার পাশে একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। হুঁকোবরদার তাড়াতাড়ি গড়গড়ার তামাক সেজে নলটি হাতে দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

গড়গড়ার নলে বারকয়েক জোরে জোরে টান দিয়ে আবার বললেন দেওয়ানজী—আমি আগেই জানতুম, ও সম্পত্তি তোমরা রাখতে পারবে না, তোমার বাবাতো মহারাণীকে গালাগাল দিয়ে সম্পত্তি খোয়াল, তখন তুমি নিতান্তই শিশু, তোমাদের কুল-পুরোহিত গোবর্ধন ভট্টাচার্য পরমধার্মিক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, তিনি এসে আমাকে ধরে পড়লেন, তাবলুম সাক্ষাৎ ভাইপো নয়েন, মনে মনে আমাকে যাই ভাবুক, আড়ালে যাই বলুক, এক বংশের রক্ত আমাদের, আমার বাবার বংশ তিবিরী হয়ে যাবে, তাই দিয়ে মহারাজাকে বোঝালুম, মহারাণীর কাছে ধরবার করলুম, ক্ষমা-টমা চেয়ে একরকম হাতে পায়ে ধরে তিনটে মহাল ইজারা দেবার বন্দোবস্ত করলুম—একটু সময় চুপচাপ তামাক টানতে লাগলেন।

মিনমিন করে বললো ভারত—আমিতো জানি সবই, আপনার দয়া—

—আহা থামো তুমি—দেওয়ানজী আবার হুঙ্কার দিলেন—সব জেনে আর করতে পারলেটা কি, তোমার বাবা-দাদারা অপদার্থ আর তুমি হচ্ছ দারিদ্র-জ্ঞানহীন নির্বোধ, সামনে পৌষপাল, ধানের সময়, এখন যদি টাকার ব্যবস্থা করতে না পার, তবে আর কবে করবে, নজরানার নাম করে কিছু টাকা ধরে দিতে পারলেও সময় নেবার মুখ থাকতো, আমি এখন মহারাজাকে কি বোঝাব—বিপন্নমুখে বললো ভারত—আমি চেষ্টা করে দেখি যদি কোথাও ধার পাই—

—আহা থামো তুমি, ওসব কথা আমাকে বুঝিওনা—দেওয়ানজী গড়গড়ার নল সরিয়ে রেখে উঠলেন, উঠতে উঠতে বললেন—কে তোমাকে ধার দেবে, এই শহরে কে চেনে তোমাকে, এখানে কি তোমার কোন তালুক-মুলুক আছে, না তোমার ঘরে সোনা দানা আছে যে তাই দেখে—

পায়ে জরির নাগরা, কাঁধে পাঠকরা শাল, বাইরে যেতে যেতে বললেন—আমি এখন দরবারে যাচ্ছি, ফিরে না আসা

পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা করবে। ব্যস্তভাবে দরবারের দিকে চলে গেলেন রাজবল্লভ রায়। পেছন পেছন দেওয়ানজীর খাস-মুনশী ষষ্ঠিপদ হালদার।

দেউড়ির সামনে টানা বারান্দার একপাশে খানকয়েক জলচৌকি পাতা ছিল। যাওয়ার প্রতীক্ষায় কেউ এসে বসে এখানে। তারই একটার ওপর পাশে হাত দিয়ে অসহায়-ভাবে বসে রইল ভারত। কোনদিকে কোন পথ দেখছে না। বিদ্যাধর এখানে থাকলে হয়তো একটা উপায় বার করতো। আজ প্রায় ছয়মাস হল বিদ্যাধর মুর্শিদাবাদ গেছে। ওখানে নাকি রেশম আর সোরার কারবারে খুব লাভ। সেই মতলবে ঘুরে গেছে বিদ্যাধর। নয়তো এতদিন দেরি করবার কথা নয়। কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠিতে নাকি সোরা সরবরাহের চুক্তি নিয়েছে। মাঝে মাঝে খবর আসে। হাতি আসে, হাত-চিঠা আসে সোমস্তা গোপাল দত্ত মশাইয়ের নামে। তাঁর মুখ থেকেই বিদ্যাধরের খবর পায় ভারত। নবাব আলিবর্দি খাঁ বোধহয় উড়িষ্যা অভিযানে যাবেন। নবাব মুর্শিদাবাদ থেকে বেরোবার পর হয়তো বর্ধমানে ফিরে আসতে পারে বিদ্যাধর। কিন্তু কবে নবাব মুর্শিদাবাদ থেকে বেরোবেন, তারপর কবে বিদ্যাধর ফিরবে, তার সঠিক খবর কে দেবে? গত দুইবারে ষষ্ঠিপদ ফিরে এসে খবর দিয়েছে। দেওয়ানজীর খাস-মুনশী ষষ্ঠিপদ হালদার। অমৈক গোপন খবরের তল্পীদার। বেটে খাটো গোলগাল মানুষটি। শ্যামলা রঙ, কদম ছাঁট চুল, কপালে শ্বেতচন্দনের ফোঁটা। সব সময় হাসি হাসি মুখ। কোন বিশেষ কথা, গোপন কথা বলার সময় বাঁ-চোখটা ছোট করে বলে। বাবা নিচু করে বসেছিল ভারত। বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছিল।

ষষ্ঠিপদ এসে বললো—আর কি ভাবছেন রায় মশাই, আপনার তো হয়ে গেল—

—অ্যাঁ কি, হ'ল—চমকে চোখ তুলে তাকাল ভারত।

—মহারাজার হুকুম হয়ে গেল, আজ থেকে বর্ধমান শহরের বাইরে এক পাও যেতে পারবেন না আপনি, রোজ সকালে দরবার-বসবার আগে দেওয়ানজীর সামনে হাজিরা দিয়ে যাবেন।

—সে-কি হঠাৎ এমন হুকুম হল কেন—উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল ভারত, মুখ শুকিয়ে গেছে।

—কেন হবে না, আপনি ঠিকমত দরবারে হাজির থাকেন না, দেরেস্তারও আসেন না—বাম চোখ ছোট করে বললো ষষ্ঠিপদ—আপনি হলেন ভূবণ্ডট পরগণার আধ-মোক্তার আপনার কত দায়িত্ব, দেখুন গে অন্য সব পরগণার মোক্তার, ইজারাদার, তালিলদারদের কাজ-কারবার, তারা কত খোঁজ-খবর রাখে, মোটা টাকা নজরানা দেয়, দেরেস্তার আমলাদের পান-তামাকের খরচা দেয়, দারোগান-চাপরাশিদের বখশিশ করে—ষষ্ঠিপদের গোলগাল মুখের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল ভারত। যে নামই যাও, নজরানাই বলো, পান-তামাকের খরচাই বলো কিম্বা বখশিশই বলো আসল নাম হ'লো ঘুষ। দেউড়ির দারোগান থেকে শহরের দেওয়ানজী—সবাই ঘুষ চায়, ঘুষ পায়। ঘুষ না পেলে, পাঁচরকম কম্মী করে অথবা হয়রাণ করবে, নাস্তানাবুদ করবে। একদিনের কাজে একবছর ঘোরাবে। মুর্শিদাবাদের নবাব-সরকারই হোক কিম্বা বর্ধমানের রাজ-দরবারই হোক—সব জায়গায় একই রেওয়াজ। এমন কি দিল্লীর বাদশা মুহম্মদশাহ পর্যন্ত ঘুষ খায়। নজরানার নামে যে চুয়াশি লাখ টাকা দিয়ে নবাবী করবার পেলেন মুহম্মদ আলিবর্দি খান বাহাদুর মুহম্মদজঙ্গ, আসলে সে টাকাটোতো ঘুষ। চুয়াশি লাখটাকা ঘুষ দিয়ে সুবে-বাংলার মসনদ কিনে নিলেন আলিবর্দি খাঁ। যে-আইনী বিদ্রোহ আইন ঘোষণাবেক হ'ল। টাকা দিয়ে যা হয় সব কেনা যায়—ধর্ম, বিশ্বাস, বিবেক, সততা। বুধাই সরকরাজের সেনাপতি গাউস মহম্মদ খাঁ সততার সঙ্গে লড়াই করে প্রাণ দিল। বুধাই গিরিয়ার

যুদ্ধে বারো বছরের বালক জালিমসিংহ ধর্মরক্ষার জন্য পিতার মৃতদেহ আগলে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছিল, লড়াই করেছিল। তবু এমনি দুএকটা মানুষ এখনো থাকে থাকে সংসারের সাধারণ আইন কানুনের বেড়াজাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে, সমস্ত লোভ-লালসার উপরে মাথা তুলে দাঁড়ায়। গাউস বহুদ্দরের মতো সেনাপতিরা, জালিম সিংহের মতো সন্তানরা আছে বলেই হয়তো সমাজ-সংসার রসাতলে যায়নি। এখনো চন্দ্র সূর্য ওঠে, দিন রাত্রি হয়। নাহলে সমাজের ভেতর এত অন্যায়, এত অবিচার, এত পাপ জমেছে যে এক এক সময় যেন প্রলয় হয়ে আসে ভাগ্যচক্রের। বড় ঘেন্না হয়, সমাজের ওপর, মানুষের ওপর, এমনকি নিজের ওপর। দু'মুঠো অন্নের জন্য, শুধুমাত্র খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্য দিনের পর দিন কি নীচতা, কি হীনতা তাকে সহ্য করতে হচ্ছে। আরো কতদিন করতে হবে কে জানে। একএক সময় মানুষের মুখ দেখতে ঘেন্না করে, মনে কি আয়নায় নিজের মুখ দেখতেও ঘেন্না হয়। এক এক সময় ইচ্ছে করে কোথাও পালিয়ে যায়। যেখানে মানুষ নেই, শহর নেই, শহুরের রাজনীতি নেই, সরকার নেই, দেওয়ান নেই, জমিদারী নেই, ঘুষ নেই, লোভ নেই, লালসা নেই। কিন্তু তার যে হাত পা বাঁধা। বাপ নরেন্দ্রনারায়ণ তাকে বিশ্বাস করে পাঠিয়েছেন, মাথারা তার উপর নির্ভর করে আছেন। সেই বিশ্বাসের মর্যাদা, সেই নির্ভরতার মূল্য সে নষ্ট করবে কি করে? সব ছেড়েছুড়ে চলে যাবার কোন উপায় নেই তার। এবং উপায় নেই বলেই বিপন্ন সুরে বললো ভারত—কিন্তু ছুরতও যেতে না পারলে আমি টাকা আনবো কি করে আর কমপক্ষে কত টাকা হলে—

—আপনার যাবার দরকার কি, বিশ্বাসী কাউকে পাঠান—বাঁ চোখ ছোট করে পরামর্শ দিল ঘটিপদ—মজুরানার জন্য কমপক্ষে হাজার দুই আর উপরি খরচাবাবদ হাজারখানেক, মোটমাট এই হাজার তিনেক নিয়ে আসুন, দেওয়ানজীর কাছ থেকে একপক্ষ সময় চেয়ে নিন, সে ব্যবস্থা আমি করে দেব—

গোপাল হাসি-হাসি মুখে তাকিয়ে আছে ঘটিপদ। শ্বেতচন্দনের কৌটা শুকিয়ে কপালের ভাঁজে ভাঁজে কেমন ফেটে ফেটে গেছে।

লোচন তখন বলছিল—ভাই রঘু, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা রাখ, শহর বলে কথা, খুব খারাপ জায়গা, একি তোমার দেশের পাড়াগাঁ, এখানে কি এত গরম হলে চলে—

কোন জবাব দিল না রঘুনাথ। জবাব দিলেই কথায় কথা বাড়বে। কথা কাটাকাটি হবে। লোচনদাস মানুষটা সুবিধের নয়, দেওয়ানজীর চর। কোন মতলবে এসব কথা তুলছে কে জানে। রঘুনাথ তাই চুপচাপ রোদ্দুরে বসে সারা গায়ে সরষে সজনের তেল মাখছিল। সকাল বেলাই মারামারি করে পা-হাত-পা ব্যথা হয়েছে। ভাল করে তেল মেখে সরকার-বাড়ির কুয়োতলায় পরিপাটি চান করতে হবে। তারপর রান্নার ব্যবস্থা।

ছোটকর্তা ফিরে এলে রান্না করবেন। হয়তো ফিরতে দেরি হবে। তার আগেই চালডাল ধুয়ে, কুটনো কুটে রাখতে হবে। সকালবেলাই অতিথিদের জন্য চালডালের সিধে নিয়ে আসে লোচনদাস।

রান্নার কাঠ থেকে শুরু করে

জিনিষ রোজ দিয়ে যায়।

আজ দিয়েছে দু'জনের মতো সরু চাল, কাঁচামুগের ডাল, একফালি লাউ, আধসেরের মত পাকা কুইএর টুকরো, দুটো বেগুন, একপো সরষের তেল, একটু ঘি, একসের দুধ, বাতাসা। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে খুব বাছ-বিচার ছোট কর্তার। খাসে তেমন রুচি নেই, সবরকম মাছও খেতে চান না, সবজাতের তরি-তরকারিও খাবেন না। মোটামুটি লাউ, বেগুন, মুলো, কচু, কাচকলা আর দুতিনরকম শাক পছন্দ করেন।

সব নিজের হাতে রান্না করবেন। রান্নাটিও করেন চমৎকার। পাকারাঁধুনীরাও হার মানবে।

শহরের বাজারে নতুন রকম তরকারি দেখেছে রঘুনাথ। কিরিচি বেগুনের আমদানী। আলু আর বিলিতি বেগুন। বিলিতি বেগুনগুলি দেখতে বেশ। গোল গোল, লাল লাল। কিন্তু খেলে নাকি খোস-পাঁচড়া হয়।

বামুন পণ্ডিতদের মুখে শুনেছে রঘুনাথ। আর আলু খেলে নাকি মেদবৃদ্ধি হয়, বহুমূত্র হয়, বায়ুর প্রকোপ হয়, কামভাব প্রবল হয়। কথায় বলে, আলুর গোদ। ছোটকর্তাও তাই বিশ্বাস করেন। অনেক শাস্ত্র পড়েছেন ছোটকর্তা। তাঁর কথা মিথ্যে হয় না। কিন্তু লোকে কি আর শুনছে না। বামুন পণ্ডিত মশাইরা যাই বলুন, যাই বিধান দিন। শহরে-বন্দরে অনেক বড় বড় হিন্দু গেরস্থের ঘরেই আলু ঢুকেছে। কিছুকাল পরে হয়তো বিলিতি বেগুনও ঢুকবে। এই তিনবছর বর্ধমান শহরে থেকে অনেক কিছু দেখেছে রঘুনাথ। ছোটকর্তার কাছাকাছি থেকে অনেককিছু শিখেছে, অনেক কিছু জানতে পেরেছে।

স্নান করে এসে রান্নার যোগাড় করল রঘুনাথ। কুটনো-কুটল, বাছ কুটলো, মশলা বাটল। তারপর কুয়োতলায় গেল চাল ডাল ধুতে। খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরে লম্বা এক ঘুম দিতে হবে। মনমেজাজ ভাল নেই, শরীরও ভাল যেতে না। সন্ধ্যে বেলা মিশিরজী সিদ্ধি ঘুটে সরবত বানায়। আজ একলোটা সিদ্ধির সরবত খেতে হবে। সিদ্ধি খেলে যদি শরীরের ব্যাথা কমে। কুয়োতলা থেকে ফিরে দেখল, ছোটকর্তা এসে গেছেন। মুখ চোখের চেহারা ভাল নয়। রঘুনাথকে দেখে বললো ভারত—তাড়াতাড়ি রান্না খাওয়া শেষ করে নে, তোকে এখুনি ভুরশুট যেতে হবে—

—সে কি, হঠাৎ কি জন্যি—খুব অবাক হ'ল রঘুনাথ।

তাকে ঘরের ভেতর ডেকে নিয়ে চুপিচুপি সব বললো ভারত। তিন হাজার টাকা চাই। নজরানার নামে ধরে দিতে হবে। তা হলে আরো তিন মাসের মত সময় পাওয়া যাবে। তারপর দু'সনের খাজনা একসঙ্গে দিতে হবে। হয়তো কিছু খাজনা কিছু মাপও হতে পারে। সবই দেওয়ানজীর মেজাজ-মর্জির উপর নির্ভর করছে। নজরানার টাকা আনার জন্য আপাততঃ একপক্ষকাল সময় দিয়েছেন দেওয়ানজী।

উপায় থাকলে ভারত নিজেই যেতো। কিন্তু বর্ধমান শহরের বাইরে যাবার হুকুম নেই। এরপর টাকা দিতে না পারলে হয়তো দোলাইচণ্ডি করেদ করে রাখবে। দেওয়ানজীর অসাধ্য কাজ নেই। বাড়িতে সব কথা খুলে বলবে রঘুনাথ। তারপর যেভাবেই হোক টাকাটা যোগাড় করে নিয়ে আসবে।

তাড়াতাড়ি রান্না খাওয়ার পাট চুকিয়ে, দুপুরের শেষে রওনা হল রঘুনাথ। মাথায় সেই লাল শালুর পাগড়ি। হাতে পাকা বাঁশের লাঠি। দেউড়ির কাছে লোচন জিজ্ঞেস করল—যাচ্ছ কোথায়?

কোন জবাব না দিয়ে দেউড়ি পার হল রঘুনাথ।

পেছন থেকে লোচন আবার জিজ্ঞেস করলো—আরে কথা বলছো না যে, বলি চললে কোথায়?

এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে জবাব দিল রঘুনাথ—তুমার তাতে কাম কি?

—আরে চটছো কেন, এমনি জিজ্ঞেস করলুম—

—ভুরশুট, যাচ্ছি—

—সে কি হঠাৎ, কবে ফিরবে—

—জানি না—হনহন করে চলে গেল রঘুনাথ। দেখতে দেখতে চোখের আড়াল হ'ল।

সন্ধ্যার আগেই খবর পেলেন দেওয়ানজী। দেওয়ান রাজবল্লভ রায় তখনো রাজ-বাড়ির সেরেস্তার পাশের খাস-কামরায় বসেছিলেন। কানাচোখে এসে খবর দিল—রঘুনাথ ভুরশুট চলে গেছে।

—কখন গেল?—দেওয়ানজী জিজ্ঞেস করলেন।

—আজ দুপুরের দিকে—

—ভাল করে নজর রাখবি, কবে ফিরে আসে লক্ষ্য করবি—

—আমি ওকে শেষ করে দেব—দাঁতে দাঁত চেপে বলল কালাচাঁদ।

দেওয়ানজী চোখ পাকিয়ে চাপাগলায় ধমক দিলেন—খবরদার এখন কিছু করতে যাবনা, যদি পারিস—নিচুগলায় প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে কয়েকটা কথা বললেন। মাথা নেড়ে নেড়ে সায় দিল কালাচাঁদ। তারপর নমস্কার করে নিঃশব্দে চলে গেল।

তেইশ

পরের দিন সন্ধ্যার কিছু পরে পাতুরা পৌঁছুল রঘুনাথ। আগের দিন শেষ বেলায় বর্ধমান থেকে রওনা হয়েছিল। তারপর সারারাত সারাদিন দ্রুতপায়ে পথ চলেছে। পথে কোথাও বিলম্ব করেনি। শুধু শেষ রাতের দিকে পথের পাশে এক আম গাছের নিচে কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম করেছিল।

অসুস্থ নরেন্দ্রনারায়ণ অন্দরে ছিলেন। রঘুনাথের ডাক পড়ল সেখানে। দোতালায় শোবার ঘরের সামনে টানা বারান্দা। আগে কখনো অন্দরের দোতালায় আসেনি রঘুনাথ। ছোটবেলায় দুএকবার ছাড়া বড় হয়ে অন্দরের দিকে আসেনি কোনদিন। আবছা অন্ধকার বারান্দা। ডানদিকে দেয়ালে পদ্মের কাজ। বাঁদিকে মোটা মোটা থাম, দুই থামের মাঝে রঙিন কাঠের গরাদ-বসানো ঝুলবারান্দা ঘেরা। মাথার উপর কিছু ঘুরে ঘুরে কয়েকটা ঝাড়বাতি ঝুলছে বটে, কিন্তু কোন আলো নেই। শুধু রাজা-মশাইর শোবার ঘরের সামনে একটি দেয়াল-গিরি জ্বলছে। আগে আগে যাচ্ছেন বড়কর্তা চতুর্ভুজ রায়। পেছন পেছন রঘুনাথ।

ঘরের ভেতর কারুকাজ করা মস্ত এক পালঙ্কের উপর আদশোয়া ভাবে বসেছিলেন নরেন্দ্রনারায়ণ। পেছনে পিঠের দিকে কয়েকটা তাকিয়া বালিশ পর পর উঁচু করে সাজানো। গায়ে গরদের কামিজ, দামী বালাপোষ।

পালঙ্কের পাশে একটা ছোট চৌকির উপর রুপোর গড়গড়া, রুপোর সেলাসে জল। একটা রেকাবিতে কিছু কাটাফল, পানের ডিবে, পিকদান—সবরুপোর। কিছুদূরে এককোণে পেতলের দীপবৃক্ষের মাথায় ঘৃতসিক্ত তেলের পঞ্চপ্রদীপ।

দেওয়ালের গায়ে ঝুলন্তিতে শ্বেতপাথরের ধূপদানে কয়েকটি ধূপকাঠি পুড়ছে। বাতাসে হালকা সুগন্ধ।

চতুর্ভুজরায় পালঙ্কের একপাশে বসলেন। দরজার বাইরে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল রঘুনাথ।

মুখ তুলে তাকালেন নরেন্দ্রনারায়ণ। অসুস্থ দুর্বল দৃষ্টি, মুখের চেহারা শীর্ণ। জিজ্ঞেস করলেন—কিরে রঘু কেমন আছিস—হাত জোড় করে বলল রঘুনাথ—আজ্ঞে আপনের দয়ায় ভালই আছি—

—আয় ভেতরে এসে বোস্—রাজামশাইর কথামত ঘরের ভেতর এক পা এসে দরজার পাশে মাটিতেই বসল রঘুনাথ। নরেন্দ্রনারায়ণ বড়ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—হ্যাঁ, এবার বল সব খবর।

রঘুনাথের মুখে যে খবর শুনেছিলেন চতুর্ভুজ রায়, সব খুলে বললেন। তারও টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে।

তিন হাজার টাকা। শুধু নজরানা হিসেবে জমা দিতে হবে রাজ-সরকারে। দিলে হয়তো সনদ পাওয়া যাবে।

নতুবা সামনের চৈত্রেই দু'সনের বাকি খাজনার দায়ে সম্পত্তি খাস-দখল করে নেবেন মহারাজ কীর্তিচাঁদ।

একটু সময় চুপচাপ কি যেন ভাবলেন নরেন্দ্রনারায়ণ, শেষে জিজ্ঞেস করলেন—তহবিলে কত টাকা আছে?

—হাজার খানেকের কিছু বেশি হবে হয়তো—জবাব দিলেন চতুর্ভুজ রায়।

নিঃশব্দে বসে রইলেন নরেন্দ্রনারায়ণ। কি বলবেন বোধহয়

ভেবে পেলেন না। তাঁর ঘরে আজ তিনহাজার টাকারও সংস্থান নেই। ভুরশুট রাজ্যের দু'আনা অংশের মালিক ছিলেন তিনি। তাঁর সম্পত্তির আয় ছিল বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা। আরো জ্ঞাতি-গোষ্ঠিরা আছেন। গড়-ভবানীপুর, গড় গোপাল্লিয়ার তাদের বংশের আরো দুটো প্রধান শাখা। জ্ঞাতিরা কেউ কারো ভাল দেখতে পারে না। কারো সঙ্গে কারো সদ্ভাব নেই। শরিকানা বিবাদ লেগেই আছে। বর্ধমান-রাজ সব সম্পত্তি দখল করে নেবার পরেও কিছু ধান-জমি হাতে আছে। বছরের ধান-চাল আসে সেখান থেকে। দেবোত্তর সম্পত্তি থেকে পুজো-পার্বণের খরচা উঠে আসে। কোনরকমে তাই চলে যাচ্ছে। না খেয়ে মরতে হয়নি। তারপর বর্ধমান-রাজের সঙ্গে মিটমাট করে একরকম বাধ্য হয়েই মোটা টাকা খাজনা দেবার চুক্তিতে তিনখানা নতুন মহাল ইজারা নিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন আস্তে আস্তে আবার আগের অবস্থা ফিরে আসবে।

পাঁচবছর হল নতুন মহাল ইজারা নিয়েছেন নরেন্দ্রনারায়ণ। প্রথম দু'সনের খাজনা ঘর থেকেই দিতে হয়েছে।

তৃতীয় এবং চতুর্থ সনের খাজনা ভারতের যারফত জমা দিয়েছেন। কিছু ধার করে কিছু প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করে। পঞ্চম বছরের খাজনা জমা দিতে পারেন নি, তার উপর আরো এক সনের সময় হয়ে গেল।

নরেন্দ্রনারায়ণ দুর্বল হয়ে পড়েছেন। আগের মতো শক্তি নেই, ধারও নেই, পাইক-পেয়াদা, লোক-লস্কর নেই।

বর্ধমান রাজার সঙ্গে যুদ্ধে হেরে যাবার পর মান-মর্যাদা নষ্ট হয়েছে। প্রজারা আর মানতে চায় না, খাজ-পত্য করে না। তারা ভাবে দুদিন পরে এ সম্পত্তি হাত ছাড়া হবে, অন্য মালিক আসবে। দুর্বল নরেন্দ্র রায়কে খাজনা দিয়ে লাভ কি? নতুন মালিক এলে, তাকে আবার খাজনা দিতে হবে, আবার নজরানা দিতে হবে। কে এমন নির্বোধ আছে যে, দু'বার করে খাজনা দিয়ে লোকসানে যাবে। জ্ঞাতি-গোষ্ঠিরাও নানারকম চক্রান্ত করে, গুলব রটায়, উস্কানি দেয়।

গত সনে তেমন কিছুই আদায় হয়নি। নরেন্দ্রনারায়ণ অসুস্থ হয়ে পড়ায় গুলব রটনার আরো সুযোগ পেয়েছে ঈর্ষাকাতর জ্ঞাতিরা, পুরনো শত্রুরা। সামান্য যা কিছু আদায় হয়েছিল সবই খরচ হয়েছে তাঁর চিকিৎসার জন্য আর সংসারের প্রয়োজনে। আত্মীয়-কুটুম, আশ্রিত অভ্যাগতের অভাব নেই। বিপদের দিনে যারা কেলে পালিয়েছিল, নতুন মহাল ইজারা নেবার সংবাদ শুনে তারাই আবার পরম হিতৈষী হয়ে ফিরে আসছেন।

সামনে পৌষ মাস। আর কয়েকটা দিনের মধ্যেই চতুর্ভুজ, অর্জুন আর দয়ারাম আদায় উসুল করতে বেরিয়ে যাবে। মহালে মহালে ঘুরে খাজনা আদায় করবে পৌষ-মাঘ-ফাল্গুন পর্যন্ত। তারপর চৈত্রের প্রথমে বর্ধমানে খাজনার টাকা নিয়ে যাবে অর্জুন কিম্বা দয়ারাম, সঙ্গে থাকবে রঘুনাথ আর মুকুন্দ দিঙ্। কিন্তু তার এখনো তিনমাস দেরি। অথচ পনেরো দিনের মধ্যে টাকা চেয়েছে ভারত। টাকা না পেলে বিপদ হবে। হয়তো কয়েদ করে রাখবে। নরেন্দ্রনারায়ণ বললেন—যে ভাবেই হোক আরো দু'হাজার টাকার ব্যবস্থা করো—

চতুর্ভুজ রায় বললেন—একেবারে তহবিল শূন্য করে দেবেন, আরো কিছুদিন অপেক্ষা করলে হত না—

—কিন্তু অপেক্ষা করি কি করে, রঘু যা বললো—হাত বাড়িয়ে গড়গড়ার নলটি তুলে নিলেন নরেন্দ্রনারায়ণ—আর দেরি করলে হয়তো ভারতকে কয়েদ করে রাখবে—

—আমার মনে হচ্ছে কি জানেন, ভারতকে ছেলে মানুষ পেয়ে ভয় দেখিয়ে, ধমকা দিয়ে টাকাটা আদায় করার মতলব, টাকাটাও যাবে আসলে কাজ হবে না কিছু—চতুর্ভুজ রায়ের কথা শুনে চিন্তিত মুখে থেমে থেমে বললেন নরেন্দ্রনারায়ণ—তোমার কথা হয়তো ঠিক, কিন্তু রঘুর মুখে যা শুনলে—

—আজ্ঞে আমি ঠিকই কইছি—কথার মধ্যে হাতজোড় করে বলল রঘুনাথ—টাকা না পাঠালে ছোটকর্তার মুক্তিল হতি পারে, সেওয়ানজীর অসাধ্য কাম নাই—উদ্বেগে, উত্তেজনায় গলার স্বর কাঁপছিল রঘুনাথের।

চতুর্ভুজ রায় যেন বিরক্ত হলেন—আচ্ছা তুই এখন যা, আমরা ভেবে দেখি কি করতে পারি—

আবার প্রণাম করে নিঃশব্দে চলে এল রঘুনাথ, কিন্তু দুর্ভাবনা গেল না। রাজামশাই আর বড়কর্তার কথার নড়চড় ভাল ঠেকল না। তাদের হাতে টাকা নেই, চেষ্টা করেও পাঠাবেন কিনা সন্দেহ। রাজামশাইর নিজের কোন জোর নেই মনে হয়; বড় কর্তাই সব। তাঁর পরামর্শ মতই সব হবে। অন্দর থেকে ফিরে আসতে আসতে একটা উপায় ভাবল রঘুনাথ। রাণীমাকে সব বলতে হবে। নিজের ছেলের মতো তাকে স্নেহ করেন রাণী মা। তাঁর কাছে রঘুনাথের সব সময় খোলা দরজা। যখন খুশি যাবার হুকুম। রোজ সন্ধ্যায় আরতির সময় লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরে থাকেন ভবানী দেবী। আরতির পর ভোগ হয়, প্রসাদ বিতরণ হয়। তারপর রূপোর পালঙ্কে স্বামী বিছানায় ঠাকুরকে শোয়ানো হয়। মানুষের পাখার বাতাস দিয়ে মশারি ফেলা হয়। ঠিক মানুষের মত সেবা করা হয়। এই সাড়াটা সময় সেখানে থাকেন রাণীমা। নিজে সব তদারক করেন।

অতএব কেঁদে মন্দিরের দিকে গেল রঘুনাথ। সন্তু-ঝিকে বলে রাণী-মাকে খবর পাঠাল। মন্দিরের ভেতর তখন কাঁসর ঘণ্টার তুমুল শব্দ। ধূপের ধোঁয়ায় অন্ধকার। ভবানীদেবী বেরিয়ে এসে মন্দিরের রোয়াকে দাঁড়ালেন। রোয়াকের নিচে দাঁড়িয়ে পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করল রঘুনাথ।

—কিরে রঘু, তুই কখন এলি—ভবানীদেবী অবাক।

—এই কিছু আগে আলাম—চেঁচিয়ে জবাব দিল রঘুনাথ। কাঁসর-ঘণ্টার শব্দে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না।

—তারত কেমন আছে, তুই হঠাৎ এলি কেন, আচ্ছা চল্ ভেতরে চল্, এখানে কিছু শোনা যাচ্ছে না—

—রঘুকে নিয়ে আবার অন্দরে এলেন ভবানী দেবী। একতলার রান্নাঘরের রোয়াকে দাঁড়িয়ে সব খবর শুনলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন সব কথা। তারপর সন্তু-ঝিকে বললেন—সন্তু, রঘুনাথ রাতে খাবে, ওকে এখন কিছু মুড়ি-মুড়কি এনে দে, হাত মুখ ধুয়ে কিছু মুখে দে রঘু, আমি আসছি—

সোজা উঠে গেলেন দোতলায়, নরেন্দ্রনারায়ণের ঘরে। তখনো চতুর্ভুজ রায় সেখানে বসে পরামর্শ করছিলেন।

ঘরে ঢুকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন ভবানীদেবী—তোমরা কি ব্যবস্থা ঠিক করলে—

দুজনেই নির্বাক চোখে তাকালেন। একটু কেশে গলা সাফ করে, একটু নড়েচড়ে বসে জিজ্ঞেস করলেন নরেন্দ্রনারায়ণ—কোন্ ব্যবস্থার কথা বলছো তুমি—

—তারতকে টাকা পাঠাবার কি ব্যবস্থা করলে তোমরা—কঠিন গলায় উত্তর দিলেন ভবানীদেবী। যেন এখুনি একটা নিশ্চিত জবাব শুনতে চান তিনি। দেরি করলে চলবে না। অভাবের সংসার দেরী হলে আর টাকা পাঠানো যাবে না। দেরি করে গে টাকা পাঠালেও কোন কাজ হবে না। তারতের যা বিপদ ঘটার ঘটে যাবে। তিনজনেই অবস্থাটা বুঝতে পারছেন। কিন্তু উপায় কি।

নরেন্দ্রনারায় বললেন—তুমি কার মুখে শুনলে, রঘু বলেছে বুঝি—

—তোমরা যার মুখে শুনেছ, আমিও তার মুখেই শুনেছি, হ্যাঁ রঘুই বলেছে, এখন তোমরা কি বলবে শুনতে চাই—

ভবানীদেবীর কঠোর-কঠ শুনে ম্লানভাবে একটু হাসলেন নরেন্দ্রনারায়ণ, সান্ত্বনা দেবার মত সুরে বললেন,

—আহা তুমি এত উতলা হচ্ছ কেন, এ সময় অত অস্থির হলে কি চলে, মাথা স্থির রেখে—

—উতলা আমি মোটেই হইনি—নিরুত্তাপ গম্ভীর গলায় বললেন ভবানীদেবী—বাবা আমার খুব স্থির আছে, এখন ছেলেটার জন্ত তোমরা কি ব্যবস্থা করবে তাই শুনতে এলুম—

—দেখি ভেবে কি করা যায়, তুমি কি একাই ছেলের কথা ভাব্‌ছো, আমরা কিছু ভাবছি না বুঝি, শুধু ছেলে কেন, সম্পত্তি রক্ষার কথাও আমাদের ভাবতে হচ্ছে—স্বামীর কথা শুনে আবার দৃঢ় কণ্ঠে বললেন ভবানীদেবী—আমার কাছে ছেলে আগে, সম্পত্তি থাকুক ছাই না থাকুক, আমার কিছু যাবে আসবে না, কিন্তু ভারতের ভালমন্দ কিছু হলে আমি আত্মঘাতী হব, এই বলে দিলুম—

—অবস্থাটা না বুঝে তুমি রেগে যাচ্ছ, রেগে গেলে কোন আলোচনা হতে পারে না, কইরে হরিচরণ তোর তামাক সাজা হল—কথার শেষে চাকরকে ডাক দিলেন নরেন্দ্রনারায়ণ।

কল্কিতে ফুঁ দিতে দিতে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকল হরিচরণ। গড়গড়ার উপর কল্কি বসিয়ে রেখে বেড়িয়ে গেল।

চুপচাপ তামাক টানতে লাগলেন নরেন্দ্রনারায়ণ।

এবার চতুর্ভুজ রায় বললেন—কিন্তু বা, আমাদের হাতে তো এখন অত টাকা নেই, ভারত চেয়েছে তিন হাজার টাকা, অথচ বাজাকিখানার তহবিলে মজুত আছে মাত্র হাজারখানেক—

—ওই হাজারখানেকের উপরই আরো দু'হাজার টাকার ব্যবস্থা করতে হবে, দু'তিন দিনের মধ্যে—শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে অভাব দিলেন ভবানীদেবী—আমার গায়ের গয়না আছে, ঘরে কিছু সোনারূপোর বাসন আছে, তাই বিক্রি করে হোক, বন্ধক দিয়ে হোক—শেষ পর্যন্ত সেই ব্যবস্থাই পাকা হ'ল। নগদ এক হাজার সিক্কা টাকা, কিছু মোহর আর ভবানীদেবীর কিছু গয়না। গয়নাগুলি বর্ধমান শহরে বিক্রি করবে বা বন্ধক দেবে ভারত। সব জিনিষ পাটের বস্তায় তৈরী একটা থলির ভিতর ভরে কোমরের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে চারদিন পরে রওনা হল রঘুনাথ। মাথায় সেই লাল শালুর পাগড়ি, হাতে পাকা বাঁশের লাঠি। যাবার আগে অন্দরে এসে রাণী-মাকে প্রণাম করল।

চোখের জল মুছে আশীর্বাদ করে বললেন ভবানীদেবী—খুব সাবধানে যাবি বাবু, আবার ফিরে এসে আমাকে খবর দিয়ে যাবি, আমি খুব চিন্তায় রইলুম।

(ক্রমশঃ)

২০৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থিত গৌরবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীবিমলচন্দ্র মিত্র এম্‌ভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।